ভারতবর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষ

সূচীপত্র

[১ম খণ্ড—১৩২১ পৌষ হইতে ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ]

বিষয়নির্ব্বিশেষে বর্ণানুক্রমিক

প্রবন্ধমালা

শিল্প—কৃষি—বাণিজ্য

মৌলিক গবেষণা

অর্থনীতি

সমাজতত্ত্ব

ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শন

শাস্ত্রানুবাদ

সা—সমালোচনা

ইতিহাস—প্রত্নতত্ত্ব

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—দেশের বিবরণ

শিক্ষা

জীবনী

শোকসংবাদ-সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিবিধ

কবিতা—গাথা

গল্প—

প্রতিবাদ

উপন্যাস—ধারাবাহিক

পুস্তক পরিচয়

সঙ্গীত ও স্বরলিপি

ভারতবর্ষ—সূচি

দ্বিতীয় বর্ষ

[দ্বিতীয় খণ্ড—১৩২১ পৌষ হইতে ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ]

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক নামানুসারে

প্রবন্ধমালা

চিত্রাবলী

মনস্বিবর্গের প্রতিকৃতি

(পত্রাঙ্কানুক্রমিক)

স্থানীয় দৃশ্যাবলী

(পত্রাঙ্কানুক্রমিক)

পৃষ্ঠাব্যাপী

বহুবর্ণ চিত্র

মন্দির-আরতি

দ্বিতীয় খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

রুদ্র-বরণ

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

ক্ষুদ্র মোরা তবুও তার রুদ্ররূপে কভু না ডরি ;
বজ্রশিখা বক্ষে ধ'রে হাসিয়া গৃহকক্ষে বরি'।
মুণ্ডমালা কণ্ঠে যার, রক্তমাখা খড়্গ হাতে,
মণ্ডপে সে চণ্ডিকারে অর্চ্চি অমাবস্যা-রাতে।
প্রেতের যথা তাণ্ডবিত—পিশাচ যথা অট্টহাসে—
শবের পরে তথায় মোরা ডাক্‌তে পারি সর্ব্বনাশে।
খেলার ছলে অম্বিকারি সিংহটারে চাহিয়া নেই,
মকর-গায়ে ঢলিয়া পড়ে' গঙ্গাপদে পুষ্প দেই।
পিণাকগুণে টানিয়া ধরি ত্রিশূলে দেই সিঁদূর আঁকি',
নিদ্রা লভি অনন্তেরি হাজারফণা-ছায়ায় থাকি।

সহিতে পারি অনলেঘেরা যজ্ঞধূমে উগ্র তপে,
তপ্ত শুচি তপনতলে বসিতে পারি লক্ষ জপে।
ক্ষুদ্র মোরা তবুও তার রুদ্ররূপে কভু না ডরি ;
বজ্রশিখা বক্ষে ধ'রে হাসিয়া গৃহকক্ষে বরি'।

ডরিব কেন শমনে যদি জিনিতে পারি জীবন-পণে,
হারাণো ভয় না থাকে যদি, রিক্ত যদি মরণে রণে ;
কাড়িতে পারি তারার হাতে অভয়বর আশীষ দি,
ঝাঁপায়ে যদি পড়িতে পারি হেরিয়া ভীম রুধির-নদী !
নাচিতে পারি ঈশান সাথে পিছিল পথে বিষাণ নিয়ে,
হাড়ের মালা গাঁথিয়া তার, করোটি ভরে' গরল পিয়ে ;
যুঝিয়া যদি জিনিতে পারি আশীষ—পাশুপতটি তার,
খুঁজিয়া যদি আনিতে পারি পাতাল হ'তে মণির হার,
চক্রগদা চাহিয়া যদি কাঁপাতে পারি বিশ্বতলে,
শঙ্খটি তাঁর কাড়িয়া নিয়া বাজাতে পারি রুদ্রবলে,
ডরিব কেন,—সকলি সঁপি নিজের কিছু যদি না গণি,
পড়িতে পারি চক্রতলে, ধরিতে পারি হরের ফণী !
ক্ষুদ্র মোরা তবুও তার রুদ্ররূপে কভু না ডরি,
বজ্রশিখা বক্ষে ধ'রে হাসিয়া গৃহকক্ষে বরি'।

ভাষায় ভারতবাণিজ্যের ইতিহাস

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, M. A.]

ভাষার প্রমাণের ন্যায় প্রত্যয়যোগ্য আর কোন প্রমাণই হইতে পারে না। কিংবদন্তি অপেক্ষা লিখিত-ইতিহাস অধিক প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। লিখিত-ইতিহাসে লেখকবিশেষেরই ব্যক্তিগত মত প্রকাশিত হয় বলিয়া, তাহাও সকল সময়ে নির্ব্বিবাদে পরিগৃহীত না হইতে পারে; কিন্তু যে ইতিহাস ভাষার মধ্যে অঙ্কিত হইয়া ভাষারই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহা জাতীয় অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে, ইহাই মনে করিতে হইবে। ভারতীয় ভাষায় এই ইতিহাস যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত দেখা যায়, এরূপ আর অন্য কোন দেশের ভাষাতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে, আমরা সেই ভাষার ইতিহাসে ভারতবাণিজ্যের কি প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই প্রণালী অবলম্বনে ভারতবাণিজ্যের ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হওয়া যে সম্ভবপর, ভারতের পুরাতত্ত্বাবিষ্কারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ Mr. Manning এর মন্তব্যে তাহার যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়—"The indirect evidence afforded by the presence of Indian products in other countries, coincides with the direct testimony of Sanskrit literature to establish the fact that the ancient Hindus were a commercial people."—Ancient and Mediæval India, Vol. II, p. 353.

অভিধানেই আমরা ভাষার উপাদানরূপ শব্দরাশি সংগৃহীত দেখিতে পাই। সুতরাং সেই অভিধানের মধ্যেই আমাদিগকে ভাষার প্রমাণের জন্য প্রধানতঃ অনুসন্ধান করিতে হইবে। সংস্কৃতে অমরসিংহসংগৃহীত 'নামলিঙ্গানুশাসনের' ন্যায় কোষগ্রন্থ অতি বিরল। তদীয় কোষগ্রন্থ, সমস্ত কোষগ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ প্রায় দুই সহস্র বৎসর প্রচলিত রহিয়াছে। অমরসিংহের অভিধানে বুদ্ধের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতেও বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা বৌদ্ধযুগে বিরচিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অমরসিংহ-সঙ্কলিত শব্দসকল সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন যুগেই উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ইহারা যে, ইতিহাসের প্রাচীন সংবাদ আমাদিগকে প্রদান করিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের অধিকাংশ প্রমাণ, এই অমরকোষ হইতেই প্রদান করা হইবে।

আমরা এইখানে বাণিজ্যের কথা বলিব বলিয়াই সংকল্প করিয়াছি। সুতরাং বাণিজ্যের প্রথম প্রবর্ত্তন কাহাদিগের দ্বারা হয়, তাহাই প্রথম অনুসন্ধান করা উচিত। এই অনুসন্ধানে আমরা দেখিতে পাই যে, বিদেহের লোকেরাই প্রথম বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেই তাহাদের নামেই বণিকের নাম "বৈদেহক" হইয়াছে। যথা, অমরকোষে—"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্" ইত্যাদি। বিদেহ, মগধেরই অন্তর্গত। 'মাগধ' নামটিও সাধারণভাবে ভ্রমণকারী বণিক্‌কেই বুঝাইয়া থাকে—"* * * And 'Magadha' for 'commercial traveller' seems to point to the travelling propensities of the inhabitants of Magadha (South Behar)."—On the ancient Commerce of India, by Gustav Oppert, Ph. D.-p. 14.

শ্যামদেশে ভারতীয় উপনিবেশ-স্থাপন ও হিন্দুর লঙ্কা-বিজয় প্রথম মগধদেশীয়দিগের দ্বারাই হয়; বৈদেহদিগের বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রথম প্রবৃত্ত হওয়া সম্বন্ধে ইহা যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বৈদেহদিগের দ্বারা বাণিজ্যপ্রবর্ত্তনের স্পষ্ট প্রমাণ এখানে পাইলেও, তাহাদিগের পূর্ব্বেও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের যথেষ্ট আভাসই আমরা ভাষা হইতে প্রাপ্ত হই। 'বণিক্' শব্দটির মধ্যেই আমরা ইহার প্রথম আভাস দেখিতে পাই। বণিক্ শব্দটি বৈদিক 'পণি'জাতির নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া

বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং, বাণিজ্যের সহিত পণি-জাতিরই প্রথম সম্বন্ধের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। তাহাতেই বাণিজ্যদ্রব্য—'পণি' নাম হইতে "পণ্য" হইয়াছে। কার্থেজের প্রাচীন বাণিজ্যব্যবসায়ী ফিনিকৃগণ পূর্ব্বোক্ত পণিদিগেরই বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়। 'বণিক্' ও 'ফিনিক্' নামের সাদৃশ্যই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়া থাকে। বস্তুতঃ স্মরণাতীত পুরাকাল হইতেই বেবিলন, চেল্ডিয়া, জুডিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে ভারতীয় ভাষায় কতকগুলি দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু তত্তৎদেশের ভাষায় ইহাদের কোনও স্বতন্ত্র নামই পাওয়া যায় না। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যজাত ভারতেরই পণ্য এবং ভারতীয় বণিক্দিগেরই দ্বারা বিদেশে প্রেরিত হইত। ঐ সমস্ত পণ্যের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের স্বর্ণই প্রথম উল্লেখযোগ্য—বেদে ইহা "মনা" (ঋগ্বেদ ৮।৭৮।২) নামে অভিহিত হইয়াছে। চেল্ডিয়া বা বেবিলনে ইহা এই রূপেও অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়। পরে ইহা 'ম্না' এইরূপে গ্রীক্দিগের মুদ্রা-গণনার অন্তর্গত হয়, এবং তাহা হইতে লাটীন্ ভাষায় 'মিনা' (mina)—এই আকার প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য 'মণি' (money—টাকাপয়সা), 'মিণ্ট্' (mint—টাকশাল) প্রভৃতির মূলে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক 'মনা' শব্দই বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়।

সিন্ধুদেশ আর্য্যদিগের আদিবাসস্থান; এই সিন্ধুদেশেই প্রথম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। তাহা হইতেই বস্ত্রের প্রাচীন নাম "সিন্ধু" হইয়াছিল। বেবিলনে আমরা বস্ত্রের এই "সিন্ধু" নামই প্রাপ্ত হই। চেল্ডিয়ান্দিগের প্রাচীন 'উর' (পরবর্ত্তী 'মুঘের') ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সেগুণ গাছের খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ইহা যে ভারতীয় বৃক্ষ, তদ্বিষয়ে এই নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইহা দক্ষিণ-ভারত বা দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়া থাকে এবং মলবার উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আর কোথাও ইহা জন্মিতে দেখা যায় না এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরে একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহুদিরাজ সলোমনের বাণিজ্যপোতে চন্দনকাষ্ঠ, হস্তি-দন্ত, কপি ও ময়ূর প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য আনীত হয়, তৎসমস্তের কোনটিরই নাম প্রকৃত হিব্রুভাষার নাম নহে; সংস্কৃত ও তামিল ভাষারই নাম।

পাশ্চাত্য সুপণ্ডিত রেগোজিন্, তাঁহার 'Vedic I ("বৈদিক ভারত") নামক গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত ক কৌতুকাবহ ঐতিহাসিকতত্ত্বের উল্লেখ করিয়া করিয়াছেন, অতি পুরাকালে ভারতীয় দ্রাবিড় নামক জাতি আসিয়া-মাইনরের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে ছিল। আমরা যে বৈদিক পণিজাতির সহিত বা প্রথম সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছি, সেই পণিজাতিও অনার্য্যজাতিরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং, ঐতি প্রমাণ আমাদের প্রতিকূলে না হইয়া অনুকূলেই হই এখানে আমরা রেগোজিনের মূল মন্তব্য হইতে করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে

"He (late Francis Lenormant) laid stress on the use of the word monâ as as the Rig-Veda to denote a definite qu of gold*—a word which can be trace ancient Chaldea or Semitic Babylonia the same meaning, and which after passed into the Greek monetary sy (mnâ still latinized into mina). Well little fact simply points to a well-establ commercial intercourse between Drav India (for the Kolarians never came a west as the land by the Indian Ocean Babylonia or Chaldea. And now, after, chance brings to more discoveri dividually as trifling, yet linked together three form a chain of evidence as con as it is strong. In the ruin of Mu ancient Ur of the Chaldees, built by U (or Ur-Bugastuv) the first king of u Babylonia, who ruled, not less than years B. C., we find a piece of Indian t

* Rig-Veda VIII, 78,2—"Oh! bring us cattle, horses and a monâ of gold."

† Sayce, Hibbert Lectures for 1887, pp. 1 137.

This evidence is exceptionally conclusive, because as it happens, this particular tree is to be located with more than ordinary accuracy; it grows in Southern India (Dekhan) where it advances close to the Malabar Coast, and nowhere else; there is none north of the Vindhya. Then again, precious Vocabularies and lists of all kinds of things and names which those precise old Babylonians were so fond of making out and which have given us so startling surprises, come to the fore with a bit of very choice information, namely that the old Babylonian name for muslin was Sindhu, *i. e.*, that stuff was simply called by the name of the country which exported it.

"This is very strong corroborative evidence of several important facts, *viz.*, that the Aryan settlers of Northern India had already begun at an amazingly early period to excel in the manufacture of the delicate tissue which has ever been and to this day—doubtless in incomparably greater perfection—one of their industrial glories, a fact which implies cultivation of cotton plant—a tree probably in Vedic times already;—that their Dravidian contemporaries were enterprising traders; that the relation between the two races were by means of an exclusively hostile and warlike nature.

"Maxmüller has long ago shown that the names of certain rare articles which King Solomon's trading ships brought him, were not originally Hebrew.* These articles are sandal-wood (indigenous on the Malabar Coast and no where else), ivory, apes, and peacocks, and their native names, which could easily be traced though the Hebrew corruptions, have all along been set down as Sanskrit, being common words of that language. But now, quite lately, an eminent Dravidian scholar and specialist brings proof that they are really Dravidian words, introduced into Sanskrit." †—Vedic India, pp. 305-6-7.

ভারতের বৈদেশিক উপনিবেশ যখন মগধদেশীয়দিগের দ্বারা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বৈদেশিক বাণিজ্যও যে, তাহাদের দ্বারাই প্রথম পরিচালিত হইবে, তাহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। প্রথম যেমন মাগধীয়গণ পূর্ব্বদিকে উপনিবেশার্থ গমন করেন, তদুপলক্ষে পূর্ব্বদিকের সহিতই প্রথম বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করেন, ইহাই আমরা মনে করি। তাঁহাদের প্রথম বাণিজ্যসম্বন্ধ চীনের সহিত হয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়। চীনের দুইটি বাণিজ্যদ্রব্য ভারতের সহিত সেই সম্বন্ধকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। একটি চীনের শস্যবিশেষ—অপরটি চীনের রেশমী বস্ত্র। উভয়ই সংস্কৃতভাষায় চীনদেশের নামে "চীন" বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের নাম অমরকোষে পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু চীন-বস্ত্রের উল্লেখ আমরা কোষকার অমরেরই সমসাময়িক কবিচূড়ামণি কালিদাসের শকুন্তলায় প্রাপ্ত হই; যথা—"চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।" এখানে চীনবস্ত্রে পতাকা নির্ম্মাণের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং, চীনবস্ত্র যে তৎকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল, তাহাই বুঝা যায়। চীনশস্যের সাধারণ 'চীনা' নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত বলিয়া আমরা মনে করি। বঙ্গদেশে রীতিমতই ইহার চাষ হইয়া থাকে। চীন একপ্রকার মৃগের নাম বলিয়া অমরকোষে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহা চর্ম্মজাতীয় মৃগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যথা—

"কদলী কন্দলী চীনশ্চমূরু প্রিয়কাবাপি।
সমূরুশ্চেতি হরিণা অমী অজিনযোনয়ঃ॥"

* Science of Language.—Ist. series, pp 203—4 (1882).

† Dr. Caldwell,—Introduction to his Comparative Grammar of the Dravidian Languages.

ইহাদের চর্ম্ম বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হওয়াতেই ইহারা চর্ম্মজাতীয় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। এই মৃগ চীনদেশজাত হওয়াই সম্ভবপর, তাহাতেই ইহার নাম 'চীন' হইয়াছে। চীনদেশ হইতে ইহা ভারতে আনীত হইয়া চর্ম্মের জন্য পালিত হইত বলিয়াই ভারতের ভাষায় ইহার নাম বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। চীনের বস্ত্র যেমন ভারতে আদৃত হইত, সূত্রও তেমনই আদৃত হইত বলিয়া বোধ হয়; তাহাতেই অভিধানে চীন শব্দে সূত্রও বুঝায়। 'মেদিনী' অভিধানে চীনের পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত অর্থই আমরা স্বীকৃত দেখিতে পাই। যথা—

"চীনো দেশাংশুক ব্রীহিভেদে তন্তৌ মৃগান্তরে॥"

চীন হইতে এইরূপে শস্য ও বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেও ভারতের যে নিজের শস্য ও বস্ত্র-বাণিজ্য ছিল না, তাহা নহে। ভারতের খাদ্য-শস্য যে গ্রীস্ ও ইটালী পর্য্যন্ত প্রেরিত হইত, তাহারও প্রমাণ আমরা ভারতীয় ভাষায় প্রাপ্ত হই। ধান্যই ভারতের প্রধান খাদ্য-শস্য। ইউরোপীয় ভাষায় এই ধান্যের নাম 'রাইছ্' (Rice)। ইহাকে আমরা সংস্কৃত 'রাশি' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিতে পারি। 'রাশি' শব্দটি বিশেষভাবে ধান্যাদির স্তূপ বুঝাইতেই অভিধানে ব্যবহৃত হয়। অমরকোষ অভিধানে রাশির পর্য্যায়বাচী এই সমস্ত শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে—"পুঞ্জরাশীতূৎকরঃ কূটমস্ত্রিয়াম্॥"—পুঞ্জ, উৎকর, কূট। অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভানুজিদীক্ষিত টীকায় ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "চত্বারি ধান্যাদি রুচ্ছ্রিত বৃন্দস্য।" বাণিজ্যার্থ ধান্য স্তূপীকৃত হইয়া প্রেরিত হইত বলিয়াই সমস্তগুলি 'রাশি' বলিয়া যে নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা সম্পূর্ণই সম্ভবপর বোধ হয়। তাহা হইতেই বিদেশীয় ভাষায় ধান্যের 'রাইছ্' নাম হওয়া অসম্ভাব্য বোধ হয় না। ইহার ইটালীয়ান্ 'রিশো' (riso) নাম 'রাশি' নামের বিশেষ নিকটবর্ত্তী এবং গ্রীক্ oryza নামটিরও আদ্য উপসর্গরূপ o অংশটি ছাড়িয়া দিলে, অবশিষ্ট ryza 'রাইজ্' অংশটি সংস্কৃত 'রাশি' হইতে বড় দূরবর্ত্তী হইবে না।

ডাক্তার অপার্ট ও অপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধানের প্রাগুপ্ত গ্রীক্ oryza নামটিকে তামিল 'অরাইশি' নামেরই অপভ্রংশ মনে করিয়াছেন, এবং ভারতের ধান্যের সহিত যে গ্রীক্‌গণ সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন, তাহারও বহু প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন; যথা—

"The Greeks most likely obtained t rice from India; as this country alone duced it in sufficient quantity to be abl export it. Moreover, the Grecian name rice 'oryza,' for which there exists no A or Sanskrit root, has been previously ide fied by scholars with the Tamil word 'a which denotes rice deprived of the h This was exactly the state in which rice exported. The Greeks besides connected generally with India. Athenæos qu 'oryza hepthe,' cooked rice, as the food of Indians, and Ælianus mentions a wine m of rice as an Indian beverage. If now Greeks received their rice from India, and name they called this grain by, is a Dravid word, we obtain an additional proof of Non-Aryan element represented in the Inc trade."—On the Ancient Commerce of I by Gustav Oppert, Ph. D., p. 37.

এখানে, 'অরাইশি' শব্দটি আমাদের নিকট সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত 'রাশি' অর্থাৎ 'আরাশি' শব্দেরই অপভ্রংশ ব বোধ হয়। প্রাচুর্য্য অর্থেই উপসর্গটি যুক্ত হইয়া থাকি গ্রীক্ oryza শব্দের oটি উপসর্গ মাত্র, সুতরাং শব্দের অংশ নহে বলিয়াই এইটি বাদ দিয়া উহা হইতে ইং rice শব্দটি গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও রা 'রাশ' বলা হইয়া থাকে; যেমন 'এক রাশ'।—এবং আমা ধান্যাদি রাখিবার ভাণ্ডকে সাধারণতঃ 'রাশ' নাম দে হইয়া থাকে।

গ্রীস্ ও রোমের সহিত বস্ত্র-বাণিজ্যের যোগ স বিশেষ নিদর্শনই আবিষ্কার করা যাইতে পারে। ভার বস্ত্র, গ্রীসে ভারতের সপ্তসিন্ধুদেশ বা সিন্ধুদেশ নাম হ সিন্দোনিজ (Sindones) নামে পরিচিত ছিল: "T cotton clothes (Sindones of Herodotus) sh by their name, their Indian origin. It occ also, afterwards in the Periplus where a

tinction is made in the cotton-goods according to quality, and cotton thread is mentioned as a separate article."—On the Ancient Commerce of India by Dr. Oppert, p. 37.

কার্পাস্, ভারতীয় বস্ত্রের প্রধান উপাদান। রোমের ভাষায় ইহা 'কার্পেসিয়াম্' (Carpasium) নামে কথিত হইয়া থাকে ; এবং কার্পাস-বস্ত্র 'কার্ব্বেসিয়া' (Carbasia) নামে কথিত হয় :—"The Roman Digesta call the cotton thread "Carpasium", and the cotton-cloth —"Carbasia," which name for the latter is also used by the Alexandrian merchant, the Sanskrit name being Kârpâsa. Upto the first century after Christ the cotton tree was, except in India, only cultivated in the small islands of Tyros and Avados in the Persian Gulf."—*Ibid*, pp. 37-38.

আমরা পূর্ব্বে রেশমী বস্ত্র ভারতে 'চীন' নামে কথিত হওয়ার বিষয় বলিয়াছি। রেশমী বস্ত্রের বাণিজ্যও আমরা ভারতের দ্বারাই পরিচালিত হওয়ার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। তাহাতেই রোমের বিবরণীতে ইহা 'Sericum Indicum' ('ভারতীয় রেশমী') নামে উল্লিখিত হইয়াছে :—"And it is mentioned as Sericum Indicum in the Roman Digesta."—*Ibid*, p. 36.

"The author of Periplus, after describing the geographical position of China, says: 'Silk was imported from that country, but the person engaged in this trade were the Indians themselves.'"—Hindu Superiority, pp. 421-22.

ভারতবর্ষে যে রেশম উৎপাদিত হইত, অমরকোষেই তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অমরকোষে রেশমী বস্ত্রের নাম 'কৌশেয়' দেওয়া হইয়াছে ; যথা, "কৌশেয়ং কৃমিকোশোত্থম্।" গুটিপোকার গুটি হইতে রেশম উৎপাদনের প্রকৃত তত্ত্ব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত নাম ও বিবরণ কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতবর্ষে স্বতন্ত্রভাবে রেশমোৎপাদনের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন :—"Moreover, there exist also in this country 12 species of silk-spining worms. Indian made silk articles were bought by Greek and Roman merchants."—On the Ancient Commerce of India,' p. 36.

"ভারতবর্ষে ১২ প্রকারের গুটিপোকা (রেশমোৎপাদনকারী পোকা) দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক্ ও রোমক বণিক্‌গণ ভারতনির্ম্মিত রেশমী বস্ত্র সকল ক্রয় করিত।"

কিন্তু বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা ভারতের গন্ধ-দ্রব্য বা মসলাই ইউরোপীয় বাণিজ্যে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গন্ধ-দ্রব্যের মধ্যে পিপ্পলীই ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের মধ্যে প্রথম পরিচিত হয়। এই পিপ্পলী নামের অপভ্রংশ হইতেই ইউরোপীয়দিগের 'pepper' নামের উৎপত্তি হইয়াছে— "Among the Indian spices pepper, *pippali* in Sanskrit, was in much demand." *Ibid*—p. 38. ইউরোপীয় বণিক্‌গণ গোলমরিচ, লঙ্কামরিচ প্রভৃতিকেও pepper নামই প্রদান করিয়াছেন। 'দারুচিনির' চিনি এই অংশ হইতেই ইহার পাশ্চাত্য cinnamon নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পিপ্পলী 'বৈদেহী'ও 'মাগধী' নামেও সংস্কৃত ভাষায় পরিচিত ; যথা, অমরকোষে—

> "কৃষ্ণোপকুল্যা বৈদেহী মাগধী চপলাকণা।
> উষ্ণা পিপ্পলী শৌণ্ডী কোলা॥"

যে বিদেহ ও মগধের লোকগণ প্রথম বাণিজ্য-ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহাদের দেশজাত পিপ্পলীই যে মসলা বাণিজ্যের প্রথম বাণিজ্যদ্রব্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ইউরোপীয় বণিক্‌গণ মলবার উপকূল হইতেই গোলমরিচ প্রভৃতি মসলাদ্রব্য সংগ্রহ করিত। পিপ্পলীর উপরি উক্ত 'উপকুল্যা' নামের দ্বারা উপকূলের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না, বলা যায় না। মসলা দ্রব্যের মধ্যে 'জটামাংসী' অন্যতম ; ইহা অবিকল এই নামেই ইউরোপীয় মসলা-বাণিজ্যদ্রব্যের অন্তর্গত দেখা যায়। কর্পূরও একটি বিশিষ্ট গন্ধদ্রব্য। ইহার নাম

সামান্যমাত্র পরিবর্তিত হইয়া ইহা ইউরোপীয় ভাষায় Camphor এইরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এলাইচ্ একটি বিশিষ্ট মসলা ও গন্ধদ্রব্য। সংস্কৃতে ইহার নাম 'এলা'; ইউরোপীয় ভাষায় ইহার নাম Cardamom। সংস্কৃত 'এলা' শব্দের সঙ্গে এই নামের কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও সংস্কৃতে আমরা 'যক্ষ কর্দ্দম' নামে একটি লেপের উল্লেখ পাই; ইহা এলা, কর্পূর, কস্তূরী, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যেরই সংমিশ্রণ; যথা; অমরকোষে "কর্পূরাগুরু ও কস্তূরীকক্কোলৈ র্যক্ষকর্দ্দমঃ।" এই 'কর্দ্দম' নামটি হইতে Cardamom নাম হওয়া অসম্ভাব্য নহে। 'যক্ষকর্দ্দম' নামের দ্বারা ইহা যে বিদেশীয় ও অনার্য্যদিগেরই মধ্যে প্রথম ব্যবহৃত হয়, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় 'এলা' বাণিজ্যের ইতিহাসেও যেন ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়; যথা, "Cardamom and clove, indigenous in the Philippines, came *viâ* India, and were regarded as Indian articles."—On the Ancient Commerce of India, p. 40.

রাজনির্ঘণ্টে এলার 'দ্রাবিড়ী' ও 'সাগরগামিনী', এই দুইটি নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, সমুদ্র তীরবর্ত্তী দ্রাবিড় দেশেও ইহা উৎপাদিত হইত এবং ইহা সমুদ্রবাণিজ্যের প্রধান পণ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

'লবঙ্গের' এক নাম অভিধানে 'বারিসম্ভব' পাওয়া যায়; তাহাতেও ইহা যে সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপে উৎপন্ন হইত, এবং তথা হইতে আনীত হইয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরিত হইত, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

'আদ্রক' একটি মসলা দ্রব্য; সংস্কৃতে ইহার একনাম 'শৃঙ্গবের'। এই 'শৃঙ্গবের' শব্দের অপভ্রংশেই ইউরোপীয় Ginger নাম হইয়াছে।

'কুষ্ঠ' একটী সুগন্ধি উদ্ভিদ্; ইহা ইউরোপীয়দিগের নিকট Costus নামে পরিচিত হইয়াছে। রোমান্‌দিগের মধ্যে ইহা বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। ডাক্তার অপার্ট লিখিয়াছেন—"The costus of the ancients is the Sanskrit 'Kushtha', one species came from the neighburhood of Multan, another from Kabul and Kasmir. The Romans had a great predilection for this root; they used it at sacrifices, its oil was turned into a salve, and t mixed their wines with costus and ava themselves of it as a medicine. One po at 6 dinars or 1⅘ upees."—On the Anc Commerce of India p. 41.

'নলদ' ও অপর একটি সুগন্ধি উদ্ভিদ্; ইউরোপে 'Nard' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহা ইউরোপে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। ডাক্তার অপার্ট লিখিয়া "The nard, in Sanskrit nalada, grows on bank of the Upper Indus, in Nepal along the Ganges. The reputation of Valeriana had already spread in e times, the singer of the song of Solo praises its fragrance. * * * Its va depends on the size of the leaves an pound of the best leaves was worth dinars or 30 rupees, the smallest leaves fe ing the highest price."—*Ibid.*, p. 41.

ইউরোপের Myrrh নামক প্রসিদ্ধ গন্ধরস ভারে দ্রব্য; ইজিপ্টে ইহার নাম 'বল' পাওয়া যায়; স ভাষায় ইহার নাম 'বোল'; যথা, অমরকোষে "বোল গ প্রাণপিণ্ড গোসরসাঃ সমাঃ॥" ইহা হইতে অনুমান যায় যে, ইজিপ্টের মধ্য দিয়াই ইউরোপীয়গণ 'বোল' হইয়াছে। ডাক্তার Royleএর মত, ইহাই পোষকতা ক "Dr. Royle observes that myrrh is called ' by the Egyptians, while its Sanskrit n is 'bola,' bearing a resemblance which le no doubt as to its Indian manufacture (Royle's 'Ancient Hindu Medicine'.—My p. 112)—Hindu Superiority, p. 411.

'কস্তূরী' একটি প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য। পাশ্চাত্য ইহার নাম Musk; এই musk শব্দটি সংস্কৃত শব্দেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ। 'মুষ্ক' শব্দের অর্থ অণ্ড কস্তুরীকে আমরা 'মৃগনাভি' বলিয়াই জানি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নাভিজাত নহে, ইহা নাভি ও অণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কোষ বিশেষে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত 'মুষ্ক'

তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতে "সৌম্নি পুষ্যলকো-হতঃ" বলিয়া যে শ্লোক পাওয়া যায়, তাহাতেও ইহারই সমর্থন হয়। Materia Medicaতে 'মুষ্ক' আসিয়া দেশজাত বলিয়াই উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং ভারতই যে কস্তুরী বা মুষ্কের আদিস্থান, তাহারই প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

'শর্করা' মিষ্ট দ্রব্য; ইহা প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপীয়গণ প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই ইউরোপে "শর্করা"র অপভ্রংশে Sugar নাম হইয়াছে। মিসেস মেনিং (Mrs. Manning) লিখিয়াছেন, "It was in India that the Greeks first became acquainted with sugar. *" মিছরীর "শর্করাখণ্ড" নামের অপভ্রংশে পাশ্চাত্যভাষায় Sugar-Candy নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

রন্ধন-দ্রব্যও যে ইউরোপ, ভারত হইতেই প্রাপ্ত হয় তাহারও প্রমাণ ভাষাতেই পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, নীলবর্ণের উপাদান 'নীল' যে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রসার লাভ করে, তাহার সুপ্রচলিত ইউরোপীয় Indigo নামই ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন। ইউরোপে নীল-বাণিজ্যের ইতিহাস ডাক্তার অপার্ট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"India is rich in vegetable-dyes, but its most famous is, no doubt, Indigo, the Indikon of the Greek. Already Vitsruvius mentions the Indicus color, and Plinius distinguishes between two different sorts of Indicum.—On the Ancient Commerce of India, p. 38.

ইউরোপীয়গণ নীলের Indigo নামটির উদ্ভাবন করিলেও, আরবীয় বণিকেরা ইহাকে "নীল" নামেই জানিতেন এবং ইহাকে নিজেদের ভাষার রূপ প্রদান করিবার জন্য, ইহার পূর্ব্বে তাহাদের সুবিদিত al উপসর্গটি যোগ করিয়া, ইহাকে al-nil বা তাহারই রূপান্তরে an-nil বলিতেন। ইউরোপীয় স্পেনীয় বণিকগণ, আরবীয়দিগের নিকট হইতেই উক্ত নামটী গ্রহণ করিয়া, ইহাকে anil—এইরূপ নাম প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকারে ইউরোপীয় ভাষায় নীলের এই anil নামও প্রচলিত হইয়াছে।

রক্তবর্ণের মূলউপাদান ইউরোপে lac বলিয়া পরিজ্ঞাত। এই lac নামটি ভারতীয় 'লাক্ষা' নামেরই অপভ্রংশ। সুতরাং রক্তবর্ণের উপাদানদ্রব্যও যে ভারত হইতেই ইউরোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

টিনের সংস্কৃত নাম 'কাস্তীর'। গ্রীক্‌ভাষায় ইহার নাম 'কাস্‌সিটেরস্' (Kassiteros)। ইহা সংস্কৃত 'কাস্তীর' নামেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। পাণিনিসূত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং, ভারতবর্ষে ইহা উৎপন্ন না হইলেও, ভারতসন্নিহিত প্রদেশে ইহা উৎপন্ন হইত বলিয়াই ইহাকে ভারতজাত বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয় না। ডাক্তার অপার্ট লিখিয়াছেন:—"Whether the Greek word for tin—Kassiteros is derived from the Sanskrit Kastira, or whether the Hindus got from the Greeks, is still doubtful. That it was originally not much found in India but in Further-India is immaterial, as it was early known in India, and the fact of the word Kastira, occurring in Panini's Sutras is important."—On the Ancient Commerce of India, p. 43.

ভারতের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা 'দীনার', রোমকদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়; তথায় ইহা Dinarius এইরূপ নাম গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপীয়দিগের বর্ত্তমান রৌপ্যমুদ্রা Rupee, আমাদের রৌপ্য শব্দেরই অপভ্রংশমাত্র। ভারত হইতে রত্নও যে পাশ্চাত্যগণ গ্রহণ করেন, তাহার প্রমাণ মরকত মণির গ্রীক্ Smaragdos বা Maragdos নামেই পাওয়া যায়; উভয় শব্দই মরকতের অপভ্রংশমাত্র।—"The Greek word for emerald is Smaragdos, or Maragdos, from Sanskrit 'Marakata'".—National Encyclopædia.

এই পর্য্যন্ত আমরা ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের আলোচনা করিলাম; এক্ষণে আমরা অন্তর্ব্বাণিজ্যেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আদানপ্রদানই বাণিজ্যের নিয়ম। সুতরাং, ভারতজাতদ্রব্য যেমন আমরা বিদেশে পণ্যরূপে প্রেরিত হইতে দেখি—তেমনই বিদেশজাতদ্রব্যও আমরা ভারতে পণ্যরূপে আনীত হইতে দেখি।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য গন্ধদ্রব্যের জন্যই ইতিহাসে বিশেষরূপে স্মরণীয় হইয়াছে। কিন্তু এই গন্ধদ্রব্য বিদেশ হইতেও যে ভারতে আনীত হইত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণই

* Ancient & Mediæval India, vol. II. p. 353.

সংস্কৃতভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। 'সিহ্ল' নামক একটি *গন্ধদ্রব্যের উল্লেখ অমরকোষে পাওয়া যায়। ইহার 'তুরুষ্ক' 'যবন' দুইটি বিদেশীয় নামই আছে ;—যথা,"তুরুষ্কঃ পিণ্ডকঃ সিহ্লো যবনোঽপি।"* 'তুরুষ্ক' যে দেশবিশেষ ও ম্লেচ্ছ-জাতিবিশেষের নাম, সংস্কৃত অভিধানে তাহার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যায়।—"তুরুষ্কঃ সিহ্লকে ম্লেচ্ছজাতৌ দেশান্তরেঽপিচ॥"—ইতি বিশ্বমেদিন্যৌ। আসিয়া-মাইনরের আওনিয়ান্ গ্রীক্‌গণ হইতেই গ্রীক্‌গণ 'যবন' নামে সংস্কৃতভাষায় উল্লিখিত হইয়া থাকে। সুতরাং তুরুষ্ক ও গ্রীক্ উভয়জাতির সহিতই যে 'সিহ্ল' নামক গন্ধদ্রব্যের সম্বন্ধ, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

জৈনের নাম অমরকোষে 'যবানিকা' পাওয়া যায় ; ইহার সহিত যবনের কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নাও হইতে পারে।

ব্যবধান-পটের (পর্দ্দার) একনাম সংস্কৃতে "যবনিকা" ; ইহা আওনিয়ান্ গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত বলিয়া অনুমান হয়। অমরকোষেও এই শব্দটি স্বীকৃত হইয়াছে।

অমরকোষে 'রৌমক' নামক একপ্রকার লবণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার ব্যুৎপত্তি ভানুজি দীক্ষিত এইরূপ করিয়াছেন—"রুমায়াং ভবম্।" 'রুমা' আমাদের নিকট রোমেরই নাম বলিয়া বোধ হয়।

তাম্র ধাতু আমরা অমরকোষে 'ম্লেচ্ছমুখ' নামে অভিহিত দেখি। ইহার ব্যাখ্যায় ভানুজি দীক্ষিত লিখিয়াছেন, ম্লেচ্ছদেশে উৎপত্তি বলিয়াই এই নাম হইয়াছে ; যথা—"ম্লেচ্ছদেশে মুখমুৎপত্তিরস্য।"

অমরকোষে ঘোটকের যে সমস্ত বৈদিশক নাম পাওয়া যায় তাহাতে আরব, পারস্য, কাম্বোজ ও বাহ্লিক দেশের ঘোটক যে ভারতে বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাই বুঝা যায়। অমরকোষে ঘোটকের নাম, যথা—"বনায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজাঃ বাহ্লিকাহয়াঃ। ভানুজি দীক্ষিত ইহাদিগকে "ভিন্নদেশীয়াশ্বানাম্" বলিয়া টীকায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'কুঙ্কুম' ও 'হিঙ্গু' উভয়কেই অমরকোষে 'বাহ্লিক' নামে উল্লিখিত দেখি। সুতরাং, উভয়ই যে বাহ্লিকদেশোৎপন্ন, তাহাই আমরা বুঝিতে পারি।

'লশুন', অভিধানে 'ম্লেচ্ছকন্দ' ও শুশ্রুত নামক চিকিৎসা-গ্রন্থে 'যবনেষ্ট' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে ইউ ও *মুসলমানদিগের ইহা যে বিশেষপ্রিয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়।*

কিরাত দেশ হইতে চিরতা আনীত হইত বলিয়া 'কিরাত-তিক্ত' নামে অভিহিত দেখা যায়। 'কিরাত সম্ভবতঃ আসামেরই নাম ছিল।

চীন হইতে যে একপ্রকার কর্পূর ভারতে অ হইত 'চীন-কর্পূর' নামেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। হইতে লোহ ও সীসও আনীত হইত। তাহাতেই একনাম "চীনজ", ও সীসের এক নাম 'চীনবঙ্গ' প যায়। চীন হইতে একপ্রকার সিন্দূরও ভারতে আ হইত ; ইহার নাম ছিল 'চীনপিষ্ট'।

দরদ্ অর্থাৎ দর্দ্দিস্থান হইতে একপ্রকার বিষ আ তাহা 'দারদ' নামে অমরকোষে অভিহিত দেখা যায়।

সিংহল ও বঙ্গদেশে রাঙ্ উৎপন্ন হইত বলিয়া, 'সিংহল'ও 'বঙ্গ' উভয় নামই পাওয়া যায়। 'লঙ্কা নাম সম্ভবতঃ লঙ্কাতে উৎপন্ন হইত বলিয়াই হইয়াছে।

উপরিবর্ণিত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণি বিবরণ হইতে আমদানিদ্রব্য অপেক্ষা রপ্তানিদ্রব্যের সবিশেষ আধিক্য ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতে ডাক্তার অপার্ট লিখিয়াছেন—"Comparing the lists of import and export goods with other, we see that while the latter is considerable in number and differing variety, the former contains only few articl "On the Ancient Commerce of India, p. 4(

এপর্য্যন্ত আমার ভাষা হইতে ভারত-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলিত করিলাম, তাহা হইতে দে পাইলাম যে, পূর্ব্বে চীন, উত্তরে তুরুষ্ক, দক্ষিণে স পশ্চিমে ঈজিপ্ট, আরব, ইউরোপ অর্থাৎ প্রায় সমগ্র প্র পৃথিবীর সহিতই ভারতবর্ষ বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন ক ছিলেন। এই বাণিজ্যসাধন দ্বারা ভারত আপনার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া যেমন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" মূল মন্ত্রলাভ করিয়াছিলেন, তেমনই সমস্ত পৃথিবীকে সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, নিজে ইহার গুরুপদে বরিত হ ছিলেন।

মাতৃহারা

(শেষাঙ্ক)

[শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী]

(৪)

পাঁচটা বাজিতে মিনিট কতক দেরি আছে! প্রকাণ্ড অট্টালিকার মাথায় যে মস্ত ঘড়িটা দেওয়ালের সহিত গাঁথা ছিল, সেই ঘড়িটার দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রবি ভাবিতেছিল, আর ১৫ মিনিট পরেই বাবু মটরে চড়িয়া বাহির হইয়া যাইবেন। কারণ, রবি দেখিয়াছে, প্রত্যহ এই সময়েই তিনি বাহিরে যান। বাবুর সুন্দর মুখে যে বিষণ্ণ ম্লানতার ছায়া সর্ব্বদা পরিস্ফুট হইত, তাহাই রবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

বৈশাখের অকালবর্ষণে খানিক পূর্ব্বে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া, ধরণীর তপ্ত বক্ষের সারাদিনের তাপদাহ জুড়াইয়া দিয়া, জলেস্থলে গগনেপবনে একটা স্নিগ্ধ শান্তির ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। বৃষ্টিধৌত গাছগুলার গাঢ় সবুজ শোভা! বৃষ্টির পর রৌদ্র দেখা দিয়াছে। বালকের হাসি-কান্নার মতই তাহা তরল—করুণ। রৌদ্রে তেজ ছিল না দীপ্তি ছিল। রবি প্রতিদিনের মতই সিঁড়ীর ধাপের উপর পা ঝুলাইয়া গাছের পাতার শব্দ শুনিতেছিল। হাঁটুর উপর অঙ্কন-বই-খানার পাতা খোলা, রবি তাহার ত্রিকোণ চতুষ্কোণ আঁকা ছাড়িয়া দিয়াছে। হাতের মুঠায় বদ্ধ কর্ত্তিত সূক্ষ্ম-মুখ পেনসীলটা। আজ তাহার পরিচ্ছদেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল; একটি সুদৃশ্য কালো রেশমি কাপড়ের জামা ও মিহি একখানি ধুতি তাহার সুন্দর দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। রৌদ্রালোকে কোটের বোতাম গুলা ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সকাল বেলা রবির মামী রবিকে যখন পোষাকটি পরাইয়া দিয়াছিলেন, তখন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলিয়া ছিলেন যে, "পোযাকটা তুমি তোমার নিজের কোন গুণের জন্যে পাচ্ছ মনে কোরনা যেন—যাও।" সে কথা রবির বেশ্ মনে আছে। রবি জানিত, মামী তাহাকে ভালবাসে—তাহার গুণের জন্য না পাইলেও পোষাক পাইবার অন্য কোন কারণ অনুসন্ধানেরও সে আবশ্যকতা অনুভব করিল না। মামা কহিলেন, "ভাল-ছেলে হয়ে থেক—দুষ্টুমী কোরনা—বাইরে বসে থাকগে।"

ফটকের বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া রবি ভাবিতেছিল, এবেলাও যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হোত—বেশ্ হোত। অদূরে তাহাদের বাসগৃহের খোলা দরজা জানালার মধ্য দিয়া মগ্নর কার্য্যরত মূর্ত্তি দেখা যাইতে ছিল না। কাপড় আছড়ানর শব্দ থামিয়া গেল। গাছের পাতানড়ার শব্দ এবং রাস্তা দিয়া গাড়ীর শব্দ শোনা যাইতেছিল। সহসা একটা পরিচিত শব্দ রবিকে চকিত করিয়া তুলিল। দরওয়ান গেট খুলিয়া দিয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রবির প্রতিদিনের মতই ইচ্ছা হইয়াছিল ছুটিয়া গিয়া মামার সাহায্য করে কিন্তু স্বাভাবিক সংযমবলেই সে অবিচলিতভাবে আপনার স্থানটিতেই বসিয়া রহিল। সশব্দে মটর-চালক মটর থামাইল। সিঁড়ি দিয়া প্রতি-দিনের মতই বাবু নামিয়া আসিয়া, মটরে আরোহণ করিলেন, সেফর ও দ্বারবান তাঁহাকে সেলাম করিল। রবি তাহার শুভ্র হাতখানি ললাটে স্পর্শ করিয়া, মামার অনুকরণে বাবুকে সেলাম করিয়া ফেলিল। অনেক দিন হইতেই এইটি তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে লজ্জায় পারিত না। আজিও তাহার ললাট হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত গোলাপী রঙ্গে রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছিল; নয়নে অধরে সুমিষ্ট সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। মটরখানা আজ আর অন্যদিনের মত সশব্দে বাহির হইয়া গেল না; রবি ও তাহার মামা বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। বাবু তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে সহসা যেন একটু খানি বিচলিতভাবে রবির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি গাড়ী চড়ে আমার সঙ্গে যাবে খোকা?" রবি এই অতর্কিত নিমন্ত্রণে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ধীরে

ধীরে উত্তর দিল "এঁ্যা—" রাধানাথ ভৎর্সনা-সূচক কটাক্ষে ভাগিনেয়ের প্রতি চাহিয়া, তাহাকে সচেতন করিয়া দিয়া, তীব্রস্বরে কহিল—"রবি ?" বাবু গাম্ভীর্য্যপূর্ণনেত্রে রাধানাথের পানে মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া রবির দিকে চাহিলেন; বলিলেন—"এসো"। সে স্বরে আর সে চাহনিতে রবি যে আশ্বাস পাইয়াছিল, তাহাতে হাতের ড্রয়িং বুকখানা সেই খানেই ফেলিয়া সে নামিয়া আসিয়াছিল; বাবু তাহাকে হাত বাড়াইয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। "ঠিক্ হয়েচে; তুমি এখানে একলা থাক্‌তে পারবে ভয় কর্‌বে না তো ?" বীরত্বপূর্ণ স্বরে রবি কহিল—"কিচ্ছু না"! বাবু সেফরকে পিছনে যাইতে বলিয়াই পরক্ষণে, কি ভাবিয়া নিজেই পশ্চাতে গিয়া, সেফরকে আপনার স্থান ছাড়িয়া দিলেন।

গাড়ীখানা যখন গেটের বাহির হইয়া যাইতেছিল, তখন স্তম্ভিতপ্রায় দরওয়ানের দিকে চাহিয়া বাবু বলিলেন—"সাতটার সময় ফিরে আস্‌ব।"

মটর চলিয়া গেল; হতভম্ব রাধানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় সেই দিকেই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার জীবনে এত বড় অঘটন-সংঘটন আর কখনও সে হইতে দেখে নাই। সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও সে ইহার অধিক বিস্ময় বোধ করিত কি না সন্দেহ।

বাবু রবির দিকে চাহিয়া বলিলেন—'এসো'

ছায়াঢাকা সম্মুখের পরিচিত রাস্তা ছাড়াইয়া মোটর যখন বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল, রবির বড় বড় কালো চোখ আনন্দ ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! বাড়ীর বাহিরে পরী ও দৈত্যদের রাজ্য ছাড়া—মানুষের রাজ্যে যে এমন সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সুসজ্জিত দোকান, অসংখ্য গাড়ী ঘোড়া, আরও কত বিচিত্র অদ্ভুত অজ্ঞাত দৃশ্য থাকিতে পারে, রবি কোন দিন তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহাদের রাণীগঞ্জে ত এমন কিছুই ছিল না।

স্নেহপূর্ণ কটাক্ষে রবির পানে চাহিয়া, বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আর কখনও মটরে চড়েছিলে খোকা ?" "না,—কখনও না।" "তোমার ভাল লাগ্‌চে ?" উৎসাহের সহিত মাথা নাড়িয়া রবি উত্তর দিল, "খুব ভাললাগ্‌চে।" কিন্তু শীঘ্রই তাহার আনন্দ ভয়ে পরিণত হইল; মোড় ফিরাইবার জন্য গাড়ীখানা যখন বাঁকিয়াছিল; রবির মনে হইল সে এখনি পড়িয়া যাইবে। একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া, সে বাবুকে ধরিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। তিনি রবির ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন। "ও কি হয়েছিল ? অমনতর হোল কেন ?" "গাড়ী খানা মোড় ঘুর্‌ল কি না;—আমি তোমায় ধরে থাকব ?" "হ্যাঁ, হ্যাঁ ধরুন; নৈলে আমি পড়ে যাব যে ?"

একটুখানি বিষাদের হাসিতে বাবুর বিষণ্ণ মুখের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি রবিকে বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এসব দেখতে ভাল লাগ্চে খোকা?—" "হুঁ!—আপনার?" "আমার? আমারও লাগবে?" "লাগচেনা কেন?" রবি প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। বাবু বলিলেন, "দেখ, দেখ, কত উঁচু! ওর নাম কি, জান? ওকে বলে, মনুমেণ্ট; তুমি একদিন ওর উপর উঠ্‌বে?" "উঠ্‌ব! পড়ে যাব না? আপনি ধ'রে থাক্‌বেন ত?"

একটা প্রকাণ্ড আফিস-বাড়ীর নিকট গাড়ী থামিলে বাবু, রবিকে গাড়ীতে বসিতে বলিয়া, নামিয়া গেলেন। ক্ষিপ্র হস্তে দুই চারিটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উল্টাইয়া দেখিয়া, কর্ম্মচারীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিয়া, ফিরিয়া আসিলেন।

আফিসের দরওয়ান এক গ্লাশ গরম দুধ ও সন্দেশ আনিয়া রবিকে খাওয়াইয়া গেল।

বাবু গাড়ীতে উঠিলে, গাড়ী আবার বাড়ীর পথে ফিরিয়া চলিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া রবি তাহার নূতন বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি হয়েচে? আপনি অমন দুঃখু ক'রে রয়েচেন কেন?" একটা ব্যথিত নিশ্বাস তাহার কাণে বাজিল—"দুঃখ ক'রে?—কি জানি কেন তা জানিনা।"

"আপনার মুখ কেবলই দুঃখু দুঃখু হয়ে থাকে; এখন কিন্তু আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।" রবি দেখিল, তাঁহার ম্লানগম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া গেল! কিন্তু সে তাহাতে ভয় পাইল না; আর একটু কাছ ঘেঁসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বাবু তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া, আদর করিয়া, কহিলেন, "সোনা ছেলে!"

দূর হইতে প্রকাণ্ড গেটওয়ালা ঘড়ি-দেওয়া সুপরিচিত বাড়ীখানা চোখে পড়িতে কহিলেন, "কাল সকালে আবার তুমি আস্‌বে খোকা?" "হ্যাঁ আস্‌ব—না আমি আস্‌তে পার্‌ব না!" তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, সকালে তাহার বাগানে "তাঁহার" কাছে যাইবার কথা আছে; কথা দিয়া কথা না রাখা যে ভারী দোষ, তাহা সে জানিত। "আস্‌তে পারবে না? কেন আস্‌তে পারবে না? তোমার খুব বেশি কাজ আছে বুঝি?" বাবুর স্বরে নিরাশা বা আনন্দ কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। রবি খুব বেশি কাজের মানে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাঁহার স্বর তাহার পছন্দ হইল না। কহিল, "দেখুন—।" কথাটা বলিতে গিয়াই রবির মনে পড়িয়া গেল যে, সে বলিয়াছে যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কথা কাহাকেও বলিবে না। সে আগ্রহপূর্ণ নম্রস্বরে কহিল, "দেখুন, আমি বিকেলে আস্‌তে পারি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আমরা বিকেলেই বেড়াতে যাব; কাল তিনটের সময় তুমি ঠিক্ হয়ে থেক। 'না' বল্‌বেনা ত?"—"না; আমি তিনটের সময় আসব। ঐ বড় ঘড়িটায় তিন্‌টে বাজলেই, আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। দেখুন, আপনাকে আমার খুব ভাল-লাগচে; আমার বাবার মত ভাললাগচে?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরস্বরে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি খোকা?"

"আমার নাম—আমার নাম শ্রীরবিলোচন রায়। আমার বয়েস পাঁচ বচ্ছর—পাঁচ—বচ্ছর।"

দরওয়ান ধীরে ধীরে গেট বন্ধ করিয়া, বাবু যে পথে চলিয়া গিয়াছিলেন সেইদিকেই হাঁ করিয়া, চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(৫)

রবির সহিত এমনি করিয়া বাবুর ঘনিষ্ঠতা যখন বর্দ্ধিত হইল, তখন একদিন একটুখানি ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রবি, তোমায় সকাল বেলা আস্‌তে ব'ল্লে আস্‌তে পার না কেন?" রবি দুঃখিতভাবে কোটের বোতাম খুঁটিতে লাগিল, উত্তর দিল না। অনেকবার ইচ্ছা হইয়াছিল সে বলে যে, তাহার মটর চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার কথা সে তাঁহাকেও বলে নাই; কিন্তু তাঁর কথা রবি ত বলিতে পারে না। তাই, একটুখানি অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া, সে বাবুর আঙ্গুলগুলি নাড়িতে ছিল।

এমন অনেক কথা আছে, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু সামান্য একটু হাসি চাহনিতে ছবির মত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। একটু খানি স্নেহপূর্ণস্বরে বাবু কহিলেন, "আচ্ছা রবি! তোমার গোপন-কথা বলে কাজ নাই—আমি তা শুনতে চাইব না।" বাবু ভাবিয়া-ছিলেন যে, রাধানাথের স্ত্রী সম্ভবতঃ সকাল বেলাটা তাহাকে কোন কাজে আটক করিয়া রাখে; বাধ্য বালক কাজ

ছাড়িয়া আসিতেও পারে না; আপত্তি করিতেও হয় ত তাহার সাহস হয় না।

রবি বলিল, "আপনি যে তখন বল্লেন, "গোপন-কথা" তার মানে কি? গোপন-কথা কেউ কাকেও বলে না, বুঝি?" গোপন-কথার অর্থবোধ সম্বন্ধে রবির অভিজ্ঞতা অধিক দূর অগ্রসর না হইলেও, তাঁহার বলিবার ভঙ্গি ও সুমিষ্ট সুরটি রবির ভারী মিষ্ট লাগিল; সে অকারণে খুব হাসিতে লাগিল। তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার বিষণ্ণ মুখের গাম্ভীর্য্যের আবরণখানা যেন একটু একটু করিয়া সরিয়া পড়িতে ছিল।

(৬)

দশটা বাজিয়া গেল। রমণী হাতের মাসিকপত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। শ্রাবণের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে রোদ ও বৃষ্টির চকিত লীলাভিনয় চলিতে ছিল। এখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, বৃষ্টিধৌত বৃক্ষপত্রে শ্যাম চিক্কণতা, গাছে গাছে পাখীর দল কিচকিচ্ শব্দ করিয়া ভিজা ডানা ঝাড়িয়া ফেলিয়া শান্ত হইয়া বসিয়া আছে। বর্ষার বাতাস হুহু করিয়া গাছের পাতা দোলাইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। সর্ব্বত্রই বায়ুতাড়িত জড়পদার্থের মধুরালাপ। রমণী উৎকণ্ঠিত আগ্রহপূর্ণনেত্রে বারবার বাহিরের বাগানের দিকে চাহিতে ছিলেন। টেবিলের উপর একখানি রূপার থালায় কতকগুলি আঙ্গুর, আপেল, আতা, নেংড়া আম বস্ত্রাচ্ছাদিত; তাহার ঢাকনাটা খুলিয়া রাখিলেন। একধারে কতকগুলি খেলানা, ব্যাট্‌বল, ছবির বই সজ্জিত ছিল। একখানি রুলকাটা খাতায় আঁকাবাঁকা হাতের লেখা, তাহার ক্ষুদ্র অধিকারীর স্মৃতিচিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল। দেওয়ালের গায়ে একখানি ঘুড়ি টাঙ্গান আছে, লাটাইটা অদূরে একটা ত্রিপদীর উপর যত্নে রক্ষিত।

রমণীর সতৃষ্ণচক্ষু বারবার বাগান হইতে গেটের বাহিরে যাতায়াত করিতেছিল। ক্রমে প্রতীক্ষা অসহ্য হওয়ায়, তিনি বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়া, সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। বাগানের সরু রাস্তাটি ধরিয়া খানিক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন, মনের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া পড়িতেছিল। ব্যাকুল চিত্ত ক্রমাগতই অশুভ কল্পনায় অধীর হইতেছিল।—ঘড়িটা কি ভুল চলিতেছে? গেট্‌টা বন্ধ নাই ত? না, খোলাই আছে? সে কি তবে ফিরিয়া গিয়াছে? কিন্তু তিনি ত কোথাও সরিয়া যান নাই বরাবর এই খানেইত উপস্থিত রহিয়াছেন! না ডাকিয়া সে ত কখনও ফিরিয়া যায় না। তবে? নিরূপিত সময়ে অনুপস্থিত আজ যে রবির প্রথম। এমন ত আর কোন দিন ঘটে না! কথারাখা তাহার স্বভাব, জলঝড়েও সে বাধা মানিত না। কতদিন এইজন্য শাসনচ্ছলে প্রচুর স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। সময় সময় হয়ত সংসারের কাজে তাঁহারই আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, রবি তাহার বড় বড় কালো চোখের ব্যাকুল দৃষ্টিতে বিদ্ধ করিয়া সাভিমানে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "এত দেরি হলো?" মরিচা-ধরা ঐ লোহার রেলিংঘেরা গেট্‌টা যে আর কখনও খোলা হইবে, একথা দুইমাস পূর্ব্বে তিনি মনেও করিতে পারেন নাই। এই অন্ধকার শব্দহীন গৃহখানাতে আবার যে কোন দিন বালকণ্ঠের বালাহাস্যধ্বনি মুখরিত হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অপ্রত্যাশিত। অন্ধকার নিশীথে বিদ্যুৎ-বিকাশ হয় অন্ধকারের গাঢ়ত্ব প্রতিপাদন করিতে; ইহাও কি তবে তাই? যে সুগভীর বেদনা ভিত্তিভেদী বটবৃক্ষের মত তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় অংশটাকে জুড়িয়া রাখিয়াছে, তাহার মূল উৎপাটন করিতে হইলে, হৃদয়খানাকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়;—তাহা ত জীবনান্তের সঙ্গী। যে অসীম দুঃখের গাঢ় অন্ধকার অন্তঃকরণের সবটুকু অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, সেই সুগভীর অন্ধকারে সুমধুর আলোক-রেখাটির মত আনন্দের যে ক্ষীণ ধারাটি মৃদুভাবে ঝরিতেছিল—সে যে ঐ রবি। চোখের উপর হইতে সেই সরু পথটা, ঝোপঝাপওয়ালা বাগানখানা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। মেঘ কাটিয়া গিয়া অম্লান রৌদ্রে সমস্ত আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। শান-বাঁধান ছোট পুকুরের জলে ঢেউগুলি হীরককণার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল—রাঙামাছের দল প্রতিদিনের মতই জলের ভিতর সন্তরণ-বিদ্যার অনুশীলনে হর্ষোৎফুল্ল। বাতাসে গাছের পাতার মর্ম্মরধ্বনি। আপাদমস্তক পুষ্পখচিত কামিনী গাছটার ঝোপের ভিতর লুকাইয়া গন্ধবিভোর বর্ষার কোকিল সুগভীর স্তব্ধতাকে থাকিয়া থাকিয়া সচকিত করিয়া দিয়া ডাকিতেছিল, "কুউ-উ।" জড় ও চৈতন্যের মর্ম্মে মর্ম্মে একটা বিস্মৃত স্মৃতির আলোক-রেখা সর্ব্বত্রই সজাগ।

"সে কেন-এলোনা—কেন এলোনা?" একটা অস্ফুট

আশঙ্কা ক্রমাগতই তাঁহার মনের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল। জীবনের পাত্র হইতে যে দুইএরই স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নিকট তিক্তস্বাদ দুঃখ বা মিষ্টস্বাদ সুখ, দুইই যে সুপরিচিত। তথাপি বন্ধনজাল অনিচ্ছাতেও যে নিবিড়ভাবে জড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "সে কি তবে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে? কোন নূতন ক্ষুদ্র সঙ্গী কি তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে? না, তাহাও ত সম্ভব নহে? কাল সকালে বিদায়ের পূর্ব্বেও যে সে তাঁহাকে সুকোমল ছোট হাত দুইখানির স্নেহবন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন দিয়াছে; চুম্বনের সে চিহ্নটুকুও বুঝি খুঁজিলে মেলে, সুখস্পর্শটুকু এখনও যে অন্তরে অনুভূত হইতেছিল। তবে? হা ঈশ্বর! তাঁহার দুঃখের কি শেষ নাই! বুঝি তাঁহার অদৃষ্টের সহিত স্নেহবন্ধনে জড়িত হইতে চাহিয়াছিল বলিয়াই বালকের কোন বিপদ ঘটিয়াছে? ভাবিতে বুকের বেদনা যখন অসহ্য হইয়া পড়িল, রমণী তখন দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। তখনই তাহার খবর চাই। নিশ্চয়ই তাহার কিছু হইয়াছে।

ঠিক সেই সময় গেটের অপরপ্রান্তের ঘরখানার পাশের দরজাটা খুলিয়া গেল। রমণী তড়িতাহতের মত ফিরিয়া দেখিলেন, না রবি নহে—আগন্তুক তাঁহার স্বামী। দুইবৎসর পরে আজ প্রথম তিনি এখানে আসিয়াছেন;—এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর তিনি সাবধানে, এই অংশটাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছিলেন, দুইবৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া যখন ঐ পুষ্পখচিত উদ্যানমধ্যে ঐ শুভ্র বেদির উপর আসিয়া বসিতেন, তখন আরএকখানি ছোট মুখ তাঁহাদের দুইজনের মাঝখানে কি গভীর আশা-আনন্দের আলোকেই প্রদীপ্ত হইয়া ফুটিত। টগরের ও বাতাবী-নেবু-ফুলে ভরা বাগানের ঐ অংশটাতে যে সুকোমল হাস্য-লহরী তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি স্নায়ুজালের উপর আনন্দের বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করিয়া ধ্বনিত মুখরিত হইয়া উঠিত, তাহার অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি এখনও বুঝি বাতাসে লাগিয়া রহিয়াছে। তারপর, একদিন বিশ্ব যখন জ্যোৎস্নাজলে স্নান করিয়া, সেফালিকার সুগন্ধি মাখিয়া, পাপিয়ার কলঝঙ্কারে দিগন্ত মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তেমনি জ্যোৎস্না-রাতে মায়ের বুক হইতে কুন্দকলির মত শুভ্র নবনীর ন্যায় কোমল সেফালিগুচ্ছের মত সুরভি ফুলটিকে ছিনাইয়া লইয়া নিষ্ঠুর কাল কোন অনির্দ্দেশ্য পথে যাত্রা করিয়াছে। সেই দিন হইতেই ঐ লোহার গেট বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—সে আর আসিবে না! চিরদিনের জন্যই তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে!

হেমেন্দ্রনাথ সেই দিন হইতেই অট্টালিকার এ অংশ ত্যাগ করিয়াছেন; ভুলিয়াও আর এদিকে পদার্পণ করেন নাই। পরিত্যক্ত সর্পনির্ম্মোকের মত অতীতটাকে যদি পরিত্যাগ করিবার তাঁহার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে বুঝি ভাল হইত। তাই, সেই চেষ্টাই এপর্য্যন্ত প্রাণপণে করিয়াও আসিতেছিলেন। রমণী যে শোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে চায়, পুরুষ তাহা হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসে। রমণীর সহিষ্ণুতা অধিক, তাই সে আঘাত পাইলেও আহত অংশটাকে বাদ দিতে রাজী হয় না।

রমণী বুঝিলেন, স্বামী অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই অচিন্তিত দৃশ্যটাকে গ্রহণ করিতেছিলেন। এখানে এমন করিয়া আবার যে এই সব ছোট ছোট স্মৃতিচিহ্ন সজ্জিত হইতে পারে, ইহা বাস্তবিকই তাঁহার ধারণার অতীত! তিনি কি পত্নীর নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতায় ক্ষুব্ধ হইয়া গিয়াছেন? তিনি কি সত্যসত্যই বিশ্বাস করিয়াছেন যে, "মনি"কে সে ভুলিয়া গিয়াছে? তাহারই শূন্য সিংহাসনে অন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার স্মৃতিকেও মুছিয়া ফেলিয়াছে! অতীত ও বর্ত্তমানের সংক্ষুব্ধ স্মৃতির তাড়নায় তাঁহার অন্তরে যে নিদারুণ ঝটিকা উত্থিত হইতেছিল, বাহিরে তাহার অধিক প্রকাশ বুঝা গেল না। কম্পিত দেহের ভর গেটের উপর রাখিয়া, অত্যন্ত ম্লান হাসি হাসিয়া, রমণী স্বামীর প্রতি চাহিলেন; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অতি দুঃখেও মানুষ হাসে। হেমেন্দ্রনাথও হাসিয়া স্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। অনেক দিনের পর স্মৃতি-সাগরের তলদেশ আন্দোলিত করিয়া, যে গভীর বেদনা ও আকস্মিক উত্তেজনা তাঁহার অন্তরে উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল, মুখে তাহারই সুগভীর ছায়া ফুটিয়া উঠিল। অভিজ্ঞেরা সে হাসি দেখিলে নিঃসন্দেহ ভীত হইতেন।

হেমেন্দ্রনাথের মুখের পানে চাহিয়া রমণী বুঝিলেন, স্বামী যে জন্যই হাসিয়া থাকুন, তাঁহাকে তিরস্কার করিবার

উদ্দেশ্যের ভাব সে মুখে নাই। প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিয়া স্বামী কহিলেন, "মিলি!" কথাটা শেষ না করিয়াই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নত দৃষ্টিতে চুরুটটার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে কিনা তাহারই পরীক্ষা করিতে করিতে কহিলেন, "মিলি, তুমি আশ্চর্য্য হচ্চ—আমি—আবার—এখানে—এসেচি। তুমি হয় ত জাননা, বাড়ির বাইরে একটি ছেলে আছে, ভগবান্ তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—রাধানাথ তার মামা—অতি নির্ব্বোধ সে, সে আমায় খুসী করবার জন্যে ছেলেটিকে গাছে উঠ্‌তে বলে; ফুল পাড়্‌তে ছেলেটি পড়ে গিয়ে—। মিলি, মিলি, তুমি কি ভয় পেলে?"

"না, না, তারপর তার কি হোল—ওগো বল, কি হোল?"

হেমেন্দ্রনাথ অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, মিলির মুখখানা একেবারে পাণ্ডাস হইয়া গিয়াছে; সমস্ত দেহ বায়ুতাড়িত বেতসপত্রের মত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। পত্নীর কম্পিত হাতখানি সস্নেহে আপনার হস্তে ধারণ করিয়া, সুগভীর করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে হেমেন্দ্রনাথ পত্নীর উদ্বেগ-পীড়িত বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "শান্ত হও, মিলি। আমি তোমায় জানাতে এসেছিলুম—"

"বল, কি জানাতে এসেছিলে বল—আমি সব সইতে পার্‌ব—আমায় দেখে বুঝ্‌তে পাচ্চ না, কত বড় রাক্ষুসী আমি।"

রমণী হাঁফাইতেছিলেন। চোখে জল ছিল না; একটা উত্তপ্ত অগ্নিশিখা চোখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। পত্নীর আকস্মিক বিচলিতভাবে বিস্মিত হইয়া গিয়া হেমেন্দ্রনাথ মিলির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছেলেটির ডান হাতের হাড় ভেঙ্গে গেছে। ডাক্তার সরকার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন। আমি বল্‌ছিলুম, রাধানাথের ত ঐ ঘরদোর—ওখানে ত ভাল জায়গা নেই, ওখান থেকে ওকে সরালে হয় না?"

"না না ওকে হাঁস্‌পাতালে পাঠিও না।" মিলি ব্যগ্রভাবে স্বামীর বাহু অবলম্বন করিল।

"না—তা পাঠাব না; আমি ভাবছিলুম ওকে বাড়ীতে এনে রাখলে হোত না? না থাক, তাতে কাজ নেই—তোমার অসুবিধা হবে হয় ত? ছেলেটি বড্ড ভাল—আহা বাপ মা তার দুইই নেই—রাধানাথ তার মামা—তোমার কি মনে হয়—কষ্ট হবে কি?" হেমেন্দ্রনাথ পত্নীকে আর একটু কাছে টানিয়া কোমলতর স্বরে পুনরায় কহিলেন, "তুমি যা বল্‌বে—তোমার ইচ্ছের উপর ছেলেটির ভাগ্য নির্ভর কচ্চে।"

স্তব্ধ গৃহে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সুগভীর নিস্তব্ধতা বিস্তৃত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণের পর মৃণালিনী মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিল। সে চক্ষু তাঁহারই মুখের উপর স্নেহবর্ষণ করিতেছিল! কে বলে সে হতভাগিনী?—এমন করুণাময় উদার উন্নত হৃদয় স্বামীর, স্ত্রী সে। জীবনের—জন্মের এতখানি সার্থকতা সত্যই সে পাইয়াছে। আর সেই স্নেহের বন্ধন? তাঁহাদের দুইটি জীবনতন্ত্রীর একই সুর। কে বলে সে নাই? তাঁহাদের অন্তরের সবখানটাই যে সে জুড়িয়া পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সে নাই, কিন্তু তাহার স্মৃতি ত আছে?

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মিলি দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; "এদিকে এস—তুমি যার কথা বল্‌চ, এসব তারই জন্য। রোজ সকাল বেলা সে আমার কাছে আস্‌ত, হাস্‌ত, খেলা কর্‌ত, পড়্‌ত, তাকে যেদিন প্রথম দেখি, সে ঐ গেটের ধারে ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে মার জন্যে কাঁদ্‌ছিল। আমি মনে করেছিলুম, তার কথা সব তোমায় বল্‌ব; কিন্তু বল্‌তে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল, তুমি হয়ত ভাব্‌বে খোকাকে—আমার যাদুকে—আমি ভুলে গেছি। হয়ত মনে করবে—তোমার এত ভালবাসাতেও আমি সুখী হইনি। রবি আমায় শান্তি দিয়েচে সত্যি—কিন্তু তার জায়গা সে দখল করে নি—তার সিংহাসন খালি রেখে পাশে দাঁড়িয়ে সে শুধু—" একটুখানি সলজ্জ ম্লানহাসির সহিত স্বামীর পানে চাহিয়া মিলি কহিল—"তুমি আমায় ভুল বোঝনি ত?"

হেমেন্দ্রনাথ সুগভীর স্নেহের সহিত পত্নীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ধরিলেন। আবেগের অশ্রু হু হু করিয়া দুই চোখ ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমি সব বুঝ্‌তে পেরেচি মিলি! আমাকেও সে সুখী করেচে—ভালবেসেচে।"

একটা সুগভীর নিশ্বাসে হৃদয়ভার লঘু করিয়া দিয়া

মিলি কহিল, "ভগবান্ তাকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। সে তাঁরই দান। তাকে ভালবেসে আমরা মণির কাছে অপরাধী হব না—"। তাহার বেদনাতুর বক্ষে যে করুণ সুর ধ্বনিত হইতেছিল, যেন তাহারি অনুরণন সারাবিশ্ব প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সংশয়াকুল চিত্ত নিজের কাছে অনেকবারই এই প্রশ্ন তুলিয়াছে—সন্দেহ অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছিল। আজও তাই ঐ কথাই তাহার মনে হইল। মৃত সন্তানের স্মৃতির নিকট সত্যই কি সে অপরাধিনী হইতে চলিয়াছে! পরের ছেলেকে ভালবাসিয়া নিজের স্বর্গগত পুত্রকে অবহেলা করিল না ত? রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া হেমেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ডাক্তার সরকার তার কাছে বসে আছেন—তুমি যাবে কি সেখানে—দেখ্‌তে?"

বাগানের ধারের সুসজ্জিত প্রশস্ত গৃহে জানালার ধারে খাটের উপর রবি শয়ন করিয়াছিল। পাশে বসিয়া সস্নেহনেত্রে চাহিয়া মিলি তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। রবির হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে অতৃপ্তনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া মিলি কহিল—

স্বামীর পানে চাহিয়া মিলি কহিল, তুমি আমায় ভুল বোঝনি ত?

"ডাক্তার বলে গেলেন, কাল তুমি উঠে বেড়াতে পাবে। আস্‌চে হপ্তায় আমরা দার্জ্জিলিংএ যাব।"

"দার্জ্জিলিংএ—সে কোথায়?"

"সে অনেক দূর—পাহাড়ের উপর দেশ—খুব সুন্দর জায়গা সে।"

"সেখানে বাড়ী আছে?"

"হ্যাঁ, তুমি গেলে দেখ্‌তে পাবে, খুব বেড়াবার সুবিধা সেখানে।"

"বাবু কোথায় গেলেন?—এক্ষুনি আস্‌বেন যে বলে গেলেন?"

"ঐ যে তিনি আস্‌চেন—বাবুকে তুমি ভালবাস?" খোলা জানালা দিয়া রবি চাহিয়া দেখিল, হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খুব ভালবাসি—দেখুন"—রবি তাহার সুন্দর মুখের মিষ্ট হাসিতে সুধা ঢালিয়া দিয়া কহিল, "দেখুন,—বাবুকে কেমন সুন্দর দেখাচ্চে? আজ মুখভার করেন্‌নি ত?"

রমণী উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া সতৃষ্ণনেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া, রবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার গালের উপর মুখ রাখিয়া, চুম্বন করিয়া, মৃদু মৃদু আদরের স্বরে কহিতে লাগিলেন, "সোনা আমার, গোপাল আমার!"

হেমেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকিয়াই প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "সব ঠিক্ হয়ে গেল—রাধানাথের স্ত্রী কিন্তু ভারী কাঁদ্‌চে। তার একটুকুও ইচ্ছে ছিল না।"

মৃণালিনী স্বামীর পানে চাহিয়া ব্যথিতস্বরে উত্তর দিলেন, "তা হবে না—তারা ত আপনার জন। আমার

কিন্তু ওর সম্বন্ধে বড্ড ভুল ধারণা ছিল। আমি ভাবতুম, পাথরে গড়া পুতুল ও, মন টন্ বুঝি কিছু নেই। মানুষ যত রকম ভুল করে, অপরকে বুঝ্‌তে যাওয়াই দেখ্‌চি সব চেয়ে বেশী ভুল। 'ওদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করে দিলে ত ?"

হেমেন্দ্রনাথ রবির পানে স্নেহপূর্ণনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ—মহল কলাকাঁদাতে রাধানাথকে তসিলদারের কাজে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিলেম। সেখানে সে থাক্‌বে, ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে এখানে এসে রবিকে দেখে যেতে পাবে।—আচ্ছা রবি, আমাদের কাছে তুমি বরাবর থাক্‌তে পার্‌বে ত ? কেমন লাগ্‌বে তোমার ?"

মৃণালিনী তাহার দুই ব্যগ্র চক্ষুর ব্যাকুল দৃষ্টি বালকের মুখে স্থাপিত করিয়া, প্রতিধ্বনি করিল,"থাক্‌তে পার্‌বে ত ? বল—বরাবর থাক্‌তে পার্‌বে ত ? বল বরাবর থাক্‌বে—ছেড়ে যাবেনা কোথাও ?"

রবি তাহার বড় বড় কালো চোখের বিস্মিত দৃষ্টি দুজনের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া, অত্যন্ত সহজ স্বরে উত্তর দিল, "আমিত এইখানেই বরাবর থাক্‌ব। কোথাও ত যাবনা মা তোমাদের ছেড়ে !"

আমন্ত্রণ

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী]

আলোয় ভরা আকাশখানি
ছাপিয়ে, শুধু সুধার বাণী
উছ্‌লে পড়ে সারা ভুবন মাঝ !
'ছলছলিয়ে' ভাবের নদী
এম্‌নি করে'ই বইছে যদি,
ওরে ও মন, আয়রে ধেয়ে' আজ ;—
আয়রে তবে দু'হাত তুলে',
সব চুকিয়ে, আপন ভুলে',
বাঁধন খুলে' ঝাঁপ দিবি তো আয় !

ঢেউগুলি ওই অমন করে'
ডাক্‌ছে কা'রে পাগল ওরে,
উদাস স্বরে, অথির ইসারায় ?
কেমন্ করে' আপন মনে
ঘুমিয়ে র'বি ঘরের কোণে ?—
শ্রবণ ভরি' শোন্‌রে এখন শোন্—
গগন ছেয়ে' ক্ষণে ক্ষণে
কাহার লাগি' এই বিজনে
আস্‌ছে ভেসে' আকুল আমন্ত্রণ !

মানব-সভ্যতার ইতিহাস

(অনুবাদ)

[শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত, M. A.]

ভদ্রমহোদয়গণ,

এতকাল বিচ্ছেদের পরে আপনাদিগের সাদর অভ্যর্থনায় আমি বিচলিত হইয়াছি; আমাদের মধ্যে যে মনের মিল ছিল,* এতদিনের ছাড়াছাড়ি হওয়া সত্ত্বেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই,—আজিকার আপ্যায়নে ইহাই যেন সূচিত হইতেছে, এই রূপেই আমি ইহা গ্রহণ করিতেছি।—হায়, আমি এমন ভাবে কথা কহিতেছি, যেন সাত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা আমার তাৎকালিক কার্য্যের সহচর ছিলেন এবং এই গৃহে সমবেত হইতেন, তাঁহারাই যেন আজ আমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; আমি নিজে এখানে পুনরায় উপস্থিত আছি বলিয়া বোধ হইতেছে, যেন আমার সমস্ত পুরাতন পরিচিত শ্রোতৃবর্গেরও এখানে হাজির হওয়া উচিত; কিন্তু ইহার মধ্যে সমগ্র জগৎসংসারে কি পরিবর্ত্তন, কি বিষম পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে! সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা এখানে সমবেত হইতাম, আমাদের হৃদয় নানা সন্দেহ ও আশঙ্কা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত ছিল। চারিদিকে বিপদ্ ঘনীভূত; আমরা যেন একটা অমঙ্গলের দিকে আকৃষ্ট হইয়া সেইদিকে প্রধাবিত হইয়াছি; যেন আমরা স্থির, গম্ভীর, শান্ত সংযমের দ্বারা সেই অমঙ্গল নিরাকরণের প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমাদের আজিকার মিলন কিন্তু উদ্বেগশূন্য;—হৃদয় আশা ও শান্তিপূর্ণ, চিন্তাশক্তি স্বাধীন ও অপ্রতিহত। এই সুন্দর পরিবর্ত্তনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার একমাত্র উপায় আছে;—আমাদের এই সভার বৈঠকে আমাদের শাস্ত্রালোচনাকে সে কালের সেই গম্ভীর শান্ত সংযম ও স্থিরপ্রতিজ্ঞা দ্বারা পুনরায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে; সেই যখন আমরা দিনের পর দিন গণিতাম, মনে হইত যে, আমাদের বিদ্যাচর্চ্চার উপর হয়ত কড়া পাহারা বসাইয়া দেওয়া হইবে, কিংবা লেখাপড়া সহসা বন্ধ করিয়া দিবে, তখনকার সংযম ও প্রতিজ্ঞাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সৌভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা। আশার সঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু এই নবজাগ্রত আশার পশ্চাতে প্রবৃত্তিকে উদ্দাম হইতে দিলে চলিবে না; আশঙ্কার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যেমন চলিয়াছিলাম, আশার সহিত সামঞ্জস্য রাখাও সেইরূপ আবশ্যক; ব্যাধির পূর্ব্বাভাস-কালে যে সতর্কতার প্রয়োজন, রোগমুক্তির সময়েও প্রায় তেমনই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আশা করি, আপনারা সকলে সেই সতর্কতা ও সংযম প্রদর্শন করিবেন। ঘোর দুর্দ্দিনে ও বিপদের মধ্যে যে মতের মিল ও ভাবের ঐক্য আমাদিগকে নিবিড় সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল এবং অন্ততঃ ঘোর দুষ্কার্য্য হইতে বিরত রাখিয়াছিল, আজিকার এই শুভদিনেও তাহারা আমাদিগকে তেমনই করিয়া মিলিত করিবে; যে শুভফল প্রসূত হইবে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব। আপনাদের সাহচর্য্যের উপর আমি নির্ভর করিতেছি; তদ্ব্যতীত আর কিছু চাহি না।

আজিকার এই অধিবেশনের পর এ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সময় বড় বেশী থাকিবে না; আমি আবার আমার বক্তৃতাগুলির বিষয় সম্বন্ধে ভাবিবার অবসর অত্যন্ত অল্প পাইয়াছি। সুতরাং বিষয়-নির্ব্বাচন একটা গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এমন বিষয় হওয়া চাই যে, এই বৎসরের যে কয় মাস আমাদের হাতে আছে, সেই কয় মাসে তাহা আলোচিত হইতে পারে; অথচ অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আমিও বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। আমার বোধ হইল যে, সভ্যতা-বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, আধুনিক য়ুরোপের ইতিহাসের সাধারণ আলোচনা, অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস,—তাহার উৎপত্তি, তাহার উন্নতি, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার প্রকৃতি,

* গীজোর ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই সকলের আলোচনা আমাদের সময়োপযোগী হইবে। এই জন্য আমি মনে করিয়াছি যে, এই বিষয় লইয়া আমি আলোচনা করিব।

আমি য়ুরোপীয় সভ্যতা শব্দটি ব্যবহার করিলাম, কারণ বাস্তবিক য়ুরোপীয় সভ্যতা নামক একটা স্বতন্ত্র জিনিষ রহিয়াছে। সমগ্র য়ুরোপের রাষ্ট্রীয় সভ্যতার মধ্যে একটা ঐক্য রহিয়াছে; দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও এই সভ্যতা প্রায় একই প্রকার বাস্তব ঘটনা হইতে উদ্ভূত হইয়া, একই রকমের কার্য্যকারণ-পরম্পরার বশীভূত হইয়া চলিতে চলিতে সর্ব্বত্রই প্রায় একই রকমে ফলপ্রসবের প্রবণতা দেখাইয়া থাকে। কাজেই, একটা য়ুরোপীয় সভ্যতা আছে বৈ কি; এবং সেই সভ্যতাসমষ্টিকে আমার বক্তৃতার বিষয়ীভূত করিয়া, তৎপ্রতি আপনাদিগের মনোনিবেশ প্রার্থনা করিতেছি।

পুনশ্চ দেখা যাইতেছে যে, য়ুরোপের কোনও একটা রাষ্ট্র-বিশেষের ইতিহাসের মধ্যে এই সভ্যতাকে, এই সভ্যতার ইতিহাসকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এক হিসাবে ইহার যে কয়টি বিশিষ্ট মৌলিক গুণ আছে, তাহা স্বল্প বটে; কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য বড় কম বিস্ময়কর নহে; কোনও দেশে ইহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করে নাই; ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি নানা স্থানে নানারূপে প্রকট হইয়া রহিয়াছে; ইহার সারতত্ত্বের অন্বেষণে আমাদিগকে কখনও ফ্রান্সে, কখনও ইংলণ্ডে, কখনও জর্ম্মানীতে, কখনও স্পেনে যাইতে হইবে।

আমরা ফ্রান্স-দেশবাসী; আমাদের পক্ষে এই বিষয়টি লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার যথেষ্ট সুবিধা আছে। ব্যক্তি-বিশেষের তোষামোদ, এমন কি, আমাদের স্বদেশের সুখ্যাতির আতিশয্য সব সময়ে বর্জ্জনীয়; কিন্তু আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ফ্রান্সই য়ুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। আমি এমন কথা বলি না যে, সে বরাবর সর্ব্বতোভাবে সমগ্র জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন যুগে, সুকুমার কলায় ইটালি, এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ইংলণ্ড—ফ্রান্সের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে; বোধ হয়, সময়ে সময়ে অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতি অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব, যে যখনই সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, অন্যান্য জাতি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অরোহণ করিয়াছে, তখনই সে নূতন বল সঞ্চয় করিয়া, নবীন উদ্যমে এক লম্ফে তাহার প্রতিযোগীদিগের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; হয়ত বা তাহাদের সকলের সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সের শুধু যে, এই টুকুই বৈশিষ্ট্য ও সৌভাগ্য, তাহা নহে। অন্যান্য দেশে যখন নবীন ভাবোন্মেষ হয়, নূতন নূতন অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তখন সেই সকল ভাব, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান, দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া

পাষাণ-বাঁধন টুটি ভিজায়ে কঠিন ধরা
বনেরে শ্যামল করি,' ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,

সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু তাহারা ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া রূপান্তর হইয়া যায়; যেন সেখানে তাহারা নবজন্ম লাভ করে; তখন যেন তাহারা তাহাদের এই নূতন জন্মস্থান হইতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়ে। মানব-সভ্যতার ক্রমোন্মেষে এমন কোনও বিরাট ভাব, এমন কোনও বিপুল তত্ত্ব নাই, যাহা পরিব্যাপ্তির পূর্ব্বে ফ্রান্সের ভিতর দিয়া যায় নাই।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ফরাসীর জাতীয় চরিত্রে সামাজিকতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি এমন কিছু বিশিষ্ট গুণ আছে, যাহা অতি সহজে সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া বসে, যেথানে অন্যান্য দেশের জাতীয় শক্তি কার্য্যকরী হইতে পারে না; আমাদের ভাষার গুণেই হউক, কিংবা আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিশিষ্টতার জন্যই হউক, ইহা সুনিশ্চিত যে, আমাদের ভাবগুলি অন্যজাতির চেয়ে ইতর-সাধারণের নিকট স্পষ্টতর ও অধিকতর সুবোধ্য হইয়া, তাহাদিগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়; স্বচ্ছতা, সামাজিকতা, সহৃদয়তা—ফরাসী এবং ফরাসীর সভ্যতার বিশিষ্ট গুণ; এই গুণগুলিই তাহাকে য়ুরোপীয় সভ্যতার পুরোভাগে অগ্রণী হইবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

অতএব, এত বড় ঐতিহাসিক সত্যসম্বন্ধে তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি আমরা ফ্রান্সকে বাছিয়া লইয়া, আমাদের বিষয়ের কেন্দ্রস্থলে দাঁড় করাইয়া দি, বোধ হয়, তাহা হঠকারিতার বা খামখেয়ালির পরিচায়ক হইবে না। যদি আমরা সভ্যতার মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে চাই, সারসত্যের

অন্তস্তল উদ্‌ঘাটিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগের গত্যন্তর নাই।

ঐতিহাসিক সত্য—এই কথাটা আমি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম; অন্যান্য সত্যের মত মানবসভ্যতাও সত্য,—তাহাদিগের মত ইহাও আলোচিত, বর্ণিত, বিবৃত হইতে পারে।

শুধু সত্য ঘটনার বিবৃতিতে ইতিহাসের কার্য্য পর্য্যবসিত হওয়া উচিত, এই রকম একটা কথা কিছু কাল ধরিয়া শুনা যাইতেছে; ইহার চেয়ে ন্যায়সঙ্গত কথা আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণতঃ লোকে প্রথম প্রথম যে গুলিকে সত্য বলিয়া মনে করে, তদতিরিক্ত আরও অনেক বিচিত্র সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;—স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য,—যথা, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজসরকারের কার্য্যাবলী; আধ্যাত্মিক সত্য,—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে বলিয়া যে সে গুলি সত্য হিসাবে কোনও অংশে ন্যূন তাহা নহে; স্বতন্ত্র এক একটি সত্য,—তাহাদের স্বতন্ত্র নামকরণ হইয়াছে; সাধারণ সত্য,—তাহাদের বিশেষ কোনও নামকরণ হয় নাই এবং তাহাদের সম্বন্ধে সাল তারিখ ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করাও অসম্ভব, কিন্তু সে গুলিও অন্যান্য ঐতিহাসিক সত্যের মত খাঁটি সত্য, ইতিহাস হইতে সে গুলিকে বাদ দিলে ইতিহাস পঙ্গু হইয়া পড়িবে।

ইতিহাসের যে অংশটিকে আমরা সাধারণতঃ দার্শনিক বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি,—ঘটনাপরম্পরার সম্বন্ধ, কি সূত্রে তাহারা পরস্পর গ্রথিত, তাহাদের কার্য্য-কারণের বিচার,—এ সকলই সত্য; যুদ্ধের বিবরণের মত, অন্যান্য স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার বিবরণের মত ঐতিহাসিক সত্য। এই সকল সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ব্যাখ্যা করা অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার; ইহাদিগকে বর্ণনা করিবার সময় ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা অধিক; ইহাদিগের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; বিচিত্র বর্ণসমাবেশে পরিষ্কার ভাবে দেখান শক্ত। কিন্তু শক্ত বলিয়া ইহাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না; ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইহাদের আবশ্যকতার তিলমাত্র হ্রাস হয় না।

মানব-সভ্যতা এই রকম একটি সত্য ব্যাপার,—সাধারণ, রহস্যময়, জটিল সত্য; স্বীকার করি, ইহাকে বর্ণনা করা, বিবৃত করা, অত্যন্ত কঠিন কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; ইহা আছে; এবং আছে বলিয়া ইহার বর্ণিত বিবৃত হইবার অধিকার আছে। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এ প্রশ্ন অনেকবার করা হইয়াছে,—এই যে সভ্যতা, ইহা ভাল না মন্দ? অনেকে মন্দ মনে করিয়া ইহার জন্য দুঃখিত; আবার অনেকে খুব আনন্দিত। প্রশ্ন উঠে, ইহা কি শাশ্বত সত্য? সমগ্র মানবজাতির বিশ্ব-জনীন সভ্যতা বলিয়া একটা কিছু আছে কি? মানবের ধ্রুব অদৃষ্ট, অখণ্ডনীয় বিধিলিপি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি? এমন একটা কিছু, যেটিকে বিভিন্ন মানবসমষ্টি যুগে যুগে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; যেটি কখনও লুপ্ত হয় নাই, পরন্তু বর্দ্ধিতায়তন হইয়া অনন্তকাল চলিতে থাকিবে? আমার নিজের বিশ্বাস যে, মানবসাধারণের বাস্তবিকই একটা ধ্রুব সুনির্দ্দিষ্ট পরিণাম আছে,—সমগ্র সভ্যতার ধারাবহন। সুতরাং শাশ্বত মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচিত হইবে। কিন্তু এত বড় বড় প্রশ্ন উত্থাপিত না করিয়া—এ প্রশ্নগুলির সমাধান অত্যন্ত কঠিন—আমরা যদি নির্দ্দিষ্ট দেশকালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া, কয়েক শতাব্দীর ও কয়েকটি জাতির ইতিহাসে মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এই অল্প পরিসরের মধ্যে মানবসভ্যতা এমন একটি সত্য ব্যাপার যাহাকে বর্ণিত, বিবৃত করা যায়,—যাহা বাস্ত-বিক ইতিহাস। আমি বলিতে চাই, ইহাই সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর ইতিবৃত্ত,—অন্য সমস্তই ইহার অন্তর্গত।

আর বাস্তবিকই কি আমাদের নিকট এই সত্যটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না,—সাধারণ সুনির্দ্দিষ্ট সত্য, যেখানে অন্য সমস্তই পর্য্যবসিত ও বিলীন হইয়া যায়? যে সকল জিনিষ একটা জাতির ইতিহাস রচিত করিয়া তুলে, যেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ সেই জাতির ইতিহাসের প্রাণ-স্বরূপ মনে করিয়া থাকি,—ইহার জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি, ইহার বাণিজ্যব্যাপার, ইহার যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইহার রাষ্ট্রপদ্ধতি,—এই সকলগুলির বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন। যখন আমরা এগুলিকে সমষ্টিভাবে দেখিয়া, ইহাদের পরস্পরের মিলনের দিকে লক্ষ্য করিয়া, ইহাদের মূল্যের হিসাব করিতে বসি, বিচার করিতে বসি, তখন

প্রশ্ন করি যে, এই জাতীয় সভ্যতায় ইহারা কি দিয়াছে, কি কাজ করিয়াছে, কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এইরূপে আমরা যে শুধু এগুলিকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা নহে, আমরা ইহাদের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। এগুলি যেন ছোট ছোট নদী, আমরা যেন জিজ্ঞাসা করি, ইহারা কতটা জল সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়াছে। সভ্যতা একটা সমুদ্র-বিশেষ; ইহারই ভিতর হইতে একটা জাতির সৌভাগ্যলক্ষ্মী উত্থিত হয়েন; ইহারই উপরে তাহার জীবনের সমস্ত উপাদান, তাহার জীবন-রক্ষার্থ সমস্ত শক্তি সংহত ও মিলিত হয়। এ কথাটি খুব সত্য; কারণ, এমন অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার আছে, যেগুলা জঘন্য ও হেয়, যাহা একটা জাতির বুকের উপরে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া থাকে, যেমন মনে করুন, একেশ্বর রাজত্ব এবং অরাজকতা; কিন্তু তাহারা যদি সভ্যতার বিকাশে কিছুমাত্র সহায়তা করিয়া থাকে, যদি তাহাকে কতক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করাইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করি, তাহাদের অন্যায় ও অমঙ্গলের দিকটার প্রতি লক্ষ্য করি না। যেখানেই আমরা সভ্যতাকে চিনিতে পারি, যে কোনও কারণেই তাহা উদ্ভূত হউক না কেন, কি মূল্য দিয়া তাহাকে পাওয়া গিয়াছে, সে কথা ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।

আবার এমন অনেকগুলি সত্য আছে, যেগুলিকে ঠিক সামাজিক বলা যায় না; বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র জিনিষ, মানবাত্মার সহিত যাহার সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহার সামাজিক জীবনের সহিত নহে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস, দার্শনিক-মত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। এগুলি মানুষের নৈতিক উন্নতির সহায়তা করে বলিয়া, তাহার চিত্তাকর্ষক বলিয়া, তাহার নিকট উপাদেয়; তাহার আভ্যন্তরিক উন্নতি, তাহার চিত্ত-বিনোদনই ইহাদের উদ্দেশ্য; তাহার সামাজিক অবস্থার সহিত সম্পর্কিত নহে। কিন্তু এখানেও এই সত্যগুলিকে সভ্যতার দিক হইতে প্রায় বিচার করিয়া দেখা হয়, সেই দিক দিয়া বিবেচিত হইবার জন্য যেন ইহাদের একটা দাবী আছে।

সব সময়ে, সব দেশে, ধর্ম্ম বাহাদুরি লইয়া থাকে যে, সে মানুষকে সভ্য করিয়াছে; বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, সমস্ত মানসিক ও নৈতিক আনন্দ, এই বাহাদুরিতে ভাগ বসাইতে চায়; তাহাদের এই দাবী গ্রাহ্য হইলে আমরা মনে করিয়া থাকি যে, ইহা তাহাদের সুখ্যাতির ও গৌরবের পরিচায়ক। এইরূপে যে সকল জিনিষ স্বতঃই অতি আবশ্যক ও উচ্চ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, যাহাদের মূল বহির্জগতের ফলের উপর নির্ভর করে না, যাহাদের কেবলমাত্র মানবাত্মার সহিত সম্বন্ধ, তাহারাও সভ্যতার সম্পর্কে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার ও ভক্তির জিনিষ হইয়া পড়ে। এই সাধারণ সত্যটির মূল্য এত অধিক যে, ইহা যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাকেই মূল্যবান্ করিয়া তুলে। শুধু যে সভ্যতাই ইহাদিগকে মূল্যবান্ করিয়া তুলে, এমন নহে; অনেক সময়ে আমরা এই সকল ধর্ম্মবিশ্বাস, দার্শনিক মত, সাহিত্য, কলাবিদ্যা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখি যে, ইহারা বিশেষভাবে সভ্যতার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সেই প্রভাব কতক দূর পর্য্যন্ত এবং কিছু কালের জন্য তাহাদেরই গুণবত্তার নির্ভুল পরিমাপকরূপে গৃহীত হয়।

অতএব, এই ইতিহাসের প্রারম্ভেই আমি একটি প্রশ্ন করিব;—সেই জিনিষটি কি, যাহা স্বতঃই এত গুরু, এত বিরাট, এত মহামূল্য যে, তাহা সমগ্র জাতীয় জীবনকে পুঞ্জীভূত করিয়া বহিঃপ্রকটিত করে বলিয়া অনুমিত হয়?

এই খানে আমাকে একটু সতর্ক হইতে হইবে যেন আমি নির্ভেজ দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করিয়া না বসি; যেন একটি ন্যায়সূত্র অবলম্বন করিয়া, তাহা হইতে সভ্যতার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা না করি; এ পন্থা অব-লম্বন করিলে ভুলের সম্ভাবনা অধিক। এই স্থলে আমরা একটি ঐতিহাসিক সত্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে ও বর্ণনা করিতে চাই।

অনেক দিন হইতে 'সভ্যতা' কথাটা নানাদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; লোকে এই কথাটার সহিত কতকগুলা ভাব জড়িত করিয়া দিয়াছে,—কোনও কোনওটা সুস্পষ্ট ও ব্যাপক, কোনওটা বা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও সঙ্কীর্ণ; সে যাহাই হউক, এ শব্দটা কিন্তু ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং যাহারা এটাকে ব্যবহার করে, তাহারা কোনও না কোনও একটা অর্থ ইহার সহিত সংযোজিত করিয়া দেয়। এই শব্দটির সাধারণ, প্রচলিত অর্থটাই আমরা আলোচনা

করিব। প্রায় দেখা যায় যে, অত্যন্ত সাধারণ শব্দগুলি যে অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই অর্থ তাহাদের সযত্নরচিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর সমীচীন। মানুষের সাধারণ সহজ জ্ঞান শব্দগুলিকে তাহাদের সাধারণ অর্থটাই দিয়া থাকে; এবং এই সাধারণ সহজবুদ্ধি মানুষেরই গুণবিশেষ। একটা শব্দের প্রচলিত অর্থ বাস্তব সত্যের সহিত বরাবর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিয়া অল্পে অল্পে গড়িয়া উঠে। ক্রমে এমন হয় যে, যখন একটা নূতন সত্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং মনে হয় যে, ইহাকে একটা পরিচিত শব্দের অর্থভুক্ত করা যাইতে পারে, তখন ইহা অতি সহজেই তন্মধ্যে গৃহীত হয়; ক্রমে সেই শব্দটির অর্থ বাড়িয়া যায়; এবং যে সকল বিচিত্র সত্য ও বিভিন্ন ভাব স্বভাবতঃই এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, লোকে সেগুলিকে ঠিক তাহার মধ্যে আনিয়া ফেলে।

পক্ষান্তরে যদি একটা শব্দের অর্থ বিজ্ঞানের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, এই অর্থনির্দ্ধারণ-ব্যাপার কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, যখন মন কোনও একটা বস্তুবিশেষকে অনুভব করে। এই জন্য শব্দের সাধারণ অর্থের চেয়ে তাহার বৈজ্ঞানিক অর্থ প্রায়ই সঙ্কীর্ণতর,—সুতরাং সত্য হিসাবে অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হইয়া পড়ে। সত্য হিসাবে 'সভ্যতা' শব্দটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার কালে, কি কি ভাব এ শব্দটির ভিতর সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার সময়ে, যদি আমরা মানুষের সহজবুদ্ধির আশ্রয় লই, তাহা হইলে পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অপেক্ষা খাঁটি সত্যের উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা আমাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েকটি কল্পিত সামাজিক অবস্থা আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব। আমি বিভিন্ন অবস্থার কয়েকটি সমাজের বর্ণনা করিব। পরে আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব যে, মানুষের সহজ বুদ্ধি তাহাদিগের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করিতে পারে কি না, যাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই জাতি নিজের সভ্যতার জন্য সচেষ্ট, তাহাদের মধ্যে মানুষ সাধারণতঃ 'সভ্যতা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কি না।

প্রথম একটা জাতির কথা মনে করুন, যাহার বাহিরের সামাজিক জীবন বেশ সুখসচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। তাহারা সামান্য টেক্স দেয়; তাহাদের কোনও কষ্ট নাই; পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়বিচার ভালই হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে, তাহাদের স্থূল সামাজিক জীবন সুখময় এবং সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তাহাদের মানসিক ও নৈতিক অস্তিত্বকে সচেষ্টভাবে জড়ত্বে পরিণত করিয়া রাখা হয়; নিপীড়িত করিয়া রাখা হয়, এমন কথা আমি বলি না, কারণ নিপীড়ন জিনিষটা কি, তাহা তাহারা বুঝে না; তবে পিষ্ট করিয়া রাখা হয়। এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ছোট ছোট অভিজাততন্ত্র-রাষ্ট্র এমন অনেক আছে, যেখানে প্রজাপুঞ্জ গৃহপালিত পশুর মত ব্যবহার পাইয়া থাকে,—বেশ সুবন্দোবস্তে রক্ষিত ও সাংসারিক সুখসমৃদ্ধিবান, কিন্তু নৈতিক ও মানসিক জীবনীশক্তি বর্জ্জিত। ইহাকে কি সভ্যতা বলা যায়? এই লোকগুলি কি সভ্য?

আর একটা সামাজিক অবস্থা মনে করুন। সমাজের লোকের জীবনযাত্রা প্রথমটার চেয়ে একটু কম সচ্ছন্দতার সহিত নির্ব্বাহিত হয়; কিন্তু যাহা হউক, জীবন ধারণ করা চলে। পক্ষান্তরে, নৈতিক ও মানসিক অভাবগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে; মানসিক শক্তি-বিকাশের ক্ষেত্র কতকটা প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; সেখানে উচ্চ, পবিত্র ভাবগুলির অনুশীলন হইয়া থাকে; তাহাদের আধ্যাত্মিক ভাবগুলিও খানিকটা উন্নত; কিন্তু অতি সতর্কভাবে তাহাদিগের মধ্যে স্বাধীনতাবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখা হয়। পূর্ব্বোক্ত সমাজে যেমন স্থূল সাংসারিক অভাবগুলি মোচন করা হয়, এখানে তেমনই মানসিক ও নৈতিক অভাবগুলি পরিতৃপ্ত করা হয়। প্রত্যেকের অংশস্বরূপ একটু একটু সত্য তাহাকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়; নিজে অন্বেষণ করিয়া সেই সত্যকে উপলব্ধি করিবার অধিকার কাহারও নাই। নির্জ্জীবত্বই ইহাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষণ। এই অবস্থায় অধিকাংশ এসিয়াবাসী পতিত হইয়াছে; যেখানে যাজকতন্ত্রের প্রাধান্য মানুষকে নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিয়াছে; দৃষ্টান্তস্থলে হিন্দুদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানেও আমি পূর্ব্বের মত প্রশ্ন করিতে পারি,—এই সমাজ কি নিজেকে সুসভ্য করিতেছে?

আমার কাল্পনিক সমাজের প্রকৃতিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া লই। মনে করুন, যেন এমন একটি সমাজ আছে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অতিমাত্রায় প্রকটিত, কিন্তু গোলমাল ও বৈষম্য খুব বেশী। এটি পূরামাত্রায় বলের সাম্রাজ্য, এখানে দৈব ঘটনার পূর্ণ অধিকার। যে বলিষ্ঠ নয়, সে নিপীড়িত হইয়া, ক্লেশ ভোগ করিয়া মারা যায়; বলপ্রয়োগই এই সমাজের প্রধান লক্ষণ। ইহাকে কি সুসভ্য সমাজ বলা যায়? সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে সভ্যতার বীজ নিহিত আছে; কালে তাহা অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইবে; কিন্তু এ সমাজের যে জিনিষের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে নিশ্চয়ই মানব-সাধারণের সহজবুদ্ধিতে সভ্যতা বলা যায় না।

এইবার আর একটি সমাজের কথা বলিয়া আমার কাল্পনিক সমাজ বর্ণনা শেষ করিব। আর একটি সমাজ মনে করুন; সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা খুব বেশী; তাহাদের মধ্যে বৈষম্য নাই বলিলেই হয়, অন্ততঃ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যাহার যাহা ইচ্ছা, প্রায় তাহা করে; তাহার ও তাহার প্রতিবেশীর মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য বড় বেশী নাই; কিন্তু সেখানে সাধারণ সামাজিক ভাব অতি অল্পই আছে, সমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা অতি ক্ষীণ;—অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তির ক্রিয়াশক্তি ও অস্তিত্ব দেখা দিয়া বিলীন হইয়া যায়, পরস্পরের প্রতি কোনও ঘাতপ্রতিঘাত করে না, পশ্চাতে কোনও চিহ্নও রাখিয়া যায় না। বংশপরম্পরাক্রমে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে; মানুষ সমাজের যে অবস্থায় জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, সেই যাত্রার অবসানেও সমাজকে তদবস্থ রাখিয়া যায়। বন্য বর্ব্বর জাতির এই অবস্থা; সাম্য ও স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু সভ্যতা নাই।

আরো নানাবিধ সামাজিক অবস্থার কল্পনা আমি করিতে পারি। কিন্তু সভ্যতা শব্দটির সাধারণ লৌকিক তাৎপর্য্যার্থ বুঝাইবার জন্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপরে যে কয়টি সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিলাম তাহাদের একটিও ঐ শব্দের লৌকিক তাৎপর্য্যের সহিত খাপ খায় না। কেন? আমার মনে হয় যে, এই সভ্যতা শব্দটির মধ্যে যে মূলতত্ত্ব নিহিত আছে (আমার উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই ইহা পাও[য়া] যায়) তাহা আর কিছু নহে—গতিশীলতা, উন্নতিপ্রবণতা এই শব্দটিতে একটি ভাব চকিতে মানসপটে উদিত হয়,—সমাজ অগ্রসর হইতেছে, স্থান পরিবর্ত্তন করিবার জ[ন্য] নহে, অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্য; অনুশীলন, উন্নতির চেষ্টা তাহার অবস্থার পরিচায়ক। এই যে গতির, উন্নতির ভা[ব] ইহাই সভ্যতাশব্দের মূলভাব, এইরূপ আমার মনে হয় আচ্ছা, এই গতিটা কি? এই উন্নতিটাই বা কি? এই খানেই আমাদের কঠিনতম সমস্যা।

Civilization শব্দটার ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ দেখিলে মনে হইতে পারে যে একটা পরিষ্কার, সন্তোষজনক উত্ত[র] পাওয়া গেল। আভিধানিক অর্থে ইহা সমাজে মানুষে[র] সহিত মানুষের সম্পর্কের, সামাজিক জীবনের, উন্নতি ও পরিণতি-চেষ্টা।

শব্দটি উচ্চারিত হইলেই প্রথমে এই ভাব উদিত হয় সামাজিক সমস্ত সম্বন্ধের সম্প্রসারণ, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশলতা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রবদ্ধ বিধিব্যবস্থা, এই গুলি আমাদের মানসপটে যুগপৎ চিত্রিত হইয়া উঠে;—এক দিকে সমাজকে শক্তি ও সুখ দিবার জন্য নূতন নূতন উপায়ের উদ্ভাবন, পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগুলির মধ্যে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ভাবে সেই শক্তির বিস্তার।

এই মাত্র? সভ্যতা শব্দটির সহজ, সাধারণ তাৎপর্য্য কি ইহাতে আমরা নিঃশেষিত করিয়াছি? ইহার মধ্যে কি আর কিছু নাই?

আমাদের প্রশ্ন যেন এইরূপ দাঁড়াইতেছে;—শেষ পর্য্যন্ত কি ইহাই দাঁড়াইল যে, মানবজাতি একটা বল্মীকমাত্র? একটা সমাজ যেখানে শান্তি ও শারীরিক সচ্ছন্দতা ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক নহে, যেখানে যত বেশী শ্রম ও সেই শ্রমের ফল যত বেশী ন্যায্যভাবে বিভক্ত হয়, ততই উদ্দেশ্যটা সফল হয়, উন্নতির ও চরম পরিণতি হয়।

মানুষের চরম পরিণতি সম্বন্ধে এইরূপ সংকীর্ণ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে আমরা স্বভাবতঃই নারাজ। আমাদের হৃদয় প্রথম হইতেই অনুভব করে যে, এই civilization শব্দটিতে কেবলমাত্র সামাজিক সম্বন্ধের, সামাজিক শক্তির ও শান্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ব্যতীত ব্যাপকতর, জটিলতর, উন্নততর একটা কিছু আছে।

বাস্তব সত্য, জনসাধারণের মত, ঐ civilization শব্দের সাধারণ লৌকিক তাৎপর্য্য, সমস্তই আমাদের এই অনুভূতির সহিত মিলিয়া যায়।

রোমের কথা মনে করুন। যখন তাহার গণতন্ত্রনীতির চরম বিকাশ হইয়াছে, কার্থেজের সহিত দ্বিতীয় দফার যুদ্ধের অবসান হইয়াছে, জাতীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি প্রকটিত হইয়াছে, জগতের আধিপত্যের অভিমুখে সে অগ্রসর হইয়াছে; তাহার সমাজ ক্রমোন্নতির দিকে চলিয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। আগষ্টসের সময়ের রোমের কথা মনে করুন। তখন অবনতির যুগ আরব্ধ হইয়াছে; অন্ততঃ উন্নতির দিকে সমাজের প্রবণতা স্তম্ভিত হইয়া, মন্দভাবগুলি প্রবল হইবার সূচনা দেখা দিয়াছিল। এমন কেহ নাই যে, এরূপ ভাবিতে পারে কিংবা বলিতে পারে যে, ফ্যাব্রিসিয়াস্ বা সিন্সিনেটসের রোম অপেক্ষা আগষ্টসের রোম অধিকতর সুসভ্য ছিল।

আসুন, আমরা আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কথা ভাবিয়া দেখি। সমাজের দিক দিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তখনকার দিনে হল্যাণ্ড্, ইংলণ্ড্, প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ব্যক্তিগত সুখসচ্ছন্দতা অপেক্ষা তাৎকালিক ফ্রান্সের সুখসচ্ছন্দতা খর্ব্বতর ছিল। আমার বিশ্বাস যে, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে সামাজিক ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল, এবং উত্তরোত্তর দ্রুততর বৃদ্ধি পাইতেছিল; সেই ক্রিয়াশক্তিপ্রসূত ফল ফ্রান্স অপেক্ষা অধিকতর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছিল। তথাপি মানুষের সহজ বুদ্ধিকে যদি প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উত্তর পাইবে যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের মধ্যে ফ্রান্সই সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ছিল। এই উত্তরে অনুমোদন করিতে য়ুরোপ তিলমাত্র বিলম্ব করে নাই। ফ্রান্স সম্বন্ধে জনসাধারণের মতের কিছু কিছু চিহ্ন য়ুরোপীয় সাহিত্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য অনেক দেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারিতাম, যেখানে সমৃদ্ধি বিপুলতর, দ্রুততর বর্দ্ধিত ও জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্যতর ভাবে বিভক্ত; মানুষ কিন্তু সহজবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বলিবে যে, এই সকল দেশের সভ্যতা কেবল মাত্র সামাজিক হিসাবে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ দেশের সভ্যতা অপেক্ষা নিম্নপর্য্যায়ের জিনিষ।

ইহার অর্থ কি? এই সকল দেশের এমন কি ভাল জিনিষ আছে? ইহাদের মধ্যে এমন কি আছে যে, সভ্যদেশ হিসাবে তাহারা এই স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা লাভ করে? সে জিনিষটা কি, যাহা জনসাধারণের মতে এতগুলা সদ্‌গুণের অভাব অনেকটা দূরীভূত করিতে পারে?

তাহাদের মধ্যে সামাজিক জীবনের বিকাশ ব্যতীত আর একটা জিনিষ দীপ্ততর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে; স্বতন্ত্র ব্যক্তির বিকাশ; তাহার আভ্যন্তরিক জীবনের, তাহার সমগ্র মনুষ্যত্বের, তাহার শক্তির, তাহার ভাবের বিকাশ। তাহাদের সমাজ হয় ত অন্য দেশের মত সর্ব্ব-গুণান্বিত নহে; কিন্তু তাহাদের মনুষ্যত্ব দীপ্ততর ও বলবত্তর ভাবে প্রকটিত হয়। অনেক সামাজিক অভাব পূর্ণ করিবার বাকী আছে বটে; কিন্তু প্রভূত মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অনেক লোক হয়ত সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা ও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত; কিন্তু অনেক বড় লোক আবির্ভূত হইয়া জগৎকে চমকিত করে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা নিজ নিজ মহিমা প্রচার করে। মানুষ যেখানেই এই সকল চিহ্ন, মানব-চরিত্র-মহিমায় মণ্ডিত এই সকল নিদর্শন দেখিতে পায়, এই সকল অশরীরী আনন্দের উপাদান সৃষ্ট হইয়াছে দেখিতে পায়, সেই খানেই ইহাকে চিনিতে পারে এবং ইহাকে সভ্যতা আখ্যা প্রদান করে।

অতএব এই মহৎ সত্যের মধ্যে দুইটি বাস্তব সত্য নিহিত আছে; সেই দুটির উপর ইহা নির্ভর করিতেছে, তাহাদের সাহায্যে ইহা আত্মপ্রকাশ করে;—সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াশক্তির যুগপৎ বিকাশ, সমাজের এবং মানবের উন্নতি। যেখানে সমাজের বাহ্য অবস্থা আপনাকে সঞ্জীবিত করিয়া, উন্নত করিয়া ব্যাপকতা লাভ করে, যেখানে মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি দীপ্ত ও মহিমান্বিত হইয়া নিজেকে প্রকটিত করে, সেইখানেই, সামাজিক অবস্থার বিষম অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মানুষ সভ্যতার জয়গান গায়।

মানুষের সামান্য সহজবুদ্ধি-প্রণোদিত পরীক্ষার ফল এইরূপ দাঁড়ায়; বোধ হয়, এ স্থলে আমি আত্মবঞ্চনা করিতেছি না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন এক এক

সময় আসে, যখন মনে হয় যে, সে একটা মহাসন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন যদি ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যে সকল বাস্তব ঘটনা ইহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ ? যদি আমরা ইতিহাসের মহা-সন্ধিক্ষণের ঘটনাবলীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা উল্লিখিত লক্ষণ দুইটার একটা না একটা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইব। তখন ব্যক্তিগত বা সামাজিক বিকাশে একটা বড় গোছের পরিবর্ত্তন সূচিত হয়; এমন ঘটনা সংঘটিত হয় যে, তদ্দ্বারা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি, তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস, অন্য ব্যক্তির সহিত তাহার সামাজিক সম্পর্ক, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কথা ধরা যাউক ; ইহার আবির্ভাব-কালে শুধু নহে, ইহার প্রথম যুগের ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়া, ইহা সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে নাই ; উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিল যে, সামাজিক ব্যাপারের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট হইবে না ; প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে দাসকে হুকুম করিল ; সমাজের বড় বড় ত্রুটিগুলাকে, দোষগুলাকে আক্রমণ করে নাই। তথাপি কে অস্বীকার করিবে যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আবির্ভাব সভ্যতার ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ? কেন এমন হইল ? কারণ, ইহা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল ; তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস, তাহার ভাব, সমস্তই বদলাইয়া দিয়াছিল। মানুষের নৈতিক প্রকৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিকে নূতন করিয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছিল।

আমরা আর এক প্রকারের যুগান্তকারী ঘটনা দেখিয়াছি, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, তাহার বহিরবস্থাই তাহার এক মাত্র লক্ষ্য ছিল ; সে সমাজকে পরিবর্ত্তন করিল, পুনরুজ্জীবিত করিল। সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে আপনাদের দৃষ্টি পরিচালিত করুন, সর্ব্বত্রই একই ফল লাভ করিবেন ; যে সকল জিনিষ সভ্যতার বিকাশে আবশ্যক ও সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে উপরোক্ত দুইটি লক্ষণের একটি না একটির পর্য্যায়ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই ত হইল শব্দটির সহজ এবং সাধারণ অর্থ ; সভ্যতারূপ বাস্তব সত্যটি ঠিক এখানে পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত না হউক, অন্ততঃ বর্ণিত হইল, তাহার সামান্য লক্ষণগুলির যাথার্থ্যও পরীক্ষিত হইল। আমাদের সম্মুখে সভ্যতার দুইটি উপাদান রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠে এই—ইহাদের কোনও একটা কি সভ্যতাগঠনের পক্ষে যথেষ্ট ? সামাজিক অবস্থার ক্রমোন্নতিকে বা ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশকে সভ্যতা বলা যাইবে কি ? মানব জাতি ইহাকে সভ্যতা বলিয়া পরিগণিত করিবে কি ? কিংবা এই দুটা জিনিষের পরস্পর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ও অবশ্যম্ভাবী যে, যদিই ইহারা যুগপৎ আবির্ভূত না হয়, তথাপি একের আবির্ভাবে অন্যটিও আজ না হয় কাল আবির্ভূত হইবে ?

এই সমস্যাসমাধান করিতে হইলে, আমরা বোধ হয়, তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে ইহার আলোচনা করিতে পারি। সভ্যতার উপাদানদ্বয়ের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি যে, তাহাদের প্রকৃতিগত এমন কিছু আছে কি না, যদ্দ্বারা তাহারা পরস্পরের সহিত এমন নিবিড় ভাবে সম্বদ্ধ যে একের পক্ষে অন্যটি অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইতিহাসের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পারি, এই দুইটি লক্ষণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, না তাহাদের একটা হইতে অপরটা প্রসূত হইয়া থাকে ? পরিশেষে আমরা এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের মত সহজ বুদ্ধিকে প্রশ্ন করিতে পারি। আমি এই সহজবুদ্ধির দিক দিয়া প্রথমে আলোচনা করিব।

দেশের মধ্যে যখন একটা বড় গোছের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সমৃদ্ধি ও শক্তি বেশী পরিবর্দ্ধিত হয়, সামাজিক উপকরণের বণ্টনে বিপ্লব ঘটে, তখনই এই অভিনব ব্যাপারের বিরুদ্ধে অনেক লোক দণ্ডায়মান হয় ; এ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন কি ? তাঁহারা বলেন যে, এই সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে মানুষের আভ্যন্তরিক নৈতিক উন্নতি সমপরিমাণে হয় না ; এই উন্নতি মিথ্যা ও মায়িক, ইহার ফল মানুষের পক্ষে, মানুষের চারিত্র-নীতির পক্ষে অশুভ। সামাজিক উন্নতির বন্ধুগণ কিন্তু সবলে এই আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহারা দৃঢ় স্বরে বলেন যে, সামাজিক উন্নতির সহিত চারিত্র্য-নীতি নিত্য সম্বদ্ধ, সামাজিক উন্নতির মধ্যে উহা নিহিত ; সামাজিক জীবন সুন্দরতররূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে, অন্তঃপ্রকৃতিও মধুরতর ও পূততর হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সমস্যাটা এইরূপ দাঁড়ায়।

ঠিক বিপরীত অবস্থা কল্পনা করুন,—মনে করুন যেন নৈতিক উন্নতি হইতেছে। যাঁহারা উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইয়া কাজ করেন, তাঁহারা মানুষকে কি আশার কথা শুনান? যে সকল ধর্ম্মতন্ত্রের নেতা, সাধু পুরুষ ও কবি, সমাজগঠনের প্রারম্ভে মানুষের স্বভাবচরিত্র কোমল ও সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কি আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন? তাঁহারা আশা দিয়াছিলেন যে, সমাজ উন্নত হইবে, সামাজিক জীবনের উপকরণও ন্যায্যতর ভাবে বিতরিত হইবে। তবে এই সকল কলহের, এই সকল উক্তির মধ্যে কি নিহিত আছে? ইহাদের তাৎপর্য্য কি? ইহাদের অর্থ কি?

ইহাদের অর্থ এই যে, সভ্যতার দুটি অঙ্গই,—সামাজিক ও চারিত্রনৈতিক উন্নতি নিবিড় ভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া, লোকের সহজেই ধারণা এত স্বাভাবিক দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, একটাকে দেখিলেই সে আর একটার আবির্ভাবের আশা করে। এই সহজ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত দুইটি দল স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তর্ক করিয়া থাকে। সকলেই বুঝেন যে, যদি আমরা মানবজাতির মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করিতে পারি যে, সামাজিক উন্নতি ব্যক্তিগত উন্নতির বিরুদ্ধ, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ ব্যাপিয়া যে বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, তাহাকে হেয় ও দুর্ব্বল করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি আমরা এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, ব্যক্তিগত উন্নতির দ্বারা সামাজিক উন্নতি সংঘটিত হইবে, তাহা হইলে এই প্রকার উক্তিতে বিশ্বাসস্থাপন করিবার প্রবণতা হয়, এবং ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সভ্যতার বিকাশে উহারা পরস্পর সম্বদ্ধ, এবং একটি অপরটিকে উৎপাদন করে, ইহাই মানুষের সহজ স্বাভাবিক বিশ্বাস।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ঐ উত্তরই পাই। আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ উন্নতির ফলে সমাজের লাভ হইয়াছে; এবং সামাজিক অবস্থার যত কিছু উন্নতি, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির উপকারে আসিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, উপরোক্ত দুইটি বাস্তব সত্যের মধ্যে একটি প্রবলতর হইয়া, লোক সমক্ষে প্রকটিত হয়, এবং এই সভ্যতা-বিকাশের উপর একটি স্বতন্ত্র রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ উন্নতি হইতে যে সভ্যতা প্রসূত হইয়া বহুযুগ পরে সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, সহস্র পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে, হঠাৎ একদিন সামাজিক অঙ্গটি আপনাকে বিকশিত করিয়া, তাহার সহিত মিলিত হইয়া, তাহাকে পূর্ণতা দান করে। বিশ্বনিয়ন্তার কার্য্য সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে; কাল যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, আজ তাহার ফল পাওয়া যাইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন কাল পূর্ণ হইবে, তখন ফল পাওয়া যাইবে; হয়ত শত শত বৎসর অতিবাহিত না হইলে পাওয়া যাইবে না। অনেক সময় লাগে বটে, কিন্তু ফল ধ্রুব ও সত্য; বিশ্বনিয়ন্তার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইতে কিছু দেরী লাগে বটে, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তটি স্থির ও ধ্রুব। তাঁহার কাছে কাল কিছুই নহে; হোমরের দেবতারা যেমন আকাশের মধ্যে সহজে চলিয়া যায়, কালের মধ্য দিয়া তাঁহারও গতি তদ্রূপ; পদক্ষেপে কতযুগ অন্তর্হিত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মানব-সমাজের উপর তাহার মহান্ প্রভাব বিস্তার করিয়া, তাহাকে নবজন্ম দিবার পূর্ব্বে কত শতাব্দ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কত অগণন ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে! তথাপি ইহা সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা সভ্যতার যে দুটি অঙ্গের কথা আলোচনা করিতেছি, তাহাদের প্রকৃতিগত লক্ষণ যদি স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলেও ফল সেই একই দাঁড়াইবে। এমন কেহ নাই, যাহার এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার এই উক্তির সমর্থন করে না। মানুষের মধ্যে যখন কোনও একটা নৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; যখন সে একটা নূতন ভাব, একটা নূতন গুণ, নূতন শক্তি লাভ করে, অর্থাৎ যখন সে ব্যক্তি হিসাবে অধিকতর উন্নত হয়, তখন তাহার অন্তরে কি আকাঙ্ক্ষা, কি অভাব, জাগিয়া উঠে? সেটি আর কিছু নহে, তাহার মধ্যে যে নবীন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই ভাবে সমস্ত জগৎকে অনুপ্রাণিত করিবার আকাঙ্ক্ষা; সেই ভাবটিকে বহিঃপ্রকটিত করিবার বাসনা। মানুষ যখনই একটা নূতন জিনিষ পায়; যখনই সে বুঝিতে পারে যে, তাহার সত্ত্বার অভিনব বিকাশ আরব্ধ হইয়াছে: তখনই সে এই নূতন মহামূল্য জিনিষটিকে একান্ত তাহার নিজস্ব বলিয়া মনে করে; তাহার অন্তরতম প্রদেশে কে যেন বলিতে থাকে যে, এ জিনিষটি অপরকেও দিতে হইবে; যে পরিবর্ত্তন

যে উন্নতি তাহার মধ্যে সংসাধিত হইয়াছে, জগৎসংসারে তাহা প্রসারিত করিবার জন্য কে যেন তাহাকে তাড়না করিতে থাকে; তাহার সহজবুদ্ধিও সেই দিকে যেন তাহাকে লইয়া যায়। এই রকম করিয়া বড় বড় সংস্কারকের আবির্ভাব হয়; যে সকল মহাপুরুষ নৈতিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া নবজন্ম লাভ করিয়া, জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য কোন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, নিজ নিজ পথে চালিত হয়েন নাই। মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হইবে; এখন অপরটি দেখা যাউক। ধরুন—যেন সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে; সমাজ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুনিয়মিত; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার এবং ধনসম্পত্তি সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যথোচিত বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে; ফলতঃ, সংসারের চেহারা ফিরিয়াছে; রাজসরকারের কার্য্যাবলী ও সামাজিক ব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও উদার ভাব ধারণ করিয়াছে; আপনারা কি মনে করেন যে, বহির্জগতের এই সুন্দর পরিবর্ত্তনে মানব-হৃদয়ে কোনও ঘাতপ্রতিঘাত হয় না? উন্নত আদর্শের, দৃষ্টান্তের, সামাজিক বিধিব্যবস্থার অনুজ্ঞার ভিত্তি এই যে, বহির্জগতের কোনও একটা সুন্দর, সুনিয়মিত সত্য, আজ হউক—কাল হউক, মানুষের অন্তর্জগতের অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিবেই, তাহাকেও সুন্দর, সুনিয়মিত করিয়া তুলিবে; বহিঃসংসার অধিকতর ন্যায়পরতন্ত্র হইলে মানুষকেও তদ্রূপ করিয়া তুলিবে; বাহির ভিতরকে সংস্কৃত করে, যেমন ভিতর বাহিরকে সংস্কৃত করে; সভ্যতার দুইটি অঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; উভয়ের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান ও বহু প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে; হয় ত তাহাদের পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের আকার সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; কিন্তু আজ হউক, কাল হউক, তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেই; ইহাই তাহাদের প্রকৃতিগত চিরন্তন বিধি, ইহাই ইতিহাসের শাশ্বত সত্য, সমগ্র মানবজাতির নিগূঢ় বিশ্বাস।

সভ্যতারূপ ঐতিহাসিক সত্যটিকে বোধ হয়, সমগ্ররূপে না হউক, কতকটা মোটামুটি, আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম। জিনিষটাকে বর্ণনা করিলাম, ইহার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম, যে সকল মুখ্য মৌলিক সমস্যা আসিয়া পড়ে, তাহাও বলিলাম। এইখানেই চুপ করিলে চলিত; কিন্তু এইখানে একটি নূতন সমস্যা আসিয়া পড়ে, তাহার আভাস না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই ধরণের সমস্যাকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা চলে না বটে, আনুমানিক বলা যাইতে পারে; ইহার এক প্রান্ত দৃঢ় করিয়া যদি কেহ ধরে, অপর প্রান্তটি চিরকাল তাহার অনায়ত্ত থাকিবে; মানুষ ইহার একদেশদর্শী,—সর্ব্বাঙ্গীণ জ্ঞান তাহার সম্ভবপর নহে; অথচ এই সকল সমস্যা ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে; ঐতিহাসিক সত্যের মত মানুষের চিন্তাশক্তিকে নাড়াচাড়া দিয়া থাকে, তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার সম্মুখে প্রতিমুহূর্ত্তে উপস্থিত হয়।

এই যে দুটা স্বতন্ত্র বিকাশের কথা বলিলাম, যে দুটাকে লইয়া সভ্যতা গড়িয়া উঠে,—সমাজের বিকাশ ও মানবত্বের বিকাশ—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা পরিসমাপ্তি, কোন্‌টা আরম্ভ? সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান করিবার জন্য, সাংসারিক জীবনযাত্রা অধিকতর আনন্দময় করিবার জন্যই কি মানুষ তাহার নিজের সমস্ত শক্তির, সমস্ত ভাবের পুষ্টিসাধন করে? অথবা, সমাজের উন্নতি প্রয়াস, সমাজের ক্রমোন্নতি, গোটা সমাজটাই কি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক ক্রীড়াক্ষেত্র নহে কি? অর্থাৎ, মানুষের জন্য সমাজ,—না, সমাজের জন্য মানুষ? এই সমস্যা-সমাধানের সহিত মানবজীবনের উদ্দেশ্য নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষের কি একান্ত ভাবে সামাজিক হওয়া চাই? সমাজ কি তাহার সমগ্র শক্তিকে নিঃশেষে হরণ করিয়া লইবে? অথবা তাহার ভিতরে সমাজ ছাড়া, সংসার ছাড়া, উন্নততর একটা কিছু আছে, যেটা শুধু প্রাণধারণ অপেক্ষা মহত্তর?

মিঃ রয়ে কলার একটি বক্তৃতায় ইহার উত্তর দিয়াছেন; উত্তরটি তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস-প্রণোদিত। তাঁহাকে আমার বন্ধুসম্বোধনে গর্ব্ব অনুভব করি; আমাদের এই সভার মত বহুসমিতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া, তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক অশান্ত ও প্রবল সমিতির অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় আমি এই দুটি ছত্র দেখিতে পাই—"মানব-সমাজগুলি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, জীবন ধারণ করে, এবং লয় প্রাপ্ত হয়; সেই খানেই

তাহাদের বিধি-নিয়ন্ত্রিত কার্য্যের অবসান...কিন্তু তাহারা সমগ্র মানুষটিকে আত্মসাৎ করিতে পারে না। সে যখন সমাজের সঙ্গে চুক্তি করিয়া ফেলে, তাহার মহত্তম অংশটি তাহার নিজস্ব রহিয়া যায়; সেই সকল উচ্চ বৃত্তি যদ্দ্বারা সে ভগবানের দিকে, পরকালের দিকে, একটা অদৃশ্য লোকে অননুভূতপূর্ব্ব সুখের দিকে উন্নীত হয়...আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অমরত্ব লাভ করিয়াছি; রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।"

ইহার অধিক আমি আর কিছু বলিতে চাহি না; আমি এ প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিব না; প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইলাম। সভ্যতার ইতিহাসে আমরা ইহাকে দেখিতে পাই। যখন সেই ইতিহাস পরিসমাপ্ত হয়; যখন আমাদের ইহজীবন সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না; তখন মানুষ অগত্যা নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে, সমস্তই সে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে কি না, তাহার সমগ্র জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে কি না। সভ্যতার ইতিহাসে এইটাই শেষ ও সর্ব্বোচ্চ সমস্যা। ইহার স্থান ও ইহার বিরাটত্ব নির্দ্দেশ করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সভ্যতার ইতিহাস দুই রকমে রচিত হইতে পারে, দুইটি স্বতন্ত্র উৎস হইতে বাহির করা যাইতে পারে, দুইটি স্বতন্ত্র দিক হইতে আলোচিত হইতে পারে। ইতিহাস-রচয়িতা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট জাতি-বিশেষের মানব-হৃদয়ের অন্তস্তলে কিছুকাল ধরিয়া বা বহুযুগ ব্যাপিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া, মানবহৃদয়ের অভ্যন্তরের সমস্ত ঘটনাপরম্পরা, সমস্ত পরিবর্ত্তন, সমস্ত বিপ্লব, পর্য্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করিতে পারেন; যখন তিনি শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিবেন, তখন সে জাতির সে যুগের ইতিহাস তাঁহার রচিত হইয়া গেল। তিনি আর এক উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। মানব-হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া, তিনি সংসারের মাঝখানে দণ্ডায়মান হইতে পারেন; ব্যক্তিগত ভাবসমষ্টির বর্ণনা না করিয়া, তিনি সামাজিক অবস্থার বিষয়গুলির, ঘটনাবলীর, বিচিত্র পরিবর্ত্তনের বর্ণনা করিতে পারেন। এই দুই অংশ, মানবসভ্যতার এই উভয়বিধ ইতিহাস, পরস্পরের সহিত অতি নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ। অথচ তাহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে; বোধ হয়, তাহাদিগকে পৃথক করা উচিত (অন্ততঃ প্রারম্ভে) তাহা হইলে উভয়দিক পরিষ্কারভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইতে পারে। আমি ত আপনাদের সহিত মানব-হৃদয়ের অভ্যন্তরে সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে চাহি না; বাহিরের ঘটনাবলীর ইতিহাস, পরিদৃশ্যমান সংসারের ইতিহাস লইয়া আমি ব্যাপৃত থাকিব। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সভ্যতার যত জটিলতা ও ব্যাপকতা আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহা সমগ্রভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব; যে সকল বড় বড় সমস্যা উত্থিত হয়, সেগুলি আপনাদের সম্মুখে বিবৃত করিব। আপাততঃ আমি নিজেকে সংযত করিতেছি; অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চাহি; কেবলমাত্র সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি।

আমরা প্রথমেই য়ুরোপীয় সভ্যতার অতি শৈশব কালে তাহার উপাদানগুলির অন্বেষণ করিব; তখন রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছে। সেই দেশবিশ্রুত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সমাজ ছিল, তাহা আমরা মনোযোগসহকারে আলোচনা করিব। তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিব না; তাহার উপাদানগুলি পাশাপাশি স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব; স্থাপিত করা হইলে সেগুলিকে পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া, তাহাদের ক্রমবিকাশের অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইব।

আমার বিশ্বাস যে, এই আলোচনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, আমাদের প্রতীতি জন্মিবে যে, সভ্যতা এখনও অতি নবীন; পৃথিবীর সমগ্র জীবনের পরিমাপ এখনও হয় নাই। নিশ্চয়ই মানুষের চিন্তাশক্তির যতদূর পরিণতি সম্ভবপর, তাহা সুদূরপরাহত; মানুষের সমগ্র ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করিতে এখনও খুব বিলম্ব। যদি আমরা প্রত্যেকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অবতরণ করিয়া, আপনা-আপনি প্রশ্ন করি যে, আমরা চরমতম মঙ্গলের ধারণা বা আশা কতদূর পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছি; যদি আমাদের সেই ধারণার সহিত জগতের বাস্তব অবস্থার তুলনা করিয়া দেখি; তাহা হইলে, আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মিবে যে, সমাজ ও সভ্যতা এখনও অত্যন্ত নবীন; যদিও তাহারা অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এখনও

তাহাদের বহুদূর যাইতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের বাস্তব অবস্থার আলোচনায় আনন্দের হ্রাস হইবে না। য়ুরোপের গত পঞ্চদশ শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাসের বড় বড় যুগান্তকারী ঘটনাগুলি যখন আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব, আপনারা দেখিবেন যে, আমাদের একাল পর্য্যন্ত মানুষের বাহ্য অবস্থা ও আধ্যাত্মিক জীবন কি পর্য্যন্ত ক্লেশময় ও ঝটিকাসঙ্কুল হইয়া আসিয়াছে। এত শত বৎসর ধরিয়া মানব জাতির সহিত মানবচিত্তও ব্যথিত হইয়াছে; আপনারা দেখিবেন যে, এতদিন পরে এই আধুনিক যুগে মানবচিত্ত কতকটা শান্তি ও সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে; এ অবস্থাটি এখনও খুব অপরিণত। সমাজেরও অবস্থা তদ্রূপ; বেশ দেখা যাইতেছে যে, সমাজ খুব উন্নতি করিয়াছে; মানুষের অবস্থা এখন অনেক অংশে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের কথা স্মরণ করিয়া, আমাদের নিজেদের প্রতি ল্যুক্রেশিয়সের কয়েক পংক্তি প্রয়োগ করিতে বোধ হয় পারি—"সমুদ্রতীরে নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া বাত্যাতাড়িত অর্ণবপোতগুলির বিপদ কল্পনা করিলে আরাম বোধ হয়।" হোমরের স্থেনেলসের মত আমরাও বিশেষ অহঙ্কার না করিয়া বলিতে পারি,—"ভগবানকে ধন্যবাদ দি, যে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের চেয়ে অনেক ভাল আছি।"

আমাদের সতর্ক হইতে হইবে, যেন আমরা আমাদের সুখের ও উন্নতির কল্পনায় বিভোর ও তন্ময় হইয়া না যাই; তাহা হইলে, আমরা যুগপৎ গর্ব্বের ও আলস্যের কবলে পতিত হইব; যতটুকু আলোক পাইয়াছি, তাহাতেই মানব-চিত্তের শক্তি ও সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস অতিমাত্রায় জন্মিতে পারে; এবং সেই সঙ্গে একটা দৌর্ব্বল্য আসিতে পারে, যেটা অলস বিলাস-জনিত। আমার মনে হয় যে, আমরা সামান্য কারণে অভিযোগ করিতে যেমন পটু, তেমনি অকারণে সন্তুষ্ট হইতেও পারি; এই দুই অবস্থার মধ্যে আমাদের চিত্তবৃত্তি সদাই দোদুল্যমান। আমাদের একটা ভাবপ্রবণতা আছে; মানসিক আকাঙ্ক্ষার অসীমতা, কল্পনার চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু যখনই কর্ম্মজীবনে আসিয়া পড়া যায়; ক্লেশ স্বীকারের জন্য, ত্যাগের জন্য, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে প্রচেষ্টার জন্য আমরা আহূত হই; তখনই আমাদের বাহু অসাড় হইয়া পড়ে, আমরা হতাশ হইয়া কার্য্য হইতে বিরত হই; সাফল্যলাভের জন্য পূর্ব্বে যে অধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, কাজটা ছাড়িয়া দিবার জন্য এখন তদনুরূপ তৎপরতা দেখাইয়া থাকি। আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে, যেন আমরা এই উভয়বিধ দৌর্ব্বল্যের নিকট পরাভব স্বীকার না করি। আমাদের শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞানের প্রসার কতদূর, সে সম্বন্ধে যে আমরা পূর্ব্বাহ্ণেই একটা ঠিক হিসাব করিতে অভ্যস্ত হই ন্যায়ানুমোদিত পন্থা অবলম্বন করিয়া, সভ্যতার মৌলিক সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যাহা পাওয়া যায় না, এমন জিনিষের দিকে যেন আমরা প্রধাবিত না হই। যে সকল জিনিষকে আমরা সাধারণতঃ হেয় বলিয়া ঘৃণা করি, সেই গুলিকেই সাদরে গ্রহণ করিবার প্রলোভন আমাদের মাঝে মাঝে হইয়া থাকে,—অসভ্য বর্ব্বর য়ুরোপের বলবত্তমের অধিকার, পশুশক্তি, অত্যাচার, মিথ্যাচরণ, যাহা চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু যখনই আমরা মুহূর্ত্তের জন্য এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হই, তখনই বুঝিতে পারি যে, সেই বর্ব্বরযুগের মানুষের মত অধ্যবসায় ও উদ্দাম-উৎসাহ আমাদের নাই; তাহারা নিজের অবস্থায় পীড়িত হইয়া স্বভাবতঃই মুক্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া অনবরত চেষ্টা করিত। আমরা আজ-কাল আমাদের অবস্থায় পরিতৃপ্ত; অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া যেন আমরা সঙ্কটাপন্ন না হই; সে সকল কামনার পরিতৃপ্তির সময় এখনও আসে নাই। অনেক জিনিষ আমরা পাইয়াছি বটে, আমাদের নিকট হইতে লোকে অনেক চাহিবে; আমাদের উত্তর-পুরুষের কাছে আমাদের কার্য্যাবলীর কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দিতে হইবে; সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি, সমস্তই এখন তর্কের, পরীক্ষার, দায়িত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ন্যায়ানুগতা, স্বাধীনতা, জনসাধারণে বিজ্ঞাপ্তি প্রভৃতি যে সকল মৌলিক ভাব লইয়া আমাদের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, আসুন আমরা সেইগুলিকে দৃঢ়তার সহিত, অবিচলিতভাবে, এক-নিষ্ঠভাবে ধরিয়া থাকি; যেন ভুলিয়া না যাই যে, আমরা যেমন চাই যে, আমাদের তত্ত্বানুসন্ধিৎসার পরিতৃপ্তির জন্য যাবতীয় পদার্থ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকুক, তেমনই আমরাও এই সংসারের চক্ষু এড়াইতে পারি না; আমরাও তাহার আলোচনার, বিচারের বিষয়ী-ভূত হইব।

পুত্র-বলি

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

১

তারাপদ সব্-ইন্স্‌পেক্টারী পদে পাকা হইবার পর-মাসেই বাড়ী হইতে তাহার পিতা লিখিলেন—"আমায় মাসে অন্ততঃ আশী টাকা পাঠাইতেই চাও,—দেনার জ্বালায় মরিয়া যাইতেছি।"

তারাপদ মাহিনা পায়—মাসে পঞ্চাশটি টাকা। সুতরাং পিতাকে 'আসন্ন' মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, তারাপদকে সেই মাসে একখানি 'হ্যাণ্ডনোট্' কাটিতে হইল।

কবি সেক্স্‌পিয়ার যখন লিখিয়াছিলেন—'কাপুরুষেরা জীবনে বহুবার মরিয়া থাকে,' তখন তাঁহার লেখা উচিত ছিল—অমিতব্যয়ীরাও জীবনে অনন্তবার মরে!—মাস না যাইতেই বাড়ী হইতে আবার চিঠি আসিল,—"খাস-মহলের খাজনা বাবদে অনেকগুলি টাকা বাকী পড়িয়াছে, এমাসে দু-চার দিনের মধ্যে অন্ততঃ গোটাকুড়ি টাকা আদায় দিতে না পারিলে, আমার উপর 'সার্টিফিকেট্' জারী হইবে—চারি-দিক্‌কার দেনার দায়ে আমি মারা গেলুম"—ইত্যাদি।

তারাপদ আবার এক 'হ্যাণ্ডনোট্' কাটিল। কিন্তু এবার শুধু টাকা পাঠাইল না, সেই সঙ্গে দু-চারিটি কথাও লিখিয়া পাঠাইল—"আমি মাহিনা পাই মোটে পঞ্চাশ টাকা, ইহা হইতে বাসাখরচ বাদে যা থাকে, তাহার অতিরিক্ত অর্থ পাঠানো আমার সাধ্যাতীত। আপনার আদেশানু-যায়ী টাকা পাঠাইতে গিয়া, আমার পঞ্চাশ টাকার উপর ঋণ হইয়া পড়িয়াছে, অতএব প্রার্থনা—একটু বিবেচনা করিয়া খরচপত্র করিবেন।"

পত্র পাইয়া রামসদয় ভাবিলেন, ছেলে-জাতটা কি কৃতঘ্ন! এত করিয়া যাহাকে মানুষ করিয়া তুলিলাম, আজ কিনা আমায় বিবেচনা শিক্ষা দিয়া চিঠি লিখিয়াছে!—তার পঞ্চাশ টাকা ঋণ হইয়াছে!—পুলিশে চাকরি করিলে কাহাকেও আবার ঋণ করিতে হয়?—সব মিথ্যা—ধূর্ত্তামি—না দিবার মতলব!

অনন্তর রামসদয় পুত্রকে কড়াভাবে একপত্র লিখিলেন—"তুমি পুলিশে ঢুকিয়া যে এত শীঘ্র বাইশবছরের পিতৃঋণ ভুলিয়া গিয়া, সামান্য পঞ্চাশ টাকার ঋণে অস্থির হইয়া, তোমার বুড়ো বাপ্‌কে বিবেচনা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া পত্র লিখিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই!—তোমার ঋণের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তুমি না পুলিশে চাকরী করিতেছ?—তুমি আমার ছেলে হইয়া যে এত বোকা,—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না—" ইত্যাদি।

বাপের চিঠি পাইয়া, তারাপদ এক নিমিষে বুঝিয়া লইল, কোন্ অন্ধ-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার পিতা এত ঘন-ঘন টাকার তাগাদা করিতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ পিতাকে লিখিল—"কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া দিয়াও পিতৃঋণ পরিশোধ করা যায় না বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাহারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে যায়, আমার মনে হয়, তাহারা পিতৃ-গৌরব ও আত্মমর্য্যাদাও কলুষিতই করিয়া তোলে!—আশীর্ব্বাদ করুন, আমি পুলিসে ঢুকিয়াছি বলিয়া, যেন অসৎ উপায়ে অর্থ-উপার্জ্জনের দিকে আমার মন কোন দিন না যায়। আর, পুলিস-বিভাগেও যে, দেবচরিত্র ব্যক্তির একান্ত অভাব এমন নহে—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি।"

পত্র পাইয়া রামসদয় মনে মনে বলিলেন—"হুঁ ব্যাটা আমার এর মধ্যে সব রকম কৌশল আয়ত্ত ক'রে নিয়েচে বটে!—কেমন সাধুতার ভাণ করে পত্রখানা লিখেচে! কিন্তু আমি রামসদয় রাম—শীলেদের সরকারে মাসিক ১২ টাকা মাইনে পেয়ে পঁচিশ বছরের উপর দু-হাতে কত

টাকা লুটেচি—তাহাতে কত উড়িয়েচি, কোন মিঞা ধরা-ছোঁয়া পান নি—আমার কাছে চালাকি ?—আচ্ছা !”

কিন্তু মনের ভাব মনে রাখিয়া রামসদয় লিখিলেন—“তোমার কথাগুলি খুব ঠিক স্বীকার করি, কিন্তু বাপু, নির্জ্জলা সাধুতা-সেবনে পরকালের পথ সাফ হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহকালে শুধু তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। সুতরাং তুমি মুষ্টিমেয় মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে, আমাদিগকে অনাহারে অপমানে মহাপথের দিকে গমন করিতে হইবে ! অতএব কেতাবে-পড়া বড় বড় বুলি ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে দু পয়সা ‘উপরি’ পাইয়া, আমায় একটু সাহায্য করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিয়ো—শুধু মাহিনার টাকায় নির্ভর করিবে বলিয়া, তোমায় পুলিস-লাইনে পাঠাই নাই—এইটুকু সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে!—বড় টানাটানি যাইতেছে—কিছু টাকা পাঠাইবে !”

২

শুধু মাহিনার কয়েকটি টাকার উপর নির্ভর করায় তারাপদকে কেবল যে পিতার নিকট হইতে গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত তাহা নহে, অন্যান্য সহযোগীদেরও নিকট হইতে বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত। প্রায় সকলেই বলিত—“ভায়ার গায় এখনও বেঞ্চির গন্ধ আছে—আচ্ছা, আর দিন কতক যাক্।” কিন্তু বৈকুণ্ঠ শুধু ঠাট্টা করিয়াই নিরস্ত হইত না; সে নিজে বে-তর ঘুসখোর ছিল, সাধুতা তাহার চক্ষুশূল সুতরাং তার অন্তরে কেমন একটা প্রচণ্ড জেদ ছিল, তারাপদর ও ‘অনেষ্টি’টুকু ঘুচাইতে হইবে।

বৈকুণ্ঠর ‘উপরি’-লাভ হইলেই সে তারাপদকে তাহার প্রাপ্তির সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া বলিত। একদিন তারাপদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“কোরচো কি ?” বৈকুণ্ঠ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল, “কোম্পানীর কাগজ !” তারাপদ যেন আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল! জিজ্ঞাসা করিল, “পাপের টাকা কি কখন মানুষের থাকে ?” বৈকুণ্ঠের ইচ্ছা হইল, তখনি তারাপদর টুঁটিটা টিপিয়া ধরে ! কিন্তু চতুর বৈকুণ্ঠ খানিকটা হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—“পাপের টাকা না থাক্‌লে আর তোমায় যখন-তখন ধার দিত কে ?”

এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষটা তারাপদর প্রাণে বড় বাজিল—তারাপদ মনে মনে স্থির করিল—আর সে বৈকুণ্ঠের নিকট কোনদিন ধার চাহিবে না। কিন্তু পর মাসেই পিতার এক দীর্ঘ পত্র পাওয়ায় তারাপদর সে সংকল্প কোথা ভাসিয়া গেল ! এইরূপে কিছু দিনের মধ্যে বৈকুণ্ঠের নিকট তারাপদর সুদে-আসলে কিছু কম দুশো টাকা ধার দাঁড়াইল ! বৈকুণ্ঠ ভাবিল,—এইবার সু সময়—ছিপে টান দিই ! বৈকুণ্ঠ একদিন টাকা চাহিয়া বসিল, তারাপদ চোখে অন্ধকার দেখিল !

৩

সে দিন আকাশে—মেঘ ; মনে—ভাবনা ; পকেটে—চিঠির মধ্যে বিপন্ন পিতা ‘টাকা টাকা’ করিতেছে, আর সম্মুখে বৈকুণ্ঠ বিরক্তিভরে বলিতেছে—“আর ফেলে রাখ্‌তে পারিনে !”

এমন সময় একটা তদারকের ভার তারাপদর উপর পড়িল। রাজস্ব বাকী পড়ায় কঙ্কালসার জমীদার রায়-বাবুদের মালক্রোকের আদেশ হইয়াছিল কিন্তু কর্ম্মচারী রিপোর্ট করিয়াছে—মাল নাই। সেই জন্য পুলিশের উপর তদারকের হুকুম হইয়াছে।

সংবাদ পাইয়া রায়-বাবুদের লোক নগদ তিন শত টাকা লইয়া, তারাপদর শরণাপন্ন হইল, ঘণ্টাদুই অপেক্ষা করিয়া, তিনি ইন্‌কোয়ারিতে যান্—এই তাঁহাদের প্রার্থনা। তাহা হইলে, তাঁহারা মাল স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারিবেন এবং মালক্রোকের অপমান হইতে একটা বড় ঘর রক্ষা পাইবে !

এক মুহূর্ত্তে নগদ—তিনশত টাকা ! তারাপদর বুকটা দুড়-দুড় করিয়া উঠিল। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন উৎকোচের নামে তাহার প্রাণের ভিতর হইতে কে একজন ‘না’—‘না’ করিয়া উঠিত, কই আজ তো তেমন করিয়া উঠিল না !—একি !

তারাপদ মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—“না—না আমি ঘুস্ নিতে পার্‌ব না !” কর্ম্মচারী কাতর-ভাবে বলিল, “একটা বনেদী-ঘরকে অপমানের হাত থেকে রক্ষে করুন—অমত করবেন না—অমত করবেন না !”

ক্ষণকাল নীরব রহিয়া তারাপদ বলিল—“আচ্ছা যান

আমি আপনাদের কথা-মত বিলম্ব করেই যাব—ও টাকা আপনি নিয়ে যান্!"

লোকটা চলিয়া গেলে তারাপদর ভিতরটা কই ততটা খুসী ত হইল না। দু-ঘণ্টা বিলম্বে যাওয়ায় কর্ত্তব্যে অবহেলা তো সেই হইলই; অথচ ঋণশোধের এমন সুযোগটা!—

মনের এ ভাবটার উপর তারাপদ দু-একবার চোখ রাঙ্গাইতেও কসুর করিল না, কিন্তু মন পূর্ব্বের মত কই নিজের ইচ্ছায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল না ত!

রায়-বাবুদের, অর্থাভাব ঘটিলেও, মন তেমনি উঁচু ছিল। জমীদার মহাশয় তারাপদের নিঃস্বার্থ ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন—তিনি তারাপদকে কিছুতেই ছাড়িলেন না—এমন ভদ্রতার ঋণ কি মানুষে ঘাড়ে করিয়া থাকিতে পারে!—তিনি তারাপদকে বার-বার বুঝাইতে লাগিলেন—"আপনি অর্থের লোভে আমার উপকার ক'র্‌তে আসেন্ নি;—সুতরাং এটাকা আমি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দিচ্ছি;—একে ঘুষের চোখে দেখ্‌লে বড়ই দুঃখিত হব।"—

এ টাকা আমি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ দিচ্ছি—

তারাপদর মনটাও সেই সময় ভিতর থেকে বারবার বলিতে লাগিল—'তারাপদ! বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়! সাধুতায় সকলকে টেক্কা দিতে যাইয়ো না—শেষ রক্ষা হ'বে না!—এ টাকা কৃতজ্ঞতার পূজা—এতে উৎকোচের কোনো গন্ধ নেই—থাকৃতেই পারে না!'

বৈকুণ্ঠও না ঠিক এই কথা বলিত? তারাপদ মন্ত্র-চালিতের ন্যায় নোটগুলি গ্রহণ করিয়া পকেটে পূরিল।

সমস্ত রাত তারাপদ ঘুমাইতে পারিল না;—কি যেন একটা অব্যক্ত অশান্তি বুকের ভিতর বিঁধিতে লাগিল। দৈন্যনিপীড়িত পিতার তীব্র পত্রে অনেক সময় তারাপদর এমন বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু কই এমন অশান্তি তো তাহার হৃদয়কে কখনও ব্যথিত করে নাই? তারাপদ বেশ বুঝিল, সেই পাপ তিনশত মুদ্রাই যত অশান্তির মূল। এত দিন সে দরিদ্র ছিল কেবল বাহ্যসম্পদে, কিন্তু আজ সে তিনশত মুদ্রার মোহে হৃদয়ের যে মহৎ বস্তুটি হারাইতে বসিয়াছে, তাহার যে মূল্য নাই—সে জিনিস যে একবার গেলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। জমীদারবাবু বলিয়াছিলেন, উহা উৎকোচ নহে, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। যদি তাই হয়, তবে এত অশান্তি কেন?—না, না ভুল বুঝিয়াছ—তারাপদ—ও অর্থ কখনই নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে না—উহা ঘৃণ্য,—অস্পৃশ্য! তারাপদ প্রতিজ্ঞা করিল, সে কালই টাকাগুলি জমীদারবাবুকে ফিরাইয়া দিবে!

৪

তারাপদর স্থির প্রতিজ্ঞা—টাকা ফিরাইয়া দিবে; কিন্তু প্রভাতেই বৈকুণ্ঠ আসিয়া টাকার তাগিদ দিল। তারাপদ বড়ই মুস্কিলে পড়িল, কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত হইল না। নিতান্ত

কাতরভাবে বলিল—"ভাই আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, যতটা পারি আমি শোধ করব—"

বৈকুণ্ঠ কেমন করিয়া সন্ধান পাইয়াছিল যে, তারাপদ জমীদার-বাড়ী হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সুযোগ পাইয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"কি রকম! এই কাল জমীদার-বাড়ী থেকে 'অনেষ্টি'র 'রিওয়ার্ড' বাবদে এতগুলো টাকা পেলে, তবু ধার শোধ করতে চাও না?—এ মন্দ নয়!"

বৈকুণ্ঠের এই তীক্ষ্ণ শ্লেষে তারাপদর হৃদয়টা যেন পিষিয়া গেল। একবার ভাবিল, বৈকুণ্ঠকে সত্য কথা খুলিয়া বলে, কিন্তু আবার ভাবিল, না বৈকুণ্ঠ তা বিশ্বাস তো করিবেই না, অধিকন্তু কত কি ভাবিবে!

তারাপদকে নির্ব্বাক দেখিয়া বৈকুণ্ঠ একটু রুক্ষ স্বরে বলিল, "এখন কি মৎলব বল দেখি;—টাকাগুলা দেবার ইচ্ছা আছে, না আমায় অন্য উপায় দেখতে হবে?—এ মন্দ অনেষ্টি নয়—'সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং' ওয়াটার'—যাকে বলে, ডুবে ডুবে জল খাওয়া—অথচ—"

তারাপদর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; সে বলিল, "ভাই, মাপ্ করো—তোমার টাকা দিচ্চি।"

সমস্ত পাওনা টাকা হস্তগত করিয়া, বৈকুণ্ঠ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, 'থ্যাঙ্কস্' বলিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। তারাপদর চোখের সম্মুখে তখন সমস্ত সংসারটা যেন কুমোরের চাকের মত বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল!

অনেকক্ষণ পরে তারাপদ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল—"এঁ্যা—শেষে সেই ঘুষ-খোর হ'তে হোলো;—সংসারে কেউ আমার সহায় হ'ল না। হা ভগবান,—তুমিও না!"

বিধাতার উপর এই তীব্র অভিমান তারাপদকে মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল;—সে স্থির সঙ্কল্প করিল—"আচ্ছা সংসার যা চায়, আমি তাই হব;—দেখি, পুণ্যের অতট হতে পাপের অতলে কত দ্রুত নেমে যেতে পারি!"

এই ভীষণ হেয় সংকল্পের দুইমাস পরেই তারাপদ পিতাকে মাহিনার টাকা বাদে আরও সাড়ে তিন শ' টাকা পাঠাইলেন। টাকা পাইয়া রামসদয় মহা খুসী,—ভাবিলেন, 'হাঁ—এত দিনে পুত্রের পিতৃভক্তি দেখা দিয়াছে!'

৫

দেখিতে দেখিতে প্রায় চারি বৎসরকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই কয়বৎসরে তারাপদর বিষম পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—সে এখন উৎকোচ-লক্ষ্মীর বর-পুত্র!—রজত-চক্রের ইঙ্গিতে দিনকে রাত, রাতকে দিন করিতে সে এখন সিদ্ধহস্ত! তারাপদর শরীর কিন্তু ভাল নহে;—কঠিন শিরঃ-পীড়ায় সে মাঝে মাঝে উন্মাদবৎ হইয়া উঠে। কি জানি কেন, তাহার মনে সময়ে সময়ে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। চিকিৎসক তারাপদকে ছুটি লইয়া কিছুদিন বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিলেও তারাপদ সম্মত হয় না;—এখন উৎকোচের উৎকট নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল!

তখন পূজার ছুটি কাছাকাছি। তারাপদ পিতার নিকট হইতে এক 'জরুরী' পত্র পাইল;—শীঘ্র কিছু টাকা চাই। সে সময়ে তেমন কোন 'সারবান্' তদন্তের ভার তারাপদর উপর ছিল না; সুতরাং সে একটু চিন্তিত হইল। কিন্তু দুইচারি দিন পরে একটি 'লোভনীয়' তদন্তের সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

লোভনীয় বলিবার অর্থ,—এই তদন্তের ক্ষেত্র হইতেছে—নীলগাঁর জমীদার-বাটী। নীলগাঁর জমীদার-বাড়ীতে এক জন কর্ম্মচারী খুন হইয়াছে শুনিয়া, তারাপদর প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল!—তার ভাই শ্যামাপদ যে নীলগাঁর জমীদার-সেরেস্তায় কাজ করে!

তারাপদর আশঙ্কার অনুরূপই ঘটনা ঘটিয়াছিল—শ্যামাপদরই সন্দেহজনক মৃত্যু হইয়াছিল। ইন্স্পেক্টর যখন শুনিলেন, শ্যামাপদ তারাপদর ভ্রাতা, তখন প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়াই তিনি তারাপদর উপরই তদন্তের ভার অর্পণ করিলেন।

৬

নীলগাঁর জমীদার-বাবু যখন শুনিলেন যে, যে দারগা তদন্তে আসিতেছে, সে তাঁহার নিহত কর্ম্মচারী শ্যামাপদরই সহোদর ভ্রাতা, তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন। তাহা হইলে তো আর রজতখণ্ডের প্রভাব থাটিবে না! কিন্তু পুরাতন কর্ম্মচারী শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী ভারি পাকা লোক—অনেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে। সে জমীদার-বাবুকে আশ্বাসদিয়া বলিল—"হুজুর যদি আমাকে টাকার সম্বন্ধে ভরসা দেন,

তবে বুক্ ঠুকে বল্‌ব—আমি কাজ হাসিল করবই ;—তবে টাকা কিছু বেশী খরচ ক'র্‌তে হবে।”

জমীদার-বাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—“তার জন্যে ভাব্‌না নাই ; দু-দশ হাজার যায়, কি করব !—ছেলে আগে —না টাকা আগে !” শ্রীনিবাস উৎফুল্ল হইয়া বলিল, “তবে এ গরীবেরই উপর ভার রইলো ; দারগার সঙ্গে যা বোঝা-পড়া কর্‌তে হয়, আমিই করব।”

তদন্তের সময়, প্রায় সকলেই জমীদারের হইয়া বলিতে চেষ্টা করিলেও, তারাপদ বেশ বুঝিল, জমীদারের পুত্রকর্ত্তৃক এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। সুতরাং, সে জমীদার-পুত্রকে চালান দিবে স্থির করিল ; কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীনিবাস, তারাপদর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া, নিজের অভিপ্রায় জানাইল।

শ্রীনিবাসের কথা শুনিয়া তারাপদ, ক্ষণেক নির্ব্বাক হইয়া, তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর অতি ধীর স্বরে বলিল, “জান—শ্যামাপদ আমার কে ?”

শ্রীনিবাস বলিল, “জানি। কিন্তু—”

“কিন্তু কি ?”

তখন শ্রীনিবাস তারাপদকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, 'তারাপদর রিপোর্টে জমীদার-পুত্রের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; কিন্তু তাহাতে শ্যামাপদ পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে না ; এবং এক প্রতিহিংসা লওয়া ব্যতীত, তাহাতে তারাপদর আর কোন লাভ নাই ;—সুতরাং, তারাপদ, যদি অনুগ্রহ করিয়া জমীদারের স্বপক্ষে রিপোর্ট দেন, তবে জমীদার-পুত্রও রক্ষা পায়—আর তিনিও বিপুল অর্থলাভ করিতে পারেন !

তারাপদর ললাটে কুটিল রেখা ফুটিয়া উঠিল ; সে মনে মনে বলিল, 'না। চার দিক্ থেকে নরকের শিখা জাগিয়ে তুলেচে।' তার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কত টাকা ?”

“যত চান্—পাঁচ হাজারেও পেছুব না”

তারাপদর হাতের কলমটা কাঁপিয়া উঠিল। সে একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল—“না, তোমরা সকলে মিলে আমায় পশাচ করে তুল্‌লে !”

এই বলিয়া তারাপদ, পূর্ব্বলিখিত রিপোর্টখানা তাড়াতাড়ি লইয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, একবার উপর দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “মাপ্ করিস্ ভাই, বাবার টাকার দরকার !”

৭

তারাপদ থানায় ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে এবং উৎকোচের পাঁচ সহস্র টাকা সমস্তই পিতার নিকট পাঠাইয়াছে। রিপোর্ট দেখিয়া সকলে অবাক্। ইন্‌স্পেক্টর একবার শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কিছুই কিনারা হল না ?” তারাপদ সংক্ষেপে উত্তর দিল—“না”।

তখন রাত্রি গভীর। থানার প্রায় সকলেই নিদ্রিত—তারাপদ আপনার ঘরে গুম্ হইয়া কি ভাবিতেছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর বাতিটা প্রায় সবটা পুড়িয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ তারাপদ চেয়ার হইতে উঠিয়া, রিভলভারের বাক্সটা খুলিয়া, রিভালভারটা বাহির করিল, দেখিল ঠাসা আছে। তখন পিছন ফিরিয়া, ঘরের দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। পিছন ফিরিতেই দেখিল, পশ্চিমের দেয়ালে শ্যামাপদর একখানা ফটো টাঙ্গান ; সহসা সেইদিকে তারাপদর দৃষ্টি পড়িল। অমনি সেই খানা লইয়া উন্মত্তের মত হইয়া, নিজের বুকের উপর এমন চাপিয়া ধরিল যে, পরমুহূর্ত্তে ফটোর কাঁচখানা ভাঙ্গিয়া ঝনঝন শব্দে মেজেতে পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া, তারাপদ ধীরে ধীরে ছবিখানিকে চোখের সামনে স্থাপিত করিল ও টেবিলের উপর হইতে সেই ঠাসা রিভল্‌ভারটি তুলিয়া, তাহার নলের অগ্রভাগ নিজের হৃৎপিণ্ডের উপর স্থাপিত করিল ; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা নামাইয়া রাখিল এবং একখানা বড় কাগজ লইয়া ক্যাঁস্ ক্যাঁস্ করিয়া খানিকটা কি লিখিল। সেই খানা টেবিলের উপর রাখিল, আবার রিভল্‌ভারটা তুলিয়া লইল ; তারপরে ফটোর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ; তারপর সহসা সেই গভীর নিস্তব্ধতাকে কাঁপাইয়া, 'গুড়ুম্' করিয়া একটা শব্দ হইল, আর সশব্দে তারাপদ কক্ষতলে পড়িয়া গেল ;—তার মুখ হইতে খানিকটা রক্ত ছিটাইয়া সেই কাগজে গিয়া লাগিল !

* * * *

রিভল্‌ভারের শব্দে রামদীন্ কনেষ্টবল্ সেই দিকে ছুটিয়া গেল। তারাপদর কক্ষ হইতে তখনও একটা যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ নির্গত হইতেছিল। তখনি সকলে দ্বার ভাঙ্গিয়া, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রক্তাক্ত দেহে তারাপদ কক্ষতলে পড়িয়া গোঁ—গোঁ শব্দ করিতেছে !

সহসা একজনের দৃষ্টি সেই লেখা কাগজখণ্ডের উপর পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল;—

"শ্রীচরণেষু—

বাবা, আপনি আমায় ঘুসখোর হতে পুলিশ-লাইনে পাঠিয়েছিলেন, আর আপনার গঞ্জনায় তিরস্কারে তাড়নায় ঘুসখোরও হয়েছিলুম; কিন্তু কাল্‌কে,—যে যেখানে যত বড়ই ঘুসখোর থাক্‌না কেন—সকলকে টেক্কা দিয়েছি;—পাঁচ হাজার টাকা পেয়েচি, এক পয়সা খরচ করিনি,—সব পাঠিয়েছি। আপনি ভাবচেন, পাঁচ হাজার টাকা, এ আর বেশী কি—এর চেয়েও লোকে কত বেশী পায়। হাঁ, পায়;—কিন্তু বাবা এপর্য্যন্ত কি কেউ নিজের মার পেটের ভায়ের খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ঘুষ নিয়েচে?—নিতে পেরেচে?—কিন্তু আমি কাল তাও করেচি—কি করি?—পূজা আস্‌চে—আপনার টাকার দরকার! টাকা নিয়ে আপনি জুড়োন্‌, কিন্তু আমি কিসে জুড়ুব?—বুক্‌ যে জ্বলে যাচ্চে—নিজের বুকের রক্ত নইলে কি এজ্বালা জুড়োবে?—না—না—কখনই না! ইতি—

আপনার ঘুষখোর ছেলে—তারাপদ।"

পূর্ণিমায়

[শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়]

তোমার ও স্নেহ-ভরা নয়ন হতে
দৃষ্টি আলো-ধারা,
আমার এ দেহমনে সিক্ত করি
করল আত্মহারা!
তুমি যে অমন করে চেয়ে আমায়
ডাক্‌ দিলে কোন ভাবে,
আমি যে আপন-ভোলা তোমার পানে
চাই যেতে কোন্‌ আশে?
কত আমার প্রাণে তোমার ভাষা—
নীরব আলাপন,
তুমি আমার মনে ঘিরে শুধু
রাখ তোমার মন!
আজ কথার বাধা কেটে শুধু
দেখার পালা হোক্‌—
শুধু তোমায়-আমায় নির্নিমেষে
ভাসুক্‌ বিশ্বলোক!
আলোয় তোমার নয়ন ভেসে
ভাসাক্‌ আমারে,
গাহন করি দৃষ্টিস্রোতে
তোমার মাঝারে!
কল্পনা আজ ঘুচিয়ে দিয়ে—
মুছিয়ে দিয়ে মায়া,
তোমায়-আমায় এই যে দেখা—
নয় ত ইহা ছায়া!
সত্য ইহা, কোথায় খুঁজিস্‌
সত্য-লোভাতুর?
আপন-ভোলা হলেই হলি
সত্যে ভরপুর!
এই যে দেখা তোমায়-আমায়
চোখের চাহনে,
এ যদিরে মিথ্যা, তবে
মিথ্যা গগনে—
মিথ্যা বহে পবন, মিথ্যা
বর্ষে বারিধারা;
চন্দ্র মিথ্যা, সূর্য্য মিথ্যা,
মিথ্যা গ্রহ তারা!

কেন্দ্রীয় উষা

[শ্রীঅঘোরনাথ বসু, কবিশেখর]

বিশ্বপতি বিধাতা এই বিরাট বিশ্বের কেবল সৃষ্টি করিয়াই নিরস্ত হন নাই; বিশ্ববাসী জীববৃন্দের সুখশান্তি-বর্দ্ধনেরও উপায় বিধান করিয়াছেন এবং তাহাদিগের অভাব-অসুবিধা নিবারণের নিমিত্ত নানা নূতন নূতন পদার্থেরও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পদার্থসমূহের মধ্যে কতকগুলি আবার পরম রমণীয়; যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই প্রীতি-প্রদ ও নয়নমনোমোহকর। মনুষ্যাদি প্রাণিগণ সেই সকল দ্রব্যের সাহায্যে একপক্ষে যেমন আপন আপন অভাব-মোচন ও প্রয়োজন সিদ্ধ করে, পক্ষান্তরে আবার তেমনই তাহাদিগের মনোমদ মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে আত্ম-হারা ও বিহ্বল হইয়া থাকে। আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য কেন্দ্রীয় উষাও সেই প্রীতিকর, আবশ্যক পদার্থ-নিচয়েরই অন্যতম। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিলাম।—

সূর্য্যের অবস্থান ভেদে এই বিশাল ধরিত্রী পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগ বা মণ্ডলে (Belt) বিভক্ত। সেই বিভাগ বা মণ্ডল-পঞ্চের মধ্যে একটির নাম মেরুমণ্ডল। মেরুমণ্ডল পৃথিবীর প্রান্তদেশে অবস্থিত এবং, উত্তর ও দক্ষিণ-ভেদে, যথাক্রমে উত্তর, বা সুমেরু, ও দক্ষিণ, বা কুমেরু, নামে পরিচিত। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি একরূপ এবং ভূমণ্ডলের মধ্যস্থল হইতে সমদূরবর্ত্তী; মধ্যন্দিন বা বিষুব-রেখা হইতে ৯০ নব্বই অক্ষাংশ (Degree), অর্থাৎ, প্রায় ৬২৫৫ ছয় হাজার দুই শত পঞ্চান্ন মাইল দূরে অবস্থিত। এই দূরবর্ত্তিতাবশতঃ, সূর্য্যের অধিশ্রিত ভূমিভাগ বা উষ্ণ কটিমণ্ডল হইতে মেরুমণ্ডলের প্রাকৃতিক অবস্থা স্বতন্ত্ররূপ। মেরুমণ্ডলে ঋতুভেদ নাই, একমাত্র শিশির ব্যতীত আর কোনও ঋতুর প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না—বারমাসই, সকল সময়েই এখানে প্রবল শীত, আর এখানকার সমস্ত ভাগই শুভ্র তুহিনমালায় সতত সমাচ্ছন্ন। মেরু-প্রদেশের অপর এক বিশেষত্ব এই যে, এখানে দিবা ও রাত্রিমান অত্যন্ত দীর্ঘ; অন্যত্রদুর্ল্লভ এই দীর্ঘতম দিবা ও রাত্রির পরিমাণ ছয়মাস অর্থাৎ এক অহোরাত্রে, বা একটিমাত্র দিন ও একটি মাত্র রাত্রিতেই এখানকার একটি সংবৎসর পরিপূর্ণ হইয়া থাকে!

উল্লিখিত প্রাকৃতিক বৈষম্য জীবজগতের—বিশেষতঃ মনুষ্যজাতির—পক্ষে বিশেষ ক্লেশকর ও অসুবিধাজনক হইলেও, মেরুমণ্ডল জীবহীন বা মানবশূন্য নহে। দক্ষিণ বা কুমেরু-মণ্ডলে কোনও দেশ বা মনুষ্যজাতির অধ্যুষিত ভূভাগ, বা গ্রামনগরাদি না থাকিলেও,—কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রাণী এবং কয়েকপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম ব্যতীত অপর কোনও জীব বা উদ্ভিদের দর্শনলাভ সম্ভবপর না হইলেও,—উত্তর বা সুমেরু-মণ্ডল সেরূপ নহে; উহা মনুষ্যাদি জীব ও উদ্ভিদ্-পরিশূন্য নহে। সেখানকার সাইবিরিয়া, ল্যাপলণ্ড, গ্রীন্‌লণ্ড, প্রভৃতি দেশ ও দ্বীপে অসংখ্য বৃক্ষাদি ও বহুসংখ্যক মনুষ্য—ল্যাপ (Lapp), এস্‌কিমো (Exquimau) প্রভৃতি বহুল অসভ্য নরনারী বাস করিয়া থাকে। সুতরাং সেই অসভ্য লোকদিগকেই মেরুদেশের সেই নৈসর্গিক অসুবিধা—দিবারাত্রির অত্যধিক দীর্ঘতা-জনিত ক্লেশ—সহ্য করিতে হয়। কিন্তু কি প্রকারে, কোন্ অনন্যসাধারণ, অমানুষশক্তি প্রভাবে তাহারা তাহা সহ্য করে? তবে কি, তাহারা ক্রমাগত ছয় মাসকাল কার্য্যে লিপ্ত ও ছয়মাস কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রাসুখে নিমগ্ন থাকিয়াই সেই অসুবিধা ও ক্লেশের নিরাকরণ করিয়া থাকে? সেরূপ অসাধ্যসাধন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত কি?—মনুষ্যজাতির পক্ষে সেরূপ ছয়মাসব্যাপী অবিরত পরিশ্রম ও বিশ্রাম কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে?

না—তাহা নয়;—তাহারা আমাদিগেরই মত পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য ও কার্য্যান্তে বিশ্রাম করে।—সুদীর্ঘ দিবা ও রাত্রি, আমাদিগের দিবা ও রাত্রির ন্যায় খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়া, আপন আপন কর্ত্তব্য-সম্পাদন ও নিদ্রাসুখ সম্ভোগ

করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেইবা তাহাদিগের সমস্ত ক্লেশ কিরূপে নিবারিত হয়? দীর্ঘ দিবাভাগ পর্য্যায়ক্রমে বহুবার কার্য্য ও বিশ্রামে অনায়াসেই অতিবাহিত করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু রাত্রির ঘনান্ধকারে সেরূপভাবে কার্য্য করা ত আর অনায়াসসাধ্য নহে। তাই, বিশ্বপালক বিধাতা, করুণাময় ভগবান, সেই অসুবিধা নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন!—মেরুচারী মানবেরা যাহাতে রাত্রিতেও দিনমানের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে,—অন্ধকারে আহার সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, যাহাতে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়,—তাহারও এক সুন্দর ও সহজ উপায়ের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন! মেরুবাসীদিগের হিতের জন্য, রাত্রির অন্ধকারজনিত অসুবিধা-নিবারণের জন্য, মেরুপ্রদেশে এক অপরূপ জ্যোতিঃর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন!—ইহারই নাম মেরু-জ্যোতিঃ বা কেন্দ্রীয় ঊষা।

কেন্দ্রীয় ঊষা লোহিতাভ আলোক-বিশেষ। ইহা মেরু-গগনে আবির্ভূত হইয়া, সমস্ত মেরুমণ্ডল আলোকিত ও তদ্দ্বারা তদ্দেশবাসীদিগের মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। মেরুমণ্ডলে যেদিন হইতে রাত্রি আরব্ধ হয় (সুমেরুমণ্ডলে ১১ই আশ্বিন ও কুমেরুমণ্ডলে ১১ই চৈত্র), সেইদিন হইতেই এই বিচিত্র আলোক প্রকাশিত হয়; এবং ছয়মাস কাল নানা মনোহর মূর্ত্তিতে মেরু-আকাশে বিরাজিত থাকিয়া, যেমনই দিবা-ভাগ সমাগত হয় (উত্তর মেরু-প্রদেশে ১১ই চৈত্র, ও দক্ষিণ মেরু-প্রদেশে ১১ই আশ্বিন) অমনই অন্তর্হিত হইয়া থাকে! ইহা সূর্য্যালোকেরই তুল্য প্রোজ্জ্বল, প্রতপ্ত বা তীক্ষ্ণ না হইলেও, অন্ধকার-নিবারণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী; কিন্তু এই জ্যোতিঃ সমস্ত রাত্রি, অর্থাৎ পূর্ণ ছয়মাস কাল, ক্রমাগত একই ভাবে আকাশতলে অবস্থিত থাকে না; মধ্যে মধ্যে আংশিকরূপে, এবং সময়ে সময়ে সম্পূর্ণরূপেই, অন্তর্হিত ও দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইয়া যায়। তবে, সেই অদর্শন-কাল এরূপ অল্প বা ক্ষণস্থায়ী যে, তদ্দ্বারা মেরু-প্রদেশে প্রায়ই আলোকাভাব হয় না। অন্ধকার সর্ব্বত্র সমভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে না করিতেই, ইহার পুনঃপ্রকাশে অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত ও অদৃশ্য হইতে থাকিলেও, ইহার পূর্ণপ্রকাশে, পূর্ণ-মূর্ত্তি পরিগ্রহণে, কিঞ্চিৎ অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়; কিন্তু একবার পূর্ণমূর্ত্তি ধারণ করিলে, সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিলে, সহসা অদৃশ্য হয় না; কয়েক প্রহর কাল একরূপ অবিকৃতভাবেই আকাশমার্গে বিরাজ করিতে থাকে।

এই অপূর্ব্ব আলোকের পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় নাম—আরোরা (Aurora)। 'আরোরা' লাটিন ভাষার শব্দ, ইহার অর্থ—'সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল', বা 'ঊষা'। সুসভ্য গ্রীক্‌জাতি আরোরাকে 'হিয়স্' (Heos), বা 'ইয়স' (Eos), নামে অভিহিত করিয়াছে—এবং আপনাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থে ইহাকে 'প্রভাতকালের অধিষ্ঠাত্রীদেবী', বা 'রবি-অগ্রদূতী ঊষা' (The Goddess of the morning or daybreak) বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।* গ্রীক্ শাস্ত্রকারদিগের মতে, সুগভীর সাগরতলই আরোরাদেবীর আবাস-নিকেতন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে, রবির আগমনবার্ত্তা জগৎবাসীকে জ্ঞাপন করিবার জন্যই যেন, দিব্য রথারোহণে সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুত্থিতা হন, আর তাঁহার গোলাপরঞ্জিত লোহিত অঙ্গুলিগুলি হইতে নিশার নীহারকণা সকল ক্ষরিত হইতে থাকে! আরোরা মেরু-মণ্ডলেরই আলোক—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র-বাসীদিগেরই নিজস্ব সম্পদ; আর তজ্জন্য যথাক্রমে উত্তর কেন্দ্রীয় ঊষা (Northern Lights, or Aurora Borealis) এবং দক্ষিণ কেন্দ্রীয় ঊষা (Southern Lights or Aurora Autralis, or Aurora Septentrionalis) নামেই অভিহিত। এই আলোক কেন্দ্রভেদে এইরূপ ভিন্ন নামে কথিত ও পরিচিত হইলেও, ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে; একইরূপ আকৃতি-প্রকৃতি ও ঔজ্জ্বল্য-সমন্বিত। এজন্য প্রত্যেকের পৃথক্ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন

* গ্রীকভাষায় 'হিয়স্' শব্দের সহিত 'আরোরা' শব্দের কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও সংস্কৃত 'ঊষা' শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্যসংস্রব যেরূপ ঘনিষ্ঠতর, তেমন বোধ হয়, আর কোনও ভাষার কোনও শব্দের সহিতই নহে। সংস্কৃত ভাষার ঊষা, আর লাটিন ভাষার আরোরা, সম্পূর্ণ একার্থবোধক শব্দ; এবং উভয় শব্দই সংস্কৃত 'উষ্' ধাতু (Ush—to burn) হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং, আরোরা যে সংস্কৃতমূলক, সংস্কৃত ভাষা হইতে সমুৎপন্ন শব্দবিশেষ, তাহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। আর, প্রাচীন আর্য্যঋষিরাও যে এই আরোরার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহাও এতদ্দ্বারা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

বাধে, একমাত্র উত্তর কেন্দ্রীয় ঊষার কথাই এখানে আলোচনা করিব।

আরোরা কিসের আলোক, কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয়, এবং একমাত্র কেন্দ্র বা মেরুমণ্ডল ব্যতীত অপর কোনও স্থানেই বা প্রকাশিত হয় না কেন,—তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে; একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খ-তত্ত্ববিদ্‌গণ ও ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহার স্বরূপ নিরূপণ করিবার জন্য অনেক যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছেন,—গভীর গবেষণা, প্রভূত পরিশ্রম ও পরীক্ষা প্রভৃতি হইতেও পশ্চাৎপদ বা বিরত হন নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই—কোনও সর্ববাদিসম্মত সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ ইহাকে মেরু-আকাশের কোনও অদৃশ্য প্রাকৃতিক-বিশেষের অপরিস্ফুট দ্যুতি, এবং কেহ বা কোনও ভাস্বান্ গ্রহাদির প্রতিফলিত প্রভা বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের কোনটিই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। তবে, অধুনাতন প্রতীচ্য বুধমণ্ডলী ইহার বিচিত্র গতি ও আলোকের বিশেষ প্রকার রীতিপ্রকৃতি ও বর্ণচ্ছটা প্রভৃতির পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়া, ইহাকে এক প্রকার তাড়িত-তেজ, বা বিদ্যুৎ হইতে সমুৎপন্ন আলোকবিশেষ, বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন; আর এই অনুমানকে এখন একরূপ সমীচীন বলিয়াই অনেকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, আরোরা—কেন্দ্রীয় ঊষা, কেন্দ্রালোক, মেরুজ্যোতিঃ প্রভৃতি নামে পরিচিত হইলেও,—একমাত্র কেন্দ্রে বা মেরুমণ্ডলই ইহা নিবদ্ধ নহে; অর্থাৎ, ইহা যে কেবল মেরু-প্রদেশকেই আলোক দান করে, তাহা নহে। সময়ে সময়ে ইহার প্রোজ্জ্বল প্রভা কেন্দ্র বিভাগেও গমন করে—মেরুদেশ হইতে বহুদূরে, সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী দেশেও আভা বিকিরণ করিয়া থাকে!

মেরুমণ্ডলে দীর্ঘদিবার অবসান, ও রাত্রিকাল সমাগত, হইলেই আরোরার আবির্ভাব হয়। প্রথমে উত্তর আকাশ কিঞ্চিৎ মলিনভাব ধারণ করে, ক্রমে সেইভাব কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয় আর তন্মধ্য হইতে শনৈঃ শনৈঃ স্রোতের আরো-রার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দৃশ্যমান হইয়া উঠে! উত্তর হোরাচক্রের (Northern Horizon) কয়েক অক্ষাংশ উর্দ্ধে, ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম মেঘরেখার উপরিভাগে, ইহার মূলভাগ সংন্যস্ত থাকে; আর, শীর্ষদেশ আকাশের মধ্যবিন্দু (Zenith) অভিমুখে প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু যখন মধ্যবিন্দু অতিক্রম করিয়া, দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত হয়, তখন স্রোতো-মূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক অপরূপ বর্ত্তুলমূর্ত্তি,—জ্যোতির্ম্ময় বৃত্তের আকার ধারণ করে এবং দেখিতে দেখিতে বিচিত্র বর্ণে বিরাজিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, লোহিত আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকে। কখনও কখনওবা কৃষ্ণবর্ণ গগনতলে অনুজ্জ্বল মলিন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া, পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, বৃহদাকার ধনু, খিলান বা খণ্ডিত বৃত্তের আকারে দৃশ্যমান হয়; কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই সেই মলিনভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং উহার পার্শ্বদেশ হইতে নীলের আভাযুক্ত শুভ্রালোক বিনিঃসৃত হইতে থাকে; আর দেখিতে দেখিতে সমগ্র আরোরা-মূর্ত্তি উজ্জ্বল প্রভায় জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে! সেই জ্যোতির্ম্ময় ধনু, খিলান বা বৃত্তখণ্ডও আবার এক এক সময়ে অপরূপ রূপ, অভিনব বিচিত্রমূর্ত্তি, পরিগ্রহ করে; তখন উহার সর্ব্বাবয়ব সমান সুদৃশ্য, পরিপুষ্ট ও সমুজ্জ্বল হয়; আর উহার উপরিভাগ হইতে অসংখ্য আলোকচ্ছটা, ঝালরের আকারে উর্দ্ধদেশে বিনির্গত হইয়া, উহাকে এক অনুপম দিব্যশোভায় সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলে!

আরোরা পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন, পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, শোভা সৌন্দর্য্যেরও সমধিক উৎকর্ষ বা শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে। তখন ইহার সৌন্দর্য্য-সুষমা অত্যধিক মনোহর হইয়া উঠে! শত শত সুরঞ্জিত রশ্মিরেখায় বিশোভিত অলঙ্কৃত হইয়া, আরোরা দেহ, সেই জ্যোতির্ম্ময় বৃত্তখণ্ড, অবিকল একখানি অর্দ্ধবৃত্তাকার অপরূপ কেশ-প্রসাধনী প্রকাণ্ড কঙ্কতিকা রূপে (Semi-Circular Comb) নভোমণ্ডলে বিরাজ করিতে থাকে! অস্থি-রচিত কেশ-কঙ্কতিকার সমস্ত কণ্টকই প্রায় একরূপ, সম-স্থূল, সমশীর্ষ ও সমব্যবধানে সংস্থিত। কিন্তু ইহার এই অনুপম আলোক-কঙ্কতিকার প্রত্যেক রশ্মি-কণ্টকই বিসদৃশ—ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি নানা আকারে, নানা ভাবে সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত এবং নীল, পীত, হরিৎ, লোহিতাদি নানা বর্ণে সুরঞ্জিত; সমলঙ্কৃত!—অতি অপরূপ, অতি মনোহর, সুশোভন দৃশ্য!

উপরে কেন্দ্রীয় ঊষার যে কয়েক প্রকার রূপের কথা উল্লেখ করা হইল, তদ্ব্যতীত ইহার আরও অনেক রূপ আছে;

অর্থাৎ, সময়ে সময়ে ইহা আরও শত সহস্র প্রকার অভিনব অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া মানবজাতির মনোহরণ ও চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। সেই সকল রূপের মধ্যে একটি রূপ আবার এমন সুন্দর যে, তাহার নিকটে, সে রূপের তুলনায় ইহার অপর সহস্র প্রকার রূপও নিতান্ত হেয়, অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই গণ্য হয়। সেই অতুলনীয়, নয়ন-রঞ্জন বিচিত্র রূপের নাম—"মধুর নৃত্যকারিণী মূর্ত্তি" (Merry Dancers)! * আরোরা-দেহ এক এক সময়ে ঊর্দ্ধাধোভাবে ধীরে ধীরে বিচরণ করে—দীপ্তিশীল অর্দ্ধ-বক্তুলাকার বিশাল কণ্ঠিকা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিচিত্র বর্ণের সংখ্যাতীত কম্পনশীল রশ্মিচ্ছটার সহিত মৃদুমন্দ-ভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে! তখন দেখিলে মনে হয়, যেন দেবী-আরোরা মূর্ত্তিমতী হইয়া, লোচনা-নন্দদায়িনী দিব্যমধুরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মর্ত্তাভূমে অবতরণ করিয়াছেন এবং মেরুগগনে একখানি সুরম্য সুদৃশ্য আসন আস্তীর্ণ করিয়া, তদুপরি অগণিত দিব্যদেহধারিণী আলোকময়ী সহচরীর সহিত মধুর ভঙ্গিসহকারে মহানন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন; আর তাঁহার চারু অঙ্গের উজ্জ্বল আভায়—রূপের ছটায়, দশদিক্‌ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে! পাশ্চাত্য মনীষিগণ কত কত বার মেরু-সন্ধানে গমন করিয়া, ইহার নয়নাভিরাম মনোহর শোভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ইহার সম্বন্ধে কত তথ্যাদিও আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোন্‌ সভ্যদেশের কোন্‌ মহাত্মা যে, ইহার আবিষ্কর্ত্তা, তাহা কাহারও পরিজ্ঞাত নহে। তবে, ভারতীয় আর্য্য ঋষিরা যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কেন্দ্রীয় ঊষার বিষয় অবগত ছিলেন—এককালে ইহার লোকাতীত সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে আত্মবিস্মৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি—রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সকল—আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। * মহাভারতে 'শ্বেতদ্বীপ' নামে এক মহাদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থানকে পৃথিবীর উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী, সূর্য্যসঞ্চারবিহীন ও তেজোনিবাসভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত শ্বেত-দ্বীপই যে চন্দ্রধবল তুষাররাশি-সমাবৃত মেরুমণ্ডল, আর তত্রত্য তেজঃই যে এই কেন্দ্রীয় ঊষা, 'নদীচীন আলোক'ই যে 'আরোরা বরিয়েলিস্‌' তাহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে। জগতের আদি-কবি, মহর্ষি বাল্মীকিও স্বরচিত পৃথিবীর আদি-কাব্য রামায়ণেও এই অদ্ভুত আলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। বানররাজ সুগ্রীব যখন সীতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, দিকে দিকে চর প্রেরণের ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি শতবর্ণ-নামা বানরকে উত্তর-মেরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে এই আরোরার কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন,—"অনন্তর উল্লিখিত পর্ব্বতপ্রধান মৈনাক অতিক্রম করিয়া উত্তর-সাগর ও তন্মধ্যস্থ সুবর্ণময় সুমহান্‌ সোমগিরি দর্শন করিবে; সেই গিরিতটবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ সূর্য্যসঞ্চারবিহীন, অথচ সোম-গিরির প্রোজ্জ্বল প্রভা-পরম্পরায় সতত সমুদ্ভাসিত। দেখিলে বোধ হয়, যেন সূর্য্যালোকেই আলোকিত হইতেছে।" † সুগ্রীব কথিত সেই গিরিপ্রভা, সোমগিরির অঙ্গজ্যোতিঃই যে বর্ত্তমান কালের, অধুনাতন প্রতীচ্য পণ্ডিত মণ্ডলীর আবিষ্কৃত, এই আরোরা—তাহাতে আর সংশয় কি? তবে, মহর্ষি বাল্মীকি যাহাকে পর্ব্বত নিঃসৃত আলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এখনকার বিশেষজ্ঞেরা তাহাকে বৈদ্যুতিক তেজঃ বা তাড়িতালোক বলিয়াই অনু-করিতেছেন, এই যা' পার্থক্য। অতএব প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণও যে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয়দিগের ন্যায়, এই আরোরা বরিয়েলিস, 'নদীচীন আলোক' বা কেন্দ্রীয় ঊষা সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত ছিলেন না, তাহা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে?

* এই নৃত্যকারিণী বিচিত্র মূর্ত্তিকে সুসভ্য ফরাসী জাতি আবার 'নৃত্যপর ছাগ' (Dancing goat) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ছাগের সহিত এই 'মধুর নৃত্যকারিণী মূর্ত্তি'র যে কি সম্পর্ক, কিরূপ সৌসাদৃশ্য, তাহা আমাদিগের বোধগম্য নহে। বোধ হয়, ছাগের শৃঙ্গের সহিত এই আলোকচ্ছটার, এবং ছাগনৃত্যের সহিত ইহার সঞ্চারশীলতার, কোনওরূপ একরূপতা থাকিতে পারে।

* "তেজোনিবাসঃ সদ্বীপঃ।"—মহাভারত।

† "তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তর স্তোয়সন্নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্‌॥
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্মাভি বিজ্ঞেয় স্তপত্যেব বিবস্বতা॥"
বাল্মীকি রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪৩ সর্গ, ৫৪।৫৫ শ্লোক।

শিকার-স্মৃতি

[শ্রীআখেটক]

(শেষার্দ্ধ)

হাওদাখানি পুনরায় পূর্ব্বভাব ধারণ করাতে ও ব্যাঘ্রবরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, আমি সম্মুখে ফিরিয়া বন্দুকটি যথাস্থানে রাখিতে যাইতেছি, এমন সময়ে গজমতীর হৃদয়ে হঠাৎ "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনাৎ" নীতিটির উদয় হইল, এবং সে তৎক্ষণাৎ সেই পন্থা অবলম্বন করিল। তখন তাহার 'গোদা গোদা' পদচতুষ্টয়, সেই প্রকাণ্ড বপুখানি লইয়া কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে যে চলিতে পারে, যেন তাহারই পরিচয় দিবার জন্য সে উদ্ধপুচ্ছ হইয়া উন্মত্তভাবে ছুটিতে লাগিল। কোথায় সে যাইতেছে, তাহা সে জানে না। কেবল একমাত্র জানে যে, তাহার স্থূল দেহটি 'দুর্জ্জনের' সংশ্রব হইতে যতটা দূরে রাখিতে পারে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। কোথায় যে যাইতেছি, তাহা আমরাও জানিনা; কেবল একমাত্র বুঝিলাম যে, আমাদেরও এই ক্ষণভঙ্গুর অস্থিপঞ্জর কয়েকখানি হাওদার কঠিন অঙ্গ-সংস্পর্শ হইতে যতটা দূরে রাখিতে পারি, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়।

এইরূপ কিছুদূর যাইতে না যাইতে, হঠাৎ একটি ছোটখাট রকমের সংঘর্ষণ (collision) হইয়া, আমাদিগকে একেবারে 'হাওদাসাৎ' করিয়া ফেলিল। হাওদাসাৎ হওয়ার ফলস্বরূপ আঘাতপ্রাপ্ত স্থানগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কোন প্রকারে উঠিয়া, সংঘর্ষণের কারণ কি, অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি যে, জগতের হাতীর গায়ের উপর আমাদের হাতী আসিয়া পড়িয়াছে। বেচারা বনোয়ারীলাল পড়িতে পড়িতে কোনরূপে এই ধাক্কা সামলাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। এই অবসরে একবার জগচ্চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, জগচ্চন্দ্র তখন ভয়ে আড়ষ্ট। চুণীলালকে দেখিবার আর অবসর পাইলাম না। বাধা অপসৃত হইবামাত্র, গজমতী পূর্ব্ববৎ দৌড়াইতে লাগিল।

এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে হয় কোন অজানিত 'খানায়' পতন, নয়ত ঝাউশাখা-কর্তৃক আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদির বিপর্য্যয়-ঘটন; কিংবা মধুচক্র-ভগ্নের ফলস্বরূপ মধুমক্ষিকা-দংশন প্রভৃতির আশঙ্কা করিতে করিতে হস্তি-যানে ঘণ্টায় ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিবার সাধ মিটাইয়া, অবশেষে বন ছাড়াইয়া মাঠে আসিয়া উপনীত হইলাম। কিন্তু এখনও হস্তিনীর গতি মন্থর হইল না; বরং পরিষ্কার মাঠ পাইয়া কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইল। মহূত এতক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণে তাহার হস্তস্থিত 'কোলজাঠার' সদ্ব্যবহার করিতে করিতে 'হায়রান'—হইয়া পড়িয়াছে;—যেন আর পারে না। হস্তিনীর কপাল ও গণ্ডস্থল বহিয়া রুধিরধারা ছুটিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও তাহার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই।

এদিকে বরদারা গ্রাম হইতে হস্তি-ব্যাঘ্রের সম্মিলিত (Duet) সঙ্গীত শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া বনের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। এবং তাহার পর তাহারা যখন আমাদিগকে বন হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে দেখিল, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে স্থির করিয়া, আমাদের নিকট দ্রুতবেগে উপস্থিত হইল। তাহাদের হস্তীগুলিকে নিকটে পাইয়া, গজমতীর লুপ্তসাহস যেন কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পরে দেখিলাম—আমরাই যে রণে ভঙ্গ দিয়াছি তাহা নহে, আলাউদ্দিনও আমাদের এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে নাই। তাহার বৃদ্ধ মাহুত দীলমামুদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুইও ত আমাদের সঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছিস, দেখিতেছি;—বনোয়ারীলাল কি তবে একাই বনের ভিতর আছে?" সে তাহার কম্পমান অর্দ্ধপক 'নুর' অধিকতর কম্পিত করিয়া, উত্তরে এই কয়েকটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিল যে, "বাপ্‌রে—মস্ত বাঘ!" এই সদুত্তরে আমরা সন্তুষ্ট না হইয়া,

তাহার প্রতি সকলে একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। এই বাণসমূহ, তাহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট হওয়াতে, সে আর মুখ নাড়িতে সক্ষম হইল না। কাজে কাজেই তাহার আর একটি কথাও আমরা শুনিতে পাইলাম না। তখন হতাশ হইয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া, সকলকে পুনরায় বনে প্রবেশ করিবার জন্য আদেশ দিলাম। সকলেই আদেশ অনুযায়ী চলিতে লাগিল ; কেবল চলিলাম না—আমি। গজমতী কিছুতেই, আর অগ্রসর হইতে রাজী নহে। মত্ত কয়েকটা 'কোল জাঠার' খোঁচা মাথায় বসাইয়া দিল,— ফলে সে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, বরং দুই চারি পদ পিছু হটিয়া গেল।

তবে কি সত্যসত্যই আজ রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইবে? আর একবার কি বাঘের কাছে যাইতে পারিব না? তবে কি স্থানীয় লোক ও তাহাদের পালিত পশুদিগকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য, এই আহত বাঘকে বনে ছাড়িয়া যাইতে হইবে? এতদিন ধরিয়া বাঘ-শিকার করিতেছি ; কই কখনও ত এরূপ হয় নাই!—তবে কি ভগবান আজ সত্যসত্যই আমার দর্পচূর্ণ করিবেন? এখন উপায়!—একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, জয়মালার মাহুতের হস্তে অকস্মাৎ যেন ঈশ্বরের প্রেরিত একটি উপায় বিরাজ করিতেছে। উপায়টি আর অন্য কিছু নহে—একটি সুদৃঢ় লৌহ-নির্ম্মিত 'গজ-বাগ' (অঙ্কুশ)। জয়মালা স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ ভীতা, বাঘ-শিকারে আসিয়াছে বলিয়া তাই তাহার মাহুত, এই ভীতি-নিসূদন ঔষধটি সঙ্গে আনিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া এই ঔষধটি মত্তুকে দিতে বলিলাম। মত্তু উহা লইয়াই ক্ষিপ্র হস্তে গজমতীর মস্তক দেশে ও কর্ণমূলে যথাবিহিত প্রয়োগ করিতে লাগিল। তখন সে আর বিশেষ আপত্তি না জানাইয়া, অন্যান্য হাতীর সহিত বনে প্রবেশ করিল।

ক্ষণকাল মধ্যেই আমরা যেখানে ইতঃপূর্ব্বে যুদ্ধে বিরত হইয়া, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে, অদূরে জগচ্চন্দ্র খুব সাহসিকতার পরিচয় দিয়া, এখনও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। সে আমাকে দেখিবা মাত্র, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া যে স্থানে বাঘ লুক্কায়িত আছে, সেই স্থান দেখাইয়া দিল। আমরা 'লাইন' ঠিক করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু ঠিক সেই সময় তাহার বিপরীত দিকে বন 'নড়িয়া' উঠিল। জগচ্চন্দ্রের ভুল বুঝিতে পারিলাম। সেখানে সে বাঘ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেখানে বাঘ ছিল না। আমার মস্তিষ্ক স্বভাবতঃই গরম ; তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে আরও গরম হইয়া আছে। সুতরাং জগতের এবংবিধ নিপুণতার পরিচয় পাইয়া, একেবারে গরমতম হইয়া উঠিল।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত ; এমন কি, সুবিধা পাইলে অনেক স্থলে অনেকে তাহার সীমাও অতিক্রম করিয়া থাকেন। আজ আমি নায়ক-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় অনেকটা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমিই বা জগতের প্রতি সেই ক্ষমতা-প্রকাশের এই মহা সুযোগটা ছাড়ি কেন? তাই যাহাতে তাহার বাক্‌পটুতা-শক্তির কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া,দর্শন-শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিছু রূঢ়ভাবে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে বলিলাম।

তারপর সকলে এক হইয়া যেখানে ইতঃপূর্ব্বে জঙ্গল নড়িতে দেখিয়াছিলাম, সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ব্যাঘ্র-মহাশয় আমাদিগকে এরূপ দলবদ্ধ হইয়া নববিক্রমের সহিত আসিতে দেখিয়া, প্রথমতঃ ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং রণে ভঙ্গ দিয়া পূর্ব্বমুখে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু দূর চলিয়া যখন দেখিলেন যে, আগের মত তিনি তাঁহার আহত দেহ লইয়া অক্লেশে বন মধ্যে চলিতে পারিতেছেন না, এবং আমরাও বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছি, তখন তিনি স্থির হইয়া, একস্থানে বসিয়া, আমাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, আমাদিগকে নিকটে পাইলেই, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব অভিনয় দেখাইতে প্রস্তুত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা নিকটে গিয়া তাহা দেখিতে প্রস্তুত নহি। সেই জন্য দূর হইতে অনুমান করিয়া তাঁহার উপর গুলি-বর্ষণ চলিতে লাগিল। 'হালাতে' * মারা বিদ্যায় আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। একটি গুলিও তাহার গাত্র স্পর্শ করিল না বটে, কিন্তু এই গুলিবর্ষণে কিছু ফল পাওয়া গেল। বাঘের চারি পার্শ্বে যখন শিলাবৃষ্টির মত গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন তিনি ঐ স্থান আর নিরাপদ নহে মনে করিয়া, আর একটু দূরে সরিয়া গিয়া বসিলেন।

* জানোয়ারগমনকালে বন নড়া।

এই ভাবে বাঘের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুলিবর্ষণ করিতে রিতে সমস্ত দিন ধরিয়াও কিছু ফল হইবে না। ত্রএব নূতন কোন কৌশল উদ্ভাবন করা আবশ্যক মনে ল। তখন সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া স্থির া গেল যে, বাঘ প্রায় বনের পূর্ব্ব প্রান্তে আসিয়া ড়য়াছে। এখন যদি আমরা উত্তর দিক হইতে তাহার রে পূর্ব্ববৎ গুলিবর্ষণ করিতে থাকি, তাহা হইলে সে দিকে অর্থাৎ মাঠের দিকে না যাইয়া, খুব সম্ভব দক্ষিণ বা পশ্চিমের বড় জঙ্গলে পালাইবার চেষ্টা করিবে। এব যদি আমরা ঐ উভয় দিকে লম্বা করিয়া দুইটি স্থান া দিয়া ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করিয়া লই এবং উহার সন্ধি- দাঁড়াইয়া উভয় পার্শ্বে লক্ষ্য রাখি—তাহা হইলে বাঘ জঙ্গলে পলাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে গিয়া, যখন ইটি পরিষ্কৃত স্থানের একটি পার হইতে চেষ্টা করিবে— তাহাকে স্পষ্ট দেখিয়া গুলি করিবার অবসর পাওয়া বে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, জগৎ ও আমি স্থানে দাঁড়াইয়া বাঘের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে লাম। বরদা অন্যান্য হাতী লইয়া জঙ্গল পরিষ্কার তে চলিল।

অল্পকাল মধ্যে বরদা সুচারুরূপে তাহার কার্য্য নিষ্পন্ন য়া ফিরিয়া আসিলে,—তাহাদিগকে দক্ষিণ মুখে শ্রেণী- হইয়া দাঁড়াইতে বলিয়া, আমি গজমতীকে লইয়া উক্ত স্থলে উপনীত হইলাম। তাহার পর আমার ইঙ্গিতা- র জগৎ ও বরদা অনুমান করিয়া বাঘের উপর গুলি- করিতে লাগিল। প্রায় ১০।১২ টা আওয়াজ হইল। গল, বারুদের ধূমে চারিদিক ক্রমে আচ্ছন্ন হইতে া। এমন কি, বহু পরিশ্রম করিয়া যে স্থান 'ধুয়া' ষার) করা হইয়াছিল, তাহাও ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া তবুও কিন্তু 'ডুরে' (Stripe) মহাশয়কে, কোন স্থানভ্রষ্ট করা গেল না। বোধ হয় সে, বরদাদের ভাঙ্গার শব্দ শুনিতে পাইয়া, মনে করিয়াছিল যে, তাহাকে তিনদিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছি। গেল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুলি তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া ক 'মরিয়া' করিয়া না তুলিবে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ ভ্রান্তির অপনোদন হইবে না। বরদা ১২নং Gun) ব্যবহার করিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া 'ছড়ার' কার্ট্রিজ (Short cartridge) পুরিয়া মারিতে বলিলাম। কারণ গুলির কার্ট্রিজে—(Ball cartridge) একটি মাত্র গুলি, তাহাও আবার অনুমান করিয়া মারিতে হইবে—এরূপ স্থলে কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু 'ছড়ার' কার্ট্রিজ হইলে, তাহাতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'ছড়রা' থাকে, অন্ততঃ তাহার একটা না একটা ব্যাঘ্র-শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। যদিও ঐ ক্ষুদ্র 'ছড়রার' দ্বারা ব্যাঘ্রের অকালমৃত্যুর কোনই আশঙ্কা নাই, তথাপি তাহাকে স্থানভ্রষ্ট করাইবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অনেক সময় ক্ষুদ্রের দ্বারাও বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। আজ এই ক্ষুদ্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আশাতীত ফললাভ করিলাম। বরদা 'ছড়ার' কার্ট্রিজ পূরিয়া যেমন আওয়াজ (Fire) করিল, অমনি একটা ভীষণ গর্জ্জন শ্রুত হইল। এবং পরক্ষণেই একটা হরিদ্রাভা বিদ্যুৎবেগে দক্ষিণের সেই ধূম্রাচ্ছাদিত পরিষ্কৃত স্থানটির উপর দিয়া যেন বহিয়া গেল। বোধ হয় যেন, মেঘের কোলে ভুলক্রমে গর্জ্জনের পর একবার মাত্র বিজলি চম্‌কাইয়া—মুহূর্ত্তমধ্যে আবার কোথায় অন্তর্ধান হইল। ধোঁয়ার জন্য বাঘকে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও গুলি ছুড়িতে ত্রুটী হইল না। কিন্তু যখন দেখিলাম, সে বন আলোড়নপূর্ব্বক একটু দক্ষিণে গিয়াই আবার পশ্চিম মুখে ছুটিল—তখন বুঝিলাম যে, আমার বন্দুকের এবারের গর্জ্জন, কেবল "অসারের তর্জ্জন গর্জ্জনবৎ" হই- য়াছে মাত্র। যাহা হউক, আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ব্যাঘ্রের পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। কিছু দূর গিয়া, যখন তাহাকে থামিতে দেখিলাম, তখন আমিও সসম্ভ্রমে একটু তফাতে থাকিলাম। ইতোমধ্যে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, ইতঃপূর্ব্বে যে কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল, এবারেও তাহাই করিতে হইবে। একটু সুবিধাও পাওয়া গেল। এবার যে বনে বাঘ আশ্রয় লইয়াছে, সেই জঙ্গল ও তাহার পশ্চিমের ঘন জঙ্গল—এই উভয় জঙ্গলের মধ্যে, প্রায় ৭।৮ হাত লম্বা একটি পরিষ্কৃত স্থান আছে। এখন কেবল পূর্ব্ব- পশ্চিমে লম্বা করিয়া দক্ষিণদিকে কতকটা স্থান, হাতী দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই চলিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়াছি, এমন সময় একবার পশ্চিম গগনে দৃষ্টি পড়িল। সূর্য্যদেব তখন অস্তোন্মুখ। আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ধরণী তমসাচ্ছন্ন হইবে! কিরূপে যে এতটা সময় কাটিয়া গিয়াছে, শিকারের উত্তেজনায় তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারি—ভালই; নতুবা আত্মগ্লানি ও অপমানের বোঝা মাথায় বহিয়াই বাড়ী ফিরিতে হইবে।

আর কালবিলম্ব না করিয়া, বরদাকে অন্যান্য হস্তীর সহিত জঙ্গল ভাঙ্গিবার জন্য প্রেরণ করিলাম। ইত্যবসরে যাহাতে বাঘ, উত্তরের ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইজন্য জগৎ ও আমি সেইদিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় জহুরুদ্দিন "ঐ যে বাঘ দেখা যায়" চীৎকার শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখি যে, জহুরুদ্দি বরদার পশ্চাৎ হইতে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বনের ভিতর কি দেখাইতেছে। আর বরদা মাথা নীচু করিয়া তন্ময়ভাবে সেই দিকে চাহিয়া আছে। আমি মতুকে ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া হাতী 'দাঁড়' করাইতে বলিলাম। জগৎ আমার বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে প্রস্তুত হইয়া বরদাকে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে, সে বাঘ দেখিতে পাইতেছে কিনা? উত্তর পাইলাম—হাঁ। "তবে গুলি কর, দেরী করিতেছ কেন?"—এই কথা বলিবামাত্র বরদা বন্দুক তুলিয়া 'তাক' করিতে লাগিল। বরদার ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন সে 'তাকের' অন্ত নাই—উহা অনন্ত। আমরা ব্যগ্রভাবে চাহিয়া রহিলাম। অবশেষে বহুক্ষণ পরে আমাদের ব্যগ্রতাকে অন্ত করিয়া তাহার 'তাকের' অন্ত হইল। তাহার বন্দুকের 'গুড়ুম্' শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই 'ডুরে' মহাশয় (Mr. Stripe), বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে ১০।১৫ গজ দূরে, আমাদের সম্মুখস্থ পরিষ্কার স্থানে বাহির হইয়া পড়িল। আমি ·৫৭৭ হস্তে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলাম। বাঘকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইয়া, 'ডাননালা' (Right barrel) ছুঁড়িলাম। কিন্তু নিজের হস্তকৌশলের গুণেই হউক কিংবা হাতী বিচলিত হইয়াছিল বলিয়াই হউক,—ফলে বাঘের গায়ে গুলি লাগিল না; সুতরাং গতিরোধও হইল না। সে অপ্রতিহত গতিতে, লম্ফপ্রদান করিতে করিতে ক্রমেই আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বাঘ এবং হাতীর মধ্যে কেবল ৩।৪ হাত ব্যবধান মাত্র। একটি 'লাফ্' দিলেই সে হাতীর উপর উঠিয়া পড়িবে। এমন সময় 'বাঁ-পায়া' (Left-Trigger) টানিতে যাইতেছি—কিন্তু ওকি? বাঘ যে সত্য সত্যই লাফাইল! সে যখন ভূ-পৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া প্রায় ৪।৫ হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় আমার গুলি তাহার শরীরে বিদ্ধ হইল।

ক্ষুদ্র এক্‌স্‌প্রেস্ (Express) গুলির কি আশ্চর্য্য শক্তি! গুলিটি লাগিবা মাত্র, বাঘের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহসা অসাড় হইয়া গেল। মুণ্ডটি এক ধারে ঢলিয়া পড়িল, পদচতুষ্টয় শিথিল হইয়া আসিল। হতভাগ্য নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া, নদীর ভগ্ন তীরের ন্যায় উপর হইতে যেন খসিয়া ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইল। এত তেজ, এত শক্তি, এত বীরত্ব ও এত বিক্রম, এক মুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন মাহুতগণের দেশী আনন্দধ্বনির সহিত আমাদের বিদেশী "হিপ্ হিপ্ হুররে"-ধ্বনি মিলিত হইয়া, কতকদূর পর্য্যন্ত ব্যাঘ্র-আত্মার সহচররূপে গগনমার্গে উত্থিত হইয়া, তারপরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে এই ধ্বনি, ব্যাঘ্রভয়ে ভীত এবং তন্নিবন্ধন গৃহোপর্য্যারূঢ় গ্রাম্য বীর পুঙ্গবদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহারা সদলবলে ঐ নিরাপদ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের দিকে ধাবিত হইল।

সমাগত ব্যক্তিদিগের সাহায্যে বাঘটিকে বনের বাহির করিবার ভার চুণীলালকে অর্পণ করিয়া, আমরা বনের বাহিরে আসিলাম। কিছু পরেই ব্যাঘ্রদেহ মনুষ্য কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া, বনের বহির্ভাগে একটি মাঠে স্থাপিত হইল। আমরা হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া, প্রথমে গজমতীর পশ্চাদ্ভাগে প্রায় ৭ ফিট উপরে—যেখানে ব্যাঘ্রী মহাশয়া, তাঁহার দন্ত ও নখচিহ্ন ১ইঞ্চি গভীর করিয়া রাখিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলাম। এখন পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয়, সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, যদি গজমতীতে না উঠিয়া, অপর কোন হাতীর উপর বাঘিনী উঠিত, তাহা হইলে এতক্ষণ তদুপরিস্থ শিকারী, কিংবা মাহুতের মস্তক দেশ, অনায়াসে ব্যাঘ্রের উদরে বিরাজ করিত। তারপর অতি কষ্টে দর্শকমণ্ডলীপরিবেষ্টিত ব্যাঘ্রী-দেহের নিকট

শিল্পী—স্যাসসোফেরাটো] প্রার্থনা

Engraved and Printed by K. V. ... S. Pres.

পস্থিত হইলাম এবং যথারীতি তাহার পরিমাপ কার্য্যে নোনিবেশ করিলাম। দেখা গেল, ব্যাঘ্রী-মহাশয়া কবল মাত্র ৮ফিট্ ৬ইঞ্চি লম্বা। বড় বাঘের (Royal Tigerএর) পক্ষে ইহাকে খুব ছোটই বলিতে হইবে ; কন্তু বিক্রমে ইনি ছোট নহেন।

আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বাধ হয়, ছোট বাঘেরই বিক্রম বেশী হইয়া থাকে। এ বারের ঘটনায় এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইল। অল্প-বয়স্ক ব্যাঘ্রের এইরূপ ক্রোধের মাত্রা বেশী হইবার কারণ ক ?—এ প্রশ্নের উত্তর, প্রাণিতত্ত্ববিদেরা কিংবা বহুদর্শী বিচক্ষণ শিকারীরাই দিতে সক্ষম। আমার মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এই সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে যাওয়া কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, বাল্যস্বভাবসুলভ চপলতা ও অনভিজ্ঞতাই ইহাদিগকে এতটা দুঃসাহসী করিয়া তোলে। ইহারা মত এ পর্য্যন্ত কোথায়ও 'ঠকে' নাই ; যেখানে গিয়াছে, সেই খানেই সম্ভবতঃ জয়লাভ করিয়াছে। তাই সতর্কতা-অবলম্বন করার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক বাঘের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা 'ঝুন' (পরিপক্ক) —অনেক ঠকিয়া হাড় পাকাইয়াছে। তাহাদের মাথা সহজে গরম হয় না। তাহারা ইহাদের মতন 'গোঁয়ার গোবিন্দ' নয়। তাহারা যতক্ষণ সম্ভব প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তাহার পর অতিরিক্ত চাপ পড়িলে পাশ কাটাইয়া চুপে চুপে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা দেখে। তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে, তাহারা প্রকৃত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয় এবং তখন তাহারা অসীম সাহসিকতা ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহার ভিতরেও যেন সর্ব্বদা একটা সতর্কভাব পরিলক্ষিত হয়।

তাহার পর বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া, ব্যাঘ্রীর ক্ষতস্থানগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল। লাঙ্গুল ও শরীরের সন্ধিস্থানের কিঞ্চিৎ নিম্নে, বাম নিতম্বে, যে একটি ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হইল, সেইটাই আমার '৫৭৭-এর প্রথম আওয়াজের ফল। ঐ গুলিটি আর দুই ইঞ্চি উপরে লাগিলেই, তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইত এবং সে একেবারেই অচল হইয়া পড়িত। যাহা হউক, ঐ গুলিতেই উহার বাম পশ্চাৎপদখানি অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল বলিয়াই—আজ তাহার নখ ও দন্তের পরিচয়টা আমার কিংবা ইয়াকুবের স্কন্ধদেশের সহিত না হইয়া, কেবল গজমতীর পশ্চাদ্দেশের সহিতই হইয়া গেল। আমার এই 'ছাই মাথামুণ্ড' শুনাইয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্যই বোধ হয়, ভগবান এ যাত্রায় আমাকে ব্যাঘ্রীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিলেন। সে কথা এখন যাউক, যেখানে আমার গুলি লাগিয়াছিল, তাহার একটু নীচে একটা বড় রকমের ক্ষত দেখা গেল ; ওটি নিশ্চয়ই ১২ নম্বরের গুলির চিহ্ন। ঐ গুলির চোটেই ত বেচারী হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া, আমাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। এখন শেষ গুলিটি, অর্থাৎ যে গুলিতে উহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কোথায় লাগিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিলাম। গুলি তাহার বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছে! তবে ত ব্যাঘ্রী আমার হস্তিনীকে লক্ষ্য করিয়া লাফ দেয় নাই—তাহা হইলে হয় তাহার মাথায় কিংবা বক্ষস্থলে গুলি লাগিত। তবে নিশ্চয় জগৎই তাহার লক্ষ্যস্থল ছিল ; তাই আমার গুলিটা বাম পার্শ্বে লাগিয়াছে। আজ জগৎকে কি ভয়ানক বিপদ হইতেই ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। ঐরূপ ভাবে আক্রমণকারিণী ব্যাঘ্রীকে যে ঠিক এক গুলিতেই মারিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আমার হস্ত-নিপুণতার গুণে নহে, কেবল শ্রীশ্রী ভগবানের দয়া ও জগতের কপালগুণেই বলিতে হইবে। আজ এই চিরস্মরণীয় অকস্মাৎবিদ্ধ-গুলিটি (Fluke)র কৃপায় জগচ্চন্দ্র, এই 'ঝানর আলনায়' অকালে অস্তমিত হইল না। আমি এরূপ চিন্তায় মগ্ন, এমন সময়ে জগচ্চন্দ্র ব্যাঘ্রীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া বলিয়া উঠিল—"দেখুন! বরদা যে 'ছড়্‌রা' দিয়া আওয়াজ করিয়াছিল, তাহার কয়েকটা 'ছড়রার' দাগ উহার গায়ে দেখা যাইতেছে।" আজ যে তাহার কি 'ফাঁড়া' কাটিয়া গিয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্তও সে জানে না।

তার পর চুণীলালকে ব্যাঘ্রী-দেহ হস্তি-পৃষ্ঠে উঠাইবার আদেশ দিয়া, আমি একটি নাতিদীর্ঘ সিগারেট্ অধর-কোণে গুঁজিয়া—গ্রাম্য দর্শক-মণ্ডলীর বিস্ময়-দৃষ্টির পুরোভাগে বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় পদচারণ করিতে লাগিলাম।

ইহার পূর্ব্বেও বাঘ মারিয়া আনন্দ পাইয়াছি সত্য, কিন্তু অদ্যকার আনন্দের মাত্রাটা অনেক বেশী। আজ কেবল আমারই নায়কত্বে অতি অল্পসংখ্যক হাতী

লইয়া বাঘ মারা গিয়াছে। এবং তাহা ছাড়া আজ একটু বেশী বিপদে পড়িয়াও বিপদ্ কাটিয়াছে—তাই বিপদের অনুপাতে আনন্দও বেশী পরিমাণে অনুভব করিতেছি। বিপদের সঙ্গেসঙ্গেই যে আনন্দের মাত্রাও বাড়িয়া যায়, তাহা বোধ হয়, আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

চুণীলাল হাঁকিল, "বাবা, বাঘ তোলা 'হইচে'—(হইয়াছে)।" বনোয়ারীলাল পৃষ্ঠে দোদুল্যমান ব্যাঘ্রদেহ রজ্জুদ্বারা সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, চুণীলাল দ্বিতীয় আদেশের জন্য পুনরায় হাঁকিল—"বাবা বাঘতোলা 'হইচে' (হইয়াছে)"। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে 'ঢুরে' মহাশয়ার (Mrs. Stripe এর), এই বনোয়ারীলাল পৃষ্ঠে উঠিবার যে সাধ ছিল, তাহা সে মরিয়া মিটাইল। একে বলে, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যাক্—আমাদেরও ভাবনার সিদ্ধি হইয়াছে। এখন শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরাই শ্রেয়ঃ।

আজ এতই ফুর্ত্তি বোধ হইতেছে যে, আমি নিজেই জয়মালার মাহুত হইয়া বসিলাম। জগৎ ও বরদা গদির উপরে বসিল। হাতী চালাইতে গিয়া দেখি যে, সম্মুখে সেই 'খবরিয়া' (সংবাদদাতা) কর-যোড়ে দণ্ডায়মান; তাহার বক্সিসের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু তাহার পার্শ্বে আর একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাহারও কিছু বলিবার আছে। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, সে এই 'দ্যাশে' (দেশে) অল্পদিন হইল আসিয়াছে। একজোড়া গরু কিনিয়া চাষ আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র, ইতোমধ্যেই তাহার দুরদৃষ্টবশতঃ একটি গরু বাঘে 'মাইর‍্যা'-(মারিয়া) ফেলিল। এখন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছে।—আজ আমি যেন একটি ছোট খাট রকমের 'কল্পতরু' হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তাই পূর্ব্বোক্ত লোকটি যাহাতে চারিদিকে আলোক দেখিতে পায়, তাহারও কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করা হইল। মাহুতেরা আমার এ ভাব দেখিতে পাইয়া ধরিয়া বসিল যে, তাহারা আজ বড়ই পরিশ্রম করিয়াছে—অতএব কিছু জলযোগের প্রার্থনা করে। উত্তর—"বহুত আচ্ছা।" এমন সময় আর একটি লোক বলিয়া উঠিল—"হুজুর! আমার আশি বৎসর বয়সের বৃদ্ধা মাতা—আর এ জীবনে কখনও বাঘ দেখিবে কি না সন্দেহ—তাই এই বাঘটি একবার দেখিতে চায়।" এই অদ্ভুত প্রার্থনাটিও মঞ্জুর করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম। আর কিছুক্ষণ সেখানে থাকিলে হয়ত দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্র হইতে হইত।

অল্পক্ষণ মধ্যে আমরা চর ছাড়াইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গ্রাম্য লোকেরা তাহাদের সদ্য-কর্ত্তিত স্তূপীকৃত ধান্যরাশির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ব্যাঘ্র-দর্শনের আশায় উৎসুক হইয়া আছে। প্রত্যেকের মুখেই একটা সন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কেবল বাঘ দেখিতে পাইবে বলিয়াই যে, তাহাদের মনে এতটা সন্তোষের ভাব, তাহা নহে; এতদিনের পরিশ্রমের ফল সুপক্ক ধান্য যে নির্ব্বিঘ্নে ঘরে আনিতে সক্ষম হইয়াছে, তাই তাহারা এতটা উৎফুল্ল। এবং আমরাও আমাদের এত পরিশ্রমের 'ফল' লইয়া ঘরে ফিরিতেছি, সুতরাং তাহাদের অপেক্ষা আমরাও কম উৎফুল্ল নহি।

পথে আসিতে আসিতে গজমতী নানারূপ ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহার মাথার ভিতর হইতে এখনও সেই ব্যাঘ্র-দংষ্ট্রা-ভীতি অপসারিত হয় নাই। সে বারম্বার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া চলিতেছে। হঠাৎ কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেই দৌড়িয়া আসিয়া হাতীর দলে প্রবিষ্ট হইতেছে। ইত্যাদি কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, অদ্য হইতে গজমতীর দ্বারা আর ব্যাঘ্র-শিকার চলিবে না।

যথাসময়ে বাড়ীতে পৌছিয়াই প্রথমে ছেলে ও মেয়েকে ডাকিয়া বাঘ দেখাইলাম। তার পর ক্রমশঃ দর্শকবৃন্দের 'ভিড়' বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন দেখিলাম যে, সভা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন গজমতীর ক্ষতস্থান সকলকে দেখাইয়া অদ্যকার "ব্যাঘ্রী-গজমতী সংবাদ"—এই অত্যাশ্চর্য্য শিকার-কাহিনী—তাঁহাদের নিকট বিবৃত করিতে লাগিলাম। যদিও দেখা গেল যে, শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, তথাপি আমার বর্ণনা অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল। তার পর যখন গলা বসিয়া, বাক্শক্তি ক্রমেই একপ্রকার রহিত হইয়া আসিতে লাগিল এবং সভাস্থল শ্রোতাশূন্য হইয়া উঠিল, তখন কল্য আবার গলা ভাল হইলে এবিষয় যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া, কৌতূহলী শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত ও অকৌতূহলীদিগেরও কৌতূহল উদ্দীপ্ত করা যাইবে—মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া, বিশ্রাম করিতে চলিলাম।

পরদিন সকালে ইয়াদু আসিয়া নতশিরে জানাইল যে, কাল সে মহামায়ার (স্থানীয় দেবী-মূর্ত্তির) নিকট 'মানস' করিয়াছিল—যদি বাঘ মারা পড়ে, তবে একসের চিনির ভোগ দিবে। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আরও অনেক বাঘ মারা পড়িয়াছে, কখনও ইয়াদুর এরূপ ভক্তিপ্রাবল্য দৃষ্ট হয় নাই। গত কল্য হঠাৎ এইরূপ ভক্তি-প্রাবল্যের কারণ কি? তাহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। কল্যকার সেই 'কল্পতরু' নেশার ঝোঁকটা এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই, তাই তাহাকে 'তথাস্তু' বলিয়া বিদায় দিলাম।

বহুদিন পরে পুনশ্চঃ—হত ব্যাঘ্র সম্বন্ধে "অপরংবা কিং ভবিষ্যতি"—জানিবার জন্য যদি কেহ কৌতূহলী হইয়া উঠেন, সেই নিমিত্ত আগে হইতেই বলিয়া রাখা ভাল যে, জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে, জীব সাধারণের পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ যেরূপ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, ইহারও দেহ সেইরূপ যথাশাস্ত্র পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। তবে কেবল মস্তক-কঙ্কাল ও চর্ম্মখানি, স্থানীয় চর্ম্মকার, বিধির বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া, কতকগুলি মালমসলার সাহায্যে পাঁচভূতের হাত হইতে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতঃপর কোনক্রমে সাধু-সন্ন্যাসীর লোলুপ দৃষ্টি হইতে সুরক্ষিত সেই চর্ম্ম ও কঙ্কাল যথাসময়ে কলিকাতার কোন এক বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরিত হইয়া, তদ্দ্বারা মানবের ক্ষমতাধীন কতকগুলি খড়, কাঠ ও যেস্থানে চক্ষু ছিল, সেই স্থানে দুইটি স্ফটিকের চক্ষু সংযোগে- যথাসম্ভব আক্রমণকালীন ভাবভঙ্গি-সম্বলিত কৃত্রিম ব্যাঘ্র প্রস্তুত হইয়া আসিল। সে এখন আমার বৈঠকখানায় থাকিয়া, প্রধানতঃ বৈঠকখানার শোভাবর্দ্ধন ও নিরীহ আহূত ও অনাহূত অসন্দিগ্ধ আগন্তুকবর্গকে বিস্ময়ান্বিত এবং ক্ষুদ্র বালক-বালিকাদিগকে অযথা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে অমিততেজে সচ্ছন্দে বনে বিচরণ করিয়া কত শত প্রাণীকে ত্রস্ত, ব্যস্ত ও ভয়-বিহ্বল করিত এবং অসহায় দুর্ব্বল প্রাণীর প্রাণসংহার করিয়া উদর পূর্ণ করিত, আজ নিয়তির প্রভাবে কালের কঠোর শাসনে তাহার পরিণাম এই।

আর এক কথা—দুঃখের বিষয় আর কি বলিব, সেই দ্বিতীয়বার বক্তৃতার যে প্রবল ইচ্ছা ছিল, তাহা শ্রোতৃ-বর্গের ও আমার সুযোগের অভাবে এতদিন ঘটিয়া উঠে নাই। তাই অনন্যোপায় হইয়া লেখনীরূপ দুন্দুভির সাহায্যে সর্ব্বসাধারণে এই বীরত্ব-কাহিনী প্রচারে প্রয়াসী হইলাম। ইহার ফল—"ভগবন্ ত্বয়ি সমর্পিতমস্তু" বলিয়া ইতি করা যাউক।

বিশ্বপতির হাসি।

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু]

তীরে ফুল এক প্রভাতে ফুটিয়া
  হাসিয়া পড়েছে ঢলি,
বক্ষে ধরিয়া ছায়াখানি তা'র,
  তটিনী যাইছে চলি ;
মলয় তাহার মধুর সুবাস
  বিদেশে করিছে দান,
গুণরাজি তা'র, পাপিয়া কোকিল
  হরষে করিছে গান ;
ভাবুক কবিরা তা'র কথা লয়ে
  লিখেছে কবিতারাশি,
চিত্রকর হের ফুটা'য়ে তুলেছে
  জগৎপতির হাসি।

অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী

সন্দর্ভ-সাহিত্য

[শ্রীশিবরতন মিত্র]

সম্প্রতি, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব গ্রন্থাবলী-সংরক্ষণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে ; সুতরাং অচিরেই, যে আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের অপরিজ্ঞাত ভাণ্ডারে অপর্য্যাপ্ত বিবিধ সম্পদের অস্তিত্ব সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উল্লসিত ও গৌরবান্বিত হইব, এ আকাঙ্ক্ষা এখন বৃথা মনে করি না। বর্ত্তমান সংরক্ষণের যুগে, যাহাতে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত লুপ্তপ্রায় রত্নরাজি সংগৃহীত হয়, যাহাতে আমরা আমাদের সাহিত্য-সম্পদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অধিকার হইতে আমাদেরই অবহেলার জন্য নিজে বঞ্চিত হইয়া, উত্তরপুরুষগণকেও চিরবঞ্চিত না করি, যাহাতে সমগ্র জীবনব্যাপী নিঃস্বার্থ পরিশ্রম দ্বারা আমাদেরই জন্য বিরচিত গ্রন্থরাজি নষ্ট করিয়া, গ্রন্থকারের যত্নলব্ধ জ্ঞান ও অমূল্যজীবন ব্যর্থ ও নিষ্ফল করিয়া, পাপে লিপ্ত না হই, তাহার ব্যবস্থা করা—প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য।

জানা গিয়াছে যে, সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে এমন পল্লী নাই, যেখানে কোন না কোন কালে কোনও অজ্ঞাতনামা কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন গ্রন্থ, পদাবলী বা সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। প্রতি পল্লী অনুসন্ধান করিলেই, আমরা প্রাচীন পুঁথির সাক্ষাৎকার লাভ করিব। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ না হইলেও প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তান, এই প্রাচীন পুঁথিগুলি কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সংরক্ষিত করিয়া দিলেই, তৎসমুদয় বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে চিরতরে নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করিতে পারিবে।

বিশৃঙ্খল বা কীটদষ্ট হইলে, জলাশয় বা আবর্জ্জনা-স্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, প্রাচীন পুঁথিগুলির প্রতি অযথা আচরণের পরিবর্ত্তে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে তৎসমুদয় প্রদান করিতে আপত্তি করিবেন, এরূপ সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ব্যক্তির সংখ্যা তত অধিক নহে। একথা স্মরণ রাখা উচিত, যে দেব-মণ্ডপে সংরক্ষিত গ্রন্থরাজি পাঠের পরিবর্ত্তে, নিরক্ষর ব্যক্তিগণ সেগুলিকে চন্দনলিপ্ত করিয়া, তাহার অক্ষরগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত করিয়া দিলে, জননী বীণাপাণির পূজা হইল না ; তাহা পাঠকরণ এবং জনসাধারণ মধ্যে প্রচার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রদান করাই প্রকৃত পূজা। গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অনভিজ্ঞ রহিয়া, গ্রন্থে শুদ্ধ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে, কোনরূপ পুণ্যার্জ্জন হয় কি না, বলিতে পারি না—তবে, পিপাসু পাঠককে বঞ্চিত করিয়া, গ্রন্থকারের যত্ন পরিশ্রম ও জীবন-ব্যাপী সাধনালব্ধ জ্ঞান ব্যর্থ করিলে যে, যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে, একথা এখন প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমরা প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তানকে, এ বিষয়ের সহায়তা করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আশা করি, মাতৃভাষার কল্যাণ সাধনে আমাদের এই সাগ্রহ প্রার্থনা বিফল হইবে না।

পৌরাণিক অথবা স্বকপোল-কল্পিত উপাখ্যান অবলম্বনে বিবিধ গ্রন্থকার-রচিত কতশত ক্ষুদ্রবৃহৎ খণ্ডকাব্য যে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে লোক-লোচনের অন্তরালে রহিয়া, আসন্ন বিলয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান কালে, অধিকাংশ স্থলেই আমরা এইরূপ বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র উপাখ্যান গ্রন্থের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এই খণ্ড কাব্য সন্দর্ভগুলি, পদাবলীর ন্যায়, বঙ্গ-সাহিত্যের একরূপ বিশিষ্ট সম্পদ।

আমাদের ক্ষীণ চেষ্টায় অনেকগুলি অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে ; এই সকল গ্রন্থের পরিচয়, আমরা বহুকাল অবধি বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। এখন আরও নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ নিচয়ের পরিচয় যথাসম্ভব গ্রন্থকারের ভাষায় ক্রমে ক্রমে সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সমুপস্থিত করিব। বর্ত্তমান

প্রবন্ধে, ধারাবাহিকরূপে নবাবিষ্কৃত প্রাচীন সন্দর্ভ-গ্রন্থাবলীর পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। যম-সংহিতা

রচয়িতা—শঙ্কর দাস। গ্রন্থ-শেষে

কহেন শঙ্কর দাস মনেতে ভাবিয়া,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব-পদ শিরেতে ধরিয়া॥

এই ভণিতা ব্যতীত গ্রন্থকারের অপর কোন রূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই।

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে, তন্মধ্যে অনুল্লিখিত পুঁথি-তালিকায় শঙ্করদাস-বিরচিত 'যম উপাখ্যান' গ্রন্থের ১২৫৩ সালের হস্তলিপির উল্লেখ আছে। আমাদের প্রাপ্ত পুঁথির শেষে—'ইতি যম-সংহিতা গ্রন্থ সমাপ্ত—১২৩৪ সাল ১৪ই মাঘ' এইরূপ উল্লেখ আছে। এই উভয় গ্রন্থ এক বলিয়া মনে হয়। পুঁথির আকার ক্ষুদ্র —১৫ পত্র, বীরভূম 'রতন'-লাইব্রেরী পুঁথি—নং ১০৭৩

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—

প্রণতি করিয়া ভাই শুন সর্ব্বজন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বল অনুক্ষণ॥
তীর্থযাত্রা হেম আজি নানা দান করি।
তথাপি না পাইবেক লভিতে শ্রীহরি॥
ভকতবৎসল প্রভু দয়াল ঠাকুর।
কলিযুগে হরিনাম শুনিতে মধুর॥
বন্ধুবান্ধব দেখ পুত্রপরিবার।
মৃত্যুকালে সঙ্গে দেখ না যায় কাহার॥
প্রাণ ছাড়ি দেহ পড়ি রহে সর্ব্ব ঘরে।
পুত্রপরিবার বলে চালাহ সত্বরে॥
ধরাধরি করি লয় শ্মশান নিকটে।
চিতা জ্বালি দাহন করয়ে দিবা ঘাটে॥
জলাঞ্জলি দিয়া তারা চলি যায় ঘরে।

এইরূপে মুখবন্ধের পর, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ধর্ম্মরাজ সমীপে উপস্থিত করিয়া, কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থকার স্বীয় বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

পুনরপি জিজ্ঞাসা করেন ধর্ম্মরাজে।
নানাবিধ পাপ নর কৈল কোন্ কাজে॥
অনাথের নাথ কৃষ্ণ জগতজীবন।
কি লাগিয়া না ভজিলে তাঁহার চরণ॥
গঙ্গাস্নান না করিলে তুলসী-সেবন।
নীলাচলে জগন্নাথ না কৈলে দর্শন॥
তীর্থপর্য্যটন কেন না কৈলে হাটিয়া।
সাধুসঙ্গ না করিলে পাপে বদ্ধ হৈয়া॥
অতিথিবৈষ্ণব পাপা না কৈলে সেবন।
কর্ণভরি কৃষ্ণকথা না কৈলে শ্রবণ॥
একাদশী মহাতিথি তাহা উপেখিলে।
মিছা পরনিন্দা কথা কেন বা কহিলে॥

এবংবিধ কর্ত্তব্য অবহেলার কথা উল্লেখ করিয়াও ধর্ম্মরাজ পুনরায় বলিতেছেন—

আপনার কর্ম্মদোষ ভুঞ্জহ অপার॥
পাপকর্ম্ম করি পাপী পাইলে বিড়ম্বন।
বিনা কৃষ্ণ না ভজিলে না হয় মোচন॥

তদনন্তর

শুনিয়া যমের বাক্য পাপ দূর হৈল।
পাপী সব তাহা শুনি যোড় হস্তে কৈল॥
মুঞি অধমের প্রতি যদি দয়া হয়।
আপনি করহ দয়া ওহে মহাশয়॥
দুর্লভ মনুষ্যকুলে যদি জন্ম হয়।
ভজিব কৃষ্ণের পদ প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়॥

এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে পর

জন্মিবারে আজ্ঞা তারে কৈল ধর্ম্মরাজ।

তদনন্তর, শব পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, নব-কলেবর প্রাপ্ত হইল এবং

মনে মনে ভাবে জীব গর্ভেতে রহিয়া।
আর না করিব পাপ মনেতে ভাবিয়া॥
এবে যদি মর্ত্তে যাই পাপ না করিব।
গোবিন্দ পদারবিন্দ দড় করি লব॥
গর্ভের যাতনা যেন নাহি হয় আর।
সংসারের পুণ্য কর্ম্ম করিব অপার॥

এবংবিধ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া দশমাস গর্ভবাসের পর যখন ভূমিস্পর্শ করিল, তখন—

দূরে গেল সত্যজ্ঞান পড়িয়া ভূমিতে॥

এবং , বিষ্ণুমায়া আসি তাঁরে কৈল আবরণ।
মনে যত ভাবিল তাহা পাশরে তখন ॥

ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, সে ভুলিয়া গেল যে—

স্ত্রীপুত্র দুখসুখ পথিকের সঙ্গ।
নদীর প্রভাবে কাষ্ঠ ভাসায়ে তরঙ্গ ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা সকলি অসার।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাই ত্রিভুবনের সার ॥

তখন তাহার, শ্রীভাগবত হৈতে স্মার কথা দড়।
রমণী বলয়ে সেবা সেই কথা বড় ॥
দেবনিন্দা বিপ্রনিন্দা করে সর্ব্বক্ষণ।
পরনিন্দা করে আর নিন্দে সাধুজন ॥
হরিনাম নাহি হয় বদনে সঞ্চার।
অসঙ্গত অসৎকথা কহে দুরাচার ॥

এইরূপে কখন তাহার অজ্ঞাতে
দিনে দিনে আয়ুশেষ তাহা নাহি জানে।
পুনরায় চলি যায় যমের সদনে ॥
এবং পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে পাপী নরে ॥

তথাচ তাহার এরূপ জ্ঞান হইল না যে,
কৃষ্ণ বিনা সংসারেতে বন্ধু নাহি আর।
অনাথের কৃষ্ণ নাথ সংসারের সার ॥
ভকতবৎসল প্রভু দেব জগন্নাথ।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু রহেন সতত ॥
কৃষ্ণভক্তজনের যমের নাহি দায়।
নাম শুনি যম ত ভয়েতে পলায় ॥

তদনন্তর গ্রন্থকার জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন

শুন হে নর বল হরি হরি।
কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দ্দন কেশব মুরারি ॥
গোবিন্দ মাধব রাম জয় হৃষীকেশ।
যে নাম শুনিলে নাহি থাকে পাপ লেশ ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মা যার উদ্দেশে ধেয়ায়।
পঞ্চমুখে সদাশিব যার গুণ গায় ॥
চারিবেদ যাহার গুণের অন্ত নাহি পায়।
লক্ষ্মীসরস্বতী যাহার চরণ ধেয়ায় ॥
নারদ প্রহ্লাদ শুকদেব মহাশয়।
কৃষ্ণগুণ গায় সদা আনন্দ হৃদয় ॥
প্রেমভাবে ভক্ত সদা কৃষ্ণ-গুণ গায়।
অহর্নিশি ভজে কৃষ্ণের চরণ ধেয়ায়।
তাহার তুলনা দিতে নাহিক সংসারে।
যম কি করিতে পারে পাপিষ্ঠ পামরে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ভাই ভরিয়া বদন।
হৃদয় ভরিয়া ভজ কৃষ্ণের চরণ ॥
নামেতে তরিবে ভবে নাহিক সংশয়।
কৃপার সাগর বড় কৃষ্ণ দয়াময় ॥

অতঃপর তিনি কৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন

পুনঃ ক্ষিতিতলে জন্ম না হয় আমার।
যমের যাতনা হৈতে মোরে কর পার ॥
কৃষ্ণনাম লইতে প্রাণ যাউক আমার।
পুনরপি গর্ভবাস নহে যেন আর ॥

এখন, কৃষ্ণনাম বিনা কলির নাহি কোন কর্ম্ম ॥

কিন্তু কপিল নারদ শুক প্রহ্লাদাদি আর ॥
সংসার ধ্বংস কারণ না কৈল প্রচার।
কৃষ্ণভজন গুপ্ত কৈল যেন মত যার ॥

সেই জন্য গ্রন্থশেষে উপসংহারে কবি বলিতেছেন—

কলিযুগে জীবের দুঃখ দেখি দয়াময়।
নবদ্বীপে অবতার চৈতন্য দয়াময় ॥
দরশনে নিস্তারিলা দয়াল চৈতন্য।
নাম প্রকাশিয়া পৃথিবী কৈল ধন্য ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ পদ চারিবেদসার।
হরিনাম দিয়া জীবে করিল নিস্তার ॥
দয়াল ঠাকুর মোর চৈতন্য গোসাঞী।
কলিভার তরাইতে আর কেহ নাই ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ চিন্ত দিন যায় বঞা।
অবহেলে নাশ পাপ কৃষ্ণ কথা কঞা ॥
ধনজনপুত্র দেখ সকলি অসার।
পরিণামে সংহতি দেখ কেহ নহে আর ॥
পথের পরিচয় দেখ সকল বন্ধুগণ।
এতেক জানিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

হরি গুরু বৈষ্ণবপদ এই মাত্র সার।
ইহাঁর চরণ বিনু গতি নাহি আর॥
কহে শঙ্কর দাস মনেতে ভাবিয়া।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ শিরেতে ধরিয়া॥

২। সুদামা চরিত্র

রচয়িতা—পরশুরাম দ্বিজ। ভণিতা এইরূপ-

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অতি সুধারাশি।
গান দ্বিজ পরশুরাম কৃষ্ণ-অভিলাষী॥ (১)
দ্বিজ পরশুরামে গায় পুরাণের সার।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার॥ (২)

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থমধ্যে রচয়িতার কোনরূপ আত্মপরিচয় নাই। আমরা দ্বিজ পরশুরাম রচিত 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' ('রতন' লাইব্রেরী পুঁথি ১১৮) ও 'ভক্তিবিলাস' (ঐ—৫৬১) গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে পরশুরাম-বিরচিত "লক্ষ্মী চরিত্র" গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা পরশুরাম একই ব্যক্তি কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। 'সুদামা চরিত্র' গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র -আকার ৯ পত্র। হস্তলিপি-কাল—১১৬৭। *

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী বাল্য-সখা ব্রাহ্মণকুমার সুদামা অতিশয় দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হইলে, একদিন তাহার পত্নী বলিল—

কৃষ্ণ হৈল সখা তোমার দ্বারকা নগরে।
লক্ষ্মী যার পদসেবা অবিরত করে
হেন সখা বিদ্যমানে এত দুঃখ পায়।
সব দুঃখ দূরে যাবে যাইলে তথায়॥
পুরাণে শুনেছি তিহোঁ দয়াল ঠাকুর।
তোমারে দেখিয়া ধন দিবেন প্রচুর॥

কিন্তু সুদামা আশঙ্কা করিতেছেন,

গুরুকুলে কৃষ্ণ সঙ্গে পড়িতাম যখন।
সখা বলি কৃষ্ণ মোরে বলিত তখন॥
আজ তিহোঁ লক্ষ্মীকান্ত দ্বারকা নগরে।
আর নাকি তার মনে পড়িবে আমারে॥
কিবা তার ভাই বন্ধু কিবা তার সখা।
এত ভাগ্য হবে প্রিয়ে তার হবে দেখা॥
অখিল-ভুবন-পতি-শিরোমণি সে।
কেন মোরে ধন দিবেন আমি তার কে॥

কিন্তু ব্রাহ্মণীর সনির্বন্ধ অনুরোধ অতিক্রম করা উচিত নয় ভাবিয়া, অনেক ইতস্ততের পর অবশেষে সম্মত হইয়া বলিলেন,

এ মোর পরম ভাগ্য হবে যে আমার,
দেখিতে পাইব সেই দেবকীকুমার॥

কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ তখন রাজা হইয়াছেন—তাঁহার দর্শন-কালে 'ভেট' প্রদান করা উচিত। সুতরাং

এতেক ভাবিয়া বিপ্র ব্রাহ্মণীকে কন।
ঘরে কিছু আছে প্রিয়ে দিবা উপায়ন॥

কিন্তু গৃহে যে এক কণা তণ্ডুল পর্যান্ত নাই! অগত্যাই

শুনিয়া ব্রাহ্মণী তবে স্বামীর উত্তর।
ভিক্ষা করিবারে গেল নগর ভিতর॥
চারি মুষ্টি ক্ষুদ ভিক্ষা পাইল চারি ঘরে।
পৃথক তণ্ডুল সেই লইল সাদরে॥
ভগ্ন বস্ত্রে বান্ধি দিল ক্ষুদের পুটলি।
স্বামীরে আনিয়া দিল বড় কুতুহলী॥

সুদামা ব্রাহ্মণ এই ক্ষুদের পুটলি কক্ষে লইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে সশঙ্ক-হৃদয়ে দ্বারকানগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে

স্বর্ণময় পুরী সব প্রতি ঘরে মহোৎসব
কোন্ ঘরে পাব নারায়ণ॥
ক্ষুদের পুটুলি কক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
কোথা কৃষ্ণ দেবকীকুমার।
পূর্ব্বে মোর ছিলে সখা এবে যদি পাই দেখা
তবে জানি মহিমা তোমার॥

এইরূপভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সুদামা ব্রাহ্মণ একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—

লক্ষ্মীর সহিত হরি আছিলা শয়ন করি
সখা দেখি উঠিলা সত্বর॥

শ্রীকৃষ্ণ, বাল্য-সখা সুদামাকে দেখিবামাত্র এইরূপভাবে সাদর-সম্ভাষণ করিলেন—

* বীরভূম 'রতন'-লাইব্রেরী পুঁথি—নং ২৮, ২৭৭, ৩৩১, ৩৮৯, ও ১।

আইস আইস প্রিয়সখা চিরদিনে হৈল দেখা
আজি মোর জনম সফল।
ভাগ্যের মোর নাহি লেখা বন্ধুজন সঙ্গে দেখা
সুদামেরে প্রভু দেন কোল॥

তদনন্তর সুদামাকে স্বীয় পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া

প্রেমে অঙ্গ গদ গদ ব্রাহ্মণের দুই পদ
ধোয়াইল প্রভু গদাধর॥
বিপ্র পাদোদক লঞা আপন মস্তকে দিঞা
তবে দিলা লক্ষ্মীর মস্তকে॥

বাল্য-সখাকে স্বহস্তে চন্দনচর্চ্চিত ও বিবিধ ভূষায় ভূষিত করিয়া নানা উপচারে ভোজন করাইলেন এবং তাহাকে পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া, স্বয়ং ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর সুদামাকে 'কল্যাণ-কুশল' জিজ্ঞাসা করিয়া, অবশেষে গুরুকুলে অবস্থানকালে এক-দিনের বিশিষ্ট ঘটনা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—

গুরুকুলে মোরা সব পড়িতাম যখন।
মনে কিছু পড়ে সখা সে সব কথন॥
একদিন গুরুমাতা কহিল সবারে।
তৃণকাষ্ঠ বাছা সব কিছু নাহি ঘরে॥
গুরু-মাতার আজ্ঞা পেঞা যত শিশুগণ।
কাষ্ঠ আনিবারে গেলাম গহন কানন॥
গহন কাননে গিয়া প্রবেশিলাম মোরা।
আচম্বিতে সবাকার দিশে হলো হারা॥
কোন মতে পথের করিতে নারি দিশা।
রাত্রি উপস্থিত হৈল অন্ধকার নিশা॥
হাতাহাতি করি পথে সকলে ব্যাকুল।
আচম্বিতে ঝড়-বৃষ্টি হইল বিপুল॥
বিপরীত শিলাবৃষ্টি হৈল অকস্মাৎ।
ঘনে ঘনে চিকুর পড়ে ঘন বজ্রাঘাত॥
পরস্পর সবাকার হাতে হাত ধরি।
হাতাহাতি করি মোরা বনমধ্যে ফিরি॥
হেথা গুরু কান্দেন, কান্দেন গুরু-মাতা।
ঝড় বৃষ্টে শিশুগণ বধ হৈল কোথা॥
সূর্য্যের উদয় হৈল রজনী প্রভাত।
আমা সবা তল্লাসে আইলা গুরুনাথ॥
হেনকালে মোরা সব আইসে সেই পথে।
আমা সবা দেখি গুরু লাগিলা কান্দিতে॥
আইস আইস পুত্র সব আইসহ নিকটে।
বড় দুঃখ পাইলে সবে বিষম সঙ্কটে॥
বড় ভাগ্য মোদের রক্ষা পাইল জীবন।
গুরুপদে মোরা সব করিনু প্রণাম॥
তবে গুরুমাতাকে করিল নমস্কার।
লজ্জা পেঞা আশীর্ব্বাদ করিলা অপার॥
আর কত কর্ম্ম কৈল গুরু-নিকেতনে।
কতেক কহিব সখা কিছু আছে মনে॥

তদনন্তর সুদামা ব্রাহ্মণ, লজ্জা ও আশঙ্কায় ক্ষুদগুলি দিতে পারিতেছেন না জানিয়া, অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

শুন শুন অহে সখা সুদামা ব্রাহ্মণ।
কি এনেছ মোর তরে দ্রব্য উপায়ন॥
অল্প বলি হেন বুঝি নাহি দাও মোরে।
ভক্তে যাহা আনে তাহা লই যে সাদরে॥
পত্র পুষ্প ফল জল যে দেয় ভক্তলোকে।
তাহাতে বড়ই তুষ্ট হইয়া কৌতুকে॥
অভক্তের দ্রব্যেতে মোর নাহি হয় ইচ্ছা।
তুমি কি এনেছ সখা নাহি কহ মিছা॥
এত যদি কহিলেন প্রভু বনমালী।
লজ্জায় না দেন বিপ্র ক্ষুদের পুটুলি॥

তখন স্বয়ং ক্ষুদগুলি লইয়া—

এক মুষ্টি খাই প্রভু সন্তুষ্ট হইলা॥

এবং

আর এক মুষ্টি যে লইলেন হাথে॥

তখন লক্ষ্মীদেবী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—

যে খাইলে সে খাইলে না খাইবে আর।
কত দিনে শোধ যাবে সুদামের ধার॥
কত দিনের তরে বিক্রী করিলে আমারে।
কতকাল থাকিব আমি সুদামের ঘরে॥

তখন, কৃষ্ণ বলেন লক্ষ্মী তুমি জানহ সকল।
শুনেছ আমার নাম ভকতবৎসল॥

সুদামা ব্রাহ্মণ, সে রাত্রি কৃষ্ণ-সখা-মন্দিরে অবস্থান

করিয়া প্রভাতে গৃহপ্রত্যাগমন করিলেন। বিদায় কালে, গোবিন্দের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিলে

প্রণাম করিলা কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পায় ॥

এদিকে সুদামা ব্রাহ্মণ যাহার জন্য পত্নী কর্ত্তৃক কৃষ্ণ সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বুঝি নিষ্ফল হয়। কেন না,

লজ্জার কারণে কিছু না চাহিল ধন ॥

সুদামা ব্রাহ্মণ সেইজন্য মনে মনে আপনাকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া গৃহ-প্রত্যাগত হইলেন। এ দিকে,

সর্ব্বআত্মা ভগবান জানিল কারণ ॥

প্রত্যাগমন করিয়া,

স্বর্ণময় পুরীখান দেখিল সাক্ষাতে ॥
বসিঞা সুদামা বিপ্র দেখে পুরীখান।
চন্দ্র সূর্য্য প্রভা কিবা বিচিত্র উদ্যান ॥
কোকিলের কলরব গুঞ্জরে ভ্রমর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে দিব্য সরোবর ॥
প্রফুল্লকুমুদ সব দেখিতে সুন্দর।
শ্বেত রক্ত নীল পীত সহস্র কমল ॥
আজ্ঞাকারী দাসদাসী বিচিত্র গণনা।
সরোবর ঘাটে করে অঙ্গের মার্জ্জনা ॥
বিচিত্র দেখিয়া পুরী ভাবে দ্বিজবর।
কোন্ রাজা আসি মোর নিল বাড়ী ঘর ॥
এইখানে ছিল মোর পত্রের কুড়াখানি।
কোথাকারে গেলা মোর দুঃখিতা ব্রাহ্মণী ॥
মাতা নাই—পিতা নাই—নাহি সহোদর।
ত্রিভুবনে কেহ নাই যাবে কার ঘর ॥
গিয়াছিলাম কৃষ্ণস্থানে মাগিবারে ধন।
সেই হেতু মোরে বিড়ম্বিল নারায়ণ ॥

সুদামা ব্রাহ্মণ আপনাকে এইরূপে বিড়ম্বিত ভাবিয়া, যখন পুনরায় বলিতেছেন—

কেমনে জানিব মোরে বিড়ম্বিবে গোবিন্দ।
দণ্ডাইয়া ধরিতাম চরণারবিন্দ ॥

সেই সময়, তাহাকে দেখিয়া যত দাসদাসীগণে ॥

ধেঞা যেঞা কহিলেক ব্রাহ্মণীর কাছে।
দুঃখিত ব্রাহ্মণ এক দণ্ডাইয়া আছে ॥
এত শুনি বিপ্রপত্নী বড় হৃষ্টমতি।
দুঃখিত ব্রাহ্মণ নহে—মোর প্রাণপতি ॥

এই বলিয়া দাসদাসী সঙ্গে

বাড়ীর বাহির হইলা বিপ্রের রমণী ॥

কিন্তু,　চিনিতে না পারে বিপ্র আপন রমণী ॥

তখন,　ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু তব দাসী আমি।
এসব সম্পদ তব ঘর আইস তুমি ॥
তখন সুদামা বিপ্র জানিল নিশ্চয়।
এ সব সম্পদ দিলেক কৃষ্ণ মহাশয় ॥

ইহার পর, লক্ষ্মীনারায়ণ সুদামা গৃহে আবির্ভাব হইয়া তাহাকে চরিতার্থ করিলেন। এখন সুদামার, পত্রকুটীর পরিবর্ত্তে

স্বর্ণময় ঘর ছায় মুকুতা-প্রবালে।

কিন্তু সে অতুল ঐশ্বর্য্যে আত্মহারা না হইয়া

আনন্দে সুদামা বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
এত ধনে মত্ত নাহি সুদামা ব্রাহ্মণ।
অনুক্ষণ মনে করে গোবিন্দ চরণ ॥

এইরূপে,

সুদামার দারিদ্র্য ভঞ্জিল নারায়ণ।
কহিল অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্বজন।

ধূমকেতু

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী]

লোকে বলিত, তারিণীদত্ত টাকার আণ্ডিল বাঁধিয়াছে; আবার তাহারাই বলিত যে, সে টাকা লইয়া 'যখ' দিবে। টাকার আণ্ডিল তারিণী বাঁধিয়া যে নাছিল, এমন নয়, কিন্তু 'যখ' দিবার ইচ্ছাটা এখনও তাহার মনে জাগে নাই—কখনও জাগিবে যে, এমন কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাহার কারণ 'যখ' দিলে, টাকা মাটি মধ্যে পুঁতিতে হয়। শোনা গিয়াছে, তাহার দত্ত ফলোৎপাদিকা শক্তি তখন বিফলা হইয়া যায়—অর্থাৎ সুদ বন্ধ হয় টাকা বাড়ে না।

যে সকল হিন্দুস্থানী বড় লোকের ছেলেরা নাচের মজলিসে বসিয়া, মুজরাওয়ালীর নূপুর-নিক্বণের মূল্য-স্বরূপ মদিরারঞ্জিত খোস মেজাজে তাহাকে ত্রিশূন্যের যে কোন সংখ্যা রজতমুদ্রা ফরমায়েস করেন এবং সেই সুষুপ্তিমগ্ন অন্ধরাত্রে সেই অর্থ সেই মুহূর্ত্তে সংগৃহীত হয়, তখন তারিণী দত্তর লোহার সিন্দুকই তাহা সরবরাহ করে। সে টাকার কি দিব্যতেজ! তাহা রাবণের হস্তনিক্ষিপ্ত শেলরাজ শক্তির ন্যায় সদ্যোসংহারী মহাস্ত্র। বাবুর আদেশ,—সেই ক্ষণেই যেরূপে হয়, ঈপ্সিত অর্থ চাহি।—উত্তমর্ণ বলেন, একশতের সুদ একশত আট না দিলে, এমন সময় টাকা বাহির করিবে কে? বিশেষ মা-লক্ষ্মীকে কি রাত্রে ঘুমন্ত-বিদায় করিতে আছে? বাবুর হৃদয়-বন্যায় তখন জোয়ারের বেগ বহিতেছে, সে কোন্ বাধার নিষেধে শান্ত হইবে? কাজেই একটা খত লিখিয়া চারি সহস্রে চারি সহস্র তিনশত কুড়ি টাকা সুদ-স্বীকার ও সেই ক্ষণে সেলামী-স্বরূপ শতকরা দশ টাকা বাদ দিয়া, তিন সহস্র ছয়শত নগদ মুদ্রা গ্রহণ করিত। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে আবার তিনশত পঞ্চাশ কর্ম্মচারীর ঘরে উঠিত; বাবু পাইতেন, তিন হাজার দুইশত; বাকি পঞ্চাশ কি হইত, তাহার খবর ঠিক মিলে না। কিন্তু তিন বৎসরের সুদ ও তস্য তস্য তস্য সুদে এই সূচিকালাঙ্গলের ফলারূপে একটা জমিদারী-খণ্ডের ভূমি আকর্ষণ করিয়া উঠিতে বাধিত না। তারপর সেটা উচ্চডাকে শত্রুপক্ষকে বেচিয়া তারিণী দত্তের লৌহসিন্দুক ভরিয়া উঠিত এবং শোণিতাস্বাদ প্রাপ্ত বাঘ যেমন শোণিতের গন্ধে মাতিয়া উঠে, তেমনি করিয়া, সেও সুযোগান্তরের প্রতীক্ষা করিতে থাকিত। আর সুযোগ—? দেশে কুলাঙ্গারের কিছু অভাব ঘটিতেছে, বলিতে পার?

এমনি চিরদিন চলিতেছে। ওদিকে যখন কর্ম্মকাজ ছিল, অন্যদিক দিয়া টাকাকড়ি গৃহজাত হইতেছিল—উপার্জ্জনও বড় কম ছিল না; আবার গৃহে পোষ্যের সংখ্যাও নেহাৎ অল্প নয়; খরচপত্রও কিছু কিছু না করিবারও যো ছিল না। তখন টাকার নেশাটাও বুঝি কিছু কমও ছিল। কিন্তু যখন যম ঠাকুরাণীর অপ্রত্যাশিত কৃপা, কৃতান্ত-দেবতার অনুচর অনুচরীবর্গ দ্বারা খণ্ডিত হইতে লাগিল, একে একে কেশব, করুণা ও নীলমণি তিন পুত্র, ও হেমন্ত—রাজবালা নামে দুই কন্যা, কেহ মা-শীতলার হস্তে শীতল হইল, কেহ ওলাদেবী বা প্লেগাধিষ্ঠাত্রীর কৃপাদৃষ্টিক্ষণের ফলে অপহৃত হইল, তখন হইতে তারিণীদত্তর সমুদয় স্নেহপ্রীতির সঞ্চার, তাহার অকৃতজ্ঞ সন্তানসন্ততির উপর হইতে অপহৃত হইয়া, কৃতজ্ঞ অর্থরাশির উপরেই সংন্যস্ত হইয়াছিল। ছেলেমেয়ে-গুলা যেন সড় করিয়া, তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্যই এই কাজটা করিয়াছে, এইরূপ একটা তীব্র অভিমান তিনি তাহাদের পরে অনুভব করিয়া, যেন সেই বিদ্রোহিদলের জন্য শোক-পরিহার মানসেই বিপুল উদ্যমে টাকার সুদ বাড়াইয়া অর্থ-বৃদ্ধির দিকে একান্ত মনোযোগ দান করিলেন। দেখিয়া বাহিরের লোক বলিল,—বুড়র ভীমরথি ধরিয়াছে, এইবার ও মরিবে। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাহার মরিবার কোনও উদ্যোগ-আয়োজন দেখা গেল না, তখন সকলে বিস্ময়ে মুখ তাকাতাকি করিয়া অবাক হইল। কেহ কহিল, "এ রকম হয়ে থাকে—বলে, 'অল্পশোকে কাতর—আর বিস্তর শোকে পাথর।' দেখছ না এর সেই রকম হয়েছে।"

তা যাই হোক, তারিণী কোন দিকের কোন কথায় কর্ণ-পাত করিল না, সে সমান উৎসাহে টাকা ধার, জমীদারী বন্ধক ও ডিক্রিজারি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য-স্রোতে নিজেকে নিমগ্ন

সে সিন্দুক খুলিয়া টাকা গুণিতে থাকে—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ

জর্জ্জরিত শরীরের জ্বালায় ছট ফট করিয়া, সকলের সহযাত্রী হইলেন। ছোটবধূর খোকা-খুকি দুটির একটিও রহিল না; গৃহিণী অসহ্য শোকের বজ্রানলে ঝলসিত হইয়া দুটি বৎসর জন্মান্তরের পাপ খণ্ডন করিলেন; তারপর এক গ্রীষ্ম-অপরাহ্নে সমস্ত রোগশোকের জ্বালা ভুলিয়া শান্ত চিত্তে কর্ম্মান্তরূপ লোকে গমন করিয়া জুড়াইলেন। সেই প্রকাণ্ড পুরীমধ্যে অতগুলি মানুষের ভিতর জীবিত রহিল—তারিণী দত্ত এবং রাজবালার কন্যা সুহাসিনী। নীলমণির স্ত্রীও বাঁচিয়াছিল,—পাছে এবাড়ীর বাতাসে কন্যাটির নরজন্ম অতি শীঘ্র সমাপ্ত হইয়া যায়, সেই ভয়ে নীলমণির শ্বশুর, কন্যাকে পাঠাইলেন না। লোকে বলিল—"আরে এমন আহাম্মকের কাজও করে, বুড়র সেবা করুক গিয়ে, বিষয়ের ভাগ পাইবে।" পিতা উত্তর দিলেন,—"বিষয়ের ভাগে আর কাজ নাই; যে ঘরে বিবাহ দিয়াছিলাম, মেয়েটা এখন বাঁচিয়া থাকিলেই বাঁচি।"

তারিণীর ইহাতে দুঃখ ছিল না। প্রথম যখন কেশব মরিয়াছিল, একবার সে স্ত্রীকে বলে—"গিন্নি আর দেখচ কি, চলো দুজনে গঙ্গা উলিগে যাই।" কিন্তু এখন! এখন আর সেদিন নাই; যে হতভাগ্য অল্পজীবী সন্তানগুলা তাঁহাকে ফাঁকিদিতে গিয়া নিজেরা ফাঁকে পড়িল, তাহাদের কাহারও প্রতি তাঁহার স্নেহ নাই। তা ছাড়া বুঝি বরাবর একটু কমই ছিল। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকেই লইয়া থাকিতে পাই, সেও অল্প সুখ নহে। যখন দেখা গেল, পোষ্য কমায় টাকাটা হুহু শব্দে বাড়িয়া চলিয়াছে, তখন যাহারা আছে, তাহাদের প্রতি ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে মন পড়িয়া গেল। বধূর বাপ পাঠাইল না—একটা ছুতা—বেশ ভালই ছুতাটা মিলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল নিজে—আর সুহাসিনী;—তা হউক বেশী খরচ হইবে না।

সুহাসিনী মেয়েটিও বড় শান্ত। শৈশবে শোকের ঝড় খাইয়া ভূলুণ্ঠিতালতাটির মত মাটির পরেই বাড়িয়াছে, তাই সময়-মত ফুল ধরে, ফলও হয় কিন্তু সবই যেন চুপিচাপি ধীরে

[...]খিয়া, মৃত্যুরূপী হলাহলের সুতীব্র বিষজ্বালা মৃত্যুঞ্জয়ের মত [...]তিয়া লইল। প্রকাণ্ড বাড়ীটা খাঁ খাঁ করিয়া প্রাণের [...]ধ্য একটা নিদারুণ হতাশার আগুনে ঝড় বহাইতে থাকে, [...]রর রুদ্ধ দুয়ারগুলায় ধুলা পুরু হইয়া পড়ে, ধূলিম্লান [...]সজ্জাগুলা শোকদীর্ণ বক্ষে তাহার মুখের দিকে তাকায়, [...]র সে সিন্দুক খুলিয়া টাকা গুণিতে থাকে—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ, [...]মিঠা বুলি! করুণার পুত্রটিও বুঝি, অমন মধুর সুরে [...] কহিত না! কন্যা হেমন্তর হাসিটুকুর বীণাঝঙ্কারী তান [...] মধ্যে কাণের পর্দ্দায় এখনও আঘাত করে বটে কিন্তু [...] অপসৃত সুরের ধ্যানের চেয়ে, যাহা নিজের কাছে [...]ছ, তাহার চিন্তা শ্রেয়ঃ নহে কি?

[...]দুই পুত্রবধূও একটির পর একটি একে একে বিদায় [...]; রাজবালার স্বামী মদনমোহন মৃতাকে দাহ করিয়া [...]য়াই তাহার পরিত্যক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া, ব্রণ-

ধীরে। সে বড় হইতেছে, কৈশোর পার হইবার সময়ও আসিল কিন্তু সে বসন্তাগমের কোন খবরই পাইল না। কারণ সে তৎসহকারাশ্রয়ে মাথা খাড়া করিতে পায় নাই,—মাটির বুকে পড়িয়া কোন মতে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু সে সেই খবরে অজ্ঞ থাকিলে কি হইবে,পাড়ার পাঁচজনের কাছে সংবাদটা পৌঁছিয়াছিল, তাহারা মরুভূমির মধ্যে কোকিলের সাড়া পাইয়া দেখিতে আসিল; আসিয়া দেখিল, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে ছিন্নলতা নববসন্তভূষণে খচিত হইয়া উঠিয়াছে।

তারিণীদত্ত দিবা নিশ্চিন্ত মনে ৯৯কে একশতে পরিণত করিতেছে। এমনি করিয়া মাসের পর মাসে শতের সংখ্যা সহস্রে উঠিয়া ক্রমে স্বর্ণগুলা চড়িয়া উঠিতেছিল। এমন সময় ঘটকঠাকুর অযাচিত হইয়া আসিয়া খবর দিলেন, "নাতিনী সুহাসিনীর জন্য ভাল বরপাত্র আসিয়াছে, তাহারা বেশি খাঁই করে না—মোটে আট হাজার পাইলেই হইল, কেননা সকলিই তো মেয়ের হইবে! বর চারিটা পাশকরা।" শুনিয়াই তারিণীদত্তর চক্ষু কপালে উঠিল।—"আট—হাজার টাকা? আটখানা কোম্পানির কাগজ গাথিয়া রাখিলেও যে, বৎসর তাহারা দুইশত আশি টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম। একটা চাকরে ছেলে!" ঘটককে বলিলেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ—অত টাকা কোথা পাইব! একটি গরীব-গরিব দেখে বর খুঁজে দাও।"

সংসারে ফরমাইস দিলে সকল জিনিসই মিলে। চারিটা পাশকরা বড় লোকের সন্তান বরের পরিবর্ত্তে একটি দেড়-খানি পাশকরা বিধবা-সন্তান গরীব-বর অল্প দিনের মধ্যেই লাল চেলি ও একগাছি গড়ে-মালা পরিয়া আসিয়া, সুহাসিনীর সহিত সেই গাছা বদল করিয়া গেল।

মানুষে বেশি আশা করিতে গেলেই নিরাশ হয়; এসংসারে পদে পদে আমরা ইহা দেখিয়া আসিতেছি। সুহাসিনীর বর অপ্রকাশচন্দ্র ও তাহার লোভাতুরা মাতা বিবাহের অতি অল্প পরেই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ঠাকুরদাদা বড় লোক ও নাতিনী তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইলে কি হয়, সিন্দুকের কড়ি গণ্ডির বাহির করা বড় কঠিন কাজ। অপ্রকাশের আশা ছিল, বিবাহের দ্বারা সে নিজের পড়াশুনার কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে কিন্তু ঠাকুরদাদা শুনিয়া থমকিয়া দুইচক্ষু কপালে উঠাইলেন। "পড়ার খরচ আমি দিব! তোমরা কি আমায় ক্রোরপতি ঠাহরাইয়াছ নাকি?"—লাজুক অভিমানী অপু আর কিছুই বলিতে পারিল না। ঘরে এমন স্বচ্ছলতা নাই, যাহাতে তাহাকে পড়িবার সুযোগ দেয়। সে শেষ-আশা-নাশে মর্ম্মাহত হইল।

তারিণীদত্ত দেখিলেন, নাতিনীর বিবাহ দিয়া এক কাল হইল! জামাই হামেসাই আসিয়া উপস্থিত হইতেছে! আসিলে দুই তিন দিনের কমে যাইতেই চাহে না! মেয়েটাও আবার তেমনি—তাহাকে যদি বলা যায়, জামাই সর্ব্বদা আসা ভাল দেখায় না—তুই বারণ করতে পারিস না! তাহাতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে!—নিলর্জ্জ তার দিনকাল পড়িয়াছে—তা সে করিবে কি!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে অপ্রকাশ স্থির করিল, বিদ্যালাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সে চাকরি করিবে ও সুহাসিনীকে ঘরে আনিবে। অনেক কষ্টে একটি কুড়িটাকা মাহিনার চাকরী যোগাড় করিয়া সুহাসিনীর নিকট গেল।

সেদিন বর্ষার মেঘ ডম্বরু বাজিয়া উঠিয়াছে। নবীন নীরদজালে চারিদিক আচ্ছন্ন; সুহাসিনী কাপড় তুলিয়া দ্রুতপদে ছাদ হইতে ফিরিতেছিল, এমন সময় সহসা সে কাহার আদরপূর্ণ ভুজপাশে বন্দী হইল। "এসেছ!"—সে একটু মধুর হাসি হাসিল। ওই ভাষাটুকু দিয়া যতখানি প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আর বেশী প্রকাশ চেষ্টা মানুষের দ্বারা হয় না। ইহার মধ্যে অনেকদিক হইতে অনেক অর্থ নিহিত আছে, অর্থাৎ তোমার আসিবার কথা ছিল,—এসেছ! আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতে-ছিলাম,—এসেছ! মেঘ দেখিয়া হয় ত আসিবে না বলিয়া মনে সংশয় জাগিতেছিল—এসেছ!

অপু তাহাকে কাছে টানিয়া কহিল,—"না এসে কি থাকতে পারি সুহাস! ঠাকুরদাদা পছন্দ করেন না তবু কেবল কেবলই আসি।"

"ও কথা ছেড়ে দাও, ঠাকুর-দাদার ও একটা বাতিক। কি করবে, আমার যেমন কপাল! মা-বাবারা থাকলে কি এমন হতো?"—সে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অপ্রকাশ তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া, তাড়াতাড়ি আরও নিকটে টানিয়া লইয়া, আদর করিয়া কহিল—"তার জন্য কি হয়েছে—তুমি তো আমায় ভালবাস হাসি, আমার সেই ঢের!" যথার্থই সুহাসিনী তাহাকে ইহার মধ্যেই প্রাণ ঢালিয়া

ভালবাসে। এত অল্পদিনে হিন্দু-ঘরের বালিকা, বোধ হয়, ভাল করিয়া চিনিতেও পারে না কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সে পত্নীপদের সকল অংশই গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ, জগতে আসিয়া সে এই প্রথম যথার্থ যত্ন ভালবাসা লাভ করিয়াছে। এই কৃতজ্ঞতায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুক যেন তাহাকে এক মুহূর্তে সকল দিনের সকল অসম্পূর্ণতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া নবজীবন দান করিয়াছিল। ধনি-গৃহের চির অনাদৃতা আজ দরিদ্রজীবনের অমূল্য প্রেম-সাম্রাজ্য-পাস্তে রাজেন্দ্রাণীর মহিমা লাভ করিয়াছে।

স্বামীর স্নেহপূর্ণ বাক্যে সে প্রীতি-ভরা সজল নেত্র দুইটি তাহার সাগ্রহ নেত্রে স্থাপন করিয়া, একটুখানি সুখের হাসি হাসিল। যেন বলিল—"তোমায় ভাল না বাসিয়া কি লইয়া থাকিব? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব।"

(১)

ঠাকুরদাদা বড় বিপন্ন। পাঁচ দিন ছয় দিন ধরিয়া, অবিশ্রান্ত বারাধারা চলিতেছে—বে-মেরামত পুরাণো বাড়ীর ছাদগুলা সেই মুষল-প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া হু হু শব্দে অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল। আলকাতরা ও বালি, সে দীর্ণবিদীর্ণ অঙ্গসকল জোড়া লাগাইতে অক্ষম হইয়া, অশ্রু-জলে ধৌত কজ্জলরাগের ন্যায় গৃহ-ভিত্তি প্লাবিত করিতেছিল। ইহার উপর আবার জামাইএর ব্যবহারে তিনি আতঙ্কে অস্থির হইয়া আছেন;—সেটা সেই যে মেঘবৃষ্টি মাথায় লইয়া আসিল, সেই অবধি বৃষ্টিও থামিতে চাহে না, সেও যাইতে চাহে না। ঘরে জামাই আসিলেই খরচ;—নিত্য চারি পয়সার মাছ এবং দু পয়সার তরকারি হইলেই সংসার চলিয়া যায়; ঘরে লাউ, কুমড়া, শাক-সব্জি থাকিলে সে পয়সা দুটাও বেশীর ভাগই বাঁচে। আজকাল দুবেলায় আট পয়সার মাছ, পাঁচ পয়সার জলখাবার লাগিতেছে! এ বাড়ীতে ইদানীং পানের খরচটা ছিলই না; ইনি পানের একেবারে যম। দু পয়সার পান, দু পয়সার মসলা নিত্য চাই, তবু সদানন্দ বেটার মন উঠে না। পুরাণ চাকর বলিয়া অনেক সহা যায় তাই;—বেটা বলে কি না—'দাদা-বাবুরা থাকলে, দিদিমণি থাকলে, অমন জামাই—কত আদর করতো—একি কিছু হচ্চে!'—এতক্ষেও হয় না? আর কি করিতে হইবে? কোলে লইয়া নাচিতে হইবে নাকি?

যেদিন বৃষ্টি একটু ধরিল, খাওয়া-দাওয়ার পর চাকরদের লইয়া, তারিণী বাবু আলকাতরা-বালির দাগরাজীতে হাতগুলা ভরাইয়া ফেলিলেন। বড় বড় বিচিত্র ডোরায় ছাদ চিত্রিত হইয়া গেলে, তদুপরি খড়পাতা-কাষ্ঠখণ্ড চাপাইয়া, নীচে নামিতেই দেখিলেন—বারান্দায় নাত জামাই পান চিবাইতে চিবাইতে পায়চারি করিতেছে; দেখিয়াই তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল,—মনে মনে বলিলেন—"গোরু মরিয়া মানুষ হয় বটে, জাবরকাটা অভ্যাসটি এ জন্মেও গেল না! সাধে বলে—'স্বভাব যায় না মলে!'" প্রকাশ্যে বলিলেন—"কিহে অপু, আজই তো তা হলে বাড়ী যাচ্ছো—কেমন?"

অপ্রকাশ একটু যেন অপ্রতিভ হইল, সে পা দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদু মৃদু উত্তর দিল—"আজ? না—আজ তো যাচ্চিনে, মনে করচি কাল কিংবা,—" তারিণীচরণ ঘোর অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দান করিয়া বলিলেন, "ওহে না না, ছেলে-মানুষ তোমরা বোঝ না, আজ বৃষ্টি থেমেচে—আজই এসো গিয়ে। চাঁদ কি আবার রাত থেকে নামতে পারে। আবার আজ শনিবার—নামেতো সেই সাতদিন। সাতদিন কি আবার শ্বশুরবাড়ী বসে থাকতে পারবে? ও দেরি করা ঠিক হবে না।"

অপ্রকাশ কহিল—"আচ্ছা আজই যাইব; মা বলেছিলেন—ওকেও এবার নিয়ে যেতে—তা হলে ওকেও আজ আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন না।"

তারিণী প্রমাদ গণিলেন। মেয়েটাই ঘর-সংসারটা রাখিয়াছে, সে গেলে চাকরবেটারা কি কিছু কোথাও রাখিবে? তা ছাড়া মেয়ে পাঠানর কিছু খরচ তো আছে, তাহাতে আবার এইবার দ্বিরাগমন। ভাল কথা মনে পড়িয়াছে; চট্ করিয়া কহিয়া উঠিলেন—"এই দেখ—যোড়া বছর যাই পড়িল, অমনি তোমার মায়ের বউ নিয়ে যাবার লোভ হলো; কি করে পাঠাই! তা ছাড়া বাপু, এখন পোড়ো ছেলে, পড়া-শোনা করগে—বউ তো আর পালাবে না।"

অপ্রকাশ ভালমানুষ, ক্ষণিকের উত্তেজনা তাহার শান্ত হইয়া আসিয়াছিল; সে একটু দুঃখের সহিত হাসিল। মনে মনে বলিল—"বিশ্বাস কি! যে বাড়ী!" প্রকাশ্যে কিছু বলিল না।

সেদিন সে যখন ট্রেণে চাপিয়া বসিল এবং ট্রেণখানা হু হু শব্দে তাহাকে সুহাসিনীর নিকট হইতে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্রমেই অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে

লাগিল, তখন তাহার মনের ভিতরটাও যেন তেমনই দূর ব্যবধান হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিতেছিল। ঠাকুরদাদার গৃহে এ নিঃস্ব ভিখারী-বেশে আর না; যদি কখনও মানুষ হয়, তবেই সে সেই মনুষ্যত্বের দাবীতে স্ত্রীকে লইতে আসিবে। কিন্তু হায়, এসব গল্পেই শোভা পাইয়া থাকে। মানুষ এত সহজে এ গুমর করিতে পারে না। সহায়-হীন কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে সে কিসের জোরে এ পথ কাটাইবে! কালই যে, একটা দশটাকার কেরাণীগিরির উমেদারীতে তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। মামা বড়লোকের বাড়ী বিবাহ দিয়া দায়মুক্ত, চিরদিন কে কাহাকে পুষিতে পারে!

কখন কে উঠিতেছে—নামিয়া যাইতেছে—আবার কতকগুলি নূতন লোকে মোটঘাট লইয়া সেই স্থান দখল করিয়া ফেলিতেছে, জানাও যায় নাই; হঠাৎ সে তাহার বাহুমূলে একটা স্পর্শ অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সকৌতুক কণ্ঠ তাহার কাণের কাছে বাজিয়া উঠিল "চিনিতে পারো?" অপ্রকাশ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বিবাহরাত্রে তাহার এক শ্যালক-সম্বন্ধীয় যুবক তাহাকে লইয়া অনেক রঙ্গরহস্য করিয়াছিল—সেই দেবনাথ!

দেবনাথ বড় সেয়ানা ছেলে, সে অতি শীঘ্রই অপ্রকাশের মনের ভাব বুঝিয়া, কথাগুলা বাহির করিয়া লইল। সব শুনিয়া সে হাসিয়া বলিল—"এমন বোকারাম! ও বুড়র হাত থেকে কেমন করে টাকা বার করতে হয়, আমি ঠিক জানি, দেখবে?"—অপ্রকাশের মন ভাল ছিল না, তথাপি এ কথায় হাসিয়া ফেলিল—"পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠতে পারে—তবু।" "যদি পারি?" "অসম্ভব।" "বাজি রাখ যদি পারি?"—"আমার কি আছে?"

"আমার বোনের কেনা হয়ে থাকবে তো?"

অপ্রকাশ হাসিল; মনে মনে বলিল—"এমনিতেই তো আছি।"

দেবনাথ বলিল—"একমাস চাকরী খুঁজো না—এর মধ্যে না পারি লিখে পাঠাব, তখন যা হয় করো।"

(৩)

নাতি দেবনাথকে বুড়া দুদিনেই ভালবাসিয়া বসিল। এমন ভাল ছেলে তারিণী দত্ত দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাচক মাছতরকারি না বাড়াইলে, শুধু ভাত দিতে বাধা হইবে বলায় সে বলিল—সে মাছ খায় না—তরকারিও তেমন পছন্দ করে না, কেবল লবণ-সংযুক্ত লেবু মাখিয়া ভাত খায়—লেবুর গাছ বাড়ীতেই আছে। ভাতও বেশ ভদ্রলোকের মত খাওয়া—এতকটি হইলেই হয়! অম্বলের ব্যারাম—জল খাওয়া অভ্যাস নাই। পান, তামাক বা চুরোট সর্ব্ব প্রকার নেশা-বিবর্জ্জিত সদভ্যাস। এমন না হইলে ছেলে!—দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। তারিণী দত্ত নাত-জামাইএর নিন্দা করিলেন। "দেখেছ হে শালার আক্কেল! বলে পড়ার খরচা দাও! আমি তার পড়ার খরচ দিই কি করে? আমায় কি কেউ রোজগার করে এনে দিচ্চে? এই তো কটা টাকা আছে তাই খাচ্চি; ফুরিয়ে গেলে আমার হবে কি? বলো দেবু, ছেলেপিলে সব গেছে, এক রকমে কেটে যাচ্চে। তারা থেকে যদি টাকাগুলা যেত, তাদের হাত ধরে পথে পথে বেড়াতে হতো ত? টাকার চেয়ে কেউ নয়, তা যতই বল।" দেবু তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া গেল—"বটেই তো—ওসব এক ফ্যাসান উঠেচে! টাকা কি দেওয়া যায়—সিকি পয়সাও বার করবেন না! যে দিনকাল পড়চে!"

সুহাসিনী দেখিল, তাহার দুখের উপর এই এক সোয়াস্তি জুটিল! ঠাকুরদাদা যদি একটি পয়সা বাহির করিতে চাহেন, ত তাঁহার এই চেলাটি ছুটিয়া আসিয়া বলে—"হাঁ হাঁ করেন কি! ও আধটা হলেই বেশ চলে যাবে, বাজে খরচ করতে আছে—যে দিনকাল!" এমনি করিয়া মাস দুই কাটিলে, হঠাৎ সে একদিন আসিয়া বলিল—"আজ বাড়ী যাচ্চি গো ঠাকুদ্দা!"—শুনিয়া সুহাসিনী মনে মনে হরিরলুট মানত করিল।

তারিণীদত্তের কিন্তু যাহা কোন দিন হয় নাই, আজ তাহাই হইল,—বড় মন কেমন করিতে লাগিল। এই তরুণবয়স্ক ছেলেটি ভিন্ন তাঁহাকে কেহ এমন করিয়া কোন দিন চিনিতে পারে নাই। দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"কেন যাবিরে দেবু?"

দেবু নিতান্ত ঔদাস্যের সহিত ছাদের ভিতরদিক্ হইতে যে অন্ধকারমূর্ত্তি লম্বা ঝুলগুলা ঝাড়লণ্ঠনের মত ঝুলিয়া রহিয়াছিল, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল—"আর না গিয়া কি করি ঠাকুদ্দা! কটা দিনই বা আর আছি, এই কটাদিন ঘরের ছেলে ঘরেই

থাকি গিয়ে। তা ছাড়া যখন যেতেই হবে, উপায় যখন আর কিছুই নেই, তখন যাতে স্বর্গেটর্গে যেতে পারি, তারও তো একটা পথ করতে হবে। তোমায় বলি, কাউকে বলো না; মিথ্যে মোকদ্দমা করে, একটা জমি কেড়ে নিয়েছিলাম, সেটা আর রাখ্‌বো না—ফিরিয়ে দোব। আর দুটা দশটা টাকা-কড়ি যা আছে সেগুলোই বা কি হবে—দান খয়রাত করে পুণ্যি করে নিই গে।"

তারিণী অবাক্ হইয়া গেল। "কি বল্‌ছিসরে দেবা, তোর তো নেশাটেশা অভ্যাস ছিল না!" "আজও নেই গো ঠাকুর্দ্দা! তুমি কিছু শোননি?"—"কি শুনবো?"—"কেন ঐ যে ধূমকেতুটা উঠচে দেখেছতো? ও কি করবে জানোনা?"—"না কি করবে?"—"১৮ই মে আমাদের পৃথিবীটা যে ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্যে দিয়ে যাবে—জানোনা?" তারিণীদত্ত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—"ভায়া ওসব কাগজ-ওয়ালাদের পাগলামি, অমন পুচ্ছমুচ্ছ ঢের ঢের পার হয়ে গেছে। পৃথিবীটে কি বেলেমাটির, যে আঙ্গুল লাগলেই ধসে যাবে?" দেবনাথ অসহায়ভাবে বসিয়া পড়িল—'হাসচেন কি ঠাকুর্দ্দা! যখন হবে—তখন বলবেন যে—হাঁ! সকল দেশেই মহা ধূম লেগেচে—রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত সবাই নিজের কাজ করে নিচে; আমি তো এমন সুযোগ ছাড়িতে পারিনে! দানটান করে এই বেলা একটা পথ করে রাখি; ফট্ করে মরে যাব—কিছুই হবে না! আর এ কেমন সুযোগ দেখনা—ছেলেপিলে সপুরী একগাড়! কাঁদতে-ককাতে কেউ থাকবে না, যে কারু জন্য ভাবতে হবে। দুহাতে ছড়িয়ে দাও, পুণ্যিকে পুণ্যি!"

সেদিন প্রতিবেশী যাহারা বেড়াইতে আসিল, সকলকারই মুখে ঐ এক কথা! দেশটা একসঙ্গে যেন এক মহাসঙ্কল্প হইয়া বসিয়াছে। পরিণামও সবারই যে একই!

তারিণীদত্তর মনে এ চিন্তার ছায়াপাত হইল। পরদিন দেবেকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন—"সত্যিরে দেব! পৃথিবীটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?"—মুখ চুণ করিয়া দেবনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল—"বিলাত থেকে—আমেরিকা থেকে—সবাই এই কথাইতো বলচে। কি রকমটা হবে, কে জানে! আমি ঠিক করেচি, সেদিন একখানা গরদ পরবো, কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে কোশাকুশি নিয়ে গঙ্গাতীরে—"

তারিণী দত্তর মনটা বড় কাতর হইয়া উঠিতেছিল; ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আমার লাখটাকার ওপোর আছে—সব কি হবে?"—"সব সিন্দুকে থাকবে তাতে কি? চুরি করবার কেউতো বেঁচে থাকবে না। ও সিন্দুক-মিন্দুক সব একাকার, লণ্ডভণ্ড! পৃথিবীটা যদি ঠোক্কর খেয়ে উল্টে যায়, তাহলে মানুষগুলো ওপোর দিকে পা, নীচে দিকে মাথা করে উল্টে পড়্‌বে, যদি বায়ে হেলে তাহলে—"

তারিণীদত্তর চোখে জল আসিল,—"সব যাবে! হাঁ দেবু, সত্যি কি সব যাবে?"—"কি জানি ঠাকুর্দ্দা! লোকেতো বলচে ঐ রকমই। যদি বায়ে হেলে আমরাও ঘরবাড়ী সিন্দুকপেটরা নিয়ে বা কাতে গড়িয়ে পড়্‌বো, মাথাগুলো হয়ত ঠোকাঠুকি হয়ে ছেঁচে যাবে, সিন্দুকটা ধাঁ করে এসে গায়ের উপর ছিটকে পড়বে, ডালা খুলে টাকার ছিনিমিনি খেলা—"

"এঁ্যা যাবে! সব ছড়িয়ে পড়ে কোথায় চলে যাবে! এক কাজ করলে হয়না দেবু?"—"কি?"—"দান করবো?"—"দান! দান মানেই নষ্ট, তাহলেই তো গেল!"—"পৃথিবী ধাক্কা খাবে ঠিক তো?"—"জোতিষ যদি সত্য হয় ঠিক।"—"ধাক্কা খেলে কেউ বাচবে নাতো?"—"না, সেটা বলতে পারি যে, ধাক্কা খেলে কেউ বাচবে না। পৃথিবীটাই গুঁড়িয়ে যাবে।"—"যাবে তো?—তবে দান করি?" দেবনাথের এ প্রস্তাব মনঃপূত হইল না, সে খুঁৎখুঁৎ করিয়া বলিতে লাগিল—"দান, আহা সে যে খরচ হয়ে যাবে! তার চেয়ে সিন্দুক-ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, সেও ভাল। অবশ্য পুণ্যিটা তাতে হবে না এই যা—একটু খুঁত,—তবু।" শেষে স্থির হইল, দানটা পথে ঘাটে না করিয়া ঘরেঘরেই করা ভাল। দেবেনের মন্ত্রণায় এবং শেষে তাহার বারবার অনিচ্ছাজ্ঞাপনের মধ্যেই উকিল আসিয়া, দানপত্র লিখিয়া ফেলিলেন। তারিণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পৃথিবীটা যথার্থ গুঁড়িয়ে যাবে? ১৮ই মে তো?"—"যাবেই, এতো পৃথিবী শুদ্ধ সবাই জানে।"—"কেউ থাকবে না?"—"জন-প্রাণী না।" তারিণী বাবু বলিলেন—লিখুন—"আমার দৌহিত্রী সুহাসিনী এবং দৌহিত্রী-জামাতা শ্রীযুক্ত অপ্রকাশচন্দ্রকে আমার সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর-সম্পত্তি এই দানপত্র দ্বারা প্রদান করিলাম। আমি জীবিত কালাবধি ভরণপোষণ জন্য মাসিক একশত টাকামাত্র লইব, এবং ইহার মধ্য হইতে পাঁচ হাজার টাকা আমার গুরুদেবকে দেবমন্দির সংস্কার

প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য, আর পাঁচ হাজার আমার যৌনসম্পর্কীয় দেবনাথ দত্ত পাইবেন। বাকি ৯৮ হাজার সাত শত পঁয়ত্রিশ টাকা এবং সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি সুহাসিনী ও অপ্রকাশের।"

১৮ই মে নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল।—হ্যালির ধূমকেতু দীর্ঘপুচ্ছ মেলিয়া বিমানমার্গে সগর্ব্বে বিচরণ করিতে লাগিল, পৃথিবীর উপর তাহার কোন আক্রোশ দেখা গেল না।

অপ্রকাশ কলিকাতায় ছোট একটা মেস লইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল মাত্র। তারিণীদত্তও এই একটা সুযোগে এমনি বদলাইয়া গেল যে, সে আর এ দান ফিরাইয়া লইবার কথাও উত্থাপন করিল না। কোন্ মুহূর্ত্তে কাহার জন্য বিধাতা কোন্ সুযোগ বিস্তৃত করিয়া রাখেন, কেহ জানে না। ধূমকেতু আর যাহার ভাগ্যে যাহাই বহন করিয়া আনুন, অপ্রকাশের পক্ষে মঙ্গলগ্রহ স্বরূপ আসিয়াছিল।

তারিণীবাবুর দানপত্রে স্বাক্ষর

বিশ্বরূপ

[শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, M. A.]

হেরেছি তোমার সৌম্য মূরতি উষার তরুণ আলোকে,
শান্ত উদার সুষমা তোমার পরাণ ভরেছে পুলকে।
দিকে দিকে তব মধু উৎসব—ধরণী অঙ্গ শিহরে,
চারিদিক তব বিশ্বজনতা বিহ্বল চিতে বিহরে,
সঞ্চিত আশে সজ্জিত মেঘ নবীন কিরণে ঝলকে।
নীলিমা আপন সাধের স্বপন অসীম আলোকে গড়িয়া,
তোমার চরণে শরণ লভেছে অমর মরণে মরিয়া—
যে চাহে মরিতে সেই বেঁচে রহে সকল দ্যুলোকে ভূলোকে।
যত দূর গেছে তোমার ও হাসি মুক্ত পবনে ভাসিয়া,
মুক্তি প্রাণের বাঁধন খুলেছে মৃত্যুবাহনে আসিয়া,
দিকে দিকে মৃত জাগিয়া উঠেছে তব ইঙ্গিত-আলোকে।
ঘুমিয়া ঘুমিয়া চরণ চুমিয়া বাতাস উঠেছে জাগি,
কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে ফিরিছে তোমার লাগি,
মেঘমালা দিয়ে সজ্জিত করে তব কুঞ্চিত অলকে।
চেয়ে আছে রবি চেয়ে আছে ধরা চেয়ে আছে ফুলকলি,
চেয়ে আছে আশা আমার হৃদয়ে কি কথা তোমারে বলি,
বলিবে না কিছু চেয়ে আছে শুধু বিরামবিহীন পলকে।
হে আমার প্রিয়! চাহিবারে দিয়ো আঁখি'পরে রেখো দৃষ্টি,
হে আমার সখা! পলকে পলকে আমারে করিয়ো সৃষ্টি,
লক্ষ মরণে লক্ষ্য আমার লভিব প্রাণের পুলকে।

নরওয়ে ভ্রমণ

[শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা]

গাড়ীতে যাইবার সময় বড় রাজপথের ধারে এক ভজনালয় অবস্থিত দেখা গেল। এক এক খানা করিয়া গাড়ী সেই মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া থামিতেছে, আর সেই মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান দিব্যদেহধারী এক পাদরী সাহেব সসম্মানে সকলকে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতেছেন। আমরা চলি যেন একেবারে রাজার হালে,—আমাদের সঙ্গে সারবাঁধা গাড়ী চলে। যেখানে গিয়াই দাড়াই, সেখানেই একটা রব পড়িয়া যায়। আজ কোন বিশেষ কাজে আটকা পড়াতে দাদা আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই; তাই আমরা চইটি বঙ্গীয় মহিলা কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। সেটা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ দোষ। সভ্য দেশের হাওয়াও তা উড়াইয়া দিতে পারে নাই—কি করা যায়! আমাদের এই সঙ্কোচ-ভাব দেখিয়া, সেই ধার্ম্মিক-প্রবর আমাদের মুরুব্বি হইয়া, বিশেষভাবে সকল দেখাইতে লাগিলেন! আর একটি পথপ্রদর্শকও আসিয়া জুটিল। দেখিলাম, যীশুর দ্বাদশ শিষ্য চুই পার্শ্বে অবনত-মস্তকে দণ্ডায়মান,—নিপুণ হস্তের শিল্প বটে! মধ্যস্থলে যজমানের স্বর্ণ-সিংহাসন স্থাপিত, এবং তাহার বামে দক্ষিণে কনকস্তম্ভে দীপ জ্বলিতেছে। সম্মুখভাগে উপদেষ্টার মঞ্চ মহার্হ কাষ্ঠে নির্ম্মিত;—মনে হইল, যেন আমাদের প্রাচীন নবাবী আমলের কোন খাসমহলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চারিদিকের চাক্‌-চক্যে চক্ষু যেন ঝল্‌সিয়া গেল। ভাবিলাম, এক দরিদ্র রাখালের পূজার জন্য এত বাহ্য আড়ম্বর কেন? তবে কি আড়ম্বরপ্রিয়তা মনুষ্যজাতিমাত্রেরই মজ্জাগত হইয়া আছে? পূজার প্রকরণভেদে, প্রাণের ভক্তিশ্রদ্ধার তারতম্য ঘটে কি? এত সব আস্‌বাব্ সত্যসত্যই কি ধর্ম্মভাব-উদ্দীপক? যাক্—আমরা আগন্তুক, আমাদের এ অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যক কি?

আমরা জানিতাম যে, আমাদের দেশের অশিক্ষিত পাণ্ডার দলই কুসংস্কারবশতঃ অধিকাংশ সময়ে তীর্থ-যাত্রীদিগের দ্বারা জবরদস্তি দানকার্য্য করাইয়া তীর্থ-গমনের ভবিষ্যৎ পুণ্য-সঞ্চয়ের সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি হইলেও, গৌণভাবে সংসংকল্পে গিয়া পৌছায়। কিন্তু এই সকল সুসভ্য সাহেব পাণ্ডাদের পাকে-প্রকারে দর্শকমণ্ডলীর পকেট খালি করিবার তাৎপর্য্যটা এরূপ দ্বিধা বিযুক্ত ছিল কি না, ঠিক বোঝা গেল না। এইবারে কুক কোম্পানীকে করযোড়ে বলিতে ইচ্ছা হইল, "আর কেন ভাই! ঢের হয়েছে—এখন আমাদিগকে বাড়ীর দিকে ফিরাও।" এই যে এতদিন প্রকৃতি দেবীর পিছে পিছে ঘুরিলাম, ইহাতে শ্রান্তি বোধ দূরে থাকুক চিত্ত যেন নিত্য নব নব ভাবে বিভোর হইয়া পড়িত—অন্তরের আনন্দ, অঙ্গের অবসাদকে একেবারে উড়াইয়া দিত। আর আজ দেখ না! পা আর চলিতে চায় না, বড় ক্লান্ত বড় শ্রান্ত।

সেদিন আমাদের জলনিবাসে নিরূপিত সময়ে পৌঁছিয়াই সটান কেবিনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আহা! যেন মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া, বড় আরামে—বড় নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলাম। আর ভাবিলাম—"কেগো তুমি কাছে থাক সর্ব্বদা আমার? সকলকে ছাড়িয়া এতদূর দেশে আসিয়াছি, তুমি তবুও সঙ্গ ছাড় নাই?"—এত স্নেহ কার?—বুঝিলাম না, ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখি, শরীর মন আবার তাজা হইয়া উঠিয়াছে। মা গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়াছেন। সে স্পর্শ যে সর্ব্ব-ক্লান্তিহর।

পরদিন প্রাতে প্রাতরাশের পূর্ব্বেই গিয়া বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া আসিলাম, সেদিন কোথায় যাওয়ার ব্যবস্থা হই-য়াছে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "Isle of Markuiতে গিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে দেখা। তারা নাকি তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে ধরণের পোষাক পরিত, এখনও ঠিক সেই মতই পরিয়া থাকে,—কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তখন এত বড় একটা রাজধানীর বাহার ছাড়িয়া

ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের দিকে মনটা যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। যেন আর তর সয় না। কিন্তু সে জায়গায় উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা বড় সোজা নয়। প্রথমে কতক-দূর একটা গ্রামের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিলাম; অনেক গলি-ঘুঁজি বলিয়া সেখান দিয়া গাড়ী চলে না। তা বেশ! অনেক দিন পরে গ্রাম-শোভা মন্দ লাগ্‌ছিল না। পল্লী-বাসীরা সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত ছিল, আমাদের এত লোকের পায়ের শব্দ শুনিয়া, যে যার কাজ ফেলিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া, দাঁড়াইতেই, এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব জীব কয়েকটির প্রতি তাহারা এমন ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যেন "শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষু-রিব প্রবিষ্টা।" কয়েকজন ত আমাদের সঙ্গই নিল,—

এই ভাবে যথাস্থানে আসিয়া খেয়া-ঘাটে ছোট ছোট Tender বাঁধা আছে দেখিলাম। ওপারে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যাইতেছে, সেইটিই আমাদের গন্তব্য স্থান। শুনিলাম, সেখানে শুধু সম্প্রদায়িক ধীবরের বাস। অন্য আর কোন জাতির বসতি তথায় নাই। একটু অগ্রসর হইতেই মৎস্যজীবীদের নৌকার মাস্তুল সকল দেখা যাইতে লাগিল। আমরাও উদ্গ্রীব হইয়া সেই স্থলখণ্ডে পৌঁছি-বার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু জলপথের দূরত্ব নির্ণয় করা বড় দুরূহ ব্যাপার। জলতত্ত্ববিদ্ ভিন্ন ইহা সহজ লোকের চক্ষুকে সততই বিড়ম্বিত করে। ক্রমে মাস্তুল সহ তরীসকলের সন্ধান মিলিল। তাহার পর মানবদেহসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর কূলে
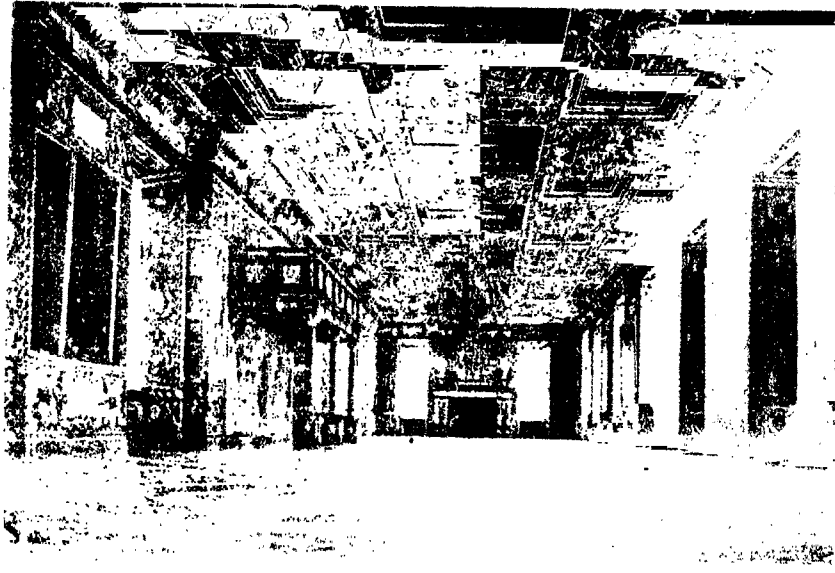
"ফ্রেডরিকস্‌বর্গ স্ট্রীট্"—রিডস লেন্

কি জানি যদি আর এমন দ্বিপদ জন্তু এজন্মে না দেখে! আমরা কিন্তু এদের দিকে তত নজর করিয়া দেখিতে পারি নাই। বাপরে! কলিকাতার বড়বাজারের গলি এর কাছে লাগে কোথায়? এত দুস্তর রাস্তা জানিলে কি আর দ্বীপদর্শনে আসি! বাসিন্দারা কেমন খোসমেজাজে চলিয়াছে! দেখিয়া হিংসা হইল। মনে ভাবিলাম, বিধাতাপুরুষ যদি অন্ততঃ দণ্ড দুইএর জন্যেও এদের মত আমাদের ঘ্রাণ এবং দৃষ্টি শক্তিকে একটু মন্দী-ভূত করিয়া দিতেন, তবে এযাত্রা বাঁচিয়া যাইতাম! কিন্তু তা হইবার নয়, তা ভাবিয়া ফল কি?

আসিয়া আমাদের জলযান ভিড়ল। তারে শিশুর দল মহা কলরব উপস্থিত করিল। সঙ্গে দুইচার জন নবীনা চকিত নেত্রে আমাদিগকে সাদরসম্ভাষণ জানাইয়া, তাহাদের চিরন্তন ব্যবসার কিছু মুনফা করিবার আশায় আমাদিগের হস্তে বহুবিধ পোষ্টকার্ড চাপাইয়া দিল। দুই একজন আবার দুচার কথা ইংরেজীও বলিতে লাগিল; তা শুনিয়া আমরাও কিছু উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু এদের এ বিদেশী ভাষার বিদ্যাটা বেশী দূর গড়াইল না দেখিয়া, বাধ্য হইয়া, বাগ্‌দেবীকে বিদায় দিলাম।

এ দ্বীপবাসীরা সকলেই খর্ব্বাকৃতি ও কৃশকায় এবং

তাহারা যে ধরণে পোষাক করিয়াছে, তাহা দেখিলে কোন মতেই হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আমাদের দেশের নাচের কাঠের পুতুলের কথা মনে পড়িয়া গেল। মেয়েদের গড়ন যেন অবিকল সেই ছাঁচের, কেবল পরণের ঘাগ্‌রার ঘেরটা তদপেক্ষা চতুর্গুণ। পুরুষদের পরিচ্ছদ অনেকটা কাবুলিওয়ালাদের মত, কেবল মাথার পাগড়ীর বদলে কাল চতুষ্কোণ টুপী। ইহাদের সকলেরই পদদ্বয়ে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাদুকা, নচেৎ চলাফেরা চলে না; কেন না বৎসরের বেশীর ভাগই এই স্থলভূমিটুকুতে বারিধারা বর্ষিত হয়, বাকি সময়, রাস্তাঘাট বরফে ঢাকা থাকে। বস্তুতঃ, এমন জায়গায়ও কি মানুষ সাধ করিয়া বাস করিতে আসে? পর্য্যটকের পক্ষে এ দৃশ্য সাময়িক আনন্দদায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু আজীবন এ কষ্টভোগের কি রহস্য থাকিতে পারে, সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আমরা পোষ্টকার্ড নির্ব্বাচন করিতে করিতে, পথ চলিতে লাগিলাম। তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান প্রবীণপ্রবীণারা, অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা আমাদিগকে তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিতেছিল। আদত কথা শুনিলাম,—এখানে যাহার ঘরেই যাও, কিছু নজর দিয়া আসিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এখন কাকে ছাড়িয়া কার মন রাখি, এই এক মহা সমস্যা হইল। হঠাৎ কি মনে করিয়া, আমরা আর সকলকে বঞ্চিত করিয়া এক অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধার আহ্বানমত তাহার ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আর তার আনন্দ দেখে কে? আমাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনার নিমিত্ত সে যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে কৌতূহলপরবশ হইয়া, সে কুটীরের সকলেই আসিয়া, আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিয়া মনে হইল, যেন কতকগুলি কৃত্রিম পুতুলেতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ঘরের দ্রব্যসামগ্রী সুশৃঙ্খলা মত সাজানো রহিয়াছে। [illegible] তাহাদিগের পরিধেয় পরিচ্ছদ সকলের নমুনা দেখাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে একটি টেবিলেরপাশে [illegible] গেল এবং তৎসমুদায়ই যে তাহাদিগের স্বহস্তকৃত, [illegible] বলিয়া দিল।

চারিদিকে চাহিয়া, একটি বই দুইটি কুঠারী দেখা গেল

হ্যামারফেষ্ট

না; তাও আবার এত সংকীর্ণ যে, আমাদিগের বঙ্গীয় দেহের স্বাভাবিক পরিসর লইয়া, দুচারটি প্রাণীর সচ্ছন্দে ইহাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, কোন মতেই সম্ভবপর নহে। এক কোণে আবার রন্ধনসম্পর্কীয় যাবতীয় সামগ্রী মজুত আছে। ইহাদিগের আহার্য্য বস্তুর পাক-প্রণালী এত অল্প সময়-সাপেক্ষ, যে আমরা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই তাহাদের মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন সমাপ্ত হইয়া গেল! একটি লোহার ষ্টোভে, উপর্য্যুপরি তিন চারিটা পাকস্থালীতে সব্‌জী ও মৎস্যাদি মসলা-সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই একমাত্র ব্যঞ্জন ও রুটিই ইহাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্য। সান্ধ্য-ভোজনে নাকি ইহার কিছু পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহারা বড় মাংসাশী নহে। মোট কথা, ঐ জিনিষটা এই জলসমাকীর্ণ ক্ষুদ্র স্থানে সংগ্রহ করাই যায় না। তাহার পর সেই কোণেই মেজেতে একটি খোঁড়া গর্ত্তের ভিতরে ছোট একটি বাল্‌তি ফেলিয়া, তাহা টানিয়া তুলিয়া, তাহারা জলের জোগাড় করিল। আমরা ইহাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এই ক্ষিপ্র কার্য্য-কুশলতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। এ সমুদায় বন্দোবস্ত থাকিবার কারণ এই, এ জায়গায় বৃষ্টি এত বেশী হয়, যে ঘরের বাহিরে বড় কেহ যাইতে পারে না; তা ছাড়া শীতাধিক্যত আছেই। তারপর দেখা গেল যে, আহারের স্থান ও বিশ্রাম উপভোগের ব্যবস্থা সংকীর্ণভাবে সকলই রহিয়াছে; তবে সবই যেন শিশুদের খেলার উপযোগী উপকরণ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। আচ্ছা! এসব ত বেশ দেখা গেল, কিন্তু শয়নের সরঞ্জামের ত কোনই সন্ধান পাইতেছি না! ভাবিলাম, অবশ্যই স্বতন্ত্র কামরা আছে। কিন্তু এ হেন কল্পনার আশ্রয়ে আমাদিগকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না। সেই স্থবিরা স্মিতমুখে, একখানি পত্রপুষ্পপরিশোভিত

পরদা, দেয়ালের গায় হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক এক অভিনব দৃশ্য দেখাইলেন। বস্তুতঃ এ দৃশ্য এ জন্মে আর দেখিব বলিয়া মনে হয় না। ইহাকে শয়নাগার না বলিয়া শয্যা-বিভ্রাট বলাই বেশী সঙ্গত হইবে, বোধ হয়। একটি প্রাচীর-সংলগ্ন আলমারীর থাকে থাকে চারিটি প্রাণীর শয্যা পাতা রহিয়াছে, এবং দর্শকবৃন্দের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য, ইহার প্রত্যেকটিতে এক একটি শিশু শোওয়াইয়া রাখা হইয়াছে। কোথাও একটি ছিদ্রও নাই যে, তাহা দ্বারা বাহিরের নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিয়া, অভ্যন্তরের দূষিত বায়ুকে বহির্গত করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য যে, সেই লোচন-গ্রাহিণী নিদ্রাদেবীর এস্থলে দয়ার এই অযাচিত পক্ষপাতিতা দেখিয়া, আমরা কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলাম। আমাদের এত সাধাসাধনায়ও তাঁর মন পাওয়া যায় না কেন? আমরা 'নিশিভোর' দ্বার বিমুক্ত রাখিয়া একান্তে তাঁর নিঃশব্দ পদসঞ্চার প্রতীক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু তিনি অনেক সময়ই তাহা উপেক্ষা করিয়া, অকারণ আমাদের দেহমনের নিপীড়ন করিতে ছাড়েন না। আর এরা এই প্রকৃষ্টরূপে আবদ্ধ একটি ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে, গাত্র ঢালিবা-মাত্রই তিনি যে নেত্রে জুড়িয়া বসিয়া, পরম মিত্রবৎ আচরণ করেন!—ইহাকে পক্ষপাতিতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে!

এই বদ্ধাবস্থা দেখিতেই আমাদের প্রাণ-বায়ু যেন রুদ্ধ হইয়া আসে, অথচ এদের তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। জানি, জন্মাবধি এভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আমাদেরও ইহা অভ্যস্ত হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের দৃশ্য বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে, তন্নিবাসী-দিগের আচারপদ্ধতির পার্থক্য দেখিয়া, ক্ষুদ্র প্রাণও যে কি পরিমাণে প্রসারতা লাভ করে, ভাবিলে আশ্চর্য্যবোধ হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার নব নব সৃজনী-শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, অন্তরে যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়, ইহাই দেশ-পর্য্যটনের স্থায়ী ফল মনে করি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আনমনে আরও দুই চারিটি কুটীরের ভিতর-বাহির প্রদক্ষিণ করিতেছি, এমন সময় আমাদের তত্ত্বাবধায়ক স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, আমরা এস্থানের সাময়িক পরিদর্শক মাত্র;—আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনে তৎপর হইলাম। তখন কুটীরবাসী-দিগের করুণ দৃষ্টি আমাদের কাণে কাণে যেন কি কথা কহিতেছিল, প্রথমে তাহা কিছুই বোধগম্য হয় নাই। তাহার পরেই মনে হইল, ইহাদের এহেন শিষ্টাচারের বিশিষ্ট পুরস্কার পাওয়া চাইত! একথা আমাদের বেমালুম বিস্মৃত হওয়া ন্যায়সঙ্গত হয় নাই বুঝিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইলাম, এবং আমাদের ইঙ্গিত-মত, তৎক্ষণাৎ প্রসারিত দুই চারিটি দক্ষিণ হস্তে কুক কোম্পানী হইতে গৃহীত কয়েক খণ্ড তদ্দেশীয় রজতমুদ্রা দান করিয়া, অবিলম্বে বিদায় গ্রহণ করিলাম। খেয়াঘাটে আসিয়া দেখি, যেন চূড়ামণি-যোগ উপস্থিত। তবে এ সেই পূতসলিলা পুণ্য-প্রবাহিণী জাহ্নবী নয় যে শৈত্যের প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া, প্রাণের আবেগে ইহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, দেহমনের মলিনতা বিধৌত করিয়া লইবে। সামান্য সরিৎসমুদ্রকে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত করিয়া লইতে, এদেশের লোকের প্রবৃত্তি হয় না। শুনিলাম, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, নাকি এরা অকারণ স্নানাদিতে বৃথা সময় নষ্ট করে না। পূজা-পার্ব্বণের তাড়াও নাই যে, অন্ততঃ পক্ষে বৎসরান্তে দুই চার দিন, ধর্ম্মের খাতিরে দেহকে জলস্পর্শ করাইতে হইবে। প্রত্যহ এই কাপড় কাচায়, আর গা মাজায় কি আমাদের কম সময়টা যায়? এসব বালাই এদের নাই।

এবার অন্য পথে গিয়া ওপারে ফিরিলাম। কিন্তু কেমন স্থানে যে ফিরিলাম, তাহা আর কহতব্য নয়। এতদিন কেবল সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিয়া, এইটি বড় বদ অভ্যাস হইয়াছে যে, বিশ্রী কিছুই যেন বরদাস্ত হইতে চায় না। এ কি বিষম বিড়ম্বনা! আমাদের দেশে কি সবই শোভন? সকলই নয়ন-রঞ্জন? তবে?—এই "তবের" ভিতর একটু তাৎপর্য্য আছে। বলিতে কি, এই ভুবন-মোহন দেশে যে, এ হেন কদর্য্য স্থানও আছে, আমাদের কল্পনার সীমানার মধ্যেও তা আসে নাই। আর এমন স্থান থাকিলেই বা বিদেশী দর্শকবৃন্দকে তাহা দেখাইতে হইবে, এমনই বা কি কথা? কাজেই কুক-বাহাদুরের আমাদিগকে এই অপথে লইয়া আসিবার আবশ্যকতা বোধগম্য না হওয়ায়, সকলেরই মুখমণ্ডলে বিরক্তির রেখা দেখা দিল। বিধিরক্তে এমন সময় এতৎ-স্থলে একটি অমলধবল দিব্যধামের দর্শন পাওয়ায়, চকিতে সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। এই ভবনটির

ভিতরে অবশ্যই ভোজনের আয়োজন আছে, ইহা অনুমান মাত্রই, সর্ব্ব উগ্রভাব অতিক্রম করিয়া উৎফুল্লতা আসিয়া সকলকে প্রফুল্ল করিয়া দিল। এও কি কখন সম্ভব যে, এত বড় কুক কোম্পানী, একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া, এত লোকের সংরক্ষণের ভার লইয়া স্থানটি মন্দ বলিয়া, সকলকে উপবাসী রাখিয়া দিবে? তারপর মন্দ স্থানই বা বলা কেন? মৎস্যজীবীদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা দেখিতে আসিয়াছ, এস্থান যে পদ্মগন্ধপরিপূর্ণ হইতে পারে না, সেত জানা কথাই ছিল। যেখানে হাজার হাজার মৎস্যের কারবার, এবং এদেশের ফিরিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক যেন সন্ধান করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সে তৎক্ষণাৎ সন্তানের ঠিকানাসহ এক-খণ্ড কাগজ আমাদিগের হস্তে প্রদান করিল। পুত্রস্নেহের এ হেন অভিব্যক্তি দেখিয়া, বস্তুতঃই সে সময়ে অভিভূত হইয়া, সেই সরল পিতৃপ্রাণের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া, নিজের কাছে বড়ই অপরাধী আছি।

আমাদের আজকার যাত্রার Romance এর এখনও ইতি হয় নাই জানিয়া, মা দুর্গতিনাশিনীকে স্মরণ করিয়া,

সেণ্ট জনস্‌পয়েণ্ট—বার্গেন্

বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পসার, সেইটি না দেখিয়া যাওয়াই কি বড় সঙ্গত হইত? না হয়, যে-সে জায়গায় আহার-কার্য্য সমাধান, সকলের রুচিকর হয় না। তা নাই বা হ'ল! এক বেলার অনাহারে কেহ কি কখনও মারা পড়ে? বিশেষ বঙ্গবাসিগণ? তাহাদের কয়জনেরই বা পেটে ... না অন্ন জোটে! আমাদিগের সে স্থান হইতে প্রস্থানের ... সে হোটেলের ম্যানেজার মহাশয় একখানি পুস্তক ... উপস্থিত হইয়া, আমাদিগকে তাহাতে স্ব স্ব নাম-ধাম ... করিতে অনুরোধ করিলেন। আমাদিগের লিখিত "Calcutta" শব্দটি নজরে পড়িবা মাত্র সে ব্যক্তি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ব্যক্ত করিতে চাহিল যে, তাহার এক পুত্র ... কি এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, আমরা দেশে

আবার যাত্রা করিলাম। এবার জলপথে, ছোট এক নালার মধ্য দিয়া, নৌকাযোগে গমন। কিন্তু তত্রস্থিত তরণী সকলের আকৃতি দেখিয়া, তাহাতে আরোহণ করিতে চিত্তে তেমন প্রলোভন জন্মিল না। তবে কদাকারেও অদ্ভুত কার্য্যদক্ষতা থাকিতে পারে, এই আশায় প্রণোদিত হইয়া, সকলে মিলিয়া, উঠিয়া সার বাঁধিয়া বসিলাম। ঊর্দ্ধে মুক্ত আকাশে, তখন তপনদেব বিরাজমান দেখিলাম। কিন্তু আজ তাঁর প্রত্যক্ষ-দর্শন এবং মস্তকোপরি তাঁর এই অজস্র তেজঃস্বরূপিণী করুণাবর্ষণ ভাগ্য বলিয়া মানিতে পারিতেছি না। ক্লান্তকলেবর ইহার অন্তরায় হইয়া আছে। চট্‌পট্ যে তাঁর প্রচণ্ড লোচনের তীব্র দৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে অন্তর্হিত করিব, তরীবাহকের

জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ্‌কুল পুষ্পিত হইলে, উহাদের সৌরভ যখন প্রাতঃ ও সান্ধ্য সমীরণ-প্রবাহ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয়, তাহার নিকট ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সুখের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয় না। তখন "দিল্লীশ্বরো বা পরমেশ্বরো বা" কথা কয়েকটি তাহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া, এবিষয়ে অধিক ভূমিকা লেখা বাহুল্য মাত্র।

জলোদ্যানের চিত্র

জলজ উদ্ভিদকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়;—জলজ (Aquatic plant) বিলজ (Marsh or Bog plant ও অন্তর্জ্জল (Subaquatic plant)। যাহা জলে জন্মে উহাকে জলজ, যাহা দাম-দল বা তদ্রূপ জঙ্গল-পূর্ণ অতিশয় আর্দ্র বা অত্যন্ত জলযুক্ত জলাভূমিতে জন্মে, উহাকে বিলজ এবং যাহা জলাশয়ের পার্শ্বে বা সামান্ত-স্থলে জন্মে, উহাকে অন্তর্জ্জল-উদ্ভিদ্ কহে।

স্বভাবতঃ জলাশয়ের অভাবে কৃত্রিম খাল, বিল, ঝিল ও হ্রদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতেও জলজ, বিলজ ও অন্তর্জ্জল উদ্ভিদের চাষ করা যায়। জলাশয়ের ধারে পাকা চৌবাচ্চা (Reservoir) বা তদ্রূপ কৃত্রিম জলাশয় প্রস্তুত করিয়া, উহা প্রস্তর বা ইষ্টকখণ্ড দ্বারা পূর্ণ করিয়া, উহাতেও এই সকল উদ্ভিদের চাষ হইতে পারে। ইহার সহিত দমকল (Pump) সংযুক্ত করিলে, ইহাকে সর্ব্বদাই জলপূর্ণ রাখা যায়। জলাশয়ের জলপূর্ণ স্থানের অদূরে চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিতে হয়। ঐরূপ জলাশয় সর্ব্বদাই জলপূর্ণ থাকা প্রয়োজন। নচেৎ জলোদ্যান ও বিলোদ্যানের সৌন্দর্য্য রক্ষা হয় না।

জলজ উদ্ভিদ্ মধ্যে যেগুলির সুন্দর সুন্দর পুষ্প হয়, তাহাদের বিবরণ পাঠকগণকে অবগত করাইতে ইচ্ছা আছে। অদ্য কুমুদ-পরিবারের বিবরণ লিখিত হইল।

নিম্ফিয়া Nymphia কুমুদ। Water Lilies. Natural order. Nympheaceæ.

ইহারা সর্ব্বজনপরিচিত জলজ উদ্ভিদ্। ইহাদের পরিবার বৃহৎ। অধিকাংশের জন্মস্থান গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহ। শীতপ্রধান দেশেও বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর জাতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ, মালয় উপদ্বীপে, সিংহল, ও আফ্রিকার অন্তর্গত মিশরদেশ অতি সুন্দর সুন্দর জাতির অধিবাস-ভূমি। চীন, জাপান, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতেও সুন্দর সুন্দর জাতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ফলতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহারা জন্মিয়া থাকে। ইহাদের ফুলের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। অধুনা ইহাদের বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতিরও উৎপত্তি হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে ইহাদের পরস্পর সঙ্গম কার্য্য সাধন করিয়া, এই সকল সঙ্কর জাতির উৎপাদন হইয়াছে। উদ্যানস্থ পুষ্করিণী, কৃত্রিম হ্রদ, খাল ও বিল ইত্যাদি জলাশয়ের শোভাবৰ্দ্ধন জন্য উহাতে ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। আবার গৃহের শোভা-বৰ্দ্ধন জন্য গামলা বা চাড়িতেও ইহাদের চাষ হয়। কোন কোন জাতি ঘরের বারিন্দায় চাষেরও উপযোগী। ইহাদের ফুলফল ও পত্র বড়ই নয়নানন্দদায়ক। এদেশীয় জাতি অপেক্ষা আফ্রিকা ও ইউরোপজাত কুমুদ সকলই অধিক সুন্দর। প্রথমোক্ত জাতির চাষের পক্ষে গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশ ও শেষোক্ত জাতির চাষের পক্ষে শীত-প্রধান দেশই বিশেষ উপযোগী। শীতপ্রধান দেশজাত জাতি মধ্যে কোন কোন জাতি এদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশের এবং কোন কোন জাতি নিম্ন প্রদেশেরও উপযোগী। শীতপ্রধানদেশে কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের সৃষ্টি করিয়া, উষ্ণ-গৃহে গ্রীষ্মপ্রধানদেশ-জাত কুমুদের চাষ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী ও অষ্ট্রেলিয়াতে কুমুদের চাষ একরূপ নেশার মধ্যে পরিগণিত। এদেশে ইহাদের চাষ হয় না। এদেশের নানাবিধ আবদ্ধ জলাশয়ে, বিল, ঝিল ও জলাভূমিতে এমন কি জলযুক্ত

শস্যক্ষেত্রে ও নালা (নালী) প্রভৃতিতে স্বভাবতঃই ইহারা জন্মিয়া থাকে।

কোন কোন জাতি ঔষধে ব্যবহার হয়। এইজন্য কেহ কেহ বসতবাটীর প্রাঙ্গণস্থ পুষ্করিণী বা তদ্রূপ জলাশয়ে ইহাদের ২।৪টি গাছ রোপণ করিয়া থাকে। ইহাদের চাষ-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহাদের নামের পরিচয় দেওয়াই সঙ্গত সুতরাং ইহাদের বিভিন্ন নামের পরিচয়ই সর্ব্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করিব। ইহার আভিধানিক নাম কুমুদ,

[illegible]

শ্বেতোৎপল, [illegible], রক্তাম্ল, কৈরব, কুবলয়, কহ্লার, শীতলক, শশিকান্ত, ইন্দুকমল, চন্দ্রিকাম্বুজ ও উৎপলিনী। ইহাদের ফুল দিবসে মুদ্রিত ও রজনীতে প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া, চন্দ্রকে কুমুদ-বান্ধব, কুমুদিনী-প্রাণবল্লভ, কুমুদনাথ, কুমুদানন্দ, কুমুদিনী-নায়ক ও কুমুদিনীপতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কুমুদিনী ও কুমুদ্বতী শব্দে কুমুদসমূহ বা কুমুদের ঝাড়কে বুঝায়। "কু" শব্দে 'পৃথিবী' ও "মুদ্" শব্দে 'হৃষ্ট হওয়া' বুঝায়। সুতরাং যে ফুলের সৌন্দর্য্যে পৃথিবী (পৃথিবীর লোক) হৃষ্ট হয়, উহাই কুমুদ। কুমুদ শব্দ ক্লীবলিঙ্গবাচক। কিন্তু কুমুদিনী, কুমুদ্বতী ও কুমুদ্বতী শব্দ কয়েকটি স্ত্রী-লিঙ্গ-বাচক। ফলতঃ কুমুদ ও কুমুদিনী প্রভৃতি শব্দ প্রায় একই অর্থবাচক। কেবল শব্দের মিষ্টতা ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যই কুমুদিনী প্রভৃতি নামের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার চন্দ্রের সহিত ইহাদের নিকট সম্বন্ধ দেখাইবার অভিপ্রায়েই সম্ভবতঃ চন্দ্রকে কুমুদবান্ধব, কুমুদিনী-প্রাণবল্লভ ও কুমুদনাথ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই জাতির অধিকাংশ ফুলই সূর্য্যাস্তের পরে প্রস্ফুটিত হয়। অন্ধকার রাত্রিতেও ইহাদের ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে; সুতরাং চন্দ্রমালোক-বিভূষিত রজনীই যে, ইহাদিগের বিকাশ-কার্য্যের সহায়, তাহা ঠিক নহে। তবে চন্দ্রালোকযুক্ত রজনীতে ইহাদের সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ উপলব্ধি হয় বলিয়াই সম্ভবতঃ চন্দ্রের সহিত ইহাদের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে দৃষ্টিং।
ন নন্দয়তি সংস্মরণীয় শোভা॥"

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কুমুদকে পদ্ম-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে পুণ্ডরীক, সৌগন্ধিক, রক্তপদ্ম, কুমুদ এবং শ্বেত, নীল ও রক্তভেদে ত্রিবিধ উৎপলকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। শ্বেত, নীল ও রক্তোৎপলকে ক্ষুদ্র-উৎপল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্ববঙ্গে সাবলা ও শালুক নামে পরিচিত। দেশীয় কুমুদ-সকল শরৎকালে ও কোন কোন জাতি শীতকালেও পুষ্পিত হয়। পদ্ম ও কুমুদ আয়ুর্ব্বেদমতে একই পরিবার-ভুক্ত উদ্ভিদ্। ফুলের ও পাতার আকৃতিগত পার্থক্য দ্বারা ইহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে মাত্র। ইহারা শরৎকালে প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া, সম্ভবতঃ ইহাদিগকেই আয়ুর্ব্বেদে শরৎ-পদ্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্বেত ও রক্তপদ্ম গ্রীষ্মকালে প্রস্ফুটিত হয়। রক্তপদ্ম বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদোক্ত শরৎপদ্ম অর্থে কুমুদ বা রক্তপদ্ম উভয়ের কোনটিকে উদ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। আয়ুর্ব্বেদে পদ্ম ও কুমুদের গুণ ও ক্রিয়া একই রূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং নামের গৃঢ়ার্থ-জনিত দোষে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কুমুদ ও কহ্লার একই পর্য্যায়-বাচক শব্দ। কিন্তু কোন কোন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যের মতে ইহারা বিভিন্ন জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পদ্ম-মূল সহিত কুমুদ-মূলের কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই। পদ্ম-মূলের শালুক (tuber) হয় না। ইহার মূল লতা-

স্বভাব ও গ্রন্থিল। কুমুদমূল গোলাকার ও কন্দজাতীয় (tuberous)। এই কন্দ পূর্ব্ববঙ্গে শালুক ও ফল ভেট্ নামে পরিচিত।

পদ্মপত্র, পদ্মমূল, পদ্মফুল ও পদ্মফল (চাক), কুমুদপত্র, কুমুদমূল, কুমুদফুল ও কুমুদফল (ভেট্) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নাকৃতি। কুমুদফল গোলাকার ও সবুজ বর্ণ। পাকিলে মলিন সবুজ বর্ণ ধারণ করে। পদ্মফলের নিম্নভাগ দীর্ঘাকার, ক্রমে সরু, উপরিভাগ চেপ্টা, শ্বেতাভ সবুজ বর্ণ। গঠন মৌচাকের ন্যায়। কুমুদ ফল, পরিপক্ক হইলেই ইহার বীজকোষ ফাটিয়া যায়। তখন ইহার বীজসকল বীজ-কোষ হইতে স্খলিত হইয়া ভূপতিত হয়। পদ্মফল পরিপক্ক হইলে, উহার বীজও গর্ভকোষ হইতে স্খলিত হইয়া ভূপতিত হয়। পদ্মের ডাঁটা (পত্রবৃন্ত) কঠিন ও কণ্টকযুক্ত। কুমুদের পত্রবৃন্ত কোমল, রসাল ও কণ্টকহীন। পদ্মপত্র পদ্মফলের বর্ণ। কুমুদপত্র পীতাভ সবুজ বর্ণ, কুমুদকন্দ বা শালুক কৃষ্ণবর্ণ ও তুলার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। শস্য পীত বা পীতাভ শ্বেতবর্ণ। উপরিভাগ (ত্বক্) ঈষৎ রক্তবর্ণ। পদ্মমূল ভূমিতে লতাইয়া যায় ও গ্রন্থিযুক্ত। এই মূলই ইহার প্রকৃত কাণ্ড। প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় বহির্গত হইয়া, মৃত্তিকায় প্রবেশ করে। পূর্ব্বোক্ত মূল বা কাণ্ড হইতে ডালপালা বহির্গত হইয়া, প্রত্যেক ডালের অগ্রভাগে একটি নূতন গাছের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কুমুদ-মূল সেরূপ নহে। ইহার শালুক বা কন্দমূল হইতে পত্রের সহিত পত্রবৃন্ত ও পুষ্পের সহিত পুষ্পবৃন্ত বহির্গত হয়। পদ্মের লতা-গ্রন্থি হইতে ফেকড়ির ন্যায় শিকড় বহির্গত হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করে। কাণ্ডগ্রন্থি ও কাণ্ডের ডালপালার গ্রন্থিস্থল হইতে পত্রের সহিত পত্রবৃন্ত ও পুষ্পবৃন্তের সহিত পুষ্প বহির্গত হয়। পদ্মবীজ বৃহৎ ও দীর্ঘাকার এবং উহার বহিরাবরণ কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ। কুমুদ-বীজ ক্ষুদ্র ও গোলাকার। উহার বাহ্যাবরণ পদ্মফলের বাহ্যাবরণ অপেক্ষা কোমল। সুতরাং পদ্ম ও কুমুদ এক পরিবারভুক্ত হইলেও একস্বভাব বা একজাতীয় উদ্ভিদ্ নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কুমুদের বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইবে। কুমুদপত্র (কচি ও বৃদ্ধ), পুষ্প ও কন্দ, ঔষধে ব্যবহার হয়।

কুমুদ-বীজের খই, মুড়কী, মোঁয়া ও মোদক অতি সুখাদ্য। যে প্রণালীতে ধানের খই প্রস্তুত হয়, ইহার খইও ঠিক সেই প্রণালীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীপূজায় ইহার খইয়ের মোয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীপূজার দিন ইহার খই খাওয়া একরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। দুর্গোৎসবেও ইহার শালুক ব্যবহার হয়। ইহার পুষ্পবৃন্তের উপরের ত্বক্ ফেলিয়া দিয়া, উহার শাঁসাল অংশ তরকারী-স্বরূপে ব্যঞ্জনে ব্যবহার হয়। ইহার ছেঁচ্‌কি বা চচ্চড়ি সুখাদ্য। ইহার শালুক বা কন্দ কাঁচা বা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ সময়ে ইহার বীজ ও কন্দ দ্বারা খাদ্যের অভাব কতকাংশে পূর্ণ হয়। ইহার মূল দ্বারা এরোরুটের ন্যায় একরূপ খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহার পুষ্প ও

নিম্ফিয়া মোরিওসা— ১০ নং

পত্রবৃন্তের মালা প্রস্তুত করিয়া, পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বালক-বালিকাগণ গলায় পরিয়া থাকে। পুষ্পবৃন্তের ত্বক্‌জাত সূত্রও কখন কখন রশি বা রজ্জুস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার দৃঢ়তা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। সেইজন্য ইহা দ্বারা রজ্জুর ব্যবসায় চলে না। ইহার ফুল দেশীয় রমণীগণ খোপায় ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের কোন কোন জাতির ফুল সুগন্ধযুক্ত এবং কোন কোন জাতির ফুলে মধুও আছে।

ইহাদের কোন কোন জাতি গভীর ও কোন কোন জাতি অগভীর জলে চাষের উপযোগী; শেষোক্ত জাতি গামলায়, চাড়িতে ও একোয়ারিয়াতে (Aquaria) চাষের উপযোগী। পুরাতন পুকুর ও বিলঝিলের তলস্থ মৃত্তিকা

ইহাদের চাষের পক্ষে উপযোগী। বর্ষাবিধৌত পলি ও কর্দ্দম-মৃত্তিকাও ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। ক্রমনিম্নতল পুকুরে নানাজাতি কুমুদের চাষ একই সময়ে হইতে পারে। পুকুর কাটিবার সময় উহাতে ক্রমোচ্চ ও ক্রমনিম্ন বগচর (Bank) রাখিতে হয়। জাতি-বিশেষে ইহাদের গাছ ঐ সকল বগচরে রোপণ করিতে হয়। কোন কোন জাতি কেবল আর্দ্র স্থানে, কোন কোন জাতি গভীর জলে ও কোন কোন জাতি অগভীর বা অল্প গভীর জলে সহজে বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য পুকুরের তলা ঢালুভাবে কর্ত্তন করা সঙ্গত। তাহা হইলে একই স্থানে নানাজাতি কুমুদের সমাবেশ হইতে পারে। কোন কোন জাতির জন্য সর্ব্বদাই জলাশয়ে বা গামলায় জল থাকা প্রয়োজন। আবার

নিম্ফিয়া বাবিয়ানি ৭৭ নং
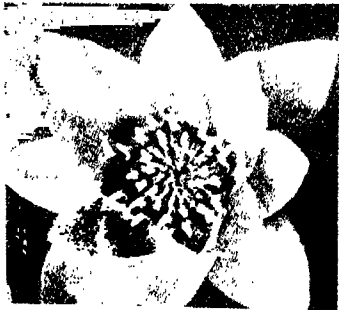
কোন কোন জাতির জন্য বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জল থাকার প্রয়োজন হয় এবং কোন কোন জাতির জন্য কোন কোন সময় শুষ্কতারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শীতকালেই ইহাদের জন্য শুষ্ক অথচ আর্দ্র স্থানের আবশ্যক হয়। এদেশের নিম্নভূমিতে বর্ষাকালে কোন কোন জাতি পুষ্পিত হয়। আবার শীতকালে ঐরূপ ভূমি শুষ্ক হইলে, উহাদের মূল ভূমিতেই থাকিয়া যায়। গ্রীষ্মারম্ভে পুনরায় উহাদের মূল হইতে নূতন গাছ বহির্গত হয়। ধান্য-ক্ষেত্রেও ইহারা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে উচ্চ স্থানের মাঠ সকল ধৌত হইয়া নিম্নস্থানে যে কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকা জমিয়া থাকে, উহাই ইহাদের পক্ষে সারের কার্য্য করিয়া থাকে। চাড়ি বা গামলাতে কি একোয়ারিয়াতে ইহাদের চাষ করিতে হইলে, পচা উদ্ভিজ্জ-সার, অস্থিসার, ও সোরাসার অল্প পরিমাণে গামলার মৃত্তিকায় ব্যবহার করিলে, ইহাদের ফুলের সমধিক উৎকর্ষ হয়। অস্থিসার ব্যবহার করিতে হইলে, উহার ব্যবহারের পূর্ব্বে গন্ধকদ্রাবকে দ্রব করিয়া লইতে হয়। গামলা বা চাড়িতে ইহাদের চাষ করিতে হইলে, উহাতে তৃণাদি জঙ্গলা গাছ জন্মিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। সসার দোঁয়াশ মৃত্তিকাও এই চাষের পক্ষে উপযোগী।

অধুনা এই চাষ পৃথিবীর নানাদেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। পুকুর, খাল, বিল, ঝিল, হ্রদ ও সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ের উপরিভাগ সুশোভিত করার জন্য, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ায় বহুল পরিমাণে ইহাদের চাষ হইতেছে। ঐ সকল জলাশয়ের জলভাগ কুমুদকহ্লার প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ্ দ্বারা এবং জলের পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ নানাবিধ গুল্মাদি দ্বারা সুশোভিত করা হয়। এইরূপ জলোদ্যানের বিচিত্র দৃশ্য অতিশয় মনোহর। ইংলণ্ডে গৃহ-প্রবেশ-দ্বারের ও পথের দুই পার্শ্বে, পার্ক (Park) উদ্যান ও ঘরের বারিন্দা, কুমুদ গাছ দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এরূপ সজ্জার জন্য গামলা বা চাড়িতে ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। চাড়িতে গাছ রোপণ করিয়া উহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়। এবং উহা সর্ব্বদা জলপূর্ণ রাখা হয়। ঐ সকল দেশে মে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কুমুদ গাছ পুষ্পিত হইয়া থাকে। এদেশেও প্রায় এই সময়েই ইহারা পুষ্পিত হয়। এদেশের নিম্নপ্রদেশে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে মাঘ ও ফাল্গুন মাসে ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। শীত প্রধান দেশেও এই সময়েই ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। শীতপ্রধান দেশে এপ্রেল মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্তও ইহাদের গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। জাতি-বিবেচনায় রোপণের সময় নির্দ্দিষ্ট হয়।

সুন্দর সুন্দর জাতির চাষ করিতে হইলে, বিদেশ হইতে উহাদের মূল বা বীজ আমদানি করিতে হয়। গাছ আমদানী করিলে, উহারা এদেশে পঁহুছিবামাত্র উহাদিগের মূল নেকড়া বা শৈবাল দ্বারা জড়াইয়া জলে ডুবাইতে হয়। সূর্য্যোত্তাপে উহাদের গাছের বা মূলের কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। গাছের মূল ও পাতা কিছুতেই শুষ্ক না হইতে পারে, ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এইরূপে ২।৪ দিন গাছকে রক্ষা করিবার পরে যখন উহারা আংশিক তেজস্বিতা লাভ করিবে, তখন উহা-

দিগকে ঝাঁকায় বা গামলায় রোপণ করিয়া, এক বা দেড় ফুট গভীর জলে ডুবাইয়া রাখিবে। স্রোতোহীন জলে ডুবাইয়া রাখাই সঙ্গত। এই সকল গাছ হইতে নূতন শিকড় বহির্গত হইলে, পুনরায় উহাদিগকে উঠাইয়া যথাস্থানে রোপণ করিবে। স্রোতোহীন জলে না ডুবাইয়া স্রোতযুক্ত জলে ডুবাইলে স্রোতের আঘাতে নব উপ্ত গাছের ক্ষতি হইবারই অধিক সম্ভাবনা। খরস্রোতবিশিষ্ট জলাশয় সেইজন্যই ইহাদের চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। সুতরাং স্রোতোহীন, মন্দস্রোত, বা আবদ্ধ জলাশয়ই ইহাদের চাষের পক্ষে উপযোগী। বীজ ও মূলদ্বারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়।

বীজ হইতে গাছ উৎপাদন করিতে হইলে, ইহাদের বীজকে মৃত্তিকার গোলায় রোপণ করিয়া, ঐ সকল গোলা জলে নিক্ষেপ করিবে। অথবা গোলা জলপূর্ণ গামলাতে রোপণ করিবে। উহাতে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, গাছ উৎপন্ন হইলে, ঐ সকল গাছ যথাস্থানে রোপণ করিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে বীজ রোপণ করিয়া, বীজের সহিত ঐ সকল পাত্র, জল ও মৃত্তিকাপূর্ণ বড় গামলায় ডুবাইয়া রাখিয়াও বীজ দ্বারা গাছ উৎপন্ন করা যায়। এই সকল ক্ষুদ্র পাত্রে বীজ অঙ্কুরিত হইলে, পাত্রের সহিত গামলাটিকে জলে ডুবাইয়া রাখিবে। ২।৩ মাস মধ্যে উহাদের বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন হইবে। গাছগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, উহাদিগকে ক্ষুদ্র পাত্র হইতে বাহির করিয়া যথাস্থানে রোপণ করিবে। ইহাদের বীজকে ঘরে রাখিলে, উহার উৎপাদিকা শক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সেই জন্য বীজ পরিপক্ক হইবার অব্যবহিত পরেই উহাদিগকে রোপণ করিতে হয়। ইহাদের বীজ দূরদেশে পাঠাইতে হইলে, জলপূর্ণ শিশিতে পুরিয়া, উহার মুখ ছিপি দ্বারা দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া পাঠাইতে হয়। জলে রক্ষিত বীজের উৎপাদিকাশক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয়। ইহাদের গাছ বা মূল দূরদেশে পাঠাইতে হইলে, উহাদিগকে শৈবাল দ্বারা জড়াইয়া ২।১ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে উহাদিগকে শৈবালপূর্ণ বাক্সে পুরিয়া দূরদেশে পাঠাইতে হয়। আবার ইহাদের মূলকে ঘরে রাখিয়া মৃদু সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিয়া, তৎপরে শৈবাল গুঁড়া,

নিম্ফিয়া মার্লিয়াসিয়া জাতির সংকর

(Powdered moss) করাতের গুঁড়া (Saw dust) বা নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়াপূর্ণ বাক্সে পুরিয়াও দূরদেশে পাঠান যায়। উভয় অবস্থায়ই ইহাদের মূল মাসাধিক কাল তাজা থাকে।

ইউরোপে যে প্রণালীতে ইহাদের চাষ হইয়া থাকে, উহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। তথায় সম্পূর্ণ সূর্য্যকিরণযুক্ত স্থানে ও আবদ্ধ জলাশয়ে ইহাদের চাষ হয়।

২। ক্ষয়প্রাপ্ত গোবরের সার ও কঠিন দোয়াঁশ মৃত্তিকাতে ইহাদের চাষ হয়। ইহাদের চাষে পুকুর বা নদীতলস্থ মৃত্তিকার ব্যবহার হয় না।

৩। মে মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ইহাদের গাছ রোপণ করা হয়।

৪। অধিকাংশ জাতির চাষ ১৮ ইঞ্চি হইতে ২৪ ইঞ্চি জলযুক্ত গামলায় হইয়া থাকে। কোন কোন জাতি ৯ ইঞ্চি হইতে একফুট গভীর জলেও চাষ হইবার যোগ্য। অত্যধিক মৃত্তিকার নীচে ইহাদের মূলরোপণ করা হয় না। তাহা হইলে, আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। গভীর জলে ইহাদের চাষ করিলে, জলাশয়ে যে স্থানে ইহাদের চাষ করিতে হইবে, ঐস্থান মৃত্তিকা দ্বারা উচ্চ করিয়া, উহার উপর ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়।

৫। ঝাঁকায় রোপণপ্রথাই তথাকার চলিত রীতি। ঘাসমূলযুক্ত মৃত্তিকাদ্বারা ঝাঁকা পূর্ণ করিয়া, উহাতে ইহাদের গাছ বা মূল রোপণ করা হয়। তৎপর ঐ ঝাঁকাকে জলে ডুবাইয়া রাখা হয়।

৬। স্রোতোজলে ইহাদের চাষ হয় না।

৭। অধিকাংশ সময়েই গামলায় ইহাদের চাষ হয়।

৮। অন্যূন তিন ফুট গভীর গামলার ব্যবহার হয়।

৯। গামলায় চাষ করিলে প্রতিদিন উহার জল পরিবর্ত্তন করা হয়। পরিষ্কার জলে ইহারা স্ফূর্ত্তিলাভ করে বলিয়াই জল পরিবর্ত্তন করার আবশ্যক হয়।

১০। মে কি জুন মাসের পরে ইহাদের গাছ রোপণ করিলে, ঐ গাছকে কিছুকাল বিশ্রাম দেওয়া হয়। উহাদের মূল হইতে নূতন গাছ বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে স্পর্শও করা হয় না।

ইহারা বৃহৎ পরিবারবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান জাতির বিবরণ লিখিত হইল।

জলোদ্যানে নিম্ফিয়া মালিয়াসিয়া এল্‌বিডা--৫২ নং
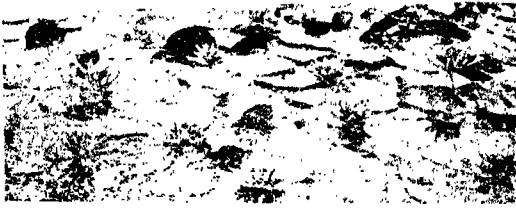
১। নিম্ফিয়া লোটাস্—Nymphea Lotus. শ্বেত-কুমুদ। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ। পুষ্পাবরকপত্র বা পাপড়ি দলকলের বহির্ভাগ সবুজবর্ণ। ইহা বঙ্গদেশে শ্বেতশালুক বা শ্বেত সাবলা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ;—

"শ্বেতকুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা।"

অর্থাৎ শ্বেতকুমুদের নাম কুবলয়, কুমুদ ও কৈরব।

বঙ্গদেশে ইহা সালুক ও সাবলা; হিন্দুস্থানে কোঙ্গি, কমোদিনী, ও বঘোলা; মহারাষ্ট্রে পাটরেং ও উৎপল; কর্ণাটে বিলেয়েতেইটিলু; গুজরাটে পোয়না; তৈলঙ্গে কলুবলুগুে, কোলিমু ও কলুবপুব্ব নামে পরিচিত।

ইহা স্নিগ্ধ, মধুর-রস, আহ্লাদজনক ও শীতবীর্য্য। পণ্ডিতগণ কুমুদবীজকে কৈরবিণী ফল নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"উক্তং কুমুদবীজন্তু বুধৈঃ কৈরবিণীফলম্।"

ইহার হিন্দিনাম ভেট্‌বেরা ও বাঙ্গলা নাম ভেট্। কোন কোন স্থানে বীজের সহিত ফলকেও ভেট্ কহে। ইহার বীজ মধুর-রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও গুরু।

ইহার মূলের নাম শালুক, কন্দ ও উৎপল।

"শালুকং কন্দ-উৎপলং।"

মূলাদি সর্ব্বাঙ্গের সহিত, সমুদিতা কুমুদকে কুমুদিনী বলা যায়। কুমুদ্বতী, কৈরবিকা ও কুমুদিনী, একই পর্য্যায়-বাচকশব্দ। ইহার গুণ ও ক্রিয়া পদ্মিনীর ন্যায়।

"কুমুদ্বতী কৈরবিকা তথাকুমুদিনীতিচ।
সা তু মূলাদিসর্ব্বাঙ্গৈরুক্তা সমুদিতা বুধৈঃ॥
পদ্মিন্যা যে গুণাঃ প্রোক্তা কুমুদিন্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ।"

কেহ কেহ ক্ষুদ্রজাতিকে কুমুদিনী ও বৃহজ্জাতিকে কুমুদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। উভয়ের গুণ ও ক্রিয়া একই রূপ। ইহার আরও একটি জাতি আছে। উহা কহ্লার নামে আখ্যাত হইয়াছে। শ্বেতজাতিকে শ্বেতকহ্লার ও লালজাতিকে রক্তকহ্লার বলা যায়। ইহাদের প্রত্যেক জাতির পর্য্যায়বাচক শব্দ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। ইহাদের নাম সম্বন্ধে বিরোধ ও বিরুদ্ধবাদ লক্ষিত হইলেও সকল জাতির গুণ ও ক্রিয়া একই রূপ। কহ্লার, কুমুদ, কুমুদিনী, কৈরব, কৈরবিণী প্রভৃতির পরিচয়ে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণও পরস্পর বিসম্বাদী। ইহার কারণ স্থির করা কঠিন হইলেও ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, প্রত্যেক জাতিরই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দুই তিনটি জাতি থাকাই সম্ভব, সেই জন্যই ইহাদের পর্য্যায়ে পরস্পর বিরুদ্ধবাদ দৃষ্টিগোচর হয়; প্রকৃতপক্ষেও একই জাতিরই ২।৩টি অন্তর্জ্জাতির অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কোন কোন আচার্য্য কহ্লারকে শ্বেত ও লাল ভেদে দুই জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্বেতকহ্লারকে সৌগন্ধিক ও কহ্লার এবং রক্তসুন্দিকে (সুঁদি) হল্লক ও রক্তসন্ধ্যক নাম অভিহিত করিয়াছেন।

"সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারং হল্লকং রক্তসন্ধ্যকম্।"

ইহা তৈলঙ্গে কোদ্দিগা, এড়গ বুংড়ি ও বাসনগল কলুব, নামে পরিচিত। ইহা শীতবীর্য্য, ধারক, বিষ্টম্ভি, গুরু ও রুক্ষ। কোন কোন আচার্য্য কুমুদ ও কহ্লারকে কৈরব, চন্দ্রকান্ত, গর্দ্দভ, কুমুদ ও কুমুৎ পর্য্যায়ে পাঠ করিয়াছেন।

"কৈরবং চন্দ্রকান্তঞ্চ গর্দ্দভং কুমুদঃ কুমুৎ।" (রত্নমালা) ইহার গর্দ্দভ নামটি অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। ডল্বনের মতে গর্দ্দভপুষ্প শব্দে নীল পদ্মকে বুঝায়। তাঁহার মতে উহা অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত ও চন্দ্রোদয়ে বিকসিত হয়।

"সৌগন্ধিকং গন্ধভপুষ্পাভিধান মত্যন্তমুরভি।

চন্দ্রোদয় বিকাশি"।—ইত্যাদি বচন দ্বারা তাঁহার মত অভিব্যক্ত হয়। ইহাদের সকল জাতির জন্মস্থানই ভারতবর্ষ। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে ইহাদের নানাজাতি দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন জাতির ফুলে সামান্য সুগন্ধও আছে। নীলপদ্ম কি পদার্থ, তাহা আজকাল কেহই স্থির করিতে পারেন না। ইহা দুর্ল্ভ বলিয়াই অনুমিত হয়। কেহ কেহ আমেরিকাজাত কুমুদ-পরিবার-ভুক্ত ভিক্‌টোরিয়া রিজিয়া (Victoria Regia) নামক নীলোৎপলকেই নীলপদ্ম বলিয়া অনুমান করেন। ভিক্‌টোরিয়া রিজিয়ার বিবরণে ইহার বিস্তৃত তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে।

কোন কোন গ্রন্থে পদ্মোৎপল (পদ্মবর্ণের কুমুদ) নামে অপর এক জাতীয় কুমুদের উল্লেখ আছে। ডাক্তার রক্সবার্গ বলেন, এইজাতি বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়। প্রকৃত পক্ষে পদ্ম বা পাটল অর্থাৎ গোলাপীবর্ণের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণের একটি জাতি পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্টের কোন কোন বিল ও জলাভূমিতে আমি দেখিয়াছি। উহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। ইহাই পদ্মোৎপল।

"পদ্মোৎপল নলিন কুমুদ সৌগন্ধিক
কুবলয়-পুণ্ডরীক-শৈবল-কোল্যজাতাঃ।"

এই বচন দ্বারাও পদ্মোৎপলের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়।

২। নিম্ফিয়া রুব্রা—Nymphea Rubra—রক্ত কুমুদ।

ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ইহা বঙ্গদেশে রক্ত-সাবলা বা রক্তোৎপল নামে পরিচিত। ইহার ফুল বেগুনে বর্ণের আভাযুক্ত রক্তবর্ণ। ইহার পাতা ও পত্রবৃন্তও লালবর্ণ। ইহা এদেশের সর্ব্বত্র—পুকুর, বিল, ঝিল ও জলাশয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অল্লগন্ধ, সৌমাখ্য, হল্লক ও রক্তকৈরব।

"তদল্লগন্ধং সৌমাখ্যং হল্লকং রক্তকৈরবং।"

ইহার রক্তোৎপল, রক্তসুন্ধিকা, রক্তকমল ও রক্তকম্বল প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাম আছে। ইহা তৈলঙ্গে ইয়ারাকালোয়া, হিন্দুস্থানে রক্তচন্দন ও সুন্ধুকা নামে পরিচিত। ইহার গুণ ও ক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায়। ইহার ফুল রক্তপ্রদর রোগের মহৌষধ।

৩। নিম্ফিয়া ষ্টিলেটা—Nymphea Stellata. ছোট সুন্ধি বা নীলোৎপল।

ইহার জন্মস্থান বঙ্গদেশ। ইহা বঙ্গদেশে ছোট সুন্ধি, নীলোৎপল ও ছোট-শালুক নামে পরিচিত। ইহার ফুল নীলবর্ণ। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং এদেশের নানা স্থানে নিম্ন জলাভূমিতে ও বিল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয়ে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ইন্দীবর, কুবলয়, নীলাব্জ, নীল ও উৎপল।

"ইন্দীবরং কুবলয়ং নীলাব্জং নীলমুৎপলং।"

ইহার গুণ ও ক্রিয়াও প্রথমোক্ত জাতির ন্যায়।

৪। নিম্ফিয়া কায়েনিয়া—Nymphea Cyanea—বড় সুন্ধি, নীলপদ্ম।

ইহার জন্মস্থান বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান। ইহার ফুল আকাশের ন্যায় নীল। ইহা এদেশে বড় সুন্ধি বা নীলপদ্ম নামে পরিচিত।

৫। নিম্ফিয়া এস্কিউলেন্টা—Nymphea Esculenta—ছোট শ্বেত সুন্ধি।

ইহার জন্মস্থানও বঙ্গদেশ। ইহা শ্বেত কুমুদেরই রূপান্তর-বিশেষ। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ ও ক্ষুদ্র। ইহার ফলও ক্ষুদ্র। ইহার মূল, ফল ও পত্রবৃন্ত খাওয়া যায়। ইহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র নিম্ন ভূমিতে ও বিল, ঝিল, পুকুর ও তদ্রূপ আবদ্ধ জলাশয়ে ও ধান্যক্ষেত্রেও দৃষ্টিগোচর হয়।

৬। ঐ ভার্সিকলর—Nymphea Versicolor

ইহার জন্মস্থানও বঙ্গদেশ। ইহার ফুল পাটলবর্ণ। ইহাকে পদ্মোৎপল বলা যায়। ইহার আর একটি জাতি আছে, ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ (N. S. V. Alba)

৭। ঐ পিউবেসেন্স—Nymphea Pubescens.

৮। ঐ ইডিউলিস—N. Edulis—*Syn.* Nymphea Lotus.

ইহাদের জন্মস্থান বঙ্গদেশ। ইহারা শ্বেত-কুমুদেরই রূপান্তর-বিশেষ।

৯। নিম্ফিয়া ছেরিউলিয়া—Nymphea Cœrulea.

ইহার জন্মস্থান মিশরদেশ। ইহার গাছ ক্ষুদ্র। ইহা গামলায় চাষের উপযোগী জাতি। ইহার ফুল নীলবর্ণ,

মধ্যভাগ পীতবর্ণ। ইহার ফুল অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। আইরিস (Iris) ফুলের গন্ধের ন্যায়।

১০। ঐ ওডোরেটা—Nymphea Odorata.

ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত। ইহার জন্মস্থান আফ্রিকা।

১১। ঐ ষ্টার্টিভেন্টি—N. Sturtevantii.

ইহার ফুল পাটল বর্ণের আভাযুক্ত লালবর্ণ। ইহার জন্মস্থান আফ্রিকা।

নিম্ফিয়া লেডেকারিয়োসিয়া—৪৭ নং

১২। ঐ এল্‌বা—Nymphea Alba.

ইহার ফুল নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ ; দ্বিদল ও সুগন্ধযুক্ত। ইহার জন্মস্থান ইংলণ্ড। ৪ ফুট জলেও ইহার চাষ হইতে পারে।

১৩। ঐ টিট্রাগোনা—N. Tetragona.

ইহার জন্মস্থান জাপান। ইহার ফুল অর্দ্ধদ্বিদল ও শ্বেতবর্ণ। ইহা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রস্ফুটিত হয়।

১৪। ঐ এল্‌বা ভ্যার ডেলিকেটা—N. Alba Var Delicata

ইহার জন্মস্থান ইংলণ্ড। ইহার ফুল বৃহৎ ; নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ ; মধ্যভাগ পাটল বর্ণের ছায়াযুক্ত। পরাগকেশর পীতবর্ণ।

১৫। ঐ প্লেনিসিমা—N. Alba-Plenissima.

ইহার ফুল বৃহৎ, নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ ; কখন কখন পাটল বর্ণের আভাযুক্ত। ফুলের ব্যাস প্রায় ৬ ইঞ্চি হয় ও অর্দ্ধ দ্বিদল। গ্রীষ্মকাল ব্যাপিয়া ফুল হয়।

১৬। নিম্ফিয়া এল্‌বা রোসিয়া—Nymphea Alba Rosea. *Syn.* Spheno Carpa Rosea Baspary.

ইহার জন্মস্থান সুইডেন। ইহা এদেশের নিম্নপ্রদেশের উপযোগী নহে। ইহার ফুল বৃহৎ ; গোলাপী বর্ণ। ইহা পদ্মোৎপল-বিশেষ।

১৭। ঐ এণ্ড্রিয়ানা—Nymphea Andreana.

ইহার জন্মস্থান ইংলণ্ড। ইহার ফুল পাট্‌কিলে বর্ণ ; কমলা বর্ণের ছায়াযুক্ত ও বৃহৎ। ইহা জলের ৪।৫ ইঞ্চি উপরে থাকে। ইহার পাতা বৃহৎ ; পিঙ্গল বর্ণের আভাযুক্ত।

১৮। আক এন্ সাইয়েল্ N. Arc-en-Siel.

ইহার জন্মস্থান ইউরোপ। ইহার বহুসংখ্যক পাতা হয়, পাতা নানাবর্ণে চিত্রিত ও ডোরাযুক্ত। ফুল বৃহৎ ; সুগন্ধযুক্ত ; শ্বেতবর্ণ ও মলিন মাংস বর্ণের আভাযুক্ত।

১৯। ঐ এরিথিউসা—N. Arethusa.

ইহার ফুল বৃহৎ ও গোলাপীবর্ণ। জন্মস্থান ইউরোপ। ইহা পদ্মোৎপল-বিশেষ।

২০। ঐ এট্রোপার্পিউরিয়া—N. Attro purpurea.

ইহার জন্মস্থান ইউরোপ। ইহার ফুল অতি বৃহৎ ৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ; বেগুনে লাল বর্ণ ; পরাগ-কেশর স্বর্ণবর্ণ।

২১। ঐ অরোরা N. Aurora (Hybrid).

——ইহা সঙ্কর জাতি। ইহার জন্মস্থান ইউরোপ। ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার ফুল ৩।৪টি বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয় ; প্রথম দিন গোলাপী পীতবর্ণ, দ্বিতীয় দিন কমলা লালবর্ণ ও তৎপর নানাবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। ইহার পাতা চিত্রিত।

২২। ঐ ব্রেক্‌লি-রোসিয়া—N. Brackleyi Rosea.

ইহা সঙ্কর জাতি। টিউবা রোসা (Tuba Rosa) ও ওডোরেটা রোসিয়া (Odorata Rosea) এই দুই জাতির সংযোগে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পাতা টিউবারোসা (Tuberosa) জাতির ন্যায় ও ফুল ওডোরেটার (Odorata) ন্যায়। ফুল বৃহৎ পাটলবর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত। ইহা পদ্মোৎপল-বিশেষ।

২৩। নিম্ফিয়া ক্যাণ্ডিডা—Nymphea Candida.

ইহার জন্মস্থান বোহিমিয়া। ইহার ফুল নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ।

২৪। ঐ কেণ্ডিডাঃ ভ্যার সেমিয়াপার্টা—N. C. Var. Semiaperta.

ইহার জন্মস্থান নরওয়ে। ইহা দুর্ল্লভ জাতি। ইহা পার্ব্বত্য প্রদেশের উপযোগী ; নিম্ন প্রদেশের উপযোগী

নহে। ইহার ফুল অৰ্দ্ধ-দ্বিদল ও শ্বেতবর্ণ। পরাগকেশর পীতবর্ণ।

২৫। ঐ কেণ্ডিডিসিমা রোসিয়া—N. Candidissima Rosea.

ইহার ফুল অতিবৃহৎ; গোলাপীবর্ণ। ইহাও পদ্মোৎপল-বিশেষ।

২৬। ঐ কেরিস্ ব্রুকি N. Caris brookie.

ইহার জন্মস্থান কেলিফোর্ণিয়া। ইহার ফুল দেখিতে মার্লিয়াসিয়া কার্ণিয়ার (Marliacea Carnea) জাতির ফুলের ন্যায়। ফুল উহা অপেক্ষা সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত।

২৭। ঐ কেরোলাইনিয়ানা—N. Caroliniana.

ইহার জন্মস্থান আমেরিকা। ইহা অতিশয় সুন্দর জাতি। ইহার ফুলের ব্যাস ৭।৮ ইঞ্চি হয়। ফুল পাটল বর্ণ। মধ্যভাগ গাঢ় পাটলবর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত। ইহাও পদ্মোৎপল-বিশেষ।

২৮। নিম্ফিয়া কেরোলাইনিয়ানা নাইভিয়া—Nymphea Caroliniana Nivea.

ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ; মধ্যমাকার; পাপড়ি লম্বা ও সরু। দেখিতে নক্ষত্রের ন্যায়।

২৯। ঐ কেরোলাইনিয়ানা পার্ফেক্টা—N. C. Perfecta. ইহার ফুল অৰ্দ্ধ ডবল; পাপড়ি সরু; সুগন্ধযুক্ত।

৩০। ঐ ঐ রোসিয়া—N. C. Rosea.

ইহার ফুল বৃহৎ; গোলাপী বর্ণ; সুগন্ধযুক্ত; ইহা নূতন জাতি। ইহাও পদ্মোৎপল-বিশেষ।

৩১। ঐ ঐ ক্রাইসেন্থা—N. C. Chrysantha.

ইহার পাতা ব্রোঞ্জ (Bronze) বর্ণ, ফুল মধ্যমাকার; প্রথম পীতবর্ণ থাকে; পরে ক্রমে লালবর্ণ হয়। ইহার পরাগ-কেশর কমলাবর্ণ।

৩২। ঐ কলোসিয়া—N. Colosea.

ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার ফুল বৃহৎ; পিচ্‌ফুলের (Peach blossom) বর্ণ। অতিশয় সুগন্ধযুক্ত।

৩৩। ঐ কোমোঞ্চ—N. Comonche.—ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার ফুল পাটল বর্ণ। ইহাও একরূপ পদ্মোৎপল-বিশেষ।

৩৪। ঐ ইলিসিয়ানা—N. Ellisiana. ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার পাপড়ি বিস্তৃত। কিউরেণ্ট (Currant) বা কিস্‌মিস্ ফলের বর্ণ। ইহা নূতন জাতি।

৩৫। ঐ ইরেক্টা—N. Eracta.

ইহার পাতা অতি সুন্দর। জলের এক ফুট উপরে থাকে।

৩৬। ঐ ফ্লেভা—N. Flava. ইহা দুর্লভ জাতি। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ ইহার জন্মস্থান। ইহার ফুল বৃহৎ, মলিন পীতবর্ণ; পাতা বেগুনে বর্ণে চিত্রিত।

৩৭। নিম্ফিয়া ফ্রোবেলি—Nymphea Froebeli.

ইহার ফুল মধ্যমাকার; লালবর্ণ; বহুসংখ্যক ফুল হয়। ফুল জলের ৪।৫ ইঞ্চি উপরে থাকে। অতিশয় সুগন্ধ-যুক্ত।

৩৮। ঐ ফাল্‌ভা—N. Fulva.

ইহা অতিশয় সুন্দর জাতি। ইহার ফুল সুগন্ধযুক্ত; মধ্যমাকার; পীতবর্ণ; পাটলবর্ণের ছায়াযুক্ত; ক্রমে কমলা-লালবর্ণ ধারণ করে। ইহার পাপড়ি থাবার আকার। পাতা বৃহৎ; চেষ্টনাট্ (Chestnut) নামক ফলের বর্ণের ন্যায় বর্ণ দ্বারা চিত্রিত।

৩৯। ঐ গ্লেডষ্টোনিয়ানা—N. Gladstoniana.

ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার ফুল বৃহৎ; প্রায় ৮ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়। ফুল নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ; পাপড়ি পুরু ও পরাগ-কেশর স্বর্ণবর্ণ।

৪০। ঐ গ্লোরিওসা—N. Gloriosa.

ইহার ফুল ৭।৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়; প্রথম পাতলা লোহিতবর্ণ, পরে ক্রমে গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করে।

৪১। ঐ গ্রেছিলিমা এল্‌বা—N. Gracillima Alba.

ইহার ফুল মধ্যমাকার; নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ; ডবল ও সুগন্ধযুক্ত।

৪২। ঐ গ্রেজাইল্লা—N. Graziella.

ইহার ফুল মধ্যমাকার; নানা বর্ণে বিভূষিত। ফুল রক্তাভ কমলাবর্ণ; সবুজ বর্ণের ডোরা ও লাল বর্ণের পরাগ-কেশরযুক্ত।

৪৩ ঐ জেম্‌স্-ব্রাইডন্—N. James Brydon.

ইহার ফুল অতি বৃহৎ; ৫।৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়। পাপড়ি ভিতর দিকে বক্র; ফুল গোলাপী লালবর্ণ।

লেডিকারি শ্রেণী Layde Keri Group.

ইহারা সঙ্কর জাতি। টিট্রেগোনা (Tetragona) জাতি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের পাতা ক্ষুদ্র ও ফুল মধ্যমাকার। অল্প বা অগভীর জলে চাষের উপযোগী। গামলাতেও সুবিধামত ইহাদের চাষ হয়। বর্ণ-চাকচিক্যে ইহাদের ফুল অদ্বিতীয়।

৪৪। নিম্ফিয়া লেডিকারি ফুল জেন্স্—Nymphea Layde Keri Fulgens. ইহার ফুল ঘোর রক্তবর্ণ; পরাগ-কেশর অগ্নিবর্ণ।

৪৫। ঐ লেডিকারি লাইলেসিয়া—N. L. Lilacea.

ইহার ফুল মধ্যমাকার; টি (Tea) জাতীয় গোলাপ-গন্ধী; গোলাপী বর্ণের ছায়াযুক্ত। ক্রমে লালবর্ণ হয়।

জলোদ্যানে নিম্ফিয়া লেডেকারি পার্পুরেটা—৪৬নং

৪৬। ঐ ঐ পার্পুরেটা—N. L. Purpurata.

ইহার ফুল অতিশয় মনোহর; গোলাপী লালবর্ণ; মধ্যভাগের বর্ণ ক্রমে গাঢ়; বাহিরের পাপড়ি সকল গোলাপী বর্ণ; পরাগ-কেশর লাল-কমলাবর্ণ।

৪৭। ঐ ঐ রোসিয়া—N. L. Rosea.

ইহার ফুল অতিশয় সুগন্ধযুক্ত; বহুসংখ্যায় ফুল হয়। ফুল পাটলবর্ণ ক্রমে গাঢ় গোলাপী ও লালবর্ণ ধারণ করে। পরাগ-কেশর কমলাবর্ণ। এইজাতি দুর্ল্লভ।

৪৮। ঐ ঐ রোসিয়া প্রলিফিরা—N.L.R. Prolifera.

এই জাতি সমস্ত কুমুদ-পরিবার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান-লাভের অধিকারী; কিন্তু ইহা সুলভ নহে। ইহার গাছ উৎপাদন অতিশয় কঠিন। সেই জন্যই ইহা দুর্ল্লভ। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে একটি ক্ষুদ্র চারার মূল্য ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা হয়। ইহার ফুল মধ্যমাকার; গাঢ় গোলাপী বর্ণ; বহুসংখ্যায় ফুল হয়। সমস্ত গ্রীষ্মকাল ব্যাপিয়া ফুল হইয়া থাকে। একটি গাছে ৩০।৪০টি ফুল হয়। ইহা এক-প্রকার পদ্মোৎপল-বিশেষ।

৪৯। নিম্ফিয়া লেডিকারি লুসিডা—Nymphea Layde-Keri Lucida.

ইহার ফুল অতি সুন্দর; নক্ষত্রাকার; গোলাপী সিন্দুর বর্ণ; মধ্যভাগ ক্রমে গাঢ়বর্ণ ধারণ করে। পরাগ-কেশর কমলা বর্ণ; পাতা রক্তাভ পিয়ালী বর্ণে চিত্রিত।

৫০। ঐ ঐ লেক্‌টিয়া—N. L. Lactea.

ইহার ফুল বৃহৎ; সুগন্ধযুক্ত।

৫১। ঐ ঐ লুসিয়ানা—N. L. Luciana.

ইহার ফুল গোলাপীবর্ণ।

মার্লিয়াসিয়া শ্রেণী—Marliacea Group

ফ্রান্সের গৌরব "ভিক্‌টর হিউগো" নগরবাসী বিঃ লেটৌর মার্লিয়াক্ (B. Latour Marliac) নামক বিখ্যাত জলজ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদের নামানুসারে এই শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। এই শ্রেণীর গাছের পাতা বৃহৎ; বহুসংখ্যায় ফুল হয়। গভীর জলেও এই জাতির চাষ হইতে পারে।

৫২। নিম্ফিয়া মার্লিয়াসিয়া এল্‌বিডা—Nymphea Marliacea Albida.

ইহার ফুল অতি বৃহৎ; নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ; বাহিরের পাপড়ি পাটলবর্ণের ছায়াযুক্ত ও সুগন্ধবিশিষ্ট।

৫৩। ঐ ঐ কার্ণিয়া—N. M. Carnea.

ইহার ফুল আরক্ত (Blush); ক্রমে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে; পরাগ-কেশর স্বর্ণবর্ণ।

৫৪। নিম্ফিয়া মার্লিয়াসিয়া ক্রমাটেল্লা—Nymphea Marliacea Chromatella.

ইহার ফুল পীতবর্ণ ও বৃহৎ। পাতা চিত্রিত। ইহা অতি সুন্দর প্রাচীন জাতি। প্রাচীন হইলেও সর্ব্বদাই নূতন দেখায়।

৫৫। ঐ ঐ ফ্লেমিয়া—N. M. Flammea.

চাকচিক্যে ইহা অদ্বিতীয়; ফুল মধ্যমাকার, রক্তাভ, বৃহৎ; পাতা চিত্রিত।

৫৬। ঐ ঐ ইগ্‌নিয়া N. M. Ignea.

সঙ্কর জাতি মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট। ইহার ফুল মধ্যমাকার; পরাগ-কেশর অগ্নিবর্ণ; ফুলও রক্তবর্ণ; মধ্যভাগ ক্রমে গাঢ়বর্ণ ধারণ করে।

৫৭। ঐ ঐ রোসিয়া—N. M. Rosea.

ইহার ফুল বৃহৎ; উজ্জ্বল গোলাপীবর্ণ; ক্রমে মাংসবর্ণ ধারণ করে, অতিশয় সুগন্ধযুক্ত।

৫৮। ঐ ঐ রুব্রাপাঙ্কটেটা—N. M. Rubra Punctata.

ইহার ফুল অতি বৃহৎ। বহুসংখ্যায় ফুল ধারণ করে। ফুল গাঢ় বেগুনে লালবর্ণ; লালবর্ণের ফোঁটাযুক্ত; পরাগ-কেশর কমলাবর্ণ।

৫৯। ঐ ঐ মেসা নাইলো—N. M. Masaniello.

ইহা নূতন জাতি, ইহার ফুল বৃহৎ; গোলাপীবর্ণ; পাপড়ির কিনারার দিকে ক্রমে গাঢ় লালবর্ণ। বাহিরের পাপড়ি শ্বেতবর্ণ; পরাগ-কেশর পীতবর্ণ; সুগন্ধযুক্ত।

৬০। ঐ ঐ মুরি—N. M. Moorie.

ইহার জন্মস্থান নিউজিলাণ্ড। ইহা অতি সুন্দর জাতি। এই জাতি মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার ফুল বৃহৎ, ডবল ও স্বর্ণবর্ণ।

ওডোরেটা শ্রেণী—Odorata Group

ইহাদের জন্মস্থান আমেরিকা। ইহাদিগকে আমেরিকায় জঙ্গলা-কুমুদ কহে। ফুলের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধের জন্য এই জাতি বিশেষ আদৃত। ইহাদের ফুল মধ্যমাকার। চাক্‌চিক্যে ইহারা অদ্বিতীয়। ক্ষুদ্র পুকুর ও গামলায় চাষের পক্ষে ইহারা বিশেষ উপযোগী।

৬১। নিম্ফিয়া ওডোরেটা এলবা—Nymphea Odorata Alba.

ইহার ফুল বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত। এই জাতি একোয়ারিয়া (Aquaria) ও ক্ষুদ্র গামলায় চাষের উপযোগী।

৬২। ঐ ঐ এক্সকুইজিট—N. O. Exquisite.

ইহার ফুল মুক্তার ন্যায় সুন্দর। ইহার পাপড়ি লম্বা; ক্রমে সরু। ফুল পাটলবর্ণ ও অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। ইহা একরূপ পদ্মোৎপল-বিশেষ।

৬৩। ঐ ঐ জাইগেন্টিয়া—N. O. Gigantea (Maxima)

ইহার ফুল অতি বৃহৎ—প্রায় ৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ; মাংসবর্ণের পোছ যুক্ত; পাতা বৃহৎ; ব্রঞ্জ (Bronze) বর্ণ।

৬৪। ঐ ঐ হার্ম্মোসা—N. O. Hermosa.

ইহা নূতন জাতি। ফুল অতি বৃহৎ; গোলাপীবর্ণ; ইহার ফুল জলের উপরে ভাসিয়া থাকে।

৬৫। ঐ ঐ লুসিয়ানা—N. O. Luciana.

ইহা অতি সুন্দর জাতি। ফুল গোলাপী পাটলবর্ণ।

৬৬। ঐ ঐ মাইনর—N. O. Minor (Pumila).

ইহার ফুল ক্ষুদ্র; নক্ষত্রাকার, নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ। ইহা কাচের পাত্র, একোয়ারিয়া ও গামলায় চাষের উপযোগী।

৬৭। নিম্ফিয়া ওডোরেটা রোসিয়া সুপার্ব্বা—Nymphea Odorata Rosea Superba.

ইহার ফুল বৃহৎ; উজ্জ্বল গোলাপী বর্ণ; জলের ৪।৫ ইঞ্চি উপরে উঠিয়া থাকে, ইহা টবে চাষের উপযোগী।

৬৮। ঐ ঐ সুয়াভিসিমা—N. O. Suavissima.

ইহার ফুল পাটলবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত; জলের ৬।৭ ইঞ্চি উপরে উঠিয়া থাকে।

৬৯। ঐ ঐ সালফুরিয়া—N. O. Sulphurea.

ইহার ফুল বৃহৎ; গন্ধকবর্ণ; ভ্যানিলার (Vanilla) গন্ধবিশিষ্ট।

৭০। ঐ ঐ সাল্‌ফুরিয়া গ্রেণ্ডিফ্লোরা—N. O. S. Grandiflora.

ইহার ফুল নক্ষত্রাকার, অতি বৃহৎ; পীতবর্ণের ছায়াযুক্ত।

৭১। ঐ ঐ টিউরিসেন্‌সিস্—N. O. Turicensis.

ইহা নূতন জাতি। এই শ্রেণী মধ্যে ইহার ফুলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; লাল গোলাপীবর্ণ।

৭২। ঐ ঐ মেক্সিমা—N. O. Maxima (Gigantea) জাইগেন্টিয়া দেখ।

নানাবিধ জাতি—Varieties.

৭৩। ঐ পল্‌হেরিয়ট্—N. O. Paul Hariot.

ইহা নূতন সঙ্কর জাতি। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইহার পাতা বৃহৎ, গাঢ় সবুজবর্ণ; নীচের পীঠ লালবর্ণ, ফুল বৃহৎ; পীতবর্ণ; পাপড়ির অপর পীঠ লালবর্ণ।

৭৪। নিম্ফিয়া ফিবাস্—Nymphea Phœbus.

ইহাও নূতন জাতি, এই জাতি ক্ষুদ্র পুকুর, পাত্র, গামলা ও একোয়ারিয়ায় চাষের উপযোগী। ইহার ফুল ক্ষুদ্র;

পীতবর্ণ; লালবর্ণের শিরাযুক্ত; ক্রমে ইহার ফুল লালবর্ণ ধারণ করে; পরাগকেশর কমলাবর্ণ; পাতা বেগুনেবর্ণে চিত্রিত।

৭৫। ঐ পিগ্‌মিয়া এল্‌বা—N. Pygmœa Alba.

ইহার জন্মস্থান চীনদেশ। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ; মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল হয়। ইহা ক্ষুদ্র গামলা ও একোয়ারিয়াতে চাষের উপযোগী।

৭৬। ঐ পিগ্‌মিয়া হেল্‌ভোলা—N. P. Helvola.

ইহা সুন্দর জাতি, ইহার ফুল ক্ষুদ্র; গন্ধকবর্ণ পাতা মর্ম্মর প্রস্তরের বর্ণে চিত্রিত। ইহা গামলা ও একোয়ারিয়াতে চাষের উপযোগী।

পাত্রে কুমুদ সংহতি

৭৭। ঐ রবিনসনি—N. Robinsonii.

ইহার ফুল মধ্যমাকার; সিন্দূর বর্ণ; মধ্যভাগ পাতলা লালবর্ণের ছায়াযুক্ত; পাতা পিঙ্গলবর্ণের ফোটাযুক্ত।

৭৮। ঐ রসিটা—N. Rosita.

ইহা অতি সুন্দর নূতন সঙ্কর জাতি, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, ইহার ফুল বৃহৎ; গাঢ় গোলাপীবর্ণ। ক্রমে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। ইহা ওডোরেটা শ্রেণীর অন্তর্গত জাতি।

৭৯। ঐ সেঙ্গুইনিয়া—N. Sanguinea.

ইহার ফুল রক্তবর্ণ, পরাগকেশর গাঢ় কমলা লালবর্ণ।

৮০। ঐ স্কিউটিফলিয়া—N. Scutifolia.

ইহার জন্মস্থান দক্ষিণ আফ্রিকায় ফ্লিনদী। ইহার ফুল নক্ষত্রাকার; নীলবর্ণ। জলের ৭।৮ ইঞ্চি উপরে উঠিয়া থাকে।

৮১। নিম্ফিয়া সিগ্‌নোরেটি—Nymphea Signouretii.

ইহার ফুল মধ্যমাকার; জলের ৫।৬ ইঞ্চি উপরে হেলিয়া থাকে। ফুল প্রিম্‌রোজ (Primrose) নামক ফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। উহা অপেক্ষা ফিকা বর্ণের। ইহা ক্রমে ঐ বর্ণ হইতে লাল বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। পাতা চিত্রিত।

৮২। ঐ সিয়উক্‌স—N. Sioux.

ইহা নূতন জাতি। ইহার ফুল পীতবর্ণ; পাপড়ির কিনারা লালবর্ণ। পাতা বৃহৎ; ব্রোঞ্জ-লালবর্ণ (Bronze-red)

৮৩। ঐ সল্‌ফেটিয়ার—N. Solfaterre.

ইহা নূতন জাতি। ইহার ফুল বৃহৎ; পীতবর্ণ; ক্রমে গোলাপীবর্ণ ধারণ করে। মে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ফুল হয়।

৮৪। ঐ সম্পটিউওসা—N. Somptuosa.

ইহা নূতন জাতি। ইহার ফুল অতি বৃহৎ গোলাপীবর্ণ; পাপড়ির মধ্যভাগ ক্রমে গাঢ় গোলাপীবর্ণ ধারণ করে। উহা উজ্জ্বল লালবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। পরাগকেশর কমলাবর্ণ, ফুল অতিশয় সুগন্ধযুক্ত।

৮৫। ঐ স্পিসিওসা—N. Speciosa.

ইহার ফুল বৃহৎ; সুগঠিত; গোলাপীবর্ণ; সুগন্ধযুক্ত।

৮৬। ঐ টিউবারোসা—N. Tuberosa.

ইহা গভীর জলে চাষের উপযোগী। ইহার মূল মৃত্তিকার তলদেশে লতাইয়া যায়। সুতরাং ইহার চাষে স্থানের অধিক প্রয়োজন হয়। ইহার ফুল নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ।

৮৭। নিম্ফিয়া টিউবারোসা রিচার্ডসনি—Nymphea Tuberosa Richardsonii.

ইহার জন্মস্থান উত্তর আমেরিকা, ইহার ফুল বৃহৎ; গোলাকার; ডবল; বরফের ন্যায় নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ। ফুল জলের উপরে উঠিয়া থাকে। ইহার মূলও মৃত্তিকাতে গড়াইয়া যায়। ইহার চাষেও অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। ইহা গভীর জলে চাষের উপযোগী জাতি।

৮৮। ঐ ঐ রোসিয়া—N. T. Rosea.

ইহার স্বভাবও পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায়। ইহার ফুল বৃহৎ; গোলাপী বর্ণ; জলের উপরে উঠিয়া থাকে। ইহা গভীর জলে চাষের উপযোগী। ইহার চাষেও অধিক স্থানের আবশ্যক হয়। ইহা পদ্মোৎপল-বিশেষ।

৮৯। ঐ ঐ রুব্রা—N. T. Rubra.

ইহার ফুল বৃহৎ; লালবর্ণ; ইহা গভীর জলে চাষের উপযোগী। ইহার চাষেও অধিক স্থানের আবশ্যক হয়।

৯০। ঐ ডবলিউঃ এম্ঃ ডুগোয়ে—N. W. M. Doogue.

ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার জন্মস্থান আমেরিকা। ইহার ফুল বৃহৎ; ৫।৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়, মলিন লালবর্ণ; ইহার চাষে অধিকস্থান ও গভীর জলের আবশ্যক হয়।

৯১। ঐ উইলিয়ম ফেল্‌কণার—N. W. Falconer.

ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার ফুল অতি বৃহৎ; ৬।৭ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়। রক্তবর্ণ; চুণিপাথরেব ছটাযুক্ত; মধ্যভাগ স্বর্ণবর্ণ; ইহার কচিপাতা উজ্জ্বল লালবর্ণ; ক্রমে উহা সবুজবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। মাঝে মাঝে বেগুনে বর্ণের শিরা থাকে। ইহা গভীর জলে চাষের উপযোগী জাতি, ইহার চাষেও অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়।

৯২। নিম্ফিয়া উইলিএম সঃ—Nymphea W. Shaw.

ইহার ফুল নক্ষত্রাকার; পাটলবর্ণ; দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা গভীর জলে চাষের উপযোগী, ইহার চাষেও অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। ইহার ফুল দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহা পদ্মোৎপল-বিশেষ।

৯৩। ঐ ভিসিউভ্—N. Vesuve.

ইহা নূতন জাতি; ইহার ফুল অতি বৃহৎ; ৬।৭ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হয়; গাঢ় অম্লান গোলাপী লালবর্ণ; পরাগকেশর গাঢ় লালবর্ণ, ইহা বহুসংখ্যায় ফুল ধারণ করিয়া থাকে। ইহার চাষে গভীর জল ও অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়।

৯৪ ঐ লিউটিয়া—N. Lutea. মূলজ জাতি। ফুল পীতবর্ণ।

৯৫। ঐ কেপেন্‌সিস—N. Capensis

৯৬। ঐ ডিয়ানিয়ানা - N. Deaniana.

৯৭। ঐ ডেণ্টেটা—N. Dentata.

৯৮। ঐ ওমারেনা—N. O'marana.

৯৯। ঐ সেমি এপার্টা—N. Semi Aperta.

১০০। ঐ উইলিএম ষ্টোন—N. W. Stone.

১০১। ঐ জেঞ্জিবারিএন্‌সিস্—N. Zanziberiansis.

১০২। ঐ ঐ রোসিয়া—N. Z. Rosea.

১০৩। ঐ ব্লুবেয়ার্ড—N. Blue-Beard.

১০৪। ঐ ব্লুগ্রেসিলিস্—N. Blue Gracilis.

১০৫। ঐ গ্রেসিলিস—N. Gracilis.

ইহারাও সুন্দর জাতি।

১০৬। ঐ ডিভোনিএন্‌সিস্—N. Devoniensis.

১০৭। ঐ পাল্‌চেরিমা—N. Pulcherrima.

১০৮। ঐ কলাম্বিয়ানা—N. Columbiana.

১০৯। ঐ ব্লেণ্ডা—N. Blanda.

ইহারাও সুন্দর জাতি; গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ইহাদের জন্মস্থান। ইহারা এ দেশের নিম্নপ্রদেশের উপযোগী।

একাদশীতত্ত্ব *

(স্মৃতি নয়, গল্প)

[মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন]

চতুষ্পাঠী গৃহ

বৃদ্ধ গঙ্গাচরণ চূড়ামণি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া, গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে, মাথা মুছিতে মুছিতে নিজগৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া, একেবারে চতুষ্পাঠী-গৃহের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্তব শেষ করিয়া, ছাত্রদিগকে বলিলেন,—"আর আমি তোমাদিগকে পড়াইতে পারিব না, তোমরা যথাস্থানে প্রস্থান কর। আমি আর এ পাপ-সংসর্গে থাকিব না—আমি আর এ পাপ-গ্রামে—না না—আমি আর এ পাপ-দেশেই থাকিব না।"

চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি দোপাটী ফুলের গাছ আছে। দোপাটী ফুল ফুটিয়া, সমস্ত গাছগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীরাম বিদ্যাবাগীশ সেই ফুলের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না; প্রত্যহ তিনি প্রত্যুষে ডালা-হাতে সেইখানে ফুল তুলিতে আসেন, আজও আসিয়াছেন। দুই চারিটি ফুল তুলিয়াছেন, তাঁহার কর্ণে চূড়ামণির কথাগুলি প্রবেশ করিল। তিনি চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে চূড়ামণি, কি হয়েছে? তুমি . ম ত্যাগ করিবে কেন? দেশই বা ত্যাগ করিবে কেন? দেশ তোমার কি করিল?"

চূড়ামণি। আবার হবে কি? মহাপাপ, মহাপাপ—এ অপেক্ষা কি আর পাপ আছে? তুমি জান না? গ্রামে কি হইয়া গেল? গ্রামে এতবড় একটা ব্যাপার হইয়া গেল, আর তুমি তা জান না!

বিদ্যাবাগীশ। না, ভাই, আমিত কিছু জানি না।

চূড়ামণি। আরে মুখুয্যাদের সেই মেয়েটা, সরোজিনী,—সরোজিনী; মেয়েটা রাক্ষসগণের, ছেলেটা কেমন কার্ত্তিকের মত ছিল, কি কি পাসটাসও নাকি করিয়াছিল। সেদিন বিবাহ হইল, এক বৎসর যেতে না যেতেই মেয়েটা বিধবা, যেন বিবাহের আগেই হবিষ্যির হাঁড়িচড়িয়ে রাখিয়াছিল! এতেও বেটারা জন্মান্তর মানে না—জ্যোতিষ মানে না—এ যে অকাট্য প্রমাণ।

বিদ্যাবাগীশ। তা জানি, সরোজিনী বিধবা হয়েছে। তোমার গ্রাম-পরিত্যাগের কারণটা কি?

চূড়ামণি। আরে কল্য একাদশী ছিল ত; তাকে কল্যরাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধের সহিত সুপক্ক কদলী-যোগে একাদশী করান হয়েছে।

বিদ্যাবাগীশ। এ অনুকল্পের ব্যবস্থাটা দিল কে?

চূড়ামণি। দিল কে?—দিল কে?—জিজ্ঞাসা করিতেছ কি? তুমি আমি কি পণ্ডিত? তোমার, আমার ব্যবস্থা না হইলে চলিবে না! তোমায়, আমায় জিজ্ঞাসা করে কে? সে দিন আর নাই। সামান্য ষষ্ঠী-পূজা পর্য্যন্ত তোমায় বা আমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া কেহ করিত না, এখন যে দেশে বড়পণ্ডিত গজিয়েছে। মহেশ ন্যায়রত্ন খুব একটি কৌশল আঁটিয়াছিলেন; আর কিছু হউক, না হউক, গরিব-দুঃখী ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের নিকট হইতেও ইংরেজ বাহাদুরের দুই টাকা করিয়া অনায়াসে ট্যাক্স আদায় হইতেছে। আরে, তা না হইলে, অত পদবৃদ্ধি, বেতনবৃদ্ধি হয়! বিদ্যাসাগরেরও অত বেতন ছিল না। এই যে ন্যায়রত্নি-পরীক্ষায় পাস করিয়া, ঝুড়ীঝুড়ী 'তীর্থ' বাহির হইতেছে; বলিতে পার, এদের মধ্যে কটা প্রকৃত পণ্ডিত বাহির হইতেছে?

বিদ্যাবাগীশ। তবে বুঝিয়াছি, ব্যবস্থা-দাতা বুঝি শ্রীমান্ হরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—কেমন? অতবড় পণ্ডিতের বংশধর হইয়া, অনায়াসে এই অব্যবস্থাটা দিল! পাপেরও ভয় নাই। আমারও ত ভায়া, উঁহারই পিতামহের ছাত্র।

---

* কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত জলধরসেন মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত 'পরাণমণ্ডল' নামক পুস্তকে 'একটু জল' নামে একটি গল্প লিখিয়াছেন। সেইটি পড়িয়া, এই গল্পটি পড়িতে পাঠকপাঠিকাকে অনুরোধ করি। এটি তাহারই পরিশিষ্ট।—লেখক

চূড়ামণি। আরে পাপের ভয় ত ষোল আনা আছে! উহারা ঘোর পাষণ্ড, ঘোর নাস্তিক; কিছু মানে না, কিছু মানে না। ভাগিনীটি মারা গিয়াছে কি না, তাইতে শর্ম্মা রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হয়েছেন; প্রতিজ্ঞা, এখন দেশশুদ্ধ সকল বিধবাকে একাদশীতে জল খাওয়াইবেন। একবার ভাবিয়া দেখিস না, তোর যে ভাগিনী মারা গিয়াছে, সে ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে; বিধবার ত মরাই ঠিক। সেত আর মন্দকার্য্যে মারা যায় নাই! হরিবাসরের মত পুণ্য-কার্য্য করিয়া মারা যাওয়াতে তাহার যে কল্পকল্পান্ত বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি হইবে। বাঁচিয়া থাকিলে, ভ্রূণহত্যায় যাইত না, কে বলিতে পারে? গোঁয়ারগোবিন্দেরা এ সকল ভাবে, না—চিন্তা করে?

বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যা হইতে পারে, তা, বহুদর্শিতা কোথায়? ঠগিতে ঠগিতে শিখিতে হয়, তাই "শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ-সহস্রমারী চিকিৎসকঃ" এই শাস্ত্রীয় বচন চলিত আছে। ও না হয়—একাদশীতে বিধবার অনুকল্পের ব্যবস্থা দিল; ওরা তা মানিল কেন?

চূড়ামণি। আহে,—তুমিত বড় অর্ব্বাচীন; ওরাত ঐ সমস্ত ব্যবস্থাই চায়; যারা ঐ সব ব্যবস্থা দিবে, সমুদ্রযাত্রায় দোষ নাই, ম্লেচ্ছদেশ-গমনে দোষ নাই, অসংখ্যবার ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণ করিলেও প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্য হইবে, প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু নয়, গায়ত্রী-জপ বা গঙ্গাস্নান, কর্ত্তাদের গায়ে যেন কোন আঁচোড় না লাগে, বিধবা-বিবাহ, যুবতি-বিবাহ, একাদশীতে বিধবার ফলার, ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিবে, সেই ত ওদের কাছে মহাপণ্ডিত,—মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ঋষি; আমরা ওরূপ ব্যবস্থা দিতেও পারিব না, আমরা ওদের কাছে পণ্ডিতও নেই। ও যে মনোমত ব্যবস্থা দিয়াছে, ওরা যা চায়, তাই পাইয়াছে, সে ব্যবস্থা মানিবে না?

বিদ্যাবাগীশ। ভাগিনীর বেলা এ ব্যবস্থা হইল না কেন? এতদিন এশাস্ত্র কোথায় ছিল? ভাগ্নী মারা যাওয়ার পরে বুঝি শাস্ত্রের বচনটা পাওয়া গেল!

চূড়ামণি। আরে, বুঝিলে না, এদেশের ধাতুগুলি সমস্তই সমস্তই পরস্মৈপদী, একটিও আত্মনেপদী নাই। ব্যবস্থাই বল, দেশহিতৈষিতাই বল,—সমস্তই পরে পরে, নিজের বেলা একটিও নয়। দেখিলে না, সে স্বদেশীর হিড়িকের সময়ে যারা নেতা সাজিয়াছিল, তাদের ছেলেদের অনায়াসে সরকারি স্কুলে দিয়া, যত বোকাদের ছেলে ধরিয়া স্বদেশী স্কুলে ভর্ত্তি করা! যারা তাদের কথায় ভিজে নাই, তাদের উপরে কত নির্য্যাতন, কত নাক-সিটকান, কত তীব্রভাবে আলোচনা। এই যে এত পৈতার ধূম পড়িয়া গিয়াছে, দেখিবে, অনেক নেতাই নিজে পৈতা লয়েন নাই, কেবল—গলা ভাঙ্গিয়া অন্যের জন্য বক্তৃতা-দান। আবার অনেকে পিতামাতা বর্ত্তমানে পৈতা লয়েন না, তাঁদের পরলোকের পরে একত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ সারিয়া, পরে পৈতা গ্রহণ করেন। আবার কেহ নিজে পৈতা না লইয়া, নিজের পোষ্যপুত্রকে পৈতা দেন,—বুঝিলেত, এমনিও তিন দিন, অমনিও তিন দিন। আবার কেহ জলপিণ্ডদানের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে অনুপনীত রাখিয়া, বাড়ীশুদ্ধ পৈতা লইতেছেন। বুঝিলে, —ইহাদিগের কোন দিকেই বিশ্বাস নাই। স্মৃতিতীর্থ বাবাজীবনকেও এই বাতাস লাগিয়াছে। আশুবাবুকে আমি ভক্তি করি; যে যাই বলুক, সে লোকটি খাঁটি লোক। যাহা বুঝিয়াছেন, অন্যকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেও যান নাই, অনুরোধও করেন নাই, নিজেই তাহা করিয়াছেন। এই জন্য বলি, ইঁহার ধাতু পরস্মৈপদী নহে, আত্মনেপদী। তাঁহার উপরে আমার শ্রদ্ধা আছে।

বিদ্যাবাগীশ। আমার বোধ হয়, তা নয়; স্মৃতিতীর্থ আর যাই হউক, শাস্ত্র বুঝুক, না বুঝুক, সেই মহাপুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজে একরূপ করিবে, অন্যকে অন্যবিধ উপদেশ দিবে, এ বিশ্বাস হয় না। জানত, আমরা যাইতে চাইলাম, বিশ্বাস হইল না;—খাইতে যাইবেন, পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জন পড়িয়া রহিল; সেই ভাদ্রমাসের তালপাকা রৌদ্রে চাদরখানি লইয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন। সাত ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া দত্তদের বাড়ীতে গিয়া, সেই বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দত্তকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, সেটি ভুল, সিদ্ধান্তভূষণ যা বলিয়াছে, সেই ব্যবস্থাই ঠিক, তোমরা সেই মতেই কার্য্য করিও।" সেই মহাত্মারইত পৌত্র স্মৃতিতীর্থ। সে প্রতারণা করিবে, —আমার বিশ্বাস হয় না। পরীক্ষা দিলেও, স্মৃতিতীর্থের নাকি স্মৃতির কোন কোন গ্রন্থ অনধীত ছিল, ভাগিনীর মৃত্যুর পরে সেইগুলি পড়িবার জন্য বোধ হয়, বিক্রমপুরে গিয়াছিল। শুনিয়াছি, যে দেশে একাদশীতে বিধবার অনুকল্প প্রচলিত, সে দেশী পণ্ডিতেরাও নাকি অনুকল্পের

ব্যবস্থা দেন। সেই সংসর্গে ও তাঁহাদিগের উপদেশে স্মৃতিতীর্থেরও মতিভ্রম ঘটিয়াছে।

চূড়ামণি। বল কি? বল কি? তাই নাকি? তাই নাকি? অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয়। এখনকার ছেলেদের দ্বারা আর দেশের সম্ভ্রম বজায় থাকে না। এঁ,—অবশেষে স্মৃতিতীর্থ বিক্রমপুরে পড়িতে গেল! লজ্জায় যে মাথা হেঁট! বাঙ্গালেরাইত পাঠ সম্পূর্ণ করিবার জন্য চিরদিন এদেশে আসে। এ দেশের ছাত্র পড়িতে যাইবে বাঙ্গালদেশে! নিকটে কি নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, পূর্ব্বস্থলী নাই? তোমার, আমারও ত কত বাঙ্গাল ছাত্র আছে; শুধু বঙ্গদেশ কেন? নবদ্বীপে সমস্ত ভারতবর্ষের ছাত্র আছে; তাই বলি, "স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" —এই মনুর বচনটি এক্ষণে এই দেশের উপরেই খাটে। বাঙ্গালদেশে পড়িতে যাওয়া অপেক্ষা উহার মৃত্যু যে ভাল ছিল, উহার মৃত্যু হইল না কেন? আবার বাঙ্গালদেশের অনুকরণে ব্যবস্থা দেওয়া; ধিক্, আমাদিগকে ধিক্, আমরা বিদ্যমানে এই হইল! চক্ষে ইহাও দেখিতে হইল! এ, ত অব্যবস্থা, নিতান্ত অব্যবস্থা; সুব্যবস্থা হইলেও ত বাঙ্গালের অনুকরণে কর্ত্তব্য নয়, বাঙ্গালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ!! বাঙ্গালের আবার শাস্ত্রজ্ঞান, ওদের কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আছে? দেশে সংবৎসর নানা পাপ করিয়া বর্ষান্তে একবার এদেশে গঙ্গাস্নান করিতে আসা হয়। শুন নাই কি? সেই সঙ্কল্প বাক্যে "মাঠে ধান্য চুরি" পর্য্যন্ত গুঁজিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যূষে ও সায়ংকালে ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যাটি করা চাই, প্রত্যহ শিবপূজাটি করা চাই, কিন্তু হেগো কাপড় ত্যাগ করা হইবে না, হেগো কাপড়ে সন্ধ্যা, শিবপূজা, রন্ধন-ভোজন সবই হয়। আহে, অনুকল্প কি? অনুকল্প কি? বিধবা ত ওদেশে দৈয়ে, থৈয়ে উত্তমরূপে ফলার মারে।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী রামধন তর্কতীর্থ, চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে স্মৃতি পড়িতে আসিয়াছিলেন; তিনিও তৎকালে চতুষ্পাঠী-গৃহে ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নিন্দা তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি বাহির হইয়া বলিলেন,—মোশয়, এইটা কি আপনি ভাল কইছেন, "পরাপরাধেন পরাপমানং"। স্মৃতিতীর্থ মন্দ করচেন, তান্ নিন্দা করুন, বাঙ্গাল দোষ করল কি? আর এইটা কি বঙ্গস্থাশ না? দোষ-বিশেষ ত দ্যাশ-বিশেষের আছেই, আপ্‌নেগো কি দোষ নাই? আপ্‌নেগো দ্যাশে বিধবারা যে পুঁইশাগ্ খায়, মাষকলাই খায়, সিদ্ধ চাউল খায়, তাম্বুল খাইয়া যে ঠোঁট্ রাঙ্গা করে, এইটা কোন্ শাস্ত্র-সিদ্ধ? রাত্রে যে বিধবারা লুচী-কচুরী খায়। অনেক বিধবাগো দেখ্‌চি, ময়রার দোকানের থাইক্যা জিলাপী-কচুরী কোচেকর্যা লইয়া যায়, দশমীর রাত্রটা একবার ভাবুন, আমরা স্বচক্ষে দেখ্‌ছি। আপ্‌নের গো দ্যাশে সিন্দুকের মদ্যে লুচী-কচুরী রাখে, সেইটায় দোষ হয় না? তারপর আপ্‌নের গো দ্যাশে পণ্ডিতরা প্রায়শ্চিত্তের কড়িদান পর্য্যন্ত ত্যাগ করে না। আর কত কি বল্‌বো? আপ্‌নের গো কথা আর কয়্যা কাম কি? আপনে অধ্যাপক, আপনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকালে উঠ্যা গামছা লইয়া নিত্যে কই যান্? আবার সন্ধ্যাকালে এক হাতে একটা ঘটী আর এক হাতে শঙ্খ লইয়া কই যান্? আর বেশী কইমু কি? আপনারা বিধবাদের উপর নির্য্যাতনটা কম করেন না। অনুকল্পে রাগ হইবই ত। সধবা ভাগ্যবতী খাটে বস্যাই থাকেন, মাসী, পিসী, মামী, জ্যাষ্ঠা ভগিনী, জ্যাঠী, খুড়ী, শাশুড়ী, মাতা যেই হন তান্ আর নিস্তার নাই। পাচিকার কার্য্যটা তান্‌গোই কর্ত্তে হয়। একাদশীর দিনও মাছমাংস না রান্দ্যা উপায় নাই। পরদিন দ্বাদশী একদণ্ড—থাকলেও পারণ-করণের জো নাই। সগ্‌গলকে খাওয়াইয়া, তিন ফহর বেলার সময় গঙ্গাস্নান কর্যা সেই মাছের আথায় একটু গোবর লেপ্যা বাসী হাঁড়ীতে নিজের জন্য হবিষ্য-পাক করন হয়।

সেই চতুষ্পাঠী হইতে এই গ্রামবাসী ছাত্র রামময় ভট্টাচার্য্য লাফ্ দিয়া বাহির হইয়া বলিলেন—"বাঙ্গাল, বলছ কি? লুচী ত ঘৃতপক্ব, তাতে দোষ কি? ঘৃতপক্ব যে ফলের মধ্যে গণ্য, এই জন্যই ত লুচীর নিমন্ত্রণে তাকে ফলার বলে।"

তর্কতীর্থ। লুচী খাওয়ারে ফলার কয়, এই জন্য লুচী ফল? তবে আর নবান্নের দিন কাকবলির জন্য ব্যস্ত হন ক্যান? আপ্‌নেরগো দ্যাশে ত খুড়ারেই কাকা কয়। তানে কাক-বলি দিলেই ত হয়। কোকিলারে যে কাকী ছোট হানে হাতে কৈর‍্যা প্রতিপোষ করল; সে কোকিলার মধুর স্বর এখোন পঞ্চমে; আর কাকীর ভাগ্যে দিনান্তেও এক মুষ্টি আতব তণ্ডুলের বলি মিলে না, তান্ যে বড় কর্কশ স্বর।

রামময়। বাঙ্গালটা বলে কি? হাঁ ভট্টাচাযমো'শায়, লুচী কি ফলের মধ্যে গণ্য নয়? এরত শাস্ত্রও আছে।

চূড়ামণি। আছে বৈকি, "আজ্যপক্বং পয়ঃ পক্বং"

তর্কতীর্থ। এটা কোন্ গ্রন্থের বচন? কোন গ্রন্থকার এটা কি ধরচেন?

চূড়ামণি। দেখেছ বিদ্যাবাগীশ, এর আস্পর্দ্ধাটা? আমিই বচন বলছি; ও অপ্রামাণিক ব'লে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। কিছুদিন এদেশে বাস ক'রে এখন চোখমুখ ফুটেছে। আরে গাধা, তোর যে বড় সাহস; জানিস্ তোদের জগৎ সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথা কইতে সাহস করে না। শোন বিদ্যাবাগীশ, আর বাঙ্গালকে পড়াবে না প্রতিজ্ঞা কর।

আমি যদি বাঙ্গালকে পড়াই; তবে আমি অব্রাহ্মণ। দেখি, বেটারা কোথায় পড়িয়া বিদ্যা করে। গুরুমারা বিদ্যা হয়েছে না? আর আমি দাঁড়াতে পারি না, ক্রোধে আমার শরীরে কম্প হ'চ্ছে। ইত্যাদি বলিতে বলিতে চূড়ামণি মহাশয় দ্রুতপদনিক্ষেপে অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ও ফুলের ডালা হাতে করিয়া, ধীরে ধীরে স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

স্নানের ঘাট

গঙ্গার মেয়ে-ঘাটে দিবা নয় ঘটিকার সময়ে পাড়ার মেয়েরা গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ গঙ্গাজলে গামছা ভিজাইয়া পা রগড়াইতেছে, কেহ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া জপ করিতেছে, কোন কোন বর্ষীয়সী বাঁধাঘাটের উপরে টাট পাতিয়া, তাহার উপরে শিব বসাইয়া, পুষ্পবিল্বপত্রে পূজা করিতেছেন। সধবা-বধূরা অবগুণ্ঠনের সহিত ডুব দিয়া আর্দ্র বস্ত্রেই বাড়ী চলিয়া যাইতেছে; বিধবা শ্যামাসুন্দরী দেবী তারকেশ্বরের একখানি গামছা কাঁধে ফেলিয়া, আঙ্গুলে তামাকপোড়ায় দাঁত ঘষিতে ঘষিতে ধীর মন্থরগতিতে ঘাটে উপস্থিত। আসিয়াই বলিল,—কি সদু, আজ যে দশটায় পারণ, তা তুই যে এখন গঙ্গার ঘাটে, তবে তুইও বুঝি কাল ফলার মেরেছিস্, নয়ত কাল যে তালপাকা রোদ; মাগো, তেষ্টায় প্রাণ ফেটে যায়, এতক্ষণ থাকৃতে হত না। এবার ম'রে জন্মালে যেন বাঙ্গাল দেশে জন্ম হয়। মা গঙ্গা, তাই ক'রো।

শুনেছি, সে দেশে একাদশীর ২।৪ দিন আগে থেকে নাকি খৈ-ভাজার ধূম লেগে যায়। এক এক একাদশীতে এক এক বাড়ীতে নাকি বিধবাদের নেমন্তন্নের ঘটা। ঝুড়ি ঝুড়ি বিচে কলা, মত্তমান কলা, চাঁপা কলা, নারকুলি সন্দেশ, বড় পাথরবাটীতে চিনিপাতা দৈ, আঙ্গুল সিঁধোয় না—বাটী বাটী ক্ষীর; মাগো, সেই রাক্কুসীরা নাকি পা ছড়িয়া ব'সে ছুটো ছুটো যোয়ান্ পুরুষের খোরাক এক একটা বিধবা সপাসপ্ মেরে দেয়।

সৌদামিনী। আর বাঙ্গালদেশে জন্মিতে হবে না, জন্মিতে হবে না; এখনকার বিধানে এখানেও খাওয়া চল্‌বে।

শ্যামাসুন্দরী। (বড় গলায়) শুন্‌লে—সবাই শুন্‌লে, উটের নাম সহরে; আমিই নাকি সব রটিয়ে দি? এখন কাণথাকীদের কাণ নাই? শুন্‌ছ না,—সদু কি বল্‌ছে, ডেক্‌রারা আয় না, সদুর মুখ চাপা দে না; কেবল শ্যামাবামনীর রেশে লেগে থাকিস্। সরোজিনী যে কাল একাদশীর রেতে ফলার মেরেছে, আমি কি তা ঘাটে বলেছি? পাপ-কর্ম্ম ছাপা থাকে না, ধর্ম্মের ঢোল আপ্‌নি বেজে উঠে, আজ যে ঘাটময় রাষ্ট্র, সদু কেমন নাক সিঁটকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌ছে,—শোন্‌না। এ শ্যামাবাম্‌নী নয়, শ্যামাবামনী নয় যে, খ্যাঙ্‌রা নিয়ে কোমর-বেঁধে আস্‌বি?

সৌদামিনী। সবাইত শুন্‌লে, আমি কি সরোজিনীর নাম করেছি? এ যে বাতাসের আগা ধ'রে কোঁদল করা।

শ্যামাসুন্দরী। বটেরে, বলিস্ নি? গৌরীদিদি দ্যাখ্‌লি? এমন্ বাপে জন্মায়নি, যা একবার বল্‌বে, তা গিল্‌বে ক্যান? কার ভয়? বল্‌বে, আবার কোঁদল কর্‌বে, দ্যাখ্‌ সদু, তোর সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না, তোর কোঁদলের সাধ থাকে, তোর ভেজের সঙ্গে কোমর বেঁধে লাগ্‌না, আমার তেষ্টায় মুখ শুকিয়ে গ্যাছে। আমি দুঃখী মানুষ, আমি কারু কথায় থাকি না।

হরসুন্দরী। তা, হয়েছে কি? তুমিই বল, আর সদুই বলুক, সত্য কথা বলেছ, তাতে আর দোষ কি? তারা ক'ত্তে পারে, লোকে কি তা বলতেও পারে না?

গৌরী। তোমরা যে একাদশীতে জল খেয়েছে ব'লে বড় ঘোঁট ক'চ্ছ; তার যে বিয়ে, তার কোন খবর রাখ কি?

শ্যামাসুন্দরী, হরসুন্দরী প্রভৃতি মেয়েরা (দাঁতে জিব

Sponsa de Libano—বসন্তাগমে

চিত্র-শিল্পী—স্যর্ এড্ওয়ার্ড্ বর্ণ্-জোন্স্, Bart.]

কাটিয়া, ওমা, বল কি? বল কি? তোমায় আবার এ খবর দিলে কে?

গৌরী। দিবে আবার কে? যাদের কাজ তারাইত বলছে। সেদিন কৃষ্ণধন মুখুয্যা নাকি তার বৈঠক্‌খানায় বলেছে, আমারত আর ছেলেপিলে নেই, ছেলে বল্লেও সরোজিনী, মেয়ে বল্লেও সরোজিনী; যদি স্মৃতিতীর্থ বাবাজী স্বীকার করে, তবে সরোজিনীকে তার হাতে তুলে দিয়ে, সরোজিনীর নামে বাড়ীঘর বিষয়সম্পত্তি লিখে দিয়ে, আমরা স্ত্রী-পুরুষে কাশীবাস ক'র্‌ব। একথা সবাই শুনেছে,—সবাই শুনেছে।

হরসুন্দরী। বটে, বটে, তাইত, তাইত; সেদিন ভাগ্নীটা বুক্‌ ফেটে মারা গেল, একটু জল একটু জল ক'রে কার না পা ধ'ল্লে; তার কাত্‌রানি দেখে চোখে জল এল, একাদশী যে, জল ত দিতে পারি না, চোখের সাম্‌নে কাটা পাঁটার মত ছট্‌পটিয়ে মারা গেল; সে বেলায় দয়া হ'ল না। এ যে নধর চেহারা, দুধে-আল্‌তায় গুলিয়ে রঙ্‌, পটোল-চেরা চোখ, চাঁদপানা মুখ, দয়া হবে না? বুঝ্‌বার আর বাকী নেই, সব বুঝেছি, সব বুঝেছি।

সৌদামিনী। কেবা বুঝে না? কেবা এত হ্যাকা! সেদিন এই ঘাটে সরোজিনী নেয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ী চ'লে গেল, আর ঐ ঘাটে স্মৃতিতীর্থ সন্ধ্যা ক'চ্ছিল। যতক্ষণ সরোজিনীকে দেখা গেল, মিন্‌সে একদৃষ্টে হাঁ করে সেই দিকে—তাকিয়ে রইল, কোথা বা সন্ধ্যা, কোথা বা তর্পণ, সব গুলিয়ে গেল।

পূজান্তে বর্ষীয়সীরা পুষ্প-বিল্বপত্রগুলি আস্তে আস্তে গঙ্গায় দিয়া, আসন গুটাইয়া, বগলে লইয়া, টাট-কোশাকুশী ডালায় উঠাইয়া হাতে লইয়া, প্রস্থানোদ্যতা হইলে, অন্যান্য মেয়েরাও তাড়াতাড়ি স্নানাদি সারিয়া, তাহাদিগের অনুগমনে প্রবৃত্তা হইল।

জমীদারের বৈঠকখানা গৃহ

গ্রামের মধ্যস্থলে গ্রামের জমীদার কৃষ্ণধন চৌধুরীর প্রকাণ্ড গৃহ। তাহার বৈঠকখানার উপরের হল-ঘরে সমস্ত ঘরজোড়া তক্তপোষের উপরে সেই তক্তপোষজোড়া প্রকাণ্ড তোষক, ধপধপে প্রকাণ্ড সাদা চাদরে সমস্ত তোষক ঢাকিয়া প্রকাণ্ড ফরাস হইয়াছে। সেই ফরাসের মধ্যে একটি বৃহৎ তাকিয়া রহিয়াছে; সেই তাকিয়ায় পড়িয়া, টানা পাখার বায়ুহিল্লোলের মধ্যে থাকিয়া, কৃষ্ণধন চৌধুরী এপাশ ওপাশ করিতেছেন। দেওয়ালে আবদ্ধ ঘড়ীতে ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দে তিনটা বাজিয়া গেল। জড়িত চক্ষু ঈষৎ মেলিয়া, হাই তুলিয়া, জড়িত কণ্ঠে কহিলেন,—"নট, তামাক কৈ?"

নট। আজ্ঞা, তামাক প্রস্তুত।

নট তাড়াতাড়ি রূপার পিক্‌দানী, জলপূর্ণ রূপার একটি বড় গাড়ু ও গামছা লইয়া, পাপোছে পা পুঁছিয়া, ফরাসের উপরে হাজির। কৃষ্ণধন উঠিয়া পিক্‌দানীতে ২।৩ বার কুলকুচা জল ফেলিয়া, গামছায় হাত, মুখ, চোখ পুঁছিয়া, গামছা নটের হাতে দিলেন। মুহূর্ত্তের ভিতরে নট মিছরির সরবোতে পরিপূর্ণ রূপার একটি গেলাস ও রূপার একটি ছোট কৌটা মুখ খুলিয়া, কৃষ্ণধনের সম্মুখে উপস্থিত করিল। কৃষ্ণধন দক্ষিণ হস্তে কৌটা হইতে একটি কৃষ্ণবর্ণ বটিকা তুলিয়া, আবার আঙুলে একটু একটু পাকাইয়া, মুখে ফেলিয়া দিয়া, গেলাসের সরবতটুকু নিঃশেষ করিলেন; বটিকা একটু আটা আটা, এইজন্য গামছায় আঙুল দুইটি পুঁছিয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ নট মুখ খুলিয়া, একটি রূপার ডিবা ধরিল; কৃষ্ণধন সেই ডিবা হইতে দুইটি পান লইয়া মুখে দিলেন ও মুখের এপাশওপাশ করিয়া, আস্তে আস্তে চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন—আরে, আর কি দাঁতে তেমন জোর আছে? শুপারিগুলি আরও সরু করিয়া কাটিস্‌। নটো একটি বড় কল্‌কায় ফুঁ দিতে দিতে ফরসির উপরে বসাইয়া, তাহার উপরে সরপোষ দিয়া নলটি কৃষ্ণধনের হাতে তুলিয়া দিল। কৃষ্ণধন তাকিয়ায় ভাল করিয়া ঠাস দিয়া, তামাক খাইতে লাগিলেন ও মুহূর্ত্তে সুগন্ধির ধূমে গৃহটিকে হিমালয়ের অংশ-বিশেষ করিয়া তুলিলেন।

কৃষ্ণধন। আরে, চূড়ামণি মহাশয়, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ও স্মৃতিতীর্থকে ডাকিতে কেউ গিয়াছিল?

নট। আজ্ঞা, দরোয়ান গিয়াছিল; তাঁরা আস্‌ছেন।

কৃষ্ণধন। একখানি গালিচা পাড়িয়া রাখ।

নট। আজ্ঞা, সব ঠিক আছে, গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছি।

এক সঙ্গেই চূড়ামণি, বিদ্যাবাগীশ ও স্মৃতিতীর্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণধন। (চূড়ামণি ও বিদ্যাবাগীশের দিকে তাকাইয়া)

একটু পায়ের ধুলা দিয়া আসনে বসুন; স্মৃতিতীর্থ বাবাজী, প্রণাম।

স্মৃতিতীর্থ। এরূপ করিলে আপনার নিকটে কি করিয়া আসি? আপনি আমার পিতারও বয়োজ্যেষ্ঠ।

কৃষ্ণধন। আরে পাগলা বলে কি? তোমরা যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত; স্ববৃত্তিতে আছ। আমরা জমীদার, আমাদের শ্ববৃত্তি।

চূড়ামণি। কর্ত্তা, বলেন কি? আপনাদের শ্ববৃত্তি হইবে কেন? চাকুরিই হইতেছে শ্ববৃত্তি।

কৃষ্ণধন। তাত বটে, তাত বটে। একমুষ্টি ভাতের জন্য কুকুরগুলো কেমন কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি করে, আমরা জমীদারেরাও তেমনি এক হাত মাটির জন্য কত মারামারি, কাটাকাটি, দাঙ্গাহাঙ্গামা করি; কত ফৌজদারী, দেওয়ানি মোকদ্দমা করি; আমরা কুকুর বৈ কি আর? (হো হো করিয়া হাস্য)

বিদ্যাবাগীশ। চূড়ামণি, কর্ত্তার কবিত্বটা দেখ একবার কেমন মিলাইয়া দিলেন।

চূড়ামণি। বল কি বিদ্যাবাগীশ, বল কি? তুমি কি আজ জানিলে? কর্ত্তা যে নির্জ্জনে থাকার সময়ে নিজেই গুণ গুণ করিয়া গান, আর লিখেন; এমন বড় বড় ৫।৭টি খাতা গান রচনা করিয়া পূর্ণ করিয়াছেন; সবগুলিই সাধন-মার্গের, সবগুলিই জগদম্বার বিষয়ে। জগদম্বার রূপ, গুণ, লীলা সব আছে। দোষের মধ্যে সেগুলি প্রকাশ করিলেন না, করিলে কমলাকান্ত, দেওয়ান মহাশয়, রাম-প্রসাদ আর ক'লকে পেত না। (কৃষ্ণধনের দিকে তাকাইয়া) কর্ত্তা, বলেন কি? এই যে ভূমিসম্পত্তি লইয়া, আপনারা বিবাদ বিসংবাদ করেন, একি কুক্কুর-বৃত্তি, এ যে সিংহ-বৃত্তি; সিংহের আসনে বসিয়া, কি শৃগালের কার্য্য করিবেন? আপনি রাজা, রাজা ইন্দ্রাদি লোকপালের অংশে জাত; বিদ্যাবাগীশ, বলনা, বচনের পূর্ব্বার্দ্ধটা কি? যাউক,—"মাত্রাভি র্নিম্মিতো নৃপঃ" দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন কর্‌বার জন্যই রাজার সৃষ্টি; তেজ না হ'লে প্রজাপালন চলিবে কি করিয়া? দুষ্টের উপদ্রবে যে প্রজা নির্ম্মূল হইবে। শুধু কোমলতায়, শুধু শীতলতায়, আপনাদের চলে না; তেজ চাই, তেজ চাই; এক মুষ্টি অন্ন রাঁধিতে হইলেও যে, অগ্নিজলের প্রয়োজন; একটি চাল্‌কেও সিদ্ধ করিতে শীতল জলের ক্ষমতা নাই; আর এত বিপুল সম্পত্তি। রাজাদিগের যুদ্ধবিগ্রহইত নিত্য কর্ম্ম। এক্ষণে কলিতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ কি না? "ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহু-র্মনীষিণঃ।"

বিদ্যাবাগীশ। না, না ও বচনে যুদ্ধের উল্লেখ নাই।

চূড়ামণি। ও বচনে না থাকে—বচনান্তরে আছে; যুদ্ধ কি এখন আছে ভায়া? দেখাতে পার? এখন যে কর্ত্তাদের মধ্যে একাধটু দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, আর বিলাত-আপীল পর্য্যন্ত যে মামলা-মোকদ্দমা হয়, এই গুলিই যুদ্ধ-স্থানীয়। ইহাতেও জয়পরাজয় শব্দের ব্যপদেশ আছে। কর্ত্তার সুকৃতির অবধি নাই, এত যে মোকদ্দমা হইতেছে, একটিতেও কি কর্ত্তার পরাজয়ের নামগন্ধ শুনিয়াছ? সেবার সেই বড় মোকদ্দমায় উকীলেরা ভীত হইয়াছিল, আমিই কেবল সাহস দিয়াছি। শাস্ত্র কি মিথ্যা হইবে। বগলামুখীর মন্ত্র জপ করিতেছি, জয় না হইয়া যায় না। এক দিন নয়, দুদিন নয়, ছটি মাস হবিষ্যান্ন ক'রে মন্ত্রজপ করিতে হয়েছে, তুমিই ত জপে ছিলে। পূজার সেই হরিদ্রা-বর্ণের গরদের শাড়ীখানি আজও ঘরে আছে, কখনও ব্রাহ্মণী পরিধান করে, কখনও বধূমাতা পরিধান করেন।

বিদ্যাবাগীশ। ঠিক বলিয়াছ চূড়ামণি, ঠিক বলিয়াছ। জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্য না থাকিলে, কি এইরূপ উচ্চ-বংশে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন? না এত লোক মুখাপেক্ষা হইয়া থাকিত? "পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা-নাসৌ প্রাকৃতমানুষঃ।"

চূড়ামণি। কর্ত্তার সুকৃতির দৃষ্টান্ত ত প্রতিপদেই বিদ্যমান। স্বর্গীয় কর্ত্তাদের সময়ে যে পরিমাণে জমীদারি ছিল, কর্ত্তার সময়ে ত তার চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, আয়ত দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসিবার সময়ে কর্ত্তার কর্ত্তিত পুষ্করিণীটি দেখিয়া আসা হইল; দেখিলে ত সেটি পুষ্করিণী নয়, সাগর-বিশেষ। বাঁধা ঘাটটিই বা কেমন সুন্দর; অত্যুৎকৃষ্ট, অত্যুৎকৃষ্ট। সাততাল জলের নীচের বালুকাগুলি পর্য্যন্ত গোণা যায়; এমন নির্ম্মল জল ত কখনও দেখি নাই। পাপমুখে কি বলিব? গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, এই নির্ম্মল শীতল জল পান করিতে ইচ্ছা করে। "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণং"—সর্ব্বত্র সৌভাগ্যের পরিচয়। পুত্র কয়েকটি কেমন

রত্ননির্ব্বিশেষ। (কৃষ্ণধনের দিকে তাকাইয়া) কর্ত্তার তৃতীয় পুত্র হরিধন এবার ২য় পরীক্ষা ত দিবে?

কৃষ্ণধন। আজ্ঞা, না, এবার তার প্রথমবার্ষিক শ্রেণী আগামী বৎসরে তার পরীক্ষা। আপনি ভুল ক'রেছেন, ওর নাম হরিধন নয়—হরিসাধন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির নাম কালীধন। এইটি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ হইতে এম্, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। সরকার বাহাদুর ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি দিতে চান; আমার মত নয়, কিসের অভাবে ডিপুটিগিরি ক'রে; এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে। মেজোটির নামই হরিধন; এম, এ, বি, এল, পাশ ক'রে, হাইকোর্টের উকিল হ'য়েছে। হাইকোর্টে নিজেরও ত সদা সর্ব্বদা কাজকর্ম্ম থাকে; সেইজন্য তাকে হাইকোর্টে দিয়াছি। এখন আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

চূড়ামণি। আমি কয়েকটিকেই ভালরূপে চিনি, বলিতে ভুল করিয়াছি; হরিসাধন বলিতে যাইয়া, হরিধন বলিয়াছি। তাই বলিতেছি, ছেলে কয়েকটিই যেন রত্ন। যেমন বিদ্যা, তেমনি বুদ্ধি, তেমনি বিনয়, নম্রতা, তেমনি হিন্দুয়ানি; সন্ধ্যা না করিয়া জলপান করা নাই।

কৃষ্ণধন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে এবংশে অহিন্দুভাব আস্‌বার সম্ভাবনা নাই। (স্মৃতিতীর্থের দিকে মুখ ফিরাইয়া) দেখ বাবাজী, এ বংশ হ'তে হিন্দুয়ানীও উঠিবে না, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সম্মানও যাইবে না। বাপ-পিতামহকে যেরূপ করিতে দেখিয়াছি, সেইরূপ চিরকাল করিব। তুমি বয়সে কম হইলে হয় কি? তোমরা যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। আমরা বুনিয়াদি ঘরের লোক, আধুনিক নাই। জমীদার হ'লে হয় কি? এ জমীদারি আজ-কালকার নয়; আমরা নবাবি-আমলের জমীদার কিনা; সেই জন্য নাটোরের ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের মত আমাদের ঠিক চালচলন চলিয়া আসিতেছে, আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ভক্ত। তবে কথা কি জান; এখন তোমাদের নিজের সম্মানটুকু তোমরা নিজে বজায় রাখিলেই থাকিবে; নয়ত এদিক্ ওদিক্ গেলে এ সম্মান থাকিবে না।

স্মৃতিতীর্থ। আজ্ঞা, বুঝিলাম না, এদিক্ ওদিক্ যাওয়াটা কি?

কৃষ্ণধন। বুঝিলে না, এই বিদ্যাসাগরের চেলা হওয়া। যেমন তুমি হইয়াছ।

স্মৃতিতীর্থ। আমার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলাপও নাই—পরিচয়ও নাই। আমি কখনও তাঁর নিকটেও যাই নাই; বিধবা-বিবাহেরও আমি সমর্থন করি না; তবে তাঁর চেলা হইলাম কি করিয়া?

কৃষ্ণধন। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, আর হরচন্দ্র একাদশীতে বিধবাকে দিব্যি ফলার করাইতেছেন,—একই কথা।

স্মৃতিতীর্থ। একাদশীতে বিধবা যে অনুকল্প করিতে পারে; তার আমি শাস্ত্র দেখাইতে পারি।

কৃষ্ণধন। বিদ্যাসাগর কি আর বিধবা-বিবাহের শাস্ত্র দেখান নাই? বুঝিতে হইবে, ও সকল শাস্ত্র এখন বাতিল। শাস্ত্র কামধেনু—যা চাও—তাই পাওয়া যায়। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যে মনুতে সুরা-পানের মরণান্ত-প্রায়শ্চিত্ত আছে, সেই মনুতেই আবার মদ্যপানে দোষ নাই, আছে; এখন ব্যবস্থা কি দিবে? যখন মনু নিজেই "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" বলিয়াছেন, নিয়মটিইত সর্ব্বত্র খাটিবে। প্রবৃত্তি ত শুধু মানুষের নয়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সবারই স্বাভাবিক। পতঙ্গ যে প্রদীপে পড়িয়া মরে; মাছ যে বড়িশে বিদ্ধ হয়; সেওত তাহাদিগের প্রবৃত্তির উত্তেজনায়। তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রও নাই, গুরুও নাই। প্রবৃত্তির জন্য কি আর শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় বাপু? জন্মাবধি মানুষ তার তাড়নায় অস্থির। পিতা, মাতা, ধাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই বালককে জন্মাবধি নিবৃত্তির শিক্ষা দিয়াই আসিতেছে। নয়ত কবে বালক আগুনে পুড়িয়া, জলে ডুবিয়া, বিষ খাইয়া, সাপের জিভে হাত দিয়া, মারা যাইত বা হাত পা পোড়াইয়া, কাঁটায়, খোঁচায়, অস্ত্রেশস্ত্রে কোন অঙ্গকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিত। নিবৃত্তির শিক্ষাই শিক্ষা, প্রবৃত্তির শিক্ষা দিতে হয় না; আপ্‌না আপনিই মানব প্রবৃত্তির কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছে। এইজন্য শাস্ত্রের যে যে অংশে প্রবৃত্তির উপদেশ আছে, সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নয়, তার অন্যরূপ অর্থ থাকিতে পারে। বাবাজী, এগুলি আমার কথা নয়, এগুলি সেই মহাপুরুষের কথা, তোমার পিতামহের কথা, সব কি ছাই আর তা মনে আছে।

চূড়ামণি। বিদ্যাবাগীশ, শুনিলে, শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত।

কর্ত্তা যা অল্লাক্ষরে-বুঝাইয়া বলিলেন, আমরা তা পারিতাম না। একাধারে লক্ষ্মী, সরস্বতী দুই বিদ্যমান।

বিদ্যাবাগীশ। কেবল লক্ষ্মী, সরস্বতী কেন বল? আর ধর্ম্ম!

চূড়ামণি। আরে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম বল কি? সাক্ষাৎ ধর্ম্মইত শাপভ্রষ্ট হইয়া কর্ত্তা হইয়া জন্মিয়াছেন! সেই জন্যই ত আজও পৃথিবীতে ধর্ম্ম আছে, আজও চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত আছে, দিবারাত্রি আছে, রব্যাদিবার, তিথি, নক্ষত্র, সবই আছে, পতিতপাবনী গঙ্গা রয়েছেন। কি বলিব? ভায়া, উনি যদি কলিকালে না জন্মিয়া দ্বাপরে জন্মিতেন; তবে তাঁহাকে লইয়া বেদব্যাস আর একখানি মহাভারত রচনা করিতেন।

স্মৃতিতীর্থ। যখন শাস্ত্রের কথা উঠাইলেন, তখন আমি কিছু বলিতে চাই।

কৃষ্ণধন। (একটু ক্রুদ্ধস্বরে) তুমি আর কি বলিবে বাপু? যে শাস্ত্রের সঙ্গে সদাচারের মিল নাই, সে শাস্ত্র কস্মিন্ কালে মান্য নয়। জানত—"আচারো বিনয়ো বিদ্যা" —সেই আচার মানিয়া চলিতে হইবে। তুমি আর কতটুকু শাস্ত্রই পড়িয়াছ, তাই আবার বলিবে! সেকালে তোমার পিতামহের কেহ জুড়ি ছিলেন না; তাঁর সঙ্গে বিচারে আঁটিতে পারে,—এমন পণ্ডিত ত আমি দেখি নাই। এই চূড়ামণি মহাশয়, এই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ও তাঁর ছাত্র। তিনিই বলেছেন—"একাদশীতে বিধবার অন্তর্জ্জলি পর্য্যন্ত নাই"—তা অপেক্ষায় তুমি কি আবার বড় পণ্ডিত হইলে যে, তোমার মুখে শাস্ত্র শুনিব? এইত সেদিন নব্বুই বৎসর বয়সে মা-ঠাকুরাণীর গঙ্গা-লাভ হইল। দ্বাদশীর দিন তাঁর গঙ্গালাভ হয়। একাদশীর দিন আর আমি সহ্য করিতে পারিলাম না; বলিলাম,—"মা, আমি সমস্ত পাপ মাথিয়া লইতেছি, আপনি একটু গঙ্গা-জল পান করুন।" মা বলিলেন, "মূর্খ, বলিস কি? এতদিন একাদশী ক'রে বিধবা হ'য়ে আজ মরবার সময় জল খাব? না হয়, এতে মৃত্যুই হবে। দেখছিস্ না, আমার জন্য বিষ্ণুদূত ঐ রথ নিয়ে আকাশে দাঁড়িয়ে আছে; আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, তোরা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না।"

চূড়ামণি। আহা! কি বল্‌ব? তাঁর তুলনা নাই, তাঁর তুলনা নাই, তাঁর তুল্য পুণ্যবতী এ কলিকালে মিলে না, কলিকালে মিলে না। এক রাণী ভবানীর কথা শুনিয়াছি, আর চক্ষে ইঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁর কথা তুলিলেই চক্ষে জল আসে। তাঁর সেরূপ পুণ্যবল না থাকিলে কি তিনি এরূপ রত্নগর্ভা হ'তে পার্‌তেন?

কৃষ্ণধন। দেখুন,—চূড়ামণি মহাশয়, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, স্মৃতিতীর্থ ঘরের ছেলে, অন্য নয়, সেই মহাপুরুষের বংশধর; তাঁর নিকটে আমরা সকলেই ঋণী। না বুঝে বয়সের দোষে যা একটা ক'রে ফেলেছে; তাই বলে কি স্মৃতিতীর্থকে ত্যাগ করা যেতে পারে! নিজের বিষ নিজেই গিলতে হবে। এইত, মাঠাকুরাণীর ষাণ্মাসিক কৃত্য আস্‌ছে; নানা স্থানের পণ্ডিতদিগের চরণধূলি পড়্‌বে। চুপি চুপি তাঁদিগকে জিজ্ঞাসা ক'রে গঙ্গাস্নান বা গায়ত্রী-জপ যা হয়, একটা চুপি চুপি একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেই হ'বে।

চূড়ামণি। তা যেন হ'ল, সে বিধবাটার, তারত আর চুপি চুপি সার্‌বার উপায় নাই, শাস্ত্র ত আর তা বলে না।

কৃষ্ণধন। সে সম্বন্ধে যা করিতে হইবে, আমিই করিব, সব ঠিক আছে, সে বিষয়েও আপনাদের ভাবিতে হইবে না। তা যাউক, আর ত দিন নাই, আজ ২রা, ১৫ই কার্ত্তিকইত শ্রাদ্ধের দিন। নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হইবে, তারপর শিরোনাম লিখিতে, ডাকে দিতে, আরও ২।১ দিন বিলম্ব হতে পারে; আপনি ত নিমন্ত্রণের শ্লোকটি এখনও দিলেন না।

চূড়ামণি। (নিজের স্কন্ধ হইতে চাদরখানি নামাইয়া তাহার কোণা হইতে বন্ধন মুক্ত করিয়া, দীর্ঘে ১০ অঙ্গুলি, প্রস্থে দুই অঙ্গুলি প্রমাণ একখানি কাগজ বাহির করিয়া কৃষ্ণধনকে দিয়া বলিলেন) এই শ্লোক করিয়াছি, লউন।

কৃষ্ণধন। আপনি একবার শ্লোকটি পড়ুন; আগে শোনা যাউক, অদ্যই ছাপাইতে ছাপাখানায় দিতে হইবে। চস্‌মার কি প্রয়োজন হইবে?

চূড়ামণি। চসমা! না, এই সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে; চসমার প্রয়োজনের উপলব্ধি একদিনও করি নাই। আমরা ত বর্ত্তমান কালের দেবেন্দ্র, উপেন্দ্র, নগেন্দ্র, নই যে, ষোল বৎসর বয়সের সময়েই চসমার আবশ্যকতা হইবে।

(হো হো করিয়া সকলের হাস্য।)

চূড়ামণি। তবে শ্লোকটা শুনুন,—

দেহার্দ্ধং প্রণিপাত্য জাহ্নবীজলে পীত্বা চ গঙ্গাজলং
নত্বা শ্রীগুরুদেবচরণকমলং স্মৃত্বা চ নারায়ণং।
ধ্যাত্বেষ্টাং কুলদেবতাং গতবতীস্ব স্বৎকৃতির্ভাবিনী
উর্জ্জে কামশরেন্দু মে রবিদিনে প্রেত্যাত্রমা পূর্য্যতাং ॥

কৃষ্ণধন। বড় সুন্দর হয়েছে, বড় সুন্দর হয়েছে। গত কল্য ভট্টপল্লী হ'তে ঠাকুর মহাশয় এসেছিলেন; তিনি বল্লেন, "চূড়ামণি মহাশয় থাক্‌তে আর আমার শ্লোক করা উচিত নয়।" মার যা ছিল, তার সব কথাগুলি আপনি শ্লোকে বসিয়া দিয়াছেন। বাখরগঞ্জে আমাদের বড় সম্পত্তি কি না, প্রজারা একবার মাকে যাবার জন্য বড়ই জেদাজেদি করেছিল; যথেষ্ট লাভ ছিল, কিন্তু সেখানে গঙ্গাজল পাওয়া যাবে না ব'লে, মা যেতে রাজি হন নাই। মা গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য জল কখনও খেতেন না, গুরুদেবকে প্রতিদিন ১৲ টাকা প্রণামী দিয়া প্রণাম করিতেন। জগদম্বা ও নারায়ণে তাঁর তুল্যবুদ্ধি ও তুল্যভক্তি ছিল, আবার অন্তিম কালে যে, তাঁকে গঙ্গাজলে অর্দ্ধনাভি করা হয়েছিল; এ সমস্ত কথাইত আপনি শ্লোকে দিয়াছেন। আমি যদিও তেমন সংস্কৃত জানিনা, তবু শুনিলে বুঝিতে পারি। আমি যা বলিলাম, তাইত শ্লোকটির অর্থ?

চূড়ামণি। দেখেছ বিদ্যাবাগীশ, এই শোনা মাত্র অর্থবোধ! দেখেছ, এরূপ কখনও কাহারও কি হয়? বিদ্যাবাগীশ, কর্ত্তার প্রতিভার কাছে যে কিছুই আটকায় না। হাঁ! স্মৃতিতীর্থ বাবাজী, তুমি একবার শ্লোকটা দেখনা। আমরা বৃদ্ধ—বহুকাল ব্যাকরণ পড়িয়াছি—মলিন হইয়া গিয়াছে, তারত ব্যবসায় করি না; স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবসায়েতেই যে সময় পাওয়া যায় না। তোমার অল্পদিনের পড়া, বেশ উজ্জ্বল আছে।

স্মৃতিতীর্থ। আজ্ঞা, অল্প কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলে মন্দ হইত না। "প্র" "এবং "নি" পূর্ব্বক "পত" ধাতুর প্রণামেই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। "প্র" পূর্ব্বক "ই" বা "ইন্" ধাতুরও পরলোক-গমনেই ব্যবহার দেখা যায়; সেই জন্য "প্রণিপাত্য" ও "প্রেত্য" এই দুই পদের পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। "জাহ্নবী জলে" এই স্থলে "গাঙ্গ সলিলে" ও "চরণ-কমলং" এই স্থলে "পাদ কমলং" করিলে যেন ভাল হয়। এই দুইটি পরিবর্ত্তন কেবল ছন্দের জন্য করিতে বলি।

চূড়ামণি। এমন কথা ত কখনও শুনি নাই যে, "প্র" পূর্ব্বক "ই" ধাতু বা "ইন্" ধাতু হইলেই পরলোক-গমন বুঝায়। নিমন্ত্রণ-পত্রের শ্লোকে "প্রেত্য" দেওয়ার চিরদিন ব্যবহার আছে। এরূপ সহস্র সহস্র শ্লোক দেখাতে পারি। ছন্দঃ কিহে ছন্দঃ কি? লঘুগুরুনির্ণায়ক চিহ্ন কিছু জান? দণ্ডাকার চিহ্নের নাম লঘু—আর দকারাকার চিহ্নের নাম গুরু। আমরা যে কোন প্রাচীন কবিতাকে আদর্শ করিয়া, প্রথমতঃ তাহার একটি চরণ লিখি, তারপর সেই চরণের লঘুগুরু দেখিয়া, চিহ্নগুলি লিখি, সেই চিহ্ন অনুসারে কবিতা লিখি; তোমরা কি কর?

স্মৃতিতীর্থ। ঐরূপ চিহ্নের ব্যবহারের কথা শুনিয়াছি। আমরা কোন চিহ্নও লিখি না, তদনুসারে কবিতাও করি না। ছন্দঃ ঠিক হইল কি না কর্ণই তা বলিয়া দেয়।

চূড়ামণি। বল কি? কর্ণ কি সচেতন, সে ছন্দঃ বুঝে; তার কি বাক্‌শক্তি আছে, সে বলিতে পারে। "তথাত্বক্ষে দিদ্রিমাণামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ"—শুধু স্মার্ত্ত মনে করিওনা, অবয়বান্ত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। তোমরা অস্তি অপদার্থ, তীর্থ ত নও—কাকতীর্থ। আজ কর্ণের চৈতন্য, কাল চক্ষুর চৈতন্য স্বীকার করিতে করিতে, ঢেঁকী কুলোর পর্য্যন্ত চৈতন্য স্বীকার করিবে। যাউক, কর্ত্তা কি বলেন? "জাহ্নবী জলে" পরিবর্ত্তন করিয়া কি "গাঙ্গ সলিলে" করিব? "চরণ কমলে" পরিবর্ত্তন করিয়া কি "পাদকমলে" করিব? যা বলেন, তাই করিব।

কৃষ্ণধন। না না, তাকি হয়? "জাহ্নবী জলে" দুইটি "জ" পড়েছে, এরূপ মিষ্টি অনুপ্রাস কি ছাড়া যায়? "পাদকমলে" অপেক্ষা "চরণ কমলে" যে বড় মিষ্ট। পদ্যে মধ্যে মিল দিবার পর্য্যন্ত রীতি আছে; "কমলে" এতে ম আছে, "চরণে" এতে ণ আছে। বর্গের পঞ্চম বর্ণ বড়ই মধুর। আপনি "চরণ" দিয়েছেন বলেইত আপনার "চরণে" প'ড়ে চির দিন রয়েছি। (হাই তুলিয়া) তারা, চরণে স্থান দাও। দেখুন, চূড়ামণি মহাশয়, স্মৃতিতীর্থ বাবাজী এখনও বালক। তার এখনও শিখবার অনেক আছে। আপনারা যদি কিছু দিন বেঁচে যেতে পারেন, তবে ইনিও আপনাদের মত হ'তে পারবেন,—বুদ্ধি আছে, নম্রতাশীলতাও আছে।

একে আপনি ক্ষমা করবেন; এ আপনার পুত্র বল্লেই হয়।

চূড়ামণি। আমি ত তাই মনে করি; ধৃষ্টতাটা একবার দেখুন, আমার সম্মুখেই।

নট। আজ্ঞা, লছমী লাল মাড়য়ারি, কৃষ্ণ সেক্‌রা ও মুরসিদাবাদের গোবিন্দ মুখুয্যা এসেছেন।

কৃষ্ণধন। আচ্ছা, নিয়ে এস।

নট বাহির হইয়া আবার তাহাদিগকে লইয়া, গৃহে প্রবেশ করিল। লছমী লাল প্রণাম করিয়া, তিনখানি শাল সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"এই জোড়া কাশ্মীরি শাল মূল্য পাঁচ শত টাকা, এ জোড়ার মূল্য আড়াই শত টাকা—আর এখানি দেরোখা মূল্য পঞ্চাশ টাকা।"

কৃষ্ণধন। চূড়ামণি মহাশয়, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, শাল গুলি দেখুন না, পছন্দ হয় কি না?

চূড়ামণি-বিদ্যাবাগীশ। বুঝিলাম না, কিসের জন্য? জানিলে পছন্দ করিতে পারি।

কৃষ্ণধন। এই পাঁচশত টাকার জোড়া সুখাসনে দিব, আড়াই শত টাকার জোড়া বৃষের পৃষ্ঠের—আর শীত কাল এল কিনা—সেই জন্য দানে, বরণে ও সভাবরণে এই দোরোখা সাল দিতে মনঃস্থ করেছি।

বিদ্যাবাগীশ। সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে, শালগুলির ভিতরে একখানিও থেলো নয়। গুরুর শালখানির কি প্রকাণ্ড হাঁসিয়া।

চূড়ামণি। উত্তরীয় বস্ত্র যেন হইল? পরিধের বস্ত্রত চাই।

কৃষ্ণধন। শুধু পরিধেয় কেন বল্‌ছেন, আরও এক একটি গরদের জোড় থাক্‌বে। (গোবিন্দ মুখুয্যার দিকে তাকাইয়া) আপনিও ত এনেছেন?

চূড়ামণি। উত্তম কল্প।

গোবিন্দ মুখুয্যা নমস্কার করিয়া একটি গরদের জোড় সম্মুখে রাখিলেন।

কৃষ্ণধন। (ধুতি ও চাদর পৃথক্ পৃথক্ দেখিয়া) মূল্য?

গোবিন্দ। ধুতির সঙ্গে যে সকল চাদর বোনা হয়, তা ভাল হয় না। সেই জন্য পৃথক্ বোনা ধুতি, পৃথক্ বোনা চাদর এনেছি। চাদরের দাম দশ টাকা, ধুতির বার টাকা।

চূড়ামণি। তবেত এক একটি বরণে অনেক খরচ পড়িবে?

কৃষ্ণধন। আরও আঙ্‌টী ও পৈতা আছে। কৃষ্ণ, বের কর্‌না।

কৃষ্ণ সেক্‌রা প্রণাম করিয়া আঙটী, পৈতা এবং কলসী প্রভৃতি কতকগুলি রূপোর বাসন বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিল।

চূড়ামণি। (পৈতা ও আঙ্‌টী হাতে করিয়া) সুন্দর হইয়াছে, ওজনেও আছে, আঙ্‌টীতে আবার দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে।

কৃষ্ণধন। ধর্ম্মের সঙ্গে চালাকি করা আমি পছন্দ করি না। পৈতায় নয়গুণ থাকা প্রয়োজন; সেই জন্য নয়গুণে পেচিয়ে দুই ত্রিদণ্ডী করা হয়েছে, এইজন্য ওজনে একটু ভারি হয়েছে। বরণ-বাক্যেত সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক বলবেন? আশীরতি সোণা না হ'লে যে সুবর্ণ হয় না। (হাসিয়া) দেবমূর্ত্তি এতে দেওয়াতে আর ভেঙ্গে অন্য কাজে লাগাতে পারবেন না, প্রতিমা ভঙ্গে যে পাপ হয়। বিক্রি ক'র্ত্তেও পার্‌বেন না, ব্যবহার ক'র্ত্তেই হবে। শুনেছি, সেদিন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একখানি পত্র রেজেষ্টারি ক'র্ত্তে যে একটি শীলমোহরের জন্য নাকাল হয়েছিলেন, সে কাজও চল্‌বে।

চূড়ামণি। দেখিলে বিদ্যাবাগীশ, কর্ত্তার ধর্ম্মবুদ্ধি কেমন? ব্যবহারবিষয়িণী বুদ্ধিই বা কেমন প্রখরা? আচ্ছা, রূপোর টাট—কোশাকুশীর প্রয়োজনীয়তাটা ত বুঝিলাম না।

কৃষ্ণধন। রূপোর দানসাগর ক'রে তামা পেতল দিয়ে বৃষোৎসর্গ করা মানায় না। তাই বৃষোৎসর্গেও রূপোর জিনিস ক'র্ত্তে বলেছি। ব্রতীদের আচমন ক'র্ত্তে হবে ত? কোশাকুশীর দরকার। বেদীতে চারিজন, বিরাটে চারি জন, গীতায় চারিজন ব্রতী থাকিবেন, তাদের এই বার জোড়া কোশাকুশী। আর এই বড় জোড়া গুরু-শয্যার সঙ্গে থাক্‌বে। আতরদান, গোলাপপাশ থেকে আরম্ভ ক'রে ছাতি আড়ানী, আশাসোটা, হাতী, ঘোড়া, নৌকা, পাল্কী, সমস্তই গুরু-শয্যার সঙ্গে থাক্‌বে। এদেশে বিরাটের ২।১টি শ্লোকমাত্র পড়ে, সমগ্র বিরাট পড়ে না, যদিও রঘুনন্দন লিখেছেন,—রাঢ়ীরাই বিরাট পড়ে। আমরা—বারেন্দ্ররাই এখন রঘুনন্দনের

হুকুম তামিল কচ্ছি। এদেশে গুরুশয্যাও দেয়না। সাতপুরুষ এদেশে বাস ক'রে, এই দেশী গুরুপুরোহিত ক'রেও বারেন্দ্রের রীতিপদ্ধতি ছাড়্তে পারি নি।

চূড়ামণি।—না, না বারেন্দ্রদের অনেক গুলি রীতিনীতি ভাল। তা ছাড়্বেন কেন? "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ" শাস্ত্র, গুরুকে দিবেন; তাতে বাধা দিবে কে? রাজসাহীর দুই একটি পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ কর্বেন কি? আপনাদের পূর্ব্ববাস সেই দেশে কি না?

কৃষ্ণধন।—শুধু রাজসাহী কেন? বাক্‌লা, বিক্রমপুর, যশোর, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা নোয়াখালি, ময়মনসিং, রঙ্‌পুর, দিনাজপুর, বগুড়া, মালদহেরও প্রধান দেখিয়া, ২১টি অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ করা চাই। কাশী-মিথিলায় ত থাক্‌বেই।

চূড়ামণি। আপনার পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল বলিয়া আমি রাজসাহী মাত্র বলিয়াছিলাম। আপনি একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আপনি না হ'লে আর এদেশের গঙ্গাতীরের মান রক্ষা কে করিবে? বাঙ্গালেরা কি এদেশ হইতে নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য?

কৃষ্ণধন। আপনি বাঙ্গাল ব'লে কাকে অবজ্ঞা কচ্ছেন? বাঙ্গাল নিয়েইত নবদ্বীপ। জগদীশের বাড়ী ছিল সিলটে, গদাধরের বাড়ী ছিল—রঙ্‌পুরে। রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের বাড়ী ছিল কোথায় ঠিক করে বল্‌তে না পাল্লেও আমার মনে হয়, তাঁরাও বাঙ্গাল ছিলেন। কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের জন্মভূমি বগুড়া, তিনি মুরসিদাবাদে থাক্‌তেন। এই ভুবন বিদ্যারত্নের পিতা নবদ্বীপের বড় ভট্টাচার্য্য শ্রীরাম শিরোমণি সেই কৃষ্ণনাথের ছাত্র। বিক্রমপুরেরইত পণ্ডিত কালীশঙ্কর; তাঁরই প্রস্তুত পত্রিকার নাম কালীশঙ্করী পত্রিকা। সেই পত্রিকা শুধু নবদ্বীপ-ভাটপাড়ায় নয়, সমস্ত ভারতে চল। ভট্টপল্লীর ঠাকুর মহাশয়দের আদি বাড়ী কোথায়? শিক্ষার সুবিধা পেলে সব জায়গায় ভদ্রলোকের ছেলেই পণ্ডিত হ'তে পারে; এতে পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ কোন বিশেষত্ব নেই! মূর্খেরাই বাঙ্গাল ব'লে নাক শিট্‌কোয়,—আপনি পণ্ডিত, আপনার এরোগ হ'ল কেন? বুঝিনা। আপনার এই কথায়, আমি বড়ই দুঃখিত হ'লাম। এভাব পোষণ করলে দেশের মঙ্গল না হ'য়ে অমঙ্গল হয়।

কৃষ্ণ স্যাকরা। দেওয়ানজী ম'শয় কলসী-থালা, দেখে বড় রাগ ক'চ্ছেন, ওগুলি নাকোচ ক'রে আবার গড়্‌তে বল্‌ছেন। দিন নেই, আমি কি ক'রে গ'ড়্‌ব?

কৃষ্ণধন। ক্যানরে, ক্যান?

স্যাক্‌রা। ফর্দ্দে কলসীতে আছে আশীভরি, থালায় আছে পঞ্চাশ ভরি, তা আমি ভুল ক'রে কলসীতে লাগিয়েছি একশ পঁচিশ ভরি, থালায় দিয়েছি,—আশীভরি।

কৃষ্ণধন। যাঁরা সরকারের হিতৈষী, তাঁরাত রাগ কর্‌বেনই। মার ইচ্ছা, তুই বা করবি কি? আমিই বা ক'রব কি? মা কি কথনও থেলো জিনিস ব্যবহার কর্ত্তেন যে, তাঁর শ্রাদ্ধে থেলো জিনিস দিতে হবে? এই কথা দেওয়ানজী মহাশয়কে বল্‌গে। তুই যে আঙ্‌টীতে কালী, তারা, ষোড়শী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি এঁকেছিস্, অতি সুন্দর হয়েছে। দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়, চোথ উঠুতে ইচ্ছা করে না। এর জন্য আমি তোকে আলাদা বকসিস দিব। কলসী-থালা বেশ হয়েছে, আমার পছন্দমত হয়েছে, লোক-দেখান জিনিস দেওয়া আমার মত নয়। যাকে দেওয়া হবে, তিনি ব্যবহার ক'র্ত্তে পারেন, এইরূপ দেওয়াই উচিত।

চূড়ামণি। রূপোর জিনিষের ব্যবহার কেমন? ওত কেটে কেটে দিতে হবে।

কৃষ্ণধন। না, না, কেটে দেওয়া হবে না। এই দেশেই কেটে দেওয়ার রীতি; বরেন্দ্রভূমে তা নয়। উৎসর্গ বাক্যে "রজতাধার জল" বলিলাম, আর দেবার সময়ে জল ফে'লে দিয়ে রূপোর টুক্‌রো ব্রাহ্মণকে দিলাম, ওকি ঠিক হ'ল? বাক্যেত টুকরা ছিল না, আধার ছিল, আধার অর্থ কলসী। কলসীইত ব্রাহ্মণকে দিতে হয়, টুক্‌রোর নাম কলসী নয়। তারপর বাক্যে আছে, "ব্রাহ্মণায়াহং" একবচন; সুতরাং একটি ব্রাহ্মণকেইত তা দেওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মে জুয়োচুরি পছন্দ করি না, ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকে, করোনা;—বেগার-শোধের কাজ কর্ত্তে যাও কেন?

চূড়ামণি। ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন।

কৃষ্ণধন। হাঁ, চূড়ামণি মহাশয়, ভাল কথা, আপনিইত অধ্যক্ষ থাক্‌বেন; দেখবেন, যেন ন্যায়রত্নি টোলে সপাথেয়

বিদায় দেওয়া না হয়। আর দানে বিদায়ে মিশিয়ে খিচুড়ী করিবেন না, শুধু নগদ টাকায় বিদায় করবেন, দান উপরি দিবেন। পাথেয় যিনি যা বলেন, দ্বিরুক্তি না ক'রে, তাই তাঁকে দিবেন।

স্মৃতিতীর্থ। পাথেয় লইয়া দ্বিরুক্তি না করিলে, কি মিথ্যার প্রশ্রয় ও চুরির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না?

কৃষ্ণধন। বাবাজী, এই পাথেয় নিয়ে মিথ্যা ব্যবহার না ক'রে কে? যত দোষ কেবল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের!

স্মৃতিতীর্থ। কেউ সেই দোষটা করে; সেই জন্য সেটা দোষ নয়, ব'লতে চান কি?

কৃষ্ণধন। দোষ নয় ব'লতে চাই না, তবে অভাবে স্বভাব নষ্ট। এই যে এতকাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাই কেবল ধর্ম্মের লাগামটা জোর ক'রে আঁ'কড়ে ধ'রে রয়েছেন; সে জন্য কি তার উপযুক্ত পূজা করি? এই যে নিজের খেয়ে ছাত্র পড়ান, শুধু পড়ান নয়, তাহাদিগকেও খেতে দিতে হয়। এই খাইয়ে পড়িয়ে সংস্কৃত ভাষাকে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন; ইংরেজিনবিশেরা একটি ভদ্র লোকের ছেলেকে বাসায় রাখিয়া, একমুষ্টি অন্নদিয়ে তার পড়ার সাহায্য ক'র্ত্তে রাজী হন না, আর উঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি ক'রে ১০।১২টি ছাত্রকে অনায়াসে শাকান্ন দিচ্ছেন; আমরা সে জন্য কিছু কি তাঁদের দিচ্ছি? কৈ দিতে পাচ্ছি কৈ? বোধ হয়, সেই অভাবেই ওদের ঐ দোষটুকু হয়েছে। তা হলেও আমি একার্য্যের সমর্থন ক'র্ত্তে পারি না; তাই ব'লে এখন কি ক'র্ত্তে বল? আমরা হব, তাঁদের শাসন-কর্ত্তা!—ছি! ছি! বল কি? এ অপেক্ষা ধৃষ্টতা যে আর নাই। ওঁরাই যে আমাদের নিত্য শাসন-কর্ত্তা। ওঁদের সেই অভ্যাসদোষটুকু কখনই যাবে না, গোলমাল ক'রে কেবল ওঁদের উপরে সাধারণের অভক্তি জন্মান হবে। শাসকের উপরে শাস্তের অভক্তি জন্মান অকর্ত্তব্য। বুড়োর দল কদিনই বা থাক্‌বেন? তোমরা যুবকেরা সাবধান হও, বুড়োর দলের সরলতা প্রভৃতি অনেক গুণ আছে, সেই গুলির অনুকরণ কর; আর এইরূপ যে একাধটি দোষ আছে, সেগুলি দূরে পরিহার কর, তা হ'লেইত হ'ল।

চূড়ামণি। সায়ংসন্ধ্যার কাল উপস্থিত; অনুমতি হইলে সন্ধ্যোপাসনার জন্য গঙ্গার ঘাটে যেতে পারি।

কৃষ্ণধন। আচ্ছা— প্রণাম। (চূড়ামণি ও বিদ্যাবাগীশের পদধূলি গ্রহণ) স্মৃতিতীর্থ বাবাজী, মনে কিছু করো না, প্রণাম।

পণ্ডিতত্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ মুখুয্যা, মাড়ুয়ারি ও স্যাক্‌রাও বাহির হইল। কৃষ্ণধনও মুখ ও হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, গরদের জোড় পরিয়া, ঠাকুর দালানের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিচার সভা

আজ কৃষ্ণধন চৌধুরী মহাশয়ের ষাণ্মাসিক মাতৃকৃত্য। গ্রাম থৈ থৈ করিতেছে—লোকে লোকারণ্য। আহূত, অনাহূত, রবাহূতে গ্রাম ভরিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণধন চৌধুরীর আত্মীয়কুটুম্বে, আলাপী ভদ্রলোকে ও কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্রলোকে তাঁহার প্রাসাদোপম সুবৃহৎ গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণধনের বৃহৎ অতিথিশালা পূর্ণ করিয়া, আগন্তুক লোক গ্রামে ছড়িয়া পড়িয়াছে। গ্রাম-বাসীর গৃহেও কুলায় নাই; এ জন্য বাগানে, বৃক্ষতলে, পুষ্করিণীর তীরে ও রাজমার্গের পার্শ্বদ্বয়ে লোক কিল কিল করিতেছে। বৈরাগী, সন্ন্যাসী, ফকিরের ও কাঙ্গালীর সংখ্যা করা যায় না। পদ্মগন্ধে ভ্রমরকুলের ন্যায় দূরে প্রসারিত সন্ন্যাসীর গাঁজার গন্ধে গেঁজেলকুল আসিয়া সন্ন্যাসীসেবায় ব্যাপৃত হইয়াছে। কোন কোন ফকিরের সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, উট, ও তাম্বু আসিয়া বাণভট্টের চেষ্টালব্ধ বিরোধাভাস অলঙ্কারের উপর নাক সিট্‌কাইতেছে। কর্ম্মের পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ফকির, কাঙ্গালী আসিয়া পড়িয়াছে; তদবধি দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিতেছে। প্রবীণ কর্ম্মচারী দেওয়ান রমানাথ বসু মহাশয়ের সুবন্দোবস্তে এক সন্ধ্যার জন্যও কেহ অভুক্ত ছিল শোনা যায় নাই; তাঁহার অচল দেহকে তাঁহার সুবৃহৎ তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিতেও কেহ কখনও দেখে নাই।

নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণ কর্ম্মের পূর্ব্বদিন আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের বাসার ও অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মুখে শোনা গিয়াছে—এরূপ সিধার পারিপাট্য তাঁহারাও আর কখনও দেখেন নাই। জমীদার-বাড়ীর পূর্ব্বদিকে যথাক্রমে শ্রেণীবদ্ধ ঠাকুরবাড়ী, চণ্ডীমণ্ডপ ও কালীবাড়ী রহিয়াছে। প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ গেট আছে; প্রত্যেক গেটেই প্রহরী রহিয়াছে। কাঠের উঁচু বেড়ার পার্টিসান ছিল বলিয়া বাড়ীগুলির পার্থক্য বুঝা

নাইত। আজ সেই বেড়াগুলি উঠাইয়া দিয়া প্রকাণ্ড মাঠের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মাঠের উত্তরাংশে দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে লাল মখমলে মণ্ডিত বৃষোৎসর্গের চৌয়ারি উঠিয়াছে। দক্ষিণাংশে যথাক্রমে তিনটি সুবৃহৎ সামিয়ানা খাটান হইয়াছে। প্রথমটিতে দানসাগরের জিনিসগুলি ও শুক্রশয্যা সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; দ্বিতীয়টিতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের জন্য প্রকাণ্ড পুরু গালিচা পাতিত হইয়াছে; তৃতীয়টিতে গঙ্গাটিকুরির প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক রসিক ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়িকা পান্না, হরিমতি প্রভৃতির জন্য আসর করা হইয়াছে।' রসিকের আটটি খোল যখন যুগপৎ মেঘ-গর্জ্জনে বাজিয়া উঠিল, তখন গ্রামবাসী সকলেই বুঝিল, কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। শুনিয়াছি, রসিক যখন একটি গানে একটি সুন্দর আঁখোর দিয়া সুর ভাঁজিতেছিল, তখন ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন একটি নিবেশে চারিবার অভাব দিতে ভুলক্রমে তিনবার অভাব দিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাতে সিদ্ধান্ত না হইয়া পূর্ব্বপক্ষই আঁটিয়া গিয়াছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পণ্ডিতগণ আসিয়া দানসাগরের নিকট দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণধনও পুত্রত্রয়ের হাতে সভাবরণ করিয়া, পণ্ডিতদিগের অনুমতি লইয়া, দান ও বৃষোৎসর্গের সংকল্প করিতে প্রস্থান করিলেন। সভাবরণের সময়ে নবদ্বীপের সুকবি অজিতনাথ ন্যায়রত্ন দাঁড়াইয়া বলিলেন—"সমাকৃষ্টৈ রিহাস্মাভির্ধনসাধননামভিঃ। কৃষ্ণকালীহরি-মুখং ধনসাধনবীক্ষণম্।"

ধন এবং সাধন এই নামে আকৃষ্ট হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। আসিয়া কৃষ্ণপূর্ব্বক ধন,—কালীপূর্ব্বক ধন, হরিপূর্ব্বক ধন ও হরিপূর্ব্বক সাধন অর্থাৎ কৃষ্ণধন, কালীধন, হরিধন ও হরিসাধনকে স্পষ্ট দেখিলাম। অথচ ধনসিদ্ধির উপায়ের নামে আকৃষ্ট হইয়া, এখানে আসিয়া, ঠাকুর মণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম, কালীমন্দিরে কালীর মুখপদ্ম, ও নারায়ণের মন্দিরে নারায়ণের মুখপদ্ম বিলোকন করিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে অর্থসিদ্ধিও হইল।

সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা বলিলেন—"সাধু, সাধু, ন্যায়রত্ন, তোমার তুল্য এখন আর কবি নাই। কাব্যের মধ্যে নৈষধ শ্রেষ্ঠ—তেমনটি আর নাই; চেতোনলং কাময়তে মদীয়ং' এতে শব্দ-চাতুর্য্য দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থচাতুর্য্য কত; তুমিও নৈষধের অনুকরণে অনেকটা লিখিতে পার কিনা?" একটি পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—"কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ।"

একটি বৃদ্ধ পণ্ডিত বলিলেন—নৈষধের সঙ্গে তুলনা? তেমনটি আর হ'বার যো নাই। "আয়াতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবি;"—শ্রীহর্ষের সঙ্গে কালিদাসের তুলনা? কালিদাসের কাব্যে ত রঘু, "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং?" পিতামহীর মুখে যেন বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমীর রূপকথা শুনিতেছি—রাজারাণী রথে উঠিলেন, ঘোড়ার খুরে পথ হইতে খুব ধূলি উড়িতেছিল, কিন্তু বাতাস অনুরূপ ছিল বলিয়া, রাজার পাগড়িতে ও রাণীর চুলে একটুও ধূলো লাগে নাই। পথে কতকগুলি গয়লাকে দেখিয়া, রাজা ও রাণী পথের ধারের গাছগুলির নাম জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন। এই গুলিকে কি কবিতা বলে? শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ কি? শ্রেষ্ঠ কাব্যকর্ত্তৃত্বং শ্রেষ্ঠ কবিত্বং—এ ভিন্ন আর কি বলিবে? যদি কাব্যের মধ্যে মাঘ শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তাহার গ্রন্থকারই ত কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে; কালিদাস কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ হইবে? তবে যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণে হয়; হ'তে পারে। "পশ্য রামদুলালস্য সরকারস্য পুরো-হিতঃ।" (সকলের হো হো করিয়া হাস্য।)

একটি বাবু আসিয়া, প্রত্যেকের হাতে এক একটি নস্য-দানী দিয়া বলিলেন—আপনারা দয়া করিয়া আসিয়া সভায় উপবেশন করুন। আপনাদের দ্বারাইত সভার মহিমা। সেই বাবুটির সঙ্গে যাইয়া অধ্যাপকবৃন্দ সেই পাতিত গালিচার উপরে আসীন হইলেন।

পরিধানে ধপধপে ধৌত গরদের ধুতি—গায়ে সেইরূপ উত্তরীয়, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন যজ্ঞোপবীত, দক্ষিণ বাহুতে স্থূল সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত নবরত্ন ও কেয়ুরপ্রায় পাকা সোণার ইষ্টকবচ, মধ্যমাঙ্গুলীতে নবরত্নের অঙ্গুরীয়ক, গলায় সুবর্ণ-সূত্রে গ্রথিত ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা, মস্তকে পক্কাপক্ক কয়েক গাছি কেশের একটি শিখামাত্র, হস্তে নস্যের একটি রৌপ্য-ময় কৌটা ও একখানি রেশমের রুমাল, দীর্ঘকায়, গৌরাঙ্গ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন গালিচার ঠিক মধ্যস্থলে সিংহবিক্রমে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার নস্যস্থ ও রুমালস্থ আতরের সৌরভে সভা ভর ভর করিতেছে। তাঁহার দক্ষিণে বিল্ব-পুষ্করিণীর ক্ষীণকায় শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ প্রসন্ন ন্যায়রত্ন। বামে ভট্টপল্লীর রাখালদাস ন্যায়রত্ন। ইঁহারও দেহকান্তি ফুটিয়া

বাহির হইতেছে, পরিচ্ছদে পারিপাট্য রহিয়াছে। কলিকাতার তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গুপ্তিপাড়ার গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, মুর্শিদাবাদের শ্রীরাম শিরোমণি ও কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন যথাক্রমে তাঁহার বামে উপবিষ্ট হইয়াছেন। প্রসন্ন ন্যায়রত্নের দক্ষিণে মিথিলার বিশ্বনাথ ঝা ও কাশীর কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি। তাঁহারই পার্শ্বে পরিধানে মহারাষ্ট্রী চওড়া লাল রেসমপেড়ে ধুতী, গায়েও সেইরূপ চাদর ও জামা, মস্তকে জরির কাজকরা প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, ললাটে রামানুজ সম্প্রদায়ের তিলক কাশীর রামমিশ্র শাস্ত্রী। সম্মুখে কোড়কদির রামধন তর্কপঞ্চানন, কোটালিপাড়ার রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, বিক্রমপুরের প্রসন্ন তর্করত্ন ও গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন।

একটু দূরে আর একটি চক্রে নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বসিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বদ্বয়ে ও সম্মুখে যথাক্রমে নবদ্বীপের মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, পূর্ব্বস্থলীর কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, ময়মনসিংহের চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, যশোহরের শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, কলিকাতার চন্দ্রশেখর চূড়ামণি, বিক্রমপুরের তারিণী চরণ শিরোমণি ও জগচ্চন্দ্র সর্ব্বভৌম উপবেশন করিয়াছেন। পরিধানে বহুমূল্য জরিপেড়ে গরদের ধুতি, গায়ে সেইরূপ চাদর, গলায় সুবর্ণ-সূত্রে গ্রথিত ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণধন চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র কালীধন চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও এটা সেটা করিয়া সমস্ত খুঁটিয়া দেখিতেছেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে মিশিলেন। অনেকেরই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিচার দেখিবার ও শুনিবার সখ। ন্যায়রত্ন তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া একবার স্মৃতির আসরের সম্মুখে, একবার ন্যায়ের মজলিসের আগে ও একবার রামধন তর্কপঞ্চাননের সহিত রামমিশ্র শাস্ত্রীর যে মায়া-অনুমানের বিচার চলিতেছে—একবার সেখানে দাঁড়াইয়া সেই সমস্ত শুনিতেছেন ও বাঙ্গালা-ইংরাজী-মিশান ভাষায় এক একবার সেই সকল বিচারের মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

সভা যখন গমগম করিতেছে, সেই সময় সেই গ্রামের মোড়ল ষষ্টিবর্ষবয়স্ক নিকষকুলীন কালীনাথ মুখোপাধ্যায় আসিয়া, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বিদ্যারত্ন মহাশয়, একাদশীতে যদি কোন বিধবা জলপান করে, তবে তা'র কি প্রায়শ্চিত্ত? যে পণ্ডিত এই ব্যবস্থা দেয়, তাহারই বা কি প্রায়শ্চিত্ত?"

বিদ্যারত্ন।—

"লোভান্ মোহাৎ প্রমাদাদ্বা ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ।
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্ বা কেশমুণ্ডনম্।"

প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য; বা শব্দ-বিকল্প নয়—সমুচ্চয়। সুতরাং মুণ্ডনও করিতে হইবে—"তৎ পাপং তেষু গচ্ছতি"—তুল্য-ন্যায়ে পণ্ডিতেরও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বলিতে পারি।

কালীনাথ। যা' বল্লেন, সেই ভাবের একখানি ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিন। এই দোয়াত, কলম, কাগজ এনেছি।

বিদ্যারত্ন। আচ্ছা, আমি বলছি; তোমরা একজন লেখ দেখি।

কৃষ্ণধন চৌধুরীর মধ্যমপুত্র হাইকোর্টের উকীল হরিধন সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—

"আমি একটু জিজ্ঞাসা ক'ত্তে পারি?"

বিদ্যারত্ন। কেন পারবে না?

হরিধন। একাদশীতে উপবাস কি একমাত্র বিধবারই কর্ত্তব্য?

বিদ্যারত্ন। না, না, মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তবে বিধবার সঙ্গে প্রভেদ এই, অন্যে অসমর্থ হইলে অনুকল্প অর্থাৎ জল, দুগ্ধ পান, ফলমূল ভক্ষণ করিতে পারে; বিধবা পারে না।

হরিধন। অন্যেই বা পারে কেন—বিধবাই বা পারে না কেন?

যদুনাথ শিরোরত্ন। ক্ষীণের পক্ষেই অনুকল্প ব্যবস্থা। বিধবাকে ত ক্ষীণ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত, তার পক্ষে অনুকল্প হ'বে কেন?

হরিধন। আপনি যে বচন আওড়া'লেন, তা'তে দেখছি, ক্ষীণের অনুকল্প করা উচিত। বিধবাকে ক্ষীণ করা যখন শাস্ত্রের উপদেশ তখন বিধবা ত ক্ষীণ হয়েই আছে—তখন বিধবার পক্ষেইত অনুকল্প খাটে। অন্যে ক্ষীণ কি না তা'র জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেটের দরকার হ'বে—বিধবার ত মনুরই সার্টিফিকেট আছে। এই যে বিধবার পক্ষে ঘৃতপক্ব খাবার ব্যবস্থা, একাহারের ব্যবস্থা, সুপক্ব কদলী প্রভৃতি ফল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত খাবার ব্যবস্থা, হরীতকী দ্বারা

মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা, এগুলি কি ক্ষীণ করবার মত হ'ল? পক্ক ফল ও হরীতকী যে লিভারের একসন্ বৃদ্ধি করে। সাহেবরা কখনও সিদ্ধ চাউল খায় না—সিদ্ধ চাউলে সারটুকু থাকে না—ভাতের মাড় গড়ালেও মাড়ের সঙ্গ সার চ'লে যায়। বিধবার পক্ষে একচালা খেতে হয়। মাছ-মাংস লিভারের একসন্ খারাপ করে। এই যে মাসের মধ্যে দুই দিন একাদশী, এতেওত পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। এর প্রমাণ সধবা আর বিধবাকে 'কম্পেয়ার' করে দেখুন না—ব্যারাম-পীড়া সধবার বেশী—না বিধবার বেশী? ঋষিরা বিধবার এই সকল বাঁধাবাঁধি নিয়ম ক'রে তাদের স্বাস্থ্যোন্নতিরই ব্যবস্থা করেছেন—আবার যদি ক্ষীণ কর্‌বার কথা ব'লে থাকেন, তবে তাঁদিগকে গেঁজেল ব'লতে হয়, নয় ত পাগল ব'লতে হয়। ফল আমি যদ্দূর বুঝছি, তা'তে বোধ হয়, ভারতে যেমন একদল দণ্ডী সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের কোন বন্ধন নাই, তাঁরা যেমন পৃথিবীর উপকারের জন্য কেবল জ্ঞানের চর্চ্চা করেন, শাস্ত্রাভ্যাস করেন, নূতন নূতন 'থিওরী' বা'র করেন, (শঙ্করাচার্য্যও এই দলেরই ছিলেন); সেইরূপ বিধবাদেরও স্বামী নাই ব'লে কোনরূপ টান নেই; সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা বিধবা-দিগকেও সেইরূপ জ্ঞানের চর্চ্চা করবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়েছেন। সেই জন্য সন্ন্যাসীর মত মস্তিষ্কের পুষ্টিকর খাদ্যের ও বাঁধাবাধি নিয়মে থাক্‌বার ব্যবস্থা করেছেন।

বিদ্যারত্ন।—তুমি বল্‌ছ কি হে? সব কি দৃষ্টার্থফলক শাস্ত্র? অদৃষ্টার্থফলক শাস্ত্র নেই? তুমি ইংরাজীনবিশ, তোমার সহিত আমি কথা কইতে চাই না। ইংরাজী-নবিশের সহিত আবার শাস্ত্রীয় বিচার কি হে? দেখ, আমরা ইংরাজী জানি না, তোমার বিজ্ঞানফিজ্ঞান বুঝি না,—তদর্থেয়ু কখনও আমরা তোমার বিজ্ঞানফিজ্ঞান নিয়ে কথা কই! আমরা ত আর তোমাদের মত ধৃষ্ট নই। তোমরা না জেনেই চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রে পণ্ডিত—সবজান্তা। শাস্ত্র বুঝতে চাও—আগে ব্যাকরণ পড়—ন্যায় একটু পড়, মীমাংসা দর্শনের ২।১ খানা পুঁথি পড়, পরে স্মৃতি শাস্ত্র বুঝবার চেষ্টা কর। এ "নরঃ নরৌ" এর কর্ম্ম নয়।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন দূরে দাঁড়াইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথাগুলি সমস্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণধন চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র কালীধনকে বলিলেন—"দেখ, কালীধন, তুমি কি ইংরাজী-নবিশের উপর, এই আক্রমণ সহ্য করতে পার? তুমি ত দায়ভাগ, দত্তক-চন্দ্রিকা, দত্তক-মীমাংসা ও কুল্লুক ভট্টের টীকার সহিত মনুসংহিতা পড়েছ, তুমি স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারের কতকটা শৈলী জান, তুমি গিয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হও; আবশ্যক হ'লে আমি সাহায্য করব।

কালীধন। আজ্ঞা, আচ্ছা। আপনার আশীর্ব্বাদ। (স্মৃতিতীর্থের দিকে মুখ ফিরাইয়া) দাদা, শীঘ্র আপনার একাদশীতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্বখানা নিয়ে আসুন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় কালীধনকে সঙ্গে করিয়া স্মৃতির বিচার-চক্রের নিকটে গিয়া বলিলেন—"বিদ্যারত্ন মহাশয়, ইঁহার নাম কালীধন চৌধুরী, যাঁহার নিমন্ত্রণে আপনারা এসেছেন, ইনি তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার একান্ত ইচ্ছা, সেই ব্যবস্থাটা আপনার নিকট থেকে বুঝিয়ে নেন।

বিদ্যারত্ন। (সোল্লাসে) এস বাবা, এস। তোমাদিগকে বুঝাইব না ত কাকে বুঝাইব? তোমরা ধার্ম্মিক, তোমরা যেরূপ কর্ম্ম কর্‌লে, এরূপ কর্ম্ম জগতে খুব কম হয়; এস বাবা, এস।

ন্যায়রত্ন মহাশয় এদিকে ভুবন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে গিয়া বলিলেন—"আপনারা এদিকে একটু এগিয়ে বসুন; এই কর্ম্মকর্ত্তার পুত্র, ব্রজ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিচার কর্ত্তে এসেছেন, আপনারাও একটু শুনুন।"

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন নৈয়ায়িকদিগের সহিত একটু সরিয়া গিয়া, স্মৃতি-চক্রের সহিত ন্যায়-চক্রের এক করিয়া দিলেন। ভুবন বিদ্যারত্নকে দেখিয়া সকলেই সরিয়া সরিয়া বসিয়া, তাঁহার সম্মুখটা ফাঁক করিয়া দিলেন।

ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন। "দেখ্‌ছি, কৃতীর পুত্রই আজ বিচারে প্রবৃত্ত! উত্তম, উত্তম; ভয় ক'রনা বাবা, ভয় ক'র না। নির্ভয়ে বিদ্যারত্ন-দাদার সহিত বিচার কর। আমি যেমন ন্যায়শাস্ত্রে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান—বিদ্যারত্ন দাদাও তেমনি স্মৃতিশাস্ত্রে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান। নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান হ'লেই বাংলার সর্ব্বপ্রধান, বাংলার সর্ব্বপ্রধান হ'লেই জানবে—পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান। কারণ কি জান—বাংলায় যেমন ন্যায়শাস্ত্রের ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চ্চা, তেমনটি আর কুত্রাপি নাই। রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, মথুরানাথ, রঘুনন্দন সকলেরই বাড়ী যে নবদ্বীপে। এঁরাই

যে, ন্যায় ও স্মৃতির গ্রন্থকার। বিদ্যারত্ন-দাদা তোমাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন।।

কালীধন। বিধবার যে একাদশীতে অনুকল্প নেই বলছেন, সে সম্বন্ধে কি কোন ঋষি-বচন আছে ?

ব্রজ বিদ্যারত্ন। আছে।

ভুবন বিদ্যারত্ন। বটে, একদাশীতে বিধবার অনুকল্প নিয়ে বিচার ? বহুদিন পূর্ব্বে নাটোরের ছোট-তরফের রাজা আনন্দনাথের শ্রাদ্ধে এই নিয়ে একবার বিচার হ'য়েছিল। পুঁটিয়ার ঈশান চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, মহেশ শিরোমণি ছিলেন—সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে; কিন্তু রীতিমত বিচার হ'তে পারে নাই। গোলমালে বিচারটাকে চাপা দেওয়া হ'য়েছিল। আজ তা' হ'বে না—আজ ঠিক ঠিক বিচার হ'বে। আমি যখন মধ্যস্থ হয়েছি—তখন গোলমাল কর্ত্তে দিব না। আজকের বিচার-ফল নিয়েই সিদ্ধান্ত-নির্ণয় হ'বে। সমস্ত দেশের পণ্ডিতই এখানে উপস্থিত, যা হ'বে সকলকেই তা মান্‌তে হ'বে। (প্রসন্ন তর্করত্নের দিকে মুখ ফিরাইয়া) কি তোমাদের বিক্রমপুরে বুঝি অনুকল্প প্রচলিত ?

প্রসন্ন তর্করত্ন। বুরা শিব কন্ কি ? হ আচুইত, বুরাশিবের কি জানা নাই ?

জগৎ সার্ব্বভৌম। আমি বিচারে প্রবৃত্ত আছি। দ্যাশের ব্যবস্থায়ে—

স্মৃতিতীর্থ। (পুস্তক হস্তে) না, আপনার বিচার কর্ত্তে হ'বে না, আমিই ক'রব। আমার ভ্রম-প্রমাদ হ'লে আপনি সাহায্যে করবেন।

(চূড়ামণি ও বিদ্যাবাগীশ একটু দূরে দাঁড়াইয়া।)

চূড়ামণি। দেখেছ বিদ্যাবাগীশ দেখেছ, এ ছোঁড়ার ধৃষ্টতা কত ? ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিচার কর্ত্তে প্রবৃত্ত হ'য়েছে ! বুকের পাটা কত বড় দেখেছ ! আবার জগৎ সার্ব্বভৌমের সাহায্য চাচ্চে—মাথা কাটা গেল—মাথা কাটা গেল ; একেবারে দেশের নামটা ডুবুলে।

বিদ্যাবাগীশ। চূড়ামণি, আমাদের উদাসীন থাকাই ভাল। দেখ্‌লে না, সেদিন কর্ত্তার মনের ভাবটা ? তিনি এ নিয়ে হৈ চৈ করা পছন্দ কর্‌বেন না। এই একটা বৃহৎ কর্ম্মের সময়ে কি কর্ত্তাকে চটিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য ? বিশেষ প্রত্যাশা আছে ; কে গিয়ে টুক্ ক'রে লাগিয়ে দেবে, আর সব মাটি হ'বে ; জান ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কপাল ! আমরা দূরে দাঁড়িয়ে শুনে যাই, "ঝড় শক্র পরে পরে যাক।"—ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিচারে আঁটিবে কে ?

ভুবন বিদ্যারত্ন। বাবাজী শুন্‌তে চাচ্ছে, বিদ্যারত্ন দাদা, বচনটা ব'লে ফেল।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন।—

"বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা পদে পদে ॥"

এই বচনটি কাত্যায়নের, এই বচনের অর্থ—যে বিধবা স্ত্রী একাদশীতে ভোজন করবে, তাঁর সমস্ত পুণ্য নষ্ট হ'বে এবং পদে পদে ভ্রূণ-হত্যার পাপ হ'বে।

কালীধন। বিধবা ভিন্ন অন্যেরও একাদশী কর্ত্তব্য ; এর কোন বচন আছে কি না ?

ব্রজনাথ। আছে বৈ কি ?—

"অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাদেকাদশ্যাং স পাপকৃৎ ॥"

আট বৎসর বয়সের পরে আশী বৎসর বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে মানব একাদশীতে ভোজন কর্‌বে, সে পাপী হবে।

কালীধন। যে কর্ম্ম না কর্‌লে পাপ হয়—সেই কর্ম্মের নাম নিত্য কর্ম্ম—আপনারাই ত বলে থাকেন ; বিধবা একাদশীতে উপবাস না করিলে তাহার পাপ হয়—প্রথম বচনে আছে। একাদশীতে ভোজন করিলে, মনুষ্যমাত্রেরই পাপ হইবে—দ্বিতীয় বচনে আছে। সুতরাং বিধবার পক্ষে যেমন একাদশী নিত্য—সাধারণ মনুষ্যের পক্ষেও সেইরূপ একাদশী নিত্য। এই জন্য বলতে চাই, কাত্যায়ন-বচনে যে, "বিধবা" পদ আছে, তার উপলক্ষণ কার ; সেই "বিধবা" পদের অর্থ মানব। 'সম্ভবতোকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে'—বচনদ্বয়ের একবাক্যত্ব ক'র্ত্তে পারে আর ভিন্ন-বাক্যত্ব করা কর্ত্তব্য নয় ; আপনারাইত এইরূপ বলে থাকেন।

ভুবন বিদ্যারত্ন। বুঝেছি, 'প্রত্যবায়জনকীভূতাভাব প্রতিযোগিত্বং নিত্যত্বং', এইরূপ নিত্যত্ব বিধবা ও বিধবেতর উভয়ের সম্বন্ধেই একাদশীর উপরে তুল্যরূপে আছে। বাবাজী, বেশ বলেছ, বেশ বলেছ।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। না, উপলক্ষণ কর্ত্তে পার না, যত্তৎ-পদ সমভিব্যাহৃত পদের উপলক্ষণ হয় না। "বিধবা যা ভবেন্নারী" বচনে আছে, অর্থাৎ নারী যদি বিধবা হয় তবে সে ইত্যাদি—শুধু বিধবাপদ থাকিলে উপলক্ষণ কর্ত্তে পাত্তে; গত্যন্তর নাই বলিয়া স্মার্ত্ত বাক্যভেদ স্বীকার ক'রেছেন। তিনি 'বিধবায়াস্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বমাহ' এইরূপ লিখিয়া, ঐ কাত্যায়ন-বচনের উল্লেখ ক'রেছেন।

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। হাঁ, বিদ্যারত্ন দাদা, ভাল ব'লেছেন।

কালীধন। "সর্ব্বথা নিত্যত্বং" অর্থ কি ?

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। "অষ্টাব্দাদধিকোমর্ত্ত্যঃ "এই বচন দ্বারা যখন মানব মাত্রেরই একাদশীতে উপবাস নিত্য, তখন উপবাসে নিত্যতা বলিয়া লাভ কি ? এজন্য এই স্মার্ত্ত-সন্দর্ভস্থ 'নিত্যত্বং' এর অর্থ নিত্যত্ব নয় বল্‌তে হ'বে —এর অর্থ—অনুকল্পরাহিত্য।

কালীধন। তবে আর 'সর্ব্বথা' বিশেষণ কেন ? সর্ব্বথা অনুকল্পরাহিত্য কি বুঝিলাম না। সর্ব্বথা শব্দের অর্থ ত সর্ব্ব প্রকার। সর্ব্বপ্রকার অনুকল্পরাহিত্য ব'লে লাভ কি ? ঘট নাই বলিলে শুক্ল, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ সকল ঘটেরই অভাব বুঝায়; অনুকল্পরাহিত্য বলিলেই সর্ব্বপ্রকার অনুকল্পের রাহিত্যই বুঝাইবে, ব্যর্থ সর্ব্বথা বিশেষণ কেন ?

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। (ন্যায়রত্নের দিকে তাকাইয়া) ছেলেটি দেখ্‌ছি বড় বুদ্ধিমান; হবেই না কেন—সদ্বংশজাত, বড় লোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে—সোনার উপর মিনার কাজ হ'য়েছে।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। "সর্ব্বথা"—"নিত্যত্বং" এর বিশেষণ নয়—বিধবার বিশেষণ। কতকগুলি বিধবা উপবাসে শক্ত (সমর্থ), কতকগুলি অশক্ত (অসমর্থ); 'সর্ব্বথা' সর্ব্বপ্রকারে বলাতে বুঝা গেল—বিধবা শক্ত হউক, অশক্ত হউক, কাহারই অনুকল্প নাই।

কালীধন। তা' হ'লেও 'সর্ব্বথা' পদের সার্থকতা থাকে না; শুধু বিধবা বল্লেইত বিধবাসামান্যকে পাওয়া যায়, বিশেষণ পদেই, বিশেষ্য পদের অর্থ-সঙ্কোচ করে। 'সর্ব্বথা' না দিলেও আমরা শক্তাশক্ত উভয়বিধ বিধবাকেই পাইতাম; সর্ব্বথা দিবার আবশ্যক কি ? তারপর 'নিত্যত্বং', এই পদের অনুকল্পরাহিত্য অর্থ শক্যার্থ নয়, আপনি লক্ষণার আশ্রয়ে এইরূপ অর্থ করিতেছেন। ঋষি বচনে লক্ষণা করিবার রীতি, আছে—গ্রন্থকারের সন্দর্ভে লক্ষণাগ্রহণ কি সঙ্গত ? রঘুনন্দনের যদি সেইরূপ বলাই অভিপ্রেত হ'ত, তবে কি আর তিনি 'অনুকল্পরাহিত্যং' এই স্পষ্ট কথাটুকু লিখ্‌তে পাত্তেন না ?

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। আচ্ছা, বাবাজী, বিদ্যারত্ন-দাদার ব্যাখ্যার উপরে যে দোষ দিয়েছ, শুনিয়া রাখিলাম। তোমার মতে এই 'সর্ব্বথা নিত্যত্বং' এই বাক্যের কিরূপ অর্থ ?

কালীধন। স্মার্ত্ত একাদশী-তত্ত্বে লিখেছেন—'নিত্য-মিতি শ্রবণান্নিত্যত্বং পুরুষার্থচতুষ্টয়মিতি শ্রবণাৎ কাম্যত্বঞ্চ'—বচনে নিত্যপদ আছে, অতএব একাদশী নিত্য; পুরুষার্থ-চতুষ্টয় (চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রাপ্তি) আছে, অতএব একাদশী কাম্যও বটে। কাত্যায়ন-বচনে বিধবার একাদশীতে কোনরূপ ফল-শ্রুতি নাই; না করিলে পাপশ্রুতি মাত্র আছে; এই জন্য অন্যের একাদশী যেমন নিত্যও বটে, কাম্যও বটে; বিধবার পক্ষে একাদশী সেরূপ নয়—সর্ব্বপ্রকারে নিত্য, কোন প্রকারেই কাম্য নয়। আবার আট বৎসরের পরে ও আশী বৎসরের পূর্ব্বে মানবের একাদশী নিত্য, না করিলে পাপ হইবে। আট বৎসরের পূর্ব্বে ও আশী বৎসরের পরে না করিলে পাপ হইবে না—সুতরাং নিত্য নয়, কিন্তু বচনে চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রাপ্তির কথা আছে, এজন্য পুণ্য হইবে, সুতরাং তখন তাহার একাদশী কাম্য। কিন্তু বিধবার পক্ষে আট বৎসরের ভিতরেই হউক বা আশী বৎসরের পরেই হউক, একাদশী নিত্য—কখনই কাম্য নয়; অর্থাৎ—সর্ব্ব-কালাবচ্ছেদেই একাদশী নিত্য। কাল—কর্ম্মেরও বিশেষণ হ'তে পারে, অধিকারীরও বিশেষণ হ'তে পারে। সুতরাং 'সর্ব্বথা' 'নিত্যত্ব'এর সহিতই অন্বিত করুন বা বিধবার সহিতই অন্বিত করুন, উভয়েতেই আমার সমান হ'ল। এই জন্য স্মার্ত্ত একাদশীতত্ত্বের সংক্ষেপে লিখিয়াছেন—"অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যোহপূর্ণাশীতিবৎসরো নিত্যাধিকারী বিধবায়াস্তু সর্ব্বদৈব নিত্যাধিকারঃ।" নিত্য বলিয়াই অনুকল্প হ'তে পারে, কাম্য হ'লে হ'ত না।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।—কালীধন, "বিধবায়াস্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বং"—এই নিত্যত্বং কিং বৃত্তিক ? অর্থাৎ কাহার উপরে অবস্থিত ?

কালীধন।—যদিও স্মার্ত্ত লিখেন নাই, তা' হ'লেও বুঝতে হবে, এই নিতান্ত একাদশীর উপবাসের উপরে অবস্থিত।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। উপবাস কি?

কালীধন। অহোরাত্রসাধ্য ভোজনাভাব।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।—বেশ কথা, তোমার সেই ভোজনাভাবের প্রতিযোগী যে ভোজন, তাহারই বিশেষণ 'সর্ব্বথা'। অর্থাৎ সকলের পক্ষে একাদশ্যুপবাস নিত্য, কেহ অশক্ত হইলে একাদশীতে উপবাসের অনুকল্প—"নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা" ইত্যাদি ভোজন করিতে পারে; কিন্তু বিধবার পক্ষে একাদশীতে সর্ব্বপ্রকার ভোজনের অভাবে নিতান্ত অবস্থিত; কাজে কাজে তাহারা আর অনুকল্প করিতে পারে না—এইরূপ ব্যাখ্যায় দোষ কি?

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। (ন্যায়রত্নের প্রতি) একে ত বালককে সপ্তরথী ঘিরিয়া ফেলেছে—তার উপর আপনি আবার এই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; বালক এই অস্ত্রের তেজ সহ্য করবে কি করে? সুতরাং এর প্রতিসংহার আমাকেই যে ক'রতে হয়।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। না, আপনার ক'র্ত্তে হবে না, আপনার ক'র্ত্তে হবে না, বালকের এ রহ্মাস্ত্র সুবিদিত, ইহার প্রতিক্রিয়াও সুবিদিত। আপনারা যে ইংরাজীনবিশ দেখ্লেই নাক সিট্কান, তাই দেখাবার জন্য আমি এই আপত্তি উঠিয়েছি। আমরা ফাঁকি দিয়ে গভর্ণমেণ্টের টাকাগুলি হজম করি না—মানুষও তয়ের করি।

কালীধন। তা'হলে এখানে একদেশ-অন্বয় কর্ত্তে হয়; জগদীশ তর্কালঙ্কার স্পষ্ট করে লিখেছেন—'কারক পদ সাপক্ষে ও নিত্য সম্বন্ধি পদ সাপক্ষে কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস হ'তে পারে; কিন্তু বিশেষণপদ সাপক্ষে হয় না, "শরৈঃ পাতিত পত্রোঽয়ং" "চৈত্রস্য দাসভার্য্যোঽয়ং প্রভৃতি হ'তে পারে; "তরুণ্যো বৃষলীভার্য্যাঃ" "প্রবীরং পুত্র কাম্যতি" "ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গাঃ" প্রভৃতি হয় না। বৈয়াকরণদিগেরও এই মত। সুতরাং কৃদন্ত "উপবাস" পদের অর্থের অন্তর্নিবিষ্ট ভোজনের বিশেষণ "সর্ব্বথা" হ'তে পারে না।

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। সাধু, সাধু, দীর্ঘজীবী হও; আজ অর্জ্জুনের হাতে দ্রোণের পরাভূতি।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তা' হ'লে দ্রোণেরই প্রশংসা।

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। হাঁ, বুঝেছি, এর উপর আর কিছু বলিবার আছে?

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। (ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া) আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি একটু বল্‌তে চাই।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। হাঁ, বল্‌তে পার।

ন্যায়পঞ্চানন। "প্রাপ্তং হি প্রতিষিধ্যতে" যাহা প্রাপ্ত তাহারই প্রতিষেধ হয়, অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না—"অদগ্ধদহন ন্যায়" এই ব্যবস্থাই আমরা পাইতেছি। একাদশীতে—বিধবা যে ভোজন ক'র্ত্তে পারে, ইহার প্রাপ্তি কৈ? যখন প্রাপ্তি নাই, তখন কাত্যায়ন-বচনে তাহার নিষেধ হইল কেন? একাদশী নিত্য, সুতরাং অশক্ত অনুকল্প করিতে পারে, এই যে সামান্যাকারে অনুকল্পের বিধান আছে, তা' দ্বারা একাদশীতে বিধবারও অনুকল্পের প্রাপ্তি হয়েছিল; কাত্যায়ন-বচন দ্বারা তাহারই নিষেধ হ'য়েছে।

কালীধন। আমি বলি, আট বৎসরের পূর্ব্বে ও আশী বৎসরের পরে একাদশীতে ভোজনে দোষশ্রুতি নাই; সুতরাং অন্যের ন্যায় বিধবারও সেই সেই সময়ে একাদশীতে ভোজন রাগ-প্রাপ্ত, কাত্যায়ন-বচনে তাহারই নিষেধ ক'রেছে। স্মার্ত্ত সেই জন্য তিথিতত্ত্বে "বিধবায়াস্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বমাহ" বলিয়া, কাত্যায়ন-বচনের উল্লেখ ক'রেছেন, সেই বচনের পরেই "অষ্টাব্দাদধিকো মর্ত্ত্যো" এই বচনটির উল্লেখ ক'রেছেন। এ দ্বারা বুঝতে হ'বে—রঘুনন্দন এই বচন দেখে পূর্ব্ব বচনটির ব্যাখ্যা ক'র্ত্তে উপদেশ দিয়েছেন। রঘুনন্দন যে স্পষ্টতঃ বিধবার অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়েছেন, তাও দেখাচ্ছি। স্মৃতিতীর্থ দাদা, দিন্ ত একাদশী-তত্ত্বখানা। (স্মৃতিতীর্থের হস্ত হইতে একাদশীতত্ত্ব লইয়া খুলিয়া, ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের হাতে দিয়া) আপনি এই অংশটুকু একবার পাঠ করিয়া দেখুন।

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন।—তুমিই পাঠ কর, আমি শুন্‌ছি।

কালীধন। এই দেখুন, মৎস্যপুরাণং 'গর্ভিণী-সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা। যদা শুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা"। উপবাসাচরণে গর্ভাদিপীড়া সম্ভাবনায়াং নক্তং ভোজনং কুর্য্যাৎ'।" রঘুনন্দন মৎস্য-পুরাণের বচনের উল্লেখ ক'রে উপবাস ক'র্‌লে গর্ভাদি-পীড়ার সম্ভাবনা আছে, গর্ভিণী

রাত্রে ভোজন ক'র্‌বে। এ গর্ভিণী অবশ্য বিধবা; এর পূর্ব্বের এই অংশটুকু দেখুন—"অথ রজস্বলা সূতকিনোব্রতং", পুলস্ত্যঃ "একদশ্যাংন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি।" নারী বিধবা; সধবায়া নিষেধাৎ। তথাচ বিষ্ণুঃ-"পত্যৌ জীবতি যা নারী উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ। আয়ুষ্যং হরতে পত্যু র্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।" রজোযোগ হ'লেও নারী একাদশীতে ভোজন করবে না, পুলস্ত্য-বচনে এরূপ আছে। রঘুনন্দন সেই নারী শব্দের অর্থ, বিধবা ক'রেছেন ও সধবা উপবাস ক'রে ব্রত ক'র্‌লে সে তা'র স্বামীর আয়ু হরণ ক'র্‌বে ও নরকে যা'বে এই বিষ্ণু-বচন দেখিয়ে, সধবার উপবাস নাই, —সুতরাং নারী শব্দের অর্থ বিধবা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন।—স্বামীর অনুমতি লইয়া সধবা উপবাস করিতে পারে; যে সধবা স্বামীর অনুমতিক্রমে একাদশীর উপবাস করে, সে যদি গর্ভিণী হয়, তা'রই সম্বন্ধে রঘুনন্দন ঐরূপ অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়েছেন, এইরূপ ব'ল্লে দোষ কি?

কালীধন। স্বামীর অনুমতিক্রমে সধবা একাদশীর উপবাস কর্ত্তে পারে কি না সন্দেহ; তা'র পর কর্‌লেও কাম্য হ'বে, কাম্যে প্রতিনিধি নেই—অর্থ—অনুকল্প নেই। "উপবাসনিষেধেতু কিঞ্চিদ্‌ ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ" সুতরাং সধবা একাদশীর উপবাস ক'র্‌লে, সে শক্ত হউক আর অশক্তই হউক, তাহার কিঞ্চিৎ আহার কর্ত্তেই হ'বে। তখন আর স্মার্ত্তের উল্লেখিত গর্ভাদিপীড়ার আশঙ্কা থাটে কি করিয়া? রঘুনন্দনের এইরূপ সুস্পষ্ট লেখা সত্ত্বেও যদি আপনারা মহাপণ্ডিত হ'য়ে টানাহ্যাঁচড়া ক'রে, শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা ক'র্ত্তে যান, তবে আর আর আমি কি বলব? আমার ত আর সেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান নাই—আমি যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখেছি মাত্র।

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। আজ আমি তোমার বিচারে অত্যন্ত প্রীত হ'য়েছি; তুমি শাস্ত্রে প্রবিষ্ট। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল কর।

এই সময়ে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রসন্ন তর্করত্ন (তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইয়া) অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"ওঁ নমো ভগবতে শ্রী৺সূর্য্যায়। ভগবান্‌ শ্রীসূর্য্যদেবের কৃপায় নবদ্বীপের মধ্যস্থতায় আজ সভায় বিক্রমপুরেরই জয় হ'ল; সকলে বিক্রমপুরের জয়-ঘোষণা করুন।

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন। (ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে) সর্ব্বত্র তোমার পাগলাম। বিক্রমপুরের জয় হ'ল কিসে? এ অশক্ত বিধবার পক্ষে অনুকল্পের বিচার; তোমাদের বিক্রমপুরের ত শক্তাশক্ত নেই, বিধবা-সামান্যেই ত খৈএ দৈএ ফলাহারের ব্যবস্থা।

কৃষ্ণধন চৌধুরীর ভগিনীপতি রাজসাহীনিবাসী জয়কৃষ্ণ শান্যাল। এখন রাঢ়ে বরেন্দ্রেও খৈ-দৈ এর ব্যবস্থা হ'বে। কলিতে একপদ ধর্ম্ম আছে, শাস্ত্রে আছে—আমি বলি—তাও নাই। ধর্ম্ম পৃথিবী ছেড়ে গেছে। এই নিজ্জলা উপবাসটা ক'রে বিধবারা একা ধর্ম্মের কাপড় দশীটুকু ধ'রে টেনে রেখেছিল, তাই ত এর নাম 'একাদশী' হয়েছে। তাও আপনারা কেটে দিলেন।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন। হ্যাঁ হে, তুমি শিষ্টাচার মান না?

কালীধন। আজ্ঞা, মানিব না কেন? শিষ্টাচার দ্বারা বেদের অনুমান কর্ত্তে হয়।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন। তবে এতদ্দেশের শিষ্টাচার-পরম্পরায় ত, জানা যায়, বিধবার একাদশীতে অনুকল্প নেই।

কালীধন। এই আচার কতটুকু স্থান লইয়া আছে? দক্ষিণ—নদীয়া, কলিকাতা হ'তে আরম্ভ ক'রে, উত্তরে রঙ্গপুর-দিনাজপুর পর্য্যন্তই ত ঐরূপ আচার বল্‌বেন? কিন্তু সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে ও বঙ্গ ভিন্ন সমস্ত ভারতবর্ষে বিধবার অনুকল্প প্রচলিত। অধিক স্থানব্যাপী শিষ্টাচার দেখে শ্রুতিকল্পনা কর্ত্তব্য কি না, আপনি একবার বিবেচনা করুন। তারপর হোলাকাধিকরণে সিদ্ধান্ত হয়েছে—আচার-দর্শন শ্রুতি কল্পিত হবে, অনাচারে হয় না। পূর্ব্বদেশীয়েরা হোলাকার আচরণ ক'রে থাকে, অন্যত্র করে না; সেই আচার দেখেই সকলের পক্ষে হোলাকা কর্ত্তব্য, এইরূপ সামান্যাকারেই শ্রুতি কল্পিত হবে। নয়ত অন্যত্র করে না, এ জন্যও শ্রুতি-কল্পনার আশঙ্কা হত। না করার প্রতি কত কারণ থাকতে পারে; হয়ত এই এই স্থানে পূর্ব্বে প্রয়োজনই হয় নাই।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন। দেখ, আমি গঙ্গাজল দিবার ব্যবস্থা দিতে পারি—আমি দিয়েওছি, জান্‌বে।

রাজকুমার ন্যায়রত্ন।—

জলজলমিতি রুবতাং তত্যাং নিদাঘাদ্দিতা
হতা বত হতাপততৎ সুগুরুপাতকা চাতকী।
অনর্পিতপয়ঃকণো জলধরোঽপ্যসৌ রোদিতি
প্রবর্ষতি করৈঃ সুধাঃ স হরচন্দ্র এনোঽনিশম্॥

আলোক্য স্ময়তে স্ম যস্ত জনকো ব্যাপারমত্যাদ্ভুতং
বিদ্যাং সোঽপি বিশিষ্যিরে মতিমতো ভীতাঃ পুন-
র্মৈথিলাঃ।
যস্মাৎ সীদতি সিন্ধুশুভ্রযশসঃ ক্রব্যাৎপ্রফুল্লাননং
সোঽয়ং শ্রীরঘুনন্দনো জয়তি নঃ সাক্ষাদ্ গুরূণাং গুরুঃ॥

[সভাভঙ্গ।]
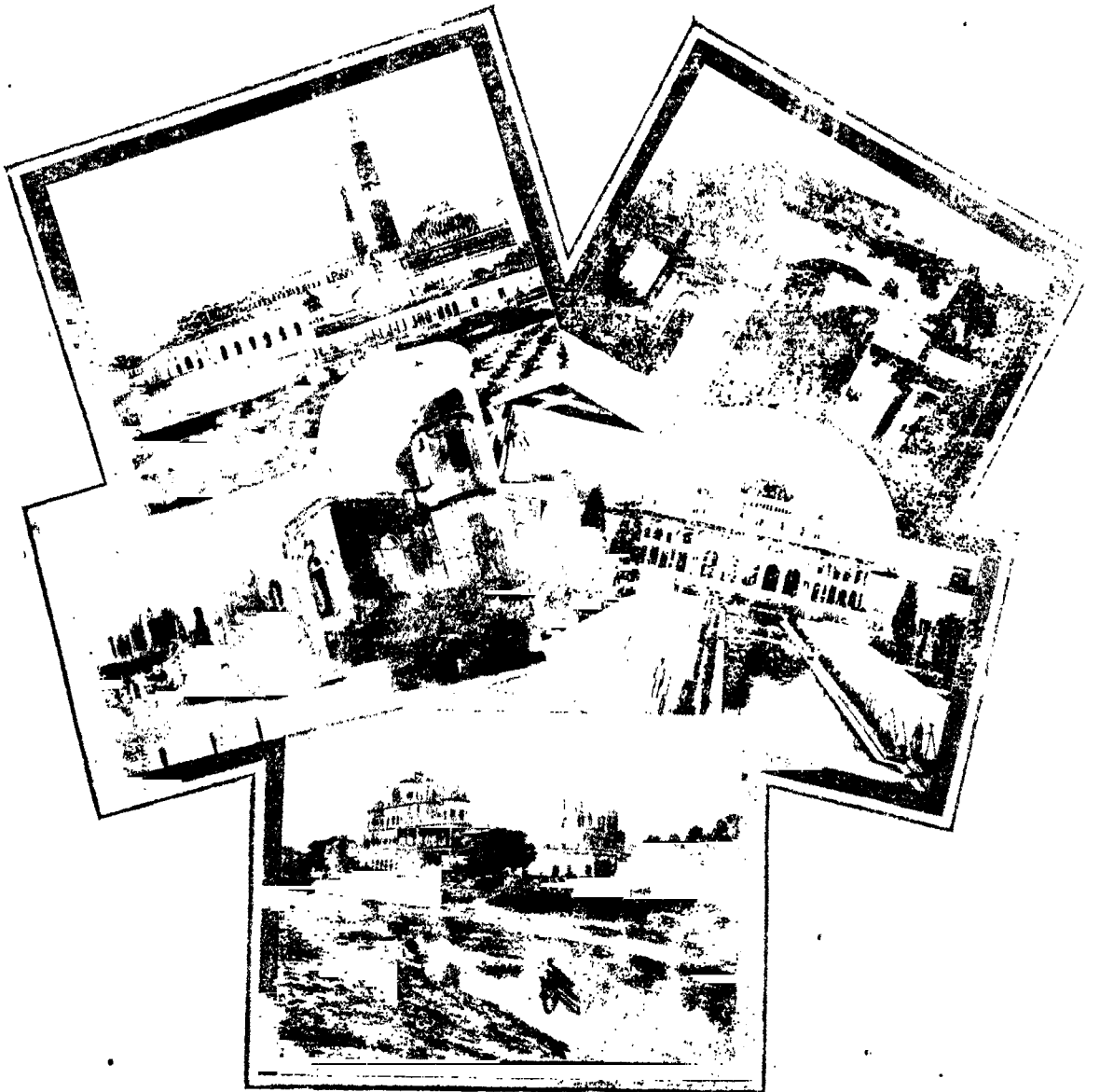
লক্ষ্ণৌ দৃশ্যাবলী

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M.A.]

(১৯)

গণেশ খুড়া যে এরূপভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, ইহা আমাদের মধ্যে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। যাই হ'ক, তাহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য আমরা সকলেই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলাম।

পিতা হাতের ছড়িটা পশ্চাৎ দিকে মেজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মাতাও মণ্ডপমধ্যে গৃহমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভৃত্য ও আরদালী তাহার উভয় হস্ত ধরিয়াছিল। চোর ধরিবার সহায়তা করিতে বাহিরের দুই জন লোক তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়াই তাহারা লজ্জায় খুড়াকে পরিত্যাগ করিয়া, সেস্থান হইতে পলাইল। যাইবার সময়, চোর ধরার পুরস্কার-স্বরূপ তাহারা ঝির কাছে যৌটাকতক তীব্র তিরস্কার উপহার প্রাপ্ত হইল।

পিতা ও মাতা উভয়েই তাহার এই লাঞ্ছনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এবং মনে কিছু ক্ষোভ না রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। পিতামাতার অনুনয়ে গণেশ-খুড়ার ক্ষোভ অপসারিত হইল। তাহার মুখে হাসি আসিল। মাতৃ-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি খুড়ার হাত ধরিয়া, তাহাকে হল-ঘরে লইয়া আসিলাম।

ঘরের মেজেটা মর্ম্মর দিয়া বাঁধান ছিল। মধ্যস্থলে কতকগুলা চেয়ারবেষ্টিত একটি গোল টেবিল। আমি সেই টেবিলে পুস্তকাদি রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম।

আমি খুড়াকে একখানা চেয়ারে বসিতে বলিলাম। খুড়া বসিল না। বলিল—"আমার কাপড়-চোপড় সব নষ্ট হইয়াছে। আমি স্নান না করিয়া আর বসিতেছি না।"

পিতাও মাতা উভয়েই প্রকৃত শুচিতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ দিলেন। কোনও ফল হইল না। কিসে যে সে অপবিত্র হইয়াছে, তাহা গণেশ-খুড়া বলিল না। ক্ষণপূর্ব্বের লাঞ্ছনার একটিও কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইল না।

পিতা বুঝিলেন, খুড়ার ভয় এখনও দূরীভূত হয় নাই। তিনি তাহাকে নানা অভয় বাক্য শুনাইলেন। মা শুনাইলেন। তাহাদের দেখাদেখি আমিও শুনাইলাম। তবু খুড়া স্নানের জেদ ছাড়িল না। অধিকন্তু তাহাকে স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া, আমাকেও সে স্নান করিতে অনুরোধ করিল।

অগত্যা পিতাকে খুড়ার স্নানের ব্যবস্থা করিতে হইল। যে আরদালী তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া আনিয়াছিল, পিতা তাহাকেই খুড়ার সঙ্গে গঙ্গায় পাঠাইলেন। মা-গঙ্গার তীরে আসিয়া খুড়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে চাহিল না।

ইহার কিছু পূর্ব্বেই টেবিলের উপর খাবার রাখিয়া আমরা আহারে বসিয়াছিলাম। ভুক্তাবশিষ্টগুলা টেবিলের উপরেই পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে দেশে মাকে কখন পিতার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে দেখি নাই। বরং তাঁহার আহারের সময়ে ঘটনাক্রমে পিতা যদি কোনও দিন উপস্থিত হইতেন, অমনি জননী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ভোজন হইতে নিবৃত্ত হইতেন। এখানে তাঁহার আর কাহাকেও সরম দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না, লোকলজ্জারও ভয় ছিল না। নির্জ্জন-বাসের ফলে, এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনোপযোগী মনের বলে, আমরা গ্রাম্য কুসংস্কারগুলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।

অন্য দিন আহারের সময়ে কুকুর দুইটা উপস্থিত থাকিত। এবং আহার-শেষে যখন আমরা আসন পরিত্যাগ করিতাম, তখন সেই দুটা পাত্রে মুখ দিয়া, যাহা কিছু তাহাদের খাদ্যযোগ্য অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই তুলিয়া লইত। বাড়ীতে রক্ষক কেহ ছিল না বলিয়া, সে দুটাকে আজ বাহিরে রাখা হইয়াছিল। বিশেষতঃ আজ আহারের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য দিন ভিতর দিকের বারাণ্ডায় আমাদের আসন হইত। আজ আমরা ঘরের ভিতরে টেবিলে আহার করিয়াছি। আমাদের আসনগুলা উন্নতির সমানুপাতে মাটি ছাড়িয়া চেয়ারে উঠিয়াছে। কুকুর দুইটা অগ্রে এস্থান নির্ণয় করিতে পারে নাই। গণেশ-খুড়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই তাহারা হলঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ মাত্রেই তীব্র ঘ্রাণ-শক্তি-বলে আহার্য্যের সন্ধান পাইল। অমনি দুইটাতেই লাফাইয়া টেবিলের উপর উঠিল।

পিতা এতক্ষণে গণেশ-খুড়ার গৃহত্যাগের কারণ বুঝিলেন। তিনি মাকে বলিলেন,—"এ টেবিলটা পরিষ্কার না করিয়া, গণেশকে এখানে আনা অন্যায় হইয়াছে।" মাও বোধ হয়, কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি পিতার কথায় কোনও উত্তর না করিয়া, টেবিল পরিষ্কার করিবার জন্য ঝিকে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন। তথাপি ঝি উত্তর দিল না।

দুই বারের আহ্বানে ঝির উত্তর মিলিল না দেখিয়া পিতা বলিলেন—"সে বোধ হয় নিকটে নাই। তাহার ফিরিবার অপেক্ষা না করিয়া, তুমিই টেবিলটা পরিষ্কার করিয়া ফেল। ফিরিয়া যেন গণেশ এগুলা দেখিতে না পায়।"

"তুমি কি মনে করিয়াছ, মূর্খটা এইগুলা দেখিয়াই আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়াছে?"

"তাহাতে আর সন্দেহ আছে? সে ফিরিলেই বুঝিতে পারিবে।"

মা আর একবার ঝিকে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না; অগত্যা তাঁহাকেই টেবিল পরিষ্কার করিতে হইল।

পিতা এইবারে ভৃত্যটাকে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ভৃত্য পাঁচু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পিতা তাহাকে ভিজা গামছা দিয়া টেবিলটা মুছিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন। আর বলিলেন—"টেবিল সাফ করিয়াই কুকুর দু'টাকে শিকলে বাঁধিয়া বাহিরে লইয়া যা। দেখিস্—কোন রকমে এ দুইটা যেন আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করে।"

মাতা বলিলেন—"তুমি মিছামিছি এমন ভয় পাইতেছ কেন?"

পিতা এ কথার কোনও উত্তর করিলেন না। ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য করিতে পাঁচুকে আদেশ করিলেন। টেবিল পরিষ্কার করিয়া, কুকুর দুটাকে সঙ্গে লইয়া, পাঁচু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মা পিতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"কিছু ভয় নাই। গণেশ আসিলেই আমি তাহাকে জলের মত সমস্ত বুঝাইয়া দিব।"

"পারিলেই ভাল—এই বলিয়াই পিতা বিশ্রামার্থ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমার পরিধানে একটা ঢিলা পায়জামা ছিল। মায়ের ছিল সেমিজ। অতি অল্পদিন মাত্র হিন্দুর গৃহে সেগুলার প্রচলন হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক হিন্দু-পরিবারই সেগুলার ব্যবহারে সাহসী হইয়াছে। তাহাদেরও মধ্যে অনেকেই নিমন্ত্রণাদি ব্যাপার ব্যতীত অন্য সময়ে তাহা পরিধান করিত না। মাও প্রথম প্রথম সসঙ্কোচে সেমিজের ব্যবহার করিতেন। ইদানীং শিক্ষার জন্য একজন মেম ও একজন খৃষ্টান দেশীয় মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়াতে মাতা সর্ব্বদা সেমিজ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

পিতা প্রস্থান করিলে, মা আমাকে বলিলেন—"হরিহর! পায়জামাটা ছাড়িয়া কাপড় পরবি আয়।"

মাতার আদেশানুযায়ী আমি তাঁহার সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিলাম। মাতাও বেশ-পরিবর্ত্তন করিলেন। তদন্তে উভয়েই গণেশ-খুড়ার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

আমি রহিলাম কেন? খুড়াকে দেখিয়াই আমার জন্মভূমির প্রীতি আকুল আবেগে জাগিয়া উঠিয়াছে। পিতামহীর সংবাদ লইবার ইচ্ছা হইয়াছে। মা যে কেন রহিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

পিতা কিন্তু শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শয্যায় তাঁহাকে স্থিরভাবে শয়ান দেখিয়া অনুমান করিলাম, তিনি ঘুমাইয়াছেন।

(২০)

আমাদের বাসা হইতে রশী দুই অন্তরেই গঙ্গার ঘাট। স্নানের জন্য অধিক সময় নষ্ট না করিলে, সেখান হইতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসা যায়। নির্দ্দিষ্ট ঘাটে স্নান না করিয়া, যদি কেহ সোজাসুজি পথ ধরিয়া, আমাদের বাসা হইতে গঙ্গাতীরে যাইতে চায়, তাহা হইলে আরও অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত চলে। আমাদের বাসা ও গঙ্গাতীরের মধ্যে সে সময় এক ওলন্দাজ ফিরিঙ্গীর বাগানবাড়ী ছিল। সদর রাস্তার উপরে সেই বাগানের ফটক। সেই ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া, গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটি সরল পথ। এই পথ-অবলম্বনে গঙ্গার তীরে আরও অল্প সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া যাইত। তবে সে পথটায় যে সে চলিতে অধিকার পাইত না। হাকিমের পুত্র বলিয়া, আমি অথবা আমাদের সম্পর্কীয় যে কোন লোকের সে পথে চলিবার নিষেধ ছিল না। যদি বাগানের ফটক বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে গণেশ-খুড়াকে সেই পথ-অবলম্বনে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পিতা আরদালীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। গণেশ-খুড়াকেও শীঘ্র শীঘ্র স্নান সারিয়া ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। গণেশ-খুড়া ফিরিল না। আর আরদালীও ফিরিল না। ঝি যে কোথায় গেল, তাহারও সন্ধান নাই!

অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া মায়ের চোখে তন্দ্রা আসিল। মা নিজের অবস্থা আমাতে আরোপ করিয়া বলিলেন—"আর কেন হরিহর? কতক্ষণ তার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবি—ঘুমা।"

এই বলিয়াই মাতা হাতের উপর মাথার ভর দিয়া, একটা বালিসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি শয়ন করিলাম কি না, তাহা দেখিবার তাঁহার অবসর রহিল না। দেখিতে দেখিতে তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আমার কিন্তু ঘুম আসিল না। ঘুমাইবার দুই একবার চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা বিফল হইল।

একঘণ্টা—দুইঘণ্টা দেখিতে দেখিতে ঘড়ীতে দশটা বাজিল। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। অথচ সমস্ত দ্বারই খোলা রহিয়াছে।

চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া থাকায় ক্রমে কষ্টবোধ হইতে লাগিল।

পিতার সারাদিবসের পরিশ্রম। তিনি শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাইয়াছেন। এখন তাঁহার নাসিকাধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছিল।

অবকাশ পাইয়া আমি ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিলাম। এবং পা টিপিয়া টিপিয়া হলঘরে উপস্থিত হইলাম।

তখনও ঘরে বাহিরে আলো জ্বলিতেছিল। রাত্রিও অধিক হয় নাই। গ্রীষ্মকাল—জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রি। সবেমাত্র দশটা বাজিয়াছে।

হলঘরে প্রবিষ্ট হইয়া, আমি বাহির বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, সমস্ত দ্বারই মুক্ত। অথচ বাড়ীটা যেন জনশূন্য।

টেবিল পরিষ্কার করিয়া কুকুর দু'টাকে সঙ্গে লইয়া, চাকর পাঁচুও যে সেই বাহিরের দিকে গিয়াছে, সেও আর ফিরিয়া আসে নাই।

ঘর ছাড়িয়া এবার আমি বাহিরের বারান্দায় আসিলাম। সেখানে আসিয়া দেখি, বারাণ্ডার এককোণে মেঝের উপর একটা বালিশ মাথায় দিয়া, পাচু অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে।

সকলকেই ঘুমাইতে দেখিয়া, আমার মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার হইল। নিঃশঙ্কচিত্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম। এখন বাহির হইতে ভিতরে ফিরিতে গাটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। আমার পাঁচুকে জাগাইবার প্রয়োজন হইল। পাছে পিতা ও মাতার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কোন সাড়াশব্দ না করিয়া, শুধু করস্পর্শে তাহাকে উঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

নিকটে গিয়া তাহার গায়ে হাতটি দিতে যাইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে এবং অনুচ্চকণ্ঠে কে আমাকে ডাকিল—"খোকাবাবু!"

পিছন ফিরিয়া দেখি—ঝি। সে আমাকে আর কোনও কথা কহিবার অবকাশ দিল না। আমাকে ফিরিতে দেখিয়াই বলিল—"মা ও বাবা কি করিতেছেন?"

"ঘুমাইতেছেন।"

"বেশ হইয়াছে। বিধাতা কৃপা করিয়াছেন। ও

খোকাটাকে জাগাইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

"কোথায়?"

"এখানে বলিব না। এখনি জানিতে পারিবে। দেরী করিলে কাজের ক্ষতি হইবে।"

"যদি বাবা কিংবা মা ইহার মধ্যে জাগিয়া উঠেন?"

"উঠেন, আমি তার ব্যবস্থা করিব। তোমার কোনও ভয় নাই।"

কৌতূহলপরবশ হইয়া আমি ঝির অনুসরণ করিলাম। বারাণ্ডা হইতে নামিয়া উঠানে পা দিতেই ঝি আমার হাত ধরিল। ধরিয়া বলিল—"খোকাবাবু! এইবারে তোমাকে আমার কোলে উঠিতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"কেন?"

"আমি তোমাকে একবার ফটকের বাহিরে লইয়া যাইব। দেশ থেকে তোমাদের এক আত্মীয় আসিয়াছেন। তিনি তোমাকে একবার দেখিবেন।"

কে আত্মীয় না বুঝিলেও আত্মীয়ের নাম শুনিবামাত্র আমি ঝির কোলে উঠিলাম।

ফটক পার হইয়া ঝি সদর রাস্তায় পড়িল। তারপর কিছুদূর পূর্ব্বমুখে চলিল। যেখানে সেই প্রশস্ত পথ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আর একটু সরু পথের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ঝি সেই খানে উপস্থিত হইয়াই কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"বাবা ঠাকুর! আনিয়াছি।"

এই বলিয়াই ঝি কোল হইতে আমাকে নামাইয়া, সেই চৌমাথার পথে দাঁড় করাইল।

সেখানে একটি আলোক-স্তম্ভ ছিল। ভূমিতে পা দিয়াই দেখিলাম, আলোক-স্তম্ভে ভর দিয়া কে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যক্তি ঝিয়ের কথা শুনিবা মাত্র আমার দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে আসিবামাত্র আমি চিনিতে পারিলাম। তিনি অন্য কেহ নহেন—সার্ব্বভৌম ম'শায়।

আমাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। পথের লণ্ঠন হইতে নির্গত আলোক-রশ্মিতে আমি তাহা সুস্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি যেন স্পন্দহীনের মত দাঁড়াইয়াছি! আমার মুখ হইতে একটিও বাক্য নির্গত হইতেছে না। নির্নিমেষ নেত্রে আমি কেবল তাঁর মুখের পানে চাহিয়া আছি। সে অবস্থা আজিও পর্য্যন্ত আমার মনে সুস্পষ্ট জাগিয়া আছে। ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিয়া, প্রথমে কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। আমারই মত কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ঝিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"মা! কি বলিয়া যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

ঝি একথার কোনও উত্তর না দিয়া আমাকে বলিল—"কার কাছে তোমায় আনিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছ দাদা বাবু? দাও ঠাকুরকে প্রণাম কর।"

ঝির আদেশমত আমি ব্রাহ্মণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম। ব্রাহ্মণ নিষেধ করিলেন। বলিলেন—"বাবা, একটু অপেক্ষা কর।"

তাঁহার হাতে একটা গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু ছিল। আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াই, তিনি কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল আমার মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তাঁর পশ্চাতের পথপার্শ্বস্থ একটা বকুল বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"ব্রাহ্মণী, কন্যাকে লইয়া আইস।"

আমি বিস্ময়বিমূঢ়—হাঁ করিয়া, বকুল বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সেস্থানটায় বেশ অন্ধকার। বিশেষতঃ আমরা আলোকের কাছে অবস্থিত ছিলাম বলিয়া অন্ধকার গাঢ়তর বোধ হইতেছিল। প্রথমে আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ব্রাহ্মণও বোধ হয়, দেখিতে পাইলেন না। তিনি একটু ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"কি করিতেছ? বিলম্বে কি আমার সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট করিবে!"

অমনি দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, ক্রোড়স্থা একটি বালিকাকে লইয়া, যথাসম্ভব দ্রুতপদে এক রমণী আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বালিকা রক্তবস্ত্র-পরিধারিণী। তাঁহারও মুখে অবগুণ্ঠন।

তাঁহারা কে এবং কিজন্য এখানে একপ ভাবে উপস্থিত হইল, তখনকার বালকের বুদ্ধিমত্তায় আমি সে সময় কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

আমি হতভম্বের ন্যায় তাঁহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম। ঝিও কিছু বুঝিতে পারে নাই। সেও আমারই মত হতভম্ব।

আমি কি জানি কেন তাহার পানে ফিরিয়া দেখি, সও আমারই মত হাঁ করিয়া, তাঁহাদের পানে চাহিয়া াছে।

তাঁহাদের পানে ফিরিয়া দেখি, রমণী বালিকাকে কোল ইতে নামাইয়াছেন। এদিকে ব্রাহ্মণ গলার পুঁটুলি হইতে ক একটা দ্রব্য বাহির করিতেছেন।

দ্রব্যটি বাহির হইবা মাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম, সেটি একটি শালগ্রাম-শিলা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া অতি শৈশবেই শালগ্রামের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে। উপনয়ন সংস্কারের পর আমি ই এক দিন তাহার পূজা করিয়াছি। মোটামুটি পূজার দ্ধতিও শিখিয়াছি। সুতরাং সেই কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড দেখিবা াত্র তাহাকে নারায়ণ বলিয়া বুঝিতে আমার বিলম্ব ইল না।

এক হস্তে শালগ্রাম, অন্যহস্তে কমণ্ডলু লইয়া ব্রাহ্মণ যেন শেষ অসুবিধায় পড়িলেন। বলিলেন—"তাইত! এসময় শেশ নিকটে থাকিলে বড়ই ভাল হইত।"

এই কথায় অবগুণ্ঠনবতী রমণী বলিলেন—"তাহার াসিবার উপায় নাই। তাহার সঙ্গে একটা লোক হিয়াছে।"

"বেশ—মা দাক্ষায়ণি! তুমি কমণ্ডলুটা হাতে কর।" এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ পট্টবস্ত্রাবৃতা বালিকার হস্তে কমণ্ডলু দান করিলেন।

আমি বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে কেবল তাঁহাদের কার্য্য-লাপ দেখিতেছি।

ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্রতার সহিত উত্তরীয়াঞ্চল হইতে কতকগুলা প বাহির করিলেন। বাহির করিয়াই কমণ্ডলু হইতে বার কিছু জল লইয়া বালিকার মস্তকে প্রদান করিলেন। হপরে বাম হস্তে আমার জানু স্পর্শ করিয়াই আমার মস্তকে প নিক্ষেপ করিলেন।

অতি ক্ষিপ্রতার সহিত এই সকল ও আনুসঙ্গিক আরও নেকগুলা কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণ হস্তে শালগ্রাম রক্ষা রিলেন। এতক্ষণের কার্য্য সকল নীরবেই নিষ্পন্ন হইতে ল। সকলের নিঃশ্বাসগুলাও বুঝি নীরবতা-ভঙ্গের ভয়ে থার অধিকারীর হৃদয় মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল।

এইবারে ব্রাহ্মণ কথা কহিলেন। বলিলেন—"হরিহর! একবার প্রণব উচ্চারণ কর।"

প্রণব কিরূপভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে, তিনি বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশানুযায়ী আমি প্রণব উচ্চারণ করিলাম। হৃদয়ের আবেগেই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, তাহা এমন ভাবে আমার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল যে, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার চতুষ্পার্শস্থ স্থান যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে স্পন্দন আমি সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম। অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমারও সর্ব্ব-শরীর স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

উচ্চারিত বাণী শ্রবণ মাত্র ব্রাহ্মণ অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণি! নিরাশ হইও না। কন্যাকে ভাগ্যহীনা ও তাহাকে গর্ভে ধরিয়া নিজেকেও ভাগ্যহীনা মনে করিও না। আমি যে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিয়া, এই বালককে কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তিনি আমাকে অপাত্রে কন্যাদানে প্ররোচিত করেন নাই।"

এই সময়ে রমণীর কণ্ঠ হইতে অতি মৃদু রোদন শব্দ আমি যেন শুনিতে পাইলাম। ব্রাহ্মণ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া, আমাকে বলিলেন—"নাও বাপ, এইবারে একবার সপ্রণব নারায়ণ-মন্ত্র উচ্চারণ কর। আমি সে মন্ত্র জানিতাম। তিনি আদেশ করিতে না করিতে আমি বলিয়া উঠিলাম—ওঁ নমো নারায়ণায়।

ব্রাহ্মণ আমার উচ্চারণ শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি উল্লাস আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। শিলাখণ্ড মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, তিনি আমার কুক্ষিদেশ বাহুনিবদ্ধ করিলেন। এবং তিনি কি করিতেছেন—আমি বুঝিতে না বুঝিতে আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন—"ব্রাহ্মণি! কন্যাকে কোলে কর।"

আমাকে বলিলেন—"হরিহর! এইবারে তোমাকে যে কথা বলিব, তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান কর। তুমি জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ ঋষি গৌতমের গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।"

আমি উত্তর করিলাম—"বলুন।"

"তুমি মনে কর, তোমার হৃদয় মধ্যে নারায়ণ বাস করিতেছেন।

আমি প্রথমে একথার কোনও উত্তর দিলাম না।

চোক খুঁজিয়া হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত নারায়ণকে খুঁজিতে লাগিলাম।

আজ বহুকালের কথা। তারপর কত বৎসর সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কতবার কত প্রকারে হৃদয় মধ্যে নারায়ণের অনুসন্ধান করিয়াছি। আজও পর্য্যন্ত করিতেছি। কিন্তু সে রাত্রি সাধু ব্রাহ্মণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, নারায়ণ খুঁজিতে আমার যে অবর্ণনীয় আনন্দের অবস্থা হইয়াছিল, সত্য বলিতে কি, সে অবস্থার কণাও যদি এখন আমার লাভ হইত, তাহা হলেও আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করিতাম।

সে অবস্থার ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র আমার মনে জাগিয়া আছে। কেহ বুঝিতে চাহিলে, তাহাও বুঝাইতে আমার সাধ্য নাই।

সে অবস্থার একমাত্র অবশিষ্ট সাক্ষীর মুখে শুনিয়াছি, আমাকে নারায়ণ খুঁজিতে আদেশ করিয়া, আবার ব্রাহ্মণ যখন আমাকে সম্বোধন করেন, তখন তিনি উত্তর পান নাই। আমাকে কোলে রাখিয়া, বহুক্ষণ স্থির ভাবে তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কথায় ষোলআনা-বিশ্বাসে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, ভাগ্যবান বালক বুঝি সেদিন নারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিল। সংসারভোগপুষ্ট দুর্বল বৃদ্ধের সে অবস্থা বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

কতক্ষণ পরে জানি না, সংজ্ঞার পুনরাবর্ত্তনে আমি তিনবার নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"হরিহর! তুমি ধন্য। তোমাকে কোলে করিয়া আমি ধন্য। তোমাকে যে আজ আশ্রয় করিতে আসিয়াছে, সে বালিকাও ধন্য। তারপর শুন। যিনি তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, মনে কর, সেই নারায়ণই পূর্ণ চৈতন্যে এই শিলা-মূর্ত্তির ভিতরে অবস্থিত রহিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি শালগ্রামটি আমার দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিলেন।

আমি সেই ছিদ্রবিশিষ্ট শিলাখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সে শিলাখণ্ড আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। আমার বোধ হইল, যেন এক অপূর্ব্ব সরোবর মধ্যে অপূর্ব্ব কমলাসনসন্নিবিষ্ট, কেয়ূরবান, কনককুণ্ডলবান এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় বালক—যেন কতকালের পরিচিত সঙ্গী—ঈষৎ হাস্যমুখে আমাকে বলিতেছে,—"কি ভাই হরিহর! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

আমি উত্তর করিলাম—"তুমি নারায়ণ!"

ইহার কতক্ষণ পরে জানি না, সেই রাত্রির অন্ধকারে শালগ্রাম-নিবদ্ধ আমার হস্তে সেই পট্টবস্ত্র-পরিধায়িনী অবগুণ্ঠনবতী বালিকার কোমল হস্ত রক্ষিত হইল।

রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব-গদগদ কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—"দাক্ষায়ণি! মা আমার! এই তোমার স্বামী। স্বামী নারায়ণ। এই হরিহর-নামধারী নারায়ণের করে আমি তোমাকে নিবেদন করিলাম।"

এই বলিয়াই তিনি বালিকার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিলেন। আমাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল।

উল্লাসে আমার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইয়া উঠিল। উল্লাসে স্খলন-ভয়ে বালিকা স্পন্দিত হস্তে সবলে আমার নারায়ণ-যুক্ত হস্ত চাপিয়া ধরিল। অবগুণ্ঠনবতী রমণীর অতি মৃদু উলুধ্বনিতে হুগলি সহরের একটি নিভৃত পথে আমাদের বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আর দাক্ষায়ণী এই তিন জন সাক্ষী। বাহিরের সাক্ষী এক শূদ্রা রমণী। সে চিত্রপুত্তলিকার মত আমাদের বিবাহ-ব্যাপার দেখিতেছিল! আর কেহ জানিল না। এ অপূর্ব্ব সংযোগ-কথা আজিও পর্য্যন্ত আমাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে সংগোপনে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

দানান্তে ব্রাহ্মণ আমাকে কোল হইতে নামাইলেন। তারপর হস্ত হইতে শিলাটি গ্রহণ করিলেন। লইয়া বালিকার অঞ্চলে বাঁধিলেন। স্ত্রীলোকের শালগ্রাম স্পর্শ নিষিদ্ধ, সেই বালককাল হইতেই আমি জানিতাম। কিন্তু সার্ব্বভৌমিক তাহা জানিতেন না?

শিলা-বন্ধন শেষ হইলে ব্রাহ্মণের আদেশে বালিকাকে হাতে ধরিয়া আমি সপ্তপদ গমন করিলাম। এইখানে ব্রাহ্মণী আমাদের উভয়কে ধান্য ও দূর্ব্বা-দানে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই সময়ে দূরে জনসমাগম অনুমিত হইল। ব্রাহ্মণ তখন নিজেও কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্রতার সহিত আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ঝিকে বলিলেন—"মা! ইহজন্মে তোমার উপকার বিস্মৃত হইব না।"

এই কথা শুনিয়াই ঝি দণ্ডবৎ ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে পতিত

হইল। বলিল—"দেবতা! অমন কথা মুখেও আনিবেন না।"

"যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, স্মরণ রাখিব। তুমি মা আমার জাতিকুল রক্ষা করিয়াছ।"

"আমি শূদ্রের মেয়ে! তবে জন্মজন্মান্তরে বুঝি কিছু পুণ্য করিয়াছিলাম। নইলে আমি এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতে পাইলাম কেন?"

ব্রাহ্মণ তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। সে কাঁদিয়া ফেলিল—পুরস্কার গ্রহণ করিল না। বলিল—"ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে।"

ব্রাহ্মণ মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর বলিলেন—"আর নয় মা, বালককে গৃহে লইয়া যাও। নিদ্রিতা মাতা জানিতে পারিলে, বালকের ও তোমার লাঞ্ছনা হইবার সম্ভাবনা।"

"কিছু ভয় নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সব গুছাইয়া লইব।"

এই বলিয়া ঝি আমাকে কোলে উঠাইয়া লইল।

কর্ম্মবশে এ অপরূপ সুখসঙ্গ আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। ব্রাহ্মণ—কন্যা ও পত্নীকে লইয়া পথের একদিকে চলিয়া গেলেন। ঝি আমাকে কোলে করিয়া বিপরীত দিকে লইয়া চলিল।

গৃহে ফিরিয়া দেখি, বাড়ীখানা যেন এক বিরাট সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়াছে। নিদ্রিত কুকুর দুইটার পার্শ্ব দিয়া, সুষুপ্ত ভৃত্য পাঁড়ের মস্তকে পাদস্পর্শ করিয়া, সুনিদ্রিত পিতার নাসিকাধ্বনি শুনাইয়া, মোহাচ্ছন্ন জননীর পার্শ্বে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপস্থিত হইয়া, ঝি সন্তর্পণে আমাকে শয্যায় শয়ন করাইল।

অতি প্রত্যূষে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন-শেষে সহসা কার যেন আহ্বানে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। "হরিহর! বাবাজী! খোকা বাবু!"

ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, সম্বোধন-কর্ত্তা অপর কেহ নহে—গণেশের মা'র গণেশ।

রণ-যাত্রা

[শ্রীশশধর রায়]

১

বুম্ বুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ ;
গর্জ্জে কামান উগারি ধূম।
চলে সিপাহী কাতারে কাতার,
রণমদে মত্ত হৃদয় তাহার,
রণ-সঙ্গীত করে গান ;
চলে ভারত-সন্তান।
ক্ষিতি টলমলি, অর্ণব দলি,
চলে হিন্দু মুসলমান।

২

মণ্ডিত শিরে নব উষ্ণীষ,
মাঙ্গলিক অর্ঘ্য দেবের আশীষ
জননী পরান আপন করে ;
ভার্য্যা পরান আদর ক'রে,
চন্দন-চর্চ্চিত মাল্য বুকে,
ঈষৎ হাস্য জড়িত মুখে।
বম্ বম্ হর হর রব
ধ্বনিছে প্রতাপ, ধ্বনিছে গৌরব
সে রবে খণ্ডিত নভঃ খান্ খান্
চলে বীর হিন্দুর সন্তান।

৩

আল্লা হো আকবর,
উচ্চে উঠিছে কাঁপায়ে অম্বর,
সহস্র কণ্ঠে ভীষণ ধ্বনি ;
দিন্ দিন্ রবে প্রমাদ গণি,
পালায় বিহগ আকাশ ছাড়ি।
জননী উচ্ছ্বাসে চুম্বন করি
পুত্রে বিদায় করে ;
ভার্য্যা হাসিয়া নিকটে আসিয়া
অসি—কোষ হ'তে মুক্ত করিয়া,
অসি উঠাইয়া দেয় করে।
ক্ষিতি টলমলি, হ'য়ে আগুয়ান্
চলে বীর হিন্দু মুসলমান।

৪

দুরু দুরু কাঁপে শত্রুর হিয়া,
চলে বীর সঙ্গীন দলিয়া
ভীম মূর্ত্তি, অর্ণব-পোতে ;
ভারতের বুকে কি অদম্য বল,
ভারতের পণ কেমন অটল,
দেখাবে আবার স্তব্ধ জগতে
সেই পূর্ব্ব ভারত-সন্তান ;
সেই বীর হিন্দু মুসলমান।

৫

যারা পুরাকালে সর্ব্বগিরি দলি,
হুঙ্কারে কাঁপায়ে গগনমণ্ডল
পশিল ভারতে, ক্ষিতি টলমল
কাঁপিল যাদের চরণ-ভরে ;
যাদের অস্ত্রে করকার প্রায়
সহস্র মুণ্ড পড়িল ধরায়,
রক্তে শোণিতের স্রোত ব'য়ে যায়
পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব সাগরে ;
যারা রাজসূয় যজ্ঞ করি শেষ
ছত্রপতি হ'ল ভারতভূমে,
এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিক্ দেশ,
যবনানী, যাদের বীরত্ব-বলে
আচ্ছন্ন হইয়া রহিল পড়িয়া,
পদচিহ্ন বুকে অঙ্কিত ধরি ;
সেই হিন্দুজাতি ছুটেছে সমরে,
শত্রু-হৃদয় কাঁপে থর থরে,
দেখাবে আবার দেবযক্ষনরে
পূর্ব্ব প্রতাপ স্মরণ করি।

৬

যারা অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত নিশান
উড়াল গৌরবে পৃথিবী যুড়ি,
চীন হতে পেরু মানব-সন্তান—
এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিক পূরি,
যাদের দর্পে কম্পিত প্রাণ,
সেই বীর মুসলমান।

রণমদে মত্ত হৃদয় তাহার,
চলে সিপাহী কাতারে কাতার ;
ক্ষিতি টলমলি, অর্ণব দলি,
চলে উড়াইয়া বিজয় নিশান—
হিন্দু মুসলমান।

৭

বাজা রে বাদক, বাজা রণবাদ্য,
রোধিবে এদের কাহার, সাধ্য ?
নিমেষে উহারা সাদী, পদাতিক,
কিবা ওলন্দাজ যমের অধিক,
শত্রু নাশিবে রণে ;
উরু শিরঃ বাহু কাটিয়া ভূতলে
পর্ব্বত গড়িবে ভীম রণস্থলে ;
বজ্রসম তেজে ব্যূহভেদ করে
মুহূর্ত্তে বধিবে সম্মুখ সমরে ;
দক্ষিণে বামে, পশ্চাতে ঘেরে
চূর্ণ করিবে জঘনে।
রাখিবে জগতে অতুল কীর্ত্তি—
দেখাবে জগতে ন্যায়ের মূর্ত্তি ;—
অন্যায় সমরে কি ফল হয় ;
দুর্ব্বলে পীড়িলে কেমন ফল,
দুর্ব্বলে করিলে আরও দুর্ব্বল,
শুধু স্বার্থ স্বার্থ ধর্ম্মের ছল
বিধির জগতে বিধান নয়।

৮

বুম্ বুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্
গর্জ্জে কামান উগারি ধূম !
চলে সিপাহি অর্ণব বাহি
রণমদে মত্ত হৃদয় তা'র,
ভীম গর্জ্জে দীপক মল্লার
রণ-সঙ্গীত করি গান,
চলে ভারত-সন্তান ;
ক্ষিতি টলমলি, অর্ণব দলি
চলে হিন্দু মুসলমান।

কার্লি

[শ্রীকুঞ্জলাল সাহা]

প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য-শিল্প-কলা যে, একসময়ে কতদূর উন্নত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর আদর্শ এখনও নানা স্থানে পর্ব্বতোৎকীর্ণ মন্দিরে বিদ্যমান আছে। কঠিন পাহাড় কাটিয়া, বিরাট মন্দির-নির্ম্মাণ ভারতের একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। পৃথিবীর আর কোথায়ও এইরূপ অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য বড় দেখা যায় না। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি, মধ্যপ্রদেশের সাঁচীগুহা, বোম্বাইএর নিকটবর্ত্তী হস্তিগুম্ফা, ইলোরার "কৈলাস" ও "ইন্দ্রসভা" এই সকল কীর্ত্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। বোরঘাট-পর্ব্বতমালা মধ্যে বক্ষ্যমাণ কার্লিগুহা (করালী গুহা) এই কীর্ত্তির একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

কার্লি—বোম্বাই হইতে পুণা যাইবার রেলপথে একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এখান হইতে গুহা তিন মাইল। এখানে অনেক সময় কোন প্রকার গাড়ী পাওয়া যায় না শুনিয়া, আমরা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেউনলী ষ্টেশনে অবতরণ করি। এখান হইতে গুহা চারি মাইল। যাইবার জন্য টোঙ্গা পাওয়া যায়। আমরা ষ্টেশনের একজন জমাদারের নিকট আমাদের জিনিষপত্র রাখিয়া টোঙ্গাযোগে গুহা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। লেউনলী বোরঘাট উপত্যকায় অবস্থিত। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। এই জঙ্গলে শিকারোপযোগী বড় বড় হিংস্র জন্তু পাওয়া যায় বলিয়া, ইংরাজ শিকারিগণ মধ্যে মধ্যে এখানে শিকার করিতে আসিয়া থাকেন। পথে যাইতে শিবাজীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহগড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি উচ্চ ও দুরারোহ শৈলোপরি এই দুর্গ অবস্থিত। ইহার নিকটে ইন্দ্রাণী নদীর উৎপত্তিস্থান।

আমরা বেলা আড়াইটার সময় একটি নাতি-উচ্চ পাহাড়ের পাদমূলে উপনীত হইলাম। ইহার উপরিভাগে কতকাংশ ক্ষোদিত করিয়া, এই গুহা বা মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। প্রায় আটশত ফুট উপরে উঠিলে, ইহার প্রবেশদ্বার পাওয়া যায়। উপরে উঠিবার সিঁড়ি নাই। সর্পগতি পার্ব্বত্যপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে হয়। উপরে উঠিবার জন্য ডাণ্ডী পাওয়া যায়। অনেক পার্শী-মহিলাকে ডাণ্ডীতে উঠিতে দেখিলাম। আমরা মহোৎসাহে পদব্রজেই উঠিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু কিয়দ্দূর উঠিতেই পথশ্রমে উৎসাহের ও পদের বেগ মন্দ হইয়া আসিল; আমি তখন একটি বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার মধ্যে একটি পার্শী-মহিলাকে ডাণ্ডীতে উঠিতে দেখিয়া, বাহকদিগকে নামিয়া আসিয়া, আমাকে লইবার জন্য ইঙ্গিতে জানাইলাম ও তাহাদের ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল উপলখণ্ডে বসিয়া, প্রকৃতির কমনীয় শোভা সন্দর্শনে শ্রান্তি অপনোদন করিলাম।

এই গুহার প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটি শিবমন্দির স্থাপিত আছে। এই মন্দির দেখিয়া প্রতীত হয়,ইহা সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কোন হিন্দু-নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গুহা বৌদ্ধ-কীর্ত্তি। এবং ভারতবর্ষে যতগুলি পর্ব্বতখোদিত মন্দির বা গুহা আছে, তন্মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন বলিয়া কথিত। এই গুহার শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের কারুকার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ইহাকে হীন নহে বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। অথচ ইহা দেড়সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া, তৎকালে ভারতে স্থাপত্য-বিদ্যা কিরূপ উন্নতির চরমশিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই মন্দিরটির প্রবেশদ্বার বড় ছোট নয়। ইহা বায়ান্ন ফুট প্রশস্ত ও চারিটি উচ্চ স্থূলোদর স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত। এই দ্বারের পার্শ্বে চারিটি প্রশস্ত সিংহমূর্ত্তি আছে বলিয়া ইহাকে সিংহদ্বার বলা হইয়া থাকে। এই দ্বারের উপরিভাগে ও পার্শ্বে স্ত্রীপুরুষের বহুবিধ উলঙ্গমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, কোন গির্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। মধ্যস্থ বৃহৎ কক্ষটি দৈর্ঘ্যে একশত ছাব্বিশ ফুট ও প্রস্থে সাড়ে পয়তাল্লিশ ফুট হইবে। ইহা একচল্লিশটি উচ্চ ও সুগঠিত স্তম্ভের উপর অবস্থিত।

প্রত্যেক স্তম্ভ গোলাকার ও তাহার পাদদেশ ও শীর্ষভাগ নানাবিধ সুচিক্কণ কারুকার্য্য-খচিত। প্রত্যেক স্তম্ভোপরি গজারূঢ় ভুজ-পাশাশ্লিষ্টকণ্ঠ পূর্ণাকৃতি স্ত্রী-পুরুষের যুগলমূর্ত্তি; কচিৎ দুই একটি স্তম্ভে এই দম্পতীর পরিবর্ত্তে যুগল রমণীমূর্ত্তি দেখিলাম। এইগুলির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতই স্বাভাবিক ও সুন্দর যে, ইহারা শিল্পচাতুর্য্যে ইটালীর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ফার্গুসন সাহেবের মতে এই গুহা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত। কেহ যেন মনে না করেন, এই সকল গজারূঢ় মূর্ত্তি স্বতন্ত্র প্রস্তরখণ্ডে পরিকল্পিত হইয়া পরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। একটি সমগ্র পাহাড়ের কঠিন অংশ কাটিয়া, এই গুহার মধ্যস্থ কক্ষ, স্তম্ভ ও নরনারীমূর্ত্তিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে। বোধ হয়, শিল্পকলার এরূপ উৎকর্ষ এই ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এই গুহার মধ্যস্থ বৃহৎ কক্ষটির প্রান্তদেশে একটি পাষাণমঞ্চ ও তদুপরি কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি বৃহৎ ছত্র স্থাপিত আছে। সম্ভবতঃ এই মঞ্চে সমাসীন হইয়া বৌদ্ধযাজক শিষ্যগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। এই সুবৃহৎ কক্ষটির উভয় পার্শ্বে বারান্দা এবং তৎসংলগ্ন আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। তন্মধ্যে একটি ত্রিতল কক্ষ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই গৃহের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। উহার দ্বিতল গৃহটির ভিত্তি-গাত্রে প্রস্তরনির্ম্মিত বসিবার আসন আছে। তথায় কয়েকটি পার্শি সবকসবতা বসিয়া তাসক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া, আমরা তাহাদের বিঘ্ন না জন্মাইয়া ত্রিতলে উঠিলাম। তথায় একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ; আমরা সেই কক্ষতলে মসৃণ প্রস্তরোপরি উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তক্লান্ত চরণ-যুগলের ক্ষণেক বিশ্রামের অবকাশ দিলাম ও কিয়ৎকাল শান্তি উপভোগ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম।

প্রবেশ-দ্বারের পুরোভাগে একটি শিব-মন্দিরের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আমরা গুহা হইতে বহির্গত হইয়া, সেই মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেবদর্শন করিলাম। সেখানে জনৈক গুজরাটী সহিত আলাপ পরিচয় হইল।

কার্লিগুহার প্রবেশদ্বার

তিনি মোটামুটি ইংরাজী জানেন, এই জন্য কথোপকথনের অনেক সুবিধা হইল। তাঁহার নিকট তাঁহাদের দেশের আচারব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইতে পারিলাম। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাদ্বয় নিঃসঙ্কোচে আমাদের নিকট বসিয়া, স্মিতমুখে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে গোধূলির ধূসর ছায়ায় চারি-দিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। আমরাও সন্ধ্যা-সমাগমে প্রকৃতির অপরূপ মাধুরী দেখিতে দেখিতে ধীরপদে পর্ব্বতশীর্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, গুজরাটী বন্ধুগণের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক টোঙ্গারোহণে নগর অভিমুখে চলিলাম। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী—রজতশুভ্র কৌমুদীধারা-বিধৌত ধরিত্রী আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। অদূরে গিরিরাজী চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে অচঞ্চল অভ্রমালা ও নগোপকণ্ঠে শ্যামায়মান বনরাজী যেন উচ্ছলিত চন্দ্রিকা-তরঙ্গে শশাঙ্কের প্রতিবিম্বিত কলঙ্কলেখা বলিয়া বোধ হইতেছিল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে, আমরা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন ষ্টেশনে এক পাহারাওয়ালা ব্যতীত আর জনপ্রাণী কেহ উপস্থিত নাই দেখিলাম। পাহারাওয়ালাটি আমাদের জিনিষপত্রের পার্শ্বে বসিয়া ঝিমাইতেছে। তাহাকে ষ্টেশনের বাবুদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইলাম না। সেও ইংরাজী

জানে না, আমরাও মারহাটি ভাষায় সুপণ্ডিত। তখন অনন্যোপায় হইয়া, ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। বাহিরে যে দুইতিন খানি মিষ্টান্নের দোকান আছে, তাহার কোন দ্রব্যই আমাদের পছন্দ হইল না। অপরিচিত স্থান; কোথায় যাই, কোথায় আহার করি, মহা সমস্যার বিষয়। এ দিকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির করিয়াছে। তখন অগত্যা গ্রামাভিমুখে চলিলাম। গুহা দেখিতে যাইবার সময় অদূরে রাস্তার পার্শ্বে কয়েকখানি চালাঘর দেখিয়াছিলাম, সেইদিকে গ্রাম আছে, অনুমান করিয়া চলিলাম। অনেক অনুসন্ধানে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটী মিলিল। বাটীর দরজায় অপরিচিত কয়েকজন বিদেশী আগন্তুককে রাত্রিকালে উপস্থিত দেখিয়া, বাটীর পুরুষ ও রমণীগণ ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। আমাদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা উপবীত দেখাইয়া, ইঙ্গিতে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দ্বারে উপস্থিত বুঝাইয়া দিলেন। হিন্দু রমণীগণ স্বভাবতঃই কোমলহৃদয়া ও পরদুঃখকাতরা; তাঁহারা দরিদ্র হইলেও দ্বারে সমাগত অতিথিকে কোন ক্রমে বিমুখ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বসিবার জন্য আমাদিগকে একখানি কম্বল বিস্তার করিয়া দিলেন; ভগবানের কৃপায় আমরা এই অপরিজ্ঞাত স্থানেও এত সহজে আশ্রয় পাইয়া, তাঁহার অভয়পদ ভক্তিভরে স্মরণ করিলাম। দয়াবতী রমণীগণ আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া, তাড়াতাড়ি অন্ন প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিলেন। ব্যঞ্জনাদি বোধ হয় পূর্ব্বেই পাক করা ছিল। খাইবার উপকরণ, ভাত, ডাল (ওয়াবং), তরকারী (শাক) মাত্র, কিন্তু ডাল ও তরকারী একে নারিকেল তৈলে পাক, তাহার উপর এতই ঝালদুষ্ট যে, মুখে দিতেই কোষ্ঠা পাড়িবার উপক্রম হইল। তখন আমরা ট্যান্টালসের (Tantalus) দশায় উপনীত হইলাম। সম্মুখে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত কিন্তু সাধ্য নাই যে গলাধঃকরণ করি। বাটীর গৃহিণী আমাদের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া, অতি সত্বর মহিষের দুগ্ধ ও চিনি আনিয়া দিলেন। দুগ্ধ মহিষের হইলেও গরম গরম খাইতে মন্দ লাগে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় সেই দুধভাত পায়সান্ন অপেক্ষাও মিষ্ট বোধ হইল। এদেশে জনসাধারণ নারিকেল-তৈলে পাক করিয়া খায়। তবে এই তৈল, টাটকা নারিকেল ঘানিতে ভাঙ্গাইয়া প্রস্তুত করা হয়; এই জন্য আমাদের দেশের নারিকেল তৈলের ন্যায় দুর্গন্ধময় নয়। তাহা হইলেও নারিকেল তৈল কখনও অনভ্যস্ত বাঙ্গালীর রসনা-তৃপ্তিকর হইতে পারে না।

কালিগুহার চৈত্যাভ্যন্তরের দৃশ্য

যাহা হউক, আমরা আহারান্তে সেই দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদানান্তে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তখন রাত্রি এগারটা। সেই গভীর নিশিতে চন্দ্রালোকপ্লাবিত অপরিচিত গ্রাম্য-পথে আমরা কয়েকজন ষ্টেশনাভিমুখে চলিলাম। লোকালয়ে কোথায়ও সাড়াশব্দ নাই; প্রকৃতি নিশ্চল নিস্পন্দ। পথপার্শ্বে পাহাড়ের সানুদেশব্যাপী পার্ব্বত্যবৃক্ষের শ্রেণী; চন্দ্রোদয়ে রজনীর অন্ধকার যেন সভয়ে সেই ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত আছে। ক্বচিৎ বৃক্ষচ্যুত পর্ণোপরি বন্যজন্তুর পদশব্দ রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আমরা ত্বরিৎপদে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন পুণাগামী প্যাসেঞ্জার আসিবার সময় বলিয়া, ষ্টেশনে বাবুরা উপস্থিত হইয়াছেন। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাদিগকে ভিন্নদেশীয় বুঝিতে পারিয়া, আমাদের পরিচয় লইলেন। আমরা গুহা দেখিতে যাইবার কালে তাঁহাকে জানাইয়া গেলে, আমাদিগকে রাত্রিকালে আহার-অন্বেষণের জন্য এই শ্বাপদভয়সঙ্কুল গ্রাম্যপথে যাতায়াতের কষ্টভোগ করিতে হইত না, তিনি তাঁহার বাসায় আমাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত রাখিতেন বলিয়া যথেষ্ট সৌজন্য জানাইলেন। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিশ্রামগৃহে অবশিষ্ট রাত্রি যাপনপূর্ব্বক প্রত্যূষে বোম্বাই রওয়ানা হইলাম।

রমার কপাল

[শ্রীসুনীতি দেবী]

(১)

ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া, সহসা যখন অবিনাশচন্দ্র পশ্চিম হইতে বিবাহ করিয়া ফিরিলেন, তখন বন্ধুমহলে কয়েক দিন ধরিয়া, খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল।

. ধনী পিতা তারাপ্রসন্নের একমাত্র পুত্র হইলেও অবিনাশ বিলাসের মধ্যে লালিত হন নাই। তাঁহার পিতা এই মাতৃহান বালকটিকে গভীর স্নেহের সহিত পালন করিতেন, কিন্তু কখন অযথা আদর দিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া যান নাই। বাল্যকাল হইতে অবিনাশ অত্যন্ত অধ্যয়নশীল ছিলেন। আঠার বৎসর বয়সে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবা মাত্র তাঁহার পিসিমাতা নিস্তারিণী ঠাকুরাণী আসিয়া, তাঁহার পিতাকে বলিলেন "তারা, এইবার অবুর বিয়ে দে।" তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "এখন থাক্"। নিস্তারিণী ভ্রাতাকে চিনিতেন ; তিনি বুঝিলেন, ইহার পর কথা বলা নিষ্ফল। তথাপি এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "এখন থাক্‌বে ত কবে হবে ? বৌ বেঁচে থাক্‌লে ক অবু এতদিন আইবুড় থাকৃত!"—তারাপ্রসন্ন মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "দিদি, আমি একবার বলেছি ত এখন থাক্। অবুর এখনও বিয়ের বয়স হয়নি।" নিস্তা-রিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। তারাপ্রসন্ন যদি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হইতেন, তবে দিদির কথা অগ্রাহ্য করিতেন না। তিনি জানিতেন না, যে বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে তাহার ভবের খেলা সাঙ্গ হইবে ; জানিলে তখনই অবি-নাশের বিবাহ দিয়া, পুত্র ও পুত্রবধূকে কোলে করিয়া, জীবনের শেষ কয়টা দিন সুখে কাটাইতেন।

তারাপ্রসন্নের মৃত্যুর পর অবিনাশের পিসিমা, তাঁহাদের সমস্থ জমিদার-কন্যার সহিত অবিনাশের বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। অবিনাশ বলিলেন, "মেয়েটি নাকি বড় কালো ? তা এখন কিছুদিন যাক্ না কেন!" পিসিমা বলিলেন, "বাবা, তোমরা আজকালকার ছেলে, গুরু-জনের কথা কাণেই তোল না। সুন্দরী মেয়েই যদি তুমি চাও, তারই বা অভাব কি ? তুমি মত দিলেই সব হয়।" অবিনাশ বলিলেন, "পিসিমা, রাগ করো না। এখন কিছু দিন থাক্।" পিসিমা মুখ ভার করিয়া উঠিয়া গেলেন।

তারাপ্রসন্নের জীবিতাবস্থায় তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়া-খানি খালি পড়িয়া থাকিত। অবিনাশ এখন সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। অবিনাশ বাড়ীতে এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী করিলেন, এবং দিনরাত্রি অধ্যয়নে নিমগ্ন হইয়া, বিবাহের কথা ভুলিয়া গেলেন। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বহির্জগতের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অন্ন-চিন্তা ছিল না, অন্য কোন চিন্তাও ছিল না। তিনি বন্ধু-হীন ছিলেন না,—তাঁহার ন্যায় বড়লোকের বন্ধু না থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বন্ধুবর্গ মধ্যে মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি বলিতেন, "দরকার কি ? এই ত বেশ আছি।" এমন সময় তাঁহার দেশ ভ্রমণের বাসনা জন্মিল। পশ্চিমে গিয়া বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল। শ্যামাঙ্গী কমলিনীকে বিবাহ করিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন। কমলিনীর বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর। তাহার দরিদ্র পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করাই যে, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বাহিরের লোকে জানিল না। তিনি দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই আত্মীয়স্বজনকে তাঁহার বিবাহ-সংবাদ জানাইলেন। সকলেই মনে করিলেন, অবিনাশ নিশ্চয়ই এক অসামান্যা সুন্দরী বিবাহ করিয়া আনিতেছেন। কারণ কন্যা সুন্দরী না হইলে, অবিনাশের চিরকুমার-ব্রত টলিতে পারে না। জমিদারের কালো মেয়ের প্রতি তাঁহার বিরাগের কথাটাও অনেকে জানিতেন। কমলিনীকে দেখিয়া, সকলের ভ্রান্তি দূর হইল। অবিনাশ এই "কালো ধেড়ে মেয়ে" বিবাহ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের বিরাগভাজন হইলেন ; বন্ধুমহলেও এই বিষয় লইয়া খুব একটা আন্দোলন চলিতে লাগিল।

(২)

কমলিনীর শোভার মধ্যে চক্ষু দুইটি বড় তীক্ষ্ণ ছিল। পাড়ার একটি মেয়ে দেখিয়া বলিয়াছিল, "মাগো, চোখের দৃষ্টি যেন বাজপাখীর মত।" কমলিনী গরীবের মেয়ে, কাজেই এই অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আসিয়া, তাহার 'ভ্যাবাচ্যাকা' লাগিয়া যাইবার কথা; কিন্তু সে তেমন ধরণের মেয়েই ছিল না। সে স্বামি-গৃহের এই অগাধ ধনরাশি দেখিয়া, কিছুমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল না। এই ঐশ্বর্য্যের বন্যা তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। তাহার চালচলন দেখিলে মনে হইত, যেন সে জন্মাবধি সুখভোগে অভ্যস্ত।

অবিনাশের বিধবা দিদি "অবুর বৌ"কে ঘরসংসার শিখাইবার উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য আসিলেন। দুই একদিনের মধ্যেই তিনি বুঝিলেন, "অবুর বৌ"কে শিখাইবার কিছু নাই, এবং সে তাঁহার উপস্থিতি বিন্দুমাত্র কামনা করে না। তিনি অবিনাশকে বলিলেন, "অবু, বৌ ত বেশ সেয়ানা মেয়ে; এরই মধ্যে নিজের সংসার দিব্যি বুঝে নিয়েছে। আমার আর থাকবার দরকার দেখি না। আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দে।" অবিনাশ আর দুইদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি অনেক ওজর-আপত্তি দেখাইয়া চলিয়া গেলেন।

অবিনাশের সংসারে তাঁহার কোন আত্মীয়ের স্থান রহিল না। কেহ আসিলে কমলিনী মুখের সাম্‌নে কিছু বলিতেন না বটে কিন্তু তাঁহার ব্যবহার এবং তীব্র দৃষ্টি স্পষ্টভাবে বলিত, তোমাদের এখানে অনধিকার-প্রবেশ। তাহাতেও কেহ বিচলিত না হইলে, তিনি তাহাকে শুনাইয়া দাসীদের নিকট এমন সব কথা বলিতেন যে, তাহার সে স্থানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিত। অবিনাশ এসকলের কিছু জানিতেন না। তিনি সংসারের সকল ভার কমলিনীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্তমনে পুস্তকরাশির মধ্যে ডুবিয়াছিলেন।

(৩)

দুই বৎসর বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাপনের পর অবিনাশের সংসারে একটি নূতন ঘটনা ঘটিল। কমলিনী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। অবিনাশ তখন তাঁহার দিদিকে আনাইলেন। দিদি ভ্রাতৃজায়ার পূর্ব্ব-ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। একমাস পরে তিনি নিজগৃহে ফিরিবার প্রস্তাব করিলে, কমলিনী বলিলেন, "দিদি, এত শীঘ্র যাবেন?"—দিদি মনে মনে বলিলেন, "সেবারে ত এক সপ্তাহেই অসহ্য হয়েছিল, এবার যে বড় গরজ দেখ্‌ছি!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি ত এখন বেশ সুস্থ হয়েছ, নিজেই মেয়েটাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারবে। তাছাড়া একমাস বাড়ী যাইনি, তাঁরা হয়ত রাগ করছেন।" ইহার পর কমলিনী আর কিছু বলিলেন না।

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে অবিনাশ তাঁহার দূর-সম্পর্কে এক খুড়তুতো ভাই বিরাজমোহনের একখানি পত্র পাইলেন। তিনি এত অসুস্থ, যে অন্যকে দিয়া পত্রখানি লেখাইয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই, যে তিনি অবিনাশের সহিত শেষ-দেখা করিতে চাহেন। বাল্যকালে দূরসম্পর্কিত ভ্রাতাদিগের মধ্যে একমাত্র ইঁহাকেই অবিনাশ অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তারপর উভয়ের পিতার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায় দুইজনের অনেকদিন ছাড়াছাড়ি। অবিনাশ অভিমান করিয়া চিঠিপত্র লেখেন নাই। বিরাজমোহন বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী দুই বৎসরের শিশু কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া, বিরাজমোহন কন্যাটিকে বুকে করিয়া মানুষ করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না; পত্নী-বিয়োগের পর শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল। ওকালতীতে তাঁহার যথেষ্ট আয় হইতেছিল। পূর্ব্ববিবাদের কথা স্মরণ রাখিয়া, তিনিও এতদিন অবিনাশের সংবাদ রাখেন নাই। মৃত্যু যখন শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার "অবুদা"র কথা মনে পড়িল।

পত্রখানি লেখাইয়া তিনি অবিনাশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিনাশ পত্রখানি পাঠ করিয়া, সেই দিনই এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, বিরাজের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত-প্রায়। বিরাজের শয্যাপার্শ্বে বসিতেই তিনি চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, "অবুদা এসেছ?" অবিনাশের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, তিনি বিরাজের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, "আগে কেন খবর দাওনি, বিরাজ?" বিরাজমোহন

কেবল একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "অবুদা, আমার মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য তোমায় ডেকেছি। আমার সব বিষয়সম্পত্তি আর মেয়েটাকে তোমার কাছে দিয়ে যাব, তুমি দেখো।" অবিনাশ বলিলেন, "তোমার মেয়েকে আমি নিজের মেয়ের মতই রাখ্‌ব। সেজন্য তুমি ভেবো না।" বিরাজমোহন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা আমি জান্‌তাম। অবুদা, তুমি আমায় ছেলেবেলায় বড় ভাল-বাস্‌তে, তাই শেষ সময়ে তোমার কথাই আগে মনে হ'ল। তোমার সঙ্গে দেখা কর-বার জন্যই বোধ হয়, আমি এখন পর্য্যন্ত বেঁচে আছি।" তাহার পর চাকরকে বলিলেন, "রমা কোথায় রে?" চাকর বলিল, "দিদি-মণি ঘুমোচ্ছেন।" বিরাজমোহন বলিলেন, "আহা, বেচারা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।" অল্প পরেই ক্ষীণাঙ্গী একটি বালিকা চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে আসিয়া বিরাজের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "বাবা!"—বিরাজমোহন ক্ষীণ হস্তে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মি, এর মধ্যে ঘুম হয়ে গেল? ঐ দেখ্—তোর জেঠা-মশাই এসেছেন।" বালিকা তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি অবিনাশের দিকে ফিরাইয়া, একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। অবিনাশ বলিলেন, "এস ত মা, আমার কাছে।" বালিকা পিতাকে জড়াইয়া বসিয়া রহিল, নড়িল না। বিরাজ বলিলেন, "যাও না মা, জেঠামশায়ের কাছে যাও।" তথাপি বালিকা নড়িল না। অবিনাশ বলিলেন, "থাক্—অচেনা লোক দেখে বোধ হয় সঙ্কোচ হচ্ছে।" বিরাজমোহন বলিলেন, "আচ্ছা, এখন থাক্। রমা তুমি একটু খেলা কর গিয়ে।" রমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া গেল।

বালিকা পিতাকে জড়াইয়া বসিয়া রহিল

বিরাজমোহন তখন অবিনাশকে বলিলেন, "অবুদা, মেয়েটাকে ছেড়ে যেতে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমার সব টাকা রমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওকে ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ো। আর অবুদা, মেয়েটা ঠিক্ ওর মার মতন হয়েছে। বড় অভিমানী। মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পারে না; কিন্তু একটি কর্কশ কথায় দুচোখ জলে ভরে যায়। দেখ্‌তেও ঠিক্ মার মত সুন্দরী হয়েছে।" বলিতে বলিতে বিরাজমোহনের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "অবুদা, এই অনাথা বালিকাটিকে পিতৃস্নেহে পালন ক'রো।" অবিনাশের চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। এমন সময় রমা দ্বারের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আস্‌ব?" অবিনাশ উঠিয়া গিয়া, তাহাকে কোলে করিয়া আনিলেন। সে কোন আপত্তি করিল না। বিরাজমোহন রমার দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "মা লক্ষ্মি, জেঠামশাই তোমাকে খুব ভালবাস্‌বেন। তুমি তাঁর কথা শুনে চ'লো।"

(৪)

একদিন রাত্রে বিরাজমোহন রমার মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাতে রমা যখন বুঝিল, তাহার পিতাকে আর ফিরাইয়া পাইবে না, তখন অবিনাশের শত সান্ত্বনা-বাক্য তাহাকে আশ্বস্ত করিতে পারিল না। করুণস্বরে "বাবা গো" বলিয়া, সে ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। শিশুর ক্ষুদ্রবক্ষ শোকের প্রচণ্ড আঘাতে যেন ভাঙ্গিয়া গেল। হায়! শিশু প্রাণের সে গভীর দুঃখ কে বুঝিবে?

শোকের তীব্রতা কিছু কমিয়া আসিলে, দুই চারিদিন পরে অবিনাশ তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কমলিনীর কোলের কাছে তাহাকে বসাইয়া বলিলেন, "কমল, এই নাও—তোমার আর একটি মেয়ে।"—বলিতে বলিতে বিরাজমোহনের সেই স্নেহপূর্ণ মুখখানি মনে পড়িয়া গেল। তিনি আবার বলিলেন, "ওর বাপকে আমি বড় ভালবাস্‌তাম। দেখো—এর যেন অযত্ন না হয়।" রমা কমলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কে?" কমলিনী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অবিনাশ বলিলেন, "উনি তোমার জেঠাই-মা।" এমন সময় দাসীর কোলে চড়িয়া কমলিনীর মেয়ে আসিল। অবিনাশ বলিলেন, "এই তোমার বোন্। ওর নাম লাবণ্য, ওকে নোটন বলে ডাকে। নোটন তোমাকে 'দিদি' বল্‌বে।" রমার মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে নোটনের গলা জড়াইয়া চুম্বন করিল, নোটন তাহার কোঁকড়া চুলের একটা গুচ্ছ টানিয়া দিয়া হাসিতে লাগিল। কমলিনী রমাকে বলিলেন, "তুমি কাপড়-চোপড় ছাড়, তারপর সারাদিন নোটনের সঙ্গে খেলা ক'রো।" একজন দাসী রমাকে লইয়া গেল।

কমলিনী অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমার বাপ কি কিছু রেখে গেছে, না মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে?" অবিনাশ সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বিরাজমোহন কন্যার জন্য যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন শুনিয়া, কমলিনী রমার খরচপত্র সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। অবিনাশ রমার অর্থ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া, তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন। রমার অর্থ তাহার বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ সঞ্চিত থাকিল। কমলিনী একদিন অবিনাশকে বলিলেন, "রমার যদি কিছু না থাক্‌ত, তবে এক কথা; ওর ত যথেষ্ট টাকা আছে, ওর খরচের টাকাটা তোমার নেওয়া উচিত।" অবিনাশ এই প্রথম স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া, বলিলেন, "ছি!—ওকথা মুখে এনো না। ও ত তোমারই মেয়ে।"

অবিনাশের বাড়ীর পাশে দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ী ছিল। তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া কমলিনী তাঁহাদের সহিত বড় বেশী মিশিতেন না। দেবেন্দ্র বাবুর মেয়ে কনক, রমার সমবয়সী। কাজেই রমার সহিত তাহার খুব ভাব হইয়া গেল, এবং উভয়ে সই পাতাইয়া ফেলিল। দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, রমাকে বড় স্নেহ করিতেন, তাই রমাও 'সইমা'র প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। শিশু-হৃদয়ে ত আপন-পর-জ্ঞান থাকে না,—যেখানে ভালবাসা পায়, সেইখানেই আপনাকে সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকে। ব্রাহ্ম-পরিবারের সহিত এতটা ঘনিষ্ঠতা কমলিনীর ভাল লাগিত না। তিনি একদিন রমাকে বলিলেন, "রোজ রোজ কনকদের বাড়ী যাওয়া কেন? সঙ্গে আবার নোটনকে নিয়ে যাওয়া চাই। যেতে হয়, একলা গিয়ে মেমসাহেবী শিখে এসো।"

রমা সেদিন কনকদের বাড়ী গেল না। বিকালবেলা নোটনকে লইয়া বাগানে খেলা করিতে লাগিল। নোটন এখন চার বছরের মেয়ে। মুখখানি হাসিভরা, অনেকটা বাপের মত; আর চক্ষু দুইটি বুদ্ধিমত্তায় উজ্জ্বল। কথায় তাহাকে আঁটিয়া উঠা যায় না। বাড়ীশুদ্ধ লোক তাহার দুরন্তপনায় শশব্যস্ত; কিন্তু রমার কাছে তাহার ভিন্ন মূর্ত্তি। রমার কোন কথা সে অগ্রাহ্য করে না; রমা না হইলে তাহার একদণ্ড চলে না। লোকে তাই অবাক হইয়া ভাবিত, এই শান্ত নীরব বালিকা কি যাদুমন্ত্রে এই চঞ্চল শিশুকে বশ করিয়াছে। রমা যখন পাঠাভ্যাস করিত, তখন নোটন গম্ভীরভাবে তাহার পাশে বসিয়া, কালি কলম লইয়া, হিজিবিজি কাটিত। রমাও নোটনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। বাড়ীর সকলে, বিশেষতঃ অবিনাশ—রমাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন বলিয়া, কমলিনী তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। একদিন নোটন রমাকে না দেখিয়া "দিদি কোথায়" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন কমলিনী মেয়ের পিঠে এক কিল বসাইয়া কহিলেন, "দিদি

তোর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে। সারাক্ষণই দিদি—দিদি!" প্রহার ও তিরস্কার কিছুই এই দুইটি বালিকার ভালবাসার স্রোত রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

আজ কনকের বাড়ী যাইতে না পারিয়া, রমা ও নোটন বাগানে খেলা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কনক পশ্চাৎ হইতে আসিয়া রমার চোখ টিপিয়া ধরিল। নোটন অমনি চীৎকার করিয়া বলিল,—"সই"। নোটনও রমার দেখাদেখি, কনককে 'সই' বলিত। কনক, রমার চোখ ছাড়িয়া, নোটনের গাল টিপিয়া বলিল, "দুষ্টু মেয়ে।" তারপর রমার গলা জড়াইয়া বলিল, "সই, আজ যাওনি কেন? আজ দাদাকে বলে ম্যাজিক লণ্ঠন আনিয়েছিলাম। তুমি গেলে না বলে করা হল না।" রমা বলিল, "আমার আজ যেতে ইচ্ছা করল না।" কনক যেখানে থাকিত, সেখানে বিষাদের স্থান হইত না। তাহার প্রকৃতি যেন আনন্দের প্রস্রবণ ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে রমাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত তিনজনে বাগানে কত খেলা করিল। বাড়ী ফিরিলে কমলিনী বলিলেন, "রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে থাকার কি দরকার? নোটনের অসুখ না করিয়ে তুমি ছাড়বে না।"

নোটন অমনি চীৎকার করিয়া বলিল—সই!

প্রতিদিন রমা কোন না কোন কাজের জন্য কমলিনীর কাছে খোঁটা খাইত। আজ সারাদিনই কমলিনী তাহার দোষ ধরিয়া, তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন, তাই আজ রমা একটু অধিক বিষণ্ণ। সে ধীরে ধীরে তাহার পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিয়া পড়িতে বসিল। আজ তাহার পড়ায় মন লাগিল না। সে পড়া ছাড়িয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার আকাশে অনেক তারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইল, এমনি এক অন্ধকার রাত্রে তাহার পিতা তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। পিতার আদর মনে পড়িয়া, তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

(৫)

দেখিতে দেখিতে রমার বয়স দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। অবিনাশ অনেক সন্ধান করিয়া, তাহার জন্য একটি পাত্র স্থির করিলেন। ছেলেটির পিতা অমূল্যধন বাবুকে অবিনাশ চিনিতেন। ছেলেটির নাম অরবিন্দ; এম, এ, পাশ করিয়া বি, এল, পড়িতেছে। পিতা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। গৃহে জননী ভিন্ন কোন আত্মীয়া নাই। অরবিন্দ দেখিতে অতি সুশ্রী, এবং স্বভাব-চরিত্র-গুণে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রিয়।

খুব ধনী না হইলেও অবস্থা সচ্ছল। অরবিন্দের জননী রমাকে দেখিয়াই পছন্দ করিলেন। বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে কমলিনী, কি কারণে রমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করাতে সে ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। কনক তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া রমাকে সেই অবস্থায় দেখিল। সে রমার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "সই, তোর বিয়ে হয়ে গেলে, তুই কেমন সুখে থাক্‌বি। তখন ত আর জেঠাই-মা তোকে বক্‌বে না।" অবিনাশ ঘরের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, কথাটা তাঁহার কাণে গেল। কনক চলিয়া গেলে, তিনি রমাকে নিজের কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি এখানে বড় কষ্টে থাক, মা?" রমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।" তিনি বলিলেন, "তবে কনক যে আজ তোমাকে কষ্টের কথা বল্‌ছিল?" রমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে চুপ্‌ করিয়া রহিল। অবিনাশ সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তোমার কষ্ট হলে আমাকে জানাও না কেন, লক্ষ্মি? আমি ত তোমাকে নোটনের মতই ভালবাসি।" তাঁহার স্নেহবাক্যে রমার সকল দুঃখ যেন মুছিয়া গেল। অবিনাশ সেইদিন কমলিনীকে ডাকিয়া, সকল কথা বলিয়া, তিরস্কার করিলেন। কমলিনী কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইলেন, এবং বিবাহের দিন পর্য্যন্ত রমার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না।

রমার বিবাহের পর তাহার শাশুড়ী তাহাকে লইয়া, কয়েক দিনের জন্য নিজ গ্রামে গেলেন। একটিমাত্র লোকের অভাবে অবিনাশের গৃহ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। এই সামান্য বালিকাটি সংসারের কতখানি স্থান পূর্ণ করিয়াছিল, তাহা সকলেই অনুভব করিতে লাগিল। রমা আসিবার পর হইতে নোটনের সকল ভার তাহার উপরে পড়িয়াছিল; কমলিনীকে কিছু দেখিতে হইত না। এখন এই দুরন্ত বালিকাকে লইয়া, সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। নোটন কাহারও কথা শোনে না, ভারি জ্বালাতন করে। দিদির অভাবে তাহার শরীর আধখানা হইয়া গেল।

রমা চলিয়া যাইবার পর হইতে আনন্দময়ী কনকও একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল। এখন আর তাহার অকারণ হাস্যে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে না। সে এখন প্রায় সব সময় নোটনকে লইয়া রমার গল্প করিত, এবং ভালবাসার চিহ্ন-স্বরূপ রমাকে কি কি দ্রব্য পাঠাইতে হইবে, সে বিষয়ে পরামর্শ করিত। নোটন একদিন হাসিতে হাসিতে বলিল, "সই, আমি একটা বুদ্ধি করেছি। দিদি ময়না-পাখীটাকে ভালবাসিত। সেটাকে পার্শেল করে, পাঠিয়ে দিলে হয় না? ময়নাটা বেশ কথা বল্‌তে পারে,—দিদি তার সঙ্গে কত গল্প করবে।" কনক রাগিয়া বলিল, "তুই বড় বোকা। পার্শেল করলে পাখীটাত রাস্তায়ই মরে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করি আয়।" এই বলিয়া নোটনের হাত, ধরিয়া এক দৌড়ে বাড়ী গেল। সেখানে তাহার দাদাকে গিয়া বলিল, "দাদা, তুমি যে নতুন ক্যামেরা কিনেছ, তাতে আমাদের ফটো তুল্‌তে হবে। এখনি তুলে দাও।" কনকের হুকুমের উপর আর কথা ছিল না। দাদা-বেচারা পড়া ফেলিয়া, ফটো তুলিতে ব্যস্ত হইল। কনক গম্ভীরভাবে নোটনকে লইয়া, একটা সোফার উপর বসিল। তাহার দাদা মাথার উপর কালো কাপড়টা ঢাকা দিতেই নোটন হাসিয়া ফেলিল। কনক তাহাকে এক ধমক দিয়া বলিল, "হাস্‌তে বারণ করেছি! সইর কাছে যখন ছবিখানা পাঠাব, তখন সে দেখে যেন বুঝ্‌তে পারে যে, তাকে ছেড়ে আমাদের কত কষ্ট হচ্ছে। খুব গম্ভীর হয়ে থাক্‌।" তার পর দুইজনে মুখ যথাসম্ভব বিষণ্ণ করিয়া ফটো তোলাইল। ছবিখানা রমার কাছে পাঠাইবার সময় লিখিয়া দিল, "তোমার জন্য আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি শীঘ্র এসো।"

কনকের জন্মদিনে একজনের নিকট হইতে সে এক শিশি এসেন্স পাইয়াছিল। এসেন্সটি নিজে ব্যবহার না করিয়া, সে তাহার দাদার কাছে গিয়া বলিল, "দাদা, এইটা সইর নামে পাঠিয়ে দাও ত। সে এটা বড় ভালবাসে।" তাহার দাদা বলিল, "আহা, সে যেমন নিজে কিন্‌তে পারে না! ভারি ত জিনিষ, তা আবার পাঠান হচ্ছে!" কনক বলিল, "বেশ আমি পাঠাচ্ছি, তোমার কি? পাড়া গাঁয়ে এসেন্স পাওয়া যায়?" রমা যে কয়দিন গ্রামে ছিল, প্রায় প্রতিদিনই কনক ও নোটনের স্নেহ-স্মৃতি বহন করিয়া, নানা প্রকার দ্রব্য তাহার নামে আসিত। কনক ও নোটনের গভীর প্রীতি ও রমাকে আনন্দ দিবার চেষ্টা, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মরণ-চিহ্ন-গুলির মধ্য দিয়া, রমার নিকট বাক্যের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

(৬)

রমা কলিকাতায় আসিবার পর একদিন কমলিনী অবিনাশকে বলিল, "রমা ত কিছু বড় মেয়ে নয়, কতদিন আমাদের ছেড়ে আছে, তাকে একবার আনাও না।" অবিনাশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে সেখানেই বেশী সুখে আছে।" কমলিনী রাগ করিয়া আর কিছু বলিল না। নোটন একদিন অবিনাশের গলা জড়াইয়া বলিল, "বাবা, দিদিকে নিয়ে এসো। আমার তাকে ছেড়ে বড় কষ্ট হয়। দিদি সইকে লিখেছে, তার এখানে আস্‌তে বড় ইচ্ছা করে। সই তোমাকে বল্‌তে বল্‌ল।" অবিনাশ সেই দিনই রমাকে লইয়া আসিলেন।

রমার শাশুড়ী বলিয়া দিয়াছিলেন, এক সপ্তাহ পরেই যেন রমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রমা না হইলে তাঁহার এখন চলে না। রমাকে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তাহার বিষাদমাখা মুখের উপর আনন্দের আভা পড়িয়া অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। কনক রমাকে দেখিবামাত্র বলিল, "সই, তুই আমাদের ছেড়ে বেশ সুখেই আছিস্, দেখ্‌ছি।" রমা হাসিয়া বলিল, "যাঃ।" এক সপ্তাহ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। যাইবার সময় নোটন ও কনকের গলা জড়াইয়া রমা কাঁদিতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্বে রমা কতদিন বলিত যে, তাহাদের কোনদিন ছাড়াছাড়ি হইবে না। সেই কথা মনে করিয়া কনক বলিল, "আমরা তিনজনে যদি চিরকাল একসঙ্গে থাক্‌তাম, ত বেশ হত।" বড় হইলে, তাহারা তিনজনে একটা বাড়ী তৈয়ার করিয়া, তাহাতে খুব সুখে থাকিবে, ইত্যাদি কত প্রকার কল্পনা করিত। এমন কি, বাড়ীটা কত বড় হইবে, পুকুরে কত মাছ থাকবে, এবং বাগানে কি কি গাছ লাগান হইবে, তাহা পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল।

রমা, শাশুড়ীর নিকট মাতৃস্নেহ পাইয়া, দুই দিনেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিল। তাহার স্বভাব চিরদিনই ভালবাসা-প্রবণ ছিল। যেখানে একটু আদর পাইত, সে খানেই রমা প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিত।

অরবিন্দ রমার স্নিগ্ধশান্ত চক্ষু দুইটি দেখিয়া প্রথমেই মুগ্ধ হইয়াছিল। ক্রমে তাহার পুষ্পের ন্যায় সুন্দর ও কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া, তাহাকে আরও ভালবাসিতে লাগিল। শাশুড়ীর স্নেহে ও স্বামীর প্রেমে রমার দিনগুলি স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইত। তবে নোটন ও কনকের অভাব সে বড় বেশী বোধ করিত। প্রতিদিন তাহাদের পত্র না লিখিলে, তাহার চলিত না। অরবিন্দ একদিন হাসিয়া বলিল, "তুমি যখন ওখানে ছিলে, তখন আমাকে ত রোজ চিঠি লিখ্‌তে না। ওদের দেখ্‌ছি আমার চেয়ে বেশী ভালবাস,—না?" রমা লজ্জায় পলাইয়া গেল।

রমার এখানে কোন অভাব ছিল না। অরবিন্দ যেন তাহার মনের কথা সব না বলিতেই বুঝিত। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রমার সকল অভাব পূর্ণ হইত। এই ভাবে রমার দিনগুলি সুখস্বপ্নের মত কাটিতে লাগিল।

(৭)

চিরদিন যেমন কাহারও দুঃখে যায় না, তেমনি চিরদিন কাহারও সুখেও যায় না। তবে কাহারও ভাগ্যে দুঃখের মাত্রা একটু বেশী পরিমাণে থাকে। রমা দুঃখের অদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়াছিল। সুখ ক্ষণিকের জন্য তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া, আলেয়ার আলোর ন্যায় আবার কোথায় মিলাইয়া গেল।

পাঁচ বৎসরের পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতা সহরে সেবার মহামারীর প্রকোপ অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। মহামারীর স্রোতে অরবিন্দ ও তাহার মাতাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। অভাগিনী রমা গভীর দুঃখের বোঝা লইয়া পড়িয়া রহিল।

অবিনাশ তাহাকে লইয়া যখন গৃহে আসিলেন, তখন তাহার কাঁদিবার শক্তিটুকুও ছিল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল,—বুঝিতে পারিল না, তাহার এ শোক স্বপ্ন না সত্য! তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ তাহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না। কনকের বিবাহের পর সে স্বামীর কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছিল। সে থাকিলে রমাকে বুকে টানিয়া লইত। নোটন ধীরে ধীরে রমার কাছে গিয়া, একবার "দিদি" বলিয়া ডাকিল। তারপর তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। রমা তাহার দিকে চাহিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অনেক কষ্টে জ্ঞান হইলে পর সে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। এতক্ষণ পরে সে নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল।

সন্ধ্যাবেলা চোখের জল মুছিয়া রমা বাগানে আসিয়া বসিল। নোটন এক মুহূর্ত্তও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই; সেও সঙ্গে আসিল। একে একে রমার সকল কথা মনে পড়িল। রমা ভাবিল, লোকে বলে পাপ করিলে শাস্তি হয়। সে ত জানিয়া শুনিয়া কোন দিন এমন কোন পাপ করে নাই, যাহার জন্য তাহার এত শাস্তি! কি পাপে সে শৈশবেই পিতামাতা হারাইল? কি পাপে এই সতের বৎসর বয়সে সে চিরদুঃখিনী হইল? তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রীতিটুকু দিয়া, সে ত সব সময়ে প্রতিদান পায় নাই! যাহারা তাহাকে ভালবাসিয়াছে, তাহারা দুদিন পরে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কথা ভাবিতেই মনে পড়িল,—না, ভালবাসিবার লোক এখনও আছে। অবিনাশ, কনক, নোটন ইহারা ত তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসে। সে নোটনের হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইল। তাহার চক্ষু হইতে আবার জল পড়িতে লাগিল। নোটন যেন তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "দিদি, তুমি কেঁদোনা। আমি তোমাকে খুব ভালবাস্‌ব।" সেই মুহূর্ত্তে অরবিন্দের প্রশান্ত মুখচ্ছবি রমার মনে পড়িয়া গেল। বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়া, রমা এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। অরবিন্দ তাহাকে আদর করিয়া বলিয়াছিল, "রমা কেঁদো না। আমি তোমাকে খুব ভালবাস্‌ব। কখন ছেড়ে যাব না।" সেই কথা মনে পড়িয়া, রমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে নোটনকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তারপর গৃহে আসিয়া অন্ধকার বারান্দার উপর লুটাইয়া পড়িয়া, মনে মনে বলিল, "ওগো, তুমি যে কখন ছেড়ে যাবে না বলেছিলে। কেন গেলে?"

(৮)

সময় কাহারও মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। অবিনাশের গ্রামের জমিদারপুত্রের সহিত নোটনের বিবাহ হইয়া গেল। রমার দিন এখন কি ভাবে কাটে, দেখা যাক্।

রমা নিজের ব্যয়ের জন্য কিছু রাখিয়া, তাহার সকল অর্থ সৎকার্য্যে দান করিল। অবিনাশ তাহাকে সংসারের কোন কাজ করিতে দিতেন না। তাই সে সারাদিন নানা প্রকার পুস্তক পাঠ করিয়া সময় কাটাইত। অবিনাশ বিবাহের পূর্ব্বে তাহার লেখাপড়া সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। বিবাহের পর অরবিন্দ তাহাকে অনেক শিখাইয়াছিল। এখন রমা সময় অপব্যয় না করিয়া, জ্ঞানানুশীলনে রত হইল। কমলিনী একদিন তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, "বাবা, মেমসাহেবী দেখে বাঁচি না। দিনরাত বই পড়া!" রমা সেদিন আর পড়িবে না ভাবিল; কিন্তু কেমন করিয়া সময় কাটাইবে? গৃহকর্ম্ম করিতে যাওয়াতে কমলিনী বলিলেন, "থাক্ থাক্, ও সব কাজে আবার হাত দেওয়া কেন? কষ্ট হবে যে! তা ছাড়া ঝি-চাকর ত ঢের আছে। তোমার কাজ করবার দরকার নাই।" কাজেই রমা আবার পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যার পর রমা কোন কাজ করিত না। ছাতের উপর কিংবা বাগানে পুকুরঘাটে বসিয়া থাকিত। সারাদিন আপনার মন নানা কাজে ভুলাইয়া রাখিত, কিন্তু এই সন্ধ্যার সময় সে কিছুতেই কোন কাজ করিতে পারিত না। মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া সে কত কি ভাবিত। কে তাহার চিন্তার ইয়ত্তা করিবে।

নোটনের বড়মানুষ শ্বশুরবাড়ী বিবাহের পর তাহাকে একবারও বাপের বাড়ী পাঠায় নাই। যখন সংবাদ আসিল, নোটনের একটি খোকা হইয়াছে, তখন অবিনাশ আর থাকিতে পারিলেন না। নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন।

এইবার রমার একটা কাজ বাড়িল। নোটনের খোকাকে লইয়া, সে সারাদিন ব্যস্ত থাকিত। নোটন একদিন বলিল, "দিদি, তুমি দেখ্‌ছি আমার চেয়ে খোকাকে বেশী ভালবাস। এবারে যখন আস্‌ব, তখন খোকাটাকে সেখানে রেখে আস্‌ব। তা না হলে তোমাকে একদণ্ড কাছে পাব না।" রমা হাসিয়া বলিল, "তুই এখনও তেম্‌নি ছেলেমানুষ আছিস্! সেই ছেলেবেলায় তোকে ছেড়ে, সইর সঙ্গে গল্প করলে, তুই রাগে চীৎকার করতিস্। হিংসুটে কোথাকার!" এই বলিয়া খোকাকে মাটিতে শোয়াইয়া, নোটনের কাছে বসিয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। আর খোকা তখনি চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। নোটন বলিল, "ছেলেটা ভারি দুষ্টু হয়েছে।" রমা বলিল, "ঠিক্ তোর মতন।" তারপর খোকাকে কোলে তুলিয়া শতসহস্র চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নোটন বলিল, "দিদি, সই তোমাকে চিঠি লেখে?" রমা

বলিল, "লেখে বটে, তবে আমার মত নয়। ছেলেমেয়ে নিয়ে, সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে, বোধ হয়; একবার এখানে আস্‌বে লিখেছে।" নোটন বলিল, "এলে বেশ হয়; কতদিন তাকে দেখি নি। আমরা তিনজন ছেলেবেলায় কি সুখেই ছিলাম।" পূর্ব্বের সুখের স্মৃতি মনে করিয়া, রমার চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে খোকাকে লইয়া উঠিয়া গেল।

(৯)

নোটন আবার শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। কমলিনীর শরীর অসুস্থ; মাথার যন্ত্রণায় বিছানা হইতে উঠিতে পারেন না। রমার উপর সংসারের ভার পড়িল। কাজ করিতে পাইয়া, রমা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রমাই কমলিনীর সেবা করিত। তথাপি প্রয়োজন হইলে, তিনি "হরিদাসী" "বামার মা," প্রভৃতিকে চীৎকার করিয়া ডাকিতেন, কিন্তু রমাকে কিছু ফরমাস করিতেন না। কমলিনীর এই ব্যবহার রমাকে বড় আঘাত দিত। রমা তবু কোনদিন বিরক্তি প্রকাশ করিত না।

রমা নোটনের কাছে বসিয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল

একদিন সন্ধ্যার সময় রমা, কমলিনীকে ঔষধ দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে দিন একাদশী ছিল। তাহার বক্ষ আলোড়িত করিয়া, চিন্তার পর চিন্তা আসিতেছিল। সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কমলিনী উঠিয়া নিজে ঔষধ আনিতেছিলেন। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া রমার চমক্ ভাঙ্গিল; সে দ্রুতপদে কমলিনীর ঘরে গেল। সে যাইবার পূর্ব্বেই একজন দাসী তাঁহাকে তুলিয়াছিল। রমাকে দেখিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, তিনি বলিলেন, "আমি অসুখে পড়ে সংসারটা ছারেখারে গেল। নিয়মিত সময়ে কিছু হবার যো নাই। ওসুধটুকুও খেতে পাই না।" রমার মনে হইল, তাই ত! আজ ত সে ধান্নার জোগাড়ও করিয়া দেয় নাই। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় শুনিতে পাইল, কমলিনী বলিতেছেন, "মা-বাপ থেকে আরম্ভ করে সবাইকে খেয়েছে! এখন আমাদের খেলেই ওর প্রাণটা জুড়োয়।" রমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, থরথর করিয়া তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। আজ সারাদিন সে জলস্পর্শ করে নাই; দুর্ব্বল শরীরে মনের উপর আঘাত সহিল না—সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া সে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া দাসীরা আসিয়া তাহাকে তুলিল। রমার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল; সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞান হইলে সে দেখিল, অবিনাশ তাঁহার পাশে বসিয়া আছেন। সে সঙ্কুচিত হইয়া, উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। অবিনাশ বলিলেন, "উঠোনা মা—একটু শুয়ে থাক, আমি ডাক্তার ডেকে আন্‌ছি।" রমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, না, ডাক্তার দরকার নাই। কিছু হয় নি।

ও ভাল হয়ে যাবে।" তারপর কপালে হাত দিয়া দেখিল, বড় ব্যথা। কিছু বুঝিতে পারিল না। অবিনাশ উঠিয়া গেলে সে প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। অবিনাশ ডাক্তার আনিয়া দেখিলেন, রমা অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে।

সেই রাত্রে রমার ভয়ানক জ্বর হইল। সকালবেলা রমা অবিনাশকে বলিল, "জেঠামশাই, আমি আর বাঁচব না। নোটনকে একবার আনাও।" অবিনাশ বলিলেন, "বাঁচবে না কেন মা! এমন কিছু হয় নি ত।—তবে নোটন্‌কে দেখ্‌তে চাও—ত কালই তাকে আনাব।" ডাক্তার অবিনাশকে বলিলেন, "অনেক আগে থেকে বোধ হয় ওঁর শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তার উপর কপালে এই আঘাত এবং এত বেশী জ্বর হওয়াতে বিশেষ ভয়ের কারণ হয়েছে।" ডাক্তারের কথা শুনিয়া অবিনাশ ভীত হইলেন।

নোটন আসিয়া রমার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রমা তাহার হাতখানা নিজের শীর্ণ হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "কাঁদিস্‌নে বোন! মরণে যার সকল জ্বালা জুড়োয়, তার মরণই ভাল।" খোকাকে সে নিজের তপ্তবুকের মধ্যে লইয়া একটু আদর করিল। তারপর বলিল, "থাক্—আর মায়া বাড়ান কেন?" পরদিন তাহার জ্বর আরও বাড়িল। ডাক্তার বলিলেন, "আর আশা নাই।"

সন্ধ্যা সময় সকলে রমার কাছে গিয়া বসিলেন। রমা অবিনাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "জেঠামশাই, চল্লাম।" কমলিনী রমার মাথার কাছে বসিয়াছিলেন; রমা তাঁহাকে বলিল, "জেঠাইমা, তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি, সব ক্ষমা ক'রো।" নোটন কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "দিদি, আমাদের ছেড়ে যেও না।" রমা বলিল, "ছি দিদি কেঁদো না। তোমাদের দেখে মর্‌তে পারলাম—এই আমার সুখ।" নোটন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। রমা জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা কোথায়?" নোটন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "খোকা ঘুমোচ্ছে।" রমা বলিল, "তবে থাক্। তাকে জাগিও না। নোটন, আরও কাছে আয় বোন।" নোটন সরিয়া কাছে আসিল। রমা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সইকে একবার দেখ্‌তে পেলাম না।" তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বুকের উপর হাত দুখানি রাখিল। শুভ্র চন্দ্রালোক তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার ম্লানমুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসিটুকু ধীরে ধীরে শশি-নক্ষত্র-খচিত আকাশে মিলাইয়া গেল। অবিনাশ চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কমলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নোটন কাঁদিলও না, কোন কথাও বলিল না। সে রমার নিস্তব্ধ বুকের উপর নিঃশব্দে লুটাইয়া পড়িল। চিরদুঃখিনী রমার সকল দুঃখ আজ ফুরাইল!

কবি ও বৈজ্ঞানিক

[শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়]

হাসিতে যাহার কমল ফুটে,
　　রূপে জগৎ আলা;
মানসমোহন মধুর হাসি—
　　দন্ত মুক্তা মালা।
আঙুর সমান আঁঙুল কচি,
　　নয়ন ভুলা ঢঙ;
শিরীষ কোমল চরণ দুটী—
　　ডালিম ফুলে রঙ।

স্বভাব সরল সোণার ভাঁটা—
　　স্বর্গপুরের ফুল;
কবির নয়ন পায় না খুঁজে—
　　শিশুর সমতুল।
এমন শিশু, ও বৈজ্ঞানিক—
　　তোমার অনুভব,—
হস্তে,—পদে চিহ্ন আছে—
　　শাখা মৃগের সব?

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

[মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর, K. C. S. I., K. C. I. E., I. O. M.]

একাদশ-পরিচ্ছেদ

সামাজিক লণ্ডন

যেদিন আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম, তাহার পর দিনই আমি প্রথমে ১নং কারল্‌টন হাউস টেরেসে (Carlton House Terrace) লর্ড কর্জ্জন মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমি পরম আনন্দ অনুভব করিয়া ছিলাম। ভারতের এই রাজপ্রতিনিধিকে ভারতবাসীরা প্রকৃতরূপে বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অন্যায় মত অনেকে পোষণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে, ভারতবর্ষকে কত ভালবাসিতেন এবং ভারতবর্ষের উপর তাঁহার

লর্ড কর্জ্জন্

যে কত অনুরাগ ছিল, তাহাও অনেকে জানিয়া শুনিয়াও অস্বীকার করিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহাকে দেখিতে গেলাম,তখন তাঁহাকে যেন একটু অবসন্ন দেখিলাম। শ্রীমতী লেডী কর্জ্জনও সে সময়ে অসুস্থা ছিলেন, কিন্তু কে জানিত যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার লণ্ডন অবস্থান সময়েই তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইবেন! কে তখন ভাবিয়া ছিল যে, তাঁহার জীবনকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে! লর্ড কর্জ্জন যখন ভারতবর্ষে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতেন, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, আর এখন এই কারল্‌টন হাউস টেরেসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ, এই উভয়ের মধ্যে যে কত পার্থক্য, তাহা আমি এই দিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং এই পার্থক্যের স্মৃতি বহুদিন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। এই রাজনীতি-বিশারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, এখন আর নানা রকম-বেরকমের আদব-কায়দার অনুষ্ঠান করিতে হয় না; দ্বারে শান্ত্রী-পাহারা নাই, পার্শ্বে শরীররক্ষক নাই,—সে সকল রাজকায়দার কিছুই নাই। দেখা করিবার সময় জানিবার জন্য যে পত্রখানি প্রেরণ করিলাম, ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি মহাশয় তাহার উত্তর তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলাম, গৃহদ্বারে লম্বিত ঘণ্টায় মৃদু আঘাত করিলাম, তাহার পরই যে ভৃত্য আসিল, তাহার হস্তে আমার কার্ড দিলাম, ভৃত্য কার্ডখানি লইয়া চলিয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। দুই তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইয়াই আমি লর্ড কর্জ্জনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং তিনি পরমসমাদরে আমার করকম্পন করিলেন। কোন রাজকায়দা নাই। কিন্তু ইনিই সেই রাজপ্রতিনিধি, যাহাকে আমি আমার যৌবনের উন্মেষ সময়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান আসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলাম। ইনিই সেই রাজনীতিক পণ্ডিত, যাঁহার সুমধুর ব্যবহার এবং তীক্ষ্মনীষা আমাকে তাঁহার অনুরক্ত করিয়াছিল এবং তাঁহাকে আমি আমার পরম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলাম। এতদিন পরে এই প্রথম সাক্ষাতে আমি সত্য সত্যই আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার পর

এই লণ্ডন নগরীতে, এই ইংলণ্ডে আমি কি ভাবে চলিব, কোথায় যাইব, কাহার কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এই সকল সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং তিনি যে কত লোকের নিকট পরিচয়-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। মোট কথা এই যে, বিলাতে অবস্থান-সময়ে আমাকে কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি আমাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং আমার জন্য কোন প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই।

লেডি কর্জ্জন

২রা জুন তারিখে লর্ড কর্জ্জন আমাকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহা পারিবারিক নিমন্ত্রণ, অন্য কোন অতিথি এ নিমন্ত্রণে ছিলেন না। এই পারিবারিক আহার সময়ে লর্ড কর্জ্জনের ব্যবহার দেখিয়া, আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম; তাঁহার কন্যাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আনন্দ করিতেছিল, লেডি কর্জ্জন সেই অসুস্থ অবস্থাতেও আমাদের কথাবার্ত্তায় আমোদ-আনন্দে হৃষ্টচিত্তে যোগদান করিতেছিলেন; লর্ড কর্জ্জন সকলের সহিতই কথা বলিতেছিলেন; এমন কি, তিনি তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষয়িত্রীর সহিত রহস্য করিতে করিতে বলিলেন যে, লণ্ডনে এত স্থান থাকিতে তিনি সর্ব্বদাই ছেলেপিলেদের লইয়া, কি কারণে হ্যাম্প্‌ষ্টেড হিথের দিকেই বেড়াইতে যান। এই প্রকার রহস্যালাপে মহা আনন্দে ভোজন-ব্যাপার চলিতে লাগিল। ভোজনের যে একটা বিশেষ আয়োজন ছিল, তাহা নহে,—প্রতিদিন যেমন আয়োজন হইয়া থাকে, এদিনেও তাই। এ কথাটা বলিবার কারণ এই যে, রাজপ্রতিনিধির গার্হস্থ্য জীবনের এই অংশের সামান্য পরিচয়ও আমরা দেশে থাকিয়া পাই না, পাইবার সুবিধা হয় না। বলিতে কি, এমন ভাবে পারিবারিক জীবন-যাত্রা দেখিতে না পাইলে, রাজপ্রতিনিধির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমি লর্ড কর্জ্জনের পরিবারে মিশিয়া সত্যসত্যই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; তাই এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। লেডি কর্জ্জন মহোদয়ার সহিত এই আমার শেষ সাক্ষাৎ; কারণ ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি অধিকতর অসুস্থা হইয়া পড়েন, এবং তাহার পর ১৯শে জুলাই তারিখেই তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হয়। এই সদাশয়া ও উন্নতহৃদয়া মহিলার সংসর্গে আসিয়া, তাঁহার ভালবাসার কোমল স্পর্শে—তাঁহার সহানুভূতির শীতল ছায়ায়, লর্ড কর্জ্জন তাঁহার জীবনের অনেক বিরক্তির ও অশান্তির সময়ে সান্ত্বনা ও ও প্রসন্নতা লাভ করিতেন। এতকাল পরে তাঁহার সেই সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষার সঙ্গিনী তাঁহাকে ফেলিয়া অকালে চলিয়া গেলেন।

লণ্ডন নগরীতে অবস্থান সময়ে আমি যে সকল ভোজে ও অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলাম, তাহার সকলগুলির বিশেষ বিবরণ প্রদান করিবার ইচ্ছা আমার নাই—তাহা বলিয়া উঠাও সহজ নহে। আমি কেবল দুইটি ভোজের সম্বন্ধে এক আধটি কথার উল্লেখ করিব। কুইন য়্যান্‌স্ গেটে (Queen Anne's Gate) সার জন ও লেডি ফিসারের ভবনে যে ভোজের নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে অধুনা পরলোকগত লর্ড কেলভিন্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়া, আমি বড়ই গৌরব ও আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের মহামনীষা-সম্পন্ন সম্মাননীয় বৃদ্ধ মহোদয়ের সহিত নানা বিষয়ে অনেক কথা ও আলোচনা হইয়াছিল। তৎপরে একদিন মাননীয় মিঃ ও মিসেস্ সিরিল ওয়ার্ড (Mrs. Cyril Ward) আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; এই নিমন্ত্রণে

যাইয়া তাঁহার পেমব্রোক্-স্কোয়ারস্থিত ভবনে তাঁহাদের পরিবারের অনেকের সহিত আলাপ পরিচয় হয় ; তাঁহাদের মধ্যে আর্ল্ অব ডাড্লি (Earl of Dudley) একজন। অনেক সময়ে শুনিয়াছি যে, ইংলণ্ডের অতি অল্পসংখ্যক মহাশয় ব্যক্তিই ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। আমার মনে হইল, লর্ড ডাড্লি মহোদয় সেই অত্যল্প সংখ্যার একজন ; তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সে প্রশ্নগুলি নিতান্ত সাধারণ প্রশ্ন নহে ; যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

৩১ শে মে তারিখে লণ্ডনে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই ইণ্ডিয়া অফিসের মারফত আমি সম্রাট সকাশে উপস্থিত হইবার জন্য একখানি আদেশ-পত্র প্রাপ্ত হই। সেই আদেশপত্রে লিখিত ছিল, আমি যেন "উপযুক্ত দরবার পরিচ্ছদ" (proper Durbar-dress) পরিধান করিয়া গমন করি। এই অনুরোধ সমীচীন বলিয়াই আমার বোধ হইল ; কারণ আমাদের দেশের রাজা—মহারাজা—কি সম্রান্ত ভদ্রলোকেরা সাহেবী পোষাক পরিধান করিতে যতই ভালবাসুন না কেন, কোন রাজকীয় দরবারে বা মজলিসে তাঁহার জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহা শোভনও বটে ; বিশেষতঃ তাঁহাদের জাতীয় বা বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত টুপী, পাগড়ী বা অন্য কিছু কোন মতেই পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

আমি রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে (Buckingham Palace) উপস্থিত হইলাম। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে রাজসভার অধিবেশন হয় না। রাজ-প্রাসাদের অনুচরগণ পাউডারমণ্ডিত কেশে ও রাজসভার উপযুক্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া এদিকে ওদিকে যাতায়াত করিতে লাগিল ; দলে দলে সুন্দরী ও সুবেশা মহিলাগণ এই আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদে সমবেত হইতে লাগিলেন ; তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য ভূষণের চাক্‌চিক্যে স্থানটি মনোরম হইয়া উঠিল ; রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলি বহুমূল্য আসবাব-পত্র ও নয়ন-রঞ্জন চিত্রাবলিতে সুশোভিত দেখিলাম। সম্রাটের প্রাসাদ যেমন হইতে হয়, বাকিংহাম প্রাসাদে তাহার কিছুরই অভাব দেখিলাম না। প্রাসাদের ড্রয়িং রুমে বৈঠকখানায় আমার স্বদেশবাসী আরও তিনজন ভদ্রলোককে দেখিয়া, আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, একই দিনে একই সময়ে ভারতের চারি প্রান্তস্থ চারিটি প্রদেশ হইতে চারিজন মহারাজা ভারতেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ; এ প্রকার যোগাযোগ প্রায়ই হয় না। অপর তিনজনের মধ্যে একজন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজ-পিপলার রাজা ; দ্বিতীয় জন মান্দ্রাজের পদুকোটের রাজা, এবং তৃতীয় জন পঞ্জাবের পাতিয়ালার কুমার সাহেব। ইণ্ডিয়া আফিসের সার কর্জ্জন ওয়ালি (Sir Curzon Wyllie) আমাদিগকে ক্রমানুসারে একে একে হোয়াইট ড্রয়িং রুমে (White Drawing Room) লইয়া গেলেন। আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদের সম্মাননীয় সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড মহোদয় ফিল্ড মার্সালের পরিচ্ছদ পরিধান

সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড

করিয়া দণ্ডায়মান আছেন ; তাঁহার বামপার্শ্বে সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা রহিয়াছেন ; সম্রাজ্ঞী সেদিন শোক-পরিচ্ছদ পরিহিতা ছিলেন, কারণ কয়েকদিন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা ডেনমার্কের নরপতি পরলোকগত হইয়াছিলেন। মহামহিমান্বিত সম্রাট মহোদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আমি প্রথমে যেন একটু কেমন হইয়া গেলাম। তাহার কারণ আছে ;

ভিনিসায় পরিবার

শিল্পী—লিউকফিল্ডস, R. A.।

আমরা ভারতবাসী ; আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃত রাজভক্তি একেবারে রক্তমাংসের সহিত জড়িত। একজন রাজভক্ত ভারতবাসী প্রজা তাহার সম্মুখে তাহার সম্রাট্‌কে সশরীরে উপস্থিত দেখিলে, তৎকালে তাহার মনে যে, অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে, আমার মনেও সেই ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং সেই জন্যই আমি হঠাৎ কি এক ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সম্মুখে আমার সম্রাট্‌ দণ্ডায়মান—এ দৃশ্য আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা হইয়াছিল

সম্রাজ্ঞী আলেক্‌জান্দ্রা

যে, সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আমরা কেবল নত-মস্তক হইব ; আমরা যেন সম্রাটের করচুম্বন না করি। যখন আমাকে সম্রাটের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল এবং আমার পরিচয় প্রদান করা হইল, সে সময়টা আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত বলিয়া আমি মনে করি। প্রথমে সম্রাজ্ঞী মহোদয়া আমার করকম্পন করিলেন এবং দুই একটি সদয় কথা বলিলেন। তাহার পর সম্রাট্‌-মহোদয় অতি সমাদরে ও সানন্দ আমার কর-কম্পন করিলেন এবং আমার সহিত দুই চারিটি কথা বলিলেন। যদিও এ প্রকার দরবারে অধিকক্ষণ কথা বলিবার সময় নহে, সামান্য দুই এক মিনিট মাত্র সময় পাওয়া যায়, তবুও সেই সামান্য সময়ের মধ্যেই সম্রাট্‌ মহোদয় আমাকে যে কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, কি জন্য তাঁহাকে সকলে য়ুরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণধী সম্রাট্‌ বলিয়া থাকে। সম্রাট্‌-মহোদয় যখন আমার করকম্পন করিলেন, তখন পূর্ব্বের নিষেধ সত্ত্বেও আমি সুধু মস্তক নত করিয়াই থাকিতে পারিলাম না ; সে সময়ে আমার মনের ভাব এমন হইয়াছিল যে, আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহার প্রসারিত হস্তখানি আমার মস্তকে স্পর্শ করিলাম। আমার এই কার্য্য দেখিয়া সম্রাট্‌ মহোদয় বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলেন বলিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম ; তিনি আমার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন।

তাহার পর যে কক্ষে সিংহাসন স্থাপিত আছে, আমাদিগকে সেই কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। এই কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ; কক্ষের এক পদবি একটু উন্নত স্থানে ; রাজকীয় বাদকদল তখন বাদ্যধ্বনি করিতেছিলেন। আমরা সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইলাম ; সেই সময়ে সম্রাট্‌ ও সম্রাজ্ঞী সদলবলে যথারীতি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে রাজভবনের মহিলা ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ প্রবেশ করিলেন; সকলেই উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন ; মহিলাগণ সকলেই কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন, কারণ সে সময়ে সম্রাজ্ঞী পিতৃবিয়োগের জন্য শোক-পরিচ্ছদ-পরিহিতা ছিলেন। তাহার পরেই সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পর প্রথমেই প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ সম্রাটকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন ; তৎপরে রাজপরিবারের অন্যান্য সকলে এবং বিদেশীয় রাজদূত ও প্রধানতম কর্ম্মচারিবৃন্দ যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজপরিবারের মহিলাবৃন্দ ও রাজভবনের অন্যান্য মহিলাগণ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন ; তাহার পর বিদেশীয় রাজদূতগণের মহিলাবৃন্দ আগমন করিলেন। তাহার পরেই অন্যান্য ভদ্রলোকগণ আসিতে লাগিলেন। দরবারের পরিচ্ছদে সুশোভিতা মহিলাগণের পরিচ্ছদ বড়ই শোভন বোধ হইয়াছিল। বিদেশীয় রাজদূতগণের মহিলাবৃন্দ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাওয়া

পর্য্যন্ত সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী দণ্ডায়মানই থাকিলেন; তাহার পর তাঁহারা উপবেশন করিলেন। অন্যান্য সকলের অভিবাদন গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়া গেল। আমাদের সকলকেই এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল, তবে ইহা আমাদের পক্ষে নূতন নহে। যাঁহাদের কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে এই প্রকারের দরবার উপলক্ষে প্রবেশের অধিকার আছে, তাঁহারা এভাবে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। দরবার শেষ হইয়া গেলে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী সপারিষদ চলিয়া গেলেন; আমাদিগকে তখন পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল; সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জলযোগের বিশেষ আয়োজন ছিল। এই ভোজন স্থলে বহুদিন পরে আমি লেডি ল্যান্সডাউনের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। ইনি যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, তখন আমি ছেলে মানুষ ছিলাম। ইনি তখন আমাকে ও আমার ভগিনীকে বড়ই ভালবাসিতেন। এখন তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে, তবুও কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে তাঁহাকে লোকে যে প্রকার সৌন্দর্য্যশালিনী দেখিয়াছেন, এখনও সে সৌন্দর্য্য ও সে স্বাস্থ্য অনেকাংশে অটুট রহিয়াছে। আমি যখন সম্রাট্ মহোদয়ের সহিত কথা বলিতেছিলাম, তখন তাঁহার উচ্চারণে একটা জর্ম্মান টান বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম; আমার মনে হয়, রাজ-পরিবারের সকলেরই উচ্চারণে ঐ জর্ম্মান টান বিদ্যমান। আমি দেশে থাকিতে সম্রাট্ মহোদয়ের যে সমস্ত রঞ্জিত চিত্র দেখিয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলি দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল যে, সম্রাট্-মহোদয় খুব স্থূলকায় ও তাঁহার বর্ণ খুব ধূসর; কিন্তু তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া ত তেমন মনে হইল না।

বর্ত্তমান সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী

৩রা জুলাই তারিখে, পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়া, আমি ক্ল্যারেন্স হাউসে (Clarence House) মহামান্যবর শ্রীযুক্ত ডিউক্ অব্ কনটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ডিউক্ মহোদয় যখন লণ্ডনে আসেন, তখন ক্ল্যারেন্স হাউসেই অবস্থিতি করেন, লণ্ডনে এইটিই তাঁহার প্রাসাদ। উক্ত প্রাসাদের ড্রয়িং রুমে যখন ডিউক্ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন সেখানে তাঁহার পত্নী ডাচেস্ মহোদয়া ও তাঁহার কন্যা রাজকুমারী পেট্রিসিয়া উপস্থিত ছিলেন; ইতঃপূর্ব্বে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের দিল্লী-দরবারের সময় মাননীয় ডিউক্ ও তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; ডিউক্ মহোদয়ের সে কথা বেশ স্মরণ আছে, জানিতে পারিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। এমন কি, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি তাঁহাকে যে বাচ্চা হাতীটি উপহার দিয়াছিলাম, সেই হাতীর সঙ্গে যে মাহুতটি বিলাতে আসিয়াছিল, সে নিরাপদে দেশে পৌছিয়াছে কি না। এই প্রকার আদবকায়দা-পরিপূর্ণ দেখা-সাক্ষাৎ অনেক সময়েই বড় কেমন কেমন ঠেকে; কিন্তু আমি দেখিলাম যে, বৃটীস রাজপরিবারের সকলেই এই প্রকার দেখা-সাক্ষাৎ যতদূর সম্ভব প্রীতিপদ করিতে জানেন; সেই জন্যই রাজপরিবারের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তেমন অসুবিধা বা বাধবাধ ঠেকে না; সময়টুকু বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়।

১৪ই জুলাই তারিখে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ মহোদয় আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আদেশ করেন। আমি তদনুসারে মার্লবরো হাউসে

লণ্ডনে আমার একটা বড়ই প্রীতিকর কার্য্য হইয়াছিল অবসর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ানগণের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা; অবশ্য অনেকের সঙ্গে পথে ঘাটেও সাক্ষাৎ হইত। প্রথম প্রথম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইত যে, যাঁহারা আমাদের দেশে লাটগিরি করিয়া অবসর গ্রহণপূর্ব্বক বিলাতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই লণ্ডনের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত এক কোণে সাধারণ কয়েকটি ঘর দখল করিয়া, নীরবে লোক-চক্ষুর অগোচরে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতেছেন। লাট সাহেবদেরই যখন এই অবস্থা, তখন আমাদের দেশে যাঁহারা কমিশনর, কি জজ-কালেক্‌টরী করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই; তাঁহাদের অনেককে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হায়রান হইতে হয়। এই সিবিলিয়ানদিগের খোঁজ করিতে করিতে আমি বাঙ্গালার ভূত-পূর্ব্ব ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলি মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ করি! ইনি যখন বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনিই বর্দ্ধমানের পরলোকগতা মহারাজাধিরাণী মহোদয়া কর্ত্তৃক আমাকে দত্তকগ্রহণ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সার ষ্টুয়ার্ট অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; এবং তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় বলিয়া এখন একটু কুব্জ হইয়াছেন। তিনি কিন্তু আমার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিলেন; কারণ, তিনি যখন আমাকে দেখিয়াছিলেন, তখন আমার বয়স সবে সাত বৎসর হইয়াছিল।

ডিউক্ অব্ কনট

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি ভারতভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি সদয়ভাবে এত কথা বলিতে লাগিলেন এবং এত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, সে সকল কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; দেখিলাম যে, তিনি শুধু ভ্রমণই করেন নাই; অনেক বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন; এবং তৎসম্বন্ধে তিনি যে সকল অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার-শক্তির পরিচয় পাইয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। বাহির হইতে দেখিলে মার্লবরো হাউস তেমন সুদৃশ্য প্রাসাদ বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু এই প্রাসাদের অভ্যন্তর ভাগ অতি পরিপাটী এবং ইহা সর্ব্বাংশেই রাজপ্রাসাদের উপযুক্ত।

মার্লবরো হাউস্

সিবিলিয়ানগণের সহিত সাক্ষাতের আমার আর একটা সুবিধা হইয়াছিল। এখানে যে সমস্ত সিবিলিয়ান আছেন, তাঁহারা বৎসরে একবার করিয়া সম্মিলিত হন। আমি এবার রিজেন্টপার্কে তাঁহাদের এই সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। এখানে উপস্থিত হইয়া, আমি অনেকগুলি সিবিলিয়ান-বন্ধুর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম। আর একটি উদ্যান-সম্মিলনের কথা এই স্থানে বলিতে হইতেছে। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস এলিয়ট ও লেডি এলিয়ট—উইম্‌ব্লেডন্‌-পার্কের ফার্ণউড-ভবনে একটি উদ্যান-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। আমি তাঁহাদের ভবনে এই সম্মিলন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। বহুকাল পরে লেডি এলিয়টের দর্শনলাভ করিয়া, আমি বড়ই সুখানুভব করিয়াছিলাম। এখন অনেকদিন পূর্ব্বের কথা আমার মনে হইল। যখন লেডি এলিয়ট কলিকাতার বেল্‌ভিডিয়ার প্রাসাদে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন, তখন আমি বালক ছিলাম। আমি তখন তাঁহার পুত্র ক্লড এলিয়টের সহিত কত খেলা করিয়াছি, বেলভিডিয়ারের সুপ্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে আমরা দুইজন কতদিন দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইয়াছি। এতদিন পরে সেই সকল পূর্ব্বস্মৃতি আমার মনে উদিত হইল। শুনিলাম, ক্লড এলিয়ট তখন ইটনে অবস্থান করিতেছেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের দুইটি সম্মিলনে (At Homes) আমি যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। এ সকল সম্মিলনে যোগদান আমার পক্ষে নূতন বলিয়া আমি ইহা উপভোগ করিয়াছিলাম; কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, এ সকল সম্মিলন যেন ঐ এক রকমের; ইহাতে বেশ স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একটি সম্মিলন ক্যান্টারবেরির আর্চ-বিশপ মহোদয় আহ্বান করিয়াছিলেন; অপরটি লণ্ডনের বিশপ-মহোদয়ের আহূত। এই দুইটি সম্মিলনেই দেখিলাম যে, দলে দলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আগমন করিতেছেন; আর তাঁহাদিগকে একে একে ধর্ম্মযাজক মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইতেছে; তাহার পর যে সকলে উদ্যানে চলিয়া যাইবেন তাহা নহে; সকলেই সেখানে ভিড় পাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরে যাঁহারা আসিয়া অভ্যর্থিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা দেখিতে লাগিলেন। আমার নিকট কিন্তু ইহা ভাল লাগিল না।
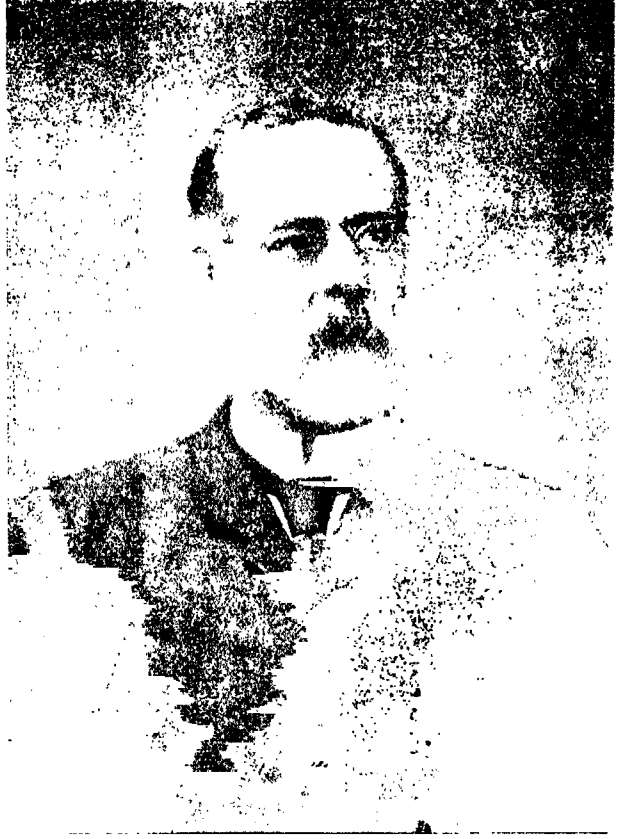
এই পরিচ্ছেদটা ক্রমেই যেন দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; এখন একটু সংক্ষেপ করি। কেবল একটি চা-পানের সম্মিলনের কথা এই স্থানে উল্লেখ করিব। এলিস্‌মোর বাগানে কয়েকজন বন্ধু একটা চা-পানের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈন্যদলের যে সমস্ত ভারত সন্তান প্রতি বৎসর সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য এ দেশে আগমন করেন এবং যাঁহারা সম্রাটের পার্শ্বচরের কার্য্য করিতে আদিষ্ট হন, সেই সকল ভারতীয় সৈনিক বিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারীরা এই সম্মিলনে আহূত হইয়াছিলেন। এই সম্মিলন-স্থানে একটি ব্যাপার

দেখিয়া খুব বিস্ময় ও আমোদ বোধ হইয়াছিল। উপস্থিত ইংরাজ ভদ্রলোক ও মহিলাগণ এই সকল 'কালা-আদ্‌মী'র করমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। সুধু কি তাই ?—তাঁহারা এই সকল দেশীয় লোকদিগের বসিবার জন্য চেয়ার আনিয়া দিতে লাগিলেন, তাহাদের হস্তে চুরুট প্রভৃতি প্রদান করিয়া আপ্যায়িত ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, ভারত-প্রত্যাগত এংলো-ইণ্ডিয়ান হুজুরেরাও এই ভাবে কালা-আদ্‌মীদিগকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তখন আমার মনে হইল যে, এই সকল দেশীয় ভদ্রলোক ভারতবর্ষে অবস্থান সময়ে যদি এই সমস্ত বড় সাহেবের সমীপস্থ হইবার জন্য আবেদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল হুজুর-লোকের সহিত 'মুলাকাৎ' করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ—চেয়ার আগাইয়া দেওয়া বা চুরুট দেওয়া ত বহুদূরের কথা! এই ব্যাপার দেখিয়া আমার একটা পুরাতন কথা মনে হইয়া পড়িল। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি একজন ছোটলাটের সহিত বাঁকুড়া জেলার এক জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় তিনি কথা-প্রসঙ্গে এক দিন আমাকে বলেন, "Remember Maharaja, that the Englishman at-home is a different being altogether to the one out in India. It is you Indians who spoil us by your over-politeness and constant low bowings." অস্যার্থ—"মনে রাখিবেন মহারাজা, ভারতবর্ষে ইংরেজকে যেমন দেখেন, তাঁহারাই স্বদেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। আপনারাই ত ক্রমাগত অতিরিক্ত বিনয়-নম্র ব্যবহার এবং আভূমি-প্রণত সেলামে আমাদিগকে মাটি করিয়া দিয়া থাকেন।" বিলাতে এই দিনের ব্যাপার দেখিয়া, আমার সেই ছোট লাটের মন্তব্যটা মনে পড়িল। সে ছোটলাট এখন আর জীবিত নাই; তিনি কলিকাতাতেই দেহত্যাগ করেন, এবং তাঁহাকে কলিকাতাতেই সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। এই ছোটলাটই আর এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে,

স্যর্ চার্লস এলিয়ট্

এংলো-ইণ্ডিয়ান মহাশয়েরা আমাদের দেশে রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া যখন বিলাতে উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদের সকল বিষয়েই ভারি অসুবিধা বোধ হয়; তাঁহারা বিলাতে মোটেই স্বচ্ছন্দ ও স্বস্তি বোধ করেন না, কারণ বিলাতে তাঁহারা ত আর 'হুজুর' থাকেন না! তাঁহাদিগকে সাধারণ দশজনের একজন হইয়া থাকিতে হয় এবং অবশিষ্ট জীবন অতি সাধারণভাবেই যাপন করিতে হয়। বিলাতে আসিয়া এই সদাশয় ছোটলাট বাহাদুরের কথাগুলির মর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম।

ও সকল কথা থাকুক। লণ্ডনটা যে কি, তাহা আমি শ্রীযুক্ত ফিসার মহোদয়ের দশজন পরিবারের সহায়তায় বেশ অবগত হইতে পারিয়াছিলাম। সার জন ফিসার, লেডি ফিসার এবং তাঁহাদের কন্যাগণের সহানু-

ভূতিপূর্ণ ভদ্রব্যবহার আমি চিরদিন স্মরণ রাখিব। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, সেই সময়েই একটি ফিসার দুহিতার শুভউদ্বাহব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। অবশ্য আমি এই শুভানুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। হ্যানোভার স্কোয়ারের সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জায় এই বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল; লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের বিবাহ ক্রিয়া এই গির্জ্জাতেই হইয়া থাকে। আমার সিবিলিয়ান্ বন্ধু সিসিল ফিসারের বন্ধুবৎ ব্যবহার সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব; তাঁহার ন্যায় বন্ধুলাভ আমি পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। আমি ফিসার পরিবারের প্রত্যেকের নিকট নানাভাবে কৃতজ্ঞ; তাঁহাদের দ্বারাই আমি লর্ড কেলভিন, লর্ড টুইডরাউথ প্রভৃতি মহারথীদিগের সৌহৃদ্যলাভে সক্ষম হইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত, যাঁহারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিলাসী লণ্ডনের কেন্দ্রস্থান পার্কলেনে বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের সহিতও ফিসার পরিবারের কেহ না কেহ আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।—এবার এইখানেই শেষ।

মেঘের বাসর

[মলিনা]

আমি—

হিয়ার মাঝারে নিরালা বসিয়া রচিব মেঘের ঘর,
রজত-শশীর রূপালি জোছনা ঝরিবে চূড়ার পর।
কৌমুদী ধরি মম্মর করি' সাজাইব থরে থরে,
ইন্দ্রধনুর স্তম্ভ রচিব সে মোর সাধের ঘরে।
সৌধ-চরণ ধৌত করিবে শিশির নদীর নীর,
প্রাঙ্গণে তার তারার নির্ঝর ঝরি' যাবে ঝির্ ঝির্।

আমি—

স্বপনের ফুলে বিছাব বিরলে পিরীতি-শয়ন খানি,
সোহাগের শত মাণ মরকতে ঝালর ঝলাব আনি'।
কত জনমের আশার চামর শিথানে রাখিব মোর,
বঁধুয়ার লাগি' সারা নিশি জাগি' ধেয়ানে রহিব ভোর।
সহসা থমকি' উঠিবে চমকি' পুলকে শিহরি' প্রাণ,
রুণ্ রুণ্ রুণ নূপুরের রোলে মরমে বহিবে বান্।

মোর—

নীল মরকত নীরদ-ভবনে আজি কে অতিথি এল?
নব জলধর জিনি কলেবর মরম মথিয়া গেল!
হাতে তার বাঁশী, মুখে সুধাহাসি রূপে হিয়া টল মল,
তেরছ দিঠীতে পরাণ কাড়িয়া পলা'ল করিয়া ছল!
ভেঙ্গে গেল মোর মেঘের বাসর, সে হ'তে মরম ঝুরে,
কুমারী-গরব খরব করিয়া বঁধুয়া পলা'ল দূরে!

বিবিধ প্রসঙ্গ

"স্বদেশী"-শিল্প

[শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য]

যেদিন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষ্য করিয়া, মহামতি লর্ড বেণ্টিঙ্কের ধাতুমূর্ত্তির পদতলে দাঁড়াইয়া, বাঙ্গালার নেতারা "স্বদেশী"-মন্ত্র প্রচার করিলেন, সেদিন বাঙ্গালার ইতিহাসে অবশ্যস্মরণীয়। কি কুহকবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বঙ্গবাসীকে—বঙ্গবাসীকে কেন,সমগ্র ভারতবাসীকে—এক নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল, ইহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। কেহ বলেন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপার বাঙ্গালীকে এত আঘাত করিয়াছিল যে, ভাব-প্রবণ বঙ্গবাসী তাহারই ফলে এই "স্বদেশী"-মন্ত্রে এত অল্প সময়ের মধ্যেই অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। হইতে পারে, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ একটা প্রধান উপলক্ষ্য। কিন্তু উহাই স্বদেশী শিল্পের অভ্যুত্থানের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে ভ্রমাত্মক নহে,একথা বলিতে পারি না। ১৮৯২ সালে যখন "স্বদেশী"-শব্দ কেহ স্বপ্নেও জানিতেন না, তখন 'বঙ্গবাসী'র অধ্যক্ষগণ দেশীয় শিল্প-জগতের উন্নতি বিধান কল্পে একটি যৌথ-কারবারের উদ্যোগ করেন। ১৮৯৬ সালে, আমরা যখন পড়ি তখন, ত' বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের কল্পনাও কেহ করেন নাই—সেই সময় হ্যারিসন্ রোডে কলেজস্কোয়ারের সন্নিকটে একটী স্বদেশী দোকান সর্ব্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি। শুনিয়াছিলাম, তাহার প্রধান উদ্যোগী কবিবর রবীন্দ্রনাথ। অভাব না হইলে কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় না। এই সময়ে অনেকের মনে স্বদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে যে, সেই প্রথম দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কতক লোকের মনে যে, স্বদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে, দেশের অর্থ দেশেই থাকিবে, দেশের শিল্পের উন্নতি হইবে, এইরূপ ভাব সেই সময় হইতে জাগিতেছিল, সে বিষয় আমি নিজেই সাক্ষ্য দিতে পারি। আমাদের সহপাঠীরাও অনেকে এই কথাই বলিবেন।

ইহার কিছুদিন পরেই Dawn Society প্রতিষ্ঠিত হয় ও কুঞ্জবিহারী সেন কোং বড়বাজারে এক দোকান খুলেন; এখানে বোম্বায়ের মিলের কাপড়, চাদর প্রভৃতি পাওয়া যাইত। দেখিতে দেখিতে 'ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স,' 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ও প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহা হইলেই এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এইরূপ একটা দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের ইচ্ছা অনেকের মনে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সুপ্ত ছিল, সময়ের গুণে, বাতাস পাইয়া, তাহা এক মুহূর্ত্তে দাবানলের মত সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

কিন্তু প্রথমেই ইহা খড়ের আগুনের মত এমন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, ইহাতে ইন্ধন যোগাইয়া জনসাধারণকে তৃপ্ত করিতে সামান্য চারিটি দোকান সমর্থ হইল না। যে বম্বে স্বদেশীমিলের কাপড় ২।০ দরে 'কে বি, সেন কোং'র দোকানে বিক্রয় হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে ১৫।২০ দিনের মধ্যে তাহার মূল্য ৩৲ জোড়া হইয়া উঠিল! বড়বাজারের কোন কোন অসাধু দোকানদারেরা এই সময়, বিলাতী কাপড়ের বিক্রয় কমিতেছে দেখিয়া, কাপড়ের নূতন ভাঁজ করিয়া, তাহার উপর যা' তা' একটা ছাপ মারিয়া, "স্বদেশী" বলিয়া চালাইতে লাগিল। অনেকে স্বদেশী কাপড়, বোম্বায়ের কলওয়ালাগণের সঙ্গে, চড়া দরে "কণ্ট্রাক্ট" করিয়া ফেলিল; কাজেই কাপড় বাজারে অতিরিক্ত চড়া দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। তাহার উপর মনোমত কাপড় অধিকাংশ সময়ে পাওয়া যায় না—যাহা যায়,তাহারও পাড় কাঁচা। তথাপি বাঙ্গালী "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" মাথায় তুলিয়া লইতে ছাড়িল না। কিন্তু এক ভাবের

দোহাই দিয়া কতদিন চলিতে পারে?—কাজেই অনেকে, যাহারা পরের দেখাদেখি চক্ষুলজ্জার খাতিরে "স্বদেশী" ব্যবহার করিতেছিল তাহারা, এই সময় গা-ঢাকা দিল। প্রথম স্রোতঃ এইখানে বাধা পাইল।

ইহাতেও যাহারা 'যায় প্রাণ' থাক মান করিয়া, "স্বদেশী" ধরিয়া রহিল, তাহারা আরও কিছুদিন চালাইল। সাধারণ লোকে যাহারা মিলের কাপড় পরে, তাহাদের অধিকাংশই ছাপোষা—অতিরিক্ত মূল্য দিয়া, ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহারাও আর কিছুদিন চালাইল।

বাংলাদেশের আঢ্য-সম্প্রদায়ের এই "স্বদেশী"র সহিত মৌখিক সহানুভূতি থাকিলেও, তাঁহাদের যে কখন আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, ইহা তো মনে হয় না। আমাদের দেশের "বাবু"রা—যাঁহারা সুচিক্কণ বিলাতীতে অভ্যস্ত, তাঁহারা মুখে সহানুভূতি দেখাইলেও, মোটা "স্বদেশী" ব্যবহার করিতে পারিলেন না। গরীবরা কতদিন ক্ষতি সহ্য করিতে পারে! কাজেই স্বদেশীর পতন আরম্ভ হইল।

অপর দিকের কথাটাও বলা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভাবই সৃষ্টির কারণ। প্রথম "স্বদেশী"র আবেগে একদল নূতন ব্যবসাদার এবং একদল নূতন শিল্পীর সৃষ্টি হইল। এই নূতন ব্যবসায়িদলের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্বে কখনও কোন ব্যবসায় করে নাই—বা সে শিক্ষাও তাহাদের কখনও ছিল না। ইহাদের অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া ছিল—এই সুযোগে ব্যবসায় করিয়া উপার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইল। ইহাদের আবার অধিকাংশের মূল-ধনের অভাব। ইহারা যেমন-তেমন করিয়া, কয়েক শত টাকা যোগাড় করিয়া, গোটাকতক আলমারি সাজাইয়া, দোকান খুলিয়া বসিল। এই সময় এই সব "স্বদেশী" দোকানের একটা নূতন রকম নাম সৃষ্টি হইল—হয় "ষ্টোর্স" না হয় "ভাণ্ডার"। ইহাদিগকে পরে অনেককে "চোর্স" বলিয়া ঠাট্টা করিতে শুনিয়াছি।

দোকান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কেন কিছু পূর্ব্বেই নূতন "শিল্পী"র দল দেখা দিল। কেহ একখানা তাঁত কিনিয়া, কেহ মোজা প্রভৃতি কল করিয়া, শিল্পী (Manu facturers) হইয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য, এসব কার্য্য তাঁহারা পূর্ব্বে কোন দিন করেন নাই—জ্ঞান বা অভ্যাস, কিছুই ছিল না। ইঁহারাও এই সুযোগে লাভবান হইবেন, মনে করিলেন। অনেক কষ্টে যখন জিনিষ তৈয়ারী হইল, তাহা ত বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে হইবে। কাজেই তখন তাঁহারা সেই সমস্ত দ্রব্যজাত লইয়া বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করিলেন। প্রথম চেষ্টার ফলেই বুঝিলেন, বাস্তবে ও কল্পনায় কত প্রভেদ। দোকানদারেরা কেহবা মাল অপছন্দ করিল, কেহবা মূল্যাধিক্যবশতঃ লইতে অস্বীকৃত হইল। অথচ সেই সমস্ত মাল তাঁহাদের কিছুদিন ধরিয়া রাখিবারও ধৈর্য্য বা শক্তি নাই; কারণ—বলাই বাহুল্য, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সামান্য অবস্থার লোক, নচেৎ সামান্য ব্যবসা করিতে যাইবেন কেন? অগত্যা দোকানদারদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় রহিল না। দোকানদারেরও তাদৃশ সঙ্গতি নাই; আবার, তাহারা এখন শিল্পীকে বাগে পাইয়াছে। তাহারা এখন বলিতে লাগিল—মাল দিয়া যাও বিক্রয় হইলে টাকা দিব। শিল্পীও অগত্যা বাধ্য হইয়া, তাহাতেই সম্মত হইল। এক্ষেত্রে জগতের যাহা নিয়ম, তাহাই হইল;—"ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃপ্রীতি বিপত্তেঃ কারণম্মতম্।" মানুষের কথার ঠিক রাখা বড় কঠিন। শিল্পী টাকার তাগাদা করিতে আসিয়া অনেকস্থলে টাকা পাইল না—কিছুদিন পরে দেখিল, দোকান উঠিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই এই নূতন-শিল্পিদলের অনেকেই হাত গুটাইল। অতঃপর যে সমস্ত শিল্পী ও দোকানদার লোকসান দিয়াও টিকিয়া রহিলেন, তাঁহাদের অবস্থাও বিশেষ সচ্ছল রহিল না। আমাদের দেশে প্রতিযোগীর অভাব হয় না। ভাল করিয়া না কসিয়ামাজিয়াই প্রতিযোগী ভাবে যে, অপরে যখন পাঁচ আনায় কোন জিনিষ বেচিতেছে, সে অবশ্যই উনিশ পয়সায় বেচিতে পারে—না হয় এক পয়সা লাভ কম হইবে, তাহাতে আর কি আসে যায়! ইঁহারা জিনিষের দর ধার্য্য করিবার আগে একবারও খতাইয়া দেখেন না, তাঁহার নিজের কি দর পড়িতেছে—মনকে চোখ ঠারিয়া কার্য্য সারিয়া লয়েন। ফলে, "মজালি সুবর্ণ লঙ্কা আপনি মজিলি" হয়।

শিল্পীকে কোন দ্রব্যের দর ফেলিতে হইলে কতগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়, তাহা অনেকে হয়ত' জানেন না—নিম্নে তাহার আভাস দিলাম। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, কতগুলি খরচ একত্র করিলে জিনিষের দর স্থির হয়;—

- বিক্রয় মূল্য
  - I. মোট খরচ বা মূল্য
    - ১ তৈয়ারি খরচ
      - (ক) প্রথম খরচ — কাঁচা মাল মজুরি (প্রত্যক্ষ)
      - (খ) চাপান — অপ্রত্যক্ষ মজুরি, আলো, বাড়ীভাড়া, টেক্স, ইন্সিওর, লাইসেন্স, মূল্য হ্রাস (যন্ত্রাদির) ইত্যাদি, আপীস, বিক্রেতা,
    - ২ বিক্রয়ের খরচ — বিজ্ঞাপন, সরঞ্জামী, আনুষঙ্গিক খরচ, টাকার সুদ, ইত্যাদি।
  - II. লাভ

এই প্রসঙ্গে অপর এক দিকের কথাও বলা প্রয়োজন। "স্বদেশী"র উৎসাহে একজন লোক বিদেশী-বর্জ্জনের এমন পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের পল্লীস্থ কাহাকেও স্বদেশী ব্যবহার করার একান্ত-প্রয়োজন বুঝাইয়া উঠিতে না পারিয়া অবশেষে বলপ্রয়োগ করিতেও ক্রটী করিলেন না; ফলে, তাঁহারা শান্তিভঙ্গের জন্য রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। স্থানে স্থানে ইহা লইয়া মামলা-মকর্দ্দমা পর্য্যন্ত গড়াইল। রাজপুরুষেরা এরূপ বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে দণ্ডবিধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এমনই হইয়া দাঁড়াইল যে, কতক লোকের বিশ্বাস জন্মিল "স্বদেশী" করিলে রাজপুরুষদিগের বিরাগভাজন হইতে হয়। পরে আবার বোমার ব্যাপার মাথা থাড়া দিয়া উঠিতেই রাজপুরুষদিগের দৃঢ় ধারণা হইল, এই সকল অপকর্ম্ম বুঝি চরমপন্থীদিগের কীর্ত্তি। সাধারণ লোক ইহাতে বিশেষ ভয় পাইল—ভাবিল স্বদেশী করিয়া রাজপুরুষদিগের বিষ-নয়নে পড়িবার যখন পদে পদে আশঙ্কা, তখন স্বদেশীর কথা মুখে না আনাই ভাল। এইরূপেই "স্বদেশী"র মূলে কুঠারাঘাত হইল।

গবর্ণমেণ্ট নিজে "স্বদেশী"র পক্ষপাতি—গবর্ণমেণ্ট অফিসে একটি নোটিশ জারি আছে যে, অফিসের কর্ত্তারা যথাসম্ভব দেশী জিনিষ তাঁহাদের অফিসে ব্যবহার করিবেন। 'Comptroller of Stores'এর দ্বারা অনেক দেশী জিনিষ সরকারী অফিসে ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু তাহাতে দেশীয় শিল্পের কোনই উন্নতি হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যে সকল দেশী জিনিষ লয়েন, তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল জিনিষ,—এমন কি বিলাতীর সমতুল্য দেশী দ্রব্যাদি, বাজারে পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, গবর্ণমেণ্ট অফিসে যে দেশী ছুরি দেওয়া হয় তাহার কথাই ধরুন। সেগুলি ইস্পাতের তৈয়ারী বলিয়া মনেই হয় না—তাহার দ্বারা একটি সুতাও কাটা যায় না—পেন্সিল কাটা ত' দূরে কথা। ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল দেশী ছুরি—বিলাতীর সমকক্ষ—যে সকল বাজারেই পাওয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। আমরা ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, যে মূল্যে এই সকল দ্রব্য সরবরাহ করিতে হয়, তাহা এত অল্প-যে, তাহাতে উহা অপেক্ষা ভাল জিনিষ প্রস্তুতই হইতে পারে না।

জিনিষের গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দর কমিতে কমিতে যে এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপে কি কখনও শিল্পের উন্নতি হওয়া সম্ভব? গবর্ণমেণ্ট যদি একমাত্র মূল্যের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া, গুণের উপর কতকটা লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

আমরা এইবার মোটামুটি যে যে দোষের জন্য ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, তাহার আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, অনেকগুলিই আমাদের "স্বদেশী" কারবারে অধিকাংশ স্থলে প্রায়শঃ প্রয়োজ্য।

(১) **অকর্ম্মণ্য অধ্যক্ষ**—কোন শাস্ত্রই রীতিমত শিক্ষা না করিলে আয়ত্ত হয় না, এ কথা সকলেই জানেন। ব্যবসায় শাস্ত্রও বিশেষ শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি অনেক লোককেই দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি—কিছু টাকা হাতে পাইলেই, উপস্থিত চাকরি বাক্‌রি ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসা করি। তাঁহাদের ধারণা, ব্যবসা করা মানে শুধু কিছু টাকা সংগ্রহ করা; তার পরে, ব্যবসা আপনি চলে এবং আপনি লাভ হয়। আমেরিকাবাসীরা বিজ্ঞানের মত ব্যবসা শিক্ষা করেন, তাই তাঁহারা এত উন্নতি করিতে সমর্থ হন। আমাদের অধিকাংশ "স্বদেশী" কারবারের অধ্যক্ষগণ কোন দিন ব্যবসা করেন নাই, বা শিক্ষাও পান নাই—কাজেই তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কারবারের উন্নতি হয় না। মাড়ওয়ারি বালক বাল্যকাল হইতে গজে মাপিয়া কাপড় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে গদীয়ান হয়—তাই তাহাদের ব্যবসা সুপরিচালিত।

(২) **বিজ্ঞাপনে কার্পণ্য।**—আমাদের দেশের ব্যবসাদার এখনও বিজ্ঞাপনের মূল্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিজ্ঞাপনে কার্পণ্য করিলে "কামারকে

ইস্পাত ফাঁকি" দেওয়ার অবস্থা হইতেই হইবে। আমেরিকাবাসীরা যে 'বিজ্ঞাপন', শাস্ত্রহিসাবে অধ্যয়ন করেন, আমাদের দেশের কয়জন ইহার সন্ধান রাখেন? অনেকে বিজ্ঞাপনে ব্যয় অনাবশ্যক মনে করেন। ইংরাজ-পরিচালিত বোধ হয়, খুব কম ব্যবসা আছে যাহাতে বিজ্ঞাপন লিখিবার ও তাহা দিবার ব্যবস্থার ভার একজন উপযুক্ত লোকের হস্তে ন্যস্ত নাই। আমাদের দেশের কয়েকজন ব্যবসাদার—যাঁহারা ইহার মূল্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারই দিন দিন উন্নতি করিতেছেন;—লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন।

(৩) **খরিদ**।—"খরিদের মুখে লাভ" একথা সকল ব্যবসাদারই জানেন।—যা' তা' খরিদ করিয়া, দোকান সাজাইলেই চলে না। যাহার যেরূপ "খরিদদার" সেই বুঝিয়া, তাঁহাকে জিনিষ সংগ্রহ করিতে হইবে। যে পল্লীতে "সস্তার" খরিদদার অধিক, সে পল্লীতে অধিক মূল্যের ভাল জিনিষ রাখিলেও কাটতি হয় না। আবার সময় বুঝিয়াও পণ্য-সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। শীত পড়িবার মুখেই শীতের জিনিষ রাখা উচিত; আবার গরম পড়িতে পড়িতেই গ্রীষ্মকালের উপযোগী জিনিষ আমদানি করা উচিত।

(৪) **দোকানের স্থান**।—অনুপযুক্ত স্থানে দোকান করিতে নাই। সকল দ্রব্য বিক্রয়েরই বিভিন্ন পল্লী আছে; ঠিক স্থানটি বাছিয়া লওয়া উচিত। দোকানের বিক্রয়, স্থানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সাহেবপাড়ায় স্বদেশী-দোকান করিলে কি চলে? না, মসলার বাজারের মধ্যে ঘড়ির দোকান করিলে চলে?

(৫) **প্রদর্শন**।—ইহার উপর যে বিক্রয় কতকটা নির্ভর করে, তাহা সাহেব-পল্লীর দোকানগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। দোকানটি এমন ভাবে সাজান উচিত যে, সকল জিনিষই যেন ক্রেতার চক্ষে পড়ে। আমরা অনেকসময়ে দরকার না থাকিলেও সাহেববাড়ী হইতে জিনিষ কিনিয়াছি—যেন তাহাদের আকর্ষণী শক্তি আছে—এমনই তাহাদের সাজাইবার কায়দা।

(৬) **উপযুক্ত বিক্রেতা**।—বিক্রয় করিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। এমন একএকজন লোক আছে, যাহাদের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়, বিশ্বাস জন্মে। এইরূপ লোক বাছিয়া, তাহার উপর বিক্রয়ের ভার দেওয়া উচিত। ইংরেজরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বিক্রয়ের লোক রাখেন। কোন কোন ইংরাজের দোকানে, যদি কোন বিক্রেতার নিকট হইতে তিন জন লোক কিছু না কিনিয়া চলিয়া যায়—তাহাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। সুদক্ষ বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতা প্রায় ফিরিতে পারে না; আপনি যাহা খুঁজিতেছেন, সেটি ঠিক না থাকিলেও, অপর একটি সেইরূপ জিনিষ দিয়া আপনাকে এমন সহজ সরলভাবে বুঝাইয়া দিবে যে, আপনি তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন। সুদক্ষ বিক্রেতাকে কিছু অধিক বেতন দিয়া রাখাতেও লাভ আছে।

(৭) **বিলম্বে সরবরাহ**।—এটি বোধ হয় বাঙ্গালীর চরিত্রগত দোষ। অর্ডার পাইবামাত্র তাহা যতশীঘ্র সম্ভব সরবরাহ করা উচিত। লোকের প্রয়োজন না থাকিলে অর্ডার দেয় না; যত শীঘ্র সরবরাহ করা যায়, ক্রেতা ততই সন্তুষ্ট হয়। একজন ক্রেতা সন্তুষ্ট থাকিলে, তাহারই দ্বারা আর দশটি পাইবার আশা থাকে। ব্যবসায়ে, কথার ঠিক রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বরং লম্বা কড়ার করিয়া কথায় ঠিক রাখা ভাল, তবু শীঘ্র দিব বলিয়া একদিন দেরিতে দেওয়া উচিত নহে।

(৮) **বদনাম**।—ইহাই ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশের কারণ। একবার দুর্নাম প্রচার হইলে, তাহা ঢাকিতে অনেক সময় লাগে। "স্বদেশীর" প্রারম্ভে যে-যে জিনিষের একবার বদনাম প্রচার হইয়াছে, এখন তাহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইলেও লোকে আর সেগুলিতে বিশ্বাস করিতে চাহে না।

(৯) **অল্পমূলধনে কারবার**।—ইহাই স্বদেশী-শিল্পের অধিকাংশস্থলে পতনের কারণ। প্রথম প্রথম শিল্পী যে অর্থ লইয়া কারবারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিলেন তাহাতে সঙ্কুলান হয় না। যে মূলধনে জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে, অন্ততঃ তাহার চারি গুণ মূলধন হাতে থাকা আবশ্যক। মাল বিক্রয় না হইলে, তাহা কিছুদিন ধরিয়া রাখিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। সব সময় বাজার সমান থাকেনা—মূলধন না থাকিলে, লোকসান করিয়া বিক্রয় করিতে অনেক সময় বাধ্য হইতে হয়—অথচ কারখানাও বন্ধ রাখা চলে না। অল্প মূলধনের কারবারে পদে পদে বিপদ—পদে পদে ঠকিতে হয়।

(১০) **অমনোযোগিতা।** কারবারও, অধ্যয়নের মত, একমন হইয়া না করিতে পারিলে কদাচ করা উচিত নহে। দু' নৌকায় পা দিতে নাই। অনেক স্বদেশী ব্যবসা এইরূপে মাটি হইয়াছে। অনেকে চাকরীর মোহও কাটাইতে পারেন নাই—অথচ ব্যবসায়ের লোভও সামলাইতে পারেন নাই। দুইদিক রাখিতে গিয়া, এই সব স্থলে ব্যবসা মাটি হইয়াছে। ব্যবসাও সাধনা সাপেক্ষ—একাগ্রচিত্ত হইয়া লক্ষ্মীর আরাধনা না করিতে পারিলে সাফল্য লাভ সুকঠিন।

নিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

[শ্রীধীরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, M. A.]

ব্রহ্মবিদ্যার আদিপ্রবর্ত্তক স্বয়ং পরব্রহ্ম নারায়ণ। প্রথমতঃ তিনি এই বিদ্যা লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনকাদি চারিজন মহর্ষিকে প্রদান করেন। উঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গলোকে এই বিদ্যা প্রচারিত হয়। কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে তখনও এই বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কপিল, কণাদ, গোতম, জৈমিনি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ শ্রুতির একদেশ গ্রহণ করিয়া অসম্পূর্ণ মত সকল বিস্তার করিতেছিলেন। কপিল, ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কণাদ—আত্মার জড়ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, গোতম—মুক্তিকে সুখবিরহিত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, জৈমিনি—শ্রুতিশিরোভাগকে অর্থবাদবাক্যে পরিণত করিয়া, যজ্ঞের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। আবার হৈরণ্যগর্ভ, পাশুপত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি নানাপ্রকার মতবাদিগণ পরমতত্ত্বের অপলাপক একদেশী সিদ্ধান্ত সকল প্রকটিত করিয়া, জীবগণকে বিমোহিত করিতেছিলেন। এইরূপে সর্ব্বত্র জ্ঞান আকুলীভূত হইলে, মানবগণ পরমেশ্বর-বিষয়ে ভক্তিবিহীন হইলে, ভগবান্ বাসুদেব পুরুষোত্তম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের ঈশ্বর-বিষয়ে জ্ঞান-ভক্তি উৎপাদিত ও দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে পরমতত্ত্বপ্রকাশক (সমন্বয়, অবিরোধসাধন ও ফল নামক) চারি-অধ্যায় সম্বলিত শারীরকমীমাংসা নামধেয় বেদান্তশাস্ত্র সূত্রাকারে রচনা করেন। কিন্তু ঐ সূত্রগ্রন্থ সদ্ব্যাখ্যার অসদ্ভাবে ও অসদ্ব্যাখ্যার সদ্ভাবে মানবগণের উপকারাবহ না হইয়া, অপকারাবহ হইতে লাগিল। তখন সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল বলিয়া, লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনকাদি মহর্ষিগণ চারিটি সম্প্রদায় সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিলেন। তদনুসারে লক্ষ্মীদেবী রামানুজাচার্য্যকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং সনকাদি মহর্ষিগণ নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কাচার্য্যকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করিলেন। এজন্য উঁহাদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়গুলি যথাক্রমে শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায় ও চতুঃসনসম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়।—ইহাই বৈষ্ণবগণের অভিপ্রেত ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারের ইতিহাস। ভক্তমালের বঙ্গানুবাদে উহার সমর্থনের জন্য পদ্মপুরাণাদি হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত হইয়াছে—

> 'সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
> সাধনোঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥'
> 'কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
> শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥'
> 'রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ।
> শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥'

আমরা শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কথা বলিব। নিম্বাদিত্য যে চারিজন মহর্ষির অভিপ্রেত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করেন, তাঁহাদের নাম—সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন। এজন্য এই সম্প্রদায়কে সনকাদি বা চতুঃসনসম্প্রদায় বলে। ইহার প্রবর্ত্তকের আদিনাম নিয়মানন্দ। ইনি নিম্ববৃক্ষে আদিত্যদেবকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহার নাম পরে নিম্বাদিত্য হয়। তাহার উপাখ্যান ভক্তমালে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—'একদা এক দণ্ডী ইঁহার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। তখন দুইজনে তন্ময় হইয়া, তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হন। সূর্য্যদেব অস্তপ্রায় হইলে, নিয়মানন্দ দেখিলেন যে, তখনও অতিথি-সৎকার করা হয় নাই। নিয়মানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দণ্ডী, আহার করিতে করিতে সূর্য্যদেব অস্ত যাইবেন বলিয়া ভোজনে সম্মত হইতে পারিলেন না। ইহাতে নিয়মানন্দ স্বীয় যোগপ্রভাবে প্রাঙ্গণস্থিত নিম্ববৃক্ষে সূর্য্যকে রুদ্ধ করিলেন। আহারাদি শেষ পর্য্যন্ত সূর্য্য তদবস্থ ছিলেন। ইহার পর

হইতে নিয়মানন্দ নিম্বাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।' এই উপাখ্যান ইঁহার সম্প্রদায়েও প্রচলিত, কিন্তু প্রকাশিত স্বপ্রণীত পুস্তকে নিম্বাদিত্য স্বয়ং এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত করেন নাই। কিন্তু ইঁহার ব্রহ্মবিদ্যালাভ যে, অলৌকিক-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা ইনি স্বয়ংই সূচিত করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে নারদ-সনৎ-কুমার-সংবাদ বর্ণিত আছে। নিম্বাদিত্য ব্রহ্মসূত্রের স্ব-প্রণীত ভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রে ভাষ্যে উহার উল্লেখ করিতে যাইয়া, ঐ নারদকে নিজগুরু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিতে মধ্বাচার্য্য বেদব্যাস কর্ত্তৃক উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এরূপ উল্লিখিত আছে। এইরূপ সকল আচার্য্যের জীবনেই নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ দেখা যায়। নিম্বাদিত্য স্বসম্প্রদায়ে সুদর্শন-চক্রের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, ইনি সূর্য্যের অবতার; তাহা ঠিক নহে। ইনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার নাম 'বেদান্ত-পরিজাত-সৌরভ'। ইঁহার আজ্ঞায় ইঁহার শিষ্য পাঞ্চজন্য শঙ্খাবতার শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার অনুযায়ী বিস্তৃততর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহার নাম 'বেদান্তকৌস্তুভ'। কাশ্মীরি কেশব ভট্টাচার্য্য এতদুভয়ের অনুযায়ী সুবিস্তৃত 'বেদান্তকৌস্তুভ-প্রভা' নামধেয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। নিম্বার্কাচার্য্য 'দশশ্লোকী' বা 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামধেয় আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্বার্কবিরচিত 'মধ্বমুখমর্দন' নামে একখানি গ্রন্থ আছে বলিয়া কথিত হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকালীন নহেন। কারণ মধ্বাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হন। মথুরার সন্নিহিত 'ধ্রুবক্ষেত্রে' এই সম্প্রদায়ের গুরুগণের গদি সংস্থাপিত। তাঁহারা বলেন যে, নিম্বার্ক চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে,—তাহা হইতে দেখা যায় যে, ইহা স্বীকার করা অসম্ভব।

নিম্বার্ক সম্বন্ধে অত্যল্প যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা হইল। বারান্তরে তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত বা প্রচারিত 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা যাইবে। এইবার তাহার মতকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ কেন বলে, তাহাই সংক্ষেপে বলা হইবে। সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি এই যে, নিম্বার্কাচার্য্য মহর্ষি ঔড়ুলোমিপ্রণীত বৃত্তি-অনুসারে স্বীয় ভাষ্য রচনা করেন।

আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই যে, যাবতীয় পদার্থই—জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিনের অন্তর্গত। "আমি" এই শব্দের দ্বারা যে পদার্থকে বুঝায়, তাহাই জীব। এই জীব জড়পদার্থ নহে, ইহার জ্ঞান লাভের ক্ষমতা আছে এবং অনেক বিষয়ে ইহার কর্ত্তৃত্ব আছে, অর্থাৎ অনেক বিষয়ে ইহা পরস্পরবিরোধী দুই বা ততোধিক মার্গের যে কোনটি অবলম্বন করিতে পারে। অচেতন পদার্থ মাত্রই জগৎশব্দের দ্বারা সংগৃহীত হয়। এই অচেতন পদার্থ আমাদের কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকেই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তবে আমরাও কতকটা আমাদের ইচ্ছামত ইহার পরিবর্ত্তনে বাধা দিতে পারি, অথবা সাহায্য করিতে পারি। ইহাই আমাদের কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু আমাদের কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকেও অনেক ব্যাপার সংঘটিত হয় এবং অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে, ইচ্ছা করিলেও—আমরা ইচ্ছানুযায়ী প্রযত্ন প্রয়োগ করিতে পারি না। আমরা ভৌতিক পদার্থের উপর ত ইচ্ছানুযায়ী কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিই না; এমন কি, আমাদের নিজের ইচ্ছাকেও ইচ্ছানুযায়ী পথে চালিত করিতে পারি না। ইহা সকলের অনুভব-সিদ্ধ। ইহা দ্বারা মনে হয় যে, আমরা এবং জগতের যাবতীয় পদার্থ, অপর কোন শক্তির আয়ত্ত। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ইহাই এইরূপে বলেন—জীব ও জগতের স্থিতি ও প্রবৃত্তি ঈশ্বরের আয়ত্ত, ঈশ্বর উভয়েরই নিয়ন্তা; অচিন্ত্য ও অনন্তশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। এই সকল মত শ্রুতিরও স্মৃতিবাক্যের দ্বারা যথাযথ সমর্থিত হয়, বাহুল্যভয়ে তাহা এবার উল্লিখিত হইল না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত তিনটি পদার্থের স্বরূপ এইরূপ—জীব ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য ও ঈশ্বর নিয়ন্তা। জীব চেতন ও অল্পশক্তি, জগৎ অচেতন ও অন্যচালিত, ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী ও সর্ব্বশক্তিমান্। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, এতএব জীবের ও জগতের স্থিতি, প্রবৃত্তি-আদি সমস্তই ঈশ্বরের আয়ত্ত।

জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ পূর্ব্বোক্তরূপে হইলে, উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ বলিব? জীব, জগৎ ও

ঈশ্বর, পরস্পর অভিন্ন বলিতে পারি না; কারণ, প্রত্যেকের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য নাই—এরূপ অদ্বৈতবাদ পূর্ব্বে প্রতিপাদিত জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। আবার জীব, জগৎ ও ঈশ্বর পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন এরূপ বলা যাইতে পারে না; কারণ, জীব ও জগতের যাহা কিছু স্বরূপ, তাহা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও ঈশ্বরের শক্তিরই বিকাশ। এতএব জীব, জগৎ ও ঈশ্বর পরস্পর পৃথক্—এরূপ দ্বৈতবাদও পূর্ব্বে প্রতিপাদিত জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ ঈশ্বর এবং জীবজগৎ, সমুদ্র ও তরঙ্গের ন্যায়, বৃক্ষ ও শাখাপল্লবাদির ন্যায়, সর্প ও কুণ্ডলের ন্যায়, দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় ভিন্ন এবং অভিন্ন। এইজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদই যথার্থ তত্ত্ব-প্রকাশক। পদার্থত্রয়ের পার্থক্য ও মূলগত ঐক্য উভয়ই স্বীকৃত হয় বলিয়া, এই মতের নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রেরও ইহাই অভিপ্রেত, তাহাও দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ যথাযথ প্রদর্শন করেন।

অর্থ-নীতির মূলসূত্র

[শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, M. A.]

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অর্থ অনর্থের মূল। প্রকৃতই কি তাই? জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, প্রতীতি হয় যে, সভ্যতার ক্রমোন্মেষে বিদ্যা, বীরত্ব প্রভৃতি যথেষ্ট সহায়তা করিলেও, ধন ব্যতিরিক্ত তাহা বিকসিত হইতে পারিত না। কি অসভ্য মৃগয়াজীবী মানবকুলের মধ্যে, কি অর্দ্ধসভ্য কৃষি-যুগে, কি বর্ত্তমান সুসভ্য শিল্প-যুগে, মানবকুলের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে স্তরেই আমরা দৃষ্টিপাত করিনা কেন, আমাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, সঞ্চিত ধন, মৃগয়ালব্ধ পশুমাংসরূপেই হউক, কৃষিজাত শস্যরূপেই হউক, অথবা পণ্য বিক্রয়-লব্ধ মুদ্রাদি রূপেই হউক, জগতের সভ্যতা-বিস্তারের পক্ষে অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান যুগের ত কথাই নাই। এক্ষণে জগতের যে কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাউক না কেন, অর্থের সহায়তা ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষায়, গমনাগমনের সুব্যবস্থায়, মানবজাতির কষ্টলাঘবে, শিক্ষা বা শিল্পকলার উন্নতিতে, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে বা সমগ্র মানবজাতির উন্নতি-বিধানে সর্ব্বত্রই অর্থের কৃতিত্ব। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, অর্থনৈতিক আলোচনা, কি সমগ্র মানবহিতৈষী, কি স্বদেশহিতৈষী, কাহারও পক্ষে অমনোযোগের বিষয় নহে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের অর্থনীতিশাস্ত্রে জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশে রাজনৈতিক আলোচনার যত প্রাদুর্ভাব, সে বিষয়ে যত বক্তৃতা, বাগ্বিতণ্ডা হইয়াছে, তাহার তুলনায় তদপেক্ষা শতগুণ অধিক প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক আলোচনা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজনৈতিক আন্দোলনে এ পর্য্যন্ত সুফল অপেক্ষা কুফলই যে অধিক প্রসূত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থনৈতিক আলোচনায় কুফল প্রসবের সম্ভাবনা একেবারেই নাই। তথাপি আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন।

মোটামুটি বলিতে গেলে অর্থনৈতিক আলোচনার দুইটি রীতি আছে। একটি রীতি ইংরাজী পণ্ডিতগণের অনুসৃত। ইংরাজ-অর্থনৈতিকগণ অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনার প্রারম্ভেই কল্পনা করিয়া লইয়াছেন যে, জগতে মানব মাত্রই অর্থোপার্জ্জনে লালায়িত, কিন্তু পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাদের কল্পিত "অর্থনৈতিক মানব" সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বসময়ে অর্থলাভের চেষ্টায় নিয়োজিত, এবং পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া, কিসে স্বল্প পরিশ্রমে সুপ্রচুর অর্থলাভ হয়, তাহার উপায়-অন্বেষণে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই কল্পিত অর্থনৈতিক জীব—দায়ামায়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, স্বদেশপ্রিয়তা, স্নেহশীলতা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক মানবোচিত গুণে একেবারে বঞ্চিত। এই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া, ইংরাজ অর্থনৈতিকের অর্থনীতি-শাস্ত্রের আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে অর্থনীতির সূত্রগুলি সার্ব্বজনীন এবং সর্ব্বদেশে প্রযোজ্য; কেননা, অর্থ সম্বন্ধে মানব সর্ব্বত্রই একরূপ। জার্ম্মান পণ্ডিতেরা বলেন যে, উক্ত প্রকার কল্পিত মানবের—যাহার অস্তিত্ব কখনও এ জগতে সম্ভব নহে,—তাহার উপর নির্ভর করিয়া,

যে সকল সূত্র নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহার কোনটিই প্রকৃত মানবের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইংরাজদিগের প্রথানুসারে আলোচিত অর্থ-শাস্ত্রে জগতের কোন উপকার আসিতে পারে না। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে। যদি মানব-কুলের হিতের জন্য অর্থনীতির আলোচনা প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে, সেই জাতির বিশেষত্ব সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিলে কোন ফলই হইবে না। সেই জন্য প্রত্যেক জাতির অর্থনীতি বিভিন্নভাবেই আলোচনা করা উচিত। জার্ম্মানির পক্ষে অর্থ সম্বন্ধে যে নীতি প্রশস্ত, ইংলণ্ডের পক্ষে তাহা সেরূপ না হইতে পারে।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, উভয় রীতির মধ্যেই কতক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে। ইংরাজ-রীতির কল্পিত অর্থনৈতিক জীব একবারেই অর্থশূন্য নহে। কে ইহা অস্বীকার করিবে যে, মানব স্বভাবতঃই অর্থোপার্জ্জনে লালায়িত, কিন্তু পরিশ্রম-স্পৃহাশূন্য ? তবে বাস্তব-মানবের যে কেবল এই দুইটিমাত্রই গুণ, আর কোন গুণ নাই, তাহাও স্বীকার্য্য নহে। আবার জার্ম্মান-রীতির প্রস্তাবিত বিভিন্ন জাতির বিশেষত্ব স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং এই দুইটি রীতির সত্যটুকু গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া, অর্থনীতি-শাস্ত্রের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। ইংরাজ-নীতির উপর নির্ভর করিয়া, কতকগুলি সার্ব্বজনীন অর্থনৈতিক সূত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সকল সূত্র বাস্তব-মনুষ্য-মণ্ডলে প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহাদের জাতীয় বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।

বৈদেশিক অর্থনৈতিক সূত্রগুলি আমাদের স্বদেশে অনেক সময়ে প্রযোজ্য নহে। আমাদের দেশের ভূমির অবস্থা, জলবায়ুর অবস্থা, সামাজিক গঠন, পাশ্চাত্য দেশ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। এ দেশের লোকের প্রকৃতি, আচারব্যবহার, ধর্ম্মানুরক্তি, কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রভৃতিও পাশ্চাত্যের অনুরূপ নহে ; সুতরাং ভারতবাসীর অর্থনীতি যে, পাশ্চাত্যের অনুরূপ হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য এদেশে অর্থনৈতিক আলোচনা করিতে হইলে, বিশেষ সাবধানতার সহিত দেশীয় লোককে এবং দেশের অবস্থাকে বুঝিতে হইবে।

ধনের সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহাদিগকে মোটামোটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—অর্থের উৎপত্তি, বিভাগ এবং বিনিময়। নব্য অর্থ-নৈতিকেরা উপরিউক্ত তিনটি ব্যতীত অপর একটি শ্রেণীতে কতকগুলি অর্থনৈতিক প্রশ্নকে স্থান দিয়াছেন। সে শ্রেণীটির নাম অর্থব্যবহার। ভারতবর্ষে উপরোক্ত চারি শ্রেণীর অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির কি প্রকার মীমাংসা হইতে পারে, আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

লক্ষ্মী

[শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী]

উজল-কোমল-কমলে রাজীব-চরণ-যুগলরাজে,
চরণে নূপুর গুঞ্জরে মধুর বাজে—ওই শুন বাজে !
অলক্ত-রঞ্জিত চরণ-দুখানি যেন সুশোভার খনি
পদ্ম-গন্ধ তায় রয়েছে মাখান, নখর উজলমণি ;
ক্ষীরোদ-তনয়া, হরিপ্রিয়া তুমি, ভক্তজন মনোরমা,
বিশ্বপালিনী তুমি মা পদ্মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি রমা !

অমূল্যবসন শোভিছে তোমার চম্পক-বরণ-অঙ্গে,
স্পর্শিছে সমীর শীতল মৃদুল, আসি' রঙ্গে তব অঙ্গে ;
ঝরিছে সুষমা সমীরে নিয়ত, অধীর হয়েছে বিশ্ব,
তার মাঝে তব শত-সুধাকর-লাঞ্ছন মধুর হাস্য ;
পদ্মবালা তুমি, হরিপ্রিয়া তুমি, ভক্তজন মনোরমা,
বিশ্বপালিনী তুমি মা পদ্মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি রমা !

বামেতর-করে ধান্য শোভে তব, অন্য করে শোভে পদ্ম,
সুস্থ বলবান্ হয় সেই দেশ, যে দেশ তোমার সদ্ম ;
কণ্ঠহার তব অমূল্য—উজল প্রভাত-তপন সম ;
তোমার সকল অপূর্ব্ব সুন্দর, নিত্যনব, অনুপম ;
'যা' 'মা' 'তা' 'সা' তুমি, হরিপ্রিয়া তুমি, ভক্তজন-মনোরমা,
বিশ্ব-পালিনী তুমি মা পদ্মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি রমা।

তব শিরসিজ কোমল কুঞ্চিত, কমল-পলাশ-আঁখি ;
তোমার মুকুট রূপের প্রভায় করিতেছে ঝিকি মিকি।
মন্থন-সময়ে ক্ষীরাব্ধি হইতে লভিয়া জনম তুমি,
বরিয়াছ তুমি দেবনারায়ণে তোমার প্রাণের স্বামী ;
কমলা, ইন্দিরা, হরিপ্রিয়া তুমি, ভক্তজন-মনোরমা,
বিশ্বপালিনী তুমি শ্রী, পদ্মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি রমা !

য়ুরোপে তিনমাস

[মাননীয় শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, M. A., L. L. D.]

লণ্ডন, শুক্রবার ৭ই জুন।—জিনিস-পত্র সব আসিয়া পৌঁছে নাই। কাজেই গৃহস্থালীর কাজ এখনও অতি সামান্য। আহারাদির বন্দোবস্ত নিজের সুবিধা ও রুচিমত করিবার ব্যবস্থা সম্ভব বলিয়া, নানা বিভীষিকা সত্ত্বেও প্রফুল্ল-ভায়ার বাড়ীওয়ালীর শরণাপন্ন হওয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভায়ার রুচি এ বিষয়ে সকলের সহিত একমত নয় এবং বিলাতের ঝকমকানির গল্প-শ্রুত তরুণবয়স্ক ভারতবাসীর পছন্দ মত ত আদৌ নহে। বাড়ীওয়ালী প্রাচীনা—পরিচারিকা ততোধিক, বাড়ীটি ও আসবাবগুলি সবই প্রাচীন, বন্দোবস্তও সব প্রাচীন তন্ত্রের, পাড়াটাও যে খুব সৌখীন, তাহা নহে। তবে সুবিখ্যাত বটে, কেননা যেখানে নানা রকমের নাচ-তামাসা-প্রদর্শনী "নিত্য নূতন"ভাবে প্রতিবৎসর দেখা দেয়, সেই আর্লস কোর্ট (Earls' Court) ঠিক বাড়ীর সাম্নে ; রেলওয়ে বস, ট্যাক্সী প্রভৃতির যথেষ্ট সুবিধা,—অতি নিকটে থাকাতেও আমাদের রাস্তাটি অতি নির্জ্জন। ঘরটি মন্দ নহে; প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র সবই আছে।—খাস বিলাতের পক্ষে আসবাবের প্রাচুর্য্য ও সৌখীনত্ব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও ডাক্তার রায়ের মত ঋষি-তপস্বী ও আমার ন্যায় তৎশিষ্যের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। আমার যেরূপ অভ্যাস ও রুচি তাহাতে কলিকাতার হিসাবে এখানে বাবুগিরির বন্দোবস্ত ; কিন্তু এখানকার হিসাবে সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষাও কম। এক প্রাচীনা পরিচারিকাই প্রাচীনা গৃহকর্ত্রীর সহায় এবং ডাক্তার রায় তাহাতেই মোহিত। কাজেই আমারও কথা—তথাস্তু। ডাক্তার রায় ও আমি দ্বিতল ও ত্রিতলের অধিকারী। গৃহস্বামিনী একতলা ও "পাতালের তলায়" বিরাজ করেন। পাড়াটিতে বহু গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস। নিকটে অনেক ছাত্রাবাসও আছে। অনেকগুলি পরিচিত বাঙ্গালী ছাত্র নিকটেই থাকে। তাহারা সর্ব্বদা তত্ত্ব লয়। এই সকল কারণে, অন্যান্য অসুবিধা ও অভাব থাকিলেও আমাদের এইখানে থাকারই সুবিধা বোধ হইল। প্রধান কারণ—আহার-বিহার ইচ্ছামতই করিতে পারা যায়। ধুতি, চটিজুতা, গাড়ু-গামছা ইত্যাদি বজায় রাখিতে গেলে, নিতান্ত ফাশনেবেল বাটী কিংবা হোটেলে থাকা সম্ভব নয় বলিয়া, আমার এই গৃহস্থালীই মনোমত। আমাদের অল্প-বয়স্ক শিক্ষার্থীরা এইরূপ বাসা খুঁজিয়া লইলে, নানা বিপদ্ ও প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় বিলাত-বাস চালাইতে পারে বলিয়া, এত কথায় ভূমিকার প্রয়োজন। নতুবা যাহা বলিলাম, তাহা আমার পক্ষে নিতান্ত unfashionable বলিয়া, কবুল জবাব জানিয়াও একথার অবতারণা করিয়া "খেলো" হইতাম না। Temprance Society'র Grubb সাহেব নিজ বাটীতে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন। University Congressএর Secretary Delgateদের থাকিবার স্থান স্থির করিয়া লিখিয়াছিলেন; Bengal Arts Societies
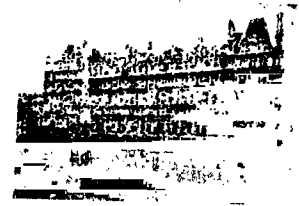
চারিং ক্রস্ ষ্টেশন্

Club, Colonial Institute, National Liberal Club, এগুলির মধ্যে যেখানে হয়, রাজার হালে অপেক্ষা-কৃত অল্প খরচায় থাকা যাইতে পারে এবং Northbrook Societyতে থাকিবার জায়গা আপাততঃ স্থির করিয়া Pearson সাহেবকে কাল কর্ত্তৃপক্ষেরা Stationএই পাঠাইয়া-ছিলেন। এ সকল সত্ত্বেও এই স্থানে থাকাই স্থির করিলাম। নিকটেই Tube, Under Ground, District Railway, Motor, Bus প্রভৃতি পাওয়া যায়। Londonএর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে, এই সকলের সাহায্য বিশেষভাবে লইতে হয়। ধনীদিগকেও ইহা ব্যবহার

করিতে হয়। নতুবা Motor, Taxicab, Hansum, Four Wheeler প্রভৃতিও পাওয়া যায়, তবে তাহাতে ব্যয় বিস্তর। দুই একবার ব্যবহার করিয়া দেখিলাম যে, আমার পক্ষে সে নবাবী বরদাস্ত হইবে না। অতএব সকলে যাহা করে, তাহাই করিতে হইবে। রেলে সেকেণ্ড ক্লাস নাই। মাত্র ফার্ষ্ট আর থার্ড ক্লাস। থার্ড ক্লাসের বন্দোবস্ত সুন্দর, দামও সস্তা। ফার্ষ্ট ক্লাসে প্রায় কেহই চাপে না। Smoking Carriage গুলায় না চাপিলে থার্ড ক্লাসে কোন কষ্ট নাই। তবে ভিড়ের সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। গাড়ী বড় জোর যায় বলিয়া, ধরিয়া দাঁড়াইবার জন্য বিস্তর চামড়ার হাতল ছাত হইতে ঝুলিতেছে, গাড়ীর মাঝখানে সেইগুলা ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে কোনমতে যাওয়া চলে। এবং এই strap ধরিয়াও ঝুলিতে ঝুলিতে

সিটি এণ্ড্ সাউথ লণ্ডন (টিউব) রেলওয়ে

যাহারা তাড়াতাড়ি যাতায়াত করিবার খাতিরে ভিড় দেখিয়াও গাড়ীতে ওঠে, তাহাদের নাম Strap-hanger হইয়াছে। এই সকল যাতায়াত-প্রণালীর তথ্য দুই এক দিনে বোঝা যায় না। সর্ব্বদা পকেটে ম্যাপ রাখিয়া, আর পথের লোককে ও পুলিশম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিয়া লইতে হয়। পুলিসম্যানগুলি অতি ভদ্র। তাহাদের কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই বিনীতভাবে সব বলিয়া দেয়। খাস বাঙ্গালী পোষাক পাগড়ী দেখিয়া বরং অধিক সাহায্য করে। রাস্তার ছেলেরা (Street Arabs) ও কোন কোন ছোট লোক যে হাঁ করিয়া থাকে না কিংবা আপনা আপনি কানাঘুসা কখন করে না, তাহা নহে। তাহাতে বিন্দুমাত্র আসিয়া যায় না; মোটের উপর পাগড়ীর যথেষ্ট মান্য আছে, কোন অসুবিধা নাই বরং কোথাও কোথাও সাতখুন মাপ আছে। পাগড়ী ছাড়াইবার জন্য আমাদের পুরাতন একজন Anglo-Indian বন্ধু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আর সকলেই—এমন কি, আমার সেই Anglo-Indian বন্ধুর স্ত্রী পর্য্যন্ত সকলেই পাগড়ী বজায় রাখার পক্ষে। এ কথাগুলা এক সময়ে না এক সময়ে বুঝাইতে হইবে, তাই এই খানেই বলিয়া রাখিতেছি। আর বার বার বলিবার তাৎপর্য্য যে, ভারতবাসী বিলাতে আসিয়াও নিজ ব্যক্তিগত-জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিলে, ভদ্র ইংরাজ পুরুষ বা মহিলা কোন আপত্তি না করিয়া, বরং শ্রদ্ধা সম্মান করেন, সকল রকম সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, একথা দেশের লোকের বিশেষরূপে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। দেশে "কাপুড়ে বাবুর" জ্বালায় অস্থির। "কাপুড়ে বাবু" আবার "কাপুড়ে সাহেবে" রূপান্তরিত হইলে, আরও ভীষণ—ভীষণতর পদার্থ হইয়া উঠে। আর ফিরিয়া আসিয়া দেশের লোকের সহিত যে কিছু বিসম্বাদ ও পার্থক্য হয়, তাহার অধিকাংশ এই পোড়া কাপড়ের খাতিরে। কারণ ব্যবহার-বৈষম্য প্রায় কমিয়া আসিয়াছে; দেশে বসিয়া যে "অনাচার কদাচার" অভ্যস্ত হয়, অনেক বিলাত ফেরতও তাহার নিকট হার মানেন।

আহারাদি বা পোষাক পরিচ্ছদের জন্য আমার কখন কোথাও কোন অসুবিধা হইবে, তাহা কখন মনে হয় নাই। এখনও ঘটিতেছে না।

কোথাও কোথাও রাস্তার মাথার উপর দিয়া, কোন কোন রেল পুল বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার উপর ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম, ঘোড়ার বস্, Taxi Cab, Taxi Motor Cab, Hansom, Four Whe,eler, Bicycle এ সব ত চলিয়াছেই। রাস্তার নীচে প্রথম তালায় District Railway; সিঁড়ি দিয়া লাইনে ও প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া যাইতে হয়। তাহার নীচে—মাটির প্রায় ৭০।৮০ ফুট নীচে লোহার প্রকাণ্ড নল করিয়া তাহার ভিতর Tube Electric Railway; হাজার হাজার লোক প্রতি ঘণ্টায় যাতায়াত করিতেছে। লোকের সিঁড়ি দিয়া নামা-উঠা অসম্ভব বলিয়া, প্রকাণ্ড Lift সর্ব্বদা উঠিতেছে নামিতেছে। Lift যদি কোন গতিকে বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ। কখন কখন এরূপ সর্ব্বনাশ না হয়, তা নয়। তবে এরূপ বিপদ ঘটিলে, কোন মতে উঠিবার জন্য সিঁড়িরও আয়োজন আছে। নিতান্ত আতঙ্কের সময় হাজার হাজার লোক ঠেলাঠেলি

করিলে বিষম বিপদ সম্ভাবনা। কিন্তু ইংরাজের অসাধারণ শৃঙ্খলা ও নিয়মপ্রিয়তা গুণে এরূপ *"হেড়োমো কাণ্ড" প্রায় ঘটে না।*

এ পাড়ার বাড়ীগুলি এক ধরণের তৈয়ারী। রাস্তা হইতে একটু ছাড়িয়া বাড়ী; সাম্‌নে একটু খোলা জায়গা রাখিয়া, রাস্তা হইতে একটু দূরে বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। সেই খোলা জায়গায় বাহিরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চাকরদের ঘর, রান্না-ঘর, কয়লা-ঘর যাইতে হয়। সে সিঁড়ি কেবল চাকরদের জন্য ও জিনিস-পত্র যাহারা যোগায় তাহাদের জন্য। সেই খানেই প্রায় ফুটপাথের উপর কয়লা দিবার গর্ত্ত আছে। লোহার চাদর দিয়া সে গর্ত্ত ঢাকা থাকে। কয়লার গাড়ী আসিয়া, চাদর খুলিয়া, গর্ত্তে কয়লা ঢালিয়া দেয়। বিনা বাক্যব্যয়ে ওজন, কুলী, গাড়ী-ভাড়ার "বচসা বিনা" কয়লা গৃহস্থের ভাণ্ডারে "স্বয়ম্ভু" হইয়া পৌঁছিয়া যায়। দোকানদারকে চিরকুট পাঠাইলে, সে সব জিনিস মাথায় করিয়া পৌঁছিয়া দেয়। স্বতন্ত্র মুটে ভাড়া লাগে না। "মাথায় করিয়া" মানে প্রায় ঘোড়ার গাড়ী, না হয় মোটরগাড়ী করিয়া, মাল তোমার বাড়ী পৌঁছিয়া দিবে। অতি সামান্য জিনিস কিনিয়া, ঠিকানা দিয়া আসিলেই এই রকমে মাল পৌঁছিয়া দেয়। নিজে হাতে করিয়া কিংবা মুটে করিয়া, জিনিস আনিবার প্রয়োজন প্রায় হয় না। সঙ্গে দাম না থাকিলে, মাল দিয়া বাড়ী হইতে টাকাও লইয়া যায়। মাটির নীচে যে সব ঘর, সেই খানে চাকরবাকর ও রান্নাঘরের ব্যবস্থা। আধুনিক প্রণালীতে যে ঘরবাড়ী হইতেছে, তাহাতে মাটির নীচের ঘর, বড় চলন নয়। কারণ আধুনিক তন্ত্রের চাকর চাকরাণীরা সিঁড়ি উপর-নীচে করিতে, বড়ই আপত্তি করে। আমাদের দেশেও এ ধূয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর সাম্‌নের ফাঁকা জায়গা দিয়া, আলো মাটির নীচে যায়। যেমন রাস্তা হইতে কয়লা ঢালিয়া দেয়, তেমনি রাস্তা হইতে মিউনিসিপলিটির লোক বিনা হাঙ্গামা-চীৎকারে ময়লাও উঠাইয়া লয়। গৃহস্থের দেকদারী হইবার সম্ভাবনা সর্ব্বরকমেই কম। আর রাস্তায় ময়লা-আবর্জ্জনা ঢালিয়া, রাস্তা অপরিষ্কার ও পথিকের অসুবিধা-গ্লানিরও কোন কারণ থাকে না। কোথাও কোথাও বাড়ীর সাম্‌নে একটু বাগানও

লণ্ডন ব্রিজ্

আছে। কিংবা Window Garden করিয়া, বাগানের সখ মিটাইতেও দেখা যায়। বড় বড় প্রায় সকল রাস্তার নীচে দোকানঘর—উপরে বসত-বাড়ী। কিন্তু এক এক রাস্তায় এক এক নিয়মে সকল বাড়ী-বাগানের বাহিরের নক্সা ও বন্দোবস্ত। জয়পুরের একটি রাস্তার এইরূপ বন্দোবস্তে এত বাহাদুরী জাহির। লণ্ডনের প্রায় সকল নূতন রাস্তাতেই এই বন্দোবস্ত। তাহাতেই রাস্তার সৌষ্ঠব যথেষ্ট হয়। কিন্তু আগন্তুকের পক্ষে অসুবিধা অনেক; নিজের বাড়ী, বন্ধুর-বাড়ী সহসা ঠিক করিতে পারার একটু গোল হয়। নম্বর ভুলিয়া গেলে, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ ভ্রান্তি-বিলাসের অভিনয়ও হয়। যাহা হউক, গৃহস্থালী একপ্রকার গুছাইয়া পত্রাদি লিখিলাম; কারণ, শুক্রবার বিলাত হইতে ডাক যায়। ডাক্তার পি, সি, রায়কে লইয়া, Cromwell Road, Northbrook Society দেখিতে গেলাম। Pearson, ও Cheshire সাহেবের সহিত ও National Indian Associationএর Secretary Miss Beckএর সহিত দেখা ও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভারতবর্ষীয় কয়েকজন ছাত্রের সহিত দেখা হইল। পঞ্জাব, বম্বে অঞ্চলের ছেলেরা বিশেষ স্বাধীন ও সাহেব দেখিলাম। আগন্তুক দেখিয়া, তাহাদের বড় সমীহ মনে হয় না—খাতির-সম্ভ্রমও ততটা আসে না। কিন্তু বাঙ্গালী ছেলেরা খাতির-সম্ভ্রম যথেষ্ট করিল। গবর্ণমেণ্টের সংস্রব আছে বলিয়া, Northbrook Society, ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের বড় প্রিয় নয় বরং যাহারা তথায় যাতায়াত করে ও সেখানে থাকে,

তাহাদিগকে কেহ কেহ কিছু সন্দেহের চক্ষে দেখে। একথা সম্প্রতি আরও ঘনীভূত হইয়াছে। যাহাতে সকল ভারতীয় ছাত্রের সর্ব্বতোভাবে সুবিধা; সুবন্দোবস্ত, ও শৃঙ্খলা থাকে, তাহার চেষ্টাতে নর্থব্রুক সোসাইটি এই বাড়ীর সৃষ্টি, আর আমি Kings Memorial সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাও অনেকটা এই ধরণের; তবে বন্দোবস্তের অভাবে যদি কোন দুর্নাম উপস্থিত হয়, সকলের চেষ্টা করিয়া, তাহার নিরাকরণ করা উচিত। তাহা বলিয়া, ছেলেদের উপর গোয়েন্দাগিরি করিলেও অন্যায় করা হইবে। সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য না করিয়া লইলে, কোন পক্ষেরই শ্রেয়ঃ নাই।

ছেলেদের জন্য বন্দোবস্ত বেশ আছে। London University, Albert Hall, Science and Technological College, Kensington Garden, Kensington Museum প্রভৃতি সমস্তই এ স্থান হইতে অতি নিকটে।

সেই খানে বসিয়াই শোনা গেল, Sir Beerbhom Tree, Shakespare Revival উপলক্ষে আজ রাত্রে Merry Wives of Windsor অভিনয় করিবেন এবং Falstaff সাজিবেন। কাল হইলেই বর্ত্তমান অভিনয়ের পালা শেষ হয়। বন্ধুদিগের উপরোধে আহারাদির পর His Majesty's Theatreএ যাওয়া গেল। নীচের ক্লাসে ভয়ানক ভিড় হয়। স্থান পাইবার জন্য অনেক স্ত্রী-পুরুষ পরে পরে কাতার দিয়া (Venew) দাঁড়াইয়া ফুটপাথে থাকে। এত ভিড় যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিস পাহারা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কেহ কাহাকেও ঠেলিয়া আগাইয়া যাইতে পারিবে না। যে যেমন আসিয়া টিকিট কিনিয়াছে, সে সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে ভিতরে যাইতে পারিবে। অনেকে নাকি ভোর বেলা হইতে রুটিবিস্কুট সঙ্গে লইয়া আসিয়া, এইরূপে সমস্ত দিন কাটাইয়া সাম্নের স্থান দখলের চেষ্টা করে। আমাদের জায়গা পূর্ব্ব হইতে টেলিফোঁ সাহায্যে বেশী দাম দিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল বলিয়া, কষ্টের কোন কারণ ছিল না। সিঁড়ি ও বন্দোবস্ত সব আলাদা। ভিড়ের মধ্যে আদৌ যাইতে হইল না।

থিয়েটারটি বিশেষ বড় কিংবা জাঁকজমকের নহে। তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। Programme-খানিও ছয় পেনী দিয়া কিনিতে হইল অথচ তাহাতে কিছুই নাই। অপেরা গেলাস ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয়, চৌকির সাম্নেই অপেরা গেলাস লাগান আছে। ছয় পেনী একটা গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া দিলেই অপেরা গেলাস হাতে আইসে। ব্যবহার হইলে আবার রাখিয়া দাও।
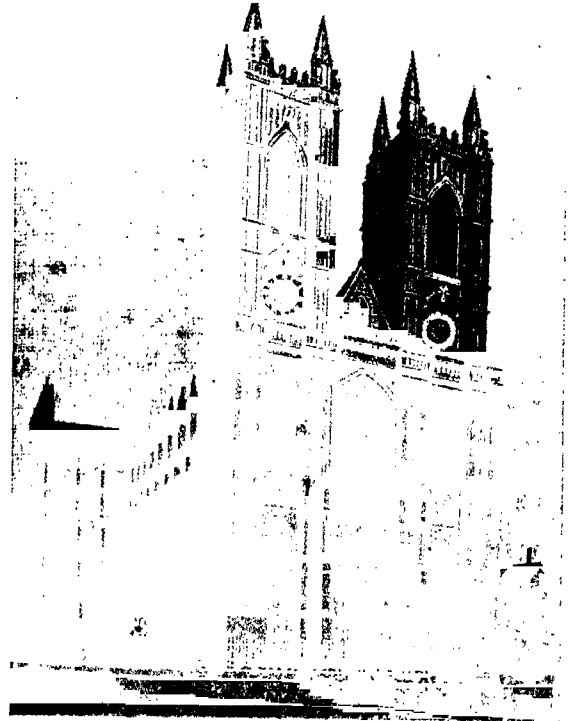
ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার এবি

Sir Beerbhom Treeর Shakespeare অভিনয় সম্বন্ধে নামডাক-প্রতিপত্তি খুব আছে; কিন্তু যতদূর—কৃতকার্য্যতা তত বেশী নয়। Benson, Frank, Robertson, Bourchier, এমন কি, ছোট Irvingও ইহার অপেক্ষা উচ্চ দরের অভিনেতা বলিয়া শোনা যায়। Sir Henry Irvingএর অভিনয়ের পর ইঁহাদের কাহারও অভিনয় তেমন "জমে না"। খুব উচ্চ দরের অভিনেতারও Merry Wives of Windsorএর অভিনয়ের গুণপণায় বড় সুবিধা নাই। পুস্তকের আগাগোড়া পূর্ণমাত্রায় ভাঁড়াম আছে। বর্ত্তমান অভিনয়ে তাহার কিছু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখা গেল। আর যেখানে নাচ-গানের সুবিধা পাইয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা সেইখানে তাহার প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। আমাদের দেশের Theatre এ যে এই সব দোষ ঢুকিয়াছে,

হা বোধ হয়, বিলাতের অনুকরণে যে সব নিম্ন শ্রেণীর য়েটার শীতকালে ভারতবর্ষে যায় আসে, তাহাদেরই খিয়া শুনিয়া। অভিনয় কাহারও বিশেষ ভাল লাগিল । রাত্রে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফেরা গেল। অতএব লণ্ডে আসিয়া সেক্সপীয়র অভিনয় দেখার মজুরী পাষাইল না। ভাল ভাল থিয়েটারের সময় অতীত হইয়া য়াছে। অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া, এ সব জিনিস খিবার সুবিধা সম্ভাবনা নাই।

বিলাত প্রবাসের প্রারম্ভটা বড় সুবিধার হইতেছে না বলিয়া, মনটার উপর "ভিজা কম্বলের" ন্যায় বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রবিবার ৯ই জুন।—আজ সকাল বেলাও অবিশ্রাম বৃষ্টি। বৈকালে বৃষ্টি থামিলে, Tube Railway দিয়া Kew Gardan দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড Botanical Garden—Hot-house, Palm-house, Chinese Pagoda প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। যে যে Temperatureএ যে যে গাছ ঠিক থাকে, সেই-

পার্লামেণ্ট হাউস
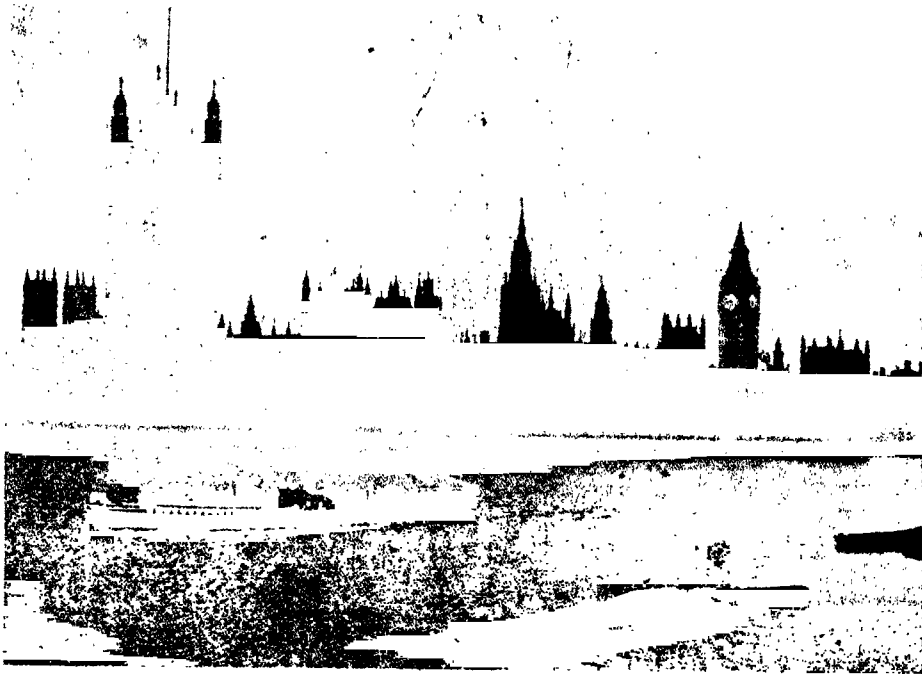
শনিবার ৮ই জুন।—দিনরাত্রি বিভাগ করা এক রূহ ব্যাপার। রাত্রি ৮॥ পর্য্যন্ত দিনের আলো থাকে, এদিকে ভার তিনটা না হইতে হইতেই আলো। কাজেই অন্ধকারে ঘুমাইবার আর সময় পাওয়া যায় না। তার উপর বৃষ্টি। গ্রীষ্মকালে Englandএ Leafy Juneএর প্রত্যাশায় আসিয়া, এত বৃষ্টি-বাদল ভাল লাগে না। আজ প্রায় সমস্ত দিনটাই ঘরে দরজা বন্ধ করিয়াই কাটাইতে হইল। বৈকালে Cornwall Gardensএ Mrs. P. K. Rayএর সহিত দেখা করিতে যাওয়া গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার পুত্র বাড়ী ছিলেন; ফিরিবার সময় পথে চায়ের দোকানে চা খাইয়া বাড়ী আসিলাম।

রূপ হিসাবে গাছ সব সাজাইয়া Hothouse-এ রাখিয়াছে। Botanical Studies-এর জন্য এই বাগান বিখ্যাত। চারিদিক দেখিয়া, বড়ই আনন্দ ও যথেষ্ট নূতন বিষয়ের শিক্ষা হইল।

সোমবার ১০ই জুন।—University Congressএর Secretary, Dr. Alex. Hill-এর সহিত দেখা করিতে গেলাম। Congress সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বন্দোবস্তের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমি এত পরিশ্রম করিয়া, যে সব তথ্যসংগ্রহ করিয়াছি, তাহা কোন বিশেষ কাজে আসিবার সম্ভাবনা দেখি না। কেননা, ভারতের

পক্ষে বেশী কথা শুনিবার বিশেষ আগ্রহ দেখিতেছি না। তিল-কাঞ্চনে সারিবারই ব্যবস্থা। বক্তাদের নাম যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমার নাম অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং একটা বক্তৃতা করিয়া দুঃখ-নিবারণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা করিতে পারা যাইতে পারে, এইরূপ ভাব। তাহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম-গবেষণার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আসল বিষয়ের কিছুই হইবে না, তাহা Hillসাহেব শাকে-প্রকারে যেন স্পষ্টই বলিয়া দিলেন। জানিয়া এই মাত্র সান্ত্বনা যে, আর অকারণ পরিশ্রম না করিয়া, গণ্ডায় আণ্ডা দিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু ইহা পূর্ব্বে বুঝিলে, শরীর, অর্থ, মনের সুখ ও কাজ নষ্ট করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, আসিবার প্রয়োজন হইত না। ভারতবর্ষের বিষয় বিশেষরূপে আলোচনার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট দিন দূরে যাউক একটি নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থির করাইতে পারিলাম না। Australia, Canada, South Africa পর্য্যন্ত যে সকল অধিকার পাইয়াছে ও পাইবে, ভারতবর্ষ তাহা হইতে সম্পূর্ণ রক্ষিত।

South Kensington হইতে Charring Crossএ পূর্ব্ব বন্দোবস্তমত যাইয়া, আমাদের পুরাতন বন্ধু এটর্ণি Farr সাহেবের সহিত মিলিত হইলাম। তাঁহার জন্য অনেক-ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের দুই একটা বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিয়াই এবং কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই, স্বতঃই মনে হইল যে, একটি House of Commons আর একটি Westminster Abbey. কিন্তু দূর হইতে যত শোভা-সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্য কল্পনা হইত, নিকটে আসিয়া যেন ততটা মিলাইয়া পাইলাম না। তাজমহল দেখিয়াও মনে হয়—"যে এই কি সেই জগদ্বিখ্যাত তাজমহল!" কিন্তু দেখিতে দেখিতে সব সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া উঠে।—Arnold তাঁহার Philosophy of Historyতে Romeএর St. Paul সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। Farr সাহেব আসিলে, তাঁহার সহিত Downing Street, White Hall, Privy Council, প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে যে স্থান দিয়া Charles I. কে বধ্যস্থলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া India Officeএ গেলাম। ইহা প্রকাণ্ড বাড়ী। সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব জজ Sale সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া, নানা কথাবার্ত্তার পর Farr সাহেবের নিকট বিদায় লইলাম। Sale সাহেব এখন India office-এর আইন-উপদেশক।

Temperance Societyর Frederick Grubb, Wimbleden Park-এ থাকেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বাড়ী যাইবার সময় যে রহস্য-জনক ঘটনা ঘটিল, তাহা অনেকের ঘটিবার সম্ভাবনা। কয়েক দিন ধরিয়া Rehearsal দিয়াও পথঘাটের গুপ্ত তথ্য এখনও দখল হয় নাই, তাহার পরিচয়-রূপে একথা বলিতেছি। Wimbleden ও Wimbleden Park নামে স্বতন্ত্র ষ্টেশন আছে। সেই খেয়াল না থাকাতে Wimbleden Park এড়াইয়া Wimbledenএ যাইয়া উপস্থিত। রেলওয়ে নিয়ম অনুসারে তৎক্ষণাৎ পরের ট্রেণে বিনা খরচায় Wimbleden Parkএ ফিরিতে পারিতাম। তাহা না জানা থাকার দরুণ বিস্তর খরচ করিয়া, গাড়ীভাড়া করিয়া, Wimbleden Parkএ ফিরিয়া আসিতে হইল। Lord Morley এইখানে থাকেন। স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—Garden Suburbs, এখানের বাড়ী বাগান অতি পরিষ্কার বড় বড় খেলাধুলার জন্য সময়ে সময়ে সহর হইতে লোক গিয়া ভিড় করে। গ্রাব্ সাহেবের বাড়ীতে চা খাওয়া হইল ও নানা কথাবার্ত্তা হইল। গ্রাব্ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী বড় অমায়িক; তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিলেন, বাড়ীতে থাকিবার জন্য ও Temperance সম্বন্ধে নানাস্থানে বক্তৃতা করিবার জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমার আর ভাল লাগিতেছে না। Congress এ যে কাজ নিশ্চয় হইবে মনে করিয়াছিলাম, তাহার কোন সুযোগ নাই। Temperance Federationএর প্রধান Meeting হইয়া গিয়াছে। আর অকারণ বাড়ী ছাড়িয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই, এই সব মনে হইতেছে। আর মনের উৎসাহও কমিয়া যাইতেছে। বিলাত আসিবার সম্বন্ধে অনেকে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন; সেই সকলের ফল-স্বরূপ এই সব বাধা-বিঘ্ন ঘটিতেছে, বোধ হয়। তবে ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসি নাই, এই জন্য নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা ও তন্নিমিত্ত মনঃক্ষোভের কোন কারণ নাই—বা সান্ত্বনা। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"।

ভারতে নৌ-বিদ্যা

বইখানি ইংরাজী-ভাষায় লিখিত; ইহার নাম—A History of Indian Shipping and Maritime Activity From the Earliest Times, অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম কাল হইতে অর্ণবযান সম্বন্ধে কার্য্যকুশলতার ইতিহাস। লেখক মনস্বী শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ-মহাশয়। আজকালকার দিনে আমাদের দেশের লোকে নাটকনবেল পড়েন, বাজে বই পড়েন; অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীই ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার অনেকেই ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব-পাঠে এমন নিবিষ্টচিত্ত এবং আদিম-ভারতের ইতিহাস-অনুসন্ধানে তাঁহাদের এত আগ্রহ যে, দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমাদের দেশের কথা অনুসন্ধানের উৎসাহ বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই, আর বিদেশীয়গণ আমাদের দেশের তথ্য অবগত হইবার জন্য প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন! আমাদের এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য যে অল্প কয়েকজন বাঙ্গালী চেষ্টাযত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, অধ্যাপক রাধাকুমুদ বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া, বহুকাল অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিয়া, হিন্দুদিগের অর্ণবযান ও বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী অধ্যাপক রাধাকুমুদ বাবুকে একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুস্তকখানি ইংরাজী-ভাষায় লিখিত। ইহাতে হয় ত অনেকে দোষ ধরিতে পারেন; কিন্তু আপাততঃ ইহাতে আমরা দোষের কোন কারণই দেখি না। তোমার দেশের কথা, তোমাদের পড়িবার আগ্রহ নাই; যদিই বা দুইচারি জনের থাকে, তাঁহারা সকলেই ইংরাজী-ভাষায় অভিজ্ঞ। ওদিকে যাঁহারা এই সকল তথ্য অবগত হইবার জন্য আগ্রহপরায়ণ, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা জানেন না। এ অবস্থায় শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বাবু তাঁহার পুস্তকখানি প্রথমে ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া, ভাল কাজই করিয়াছেন; যাঁহারা এ সকল কথা জানিতে চান, যাঁহারা এ প্রকার চেষ্টাযত্ন ও গবেষণার মূল্য বোঝেন, পুস্তকখানি সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের অধিগম্য করিয়া, গ্রন্থকার উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকের এই তথ্য জানিবার জন্য আগ্রহ দেখিলে, গ্রন্থকার মহাশয়ের পক্ষে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করা অতি অল্প আয়াসসাধ্য ব্যাপারই হইবে।

এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য রাধাকুমুদ বাবু অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার জন্য সমস্ত মালমসলা তাঁহাকে খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। বৈদেশিক পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে যতটুকু অনুসন্ধান করিয়াছেন, রাধাকুমুদ বাবু তাহাই জোড়াতাড়া দিয়া এই পুস্তকখানি লেখেন নাই; এই পুস্তকে পূর্ব্ববর্ত্তী গবেষণার অতিরিক্ত অনেক মৌলিক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহারই জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট এই পুস্তকের এত আদর হইয়াছে।

এই দীর্ঘকায় ২৮৩ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকের সমস্ত কথা বিবৃত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বাবু এই পুস্তকে একটিও অবান্তর কথার উল্লেখের স্থান পান নাই, একটুও বর্ণনা-চাতুর্য্য দেখাইবার অবকাশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই! তিনি এই ২৮৩ পৃষ্ঠার মধ্যে এত অধিক তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, পাঠ করিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এ পুস্তকের সার-সংগ্রহ করা যায় না, কারণ ইহাই যে সার-সংগ্রহ; সমস্ত পুস্তকখানি অনুবাদ করিয়া দিলে তবে এই পুস্তকের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা হয়। আমরা এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, একটি বিষয় বিশেষভাবে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাচীন ভারতের অর্ণবপোত ও নৌ-বাণিজ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে, দুইটির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; প্রথম স্বদেশ-লব্ধ উপকরণ, দ্বিতীয় বৈদেশিক উপকরণ। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বাবু বৈদেশিক তথ্যের উপর তাঁহার গবেষণার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। আমরা দেখিলাম যে, তিনি আমাদের দেশের গ্রন্থাদি ও

কাগজপত্র প্রভৃতিকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্ধ ভক্তের ন্যায় যাহা কিছু সংস্কৃত, পালি, বা পারস্য ভাষায় লিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; যুক্তি, তর্ক, ঘটনাপারম্পর্য্যে যাহা খাঁটি বলিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রমাণস্থলে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রাধাকুমুদ বাবু বলিয়াছেন—"The evidences that will, therefore, be first presented will be all Indian, being those supplied by Indian Literature and Art, and after them will follow the evidences derived from foreign sources."—অর্থাৎ 'ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা হইতে যে সমস্ত প্রমাণ সংগৃহীত হইবে, তাহাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে; তাহার পর, বৈদেশিক প্রমাণের আসন দিতে হইবে।' রাধাকুমুদ বাবু তাহাই করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহের জন্য, তাঁহাকে ভারতের সমুদ্রোপকূলভাগে পরিভ্রমণ করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই সকল প্রমাণের সাহায্যে তিনি দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইত এবং ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বহুদূরদেশপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাঁহারা এই সকল কথা জানিতে চান, তাঁহারা রাধাকুমুদ বাবুর এই পুস্তকখানি অধ্যয়ন করুন। সর্ব্বশেষে আমরা শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বাবুকে একটি অনুরোধ করিতে চাই। তাঁহার এই পুস্তকখানি পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে তিনি যাহা শুনাইতে ও জানাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি শুনাইয়াছেন ও জানাইয়াছেন ; এখন তিনি আমাদের এই যাবতীয় গৌরবের কথা আমাদের দেশবাসীকে ভাল করিয়া জানাইয়া দিন ; তিনি তাঁহার এই সুন্দর পুস্তকের একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত করুন। বাঙ্গালা-ভাষার ভাণ্ডারে এমন ইতিহাসের স্থান শূন্য থাকিবে কেন ? বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান রাধাকুমুদ বাবু আমাদের এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা অবশ্যই অনুভব করিতে পারিবেন।

পোলাও পুলি ও পুলিপোলাও

[শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী]

খাও ধনী খাও, খুব খাও
পোলাও পুলি পায়স অন্ন,
আমি চল্লেম পুলিপোলাও,
তোমার কি দায় আমার জন্য ?

চাকরী গেল মান রাখ্‌তে
পড়্‌ল 'সাবাস' 'সাবাস' ডাক,
মাসিক পত্রে ছবি ছাপায়
'দৈনিক' বাজায় জয়ঢাক।

গোষ্ঠি মরছে উপোস ক'র
খেত যারা আমার ভাত,
ধন্য দিয়ে ভুলায় দেশ
অন্নের বেলায় গুটায় হাত।

অচিকিৎসায় ম'ল মেয়ে
স্ত্রীকে কর্‌লাম অন্তর্জলি।
খোকা ধুক্‌ছে জ্বরে পড়ে
ঝি পালাল 'দেউলে' বলি!

বন্ধুরা সব মুখ ফিরাল
চাইতে গেলাম যখন কড়ি,
মহাজনের সিংদরজায়
হত্যা দিলাম ধূলায় পড়ি'।

মাথা খোঁড়া কান্নার চোটে
বাবু এলেন হাতে কোড়া,
মদের নেশায় ধনের উষ্মায়
ভাব্‌লেন আমায় গাধা ঘোড়া।

সপাং সপাং চল্‌ল চাবুক
পিঠের চামড়া উঠে আসে,
মোসাহেবদের ভারি ফূর্ত্তি,
দেখিয়ে দেখিয়ে আমায় হাসে!

ঘেয়ো বাঘের মত তেড়ে
গর্জ্জে উঠ্‌লাম হঠাৎ কখন,
বাবুর নাকে মার্‌লাম মুষ্টি
হলেন ঠাণ্ডা জন্মের মতন!

খাও, ধনী, খাও কালিয়া কাবাব
উড়াও ফূর্ত্তি 'ফ্যানের' তলায় ;
চল্‌ল একটা হতভাগা
ফাঁসির রসি পর্‌তে গলায়॥

পুস্তক-পরিচয়

মিশরমণি—ক্লিওপেট্রা

[শ্রীপ্রথমনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ; মূল্য এক টাকা মাত্র]

এখানি নাটক। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাটক লেখার এই প্রথম উদ্যম। আমরা বলিতে পারি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রথম উদ্যম জয়যুক্ত হইয়াছে। তিনি এই পুস্তকখানি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন।

মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার নাম ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন; তাঁহার অভূতপূর্ব্ব অচিন্তিতপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ ইতিহাস-পাঠকগণের অপরিচিত নহে। প্রমথ বাবু সেই মিশরমণি ক্লিওপেট্রার জীবনের ঘটনাবলি নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, যে সময় এই ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা আজকালিকার বা দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বের কথা নহে; সে সময়ের উপর দিয়া দুই হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে,—তাহা আদিম সভ্যযুগের মিশর ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব, বৈচিত্র্যময় ইতিহাস। এতকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই ইতিহাস বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার মুখবন্ধে বলিয়াছেন—"নট-কুলচূড়ামণি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'ম্যাকবেথ' অভিনয়ের সময় প্রথম একবার এই চেষ্টা করেন;—তখন, বোধ হয় সময় হয় নাই বলিয়া, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে ম্যাকবেথের আশানুরূপ আদর হয় নাই। এখন ভরসার মধ্যে এই যে, আজকাল অনেকে বায়স্কোপের অভিনয় দেখেন,' ও ক্রমে বৈদেশিক নাটক-দর্শনে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়াছেন। এখন ইহা অনেকের কাছে বিসদৃশ না লাগিতেও পারে, এই আশায় এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।" প্রমথ বাবু যে আশা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। যে সময়ে ম্যাকবেথের অভিনয় হয়, তখন দর্শকগণ বিদেশের দৃশ্যাবলি দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই; তাই গিরিশচন্দ্রের এমন সুন্দর ম্যাকবেথও জনাদর লাভ করিতে পারে নাই। এখন আর সে সময় নাই; এখন বৈদেশিক নাটকের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত লোক যথেষ্ট হইয়াছে। তাহার পর ক্লিওপেট্রার জীবনের কাহিনী—সে এক আশ্চর্য্য ও ঘটনা-বহুল ব্যাপার। সুতরাং ক্লিওপেট্রা নাটক পড়িবার ও তাহার অভিনয় দেখিবার লোকের অভাব হইবে না; গ্রন্থকারের আশা সফল হইবে।

রাণী ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক আছে; তাহার মধ্যে মহাকবি সেক্‌স্পীয়রের 'Antony and Cleopatra,' ড্রাইডেনের 'All for Love', ও সার রাইডার হ্যাগার্ডের 'Cleopatra' সর্ব্বপ্রধান। প্রমথ বাবু সার রাইডার হ্যাগার্ডের 'Cleopatra'র উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নির্ভরমাত্রই করিয়াছেন, অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নাই, অনুবাদ করেন নাই; তিনি ছাঁচ লইয়াছেন মাত্র—বর্ণবৈচিত্র্য, বর্ণনামাধুর্য্য, রসাভাস সমস্তই তাঁহার নিজস্ব। তাহা না করিয়া অন্ধভাবে কোন লেখকের অনুসরণ করিলে, তাঁহার ক্লিওপেট্রা এমন সুন্দর হইত কি না, এমনভাবে বাঙ্গালী পাঠকসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে পারিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

প্রমথ বাবুর ক্লিওপেট্রা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে, দর্শকগণও অভিনয় দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, নবীন গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা যথেষ্ট সৌভাগ্যের কথা। পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, প্রমথ বাবু কোথাও ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই, অথচ যেখানে যেমন করিয়া সাজাইলে, যাহার মুখে যে কথাটা দিলে, বাঙ্গালী পাঠক প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা করিয়াছেন। একজন নবীন লেখকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার ক্লিওপেট্রা জনাদর লাভ করিবে, ইহা আমরা বলিতে পারি। আমাদের স্থান সংক্ষেপ, তাই আমরা ইচ্ছাসত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রমথ বাবুর সৌন্দর্য্যবোধ ও লিপিকুশলতা দেখাইয়া দিতে পারিলাম না; পাঠকগণ পুস্তকখানি পাঠ করিলেই লেখকের শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

পুষ্পক

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি.এল.-প্রণীত ; মূল্য এক টাকা মাত্র]

ইহা একখানি ছোট গল্পের সংগ্রহ; এই গল্পগুলি পূর্ব্বে নানা মাসিকপত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল; কয়েকটি গল্প ইতঃপূর্ব্বেই হিন্দীভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে। এই সংগ্রহে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রবাবু বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত; তাঁহার নাটকগুলি ও তাঁহার ছোটগল্প ও উপন্যাস সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি একজন যশস্বী লেখক; বর্ত্তমান সংগ্রহ-পুস্তকে তাহার সে যশঃ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; সকল গল্পেই তাঁহার ওস্তাদি হাত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই ১৫টি গল্পের প্রত্যেকটিই সুন্দর; তবুও আমরা বিশেষভাবে তাঁহার পত্নীপ্রেম, জীবন-নাট্য, স্নেহের জয়, হকের ধন প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করিতেছি। বাস্তুভিটা গল্পটি Daudetএর একটি গল্পের অনুসরণে লিখিত। বাস্তুভিটার উপর সে-কেলে লোকের যে কেমন একটা প্রাণের টান ছিল, তাহা বৃদ্ধের দুই চারিটি মর্ম্মভেদী কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু এখনকার লোকে কি বৃদ্ধের সে অন্তর্দাহ বুঝিতে

পারিবেন? তাহা বুঝিলে কি বুড়ার ছেলেরা বাড়ী বিক্রয় করিতে চাহিত? লেখক সমস্ত প্রাণের আবেগ তাঁহার এই বাস্তুভিটা গল্পে ঢালিয়া দিয়াছেন। একটি গল্পের কথা বলিলাম; এই সংগ্রহের সমস্ত গল্পই এই রকম সুন্দর, এই রকম পাকা হাতের লেখা।

মুক্তধারা

[শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পোদ্দার-প্রণীত; মূল্য এক টাকা মাত্র]

লেখক নবীন; এই মুক্তধারাই তাঁহার প্রথম পুস্তক। তিনি প্রাণের আবেগে এই মুক্তধারা লিখিয়াছেন। বইখানি পড়িলেই মনে হয়, লেখকের মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তিনি তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে মুক্তপ্রাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং পুস্তকখানির নামকরণ সার্থক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই পুস্তকের একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। লেখক নবীন হইলেও তাঁহার ভাষা অতি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী; লেখার কোন স্থানে কষ্টকল্পনা নাই; তাহা হইলে ইহা মুক্তধারা হইত না। পুস্তকখানি যে কেবল ভাবোচ্ছ্বাস, তাহাও বলা যায় না, কারণ শ্মশানচিন্তা নামক প্রবন্ধে লেখক মহাশয় অনেক তত্ত্বকথারও অবতারণা করিয়াছেন এবং সে সকল কথাও তাঁহার সুললিত ভাষার গুণে কটমট হয় নাই, বেশ পড়িয়া যাওয়া যায় এবং লেখক যে কি বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে একটুও ভাবিতে হয় না। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের ইহা প্রথম উদ্যম হইলেও তিনি কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি অতি সুন্দর।

তিব্বে মসিহা বা সহজ হাকিমী শিক্ষা

[হাকিম মসিহর রহমান কোরায়শী-প্রণীত; মূল্য দুই টাকা]

হাকিমী চিকিৎসার গৌরব-কাহিনী আমাদের দেশে অজ্ঞাত নহে। হাকিম মসিহর রহমান কোরায়শী সাহেব এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া হাকিমী চিকিৎসা-তত্ত্বান্বেষিগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাতে ইউনানী বা হাকিমী চিকিৎসা শাস্ত্র মতে রোগের লক্ষণ, কারণ-নির্দ্দেশ ও উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা অতি সহজ সরল ভাবে সুশৃঙ্খলাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সতী-দাহ

[শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক-প্রণীত; মূল্য এক টাকা মাত্র]

বেদ, পুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, নানাদেশীয় সাহিত্য, ইতিহাস, হস্তলিখিত পুঁথি, এবং প্রচলিত কিংবদন্তীমূলক সহমরণ সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক নিবন্ধ পুস্তক। গ্রন্থকার কুমুদনাথ বাবুর পরিচয় দিতে হইবে না; তাঁহার 'নদীয়া কাহিনী', 'শ্রীগৌরাঙ্গ', 'শ্রীচৈতন্য' প্রভৃতি গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই কুমুদ বাবুর লিপিকুশলতার বিষয় অবগত আছেন। এই সতীদাহ পুস্তকখানি উক্ত প্রথার দোষগুণ-বিচারের জন্য লিখিত হয় নাই, গ্রন্থকারের তাহা উদ্দেশ্য নহে। তিনি সতীদাহের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিপিয়াছেন। যাহা শাস্ত্রোক্ত, যাহা প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্ট, যাহা ঐতিহাসিক সত্য, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য কতকগুলি প্রবাদমূলক ঘটনার বিবরণও এই পুস্তকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। কুমুদ বাবু বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সতীদাহ-নিবারণের সময় পর্য্যন্তের ইতিহাস ধারাবাহিক-ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সংগ্রহ-কার্য্যে কুমুদবাবুকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটিতে হইয়াছে, ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত অনেক কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয় যে সফল হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই পুস্তকে অনেকগুলি ছবিও দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানির ছাপা বাঁধাই, ছবি, সবই ভাল।

অদৃষ্ট-লিপি

[শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা]

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সামাজিক উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রথম উপন্যাস নহে; ইনি—মনোরমার গৃহ, দুখানি ছবি, কমল কুমার, মা ও ছেলে দুই খণ্ড প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই যশোভাজন হইয়াছেন; ইঁহার সর্ব্বপ্রধান পুস্তক 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত'। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক চণ্ডীবাবু পরিণত বয়সে এই 'অদৃষ্ট-লিপি' লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি আজকালকার ঘটনা লইয়া লিখিত নহে, অনেকদিন পূর্ব্বের কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তখন কুষ্টিয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের শেষ সীমা ছিল, কুষ্টিয়া তখন 'ছোট-কলিকাতা' নামে সে অঞ্চলে অভিহিত হইত। কুষ্টিয়ায় সে সময়ে অনেক কুলী-ডিপো ছিল; সেই সকল ডিপো হইতে আসাম অঞ্চলের চা-বাগিচাগুলিতে কুলী রপ্তানি হইত। 'অদৃষ্ট-লিপি'র নায়ক চিত্তরঞ্জন, কুষ্টিয়ার এক ডিপোর কর্ত্তা বৈদ্যনাথের জোরজবরদস্তীতে কুলী হইয়া আসামে প্রেরিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন খুব তেজস্বী ও নির্ভীক যুবক ছিল; সে ব্রহ্মপুত্র নদীতে সাঁতার দিয়া পলায়ন করে এবং মিঃ বেল নামক এক চা-কর সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করে। সাহেবের অনুগ্রহে তাহার উন্নতি হয় এবং পূর্ব্বে অজ্ঞাতকুলশীল অবস্থায় যে ব্রাহ্মণ গৃহে সে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর, সেই ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত চণ্ডী বাবু এই উপন্যাসের মধ্যে একটি মহাপুরুষ সন্ন্যাসীকে আনিয়া ফেলিয়াছেন এবং সেই সন্ন্যাসীর দ্বারাই সমস্ত ঘটনা পরিচালিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে মোক্ষদার চরিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবীণ লেখকের চেষ্টা সফল হইয়াছে। হিন্দুনারী কেমন করিয়া, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও, নারীধর্ম্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, আজকালকার ধর্ম্মজ্ঞান-হীন তথাকথিত শিক্ষিত ও পদস্থ যুবক প্রবৃত্তির তাড়নায় কেমন

গাওজ্ঞানহীন হয়, তাহা এই পুস্তকে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে।

The Positive Background of Hindu Sociology, Book I.

পুস্তকখানি যে ইংরাজী ভাষায় লিখিত, তাহা আর বলিতে হইবে না। লেখক শ্রীযুক্ত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম, এ-মহাশয়। অক্লান্তকর্ম্মা, মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সেবক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের এই পুস্তকখানি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'শুক্রনীতি' নামক বৃহদায়তন পুস্তকের ভূমিকা মাত্র। এলাহাবাদের পাণিনি অফিস হইতে এই সকল বহুমূল্য ও গভীর গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, এবং শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়ে এই মূল্যবান গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা মহিমময় আদিম হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ইতিহাস; 'শুক্রনীতি' অর্থেও আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি; কারণ নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধম্মসূত্র সমস্তই এই শুক্রনীতির অন্তর্গত। আদিম হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস বুঝিতে হইলে, এ সকল না বুঝিলে, এ সকল তত্ত্ব অবগত না হইলে, চলে না। সেইজন্যই এই উপক্রমণিকা ভাগের নাম—The Positive background of Hindu Socoilogy। এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আদর নিশ্চয়ই হইবে।

প্রেমাশ্রু

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি-এ. এল. এম. এস-প্রণীত ;
মূল্য আট আনা মাত্র]

এখানি কবিতা-পুস্তক। আজকাল বাজারে যে সমস্ত কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়, এখানি তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অন্যতম। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সাধক ব্যক্তি; এই কবিতা পুস্তকে তাঁহার সাধনার উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সত্যসত্যই প্রাণের গাথা, ইহা গঙ্গাজলের ন্যায় পরম পবিত্র; কবিতাগুলি পাঠ করিলে, ভক্ত সাধক হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই কবিতা পুস্তকের যথেষ্ট আদর হইয়াছে।

কবির প্রার্থনা

[শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ]

আপনি তুলিয়া আমার হস্তে
　　যে কাজ সঁপেছ, প্রভু।
ভয় হয় পাছে তাহার সাধনে
　　অবহেলা করি কভু।
তোমার মহান্ বিপুল কঠিন
　　করম সাধিতে গিয়া,
অবসাদ যদি ঘিরে ফেলে মোরে
　　পড়ি যদি ঘুমাইয়া ;
তবে তুমি মোরে মৃদু পরশনে
　　জাগায়ে দিওগো, প্রভু !

তোমার কীর্ত্তি কাহিনী কহিতে
　　পাঠায়ে দিয়াছ মোরে,
সর্ব্ব জগতে বাঁধিয়া রাখিতে
　　তোমার প্রেমের ডোরে ;
যদি গো তোমার চিহ্নিত পথ
　　ছাড়িয়া বিপথে যাই,
তোমার কীর্ত্তি কাহিনী ছাড়া
　　আর কিছু গান গাই ;
ভুলটুকু মোর ধরাইয়া দিও,
　　মূর্খে করুণা করে।

আমার হৃদয়ে তোমার মূরতি
　　আঁকিয়া কহেছ মোরে,
বিশ্ব মাঝারে দেখাতে সেরূপ
　　সর্ব্ব হিয়ার দ্বারে।
মোহন মধুর মূরতি তোমার
　　আমি কি আঁকিতে পারি ?
পরাণ মাতানো হাসির রেখাটি
　　ফুটাব কেমন করি ;—
তুমি যদি মোরে শিখায়ে না দাও
　　আমার লেখনা ধরে ?

যে কাজ আমারে সাধিতে দিয়াছ
　　প্রভু, হে হৃদয়রাজ !
বার বার তাহে পরাজয় মানি
　　পেয়েছি শতেক লাজ।
আমার ক্ষমতা, কতটুকু সে যে—
　　জান তো সকলি তার ;
আমি কি গো পারি সাধিতে তোমার
　　বিপুল কর্ম্ম ভার ?
দাও, প্রভু ! মোরে শিখায়ে কেমনে
　　সাধিব তোমার কাজ।

মহরম

[ইব্রাহিম খাঁ]

প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে ইসলাম-রবি হজরত মহম্মদের প্রিয়তম দৌহিত্র মহাত্মা হোসেন অনুচরবর্গের সহিত কারবালা প্রান্তরে হৃদয়ের পবিত্র রক্তে মহরমের স্মরণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। এ দুর্ব্বল লেখনীতে সেই পবিত্র মহরমের পুণ্য-চিত্র অঙ্কিত করা অসম্ভব।

৬৩২ খৃষ্টাব্দে, হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর, তদীয় প্রবর্ত্তিত নির্ব্বাচন-প্রথানুযায়ী পর্য্যায়ক্রমে হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, এবং হজরত ওসমান খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়া, ইসলামের ধর্ম্মরাজ্য শাসন করেন। হজরত ওসমানের মৃত্যুর পর হজরত মহম্মদের জামাতা, হজরত আলী, খলিফা-নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু মাবিয়ার কূটচক্রে অল্পকাল পরেই তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া, জ্ঞান-চর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে মসজিদে প্রার্থনা-কালে এক দুর্বৃত্ত ঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। তিনি তদানীন্তন মোস্‌লেম-জগতে জ্ঞান, বীর্য্য, ধর্ম্মানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার অশেষ গুণবতী ভার্য্যা, হজরত মহম্মদের দুহিতা, বিবি ফাতেমার গর্ভে তাঁহার হাসান এবং হোসেন নামক দুইপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে হজরত আলীর অবসরগ্রহণের পর মাবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধি-কামনায় দামেস্কে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান এবং তথায়, আপনার বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া, মৃত্যুকালে, পূর্ব্ব-অনুসৃত নির্ব্বাচন-প্রথার বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। অপরিণতবয়স্ক যুবক এজিদ, বিপুল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া, মদগর্ব্বিত, স্বেচ্ছাচারী, সুরাপায়ী, কুক্রিয়াসক্ত এবং ধর্ম্মকর্ম্মে উদাসীন হইয়া পড়েন। মদিনার লোক, তাঁহাকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া, মহাত্মা হাসানকে উক্ত গৌরবান্বিত পদে বরণ করেন। এজিদ কৌশলে কালকূট সাহায্যে হাসানের বধসাধন করেন, এবং হোসেনের বিনাশের জন্য এক বিপুল ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেন। এই হোসেন বধ-লীলা মহরম মাসে সংঘটিত হয়—ইহারই নাম 'মহরম'।
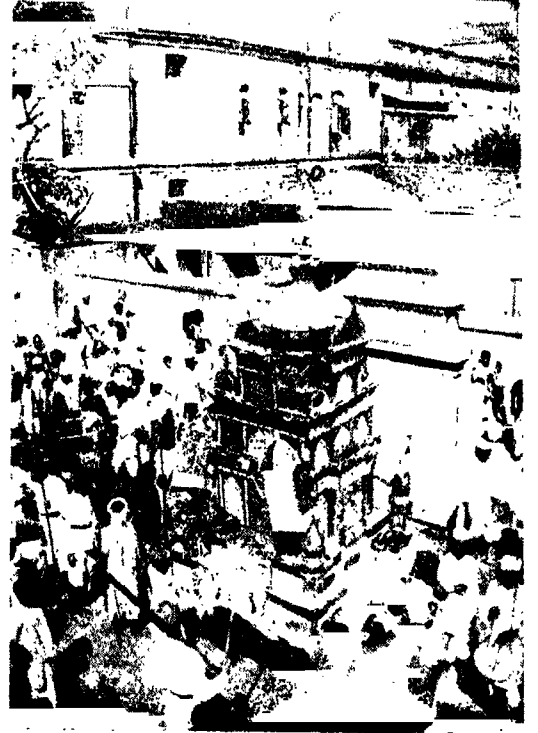
কলিকাতায় মহরম

হোসেন এজিদের প্ররোচনায় অনুচরবর্গের সহিত কারবালায় উপস্থিত। কারবালা এক বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তর; তাহার একদিকে এক বিজন অরণ্য, সম্মুখে ফোরাত (ইয়ুফ্রেটিশ) নদী, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে প্রান্তর-সীমা গগনসীমায় মিশিয়াছে। শিবিরসংস্থাপনান্তে পথশ্রান্ত তৃষাতুর অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে জলের অন্বেষণে ছুটিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সকলে ফিরিয়া আসিয়া, হতাশভাবে হোসেনের নিকট নিবেদন করিল—"অদূরে ফোরাত ভিন্ন আর কোথাও জল নাই; কিন্তু সে ফোরাত এজিদের বিপুল বাহিনী ঘিরিয়া রাখিয়াছে; বিনা যুদ্ধে এক বিন্দুও জল দিবে না।"

জলাভাবে হোসেন-পরিবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে।

াজ কি সানুচর হোসেন কারবালা প্রান্তরে দুর্ব্বল রমণীর ায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া পিপাসায় প্রাণত্যাগ করিবেন? না, র্ত্তি আজিদের সঙ্গে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া, র-শয্যা গ্রহণ করিবেন? কে যুদ্ধ করিয়া জল ানিবে? অনুচরগণের মধ্যে ওহাব নামে এক যুবক লেন; তাঁহার তেজস্বিনী মাতা জ্বালাময়ী ভাষায় পুত্রকে ক্ষ করিয়া জল আনিতে উত্তেজিত করিলেন। আরব-জীবনে াকৃতির প্রভাব বড় বেশী—আরব-চরিত্র জননী-জন্মভূমির রিত্রে বড় অনুপ্রাণিত। পথিক! তুমি আরবের প্রান্তর- ক্ষে দাঁড়াইয়াছ? দেখ দেখি কি সুন্দর দৃশ্য! উর্দ্ধে

বোম্বায়ে মহরম

অনন্ত উদার নির্ম্মল নীলিমা-সাগর, চতুর্দ্দিকে অনন্ত উদার শ্বেত বালুকা-সাগর; সেই সাগর বহিয়া ধীরে মুক্ত হাওয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য মধ্যগগনে আসিল; ঐ দেখ, তোমার পদতলের বালুকাকণা অগ্নিকণায় পরিণত হইয়াছে;—ঐ দূরে খর্জ্জুর-তলে গিয়া একটু দাঁড়াও। এইত আবার সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, আকাশে চাঁদ উঠিল, কৌমুদীস্নাত আরবের শুভ্রশীতল বক্ষে স্নিগ্ধ সমীরণ আনন্দে পাগল হইয়া ছুটিয়া খেলা করিতে লাগিল। এখন একবার আরব জীবন পর্য্যালোচনা কর; ঐ মুক্ত বায়ুর ন্যায় স্বাধীন, ঐ অনন্ত আকাশের ন্যায় দিগন্তব্যাপী বালুকা- সাগরের ন্যায় উদার—মহৎ, তেজস্বিতা এবং প্রতিহিংসায় ঐ নিদাঘ সূর্য্য-তাপিত বালুকারাশির ন্যায় অগ্নিময়, স্নেহ- প্রেম-ভক্তিতে ঐ চন্দ্রকরোজ্জ্বল আরবরজনীর ন্যায় স্নিগ্ধ-মনোরম। আজ এজিদের পাপ ষড়যন্ত্রে প্রভু-পরি- বারের বিপদে ওহাব-জননীর হৃদয় অগ্নিময় বালুকা- সাগরের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি ওহাবকে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে দেন নাই। প্রভু- পরিবারের বিপদ-মোচনের মহৎব্রতে যুদ্ধযাত্রীর আবার যুবতী স্ত্রীর মুখদর্শন কেন? ওহাব যুদ্ধে গেলেন; যাহা হইবার তাহাই হইল—কিছুক্ষণ পরে ওহাবের রক্তাক্ত দেহ লইয়া শিক্ষিত অশ্ব শিবিরে ফিরিল। ওহাবের মাতা পুত্রের মৃতদেহ কোলে লইয়া, ঘন ঘন চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, "বাছা! আজ তুই প্রভুর জন্য বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়েছিস—আজ তোর জননীর দুধের ঋণ শোধ হ'য়েছে।" তৎপরে বীরাঙ্গনা পুত্রের তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তাহার শোণিত অঙ্গে মাখিতে মাখিতে যুদ্ধে ছুটিলেন এবং কতিপয় বিপক্ষ সৈন্যের সংহার করিয়া সহিদ হইলেন। আর একটি রমণী এইরূপ পরের মঙ্গল-বেদিতে প্রাণ-প্রিয়তর পুত্রকে বলিদান করিয়াছিলেন—মহত্ত্ব-শৌর্য্যের লীলা নিকেতন রাজপুতানার এক দেবীপ্রতিমা ধাত্রী আপনার শিশুপুত্রকে বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া, শোণিত-লোলুপ শার্দ্দূলাধিক হিংস্র আততায়ীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া প্রভুপুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

কাসেম বীরসাজে সজ্জিত হইয়া, হোসেনের নিকট

যুদ্ধের অনুমতি চাহিতে আসিয়াছেন; কাসেম—মহাত্মা হাসেনের একমাত্র পুত্র, উদীয়মান যোদ্ধা, কন্দর্পকান্তি, পিতৃব্য এবং মাতার চক্ষুর মণি। যে অমূল্য রত্ন হাসেন মৃত্যুকালে হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আজ কোন্ প্রাণে হোসেন সেই শিশু-যোদ্ধাকে এজিদের সৈন্য-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আদেশ দিবেন? হোসেন পুনঃ-পুনঃ নিষেধ করিতেছেন, আর নবোন্মেষিত যৌবনগর্ব্বিত বিক্রান্ত কাসেম অগ্নিময়ী ভাষায় হোসেনকে যুদ্ধানুমতি-দানে উত্তেজিত করিতেছেন। অবশেষে, হোসেন কাসেমকে তাঁহার মাতার অনুমতি লইতে আদেশ করিলেন। কাসেম বহু অনুনয়ে মাতার অনুমতি লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন, এমন সময় হোসেন তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া কহিলেন,—"কাসেম! মৃত্যুকালে তোমার পিতা সখিনার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে কহিয়াছিলেন—আমিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ কর; আজ যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে আমার স্বর্গীয় ভ্রাতার নিকট যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, তাহা পূর্ণ করিব।" সখিনা, হোসেনের কন্যা—অতুল রূপসী, ততোধিক গুণবতী। যথারীতি বিবাহের আয়োজন হইল। সেই জ্বলন্ত মরু-প্রান্তরে পিপাসায় আসন্ন মৃত্যুমুখে বিবাহ হইবে! কি আয়োজনই বা হইবে? তথাপি বিবাহ হইল—কিন্তু সে দৃশ্য যে দেখিল, তাহারই হৃদয় মুগ্ধ হইল। ইতিহাসে এইরূপ আর একটি বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়; সে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত একটি দ্বীপের এক মহামনা স্বাধীনতার উপাসকের করুণ-কাহিনী। সমুদ্রতীরে বদ্ধাবস্থায় বীরের প্রাণ-সংহারের জন্য কতিপয় সৈন্য একসঙ্গে বন্দুক তুলিয়া ধরিয়াছে, এমন সময় এক রমণী আলুথালু বেশে আসিয়া মৃত্যু-পথের যাত্রীর সঙ্গে বিবাহের অনুমতি চাহিল—রমণী অপরাধীর বাগ্‌দত্তা। সেই সমুদ্রতীরে মুক্ত আকাশতলে দুই জনের বিবাহ হইল এবং পরমুহূর্ত্তে স্বদেশভক্তের প্রাণ শত্রুর গুলিতে অনন্তে মিলাইয়া গেল। এই দুই অভাগার বাসরশয্যা ঘটে নাই—এই দুই অভাগিনীর নয়ন-কোলে বিবাহের আনন্দাশ্রু দেখা দেয় নাই,—যদি দিয়া থাকে ত তাহা পরমুহূর্ত্তে বৈধব্যের শোকাশ্রুর সঙ্গে মিশিয়াছে।

বিবাহান্তে কাসেম যুদ্ধে চলিলেন; কাসেমের মাতা কহিলেন, "কাসেম যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে তোমার স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া যাও।" কাসেম বিদায় লইতে গেলেন। সখিনার আয়ত নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কাসেম কহিলেন, "সখিনা, আমাদের বিবাহ কেবল ইহকালের জন্য নয়, মৃত্যু এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। আজ যদি আমার বাসরশয্যার পূর্ব্বে শত্রুসংগ্রামে ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হয়, তবে দুঃখ কি সখিনা? মৃত্যু ত বীরের পক্ষে স্বর্গের সোপান।" সখিনা নীরব। কাসেম আবার কহিলেন, "ঐ শোন, শত্রুগণ রণবাদ্য বাজাইতেছে আরবের বীরকেশরী হজরত আলীর পৌত্র, মহাত্মা হাসেনের পুত্র, তোমার স্বামী কাসেম কি ঐ রণবাদ্য শুনিয়া শিবিরে স্থির থাকিতে পারে?" সখিনার অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নদ্বয় বিভাসিত হইল;—বীরজায়া গ্রীবা ঈষদুন্নত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যুদ্ধানুমতি প্রদান করিলেন।

কাসেম যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া হাঁকিলেন—"যাহার জীবনে অসাধ হইয়াছে, সে আমায় যুদ্ধ দাও।"—কেহ আসিল না। তখন এজিদের প্রধান সেনাপতি ওমর, প্রথিতনামা যোদ্ধার নিকট গিয়া কহিলেন—"বজ্জক! তুমি ভিন্ন কাসেমের সম্মুখীন হইবার কেহ নাই।" বজ্জক তুচ্ছতার হাসি হাসিয়া কহিলেন, "সেনাপতি মহাশয়, আপনার আজ্ঞা অবহেলা করি এমন শক্তি নাই; কিন্তু এ দাস জীবনব্যাপী সংগ্রামে যে জগত-জোড়া যশ অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা মুহূর্ত্তে এই বালক-সংগ্রামে বিসর্জ্জন দিবে, এই কি আপনার বিচার? আমার বীর্য্যবন্ত চারি পুত্র আছে; যে কাহাকেও আদেশ করুন, বালকের শির লইয়া আসিবে।" বজ্জকের প্রথম পুত্র যুদ্ধে গেল; ওমর ও বজ্জক দেখিলেন, কাসেমের অসিতলে অচিরেই সে জীবন বিসর্জ্জন দিল। দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধে আসিল, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারও মস্তক ভূমি-চুম্বন করিল। তৃতীয় পুত্র গেল, তাহারই ঐ দশা;—চতুর্থ পুত্রেরও ঐ একই। এবার ক্ষুধিত শার্দ্দুল উঠিল; সেনা-পতির আদেশ চাহিল না, আদেশের অপেক্ষাও করিল না; নীরবে কাসেমের সম্মুখীন হইয়া কহিল—"কাসেম! আমি, রুম, শাম, ইরাণ, আরবে যুদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু তোমার মত তরবারধারী দেখি নাই। তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে আমার চারিটি পুত্রকে হত্যা করিয়াছ—সে জন্য দুঃখ করি না; তোমার মত একজন উদীয়মান যোদ্ধা যে আমার হাতে

নিধন পাইবে, এই দুঃখ হইতেছে।” কাসেম কহিলেন, *“আমার এই দুঃখ হইতেছে যে, তোমার ন্যায় পুত্র-শোকাতুর* ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধের অঙ্গে আমায় বজ্রপ্রহরণ নিক্ষেপ করিতে হইবে।” বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হইল—উভয়েরই অশ্বদেহ ফেন উদ্গীরণ করিল—উভয়েরই বীরবপু শোণিতাপ্লুত হইল, রক্তরঞ্জিতা বিজয়লক্ষ্মী একবার কাসেমের দিকে, একবার বর্জ্জকের দিকে মস্তক হেলাইতে লাগিলেন। সহসা একবার এজিদের বিস্মিত সৈন্যদল দেখিল, কাসেমের তরবারির আঘাতে বজ্জকের ছিন্নশির ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল!

দিনের দারুণ পিপাসায় মাতৃস্তনে দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছিল; বালকের ক্ষুধা নিবারণ দূরে থাকুক, পিপাসা নিবারণ হইতেছিল না। সে পুনঃপুনঃ মাতৃস্তন মুখে দিয়া, দুধ না পাইয়া কাঁদিতেছিল। শিশুর আকুল ক্রন্দন মাতার হৃদয়ে শেলের অধিক বিদ্ধ হইল। তিনি শিশুকে কোলে লইয়া আসিয়া, তাহার জন্য এজিদ সৈন্যের নিকট কিঞ্চিৎ জল প্রার্থনা করিতে হোসেনকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে হোসেন শিশুকে কোলে লইয়া, এজিদ-সৈন্যের নিকট যাইয়া বলিলেন, “ভাইগণ, আমরা তোমাদের শত্রু—আমাদিগকে পিপাসায় হত্যা কর; কিন্তু এই নির্দ্দোষ

মান্দ্রাজে মহরম

দ্বন্দ্বযুদ্ধের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া, ওমর, কাসেমের বিরুদ্ধে দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কাসেম অশ্ব-বল্গা দন্তে ধারণ করিয়া, যুগপৎ অসি ও বর্ষার সাহায্যে সেই সৈন্যসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাসেম মানুষ, মানুষের যাহা সাধ্য, তাহা করিয়া, তিনি সহিদ হইলেন। নবীবংশের উদীয়মান গৌরবরবি অকালে অস্তাচলে গমন করিল, আরবের অভিমন্যু কৈশোরে সমরশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ হোসেন বধ। হোসেনকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার যুদ্ধে গমনের পূর্ব্বের একটি কথা বলিয়া লইতে হয়। হোসেনের এক দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তান ছিল। কয়েক

দুধের শিশুর ছাতি আজ পিপাসায় ফাটিয়া যাইতেছে; একবার উপরের দিকে চাহিয়া, খোদাকে স্মরণ করিয়া, একবিন্দু জল দ্বারা এই শিশুপুত্রের প্রাণরক্ষা কর।” অনেকক্ষণ সকলে নীরব রহিল, পরে এক পাষাণহৃদয় যোদ্ধা “এই শিশুর পিপাসা নিবারণ করিতেছি” বলিয়া, এক তীর নিক্ষেপ করিল, তীর বালকের বক্ষ ভেদ করিয়া, হোসেনের বাহুতে বিদ্ধ হইল—বালক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। হোসেন নীরবে শিবিরে ফিরিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে শান্ত, স্থির, অকম্পিতকণ্ঠে স্ত্রীকে কহিলেন, “এই শিশু নাও, বেহেস্তের অমৃতধারে তাহার পিপাসার চিরনিবৃত্তি হইয়াছে।” তাঁহার নয়নে অশ্রুকণা নাই, বদনে বিষাদচিহ্ন নাই, বক্ষে

দীর্ঘনিশ্বাস নাই, কণ্ঠে শোক-কম্পন নাই। স্বাধীনতার উপাসক শিশোদীয়-কুল-সূর্য্য প্রতাপসিংহ রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, মুক্ত আকাশতলে, অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, কন্দরে বাস করিয়া পঞ্চবিংশবর্ষ দুর্দ্ধর্ষ মোগলের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিলেন; অভুক্ত শিশুপুত্রের সম্মুখ হইতে যখন বন্য পশু ভক্ষ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়ায় শিশু ক্রন্দন করিয়াছিল, তখন সেই করুণ-ক্রন্দন গর্ব্বিত প্রতাপের কুলিশ-কঠিন দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা শিথিল করিয়া দিয়াছিল; মুহূর্ত্তের জন্য শোকাভিভূত হইয়া, প্রতাপ আপনার পবিত্র ব্রত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয় বীর অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্রে বীরপুত্রের রক্ত-রঞ্জিত দেহ দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া শত্রুসংহারে তাঁহার ভীষণ গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ প্রবোধবাক্যে সেই উদ্যত বজ্র দমন করেন। সাহনামার প্রধান নায়ক ভুবনবিক্রতবীর রোস্তম শত্রু-প্ররোচনায় বীরপুত্র সোহরাবের বধসাধন করিয়া, ভূমিতে লুটাইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। ইয়ুরোপ-ত্রাস বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ন পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হইয়া, প্রেমময়ী যোসেফাইনের পবিত্র-পরিণয়-সূত্র ছিন্ন করিয়া, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবের বীর পুণ্যশ্লোক হোসেন বিদীর্ণহৃদয় শিশুপুত্রকে বক্ষে লইয়া থাকিয়াও সে বক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে দেন নাই।

মলয়াপুরে মহরম

হোসেন যুদ্ধে চলিয়াছেন। তিনিই শেষ যোদ্ধা। স্বীয় জীবন-উৎসর্গের পূর্ব্বে আর কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দেন নাই। তিনি এতক্ষণ পাষাণে বুক বাঁধিয়া, মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যের ন্যায় নীরবে এই নিষ্ঠুরতার অভিনয় দেখিয়াছেন। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে তিনি সকলকে একত্র ডাকিয়া, অনেক উপদেশ দিলেন। "শত্রুহস্তে পড়িয়াও যথাসাধ্য আত্ম-সম্মান রক্ষা করিও, বিপদে পড়িয়াছ বলিয়া ভগবানে দোষারোপ করিও না, তাঁহার নামামৃতই বিপদে তোমাদের অক্ষয়-কবচ; কখনও কাঁদিও না, কাঁদিলেও যেন তাহা অন্যে না শোনে; জয়নাল আবদীনকে * যুদ্ধে যাইতে দিও না, তাহার দ্বারা জগতে পূজনীয় মাতামহের পবিত্র রক্ত রক্ষা পাইবে; এজিদের নিকট হয়ত তোমাদের অনেক অত্যাচার সহিতে হইবে, তাহা ধৈর্য্য-সহকারে সহিও, ধার্ম্মিকের নিকট বেহেস্তের দরজা খোলা।" এজিদের সৈন্যেরা হোসেনের পরাক্রম অবগত ছিল, যাহারা অনবগত ছিল, তাহারা কাসেমের যুদ্ধ দেখিয়াছিল, কেহ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আসিতে সাহস করিল না। হোসেন অগ্রসর হইয়া, তাহা-

* কিশোরবয়স্ক জয়নাল আবদীন তখন কাতর ছিলেন। এজিদ, হোসেনের পরিবারকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেও তাঁহাকে বধ করেন নাই। তাঁহার বংশধরগণ এখন মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিজাত সৈয়দ।

গকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এজিদের সঙ্গে বা তাহাদের ঙ্গে তাঁহার কোন শত্রুতা নাই, এজিদ অন্যায়রূপে তাঁহার রিবারকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। তাহারা সকলে তাঁহার াই; পূজনীয় মাতামহ এই পবিত্র সম্বোধনে সকল াতিকে এক ধর্ম্মপতাকার তলে সমবেত করিয়াছিলেন; খনও তাঁহাকে নিরাপদে যাইতে দিলে, তিনি সমস্ত বিবাদ-বসম্বাদ ভুলিয়া, সপরিজনে মদিনায় চলিয়া যান"। সমস্ত সন্য নীরব রহিল—কেহ কোন উত্তর করিল না। অগত্যা হাসেন তরবারী কোষমুক্ত করিলেন। আমরা হোসেনের ীরত্ব বর্ণনা করিব না; এই টুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁহার াসির সম্মুখে এজিদের বিরাট সৈন্যদল টিকিল না। হোসেন কবারে কোরাতের জলে গিয়া নামিলেন। স্ফটিকস্বচ্ছ াল, বুকে নিদারুণ পিপাসা,—ইচ্ছা হইল, এক নিশ্বাসে নদীর মস্ত জল পান করিয়া ফেলেন। অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া, খের নিকট জল তুলিলেন, এমন সময় পরিজন এবং অনু-রবর্গের কথা মনে পড়িল—কাসেমের কথা মনে পড়িল—খিনার কথা মনে পড়িল—তীরবিদ্ধ শিশুর কথা মনে ড়িল; যেন সহিদগণের ও শিবিরস্থ রমণীগণের পিপাসা-বর্ণ মুখ তাঁহার অঞ্জলিস্থ স্বচ্ছ জলে বিম্বিত হইয়া উঠিল। হাসেন কি এতই কৃতঘ্ন, এতই স্বার্থপর, জীবনের লালসা ক তাহার এতই প্রবল যে, সকলকে ছাড়িয়া সে একা পপাসা নিবারণ করিবে? অঞ্জলিস্থ জল নদীগর্ভে নিক্ষেপ রিয়া তীরে উঠিলেন। তখন হোসেনের মন আর ইহ-গতে নাই। তিনি আকাশে নয়ন ন্যস্ত করিয়া, ধীরে ীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ভ্রমণ রিতে করিতে অজ্ঞাতসারে অঙ্গের সমস্ত যুদ্ধসাজ লিয়া ফেলিলেন। প্রিয় অশ্ব দুলদুল প্রভুর পশ্চাৎ শ্চাৎ বেড়াইতে লাগিল। এজিদের সৈন্যেরা সবই খিতেছিল। অবশেষে কয়েকজন সাহসী যোদ্ধা জঙ্গল ইতে বাহির হইয়া আসিয়া,দূর হইতে হোসেনের শরীরে তীর ক্ষেপ করিল—একটি,—না আরও একটি তীর আসিয়া, াসেনের পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিল; হোসেন তাহা জানিতে ারিলেন না; তখনও তাঁহার দৃষ্টি আকাশেই বদ্ধ। সহসা হাসেনের হাত সেই রক্তে পতিত হইল; চাহিয়া দেখিলেন —সমস্তরক্ত। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে আততায়ী ণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটি তীর আসিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; তিনি ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। শেমর নামক এক অর্থলোভী "তোমার মস্তকের মূল্য লক্ষ টাকা" বলিয়া লম্ফদিয়া আসিয়া, তাঁহার বুকে চাপিয়া বসিয়া খঞ্জর বাহির করিল। হোসেন বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার বন্ধুর কাজ কর, শীঘ্র আমায় বধ কর; আর দেখ, আমার গলায় তুমি খঞ্জর বসাইও না, ঐ স্থানে পূজনীয় মাতামহ নুরনবী মহম্মদ আমায় স্নেহ করিয়া চুম্বন করিতেন, ওখানে তোমার খঞ্জর বসিবে না; তুমি আমার ঘাড়ে খঞ্জর চালাও, একবারে মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইবে।" শেমর হোসেনের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া, ছিন্ন-মস্তক লইয়া, লক্ষ টাকার পুরস্কার লোভে এজিদের নিকট ছুটিল। মহরম পর্ব্ব শেষ হইল।

এইরূপে ত মহরম শেষ হইল; কিন্তু কারবালার সেই ভীষণ মুহূর্ত্তগুলি অনন্ত মুহূর্ত্ত হইয়া রহিল। আজিও জগতের বিভিন্ন স্থানে বিরাট মুসলমান-সমাজে কারবালার অভিনয় চিরপরিচিত। আজিও মোসলেম-ললনাগণ সখিনার বিলাপ গাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন। সেদিন দেখি-লাম, এক পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা সখিনার করুণ-গান গাহিতেছে। আজিও ধার্ম্মিক মুসলমানগণ মহরম-মাসে দশদিন রোজা রাখেন এবং নামাজ ও কোরাণ পাঠ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে সময়ক্ষেপ করেন—পথে ঘাটে সহস্র সহস্র মুসলমান বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে "হা হোসেন—হা হোসেন" বলিয়া বিলাপ করেন। যতদিন জগতে মুসলমান থাকিবে, ততদিন মহরম থাকিবে। মহরমের এ পূজা শোক-পূজা নয়—মনুষ্যত্বের পূজা, বীর-পূজা, করুণার ভীষণ-মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; হোসেন পরিজনের সহিত পিপাসায় মরুবক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া-ছিলেন, কেবল এই জন্য মহরম স্মরণীয় নহে, ইহার পশ্চাতে এমন কিছু আছে, যাহা মানুষ ভুলিতে পারে না—তাহা মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, ধর্ম্ম। যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত চেঙ্গিজ খাঁ রক্তগঙ্গা বহাইয়াছিলেন, নাদির নরমেধযজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন, শতাব্দীব্যাপী ক্রুসেডে ধর্ম্মের নামে ইয়ুরোপ যে অভিনয় করিয়াছিল, আজও সভ্যতাগর্ব্বিত ইয়ুরোপের বুকের উপর যে লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতার অভিনয় হইতেছে, সে নিষ্ঠুরতার নিকট কারবালার ঘটনা সমুদ্রে জলবিন্দু। তথাপি, এ সমুদ্রকে ভুলিতে পারা যায় কিন্তু

এ বিন্দুকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। নিষ্ঠুরতার সংবাদ মাত্রই সহৃদয় মনুষ্যত্বের দ্বারে আঘাত করে; কিন্তু সে নিষ্ঠুরতার পশ্চাতে মহত্তর কিছু না থাকিলে, তাহার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যত্বের করুণ আহ্বান বন্ধ হইয়া যায়। কারবালার ঘটনা কেবল নিষ্ঠুরতার ঘটনা নয়। নিষ্ঠুরতার সকল কোলাহল ডুবাইয়া, তথায় এক মনুষ্যত্বের —ধর্ম্মের সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল; যুগে যুগে মানব সেই সুরে সুর মিলাইবে।

অষ্ট্রিচ-পালন

[শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়]

যে পাখী মাসে এক ফুট করিয়া বাড়ে, আর ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার তিন দিন পর হইতেই কাচ ও কাঁকর খায়, সে বড় যে-সে পাখী নয়। একমাত্র অষ্ট্রিচ বা উটপাখীর পক্ষেই ইহা সম্ভব। অষ্ট্রিচ আমাদের দেশে যত্র তত্র দেখা যায় না—মাত্র চিড়িয়াখানাগুলিতেই দু'চারিটা থাকে। তবে, কালে জার্ম্মানী, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত আমাদের দেশেও যে অষ্ট্রিচ পালিত হইবে না, তাহা

ডিম—ডিম-ফোটা

কে বলিতে পারে? ফলে ইতোমধ্যেই এদেশে অষ্ট্রিচের চাষ করিবার চেষ্টা-যত্ন চলিতেছে।

উটপাখী-পালনক্ষেত্রগুলিতে ধাড়ীগুলাকে কচিৎ ডিম ফুটাইতে দেওয়া হয়—প্রায়শঃই (Incubator) কলে দিয়া, ডিম ফুটান হয়। বস্তুতঃ, ডিম ফুটাইবার যন্ত্রগুলির এখন এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক উপায়ে পাখীদের দিয়া ডিম ফুটান অপেক্ষা এক্ষণে কলের সাহায্য লওয়াই অনেকে প্রশস্ত মনে করেন।

আমেরিকার দক্ষিণ পাসাডেনা, কালিফোর্ণিয়া, ফ্লোরিডা প্রভৃতি প্রদেশে কিংবা জার্ম্মানী ও বিলাতে উটপাখী-পালনের ক্ষেত্রগুলিতে যাইলে, ইহাদের বিচিত্র জীবনীর নানা অবস্থা স্পষ্ট দেখা যায়। বিলাত প্রভৃতি স্থানের জলবায়ু ইহাদের প্রকৃতির প্রতিকূল—কিন্তু সমুন্নত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কিরূপে যে সেই প্রতিকূলতা বিদূরিত হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে সদ্যোজাত শাবক হইতে পূর্ণপরিণত 'ধাড়ী' পর্য্যন্ত সকল অবস্থার পাখীই বিচরণ করে। কোথাও বা ছোট ছোট শাবকগুলি মাটি হইতে এক ফুট দুই ফুট উচ্চে মাথা তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কোথাও বা মানুষের দ্বিগুণ ওজনের সাত আট ফুট উচ্চ শিরঃপ্রমাণ পাখী ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। সে দৃশ্য বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। চেহারায় ইহাদের বলের পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে ইহার সরু সরু শীর্ণ-দর্শন পায়ে এত বল, যে সেই পদাঘাতে ইহারা বৃহদাকার কুকুর বা বলিষ্ঠ দেহ মানুষকে ধরাশায়ী ও অচেতন করিয়া ফেলিতে পারে। কারণ, ইহাদের পদগুলি নিরেট হাড় মাত্র—তাহার প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড এক জোড়া থাবা। এই থাবা দিয়া, ইহারা কঠিন মাটি খুঁড়িয়া কাচ ও পাথরের টুকরা এবং শস্য প্রভৃতি আহার্য্য আহরণ করে—বাসার জন্য গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে। এতদ্দ্বারা ইহারা আত্মরক্ষা করে এবং আততায়ীর শরীর সাংঘাতিকরূপে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়।

১৮৯০ সালে মিঃ Edwin Cawston কমরিন্ অন্তরীপ হইতে চাষ করিবার উদ্দেশে আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথম ৫২টি উট-পাখী লইয়া আসেন। কালিফোর্ণিয়ার জলবায়ু অনেকটা আফ্রিকার মত বলিয়া, সেই খানেই ইহার পালন-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু সেখানেও অচিরে প্রায় অর্দ্ধেক-গুলি মরিয়া যায়। অবশিষ্ট কয়েকটি হইতে এখন শত শত পাখী উৎপাদিত হইয়াছে। ফ্লোরিডার পালন-ক্ষেত্রে এখন

প্রায় আড়াই শত পূর্ণপরিণত উটপাখী মজুত আছে—ইহাদের মধ্যে একটি এত বৃহদকার যে, পৃথিবীতে বুঝি তাহার দ্বিতীয় আর নাই; আর একটিতে সাজ দিয়া ঘোড়ার মত গাড়ীতে জোতা চলে।

ডিম ফুটাইবার যন্ত্র
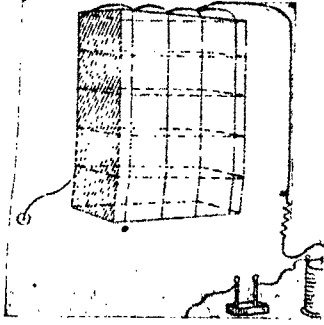
পালকের জন্যই উটপাখীর চাষ করা হইয়া থাকে; তা বড়ই লাভজনক পণ্য এবং নানাবিধ আকারে পরিণত হইয়া, প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়। মার্কিন অষ্ট্রিচগুলির আদি-পুরুষ অর্থাৎ প্রথম আনীতগুলির অধিকাংশ এখন প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স এবং এখনও বেশ সবল ও সুস্থ অবস্থাই আছে। মনে হয়, যত্নে রাখিলে, আরও বিশ ত্রিশ বৎসর বাঁচিবে।

সাধারণ অষ্ট্রিচ-জীবন সুখদুঃখপূর্ণ—তবে ইহাদের জীবনে যেন সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভরাই সমধিক।—ইহারা পদভরেই গতিবিধি করে—তবে বেগে চলিবার সময় পাছে হেলিয়া পড়ে, তজ্জন্যই ইহারা পক্ষ দুইটি ব্যবহার করে। ব্যবসায়ের জন্য এই পক্ষ দুইটির পালকগুলি কাটিয়া লওয়া হয়। তখন ইহাদিগকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

এক সপ্তাহের একটি ডিম্বের উপরিভাগে চামড়া দিয়া মুড়িয়া লইলে, বেশ ফুটবল খেলা চলে—কারণ আকার ও কাঠিন্যে ইহা ঠিক ফুটবলেরই মত। সদ্যোজাত একটি ডিম ওজনে প্রায় দেড় সের; এইরূপ একটা ডিম ভাজিলেই ২০। ৩০ জনের বেশ আহার করা চলে।—তবে প্রাতরাশের জন্য এই সৌখীন খাদ্য ব্যবহার করিতে গেলে কিছু ব্যয়াধিক্য ঘটে, কারণ এক একটি ডিম কিনিতে গেলে, সের করা ১৫৲ হিসাবে খরচ হয়। সদ্যোজাত ডিম যে বড়ই সুস্বাদু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ডিম পাড়িবার সময় হইলে 'ধাড়ী' দুইটি একযোগে মাটি খুঁড়িয়া, প্রায় চার ফুট পরিধির এক ফুট হইতে দেড় ফুট গভীর, বাটার আকৃতি একটি গর্ত্ত খনন করে। গর্ত্ত নির্ম্মিত হইলে, স্ত্রী-পক্ষীটা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে এবং একদিন অন্তর একটি করিয়া ডিম প্রসব করিতে থাকে। ১২। ১৫টি প্রসব করিবার পর যখন সে বুঝিতে পারে যে যথেষ্ট হইয়াছে, তখন পা দিয়া আশ পাশ হইতে বালুকা টানিয়া, ডিমগুলির উপর ২।৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া চাপা দেয়। অনন্তর পক্ষী-দম্পতী পালা করিয়া, দুইজনে দিবারাত্র সেই গুলিকে পাহারা দিতে আরম্ভ করে; প্রায়শঃ স্ত্রী-পক্ষী দিবা-ভাগে এবং পুরুষটি রাত্রিযোগে পাহারা দেয়। প্রকৃত পক্ষে এই সময়ে পুরুষ যথেষ্ট নারী-মর্য্যাদা রক্ষা-বৃত্তির পরিচয় দেয়—যখনই বুঝিতে পারে, স্ত্রীর কষ্ট হইতেছে, তখনই গিয়া যথাসাধ্য তাহার শ্রমলাঘব করে। সচরাচর বৈকাল ৪টা হইতে পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ নয়টা পর্য্যন্ত এই সতর ঘণ্টা কাল পুরুষটির পাহারা দিবার নির্দ্দিষ্ট সময়। তদ্ব্যতীত মধ্যাহ্নেও প্রায় ঘণ্টাখানেক আসিয়া, বাসায় অবস্থান করে—স্ত্রী মধ্যাহ্ন-খাদ্যান্বেষণে প্রস্থান করে। মোটের উপর দিবারাত্রের তিনভাগ পুরুষটিই এই রক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। সদ্যোজাত ডিমের খোলা বড়ই পাতলা থাকে—সুতরাং তদবস্থায় ডিমগুলি ঢাকিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি ভগবৎ-প্রদত্ত বুদ্ধিরই পরিচায়ক।

এক মাসের শাবক

ডিমের উপর তাহারা যদি তাহাদের বিপুল ভার লইয়া "তা" দিতে বসে, তাহা হইলে ডিমগুলি চূর্ণ হইয়া যায়।

সুতরাং তাহারা তাহাদের শীর্ণ দৃঢ় পদদ্বয়ে ভর দিয়া, পক্ষদ্বয় প্রসারিত করিয়া, ডিমগুলিকে আবৃত ও গরম রাখে।—এইরূপে কঠোরভাবে পক্ষি-দম্পতীকে ৪০ দিন কাটাইতে হয়। ইহা হইতেই বুঝুন, অষ্ট্রিচের কি দুঃখ-কষ্টের জীবন।

শাবকগুলি ডিমের মধ্যে পুষ্ট ও পরিণত হইবার পর হইতেই খোলার ভিতর ঠোকর মারিতে থাকে—ডিম ফুটিবার অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই ঠোকরের শব্দ শুনা যায়। এইরূপে ক্রমে একটি ছিদ্র করে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই নির্গত হয়। অনেক 'ধাড়ী'-পাখী বক্ষপঞ্জর-বলে খোলাটি চূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে বাহির করিয়া লয়। কখনও কখনও খোলার অর্দ্ধাংশ শাবকের পশ্চাদ্দেশে দুই একদিন পর্য্যন্ত সংলগ্ন থাকিয়া যায়—ক্রমে চলিতে ফিরিতে সেটা খসিয়া পড়ে। শাবকগুলির ক্রমবর্দ্ধন বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং ছয় মাসের মধ্যেই সচরাচর মানুষ যতদূর নাগাল পায়, প্রায় তত উচ্চে তাহারা মুখ স্পর্শ করিতে পারে; অতঃপর তাহাদের বৃদ্ধি তত পরি-স্ফুট ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। ফ্লোরিডা ও কালি-ফোর্ণিয়ায় কাচ ও প্রস্তরখণ্ডের সহিত মুষ্টিমেয় অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া, যথেষ্ট গমের ভুষি, ঘাস ও কপিপাতা তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ খাদ্যে তাহাদের অস্থি ও পেশী পুষ্ট হইয়া পাখীগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অষ্ট্রিচের ডিম্ব ফুটাইবার কল, কুক্কুটী-শাবক উদ্ভাবনের যন্ত্রের মতই—অবশ্য অপেক্ষাকৃত অনেক বৃহদাকৃতি। প্রসূত হইবার পরেই ডিমগুলি যন্ত্রমধ্যস্থ খোপে স্থাপিত হয়—নলযোগে তাপ বাহিত হইয়া, সেগুলির যথোপযুক্ত উষ্ণতা রক্ষিত হয়। এইরূপে ৪০ হইতে ৪২ দিনে শাবক উৎপাদিত হইয়া থাকে। ফ্লোরিডায় এইরূপে এককালে এক একটি যন্ত্রে ৩০টি পর্য্যন্ত ডিম ফুটান হইয়াছে। পাখীদের দিয়া ডিম ফুটাইতে হইলে, যেমন তাহারা এক প্রস্ত ডিমে "তা" দিয়া শাবক বাহির করিল, অমনিই সেগুলিকে তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়। তখন স্ত্রীপক্ষীটি আবার নাতিবিলম্বে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এইরূপে একজোড়া পাখী বৎসরে সচরাচর ৬০টি ডিমে "তা" দিয়া বাচ্ছা ফুটায়। একটি হৃষ্টপুষ্ট ৬

শীত পাল

মাসের শাবকের বাজার দর ৮০৲ হইতে ৯৬৲ টাকা। কাজে কাজেই ক্ষেত্রস্বামী এক এক জোড়া পাখী হইতে যত বেশী বাচ্ছা ফোটাইয়া লইতে পারে, ততই অধিক লাভবান হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমেণী সকল পক্ষি ডিম্বপ্রসবিনী হয় না—কতকগুলি বন্ধ্যা হয়, নচেৎ এমন লাভজনক ব্যবসায় আর দেখা যাইত না।

অষ্ট্রিচের পালকগুলি যথাসম্ভব দীর্ঘ, পরিণত ও উজ্জ্বল হইতে এক বৎসর কাল লাগে; তখন ছিঁড়িবার উপযোগী হয়। পাখীর বয়স ও লিঙ্গভেদে পালকগুলির বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হয়। ছোট পাখীদের পালক, শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণ বিমিশ্র। দেড় বৎসর বয়সের পক্ষিণীর পালক ঘোর কটা বর্ণের এবং পাখীর কৃষ্ণবর্ণ। পরিণতবয়স্ক পুংপক্ষীর পালকই সমধিক মূল্যবান্। পাখার পালকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও নমনশীল এবং প্রায়ই অল্পাধিক শ্বেতবর্ণ। পুচ্ছের পালকগুলি বর্ণ ও বিশেষত্বে হীনতর। শ্বেত পালকগুলির অধিকাংশেরই বর্ণ হস্তিদন্তের ন্যায় এবং সেইগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্।

প্রতি নয়মাস অন্তর প্রত্যেক পাখীকে একবার পরীক্ষা করিয়া 'পাকা' পালকগুলি ছিঁড়িয়া লওয়া হয়। পালক ছিঁড়িতেও কতকটা কৃতিত্ব ও বহুদর্শিতা আবশ্যক—অনবধানতা-সহকারে পালক ছিঁড়িলে, নূতন পালক গজা-ইবার পক্ষে হানি ঘটে। পালকের মূল আহত হইলে, সে ক্ষত আর কিছুতেই নিরাময় হয় না; কারণ, মূলের "সঁপি" (Socket) উৎপাটিত হইলে, আর কদাচ নূতন পালক জন্মিতে পারে না। ছোট পালকগুলি তুলিবার সময়

পাখীর বিশেষ কষ্ট হয় না, কারণ সেগুলি সুদক্ষ হস্তে উৎপাটিত না হইলে, অচিরে আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়ে। ডানার মোটা পালকগুলি বড় বড় কাঁচি দিয়া কাটিয়া লওয়া হয়—মূলগুলি ডানাতেই থাকিয়া যায়। পালক সংগ্রহের তিনমাস পরে এই মূলগুলি তুলিবার উপযোগী হয়।

সকপুত্র দম্পতী ও শাবক

অষ্ট্রিচ-ক্ষেত্রে গড়ে দুইবৎসরে তিনবার পালক উৎপাটন-কার্য্য ঘন ঘন হয়। পালকের হিসাবে প্রতি পাখীর মূল্য বৎসরে ৯০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক পাখী হইতে যে পরিমাণে পালক লাভ হয়, তাহার মূল্য গড়ে ৯ হইতে ২০ পৌণ্ড। আফ্রিকার এই পাখীগুলি সাধারণতঃ ৭০ বৎসর বাঁচে। সুতরাং পালক হিসাবে পাখীগুলির উপার্জ্জনের পরিমাণ ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

উটপাখীর পালক-সংগ্রহ একটা দর্শনীয় ব্যাপার। কতকগুলি পাখীকে তাড়াইয়া একটা ছোট (Corral) খোঁয়াড়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, তারপর একে একে তাহাদিগকে এক একটি ত্রিকোণযুক্ত বেষ্টনী মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। পরে মাথার উপর নিশ্বাস ফেলিবার জন্য শেষ দিকে ছিদ্রবিশিষ্ট একটি থলিয়া চাপা দেওয়া হইয়া থাকে।

এখন একজন লোক পাখীটাকে ধরিয়া রাখে, এবং অপর একজন দক্ষ হস্তে পাকা পালকগুলি ছাঁটিয়া বা তুলিয়া লয়। চক্ষু বন্ধ হওয়ায় পাখীগুলি প্রায় নিতান্ত ঠাণ্ডা হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সময়েও "চাট" ছুড়িতে বিরত থাকে না; সুতরাং সে পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। বেষ্টনীর কোণের দিকে একটি ছোট দ্বার থাকে;—পালক-সংগ্রহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেলেই সেইটি খুলিয়া দিয়া, মুখের থলিয়াটি তুলিয়া লওয়া হয়—পাখীটা ডানা মেলিয়া, ভারহীন হইয়া ছুটিয়া প্রস্থান করে।

পুং ও স্ত্রী পক্ষী-নির্ব্বিশেষে পালকগুলিকে, পুচ্ছের, ডানার, শ্বেত-কৃষ্ণ-ধূসর প্রভৃতি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, আবার সেগুলির মধ্য হইতে ছোটবড় পক্ষগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া, বিভিন্ন থলিয়া বদ্ধ করা হয়। পালকগুলি ব্যবসায়োপযোগী পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এক একটি করিয়া বা দুই তিনটি একত্র করিয়া, পালকগুলি একগাছি প্রায় ৪ ফুট দীর্ঘ রজ্জুতে বাঁধা হয়, তারপর ধৌতকারগণ সেইগুলিকে

পালক-ছাঁটাই

চাঁচিয়া, সাবান জলে এবং বারম্বার পরিষ্কৃত জলে ধৌত ও পরিষ্কৃত করে। তখন সেগুলি রঙ্‌ করিবার জন্য "রঙরেজে"র হস্তে ন্যস্ত হয়; সাধারণতঃ পালক

গুলিকে কলে রঙ্ করা চলে—সেটা যে শুধু স্বাভাবিক রঙ্ থাকে বলিয়াই সহজসাধ্য হয়, তাহা নহে, ঐগুলির উপর রেশমের স্থায় একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম লোম আছে, যাহাতে সহজেই চক্‌চকে কাল রঙ্ ধরে—যে গুণে গুণগ্রাহীরা সেগুলির বিশেষ আদর করে। রঙ্ করিবার পর শ্বেতসার-বিমিশ্রিত জলে সেগুলিকে চুবান হয়। তারপর একখানি মসৃণ কাষ্ঠফলকের উপর আছড়াইয়া, শ্বেতসারগুলি মাড়িয়া ফেলা হয়। অতঃপর সেগুলি কার্য্যশালায় নীত হয়—সেখানে সুদক্ষ মিস্ত্রীরা (finish) শেষ-প্রসাধন-কার্য্য সম্পন্ন করে। এক্ষণে আবার শ্রেণীবিভাগ কার্য্য হয়—এই বাছাই কার্য্য বড়ই কঠিন—বহুকালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন ভিন্ন সুদক্ষভাবে এই কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। ইহার পর পালকগুলিকে "সেলাই" বা দর্জ্জি ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। বাজারে যে সকল অষ্ট্রিচের পালক বিক্রয় হয়, তাহার প্রত্যেকটি অনেকগুলির সমষ্টি ও মূল্যানুযায়ী তিন চারি পাঁচটি পালক গোড়ায় গোড়ায় এমন কৌশলে সেলাই করা থাকে যে, দেখিতে যেন একটির মতই বোধ হয়।

ছাঁটাইয়ের পর

উটপাখীর গাড়ী

সেলাই কার্য্য হইয়া গেলে পালকগুলিকে বাষ্পের উপর ধরা হয়, যাহাতে প্রত্যেক আঁশগুলি স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। এইবার (Curler) কুঞ্চনকারীর বা নাপিতের হাতে গিয়া পড়ে—ইহারাই ডাঁটা ও লোমগুলির উপর সেই 'কেরামতি' টুকু করে, যাহাতে পালকগুলি অপূর্ব্ব শোভন-দর্শন হয়—যাহার জন্য এই পালকের এত আদর। অবশেষে গুচ্ছকারক বা মালাকরের হস্তে যায়—ইহারা পালকগুলিকে বিক্রয়োপযোগী বিবিধ আকারে পরিণত করে। বর্ত্তমানকালে কেপকলোনি হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রের জন্য বৎসরে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের এই পালক রপ্তানী হয়—তন্মধ্যে এক ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সই ত্রিশ লক্ষ টাকার ক্রয় করে। এক্ষণে আফ্রিকার কলোনিয়াল গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, আফ্রিকা হইতে জীবন্ত উটপাখী চালান দিতে হইলে, প্রতি পাখীর উপর দেড় হাজার টাকা শুল্ক দিতে হইবে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আফ্রিকায় এই পাখী কতদূর মূল্যবান্ মনে করে।

অষ্ট্রিচ্ কিছুতেই 'পিছপাও' নহে—স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েই লড়াই করিতে খুব মজবুত। ফলে, এক ছোট কুকুর ভিন্ন আর কাহাকেও ইহারা ভয় করে না। ইহারা যখন মানুষকে আক্রমণ করে, তখন ইহাদের ঠোঁট ও পা—দুই-ই চলিতে থাকে, তবে দুই ফুটের অপেক্ষা নিচু জিনিষের উপর ইহাদের সবল 'ঠ্যাঙ্গের' আঘাত লাগে না। তাই, ইহারা ক্ষুদ্রকায় 'ফক্সটেরিয়ার' কুকুরের নিকট হইতে সভয়ে পলায়ন করে, অথচ বৃহদাকার 'ম্যাষ্টিক' বা 'সেটর' কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

'তা' দিবার সময় অষ্ট্রিচের জনক-জননী দুজনেরই মেজাজ বড়ই 'তিরিক্ষি' হয়। 'তা' দিবার সময় পালকদিগকে মাঝে মাঝে দুই তিনবার ডিমগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। সে সময় একজন একটা কাঁটামুখো দণ্ড দিয়া

পাখীগুলিকে দূরে ঠেলিয়া রাখে, অপর একজন ডিমগুলি ফুটিবার কত দেরী পরীক্ষা করে। হঠাৎ যদি পাখীটা ও হইতে ছাড়া পায়, পরীক্ষককে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া, বেড়া ডিঙ্গাইয়া, পলাইতে অথবা অদূরবর্ত্তী গাছের আড়ালে লুকাইতে কিংবা অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে হয়। দৌড়িয়া ইহাদের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই—কারণ, সাধারণতঃ ইহারা দুই মিনিটে এক পোয়া পথ অতিক্রম করিতে পারে।

"জ্যাক্‌সন্‌ভিলি" ক্ষেত্রের "নেপোলিয়ন" নামক অষ্ট্রিচই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও সুবিখ্যাত। ক্ষেত্রের ম্যানেজারের মাথা হইতেও ইহার মাথা প্রায় দুই হাত উচ্চ। 'নেপোলিয়ন' প্রকৃতই কাহাকেও দৃক্‌পাত করে না; দেখিতেও প্রিয়দর্শন এবং বৎসরে নয় শত হইতে তিন হাজার টাকা মূল্যের পালক দান করে।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বাহিরে অষ্ট্রিচ্-চাষ করা অসম্ভব। কিন্তু পূর্ব্বকথিত এড্‌উইন্ কষ্টন্ নামক ইংরাজই প্রথমে প্রমাণ করেন যে, কেপ কলোনির বাহিরে ইহার চাষ করা সম্ভব। বর্ত্তমানকালে বিবিধ মার্কিন-ক্ষেত্রগুলিতে পঞ্চ সহস্রাধিক অষ্ট্রিচ্ বিচরণ করিতে দেখা যায়। এই মিঃ কষ্টনই দক্ষিণ-ফ্রান্সে নাইস্ নগরে আবার একটি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডেও অষ্ট্রিচ্-পালন-ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে।

প্রত্যেক স্থলেই গ্রীষ্মপ্রধান (tropical) অথবা Semitropical স্থান নির্ব্বাচন করিয়াই অষ্ট্রিচ্-ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে—নাতিশীতোষ্ণ (temperate) জলবায়ু-বিশিষ্ট স্থানে কেহই এই আফ্রিকাবাসী পাখীর ক্ষেত্র করিতে সাহসী হন নাই। বহুকাল ধরিয়া মিঃ কার্ল হ্যাগেনবেক্ (Mr. Carl Hagenback) নামক একব্যক্তি অভিমত প্রচার করিয়াছিলেন যে, যথোচিতভাবে জলবায়ু সহ করাইয়া লইলে, উত্তর য়ুরোপের শীতপ্রধান প্রদেশেও অষ্ট্রিচ পালন করা চলে। তিনি উত্তর-জার্ম্মানির ভীষণ শীতের সময় তাঁহার নিজের অষ্ট্রিচগুলিকে ছাড়িয়া রাখিয়া, নিজে এবিষয়ে স্বয়ং নিঃসংশয় হইয়াছিলেন।

মধ্য-গ্রীষ্মকালে তিনি আফ্রিকা হইতে ৯ মাস হইতে একবৎসরবয়স্ক ছোট ছোট অষ্ট্রিচ্ আনাইয়া পরবর্ত্তী শীতকালে সেগুলিকে বাহিরে ছাড়িয়া রাখিয়া দিতেন। ইহাতে প্রত্যেক বারেই পাখীগুলি পুষ্ট ও পালকগুলিও সুদৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ ঠাণ্ডায় তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

এই সকল পরীক্ষায় সফলকাম হইয়া, মিঃ হ্যাগেনবেক্ হ্যামবার্গের সন্নিকটবর্ত্তী ষ্টেলিঙ্গেন নামক প্রদেশে নিজ পশু-বাটিকার পার্শ্বেই ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে একটি অষ্ট্রিচ্-ক্ষেত্র স্থাপিত করেন। সে সময় তথায় ১১২টি পূর্ণবয়স্ক অষ্ট্রিচ্ ছিল। ক্রমে যখন তথায় ১৫০টি ডিম ফুটান হইল এবং শতকরা ৯০টি শাবক পুষ্টকায় হইল; তখন বুঝা গেল, পশুতত্ত্ববিদ্ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের ভবিষ্যৎবাণী ভ্রান্ত ও অমূলক—অষ্ট্রিচ্‌গুলি শীতপ্রধান দেশেও বাঁচিয়া থাকিতে ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে।—মিঃ হ্যাগেনবেকের সিদ্ধান্ত কার্য্যতঃ অভ্রান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষ্টেলিঙ্গনের ক্ষেত্রটি প্রায় ৭ একর, অর্থাৎ ২২ বিঘা বিস্তৃত এবং মনোরম পুষ্পবীথিকা ও সুচারু উপলবর্ত্মরাজি সুশোভিত। ক্ষেত্রটিতে ৩ একর—১০ বিঘা ব্যাপী পক্ষিশালা, পুষ্করিণী ও আহার্য্যের পাত্রাদি আছে—পাখীর দলগুলির জন্য একটি (Paddock) বাথান, দশটি সুবৃহৎ খোঁয়াড় (Pen) এবং প্রত্যেকটির সহিত একটি পক্ষিশালা (Stable) সংলগ্ন; আহত ও রুগ্ন পাখীদের জন্য একটি হাঁসপাতাল, একটি শাবক-গৃহ বা আতুড়-ঘর —যেখানে যন্ত্রযোগে ডিমগুলিকে 'তা' দেওয়া হয়—তদ্ভিন্ন একটি প্রদর্শনী-গৃহ এবং একটি কার্য্যশালা আছে এই স্থানে পালকগুলিকে বিবিধ প্রক্রিয়ায় বিক্রয়োপযোগী পণ্যে পরিণত ও প্রদর্শন করা হয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, এখানে যে সকল শাবক জন্মিয়াছে, তাহাদের কতকগুলি অষ্ট্রিচ্ জাতির পরমসুন্দর নিদর্শন। তদ্ভিন্ন, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, শীতপ্রধান দেশে জন্মিয়া পালকগুলি অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ ও দৃঢ় হয়, সুতরাং অধিকতর মূল্যে বিক্রীত হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, উত্তর-জার্ম্মাণীতে যখন অষ্ট্রিচ্-পালন চলে, তখন উত্তর-ব্রিটেনেই বা না চলিবে কেন? বস্তুতঃ, অচিরেই যে ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডেও অষ্ট্রিচ্-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ

সম্ভব। ইতোমধ্যেই ব্রেড্‌ফোর্ডশায়ারে একটি ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি' জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ একটি অ'ষ্ট্রিচ্-ক্ষেত্র স্থাপন মানসে ইংলণ্ডের দক্ষিণ-উপকূলে একটি স্থান-নির্ব্বাচনও করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে ক্যাপ্টেন্ মরে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় অ'ষ্ট্রিচ্-পালন-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা-কল্পে গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সরবরাহ করিতে বলেন। তাঁহার সেই একই যুক্তি,—যখন উত্তর-জর্ম্মণীতে অষ্ট্রিচ্-পালন-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন স্কটল্যাণ্ডেও না চলিবার কারণ নাই।

বিলাতী ক্ষেত্রপতি ও ভূম্যধিকারীরা এই ব্যবসায়ে লাভ দেখিয়া, ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক হইয়াছেন। অষ্ট্রিচের প্রধান আহার্য্য 'অল্ফাল্ফা' নামক এক শ্রেণীর উদ্ভিদ্ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাও বিলাতে সাধারণ ঘাসের মত সহজেই উৎপাদিত হইতে পারে। দশ মাস বয়সের একটি শাবক হইতে ৩০্ টাকা মূল্যের পালক পাওয়া যায়; তৎপরে বর্ষে বর্ষে বহুকাল পর্য্যন্ত ৯০০্ হইতে ৩০০০্ টাকা মূল্যের পালক পাওয়া যায়। ৫ বৎসরে অষ্ট্রিচেরা পূর্ণবয়স্ক হয়, এবং সংখ্যায়ও অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর ইহারা মানুষের মত বাঁচে এবং ৫০ বৎসরের পর শারীরিক অবনতি সূচিত হয়। অনেক অষ্ট্রিচের আবার ৭৫ বৎসর বয়সেও সুন্দর পালক জন্মিতে দেখা যায়।

আমরা যে চিত্রগুলির প্রতিলিপি দিলাম, ইহার অধিকাংশই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সুবৃহৎ অ'ষ্ট্রিচ্-ক্ষেত্র হইতে গৃহীত। ভবিষ্যতে বিলাতের ক্ষেত্রগুলির উৎপত্তি এবং এই পালকের সুবিস্তৃত ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আগরায় রবীন্দ্রনাথ
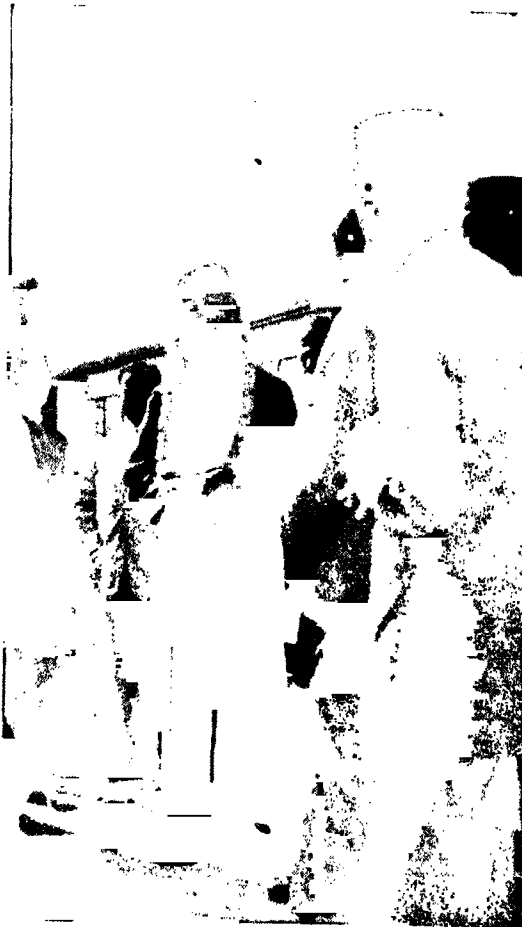
হঠাৎ প্রয়াগ থেকে এক তার এল—কবি রবীন্দ্রনাথ আগরায় আসছেন। চারিদিকে সোর-গোল পড়ে গেল; খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ,—বাড়ী খোঁজ। যতীন বাবু আগরার এক সীমা থেকে অপর সীমা পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলেন। প্রাণহীন আগরা-প্রবাসী-বাঙ্গালী-সমাজে যতীন বাবু ও হরপ্রসাদ বাবুর উত্তেজক ঔষধের গুণে একটু প্রাণের লক্ষণ দেখা দিল। অমনি আর এক সংবাদ এল—কবি আসবেন, কিন্তু এখন নয়,—পরে; সব থেমে গেল। এইরূপে কয়দিবস কেটে গেল।

আবার সংবাদ এল; এবার নিশ্চিত আগমন। কবি আসচেন ত ঠিক—এখন উপায়? যতীন বাবু, হরপ্রসাদ বাবু, আবার 'আদাজল' খেয়ে লেগে পড়লেন। কত বাড়ীওয়ালার বাড়ী, কত পাথরের দোকান, কত 'ভদ্দর,' কত 'অভদ্দরের' বাড়ীতে যে, ঘুরতে ফির্‌তে লাগলেন, তা আর বলে শেষ করা যায় না।

অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হ'য়ে গেল যে, "অভিনন্দন উপহার" দেওয়া হবে। অভিনন্দন লিখবার ভার পড়ল, আগরার সর্ব্বজ্ঞ-ভট্‌চায মশায়ের উপর। অন্য দু' এক জনেরও 'হস্ত-কণ্ডূয়ন' আরম্ভ হল; তাঁরাও বড় ছেড়ে কথা কইলেন না।

অবশেষে ২৬এ অক্টোবর বাঙ্গলার কবি—ভারতের

কবি—এসিয়ার কবি রবীন্দ্রনাথ আগরায় এসে পদার্পণ করলেন। সেই সনাতন মতে ফুলের মালায় কবি ভূষিত হলেন, কবির উপর পুষ্পবৃষ্টি হল। কবিবর দু'এক মিনিট এর ওর মুখের দিকে দেখে, কখনও বা কা'কেও নমস্কার ক'রে, ষ্টেসনের মাঝ দিয়ে চলে, অতিথি-পরায়ণ নাগ-বাবুর জামাতা আগরা কলেজের অধ্যাপক যুবক নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও মাননীয় বৃদ্ধ * নীলমণি বাবুর সহিত ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বসলেন।

পরদিন অনেক স্বীকার-অস্বীকারের পর কবি বাঙ্গলা লাইব্রেরীতে পায়ের ধূলো দিতে স্বীকার করলেন। বাঙ্গলা লাইব্রেরী পবিত্র হল; বাঙ্গালীরা ধন্য হলেন। দিন স্থির হল, ৩০এ অক্টোবর শুক্রবার, অপরাহ্ন ৫টায়, তাঁর অভ্যর্থনা করা হবে।

এইবার অভ্যর্থনা। যথাসময়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল, বাঙ্গালার কবি বাঙ্গালা লাইব্রেরীতে প্রবেশ করলেন। দু'চার মিনিট মিষ্ট মধুর আলাপ ক'রলেন। তার পর সভাস্থলে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন।

নীলমণি বাবু সভাপতি হলেন। তিনি কলকাতার ঠাকুর-দের, ৺দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও পরলোকগত মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব'লে, কবির সম্বন্ধে কিছু বললেন,—কবির কবিত্ব-শক্তি, বোলপুরের বিদ্যালয়, নোবেল পুরস্কার ইত্যাদি। তারপর এল—অভিনন্দনের পালা। অক্ষয় বাবু এরূপে আগরা-প্রবাসী বাঙ্গালীগণের পক্ষ থেকে "অভিনন্দন উপহার" ও সাহিত্যরথী অতিথি রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা শেষ ক'রে আসন পরিগ্রহ করলেন। এবার আগরার বঙ্গমহিলাগণের প্রতিনিধিত্ব ল'য়ে যুবক হরপ্রসাদ বাবু অবতীর্ণ হলেন। লেখাটা মন্দ হয় নি, পড়ার গুণে লাগল ভাল। তারপর কৃষ্ণবাবু সাহিত্য-সমিতির পক্ষ থেকে গল্পের আকারে লেখা একটা ছোট গল্প নিয়ে একেবারে অগ্রসর হ'য়ে এলেন।

লেখকের গলাটা চাপা, তায় সেদিন গেছিল ভেঙ্গে; আর বলতে কি, তিনি ত একজন 'স্নায়ুপীড়ার' পুরোণো রোগী, তবে লেখাটা খুব ছোট, আর একটু নূতন রকমের, বাজে কথা নেই।

এবার কবির পালা। কবি অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠলেন। তিনি কাতরভাবে বললেন যে, তাঁর মত কোণের মানুষকে টেনে এনে লোকের মধ্যে কেন এ অপদস্থ করা। তাঁর কাণে তাঁরই সুখ্যাতি ঢুকান', এটা যে কতদূর কষ্টকর, তা তিনি বুঝাতে পারেন না। তারপর তিনি বললেন যে,এসব ব্যবস্থা দেখে,কা'কেও কিছু না ব'লে, তিনি পালিয়ে যাবেন, স্থির করেছিলেন; কিন্তু তাঁর বিশ্বাসী বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, তাঁর সব কথা রটিয়ে দিয়ে, তাঁর এই দুর্দ্দশা করলেন। ভবিষ্যতে তিনি আর কোন বন্ধুকে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু কবি বোধ হয় জানেন যে, কথা কোনকালে চাপা থাকেনি, কখনও থাকিবেও না।

তারপর কবিবর বললেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করায়, তাঁর গৌরবের বোঝা অনেকটা হাল্কা হওয়ায়, তিনি আরাম পাচ্ছেন। এযে বাঙ্গালীদের ন্যায্যদাবী। কবি! তুমি বাঙ্গালী জাতির, বাঙ্গালী জাতি তোমার,—তাই সে জাতির প্রেম-ভক্তির অঞ্জলি দিয়া, তোমায় পূজা করবে, আর তোমার গৌরবের অংশ তুমি দাও বা না দাও, তাহা অধিকার ক'রে বসবে। এটা যে তাদের 'পাওনাগণ্ডা'। সভা ভঙ্গ হল। কবি-ডাক্তার বাগচী মহাশয়ের বাড়ী হয়ে একটা কার্পেটের কারখানায় গেলেন, সেখান থেকে নাগ মহাশয়ের বাড়ী গেলেন।

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে, একটা মহৎকার্য্যের সঙ্কল্প করেছেন, তা যদি পূর্ণ করেন, তাহলে বাঙ্গালী জাতির আর এক মহোপকার করা হয়। তিনি আগরা থেকে ভাল কারিকর নিয়ে গিয়ে, তাঁর বোলপুরের স্কুলে কার্পেট-বোনা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করবেন ব'লে নাকি মনস্থ করেছেন। একথা সত্য হ'লে, বড় আনন্দের বিষয়। আগরার এই শিল্প ভারতপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গলাদেশে এই কাজ হয় ব'লে, অন্ততঃ এরূপ সুন্দরভাবে হয় বলে,—আমরা জানি না। ডাঃ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তি চেষ্টা করিলে, কৃতকার্য্য হতে পারেন, ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

* আগরা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি ধর।

শোক-সংবাদ

পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং সমগ্র বঙ্গের রাখাল দাস ন্যায়রত্ন একই যোগে বঙ্গ অন্ধকার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের বিয়োগে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানের শেষ নিদর্শন একরূপ অন্তর্হিত হইতে চলিল।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন

জন্ম—১২৩৬—২৮এ ভাদ্র, মৃত্যু—১৩২১—৩০এ কার্ত্তিক

একাদিক্রমে অর্দ্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল অধ্যাপনা ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া, বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচ্ছত্রী আচার্য্য দীর্ঘকাল কাশীবাস করিয়া, বিগত ৩০এ কার্ত্তিক অভীষ্ট-লোক-গমন করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের অক্ষুণ্ণ-গৌরব ন্যায়ের পূর্ণ প্রতিভা অন্তর্হিত হইল।

মহামহোপাধ্যায় ৺প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন

জন্ম—১২৪৯—২১এ শ্রাবণ, মৃত্যু—১৩২১—২২এ কার্ত্তিক

পূর্ব্ববঙ্গের রত্ন প্রসন্নচন্দ্র ও অর্দ্ধশতাব্দী কাল অধ্যাপনা করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া, পাণ্ডিত্য গৌরবে ও চারিত্র্য-সৌরভে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া, আজ স্তুতিনিন্দার অতীত লোকে গমন করিয়াছেন।

৺লর্ড রবার্ট্‌স

ফ্রেডরিক স্লে রবার্টস, অফ্ কান্দাহার প্রিটোরিয়া ও ওয়াটারফোর্ড, ভাইকাউন্ট সেন্ট পিরি (১৯০১) প্রথম ব্যারণ ১৮৯২ P. C., K. P., G. C. B., G C. S. I., G. C. I. E., V. C., K. G., D. C. L., L. L. D., O. M., F. M. & Conolel of National Reserves.

লর্ড রবার্টস
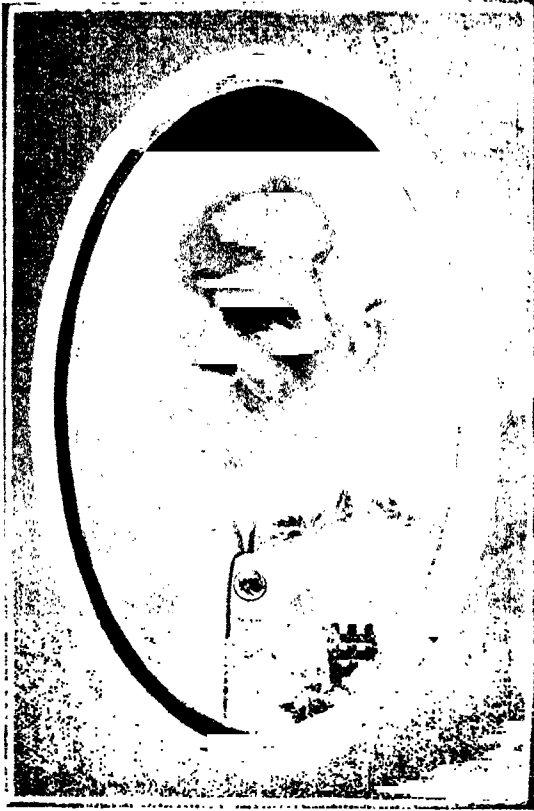
জন্ম—১৮৩২ - ৩০এ সেপ্টেম্বর—মৃত্যু—১৯.৪—১৫ই অক্টোবর

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কানপুরে ইঁহার জন্ম হয়। লর্ড-রবার্টসের পিতা জেনারল স্যর এব্রাহাম রবার্টস্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। ইটন, সাণ্ডহার্ষ্ট, ও এডিসকুম্বে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মে লর্ড রবার্টসের বিবাহ হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর বেঙ্গল আর্টিলারির দ্বিতীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট হইয়া আসেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই আহত হন এবং এই বিদ্রোহ-দমনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের জঙ্গীলাট পদে নিযুক্ত ছিলেন। চির-কাল সামরিক কার্য্যে থাকিয়াও তিনি পুস্তক-প্রণয়ন করিয়াছেন। লর্ড রবার্টস দীর্ঘকাল সমর-বিভাগে থাকিয়া, নানাস্থানে বহুযুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া, সমর-বিভাগের শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। ভারতীয় বীর শিখ, গুর্খা,পাঠান সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভরে দেখিত এবং তিনিও তাহাদের বীরত্ব ও প্রভুভক্তির একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, ভারতীয় সৈনিকগণের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগেরই পরিচয় দিয়াছেন। সকলে বার বার নিষেধ করিলেও আবেগবশে উপযুক্ত পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত না করিয়া, শৈত্য-সংস্পর্শে তাঁহার যে পীড়া হইল, তাহাতেই এই মহাবীরের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

স্বর্গীয় বিপ্রদাস পাল চৌধুরী

বাঙ্গালীর কর্ম্মবীর, তাম্বুলী-জাতির গৌরব, নাটুদহের বিখ্যাত জমীদারবংশীয় স্বনামধন্য বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি লণ্ডনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার

জীবনে ভোগের ও উদ্যোগের বিশেষ সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। বিশিষ্ট জমীদার-পুত্র হইয়া ভোগ-বিলাসে দিন না কাটাইয়া, চিরজীবনই ইনি নানাকার্য্যে উদ্যোগী ছিলেন এবং নানা-প্রকার অনুষ্ঠানও করিয়াছেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নাটুদহে ইঁহার জন্ম হয়। ১৯ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়। ২২।২৩ বৎসর বয়সে তিনি পূর্ত্তবিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিতে বিলাতে যান এবং সাড়ে তিন বৎসর পরে প্রত্যাগমন করেন। বিদেশের বিজ্ঞানবীজ স্বদেশে রোপণ করিয়া, স্বদেশীয়দিগকে উহার ফলভোগ করাইবার বাসনা তাঁহার প্রবল ছিল। এই উপলক্ষে লৌহ-কারখানা, চামড়া-সংস্করণ, পিতল-ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি নানা কার্য্যে তিনি অজস্র অর্থক্ষতি স্বীকার করিয়াও পুনঃ পুনঃ এই সকল কার্য্যে উদ্যোগী হন। দেশের উন্নতি সাধন, প্রজাবর্গের দুর্দ্দশা নিবারণ, এবং শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। কৃষকদিগের দুঃসময়ে সাহায্য করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে মাতৃদেবীর উদ্দেশে "কৈলাসেশ্বরী ফণ্ড" নামে একটি Co-operative Credit Society স্থাপন করেন। প্রজাদিগের জলকষ্ট-বিদূরণের জন্য বার্ষিক ৫০০।৬০০ ব্যয়ে কূপাদি খননের ব্যবস্থা আছে। অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাসিক সাহায্যের জন্যও ২০০।২৫০ টাকা দান ছিল।

গত এপ্রেল মাসে স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বিপ্রদাস বাবু এবার সপরিবারে বিলাত-যাত্রা করেন। তাঁহার পুত্রত্রয় এখন বিলাতেই আছেন।

৺লেডী কটন্

ভারতবন্ধু স্যার্ হেন্‌রী কটনের পত্নী বিগত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন নগরে পরলোক গমন করিয়াছেন। লেডী কটনের মৃত্যু-সংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই ব্যথিত। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল কুমারী রিয়ান্ (Miss Ryan). ১৮৬৭ সালে ফ্রেশওয়াটার নামক স্থানে তাঁহার সহিত স্যার্ হেন্‌রীর বিবাহ হয়। বিবাহান্তে লর্ড টেনিসনের গাড়ী করিয়া নবদম্পতি গির্জ্জা হইতে বহির্গত হন। লোকান্তরিতা লেডী কটন যেমন গুণবতী, সেইরূপ বিদুষী ছিলেন। যৌবনে তিনি বিলাতের বিখ্যাত সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার মনোমোহিনী মূর্ত্তি কয়েকজন চিত্রকর আলেখ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। স্যার্ হেন্‌রী কটন্ যখন আসামের চীফ কমিশনার, সে সময় তিনি স্বামীর সঙ্গে ছিলেন। বিগত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘোর ভূকম্পনে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ যখন আলোড়িত হইয়াছিল, সেই সময় শিলংয়ের গবর্ণমেণ্ট হাউস্ ও অন্যান্য অট্টালিকাসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। সেই সময় হইতে লেডী কটনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তদবধি তিনি আর সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই। তিনটি কৃতী পুত্র ও বর্ষীয়ান্ স্বামীকে রাখিয়া পুণ্যবতী সাধ্বী পরলোক গমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে পত্নীর শোক স্যার হেন্‌রী কটনকে বড় বিষম বাজিয়াছে, সন্দেহ নাই। ভগবান তাঁহাকে শোকসংবরণের শক্তি প্রদান করুন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

৺টি. পি. মিত্র
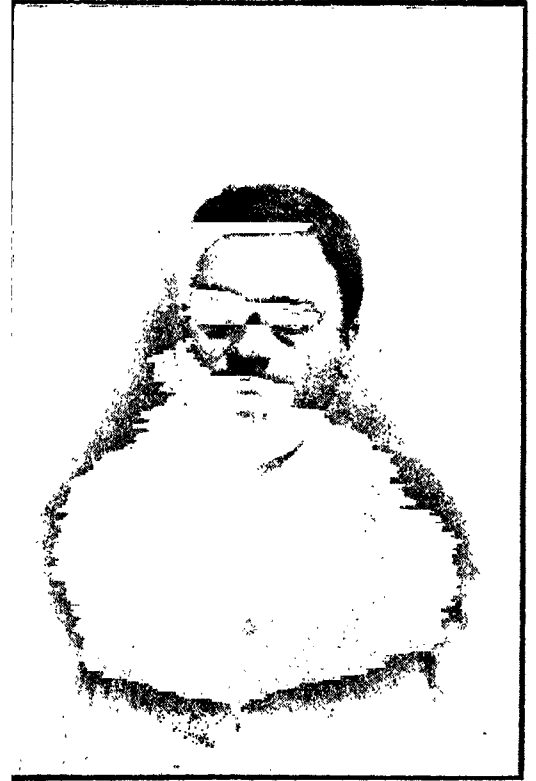
'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মিত্র বা টি. পি.র নাম যেন একসূত্রে গাঁথা। বিগত ১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার দেহত্যাগের সহিত সেই অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন বাবুর মাতা এখনও জীবিতা। পুত্রহীনা মাতা ও স্বামিহীনা পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা পৃথিবীতে নাই।

মাস-পঞ্জী

(কার্ত্তিক)

১লা—স্যর এফ, ডিউকের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য-নিয়োগ সংবাদ-প্রচার।—লাহোরের "জমীদার" পত্র-সম্পাদক মিঃ জাফর আলীকে নজরবন্দী করার সংবাদ প্রচার।

২রা—উড়িষ্যার দশপাল্লা রাজ্যে বিদ্রোহ।—জেনারেল হ্যামিলটনের মৃত্যু। দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্ণেল মারিজ নামক বুয়ার সেনাপতি বিদ্রোহী: তাহার অধীনস্থ অনেক সৈনিকপুরুষ ধৃত হইয়াছে।

৩রা—লণ্ডনে "ট্রাফালগার" উৎসব।—মাননীয় সৈয়দ আবদুল রউফ সভাপতিত্বে এটাওয়ায় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সম্মিলনীর অধিবেশন। এটাওয়ায় এক "এডুকেশন এক্‌জিবিসন্" উদ্ঘাটন। —সৈয়দ আলি আলহায়রী মুজতাহীদের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে অল-ইণ্ডিয়া-সিয়া-কনফারেন্সের বাৎসরিক অধিবেশন।—"লোকখানা গেজেট্" সম্পাদক শ্রীটহলরাম মুলচ্, কথিত মানহানির দায়ে অভিযুক্ত।—দশপাল্লা রাজ্যে শান্তি-স্থাপন; বিদ্রোহিগণ পলাতক।

৪ঠা—"এমডেন" কর্ত্তৃক আরও পাঁচখানা জাহাজ ডুবাইবার সংবাদ প্রকাশ।

৫ই—লণ্ডনে "নেলসন ডে" উৎসব।—বটেভিয়ায় আন্তর্জাতিক "রবার-প্রদর্শনী" উদ্ঘাটন।

৬ই—মিঃ উইলিয়ম ট্যাটাস্যলের মৃত্যু।—কলিকাতায় "বজবজ দাঙ্গা-অনুসন্ধান কমিটির" অধিবেশন আরম্ভ।—পারামবোরে সুবেদার মেজর সুলেমান খাঁ সাহেবের মৃত্যু।—স্যর্ বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু।—মাননীয় রায় শিবশঙ্কর সর্দ্দার বাহাদুরের মৃত্যু।

৭ই—মাননীয় কে. আর. ভী. কৃষ্ণরাওর সভাপতিত্বে এলোরে 'কৃষ্ণা প্রাদেশিক সমিতি'র ২৩ বাৎসরিক অধিবেশন।—কাশ্মীর-রাজের "হোম্‌মিনিষ্টর" ডাক্তার এ. মিত্রের মৃত্যু।

৮ই—নিউপোর্ট যুদ্ধে জেনারেল ট্রিপ ও তাঁহার "ষ্টাফে"র নিধন-বার্ত্তা প্রচার।—জেনারেল স্যর চার্লস ডগলাসের মৃত্যু।—কলিকাতা পুলিশ কোর্টের উকীল আশুতোষ সাহার মৃত্যু।

৯ই—এটর্নী অমরনাথ ঘোষের মৃত্যু।—"সার্ব্বজনিকধর্ম্ম"-প্রণেতা ইঞ্জিনিয়ার পূর্ণচন্দ্র সরকারের মৃত্যু।

১০ই—'বেঙ্গলী'র ম্যানেজার তারাপ্রসন্ন মিত্রের মৃত্যু।—মহেশগঞ্জের বিখ্যাত জমীদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরীর মৃত্যু।—জেনারেল স্যর উইলিয়ম ফ্রান্‌কিন্‌লের মৃত্যু।

১১ই—প্রিন্স্ মরিস অফ্ ব্যাটেনবার্গের মৃত্যু।

১২ই—স্যর জন্ ওয়ালেস্, মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান-জজ্‌পদে নিযুক্ত।—সাইনর পেলিটীর মৃত্যুসংবাদ প্রচার।

১৩ই—ভাইস্-এড্‌মিরাল্ প্রিন্স্ লুই অফ্ বাটেন্‌বার্গের পদত্যাগ।—পূর্ণিয়ার বিখ্যাত ইউনানী চিকিৎসক পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্রের মৃত্যু।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার ডাক্তার জি. থিবর মৃত্যুসংবাদ-প্রচার।

১৪ই—স্যর উইলিয়ম ডিউকের পদত্যাগ।—বোম্বায়ের ধনকুবের শ্রীযুক্ত সি. নৈরোজির মৃত্যু।

১৫ই—তুর্কীর সহিত মিত্রপক্ষদিগের যুদ্ধ-ঘোষণা।

১৬ই—ভূতপূর্ব্ব সবজজ রায় সাহেব গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১৭ই—সার্ভিয়া কর্ত্তৃক তুর্কীর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ।—ঢাকা কলেজের প্রফেসর কালীপদ বসুর মৃত্যু।

১৮ই—মেদিনীপুর-বিভাগসম্বন্ধে এক 'ডেপুটেসনে' লর্ড কারমাইকেল্ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎকার।—"কমরেড্" পত্রিকার জামিন সরকার বাহাদুর-কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত।—ইজিপ্টে 'মার্শেল ল' জারী।

১৯এ—জেনারেল্ কেকেউইচ ও ডিউক অফ্ বুকলের মৃত্যু।

২০এ—শিবাজী বংশীয় শিবাজীরাও সাহেবের মৃত্যু। ফ্রান্সের সহিত তুর্কীর যুদ্ধ-ঘোষণা।—জাপানী সৈন্য কর্ত্তৃক সিংটাও অধিকার।

২২এ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের মৃত্যু।

২৩এ—লণ্ডনে 'লর্ড মেয়র্স ডে' উপলক্ষে 'গিল্ডহলে' মহাভোজ।

২৪এ—মেদিনীপুর বিভাগ যে নিষ্কারিত, লর্ডকারমাইকেল বাহাদুর-কর্ত্তৃক এই অভিমত জ্ঞাপন।—মাননীয় কাপ্তেন এ. ও'নীলের মৃত্যু। "সিড্‌নী" নামক ইংরেজদের রণতরী কর্ত্তৃক "এমডেন" নামক জার্ম্মান রণতরী-দাহ।—হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর হেনরী প্রিনসেপের মৃত্যু।

২৫এ—কলুটোলার বিহারীলাল পাইনের মৃত্যু।—কমন্স্ মহাসভা উদ্ঘাটন।

২৬এ—ভূতপূর্ব্ব সবজজ শ্রীশশিভূষণ সেনের মৃত্যু।—"হামদর্দ্দ" পত্রিকার প্রচার বন্ধ।

২৭এ—দিনাজপুরের উকীল মধুসূদন রায়ের মৃত্যু।—নারায়ণগঞ্জের পাট-ব্যবসায়ী যোগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্তের মৃত্যু।

২৯এ—আর্ল রবার্টসের মৃত্যু।

৩০এ—কলিকাতার "আল-হিলাল্" প্রেস্ পুলিশ-কর্ত্তৃক অনুসন্ধান ও তাহার জামিনের টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত।—জনাইয়ের শ্যামলচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের মৃত্যু।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি.এ.-প্রণীত 'ভাষা ও স্বর' নামক একখানি গীতিকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত 'বল্লাল সেন' নামক একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের কিশোরদিগের জন্য নূতন ছোট গল্প সংগ্রহ—'কিশোর' ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

"বৈজ্ঞানিকী", "প্রাকৃতিকী" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা, অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বালকবালিকাদিগের উপযোগী একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থরচনা শেষ করিয়াছেন। শীঘ্রই উহা সচিত্র হইয়া প্রকাশিত হইবে।

'শৈব্যা' 'মহরম' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "ব্রতকথা" প্রকাশিত হইয়াছে; ঢাকার পপুলার লাইব্রেরী ইহার প্রকাশক। গ্রন্থকারের আর একখানি গল্প-গ্রন্থ, "কলের ডায়ারী" যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "ইন্দুমতী" নামক একখানি 'কাব্য' প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট; ইহাতে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা চারিআনা মাত্র।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "সমসাময়িক ভারত" এবং "ইংরাজের কথা" বিহার ও উড়িষ্যার 'টেক্সটবুক কমিটী' কর্ত্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজ পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। দেশের অনেক সুধীবৃন্দ এই বিরাট-গ্রন্থাবলী প্রণয়নে নিযুক্ত শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয় 'লা-মিজারেবলের' প্রকাণ্ড অনুবাদ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সুবিস্তৃত গ্রন্থ বহুচিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। তিনি বর্ত্তমান মহাসমর সম্বন্ধেও একখানি সুদীর্ঘ পুস্তক লিখিয়াছেন; তাহাও যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

পাটনা-কলেজের অধ্যক্ষ জ্যাকসন্‌ও অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়ের সঙ্গে উক্ত কলেজের ২২জন ছাত্র পরেশনাথ, গুরপা এবং বুদ্ধগয়ার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিয়া, সম্প্রতি পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রকাশ, বড়দিনের ছুটীতে তাঁহারা বরাকর প্রভৃতি স্থানে যাইবেন।

গৌহাটি "সনাতন ধর্ম্ম সভা কর্ত্তৃক 'সমাজসেবক পুস্তকাবলী'রূপে নিম্নলিখিত চারিখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; স্বধর্ম্মপরায়ণ শক্তিমান সাহিত্যসেবী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ-প্রণীত 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রমনিরাশ' এবং 'হিন্দু বিবাহ-সংস্কার'; স্বধর্ম্মসেবী শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, বি. এল্-প্রণীত 'ঈশ্বরের স্বরূপ' এবং 'ঈশ্বরের উপাসনা'। ইহার প্রত্যেকখানির মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র এবং প্রত্যেকখানিই হিন্দুসন্তান মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

ইংরাজীতে যেমন প্রতিবৎসর 'Who's Who' প্রকাশিত হয়, এ দেশেও সেই প্রকার চেষ্টা হইতেছে। এলাহাবাদের পাণিনি অফিস হইতে একখানি 'Who's Who' প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল ভারতবর্ষের সমস্ত সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁহাদের পুস্তকের নাম, প্রথম প্রকাশের সময় এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির বিবরণ থাকিবে। বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যিকগণ, পাণিনি-অফিস—এলাহাবাদে তাঁহাদের বিবরণ প্রেরণ করিলে, প্রকাশকগণ তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

বীণাপাণি

[শিল্পী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বাগচী]

মাঘ, ১৩২১

দ্বিতীয় খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বীণাপাণি—

আবাহন

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

এস—এস মন্দিরে জননি !
শীতশিশিরাহতে, ভীত-নীরব-নতে,
গীত-মুখরিত করি চির এমনি।
এস—পিককুল-কুহরিত-কুঞ্জে,
এস—দিককুলে শুভালোকপুঞ্জে,
এস—অলিকুল-গুঞ্জনে কলিফুল-রঞ্জনে,
ফুলমধু-ভুঞ্জনে পুলকিয়া ধরণী ;
এস বনকান্তারে জননি !
এস—আম্র-মুকুল-মৃদু-গন্ধে,
এস—তাম্র-প্রবাল-লীলানন্দে,
এস—নন্দনাগত-দূতে, মন্দচল-মারুতে,
চন্দ্রজ্যোছনা-পূত করি, তমোহরণি ;
ছায়াপথ বাহি' এস জননি !

পূজন

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

সকল ভবন আলোকি' আজি যে জননী আমার রাজে,
সরস-হৃদয় করুণা-পরশ বিপুল পুলক মাঝে ;
সারাটি বঙ্গে উঠিয়াছে আজি মায়ের অভয়-বাণী—
'আমার বঙ্গবাণী—সে যে গো অখিল-জ্ঞানের রাণী।'

আম্রমুকুল-পলাশ-বিল্ব মায়ের চরণে শোভে ;
মধুপপুঞ্জ কুঞ্জ হইতে ছুটিছে মধুর লোভে ;
গুঞ্জরে তারা কত-না ছন্দে—কত-না মধুর বাণী,—
'আমার বঙ্গবাণী—সে যে গো অখিল-জ্ঞানের রাণী।'

শঙ্খ-ঘণ্টা বন্দনা-গীতি ঐ শুন ঘন বাজে ;
মানস-আসনে শুভ্র-উজল চরণ-সরোজ রাজে ;
শোভিছে পুণ্য-আরাধনামাঝে মায়ের আননখানি ;—
'আমার বঙ্গবাণী—সে যে গো অখিল-জ্ঞানের রাণী।'

বহুদিন পরে ডেকেছেন মাতা আর কি ঘুমান সাজে ;—
কোথায় রয়েছ অলসে বিলাসে মগন অলীক কাজে ?
পশেছে স্মরণে ধররে চরণে, বহুভাগ্য আজি মানি ;—
'আমার বঙ্গবাণী—সে যে গো অখিল-জ্ঞানের রাণী।'

ভজন

[শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, B. A.]

নটবেহাগ—ঝাঁপতাল

বরদে সারদে দেবি বাগ্‌বাদিনি,
বিজ্ঞান-ঘনরূপা, তমোহারিণি !
করে বেদ-বীণা, পূত পদ্মাসীনা,
অনন্য সাধকে জ্ঞান-দায়িনি !
কল্যাণ-দায়িকে, কলুষ-হারিকে,
মোহান্ধ-নাশিকে, জ্যোতিঃ-বিধায়িকে !
করুণ নয়নে হের ভকতজনে,
ধরে'ছি চরণে, দীন-তারিণি !

কবি কেশবদাস

[শ্রীরসিকলাল রায়]

"সুর সুর তুলসী সসী
উড়গন কেসবদাস।"

হিন্দী সাহিত্যসমাজে আপামর সাধারণ সকলের মুখের ঐ এক কথা,—

"সুর সুর, তুলসী সসী, উড়গন কেসব দাস;
আব্‌কে কবি খদ্যোতসম যহাঁ তহাঁ করত পরকাস।"

"কাব্যগগনে 'সুরদাস' হিন্দীর গৌরবসূর্য্য, তুলসীদাস নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী, কেশবদাস উজ্জ্বল নক্ষত্র। অতঃপর যে সকল লেখক (কবি) লেখনী-পরিচালনাদ্বারা সাহিত্য-সেবা করিয়া যশস্বী হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা খদ্যোতের ন্যায় যেখানে সেখানে মিটিমিটি জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছেন।" নিরপেক্ষ জনসাধারণের এই কঠোর মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, আংশিকভাবে যথার্থ। তুলসীদাস, হিন্দী রামায়ণের অমৃত সঙ্গীততরঙ্গে হিন্দী-ভাষা-ভাষী নরনারীর চিত্ত অপূর্ব্ব আনন্দরসে প্লাবিত করিয়া অমর হইয়াছেন। তুলসীর প্রতিভা, ভক্তিরসের বর্ণনায় সবিশেষ পরিস্ফুট হইলেও, কি বীর রস, কি করুণ রস, কি বাৎসল্য রস, কি মধুর রস, সকল বিষয়েই তাঁহার প্রায় তুল্য অধিকার ছিল। তাঁহার মধুর-স্নিগ্ধ দোহাবলী ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুস্থানবাসীর কণ্ঠে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকটও তুলসীর নাম সুপরিচিত। অনেক সাময়িক পত্রে ও পুস্তকাদিতে বঙ্গভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ তুলসীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দী-সাহিত্যের কবি সম্রাট্ ভক্তকুল-চূড়ামণি 'সুরদাসের' কথা, দুইতিনবৎসর পূর্ব্বে পত্রিকান্তরে, আমরা ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব, স্বদেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলাম। কিন্তু সুকবি কেশবদাসের নাম বঙ্গবাসীর কর্ণগোচর হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।* চাঁদবর্দ্দৈ হিন্দী কবি-বংশের প্রপিতামহ। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে আমাদের মতে সুরদাস, তুলসী দাস, ভূষণ ও বিহারীলালের পরেই কবি **কেশবের** আসন। † 'আনন্দ-কাদম্বিনী' এবং 'নাগরীনীরদে'র সুযোগ্য সম্পাদক তৃতীয়-হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বদরীনারায়ণ চৌধরী, কেশবকে শ্রীহর্ষের সহিত এবং বিহারীলালকে কালিদাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন,—

'যদি কেশব শ্রীহর্ষ, তো বিহারী কালিদাস হৈঁ।' ‡

উল্লিখিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দীসাহিত্যসেবক মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, ১৬শ বিক্রম শতাব্দীতে যেসকল হিন্দী সুকবির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার তৃতীয় শ্রেণীতে **কেশব**, নরহরি, তুলসী, দেব, ভূষণ, মতিরাম, বিহারী, ভিখারীদাস, আনন্দঘন, পদ্মাকর, কবিন্দ, পজনেস প্রভৃতির নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই পুষ্ট ব্রজভাষা ও মিশ্রিতভাষায় কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। §

হিন্দী 'নবরত্নে'র গ্রন্থকার 'মিশ্র' পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, কেশবদাস খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা সম্বন্ধে সবিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তিনি স্বয়ং 'কবি প্রিয়া' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিতভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি, সনকাদির মানস পুত্র সনাঢ্য। পরশুরাম, সনাঢ্যের চরণ প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে অনেক গ্রাম ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহাকে মথুরামণ্ডলে ৭০০ গ্রাম প্রদান করিয়া-

* এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইবার পর দেখা গেল, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অপর এক মাসিকপত্রে 'কেশবদাস ও বিহারিলাল রায়' শীর্ষক প্রবন্ধে কেশব কবির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছিল।

† অন্য দুইখানি মাসিকপত্রে আমরা বিহারীলাল ও ভূষণ ত্রিপাঠীর কথা আলোচনা করিয়াছি।

‡ তৃতীয় হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলন, কার্য্যবিবরণী, ৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

§ তৃতীয় হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলন, কার্য্যবিবরণী, ৩৬—৩৭ পৃঃ।

ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে ঐ দেশ পুনরায় দান করেন। সনাঢোর কুম্ভবার কুলে দেবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র জয়দেব, জয়দেবের পুত্র দিনকর। দিল্লীর আলাউদ্দীন বাদশাহ, দিনকরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। দিনকর গয়াতীর্থের প্রসাদে যে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম গয়াগদাধর। তাঁহার পুত্র জয়ানন্দ এবং জয়ানন্দের নন্দন ত্রিবিক্রম মিশ্র। গোপাচল দুর্গের রাজা, ত্রিবিক্রমের পাদপূজা করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রমের পুত্র ভাবশর্ম্ম, তাঁহার পুত্র সুরোত্তম মিশ্র। রাজা মানসিংহ, সুরোত্তমকে বিশখনা গ্রাম প্রদান করেন। সুরোত্তম মিশ্রের পুত্র হরিহরনাথ, তাঁহার আত্মজ কৃষ্ণদত্ত। মহারাজ রুদ্র, কৃষ্ণদত্তকে বৃত্তিদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদত্তের পুত্র কাশীনাথ; কাশীনাথের নন্দন বলভদ্র, **কেশবদাস** ও কল্যাণদাস।'

ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বংশলতা প্রাপ্ত হইতেছি;—
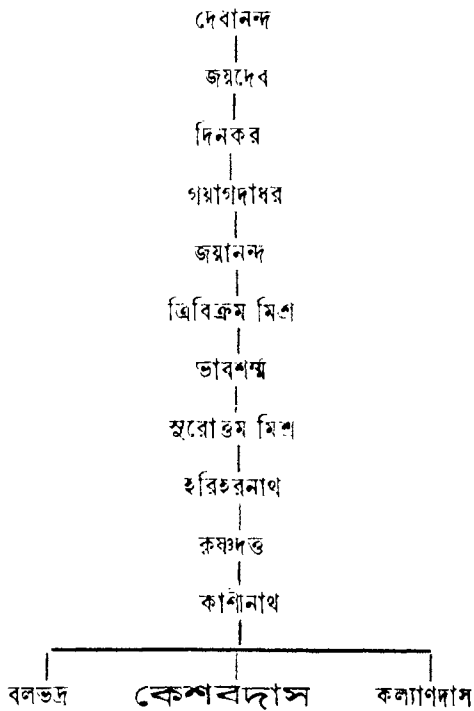
হিন্দী 'নবরত্নে'র মিশ্র-ভ্রাতৃগণ অনুমান করেন, ১৬০৮ সংবৎ, অর্থাৎ ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাহা প্রকৃত হইলে, ভক্ত কবি সুরদাসের তিরোধানকালে কেশব বালক ছিলেন। কেশবের পিতা জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতামহ পুরাণে পারদর্শিতার জন্য বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী ওড়ছে গ্রামে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন।* কেশবও সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদিতে তাঁহার সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কেশবের লেখনী তাঁহার তরুণীভার্য্যা ও বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে যে রসোদ্গার করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, বোধ হয়, তাঁহার পত্নীর নাম 'চন্দ্রবদনী' ছিল—

'চন্দ্রবদনী মৃগ-লোচনী বাবা কহি কহি জাহিঁ'।

কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অনুমান-মূলক তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কেশবের বিবাহ, শ্বশুরালয় ও পারিবারিক-জীবনের কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই। অমানিশার ঘোরান্ধকারে অনন্তগগনবক্ষে যে অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্কের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা উজ্জ্বল স্মৃতির রেখা পশ্চাতে ফেলিয়া অন্ধকারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ দাসজী লিখিয়াছেন, বিখ্যাত কবি বিহারিলাল কেশবের আত্মজ ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস বিরচিত 'বিহারী-বিহার' গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিলে, অন্যরূপ ধারণা জন্মে। হিন্দী 'নবরত্ন'ও এইমত সমর্থন করেন নাই।

শিবাজীর সভাকবি, ভূষণ ত্রিপাঠী, ছত্রপতিদ্বারা কিরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পত্রান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। কবি কেশবজীও প্রায় তত্তুল্য রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কেশব, ওড়ছে গ্রামে বাস করিয়া, তাঁহার পিতামহের প্রাপ্ত বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন। ওড়ছেতে অদ্যাবধি গহরবার বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করিতেছেন। ইঁহারা মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর।

---

* গ্রিয়ার্সন সাহেব বলেন, "কেসবদাস সনাঢ্য মিশ্র of Bundelkhand. His original home was in Tehri, but he visited king Madhukar Shah of Urchha and received much honour from him. Subsequently King Indrajit, Madhukar's son, endowed him with twenty-one villages, whereupon he and his family finally settled in Urchha."—The Modern Literary History of Hindustan.

এইবংশে পঞ্চমসিংহ নামক এক পরাক্রান্ত ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চমের বংশোদ্ভব রামসিংহ, কেশবের সমসাময়িক ছিলেন। কোন কোন হিন্দীসাহিত্য-সমালোচকের মতে রামসিংহের প্রকৃত নাম, দুলহরাম সিংহ।
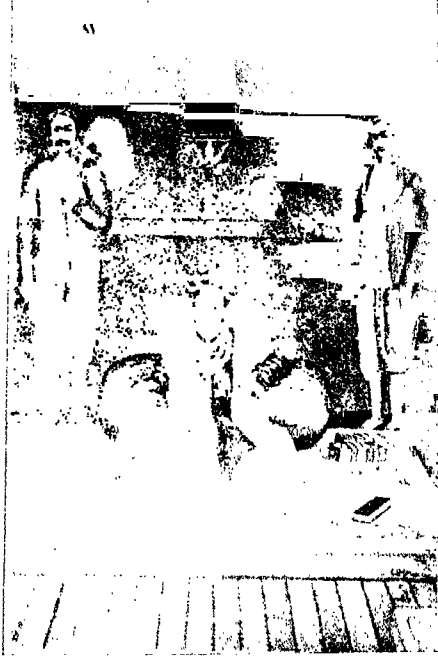
কবি কেশবদাস

রামসিংহের কনিষ্ঠভ্রাতা 'ইন্দ্রজিৎ সিংহ'—নামে না হইলেও কার্য্যে—ওড়ছে-রাজ্যের রাজা ছিলেন। রাজা রামসিংহ, সহোদরের হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ 'কক্ষেবা কমল' নামক দুর্গ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায়ই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। পৃথ্বীরাজের সহিত চন্দবরদাইর, শিবাজীর সহিত ভূষণের, এবং নবাব খানিখানার সহিত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের যে সম্বন্ধ, ইন্দ্রজিতের সহিত কেশবদাসেরও সেই সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল।† বিদ্যোৎসাহী গোষ্ঠীপতি রাজা এবং ভূস্বামিগণের সাহায্য ও আশ্রয় ব্যতীত কবিতা-লতিকা জীবিত থাকিতে পারে না। বরাভয়-করা দশভুজা শক্তির মহিমা-চন্দ্রাতপতলে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর গৌরব ও প্রতিভা চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে। রাজা হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য, কনিষ্ক, আকবর, শিবাজী, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, শিবসিংহ প্রভৃতি সহকারতরু বেষ্টন করিয়া কতশত সুকুমারকলা-কবিতা-ও-শিল্প-মাধবী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রজিতের উৎসাহে ও সাহায্যে কেশবের প্রতিভা পরিপুষ্টি ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কথিত আছে, ইন্দ্রজিতের কক্ষেবা কমল দুর্গে সঙ্গীতের 'আখড়া' ছিল। তাহাতে ছয়জন প্রসিদ্ধা গায়িকা-নর্ত্তকী সংগৃহীতা হইয়াছিল, যথা—

'(১) রায় প্রবীণ, (২) নবরঙ্গরায়, (৩) বিচিত্রনয়না,
(৪) তানতরঙ্গ, (৫) রঙ্গবাই, ঔর * (৬) রঙ্গমূরতি।'

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, ইন্দ্রজিৎ রায়প্রবীণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। রায়প্রবীণ গণিকা নর্ত্তকী হইলেও তাহার অসাধারণ 'পাতিব্রত্য' ছিল। এই গায়িকা আমাদিগকে 'বিল্বমঙ্গলে'র চিন্তামণি ও 'পরপারে'র শান্তার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার রূপলাবণ্যের খ্যাতি শুনিয়া, সম্রাট্ আকবর তাহাকে দিল্লীর দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দ্রজিতের নিকটই সম্রাটের আদেশ প্রেরিত হইয়াছিল। সুকবি রায়প্রবীণ, † বাদশাহের আদেশ অবগত হইয়া, ইন্দ্রজিতের সভায় নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

"আই হোঁ বূঝন মন্ত্র তুমহৈ নিজ
সাসন সৌঁ সিগরী মতি গোই।
দেহ তজৌঁ কি তজৌঁ কুল কানি,
হিয়ে ন লজৌঁ লজি হৈ সব কোই॥

"স্বারথ ঔ পরমারথ কো পথ
চিত্ত বিচারি কহৌ অব সোই।
জা মেঁ রহৈ প্রভু কী প্রভুতা, অরু
মোর পতিব্রত ভঙ্গ ন হোই॥"

—'(সম্রাটের) আদেশ শুনিয়া, আমি হতজ্ঞান হইয়া, আপনার নিকট পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। আমি এ

† তৃতীয় হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ,—৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* ঔর = এবং, আর।

† "She was authoress of numerous short poems which have a great reputation."—The Modern Literary History of Hindustan by G. A. Grierson, p. 59.

দেহই ত্যাগ করিব, কি কুল (সতীধর্ম্ম) ত্যাগ করিব ? কেননা আমার মনে লজ্জা না হইলেও আর সকলে লজ্জিত হইবে। অতএব স্বার্থ এবং পরমার্থ চিত্তে বিচার করিয়া, সেইরূপ উপায় নির্দ্দেশ করুন, যাহাতে প্রভুরও প্রভুতা রক্ষা হয় এবং আমারও পাতিব্রত্য নষ্ট না হয়।'

ইন্দ্রজিৎ নিরুপায় হইয়া রায়প্রবীণকে আগরা পাঠাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু গায়িকার উক্তি শুনিয়া, তিনি লজ্জায় মাথা হেট করিলেন এবং আশ্রিতাকে বিধর্ম্মী সম্রাটের সভায় প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। সম্রাট্, মনোরথভঙ্গ হেতু ক্ষুব্ধ হইয়া, রাজদ্রোহ-অপরাধে ক্ষুদ্র অধীন নরপতির ভ্রাতার ক্রোরমুদ্রা অর্থদণ্ড করিলেন। ‡ জনশ্রুতি, কেশবদাস আগরা যাইয়া, বীরবলের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া, তাঁহার প্রতিপালক ইন্দ্রজিতের অর্থদণ্ড মাপ করাইয়াছিলেন। পরে সে প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাইতেছে।

কেশবের জন্মভূমি ওড়ছে গ্রাম § বেতবৈ নদীর তীরে অবস্থিত। কেশব তাঁহার জন্মভূমি ও শৈশববন্ধু বেতবৈ নদীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ;—

"নদী বেতবৈ তীর জহঁ তীরথ তুঙ্গারণ্য।
নগর ওড়ছো বহু বসৈ ধরণীতলমেঁ ধন্য॥
কেশব তুঙ্গারণ্য মেঁ নদী বেতবৈতীর।
নগর ওড়ছো বহু বসৈ পণ্ডিত মণ্ডিত ভীর॥"
ইত্যাদি।

—'বেতবৈ-নদীর তীরে তুঙ্গারণ্য নামক তীর্থ, তথায় ওড়ছে নগরে বহুলোকের বাস; উহা ধরণীতলে ধন্য। কেশব (কহে), তুঙ্গারণ্যে বেতবৈ নদীর তীরে ওড়ছে নগরে বহুপণ্ডিতজন বাস করেন।'

'রসিকপ্রিয়া' গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, ইন্দ্রজিৎ ভিন্ন ওড়ছেতে আর কেহ কবি কেশবের গুণের সমুচিত আদর করিতেন কি না সন্দেহ। 'রসিকপ্রিয়া' গ্রন্থে কবি লিখিয়াছেন,—

"তিন কবি কেসবদাস সোঁ কীনহোঁ ধরম সনেহ।
সব সুখদৈ কৈ য়হ কহো 'রসিক প্রিয়া' করি দেহ॥"

—"তিন রসিক ব্যক্তি কেশবদাসের প্রতি অত্যন্ত পবিত্র প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেশবের সকলপ্রকার সুখভোগের ব্যবস্থা করিয়া, 'রসিকপ্রিয়া' গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন।"

কেশব, ইন্দ্রজিতের অর্থদণ্ড ক্ষমা করাইতে, রাজধানী আগরা গমন করিয়াছিলেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তথায় কবি কেশব, মহারাজ বীরবলের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া, নিম্নোদ্ধৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,—

"পাবক পঙ্খী পসু নর নাগ নদী নদ লোক রচে দস চারী।
কেসব দেব অদেব রচে নরদেব রচে বরনান নিয়ারী॥
কৈ বর বীর বলী বর কোয্ ভয়ো কৃত কৃত্য মহাব্রত ধারী।
দৈ করতাপন আপন তাহি দিয়ো করতারী দুহুঁ করতারী॥"

—'কেশব (কহে), (ব্রহ্মা) পাবক, পক্ষী, পশু, নর, নাগ, নদী, নদ, চতুর্দ্দশ ভুবন রচনা করিয়া বর্ণনাতীত দেবতা রাক্ষস ও রাজা রচনা করিলেন। (অবশেষে) মহাব্রতধারী ব্রহ্মা বলী বীরবরকে সৃষ্টি করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন, এবং তাঁহাকে আপন তেজঃ ও প্রতিভা অর্পণ করিয়া আনন্দে করতালি দিতে লাগিলেন।'

উক্ত দোহা শ্রবণ করিয়া গুণগ্রাহী বীরবল এতদূর প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট ছয়লাখ টাকার একখানা হুণ্ডী ছিল, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ কেশবদাসকে পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ আকবরের নিকট দরবার করিয়া কেশবের প্রভু ইন্দ্রজিতের অর্থদণ্ড মাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। * প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, কেশব পরে আবার

---

‡ "শিবসিংহ সরোজ" নামক গ্রন্থে এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা আছে।

§ গ্রিয়ার্সন সাহেবের মতে 'টেহ্‌রী।'

* "When the Emperor Akbar fined king Indrajit ten million rupees for disobedience and revolt, because Parbin Rai Paturi didnot appear in his (Akbar's) court, Kesab Das had a secret audience with Raja Birbal, the Emperor's minister, and recited the wellk-nown lines ending "দিয়ো করতারী দুহুঁ করতারী". Raja Birbal was much pleased with them and got the fine remitted, but Parbin Rai Paturi had nevertheless to appear in court"—G. A. Grierson.

সানন্দে গায়িয়াছিলেন,—

"কেসবদাসকে ভাল লিখ্যো বিধি রঙ্ক কো অঙ্ক বনায়
সঁবার ঠ্যো।
ছোড়ে ছুট্যো নহিঁ, ধোয়ে ধুয়ো বহু তীরথ কে জল জায়
পথার ঠ্যো॥
হৈব গয়ো রঙ্কতে রাউ তহীঁ জব বীরবলী বলবীর
নিহার ঠ্যো।
ভুলি গয়ো জগকী রচনা চতুরানন বায় রহ্যো মুখ চার ঠ্যো॥"

—"বিধাতা কেশবদাসের ললাটে 'দারিদ্র্যের অঙ্কে জন্মিয়া চিরদরিদ্রতা' লিখিয়াছিলেন; সে বিধিলিপি কিছুতেই মিটিল না। বহুতীর্থের জল নিঃশেষ হইয়া গেল, তথাপি তাহা ধুইয়া ফেলিতে পারা গেল না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কেশব বলী বীরবলকে অবলোকন করিয়াছে, সে দরিদ্র হইয়াও রাজা হইয়া গিয়াছে; এই (অসম্ভব সম্ভব হইতে) দেখিয়া, চতুরানন বিস্ময়ে বিহ্বলচিত্ত হইয়া, জগতের সৃষ্টি-কার্য্য ভুলিয়া, চারিমুখ ব্যাদান করিয়া, চাহিয়া আছেন।"

বীরবল পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন, "কবি! বর মাঙ্গ।" কেশব তাঁহার নিজের ভাষায় সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"য়োঁ হীঁ কহ্যো জু বীরবল মাঙ্গু জু মাঁগন হোয়।
মাগ্যোঁ তুব দরবার মেঁ মোহিঁ ন রোকৈ কোয়॥"

—"বীরবল কহিলেন, 'তোমার যে বর ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর।' আমি প্রার্থনা করিলাম,—'আপনার দরবারে যাইতে যেন আমাকে কেহ বাধা না দিতে পারে।'" পার্থিব সম্পদের প্রতি কবির কি ঔদাসীন্য, কি ত্যাগ! দাতারই বা কি উদারতা! সে কালে কবি ও কাব্যের প্রতিই বা লোকের কি অপূর্ব্ব অনুরাগ ছিল!

আগরা হইতে 'ওড়ছে' প্রতিগমন করিলে, কবি কেশবের সম্মান, প্রতিপত্তি ও সুনাম দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কেশব, ইন্দ্রজিতের প্রসাদে গৌরবান্বিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

"ভূতল কো ইন্দ্রজীত জীবৈ জুগ জুগ।
জাকে রাজ কেসৌদাস রাজসো করত হৈ॥"

—'ভূতলের ইন্দ্র ইন্দ্রজিৎ যুগযুগ জীবিত থাকুন, যাঁহার রাজ্যে কেশবদাস রাজার ন্যায় বিরাজ করে।'

কথিত আছে, একবার উদারচেতা ইন্দ্রজিৎ, প্রয়াগে গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান হইয়া, কেশবকে যাহাইচ্ছা প্রার্থনা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কেশবকবির ধনতৃষ্ণা আদৌ ছিল না; তিনি কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধি কামনা করিয়াছিলেন। কবি ইঙ্গিতে এই ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন,—

"ইন্দ্রজীত তাসোঁ কহিও মাঁগন মধ্যপ্রয়াগ।
মাগ্যোঁ সবদিন একরস কীজৈ কৃপা সভাগ॥"

—'ইন্দ্রজিৎ মধ্যপ্রয়াগে তাঁহাকে বর মাগিতে বলিলেন। তিনি চিরদিন যেন রাজার কৃপা তাঁহার প্রতি সমভাবে থাকে, মাত্র এই বর প্রার্থনা করিলেন।'

সরস্বতীর বরপুত্রের কি অদ্ভুত ত্যাগ এবং লক্ষ্মীর বরপুত্রেরই বা কি অসাধারণ গুণগ্রাহিতা!

কাবুলের যুদ্ধে রসিক চূড়ামণি বীরবলের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কৃতজ্ঞ কবি কেশবদাস শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার লেখনীমুখে সে শোকোচ্ছ্বাস যে আকারে উদ্গীর্ণ হইয়াছিল,নিম্নে তাহার অভাস দেওয়া যাইতেছে;—

"পাপকে পুঞ্জ পথাবজ কেসব সোককে সঙ্খ সুনে সুষমা মেঁ।
ঝূঠ কী ঝালরি ঝাঁঝ অলীক কে আবঝজূথন জানি
জমা মেঁ॥
ভেদ কী ভেরী বড়ে ডর কে ডফ কৌতুক ভো কলিকে
কুরমা মেঁ।
জূঝত হী বলবীর বজে বহু দারিদ কে দরবার দমামেঁ॥"

কিংবদন্তী আছে যে, ইন্দ্রজিতের চিত্তে একবার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল যে, 'আমার এই সুন্দর সাঙ্গোপাঙ্গ রাজসভা কালকবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহার উপায় কি? মৃত্যুর পর ইহাকে কিরূপে স্থায়ী করা যাইতে পারে?' কেশবদাস, ইন্দ্রজিতের চিদাকাশ হইতে চিন্তাঘন বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে প্রেতযজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। যেহেতু, প্রেতযোনিতে মানব দশসহস্র বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। কথিত আছে, প্রেতযজ্ঞের যথারীতি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল এবং ইন্দ্রজিৎ দেহত্যাগ করিয়া কেশবদাস প্রভৃতি সভাসদ্‌গণের সহিত প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এজন্য, কোন কোন বিরুদ্ধ পক্ষীয় কবি কেশবের কাব্য সম্বন্ধে 'কঠিন কাব্যেকে প্রেত' বলিয়া কঠোর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কেশব কি প্রকারে প্রেত-যোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও গল্প

প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কেশবের প্রেতাত্মা এক কূপমধ্যে বাস করিতেছিল। দৈবাৎ, গোস্বামী তুলসীদাস সেই ইন্দারায় জল ভরিতে গিয়াছিলেন! কেশব তাঁহার ঘটী ধরিয়া ফেলিলেন। তুলসী, প্রেতযোনির অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে ঘটী ছাড়িয়া দিতে অনুনয়-বিনয় করিলেন। কেশব কহিলেন, 'তুমি যদি আমাকে প্রেত-যোনি হইতে মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া দাও, তাহা হইলেই তোমার ঘটী ছাড়িয়া দিব, নচেৎ নহে।' তুলসী বলিলেন, "তুমি তোমার স্বরচিত 'রামচন্দ্রিকা' একুশবার আবৃত্তি কর, তাহা হইলেই তোমার প্রেতযোনি ত্যাগ হইবে।" 'রামচন্দ্রিকা'র প্রথম কবিতা কেশবের স্মরণ হইতেছিল না, তুলসী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়াদিলেন। কেশব প্রেতযোনি-মুক্ত হইয়া অমরধামে প্রয়াণ করিলেন।

এই গল্প বিশ্বাসযোগ্য নহে; কিন্তু ইহা হইতে আমরা কতক সত্যনির্দ্ধারণ করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি, কেশব, তুলসীদাসের পূর্ব্বকালবর্ত্তী কবি ছিলেন। তুলসী ১৬৮০ সংবৎ স্বর্গলাভ করেন।

"সম্বৎ সোরহ্ সৌ অসী গঙ্গ কে তীর,
সাবন স্থকুলা সত্তিমী তুলসী তজো সরীর।" (*)

কেশব, তাহার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। হিন্দী নবরত্নের গ্রন্থকারদিগের মতে ১৬৭৪ সম্বৎ কেশবের দেহান্ত হয়। কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"হমকো সং ১৬৬৭ কে পীছে কেশবদাসকে জীতে রহনেকা অবতক কোই প্রমাণ নহীঁ মিলা।"

যাহা হউক, সং ১৬৬৭ হইতে ১৬৮০ সনের মধ্যে যে কোন সময়ে যে কেশবের জীবনান্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না।

উল্লিখিত কিংবদন্তী হইতে আমরা আরও জানিতে পারি, কেশবের কবিতার মধ্যে রামচন্দ্রিকা শ্রেষ্ঠরচনা এবং উহা ধর্ম্মবিষয়ক। তিনি স্বয়ং রাম-মন্ত্রের সাধক ছিলেন। কিন্তু ভোগবিলাসরত ইন্দ্রিয়-সুখপরায়ণ ক্ষত্রিয় ইন্দ্রজিতের সংসর্গে তাঁহার জীবনের এতদূর অধোগতি হইয়াছিল যে, মৃত্যুর পর তাঁহাকে প্রেতযোনিতে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। সাধারণ লোকের চক্ষে তুলসীদাস ও কেশবদাস কিরূপ বিভিন্ন স্থান অধিকার করেন, এই কিংবদন্তী তাহারও ইঙ্গিত করিতেছে। কেশব প্রতিভার আবেগে, ঐশী-শক্তির প্রেরণায়, জীবনের সুমুহূর্ত্তে যে 'রামচন্দ্রিকা' রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, কর্ম্মজীবনের বিপরীত আচরণে তাহা এতদূর বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, মর্ম্মগ্রাহী রঘুবীর-ভক্ত তুলসী সেই রসাস্বাদনে বিভোর হইয়া, সেই মন্ত্রে কবিকেশবের স্মৃতির ও আত্মার উদ্বোধন করিয়া, জগতের সমক্ষে তাঁহার জীবনের অন্তস্তলে লুক্কায়িত ধর্ম্মসংস্কার উদ্‌ঘাটিত করিয়া না দেখাইলে, হয়ত কেহ কখনও তাহা বুঝিতে পারিত না। তুলসীর রচনার মর্ম্মে মর্ম্মে সুনীতির, সাধুতার, ভক্তির, ধর্ম্মপ্রাণতার ঝঙ্কার উঠিতেছে। কিন্তু কেশবদাসের প্রতিভা গণিকা রায়-প্রবীণের গুণগানে আত্মহারা! * তিনি সেই প্রতিভা-শালিনী নর্ত্তকীকে রমা-শিবা-সরস্বতীর সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই!

"নাচত গাবত পঢ়ত সব, সবৈ বজাবত বীণ।
তিনমেঁ করতি কবিত্ত য়ক রায়প্রবীন প্রবীণ॥
রতনাকর পালিত সদা পরমানন্দহি লীন।
অমল কমল কমনীয় কর রমা কী রায়প্রবীন॥
রায়প্রবীণ কি সারদা সুচি রুচিবাসিত অঙ্গ।
বীণাপুস্তকধারিণী রাজহংসসুতসঙ্গ॥
বৃষভবাহিনী অঙ্গ উর বাসুকি লসত প্রবীণ।
শিবসঙ্গ সোহতি সর্ব্বদা শিবা কী রায়প্রবীন॥
সবিতাজু কবিতা দই তা কহঁ পরম প্রকাস।
তাকে কারন কবি প্রিয়া কীন্‌হো কেসবদাস॥"

—'সকলেই নাচে, গায়, পড়ে এবং বীণা বাজায় বটে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কবিতা রচনা করে এক প্রবীণ রায়প্রবীণ। রত্নাকর-পালিত পরমানন্দমগ্ন অমল-ধবল-কমলসদৃশ কমনীয় দ্যুতি (মূর্ত্তিমতী) রমার ন্যায় রায়প্রবীণ। রায়-প্রবীণের সারদারন্যায় শুচি রুচিবাসিত চারু-অঙ্গ রাজ-হংসযুক্ত বীণাপুস্তকধারিণী দেবী সরস্বতীর বরাঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শিবসঙ্গে দীপ্তিমতী বৃষভবাহিনীর

(১) সোরহ সৌ = ষোলশ, অসী = আশী, সাবন = শ্রাবণ, স্থকুলা = শুক্ল, সত্তিমী = সপ্তমী, তজো = ত্যাগ করিলেন, সরীর = শরীর।

* "Kesab Das composed his 'Kabipriya' in honour of this courtezan, and in its dedication highly honoured her."—Grierson.

ন্যায় কান্তিসম্পন্না রায়প্রবীণ সূর্য্যের ন্যায় চিত্তে কবিতার প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব কেশবদাস রায়প্রবীণের রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়া 'কবিপ্রিয়া' রচনা করিতে প্রণোদিত হইয়াছে।"

রায়প্রবীণের চাটুদ্বারা কেশবের কবিত্বশক্তি চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে তিনি লোকমণ্ডলীর পরম-কাম্য ইষ্ট-দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে শনির সহিত উপমা দিয়াছেন—

'রাহু মনো শনি অঙ্ক লিয়ে'

—রসিকপ্রিয়া।

এবং ইষ্ট-গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে 'ঠগ' বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন—

'কৈ ধোঁ কোউ ঠগ হৌ ঠগোরী কীনহেঁ কৈ ধোঁ
তুম হরিহর শ্রী হো শিবা চহত ফিরত হৌ।'

—'তুমি যেমনই ঠগ হওনা কেন এবং যাহার সহিতই ঠগামি করনা কেন, তুমি নিশ্চয়ই স্বয়ং হরিহর শ্রী ও শিবার অন্বেষণে ফিরিতেছ।'

কিন্তু এ ভক্তের আদরের আব্দারের ডাকে দোষ ধরিতে পারা যায় না। ভক্ত রামপ্রসাদ মাত্রা আরও অনেক চড়াইয়া দিয়াছিলেন।

প্রতিভা সৌন্দর্য্যোপাসক। পার্থিব সৌন্দর্য্যে তাহার প্রাণের পিপাসা মিটে না। তথাপি সে আলেয়ার পশ্চাতে, 'সত্যং শিবং সুন্দরম্', সুন্দরতমের সন্ধানে ছুটিয়া বেড়ায়। অতএব কেশব সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, কলাশাস্ত্রে পণ্ডিতা, প্রতিভাশালিনী, রাজানুগৃহীতা,গায়িকা, পাতুরী রায়প্রবীণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহার গুণগানে দিঙমণ্ডলপূর্ণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির 'লছিমাদেবী', চণ্ডীদাসের 'রামী'র

'রজকিনীর রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়'।

এবং জয়দেবের পত্নী পদ্মাবতীর কথা স্মরণ করিলে, কালের বিচার করিয়া, কেশবের বিশুদ্ধ গুণগ্রাহিতার ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার (pure admiration) প্রতি সবিশেষ দোষারোপ করা যায় না।

পুস্তক-পরিচয়

কবি কেশব-বিরচিত চারিখানি হিন্দীগ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাব্যতীত তাঁহার আরও কোন কোন অপরিজ্ঞাত গ্রন্থ থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে কেশবের সময়ে হিন্দীভাষার সম্যক্ আদর ছিল না। কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিন্দীরচনায় মনোনিবেশ করিলে তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে বিদ্রূপের ভাগী হইতে হইত। অদ্বিতীয় কবি তুলসীদাস স্বয়ং এই কথার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন—

'ভাষা ভণিত মোরি মতি থোরী।
হঁসিবে লোগ হঁসে নহি খোরী॥'

—'আমি ভাষা (হিন্দী)য় কবিতা রচনা করিলাম, আমার বিদ্যাবুদ্ধি অতি অল্প। লোকে হাসিবে বটে, কিন্তু রসজ্ঞ ব্যক্তি হাসিবেন না।' কেশবও কহিয়াছেন—

"উপজ্যো তেহি কুল মন্দমতি 'শঠ কবি' কেশবদাস।
রামচন্দ্রকী চন্দ্রিকা ভাষা করী প্রকাস॥
ভাষা বোলি ন জানহোঁ জিনকে কুলকে দাস।
ভাষা কবি ভো মন্দমতি তেহি কুল কেশবদাস॥"

—"সেই কুলে মন্দমতি শঠ কবি কেশবদাস জন্মিয়াছে, যে কুলে (পূর্ব্বে) কেহ ভাষা (হিন্দী) জানিত না (অর্থাৎ,সকলেই সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন)। সেই কুলে মন্দমতি কেশবদাস ভাষা-কবি হইয়াছে।"

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় লোকমতের বিরুদ্ধে পণ্ডিত কেশবদাস হিন্দী রচনায় লেখনী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার যেমন সৎসাহসের, তেমনই অসাধারণ ভাষানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কেশব ও তুলসী উভয়েই সংস্কৃত কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের দত্তকবি মধুসূদনের ন্যায় তাঁহারা উভয়েই, মাতৃভাষার সেবা করিয়া,অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১) **রসিকপ্রিয়া***—সংবৎ ১৬৪৮, কার্ত্তিক, শুক্লপক্ষ, সোমবার সমাপ্ত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ আদিরস-প্রধান কাব্য; ইহা ইন্দ্রজিতের অভিপ্রায়ানুসারে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে কবি বীর-রৌদ্র-বীভৎসাদি রসের বর্ণনায়ও শৃঙ্গার রসের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থে নবরসের বর্ণনা আছে, নায়িকাভেদ ও নায়কভেদ বর্ণনা আছে, হাবভাব-বিলাসবিভ্রম বর্ণনা আছে, সাক্ষাৎ-চিত্র-স্বপ্ন-শ্রবণপ্রভৃতি

* "He also wrote the learned Rasikpriya on composition—(সাহিত্য)"—Grierson.

চারি প্রকার দর্শন বর্ণনা আছে, রসাষ্টকের সহিত শৃঙ্গার রসের মিলিত বর্ণনা আছে এবং কৌশিকী-ভারতী-অরভটী-সাত্ত্বিকীপ্রভৃতি বৃত্তি বর্ণনা আছে। সমগ্রগ্রন্থ ১৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। বর্ণনা অবশ্য সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট নহে। নায়িকাভেদে কেশব গণিকার উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ 'রসিকপ্রিয়া'ই কবিকেশবের প্রথম পুস্তক। কিন্তু তথাপি ইহা হিন্দীভাষার প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

(২) **বিজ্ঞানগীতা**—সং ১৬৬৭ সমাপ্ত হইয়াছিল। বোধহয় ইহা কেশবের লেখনী প্রসূত ৪র্থ গ্রন্থ।। পুস্তক খানার একুশ অধ্যায় পর্য্যন্ত কেবল মহামোহ ও বিবেকের সংগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট নয় অধ্যায়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। 'বিজ্ঞানগীতা' হিন্দী-ভাষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ।

(৩) **কবিপ্রিয়া**—১৬৪৮ সংবৎ, কার্ত্তিক, শুক্ল-পঞ্চমী, বুধবার সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ এই গ্রন্থকে কেশবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া মতপ্রকাশ করেন। অনেকের মত রামচন্দ্রিকায়ই কেশবের রচনাশক্তি পূর্ণোৎ-কর্ষ লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রেতযোনির কিংবদন্তীতেও তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'কবিপ্রিয়া'র ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নহে। ইহাতে কবি স্ববংশের ও রাজকুলের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ১৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাকে হিন্দীর 'সাহিত্যদর্পণ' বলিলে বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। তৃতীয় অধ্যায়ে কাব্য দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

'বিপ্র ন নেগী কীজিয়ে, মূঢ় ন কীজৈ মিত্ত।
প্রভু ন কৃতঘ্নী সেইয়ে দূষণ সহিত কবিত্ত॥'

—'বিপ্রকে (বার্ষিকাদি) বৃত্তিভোগী করিবে না,মূর্খের সহিত মিত্রতা করিবে না, কৃতঘ্ন প্রভুর সেবা করিবে না, দোষযুক্ত কবিতা রচনা করিবে না।'

কেশব কবিতার ৫টী প্রধান ও ১২টী অপ্রধান দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। মুখ্যদোষ, যথা—

অন্ধ (পথবিরোধী), বধির (শব্দবিরোধী), পঙ্গু (ছন্দ বিরোধী), নগ্ন (অলঙ্কার-বিবর্জ্জিত) এবং মৃতক (অর্থ-হীন)।

গৌণ বা সাধারণ দোষ, যথা—

অগণ, হীনরস, যতিভঙ্গ, ব্যর্থ (অর্থবিরোধ), অপার্থ (উন্মত্তের বা বালকের ন্যায় নিরর্থক বাক্য), কর্ণকটু (শ্রুতিকটু), পুনরুক্তি, দেশবিরুদ্ধ, কালবিরুদ্ধ, লোক-বিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ এবং আগমবিরুদ্ধ।

চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রিবিধ কাব্যের কথা বলা হইয়াছে যথা—উত্তম, মধ্যম ও অধম; অথবা, দেবকাব্য, মানুষী-কাব্য ও সদোষ কাব্য। তাঁহার মতে 'কবিমতি' ত্রিবিধা, যথা,—সত্যভাষিণী, অসত্যভাষিণী ও সত্যাসত্যভাষিণী। পঞ্চম অধ্যায়ে অলঙ্কার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। অলঙ্কার, সামান্য ও বিশিষ্ট এই দুই প্রকার। সাধারণ অলঙ্কারের মধ্যে রঙ্, চিত্র ও রাজশ্রী সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে বিশিষ্ট অলঙ্কারের প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে। নবম হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত কেবল অলঙ্কারের কথা। কিন্তু কেশবের অলঙ্কার-বর্ণনায় কোন প্রকার শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য, লক্ষিত হয় না। স্থানে স্থানে অপ্রচলিত নামের প্রয়োগ দেখা যায়। শেষ অধ্যায়ে চিত্র-কাব্য। কেশব চিত্রকাব্য লিখিতে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন। কবিপ্রিয়া কেশবের অতি আদরের সামগ্রী। তিনি স্বয়ং তাঁহার এই মানসী-কন্যার প্রশংসায় লিখিয়াছেন—

কবিপ্রিয়া হৈ কবিপ্রিয়া কবি সঞ্জীবনি জানি।*

কবিপ্রিয়া গ্রন্থ, ইন্দ্রজিতের প্রিয়তমা নর্ত্তকী প্রবীণ-রায়ের নামে বিরচিত। অতএব কবি ইহাতে যথাসাধ্য আদিরস পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। গণিকা রায়প্রবীণের চরিত্রের প্রতি কবির কতদূর শ্রদ্ধা ছিল, তাহা ইহা হইতেই বেশ অনুমান করা যাইতে পারে। সেকালের শৃঙ্গাররসের কবির দেশকালপাত্র বিবেচনা এবং সুরুচির দৃষ্টান্ত আমাদের অনেক আধুনিক সুসভ্য সুশিক্ষিতদিগেরও অনুকরণীয়। ভারতের সেই Age of Chivalryর স্বভাব আমাদের শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়াছিল।

। গ্রিয়ার্সন্ এই গ্রন্থকে কবির প্রথম বিখ্যাতগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন;—"His first important work was the Bigyan Gita, which he wrote under the name of Madhuker Shah."

* এপর্য্যন্ত বহুপণ্ডিত এই কাব্যের টীকা করিয়াছেন। "The Modern Literary History of Hindustan" দ্রষ্টব্য।

(৪) **রামচন্দ্রিকা**—এই পুস্তক সং,১৬৫৮,কার্ত্তিক শুক্ল দ্বাদশী, বুধবার সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা কেশবের প্রভু ইন্দ্রজিৎ সিংহের আদেশে, বা অনুরোধ ক্রমে, রচিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রিকায়, শ্রীরামচন্দ্রের কথা বিবৃত হইয়াছে। কেশব-গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারের জন্য 'কবি-প্রিয়া' ও 'রামচন্দ্রিকার' চিরবিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থ ৩৯ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। কথিত আছে, বাল্মীকি কেশবকে রামগুণগান করিতে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন। তদবধি, তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাণের ইষ্টদেবতা ও ভবার্ণবের কাণ্ডারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কেশব সংস্কৃতে রামায়ণ পাঠ করিয়া, বাল্মীকির রচনায় মুগ্ধ হইয়া, উহার হিন্দী অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কিংবা সত্য সত্য স্বপ্নাদেশদ্বারাই প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। 'রামচন্দ্রিকা,' শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী লইয়া রচিত। ইহাতে রামের বাল্যলীলার সবিশেষ উল্লেখ নাই। কেশবের রাজসভা ও রাজপুরী বর্ণনা তুলসীদাসকে অতিক্রম করিয়াছে। ভিখারী ও ভক্ত তুলসী, সাধারণ লোকের রীতিনীতি ও ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিক বিষয় বর্ণনায় অদ্বিতীয়। রাজকবি কেশব, রাজভোগের খুঁটিনাটি বর্ণনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। রামের স্বর্গারোহণ, কেশবের তুলিকায় চিত্রিত হয় নাই। পরশুরামের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গ লইয়া বিবাদে, কেশব স্বয়ং মহাদেবকে আনিয়া হাজির করিয়াছেন। অঙ্গদ দৌত্যকার্য্য করিতে রাবণের সভায় গমন করিলে, কেশবের রাক্ষসরাজ রাবণ নানাউপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কুম্ভকর্ণের সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া, মোহান্ধ লঙ্কেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে মন্দোদরী তাঁহার তিনপুত্রকে আহ্বান করিয়া পিতা ও পিতৃব্যের বিবাদ মিটাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের সহিত বানর-দলপতিদিগের পরিচয়, লাটসাহেবের ভবনে 'লেভি'র (Levee) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অযোধ্যায় আসিয়া অঙ্গদ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য, রঘুবংশীয়দিগের সহিত যুদ্ধকরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ সমস্তই কেশবের নিজস্ব ও বিশিষ্টত্ব। স্বকুলদ্রোহী স্বদেশের শত্রু শ্রীরামকিঙ্কর বিভীষণের প্রতি লবের মুখে কবি কেশব যে কটূক্তি করিয়াছেন, তাহা এইগ্রন্থের এক অভিনব পরিচ্ছেদ।

কোন কোন সমালোচকের মতে রামচন্দ্রিকা হিন্দী ভাষার ভূষণস্বরূপ। তুলসীকৃত রামায়ণভিন্ন এরূপ গ্রন্থ হিন্দীভাষায় আর দ্বিতীয় নাই।

"রামচন্দ্রিকা গ্রন্থ ভাষা কাব্য কা শৃঙ্গার হৈ। ঐসা রোচক গ্রন্থ ভাষা-সাহিত্য মেঁ সিওয়া তুলসীকৃত রামায়ণকে এক ভী নহীঁ হৈ।" *

কেশবের রচনার আকর্ষণীশক্তি এমন অদ্ভুত যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না। গ্রন্থের শেষাংশের রচনা একটু শিথিল ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট।

(৫) **বীরসিংহদেব** সম্বন্ধে কেশবের রচিত এক গ্রন্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহা সুদুর্লভ।†

রচনা

কেশব ব্রজভাষার কবি। ব্রজভাষাই হিন্দী সাহিত্যের মূলকাণ্ড। তখন হিন্দীসাহিত্যের কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা ছিল না। কেশবের রচনায় ব্রজভাষার সহিত বুন্দেলখণ্ডী শব্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কেশব সংস্কৃতশব্দেরও বহুলব্যবহার করিয়াছেন। এজন্য স্থানেস্থানে রচনা শ্রুতিকটুদোষে দুষ্ট হইয়াছে। কেশবের রচনা স্বভাবতঃ একটু কঠিন। পূর্ব্বে একথার আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত বাক্যেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

'কবি কহঁ দীন ন রহৈ বিদাই।
পূছে কেশবকী কবিতাই॥'

কিন্তু এই সকল সামান্য ত্রুটী সত্বেও কেশবের ভাষা অতি অনিন্দ্য, সুখকরী ও হৃদয়গ্রাহিণী। প্রসাদগুণে অতি অল্পলেখকই তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারেন।

"তা মহঁ কেশবদাস বিরাজত রাজকুমার সবৈ সুখদাই।"

কেশবদাস পুনঃ পুনঃ ছন্দ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার রচনা পাঠ করিতে ক্লেশ বোধ হয় না। তুলসীর রচনায় কেবল দোহা চৌপায়; কেশব বিবিধ ছন্দে রচনা চাতুর্য্যের ছটা দেখাইয়াছেন। কেশব অনুপ্রাসের বড়

* হিন্দী নবরত্ন, ২৯২ পৃঃ।

† গ্রিয়াসন, "রাম অলঙ্কৃতমঞ্জরী" নামক পুস্তকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

একটা ভক্ত ছিলেন না; কিন্তু তথাপি তিনি স্থানবিশেষে অনুপ্রাসের ঘটাও দেখাইয়াছেন। কেশবের সরস রচনা রসিকতার সুবাসে চিত্ততোষিণী; 'চন্দ্রবদনী'র প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই দূরবর্ত্তী যুগের রসিকতার রুচি ও আদর্শ, আমাদের আধুনিক মার্জ্জিত সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিতসমাজে কতদূর আদরণীয় হইবে বলিতে পারি না। সুরদাস, তুলসীদাস, বিহারিলাল, ভূষণ ত্রিপাঠী বিষয়-বিশেষের কবিতা রচনায় চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেশবের সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি সকলবিষয়েই অদ্ভুত-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু তদগত-চিত্ততার অভাবে কোন এক বিষয়ে তন্ময় হইবার ক্ষমতা ও আত্মবিস্মৃতির অভাবে বোধ হয় কেশব কোন বিশেষ বিষয়েরই তুঙ্গস্থানে আরোহণ করিতে পারেন নাই। অতএব, আত্মবিহ্বল ভাবোন্মত্ত স্বভাবকবি সুর, তুলসী, ভূষণ এবং সরস-সুমার্জ্জিত রচনা-নিপুণ বিহারীর অব্যবহিত পরেই হিন্দীসাহিত্যের সুপণ্ডিত বিচারকগণ কেশবকবির স্থাননির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ বলেন অর্থ-গৌরবে কেশবের রচনা অতুলনীয়।* মহাকবি দেব ও মহাকবি কেশব, এই উভয়ের মধ্যে কে বড় কে-ছোট তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। দেব কবি স্বয়ং কেশবকে মহাকবির সম্মান প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—"কেশব আদি মহাকবিন।"

ধর্ম্ম মত

ব্রাহ্মণ বলিয়া কেশবের পূর্ণ অভিমান ছিল। তাঁহার রচনার অন্তরাল হইতে স্থানে স্থানে এই আভিজাত্য গৌরবের অভিমান স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—

"দ্বিজদোষী ন বিচারিয়ে কহা পুরুষ কহ নারি।"

—'দ্বিজের দোষ বিচার করিবে না, সে পুরুষই হউক আর নারীই হউক।'

"ব্রহ্মদোষকে অগ্নিকণ সব সমূল জরিজাত।"(†) ইত্যাদি।

কবি, সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য গঙ্গাতীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং 'বিজ্ঞানগীতায়' স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, কেবল গঙ্গাস্নান করিলে মনের কলুষ ধৌত হয় না ও মানবের চিত্তশুদ্ধি হয় না।

"চিত্ত ন তজত বিকার নহাত যত্তপি নর গঙ্গা।"

তথাপি কবি, সাধারণ লোকের জন্য, স্থূলজ্ঞান ও কর্ম্ম-কাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দয়াধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, তিনি দুইপ্রকার দানের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—সুপাত্রে দান ও কুপাত্রে (অপাত্রে) দান। সুপাত্রে দান তিনপ্রকার; যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। দানপাত্র সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

'পহিলে নিজবর্ত্তিন দেহু অবৈ,
ফিরি পাবহিঁ নাগর লোগ সবৈ।
ফিরিদেহু সবৈ নিজদেসিন কো,
উবরো ধন দেহু বিদেসিন কো।

—'প্রথমে আপন পরিজনকে দান কর, তৎপর স্বনগরের লোকেরা পাইবে, তারপর স্বদেশীয়দিগকে দান কর, উদ্বৃত্ত ধন বিদেশীয়কে দান কর।'

এক কথায় 'Charity begins at home.'

দান—সকাম, অকাম, দক্ষিণ (ধর্ম্মহেতু) এবং বাম (ধর্ম্মবিরুদ্ধ) এই চারিপ্রকারও হইতে পারে। ভূমিদানকে কেশব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণকেই কবি সর্ব্বোত্তম দানপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কলির বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

'জব বেদপুরাণ নসৈ হৈঁ
জপতীরথ মধ্য বসৈ হৈঁ।'—ইত্যাদি'

—'(কলিকাল তখনই) যখন বেদপুরাণ বিনষ্ট হইবে এবং তীর্থস্থলে ধর্ম্মাচরণ (জপ) আবদ্ধ থাকিবে।'

সকলেই জানেন ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।

স্ত্রীলোকের পক্ষে কেশব পাতিব্রত্য ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সার বলিয়াছেন—

'কুবজৈ কলহী কাহলী কুটিল কৃতঘ্ন কুরূপ।
সপনেহু ন তজৈ তরুণি কোঢ়ীহু পতি ভূপ॥
নারী তজৈ ন আপনো সপনে হু ভরতার।
পঙ্গু, গুঙ্গা, বৌরা, বধির, অন্ধ, অনাথ অপার॥

—'হে ভূপ, স্বামী কুব্জ, কলহী, রুগ্ন, কুটিল, কৃতঘ্ন, কুরূপ, খঞ্জ, মূক, উন্মত্ত, বধির, অন্ধ, অনাথ হইলেও নারী স্বপ্নেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না।'

ইহা হিন্দুর সামাজিক সংস্কার ও শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা। কেশব, তুকারাম ও সুরদাসের ন্যায় একেশ্বরের উপাসক

* "Gang excels in sonnets and Birbal in the Kabitta metre. Kesab's meaning is ever profound. etc." —The Modern Literary History of Hindustan, p. 25.

† জরি জাত = জ্বলিয়া যায়।

ছিলেন। তিনি দেবদেবীর রূপকল্পনা ও প্রতিমাপূজা সাধারণ অজ্ঞলোকদিগের নিমিত্ত বিহিত বলিয়া মনে করিতেন। রামচন্দ্রিকায় ও বিজ্ঞানগীতায় তাঁহার সত্যদেবতার রূপ বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুব্রাহ্মণের শক্তিশালিনী লেখনীমুখে উপনিষদের অধ্যাত্মবাদের সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্বের প্রচার অতি স্বাভাবিক।

'রাম রমাপতি দেব নহিঁ রঙ্গ ন রূপ ন ভেব।
দেব কহত ঋষি কৌন কো সিখউ জাকী সেব?
সতচিত প্রকাশ প্রভেব।
তেহি বেদ মানত দেব॥
তেহি পূজি ঋষি রুচিমণ্ডি।
সব প্রাকৃতন কো ছণ্ডি॥'—রামচন্দ্রিকা।

—'রাম রমাপতি দেবতা নহেন; ঋষিগণ কোন দেবতার সেবা করেন? যাহার রূপ নাই, রঙ নাই, ভাব নাই, যিনি সচ্চিৎ প্রকাশস্বরূপ, সেই দেবতাকে বেদ দেবতা বলিয়া মান্য করে এবং ঋষিগণ,অন্য প্রাচীন দেবতা ছাড়িয়া, তাঁহারই উপাসনা করেন।'

"অজন্ম হৈ অমর্ত্ত হৈ, অশেষ অস্ত সর্ত্ত হৈ।
অনাদি অন্তহীন হৈ, জু নিত্যহী নবীন হৈ॥
অরূপ হৈ অমেয় (?) হৈ, অমাপ হৈ অমেয় হৈ।
নিরীহ নির্ব্বিকার হৈ, সুমধ্য অধ্যাহার হৈ॥
অকৃতা হৈ অখণ্ডিতৈহ অশেষজীব মণ্ডিতৈ।
সমস্ত শক্তিযুক্ত হৈ সুদৈব দেব মুক্ত হৈ॥"
বিজ্ঞান গীতা।

—'পরমদেবতা পরমাত্মা, জন্মহীন, মৃত্যুহীন, অশেষ, অন্তিমে শরণীয়, অনাদি, অন্তহীন, নিত্য-নবীন, অরূপ, অমেয়, অমাপ, নিরীহ, নির্ব্বিকার, সুমধ্য, অকৃত্য, অখণ্ডিত, অশেষ জীবমণ্ডিত, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, সুদৈব, মুক্তদেব স্বরূপ।'

বিজ্ঞানগীতা হইতে অদ্বৈতবাদের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

'দেব অরূপ অমেয় হৈ কহে নিরীহ প্রকাস।
সর্ব্বজীবমণ্ডিত কহৌ কৈসে কেসবদাস?
জ্যোঁ অকাশঘট ঘটনি মেঁ পূরণ লীন ন হোয়।
ত্যোঁ পূরণ সন্দেহ মেঁ রহে কহে মুনি লোগ॥'

—'পরমদেব অরূপ অনন্ত নির্ব্বিকার জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উক্ত হন। তাহা হইলে, হে কেশবদাস, তিনি সর্ব্বজীবমণ্ডিত কিরূপে হইতে পারেন? যেরূপ আকাশ ঘটপূর্ণ করিয়া থাকিলেও তাহাতে লীন হয় না, সেইরূপ পরমাত্মাও জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন বলিয়া,মুনিগণ অনুমান করেন।'

কেশবের লেখনীমুখে জীবন্মুক্তের বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা সংগ্রহ করা গেল—

'লোক করৈ সুখদুঃখনি কৈ জনি রাগ বিরাগনি
যা মহঁ আনৈ।
ডারৈ উপারি সমূল অহং তরু কঞ্চন কাঁচ ন জো
পহিচাঁনে॥
বালক জ্যোঁ ভবৈ ভূতলমেঁ ভব আপুনসে জড় জঙ্গম
জানৈ।
কেশব বেদ-পুরাণ-প্রমাণ তিনহৈঁ সবজীবন মুক্ত
বখানৈ॥'

—'আসক্তি ও বিরাগের বশীভূত হইয়া লোকে সংসারে সুখদুঃখের সৃষ্টি করে। অহঙ্কার-তরু সমূলে উৎপাটন করিয়া যে কাচ-কাঞ্চনের পার্থক্য ভুলিয়া যায় এবং যে সংসারে বালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আপনার অবস্থা তুলনা করিয়া, সহানুভূতির সাহায্যে, জড়জঙ্গমের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করে, কেশব বলেন, বেদপুরাণ তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করে।'

কেশব বলিয়াছেন, মানুষের মনেই স্বর্গ, মনেই নরক। কর্ম্মফল অনুসারে ইহসংসারেই সকলকে স্বর্গ নরক ভোগ করিতে হয়—

'জোহী জানো কর্ম্ম সব সবৈ জগতকে কন্ত।
আদি সরস মধ্যম বিরস অতি নীরস হৈ অন্ত॥
জোই করৈঁ সো ভোগবৈ যহ সমুঝৌ নৃপনাথ।
স্বর্গ নরক বন্ধন মুকুত মানোমনকী গাথ॥

—'হে জগতের স্বামি! সংসারের সকল কর্ম্মেরই আদি সরস, মধ্যম বিরস এবং অন্ত নীরস। হে কৃপানাথ! সংসারে যে কাজ করিবেন তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। স্বর্গ নরকের বন্ধন মনের কল্পনা বলিয়া জানিবেন।'

চক্রবর্ত্তী মুকুন্দরামও কহিয়াছেন,—

'এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।'.

রাজসভার কোলাহলের মধ্যে ভোগবিলাসে মত্ত

থাকিয়াও কেশবের শৈশব শিক্ষাও ব্রাহ্মণকুলের পূত সংস্কার তাঁহার চিত্তে প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞান বিকাশের সহায়ক হইয়াছিল। তিনি তুলসীর ন্যায় রামনামের মাহাত্ম্য গান করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি, যে নাম উল্টা জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কেশবও সেই পথে সেই উপায়ে ভূতলে অতুল যশঃ ও পরলোকে পরমার্থ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'হরিনাম' বাঙ্গালা সাহিত্যে এক বিশাল অধ্যায় যোজনা করিয়াছে, 'রামনাম'ও হিন্দীসাহিত্যে ইন্দ্রজালের ন্যায় অদ্ভুত শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। সেই নাম ধন্য—

"জান আদি কবি নাম প্রতাপূ,
ভয়উ সিদ্ধ করি উল্টা জাপূ।" *

* গ্রিয়ার্সন সাহেবের সহিত আমাদের স্থানে স্থানে মতের অনৈক্য হইয়াছে। আমরা আশা করি, তিনি নিজেও তাঁহার পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত করিবেন।

সন্ধ্যা

[শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়]

ক্ষান্ত রণ কোলাহল, দিবসের শেষে, বুঝি
আসে সন্ধি-ক্ষণ ;
অবসন্ন—ক্লান্ত তনু, শিথিল অস্ত্রের মুষ্টি,
স্তিমিত নয়ন !
নামায়ে পতাকা ধীরে — শিবিরে যে-যার ফিরে
যাইবে এখন।
মিথ্যা বিজয়ের আশা, আর কেন ?—অস্ত্র তব
কর সংহরণ।
প্রাণপণে যুঝিয়াছ, ধৌত কর এবে তব
রক্ত-সিক্ত কর ;
কোষবদ্ধ কর অসি, মুছ' শোণিতের লেখা,—
কি হেতু কাতর ?
ভাবিতেছ—পরাজয় ?— না লভিয়া জয়মাল্য—
ফিরিবে কি ঘরে ?
বিস্মৃতির যবনিকা পড়িবে কি ভাগ্যহীন-
পরাজিত 'পরে !
হিংসা-দীপ্ত রণোল্লাস নির্ব্বেদ—নির্ব্বৃতি-মাঝে
যাক্—ডুবে যাক্ ;
গম্ভীর মরণ-মত আসুক্ নীরবে সন্ধ্যা
পরম নির্ব্বাক্ !

আপনার ক্ষতি-লাভ, জয়-পরাজয়-কথা
তুল'না এখন ;—
আজি এ প্রশান্তক্ষণে আসন্ন সন্ধ্যারে লহ
করিয়া বরণ !
দিবসের ভেদ-রেখা লুপ্ত দেখ অন্ধকারে,
নাহি আত্ম-পর ;
যুগ-যুগান্তের সাক্ষী— অসংখ্য নক্ষত্ররাজি
মাথার উপর !
টুটিছে—ফুটিছে কত, অনন্তের নাহি ক্ষতি,
নাহি তার হ্রাস ;
তুমি কেন আপনারে দীন-পরাজিত ভাবি'
ফেলিছ নিশ্বাস !
উত্থান-পতন-মাঝে তুমি ক্রীড়নক, নর,
কারে বল—ক্ষতি ?
সেই বিজয়ের বীজ, তুমি যারে পরাভব
ভাবিছ সম্প্রতি !
সত্য-শিব-সুন্দরের হোক্ সদা—শুধু জয়,—
সেই ত সান্ত্বনা ;
পূর্ণ হোক্ শুভ যাহা, তারি মাঝে ডুবে যাক্
তোমার কামনা।

আর্য্য ও অনার্য্য সাহিত্য

[শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, M. A., B. L.]

মানুষ কিছিল, কি হইয়াছে! তাহার হৃদয় কত ধীরে ধীরে জ্ঞান এবং ভাবের রাজ্যে প্রসারিত হইয়াছে; নিজের অস্মিতা বিষয়ে বিশ্ব প্রকৃতি এবং বিশ্বের অন্তরাল-স্থিত অব্যক্তের বিষয়ে তাহার সচেতন-অনুভব এবং গবেষণা ও কত শনৈঃ শনৈঃ শম্বুকের গতি অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়াছে—এই সমস্ত চিন্তা করিলে, বিস্মিত হইতে হয়। এত বড় বিস্ময়ের বিষয় বোধ করি, ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয় নাই! মনের সমস্ত প্রকোষ্ঠে চৈতন্যের অধিকার, মনের সমস্তভাবকে আপন গর্ভে ধারণ করার জন্য তাহার ভাষার সামর্থ্য, বিশ্ব-বিষয়কে অনাকুল এবং প্রসারিতভাবে গ্রহণ করিবার জন্য তাহার অন্তরাত্মার ক্ষমতা, ক্ষণিক বৃত্তিমাত্রকে স্থির উদ্দেশ্যে সংযত করিবার জন্য তাহার অভ্যাসপটুতা, মানুষ এই সমস্ত লক্ষলক্ষ বৎসরের স্মরণাতীত কালপথে ধীরে ধীরে অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। মনুষ্য-মনের বর্ত্তমান শক্তি তাহার পার্থিব-জীবনের লক্ষলক্ষ বৎসরের ক্রমিক অভিজ্ঞতার শেষফল বই নহে। ইতিহাস এবং বিজ্ঞান,—সর্ব্বোপরি মানব-বিজ্ঞান—পৃথিবীবক্ষে মনুষ্যত্বের এবং মনুষ্য-সভ্যতার ক্রমিক অভিব্যক্তি-বিষয়ক বিজ্ঞান, মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্র-নীতি-জীবনের ইতিবৃত্ত, এই দুইটি মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয়—তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য শাস্ত্র। মনুষ্যনামধারী, মনুষ্যত্বের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই জ্ঞান অপরিহার্য্য। তদভাবে তাহার ধর্ম্ম বা সমাজের, ইহকাল বা পরকালের জীবন বিষয়ে কোন নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণ কিংবা সর্ব্বাঙ্গীণ হইতে পারে না। একদিন না একদিন মানুষ যে, এই অভিব্যক্তি-বিজ্ঞান এবং ইতি-হাসকে ইহজীবনের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় নাই। মনুষ্যের আত্মজ্ঞান-বিষয়ে, তাহার নিজের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ প্রশ্নসমস্যা-বিষয়ে, সাধারণ মনুষ্যমাত্রেই নানাদিকে অন্ধকারে থাকিয়া, অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ থাকিয়াই চলিয়া যাইতেছে! অথচ, এইস্থলেই মনুষ্যত্বের প্রধান দাবী এবং দায়িত্ব। নিজের জ্ঞান-দৃষ্টিসাহায্যে—নিজের জীবনের কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক জীবনযাপন করাই প্রত্যেক মনুষ্যের প্রধান 'ধর্ম্ম'। মানুষ ভাল-মন্দ বা পাপ-পুণ্য, যাহাই অনুষ্ঠান করুক, এই জাগ্রৎভাববাতীত অধ্যাত্মরাজ্যে সমস্তই নিরর্থক এবং নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এই সজ্ঞান-ভাব বা চৈতন্যলাভই সৃষ্টিপর্য্যায়ে মনুষ্যের পরমার্থ।

হৃদয়, প্রকৃতি এবং অব্যক্ত,—এই ত্রিতয় লইয়াই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি; এবং এই তিনকে অবলম্বন করিয়াই দেশে দেশে মনুষ্যসভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে; এই বিকাশের হিসাব-গ্রন্থ – সকলহিসাবের পাকা হিসাব, মানুষের সাহিত্যে! এই সাহিত্য তাহার সুমেরু-গাথা! তাহার অতলস্পর্শের কথা!—তাহার সংসার জীবনের পুণ্য-মুহূর্ত্তগুলির নিকাশ-পরিচয়টাও এই সাহিত্যে! যেমন পূর্ব্বে তেমনই পশ্চিমে,—পৃথিবীস্থ মনুষ্য-মন এই তিনপথে পরিচালিত হইয়াই সজ্ঞানতা-লাভ করিতেছে। ফলে, স্বভাব, নিয়তি এবং যদৃচ্ছার ভেদে, দেশ, উপদেশ কিংবা মহাদেশ-ভেদেও, এই সাহিত্যধারার জাতি, বর্ণ এবং প্রকৃতি-ভেদ ঘটিয়াছে। প্রাচীনকালে, যখন জাতি-সমূহ জীবন-পথে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ব্যবহিত থাকিয়া চলিতেছিল, তখনই বরং এই ভেদ সমধিক উজ্জ্বল। এখন মনুষ্যসভ্যতার সাধারণ উন্নতি এবং বিস্তৃতির জন্য মনুষ্যভাগ্যে স্থানকালের ভেদফল অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা হৃদয়ভাবের মধ্যেও একটা সাধারণতা বা বিশ্ব-সমতার বায়ু মনুষ্যসমাজে বহিতেছে; মুদ্রাযন্ত্র, ডাক-টেলিগ্রাম, ট্রেন-ষ্টীমার এবং সাধারণশিক্ষাপ্রভৃতি আধুনিক মানব-সভ্যতার ব্রহ্মাস্ত্র-সাহায্যে মনুষ্যের জ্ঞানভাবের মধ্যে একটা সাধারণ্য এবং সাম্যের লক্ষণ প্রসারিত হইয়া, এই সাধারণশিক্ষা-

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপীয় সাহিত্যের মূল লক্ষণগুলি ভারতীয় সাহিত্য-দার্শনিকের দৃষ্টিতে আলোচিত হইবে।—লেখক

প্রাপ্ত প্রত্যেক মনুষ্যকে ন্যূনাধিক সমবর্ণতা প্রদান করিতেছে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও মনুষ্য-অদৃষ্টে ইহা সম্ভব ছিল না। সুতরাং মনুষ্যত্বের ইতিহাসে আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ—দেশে দেশে শিক্ষা-দীক্ষার এবং ভাবচিন্তার সমতা। তাই আধুনিককালে মনুষ্যকে এই দেশ-ধর্ম্ম বা প্রাকৃতিক প্রভাব আগের মতন বশীভূত করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, উহার বৈরতাকে নির্জ্জিত করিয়া, অন্ততঃপক্ষে সন্ধি-সংঘটন করিয়াও, মনুষ্য বিশ্ব জীবনস্রোতের সমতল রক্ষা করিতে চাহিতেছে।

এই জন্য—এই বিচ্ছিন্ন-অবস্থান, অসুবিধা এবং অভাবের জন্য—জীবনপথে একের কোন বিশেষ আবিষ্কার, অভিজ্ঞতা বা কোন বিশেষ-প্রাপ্তি সহজে অপরের অধিগম্য ছিল না বলিয়া, প্রাচীন-অবস্থার প্রত্যেক জাতিকে তাহার সাহিত্যদ্বারা ধারণা করিতে বসিলেই এক অপরূপ সত্য মনে সমুদিত হইতে থাকে। দেখা যায় যে, একএকটা ক্ষুদ্র দেশ বা জাতি লইয়া, যেমন সাহিত্যের বর্ণভেদ ঘটিয়াছে, তেমনই ব্যাপকভাবে —প্রত্যেক মহাদেশ লইয়া, প্রাচীন-এসিয়া এবং প্রাচীন-য়ুরোপ লইয়া, পূর্ব্ব-পশ্চিম, শ্বেত-কৃষ্ণ, আর্য্য-অনার্য্য লইয়া, সমুদ্র-উপকূল কিংবা মধ্যদেশ লইয়াও—মনুষ্যহৃদয়ের সাহিত্য প্রতিভার মধ্যে সুপরিচ্ছিন্ন বর্ণ ধর্ম্মভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক মনুষ্যই স্বাধীন-মনোগতিশীল এবং আত্মবান্-জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, এই ধরিত্রীর বিপুল জড়ধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট এই সিন্ধু-শৈল এবং আকাশ, তাহার সমাজ-বৃত্তি, মনোবৃত্তি এবং ভাষা-প্রবৃত্তিকে, তাহার বাহ্য বা আন্তরিক জীবনকে, এবং জীবন মনের ফলস্বরূপ সাহিত্যকেও নানাদিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

প্রাচীন মনুষ্য-ইতিহাস বিচার করিতে বসিলেই দেখিব, এই নিসর্গ-প্রভাব জড়ধর্ম্ম বা জড়তার ফলাফলই বরং মনুষ্যের অধ্যাত্ম-জীবনকে বিস্ময়াবহভাবে শাসন করিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে, প্রকৃতিই যেমন মনুষ্য হৃদয়কে জাগাইয়াছেন, তেমনই নিজের এবং জগতের বিষয়ে জগদন্তরালস্থিত অব্যক্তের বিষয়েও তাহাকে বিশেষবিশেষ দিকে বিজ্ঞানী করিয়া, সর্ব্বথা বিশেষ-পথেই পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন।

মনুষ্যের এই নিসর্গ-দীক্ষা তাহার সভ্যতার ইতিহাসে সর্ব্ববৃহৎ ঘটনা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব। নিসর্গের সিন্ধু, শৈল, আকাশ,—ইহারা কোন কোন মতে মনুষ্যজাতির অবস্থা-পরিবেষে পরিণত হইয়া, তাহার মনোবৃত্তি এবং তাহার সভ্যতার স্ফূর্ত্তিবিষয়েও বলবতী উদ্দীপনা-স্বরূপে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। উহার প্রভাবে যেমন একদিকে সমতলবাসী মনুষ্যের মধ্যে শান্ত-সমুজ্জ্বল-নিসর্গ প্রকৃতি এবং জ্যোতিষ্ক-ভাস্বর আকাশের নিম্নতলবাসী মনুষ্যের চরিত্র বা মনোবিকাশ অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রসেবী বা সমুদ্র-পারবাসী মনুষ্যের মনোবিকাশ মধ্যেও প্রবল বর্ণভেদ উপজাত হইয়াছে।

সমুদ্রের অবিশ্রান্ত শক্তি চাঞ্চল্য, বিপুল-বিশালতা এবং প্রতিমুহূর্ত্তের জীবন-চঞ্চল উচ্ছ্বাস প্রবাহ এবং আন্দোলন মনুষ্যের দেহে ও মনে প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক, তাহাকে যেমন পেশল, মাংসল, কর্ম্মঠ এবং কর্ম্ম, বিগ্রহ, বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য্য-প্রিয় করিয়া তুলিতে পারে; সমতল, ভূমি এবং আকাশের শান্তিমিলনের মন্দিরমধ্যে মনুষ্যের অন্তশ্চরিত্র তেমনই স্থিরতানিষ্ঠ—কৃষিনিষ্ঠ—গৃহমুখী এবং গার্হস্থ্যপ্রিয় হইয়া পড়িতে পারে; আকাশের আলোক-মহিমায় সমুদ্দীপ্ত হইয়া বিশেষভাবে আলোক এবং অব্যক্তের ভাবুকও দেবতাপ্রিয় এবং দেবপূজকও হইয়া পড়িতে পারে। উভয়ের সভ্যতা এবং জ্ঞানকর্ম্মভাবের মধ্যে এই সমুদ্র ধরা-আকাশের পরিচ্ছিন্ন মহিমাপ্রভাব প্রকট হইয়া, উভয়ের ভাষা-সাহিত্য-শিল্প এবং বিজ্ঞান-দর্শনপ্রভৃতিকেও এক একটা বিশেষ বর্ণ-ধর্ম্মে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে। নিসর্গের প্রভাব—এই সমুদ্র এবং আকাশের বিশেষ দীক্ষা—প্রাচীন মনুষ্যসভ্যতার একটা প্রধানলক্ষণ। প্রাচীনকালের প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, আর্য্য এবং অনার্য্য বা দ্রাবিড়জাতির মধ্যে উভয়-দীক্ষার ক্রিয়াগতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিব।

আমরা ভারতবাসী, অধুনা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য বলিতে বিস্তারিতভাবে য়ুরোপ এবং এসিয়ার পার্থক্যটাই বুঝি; উভয় মহাদেশের সাহিত্য-সভ্যতা এবং বিজ্ঞান-দর্শনের পার্থক্যকে দিগ্দেশ-লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত করিতে চাহি। উহা আধুনিক কালের ভেদ। দুই হাজার বৎসরপূর্ব্বে মানব-সভ্যতামধ্যে বর্ত্তমান য়ুরোপের অনেক অংশের কোন কর্ত্তৃত্ব-চিহ্ন ছিলনা। গ্রীক্ এবং

রোমক জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই দক্ষিণ-য়ুরোপ, দক্ষিণ-এসিয়া বা ভূমধ্য-সাগরীয় সভ্যতা পর্য্যায়সূত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, গ্রীক্ বা রোমকের মাহাত্ম্যও খ্রীষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসরের মধ্যবর্ত্তী। তৎপূর্ব্বে পাশ্চাত্য বলিতে, বাবিলন্, মিশর, ফিনিশীয় এবং ঈজীয়ান্-দ্বীপপুঞ্জের মিশীনীয় জাতির সভ্যতাকেই বুঝাইত। এই প্রসঙ্গের শিরোনামায় 'অনার্য্য' শব্দে আমরা উহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছি।

এইসকল প্রাচীন পাশ্চাত্যজাতি মোটামুটি অনার্য্যজাতি; উহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে ককেশীয় চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইলেও, উহারা অধিকাংশই কৃষ্ণাঙ্গ, দীর্ঘশির, কর্ম্মঠ এবং বিষয়-বৈভবপ্রিয় ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এই সমস্তকেই দ্রাবিড়ী-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। খ্রীষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই জাতি পৃথিবীর উত্তর-গোলার্দ্ধের দক্ষিণ-সমুদ্রপারে—দাক্ষিণাত্য হইতে আরম্ভ করিয়া, আরব বা সীরিয়া, উত্তর-আফ্রিকা বা মিশর, বাবিলোনিয়া, ফিনিশীয়া, ভূমধ্য-সমুদ্রের উপকূল এবং দ্বীপ-সমূহ, ইটালী এবং গ্রীক্-দ্বীপপুঞ্জ অধিকারপূর্ব্বক প্রাচীন পৃথিবী এবং উহার সভ্যতামধ্যে একচ্ছত্র অধিকার-ভোগ করিতেছিল। প্রাচীন 'আবেস্তা' গ্রন্থে ইহারাই 'তুরাণ' জাতি বলিয়া, এবং সংস্কৃতগ্রন্থসমূহে 'দানব' বা 'রাক্ষস' জাতি বলিয়া উল্লিখিত। ইহারা বীর, কর্ম্মঠ, মায়াবী, কৌশলী, সমুদ্র-সেবক, ঐশ্বর্য্যবান্ এবং বিভবপ্রিয় ছিল; ইহারা প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী—ভাস্কর এবং কারিগর; কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে স্থূলমতি, নিরগ্নি ও অযাজ্ঞিক, সুতরাং কদর্য্য-জীবী এবং কদর্য্য-আহারী ছিল বলিয়া, ভারতীয় আর্য্যগণের হস্তে—অগ্নিতত্ত্ব এবং দেবতত্ত্বের উপাসকগণের হস্তে—সর্ব্বত্র ঘৃণা এবং অবজ্ঞা লাভ করিয়াছে। এই রাক্ষস, নাগ এবং দানবগণের—আর্য্যের দেব-যজ্ঞ-হিংসকগণের—পণ্যজীবী এবং আর্য্যের গোহারক 'পণি'গণের*—আর্য্যের সীতা-হারকগণের সহিত বিরোধ-সংঘর্ষের কথায় প্রাচীন বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষে তাহারা ক্রমে আর্য্য-কর্ত্তৃক অধ্যাত্মশক্তি এবং বাহু বলে বিজিত হইয়া, অনেক স্থলে আর্য্যের ধর্ম্ম, সভ্যতা এবং সমাজ-সীমার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে; উত্তর-ভারতের আর্য্যরক্ত, সভ্যতা এবং ধর্ম্মপ্রভৃতি নানাদিকে আর্য্য-দ্রাবিড়ের মিশ্র-লক্ষণে অনুস্যূত; শ্বেতাঙ্গ আর্য্যজাতির সহস্র ঘৃণা এবং স্পর্শাস্পর্শ বিচারসত্ত্বেও এই সম্মিলন-ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

আমরা দেখিব, দক্ষিণ-য়ুরোপেও এই অনার্য্য জাতি, ক্রমে প্রাচীন আর্য্য-শাখার গ্রীক্ এবং রোমক জাতি-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া, প্রবলতর আর্য্য-সভ্যতার মধ্যে নিজের বৈষয়িক সভ্যতাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর হইতেই এই আর্য্যজাতিকে ভূমণ্ডলে প্রাবল্য লাভ করিতে দেখা যায়। তৎপূর্ব্বে ইঁহারা মধ্য-এসিয়ার কোন স্থানে নিজের পরিবারনিষ্ঠ কৃষি-সভ্যতা এবং স্থিতিশীল গ্রাম্য-সভ্যতার মধ্যে জাতীয়-জীবনের বীজ রোপণ-পূর্ব্বক আলোক-দেবতার—অগ্নি, বায়ু এবং বরুণ দেবতার—আরাধনায় সমাহিত ছিলেন বলিয়াই ধারণা জন্মিয়া থাকে।* খ্রীষ্টপূর্ব্বের দ্বিতীয় সহস্র বৎসরই য়ুরোপে আর্য্য-প্রাদুর্ভাবের কাল; উহাকে মান-যন্ত্ররূপে ধরিয়া, বর্ত্তমানের ইতিবৃত্ত-গবেষণা ওই সময়টাকেই সর্ব্বত্র আর্য্য-অভ্যুদয়ের কাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছে;—যেমন ভারতবর্ষের, তেমনই পারস্যের, বিষয়েও উহাই আর্য্য-অভ্যুত্থানের কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি, ওই সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমধ্য-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং উপকূল ভাগে একটা অত্যন্ত প্রবল এবং বৈষয়িক-সভ্যতাগরিষ্ঠ অনার্য্য জাতি বাস করিতেছিল; হোমরের কাব্যে উহারাই "সোণার মিশীনী" (Golden Mycean) বলিয়া উল্লিখিত। উহারা মনুষ্য-সভ্যতার বহুল বাহ্যউপকরণ আয়ত্ত করিয়া, তদ্বিষয়ে নানাদিকে আধুনিকের সমকক্ষ হইয়াছিল বলিলেও ভুল হইবে না। এই মহাপ্রবল মিশীনীয় সভ্যতাকে কুক্ষিগত করিয়া—নানাদিকে উহাকেই ভিত্তিরূপে এবং পাদপীঠ-রূপে অবলম্বন করিয়াই—হয়ত গ্রীক্-সভ্যতা বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; প্রাচীন ভারতীয়, কিংবা পারস্য, সভ্যতা

* পণ্ডিত রাজেশ্বর গুপ্ত দেখাইয়াছেন যে, বেদের "সরমা এবং পণি" উপাখ্যান এবং 'পণি'-শব্দ রূপক নহে; 'পণি'-শব্দ একান্তভাবে প্রাচীন ফিনীশীয় জাতিকেই বুঝাইতেছে।—লেখক

* জর্ম্মণী তুর্কিস্থানে যে প্রত্ন-অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সমগ্র ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে, এপর্য্যন্ত উহার প্রধান আবিষ্কার—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ সনের "হীটাইট্" রাজবংশের এক সন্ধিপত্র; তাহাতে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নামোল্লেখ্ আছে। কিন্তু বেদের রচনাকাল এখনও কেবল কল্পনা-সাপেক্ষ হইয়া আছে।—লেখক

হইতে গ্রীক্-সভ্যতা যে-যে-দিকে পৃথক্ স্বত্রী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তাহার প্রধান কারণটাও হয়ত এই মিশীনীয় জাতির মধ্যেই দেখিতে পাইব।

আমরা পাশ্চাত্য-সাহিত্যচিন্তায় ব্রতী হইয়াছি। য়ুরোপের ইতিহাস, এই গ্রীক্ এবং তৎশিষ্য রোমক জাতিকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সাহিত্যের জনক বলিয়া একবাক্যে নির্দ্দেশ করে। আমরা দেখিব, এই গ্রীক্জাতি একদিকে যেমন প্রবল বিষয়-নিষ্ঠা, অন্যদিকে তেমনি নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতাও, সিদ্ধ করিয়া প্রাচীন জগতে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া গিয়াছে; ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা হইতেও নানাদিকে একটা বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে; এই জাতি সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে নিজের আলোকে আলোকিত করিয়া, উহাকে বৈষয়িক এবং অধ্যাত্ম-আদর্শের মধ্যে অপরূপ সাম্য-আদর্শের শিক্ষাদান করিয়াছে। গ্রীক্-সভ্যতা কি করিয়া, এই বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিল, তাহা সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করিতে থাকে। আমরা জানি, এসিয়ার আর্য্যশাখা—অন্ততঃ বৈষয়িক ক্ষেত্রে—গ্রীক্জাতির সমক্ষে প্রতিপত্তি লাভ করার নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। এই গ্রীক্জাতি কি করিয়া দাঁড়াইল,—এইরূপ দৃঢ় বিষয়-বস্তু-ভিত্তির উপরে নিজের সাহিত্য এবং শিল্প প্রভৃতিকে অপূর্ব্ব সংযতভাব এবং বিষয়-নিষ্ঠার আদর্শে সুদৃঢ় করিতে পারিয়াছিল—তাহার নিদান অনুসন্ধান করিলেই লক্ষিত হয়—ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচীন অনার্য্য সভ্যতা! আমরা পরে এই বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি করিতে পারিব।

য়ুরোপীয় সভ্যতার গুরুক্রম নির্দ্দেশ করিতে হইলে—তাহার সাহিত্যের ধারা-গতি অবধারিত করিতে হইলেও—বলিতে হয়, প্রাচীন ব্যাবিলন্ হইতেই মিশর, ফিনিশীয়া ও পূর্ব্বকথিত মিশীনীয়া; উহা হইতেই গ্রীক্ জাতি, গ্রীক্ হইতে রোমকজাতি, এবং তাহা হইতে বাইজান্টাইন সাক্সন্ ও গোথ্ জাতির মধ্যে, পরে ইটালীয়, স্পেনীয়, ফরাশী, ইংরেজ ও জর্ম্মণ প্রভৃতি আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে, একটা অক্ষুণ্ণ ধারাপ্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও পরস্পরসম্পর্কে ন্যূনাধিক ওতপ্রোতভাবেই চলিতেছে। মিশরীয়গণ পরবর্ত্তী মনুষ্য-জাতির জন্য কেবল কয়েকটি পিরামিড্, অসংখ্য মমী ও সমাধিগাথা মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন বলিলে, নিতান্ত নির্দ্দয়তা হইবে। কেননা, হীব্রুসভ্যতা এবং গ্রীক্সভ্যতাও এই মিশরীয় জাতির নিকট ঋণী। হীব্রুজাতি বর্ত্তমান য়ুরোপকে ধর্ম্ম দিয়াছে, এবং তাহার সভ্যতাও নানা-দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—প্রাচীন হীব্রুধর্ম্ম এবং গ্রীক-জাতির ধর্ম্ম-আদর্শের ওতপ্রোত প্রভাব হইতে বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি! মিশর-জাতির প্রেততত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব, পুনর্জীবন-তত্ত্ব,—উহার গতিবিধি, নৈতিক-আদর্শ এবং সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের আদর্শ হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম নানাদিকে লাভবান্ হইয়াছিল। তথাপি, স্বীকার করিতে হয় যে, এই মিশর-জাতির মধ্যে প্রকৃত সাহিত্য বা সারস্বত আদর্শ আধুনিকের গণনীয়ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। তাহার সারস্বত-ব্যাপারের অনেককিছু বিলুপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছে, সাহিত্যহিসাবে তাহার গুণ ও প্রকৃতি বিশেষ গণনীয় নহে। মিশরীয় জাতির লিপিকার্য্যের নিদর্শন বড় কম নহে, দৈনিক ব্যবহার-জীবনের রাশি রাশি দলীল, সমাধি-লিপি, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের ধর্ম্মযুক্ত রচনা, শাস্ত্রীয় এবং ধর্ম্মবিষয়ক গাথা, গল্প, ইতিহাসকথা এবং গীতিকবিতাও কম নহে; কিন্তু সমস্তই প্রাচীন-যুগের নিদর্শন বলিয়াই যে কিছু মূল্যবান্। উন্নতসাহিত্যের হিসাবে, মিশর আমাদের চিন্তনীয় কিংবা স্মরণীয় পদার্থ বিশেষ কিছু দিয়া যাইতে পারে নাই। এই জাতির ভাষার মধ্যেও এমন কোন স্বচ্ছতা বা স্বাচ্ছন্দ্য পরিস্ফুট নাই, যাহাতে ধারণা হয় যে, এই জাতি কখনও মনোলোকে ধ্যানস্থ হইবার জন্য, কিংবা সারস্বত-রাজ্যে নিজের সাংসারিক বুদ্ধিবিজ্ঞানকেও স্থায়িভাবে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিয়াছে। শতসহস্র বৎসরের ক্রমান্বয় সঞ্চিত বাণী-ভাণ্ডার পরিদর্শন করিলেও দেখা যায়, তাহাদের আদিম-ভাষা, বা রচনা-প্রণালী বিশেষ কোন অভিব্যক্তি, ঘনতা, বা সামর্থ্য লাভ করিতে পারে নাই। উহাদের সভ্যতা এবং সাহিত্যের মধ্যে কোথাও যেন একটা বৃহৎ ফাঁক ছিল। বহির্জ্জগতের প্রভুতা এবং প্রভাব অক্লান্তযত্নে বিস্তারিত হইয়া চলিলেও, উহাদের নিজের অন্তঃপুরের রুদ্ধদ্বারগুলি নিরর্গল করিবার চেষ্টা হয় নাই। অথচ, এই জাতি ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীবক্ষে নিজের পার্থিবশক্তির পিরামিড্ উত্তোলন

করিয়াছে; আত্মার অমরত্বে এবং প্রেত-জীবনে বিশ্বাসী হইয়া, মৃতদেহের চিরস্থায়ী শ্মশানগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে! এই গৃহের মধ্যে, পরলোক এবং আত্মার বিষয়ে তাহার সর্ব্ব-সমুন্নত ভাব-চিন্তার সারস্বত-নিদর্শন থাকিবারই কথা। তাহার প্রেতগ্রন্থে, কিংবা তাহার নর-পালগণের সমাধি-গাথা সংগৃহীত হইলে, তন্মধ্যে এই জাতির সর্ব্বোত্তম মানসী-প্রথার নিদর্শন প্রকাশ না পাইয়া পারে না। দেখা যাইবে, এই জাতি জগদীশ্বর এবং আত্মার অমরত্ব বিষয়ে উন্নত-ধারণা লাভ করিয়াছিল। উহাই সময় সময় অপরূপ বিদ্যুৎ-বিভাসে অন্তরাত্মাকে উচ্চকিত করিতে থাকে।—কিন্তু, এই পর্য্যন্ত! এই ক্ষণপ্রভা স্থিরসংযত হইয়া, পরিব্যাপ্তি কিংবা ঘনতা লাভ করার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ মিলিতেছে। এই জাতি পরকালের জন্য নিজের সাহিত্য-সাধনার অপর কোন স্বাধীন নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। ফিনিশীয়া বা কার্থেজ বা মিশরীয় জাতি সমূহেরও এই অবস্থা। মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে, ভূমধ্য-সাগরীয় সভ্যতা সাহিত্যমুখী ছিল না। উহা বিশেষভাবে বাহ্য ঐশ্বর্য্য এবং সৌখ্যবিলাসিতার আদর্শে বর্দ্ধিত হইয়া, খ্রীষ্টজন্মের দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত অবনী-পৃষ্ঠে—পারস্যসমুদ্রের পশ্চিমউপকূল হইতে আধুনিক জিব্রাল্টর পর্য্যন্ত, উত্তর গোলার্দ্ধের হৃদয় দখল করিয়া, সাগরমন্থনে ব্যাপৃত ছিল এবং সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতা লক্ষ্মী-দেবীর চরণামৃতপানে বিভোর থাকিয়াই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে।

এই সাধারণতত্ত্বের একটিমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে—প্রাচীন ব্যাবিলন্ এবং নিনেভা বা চাল্ডিয়া-সম্পর্কে। মিশর, বা সমগ্র পাশ্চাত্যখণ্ডই, নানাদিকে ব্যাবিলনের শিষ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ দর্শন করিতেছেন। এই ব্যাবিলন্ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সাতহাজার বৎসরের প্রাচীন-ইতিবৃত্ত বহন করিতেছে। সমুদ্রসম্পর্ক হইতে বহুদূরে, অতীতের কুক্ষিগহ্বরে, এই জাতি বিকাশলাভ করিয়াছিল। প্রাচীন আসিরিয়া বা নিনেভা নগরী এই জাতির শাখাবিশেষ-কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে সংস্থাপিত। বাইবেলের প্রলয়পয়োধি-উত্তীর্ণ 'নোয়া'র বংশধরগণ-কর্ত্তৃক এই ব্যাবিলন্ নির্ম্মিত হয়। ইহারা প্রাচীন তুরাণজাতির শাখা; উহাদের উপাস্য দেবতা 'ইল্লল' বা 'বল' দেবতার নামেই ব্যাবিলনের নামকরণ। এই জাতি প্রাচীন মনুষ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারিগর, স্থপতি এবং ভাস্কর। উহারা দানবজাতি; ইতিহাসে উহারাই লিপিবিদ্যার এবং জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে 'লুগাই'-কর্ত্তৃক 'নীপুরের' দেবমন্দির সংস্থাপিত হয়; এই মন্দির-দেবতার পীঠতলে চল্লিশ হাজার (মৃণ্ময়) ফলক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতির 'সুমেরু-গাথা' খ্রীষ্টজন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত। চাল্ডীয় জাতির মহাকাব্যও (Heroic Epic of Chaldea) খ্রীষ্টজন্মের তেইশ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রথিত—; উহার মধ্যে সৃষ্টি-তত্ত্ব, উৎপত্তি এবং প্রলয় (Flood) প্রভৃতি গীত হইয়াছে। ঐ সময়ে ব্যাবিলনের বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত পাশ্চাত্যখণ্ডের 'দীপ গৃহ'-স্বরূপে আলোক-বিকীর্ণ করিতে-ছিল। এই জাতিকে অনার্য্য-সভ্যতার—সমগ্র মানব-সভ্যতার—জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক ইতস্ততঃ করেন নাই। আধুনিকের চক্ষে, এই জাতির সারস্বত-কার্য্যের কোন বিস্তারিত নিদর্শন না থাকিলেও, উহার সাহিত্য-সভ্যতাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু ইহাও দেখা যাইবে যে, এই সাগরসম্পর্ক হইতে বহুদূরেই ইহারা আকাশের সপ্তগ্রহ-দেবতার উদ্দেশে সপ্ততল প্রাসাদমন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিল। মিশর, আসিরিয়া বা ফিনিশীয়া, এই জাতির দীক্ষা-শিষ্য হইলেও, উহার সারস্বত-আদর্শকে কোনদিকে বিশেষ অগ্রসর করিতে পারে নাই বলিয়াই ধারণা হইবে। এই ব্যাবিলন্ এবং নিনেভা নগরীও যে পরবর্ত্তীকালে নিজের জড়তা বা পাষণ্ডতার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, হীব্রু 'প্রফেট্'-গণের মধ্যে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এই স্থানে বক্তব্য এই যে, কেবল জড়-প্রীতিই কোন জাতির ধ্বংসের কারণ হইতে পারে না; কারণ, জড়তাই একদিকে মনুষ্যত্বের ভিত্তি। এই জড়তা যখন অত্যধিক হইয়া মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে কলুষিত করে, মনুষ্যহৃদয়ের বীর্য্য-ঔদার্য্য-মহত্ত্বকে অতিক্রম করে, আবশ্যকমতে উন্নততর উদ্দেশ্যে সমস্ত সাংসারিক সৌখ্য এবং ভোগ-স্বাচ্ছন্দ্যকে উৎসর্গ করিবার শক্তি যখন জাতীয় হৃদয় হইতে অন্তর্ধান করে, তখনই জাতীয়ভাবের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। এই সকল জাতি, বিপুল জড়শক্তি এবং ঐশ্বর্য্য-প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও, ক্রমে উহারই ফলে, অন্তরাত্মার শক্তি-সামর্থ্য-

বিষয়ে পঙ্গু হইয়া, প্রবলতর অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন এবং বীর্য্যবান্ জাতি-বিশেষের দ্বারা নিহত হইয়াছে।

এই বিজয়ী-জাতিই আর্য্যজাতি। এইস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই 'আর্য্য' শব্দ আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে; এবং তাহার বিপরীত 'অনার্য্য' শব্দ কোনরূপ ঘৃণাসূচক নহে। এইরূপ স্থলে 'আর্য্য' বলিতে ভাষা-পণ্ডিতগণ প্রাচীন হিন্দু, পারশিক, গ্রীক্, রোমক, কেল্ট এবং সাক্সন্ জাতিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অতীতকালে, মধ্য-এসিয়ার কোন স্থানে এই সমস্তের পূর্ব্বপুরুষ একত্র বাস করিয়া, একই সাধারণ ভাষায় ভাববিনিময় করিতেন। উঁহাদের সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম্মভাব, মানসিক মতিগতি এবং শরীর-লক্ষণের মধ্যেও একটা প্রবল স্বাধর্ম্ম্য এখনও পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্তের ব্যতিরেক-লক্ষণাক্রান্ত তাবৎজাতিকেই 'অনার্য্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। দেখা যাইবে, ইঁহারা স্বয়ং (যেমন হিন্দু এবং পারশিকগণ) আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। সে যাহা হউক, ইতিহাস সাক্ষী,—এই জাতিই এককালে প্রাধান্যলাভ করিয়া, ভূপৃষ্ঠে অনার্য্য এবং দানব-সভ্যতাকে নির্জ্জিত করিয়াছেন।—যেমন প্রাচ্য তেমনই প্রতীচ্যখণ্ডে, খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে, এই জাতি নিজের স্থিতিশীল কৃষি, গার্হস্থ্য এবং গ্রাম্য-সভ্যতা হইতে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক বসুন্ধরা ভোগ করিতে, এবং বিশ্বরঙ্গ মধ্যে নিজের দিগ্বিজয়ী মাহাত্ম্য প্রকটনপূর্ব্বক সর্ব্বত্র দানব সভ্যতাকে নিরস্ত করিতে, আরম্ভ করিয়াছেন।

এই জাতির প্রধান মাহাত্ম্য এই যে, যেমন দেহ-সৌন্দর্য্যের বীর্য্যপৌরুষমহত্বে, তেমনই মনোবৃত্তির বিশ্বতোমুখী প্রভুত্বে, শুচি-সুন্দর জীবনের আদর্শে, সৌম্যগম্ভীর পরলোক-ধারণায়, ইঁহারা প্রথম হইতেই, পরম আত্ম-জাগ্রত অহমিকায়, আপনাদিগকে চতুষ্পার্শবর্ত্তী অনার্য্যসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট প্রমাণিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি, ইঁহারা অগ্নিতত্ত্বের—জ্যোতিস্তত্ত্বের সাধক; প্রভা-ভাস্বর আকাশ (বরুণ) ইহাদের আরাধ্য-দেবতা এবং গুরু। আকাশতত্ত্বের অন্তর্দেবতা 'বাণী' ইঁহাদের প্রধান-উপাস্যা; পূর্ব্বপুরুষীয় বাক্-বিত্ত, এবং উহার উত্তরাধিকার ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন। যখন মনুষ্য এই বাক্যকে বাহ্যপাঠ-চিহ্নের দ্বারা স্থিরতা প্রদান করিতেও শিখে নাই, তখন হইতে এই জাতি, এই মৌরসীবিদ্যা বা বেদকে পুরুষানুক্রমে মনোভাণ্ডে রক্ষা করিয়া, উহাকেই মনুষ্যত্ব এবং আর্য্যত্ব-লাভের প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়া, ঐতিহাসিক যুগসীমায় চলিয়া আসিয়াছিল।

এই বেদ কখন রচিত হইয়াছিল, সমস্ত মতভেদ বিচারপূর্ব্বক তাহার নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া সাহিত্য-চিন্তকের অধিকার নহে। তবে, ইহা নিশ্চিত যে, উহাই আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রাচীন বাক্ সম্পত্তি; এবং মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য-লক্ষণ উহার মধ্যেই প্রকটিত। এক শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলী উহাকে যেমন অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসরের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, অন্যেরা তেমনই (জ্যোতিষ এবং স্থানকালের প্রমাণাবলিসাহায্যে) উহার অংশ-বিশেষ অন্ততঃ আট হাজার বর্ষপূর্ব্বের স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। যাহাই হউক, এই বেদের রচনা, বিশেষতঃ ইহার রক্ষার, মধ্যেই সমগ্র আর্য্যজাতির সাহিত্য-প্রতিভা সূচিত। আমরা জানি, অন্য কোন জাতি বাক্য-সম্পত্তিকে এত প্রাণপণ আগ্রহে রক্ষা করিতে চায় নাই। বেদের সমসাময়িক অনার্য্যসমূহের মধ্যেও তাহাদের ধর্ম্ম, কিংবা ব্যবহার-জীবন-বিষয়ক, বিপুল লিপি-কার্য্যের যে প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। ব্যাবিলনের ভাণ্ড-লিপি, মিশরীয় জাতির প্রেত-গ্রন্থ, চাল্ডিয়ার কাব্যগাথায় যে ধর্ম্মভাব প্রকটিত—তাহা কোন-কোন-দিকে আর্য্যজাতির বেদ-গাথার নিকটবর্ত্তী। উহারা পরলোক, কিংবা আধ্যাত্মিকতা, বিষয়ে একেবারে অন্ধকারে ছিল না; দ্রাবিড়জাতির চিত্ত, বিষয়-প্রবণ হইলেও, অন্ততঃ ক্ষণিক স্ফূর্ত্তিবশে অনেক সময় উন্নত অধ্যাত্মলোকে বিহার করিয়া আসিয়াছে;—কিন্তু, সমস্তই বিক্ষিপ্তভাবে। উহা তাহাদের জীবনে বিশেষ জমাট বাঁধিতে পারে নাই; সরস্বতী তাহাদের জীবনে ব্যাপক, কিংবা স্থায়ী, অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাই, আজ এই সকল জাতির ভাষা, কিংবা সারস্বত-উপার্জ্জন, মনুষ্যজাতির জ্ঞানসূত্রে নিজের পদবীরক্ষা করিতে পারে নাই;—কেহ উহাকে জাগাইয়া রাখাও আবশ্যক মনে করে নাই। বেদ, লিপি আবিষ্কারের পূর্ব্বে রচিত হইয়াও, ভারতীয় আর্য্য-আত্মার স্মৃতিভাণ্ডে অক্ষুণ্ণ-ভাবে

রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; বেদের সারস্বত-সন্ততি যেমন হাজার হাজার বৎসরেও বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই, তেমন এই বেদই সহস্র দুর্দ্দশার মধ্যেও ভারতীয় জাতির একত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে;—বর্ত্তমান দুরবস্থার সময়েও একটা সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ভারতবাসীর মনোমধ্যে জাগাইয়া রাখিতেছে। সাহিত্য কি করিয়া জাতীয়-জীবনের প্রকৃত একতা এবং অনুপ্রাণনা রক্ষা করিতে পারে,—ভারতের বেদ-সাহিত্য তাহার প্রমাণ। অনার্য্য জাতিসমূহের এই সাহিত্য-বুদ্ধি ছিল না, এবং এই না থাকার মধ্যেই আর্য্য-অনার্য্যের প্রধান পার্থক্যটুকু নিহিত। সাংসারিক বিষয়ে এত বড় উন্নত একটা সভ্য-জাতি সরস্বতীর কৃপাবিষয়ে বঞ্চিত ছিল!—বঞ্চিত ছিল বলিয়াই, এত সহজে আপনাকে হারাইয়া অতীতের ধূলায় মিশাইয়া গিয়াছে। আর্য্যজাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গেই ভূমণ্ডলে মনুষ্যের প্রকৃত জ্ঞান-জীবনের, প্রকৃত সারস্বত-জীবনের, সূত্রপাত। তৎপূর্ব্বে পৃথিবীতে সোণা-রূপার মাহাত্ম্য যথেষ্ট ছিল; 'সোণার মিশীনী' বা 'রত্ন-সৌধ-কিরীটিনী' লঙ্কাপুরী সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মীর চরণতলাশ্রিত কাল-বায়ু-চঞ্চল শতদল! ভাবের মাহাত্ম্য, জড়তা-বিজয়িনী বিদ্যার মাহাত্ম্য, বেদ বা বাক্‌দেবীর মাহাত্ম্য, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—আর্য্য-জাতি।—সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মী ও আকাশকন্যা বাণী। মনুষ্যের ললাটোদ্ভবা—তৃতীয়নেত্র-সম্ভবা—সরস্বতী।

সিন্ধু এবং আকাশ-তত্ত্বের এই যে স্বতন্ত্র এবং সবিশেষ অনুপ্রাণনা, উহার প্রভাববশে জাতিবিশেষের এই যে আধ্যাত্মিক অদৃষ্টনিয়তি এবং অভিব্যক্তি, জগজ্জীবনের সকলপ্রকোষ্ঠে এই বিশেষতত্ত্বের যে স্বতন্ত্র প্রতিভা এবং প্রতিভাস, এই সমস্ত অবশ্য প্রাচীনকালে কোথাও সজ্ঞানভাবে বা সজাগহইয়া প্রকাশিত হয় নাই। কোন জাতি, বা তাহার কোন চিহ্নিত কবি কিংবা ঋষি, আপনাদের অধ্যাত্মতত্ত্বে চৈতন্যলাভ করিয়া, এমন বলিয়া যান নাই যে, "আমরা সমুদ্রের শিষ্য" বা "আমরা আকাশ হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছি!" আর্য্য-বহির্ভূতজাতি-মাত্রকে অনার্য্য বা বর্ব্বর (Barbarians) আখ্যায় বিশেষিত করার মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা বা গরিষ্ঠতা বিষয়ে যে একটা অহমিকার আভাস আছে, অবশ্য তাহাও যৎসামান্য নহে। কিন্তু, ইতিহাসের দূরদর্শনক্ষেত্র হইতে দার্শনিকের ভাব-নেত্রসমক্ষে প্রাচীন পূর্ব্ব-পশ্চিমের বা আর্য্য-অনার্য্যের এই পার্থক্য-লক্ষণ পরিস্ফুট না হইয়া পারে না। ভূমধ্য-সাগরীয় সভ্যতা বিশেষভাবে দানব-সভ্যতা, এবং তন্মধ্যে সমুদ্রের তত্ত্বই সবিশেষ প্রকটিত! সাংসারিক বা 'মেটিরিয়েল' ঐশ্বর্য্য বলিতে যাহা বোঝা যায়, বাণিজ্য তাহার মূল; এবং মনুষ্যকে উহার পথ দেখাইয়াছেন সমুদ্র,—জগতের জলতত্ত্ব! কৃষিজীবনের শান্ত-স্থাবর স্থিরভাব এবং তুষ্টির আদর্শ নানাদিকে উহার বিপরীত; সুতরাং ভাবুকের ভাষায়, প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতা আকাশ হইতে দীক্ষালাভ করিয়াছিল বলিলেই, অনার্য্য বা দ্রাবিড়-সভ্যতা সমুদ্রের দীক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া বিশেষিত করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, বহিঃপ্রকৃতির তিনটি বিশেষ স্ফূর্ত্তি—সিন্ধু, শৈল ও আকাশ। মনুষ্য-হৃদয়, অজ্ঞানে বা অতর্কিতে, অধ্যাত্মভাবে এই ত্রিশিরদা দেবীর প্রভাবসম্পর্কে আসিয়াই মনোজীবন লাভ করিয়াছে; জ্ঞানকর্ম্মের বা ভূমার তত্ত্বেও প্রশস্তি লাভ করিয়াছে। বৈদিক আর্য্যজাতির নিকট যে জলধি (Ocean) অপরিচিত ছিল, ভট্ট-পণ্ডিতগণ তাহা প্রমাণ করিতেছেন। বেদে তদর্থক কোন শব্দ নাই (?); ঋষি "সমুদ্র" বলিতে ঊর্দ্ধ-লোকের বায়ু-সমুদ্রই বুঝিতেন। (?) বৈদিক আর্য্যগণ যে, সর্ব্বপ্রথমে আকাশতত্ত্ব হইতেই ভাবপ্রাণতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দ্যাবা-পৃথিবী (জ্যোতির্দীপ্ত আকাশ, বরুণ বা 'উরেণস্' এবং সমতল-প্রসারিণী ধরণী—ইহারাই) আদি-আর্য্যনিবাসের আদিমতম দেবতা। তাহার পর, হিমালয়ের প্রভাবে, বা উচ্চাবচ-বন্ধুর ভূমিভাগে আগত হইয়া, ভারতবর্ষে বা সপ্ত-সিন্ধু-দেশে উপনীত হইয়া, তাঁহাদের অন্তরাত্মা যে এক নবগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, গঙ্গার সহিত পরিচয়ে এই জাতির হৃদয়ে যে এক নবতর উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছিল, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বেদে 'গঙ্গা'র উল্লেখ বা তাঁহার প্রভাব সামান্য।* সিন্ধু বা গঙ্গার প্রভাবে উপনীত হইয়া, এই জাতির আকাশ-দীক্ষিত এবং শান্তিনিষ্ঠ কৃষিজীবন ও অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে যে আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়াছিল,

* দুই-একস্থলে, গঙ্গার নাম পাওয়া গেলেও, উহাকে কোন কোন পণ্ডিত "গতিশালিনী," বা কেবল নদী, বা সিন্ধু-নদী, বলিয়া অনুমান করেন।—লেখক

আত্ম-দৃপ্তি এবং প্রভুতার মহিমা দেশে দেশে প্রসারিত করিতে,চীন-মহাচীন-উত্তরআমেরিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, শ্যাম-কাম্বোজ এবং জাপান পর্য্যন্ত সন্ততি বিস্তারিত করিতে, মেদিনীবক্ষে নিজের প্রভুত্বপতাকা সমুড্ডীন করিতে, যে শক্তি-প্রযত্ন জাগ্রত হইয়াছিল,তাহার নিদর্শনও প্রোথিত-যুগের ইতিবৃত্ত-গহ্বর হইতেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। রামায়ণের গঙ্গাবতার-কাহিনী সকলদিকেই যে কল্পনা, তাহা বলিতে পারি না। অন্তর্যোগ-সিদ্ধ আদ্য-বংশধরের গঙ্গা-সাধনা, এবং পূর্ব্বপুরুষের প্রেতভস্মের অভিনব উদ্ধার-কাহিনী, অন্ততঃ ভারতীয় আর্য্যজাতির নবজীবন লাভের একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস বলিয়াই অনুমান করিতেছি। উহা আর্য্যজাতির একটা সমুন্নত নিয়তি-গাথা। অনন্ত-পদোদ্ভূতা এবং হিমাদ্রিস্থতা স্রোতস্বিনীর মহাসমুদ্র লক্ষ্যে যাত্রার মধ্যে আর্য্যজাতির সভ্যতা-গতির ইতিহাস। এই বিমানচারিণী প্রতিভা সিন্ধুতত্ত্বের সঙ্গতা লাভ করিয়াই, আর্য্যজাতিকে উদ্ধারপূর্ব্বক, উহাকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন ;—তাহাকে সকলদিকে বিশ্ব-শীর্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন। আকাশের দীক্ষাপ্রাপ্ত মনুষ্য মন সমুদ্র-তত্ত্বের সহিত সঙ্গতি-ঘটনা হইলেই বিশ্ব-বিজয়ী হইতে পারে। সকলদিকে দানবী-সভ্যতাকে পরাস্ত করিয়া, যেমন ইহলোকে তেমনি পরলোকে – যুদ্ধ বাণিজ্যে, দর্শন-বিজ্ঞানে এবং ধর্ম্মে—আপনাকে সার্ব্বভৌম ও একচ্ছত্রী করিয়া তুলিতে পারে।

প্রাচীন বেদোপনিষদের হৃদয়-কাহিনী—এই শৈলাকাশ-দীক্ষার কাহিনী। উহা আর্য্যজাতির আদ্যাশক্তি। সমুদ্র-পৈতৃক বা নদীমাতৃক সভ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্মীর চরণাশ্রিত। উহা যেমন ভূমধ্য-সমুদ্রের উপকূলে, তেমনই টাইগ্রীশ্, ইউফ্রেটিশ্, নীল্, টাইবার, ইয়াংসিকিয়াং,এবং সিন্ধু বা গঙ্গাতীরেও বিকাশলাভ করিয়াছিল। তবে, নানা-কারণে ভারতের জাতীয়জীবনে এই নদী-দীক্ষা বা সমুদ্র-শিক্ষা, পাশ্চাত্য আর্য্যজাতির গ্রীক্‌শাখা কিংবা প্রাগুক্ত অনার্য্যজাতির তুলনায়, অব্যাহতভাবে বলবতী হইতে পারে নাই,—চীনেও তত পারে নাই। উহা পশ্চিম দিক্-দেশেই ক্রমান্বয়ে বলিষ্ঠ হইয়া প্রাচীনকাল হইতেই ঐ ভূখণ্ডের মানব-জীবনকে বিশেষ ফলভাগী করিতে পারিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, ব্যাবিলন্ বা মিশর, এসিরিয়া বা ফিনিশীয়া, বা মিশীনীয়ার প্রাচীন-ইতিহাস নানাদিকে ঐকান্তিকী সমুদ্র-সেবা বা বিষয়-সেবার ইতিহাস। মনুষ্যের বাহুর আস্ফালন বা পদাঘাত-চিহ্ন, তাহার স্বর্ণ-রৌপের শকটগতি বা ক্রিয়াগতি, মেদিনীবক্ষে যে রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছিল, অতীতের নির্দ্দয় মৃত্তিকাস্তর খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া, আধুনিক মানব তাহার একটা ইতিহাস-বৃত্তান্ত অনুমান করিতে চাহিতেছে। মানবের আধুনিক সভ্যতা ঐ অতীতকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়াছে। আদি-কালের দানবগণ সর্ব্বংসহার-বক্ষে দিকে দিকে অসিভল্লের দ্বারা যে চিহ্ন মুদ্রিত করিয়াছিল, নিজের অধিকার এবং রাজ্য-সাম্রাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া, যে প্রাকার-পরিখা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তদ্ভিন্ন এই সমস্ত জাতির মানবত্বের বা মনোজীবনের অন্যকোনও প্রমাণ জীবন্ত নাই বলিলেও ভ্রম হয় না। তাহার পর যাঁহারা এই রঙ্গভূমে প্রবেশ করিলেন, তাঁহারা একটা অভিনব-প্রথার দৃষ্টান্ত লইয়াই প্রবেশ করিলেন।—স্থান-নির্দ্দেশবিহীন এক অমেয় এবং অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার লইয়া, নিশ্চিহ্ন বিমান-রাজ্যের রাজত্ব-অর্জ্জনপদ্ধতি, ও অমরত্ব-প্রাপ্তির পদ্ধতি, লইয়াই ইঁহারা প্রবেশ করিলেন! ইঁহারা আদিম দানবী-বিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়া, নিজের দেবযানী-বিদ্যার সহিত উহার সঙ্গতি এবং সমন্বয় সাধন করিয়াই, বিজয়ী হইয়া দাঁড়াইলেন! পাশ্চাত্য-খণ্ডে আর্য্যজাতির গ্রীক্-শাখার মধ্যে সমুদ্র এবং আকাশ-তত্ত্বের এই সমন্বয়, সমুত্তম মহা-প্রকাশ, ঘটিয়াছিল বলিয়াই ইতিহাস প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিতেছে।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

"মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ ॥ মধুনক্ত-মুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতি, র্মধুমাঁ ইস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥—মধু মধু মধু।"
—ঋগ্বেদ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাঙ্গালার—বাঙ্গালীর মধুসূদনের যে কেবলই কবি ও বিদ্বান্ বলিয়াই প্রসিদ্ধি, তাহাই নহে। কবিতা-রচনার ন্যায় পত্র-রচনাতেও মধুসূদনের অসাধারণ শক্তি ছিল। যাঁহারা তাঁহার পত্রাবলী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সে পরিচয় বিলক্ষণই পাইয়াছেন। তাঁহার কবি-হৃদয়, জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উদার ও মহান্ ছিল। বন্ধুপ্রীতি, স্নেহ ও বিপন্নের প্রতি দয়া, চিরদিনই তাঁহার হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল; তিনি কখনও এই সকল সদ্গুণ হইতে বিচ্যুত হন নাই। সরস বাক্পটুতা ও কথোপকথনশক্তিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; তাঁহার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। তিনি যে সভায় বা মজলিসে উপস্থিত থাকিতেন, তিনি তাহার প্রাণস্বরূপ হইতেন। স্বর্গীয় হরনাথ রায় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন,—

"নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার,
এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার?"

তাঁহার বন্ধুগণ একবাক্যে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন;—

"His sparkling wit and brilliant repartee were to him the flute, as it were, with which he charmed and enthralled. It was the poetry of his soul, the music in the fibres of his composition, that made every one gravitate towards him. The magic of his conversation, the sweetness of his manners, acted like electricity upon those who associated with him. When he was in your presence, you could never open your mouth; you would only hear him talk, laugh and break your sides with laughter. He was a universal favourite. Once met, he was always and ever afterwards 'hail-fellow well-met.'

"* * He was never morose or moody,

but always cheerful and lively, humorous and jocular."

ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন ;—"Modhu fully justified his name.—He was all মধু, all that endeared one to another."

আমরা এহেন মধুসূদনের কয়েকটি স্মৃতি-প্রসঙ্গ পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিব।

উপরে উদ্ধৃত ইংরেজি পংক্তিগুলি পাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চিরজীবন নিবিড় বিষাদমেঘে সমাচ্ছন্ন হইলেও, তিনি সতত সহাস্যবদন ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। কৈশোরে ও যৌবনে তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল; পঠদ্দশায়, স্কুল-কলেজে অবকাশরঞ্জনের নিমিত্ত পারস্যভাষায় গজল গান করিয়া, তিনি বন্ধুবান্ধবকে প্রমোদিত করিতেন।

হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে, মধুসূদন একদা তাঁহার সুহৃদ্ গৌরদাস বসাক ও ভোলানাথ চন্দ্রকে খিদিরপুরের বাটীতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা নিরূপিত সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মধুসূদনের পিতা প্রবীণ রাজনারায়ণ দত্ত কৌচে বসিয়া, প্রকাণ্ড আলবোলার নল মুখে দিয়া, ধূম-উদ্গীরণ করিতেছেন। গৌরদাসবাবু প্রভৃতি মধুসূদনের সহিত নিকটস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলে, কিয়ৎকাল পরে, রাজনারায়ণবাবু স্বয়ং পুত্রের হস্তে আলবোলার নল প্রদান করিলেন; মধুসূদন তাঁহারই সম্মুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন। গৌরদাসবাবু এ দৃশ্যে চমৎকৃত হইয়া, অন্তরালে মধুসূদনের নিকট একথা উত্থাপন করিলে, তিনি বলিলেন, "My father minds not your common punctilios."

সেদিন, পুত্রের বন্ধুদ্বয়ের নিমিত্ত পুত্রগতপ্রাণা জননী জাহ্নবী স্বয়ং নানাবিধ রসনা-পরিতৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কতকগুলি রৌপ্য-নির্ম্মিত রেকাবে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত হইল; তাঁহারা পরম পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলেন। গৌরদাসবাবু বলিলেন, তিনি জীবনে এই প্রথম ছাগমাংসের রসনারঞ্জন পোলাও আস্বাদন করিলেন। ভোলানাথ চন্দ্রও সে পোলাও খাইয়া এত খুসী হইয়াছিলেন যে, স্বরচিত 'মধুস্মৃতি'তে সেই পোলাওর উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"His Pilau was the Czar of dishes."

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দুকলেজের সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণের কথা পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারেন নাই। শুনা যায়, ইংলণ্ডগমনের আশৈশব-পোষিত উৎকট আকাঙ্ক্ষাবশে, এবং জনৈকা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী ব্রাহ্মণ-কুমারীর পাণিগ্রহণ অভিলাষে, নাকি তিনি ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ইংরেজিভাষাবিৎ, সেক্ষপীয়রের পাঠাভিজ্ঞ, ডি. এল্. রিচার্ডসন্ সে সময়ে হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ;—তাঁহারই নিকট মধুসূদন ইংরেজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর, বিশপ্‌স্ কলেজে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, তিনি গ্রীক্, ল্যাটিন্, পারস্য ও হিব্রু ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়নকালে—ছাত্রজীবন হইতেই তিনি স্বাধীনচিত্তের ও নির্ভীকতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। কলেজের য়ুরোপীয় ছাত্রেরা চতুষ্কোণ-টুপী (Academic Cap) ব্যবহার করিত; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশীয় ছাত্রদিগকে সে টুপী ব্যবহার করিতে দিতেন না। জানিয়া-শুনিয়াও মধুসূদন ইংরাজ-ছাত্রদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলে, অধ্যাপকগণ আপত্তি করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"হয়, আমাকে আমাদিগের দেশীয় পরিচ্ছদ, না হয়, য়ুরোপীয় বালকদিগের ন্যায় 'কলেজীয়েট্' পরিচ্ছদ, পরিধান করিয়া আসিতে দিতে হইবে। একই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্ন বিধান কিছুতেই চলিতে পারে না।" অবশেষে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবর্ত্তিতায় কর্ত্তৃপক্ষগণকে বাধ্য হইয়া মধুসূদনের সঙ্কল্প বজায় রাখিতে দিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ, শৈশবকাল হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি হৃদয়ের স্বাধীনতাকে কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি মান্দ্রাজে গমন করেন। তথায় নানাবিধ ইংরেজি পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ও 'এথিনিয়ম্' নামে একখানি বিশিষ্ট পত্র-সম্পাদন করিয়া, একজন গণনীয় ইংরেজি-লেখক বলিয়া বিশেষ যশস্বী হন। এতদ্ভিন্ন, তিনি অনাথ ইংরেজবালকদিগের বিদ্যালয়ে ইংরেজি-ভাষার শিক্ষক ছিলেন। কিছুদিন পরে, তত্রত্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজিশিক্ষকের কার্য্যও করেন। এখানে

আসিয়াও তিনি তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীন ও নির্ভীক হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে তখন

ডি. এল. রিচার্ডসন্

দেশীয়দিগকে লোকে 'Nativeman' ও সাহেবদিগকে 'European Gentleman' বলিত। স্বাধীন-চেতা মধুসূদন, সংবাদপত্রে এই বহুকাল-প্রচলিত ঘৃণাসূচক অন্যায় প্রয়োগের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া, 'Nativeman'-শব্দ প্রয়োগ-প্রথার সমূলে উচ্ছেদ-সাধন করিলেন।

মান্দ্রাজে, প্রথমে রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্ নাম্নী স্কচ্‌মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই,তাঁহার পত্নীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। অনন্তর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রধান শিক্ষকের কন্যা এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া (Amelya Henrietta Sophia)র সহিত আবার পত্নীসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সাবিত্রীকল্পা সাধ্বী রমণীর সহিত তিনি চিরজীবন বাস করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে দু'একটি কথা, আমরা প্রসঙ্গের শেষে উল্লেখ করিব।

মান্দ্রাজে অবস্থানকালে পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি 'Captive Lady' নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং তৎসঙ্গে 'Visions of the Past' নামক একখানি খণ্ডকাব্য সংযুক্ত করিয়া প্রকাশিত করেন। মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ, ও সংবাদপত্রের সম্পাদকবর্গ, মুক্তকণ্ঠে Captive Ladyর প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'মধুসূদনের জীবনী'-লেখকের মতে, এতদঞ্চলের শিক্ষিত-সমাজে উক্ত গ্রন্থের তাদৃশ সমাদর হয় নাই; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে, কতকগুলি পরশ্রী-কাতর বন্ধু-নামধেয় জীব ও বাঙ্গালীদ্বেষী 'হরকরা'-সম্পাদক ভিন্ন সকলেই Captive Ladyর রচনা-কৌশল দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার সে সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজি মাসিকপত্রিকার * শক্তিমান্ সম্পাদক "পাঁচজন দত্তবংশীয় ইংরেজী কবিতালেখকের রচনা" সমালোচনকালে মধুসূদনের ও অপর চারিজন দত্তের রচনা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছিলেন দেখুন ;—

"We have said, that there are at least five Dutts who write verses. Four of them live and sing in Calcutta; and the fifth, though now doomed to reside at 'benighted' Madras, like Ovid on the shores of the Black Sea, is also a native of Bengal. † * * For a foreigner and an Asiatic, writing English verses, in a language picked up at a School, a general correctness of expression and composition contributes a claim to praise; and this claim all the Dutts possess. In this respect, as in some others, they might fearlessly compete with most of our enthusiastic young gentlemen, who qualify for the Poets' Corner of Westminister Abbey, in the Poets' Corner of our home and colonial newspapers. Indeed, he would be an acute critic, who, from internal evidence alone, could discover that their verses were elaborated under a turban, and not under a hat, or that the initial 'D.,' appended to them,stood for 'Dutt,' and not for 'Dobbs'. Perhaps, we might go

* Calcutta Review,

† মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

even further, and assert that the versification of these young Hindus is distinguished by a grace and strength, which are rarely seen in that of our small English bards, and which would in some measure atone for the scarcity of new, striking, or profound thoughts. There is also in their style and tone a vigour, an energy, which, exhibited by a soft lethargic Hindu, is not a little remarkable." *

মধুসূদনের প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইয়াছে ; †—"Another of the Dutts has left that nursery of fledging bards, the Newspaper 'Poets' Corner,' and come out in all the dignity of a 'Book of His Own', which, very small though it be, gives him a claim to rank second in our brief chronicle. This is M. M. S. Dutt, a native of Bengal, as his name avouches, an ex-student of Bishop's College, and a Native Christian, now residing at Madras. He also has put forth a pamphlet of verse, containing a metrical tale, founded on a passage in the half-fabulous History of India, and called 'The Captive Lady', which is followed by a fragment of blank-verse, called 'Visions of the Past.' * * He is less fertile in thought than Govind Chunder ; but on the other hand, excels him in force of diction and music of rhyme and rythm."

এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থ হইতে নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; সে সকল উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। সম্পাদক মহাশয় শশিচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত ও গিরিশচন্দ্র দত্তকে ক্রমান্বয়ে মধুসূদনের নিম্নে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সমালোচনা দেখিয়া 'হরকরা'-সম্পাদক চমৎকৃত ও নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য মহাত্মা ভোলানাথ চন্দ্রের 'ক্যাপ্টিভ্ লেডী' সম্বন্ধে অভিমতটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"It rose as an Aurora Borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengalee poets, such as Kasi Prosad Ghosh, Raj Narain Dutt, Guru Charan Dutt, O. C. Dutt and others ; Madhu distances them all."

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের পিতৃবিয়োগ হয়। রেভরেণ্ড্ কে. এম. বান্যার্জ্জির দ্বারা গৌরদাস বাবু তাঁহাকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, মাইকেল মধুসূদন, দীর্ঘ আট বৎসর প্রবাসবাসের পর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে সস্ত্রীক প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার এই দীর্ঘ প্রবাসের বিস্তৃত বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই। বিদেশবাসের, ও য়ুরোপীয় সহবাসের, প্রভাবে তিনি বাঙ্গালা ভাষা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। জাহাজ হইতে তিনি কলিকাতায় অবতরণ করিবামাত্র, ঊর্দ্ধশ্বাসে গৌরদাস বাবুর নিকট ছুটিলেন ; মধুসূদনের এমন বন্ধু আর পৃথিবীতে ছিল না। স্বদেশ বিস্মৃত প্রবাসী বিধর্ম্মী বন্ধুকে দীর্ঘ আট বৎসরের পর আলিঙ্গন করিয়া, বক্ষে তুলিয়া, লইতে একাকী তিনিই হস্তপ্রসারিত করিয়া উৎসুকহৃদয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন!

* The Calcutta Review. Vol XII. 1849

† Ibid.

সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা

[শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, M. A.]

বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, " 'গীজোর ইতিহাস' তর্জ্জমা করিবার আর কি তুমি সময় পাইলে না? য়ুরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা বুঝিবার জন্য যে গীজোর নিকট যাওয়া আবশ্যক, এ কথা তোমার হঠাৎ এখন মনে হইল কেন? আমাদের ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার প্রতি তিনি ত দেখিতেছি, বেশ একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এত সাধের য়ুরোপীয় সভ্যতার যে অগ্নি-পরীক্ষা হইতেছে, তাহার ফল কি দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য আমার একটু ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে।"

লেখক উত্তর করিলেন, "অনুবাদ যে সূত্রেই আরব্ধ হউক না কেন, পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া, সময়-অসময় বিচার করিয়া, দেখি নাই। তবে, নেহাৎ অসময় বলিয়া ত আমার মনে হয় না। এখন পাষণ্ড বর্ব্বরের হাতে য়ুরোপীয় সভ্যতা যায়-যায় হইয়াছে, এই আশঙ্কায় অর্দ্ধজগৎ সন্ত্রস্ত। যদিই এই অগ্নি-পরীক্ষার ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার পাতালে প্রবেশ হয়, তাহা হইলে—"

বন্ধু বলিলেন,—"তাহা হইলে, গীজোর মুখে কিছু আশার বাণী শুনিতে পাইলেই বা কি আসে যায়? অশীতি বৎসর পূর্ব্বে তিনি কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার লাভ কি?"

লেখক বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—"না হয় তুমি সে কথা নাই শুনিলে। কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা বলিলে কি বুঝায়, তাহাও ত জানা আবশ্যক। তিরাশি বৎসর বয়সে, মৃত্যুশয্যায় শুইয়া, গীজো এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন—'আমি পীড়িতা ধরিত্রী হইতে বিদায় লইতেছি। আবার কি ইহার নবজীবন হইবে? আমি জানি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি—হইবে।' (Je laisse le monde bien trouble. Comment renaitra-t-il? Je l'ignore, mais j'y crois.) এই যে বেদনাপূর্ণ করুণধ্বনি,—

'আবার কবে, ধরণী হবে
তরুণা?'

"বৃদ্ধের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভগ্ন-হৃদয়ের বিলাপের সুরে নহে; তাহার পশ্চাতে সাধকের একান্ত-বিশ্বাসের বল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; চারিদিকে বিভীষিকা, কিন্তু মন বলিতেছে—'আসিবে সে দিন, আসিবে'। নর্ম্মাণ্ডির অন্তঃপাতী গ্রামের মধ্যে বিজন কক্ষে শয়ন করিয়া, কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসানকালে একবার তিনি তাঁহার চারিদিকের ঘন অন্ধকার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন!—গ্রাভ্‌লট্, মেট্‌জ্, সেডান্, প্যারিস! ফ্রান্স যদি দৈত্যকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত, হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে কে? বারংবার প্রশ্ন হইতেছে,—'আবার কবে, ধরণী হবে তরুণা?' কবে হবে, তাহা আমি জানি না; কিন্তু আমার একান্ত-বিশ্বাস আছে,—হবে।"

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমারই ভাষায় তোমার কথার একটা পাল্টা-জবাব দিতেছি। দৈত্য-নির্য্যাতিত ফ্রান্স আত্মবিস্মৃত হইলে, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে কে? দেখ, ১৮৭০ সালে ১৯এ জুলাই বেলা পৌনে দুইটার সময় ফরাসী-সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলীয়ন্ সমর ঘোষণা করিলেন। যে দৈত্যের কথা বলিতেছ, সেই দৈত্যগুরু বিস্মার্ক, তাহার তিন মাস পূর্ব্বে 'কোয়ল্‌নিশ্ জাইটাঙ্গ' (Kölnische Zeitung) পত্রিকায় লিখাইয়াছিলেন,—ফরাসীরা অধঃপাতে গিয়াছে; বহুপুরুষ পরে তাহারা সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে; দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্ত য়ুরোপেরই অবনতি হইয়াছে।—('The French show themselves to be a decadent nation, and not the least in their manners. It will require generations, to recover the ground they have lost. Unfortunately, so far as manners are

concerned, all Europe has retrograded.') এখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল, ভাবিয়া দেখ। গীজো বলিতেছেন—'Comment . renaitra-t-il' ?—'আবার কবে, ধরণী হবে তরুণা ?' বিসমার্ক উত্তর দিতেছেন,—'It will require generations, to recover the ground they have lost.' ফরাসী অধঃপাতে গিয়াছে। আভাসে যেন বলা হইল য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যে মন্ত্র আবশ্যক, সেই সঞ্জীবনী-মন্ত্র একমাত্র দৈত্য-গুরু বিসমার্কের জানা আছে ;—'All Europe has retrograded.'"

লেখক হাসিয়া বলিলেন—"ফরাসী অধঃপাতে গিয়াছে ? বিস্মার্ক এই কথা প্রচার করিয়াছেন! বিস্মার্কের জন্মভূমি ফরাসীর কাছে কতদূর ঋণী, তাহা বোধ হয় তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। শার্ল্‌মানের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উইল্‌হেল্‌মের সময় পর্য্যন্ত, সহস্র বৎসরব্যাপী জর্ম্মণির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই ঋণের বোঝার গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। জর্ম্মণ জাতির সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রাগ্‌ (Prague) নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্যারিস্ য়ুনিভার্সিটির সমস্ত নিয়মাবলি সেখানে গোড়া হইতেই অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইল। আজ কিন্তু, য়ুরোপীয় সভ্যতার দোহাই দিয়া, জর্ম্মণির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকবর্গ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কি না বলিতেছেন! যে হোহেনজোলার্ন্‌ রাজা ফ্রেড্রিক প্রুসিয়াকে য়ুরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন, তিনি কায়মনোবাক্যে নিজেকে ফরাসী বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। আর আজ অধঃপতিত য়ুরোপকে শিক্ষা দিবার জন্য বুঝি নিট্‌শের (Nietzsche) অতিমানুষ (superman) জর্ম্মণির কৈশররূপে অবতীর্ণ হইয়া বর্ব্বরের হাত হইতে য়ুরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন! তুমি কি বল যে, নিট্‌শের শক্তিমন্ত্র—Will to power—পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র হইবে ?"

বন্ধু বলিলেন—'য়ুরোপীয় জনকতক পণ্ডিতের কথায় সায় দিয়া তুমিও নিট্‌শেকে দোষী করিতেছ ? তুমি কি ভুলিয়া গেলে যে, যদি কেহ জর্ম্মণির বৈশ্য-সভ্যতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, জর্ম্মণিকে গালাগালি দিয়া থাকে—'

লেখক বলিলেন—"সে নিট্‌শে। এই ত তুমি বলিতে চাও ? বেচারা গালি দিতে দিতে, প্রতিবাদ করিতে করিতে, বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয় তোমার আক্ষেপের পরিসীমা নাই। যে মাটির পুতুল গড়িয়া জর্ম্মণ সমাজ খেলা করিতেছিল, প্রমিথিয়স্-পন্থাবলম্বী নিট্‌শে কোন্ স্বর্গ হইতে অগ্নিকণা অপহরণ করিয়া, সেই পুত্তলিকার প্রাণসঞ্চার করিবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়া, কোন্ দেবতার কোপে পাগল হইয়া গেলেন! ডারুয়িন বলিয়াছিলেন—'জীবজগতে যেটি সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্ব-প্রধান সত্য, সেটি আর কিছু নহে—বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা (will to live)'। নিট্‌শে বলিলেন, 'এ শাস্ত্র মানবেতর জীবের শাস্ত্র হইতে পারে, ইতর মানবের ও শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু শুধু বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাই সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর মানবের প্রধানতম বৃত্তি হইতে পারে না ; প্রকৃত মনুষ্যত্ব-প্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রই, এই কাপুরুষের ধর্ম্মকে দূরে পরিহার করিয়া, শক্তিমান্ হইবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিবে।' এই 'will to power' এর বিকাশ করিতে হইলে,' শুধু, অন্ধ জীবন-সংগ্রামে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কোনও রূপে এড়াইয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিলে চলিবে না ; প্রকৃতির উপর, মানব-সমাজের উপর নির্ম্মমভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আত্ম-সংযমে কোনও মাহাত্ম্য নাই ; পরকে পরাজিত না করিতে পারিলে সুখ কোথায় ? মানবের লৌকিক ধর্ম্ম এতদিন তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র! তাহার আত্ম-সম্প্রসারণ আবশ্যক। অতএব যুদ্ধ আবশ্যক।' তুমি বলতেছ, নিট্‌শে জর্ম্মণিকে গালি দিয়াছেন ; তাহার অর্থ আর কিছুই নহে,—জর্ম্মণির খৃষ্টীয় culture ও বণিগ্‌বৃত্তি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়াছিল। যে মার্টিন্ লুথার যুদ্ধকে খাওয়া-পরার মত অত্যন্ত-আবশ্যক ঐশ্বরিক ব্যবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই লুথারকেও নিট্‌শে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন ; কেন না, লুথার খৃষ্টীয় ধর্ম্মটাকে লইয়া অত বাড়াবাড়ি করিলেন। যে ধর্ম্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে এক গালে চড় মারিলে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে হইবে, সে ধর্ম্ম ত হীন ক্রীতদাসের ধর্ম্ম। নিট্‌শে যেন বলিতেছেন,—'ধিক্ জর্ম্মণিকে, আর ধিক্ লুথারকে! এই ধর্ম্ম লইয়া উহারা জগৎটাকে তোল্‌পাড়্ করিয়া তুলিল।'

নিট্‌শে তাঁহার স্বদেশবাসীকে অনেক কটু কথা শুনাইয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহার শক্তিমন্ত্র, তাঁহার স্বদেশবাসীর মূলমন্ত্র দাঁড়াইয়া গেল। তিনি যে অভাব রাখিয়া গেলেন, ট্রেচ্‌কে তাহা পূরণ করিয়া দিল; ট্রেচ্‌কের স্বদেশপ্রীতি ও ইংরাজ-বিদ্বেষ জর্ম্মণির মজ্জাগত হইয়া গেল। এই সব জানিয়া-শুনিয়াও যদি নিট্‌শের দায়িত্বের কথা আলোচনা না করা যায়, নিট্‌শেকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত না করা যায়, তাহা হইলেই কি সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়? নিট্‌শের শক্তি-মন্ত্রে জর্ম্মণির মহাদ্রুমে সবুজপত্র গজাইয়া উঠিল। আজ বিশ্বের মানব সভয়ে চকিত হইয়া দেখিতেছে,—সেই সবুজ পত্রের অভিযান!

"বিস্‌মার্ক বলিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স অধঃপাতে গিয়াছে! ইংরাজ-সাহিত্যিক এড্‌মণ্ড্ গস্ (Edmund Gosse) বলিতেছেন,—'ফরাসী-প্রতিভা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না।' ফ্রান্সের নব-অভ্যুদয় হইবে, গীজোর যেমন বিশ্বাস জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল, এই ইংরাজ সাহিত্যিকেরও সেই বিশ্বাস খুব প্রবল। তিনি বলিতেছেন—'But of the ultimate salvation of the genius of France, he would be a cowardly pessimist who should doubt for a moment. If the lovely provinces from Dunkirk to St. Jean de Luz, from Brest to Menton, were wholly overrun by barbarians, if everything we have honoured and delighted in were obscured, and if the lamp lay shattered in the dust, still the world would not despair for France. In the last hour, the horn of Roland must sound from the dark gorge of Roncevaux, and angels must descend from heaven with vengeance against the enemies of France and God.' গীজোও শেষপর্য্যন্ত হতাশ হয়েন নাই; শেষমুহূর্ত্তে বন্ধুবান্ধবগণকেও হতাশ হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—"Dites-le, je vous prie, á mes amis; je n'aime pas á les savoir decouragés." ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই আশার বাণী শুনাইয়া, তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন; ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আততায়ী জর্ম্মণসৈন্য Rheims Cathedral ভস্মীভূত করিল। আজ কিন্তু সমগ্র ফরাসীজাতি বৃদ্ধ গীজোর কথা ভক্তিভরে স্মরণ করিতেছে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল,—'আসিবে সে দিন, আসিবে;' ফ্রান্স ভাবিতেছে,—সেই দিন আসিয়াছে।

'অনেক দিন, পরাণ-হীন
ধরণী,—
বসনাবৃত খাঁচার মত
তামস-ঘন বরণী।'

"আজ 'ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমকে' প্রাণহীনা ধরণী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছে; স্রস্তবসনা খাঁচার গায়ে বিদ্যুৎ খেলিতেছে; অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। ১৮৭১ সাল হইতে সে দিন গণিতেছে; কে তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিবে? কবে তাহার ব্রত সফল হইবে? কত ভয়ে ভয়ে তাহাকে চলিতে হইয়াছে, পাছে সে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। ছেলে বেলায় হরিশ্চন্দ্র নাটকের যাত্রাভিনয় দেখিয়াছিলে, মনে পড়ে কি? সেই 'রাজ্য যাওয়া, রাণী যাওয়া, প্রাণের কমল যাওয়া?' নেপোলীয়ন্ গেলেন, সম্রাজ্ঞী ইউজেনী প্রবাসিনী হইলেন, ফরাসীর রাজসিংহাসনের কমল দল—fleur de lys—পাষণ্ড বর্ব্বর পদদলিত করিল।"

বন্ধু বলিলেন—"মনে পড়ে বৈ কি? খগা পাগ্‌লার কথা মনে পড়ে,—'উঃ, কি কুচুটে বিষ!' ফরাসীর জাতীয়-জীবনপাত্রে কে সেই কুচুটে বিষ ঢালিয়াছিল? বিস্‌মার্ক? নিট্‌শের শক্তিমন্ত্র তখনও ত ফরাসীকে সন্ত্রস্ত করে নাই। বিলাসিনী ফ্রান্স, বিলাস-বিভ্রমের ভিতর দিয়া, তাহার সমস্ত জাতীয় জীবনের শক্তিটাকে সুরার মত নিঃশেষে পান করিয়া, আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইল;

'শেষে শ্রান্ত শয়নে অবশ পরাণ,
আলস রসে
আবেশ বশে;
পরশ করিলে জাগে না সে আর!
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশি-দিবসে,
বেদনা-বিহীন অসাড় বিরাগ মানসে পশে
আবেশ বশে।'

"তুমি বলিতেছ, সে ১৮৭১ সাল হইতে দিন গণিতেছে। তোমার এই বঙ্কিম ভাষার অতিশয়োক্তি আমি ক্ষমা করিতে পারি; কিন্তু একথাটা মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত নহি। তাহা হইলে ম্যাল্‌থসের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া, সে নিজের ও য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইত না। ১৮৭১ সালে তাহার লোক-সংখ্যা ছিল—প্রায় চার কোটি; ১৯১০ সালে দেখা গেল, তাহার লোকসংখ্যা কিঞ্চিদূন চারি কোটি মাত্র! ১৮৭১ সালে জর্ম্মণির লোকসংখ্যাও প্রায় চারি কোটি ছিল; ১৯১০ সালে তাহার লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি দাঁড়াইল! এখন বল দেখি, জাতীয় ব্রত-উদ্‌যাপন করিবার কি এই প্রকৃষ্ট উপায়? ফ্রান্স যদি বিশ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারে, জর্ম্মাণ যে চল্লিশ লক্ষ সৈন্য আনিয়া ফেলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? তুমি বলিতেছ, সে ভয়ে ভয়ে চলিতেছে—পাছে সে আত্মবিস্মৃত হয়। একদিন ছিল বটে, যখন Bourbon-বংশ নূতন কিছু সহজে শিখিত না, পুরাতনও কিছু সহজে বিস্মৃত হইত না। আজ, সেই বংশলোপের সঙ্গে সঙ্গে, স্মৃতিলোপও হইয়াছে। ষোলবৎসর পূর্ব্বেও তাহার রণতরীর সংখ্যা কেবলমাত্র ইংলণ্ডের অপেক্ষা ন্যূন ছিল; এখন জর্ম্মণি ও মার্কিণ তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তালিকা দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইয়াছে;—

	ইংলণ্ড	জর্ম্মণি	ফ্রান্স	অষ্ট্রিয়া
বৃহত্তম রণতরী—	৩১	১৬	৪	৩
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐ—	৪০	২০	১৮	৬
বড় ক্রুজার—	৩৪	৯	২০	২
ছোট ঐ—	৭৪	৪১	৯	৫

অন্যান্য জাহাজের কথা ছাড়িয়া দিই। জর্ম্মণির কৈসর বলিলেন—'জর্ম্মণির ভবিষ্যৎ সমুদ্রের উপর প্রসারিত'—অমনি যেন যাদুমন্ত্রে এই কয় বৎসরের মধ্যে এত বড় নৌ-বাহিনী গড়িয়া উঠিল। জর্ম্মণির প্রথম Navy Law প্রচারিত হয় ১৮৯৮ সালে; এই ১৬ বৎসরের মধ্যে সে ষোলখানা Dreadnought জাহাজ ভাসাইয়াছে; লক্ষাধিক নাবিককে প্রস্তুত করিয়াছে; Kiel খাল খনন করিয়া, বল্‌টিক্-সাগরের সহিত জর্ম্মণ-সাগরের যোগসাধন করিয়াছে; জগতের সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কে আত্মবিস্মৃত হয় নাই? ফ্রান্স, না জর্ম্মণি?"

লেখক বলিলেন,—"রোমানদের সময়ে জর্ম্মণি যে-বর্ব্বর ছিল, আজও সে সেই-বর্ব্বর রহিয়া গেল; সেদিক দিয়া দেখিলে, আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, জর্ম্মণি আত্মবিস্মৃত হয় নাই। এখন কিন্তু সে নূতন ধুয়া ধরিয়াছে। সে বলিতেছে যে,'সভ্যতার অনুরোধে, সত্যের অনুরোধে, সে অস্ত্রধারণ করিয়াছে।' জর্ম্মণ্ Kultur সমগ্র মানবসমাজে প্রসারিত না হইলে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে না—ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইবে না।—মানবসভ্যতা জর্ম্মণ্য-ভাবপ্রণোদিত হইবে; পৃথিবীর উপরে জর্ম্মণ্ একমাত্র World-Race হইয়া দাঁড়াইবে; নতুবা মানবসমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। অধ্যাপক ক্র্যাম্ব্ লিখিতেছেন—'The triumph of the Empire will be the triumph of the German culture, of the German world-vision in all the phases and departments in human life and energy,—in religion, poetry, science, art, politics and social endeavour. The characteristics of this German world-vision, the benefits which its predominance is likely to confer upon mankind, are, a German would allege, truth instead of falsehood in the deepest pre-occupation of the human mind.'—অসত্যকে, দূর করিতে হইবে; সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; তাই বোধ হয় জর্ম্মণির 'super-man' কৈসর উইলিয়ম্ সত্যের ভেরি বাজাইয়াছেন,—

'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে
কেমন করে সইব?'

"তাই তিনি জগতে সত্যের ধ্বজা উড়াইয়াছেন; সেই পতাকা বহন করিবার জন্য কিন্তু দুর্ব্বল ভীরুর মত ভগবানের কাছে আবেদন করেন নাই—'বহিবারে দাও শকতি।' ভগবান যে তাঁহার হাত-ধরা! ভন্ মল্টকে বলিলেন—'ভগবানের রাজ্যে যুদ্ধ আবশ্যক';
ভন্ বুএলো বলিলেন—'যুদ্ধ আবশ্যক';
'নিট্‌শে বলিলেন—'will to power-মন্ত্র সাধনা কর';

'ট্রেচ্‌কে বলিলেন—'বৈশ্য-বণিক ইংরাজ জর্ম্মণ্য-সভ্যতা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ; ইংরাজ-বিদ্বেষ সমস্ত জর্ম্মণ জাতির মজ্জাগত করিয়া দাও';

'বার্ণার্ডি বলিলেন— 'আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, ভবিষ্যতে জর্ম্মণি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিলে জয়লাভ করিতে পারে';

ক্রুপ্‌ বলিলেন—'আমি অস্ত্র-শস্ত্র গড়িয়া দিতেছি ;'

জেপেলিন্‌ বলিলেন—'মেঘের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আমি করিয়া দিতেছি ;'

ভন্‌ টার্পিট্‌জ্‌ বলিলেন—'আমি এমন নৌ-বাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিব যে, ইংরাজ তাহাকে আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিবে।'

"হাঁ, এক হিসাবে সে আত্মবিস্মৃত হয় নাই। সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আরম্ভ হইতে সে যে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার শেষসীমায় না পৌছিয়া সে বিরত হইবে না। ছেলেবেলার একটি রূপকথা মনে পড়িয়া গেল।—রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, মন্ত্রিপুত্র, ও সওদাগরের পুত্র মৃগয়া করিতে গেলেন। অনেকদূর গিয়া, একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলা অস্থিখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোটালের পুত্র বলিলেন—'আমি এমন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি যে, মন্ত্রবলে এই পশুর যেখানে যত হাড় আছে, সব একত্র করিতে পারি।' সকলে অনুরোধ করিলেন ; তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সওদাগরের পুত্র বলিলেন—'আমি এইগুলিকে পশুর কঙ্কালে পরিণত করিতে পারি।' তাহাই করা হইল। মন্ত্রিপুত্র বলিলেন—'আমি ইহাকে রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা দিতে পারি।' পশুটা একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করিল। রাজপুত্র বলিলেন—'আমি ইহার মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারি।' তখন সকলে বলিলেন—'দাঁড়াও, আমরা এই গাছের উপরে উঠি।' প্রাণ পাইয়া, ব্যাঘ্র, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া, এক লম্ফে রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল। তালপাতার খাঁড়ায় রাজপুত্র তাহাকে সংহার করিলেন।—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উত্তর-জর্ম্মণ্‌ ও দক্ষিণ-জর্ম্মণ Confederationএর ছোটবড় রাষ্ট্রগুলিকে বিরাট্‌ জর্ম্মণ্‌-সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া, মন্ত্রিপুত্র বিস্মার্ক স্বর্গারোহণ করিলেন ; রাজপুত্র উইল্‌হেল্‌ম্‌ তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিলেন ;—জর্ম্মণ্‌ জাতিকে বিনষ্ট না করিয়া, সে নিরস্ত হইবে না। তাঁহার mailed fistরূপ তালপাতার খাঁড়া তাঁহার Hohenzollernবংশকে এই উন্মত্ত পশুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে কি ? খ্রীষ্টাব্দ ১৪১৫ হইতে খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৪ পর্য্যন্ত, পাঁচশত বৎসর ধরিয়া, হোহেন্‌জোলার্ণ বংশ য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে যে বিচিত্র অভিনয় করিয়াছে, আজ কি তাহার পর্য্যবসান ?

"দুইশত বৎসর ধরিয়া প্রুসিয়ার হোহেন্‌জোলার্ণ রুসিয়ার রোম্যানফ্‌কে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পীটর্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া নিকোলস্‌ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত রোম্যানফ্‌ সম্রাট্‌ জর্ম্মণ্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিতেছিলেন। জর্ম্মণভাষার অনুকরণে পীটর্‌ নিজের রাজধানীর নাম রাখিলেন—'পীটস্‌বর্গ্‌।' এত দিন পরে, গত পহেলা সেপ্টেম্বরে, তাহার স্লাভ্‌ নাম হইল—'পেট্রোগ্রাড্‌'। উনবিংশ শতাব্দীতে, পুষ্কিণ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া ডষ্টয়েভ্‌স্কী পর্য্যন্ত, অধিকাংশ প্রতিভাবান্‌ রুষীয় সাহিত্যিক স্বদেশের মাহাত্ম্যে দেশের লোকের শ্রদ্ধা জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বদেশের কথা লইয়াই টুর্গেনিফের সহিত ডষ্টয়েভ্‌স্কীর বিষম বিরোধ হইল। তাঁহার একখানা চিঠিতে প্রকাশ যে, টুর্গেনিফ্‌ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, 'যদি একটা ভূকম্পে রুষিয়া নষ্ট হইয়া, পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়, তাহাতে মানবজাতির কোনও ক্ষতি নাই ; কেহ তাহার খবরও লইবে কি না সন্দেহ। রুষজাতি চিরকাল জর্ম্মণ্‌দিগের পদতলে ধূলায় লুটাইবে। স্বাধীন রুষিয় Cultureএর প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র!' ডষ্টয়েভ্‌স্কী বলিতেন—'য়ুরোপের শেষ আধ্যাত্মিক হিসাব-নিকাশ রুষিয়াতে হইবে ; রুষিয়ার Orthodox ধর্ম্মের ভিতর হইতে এক জন নবীন খ্রীষ্টের আবির্ভাব হইবে।' এমনই করিয়া স্লাভের সঙ্গে জর্ম্মণের ভাবদ্বন্দ্ব উৎকটভাবে দেখা দিল। আজ, প্রধানতঃ এই স্লাভ্‌-টিউটনের দ্বন্দ্বে, এই দিক্‌ দিয়া ব্যাপারটা স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

"উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জর্ম্মণ্‌-প্রভাব কেমন করিয়া প্রসারলাভ করিয়াছিল, তাহা ইংরাজি-সাহিত্যসেবী-মাত্রেই জানেন। আবার, জ্ঞাতিকুটুম্ব হিসাবে য়ুরোপের

অধিকাংশ রাজন্যবর্গ আপনাদিগকে জর্ম্মণ্ বলিয়া মনে করিতে পারেন। ইংলণ্ডের 'নেশন্' পত্রিকায় এই যুদ্ধ সম্বন্ধে মিঃ বার্ণার্ড শ'র একখানা খোলা-চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট্‌কে লিখিতেছেন—

'A war waged formally between the German Kaiser, the German Tsar, the German King of the Belgians, the German King of England, the German Emperor of Austria, and a gentleman who shares with you the distinction of not being related to any of them, and is, therefore, describable monarchially as one Poincaré, a Frenchman.' এখন দেখা যাইতেছে যে, এই মহাকুরুক্ষেত্র একটা প্রকাণ্ড জাতিবিরোধ।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্লাভ্-টিউটনের দ্বন্দ্ব বুঝিতে পারি; ফ্রান্স-জর্ম্মণের বিরোধ ইতিহাসের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—ইংলণ্ড কেন যুদ্ধে নামিলেন?"

লেখক উত্তর করিলেন—"লর্ড কিচ্‌নার বলিয়াছেন, ইংলণ্ড আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের আসল কথাটা আমি ওথেলোর ভাষায় বুঝাইতে পারি—

'She is protrectress of her honour too;
Can she give that away?'

"এই কথাটা জর্ম্মণ্ গোড়া হইতেই বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। এক টুক্‌রা কাগজের জন্য ইংরাজ সহসা যুদ্ধের আসরে নামিবেন! ইম্পিরিয়াল্ চান্সেলর্ বিস্মিত হইয়া ইংরাজ প্রতিনিধি গোশেন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই যুদ্ধে কত বলক্ষয় ও ধনক্ষয় হইবে, তাহা আপনারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি?' গোশেন্ ধীরভাবে দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—'যেখানে সমস্ত ইংরাজজাতির মান লইয়া টানাটানি পড়ে, সেখানে আমরা লাভ-লোকসানের হিসাব করিয়া কাজ করি না।' ক্ষত্রিয় তেজোদৃপ্ত জর্ম্মণ্ অবাক্ হইয়া গেল। বৈশ্য-বণিক্-ইংরাজ লাভ-লোকসানের খতিয়ান্ করে না! Honourএর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইংরাজ বেল্‌জিয়ম্‌কে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প। প্রিন্স্ লিক্‌নোস্কি এ কথাটা ঘুণাক্ষরেও যদি আগে জানিতে পারিত! কিন্তু এখন উপায় নাই, উপায় নাই! এতক্ষণে বোধ হয় জর্ম্মণির সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করিয়া জর্ম্মণ্‌সৈন্য বেল্‌জিয়মে পদার্পণ করিয়াছে! 'এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?' ইংরাজ যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। এই ইংরাজ-জর্ম্মণের বিরোধে যে ভাবদ্বন্দ্ব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, এইদিক দিয়া মহাকুরুক্ষেত্রের ব্যাপারটা আলোচনা করিলে, 'সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা' সমস্যার মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে পারিবে।'

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে লর্ড কিচ্‌নারের আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের অর্থ কি?"

লেখক বলিলেন,—"একজন প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ্‌লেখকের ভাষায় ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারি। Herr Harden সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'কেন জর্ম্মণি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে লুকাচুরি করার দরকার নাই। আমরা সমগ্রজাতি যে, সহসা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এই যুদ্ধে নামিয়াছি, তাহা নহে। এ যুদ্ধ আমাদের অভীপ্সিত; আমরা য়ুরোপের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইতে চাহি না। জর্ম্মণি আঘাত করিবে; কেন না সে মনে করে যে,পৃথিবীতে নড়িবার-চড়িবার একটু জায়গায় তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবি আছে। জর্ম্মণি প্রধানতম শক্তির স্থান অধিকার করিতে চায়;—বেল্‌জিয়ম্ তাহার অধিকারে থাকিবে; ক্যালে পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী খানিকটা ভূমি তাহার দখলে থাকিবে; তাহার পতাকা ইংলিশ্ চ্যানেলের উপরে উড়িবে। এইটুকু হইলেই সে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে।' জর্ম্মণির ভাবগতিক দেখিয়া ইংলণ্ডের সমর-সচিব প্রথম হইতেই এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই দিক হইতে এই মহাকুরুক্ষেত্রের ব্যাপারটা আলোচনা করিলেও 'সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা' সমস্যার উপর অনেকটা রশ্মিপাত হইবে।

'ইংলণ্ডের উপর জর্ম্মণির আক্রোশের মূলে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্য-ভাব-সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়,—এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে। জর্ম্মণির Militarismই বল, আর Navy Lawই বল, উহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে,—ইংরাজের মত বৈশ্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া বসিতে হইবে। এই কথাটা 'নর্থ্ আমেরিকান্ রিভিউ' পত্রিকায় একজন লেখক বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'এ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বৈশ্য-সভ্যতার লক্ষ্মীকে জর্ম্মণীর অঙ্কশায়িনী করিতে হইলে,

যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণ জখম না করিলে, আফ্রিকা ও এসিয়ার জলপথে তাহার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না। যেসকল জাতির শিরায় জর্ম্মণ্-রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগকে লইয়া একটা নূতন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইবে;—বর্ত্তমান জর্ম্মণি, অষ্ট্রিয়া, হঙ্গেরি, হল্যাণ্ড্, বেল্‌জিয়ম্, ডেন্‌মার্ক, সুইট্‌জারল্যাণ্ড্, ইটালি, বল্‌কানপুঞ্জ ও তুর্কি সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে।… বল্‌কানে একমাত্র সার্ভিয়া আপত্তি করিতে পারে; তাহাকে জখম করিতে হইবে। ইংলণ্ড এখন আল্‌ষ্টর্ লইয়া ব্যস্ত; ফ্রান্স্ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; রুষিয়া একাকী অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণির সহিত লড়াই করিবে না। এই ত উপযুক্ত সময়।…'

"সার্ভিয়া সম্বন্ধে মাকিন্‌লেখক যাহা বলিয়াছেন, ইটালির ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র-সচিব জিওলিট্টি সেদিন সভার মধ্যে যে গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরে আর সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

"ইংলণ্ডের ভাবগতি দেখিয়া জর্ম্মণি বুঝিল, শুধু ভয় দেখাইলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার আধিপত্যলাভ করিতে হইলে, অস্ত্রধারণ করিতে হইবে। অগত্যা কৈশর উইল্‌হেল্‌ম্ জগৎকে জানাইয়া দিলেন—'The sword has been forced into our hands.' একদিন ছিল, যখন তাঁহার 'shining armour' দেখিয়া রুষিয়া ভয় পাইয়াছিল; অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ বার্লিন্-সন্ধির কাগজের টুক্‌রাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, দুইটা দেশ আত্মসাৎ করিলেন; বুল্‌গেরিয়ার প্রিন্স্ ফার্ডিনাণ্ড্ স্বাধীন নৃপতি (King) হইলেন। তাঁহার কথায় বল্‌কান্-যুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়া ও ইটালি সার্ভিয়াকে আট্‌কাইবার জন্য একটা স্বতন্ত্র আল্‌ব্যানিয়া রাষ্ট্র খাড়া করিয়া দিল। এক দিন ছিল, যখন তাঁহার কথায় ফ্রান্সের মন্ত্রী পদচ্যুত হইত, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট্ পদত্যাগ করিত। কিন্তু ইংরাজকে তিনি ভুলাইতে পারিলেন না। তাই এই বিংশশতাব্দীর সমুদ্রমন্থনব্যাপারে দেবাসুরদ্বন্দ্ব সুরু হইল। এই মন্থনের ফলে লক্ষ্মী উঠিবেন কি না, জানি না; কিন্তু যে গরল উত্থিত হইতেছে, তাহার উপায় কি হইবে? এসিয়ায় আফ্রিকায় ইংরাজ

'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে।'

'কিন্তু জর্ম্মণি চাহে, যে ভবিষ্যতে—

'কৈশরের রাজদণ্ড দেখা দিবে পোহালে শর্ব্বরী
মানদণ্ডরূপে।'

"ইংরাজ তাহা ভাল রকমই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই লর্ড কিচ্‌নার, ওকথা বলিয়াছেন। যে সমুদ্রের উপর ইংরাজ লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছেন, সেই সমুদ্রের উপরেই ইংরাজের পাঁচশত রণতরী দশসহস্র পণ্যবাহী অর্ণবপোতকে রক্ষা করিয়া, পদ্মালয়া কমলাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিতেছে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করাই যখন জর্ম্মণির সঙ্কল্প ছিল, ইংরাজের সঙ্কল্প দেখিয়া সে বিচলিত হইল কেন?"

লেখক বলিলেন—"জর্ম্মণি ভাবে নাই যে, ইংরাজ গোড়া হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে; অন্ততঃ কিছুদিনও সে যদি অপেক্ষা করে, তাহা হইলে ফ্রান্স ও রুষিয়াকে জর্ম্মণি জখম করিতে পারিবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ হইয়া গেল। জর্ম্মণির রণতরী বাহিরে আসিয়া, ফ্রান্সকে জখম করিতে পারিল না। অন্ততঃ যদি সে বিদেশে ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি দখল করিতে পারে, তাহা হইলে, তবুও খানিকটা 'place in the sun' পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার কোনও সম্ভাবনাই রহিল না। এইজন্য গোশেনের সহিত কথাবার্ত্তার সময়ে ইম্পিরিয়াল চান্সেলর অত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। জর্ম্মণির সুবিধামত সে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিবে, এইরূপ তাহার মৎলব ছিল। উইন্‌ষ্টন্ চর্চ্চিল্ জর্ম্মণির 'chosen moment'এর জন্য কিন্তু অপেক্ষা করিলেন না।

"যাক্,—এসকল কথার আলোচনায় আমাদের আসল কথাটা চাপা দিলে চলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতার কথা হইতেছিল। তুমি বলিতেছিলে যে, আশী বৎসর পূর্ব্বে গীজো য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার লাভ কি?

"গোশেনের মত আমারও বলিবার ইচ্ছা হইতেছে যে, 'য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোচনা করিতে বসিয়া, লাভ-লোকসানের খতিয়ান্ করা সুধীজনের উচিত নহে।'

গীজোকে ফ্রান্সের chauvinist বলিয়া যদি মনে কর, খ্রীষ্টীয় য়ুরোপীয় সভ্যতার নিন্দুক নিট্‌শেকে জর্ম্মণির আদিম-বর্ব্বর বলিয়া মনে করিতে আপত্তি কি ?

"আপত্তি এই যে, কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, যেদেশে গয়্‌টে, শিলার্, বেটোবেন্, ওয়াগ্নারের জন্মস্থান ; যেখানে কাণ্ট্, হেগেল্, অয়কেন্, হেকেল্ প্রভৃতি পাণ্ডিতমণ্ডলী দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন—সে দেশকে বর্ব্বর বলিব কিরূপে ?'

"তদুত্তরে একজন বলিতেছেন,—'আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, জর্ম্মণির অধিকাংশ নামজাদা বড়লোক খাঁটি জর্ম্মণ্ নহেন,—হয় পোল্, না হয় হিব্রু।'

"এ কথার নাকি উল্টা জবাব একজন জর্ম্মণ্ দিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'হিব্রু বলিয়া কোনও জাতি জগতে ছিল না ; হিব্রু জাতিটা বেনামি জর্ম্মণ্ মাত্র। খুব সম্ভব Jesus Christ জর্ম্মণ্ ছিলেন। ঐ যে 'us' suffix, ওটাতে পুরুষ—অর্থাৎ man বুঝায় ; আবার Jesএর s, যে r অক্ষরের পরিবর্ত্তে অনেক জায়গায় বসে। ফলে দাঁড়াইল Jesus = Jerman, বা German!' Emile Richeএর এই অনুমানটা না হয় রসিকতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া গেল।

"সিড্‌নি লো বলিতেছেন—'প্রুসিয়ার militarism, জর্ম্মণ্ cultureকে অভিভূত করিয়া, জর্ম্মণিকে বর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে।'

"মেটার্লিঙ্ক্ কিন্তু একথা একেবারেই মানেন না। তিনি লণ্ডনের Daily Mail পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—'যখন আমাদের জয় হইবে, শত্রু মাথা তুলিতে পারিবে না, তখন বোধ হয়, কেহ কেহ আমাদের হৃদয় আর্দ্র করিবার চেষ্টা করিতে পারে। আমরা হয় ত শুনিব যে, নিরীহ জর্ম্মণ্ জাতির কোনও দোষ নাই ; তাহাদের সম্রাট্ ও তাহাদের ক্ষত্রসম্প্রদায়-কর্তৃক তাহারা চালিত হইয়াছে মাত্র। যে জর্ম্মণি আমাদের পরিচিত, তাহার হৃদয় বেদনায় স্পন্দিত হয়, সে পরকে আপন করিতে জানে, তাহার কোনও দোষ নাই ; যত দোষ মদোন্মত্তা প্রুসিয়ার। শান্তি-প্রিয় বাভেরিয়া, রাইন্-তীরবর্ত্তী অতিথিবৎসল গৃহস্থসকল, সাইলেশিয়ান্ ; স্যাক্সন্ প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছে। আজ আমাদের চোখের সাম্‌নে সত্য প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। এই মহাপাপের মধ্যে দোষী নির্দ্দোষ নাই, অথবা দোষের তারতম্য নাই। যাহারা এই পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই এক পর্য্যায়ভুক্ত। জর্ম্মণ্ জাতি ক্রীতদাস নহে যে, একজন অত্যাচারী রাজা, তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়াছে। একটা জাতিকে ঠকান যায় না,—যদি সে ইচ্ছা করিয়া নিজে না ঠকে।'

"মেটার্লিঙ্কের কথা শুনিয়া জেরার্ড হাউপ্‌ট্‌মান্ বিদ্রূপ করিয়াছেন ; তিনি বলেন,—'প্যারিসের পল্লবগ্রাহী দার্শনিক বার্গসোঁ যত ইচ্ছা আমাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন ; বড় কবি মেটার্লিঙ্কও ঐ রকম আখ্যায় আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে পারেন। মেটার্লিঙ্ক ভ্রান্ত, ফরাসি-সভ্যতায় মাতোয়ারা, Gallomaniac ; তিনিই একদিন জর্ম্মণিকে য়ুরোপের conscience বলিয়া বরণ করিয়াছেন। আমাদের মত সার্ব্বভৌমিক উদারতা আর কোন জাতির আছে ? আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য কর ; আমার নিকটে আর কোনও জাতির নাম কর দেখি, যে নানাদেশের নানাজাতির মর্ম্মস্থানে পৌছিবার জন্য আমাদের মত চেষ্টা করিতেছে ! মেটার্লিঙ্কের খ্যাতি ও অর্থলাভ, অনেকটা আমাদের দেশেই হয় নাই কি ? অবশ্যই, কাণ্ট্ ও শোপেনহৰারের দেশে, বার্গসোঁর মত বৈঠকখানার ঝুটা-দার্শনিকের স্থান নাই। আমি খোলসা করিয়াই বলিতেছি। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোনও আক্রোশ আমাদের কখনও ছিল না, এখনও নাই। তাহার ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সাহিত্য আমরা পূজা করিয়া আসিতেছি ; রোডিনের বিশ্ববিশ্রুতির পথ জর্ম্মণিই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। আমরা আনাতোল ফ্রান্সকে শ্রদ্ধা করি। মোপাসাঁ, ফ্লবেয়ার, বাল্‌জাকের রচনা, আমাদের দেশের লেখকের রচনার মত, আমাদের দেশে পঠিত হয়। দক্ষিণ-ফ্রান্সের জাতীয় জীবনের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভক্তি আছে। জর্ম্মণির ছোটছোট সহরে, দরিদ্রকুটীরেও, কবি মিস্ত্রালের একান্ত ভক্ত দেখিতে পাইবে। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কোনও আগন্তুক, বিদেশী জর্ম্মণ্ পরিবার, জর্ম্মণ্ সহর, জর্ম্মণ্ হোটেল, জর্ম্মণ্ জাহাজ, জর্ম্মণ্ কন্সার্ট, জর্ম্মণ্ থিয়েটর—বেরুথ্, জর্ম্মণ্ লাইব্রেরি, জর্ম্মণ্ মিউজিয়ম্ পরিদর্শন করিতে আসিয়া

কখনও মনে করিয়াছেন যে, তিনি বর্ব্বরদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সমরসচিব হল্‌ডেন্ অনেকগুলি ইংরাজবন্ধু সমভিব্যাহারে মাঝে মাঝে আমাদের বর্ব্বর উইমার সহরে তীর্থদর্শন করিতে আসিতেন; এইখানেই বর্ব্বর গয়টে, শিলার, হার্ডার, উইল্যাণ্ড, এবং আরও অনেকে বিশ্বের মানবের জন্য আজীবন কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। আমাদের একজন জর্ম্মণ্ কবি আছেন, যাঁহার নাটকগুলি আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে; অন্য কোনও জর্ম্মণ্ কবির নাটক সেরূপ হয় নাই;—তাঁহার নাম উইলিয়ম্ সেক্ষপীয়র্; যিনি ইংলণ্ডের কবিসম্রাট্, সেই সেক্ষপীয়র।'

"ফরাসি লেখক রোমেন্ রোলান্দ্ বলিলেন,—'জেরার্ড্ হাউপ্ট্‌মান্! অন্যান্য ফরাসীর মত আমি জর্ম্মণিকে বর্ব্বর মনে করি না। আমি তোমাদের অত বড় জাতির মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় অবগত আছি। জর্ম্মণির প্রতিভাশালী চিন্তয়িতাদিগের নিকট আমি কত ঋণী, তাহা আমি জানি। সেই জন্য তোমাদের জর্ম্মণি আমাকে যতই বেদনা দিক, আমি তজ্জন্য সমস্ত জর্ম্মণ্‌জাতিকে দোষী করিব না। তোমার মত আমি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিবেচনা করি না। ফরাসী কখনও ভবিতব্যে বিশ্বাস করে না। আমাদের দুঃখের জন্য তোমাদিগকে তিরস্কার করি না। যদি ফ্রান্স্ অধঃপাতে যায়, জর্ম্মণিও অধঃপাতে যাইবে। যখন তোমাদের সেনাদল বেলজিয়মের রাষ্ট্রীয় ঔদাসীন্যের অপমান করিল, তখনও আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করি নাই। ওটা তোমাদের প্রুসীয় রাজাদের কৌলিক ধর্ম্ম; উহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। কিন্তু যখন দেখি যে, ঐ নির্ভীক জাতির ন্যায়ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রাণপণ প্রয়াসকে মহা অপরাধ বিবেচনা করিয়া উহার প্রতি কি পাশব অত্যাচার করিতেছ...উঃ, ইহা একেবারে অসহ্য! তোমরা জর্ম্মণ্‌জাতি, তোমরাও ত ১৮১৩ সালে এইরকম করিয়া স্বাধীনতারক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলে। সমস্ত জগৎ শিহরিয়া উঠিয়াছে। ঐ সমস্ত বর্ব্বরতা আমাদের ফরাসিজাতির জন্য রাখ; আমরাই তোমাদের শত্রু। কিন্তু এই ক্ষুদ্র, দুঃখী, নিরপরাধ বেল্‌জি জাতির উপর এত আক্রোশ! কি লজ্জা! শুধু জীবন্ত বেল্‌জিয়মের উপর নিপতিত হইয়া তোমরা ক্ষান্ত হও নাই। তোমরা মৃতের সহিত যুদ্ধ কর, অতীত যুগের মহৎ স্মৃতিচিহ্নগুলির সহিত তোমাদের বিরোধ। তোমরা ম্যালিনের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছ, রিউবেন্স্ পুড়াইয়াছ, লুভেঁ ভস্মীভূত করিয়াছ। তবে কি তোমরা, হাউপ্ট্‌মান! কি নামে তোমাদিগকে অভিহিত করিব? তুমি ত বর্ব্বর আখ্যা প্রত্যাখ্যান করিতেছ। তোমরা গয়টের বংশধর, না আটিলার উত্তরাধিকারী? তোমরা সেনার সহিত যুদ্ধ করিতেছ, না মানবাত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছ? ইচ্ছা হয়, নরহত্যা কর; কিন্তু 'আর্টে'র, ধর্ম্মের চরম-উৎকর্ষের চিহ্নগুলিকে শ্রদ্ধা করিয়া চল। সেগুলির উপর সমস্ত মানবজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে দাবী আছে। আমাদের মত, তোমাদেরও এবিষয়ে দায়িত্ব আছে; যদি ইহা অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে ক্ষুদ্র য়ুরোপীয় সৈন্য সভ্যতার রক্ষক, তাহার মধ্যে তোমরা স্থান পাইবার অনুপযুক্ত।"

বন্ধু মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন—"নানা মুনির নানা মত শুনিয়া, আমি তোমার ঐ 'সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা' সমস্যার কিনারা পাইলাম না। যে ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার উপর গীজো একটু কটাক্ষ করিয়াছেন, সে দিক হইতে এ সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করা যায় না কি?"

লেখক বলিলেন—"এখন তাহার সময় আসে নাই। আমার কর্ণে এখনও লর্ড্ রোজ্‌বেরির কথা বাজিতেছে—'Europe rattling back into barbarism'। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য-সমাজ দেখিতেছে যে, একদিন যে য়ুরোপীয় সভ্যতা মানবের সম্মুখে বর ও অভয় লইয়া আবির্ভূতা হইয়াছিল, আজ তাহার মূর্ত্তি ভীমা ছিন্নমস্তারূপিণী! স্বহস্তে নিজের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া নিজের রুধির নিজে পান করিতেছে। সংসারের সমস্ত মঙ্গল ভূমা শিবকে পদদলিত করিয়া, সভ্যতার সমস্ত বসনভূষণ ফেলিয়া দিয়া, নৃমুণ্ড-মালিনীর একি ভৈরব তাণ্ডব! Renaissanceএর পূর্ব্ব হইতেই যিনি মানবকে বৈরাগ্যের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য, ভোগের দিকে, সংসারের সুখের দিকে বাঁশীর স্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আজ তিনি বাঁশী ফেলিয়া অসি ধরিলেন কেন? এই যে 'পরাণের সাথে মরণ-খেলা, নিশীথ বেলা'—এই যে 'দে দোল্ দোল্, মত্ত রোল'—কোন্ চক্রী এই খেলা খেলিতেছেন? কোন্ বিরাট্ Cosmic Force

এই দোলনা দুলাইতেছে? ব্রাহ্মণ্য-সমাজ ভাবিতেছে, **মানুষ ভোগের মধ্যে আপনাকে হারাইতে বসিয়াছিল ;**

'ঢালি মধুরে মধুর; বঁধুরে আমার
হারাই বুঝি,
পাইনে খুঁজি ;
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে,
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে,
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি,
অগাধ স্বপ্ন সাগরে ডুবিয়া
মরি যে বুঝি,
পাই নে খুঁজি।'

"এই যে ভোগের 'সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ',—ইহাতে 'স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা' থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনের উদ্দাম আনন্দের আভাস মাত্র নাই। প্রাণকে ঝাঁকানি দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে ; আলো চাই, হাওয়া চাই, place in the sun চাই ; নইলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, জীব জড়ত্বে পরিণত হইতে থাকে ;—War is a biological necessity!—হিমাচলের পাদমূলে বসিয়া মৌন শান্ত ব্রাহ্মণ্য-সমাজ পশ্চিমাকাশের রক্ত মেঘপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছে - ঐ মহাকুরুক্ষেত্রে মানবের নবীন যুগের নবীন গীতা উদ্গীরিত হইবে কি?"

আকাঙ্ক্ষা

[শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী]

তোমায় শুধু দেখ্‌ব আমি,—
বল্‌ব না—কিছু বল্‌ব না ;
তোমার পথে চল্‌ব আমি,
অন্য পথে চল্‌ব না।
যখন তুমি জ্যোৎস্নারাতে,
ঘুমিয়ে থাক্‌বে আমার ছাতে,—
চাঁদের আলো পড়্‌বে এসে
হাতে, মুখে, পায়েতে ;
তখন আমি অলক্ষিতে,
আস্তে উঠে, আস্তে এসে,
বস্‌ব তোমার পায়ের কাছে ;—
অন্য কোথাও বস্‌ব না।
জ্যোৎস্নাসিক্ত পায়ের শোভা—
দেখতে অতি মনোলোভা—
কোটি কোটি চাঁদের আভা
এক এক নখে রয়েছে ;
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কতক্ষণে,
কি জানি, কোন্ শুভক্ষণে,
পায়ের সাথে মিশ্‌ল মাথা—
বল্‌তে কিন্তু পার্ব্বোনা।

নিদ্রা ভাঙ্‌লে সকালবেলা,
চতুর্দ্দিকে দেখি আলা,
প্রাণের ভিতর চেয়ে দেখি,
সেখানেও কি হয়েছে,—
(যেন) নবানন্দে অবিরত
প্রাণ হতেছে ওতপ্রোত,—
কে বহালে সুখের নদী
বল্‌তে চেষ্টা কোর্ব্বোনা।
সেদিন হ'তে ঠিক জেনেছি,
তোমার দয়ায় বেঁচে আছি,—
বাস্‌তে তোমায় পার্‌লে ভাল
সাধ যেন সব পুরেছে ;
সেদিন হতে ঠিক বুঝেছি—
অন্য সবই মিছামিছি—
তোমার কথাই ভাব্‌ব শুধু,
অন্য কথা ভাব্‌ব না।—
তোমার নামই গাইব আমি,
অন্য গান আর গাইব না!

দর্পচূর্ণ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সন্ধ্যার পর ইন্দুমতী বিশেষ একটু সাজ-সজ্জা করিয়া তাহার স্বামীর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি হচ্চে ?"

নরেন্দ্র একখানি বাঙ্গলা মাসিকপত্র পড়িতেছিল; মুখ তুলিয়া, নিঃশব্দে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, সেখানি হাতে তুলিয়া দিল।

ইন্দু খোলা পাতাটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া, জোড়া-ভ্রু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া, বিস্ময় প্রকাশ করিল,—"ইস্, এ যে কবিতা দেখ্‌চি! তা' বেশ—বসে না থাকি, বেগার খাটি। দেখি এখানা কি কাগজ? 'সরস্বতী' ? 'স্বপ্রকাশ' ছাপালেনা বুঝি ?"

নরেন্দ্রের শান্ত দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া আসিল।

ইন্দু পুনরায় প্রশ্ন করিল, "'স্বপ্রকাশ' ফিরিয়ে দিলে ?"

"সেখানে পাঠাই নি।"

"পাঠিয়ে একবার দেখ্‌লে না কেন? 'স্বপ্রকাশ', 'সরস্বতী' নয়, তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এই জন্যেই আমি যা-তা কাগজ কখ্‌খনো পড়িনে।" একটু হাসিয়া ইন্দু আবার কহিল,—"আচ্ছা, নিজের লেখা নিজেই খুব মন দিয়ে পড়। ভাল কথা,—আজ শনিবার, আমি ও-বাড়ীর ঠাকুরঝিকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাচ্চি। কমলা ঘুমিয়ে পড়েচে। কাব্যের ফাঁকে মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো। চল্লুম।"

নরেন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করিয়া, টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল,—"যাও।"

ইন্দু চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা গভীর নিঃশ্বাস কাণে যাইতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি কিছু একটা কর্‌তে চাইলেই তুমি অমন করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল কেন, বল ত? এতই যদি তোমার দুঃখের জ্বালা, মুখ-ফুটে বলনা কেন, আমি বাবাকে চিঠি লিখে যাহোক্ একটা উপায় করি।"

নরেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল মুখ তুলিয়া, ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, যেন সে কিছু বলিবে। কিন্তু কিছুই বলিল না, নীরবে মুখ নত করিল।

নরেন্দ্রের মামাত ভগিনী বিমলা ইন্দুর সখী। ও-রাস্তার মোড়ের উপরেই তাহার বাড়ী। ইন্দু গাড়ী দাঁড় করাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, "ওকি ঠাকুরঝি!—কাপড় পরনি যে?—খবর পাওনি নাকি ?"

বিমলা সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, "পেয়েছি বৈ কি; কিন্তু একটু দেরি হবে ভাই। উনি এইমাত্র একটুখানি বেড়াতে বেরুলেন—ফিরে না এলে ত যেতে পারব না।"

ইন্দু মনেমনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। একটা খোঁচা দিয়া প্রশ্ন করিল—"প্রভুর হুকুম পাওনি বুঝি ?"

বিমলার সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধমধুর হাসিতে ভরিয়া গেল। এই খোঁচাটুকু সে যেন ভারি উপভোগ করিল। কহিল, "না, দাসীর আর্জ্জি এখনও পেশ করা হয়নি। তবে, হলে যে না-মঞ্জুর হবেনা, সে ভরসা করি।"

ইন্দু আরও বিরক্ত হইল। প্রশ্ন করিল, "তবে, পেশ হয়নি কেন? খবর ত তোমাকে আমি বেলা থাক্‌তেই পাঠিয়েছিলুম!"

"তখন সাহস হলনা বৌ। আফিস থেকে এসেই বল্লেন, মাথা ধরেছে। ভাবলুম, জলটল খেয়ে, একটু ঘুরে আসুন—মনটা প্রফুল্ল হোক্—তখন জানাব। এখনও ত দেরি আছে; একটু বোসোনা ভাই, তিনি ফিরে এলেন বলে।"

"কি জানি, কিসে তোমার হাসি আসে ঠাকুরঝি! আমি ত এমন হলে লজ্জায় মরে যেতুম। আচ্ছা, ঝিকে কিংবা বেহারাটাকে বলে দিয়ে কি যেতে পার না ?"

বিমলা সভয়ে বলিল, "বাপ্‌রে! তা'হলে বাড়ী থেকে দূর করে দেবেন—এ জন্মে আর মুখ দেখ্‌বেন না।"

ইন্দু ক্রোধে বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, "দূর করে দেবেন! কোন্ আইনে? কোন্ অধিকারে শুনি?"

বিমলা নিতান্ত সহজভাবে জবাব দিল, "বাধা কি বৌ! তিনি মালিক—আমি দাসী বৈ ত নয়। তিনি তাড়ালে, কে তাঁকে ঠেকাবে বল?"

"ঠেকাবে রাজা। ঠেকাবে আইন। সে চুলোয় যাক্‌গে ঠাকুরঝি, কিন্তু নিজের মুখে নিজেকে দাসী বলে কবুল কর্‌তে কি একটুকু লজ্জা হয় না? স্বামী কি মোগল বাদশা—আর স্ত্রী কি তাঁর ক্রীতদাসী, যে আপনাকে আপনি এমন হীন—এমন তুচ্ছ করে গৌরব বোধ কর্‌চ?"

এই ক্রোধটুকু লক্ষ্য করিয়া, বিমলা আমোদ বোধ করিল,; কহিল—"তোমার ঠাকুরঝি যে মুখ্যু মেয়ে মানুষ, বৌ; তাই নিজেকে স্বামীর দাসী বলে গৌরব বোধ করে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি ভাই, তুমি যে এত কথা বল্‌চ, তুমিই কি বাড়ী থেকে বেরিয়েচ দাদার হুকুম না নিয়ে?"

"হুকুম? কেন, কি জন্যে? তিনি নিজে যখন কোথাও যান, আমার হুকুমের অপেক্ষা করেন কি? 'আমি যাচ্চি'—শুধু এই কথা তাঁকে জানিয়ে এসেচি।" নিমেষ মাত্র মৌন থাকিয়া, অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, "তবে, এ কথা মানি যে, আমার মত গুণের স্বামী, কম মেয়ে মানুষের ভাগ্যে জোটে। আমার কোন ইচ্ছেতেই তিনি বাধা দেন না। কিন্তু, এমন যদি না-ও হ'ত, তিনি যদি নিতান্ত অবিবেচক হতেন, তা'হলেও তোমাকে বল্‌চি ঠাকুরঝি, আমি নিজের সম্মান ষোলো আনা বজায় রাখ্‌তে পারতুম; কিছুতেই তোমাদের মত এ কথা ভুল্‌তে পারতুম না যে, আমি সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী—তাঁর ক্রীতদাসী নই। জান ঠাকুরঝি, এম্‌নি করেই আমাদের দেশের সমস্ত মেয়ে মানুষ পুরুষের পায়ে মাথা মুড়িয়ে এত তুচ্ছ, এমন খেলার পুতুল, হয়ে দাঁড়িয়েচে। নিজের সম্ভ্রম নিজে না রাখলে, কেউ কি যেচে দেয় ঠাকুরঝি?—কেউ না। আমার ত' এমন স্বামী, তবু কখনও তাঁকে আমি এ কথা ভাব্‌বার অবকাশ দিইনে—তিনিই প্রভু, আর আমি স্ত্রী বলেই তাঁর বাঁদী। আমার নারী-দেহেও ভগবান বাস করেন, একথা আমি নিজেও ভুলিনে—তাঁকেও ভুল্‌তে দিইনে।"

বিমলা চুপ করিয়া শুনিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল; কিন্তু তাহাতে লজ্জা বা অনুশোচনা কিছুই প্রকাশ পাইল না। কহিল, "জানিনে বৌ, আত্ম-সম্ভ্রম আদায় করা কি; কিন্তু, তাঁর পায়ে আত্ম-বিসর্জ্জন-দেওয়াটা বুঝি। ঐ যে উনি এলেন;—একটু বোসো ভাই, আমি শিগ্‌গীর হুকুম নিয়ে আসি" বলিয়া, হঠাৎ একটু মুখটিপিয়া হাসিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ইন্দু এ হাসিটুকু দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রাগে রি-রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

* * * * *

বায়স্কোপ হইতে ফিরিবার পথে ইন্দু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরঝি, হুকুম না পেলে ত তুমি আস্‌তে পার্‌তে না।"

বিমলা পথের দিকে চাহিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া, কি জানি কি ভাবিতেছিল; বলিল, "না।"

"তাই, আমার মনে হয় ঠাকুরঝি, আমি যখন তখন এসে, তোমাকে ধরে নিয়ে যাই বলে, তোমার স্বামী হয়ত রাগ করেন।"

বিমলা মুখ ফিরাইয়া কহিল, "তা'হলে আমি নিজেই বা যাব কেন বৌ! বরং আমার ভয় হয়, তুমি এমন করে এসো বলে, দাদা হয়ত মনে মনে আমার উপর বিরক্ত হন।"

ইন্দু সগর্ব্বে কহিল, "তোমার দাদার সে স্বভাব নেই। একেত কখনো তিনি নিজের অধিকারের বাহিরে পা দেন না, তা'ছাড়া আমার কাযে রাগ করবেন, আমি ঠিক জানি, এ স্পর্দ্ধা তাঁর স্বপ্নেও আসে না।"

বিমলা মিনিট দুই স্থির থাকিয়া, গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বৌ, দাদা তোমাকে কি ভালই বাসেন! কিন্তু তুমি বোধ করি—"

এতক্ষণে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল। কহিল, "তাঁর কথা অস্বীকার করিনে; কিন্তু, আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হ'ল কিসে?"

"তা' জানিনে বৌ। কিন্তু, মনে হয় যেন—"

"কেন হয় জান ঠাকুরঝি, তোমাদের মত পায়ে-লুটিয়ে-পড়া ভালবাসা আমার নেই বলে। আর ঈশ্বর করুন, আমার নারী-মর্য্যাদাকে ডিঙিয়ে যেন কোন দিন আমার ভালবাসা মাথাতুলে উঠ্‌তে না পারে। যে ভালবাসা

আমার স্বাধীন-সত্বাকে লঙ্ঘন করে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।"

বিমলা গোপনে শিহরিয়া উঠিল।

মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া, ইন্দু কহিল, "কথা কওনা যে ঠাকুরঝি! কি ভাব্‌চ?"

"কিছু না। প্রার্থনা করি, দাদা তোমাকে চিরদিন এম্‌নিই ভালবাসুন। কারণ, যতই কেন বলনা বৌ, মেয়ে মানুষের স্বামীর ভালবাসার চেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও বড় নয়।" মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বিমলা পুনরায় কহিল, "কি জানি, কি তোমার নারী-মর্য্যাদা—আর কি তোমার স্বাধীন-স্বত্বা! আমি ত আমার সমস্তই তাঁর পায়ে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেচি। সত্যি বল্‌চি বৌ, আমার ত এম্‌নি দশা হয়েছে, নিজের ইচ্ছে বলেও যেন আর কিছু বাকি নেই। তাঁর ইচ্ছেই—"

"ছিছি চুপ কর—চুপকর—"

বিমলা চমকিয়া চুপ করিল। ইন্দু ঘৃণাভরে বলিতে লাগিল,—"আমাদের দেশের মেয়েরা কি মাটির পুতুল? প্রাণ নেই, আত্মা নেই,—কিচ্ছু নেই! আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এত করে কি পেয়েচ? আমার চেয়ে বেশী ভালবাসা আদায় কর্‌তে পেরেচ কি? ঠাকুরঝি, ভালবাসা মাপবার যে যন্ত্র নেই, নইলে মেপে দেখাতে পারতুম—যাক্ সে কথা—কিন্তু কেন জান? নিজেকে তোমাদের মত নীচু করিনি বলে। তোমাদের এই কাঙাল-বৃত্তি মাথায় তুলে নিইনি বলে—আমার ভারি দুঃখ হয়, ঠাকুরঝি, কেন তিনি এত শান্ত,—এত নিরীহ। কিছুতেই একটা কথা বলেন না—নইলে, দেখিয়ে দিতুম, তিনি যাকে গ্রাহ্য করেন না, সেও মানুষ; সেও অগ্রাহ্য কর্‌তে জানে। সেও আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে ভালবাসা চায় না।—ও আবার কি? মুখ ফিরিয়ে হাস্‌চ যে!"

বিমলা জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল—"কৈ—না।"

"না কেন? এখনো ত তোমার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েচে।"

বিমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "লেগে রয়েচে তোমার কথা শুনে। ওগো বৌ, অনেক পেয়েচ বলেই এত কথা বেরুচ্চে।"

ইন্দু ক্রুদ্ধমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "না পেলে?"

"বেরুত না।"

"ভুল—নিছক ভুল। ঠাকুরঝি, সকলেই তোমার মত নয়—সকলেই ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায় না। আত্মগৌরব বোঝে, এমন নারীও সংসারে আছে।" এবার বিমলার মুখের হাসি ধীরে মিলাইয়া গেল; বলিল, "তা' জানি।"

"জান্‌লে আর বল্‌তে না। যাই হোক্, এখন থেকে জেনো যে—ভিক্ষে চায় না, নিজের জোরে আদায় করে, এমন লোকও আছে।"

বিমলা ব্যথিতস্বরে বলিল, "আচ্ছা।—এই যে বাড়ী এসে পড়েচে। একবার নাব্‌বে না কি?"

"নাঃ—আমিও বাড়ী যাই। গাড়োয়ান, ঐ ও-গলিতে—

দাদাকে আমার প্রণাম দিয়ো বৌ।"

"দেব।—গাড়োয়ান চলো—"

(২)

"আর নেই—সংসার-খরচের কিছু টাকা দিতে হবে যে।" স্ত্রীর প্রার্থনায় নরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইল। কহিল, "এর মধ্যেই দু'শ টাকা ফুরিয়ে গেল?"

"না গেলে কি মিথ্যে কথা বল্‌চি; না, লুকিয়ে রেখে চাইচি?" নরেন্দ্রের চোখে মুখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল।—কোথায় টাকা? কি করিয়া সংগ্রহ করিবে?

সেই মুখের ভাব ইন্দু দেখিল বটে, কিন্তু ভুল করিয়া দেখিল। কহিল, "বিশ্বাস না হয়, এখন থেকে একটা খাতা দিয়ো, হিসেব লিখে রাখ্‌বো। কিংবা, এক কায করনা—খরচের টাকাকড়ি নিজের হাতেই রেখো—তাতে তোমার ভয় থাক্‌বে না, আমিও সংশয়ের লজ্জা থেকে রেহাই পাব।" বলিয়া তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখের গাঢ় ছায়া বেদনায় গাঢ়তর হইয়াছে।

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, "অবিশ্বাস করিনে—কিন্তু—"

"কিন্তু কি? বিশ্বাসও হয়না—এই ত? আচ্ছা যাচ্ছি, যতটা পারি, হিসেব লিখে আনি। উঃ—কি সুখের ঘরকন্নাই হয়েচে আমার!" বলিয়া, সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কিন্তু কেন? কিসের জন্যে হিসেব লিখ্‌তে যাবো—আমি কি মিথ্যা বলি? আমার মামাত বোনের বিয়েতে কাপড়, জামা লাগ্‌ল—পঞ্চাশ টাকার ওপর। কমলার জামা দুটোর দাম বারো টাকা—

সেদিন বায়স্কোপে খরচ হ'ল দশ-বারো টাকা—খতিয়ে দেখ দেখি, বাকি থাকে কত? তাতে এই দশ পনর দিন সংসার-খরচটা কি এম্নি বেশী যে, তোমার দুই চোখ কপালে উঠ্‌ছে! আমার দাদার সংসারে মাসে সাত-আটশ টাকাতেও যে হয় না। সত্যি বল্‌চি, এমন কর্‌লে, আমি ত আর ঘরে টিক্‌তে পারিনে। তার চেয়ে, বরং স্পষ্ট বল; দাদা মেদিনীপুরে বদ্‌লি হয়েছেন, আমিও মেয়ে নিয়ে চলে যাই—আমিও জুড়োই, তুমিও বাঁচ।"

নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ঘাড়হেঁট করিয়া থাকিয়া, মুখ তুলিয়া কহিল, "এবেলায় ত হবে না, দেখি যদি ও-বেলায় কিছু জোগাড় কর্ত্তে পারি।"

"তার মানে? যদি যোগাড় না কর্‌তে পার, ত উপোস কর্‌তে হবে নাকি? দেখ, কালই আমি মেদিনীপুরে যাব। কিন্তু, তুমিও এক কাজ কর। এই দালালী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, দাদাকে ধরে, একটা চাক্‌রি জোগাড় করে নাও। তাতে বরঞ্চ ভবিষ্যতে থাক্‌বে ভাল; কিন্তু যা' পারনা, তাতে হাত দিয়ে,নিজেও মাটি হয়োনা, আমাকেও নষ্ট কোরোনা।"

নরেন্দ্র জবাব দিল না। ইন্দু আরও কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু এই সময়ে বেহারাটা শম্ভুবাবুর আগমন-সংবাদ জানাইল। এবং পরক্ষণেই বাহিরে জুতার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দু পার্শ্বের দ্বার দিয়া,পর্দার আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুবাবু মহাজন। নরেন্দ্রের পিতা বিস্তর ঋণ করিয়া, স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্রের কাছে তাগাদা করিতে শম্ভুবাবু প্রায়ই শুভাগমন করিয়া থাকেন; আজিও উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মৃদুভাষী। আসন গ্রহণ করিয়া, ধীরে ধীরে এমন গুটিকয়েক কথা বলিলেন, যাহা দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্ব্বে অতি-বড় নির্লজ্জও নিজের মাথাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে দ্বিধা করিবে না। শম্ভুবাবু প্রস্থান করিলে, ইন্দু আর-একবার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?"

"শম্ভু বাবু।"

"তার পরে?"

"কিছু টাকা পাবেন, তাই চাইতে এসেছিলেন।"

"সে টের পেয়েছি। কিন্তু, ধার করেছিলে কেন?"

নরেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল। কহিল, "বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, তাই—"

ইন্দু অতিশয় রুক্ষস্বরে বলিল, "তোমার বাবা কি পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কাছে দেনা করে গেছেন? এ শোধ কর্‌বে কে? তুমি? কি করে কর্‌বে শুনি?"

এতগুলা প্রশ্নের একনিঃশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দু নিজেও সে জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল না—তৎক্ষণাৎ কহিল, "বেশত, তোমার বাবা না হয় হঠাৎ মারা গেছেন; কিন্তু তুমি ত হঠাৎ বিয়ে করনি? এ সব ব্যাপার আমার বাবাকে ত জানানো উচিত ছিল। আমাকে গোপন করাও ত কর্ত্তব্য হয়নি। লোকের মুখে শুনি, তুমি ভারি ধর্ম্মভীরু লোক—বলি, এ সব বুঝি তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে না?" বলিয়া, ঠিক যেন সে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু, হায়রে, এত গুলা সুতীক্ষ্ণ বাণ যাহার উপর এমন নিষ্ঠুরভাবে বর্ষিত হইল, ভগবান তাহাকে কি নিরস্ত্র, কি নিরুপায় করিয়া, সংসারে পাঠাইয়াছিলেন! কাহাকেও কোন কারণেই প্রতিঘাত করিবার সাধ্যটুকুও তাহার ছিল না; শুধু সাধ্য ছিল সহ্য করিবার। আঘাতের সমস্ত বেদনাই তাহার নিজের মধ্যে পাক খাইয়া, অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া যাইত; কিন্তু সেই স্বল্প সময়টুকুও আজ তাহার মিলিল না। শম্ভুবাবুর অত্যুগ্র কথার জ্বালার কণামাত্র শান্ত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দু তাহাতে এমন ভীষণ তীব্রজ্বালা সংযোগ করিয়া দিল যে, তাহারই অসহ তীব্রতায় আজ সেও প্রত্যুত্তরে একটা কঠোর কথাই বলিতে উদ্যত হইয়া উঠিল; কিন্তু শেষ-রক্ষা করিতে পারিল না। অক্ষমের নিষ্ফল আড়ম্বর, মাথা তুলিয়াই ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুধু ক্ষীণস্বরে বলিল, "বাবার সম্বন্ধে তোমার কি এমন করে বলা উচিত?"

"না—উচিত নয়। কিন্তু আমার উচিত-অনুচিতের কথা তোমাকে মীমাংসা করে দিতে ত বলিনি। তুমি কেন তোমাদের সমস্ত ব্যাপার বাবাকে খুলে বল নি?"

"আমি কিছুই গোপন করিনি, ইন্দু। তা ছাড়া, তিনি বাবার বাল্য বন্ধু ছিলেন, নিজেই সমস্ত জান্‌তেন।"

"তা হলে বল, সমস্ত জেনে-শুনেই বাবা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছেন!"

অসহ্য ব্যথায় ও বিস্ময়ে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া, চাহিয়া থাকিয়া, শির নত করিল। স্ত্রীর এই ক্রোধ যথার্থই সত্য

কিংবা কলহের ছলনা মাত্র, হঠাৎ সে যেন ঠাহর করিতেই পারিল না।

একটু গোড়ার কথা বলা আবশ্যক। বহুকাল উভয় পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়াছিলেন এবং বিবাহটা একরূপ স্থির হইয়াই ছিল। কিন্তু এক সময়ে ইন্দুর পিতা অকস্মাৎ মত-পরিবর্ত্তন করিয়া, মেয়েকে একটু অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করায়, বিবাহ-সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েক বর্ষ পরে, ইন্দুর আঠারো বৎসর বয়সে আবার যখন কথা উঠে, তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনেন, নরেন্দ্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সময়ে তাহার সাংসারিক অবস্থা ইন্দুর পিতামাতা যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহাদের মত পর্য্যন্ত ছিল না। শুধু, বয়স্থা ও শিক্ষিতা কন্যার প্রবল অনুরাগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।

এত কথা এত শীঘ্র ইন্দু যথার্থই ভুলিয়াছে কিংবা মিথ্যা মোহে অন্ধ হইয়া, নিজেকে প্রতারিত করিবার নিদারুণ আত্মগ্লানি এখন এমন করিয়া, তাহাকে অহরহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, নরেন্দ্র স্তব্ধ নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

সেই নির্ব্বাক স্বামীর আনত মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া, ইন্দু আর কোন কথা না বলিয়া, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে নিঃশব্দে গেল বটে,—এমন অনেক দিনই গিয়াছে, কিন্তু, আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রের মনে হইল, তাহার বুকের বড় বেদনার স্থানটা ইন্দু যেন ইচ্ছা-পূর্ব্বক জোর করিয়া, মাড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। একবার ঈষৎ একটু ঘাড় তুলিয়া, স্ত্রীর নিষ্ঠুর পদক্ষেপ চাহিয়া দেখিল; যখন আর দেখা গেল না, তখন গভীর—অতি গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, নির্জ্জীবের মত সেই খানেই এলাইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা আজ প্রথম মনে উদয় হইল, সমস্ত মিথ্যা—সব ফাঁকি। এই ঘরদ্বার, স্ত্রীকন্যা, স্নেহপ্রেম সমস্তই তাহার এক নিমেষে মরুভূমির মরীচিকার মত উবিয়া গেল।

(৩)

"দাদা ?"

"কেরে বিমল ? আয় বোন্—বোস্।" বলিয়া, নরেন্দ্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার উভয় ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথার যে চিহ্নটুকু প্রকাশ পাইল, তাহা বিমলার দৃষ্টি এড়াইল না।

"অনেক দিন দেখিনি দিদি, ভাল আছিস্ ত ?"

বিমলার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বলিল, "কেন দাদা, তোমার অসুখের কথা আমাকে এতদিন জানাও নি ?"

"অসুখ তেমন ত কিছুই ছিলনা বোন্। শুধু সেই বুকের ব্যথাটা একটু—"

বিমলা হাত দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "একটু বৈ কি! উঠে বস্‌তে পার না—ডাক্তার কি বল্‌লে ?"

"ডাক্তার ? ডাক্তার কি হবে রে ? ও আপনি সেরে যাবে।"

"এঁ, ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকাও নি ? ক'দিন হ'ল ?"

নরেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল, "ক'দিন ? এইত সেদিন রে। দিন সাতেক হবে বোধ হয়।"

"সাত দিন—! তা'হলে বৌ সমস্ত দেখেই গেছে!"

"না না দেখে যায়নি, বোধ হয়—অসুখ আমার নিশ্চয় সে বুঝ্‌তে পারেনি। আমি তার যাবার দিনও উঠে গিয়ে বাইরে বসে ছিলুম। না না, হাজার রাগ হোক্, তাই কি তোরা পারিস্ বোন্ ?"

"বৌ তাহ'লে রাগ করে গেছেন, বল ?"

"না রাগ নয়,—দুঃখ-কষ্ট—কত অভাব জানিস্ ত। ওদের এসব সহ্য করা অভ্যাস নেই—দেহটাও তার বড় খারাপ হয়েচে—নইলে অসুখ দেখ্‌লে কি তোরা রাগ করে থাক্‌তে পারিস্ ?"

বিমলা অশ্রু চাপিয়া, কঠিনস্বরে বলিল, "পারি বৈ কি দাদা, আমাদের অসাধ্য কায নেই। নাহলে, তোমরা বিছানায় না শোয়া পর্য্যন্ত আর আমাদের চোখে পড়ে না! ভোলা, পাল্‌কি এল রে ?"

"আন্‌তে পাঠিয়েছি মা।"

"এর মধ্যেই যাবি দিদি ? এখনো ত সন্ধ্যে হয়নি—আর একটু বোস্ না।"

"না দাদা, সন্ধ্যে হলে হিম লাগ্‌বে। ভোলা, পাল্‌কি একেবারে ভেতরে আনিস্।"

"ভেতরে কেন বিমল ?"

"ভেতরেই ভাল দাদা। এই ব্যথা নিয়ে তোমার বাইরে গিয়ে উঠ্‌তে কষ্ট হবে।"

"আমাকে নিয়ে যাবি? এই পাগল দেখ। কি হয়েচে যে, এত কাণ্ড করতে হবে? এ তো আমার প্রায়ই হয়, প্রায়ই সেরে যায়।"

"তাই যাক্‌ দাদা। কিন্তু, ভাই ত আমার আর নেই যে, তোমাকে হারালে আর একটি পাব? ঐ যে পাল্‌কি—এই র‍্যাপারখানা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ো—ভোলা, আর একটু এগিয়ে আন্‌তে বল্‌—না দাদা, এ সময় তোমাকে চোখে-চোখে না রাখ্‌তে পার্‌লে, আমার তিলার্দ্ধ স্বস্তি থাক্‌বে না।"

"কিন্তু, নিয়ে যেতে চাইবি বুঝলে যে, তোকে আমি খবরই দিতুম না।"

বিমলা মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমাদের বোঝা তোমাদেরই থাক্‌ দাদা, আমাকে আর শুনিয়ো না। আচ্ছা, কি করে মুখে আন্‌লে বলত? এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে পারি? সত্যি কথা বোলো?"

নরেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে চল্‌ যাই।"

"দাদা?"

"কি রে?"

"আজ রাত্রেই বৌকে একখানা টেলিগ্রাফ করে দিই, কাল সকালে চলে আসুক।"

নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল—"না না, সে দরকার নেই।"

"কেন নেই? মেদিনীপুর ত বেশি দূর নয়, একবার আসুক, না হয়, আবার চলে যাবে।"

"না রে বিমল, না। সত্যিই তার দেহটা ভাল নেই—দুদিন জুড়োক।"

একটুখানি থামিয়া বলিল, "বিমল, আমি তোর কাছে থেকে ভাল না হতে পারি ত আর কিছুতেই পারব না। হাঁরে, আমি যে যাচ্ছি, গগন বাবু শুনেচেন ত?"

"বেশ যাহোক তুমি। তিনি ত এখনো আফিস থেকেই ফেরেন নি।"

"তবে?"

"তবে আবার কি? তোমার ভয় নেই দাদা,—তাঁর বেশ বড় বড় দুটো চোখ আছে, আমরা গেলেই দেখ্‌তে পাবেন।"

নরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কহিল,—"বিমল, আমার যাওয়া ত হতে পারে না।"

বিমলা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

"গগন বাবুর অমতে—"

"অমন করলে মাথা খুঁড়ে মরব দাদা। একটা বাড়ীর মধ্যে কি ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে যে, আমাকে অপমান করচ?"

"অপমান করচি! ঠিক জানিস্‌ বিমল, ভিন্ন মত থাকে না?"

বিমলা আবশ্যক বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতেছিল, সলজ্জে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

* * * *

"দাদা, আজ ব্যথাটা তত টের পাচ্চনা, না?"

"একেবারে না। এই আট দিন তোদের কি কষ্টই না দিলুম—এখন বিদেয় কর্‌ দিদি!"

"করব কার কাছে? আচ্ছা দাদা, এই ষোলো সতর দিনের মধ্যে বৌ একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিলে না?"

"না, দিয়েচেন বৈ কি। পৌছন সংবাদ দিয়েছিলেন,—কালও একখানা পেয়েচি—বরং, আমিই জবাব দিতে পারিনি ভাই।"

বিমলা মুখ ভার করিয়া, নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"সেখানে গিয়ে পর্য্যন্ত তিনি ভাল নেই—সর্দ্দি, কাশি, পরন্তু একটু জ্বরের মতও হয়েছিল, তবু তার ওপরেই চিঠি লিখেচেন—"

"আজ তাই বুঝি সেখানে টাকা পাঠিয়ে দিলে?"

নরেন্দ্র অধিকতর লজ্জিত হইয়া পড়িল। কহিল,—"কিছুই ত তাঁর হাতে ছিল না—বাড়ীর পাশেই একটা মেলা বস্‌চে—লিখেচেন সেটা শেষ হয়ে গেলেই ফির্‌তে পারবেন—তোমাকে বুঝি চিঠিপত্র লিখ্‌তে পারেন নি?"

"পেরেছেন বৈ কি। কাল আমিও একখানা চারপাতা জোড়া চিঠি পেয়েচি—"

"পেয়েছিস্‌? পাবি বৈ কি—তার জবাবটা—"

"তোমার ভয় নেই দাদা—তোমার অসুখের কথা লিখ্‌ব

না। আমার নষ্ট করবার মত অত সময় নেই।" বলিয়া বিমলা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা জানালার ভিতর দিয়া, ম্লান আকাশের পানে চাহিয়া, নরেন্দ্র স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল, বিমলা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "চুপ করে কি ভাব্‌চ, দাদা?"

নরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "কিছুই ভাবিনি বোন্,—মনে মনে তোকে আশীর্ব্বাদ করছিলুম, যেন এম্‌নি সুখেই তোর চিরদিন কাটে।"

বিমলা কাছে আসিয়া, তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, একটা চৌকির উপর বসিল।

"আচ্ছা, দুপুর বেলা অত রাগ করে চলে গেলি কেন বল্‌ত?"

"আমি অন্যায় সইতে পারিনে। কেন তুমি অত—"

"অত কি বল্? ইন্দুর দিক্ থেকে একবার চেয়ে দেখ দেখি? আমি ত তাঁকে সুখে রাখ্‌তে পারি নি?"

"সুখে থাক্‌তে পারার ক্ষমতা থাকা চাই দাদা। সে যা পেয়েছে, এত ক'জন পায়? কিন্তু সৌভাগ্যকে মাথায় তুলে নিতে হয়; নইলে—" কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই বিমলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

নরেন্দ্র নীরবে স্নিগ্ধ-সস্নেহ দৃষ্টিতে এই ভগিনীটির সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিয়া, ক্ষণকাল পরে কহিল, "বিমল, লজ্জা করিস্‌নে দিদি,—সত্যি বল্‌ত, তুই কি কখনো ঝগড়া করিস্‌নে?"

"উনি বলেচেন বুঝি? তা'ত বল্‌বেনই।"

নরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, গগনবাবু কিছুই বলেন নি—আমি তোকেই জিজ্ঞেসা কর্‌চি।"

বিমলা আরক্ত মুখ তুলিয়া বলিল—"তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কে পার্‌বে বল? শেষে হাতে-পায়ে পড়ে—ওখানে দাঁড়িয়ে কে?"

"আমি, আমি,—গগন বাবু। থাম্‌লে কেন—বলে যাও। ঝগড়া করে কার হাতে পায়ে কা'কে পড়্‌তে হয়—কথাটা শেষ করে ফেল।"

"যাও—যে সাধু পুরুষ লুকিয়ে শোনে, তার কথার আমি জবাব দিইনে" বলিয়া, বিমলা কৃত্রিম ক্রোধের আড়ালে হাসি চাপিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মোটা তাকিয়া হেলান দিয়া বসিল। গগনবাবু বলিলেন, "এ বেলায় কেমন আছ হে?"

"ভাল হয়ে গেছি। এইবার বিদায় দাও ভাই।"

"বিদায় দাও? ব্যস্ত হোয়োনা হে—দু'দিন থাকো। তোমার এই বোন্‌টির আশ্রয়ে যে ক'টা দিন বাস করতে পায়, তার তত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে খবর জানো?"

"জানিনে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

গগন বাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"বিশ্বাস করি কিহে, এ যে প্রমাণ করা কথা। বাস্তবিক নরেন বাবু, এমন রত্নও সংসারে পাওয়া যায়! ভাগ্য! ভাগ্য! ভাগ্যং ফলতি—কি হে কথাটা? নইলে আমার মত হতভাগা যে এ বস্তু পায়, এতো স্বপ্নের অগোচর। বৌঠাকরুণ—না হে, না, থেকে যাও দু'দিন—এমন সংসার ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আরাম পাবেনা, তা' বলে দিচ্চি ভাই।"

বিমলা বহু দূরে যায় নাই—ঠিক পর্দ্দার আড়ালেই কাণ পাতিয়াছিল—চোখ মুছিয়া, উঁকি মারিয়া, সেই প্রায় অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার স্বামীর কথাগুলা শুনিয়া, নরেন দাদার মুখখানা একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন নিবিয়া কালি হইয়া গেল।

(৪)

দিন পনর পরে দুপুরের গাড়ীতে ইন্দু মেয়ে লইয়া, মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী ও কন্যাকে সুস্থ সবল দেখিয়া, নরেন্দ্রের শীর্ণপাণ্ডুর মুখ মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে ঘুমন্ত কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছ ইন্দু?"

"বেশ আছি। কেন?"

"তোমার জ্বরের মত হয়েছিল শুনে ভারি ভাব্‌না হয়েছিল। সর্দ্দিটা সেরে গেছে?"

"না হলে ডাক্তার ডাকাবে নাকি?"

নরেন্দ্রের হাসি মুখ মলিন হইল। কহিল, "না, তাই জিজ্ঞেসা করচি।"

"কি হবে করে? এদিকে ত পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে চিঠির ওপর চিঠি যাচ্ছিল—কেমন আছ—কেমন আছ—সাবধানে থেকো—সাবধানে থেকো। আমি কি কচি খুকি, না, পঞ্চাশটি টাকা দাদা আমাকে দিতে পারতেন না? ও টাকা পাঠিয়ে সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট

করে দেবার কি দরকার ছিল ? সেদিন বাড়ীতে যেন একটা হাসি পড়ে গেল।"

নরেন্দ্র ম্লানমুখ আরও ম্লান করিয়া, অস্ফুটে কহিল—"আর যোগাড় করতে পারলুম না।"

"না পাঠিয়ে, তাই কেন লিখে দিলে না ? উঃ—আবার সেই নিত্য নেই নেই—দাও দাও—বেশ ছিলুম এত দিন। বাস্তবিক, বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে পড়ার মত মস্ত পাপ আর সংসারে নেই" বলিয়া, এই পরম সত্যে স্বামীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া, ইন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

মাসাধিক পরে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

বাহিরে আসিয়া ইন্দু ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়া, ভারি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, বাড়ীর অন্যান্য স্থানের মত এখানেও সমস্ত বস্তু রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে।

জিজ্ঞাসা করিল, "এত ঝাড়া মোছা হচ্চে কেন রে ?"

নূতন ঝি বলিল—"আপনি আস্‌বেন বলে।"

"আমি আস্‌ব বলে ?"

"হাঁ মা, বাবু তাইত বলে দিলেন। আপনি ময়লা কিছু দেখ্‌তে পারেন না—আজ তিন দিন থেকে তাই—"

ইন্দু অন্তরের মধ্যে একটা বড় রকমের গর্ব্ব অনুভব করিল। কিন্তু সহজভাবে বলিল—

"ময়লা আবার কে দেখ্‌তে পারে ? তবু ভালো যে—"

"হাঁ মা, লোক লাগিয়ে ওপর নীচে সমস্ত সাফ করা হয়েচে।"

"ঝি, রামটহলকে একবার ডেকে দাওত, বাজার থেকে কিছু ফলমূল কিনে আনুক।"

"ফলটল ত সব আছে মা। বাবু আজ সকালে নিজে বাজারে গিয়ে সমস্ত খুটিয়ে কিনে এনেচেন।"

"ডাব আছে ? আঙুর—"

"আছে বৈ কি। এখনি নিয়ে আস্‌চি" বলিয়া, দাসী চলিয়া গেল। ইন্দুর মুখের উপর হইতে বিরক্তির মেঘখানা সম্পূর্ণ উড়িয়া গেল। বরং, অনতিপূর্ব্বে স্বামীর মলিন মুখখানা বুকের কোথায় যেন একটু খচ্ খচ্ করিতেও লাগিল।

বিশ্রাম করিয়া, ঘণ্টা দুই পরে সে প্রসন্নমুখে স্বামীর বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নরেন্দ্র চসমা খুলিয়া, খুব ঝুঁকিয়া বসিয়া কি লিখিতেছে। কহিল, "অত মন দিয়ে কি লেখা হচ্চে ?—কবিতা ?"

নরেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল,—"না।"

"কি তবে ?"

"ও কিছু না", বলিয়া, সে লেখাগুলা চাপা দিয়া রাখিল।

ইন্দুর প্রসন্নমুখ মেঘাবৃত হইয়া গেল। কহিল—"তা হলে কিছু-নার ওপর অত ঝুঁকে না পড়ে বরং যাতে দুঃখ-কষ্ট ঘোচে, এমন কিছুতে মন দাও। শুনলুম, দাদার হাতে নাকি গোটা কতক চাকরি খালি আছে।" বলিয়া, ভাল করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, এই চাক্‌রি করার কথাটা তাঁহাকে চিরদিন আঘাত করে। আজ কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, আঘাতের কোন বেদনাই তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

নরেন্দ্র শান্তভাবে বলিল, "চাক্‌রি করবার লোকও সেখানে আছে।"

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে ইন্দু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, "তা' জানি। কিন্তু সেখানে আছে, এখানে নেই নাকি ? আজকাল ভাল কথা বল্‌লে যে, তোমার মন্দ হয় দেখ্‌চি! ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে বসে, কবিতা লিখ্‌তে তোমার লজ্জা করেনা ?" বলিয়া সে চোখ মুখ রাঙা করিয়া, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ!

* * *

"অ্যাঁ—এ যে বৌ! কখন্ এলে ?"

"পরশু দুপুর বেলা।"

"পরশু—দুপুর বেলা! তাই এত তাড়াতাড়ি আজ সন্ধ্যা বেলায় দেখা দিতে এসেচ ? না ভাই বৌ, টান্‌টা একটু কম কোরো।"

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "চিঠি লিখে জবাব পর্য্যন্ত পাইনে। আমি একা আর কত টান্‌ব ঠাকুরঝি ?"

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জবাব পাওনি ?"

"সে না পাওয়াই। চার পাতার জবাব চার ছত্র ত ?"

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তখন এতটুকু সময় ছিল না ভাই। এ ঘরে দাদা যদি বা একটু সারলেন, ওদিকে আমার নতুন ভাড়াটে যায় যায়।"

ইন্দু কথাটার একবর্ণও বুঝিলনা। হাঁ করিয়া, চাহিয়া রহিল।

বিমলা সেদিকে মনোযোগ না করিয়া, বলিতে লাগিল, সেই মঙ্গলবারটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সাত দিনের দিন খবর পেয়ে দাদাকে নিয়ে এলুম, তার দু'দিন পরে দাদার বুকের ব্যথার যেমন বাড়াবাড়ি, অম্বিক-বাবুর অসুখটাও তেম্‌নি বেড়ে উঠ্‌ল—তোমাকে বল্‌ব কি বৌ, সেক দিতে দিতে আর ফোমেণ্ট করতে করতে, বাড়ী-শুদ্ধ লোকের হাতের চাম্‌ড়া উঠে গেল—সারা দিন-রাত কারু নাওয়া-খাওয়া পর্য্যন্ত হ'লনা। হাঁ, সতী-সাধ্বী বলি, ওই অম্বিক বাবুর স্ত্রীকে! ছেলে মানুষ বৌ, কিন্তু কি যত্ন, কি স্বামি-সেবা! তার পুণ্যেই এযাত্রা তিনি রক্ষে পেয়ে গেলেন—নইলে ডাক্তার-বদ্যির সাধ্য ছিল না।"

"অম্বিক-বাবু কে?"

"কি জানি, ঘাটালের কাছে কোথায় বাড়ী! চিকিৎসার জন্যে এখানে এসে আমাদের ঐ পাশের বাড়ীটা ভাড়া নিয়েচেন। লোকজন নেই—পয়সা-কড়িও নেই—শুধু বৌটি—"

ইন্দু মাঝখানেই প্রশ্ন করিল—"তোমার দাদার বুঝি খুব বেড়েছিল?"

বিমলা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"সে রাতে আমার ত সত্যিই ভয় হয়েছিল। ঐ তাকের ওপর ওষুদের খালি শিশিগুলো চেয়ে দেখনা—তিন জন ডাক্তার—আর—আচ্ছা, বৌ, দাদা বুঝি এসব কথা তোমাকে চিঠিতে লেখেন নি?"

ইন্দু অন্যমনস্কের মত কহিল—"না।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, এখানে "এসে বুঝি শুন্‌লে?"

ইন্দু তেম্‌নিভাবে জবাব দিল—"হাঁ।"

বিমলা বলিতে লাগিল, "আমি ত তোমাকে প্রথমদিনেই টেলিগ্রাফ কর্‌তে চেয়েছিলুম; মাত্র দু'তিন ঘণ্টার পথ সচ্ছন্দে আস্‌তে পারতে কিন্তু দাদা কিছুতে দিলেন না।" হাসিয়া কহিল, "কি যে তাঁকে, তুমি করেচ, তা তুমিই জান বৌ, কিন্তু পাছে অসুস্থ শরীরে তুমি ব্যস্ত হও, এই ভয়ে কোন মতেই খবর দিতে চাইলেন না। যাক্‌—ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল হয়ে গেছে—নইলে—"

"নইলে আর কি হ'ত ঠাকুরঝি? অসুখ সারতেও আমাকে দরকার হয়নি—না সারলেও হয়ত দরকার হ'ত না" বলিয়া, ইন্দু উঠিয়া গিয়া, ঔষধের শূন্য এবং অৰ্দ্ধশূন্য শিশিগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া, লেবেলের লেখা পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু একি হইল? কখনও যাহা হয় নাই—আজ অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ অশ্রুজলে ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। কেন, সে কি কেহ নয় যে, এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ, তাহাকে জানানো পৰ্য্যন্ত হইল না! সে নিজের এমন কি পীড়ার কথা লিখিয়াছিল, যাহাতে সংবাদ দেওয়াটাও কেহ উচিত মনে করিলেন না!

তিনি ভাল হইয়াও ত কতগুলা পত্রে কত কথা লিখিলেন, শুধু নিজের কথাটাই বলিতে ভুলিলেন? বেশ, এখানে আসিয়াও ত তিন দিন হইল, তবু কি মনে পড়িল না?

ইন্দুর তীব্র অভিমানের সুর বিমলা টের পাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শিশি-বোতল নাড়া চাড়া করে আর কি হবে বৌ, ওরা কখনও মিথ্যে সাক্ষী দেবেনা, তা' যতই জেরা কর না। এস তোমার চা দেওয়া হয়েচে।"

'চল' বলিয়া ইন্দু অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া, তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে, বিমলা কি জানি ইচ্ছা করিয়া, আঘাত দিল কি না কহিল, "সে এক হাসির কথা বৌ। এক বাড়ীতে দুই রোগী—কিন্তু দুজনের কি আশ্চর্য্য ভিন্ন ব্যবস্থা! দাদা মর মর হয়েও তোমাকে খবর দিতে দিলেন না, পাছে ব্যস্ত হও—পাছে তোমার শরীর খারাপ হয়—আর অম্বিক-বাবু একদণ্ডও ওঁর স্ত্রীকে সুমুখ থেকে নড়তে দিলেন না। তাঁর ভয়, সে চোখের সুমুখ থেকে গেলেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে! এমন কি, সে ছাড়া তিনি কারও হাতে বিশ্বেস করে ওষুদ পর্য্যন্ত খেতেন না—এমন কখনও শুনেচ বৌ? আমাদের এঁকে তোমরা সবাই তামাসা করো কিন্তু অম্বিক বাবুরা সকলকে ডিঙিয়ে গেছেন; খেটে খেটে এই মেয়েটির ঠিক মড়ার মত আকৃতি হয়েচে।"

ইন্দু 'হুঁ' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আর একদিন এসে তোমার সতী-সাধ্বী বৌটির সঙ্গে আলাপ করে যাব—আজ গাড়ী এসেচে, চল্লুম।"

"তাহলে কাল একবার এসো। আলাপ করে, বাস্তবিক সুখী হবে।"

"দেখা যাবে যদি কিছু শিখ্‌তে পারি"—বলিয়া ইন্দু মুখ ভার করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অম্বিকবাবুর পাগলামি তাঁহার মনের মধ্যে আজ সমস্ত পথটা তাহার স্বামীর গম্ভীর মঙ্গলেচ্ছার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া, লজ্জা দিতে দিতে, চলিল।

(৫)

দিন-দুই পরে কথায় কথায় ইন্দু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "যদি সত্যি কথা শুন্‌লে রাগ না কর, তা'হলে বলি ঠাকুরঝি, বিয়ে করা তোমার দাদারও উচিত হয়নি, এই অম্বিকবাবুরও হয়নি।" বিমলা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"কারণ, প্রতিপালন কর্‌বার ক্ষমতা না থাকলে, এটা মহাপাপ।" উত্তর শুনিয়া, বিমলা মর্ম্মাহত হইল। ইন্দুকে সে ভালবাসিত। খানিক পরে কহিল, অম্বিকবাবুর অন্যায় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে, তাঁর স্ত্রী নিজের কর্ত্তব্য কর্‌বে না? তাকে ত মরণ পর্য্যন্ত স্বামি-সেবা কর্‌তে হবে।"

"কেন হবে? তিনি অন্যায় করবেন, যাতে অধিকার নেই, তাই করবেন,—তার ফলভোগ কোর্‌ব আমরা? তুমি ইংরিজি পড়নি, আর পাঁচটা সভ্যসমাজের খবর রাখ না; নইলে বুঝিয়ে দিতে পারতুম, কর্ত্তব্য শুধু একদিকে থাকে না। হয় দুদিকে থাক্‌বে, না হয়, থাক্‌বে না। পুরুষেরা এ কথা আমাদের বুঝ্‌তে দেয় না;—দেয় না বলেই আমরা অম্বিকবাবুর স্ত্রীর মত মৃত্যুপণ করে সেবা করি।"

বিমলা মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "না হলে কর্‌তাম্ না! বৌ, সেবা করাটা কি স্ত্রীর বড় দুঃখের কাজ বলে মনে কর? অম্বিকবাবুর স্ত্রীর বাইরের ক্লেশটাই দেখতে পাও, তার ভেতরের আনন্দটা জান্‌তে পাও কি?"

"আমি জান্‌তেও চাইনে।"

"স্বামীর ভালবাসাটাও বোধ করি, জান্‌তে চাও না!"

"না ঠাকুরঝি—অরুচি হয়ে গেছে। বরং, ওটা কম করে নিজের কর্ত্তব্যটা কর্‌লেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

বিমলা দাঁড়াইয়া ছিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ঠিক এই কথাটা আগেও একবার বলেচ। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি, এখনো বুঝতে পারলুম না;—আমার দাদা তাঁর কর্ত্তব্য করেন না! কি সে, তা' তুমিই জানো! অনেক বই পড়েচ, অনেক দেশের খবর জান—তোমার সঙ্গে তর্ক করা সাজে না। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, স্বামী ন্যায়-অন্যায় যাই করুন, তাঁর ভালবাসা অগ্রাহ্য কর্‌বার স্পর্দ্ধা কোনদেশের স্ত্রীরই নেই। আমার ত মনে হয়, ও-জিনিস্ হারাণোর চেয়ে মরণ ভালো;—তার পরেও বেঁচে থাকা শুধু বিড়ম্বনা।"

"আমি তা' মানিনে।"

"মানো নিশ্চয়ই", বলিয়া বিমলা হাসিয়া ফেলিল। তাহার সহসা মনে হইল, এ সমস্তই পরিহাস। সত্যই ত। পরিহাস ভিন্ন নারীর মুখে ইহা আর কি হইতে পারে! কহিল, "কিন্তু, তাও বলি বৌ, আমার কাছে যা' মুখে আসে বোল্‌চ, কিন্তু দাদার সাম্‌নে এসব নিয়ে বেশি চালাকি কোরোনা। কেননা, পুরুষ মানুষ, যতই বুদ্ধিমান্ হোন্, অনেক সময়ে—"

"কি—অনেক সময়ে?"

"তামাসা, কি না, ধর্‌তে পারেনা।"

"সে তাঁর কাজ। আমি তা নিয়ে দুর্ভাবনা করিনে।"

"কিন্তু, আমি যে, না ভেবে থাক্‌তে পারিনে বৌ।"

ইন্দু জোর করিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন বলত?"

বিমলা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, "রাগ কোরোনা বৌ; কিন্তু সেই অসুখের সময় আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, দাদা যে তোমাকে পাবার জন্যে একসময়ে পাগল হয়ে উঠেছিলেন, সেই যে কি-বলে 'পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে বুক পেতে দেওয়া'—কিন্তু, সে-ভাব আর বুঝি নেই।"

হঠাৎ ইন্দুর সমস্ত মুখের উপর কে যেন কালি লেপিয়া দিল। তার পরে, সে জোর করিয়া শুক্‌নো হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল—"তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ ঠাকুরঝি, তোমার দাদাকে বোলো আমি ভ্রূক্ষেপও করিনে। আর তুমিও ভালকরে বুঝো, আমার নিজের ভাল-মন্দ নিজেই সামলাতে জানি। তা' নিয়ে পরের মাথা-গরম করাটাও আমি আবশ্যক মনে করিনে।"

* * * * *

ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু স্বামীর ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন

করিল—"আমি মেদিনীপুরে গেলে তোমার ব্যামো হয়েছিল ?"

নরেন্দ্র খাতা হইতে মুখ তুলিয়া, ধীরে ধীরে বলিল—"না ব্যামো নয়—সেই ব্যথাটা।"

"খরচ বাঁচাবার জন্যে, ঠাকুরঝির ওখানে গিয়ে পড়েছিলে ?"

স্ত্রীর এই অত্যন্ত কটু ইঙ্গিতে নরেন্দ্র খাতাটার উপর পুনর্ব্বার ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, মৃদু কণ্ঠে বলিল, "বিমল এসে নিয়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু, আমি শুনতে পেলে বলে দিতুম, অক্ষমদের জন্যই হাঁসপাতাল সৃষ্টি হয়েচে। পরের ঘাড়ে না চড়ে, সেইখানে যাওয়াই তাদের উচিত।"

নরেন্দ্র আর মুখ তুলিল না—একটি কথাও কহিল না।

ইন্দু টান মারিয়া পর্দ্দাটা সরাইয়া বাহির হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিয়া, একটা ক্ষুদ্র টিপাই ফুলদানি-সমেত উল্টাইয়া পড়িল ; সে ফিরিয়াও চাহিল না।

মিনিট পাঁচেক পরে, তেমনি সজোরে পর্দ্দা সরাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ঠাকুরঝি খবর দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মানা করেছিলে কি জন্যে ? ভেবেছিলে বুঝি আমি এসে ওষুদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেব ?"

নরেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই বলিল, "না তা ভাবিনি। তোমার শরীর ভাল ছিলনা—"

"ভালই ছিল। যদিও খবর পেলেও আমি আসতুম না সে নিশ্চয়। কিন্তু, আমি সেখানে যে রোগে মরে যাচ্ছিলাম, একথাও তোমাকে চিঠিতে লিখিনি। অনর্থক কতকগুলো মিছে কথা বলে,ঠাকুরঝিকে নিষেধ করবার হেতু ছিল না।"—বলিয়া সে যেমন্ করিয়া আসিয়াছিল, তেম্‌নি করিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্রও তেম্‌নি করিয়া খাতাটার পানে ঝুঁকিয়া রহিল—কিন্তু সমস্ত লেখা তাহার লেপিয়া মুছিয়া, চোখের সুমুখে একাকার হইয়া রহিল।

* * * * *

ইন্দু পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারকে কহিল, "আপনিই গগনবাবুর বাড়ীতে আমার স্বামীর চিকিৎসা করেছিলেন ?" বুড়া-ডাক্তার চোখ তুলিয়া, ইন্দুর উদ্বেগ-মলিন্ মুখখানির পানে চাহিয়া, ঘাড়-নাড়িয়া সায় দিলেন।

ইন্দু কহিল, "কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। এই আপনার ফি'র টাকা—আজ একবার ওবেলা যদি দয়া করে, বন্ধুভাবে এসে, তাঁকে দেখে যান, বড় উপকার হয়।"

ডাক্তার কিছু বিস্মিত হইলেন। ইন্দু বুঝিয়া কহিল, "ওঁর স্বভাব, চিকিৎসা করতে চান-না। ওষুদের প্রেস্‌ক্রিপ-সানটা আমাকে লুকিয়ে দেবেন। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন।"

ডাক্তার সম্মত হইয়া বিদায় হইলেন।

রামটহল আসিয়া সংবাদ দিল—"মাজী, বল্লভ স্যাকরা এসেচে।"

"এসেচে ? এদিকে ডেকে আন।"

"ও বল্লভ, একটু কাজের জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে-ছিলুম, তুমি আমাদের বিশ্বাসী লোক—এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রী করে দিতে হবে। বড় পুরোণো ধরণের চুড়ি বাপু, আর পরা যায় না। এর দামে নতুন এক জোড়া কিন্‌ব মনে কচ্চি।"

"বেশত, মা। বিক্রী করে দেব।"

"নিক্তি এনেচ ত ? ওজন করে দেখ দেখি কত আছে ?—দাম্‌টা কিন্তু বাপু আমাকে কালই দিতে হবে। আমার দেরী হলে চল্‌বে না।"

"তাই দেব।"

বল্লভ চুড়ি হাতে করিয়া বলিল, "এ যে একেবারে টাট্‌কা জিনিস মা। বেচ্‌লেই ত কিছু লোকসান হবে।"

"তা' হোক্ বল্লভ। এর গড়নটা আমার মনে ধরে না। আর দেখ, এসম্বন্ধে বাবুকে কোনো কথা বোলো না।"

বাবুদের লুকাইয়া অলঙ্কার বেচা-কেনার ইতিহাস বল্লভের অবিদিত ছিল না। সে একটু হাসিয়া চুড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

(৬)

"ডাক্তার বাবু, ৫।৭ শিশি ওষুদ খেলেন, কিন্তু বুকের ব্যথাটা ত গেল না।"

"গেল না ? কৈ তিনি ত কিছু বলেন না।"

"জানেন ত, ঐ তাঁর স্বভাব ; কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, একটু ব্যথা লেগেই আছে—তা ছাড়া, শরীর ত সারচে-না ?"

ডাক্তার চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দেখুন, আমারও সন্দেহ হয়, শুধু ওষুদে কিছু হবেনা। একবার জল-হাওয়া পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

"তাই কেন তাঁকে বলেন না ?"

"বলেছিলাম একদিন। তিনি কিন্তু প্রয়োজন মনে করেন না।"

ইন্দু রুষ্ট হইয়া বলিয়া ফেলিল,—"তিনি মনে না কর্‌লেই হবে ? আপনি ডাক্তার, আপনি যা' বল্‌বেন, তাইত হওয়া চাই।"

বৃদ্ধ চিকিৎসক একটুখানি হাসিলেন।

ইন্দু নিজের কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল, "দেখুন, আমি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েচি। আপনি ওঁকে খুব ভয় দেখিয়ে দিন।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "এসকল রোগে ভয় ত আছেই।" ইন্দুর মুখ পাংশু হইয়া গেল; কহিল, "সত্যি ভয় আছে ?"

তাহার মুখের পানে চাহিয়া, ডাক্তার সহসা জবাব দিতে পারিল না।

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল; বলিল, "আমি আপনার মেয়ের মত ডাক্তারবাবু; আমাকে লুকোবেন না। কি হয়েচে, আমাকে খুলে বলুন।"

ঠিক যে কি হইয়াছে, তাহা ডাক্তার নিজেও জানিতেন না। তিনি নানা রকম করিয়া যাহা কহিলেন, তাহাতে ইন্দুর ভয় ঘুচিল না। সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকাল বেলা নরেন্দ্র হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া, খোলা জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল; ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। নরেন্দ্র একবার মুখ ফিরাইয়া, আবার সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে ইন্দু টাকা চাহে নাই; আজ সে-যে কিজন্য আসিয়া বসিল, তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া, তাহার বুকের ভিতরটায় ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

ইন্দু টাকা চাহিল না; কহিল,"ডাক্তারবাবু বলেন,ব্যথাটা যখন ওষুধে যাচ্চেনা, তখন হাওয়া বদলানো দরকার। একবার কেন বেড়াতে যাও না।"

নরেন্দ্র বাস্তবিক চমকিয়া উঠিল! বহুদিন-অজ্ঞাত বড়-স্নেহের ধন, যেন কোথায় লুকাইয়া তাহাকে ডাক দিল। ইন্দুর এই কণ্ঠস্বর, সে-ত ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই মুখ ফিরাইয়া, হতবুদ্ধির মত চাহিয়া, ক্ষণকালের জন্য যেন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

ইন্দু কহিল, "কি বল ? তা'হলে, কালই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। বেশীদূরে কাজ নেই—এই বদ্দিনাথের কাছে টাছে—আমরা দু'জন, কমলা আর ঝি—রামটহল পুরোণো বিশ্বাসীলোক, বাড়ীতেই থাক্। সেখানে একটা ছোটবাড়ী নিলেই হবে। তা' হলে, আজথেকেই গুছোতে আরম্ভ করুক না কেন ?"

কোনপ্রকার খরচের কথাতেই নরেন্দ্র ভয় পাইত। এই একটা বড় রকমের ইঙ্গিতে তাহার মেজাজ একেবারে বিগ্‌ড়াইয়া গেল। প্রশ্ন করিল, "এই ডাক্তারটিকে এখানে আস্‌তে বল্‌লে কে ?"

ইন্দু জবাব দিবার পূর্ব্বেই সে পুনরায় কহিল, "বিমলকে বোলো, আমার পিছনে ডাক্তার লাগিয়ে উত্ত্যক্ত কর্‌বার্ আবশ্যক নেই;—আমি ভাল আছি।"

বিমলা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ডাক্তার পাঠাইতেছে,—বিমলাই সব!—ইন্দু অন্তরে আঘাত পাইল। কিন্তু চাপা দিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি ত সত্যিই ভাল নেই। ব্যথাটা ত সারেনি।"

"সেরেচে।"

"তা'হলেও শরীর সারেনি—বেশ্ দেখ্‌তে পাচ্চি। একবার ঘুরে এলে, আর-যাই-হোক্—মন্দ কিছুত হবে না।"

নরেন্দ্র ভিতরে-বাহিরে এমন যায়গায় উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে সহ্য করিবার ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তবুও ধাক্কা সাম্‌লাইয়া বলিল,—"আমার ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য নেই।" ইন্দু জিদ্ করিয়া বলিল—"সে হবে না। প্রাণটা ত বাঁচানো চাই।"

এই জিদটা ইন্দুর পক্ষে এতই নূতন, যে নরেন্দ্র সম্পূর্ণ ভুল করিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল, তাহাকে ক্লেশ দিবার ইহা একটা অভিনব কৌশল মাত্র। এতদিনের ধৈর্য্যের বাঁধন, তাহার নিমেষে ছিন্ন হইয়া গেল। চেঁচাইয়া উঠিল,—"কে বল্‌লে প্রাণ বাঁচানো চাই? না চাইনা—একশ'বার চাই না। তোমার পায়ে পড়ি ইন্দু, আমাকে রেহাই দাও,—আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

স্বামীর কাছে কটুকথা-শোনা ইন্দু কল্পনা করিতেও পারিত না। সে কেমন যেন জড়-সড় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু, নগেন্দ্র জানিতে পারিল না; বলিতে লাগিল, "তুমি ঠিক জানো, আমি কি সঙ্কটের মাঝখানে দিনকাটাচ্চি। সমস্ত জেনে-শুনেও আমাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্যেই অহর্নিশি খোঁচাচ্চ। কেন, কি করেচি তোমার? কি চাও তুমি?"

ইন্দু ভয়ে বিবর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চেঁচাচেঁচি—উত্তেজনা নরেন্দ্রের পক্ষে যে কিরূপ অস্বাভাবিক, তাহা এইবার সে নিজেই টের পাইল। কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, "বেশ, স্বীকার করলুম, আমার হাওয়া বদলানো আবশ্যক, কিন্তু কি করে যাব? কোথায় টাকা পাব? সংসার-খরচ যোগাতেই যে আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্চে।"

ইন্দু নিজে কোনদিন ধৈর্য্য শিক্ষা করে নাই; অবনত হইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। আজ কিন্তু সে ভয় পাইয়াছিল। নম্রকণ্ঠে কহিল, "টাকা নেই বটে, কিন্তু অনেক টাকার গয়না ত' আমাদের আছে—"

"আছে; কিন্তু আমাদের নেই—তোমার আছে। তোমার বাবা দিয়েচেন—তোমাকে। আমার তাতে এক-বিন্দুও অধিকার নেই,—একথা আমার চেয়ে, তুমি নিজেই ঢের বেশী জান।"

"বেশ, তা না নাও—আমি নগদ টাকা দিচ্চি।"

"কোথায় পেলে? সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়েচ?"

ইহা চুড়িবিক্রীর টাকা। ইন্দু সহজে মিথ্যা কহিতে পারিত না। ইহাতে তাহার বড় অপমান বোধ হইত। আজ কিন্তু সে মিথ্যা বলিতে স্বীকার করিয়া ফেলিল। নরেন্দ্রের মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন হইল। ধীরে ধীরে বলিল, "তা'হলে রেখে দাও, গয়না গড়িয়ো। আমার বুকের অনেক রক্ত জল করে যা জমা হয়েচে, তা এভাবে নষ্ট হতে পারে না। ইন্দু, কখনো তোমাকে কটুকথা বলিনি, চিরদিন শুনেই আস্‌চি। কিন্তু, তুমি-না সেদিন দম্ভ করে বলেছিলে, কখনও মিথ্যে বল না? ছিঃ—"

কমলা পর্দ্দা ফাঁক করিয়া ডাকিল, "মা, পিসিমা এসেচেন।" "কি হচ্চে গো, বৌ?" বলিয়া বিমলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু, মেয়েকে আনিয়া, তাহার গলার হারটা দুইহাতে সজোরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, স্বামীর মুখের সাম্‌নে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—"মিথ্যে বল্‌তে আমি জান্‌তাম না—তোমার কাছেই শিখেচি। তবুও এখনো পেতলকে সোণা বলে চালাতে শিখিনি। যে স্ত্রীকে ঠকায়, নিজের মেয়েকে ঠকায়, তার আর কি বাকী থাকে? সে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে কি করে?"

নরেন্দ্র ছিন্ন হারটা তুলিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "কি করে জান্‌লে পেতল? যাচাই করিয়েচ?"

"তোমার বোনকে যাচাই করে দেখ্‌তে বল।" বলিয়া সে দুইচোখ রাঙা করিয়া বিমলার দিকে চাহিল।

বিমলা দু'পা পিছাইয়া গিয়া বলিল, "ও কাজ আমার নয় বৌ। আমি এত ইতর নই, যে দাদার দেওয়া গয়না স্যাক্‌রা ডেকে যাচাই করে দেখ্‌ব।"

নরেন্দ্র কহিল, "ইন্দু, তোমাকেও দু'একখানা গয়না দিয়েচি, সেগুলো যাচাই করে দেখেচ?"

"দেখিনি, কিন্তু এবার দেখ্‌তে হবে।"

"দেখো সেগুলো পেতল নয়"। ভগিনীর মুখের পানে চাহিয়া হারটা দেখাইয়া কহিল, "এটা সোণা নয় বোন্ পেতলই বটে। যে দুঃখে বাপ হয়ে ঐ একটি মেয়ের জন্ম-দিনে তাকে ঠকিয়েচি, সে তুই বুঝ্‌বি। তবুও, মেয়েকে ঠকাতে পেরেচি, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ঠকাতে সাহস করিনি।"

(৭)

"কথা শোন বৌ; একবার পায়ে হাত দিয়ে তাঁর ক্ষমা চাওগে।"

"কেন, কি দুঃখে? আমার মাথা কেটে ফেল্‌লেও আমি তা পারবনা ঠাকুরঝি।" "কেন পারবে না? স্বামীর পায়ে হাত দিতে লজ্জা কি? বেশ ত, তোমার দোষ না হয় নেই,—কিন্তু তাঁকে প্রসন্ন করা যে সকল কাজের বড়।"

"না—আমার তা নয়। ভগবানের কাছে খাঁটি থাকাই আমার সকল কাজের বড়। যতক্ষণ সে অপরাধ না কর্‌চি, ততক্ষণ আর কিছুই ভয় করিনে।"

বিমলা রাগিয়া বলিল, "বৌ, এসব পাকামির কথা আমরাও জানি,—কিন্তু তখন কিছুই কোন কাজে আস্‌বে না, বলে দিচ্চি। চোখ্ বুজে বিপদ এড়ানো যায় না।—দাদা সত্যই তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠচেন।"

বলিল, "আমার নাটক-নভেল পড়তে ইচ্ছেও করে না, ভালও লাগে না। যাহোক্, ভাল হয়েচে শুনে সুখী হলুম।" অম্বিকবাবুর চাকর আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"বাবু জিজ্ঞেসা কচ্চেন, আজ তাঁর যে যাদুঘর দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল—যাবেন ?" এই বধূটি সকলের চেয়ে ছোট; সে লজ্জা পাইয়া, ঘাড়হেঁট করিয়া, মৃদুস্বরে কহিল,—"না, তাঁর শরীর এখনো তেমন সারেনি—আজ যেতে হবেনা।" চাকর চলিয়া গেল, ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এমন আশ্চর্য্য কথা সে জীবনেও শোনে নাই।

ভোলা আসিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু আপীস থেকে জান্‌তে লোক পাঠিয়েছেন—একটা বড় আল্‌মারি-দেরাজ নিলাম হচ্চে। বড় ঘরের জন্যে কেনা হবে কি ?"

বিমলা কহিল,—"না, কিন্‌তে মানা করে দে। একটা ছোট বুক-কেস্ হলেই ওঘরের হবে।"

ভোলা চলিয়া গেল। ইন্দু, মহাবিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাঁহাদের প্রশ্নগুলাতেও সে বেশী প্রভুত্ব দেখিতে পাইল না; ইঁহাদের আদেশগুলাও তাহার কাছে ঠিক দাসীদের মত শুনাইল না। অথচ, তাহার নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি করিয়া যেন ইহাদের কাছে সে একেবারে ছোটো হইয়া গিয়াছে!

যাইবার সময় বিমলা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ, সত্যি কি তুমি দাদার এই বইটার কথা জান্‌তে না ?"

ইন্দু তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—"না;—আমার ওজন্যে মাথাবাথা করে না। সারাদিন বসেই ত লিখ্‌চে—কে অত খোঁজ করে বল ?—ভাল কথা, ঠাকুরঝি, কাল বাপের বাড়ী যাচ্চি।"

বিমলা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "না, বৌ যেয়োনা।"

"কেন ?"

"কেন, সে কি বুঝিয়ে বল্‌তে হবে বৌ ? দাদা তোমাকে তাঁর দুঃখের সুখের কোনো ভারই দেন না—তাওকি চোখে দেখ্‌তে পাও না ? স্বামীর ভালবাসা হারাচ্চ—তাওকি টের পাও না ?"

ইন্দু হঠাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, "অনেকবার বলেচি, তোমাকে আমি চাইনে—চাইনে—চাইনে। আমি দাদার ওখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌ব; ইনি আর যেন আমাকে আন্‌তে না যান,—আর যেন জ্বালাতন না করেন।"

এবার বিমলাও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল,"এসব বড়াই পুরুষ মানুষের কাছে কোরো বৌ, আমি ত মেয়ে মানুষ, আমার কাছে কোরো না। তোমার বাপেরা বড়লোক, তোমার সংস্থান তাঁরা করে দিয়েছেন,—এই ত তোমার অহঙ্কার ? এখন যাচ্ছ যাও; কিন্তু, একদিন হুঁস হবে, যা' হারালে তার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীটাও ছোট। বৌ, যা' তুমি পেয়েছিলে, কম মেয়ে মানুষেই তা' পায়—সে জানি, কিন্তু যে অপব্যয় তুমি করলে, তাতে অক্ষয়ও ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। বোধ করি, গেলও তাই।"

সেই বইখানা বিমলার হাতেই ছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ইন্দুর বুকের ভিতরটা আর একবার হুহু করিয়া উঠিল। বলিল, "অহঙ্কার করবার থাক্‌লেই লোকে করে। কিন্তু, আমার সর্ব্বনাশ হয় হবে, যায় যাবে, সে জন্যে, ঠাকুরঝি, তুমিই বা মাথা গরম কর কেন, আর আমিই বা যা-তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি কেন ? আমার থাক্‌তে ইচ্ছে নেই,—থাক্‌ব না। এতে যা হয় তা হবে—কারু পরামর্শ নিতেও চাইনে, ঝগড়া করতেও চাইনে।"

বিমলা মৌন হইয়া রহিল। তাহার ব্যথা অন্তর্য্যামী জানিলেন, কিন্তু, এ অপমানের পরে আর তর্ক করিল না।

ইন্দু অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই কহিল, "দাঁড়াও ত বৌ, তুমি সম্পর্কে বড়—একটা প্রণাম করি।"

(৯)

সেদিন সন্ধ্যা না হইতেই সমস্ত আকাশ কাঁপিয়া মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ইন্দু মেয়ে লইয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ তাহার ছোট ভগিনীপতি আসিয়াছিলেন, পাশের ঘর হইতে তাঁহাকে খাওয়ানো দাওয়ানো গল্পগুজবের অস্ফুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ততই কিসের অব্যক্ত লজ্জায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

তিন মাস হইতে চলিল, সে মেদিনীপুরে আসিয়াছে। ছোট-ভগিনীও আসিয়াছে। তাহার স্বামী এই দুই মাসের মধ্যেই শান্তিপুর হইতে অন্ততঃ পাঁচ ছয়বার আসা যাওয়া

সাঁঝের প্রদীপ

চিত্র শিল্পী—শ্রীলালমোহন ঘোষ]

করিলেন কিন্তু, নরেন্দ্র একটিবারও আসিলেন না, একখানা চিঠি লিখিয়াও খোঁজ করিলেন না।

কিছুদিন হইতে ব্যাপারটার উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং প্রায়ই আলোচনা হইতেছে। ছোট-ভগিনী-পতির ঘরে সকলের সম্মুখে পাছে এই কথাটাই উঠিয়া পড়ে, এই ভয়েই ইন্দু অসময়ে পলাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী আসেন না। তাঁহার অবহেলায় বেদনা কত, সে ইন্দুর নিজের কথা—সে যাক্। কিন্তু, ইহাতে এত যে ভয়ানক লজ্জা, একথা সে ত একদিনও কল্পনা করে নাই। ভ্রূণহত্যা, নরহত্যার মত এ যে কেবলই লুকাইয়া ফিরিতে হয়! মরিয়া গেলেও যে কাহারো কাছে স্বীকার করা যায় না, স্বামী ভালবাসেন না!

এতদিন স্বামীর ঘরে, স্বামীর পাশে বসিয়া তাঁহাকে পিটিয়া পিটিয়া নিজের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা বাড়াইয়া তুলিতেই অহরহ ব্যস্ত ছিল, কিন্তু, এখন পরের ঘরে, চোখের আড়ালে সমস্তই যে ভাঙিয়া ধসিয়া পড়িতেছে—কি করিয়া সে খাড়া করিয়া রাখিবে?

আজ ভগিনীপতি আসার পর হইতে যে কেহ তাহার পানে চাহিয়াছে, তাহার মনে হইয়াছে, তাহাকে করুণা করিতেছে! কমলাকে কেহ তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দু মরমে মরিয়া যায়, বাড়ী ফিরিবার প্রশ্ন করিলে, লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া যায়!

অথচ, আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে সে অনেকগুলা মর্ম্মান্তিক কথায় বলিয়া আসিয়াছিল—প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা হইলে যেন লইয়া আসে!

হঠাৎ ইন্দুর মোহের ঘোর কাটিয়া গেল—"কমল, কাঁদ্‌চিস্ কেন মা?"

কমলা রুদ্ধস্বরে বলিল, "বাবার জন্যে মন কেমন কচ্চে।" ইন্দুর বুকের উপর যেন পাহাড় ভাঙিয়া পড়িল। মেয়েকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, ইন্দু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাহিরের বারিবর্ষণ তাহার লজ্জা রক্ষা করিল—কন্যা ছাড়া এ কাহিনী আর কেহ জানিল না।

তাহার জননী শিখাইয়া দিলেন কি না জানি না, পরদিন সকাল হইতেই কমলা পিতার কাছে যাইবার জন্য বায়না ধরিল। ইন্দু অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, শেষে দাদাকে আসিয়া কহিল, "কমলা কিছুতেই থামে না—কলিকাতায় যেতে চায়।" দাদা বলিলেন, "থামাবার দরকার কি বোন্, কাল সকালেই তাকে নিয়ে যা। কেমন আছে নরেন? সে আমাকে ত চিঠি পত্র লিখে না, তোকে লেখে ত?"

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—"হুঁ।"

"ভাল আছে ত?"

ইন্দু তেম্‌নি করিয়া জানাইল—আছেন।

* * * * *

বিমলা অবাক হইয়া গেল,—"কখন এলে বৌ?"

"এই আসচি।"

ভৃত্য গাড়ী হইতে ইন্দুর তোরঙ্গ নামাইয়া আনিল। বিমলা দারুণ বিরক্তি কোনমতে চাপিয়া কহিল, "বাড়ী যাওনি?"

"না। শুধু, কমলাকে সুমুখ থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেচি। শুধু তার জন্যেই আসা,—নইলে আসতুম না।"

বিমলা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না এলেই ভাল করতে বৌ। ওখানে তোমার আর গিয়েও কাজ নেই।"

ইন্দুর বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল; "কেন ঠাকুরঝি?" বিমলা সহজ গম্ভীরভাবে কহিল, "পরে শুনো। কাপড় ছাড়, মুখ হাত ধোও—যা' হবার সেত হয়েই গেছে—এখন, আজ শুন্‌লেও যা, দু'দিন পরে শুন্‌লেও তাই।"

ইন্দু বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল—বলিল, "সে হবে না ঠাকুরঝি, না শুনে আমি একবিন্দু জলও মুখে দেব না। তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েচি, তিনি বেঁচে আছেন—তবুও সেখানে আমার গিয়ে কাজ নেই কেন?"

বিমলা খানিক থামিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"সত্যিই ওবাড়ীতে তোমার জায়গা নেই। এখন তোমার পক্ষে এখানেও যা',—বাপের বাড়ীতেও তাই। ওবাড়ীতে তুমি থাকতে পারবে না।"

ইন্দু অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি আর সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, কি হয়েচে খুলে বল। বিয়ে করেচেন?"

"বিশ্বাস হয়?"

"না। কিছুতে না। তিনি অন্যায় কিছুতে কর্‌তে পারেন না। তবুও কেন আমার তাঁর পাশে স্থান নেই

বল্‌বে না?" বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিমলার নিজের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু, অশ্রু ঝরিল না। বলিল, "বৌ, আমি ভেবে পাইনে, কি করে তোমাকে বোঝাব, সেখানে আর তোমার স্থান নেই। শম্ভুবাবু, দাদাকে জেলে দিয়েছিল।"

ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—"তার পরে?" বিমলা বলিল—"আমরা তখন কাশীতে। শম্ভু বাবু টাকা যোগাড় করবার দুদিন সময় দেয়। কিন্তু চার হাজার টাকা যোগাড় হয়ে ওঠে না। ধরে নিয়ে যাবার পরে দাদা ভোলাকে আমার কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দেন কিন্তু আমরা তখন এলাহাবাদে চলে যাই। সে ফিরে আসে, আবার যায়; ঐ রকম করে ১০ দিন দেরী হয়ে যায়। তার পরে আমি এসে পড়ি। আমার কাছেও নগদ টাকা ছিল না, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে, এগার দিনের দিন দাদাকে বার করে নিয়ে আসি। তোমারও ত চার পাঁচ হাজার টাকার গয়না আছে বৌ,—মেদিনীপুরও দূর নয়, তোমাকে খবর দিতে পারলে, এসব কিছুই হতে পারত না। দাদা বরং দশ দিন জেল-ভোগ করিলেন কিন্তু তোমার কাছে হাত পাতলেন না। আর তোমার তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে? অনেক সুখই ত তাঁকে তুমি দিলে, এবার মুক্তি দাও—তিনিও বাঁচুন, তুমিও বাঁচো।"

ইন্দু এক মুহূর্ত্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে একে একে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, বিমলার পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল—"এই দিয়ে তোমার জিনিস উদ্ধার করে এনো ঠাকুরঝি,—আমি তাঁর কাছেই চল্‌লুম। তুমি বল্‌চ স্থান হবেনা,—কিন্তু আমি বল্‌চি, এইবারেই আমার তাঁর পাশে যথার্থ স্থান হবে। যা' এতদিন আমাকে আলাদা করে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে, আমি নিজের স্থান নিতে চল্‌লুম। কাল একবার যেয়ো ভাই,—গিয়ে তোমার দাদা আর বৌকে দেখে এসো—চল্‌লুম" বলিয়া, ইন্দু গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

"ওরে ভোলা সঙ্গে যা" বলিয়া, বিমলা চোখ মুছিয়া, পিছনে পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ছিল

[শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, B. A.]

ছিল ফুল্ল ফুলকুঞ্জ শ্যাম ধরাতল;
ছিল মনোমুগ্ধকর বাঁশরীর তান;
বহিয়া আনিত দূর-বিহগীর গান
রোগশূন্য ধূমশূন্য আকাশ নির্ম্মল।
ছিল প্রেমস্মৃতিভরা যমুনার জল,
ছিল শত কাব্যকলা শাস্ত্রের বিধান।
হৃদয়েতে স্ফূর্ত্তি ছিল দেহে ছিল বল;
ছিল শঙ্কা-দ্বিধা-শূন্য উদার পরাণ,
উদরেতে অন্ন ছিল মুখে ছিল হাসি;
শোকের সান্ত্বনা ছিল স্নেহের পরশ
হৃদয়ের আকর্ষণ বিদ্বেষ-বিনাশী।
ছিল চারিদিকে শান্তি পবিত্র হরষ;
ছিল অবিচলা ভক্তি পবিত্র অন্তর,
শুদ্ধ শান্ত সমাহিত অনন্ত নির্ভর।

পেয়েছি

[শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, B. A.]

পেয়েছি জনতা-পূর্ণ তপ্ত ধরাতল;
শোকে হাহাকারে ডুবে গেছে প্রেমগান;
ভীত, ত্রস্ত বিহগীর অর্দ্ধভগ্ন তান
নাহি বহে ধূমাকুল পবন-মণ্ডল।
পেয়েছি জঠর-জ্বালা, তপ্ত অশ্রুজল
গোপনে নয়ন-কোণে; পেয়েছি বিরাগ
কায়মনোবাক্যে পদ সেবি অবিরল;
ব্যথা-ভার হৃদে দেহে বিলাসের দাগ;
বিলাপের বিনিময়ে পেয়েছি নিয়ত
হৃদিহীন শুষ্ক 'আহা' ভরা উপেখায়;
জীবন-সংগ্রামে সবে ব্যস্ত অবিরত
পড়িয়াছি দূরে দূরে। পেয়েছি বারতা—
কর্ম্মহীন ধরমের শুক-পাখী প্রায়,
নাস্তিকতা চেয়ে হীন ক্ষুদ্র কপটতা।

ভূদেববাবু ও ছেলেদের শিক্ষা

[শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

৺ভূদেব বাবু

বিবাহিত কোনও ব্যক্তি বিবাহের রাত্রির কথা ভুলিয়া যাইতে পারেন! যখন স্ত্রীআচারকালে ছানলা-তলায় বর ও কন্যার মস্তকে কাপড় ঢাকা দিয়া, সমবেত প্রতিবেশবাসী, বন্ধুগণ 'চাহিয়া দেখ—চাহিয়া দেখ' বলিয়া, পীড়াপীড়ি করিতেছেন, যখন বর ও কন্যার অবস্থা

"তয়োরপাঙ্গপ্রতিসারিতানি
ক্রিয়াসমাপত্তিনিবর্ত্তিতানি।
হ্রীমন্ত্রনামানসিরে মনোজ্ঞা-
মন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি॥"

তৎপরে যখন পুরোহিত বরকন্যার হস্তে হস্তবন্ধ করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন ও করাইলেন, তখন—

"আসীদ্বরঃ কণ্টকিতপ্রকোষ্ঠঃ
স্বিন্নাঙ্গুলিঃ সংববৃতে কুমারী
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণিসমাগমেন
সমং বিভক্তেব মনোভবস্য।"

তদনন্তর সপ্তপদী-গমন, কন্যার সীমন্তে সিন্দুর-লেপন ও লাজাহুতিদান। বিবাহ-কার্য্য সমাপ্ত। বিবাহ-রাত্রির ও পরদিন প্রাতের বাসি-বিবাহ কি শুধু একটা করণীয় প্রথা মাত্র! এই দিবস মানবের জীবনে নূতন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। কোথাকার কে দুই জন আসিয়া মিলিত হইল—আর কি জন্য মিলিত হইল? বিবাহ হইলেই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ হয়—প্রণয়-সঞ্চার হইলেই দম্পতির স্বার্থপরতার সংস্কার আরম্ভ হয়। স্বার্থপরতার সংস্কার কি? পরার্থে উহার বিস্তৃতি। যতক্ষণ ঐ বিস্তৃতি হইতে থাকে, ততক্ষণই সংস্কার হইতে থাকে। বিস্তৃতি স্থগিত হইলেই সংস্কারও স্থগিত হয়। যতক্ষণই তোমার স্বার্থ আর কাহার স্বার্থের সহিত সম্মিলিত হইতে যাইতেছে, ততক্ষণই তোমার স্বার্থের সংস্কার হইতেছে;—যখন মিলিয়া গেল—দুই স্বার্থে এক স্বার্থ হইল, তাহার পর আর স্বার্থের বিস্তৃতিও হইল না,—সংস্কারও হইল না। এই জন্যই বলিলাম যে, দম্পতীর প্রণয়ে তাহাদের স্বার্থ-সংস্কারের আরম্ভ হয় মাত্র। দম্পতীর পরস্পর আকর্ষণ এত প্রবল যে, ঐ আকর্ষণ-প্রভাবে দুইটি জীবন অতি অল্প কাল মধ্যেই দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়া, সম্মিলিত এক জীবনের ন্যায় হইয়া উঠে। উহাদের মধ্যে স্বার্থ-পরার্থের বোধ লুপ্ত-প্রায় হয়। অথবা প্রকৃতিভেদে যতদূর লুপ্ত হইবার তাহা হইয়া, ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া পড়ে।

সন্তান জন্মিলে পিতামাতার একীভূত স্বার্থপরতা আবার বিস্তৃত ও সুসংস্কৃত হইতে থাকে। কি করিলে ছেলে ভাল

থাকিবে, কি করিলে সে ভাল হইবে, কেমন উপায় করিতে পারিলে তাহার অবস্থা আপনাদিগের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে, এই সকল চিন্তা আসিয়া, পিতামাতার হৃদয়কে আশ্রয় করে। তাঁহারা আপনাদিগের সুখের দিকে বড় আর দৃষ্টিপাত করেন না—স্বার্থপরতার পুনঃ-সংস্কার হইয়া পরার্থপরতার উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করে। সন্তান পিতামাতার নিরয়ত্রাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রীতিভাজন সন্তান—আলস্য, নিশ্চেষ্টতা, নিরুৎসাহতা, অপ্রযত্ন, অসমীক্ষ্যকারিতা প্রভৃতি নিরয় হইতে পিতামাতাকে বিমুক্ত করে এবং তজ্জন্যই সন্তানকে নরকত্রাতা বলা যায়।

যে দম্পতীর সন্তান না হইল, তাহাদের প্রণয় বর্দ্ধিত, বিস্তৃত ও উচ্চতর সংস্কারপূত হইতে পারে না। নিরপত্যতা এমনই দুর্ভাগ্য যে, কিছুতেই উহার সম্যক্ প্রতিবিধানের সম্ভাবনা নাই। ছেলে হয়ে যাওয়ার চেয়ে ছেলে না হওয়া ভাল, যাহারা বলেন, তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্রীর নিম্নলিখিত বাক্য শুনিয়া (১) কি বলেন? গ্রন্থকর্ত্রী বলেন, "চিরান্ধ হওয়া অপেক্ষা একবার মাত্র সূর্য্যের মুখ দেখিয়া অন্ধ হওয়া ভাল।" টেনিসনও বলেন—

It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

যাহার সন্তান হইয়া যায়, সে অন্যের ছেলেকে পাইলে আপনার করিয়া লইতে পারে। রাজাদিলীপের পুত্র-সন্তান হইলে কবি বলেন—

"তস্যামাত্মানুরাগায়ামাত্মজন্মসমুৎসুকঃ।
বিলম্বিতফলৈঃ কালং স নিনায় মনোরথৈঃ॥"

এখানে সন্তানরূপে আপনারই উৎপত্তির কথা লিখিত হইয়াছে। সন্তানরূপে আপনার উৎপত্তির কথা শ্রুতিতেও আছে, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি।" এখন মানুষের এই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবার হেতু কি?—হুকার বলেন:—

"God alone excepted, who actually everlastingly is, whatsoever He may be, and which hereafter cannot be that which now He is not; all other things besides are somewhat in possibility, which as yet they are not in act. And for this cause there is in all things an appetite or desire, whereby they incline to something which they may be; and when they are it, they shall be perfecter than now they are. All which perfections are contained under the general name of goodness. And because there is not in the world anything where by another may not one way be made perfecter, therefore all things that are, are good. Again, there can be no goodness desired which proceedeth not from God Himself, as from the supreme cause of all things; and every effect doth after a sort contain at least wise resemble the cause from which it proceedeth, all things in the world are said in some sort to seek the highest, and covet more or less the participation of God himself; yet this doth so much appear as it doth in man; because there are as many kinds of perfections which a man seeketh. The first degree of goodness is that general perfection which all things do seek, in desiring continuance of their being. All things therefore coveting as much as may be to be like unto God, in being ever, that which hereunto attain personally doth seek to continue itself another way that is by offspring and propagation." (১)

সাধারণতঃ মানুষ, খুব বিশেষ দুঃখে কষ্টে না পড়িলে, মরিতে চায় না। (২) আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম্ম গ্রন্থে ও পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে যে সব বর্ণনা

(১) পারিবারিক প্রবন্ধ—৭ম সং—১০৫ পৃঃ।

(১) Hooker's Ecclesiastical Polity.

(২) কথামালার 'বৃদ্ধা ও কাঠের বোঝার' গল্প মনে পড়ে। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, বৃদ্ধা কায়মনোবাক্যে যমরাজের শরণাগত—আমায় এ অসহ্য জীবন-যাত্রা হইতে মুক্তি দাও। যমরাজ উপস্থিত—বৃদ্ধা বলিল, কাঠের বোঝাটা মাথায় তুলিয়া দিতে ডাকিয়াছি—মরিবার জন্য নহে।

আছে, তাহাতে এই অমরত্ব লাভ করিবার ইচ্ছার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। রাবণ, বিভীষণ, মধুকৈটভ-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ অমর হইবার জন্য বহুসহস্র-বর্ষ-ব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলেন। তপে তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট দেবতা যখনই বর দিবার জন্য সাধকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনই তাপস 'আমাকে অমর কর' এই বর সর্ব্ব প্রথম ভিক্ষা করিয়াছেন। পার্থিব কোন সৃষ্ট জীবকে অমর করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা অসাধ্য, একথা বলিলে, সাধক এমন এক বর চাহিয়াছেন, যদ্দ্বারা তিনি প্রকাশ্যতঃ অমর না হইয়াও প্রকারান্তরে অমর হইয়াছেন। মধুকৈটভ বর চাহিল—আমার জলে অথবা স্থলে যেন মৃত্যু না হয়। তাহাকে স্বীয় জানূপরি রাখিয়া, ঈশ্বর নিহত করেন। আপনা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট কোনও জীব যেন আমার প্রাণ হরণ করিতে না পারে, এই বর হিরণ্যকশিপুকে দেওয়ায় নারায়ণকে নৃসিংহরূপ গ্রহণ করিয়া, তাহাকে শমন ভবনে লইয়া যাইতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী দধীচিকে দেবকুলের হিতার্থে প্রাণত্যাগ করিয়া, বজ্র-নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার অস্থি দিতে বলায় তিনি কি বলিয়াছিলেন?—

"অপি বৃন্দারকা যূয়ং ন জানীথ শরীরিণাং।
সংস্থায়াং যস্ত্বভিদ্রোহোদুঃসহশ্চেতনাপহঃ॥
জিজীবিষূণাংজীবানা মাত্মাপ্রেষ্ঠ ইহেপ্সিতঃ।
ক উৎসহেত তং দাতুং ভিক্ষমাণায় বিষ্ণবে॥" (১)

ভাগবতে লেখা আছে, দধীচি উক্ত বাক্যগুলি "প্রহসন্নিব" বলিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকে ঐ কথা বেশ গম্ভীর ভাবেই বলে।

মানুষের এইরূপ বাঁচিবার ইচ্ছা ও পুত্র-সন্তান না হইলে, দম্পতি পরার্থপ্রবণ হইতে পারে না দেখিয়া, হিন্দুধর্ম্মোপদেশকগণ ইতর লোকের মনে বংশলোপ হইতে দিতে নাই, এইরূপ ভাব সহজে বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুরও বিশ্বাস ছিল যে, পুত্র ও নিজের আত্মা অভিন্ন। তাই তিনি লিখিয়াছেন, "পার্থিব পরলোক অর্থাৎ সন্তান।" মানবের পাঞ্চভৌতিক দেহ লয়প্রাপ্ত হইলেও তিনি পরবর্ত্তী কালে আপনার সন্তানরূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন। আর এই জন্যই সংসার-আশ্রমীর অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যের চরম ফল তাঁহাদের "আত্মজে" অর্থাৎ সন্তানে বিদ্যমান থাকে। জ্ঞানচর্য্যা, ধর্ম্মচর্য্যা, পতি-পত্নী প্রেম, পিতৃমাতৃ-সেবা, কুটুম্বিতা, জ্ঞাতিত্ব, লৌকিকতা, মিতাহার, মিতাচার, ইন্দ্রিয়-সংযম, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, দাতৃত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সংসারাশ্রমে বিহিতভাব সকলেরই বল সেই সংসার-আশ্রম-সম্ভূত, সেই আশ্রমপালিত সন্তানে দৃষ্ট হয়। এই জন্যই সন্তান ভাল হইলে, পিতামাতার পুণ্য সূচিত হয়, সন্তান মন্দ হইলে পিতামাতার অপুণ্য সূচিত হয়। যাঁহারা পুণ্যবান, তাঁহাদের "পার্থিবপরলোকে" অর্থাৎ সন্তানে, উর্দ্ধ-গতি; যাহারা পুণ্যশালী নহে, তাহাদের পার্থিব-পরলোকে অর্থাৎ সন্তানে, অধোগতি।

আমাদের মনে আশৈশব একটা ধারণা যে, ইহলোকের অপেক্ষা পরকালের সুখের জন্য চেষ্টা করা উচিত। ইহ-জগতের সবই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী; পরকালের সমুদায় স্থায়ী। এই পরকালের মুক্তির জন্য হিন্দুর অসাধারণ শ্রমস্বীকার করিয়া তপশ্চরণ অথবা প্রাণবিসর্জ্জন। কিন্তু পারত্রিক পরকালের মঙ্গলের জন্য যেমন চেষ্টা করা হয়, সেইরূপ "পার্থিব" পরকালের, অর্থাৎ সন্তানের, উন্নতিবিধানও হিন্দু-শাস্ত্রের দৃঢ় আদেশ। হিন্দুশাস্ত্র শুধু সন্তান উৎপাদন করিয়া, তাহাদের "জন্মের হেতু"—এই নাম কিনিবার ঘোরতর বিরোধী। নির্ম্মল স্নিগ্ধকিরণে সমুদায় সমুদ্ভাসিত করিতে পারে, এমন এক পুত্রের জন্ম দিবে, শত কুপুত্রের পিতা হইবে না। যাহাতে পুত্র কুলের কেতু স্বরূপ হয়—যাহাতে পুত্র কুল-প্রদীপ হইয়া উঠে—সে পক্ষে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে, ইহাই আমাদের শাস্ত্রাদেশ। সকলেরই অন্তঃকরণে এই তথ্যটি জাগরূক রাখা আবশ্যক যে, সন্তানদিগকে উৎ-কৃষ্টতর দেহ-মন-সম্পন্ন করিয়া যাইতে না পারিলে, কোনও নরনারীর পারলৌকিক উর্দ্ধগতি সম্পাদিত হইতে পারে না। আর আমাদের শাস্ত্রে বলে—"পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্"—'পুত্রের নিকট হারিব' এই ইচ্ছা করিবে। ছেলেকে ভালবাসি বলিয়া, ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট হারিবে এমন ইচ্ছা বা সন্তান-বাৎসল্য, যেন না হয়। ইহার অর্থ এই—আপনি

---

(১) কাশীরাম লিখিয়াছেন—

"না হ'ল তোমার কার্য্য কিবা মোর দায়।
না বুঝি আদেশ কেন কর দেব রায়॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি শুনহ বিচার।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-দেহ হ'য়েছে আমার॥
বহুপুণ্যে দ্বিজ-তনু পাইনু এবার॥"

যত সদ্‌গুণের ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে পার হও, তাহাতে অণুমাত্র ত্রুটী যেন না হয়। আপনার পুত্রকে সৎপথে চালিত করিয়া, তাহাকে এত উপযুক্ত করিয়া তুলিবে যে, নিজে যেন স্পষ্ট বুঝিতে পার যে—অপক্ষপাতে কেহ দুইজনের তুলনায় সমালোচনা করে ত, যেন সন্তানকে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করে। যেমন রঘু:—

"মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়াগুরৌ।
ফলেন সহকারস্য পুষ্পোদ্গম ইব প্রজাঃ॥"

রঘুর গুণের আধিক্য দেখিয়া প্রজারা তাঁহার পিতার কথা (প্রায়) ভুলিয়া গেল। আমের গুটি ধরিলে—পরে ফল পাকিলে—মুকলের আর আদর থাকে কি?

গ্রীসের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই:—"Every child after birth was exhibited to public view, and if deemed deformed and weakly, and unfit for a future life of labour and hardship and fatigue, was exposed to perish on Mount Taygetus."

সন্তান সমাজমধ্যে দুর্ব্বলতা ও রোগ প্রসারের সহায়তা করিবে—এই আশঙ্কায় সমাজনেতৃগণ ও ব্যবস্থাপকগণ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ভূদেববাবু বলেন:—"পুত্রের শরীর যাহাতে নীরোগ, পটু ও বলিষ্ঠ হয়, তাহা করিতে হইবে। তজ্জন্য সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বকাল হইতে আপনাদিগের শরীর নীরোগ, শুচি এবং কার্য্যক্ষম করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। সুতরাং মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম-চর্চ্চা স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। পিতৃ-মাতৃ শরীরে অপকরস ক্লেদাদি থাকিলে, তাহা সন্তানের শরীরে সংক্রমিত হইয়া তাহাকেও রুগ্নদেহ করে। পিতৃ-মাতৃ শরীর সবল ও শুচি হইলে, তজ্জাত সন্তানের দেহও নীরোগ ও বলশালী হয়।" আমাদের বাঙ্গালীর মেয়েরা ত ব্যায়াম-চর্চ্চা আদৌ করেন না, সর্ব্বদা অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকেন। বসিয়া বসিয়া গল্প-গুজব, আমোদ-আহ্লাদ, তাসখেলা, উলবোনা, হালফেসানে কিছু গান-বাজনা, ইত্যাদি যাহা-হয় কিছু করিতে পারেন। পূর্ব্বে পাকশালায় তাঁহাদের যাহা কিছু অঙ্গসঞ্চালন হইত, এখন তাঁহারা তাহা করিতেও নারাজ—অথবা বাবুগণ তাহা করিতে দিতে চাহেন না। পাকগৃহে আগুনতাপ সহা—বা আহারাদির পর বাসন মাজা, আর তাঁহাদের করিতে হয় না। আর পুরুষেরা, আফিসের কার্য্য করিয়া, ব্যায়ামের অবসর ত পানই না। যে দুই একজন সামান্য অবসর পান, তাঁহারা হয় সঙ্গীত-সমাজে অবসরকালটুকু কাটান, বা সামান্য সায়ংভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করা হইল ভাবিয়া পুলকিত হন। যতটুকু শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা, কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই করেন না। ইহার ফল অতিশয় আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে। অল্পবয়সে যে কত শিশু কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আর কত নূতন-নূতন রোগ যে, আমাদের সমাজে দেখা দিতেছে, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যে সকল বালক বাঁচিয়া স্কুল-কলেজে যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ খর্ব্বাকৃতি, রুগ্নদেহ, চশমাবৃত-চক্ষু, হীনবীর্য্য ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। জীবনসংগ্রাম দিন দিন আরও কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়াই দূরদর্শী ভূদেববাবু লিখিয়াছেন;—"আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানগণকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে হইবে। আপনারা সুস্থশরীর না হইলে, সন্তান সুস্থশরীর হইবে না। আপনারা অকৃত্রিম ধর্ম্মশীল না হইলে, সন্তানও ধর্ম্মশীল হইবে না। আপনারা বিদ্যাচর্চ্চায় উন্মুখ না হইলে, সন্তানের বিদ্যানুরাগ জন্মিবে না। আপনারা মিতব্যয়ী না হইলে, সন্তানকে সম্পত্তিশালী করিতে পারিবে না।—আপনাদের অপেক্ষা, সন্তানকে কোনও এক বিষয়ে নহে, সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা কর—ধর্ম্মসাধন হইবে। যাঁহারা সন্তানকে আপনাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা উন্নতিশীল মানব-জীবনের সার্থকতা সাধন করেন। তাঁহাদের ইহলোক ও পরলোক—উভয়লোকই রক্ষিত হয়। যাঁহারা তাহা না পারেন, তাঁহাদের ইহলোকে মনস্তাপ ও পরলোকে অধোগতি।"

ভূদেববাবু নিজে শিক্ষাদান সম্বন্ধে কি কি উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা পরে উল্লেখ করিব। তিনি বাঙ্গালী মাত্রকেই শিক্ষাদান সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। আমাদের কেহ যদি উপদেশ দিতে আইসেন, ত আমাদের ব্যাজার ধরে। আমাদের মনে হয়, 'উপদেশ দিতে খুব পারেন,

—প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে আপনি নিজে ত কায করিতে পারেন না।' বস্তুতঃ দশ-বিশজনকে মুখের কথামাত্র খসাইয়া 'এই এই কর,' বলা যত সহজ, সেই উপদিষ্ট দশ-বিশজনের মধ্যে একজন হইয়া, আপনার প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করা তত সহজ নহে। * কিন্তু উপদেষ্টা যদি আপনি আপনার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করেন—যদি দেখি যে, তাঁহার কাযে ও কথায় প্রভেদ নাই, তিনি যাহা পারেন না, অপরকে তাহা করিতে উপদেশ দেন না—আপনার অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান বা উপায় অপরকে বলিয়া দিতেছেন, এবং সেই পথে চলিয়া তিনি প্রত্যক্ষ যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন, ত এরূপ আচার্য্যের বাক্য আশুফলপ্রদ মহৌষধ বলিয়া জ্ঞান জন্মে ও তিনি যাহা বলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে ও তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। ভূদেববাবুর প্রদত্ত উপদেশ মহামূল্য জ্ঞান করিবার আর এক কারণ আছে। ভূদেববাবু কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, কবিবর হেমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন "হায় কি হ'লো! ভূদেব গেল ছেড়ে গুরুগিরি।" হেমবাবুর আক্ষেপ করিবার কারণ যথেষ্ট ছিল। যে সময়ে ভূদেববাবু শিক্ষা-বিভাগে ছিলেন, সে সময়ে তিনি সেখানে না থাকিলে আমাদের অবস্থা কি হইত, কে বলিতে পারে? ইংরাজী-শিক্ষা সমস্ত আয়ত্ত করিয়াও, ভূদেববাবুর মত স্বাধীন ছিল—তিনি স্বজাতীয়-ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। অধিকাংশ লোকই ইংরাজীশিক্ষার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে—হইতেছে—ও হইবে; তথাপি, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের অনেক অনিষ্টও এই ইংরাজী-শিক্ষা হইতে হইয়াছে। ভূদেববাবু ইহা সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং আপন সাধ্যানুসারে তাহার প্রতীকারকল্পে আপনার সমস্ত শক্তি বিনিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং, যতদূর অনিষ্ট ইংরাজী-শিক্ষা আমাদের করিতে পারিত, ততদূর অনিষ্ট করিতে পারে নাই। ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবে, ইংরাজের উচ্চাদর্শে, ইংরাজী ইতিহাসের আস্বাদনে, ইংরাজী স্বাধীনতার ভাবগ্রহণে—আর সকলের অপেক্ষা অধিক, মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার, ডফ্, বেথুন্, ডিরোজিওর সংস্পর্শে, বাঙ্গালী যুবকগণ যে, আপনাদের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না ও পারিতেছিল না, ইহা ভূদেববাবু দিব্যচক্ষে দেখিতে পান। এবং যাহাতে ঐ সব সত্ত্বেও আপনার বংশধরগণ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব-রক্ষা করিয়া চলেন, অথচ নূতন প্রবর্ত্তিত ইংরাজী-শিক্ষার সারভাগ গ্রহণ করেন, তদনুরূপ শিক্ষাদানে তিনি মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে চলিলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়া শিখাইতে হয়, এই ভাবটি এখন সকলের মনে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে যে বাঙ্গালার মনে এ বোধ ছিল না, বা এখন অপেক্ষা কম ছিল, তাহা নহে। তবে, পূর্ব্বে ঐ বোধ এখনকার মত প্রখর এবং সতেজ ছিল না। এই বোধ উদ্বোধিত হইবার কারণ,লেখাপড়া না শিখিলে, এখনকার দিনে চাকুরী জুটে না; সুতরাং, বাধ্য হইয়া ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে হয়। পূর্ব্বকার ব্যবস্থা—পাঁচ বৎসরের ছেলের হাতেখড়ি দাও, পাঠশালে পাঠাও, পাঠাভ্যাস করাও, না করে—'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ' এই উপদেশ স্মরণ করিয়া, যাহা করিতে হয়, কর। যাহা করা উচিত, তাহা সন্তানকে বলিয়া দাও; যাহা না করিতে হয়, তাহা বলিয়া দাও; বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—উচিত না করিলে মার—অনুচিত করিলেও মার। এই করিলেই শিক্ষানীতির পদ্ধতি-জ্ঞান এবং তাহার মুখ্য অনুষ্ঠান হইল।

আজকাল এ প্রণালী অনুসারে আর শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখন ছেলের হাতে-খড়ি দিতেই হয় না। এখন তাহাকে ফাঁকিজুঁকি দিয়া শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ছেলে যেন টের না পায় যে, খেলা ধূলার ছলে তাহাকে শিক্ষাদান করা হইতেছে, অথচ যেন এই খেলা-ধূলার সঙ্গে তাহার শিক্ষা হইয়া যায়। য়ুরোপে কোথাও কোথাও নিয়ম হইয়াছে যে, পরকীয় ভাষা ছেলেকে শিখাইতে হইলে, ঐ পরকীয় ভাষায় কথা কহে এমন চাকর বা চাকরাণী রাখিয়া দিবে; উহার সহিত কথা কহিতে কহিতে, ছেলে পরকীয় ভাষা শিখিয়া ফেলিবে। কোনও দ্রব্যের গুণ-ধর্ম্ম-ব্যবহারাদি শিখাইতে হইলে, কথায় বলিয়া দিলে হইবে না, সেই দ্রব্য আনিয়া ছেলেকে দিতে হইবে; সে ব্যবহার করিয়া তাহার

* "It is easier to teach twenty what were good to be done, than be one of the twenty and follow one's own instructions."—Shakespeare.

গুণাদি বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিবে এবং আপনার (Inquisitiveness) কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিয়া লইবে। কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উৎপাদনের জন্যও ঐ প্রণালী অবলম্বনের কতকটা চেষ্টা হইয়াছে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকে আগাগোড়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছেলেকে বিধিনিষেধ মুখে কিছু না শিখাইয়া, যাহাতে সে ঠেকিয়া শেখে, এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। * একটি সামান্য উদাহরণ দিয়া তিনি আপন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ছোট মেয়ে পুতুলের বাক্স লইয়া খেলা করিবার সময় ঘরের মেঝেয় পুতুল ছড়াইয়া রাখিল, তুলিল না, বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া গুছাইয়া না রাখিয়া এখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিল, বা পুতুলের কাপড় তৈয়ার করিবার ছেঁড়া নেকড়া মেঝেয় ছড়াইয়া ঘর অপরিষ্কার করিল। বাড়ীর গিন্নী নিজে হয়ত সব পরিষ্কার করিলেন, নয় বড়বোন বা ভাই ঘরটি পরিষ্কার করিলেন; রাগ হইলে ছোটমেয়েকে বকিলেন বা মারিলেন। ইহা করা উচিত নহে। যে ঘর অপরিষ্কার করিয়াছে, তাহাকে দিয়াই ঘর 'মুক্ত' করান উচিত। এরকম প্রতিগৃহে নিত্য হইতেছে। মেয়ে যদি ঘর পরিষ্কার করিতে না চাহে,ত তখনই তাহার শাস্তি পাওয়া উচিত। মনে কর, ছেলে পুতুল তুলিতে আদিষ্ট হইয়া, আদেশ অমান্য করিল। তখন মার কর্ত্তব্য কি? আপনি তুলিয়া রাখিবেন। পুতুলের বাক্স ছেলে-মেয়ে ফের চাহিলে বলিবেন, 'এর আগের বার তুমি পুতুল ছড়াইয়া ফেলিয়া গিয়াছিলে, আমায় তুলিতে হইয়াছিল। আমার কায আছে, তুমি পুতুল ছড়াইলে আমি তুলিতে পারিব না। তোমার ভাই-বোনেও তোমার পুতুল তুলিতে পারিবে না। তুমি নিজে ত পুতুল কুড়াইয়া তুলিতে পারিবে না? তুমি পুতুল পাইবে না।' পুতুলটা পেতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে; সে সময় না পাওয়ায় আপনার কৃত অকর্ম্মের জন্য অনুতাপ হইবে। আর এইরূপে যে শিক্ষা লাভ হইল তাহা আর পরে ভুলিবে না। এই রকম দুচারবার করিলে, দোষের যতদূর সম্ভব পরিহার হইবে। আর ছেলে-বেলাতেই এই শিক্ষা হইল, যদি আমোদ করিতে চাও ত তার সঙ্গে 'মেহনত'ও করিতে হইবে। আর একটি দৃষ্টান্ত লউন।—ছেলেদের সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইবার প্রথা অনেক পরিবারে আছে। তন্মধ্যে একটি মেয়ে সময়ে সাজিয়া প্রস্তুত হইতে পারে না। সকলে কাপড়-চোপড় পরিয়া তৈয়ার হইতেছে, ঐ একটি মেয়ে আপনার কাযে ব্যস্ত, তাহার কাপড় পরা হইল না। অন্য সকলে তাহাকে তাড়া দেয়, কিন্তু সে যতক্ষণ প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করে। মা মেয়েকে সেই এক কথার জন্য রোজই বকেন। মেয়ের কাপড় চোপড় যেদিন পরা না হইল, সেদিন তাহাকে রাখিয়া আর সকলে বেড়াইতে গেলে দুইদিনে ঠেকে শিখিয়া মেয়ের রোগ সারিয়া যাইবে। একথা খুব পাকা কথা, তাহার সন্দেহ নাই; ঠেকে শিখিলে শিক্ষা যেমন বদ্ধমূল হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। অতএব, উল্লিখিত গ্রন্থকার যেমন পরামর্শ দিয়াছেন সম্ভবমত তদনুরূপ চলিবার চেষ্টা করা উচিত।

ঠেকে শেখার তাৎপর্য্য এই যে সুখ-দুঃখ ভোগদ্বারা শিক্ষা-লাভ। এই ঠেকে শেখা ভিন্ন কি অন্য পন্থা নাই? অনেক স্থলে সুখ-দুঃখের বোধ হাতে-হাতে হয় না। ছেলে মিষ্টান্ন খাইল—খাইতে বেশ লাগিল—সেইরূপ রসনার তৃপ্তিকর বস্তু খাইতে থাকিল। দুইচারিদিন পরে পীড়া হইল। শিশু মিষ্টান্ন-ভোজন হেতু অসুখ হইয়াছে বুঝিবে কেমন করিয়া?—অতএব বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। (১)

* "When a child falls, or runs its head against the table, it suffers a pain, the remembrance of which tends to make it more careful; and by repetition of such experiences it is eventually disciplined into proper guidance of its movements. If it lays hold of the fire-bars, thrusts its head in a candle-flame, or spills boiling water on any part of its skin, the resulting burn or scald is a lesson not easily forgotten. So deep an impression is produced by one or two events of this kind, that no persuation will afterwards induce it thus to disregard the laws of its constitution.' H. Spencer.'

(১) মনে কর, কোন ছেলে নৈতিক-সোপানে অবতরণ করিতেছে। তাহাকে কি ঠেকে শিখিতে দিবে? না, যাহাতে তাহার অধঃপতন না হয় বুঝাইয়া, অথবা অন্য যে কোন প্রকারে পার, তাহার গতিরোধ করিবে? এস্থলে অবশ্য ঠেকে শিখিতে কেহই দিবেন না।

কিন্তু বুঝাইয়া দিলে যে শিক্ষা হয়, তাহার মূল ঠেকে-শেখা নহে, ছেলের বিশ্বাস মাত্র। বিশ্বাসের উপর শিক্ষাকার্য্য অনেকটা নির্ভর করে। সবই ঠেকে শেখা চলে না ;—অতএব ভূদেব-বাবু বলেন, বিধি-নিষেধ (এ রকম করা বারণ, এ রকম ক'রো না আদেশ) দ্বারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদ্রেক বিধান একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে, সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে ; কেবল সুখ-দুঃখ-বিচারের উপর কর্ত্তব্য-বোধের সংস্থাপন কখনই কার্য্যকালে দৃঢ় থাকে না—নিষ্কাম ধর্ম্মসেবায় প্রবৃত্তি দেয় না এবং বিধি প্রতিপালন করাই যে পরমধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান জন্মায় না। কর্ত্তব্য-বোধের ভিত্তি ওরূপে সঙ্কুচিত করিলে, হিন্দু-ধর্ম্ম যে, তাদৃশ জ্ঞানের অত্যুচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশে বিদ্যা অর্থকরী। লেখাপড়া শিখিলে, চাকুরী হইবে, এই জন্য লেখা-পড়া শিখান হয়। আর চাকুরী হইলে, চাকুরের অন্য কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি থাকে না। এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত বিদ্যা হইলে, অনেকে সন্তুষ্ট ; যিনি এল্.এ. পড়িলেন, তিনি ত মহামহোপাধ্যায় ; যিনি বি.এ, তিনি অতীতাধ্যাপক। যিনি এম.এ. তাঁহার ত কথাই নাই! তাঁহার বিদ্যা উপচিয়া পড়িতে থাকিল—তাঁহার চলিতে, কথা কহিতে, যেখানে সেখানে বিদ্যা ছড়াইয়া পড়ে। ভূদেব-বাবু বলেন, ডিগ্রী-লাভ ত হইল—কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য শুধু চাকুরী হওয়া উচিত নহে। সমাজের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। আমরা বাঙ্গালী—আমাদের সমাজ যে ভাবাপন্ন, তাহাতে আমাদের প্রয়োজন কি? এইটি সুপরিস্ফুটরূপে অবধারিত করিয়া, আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষেরা যাহাতে ঐ সকল প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়াই আমাদের প্রকৃত শিক্ষাদান। মনুষ্যত্ব-সাধন মস্ত কথা। মনুষ্যত্ব যে কি এবং উহা যে কি নয়, বা কি হইতে পারে না, তাহা এ পর্য্যন্ত বোধ হয়, কেহই স্পষ্টরূপে বুঝিতে এবং বলিতে পারেন নাই। অতএব কিরূপ হইলে, ছেলেটি প্রকৃত মনুষ্য হইবে, তাহা না ভাবিতে গিয়া, কিরূপ হইলে ছেলেটি সমাজের অভাব-মোচনে সাহায্য করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক।

ছেলেটিকে সমাজের সেবায় বিনিয়োজিত করিতে হইলে, তাহার প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপ হইবে, (স্কুল বা কলেজে কেমন ভাবে পড়ান উচিত সে বিষয় নহে) তাহার শরীর ও মনটি কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, সেইরূপ গড়িয়া তুলিতে হইলে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বনীয় ও ছেলেকে কোন্ কোন্ দোষ বর্জ্জন করাইতে চেষ্টা করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে গভীর চিন্তায় ভূদেব বাবুর মনে কয়েকটি বিষয়ের উদয় হয়। তিনি নিজের বাড়ীর ছেলেদের কেমন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন এবং সেইরূপ গড়িবার উদ্দেশ্যে কি কি করিতেন এবং তিনি যে সমুদায় উপদেশ দিতেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বালকদের পাঠ্য ও পাঠনার রীতি সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা হইবে।

ভূদেব-বাবু খুব সকালে শয্যা-ত্যাগ করিতেন। আপনার প্রাতঃকৃত্য হইয়া গেলে একটি ঘণ্টা বাজাইয়া, ছেলেদের স্তোত্র ও শ্লোক আবৃত্তি করিবার জন্য আহ্বান করিতেন। সুতরাং ছেলেদের ভোরে উঠা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। শ্লোক-আবৃত্তি করিতে আসিবার পূর্ব্বে ছেলেদের শৌচ সারিয়া লইতে হইত। মুখে জল দিয়া, মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, শুচি হইয়া, আসিতে হইত। চোখে পিঁচুটি লইয়া বা—চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইবার যো ছিল না। কেহ কাপড় ছাড়িয়াছে কি না ইত্যাদি ভূদেব-বাবু সহজে ধরিতে পারিতেন। এ সব না করিয়া আসিলে, অশুচি অবস্থায় আসিলে, তিনি বড় অসন্তুষ্ট হইতেন। আর ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে না পারিলে, কৈফিয়ৎ দিতে হইত। এইরূপে সময়ানুবর্ত্তিতার সূত্রপাত করা হইয়াছিল। ভূদেব-বাবুর মত, ভালবাসায় ছেলেকে যত বশ করা যায়, অন্য কিছুতে তত নহে। অসন্তোষের কাজ করিলে, বিরাগভাজন হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া যে বশ্যতা, তাহা অপেক্ষা মধুরতর জিনিষ আর নাই। মার-পিট করিয়া, ঠেঙ্গাইয়া ছেলে বশ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বশীকৃত ও বশকর্ত্তা উভয়েরই মন ভার ভার থাকে। (১)

(১) হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন :—"আমার এক বন্ধু ভগিনীপতির নিকট থাকিতেন ; আপনার ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীর পড়াশুনা

এই পথই সকল অভিভাবকের অবলম্বনীয়। ছেলেরা আসিয়া সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইত, বয়স অনুসারে। ভূদেব-বাবুর সম্মুখে আসিয়া তাহাদের প্রথম কার্য্য তাঁহাকে নমস্কার করা। প্রাতঃকালে বালকেরা দেবদেবীর যে স্তব ও ধ্যানের আবৃত্তি করিত, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা ভিন্ন এইরূপ অন্যান্য অনেক শ্লোকের আবৃত্তি করিতে হইত।

১। রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

২। রামং লক্ষ্মণ-পূর্ব্বজং রঘুবরং, সীতাপতিং সুন্দরং ইত্যাদি।

৩। যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভূজা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদাবন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতীনিঃশেষজাড্যাপহা॥

৪। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

৫। ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারীভানুঃশশীভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনীরাহুকেতুকুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥

৬। লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীকান্তবিষ্ণোর্ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে

দেখিতেন। ছেলেদের বড় ভালবাসিতেন, তাই এই ভালবাসায় বশ করিবার পথ তিনি অবলম্বন করেন। বাড়ীতে যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি তাদের সঙ্গে: বাহিরে তাহাদের ক্রীড়া-সঙ্গী ছিলেন। ছেলেরা তাঁর সঙ্গে বেড়াইতে যাইত, গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া আনিত। তাঁহার জন্য নূতন নূতন উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করিত, কেমন করিয়া তিনি গাছ-গাছড়া চেনেন, তাহা দাঁড়াইয়া দেখিত। তাঁহার সঙ্গে থাকায় তাহাদের আমোদও হইত, অনেক শিক্ষাও হইত। অল্প কথায়—"স পিতা পিতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" এই পণ্ডার কথা গল্প করিতে করিতে তিনি আমাদের বলেন: 'একদিন বিকালে বাড়ীর অপর এক অংশে আছে, এমন একটা জিনিষের দরকার হওয়ায় ভাগিনেয়কে তাহা আনিতে বলিলেন। সে সময়ে সে কি একটা মজা দেখিতে ব্যস্ত থাকায়—অন্য সময়ে এমন করে না—হয় যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, নয় যাইতে অস্বীকার করিল, ঠিক মনে নাই, কোন্‌টা। মামা তাহাকে জোর করাইয়া, কাজ করাইতে অনিচ্ছুক; আপনি গিয়া জিনিষটা আনিলেন। ভাগিনেয়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ব্যবহারে এইটুকু মাত্র তাহাকে বুঝিতে দিলেন। সন্ধ্যার পর মামার সহিত খেলিবার প্রস্তাব করিলে মামা যেন বড় অসন্তুষ্ট এই ভাব দেখাইয়া, খেলিতে রাজী হইলেন না। বালকের কৃত আচরণের ফল ভোগ হইল। পর দিন প্রাতে শোবার ঘরের দরজার বাহিরে একটি নূতন স্বর শোনা গেল—সেই ছোট ভাগিনেয় নিজে গরম জলের কেট্‌লি লইয়া আসিয়াছে। সে ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া দেখিতেছে, মামার আর কি দরকার। তারপর বলিল, আপনার জুতা এ ঘরে নাই ত, এনে দি। সে খাঁ করিয়া সিঁড়ি বহিয়া জুতা আনিতে গেল। এইরূপে ও অন্যান্যরূপে সে দেখাইল যে, সে আপনার আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে। একটা কাজ না করিয়া, দুষ্কর্ম করিয়াছে—আজ হরেক রকম কাজ করিয়া দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহার মনের সদ্‌বৃত্তিসমূহ অসদ্‌বৃত্তিগুলিকে পরাভূত করিয়াছে: আর এই জয়লাভে সদ্‌বৃত্তিগুলি সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। মামার বন্ধুত্ব-হারানয় কত ক্ষতি তাহা বুঝিয়া নষ্টবন্ধুত্ব পুনর্লাভ করিবার জন্য আজ তাহার এত চেষ্টা।

এই মামা এখন নিজে ছেলের বাপ। এখনও সেই শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে চলেন: আর দেখেন, এতে খুব সুফল পাওয়া যায়। তিনি পুত্রগণের সহিত মিত্রবৎ আচরণ করেন। ছেলেরা চায়, শীঘ্র বিকাল হউক, কেন না তখন বাবা তাহাদের কাছে লইয়া বসিবেন। রবিবার তাহাদের বড় আমোদের দিন; কেন না পিতা চব্বিশ ঘণ্টাই তাহাদের কাছে থাকিতে পান,—তাহাদের তাঁহার উপর এত গভীর ভালবাসা ও বিশ্বাস। তিনি দেখেন যে, ছেলেদের কার্য্যে সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ দ্বারাই তিনি তাহাদের বশে রাখিতে পারেন। বাড়ী আসিয়া যদি শুনেন যে, কোনও ছেলে দুষ্টুমি করিয়াছে, বা অপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে আদর করেন না। এসে, বাবা চুমো খান নাই—এতে ছেলে যত কাঁদে অনেক পিটিলেও ছেলে তত কাঁদে না। আর এই নৈতিক শাস্তির ভয় তাহাদের মনে সর্ব্বদা থাকে। এত ভয় থাকে যে, তারা দিনে দশবার জিজ্ঞাসা করে, মা আজ ত কিছু অন্যায় করি নাই—বাবা এলে বলবে ত যে আমি আজ খুব ভাল ছেলে হইয়াছি। একদিন এক পাঁচ বছরের ছেলে তাহার ভাইয়ের চুল কাঁচি দিয়া খানিকটা কাটিয়া দিয়াছিল। হাতে কাঁচি পাইলে হাত নিশপিস করে কি না; আর বাপের ক্ষুর বাহির করিয়া তাহাতে আপনার হাত কাটিয়াছিল। এই কথা বাড়ীতে আসিয়া শুনিয়া, বাপ সেদিন রাত্রে বা পরদিন সকালে ছেলের সঙ্গে কথা কহেন নাই। ছেলে ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল। পরে এক দিন মা কোথাও যাইবেন শুনিয়া, মাকে বলে—না মা তুমি বাড়ী থেকে যেও না। তুমি বাড়ী না থাকিলে যদি আবার সেদিনের মত করিয়া ফেলি। Spencer's Education. 113-115 pp.

৭। জানামিধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

৮। জবাকুসুমসঙ্কাশংকাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
অন্যান্যনবগ্রহস্তোত্র।

৯। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

১০। অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বালকগণের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত ও সমকালে উচ্চারিত এই সব ধ্যান ও স্তবমালা যখন আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইয়া, বিলীন হইত, তখন শ্রোতৃমাত্রের মনে যে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাব হইত, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। ভূদেব-বাবুর পরিচিত অনেক বন্ধু-বান্ধব ছেলেদের এই শ্লোকের আবৃত্তি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। যাঁহারা ভূদেব-বাবুর বাটীতে ছেলেদের মুখে প্রাতঃকালে এই সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাঁহাদের রবিঠাকুরের গানের এই দুই ছত্র মনে পড়িবে :—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে।"

যখন মুখস্থ শ্লোক ও ধ্যানের সংখ্যা তত বেশী হয় নাই কম ছিল, তখন প্রাতে ইহার সহিত বালকেরা যে সকল চাণক্য ও নীতিপূর্ণ শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিল—সে সমুদায়ও আবৃত্তি করিত। ক্রমে যখন উভয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল, তখন প্রাতে কেবল ধ্যান ও স্তোত্র আবৃত্তি করা হইতে, অপরাপর শ্লোকগুলি ভূদেব-বাবু রাত্রে আহার করিয়া শুইলে তাঁহার সমক্ষে বসিয়া প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক আবৃত্তি করিবে, এইরূপ নিয়ম হয়। একজন কর্তৃক আবৃত্ত শ্লোকের পুনরাবৃত্তি দ্বিতীয় বালক করিতে পারিবে না। এইরূপে প্রায় ১৫০-২০০ শ্লোক ছেলেদের শিখান হইয়াছিল। কত যায়গা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কত যে শ্লোক মুখস্থ করান হইত, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। চাণক্য ও নীতিপূর্ণ শ্লোকের ও অন্যান্য কিরূপ ধরণের শ্লোক বালকদিগকে শিখান হইত, জানিতে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে ভাবিয়া, তাহারও কয়েকটি মাত্র এখানে দেওয়া গেল :—

১। যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

২। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

৩। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

৪। দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেৎ বাচং শাস্ত্রপূতং সমাচরেৎ॥

৫। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ংব্রূয়ান্নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

৬। অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

৭। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

৮। দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যোবিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

৯। যস্মিন্ কর্ম্মণি যুক্তঃ স্যান্মনস্তত্র নিবেশয়েৎ।
অনিবেশিতচিত্তস্য কার্য্যসিদ্ধিঃ সুদুর্লভা॥

১০। নিত্যংছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পসেবা
দন্তানামল্পশৌচং মলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাং।
দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতিধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীং॥

১১। বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচিব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাং॥

১২। ধর্ম্মস্যমূলান্যসবঃ প্রকাণ্ডো
বিত্তানি শাখাশ্চদনানি কামাঃ।
যশাংসি পুষ্পাণি ফলঞ্চ পুণ্য
মসৌ সদাচারতরুর্ম্মহীয়ান্॥

১৩। যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যাবহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বেকালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

১৪। বরমেকোগুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্র স্তমো হন্তি ন চ তারাশতৈ রপি॥

১৫। একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥

১৬। প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্॥

১৭। পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
আপৎকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

১৮। ষড়্‌দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধমালস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

নিজে ত বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক মুখস্থ করাইতেন, আবার যদি কেহ বাহির হইতে নূতন কোনও ভাল শ্লোক শিখিয়া আসিত, তাহা অমনি নিজে লিখিয়া লইয়া, যে যে উক্ত শ্লোক জানিত না তাহাদিগকে তাহা শিখাইতেন। একবার তাঁহার এক দৌহিত্র তাহার জেঠার (৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের) নিকট হইতে একটি শ্লোক শিখিয়া আসে। রাত্রিকালে শ্লোক-আবৃত্তির সময় উক্ত দৌহিত্র দেখিল যে, সে যতগুলি শ্লোক জানে, বাটীর অপরাপর বালকেরা, তাহার অনুপস্থিতিকালে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শ্লোক শিখিয়াছে। অথচ উহাদের সঙ্গে আপনার Turn আসিলে, তাহাকে একটি করিয়া শ্লোক বলিতে হইবে। সে এক কৌশল অবলম্বন করিল। সে প্রতি Turnএ (সারিতে?) তাহা কর্তৃক নূতন শিক্ষিত শ্লোকের এক এক চরণ উচ্চারণ করিয়া, চারিবারে শ্লোকটি পূর্ণ করিল। সে শ্লোকটি এই :—

পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈ কান্ত জীবিতান্
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তে বারযন্তিনঃ।
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যপজীবিনাম্
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ
গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে।
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহদেহেষু
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা॥

যখন চারিবারে এই শ্লোকের আবৃত্তি পূর্ণ হইল, তখন ভূদেব বাবু অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার দৌহিত্রকে আদর করিলেন ও কাহার কাছে এই শ্লোক অভ্যাস করিয়াছে, দৌহিত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ অবগত হইলেন। তাঁহার বড় আহ্লাদ হইয়াছিল যে, পূজনীয় ৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১) মহাশয়ও তাঁহার মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন চমৎকার শ্লোক যেমন আপনি পড়িয়াছেন—অমনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকেও তাহা শিখাইয়াছেন।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এরূপ ভাবে সংস্কৃত শ্লোক শিখাইবার উদ্দেশ্য কি? (১) উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে ইংরাজী শিক্ষারূপ বিষের প্রতিষেধক প্রয়োগ করা।

---

(১) এই সংস্কৃত নীতিশ্লোক শিখাইবার আর একটি উদ্দেশ্যই :— Carry you a select store of holy texts within and you will be much more effectively armed against the powers of evil than any most absolute monarch, behind a bristly body guard.

Blackie.

(১) ৺পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই সহোদর ভ্রাতা সুবর্ণপুরনিবাসী ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। পরেশ বাবু অতি তেজস্বী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। প্রথমে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন, পরে হাইকোর্টের অধীন হইলে, স্থানীয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর একান্ত আজ্ঞাধীনতায় থাকিতে হইবে না বিবেচনা করিয়া মুন্সেফ হন ও আপন চিত্তের স্বাধীনতা বজায় রাখেন। সবজজ হইয়া ইনি যে নির্ভীকতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও অনেকের মুখে শুনা যায়। তিনি যে Serviceএ ছিলেন, আমিও সেই Serviceএ আছি বলিয়া, অনেকে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন! ভাগলপুরে সবজজ থাকাকালে, সর্ব্বশাস্ত্রে দক্ষ একজন মাইথিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট ইনি নিয়মিত সংস্কৃত পড়িতেন। ইঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত পুস্তক দেখিবার জিনিষ ছিল। পুত্রকে সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। প্রথমে ইংরাজির উপর বড় ঝোঁক ছিল, পরে সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ও অধিকাংশ সময় সংস্কৃতের চর্চায় কাটাইতেন। পরেশ বাবুর মত ইংরাজী-শিক্ষিত লোক আপনার শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন ও বংশধরগণ যাহাতে সংস্কৃতে অনুরক্ত থাকে, সেজন্য ভূদেব-বাবুর উদ্ভাবিত প্রণালী না জানিয়াও অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া ভূদেব-বাবুর আশা

ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষা করাইতে হইবে। ইংরাজী শিখিবার পূর্ব্বে আপনাদের শাস্ত্র ও সাহিত্য যে একান্ত অপদার্থ নহে, তাহারই বোধ জন্মাইয়া দেওয়া। বোধ হয়, আমি ভাল বুঝাইতে পারিলাম না।

মাইকেলের জীবনীলেখককে ভূদেব-বাবু যে পত্র লেখেন, তাহাতে বলেন ;—"রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেইদিন রামচন্দ্র-বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজী-ওয়ালা মাত্রই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র-বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল, কিন্তু, তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না।" আমি কোনও কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরি সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমায় একখানি পুঁথি দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম—তথায় লেখা রহিয়াছে "করতল কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" বচনটি পাঠ করিয়া, মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে সেইটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম—"আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা ত পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন ; এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটিও পুঁথি মধ্যে আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র-বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল ; তা তোমার বাবা বলিবেন বৈকি ; তবে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

শৈশবে শিক্ষক রামচন্দ্রের এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি অবজ্ঞায় ও আপনাদের দেশের শাস্ত্র ও সাহিত্যকে হেয় জ্ঞান করায়, বালকের মনে একটি ভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। ঐ চিহ্ন তাঁহার মন হইতে আর মুছিয়া যায় নাই। পরে যখন আপন সহকারী ৺ রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় রচিত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" পাঠ করিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি দেখিলেন, "ইংরাজীতে অতি ব্যুৎপন্ন তাঁহার বন্ধুর তখনও ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই। গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এইমাত্র দেখাইয়াছেন যে, উহা ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকর্ত্তার মনের মানদণ্ড ইংরাজ।"

ভূদেব-বাবু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলেন যে, যদি ইংরাজী-শিক্ষিত সকল ব্যক্তিরই মন এইরূপ হইতে থাকে, তবে অচিরে ভারতের অবস্থা, রোমে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সিসেরোর শাসনাধীনে পরিচালিত সিলিসিয়া প্রদেশের মত হইয়া যাইবে। সিসেরোর বিপক্ষ পক্ষের একব্যক্তি তাঁহার নামে সেনেটে বলেন—"সিসেরো একটা দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি ত কিছুই কায করিতে পারেন নাই। একটি যুদ্ধও জয় করেন নাই, একটি শত্রুও বিনাশ করেন নাই।" সিসেরো তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন, "আমি সিলিসিয়া প্রদেশে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে ঐ প্রদেশবাসীরা চিরকালের জন্য রোমের দাসানুদাস হইয়া থাকিবে। আমি রোমীয় ভাষা শিক্ষার জন্য একচল্লিশটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একেবারে রোমীয় মন্ত্রে দীক্ষিতের ন্যায় হইবে—কখনও রোমীয় ভিন্ন আর কাহাকেও আপনাদের আদর্শ মনে করিতে পারিবে না।"

ভূদেব-বাবু দেখিয়াছিলেন যে "কেবল ইংরাজীতে শিক্ষিত হইলে যে, ইংরাজই যুবকদিগের আদর্শ স্থলাভিষিক্ত হইবে ইহা সাধারণ মনুষ্য-স্বভাবসিদ্ধ। ইংরাজী-শিক্ষিতেরা মুখে যাহাই বলুন, আর মনে মনে আপনাদের মন না বুঝিতে পারিয়া যাহাই ভাবুন, তাঁহারা অপরিসীম

হইয়াছিল যে, কালে সকল ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বন করিবেন। ৺শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূদেব-বাবুর তৃতীয় জামাতা।

ইংরাজ-ভক্ত। তাঁহাদের ভক্তি মুখের ভক্তি নহে—অন্তরের অন্তস্তল ভাগের ভক্তি। ইংরাজ যে আমাদের আদর্শস্থলাভিষিক্ত হইবে, ইহা ইংরাজী-শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল। ইংরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয়, তাহা হইলে কতকটা বিষ কম লাগিতেও পারে। পুত্র-কন্যাকে ইংরাজী পড়াইবার পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইয়া লওয়া উচিত এবং সংস্কৃতের চর্চ্চা ইংরাজী-শিক্ষার সহিত বরাবর প্রচলন রাখা উচিত (১)" ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে ইংরাজী বিষে জারিয়া যায় দেখিয়া, অন্যত্র লিখিয়াছেন "বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অযথারূপে প্রবলা হইয়া উঠিয়াছে। অনুকরণ উৎকর্ষ সাধনের একটি প্রধানতম পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণে এক প্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। অতএব বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব সম্বৰ্দ্ধিত করিবার উপায় করা আবশ্যক। পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তিস্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই হেতু বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করাইবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়। যখন ছেলে ইংরাজী পড়িবে, তখন ইংরাজী গ্রন্থে কোনও উৎকৃষ্ট ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, তাহার অনুরূপ অথবা তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব যে সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।" (২) নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকগণ ইংরাজী-শিক্ষা-কালে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনাদি হইতে যে যে রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, দেশকাল ও পাত্রভেদে সে সমুদয় আমাদের দেশের উপযোগী কিনা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাঁহারা ইংরাজী ভাবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা যাহা ইংরাজী বিদ্যায় শিখাইয়াছে, তাহা অবশ্য কার্য্যে পরিণত করা উচিত, এইরূপ একটা ঝোঁক তাঁহাদের চাগিয়া যাইত; এই শিক্ষার বেগ সামলান যুবকগণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইয়াছিল। একমাত্র ভূদেব-বাবুই ইহা উপলব্ধি করেন; ও শিক্ষকতা কালে এই ভাব যাহাতে যুবকদের মনে অঙ্গীকৃত হয়, তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আখ্যান মঞ্জরী ও ৺রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত পুস্তকে ডুবাল ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণের জীবনী সন্নিবেশিত থাকায়, পাছে দেশের যুবকগণ মনে করে যে, ওরূপ চরিত্রের লোক আমাদের দেশে কেহ জন্মে নাই, তজ্জন্য ভূদেব-বাবু ৺কালীময় ঘটককে দিয়া, চরিতাষ্টক নামক পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া, দেশের যুবকগণের সমক্ষে দেশীয় মহাত্মাগণের গৌরবকাহিনী, পুণ্যকীর্ত্তি ও চরিত্রসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহাতে যুবকগণের মন আপনাদের অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়া, গৌরব অনুভব করে, আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হয় ও ইংরাজী ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া, তলাইয়া না যায়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ভূদেব-বাবু রচনার মধ্যে "কৃতবিদ্য" কথাটি যেখানে সেখানে ব্যবহার করিয়াছেন—সেখানে দেখা যাইবে যে, তিনি উহা শ্লেষের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সে সকল ব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইয়াও আপনাদের জাতীয়তা হারায়; যাহাদের সমাজ, গুরুজন, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সহানুভূতি জন্মে না; যাহাদের আপনার মাতৃভাষা, ইতিহাস ও বংশগৌরবে গৌরবান্বিত হইবার বাসনা লোপ হয়; যাহাদের বাহাদুরী পদেপদে শাস্ত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করা ও তদনন্তর অনুষ্ঠিত কার্য্যকে স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যা করা, তাহাদের কোনও শিক্ষা লাভই হয় নাই। তাহারা কোন্ ভাবের বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহা তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারে না। যাহাদের অন্তর্নিহিত জাতীয়ভাব লোপ পাইয়াছে, তাহাদের মনুষ্যত্ব নাই। তাহাদের অবস্থা ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত দাঁড়কাক হইতে অণুমাত্র পৃথক্ নহে। তাহারা বিশেষ সমাজভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের অবস্থা ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হয়—তাহারা কিছুই মানিতে চাহে না—তাহাদের জীবন পরিশেষে অতিশয় দুঃখময় ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই সকল অনিষ্টের প্রতিকার-কল্পে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও কার্য্যশৃঙ্খলা শিক্ষার জন্য যত্নের সহিত সকল হিন্দু ও মুসলমানের যাহাতে স্ব স্ব ধর্ম্মে ভক্তি থাকে, তাহার ব্যবস্থা করার অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োজন, ইহা ভূদেব-বাবু সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। নিজের ছেলেদের সম্বন্ধে এইরূপ শিক্ষাদান করিয়া, সুফল পাইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি দেশের যুবকগণের পক্ষে এই শিক্ষা-

(১) সামাজিক প্রবন্ধ ৭৬ পৃঃ।

(২) পারিবারিক ১১৬ পৃঃ।

নীতি অবলম্বনীয় ভাবেন ও এতদ্দেশীয় প্রৌঢ় ও যুবকগণকে মানস চক্ষে রাখিয়া সামাজিক প্রবন্ধ লেখেন। ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া, তাঁহার ছেলেরা কেমন হইয়াছিল—"তোমরা দুই ভ্রাতা ইংরাজী-বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াও যে প্রকার গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান ও পরিজনের প্রতি প্রীতিমান, সেইরূপ আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং স্বদেশীয় জনগণের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট।" (১)

ভূদেব-বাবুর শিক্ষানীতির এই বিশিষ্টতা উপলব্ধি করিয়া, কবিবর হেমচন্দ্র ভূদেব-বাবুকে "ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে" বলিয়া অভিহিত করেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্বর্গীয় স্যর চার্লস এলিয়টও ভূদেববাবুর সামাজিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া, সেই কথা বলেন—"A Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy had had an equal share—ভূদেব-বাবুরও 'সামাজিক প্রবন্ধ' লিখিবার ও তৎকর্ত্তৃক অবলম্বিত শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আপনার সাহিত্য হইতে সমুদায় গ্রহণ কর—যাহা তাহাতে নাই, তাহা ইংরাজী বিদ্যা হইতে গ্রহণ কর;—ইংরাজীভাবে বিভোর হইয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিও না; আর যাহাতে কোন দুর্ঘটনা না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা বিদ্যারম্ভের প্রারম্ভ হইতে প্রত্যেক অভিভাবক ও পিতার করা কর্ত্তব্য।

ছেলেরা শ্লোক আবৃত্তি করার পর সামান্য জলখাবার খাইয়া, কেহ বা একগ্লাস দুধ খাইয়া, গৃহশিক্ষক শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট পড়িতে যাইত। ছেলেদের জল-খাবার বাটীতে তৈয়ার করিয়া দিতে হইত। রুটী অথবা মোহনভোগ সাধারণতঃ তৈয়ার হইত। বাজারের জল-খাবার ভূদেব-বাবু দেখিতে পারিতেন না। বাটীর পাশে "অন্নদার" দোকান ছিল। সেখান হইতে খাবার আনাইয়া খাওয়াইলে বড় রাগ করিতেন। সুতরাং বাটীর মেয়েদের সকাল সকাল দুধ জ্বাল দিয়া অথবা খাবার তৈয়ার করিয়া, ছেলেদের পড়িবার ঘরের সম্মুখে পাঠাইয়া দিতে হইত। ছেলেরা যাহা খাইবে তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করার একটা আনন্দ ত আছেই, তাহা ছাড়া উপকার এই হইত যে, বাড়ীর মেয়েদের কর্ম্মকরার অভ্যাস রহিত, সময়ে কায করিতে হইবে, সে বোধ হইত, আর ভেজাল জিনিষ ছেলেদের পেটে যাইত না। গৃহশিক্ষকের নিকট ৯৷৷০টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়া, ছেলেরা একটু আধটু মার্ব্বল লইয়া খেলা করিত—অথবা স্নানার্থ ঘাটে নামিয়া জলক্রীড়া করিত। সন্তরণে বাটীর সকলে বেশ পটু হইয়া উঠিয়াছিল—কেবল যে সকল দৌহিত্র তাঁহার কাছে না থাকিত, তাহারাই সাঁতার কাটিতে শিখে নাই। কোনও কোনও দিন ভূদেব-বাবু দৌহিত্র বা পৌত্র-বিশেষকে আপনি সঙ্গে করিয়া আপন স্নানাগারে লইয়া গিয়া, তাহার অঙ্গমার্জ্জন করিয়া দিয়া স্নান সমাপনান্তে তাহার মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিতেন। সাধারণতঃ লোকে যেদিকে টেরী কাটে, তাহার বিপরীত মস্তকাংশে টেরী কাটিয়া দিয়া বলিতেন, "সকলে ত এইদিকে টেরী কাটে; এ দৌহিত্র বা পৌত্র অসাধারণ ব্যক্তি হইবে, তাই উল্টাদিকে টেরী কাটিয়া দিলাম।" ভূদেব-বাবু নিজে তেল বড় কম মাখিতেন—সাবান ও গঙ্গা-মৃত্তিকা গায়ে বহুপরিমাণে লেপন করিয়া, অঙ্গসংস্কার করিতেন।

স্নানান্তে বালকেরা ভোজনালয় বা রন্ধনশালায় গমন করিয়া খাইতে বসিত। ৺কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য,—যাঁহার নাম বহুকাল ধরিয়া এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত দেখা গিয়াছে,—তিনি যদি অন্ন দেবগণকে নিবেদন করিয়া দিয়া গিয়া থাকিতেন, তবেই যাইবামাত্র বালকগণকে খাইতে দেওয়া হইত, নতুবা "ছোড় দাদা" বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া, তাহাকে দিয়া অন্ন নিবেদন করাইয়া ভাত খাইতে বসিতে হইত। ছেলেদের আহার মোটামুটি ভাত, ডাল, তরকারি, দুধ, সামান্য গুড় অথবা চিনি। বাটী করিয়া ব্যঞ্জন বাড়িয়া দিবার আড়ম্বর ছিল না। সমুদায় দ্রব্য ভোজনপাত্রে পরিবেশন করিয়া দেওয়া হইত। বিলাসিতা ভূদেব-বাবুর আমলে তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে উঁকি মারিতে পারিত না। ছেলেদের পরণ-পরিচ্ছদে তেমন পারিপাট্য লক্ষিত হইত না। "মোটা খাওয়া ও মোটা পরা"য় বংশ-ধরগণকে অভ্যস্ত করাই তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল। বাড়ীতে যতগুলি ছেলে ছিল, ভূদেব-বাবুর চেষ্টা ছিল, তাহাদের মধ্যে সাধ্যপক্ষে যেন কোনও প্রভেদ করা না হয়। ছেলেরা বিদ্যালয়ে প্রত্যহ শিক্ষকদিগের সহিত কেমন আচরণ করে, তাহা সদা সর্ব্বদা খোঁজ লইতেন। কোনও শিক্ষক তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে অভিযোগ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দণ্ডবিধান করিতেন। বিদ্যালয় হইতে

(১) সামাজিক প্রবন্ধের উৎসর্গপত্র হইতে।

প্রত্যাগমন করিলে, রোজ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইত, যে,সেদিন তাহারা আপন আপন শ্রেণীর কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন ক্লাশে পড়া বলিতে না পারিলে, শ্রেণীর বালকগণকে স্থানচ্যুত হইতে হইত। ইহাকে সাধারণতঃ"উঠা উঠি"হওয়া বলিত। উপরকার ছাত্র পড়া বলিতে না পারিলে, নীচের বালক যদি সেই পাঠ বলিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে উপরকার ছাত্রের উপরে উঠাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইত। ছেলে উপরে ছিল বলিলে তিনি প্রসন্ন হইতেন, অন্যথায় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। এ বিষয়টির খোঁজ লইতেন না এমন দিন ছিল না। স্কুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ছেলেদের আর পড়িতে বাধ্য করা হইত না। স্কুল হইতে আসিয়া জলযোগের পর ছেলেরা খেলা করিত। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালা হইত। সে সময়ে দেশে কেরোশিন তেলের এত অধিক প্রচলন হয় নাই—আর কেরোশিন তেলের আলো ঘরে রাখিলে ঘর গরম হয় ও দুর্গন্ধ হয় বলিয়া তিনি কেরোশিন তেল বাড়ীতে আনিতেই দিতেন না। ঐ তেল-ক্রয়ের বিপক্ষে তিনি আর এক যুক্তি দেখাইতেন—যে উহার আলো এত উজ্জ্বল যে, উহার সাহায্যে কার্য্য করিলে, শীঘ্র চক্ষুর দর্শন-শক্তি কমিয়া যাইবে ও উহার উত্তাপের উগ্রতায় মস্তকের পীড়া জন্মিবে। ভূদেব-বাবু সকল ছেলেকে লইয়া আহারে বসিতেন। রাত্রের আহার সন্ধ্যার পরই সম্পন্ন করিতেন। বেশী রাত্রে খাইতেন না। ছেলেদেরও সঙ্গে করিয়া আহার শেষ করাইতেন। শুইবার পূর্ব্বে কেহ কেহ দুধ খাইত, কেহ কেহ বা খাইত না। সঙ্গে করিয়া লইয়া খাওয়ায় তিনি কাহার কতটুকু খাওয়া অভ্যাস, কে কি খাইতে ভালবাসে—কাহার কেমন হজম হয়—কাহাকে কতটুকু দেওয়া উচিত, তাহা দেওয়া হইতেছে কি না—সমস্ত স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। সুতরাং ছেলেদের খাইবার ক্ষমতা ও কাহার কি সহে—তৎসমুদায় বিশেষ ভাল করিয়া জানা হইয়া যাইত। দাদা-বাবু ভালবাসিয়া পাত হইতে উঠাইয়া কাহাকেও প্রসাদ দিলে সে ধন্য হইত। দাদা-বাবুও ছেলেদের মনোভাব এত বুঝিতেন যে, কে কি মনে করিতেছে, তাহা যেন তাহাদের মুখ-চোখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন ও তদনুসারে প্রসাদ-বিতরণে কৃপণতা করিতেন না। এক একদিন এমন হইত যে, পৌত্র-দৌহিত্রগণকে আহার্য্য বণ্টন করিয়া দিতে দিতে দাদা-বাবুর আদৌ খাওয়াই হইত না। ভূদেব-বাবু বৎসরের অনেক সময় বিকালে সাবুর পায়েস খাইতেন। একদিন পৌত্র ও দৌহিত্রগণ এত অধিকবার এই পায়সের জন্য আব্দার করিয়া ধরিয়া-ছিল যে, প্রায় সমুদায় তাহাদেরই উদরে চলিয়া গিয়াছিল; ভূদেব-বাবু তাহাদের উদরপূর্ণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন—এই তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত হইয়া—আচমন করিয়া—মুখশুদ্ধি লইয়া গিয়া আপনার পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ শয়ন করিলে পর ছেলেরা আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে মৃত্তিকায় উপবেশন করিয়া, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া শুনাইত। ঐ আবৃত্তির শেষে, তাহারা তাঁহার মাথায় গায়ে ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিত। ছেলেরা শ্লোক আবৃত্তি আরম্ভ করিলে, তাঁহার যে ছেলে যখন বাড়ীতে থাকিতেন তিনি, অথবা যে মেয়ে বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতেন, অথবা পুত্রবধূরা (যাহার গৃহ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে) আসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে অথবা অন্য উপায়ে শরীরের স্বচ্ছন্দতা বিধানে মনোযোগী হইতেন। শ্লোক আবৃত্তির অন্তে বালকেরা অল্প একটু তাঁহার সেবা করিয়া আপন আপন শয়নে যাইয়া, আশ্রয় গ্রহণ করিত।

সুইডেন-ভ্রমণ

[শ্রীমতী বিমলা দাস গুপ্তা]

পি এণ্ড ও কোম্পানী যে, কেন আগে-ভাগেই স্বর্গারোহণ করাইয়া, পরে যাত্রীদিগের অধঃপতনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তা তাঁহারাই জানেন। অবশ্যই এই উল্টাপথ ধরিয়া যাতায়াতের কোন গূঢ় রহস্য আছেই। আমরা জন্মাবধি শুনিয়া আসিয়াছি "মধুরেণ সমাপয়েৎ"—জগতে যা কিছু মধুর, তা রয়ে সয়ে ভোগ কর। তাহা হইলে যদি "Land of mid-night sun" ছাড়াইয়া আসিয়াছি, তবে আর তাহা সুসঙ্গত হইবে না, মনে করিয়া, এটাকে 'সুইডেন ভ্রমণ' নামেই অভিহিত করিলাম।

ভোরের বেলা ডেকে আসিতেই সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে, ঐ Stockholm এর বন্দর দেখা যাইতেছে। মনটা খুসী হইল না। এক রাজধানীর ধাক্কা সাম্‌লাইতে না সাম্‌লাইতেই আবার আর একটা রাজধানী! কিন্তু উপায় নাই! পয়সা দিয়া যখন পরাধীনতা

পুরাতন রাজভবন

স্বীকার করা গিয়াছে, তখন অকারণ মন খারাপ করায় লাভ কি আছে? দিলদরিয়া করিয়াই দেখা যাক্।

এখানকার পুরাতন রাজভবন না কি, এ ঘাট হইতে বহুদূরের পথ। আগন্তুকদের যখন সেটা দেখিয়া যাইবার দস্তুর আছে, তখন আর কুক-কর্ত্তা কি আমাদিগকে রেহাই দিবেন? বিশেষ সে হর্ম্যশ্রেষ্ঠের তিন কুড়ি চারটি কাম্‌রার ভিতরকার কারুকার্য্য না কি প্রত্যেকটির বিভিন্ন প্রকার;
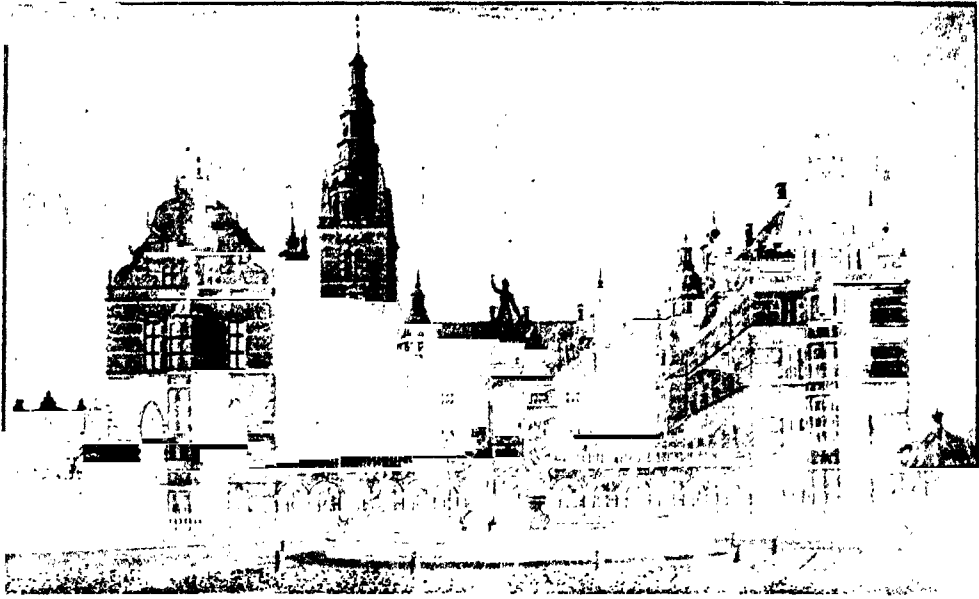
আমাদিগকে, দেখিবার মত দেখাইবে কি? শুনিলাম এর পর সুইডেন (Sweeden) আমাদিগের সাক্ষাৎকারের জন্য সম্মুখেই দণ্ডায়মান আছে, কেবল এই জলটুকু ব্যবধান। কাপ্তান সাহেব যেন ভদ্রতার অনুরোধেই তরীর হাল সে-মুখো করিয়া দিলেন। Norway দেখিতে আসিয়া যদি ফাঁকতালে আর একটা রাজ্যও দেখা যায়, তা মন্দ কি? তবে এখানকার বৃত্তান্ত দিয়া "নরওয়ে ভ্রমণ" বলিলে

তা কি না দেখে থাকা যায়। বর্ণনা ব্যাপারটায় মুখপরম্পরায়, বিকৃতিলাভের সম্ভাবনা থাকায় উপরিউক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য প্রত্যক্ষগোচর না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যয় করিতে ইচ্ছা হইল না। দূর হইতে যেমন সকল রাজপ্রাসাদেরই চূড়া দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

তোরণ-দ্বারে প্রবেশ মাত্র প্রহরিগণ, প্রস্তরবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া, আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইল। গুরুগম্ভীর শব্দে আমাদের শকট সকল, তত্রস্থ পাষাণনির্ম্মিত প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিরাট দৃশ্য সন্দেহ নাই। প্রথম প্রকোষ্ঠের ভিতর পদার্পণ করিতেই দেখি, ইহার চতুঃসীমার প্রাচীরের গায়ে, ছাদে এবং মেজেতে, তদানীন্তন সমাজ ও রাজনীতিমূলক চিত্র ও মূর্ত্তি সকল অঙ্কিত আছে। কিন্তু এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় করাইয়া দিবার মত প্রচারক তখনও আমাদের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন নাই। সে ব্যক্তি বোধ হয় কামচারী, তাই মনন মাত্রই আসিয়া দর্শন দিলেন। আজ তাঁকে নইলে নয়, তাই তাঁকে বড় বন্ধু বলিয়া মনে হইল। কুঠরীর পর কুঠরীর কারিগরি, চিত্র হইতে চিত্রান্তর, ক্রমশঃ প্রকাণ্ড। ইহাদের গঠনের নব নব ধারা যখন মনকে বড়ই আনন্দিত করিতেছিল, এমন সময় আচম্বিতে সকল সৌধচূড়ামণি, তাজ-গরবিণী আসিয়া চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তুলনার কথা কাণে তুলিয়া সব ভণ্ডুল করিয়া দিল। আর কিসের কলা! কিসের কৌশল! কার কাছে কি? তোমরা হয়ত বলিবে, সে হ'লো সৌখীন বাদসাহের প্রেয়সী বেগমের সাধের অন্তিমশয্যা! আর এ হ'লো শিক্ষিত সম্রাটের নিজ বাসোপযোগী প্রাসাদ! তা হবে।

অতঃপর আমাদের সেই প্রজ্ঞাবান্ প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রচার-কার্য্য পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল, আমরাও অবসর-

রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার
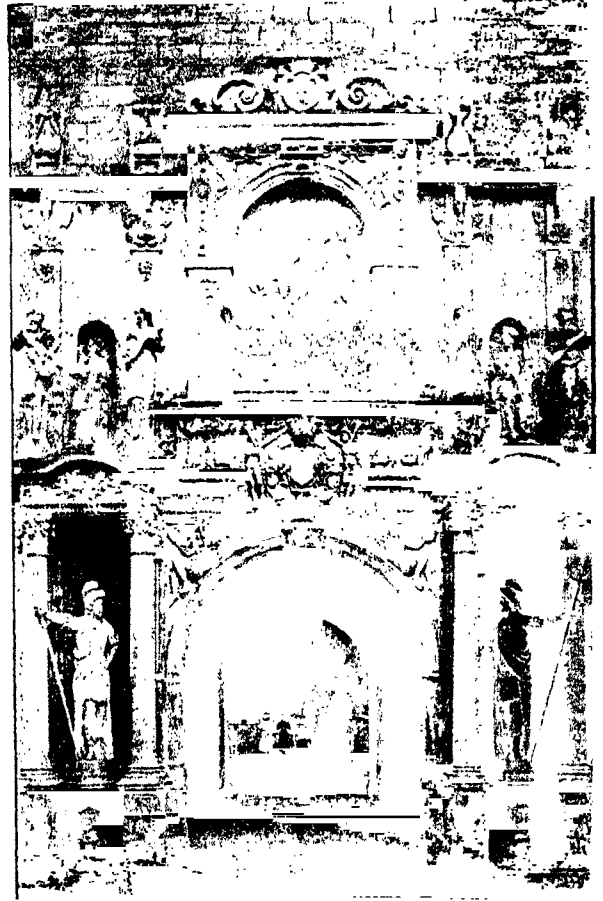
মত তাহা অবধান করিতে অন্যথা করিলাম না। কিন্তু ও সব দেখিয়া শুনিয়া আর বাহবা দিতে পারা গেল কৈ? বড় জোর "বেশ" বলা পর্য্যন্তই শেষ। পদযুগল ক্রমশঃই ক্লান্ত হইতে লাগিল, শেষাশেষি যেন তারা যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছিল। ফল কথা, এমন সব জায়গা এক বেলায় কাজ-সারা-গোছ দেখায় হয় না। তবে সন্ধ্যার প্রাক্কালে, রক্ষককে যখন মাঠ ঘাট ছাড়াইয়া, পশুপালকে বাড়ীপানে ধাওয়াইতে হয়, তখন এই রকমই ছুটোপুটি করিতে হয় বটে।

আরও এক কথা, একটি দুইটি নয় চৌষট্টিটি ঘর! দরবার হলে গিয়া দেখি, তাহাতে বিচারকের আসন হইতে, বিলাসোচিত নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থাও রহিয়াছে। বুঝি বা তাবৎ দিনের বৈষয়িক কর্ম্মের কঠোরতার মধ্যে, রজনী-

দরবার হল
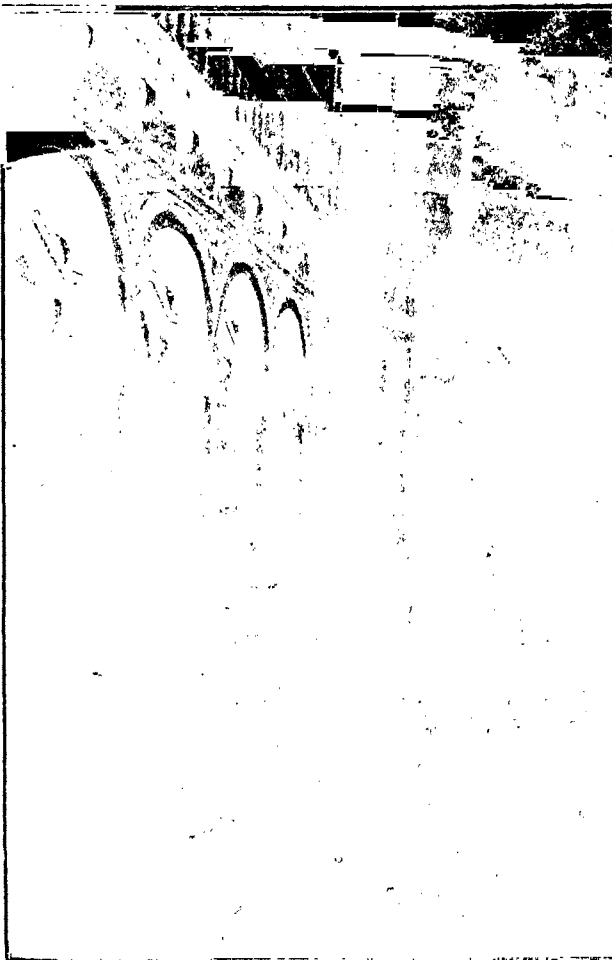
যোগে উৎসবানন্দ উপভোগের উপাদান লক্ষ্য করিতে লাগে ভাল। ধর্ম্মালয়ের ধর্ম্মাবতারের মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। মানবের দুঃখে দুঃখী যীশুর ম্লানমুখে, আনত চক্ষে, বক্ষে, শিল্পী যে কারুণা ফুটাইয়া দিয়াছেন, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। একটি গবাক্ষ হইতে ইহা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলাম আজ তাঁর মৃত্যুতে তিনি সফল-মনোরথ হইয়াছেন কি? জীবের দৈন্য ঘুচিয়াছে কি?

এ গির্জ্জার দেওয়ালের গায়ের স্বচ্ছ কাচের ভিতরে, যে চমৎকার চিত্র সমুদায় অঙ্কিত রহিয়াছে, অধুনাতন তদ্দেশীয় শিল্পীদিগের নাকি সে নৈপুণ্য সম্পূর্ণ অবিদিত। এজন্য আমাদের এই গুণজ্ঞ গুরুমহাশয় মাঝে মাঝে বড়ই মর্ম্মপীড়া অনুভব করেন, বলিলেন।

এই হর্ম্ম্যমালা পরিদর্শনান্তর Hamletএর সমাধিস্থানের উদ্দেশে ধাবিত হইতে হইবে, এরূপ আভাস পাওয়া গেল। দেখা যাবে, অমন প্রখ্যাত পুরুষের শেষ পরিণতির অবস্থাটা কি? নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে জলযোগের সময় হইল, এবং তৎক্ষণাৎ একটি একতালা হোটেলের আশ্রয়

লওয়া গেল। এটি হোটেলের মত হোটেল বটে। ইহার ভিতরকার বৃহৎ ব্যাপার দেখিয়া তাজ্জব হইলাম। জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে, এ ঘরটিতে সহস্র লোকের স্বচ্ছন্দরূপে আহারে বসিবার মত ব্যবস্থা আছে। পরিবেশকগণ এক দিক্ হইতে অন্যদিকে টেলিফোন্ যোগে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। আহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর বিশেষ কিছু পার্থক্য বোঝা গেল না। সেই একঘেয়ে রকমের রান্না। এ সব দেশের দুগ্ধপক্ক মিষ্টান্নের সঙ্গে সঙ্গে, শর্করা পরিবেশনের প্রথা দেখিয়া, আমাদের মত আদত সুধারসক্ত জনের বিশেষ বিরক্তি বোধ হইত। মিষ্টদ্রব্যে মিষ্টতার অভাব আমাদের যেন অসহ্য বোধ হয়।

এদের আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রচুর পরিমাণে থাকে, কিন্তু কোনটাতেই জিহ্বার আসক্তি দেখাইতে পারে না। এসব সংযমের ফলে স্বাস্থ্যরক্ষার যে সহায়তা হয়, তাতে আর সন্দেহ কি আছে? প্রত্যহ প্রাহ্নে মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে এবং সায়াহ্নে এত মহাভোগের আয়োজন সত্ত্বেও কাহারও কোনরূপ শারীরিক উদ্বেগ-ভোগের চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না, এ কি কম কথা! কিন্তু অত্যাহার-বিধির বিধান মানিয়া চলা আমাদের দেশের পদ্ধতি নয়। এজন্য খাদকেরা যত না দায়ী, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর প্রবর্ত্তকেরা তদপেক্ষা বেশী দায়ী নয় কি? আমাদের যত কিছু উপাদেয় সামগ্রী, প্রায় সকলই স্বাস্থ্যনাশের উমেদারী করে। কাজেই আমরা নাচার।

সমুদ্রের তীরেই এই পান্থশালাটি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। জলনিধিতে নিমজ্জন সুখ-লালসায় স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে বিস্তর লোকের সমাগম দেখিলাম। গঙ্গার ঘাটে অহরহঃ এ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সে অবগাহনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র বলিয়া, আমাদের সলজ্জ চক্ষুকে মোটেই পীড়িত করে না। পাশের ঘরে গীত-বাদ্যের চর্চ্চা চলিতেছিল। গায়িকার সুমধুর কণ্ঠস্বরে যেন সে অট্টালিকা পুলকিত এবং তন্মধ্যস্থিত ভূতগ্রাম অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। ভাবিলাম, যার কণ্ঠে এত মধু ঝরে, সে না জানি কিরূপ? এ গলা কি ঈশ্বর-প্রদত্ত? না আধার গুণে সাধায় এতটা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে? কবিগণ বলিয়া গিয়াছেন "প্রকর্ষমাধারবশংগুণানাম্"। সে যাহাই হউক, এটা যে বেশ উঁচুদরের গান (high-class singing") তা'ত শ্রোতাদের ভাবগতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। এস্থলে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য high-class music or singing, দুই একবার বই শোনা ভাগ্যে ঘটে নাই বলিয়া আজ এ গানের রসাস্বাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলাম।

এ বিষয়ে পাকা সমজদার না হইলে, পাছে, অজ্ঞতা-নিবন্ধন অস্থানে অসামঞ্জস্য ভাবের প্রশ্রয় দিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ি, সে আশঙ্কাও যথেষ্ট ছিল। আবার পরের হাসায় হাস্য, বা পরের কাঁদায় কাঁদিতে যাওয়াও কম বিড়ম্বনা নয়। কি করি! যখন সে গানকর্ত্রীর সাক্ষাৎ দর্শন-লাভ হইল, তখন তথাকার শ্রোতৃবর্গের নিস্তব্ধ নিঃস্পন্দ ভাব দেখিয়া, অনুমান করিয়া লইলাম যে, সে কণ্ঠে তবে তৎ-কলাসম্ভূত বিশেষে কোন কারদানি আছে; অতএব অবাক্ হইয়া স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান থাকাই শ্রেয়ঃ। তারপর, গান-শোনা শেষ করিয়া, পদব্রজেই আমরা সকলে হেম্লেটের গোরস্থানের দিকে রওনা হইলাম। কুক্ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী স্বয়ং আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। অমন স্থানে যাইতে হইলে, স্বভাবতঃই মনটা নম্র হইয়া আসে, ভবলীলার অনিত্যতা স্মরণে জাগে; মৃত্যুর মহিমায় আর বাহিরের আনন্দ-উল্লাসে মতি থাকে না।

আমরা যে পথ ধরিয়া চলিলাম, তাহার দুই পাশেই সারিবাঁধা সরল বৃক্ষ সকল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দিনটী বড়ই পরিষ্কার ছিল। একটু পথ চলিতেই, আমাদের মালিক একটি ভগ্নাবশেষ ইষ্টকের স্তূপের নিকট শান্তভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁর অনুযাত্রিগণও সেই প্রকার দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন; তখন তিনি সসম্ভ্রমে হস্ত-প্রসারণপূর্ব্বক, সেই বল্মীক-সদৃশ পদার্থটিই যে সর্ব্বজন-বিদিত মহামতি হেমলেটের ভূশয্যার উপরে স্থাপিত, ইহা নির্দ্দেশ করিলেন। প্রথমে একটু বিস্মিত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে কোন কোন নষ্টবুদ্ধি দর্শকের মনে ইহার সত্যতা বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মিল কিন্তু এত বড় অবৈধ কথাটা বলিয়া ফেলিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না। কেবল কাণাকাণিই সার হইতেছে দেখিয়া, খোস মেজাজী আমার অগ্রজ এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার আপনি লইলেন। তখন তিনি পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে ভাই! যথার্থ বল দেখি, এইটি তাঁরই সমাধি নাকি?

না লোকের চোখে ধূলি দিবার জন্ত এ তোমাদের নিজের মনগড়া কিছু?" তখন সে ভদ্রলোকটি হাসির চোটে কথাটা একদম চাপা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দাদাও আমার নাছোড়বান্দা, তাঁর কথার জবাব না দিলে চলিবে না। তখন সে ব্যক্তি, আমাদের মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিবার কোন বিহিত কারণ না পাইয়া, একটু কৃত্রিম রোষভরে বলিলেন—"এ তোমাদের জুলুম! যাই বল, নিজ চক্ষের দেখা নয় যখন, তখন শপথ করিয়া বলি কেমন করে, তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কইতে চাই"। "অভ্যর্থনৈব ইয়ং তে প্রার্থনাং মন্থে" বলিতে গিয়ে ত বাক্যজড়তায় আমি একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম। তিনি প্রথমেই বলিলেন যে, তিনি অল্পদিন হইল, স্বামি-বিয়োগে একটু চঞ্চল হইয়া, দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁর হীরা-মুক্তায় জড়িত বেশভূষা দেখেই ত আমার চোখ্ দুটো বিগ্‌ড়ে গেল। তবে মুখখানি করুণরস মিশ্রিত দেখিয়া, কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। ইংরাজীতে যাকে বলে,

হেমলেটের সমাধি

বল দেখি। আমরা শিষ্টাচারের অনুরোধে, সে সমাধিতেই হেমলেটের নশ্বর দেহের অবশেষ আছে মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, মৃতদেহের নামে এ নষ্টামি কিন্তু আমাদের দেশের লোকের কল্পনায়ও আসে না। সত্যপরায়ণ সভ্যদেশেরই এ সব সাজে। আজিকার দেখার পালা এখানেই শেষ হইল। আমরা একটু ক্ষুণ্ণ মনেই বাসভবনে ফিরিয়া আসিলাম। সহরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যা কিছু নয়নাভিরাম সমুদায়ই দেখিলাম।

জাহাজে আজ কদিন ধরিয়া, একটি বর্ষীয়সী রমণী আমার সঙ্গ লইয়াছেন—কি মনে করিয়া তা বলিতে পারি না। আমি যেখানে যাই, তিনি নির্নিমেষ-নেত্রে আমায় নিরীক্ষণ করেন। সহসা একদিন একেবারে সম্মুখে আসিয়া, আমার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—"যদি কিছু মনে না কর, তবে

Eccentric; হাবভাবে আমার তাই মনে হইল। আমার আপাদমস্তক শুভ্র বস্ত্রে আবৃত দেখিয়া, আমাকে কুমারী সম্বোধন করিতেই আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া, আমাদের দেশাচারের কথা উল্লেখ করিলাম।

তখন তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন "আমায় তবে তুমি নিশ্চয়ই একটা বিলাসপ্রিয় স্ত্রীলোক ভাবছ, কেমন? আমার একটা ভারি দোষ যে, আমি সমাজের নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে কখনও থাকতে ভালবাসি না; তাই দেখ না, আমি কাল পোষাক পরিয়া নাই। এতে লোকে আমাকে বড় নিন্দা করে, আমার তাতে বড় আনন্দ হয়। আমাদের জাতিটাকে আর আমাদের ধর্ম্মটাকে আমি দস্তুর মত ঘৃণা করি। তুমি শুনলে আশ্চর্য্যান্বিত হবে যে, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না?" আমাদের দেশে নাস্তিক নারী নাই

বলিলেই হয়, তাই তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার একটু কেমন কেমন লাগল। তবে ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষত্বের একটা আকর্ষণ আছে ত? কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, ইনি উচ্চ-কুলোদ্ভবা, সুশিক্ষিতা ; তবে এই গলদ টুকু ইঁহাতে আছে কেন? যাক্, আমি আর বাধা না দিয়া তাঁকে বলিতে দিলাম। তিনি বলিলেন—"আমার স্বামী এখন কোথায় কি ভাবে আছেন, আমার আদৌ এ চিন্তা আসে না, অথচ আমি যে ফের বিবাহ করব, তা মনে কিন্তু আমি তাঁকে কিছুতেই আমল দিতাম না। মাঝে মাঝে ভয় দেখাতেন, বলিতেন—উইলে কিছু দিয়ে যাবেন না। আমি সে কথায় ভ্রুক্ষেপও কর্‌তাম না। লোকটার একটা বড় দুর্ব্বলতা ছিল, আমাকে বড় ভালবাস্‌তেন, তাই আমার এত দোষ সত্ত্বেও আমাকে সব দিয়ে গেলেন। আমি উইল পড়ে লজ্জা পেয়েছিলাম। আজ অবধি তার এক পয়সাও নিজে ছুঁই নাই; আর আমাদের দেশের হিসাবে কোন ভাল কাজেও তা দিই নাই। তোমার হয়ত জানতে
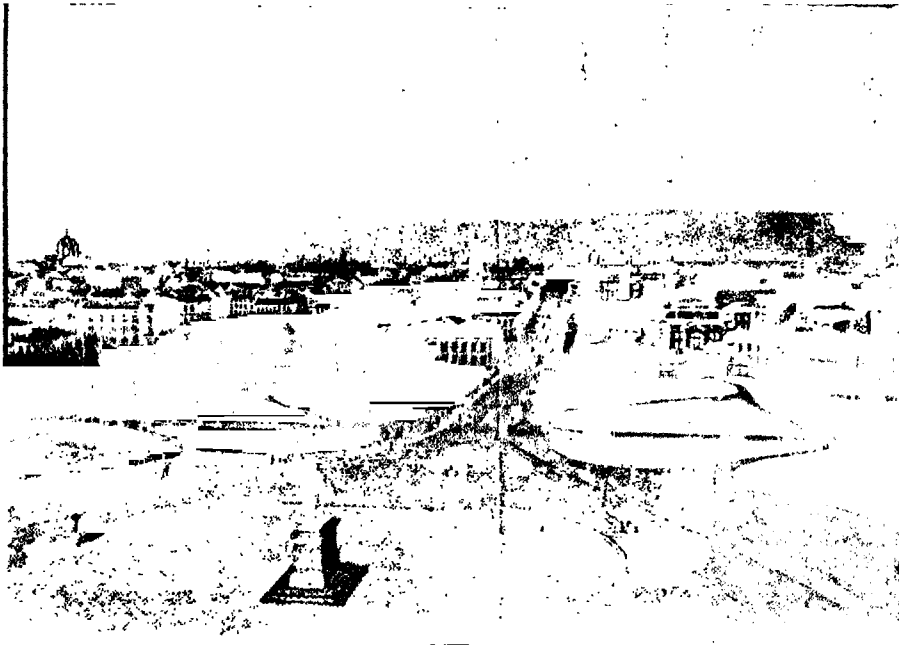
সহরের দৃশ্য

করো না! আমার স্বভাব-দোষে বন্ধুজন বড় জোটে না। এই দেখ না, এত লোক আছে, আমি তবু কেমন তফাৎ তফাৎ থাকি। আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একদম একা কাটাই। খাই দাই, বেড়াই,—সব আপন মনে। স্বামী যখন ছিলেন, আমার এই একাকেরা স্বভাবে তিনি ভারি বিরক্ত হইতেন। আমি যে কেন বিয়ে করেছিলাম, তাই ভাবি। লোকটা নেহাৎ আমায় দেখে ক্ষেপে গেলেন। আর মানুষটাও ছিলেন ভারি ভণ্ড, আর ধূর্ত্ত; তাই দেখে আমার তাঁর প্রতি একটা খেয়াল চাপল। গির্জ্জায় নিয়ে বিয়ে কর্ত্তে দিলাম না; আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে, মন্ত্র পড়তে পার্‌ব না, হলপ করে বল্লুম। তিনি হেসে রাজি হলেন। বিয়ের পর তিনি বেঁচে ছিলেন বছর দশেক, কৌতূহল হচ্ছে, যে সে টাকাগুলি কি করলাম? তোমাকে ডেকে যে আজ এসব কথা কেন বল্‌ছি, তা নিজেই জানি না। বোধ হয় এত দূরদেশের লোকের সঙ্গে এর আগে কখনও আমার দেখা হয় নাই, তাই তোমার সঙ্গে পরিচয় কর্‌বার জন্যে আমার মনে একটা অসম্ভব আগ্রহ হয়েছিল; কিন্তু সাহস পাই নাই। আর একথাও মনে হয়েছিল যে, যদি তুমি আমার ভাষা না জান।" এই বলেই "আজ এ পর্য্যন্তই" বলে তিনি আপনার আরাম-কেদারায় মুখখানা রুমাল দিয়া ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। এমন কোন খাপছাড়া কথা পাইলাম না যে, তাঁহাকে খেপা ভাবিব। ও রকম খামখেয়ালী বলেই বোধ হয়, ওঁর সঙ্গে আরও কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইল।

সুযোগ পাইলেই আবার তাঁহার তল্লাসে আসিব, এরূপ সংকল্প করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলাম। এখন আর আমাদের বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই। সেদিন চলিয়া গিয়াছে।

জাহাজে আমরা তিন শত আশী জন আরোহীর মধ্যে কত দেশী লোকই যে ছিলাম, তার ঠিকানা নাই। প্রথম দুই চারি দিন কেহ বড় আমাদের কাছে ঘেঁসিত না। কিন্তু তারপর হইতে এই প্রাতঃসন্ধ্যার শুভকামনাসূচক সম্ভাষণ প্রতিগ্রহণ করিতে করিতে আমাদের একেবারে প্রাণান্ত। ইহার একটি গুপ্ত কারণ ছিল। প্রথমে যখন আমরা কৃষ্ণকায় কজন এই জলযানে অধিরোহণ করি, তখন দূর হইতে কুটিল ভ্রূকুটি ভিন্ন আমাদের ভাগ্যে আর বেশী কিছু জোটে নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়া, দূরদর্শী দাদা আমার একটু বড়াই করিয়াই বলিয়াছিলেন, "সবুর কর না, যখন যাত্রীদিগের পদবীর সহিত নামের তালিকা প্রকাশিত হবে, তখন এরাই কেমন উল্টা সুর ধরবে"। এই পদোপাসক জাতটা আগন্তুক হইতে পরম আত্মীয় পর্য্যন্ত কেবল লোকের খেতাব-মাফিক খাতির করে। বস্তুতঃ কার্য্যেও তাহা দেখিয়া ভাবিলাম—ভাগ্যে ভগবান্, সম্প্রতি তাঁর কোনো ছেলের কৃষ্ণ নামের আগে পাছে, গোটাকতক বাছা বাছা বর্ণের বিনিবেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই চটকে আমরা উজ্জ্বল হইয়া উঠিলাম।

সে

[শ্রীমতী প্রীতিময়ী রায়]

সে যে ছিল অমরার পারিজাত ফুল ;
  সে যে পথহারা ছেলে
  এসেছিল পথ ভুলে,
ফুল্ল সে সুষমারাশি ভুবনে অতুল।
  মরি, মরি, কিবা শোভা
  জগ-জন-মনোলোভা,
নয়নে মাধুরী-মাখা, কুসুমের রাশি ;
  সে বুঝি গো মৃত্যুঞ্জয়,
  মরণেও নাহি ভয়,
অন্তিমেও শিশুমুখে কি মধুর হাসি।
  সে নয়নে কি আশ্বাস ;
  যেথায় তাহার বাস,
সে যেন গো মধুময় চিরসুখে ভরা ;
  তাই সে মধুর হেসে
  মোহন নবীন বেশে
চলিল আপন দেশে সে নহে ত ধরা।
  সেথা নাহি কোন দুখ,
  সে যে চির পূর্ণ সুখ
সেথা সিংহাসনে বসি দেব বিশ্বনাথ
  পাতিয়া স্নেহের কোল
  মুখেতে মধুর বোল
ডাকিছেন স্নেহস্বরে বাড়াইয়া হাত।

ত্রিবেণী

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত]

শরৎ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "নির্ম্মলা!"—

নির্ম্মলা কথা কহিল না; হাতে একটা সেলাইয়ের কাজ ছিল, অন্যমনস্কভাবে তাহাই বারংবার উল্‌টাইতে লাগিল।

শরৎ একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, নির্ম্মলার কণ্ঠ বাহুদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, আবার মৃদুতর-স্বরে ডাকিল "নির্ম্মল্"—

তখন নির্ম্মলা তাহার প্রশান্ত নয়নদ্বয় স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—

"আমার কথার উত্তর দাও নাই ত!"—

"উত্তর দেওয়ার অবসর কই, নির্ম্মল?"—

"ছিঃ, এমন কেন তুমি!"—

"কি আমি, নির্ম্মল?"—

"আমি একাই তো তোমার কাছে সবটুকু চাহি নাই,—আমাকে কেন সবটুকু দিবে?"—

"সেই এক কথা,—আবার!"—শরতের কণ্ঠস্বর উত্ত্যক্ত অপরাধীর মত!

"তুমি রাগ করিও না, একটু ভাবিয়া দেখ!"—নির্ম্মলা কথা কয়টি বলিয়া স্বামীর স্কন্ধে মুখ রক্ষা করিল।

শরৎ কি একটু ভাবিল, তারপর কহিল, "দেখ নির্ম্মলা, একটু তৃপ্তির জন্য যখনি তোমার কাছে আসি, তখনি যদি তুমি এমনি করিয়া আমাকে আঘাত কর, আমি না হয় আর আসিব না"—নির্ম্মলা স্বামীর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া, কহিল, "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! আমি তোমাকে আঘাত করিবার জন্য কিছু বলি নাই; তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, তাহার একটুকু অংশ দিদিকে দাও, তাহা হইলেই আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকিবে না!"—

নির্ম্মলার কণ্ঠ হইতে বাহু শ্লথ করিয়া লইয়া, শরৎ একটু রুক্ষভাবে কহিল,—"তুমি আমাকে কর্ত্তব্য শিখাইতেছ, নির্ম্মলা"—নির্ম্মলা দেখিল, শরৎ ক্রমেই রুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তখন সে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল; কহিল, "তোমার পায়ের ধূলি আমি; ভালবাস, তাই প্রশ্রয় পাইয়াছি। ক্ষমা কর!"—নির্ম্মলা কাতরভাবে শরতের পদস্পর্শ করিল। শরৎ বুঝিতেছিল, সেই অন্যায় করিতেছে! কিন্তু যে কাপুরুষ হয়, সে যাহার প্রতি অন্যায় করে, তাহাকেই আঘাত করিয়া, নিজের অন্তরকে বুঝাইতে চাহে, যে, সে ঠিকই করিতেছে।

শরৎও নির্ম্মলার অন্তরে আঘাত দিয়া, নিজের কুণ্ঠা ও দৈন্যকে ঢাকিতে চাহিল।

উত্তর না পাইয়া নির্ম্মলা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"বল, ক্ষমা করিলে?"—

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার দুই বাহু বক্ষসম্বদ্ধ করিয়া, কহিল, "নির্ম্মলা, শোন, আজ বলিব! আমি এমন হৃদয়হীন নহি যে, তোমার নিঃস্বার্থ ভাবটিকে উপলব্ধি করিতে পারি না; সব পারি, সব বুঝি, কিন্তু উপায় নাই। যৌবনের আরম্ভের দিনে যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, আজ আর তাহাকে ফিরাইবার উপায় নাই। যে প্রেম নিজ হইতে হৃদয় গলিয়া বাহির হইয়া না আইসে, তাহা কৃত্রিম। প্রেমাভিনয় করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তি আমার নাই। তাহাতে সেও সুখী হইবে না,—আমিও সুখী হইব না"—শরৎ এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, সে মুখে একটি বিষাদ-ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; কপোলদ্বয় প্লাবিত করিয়া, অশ্রু নামিয়া আসিয়াছে।

নির্ম্মলা মৃদুকাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সে তাহার ব্যর্থ নারী-জীবন লইয়া কি করিবে, যদি তুমি তাহাকে ভাল না বাস,—তাহাকে হৃদয়ে স্থান না দাও?"—

নির্ম্মলার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠের এইমৃদু আক্ষেপোক্তিটি শ্রবণ করিয়া শরৎ বিস্মিত, স্তব্ধ হইল।

শরৎ ভাবিল, এই নারী কি, দেবী না মানবী, যে এমন করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব অংশ করিয়া লইতে চাহে, বিলাইয়া দিতে চাহে!

শরতের প্রত্যেক ভঙ্গির মধ্যে একটি অকরুণ ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। তাহার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন কঠিন হস্তে মুঠা করিয়া ধরিয়া একবার সবলে নাড়িয়া দিল। তাহার চিন্তা ও কল্পনার স্রোত হঠাৎ এমন এক স্থানে আসিয়া থামিয়া গেল, যেখানে সে আর কোনমতেই একটি শ্রেয়ঃ পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

নির্ম্মলার কথার কি উত্তর সে দিবে? শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই দেবীরূপা নির্ম্মলাকে একটু পূর্ব্বেই সে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল!

তখন শরৎ আবার নির্ম্মলার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; আবার তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"তুমি কি করিতে বল, নির্ম্মল?"—

নির্ম্মলা তাহার বাষ্পব্যাকুল দৃষ্টিটুকু একবার শরতের মুখের উপর স্থাপন করিল; —তারপর স্বামীর প্রেমোদ্বেলিত বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রুরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

"শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দুই বাহু বক্ষসম্বদ্ধ করিল।

শরৎ নির্ম্মলাকে তাহার উচ্ছ্বসিত বক্ষের কাছে চাপিয়া ধরিল, সেই কুসুমপেলবা নারীর স্নিগ্ধ স্পর্শ তাহার সমগ্র অনুভূতিটুকুকে আচ্ছন্ন, পরিমূঢ় করিয়া তুলিল।

এ কি সুখ? এ কি দুঃখ? এ কি তৃপ্তি?—কি এ?

শরৎ কিছুই বুঝিল না;—শুধু তাহার স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেই বক্ষবিলগ্না নারীর দিকেই একান্তভাবে ফিরিয়া আসিল।

তারপর ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুর্দ্বয় আপনা হইতেই মুদ্রিত হইয়া আসিল।

[২]

দ্বিতলের ছোট একটি কক্ষের মধ্যে দুইটি রমণী উপবিষ্টা ছিল। একজন নির্ম্মলা,—অপরা তাহার দিদি, উৎপল!

হাতের সেলাই বন্ধ করিয়া উৎপল কহিল, "নির্ম্মল, তুই কি আমাকে স্থির থাকিতে দিবি না?"—

"কেন, কি করিয়াছি আমি?"—নির্ম্মলার মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল; সে তাহা চাপিয়া গেল,"তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক কাড়িয়া লইতেছি না ত?"—

"যে দিন মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিকই তুই কাড়িয়া নিতেছিস্, সে দিনও প্রাণে যে শান্তিটুকু ছিল, আজ যেন তাহাও নাই মনে হইতেছে।"—

নির্ম্মলা চাহিয়া দেখিল, উৎপলের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে; তাহার স্বর গাঢ়; বক্ষ আবেগ-কম্পিত!

নির্ম্মলা উৎপলের দিকে সরিয়া আসিয়া তাহার শিথিল-বিন্যস্ত দক্ষিণ হস্তখানি নিজ প্রকোষ্ঠ মধ্যে গ্রহণ করিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি"—

"কেন ?"—

"অপরাধ করিয়াছি ?"

"তুই সতীন্, এমন কেন তুই, নির্ম্মল ?"—

"দিদি !"—

"কি ?"—

"স্বামী ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাঁহাকে যদি সকলেই ভালবাসে, বড় সুখের নহে কি ? সতীনই স্বামীকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা সতীন প্রিয় নহে কেন ?"—সতীনের মুখে উৎপল এ কি শুনিতেছিল ! কি ত্যাগের মহামন্ত্র এই !

"আমরা দুই ভগিনী যদি তাঁহাকে যত্ন করিতে পারি, সুখী করিতে পারি, তার চেয়ে আর সুখ কি আছে, দিদি ?"—

"তাই বলিয়া পাগলি, সতীন্‌কে ভাগ দিবি ?"—

"কার ভাগ কে দেয়, দিদি ?"—

"তুই তো সবই পাইয়াছিলি"—

"তোমাকে বঞ্চিত করিয়া,—ছিঃ !"—

"তিনি তো আমাকে ভুলিয়াছিলেন, তুই কেন তাঁহাকে এমন করিয়া ফিরাইলি ? যে উৎসমুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তুই কেন জোর করিয়া সেখানে প্রবাহ আনিতে চাহিতেছিস্ ?"—

"প্রবাহ যদি আসে সৌভাগ্য মনে করিব"—

"মিথ্যা কথা, প্রবাহ আসে না, কর্ত্তব্যের তাড়নায় শুধু অন্তরকেই ক্লিষ্ট করিয়া তোলা হয় ;—নির্ম্মল, তুই আমাকে রক্ষা কর ! তাঁহাকে এমন করিয়া জ্বালাইয়া লাভ কি ?"

নির্ম্মলা কথা কহিল না। এমন সময়ে কক্ষদ্বারে শরৎ আসিয়া ডাকিল,

"নি—উৎপল !"—

উৎপল জানিত নির্ম্মলার অপার্থিব ত্যাগের মহিমা স্বামীর মর্ম্মবীণায় এমনি একটি অননুভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, যাহাকে তিনি নিশিদিন অন্তরমধ্যে অভিনন্দন করিতেছিলেন। যে প্রেমপ্রবাহ সহজগতিতে নির্ম্মলার দিকেই প্রধাবিত হইতেছিল, তাহাকে কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্য দিয়া ফিরাইয়া লইয়া উৎপলের দিকে আনিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলেন !

যে আহ্বান নির্ম্মলার জন্যই হৃদয়মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে উৎপলের দিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য শরতের যে কৃত্রিমতাটুকু অবলম্বন করিতে হইল, সে কৃত্রিমতাটুকু উৎপলকে মর্ম্মন্তুদ বেদনায় কাতর করিয়া তুলিল !

স্বামীর আহ্বান শুনিয়া উৎপলের কপোল ও ললাটে শোণিতের একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস খেলিয়া গেল :—তারপরই যে তাহার সমস্ত মুখখানি একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, নির্ম্মলা তাহা লক্ষ্য করিল। শয্যার নিকট হইতে একখানি হাতপাখা টানিয়া লইয়া নির্ম্মলা কহিল, "দিদি, তুমি হাওয়া কর, আমি জলখাবারের রেকাবী খানা লইয়া আসি !"

নির্ম্মলা বাহির হইয়া গেল। উৎপল তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া শরতের কাছে গিয়া দাঁড়াইল ! শরৎ কি ভাবিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া উৎপলকে বুকের কাছে টানিয়া লইল, এবং তাহার কম্পিত রক্তাধরে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

দ্বারের কাছে নির্ম্মলা আসিতেছিল, সে ঈষৎ হাসিয়া দুই পা পিছাইয়া কবাটের অন্তরালে গেল।

[৩]

বাহিরের ঘরে একখানা ছোট টুলের উপর বসিয়া বসিয়া শরৎ ভাবিতেছিল, জীবনটাকে এমন করিয়া সে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে ? এ কি মিথ্যা প্রেমাভিনয় তাহাকে নিশিদিন করিতে হইতেছে ! কোথায় ইহার শেষ ? সাধ্বী নির্ম্মলার কাছে ত্যাগের যে মহামন্ত্র সে শিক্ষা করিয়াছে, তাহা তাহাকে পুড়াইয়াই ছাই করিতেছিল।

তাহার হৃদয়ের উন্মুখ আকাঙ্ক্ষারাশি নির্ম্মলাকেই অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে, কিন্তু নির্ম্মলা তাহার সেই উচ্ছ্বসিত প্রেমকে উৎপলের দিকেই ফিরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ! অদৃষ্টের এ কি নির্ম্মম পরিহাস !

এই পুষ্পপেলবা নারী, কিন্তু কি বিপুল তাহার অন্তরশক্তি ! গর্ব্বিত পুরুষ সে, সে কেমন করিয়া তাহার কাছে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে ?

কিন্তু এমন করিয়া সে কয়দিন বাঁচিবে ? তাহার অন্তর যে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল, বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, সে তাহা কেমন করিয়া রোধ করিবে ?

প্রেমের এই মিথ্যা অভিনয়ে,এই ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনায়, উৎপলও তো শান্তি পাইতেছে না! সে তাহাকে যতটুকু দিতে চাহিতেছে, সেটুকু তো স্বাভাবিক প্রেমাভিব্যক্তির ফলস্বরূপ নহে;—সেটুকু যে অনুগ্রহদান মাত্র! এ দান তাহাকে নিরন্তর ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, সন্ত্রস্ত করিয়াই তুলিতেছে! এ যেন নারীত্বের প্রতি একটা বিষম অপমান! এমন করিয়া উৎপলকে অপমান করিবার কি অধিকার তাহার আছে?

না, সে আর নির্ম্মলার কথায় ভুলিবে না,—তাহার অশ্রুবিন্দু এমন করিয়া আর উৎপলকে অপমান করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে পারিবে না! না—কথনই না!—

ভিতরের দিক্‌কার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে যেন চাবির গুচ্ছ নাড়িয়া মৃদুশব্দ করিল, শরৎ ফিরিয়া দেখিল নির্ম্মলা!

একখানি গরিমাময়ী দেবী-প্রতিমার মত সেই মূর্ত্তিখানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল! শরৎ নিমেষশূন্য নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,—কি সে অনাবিল সৌন্দর্য্য! স্রস্ত কুন্তলদাম তাহার অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; ললাটের পার্শ্বে পার্শ্বে চূর্ণকুন্তল ঈষৎ উড়িতেছিল! আননে তাহার অপূর্ব্ব গরিমাচ্ছটা, অধর হাস্য-বিরঞ্জিত!

শরৎ তাহাকে ঈশারা করিয়া কাছে ডাকিল; নির্ম্মলা কহিল, "সম্মুখের দরজাটা বন্ধ কর, আসিতেছি!"—

শরৎ উঠিয়া সম্মুখের দরজা বন্ধ করিল, তথন নির্ম্মলা কাছে আসিল!

কোমল, কম্পিত কণ্ঠে শরৎ ডাকিল—"নির্ম্মল"—

নির্ম্মলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শরৎ তাহাকে তাহার উচ্ছ্বসিত বক্ষের কাছে টানিয়া লইল!

নির্ম্মলা ধরা দিল;—তাহার পুষ্পদলতুল্য অধরপুটে শরৎ যথন তাহার উষ্ণ কম্পিতাধর স্থাপন করিল, তথন নির্ম্মলার নয়নপল্লব আপনা হইতেই নিমীলিত হইয়া আসিল; সে সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজের অস্তিত্বটুকুকেও বিস্মৃত হইয়া গেল!

শরৎ যে তাহার প্রেমকে কোনও মতেই উৎপলাভিমুখী করিতে পারিতেছিল না, সে যে শুধু নির্ম্মলাকেই সুখিনী দেখিবার জন্য, তৃপ্তা দেখিবার জন্য, তাহার হৃদয়ের সহিত এই উন্মাদ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, নির্ম্মলা তাহা বুঝিত। শরতের মর্ম্মে মর্ম্মে যে অবসাদছায়া তাহাকে ক্লিষ্ট, পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, নির্ম্মলা তাহা বুঝিত! কিন্তু সে যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শরতের দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগকে ত আর কোনোমতেই রোধ করিয়া রাখা যাইবে না; সুতরাং এ সংগ্রামকে তাহার জাগাইয়া রাখিতেই হইবে!

কিন্তু এ সুখ, এই প্রলোভন, কোন্ নারী এমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছে? একখানি প্রেমপূর্ণ হৃদয় তাহার দিকে আপনার সহস্রমুখী উচ্ছ্বাস, আবেগ লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে চাহিতেছে, সে তাহাকে নিষ্ঠুরের মত দুইহাতে ঠেলিয়া ফিরাইয়া দিতেছে! কি নিষ্ঠুর, কি পাষাণী সে!

হে বিশ্বদেবতা, হে নির্ম্মলার অন্তরের ঠাকুর, তুমি তাহাকে শক্তি দাও, বল দাও! স্বামী মুহূর্ত্তের ভ্রমে যে অন্যায় করিয়াছেন, নির্ম্মলা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিবে! সে নারী হইয়া কেমন করিয়া উৎপলকে স্বামীসুখ হইতে বঞ্চিতা করিবে? না, তাহা হইতেই পারে না!

তাহার স্নেহময়ী দিদি উৎপল;—স্বামীর উপর তাহারই তো সর্ব্বপ্রথম অধিকার! সেই সাধ্বী মমতাময়ী নারীকে সে কেমন করিয়া সর্ব্বসুখ বঞ্চিতা দেখিবে?

স্বামীর প্রেমকে সে তো সম্পূর্ণরূপেই নিজের আয়ত্ত করিতে পারিত!

কিন্তু, আনন্দ, তৃপ্তি, সুখ কি শুধু ভোগের মধ্যেই,—না ত্যাগের মধ্যে?

সে কি এমনই হীন, যে ভোগের মধ্যেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ ও তৃপ্তিকে চাহিবে?

স্বামীর প্রেম-বিগলিত আহ্বান তাহার মুগ্ধ শ্রবণযুগলে প্রবেশ করিল, "নির্ম্মল"—

নির্ম্মলার বুকের মধ্যে বড় কেমন করিতেছিল; এই উচ্ছ্বসিত আবেগকে সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? নির্ম্মলা তবু তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিল; এ পরীক্ষা-সমুদ্র যে তাহাকে পার হইতেই হইবে! মৃদু সংযতকণ্ঠে নির্ম্মলা উত্তর দিল, "কি?"—

শরৎ দেখিল, এতটুকু এই উত্তরটুকু; নির্ম্মলা ইচ্ছা করিলে ইহারই ভিতর দিয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগকে, প্রেমকে আকারের সার্থকতা প্রদান করিতে পারিত!

হায়, নির্ম্মলা কি সত্যই পাষাণ-প্রতিমা? তাহার

নিবেদিত প্রেমটুকু কি চিরদিনই এমনি অপরিগৃহীত, অস্বীকৃত রহিবে!

শরৎ বেদনাপূর্ণ স্বরে কহিল, "কি করিলে তোমাকে সুখিনী দেখিব, তৃপ্তা দেখিব, নির্ম্মলা?"—

নির্ম্মলার বুকের মধ্যে একটি প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল;—তাহা তাহার অন্তরদেশকে বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত করিতেছিল!

কিন্তু আজ ত সে কিছুতেই কাতর হইবে না!

নির্ম্মলা কহিল, "দিদিকেও যেদিন এমনই করিয়া ডাকিবে, বুকের কাছে টানিয়া নিবে, সেই দিনই আমি সুখী হইব!"—

শরৎ বিস্মিত, স্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ এক বিপুল আবেগে কম্পিত হইতেছিল, সে সেই আলিঙ্গন-মুক্তা নারীর দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একবার চাহিল, তারপর অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে কহিল,—"কি তুমি, নির্ম্মলা, দেবী, না রাক্ষসী"—

"আমি তোমারই" নির্ম্মলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শরৎ কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল!

তখন নির্ম্মলা সেই কক্ষের মধ্যেই লুঠাইয়া পড়িল!

তাহার হৃদয় আজিকার এই সংগ্রামে বিধ্বস্ত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল সত্য সত্যই কি সে রাক্ষসী!

(৪)

সে দিন প্রভাতের বহুপূর্ব্বে নির্ম্মলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্র তখনও আকাশে হাসিতেছিল। উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া দুই একটী ক্ষীণ রশ্মি নির্ম্মলার নিঃসঙ্গ শয্যাখানির উপর পড়িয়াছে; সে আলোকটুকুতে কক্ষটীকে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে নাই। মেঘকৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ডের উপর কনক নিকষ রেখার ন্যায়, অন্ধকারপূর্ণ কক্ষের মধ্যে সেই আলোকরশ্মি বড় শোভা পাইতেছিল।

নিদ্রাভঙ্গের পর নির্ম্মলার হৃদয়তন্ত্রী বড় একটা করুণ সুরে বাজিতেছিল। তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা, বেদনা, মান, অভিমান, কিছুরই আর স্থান ছিল না। 'ভাদরের' কুলপ্লাবিনী তরঙ্গিনীর মত, সেই মুহূর্ত্তটিতে তাহার হৃদয়খানি উচ্ছ্বাসে, আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অস্তিত্বটুকু যেন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; শুধু একটি উন্মুখ আগ্রহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া, ছাপাইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে!

বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির দিকে নির্ম্মলা চাহিয়া দেখিল; সেখানেও বিপুল পরিপূর্ণতা, একটি একমুখী উন্মুখ আগ্রহ সমগ্র বিশ্বসৌন্দর্য্যকে সার্থকতা প্রদান করিতেছে!

নির্ম্মলা ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইল!

চন্দ্রমাশালিনী যামিনী! দুঃখের পাশে সুখের হাসিটুকুর মত, ছায়ায় ও আলোকে বাহিরের দৃশ্যপট আবৃত রহিয়াছে।

নির্ম্মলা একখানি ছোট টুলের উপর বসিল। রেলিংএর পাশে পাশে সাজানো টবগুলির মধ্যে ফুলের গাছ ছিল; তাহাতে দুই একটা ফুল ফুটিয়াছে। মৃদু পবনস্পর্শে গাছগুলি একটু একটু নড়িতেছিল; ফুলগন্ধ বহন করিয়া, বায়ু নির্ম্মলার চূর্ণকুন্তল উড়াইয়া, তাহার রক্তকপোল স্পর্শ করিয়া, অঞ্চলাগ্রভাগ দুলাইয়া প্রবাহিত হইতেছিল!

উপরে নক্ষত্ররাজি-পরিশোভিত অনন্ত নীলাকাশ; নিম্নে সুপ্তিমগ্না বিপুলা ধরণী!

নির্ম্মলা দেখিল, সেই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কোথায়ও এতটুকু দৈন্য নাই, এতটুকু অসামঞ্জস্য নাই!

মানুষ তাহার আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই দৈন্যকে সৃষ্টি করিয়া তুলে;—সে যে দুঃখ পায়, সে শুধু সে ত্যাগের মধ্যে আনন্দ পায় না বলিয়াই! ঠাকুরের এই সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে, মানুষ—কেন সাধ করিয়া দৈন্যকে আনয়ন করে?

হে বিশ্বরাজ, তুমিই নির্ম্মলার অন্তরকে শান্ত কর, পরিতৃপ্ত কর!

কাহার মৃদুস্পর্শে নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, উৎপল!

—"দিদি!—তুমি এখনি উঠিলে?"—

"নির্ম্মল, ঘুমাও নাই বুঝি?"—

"হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; বড় সুন্দর বাহিরটা, তাই এখানে আসিয়া বসিলাম।"—একটু চুপ করিয়া নির্ম্মলা আবার কহিল,—

—"দিদি"—

"কি নিরু,"—

"তিনি উঠিয়াছেন?"—

"না, ঘুমান নাই বোধ হয়!"—উৎপলের কণ্ঠস্বর একটু ধরিয়া আসিতেছিল।

একটু চকিতভাবে নির্ম্মলা কহিল, "বোধ হয়, সে কি!"—"নির্ম্মল, তুই আমাকে রক্ষা কর; তুই আমাকে রক্ষা কর; তুই আমাকে এ কি পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়াছিস্! নিজের অন্তরের সঙ্গে প্রতিদিন এমন করিয়া সংগ্রাম করিয়া আর পারি না!"—

"কেন, কি হইয়াছে দিদি?"—একটু কুণ্ঠিতভাবে নির্ম্মলা কহিল।

"তুই যে সতীন্, সে পরিচয় তুই দিয়াছিস্!—কিন্তু এমন করিয়া দিলি কেন নিরু! দেখ্ নির্ম্মলা, স্বামীর সুখই আমি চাহি; আমি নিজের সুখ চাহি না! স্বামী সুখী হইয়াছেন জানিলেই সুখী হইব। তুই কেন এমন করিয়া, তাঁহার অন্তরবেগকে ফিরাইতে চাহিতেছিস্? ইহাতে তাঁহাকে সুখী করা হয় নাই; তোর তৃপ্তির জন্য তিনি তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য সকলি বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন;—তুই কি পাষাণী নির্ম্মলা!—না, এমন করিয়া আর আমি তোকে বাড়িতে দিব না।"—

"দিদি, দিদি, ক্ষমা কর দিদি!"—নির্ম্মলার কণ্ঠ আবেগ-রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে ভূ-নত-জানু হইয়া উৎপলের পাদমূলে বসিয়া পড়িল।—এমন সময়ে পার্শ্বে কাহার পদশব্দ শোনা গেল।

উৎপল ও নির্ম্মলা দেখিল, স্বামী। উভয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শরৎ সেই অনাবিল চন্দ্রালোকে দেখিল, উৎপল ও ও নির্ম্মল। এই দুই নারী, উৎপল ও নির্ম্মল, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া জীবনের উষর ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গঙ্গা ও যমুনার পবিত্র ধারার মত ছুটিয়া চলিয়াছে। হায়, সে যদি তাহার প্রেমকে এই দুই ধারার সহিত সম্মিলিত করিতে পারিত!

শরৎ তাহার বাহুদ্বয় বক্ষসম্বদ্ধ করিল। ধীরে ধীরে তাহার নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল।

একটি উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার হৃদয়কে মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কি এই দুর্ব্বার সংগ্রাম, যাহা নিশিদিন হৃদয়কে ব্যথিত, বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত করিয়া দিতেছে!

শরৎ চক্ষু চাহিয়া দেখিল, উৎপল চলিয়া গিয়াছে। আর তাহার সম্মুখে রূপপ্রভায় সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক গরিমা-মণ্ডিত করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, তাহারই চিরঈপ্সিতা দয়িতা, পাষাণী নির্ম্মলা!

শরৎ রাক্ষসের ক্ষুধা লইয়া, বিপুলবেগে সেই বেপথুমতী নারীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; তারপর তাহাকে স্বীয় আবেগোচ্ছ্বসিত বক্ষের কাছে সজোরে টানিয়া লইল!

এই দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাসের মুখে নির্ম্মলা ভাসিয়া গেল; শুধু সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে কহিল,—

"দিদি, স্বামী তোমারই, তোমাকেই দিব।"

[৫]

বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দ্বিতলের একটি কক্ষের মধ্যে একখানি শুভ্র শয্যার উপর নির্ম্মলা শয়ন করিয়াছিল। পার্শ্বে একটি নিদ্রিত ক্ষুদ্র শিশু। একরাশি স্বর্ণচম্পক কে যেন শয্যার উপর ঢালিয়া রাখিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা স্থিরদৃষ্টিতে সেই ক্ষুদ্র শিশুটির মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দুইমাস পূর্ব্বে শিশু যেদিন সর্ব্বপ্রথম তাহার অস্ফুট কাকলী দ্বারা আপনার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, সেইদিন হইতেই নির্ম্মলা পীড়িতা। গত দুইমাসের মধ্যে এমন অনেক মুহূর্ত্ত গিয়াছে, যখন সে জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; প্রত্যেক বারই উৎপলের প্রাণপণ সেবা তাহাকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তবু নির্ম্মলা ভাবিত, এবার বুঝি তাহার ডাক পড়িয়াছে। স্বামীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সে যে তুষানল তাহার হৃদয়ের মধ্যে নিশিদিন প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহারই নিমেষহীন শিখা তাহাকে দিনে দিনে, পলে পলে দহন করিতেছিল,—প্রশান্ত, সুন্দর মৃত্যুর দিকে পথ দেখাইতেছিল।

নির্ম্মলা আপনার অস্তিত্বটুকুকে সম্পূর্ণরূপে উৎপলের মধ্যে লীন করিয়া দিতে চাহিতেছিল;—উৎপল আর সে, গঙ্গা ও যমুনার মত একই ধারায় মিলিত হইয়া, স্বামীকে বেষ্টন করিয়া, যদি বাড়িয়া না উঠিতেই পারিল, তাহা হইলে কোথায় তাহার নারী-জীবনের সার্থকতা? নারীর

প্রেমপূর্ণ হৃদয় লইয়া সে বিশ্বে আসিয়াছে;—ত্যাগের মধ্যে এ জীবনকে নিঃশেষ করিয়া দিয়া, সে কি আপনাকে একটি পরম ও চরম সার্থকতা প্রদান করিতে পারিবে না!

ধীরে ধীরে নির্ম্মলা চক্ষু মুদ্রিত করিল; সুখে ও বেদনার সচেতন একটি কোমলতম সুর তাহার মর্ম্ম-তন্ত্রীতে বড় ধীরে ধীরে বাজিতেছিল। শয্যাশায়িত পুষ্প-পেলব শিশুটি, আজি তাহার নয়নের কাছে একটি নিমেষহীন দীপশিখার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া, তাহাকে তাহার অন্তরের চিরসমস্যার মীমাংসা-পথ দেখাইতে-ছিল।

নিঃশব্দচরণে উৎপল কক্ষমধ্যে আসিল। শিশু জাগিয়া, তাহার হাত-পা নাড়িতেছিল। উৎপল শয্যার পার্শ্বে ধীরে ভূ-নত-জানু হইয়া, বসিয়া সস্নেহে শিশুর ললাটে তাহার বিম্বাধর স্পর্শ করিল। তাহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তাফলের মত গড়াইয়া নামিয়া আসিল। শিশু সেই মৃদু স্পর্শানুভব করিয়া, একটু অব্যক্ত শব্দ করিল। নির্ম্মলা চক্ষু চাহিয়া দেখিল, "দিদি",—তৃপ্তিতে ও আনন্দে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; সে ডাকিল—"দিদি,"—

উৎপল উত্তর দিল না, শিশুকে তুলিয়া বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল।—তাহার নয়নে অশ্রু,—মুখে প্রসন্ন হাসির রেখা। নির্ম্মলা আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, কহিল,

"দিদি"—

"কি, নিরু?"—

"এখন যদি মরিতে পারিতাম, দিদি!"—

"ভাগ্যবতী তুই, এ তোর কি সাধ নিরু!—"

নির্ম্মলার বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বড় ওলট পালট করিতেছিল; সে সেই নিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "দিদি, খোকাকে ত তাঁহার কোলে দিলে না,—"

"তুই সারিয়া ওঠ্—তারপর,"—

"রাণী-দিদির মত বিচার করিও, দিদি! আমি পেটে ধরিয়াছি বলিয়া, খোকা কি বেশী করিয়া আমার?"—

"রাক্ষসি, এমন করিয়া তুই আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছিস্ কেন?"—

"সতীন্ যে!"—নির্ম্মলার পাণ্ডুর অধরে একটি প্রশান্ত নির্ম্মল হাসি বিদ্যুতের মত ক্রীড়া করিয়া গেল।

নীচে শরতের কণ্ঠস্বর শুনা গেল!

নির্ম্মলা কহিল, "খোকাকে তিনি একদিনও কোলে করেন নাই,—বড় সাধ হইতেছে, তাঁহার কোলে খোকাকে দেখিব; দিদি, এ সাধ কি মরিবার আগে পূর্ণ হইবে না?"—

উৎপলের কপোল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল; সে নির্ম্মলার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল—"পাগল আর কি! এবার তোকে মরিতে দিলাম কই?—"

দ্বারের কাছে কাহার পদশব্দ হইল, উভয়ে চাহিয়া দেখিল, স্বামী! শরৎ অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—কি স্বর্গীয় দৃশ্য!

এতদিন যে মোহ, যে অন্ধ আবেগ, তাহাকে নিবিড়-ভাবে বেষ্টন করিয়াছিল, এই নির্ম্মল, পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া, আজি তাহা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। দিনের পর দিন সে এই দুই মহীয়সী রমণীর অপূর্ব্ব অন্তর-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেছিল। নিজের হৃদয়-দৈন্য, দিনে দিনে, পলে পলে, তাহাকে কুণ্ঠিত, পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। আজই সে সর্ব্বপ্রথম নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া অভিনন্দন করিল।

জগতে কোন্ শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এমন একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন?

সে দ্রুতপদে নির্ম্মলার শয্যার দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া উচ্ছ্বসিতস্বরে কহিল, "নিরু, অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর আমাকে!"—

উৎপল একটু অগ্রসর হইয়া, তাহার বক্ষসংলগ্ন শিশুকে স্বামীর প্রসারিত বাহুর মধ্যে অর্পণ করিল।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত কুণ্ঠা, অভিমান, ব্যথা ও বাধা দূর হইয়া গেল। শরৎ অগ্রসর হইয়া নির্ম্মলার ললাটে আবেগতপ্ত ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। উৎপলও একটু নীচু হইয়া নির্ম্মলার কপোলে তাহার বান্ধুলিপুষ্পতুল্য অধরপুট স্থাপন করিল।

নির্ম্মলা সুখের ও তৃপ্তির আবেগে চক্ষু মুদ্রিত করিল, কহিল,—

"দিদি, এবার ত মরা হইল না।"—শরৎ ধীরে ধীরে

উৎপল একটু অগ্রসর হইয়া, তাহার বক্ষসংলগ্ন শিশুকে স্বামীর প্রসারিত বাহুর মধ্যে অর্পণ করিল।

ক্রোড়স্থ শিশুকে উৎপলের ক্রোড় দিয়া বাষ্পজড়িতকণ্ঠে ডাকিল, "উৎপল"—

হায়, আজ কত কথা, কত কাহিনী, কত বেদনা ও উপেক্ষার ইতিহাস যুগপৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

সে অপরাধী,—নির্ম্মলার কাছে অপরাধী, উৎপলের কাছে অপরাধী! স্বেচ্ছায়—অনিচ্ছায় নারী-হৃদয়-রহস্য উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া আসিয়াছে।

উৎপল কোনও কথা না কহিয়া স্বামীর চরণের কাছে মাথা নত করিল; তখন শরৎ সেই অশ্রুমুখী নারীকে তাহার কম্পিত বক্ষের কাছে টানিয়া লইল।

স্মৃতি

[শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী, B. A.]

তোমারি কুঞ্জ কুসুম-মালিকা
পরাব তোমারি গলে,
তোমারি কুঞ্জ কুসুম-কলিকা
দিব তব পদতলে;
তোমারি শূন্য কুটীরের দ্বারে
গায়িব তোমারি গান,
তোমারি নীরব তন্ত্রীর তারে
তুলিব তোমারি তান;
তোমারি রচিত দেব-আলয়ে—
তোমারি স্বর্ণ আসনে,

তোমারি মুরতি স্থাপিয়া হৃদয়ে
পূজিব প্রেমপ্রসূনে;
তোমারি প্রাচীর গ্রথিত দর্পণে
হেরিব তব আনন,
তোমারি বিজন বিরহ-শয়নে
হেরিব তব স্বপন;
তোমারি প্রণয়-স্মৃতি-মধুর,
প্রেমপ্রফুল্ল-আনন,
ধরিয়া হৃদয়ে বিরহবিধুর
যাপিব দীর্ঘ জীবন!

য়ুরোপে তিনমাস

[মাননীয় শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, M. A., L. L. D. C. I. E.]

মঙ্গলবার, ১১ই জুন।—ডাক্তার রায়, বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তজ্জন্য প্রায় সমস্ত দিনই বাড়ীতে থাকি। আজ বিকালে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন দেখিয়া, Cromwell Houseএ Gould সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে যাইলাম। বক্তৃতার বিষয়—"শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি"। "কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ শিক্ষাতে।" গত বৎসর Fox Pitt নামে একব্যক্তি ভারতবর্ষে এই সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। Gouldএর বক্তৃতাও বেশ। সেখান হইতে Mr. Frederick Grubb-এর সহিত তাঁহাদের Temperance meetingএ গেলাম, Lord Rawllan সে সভার সভাপতি। অতএব সভার জাঁক খুব। সভাস্থলে লোকজন উপস্থিতও অনেক। Scotland প্রভৃতি হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছেন। সভাপতি-মহাশয় আমায় কিছু বলিতে অনুরোধ করায় আমি যথাসাধ্য কিছু বলিলাম। ভারতবর্ষে সুরা-রাক্ষসের হচ্চে জয়জয়কার; প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসের দোহাই দিয়া, কখন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে বা সংসর্গে মদ্যপান সম্বন্ধে প্রথা লইয়া, কেহ কেহ যতই বাহাদুরী করুন, বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের জন্য যাঁহারা অন্ততঃ আংশিক দায়ী, তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য না পাইলে, এ রাক্ষসের কবল হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষের রাজপুরুষদের এখন এ বিষয়ে সাধারণের সহিত অধিকতর সহানুভূতি লক্ষিত হইতেছে। এ সময় বিলাতের বিশেষ সাহায্য পাইলে আমাদের এ বিষয়ে শীঘ্র আরও অধিক লাভ ও সুবিধা হইতে পারে এবং ইংরাজ জাতির দোষ ক্ষালনেরও উপায় হইতে পারে, একথা সভাস্থলে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কথায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং যথেষ্ট সহানুভূতির আশা দিলেন।

মিটিং শেষ হইলে বিস্তর সাহেব-মেম আসিয়া, যত্ন প্রকাশ করিলেন। সুখ্যাতির মাত্রাও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালী বাবু, উড়ে বেহারার মুখে ভাঙ্গা-বাঙ্গালা শুনিলে প্রথম প্রথম যেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেন, অপরিচিত বাঙ্গালীর মুখে ভাঙ্গা-ইংরাজী শুনিলে, মহাপ্রাণ ইংরাজদের এখনও সেইরূপ আনন্দ হয়। ভারতবাসী ইংরাজ-দের মধ্যেই 'বাবু ইংরাজী'র লাঞ্ছনা যত শোনা যায়, ইংলণ্ডে তাহা ত নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেকেই আলাপ করিবার জন্য, তাঁহাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য, এবং পুনরায় স্থলবিশেষে বক্তৃতা করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন। সে প্রথম আদর-আপ্যায়নের কথা বলিয়া লিখিয়া, শেষ করিতে পারি না। Shake-hand—Con-gratulationএর ধূমে কিছু বিপন্ন, কিছু অপ্রস্তুত এবং কিছু গর্ব্বিত হইয়া উঠিলাম। সভাভঙ্গের পর সভাস্থ সাহেব-মেমেদের কথা আর শেষ হয় না—কত বন্ধুত্ব, কত স্নেহপ্রকাশ যে, চতুর্দ্দিক হইতে হইতে লাগিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লেখা আমার সাধ্য নয়, বুঝি বা উচিতও নয়। কত বড় বড় বক্তার বক্তৃতা তাঁহারা দিন রাত শোনেন। কিন্তু যে বাঙ্গালীর সম্বন্ধে ভারতের ইংরাজ-মহলে আজকাল দিন-রাত কাগজে—বক্তৃতায়—আদালতে—ক্রমাগত নিন্দা,গালা-গালি, তাহাদের মধ্যে একজনের সামান্য দুইটা কথা শুনিয়া আনন্দ-প্রকাশ ইলংণ্ডের ইংরাজের পক্ষে নিজগুণ-প্রকাশ ও ভদ্রতা মাত্র। সাহেবদের অপেক্ষা মেমেদের যত্ন, আত্মীয়তা ও আনন্দ অনেক অধিক দেখিলাম। রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত আসা অবধি আবহমান-কাল-প্রচলিত কথা যে, ইংরাজ-রমণী যোগ্য ভারতবাসীমাত্রকেই বিশেষ অনু-গ্রহের চক্ষে দেখেন। অপদার্থ কয়েকজন ভারতসন্তান নিজেদের অপব্যবহারে সে সম্মান খোয়াইয়াছে এবং সমস্ত জাতির ক্ষতি করিয়াছে। তাহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। আমার সাহেবী এখনও দুরস্ত হয় নাই। তাঁহাদের ভদ্রতার সম্পূর্ণ প্রতিদান করিবার সাধ্য আমার

হইল না। অনেকে স্ব স্ব কার্ড দিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সভা-স্থলে বক্তৃতা শুনিতে যাইবার সময় কার্ড পকেটে লইয়া যাইবার খেয়াল আমার হয় নাই। কাজেই "কার্ড বদল" হইল না। বক্তৃতা শুনিতে গিয়া, বক্তৃতা করিতে হইবে এবং এত বন্ধু-সমাগম-সৌভাগ্য হইবে, মনে হইলে কার্ড সঙ্গে রাখিতাম। মনে অবশ্য উৎসাহ ও উত্তেজনা খুব হইল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, এইরূপে কাজ বাড়াইলে কাজ আর শেষ হইবে না। ভারতের ইংরাজে ও ইংলণ্ডের ইংরাজে প্রভেদ দেখিয়া নূতন জ্ঞান লাভ হইল।
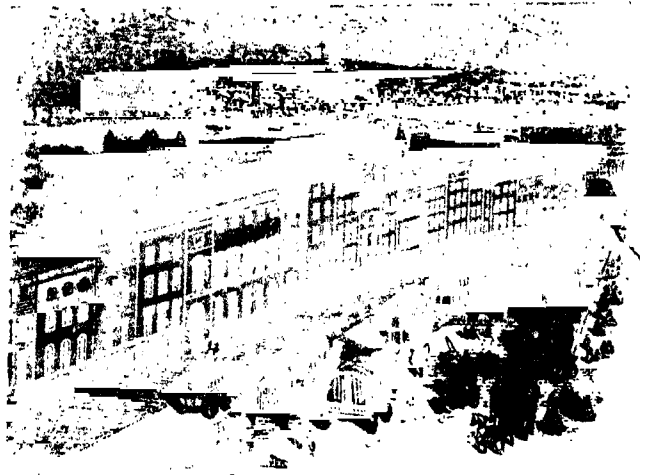
ফ্লীট ষ্ট্রীট।

বুধবার ১২ই জুন।—ডাক্তার রায়ের স্পষ্ট জ্বর। তাঁহার সেবা, পথ্য ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া Templeএ গেলাম। উদ্দেশ্য—King's Counsel, Mr. Davidএর সহিত সাক্ষাৎ করা। Hercourt Buildings, Temple E. C. তাঁহার ঠিকানা। ঠিকানা খুঁজিয়া লইবার অভ্যাস হইয়াছে। বিশেষ কষ্ট হইল না। Sale সাহেব ইঁহার কুটুম্ব এবং তিনিই পরিচয় করিয়া দিয়াছেন।

ব্যারিষ্টারদের লেখা-পড়া ও আফিসের আড্ডা এই খানেই। আমাদের দেশের ন্যায় প্রকাণ্ড Bar Library ও Club এখানে নাই। আদালতে ব্যারিষ্টারদের জন্য বন্দোবস্ত যৎসামান্য। কোন মতে Wig ও Gown রাখিবার একটা জায়গা মাত্র আছে। মক্কেলদের সঙ্গে দেখা-শুনা ও কাজকর্ম্ম করিবার জন্য সকল ব্যারিষ্টারকে নিজ নিজ Chamber কিংবা আপিস ঘর রাখিতে হয়। দরিদ্র ব্যারিষ্টারেরা অনেকে একত্র হইয়া ঘর ভাড়া লয় এবং একজন কেরাণীর সাহায্যেই সকলের কাজ চালাইয়া লয়। এই সব বাড়ী, আপিস, Chamber যেন পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। নিকটে Lincoln's Inn, তাহারই কাছে Dickensএর অমর লেখনী সাহায্যে অমর "Old Curiosities Shop" এর বাড়ীটি এখনও বর্ত্তমান বলিয়া প্রকাশ। বৃষ্টির জন্য আপাততঃ তাহা সন্ধান করিয়া দেখা হইল না। David সাহেব যতদূর সম্ভব যত্ন করিলেন; জলপানের নিমন্ত্রণ করিয়া, নিকটস্থ হোটেলে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন।

তারপর Kingsway, Strand, Great Queen's Street সন্ধান করিয়া, Freemasons Hall এ যাইয়া, বড় দাদার পুরাতন বন্ধু Thomas Jones সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। লণ্ডনের রাস্তাঘাট এখন পরিসর ও পরিষ্কার। এমন দিন ছিল, যখন লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ রাজ-পথ আমাদের বড়বাজারের অপকৃষ্ট গলির সমকক্ষ ছিল; ক্রমে উন্নতি সাধিত হইতেছে। Strand Road হইতে Kingsway নামক যে নূতন রাস্তা সম্প্রতি খোলা হইয়াছে, তাহা লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাস্তার অন্যতম। কিন্তু নূতন রাস্তার শ্রীসৌষ্ঠব এখনও পূর্ণমাত্রায় ঘটে নাই। পুরাতন গলিঘুঁজীর যে সম্মান, নূতন বড় রাস্তার সে সম্মান হইতে বিলম্ব হয়। জোন্‌স্ সাহেব বিশেষ আদর যত্ন করিলেন, পুরাতন কথা অনেক হইল। Freemasonদিগের প্রায় সকল কাজই এ সময় বন্ধ, তথাপি কোন না কোন সভা হইলেও হইতে পারে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার আয়োজন পক্ষে জোন্‌স্ সাহেবের নিকট অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইলাম। এবং উপস্থিত সভ্যগণের সহিতও তিনি পরিচয় করাইয়া দিলেন। জগতের সর্ব্বত্রই Freemasonদিগের পরস্পর আদর, সম্মান ও সাহায্য এ সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মধ্যে

সৌহার্দ্দ-ভাবের বিশেষ সঞ্চার করিয়াছে; দুঃখের বিষয়, বিশেষ কোন সভাসমিতি এ সময়ে লণ্ডনে হয় না। প্রকাণ্ড বাড়ী—প্রকাণ্ড ব্যবস্থা—প্রকাণ্ড উদ্যোগের চিহ্ন দেখিয়া সব সাধ মিটাইতে হইল।

সেখান হইতে Victoria Street, West-minister Palace Hotelএ East Indian Associationএর নিমন্ত্রণে বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। আমাদের দেশের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব একজন জজ এ সভার সভাপতি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব একজন Civil Servant,"Defects of the Systems of Law of England, India, and America"এই বিষয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে বাঙ্গালী ও ভারত-বাসীদিগকে "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" গালাগালি দিলেন। সভার অদ্ভুত নিয়ম অনুসারে সভাপতির বিনা অনুমতিতে উপস্থিত অন্য লোকের বলিবার কোন অধিকার ছিল না। অনুমতি প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি হইল না, কাজেই আমার উত্তর দিবার অবকাশ হইল না। মনে হইল, এ সকল স্থানে উত্তর না দেওয়াই ভাল। সভাপতি ও বক্তার নাম ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু প্রকাশ থাকা মন্দ নয় যে, ভারতের নিমক খাইয়া, যাহাদের অস্থিমজ্জা, তাহারা যখন "ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা" এইরূপে সুবিধার অপব্যবহার করেন, তখন বিলাতের মহাপুরুষেরাও তাহাদিগকে যথেষ্ট ঘৃণা করেন। বক্তার ও সভাপতির মন্তব্য শ্রবণে অনেক ইংরাজ আমার মত ঘৃণা ও দুঃখসহকারেই সভা ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদেরও মত হইল যে, এ সকল স্থানে নীচ যদি উচ্চ ভাষে, তাহা হইলে সুবুদ্ধির হাসিয়া উড়ানই শ্রেয়ঃ।

বৃষ্টি কমিল না; St. James Park, Queen Annie's Mansionএ Sir, R. N. Mukerjiর সন্ধানে গেলাম। তিনি সহরের বাহিরে গিয়াছেন,দেখা হইল না। আমি পথঘাট জানিয়া চিনিয়া কি করিয়া বিনা সাহায্যে এত বেড়াইতেছি, নিজে আশ্চর্য্য হই, পরেও হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পদে পদে "আহাম্মুখ বনিতেছি"। আজ হাত-পায়ের নখ কাটিতে পাঁচ শিলিং দিয়াছি! দেশে পাঁচ পয়সা দিতে কষ্ট হয়। হায়রে বিলাত! এখানে স্থানভেদে পাড়াভেদে জিনিসের দাম তফাৎ হয়। এক পাড়ায় এক দোকানে জিনিসের যে দাম, ঠিক সেই জিনিস সৌখীন পাড়ায় সৌখীন দোকানে সৌখীন দোকানদারের হাতে চতুর্গুণ কেন, দশগুণ দাম দিয়া কিনিতে সৌখীন বাবু শুধু কাতর হয় না, নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে। ভারতবাসীরা শীঘ্র এই জালে ধরা পড়ে বলিয়া কথাটার অবতারণা করিতেছি। Marble Archএর উত্তরে দক্ষিণে দোকানের দামের এইরূপ তারতম্য হয়।

বৃহস্পতিবার ১৩ই জুন।—ভোর ৭টার সময় বাহির হইয়াছিলাম, রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী আসিলাম। ১৩ঘণ্টা বাহিরে বাহিরে এক কাপড়ে ঘুরিয়া বেড়ান, বোধ হয়, দেশে কখন সম্ভব হইত না। দিনের বেলা নিদ্রা দূরে থাক, একবার ইজি-চেয়ারে পিঠ দিয়া বিশ্রাম করাও কয় দিনের মধ্যে ঘটিতেছে না। অথচ ইহার জন্য আমার প্রকৃতই কোন অসুখ বা কষ্ট নাই। অভ্যাস ও স্থানগুণে সবই সম্ভব; এবং শরীরও যে ভাল আছে, তাহার সন্দেহ নাই। তবে এরূপ অত্যাচারে কতদিন শরীর ভাল থাকিতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। রেলওয়ে এবং অম্নিবসে এখান-ওখান যাতায়াত হইতেছে বটে, কিন্তু এক রেলওয়ে প্লাটফর্ম্ম হইতে অন্য রেলওয়ে প্লাটফর্ম্মে এবং এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে যে, হাঁটাহাটি দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়, তাহাতে প্রত্যহ বোধ হয়, ৩।৪ মাইল দৌড়ান হয় এবং রেলওয়ে অম্নিবসে কোন কোন সাধারণ যাতায়াতে একশত মাইলও অক্লেশে হইতেছে। তাহা বিনা ক্লেশে কলিকাতায় কখন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ নিত্য এরূপ দৌড়াদৌড়িতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিশেষতঃ রাস্তার মোড় পার হইবার সময় যে বিপদ এড়াইয়া পার হইতে হয়, তাহা মনে করিলে আর রাস্তায় বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না। পুলিস্‌ম্যানের সাহায্য ব্যতীত বড় বড় মোড় পার হইবার সম্ভাবনা নাই। মাঝে মাঝে হাত-তোলার ইঙ্গিতে গাড়ী ও মোটরের স্রোত না থামিলে, অনেক জায়গায় রাস্তার এপার হইতে ওপার যাওয়া একেবারে অসম্ভব। রাস্তায় তবু পুলিসের সাহায্য পাওয়া যায়; বড় বড় আপিস বাড়ীর ভিতর বিপদ্ আরও অধিক। বড় বড় লোকের নাম করিয়া বাড়ীর ভিতর যাও। কিন্তু কেউ কাহাকেও চেনে না। সময়ে সময়ে একজনকে খুঁজিতে এক বাড়ীতে ঢুকিয়া গাঁটকাটার হাতে পড়িয়া কষ্ট পাইতে হয়। এক এক বাড়ীতে ৪০০।৫০০ পর্য্যন্ত ঘর আছে। লোক তাহার দশগুণ। Lift করিয়া উঠিতে নাবিতে হয়।

সুবিধার মধ্যে এইটুকু। কিন্তু লোক খুঁজিয়া লইতে বড়ই কষ্ট হয়।

সকালবেলা বাহির হইয়া দেখি, লোক সব দৌড়িতেছে। মনে করিলাম, কিছু পাল-পার্ব্বণ বুঝি! কিংবা কোথাও বা আগুন লাগিয়াছে! স্বর্ণলতার নীলকমলের অবস্থা লণ্ডনে ইংরাজ-আগন্তুকেরও হয়, আমরা ত কোন ছার! নিত্য এইরূপ। চাকর-চাকরাণী, দোকানদার, কেরাণী সকলেই রাস্তায় রেলে ট্রামে কিংবা অম্‌নিবসে তাড়াতাড়ি দিনরাতই এইরূপ যায়। "গদাই লস্করী চাল", লণ্ডনের রাস্তায় মোটে দেখা যায় না। আমার মত মন্দগামী লোক দেখিলে লোকে বিপন্ন বা পীড়িত ভ্রমে সাহায্য দানের চেষ্টাও করে। দেখা-দেখি বাধ্য হইয়া, আমাকেও দৌড়াদৌড়ি 'কছলৎ' পুনরায় করিতে হইল। কেহ কাহারও দিকে চায় না—দাঁড়ায় না। আপনার মনেই হন্ হন্ করিয়া পথ চলে। অথচ কাহাকেও ভদ্রভাবে কোন কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, ছোট-বড়-লোক সমান ভদ্রতার সহিত কথার উত্তর দেয় ও যথাসাধ্য সাহায্য করে। ভদ্র পল্লীর ত কথাই নাই—ইতর পল্লীতেও এই। আমি লণ্ডনের ছোটলোক-পাড়া এখনও দেখি নাই। অপরের সাহায্য ছাড়া সে সব জায়গায় যাওয়া যায় না। কিন্তু Convent Garden, Strand, Fleet Street, Leaden Hall Street, Ludgate Circus, Pall Mall, St. James'. Street, Victoria Street প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের অবস্থা ও বন্দোবস্ত এই। দুই একজন ছাড়া এমন পুলিস্‌ম্যান্ নাই যে, জায়গার নাড়ী-নক্ষত্র না বলিতে পারে।

আজ প্রথমতঃ Victoria Streetএ Westminister Palace Hotelএ Temperance Breakfastএর নিমন্ত্রণে গেলাম। গতবৎসর লণ্ডনের Lord Mayor যিনি ছিলেন—Sir Veizy Strong—যাঁহার বিষয়ে Stead তাঁহার Review of Reviewতে এক সুন্দর Character Sketch লিখিয়াছিলেন,—তিনি Chairman। লোকটি নিজের অধ্যবসায়ে ও গুণে এত উপরে উঠিয়াছেন। তিনি সদানন্দ ও সদালাপী। আলাপ হইল। Secretary
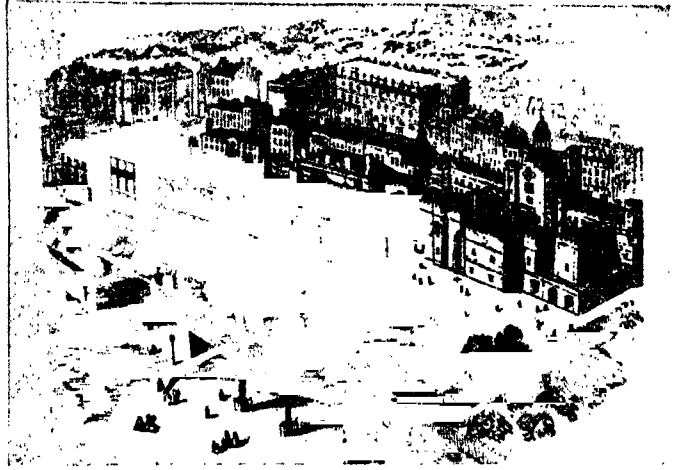
সেণ্ট জেম্‌স্ প্যালেস্ ও পার্ক।

Roe ও অন্যান্য বিস্তর ভদ্র লোকের সহিত আলাপ হইল। সকলেই মাদকতা-নিবারণ সম্বন্ধে বদ্ধপরিকর। তাঁহাদের সহিত আলাপে অনেক কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল। বিস্তর লোক দেশবিদেশ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কথাবার্ত্তা কওয়ার—বক্তৃতা করার অভ্যাস ও শক্তি অতি কম লোকের। ১২।১৪টা বক্তৃতা শুনিলাম। কিন্তু Sir Veizy Strongএর এবং Helsop নামক একজন লোকের বক্তৃতা ছাড়া শুনিবার যোগ্য বক্তৃতা বড় ছিল না। ইংরাজের খাস-মুলুকে অসংখ্য খাস-ইংরাজবক্তার মধ্যে বসিয়া, এভাব যে মনে উদয় হয়, ইহা আপশোষের কথা। খাওয়া-দাওয়া উপলক্ষ ছাড়া ইহাদের কাজকর্ম্ম বড় কম হয়। Breakfast উপলক্ষ করিয়া, Lunch, Dinner প্রভৃতি অনেক সভাসমিতি হয়। নানা কাজে ব্যস্ত যে সকল বড় লোক দেখা করিবার জন্য অন্য সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, তাঁহারা এই উপলক্ষ করিয়া, অনেক কাজকর্ম্মের কথা কহিয়া লন। Temperance সভার সভ্যগণের সহিত পরিচয় প্রায় এইরূপেই করিতে হয়।

সভার কাজ শেষ হইলে, St. James Park নামক সুন্দর বাগানের ভিতর দিয়া St. James Streetএ যাইলাম। যেমন গাছপালার বাহার, তেমনি ঝিলপুল-রাস্তা, প্রস্তর-মূর্ত্তির বাহার! সাজান বাগান ত সাজান বাগান! চক্ষু জুড়াইয়া যায়! সহরের ছোট-বড় সকল লোকই এই সব বাগানের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে। লণ্ডনের বাড়ী-ঘর-দ্বার যেরূপ আবদ্ধ, এইরূপ উন্মুক্ত প্রকাণ্ড স্থান

প্রচুর পরিমাণে না থাকিলে, নগরবাসিগণের শ্বাসরোধ হইত। কত লোক বেড়াইতেছে—বসিতেছে—গল্প করিতেছে—আনন্দ করিতেছে, সংখ্যা নাই। লণ্ডনের স্থানে স্থানে এই সব বাগান আছে, তাই লণ্ডনের লোক বাঁচিয়া আছে। বাগান হইতে বাহির হইয়া দেখি, St. James Palace-এর সামনে পুলিসের ভিড়, লোকের ভিড়, ব্যাণ্ড, ঘোড়-সওয়ার ইত্যাদির ভিড়। শুনিলাম—আজ রাজার লেভি। পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে, কার্ড পাঠাইয়া লেভিতে আসিতাম। King's Beef-Eater Footmen সব দলে দলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অদ্ভুত পোষাক! ভিড়ের সঙ্গে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, রাজা দেখিবার সুবিধা হইল না। রাজাকে দেশে বহুবার দেখিয়াছি, এখানেও দেখিবার সুবিধার সম্ভাবনা আছে। এবং কাজও বিস্তর রহিয়াছে। তাই রাস্তার ভিড় না বাড়াইয়া St. James Streetএ খুঁজিয়া Royal Societies Clubএ গেলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া Honorary Member করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের বাড়ীতে বাস করিবারও নিমন্ত্রণও করিয়াছেন। অতএব ভদ্রতার খাতিরে একবার যাইয়া দেখা-শুনা করিয়া আসা উচিত বোধ হইল। কর্ম্মচারিগণ সৌজন্যসহকারে বাড়ীঘরদ্বার সব যত্ন করিয়া দেখাইলেন; খাবার দাবার বন্দোবস্ত দেখাইলেন; চাকর-বাকর, Steward প্রভৃতিরও রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া, আমার আদর-আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সকল বন্দোবস্তই সুন্দর। অন্য অন্য Clubএও এইরূপ নিমন্ত্রণ করিতেছে। Northbrook Club, National Liberal Club, Royal Colonial Institute প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ নিমন্ত্রণ হইতেছে।

আবার লেভির ভিড় ঠেলিয়া, Pall Mall রাস্তায় Reform Club, Traveller's Club এই দুইটা প্রধান Club দেখিয়া, Ludgate Circusএ Cook and Son এর বড় আপিসে গিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যাইবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পৌত্রের সহিত দেখা হইল। তিনি যথেষ্ট যত্ন করিয়া, নিকটস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেখান হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে Mansion House, Royal Exchange, Bank of Bengal, St. Paul's Cathedral প্রভৃতি স্থান দেখিতে দেখিতে Aldgate Stationএ উঠিয়া Westminister Stationএ আসিলাম। যে সব বাড়ীর নাম করিলাম, চিরদিন তাহার নাম শুনিতেছি, এবং কত বড় ব্যাপারই না জানি বরাবর মনে করিয়া আসিতেছি। নিকটে আসিয়া দেখিয়া যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। বাহিরের জাঁকজমক কোন বাড়ীরই তত নয়—ভিতরের পারিপাট্য সাজগোজ খুব আছে। Westminister, House of Commons, Lordsএর বাড়ী দেখিয়াও এই কথা মনে হয়।

যখন Westminister Hallএ পৌঁছিলাম, তখন সময় আছে বলিয়া এদিক ওদিক Embankmentএ বেড়াইলাম ও Westminister Hallএর চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া Cromwellএর Statue প্রভৃতি দেখিয়া St. Stephen's doorএ যাইলাম। অন্যান্য সকল দরজা ও ফটকে পুলিস পাহারা। 'সফ্রাগেট' ভয়ে Police পাহারার বন্দোবস্ত কড়াকড়। ফটকের পুলিসের বাহাদুরী এই যে, পার্লামেণ্টের সকল মেম্বরকে তাহারা চেনে এবং মেম্বরেরা বিনা বাধায় তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ফটক দিয়া যাইতে পারেন কিন্তু সকল দরজা দিয়া আর কেহ যাইতে পারে না। অন্য সকলকে St. Stephen দরজা দিয়া রীতিমত অনুমতি দেখাইয়া ভিতরে যাইতে হয়।

Westminister হলের ভিতরে দুইধারে Pitt, Fox, Chatham, Burke, Mansfield প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেশমান্য জগন্মান্য লোকের প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। Westminster Hallএর যেখানে দাঁড়াইয়া Charles I. মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে স্থাননির্দ্দেশ জন্য একটি পিত্তলফলক প্রোথিত আছে। যেখানে Gladstoneএর মৃতদেহ সমাধি-স্থানে লইয়া যাইবার সময় সম্মান-প্রদর্শন জন্য ক্ষণকাল রক্ষিত হইয়াছিল, সেখানেও সেইরূপ ফলক প্রোথিত রহিয়াছে। আবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত Charles I.এর প্রস্তরমূর্ত্তিও Charles II.এর পার্শ্বেই রহিয়াছে। অদ্ভুত জাতি! মস্তকচ্ছেদও হইল এবং স্মরণচিহ্নস্বরূপ পরবর্ত্তী লোকেরা প্রস্তরমূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করিল! গৃহভিত্তিতে—ভিত্তিপার্শ্বে—ছাদে কত সুন্দর কারুকার্য্য রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। একদিন ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতাস্রোতে বর্ক-সেরিডান

এইখানে ন্যায়ের ধ্বজা প্রোথিত করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টের মেম্বরদের সহিত দেখা করিবার জন্ম অপেক্ষা করিবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। সেইখানে বসিয়া বসিয়া জনস্রোত-বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে মনে কত কথায় কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা দুষ্কর। পার্লামেণ্ট-মেম্বরদের সঙ্গে দেখা করিবার উমেদার অসংখ্য। পাছে আগামী বারে আবার ভোট না দেয়, এই ভয়ে মেম্বরেরা বাহিরে আসিয়া, তাহাদের সঙ্গে দেখা, কথাবার্ত্তা ও কাজ করিতেছেন, নানা সৌজন্য দেখাইতেছেন। এ কমিটি—ও-কমিটিতে মেম্বরদিগের নিত্য গতিবিধি—হইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া কেহ তাঁহাদিগকে চিনাইয়া দিতেছেন। জনস্রোতের এক মিনিটের বিরাম নাই। এই Sir Rufus Isaacs, ওই অমুক, ওই আর একজন স্বনামধন্য মেম্বর যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে Grubb সাহেব ও বন্ধুবর Anderson আসিয়া পৌঁছিলেন। Temperance সভার বিশেষ সাহায্যকারী Sir Herbert Robertsকে রীতিমত সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া একটা কমিটি-ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন, বিশেষ যত্ন ও আদর প্রকাশ করিলেন। যে ঘরে পার্লামেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন কমিটির কাজ হয়, তাহারই একটা ঘর আমাদের জন্য যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। Temperance সম্বন্ধে Secretary of Stateএর নিকট Deputation যাইবে; তাহার বিস্তর কথাবার্ত্তা হইয়া, Deputation যাওয়া স্থির হইল। Universities Congressএর পর, জুলাই মাসের শেষে Deputation যাইবে।

য়ুনিভার্সিটি কলেজ

তার পর Sir Herbert Roberts, Parliament Memberদের জলযোগ করিবার ঘরে লইয়া গিয়া চা খাওয়াইলেন। এই ঘরের কথা কতই শুনিয়াছি। সেখানে যাইয়া বসিতে ও খাইতে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। পুণ্যমন্দিরের অভ্যন্তরে ভক্ত প্রথম যাইলে যেভাব হয়, House of Commonsএ আসিয়া তাহাই হইল। Sir Herbert Roberts শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, আমরা এই সকল বিষয়ের এত ভক্ত। আমি পৌঁছিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই Shakespeare acting দেখিতে গিয়াছিলাম, এবং আমরা Shakespeareএর এত ভক্ত, শুনিয়াও আশ্চর্য্য হইলেন। আমিও অবকাশ পাইয়া হেম বাঁড়ুয্যের "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি" শোনাইয়া দিলাম—অবশ্য অনুবাদ সমেত। কথাবার্ত্তায় Sir Herbert আপ্যায়িত হইলেন এবং আপ্যায়িত করিলেন। শনিবার Lady Robertsএর সহিত আহার করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, পার্লামেণ্টের অন্যান্য মেম্বরদিগের সহিত আলাপ করাইয়াও দিলেন। জলযোগ করিবার ঘর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তাহার পার্শ্বেই টেমস্ নদীর উপর মেম্বরদিগের পদচারণার জন্য যে প্রশস্ত বারান্দা আছে, তাহাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। শুধু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নহে, এই জায়গাগুলিকে ইতিহাসের কারখানা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভাস্থলে যে বিচার, বক্তৃতা ও মীমাংসা হইবে, তাহা এইখানে স্থির হয়। House of Commonsএর Library সব ঘুরিয়া দেখা গেল। কোন মেম্বর সঙ্গে না থাকিলে, সহস্র অনুমতি-পত্র সঙ্গে থাকিলেও, এসব স্থানে কাহারও একাকী গমনাধিকার নাই। বিশেষ আলাপ-পরিচয় না থাকিলে, মেম্বরেরাও যাহাকে-তাহাকে এসব জায়গায় লইয়া যা'ন না। পরে Stranger's Galleryতে Sir Herbert Robertsএর অনুমতি-পত্র দেখাইয়া গেলাম। ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে, Curzon Wyllieএর খুনের পর হইতে, বড় কড়াকড় বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কোন পার্লামেণ্ট-মেম্বরের অনুমতি, কিংবা India-অফিসের অনুমতি জোগাড় করিয়া, এবং খাতায় নাম ধাম স্বহস্তে লিখিয়া তবে যাইতে হয়। যেখানে নাম লিখিতে হয়, সেখানকার কেরাণী সাহেব ইংরাজীতে Andersonসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি নাম সই করিতে জানি কি—না। যখন Sir Francis Maclean প্রথম Chief Justice হইয়া আসেন, গণেশচন্দ্র বাবুর সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গণেশ বাবু ইংরাজীতে কথা কহিতে পারেন, কি না। একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার P. C. Rayকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে হিন্দুস্থানীতে পড়াইতে হয়, কি না। সাধারণ ইংরাজ, ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে অধিকাংশই এইরূপ খবর রাখেন। পার্লামেণ্ট মহাসভার দপ্তরে এ পরিচয় পাইয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না।

ভিতরে যাইয়া, স্তম্ভিত বা আশ্চর্য্য হইবার কিছু দেখিলাম না। নীচে দুই ধারে বড় বড় বেঞ্চ—সবুজ চামড়ামোড়া। মেম্বরেরা শুইয়া বসিয়া, টুপী মাথায় দিয়া, যার-যা ইচ্ছা করিতেছেন; আসিতেছেন—বসিতেছেন—হাসিতেছেন—চতুর্দ্দিকে সকলে হো হো করিতেছে—যেন হাট। অন্যায় কথা কহিলেই সভাপতি "Order" "Order" বলিয়া থামাইয়া দেন; নতুবা হাসি, ঠাট্টা, "Hear" "Hear" শব্দের সঙ্গে St. Stephen সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। ৪।৫ জন বক্তার বক্তৃতা শুনিলাম। বিশেষ শ্রোতব্য কিছু শুনিলাম না। Loche প্রভৃতি নামজাদা লোকের বক্তৃতাও শুনিলাম। বলার ধরণ, এবং বলার বিষয় সবই সাদা-মাটা ধরণের। Home Rule Bill সম্বন্ধে 'Whole House into Committee' কিন্তু উপস্থিত-মেম্বর-সংখ্যা খুব কম দেখিলাম। স্বয়ং Speaker, Chairএ ছিলেন না; Mr. Whitney এ সভায় Chairman, মোটের উপর বড় সুবিধা বোধ হইল না। আর একদিন যাইতে হইবে।

বাড়ী আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। ডাক্তার রায়, 'সি. আই. ই.' উপাধি ও Durham Universityর D. Sc., Honorary Degree পাইয়াছেন, সংবাদ আসিয়াছে। বিশেষ সন্তোষের বিষয়। ডাক্তার পি. সি. রায়ের ন্যায় বিজ্ঞান-অনুরক্ত দেশহিতৈষী ছাত্রহিতৈষী নির্বিরোধী ধার্ম্মিক লোকের ক্রমোন্নতি সকলেরই আনন্দের বিষয়; এতদিন তাঁহার এ সকল সম্মান হয় নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। ইঁহার সম্মান, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান।

শুক্রবার, ১৪ই জুন।—জোন্‌স্‌ সাহেব লিখিয়াছেন যে, 'Handel Festival ২২এ জুন শনিবার Crystal Palaceএ হইবে। নিমন্ত্রিত ৫০০০ লোক একত্র গান গাহিবে। এরকম কাণ্ড প্রায় দেখা যায় না এবং দেখিবার যোগ্য।' কিন্তু যাই কি করিয়া, বুঝিতে পারি না। সেই দিনই Aberdeen Universityর নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ এত হইতেছে যে, রক্ষা করা ভার। Sheffield, Glasgow, Edinburgh হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। আরও কত আসিবে, তাহা বলা যায় না। ইউনিভার্সিটির নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যান করা যায় না; আর তিন বৎসর অন্তর যে Handel Festival হয়, তাহাও দেখিবার জিনিস; তাহাও ত্যাগ করা বড়ই কষ্টের বিষয়! সময় কুলাইয়া সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার, কোন সুযোগই দেখিতেছি না। বাড়ীতেও এত লোকজন আসে যে, পড়াশুনা দূরে থাক, চিঠি-পত্র লেখার সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আর কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলেও ত কায চলে না!

জল-ঝড় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। বেড়াইবার সুবিধা খুব। আজ সন্ধ্যার সময় Albert Hallএ Home Ruleএর বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড মিটিং হইবে। Bonar Law প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা করিবেন। তাহাতেও নিমন্ত্রণ আছে। শরীরের ও মনের দ্বিগুণ উৎসাহ ও সময় দ্বিগুণ হইলেও সকল কাজ সুচারুরূপে সমাধা হওয়া অসম্ভব।

৭টার সময় আহারাদি করিয়া সাউথ কেন্‌সিংটন বাগানের সামনে এলবার্ট হলে যাইলাম। সর্ব্বত্র যাইবার সুবিধার পথ District কিংবা Underground Railway। আজ Undergroundএ নূতন ব্যবস্থা এক দেখিলাম Moving Stairway, অর্থাৎ চলন্তী সিঁড়ি। Liftএর উপর দাঁড়াইলে দড়ি ধরিয়া, সমস্ত Lift যেমন সড়্‌সড়্‌ করিয়া সোজা উঠিয়া যায়—Moving Stairway সেরূপ নয়। সামনে ঠিক যেন সাধারণ ধরণের সিঁড়ি। নীচের ধাপে পা দিলেই সিঁড়ি ঠিক সিঁড়ি উঠার ধরণে এবং ভাবে আপনি উঠিয়া যায়—তোমাকে আর আলাদা ধাপ ধাপ কষ্ট করিয়া উঠিতে হয় না। যেখানে তোমার পৌঁছিবার

হাইড্ পার্কের কোণ

মহারাণী হিন্দু-বিধবার ন্যায় আচরণে জীবন অতিপাত করিয়াছিলেন। প্রিন্স আলবার্টের স্মৃতি রক্ষার জন্য সাধারণ চাঁদায় এই প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ার হয়। গোলাকার গম্বুজের এমন সুন্দর গঠন যে, এতবড় বাড়ীতেও বক্তৃতা ও গানবাজনা সহজে লোকে শুনিতে পায়। লোকজন বসিবার বন্দোবস্ত সাততালায়। দশ হাজার লোক একত্র বসিতে পারে ও সকলেই বক্তৃতা অথবা সঙ্গীতের আসর হইতে সামান্য শব্দ পর্য্যন্তও শুনিতে পায়। স্থপতি কৌশলে প্রকাণ্ড বাড়ীর এইরূপ
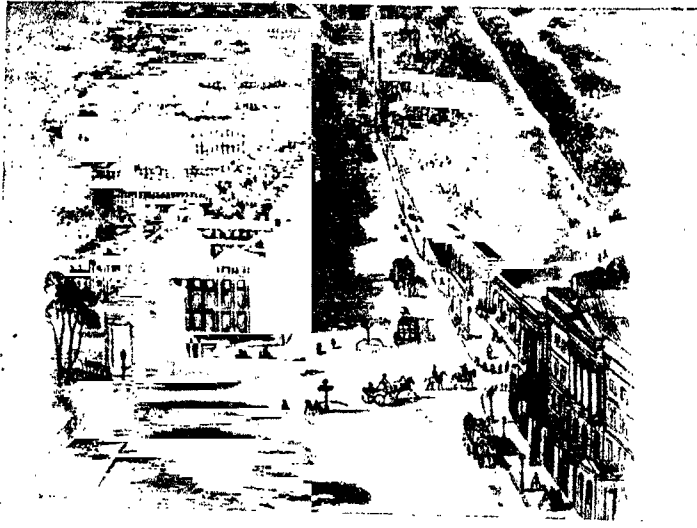
কথা, সেইখানে পৌঁছিবামাত্র সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। এইটি খুব সাবধান হইয়া করিতে হয়; নতুবা মহামুস্কিল, একেবারে যাইয়া দেওয়ালে ধাক্কা লাগিবে এবং তদপেক্ষা অধিক বিপদ হইলেও হইতে পারে। এই চল্‌তী সিঁড়ি ক্রমাগত উঠিতেছে, নামিতেছে। বিজ্ঞান ও কলকব্জার সাহায্যে মানুষের নিত্য কার্য্যের কত সুবিধাই হইতেছে, তাহার পূর্ণপ্রমাণ এইসব দেশে পাওয়া যায়।

সাউথ কেন্‌সিংটন বাগান, হাইড্‌পার্ক বাগানের পাশাপাশি। লণ্ডনের "খোলা হাওয়ার" (Open-air) প্রধান প্রধান সভা এই Hyde Parkএ হয় এবং প্রসিদ্ধ Serpentine পুষ্করিণী—যেখানে শীতকালে বরফ জমিলে সাধারণের মহানন্দে স্কেটিং হয় এবং অন্যান্য সময়ে সাধারণে স্নান করে—তাহাও এই Hyde Parkএর ভিতর। সাউথ কেন্‌সিংটন বাগানের ভিতর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী, প্রিন্স কনসর্ট আলবার্টের মূর্ত্তি এবং স্মৃতিচিহ্ন আছে। ইঁহারই নামে আমাদের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড, অ্যালবার্ট নামে পরিচিত ছিলেন এবং প্রিন্স অব ওয়েলস্ অবস্থায়, যখন ভারতবর্ষে ১৮৭৫ সালে গমন করেন, তখনও তাঁহার নাম প্রিন্স আলবার্ট ছিল এবং তাঁহার কলিকাতা-গমনের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কলিকাতায় 'আলবার্ট হল' স্থাপিত হয়। এখানকার তুলনায় সে 'হল' নিতান্ত হাস্যাস্পদ বস্তু। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী রাজপদবী পান নাই, কিন্তু বিশেষ লোকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পর

সুবন্দোবস্ত দেখিয়া, আমাদের সেনেট হলের কথা মনে পড়িল। কনভোকেশনের বক্তৃতা প্রথম সারির লোক ছাড়া কেহ এখানে শুনিতে পায় না।

এখানে থিয়েটার হয় না। কিন্তু বড়বড় মিটিং ও বড়বড় কনসার্ট হয়। মধুর গম্ভীর স্বরের প্রকাণ্ড এক অর্গান আছে। আজ আয়র্লাণ্ডের হোম রুল (Home Rule) প্রাপ্তির বিরুদ্ধে (Conservative) কনসার্‌ভেটিভ দিগের এক বিরাট মিটিংএর আয়োজন। পাছে গোলমাল হয় বলিয়া টিকিট্ হইয়াছিল। অতবড় বাড়ী প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল। এই হোমরুলের কথা বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আয়র্লণ্ডের লোক নিজের নিজের স্থানীয় বিষয়ে যাহাতে ব্রিটীশ পার্লামেন্টের অধীন না থাকিয়া, নিজের নিজের আইন বন্দোবস্ত করিতে পারে, তাহারই জন্য এই আইন হইবার কথা। মহামতি গ্লাডষ্টোন বহু চেষ্টা করিয়া, এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেও এই বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদল আইরিস মেম্বরদের তাড়নায়, অথবা নিজেদের বিবেচনা-প্রণোদিত হইয়া, পুনরায় এই আইন-পাশের চেষ্টা করিতেছেন; বোধ হয়, এবার কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু কন্‌সারভেটিভদলের ইহাতে বিশেষ আপত্তি। বিশেষতঃ (Ulster) আল্‌ষ্টার নামের এক জেলার লোক বড়ই আপত্তি করিতেছে; এমন কি, যদি আইন পাশ হয়, তাহা হইলে, তাহারা বিদ্রোহ করিবে,

আইন মানিবে না, এমন ভয়ও দেখাইতেছেন। মিটিংএ অকুতোভয়ে তাঁহারা প্রকাশ্য বক্তৃতায় এই সকল কথা বলিতেছেন এবং আজও বলিলেন। লোকে লোকারণ্য। আর গণ্যমান্য গায়ক-গায়িকাস্বদেশী সঙ্গীতে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। মিটিং আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে "Rule Britania" প্রভৃতি উত্তেজক জাতীয় সঙ্গীত গায়িতে লাগিল এবং সকলেই তাহাতে যোগ দিতে লাগিল। আমাদের ধমনীতেও যেন শোণিত দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল এবং সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের দেশে আমি এরূপ ব্যাপার দেখি নাই। এরূপ সঙ্গীত-স্রোত শুনি নাই।

ইংরাজের দেশে ইংরাজ অকুতোভয়, লোকে যা-ইচ্ছা করিতে পারে, যা-ইচ্ছা বলিতে পারে; আমাদের তাহা সাজে না ও সম্ভব নয়—উচিতও নয়। এ কথা মনে না রাখিয়া, আমাদের অকারণ অনেক অসুবিধা হইতেছে।

কনসারভেটিব দলের বর্ত্তমান নেতা বনার ল (Bonar Law), Lord Lansdowne প্রভৃতি গণ্যমান্য লোক আসেন নাই; ওয়াল্টার লং সভাপতি এবং প্রসিদ্ধ বক্তা স্যার এড্‌ওয়ার্ড কার্‌সন্‌ এ সভার প্রধান বক্তা ছিলেন। তুরী-ভেরী বাজাইয়া, আমাদের কংগ্রেসের নিয়মমত দল বাঁধিয়া, সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া, সভাস্থলে আনা হইল এবং ইংলণ্ডের প্রকাণ্ড নিশান "Union Jack" অতি সমারোহ সহকারে সভার মধ্যস্থলে উড়াইয়া দেওয়া হইল। একত্র ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলসের আইন ও বন্দোবস্তের প্রকৃষ্ট চিহ্ন এই "Union Jack"। ইহা যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, আয়র্লণ্ড যাহাতে পৃথক্‌ না হইতে পারে, তাহার চেষ্টার চিহ্ন স্বরূপ এই "Union Jack"এর এখানে এত মর্য্যাদা; এবং তাহার সম্বন্ধে উত্তেজক গীতও হইল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রাজমঙ্গল কামনায় "God Save the King" গীতও হইল। আমাদের দেশেও আজকাল তাহা হয়। আয়র্লাণ্ডের ন্যায় আমরাও অনেক বিষয়ে পার্থক্যের প্রার্থী। তবে হোমরুল বিল্‌ এখন যেভাবে প্রচলিত হইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার অনেক বিষয়ে আমি নিজে বিরোধী! এবং আমাদের দেশেও তাহা সম্ভব এবং উচিত মনে হয় না। সেই জন্যই হউক, বা বাস্তবিক বক্তৃতা তত উচ্চ দরের হইল না বলিয়াই হউক, বক্তৃতা সব আমার ভাল লাগিল না। সাধারণ বক্তাদের অপেক্ষা বরং পাদ্রীদের বক্তৃতা উচ্চ অঙ্গের হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রশংসা-চিহ্নস্বরূপ প্রচুর জয়ধ্বনিতে সেই বৃহৎ অট্টালিকা যেন কাঁপিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া মিটিং ও বক্তৃতা করার নিন্দা আমাদের বহুদিন আছে; কিন্তু আমাদিগকে পরাজয় করিয়া মিটিং ৭॥ টা হইতে রাত ১০টার পরও যখন চলিল, তখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইল। আমায় অনুগ্রহ করিয়া, Arenaতে বেশ ভাল জায়গারই টিকিট দিয়াছিল; সেই জন্য পলায়নটা অনেকের চক্ষে পড়িল। কিন্তু অনেকেই তখন পলাইতেছিল। রাত্রে ঠাণ্ডাও ছিল, অতএব আর অধিকক্ষণ থাকিতে ভরসা হইল না।

বক্তাদিগের মধ্যে Right Hon'ble Walter Long, M. P.—Chairman, Rev. Henry Montgomery, D. D., J. B. Powell, K. C. র বক্তৃতা মন্দ হয় নাই। Rev. W. L. Watkinson, D. D., (Ex.-President of the Wesllyan Methodist Conference) পাদরীর মত কাহারও বক্তৃতা হইল না—রসাবতারণা ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা করিয়া, বিশেষ বাহাদুরী করিলেন ও প্রভূত জয়ধ্বনি পাইলেন। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমি তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। তবে, তাঁহাদের জাতীয় সঙ্গীত-গানের সময় যখনই শ্রোতৃবর্গ সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল, আমিও তাহাই করিলাম। আমাদের কোন কোন সভায় দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম যে, "বন্দেমাতরং" গানের সময় যখন সকলে দাঁড়াইয়া উঠেন, হীন-প্রকৃতি কোন কোন উপস্থিত ইংরাজ তাহা করে না। মতের দ্বৈধবশতঃ সভায় উপস্থিত কোন লোকের জাতীয়-সঙ্গীতের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন ভদ্রতা-বিরোধী।

শনিবার ১৫ই জুন,—আজও সমস্তদিন বাড়ীতে কাটাইলাম। বৈকালে চা খাইয়া সাউথ কেন্‌সিংটন ন্যাচারাল হিষ্ট্রী মিউজিয়ম (South Kensington, Natural History Museum) দেখিতে গেলাম। বেড়ানও হইল—দুই ঘণ্টা মিউজিয়ম্‌ দেখাও হইল।

প্রকাণ্ড বাগান, প্রকাণ্ড সুরম্য তেতালা বাড়ী। ভিতরে হক্সলী (Huxley) ডারউইন (Darwin) প্রভৃতি জগন্মান্য বৈজ্ঞানিকদিগের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। জীবজন্তুর মৃতদেহ, অস্থি ও মূর্ত্তি নানাভাবে সাজান আছে, গাছপালা, পাথর, কাষ্ঠ, ধাতু, সব এক এক বিশাল এক এক ঘরে সাজান আছে। বিদ্যাশিক্ষার্থী অনেকে আসিয়া এখানে সময়যাপন করে। পাশাপাশি আরও দুই তিনটা মিউজিয়ম, বড় বড় কলেজ, ইউনিভারসিটি সব এই জায়গায়। বিস্তর লোক নিত্য দেখিতে আসে। তাহাদের সুবিধার সকল বন্দোবস্ত সুন্দর আছে। জলযোগের হোটেল—মায় পায়খানা মুখ ধুইবার ঘর পর্য্যন্ত প্রস্তুত। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও কাহাকেও এই সকল বিষয়ে অভাবের অনুরোধে দৌড়িয়া বাড়ী যাইতে হয় না। স্বচ্ছন্দে সমস্ত দিন দেখা-শুনা কর—পড়া-শুনা কর। বসিবার জায়গা আছে। ছাত্রদের পড়িবার কাজ করিবার আলাদা আলাদা ঘর আছে। জিনিসপত্র সাজাইবার বন্দোবস্তের তুলনায় আমাদের কলিকাতা মিউজিয়মের বন্দোবস্ত কিছুই নয়। কলিকাতার মিউজিয়ম ট্রাষ্টী রূপে ও হিসাবে আমি ফ্রান্স কিংবা ইংলণ্ডের যে কোন মিউজিয়মে যাইতেছি, সেইখানেই লজ্জিত হইতে হইয়াছে। এমনভাবে সাজান যে, যে ব্যক্তি লেখা-পড়ার বড় চর্চ্চা করে না, সেও খানিক বেড়াইলে অনেক শিখিতে পারে।

বাড়ী আসিয়া মুখহাত ধুইয়া কুইন্‌স্-গেট্ গার্ডন্‌সে (Queen's Gate Gardens)এ Sir Herbert Robertsএর বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণে গেলাম। সভ্য-ভব্য হইয়া "সন্ধ্যার কাপড়" পরিয়া গিয়াছিলাম। বড় লোকের বাড়ী। তাঁহার শাশুড়ী বিবি কেন (Mrs. Caine) উপস্থিত ছিলেন। Lady Roberts এবং Miss Roberts বিশেষ আদর যত্ন করিলেন। খানাটা যত দুর সম্ভব হিঁদুয়ানী রকমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। কথাবার্ত্তা—আদর-অভ্যর্থনাও সেইরূপ। পুনরায় যাইবার জন্য জেদ করিলেন। তাঁহাদের ছেলেটির জ্বর,

বাকিংহাম প্যালেস

হাম, অসুখ—তথাপি তাঁহারা আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলেন, এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। আমার সহিত কথাবার্ত্তায় যেন তাঁহারাও প্রীত হইলেন, বোধ হইল; মুখেও তাহা বলিলেন বটে।

রবিবার ১৬ই জুন ১৯১২।—লণ্ডন আজ নিস্তব্ধ। রবিবারে পথে লোকের চলা-ফেরাও কম। আমোদ-প্রমোদ, আহারের স্থান প্রায় সব বন্ধ। দোকান-পাঠও প্রায় বন্ধ। অনেকের বাড়ীর রান্না-বান্না রবিবারে হয় না। পান্তা খাইতে হয়; লণ্ডনে ইহা ব্রত-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নয়, বাধ্য হইয়া করিতে হয়। আমরা কথায় কথায় দেশে চাকর বামুনের উপর জুলুম করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করি, কিংবা মা-মাসী, খুড়ী জেঠাই, সে যন্ত্রণা স্থানবিশেষে ভোগ করেন। ইংলণ্ডে এ সকল বিষয়ে চাকর-চাকরাণী, কুলী-মজুরই মনিব। ক্রমশঃ তাহাদের দৌরাত্ম্য বাড়িতেছে। কে চাকর—কে মনিব, তাহা সহসা বুঝিবার যো নাই। শ্রমজীবি-রক্ষার আইন ক্রমশঃ মনিবের বিরুদ্ধেই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ন্যায়ানুসারে দেখিলে, ব্যবস্থাটা একেবারে মন্দ নয়। প্রায় সকল বাড়ীর এই নিয়ম। চাকর-চাকরাণীরা আজ ছুটি পায়, গির্জ্জায় যায়, বাড়ী যায়, বিশ্রাম করিতে পায়। কথায় কথায় ধর্ম্মঘট বলিয়া, চাকর-চাকরাণীর অনেক অত্যাচার সহিতে

হয়। কাজেই বাধ্য হইয়া, রবিবার অধিকাংশ জায়গায় "পান্তা" খাইবার দিন। আমার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ হাঙ্গাম নাই, তাই রক্ষা। পচা কিংবা বাসী মাছমাংস্ খাওয়া আমার কর্ম্ম নয়। রুটী, ফল, ডিম, চা আমার পক্ষে যথেষ্ট—তাহাতেই চলিয়া যায়। সমস্ত দিনই প্রায় বাড়ী রহিলাম। ভিন্ন ভিন্ন লোকের নামে যে সব পরিচয়-পত্র পাইয়াছি, তাহা কতক কতক পাঠাইলাম; কারণ ক্রমশঃ দেখা-শুনা করার সময় অতীত হইতেছে। বৈকালে রেলে করিয়া, রিচ্মণ্ড (Richmond) নামক প্রসিদ্ধ আমোদপ্রমোদ-প্রধান উপনগরে বেড়াইতে গেলাম। খোলা অম্‌নিবস গাড়ীর ছাতের উপর হইতে নগর-উপনগর-শোভা দেখিতে দেখিতে যাইব মনে করিয়াছিলাম। গ্লাডষ্টোন, না এই রকম কোন মহাপুরুষের অন্যতম উক্তি এই যে, লণ্ডন অম্‌নিবাসের ছাতে বসিয়া,যেমন সুন্দর দেখা যায়, এমন অন্য কোন উপায়ে নয়। কিন্তু খোলা ছাতের উপর বসিবার এত লোক, যে তাহাতে জায়গা পাইলাম না। ছুটির দিন এসব জায়গায় বিস্তর লোক যায়। পূর্ব্বে রিচমণ্ডের ন্যায় সব জায়গা বদমায়েস-দের আড্ডা ছিল। এখন শাসন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার ধারে বাগানবাড়ী অঞ্চল সব যে রকম, রিচমণ্ড অনেকটা তাহাই। টেমস্ নদীর ধারে বাড়ী-বাগান বিস্তর আছে। রিচমণ্ডপার্ক বলিয়া সাধারণের বেড়াইবার সুন্দর বাগান আছে। তাহার মধ্যে একটু ছোট পাহাড়ীর মত আছে। পাহাড়ীর গায়ে পর্ব্বতের অনুকরণে পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট প্রমোদ-কুটীর—খেলিবার জায়গা—বসিবার জায়গা। গাছ-ঘরও যথেষ্ট আছে। সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে নদী পূর্ব্বগামী; নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার। তাহা ভুলিবার নয়। যেন আগাগোড়া সাজান বাগান। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা, ছোট ছোট ষ্টীমার, মোটরবোট প্রভৃতিতে নদী পরিপূর্ণ। সামান্য ভাড়ায় বেড়াইতে পার। মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছোট ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতেও বেড়াইতে যাও। বিস্তর হোটেল আছে। ইচ্ছামত পান-আহার কর। সকলেই নিজ নিজ অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুসারে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে। এ সব জনতায় যেরূপ হইয়া থাকে, এখানেও তাই। সকল লোকের আমোদই যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহা নহে। নদী এখানে খুব সরু হইয়া গিয়াছে। একটা বড় খালের মত। দুই দিকেই তীরভূমি গাছপালা-বাগানে ভরা। গ্রীষ্মকালেই এ দেশের লোক গাছপালার পাতা সবুজ দেখিতে পায়। ৯।১০ মাস শীত ভুগিয়া, এখন একটু বাহিরের আমোদ-আহ্লাদ করিতে পায়; তাই এত আমোদ, তাই Leafy Juneএর ইংলণ্ডে এত আদর-গৌরব।

কংগ্রেসের জন্য যে সকল উপকরণ প্রস্তুত করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম অথচ নিতান্ত অনাবশ্যক দেখিতেছি, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। বাহিরে গেলেও কাজ হয় না। বাড়ীতেও দেখা শুনা করিতে এত লোক-জন আসে যে, কাজের সময় পাওয়া যায় না। দ্বিপ্রহরে কিংবা আহারের পর সামান্য বিশ্রাম করিবার অবসর এই দশদিনের মধ্যে পাইলাম না, কিন্তু তাহাতে অসুখ করে না। বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার সময় একটু লেখাপড়া করিলাম। প্রায় রাত্রি আটটা বাজিল—এখনও পূর্ণ দিবালোক। আলো না জ্বালিয়া লিখিতেছি। আলো জ্বালিতে এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। কাজেই রাক্ষসী বেলাতে আহারাদি করিতে হয়। "এক সূর্য্যে দুইবার খাইব না" বলিলে, সময়ে সময়ে এখানে ষোল ঘণ্টা আহার হইবে না।

সোমবার ১৭ই জুন।—কংগ্রেসের জন্য বিশেষ প্রস্তুত হইবার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। বাস্তবিক কাজ যখন কিছুই হইবে না, তখন বৃথা ভূতের ব্যাগার খাটিয়া ফল নাই। এদিকে দশ মিনিটের বেশী কেহ বলিতে পাইবে না, নিয়ম হইয়াছে। তার ভিতর বলাই বা কি যাইবে, আর তার জন্য পরিশ্রমই বা কি! আজ Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Grey's Inn, Chancery Lane, Lincoln's Inn Fields ইত্যাদি আইন-আদালত-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ স্থান সব দেখিয়া আসিলাম। Grey's Innই সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, Lincoln's Innই সর্ব্বাপেক্ষা বড় জায়গা দেখিলাম। তাহার লাইব্রেরী, Dining Hall, Bencher's-Room ইত্যাদি স্থানীয় অধ্যক্ষগণ যত্ন করিয়া দেখাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারবানের দক্ষিণা! উপযুক্ত দক্ষিণা ব্যতীত বিলাতের কোথাও পা বাড়াইবার যো নাই। ভদ্রলোকের বাড়ীতে দেখা-শোনা করিতে গিয়াও বেমালুম বকসীস-প্রণালীর প্রয়োজন হয়, নতুবা ভদ্রতা ও সামাজিকতা রক্ষা হয় না। লাইব্রেরীতে বিস্তর লোক পড়াশুনা করিতেছে। Dining
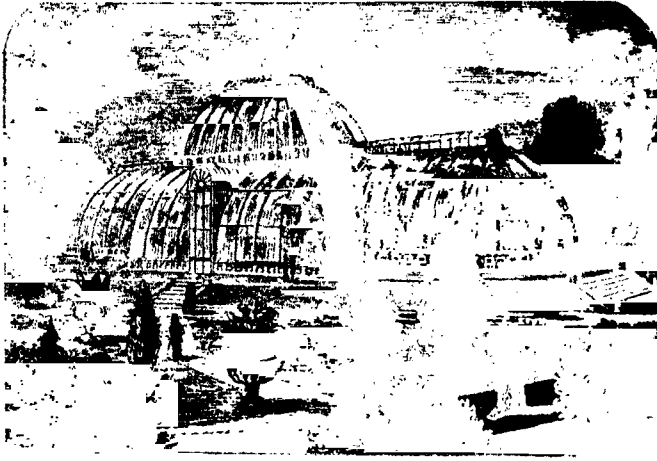
কিউ গার্ডেন্

Hallএ বড় বড় Bencherদের ছবি আছে। দেয়ালের গায়ে Law-givers of the World বলিয়া প্রকাণ্ড ছবি আঁকা। ছবির বাহাদুরী জাঁকজমক বড় দেখিলাম না। "মনু"কে কুলীবেশে, মহম্মদকে ফকীরবেশে সাজাইয়া, বিশেষ কি ফল হইয়াছে জানি না এবং মুসলমানেরা তাহাতে বিরক্ত হয় না কেন,জানি না। হজরৎ মহম্মদের, অঙ্কিত বা প্রতিষ্ঠিত, মূর্ত্তি ত মহম্মদের ধর্ম্মবিরোধী বলিয়াই প্রচার। এখানে তাহার ব্যত্যয় দেখিয়া ব্যথা লাগিল। স্থানগুলি সব নিস্তব্ধ, বিদ্যার প্রাচীন ক্ষেত্রের উপযুক্ত। পুরাতন বাটি—পুরাতন উঠান, পুরাতন গাছ-পালা—রাস্তা—সব যেন প্রাচীনতার আবরণে আচ্ছাদিত। পুঁথি-পড়া-বিদ্যার সাহায্যে মনে মনে যেরূপ চিত্র করিয়া রাখিয়াছিলাম—বাস্তব চক্ষে অনেকটা সেইরূপই দেখিলাম; দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও গৌরব অনুভবও হইতে লাগিল। ইহার পর Sommerset House প্রভৃতি বড় বড় পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাটিও দেখিয়া আসিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড উঠান, বিস্তর প্রস্তর মূর্ত্তি এই সকল বাড়ীরই দস্তুর। পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন উইল ও সাধারণ দলিল-রক্ষার সরকারী-দপ্তর ভাবেই ইহার ব্যবহার হইতেছে। ভ্রমণকারীর "সাহায্য-পুস্তকের" মত, তাহার সব স্বতন্ত্র বিস্তৃত বিবরণ লেখা নিষ্প্রয়োজন এবং অসম্ভব।

তার পর Gamageএর দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিতে গেলাম। এরূপ বড় বড় অথচ সস্তা দামের জিনিসের দোকান বিস্তর আছে। যথা,—Selfridge, Harrop, Whiteley ইত্যাদি। কলিকাতার Whiteaway Laidlawরা ইহাদের অনুকরণেই কারবার ফাঁদিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যে জিনিস চাও, তাই পাওয়া যায়। ভাল জিনিস, দাম সস্তা; একাধারে সকল সমাবেশ; সব সুবিধা। সুবিনীত সহকারিগণ খরিদদারের প্রয়োজনমত এক আনা মূল্যের জিনিস পছন্দ করাইবার জন্য যেমন যত্ন করিবে, হাজার টাকার জিনিস কিনিলেও তাই। যতক্ষণ না পছন্দ হয়, মনের মত করিবার জন্য, বিস্তর রকমের জিনিস দেখাইয়া এবং তাহা বেচিয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের দেশের লোকে দোকানদারী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। সব ফেলা, ছড়া, বেবন্দোবস্ত কাজ। আবার সাহেবী ঢঙ্গে যে সব বাবুরা কাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা না সাহেবী, না বাঙ্গালী। কাহাকেও গ্রাহ্য করে না অথচ ব্যবসাদার। এখানকার দোকানদার ও তাহাদের সহকারিগণের মুখে সামান্য খরিদদারকেও "Sir" "মহাশয়" ছাড়া কথা নাই। বড় দোকানে যাইতে প্রথমতঃ যাহাদের ইতস্তত বোধ হয়, তাহাদের অন্ততঃ ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, বড় দোকানের দাম বাস্তবিক অনেক ছোট দোকানের চেয়ে কম। কারণ যাহারা বড় আকারে ব্যবসায় কারবার করে, তাহারা এক একটি জিনিস একচেটিয়া করিয়া ফেলে, সস্তায় খরিদ করে, সস্তায় বিক্রয় করে। রকম রকম বিস্তর জিনিসও বড় দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে পছন্দের সুবিধা হয়। গ্রাম জুড়িয়া দোকান; একতালা হইতে উপরের তালায় যাইবার জন্য Lift সর্ব্বদা প্রস্তুত। তার পর সওদা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে মুখহাত ধুইবার জায়গা মায় সাবান-তোয়ালে প্রস্তুত। তাহার দাম দিতে হয় না। তার পর চা, কেক, রুটি, মদ যে যাহা খায়, তাহার জন্য দোকান, নাপিতের দোকান, জুতা বুরুষের দোকান, সব সেই এক দোকানের মধ্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সামান্য খরচেই এ সকল সরবরাহ হয়। এ সকল বিভাগে লাভের চেষ্টা আদৌ নাই, বরং পড়্তি দামেই এ সব বিভাগে জিনিস বিক্রয় হয়। কারণ সামান্য খরচায় পরিশ্রম অপনোদন করিয়া, খরিদদার

আবার সওদা করিতে আরম্ভ করিবে। এই অবসরে জল খাইবার, মুখ ধুইবার খাতিরে খরিদদার কেনা-বেচা বন্ধ করিয়া, দূর পল্লীতে আবাস স্থানে পলাইয়া না যায়, তাহার উপায়ের জন্য এই ব্যবস্থা। কেনা-বেচা করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, জলযোগ করিয়া, পোষাক বুরুষ করিয়া, বাড়ী না গিয়াও থিয়েটার, গির্জ্জা, স্বর্গ, নরক, যেখানে ইচ্ছা যাও। কেনা জিনিস বাড়ীতে দোকানদার নিজে পৌঁছাইয়া দিবে। এত বন্দোবস্ত করিয়াছে। আমাদের ঘটিলও তাই। যখন দেখিলাম, দোকানের ভিতরই মুখ-ধোয়া, চা-খাওয়া, সব বন্দোবস্ত আছে, তখন আর সময় ও শ্রান্তির উপর লক্ষ্য না করিয়া, কেনা-বেচা আরম্ভ হইল। তার পর তাহারা গাড়ী করিয়া জিনিস পৌঁছিয়া দিবে ও দাম লইয়া যাইবে। নিজের কোন ঝোঁক নাই। কেবল টাকাটি দাও। ইংরাজ ব্যবসা করিতে যথার্থ শিখিয়াছে। একটা ছোট ব্যাগ কিনিতে ছোট দোকানে গিয়া সেখানে অকৃতকার্য্য হইলাম। কিন্তু এখানে প্রয়োজনীয় কোন জিনিসের অভাব হইল না। যাহাদের সামান্য পুঁজী অথচ নিজেরা ঝুঁকী লইয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে পারে না, এরূপ মধ্যবিত্ত অনেক লোকের টাকা লইয়া, বড় বড় যৌথ কারবার বিস্তর হইতেছে। ব্যবসার বিশ্বাস ইহার মূল—কার্য্যকারিতা তার পর আসে। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনে বিঘ্ন হইবার প্রধান কারণ এই বিশ্বাসের অভাব।

ডাক আসিবার দুইদিন পরে না হইলে কুক্ এণ্ড সন্সের অনুগ্রহে পত্র পাওয়া যায় না। ইহা এক বিভ্রাট হইয়াছে। কিন্তু উপায় নাই। উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিবারণের সাধনা করিতে শিখিয়াছি। রাত্রে আনন্দমোহন মহাশয়ের ভাগ্নে ও অন্যান্য ছাত্রগণ আসিয়াছিলেন—কথাবার্ত্তা অনেক হইল।

মঙ্গলবার, ১৮ই জুন।—National Liberal Association এখানকার প্রধান Liberal Club। এলেকজাণ্ডার উইলসন সাহেব সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। Charring Cross Station হইয়া সেখানে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, সুন্দর বন্দোবস্ত, চমৎকার লাইব্রেরী, বিস্তর ছবি, প্রস্তর মূর্ত্তি ঘরে সুশোভিত। আরামের ও প্রয়োজনীয় সমুদয় প্রকরণযুক্ত পড়িবার, বসিবার, শুইবার, তামাক খাইবার, খেলাধুলা করিবার এবং আহারের বিস্তর ঘর। সুদরিদ্র ইণ্ডিয়া ক্লবের দরিদ্রতর সেক্রেটারীর এ সব ক্লব দেখিয়া শিখিবার অনেক জিনিস আছে। মেম্বরেরা ইচ্ছা করিলে ইচ্ছামত বাস করিতে পারেন। 'অনরারী' মেম্বররূপে আমারও এইখানে থাকিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু বাঁধাধরার ও গোলমালের মধ্যে থাকা সুবিধা হয় না বলিয়া ডাক্তার রায়ের নিভৃতনিলয়ের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। উইলসন সাহেব বিস্তর যত্ন আত্মীয়তা করিলেন, আমাদের দেশ তাঁহাদের দেশ সম্বন্ধে ও সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল। আমাদের ও আমাদের দেশের উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ। ভারতের সহিত সওদাগরী করিয়া, তাঁহার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। দূর হইতে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে, শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন; কারণ, ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায়ে তিনি ঠকেন নাই। এই সকল ইংরাজের গুণেই তাহাদের মঙ্গল। পুনরায় তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা-শুনা, আলাপ ও আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ক্লবের বাড়ী ঘর-দ্বার চারিদিক দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আরও অনেক পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইল।

সেখান হইতে India Officeএ Sir Richmond Ritchieর সহিত পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত দেখা-শুনা করিতে গেলাম। ভারত, ইংলণ্ড, ছাত্রসমাজ, শিক্ষক-সম্প্রদায়, ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল। ইঁহাদের পাঁচ মিনিট সময়ও পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু আমাকে এক ঘণ্টার উপর রাখিলেন এবং পুনরায় দেখা করিবার জন্য বলিলেন। কথা অনেক হয় বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাণের কথা ও আসল কথা কিছুই হইতে পায় না। পদে পদে যেন বহুদূরে রাখিয়া সব কথাবার্ত্তা। সবই বাজে কথা। গবর্ণমেণ্ট টাকা খরচ করার সম্বন্ধে ও রাজাধিরাজের ভারত ভ্রমণের স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ বিলাতে ভারতীয় ছাত্রাবাস সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে বড় উৎসাহ দিলেন না। কারণ গবর্ণমেণ্টের এখন এ সম্বন্ধে টাকা খরচের মত নয়। অতএব নিরাশ হইয়া আসিলাম। শুদ্ধ এক 'ক্রমওয়েল হাউস' সাজাইয়া বসিয়া থাকিলেই

ইংলণ্ডবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগের মঙ্গল হইবে না। স্থাপিত হইলে ভারতবাসী ও ইংরাজের মেলামেশার সুবিধা অনেক বাড়িত; কারণ আমার বিশেষ প্রস্তাব এই, যে সকল ইংরাজ সিভিল সার্ব্বিস কিংবা অন্য সার্ব্বিস লইয়া ভারতবর্ষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহারা অন্ততঃ কিছুদিন এই ছাত্রাবাসে ভারতবাসীর সহিত একত্র বাস করিবেন। তাহাতে উভয়ের লাভ এবং উভয়ে উভয়কে সম্মান করিতে শিখিবেন। আজকাল গৃহস্থ বাড়ীতে ভারতবাসি-ছাত্রাবাস প্রায় এক রকম বন্ধই হইয়াছে। কাজেই ভাল ইংরাজদিগের সহিত মেলামেশার সুবিধা ভারতবাসী ছাত্র পায় না। ছাত্রাবাসে যদি মিলনের এইরূপ সুবিধা হয় ও ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্রের জন্য উভয় শ্রেণীর ছাত্র যদি একত্র প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে পরস্পরে জানা-শুনা, বোঝাপড়া ও মেশামিশি ভাল হয়। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও উৎসাহের এ বিষয়ে অভাব এবং তাহা হইলে বাহিরের লোকের সাহায্যের অভাবও নিশ্চয় হইবে। অতএব এবিষয়ে "কাজ হওয়া" যাহাকে বলে, বিলাতে আসিয়া তাহার কোন পক্ষেরই কিছু হইল না। ডাক্তার পি. কে. রায় ভারতীয় ছাত্রদিগের সহকারী অধ্যক্ষরূপে কিছু দিন এখানে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারও এ বিষয়ে আমার সহিত এক মত। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না।
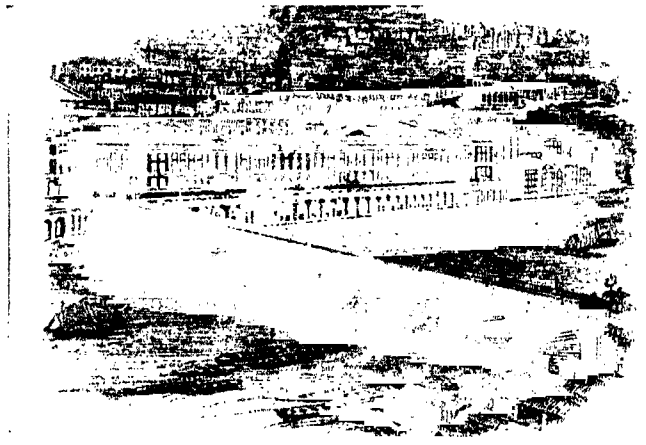
কিংস্ কলেজ্

বাড়ী আসিয়া মুখহাত ধুইয়া পুনরায় বাহির হইলাম। লণ্ডনের প্রধান হোটেল Hotel Cecil; সেখানে Calcutta Dinnerএ Farrসাহেব নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে যে সব সাহেব কাজকর্ম্ম উপলক্ষে কখন না কখন ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রতি বৎসর লণ্ডনে এক ভোজের আয়োজন করেন। অনেক পুরাতন লোকের সহিত দেখা-শুনা, কথাবার্ত্তা হয়। লণ্ডন প্রকাণ্ড সহর; সমগ্র বিলাত আরও বড়। সর্ব্বদা দেখা-শুনা খবরাখবর সম্ভব নয়। অতএব, এই রকম আয়োজন না করিলে দেখা হয় না। প্রথাটা ভাল এবং আমার পক্ষে আপাততঃ বিশেষ উপকারজনক হইল। কত পুরাতন লোকের যে দেখা পাইলাম, তাহার সংখ্যা নাই। ঠিক যেন কলিকাতাতেই Calcutta Clubএ গিয়াছি, মনে হইল। তবে বাঙ্গালীর মধ্যে আমি একা। বাঙ্গালী কেন—সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে আমিই একা উপস্থিত। এসব দলের মধ্যে বাঙ্গালী কি ভারতবাসীর আদর বরাবরই বড় কম। যদিও ভারতবাসী অনেক প্রধান প্রধান লোক বিলাতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের এ সব জায়গায় বড় নিমন্ত্রণ হয় না। আমার উপর অনুগ্রহ করিয়া নিমন্ত্রণ করা সৌভাগ্যের বিষয় বটে। কিন্তু পুরাতন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-বিশেষের পুরাতন ভারত বিদ্বেষ পরিচয় পাইয়া, ভোজের সুখ যেন কমিয়া গেল; দুই তিনজন মহা-প্রভুর সহিত আমার বিশেষ বচসা হইল। তাঁহারাও অতিথি, অতএব তাঁহাদের কথা ধরিবার মধ্যে নয়। বিশেষতঃ তর্কে পরাস্ত হইয়া, তাঁহারা যথার্থ ইংরাজদিগের নিকট যথেষ্ট অপ্রস্তুত হইলেন। সকলেই যথেষ্ট সম্মান ও আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। Hotel Cecilএর আহার ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিষয় বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। Ritz Carlton ও Hotel Cecil, লণ্ডনের প্রধান এবং 'ফ্যাশনেবল্ হোটেল'। একবার এসব স্থানে আহার করা হইয়াছে, এগল্প করিতে পাইলে, সাধারণ মধ্যবিত্ত ইংরাজ নিজেদের ধন্য মনে করে। সকল জিনিসই 'রাজার হালে'। রাজাধিরাজের অতিথিগণকেও রাজবাটীতে ভোজ না দিয়া, এই সব জায়গায় বড় বড় ভোজ দেওয়া হয়। আহারের পর Flash-lightএ Photograph উঠিল। সকলের সঙ্গে সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা বিস্তর হইল। বাড়ী আসিতে রাত্রি ১২টা বাজিল। দিনের অপেক্ষা রাত্রিতে

হর্টিকল্‌চর্যাল্‌ গার্ডেন

করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় আর একজন ভদ্রলোক আসিয়া পড়াতে রণে ভঙ্গ দিল। অজানা পথে লণ্ডনে রাত্রিকালে কেন—দিনেও এইজন্য চলিতে সকলে নিষেধ করে। একদিকে যেমন পুলিসের কড়াকড়, অন্যদিকে যেখানে পুলিশের দৃষ্টি নাই, সেখানে বদমায়েসের তেমনই প্রাদুর্ভাব।

বুধবার, ১৯এ জুন।—শরীর ভার ও গ্লানি প্রযুক্ত স্নান ত বন্ধ রাখিয়াছি, বাহিরে খাওয়া-দাওয়া প্রায় চলিয়াছে বলিয়া, বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া খুব কম রাখিয়াছি। গৃহকর্ত্রী মাঝে মাঝে বলেন যে, এত অল্প আহারে বিলাতের পরিশ্রম চলিবে না। দেশেও এইকথা দিবারাত্রি শুনিতাম। অবৈতনিক-চাক্‌রী সমস্ত দিন চলিয়াছে। যদিও অমনিবস্‌, মোটর বস্‌, টিউব, আণ্ডার গ্রাউণ্ড, এবং সময়ে সময়ে হ্যান্‌সম্‌, কিংবা ট্যাক্সি ক্যাব্‌, অথবা ট্যাক্সি-মোটর ছাড়া যাতায়াত করি না, তথাপি এক ষ্টেসন হইতে গন্তব্যস্থানে যাইতে সময়ে সময়ে যথেষ্ট পথ অতিবাহিত করিতে হয়। এইরূপ সমস্তদিনে দশটি রাই কুড়াইয়া একটি প্রকাণ্ড বেল হয়!—ষ্টেসনের ভিতর মাটীর ভিতর দিয়া গাড়ীতে পৌঁছিবার জন্য যে হাঁটিতে হয়, তাহাও নিতান্ত কম নয়। এখানে এত হাঁটা হইতেছে, যে দেশে তাহা কখনও হয় নাই।

প্রথমেই London University Buildingএ Dr. Hill এর কাছে গিয়া, কলিকাতার ইউনিভার্সিটির ছবি ও ক্যালেণ্ডার যাহা আনিয়াছি, তাহা দিলাম। কংগ্রেসের জন্য পরিশ্রম করিয়া, এত সংগ্রহ ও লেখা যাহা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের ছাপাইবার সঙ্গতি নাই বলিয়া, তাহা কাজে লাগিল না। ডাক্তার হিল, ডাক্তার রায়কে বলিলেন যে, কংগ্রেস উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিভার্সিটি হইতে সম্মানসূচক ডিগ্রী অতি অল্পলোককেই দেওয়া স্থির হইয়াছে। অতএব, ডর্হাম ইউনিভার্সিটি তাঁহাকে যে ডিগ্রী দিতেছে, তাহা বিশেষ সম্মানের চিহ্ন।—একথা নিশ্চয়। অতি অল্পসংখ্যক লোক যে সম্মান পায়, তাহার মূল্য অধিক। ডাক্তার রায়

লণ্ডনে লোকজন, গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় বড় বেশী হয়। কোন মতে পথ পাওয়া যায় না। পুরাতন ছোট-লাট Sir Stewart Bailey, পুরাতন জজ Sir Earnest Trevelyan, Sir John Stanley, পুরাতন সওদাগর Sir Montagu Turner; Sir George Sutherland, Sir Allen Arthur, Sir William Dring, Thomas Jones, Sparkes Robinson, Longmore, Morgan, Stapleton, Fink, Sir John Lambert, Bradshaw, প্রভৃতি কত লোকের সঙ্গে যে দেখা হইল, তা'র আর ঠিক নাই। একসঙ্গে এত কলিকাতার পরিচিত লোকের সঙ্গে এখানে দেখা হইবে, মনে হয় নাই; সকলেই বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিলেন। অনেক অপরিচিত লোকে আসিয়াও আলাপ করিতে লাগিলেন। "হংসো মধ্যে বকো যথা" বলিয়া, আদর-আপ্যায়ন কিছু বেশী হইল।

অত্যাচার কিছু বেশী চলিয়াছে। দেহ কতদিন বহিবে, জানি না। বিলাতে রাত্রিতে পথের বিপদের একটু পরিচয় পাইলাম। সোজা রাস্তায় রেল ধরিব বলিয়া, হোটেলের খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া, খানিক গলিপথে আসিয়া, বড় রাস্তায় পড়িব, মনে করিয়াছিলাম। ফুল-বেচিবার অছিলায় একজন বদমায়েস পয়সা ভিক্ষা করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। ষণ্ডামার্ক দেখিয়া ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করাতে লোকটা উগ্রমূর্ত্তি হইয়া, রীতিমত Sturdy Beggar রূপ ধারণ করিয়া, আক্রমণ

এরূপ বিশেষ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে—সমস্ত বাঙ্গালা দেশের সম্মান করা হইয়াছে। তাঁহাকে সম্মানসূচক যে ডিগ্রী প্রদত্ত হইবে, সে সভায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার এবং সম্মানের অংশীদার হইবার আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষদিগের যে বন্দোবস্ত, তাহাতে আমার ডর্হামে যাওয়া ঘটে না। স্বদেশী একজন বন্ধু একটা বিশেষ-সম্মান পাইবে, সেখানে আমার উপস্থিত থাকা বিশেষ সুখের বিষয় এবং উচিত বিবেচনায় আমি অন্য কাজ ছাড়িয়া ডর্হামে যাইতে প্রস্তুত হইয়া, হিল্ সাহেবকে জানাইয়াছিলাম; এবং কার্য্য-প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্তনের উমেদারীর জন্য ডাক্তার রায়ের সহিত ডাক্তার হিলের নিকট গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের বন্দোবস্তে তাহা কুলাইল না বলিয়াই হউক কিংবা অন্ততঃ একজন বাঙ্গালী আয়ার্লণ্ডে, ডবলিনে যাওয়া উচিত বিবেচনা করিয়াই হউক, ডাক্তার হিলের ইচ্ছা যে আমি ডর্হাম না যাইয়া, এবার্ডিন, সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ হইয়া ডবলিনে যাই। এবিষয়ে তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে, কাজেই আমায় তাহাতেই মত করিতে হইল।

সেখান হইতে অমনিবসে চড়িয়া হাইড পার্ক, সেণ্ট-জেমস, রিজেণ্ট ষ্ট্রীট, বণ্ড ষ্ট্রীট হইয়া, হ্যানোভার স্কোয়ারে 'ওরিয়েণ্ট্যাল ক্লাবে' পুরাতন জজ স্যর আর্‌নেষ্ট ট্রেবেলিয়নের সহিত দেখা করিতে গেলাম। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকের আড্ডা বা বৈটকখানা যাহা বল, "ক্লাব" নামে খ্যাত। ক্লাবের আদর আমাদের দেশে এত নয়। ইণ্ডিয়া ক্লাবের সেক্রেটারী হইয়া যা ভুগিতে হইয়াছে, এসব দেশে তা নয়। এক একটা ক্লাব যেন রাজবাড়ী। সকল আরাম, সুবিধা ও ঐশ্বর্য্যের স্থান। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে যথেষ্ট পাপ-প্রাবল্যও এই সব ক্লাবের সাহায্যে হয়। কিন্তু অধিকাংশ লোকে সাধারণতঃ ছোট ছোট বাড়ীতে কিংবা বাসায় থাকে। বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা-শুনা, খাওয়ান-দাওয়ান, নিজেদের মধ্যাহ্ন-ভোজন, জলযোগ, সময়ে সময়ে শয়ন, পাঠ, কাজ সবই ক্লাবে হয়। ট্রেবেলিয়ন সাহেবের সহিত পুরাতন কথা অনেক হইল। বাবা, ছোট কাকা,

ঈটন্ কলেজ্

সুরেশ, সকলকেই তিনি জানেন। কাজেই কথা ফুরায় না। আর আমরা, তাঁহাকে জজ ও ব্যারিষ্টাররূপে, অনেক দিন দেখিয়াছি। তিনি এখন অক্সফোর্ডের আইন-অধ্যাপক। যে সব কথা হইল, সব লিখিতে হইলে স্থান কুলায় না—তাহাতে ফলও নাই; হয়ত উচিতও নয়। কিন্তু বরাবরই সর্ব্বত্র যা দেখিতেছি, আসল কথা—কাজের কথায় কাহাকেও পাইবার যো নাই। বাজে কথাতেই সব পূর্ণ। ট্রেবেলিয়ন সাহেব ব্যারিষ্টারী পড়ার একজন অধ্যাপক—অক্সফোর্ডেরও আইন-অধ্যাপক। জজিয়তির পেন্‌সন লইয়া বৃদ্ধবয়সে যুবকের ন্যায় কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন। এটর্নি স্পার্কস্ সাহেবের সহিতও দেখা হইল।

তারপর Lincoln's Inn, Old Squareএ প্রাচীন অধ্যাপক ও প্রসিদ্ধ আইনগ্রন্থ-প্রণেতা অজারস্ (Blake Odgers) যাঁহার 'Studies on Libel' অর্থাৎ 'মানহানি সম্বন্ধে' বিখ্যাত পুস্তক আছে এবং Sir Frederick Pollock (পলক্, যাঁহার যুক্তি-আইন 'Contract' ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে) প্রভৃতির সহিত বন্দোবস্ত-মত দেখা করিতে গেলাম। যত্ন যথেষ্ট করিলেন, কিন্তু আসল কথায় কেহই নাই! সামান্য সামান্য ঘর লইয়া, একজন কেরাণী লইয়া, তাঁহাদের আপিস; অথচ বিশ্ববিখ্যাত প্রতিপত্তি। আড়ম্বর-ঐশ্বর্য্যেই যে খ্যাতিপ্রতিপত্তি হয়, তাহা নয়; একথা এই সকল মহাপুরুষকে দেখিলে বুঝা যায়। এইজন্য শরীর ও সময় নষ্ট করিয়া ইঁহাদের সঙ্গে দেখা

সাক্ষাৎ করিতেছি। ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের পক্ষে যে সকল প্রস্তাব ও চেষ্টা করিতেছি, তাহা সফল হইতেছে না; ইহা আমাদের সনাতন দুর্ভাগ্য। এখন আমাদের সময় ও পড়্তা এইরূপ পড়িয়াছে, আর হইবেও এইরূপ। তা বলিয়া এই সকল মহাপুরুষকে দর্শন না করিয়া গেলে, বিলাত-আসা বৃথা হইবে বলিয়া কষ্ট করিতেছি। পলক সাহেব ভারতবর্ষে Tagore Law Lecturer হইয়া গিয়াছিলেন। ভারত তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অপরিচিত স্থান নয়। নানা গভীর তত্ত্বের মধ্যে তাড়াতাড়ি আমায় টানিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার ঘরের দেয়ালের ঘুলঘুলিতে যে পাখীর বাসা করিয়াছে, তাহা সযত্নে দেখাইলেন। পক্ষিমাতার অনুপস্থিতিতে কত যত্নের সহিত তিনি ও তাঁহার কেরাণী, শাবকের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহাও বলিলেন এবং অন্যতর শাবকের অকালমৃত্যুতে যথেষ্ট শোকপ্রকাশ করিলেন এবং ব্যবহারা-জীবের উপযুক্ত কাঠিন্যের সহিত পক্ষিমাতার কঠোর হৃদয়কে ধিক্কার দিলেন। অদ্ভুত মিশ্রণ!!!

তারপর 'রয়াল সোসাইটিজ্ ক্লাবে' মুখহাত ধুইয়া বিশ্রাম করিয়া 'রিফর্ম ক্লাবে' আমীর আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাহেব শরীর রাখিয়াছেন ভাল, বড় চাকরী, বড় পদ, বড় বাস্ত—ইহার পরিচয় হাতে হাতে। ক্লার্ক-কেসের ইনিও একজন জজ ছিলেন। এসব কথা সাদা-মাটা ধরণের হইল। অন্য কথাও তাই। পুনরায় দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আমার সময়াভাব।

সন্ধ্যায় আহারাদির পর Hampstead Heath এ Pearson সাহেবের পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ জন্য তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। দীর্ঘপথ, বার বার রেল বদল করিতে হয়। Liftএর সাহায্যে প্রায় ২০০ ফুট নীচে রেলপথে যাইতে হয়; কারণ জায়গাটা লণ্ডন অপেক্ষা অনেক উচ্চ—খুব খোলা পরিষ্কার জায়গা। লণ্ডনের স্বাস্থ্যকর উচ্চ নগর-নিবাসের মধ্যে ইহা সর্ব্বোত্তম বলিয়া খ্যাত; অল্পসংখ্যক লোকেরই নিমন্ত্রণ,—কফী, আইসক্রীম ইত্যাদির আয়োজন। একজন বাঙ্গালী বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালা-সাহিত্যসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রঠাকুরের প্রশংসাবাদ যথেষ্ট করিলেন। রবীন্দ্রবাবুও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত বিলাতী লোকদের সাক্ষাৎকারের জন্য এই সভার আয়োজন। রবিবাবু, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বিলাত আসিয়াছেন। শরীর ভাল নয় বলিয়া বেড়াইতে আসিয়াছেন। আমেরিকা যাইবার অভিপ্রায়ও আছে। বিলাত-বাসী যাহাতে বাঙ্গালার সাহিত্য-অনুরাগী এবং বাঙ্গালার সাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর এখন যথার্থ পরিচয় পায়, তাহার জন্য রবিবাবুর আন্তরিক চেষ্টা। তিনি স্থানে স্থানে বিলাতবাসী বন্ধুদিগের বৈঠকখানায় এ সব আলোচনা করিতেছেন এবং তাঁহার নিজ-রচিত কবিতা ও সঙ্গীতের অনুবাদ হইতেছে। বিলাতবাসী তাহা শুনিয়া প্রীত হইতেছে। তিনি হ্যাম্পষ্টেড হিদে আছেন এবং এ সভাস্থলে উপস্থিত। রবিবাবু সকলের অনুরোধে স্বরচিত একটি গান গাহিয়া, সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

রথেন্‌ষ্টাইন্ নামক চিত্রকর ও কবি, কলিকাতায় গিয়া রবিবাবুর অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি এইরূপে রবিবাবুর কবিতার বিলাতী-মহলে প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতেছেন। কালে সে উদ্যোগে বিশেষ সুপ্রচারের সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়। বিলাতে ভারতীয় নাটক অভিনয়ের অনুষ্ঠানেও লোকের উৎসাহ দেখা যাইতেছে। বিলাত-প্রবাসিনী বাঙ্গালী রমণীদিগের উদ্যোগে লণ্ডন ও কেম্ব্রিজে ইংরাজী ভাষায় শকুন্তলার অভিনয় হইতেছে। ইংরাজ তাহাতে মোহিত হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ। ভারত-সাহিত্যের চর্চ্চা ও আদর পূর্ব্বে বিলাতে যত হইত, ম্যাক্সমুলারের মৃত্যুর পর তাহা কমিয়া গিয়াছে। রবিবাবুর প্রতিভায় যদি বিলাতে এইরূপ আদর হয়, দেশের তাহাতে বিশেষ মঙ্গল।

বৃহস্পতিবার, ২০এ জুন।—সকালে স্নানাহার করিয়া ট্যাক্সিক্যাবে করিয়া 'ইণ্ডিয়া আপিসে' গেলাম। কিছু বিলম্ব হওয়াতে রেলে না গিয়া ট্যাক্সিক্যাব লইতে হইল। কারণ, Mr. Montagu, যিনি এখন Under Secretary State for India, তাঁহার সহিত দেখা করিবার বন্দোবস্ত ছিল। দেখা করিবার দুইএক মিনিট আগু-পাছু হইলে বড় অন্যায়। তাড়াতাড়িতে একটা শিলিংএর পরিবর্ত্তে গাড়োয়ানকে একটা হাফ্-সভারেন, অর্থাৎ সাত শিলিং, দিয়া বসিলাম। দুইটাই দেখিতে প্রায় এক রকম। তবে একটা সোণার, একটা রূপার। যাহা-যাহা যেমন ঘটিতেছে, তেমনি লিখিয়া যাইতেছি, ভবিষ্যৎ-বংশীয়দিগের সাবধান

করিবার জন্য; অর্থাৎ সময়ের মূল্য বুঝিয়া কাজ করিলে, রেলের বদলে ট্যাক্সী লইতে হয় না, এবং শিলিংএর• বদলে সভারেন দিতে হয় না।

Mr. Montaguর পর আবার তিনটার সময় ঐ India Officeএই আমাদের ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার—Sir Thomas Raleighর সহিত appointment ছিল। আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, এই সময় দেখা হইলেই ভাল হয়। তিনিও অনুগ্রহ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেখা করিলেন। দুইজনের সঙ্গে দেখা করায় প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। নানা বিষয়ে বিস্তর কথা হইল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যতকথা হইবার প্রয়োজন, সব হইয়া গেল। শিক্ষা-বিভাগ ও ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধেই অধিক। কিন্তু কাজের আসল কথা পাড়িয়া যেই চাপাচাপি করিয়া ধরি, অমনি কথা চাপা দিয়া, অন্য কথা আনিয়া ফেলা, সনাতন নিয়ম। কয়দিন ভূতগত পরিশ্রম করিয়া, নানা বড়লোকের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বুঝিলাম যে, আমাদের দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়-সংক্রান্ত আসল কাজের কথা কিছুই হইবে না। আসল উপকারের কোন কথা না হইয়া, কেবল বাজে কথা, তামাসা, Interchange of views, Clearing of ground ইত্যাদি লম্বা চৌড়া কথাতেই এ সকল Interview শেষ হয়। কোন্ বিষয়ে কি কি কথা হইল, তাহা প্রকাশ করিবার আমার অধিকার নাই; সেই জন্য সে সকল বিষয়ের অবতারণা করিলাম না। Frederick Grubb সাহেব বিশেষ করিয়া আমার ছবি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ছবিও সঙ্গে নাই। তাই ছবিওয়ালার কারখানায় গিয়া তোলাইতে হইল। 'Abkari' পত্রে ছবি পত্রস্থ হইবে বলিয়া Grubb সাহেবের অনুরোধ।

বাড়ী আসিয়া, কাল Aberdeen যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ও দেশের ডাক লিখিতে সময় অনেক গেল। কাল দশটার গাড়ীতেই যাওয়া, কাজেই সময় পাওয়া যাইবে না। অনেক জায়গা হইতে কিছু কিছু বলিবার নিমন্ত্রণও আসিয়াছে। চিঠি লিখিতে, উত্তর দিতে ও দেখা করিতে ১৫ দিন সময় গেল। এইবার কাজের পালা পড়িবার সম্ভাবনা।

প্রতীক্ষা

[শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, B. A.]

ওগো ফাগুনের পাখি !
তোমার বিরহে শীর্ণা ধরণী,—
হিমগুণ্ঠিত আঁখি,
নাহি বেশ—নাহি ভূষণ-সম্ভার,
অযুত পূজক নাহি দ্বারে আর,
অঞ্চল ঘিরি বহেনা পবন
অঙ্গ-সুবাস মাখি';
কুসুমবিহীন কুঞ্জকানন,
লভিবে সে কবে নব আভরণ ?
পল্লবহীন তরুশাখে কবে
আবার গায়িবে পাখী ?
ওগো ফাগুনের পাখি !

ওগো আলেয়ার আলো !
যে পথ দেখায়ে ভুলায়েছ পথ,
সেই ভালো, সেই ভালো !
অন্তবিহীন ধূ ধূ প্রান্তর—
ঘনঘোর রাতি, কোথা শশধর ?
আঁধার সীমায় নাহি দেখা যায়
পল্লিবীথির আলো,—
পথ খুঁজে ফিরি প্রান্তর মাঝে,
তৃণ-কণ্টক পদতলে বাজে,
যদি কভু—যদি বারেক আবার
ক্ষণিক দীপ্তি জ্বালো।
ওগো আলেয়ার আলো !'

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

(২১)

প্রাতঃকালে খুড়া-রহস্য প্রকাশিত হইল। খুড়ার আহ্বানে আমিই সর্ব্বপ্রথম ঘর হইতে বাহিরে আসি। আসিয়া দেখি, খুড়া অৰ্দ্ধসিক্ত বস্ত্রে বাহির বারাণ্ডার মেজের উপর বসিয়া আছে। জানুদ্বয় বাহুদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া, পা দুইটি ভূমি হইতে ঈষৎ উপরে তুলিয়া, চেয়ারে ঠেস দিবার মত বসিয়া আছে। তার দেহ অনাবৃত—একখানি গামোছা পর্য্যন্ত কাঁধে ছিল না। বসিয়া বসিয়া আমাদের বাসার অনতিদূরস্থ একটা বকুল বৃক্ষের পানে চাহিয়া আপনার মনে শিষ দিতেছিল। আর আরদালী কাত্তিক, বারাণ্ডার সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ সোপানে পা দিয়া, খুড়াকে যেন পাহারা দিতেছিল।

আমি বারাণ্ডায় পা দিবামাত্র কাত্তিক ঈষৎ অবনত হইয়া আমাকে সেলাম করিল। খুড়া তাহা দেখিতে পাইল। অমনি সে জানু হইতে হাত ছাড়িয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইল। এবং কাত্তিকেরই মত সম্ভ্রম দেখাইয়া আমাকে সেলাম করিল। তাহার সেলাম দেখিয়া, আমি অপ্রতিভের মত দাঁড়াইলাম। বহুকালের পর গুরুজন-দর্শন, সমাজের রীতি-অনুসারে তাহাকে প্রণাম করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমি তাহা করিতে পারিলাম না। দুই কারণে পারিলাম না। খুড়া কি করিতে আসিয়াছে, আমার জানা ছিল। আরদালীর সুমুখে রাঁধুনী বামুনের কাছে মাথা হেঁট করিতে মনটা কেমন 'কিন্তু' করিতে লাগিল। দ্বিতীয় কারণ—খুড়াকে প্রণাম করিলে, মাতার কাছে তিরস্কৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

আমি প্রণাম করিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলাম। খুড়া শুনিতে পাইল না, কি শুনিয়াও শুনিল না, বুঝিতে পারিলাম না। সে আবার মুখ ফিরাইয়া বকুল বৃক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমিও তার দেখাদেখি বকুলের পানে চাহিলাম। চাহিবামাত্র একটা স্পন্দন, দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তারাভেদ করিয়া, হৃদয়দেশে একটা প্রবল ঝঙ্কার তুলিয়া দিল। কাল আমি এই এ বকুলেরই তলসমীপে আমার কনের হাত ধরিয়া এক বিচিত্র লীলা করিয়া আসিয়াছি! মনে হইতেই আমি বকুলের পানে আর একবার সাগ্রহদৃষ্টিতে চাহিলাম। বকুলের শুধু মাথা সেথান হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। দেখিয়া আমার বোধ হইল, বকুল যেন মস্তক অবনত করিয়া স্নিগ্ধঘন মধুর নীরবতায় তলদেশে আমাদের পূর্ব্বরাত্রির লীলার ধ্যান করিতেছে।

বোধ মাত্রেই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। মাথাঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপাধি-বোধেরও বিপর্য্যয় ঘটিল। আমি যে ডেপুটীর পুত্র, তাহা ভুলিয়া গেলাম। সম্মুখের বকুল-আসঙ্গলিপ্সায় আমাদের গ্রামস্থ তাহার অগণ্য বকুল,সহচরকে আনিয়া, বারাণ্ডার সম্মুখস্থ আকাশ পাতায় পাতায় ঢাকিয়া দিল। আমার মনে হইল, সেই অপূর্ব্ব শান্তিময় ছায়াতলে আনন্দময় খুড়া, ঘটকচূড়ামণির মূর্ত্তিতে আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। আমাকে কোথাও যেন দেখিতে না পাইয়া আকাশপানে চাহিয়া আছে। -

আমি ধীরে ধীরে খুড়ার সমীপে উপস্থিত হইলাম। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিলাম। চরণে করস্পর্শে খুড়ার যেন চৈতন্য হইল। চোক নামাইয়া খুড়া আমার মুখের পানে চাহিল। চাহিয়াই ঈষৎ হাসির সহিত আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—"হরিহর! কি আর বলিব! জগদম্বার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও।" কথা বলিতে বলিতে গণেশ-খুড়ার চোখে জল আসিল।

আমি বলিলাম—"কাকা! রাত্রিতে তোমার বড়ই লাঞ্ছনা হইয়াছে।"

"কিছু হইয়াছে।—মিছা কথা কহিব কেন, হরিহর! তবে তোমার মুখ দেখিয়া সে সমস্ত ভুলিলাম। আমি

তোমার গণ্ডমূর্খ কাকা। অধিক কথা তোমাকে আর বলিতে পারিলাম না।"

"ইহার জন্য বাবা, মা—উভয়েই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছেন।"

এ কথায় খুড়া আর কোনও উত্তর করিল না। আমার মনে হইল, তাহার বিশ্বাস হইল না। আমিও এক প্রকার মিথ্যা কহিয়াছি। পিতামাতার মর্ম্মকথা কিছুই না জানিয়া, শুদ্ধমাত্র অনুমান অবলম্বনে, ঐরূপ বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস ছিল, মানুষমাত্রেই খুড়ার ওইরূপ অবস্থায় দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, সে অপ্রিয় আলোচনায় নিরস্ত হইয়া, আমি খুড়াকে ঘরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

খুড়া ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিল না। বলিল—"না। আমি এখানে বেশ বসিয়াছি। তুমি এক কাজ কর। তোমার বাপের নামে একখানা পত্র আনিয়াছি। তাঁহাকে দিয়া আইস।"

এই বলিয়া সিক্ত বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া খুড়া আমাকে দিল। অগত্যা আমি পিতাকে দিবার জন্য পত্রখানা হাতে লইলাম।

খুড়ার নিকট হইতে অধিক দূর যাইতে হইল না। দুই চারিপদ চলিয়া আসিতেই পিতার কণ্ঠস্বর আমার শ্রুতি-গোচর হইল। বুঝিলাম, তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। মায়েরও কথা শুনিলাম। বোধ হইল, পিতামাতায় একটা বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। দূর হইতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র এই বুঝিলাম, কথাটা খুড়ার সম্বন্ধেই হইতেছে। পিতা খুড়াকে হুগলীতে আনিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; শুধু মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাহাকে পাঠাইতে চিঠি দিয়াছিলেন।

মায়ের শেষ কথাটামাত্র আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। মা বলিতেছিলেন—"যাইতে হয়, তুমিই যাও। আমার যাইতে দায় পড়িয়াছে। তোমার দেশের লোক। খোসামোদ করিতে হয়, তুমিই কর। আমি করিতে যাইব কেন? আমি তোমাদেরই জন্য চিঠি লিখিতে বলিয়াছি।"

ইহার পরেই পিতা তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে হলঘরে আসিলেন। মাতা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না। প্রতিদিন বেলা পর্য্যন্ত ঘুমান তাঁহার অভ্যাস ছিল। আমার অনুমান হইল, পিতাকে বিদায় করিয়া, তিনি আবার শয়ন করিয়াছেন।

পিতা বারাণ্ডার দিকেই আসিতেছিলেন দেখিয়া আমি আর অগ্রসর হইলাম না। চিঠিখানা হাতে করিয়া কার্ত্তিকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যেখানে সে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে পিতার আগমন দেখা যায় না।

আমাকে নিকটে পাইয়া কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ খোকাবাবু, ও ঠাকুরটি আপনাদের কে?"

আমি কোনও উত্তর দিতে না দিতে পিতা বারাণ্ডায় পদক্ষেপ করিলেন। কার্ত্তিক অমনি মস্তক ভূমিলগ্নপ্রায় করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল।

গণেশ-খুড়াও পিতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং কার্ত্তিকের দেখাদেখি তাহারই অনুকরণে পিতাকে সেলাম করিল।

পিতার মুখে তখনও নিদ্রাভারচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খুড়ার আচরণে তাহা আরও যেন ভারী হইয়া উঠিল। তিনি খুড়াকে প্রথমে কিছু না বলিয়া, আরদালীর দিকে মুখ ফিরাইলেন; ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি রে! তোর এমন অবস্থা কে করিল?"

কার্ত্তিক করযোড়ে উত্তর করিল—"হুজুর! গোলামকে এখন সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। করিলে উত্তর দিতে পারিব না; বাপ-মায়ের বড় পুণ্য ছিল, তাই হুজুরের হুকুম তামিল কর্‌তে পেরেছি।"

পিতা। বলিস্ কি!

কার্ত্তিক। ইহার পরে বলিব। আপাততঃ ঠাকুরকে একখানা বস্ত্র দিন। ঠাকুরের কাপড়-চোপড় সব জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

পিতা আমাকে একখানা বস্ত্র আনিতে আদেশ করিলেন। আদেশ শুনিবামাত্র গণেশ-খুড়া বলিয়া উঠিল —"না হুজুর, প্রয়োজন নাই। খোকাবাবুর হাতে আপনার নামের একপত্র দিয়াছি। সেইখানা লইয়া, আমাকে কৃতার্থ করুন। একটা উত্তর পাইলে আরও কৃতার্থ হই।"

গণেশখুড়ার এ কথাতেও পিতা কোন উত্তর করিলেন না, অথবা তাহার পানে চাহিলেন না। তিনি কার্ত্তিককে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল যে রাঁধুনীর সন্ধানে তোরা দু'জন চলিয়া গেলি, তার কি করিয়া আসিলি?"

কার্ত্তিক বলিল—"খুব ভাল একজন রাঁধুনী পাইয়াছি। খাজাঞ্চীবাবু তাহাকে যোগাড় করিয়াছে। সে আগে একজন হাকিমেরই ঘরে চাকরী করিত। সব রকমের রসুই তাহার জানা আছে। মাহিনা কিছু বেশী চায়।"

"তাহাতে কোন আটক হইবে না। তুই কাপড় ছাড়িয়া এখনি তাহাকে লইয়া আয়।"

কার্ত্তিক সিঁড়িতে দ্রুত নামিতে লাগিল। উঠানে পা দিতে না দিতে, পিতা আবার তাহাকে ডাকিলেন। কার্ত্তিক আবার ফিরিল। পিতা তাহাকে গোপনে কি বলিতে অভিলাষ করিলেন। আমি থাকিলে তাঁহার বলার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, বোধ হয়, পিতা আমাকে খুড়ার জন্য আবার কাপড় আনিতে আদেশ করিলেন।

কাপড় আনিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, মা আবার ঘুমাইয়াছেন।

যেখানে কাঠের আনালায় পিতার কাপড় থাকিত, আমি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেইখানে গেলাম এবং পিতার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্য হইতে একখানি উৎকৃষ্ট ফরাসডাঙ্গার কালাপেড়ে কাঁচি ধুতি গ্রহণ করিলাম। ধুতি চুনট করা কোঁচান। কার্ত্তিক কাপড় কোঁচাইতে পারদর্শী ছিল বলিয়া, পিতা তাহাকেই সমস্ত কাপড় কোঁচাইতে দিতেন।

কাপড় লইয়া দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময়ে মায়ের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন—"কি হরিহর ?"

"কাপড়।"

"কার জন্য ?"

আমি আসল কথাটা গোপন করিয়া বলিলাম—"বাবা চাহিয়াছেন।"

"তা, তুমি লইয়া যাইতেছ কেন ?"

"আমাকেই লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।"

"কি কাপড় দেখি।"

আমি দেখাইলাম। মা কাপড়খানা দেখিয়াই বলি-লেন—"বাবু কি বাহিরে যাইবেন ?"

"না।"

"তবে ?"

"একখানা কাপড় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমি এইখানাই লইয়াছি।"

"সে পাগলটা কোথায় আছে ?"

আমি যেন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ পাগল !"

"গণেশের মার গণেশ। যেটাকে রসুইয়ের জন্য আনাইয়াছ।"

মা আমার দুষ্টামী বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না। তিনি কিন্তু আমাকে প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিলেন না। শুধু গণেশ বলিলেই আমি আবার জিজ্ঞাসা করিতাম, কোন্ গণেশ। ইতিপূর্ব্বে গণেশ নামে আর এক 'বামুন' আমাদের বাড়ী মাসখানেক চাকরী করিয়াছিল। তাহারও একটু পাগলামীর ছিট্ ছিল। আমাদের গ্রামেও গণেশ নামে চারি পাঁচজন লোক ছিল। তাহাদের এক একটি নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট গুণানুসারে এক একটা বিশেষ বিশেষ বিশেষণ ছিল। যথা,—পোড়া গণেশ, বাঘা গণেশ, গোবর গণেশ ইত্যাদি। কি জন্য যে, তাহারা এইরূপ বিশেষণ-লাভ করিয়াছিল, তাহা কাহারও বড় একটা জানা ছিল না। পোড়া গণেশ পোড়া ছিল না, বরং সুপুরুষই ছিল। তবে বিশেষণটি যোগ দিলেই কে যে কোথাকার, তাহা আমাদের কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিত না। সেইরূপ গণেশের মার গণেশ, এই কথা বলিলেই আমাদের গ্রামমধ্যে খুড়ার সম্যক্ পরিচয় হইত।

"গণেশের মা'র গণেশ" এই কথা শুনিবামাত্র আমাকে বলিতে হইল—"বারাণ্ডায় আছে।"

"বাবু ?"

"তিনিও সেইখানে আছেন।"

"আর কে আছে ?"

"আর ছিল আরদালী।"

"এখন নাই ?"

"বাবা তাকে কাপড় ছাড়িবার জন্য চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন।"

"কাপড় আমার হাতে দিয়া তাঁকে ডাকিয়া আন।"

কি করি ; মায়ের হাতে কাপড়খানা রাখিয়া, পিতাকে ডাকিতে চলিলাম।

আমার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, পিতা ঘরে ফিরিতে-ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই কাপড়ের কথা তুলিলেন।

আমি যাহা বলিবার বলিতে না বলিতে মা ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"কি বলিতেছ ?"

"গণেশের জন্য একখানা কাপড় চাহিতেছি।"

"কেন, গণেশ কি উলঙ্গ আসিয়াছে ?"

"তাহার কাপড়ের পুঁটুলি গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে। সে নিজেও ভাসিয়া যাইত ; কার্ত্তিক গঙ্গায় নামিয়া অতি কষ্টে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে।"

"মরিলেই ভাল হইত। হতভাগাটা কিছুতেই ত আমাদের কথা শুনিল না। যাক্, তুমি কি সেই জন্য ছেলেকে কাপড় আনিতে হুকুম করিয়াছ ?"

পিতা যেন অপ্রতিভ হইলেন। এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাতা বলিতে লাগিলেন—"এই বুদ্ধিতে তুমি হাকিমী কর ? রাঁধুনী বামুনের পরিচর্য্যা করিতে ছেলেকে হুকুম কর! কেহ ছিল না বলিতেছ। কার্ত্তিক ছিল না ?"

"কার্ত্তিক থাকিলে কি হইবে ? তাহাকে ত আর গণেশের কাপড় ছুঁইতে দিতে পারি না !"

"কেন গো ! সে বাগ্দী বলিয়া ? এ দেশের বাগ্দীর আচার-ব্যবহার তোমাদের দেশের বামুনগুলার চেয়েও শতগুণে ভাল। আমি কার্ত্তিকের জল নিঃসঙ্কোচে খাইতে পারি। কিন্তু তোমাদের দেশের বামুনের হাতের জল খাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

পিতা মায়ের এই কথায় ভ্রূ আকৃষ্ট করিয়া, অর্দ্ধবদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কর কি ! আস্তে কথা কও। সে এই বারাণ্ডায় বসিয়া আছে।"

ঠিক এমনি সময়ে খুড়া গাহিয়া উঠিল—

"দোষ কার নয় গো মা !
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা !"

মাতা চমৎকৃতের মত দাঁড়াইলেন। পিতাও যেন একটু বিচলিত হইলেন। গান কিন্তু বেশীক্ষণ হইল না। গোটাকতক হাঁচি আসিয়া এই এক কলিতেই খুড়ার গান বন্ধ করিয়া দিল।

পিতা বলিলেন—"গণেশ শুনিতে পাইল না কি ?"

"পেলেই বা। আমি ত আর কাহাকেও [illegible]রিয়া বলিতেছি না। যা সত্য—তাই বলিতেছি।"

এই বলিয়া মা কাপড়খানা হাতে তুলিয়া পিতাকে দেখাইলেন। বলিলেন—"এই কাপড় কি গণেশকে পরিতে দিতে হইবে ? এই সাত টাকার ধুতি পরিয়া সে রাঁধিবে ?"

পিতা কাপড় দেখিয়াই শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন—"ওকে কাপড় আনিতেই বলিয়াছি। বোকাটা যে ওই কাপড় আনিবে, তা কেমন করিয়া বুঝিব !"

"বোকা ও হইতে যাইবে কেন,—বোকা তুমি। বালক ও কি জানে ?"

"বেশ, তুমি যা জান তাই কর। গণেশকে একখানা কাপড় দাও। দেখ, একদিনের জন্য সে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা গোল বাধাইও না।"

"একদিনের জন্য কেন ? সে কি চাকরী করিবে না ?"

"একদিনই কেন, এক দণ্ড বলিলেও চলে। ওপারে নৈহাটীতে তার কুটুম্ব আছে। সে সেইখানেই যাইবে।"

মায়ের দন্তে যেন আঘাত লাগিল। গণেশ-খুড়া চাকরী করিবে না, ও আমাদিগকে 'বাবু' 'হুজুর' বলিতে পারিবে না, বলিয়া, ডোঙ্গা হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল ; সেই গণেশ ফিরিয়া চাকরী করিতে আসিয়াছে। চাকরী করিলেই বোধ হয়, মায়ের অভিমান বজায় থাকিত। তাহা হইবে না, খুড়া থাকিবে না শুনিয়া মা যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। অন্ততঃ তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া এইটাই আমার বোধ হইল।

মা বলিলেন—"সে কি তোমাকে বলিয়াছে, চাকরী করিবে না ?"

"স্পষ্টতঃ বলে নাই। কথার ভাবে বুঝিয়াছি। আর সে চাকরী করিতে চাহিলেও আমি করিতে দিব না।"

"কেন ? স্বদেশবাসীর উপর সহসা এত রাগ হইল কেন ?"

"আমি ভাল রাঁধুনী-বামুন পাইয়াছি।"

"দিনকতক তাহাকে দিয়া রাঁধাইলেই আমার মনের আক্ষেপ মিটিত।"

"আক্ষেপ মিটাইতে পারিতে, যদি দেশে আর আমাদের না ফিরিতে হইত। সে থাকিলে তোমার আরদালী যখন তখন যে সে ঘরে ঢুকিতে পারিবে না, রান্নাঘরের ত্রিসীমা মাড়াইতে পাইবে না। বাজার হইতে খাবার

আসিবে না। মেম সাহেবকে কিছুদিনের জন্য সেলাম ঠুকিতে হইবে।"

"তবে সে আসিয়াছে কেন?"

"কেন, আসিয়া বুঝিতেছি।"

এই বলিয়া পিতা প্রাতঃকৃত্য সমাধার জন্য ভিতর বারাণ্ডার দিকে চলিলেন। তাঁহার হাতে যে চিঠি দিয়াছিলাম, দেখিলাম সেখানা মোড়া অবস্থাতেই তাঁর হাতে রহিয়াছে। মা চিঠিখানা দেখিতে পাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাতে ওটা কি?"

পিতা। চিঠি। গণেশ আনিয়াছে। বোধ হয়, মা দিয়াছেন। এখানাও কাপড়ের সঙ্গে বোকাটা ভিজাইয়াছে। পাছে ছিঁড়িয়া যায়, সেই জন্য খুলি নাই।

মাতা। আমার হাতে দিয়া যাও।

পিতা। আমি এখনও পড়ি নাই।

মাতা। ভয় নাই। গূহ্য কথা কাহাকেও প্রকাশ করিব না।

পিতা। ইহাতে সাড়ে-চুয়াত্তর অঙ্ক দেওয়া আছে।

মাতা। মানে কি?

পিতা। মানে, যাহার নামে চিঠি, সে ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পাঠ নিষিদ্ধ। পড়িলে প্রত্যবায় হইবে।

মাতা। তোমার মায়ের চোখে আমার প্রত্যবায় ত চব্বিশ ঘণ্টাই লাগিয়া আছে। চিঠি পড়িয়া আর বেশি কি হইবে?

পিতা ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন—"বড় যেমন-তেমন বেশি হইবে না। সাড়ে চুয়াত্তরের মানে জান?"

মাতা। মূর্খ স্ত্রীলোক, তাতে সেই মড়ুইপোড়া বামুনের হিসাবে আমি ছোট-লোকের বেটী। ওসব কঠিন কথার মানে কেমন করিয়া জানিব?

পিতা। চিতোরের পদ্মিনীর কথা শুনিয়াছ?

মাতা। শুনিব কেন, দেখিয়াছি। সে হরিহরের মাসী। নিষ্ঠুর তোমরা, আমাদের চিরদিন পর্দ্দানশীন পরাধীন করিয়া রাখিয়াছ। আমরা রান্নাঘরের বাহিরের খবর জানি না। আমাকে চিতোরের কথা, পদ্মিনীর কথা, জানি কি না জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা করে না? আমাদের দুঃখ দেখিয়া, মেম সাহেব আমাকে সেলাই শিখাইতে শিখাইতে এত চোখের জল ফেলে যে, মাটিতে পড়িলে এতদিনে একটা দীঘী হইয়া যাইত। অমনি অমনি কাল ত একটা রাঁধুনির ভয়ে অস্থির হইয়া তুমি আমাদের পোষাক বদলাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলে!

পিতা তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হরিহর! পদ্মিনীর ইতিহাস তুমি জান?" আমি সে সময়ের বাংলা ইতিহাসে পদ্মিনীর কথা পড়িয়াছিলাম, যথা-সম্ভব সংক্ষেপে তাহা পিতাকে শুনাইলাম।

পিতা বলিলেন—"সেই পদ্মিনীর জন্য দিল্লীর বাদসাহের সঙ্গে রাজপুতদের যুদ্ধে এত রাজপুত মরিয়াছিল যে, তাহাদের পৈতার ওজন হইয়াছিল, সাড়েচুয়াত্তর মণ!"

"এ গাঁজাখুরি কথাও কি ইতিহাসে আছে নাকি?"

"এইরূপ প্রবাদ। চিঠির মোড়কে এই অঙ্ক দিবার অর্থ এই, চিঠির মালিক ভিন্ন অন্য যেকেহ ইহাকে খুলিবে, তাহাকে সেই অসংখ্য রাজপুত হত্যার পাপ স্পর্শ করিবে।"

"স্পর্শ করিবে বলিতেছ কেন, পাপের চাপে সে ছাতু হইয়া যাইবে।"

এই বলিয়াই মা ছুটিয়া বাবার হাতের চিঠিখানা ধরিলেন। বাবা চিঠি লইতে নিষেধ করিলেন। মা শুনিলেন না; বলিলেন—"এই সাড়েচুয়াত্তরের কথা না তুলিলে লইতাম না। যখন তুলিয়াছ, তখন আমাকে লইতেই হইবে। দেখিব, সাড়েচুয়াত্তর মণ পাপের ভারে আমার মাথাটা গুঁড়াইয়া যায় কি না।"

পত্র ছিন্ন হইবার ভয়ে অগত্যা পিতা চিঠি হস্তচ্যুত করিলেন, এবং মাতাকে তাহা সযত্নে রাখিতে অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

(২২)

পত্র হাতে করিয়াই মা ঝিকে ডাকিলেন। পিতাও ঘরের বাহির হইয়া, চাকর পাঁচুকে ডাকিলেন। তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ঝি-চাকর—উভয়েই ঘুমাইতেছিল। আমরা রোজ রোজ বেলায় ঘুম হইতে উঠি বলিয়া, চাকরটাও বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইত। কিন্তু ঝি প্রতিদিন প্রত্যুষেই উঠিত। মায়ের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে সে ঘরের অনেক কাজ সারিয়া রাখিত।

আজ প্রথম, মায়ের ডাকে ঝির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে একটু সশঙ্কভাবে চোখ মুছিতে মুছিতে মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিল।

সে কাছে আসিতেই মা তাহাকে একটু মৃদু তিরস্কারের ভাবে বলিলেন—"এমনি করিয়া ঘুমাইয়া কি তুই মনিবের চাকরী করিবি ?"

"আজ একটু উঠিতে বেলা হইয়াছে। আর আপনি যে আজ এমন সময় উঠিবেন, তা জানিতাম না।"

"তাহা হইলে জেগে ঘুমাইতেছিলি বল্ ?"

"না মা, ঘুমাইতেছিলাম।"

"মিথ্যা কথা বলিতেছিস্ কেন ?"

"মিথ্যা কেমন করিয়া জানিলে ?"

"তোর চোখ দেখিয়া বুঝিতেছি। তোদের কাজ দেখিবার জন্যই আমি আজ সকাল-সকাল উঠিয়াছি।"

দেশে আমি সময়ে অসময়ে মায়ের কথায় কথা কহিতাম। মায়ের যে কাজটা আমার অন্যায় বলিয়া বোধ হইত, আমি প্রতিবাদ করিতাম। সেখানে পিতামহ ও পিতামহীর আশ্রয় ছিল। এখানে একমাত্র মায়ের আশ্রয়। মার কথা অনর্থক অন্যায় হইতেছে দেখিয়াও আমি বাঙ্-নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না।

ঝি কি একটা উত্তর করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়া গেল। কি জানি, কি বুঝিয়া, সে বলিতে নিরস্ত হইল। তখনও ঝি-চাকরের আজিকালিকার মত গুমর বাড়ে নাই। এক রাঁধুনী-বামুন ছাড়া আর সকলই সুপ্রাপ্য ছিল। তাহাদের বেতনও এখনকার মত অধিক ছিল না। আমার বোধ হয়, নিজের দরিদ্র-অবস্থা স্মরণ করিয়া, সে মায়ের এই অযথা কঠোর বাক্য-প্রয়োগে ক্রোধ দেখাইতে সাহস করিল না। কেন না আমি বুঝিয়াছি, সে মিথ্যা কহে নাই। সে মস্তক অবনত করিয়া নীরবে মার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ঝি আর কোনও কথা কহিল না দেখিয়া, মা বলিলেন—"যা,—এবার মাপ করিলাম। মিছা কথায় মনিবের কথার উত্তর দিবার বেয়াদবী দ্বিতীয় বার যেন দেখিতে না পাই।"

ঝি প্রস্থানোদ্যতা হইল। মা বলিলেন—"দাঁড়া। আমার কাজ আছে। তোর একখানা থান কাপড় লইয়া আয়।"

"পরিয়া আসিব ?"

"না ; হাতে করিয়া আন্।"

"আপনার সঙ্গে কোথাও কি যাইতে হইবে ?"

"না। আগে লইয়া আয়। কি জন্য, তার পরে বলিতেছি।"

ঝি কাপড় আনিতে গেল। ইত্যবসরে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গণেশের সঙ্গে তোর কি কোনও কথা হইয়াছিল ?"

"কথা হইতে না হইতে বাবা আসিয়া পড়িলেন। তাঁর আদেশে আমি খুড়ার জন্য——।" "খুড়া" বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতে মা হস্ত দ্বারা আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কাপড় আনিবার কথা আর মুখ হইতে বাহির হইল না। "খুড়া কে মূর্খ।—হুঁসিয়ার! আমি যা শুনিলাম ; চাকর-দাসীদের মধ্যে আর কেহ যেন এ কথা শুনিতে না পায়। শুনিলে আমাদের মাথা হেঁট হইবে। হুগলীতে আর আমরা থাকিতে পারিব না।"

এই সকল বিপদ-বিভীষিকার কথা শুনিয়া, আমি মনে করিলাম, না জানি কি গর্হিত কার্য্যই করিয়াছি। আমাদের হুগলী-বাস উৎখাত করিতে কোথা হইতে খুড়ারূপে এক প্রকাণ্ড কোদাল আসিয়াছে! আমি একেবারে দাঁতে দাঁত দিয়া চুপ করিলাম। ঝি অচিরে কাপড় লইয়া আসিল।

বস্ত্র ঝির পরিধেয় ; অর্দ্ধ মলিন। ঝি বিধবা বলিয়া তাহাতে পাড় ছিল না। মা সেই বস্ত্র খুড়াকে দিবার জন্য ঝিকে আদেশ করিলেন। ঝি মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল,সে আদেশের অর্থ বুঝিতে পারিল না। মা বলিলেন—"হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলি কেন? বামুনকে দিয়ে আয়।"

ঝি বলিল—"কেন ?"

"কাপড় আবার কিজন্য দিয়া আসে ?"

"তা তো জানি ;—কিন্তু পরিবে কে ?"

"ওই বামুনই পরিবে—আবার কে! বোকা বামুন গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়া পুঁটুলি হারাইয়া আসিয়াছে। ভিজে কাপড়ে বসিয়া আছে বলিয়া, বাবু ত হাকে একখানা কাপড় দিতে বলিয়াছেন।"

"আমার কাপড়, বামুনকে পরিতে দিবে কিগো!"

"কেন, দোষ কি ? তোতে আর তাতে বেশি তফাৎ কি ? তুই দেড় টাকা মাহিনা পাস্, সে বড়-জোর না হয়, তিন টাকা পাইবে!"

ঝি স্থিরদৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; কিছুক্ষণের জন্য কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছে। ঝি উত্তর করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কথা যেন বাহির হইতেছে না।

মা তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"হাঁ করিয়া, ডাইনের মত মুখের পানে কি দেখিতেছিস্? আমাকে গিলিয়া খাইবি না কি?"

তথাপি ঝি কথা কহিল না; মায়ের মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে কি যেন মাকে বলিবে, কিন্তু বলিবার সাহস আসিতে আসিতে আসিতেছে না।

তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া, মাও যেন কিছু শঙ্কিত হইলেন। অনেক সময়ে নির্ব্বাক্ লাঞ্ছনা উচ্চ-চীৎকারের কলহকে পরাস্ত করে। এ ক্ষেত্রেও তাই হইল; ঝিয়ের অবজ্ঞার দৃষ্টির কাছে মা পরাভব স্বীকার করিলেন; বলিলেন—"বেশ, তুই দিতে না পারিস্, কাপড় আমাকে দে।"

এইবারে ঝি কথা কহিল। অতি মৃদুতার সহিত সে মাকে বলিল—"হাঁ মা! তুমি কি?"

মা বোধ হয়, ঝির প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমি কিন্তু বুঝিয়াছিলাম। ঝিয়ের পরবর্ত্তী প্রশ্নে, আমি যে বুঝিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

মা বলিলেন—"কি মানে কি?"

"বাবু ত শুনিয়াছি ব্রাহ্মণ; কিন্তু তুমি কি?"

এই কথা শুনিবামাত্র মার চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি তদ্দণ্ডেই ঝিকে একটা কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন।

ঝি কিন্তু তাহাতে চিত্তের বিন্দুমাত্রও বিচলন প্রদর্শন করিল না; সে বলিল—"ক্রোধ কর, কটু বল, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি তাঁতির মেয়ে। এক সময় আমাদের বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব হইত। দৈব-দুর্ব্বিপাকে আজ আমাকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত আমার অবস্থাপন্ন অনেক কুটুম্ব আছে। আমার এক বোন-ঝি-জামাই তোমারই স্বামীর মত হাকিম।"

মা চমকিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম; ঝি তাহা লক্ষ্য করিল না। সে বলিতে লাগিল—"আমি, আমার মর্য্যাদা ও অভিমান বজায় রাখিতে, তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। গতর খাটাইয়া খাইব, তবু জ্ঞাতি-কুটুম্বের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারিব না, বলিয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়াছি। হাকিম বলিয়া আসি নাই—ব্রাহ্মণ বলিয়া আসিয়াছি। জানি—থাকিলে আমার নিন্দা হইবে না। কিন্তু তোমাদের ভাবগতি দেখিয়া এখানে কয়দিন হইতেই আমার সন্দেহ হইয়াছে;—সন্দেহ কেন, ভয় হইয়াছে। ভাবিতেছি, ব্রাহ্মণ ভাবিয়া কার বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে আসিলাম!"

মা বলিলেন—"তোর কি মনে হয়?"

ঠিক এই সময়ে গণেশখুড়া গায়িয়া উঠিল—

"ছুঁয়োনা রে শমন আমার জাতি গিয়েছে।"

গায়িতে গায়িতে হল-ঘরের দ্বারের সমীপে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়াই খুড়া পিতাকে লক্ষ্য করিয়া, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কই হুজুর?—চিঠি দাও। আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

মাতা তাহার সম্বোধনের কর্কশতা অনুভব করিয়া বলিলেন—"মূর্খ! এ তোমার বন্য বর্ব্বরের দেশ নয়। একটু আস্তে কথা কহিতে জান না!"

মায়ের কথা শুনিয়াই গণেশ ঘরের ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং মাকে দেখিবামাত্রই, আমাদের বেলায় যেরূপ করিয়াছিল, সেলাম করিল।

মা তাহার এইরূপ রহস্যাভিনয়ে ক্রোধ-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অধর কম্পিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু তিনি মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে না করিতে গণেশ-খুড়া বলিয়া উঠিল—"ক্রোধ করিতেছ কেন, মা লক্ষ্মী? তোমার ওই বাগ্‌দী আরদালীই আমাকে এই সব শিখাইয়া দিয়াছে। কাল আমি তোমাদের এখানে খানা খাইতে দেখিয়াছিলাম; দেখিয়া বাহির হইতেই চুপিচুপি পলাইবার চেষ্টায় ছিলাম। ফটকের মুখে কুকুর দুইটা আমাকে আক্রমণ করে। তাহাদের হাতে রক্ষার উপায় না পাইয়া, তোমাদের মুরগীর ঘরে ঢুকিয়াছিলাম। তার পর কয়বেটাতে পড়িয়া আমাকে ধরিয়া চোরের মার মারিয়াছে।"

মাতা মস্তক অবনত করিলেন। খুড়া বলিতে লাগিল—"এখনও কি মা-লক্ষ্মী, তোমার রাগ মিটিল না?"

" 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি'—যেমন কাজ করিয়াছ,তাহার ফল পাইয়াছ।"

"তা যা বলিয়াছ। আমার কা'ল বড়ই মূর্খামী হইয়াছে। দাদার আশ্রয়ে আসিতেছি বুঝিয়া বাড়ীতে লাঠি গাছটি ফেলিয়া আসিয়াছি।"

"লাঠি আনিয়া আমাদের মাথা ভাঙিয়া দিতে নাকি ?"

"আগে তোমার ওই কুকুর দু'টার মাথার ঘি বাহির করিতাম।"

"কুকুরের গায়ে লাঠি ঠেকাইলে, তখনই শ্রীঘরে যাইতে হইত। কুকুর দুইটির দাম দুইশো টাকা। তোমার ভিটামাটি বিক্রী করিলেও ওর দাম উঠিত না।"

"বটে !"

"তোমার ভাগ্য, যে কুকুরের গায়ে হাত দাও নাই। দিলে আব বাবুর কাছে তোমার দয়া পাইবার কোন প্রত্যাশা থাকিত না।"

"আর তোমার কাছে ?"

মা উত্তর করিলেন না। খুড়া কিন্তু উত্তর শুনিবার জেদ ধরিল। একবার—দুইবার—তিনবার। আমরা—ঝি ও আমি—হতভম্বের মত দেখিতেছি। তৃতীয় বারের পরেও যখন খুড়া উত্তর শুনিবার জেদ ছাড়িল না, তখন মা অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আরদালী !"

আরদালী আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে ভিতর দিক হইতে আমার পিতৃদেব ছুটিয়া আসিলেন।

মা ও খুড়ার কথাবার্ত্তা বোধ হয়, তিনি ভিতর-বারাণ্ডা হইতে শুনিয়াছিলেন। তাই, আরদালীর নাম শ্রুতিগোচর হইবামাত্র ব্যাপার কিছু কঠিন হইতেছে বুঝিয়া, শৌচাদি-কার্য্য সম্যক্ শেষ না করিয়াই, ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। একখানা তোয়ালে ও সাবান হাতে পাঁচুও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে।

পিতা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই গণেশ-খুড়া বলিয়া উঠিল—"মেম সাহেব! তোমার ওই আরদালী হুজুর আসিয়াছেন। উঁহাকে কি হুকুম করিবে কর। আমি উঁহারই সম্মুখে জোর করিয়া আবার বলিতেছি—আগে তোমার ওই কুকুর দুইটার মাথার ঘি বাহির করিতাম; তার পর যে সে—"

এই বলিয়া খুড়া, কাত্তিক-পাঁচু প্রভৃতি যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রে তাহাকে বন্দী করিয়াছিল, সকলেরই বাপগুলার মুখে পিণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদেরও মুণ্ডপাতের যে সম্ভাবনা ছিল, তাহা বুঝাইয়া দিল।

সত্বর পত্রের উত্তর দিবার আভাস দিয়া, পিতা কিঞ্চিৎ ব্যগ্রতার সহিত খুড়াকে দ্বারদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

আমাদের এখানে অবস্থানে খুড়ার নাসিকারন্ধ্র যে বিশেষ উৎপীড়িত হইতেছে, ইহা বুঝাইয়া খুড়া পত্রের প্রতীক্ষায় নিজস্থানে ফিরিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য পিতা প্রথমে পাঁচুকে তিরস্কার করিলেন। তারপর ঝিকে ও তাহাকে স্থানত্যাগের আদেশ করিলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে, পিতা মাকে বলিলেন—"তুমি কি আমাকে দেশে ফিরিতে দিবে না ?"

মায়ের তখনও ক্রোধের উপশম হয় নাই। পিতার কথা শুনিবামাত্র তিনি উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এখনি যাও। আমি কি তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছি ?"

"আমার উপর ক্রোধ করিতেছ কেন ? এ আপদ্ কি আমি জুটাইয়াছি ?"

"তাই ত চুপ করিয়া আছি। তা না-হ'লে কাণ ধরাইয়া মূর্খটাকে বাটীর বাহির করিয়া দিতাম। হতভাগার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার কুকুরের মাথার ঘি বাহির করিবে বলে ? হতভাগা জানে না, ওর চেয়ে আমার কুকুরের দর বেশি।"

"বামুনের ছেলে হ'য়ে গণ্ডমূর্খ। ওর কথায় তুমি কাণ দাও! তোমাকে আর কি বলিব! বর্ত্তমান সভ্যতা যে কি, তাহা ওদের বংশে কখন শোনে নাই। তুমি এবং তোমার কুকুর যে কি বস্তু, তা ও কেমন করিয়া বুঝিবে ?"

এই বলিয়াই পিতা মায়ের নিকট হইতে পত্র প্রার্থনা করিলেন—"শীঘ্র পত্র দাও। আমি হতভাগাকে উত্তর দিয়া বিদায় করি।"

নিজের ও কুকুরের সুখ্যাতিতে মায়ের মন দেখিতে দেখিতে নরম হইয়া গেল। তাঁহার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি না পড়িয়াই পত্রখানা পিতাকে

ফিরাইয়া দিলেন; দিতে দিতে বলিলেন—"এই লও। হতভাগার জন্য পড়িতে অবসর পাইলাম না। কিন্তু এ পত্রে কি লেখা আছে এবং ইহার কি উত্তর দিবে, আমাকে দেখাইতে হইবে।"

পিতা প্রথমে পত্র হাতে লইলেন। তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"যদি দেখাইবার যোগ্য হয়, দেখাইব; নহিলে দেখাইব না।"

"যোগ্য অযোগ্য বুঝি না, আমাকে দেখাইতেই হইবে।"

"অন্যায় জেদ করিয়ো না, নীহার!"

এইখানে বলিয়া রাখি, মায়ের নাম ছিল নিস্তারিণী। দেশের ভাগ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী পুরুষের নামগুলা "গোপাল-গদাধরের" পদবী হইতে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছে, রমণীগণের নামগুলিও সেই সমানুপাতে উন্নতি-লাভ করিয়াছে।

তখন সবেমাত্র উন্নতির সূচনা হইয়াছে! সেই সূচনার সময়েও মায়ের এই দাঁতভাঙ্গা নিস্তারিণী নাম, পিতা, মাতা, মায়ের মহিলা সঙ্গিনী—কাহারও শ্রুতি-সুখকর হইল না। পিতা ভাষাতত্ত্ববিশারদ। তিনি তখন এই নামের অঙ্গ মার্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত 'পিতৃ' যেমন 'পেটের' 'প্যাডর' স্তরেস্তরে নামিয়া অবশেষে ইংরাজী 'ফাদার'এ পরিণত হইয়াছে, আমার জননীরও 'নিস্তারিণী' নাম সেইরূপ নিষ্টার, নিস্থার, নীথর—সর্ব্বশেষে 'নীহারে' পরিণত হইল।

মা আমার জেদ ছাড়িলেন না। বলিলেন—"অন্য সময় কথা রাখিতে বল রাখিব। এ পত্র আমাকে দেখাইতেই হইবে।"

"যদি না দেখাই?"

"তা হ'লে এখনি দেখিব?" এই বলিয়াই মাতা পিতার হস্ত হইতে পত্র পুনর্গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। আকর্ষণে পত্র ছিঁড়িয়া গেল! ছিন্নাংশ ভূমিতে পতিত হইল।

প্রথমে মাতা অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু পিতার এক কথায় তাঁহার প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

পিতা বলিলেন—"নীহার! এতটা স্বাধীনতা ভাল নয়।"

বঙ্কিম গ্রীবা আরও বাঁকাইয়া, কটাক্ষে কোপ পুরিয়া মা বলিলেন—"কি বলিলে?"

পিতার কথা মুহূর্ত্তে কোমল হইয়া, কৈফিয়তে পরিণত হইল। "বাঁদরটা উত্তরের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। মিছে সময় নষ্ট করিলে, আবার সে একটা কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসিবে! তাহাকে বিদায় করিতে পারিলে, নিশ্চিন্ত হই। তাই বলিতেছি।"

"উত্তর আমি দিতেছি।"—এই বলিয়াই মাতা পিতার হস্ত হইতে পত্রের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিলেন এবং দুই হস্তে ধরিয়া তাহাকে শতাংশে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। অবাক্ হইয়া পিতা মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। আমি চাহিয়া রহিলাম।

গণেশ খুড়া আবার দ্বার-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পিতা বলিলেন—"গণেশ! চিঠির জবাব দেশে পাঠাইয়া দিব।"

গণেশ বলিল—"তবে সেলাম। জেঠাই মাকে কি বলিব?"

"কিছু বলিতে হইবে না।"

"না দাদা! একটা বলিব। বলিব—জেঠাই মা! আমি বাঁদর বটি; কিন্তু তুমি যাকে গর্ভে ধরিয়াছ, তার মত আজও আমি মগ্‌ডালে উঠিতে পারি নাই।"

"কি বল্‌লি উল্লুক?"

উল্লুক উত্তর করিল না।—"দোষ কারও নয় গো মা!" গান গায়িতে গায়িতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

পিতা, বোধ হয়, খুড়াকে শাস্তি দিবার অভিলাষী ছিলেন। মা এবারে তাঁর হাত ধরিলেন। বলিলেন—"গণ্ডমূখকে যাইতে দাও।"

"না নীহার, একটু আমার শক্তির পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। নহিলে আমার দেশে যাওয়া সম্ভব হইবে না।"

"তবে একটু দেখাইয়া দাও।"

ঠিক এমনি সময়ে উঠানে একটা কুকুর প্রথমে চীৎকার ও পরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কাত্তিক দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল—"হুজুর! বামুন কুকুরকে পদাঘাতে বিষম আহত করিয়াছে।"

পিতা গণেশকে আবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। আরদালী ছুটিল। আমি, পিতা ও মা, তিনজনেই বাহির বারাণ্ডায় ছুটিয়া আসিলাম।

দেখিলাম, আহত কুকুরের মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে—অপরটা পলাইয়াছে।

গণেশ-খুড়া ফটকে পা দিবামাত্র কার্ত্তিক তাহাকে ধরিল। যেমন ধরা, অমনি খুড়া হতভাগ্যের গালে এমন এক চপেটাঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই তাহাকে মাথায় হাত দিয়া ভূমিতে বসিতে হইল।

পিতার ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজেই নীচে নামিয়া খুড়ার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। খুড়া তখন ফটক পার হইয়া পথে পা দিয়াছে।

পিতা বলিলেন—"যাবি কোথা মূর্খ? তোকে আমি জেলে দিব।"

"এস দাদা, এস। চিরদিনের জন্য যাতে তোমার মুখ আর দেখিতে না হয়, তার ব্যবস্থা কর।" এই বলিয়া গণেশ পিতার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

আমি ও মা, উভয়েই বারাণ্ডায়। সেখান হইতে পিতাকে ফটক পার হইতে দেখিলাম। গণেশ তখন সগর্ব্বে বলিতেছে—"এস দাদা, এস। আমি দু'টি হাত বাড়াইয়া আছি।"

ফটক পার হইয়াই—সেই বকুল, সেই বকুল! গণেশ পিতাকে বকুলের দিক্ দেখাইয়া দিল।

পিতা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন। আমরা শুনিতে পাইলাম—"অঘোরনাথ! নিরপরাধকে পরিত্যাগ কর। সকল অপরাধের অপরাধী আমি। শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ কর, আমাকে দাও।"

সে মধুর পরিচিত স্বর আজ এক বৎসর পরে শুনিতেছি! সেই স্বরাকর্ষণে সমস্ত বৎসরটা যেন গুটাইয়া দণ্ডে পরিণত হইয়াছে—সুন্দর হুগলী সহর তাহার ভিতর কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে।

আমি ছুটিলাম। কে মা—কোথায় মা—ভুলিয়া গেলাম। উন্মত্তের মত সিঁড়ি হইতে নামিয়া, তখনও অর্দ্ধমূর্চ্ছিত কার্ত্তিককে পায়ে ঠেলিয়া, পিতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া,—সেই বকুল—সেই বকুল—উন্মত্তের মত আমি বকুলতলে ঠাকুর-মাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

নর-দেবতা

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

এ নহে দেবতা—অমর মানব লভিয়া ধাতার বর,
অমরা হইতে ভুবনে আসিল ধরমে করিয়া ভর।
শিরায় শিরায় বহিছে তাঁহার ভকতি-প্রীতির ধারা,
কোটি কোটি প্রাণ ডেকে ডেকে নিল—ভাঙ্গিল স্বার্থ-কারা!
জননীর স্নেহে—প্রকৃতির গেহে—বাঁধিয়া মানস-ঘর,
পিতার চরণে লুটায়ে পড়িয়া মাগিল অভয়-বর।
ভুবনে ভুবনে জীবনে জীবনে গড়িল আশার কায়
নরনারী অই প্রেমের মহিমা গায়িয়া গায়িয়া যায়!
ইষ্ট সাধনা—এ মূলমন্ত্র জপিছে মানবগণ,
খুঁজিছে কেবল তথ্যনিচয়—ঘুচাইতে অনটন।
পেয়েছে সন্ধান অমৃত-রসের—লভিয়াছে অভিজ্ঞতা
'জীবনে'র শুধু ক্ষণিক মরণ—বংশের অমরতা!
শান্তি-সুষমা-সিঞ্চিত প্রাণে প্রিয়তমা ভালবাসা,
গড়িয়া দিয়াছে মানবের মন পবিত্র করিয়া আশা।
যে মানব পারে দেবতার বরে প্রিয় হ'তে দেবতার,
গরীয়ান্ হ'তে ধর্ম্ম লাগিয়া ত্যজিতে জীবন-ভার;
যে মানব পারে স্বার্থ-সেবিত বাসনা করিতে জয়,
অমর সে নর—মহিমায় তাঁর ধরণী ধন্য হয়।
যাঁহাদের নারী স্বর্গের শিশু লয়ে আসে ধরাতলে,
যাঁহাদের স্নেহে বর্দ্ধিত 'যিশু', 'বুদ্ধ'—'মা' 'মা' 'মা' বলে,
যাঁহারা জগতে 'মৈত্রেয়ী' 'গার্গী' পুণ্য-গঠিত মূর্ত্তি,
বিশ্ব-স্বামীর চরণে বসিয়া মাগিছে জীবের স্ফূর্ত্তি;
দেহের রমণ ঘুচাতে যাঁহারা আত্মরমণে মগ্ন,
বিবেক যাঁ'দের যাত্রার পথে নির্দ্দেশ করে লগ্ন,—
শিখায়ে দিয়েছে ত্যাগের মন্ত্র মুক্তিপথের ধন,
জগতের তরে সঁপিয়া দিয়াছে আপনার প্রাণ-মন;
লক্ষ্য—পথের নব আবাহন, বিপুল পুণ্যময়,
কর্ম্মক্ষেত্রে জ্ঞানের গরিমা প্রকৃতি করিতে জয়;
এমন যাঁহারা—ভুবনে অমর—প্রেমের দেবতা যারা,
বিশ্বের লাগি কর্ম্ম বিলায়ে শক্তি দিয়াছে তারা!
ধন্য মানুষ—ধন্য তাঁহারা—বড়ই পুণ্যময়,
কত জনমের তপস্যার ফলে এহেন মানুষ হয়!
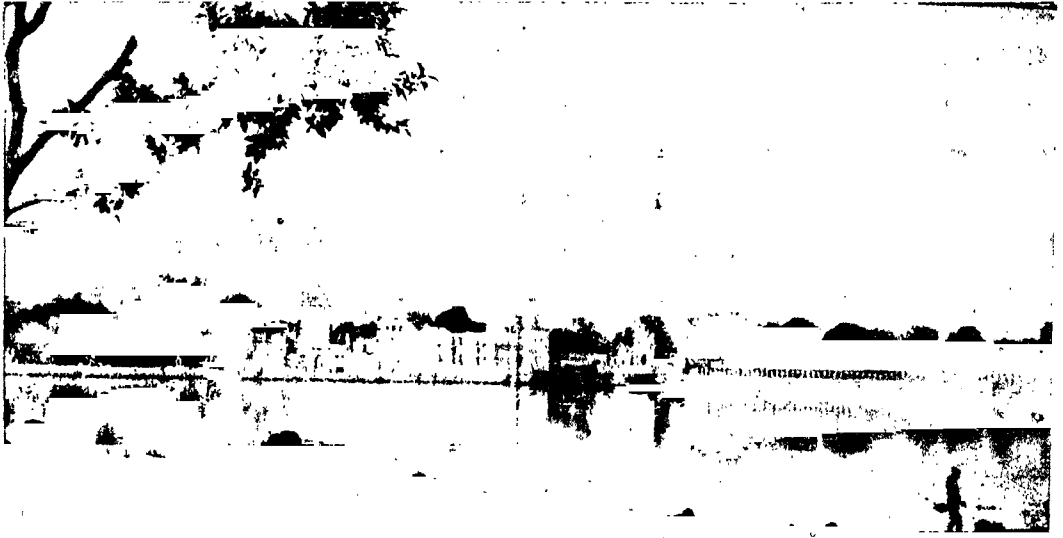
ছত্রপুর

ছত্রপুরে

[শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য]

পূজার অবকাশ-সময়ে দেশভ্রমণ এখন একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাকুরিজীবী বাঙ্গালী বৎসরে দুইবার একটু বেশী দিনের ছুটি পাইয়া থাকেন—এক পূজায়, আর বড়দিনে; অবশ্য স্কুল-মাষ্টার-মহাশয়েরা এ দলের বাহিরে। তাই পূজার এবং বড়দিনের সময়ে যাঁহাদের সঙ্গতি ও সুবিধা আছে—সখও একটু আছে, তাঁহারা নানাদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া থাকেন। আমিও বাঙ্গালী, আমিও চাকুরিজীবী;—আমি তাই বিগত পূজার অবকাশে একটু দেশভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। তবে, এবার সুধু দেশভ্রমণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; নিজে ও পরিবারস্থ অনেকেই পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন; ডাক্তারেরা বলিলেন, স্থান-পরিবর্ত্তনে উপকার হইবে। সেই জন্য এবার পুত্রকন্যাদের লইয়াই বাহির হইয়াছিলাম।

এখন অনেকেই দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানেই পূজা উপলক্ষে গমন করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানেও যান। আমি কিন্তু এবার ঐ সকল স্থানের মায়া কাটাইয়া একেবারে মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত বুন্দেলখণ্ডে গমন করিয়াছিলাম। এ দেশে, ভ্রমণের জন্য, বাঙ্গালী বোধ হয়, অতি কমই গিয়াছেন। যখন এত দূরদেশে গিয়াছিলাম, তখন এ স্থানের বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং যতদূর সম্ভব চিত্রাদিও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সেইগুলি আজ 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিবার জন্য আমি উপস্থিত। অধিক ভূমিকা না করিয়া এইবার বৃত্তান্ত আরম্ভ করি।

ছত্রপুর রাজ্য মধ্যপ্রদেশে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। স্থানটি মনোরম, চারিদিকে ছোট বড় গিরিশ্রেণী, রাস্তাঘাট সুন্দর, ডাক্তার-বৈদ্য আছে; আহার্য্য ও ভৃত্য, বঙ্গদেশ অপেক্ষা যথেষ্ট সুলভ এবং শরৎ হইতে বসন্ত পর্য্যন্ত স্থানটি খুব স্বাস্থ্যকর। তবে গ্রীষ্মকালে অতিশয় কষ্টদায়ক 'লু' চলে। এখানকার একমাত্র বাঙ্গালী-অধিবাসী আমার

অগ্রজ শ্রীত্রিদেবদাস ভট্টাচার্য্য—তিনি মহারাজার ডাক্তার। ছত্রপুর হইতে ১৪ মাইল দূরে নওগাঁয় ইংরাজের "ছাউনি" বা সেনা-নিবাস। নওগাঁয়ে কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন; তাঁহারা সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী, কেবল একজন বড় কণ্ট্রাক্টর। কণ্ট্রাক্টর বাবুর নাম শ্রীসুরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়। কোন বাঙ্গালী নওগাঁয় উপস্থিত হইলে সুরেশ বাবুর আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। লোকটি যে খুব অতিথিপরায়ণ, তাহা না বলিলেও চলে।

এইবার পথের কথা বলি। ছত্রপুর যাইতে হইলে, বোম্বাই মেলে, এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ চিতোকীর পরবর্ত্তী ষ্টেশন মাণিকপুরে নামিয়া, জি. আই. পি.র ঝান্সী-লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হয়; এই রেলপথে কিছুদূর যাইয়া, হরপালপুরে নামিতে হয়। এই হরপালপুর হইতে ডাকগাড়ীতে নওগাঁ হইয়া ছত্রপুর যাইতে হয়। হরপালপুর হইতে ছত্রপুরের দূরত্ব কম নহে;—৩৭ মাইল—ডাকগাড়ীর ব্যবস্থা আছে; তাহাতে ৫।৬ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। মাণিকপুর হইতে ২।৩টি ষ্টেশনের পর তীর্থস্থান চিত্রকূটে যাইবার চিত্রকূট ষ্টেশন। কারুই ষ্টেশন হইতে গো-শকট পাওয়া যায় বলিয়া, অনেকে কারুই হইতেই চিত্রকূট গিয়া থাকেন। এখানে রাম, সীতা, হনুমান প্রভৃতির মন্দির দ্রষ্টব্য। পাণ্ডার অভাব নাই, তাহারাই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া, দেখাইয়া লইয়া বেড়ায়।

হরপালপুর বেশ ব্যবসার স্থান; এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত ও তিল কলিকাতায় রপ্তানী হয়। এখানেও রেলিব্রাদার্সের কর্ম্মচারী দু' একটি বাঙ্গালী আছেন।

হরপালপুর হইতে ছত্রপুরের পথে প্রথমে যেখানে ঘোড়ার ডাক বদল হয়, সে স্থানটি অতি মনোরম। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত বৃক্ষলতাদিআচ্ছাদিত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী। পর্ব্বতে সকল প্রকার বন্য জন্তুই বাস করে, কিন্তু শুনিলাম, তাহারা পর্ব্বতপাদমূলস্থ গ্রাম্য জীবজন্তুর উপর অত্যাচার করে না। এই পাহাড়গুলি আলিপুর রাজ্যের অন্তর্গত। এই সকল জঙ্গলে শিকার করিতে নিষেধ আছে শুনিলাম। পথের মধ্যে তিতির প্রভৃতি শিকারের পাখী নির্ভয়ে খেলা করিতে দেখিলাম। গাড়ী যখন তাহাদের অতি নিকটে যায়, তখনই তাহারা উড়িয়া বসে। এখান হইতে পথের দু'ধারে কেবল বাবলা গাছের শ্রেণী ও জনারের ক্ষেত। এ প্রদেশে তিলের চাষও যথেষ্ট হয়। রেলের দু'পাশে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে এ দেশের অনেক প্রভেদ। বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া আসিলেই ক্ষেত্রগুলিতে ধান-গাছের পরিবর্ত্তে জনার গাছ প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালা ছাড়াইলেও একটা জিনিষ কখনও যে সঙ্গ ছাড়ে, তাহা বোধ হয় না; তাহা এই বাবলা-গাছ। দিল্লী, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, যেখানেই গিয়াছি, সেই খানেই এই বাবলা-গাছ! ছত্রপুর পৌঁছিয়াও এই সার্ব্বভৌম বাবলা-গাছের কোনই অভাব বা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না। বাঙ্গালার পল্লি-শোভা-বৰ্দ্ধক পীতপুষ্প এই কণ্টকবহুল বাবলা-বৃক্ষ—যাহার ফল-ভক্ষণে বর্ষাকালে গাভীগণের দুগ্ধে অপূর্ব্ব গন্ধের সঞ্চার হয়, যাহার নির্য্যাসে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের সম্মার্জ্জন ও সংস্কার সম্পন্ন হয়, যাহার কাষ্ঠে আমাদের দুর্গম কর্দ্দমাক্ত সাধের পল্লিপথের একমাত্র সহায় গোযানের চক্র নির্ম্মিত হয়, মাঠে চলিতে যাহার কণ্টকে ক্ষতবিক্ষতচরণে পদচারণের লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়, এ হেন বন্ধু এখানেও যে আমাদের পরিত্যাগ করেন নাই, বরং পথের দুধারে সকলকে আপ্যায়িত করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা দেখিয়া অতীব হৃষ্ট হইয়াছিলাম।

পথে আর দ্রষ্টব্য বড় কিছু নাই। যা কিছু দেখিবার তাহা নওগাঁয়ের ছাউনীতে। ছাউনী—সেনা-নিবাস, কাজেই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখান হইতে ৪ মাইল অগ্রসর হইলে "মৌ" নামক স্থানে পথের দক্ষিণে ছত্রপুরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ছত্রশালের সমাধি-মন্দির আছে। পর্ব্বতপাদমূলে এই সমাধিমন্দিরটি দেখিতে অতি সুন্দর। মন্দিরটি রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত। ইহার অনতিদূরেই পথের বামপার্শ্বে একটি হ্রদের তীরে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের বাসভবনগুলি এখনও সুসংস্কৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। শুনিলাম, মহারাজের আত্মীয়গণের কেহ কেহ এখনও এখানে বাস করেন।

এখান হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত পথ-পার্শ্বে—নিকটে ও দূরে—ছোট বড় পর্ব্বতশ্রেণী। ছত্রপুরের প্রায় তিন মাইল দূরে পথের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অনেকগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটি "পুরাতন-কাটরা" নামে অভিহিত। এখানে অনেকগুলি পুরাতন

মহারাজ ছত্রশালের সমাধি-মন্দির

বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। কেহ কেহ বলেন, ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানেই সহর ছিল। একবার মহামারী হইয়া বহুলোক মরিয়া যাওয়ায়, নগরবাসীরা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহার পর নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মন্দিরগুলি "গোঁসাইদের সমাধি" বলিয়া পরিচিত। যে সময় বাঙ্গালায় চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম বিলাইতেছিলেন, সেই সময় পশ্চিমাঞ্চলেও হরিভক্তির খুব রোল উঠে। এখানকার কয়েকটি মন্দিরকে সতীস্তূপ বলে; এই সকল মন্দির মধ্যে সতীদের ভস্মাদি রক্ষিত আছে। এইরূপ ছোট বড় সতীস্তূপ এখানে ও সহরের সন্নিকটে প্রায় দুই শত বিদ্যমান আছে। মন্দিরগাত্রে কোন লিপি না থাকায় সেগুলি কাহার স্তূপ, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।

ছত্রপুরের প্রবেশ-পথে প্রথমেই Guest House বা অতিথি-আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে মান্যগণ্য রাজ-অতিথিরা আসিয়া অবস্থিতি করেন। গৃহটি একটি অনতি-উচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত—দূর হইতে যেন ছবির মত দেখায়। এই 'গেষ্ট হাউস' হইতে সমস্ত সহর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নিকটে পর্ব্বতের শিখরদেশে হনুমান ও লক্ষ্মীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। হনুমানের মূর্ত্তি শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত; প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ হইবে। লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ক্ষুদ্র—কিন্তু বড় সুন্দর। মন্দিরে যাইবার সোপান-শ্রেণী আছে, উঠিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। দূর হইতে পর্ব্বত-শিখরস্থ এই মন্দির দেখিতে বড়ই রমণীয়। মহারাজ প্রতি
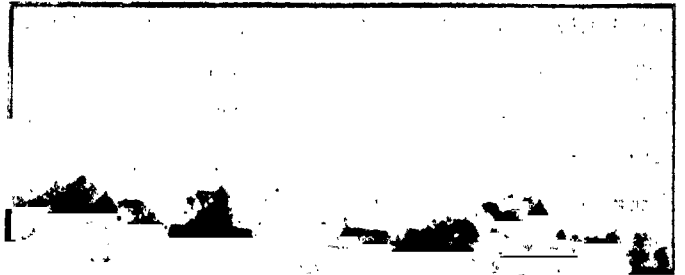
গোঁসাইদের সমাধি
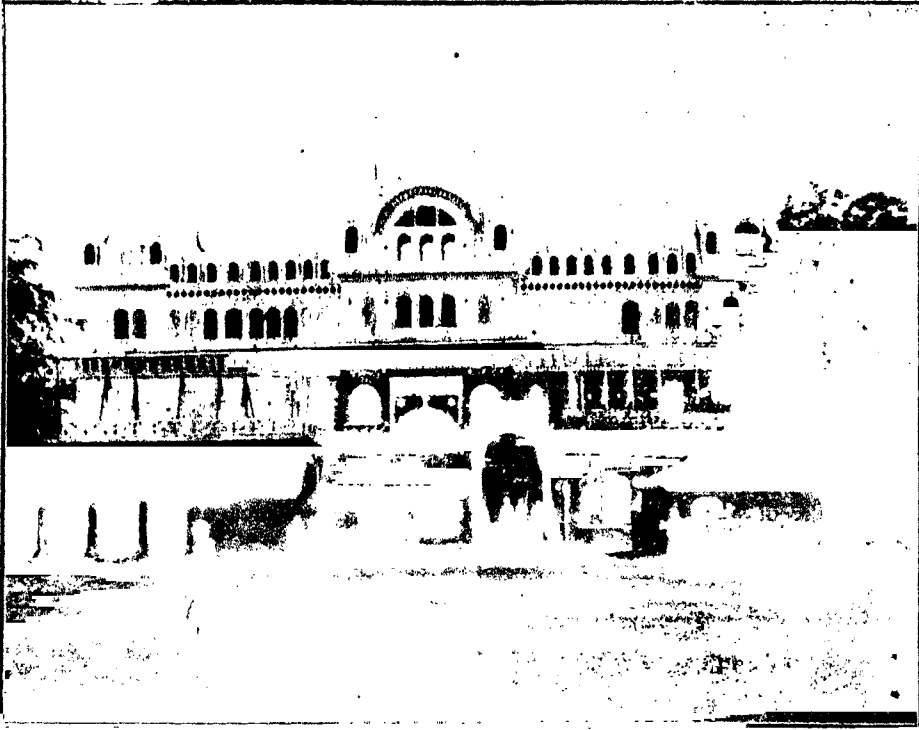
রাজবাটী

মঙ্গলবারে এখানে আসিয়া, এই মন্দিরে পূজা দিয়া থাকেন।

এখান হইতে সহর-প্রবেশের পথে সাধারণ পান্থনিবাস অবস্থিত। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই রাজবাটী। রাজবাটীটি জয়পুরের প্রথায় "ঝরোখা"-শোভিত এবং রক্ত-প্রস্তর-নির্ম্মিত। তাহার উপর চূণকাম করা। রাজ-সভা-গৃহ সুন্দর কারুকার্য্যখচিত খিলান ও স্তম্ভশ্রেণী পরি-শোভিত। দেওয়ালের গাত্রে আগাগোড়া 'পঙ্কের' কাজ করা। রাজপ্রাসাদ একটি সুবৃহৎ সরোবরতীরে নির্ম্মিত। সরোবরে রুই, মিরগাল মাছ নাই—কিন্তু শাল ও শোল মাছ যথেষ্ট আছে। পুষ্করিণীতে কাহারও মাছ ধরিবার অধিকার নাই। রাজবাটীর অনতিদূরেই আর একটি পুষ্করিণীর তীরে সঙ্কটমোচন মহাদেবের মন্দির। জলাশয়টি বৃহৎ হইলেও ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে অনাবৃষ্টির জন্য শুকাইয়া গিয়াছিল।

এখান হইতে দক্ষিণপূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে, জেল-খানা দেখিতে পাওয়া যায়। জেলখানায় উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি, গালিচা ও গালিচার আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, দরও যথেষ্ট সুলভ। সূতা প্রভৃতির মূল্যের উপর ৵৫ পয়সা রোজ হিসাবে লোক-পিছু মজুরী খতাইয়া, এগুলির মূল্য-নির্দ্ধারণ করা হয়। একজন আগ্রাওয়ালা এখানে যে কয় খানি সতরঞ্চি মজুত ছিল, তাহা কিনিয়া লইয়া গেলেন, দেখিলাম। এখানে অর্ডারমত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই সকল শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে পত্র লিখিলেই জিনিষপত্র পাওয়া যায়। জেলখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য হইতেই কয়েদীদিগের খোরাক-পোষাকের ব্যয় একপ্রকার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শুনিলাম, এখানে কয়েদীদিগের উপর বিশেষ উৎপীড়ন নাই—তাহাদের স্বাস্থ্যও এই কারাগারে ভাল থাকে।

জেলখানা হইতে দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইলে, কিছু দূরে একটি অনতিউচ্চ শৈলশিখরে অবস্থিত জৈন-মন্দির দেখিতে বড় চমৎকার। এই মন্দির এখন আতুর-আশ্রমরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ছত্রপুর-সহরটি মোটের উপর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী না হইলেও দেখিতে অনেকটা জয়পুরের মত। রাস্তাগুলি

বেশ প্রশস্ত ও সুসংস্কৃত। লোহার হাল দেওয়া চাকার গাড়ীতে যাতায়াতে কোন কষ্ট হয় না। এখানকার বাজারহাট ভাল। সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়। হাট-বার ভিন্ন অন্য কোন দিন এখানে মাছ পাওয়া যায় না। এখানে একটা /৫ পাঁচ সের রুই মাছ ৭।৮ পয়সা দিলেই পাওয়া যায়। অথচ শোল মাছ মহার্ঘ্য, একসের; তিন পোয়া একটা শোল মাছ পাঁচ ছয় পয়সার কমে পাওয়া যায় না। ছত্রপুর হইতে ১০।১২ মাইল দূরে গোরাতাল নামক সুবৃহৎ হ্রদ হইতে জেলেরা মাছ ধরিয়া, এখানকার বাজারে বিক্রয় করিতে আসে। শুনিলাম, শীতকালে যথেষ্ট মাগুর মাছও এখানে পাওয়া যায়। এখানে মাংসের সের ৵০ দুই আনা মাত্র। ঘৃত /১।০ হইতে দেড় সের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। দুগ্ধ টাকায় ১০।১২ সের। এখানে সকলে আতপান্ন আহার করে। দর টাকায় /৭ বা /৭।।০ সের। এখানে বন্দুকের পাশ নাই। কিন্তু টোটার বন্দুক যোগাড় করা শক্ত। নিকটস্থ পাহাড়ে, হরিণ, তিতির, বটের প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে সাধারণতঃ যে সমস্ত হরিণ পাওয়া যায়, তাহাদের মাথায় পাকান পাকান শিং থাকে। গুলদার হরিণ বড় দেখা যায় না। তবে এখান হইতে ১০।১২ মাইল দূরে দেওড়া কিষণগড় নামক স্থানে শুনিলাম, শীতকালে সম্বর প্রভৃতি বড় বড় হরিণ, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

দশহরা এখানকার হিন্দুদিগের প্রধান উৎসব। এই সময় রাজবাটীতে মাসাবধি "রামলীলা" হয়। জনসাধারণের জন্য সে সময় রাজবাটীর অবারিত দ্বার। এই সাজা-রামসীতার উপর সাধারণের ভক্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল বালক দেখিতে সুশ্রী ও তাহাদের সাজসজ্জায় যথেষ্ট ব্যয় করা হয়। দশহরার দিনই এখানে মহা উৎসব হয়। সেদিন জৈন-মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ ময়দানে কাগজের একটি প্রকাণ্ড রাবণ নির্ম্মিত হয়। তাহার পর রামলক্ষ্মণ আসিয়া, এই রাবণকে বধ করিয়া, সীতা উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহারাজের সৈন্যসামন্ত, কামান, হাতী, ঘোড়া, উট ও বহুলোকের সমাগম হয়। তাহার পরই কামান
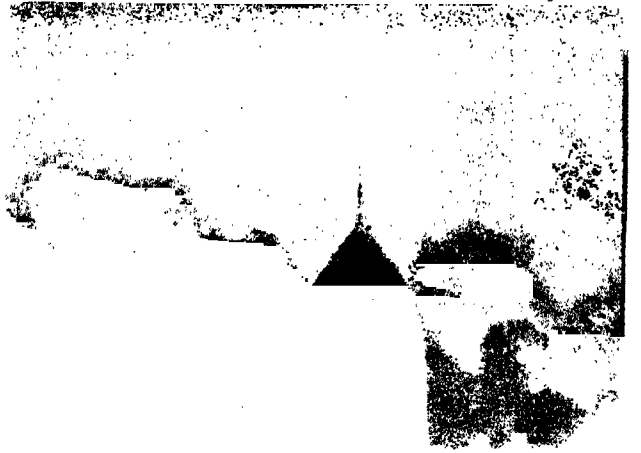
জৈন-মন্দির

সকল হইতে অবিরত 'ফাঁকা' আওয়াজ আরম্ভ হয়—কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজের আদেশ মত কাগজের রাবণকে কাৎ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। তখন এই বিরাট জনসঙ্ঘ রাঙ্‌তা-চুরির জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, মনে হয়, বুঝিবা দু'চারিটা খুন হয়। তাহার পর সন্নিকটস্থ শমী-বৃক্ষ হইতে সকলে মাঙ্গলিক চিহ্ন স্বরূপ পত্র-আহরণ করিয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই মিছিলে হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে সমস্ত রাজকর্ম্মচারীকেই উপস্থিত থাকিতে হয়।

দশহরার পর তিন-চার দিবস ধরিয়া রাজবাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নগরের সমস্ত মন্দিরের বিগ্রহ (লক্ষ্মী-নারায়ণ) একত্র করা হয় ও সমস্ত রাত্রিব্যাপী নৃত্যগীত হয়। নৃত্যগীতের খুব প্রতিযোগিতা দেখা যায়। প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য সুসজ্জিত পৃথক্ পৃথক্ পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। পটমণ্ডপের সাজসজ্জা ও নৃত্যগীত লইয়াই প্রতিযোগিতা। প্রতিদলের নর্ত্তকীরা আসিয়া, দেওয়ান-বাহাদুরের সম্মুখে এক একখানি গান গাহিয়া যান। দেওয়ানই এখানকার প্রধান কর্ম্মচারী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা। এখানকার দেওয়ান-বাহাদুর সদালাপী ও ভদ্র। ইঁহার নীচেই নাজিম, ইনিও অতি সদাশয় ব্যক্তি; ইনি পঞ্জাবী মুসলমান, শিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ।

এই রাজ্যের মধ্যে, ছত্রপুর হইতে ২৭ মাইল দূরে বিশ্ব-বিশ্রুত 'খাজরাহো' মন্দির শ্রেণী। এরূপ চমৎকার কারুকার্য্যময় মন্দির উত্তর-ভারতে আর কোথাও নাই। মন্দিরগুলি বহু-পুরাতন; উহাদের বিশেষ বিবরণ বারান্তরে বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

ঠাকুর

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী, M. A., B. L.]

(১)

"না বাবা! ঠাকুর কোথা নিয়ে যাবে? ঠাকুর আমি ছেড়ে দোব না।"

"না দিয়ে কি করবে বাবা! ঠাকুর আর আমাদের সেবা নিলেন কই! লোকে বলে, নারায়ণ-শিলা যার গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তার কখনও কোনও অভাব হয় না। সাতপুরুষ এ বিগ্রহ আমাদের বাড়ীতে রয়েছে। জ্ঞানতঃ সেবার কখনও কিছু ত্রুটি করিনি। কিন্তু আমাদের অবস্থা দেখ্‌ছ ত? আজ ঠাকুরের নৈবেদ্য করি, এমন চাল নেই। নিজেরা না হয় উপবাসে মলুম। ঠাকুরকে কি করে উপবাসে রাখি? আর ঠাকুর থাক্‌বেনই বা কোথা? দেনায় বাড়ী বিক্রী হয়েছে। কাল বাড়ী ছেড়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে। তাই ঠাকুরের একটা উপায় আগে কর্‌তেই হচ্ছে। আমাদের ভাগ্যে ত গাছতলা আর উপবাস।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। বালক পুত্রের চোখ দুটি ছল ছল করিতেছে দেখিয়া, বহুকষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বলিলেন—"যাও নারাণ, খেলা করগে যাও।" ছেলের নাম নারায়ণ।

নারায়ণ গেল না। বলিল—"ঠাকুরকে কোথা দিয়ে আস্‌বে বাবা?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা-গঙ্গায় বিসর্জ্জন দোব নারায়ণ! সাতপুরুষ ঠাকুরের পূজা করেছি, বংশে কেহ কখনও মিথ্যা কথাটি পর্য্যন্ত বলে নাই—তবু আমাদের বিনা দোষে, মিথ্যা দেনার ডিক্রীতে বাস্তুভিটা গেল; ঠাকুরকে আর কা'কেও দিতে ভরসা হয় না বাবা! আবার কা'রও এমন অবস্থা হবে!"

বড় ক্ষোভেই ব্রাহ্মণ এই কথাগুলি বলিলেন। সাত-পুরুষ আগে এই বিগ্রহ তাঁহাদের বাড়ীতে আসে। ৺মৃত্যুঞ্জয় সার্ব্বভৌম এক সন্ন্যাসীর নিকট এই বিগ্রহটি পান। সেই অবধি পরম যত্নে, পরম ভক্তিভরে সাতপুরুষ ধরিয়া, এই পরিবারে দেবসেবা হইয়া আসিতেছিল। মৃত্যুঞ্জয় সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠী ছিল। বিস্তর ছাত্র অধ্যয়ন করিত। সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজেই তাহাদের বাসস্থান ও আহারের যোগাড় করিয়া দিতেন। তাঁহার সামান্য কিছু জমী ছিল। ধনি-গৃহেও মধ্যে মধ্যে তিনি বিদায় পাইতেন, ইহাতে একরূপ তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রও একরূপ চালাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই এই ব্রাহ্মণ-পরিবারদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। ইংরাজী-শিক্ষার বহুল প্রচলনে সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাঠী একে একে যায়-যায় হইতে লাগিল। ইংরাজী সামান্য শিখিলেই ২৫৲।৩০৲ টাকা মাহিনার এক চাকরী হয় কিন্তু সমস্তজীবন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, মহামহোপাধ্যায় হইলেও তাহার স্কুলের পণ্ডিত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। এই সকল কারণে সার্ব্বভৌমের সুবিখ্যাত চতুষ্পাঠীতে দুই চারিটি ছাত্র মাত্র দৃষ্ট হইত। ধনিগণও ব্রাহ্মণ-বিদায় আজকাল কচিৎ করিয়া থাকেন। কাজেই সার্ব্বভৌমের বংশধরগণ ক্রমশঃই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে লাগিলেন। শেষে বৃদ্ধ রামকুমার তর্কালঙ্কারের নামে মিথ্যা দেনার ডিক্রী করিয়া গ্রামস্থ এক দৈবজ্ঞ রামকুমারকে বাসচ্যুত করিবার যোগাড় করিয়াছিল।

রামকুমারের গৃহে অন্ন নাই। সামান্য কুটীর, অর্থাভাবে খড়ের ছাউনি পর্য্যন্ত বহুদিন সংস্কৃত হয় নাই। বৃষ্টি হইলে ঘরের মেঝে ভাসিয়া যায়। গোটাকতক মাটির হাঁড়ী-কলসী, পিতলের থালা, গেলাস, বাটি, গাড়ু ও কয়েকখানি বস্ত্র ও উত্তরীয়মাত্র তাঁহার সম্পত্তি; এ অবস্থায় রামকুমার বৃদ্ধবয়সে যে, উপার্জ্জন করিয়া, মিথ্যা ডিক্রীর দেনা শোধ

করিবেন, সে আশা নাই। তাই তিনি বাড়ী ছাড়িয়া দিতেই কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

সেদিন সকালে দেবসেবা হয় নাই। নৈবেদ্যের জন্য এক মুষ্টি চাউল পর্য্যন্ত গৃহে নাই। অনাহারে মরিবেন, সেও স্বীকার, তবু ব্রাহ্মণ কাহারও কাছে কিছু ভিক্ষা করিতে সম্মত নন। সকাল হইতে ঠাকুরের কি করিবেন, ভাবিতেছিলেন। অনেক ভাবিয়া ঠাকুরকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়াই মনস্থ করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, নারায়ণের ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর লইয়া, রামকুমার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বদিন কিছু আহার হয় নাই। তাহার উপর বার্দ্ধক্যে শরীর দুর্ব্বল। স্খলিতপদে ব্রাহ্মণ গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ গেলে, তবে গঙ্গার তীরে উপনীত হওয়া যায়।

যাইতে যাইতে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর! আমার অপরাধ লইও না। তুমি আমাদের সেবা না লইলে, আমরা কি করিতে পারি? শুনিয়াছি, জনার্দ্দন-শিলা যে গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে গৃহ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বিলাসিতা বা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় কখনও তোমার পূজা করি নাই। কিন্তু তুমি থাকিতে আমার নারাণ যে, অন্নাভাবে মরে ঠাকুর!"

"নমস্কার তর্কালঙ্কার মশাই। ঠাকুর নিয়ে কোথা চলেছেন?"

তন্ময়-চিত্ত ব্রাহ্মণ সহসা চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্মুখে প্রসন্নবদনে দাঁড়াইয়া আছেন। হরিদাস বৃদ্ধ। এই গ্রামে ধানের কারবার করেন। অবস্থা বেশ সচ্ছল। নগদ টাকাও কিছু আছে। সংসারে এক বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রী।

তর্কালঙ্কার একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছেন বলিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইতে লাগিল। অথচ না বলিয়াই বা উপায় কি? মিথ্যা কথা তিনি জীবনে বলেন নাই। কাজেই স্পষ্ট কথায় নিজের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া হরিদাস চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"তর্কালঙ্কার মশাই! আমার এক ভিক্ষা—আমার কথা রাখিতেই হইবে। আমি আপনার হাতে ধরিতেছি। বলুন, কথা রাখিবেন?"

রাম। কি বলুন? রাখিবার হইলে নিশ্চয়ই রাখিব।

হরি। না, আপনি আগে প্রতিশ্রুত হ'ন যে, আমায় ভিক্ষা দিবেন? আপনার সাধ্যাতীত কিছু করিতে আমি বলিব না।

রামকুমারের এত কষ্টেও হাসি আসিল। বলিলেন—"আমি তোমায় ভিক্ষা দোব? আজ থেকে আমায় ভিক্ষায় বেরুতে হবে।"

হরিদাস। দোহাই আপনার। প্রতিশ্রুত হ'ন।

রাম। আচ্ছা হ'লেম। কি চাই বল?

হরি। ঠাকুরটি আমায় দিন।

রাম। সর্ব্বনাশ! তুমি বল কি! এ ঠাকুর নিয়ে উচ্ছন্ন যাবে! আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—সাতপুরুষ নিষ্ঠার সহিত ভক্তিভরে পূজা করে কি ফল পেয়েছি, দেখ্‌ছ ত? তুমি এ বিগ্রহ বাড়ীতে রাখ্‌বে! সর্ব্বনাশ হবে!

হরি। তা হোক্‌। আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন; ঠাকুর দিন।

রামকুমার হরিদাসের হস্তে ঠাকুর সমর্পণ করিলেন। বলিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ঠাকুর দিলুম; কিন্তু তুমি এ ঠাকুর বাড়ী নিয়ে যেও না। যে সন্ন্যাসী আমাদের এ ঠাকুর দিয়েছিল, সে বোধ হয়, আর জন্মে মৃত্যুঞ্জয় সার্ব্বভৌমের শত্রু ছিল। নইলে ঠাকুর বাড়ীতে থাক্‌তে, কাল সারাদিন নারাণ আমার খিদেয় কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে পড়ল!"—রাজকুমারের চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল।

হরিদাস বলিলেন, "সেকি! আপনাদের এতদূর হয়েছে? এ কথা আমায় বলেন নি কেন? বাড়ী যান। আমি আজই একটা কিছু ঠিক কোরে দিচ্ছি। আপনি যদি এতদিন ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানাতেন, তা হ'লে কি এতটা ঘট্‌ত! আমার নাত্‌নী যতদিন একমুটো ভাত পাবে, ততদিন নারাণেরও অভাব নেই। আর আমার কাছেও কি বল্‌তে নেই যে, আপনার এতদূর দুরবস্থা হয়েছে!"

হরিদাসের নিকট কিছু টাকা লইয়া দৈবজ্ঞ সেই দিনই রামকুমারের বাড়ী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

হরিদাস গ্রামের মধ্যে ক্ষমতাশালী লোক ; তাহার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলে, দৈবজ্ঞের এমন সাহস নাই। মনে মনে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেও, মুখে সে সব কথাতেই রাজী হইল ; হরিদাস তাহাকে টাকা দিলেন। সে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতে বলিতে গেল—"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

এদিকে চতুর্দ্দিকে সংবাদ রটিয়া গেল, 'তর্কালঙ্কারের গৃহদেবতা হরিদাসকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন যে, আমার সেবক বড় কষ্ট পাইতেছে, তুই তাহাকে উদ্ধার কর, আর আমি তার সেবা গ্রহণ কর্‌ব না। তুই আমার সেবা কর। হরিদাস তাই, তর্কালঙ্কারের গৃহ-উদ্ধার করিয়া, ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছেন।'

সকলে বলিল—"বড় জাগ্রত ঠাকুর!" দলে দলে চারি পার্শ্বের আট-দশখানা গ্রামের লোক আসিয়া, বিগ্রহের নিকট মানৎ করিতে ও পূজা দিতে লাগিল।

হরিদাসকে বিগ্রহ দিয়া, তর্কালঙ্কার যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন বালক নারায়ণ দৌড়িয়া গিয়া বলিল—"বাবা, এত বেলা পর্য্যন্ত কোথা ছিলে? আমি আজ অনেক ফুল তুলেছি। চল—ঠাকুরকে পূজা কর্‌বে চল।"

বাবা, এত বেলা পর্য্যন্ত কোথা ছিলে ?

তর্কালঙ্কার অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর আমাদের ছেড়ে গেছেন।"

ঠাকুর গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, মনে করিয়া নারায়ণ কাঁদিয়া উঠিল।

(২)

কে জানে কেন, ঠাকুর বাড়ীতে লইয়া যাইবার পর হইতে হরিদাসের সর্ব্ববিধ বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল। হরিদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পৃথগন্ন হইয়া কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার লোহার কারখানা ছিল। তাহাতে তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। সহসা তাঁহার মৃত্যুতে হরিদাস প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। তাঁহার নিজের ধানের কারবারেও বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। তিনি গ্রামে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে নিত্যই তাঁহার বাড়ীতে একটা না একটা উৎসব হইতে লাগিল।

তর্কালঙ্কার মহাশয় হরিদাসের এই উন্নতি-দর্শনে মর্ম্মাহত হইলেন। বৃদ্ধবয়সে উপর্য্যুপরি অভাবের তাড়নায় তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়াছিল। তার উপর আবার তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হইল। দরিদ্রের

পীড়া, ভাল চিকিৎসাও হইল না। গ্রামস্থ কবিরাজ দয়া করিয়া, বিনামূল্যে যাহা দিতেন, নারায়ণ তাহাই লইয়া আসিয়া, পিতাকে সেবন করাইত।

একদিন হরিদাসের বাড়ীতে মহা-সমারোহ; তাঁহার পৌত্রী লক্ষ্মীর ব্রত-উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চন্দ্রাতপ নিম্নে স্বর্ণ সিংহাসনে ঠাকুরটি রক্ষিত হইয়াছে। চারিদিকে কলরব। দলে দলে লোক আসিয়া, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে। রামকুমার তর্কালঙ্কারও নারায়ণের হস্ত ধরিয়া, সেখানে উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস বলিলেন, "আসুন—আসুন, তর্কালঙ্কার মশাই! ব্রাহ্মণরা খেতে বস্‌ছে; চলুন, আপনাদেরও বসিয়ে দিই গে।"

নারায়ণ বলিল, "বাবার কাল থেকে জ্বর হয়েছে। কিছু খাবেন না। কেবল ঠাকুরকে প্রণাম করবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, বলে এনেছি।"

হরিদাস। তা হ'লে উনি এই ঠাকুরের কাছে বসুন। তুমি খাবে চল।

এই বলিয়া, নারায়ণকে টানিয়া লইয়া, তিনি খাইতে বসাইয়া দিলেন।

প্রাঙ্গণের পার্শ্বে রামকুমার বসিয়া বসিয়া, ঠাকুর দেখিতে লাগিল। দুই একজন লোক মধ্যে মধ্যে প্রাঙ্গণ পার হইয়া যাইতেছে, বেশী ভিড় নাই। সকলেই ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে ব্যস্ত। একরূপ নির্জ্জন প্রাঙ্গণে রামকুমার বসিয়া রহিল।

মস্তিষ্কের পীড়া, তাহার উপর জ্বরের প্রকোপ। রামকুমার কাঁপিতে লাগিল। সম্মুখে ঠাকুর। এই ঠাকুরই না সাতপুরুষ তাহাদের বাড়ীতে ছিল! কামনাহীন হৃদয়ে এই ঠাকুরেরই না তাহারা সাতপুরুষ ধরিয়া পূজা করিয়াছিল? ঠাকুর তাহার বিনিময়ে তাহাদের কি দিয়াছিলেন? অর্থকষ্ট—অন্নাভাব—মিথ্যা ঋণের মোকদ্দমা—আরও কত ক্লেশ—রোগে ঔষধ নাই, পথ্য নাই। আর ইহাদিগের গৃহে আসিয়া, ঠাকুর ইহাকে লক্ষপতি করিয়াছেন। বিকৃতমস্তিষ্ক রামকুমার মনে মনে বলিল, "ঠাকুর! তুমি এত অকৃতজ্ঞ! গরীব ব্রাহ্মণের ভক্তিতে তোমার তুষ্টি হয় না। সোণার সিংহাসনে বসিয়া সোণার থালায় ভোগ লইতেছ! সাতপুরুষের সেবায় তোমার তৃপ্তি হয় নাই, হরিদাসের মাহিনা করা পূজারীর পূজাই তোমার মনে ধরিয়াছে! আচ্ছা—থাক তুমি। তোমায় দেখাইতেছি। তোমার ভোগ বাহির করাইয়া দিতেছি!"

সহসা রামকুমারের মনে কি এক উন্মাদ-সুলভ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সেই প্রবৃত্তিকে তাহার রোগতপ্ত দুর্ব্বল দেহ সজীব হইয়া উঠিল; এদিক-ওদিক একবার সন্তর্পণে চাহিয়া, ছোঁ মারিয়া ঠাকুরকে সিংহাসন হইতে তুলিয়া লইল। ঠাকুর কৃষ্ণবর্ণের শিলাখণ্ড। ঠাকুরকে উত্তরীয়ে জড়াইয়া রামকুমার প্রাঙ্গণের বাহিরে চলিয়া গেল। সকলেই ব্যস্ত, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না। রাস্তায় পড়িয়া, সে দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। উন্মত্ততা তাহার মস্তিষ্ক বিচলিত করিয়া দিয়াছে—শরীরে অসীম শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। জরাজীর্ণ ক্ষীণ দেহ, কিন্তু চক্ষু দুটি জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী। তারকা বিঘূর্ণিত হইতেছে। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল "ঠাকুর! মজা দেখাচ্ছি তোমায়; আমার এই দুরবস্থা করে হরিদাসের ঘরে বড় সুখে আছ নয়? যাও, ঐখানে নালার ধারে শুয়ে শুয়ে ভোগ খাও।"

এই বলিয়া ঠাকুর একহস্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। দূরে একটি নালা। তাহার পাশে এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষ। তাহার তলদেশে ইট্ পাটকেল জড় করা ছিল। শিলাখণ্ডটি তাহার উপর সশব্দে পড়িয়া প্রতিহত হইল।

রামকুমার বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল "খাও, ঐখানে পড়ে পড়ে ভোগ খাও।" উন্মত্ত ব্রাহ্মণ তীরবেগে ছুটিয়া যাইতেছিল; পায়ে হোঁচট্ লাগিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

নারায়ণ বহুক্ষণ পিতার সন্ধান করিয়া, শেষে সেই স্থলে পিতাকে দেখিতে পাইল; দুইজন লোকের সাহায্যে পিতাকে গৃহে লইয়া গিয়া বৈদ্য ডাকিতে ছুটিল। বৈদ্য আসিয়া অবস্থা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। বলিলেন, "আর কেন? গঙ্গাতীরস্থ করাই বিধেয়।" শুনিয়া নারায়ণের মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

গ্রামে তখন হুলুস্থূল। ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে হরিদাস, পৌত্রী লক্ষ্মী ও পুত্রবধূর সহিত, ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া দেখেন, সিংহাসন শূন্য, ঠাকুর নাই। চারিদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে

একথা প্রচারিত হইয়া গেল। দিকে দিকে লোক ছুটিল। হরিদাস অভুক্ত অবস্থায় সিংহাসনের সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। ঠাকুর পাওয়া না গেলে, তিনি জল-গ্রহণ করিবেন না।

কিন্তু ঠাকুর পাওয়া গেল না।

সেই দিন নিশীথে গঙ্গা গর্ভে রামকুমারের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও ভ্রূকুটি করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"কেমন, টের পেয়েছ ত!"

(৩)

পাড়ার লোক স্থির করিল, ঠাকুর নিশ্চয়ই কেহ চুরি করিয়াছে। চোর ধরিতে হইবে। মাতব্বরগণ একত্র হইয়া ঠিক্ করিলেন—"আচার্য্য ঠাকুরকে দিয়া নল-চালান হউক।"

আচার্য্য-ঠাকুর সেই দৈবজ্ঞ। ইনিই রামকুমারের বাস্তুভিটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিলেন। মাতব্বরগণ গিয়া তাঁহাকে ধরিল—নল চালাইতে হইবে।

নল-চালাইবার বার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র গ্রামশুদ্ধ লোক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখে সমবেত হইল। দৈবজ্ঞ একটি বাঁশের কঞ্চি লইয়া, তাহার দুইদিক অখণ্ড রাখিয়া, মাঝখানটি চিরিয়া দিলেন। পরে নানাবিধ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে কঞ্চি বা নলটির উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া সিঁদুর মাখাইলেন। পরে বহুবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে মন্ত্রপাঠ করিয়া, দুইজন লোককে কঞ্চিটির দুই দিক ধরিতে বলিলেন। দুইজন যুবক অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমরা ধরিতেছি।"

দৈবজ্ঞ বলিল—"আল্‌গা করে ধ'রো বাবা। জোর ক'রো না। যেদিকে নল টান্‌বে, সেই দিকে এগিয়ে যাবে।"

সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, নল এক একদিকে টান দিতেছে। ঠিক একদিকে নহে—কখন ডাহিনে, কখনও বা বাঁয়ে, যুবক দুইটি অগ্রসর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামশুদ্ধ লোক কলরব করিতে করিতে চলিল।

বহুক্ষণ ঘুরিয়া নল শেষে রামকুমার তর্কালঙ্কারের গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হইল। দৈবজ্ঞ মহোল্লাসে বলিল—"এই বাড়ীতে দেবতা নিশ্চয় আছেন। এরাই চুরি করেছে।"

তখন চারিদিকে মহা কলরব হইতে লাগিল। পাড়ার মাতব্বরগণ অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"নারাণের মা! আর লুকাইবার চেষ্টা করা বৃথা! ঠাকুর বার করে দাও। বাঁড়ুয্যে মশায় কাল থেকে জল পর্য্যন্ত মুখে দেন নাই।"

শেষরাত্রিতে রামকুমারের দাহ-কার্য্য সমাধা করিয়া আসিয়া, নারায়ণ মাতার সহিত শোকে ক্লান্তিতে অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা এই গোলযোগে নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। নারায়ণের মাতা প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শেষে অপমানে, ক্ষোভে, রোষে রোদন করিয়া উঠিলেন।

দৈবজ্ঞ মনে মনে হাসিতেছিল। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহায় ছিল বলিয়া, এতদিন সে রামকুমারের বাড়ীখানি গ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন হরিদাসের ঠাকুর যখন ইহারা চুরি করিয়াছে প্রতিপন্ন হইল, তখন ঠাকুর পাওয়া যাক্ আর না যাক্, হরিদাস আর কখনও নারায়ণ বা তাহার মাতাকে সাহায্য করিবে না। নিরাশ্রয় বিধবাও, বালক দৈবজ্ঞের কূটবুদ্ধিতে পারিয়া উঠিবে না। রামকুমারের ভিটাখানি এইবার তাহার হস্তগত হইবে।

দৈবজ্ঞ তাই কপট বিষণ্ণভাবে বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া বলিতে লাগিল—"কার মনে কি আছে, কে জানে বল? এত বড় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশ। এরা কি-না ঠাকুর চুরি করলে! ওঃ, ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে! মহাপাতকের ভয় হলো না!"

মাতব্বরগণ তখন নারায়ণের মাতাকে বলিতেছে—"আর গোলমালে কাজ নেই। তোমাকে একশ টাকা দেওয়াচ্চি। তর্কালঙ্কার-মহাশয়ের শ্রাদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহ হবে, ঠাকুরটি ফিরাইয়া দাও।"

নারায়ণের মাতা অপমানে কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"ওগো, আমি ঠাকুর চুরি করে রাখ্‌ব কেন? পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাতক ক'রেচি, তাই এ জন্মে এত যন্ত্রণা পাচ্চি। আবার এজন্মে ঠাকুর চুরি করব?"

দৈবজ্ঞ হাসিয়া বলিল—"ও সব ভিট্‌কিলমি! সোজা কথায় হবে না। গোমস্তা মশাই, একটু কড়া ক'রে বলুন।"

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুদ্রমূর্ত্তি গোমস্তা তখন বীরদাপে অগ্রসর হইয়া বলিল—"দেখ, ন্যাকামি রাখ। ভাল চাও ত এখনি ঠাকুর বার কর। নইলে, তোমাদের চাল কেটে বাস তু'লে দোব। একঘরে ক'রে গ্রামশুদ্ধ

সবাইকে আস্‌তে বারণ কর্‌ব। শীগ্‌গির ঠাকুর বার কর।"

চতুর্দ্দশবর্ষীয় নারায়ণ তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ধাবিত হইল। হরিদাস শূন্য-সিংহাসনের সম্মুখে ভূমিশয্যায় পড়িয়াছিল। নারায়ণ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"বাড়ুয্যে মশাই! একি অত্যাচার! আমরা আপনার কি করেছি যে,নলচালা দিয়ে আমার মাকে চোর অপবাদ দিচ্ছেন! মনে কচ্ছেন, এতে আপনাদের ভাল হবে?"

হরিদাস চাহিয়া দেখিলেন—শ্মশান-জাগরণে রক্তনেত্র রুক্ষকেশ পিতৃহীন বালক—কাচা গলায় দাঁড়াইয়া আছে। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। দুঃখে, করুণায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পিতৃবিয়োগ—তাহার উপর আবার এই অত্যাচার! বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন—"বাবা নারাণ! আমায় মাপ কর। আমি এখনই সেখানে যা'চ্চি।"

নারায়ণের মাতা কক্ষতলে মাথা খুঁড়িতেছিলেন; বলিতেছিলেন,"ঠাকুর! তুমি আমার এ লাঞ্ছনা দেখ্‌ছ। তুমিই এর উপায় কর। তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নাই।"

গোমস্তা তখন হুঙ্কার দিতেছিল—"দিবিনি? তবে মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া।—একি কর্ত্তা আস্‌ছেন যে!"

সকলে দেখিল, হরিদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ নারায়ণ। আসিয়াই বলিলেন—"কর্‌লি কি? তোরা কর্‌লি কি? ব্রাহ্মণের শাপে আমার সর্ব্বনাশ হবে। কে তোদের নলচালা আন্‌তে বল্‌লে? যা—সব দূর হয়ে যা।"

গোমস্তা প্রভৃতি নতমস্তকে সরিয়া গেল।

হরিদাস নারায়ণের মাতার উদ্দেশে যোড়হাত করিয়া বলিলেন—"মা, আমি হাতযোড় কচ্ছি। আমায় ক্ষমা কর। তোমার চোখের জল পড়্‌লে, আমার লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ হবে; ক্ষমা কর মা—ক্ষমা কর।"

শোণিতাক্ত রুক্ষকেশরাশি সরাইয়া নারায়ণের মাতা উঠিয়া বসিতে গেলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না; দুঃখে, অপমানে জর্জ্জরীভূত তাঁহার হৃদয় আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারিল না—সংজ্ঞা হারাইয়া তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

দৈবজ্ঞ তখন বলিতে বলিতে যাইতেছে—"বাঁড়ুয্যে মশায়ের যেমন কাণ্ড! দিচ্ছিল ত মাগী বার ক'রে! খামকা এসে পড়ে সব গোলমাল করে দিলেন!"

(৪)

কয়েকমাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই দিন হইতেই নারায়ণের মাতার জ্বর হইয়াছিল। অত্যাচারে তাহা কঠোরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দ্বিপ্রহরে নারায়ণের মাতা ঘুমাইতেছেন। নারায়ণ মাতার শিয়রে বসিয়া আছে, এমন সময় বাহির হইতে এক নবমবর্ষীয়া বালিকা ডাকিল—"নারাণ দাদা!"

নারায়ণ পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দেখিল—লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বলিল—"দাদা, তোমার মা কেমন আছে? ঠাকুরদাদা, বেদানা-মিছরি পাঠিয়ে দিলেন।"

নারায়ণ বলিল—"আয়, ঘরে আয়, আস্তে আস্তে আসিস্। মা ঘুমুচ্চে। কাল সমস্ত রাত্তির মা ভুল বকেচে।"

লক্ষ্মী ধীরেধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া, বিছানার নিকট দাঁড়াইল। নারায়ণ, বেদানা ও মিছরি রাখিয়া দিল। লক্ষ্মী দেখিল, নারায়ণের মাতা প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন।

নারায়ণ বলিল—"আজ আম পাড়্‌তে যাস্‌নে?"

লক্ষ্মী বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, দাদা। একবার চল না। খুব বড় বড় আম হ'য়েচে। আমি উঁচুতে ঢিল ছুঁড়তে পারি না।"

নারায়ণ বলিল—"আজ না লক্ষ্মি—মাকে একলা রেখে যাব না।" বলিয়াই নারায়ণ দেখিল, তাহার মাতা চাহিয়া আছেন। নারায়ণের মাতা বলিলেন—"মা-লক্ষ্মি এসেচ? যাও বাবা, নারাণ—খেলা কর না গে। আমি আজ ভাল আছি। জ্বর ছেড়ে গেছে।" বলিয়া রুগ্না উঠিয়া বসিলেন।

নারায়ণ বলিল—"না মা, আজ থাক্। কাল সমস্ত রাত্রি তুমি ভুল বকেচ।"

মাতা বলিলেন—"না রে, যা। লক্ষ্মীকে খুব বড় আম পেড়ে দিগে যা।"

লক্ষ্মী বলিল—"না, আমিও এখানে বস্‌চি।"

মাতা বলিলেন—"মা-লক্ষ্মীর আমার বুদ্ধি কত! আমার আর যত্ন কর্ত্তে হবে না, মা! আমি আজ বেশ আছি। যাও—তোমরা আম পাড়গে, যাও।"

পুনঃ পুনঃ অনুরোধে নারায়ণ ও লক্ষ্মী আম পাড়িতে গেল।

আমগাছের গোড়ায় দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী বলিল—"দেখ, নারায়ণ দাদা! আমি ঐ আমটা পাড়ি।" লক্ষ্মী ঢিল ছুঁড়িল; দুইটি আম বোঁটা ছিঁড়িয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পাতাও খসিয়া গেল। ছোট ছোট ডালগুলি নড়িয়া উঠিল।

নারায়ণ বলিল—"আমি ঐ বড়টা পাড়ি।" নারায়ণ ঢিল ছুঁড়িল; আম পর্য্যন্ত সে ঢিল পৌঁছিল না।

নারায়ণ বলিল—"দাঁড়া ত, একটা বড় ঢিল ছুঁড়ি।" হাত দিয়া কতকগুলি ঢিল হইতে বাছিয়া, অপেক্ষাকৃত একটি বড় ঢিল লইয়া, আবার ছুঁড়িল। এটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

নারায়ণ বলিল—"আচ্ছা, এইবার, এইবার যা ঢিল্‌টা পেয়েছি—আরে একি! লক্ষ্মি, দেখ্ দেখ্, কেমন গোল পাথরটা!—আবার এতে কি একটা তার জড়ান রয়েছে!"

লক্ষ্মী ঝুঁকিয়া পড়িল। "ও দাদা! এযে, আমাদের ঠাকুর! চল—চল—দাদামশাইকে দেখাইগে চল!"

উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল।

নারায়ণের মাতা উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। একবার শেষদশায় একটু বলসঞ্চার হইয়াছিল,

"ও দাদা! এযে, আমাদের ঠাকুর"!

আবার মাথাটা কেমন করিতে লাগিল। মনে হইল, এইবার শেষ।—"নারাণকে কেন পাঠালুম? শেষকালে একবার দেখ্‌তে পেলুম না! আমি মলে নারাণের কি হবে! নারাণকে কে দেখ্‌বে!" আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—"ঠাকুর! তুমিই নারাণকে দেখো। তার আর কেউ রইলনা। তুমি কোথায় জানি না, তোমায় কে নিলে জানি না; কিন্তু যেথায় থাক ঠাকুর, নারাণকে দেখো।"

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। হরিদাস, নারায়ণ ও লক্ষ্মী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হরিদাস নারায়ণের মাতাকে বলিলেন—"মা, ঠাকুর আবার এসেছেন। তোমার নারাণই ঠাকুর কুড়িয়ে পেয়েছে। নারায়ণের হাত দিয়েই ঠাকুর আমায় দেখা দিয়েছেন। মা! অনুমতি কর, লক্ষ্মি-নারায়ণের মিলন করে দিই।"

নারায়ণের মাতা অতিকষ্টে বলিলেন, "কি আর বল্‌ব! —আপনি নারাণকে জামাই কর্‌বেন, এর চেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য হবে? ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। সাতপুরুষের সেবার ফলে নারাণ আমার আজ লক্ষপতি হ'ল।—আমার আসন্নকাল উপস্থিত। নারাণ! কাছে আয়।"

নারায়ণ উচ্চরবে রোদন করিয়া মাতার পদতলে আছাড়িয়া পড়িল। লক্ষ্মীও আকুলকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল।

বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্যজগৎ

[আচার্য্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, M. A.]

BAIN-সাহেবের 'MENTAL AND MORAL SCIENCE' এককালে 'বি. এ.'-পরীক্ষার্থী 'A.' Courseএর ছেলেদের পড়িতে হইত। ঐ পুস্তকে 'Perception of Material World' অধ্যায়ে কতকগুলি কথা আছে, বহুদিন আগে তাহা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি নাই। সেই কথাগুলি লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতে চাই। আমি যেভাবে আলোচনা করিব, সেভাবে আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানি না। দার্শনিক-সাহিত্যে আমার বিদ্যার দৌড় যতটুকু, তাহাতে আমি বলিতে পারিব না যে, অন্য কেহ এরূপ আলোচনা করেন নাই। যদি কেহ আমার সমর্থন করিয়া থাকেন, বা করেন, তাহাতে আমার আনন্দই হইবে।

BAIN-সাহেব বলিতেছেন—"In regard to the Object-properties, all minds are affected alike : in regard to the Subject-properties, there is no constant agreement." এখানে—'Object-properties' বলিতে মোটামুটি সেই 'sensation' বা অনুভূতিগুলি বোঝায়, যেগুলি বাহির হইতে আসিতেছে এইরূপ আমরা মনে করি; দেশীভাষায় এগুলিকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ বলা হয়। আরও বলা হয় যে, এগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে। এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের 'Objective World' বা 'External Material World' গড়িয়া লই। বাঙ্গালায় উহাকেই 'বাহ্যজগৎ' বা 'জড়জগৎ' বলিব। এইগুলি ছাড়িয়া, আরো অসংখ্য 'feeling' বা বেদনা লইয়া কারবার করিতে হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলিকে 'organic sensations' বলা হয়, এবং কতকগুলিকে 'appetites and emotions' পর্য্যায়েও ফেলা চলিতে পারে। মাথাধরা-দাঁতকামড়ানির বেদনা হইতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং রাগ-দুঃখ-শোকতাপ পর্য্যন্ত সমস্তই এই শ্রেণীতে পড়ে। এইগুলাকেই 'Subject-properties' বলা হইয়াছে। এগুলা যেন বাহিরে হইতে আসে না; এগুলা যে-জগতের অন্তর্গত, তাহা বাহিরের 'Material World' নহে; কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া ইহাদের আসিবার যেন দরকার নাই। দেশীপণ্ডিতেরা ইহাদের জন্যও একটা অন্তরিন্দ্রিয় কল্পনা করিয়াছেন; সেই অন্তরিন্দ্রিয়ের নাম মন। একটু তলাইয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, External বা Objective জগৎ এবং ভিতরের Subjective জগৎ, এই দুই জগৎই অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। চোখ-কান প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গুলি Objective বা বাহিরের জগতের খবর মনের নিকট আনিয়া উপস্থিত করে, এবং মন তাহা গ্রহণ করে; আর ভিতরের Subjective Worldএর খবর, কোন বহিরিন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না-রাখিয়া, একেবারে মনের নিকট উপস্থিত হয়, এবং মন তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কোন্‌গুলা বাহির হইতে আসে এবং কোন্‌গুলা ভিতরের জিনিষ, তাহা সকল সময়ে আমরা নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা সীমা-রেখা না টানিতে পারিলে কোন্‌টা Objectএর সামিল, আর কোন্‌টা Subjectএর সামিল, তাহা পৃথক্ করা চলে না। BAIN সাহেব বলিতেছেন, যেগুলি Object-properties, সেগুলিকে সকলেই সমানভাবে দেখে; আর যেগুলি Subject-properties, সেগুলিকে সকলে সমানভাবে দেখে না—একএক জনে একএক রকমে দেখে। সম্মুখে সাপ বা বাঘ আসিলে ঘরসুদ্ধ সকললোকেই একই জিনিষ দেখিতে পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হয়; কিন্তু একজনের যখন মাথা ধরে; অন্যের তখন মাথা ধরে না—এমন কি তাহার মাথাধরার বেদনাটা সত্য, কি না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করাও অন্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমার দাঁতের বেদনার আমিই একমাত্র সাক্ষী; এবিষয়ে আমার সাক্ষ্যে

সংশয় করিবার অধিকার অন্যের আদৌ নাই। অতএব, BAIN সাহেবের ভাষা একটু ঘুরাইয়া বলিতে পারা যায়—আমি, তুমি, রাম, শ্যাম—আমরা সকলে যাহা একসঙ্গে এক-ভাবে দেখি, যাহার অস্তিত্ববিষয়ে সকলে মিলিয়া সাক্ষ্য দিই, সেই জিনিষটাই Objective World; ইহারই নামান্তর External World, Material World প্রভৃতি। এই বাহিরের জগৎটা সর্ব্বসাধারণের, কোন একজনের নিজস্ব নহে। সকলের সহিত ইহার সমান সম্পর্ক। সকলেই ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহা-কর্ত্তৃক অভিভূত হইতেছে, এবং ইহার প্রতি প্রভুত্ব চালাইয়া ইহাকে আপন-আপন কাজে লাগাইবার চেষ্টায় রহিয়াছে। এই সর্ব্বসাধারণের বাহ্যজগৎকে অবলম্বন করিয়াই আমরা জীবনযাত্রা চালাইতেছি। কিন্তু এই বাহ্যজগৎকে ছাড়াইয়া—ইহার অতিরিক্ত—আর একটা জগৎ আছে, যেটা আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব। সেটাকে যদি অন্তর্জগৎ বলি, সেই অন্তর্জগৎ প্রত্যেকের পক্ষে ভিন্নরূপ। বেইন সাহেবের ভাষায় সেই অন্তর্জগতে মানুষে মানুষে constant agreement নাই। একের অন্তর্জগতে অপরের কোন অধিকার নাই; একের সহিত অন্যের সম্পর্কও বিশেষ-কিছু নাই। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা রাগদ্বেষের সহিত তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা রাগদ্বেষের কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে, এমন কি আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা রাগদ্বেষ কোনকালে কোন উপায়ে তোমার প্রত্যক্ষ বিষয় পর্য্যন্ত হইতে পারে না। আমার মনে শোক উপস্থিত হইলে, সেই শোকের বেদনাটা আমার যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তোমার সেরূপ প্রত্যক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তুমি যাহা দেখিতে পাও, সে আমার নাক-মুখ-চোখের অবস্থা, আমার চোখের জল, আমার মুখের বিকার; তাহা তুমিও দেখ, আর সকলেও দেখে; অতএব সেই চোখের জল ও মুখের বিকার সর্ব্বজনের সাধারণ Object World এর অন্তর্গত। কিন্তু সেই শোকের বেদনাটুকু কেবল আমারই গ্রাহ্য এবং আমারই প্রত্যক্ষ; তোমার বা অন্যের তাহা বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। একালে thought-readingএর কথা শুনিতে পাওয়া-যায়—কাহারো কাহারো নাকি এরূপ ক্ষমতা আছে যে, অন্যের মনের ভিতরে যাহা যাতায়াত করিতেছে তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই thought-reading কিরূপে ও কিউপায়ে ঘটিয়া থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিক রীতি-ক্রমে নির্ণীত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে না যে, অপরের মনের রূপহীন ভাবগুলাই কোনও রূপে thought-readerএর প্রত্যক্ষ হয়; অথবা সেই ব্যক্তির আকার-ইঙ্গিত মুখভঙ্গি দেখিয়া, কোনরূপ law of association আশ্রয় করিয়া, সেই ভাবগুলা জানিতে পারা যায়। ফলে, একের অন্তর্জগৎ কোন-না-কোনরূপে হয়ত অপরের অনুমানগম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না। বিজ্ঞান বিদ্যার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার অধিক বলা চলিবে না।

BAIN সাহেবের ঐ উক্তি অবলম্বন করিয়া, আমরা External Objective Material Worldএর একটা সংজ্ঞা, বা definition, খাড়া করিতে পারি। প্রত্যক্ষগোচর অনুভবরাশির মধ্যে যাহা সর্ব্বজনসাধারণ, তাহাই একত্র করিয়া এই বাহ্য-জগৎ। একালে যাহাকে Physical Science বলে, এই বাহ্য-জগৎ তাহারই আলোচনার বিষয়। এই বাহ্য-জগৎটাকে postulate করিয়া লইয়া Physical Science তাহার কাজ আরম্ভ করে। দার্শনিকেরা এই বাহ্য-জগতের তথ্য লইয়া যাহা কিছু বলুনই না, Physical Scienceএর তাহাতে কাণ দিবার কোন দরকারই নাই। বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া না লইলে, Physical Scienceএর কোন কাজই থাকে না। আমি কেবল Physical Scienceএর কথাই বলিতেছি—Mental বা Moral Science, Biological বা Sociological Scienceএর কথা বলিতেছি না। Scienceএর একটা সুনির্দ্দিষ্ট method আছে; যে কোন বিষয়ে সেই method আশ্রয় করিয়া আলোচনা করা যায়, তাহাকেই আজকাল Science বলা হইয়া থাকে। ভাষা-তত্ত্ব বা ইতিহাস-তত্ত্ব পর্য্যন্ত আজকাল Scienceএর মধ্যে পড়িয়াছে। আমি সে সকল Scienceএর কথা আনিতেছি না; আমি অতি বিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থে Physical Science নামটা গ্রহণ করিব—এমন কি Physiology বা Chemistryরও সমস্তটা, এই সঙ্কীর্ণ অর্থে Physical Scienceএর ভিতর পড়িবে না। এই Physical Scienceকেই বাঙ্গালায় আমি বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিব। সে যাক্,—এই

Physical Science এর আলোচ্য যে বাহ্য-জগৎ, তাহা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ-বিষয়। প্রত্যেক মনুষ্যের যেটুকু নিজস্ব, যাহা অন্যের প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত, তাহা এই বাহ্য জগতের অন্তর্গত নহে। এই definition, বা সংজ্ঞা, ধরিয়া লইলে আপাততঃ অগ্রসর হওয়া চলিতে পারে। কোন্‌টুকু Physical Scienceএর আলোচ্য হইবে এবং কোন্‌টুকু হইবে না, তাহার মোটামুটি নিদ্ধারণ চলিতে পারে। গোটাকতক দৃষ্টান্ত লইলে কথাটা বুঝাইবার সুবিধা হইবে।

গোড়াতেই বলিয়াছি, রূপ রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ আমরা এই বাহ্য-জগৎ হইতে পাই; কিন্তু রূপ-রস-শব্দ গন্ধ স্পর্শ পাইলেই তাহা সর্ব্বজনসম্মত বাহ্য-জগৎ হইবে না। স্বপ্নে আমরা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ লইয়াই খেলা করি। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ সেই রূপ-রস শব্দাদি আমার বাহিরে অবস্থিত জগৎ হইতেই আসিতেছে, এ বিষয়ে আমার সংশয় মাত্রও থাকে না; কিন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট বাহ্য-জগৎ স্বপ্নকালে আমাকে যতই অভিভূত করুক না কেন, ইহা কেবল আমারই প্রত্যক্ষ হয় এবং আমাকেই অভিভূত করে, অন্যের প্রত্যক্ষ হয় না বা অন্যকে অভিভূত করে না; তাহা স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই আমরা অপরের সাক্ষ্য লইয়া জানিতে পারি, এবং তখন উহাকে আমার স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিই। অথচ স্বপ্নকালে উহার মত সত্যপদার্থ আমার নিকট কিছুই ছিল না, স্বপ্নভঙ্গে—অন্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া—তখন উহার মিথ্যাত্ব আমি মানিয়া লই। এই স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ, Physical Scienceএর আলোচ্য বাহ্য-জগৎ নহে, কেননা উহা নিজস্ব মাত্র, সর্ব্বসাধারণের নহে। এইরূপে, আফিমের নেশায়, বা গাঁজার দমে, যে-জগতের সহিত কারবার করা যায়, সেই নেশাখোরের জগৎও, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় হইলেও, সর্ব্বতোভাবে সেই নেশাখোরের নিজস্ব জগৎ—অন্যের ইহাতে কোন ভাগ বা অধিকার নাই; এমন কি, অন্য নেশাখোরেরও কোন অধিকার নাই। কাজেই, Physical Science সেইরূপ জগৎকে আমল দেন না। ঐরূপ, যে ব্যক্তি কোন রোগের ধাক্কায় অপ্রকৃতিস্থ, অথবা স্বভাবতঃ যাহারা অপ্রকৃতিস্থ বা পাগল, বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্য বাতিল ও না-মঞ্জুর। যাঁহারা কোন emotionএর, বা ভাবের, মাত্রাধিক্যে ক্ষণেকের জন্য অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সাক্ষ্যও এই কারণে অগ্রাহ্য।—সেদিন কোন মাসিক-পত্রে দেখিলাম, ব্রাহ্ম-সমাজের কোন উৎসব-উপলক্ষে ভাবুক ভক্তগণের মধ্যে অত্যন্ত মাতামাতি হইয়াছিল। অনেকেই দেখিয়াছিলেন, ঘরের মধ্যে যেন একটা আলো ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল।—অনেকেই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকেই আবার দেখেন নাই; অতএব বৈজ্ঞানিক সেই ভাবমুগ্ধ অনেকের কথা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন না।—আমরাও বাল্যকালে সন্ধিপূজার সময় দেখিতাম, অথবা দেখিতেছি বলিয়া মনে করিতাম, প্রতিমার মধ্য হইতে 'মা' যেন আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন, আর সিংহের চক্ষু দুটা ঘুরিতেছে। এখন সে ভক্তিও নাই, মাও এখন আর হাসেন না, সিংহও আর এখন চোখ ঘুরায় না।—কোন পল্লীগ্রামের গৃহস্থ বাড়ীর বালগোপাল বিগ্রহ-মূর্ত্তির সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ একদিন বাড়ী ছাড়িয়া দূরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্য-উপনীত বালক-পুত্রের উপর নারায়ণের সেবার—পায়সান্ন ভোগ দেওয়ার—ভার দিয়া গিয়াছিলেন। বালক যথারীতি ভোগ নিবেদন করিয়া, বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু নারায়ণ খাইতে আসিলেন না। তাহার মনে ভয় হইল, তাহার কোন ক্রটি হইয়াছে, অথবা তাহাকে বালক দেখিয়া অগ্রাহ্য করিয়া, ঠাকুর বাহির হইলেন না। অনেক কান্নাহাটি সাধ্য-সাধনাতেও তাঁহার আবির্ভাব হইল-না দেখিয়া, নিরুপায় বালক অবশেষে লাঠি বাহির করিল। তখন নারায়ণ-শিলার মধ্য হইতে বাল-গোপাল হামাগুড়ি দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন—মাথায় তাঁহার ময়ূরপুচ্ছ, হাতে সোণার বাজু, নূপুরের ধ্বনিতে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে পায়স খাইয়া তিনি অন্তর্ধান করিলেন। আর, সেই শালগ্রাম-শিলা তদবধি বালগোপাল বিগ্রহে রূপান্তরিত হইল। ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া অবাক্ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিলেও, কোন বৈজ্ঞানিকের কঠিন হৃদয় ইহাতে ভিজিবে না।

আলো-আঁধারিতে দড়িগাছটা সাপের মত দেখায়, হয়ত রীতিমত ফণা-তুলিয়া ছোঁ দেয়। বৈজ্ঞানিক এখানে বলিবেন—রজ্জুতেই সর্পভ্রম, আকস্মিক আতঙ্কের ফল;

যাহার তেমন আতঙ্ক হয় না, সে দড়িকে দড়িই দেখে। ইহা judgmentএর ভুল, দর্শনের ভাষায় ইহার নাম অধ্যাস। মরুভূমির মরীচিকা, অথবা অন্তরীক্ষে লম্বিত গন্ধর্ব্বনগর—এও কতকটা এই শ্রেণীর—atmospheric refraction এর ফলে, একই সময়ে বহুলোকেরই এইরূপ ভ্রান্তি ঘটিতে পারে। যাহা গাছপালার প্রতিবিম্বরূপে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা একহিসাবে সত্য হইলেও, জলের অস্তিত্বসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত মনে আসে, তাহা ভুল—স্থান-পরিবর্ত্তনে এই ভুল ধরা পড়ে। মরুভূমিতে মনে হয়, ঐখানে জল আছে : কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায়, জল নাই—নিতান্তই যেব্যক্তি মৃগ নহে, সে বুঝিতে পারে আমার ভুল হইয়াছিল। কাজেই এই ভুল, স্থানভেদে কতক লোকের ঘটে, কতক লোকের ঘটে-না। মরীচিকা এক-জায়গার লোকে দেখিতে পাইলেও, অন্য-জায়গার লোকে দেখিতে পায় না। আর—সকলে এক-বাক্যে যাহার অস্তিত্বসম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় না, বৈজ্ঞানিক তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া দরকার নাই। সকল লোকে একমত হইয়া যাহাতে সাক্ষ্য দেয়, বৈজ্ঞানিক তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি যাহাকে বাহ্য-জগৎ বলিবেন, তাহা সকলেই সমানভাবে দেখিবে—অন্ততঃ সমস্ত প্রকৃতিস্থ লোকে সমানভাবে দেখিবে। অধিকাংশ লোকে যাহা দেখে, তিনি তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন ; দু-দশ জনে যদি না-দেখিতে পায়, বা অন্যরূপ দেখে, তাহারা কোন-না-কোন হেতুতে অপ্রকৃতিস্থ—ইহাই তিনি ধরিয়া লন। প্রাকৃতিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের অন্য কোন উপায় বৈজ্ঞানিকের নাই। অধিকাংশ লোকে যাহা সত্য বলিয়া মানিবে, তিনি তাহাই সত্য বলিতে বাধ্য, এবং তাহাই লইয়া তাঁহার আলোচনা ও কারবার। দু-দশ জন লোক মাত্র যাহার সাক্ষ্য দেয়, তাহারা খুব মাতব্বর সাক্ষী হইলেও, তাহাদের কথা গ্রহণে তিনি বাধ্য নহেন। ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের কোন সম্পর্ক নাই—অন্ততঃ আর সকলে সেটাকে যতক্ষণ প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার না-করে। যত ভূতের গল্প, বা apparitionএর গল্প, আছে, তাহা মানিয়া লইতে, বা তাহার আলোচনা করিতে, বৈজ্ঞানিক বাধ্য নহেন। যিনি ভূত দেখেন, তিনি, নিজের প্রত্যক্ষে নির্ভর করিয়া, তাহাতে আস্থা করেন,—অন্যে সংশয় করিলে চটিয়া উঠেন ; কিন্তু চটিবার দরকার নাই। তাঁহার ভূত, তাঁহার কাছে যতই সত্য হউক, ইতরসাধারণের কাছে যতক্ষণ সেইরূপ সত্য না-হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত Physical Science সে-ভূতের কোন তোয়াক্কা রাখিবেন না। Psychical Science, বা অন্য Science, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে পারেন ; কিন্তু Physical Science তাহাকে একেবারে আমল দিবেন না। আবার সর্ব্বসাধারণে আসিয়া যদি সেই ভূত একভাবে দেখিতে পায়, এবং একবাক্যে তাহার সাক্ষ্য দেয়, তখন Physical Scienceও তাহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। তখন মানিতে না-চাহিলে তাঁহার বৈজ্ঞানিকতায় দোষ স্পর্শিবে। তবে মজা এই, তখন সেই সর্ব্বজন-স্বীকৃত ভূতের অদ্ভুতত্ব কিছু থাকিবেনা। তখন ঝড়-বৃষ্টি-উল্কাপাতের মত সর্ব্বজনসম্মত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যেই তাহার স্থান হইবে, এবং বৈজ্ঞানিকও তখন কোথাকার আলো কোন্ পথে আসিয়া এই apparitionএর সৃষ্টি করিয়াছে, গম্ভীরভাবে তাহার আলোচনা করিবেন। হয়ত সেই apparitionটা অত্যন্ত আজগুবি ধরণের, তেমন দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনো দেখে নাই ; কিন্তু তাহাতে কিছুই যায়-আসে-না, সর্ব্বজনমান্য হইলে উহা বৈজ্ঞানিকেরও মান্য হইবে। আর যতক্ষণ সর্ব্বজনে দেখিতে না পাইবে, বা সর্ব্বজনকে দেখাইতে না পারা যাইবে, ততক্ষণ কোন মাতব্বর সাক্ষীর কথাই গৃহীত হইবে না,—হউন-না-কেন তিনি Sir WILLIAM CROOKES, বা Sir ALFRED WALLACE। অতিবড়-বৈজ্ঞানিক, আপনার প্রত্যক্ষ বিষয়ে নিঃসংশয় হইলেও, অন্যকে মানাইবার অধিকারী হইবেন না। CROOKES কিংবা WALLACE এর মত লোকের বৈজ্ঞানিকতায়—অথবা বৈজ্ঞানিকোচিত সতর্কতায়—কেহ সন্দেহ মাত্র করেন না। তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষেও সন্দেহ করিবার সম্যক্ হেতু নাই। তাঁহারা মিথ্যা বলিতেছেন, এরূপ মনে আনাই পাপ। তাঁহারা ঠকিয়াছেন, এতটুকু বলাও হয়ত ধৃষ্টতা। তথাপি, যতক্ষণ তাঁহারা, Royal Institutionএর ঘরে দাঁড়াইয়া, সাধারণের প্রত্যক্ষ করাইতে না পারিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের

প্রত্যক্ষ Physical Scienceএর আলোচনার বিষয় হইবে না।

HUXLEY পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—বৈজ্ঞানিক কেবল evidence চায়। এই evidence কথাটার তাৎপর্য্য মনে রাখিলে, miracleসম্বন্ধে অধিকাংশ গণ্ডগোল অনাবশ্যক হইয়া যায়। কোন ঘটনা, যতই আজগুবি হোক না, তাহাতে বৈজ্ঞানিকের কিছুই যায়-আসে না। নিত্য-নূতন আজগুবি ঘটনার আবিষ্কারই বড় বড় বৈজ্ঞানিকের ব্যবসায়। আজকাল Radio-activity সম্বন্ধে যেসকল আজগুবি ঘটনা বাহির হইয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনাই কাহারও মাথায় আসে নাই। কোন পণ্ডিত উহা 'প্রত্যক্ষ করিয়াছি' বলিলেও অন্য পণ্ডিতে তাহা হাসিয়া উড়াইতেন; হয়ত, কেহবা উহা অসম্ভব বলিয়াই উড়াইতেন। কিন্তু দশবৎসর আগে যাহা অসম্ভব ছিল, আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে—কেবল বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীর আবিষ্কৃত বলিয়া সম্ভব হয় নাই, ইতরসাধারণের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে বলিয়া সম্ভব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা, নিজে দেখিয়াছেন, এবং, রাস্তার লোককে ডাকিয়া দেখাইতেছেন। যেসকল পণ্ডিত, সাবেক theoryর দোহাই দিয়া, অসম্ভব বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই theoryগুলাই লণ্ডভণ্ড হইয়াছে, নূতন theoryর জন্য তাঁহারা মাথা চুলকাইতে-ছেন। সর্ব্বসাধারণে, কোন theoryর ধার ধারে না; তাহারা উহার সত্যতা মানিয়া লইয়াছে, এবং, তাহাদের মধ্যে যাহারা ব্যবসাদার, তাহারা, এই আবিষ্কারগুলিকে কাজে লাগাইয়া দুপয়সা ঘরে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন ঘটনা অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অসম্ভাব্য,—এসকল অজুহাত বিজ্ঞানবিদ্যায় আদৌ চলিবে না। Physical Science চায় কেবল evidence; এবং এই evidence জনসাধারণের মান্য এবং স্বীকার্য্য হওয়া চাই। অধিকাংশ miracleএর পক্ষে এইরূপ evidence পাওয়া যায় না বলিয়া, বৈজ্ঞানিকেরা Physical Scienceএর মধ্যে তাহার আলোচনা করিতে চাহেন না—যেকয়জন সেই-সেই ঘটনায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সহিত ঝগড়ায়ও সময়ক্ষেপ করিতে চাহেন না। সাধারণে যতক্ষণ বিশ্বাস না করিবে, ততক্ষণ তাহা Physical Scienceএর আলোচ্য হইবে না—এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা নিরস্ত। এইখানে কথা উঠিতে পারে,—এককালে সর্ব্বসাধারণে যেসকল miracleএ বিশ্বাস করিত, এ কালের Physical Science তাহা মানিয়া লইবে, কি না? ইহারও উত্তর সোজা-উত্তর, কোনরূপ প্যাঁচ খেলাইবার দরকার নাই—সে-কালের লোকে যাহা মানিত, সে-কালের Physical Scienceও তাহার আলোচনা করিত; একালের সকলে যখন তাহা মানিতে চায় না, অথবা একালে সকলের সম্মুখে তাহার আবিষ্কার করিয়া সকলকে জানাইবার যখন কোন উপায় নাই, তখন এ-কালের Physical Science তাহার আলোচনা করিবে না। এ-কালের evidence যতক্ষণ তৃপ্ত না-হয়, ততক্ষণ তৎসম্বন্ধে আলোচনায় কোন লাভ নাই। যতক্ষণ এ-কালের মত evidence না মিলিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচনা স্থগিত থাকুক।

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষবাদী, ইহা সকলেই জানেন। অনুমান ও শব্দ এই দুই প্রমাণেরও সর্ব্বদা আশ্রয় লইতে হয় বটে, কিন্তু সেই অনুমান এবং শব্দেরও ভিত্তি প্রত্যক্ষে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাদের প্রামাণিকতা। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার সহিত constant association—পূর্ব্ব হইতে জানা ছিল বলিয়া, তাহারই সাহায্যে, যাহা প্রত্যক্ষ নহে, তাহার অনুমান করা যায়। যেমন ন্যায়শাস্ত্রের—ধূম হইতে অগ্নির অনুমান। ধূমের সহিত অগ্নির সাহচর্য্য পূর্ব্বে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলিয়াই, আজিও ধূম দেখিলে তাহার সহচর অগ্নির অনুমান করি। এইরূপ অনুমানে মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়, যেমন মরীচিকায় দূরের গাছপালার প্রতিবিম্ব দেখিয়া জলের অনুমান করিয়া ঠকিতে হয়। এখানে ভুল প্রত্যক্ষের নহে—ভুল প্রত্যক্ষ হইতে inferenceএর, বা judgmentএর। শব্দ-প্রমাণে অপরের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতে হয়—কোথাও বা ঠকিতে হয়, কোথাও বা হয় না। নিজের প্রত্যক্ষও যে ঠকায় না, এমন নহে; ইন্দ্রিয়কে ত বিশ্বাস করিবার জো-ই নাই; অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, সেও সকল সময় প্রকৃতিস্থ থাকে না। সেইজন্য নানারূপ যন্ত্রতন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রিয়ের দোষ সাম্‌লাইতে হয়। পাঁচবার পাঁচটা point of view হইতে দেখিতে হয়। অবশেষে, আর পাঁচজনকে ডাকিয়া বলিতে হয়—দেখ, ঠিক্ হইতেছে কি না।

সকলেই যদি বলে, হাঁ ঠিক্ দেখিতেছি, তখনই উহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ফল কথা, শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। উপমান, বা Analogy, বলিয়া যে আর একটা প্রমাণ শোনা যায়, সেটা প্রমাণের মধ্যেই নয়; সেটা কেবল পথ দেখায় মাত্র। এই analogyর সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত পথে চলিয়া অনেক নূতন তথ্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন। কিন্তু, সেই প্রত্যক্ষসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত, analogy কেবল পথপ্রদর্শকেরই কাজ করে,—বড় জোর আঁধারে আলো দেয়। জল স্বভাবতঃ উঁচু হইতে নীচে, higher level হইতে lower levelএ যায়। সেইরূপ উত্তাপ গরম হইতে ঠাণ্ডায়, higher temperature হইতে lower temperatureএ যায়; এই analogy ধরিয়া, FOURIER উত্তাপের গতায়াত সম্বন্ধে এক নূতন Science পত্তন করিয়াছিলেন। Electricity ঐরূপ higher potential হইতে lower potentialএ যায় বলিয়া, তাড়িত-প্রবাহের গতায়াত সম্বন্ধে Ohm আর এক নূতন Scienceএর পত্তন করেন। এই নূতন Scienceএর পত্তন না হইলে, সমুদ্রগর্ভে তার পাতিয়া, টেলিগ্রাফ পাঠানই হয়ত চলিত না, Atlantic Cableএর সমুদয় খরচাটাই মাটি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। Electrical, অথবা Magnetic, Lines of Force ঐরূপ higher potential হইতে lower potentialএ যায়—এইরূপ কল্পনা করিয়া, একালের পণ্ডিতেরা Electrical flux এবং Magnetic flux, এই উভয়ের প্রবাহ-কল্পনা দ্বারা তাড়িত-বিজ্ঞানকে নূতনভাবে গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। নইলে ডাইনামো চালান কত দুঃসাধ্য হইত, তাহা তত্ত্বজ্ঞেরা জানেন। দুইটা তার এক সুরে বাঁধা থাকিলে, একটায় ঘা দিলে অন্যটা চঞ্চল হইয়া উঠে; শব্দের ঢেউএর এই analogy তাড়িতের ঢেউ প্রতি প্রয়োগ করিয়া, Hartz বিনা তারে টেলিগ্রাফির উপায় উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। এসমস্তই Analogyর বলে ঘটিয়াছে; অথচ analogyর বলে তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা পরে প্রত্যক্ষপ্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়াই, analogyর সার্থকতা ঘটিয়াছে। ফলেও দেখা গিয়াছে, analogy কিছুদূর পর্য্যন্ত বেশ পথ দেখায়—তার পরে আর চলে না। কাজেই উপমান, বা analogy, প্রমাণ নহে। একালে theoryর কথা অনেক শোনা যায়; একটা theory খাড়া করিয়া, তাহা হইতে নানা নূতন সিদ্ধান্ত আনা চলিতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে সমর্থিত না হইলে, সে সকল সিদ্ধান্তের কোন মূল্যই থাকে না। গ্রহগুলা সূর্য্যের চারিদিকে আপন আপন পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; কোন্ পথে বেড়ান উচিত, NEWTON তাহার একটা theory দিয়াছিলেন। HERSCHELএর দূরবীণে নূতন গ্রহ ধরা পড়িল—Uranus। কিছুদিন পরে দেখা গেল, উহার যে পথে চলা উচিত, সে পথে চলিতেছে না—একটু বাহির ঘেঁসিয়া চলিতেছে। ADAMS এবং LEVERIER উভয়ে NEWTONএর theory মান্য করিয়া গণিতে বসিলেন; গণিয়া দেখাইলেন, বাহিরে অমুক যায়গায় একটা অপরিচিত গ্রহ আছে, যাহার টানে Uranusএর এরূপ অপথে পদার্পণ। কিছুদিন পরে সেই স্থানে সেই গ্রহ GALLE সাহেবের দূরবীণে ধরা পড়িল—তিনি নাম পাইলেন, Neptune; প্রত্যক্ষ-প্রমাণ theoryকে সমর্থন করিল; তাই theory বাঁচিয়া গেল; নহিলে NEWTONএর Law of Gravitationএর সংশোধন আবশ্যক হইত; কোনও বৈজ্ঞানিক NEWTON-এর উপর কলম চালাইতে ভয় পাইতেন না।

অতএব, প্রত্যক্ষ-প্রমাণই প্রমাণ; কিন্তু এ প্রত্যক্ষ, কার প্রত্যক্ষ? পাগলের প্রত্যক্ষ, বা আফিম-খোরের প্রত্যক্ষ, ধরিলে অবশ্য চলিবে না; জনসাধারণের প্রত্যক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে।—কিন্তু কাহাকে লইয়া এই জনসাধারণ? এই জনসাধারণের মধ্য হইতে, নেশাখোর এবং পাগলের সহিত, কবিকে ও প্রেমিককে বাদ দিতে বিজ্ঞান দ্বিধা করিবেন না,—ইঁহারা সকলেই অপ্রকৃতিস্থের সামিল। তবে প্রকৃতিস্থ কাহাকে বলা যাইবে? কি লক্ষণ দেখিয়া দর্শককে (Observerকে) প্রকৃতিস্থ ঠিক করিব? যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিজে বাহ্যজগতের তত্ত্ব আলোচনা করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস করা যাইবে, কি না? তাঁহাকেও বিশ্বাস করা যায় না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের সকলেরই মাথায় একটা না একটা theory থাকে; তাঁহারা সেই theory সমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতড়াইয়া বেড়ান। কেহ কেহ বা কোন একটা analogy ধরিয়া, সেই analogyর প্রদর্শিত পথে চলিয়া,

তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত-সমর্থনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আপন আপন theory বা সিদ্ধান্তের উপর তাঁহাদের টান, খুব প্রবল টান। সেই টানে তাঁহাদের মেজাজ ঠিক্ থাকে না। Theoryর বা Analogyর অনুকূল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাইলে, তাঁহারা চোখে আঁধার দেখেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ বলা যাইবে, কি না?—বস্তুতই তাঁহাদের প্রত্যক্ষকে বিশ্বাস করা যায় না, বস্তুতই তাঁহারা অনেক সময় হয়কে নয় এবং নয়কে হয় দেখেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা আবার শীর্ষস্থানে, তাঁহারা এক একটা Genius.- এই Geniusএ এবং পাগলে যে বড় তফাত নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ইঁহারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে একটা না একটা formulaয় ফেলিবার জন্য এত ব্যাকুল যে, ইঁহাদের মাথা সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। ইঁহাদের মাথার খুলির ভিতর কল্পনাদেবী নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন, কোন ইন্দ্রিয়কে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। ফলে, যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণসংগ্রহ বিজ্ঞানালোচনার একমাত্র ভিত্তি, এবং বৈজ্ঞানিকদের কাজ, সেই প্রমাণ-সংগ্রহে বৈজ্ঞানিকদেরই পটুতার অভাব, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা বোঝেন; সেইজন্য কোন একটা experimentএ, কোন একটা observationএ, কোন নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলে, আপনার চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস না করিয়া, আশপাশ হইতে রাস্তার লোক ডাকিয়া আনেন—যাহাদের মাথার ভিতর কোন theory নাই, experimentএর ফলাফলে যাহাদের কোনরূপ অনুরাগ-বিরাগ নাই, কোনরূপ পক্ষপাতের সম্ভাবনা মাত্র নাই, সেইরূপ লোককে ডাকিয়া আনিয়া দেখান। Observer যত গাধা হয়, observationএর গৌরব যে ততই বাড়ে, ইহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে।

তাহাই না হয় হইল;—নেশাখোর ও পাগল হইতে সাধু, ভক্ত, কবি এবং বড় বড় পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলকেই পূর্ব্বোক্ত জনসাধারণের মধ্য হইতে বাদ দেওয়া গেল। তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া কেবল প্রকৃতিস্থ লোকদিগকেই লওয়া গেল। কিন্তু তাহাই কি সম্ভব? BAIN-সাহেব যে বলিয়াছেন—"In regard to Object-properties all minds are affected alike"—এই কথাটা কি সম্পূর্ণ ঠিক্? বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, কোন দুইজন Observer ঠিক্ একরকম দেখেন না। সকলেই ঠিক একরকম দেখিলে, Observation এর artটা খুব সহজ হইয়া যাইত; কিন্তু উহা তত সহজ নহে। এক টুকরা রূপা লইয়া যদি নিক্তিতে ওজন করা যায়, কোন দুই নিক্তি ঠিক এক ওজন দিবে না,—সে যতসূক্ষ্ম chemical balanceই হউক। এ ত গেল যন্ত্রের দোষ। একই লোক একই নিক্তি লইয়া যতবারই ওজন করুক, প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু তফাত হইবেই। দশমিক ভগ্নাংশের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থস্থানে গিয়া গরমিল হইবে। আর দুইজন লোক আসিয়া যদি একই নিক্তিতে একই সঙ্গে দেখে, তাহা হইলে ত কথাই নাই;—একজন একটু অধিক, একজন একটু অল্প দেখিবেই। খুব সাবধান, সতর্ক, পক্ষপাতবিহীন লোকে ওজন করিতে গেলেও এক ওজন কিছুতেই পাইবে না, কিছু না কিছু তফাত ঘটিবেই। এক একটা লোকের ধাতুই যেন বায়ুপ্রধান, তাহারা একটুকু বেশী দেখে। আবার এক একটা লোকের ধাতু যেন শ্লেষ্মাপ্রধান, তাহারা একটুকু অল্প দেখে। ফলে, কোন দুই ব্যক্তি ঠিক্ একরকম দেখে না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয়-দোষেই হউক, আর মেজাজের দোষেই হউক, একটু না একটু বিশিষ্টতা আছে। সেটা তাহার personal equation. এই personal equationএর হিসাব না লইলে, বৈজ্ঞানিক observation নিষ্ফল হয়। কাজেই, "All minds are affected alike", একথা কিছুতেই বলা চলে না। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা জানেন বলিয়াই, কেবল একজন লোকের Observationএ আদৌ বিশ্বাস করেন না; রাস্তা হইতে দশজন অপরিচিত লোক ডাকিয়া, এবং প্রত্যেককে দেখাইয়া, শেষপর্য্যন্ত একটা গড় (Average) ঠিক করিয়া লন। প্রকৃত ওজন যাহা ধরিয়া লওয়া হয়, কেহ তার চেয়ে একটু অধিক, কেহ বা একটু অল্প বলে। বহুলোকের average হিসাব করিতে গিয়া, অধিকে অল্পে কাটাকাটি হইয়া, যাহা প্রকৃত প্রায়ই তাহার কাছাকাছি দাঁড়ায়।

Physical Scienceএর কাজ হইতেছে বাহ্য-জগতের বিবরণ, বা description দেওয়া। কোন্ জিনিষটা কেমন, এক জিনিষের সহিত অন্য জিনিষের কি সম্বন্ধ, কোন

ঘটনা কিরূপে ঘটে, এক ঘটনার সহিত অন্য ঘটনার কি সম্বন্ধ, ইহার বর্ণনা করাই তাহার কাজ। বর্ণনার সময়ে বৈজ্ঞানিক নিজের একটা ভাষা ব্যবহার করেন, সেই ভাষা সকলে না বুঝিতে পারে; কিন্তু এই বর্ণনা দিবার সময় তাঁহাকে মুখ্যতঃ অপর পাঁচজনের প্রত্যক্ষে নির্ভর করিতে হয়। সেই অপর পাঁচজন যতই প্রকৃতিস্থ হউক্ না, সকলে ঠিক্ এক রকম সাক্ষ্য দেয় না। ইন্দ্রিয়ের দোষেই হউক্, আর মেজাজের দোষেই হউক্, প্রত্যেকেই বাহ্য-জগৎকে কিছু না কিছু ভিন্নভাবে দেখে। যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি কোন একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া, সকলেরই সাক্ষ্য মিলাইয়া মিশাইয়া, একটা average কষিয়া লইয়া মাঝারি রকমের বর্ণনা দেন। এইরূপে বর্ণিত যে জগৎ, তাহাই Physical Scienceএর বাহ্যজগৎ, বা Objective Material World। কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বাহ্য-জগতের সহিত বৈজ্ঞানিকের বর্ণিত এই বাহ্য-জগতের সম্পূর্ণ মিল হয় না। বৈজ্ঞানিকের এই জগৎ তাঁহার নিজের হাতে-গড়া বা মন-গড়া কাল্পনিক জগৎ। এ জগৎ কাহারো প্রত্যক্ষ নহে; অতএব, ইহা মন-গড়া এবং কাল্পনিক। কোন জীয়ন্ত মানুষকে যদি চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়—বৈজ্ঞানিক-কল্পিত এই জগৎ, তোমার প্রত্যক্ষ-জগৎ বটে, কি না? সে বলিতে বাধ্য হইবে যে, 'হাঁ কতকটা তার মত বটে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে।' বিজ্ঞান-বিদ্যা যে জগতের আলোচনা করে, যাহার মধ্যে নানাবিধ Laws বা নিয়মের আবিষ্কার করে, যাহার সম্বন্ধে নানাবিধ Theory খাড়া করিয়া, সেই নিয়মগুলার পরস্পর সম্পর্ক বুঝিতে চায়, সে জগৎ বস্তুতই সেই কাল্পনিক জগৎ। সেই জগতের দ্রষ্টা এবং সাক্ষী, কোন জীয়ন্ত মানুষ নহে; নিতান্তই যদি সাক্ষী বা দ্রষ্টা একজন উপস্থিত করিতে হয়, তাহা হইলে একজন কাল্পনিক দ্রষ্টা ও সাক্ষী খাড়া করিতে হইবে। সে একটা মাঝারি রকমের মানুষ হইবে। অতিবড় পণ্ডিত হইতে অতিবড় মূর্খ পর্য্যন্ত বাদ দিয়া, অতিবড় ভাবুক হইতে অতি-বড় অভাবুককে বর্জ্জন করিয়া, একটা মাঝারি রকমের মানুষের কল্পনা করিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সে যেন Average। বৈজ্ঞানিককে পদেপদে এইরূপ মাঝারি বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। সূর্য্যের দৈনিক গতির সহিত মিলাইয়া আমাদিগকে সময়-নিরূপণ করিতে হয়। সূর্য্যঘড়িতে, একটা কাঠির ছায়া দেখিয়া, এইরূপে সময় নিরূপণ করা চলিতে পারে। কিন্তু সূর্য্যদেব সারা বৎসর সমানবেগে চলেন না। তিনি পৃথিবী হইতে কখন একটু দূরে থাকেন, কখন নিকটে থাকেন; কাজেই কখন একটু দ্রুত চলেন, কখন একটু ধীরে চলেন। কাজেই, সূর্য্য-ঘড়ির প্রদত্ত সময়, ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নরূপ হয়। সবদিন একরকমের হয় না। আমাদের Clockঘড়ি কিংবা Time-pieceএর সময় সেই জন্য সূর্য্যঘড়ির সময়ের সঙ্গে ঠিক্ মেলে না। Clock-ঘড়িকে সাধ্যমত সারা বৎসর সমানভাবে চলিতে হয়। কখন দ্রুত, কখন ধীরে চলিলে ক্লক্-ঘড়ির চলিবে না। সেইজন্য সূর্য্যঘড়ির সময়ে কখন কয়েক মিনিট যোগ দিয়া, কখন কয়েক মিনিট বিয়োগ করিয়া, Clock-ঘড়ির সময় পাওয়া যায়। যেটায় মিনিট যোগ-বিয়োগ করিতে হয়, তাহাকে বলে—equation of time. আসল সূর্য্যের বারমাসের average করিয়া, জ্যোতিষীরা একটা মনগড়া নকল-সূর্য্যের কল্পনা করেন। জ্যোতিষের ভাষায় ইহার নাম—Mean Sun (মধ্যম সূর্য্য বা মাঝারি সূর্য্য)। এই কাল্পনিক মাঝারি-সূর্য্য সারা বৎসর জ্যোতিষীর কল্পনায় সমানবেগে চলিয়া থাকে। আমাদের Clock-ঘড়ি, সেই মাঝারি-সূর্য্যের অনুবর্ত্তন করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে। যেটা আসল-সূর্য্য, সে এই নকল-সূর্য্যের কখন একটু আগে, কখন একটু পিছনে থাকে। এইরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। বৈজ্ঞানিকেরা theory খাড়া করিয়াছেন যে, বাতাসের অণুগুলা ভীমবেগে ছুটাছুটি করিতেছে। প্রত্যেক অণুর এক একটা বেগ আছে। অণুগুলা বেগে ধাক্কা দেয় বলিয়া, বাতাসের চাপ জন্মে। প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি জমির উপর বাতাস সাড়ে সাত সের চাপ দেয়, এই যে একটা কথা শোনা যায়, সেই চাপ এই ধাক্কা হইতে উৎপন্ন। দুর্গের প্রাকারে অজস্র গোলা-বর্ষণ করিয়া, সেই বৃষ্টির চাপে পাষাণের প্রাচীরও ফেলিয়া দেওয়া যায়, কতকটা তদ্রূপ। বাতাস গরম হইলে সেই বেগ বাড়ে, ঠাণ্ডা হইলে বেগ কমে। এই বেগের পরিমাণ উষ্ণতা-সাপেক্ষ; কিন্তু একই বাতাসের একই উষ্ণতায় সকল-অণুর বেগ সমান থাকে না; কারো বা একটু বেশি, কারো বা একটু কম থাকে। সকলগুলার বেগের গড় করিয়া, একটা মাঝারি বেগের Mean Velocity কল্পনা করা হয়, এবং বলা হয় যে, অণুগুলার

এই Mean Velocity বাতাসের উষ্ণতার নিয়ামক ; কিন্তু কোন অণুটারই আসল বেগ ঠিক এই Mean Velocityর সমান হয় না। তবে অধিকাংশেরই বেগ তাহার কাছাকাছি, কারো বা অল্প একটু বেশি, কারো অল্প একটু কম। দুই দশটা অণু হয়ত এমনও আছে যে, তাহার আসল বেগ সেই মাঝারি-বেগের অনেক বেশি বা অনেক কম। তবে সেইরূপ অপ্রকৃতিস্থ অণুর সংখ্যা, প্রকৃতিস্থ অণু সাধারণের তুলনায় অল্প। Average কবিবার সময় তাহাদিগকে বর্জ্জন করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ব্যাপারটা কতকটা লক্ষ্য-বেঁধার মত। কাল'-দেওয়ালে ছোট্ট একটি শাদা দাগ দিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া সেই লক্ষ্য বা target বিঁধিতে হয়। যিনি লক্ষ্য বিঁধিবেন, তিনি অর্জ্জুনের মত ধনুর্দ্ধর হইলেও, ঠিক্ লক্ষ্যটির গায়ে বিঁধিতে পারেন না। তাঁহার নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া লক্ষ্য হইতে একটু না একটু—আধ ইঞ্চি, সিকি ইঞ্চি, কিংবা তার চেয়েও কম,—দূরে পড়িবেই। বেধকর্ত্তা যদি খুব পটু হন, তাহা হইলে অধিকাংশ বারেই খুব কাছেই পড়িবে ; পুনঃপুনঃ বহুবার বিঁধিতে গেলে, দুই একবার ছট্‌কিয়া অধিক দূরে, দু দশ ইঞ্চি দূরেও, পড়িতে পারে। লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যতটুকু দূরে পড়ে, সেইটুকুকে Error বলা যায়। পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, এই errorএরও আবার একটা Law আছে। Error কম হইবার সম্ভাবনা অধিক ; বেশি হইবার সম্ভাবনা অল্প। কতটুকু errorএর সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা, এই Law of Error ধরিয়া, গণিয়া বলা চলে। পুনঃপুনঃ লক্ষ্য বিঁধিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পরীক্ষাফল এই Law of Errorএর সঙ্গে মোটামুটি মেলে। বৈজ্ঞানিকেরাও কোন একটা Observationএ, ভিন্ন ভিন্ন Observerএর কাছে ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্য পাইয়া, মানিয়া লন যে, কোনটাই ঠিক্ নহে—সবটাতেই কিছু না কিছু ভুল আছে। তবে মনুষ্যমধ্যে যাহারা জনসাধারণ—যাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়—তাহাদের মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা অল্প ; আর যাহারা অপ্রকৃতিস্থ, poet, lover বা lunatic —তাহাদের ভুলের সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু কাহারই প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ ঠিক নহে। যেটাকে ঠিক বলিয়া অগত্যা গ্রহণ করা হয়, তাহা সেই কাল্পনিক মাঝারি-মানুষের, বা Mean Manএর। এই Mean Man পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের average ; পাগল, ভাবুক ও নেশাখোরের সংখ্যা এত অল্প, যে তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া average করিলে বিশেষ দোষ হয় না। কিন্তু বলা উচিত যে, এই Mean Manএর পৃথিবীতে অস্তিত্ব নাই ; Mean Sunএর মত তিনিও এক কল্পিত-বস্তু এবং এই কল্পিত-মানুষের প্রত্যক্ষ যে বাহ্য-জগৎ, Physical Scienceএর নিকট সেইটাই সত্য-জগৎ, এবং সমস্ত Physical Science সেই জগতের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী মাত্রই জানেন, বৈজ্ঞানিক সত্য-নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই ; নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। মজা এই, আমরা সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া সেই কল্পিত-জগতের কল্পিত-সত্যগুলাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লই এবং আমাদের আপন আপন প্রত্যক্ষ-জগৎকে ভুল বলিয়া স্বীকার করি।

বিজ্ঞান যে প্রত্যক্ষবাদী, এ কথা অহরহ শোনা যাইতেছে বটে ; কিন্তু কথাটার তাৎপর্য্য তলাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। দাঁড়াইতেছে এই—যেটা প্রত্যক্ষ, বিজ্ঞানের নিকট সেটা ঠিক নহে ; আর যেটা প্রত্যক্ষ নহে, একেবারে কাল্পনিক, সেইটাই বিজ্ঞানের নিকট ঠিক। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদের ইহাই তাৎপর্য্য। ব্যাপারটা দাঁড়াইল একটা paradox ; যিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রথাই মানেন না, তাঁহার নিকট যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা সত্য নহে ; যাহা কাল্পনিক তাহাই সত্য। এইটুকু মনে রাখিলে, miracle লইয়া ঝগড়া প্রায়ই থাকে না। যাঁহারা miracle প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ভাবেন, অথবা অন্যকেহ miracle প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিকদিগের সংশয় দেখিয়া মেজাজ ঠিক্ রাখিতে পারেন না। অথচ বৈজ্ঞানিকের এখানে কোন দোষ নাই। বৈজ্ঞানিক, প্রত্যক্ষবাদী হইলেও, কাহারও প্রত্যক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না—এমন কি নিজের প্রত্যক্ষকেও বিশ্বাস করেন না। তিনি, তাঁহার কাল্পনিক মাঝারি-মানুষের যাহা প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, তাহাকেই সত্য বলিয়া চালান— ইহাই তাঁহার ব্যবসায়। যিনি miracle দেখেন, তিনি কখনই সেই মাঝারি মানুষ নহেন। তিনি মাঝারি-মানুষের নিম্নে, ইহা বলিলে যদি রাগ করেন, তাহা হইলে মাঝারি-মানুষের উঁচু বলিয়াই তাঁহাকে ধরিয়া লইলাম। অন্যত্র

অন্যকার্য্যে সেই শ্রেণীর লোককে মাথায় তুলিয়া রাখিতে বৈজ্ঞানিকের আপত্তি হইবে না; কিন্তু বৈজ্ঞানিক-আলোচনায় তাঁহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। আবার বৈজ্ঞানিকও তাঁহাদিগকে যদি মিথ্যাবাদী বলিয়া বসেন বা অন্য কিছু বলিয়া একটা গালি দেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষেও একটু বাড়াবাড়ি হইবে। তাহাতে তিনি, নিজের সীমানা ছাড়াইয়া, অনধিকার-চর্চ্চার অপরাধী হইবেন। নিজের কল্পিত মাঝারি-মানুষের কল্পিত সত্যই যখন তাঁহার নিকট একমাত্র সত্য—প্রত্যক্ষদর্শীর প্রত্যক্ষ সত্যকে যখন তিনি আমলে আনিবেন না,—তখন তিনি নিজের অধিকার ছাড়িয়া, প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত ঝগড়া করিতে যান কেন?

বিজ্ঞানে যেগুলাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বা Laws of Nature বলে, সেগুলা বৈজ্ঞানিকের এই কাল্পনিক-জগতের মধ্যেই ঘটে, কেননা বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের জগতের মধ্যেই এগুলার আবিষ্কার করিয়াছেন। Law of Gravitation হইতে Laws of Conservation of Matter ও Conservation of Energy পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই এই কথা। সকল Lawএর উপরে যে Law,—যার নাম Law of Uniformity of Nature,—যেটাকে বাঙ্গালায় বলা যাইতে পারে নিয়তি বা ঋত,—যেটাকে গোড়ায় মানিয়া লইয়া বাহ্য-জগতের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হয়, তার পক্ষেও ঐ কথা। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষ-গোচর জগতের পক্ষে এই সকল Law ষোল-আনা খাটিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকদের মতে যাহারা অপ্রকৃতিস্থ, তাহাদের পক্ষে ত আদৌ খাটে না। সকলের পক্ষেই এই সকল Law এর সত্যভাব approximateমাত্র;—approximationএর মাত্রা লইয়াই কেবল তারতম্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা, এইরকম কতকগুলা Law আবিষ্কার করিয়া, কিছু বেশি-বেশি আস্ফালন আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা কতকটা সংযত হইয়াছেন। Conservation of Matter এবং Conservation of Energy সম্বন্ধে এখন তাঁরা সাবধানে কথা কন। উহাদের limitation বা সীমানা কতদূর, তাহা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি Law of Gravitation পর্য্যন্ত কোন্ ক্ষেত্রমধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা লইয়াও অনেকে ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহার Universal বিশেষণটা আজকাল বড়একটা ব্যবহার হয় না। তবে Uniformity of Natureটাকে তাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, এবং সম্ভবতঃ চিরকাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন। ওটাকে ছাড়িতে গেলে, বিজ্ঞানের ব্যবসাই হয়ত নষ্ট হইবে। নিয়ম আছে ধরিয়া লইয়াই বিজ্ঞান অতীতে আস্থা স্থাপন করিয়া, ভবিষ্যৎ গণিতে বসেন; ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ও ব্যবসায়। নিয়মে আস্থা হারাইলে, তাঁহার কাজ কিছুই থাকে না। কিন্তু Natureএর এই Uniformity কোথায়, কোন্ জগতে রহিয়াছে, আপনারা এতক্ষণ বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন। কোন জীয়ন্ত মানুষের প্রত্যক্ষ জগতে এই Uniformity নাই—অত্যন্ত প্রকৃতিস্থ মানুষও সময়ে সময়ে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে, তখন তাহার Nature তাহার কাছে uniform থাকে না। গত শতাব্দীতে Reign of Law লইয়া অনেক বক্তৃতার আস্ফালন শুনা গিয়াছে। কিন্তু নিয়মের এই প্রভুত্ব কখনই তোমার আমার প্রত্যক্ষ দৃশ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—সে প্রভুত্ব কেবল বৈজ্ঞানিকের মন-গড়া সেই কাল্পনিক-জগতে, যাহার অস্তিত্ব কেবল বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় বিদ্যমান।

এই কথাটা লইয়া আর একটু নাড়াচাড়া আবশ্যক। বেইন সাহেব যাহাকে Objective Material World বলিতে চাহেন, তাহা তাঁহার মতে সর্ব্বসাধারণের জগৎ। কিন্তু এই সর্ব্বসাধারণ হইতে অপ্রকৃতিস্থ লোকগুলাকে বর্জ্জন করিতে হইবে; বৈজ্ঞানিকেরা তাহা করিয়াও থাকেন। সংশোধন করিয়া বলিতে হইবে যে, উহা প্রকৃতিস্থ সর্ব্বসাধারণের জগৎ। এই যে পুনঃপুনঃ 'প্রকৃতিস্থ' ও 'অপ্রকৃতিস্থ' এই দুটা কথা ব্যবহার করা গেল, এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ কিরূপের? প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ লোক বা Normal Man সেই কাল্পনিক Mean Man, মাঝারি মানুষ, পৃথিবীতে যাহাকে কেহ কখনও দেখে নাই; জ্যোতিবিদ্যার Mean Sunএর মত তিনি বিজ্ঞান বিদ্যার কল্পিত পদার্থ;—সকল লোকই একটু না একটু অপ্রকৃতিস্থ। যেগুলা প্রকৃতপক্ষে বড়লোক, সেইগুলাই হয়ত অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ। বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, রাস্তার লোকই সবচেয়ে বেশি প্রকৃতিস্থ; ইহারাই মাঝারি রকমের মানুষ এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ইহাদের সাক্ষ্যই মাতব্বর;—ইহারাই সেই Mean Manএর কাছাকাছি। পৃথিবীতে

ইহাদের সংখ্যাই খুব বেশি। ইহারা খায়-দায়, হাসে-নাচে, গালাগালি-মারামারি করে, কোনরূপ ভাবুকতার স্পর্দ্ধা রাখে না, এমন কি high intelligence-এর বা অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তারও কোন স্পর্দ্ধা রাখে না—সকল বিষয়েই ইহারা মাঝারি গোছের। ইহাদেরই বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাণ্ডজ্ঞান বা Common Sense বলা যায়। পৃথিবীতে ইহারাই সবচেয়ে successful; ইহাদের সংখ্যাধিক্যই তাহার প্রমাণ। জীবনে সফল বা successful না হইলে, ইহাদেরই সংখ্যা এত অধিক হইত না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইহারাই সেই পোনের আনা; যাহারা খায়দায় ও যথাকালে মরিয়া যায়; কোন নাম বা চিহ্ন রাখিয়া যায় না; অথচ যাহাদিগকে লইয়া সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র বিব্রত হইয়া আছে। ইহারা ঘাসের ও আগাছার সামিল। অশ্বথ-বটের মত ছায়া দেয় না; আম-কাঁটালের মত ফল দেয় না; যূথি-চামেলির মত ফুল দেয় না; অথচ বিনা চাষে—বিনা তদবিরে—বিনা আয়োজনে পৃথিবীর পিঠ ছাইয়া আছে। ইহাদিগকে নির্ম্মূল উৎপাটন বা উচ্ছেদ করা কাহারও সাধ্য নহে। এই যে Success বা সফলতা, ইহা জীবধর্ম্ম লইয়া সফলতা, হালের ভাষায় জীবন-সংগ্রামে সফলতা। এই 'জীবন' শব্দ খুব উচ্চ অর্থে ব্যবহার করিবার দরকার নাই। Biology শাস্ত্রে যাহাকে জীবন বা Life বলে, এ সেই জীবন। চলা-ফেরা,—Secretion, Excretion, Digestion, Assimilation—আহার-সংগ্রহ এবং শত্রুকে প্রহার, এই শ্রেণীর ব্যাপারগুলাই এখানে জীব-ধর্ম্ম। উচ্চাঙ্গের Psychical Life হয়ত ইহার অন্তর্গত নহে। উচ্চাঙ্গের Moral বা Religious Life ইহার অন্তর্গত একেবারেই নহে। পশুধর্ম্ম বলিলে যদি গালি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এই জীবধর্ম্মকে পশুধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। Biology শাস্ত্র মানুষকে এবং কুকুরকে প্রায় এক চক্ষে দেখেন—কাহারও উপর বিশেষ পক্ষপাত করেন না। এই সকল পশুধর্ম্মের প্রভাবেই মানুষ জীবজগতে জীবনসংগ্রামে এতটা সফল হইয়াছে এবং সকলের উপরে স্থান পাইয়াছে। এই হিসাবে যাহারা most successful, তাহাদের সংখ্যাই চিরকাল অধিক আছে এবং অধিক থাকিবে। তাহারাই সেই মাঝারি-গোছের মানুষ। সবল দেহ ও সুস্থ ইন্দ্রিয় ব্যতীত ভাষায় যাহাকে কাণ্ডজ্ঞান বলে, সেই কাণ্ডজ্ঞানের বলে তাহারা এতটা successful. যাহারা সেই মাঝারি-মানুষ হইতে অধিক-ছোট বা অধিক-বড়, তাহারা জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হয় না। যাহারা বিকলাঙ্গ বা বিকৃতেন্দ্রিয়, যাহাদিগকে বিকৃতবুদ্ধি বা পাগল বলা যায়, তাহাদিগকেই এই অধিক-ছোটর দলে ফেলা গেল। আর যাহারা অতিবুদ্ধি, যাহাদের Intelligence খুব উচ্চ অঙ্গের, যাহাদের Psychical, Moral বা Religious Life সাধারণকে ছাড়াইয়া দূরে গিয়াছে, তাহাদিগকেই অধিক-বড়র শ্রেণীতে ফেলা গেল। অতিবুদ্ধি যে কার্য্যনাশিকা হয়, তাহা প্রবাদেই বলে। যে অতিবড় পণ্ডিত, সে অনেক সময়ে বিষয়-বুদ্ধিহীন এবং কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত। বড় বড় Geniusকে প্রায় Moral wreck হইতে দেখা যায়। সমাজের সহিত কারবারে তাঁহারা কর্ম্মের সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। কবি আর ভাবুক—তাঁরা ত Lunaticএরই সামিল। যাঁহারা vision দেখিতে অভ্যস্ত, সমাজে তাঁহাদের স্থান নাই। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা আহার-বর্জ্জন করিয়া, মাটির তলে বাস করিতে যান। যাঁহারা তপস্বী, তাঁহারা শীতকালে বরফজলে গলা ডুবাইয়া বাস করেন। যাঁহাদের religious enthusiasm বেশি, তাঁহারা গৃহত্যাগী। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া দরকার নাই। অথচ সর্ব্বসাধারণেই ইঁহাদিগকে বড় বলে, কখনও পূজা করে, কখনও বা ভয় করে। আবার কখনও বা হাসে, গালি দেয়, কোন দেশে বা পোড়াইয়া মারে। ইঁহারা জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হন না। Natural Selection মোটের উপর ইঁহাদিগকে eliminate করিতে চায়; ইঁহাদের সংখ্যা বাড়িতে দেয় না। লক্ষ্য-বেঁধার উপমা ধরিলে দেখা যায়, Natural Selection যে Mean Manএর উৎপাদনকে লক্ষ্য স্থির করিয়া, অবিরাম আপনার অস্ত্র ছুড়িতেছে, ইঁহারা কোনগতিকে সেই লক্ষ্যস্বরূপ Mean position হইতে ছট্‌কিয়া দূরে পড়িয়াছেন। ইঁহারা প্রকৃতিদেবীর প্রিয়পুত্র নহেন। ইঁহারা যে জগতে বাস করেন, যে জগতের সহিত কারবার করেন, যে জগতের ইঁহারা সাক্ষী, সে জগৎ মাঝারি-মানুষের Common Senseএর বা কাণ্ডজ্ঞানের অনুমোদিত জগৎ নহে। কাজেই বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য যে জগৎ,

তাহার সহিত ইঁহাদের মিল নাই। ইঁহাদের জগতে নিয়মের শৃঙ্খলা নাই; সে জগৎ নিয়তির অধীন নহে। ইঁহাদের জগতে যদি uniformity না থাকে, সেখানে যদি থাকিয়া থাকিয়া miracle গজায়, তাহাতে বৈজ্ঞানিকের আপত্তি করিলেও চলিবে না, দুঃখিত হইলেও চলিবে না।

ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্বন্ধে নাকি গল্প আছে, Revolutionary Governmentএর কর্ত্তৃপক্ষগণ সভায় বসিয়া স্থির করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন—God আছেন কি না। অধিকাংশের ভোটে স্থির হইল যে, God নাই। অতএব Government রাষ্ট্রমধ্যে আদেশ-জারি করিলেন, সকলেই বল God নাই; এবং God-সম্পৃক্ত যতকিছু আচার-অনুষ্ঠান আছে, সমস্ত উঠাইয়া দাও। এই গল্পে আমরা হাসি বটে, কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ব্যবহারটাও কতকটা এইরূপ। এখানেও vote লইয়া বাহ্যজগতের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ হয়; কিন্তু তাহাতে কেহ হাসে না; পরন্তু গম্ভীরভাবে তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এখানেও অধিকাংশ লোকের vote লইয়া যে একটা মাঝারি-রকমের জগতের অস্তিত্ব খাড়া করা গিয়াছে, সেই জগৎটাকেই সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে, অর্থাৎ ইতরসাধারণে, যাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি অতি সাধারণ রকমের, যাহারা কোন বিষয়েই অগ্রণী বা অসাধারণ নহে, তাহাদেরই vote লইয়া বিজ্ঞান স্থির করিয়াছেন যে, বাহ্য-জগৎটা এই রকম। আর যাহারা সেই পক্ষে vote দিতে পারে নাই, বিজ্ঞানবিদ্যা তাহাদিগকে অপ্রকৃতিস্থ বিশেষণের ছাপ দিয়াছেন। তাহাদের দোষ এই—তাহারা জীবন-সংগ্রামে সমর্থ নহে, পশুধর্ম্মে তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সংখ্যায় তাহারা অতি অল্প। তাহারা অপ্রকৃতিস্থ, এ কথাটার মানেই হইতেছে এই যে—তাহারা নিজে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রা চালাইতে পারে না, তাহাদের অনুবর্ত্তন করিলে অন্যকেও জীবন-যাত্রায় ঠকিতে হয়। অতএব, জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাহাদের মতামত অগ্রাহ্য, তাহাদের সাক্ষ্য বর্জ্জনীয়। বৈজ্ঞানিক—তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া—মোটাবুদ্ধি, মোটা চরিত্র ইতরসাধারণের সাক্ষ্যই গ্রহণ করেন; এবং তাহারা যে জগৎ-সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সেই জগৎকেই সত্য-জগৎ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সত্য, কিরূপ সত্য? এই সত্যে আস্থা না করিলে—জীবন-সংগ্রামে ঠকিতে হয়, জীবন-যাত্রা সুষ্ঠুরূপে চলে না। কিন্তু এই যে জীবন—সে Biologistএর জীবন মাত্র। Physiology শাস্ত্রে যে জীবনের কথা বলে, বড় জোর Psychologyর মোটা অংশ যে জীবনের আলোচনা করে, এ জীবন সেই জীবন মাত্র; খাইয়া দাইয়া, জীবন কাটানই এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্য ইহার নাই। ঘাসের মত ও আগাছার মত আপনাকে বাঁচাইয়া এবং ফশলের গাছকে সাধ্যমত নষ্ট করিয়া, আপনার বংশরক্ষা করা ভিন্ন মহত্তর উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। এ জীবনকে পশুজীবন বলিলে ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। এই জীবনটা সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে কিন্তু Physical Scienceকে অমান্য করিলে চলিবে না। এই জীবন, Uniformity of Nature স্বীকারে বাধ্য; এবং Physical Science, তার আলোচ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন সীমানার মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে, আর যে সকল ছোটবড় Laws আবিষ্কার করিয়াছে, অথবা আজ আবিষ্কার করিয়া পরদিন তাহা সংশোধন করিয়া লইতেছে, সেই সকল Laws মানিতে বাধ্য—মানিয়া লইলে তবে এই জীবন সফল হইবে, না মানিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে। যে মানে, সে মোটের উপর জিতিয়া যায়। Physical Science যে গত দুইশত বৎসরে অসাধ্যসাধন করিয়াছে, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য ইহাই। বাহ্য-জগতের উপর মানুষের প্রভুত্বসম্বন্ধে যে আস্ফালন অহরহঃ শোনা যায়, তাহার গূঢ়তাৎপর্য্য ইহাই—কিন্তু ইহার অধিক কিছু নহে।

বিজ্ঞানের স্বীকৃত এই সত্যটাকে, কিরূপ সত্য বলিব? ইতরসাধারণে—মোটা লোকে, মাঝারি লোকে—যেটাকে মোটামুটি সত্য বলে, অথচ যাহার সহিত কাহারো প্রত্যক্ষ সত্য মিলে না,—বড় লোকদের প্রত্যক্ষ-সত্য ত একেবারেই মেলে না,—সেই সত্যটাকে কিরূপ সত্য বলিব? প্রায় একুশ বৎসর আগে, আমি একবার সত্যের definition দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার "জিজ্ঞাসা" গ্রন্থের মধ্যে এই প্রসঙ্গের সেই প্রবন্ধটি স্থান পাইয়াছে। তাহাতে বলিয়াছিলাম, "প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিত

(Uniformity of Nature) একটা সত্য কথা। এই হিসাবে সত্য। প্রাণভয়ে বা প্রসাদের আশায় জল-উঁচু স্বীকার করিতে হয়। একরূপ প্রাণের দায়ে, ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জীবনরক্ষা যদি কর্ত্তব্য হয়, আত্মহত্যা যদি অকর্ত্তব্য হয়, ইহাও তবে সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। জগদ্‌যন্ত্রে ব্যবস্থা নাই, নিয়ম নাই—এইরূপ কল্পনাই আমাদের অসাধ্য—মনে করিতে গেলে মনের গ্রন্থি ও জীবনের গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায়। মানব-জীবনের সহিত সুতরাং সত্যের সম্বন্ধ। মানবকে বাঁচিতে হয়—সেই জন্যই এটা সত্য, ওটা অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।" এখনও আমি এই definition আঁকড়াইয়া আছি। এই যে জীবন, এই জীবন রাখিতে হইলে একটা বাহ্য-জগৎ স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার সহিত নিয়ত আদানপ্রদান করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক যে বাহ্য-জগৎ স্বীকার করেন, সেই বাহ্য-জগৎটা মানিলে, এই আদানপ্রদান কার্য্যে ঠকিতে হয় অল্প; না মানিলে ঠকিতে হয়; যাহাকে জীবন বলি, তাহা টিকে না। কাজেই আমরা জীবনের দায়ে বৈজ্ঞানিকের বাহ্য-জগৎকে মানিয়া চলি এবং বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত, এই মানার একমাত্র উদ্দেশ্য—জীবন-ধারণ, অর্থাৎ অপর পাঁচজনের সহিত, অপর পাঁচ বস্তুর সহিত, আদানপ্রদান কারবার; তাহার অধিক কিছু নহে। এই কারবারকে শাস্ত্রীয় ভাষায় **ব্যবহার** বলে। এই ব্যবহার চালাইবার জন্য ঐরূপ সত্য মানিতে হয়। কাজেই শাস্ত্রে ইহাকে বলে, 'ব্যাবহারিক সত্য।' কোন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রত্যক্ষ-জগৎ যদি এই ব্যাবহারিক-জগতের সহিত ঠিক না মিলে, তাহা হইলে উভয়ের লাঠালাঠির কোন প্রয়োজন দেখি না। না মিলিবারই ত কথা, কেননা প্রত্যক্ষ-জগৎ প্রত্যেকের পক্ষেই ভিন্ন রূপ; আর এই ব্যাবহারিক-জগৎ কাহারও প্রত্যক্ষই নহে; ইহা সহস্র লোকের প্রত্যক্ষের average কষিয়া লব্ধ একটা কাল্পনিক জগৎমাত্র। জীবনের দায়ে এই কাল্পনিক-জগৎটাকেই আমরা সত্য-জগৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; এই সত্যকে ব্যাবহারিক-সত্য বলিলে আর ঝগড়ার কারণ থাকে না। আর যদি কোন ব্যক্তি, আপনার প্রত্যক্ষ-জগতের সহিত এই কাল্পনিক-জগতের মিল না দেখিয়া, ইহাকে মিথ্যা বলিতে চান এবং আপনার প্রত্যক্ষ-জগৎকেই সত্য বলিতে চান, তাহাতেও কোন ক্ষোভের কারণ দেখি না। তবে, এই সত্যটারও একটা বিশেষণ দিলে, বোধ হয়, গণ্ডগোলের আশঙ্কা কমে। শাস্ত্রের ভাষায় এই সত্যের 'প্রাতিভাসিক' বিশেষণ দেওয়া চলিতে পারে। যে জগৎ প্রত্যেকের নিজস্ব, যাহা তাহার নিকট প্রত্যক্ষ-প্রমাণে উপলব্ধ হয়, ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আসিয়া বুদ্ধির সমীপে প্রতিভাত বা perceived হয়, তাহাই তাহার পক্ষে 'প্রাতিভাসিক'-জগৎ। এই জগতের অস্তিত্ব তাহার নিকট প্রাতিভাসিক-সত্য। এই সত্যেরও অপলাপ করার প্রয়োজন নাই। Physical Science ইহার অপলাপ করিতে পারেন না; ইহা তাঁহার আলোচ্য বিষয়ও নহে। প্রাতিভাসিক সত্য প্রত্যেকের নিজস্ব সত্য এবং প্রত্যেকের পক্ষে ভিন্ন রূপ;—একের প্রাতিভাসিক-জগৎ অন্যে মানিবেন না, মানার দরকারও নাই; কিন্তু ব্যাবহারিক-জগৎ, যাহা বিজ্ঞানের আলোচ্য, তাহা কাল্পনিক হইলেও সর্ব্বসাধারণের উহাতে সমান অধিকার; সর্ব্বসাধারণ মিলিয়া যুলিয়া, পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য উহাকে মানিয়া লইয়াছে। উহা মানিয়াই ব্যবহার, অর্থাৎ জীবন-যাত্রা। না মানিলে অন্যদিকে লাভ থাকিতে পারে, কিন্তু পরস্পর ব্যবহারে জীবনযাত্রায় ঠকিবার আশঙ্কা থাকে। যদি কেহ জীবন-যাত্রায় ঠকিবার ভয় না রাখে—যদি কেহ স্থির করিয়া থাকে, জীবন-যাত্রা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমার আছে, আমি সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলিব, জীবন-যাত্রায় ঠকিবার আশঙ্কা করিব না; এমন কেহ থাকিলে—তাঁহার সহিত বিবাদের কোন প্রয়োজন দেখি না; বিবাদ করিতে গেলেই বা সে শুনিবে কেন?

যখন সত্য সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন Pragmatic Philosophyর কথা বড় একটা উঠে নাই। WILLIAM JAMES এবং অন্যান্য পণ্ডিতের প্রসাদে এখন Pragmatism শব্দটি দার্শনিক সাহিত্য জুড়িয়া বসিবার উপক্রম করিয়াছে। এই Pragmatismএর মোটা তাৎপর্য্য এই—যাহা কাজে লাগে, যাহা না মানিলে চলে না, আদানে, প্রদানে, কারবারে, জীবনের কর্ম্মে, যাহা মানিয়া সফলতা লাভ করা যায়, তাহাই pragmatic truth. প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন নূতন তত্ত্ব আনে নাই, তবে দার্শনিক সাহিত্যে একটা নূতন point of

view দিয়াছে; সকল তত্ত্বের আলোচনায় একটা নূতন attitude দেখাইয়াছে। এই Pragmatismএর বাংলা কি হইবে, অনেক দিন ঠিক করিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি, এই Pragmatism আর "ব্যবহার", এই উভয় শব্দের তৎপরতা বা connotation প্রায় সমান। যে সত্য pragmatic হিসাবে সত্য, তাহাকেই এদেশের প্রাচীন দার্শনিক সাহিত্যে 'ব্যাবহারিক সত্য' বলা হইয়াছে। Physical Science বস্তুতঃ জগতের একটা pragmatic view লইয়া থাকে। চলিত কথায়, ইহাকে common sense view বলা যাইতে পারে। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব লইয়া যাহারা সংশয় উপস্থিত করে, চলিত ভাষায় তাহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত বলে। দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা বাহ্যজগৎ আছে কি না, এই তর্ক তুলেন, লোকে তাঁহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বলিয়া বিদ্রূপ করে। প্রকৃতপক্ষে এই সত্য ধরিয়াই আমরা জীবনের কাজ চালাই, কাজেই ইহা কাজ চালান সত্য—তাহার অধিক কিছু নহে। আর 'প্রাতিভাসিক' শব্দের তর্জ্জমায় 'Phenomenal' ব্যবহার করা চলিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহা তাহার পক্ষে phenomenal মাত্র; এই Phenomenal World প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব এবং প্রত্যেকের পক্ষে স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে রজ্জুসর্প হইতে মরীচিকা ও গন্ধর্ব্বনগর পর্য্যন্ত, সকলই স্থান পায়,—সমস্ত illusion, hallucination apparition স্থান পায়, স্বপ্নাবস্থার বা hypnotic conditionএর সমুদায় প্রত্যক্ষ ঘটনা স্থান পায়, sub-conscious বা hyper-conscious অবস্থার সমস্ত clairvoyant অবস্থার যাবতীয় প্রত্যক্ষও স্থান পায়; সমাধিস্থ যোগী হইতে religious enthusiastদের সমুদায় vision, এমন কি credulous লোকদিগের miracle পর্য্যন্ত ইহার ভিতর স্থান পাইতে পারে। এই সত্যকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ দেখি না। তবে, ইহার 'প্রাতিভাসিক'—এই বিশেষণটা দিলে উভয়পক্ষের গণ্ডগোলের কোন অবসর থাকে না। নেশাখোর বা পাগল যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাকেও এই হিসাবে প্রাতিভাসিক-সত্য বলিলে সত্যের মর্য্যাদা কমিবে না। বস্তুতই সে যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহা তাহার পক্ষে নিজস্ব সত্য। সে সেই সত্যবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দিহান নহে—অপরে যে তাহাকে মানে না, তাহাতে তাহারও দোষ নাই, অপরেরও দোষ নাই। সে নিজে যাহা দেখে, অপরের তাহা দেখিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। একে যাহা দেখে রাঙা, অন্যে তাহাকে নীলা দেখিলে, কোন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় মীমাংসা হইতে পারে না। তবে লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া অবজ্ঞা করে, বা নেশাখোর বলিয়া গালি দেয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে—জীবন-যুদ্ধে তাহার পটুতা নাই, জীবন-যাত্রা চালাইতে সে পদে পদে ঠকিয়া যায়, এবং ইতরসাধারণের তুলনায় তাহারা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু এই অপরাধ তাহাদের একা নহে, এ অপরাধ অতিবড় Genius-এর পক্ষেও বর্ত্তে;—তাহারাও এক রকমের পাগল—আজ-কালকার পণ্ডিতেরা তাহা বলিতেছেন। Geniusএরাও জীবনযুদ্ধে অপটু এবং সংখ্যায় অল্প। পৃথিবীতে যদি এই পাগলের সংখ্যাই অধিক হইত, তবে তাহাদেরই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাক্ষ্যের average করিয়া, বৈজ্ঞানিককে তাঁহার আলোচ্য জগৎ গড়িতে হইত; এবং তাহাই মানিয়া অগত্যা সর্ব্বসাধারণকে চলিতে হইত। যে না মানিত, সেই সেখানে পাগল বলিয়া গণ্য হইত। আমরা প্রকৃতিস্থ বলিয়া এখন বড়াই করি; কিন্তু ন্যাংটার দেশে কাপুড়ের মত আমাদের দশা দেখিয়া, তখন সকলে হাসিত। তাহাদের বিজ্ঞানবিদ্যা যে জগৎকে সত্যজগৎ বলিত, সেই জগতে আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মগুলা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নিয়মগুলার সঙ্গে মিলিত না। তৎসত্ত্বেও সেই নিয়মগুলাই তখন ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইত, এবং তাহার সত্যতা বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিলে, তখনকার বৈজ্ঞানিকেরা লাঠি বাহির করিতেন। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে, তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা জীবন-সমরে পটু নহে; পৃথিবীর Course of Evolutionই তাহার জন্য দায়ী—কতকগুলা succession of accidents তাহার জন্য দায়ী। পৃথিবীর হাওয়ার মধ্যে যদি Carbonic Acidএর মাত্রা একটু অধিক হইত, আর Nitrogenএর মাত্রা একটু কম হইত, তাহা হইলে তাহারাই হয়ত তাৎকালিক Environmentএর সহিত লড়াই করিয়া, জীবনসমরে জয়ী হইত, তাহাদেরই সংখ্যা তখন অধিক হইত, আমরাই তখন minorityতে পড়িতাম ও জীবন-যুদ্ধে হঠিতাম—তাহারাই আমাদিগকে পাগল ও অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া টিট্‌কারি দিত। এ পৃথিবীতে তাহারা দৈবক্রমে জয়ী হয় নাই; অন্য কোন Planetএ কে জয়ী, তাহা কে জানে?

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমাদের মধ্যশ্রেণীর অবস্থা

[শ্রীনিঃ—]

মধ্যশ্রেণী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই—এমন কি শতকরা প্রায় ৯০ জনের—যে প্রকার দারুণ অসচ্ছল অবস্থা, এবং তজ্জনিত নানা প্রকার দুঃখ, তাহার প্রতিকার, দেশের লোকের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন সম্ভব নহে। কারণ এই সকল প্রতিকারের জন্য কার্য্য করা কাহারও একার সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষাদ্বারা প্রত্যেকেরই উন্নতি সাধন অসম্ভব। এই সকল বিষয়ে চিন্তা, এই সকল কষ্টের কারণ অন্বেষণ, প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন, তাহার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান,—এ সমস্তই, দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এবং যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

দেশের-দশের মধ্যে নেতা, ধনী, শিক্ষিত বলিয়া যাঁহারা বিখ্যাত, তাঁহারা মধ্যশ্রেণীর এই দারুণ দুঃখে এমন উদাসীন যে, তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মের—তাঁহাদের মনুষ্যত্বের,—এমন কি তাঁহাদের সহজ-বুদ্ধির শোচনীয় অভাব দেখিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইতে হয়।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র লোকের দুঃখ ও শিক্ষা উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন—"ইহার স্থূল কারণ এই যে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই, শিক্ষিতে অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার 'ফাউল-কারী' সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কিসে সুখ, তাহা ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেয় না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, আর এদেশে সার আশ্‌লী ইডেন্, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, ফটিকচাঁদের কেবল সেই ভাবনা। রামা চুলায় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।"

আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরেও ফটিকচাঁদের সে বিষয়ে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। দেশশুদ্ধ ভদ্রসন্তান অনশনে হা হা করিতেছে—মেলেরিয়া-বিসূচিকা রোগে এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলাভাবে দেশ উজাড় হইতেছে—শতকরা ৩০।৪০টি শিশু, কি জানি কি কারণে, জন্মিবার একবৎসর মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিতেছে—কন্যা-বিবাহের ভাবনায় লোক জর-জর হইতেছে—ফটিকচাঁদ কিন্তু ঠিক সেইরূপই আছেন।

জ্ঞানচর্চ্চা লোক-হিতের জন্য, ইহাই পুরুষানুক্রমে জানা আছে; কিন্তু এখন জ্ঞানচর্চ্চার নাম করিয়া, ফটিকচাঁদ পুস্তক লিখিতেছেন, মাসিক ছাপিতেছেন, তাহাতে কেবল প্রণয়জনিত আবেগ, তাহার জন্য কবিত্ব, শিক্ষিতা-রমণীর সহিত ঘোড়ার সহিস এবং জুতা-সেলাইকারক মুচীর প্রেম-বর্ণনা—ইহাই ফটিকচাঁদের মনুষ্যত্বের, জ্ঞানচর্চ্চার এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের সবিশেষ পরিচয়। কখনও বা আপনাকে প্রত্নতত্ত্বার্ণবের কাণ্ডারী বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য স্বপ্নবর্ম্মার তাম্রশাসন উদ্ধার করিতেছেন, কখনও বা 'দেশের মাটি, দেশের জল, দেশের খাঁটি, দেশের বল,' বলিয়া দেশের ও দশের দুঃখে কাতর হইয়া, গান, পদ্য, প্রবন্ধ, স্বায়ত্তশাসন, কংগ্রেস্, কন্‌ফারেন্স্, সভা, পরিষদ্ ইত্যাদি লইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। দেশের লোকের মধ্যে, কলহ-মীমাংসা করিয়া দিবার পরিবর্ত্তে, কলহ বাধাইয়া—সেই কলহ-লব্ধ 'মোটর্ কারে' মহা দ্রুতগতিতে গার্ডেন্-পার্টি, মিটিং, লেভিতে গতায়াত করিতেছেন। কখনও বা দীর্ঘ টিকি, কোশাকুশী লইয়া অথবা বেদী ও ভজনালয় করিয়া ঘোরতর ধর্ম্মচর্চ্চায় মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কাহারও মুখে—কার্য্যে—ও চিন্তায়—দেশের লোকের দুঃখ—যাহা অনুভব করাই ধর্ম্মশীলতার প্রধান পরিচয়, তাহা—কাহারও হৃদয়ে মোটেই স্থান পাইতেছে না।

লোকের দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই মানুষ; যাঁহার হৃদয়ে যত বেশী লোকের জন্য স্থান-সংকুলান হয়, হৃদয় যত প্রশস্ত হয়, তাঁহার

জীবন ততই সার্থক, ততই ধন্য হইতে পারে। উপন্যাস লিখিয়াও ভিক্টর হিউগো ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত জীন্, একটি মাত্র শিশু কন্যার প্রতি নিষ্কাম ভালবাসায় আপন জীবন-উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; এই একটি মাত্র আদর্শ-পুরুষের বর্ণনা শুনিয়া সমগ্র ফরাসিজাতি ভিক্টর হিউগোর মৃত্যুতে কি প্রকার অকৃত্রিম শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার সমাধি যাত্রার অনুগমন করিয়া—সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইর সমাধি-পার্শ্বে তাঁহার সমাধি স্থাপন করিয়া—মনুষ্যত্বের সম্রাট্তুল্য সম্মান করিয়াছিলেন।

ভিক্টর হিউগো এই একটিমাত্র নিষ্কাম-কর্ম্মের আদর্শ বর্ণন করিয়া য়ুরোপে ধন্য হইয়াছিলেন, "কিন্তু এরূপ ধর্ম্ম-পরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি—সকলেই ধর্ম্মের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণও বিশেষ সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন, কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, রাজা হইয়াও পণ্ডিত, শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। আবার, এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ হীন হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমময় চরিত্র কখনও মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই।" (১) কত জন্মজন্মান্তরে সুকৃতিফলে এমন প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও হিন্দু আজি কেমন করিয়া এমন স্বার্থসর্ব্বস্ব, ধর্ম্মবিমুখ হইতে পারে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা!

বাস্তবিক, মানুষের প্রতি ভালবাসাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বিশ্ববাসীর জন্য চিন্তা এবং কর্ম্মানুষ্ঠানই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কিসে, লোকের দুঃখের প্রতিকার হয় এবং কিসে তাহাদের মধ্যে সুখশান্তি বিরাজিত হইতে পারে,—তন্ময় হইয়া এই সকল চিন্তা করাই 'ঈশ্বর চিন্তা'; যেহেতু তিনিই বলিয়াছেন—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্।
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চা ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥" *

"আমি সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা-স্বরূপে অবস্থিত আছি, সেই আমাকে অবজ্ঞা (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা) করিয়া মনুষ্য প্রতিমা-পূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মা-স্বরূপ যে ঈশ্বর, সেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।"

এইরূপ লোকসমষ্টির চিন্তায়, এবং তাঁহার কার্য্যে, প্রাণ-মন অর্পণ করিতে পারিলে, তাহাতে অনেক সুখ। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে তাহার জন্য চিন্তা ও কর্ম্ম করিতে পারেন, নিজের শতদুঃখও তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না।

কর্ম্ম

কাহাকে বলে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন ;—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥" §

"জীবগণের জন্ম ও ক্রম-বৃদ্ধি পক্ষে অনুকূল ত্যাগশীল যে যজ্ঞ, তাহাকে কর্ম্ম বলে।" মানুষের জন্য মানুষের যাহা করণীয়, তাহা ভিন্ন আর কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পারে?

এখন পৃথিবীর সকল জীবের কথা ভাবিতে গেলে, আমাদের ক্ষমতায় সংকুলান হয় না। সুতরাং প্রথমতঃ

দেশের লোকের কথা

এবং তাহার প্রতিকারের বিষয় ভাবিতে হয়।

দেশে লোকের মধ্যে মধ্যশ্রেণীর লোকই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ;—তাহারাই সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ; অথচ, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সকল বিষয়েই নানা-প্রকার অভাব বিদ্যমান।

এই শ্রেণীর অভাবপূরণ হইলে, তবে তাঁহারা নানা-প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এবং তাহা হইতেই দরিদ্র-শ্রেণীর সকল প্রকার অভাব পূর্ণ হইবে। আমাদের দেশে ধনবানের সংখ্যা অতীব অল্প ; মধ্যশ্রেণীর পুরুষের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। সমগ্র বঙ্গদেশে—

(১) বঙ্কিম বাবুর 'ধর্ম্মতত্ত্ব।'

* ভাগবত ৩।২৯ অ। ১৭।১৮।

§ গীতা। ৮ অ। ৩

মোট হিন্দুর সংখ্যা	২ কোটি ৯ লক্ষ,
মোট মুসলমানের সংখ্যা	২ কোটি ৪২ লক্ষ ;

ইহার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা—

হিন্দু পুরুষ	৩২ লক্ষ,
„ স্ত্রীলোক	২॥ লক্ষ ;
মুসলমান পুরুষ	১০ লক্ষ,
„ স্ত্রীলোক	২৭ হাজার ;

অতএব, এই ৪২ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান পুরুষের মধ্যে ধনী ও নিম্নশ্রেণীর আনুমানিক ৬ লক্ষ ধরিলে, বাকী ৩৬ লক্ষ মধ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

এই ৩৬ লক্ষ মধ্য-শ্রেণীর লোকের মধ্যে অন্ততঃ দুই লক্ষ লোকে, ধর্ম্মপ্রচার, জ্ঞানপ্রচার, কৃষি-বাণিজ্য-ব্যবসায়-শিল্প-ইত্যাদি লোকহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দেশের দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর কোন অভাবই থাকে না। অতএব, মধ্য-শ্রেণীর উন্নতিই সর্ব্বাগ্রেই বাঞ্ছনীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে,'লোকের নিজের জীবিকা-বৃত্তি সচ্ছল না হইলে, সে ব্যক্তি নিয়মিতরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। আর সমাজস্থ কেহই যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তবে সে সমাজের—উন্নতি দূরের কথা- ক্রমেই যে অধঃপতন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?'

তাই বলিতেছিলাম, এই যে নানাপ্রকার কারণে মধ্য-শ্রেণী লোকদিগের অধিকাংশেরই—এমন কি, শতকরা প্রায় ৯৩ জনের—অতি অসচ্ছল অবস্থা হইয়াছে, তাহা কি আমাদের প্রগাঢ়রূপে, সমবেতভাবে চিন্তনীয় নহে ? এবং তাহার প্রতিকার নির্দ্ধারণ ও সাধন কি আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম নহে ? দেশের লোকের

শতকরা ৯৩ জনে

যে অভাব-অনটন দুঃখে নিপীড়িত, একথা আমাদের সুশিক্ষিত নেতৃমহলেও বিশ্বাস করেন না—শুনিতে পাওয়া যায়—একথা তাঁহাদের অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। তাহার অর্থ আর কিছুই নহে—তাঁহারা কেহই এবিষয়ে কোন চিন্তাই করেন না, করিবার অবসরও বোধ হয়, তাঁহাদের নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখুন—মাত্র বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ অন্যূন ১২ লক্ষ ছাত্র, এবং সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় ১৭ লক্ষ ছাত্র, নানাপ্রকার বিদ্যালয়ে প্রতিবর্ষে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। প্রতি বৎসরে ইহার এক-নবমাংশ বা এক-অষ্টমাংশ, অর্থাৎ প্রায় দেড়লক্ষ ছাত্র * অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া, সংসারী হইয়া থাকে।

যে উন্নতির জন্য—যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য—অধিকাংশেই বিদ্যাধ্যয়ন করে, এই দেড়লক্ষের মধ্যে প্রতিবৎসরে কয়জন উপযুক্ত উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়া থাকে ? সরকারী রিপোর্টে জানা যায়, প্রতি বৎসরে এণ্ট্রান্স, I. A., I.Sc., B.A. B.Sc., M.A., M.Sc., B.L, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারী, মোক্তারী প্রভৃতি সকল প্রকারে সর্ব্বশুদ্ধ গড়ে ১০ বা ১১ হাজার ছাত্র পাশ হইয়া থাকে। ইহাদিগের সকলকেই যদি উপার্জ্জনে সক্ষম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, (ফলে যদিচ তাহা হয় না) তাহা হইলেও প্রতিবৎসরে সংসার-প্রবেশী দেড় লক্ষের বাকী এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বালকের উপার্জ্জন করিবার কি উপায় থাকে ?—ওকালতী, ডাক্তারী, মোক্তারী এবং সরকারী-অফিসে বড় কেরাণীগিরি, ইহাদের ভাগ্যে তো ঘটেই না ; কেবল জমীদারের গোমস্তা ও মুহুরী গিরি, সওদাগরী আপিসে নিকৃষ্ট কেরাণীগিরি, দোকানের সরকারি, এবং সামান্য ব্যবসায় ও মিস্ত্রীগিরি, ইহাদের উপজীবিকার উপায় হইয়া থাকে!

সকলেই জানেন, এখন বঙ্গদেশে 'একলপ্তে' বৃহৎ খণ্ডের আবাদী জমী প্রায়ই পাওয়া যায় না। সুতরাং, ক্ষুদ্র খণ্ডে লোক রাখিয়া চাষ করিলে লাভজনক হয় না ভাবিয়া, তাহাতেও বড় একটা কেহ অগ্রসর হয়েন না। যাঁহাদের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বহু-বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড আছে, তাঁহারা তাহা হইতেই কায়ক্লেশে চালাইয়া থাকেন। সুতরাং, প্রতিবৎসর সংসার-প্রবেশী দেড় লক্ষের মধ্যে এক-লক্ষ ৪০ হাজারের সচ্ছন্দরূপ উপার্জ্জনের বিশেষ কোন উপায়ই থাকেনা বলিলেই হয়। দেড় লক্ষের মধ্যে দশ বা এগার হাজার—অনুপাতে শতকরা ৭ জন মাত্র!—তাহাদের

---

* প্রতি বৎসরের নব-সংসার-প্রবেশ হিসাবে যে ১॥০ লক্ষ অনুমান করা হইয়াছে, তাহা একেবারেই কল্পিত নহে। কারণ, এই প্রতিবৎসরের সংসার-প্রবেশী যদি আরও একপুরুষকাল, অর্থাৎ গড়ে ২৪ বৎসর জীবিত থাকে, তবে ২৪ × ১॥০ লক্ষ = ৩৬ লক্ষ মধ্যশ্রেণী হয়। মধ্যশ্রেণীর এই সংখ্যাই ধরা হইয়াছে।

মধ্যেও সকলেই যে পাশ-করিয়াই সচ্ছলরূপে চালাইতে পারেন,—তাহাও নহে।—সুতরাং, শতকরা এই ৯৩ জনের অবস্থা কিরূপে সচ্ছল হইতে পারে! -মূর্খের মধ্যে হয়ত দশ-বার' জনের অবস্থা, পাটের ব্যবসা বা পুলিশের চাকুরী করিয়া একটু সচ্ছল, কিন্তু তেমন আবার পাশ-করা অনেকের অবস্থাই মন্দ; সুতরাং, শতকরা ৯৩ জনের সংখ্যা কিছুতেই কম হইবার নহে।—এই দুরবস্থার

কারণ কি?

পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কতক পরিমাণে চাযের বা বাগানের যোগ্য জমী ছিল; তাহারই উৎপন্ন ফসলে, সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন একরূপ নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে উকীলের আধিক্যে, সকলেরই জমী, তস্য-তস্য-অংশে বিভক্ত হইয়া, প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। য়ুরোপীয় শিল্প-পণ্যের প্রাদুর্ভাবে, এদেশের তাঁতি, কুমর, কামার,—সকলেই কৃষিকার্য্য অবলম্বন করায়, এখন ভদ্রলোকের পক্ষে বিস্তৃত জমী পাওয়া কঠিন হইয়াছে। তাহার উপর, অনেকের পূর্ব্বপুরুষ বিদ্যালাভ করিয়া, কার্য্য-উপলক্ষে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায়, পৈতৃক-জমী জঙ্গলাবৃত এবং দেশ মেলেরিয়ার আকর হইয়া আছে। এখন সেখানে ফিরিয়া আসিয়া বাস, বা চাষ করা, অনেকের পক্ষে অতি দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

বাসস্থান-সমস্যা

আরও অধিক গুরুতর হইয়াছে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে সকলেরই ভদ্রাসনের সঙ্গে, অল্পাধিক জমী উদ্যানরূপে সংলগ্ন ছিল—পল্লী-গৃহস্থদের পুরস্ত্রীগণ 'শৌচাদি অন্তে গাত্র-পরিধেয়াদি ধৌতকরণাদি' কার্য্যাবলীকে সাধারণতঃ 'বাগানে যাওয়া' বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।—এখন সে সকল বাগান-বাগিচা, দায়ভাগের কল্যাণে আদালত ও উকীলের উদরসাৎ হইয়াছে, অথবা অধিকাংশস্থলেই সেই উদ্যান, কালক্রমে পুরুষানুক্রমিক সকলেরই স্বহস্ত-প্রোথিত বৃক্ষপরম্পরায় এখন নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সেথায় পিতামহ মহাশয়ের স্বহস্তে প্রোথিত আম্র বৃক্ষের শ্রেণী বিদ্যমান, অতিবৃদ্ধ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহ-মহাশয়ের কতক-গুলি তেঁতুল বৃক্ষ, পিতার পিসীমাতার চাল্‌তা, কামরাঙ্গা ও নোড় বৃক্ষ, নিজের পিসীমাতার নিম ও মাদার, দিদি ঠাকুরাণীর কদম্ব ও জামরুল—এইরূপে কাকামহাশয়ের, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের, অগ্রজের ইত্যাদি সকলেরই স্বহস্তে সযত্নে পালিত বৃক্ষরাজি, আজিকার দিনে, দিনের আলোকেও অন্ধকারমধ্যে ম্রিয়মাণ অবস্থায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। দিবসেই শৃগালের দল চীৎকারধ্বনি করিয়া, প্রতি প্রহরেই গৃহস্থের প্রাচীনতার প্রত্ন-তত্ত্ব প্রচার করিতেছে! দিবসেই ঝিল্লীরব-মুখরিত বৃক্ষকোটর হইতে পেচক বিভাবরীভ্রমে বিচরণ বাসনায় বার বার উকি মারিতেছে! আর সেই উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণী—যেথায় পিতামহী ঠাকুরাণী, শিশু পিতার হাত ধরিয়া, তাহার স্বচ্ছজলে গাগরী পূর্ণ করিতে যাইতেন,—আজি তাহার জল বহুকালবর্দ্ধিত শৈবালদামে পরিপূর্ণ, স্থবির বৃক্ষরাজির পলিতপত্রে হরিদ্বর্ণ এবং শরিকি বিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফলে—হয় ত বহু আদালতের Injunction কৃপায়—গত্যন্তরবিহীন মলমূত্রের সংক্রমণে বিষাক্ত। হায়! আজি তাহাই, সেই ভদ্রাসনের অধিবাসিগণের, এবং হয়ত নিরুপায় গ্রামবাসিগণেরও একমাত্র পানীয় জলাশয়! এই বিষাক্ত পানীয় পানফলে মেলেরিয়া, প্লীহা ও কলেরায় মৃত মিউনিসিপাল ভোটরগণের প্রেতাত্মাবর্গ আজিও বুঝি কমিশনারগণের মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে!

সহরেও গৃহস্থলোকের যে আবাসস্থান, তাহা প্রায়ই পক্ষি-পিঞ্জরের সহিত তুলনীয়। এই সকল পিঞ্জরের অধিবাসী পুরুষেরা দিবসে কার্য্যোপলক্ষে বাটীর বাহিরে বিচরণ করায় কোনমতে নীরোগ-শরীরে দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল পিঞ্জরে চিরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীগণ তাঁহাদের শাবকগণকে লইয়া কিরূপ শরীরে দিনযাপন করেন? আদরের কন্যাটির বিবাহ দিবার সময় তাহার পিতামাতা আপনাদের সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া, বিশাল-ভবিষ্যৎ-শালী সুপাত্রের হস্তে কন্যাদান করিবার কালে মনে মনে কত আনন্দময়ী কল্পনাতে উল্লসিত হইয়াছিলেন যে, কন্যাটি না-জানি, কত সুখেই থাকিবে! কিন্তু হায়! পিতামাতার ন্যায়, পিঞ্জরে বাস তার আর ঘুচিল না? এই পিঞ্জরে আজীবন বাস করিয়া, অসুস্থদেহে বার বার সন্তান প্রসব করিয়া, হয় সূতিকা, নয় গ্রহণী, নয় অপস্মার, নয় অম্লশূল, নয় যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া ভুগিয়া, পতিব্রতা সাধ্বী, জীবনে দিনেকের তরেও স্বামীর দোষের কথা উচ্চারণ মাত্র না করিয়া, নীরবে—দধীচির ন্যায়—স্বীয় অস্থিরাশি স্বামী-পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিয়া থাকেন!

এ প্রকার রুগ্না, চিরতরে পিঞ্জরাবদ্ধা প্রসূতির গর্ভে কিরূপ সন্তান হওয়া সম্ভব? তাহাদের কিরূপ হওয়া স্বাভাবিক?—একটা নিকৃষ্ট উদাহরণ দিতেছি—

স্বাস্থ্য

প্রসূতিগণ মার্জ্জনা করিবেন। সকলেই অবগত আছেন, যে গাভী কেবলই গো-শালায় আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, আদৌ মুক্ত-বায়ুতে বিচরণ করিতে পায় না, সে প্রায়ই মৃতবৎসা হইয়া থাকে, তাহার বৎস প্রায়ই রক্ষা পায় না। মাতার অজীর্ণজনিত স্তন্য দুগ্ধ যে, সন্তানের রোগের কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তথাপি, গাভীর পরিপাক-শক্তি এত অধিক যে, বিচালির ন্যায় সুকোমল দ্রব্য সে অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে। আবদ্ধ-অবস্থায় যদি গাভীরও অজীর্ণ-দোষ জন্মে, তবে সুকুমারদেহ স্ত্রীজাতির পক্ষে কত অধিক অজীর্ণ দোষ এবং তাহার আনুষঙ্গিক রোগসমূহ উদ্ভূত হওয়া সম্ভব! তাই বলিয়া, আমরা স্ত্রী-জাতির বহির্বিচরণ বা বায়ু-সেবনের প্রস্তাব করিতেছি না; তবে, স্ব স্ব বাটীতে মুক্ত-বায়ু পাইবার জন্য অল্প পরিসরযুক্ত আঙ্গিনা বা ক্ষুদ্র-উদ্যান থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, সেই কথাই বলিতেছি।

এপ্রকার প্রসূতির যে প্রকার সন্তান হওয়া সম্ভব, তাহাই হইয়া থাকে। অনেকে শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, এই সকল শিশু, ভূমিষ্ঠ হইবার এক বৎসর মধ্যেই, শতকরা প্রায় ৪০।৫০ টি কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে! কলিকাতার শিশু-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন, মাত্র—

নং ৫ ওয়ার্ডে

সাল	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১
জন্মের সংখ্যা	৭২৫	৭২৫	৮১০	৬৬৩	৭৫৬
মৃত্যুর সংখ্যা	৪৩২	৪৫০	৪৬২	৪৪৮	৪৩৬

যে কলিকাতা মেলেরিয়াশূন্য, যেখানে পৈতৃক পঙ্কিল পুষ্করিণীর জল পান করিতে হয় না, যেখানে বিশুদ্ধ কলের জল, ভূরিসংখ্যক ডাক্তার, সুশিক্ষিতা ধাত্রী, বহু হসপিট্যাল্ বর্ত্তমান, সেখানে যদি এইরূপে শিশু-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে—তবে, নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পল্লীগ্রামে কি না হইতে পারে? সেখানে প্রতি গৃহে পালিত মেলেরিয়া ও কলেরার বীজ, লক্ষ লক্ষ লোকের জ্বর-প্লীহা-অগ্রমাস আপামর সাধারণের জ্বর-জীর্ণ কঙ্কালদেহ ইত্যাদির কথা কে না অবগত আছেন? আমরা এমন অপদার্থ হইয়া গিয়াছি যে, গৃহের পার্শ্বে নিত্যই এই লোমহর্ষণ বিপদ ঘটিতে দেখিয়াও একদিনও এসকল কথা ভাবি না—তাহার প্রতিকার জন্য কোন চেষ্টা বা পরামর্শ করি না—অথচ সাময়িকপত্র ছাপিয়া, উপন্যাস, কবিতা ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায়, এবং স্বপ্নময়ী স্বায়ত্তশাসন প্রথা ও রাজনৈতিক-অধিকারের বৃথা আন্দোলন করিয়া দেশোদ্ধারের পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া থাকি!

বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু যেমন স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবনের জন্য আবশ্যক, বিশুদ্ধ সারবান্—

খাদ্যদ্রব্য

তেমনই শরীর-ধারণপক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সারবান্ দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত ও মৎস্য, মধ্যশ্রেণীর পক্ষে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা 'মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' বাক্যের পোষক-স্বরূপ। মিউনিসিপ্যালিটির আইন-প্রসাদে দুগ্ধপাত্রে লিখিত "জলমিশ্রিত দুগ্ধ" দুগ্ধ-স্থানীয়, তাহাতে এক সের দুগ্ধে যে কত অপরিমেয় অম্বুরাশি বিদ্যমান, তাহা কেবল অনুমেয়,—ধূম হইতে যেমন বহ্নির অনুমান, সেইরূপ শ্বেতবর্ণ দেখিয়া এই অনুমানিক দুগ্ধ টাকায় চারি-সের দরে বিক্রীত হইয়া থাকে! আর ঘৃতের তো কথাই নাই! ভেক, শৃগাল, সর্প ইত্যাদি যাহা কিছুর চর্ব্বি ঘৃতের মতন দেখিতে, তাহাই এবং সোর্‌গুজা, কুসুমবীজ, প্রভৃতির তৈল ও হোয়াইট্ অয়েল্-ইত্যাদি মিশ্রিত স্নেহপদার্থ ঘৃত বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। আর মৎস্য? একান্নবর্ত্তী গৃহস্থের অতলস্পর্শী ঝোলভাণ্ড-সমুদ্র, দেবতা ও দানবে মৈনাক পর্ব্বত দিয়া শতবার মন্থন করিয়াও এই মৎস্যামৃত খুঁজিয়া পাইবেন কি না সন্দেহ। এই ঘৃত-মৎস্য-দুগ্ধ বাদে যাহা নিকৃষ্ট খাদ্য, নিত্য সেই "ধাড়া বড়ি খোড়" খাইয়া মধ্য-শ্রেণীর যুবকগণ ফুটবল্-ক্রিকেট্ ইত্যাদি কিরূপেই খেলিতে পারে—আর দুরূহ জীবন-সংগ্রামে অর্থোপার্জ্জনই বা করিবে কিরূপে? এই আহারে এখনও যে ঐসকল কার্য্যে পারক হইতেছে, ইহাই মহাশ্চর্য্যের বিষয়! এই যে গো-বংশ ধ্বংস হইয়া ঘৃত-দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তাহার জন্য কাহা'র মাথা-ব্যথা? সরকারী

রিপোর্টেই প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের যেথায় যেথায় শ্রেষ্ঠ-শ্রেণীর গাভী আছে, তাহা হয় বোম্বাই, নয় কলিকাতায় প্রতি বৎসরে আমদানী হইয়া থাকে; সেথায়, গোয়ালাগণ এক বিয়ানমাত্র-কাল ইহার দুগ্ধ লইয়া, পরে কসাইকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। এইরূপে শ্রেষ্ঠজাতীয় গাভী ক্রমেই নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে।—এইরূপে শিশুরাই বা বাঁচিবে কিরূপে? যুবকেরা জীবন-সংগ্রামই বা করিবে কি খাইয়া? গো-রক্ষা করিবার হিন্দুত্ব আজি কোথায়?—ভাল, ইহার কি প্রতিকার নাই? আমরা বোধ হয়, এককালে হিন্দু ছিলাম। এখন সাধারণ মানুষ নামেরও অযোগ্য! বাঙ্গালী এখন প্রায়ই দ্বিপদপশু মাত্রে পর্য্যবসিত! তারপরে

কন্যাবিবাহ সমস্যা

এত কষ্টে লালনপালন করিয়া যে কন্যাটি রক্ষা পাইল, তাহার বিবাহের সময় পাত্র পাওয়া সুকঠিন! যতগুলি সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, একটু সবিশেষ সন্ধান লইলেই, "ঠগ্ বাছিতে গ্রাম উজাড়" হইয়া যায়। অধিকাংশের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ-আশা বড় সুবিধার নহে। কলিকাতায় আমরা যে ওয়ার্ডে বাস করি, তাহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩০ হাজারের কম নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে যথার্থ সচ্ছল অবস্থার লোক ৪০ জনের অধিক নহে। অবশিষ্ট সকলেরই দৈনিক যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের উপর নির্ভর; তদ্ব্যতীত প্রায় সকলেরই অল্পাধিক ঋণও আছে!

কন্যা-বিবাহের সময়, যে কয়জনের আর্থিক বা বৈষয়িক অবস্থা উত্তম, সাধারণ গৃহস্থের সমতুল্য, তাহাদের গৃহে পাত্র থাকিলেও, গৃহস্থের পক্ষে তাহাকে পাওয়া সুকঠিন; কারণ, তাহারা তাহাদের সমকক্ষ বা উচ্চতর 'দাঁও' সম্পন্ন ঘর না হইলে বিবাহ দিবেন না স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অবশিষ্ট কোন দিন-গুজরাণ-কারীর পুত্রটি যদি কায়ক্লেশে বি. এ. অবধি পড়িতে অগ্রসর হইয়া থাকে, তাহার নিকট যদি বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তবে তাহার, পিতা-পিতামহ প্রভৃতির এবং নিজেরও, উপার্জ্জনের অক্ষমতার জন্য যে বকেয়া-বাকী পড়িয়া মহাজনের দেনা পুষ্ট করিয়াছে, তাহা এই কন্যার পিতার নিকট সুদে-আসলে আদায় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া থাকে। অনন্যগতি কন্যার পিতা, অনেক দেখিয়াও তেমন বিশালতর ভবিষ্যশালী সুপাত্র আর কোথাও না পাইয়া, শেষে ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া, আদরের কন্যাটিকে পাত্রস্থ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এইরূপ অধিক টাকা পণ দিতে গিয়া, পিতামাতার যথাসর্ব্বস্ব ঘুচিয়া যাইবে, এই দুর্ভাবনা সহ্য করিতে না পারিয়া, সেদিন মাত্র প্রাতঃ-স্মরণীয়া কুমারী স্নেহলতা দেবী আগুনে পুড়িয়া স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন! ইহা অপেক্ষা আমাদের আর কি অধিক অধোগতি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিতেও পারা যায় না!

এই স্নেহলতা দেবীর মৃত্যুর পরে, আমাদের 'গাঁয়ে মানে-না আপনি মোড়ল' মহলে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল; তাঁহারা যুবকদিগকে ধরিয়া শপথ করাইয়া লইয়াছেন, যাহাতে তাহারা আপন-আপন বিবাহে পণ-গ্রহণ না করে।

ইহাই কি পণ-গ্রহণ প্রথার কার্য্যকর প্রতিকার? প্রথমতঃ—বিবাহ ব্যাপারে এই যুবকেরা নিজে মালিক নহে। দ্বিতীয়তঃ—সমাজে যাঁহাদের অবস্থা কতকটা উত্তম, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া, এই সকল যুবককে পাঁচ-সাত হাজার টাকা দিতে চাহিলে, এই সকল যুবকের পিতাঠাকুরেরা কি তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন? তাহা যদি প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব না হয়, তবে, অমুক পাঁচ হাজার দিতে চাহিতেছে বলিয়া অক্ষমের নিকট পাঁচ হাজার আদায় করায় কি বেশী তফাৎ? শপথ করা সারবত্তা কি?

সুতরাং, স্বাভাবিক বাণিজ্যের সরবরাহ (supply) টান (demand) নীতির ন্যায় এই সমস্যার সমাধান না হইলে, এই পণ-প্রথা নিবারিত হইতে পারে না।

তাহা কি?

—বলি। আসল কথা এই যে, ভাল-অবস্থার, অথবা ভবিষ্যতে ভাল-অবস্থা হইবার মত, পাত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সমগ্র বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ১২ লক্ষ বালক বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে; ইহাদিগকেই আমরা মধ্য-শ্রেণীর বালক বলিতে পারি। এই ১২ লক্ষ বালকের মধ্যে আনুমানিক ১॥০ দেড় লক্ষ বালক প্রতিবৎসর বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ লাভ করে। প্রায় ছাত্র-জীবনেই—অর্থাৎ, সংসার-প্রবেশের কিছু অগ্র-পশ্চাৎ সময়েই—তাহাদের বিবাহও হইয়া থাকে।

এই যে দেড় লক্ষ যুবক প্রতিবৎসর সংসারে প্রবেশ

করে, ইহাদের মধ্যে রীতিমত উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়া থাকে, প্রায় দশ হাজার বালক।

তার পর, দেড় লক্ষ যুবকে যদি প্রতিবৎসরে সংসারে প্রবেশ করিয়া বিবাহার্থী হয়, তবে সেই বৎসর দেড়-লক্ষ কন্যাও বিবাহযোগ্যা হইয়া থাকে। এখন সকল কন্যার পিতাই কন্যাটিকে সুপাত্রে অর্পণ করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রতি বৎসরে দেড়-লক্ষ কন্যার পিতা, উক্ত দশ হাজার (alleged, বা তথাকথিত) উপযুক্ত পাত্র পাইতে উৎসুক হয়েন। তাহার মধ্যে সচ্ছল অবস্থার জনকয়েক পিতা—যথা, জেলার উকীল-সরকার, ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, সব-জজ ডেপুটি প্রমুখ—উচ্চ ডাক দিয়া সুপাত্রগুলি খরিদ করিয়া লয়েন; তাহার পর বিবাহের হাটে আনীত বাকী উঞ্ছ (rejection) গুলির মধ্যে কতকগুলি, তাহাকে কবে কোন বিজ্ঞ ডিপুটি চারি হাজার টাকা দর দিয়াছিল, সেই নজীর উল্লেখে, এবং স্বপক্ষে সাক্ষী খাড়া করিয়া, কন্যা-পক্ষীয়ের মস্তক ভক্ষণ করিয়া থাকেন।—এই সকল অত্যাচার-অনাচার নিবারণের একমাত্র বিশিষ্ট

প্রতিকার

এই যে, এক্ষণে, পূর্ব্বেকার ন্যায়, লোকে যদি এমন বুঝিতে পারেন, যে পাশ না করিয়াও অন্য নানাপ্রকার উপার্জ্জন-উপায়দ্বারা কাহারও গৃহে অন্নবস্ত্রের অসদ্ভাব নাই, তবেই লোকে 'পাশ' 'পাশ' করিয়া তাহাদের দিকে ধাবিত হইয়া, তাহাদের পিতৃপুরুষের লাঙ্গুল স্ফীত করিয়া দিবে না। পাশ-করা পাত্র পরিবর্জ্জন করিয়া, অ-পাশ-সম্ভব—অন্য সদুপায়ে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম, এমন—সদ্বংশীয় পাত্রে কন্যাদান করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে, পাশ-অভিমানী, ঋণ-ক্রীত মোটর-আরোহী, সচ্ছল-ভাণ-কারী পাত্রের পিতামহাশয়দিগের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে। তখন, তাহাদিগকেই আবার সদ্বংশে জাতা, সুশ্রী, সুলক্ষণা, লক্ষ্মী-সমতুল্যা কন্যাটিকে আপনার কুলবধূ করিয়া, সংসার সুখময় করিবার জন্য কন্যার পিতার পদলেহন করিতে হইবে! ভবিষ্যতে যে সাবিত্রী, সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন, আপন পুত্রপৌত্রের যিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী গর্ভধারিণী যশস্বিনী মাতৃ-স্বরূপিণী হইবেন, তাঁহাকে গৃহে আনিয়া গৃহ উজ্জ্বল করিতে গিয়া, কেবল অর্থের প্রয়াস, এবং তাহার পিতার সর্ব্বনাশ করিতে এই সকল কুলাঙ্গারের লজ্জা বোধ হয় না? ধিক্!—তাহাদের মনুষ্যজন্মে ধিক্!

পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনে সদ্বংশ বিবেচনা করিয়া (Heredity) প্রকৃতি কৌলীন্য বজায় রাখিবার যে সুন্দর প্রথা ছিল, তাহারই গুণে আজিও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ, এণ্ডামান্, আষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতির আদিম-নিবাসীদিগের ন্যায় বিলুপ্ত না হইয়া, (Intellectual) মানসিক ধীশক্তিগুণে পৃথিবীর উন্নতিকামী অধিবাসীদিগের সহিত সমশ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়া আছে। পাত্র-পাত্রী-নির্ব্বাচনে কেবল অর্থের আধিক্য দেখিতে গেলে, রামা মুর্দ্দফরাসের পুত্র-পৌত্রী অর্থাধিক্যহেতু কায়স্থ-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া—উচ্চ-বংশের সহিত মিলিত হইলে, তাহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বুঝিবেন।

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে ১৯০২।৩ সালে, সর্ব্বসুদ্ধ ১,৩১,০৯২জন লোকে ইন্‌কম্-ট্যাক্স্ দিয়াছিল (গত-বৎসরের সংখ্যা ইহার কিছু অধিক হওয়াই সম্ভবপর) ইহার মধ্যে—

৮৪৫১১ জনের আয় বার্ষিক ১০০০ টাকা।
২৮৩৪৬ জনের " " ২০০০ "
১৮২৩৬ জনের " " ২০০০ টাকার অধিক।

বেশী আয়ের লোকের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ ও মাড়য়ারী। মধ্য-শ্রেণীর মধ্যে কেবল মাত্র ৮৪ হাজার লোকের আয় মাসিক ৮৩।৵০ আনার অধিক নহে। সুতরাং, বঙ্গদেশের সর্ব্বসুদ্ধ শিক্ষিত ৩৬লক্ষ পুরুষের মধ্য হইতে ৮৩।৵০ আয়ের ৮৪ হাজার, উচ্চশ্রেণীর ৪৬ হাজার, এবং শিক্ষিত (Literate) কৃষকের সংখ্যা ২লক্ষ বাদ দিলে, বাকী ৩২ লক্ষ মধ্য-শ্রেণী পুরুষের উল্লেখযোগ্য এমন কি জীবিকার উপায় হইতে পারে, যাহাতে তাহাদের পুত্র-কন্যা, স্ত্রী মাতা এবং অপরাপর অবশ্য-পোষ্য আত্মীয়বর্গ লইয়া সচ্ছলরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে? ৩৪ লক্ষের মধ্যে ১৩১ হাজার লোকের সচ্ছল অবস্থা ধরিলেও, তাহা মধ্য-শ্রেণীর শতকরা ৩ জন মাত্র!

এই যে উপার্জ্জন উপায়ের এত অভাব, এই জন্যই কন্যা বিবাহে সুপাত্রের এত অভাব। ইহার প্রতিকার কিসে হইতে পারে? শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা

হইলেও এত অধিক মধ্যবিত্ত লোকের তাহাতে উপার্জ্জনের বিশেষ স্থান নাই; আর শিল্প-শিক্ষা করিলে, তাহার ব্যবসায় করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন, মধ্য-শ্রেণীর সে মূলধন নাই; 'জয়েণ্ট্ ষ্টক্' করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহা পরিচালনের ক্ষমতা নাই, এমন কি তাহার ভার, পাকচক্রে যাহাদের হস্তে পতিত হয়, দুঃখের বিষয়, তাহাদের অধিকাংশ লোকেরই সেগুলির মূলধন বজায় রাখিবার বিশেষ সততা নাই! যাহা হউক, বারান্তরে দেশের এই মধ্য-শ্রেণীর অপরাপর বিষয়ক দুরবস্থার প্রতিকার-পন্থার বিশদভাবে আলোচনা করিব।

রামপ্রসাদের ভাবসাধনা

[শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

'ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ মহিষী।—'রামপ্রসাদ

'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥'

গীতা ১১।৫৪

কালীভক্ত রামপ্রসাদ মাতৃভক্তির অভ্যন্তরে এক মহিমময় ধর্ম্মভাবের সন্ধান দিয়া, ব্রহ্মময়ী শ্যামা-মায়ের বাৎসল্য-রসে মুগ্ধ হইয়া, গাহিয়াছিলেন—

'আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি
ব্রহ্মময়ীয় জমিদারি।'

প্রসাদের এই ভক্তিমিশ্রিত মধুর ভাবের সাধনা বাংলায় আজ নূতন নহে। বৈদিক যুগেও আর্য্যজাতির মধ্যে এই ভাব-সাধনা প্রচলিত ছিল। রামায়ণ-যুগ হইতে অষ্টম শতাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবস্রোত হিন্দুসমাজের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দের প্রারম্ভে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাবের কিছুপূর্ব্বে, এই ভাবসাধনা, কঠোর দর্শনতত্ত্বের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়া, রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। তখন ধর্ম্মভাবটি জ্ঞানের দিক্ দিয়াই প্রস্ফুটিত, ভক্তির দিক্‌টা অত্যন্ত সঙ্কুচিত, হইয়া আসিতেছিল। এই সময়ে বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি * ও চণ্ডীদাসের (১৪০৩ খৃঃ) আবির্ভাব হয়। প্রথমাবস্থায় চণ্ডীদাস বাশুলী-দেবীর পূজক ছিলেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ভাব-সাধনাকে মধুর রসের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে বলিয়াই, মনে হয়, ভগবান্ চণ্ডীদাসকে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ভাবে শাক্ত-কবির ধর্ম্মের গতি ফিরিয়া যায়। তাঁহার ভাবসাধনার সুশ্রাব্য পদাবলীর মত, প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্মসাহিত্যেও বিরল। তাঁহার—

বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ
* * *
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
* * *
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি, কহে চণ্ডদাস,
পাপপুণ্য মম তোমার চরণখানি।'

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর এই নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতি-পূর্ণ প্রেমভাব, মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া যেন, মানব-হৃদয়ের অধ্যাত্মের দিক্ স্পর্শ করিয়া, অমর হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পর—চৈতন্যযুগে লোচনদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, যদুনন্দন, বৃন্দাবনদাস, প্রেমদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তা—সকলেই বৃন্দাবন-লীলা বর্ণনে মধুর রসের পুষ্টিসাধন করেন। এই ভাবসাধনার মধুর রসের পূর্ণ অভিব্যক্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রেমস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

ইহার পর, অনেক দিন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মহাশক্তির প্রেরণায় ভক্তিমিশ্রিত মধুর রসের পুণ্যস্রোত বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই মধুর রসের ভাবসাধনায়, প্রেমসঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে, অনধিকারীর হৃদয়ে সুধারসের পরিবর্ত্তে কামবিষ মিশ্রিত হইয়া, দেশের ভিতর ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোত অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল। যখন বাংলার ধর্ম্মজগতে এই ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত, তখন, বৈষ্ণবীয় ভাবসাধনার নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিয়া, মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ ভাবসাধনাকে মাতৃভাবে—পুত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে—'মা'—'মা' বলিতে বলিতে, জগতের সম্মুখে নিজেকে প্রচার করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন-লীলার 'অপূর্ব্বভাব রামপ্রসাদের নির্ম্মল ভক্তিপূর্ণ-

* খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাগে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দের প্রারম্ভে তাঁহার জীবন শেষ হয়।

চিত্তে এরূপ আশ্চর্য্যরূপে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাধন-মন্দিরের ভিত্তিরূপে উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্নেহের পুত্তলি, আঁচলের নিধি বালিকা-কন্যার শ্বশুরালয়ে গমন সময়ের বিচ্ছেদ এবং তাহার পুনরাগমনকালের মিলনচিত্রে যে বিচিত্র লৌকিক স্নেহ-প্রকাশের ছবি অঙ্কিত হয়, তাহা, বৈষ্ণবীয় উপাসনা পদ্ধতির অঙ্গীভূত ব্রজধামের অত্যুন্নত বাৎসল্যভাব-জ্যোতির স্নিগ্ধ-সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল বলিয়াই, কবির 'আগমনী' ও 'বিজয়া' সঙ্গীতগুলি ভাবুক সাধক উভয়েরই সমভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।' *

সাধক, আদ্যাশক্তির মাতৃভাব উপলব্ধির পর, তাঁহাতে কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া যোগযুক্ত হইয়া গীতার—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ'

ভাবের ধ্যানে গাহিলেন—

'ওরে মন, বলি ভজ কালি,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ ক'রে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে ॥'

প্রসাদের ভক্তিমিশ্রিত মধুর পদাবলীতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মশক্তির উপাসনা শিব ভিন্ন হইবার উপায় নাই। কথামৃতে আছে—'যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ প্রকৃতির যোগ! শিবকালীর মূর্ত্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ কর্‌ছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্‌ছেন।' শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রত্যক্ষ করিতে হইলেও, সাধককে সেইরূপ রাধাতত্ত্ব জানিতে হয়।

প্রসাদের পর, জগন্মাতাকে মাতৃভাবে উপাসনা করিতে, কমলাকান্ত, দেওয়ান রামদুলাল, দেওয়ান নন্দকুমার প্রভৃতি শক্তিসাধকগণকে দেখিতে পাই। ধীরে ধীরে এই মাতৃ-ভাবের সাধনা বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। বাঙ্গালী মাত্রেই এই ভাবগ্রহণে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এই ব্যাকুলতার ভিতর মাতৃভাবের ভাবসাধনার পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া জড়বাদের যুগে—মহানগরী কলিকাতার নিকট —পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ার্থ শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। প্রসাদ ও রামকৃষ্ণ অভেদ আত্মা; প্রসাদ মাতৃভাবের মূল উৎস, রামকৃষ্ণ মাতৃভাব-সাধনার মূল-উৎসের সহিত পূর্ণ-বিকাশ। রামকৃষ্ণ প্রসাদের মাতৃভাবের ভাবসাধনার পুণ্যস্রোতকে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের ভিতর দিয়া, দেশদেশান্তরে প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। আজও সেই স্রোত তরতরবেগে লক্ষ লক্ষ পাপীতাপীকে ভক্তিরসে ভাসাইতেছে। ধন্য প্রসাদ! ধন্য রামকৃষ্ণ! প্রসাদ না জন্মিলে, বোধ হয়, উনবিংশতি শতাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইত না, এবং, যদি রামকৃষ্ণ না জন্মিতেন, তবে বাঙ্গালী প্রসাদের 'কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি;' 'ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না', 'ইন্দ্রিয় (কামিনী-কাঞ্চন) অবশ যার, দেবতা কি বশ তার;' প্রভৃতি ভাবসাধনার মধুর পদাবলীর প্রকৃত পরিচয় পাইত কি না সন্দেহ। কিন্তু যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে লীলা-প্রচার করিয়া, প্রসাদের মাতৃভাব-সাধনার সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন;—দেখাইয়াছেন কালী ও ব্রহ্ম এক; সাধনার মহাশক্তির প্রভাবে কালীমূর্ত্তি সাধকের কেবল মনশ্চক্ষু নয়—বহিরিন্দ্রিয়েরও—প্রত্যক্ষ হয়; তাহা মহামহিম, বাক্যের অতীত এবং অতি সুন্দর।

* প্রসাদী সঙ্গীত।

পত্রবাহী-কপোত

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, M. A.]

মিঃ হোরেন্ উইণ্ডহাম্ পায়োনিয়ার পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"যুদ্ধের সময়, পারাবতের দ্বারা সংবাদ-প্রেরণ করা একটা নূতন ব্যাপার নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা প্রচলিত আছে। খৃঃ পূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীতে যাশুয়া এইরূপে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। ফেরোর সময়ে প্রাচীন মিশর, গ্রীস্ ও রোম-দেশবাসীরাও পারাবতদিগকে পত্র-বাহকরূপে ব্যবহার করিতেন। মঙ্গলজাতি বাগ্দাদ অবরোধ করিলে, পারসিকেরাও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের কথা আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, ওয়াটারলুর যুদ্ধে ওয়েলিংটনের সমর বিজয়বার্ত্তা পারাবতের দ্বারাই প্রথম ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাহাদিকে সংবাদ বহনের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।"

জর্ম্মাণ্গণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস্ নগরী বেষ্টন করিলে, সংবাদ-প্রেরণের জন্য পত্রবাহক পারাবতের বিশেষ প্রয়োজন হয়। রণদূতরূপে তাহারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সংবাদ-আদান-প্রদানের সকল উপায় রহিত হইলে, একদল পারাবত-পালক তাহাদের পারাবতগুলিকে সমর-বিভাগীয় লোকের হস্তে সমর্পণ করে। এই প্রস্তাবে প্রথমে অনেকে উপহাস করিয়াছিল, তথাপি একজন বিখ্যাত বিমানবিহারী বেলুনে চড়িয়া কপোতগুলি সঙ্গে লইয়া যান; কিছু দূরে তাহাদের ছাড়িয়া দেন। ইহারা ঠিক গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা জর্ম্মাণ্ সৈন্যগণের মাথার উপর দিয়া দশ-বার বার প্যারিসে যাতায়াত করিয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেক সংবাদ-পত্রে কুড়িটি করিয়া অক্ষর লেখা ছিল। পথ মধ্যে কোন পত্রই শত্রুহস্তে নষ্ট হয় নাই।

পত্র-প্রেরণের এই সুবিধা দেখিয়া, ইউরোপের সকল দেশেই পারাবতের দ্বারা সংবাদ-আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। ফ্রান্সে সন্ধি স্থাপিত হইবার পরেই দেশের সর্ব্বত্র পারাবতের একএকটি পোষ্ট আফিস স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। জর্ম্মাণিও এই উপায়ের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া, ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিল। এক্ষণে জর্ম্মাণির প্রত্যেক বড় দুর্গে একএকটি সুপ্রতিষ্ঠিত "কপোত কুলায়িকা" আছে।

ডাঃ ভিউব্রোজ্নর্ ও প বাহী পারাবত

রুষিয়াই, বোধ হয়, ইউরো প্রথম পারাবতের পোষ্ট-আফিস স্থাপিত করে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, পারাবতদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তথায় অনেকগুলি সমিতি গঠিত হয়। রুষিয়া প্রথম পথ দেখাইলে, জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইটালি, বুলগেরিয়া, স্পেন, পর্টুগাল, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি তাহার অনুসরণ করিল। অবশেষে জর্ম্মাণিই বোধ হয়, এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া, এই প্রকার পত্র-প্রেরণের ব্যবস্থা ও উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সমরবিভাগের নির্দ্দিষ্ট ব্যয় হইতে প্রতি বৎসর ৩০০০ পাউণ্ড মুদ্রা পৃথক্ রাখা হয়। প্রায়

দুই লক্ষ পারাবত যুদ্ধক্ষেত্রে কাইসারের উপদেশ ও আদেশ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বে-সরকারী ও যতগুলি পত্রবাহক পারাবত দেশে আছে, তাহাদেরও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সেগুলি রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। সমর-বিভাগের লোকেরা সেগুলি চাহিলেই দিতে হইবে। এরূপ কোন পারাবত বিক্রয় করিলে বা বিদেশে প্রেরণ করিলে, গুরুতর শাস্তিভোগ করিতে হয়।
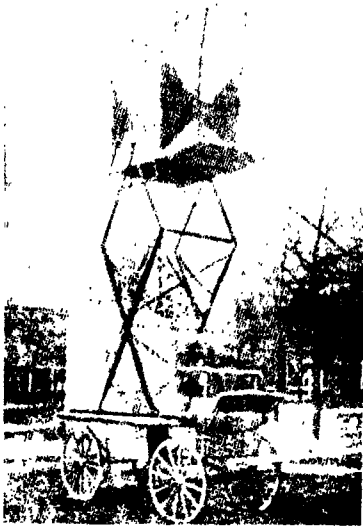
চক্রযুক্ত কপোত কুলায়

ফ্রান্সের রণকপোতের সংখ্যা জর্ম্মাণের অপেক্ষা অনেক অধিক। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সময় তাহারা যুদ্ধে কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সকল দেশেরই রণ-কপোতগুলিকে নিয়মিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সর্ব্বদাই তাহাদিগকে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বুয়ার-যুদ্ধের পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় কপোতকুলায়িকা স্থাপিত হয় নাই। লেডীস্মিথ, কিম্বারলে ও মেফ্‌কিং-বাসীরা এইরূপ রণকপোতের সাহায্য পাইলে, তাহাদিগকে সেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। বুয়ার-যুদ্ধের সময়, জনকতক বে-সরকারী কপোতপালক সমরবিভাগের লোকের হস্তে আপনাদের পারাবতগুলি অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাদের দ্বারাই লেডীস্মিথে অবরুদ্ধ বিপন্ন ইংরাজ সৈন্যের নিকট হইতে প্রথমে সংবাদপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

যে সকল কপোতপালক স্বেচ্ছায় তাঁহাদের পারাবত দেশের কার্য্যে অর্পণ করিয়াছিলেন, পিটারমারিজবার্গের মিষ্টার লী তাঁহাদের অন্যতম। অন্যত্র মিঃ লী ও তাঁহার পারাবতের একখানি ফটো দেওয়া হইল। এই পারাবতই লেডীস্মিথ হইতে প্রথম সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল এবং রণকপোতরূপে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রথম ও প্রধান সহায়তা করিয়াছিল। এই যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট পারাবতের দ্বারা পত্র-প্রেরণে বিশেষ মনোযোগী হন। পরীক্ষা দ্বারা অতীব সন্তোষজনক ফললাভও হইয়াছিল। তাহার পর একজন পারাবতপালকের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেকগুলি পারাবত প্রেরিত হয়। কেপ্‌-টাউনে একটি কপোত-কুলায়িকা স্থাপিত হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের এক কর্ম্মচারীর উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এই পত্রবাহক পারাবতদিগকে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। স্যার জর্জ্জ হোয়া-ইট্ ইহাদের কতকগুলিকে শত্রুবেষ্টিত লেডীস্মিথ নগরে লইয়া গিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বেই ইহাদের সাফল্যের বিষয় বলিয়াছি। ইংলণ্ডেও সরকারী ও বেসরকারী উভয়প্রকার পারাবতের সংখ্যা মধ্যে মধ্যে গণনা করা হয়। তাহাদের নামও রেজেষ্টরী করা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের আবশ্যক হইলেই বেসরকারী কপোতগুলি চাহিয়া লইতে পারিবেন। বুয়ার যুদ্ধের পর হইতেই ইংরাজ সমরবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন। যথোচিত সজ্জিত একটি পারাবতের পোষ্ট আফিস হইতে কতদূর সুবিধা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝিয়া ছিলেন। আবার স্থল-সৈন্য অপেক্ষা নৌসেনা-বিভাগেই ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সমধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কারণ, সমুদ্রযুদ্ধে তাহাদের অতি অল্পই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে নৌসেনাবিভাগ কপোতগৃহ স্থাপিত করেন; প্রথম, তাঁহারা ১১০০ পারাবত লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। নাবিকের ন্যায় তাহাদেরও আহার ও বাসস্থানের ব্যয় নৌসেনাবিভাগের ব্যয়ের অন্তর্গত ছিল। তাহারা পারিশ্রমিক-স্বরূপ আর্থিক পুরস্কার কিছুই পাইত না বটে, কিন্তু নাবিকদের ন্যায় তাহাদের প্রতিও বিশেষ যত্ন করা হইত।

রণ-কপোতেরা যে সংবাদ-বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহা
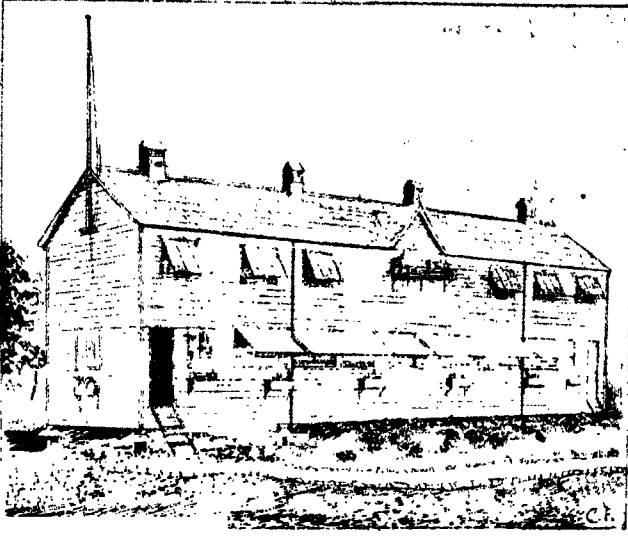
পোর্টসমথের রাজকীয় একটি কপোত কুলায়

প্রথমে সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত হয়। কলোডিয়ামের ফিল্মে তাহার ফটো তোলা হয়। ইহার আকার এত ক্ষুদ্র যে, একখানি ফিল্মের উপর ১৫০০ ছোট ছোট সংবাদ মুদ্রিত হইতে পারে। একটি পারাবত এইরূপ এক ডজন ফিল্ম্ অনায়াসে বহন করিতে পারে। ফিল্ম্‌গুলি একটি ফাঁকা পালকের কলমের ভিতর সবলে প্রবেশ করাইয়া, তার কিংবা রবারের সুতার দ্বারা কপোতের একটি পায়ে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সন্দেশবাহক পারাবত গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলে, কলমটি তাহার পা হইতে খুলিয়া লওয়া হয়; পরে একজন ফটোগ্রাফার্ সেটির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া দেয়; তাহা তখন সংবাদবিভাগের লোকের হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহারা সঙ্কেত পড়িয়া সব বুঝিতে পারেন।

শত্রুরা দেখিতে পাইলেই রণকপোতকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে ও পথিমধ্যেই তাহাদের কার্য্যের শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও গুপ্ত-সঙ্কেতের অর্থপুস্তক না থাকিলে, তাহারা সংবাদ পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

বুয়ার-যুদ্ধের পর হইতেই ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট পত্রবাহক পারাবতদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য নৌসেনা বিভাগে কপোত-গৃহ স্থাপিত করেন। পোর্টস্‌মাউথ্, ডেভেন্‌পোর্ট ও সুবারিনেসে তিনটি কুলায় স্থাপিত হইল। নাবিকগণের ন্যায় ইহাদেরও সংখ্যা নিরূপিত ও নাম রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। কুলায়ের এক কোণে একটি আপিস ঘর আছে। সেখানে কার্য্য-বিবরণী-পুস্তকসমূহ সযত্নে রক্ষিত আছে। বিবরণী-পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়। একটিতে, বাসার পারাবতদের সংখ্যা ও নামের তালিকা; একটিতে —কবে, কোথায়, কোন্ পারাবতকে ছাড়া হইয়াছিল তাহার যথাযথ বিবরণ; অপর একটি পুস্তকে, পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রত্যেক পারাবতের ক্ষমতার পরিচয় লিখিত আছে। ইহা সাপ্তাহিক ও মাসিক বিবরণী। অপর একখানি, সংবাদের সেরিস্তার বহি; তাহাতে প্রত্যেক পারাবতের দ্বারা আনীত সংবাদ সংলগ্ন আছে এবং সেই সকলের বিবরণ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

পোর্টসমাউথের কপোত-গৃহের ছবিখানি হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, উহা দ্বিতল; গৃহের মধ্যে দুইটি বিভাগ আছে। নিম্ন তলায় স্থায়ী পারাবতগণ বাস করে। এই পারাবতগুলি য়ুরোপের সকল অংশ হইতেই ক্রীত হইয়াছে; বেলজিয়মের মিঃ টুলেটের মৃত্যুর পর, তাঁহার বিখ্যাত কপোত-বাস হইতে অনেকগুলি ক্রয় করা হইয়াছিল। পারাবতদের ক্রয় করিবার সময় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। উপরোক্ত তিনটি রাজকীয় কপোতবাসে কপোত-সন্তানোৎপাদনের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা আছে।

পারাবতগণ অতীব বাধ্য ও শিষ্ট। ইহাদিগকে অতি সহজেই বাধ্য করা যায়। ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য রক্ষকগণকে বিশেষভাবে শিখাইয়া দেওয়া হয়; ইহারা অতি বুদ্ধিমান, সব কথাই অনায়াসে বুঝিতে পারে। রক্ষকগণ উহাদের সহিত সদ্ব্যবহার না করিলে, সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময়, ইহারা বাসগৃহে প্রবেশ না করিতেও পারে। অতএব রক্ষকগণকে এবিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিতে হয় এবং কোনও কারণে, ইহাদের উপর রাগ করিয়া, অশিষ্ট ব্যবহার করা একেবারে ত্যাগ করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পোর্টসমাউথের কপোত-গৃহটি দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই বিভাগের পারাবতগণকে

পৃথক্ করিবার জন্য একটি উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের পারাবতের পায়ে একটি করিয়া অঙ্গুরী বাঁধা আছে। এক বিভাগের সকলের ডান পায়ে অপর বিভাগের বাম পায়ে। সেইজন্য এক বিভাগের পারাবত অন্য বিভাগের সহিত মিশিয়া গেলেও তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

একটি কলের ভিতর দিয়া কপোত বাসগৃহের ভিতর ঢুকিতে ও সেখান হইতে বাহির হইতে হয়। কল হইতে কুলায়ে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে ছোট ছোট ফাঁকের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। সে সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া কেবল পারাবতই যাতায়ত করিতে পারে। পারাবত একটি ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেই ছিদ্রের দ্বার কলে নিঃশব্দে বন্ধ হইয়া যায়। এবং তৎক্ষণাৎ আফিসের বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিতে থাকে। তখন একজন রক্ষক নিকটে আসিয়া তাহার পা হইতে সংবাদ-পত্র খুলিয়া লয়। পরে ইহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে যাইতে দেওয়া হয়।

পত্রবাহক পারাবতগণের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ, তাহাদের শরীর সবল ও সুস্থ না থাকিলে, তাহারা সংবাদ লইয়া বাসগৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে না। কপোত-কুলায়িকাগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

ফ্রান্স ও জর্ম্মাণিতেও এইরূপ সুসজ্জিত কপোতগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল পারাবতের দ্বারা ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরের সহিত সংবাদের আদান-প্রদান চলিত। বেলজিয়মের মাছধরা নৌকা সকল প্রায়ই টেমস্ নদীর উপর অনেক পারাবত লইয়া আসে, এবং সেখান হইতে ফ্রান্স ও জর্ম্মাণিতে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহাদের ছাড়িয়া দেয়। জর্ম্মাণি ষ্টাস্‌বার্গে একটি ট্রেনিং স্কুল আছে। সেখানে সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে কপোতগৃহ-রক্ষণ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। জার্ম্মাণিতে প্রত্যেক কপোত-গৃহের সহিত অন্যান্য কপোত গৃহগুলির যোগ আছে। এক কুলায়িকার পক্ষীদিগকে অন্য কুলায়ে উড়িয়া যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপে তাহারা অনায়াসে এক দেশ হইতে অন্যদেশে সংবাদ লইয়া যাইতে শিক্ষিত হয়।

ফ্রান্স দেশে পারাবতগণকে সুনিয়মিত প্রণালীতে
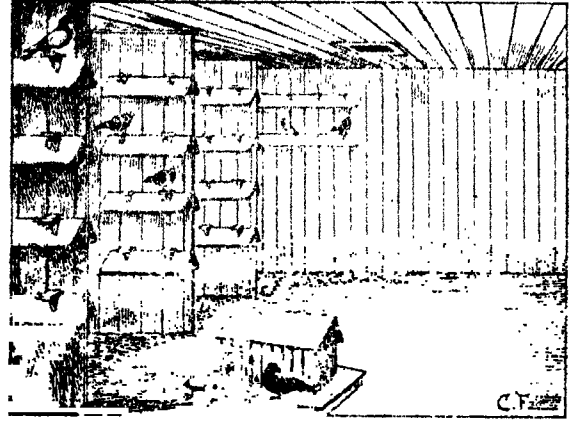
রাজকীয় যুদ্ধ-পোতস্থ কপোত কুলায়ের অভ্যন্তরবেশ

শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং কতকগুলি দূরবর্ত্তী নগরের মধ্যে ইহাদের দ্বারা নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র প্রেরিত হইয়া থাকে। সপ্তাহে তিনবার রেলগাড়ীতে করিয়া, ইহাদিগকে সীমান্ত প্রদেশে লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং কি প্রকারে তাহারা সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসে, তাহার যথাযথ বিবরণী সযত্নে লিখিত ও রক্ষিত হয়। রণকপোতগণ দেশের যে বিস্তর ক্ষতি-সাধন করিতে পারে, তাহা ফরাসীরা বেশ বুঝিয়াছে। সেইজন্য তাহারা ফ্রান্সে কোন বিদেশীকে পত্রবাহক পারাবত পুষিতে দেয় না। যখন ইংরাজের পারাবতদিগকে ফ্রান্সে ছাড়িয়া দিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়, তখন পুলিস কমিশনর তাহাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখেন এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাহাদের ছাড়িতে দেওয়া হয় না—পাছে প্রচ্ছন্ন চরেরা আসিয়া পারাবতের দ্বারা গুপ্ত সংবাদ শত্রুকে প্রেরণ করে।

বর্ত্তমান যুদ্ধেও কতকগুলি বিদেশী, পুলিসের নিকট হইতে লাইসেন্স্ না লইয়া পত্রবাহবক-পারাবত সঙ্গে রাখার অপরাধে ধৃত ও অভিযুক্ত হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্ট্রিয়াতেও সমর-বিভাগে পারাবতের পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল পারাবতের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই সরকারী। অধিকাংশ পারাবতই বে-সরকারী কপোতগৃহ ও কপোতপালকের অধিকারভুক্ত। সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রয়োজন হইলেই সেগুলি চাহিয়া লইতে পারেন। এদেশে কোন কপোত-

পালক পারাবতদিগকে পুষিয়া শিক্ষা দিলে, গবর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত তাহাদের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইংরাজেরা স্থল-সৈন্যের সাহায্যার্থে পারাবত ব্যবহার করেন না। তবে নৌ-সেনা-বিভাগের জন্য গুটিকতক কপোত-গৃহ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বুয়ার-যুদ্ধের পূর্ব্বে লেডীস্মিথে কপোতকুলায়িকা স্থাপিত হইলে, অবরুদ্ধ সৈন্যগণকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। সংবাদবাহক পারাবতগণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহভিন্ন অন্য কোন স্থানে উড়িয়া আসিবে না। মিঃ লি, ও ডারবানের জনকতক কপোতপালক তাঁহাদের পারাবতগুলিকে কার্য্যে লাগাইতে দিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের সময় যেমন মোঁসে ডন রুস্‌বেক্ ফ্রান্সে পারাবতের সামরিক পোষ্ট-আপিস স্থাপনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বুয়ার-যুদ্ধের সময় মিঃ এ, হার্ষ্ট নামক একজন ইংরাজ স্বেচ্ছায় লেডীস্মিথে গিয়া পারাবতের দ্বারা সংবাদ-পত্রাদি প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। জোহান্সবর্গে বুয়ারদের একটি কপোতগৃহের ছবি প্রদত্ত হইল। তাহারা গুপ্ত চরের সাহায্যে পারাবতদিগকে ব্যবহার করিয়াছিল। সেখানকার একজন ইংরাজ কপোতপালকের একটি বড় সুপ্রতিষ্ঠিত কপোত-কুলায়িকা ছিল। পাছে বুয়ারেরা ঐ গৃহের পারাবতদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করে, এই ভয়ে তিনি প্রত্যেক পায়রার একটি করিয়া ডানার পালক কাটিয়া দিয়াছিলেন; তাহারা পত্রবাহনে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। তাঁহাকে প্রেটোরিয়াতে বন্দী করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কোন প্রকারে পলাইয়া কেপকলোনীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে প্রায় ২৫,০০০ সমর-পারাবতপালক আছেন। তাঁহাদের পারাবতের সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও অধিক। দরকারের সময় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই সবগুলিকেই কাজে লাগাইতে পারেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আমেরিকা অনেকবার পারাবতের সদ্ব্যবহার করিয়াছিল, এবং আমেরিকার নৌসেনা-বিভাগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুসজ্জিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি কপোতগৃহ আছে।

নিউজিলাণ্ডে "গ্রেট বেরিয়ার পোষ্ট আফিস" পারাবতের

পীটর্‌মারিজ্‌বর্গ-নিবাসী মিঃ লী এবং লেডীস্মিথ্ হইতে প্রথম পত্র-আনয়নকারী কপোত

দ্বারা চালিত। ঐ দেশের পার্লামেণ্টও ইহাদের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে; পারাবতদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সরকারী রেলগাড়ীতে চড়াইয়া, দূরদেশে লইয়া যাইবার সময় বিনা টিকিটে যাইতে দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষেও, সেকেন্দ্রাবাদ ও দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি কপোতগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। বুয়ার যুদ্ধে লেডীস্মিথের পারাবতগুলি যে অশেষ উপকার করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এরূপ কুলায়িকা অনতিবিলম্বে স্থাপিত করা যুক্তিসঙ্গত। বারাকপুরে পারাবত লইয়া বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে।

বিখ্যাত পারাবতচরিত্রজ্ঞ মিঃ জে. ডবলিউ. লোগান, এম. পি. একবার বলিয়াছিলেন,—"একদল প্রবল শত্রু ইংলণ্ডে নামিয়া লণ্ডন বেষ্টন করিলে, পারাবতের দ্বারা আমাদের কোন উপকার হইবে না। কারণ খাদ্যাভাবে আমাদের সৈন্যরা বেশীদিন যুঝিতে পারিবে না। অতএব, ইংলণ্ডে, পারাবতের বাসগৃহ স্থাপন সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া, যাহাতে আমরা সমুদ্রের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারি, সেবিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। তাহা হইলে, ইংলণ্ডে শত্রু একেবারেই অবতীর্ণ হইতে পারিবে না; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের কথা বিভিন্ন। এই দুই স্থানে সুগঠিত কপোতগৃহ ও সুশিক্ষিত পারাবতের দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে।" দক্ষিণ আফ্রিকায় এবিষয়ে একরকম সুবন্দোবস্তই হইয়াছে। এবার ভারতবর্ষের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি

পড়িয়াছে। আশা করি, শীঘ্রই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কপোত-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পত্রবাহক পারাবত মধ্যে মধ্যে লোকের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে। একজন ভদ্রলোক একটি পতিত জলাভূমির উপর যাইতে যাইতে গর্ত্তে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত ঝুড়ির ভিতর একটি সন্দেশবাহক পারাবত ছিল। সে তাঁহার বাড়ীতে এই সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেল। যথাসময়ে সাহায্য পাওয়ায়, তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

কতকাল পূর্ব্ব হইতে পারাবত জাতি এরূপ সন্দেশ বহন করিয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। মিশরদেশে প্রায় ১৩৫০ খৃঃ পূঃ এই কার্য্যে পারাবতদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকারগণ—এনাক্রিওন, সক্রেটিস, ও এরিস্টটলের সময়েও ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মানবজাতি বিগত বহুশতাব্দী ধরিয়া রণ-কপোত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে ও তাহাদের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতেছে। ওয়াটারলুর যুদ্ধে পারাবতই প্রথম জয়সংবাদ বহন করিয়া আনে। মেসার্স রথস্‌চাইল্ডস, সকলের পূর্ব্বে সেই সংবাদ পাইয়া, প্রকাশপূর্ব্বক বিস্তর অর্থলাভ করিয়াছিলেন।

পত্রবাহক পারাবতগণকে কেবল পত্রবাহনের জন্যই শিক্ষিত করা হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং অপদার্থগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পারাবত শাবকেরা উড়িতে পারিলে, ও দেশের আকার সম্বন্ধে তা'দের একটু জ্ঞান জন্মিলেই তাহাদিগকে একটু একটু করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম এক মাইল দূর হইতে, তারপর দুমাইল, ক্রমশঃ আরও বেশী দূর হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পত্রবাহক-রূপে তাহাদের বিশ্বাস করিতে গেলে, এই শিক্ষা তাহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রণ-কপোতগণ বেলজিয়াম দেশজাত। বেলজিয়ামে পারাবতের দৌড় বহু বৎসরাবধি চলিয়া আসিতেছে। সেখানে এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বেলজিয়াম হইতেই ফ্রান্স, জর্ম্মাণি ও ইংলণ্ড তাহাদের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পারাবত পাইয়াছে।
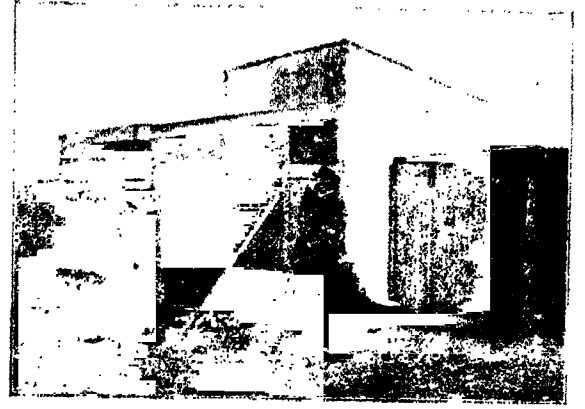
জোহান্‌বর্গের বুয়রদিগের একটি কপোত-কুলায়

কপোতগৃহের কার্য্যপরিচালন অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। উৎকৃষ্ট কলাই ও বরবটি পারাবতদিগের খাদ্য। অপরাপর ইতর প্রাণীর ন্যায় ইহাদিগকেও বেশ পরিষ্কার রাখিতে হয় ও প্রত্যহ টাট্‌কা জল পান করিতে দিতে হয়। বুয়ারদের কপোতগৃহ হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাসের জন্য উহাদের সুন্দর বাড়ীর দরকার হয় না। বিড়ালের আক্রমণ হইতে ইহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হয়, কারণ বিড়ালেরা ইহাদের বিশেষ শত্রু।

পত্র লইয়া আসিবার সময়, শত্রুহস্তে ইহাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যুদ্ধের সময়, শত্রুবেষ্টিত নগর হইতে সংবাদ-প্রেরণে, পত্রবাহক মনুষ্য অপেক্ষা ইহাদের উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, কুলায়ে উড়িয়া আসিবার সময়, দেশের মধ্যেও পারাবত-দিগকে গুলি করিয়া মারা হয়। এই কার্য্য স্বেচ্ছাকৃত প্রমাণিত হইলে, পার্লামেণ্টের বিধি অনুসারে, অপরাধীকে শাস্তি-ভোগ করিতে হয়। এই ক্ষুদ্র সাহসী পক্ষীদের দ্বারা আমাদের কত উপকার সাধিত হয়, সে বিষয়ে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, অন্ততঃ তাঁহারা ইহাদিগকে বধ করিবেন না, এরূপ আশা করা যায়।

এই পারাবতগণের মূল্য, ইহাদের শক্তির উপর নির্ভর করে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত মিঃ লোগানের পারাবত-গুলি বিক্রয়ের সময়, কতকগুলি, ৩০, ৪০ ও ৫০ পাউণ্ড দরে প্রত্যেকটি বিক্রয় হইয়াছিল। বর্ত্তমানে, পৃথিবীর অনেক উৎকৃষ্ট পারাবত যে এই সকল পারাবতেরই বংশধর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পারাবতগণ সংবাদ দিয়া, আবার সংবাদ লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিবে, এই উপায় জার্ম্মাণিই প্রথম উদ্ভাবন করে। এ বিষয়ে একটি গল্প কথিত আছে। একজন অবিবাহিতা কুমারীকে তাহার পিতা দ্বিতলস্থ একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহার প্রণয়পাত্রের সহিত তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইত না। কুমারী একটি পারাবতের সাহায্যে তাহাকে প্রণয়পত্র পাঠাইত। পারাবত পত্রের উত্তর লইয়া আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিত। এই ঘটনা কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, পারাবতটিকে ঝুড়ি করিয়া নীচে নামাইয়া দেওয়া হইত, এবং সে পত্র লইয়া কুমারীর নিকট ফিরিয়া যাইত। কিন্তু এখন ইউরোপের কয়েকটি কপোত-গৃহে এমন সব পারাবত আছে, যাহারা সংবাদ দিয়া ও সংবাদের উত্তর লইয়া, স্ব স্ব আবাসগৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে।

যে স্থান হইতে পারাবতদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেই বাসভবনটি স্থানান্তরিত করিলে, তাহারা চিনিয়া বাসায় আর ফিরিতে পারে না। এই জন্য গতিশীল কপোতগৃহ লইয়া ফ্রান্স-দেশে বিশেষ পরীক্ষা করা হইয়াছিল; কিন্তু পরীক্ষার ফল তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। এই কপোতগৃহ যুদ্ধস্থলে স্থানান্তরিত করিয়া জাপান এ বিষয়ে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া গেলে, কিংবা সৈন্যদল শত্রুর দ্বারা বেষ্টিত হইলে, পত্রবাহক পারাবতগণ বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। তারহীন বার্ত্তাবহযন্ত্রের সংবাদ আটকাইয়া শত্রুরা জানিয়া লইতে পারে, কিন্তু পত্রবাহক পারাবতকে বধ করিতে না পারিলে, সংবাদ-প্রেরণ বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। শিক্ষিত পারাবতদিগের দ্বারা বহুদুর পর্য্যন্ত সংবাদের আদান-প্রদান চলিতে পারে। তাহারা ৯০০ মাইল পর্য্যন্ত সংবাদ বহন করিয়াছে এবং রণ-কপোতগণ সাউথাম্টন হইতে লিস্‌বন ও প্যারিস পর্য্যন্ত সংবাদ লইয়া গিয়াছে, এমনও শুনা গিয়াছে।

ইহাদের গতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহারা মিনিটে ১৩২০ গজ পথ অনায়াসে যাইতে পারে। ঝড়-বাতাস ও ঋতুর উপর সেই বেগ অনেকটা নির্ভর করে। অপর সময় অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে তাহাদের গতির বেগ বর্দ্ধিত হয়। আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে ও প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, তাহারা মিনিটে এক মাইল রাস্তাও যাইতে পারে। প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টিপাত হইলেই তাহাদের গতির বেগ কমিয়া যায়। ইহারা একেবারে ১৫০ মাইল রাস্তা অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে। অত্যন্ত অধিক দুর পাঠাইলে ইহাদের পথ হারাইবার সম্ভাবনা অধিক। তবে আকাশ মেঘশূন্য থাকিলে, ৫০ হইতে ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত পথভ্রমণে ইহারা আদৌ কাতর হয় না। বহুবৎসর পূর্ব্বে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের একটি পারাবত মিনিটে ১৩০৭ গজ হিসাবে ৫১০ মাইল গিয়াছিল; অপর একটি পারাবত মিনিটে ১২৯৮ গজ হিসাবে ৫৮৭ মাইল গিয়াছিল।

পত্রবাহক পারাবতগণকে তিনচার বৎসর বিদেশী বাসভবনে ধরিয়া রাখিলেও, তাহারা বাসা চিনিয়া বেশ ফিরিতে পারে। ইহা হইতে আমরা তাহাদের প্রখর স্মৃতি-শক্তির পরিচয় পাই। বহুকাল পরে পুরাতন বাসায় ফিরিয়া গেলে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাসস্থানের জন্য দ্বন্দ্বপ্রিয় মোরগের ন্যায় লড়াই করে। স্বীয় বাসার প্রতি তাহাদের আসক্তি অত্যধিক ও আদর্শস্থানীয়।

"বউ কথা কও"

[শ্রীযুক্ত কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী]

শিশির আসিয়া যবে সাধে জোছনায়
জোছনা হাসিয়া বলে ক্ষণেক দাঁড়াও;
শুভ্র মেঘ আসি তবে হয় অন্তরায়,
বিদ্রূপে ফুকারে পাখী "বউ কথা কও"।

দুঃখ

[শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী]

পথ ছাড়ি' অশ্ব যবে চলে অন্য পথে,
ফিরায়ে সহিস তারে আনে কষাঘাতে।
জীবনের পথ ভুলে মানুষো যখন,
বেদন-চাবুক হানে চালক তখন।

ভাস্কর গণপাত্র কাশীনাথ মহাত্রে

[শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভাস্কর গণপাত্র কাশীনাথ মহাত্রে

মন্দির-পথবর্ত্তিনী

১৮৭৯ খৃঃ পুণানগরীতে গণপত কাশীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। গণপাত্র মহাশয় 'সোম'বংশীয় 'পাথ্‌রে' শ্রেণীর ক্ষত্রিয়। তাঁহার পিতা (Military Accounts Deparment) সৈনিক আয়ব্যয়-বিভাগে কাজ করিতেন; এক্ষণে তিনি পেন্সন্ ভোগ করিতেছেন। গণপাত্র তাঁহার চতুর্থ সন্তান। বাল্যকাল হইতেই গণপাত্র চিত্রবিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইতে আরম্ভ করেন।

মহীশূরের স্বর্গগত মহারাজ

পূজার্থিনী

ইংরাজিতে একটি কথা আছে—"Child is the father of man", ইহার সত্যতা গণপাত্রের জীবনে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্তিকদ্বারা তাঁহার কনিষ্ঠের ঊর্দ্ধাঙ্গ প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাহা এত সুন্দর ও তাঁহার কনিষ্ঠের এত অনুরূপ হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা একবাক্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, কালে এই বালক অদ্ভুত ভাস্কর হইবে। প্রকৃতই মহাত্রের যশঃসৌরভে, তাঁহার জন্মভূমি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিতা। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়া, তিনি ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; ইংরেজীস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৯২ খৃঃ Sir J. J. School of Art নামক শিল্পকলা-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং

সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া

তথা হইতে পারদর্শিতার সহিত সমুদয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহু সুবর্ণপদক ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এমন কি, স্কুলের অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া, ১৬ বৎসর-বয়স্ক ঐ তরুণ যুবককে ঐ স্কুলের চিত্র-বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত করেন; কিন্তু ঐ পদ তিনি অচিরে ত্যাগ করেন। শিল্প-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ভাস্কর্য্য ও আদর্শ-প্রতিমূর্ত্তি গঠনে তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি হয় এবং কালে এ বিদ্যায় তিনি প্রসিদ্ধ হন। শিক্ষকতা ত্যাগ করিলে, বিখ্যাত রাসায়নিক আচার্য্য গজ্জর (Gojjor) তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হন এবং তাঁহার রসায়নপরীক্ষা-মন্দিরের (Laboratory) এক অংশ তাঁহাকে ভাস্কর্য্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য ছাড়িয়া দেন। অতঃপর বোম্বাই শিল্পকলা-সভার প্রদর্শনীতে তিনি স্বনির্ম্মিত অনেকগুলি মূর্ত্তি পাঠাইয়া দেন এবং গঠন কৌশলের জন্য অনেকগুলি পদক ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এইরূপ একটি প্রদর্শনীতে তিনি Plaster of Paris নির্ম্মিত "মন্দির পথবর্ত্তিনী" নামক একটি মূর্ত্তি পাঠান; সকলেই উহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন; এমন কি, ভবনগরের মহারাজা গণপাত্রকে স্বহস্তে পারিতোষিক দেন। সেই মূর্ত্তির প্রতিলিপি দেখিলে ইহার রচনা-মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। বলিতে গেলে, এই একটি মূর্ত্তি তাঁহার যশঃ ও সৌভাগ্যলক্ষ্মীলাভের প্রথম ও প্রধান কারণ। বস্তুতঃ, এই

বিচারপতি রাণাডে

সরস্বতী

স্বামী শঙ্করাচার্য্য

মূর্ত্তিটির স্বভাবসুলভ কমনীয়তা, সহজ সরল ভঙ্গী ও সৌন্দর্য্যে ইহাকে একটা জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়—"পূজার্থিনী" তাঁহার অন্যতম ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তি! পূজার্থিনীর মুখমণ্ডল যেন ভক্তিরসে উদ্ভাসিত। এই প্রতিমূর্ত্তিটিতে পূজার্থিনীর মনের কথা যেন স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। বলিতে কি, স্যর জর্জ্জ বাডউড্ প্রমুখ কলাবিদ্যার সমালোচকেরা এই মূর্ত্তিটির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এক্ষণে মূর্ত্তিটি বোম্বায়ের আর্টস্কুলে রক্ষিত আছে। সেই অবধি মহাত্রে ভাস্কর্য্যে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রথমে তাঁহাকে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানিত না; কিন্তু প্রতিভা কখন লুক্কায়িত থাকে না,—স্বতঃই অচিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অচিরেই মহাত্রের যশঃ-সৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; অনেক গণ মান্য ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা, কোলাপুর, মহীশুর প্রভৃতি রাজন্যবর্গ তাঁহার কার্য্য দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। আমরা তাঁহার হস্ত-রচিত

শবর পার্ব্বতী

মহীশূরের স্বর্গগত মহারাজার প্রতিমূর্ত্তির প্রতিলিপি দিলাম। মূর্ত্তিটি দেখিলে, আদৌ কঠিন প্রস্তর-রচিত বলিয়া মনে হয় না; চক্ষের জ্যোতিঃটি পর্য্যন্ত যেন প্রতিমূর্ত্তিতে রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি দেখিয়া কাউপারের প্রসিদ্ধ লাইন দুটি মনে পড়ে—

পূজান্তে

"Blest be the Art that can imortalise,
The Art that baffles Time's tyrannic claim
to quench it !"

সম্প্রতি মহাত্রে মহারাজাধিরাজ, গুইকোয়ারের একটি উপরার্দ্ধ-প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। মহাত্রের গঠিত সাম্রাজ্ঞী ৺ভিক্টোরিয়ার আমেদাবাদস্থিত প্রতিমূর্ত্তি ও বিচারপতি ৺রাণাডের প্রতিমূর্ত্তি দুইটি ঘরে ঘরে তাঁহার নাম প্রচারিত করিতেছে। ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তিটি ৭ ফুটের উপর উচ্চ এবং মর্ম্মর-নির্ম্মিত; মহারাণীর গাম্ভীর্য্য মূর্ত্তিটিতে স্পষ্ট বিরাজমান, এবং রাজকীয় পোষাকের সূক্ষ্ম লেস্‌গুলি পর্য্যন্ত অতি সুন্দরভাবে প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে। চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহার কৃতিত্ব বুঝা যায়। মিঃ রাণাডের মূর্ত্তিটিও ৭ ফুট উচ্চ, এবং রাণাডের দক্ষিণ চক্ষুর যে দোষ ছিল, তাহাও এই প্রতিমূর্ত্তিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমরা মহাত্রের কয়েকটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তির প্রতিলিপি দিলাম। 'সরস্বতী' এবং 'শবরী পার্ব্বতী'র ভঙ্গী কিরূপ সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক এবং কমনীয় তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

সুধা

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

সাগর মথিয়া নাকি যত দেবগণ,
যত সুধা ছিল সব করেছে হরণ ?
পরম যতনে নাকি ত্রিদিবে লইয়া
রেখেছেন ইন্দ্র তারে গোপন করিয়া ?
ভোগ করে দেবগণ হরষিত চিতে,
মনুষ্যের অধিকার নাহিক তাহাতে ?

অলীক সে সব কথা—অতীব অসার।
দেখাইতে পারি আমি প্রমাণ তাহার ;
দয়া করি মহামায়া ত্রিদিব হইতে,
দিয়াছেন সুধা আনি এ মর-জগতে,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ সে সুধার রাশি,
মধুমাখা কথা আর সুধামাখা হাসি।

পল্লি-গৃহস্থ

[শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে, F. R. H. S.]

বিগত ২০।২৫ বৎসর কাল বাংলাদেশে কৃষিবিষয়ে যত আলোচনা হইয়াছে, সমগ্র ভারতের কোন প্রদেশে সেরূপ হয় নাই। যে যে বিষয়ে উদাসীন থাকে, সে সে বিষয়ের ঔদাসীন্যকে পরিহার করিবার প্রয়াস পায়; তাহার ফলে, তাহার সেই নিজস্ব উন্নতিকল্পে যত্নশীল হয়। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তি, বিষয় বিশেষের প্রতি চিরোৎসাহী থাকিলে, সেই অভ্যাসবশতঃ তদ্বিষয়ের সমধিক উৎকর্ষ-সাধনের জন্য তৎপর হয়। এই অবস্থাটি, ব্যক্তি-বিশেষে যেরূপ প্রযোজ্য, জাতি বিশেষেও সেইরূপ; অথচ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। একজনের কিছু না থাকায় সে যত্নশীল; অপর ব্যক্তি লব্ধ দ্রব্যকে আরো বাড়াইতে চাহে, আরো পূর্ণাবস্থায় আনিতে চাহে। বর্ত্তমান সময়োপযোগী কৃষিসম্বন্ধে বাংলাদেশ যেরূপ স্থিতিশীল ছিল, ভারতের অপরাপর প্রদেশও সেইরূপ ছিল; কিন্তু বাংলার সৌভাগ্য যে, এদেশে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কৃষির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে; অপর প্রদেশে তাহা হয় নাই।

চল্লিশ বৎসরের অধিক হইল, ভারতের গবর্ণর-জেনারেল—লর্ড মেয়োর শাসনকালে ভারতে কৃষিবিভাগের সৃষ্টি হয়। অতঃপর, প্রতি বৎসর কৃষিবিভাগের পুষ্টিবর্দ্ধন ও কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর-বৃদ্ধির জন্য রাজ-সরকার হইতে যে বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছে, ভারতের ন্যায় বিশাল মহাদেশের পক্ষে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আর একটি কথা এই যে, যেদেশে কিছু কিছু আছে, তথায় এরূপ অর্থব্যয় দ্বারা কাজ হইতে পারে; কিন্তু ভারতে কিছুই নাই, সুতরাং সমুদায় বিভাগেই গবর্ণমেণ্টকে ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইতেছে। যে বিষয়টি বেশী প্রয়োজন, সে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক মনোযোগী হইতে হয়—ইহাই স্বাভাবিক। মনোযোগী হওয়া অর্থে—অর্থব্যয় ভিন্ন আর কি? ইহার উপর রাজ্য-রক্ষার্থে সাময়িক-সরঞ্জাম যথাযথ-ভাবে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখিতে হয়। পৃথিবীর অভ্যুন্নত জাতিদিগের মধ্যে অধুনা সামরিক-ব্যাপারের বিরাট আয়োজন চলিতেছে; জলে, স্থলে, ব্যোমে যেরূপ আশঙ্কার ঘনাড়ম্বর দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় না যে, কোনো দেশে কখনও সামরিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। ভারতের প্রতি অনেকের শকুনী-দৃষ্টি আছে, কাজেই ভারত-রক্ষার্থ ইংরেজকেও সর্ব্বদা হাত-নাগাৎ (up-to-date) প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। তাহা ব্যতীত, প্রজা রক্ষার্থে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, বিবিধ রোগের উৎপাত প্রভৃতির জন্যও রাজাকে বহু অর্থব্যয় করিতে হয়। ইদানীং যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট ভারতের একটি অবর্জ্জনীয় উপসর্গ বা আভরণ। দুর্ভিক্ষ-কালে প্রজারক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট বড় কম টাকা খরচ করেন না, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নহে। প্রজার ঘরে ধন নাই—কাজেই সামান্য দুর্বিপাকেই প্রজাকে বিপন্ন হইতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হয়। প্রজাসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ধনাঢ্য ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়; তাঁহাদিগকে সে বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না। উপরন্তু, প্রজা-সাধারণকে রক্ষা করা, বিত্ত সম্পন্নদিগেরও যে কর্ত্তব্য তাহা প্রায় কাহারও মনে স্থান পায় না। আপৎকালে ইঁহারা মুক্ত-হস্ত হন, স্বীকার করি; কিন্তু যতটা হওয়া উচিত, ততটা হন না। ইচ্ছায় হউক, বা অনিচ্ছায় হউক, যাহা কিছু দান খয়রাৎ, তৎসমুদায় প্রায় উপরিতন শ্রেণীমধ্যেই আবদ্ধ—তন্নিম্নবর্ত্তী শ্রেণী তাহা প্রায় গ্রাহ্য মধ্যে আনেন না। সাধারণ আপৎ-বিপদে সমগ্র-দেশবাসী গবর্ণমেণ্টের পশ্চাতে থাকিলে, গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করা হয়; তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বলবৃদ্ধি হয়, প্রজাকুল বাঁচিয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিষয়ে এপর্য্যন্ত যত চেষ্টা-যত্ন করিয়াছেন, যত অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, কৃষির অবস্থা পর্য্যালোচনাতেই তাহা নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে। কৃষির উন্নতিবিষয়ক কতটা কি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিবার সময় আসিয়াছে, সত্য; কিন্তু আপাততঃ সে বিষয় উহ্য রাখিয়া, আমরা প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিব। তবে এস্থলে উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, গবর্ণ-

মেণ্টের কার্য্যফল এপর্য্যন্ত দেশবাসীর মধ্যে পৌছে নাই। গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত প্রতি প্রদেশেই ২।৫টী আদর্শ পরীক্ষা-ক্ষেত্র আছে; তাহার ফলাফল বাৎসরিক 'রিপোর্টে' প্রকাশিত হয়, রিপোর্টের উপর Resolution বা মন্তব্য প্রভৃতিও প্রকাশিত হয়; কিন্তু এতদ্দ্বারা আমাদিগের কোন কাজ হয় না—আমরা 'যে তিমিরে সেই তিমিরে।'

বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত-সম্প্রদায় মধ্যে যে সামান্য কৃষি-বিষয়ক উৎসাহ দেখিতে পাই, তাহা বিগত ২০।২৫ বৎসরের কার্য্যফল। ইহার পূর্ব্বে, কৃষি যে আমাদিগের আলোচনার বিষয়, চর্চ্চা করিবার যোগ্য, তাহা কাহারই মনে স্থান পায় নাই। কেবল কালি-কলমের আলোচনাদ্বারা সকল কাজ হয় না। তবে, কালিকলমদ্বারা মানুষকে ও সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যায় বটে; তাহা কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে—ব্যবহারিক কার্য্যেরও সূত্রপাত হইয়াছে।

সংবাদ-পত্রাদিতে এতদিন যে ভাবে কৃষির আলোচনা হইয়াছে, কিম্বা এ পর্য্যন্ত কৃষি-বিষয়ক যত পুস্তকাদি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে এমনভাবে কিছু বলা হয় নাই, যাহার অনুসরণ করিয়া লোকে নিঃসংশয়ে কৃষিচর্চ্চায় প্রবৃত্তি হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, প্রকৃত কৃষি কি, কিংবা শিক্ষিত উদ্যোগী যুবকের পক্ষে কোন্ প্রকারের কৃষি স্পৃহনীয়, কোন্ প্রকার কৃষি অবলম্বন করিলে যুবকমণ্ডলীর পক্ষে তাহা প্রীতিপ্রদ ও অর্থোৎপাদক হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে এ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করেন নাই। দেশবাসীর কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে ইহা একটি বিষম অন্তরায়। একে ত এদেশে—কি কৃষি, কি অপর কলা-শিল্প দেখিয়া—শিখিবার সাধারণ স্থান নাই; তাহার উপর লিখিত-উপদেশও যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লোকে কোন্ ভরসায় নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে সাহস পায়? সেই অভাব দূরীকরণোদ্দেশেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

কৃষি ও শিল্প।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজ ২০।২৫ বৎসরকাল মাত্র বাঙ্গালাদেশে কৃষির চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা দেশবাসী ইতর সাধারণের নিকট পৌছে নাই। বাঙ্গালাদেশে, ব্যক্তিগত ভাবে, কোন কোন ব্যক্তি, বিক্ষিপ্তভাবে কৃষির আলোচনা করিয়া, কৃষির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সম্পাদকগণও উপরিউক্ত ব্যক্তিদিগের কার্য্যকলাপ ও তৎসম্পর্কীয় নানাবিষয়ক আলোচনা নিজ নিজ পত্রিকায় সাগ্রহে স্থান দিয়া, যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন; এজন্য তাঁহারাও যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার পাত্র। বিগত ৭।৮ বৎসর হইতে অর্থাৎ 'স্বদেশীর' প্রারম্ভকাল হইতে শিল্প বাণিজ্যের কথাটা পুনরায় উত্থিত হইয়াছে। 'পুনরায়' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাঙ্গালাদেশে ইতোপূর্ব্বে আরও ২।৩বার 'স্বদেশী'র ঘনঘটা দেখা গিয়াছে এবং বৈশাখের মেঘডম্বুরের ন্যায় আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এই 'স্বদেশী' যে তাহা নহে, একথা কেমন করিয়া বলি? তবে ইহাও বলি, এই শেষোক্ত 'স্বদেশী আন্দোলন' যত দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইয়াছে, যত দেশব্যাপী হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় নাই। তবু জিজ্ঞাসা করি—ফলে কি হইয়াছে? আন্দোলন হইল, অরন্ধন হইল, নগ্নপদ হইল—আরও কত কি হইল; কিন্তু সে সকলের ফল হইল কি? যদি আমাকেই কেহ উত্তর দিতে বলেন, তাহা হইলে আমি বলিব—'কতকগুলি অপরিণত-বয়স্ক নিরীহ বালকের প্রাণনাশ হইল,—কতকগুলি আত্মহত্যা করিল, কতকগুলি ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিল, কতকগুলি মেয়াদ খাটিল, আবার কতকগুলি দ্বীপান্তরে গেল!'—আর কি হইল? বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাপড়ের কলের সংখ্যা বাড়িয়া গেল—বোম্বাই-কাপড়ে দেশ ছাইয়া গেল! এত আন্দোলন উত্তেজনার পর, বল দেখি, কাহার ঘরে কয়খানা খাস বাঙ্গালাদেশের মিলজাত কাপড় আছে? অতঃপর, বাঙ্গলাদেশে আরও কতপ্রকার কল-কারখানা স্থাপিত হইল, তাহাদিগের অবস্থার কথা আলোচনা না করাই ভাল। বিদেশী শিল্পজাত ও কলকারখানার সামগ্রীর সহিত, গরীব ভারতের মূলধন বা শ্রম কখনই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। সাধারণ দেশবাসীর টাকা নাই; যাহার আছে, তাহার টাকা খাটাইবার স্থান নাই, স্থান থাকিলেও বিশ্বাস্য নহে; ইহাই প্রায় দেখা যায়। আমরা বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি অপেক্ষা—ভূসম্পত্তি ভাল বুঝি; তারপর বুঝি নগদ টাকা—কোম্পানীর কাগজরূপে কিম্বা সুবর্ণালঙ্কাররূপে। আমরা কথায় কথায় গবর্ণমেণ্ট ও দেশস্থ জমিদারবর্গকে গালিগালাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যেন আমরা দেশে থাকিয়া তাঁহাদিগের মাথা কিনিয়াছি! গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন ও করিতে-

ছেন। ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব বিষয়কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন, সম্পত্তির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, জমিদারী বাড়াইতেছেন; ইত্যাদি। জমিদারগণ জমিদারী বাড়াইতেছেন,—ইহাই হইল সাধারণের ঈর্ষার মূল! তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত ধন আমাদিগকে বিতরণ করেন না, ইহাই তাঁহাদিগের ঘোরতর অপরাধ! জমিদার ভূসম্পত্তি বুঝেন। তাবৎ ভারতবাসী—বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি,—ভূসম্পত্তিকে অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করে, সেইজন্য সকলেই অর্থের অল্লাধিক্যানুসারে ঘর-বাড়ী জমা-জমি করিবার জন্য লালায়িত। সুবর্ণ-বলয়, চিক্-ব্রেস্লেট্ যাহা, ঘর-বাড়ী, বাগ-বাগিচাও তাহাই; এসকলেই টাকাকড়ি বৃথা আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ এগুলি dead stock. আমাদিগের টাকা খাটাইবার উপায় নাই; এই জন্য উদ্বৃত্ত অর্থকে আমরা পূর্ব্বে ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিতাম, এক্ষণে সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দিই, কিম্বা অপর কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখি, অথবা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করি। উদ্বৃত্ত অর্থের এরূপ প্রয়োগে কোন দোষ দেখা যায় না বটে, কিন্তু টাকাটা নিজে কোন কারবারে খাটাইলে সমধিক আয় হইতে পারে; অথচ বিষয়বুদ্ধি আমাদিগের এতই কমিয়া গিয়াছে যে, স্বাধীনভাবে টাকাটা খাটাইতে সাহসে কুলায় না। সকল কাজেরই শিক্ষা আছে; ব্যবসায় বাণিজ্যও শিক্ষা করিতে হয়। কোন ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্রতী হইবার সঙ্কল্প থাকিলে, পূর্ব্বাহ্ণ হইতে কোন কল-কারখানায়, বা ব্যবসায়ীর আপিসে, বা হাউসে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাজ-কর্ম্ম শিক্ষা করা প্রয়োজন। পুস্তকাদির সাহায্যে Book-keeping, বা খাতা-রাখা, শিখিলেই কোন সওদাগর বা মহাজন তাহাকে Book-keeper করিবে না, কিম্বা পাকা-খাতায় আঁচড় কাটিতে দিবে না। আজকাল অনেক যুবককে, বিদেশে প্রেরণ করিয়া, নানাবিষয়ে শিক্ষিত করিয়া আনা হইতেছে; সে শিক্ষার ফল কতদূর হইতেছে, তাহা আমরা দেখিতেই পাইতেছি। এই সকল যুবক এদেশে ব্যবহারিক কাজ (Practical work) শিক্ষা করিবার পর, ইংলণ্ড আমেরিকা বা জাপান হইতে পুথিগত-বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিকভাগ শিখিয়া আসিলে,তবে তাঁহাদিগকে লোকে বিশ্বাস করিবে। আর এক উপায় এই যে, বিদেশ হইতে বিদ্যালাভ করিবার পর, তথাকার কোন স্থানে ২।৪ বৎসর ব্যবহারিক কাজ-কর্ম্ম করিয়া আসিলে, আরও ভাল হয়। কিন্তু সে বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার; কাজেই সকলেরই লক্ষ্য থাকে, যে কোন প্রকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, শীঘ্র দেশে ফিরিয়া আসিবার দিকে। তাঁহাদিগের অভিভাবকদিগেরও প্রধান লক্ষ্য থাকে—পরীক্ষায় শীঘ্র উত্তীর্ণ হইয়া প্রবাসী বালক যত সত্বর ফিরিয়া আসে। এরূপ লক্ষ্য থাকিলে যাহা হয়, তাহাই হইতেছে। বিদেশে গিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা ও জ্ঞান আয়ত্ব করিয়া, ফিরিতে হইলে অন্তঃতপক্ষে দশটি বৎসর তথায় অতিবাহিত করা চাই। ন্যূনকল্পে চার-পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে দুই-তিন বৎসরকাল বিদেশে অতিবাহিত করিয়া আসিবার পর, যদি ১০০্ বা ১৫০্ না হয় ২০০।৩০০্ টাকা বেতনের চাকুরি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সবই ত পণ্ড হইল!—টাকা গেল, সময় গেল, ভবিষ্যতের কত উচ্চাভিলাষ—সমুদায়ই সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল;—অধিকন্তু একটি দোষ মজ্জাগত হইয়া রহিল, সেটি বিলাতী চাল ও জাতিচ্যুতি!

আমাদিগের নিজস্ব কল-কারখানা, লেবোরেটারি নাই যে, বিদেশ হইতে বিদ্যালাভ করিয়া দেশে পদার্পণ মাত্রেই, ইহার যে কোনটিতে নিযুক্ত হইতে পারিবে। সর্ব্বাগ্রে কার্য্যক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে হইবে, অবস্থিত কার্য্যক্ষেত্র সমূহকে প্রসারিত করিতে হইবে; পরে, পরিচালক উদ্ভূত হইবে। সাহেবদিগের যে সকল হাউস, বা সওদাগর-বাড়ী, কলকারখানা প্রভৃতি এদেশে আছে, এবং দিন দিন যেগুলি নূতন হইতেছে, তৎসমুদায়ে ১৫০্।২০০্ টাকার পদে গোরা সাহেব, অর্থাৎ খাস-য়ুরোপীয়, বাহাল আছে; আর প্রতি জাহাজেই ২।১০ জন সাহেব এদেশে আসিতেছে। চা-বাগান, নীলকুটী, সওদাগরী আপিস, রেলওয়ে আপিস—সকল স্থানেই এই সকল পদের জন্য সাহেব মজুত আছে, সুতরাং সাহেবদিগের সংক্রান্ত কোন পদে আমাদিগের বিলাত-জাপান প্রত্যাগতদিগের আদৌ আশা ভরসা নাই। কেরাণিগিরিতেও কোন স্থানে আর আমাদিগের পূর্ব্বেকার ন্যায় প্রাধান্য-প্রতিপত্তি নাই। ছোট ছোট—২০।৫০্টাকার পদগুলি আমরা পাইয়া থাকি। তাহার উপর হইলেই য়ুরোপীয় পুরুষ ও রমণী সেগুলিতে উত্তরাধিকার-সূত্রে সত্ত্ববান্। এতদবস্থায় মাত্র শিল্প-বাণিজ্য শিখিয়া কি হইবে?

এসকল বৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন; কিন্তু কোন একটি বৃত্তি শিখিলেই বিশেষ কোন কাজ হইল না, শিক্ষাকে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রণালীতে বিদেশ হইতে শিক্ষা-লাভ করিয়া আসিবার পর, যদি কেহ সৌভাগ্যশালী হয়েন, তবে হয়ত কোন দেশীয় নৃপতির রাজ্যে ১০০।২০০৲ টাকা বেতনে চাকুরিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহবা কোন দেশীয় কারখানায় একটি চাকুরি পাইলেন!—নিজের অর্থে, নিজ-মনোমত কোন-কিছু করিতে পারিলে, বুঝিতাম বিদেশবাস, বিদেশী-শিক্ষা প্রভৃতি সফল হইল। সে অর্থ আমাদিগের নাই; সুতরাং সে অনিশ্চিত ব্যাপারে যুবকগণকে উত্তেজিত করা কোন মতে সঙ্গত নহে। ধনী ব্যক্তিদিগের সন্তান-সন্ততি বিলাত যাউন, আমেরিকা যাউন, জাপান যাউন, তাহাতে আপত্তির কোন কথা নাই। কিন্তু সঙ্গতিবিহীন মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকগণকে এরূপ শিক্ষায় ব্রতী হইতে আমরা কদাচ পরামর্শ দিই না। যুবকগণের পক্ষে অপরের অর্থ-সাহায্যে বিদেশ যাওয়াও আমরা ঈপ্সিত মনে করি না। কারণ, তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়া নিশ্চয়ই চাকুরি-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন; পরের এতগুলি টাকা ও নিজের এতটা সময় ব্যয় করিয়া যদি সেই চাকুরিই করিতে হয়, তাহা হইলে লাভ নিজেরই বা কি হইল, দেশেরই বা কি হইল?—পাঁচজনের টাকারই বা কি প্রতিদান হইল?

শিল্প ও কল-কারখানা সংস্থাপন করা সকলের কাজ নহে, ধনাঢ্য ব্যক্তির কাজ। কার্য্যস্থল থাকিলে, লোকের অভাব হয় না; ইহা অর্থনীতি-শাস্ত্রের উপদেশ। ব্যবহারতঃ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; কারণ, সকলদেশেই অধিবাসীর বিশিষ্ট ভাগ বা majority শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; কেহ ২০০৲ টাকার, কেহ বা ৫।৭ টাকার শ্রমজীবী। অধস্তন কর্ম্মচারিগণকে শ্রমজীবী ভিন্ন, কি বলা যায়! যে রোজ আনে-খায়, যে চাকরি করে, যে পরমুখাপেক্ষী, তাহারা সকলেই শ্রমজীবী-পর্য্যায়ভুক্ত। আত্মগরিমার খাতিরে আমরা আপনা-আপনি ভদ্রলোক নামে অভিহিত হইয়া থাকি। সেকালে ভদ্রলোক শব্দটি যেরূপ সম্মান-সূচক ছিল, উক্ত শ্রেণীভুক্ত তাবৎ নরনারী সেইরূপ সম্ভ্রান্ত ও মান্য ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের ঘরে তখন যথেষ্ট অন্ন ছিল, ক্ষেত-খামার ছিল, উঠানে মরাই ছিল, গাই ছিল, বাগানে নানাবিধ ফল-পাকড়ের আওলাত ছিল, পুষ্করিণীতে মাছ ছিল। এই সকল জিনিসের অতিরিক্ত ভাগ বিক্রয় করিয়া, বা জমা দিয়া, যাহা কিছু অর্থ পাওয়া যাইত, তাহাতেই সুশৃঙ্খলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। এতদ্ব্যতীত, বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে, কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত না। বারোমাসে তের পার্ব্বণ ছিল। ইঁহারাই যাথার্থ 'ভদ্রলোক' ছিলেন। চাকুরি করিয়া ইঁহাদিগকে অন্নোপার্জ্জন করিতে হইত না। মফঃস্বলে এখনও এরূপ গৃহস্থ আছেন;—নাই কেবল সহরে, এবং সহর-ঘেঁসা বাবুদিগের মধ্যে। এইরূপ গৃহস্থশ্রেণী বঙ্গদেশের প্রধান ও শক্তিশালী অধিবাসী। আর, আমাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীতে যাহারা অবস্থিত, তাহাদিগকে কুলি-মজুর ইত্যাদি ঘৃণাসূচক নাম দিয়া রাখিয়াছি। যাহা হউক, ধনাঢ্যগণ অর্থোপার্জ্জনোদ্দেশ্যে কোন-কিছু প্রতিষ্ঠান করিলে, লোকাভাবে তাহার কাজ নষ্ট হয় না—লোক আসিয়া আপনি জুটে। আমার ভূতপূর্ব্ব অন্নদাতৃ (মুরশিদাবাদের নওয়াব-নাজিম, বা বাঙ্গলার সুবেদার হুমায়ুন জা'র পত্নী) মৃতা নওয়াব রৈসন্নিসা বেগম-সাহেবা বলিতেন, 'রোপেয়াকা নাও পাহাড়্‌মে চড়্‌তা,' অর্থাৎ 'অর্থব্যয় করিলে জলের নৌকা পাহাড়ে উঠে'। তাঁহার সম্মুখে কোন কাজ অসম্ভব বলিবার যো ছিল না। তাঁহার কথার যাথার্থ্য জগতে প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। জনহীন আসাম প্রদেশে লক্ষ লক্ষ কুলি চা-বাগানে কাজ করিতেছে; বলা বাহুল্য পয়সার জোরেই বিদেশ হইতে কুলি-আমদানী হয়। চা-বাগানে কুলির সংখ্যা বড় কম নহে, এক এক বাগানে দুই পাঁচশত হইতে দশ-বারো হাজার! আর এক-একটি কুলি—বেহার, গঞ্জাম, নাগপুর প্রভৃতি সুদূরস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে প্রায় একশত হইতে দেড়শত টাকা খরচ পড়ে!—সবই পয়সার খেলা,'Almighty dollar'এর কীর্ত্তি।

আমরা বলি অর্থনষ্ট করিয়া, সময়নষ্ট করিয়া দাস্যবৃত্তি শিখিতে সুদূর প্রবাসে যাইবার প্রয়োজন নাই। সেই টাকা, সেই সময়, সেই অধ্যবসায়, সেই উৎসাহ লইয়া দেশে থাকিয়া কাজ করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক নিজের—দেশের—দশের—উপকার হয়! •

আমরা, সাহেবদিগের ব্যবসা-বাণিজ্যসম্ভূত ঐশ্বর্য্য-সম্পদ দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, এবং সেই বিহ্বলতার প্ররোচনায় বাণিজ্য-ব্যবসায় করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি। উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু সাহেবদিগের তাবৎ কার্য্যকলাপের ভিতর দুইটি জিনিষ আছে, যাহা দুনিয়ায় দুর্ল্লভ। উক্ত জিনিষ, বা গুণদ্বয় পুস্তক পড়িয়া শিখিতে পারা যায় না—নকল করিতে পারা যায় না—তাহা ব্যতীত, সে দুইটি এক-পুরুষে লাভ করা যায় না। সে দুইটিকে আয়ত্ত করিতেহইলে, ইংরাজের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে, ইংরাজ-পরিবারমধ্যে বাস করিতে হইবে, ইংরাজের প্রত্যেক কার্য্যে তন্ময় হইতে হইবে। আমরা সামান্য যেটুকু নকল করিয়াছি, তদনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করি; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারি না, এবং তজ্জন্যই আমাদিগের অনুষ্ঠিত যত কাজ পণ্ড হইয়া যাইতেছে! পণ্ডতা দর্শনে আমরা একান্ত অভ্যস্ত বলিয়াই সেগুলি আর আমাদিগের চোখে ঠেকে না—প্রাণে লাগে না। উক্ত জিনিষদ্বয়ের নাম **সংগঠনীশক্তি** (Power of Organisation), ও **সুশৃঙ্খলা** (Discipline). Power of Oragnisation এবং Discipline পদ দুইটির একটু সংক্ষেপে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যে শক্তির সাহায্যে কোন নূতন তত্ত্ব, প্রণালী বা পদ্ধতি উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহাকে উদ্ভাবিনীশক্তি কহে। আর যে শক্তি দ্বারা কোন বিষয়কে অবয়ব দেওয়া যায়, বা কোন বিষয়কে সুচারুরূপে গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, তাহাই Power of Organisation। অবলম্বিত বিষয়টিকে এমনভাবে গড়িতে হইবে যে, তাহা যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়; বিনা বিশৃঙ্খলায়, যথা নিয়মে, যথাযথভাবে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে;—আমরা ইহাকেই সংগঠনীশক্তি আখ্যা দিলাম। আর, Discipline অর্থে ইহা বুঝি, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত হইয়া চালিত হওয়া,—সে নিয়ম, পদ্ধতি প্রভৃতি ভালই হউক, আর মন্দই হউক;—তৎসংক্রান্ত সকলকেই সে সকল নিয়মাদি মানিয়া চলিতেই হইবে, কোন ওজর আপত্তি চলিবে না, কর্ত্তব্যপালনে জীবনসংশয় হইলেও বিনা-আপত্তিতে তাহা করিতেই হইবে। ইহাকেই আমরা 'সুশৃঙ্খলা' বলিলাম। এই গুণদ্বয় ইংরাজচরিত্রে যত পরিস্ফুট, এমনটি আর কোনও জাতিতে দেখা যায় না। সুকুমারমতি বালকবালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্য্যন্ত—প্রত্যেকের জীবনে, প্রতিকার্য্যে ইহার শুভ-বিকাশ দেখা যায়। কি খেলা-ধূলা, রং-তামাসা, কি গৃহস্থালী, কি সামাজিক-সাময়িক বিধিবিধান,—সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণ উক্ত দুইটি গুণের বিকাশ দেখিতে পাই। ইহাই ইংরাজ-মাহাত্ম্য এবং ইহারই বলে মুষ্টিমেয় ইংরাজ, সুদূর আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপমধ্যে বাস করিয়া, ইঙ্গিতে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন। উক্ত গুণদ্বয় যে-জাতিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই জাতিই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বড় বড় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে এই দুইটি গুণ-প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক সাধনা করিতে হইবে; সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটিলে, তবে আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

এই জীবন-সংগ্রামের দিনে যৌথ-কারবার ভিন্ন অপর কিছুতেই কোন কার-কারবার স্থায়ী হইতে পারে না। যৌথ-কারবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ, কারণ সে কারবারে ক্ষতি হইলে কোন ব্যক্তি-বিশেষের সমূহ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের কারবার-ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে, সেই ব্যক্তি-বিশেষকেই তাহা সহ্য করিতে হয়—হয় ত তন্নিবন্ধন অনেকস্থলে সর্ব্বস্বান্তও হইতে হয়। এই জন্যই ইংরাজ, কোন বৃহৎ কার্য্যে প্রায় একাকী অগ্রসর হয়েন না,—দলবদ্ধ হইয়া করেন। আর দলবদ্ধ হইয়া করেন বলিয়াই বিস্তৃতভাবে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। যৌথ ব্যবসায়ের এই বিশেষত্ব হেতু প্রতীচ্যগণ এক্ষণে ২।৪ জন, বা ততোধিক ব্যক্তি, সম্মিলিত হইয়া কাজ করিতে বিশেষ সচেষ্ট। যৌথ-ব্যবসায়ে পাঁচজনের অর্থ, পাঁচজনের বুদ্ধি, কার্য্যতৎপরতা, কার্য্যশৃঙ্খলা প্রভৃতির একত্র সমাবেশ-ফলে বৃহৎ কারবারের সৃষ্টি হয়, সুলভে শস্য উৎপাদিত হয়, বাজার সস্তা হইয়া যায়। ইহাদিগের সহিত 'টক্কর' বা 'পাল্লা' দেওয়া ব্যক্তি-বিশেষের, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে যে যে অবস্থা, যে যে গুণ, শিক্ষা ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা আমাদিগের আদৌ নাই,—'আদৌ নাই' বলিলাম দেখিয়া শুনিয়া। 'বেঙ্গল প্রভিন্‌শিয়াল্‌ রেলওয়ে' 'Pioneer Glass-Manufacturing Co'., 'Indian Match Factory', 'Tarapur Sugar Works.' প্রভৃতি কতকগুলি

স্বদেশী প্রতিষ্ঠায় একে একে যেরূপে গা ঢালিয়া দিল, তাহাতেই আমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কৃতিত্ব বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। মনোহারি-দোকান, বইয়ের দোকান, ছাপাখানা, খবরের কাগজের সম্পাদকী, গ্রন্থরচনা, দরজীর দোকান, কাপড়ের দোকান এই কয়টি করিতেই আমরা কতকটা পারি! অন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য—পাট, তামাক, ভুষিমাল, গুড় প্রভৃতির—মহাজন ও আড়ৎদারেরাই চিরদিন করিয়া আসিতেছে; তাহারা বংশানুক্রমিক আর এক শ্রেণীর লোক। এ সকল লোকের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হয় না। আধুনিক যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের জন্য আন্দোলন, তাহা অন্য প্রকারের। আধুনিক শিক্ষিত, ও অল্প-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে সমস্যা উঠিয়াছে, তাহারই সুসমাধানোদ্দেশেই যে বর্ত্তমান আন্দোলন—ইহা বলাই বাহুল্য। ইহাদিগের যথেষ্ট মূলধন নাই, ব্যবসায়-বুদ্ধিরও অভাব। তদ্ব্যতীত, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে আরও কতরূপ প্রতিবন্ধক, কত অসুবিধা আছে, তাহা পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বলিয়াছি। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান নাই। তাই বলিয়া এমন কথা বলি না যে, ব্যবসাবাণিজ্যকে সকলে উপেক্ষা করুক, শিল্প-কার্য্যকে পরিহার করুক; অথবা কেরাণীবৃত্তি বা অপর চাকুরি না করুক;—বরং বলি যে, কেরাণীগিরিও ভাল করিয়া শিক্ষা করুক, কারণ সে সকলদিকেও ত লোক চাই! গবর্ণমেণ্ট-আপিসের অপেক্ষাকৃত বড় বড় পদ-গুলিতে প্রবেশ করিতে হইলে, এক্ষণে Accountant-ship, Clerk-ship পরীক্ষা দিতে হয়, সওদাগরী আপিসে ভাল কাজ পাইতে হইলে, (Commercial School) ব্যবসায় শিক্ষার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পর পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, নিম্নতম পদসকলের যোগ্যতার জন্যও শিক্ষা আবশ্যক। ভবিষ্যতে নিয়মাবলী আরও কঠোর হইবার সম্ভাবনা। তখন এসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেও, সকলের অদৃষ্টে চাকরি জুটিবে না। সুতরাং সাধারণ-শিক্ষিতদিগের কি উপায় হইবে, এখন হইতেই তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে, এক্ষণে মাত্র একটী পথ উন্মুক্ত, —এখনও অবারিত পড়িয়া আছে,—তাহা **কৃষি**। বারান্তরে তাহারই বিশদ আলোচনা করিব।

করুণা

কাকিনার রাণী শ্রীযুক্তা শান্তিবালা রায়চৌধুরাণী ও রাজকুমারীগণ যুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের জন্য ব্যাণ্ডেজ্ ও বিছানার চাদর প্রস্তুত করিতেছেন।

মৌলিক গবেষণা

শেয়াল-কাঁটার তৈল

[শ্রীক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী, M. Sc.]

গাছের পরিচয়

শেয়ালকাঁটার গাছ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বোধ হয়, অনেকেই জানেন না এবং শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই গাছ এদেশীয় নহে, আমেরিকা হইতে আনাত। খণ্ডিত পাতার উপর লম্বা লম্বা কাঁটা, গাছের এবং পাতার নীলাভাযুক্ত সাদা পাতা, হরিদ্রাবর্ণের ফুল এবং দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণের আঠা—এইগুলির জন্য যিনি একবার এই গাছ দেখিয়াছেন, তাঁহার আর ভুলিবার উপায় নাই।

ব্যবহার

ইহার বীজগুলি প্রায় সর্ষপের ন্যায় এবং উহা হইতে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থলে ঐ তৈল প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সমস্ত গাছ সিদ্ধ করিয়া পাচনের ন্যায় সেবন করিলে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কনকান্ প্রদেশে কুষ্ঠ-রোগীদিগকে এই গাছের রস সেবন করান হয়। গাছের আঠায় ক্ষতের উপকার হয়। গুলঞ্চরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা উপদংশ ও প্রমেহগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেবন করিতে দেওয়া হয়। এক সময় ইহার আঠা ও তৈল য়ুরোপেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। আমাশয়, কিংবা অন্য কোনও প্রকার পেটের ভিতরে ক্ষতের, চিকিৎসার জন্য ৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত এই তৈল সেবন করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চুলকানি ও পাচড়ায় এই তৈল-ব্যবহারে উপকার হয়।

পরীক্ষার্থ প্রস্তুতকরণ

আমার নিজের তত্ত্বাবধানে তৈল প্রস্তুত হয়। বীজ-সংগ্রহ নিজের লোক দ্বারা করান হয়। পরে ঐ বীজ হামাম-দিস্তায় বিশেষ করিয়া কুটিয়া লইয়া, 'স্ক্রু-প্রেসে' চাপ দিয়া, তৈল নিষ্কাশন করা হয়। এই সময় দেখা যায় যে, গুঁড়াবীজ যদি কিছু আগুনের উপর ভাজিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তৈল অতি শীঘ্রই বাহির হয় এবং একটু অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু তৈলের রং কিছু বেশী গভীর ও তৈলটাও কিছু ঘন হয়। আবার, অন্য কোনও তরল পদার্থ দিয়া তৈল বাহির করিয়া লইলে (যেমন Petroleum Ether) তৈলের রং ও কতকগুলি গুণের তফাৎ হয়। এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্যে এই যে, আমার পরীক্ষার ফল, অনেক স্থলে, বিদেশস্থ বৈজ্ঞানিকগণের ফলের সহিত মিলে নাই। এইরূপ পৃথক হইবার অনেক কারণ থাকিতে পারে;—যেমন অমিশ্রিত বীজ, খাঁটি তৈল, প্রস্তুতকরণে প্রণালী ইত্যাদি।

বাহ্য বিশেষত্ব

গুঁড়া-করা বীজ হইতে 'সক্স্‌লেট্' (Soxhlet) যন্ত্রে 'পেট্রোলিয়াম্ ইথার' দিয়া তৈল বাহির করিয়া, উত্তাপ দিয়া পেট্রোলিয়াম্ ইথার তাড়াইয়া দেওয়ার পর, ওজন করিলে দেখা যায় যে, বীজে শতকরা ২২·৩ ভাগ তৈল আছে; সার্ব্বনিয়ার (Charbonnier) বলেন যে, তিনি ৩৬ ভাগ পাইয়াছেন।

পেট্রোলিয়াম্ ইথার্‌যোগে-প্রস্তুত নির্যাস সবুজ আভাযুক্ত, হরিদ্রাবর্ণের এবং fluorescent। গরম করিয়া, পেট্রোলিয়াম ইথার তাড়াইয়া দিলে, তৈলের বর্ণ জলপাইয়ের ন্যায় সবুজ দেখায়; কিন্তু উহা কয়েক দিবস রাখিয়া দিলে, কিংবা বহুক্ষণ ধরিয়া গরম করিলে, রং ক্রমশঃ বদলাইয়া ঘন বাদামী হয়। বেশী গরম করিলে, যখন তৈল হইতে ধোঁয়া উঠে, তখন সমস্ত ঘর শেয়ালকাঁটার রসের গন্ধের ন্যায় একটা উগ্র গন্ধে ভরিয়া যায়।

চাপ দিয়া যে রং বাহির করা হয়, উহার রং কমলা-লেবুর ন্যায়, গন্ধ অতি কম, এবং কোনও স্বাদ নাই। প্রথম অবস্থায় বেশ পাতলা থাকে, কিন্তু রাখিয়া দিলে ক্রমশঃ ঘন হইয়া যায়।

আবরণহীন পাত্রে, কিংবা অম্লজনাত্মক (Oxidising) কোনও দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া, তৈল রাখিলে পাত্রের নীচে এক প্রকার লাল দানা জমে (তাহার দ্রবণ তাপ ১৭২° সেঃ)।

একটি কাঁচ-পাত্রে তৈল রাখিয়া, বরফের মধ্যে বসাইলে, দেখা যায় যে, উত্তাপ যতই কমিয়া আইসে, উহাও তত ঘন হয় এবং ১৭° সেঃ তাপে ঘোলা হয়; ১৬ সেঃ মধ্যেই সমস্ত তৈল জমিয়া যায়। কিন্তু সার্ব্বনিয়ারের তৈল ৮° সেঃ, ফ্লুকিগারের তৈল ৬ সেঃ, তাপেও পরিষ্কার ছিল।

ফুটন্ত জলের তাপে উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৯০০৭ এবং ২৭ সেঃ তাপে ০·৯১১৭।

পুনৃক্রিকের যন্ত্রে তৈলের আলোকরশ্মির গতি ফিরাইবার ক্ষমতা (Refractive index) ৪৩° ৩৪′ (তাপ ৩২ সেঃ)। কিউটিরো রিফ্র্যাক্টোমিটার দিয়া ক্রসলী ও লি সিউয়ার (Crossley and Le Seuer). ৪০° সেঃ তাপে ঐ ক্ষমতাকে ৬২·৫ বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন।

খাঁটি সুরাসারের সহিত তৈল যে কোনও অনুপাতে মিশ্রিত হয়; সুরাসার কিন্তু জলমিশ্রিত হইলে, যে কোনও অনুপাতে তৈল দ্রব করিতে পারে না। যথা—৫৪ ভাগ জলমিশ্রিত সুরাসার (৩২ ভাগ সুরাসার ও ২২ ভাগ জল) কেবল ১০ ভাগ পর্য্যন্ত তৈল লইতে পারে।

রাসায়নিক বিশেষত্ব

৩·৪৮২৮ গ্রাম্ তৈলের সাবান প্রস্তুতের জন্য ১১৬·৪ সিঃ $\left(\frac{ন}{১০}\right)$ উদ্ভিজ্জ-ক্ষার (Potash) জল প্রস্তুত হয়। অতএব ইহার (Saponification Value) সাবান-প্রস্তুত-ক্ষমতা ১৮৫·৫।

এসেটিকাম্লযুক্ত তৈলের (Acetytated Oil) সাবান-প্রস্তুত-ক্ষমতা ২১৩·৪। অতএব এসেটিকাম্লযুক্তের ক্ষমতা ২৭.৯।

তৈলে প্রচুর অসংযুক্ত (free) অম্ল আছে; অম্লক্ষমতা (Acid Value) ১৪৬।

সাবান-প্রস্তুতের পর জলে যে সকল পদার্থ পড়িয়া থাকে, তন্মধ্যে (১) ক্যাকোডাইন পরীক্ষা দ্বারা এসেটিকাম্লের ও এষ্টার্ পরীক্ষায় ভ্যালেরিকাম্লের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আইওডিন্ সংযোগ-ক্ষমতা	১০৬·৭
ব্রোমিন্ সংযোগ-ক্ষমতা	১০২·২

তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করিবার পর, উহাকে গন্ধকাম্ল দ্বারা বিযুক্ত করিয়া, বাষ্পের সহিত চোলাই করিলে দেখা যায় যে, অতি অল্পই উদ্ভিজ্জাম্ল বাষ্পের সহিত যায়।

তৈলে শতকরা ১৫·৪৮ ভাগ গ্লিসারিণ আছে।

লিভাকের (Livache) নির্ণীত উপায়ে প্রস্তুত সীসার গুঁড়ার সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া, কাচ-পাত্রের উপর ছড়াইয়া রাখিলে দেখা যায়, প্রথম ২৪ ঘণ্টা পরে প্রায় ২ভাগ (%) ওজন বৃদ্ধি হয়; কিন্তু একদিন অন্তর ওজন করিলে দেখা যায়, এই বৃদ্ধির হার দিন দিন কমিয়া দশ দিন পরে আর ওজন বৃদ্ধি হয় না; ঐ সময় শতকরা ৫·৫২ ভাগ ওজনে বাড়ে।

কমান বায়ুর চাপে (১৫ মিঃ মিঃ চাপ) তৈল চোলাই করিলে দেখা যায় যে, ২১৭—২২৮ সেঃ মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক তৈল চলিয়া আইসে, এবং ২৩৫° সেঃ মধ্যে ৩৯ ভাগ তৈলের মধ্যে ৩৩ ভাগ চলিয়া আইসে। বাকি তৈল বিযুক্ত (Decomposed) হইয়া যায়।

তৈলোৎপন্ন মিশ্র অম্লের পরীক্ষার ফল

আপেক্ষিক গুরুত্ব ২৮° সেঃ তাপে ০·৯০৫, এবং ফুটন্ত জলের তাপে ০·৮৮৮৯।

ইহার সাবান-প্রস্তুত-ক্ষমতা	১৯৪।
আইয়োডিন-সংযোগ-ক্ষমতা	১৪৭·৪।

সীসোৎপন্ন লবণ-ইথার পরীক্ষা প্রণালীতে দেখা যায় যে, ইহার ৭৭ ভাগ দ্রব অম্ল।

মিশ্রাম্লে ষ্টিয়ারিক্ অম্ল নাই

বায়ুশূন্য পাত্রে চোলাই করিলে ৮.১৪ ভাগ লবিরাম্ল পাওয়া যায়।

প্রতিধ্বনি

নির্ব্বাণ

বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে "নির্ব্বাণ কি ?" বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন—"বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নির্ব্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয়; এবং সেই সকল কথা বুঝিয়া উঠাও কঠিন। মোটামুটি ধরিতে গেলে, নির্ব্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়।" প্রদীপ নিবিয়া গেল,—আর কিছু নাই; কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলেও কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায় ? অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধ নিজে কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তিনি নিজে যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার ত কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁহার নির্ব্বাণের ৫০০ বৎসর পরে তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্ট পালি ভাষায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেও সেই দীপনির্ব্বাণেরই তুলনা।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্ততঃ ৫।৬ শত বৎসর পরে কনিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ কবিতায় নির্ব্বাণ শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি নির্ব্বাণ শব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্ব্বাণের পর আর কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে, বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে পালিভাষার পুস্তকে তাহার উত্তর আছে। নির্ব্বাণের পর কিছু থাকিবে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—না। আবার প্রশ্ন হইল কিছু থাকিবে না ? উত্তর হইল—না। আবার প্রশ্ন হইল—থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা হইবে কি ? উত্তর হইল—না। আবার প্রশ্ন হইল—"কিছু থাকা না-থাকা, এ দু'য়েরই বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইবে কি ?" সেই উত্তর—না।

তবে দাঁড়াইল কি ? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পারি না, "নাস্তি"ও বলিতে পারি না। এ দুয়ে জড়াইয়া কোন অবস্থা নয়, এ দু'য়ের অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল, কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে। 'মহাযানে' ইহাই শূন্য বলিয়া বর্ণিত। শূন্য শব্দে সাধারণতঃ কিছুই নয় বুঝাইলেও ইহার অর্থ—অস্তি নাস্তি প্রভৃতি চারিপ্রকার অবস্থায় অতীত অবস্থা-বিশেষ :—'অস্তিনাস্তিদ্বুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্'।

শিষ্য-পরম্পরায় ক্রমশঃ নির্ব্বাণ শব্দের নানারূপ মতবাদ ব্যাখ্যাত হইল। মহাযানের নির্ব্বাণ 'শূন্যতা' ও 'করুণা'য় মেশামেশি, এই নির্ব্বাণের একদিকে 'করুণা' আর একদিকে 'শূন্যতা'। করুণা সকলেই বুঝিতে পারে, কিন্তু শূন্যতা বুঝান বড় কঠিন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শূন্যতার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন—সেটি 'নিরাত্মা'। শুধু 'নিরাত্মা' বলিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন—"নিরাত্মা দেবী"। বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মস্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া নিরাত্মা দেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ—কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে, যাহা হয়, যজমানেরা সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল; কেননা সেটা বুঝিতে ত কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্ব্বাণের কি অর্থ দাঁড়াইল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়েই যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সুতরাং, নির্ব্বাণ যে শূন্যতা ও করুণায় মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল।"

—নারায়ণ, পৌষ।

সাহিত্যে দলাদলি

সাহিত্যে দলাদলি দর্শনে ব্যথিত হইয়া, 'নব্যভারত'-সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "কোন কোন কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম, সাহিত্য-অবলম্বনে, অভিনব জাতিভেদ সৃজনে বদ্ধপরিকর

হইতেছেন দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত। স্বর্গগত মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, ভারতচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, প্যারীচাঁদ, কাঙ্গাল হরিনাথ, রজনীকান্ত, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিহারীলাল, গিরিশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি সাহিত্য ধুরন্ধরগণ খ্রীষ্টান ও হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা আজ স্বর্গে। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে বসাইবার জন্য তাঁহারা নানা কুৎসিত উপায় অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, শতখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের সংখ্যা ২৯ ; পরন্তু মাইকেলের ১, বঙ্কিমের ১১, দ্বিজেন্দ্র লালের ৪ খানি মাত্র। কার ঘরে বা সব বাঙ্গালা পুস্তক আছে, কে বা সব বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছে, কোন্ শ্রেণীর লোক বা ভোট দিল? ইহা সন্দেহের ঘনান্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত। ইহাকেই বলে, 'কোলটানা বিচার'। 'বোলপুরের পদ-লেহনের জন্য গমন' অপেক্ষাও এ কার্য্য ঘৃণিত। ইহাতে রবীন্দ্র নিজেও নিশ্চয় লজ্জিত হইবেন। এই সকল নির্লজ্জ লোকের কার্য্যাবলী চিন্তা করিলে, আপাদমস্তক জলিয়া যায়। শত শত জনের গ্রন্থ লইয়াই সাহিত্যের গৌরব ;—আপন আপন বিশেষত্বে সকলেই বড়, সকলকে আদর করাই উচিত। বিধাতা এই শ্রেণীর একদেশদর্শী সাহিত্যিকদিগের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করুন। এইরূপ দলাদলি ও ভেদাভেদ-সৃজনে দেশের সমূহ অমঙ্গল হইতেছে।"

—নব্যভারত, পৌষ।

অতি-মানুষ-পূজা

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-অনুসারে অক্ষমদিগের বিনাশ-সাধন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মানুষ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রতিরোধ করিয়া অক্ষমদিগকে রক্ষা করিতেছে। নীটশে (দুঃখবাদ প্রত্যাখানকারী জার্ম্মান দার্শনিক) মানুষকে সাধারণ শ্রেণীর উপরে উঠিতে বলিতেছেন। সাধারণ মানুষের বিনাশ-সাধন করিয়া, অতি-মানুষ সৃষ্ট হইবে, এবং এই অতি-মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সৃষ্টি হইবে।

আমাদিগকে কি এই অতি-মানুষ-পূজার দোষগুণ বিচার করিতে হইবে? অতি-মানুষ পূজা আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাধনা। অতি-মানুষ-পূজা শক্তি-পূজা ও একদিক হইতে দেখিলে বিশেষ প্রভেদ নাই। Super-man—সে এক হিসাবে সিদ্ধ-তান্ত্রিক। জর্ম্মাণির অতি-মানুষ-পূজা এক হিসাবে আমাদের শক্তি-পূজার নামান্তর মাত্র।

কিন্তু জর্ম্মাণির অতি-মানুষ-পূজার ব্যক্তি আপনাকে কোন নিয়মের অধীনতা স্বীকার করেন না, কিন্তু তান্ত্রিক আপনাকে ভগবানের যন্ত্র বলিয়া অনুভব করেন। তিনি ঈশ্বরের নিয়মের অধীনতা স্বীকার করেন। তাই, তান্ত্রিকের শক্তি—সৃষ্টিস্থিতির শক্তি এবং অতি-মানুষের শক্তি—প্রলয়ের শক্তি। অতি-মানুষ, শক্তি অর্জ্জন করিয়া, আপনার শক্তি-প্রতিষ্ঠায় মাতোয়ারা থাকেন ; দীনহীন, আর্ত্ত-অনাথ-দিগের উপর অত্যাচার করিয়া আপনার গৌরব অনুভব করেন। তান্ত্রিক শক্তি-অর্জ্জন করিয়া, শক্তিময়ী শক্তিভূতার নিকট প্রার্থনা করেন—

'শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি নারায়ণি নমস্তুতে॥'

অনেক আশা করিয়াছেন, জর্ম্মাণ জাতির অতি-মানুষ-পূজা ও অতি-জাতির স্পর্দ্ধা যুদ্ধের দ্বারা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইলে, সভ্যতা রক্ষা পাইবে, বিশ্বজগতের পক্ষে মঙ্গল হইবে। কিন্তু যুদ্ধ, বা জয়-পরাজয়ের দ্বারা সভ্যতা রক্ষা হইবে না। প্রতিকূল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি আরও উদ্দাম হইবে। অতি-মানুষকে হঠাইতে গেলে, অতি-মানুষ আরও উগ্র—আরও ভয়ঙ্কর হইবে। অতি-মানুষ হঠিলে, তাহার দর্প ও স্পর্দ্ধা বিনষ্ট হইবে না, তাহার অহঙ্কার সুপ্ত থাকিবে।

আবার নূতন খৃষ্ট নূতন বেশে আসিয়া—মৈত্রী, করুণা ও প্রেমের বাণী প্রচার না করিলে, য়ুরোপকে পুনরায় নূতন সেবা ধর্ম্মে না দীক্ষিত করিলে, অতি-মানুষের বিনাশ নাই, ইউরোপে শান্তি নাই, জগতের মঙ্গল নাই, সভ্যতার মুক্তি নাই। নূতন খৃষ্ট কোথা হইতে আসিবেন? কবে আসিবেন? তাঁহার বোধন মন্ত্র কাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন? মঙ্গল-ঘট কাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন?

—উপাসনা, পৌষ।

শিক্ষা।

বঙ্গে উচ্চ-শিক্ষা

"১৯১২-১৩ সালের উচ্চ-শিক্ষা রিপোর্ট।—বাঙ্গালার পরিধি ৭৮ হাজার ৬ শত ৯৩ বর্গ মাইল। ইহার অধিবাসী ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৭টী। এবার ৩৬টী স্কুল-কলেজ কমিয়াছে; কিন্তু ২০ হাজার ৯ শত ৯টী ছাত্র বাড়িয়াছে। মোট ছাত্রসংখ্যা ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৬ শত ২৩টী। কোথায় কিরূপ ছাত্র হিসাব লউন,—কলেজিয়েট-শিক্ষা ১৫,৭৩৮টী; স্কুলশিক্ষা (সাধারণ) ১,৫৪৯,৪৪৯; স্কুলশিক্ষা (বিশিষ্ট) ৯৭,৫৭৮; প্রাইভেট স্কুল ৫৫,৮৫৮টী। এই সকল পড়ুয়ার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্ম্মীর শতকরা হিসাব লউন,—

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
কলেজিয়েট শিক্ষা	৯১	৭	২
স্কুলশিক্ষা (সাধারণ)	৫৫	৪৩	২
স্কুলশিক্ষা (বিশেষ)	২০	৭৯	২
প্রাইভেট স্কুল	২৪	৭৩	২"

—হিতবাদী।

বঙ্গে প্রাথমিক-শিক্ষা

"আমাদের শিক্ষাবিভাগে ডাইরেক্টর মিঃ হর্ণেল সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্টে প্রকাশ, আলোচ্য সময়ের মধ্যে ১৪০টী উচ্চ প্রাথমিক ও ৩৬৫টী নিম্ন-প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ১৭,২৯২টী হিন্দু বালক ও ২৯৭৪টী হিন্দু বালিকা, এবং ৫৪২১টী মুসলমান বালক ও ১৫৮৮টী মুসলমান বালিকা গত বৎসরের সংখ্যার তুলনায় কম হইয়াছে। অর্থাৎ, আলোচ্য সময়ের মধ্যে ৫০৫টী প্রাথমিক স্কুল উঠিয়া গিয়াছে এবং ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, গত বৎসরের তুলনায় ২৭, ২৭৫ জন ছাত্র কমিয়া গিয়াছে। মিঃ হর্ণেল বলিতেছেন, মর্য্যাদা হ্রাস, শুধু বাঙ্গলা শিক্ষার প্রতি লোকের অনিচ্ছা, জনসাধারণের সাহায্যের অভাব, খাদ্য-শস্যের মূল্য-বৃদ্ধি এবং 'গুরু'দিগকে বিশেষ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা না করিয়া, কেবল আইন-কানুনের বজ্র-বাধন, এই পাঁচ দফা কারণে প্রাথমিক শিক্ষার এই অধোগতি হইয়াছে।"—এডুকেশন গেজেট।

বঙ্গে চিকিৎসক ও ব্যবহারাজীব

"সমগ্র বঙ্গে ১,৩৩১৯ জন চিকিৎসক এবং ৪৮,১২২ জন উকীল মোক্তার আছেন। এই সকল উকীল-মোক্তারের অধীনে ২৬,৬.৬ জন মুহুরী কার্য্য করিয়া থাকেন।"

—বিশ্ববার্ত্তা।

ভারতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

"নিম্নোদ্ধৃত তালিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ভারতবর্ষে কত লোক শিক্ষিত, কত লোক নিরক্ষর, তাহা জানা যাইবে। (১৯১১।১০ মার্চ্চ, সেন্সাসের বিবরণী)। সামান্য চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে, এইরূপ লোককেও শিক্ষিতদের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

শিক্ষিত

ধর্ম্ম	ব্যক্তি	পুরুষ	নারী
সকল ধর্ম্ম	১৮৫৩৯৫৭৪	.৬৯৩৮৮১৫	১৬০০৭৬৩
হিন্দু :			
ব্রাহ্মণ্য	১১৯৯৭৪৭১	১৯১৮৯৮৯৮	৮০৭৫৭৩
আর্য্য	৩৭১২৯	৩১৩৫৭	৫৭৭২
ব্রাহ্ম	৩৩৩৪	১৮৭৮	১৪৬৫
মুসলমান	২৫২৭৫৭৩	২৩৯৮৭৭৬	১৩৭৮০৭
পার্শী	৭১২১৩	৩৯৯৯৫	৩১২১৮
খৃষ্টান	৮৪০৮৬৫	৫৮৮৫৭০	২৫২২৯৫

নিরক্ষর

ধর্ম্ম	ব্যক্তি	পুরুষ	নারী
সকল ধর্ম্ম	২৯৪৮৭৫৮১১	১৪৩৪৭৯৬৫৫	১৫১৩৯৬১৫৬

হিন্দু :			
ব্রাহ্মণ্য	২০৫৪৪১৫০৯	৯৯৫৯৩৬৩৯	১০৫৮৪
			৭৮৭০
আর্য্য	১০৫৫৫২	৪৮২৯৪	৫৭৩৮
ব্রাহ্ম	১৪৬০	৬৬৪	৭৯৬
মুসলমান	৬৪০৬৫৬০৪	৩২৩১৯৫০৯	৩১৭৪
			৬০০৫
পার্শী	২৮৮৮৩	১১১২৮	১৭৭৫৫
খৃষ্টান	৩০৩৫৩৩১	১৪২২১৫৪	১৬১৩১৭৭

ভারতবর্ষের কোন্ ধর্ম্মের, কত পুরুষ, কত নারী ইংরাজী জানেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

ধর্ম্ম	ব্যক্তি	পুরুষ	নারী
সকল ধর্ম্ম	১৬৭০৩৮৭	১৫২৮৩৬১	১৫২০২৯
হিন্দুঃ			
ব্রাহ্মণ্য	১০২৮৯৯৬	১০০৬১৯২	২২৬০৪
আর্য্য	৫৮৬৮	৫৭২৫	১৪৩
ব্রাহ্ম	২৩৯১	১৪৯৭	৯১২
মুসলমান	১৭৯৮৯১	১৪৬৪১	৩৯৪০
পার্শী	৩৩৬৮১	২৬৩৩৪	৮৩৫৬
খৃষ্টান	৩৬৫২১৪	২৫ ৫৯১	১১২৬৪৩”

—সঞ্জীবনী।

বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা

১৯০৮-৯ সনে—

	হিন্দু—মুসলমান—অন্যান্য জাতি		
“উচ্চ ইংরেজি স্কুল	৬২০	৬	৩১৫
মধ্য ইংরেজি স্কুল	৩৫৫	৪	৭৯৬
মধ্য বাংলা স্কুল	১২৫২	৭	৫৫৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২৩৫৫	৯৪৯১	৭৩৯৯
ট্রেনিং স্কুল	১২৯	৬	৩০০
অন্যান্য বিশেষ বিদ্যালয়	৪৪৫	১১১১৮	৫৪৩
প্রাইভেট স্কুল	১৭৮৪	১৬২১	৫৩১
মোট	১২৬৯১০	২২২২৪৮	১০৩০০

১৯০৯-১০ সনে—

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য জাতি।
উচ্চ ইং স্কুল	৬৪৩	৫	৪৪৭
মধ্য ইং স্কুল।	৪১৬	৪	৭২৪
মধ্য বাং স্কুল	১৩১০	৯৪	৬৬৪
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৬৮৯৭	১০২২৬	৭৩৩৭
ট্রেনিং স্কুল	১৭	„	১৭৫
অন্যান্য বিশেষ বিদ্যালয়	৬০৫	১৩৪৭৬	৩৪০
প্রাইভেট স্কুল	২৩৬৮	১২৭৩	৪২৩
মোট	১৩২২৫৬	২৫০৪৮	১০১১০

১৯১০-১১সনে—

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য জাতি।
উচ্চ ইং স্কুল	৬০৯	৫	৫৯০
মধ্য ইং স্কুল	৪২০	৯	৯২৫
মধ্য বাং স্কুল	১৫১৪	৩৪	৭৭৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯০৩৮	৯৮২১	৬৬৯৫
ট্রেনিং স্কুল	১১	২	১৫৬
অন্যান্য বিশেষ বিদ্যালয়	৫৭৬	১৭১৯৩	৬৩৭
প্রাইভেট স্কুল	২৯০৬	৯৪৭	৩৪৩
মোট	১৩৫০৭৪	২৮০১১	১০১১৯

১৯১১-১২ সনে—

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য জাতি।
উচ্চ ইং স্কুল	১০৬২	৪৬	৬৪২
মধ্য ইং স্কুল	৭৭২	৫২	৪৪৩
মধ্য বাঙ্গালা স্কুল	২৩৭৪	৩৫	৪৪৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৪৯৭৭	১৯২৮৩১	৪৪৫৯
ট্রেনিং স্কুল	৩২	১১	৬৮
অন্যান্য বিশেষ বিদ্যালয়	৪২৪	৯৯৭৮	৩০৩
প্রাইভেট স্কুল	১৭০৩	৬৮০৯	৪৯০
মোট	১২১৩৪৪	২০৯৭৮২	৬৮৫৩

১৯১২-১৩ সনে—

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য জাতি।
উচ্চ ইং স্কুল	১২৬৩	৪৩	৮৪২
মধ্য ইং স্কুল	৮২৮	৪৯	৫৬৯
মধ্য বাংলা স্কুল	২৬৯৭	১১৪	৩৬৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২২৫৯৪	৭৬০৮৪	৪৮৯৭
ট্রেনিং স্কুল	৫০	৪	৮৪
অন্যান্য বিশেষ বিদ্যালয়	৬৭১	১১৬০৫	২৭৮
প্রাইভেট স্কুল	১৭৪৫	৬৮৯৮	৩৯৭
মোট	১২৯৬১০	৯৪৭৯৭	৭২৫৪”

—শিক্ষা-পরিচর।

পুস্তক-পরিচয়

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস

[শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পুতিতুণ্ড প্রণীত—মূল্য এক টাকা]

গ্রন্থকার মহাশয় 'বরিশাল শাখা-সাহিত্য-পরিষদে' চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে, সেই প্রবন্ধের সহিত অন্যান্য বিষয় সংযোজিত করিয়া, এই ইতিহাসখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তী এবং বারভূঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই ইতিহাস প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকার মহাশয়কে যে, অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এপ্রকার প্রথম চেষ্টায় অনেক ত্রুটী থাকিয়া যায়, ভবিষ্যতে সেগুলি সংশোধিত হইতে পারিবে। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বিবরণ শুনিবার জন্য বাঙ্গালী মাত্রেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক; পুতিতুণ্ড মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, সকলেই অনেক পুরাতন ও নূতন তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পরিচয়-পত্র

[ট্রষ্টীদের আদেশানুসারে মুদ্রিত—মূল্য দুই আনা]

কলিকাতার যাদুঘর অনেকেই দেখিতে যান; তাঁহারা নানা কক্ষ ঘুরিয়া, যাহা যাহা চক্ষে পড়ে তাহা দেখিয়া আসেন; হয় ত অনেক ঘরের অনেক জিনিস দেখাও হয় না, বা তাহাদের সম্বন্ধে তথ্যও জানা হয় না। এইসকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য 'মিউজিয়ম্' বা যাদুঘরের ট্রষ্টী মহাশয়েরা এই পরিচয়-পত্রখানি ছাপাইয়াছেন। ইহাতে যাদুঘরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদি কোথায় কোন্ ঘরে আছে, তাহার পরিচয় দিয়াছেন, এবং দ্রষ্টব্য বস্তু সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। 'মিউজিয়ম্' দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে, দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া, এই পরিচয় পত্র এক একখানি কিনিয়া লইলে, দেখিবার ও জানিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

বর্ণ-চিত্রণ বা পেণ্টিং-শিক্ষা

[শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী-প্রণীত—মূল্য ১৲ টাকা]

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক, 'আলোক-চিত্রণ' 'ছায়া-বিজ্ঞান' 'চিত্র-বিজ্ঞান' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু যে একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তিনি শিল্প-আলোচনাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার এই 'বর্ণ চিত্রণ' যে, সর্ব্বাংশে চিত্র-শিক্ষার্থীদিগের উপযোগী হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। মন্মথ বাবু দুঃখ করিয়াছেন যে, 'আমাদের দেশের লোকের শিল্প শিক্ষা ও তাহার আলোচনায় বিতৃষ্ণা লক্ষিত হয়।'—আমরাও এ কথা অস্বীকার করি না; কিন্তু সুখের বিষয় যে, আজকাল বাতাস একটু ফিরিয়াছে, এখন চিত্র-শিল্পের দিকে শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। এসময়ে মন্মথ বাবুর ন্যায় প্রসিদ্ধ শিল্পীর প্রণীত এই 'বর্ণ চিত্রণ' বিশেষ আগ্রহের সহিত পঠিত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। এই পুস্তকে মন্মথ বাবু চিত্র-শিল্পের যে সূত্র-পঞ্চক লিখিয়াছেন, তাহা চিত্রশিল্পের মূলসূত্র বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তাহার পর, তিনি প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণ (Portrait painting), নিসর্গ চিত্র (Landscape painting), তৈল-চিত্রণ (Oil painting), প্রতিমূর্ত্তি চিত্রণে দেহবর্ণ (Flesh colour) প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে ও শিক্ষালাভ করিলে, 'বর্ণ-চিত্রণ' সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। আমরা বলিতে পারি, মন্মথ বাবুর এ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

জৈনধর্ম্ম

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত—বঙ্গীয়-সার্ব্বধর্ম্ম-পরিষৎ-গ্রন্থমালার অন্তর্গত]

এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের কিয়দংশ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; গ্রন্থকার অবশিষ্ট অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া, এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। কাশীর 'সার্ব্বধর্ম্ম-পরিষদে'র চেষ্টায় ও যত্নে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে; উক্ত পরিষদের মন্ত্রী—কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র প্রসাদ জৈন মহাশয় এজন্য সকলেরই ধন্যবাদভাজন। ভারতবর্ষে প্রায় ১৫ লক্ষ জৈনধর্ম্মাবলম্বী লোক আছেন। ইঁহারা দেশের সর্ব্বত্র নানা কার্য্যোপলক্ষে বসবাস করিতেছেন, অথচ ইঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক শিক্ষিত লোকেও অবগত নহেন; ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে, জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে স্থূল কথাগুলি সকলেই অবগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, এবং জৈনধর্ম্মের মূল-সূত্র অতি

সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানির মূল্য কত তাহা লেখা নাই।

ছায়ালোক

[শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,-প্রণীত—মূল্য ১৷০ টাকা]

সুবোধ বাবু মাসিক-পত্রিকায় সময়ে সময়ে যে সমস্ত ছোট-গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহারই নয়টি একত্র সংগ্রহ করিয়া, এই 'ছায়ালোক' প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি তাঁহার অগ্রজ পরলোকগত নফর বাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই গল্প কয়েকটিতে সুবোধ বাবুর ছোট-গল্প লিখিবার শক্তি সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ছায়া', 'প্রত্যাখ্যান', 'মধুয়া', 'হিসাবের খাতা' প্রভৃতি গল্পে সুবোধ বাবু যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ মনোজ্ঞ। 'ছায়ালোক' সুবোধ বাবুর প্রথম পুস্তক; কিন্তু এই প্রথম পুস্তকখানি পাঠ করিয়াই সকলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন। এই সকল গল্প যখন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইত, তখন অনেকেই সেগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই—সমস্তই উৎকৃষ্ট।

বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাস

[শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত—মূল্য ৵০ আনা]

'গৌহাটী—সনাতন ধর্ম্মসভা' 'সমাজ-সেবক পুস্তকাবলি' নাম দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন; 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস' তাহারই একখানি। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় 'রাজসাহী সাহিত্য সম্মিলনে'র সভাপতিরূপে কয়েকটি কথা বলেন। পরে তিনি 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন; সেই প্রবন্ধে তিনি তাঁহার রাজসাহীর অভিভাষণ হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করেন। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, প্রফুল্ল বাবুর সেই উদ্ধৃত কথাগুলির প্রতিবাদ করিয়া, এই ভ্রান্তি-নিরাস লিখিয়াছেন এবং সমালোচনার জন্য একখণ্ড আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই পুস্তিকাখানির পরিচয়মাত্রই প্রদান করিলাম। এত দীর্ঘকাল পরে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করাই ভাল।

ঈশ্বরের স্বরূপ

[শ্রীকালীচরণ সেন বি. এল-প্রণীত—মূল্য ৵০ আনা]

এখানিও 'গৌহাটী সনাতন ধর্ম্মসভা'র 'সমাজ-সেবক পুস্তকাবলি'র অন্তর্গত। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি প্রভৃতি এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয়টি গুরুতর; এসম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত কালীচরণ বাবু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সেই চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য, তিনি সকল কথা বিশদ করিয়া বলিবার অবকাশলাভ করেন নাই; কিন্তু এত ছোট একখানি বইয়ের মধ্যে যতটুকু বলা যাইতে পারে, তিনি তাহার ত্রুটী করেন নাই। এ শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কেশব-জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা

[শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর, বি এ.-কর্ত্তৃক সম্পাদিত—মূল্য ৷ আনা]

পরলোকগত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জননী দেবী সারদাসুন্দরী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল বাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে যে আত্মকথা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতি সহজ ও সরল ভাবে দেবী সারদাসুন্দরী তাঁহার জীবন-কথা বলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা এই আত্মকথায় বিবৃত হইয়াছে। দেবী সারদাসুন্দরী, তাঁহার মধ্যমপুত্র কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে অতি কম কথাই বলিয়াছেন; কারণ, যখনই কেশবচন্দ্রের কথা উঠিয়াছে, তখনই তিনি বলিয়াছেন যে, কেশবের জীবনকথা অনেকেই বলিয়াছেন, সকলেই জানেন। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন সম্বন্ধে অনেক কথা এই গ্রন্থে বলিয়াছেন। কৃষ্ণবিহারী বাবুকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, কৃষ্ণবিহারী কেশবচন্দ্রের উপযুক্ত ভ্রাতা ছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী বাবুর উপর সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাত্রা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কেশবচন্দ্র যে 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই মাতারই গুণে—তাহাও এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যোগেন্দ্রলাল বাবু এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া, বঙ্গবাসী মাত্রেরই বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

খাজনার আইন

[শ্রীদীননাথ বসু, বি. এল.-প্রণীত—মূল্য পাঁচ সিকা।]

বঙ্গদেশের 'প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সত্ত্ব' সম্বন্ধে প্রচলিত ১৮৮৫ সালের ৮ আইন। ইহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ১৯০৭ সালের ১আইন ও পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের ১৯০৮ সালের ১ আইন এবং বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমস্ত পরিবর্ত্তন ও নজীর দেওয়া হইয়াছে। এখানি বসু মহাশয়ের 'প্রণীত' না বলিয়া 'সঙ্কলিত' বা 'সংগৃহীত' বলিলেই ভাল হইত। খাজনা আইনের সমস্ত কথাই ইহাতে আছে; যাঁহাদের জমিজমা আছে, মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

শরীর-পালনবিধি

[শ্রীরাধাকিশোর কর প্রণীত—মূল্য ৵০ আনা]

স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বড় বড় পুস্তক অনেকে প্রকাশিত করিয়াছেন; কিন্তু সেগুলির দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। অনেকগুলি আবার এমন ভাষায় লিখিত যে, খুব শিক্ষিত লোক ব্যতীত অপরের তাহা বোধগম্য নহে; অথচ শরীর-পালন সম্বন্ধে এই 'অপর' লোকেরই শিক্ষালাভের প্রয়োজন তাহারাই ত দেশের পনর আনা। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর (ডাক্তার আর. জি. কর) সরল সুন্দর ও সহজবোধ্য গাথায় শরীর-পালনসম্বন্ধে নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর কর মহাশয়কে আদেশ করেন। তাহারই ফলে এই গ্রন্থের প্রকাশ। শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর বাবু যুক্তাক্ষরবিহীন সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য কবিতায় এই শরীর-পালন-বিধি লিখিয়াছেন। ইহাতে পানীয় জল দূষিত হইলে তাহার অপকারিতা, বাজারের খাবার খাওয়ার অপকারিতা, মাদকদ্রব্য সেবনের অপকারিতা, ব্যায়ামের উপকারিতা প্রভৃতি শরীর-পালনের অবশ্যজ্ঞাতব্য সাধারণ বিধি সকল গাথাকারে লিখিত হইয়াছে। কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে; আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি এগুলি স্মৃতিবদ্ধ করিয়া রাখে এবং সময়ে সময়ে আবৃত্তি করে, তাহা হইলে এইসকল কথা জানিয়া শুনিয়াও শরীর-পালনের সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা হইতে পারে। পুস্তকখানির বহুলপ্রচার প্রার্থনীয়; আমাদের বিদ্যালয়সমূহে এই পুস্তকখানি পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিলে ভাল হয়।

জীবন-চিত্র

[শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-সম্পাদিত—মূল্য ১৲ টাকা]

সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থে ২৩ জন সাধক, ভক্ত, উপাসক, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতির জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ২৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে ২৩ জন মহাত্মার জীবন-কথা লিখিতে হইয়াছে, সুতরাং বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও, যাঁহাদের কথা লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সম্পাদক মহাশয় যথাসম্ভব দিয়াছেন। ইহাতে ২৪খানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল। যাঁহাদের সুবৃহৎ জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিবার অবসর নাই, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, কয়েকজন মহাত্মার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অবগত হইতে পারিবেন।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—মেরুতত্ত্ব

[শ্রীবিনোদবিহারী রায়-প্রণীত—মূল্য, কাগজে বাঁধাই, ১৷০ টাকা]

এখানি শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের পৃথিবীর পুরাতত্ত্বের দ্বিতীয় খণ্ড—মেরুতত্ত্ব, অর্থাৎ মেরু, সুমেরু ও মহামেরুতত্ত্ব। গ্রন্থকার ভূমিকায় দুঃখ ও আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার 'পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব' প্রথমখণ্ড তিন বৎসরে দুইশত খানি মাত্র বিক্রীত হইয়াছে; এই দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশ করিতে তাঁহার বাসগৃহাদি দ্বিতীয়বার বন্ধক পড়িল। তিনি 'মাতৃভাষার সেবার জন্য' এই ঋণ করিলেন, যদি শোধ করিতে না পারেন, 'বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ তাহা শোধ করিবেন।' আমরা বলি, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ যদি তাহাই করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথমখণ্ড দুই শত মাত্র বিক্রয় হইবে কেন? তবে, এ আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। তাঁহার এই 'মেরুতত্ত্ব' পাঠ করিবার জন্য লোকের একান্ত আগ্রহ হয় নাই; সেই আগ্রহ জন্মাইতে হইবে; এবং তাহা জন্মাইবার জন্ত রায় মহাশয়ের ন্যায় কৃতী ব্যক্তিগণের ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। গ্রন্থকার রায়মহাশয় এই গ্রন্থে 'আর্য্যদের উত্তর মেরুতে আদি-বাস', 'হিমশিলাপাতে ঐ প্রদেশ নষ্ট,' 'সুমেরু-প্রদেশে আর্য্যদিগের আগমন,' 'জলপ্লাবন' এবং 'মহামেরুতে আর্য্যগণের আগমন' বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানির পরিচয়মাত্র দিলাম, তাঁহার প্রমাণসমূহ কতদূর যাতসহ, তাহা ঐতিহাসিকগণের বিচার্য্য।

আকাশ-কাহিনী

[শ্রীকৃষ্ণলাল সাধু, এম. এ প্রণীত—মূল্য ১৲ টাকা]

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় এই পুস্তকের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। সাধু মহাশয় কবিতা, গল্প প্রভৃতি না লিখিয়া যে, 'আকাশ-কাহিনী' লিখিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে হয়; তিনি সাধুজনোচিত কার্য্যই করিয়াছেন। এই গ্রন্থে জ্যোতির্ব্বিভাগের কোন মৌলিক গবেষণা নাই জ্যোতিষের যে সকল বিষয় বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই সার-সকল কৃষ্ণলাল বাবু সরল ও সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। এ সকল কথা এমন সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়া, কৃষ্ণলাল বাবু বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উন্নতি বিধান করিয়াছেন। এই সুন্দর পুস্তকখানি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত হওয়া প্রার্থনীয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের কথা, চন্দ্রের গতি, সূর্য্য, আলোক, পৃথিবী, সৌরজগৎ, ধূমকেতু ও উল্কা, ও জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য এই আকাশ কাহিনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

নারী-পঞ্চ-চত্বারিংশ

[শ্রীমতী শরৎকুমারী সিংহ-কর্ত্তৃক বিরচিত—মূল্য ৸০ আনা]

গ্রন্থকর্ত্রী এই পুস্তকে অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় বর্ত্তমানকালে নারীজাতির প্রকৃত অভাব কি, এবং কি উপায়েইবা গৃহের শান্তি ও নারীজাতির উন্নতি হইতে পারে, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকে কোন উৎকট-আদর্শ সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই; যে সকল ঘটনা সম্ভবপর, তাহারই উল্লেখ করিয়া তিনি নারী-জাতির কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভাষা অতি

সুন্দর এবং লেখিকার বর্ণনাকৌশলও প্রশংসনীয়। আমাদের পুরলক্ষ্মীরা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃতা হইতে পারিবেন।

কনক-রেখা

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম. এ., বি-এল্. প্রণীত—মূল্য ৸৹ আনা।]

এগারটি ছোট-গল্প সমন্বয়ে এই পুস্তকখানি গ্রথিত। আজকাল 'ছোট-গল্প' অনেকেই লেখেন; কিন্তু তাহার অধিকাংশেই না আছে রচনা কৌশল, না আছে রসমাধুর্য্য। এগুলি সে শ্রেণীর নয়—ইহার প্রত্যেকটিতেই বেশ একটু 'আর্ট' আছে, রচনা পারিপাট্য ও ভাব-বিন্যাস আছে। বিচিত্র মনোবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি—ঘটনা-পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী শেষ-ফল—ধর্ম্মের প্রভাব—পরিভাষা-রহস্য—সামাজিক রীতি-নীতি বিভ্রাটের বিসম্বাদী দৃশ্য প্রভৃতি এই গল্পগুলিতে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে ব্যবহারাজীব, তাহাও তাঁহার 'চার্লীবাবা'র ন্যায় গল্প এবং 'রফারফিংৎ' 'অব্‌জার্ভ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইতেই সূক্ষ্মদর্শকদিগের নিকট সহজেই প্রতীয়মান হয়। তবে, আমাদের মনে হয়, গুপ্ত-মহাশয় যদি তাঁহার এই গল্প-গুচ্ছ হইতে 'শব্দ-বিভ্রাট'টি পরিবর্জ্জন করিতেন, 'ইতিমধ্যে' কথাটাকে আধুনিক প্রচলিত 'ইতঃমধ্যে' পরিণত করিতেন, আর punctuation (ছেদাদি সংযোজনা) সম্বন্ধে একটু মনোযোগী হইতেন—নব্য ভাষা-সংস্কারকদলের অনুসরণে স্থানে-অস্থানে উদ্ধারণ-চিহ্ন প্রভৃতির লোপ সাধন না করিতেন—তাহা হইলেই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আর একটা কথা,—'নকদী'?—না, 'নগ্‌দী'? শেষ কথা, 'কনক-রেখা' কনক-রেখার মতই স্নিগ্ধোজ্জ্বল—পুস্তকখানির ছাপা-বাঁধাই অতি পরিপাটী, মূল্যও সে অনুপাতে যথেষ্ট অল্প ধার্য্য হইয়াছে।

শিক্ষা

[শ্রীজীবনকৃষ্ণ তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক-সঙ্কলিত—মূল্য ৵৹ আনা]

'শিক্ষা'র উদ্দেশ্য অতি মহৎ। 'গৃহীর কর্ত্তব্য' প্রত্যেক গৃহস্থের শিক্ষণীয়। বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম্ম উপার্জ্জন; ব্যসন, কুসংসর্গ, মিথ্যা-বাক্য ও কলহ পরিত্যাগ; মৃদু, সত্য, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য প্রয়োগ; পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা পরিত্যাগ—প্রত্যেক সংসারীর অবশ্যকর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র-পুস্তিকা সমাজে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে পারিলে, সমাজের প্রকৃত হিতসাধন করা হয়। 'নীতি-স্তম্ভে'র উপদেশগুলি সকলেরই সর্ব্বথা পালনীয়।

জিনেন্দ্র-মত-দর্পণ

[কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ জৈন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত—বিনামূল্যে বিতরিত]

এখানি সাহারাণপুরের শ্রীযুক্ত বাণারসী দাস, এম. এ., এল. এল. বি.-বিরচিত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাতে জৈন-ধর্ম্মের প্রাচীনতা, এবং বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের প্রভেদ-প্রতিপাদক যে প্রমাণগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি সকলেরই অনুধাবনযোগ্য। ক্যাপ্টেন্ ও. একফোর্ডলুয়ার্ড, এম. এ., স্যর্ উইলিয়ম্ হণ্টর্, পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক, ভিন্ন মতাবলম্বী কান্নুলাল, ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মনস্বিবর্গের এবং তিব্বতের প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ, 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রভৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থচয়ের অভিমতে জৈনমত, বৌদ্ধ মতাপেক্ষাও প্রাচীন। 'মন্তব্য-স্তম্ভে', আমি কে?'—'সংসার কি?—'আমার কর্ত্তব্য কি?'—এই ত্রিবিধ প্রশ্নসম্বন্ধে জৈনমত প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী মাত্রের এইক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠের আবশ্যতাও প্রচুর।

জৈনতত্ত্বজ্ঞান ও চারিত্র

[শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত-কর্ত্তৃক অনুবাদিত—বিনামূল্যে বিতারিত]

এখানি জর্ম্মণ অধ্যাপক এচ্, জ্যাকবি-রচিত 'The 'Metaphysics and Ethics of the Jains' নামক পুস্তক হইতে দত্তজ মহাশয় কর্ত্তৃক অনুদিত। যাবতীয় পদার্থের মূলে এক শাশ্বত আত্মা বিদ্যমান এ কথা বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণগণের ধারণা—আত্মা এক, নিত্য, অদ্বিতীয়। ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, উপনিষদের, সাঙ্খ্যদর্শনের এবং সাধারণ বুদ্ধির মতের, পরস্পর ঐক্য আছে। জৈন মতানুসারে 'আত্মা' অর্থাৎ জীব ব্যতীত সমগ্র ভৌতিক জগৎ পুদ্গল (Matter) হইতে জাত। এবিষয়ে সাঙ্খ্যদর্শনের এবং জৈন-মত এক। জৈন-মতের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শনই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

সাময়িক স্তোত্রপাঠ

[ব্রহ্মচারী শীতলপ্রসাদ জৈন-সম্পাদিত—মূল্যধ্যান্]

পুস্তিকাখানি শ্রীঅমিতগতি সূরি-বিরচিত সংস্কৃত 'জৈন-পাঠ' হইতে ভাষায় অনুবাদ। 'আমার আত্মায় যেন কোন ক্ষুদ্রভাব জাগ্রৎ না হয়' ইত্যাদি স্তোত্র সকলেরই পাঠ ও অনুধাবনযোগ্য।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়, বি, এল্,-লিখিত সংস্কৃত কবিতা, শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. বি. এল্,-রচিত—বাঙ্গালা পাঁচালী—মূল্য ৵৹ আনা]

পাঁচালীর নমুনা—

"লক্ষ্মী বলে 'হবে তাই—রব আমি দেশে,
হিন্দু-মুসলমানে তেঁহ দেখিবে সমান।" ইত্যাদি—

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে প্রচারিত হউক! তবে, বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হইয়াছে; এখনও—

"মোটা অন্ন খা'ব সবে—
ভুল্‌ব না গো—ভুল্‌ব না;
মোটা কাপড় পর্‌ব মোরা—
ছাড়্‌ব না গো—ছাড়্‌ব না!"

এই প্রতিজ্ঞা বাঙ্গালী চিরতরে পালন করিলেই মঙ্গল।

প্রতীচ্য-সাহিত্যে প্রাচ্য-কথা

আমাদের প্রাচ্যের কথা, পাশ্চাত্য প্রদেশবাসিগণ যত আলোচনা করেন,—এদেশের মহৎ-জীবনী সাহিত্য ইতিহাস, উপকথা প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতি সকল বিষয় আলোচনা গবেষণায় প্রতীচীবাসিগণ যতটা আগ্রহ যত্ন করেন—আমরা তাহার তিলার্দ্ধও করিনা। আবার যাহাও করি, তাহা প্রধানতঃ তাঁহাদেরই সংগৃহীত মাল মসলা লইয়াই করি। সুতরাং প্রতীচ্য-সাহিত্যে প্রাচ্য বিষয়ক কি কি অভিনব পুস্তকাদি প্রকাশিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলে বিশেষ ইষ্ট ও উপকার সাধিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই ধরণার বশবর্ত্তী হইয়া, বিগত নভেম্বর মাসে ইংরেজী সাহিত্যে প্রাচ্য বিষয়ক যে সকল নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই বিশিষ্ট কয়েকখানির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জানি না, পাঠকবর্গ কর্ত্তৃক ইহা কি ভাবে গৃহীত হইবে।—এবার তাই নিতান্ত সংক্ষেপেই মাত্র প্রধান খানকয়েক পুস্তকের কথাই বলিব। যদি এই আভাস তাঁহাদের মনোনীত হয়, তাহা হইলে অতঃপর প্রতিমাসেই অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে প্রতি পূর্ব্বমাসে প্রকাশিত প্রাচ্য-বিষয়ক যাবতীয় ইংরেজী পুস্তকের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

HISTORY OF UPPER ASSAM, UPPER BURMAH AND THE N. EASTERN FRONTIER. —BY COLONEL SHAKESPEAR.

কর্ণেল্ সেক্স্‌পীয়ার্-প্রণীত 'উত্তর আসাম, উত্তর ব্রহ্মদেশ এবং ঈশানদিগস্থ সীমান্ত প্রদেশের ইতিহাস।' ভারতের এই অংশের প্রাকৃতিক বিভব-সম্ভারের প্রতি সম্প্রতি লোকচক্ষুর লোলুপদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আসামের সীমান্তবাসী বিবিধ বন্যজাতির বিচিত্র জীবন-প্রণালী ও রীতি-নীতির বিবরণাদি বিদিতার্থে, ইতোপূর্ব্বে নানা পুস্তক উল্টাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইত, অথচ তেমন সুচারুরূপে সুস্পষ্ট বিশদ বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ ছিল না। কর্ণেল্ সেক্স্‌পীয়র্ এতদিনে সে অভাব মোচন করিলেন। তিনি যথা-সম্ভব অন্বেষণ ও সঙ্কলন করিয়া এতৎকল্পে বহুকালব্যাপী পর্য্যটন ও পরিশ্রম, এবং প্রভূত ব্যয় স্বীকার করিয়া—নানা তথ্য-সংগ্রহ এবং তৎসমূহ যথাযথভাবে সংযোজিত করিয়া, এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। এককালে যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহার বর্ত্তমান বিবরণই অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। পৌরাণিক স্মৃতিবিজড়িত অর্জ্জুনের নির্ব্বাসন-প্রদেশ—নাগকুলের বিহার ভূমি—প্রকৃতিদেবীর কাম্যকানন—খনিজ রত্নসম্ভারগর্ভ—বহুবিধ বিচিত্র বন্য-জাতির বাসস্থলী, ভারতের এই নাতিক্ষুদ্র কোণের যথাসম্ভব ইতিকথা যে অতি মনোরম, উপাদেয় ও সুখপাঠ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ণিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, অনেকগুলি চিত্রও মানচিত্রে পুস্তকখানি সুশোভিত। গ্রন্থকার দ্বিতীয় গুর্খা সেনাদলের সেনাপতি (Col., 2nd Goorkhas)—বহুকাল যাবৎ আসাম ও তৎসন্নিহিত নানা প্রদেশে কার্য্যব্যপদেশে, পর্য্যটনচ্ছলে, শিকারোদ্দেশে ভ্রমণ করিয়া, চেষ্টা-যত্ন করিয়া এই পুস্তকের যাবতীয় বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল প্রত্যক্ষদৃষ্ট স্বয়ং-সংগৃহীত বিশ্বস্ত বিবরণগুলির মধ্যে কল্পনা বা অনুমানের লেশমাত্রও বর্ত্তে নাই। ইহা বস্তুতঃই একখানি মূল্যবান্ অদ্বিতীয় ইতিহাস—সাহিত্যামোদী ইতিহাস-পাঠকদিগের নিকট ইহা প্রত্যুতই অমূল্য—ভ্রমণকারীরাও ইহা হইতে বহুজ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন; সাধারণ পাঠকবর্গও ইহা পাঠে আনন্দ ও নানারূপ তথ্যসংগ্রহে কৃতার্থ হইবেন।

THE CITY OF DANCING DERVISHES AND OTHER SKETCHES AND STUDIES FROM THE NEAR EAST BY HARRY CHARLES LUKACH.

মিঃ লুকাচ্ প্রণীত The Fringe of the East নামধেয় তুরুষ্ক প্রদেশে পর্য্যটন-কাহিনী যখন প্রকাশিত হয়, তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন—এমন অমিত কৌতুহলোদ্দীপক চিত্তহারী ভ্রমণ-কাহিনী বহুকাল যাবৎ দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান 'নৃত্যকুশল ফকিরদিগের দেশ এবং অদূরবর্ত্তী প্রাচ্য-প্রদেশের অন্যান্য চিত্র ও অধীত বিষয়', সেই লিপিকুশল লেখকের কুহকিনী লেখনী প্রসূত সেই তুরুষ্ক প্রদেশেরই পর্য্যটন-বিবরণীসম্বলিত অন্যতম গ্রন্থ। মিঃ লুকাচ্ তুরুষ্ক দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী নানা প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া, বহুকাল পর্য্যন্ত সে দেশের সুদূর প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্থানে বসবাস করিয়া, তুরুষ্কবাসীদের আচার ব্যবহার, কুসংস্কার, ধর্ম্মবিশ্বাস, ইতিহাস-উপকথা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন এবং সেইগুলি তাঁহার অমৃত-নিঃস্যন্দিনী ভাষায় নিঃস্বারিত করিয়াছেন। আবার, পারিজাত সুরভির মত চিত্রকণা-সিঞ্চনে এই সুধাভাণ্ডোপম পুস্তক খানিসুবাসিত হইয়াছে; ইহাতে আছে—

(১) কোনিয়া-দর্শন, প্রাচীন ইকোনিয়ম্—যথায় সেই দশসহস্র সৈন্যধিশ্রাম করিয়াছিল, যেখানে সিলিশিয়ার প্রো কন্সল্ সিসেরো স্বীয় সেনানী পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সাইপ্রস্-ত্যাগের পর যেখানে সাধুপল ও বার্ণাবাস্ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই—নগরীর বিবরণ।

(২) পাঁচ সহস্রবৎসর পূর্ব্বের তুর্কী রসিক-চূড়ামণি খোজা আক্রেহিরের বৃত্তান্ত ও তাঁহার গাল-গল্প ও রসিকতার নমুনা;

(৩) তুরুষ্কে ইসলাম্ প্রভাবের কয়েকটি ধারা;

(৪) তুর্কী খালিফত্বের ইতিবৃত্ত ও বিবরণ;

(৫) স্বনামখ্যাত মীর উজীর মেহমেদ কিয়ামিল্ পাশার শেষ-জীবন;

(৬) সাইপ্রসের ব্যবস্থাপক-সভা স্থাপনের দিনে;

(৭) ঐশীশক্তিমান্ এস্. য়্যাণ্ড্,—১৯১২ সালেটা সংঘটিত সাইপ্রস-দ্বীপের একটি আশ্চর্য্য-ঘটনা;

(৮) পুরোহিত ও প্রধানের কথা—তুরুষ্কের ধর্ম্ম ও রাজনীতি-জগতে তাঁহাদের প্রভাব;

(৯) ভাক্ত অবতার—সাবাতাই নামক স্মীর্ণাবাসী জনৈক য়িহুদী ১৬৬৬ খৃঃব্দে আপনাকে 'অবতার' পরিচয় দিয়া বহুসংখ্যক শিষ্য সমবেত করে—তাহারই বিবরণ।

(১০) রাজনৈতিক পত্র-ব্যবহার হইতে চিত্রোপম ভাষায় বিলুপ্তির বিবরণ।

THE INDIAN STORY BOOK.—BY RICHARD WILSON.—7s. 6d.

"ভারতীয় উপ-কথা"—মিঃ রিচার্ড্ উইল্সন্-প্রণীত। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, অসংখ্য নীতি-মূলক গল্পের ভাণ্ডার। গ্রন্থকার বাছিয়া বাছিয়া ধর্ম্মশক্তি, অপত্য-স্নেহ, অত্যাচারে বিরাগ, নারী মর্য্যাদা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, বিপদে সাহস ও মুক্তির-উপায় নিরাকরণ, অবস্থাবিপর্য্যয়ে ধৈর্য্য, পাপের অন্তিম পরাজয়ে বিশ্বাস—এই নবনীতি-বিষয়ক নয়টি গল্প অতি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি তরুণবয়স্কদিগের জন্য লিখিত এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সৎশিক্ষার উপযোগী। একবর্ণ ও বহুবর্ণের ১৬ খানি চিত্র সম্বলিত।

DECCAN NURSURY TALES: OR FAIRY TALES FROM THE SOUTH. BY—C. A. KINCAID, C. V. D., I. C. S.—4 s. 6 d.

"দাক্ষিণাত্যের রূপ-কথা"—মিঃ সি. এ. কিন্‌কেড্ সঙ্কলিত। শ্রীযুক্ত ডি. ডি. ধুরন্ধর অঙ্কিত ৮ খানি বহুবর্ণ-চিত্রশোভিত। মিঃ কিন্‌কেড্ শিশুপুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য, এই গল্পগুলি বলিয়াছিলেন;—তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রহমণ্ডলীর দিবার উপর প্রভাব সকল সভ্যদেশেই স্বীকৃত হয়। এই পুস্তকের কুড়িটি গল্পের মধ্যে ছয়টিতে প্রত্যেক দিনের সহিত গ্রহগণের যথাক্রমিক সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন মহালক্ষ্মী ও রাণীদ্বয়, দ্বীপস্থিত প্রাসাদ, নাগরাজ নগবা, পার্ব্বতী ও ভিক্ষুক, পার্ব্বতী ও ব্রাহ্মণ, রজকিনী সোম, বশিষ্ঠ ও রাজ্ঞী চতুষ্টয়, দীপাবলী ও রাজপুত্রবধূ, পার্ব্বতী ও পুরোহিত, ঋষি ও ব্রাহ্মণ, রাজা ও জলদেবী, পুণ্য-পেটিকার 'ডালা' ব্রাহ্মণ পত্নী ও তদীয় সপ্তপুত্র, সুবর্ণ-মন্দির। গল্পগুলি মূল মারাটি হইতে অনূদিত—তবে, পাশ্চাত্য রুচি-অনুমোদিত করিবার জন্য, হিন্দু ক্রিয়াকলাপাদির বিবরণগুলি সংক্ষিপ্ত, এবং স্থানে স্থানে জটিল বিষয়গুলি বিশদ করা হইয়াছে। দেশীয় শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রাবলী ভাব ব্যঞ্জনা ও দৃশ্য-পরিকল্পনায় অতি স্বাভাবিক হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক অনূদিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রের 'ডাক-ঘরের' ইংরেজী-সংস্করণ—THE POST OFFICE; এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী-কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-জীবনী শ্রীমতী Underhill লিখিত ভূমিকাসহ THE AUTOBIOGRAPHY OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE—নামক বাঙ্গালা হইতে অনুবাদিত দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

বীণার তান

হিন্দী

১। **মর্য্যাদা**—সচিত্র মাসিকপত্র, প্রয়াগ হইতে প্রকাশিত, সংবৎ ১৯৭১, কার্ত্তিক।

(১) 'নাটক'—লেখক শ্রীযুত কাশীনারায়ণ মালবীয়, এম-এ। লেখক আপসোস করিতেছেন যে, 'হিন্দী সাহিত্য মেঁ নাটককী বহুত কমী হৈ।' তিনি সংক্ষেপে রূপক, নাটকের ভাণ্ডার, কবির বিচার-শক্তি, নাট্যকর্ম্ম ও তদন্তর্গত পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, বিদেশীয় নাটকের ইতিহাস একনিঃশ্বাসে সমাপ্ত করিয়াছেন। উপসংহারে, লেখক প্রস্তাব করিতেছেন, ফ্রান্সের নাট্য-সমিতির অনুকরণে আমাদের দেশেও 'হর জিলে মেঁ ম্যনিসিপৈলিটী কী সহায়তাসে এক এক সমিতি ইসী কামকে লিএ খোলী জানী চাহিয়ে'—লেখকের স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা নাই। তাঁহার লেখনীতে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাধির ঝাঁঝ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

(২) কশ্মীর-সমীর'—শ্রীযুক্ত হরিহরস্বরূপ শর্ম্মা শাস্ত্রি-লিখিত। সারগর্ভ, সুলিখিত, সুখপাঠ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বাস্তবিক মৌলিক হইলে এরূপ অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা পূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনী পত্রিকার গৌরব-সন্দেহ নাই। লেখক বলেন, কাশ্মীরেরও কথ্য-ভাষাতে (পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায়?) চতুর্থ বর্গ (ধ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) নাই। সে দেশের লোকেরা 'ঘর'কে 'গর' বলে। ভূস্বর্গ কাশ্মীর সম্বন্ধে আমরা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের ভাষায় বলি,—

> "অগর ফির্ দৌস্ বররূপ জমীনস্ত,
> হমীঁনস্তো হমীঁনস্তো হমীঁনস্ত্।"

(৩) 'য়ুরোপীয় মহাভারতকে যুদ্ধসম্রাট্'—লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রলাল গুপ্ত, বি এ., এল-এল বী। অক্টোবর মাসের 'মডার্ণ্ রিভিউ' পত্রিকার প্রবন্ধবিশেষ অবলম্বনে লিখিত। সঙ্কলন ও আহরণের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(৪) 'কবিগঙ্গ বিষয়ক এক লোকোক্তি'—লেখক শ্রীযুক্ত মুন্সী মনোহর শুক্ল। মুন্সী দেবীপ্রসাদ অনুমান করেন, 'কবিগঙ্গ' ঔরঙ্গজেবের সময়ে জীবিত ছিলেন। হিন্দীভাষার ইতিহাস-প্রণেতা মিত্রবন্ধুগণ বলেন, তিনি রহীমের সমকালীন ছিলেন। লেখক, গঙ্গকবি ও ওরছা নরেশ জুঝার সিংহ সম্বন্ধে একটী গল্প-সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার হা-হুতাশ, লেখ্যবিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই।

(৫) 'সতী দ্রৌপদী'—লেখক শ্রীযুক্ত চম্পালাল জৌহরী (সুধাকর)। প্রবন্ধ-রচয়িতা পাদটীকায় স্বীকার করিয়াছেন, এই রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অবলম্বনে লিখিত। ভাগীরথীর স্রোতঃ, উল্টা প্রবাহিত হইয়া, প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমতীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে।

(৬) 'সম্পত্তি কী নসেঁ'—লেখক শ্রীযুতসোমেশ্বর দত্ত শুক্ল, বি এ। ইহা রস্কিনের রচনা 'THE BONES OF WEALTH' অবলম্বনে উর্দ্দুমিশ্রিত সরল, সহজ, কথ্যহিন্দীতে রচিত। সম্পত্তির স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মনুষ্যশরীরে নিহিত। অতএব সকল ব্যবসায় অপেক্ষা 'প্রাণোঁ কে তৈয়ার' (Manufacture of Soul) শ্রেষ্ঠ। লেখক উপ-সংহারে বলিতেছেন, 'ধন্য বহ্ দিন হোগা জব্ হম্ ইস্ ব্যাপার মেঁ তরক্কী করকে অপনে ধনসে তৈয়ার কিয়েহুএ শিক্ষিত স্বচ্ছ বলবান্ পরিশ্রমী উৎসাহী সদাচরণশীল পবিত্রহৃদয় উদারচিত্ত চিন্তারহিত ঔর অত্যন্ত সুখী কমলকে সমান খিলে হুএ মুহ, ঔর চমকদার আঁখোঁবালে মনুষ্যোঁ ঔর স্ত্রিয়োঁ, বালকোঁ ঔর বালিকাওঁ কী তরফ্ অঙ্গুলী উঠাকর্ য়হ কহ সকেঙ্গে কি,—

যে হী হমারে হীরে হৈঁ।'

(৭) 'পরদা' (কবিতা)—লেখক শ্রীযুক্ত কেশবলাল ফড়সে। ফড়সে মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, হিন্দী রচনায় এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। বেপরদা মারাঠী-হিন্দু, আমাদের মুসলমানী পরদার ইজ্জৎ নষ্ট করিতে বেজায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, এবং প্রায় সাড়ে তিন স্তম্ভে তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতা শেষ করিয়াছেন। লালিত্যগুণে কবিতাটি মুখরোচক হইয়াছে।

(৮) 'প্লেটো ঔর রাজনীতি'—লেখক শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ দ্বিবেদী। আলোচ্য প্রবন্ধ মারাঠী-লেখক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রগণেশ বি-এ, এল-এল-বী-রচিত 'প্লেটো' অবলম্বনে লিখিত। নিম্নে কতিপয় পরিভাষা উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—Monarchy—একতন্ত্রী রাজ্য-পদ্ধতি; Aristocracy—বিশিষ্টজন সত্তাত্মক রাজ্যপদ্ধতি; Democracy—প্রজাসত্তাত্মক রাজ্যপদ্ধতি; Govt. of the Rich—সধনসত্তাত্মক রাজ্যপদ্ধতি; Constitutional Monarchy—নিয়মবদ্ধ একসত্তাত্মক রাজ্যপদ্ধতি; Oligarchy—নিয়ম-রহিত শিষ্টজন-সত্তাত্মক রাজ্যপদ্ধতি, ইত্যাদি।

(৯) 'হমারে সপুত' (কবিতা)—লেখক শ্রীযুক্ত অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়। সময়োপযোগিনী রচনা। য়ুরোপীয়, মহাসমরে প্রেরিত ভারতীয় সৈন্যগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এরূপ উদ্দীপনা ও উৎসাহপূর্ণ কবিতা আমরা এই প্রথম পড়িলাম।

(১০) 'উন্নীসবীঁ শতাব্দী', বাঙ্গালা মাসিকপত্র 'গৃহস্থে'র প্রবন্ধ

বিশেষের ভাষানুবাদ। বাঙ্গালা মাসিকপত্রের কোন কোন লেখক, তাঁহাদের রচনার রসসুধা তর্জ্জমা করিয়া হিন্দী পাঠকদিগকে পান করাইতে অতিশয় ব্যগ্র; ইহা তাহারই অন্যতম পরিচয়।

(১১) 'সময় গীত' (ক্ষুদ্র কবিতা)—লেখক শ্রীযুক্ত জগন্নাথ প্রসাদ চতুর্ব্বেদী। চতুর্ব্বেদীজী সুপরিচিত কবি। তাঁহার এ কবিতাটীও সুন্দর ও সময়োপযোগিনী হইয়াছে। ইহাতে রাজভক্তি ও দেশভক্তির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১২) 'জর্ম্মণী কী যুদ্ধ-কামনা'—শ্রীবামন লিখিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে যুদ্ধসম্বন্ধে সুচিন্তিত, সুলিখিত, দার্শনিক আলোচনা-পূর্ণ প্রবন্ধ।

(১৩) 'হমারা পুস্তকালয়'—বা গ্রন্থসমালোচনা।

(১৪) 'সম্পাদকীয় টিপ্পনিয়া'—এম্‌ডেনের বিনাশ, তুরুস্কের পরিণাম প্রভৃতি দুইএকটি ক্ষুদ্র সাময়িক টিপ্পনী এবারকার 'মর্য্যাদা' শেষ করিয়াছে। হিন্দী সাহিত্য-সমাজে প্রবন্ধগৌরবে 'মর্য্যাদা' উচ্চাঙ্গের মাসিক-পত্রিকা। এবার ৬ পৃষ্ঠাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিষয়ক হাফটোনের অস্পষ্ট ছবি 'মর্য্যাদা'র 'সচিত্র' নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে!

২। ইন্দু—সচিত্র মাসিকপত্র, কাশী হইতে প্রকাশিত। কিরণ ৫, কলা ৫, খণ্ড ২, নবেম্বর বা কার্ত্তিক সংখ্যা।

সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্রের অনুবীক্ষণ-গ্রাহ্য ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। এই হাফটোনখানি বর্ত্তমান সংখ্যার সচিত্র নামের মান রাখিয়াছে। এ বিড়ম্বনার প্রয়োজন কি?

(১) 'বিদ্যাকী মহত্তা'—মামুলি কবিতা।

(২) 'যুদ্ধ কে উপযোগ'—লেখক পণ্ডিত কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, বি-এ। সমগ্র সভ্যজগতে এইটী সাহিত্যের সামরিক-যুগ; পাঠক যে দেশের যে কাগজ খুলিবেন, তাহাতেই, নানাছন্দে নানাপ্রবন্ধে নানাভাবে কেবল যুদ্ধের কথা। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন, যুদ্ধের পরিণাম 'স্বতঃ আচ্ছা হী হোতা হৈ।' অমঙ্গলের মধ্যেও যে ভগবানের রাজ্যে মঙ্গল-নিহিত আছে, তাঁহার শুভ-ইচ্ছা যে ভালমন্দ সকল ঘটনায় পশ্চাতে নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে, একথা তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। বর্ত্তমান রচনার মর্ম্ম এই যে, ন্যায়ের আবরণে আবৃত অন্যায়-আইন-কানুনের কৃত্রিম-বন্ধনের বিরুদ্ধে মানবপ্রকৃতি উত্তেজিত হইলে, বাহিরে যে বিদ্রোহভাব পরিস্ফুট হয়, তাহাই যুদ্ধ। আমাদের ব্যক্তিগত মনোমালিন্য আইন-কানুনদ্বারা মীমাংসা হইতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিবাদ-মীমাংসার একমাত্র পন্থা যুদ্ধ। লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন, উভয়পক্ষ শান্তির পক্ষপাতী হইলে, মধ্যস্থতাদ্বারা অনায়াসে যে কোন বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে পারে।

(৩) 'আর্য্যা সপ্তশতী কী সূক্তিয়াঁ'—লেখক শ্রীযুত পণ্ডিত হরিবংশ মিশ্র কাব্যতীর্থ। হিন্দীভাষার সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই হয়ত 'বিহারী সৎসই'এর রসাস্বাদন করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে, লেখক বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ গোবর্দ্ধনাচার্য্য-কর্ত্তৃক আর্য্যা ছন্দে রচিত সংস্কৃত সপ্তশতী (সৎসই) র পরিচয় দিয়াছেন। জয়দেব বলিয়াছেন,—

'শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈ রাচার্য্য
গোবর্দ্ধনস্পর্দ্ধী কোপিন বিশ্রুতঃ।'

অতএব, জানা যাইতেছে, গোবর্দ্ধন শৃঙ্গাররসের একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভট কবি ছিলেন। প্রবন্ধটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অথচ প্রবন্ধকার অন্য কোন আধুনিক লেখকের নিকট ঋণ স্বীকার করেন নাই।

(৪) 'বিদ্বদ্বর পণ্ডিত উমাপতি শর্ম্মা দ্বিবেদী, ঔর সনাতন ধর্ম্মোদ্ধার,'—লেখক পণ্ডিত শ্রীকান্তপতি শর্ম্মা ত্রিপাঠী। ইহা স্বর্গীয় পণ্ডিত উমাপতি শর্ম্মা দ্বিবেদী (উর্ফ পণ্ডিত নকছেদ রাম দ্বিবেদী)-প্রণীত 'সনাতন ধর্ম্মোদ্ধার' নামক গ্রন্থের একটী প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা। তিন স্তম্ভ ভূমিকার পর, লেখকপ্রবর চারিস্তম্ভে সমালোচনা শেষ করিয়াছেন। প্রবন্ধটী মলাটের গায় মানাইত ভাল।

(৫) 'চন্দ্রোদয়' (কবিতা)—লেখক পণ্ডিত কৃষ্ণবিহারী মিশ্র বি-এ। আধুনিক হিন্দীকবিতা যে, চিরাগত দোহা, চৌপাই প্রভৃতি সেকালের ছন্দের হাত এড়াইয়া,নূতনত্বের পথে পা,বাড়াইতে শিখিয়াছে, এই কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬) 'বচ্চোঁ কী অকাল মৃত্যু, উস্‌কা কারণ, ঔর বচনেকা উপায়'—প্রেরক শ্রীযুত অঘোরী কৃষ্ণপ্রকাশ সিংহ। লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় সূতিকাগৃহের দুর্দ্দশা বর্ণনা-করিয়া, এদেশে নবজাত শিশুর প্রতিপালন (অ)-ব্যবস্থার উপর কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন এবং শিশুদিগের অকাল-মৃত্যুর কারণ ও তাহার প্রতিষেধক উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি, কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া, তাঁহার প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু প্রবন্ধটী কোন ইংরাজী 'স্যানিটারি রিপোর্টে'র সারাংশ কিনা, তাহার উল্লেখ নাই।

(৭) 'সন্তান-শাস্ত্র (১৬), যুদ্ধ'—লেখক শ্রীযুত ঠাকুর শিবনন্দন সিংহ। যুদ্ধ কি? এবং কেন হয়? এই সম্বন্ধে আলোচনা। ঐতিহাসিক ও সামজিক তত্ত্ব-শাস্ত্রের দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া, লেখক এই সন্দর্ভে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধ শেষে উপদেশ করিতেছেন—

'হম্ অপনে কর্ত্তব্য পর্ ধ্যান নহীঁ দেতে, অপনে অধিকারোঁ কো প্রাপ্ত করনে কে লিয়ে সোর্‌গুল্ মচানা ঔর কুল দোষ রাজাকে সির্‌পর্ দেনা জানতে হৈঁ। * * * বৃটিশ-সাম্রাজ্য মেঁ ভারত কা অভ্যুদয় প্রারম্ভ হুয়া হৈ। হিমাচল সে কমোরিণ তক্ কে লোগ্ এক রাষ্ট্র (Nation) মাননে ঔর সমঝনে লগে হৈঁ। ঐ সে শুভ অবসর কো যদি হম্ আলস্য নিদ্রামেঁ খো দেঙ্গে, তো ভারত কে পুনরুত্থান কো আশা নিষ্ফল হোগী।'

(৮) 'সময়োঁকী ঔর সমবৃত্ত হিন্দী অনুবাদ,'—লেখক শ্রীযুত পণ্ডিত রামদহিন মিশ্র কাব্যতীর্থ। মেঘদূতের হিন্দী অনুবাদের চর্চ্চা মাত্র।

(৯) 'প্রাচীন ভারত' (কবিতা)—লেখক শ্রীযুত পাণ্ডেয় রঘুনাথ চিন্তামণি চতুর্ব্বেদী, বি. এস-সী। স্বদেশ-প্রেমপূর্ণ মামুলি অন্ত্যোমিল রচনা।

(১০) 'ললিতা'—লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পারসনাথ ত্রিপাঠি। বাঙ্গালা হইতে অনূদিত একটী ক্ষুদ্র-গল্প। বাঙ্গালা ভাষার লেখক ও সম্পাদকগণ স্মরণ রাখিবেন, তাঁদের দায়িত্ব ক্রমেই গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীর ৬০ কোটী চক্ষু বাঙ্গালার পানে, আদর্শের আশায়, নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। বাঙ্গালার সাহিত্য ও চিন্তাস্রোতঃ, ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশের সাহিত্যের ও চিন্তার গতি-নির্ণয় করিতেছে। আমরা ইংরাজীর অনুকরণে উদ্দেশ্য হীন, রচনাচাতুর্য্য-বর্জ্জিত, অসার, চুট্‌কী গল্পের দ্বারা মাসিক-পত্রিকার অঙ্গ পরিপূর্ণ করিলে, আমাদের কুদৃষ্টান্ত অলক্ষিতভাবে আমাদের কনিষ্ঠভ্রাতাদিগের মধ্যে সংক্রান্ত হইয়া, ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইবে।

(১১) 'লোকসেবা' লেখক শ্রীযুত মিশ্রীলাল কৃষ্ণলাল মাথুর। বিষয়টী সুন্দর; লেখকও বহুপরিশ্রম সহকারে কবি মৈথিলী শরণ গুপ্ত, ভাগবত, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি মহাজনের মত উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার সন্দর্ভ সুন্দরতর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(১২) 'ভারতকা প্রাচীন কলাকৌশল'—লেখক শ্রীযুত বাবু মৈথিলীশরণ গুপ্ত। এই কবিতাটী 'ভারত-ভারতী' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। হিন্দীভাষার প্রতিভাশালী লোকপ্রিয় কবি মৈথিলীশরণ-আজকাল ভাষায়, ভাবে ও রচনাচাতুর্য্যে, প্রথম শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। স্বদেশ-প্রেমপূর্ণ ভারতের প্রাচীন-গৌরবস্মৃতির এই কবিতাটিতে ও ছত্রে ছত্রে মাধুর্য্যের ও লালিত্যের লহরী অনুভব করা যায়।

(১৩) 'ভূল'—লেখক শ্রীযুত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ চতুর্ব্বেদী। বাঙ্গালা মাসিকপত্র হইতে অনূদিত।

(১৪) 'কসৌটী',—বাঙ্গালা মাসিকের 'কষ্টিপাথরের' অনুকরণে। ইহাতে ১। অক্টোবরের "সরস্বতী" হইতে (ক) শ্রীযুত পাণ্ডুরাঙ্গ খানখোজে লিখিত 'আমেরিকা কে ধনবান্ আপনে লড়কোঁ কো কৈসী শিক্ষা দেতে হৈঁ,' ও (খ) উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুত গোপাল শরণ সিংহ-রচিত আত্মবিশ্বাস (কবিতা)। ২। "প্রতাপ" হইতে (ক) শ্রীযুত বৃন্দাবনলাল বর্ম্ম লিখিত 'হিন্দুয়োঁ পর ইসাইয়ত কা ধাবা,' ও (খ) 'অমেরিকা কা এক সর্ব্বজাতীয় মহোৎসব জমানা'। এবং ৩। আগষ্ট মাসের "মর্য্যাদা" হইতে শ্রীযুত আদিত্যনারায়ণ লাল লিখিত 'জাপান সে প্রাপ্ত শিক্ষায়েঁ' আহৃত হইয়াছে।

(১৫) 'গুপ্তেকী উম্মেদোয়ারী'—লেখক শ্রীযুত 'নলজ্ঞ বংকূল'। তিন পৃষ্ঠার উভয় স্তম্ভব্যাপী হাসি মস্করাপূর্ণ ব্যঙ্গ-কবিতা। হিন্দী সাময়িক-পত্রিকার লেখকদিগের উপর মধুর শ্লেষ, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১৬) লণ্ডন হইতে প্রকাশিত "রাজপুত হেরাল্ড" হইতে 'শ্রীমান্ মহারাজাধিরাজ সুর প্রতাপ সিংহজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।'

(১৭) 'জয় স্বদেশ' (ক্ষুদ্র কবিতা)—লেখক শ্রীযুত পণ্ডিত লোচনপ্রসাদ পাণ্ডেয়। পাণ্ডেয়জী হিন্দী ভাষার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি।

(১৮) 'খড়ীবোলী কী কবিতা মেঁ মহাকাব্য'—লেখক শ্রীযুত পণ্ডিত হরিবংশ মিশ্র কাব্যতীর্থ। সমালোচনা, পূর্ব্বানুবৃত্তি, ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

(১৯) 'ঐক্যশক্তি,'—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুত মুন্নালাল মিশ্র। লেখকমহাশয় সামাজিক-ঐক্য বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহার অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

(২০) 'প্রেমপথ' (কবিতা)—"ইন্দু"র অন্যতম লেখক শ্রীযুত জয়শঙ্কর প্রসাদ-রচিত নবপ্রকাশিত 'প্রেমপথিক' নামক গ্রন্থ হইতে প্রায় এক স্তম্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা appreciation না, advertisement?

(২১) 'সুশীলা ঔর ললিতা'—লেখিকা শ্রীমতী ঠাকুরাণী 'শিবমোহনী'। ধারাবাহিক উপন্যাস, এইটী তৃতীয় প্রস্তাব। সম্পূর্ণ না হইলে, মতামত প্রকাশ করা অনুচিত।

(২২) 'বিবিধ প্রসঙ্গ,'—ইহাতে 'কবিসম্রাট্' রবিবাবুর 'গীতাঞ্জলি' ও পুরস্কার প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, ফরাসী রাজঘোষণার সারাংশ আছে, এবং জর্ম্মণীর সেই সুবিখ্যাত দল আদেশের অনুবাদ আছে। উল্লেখ যোগ্য মৌলিক প্রবন্ধের অনটন, পূর্ণেন্দুর সুন্দর আননে কলঙ্ক বিন্দু।

৬। চিত্রময় জগৎ, কার্ত্তিক, সংবৎ ১৯৭১।

(১) 'রামকৃষ্ণ বাক্যসুধা'—চৈতন্যের প্রেম মারাঠাদেশ প্লাবিত করিয়া তুকারামের চিত্তে যে লহরী তুলিয়াছিল, আবার কি পবিত্রতা ও সরলতার অবতার রামকৃষ্ণের মন্ত্রে মহারাষ্ট্রে সেইরূপ যুগবতারের আবির্ভাব হইবে? বাংলা চিরদিন ভারত-জননীর যে গুরু ঋণগ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, প্রেম ও ভক্তির ভরায় তাহার কিয়দংশও কি শুধিতে পারিবে না?

(২) 'য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ' (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—এবার অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়ার যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানের খলিতা (ultimatum) পর্য্যন্ত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ সরল হিন্দীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'চিত্রময় জগৎ' বর্ত্তমান মহাসমরের জন্য রুশিয়াকেই যেন দায়ী করিয়াছেন,—"প্রথম যহ ঝগড়া অষ্ট্রিয়া ঔর সার্বিয়া কে মধ্য মে থা, পরন্তু উসকী ব্যাপ্তি বঢ়ানে কা পহিলা পাপ রুশিয়া নেহী কিয়া হৈ।" হিন্দীতে Mobilisation কে 'হলচল,' Triple alliance কে 'ত্রিকুট' এবং Mine কে 'সুরঙ্গ' করা হইয়াছে।

(৩) 'শকুন্তলা—পত্র লিখন, ও চিত্র'—শ্রীযুত হরিকৃষ্ণ যজুর্ব্বেদী লিখিত অতিমধুর সুললিত কবিতা।

(৪) 'প্রাচীন হিন্দুওঁ কী শ্রেষ্ঠতা, পঞ্চম প্রস্তাব'—সুযোগ্য হস্তের এই সুলিখিত প্রবন্ধ অনেক ঐতিহাসিক-তত্ত্বের আলোচনায় পূর্ণ।

(৫) 'আমেরিকা দেশ মেঁ কৃষি কী উন্নতি'—একখানি পত্র।

(৬) 'বঞ্চক বৈরাগী' -একটী ক্ষুদ্র কবিতা—শ্রীযুত রামস্বরূপ শিব-রচিত।

(৭) 'জমীন কো ক্যো জোতনা চাহিএ?'—এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য লাঙ্গল, লাঙ্গলটানা ঘোড়া ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রাদির চিত্র ও বিস্তারিত বিবরণসহ ভূমিকর্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিশদ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা লিখিত হইয়াছে।

(৮) 'প্রার্থনা-পঞ্চক', কর্ণ-কবি রচিত। এই সরল কবিতাটি বালকদিগের কণ্ঠস্থ রাখিবার উপযোগী।

(৯) 'য়ুরোপমেঁ প্রচণ্ড যুদ্ধ'—লেখক বর্ত্তমান মহাসমরের ইতিবৃত্তি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া, অন্তিমে ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রার্থনা করিতেছেন, 'অন্তমেঁ ইঙ্গলৈণ্ড্ কা হী বিজয় ইস মহাযুদ্ধমেঁ হোগা।'

(১০) 'সহ্যাদি পর্ব্বত'—ক্ষুদ্র কবিতা; সুন্দর সরস প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনা।

(১১) 'সমরলিপ্ত রাষ্ট্রসকলের তুলনায় যুদ্ধবল' (চিত্র)—এরূপ চিত্র দেশী-ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম।

(১২) 'ইংলণ্ডের কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ (ড্রেড্‌নট্)-চিত্র।

(১৩) 'সাহিত্যচর্চ্চা' বা গ্রন্থসমালোচনা; নিম্নলিখিত পুস্তক কয়খানির আলোচনা করা হইয়াছে—'ভারত-ভারতী', 'ষট্‌চক্রবেধ, অথবা আত্মপ্রকাশ', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ ধনকী উৎপত্তি তথাবৃদ্ধি','লণ্ডনরহস্য, সাভেয়িং ও লেভেলিং', 'হিন্দী বাঙ্গালা শিক্ষা', 'রাম-রাজ্যবিয়োগ নাটক', 'মেবাড়্‌-গাথা', 'মাধবমঞ্জরী', 'চরিত্রমালা।' পাঠক দেখিবেন এই তালিকায় উপন্যাস ও গল্পের সংখ্যা কত কম। হিন্দী ও বাঙ্গলার বর্ত্তমান উত্থান-যুগের ইহাই পার্থক্য। 'চিত্রময় জগতের' শাদা-কাল চিত্রগুলি অতি স্পষ্ট ও সুন্দর।

৪। বৈদিক সর্ব্বস্ব।—বৈষ্ণব-মহাসভার মুখপত্র, সম্পাদক অধিকারী শ্রীজগন্নাথ দাস, ভরতপুর, বার্ষিক মূল্য ২॥০, শ্রাবণ সংখ্যা। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—(১) 'দর্শনশাস্ত্রকী উৎপত্তি ঔর উস্‌কা প্রচার'—লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীগিরিধর শর্ম্মা নবরত্ন, রাজগুরু ঝালরাপাটন, ও (২) 'বেদ সগুণ হী কা প্রতিপাদন করতা হৈ' (অসম্পূর্ণ)।

৫। বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব।—প্রথম ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় (নবেম্বর ও ডিসেম্বর) সংখ্যা। 'নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে'র মাসিক মুখপত্র, সম্পাদক শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী; বৃন্দাবন।

'ব্রহ্মবাদী ঋষি ঔর ব্রহ্মবিদ্যা' পাঠ করিয়া আমরা অপার আনন্দলাভ করিলাম। আমরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এই দুইখানি অতি ক্ষুদ্রকায় শিশু মাসিকপত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সংস্কৃত

শারদা।—মাসিকী সংস্কৃত পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর, প্রয়াগ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৪৲।

(১) জগন্নাথ শাস্ত্রী-রচিত 'সরস্বতী স্তুতি'; কবিতার ছন্দের পরিচয় আমাদের অপরিজ্ঞাত থাকিল।

(২) 'কিং বিধেয়ম্'—ক্ষুদ্র সামাজিক প্রবন্ধ—লেখক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া খেদ করিতেছেন। তিনি বলেন, পণ্ডিতেরা সকল প্রকার উন্নতির বিরোধী, অতএব সকলেই তাঁহাদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। পক্ষান্তরে, তাঁহারাও ধনীদিগের মুখপানে চাহিয়া, আপনাদিগের অপদার্থতাই প্রমাণ করিতেছেন। 'ঈদৃশে বিপন্ময়ে সময়ে সমুপনতে কিং বিধেয়মিতি জায়তে স্বত এব জিজ্ঞাসা।'

(৩) 'চন্দ্রভূষণোপাখ্যানম্' (পূর্ব্বানুবৃত্ত)—লেখক পণ্ডিত গঙ্গা-প্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য্য।

(৪) 'সংস্কৃত ভাষা কথং ব্যবহারিকী ভবেৎ?'—লেখক শ্রীহরিহর স্বরূপ শর্ম্মা, শাস্ত্রী। বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে 'ঋষিকুল' হরিদ্বারে অধিবিষ্ট 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনে'র প্রথম বার্ষিক মহোৎসবে পঠিত। ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় কথার যোগ্যতার সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) 'বৈদিক বিজ্ঞান-মীমাংসা'—লেখক কবিরত্নমখিলানন্দ শর্ম্মা।

(৬) 'মাতঃ কা তে দশা' (কবিতা)—ভারতমাতার দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া খেদ।

(৭) 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনম্'—গত 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনে'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই সম্মেলন-সভায় কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র, এম্-এ মহোদয় 'সভাপতেরাসনমভূষয়ৎ'।

(৮) পাণ্ডেয় রামাবতার শর্ম্মা এম্-এ, সাহিত্যাচার্য্য লিখিত 'মেদক পারসীকেতিহাস বাচিঃ ও যবনেতিহাস বাচিঃ'; কবিতা।—রামাবতারজী পণ্ডিত লোক, তাঁহার রচনায়ও তনহ আছে।

(৯) 'মুদ্রারাক্ষস বিমর্শঃ'—আলোচনা ও চরিত্র-বিশ্লেষণ।

(১০) 'অথ কালিকাস্তুতিঃ' পদ্য।

(১১) 'শ্রীশঙ্করঃ কবিঃ'—কবিতা।

(১২) শ্রীরামপাদযুগলীস্তবঃ (চিত্রকাব্যম্); এই কবিতার আদ্যক্ষর ও অন্ত্যের অক্ষর সকল যথাক্রমে উপর হইতে নীচের দিকে পড়িয়া গেলে 'শ্রীরামো রক্ষতু প্রাচ্যাং' প্রভৃতি পাঠ আসিবে।

(১৩) 'পুস্তক পরিচয়।'

এতদিন সরকারী সাহায্যে হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবর্ত্তিত 'বিদ্যোদয়' সাময়িক-পত্রের আসরে সংস্কৃতের ক্ষীণ-বর্ত্তিকা কোন মতে প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল; 'শারদার' আবির্ভাবে আমরা অনেক আশার চিত্র দেখিতেছি।

মহারাষ্ট্রী

মনোরঞ্জন।—মারাঠী ভাষায়, সচিত্র মাসিকপত্র, নবেম্বর সংখ্যা। কি প্রবন্ধ গৌরবে, কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে, কি সম্পাদন-দক্ষতায়, কি বিষয়-নির্ব্বাচনে,কি চিত্র-সৌষ্ঠবে,কি কাগজের উৎকৃষ্টতায়,'মনোরঞ্জন' ভারতবাসীর মনোরঞ্জন করিয়া যে কোন বিলাতী মাসিক-পত্রের সহিত

সমকক্ষতা করিতে পারে। মরাঠা দেশীয় 'মনোরঞ্জনে'র মটো—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। এবং
সত্যসংকল্পাচা দাতা ভগবান্ সর্বকরী পূর্ণ মনোরথ।'
—তুকারাম।

আলোচ্য সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ আছে—

(১) 'নিদ্রাগীত' (পদ্য)—কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দাগ্রজ—ছেলে-ভুলান ছড়া, সুন্দর হইয়াছে।

(২) 'রাগিণী অথবা কাব্যশাস্ত্র-বিনোদ',—লেখক শ্রীযুক্ত বামন মহলার জোশী এম্-এ,—মৌলিক গল্প।

(৩) 'কির্লোসকর-বাড়ী'—লেখক শ্রীযুক্ত প্রো অন্না বাবাজী লট্টে এম্-এ।

(৪) 'ধন্দে শিক্ষণ',—লেখিকা শ্রীমতী সৌ 'মহারাষ্ট্র ভগিনী'।

(৫) 'পরবাশ্চা গুনাম নিগ্রো আজ হিন্দুসন্তান কা গুরু হোউঁ পহাতো' (পরাধীন নিগ্রো ভারতের গুরুস্থানীয়)—লেখক শ্রীযুক্ত পী, এস্ খানখোজে এম্-এস-সি, আমেরিকা।

(৬) 'হিন্দুস্থানাবর হল্লা',—লেখক শ্রীযুক্ত 'মধুপ'।

(৭) 'ওসাড আওাডীল একচ ফুল' (কবিতা),—লেখক শ্রীযুক্ত গোবিন্দাগ্রজ।

(৮) 'জপানান্তীল স্ত্রীশিক্ষণ'—লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণ বিনায়ক ভোঁড়ে, বি-এ।

(৯) 'আকাশাকড়ে পাহূন মাহিনা কসা ওলখাবা?'—ক্ষুদ্রগল্প। লেখক শ্রীযুত প্রো, হরি রামচন্দ্র দিবেকর, এম এ।

(১০) 'আজকাল যে জর্ম্মণলোক'—লেখক শ্রীযুত প্রো ডা পাণ্ডুরঙ্গ দামোদরগুণে এম-এ পী-এচ্, ডী, দ্বিতীয় প্রস্তাব—জর্ম্মণজাতি সম্বন্ধে আলোচনা।

(১১) 'সম্রাটাক্স্যা জয় জয় কার'—'God save the king,' বর্ত্তমান মহাসমর-অবলম্বনে লিখিত একটী গল্প।

(১২) 'যুদ্ধ ব ব্যাপার,'—লেখক শ্রীযুত প্রো বামন গোবিন্দ কালে এম-এ, লেখাঙ্ক পহিলা। যুদ্ধ ও বাণিজ্য বিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধ।

(১৩) 'মৎস্যাস্ত্র ব জলান্তঃ-সঞ্চারী নৌকা',—লেখক শ্রীযুত প্রো কেশব রামচন্দ্র কানিকটর, এম্-এ, বী-এস্-সী। 'টর্পেডোবোট' বা মৎস্যাস্ত্র এবং 'সাবমেরিণ' বা জলান্তঃ-সঞ্চারী নৌকার সচিত্র বিবরণ। ইংরেজী কাগজের প্রবন্ধের ন্যায় বিশদ ও সুন্দর।

(১৪) 'বিনায়ক রাম ওক' (জীবনী),—লেখক শ্রীযুত ভালচন্দ্র শঙ্কর দেবস্থলী।

(১৫) 'যুরোপিয়ন রাষ্ট্রান্তীল যাদবী',—লেখক শ্রীযুত প্রো হরিগোবিন্দ লিময়ে এম-এ, লেখাঙ্ক চৌথা—বর্ত্তমান সমর-প্রসঙ্গ।

(১৬) 'কতকগুলি সুন্দর সাময়িকচিত্র'—ছবিগুলি বিলাতী মাসিকেরও গৌরববৃদ্ধি করিতে পারে। চিত্র, যথা—জর্ম্মণসৈন্যকে নবে ডোলে, আধুনিক তোফাকা মারা, 'রয়াল' তোফখানাকে শৌর্য্য, ব্রিটিশ ধ্বরাঙ্কী শত্রু শী চকমক্, গোবেন, হেগ, ক্রেসী প্রভৃতি যুদ্ধ-জাহাজ এম্‌ডেন ও সাম্রাজ্যসাবী লঢণারী হিন্দুস্থানঙ্কী শীপ-সেনা।

(১৭) 'কুলপী গোলে,'—চুটকী সংবাদ।

গুজরাটী

১। আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর—গণ্ডাল হইতে প্রকাশিত আয়ুর্বেদ সম্বন্ধী সচিত্র মাসিকপত্র। প্রথম গ্রন্থ প্রথম সংখ্যা সম্পাদক—শ্রীযুত বৈদ্য জীবরাম কালিদাস।

ইহাতে ঔষধি-বিচার, রসতন্ত্রসার প্রভৃতি কয়েকটী উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে। পত্রিকা স্থায়ী হইলে আনন্দের কথা।

২। 'গুজরাটী পঞ্চ' (Punch), আমদাবাদ হইতে প্রকাশিত পৌষ, ইংরাজী গুজরাটী দ্বিভাষিণী, পত্রিকা।

বর্ত্তমান সংখ্যায় যুদ্ধ-সংবাদ ভিন্ন বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বা আলোচনা নাই।

কল্পতরু

আলোক-চিত্রকর কপোত

দ্বি-মুখ ও এক মুখ 'ক্যামেরা'-যুক্ত কপোতদ্বয়

পত্রবাহক সমর-কপোতের বিষয় পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। এবার আলোক-চিত্রকর (Photographer) পারাবতের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। পারাবতের দ্বারা আলোকচিত্র তোলা, জর্ম্মণীতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইহার উৎপত্তির বিবরণ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ক্রনবার্গ নিবাসী জুলিয়াস নিউব্রোনার নামক একজন ডাক্তার ফকেনষ্টিনে একটি স্বাস্থ্য-নিবাসের তত্ত্বাবধান করিতেন। স্বাস্থ্য-নিবাসটি তাঁহার বাড়ী হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তিনি পত্রবাহক পারাবতের দ্বারা সেখানে সংবাদ প্রেরণ করিতেন, ও উত্তর পাইতেন। পূর্ব্বোক্ত দুইটি স্থানের মধ্যে নিয়মিত পারাবতের ডাক স্থাপিত হইয়াছিল। স্বাস্থ্য-নিবাসের সরকারী চিকিৎসক রোগীর অসুখের বিবরণ একখানি কাগজে লিখিয়া পারাবতের দ্বারা প্রেরণ করিতেন। পারাবত পত্রটি লইয়া ক্রনবার্গে ডাক্তারের বাড়ীতে উড়িয়া যাইত। ডাক্তার তখন, ছোটথলিতে রোগীর জন্য ঔষধের বড়ি প্রস্তুত করিয়া, অন্য একটি পারাবতের দ্বারা পাঠাইয়া দিতেন; সে স্বাস্থ্য-নিবাসে তাহার খাঁচায় উড়িয়া যাইত। পারাবত তাহার শরীরের ভারের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ প্রায় আড়াই আউন্স, বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

একবার ঘটনাক্রমে একটি পত্রবাহক পারাবত তাহার গন্তব্যস্থানে একমাস উপস্থিত হয় নাই। সে তাহার দ্রুত গতির জন্য বিখ্যাত ছিল। এই সময়টা সে কোথায় ছিল তাহা অনুমান করা অসম্ভব। তারপর, অল্পদিনের মধ্যেই আর একটি পারাবতেরও ঐ অবস্থা ঘটিয়াছিল। এই পলাতক পারাবতদ্বয়ের কি হইল?—বিজ্ঞানের দিক্ হইতে, ও পত্রবাহক-পারাবতের স্বভাব অনুশীলনের পক্ষ হইতেও এ বিষয়ে তদন্ত করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার সাহেব, এক আশ্চর্য্য উপায় নিরূপণ করিলেন। পারাবতের শরীরে ছোট 'ক্যামেরা' আঁটিয়া দিলে, পার্শ্ববর্ত্তী দেশের ফটো তাহাতে অঙ্কিত হইতে পারে। ক্যামেরার 'প্লেট্,' নির্দ্দিষ্ট সময়ে, আপনা আপনিই কাজ করিবে। তাহা হইলেই পথভ্রষ্ট পারাবত কোন্ পথে ভ্রমক্রমে গিয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়েও যথাযথ সংবাদ পাওয়া যাইবে।
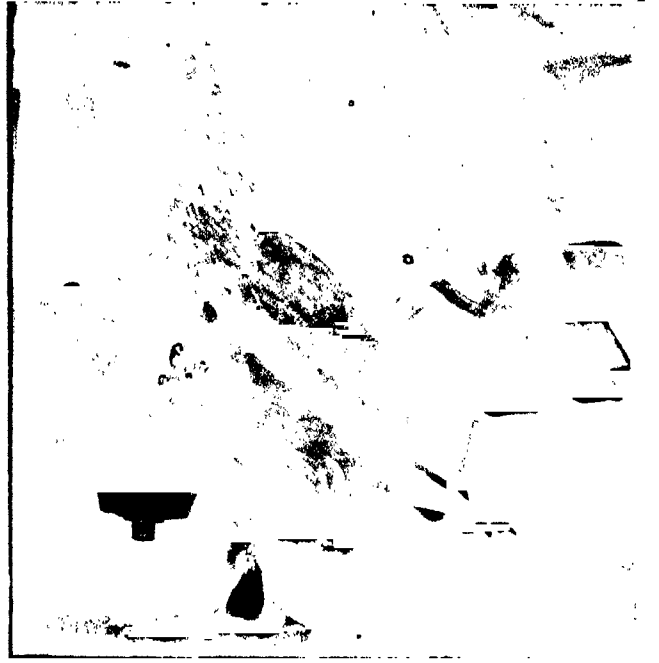
ডাক্তার সাহেব, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়া, তিনি একটি ছোট নূতন ধরণের ক্যামেরা প্রস্তুত করিলেন। এই ক্যামেরায় আধ ইঞ্চি চতুষ্কোণ একটি "negative" (বিপর্য্যস্ত চিত্র) স্থান পাইতে পারে। প্রথম চেষ্টা তেমন ফলবতী হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত ছোট চিত্রগুলি এত বিশৃঙ্খল

শিক্ষিত কপোত বক্ষে 'ক্যামেরা'-সংযোজন

ও অস্পষ্ট হইয়া যাইত যে, সেগুলির আয়তন বৰ্দ্ধিত করিতে পারা যাইত না। তথাপি, সেগুলি দেখিয়া পারাবত কোন্ কোন্ দেশ অতিক্রম করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইত। ইহার পর, এবিষয়ে অনেক পরীক্ষা করা হইয়াছে, এবং বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কালক্রমে পারাবতের দ্বারা ফটো তুলিবার কৌশলটি অত্যুৎকর্ষ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে,বর্ত্তমান সময়ে ইহা সম্পূর্ণ দোষশূন্য হইয়াছে। ডাক্তার নিউব্রোনার (৩১৫ পৃঃ) বহুবৎসরব্যাপী পরীক্ষা করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে আলোক-চিত্রকর কপোতদিগের জন্য যে বর্ত্তমান ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি তাঁহারই আবিষ্কৃত।

বিভিন্ন উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য নানাপ্রকার ক্যামেরা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাদের বাহিক আকারও পৃথক। কোন ক্যামেরায় দৃষ্টি-কাচ একখানি (single-lens); কোনও যন্ত্রে ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত দৃশ্য পরম্পরার চিত্রপট অঙ্কিত হয় (panoramic)। কোনও ক্যামেরার দুইখানি দৃষ্টি কাচ (Double-lens)। তাহাতে দু'ইঞ্চি স্কোয়ার দুখানি চিত্র ধরিতে পারে,একটি দৃশ্য লম্বিত, অপরটি শায়িত। অন্য এক প্রকার (repeating) ক্যামেরার দ্বারা কপোত উড়িলেই একে একে আটখানি চিত্র তুলিতে পারে। এই সব ক্যামেরাগুলিরই আয়তন ও ভার পারাবতের ক্ষমতার অনুরূপ। সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্যামেরা দৈর্ঘ্যে চার ইঞ্চি, প্রস্থে ও উচ্চে আড়াই ইঞ্চি। ইহার ভার প্রায় আড়াই আউন্স। পত্র-বাহক পারাবতও এই ভারবহন করিতে পারে।

এবার পারাবতকে কি প্রকারে যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা আলোচনা করিব। এবিষয়ে তাহার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। প্রথম তাহাকে এক প্রকার সজ্জা পরিধান করিতে অভ্যস্ত হইতে হয়। রবারের পাটি ও নরম চামড়া তাহার পিঠের উপর দিয়া শরীরের নিম্নস্থ এলুমিনিয়ামের প্লেটের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। পার্শ্বস্থ ছবি দেখিলেই আমরা এই বন্দোবস্তটি স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। এই সজ্জার সহিত যন্ত্রটি আঁটা থাকে। এইরূপে সজ্জিত হইলে, পারাবতকে তাহার বাস-স্থান হইতে দূরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিধান করিয়া, প্রথম সে বিশেষ রাগ প্রকাশ করে এবং এই ভার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহার ডানা, চঞ্চু ও নখরের দ্বারা বিশেষ চেষ্টা করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সমস্ত চেষ্টা বিফল দেখিয়া নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট হয় এবং তিন চারবার চেষ্টা করি-বার পর তাহার সজ্জা অতীব সুচারুরূপে বহন করিতে থাকে।

তারপর তাহাকে ক্যামেরা বহন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ক্যামেরাটি প্লেটের সহিত সংযুক্ত থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাও ফেলিয়া দিতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে কিন্তু পরে অকৃতকার্য্য হইয়া সে আশা ত্যাগ করে। একপক্ষ কাল পরে পারাবত, বুকের উপর যন্ত্র করিয়া অতীব সন্তুষ্ট চিত্তে ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন এক যুদ্ধ-সৈন্য পিঠের উপর তাহার খাদ্যদ্রব্যের থলি লইয়া যাইতেছে! সেইদিন হইতে সে "আলোক চিত্রকর পারাবত"—এই আখ্যা পাইয়া থাকে।

এবার তাহার আলোকচিত্র তুলিবার অবসর আসে। মনে করুন, তাহার বাসস্থান হইতে আট মাইল দূরেস্থিত একটি গ্রামের দৃশ্য তাহাকে তুলিতে হইবে। তাহার রক্ষক, তাহাকে সেই গ্রাম পার করিয়া তিন চার মাইল দূরে লইয়া যায়। এ স্থানটি তাহার বাসস্থান হইতে এক সরল রেখার মধ্যে। যন্ত্রের shutter (ঢাকনি) যাহাতে

সেই গ্রামে আসিয়াই রুদ্ধ হইয়া যায়, সেইজন্য,পারাবতকে ছাড়িয়া দিলে,সেই গ্রামে পৌঁছিতে কতক্ষণ সময় লাগিবে রক্ষক পূর্ব্বে তাহা ঠিক করিয়া লয়। পত্রবাহক-পারাবত এক সেকেণ্ডে প্রায় পঁচিশ গজ বা ঘণ্টায় ৫২ মাইলের কাছাকাছি উড়িতে পারে। হয়ত, যে স্থানের দৃশ্য তুলিতে হইবে, সেখানে যাইতে পারাবতের চার মিনিট দশ সেকেণ্ড সময় লাগিবে ; তাহা হইলে, কেবল তদনুযায়ী যন্ত্রটি নিয়মিত করিয়া দিলেই, সব ঠিক হইয়া যাইবে। যে ক্যামেরায় একবারে কেবল একটি দৃশ্যই তোলা যায়, তাহার গঠন প্রণালী অতীব সরল ও বুদ্ধি-কৌশলময়। একটি সুন্দর ছিদ্র বিশিষ্ট রবারের ছোট বল, একটি দণ্ডযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত আছে। এই যন্ত্রই ক্যামেরার ঢাক্‌নিটিকে ফেলিয়া দেয়। সিরিঞ্জের দ্বারা বলটিকে উপরে তুলিয়া দেওয়া হয়। বলটি বাতাসে পূর্ণ হইলে, আবার খালি হইতে দশ মিনিট সময় লাগে। একটি ক্রমচিহ্নিত মান (scale) আছে ; দশ মিনিটের কম সময়ে বলকে খালি করিতে হইলে, কত বাতাস দিতে হইবে, তাহা এই যন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। যেমন প্রয়োজন, ততদূর বলটিকে বয়ুপূর্ণ করিয়া, ক্যামেরা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং পারাবতকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; বাতাস একটু একটু করিয়া বাহির হইতে থাকে। পরে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বলটি
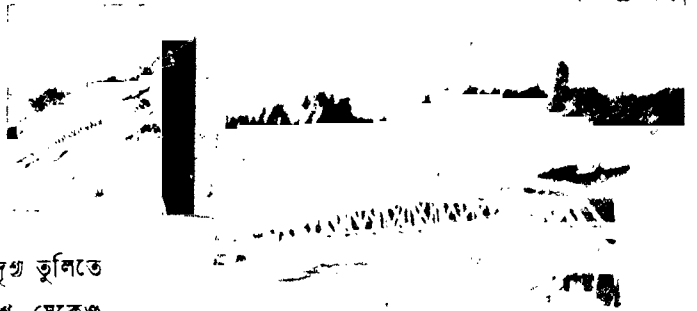
বর্দ্ধিতায়তন চিত্র

চুপসাইয়া গেলে, দণ্ডযন্ত্রটিকে ফেলিয়া দেয় ও ঢাক্‌নিটি পড়িয়া যায় ; সঙ্গে সঙ্গে চিত্রও অঙ্কিত হইয়া যায়।

যে ক্যামেরায় আটটি দৃশ্য একেবারে তুলিতে পারা যায়, তাহার যন্ত্র ঘড়ীর সুনিয়মিত যন্ত্রের ন্যায় নিয়মিতভাবে চালিত হয়। ইহাদ্বারাই 'ফিল্ম্' স্থানান্তরিত ও ঢাক্‌নি বন্ধ হয়।

পারাবত একশত মাইল পথ, আড়াই আউন্স ভার বহন করিয়া লইয়া, যাইতে পারে। তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে, ডাক্তার নিউব্রোনার একপ্রকার গতিশীল পারাবতগৃহ আবিষ্কার করিয়াছেন। (৩১৬পৃঃ দ্রষ্টব্য) একটি গাড়ীর উপর আবেষ্টনের দ্বারা একটি বড় খাঁচা রক্ষিত হইয়াছে ; যে পারাবতেরা সদা সর্ব্বদা এই গতিশীল বাসভবনে বাস করে, বাসভবনটি যেখানেই থাকুক্ না কেন, তাহারা তাহার প্রতি অশেষ আসক্ত থাকে।

বর্দ্ধিতায়তন চিত্র

এই প্রবন্ধের দৃশ্যগুলি দেখিলে আমরা এই কৌশলের কৃতকার্য্যতার বিশেষ পরিচয় পাই। উড্ডীয়মান পারাবতের অঙ্গভঙ্গী বশতঃ ছবির একটি প্রধান দোষ ঘটে ; কাচের উপর দৃশ্যগুলি অদ্ভুতভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেতুর প্রথম ছবিখানি দেখুন। কিন্তু ছবিখানি ঠিক মিলাইয়া, সমকোণ করিয়া লইলে, আর কেন দোষ থাকে না। পরের ছবিটি দেখিলেই আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিব।

যুদ্ধের সময় এই সকল চিত্রের সার্থকতা বিবেচ্য।
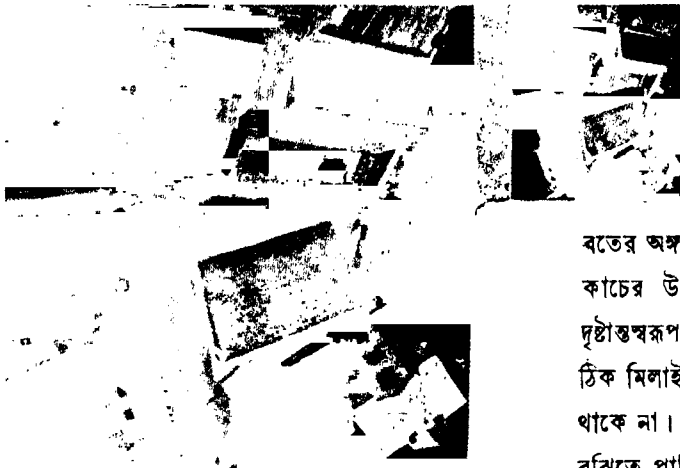
জর্ম্মণীর সমর-বিভাগের লোকেরা, এই বিষয়ে আরও অধিক পরীক্ষা করিবার জন্য, ডাক্তার নিউব্রোনারকে আহ্বান করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় সন্তোষ-জনক ফললাভও হইয়া-ছিল। ফ্রান্স দেশেও এই কৌশল প্রচলিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে এবিষয়ে এখনও কিছু করা হয় নাই। বুদ্ধিমান সৌখীন আলোক-চিত্রকরগণ এবিষয়ে মনোযোগ দিলে, ভবিষ্যতে সুফল ফলিতে পারে।

নিষ্কর্ম্মা

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

পাড়া গাঁয়ে অকেজো-দল, গ্রামকে তারা আপন জানে,
জট্‌লা করে এক-সাথেতে, দিবস-নিশি তামাক টানে;
বকুলতলে চাটাই পেতে সারা দিবস খেলায় পাশা,
চীৎকার এবং হাস্য করে, সংশোধনের নাইকো আশা;
রাত্রে 'কবির' আখ্‌ড়া দেওয়া, খোল-বাজায়ে নৃত্য করা,
'মতি' রায়ের নূতন-পালা একসাথেতে সবাই পড়া,—
জরুরি কাজ এসব তাদের, বকুনি খায় গেলেই গৃহে,—
তবু তাদের ভক্ত আমি—মুগ্ধ আমি তাদের স্নেহে।

(২)

বরযাত্রী যায় তা'রাই আগে, বরযাত্রীরে ঠকায় তারা,
নষ্টচন্দ্রে রাত্রি ধ'রে ঘুরে বেড়ায় সকল পাড়া;
অষ্টপ্রহর তারাই গাহে, কোজাগরে তারাই জাগে,
গ্রামের যত দৌত্য করে, মেলার চাঁদা তারাই মাগে;
তারাই করে নিত্যপূজা, তারাই ত যায় নিমন্ত্রণে,
আত্মীয়তা তারাই রাখে, আপন করে সকল জনে;
সকল লোকের কার্য্য করে, অকেজো তাই সবাই বলে—
স্মরি তাদের গুণের কথা, ভাসি আমি নয়নজলে।

(৩)

গ্রামে কোথা(ও) অতিথ এলে, আদর ক'রে তারাই ডাকে,
গ্রামের রোগী-দুখীর খবর সবার আগে তারাই রাখে,
রাত-দুপুরে ডাক্‌লে ওরে লম্ফ দিয়ে তারাই আসে,
সম্পদেতে নিষ্কপটে মুক্তপ্রাণে তারাই হাসে,
গ্রামবাসীদের বিপদেতে তারাই আগে কোমর-বাঁধে,
গ্রামের মৃত, গঙ্গালাভে চড়ে কেবল তাদের কাঁধে;
গ্রামে গ্রামে, হে ভগবন্! অকেজো দল এমনি দিয়ো—
তারাই গ্রামের গৌরব যে—আমার পরম বন্দনীয়।

ভারত-ভারতী *

'উপদেশ-সাহস্রী'

১। আত্মার স্বতন্ত্রতা

[শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম্. এ.]

বিষয়বর্গ এবং বিষয়-বর্গের অনুভবকর্ত্তা,—আমরা সংসারে এই দুইটি অংশ সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই শরীর, মন, ইন্দ্রিয় এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকল,—এসকল আমি নহি; কিন্তু আমি এসকলেরই প্রকাশক বা অনুভবকারী। এই আমি বা আত্মচৈতন্য—চিরনিত্য, সকলের প্রকাশক, অক্ষর, অব্যয়। কোন স্থানে বা কোন কালে এই প্রকাশস্বরূপ চৈতন্যের অভাব নাই, রূপান্তর নাই। জগতের তাবৎপদার্থ এই আত্মচৈতন্যের আশ্রয়ে স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। এই জড়-জগতের যাহা মূল উপাদান—যে উপাদানটি, ক্রমে অসংখ্য নামরূপে পরিণত হইয়া, এই জগদাকার ধারণ করিয়াছে, সেই মূল অব্যক্ত উপাদানটিও এই চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া আপন কার্য্য করিতেছে।

সকল বস্তুই যখন আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সকল বস্তুই যখন আত্ম-সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন ইহাও নিশ্চয় যে, যেসত্তার উপরে অপর সকলের সত্তা অবস্থিত, সেই সত্তাটিই একমাত্র সত্য। সেই চৈতন্য-সত্তাকে বাদ্ দিলে, তদাশ্রিত কোন বস্তুরই আর সত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং জড়বস্তুমাত্রই অসত্য হইতেছে।

আত্মাই এই জড়বর্গকে অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং এই জড়বিষয়বর্গ আত্মাতেই অনুভূত হয়, বা আত্মতেই অবস্থান করে। আত্মাকে ছাড়িয়া দিলে, আর ইহাদিগের অনুভূতি হইতে পারে না;—আত্মাকে ছাড়িয়া দিলে, ইহাদের অবস্থানও অসম্ভব হয়। সুতরাং, ইহারা সকলে আত্মাতে "অধ্যস্ত" হইয়া অনুভূত হয়। ইহারা জড়, আত্মা চেতন। ইহারা আত্মার 'জ্ঞেয়'; আত্মা ইহাদের অনুভবকার বা 'জ্ঞাতা'। সুতরাং, আত্মা এসকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। কিন্তু ইহারা কেহই স্বতঃসিদ্ধ নহে। কেন না, আত্মসত্তাতেই ইহারা অনুভূত হয় বলিয়া, ইহাদের নিজের কোন সত্তা নাই। আত্ম-সত্তাই সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। এই আত্ম সত্তাতেই অপর সকল বস্তুর সত্তা। আত্মা, এসকল বস্তু হইতে নিত্য-স্বতন্ত্র বলিয়া, এসকল বস্তু নষ্ট হইলে বা অবস্থান্তরিত হইলেও, আত্ম-সত্তা ঠিক্ অব্যাহতই থাকিবে। কিন্তু, আত্ম-সত্তা না থাকিলে যখন এসকল বস্তু দাঁড়াইতে পারে না, তখন আত্ম-সত্তার কখনই ধ্বংস বা বিলোপ হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে, আমাদের এই বর্ত্তমান সংসার-দশায়, আমরা, আত্মার যেটি প্রকৃত অবিমিশ্র স্বরূপ, সে স্বরূপটী সহজে ধরিতে পারি না। তাহার কারণ এই যে, এখন আত্মা, মন-ইন্দ্রিয়-শব্দস্পর্শাদি বিবিধ বিষয়বর্গকে সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকে। এখন, আত্মাতে ঐ সকল বিবিধ বিষয় আরোপিত বা অধ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং, ঐসকল বিষয় একে একে দূর করিয়া দিলে, আত্মার যে অবিমিশ্র শুদ্ধ-স্বরূপটী ভাসিয়া উঠে, সেই স্বরূপটীকে এখন আর আত্মা কেমন করিয়া সহজে বুঝিতে পারিবে? আত্মা—দেহ নহে, মন নহে, ইন্দ্রিয় নহে, বৃক্ষ নহে, লতা নহে, নদী নহে, পর্ব্বত নহে; কিন্তু এসকল, আত্মাতে আরোপিত হইয়া অনুভূত হইতেছে; আত্মা, এসকলের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র; আত্মা, এসকলের অনুভবকারী; আত্মা, এসকলের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছেন; সুতরাং আত্মা, এসকল বস্তু হইতেই স্বতন্ত্র।

* এই শীর্ষকে বিশিষ্ট সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের ভাবানুবাদ প্রকাশিত হইবে।—ভাঃ সঃ

আত্মার এই স্বাতন্ত্র্যের কথাটা এখন আর সহজে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। আত্মার স্বাতন্ত্র্যটী, এই সকল আরোপিত বস্তুর মধ্যে এখন একেবারে হারাইয়া গিয়াছে।

বিষয়বর্গের অনুভূতির সময়ে, সর্ব্বদা আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কথাটা যদি আমরা সতর্কদৃষ্টিতে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবেই আত্মজ্ঞান ক্রমে সুমাৰ্জ্জিত হইতে পারে।

বিষয়বর্গের অনুভব-সময়ে,—এই 'আমি' অদ্য এই কার্য্যটী সম্পাদন করিলাম; এই 'আমি' পুত্রের অরোগ্য-লাভে সুখী হইলাম; পদে কণ্টকবিদ্ধ হওয়াতে 'আমি' দুঃখ অনুভব করিতেছি;—এই সকল স্থলে, এই যে আমাদের এই 'আমি' ও 'আমার' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, এই 'আমি'-ত্ব টুকুও কিন্তু আত্ম-চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপকে বুঝাইয়া দেয় না। বিষয়ানুভব-সময়ে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়রাশির সংপর্ক হইয়া, আমাদের বুদ্ধির যেসকল বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমরা বুদ্ধির ঐসকল বিকারের সঙ্গে আমাদিগকে একেবারে অভিন্ন-ভাবে মিশাইয়া ফেলি। আমরা, আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কথাটি একেবারে ভুলিয়া যাই। বুদ্ধির, যেপ্রকার বিকার-ই উপস্থিত হউক্ না কেন, আমরা তৎক্ষণাৎ ঐ বিকারের সঙ্গে আমাদের আত্মাকে ও মিশাইয়া ফেলি, এবং ঐ অভেদের ফলে, মনে ধরিয়া লই যে, আত্মারই বিকার উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে আমরা আত্মাকে সুখী, দুঃখী, পীড়িত, হৃষ্ট প্রভৃতি বলিয়া বোধ করিতে থাকি। বস্তুকে, বা বিকার-রাশিকে, প্রকাশ করাই আত্ম-চৈতন্যের স্বভাব। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি, আমাদের বুদ্ধির যেপ্রকার অবস্থান্তর বা বিকার উৎপাদন করুক্ না কেন, বুদ্ধিতে উপস্থিত সমুদয় বিকারের মূলে বা অন্তরালে যখন আত্ম-চৈতন্য আছেন, তখন বুদ্ধির একটা বিকৃত-ভাব উৎপন্ন হইবামাত্রেই ত আত্মা সে বিকারটাকে প্রকাশ করিবেন-ই। কিন্তু আত্ম-চৈতন্য যে ঐসকল বিকার হইতে স্বতন্ত্র; ঐসকল বিকার যে আত্মাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হইতেছে—এ কথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই। স্বতন্ত্র থাকিয়াই যে আত্মা, ঐসকল বিকারের প্রকাশক বা অনুভবকারী—একথাটা যদি আমাদের ঠিক্ ভুল না হইত, তাহা হইলে, আমরা পীড়া-হর্ষাদি উপস্থিত হইলেও, সেই পীড়া-হর্ষাদি দ্বারা এতদূর অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতাম না।

আত্মা—অধিকারী, আত্মা—নিত্য। বুদ্ধিরই বিকার উৎপন্ন হয়। আত্মা নিজে অবিকৃত থাকিয়া, ঐসকল বিকারের দ্রষ্টা। বিষয়ানুভব কালে, এই প্রকারে আমাদের আত্মার স্বতন্ত্রতার কথাটা সকর্কতার সহিত মনে রাখা কর্ত্তব্য।

কোন দুরাচার ধনীর জীবনান্তে

[মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুর K. C. S. I., K. C. I. E., I. O. M.]

আশাবরী—ঝাঁপতাল।

এবারের মত হ'ল, যত খেলা অবসান।
কিন্তু যাতায়াত হ'তে, নাহিক ত পরিত্রাণ!
যে ধরায় হেয় জ্ঞানে, দলেছ সদা চরণে,
মিশিবে তাহারি সনে, বরবপু-উপাদান।
দুরন্ত ভোগের আশা, কলুষিত ভালবাসা,
মিটিল কি সে পিপাসা, দর্প-গর্ব্ব-অভিমান।
মনোধনজনবলে, সদা উচ্চশির ছিলে,
আজি ত কাল-কবলে, কালই হ'ল বলীয়ান্!

বৃথা কথা কহা এবে, কি হবে বলিলে শবে,
কে কবে লভেছে ভবে, হেন উপদেশে জ্ঞান!
স্নেহে ভুলে দোষযত সদ্গুণচিন্তনে রত,
কাঁদে বন্ধু দারা-সুত, শোকে হ'য়ে ম্রিয়মাণ।
মরণে হরিস্মরণে, জীব শিবকৃপাগুণে,
উঠে উন্নতিসোপানে, বিধির এ সুবিধান।
স্বজন-সুগতি দেখি, হ'তে নাই কভু দুঃখী,
একথা মানসে রাখি, ধীরতায় বাঁধ প্রাণ।
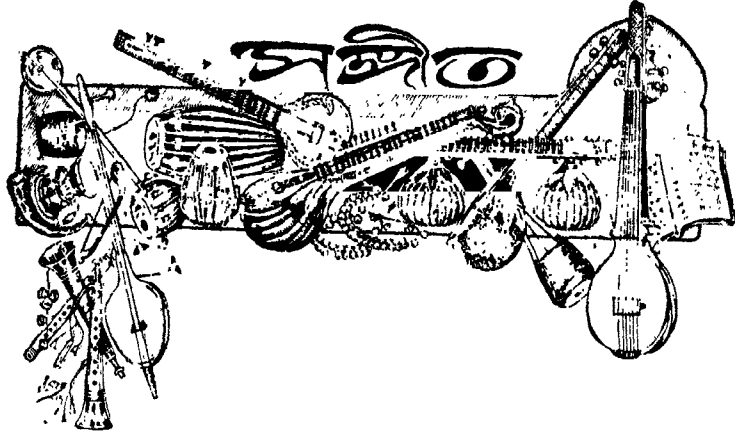
ধ্রুপদ

ভৈরব—চৌতাল

(হিন্দী)

ভৈরূঁ ভয়-হরতা সুখ-করতা
সবনকে অভয় বরদাতা।
ভৈরবী-অরধঙ্গ অরুণ-অঙ্গ
কোটী-ইন্দুসম ছবি দামিনি-দ্যুতি গাতা।
বাম কর খপ্পর-ত্রিশূলধর, গরে মুণ্ডমালা,
নৈনা জ্বাল ফিরত মাতা।
বাণী-বরবিলাস শ্যাম-রামকো দীজে চারোঁ ফল
অর্থ-ধর্ম্ম-কাম-মোক্ষ প্রাপ্ত হোত জগত্রাতা॥

স্বরলিপি

[শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত-বিদ্যার্ণব, সঙ্গীত-নায়ক]

০ ৩ ৪ ॥ ১´ ০ ২ ০
II সা-ণা | দা পমা | -পা মগা I মা পা | ণদা -া | -দা পা | পদা-পদা |
ভৈ ০ রূঁ ভ ০ ০ য় ০ হ র তা০০ ০ ০ সু ০ ০ ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
-মপা মগা | মা ঋা I ঋা মগা | -পা মা | -গমা-ঋা | মা গা | -ঋা ঋা | -সা
০০ খ ০ ০ ০ ক র০ ০ তা ০০ ০ স ব ০ ন ০

সাহিত্য-সংবাদ

আনন্দের কথা—পরম মঙ্গলময়ের শুভেচ্ছায়, শ্রদ্ধেয়বর্গের আশীর্ব্বাদে, গ্রাহক-অনুগ্রাহকদিগের অনুকম্পায় 'ভারতবর্ষে'র দিনদিনই যে অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছে, পাঠকপাঠিকারা অবশ্যই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর লিখিত কঠোর শাস্ত্রালোচনা সমন্বিত, বিচিত্র রস মাধুর্য্য-পরিলিপ্ত, অতুলনীয় গল্প 'একাদশী তত্ত্ব' যে 'ভারতবর্ষে'র গ্রাহকদিগের—বঙ্গ-সাহিত্যের এক অমূল্য অভিনব রত্ন, গুণগ্রাহীদিগকে আর সে কথা বলিয়া দিতে হইবে না। আবার মাঘে—বঙ্গ-বাণীর একনিষ্ঠ সেবক, অমিত শক্তিশালী লেখক, আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর, শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্রামের পর—তাঁহার স্বভাব সুলভ অতি সরল-প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান-দর্শন-বিষয়ক বিচিত্র মৌলিক তথ্যনিচয় সম্বলিত একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ সূচনা করিয়া, সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরাবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সন্দর্ভ 'ভারতবর্ষে'র অন্যতম মহার্ঘ নূতন অলঙ্কার। তদ্ভিন্ন, "মৌলিক গবেষণা", "ভারত ভারতী", "বীণার তান", প্রভৃতি কয়েকটি অভিনব নামকরণে কতকগুলি বিচিত্র-পর্য্যায়ের রত্নাভরণে 'ভারতবর্ষে'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়মিতরূপে সুশোভিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আশা করি, গ্রাহকগণ আমাদের এসকল চেষ্টাযত্নের মূল্যবত্তা অনুভব করিবেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'র সুযোগ্য কর্ণধার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এবার নববর্ষের দিনে 'কৈশরী-হিন্দ' রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গবাণীর প্রিয় সেবকের এই প্রতিষ্ঠা-লাভে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবক মাত্রেই গৌরব অনুভব করিবেন। এতদিনে বাঙ্গালীর স্বাধীন ঐতিহাসিক-তথ্যানুসন্ধান চেষ্টা রাজসম্মান লাভ করিল। বঙ্গের গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত কারমাইকেল্ বাহাদুর শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া, এই সম্মান লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন!

মুসলমান-সমাজের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, 'মক্কা ও মদিনা শরীফের ইতিহাস' লেখক মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার সাহেবের সহধর্ম্মিণী, "দেবী রাবিয়া"-রচয়িত্রী মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন সাহেবার বিগত ৩রা ডিসেম্বর মৃত্যু হইয়াছে। লেখিকার রচিত "সতী রহিমা" লেখা আছে, শীঘ্রই ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবে।

সুলেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'ঈশা খাঁ' শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বেই বাহির হইবে। পূর্ণবাবুর "ভারতবর্ষ" (ভারতবর্ষের ইতিহাস), "হিন্দুস্থান" (হিন্দুরাজত্বের বিস্তৃত বিবরণসহ ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত), এবং "সখা ও সারথী," "আকাশের কথা", "সতী ও সীতা" ছাপা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, বি. এ. প্রণীত "আকাশের কথা" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পুস্তকখানি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিষয়ক। ইহা বালকবালিকাদের উপযোগী সরল ভাষায় লিখিত, এবং বহুচিত্র-শোভিত।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত, সুলেখক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, নূতন নাটিকা "রূমেলা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নূতন নাটক "আহেরিয়া" মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে; শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত "অডিসির গল্প" ও "ইলিয়ডের গল্প" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য প্রত্যেক খানির ।৹ আনা।

মহারাজাধিরাজ-বর্দ্ধমান-প্রণীত "ত্রয়োদশী" নামক কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইল; মূল্য ৷৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু প্রণীত নূতন নাটক "ক্লিওপেট্রা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲ টাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফাল্গুন, ১৩২১

দ্বিতীয় খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

গোরা

[৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, M. A., F. R. A. S.]

(১)

ও কে গান গেয়ে গেয়ে
চ'লে যায়
পথে পথে—ওই
নদীয়ায় !
ও যে নেচে নেচে চলে,—
মুখে 'হরি' বলে –
ঢ'লে ঢ'লে –
পাগলেরি প্রায় !

(২)

ও কে প্রেমে মাতোয়ারা—
চোখে বহে ধারা—
কেঁদে কেঁদে সারা—
কেন ভাই ?

সব দ্বেষ-হিংসা ছুটি'—
আসি' পড়ে লুটি'—
ও তা'র— ধূলি-মাখা দুটি
রাঙ্গা পায়।

(৩)

ও সে— বলে, 'কই ত কেউ
পর নাই!'
বলে, 'সবাই যে
নিজ ভাই!'
ও সে— বলে শুধু হেসে—
'শুধু ভালবেসে—
ভ্রমি দেশে দেশে—
এই চাই!'

(৪)

ও কে যায় নেচে নেচে—
আপনায় বেচে—
পথে পথে শুধু
প্রেম যেচে যেচে!
ও কে দেবতা-ভিখারী
মানব দুয়ারে—
দেখে যা রে- তোরা
দেখে যা।

(৫)

বলে, 'ছেড়ে দাও মোদের
মোরা চ'লে যাই;—
নৈলে, প্রভু! তোমার
প্রেমে গ'লে যাই!'
এ যে নূতন মধুর
প্রণয়েরি পুর—
হেথা আমাদের
কোথা ঠাঁই?

বেদে খ্রীষ্টের আত্মবলিদান

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, M.A.]

খ্রীষ্টের আত্মবলিদানই খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। সুতরাং, এই আত্মবলিদান-তত্ত্বে বিশ্বাসই খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ আপনাদের মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট, জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই, আত্মবলিদান করিয়াছিলেন। সেই প্রায়শ্চিত্তে দৃঢ়বিশ্বাস-স্থাপন দ্বারা মানবের নিজের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। তাহাতেই মানব পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া, মোক্ষলাভ করিতে পারে ;—ইহাই আত্মবলিদানে বিশ্বাসের পক্ষে প্রধান যুক্তি।

পূর্ব্বোক্ত আত্মবলিদান-তত্ত্বটি খ্রীষ্ট ভক্তগণ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মের অভিনব মতবাদরূপে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এইটি যে নূতন মতবাদ নহে, পরন্তু বেদের পুরাতন মতবাদই নূতন হইয়াছে, আমরা তাহাই প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইব। বেদের যজ্ঞেই আমরা আত্মবলিদানের প্রথম সূচনা দেখিতে পাই। অগ্নিসহযোগেই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। অগ্নি, যজ্ঞীয় আহুতিদ্রব্যে প্রবেশ করিয়া, ইহাদিগকে তেজোরূপ সূক্ষ্ম উপাদানে পরিণত করিয়া, দেবভোগের উপযোগী করে। সুতরাং, অগ্নি, যজ্ঞে আত্মসমর্পণ করিয়া, দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করে, বলা যায়। ইহাতেই অগ্নি, দেবতাদিগের পুরোহিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অগ্নির এই আহুতিরূপে পরিণতিই আত্মবলিদানের প্রথমরূপ বলিয়া কথিত হইতে পারে। এসম্বন্ধে 'ধর্ম্মবিজ্ঞান' ("SCIENCE OF RELIGIONS" নামক গ্রন্থে ই. বর্ণূফ্ এইরূপ মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছেন—

"Those offerings are dedicated to the sacred fire upon the altar. The fire consumes them, transforms them, and raises them, to heaven in odorous vapors, where they group themselves with the glorious congregation of divine beings, and finally with the heavenly father, who presides at this ceremony. Agni, then, is the mediator of the offering—the sacrificer and mystic priest, and since the offering contains him under a material appearance, he is a sacrificer offering up himself as a victim."—THE SCIENCE OF RELIGIONS, *by Emile Burnoof.* P. 143.

হোমদ্রব্য-দহনকারী অগ্নিতে আমরা যে আত্মবলিদানের আভাস দেখিতে পাইয়াছি, হবনীয় দ্রব্যে তাহাই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। হবনীয় দ্রব্যের মধ্যে বেদে সোমরসই প্রধানরূপে পরিগণিত। এই সোমরস, সোমলতা নিষ্পেষিত করিয়া তাহা হইতে নিষ্কাশিত করা হয়। যজ্ঞের জন্য সোমলতার এইরূপ নিষ্পেষণই, বেদে আত্ম-বলিদানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সামবেদে আমরা, একটি মন্ত্রে এই আত্মবলিদানের কথা প্রাপ্ত হই। এতৎসম্বন্ধে খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজক 'মরিস্ ফিলিপস্' তদীয় 'বেদের শিক্ষা' ("THE TEACHING OF THE VEDAS") নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"The Sama Veda says of this God, that 'he submits to mortal birth, and is bruised and afflicted that others may be saved.' This is the rudest type of mediation through sacrifice, of strength through weakness, of life through death."* —THE TEACHING OF THE VEDAS—P. 50.

"সামবেদে এই দেবতা (সোম) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি মর্ত্ত্যদেহ প্রাপ্ত হন এবং অন্যের উদ্ধারের জন্য নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত হইয়া থাকেন।"—ইহাই আত্ম-

* Sama Veda ii, Prap.—5, 3 ; IV, Prap. 45 ; V, Prap. 33 ; ii, X, 2, 6 ; VI, 4

বলিদান ;—অবতারের দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া বললাভের—মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনলাভের—অপরিমার্জ্জিত আদর্শ।"

বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'পুরুষসূক্তে' আমরা আত্মবলিদানের পূর্ব্বোক্ত অমার্জ্জিত আদর্শের পূর্ণ পরিণতিই দেখিতে পাই। সেখানে পুরুষ, বা পরমদেবতা, স্বয়ংই বলিরূপে কল্পিত হইয়াছেন। পুরুষ যে পরমদেবতা বা পরমেশ্বর, পুরুষের প্রথমবর্ণনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায় ; যথা,—

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥"

—'পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া,দশ-অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া, অবস্থিত থাকেন।'

এই 'পুরুষ'—বিষ্ণু বা নারায়ণেরই নামান্তর। তাহাতেই, নারায়ণের স্নানমন্ত্রে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণনারই আবৃত্তি করিতে হয়। বিশেষভাবে নারায়ণই, পুরুষরূপী বলিয়া, তিনি 'পুরুষোত্তম' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই জন্যই কবি কালিদাস তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"বিষ্ণুর্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ।
মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ ॥" ইত্যাদি

বিষ্ণু—শ্রুতিতে যজ্ঞরূপী বলিয়াও কল্পিত হইয়া থাকেন—'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।' 'সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ' বলিয়া যে শাস্ত্রবাক্য প্রচলিত আছে, তাহাতে বিষ্ণুই প্রধান যজ্ঞদেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং 'পুরুষ'—বলিরূপে কল্পিত হওয়ায়, যজ্ঞের প্রধান দেবতাই যে যজ্ঞরূপে কল্পিত হইয়াছেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

'পুরুষ' যে পরমদেবতা বা পরমেশ্বর, তাহা, আমরা পুরুষের প্রথম যে বর্ণনা বেদে প্রাপ্ত হই—তাহা হইতেই বুঝিতে পারি। পরমাত্মাই পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ; অতএব 'পুরুষ' যে পরমাত্মাকে বুঝায়, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে, 'পুরুষ'শব্দে জীবাত্মাও বুঝায়, বলিয়া বোধ হয়। যম, সত্যবানের দেহ হইতে যে আত্মাকে লইয়া যান, তাহা 'পুরুষ' নামেই উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ।' ইহাতে, পুরুষ যে উভয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মার—বোধক, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বেদের যে 'পুরুষ'-বর্ণনা, আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহাতে আমরা 'পুরুষ'শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত উভয়ার্থেরই যোগ দেখিতে পাই। তিনি যে 'সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—তাহাতে 'বিশ্বতোবৃত্বা' বর্ণনায় যেমন সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, তাঁহাকেই পরমাত্মারূপে আমরা বুঝিতে পারি, তেমনই "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং" বর্ণনায় তাঁহাকে আমরা জীবদেহবদ্ধরূপে 'জীবাত্মা' বলিয়াও বুঝিতে পারি। 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং'—'দশ-অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত ছিলেন'—এইরূপ বলাতে পরমাত্মার দেহাবচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধভাব প্রকাশিত হইয়াছে, বলিয়াই মনে হয়। জীবদেহবদ্ধ আত্মা, বা জীবাত্মা, সাধারণতঃ 'লিঙ্গশরীর' নামে আখ্যাত হয়। 'দশাঙ্গুল', এই লিঙ্গশরীরেরই সাধারণভাবে পরিমাপক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সত্যবানের আত্মাকেও আমরা 'অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত' বলিয়াই বর্ণিত দেখিতে পাই।

'পুরুষ সূক্তে' 'পুরুষ', যজ্ঞের পশুরূপে কল্পিত হইয়াছেন দেখা যায় ; যথা—

'দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥' ১৫

—'দেবতারা যজ্ঞসম্পাদনকালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন।'

'পুরুষ'কে আমরা পরমাত্মা ও জীবাত্মা, উভয়ার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছি। পরমাত্মা জীবাত্মারূপে জীবদেহবদ্ধ হয় ; তাহাই পুরুষের 'পশুরূপে বন্ধন' বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। জীবদেহ-বদ্ধ হইয়া আত্মাতে যে পশুভাব সঞ্জাত হয়, তাহা হইতে ইহাকে মুক্ত করিবার জন্যই ইহার যজ্ঞের ব্যবস্থা। ইহার বদ্ধ পশুভাব খণ্ডিত করিয়া, ইহাতে মুক্ত দিব্যভাবের উৎপাদনই, ইহার বলিদান। এই বলির দ্বারা, জীবাত্মা সীমাবদ্ধ পশুভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, সার্ব্বভৌম ঐশভাব লাভ করে। ইহাতে, একদিকে—পরমাত্মার সহিত ইহার যোগসাধিত হইতে যেমন বাধা থাকে না, তেমনই অপরদিকে—অপর জীবাত্মার সহিত যোগসাধিত হইতেও বাধা থাকে না। এই সার্ব্বভৌম ঐশভাবের আদর্শদ্বারা পৃথিবীর লোকদিগের অনুপ্রাণনা হয় বলিয়াই, ইহাই ঈশ্বরের অবতাররূপে পরিগৃহীত হয়।

আত্মার, পূর্ব্বোক্ত পশুভাবের উৎসর্গ হইতেই, পশুর

উৎসর্গ বা বলিদান-ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং, পশুবলিকে আমরা আধ্যাত্মিক-উৎসর্গ বা মুক্তিব্যাপারেরই বাহ্যরূপক বলিয়া মনে করি। যজ্ঞের সহিত যে আমরা প্রথম পশুবলির যোগ দেখিতে পাই, তাহাতেই যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যে, আধ্যাত্মিক-উৎসর্গকার্য্য প্রথম সাধিত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যভাষায় 'যজ্ঞ' ও 'বলি'-বাচক যে একই 'Sacrifice' শব্দ পাওয়া যায়, তাহাতেও আমাদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ সমর্থনই হয়।

বলিতে ছাগশিশুর মস্তক ছিন্ন করিয়া, মস্তক ও রুধির দেবতার নিকট উৎসর্গ করা—ইহাই প্রধান নিয়ম। বলির ছাগপশু নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণ হইলেই প্রশস্ত। আমাদের পশুভাব তমোগুণেরই উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ইহা তমোগুণাত্মক। এই তমোগুণের প্রভাব বিনষ্ট করিয়া, রজোগুণের সহিত ইহাকে সাত্ত্বিক দেবভাবের নিকট উৎসর্গীকৃত করা—পশুবলি এই আধ্যাত্মিক-তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। উপাসকের হৃদয়ের রক্ত দেবতাকে উৎসর্গ করার যে নিয়ম দেখা যায়, তাহাতেও ঐ তত্ত্বই অন্তর্নিহিত বলিয়া বোধ হয়। তমোগুণের গাঢ়ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই ছাগের কৃষ্ণবর্ণ ইহার রূপকস্বরূপে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। য়িহুদিদিগের মধ্যে যে 'Scape-goat', বা ছাগোৎসর্গরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে বলির পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বেরই পরিষ্কার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইহাতে, য়িহুদি প্রধান-পুরোহিত বৎসরে একবার একটি ছাগের উপর সকলের পাপ কোনও চিহ্নরূপে স্থাপন করিলে পর—ছাগটিকে স্বচ্ছন্দে চরিবার জন্য বনে ছাড়িয়া দেওয়া হইত; আদিতে ছাগটিই সম্ভবতঃ পাপের মূর্ত্তি বা চিহ্নরূপে কল্পিত হইত; পরে অপর স্বতন্ত্র কোন চিহ্ন ইহার পৃষ্ঠের উপর স্থাপিত হওয়ার নিয়ম হয়।

বলির পশু যে প্রকৃত পশু নহে, কিন্তু পশুর রূপক মাত্র, তাহা পশুবলির মন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বলির মন্ত্রে প্রথমেই আছে—

"অগ্নিঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত সএতল্লোকমজয়ৎ।
তস্মিন্নগ্নিঃ তে লোকো ভবিষ্যতি তং জেষ্যসি পিবৈতাপঃ।"
ইত্যাদি

—"অগ্নি পশু হইয়াছিলেন—তাহার দ্বারা যজ্ঞ করা হইয়াছিল। সে এই লোক জয় করিয়াছিল। তাহাতে অগ্নি আছে। সেই লোক তোমার হইবে। তুমি সেই লোক জয় করিবে। জল পান কর।"

এস্থলে অগ্নি স্বয়ং, পশুরূপে, যজ্ঞে বলি অর্পিত হইয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা লোকসকল জয় করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় আমরা যজ্ঞে অগ্নির আত্মবলিদানের সুস্পষ্ট চিত্রই দেখিতে পাইতেছি। এই আত্মবলিদান-চিত্র 'পুরুষ-সূক্তে' চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতেই, পুরুষের আত্মবলিদান হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নূতন সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরের অবতার, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, আপনার লোকোত্তর আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক এইরূপেই নবজীবনের দ্বারা জগৎকে সমনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন।

'পুরুষ-সূক্তে' আমরা দ্বিবিধ পুরুষের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। নিম্নোদ্ধৃত ঋক্ দুইটিতে আমরা সেই দ্বিবিধ পুরুষের বর্ণনা দেখিতে পাইব—

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। ৫"

—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত।

—"পুরুষ আপনার তিনপাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এইস্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন। ৪

"তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন এবং বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন।" ৫

এই বর্ণনা হইতে পূর্ব্বে আমরা পুরুষকে যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহারই স্পষ্ট পোষকতা প্রাপ্ত হইতেছি। জীবাত্মা যেরূপ পরমাত্মার অংশ-ভূত, তেমনই এখানে এক পুরুষ অপর পুরুষের অংশভূত রূপে, বর্ণিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আদি-পুরুষকে আমরা পরম বা পূর্ণ পুরুষ, এবং তজ্জাত পুরুষকে অবান্তর বা অংশপুরুষ, নামে আখ্যাত করিতে পারি। অথবা, এক পুরুষকে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি পিতা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি; অপর পুরুষকে, সৃষ্টিরূপে, সেই পিতারই পুত্র বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

ব্রহ্মার 'পিতামহ' নামেও যে সেই আদি-পিতার কল্পনাই বর্ত্তমান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যজ্ঞে যে পুরুষ বলিরূপে অর্পিত হইয়াছিলেন, তিনি যে আদি-পুরুষের আত্মজ, তাহা পুরুষ সূক্তের বর্ণনা পাঠ করিলেই পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় ; যথা—

"তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যাশ্চ ঋষয়শ্চ যে॥" ৭

—"যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু-স্বরূপে সেই বর্হিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উঁহার দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।"

পুরুষ বলিরূপে যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত হইলে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল, বলিয়াও বর্ণনা পাওয়া যায়—

'যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্॥' ১১

—'পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল ; কয় খণ্ড করা হইয়াছিল ?'

পুরুষের দেহ খণ্ডিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব হইতে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়া, সমগ্রবিশ্ব বিরচিত হইল—

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১২
চন্দ্রমা মনসোজাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রাগ্নীশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥ ১৩
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকানকল্পয়ন্॥' ১৪

—'ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল। ১২। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু। ১৩। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুইচরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মাণ করা হইল। ১৪'।

পরমাত্মজ আত্মা, পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিভক্ত হইয়া, কি প্রকারে সর্ব্ববিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, এখানে রূপকভাবে তাহারই বর্ণনা আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

পূর্ব্বোক্তরূপে, ব্যষ্টিভাবে বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই আত্মা, জীবাত্মা-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং, জীবাত্মা, ইহার সীমাবদ্ধভাব খণ্ডিত করিতে পারিলেই, পরমাত্মার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, যেমন অপর জীবাত্মা সকলকে উজ্জীবিত করিতে পারে, তেমনই আপনার মূলীভূত পরমাত্মার সহিতও যোগসাধন করিতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবের সম্পূর্ণ বিনাশ দ্বারা বিশ্বজনীনভাবের বিকাশ না করিতে পারিলে, কখনও জগতের হিত সাধিত হইতে পারে না ;—অর্থাৎ, সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেই জগতের যেমন চরম হিত সাধিত হয়, তেমনই নিজের পরমোৎকর্ষও সাধিত হয়।

ব্যক্তিগতভাবকে পশুভাব ধরিলে, আত্মোৎসর্গের ভাবই বলিদানের ভাব হয়। সুতরাং, আত্মবলিদানের জন্য মহাপুরুষেরই আবশ্যক হয় ; ক্ষুদ্র পুরুষের দ্বারা কখনও ইহা সম্ভবপর হয় না। এই সমস্ত মহাপুরুষই অবতার-রূপ বিশেষ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যীশুখ্রীষ্ট, এইরূপ মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়াই, তিনি অবতার-রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তদীয় আত্মবলিদানের মূলে, আমরা বেদের যজ্ঞীয় পশুবলিকেই বর্ত্তমান দেখিতে পাই। তাহাতেই, যজ্ঞীয় পশু—মেষের নামে, যীশুখৃষ্টেরও একনাম Lamb, বা মেষশাবক, দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে যজ্ঞীয় বলিরূপ পুরুষকে আমরা যেমন পরম-পুরুষেরই 'আত্মজ'রূপে বর্ণিত দেখিয়াছি—যীশুখৃষ্টকেও তেমনই পরমেশ্বরের প্রিয়তম পুত্ররূপে বর্ণিত দেখা যায়। 'God, the Son' 'পুত্ররূপী ঈশ্বর' নামে তিনি স্পষ্টই ঈশ্বরতত্ত্ব বা অবতার-রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। যজ্ঞীয় পুরুষদেহ যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল, যীশুখ্রীষ্টদেহও তেমনই ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। যজ্ঞীয় পুরুষের খণ্ডীকৃত দেহ হইতে যেমন সৃষ্টি হইয়াছে—যীশুখৃষ্টের রক্তপাত হইতেও তেমনই নূতন ধর্ম্মরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঋষিগণ, যজ্ঞের উৎসর্গীকৃত সোম ও পুরোডাশরূপ উপকরণ, যজ্ঞদেবতা অগ্নিরই সত্তা দ্বারা আপূরিত দেখিতে পাইতেন। খৃষ্টধর্ম্মের Eucharist নামক ধর্ম্মানুষ্ঠানের রুটি ও মদ্যে, খৃষ্টভক্তগণ খ্রীষ্টেরই সত্তা বর্ত্তমান দেখিতে পান। বেদ ও বাইবেলের উভয় অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিত বর্ণূফ্ এই প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"He (Christ) instituted the Eucharist ; on that day He offered Himself as a newvictim

.........a victim, which should henceferth be replaced on the altar by the twofold offering of the mystic body of Christ... ....there (in the Veda) we, nearly always, find Agni offering up Himself on the altar, under the twofold symbol of the holy Cake and spirituous juice of the Soma, or as we have it, of Bread and Wine."

—THE SCIENCE OF RELIGIONS—p. 150.

—"যীশুখ্রীষ্ট ইউকেরিষ্টের প্রবর্ত্তন করেন। ঐ দিবস তিনি নিজেই আপনাকে নূতন বলিরূপে, প্রদান করিতেন। খ্রীষ্টের রূপকদেহরূপ দ্বিবিধ উপকরণ (রুটি ও মদ্য) বেদির উপর স্থাপিত হইয়া, পরিশেষে এই বলিরই স্থানগ্রহণ করে। বেদে আমরা অগ্নিকে প্রায়শঃই পুরোডাশ ও সোমরূপে—অথবা আমাদের রুটি ও মদ্যরূপে—নিজেই যজ্ঞবেদির উপর উৎসর্গীকৃত দেখিতে পাই।"

এস্থলে যীশুখ্রীষ্ট যে জীবিতাবস্থাতেই রূপকভাবে আত্মবলিদানের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা দেখিতে পাইতেছি। বেদের যজ্ঞ-বর্ণনায়, অগ্নির আত্মবলিদানের বহুল উল্লেখের দ্বারা, এই আত্মবলিদানতত্ত্ব যে, আদিতে বৈদিকযজ্ঞে উদ্ভূত হইয়া, বেদেরই পুরুষসূক্তে সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

যীশুখ্রীষ্টকে যে আমরা য়িহুদিদিগের মধ্যে প্রথম আত্মবলিদান-অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তয়িতারূপে দেখিতে পাই, তাহাতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তিনি স্বয়ংই এই তত্ত্বটি কোন সূত্রে ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার সময়ে এই তত্ত্বটি কোন প্রকারে য়িহুদিদিগের মধ্যে প্রচার-লাভ করিয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট যে তিব্বত পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সলোমনের রাজত্বকালেই ভারতের সহিত য়িহুদিদিগের যে সংস্রব ছিল, তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টের জীবিতকালেই তৎ-কর্ত্তৃক আত্মবলিদান-অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনের প্রমাণ যখন আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, তখন তাঁহার মৃত্যুতে যে, সেই আত্মবলিদানেরই আরোপমাত্র হইয়াছে, ইহা যে প্রকৃত ঘটনা নহে, তাহাই সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যে সূত্রে সাধারণ যজ্ঞের অগ্নি বা সোমের আত্মবলিদান য়িহুদিগের পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, সেই সূত্রে পুরুষযজ্ঞের পুরুষের আত্মবলিদানও যে তাঁহাদিগের পরিজ্ঞাত হইবে, তাহা অসম্ভাব্য নহে। সুতরাং, অনুমান করা যায় যে, খ্রীষ্টানুচরগণ আত্মবলিদানের যে প্রথম-শিক্ষা খ্রীষ্টের প্রথম-জীবনে পাইয়াছিলেন, পুরুষ সূক্তে তাহারই পূর্ণবিকাশ দর্শন করিয়া—তাঁহারা খ্রীষ্টের শেষজীবনের সহিত তাহা সংযুক্ত করিয়া—খ্রীষ্টের সেই শিক্ষারই পরাকাষ্ঠা সাধন করিয়াছেন।

আমার রাধা

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, B. A.]

শৈশবে মোর খেলার সাথী, কৈশোরে মোর সঙ্গিনী,
যৌবনে সে লীলাময়ী—আমার রাধা রঙ্গিণী।
বৃন্দাবনে আমার রাধা আমার সখী নায়িকা,
গো-চারণে শান্তি আমার শ্রান্তিহরা রাধিকা!
মথুরাতে আমার রাধা ফুলময়ী স্মৃতিটি,—
আমি রাজা, রাধা রাণী ;—জুড়িয়া আছে ক্ষিতিটি!
কাব্যে যাহা, চিত্রে যাহা, শ্রেষ্ঠ যাহা সঙ্গীতে—
আমার রাধা তাইগো তাই!—আমি রাধার ইঙ্গিতে
বাজাই বাঁশী, রাজ্য শাসি, শত্রু নাশি আহবে—
পাণ্ডবেরে মিতা করি, মণ্ডি জয়-গৌরবে!
রশ্মি ধরি চালাই রথ মাতি সমর-উল্লাসে
ফাল্গুনীরে শুনাই গীতা তাহার মোহ-নৈরাশে!
রাধা আমার শক্তি মন্ত্র, আমার সকল তত্ত্ব রে—
রাধা নামে বাজায় বাঁশী আমার প্রিয় ভক্ত রে!

অধ্যাপকের বিপত্তি

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, M. A.,]

স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য যে ছুটি লইয়াছিলাম, তাহা শেষ হইলে যখন বাঁকিপুর বদলি হইলাম, তখন সেখানে প্লেগ সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ অবস্থায়, সদ্যোরোগমুক্ত দুর্ব্বল স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক বুঝিয়া, স্থির করিলাম যে, স্ত্রীকে তাহার পিতা-মাতার নিকট রাঁচিতে রাখিয়া, আপাততঃ একাই বাঁকিপুর যাইব। এই মর্ম্মে শ্বশুর-মহাশয়কে চিঠি লিখিলাম এবং সাবধান করিয়া দিলাম যে, বাঁকিপুরের প্লেগের কথা যেন সুরমাকে না জানান হয়।

জানাইলে কি রক্ষা ছিল? ডাক্তার-সাহেব হাওয়া বদলাইবার জন্য তাহাকে রাঁচি যাইতে বলিয়াছেন, এই ছুতা করিয়া যেদিন তাহার নিকট প্রথম বলি যে—আমি একাই বাঁকিপুর যাইব, সেদিন হইতে সুরমা আমার উপর যে প্রশ্ন-বৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। "ডাক্তারের কি ভুল হয় না?" "তোমার যত আধিখ্যেতা, অসুখ তো সকলেরই করে; রাঁচি না গিয়া কি কেউ ভাল হ'চ্ছে না?" "ডাক্তার সাহেব যদি আমাকে মক্কা পাঠাতে বল্‌তো, তুমি পাঠাতে?" "আচ্ছা আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়েই দেখ না, সেখানে যদি ভাল না থাকি, তখন না হয় রাঁচি পাঠিয়ে দিও"—ইত্যাদি কথার সদুত্তর দিতে সময় সময় আমার প্রত্যুৎপন্নমতিকে বিপন্ন হইতে হইত। ইহার উপর, সুরমা যদি প্লেগের খবর শুনিত, তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটাইত, সন্দেহ নাই।

অনেক বলিয়া কহিয়া, তাহাকে সম্মত করাইয়া, যদি বা রাঁচি লইয়া গেলাম, সেখানে শ্বশুর-মহাশয় আবার এক বিপদে ফেলিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুশল-প্রশ্নাদির পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হ'লে বাঁকি-পুরের কোথায় বাসা ঠিক করলে?"

আমি।—সেখানে আমার জানাশুনা কেউ নেই, কাজেই বাসা ঠিক করা হয় নি। এখন গিয়ে ডাক-বাংলায় উঠ্‌ব; তারপর একটা বাসা ঠিক করে নেব, মনে ক'রেছি।

শ্বশুর-মহাশয়, মোটা চুরুটটি মুখ হইতে হস্তে লইলেন, এবং চশমার উপর দিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সে কি, বাসা না ঠিক ক'রে কি যাওয়া হয়! একে বাঁকি-পুরে বাঙ্গালী-পছন্দ বাড়ী খুব কম, তার উপর বল্‌তে গেলে ঘরে ঘরে প্লেগ হ'চ্ছে। ভাল করে না জেনে, কোন বাড়ীতে বাস করা উচিত নয়; তুমি নতুন লোক, সেখানে গিয়ে যে সুবিধামত বাড়ী পাবে, তার সম্ভাবনা খুব কম। আমি আগে জান্‌লে, আমাদের গঙ্গাধরকে লিখে একটা ভাল বাড়ীর বন্দোবস্ত কর্‌তে পার্‌তুম্‌। তুমি আজ বাদে কাল যাবে, এখন তো আর সময় নেই।"

অতিশয় চিন্তিত হইয়া, শ্বশুর-মহাশয় ঘন ঘন চুরুট টানিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—"তুমি এক কাজ কর না কেন?—গঙ্গাধরের বাসায় গিয়ে থাক না। সেখানে বেশ নিজের বাড়ীর মত থাক্‌বে, কোন কষ্ট হবে না।—ওঃ, গঙ্গাধরকে বুঝতে পারনি বুঝি? ঐ যে বাঁকিপুর কলেজের প্রোফেসার গঙ্গাধর গুপ্ত, তার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?"

আচার্য্য গঙ্গাধর গুপ্ত-মহাশয়ের নাম, ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা, অবশ্য শিক্ষিতসমাজের সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না; সুতরাং, কি সূত্রে সেই নিরপরাধ ব্যক্তির স্কন্ধে আরোহণ করিব, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, বলিলাম—"তাঁর সঙ্গে তো আমার জানাশুনা নেই; কি ক'রে তাঁর কাছে থাক্‌ব?"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন—"সেজন্য কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। তার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমার খুব হৃদ্যতা আছে। আমার অনেক আত্মীয়-কুটুম্বের চেয়ে, সে আপনার লোক; তার স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বাড়ীর মেয়েদেরও

খুব আত্মীয়তা আছে। তুমি তাদের কাছে থাকলে তারা খুব সুখী হবে, আমরাও নিশ্চিন্ত থাকব। তারপর যখন মেয়েদের নিয়ে যাবে, তখন অবশ্য আলাদা বাসা কোরো। কি বল, তা হলে গঙ্গাধরকে টেলিগ্রাফ করে দি?"

অপরিচিত লোকের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, শ্বশুর-মহাশয় আর পীড়াপীড়ি করিলেন না বটে কিন্তু পরে শ্বশুর-কন্যার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। "তুমি নাকি বাঁকিপুরের জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ীতে থাকতে রাজি হও নি? আমি বরাবর দেখে আসছি, যে কাজটি তোমার ভালর জন্যে করতে বলা যায়, তাতেই তুমি বেঁকে বস। যা ভাল বোঝ করগে, আমি কিছু জানি না।" অগত্যা সম্মতি দিতে হইল, গঙ্গাধর বাবুর নিকট টেলিগ্রাফ প্রেরিত হইল। আমি সুরমার রোগপাণ্ডু কপোল হইতে অশ্রু মুছাইয়া, নিজের শরীরে যত্ন করিব, প্রত্যহ পত্র লিখিব, অসুখ হইলে টেলিগ্রাফ করিয়া খবর দিব ইত্যাদি অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা করিয়া, বাঁকিপুর যাত্রা করিলাম।

(২)

বাঁকিপুরে আসিয়া বাস্তবিকই বাড়ীর মত সচ্ছন্দে আছি। অধ্যাপক গঙ্গাধর বাবুর সহজ ও সস্নেহ ব্যবহারে ও তাঁহার পত্নীর অকৃত্রিম যত্নে আমার সঙ্কোচের ভাব অল্প দিনেই অন্তর্হিত হইল। গঙ্গাধর বাবু স্বয়ং বড় একটা যত্ন বা আত্মীয়তা দেখাইবার সময় পান না; কারণ,তিনি কলেজের সময় ব্যতীত অন্য সময় লেখাপড়া লইয়াই থাকেন, সংসারের কোন খোঁজ রাখেন না। তাঁহার শয়ন-গৃহের সংলগ্ন একটি অনতিপ্রশস্ত ঘর আছে, তাহার মধ্যে কাঠের মঞ্চে রাশিরাশি পুস্তক সজ্জিত, অন্য আসবাবের মধ্যে একটা পুরাতন টেবিল ও দুই একখানা পুরাতন চেয়ার এবং মেজেতে একখানা পাটির উপর একটা তাকিয়া। সেই ঘরেই তিনি প্রায় সমস্ত দিন পাঠে নিমগ্ন থাকেন। ইনি একটি প্রকৃত গ্রন্থকীট হইলেও, গ্রন্থকীটের আকৃতি সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা ছিল, তাহার সহিত ইঁহার কোন সাদৃশ্য দেখিলাম না। ইঁহার সুদীর্ঘ বপু, শ্মশ্রুবহুল গম্ভীর মুখ ও ভাবপূর্ণ চক্ষু দেখিলে, মনে স্বতঃই ভক্তির উদয় হয়; তাহার উপর ইঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া আমার মত অশ্রদ্ধাতন্ত্রীয় মনও অল্পদিনেই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। এত গাম্ভীর্য্যের সহিত এরূপ সরলতার সমাবেশ হইতে পারে, এত বিদ্যার সহিত এরূপ নিরহঙ্কার থাকিতে পারে, তাহা জানিতাম না। দেখিলাম, তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি প্রগাঢ়, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে একটু উত্তেজিত করিলেই তাঁহার প্রাণের উৎস খুলিয়া যায়, মুখ হইতে মর্ম্মস্পর্শী কথার স্রোত বহিতে থাকে, ভাবাবেশে তিনি আত্মহারা হইয়া যান। এই একটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহাকে উত্তেজিত হইতে দেখি নাই। ভদ্রলোকের প্রকৃতি এত শান্ত ও নিরীহ যে, কখনও কাহাকেও প্রতিবাদ করিতে পারেন না, নিজের চাকরদের ফরমাস করিতে ইতস্ততঃ করেন; তাঁহার সম্মুখে কেহ ক্রোধ প্রকাশ করিলে বা কলহ করিলে, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন, শ্মশ্রু মধ্যে বারংবার অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে দীননয়নে চাহিয়া থাকেন।

গঙ্গাধর বাবুর পত্নী নিজেকে আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর স্থলাভিষিক্ত মনে করেন সুতরাং আমার সহিত কথা কহেন; তাঁহার আড়ম্বরহীন আন্তরিক যত্নে আমি যে প্রবাসে আছি, তাহা মনেও হয় না। এই শান্তস্বভাবা স্বল্পভাষিণী সেবা-পরায়ণা, স্নেহময়ী রমণীটি গঙ্গাধর বাবুর সংসারকে সচল, সম্পূর্ণ ও শোভন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বিদুষী নহেন, কিন্তু কায়মনোবাক্যে সেবা দ্বারা স্বামীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও তাঁহাকে সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া, তিনি যে গঙ্গাধর বাবুর বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ সহায়তা করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে আমি জ্যাঠাই মা বলিয়া সম্বোধন করি।

একদিন রাত্রিকালে আমরা দুই জনে আহারে বসিয়াছি; গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রী নিকটে বসিয়া আমাদের খাওয়াইতেছিলেন। তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আজ তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন?

গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, "আজ সমস্ত দিন মাথাটা বড় ধরে আছে।"

সস্নেহ অনুযোগের স্বরে গৃহিণী বলিলেন—"মাথা ধরার আর অপরাধ কি বল? চিরকাল শরীরের উপর এত অত্যাচার সহ্য হবে কেন? আমি এত বলি, রাত্তিরে পড়া কমিয়ে দাও, রোজ একটু বেড়াতে যেও, তা তো শুনবে না। আগে বরং মাঝে মাঝে একটু বেড়াতে, আজকাল তাও গিয়েছে; সেই গেল মাসে পুরাণ রাজবাড়ী দেখতে

গিয়েছিলে, তারপর আর এক দিনও তো বেড়াতে চাও নি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পুরাণ রাজবাড়ী? সে আবার কোথা?"

গঙ্গাধর বাবু। পুরাণ রাজবাড়ী বুঝলে না? পাটলীপুত্রের Excavation হে। Excavation নিশ্চয়ই দেখে এসেছ; কেমন,—খুব interesting নয়?

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম বটে, বাঁকিপুরের নিকটে খনন করিয়া, প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ও সকল বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল না থাকায়, সে সংবাদ মনোযোগের সহিত পড়ি নাই এবং এখানে আসিয়াও সে বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করি নাই। আমি বলিলাম—"না, ও সব কিছু আমি দেখি নি। সে কোথায়, কোন্ দিকে, তা জানি না।"

গঙ্গাধর বাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন—"সে কি! তুমি এতদিন এখানে এখানে এসেছ, আর ক্রোশ খানেক দূরে এই বহুপুরাতন-কীর্ত্তি রয়েছে, যা সাহেবদের কাছে একটা প্রধান দ্রষ্টব্য ব্যাপার, যার একখানা ইঁট পেলে জার্ম্মান আর আমেরিকান Touristরা কৃতার্থ মনে করে, বাঁকিপুরে থাকবার সময় ছোট লাট সাহেব যা দেখতে হপ্তায় দুবার করে যান, তা তুমি একবারও দেখতে যাওনি? আশ্চর্য্য!"

আমি বড়ই অপ্রতিভ হইলাম। গঙ্গাধর বাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার স্ত্রীর চক্ষু এড়াইল না। সামলাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"নরেন এখানে নতুন এসেছে; ও এখানকার খবর কি করে জানবে? তোমারই উচিত ছিল, দেখিয়ে নিয়ে আসা। কাল তো রবিবার আছে, সঙ্গে করে নিয়ে যাও না কেন?"

তাহাই স্থির হইল। গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, পরদিন বৈকালে আমাকে কুমরাহারে পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া লইয়া আসিবেন।

(৩)

কুমরাহারে পৌঁছিয়া গঙ্গাধর বাবু প্রথমে খননকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বিহারী বাবুর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। সে ভদ্রলোক সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলেও আমাকে সঙ্গে লইয়া, যাহা যাহা দ্রষ্টব্য, যত্নের সহিত দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। পারস্যদেশে দরায়ুসের শতস্তম্ভ সভাগৃহের সহিত এস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত সভাগৃহের কি কি সাদৃশ্য, অগ্নিদাহে কাষ্ঠনির্ম্মিত ছাদ নষ্ট হইয়া গেলে, কি করিয়া পাষাণ-স্তম্ভগুলি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়, সেই অগ্নিদাহের ভস্মের চিহ্ন এখনও মৃত্তিকাগাত্রে কিরূপ সুস্পষ্ট বর্ত্তমান, দরায়ুসের সভাগৃহের স্তম্ভের গাত্রে যেরূপ শিল্পীদিগের সাঙ্কেতিক চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে, অবিকল সেইরূপ চিহ্ন এই স্থানের স্তম্ভের কোথায় বর্ত্তমান, চন্দ্রগুপ্তের পাষাণ-প্রাসাদ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেলে, ঠিক সেইস্থানেই গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা যে ইষ্টক-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রাচীরাদি এখনও কিরূপ অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে, এই খননকার্য্যের কর্ত্তা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী স্পুনার সাহেবের এই কার্য্যে কিরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ ও আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে তাঁহার কিরূপ গভীর জ্ঞান, ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া, বিহারী বাবু শেষে হাসিয়া বলিলেন—"আমার মুখে আর কি শুনবেন? যে লোকের সঙ্গে এসেছেন, তাঁর কাছে শুনুন, পাঁচটা নতুন কথা জানতে পারবেন। স্পুনার সাহেব বলেন, Archæologyতে গঙ্গাধর বাবু একজন রীতিমত পণ্ডিত। সেদিন মাটির ভিতর থেকে এক রকম ভাঁড় পাওয়া গেল, দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের আস্কের খুরার মত। স্পুনার সাহেব হেসে বল্লে—'এ জিনিসটা কি তা কেউ সহজে বলতে পারবে না, গঙ্গাধর বাবু বলতে পারেন কি না দেখি।' গঙ্গাধর বাবু সেটাকে নেড়ে চেড়ে বল্লেন—'এ তো স্বস্তি দেখতে পাচ্ছি। সেকালে সেনাপতিরা যুদ্ধজয় করে এলে রাজা এই স্বস্তির ভিতর নবরত্ন দিয়ে এটাকে হলদে কাপড়ে মুড়ে সেনাপতিকে দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন।' এই ব্যাখ্যা শুনে, স্পুনার সাহেবের মহা আনন্দ, সেকহ্যাণ্ড্ করে গঙ্গাধর বাবুর হাত ছিঁড়ে দেবার উপক্রম করেছিল।"

বিহারী বাবুর সঙ্গে Excavationএর সমস্ত দেখা হইয়া গেলে, ব্যাপারটার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। গঙ্গাধর বাবুর মুখে শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, না জানি কারুকার্য্যখচিত কি প্রকাণ্ড পুরীই দেখিব, কিন্তু আসলে দেখিলাম, কেবল একটা শিল্পলেশহীন পাতরের থাম, কতকগুলা পাতরের কুচির ছোট ছোট স্তূপ, কতকগুলা মাটির

ভাঁড় ও সরা এবং নিতান্ত আধুনিক ধরণের প্রাচীরের সারি। ইহার জন্য এত হৈ হৈ, এত অর্থব্যয়! আমি বলিলাম—"যে টাকাটা নষ্ট করে এই প্রকাণ্ড খাত খুঁড়েছে, সেই টাকা খরচ করে যদি জলাশয়-প্রতিষ্ঠা ক'রত, তা হলে একশোগ্রামের চিরকালের জন্য জলকষ্ট দূর হয়ে যেত।"

গঙ্গাধর বাবু আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন—"তোমার মুখে ও কথা শুনব আশা করিনি, নরেন! একবার মনে করে দেখ দেখি, কোথায় দাঁড়িয়ে আছ! আড়াই হাজার বছর আগে সেই দিব্যপুরুষ 'আজিও জুড়িয়া অদ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর' যে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান, 'এই পাটলীগ্রাম কালে প্রসিদ্ধ নগর হবে' তা অমোঘ সত্যে পরিণত হয়েছিল; সাতশো বছর ধরে পাটলীপুত্র ভারতের শ্রেষ্ঠনগর ছিল; সুখ, সভ্যতা, শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল; ধর্ম্ম বল, আইন বল, শাস্ত্র বল, বিজ্ঞান বল, ফ্যাসান্ বল, সমস্তই এই পাটলীপুত্র থেকে সমগ্র ভারতে প্রচার হত, বিশাল ভারতসাম্রাজ্য এই খান থেকে শাসিত হত; এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার বিদ্যার্থীরা দেশবিদেশে জ্ঞানালোক নিয়ে যেত, হাজার-হাজার ক্রোশ দূর থেকে বিদেশী পর্য্যাটকেরা পাটলীপুত্র দেখ্‌তে আস্‌তো; আর এর সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক্ হয়ে যেত। একা পাটলীপুত্রেই ষাটহাজার পদাতিক সৈন্য, ত্রিশহাজার ঘোড়সওয়ার, হাজার নৌ-সেনা, আর দশহাজার হাতী থাকত। এই নগরে চল্লিশ-লক্ষ লোক থাক্‌ত—সহরতলী ও হাবড়া নিয়ে কলকাতায় দশলক্ষের বেশি লোক নেই! এই যে লণ্ডন, প্যারিস্, নিউ-ইয়র্ক, বার্লিন্—এদের মধ্যে কোন্ সহর পাটলীপুত্রের মত সাতশো বছর ধ'রে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ও সভ্যজগতের মুকুট হয়ে আছে, বা ছিল? একবার মনের ভিতর তখনকার ছবি আঁকবার চেষ্টা করে দেখ দেখি।

"পাটলীপুত্র কেমন ছিল, এখন একটু একটু মনে হচ্ছে কি? সেই সভ্যজগতের মুকুট পাটলীপুত্র—তার মধ্যমণি যে রাজ-প্রাসাদ, যেখানে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত, বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি অশোক, আর তাঁদের পরবর্ত্তী মৌর্য্য সম্রাটেরা বাস করিতেন, সেই রাজপ্রাসাদ এইখানে ছিল; যেখানে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা ছিল, ঠিক সেইখানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। ওই যে পাথরের থাম্‌টা পড়ে আছে, ওইটি রাজসভার একশো থামের একটি ছিল; অন্য অন্য থামগুলি কোথায় ছিল, তা মাটির পিল্‌পে দিয়ে নির্দ্দেশ করে দিয়েছে; সুতরাং, রাজসভার আকৃতিটা আমরা কতকটা ধারণা কর্‌তে পারি। মনে কর দেখি, এই রাজসভা এক সময়ে সোণা-রূপা, স্ফটিক-প্রবাল, মণি-মাণিক্যে কি রকম ঝলমল ক'রত। মানসপটে ছবি আঁক দেখি!

"এই রাজসভাতেই মহারাজ অশোক বস্‌তেন—যাঁর সময়ে ভারত-সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্যগগনে পৌঁছে-ছিল! যাঁকে, কি শাসন-চাতুর্য্যে, কি জনহিতে, কি ধর্ম্মবলে, কোন দেশের কোন রাজা অতিক্রম কর্‌তে পারেন নি; যিনি বিনা-রক্তপাতে সমগ্র এসিয়াখণ্ডে বুদ্ধদেবের একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপনা করেছিলেন, স্তম্ভে স্তূপে শিলালিপিতে যাঁর গম্ভীর ঘোষণা-বাণী আড়াইহাজার বছরের অনাদরসত্ত্বে আজও সেই রাজর্ষির ধর্ম্মবুদ্ধি ও পরাক্রমের পরিচয় দিচ্ছে। আবার একদিন এসেছে, যেদিন এইখান থেকেই সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিপুল-বাহিনী, সমুদ্র-গর্জ্জনে ধাবিত হয়ে, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও সমস্ত দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করেছে;—সে ভীষণ-স্রোতের মুখে অতিবড় রাজাদেরও তৃণের মত ভেসে যেতে হয়েছিল;—

"এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে,
না রাখে কাহারও ঋণ।
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—
চিত্ত শঙ্কাহীন।"

"যে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের নিকট, হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সকল রাজাকে পদানত হ'তে হ'য়েছিল; এমন কি, চিরস্বাধীন দুদ্ধর্ষ বর্ব্বর জাতিরাও যাঁর নাম শুনলে কাঁপত, সেই সমুদ্রগুপ্ত এইখানে থাক্‌তেন।

"এখন বুঝ্‌তে পারছ কি, এই জায়গার কি মহিমা, এই ভাঙ্গা-থাম, আর ইটের প্রাচীরের কি মূল্য? যে চাণক্যের নাম দু-হাজার বছর ধরে ভারতের আবালবৃদ্ধ-মহিলার কাছে তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপমাস্থল হ'য়ে আছে, সেই চাণক্য এই রাজসভায় ব'সে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে মন্ত্রণা দিতেন, যার ফলে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত, সুদৃঢ়, আর পরাক্রান্ত হ'য়েছিল; সাতশো বছর ধ'রে সম্রাটেরা এইখান থেকে যে হুকুম দিতেন, সেই হুকুম-অনুসারে কোটি-কোটি প্রজা

শাসিত হ'ত—কোনও হুকুমে কোটি-কোটি প্রজার সুখ-সম্পদ্ বেড়েছে, কোনও হুকুমে বা কোটি কোটি প্রজা হাহাকার করেছে!—এইখানে ব'সে সম্রাটেরা কত সমর-অভিযানের সংকল্প করেছেন, যার ফলে লক্ষ-লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ লক্ষ সংসার অনাথ হয়েছে, শত শত রাজা রাজ্য হারিয়েছে!—এই সভায় ব'সে সম্রাট্ অশোক তাঁর নানা জনহিতকর কাজের ও তাঁর কালজয়ী স্তম্ভ-স্তূপ-শিলালিপি-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেছেন!—এইখানে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মহারাজ অশোককে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের, সঙ্ঘারাম-মঠ-মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণের পরামর্শ দিয়েছেন। আবার এইখানেই, কোনও জায়গায় বসে, সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ের আয়োজন করেছেন। জানিনা পৃথিবীর আর কোথায় এমন প্রাসাদ বা ধ্বংসাবশেষ আছে, যেখানে এত যুগ ধ'রে কোটি কোটি লোকের সুখ-সম্পদ্, জ্ঞান-বিদ্যা, জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। থিবস্ বল, ব্যাবিলন বল, নিনেভে বল, কার্থেজ্ বল, পিকিন্ বল,—কোথাও এমন বিচিত্র সমাবেশ দেখি না। যখন মনে করি—এই পাটলীপুত্র, আর তার মহিমা, নিতান্ত আমাদেরই—তখন বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।"

গঙ্গাধর বাবুর স্বর কম্পিত হইতেছিল, তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল! সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমরা নীরবে ধীরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

(৪)

সেই দিন হইতে প্রায়ই বৈকালে Excavationএর দিকে বেড়াইতে যাই এবং বিহারী বাবুর সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বড়ই মুক্তপ্রাণ, সদালাপী ভদ্রলোক; দেখা হইলেই নানাবিষয়ে আলাপ করেন।—খনন করিতে করিতে, কোন দিন নূতন কিছু বাহির হইলে, যত্নসহকারে দেখান—কোন দিন কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া গেলে, কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া, তাঁহার অনতিদূরবর্ত্তী বাঙ্গালায় লইয়া যাইয়া, অতিথি-সৎকার করেন। একদিন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি বলিলেন—"কাল খুঁড়্তে খুঁড়্তে একটা বেদির মত ইঁটের ঢিপি পাওয়া গিয়েছে; তার উপর কতকগুলা ছোটবড় নুড়ি ছিল—সেগুলার জায়গায় জায়গায় সিঁদূরের দাগ, আর বেদিটার আশে পাশে কতকগুলা মানুষের হাড় পড়ে আছে। আমার বোধ হয়, সেখানটায় কোন কাপালিকের আশ্রম ছিল।" এই সংবাদ শুনিয়া, ব্যাপারটা দেখিবার জন্য, আমি অত্যন্ত উৎসুক হওয়ায় বিহারী বাবু আমাকে তথায় লইয়া গেলেন; কিন্তু তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, কুলিরা তাহাদের রোজের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিজের কাজে বাঙ্গালায় চলিয়া গেলেন। আমি গভীর খাতের মধ্যে নামিয়া তথা-কথিত কাপালিকের বেদি, তাহার উপরিস্থিত পাথর-গুলি, এবং ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম। বেদিটিকে মাটির স্তূপ বলিয়াই মনে হইল; তাহার চারিদিকের মাটি কতক পরিষ্কার হইয়াছে মাত্র—কঙ্কালগুলার কোন কোন অংশ মৃত্তিকাসার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আকার ঠিক বজায় আছে। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায়, ধৌত হইয়া, একটা শ্বেত নরকপাল, গোধূলির কালিমা ভেদ করিয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমার 'ছায়াময়ী'র প্রমথগণের গান মনে পড়িল—

"চলে কপাল ধঃ ধঃ ধঃ ধঃ
কার মাথা এটা হি হি হি হঃ
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া।
রাজা কি রাখাল ছিল কোন কাল
এখন মড়ার মাথার কপাল
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া।"

স্বল্পালোকে সেই জনশূন্য ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়াইয়া, যুগযুগান্তর পূর্ব্বের কোন বিস্মৃত সাধকের ইহলোকের শেষচিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে, আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল—কোনরূপে কালের যবনিকা সরাইয়া এব্যক্তি কতদিন পূর্ব্বে জীবিত ছিল, তাহার আকার-প্রকার কিরূপ ছিল, তখন এই পাটলীপুত্রের অবস্থা কিরূপ ছিল, পাটলী-পুত্রে তখন কে সম্রাট বা রাজা ছিলেন, ইত্যাদি জানিয়া লই।

পাথরগুলির উপর সিন্দুর চিহ্ন দেখিবার জন্য সেগুলির এক একটি বেদির উপর হইতে উঠাইয়া আবার রাখিয়া দিতেছিলাম; এমন সময়, বেদির উপরিস্থিত মৃত্তিকায় প্রোথিত কোন কঠিন তীক্ষ্ণ বস্তুতে লাগিয়া, হস্তে সামান্য আঘাত পাইলাম। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বৃষ্টিতে এক

স্তর মাটি ধুইয়া যাইয়া, কি একটা পদার্থের কোণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি, পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া, উহার চারিদিকের মাটি খুঁড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম; অল্প সময়ের মধ্যে একটা ছোট বাক্সের মত চতুষ্কোণ জিনিস বাহির হইল। যতটুকু আলো ছিল, তাহার সাহায্যে এবং স্পর্শে বুঝিলাম, উহা সম্ভবতঃ ধাতুনির্ম্মিত কোনরূপ আধার; উহার উপরটা অত্যন্ত বন্ধুর এবং ক্ষুদ্র হইলেও বেশ ভারি। আমার মনে আনন্দের ঝড় বহিতে লাগিল; আলোতে লইয়া গিয়া জিনিসটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম। প্রথমে ইচ্ছা হইল, বিহারী বাবুর কাছে ছুটিয়া যাই; কিন্তু তখনই মনে হইল যে, তাহা হইলে জিনিষটাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিতে হইবে, ইহার মধ্যে কি আছে তাহা দেখিতেও পাইব না, হয়তো লোকে জানিবেও না যে, আমি ইহা আবিষ্কার করিয়াছি। তাহার উপর যখন মনে হইল—ইহা পাইলে গঙ্গাধর বাবু কিরূপ আনন্দে উন্মত্ত হইবেন, তখন আর কোন দ্বিধা রহিল না; জিনিষটা কোটের পকেটে ফেলিয়া বাসায় যাইবার জন্য বাহির হইলাম। পথে একবার মনে হইয়াছিল, কাজটা ভাল হইল না; কিন্তু ইহাতে স্পুনার সাহেবের, রতন টাটার এবং গবর্ণমেণ্টের যে অধিকার, আমারও সেই অধিকার আছে, ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

"Excavation এ মাটির ভিতর থেকে একটা জিনিষ পেয়েছি"—বলিয়া হঠাৎ জিনিষটা গঙ্গাধর বাবুর সম্মুখে রাখিলে, তিনি প্রথমে কথাটা যেন সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন না এই ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে কিছুক্ষণ ধরিয়া জিনিষটা অনিমেষ নয়নে দেখিলেন, তাহার পর, উহা সন্তর্পণে হাতে লইয়া, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাত কাঁপিতে লাগিল, বলিলেন—"এটা সত্য সত্যই বহুপুরাতন জিনিষ দেখ্‌ছি; কোন রকম কৌটা বা আধার—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর গায়ে এই সব দাগ গুলা, Inscription বলে বোধ হচ্ছে।" তাহার পর সেটা কাণের কাছে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"এর ভিতর একটা কিছু আছে, বোধ হ'চ্ছে। কে জানে?—অসম্ভব নয়—হয়তো এর ভিতর বুদ্ধদেবের অস্থি আছে! পুরাকালে একটা কিম্বদন্তি ছিল যে, যেখানে Excavation হচ্ছে, তার কাছাকাছি কোন জায়গায় বুদ্ধদেবের শরীরের কোন অংশ আছে; কিন্তু কোথায় আছে, তা এপর্য্যন্ত কেউ বল্‌তে পারে নি। তুমি এটা কোন জায়গাটায় পেলে, বল দেখি।"

আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলে, তিনি বল্লেন—"কাপালিক আবার কি? বৌদ্ধেরা শেষদিকে খুব তান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল বটে, মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে খুব কারবার ক'রত; কিন্তু বৌদ্ধ-কাপালিকের কথা ত শোনা যায় না। যাই হক, কৌটাটা খুল্‌তে হ'বে; কিন্তু সে বড় সোজা কথা নয়, ডালাটা বজ্র হয়ে এঁটে আছে। আর খুব সাবধানে এটাকে পরিষ্কার করে দেখতে হবে, গায়ে কিছু লেখা আছে, কি না।"

এতক্ষণ কৌটাটা বাটী লইয়া আসার ন্যায়ান্যায়ের কথাটা তাঁহার মনে হয় নাই; এখন হঠাৎ সে কথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি একেবারে দমিয়া গিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কিন্তু এতো আমি খুলিতে পারি না, রাখিতেও পারি না; তুমি এটা কেন নিয়ে এলে? জাননা ওখান থেকে এক খানা ইট পর্য্যন্ত সরান—Punishable by Law? এটা এখনই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত; কিন্তু তা হলে আবার তোমাকে জড়াতে হয়। এখন করি কি?"—বড়ই বিচলিত হইয়া তিনি পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলেন; আমি বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলাম এবং অত্যন্ত উৎসাহের সময়ে ভর্ৎসিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে শয়ন করিলাম।

কিছু পরেই তিনি, চটিজুতার চটপট শব্দ করিতে করিতে, আমার ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন—"নরেন, নরেন,—ঘুমুলে কি?" আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলে বলিলেন—"তুমি ওর জন্যে ভেব না। আমি ভেবে দেখ্‌লুম, স্পুনার সাহেবকে বুঝিয়ে বল্লে, সে নিশ্চয় কোন গোল করিবে না; এমন কি, যদি কৌটাটা খুলি, তা হলেও বোধ হয়, বিশেষ আপত্তি কর্‌বে না; শেষকালে জিনিষটা ফিরিয়ে দিলেই চুকে যাবে।" আমি বুঝিলাম, ভদ্রলোকের কৌটা খুলিবার আগ্রহ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়াছে।

(৫)

পরদিন প্রাতঃকালে চা খাইতেছি, এমন সময় গঙ্গাধর বাবু আসিয়া বলিলেন—"নরেন, আমি আর একবার এসে-

ছিলুম, দেখি তুমি ঘুমুচ্ছ। কৌটাটাকে অনেক কষ্টে খুলেছি, তার ভিতর থেকে একটা স্ফটিকের ডিমের মত পাত্র বেরিয়েছে! দেখ্‌বে চল।”

আমি লাফাইয়া উঠিয়া, তাঁহার সহিত চলিলাম; তিনি বলিতে লাগিলেন, “কাল সমস্ত রাত কৌটাটা নিয়ে খেটেছি। সেটাকে পরিষ্কারও করেছি, তার গায়ে লেখা বেরিয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় জিনিষটার এক জায়গায় একেবারে ভেঙ্গে গেছে। মর্‌চে ধ'রে একএক জায়গায় একেবারে খ'য়ে চূণ হ'য়ে গেছে কিনা!”

তাঁহার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইলে, তিনি দেরাজের মধ্য হইতে, কাচের Paper-weightএর মত একটা জিনিষ, সন্তর্পণে বাহির করিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া, বলিলেন—“এটা ফাঁপা, hermetically seal করা। ভিতরে, করাতের গুঁড়ার মত, কি রয়েছে দেখেছ; ওর সম্বন্ধে কৌটোটার গায়ে যে inscription আছে—সে অতি অদ্ভুত কথা—নিতান্ত অসম্ভব কথা; কিন্তু—”

ইতোমধ্যে, স্ফটিক পাত্রটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, টেবিল হইতে তুলিয়া লইলাম; কিন্তু, গঙ্গাধর বাবুর কথার প্রতি মন থাকাতে, অসাবধানতায় উহা হাত হইতে মেঝেয় পড়িয়া, চুরমার হইয়া গেল!

গঙ্গাধরবাবু—“যাঃ সর্ব্বনাশ!—কর্‌লে কি?”

“যাঃ সর্ব্বনাশ!—কর্‌লে কি?” বলিয়া গঙ্গাধর বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি লজ্জায় ও ক্ষোভে একেবারে ‘এতটুকু’ হইয়া গেলাম! গঙ্গাধর বাবু, আর বাক্যব্যয় না করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে করাতের গুঁড়ার ন্যায় পদার্থটি মেঝে হইতে সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সৌভাগ্যক্রমে, মেঝে সিমেণ্ট করা বলিয়া, গুঁড়ার অধিকাংশই পাওয়া গেল। তিনি, একটা শিশির মধ্যে উহা পূরিয়া, দেরাজে চাবি-বন্ধ করিলেন।

পরে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“যাক্, It is no use crying over spilt milk। মনে করেছিলুম, এর সম্বন্ধে একটা Paper লিখে, ‘এসিয়াটিক সোসাইটি’তে পাঠাব; তা আর হ'ল না! এখন আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য কর্‌তে পার্‌ব না। কৌটোটাও ভেঙ্গেছে, এটাও গেল; এখন রইল খালি গুঁড়োটা;—তা থেকে যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়।”

অতি দুঃখেও, কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনি যে বল্‌ছিলেন, গুঁড়োটার বিষয়ে কৌটোর গায়ে কি লেখা আছে;—সেটা কি?”

গঙ্গাধর বাবু।—হাঁ কৌটোটার আষ্টেপিষ্টে ঐ কথা খোদাই করা; কিন্তু মর্‌চে ধরে এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে,

পড়া দুষ্কর—কতক জায়গায় লেখা একেবারে মুছে গেছে, Magnifying glass দিয়ে মোটামুটি একরকম পড়্‌তে পেরেছি। আমি মনে করেছিলুম, যদি কিছু লেখা থাকে—পালি ভাষায় থাক্‌বে; কিন্তু তা নয়, লেখাটা সংস্কৃতে। যতখানি পড়্‌তে পেরেছি, তার একটা Translation ক'রে রেখেছি—এই দেখ।"

ব্লটিং-প্যাডের নীচে থেকে একখানা কাগজ বাহির করিয়া, তিনি আমার হাতে দিলেন; তা'তে এই লেখা—

"ওঁ নমঃ মহাকালায়॥ ধ্বংসপ্রাপ্ত মহানগরীরূপ মহা-শ্মশানে * * * ব্যাপী সাধনাদ্বারা ব্রহ্মচারী বজ্রাচার্য্য কালের প্রভাব-বিনষ্টকারী নবযৌবন-প্রদায়ক দিব্যতেজঃসম্পন্ন রসায়ন * * * * মাষাপ্রমাণ চতুর্থী ও একাদশী তিথিতে সেবন * * * * ক্রমশঃ বয়স-অল্পতা প্রাপ্ত হইতে থাকে * * * * * দেবগণের প্রিয় শ্রীমন্মহারাজ * * দিত্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন এবং বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রমে মানবের মহা অশুভ * * * * * বিনষ্ট করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া স্ফাটিকভাণ্ডে রক্ষা করিয়া বেদিগর্ভে প্রোথিত করিলাম।"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম "আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! এ স্বপ্ন দেখ্‌ছি না তো?"

গঙ্গাধর বাবু হাসিয়া বলিলেন—"তুমি বুঝি লেখাটা ধ্রুব সত্য ঠিক ক'রে বসলে? ঐ তো আমাদের দোষ! শিক্ষিত লোকেরাও সত্যমিথ্যা বিচার কর্‌বার চেষ্টা করে না। আমাদের দেশে আগে ওষুধের গুণ সম্বন্ধে কি রকম অত্যুক্তি কর্‌ত, তা জাননা কি? এই যেমন শ্রীগোপাল তেল মাখ্‌লে ভূত-প্রেত দানা-দৈত্য সব পালিয়ে যায়। অত্যুক্তি বাদ দিয়ে বুঝ্‌তে হ'বে, এই রসায়নটা একটা Tonic ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হক, এর সত্যমিথ্যা হাতে কলমেই জানা যাবে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এই গুঁড়োটা খাবেন নাকি?"

গঙ্গাধর বাবু। কেন, তা'তে আর হ'য়েছে কি? এটাতো সাধারণ tonic ছাড়া আর কিছু নয়; তা ছাড়া, এই হাজার বছরে কি আর ওতে কিছু পদার্থ আছে? আমি নিঃসঙ্কোচে সব গুঁড়োটা খেয়ে ফেল্‌তে পারি।

আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম—"না—না—ওরকম কাজ কর্‌বেন্ না,—কি কর্‌তে কি হবে! জ্যাঠাই মা শুন্‌তে পেলে, ভেবে অস্থির হবেন।"

অপ্রসন্ন মুখে গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আপাততঃ না হয় থাক্; এর পর দেখা যাবে।"

(৬)

বসন্তের হাওয়া দিয়াছে, গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরেও একটা সজীব ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে—রক্তে যেন একটা মাদকতার সঞ্চার হইয়াছে ও সকলের চালচলনে একটা অকারণ স্ফূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মধুঋতু গঙ্গাধর বাবুকেও স্পর্শ করিয়াছে দেখিতেছি। প্রায়ই দেখিতে পাই—তিনি আপনার মনে গুন্‌গুন্ স্বরে গান করেন, কখনও বা অন্যমনস্কভাবে গলা ছাড়িয়া তান ধরেন। কর্কশ গলায় সুরলেশহীন সে তান শুনিলে, খাইতে খাইতে বালি চিবাইলে যেরূপ শরীর শিহরিয়া উঠে, দেহে সেইরূপ অনুভব হয়। চিরকালই আহার সম্বন্ধে তাঁহার অনাস্থা, সেজন্য তাঁহার স্ত্রী প্রায় অনুযোগ করিতেন; কিন্তু আজকাল বেশ খাইতে পারেন, প্রায় অন্নব্যঞ্জন চাহিয়া লন, এমন কি, কখনও এটা সেটা রাঁধিতে ফরমাস্ করেন। শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি আর পূর্ব্বের মত উদাসীন নহেন—প্রত্যূষে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হ'ন, অধিক কি বৈকালে দশ-পনর মিনিট স্যাণ্ডোর নিয়মানুসারে ব্যায়াম করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতিতে তাঁহার স্ত্রীর আনন্দের সীমা নাই।

একদিন দেখি, কলেজে বাহির হইবার সময় চাকরকে ভর্ৎসনা করিতেছেন—কেন সে তাঁহার সাদা প্যাণ্ট্‌লুনের নানাস্থানে হলুদমাখা হাতের ছাপ লাগাইয়াছে এবং শার্টের 'কফে', বোতামের পরিবর্ত্তে পাটের সূতালি দ্বারা বাঁধিয়াছে! তিরস্কারে অনভ্যস্ত চাকরটা বিরক্ত ভাবে যখন বুঝাইতে চাহিল যে, পোষাক-পরিচ্ছদে হলুদ লাগাইতে নাই—এ কথা তাহাকে গত দশবৎসরের মধ্যে কেহ বলে নাই এবং তিন মাস পূর্ব্বে বোতাম হারাইয়া যাওয়ায় এপর্য্যন্ত সূতাদ্বারাই শার্টের হাতা বাঁধা হইতেছে; তখন গঙ্গাধর বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন যে, পুনর্ব্বার এরূপ করিলে, তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। পত্নীর বহু অনুরোধসত্ত্বেও যাঁহার বেশ-ভূষা সম্বন্ধে চরম শৈথিল্য ছিল, তাঁহার পরিচ্ছন্নতার প্রতি এই নব-অনুরাগ দেখিয়া, আমি বড়ই প্রীত হইলাম।

যাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, চাকরবাকর অপরাধ করিলে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, তাঁহাকে ভৃত্যশাসন করিতে দেখিয়া ভাবিলাম যে, স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার মানসিক দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যাইতেছে।

ইহার পর, একদিন তিনি, বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া, রাত্রে আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ফিরিলেন না। তাঁহার স্ত্রী, একবার বাহিরে একবার ভিতরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন এগারটা বাজিয়া গেল, তখন আর উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে বলিলেন,"বাবা নরেন, একবার বেরিয়ে দেখতে পার—তিনি কোথায় গেলেন ? যে মানুষ আজ দশ বছরের মধ্যে কখনও রাত্রি আটটার পর বাইরে থাকেন নি, তিনি যে শুধু শুধু এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরবেন না, এ হইতেই পারে না! আমার ভয় হচ্ছে, হয়তো কি বিপদ-আপদ হয়েছে।"

কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া আমি বাহির হইলাম ; কিন্তু, কোন্ দিকে খুঁজিতে যাইব বুঝিতে না পারিয়া, মোড়ের নিকট দাঁড়াইয়া আছি—এমন সময় দেখি, একখানা একায় চড়িয়া গঙ্গাধর বাবু আসিতেছেন। তাঁহাকে একায় দেখিয়া আমার মনে হইল, নিশ্চয়ই একটা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া সে রকম কিছু মনে হইল না। আমাকে দেখিয়া সেখানেই একা হইতে নামিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে ?" আমি কারণ বলিলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কেন—আমি কি খোকা নাকি, যে ছেলে-ধরায় ধ'রে নিয়ে যাবে !"

পরে, গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, "আসল কথা কি জান—আমার স্ত্রী একদণ্ড আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, আর আমারও সেই দশা! আমরা দুটিতে কপোত-কপোতীর মত, সর্ব্বদা মুখোমুখি হ'য়ে থাকলেই সুখী থাকি ; আচ্ছা বল দেখি, আমার স্ত্রীর মত মুখের চটক্ আর কারো দেখেছ ? কাল রাত্রে, দেখে দেখে আমার আর আশ মিটছিল না।—

'জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।'

পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ ও গঙ্গাধর বাবুর মত গম্ভীর প্রকৃতি ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া, আমি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। কি বলিব, বুঝিতে না পারিয়া, তাড়াতাড়ি বলিলাম, "একার ভাড়াটা চুকিয়ে দিলে হয় না ?"

তিনি একাওয়ালাকে পয়সা দিলেন ; কিন্তু সে ভাড়া কম হইল বলিয়া গোল করিতে লাগিল। কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল ; কিন্তু এখন তাঁহার কি মতি হইল দুইটা পয়সা বেশি দিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। উপরন্তু, দুই এক কথায় একেবারে সপ্তমে চড়িয়া "হারামজাদ্ তুমকে হাম্ খুন করেঙ্গে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া একা-ওয়ালাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। আমি না থাকিলে একটা কাণ্ড করিয়া বসিতেন, সন্দেহ নাই। আমি অনেক কষ্টে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া, বাড়ী লইয়া যাইতে যাইতে, ভাবিতে লাগিলাম—"একি ? এই নিরীহ গোবেচারি মানুষ—তার আজ এ কি কাণ্ড ?"

সকাল বেলা তাঁহার সহিত দেখা হইলে, তিনি মহা উৎসাহের সহিত বলিলেন, "কাল রাত্রে কোথা গিয়েছিলুম জান ? বেড়িয়ে মাঠের ধার দিয়ে ফিরছি, দেখি মাঠে পার্সি থিয়েটারের তাঁবু। টিকিট্ কিনে ঢুকে পড়লুম। ওরা বেশ প্লে করে হে, হাস্তে হাস্তে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে গিয়েছে।" বলিয়া গান ধরিলেন—"সাড়ে তিন পয়সা এক মছ্‌লি নেহি বেচোঙ্গে।"

আমি তো অবাক্। যত হিন্দুস্থানীদের সহিত একত্র বসিয়া, ঐরূপ অপদার্থ থিয়েটার দেখিতে তাঁহার রুচি হইতে পারে, তাহা আমার ধারণাই ছিল না ; তাহার উপর আবার ঐরূপ গান! পরে ভাবিলাম—হইতেও পারে, বড়লোকদের যেমন মুড়ি খাইবার সখ্, ইঁহারও একা-চড়া ও পার্সি থিয়েটার দেখাও হয় তো সেইরূপ। কিন্তু তাঁহার গত রাত্রের রসিকতা, একাওয়ালার সহিত ব্যবহার, থিয়েটারের অপদার্থ গান-আবৃত্তি করা, ইত্যাদিতে কেমন কেমন মনে হইতে লাগিল! তাঁহার স্ত্রীরও বোধ হয় মনে একটা খট্‌কা জন্মিয়াছিল ; কারণ, সময়ে সময়ে দেখিতাম, তিনি অলক্ষ্যে স্বামীর দিকে উৎকণ্ঠিত নেত্রে চাহিয়া আছেন।

(৭)

কিছুদিন যায়।—গঙ্গাধর বাবুর চালচলন ক্রমেই কেমন বিসদৃশ হইয়া যাইতেছে। দুইএক দিন দেখিলাম, শরীর অসুস্থ বলিয়া, কলেজে গেলেন না ; কিন্তু আমি আপিস হইতে

ফিরিয়া শুনিলাম যে, তিনি বেলা দুইটার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। রবিবারের দিন কিন্তু মোটেই বাহির হইলেন না; অথচ বাড়ীতে বসিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। একদিন বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় কাদা হওয়ায় একটা নূতন পথ দিয়া আপিস হইতে ফিরিতেছি—বেলা তখন প্রায় ৪৷৷০টা—দেখি, গঙ্গাধর বাবু মাঠের ধারে মিউজিয়ম্‌ রোডের মোড়ের নিকট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া প্রথমে থতমত খাইয়া গেলেন; পরে কষ্ট-হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"কি, আজ যে বড় তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরেছ? আমি বেড়াতে বেরিয়েছি, আমার সঙ্গে চল না, একেবারে বেড়িয়ে বাড়ী ফির্‌বে এখন।—ওই দিকে চল।" একরকম জোর করিয়াই আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন; আমার মনে একটু সন্দেহ হইলেও, ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

শিক্ষয়িত্রী—"একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক; * * তাঁর এই রকম কাণ্ড!"

তাহার পরদিনেই সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেল। বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে দরজায় একখানা গাড়ি আসিয়া লাগিল; গাড়ি হইতে জুতা-মোজা-পরা একজন স্থূলকায় প্রৌঢ়া মহিলা নামিয়া, আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া, তাঁহার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"আমি, একবার গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর স্বামীর ব্যবহারের কথা বল্‌তে চাই। একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক—কলেজের প্রোফেসার—বয়স হয়েছে—তাঁর এই রকম কাণ্ড! আপনাকেই সব কথা বলি—এখানকার * * বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম জানেন তো; ওই মিউজিয়ম রোডের ধারে, আমি সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। স্কুলে একটি মেয়ে পড়ে—বড় ভাল শান্ত মেয়ে, বয়স মোটে ১২৷১৩ বছর—তাকে গঙ্গাধর বাবু এমন বিরক্ত ক'রে তুলেছেন যে, বল্‌বার কথা নয়। টিফিনের ছুটির সময়, স্কুলের রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে, মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন; তাকে দেখে হাসেন, ছুটির সময় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন, তার পিছনে পিছনে যান; সে বেচারি তো ভয়ে আধমরা হয়ে উঠেছে! তার উপর, স্কুলের অন্য মেয়েদের ঠাট্টায় অস্থির হয়ে উঠেছে, স্কুলে আস্‌তে কান্নাকাটি করে; অথচ ভয়ে এ পর্য্যন্ত কাউকে কোন কথা বল্‌তে পারে নি। বলুন দেখি,

একথা যদি প্রকাশ হয়, তা হ'লে তার বাপ-মা কি বল্‌বে! আর আমার স্কুলের কি রকম বদ্‌নাম হবে?—এর একটা বিহিত ক'রে তবে আমি যাব।"

আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি প্রকৃতিস্থা হইলে, ক্ষীণস্বরে বলিলাম, "আপনার নিশ্চয় ভুল হয়েছে। গঙ্গাধর বাবু এমন কাজ কখনও কর্‌তে পারেন না।"

শিক্ষয়িত্রী।—আমি ভাল ক'রে না জেনে কি সাহস ক'রে এমন কথা আপনাদের বাড়ীতে এসে বলছি? গঙ্গাধর বাবু কাল স্কুলের ঝিকে, একটা টাকা দিয়ে, মেয়েটিকে একখানা চিঠি আর একটা গোলাপ ফুল দিতে দিয়েছিলেন।—এই দেখুন সেই চিঠি। গঙ্গাধর বাবুর হাতের লেখা চেনেন্ তো?

দেখিলাম, গঙ্গাধর বাবুরই হস্তাক্ষর বটে! হিরণ নাম্নী কোন নায়িকার উদ্দেশ্যে লিখিত প্রেম-কবিতা, তাহার দুইটি ছত্র মনে আছে:—

"উড়াইয়া এলোচুল কর ছুটাছুটি,
ইচ্ছা করে পায়ে প'ড়ে খাই লুটোপুটি।"

ছি—ছি—ছি! বুড়া বয়সে একি কেলেঙ্কারি! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। যাই হউক, গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর কাণে একথা কখনই উঠিতে দিব না—স্থির করিয়া, শিক্ষয়িত্রী মহাশয়াকে আশ্বস্ত করিলাম যে—এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিবিধান করিব, এবং গঙ্গাধর বাবু যাহাতে তাঁহাদের আর কখনও বিরক্ত না করেন, সে ব্যবস্থা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। মহিলাটিকে ভাল বলিতে হইবে; তিনি আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে ধন্যবাদ দিয়া, প্রস্থান করিলেন।

গঙ্গাধর বাবু তখন বাড়ী ছিলেন না। কি করিয়া একথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিব, ভাবিয়া প্রথমটা চিন্তিত হইয়াছিলাম; কিন্তু এ বিষয়ে লজ্জা করিলে চলিবে না বুঝিয়া, দ্বিধা দূর করিলাম। তিনি আসিতেই তাঁহাকে বৈটকখানায় লইয়া গিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশের কথা বলিলাম—তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর,—নিদ্রা-ভঙ্গে কোন অজানা স্থানে আসিয়াছে দেখিলে লোকে যে রকম দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখে, গঙ্গাধর বাবু সেই রকম ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া, আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—যেন তাঁহার কতকটা চেতনা হইল। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাই ত; কাজটা ভাল হয় নি।"

তাহার পর আর এ বিষয়ে কোন গোলযোগ হয় নাই; তবে, কলেজে একটা ঘটনা লইয়া হাঙ্গামা হইয়াছিল। ইদানীং তিনি ক্লাশে পড়ান না, কেবল ফষ্টি-নষ্টি করেন বলিয়া একটা কাণা-ঘুষা চলিতেছিল; কিন্তু, ছাত্রদের তাঁহাকে বরাবর ভয় ও ভক্তি করিয়া চলা অভ্যাস বলিয়া, কথাটা অধিক দূর গড়ায় নাই। ইহার উপর একদিন অধ্যাপকদের বিশ্রাম করিবার ঘরে—গঙ্গাধর বাবু সকলের অগোচরে, কোন অধ্যাপকের চেয়ারের পায়া ভাঙ্গিয়া রাখায়, তিনি পড়িয়া গিয়া আঘাত পান এবং অন্য একজনের চেয়ারে আলপিন্ গুঁজিয়া রাখায় তিনি চেয়ারে বসিয়াই বিকট চীৎকার করিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শুনিলাম, তাঁহাদের আকস্মিক বিপদে উপস্থিত সকলেই—"কি হইল, কি হইল" করিয়া, শশব্যস্ত হইয়া উঠেন; কিন্তু গঙ্গাধর বাবু প্রায় পাঁচ মিনিট-ব্যাপী অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাতে স্বভাবতঃই অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং উত্ত্যক্ত অধ্যাপকদ্বয়, তাঁহার ব্যবহারে ব্যথিত ও অপমানিত হইয়া, প্রিন্সি-পালের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই সময় গুজব উঠিল যে, কলেজের একজন বেহারা ১০৷৷টার পূৰ্ব্বে গঙ্গাধর বাবুকে চেয়ারের পায়া ভাঙ্গিতে দেখিয়াছে। ইহা লইয়া কলেজে বিষম হুলস্থুল উপস্থিত হইল; কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব, গঙ্গাধর বাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া, তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে মাথা-খারাপ হইয়াছে বলিয়া, প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁহাকে তিন মাসের ছুটি লওয়াইলেন।

এই সময় হইতে তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ হইল; তাঁহার স্ত্রী, বৃথা হা-হুতাশ না করিয়া, অক্লান্ত সেবায় নিজের শরীর-মন উৎসর্গ করিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না।

(৮)

গ্রীষ্মের ছুটি হইলে, গঙ্গাধর বাবুর দশ বৎসর-বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র নিৰ্ম্মল বাঁকিপুরে বেড়াইতে আসিল। আমি তাহাকে ষ্টেশন হইতে আনিতে গেলাম, ও ষ্টেশন

হইতে আসিতে আসিতে কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে, সে জ্যাঠাইমাকে নিজের মার অপেক্ষা ভালবাসে। কিন্তু জ্যাঠা-মহাশয়কে যমের মত ভয় করে, তাঁহাকে লুকাইয়া বেড়ায়। সেই দিন মধ্যাহ্নে নির্ম্মল তাহার জ্যাঠাইমার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময় গঙ্গাধর বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। অমনি নির্ম্মলের কথার স্রোতও বন্ধ হইয়া গেল, সে পলাইবার উপক্রম করিল; কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই—"ওরে—নির্ম্মল এসেছিস্ যে রে! চ, বেড়াতে যাই।"—বলিয়া গঙ্গাধর বাবু তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন; সে নবমীর পাঁঠার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সঙ্গে গেল। ঘণ্টা দুই পরে দুইজনে ধূলি-ধূসরিত হইয়া, কলরব করিতে করিতে ফিরিলেন; গঙ্গাধর বাবুর বগলে ব্যাট্ ও উইকেট্, হাতে একটা লাটাই ও পকেট বিষম ভারি;—নির্ম্মলের হাতে খান পাঁচ-ছয় ঘুঁড়ি। ফিরিয়া আসিয়াই গঙ্গাধর বাবু নির্ম্মলকে লইয়া - বাড়ীর সম্মুখে একটু পতিত জমি আছে, সেই খানে—সেই চৈত্র মাসের দারুণ রৌদ্রে, ক্রিকেট্ খেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; নির্ম্মল 'আউট্' হইয়া গেলে, দুই হাত তুলিয়া তাঁহার নৃত্যের ধূম দেখে কে!—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! পরে মার্ব্বল্-খেলা সুরু হইল; গঙ্গাধর বাবু, ভূলুণ্ঠিত শ্মশ্রু লইয়া, উবু হইয়া বসিয়া, নির্ম্মলের সহিত সমান উৎসাহে "গাবু" "নট কিচ্ছু" ইত্যাদি চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন নির্ম্মল, তাঁহাকে বারবার পরাজিত করিয়া, গোটাকতক মার্ব্বল্ জিতিয়া লইল—তখন তিনি, অভিমান-ভরে হাতের সমস্ত মার্ব্বল্‌গুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া, ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। বাড়ীর মধ্যে যাইয়া কি করেন, দেখিবার জন্য ভিতরে যাইয়া দেখি—গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রী, বাহিরের দিকের একটা জানালায় দাঁড়াইয়া, সেই পতিত জমির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে! আমি নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার সময়, তাঁহার পড়িবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে দেখি, তিনি কতকগুলি মোটা মোটা বাঁধান বই লইয়া, এক এক জায়গা খুলিতেছেন,—তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল বলিতেছে, "না জ্যেঠামশাই, এখান্‌টা নয়।" আমি কুতূহলী হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখি, সেগুলি ডারুইন্, এমার্সন্, ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি উচ্চ-অঙ্গের গ্রন্থ। প্রথমে ভাবিলাম—এই সকল গ্রন্থ কি নির্ম্মলকে পড়িতে বলিতেছেন! কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, তিনি গ্রন্থ-গুলিতে 'জলছবি' লাগাইতেছেন! কোন্ কোন্ স্থানে ছবি লাগাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে নির্ম্মল মত-প্রকাশ করিতেছে!

ইহার মধ্যে, একদিন নির্ম্মল আমাকে বলিল, "দেখুন্ নরেন্ দা! জ্যাঠামশাই যে এত ভাল হ'য়েছেন, তা আমি জান্‌তুম্ না; আমি আর কলকাতায় যাব না, এইখানেই থাক্‌ব। তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গেলে যে মজা হয়, সে কি বল্‌ব। আজ বেড়াতে গিয়ে, আমরা দুজনে দু আনার চানা-চুর, দু আনার গোলাপী-রেউড়ি, আর পাঁচ আনার কচুরি গজা-টজা খেয়েছি। জ্যাঠাইমা বলেন, জ্যাঠামশাই খেতে পারেন্ না—ও বাবা, আমার চেয়ে তিনগুণ খেতে পারেন! ঐ সব খাবার-টাবার খেয়ে, আবার একজনদের বাগানে পেয়ারা খেতে ঢুকেছিলেন; পেয়ারা গাছ থেকে এমন পড়ে গেছেন যে, ভুঁড়িটা ছ'ড়ে গেছে!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, সর্ব্বনাশ! ভদ্রলোক আজ নিশ্চয় মারা যাইবে; ও-রকম খাওয়া কি এ বয়সে সহ্য হয়? সেইদিন রাত্রেই তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইলেন; পেটের যন্ত্রণায় এরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, ডাক্তারকে সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল!

এতদিনে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, আমার পাওয়া সেই গুঁড়াটা খাইয়া, ইঁহার এই দশা ঘটিয়াছে! কিন্তু সাহস করিয়া সে কথা কাহাকেও বলিতে পারিলাম না; কারণ, সেরূপ অসম্ভব কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না—উপরন্তু, একটা গুজব উঠিবে যে, আমি কি খাওয়াইয়া, ইঁহাকে পাগল করিয়া দিয়াছি—হয়তো গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর মনে চিরকালের জন্য একটা সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। এ বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, বড়ই অশান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলাম।

(৯)

এমন সময়, কনিষ্ঠ-ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে, আমাকে সপ্তাহের জন্য একবার দেশে যাইতে হইল।—এই বিপন্ন পরিবারকে ফেলিয়া যাইতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না; কিন্তু না যাইলে নয়, অগত্যা গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীকে আশ্বাস

দিয়া, ও ডাক্তার রাঘব বাবুকে প্রত্যহ দুইবেলা আসিতে অনুরোধ করিয়া, দেশে রওনা হইলাম।

সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া, গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার স্বামীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করায়—তিনি নীরবে মাথা নাড়িয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাশের ঘরে হুটোপাটি শব্দ হইতেছিল। তিনি, মস্তক-সঞ্চালন দ্বারা, সেই ঘর নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "খেলা কর্‌ছেন।" ক্ষণেক পরে, সে ঘরের দরজা খুলিয়া, দাই অর্থাৎ ঝি লছমনিয়া, বাহির হইয়া আসিল; এক হাতে তাহার একটা আঙ্গুল ধরিয়া ও অন্য হাতের তর্জ্জনী নিজের মুখের মধ্যে পূরিয়া, চুষিতে চুষিতে গঙ্গাধর বাবু টলিতে টলিতে তাহার সঙ্গে বাহির হইলেন, এবং আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি লছমনিয়ার পিছনে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! ব্যথিতকণ্ঠে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, "ওকি! নরেন্‌কে দেখে লুকোচ্ছ কেন? ও দেশ থেকে এল, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা কর।" তখন তিনি সলজ্জভাবে, হাসিতে হাসিতে এক পা এক পা করিয়া, ঠিক দুই তিন বছরের শিশুর মত, আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, তাঁহার গালে এক ডেলা মিছরি—তাহার রসে হাত-মুখ দাড়ি চট্‌চট্‌ করিতেছে! আমি, তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য, মিষ্টভাষে নানারূপ কথা বলিতে লাগিলাম; দেখিলাম, তাহাতে তিনি বেশ খুসী হইলেন, ও খলখল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?—বসুন না।" আমি তাঁহার মৎলব বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই তিনি আমার কোলে বসিয়া পড়িলেন; আমি এই অকস্মাৎ বিপদে, এবং তাঁহার দেহের প্রায় তিন মণ ভারে, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আসিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে আমার কোল হইতে উঠাইয়া লইলেন।

ইহার দুই তিন দিন পরেই, গঙ্গাধর বাবু হামা দিতে আরম্ভ করিলেন; আর কথা বলিতে পারেন না,—ক্ষুধা পাইলে, তাঁহার জলদগম্ভীরস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদেন—এমন পা ছুঁড়েন যে, তাঁহার নিকটে যাওয়া বিপজ্জনক হইয়া উঠে; আহ্লাদ হইলে, হাততালি দিয়া "তা—তা—তা" শব্দ করেন। একজন হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ়বয়স্ক শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির এইরূপ আচরণ, কাহারও কাহারও নিকট হাস্যজনক মনে হইতে পারে; কিন্তু চক্ষের উপর দেখিলে যে বুকফাটা কষ্ট হয়, তাহা যে না দেখিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না। সংসারের তৈজস-পত্র রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিল; কারণ, চক্ষের অন্তরাল হইলেই তিনি হামা দিয়া গিয়া, সকল জিনিষ ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া তচ্‌নচ্‌ করেন! একদিন দেখি, নিজের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় কতকগুলি বই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া, দোয়াতের কালি চারিদিকে ছড়াইয়া ও নিজের হাতে মুখে মাখিয়া, বসিয়া আছেন! একটু অসাবধান হইলেই তিনি বারান্দা প্রভৃতি উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়া আঘাত পান। একদিন একটা আস্ত সুপারি গলাধঃকরণ করিয়া, দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া, মারা যান আর কি!

এতদিনে সত্য সত্য অসহ্য হইয়া উঠিল। গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর যে অসাধারণ সহ্য গুণ, তাহাও বুঝি আর টিঁকে না। তিনি আর নিজেকে খাড়া রাখিতে পারেন না; মেঝের উপর পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, এক এক বেলা কাটাইয়া দেন!—আহারাদি তো একরকম বন্ধই করিয়া দিয়াছেন। আমি, সান্ত্বনা দিব কি, নিজেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি—মনে দারুণ অশান্তি।—ডাক্তারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যা'ন।

এমন সময় সহসা ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একদিন রাত্রে, গঙ্গাধর বাবু হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া, গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। আমরা সভয়ে সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া কাটাইলাম। প্রত্যুষে গঙ্গাধর বাবু চক্ষু মেলিয়া, ক্ষীণস্বরে দুই একটি কথা বলিলেন ও ক্রমে বেশ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। যখন বুঝা গেল, তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহার স্ত্রী আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—বাড়ীতে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। রহিল কেবল দুর্ব্বলতা, তাহাও অতি দ্রুত সারিয়া যাইতে লাগিল; দুইচারি দিনের মধ্যেই তিনি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহরে রাঘব ডাক্তারের জয়জয়কার পড়িয়া গেল এবং

রাঘব ডাক্তার নিজে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে—"* * প্রণীত Record of Obscure Cases গ্রন্থেও এরূপ অদ্ভুত কেসের উল্লেখ নাই; বিলাতে কোন ডাক্তার এইরূপ রোগ আরাম করিলে, তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।"

আমি সময় বুঝিয়া একদিন ব্রহ্মচারী-আবিষ্কৃত রসায়নের কথা তুলিলে, গঙ্গাধর বাবু বলিলেন—"সেটা খেয়েই তো আমার দুরবস্থা হ'য়েছিল। কে জান্ত যে, দেহের উপর ওর কোন ফল হয় না—কেবল মনের মধ্যে একটা Illusion আনে? Most infernal concoction! সাধ ক'রে মহারাজ আদিত্য কি ওটাকে পুঁতে ফেলতে হুকুম দিয়েছিলেন?"

গঙ্গাধর বাবু সেদিন আমার বিশ্বাস-প্রবণতার নিন্দা করিয়াছিলেন;—আজ তাহার জবাব দিবার দিন আসিয়াছে। আমি, বিজ্ঞতা-প্রকাশ করিবার লোভ-সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলাম, "যাই হ'ক, ওষুধটার গুণ যে আশ্চর্য্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি সেই কথা বিশ্বাস করেছিলুম্ ব'লে আপনি সে দিন কত কথা বল্লেন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, পুরাকালে এমন এক একটা জিনিস ছিল, যা' আজকাল অসম্ভব ব'লে মনে হয়। আপনিই তো সেদিন বলছিলেন যে, প্রাচীন কালের এক একটা প্রকাণ্ড আস্ত পাথরের থাম দেখলে বোঝা যায় যে, তখন পাথর কুঁদ্‌বার এত বড় যন্ত্র ছিল যে, আজকাল সে রকম নেই; পাহাড় থেকে অনেক দূরে কোন কোন মন্দিরের গাঁথুনিতে এত বড় বড় পাতর আছে যে, সেগুলা কি ক'রে অত দূরে নিয়ে গিয়েছিল, তা' আমরা বুঝ্‌তেও পারি না! 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।'—যারা এই সব করেছে, তারা যে অন্য অন্য বিষয়েও আজকালকার হিসাবে অসাধ্য-সাধন করেছিল, তা নিশ্চয়; তবে, থাম-মন্দির ইত্যাদি স্থায়ী-জিনিস, তাই সেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই; অন্য অন্য বিষয়ে যা ক'রেছিল, তা'র আর কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না! আমার তাই মনে হয় যে, প্রাচীনকালের কোন ব্যাপার, আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হ'লেই, সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত নয়।"

গঙ্গাধর বাবু হাসিয়া বলিলেন—"Thou too Brutus!"

সন্ধ্যা

[শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়]

তোমার বাণী শোনাও মোরে
ধীরে ধীরে ধীরে,
কথায় তব পূর্ণ কর,
আমার চিত্তটিরে!
শান্তি চাহে হৃদয়খানি
শান্তি দিয়ে যাও,
দিনান্তের এই ক্লান্তিরাশি
আপনি মুছে দাও!
পূর্ণ কর—পূর্ণ কর—
পূর্ণ কর প্রাণ!

ভিখারী এ চিত্তটিরে
শান্তি করি দান।
আকাশ-ভরা ওই পরশে
পরশ করে যাও,
নিবিড়তর এই স্নেহতে
সরস করে নাও!
সুন্দর এই সন্ধ্যাটিরে
শূন্য করি দিয়া,
তোমার কথায় পূর্ণ কর
অশান্ত এ হিয়া।

প্রাচ্যের দান

[শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, M. A.]

আধুনিক কবিশ্রেষ্ঠ কিপ্‌লিং 'East is East, West is West' বলিয়া, খুব একটা বড়াই করিয়াছেন ; কিন্তু যেমন স্বরবর্ণ না থাকিলে ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ হয় না, তেমনই প্রাচ্য-দেশ না থাকিলে, পাশ্চাত্য-দেশ এতটা উন্নতি করিতে পারিত কি না সন্দেহ। আজ কাল 'সভ্য' বলিলেই পাশ্চাত্যকে বুঝায়, পাশ্চাত্য আর সভ্য, যেন পরস্পরের প্রতিশব্দ। দিবাবসানে সূর্য্য যেরূপ পশ্চিম দিকে প্রয়াণ করেন, যুগের শেষ কলিযুগেও সেইরূপ সভ্যতাসূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িয়া, তথা হইতে সভ্যতার ক্ষীণ রশ্মি পূর্ব্ব-দেশে বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু যেখানে সর্ব্বপ্রথমে দিবা-অবসান হয়, সেই স্থানেই প্রকৃতির নিয়মে সর্ব্বাগ্রে দিবা-আগমন হয়। অতএব অধুনা প্রাচ্য-দেশ অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেও সভ্যতালোক প্রাতঃ-সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রথমে এই দেশেই বিকীর্ণ হইয়াছিল। যখন প্রাচ্য-দেশসমূহ সভ্য, তখন পাশ্চাত্যদেশের অন্ধকার এতই গাঢ় ছিল যে, তদানীন্তন ইয়ুরোপের কোন সংবাদই কেহ জানে না। তখন ইয়ুরোপকে মানুষ হইয়া সংসারে দাঁড়াইবার জন্য প্রাচ্যের নিকট দান-গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। প্রাচ্য—প্রতীচ্যকে প্রধানতঃ কি কি বিষয় দান করিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। **অক্ষর-সৃষ্টি**।—মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশের সময় কি করিয়া, ইশারা করা ও কথা-বলা ব্যতিরেকে লোককে লোক মনের ভাব বুঝাইতে পারে এবং চিন্তার ফলগুলি কি উপায়ে ভবিষ্যদ্‌ বংশধরদিগের উপকারের জন্য স্থায়িভাবে রাখিতে পারে, ইহা একটা বিষম সমস্যা ছিল। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ মিশরে প্রথমে সাঙ্কেতিক লেখার (Hieroglyphics) সৃষ্টি হয়। তাহাতেও অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর না হওয়ায় ধনুকের তীরের ফলার ন্যায় (Cuneiform) এক প্রকার অক্ষরের সৃষ্টি হয়। বহু পণ্ডিতের মত যে, উহাও প্রথমে মিশরে উদ্ভাবিত হয়। আর অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মত উহা প্রথমে আসিরিয়ায় উদ্ভাবিত হয়। (১) মিশরীয় ও আসিরিয়ার সভ্যতা অনেকটা সামসময়িক ও উভয়েই প্রাচ্য। ঐ দুই প্রকার লেখার সংমিশ্রণে যে অক্ষরের উৎপত্তি হয়, তাহা মিশরবাসীদিগের নিকট হইতে ফিনিসিয়ান-গণ গ্রহণ করেন (২) ও তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রীক্‌গণ প্রাপ্ত হন। অধুনা পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত অক্ষরসমূহ সেই অক্ষরের পরিমার্জ্জিত সংস্করণ মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্যদেশ, সভ্যতার অঙ্কুর অক্ষর-সৃষ্টির জন্য প্রাচ্যের নিকট ঋণী।

২। **কাগজ ও পার্চ্চমেণ্ট**।—অক্ষর ত পাওয়া গেল, কিন্তু কাগজ নহিলে ত আর অক্ষর-সৃষ্টির সুফল সম্যক্‌রূপে মানুষের কাযে লাগান যায় না। অক্ষর-সৃষ্টিকার-গণ কাগজ সৃষ্টি করিয়া যান নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কাগজের সৃষ্টি প্রাচ্য-দেশেই হইয়াছিল। কাগজ প্রথমে চীন দেশে প্রস্তুত হয় ও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাগজ চীনের একচেটিয়া পণ্য ছিল। চীনদিগের নিকট হইতেই উহা ইয়ুরোপে যায়। (৩) নোটের কাগজও (অর্থাৎ পার্চ্চমেণ্ট) সর্ব্বপ্রথমে প্রাচ্য-দেশে প্রস্তুত হয়। ইহার পার্চ্চমেণ্ট নামেই ইহা ধরা পড়ে। ইহা এসিয়া মাইনরে পার্‌গামাস্‌ নামক স্থানে প্রথম প্রস্তুত হয়।

৩। **ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষর**।—অধুনা আমরা ছাপান পুস্তক পাঠ করি। ইংরাজগণই

---

(১) Breasted—History of Egypt.

(২) "The view propounded by Deecke that the Phœnician alphabet had developed out of the Assyrian cuneiform."—Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Vol I

(৩) Vincent A. Smith—The Early History of India. Chapter XIV.

প্রথমে এদেশে ছাপাখানা-স্থাপন ও ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করেন। ইহা হইতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন যে, ছাপার অক্ষর ইয়ুরোপেই উদ্ভাবিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণ তাহাই বলিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতে উহা জার্ম্মাণীতে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু আসল কথা, জার্ম্মাণীতে ছাপার অক্ষর উদ্ভাবিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে চীন-দেশে এক প্রকার ছাপানর প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয়গণও এ কথা স্বীকার করেন। চীনদিগের সহিত পাশ্চাত্যের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং ছাপার কৌশল উদ্ভাবন-বিষয়ে প্রাচ্য যে প্রতীচ্যের শিক্ষাগুরু, ইহা স্বীকার করিতে অন্ততঃ প্রাচ্য-দেশবাসী কেহ বোধ হয়, ইতস্ততঃ করিবেন না; যেহেতু অভাবই ঋণের কারণ এবং চীনের ছাপার কৌশল উদ্ভাবন-কালে পাশ্চাত্যের উহার অভাব ছিল।

৪। **সংখ্যা, দশমিক ভগ্নাংশ ও বীজগণিত**।—অঙ্ক-শাস্ত্রের ১, ২ প্রভৃতি অঙ্কগুলির কোথায় জন্ম হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, সকলে অবগত নহেন। সমগ্র জগৎ এই অঙ্কগুলির জন্য ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। দশমিক-ভগ্নাংশও প্রথমে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় ও আরবদেশ হইয়া ইয়ুরোপে পৌঁছায়। এই দশমিক-ভগ্নাংশ কেবল অঙ্কশাস্ত্রে নহে, মানব-সভ্যতা-বিকাশে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে, তাহা সুধী মাত্রেই অবগত আছেন। পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেন যে, উহার উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না। বীজ-গণিত—এলজেব্রা এই আরবীয় নামে অধুনা প্রতীচ্যদেশে পরিচিত হইলেও উহা যে ভারতবর্ষে উদ্ভূত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই এবং অদ্যাপি শ্রীধরাচার্য্যের অঙ্ক কসিবার প্রণালী স্বনামে ইয়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত আছে। (ইয়ুরোপীয়গণ ভারতবর্ষ হইতে বীজগণিত পাইয়াছেন স্বীকার না করিলেও আরবদেশ হইতে পাইয়াছেন অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য, কেননা এলজেব্রা নামেই সে কথা ধরা পড়ে।)

৫। **জ্যামিতি**।—তাহার পর জ্যামিতির কথা। যজুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে যজ্ঞভূমি ও বেদি-নির্ম্মাণের জন্য কতকগুলি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার প্রয়োগ হইত। অতএব বুঝা গেল যে, বৈদিককালেও ভারতবর্ষে জ্যামিতির তত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল না। বৈদিককাল যে কবে আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করিবার কাহারও সাধ্য নাই। শুল্বসূত্র ও গ্রীকদিগের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে সৌসাদৃশ্য অনেক। ইহাতে পাশ্চাত্যগণ বলেন, ভারতবর্ষই গ্রীকদিগের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু লোক যে বিষয় জানে না, তাহাই যে সকল লোক উহা জানে, তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করে; ইহাই যখন স্বভাবের নিয়ম, তখন যে জ্যামিতি ভারতবর্ষে অনির্দ্দিষ্ট বৈদিককাল হইতে জ্ঞাত, গ্রীকদিগের সংস্রবে আসিয়া ভারতবাসিগণ উহা গ্রীকগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অযুক্তিযুক্ত অবিশ্বাস্য কথা। স্পষ্টই ধারণা হয়, যদি কেহ ঋণ করিয়া থাকেন, তবে গ্রীসই ভারতবর্ষের নিকট উহা গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত আবার বলেন যে, জ্যামিতি মিশরে প্রথমে আবিষ্কৃত হয়, কারণ মিশরে প্রতিবৎসর নীল নদের প্লাবনে জমির বিভাগচিহ্নগুলি নষ্ট হইয়া যাইত ও প্রতি বৎসর তাহার পুনর্নির্দ্দেশের নিমিত্ত জ্যামিতির উদ্ভব হয়। তাহা হইলেও ইহা প্রাচ্যের আবিষ্কার বলিতে হইবে। সাধারণ ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় ইউক্লিডকেই জ্যামিতির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন। কিন্তু ইউক্লিড কোন্ দেশের লোক, তাহা বোধ হয়, সকলে জানেন না। তিনি নামে গ্রীক্ হইলেও প্রাচ্য মিশরবাসী। অতএব দেখা গেল যে, অঙ্কশাস্ত্রের বিবিধ বিভাগের জন্য প্রতীচ্য, প্রাচ্যের নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

৬। **সৌরবর্ষ**।—চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া, চান্দ্রমাস আবিষ্কার করা কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু এই চান্দ্রমাস প্রায় ২৯ দিনে হয়, সুতরাং চান্দ্রমাস অনুসারে বৎসর গণনা করিলে, বৎসর ছোট হইয়া যায়, ৩৬৫ দিনে হয় না। তাহাতে মাসের সহিত গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতুর ঐক্য থাকে না, এই বিষম অসুবিধা ঘটে। কিন্তু বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য যে, ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা, ইহা আবিষ্কার করিল কাহারা? স্থিতিশীল (Conservative) মুসলমানগণ চান্দ্রমাসই গণনা করেন। অতএব সৌর বৎসর আরব-দেশীয়গণের আবিষ্কার নহে। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের বৎসর সৌর বৎসর। ইহাতেই অবশ্য সপ্রমাণ হয় না যে, হিন্দুরা উহা আবিষ্কার করেন। কেননা প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, হিন্দুরা উহা গ্রীকদিগের নিকট হইতে লইয়া থাকিতে

পারেন। অবশ্য বৈদিক কালেও ভারতবর্ষে সৌর বৎসর অজ্ঞাত ছিল না, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফল কথা, হিন্দুরা সৌর বৎসর আবিষ্কার করিয়াছেন কি না, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উহা যে প্রাচ্যদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সৌর বৎসর অনূ্যন ৪৮২১ খ্রীঃ পূঃ বৎসরে মিশরে প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। মিশরবাসিগণ অতি প্রাচীন কালে পূর্ণ বৎসর যে, ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় হয়, ইহা নির্দ্দেশ করেন। মিশরবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ ঐ বৎসর লয়েন ও তাহাই অল্প একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া, সমগ্র সভ্যজগতে গৃহীত হইয়াছে। অতএব এ ক্ষেত্রেও প্রতীচ্য, প্রাচ্যের নিকট ঋণী। (৪)

৭। জ্যোতিষ।—ভারতবর্ষ জ্যোতিষের জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী, এইরূপ একটা প্রচলিত সংস্কার আছে। কিন্তু আধুনিক ইয়ুরোপীয় মনীষিগণ স্বীকার করেন যে, জ্যোতিষ প্রথমে প্রাচ্য-দেশেই জন্ম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মিশরবাসিগণ যে বৎসরের পরিমাণ আবিষ্কার করেন, এ কথা ইয়ুরোপীয়েরা নিজেরাই জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মানবসভ্যতাবিকাশের প্রথম যুগে ক্যালডিয়া ও মেসোপোটেমিয়াবাসিগণ তাঁহাদের কুজ্ঝটিকাশূন্য নির্ম্মল আকাশপটে বিধাতার সৃষ্টি কৌশলের সৌন্দর্য্য-দর্শন-কালে জ্যোতিষের কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এই ক্ষুদ্র কথাটি হইতেই ক্যালডিয়া ও মেসোপোটেমিয়া জ্যোতিষে কিরূপ উন্নতি-লাভ করিয়াছিল, সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। গ্রীসের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেই ক্যালডিয়ার পতন হইলেও ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট "ক্যালডিয়াবাসী" ও "জ্যোতির্ব্বেত্তা" প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইত। গ্রীস জ্যোতিষের জন্য ক্যালডিয়ার নিকট ঋণী, একথা আধুনিক ইয়ুরোপীয় সুধীবর্গই আমাদিগকে বলিতেছেন। (৫) ক্যালডিয়া জ্যোতিষে এত উন্নতি-লাভ করিতে পারে, আর যে ভারতবর্ষ—দর্শন, ন্যায়, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে আজও পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছে, যে দেশের মুনি-ঋষিগণের যুগারম্ভে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তসকল আজকাল ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া, যথার্থ বলিয়া ঘোষিত হইতেছে এবং যে দেশের দ্রাবিড় জাতি—এমন কি, ক্যালডিয়াকেও আদিম সভ্যতার মূল তথ্য শিক্ষা দিয়াছেন, (৬) সেই দেশের জ্যোতিষসংক্রান্ত পুস্তকের মধ্যে "হোরাশাস্ত্র" আর "রোমক সিদ্ধান্ত" আছে বলিয়াই একবারে সপ্রমাণ হইয়া গেল যে, ভারতবর্ষ জ্যোতিষের জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী ? কিন্তু অনূ্যন ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ বর্ষে যখন গ্রীস কোথায় তাহার স্থিরতা নাই, তখন ভাস্করাচার্য্য যে, পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, ইহা বলিয়া যান, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে কি ? যাহা হউক, অন্ততঃ এ কথা প্রতীচ্য মনীষিগণ স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে গ্রীসের নিকট ঋণ-গ্রহণ করিলেও তাহা অবশেষে 'সুদে আসলে' পরিশোধ করিয়াছিল এবং পাশ্চাত্য জ্যোতিষগ্রন্থসমূহে জ্যোতিষ-সংক্রান্ত ভারতবর্ষীয় কতকগুলি কথা এখনও ইহার সাক্ষি-স্বরূপ জীবিত আছে। পরন্তু ভারতবর্ষ জ্যোতিষের কতকগুলি নূতন তথ্য গ্রীসের নিকট হইতে লইয়াছে, যদি ইহাও স্বীকার করা যায়, তথাপি ইয়ুরোপ জ্যোতিষের মূল প্রাচ্যের নিকটই পাইয়াছেন, ইহা প্রকৃত তথ্য।

৮। দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।—অধুনা পাশ্চাত্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য, দেশ-অধিকার প্রভৃতি কার্য্য অর্ণবযানের সাহায্যে হইতেছে, কিন্তু দিগ্‌দর্শন যন্ত্র (Compass) ব্যতিরেকে জাহাজ-চালান এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয়, অনেকেরই ধারণা, কম্পাস সাহেবরা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কম্পাসের যে প্রতীচ্য-দেশে সৃষ্টি হইয়াছিল, আজকাল নব্য সম্প্রদায় সাহেবেরা ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কূট তর্কের বক্তা খুলিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু অধুনা জাহাজ দিয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলিলেও দিগ্‌দর্শন যন্ত্র তাঁহারা সৃষ্টি করেন নাই। ইহা অহিফেনসেবী, বেণীধারী, জড়-প্রকৃতি, অসভ্য প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত চীনদেশীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্তৃক প্রায় ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ বৎসরে উদ্ভাবিত হয়। (৭)

(৪) Breasted—History of Egypt.

(৫) Maspero—Dawn of Civilization.

(৬) Hall—Ancient History of the Near East.

(৭) Hirst—History of China.

৯। বারুদ।—এখন যে যুদ্ধ আর পূর্ব্বকালের ন্যায় তীর-ধনুকে হয় না, তাহা সকলেই জানেন। আজকালকার যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ গোলা-বারুদ। এখন যাঁহার গোলাবারুদের জোর বেশী, তিনিই স্বাধীন, তিনিই প্রধান। কিন্তু গোলা-বারুদের ছড়াছড়ি ত ইয়ুরোপেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে কথা এই, বারুদ-সৃষ্টি করে কাহারা? আপনারা বোধ হয়, সকলেই জানেন যে, আতসবাজী প্রস্তুত-বিষয়ে চীনেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এবং প্রকৃত তথ্যই এই যে, চীনেরা সর্ব্বপ্রথমে বারুদ-সৃষ্টি করেন। নব্য সাহেব-সম্প্রদায় অবশ্য চীনাদিগের দ্বারা কম্পাস-সৃষ্টির ন্যায় চীনাগণ যে, বারুদ-সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে একান্ত অনিচ্ছুক।

১০। যাদুবিদ্যা।—প্রাচীন পারস্যের ধর্ম্মে আমাদের দেশের ধর্ম্মের ন্যায় অনেক যাগ-যজ্ঞ-হোম-কর্ম্ম ছিল। সেগুলিকে ইয়ুরোপীয়েরা ভৌতিক ক্রিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন; কারণ, তাহার মর্ম্ম তাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারিতেন না। বিধর্ম্মী পারস্যের পুরোহিতের নাম ছিল, ম্যাজি (Magi)। কিন্তু আচার-ব্যবহারও অনেকটা সংক্রামক ব্যাধি। পারস্যের দেখাদেখি, পাশ্চাত্যগণও ভৌতিক ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। পারস্যের ম্যাজিদিগের নিকট প্রাপ্ত ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা অদ্যাপি ইয়ুরোপে ম্যাজিক (Magic) নামে অভিহিত হইয়া, পুরাকালের প্রাচ্যের নিকট পাশ্চাত্যের দানগ্রহণের সাক্ষ্য দিতেছে। (৮) Spiritualism এই জাঁকালো নাম দিয়া, আধুনিক ইয়ুরোপে যে ভূতুড়ে কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও আদি প্রাচ্য-দেশ।

১১। দর্শন।—ইয়ুরোপে প্রবাদ আছে যে, থেলস্, এম্‌পিডক্লিস্, আনাক্সাগোরাস্, ডিমোক্রিটাস্, পিথাগোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রাচ্য-দেশে গমন করেন। এমন কি, এরূপ প্রবাদ আছে যে, পিথাগোরাস্ ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যান। দর্শন-শাস্ত্রে ভারতবর্ষ পুরাকাল হইতে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। (৯) সুতরাং গ্রীক্‌গণ যে, দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য প্রাচ্যদেশে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। একটু প্রণিধান করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য-দেশে প্রচারিত দার্শনিক সিদ্ধান্তসকল স্থূলতঃ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকমত। যথা—

(ক) ইলিয়াটিক মতের মুখ্য সূত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এবং বিশ্বেশ্বরে অভেদ-জ্ঞান এবং অস্তিত্বে অভেদ এবং জড়-পদার্থের অস্তিত্ব নাই, উহা কেবল কল্পনা মাত্র; এই মতগুলি উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের মত।

(খ) এম্‌পিডক্লিসের সিদ্ধান্ত—যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহার নূতন করিয়া উৎপত্তি নাই এবং যাহা আছে, তাহার ধ্বংস নাই; ইহাও সাংখ্যদর্শনের "অনন্ত" এবং "পদার্থের অবিনশ্বরতা" এই সিদ্ধান্তের ভাষাগত রূপান্তর মাত্র।

(গ) পিথাগোরাস্ গ্রীক্‌ধর্ম্ম, দর্শন ও গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, তাহা পিথাগোরাসের জন্মাইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এবং তাঁহার ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মতের মধ্যে এই ঐক্য দেখা যায় যে, তিনি যে ভারতবর্ষের নিকট হইতে ঐ মতগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এবং ইয়ুরোপীয়গণও তাহা অস্বীকার করেন না। পিথাগোরাসের পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে অভিমত, তাঁহার পঞ্চভূত হইতে সমস্ত জড়-পদার্থের উৎপত্তি এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অনুকরণ। পিথাগোরাসের পুনর্জ্জন্মবাদ যে, দেশান্তর হইতে আনীত, তাহা গ্রীক্‌গণই সর্ব্বপ্রথমে সকলকে জ্ঞাত করান।

(ঘ) তৎপরে নিয়োপ্ল্যাটোনিষ্ট্‌দিগের দার্শনিক সিদ্ধান্তসকল যে, সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত, তাহা বেশ বুঝা যায়। যথা, প্লোটিনাসের মত—আত্মা সুখদুঃখের অতীত, কারণ সুখদুঃখ জড়-পদার্থেই সম্ভব, তাঁহার আত্মা ও জ্যোতিতে অভেদ-নির্দ্দেশ এবং জ্ঞানতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য দর্পণের উপমা প্রভৃতি স্পষ্টই সাংখ্যদর্শনের মত। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ-রহিত করিয়া, তপস্যা করা আবশ্যক, ইহাও যোগদর্শনের মত। প্লোটিনাসের প্রধান শিষ্য পরফাইরির সাংখ্যদর্শনের নিকট ঋণ আরও অধিক। তিনি বলেন, আত্মা ও জড়দেহে অত্যন্ত প্রভেদ এবং আত্মা জড়দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে

(৮) Maspero—Passing of the Empires.

(৯) Macdonell—History of Sanskrit Literature.

সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে এবং জগৎ অনাদি। পরফাইরি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন; সে সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ প্রভাবে প্রচলিত। সুতরাং বৌদ্ধদিগের অনুকরণে তিনিও জীববলি ও প্রাণি-সংহারের বিরুদ্ধে মত দিয়া গিয়াছেন।

(ঙ) খৃষ্টান নষ্টিক ধর্ম্মের (Gnosticism) উপর ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব অতিশয় প্রবল। নষ্টিক-দিগের, আত্মা ও জড়দেহে বিশেষ পার্থক্য, জ্ঞানের জড়দেহ-বিচ্ছেদে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, আত্মা ও দিব্যজ্যোতিতে অভেদ প্রভৃতি মতগুলি সাংখ্যদর্শনের মত। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের ত্রিগুণাত্মক বিভাগানুযায়ী নষ্টিকগণও মনুষ্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বার্দ্দিসেন সাংখ্যদর্শনের লিঙ্গশরীরের অনুকরণে এক সূক্ষ্মশরীরের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

(চ) হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ এবং এখনও জার্ম্মাণ দার্শনিকগণ ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের অভিমত ঋণগ্রহণ করিতেছেন।

১২। **চিকিৎসা**।—চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রাচ্যের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের নিকট প্রতীচ্যের ঋণ কম নহে। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি অমর ঋষিগণের নাম, বোধ হয়, ভারতবাসী কাহারও অবিদিত নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি মনীষিগণের পুস্তক সকল আরবীয়গণ ভাষান্তরিত করেন। আরবীয়গণের নিকট হইতে উহা ইয়ুরোপে যায়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থসমূহের আরবীয় অনুবাদ ইয়ুরোপীয়গণের প্রধান সম্বল ছিল। অধুনাও যে তাঁহারা হিন্দুদিগের চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে মত মিলাইতেছেন, তাহা বোধ হয়, সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। দধি ও ঘোলের আদরই তাহার প্রমাণ। আর একটা কথা। কৃত্রিম নাসিকা-প্রস্তুত ইয়ুরোপীয়গণ ভারতবর্ষ-অধিকারের পর এ দেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। (১০)

১৩। **রসায়ন**।—রসায়ন-শাস্ত্রেও ভারতবর্ষ প্রতীচ্যকে ঋণদান করিয়াছে। পাশ্চাত্য যে প্রাচ্যের নিকট হইতে রসায়ন-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত পরমাণুবাদ (Atomic theory) তাহার প্রকৃত প্রমাণ। কণাদ সর্ব্বপ্রথমে ঐ তত্ত্ব প্রচার করেন। পরে আরবদেশবাসিগণ কর্ত্তৃক উহা গৃহীত ও প্রতীচ্যে প্রেরিত হয়। (১১)

১৪। **ভাষা তত্ত্ব**।—সংস্কৃত ব্যাকরণের ন্যায় এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত ব্যাকরণ পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। ইহা শুনিয়া হয় ত আপনারা বলিবেন, তাহাতে পাশ্চাত্যের কি? কিন্তু ইংরাজী-নবিশগণ সকলেই ফিললজি (ভাষাতত্ত্ব) কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় জানেন। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ দেখিয়াই যে বপ, গ্রিম প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়দিগের ভাষাতত্ত্বে চোখ খুলিয়াছে ও ফিললজির এত প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে, বোধ হয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

১৫। **কথা-সাহিত্য**।—আমরা ঈসপ্‌স্ ফেবেল্‌স্-এর অনুবাদ 'কথামালা' পড়িয়া মনে করি যে, এইরূপ উপদেশপূর্ণ গল্পের উৎপত্তি বুঝি, ইয়ুরোপেই হইয়াছে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, কথামালার (Aesop's Fables) গল্পগুলির মধ্যে অনেক গল্পই ভারতবর্ষ হইতে ইয়ুরোপে চালান হয়। এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র হইয়া ঈশপের গল্প হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দুই একটি গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—পঞ্চতন্ত্রের 'ব্রাহ্মণ ও ছাতুর সরা' 'ইয়ুরোপে গোপকন্যা ও দুগ্ধের ভাণ্ডে' ও 'অতিসঞ্চয়ী শৃগাল' 'অতিসঞ্চয়ী নেকড়ে বাঘে' পরিণত হইয়াছে মাত্র। আমাদের পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের ন্যায় গল্পচ্ছলে বালকদিগের এরূপ উপদেশগ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই। পাশ্চাত্যদেশে এমন কোন ভাষা আছে কি না সন্দেহ, যাহাতে এই গ্রন্থদ্বয় ভাষান্তরিত না হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে আরবীয়গণ ভারত হইতে গ্রহণ করেন, পরে পারস্যের মধ্য দিয়া, ইহা ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছিলেন—Fables of Pilpay। অতএব দেখা যাইতেছে, এমন কি, গল্প-বিষয়েও প্রতীচ্য, প্রাচ্যের দান গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬। **বাণিজ্য ও মুদ্রা**।—পাশ্চাত্যের সভ্যতা, সমাজ, জীবন, সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য আর্থিক উন্নতি। ইয়ুরোপীয়েরা ব্যবসায় প্রভৃতি করিয়াই এত ধনরত্ন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সে ব্যবসায়ও তাঁহারা প্রাচ্য ফিনিসিয়ান-

(১০) Macdonell—History of Sanskrit Literature.

(১১) Dr. P. C. Roy—Hindu Chemistry.

দিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন। আর যে অর্থ লইয়া আজ পাশ্চাত্যের সভ্যতা, সমাজ, সবই, সেই অর্থের জীবন 'মুদ্রা' তাঁহারা কাহার নিকট পাইয়াছেন, তাহা বোধ করি, সকলে জানেন না। মানবসভ্যতার প্রারম্ভে মুদ্রা বলিয়া বস্তু ছিল না। ব্যবসায়-বাণিজ্য সকলই বিনিময়ে (Barter System) হইত। এরূপ বিনিময়ে ব্যবসায় করা কতদূর অসুবিধাজনক, তাহা অবশ্য কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই অসুবিধা-দূরীকরণার্থ লিডিয়া দেশের বণিক্‌সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথমে সুবর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলিত করেন। লিডিয়াবাসিগণের সহিত গ্রীক্‌দিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মুদ্রার সাহায্যে ব্যবসায় করা বিশেষ সুবিধাজনক দেখিয়া লিডিয়াবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রীক্‌গণ মুদ্রার প্রচলনপ্রথা শিক্ষা করেন ও স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি নানা ধাতুর মুদ্রাঙ্কন করেন। গ্রীস্ হইতে মুদ্রা সমগ্র ইয়ুরোপে প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য, লিডিয়া প্রাচ্য-দেশের অন্তর্ভূত। (১২)

১৭। **কাচ**।—আমরা সকলেই কাচের উপকারিতা ও ব্যবহার দেখিতে পাইতেছি। এখন মনে হয়, কাচ না থাকিলে সংসার চলাই দুষ্কর। কিন্তু কাচের এত আবশ্যকতা থাকিলেও আমাদের দেশে কাচের কি প্রস্তুত হইয়া থাকে? অতি অপকৃষ্ট কাচের দুই চারিটা ফুকা শিশি মাত্র। সর্ব্ববিধ কাচের জিনিষ ইয়ুরোপ হইতেই এদেশে আসে। ইহাতে অবশ্য বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, কাচ পাশ্চাত্য-দেশেরই নিজস্ব। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। একদল পণ্ডিতের মত, কাচ ফিনিসিয়ায় প্রথম নির্ম্মিত হয়। আর একদল বলেন, উহা সিরিয়ায় সর্ব্বপ্রথমে তৈয়ারি হয়। বিলাতের আধুনিক শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক পেট্রি (Petrie) বলেন, উহা মিশরদেশে প্রথমে নির্ম্মিত হয়। অধুনা কাচ প্রতীচ্যের একচেটিয়া পদার্থ হইলেও উহা প্রাচ্য-দেশ হইতেই পাশ্চাত্যে গমন করিয়াছে, ইহাই পৃথিবীর সুধীবর্গের অভিমত। কাচ-নির্ম্মাণ-বিষয়ে পাশ্চাত্যের বিন্দুমাত্রও কৃতিত্ব নাই। ভারতবর্ষে যে মহাভারতের সময়ও কাচ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সাহেবী-মতে প্রায় খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরে হইয়াছিল। (১৩) ভারত-নির্ম্মিত কাচের জিনিষের রোমরাজ্যে বড় আদর ছিল।

১৮। **চীনামাটির দ্রব্য** (Pottery)।—আজকাল চীনামাটির জিনিষ ইয়ুরোপ হইতেই এ দেশে আসে। কিন্তু ঐ চীনামাটির জিনিষ প্রথমে কোথায় তৈয়ারি হইয়াছিল, তাহা উহার নামেই পরিচয় পাওয়া যায়। উহা চীনদেশ ব্যতীত ক্যালডিয়া এবং মিশরেও প্রস্তুত হইয়াছিল এবং চীনামাটির দ্রব্য ঐ দুই দেশবাসীদিগের ব্যবসায়ের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সেই প্রাচীন কালের মিশরীয় ও ক্যালডিয়ার চীনামাটির পাত্রগুলি অদ্যাপি পাশ্চাত্যদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে।

১৯। **ছাতা**।—এখনকার ছাতা নামে স্বদেশী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদেশী, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ছত্র প্রাচ্যভূমির জাতীয় সম্পত্তি। প্রাচ্যদেশবাসিগণের অনেক গার্হস্থ্যকার্য্যে উহা ব্যবহৃত হয়। এমন কি, রাজপদের অন্যতম চিহ্নই ছত্র এবং রাজারও একারণে নাম ছত্রপতি। ভারতবর্ষে, মিশরে ও চীনে, পাশ্চাত্য-দেশসকলের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই ছত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পরে প্রাচ্য দেশ হইতে উহা রোমে যায়। এ সকল অবশ্য পুরাকালের কথা। আধুনিক ছত্রসকল অর্ণবযান পূর্ণ হইয়া, পাশ্চাত্য-দেশ হইতে প্রাচ্যদেশে আসিলেও ছত্র আদিতে প্রতীচ্যে নির্ম্মিত হয় নাই। এখন ইয়ুরোপীয়গণ প্রত্যেকেই প্রাচ্যবাসীদিগের ন্যায় ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা ছাতা কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে একজন ইংরাজ, চীনদেশ হইতে একটি ছাতা বিলাতে লইয়া যান। তিনি যে দিন ঐ ছাতা মাথায় দিয়া লণ্ডন সহরের রাজপথে প্রথম বাহির হইলেন, সে দিন বোধ হয়, সহরশুদ্ধ লোক ঐ অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল এবং অবশেষে কতকগুলি লোক ঐ ছাতার দৃশ্য-দর্শন অসহ্য বোধ করিয়া, ডেলা ছুড়িয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ছাতার উপকারিতা দেখিয়াই ঐ ঘটনার পর হইতেই ইয়ুরোপে আধুনিক ছাতার আবির্ভাব হইয়াছে।

(১২) Maspero—Passing of the Empires.

(১৩) Cunningham—Indian Eras.

২০। মণিমুক্তা ইত্যাদি।—আজকাল ইয়ুরোপীয়গণ যে সকল বস্তু লইয়া ব্যবসায় করিতেছেন, তাহার মধ্যেও অনেক জিনিষ তাঁহারা প্রাচ্য-দেশ হইতে প্রথমে গ্রহণ করেন। যথা—মণিমুক্তা, রেশম, সূক্ষ্ম বস্ত্র (মসলিন), পাকা রং প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্যগুলি তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বা আরবদেশ হইতে লইয়াছেন। শীতবস্ত্রের সাহেবী Kashmere (কাশ্মীরী) নাম হইতেই উহা যে ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক প্রতীচ্যকে দান, তাহা বোধ হয়, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

২১। চা।—আমাদের দেশের আচার অনুসারে বাটিতে কোন ভদ্রলোক আসিলে, তাঁহাকে পান ও তামাক দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। ইয়ুরোপে সাহেবেরা আগন্তুকদিগকে চা ও চুরুট দিয়া শিষ্টাচার রক্ষা করেন। ইদানীং পাশ্চাত্যদেশে চায়ের বিশেষ প্রচলন, এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে চায়ের অভাবে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবারও সম্ভাবনা আছে। চা অধুনা পাশ্চাত্যদিগের এত আবশ্যক দ্রব্য হইলেও উহা মোটেই ইয়ুরোপীয় বস্তু নহে। উহা চীন দেশ হইতে পাশ্চাত্যে গিয়াছে। কথিত আছে, যখন চা প্রথমে বিলাতে ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়, তখন অধিকাংশ লোকেই উহার ব্যবহারে অনভিজ্ঞতাবশতঃ উহা জলে সিদ্ধ করিয়া, জল ফেলিয়া দিয়া, পাতাগুলিতে চিনি মিশ্রিত করিয়া, ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, চা জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়! এখনও চা ইয়ুরোপে প্রাচ্য-দেশ হইতেই রপ্তানি হইতেছে।

২২। দাবাখেলা।—আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রামের সহিত যুদ্ধের প্রাক্কালে রাণী মন্দোদরী রাবণকে একরূপ খেলায় আহ্বান করেন ও বলেন যে, এই খেলার ফল দেখিয়াই তিনি বলিয়া দিবেন, রামের সহিত যুদ্ধে রাবণ জয়ী হইবেন কি না। ক্রীড়াটিও সেই কারণে একটি যুদ্ধের সর্ব্বাঙ্গের অনুকরণ। অবশ্য রাবণ যে, মন্দোদরীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা সমজদার মাত্রেই প্রণিধান করিবেন। সেই ত্রেতা যুগ হইতে ভারতবর্ষের হীনবীর্য্য (?) অধিবাসিবৃন্দ গৃহে বসিয়া, এই চতুরঙ্গ ক্রীড়া দ্বারা বোধ হয়, তাঁহাদের যুদ্ধের সাধ মিটাই তেন। তাহার পর আরবদেশবাসিগণ উহা শিক্ষা করিয়া, পারস্যকে তাহা শিক্ষা দেন। এবং পারস্য হইতে ঐ ক্রীড়া 'চেস্' (Chess, পারস্য সাহ শব্দের অপভ্রংশ) নামে পাশ্চাত্য রণকুশল জাতিদিগের মধ্যে নিজের প্রসার-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে।

২৩। ধর্ম্ম।—অকিঞ্চিৎকর ক্রীড়া-কৌতুকের কথা বলিলাম, এক্ষণে সারাৎসার ধর্ম্মকর্ম্মের কথা বলি। আজকাল পাশ্চাত্যদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর প্রায় সর্ব্বত্রই মাঠে, ঘাটে, ঝোপে, জঙ্গলে সকল স্থানেই পাশ্চাত্য-ধর্ম্ম-প্রচারকগণের নিকট শুনিতে পাই—"তোমরা বিধর্ম্মী—তোমাদের নরক ছাড়া আর কোথাও স্থান হইবে না, এখন যদি স্বর্গ চাও, তাহা হইলে শীঘ্র খৃষ্টকে ভজনা কর।" পাশ্চাত্য-জাতিরা যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু বেশ জানি যে, প্রাচ্যদেশই সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ দেশ। পৃথিবীতে সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই প্রাচ্যদেশে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, য়িহুদিধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মেরই জন্মভূমি এসিয়া মহাদেশ। সাহেবেরা যে খৃষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মানেন, সেই খৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্মই বা তাঁহারা কোথায় পাইয়াছেন? প্রাচ্যের নিকট নহে কি? যীশুখৃষ্ট যদি তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচ্যই তাঁহাদিগকে সেই পরিত্রাণের পথ দেখাইয়াছেন, কারণ যীশুখৃষ্টের জনন-মরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচার-প্রয়াস সকলই প্রাচ্যদেশে। অতএব মানব-জীবনের সাররত্ন ধর্ম্মের জন্য পাশ্চাত্য, প্রাচ্যের নিকটই ঋণী।

২৪। পূজা-পদ্ধতি।—পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখে দেবতার মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করার নাম পৌত্তলিকতা ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মই পৌত্তলিকতাদোষে দুষ্ট। মিশর হইতে সভ্যতার অঙ্কুর-গ্রহণ-কালে গ্রীস্ ও রোম, মিশরদেশীয় পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করেন; এমন কি, মিশরদেশীয় দেবতা পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেবতাগণের মধ্যে স্থান পান। কালক্রমে যখন ইয়ুরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন সকল দেবতাই সয়তান বলিয়া দূরীকৃত হইলেন। দেবতা গেলেন বটে, কিন্তু পূজাপদ্ধতি রহিয়া গেল। অদ্যাপি সভ্য পাশ্চাত্য দেশসমূহ প্রাচ্য-দেশের পূজাপদ্ধতি বেমালুম হজম করিয়া আসিতেছেন। ইহা অবশ্য বিচিত্র নহে, কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্মই যে প্রাচ্যদেশ-জাত।
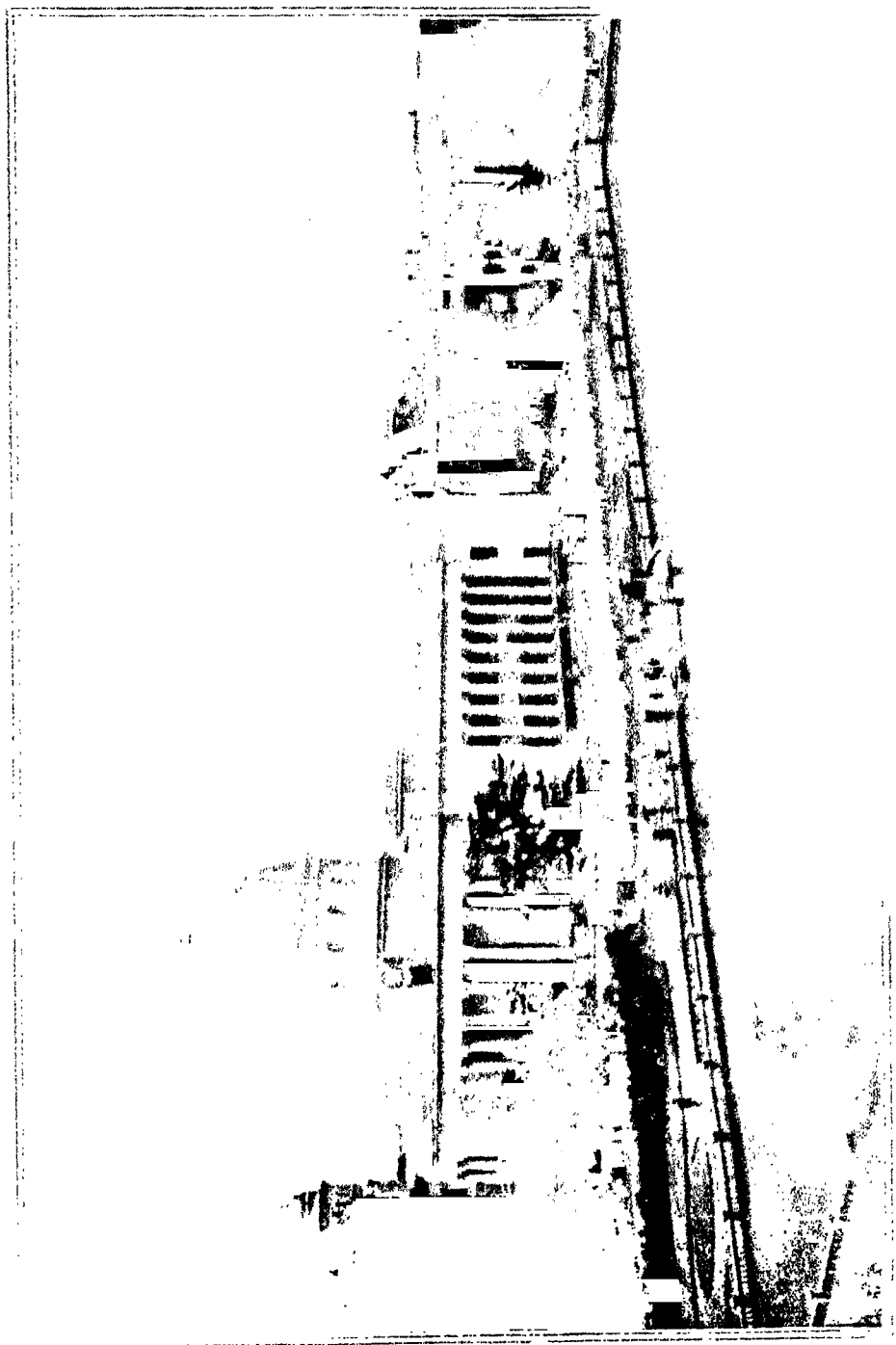
মঠ। অশোক রাজা হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকল্পে প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মঠ-প্রথা ভারতবর্ষেই ছিল, তৎপূর্ব্বে আর কোন জাতির মধ্যেই উহা ছিল না। মিশরে ভিক্ষুসম্প্রদায় গমনের পর হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে মঠ-প্রথার স্থাপনা হয়। মিশর হইতেই এই Monastic System গ্রীসের মধ্য দিয়া, সমগ্র ইয়ুরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাও ইয়ুরোপের নিজস্ব নহে। (১৪)

এক্ষণে দেখা গেল যে, উপরি-বর্ণিত বস্তুগুলি স্থূলতঃ প্রাচ্য, প্রতীচ্যকে দান করিয়াছে। এই দান প্রায় সর্ব্বদিগ্-ব্যাপী। ইহা ছাড়া প্রাচ্য, পাশ্চাত্যকে সভ্যতা-বিকাশে আরও কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য দান করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ প্রাচ্য কালচক্রের গতিতে দীনহীন কাঙ্গালীর বেশে "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া, প্রতীচ্যের দ্বারে আঘাত করিয়া, প্রতীচ্যের আরামের ব্যাঘাত করিতেছে। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। প্রাচ্য যখন জ্ঞানধনে ধনী হইয়া, অকাতরে প্রতীচ্যকে এই অমূল্য সম্পদ্ বিলাইয়াছেন, তখন প্রতীচ্য অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন। আজই প্রতীচ্য, প্রাচ্যকে আলোকে আনিবার জন্য ব্যস্ত! আর প্রাচ্যও পৈতৃক সম্পত্তি উপনিষদ্ ও গীতা ছাড়িয়া, কোম্‌ত্-স্পেন্‌সারের চেলা সাজিতে ব্যগ্র!

(১৪) Professor Bipinbihari Sen—Lectures on Egypt.

অন্বেষণ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B.A.]

নাইক আলাপ তোমার সনে
(তবু) দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
তুমি যে শ্যাম শশধর হে
আমার মানস-গগনচারা।
বুভুক্ষ ওই, অন্ন পেয়ে,
আছে দাতার পানেই চেয়ে,
ওই দেখ—ওই তুমিই এলে
ঝরায়ে তার নয়ন-বারি,
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
বিদ্রোহী ওই, রাজার কাছে,
কাতরে প্রাণ ভিক্ষা যাচে,
তুমিই ক্ষমার আজ্ঞা দিলে,
বারেক এসে বক্ষে তাঁরি।
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
ওই যে সাধু নদীর তীরে
বসে আছেন 'আদুল' গায়ে,
তুচ্ছ করি হিমের পীড়ন,
অতি দারুণ পোষের বায়ে।
তাঁহার বিমল পুলক মাঝে
জাগছ তুমি সকাল-সাঁজে,
উজল আঁখির দীপ্তিতে তাঁর
পড়ছ ধরা দুঃখ-হারী,
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
জননীর বেশ নিজেই ধরি,
থাক' তনয় বক্ষে করি,
দাতার বেশে দিচ্ছ' তুমি—
অন্য বেশে নিচ্ছ' কাড়ি'।
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
ওই দেখ ওই রাজার সাজে
করছ দমন দুষ্ট জনে,
ওই দেখ ওই জ্ঞানীর বেশে
মগ্ন কিসের অন্বেষণে।
কতই ভাবে কতই বেশে,
দিচ্ছ দেখা নিত্য এসে
চঞ্চল! এ অঞ্চলে যে
বারেক তোমায় ধরতে নারি,
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
ছড়ানো রূপ-পীযূষ-কণা,
পিয়ে' যে মোর বুক ভরে না,
বৃন্দাবন-চন্দ্র-রূপে
দাও হে দেখা বংশীধারী।
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।

আমার চিকিৎসা

[শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী]

শ্রাবণ মাস। বাহিরে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রি; কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা বলিয়া,—"তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।" আমার আড়াই বছরের মেয়ে—খুকী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খুকীর পিতা শ্রীযুক্ত ডাক্তারবাবু, বাদল রাত্রিতেও ভিজিটের মায়া সংবরণ করিতে না পারিয়া, ভিজিতে ভিজিতে রোগীর নাড়ী টিপিতে গিয়াছিলেন; আসিবারও বিলম্ব আছে। আমি রান্নাঘরে গিয়া দেখিলাম—আমার রূপসী বামুনদিদিটি, রান্না শেষ করিয়া, আলোর কাছে বসিয়া বই পড়িতেছে। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিয়া বলিলাম, "একা টেঁকা যায় না,—উপরে চল।"

তাহার হাতে বুঝি লাগিয়াছিল; সে বলিল, "উঃ, বৌদি! ছেড়ে দাও, দাদাবাবু ঘরে নেই?" আমি চলিতে চলিতে বলিলাম, "তুমি যেমন ন্যাকা;—তা থাক্‌লে কি আর তোমায় টানি?"

বেরিলিতে আমার স্বামী প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর একা থাকিয়া, এবার আমাকে আনিয়াছেন। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী রেঙ্গুনে, দেবরের বাসায় থাকিতেন। কাজেই আমি, খুকী ও 'ঝি-বামুনদি' লইয়া 'একা'ই থাকিতাম। বামুনদিদি, ঘরে আসিয়া, মেঝেতে বসিয়া পড়িল। পাশের খোলা জানালা দিয়া আর্দ্র বায়ু হুহু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। বারান্দায় টবে সখ করিয়া কেয়া-ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিলাম;—বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তীব্র-গন্ধ আসিয়া, মনটাকে যেন কেমন উদাস করিয়া দিতেছিল! আমি

"দিদি! আজ তোমার গল্প বল।"

বামুনদিদির কোলের উপর মাথা রাখিয়া বলিলাম, "দিদি! আজ তোমার গল্প বল।"

সে বলিল, "ও আর শুনে কি হ'বে, বৌদি?—তোমাদের গল্প শোনাও।" আমি জানিতাম, তাহার জীবন বিচিত্র ঘটনাময়; বলিলাম, "এমন বাদরের রাত্তিরটা মিছে কথা-কাটাকাটি ক'রে কাটাবার জন্যে হয় নি,—জান তো বামুন-দিদি,—আরম্ভ ক'রে ফেল।"

একটু থামিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, বামুনদিদি বলিতে লাগিল—"আমার বাপের বাড়ী ছিল—কোননগরে। আট বছর বয়সে পা দিতেই মা মারা যান। বাবা আমাকে তাঁহার বুকের সমস্ত স্নেহটুকু দিয়া কোন দিন

মার অভাব বুঝিতে দেন নি। আমাদের তেমন নিকট আপনার জন, কেহ ছিলেন না, যাঁ'র কাছে বাবা তাঁর মা-মরা মেয়েটিকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল। মা মরার পর তিনি স্বপাকে নিরামিষ খাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে লেখা-পড়া শিখাইতে উদ্যোগী হইলেন—কিছু বাঙ্গলা, ও একটু ইংরেজি পড়াইতে লাগিলেন। আমি পক্ষি-শাবকের মত, পিতার উদার স্নেহনীড়ের মধ্যে বাড়িতে লাগিলাম।

"সকালে বিকালে তিনি আমাকে লইয়া পড়াইতেন, ও পড়িতে বলিতেন। ভোরে উঠিয়া, ফুলের সাজিটি হাতে লইয়া, স্তব পড়িতে পড়িতে ফুল তুলিতেন। আজও যেন সেই দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, দেবোপম মূর্ত্তি চোখে ভাসে—সেই সুললিত স্বরে গীতা-পাঠের ধ্বনি কর্ণে ঝঙ্কার দেয়! তা'হা ভুলিবার নয়, জীবনে ভুলিব না। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রতিবেশী জমিদার রামতনু বাবুই সর্ব্বদা পিতার কাছে আসিয়া বসিতেন। শাস্ত্রালোচনা করিতেন, আমাকে আদর করিতেন। একদিন আহারান্তে পিতার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্যাকরণ-আবৃত্তি করিতেছি, এমন সময় রামতনু বাবু আসিয়া বলিলেন, "মুখুয্যে, কমলাকে আমায় দিতে হ'বে, কিন্তু; ও না হ'লে আমার অজিতের সঙ্গে আর কারু তেমন সাজন্ত হ'বে না!"—বাবা হাসিয়া বলিলেন, "আজ ত বল্‌চ ঠাট্টা ক'রে; কাজের বেলায় কি আর ওকথা মনে থাক্‌বে।"—কথাটা উঠিবামাত্রই, আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম।"

(২)

"দুর্দ্দিন একা আসে না। আমাকে বারো বছরের করিয়া রাখিয়া, আমার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রামতনু বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! আমার সর্ব্বস্ব তোমার কাছে রেখে, কোথায় যাচ্ছি, তা জানি না। সেই কথাটা মনে রে'খো।" রামতনু বাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র অজিত বাবুকে ডাকাইলেন। আমি তখন পিতার বক্ষ-সমীপে আসন্ন-পিতৃবিচ্ছেদ-কাতরা, রোদনবিবশা। সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে পিতা আমার কম্পিত হস্ত, তাঁহার হস্তে তুলিয়া, আর একখানি অপরিচিত হস্তের উপর রাখিয়া বলিলেন, 'বাপ! আমার আঁধার ঘরের মাণিকটি তোমায় দিলুম; দে'খো, যেন বাছা আমার অনাদরে চোখের জলে ভেসে না যায়।' তাঁহার পাণ্ডু মুখমণ্ডল অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল। উঃ! তখন যদি মরিতাম!"

ভাবের আবেগে মুহূর্ত্তকাল কমলা চুপ করিয়া রহিল। তাহার নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে, চোখ মুছিয়া, আবার সে আরম্ভ করিল—

"রামতনু বাবু আমাকে বড় আদরে, তাঁহার বিশাল অট্টালিকায় লইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীকে পাইয়া আমি যেন আমার মাকেই ফিরিয়া পাইলাম। পিতার শ্রাদ্ধাদি সেইখানেই হইয়া গেল। রামতনু বাবুর একটি পুত্র ও একটি কন্যা। মেয়েটি, বিবাহের পর হইতেই বড় একটা এখানে আসে না। শুনিলাম, ২।৪ বৎসর অন্তর আসিয়া, ৫।৭ দিন থাকিয়া, শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যায়। চাকর, ঝি ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া প্রভৃতিতে অন্দর পরিপূর্ণ। বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতেই, পূজার্চ্চনা লইয়া থাকিতেন; সংসারের খবর রাখিতেন না। তিনি অপুত্রক ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমি সে সংসারের সকলের মধ্যে একটা আদরের স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলাম। অনাথা বলিয়াই হউক, আর অদূর ভবিষ্যতের 'বধূ' বলিয়াই হউক, সকলেই আমাকে ভালবাসিতেন। আমিও সলজ্জ সরলতার সহিত সকলের মনোরঞ্জন করিতে যত্ন করিতাম। অজিত বাবু, কলিকাতার বাসায় থাকিয়া, বি. এ. পড়িতেন; চৈত্র মাসে পরীক্ষান্তে বাড়ীতে আসিলেন।

"তখন আমি বারো বছরের; বিবাহ কি, বুঝিতাম কি না জানি না, কিন্তু অজিত বাবুকে দেখিলেই লজ্জিতা হইতাম। তাঁহাকে আগে অনেকবার দেখিয়াছি; কিন্তু এবার যেন তাঁহার মধ্যে কি একটা নূতনত্ব দেখিতে পাইলাম। বেশী আর কি বলিব বৌদি, তাঁহার কোন্ গুণে বলিতে পারি না, আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলাম। মনে মনে দেবতাকে তাঁহার কুশলার্থে ডাকিতাম; দেবতা বলিতে, বাবাকেই মনে পড়িত। আমি, প্রতি রাত্রে শুইবার সময় তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতাম—"আমি যেন তোমার দানের মর্য্যাদা রাখিতে পারি—পিতা! আমি যেন তাঁহার যোগ্য হই!"

(৬)

"মানুষ মরিয়া কি হয়, জানি না ; দেবতা আছেন কি না, বলিতে পারি না ; কিন্তু আমার অদৃষ্টে, আশাতরুতে বিষফল ফলিল। বৎসর না ঘুরিতেই, রামতনু বাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন। পিতা তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, '১৪ বৎসর বয়স না হইলে, কমলার বিবাহ দিও না।' তদনুসারে আমার বিবাহের আরও এক বৎসর বিলম্ব হইবে, জানিতাম। গৃহিণী কাশীবাসিনী হইবার জন্য আগ্রহ করিতেন ; কিন্তু আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে তো আর যাওয়া হয় না !

"একদিন—এমনই বর্ষার রাত্রি, বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি, একটা যেন কি কাজের জন্য, গৃহিণীর ঘরে যাইতেছিলাম। দেখিলাম, ঘরের কপাট বন্ধ ; মুহূর্ত্তকাল সেখানে দাঁড়াইলাম। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে পাইলাম, অজিত বাবু কথা কহিতেছেন। আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতার কথা শুনিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু কি শুনিলাম !—তিনি বলিতেছিলেন, 'কি করিব মা ! আমি যদি কথা না দিতাম, তাহা হইলেও হইত। মানুষের মন, সব সময় মানুষের বশে থাকে না। আমি জানি, সে মেয়েটি কমলার মত গুণবতী নয়, হয়ত কমলা তার চেয়েও সুন্দরী ; তবু, মা, আমি কমলাকে কিছুতেই বিয়ে করিতে পারি না। এ'তে যদি আমায় ত্যজ্যপুত্র কর, কি আর করিব ! আমাকে অতঃপর না হয় খাটিয়া খাইতে হইবে। তোমাদের এ আদেশ-পালনের জন্য, আমি ভবিষ্যতের সুখের আশা ত্যাগ করিতে পারি না !'

"আমি আর শুনিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলিয়া আসিয়া, কেন জানি না, দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিতে বসিলাম।

"পরদিন সকালে উপরে বসিয়া পান সাজিতেছিলাম ; ঘরে আর মানুষ ছিল না। জুতার শব্দ শুনিয়া দেখিলাম, অজিত বাবু সেইদিকে আসিতেছেন। আমি ধীরে ধীরে বাহিরে যাইতেছিলাম ; কিন্তু, দরজার কাছে আসিয়া, তিনি বলিলেন, 'কমলা ! একটু দাঁড়াও।' আমি তাঁহার দিকে ফিরিতেই চোখে চোখ পড়িল ; লজ্জায় লাল হইয়া, মাথা নীচু করিয়া বলিলাম, 'কি বল্‌চেন ?' সেই আহ্বানে আমার বুকের ভিতর দ্রুত-স্পন্দন অনুভব হইতে লাগিল ; মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

"আমি তাড়াতাড়ি একটা জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, গত-রাত্রেই তাহার আভাস পাইয়াছি ; কিন্তু দুই দিনও সবুর সহিল না! অজিতবাবু কিয়ৎক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলেন, 'কমলা ! তোমার বাবা আমার বাবার বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ; তাঁরা দুজনেই ব'লে গিয়েছেন, সেই বন্ধুত্বের স্মৃতি-চিহ্ন চির-রক্ষার জন্য তোমার আমার মধ্যে যেন বিবাহ-বন্ধন স্থাপিত হয়। কিন্তু আমি ভাব্‌চি, তুমি কি আমায় পেলে সুখী হ'বে, কমলা ?'

"এ কি যন্ত্রণা ! মরার উপর এ খাঁড়ার ঘা কেন ? হস্তপদ-আবদ্ধ পিপাসিতের কাছে জল রাখিয়া, তাহাকে খাইতে অনুরোধ করা,—এ কি নিষ্ঠুরতা ! এ কি পরিহাস ! আমি ঘামিতেছিলাম। বহুকষ্টে ধরা গলায় বলিলাম, 'আমার জন্য ব্যস্ত হ'বেন না। আমি অভাগিনী। আপনি যা'তে সুখী হ'বেন, তাই করুন ;—তাতেই আমার সুখ হবে।'

"তিনি কি বুঝিলেন, জানি না ; কিন্তু বলিলেন, 'কমলা, আমি বড় বিপন্ন ! অনেক দিন আগে একটি অনাথা বিধবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাঁর মেয়েকে বিয়ে করব। বি. এ. পাশ হ'লেই সেই প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে হ'বে। তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর, আমার নির্ব্বাচিত সুপাত্রের সঙ্গে পরিণীতা হ'তে স্বীকৃতা হও, তবেই আমি সে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারি।—আমি তোমার অযোগ্য।'

"আমি বলিলাম, 'আমি সন্তুষ্ট মনে বল্‌চি, আপনি সে মেয়েটিকেই বিয়ে করে ঘরে আনুন। আমার কথা ভাব্‌বেন না। হিন্দুর মেয়ের দু'বার বিয়ে হয় না। আমি জন্ম-অভাগী, আমার কথা ছেড়ে দিন্।'

"আমি আর দাঁড়াইলাম না। যে কক্ষ আমার বিশ্রামের জন্য স্থির হইয়াছিল,—যেখানে বসিয়া আমার মত নিঃসহায়া অভাগিনীও সুখের স্বপ্ন দেখিত,—আকাশকুসুম দেখিত,—যে ঘরে বসিয়া আমি আমার বাঞ্ছিত পতিকে লইয়া বাসর জাগিব ভাবিতাম, আজ সেই ঘরে প্রবেশ করিতেই, আমার বুকের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল, "অনধিকার-প্রবেশ" !

(৪)

"কয়েকমাস পরে, কর্ত্তার বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। পরে, ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে, অজিতবাবু তাঁহার মনোনীতা পাত্রী ইন্দিরাকে বিবাহ করিয়া, গৃহে আনিলেন। আমি পৃথক্ বাটিতে যাইয়া থাকিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু গৃহিণীর অশ্রুসিক্ত সকাতর প্রার্থনায় শেষে সেখানেই রহিয়া গেলাম।

"বধূ ইন্দিরা, আমাকে তাহার ননদ বলিয়াই জানিত। ইন্দিরা সুন্দরী। শেষে জানিলাম, সে সুকণ্ঠী গায়িকা। তাহার প্রকৃতিও বড়ই মধুর ছিল। আমার দুর্ভাগ্যের কোন ইতিহাসই সে জানিত না। সে আমাকে সমবয়সীর মত দেখিত; তাহার সস্নেহ ব্যবহারে, দিনকতকের মধ্যেই, আমি তাহার পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলাম।

"দ্বিপ্রহরে, আহারান্তে, আমি আমার ঘরে বই লইয়া পড়িতাম। সে কোন দিন অজিত বাবুর সঙ্গে তাস খেলিত; কোন কোন দিন আমার ঘরে আসিয়া, আমার হাত হইতে 'কালিদাস' ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, তাস খেলিতে বসিয়া যাইত। তাহার অমায়িক সরল কথাবার্ত্তায়, তাহাকে আমার ছোট বোন্‌টির মতই মনে হইত।

"একদিন তাস খেলিতে-খেলিতে সে আমায় বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরঝি,তুমি ত কোন দিন ওঁর কথা আমায় জিজ্ঞেস কর না! সেখানে বিয়ের পর দুদিন ছিলুম, তাতেই আমার সমবয়সীরা পাগল ক'রে তুলেছিল।' আমি, সে কথা চাপা দিয়া, অন্য কথা তুলিলাম; মনে মনে বলিলাম, 'আমার গলার হীরার হার তোমার গলায় দিয়াছি; দূরে থাকিয়া চাহিয়া দেখিব, ভাগ্যবতী তুমি, তোমার গলায় তাহা কেমন মানাইয়াছে। কাছে গিয়া দেখিলে, যদি আমার প্রাণে ভাবান্তর আসে; তাই সাহস হয় না। তোমরা সুখে থাক—তুমি সে হীরক-হার পরিয়া, তার জ্যোতিঃতে আরও উজ্জ্বল হও।'

"তুমি হাসিও না বৌদিদি,—আমি প্রাণভরিয়া ইন্দিরাকে সাজাইতাম—আল্‌তা পরাইয়া, টিপ কাটিয়া, নিত্য নূতন ভাবে চুল বাঁধিয়া দিতাম; শুইতে যাইবার সময় ভাল করিয়া পান সাজিয়া হাতে দিতাম। তাহাকে এক এক দিন বলিতাম, "দাঁড়া দেখি ভাই; তোকে কেমন দেখাচ্ছে, দেখি।' সে আমার কথার ভঙ্গীতে অবাক্ হইয়া বলিত, 'এক এক সময় তোমার কি হয়, বলত, দিদি!'

"আমি হাসিতাম—কোন উত্তর দিতাম না; কিন্তু ভাবিতাম, 'এই ভাল! এই ভাল! ইহাদের দুজনের সেবা করিয়াই, যেন জীবনের গণা দিন ক'টা কাটাইতে পারি!' দেবতার নিকটে কেবল বর চাহিতাম—সেবার অধিকারটুকু যেন কাড়িয়া না লন।

"আমি সাহিত্য-চর্চ্চায় মন দিলাম। দিবারাত্রি 'শকুন্তলা', 'রঘুবংশ', 'নৈষধ' লইয়াই মত্ত থাকিতাম। গৃহিণী অনুরোধ করিলেন—কত মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন—তাঁহার ছেলের চেয়েও ভাল 'বরের' লোভ দেখাইলেন—কিন্তু আমি অচল, অটল; বিবাহ করিলাম না। ছিঃ! হিন্দুর মেয়ের ক'বার বিয়ে হয় গা!

"আইন-অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য অজিতবাবু কলিকাতা গেলেন। রোজ ইন্দিরাকে পত্র লিখিতেন। ইন্দিরা সাধিয়া আসিয়া আমাকে দেখাইত। আমি মানুষ, মানুষের প্রাণ যে বড় দুর্ব্বল—তাহাও জানিতাম; তাই আমি পত্র দেখিতে একটুও আগ্রহ দেখাইতাম না। কিন্তু সে কি উত্তর লিখিবে, আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত। অজিতের হাতের লেখা দেখিয়া, তাহার আবেগময় প্রাণের ভাষা পড়িয়া, আমি যেন ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ হইয়া, আমারই প্রাণের কথা তাহাকে দিয়া লিখাইয়া দিতাম। সে সব পত্রের উত্তর আসিলে, উন্মত্ত প্রাণের আবেগে পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ সাময়িক শান্তি পাইতাম। একদিন, ইন্দিরাকে একখানি দীর্ঘ পত্র দেখাইয়া, বলিলাম, 'নিত্যি মিনি-মাইনের কাজ ক'রে দিই; আজ এই চিঠিখানি আমাকে মাইনে-স্বরূপ দিতে হবে, ভাই। এখানা তোর স্মৃতি-চিহ্নের মত, আমার কাছে রইল। কি বলিস্‌. বৌদি?' সে হাসিয়া দিয়া গেল। সে চিটিখানাতে কি লেখা ছিল, তাহার ভাষা আমার এখনও মনে আছে। কেন সে পত্র—পরের পত্রখানা রাখিলাম, জানি না; কিন্তু তদবধি আমার একটি কাজ বাড়িয়া গেল—প্রতিদিন একবার করিয়া পত্রখানি পড়িয়া, বারবার সেই পরিচিত সাক্ষর—প্রিয়-নাম চুম্বন করিয়া, তবে ঘুমাইতাম—ইহাতে যেন প্রাণে একটা তৃপ্তি পাইতাম। তুমি আমাকে পাগল ভাবিতেছ? তা যাই ভাব—আমার সব গিয়েছে।—কিন্তু সেই চিঠিখানি

আমার কাছে আছে।' আমি উঠিয়া বসিলাম—বামুন-দিদির মুখের দিকে চাহিলাম—কমলা সহসা উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। জানালার নীচেই একটা হাস্নুহেনার গাছ ;—সৌরভে গৃহ আমোদিত হইতেছে। তখন বৃষ্টি ছাড়িয়াছে ; ভাঙ্গা-মেঘের আড়াল হইতে চাঁদের আলো আসিয়া কমলার মুখে পড়িয়াছে। দেখি,—কমলার চোখে জল !—বৃষ্টির জল-কণাগুলাও সেই ছোট ছোট শাদা ফুলগুলির বুকের উপর মুক্তার মত দেখাইতেছিল। কমলা গোপনে চোখ মুছিয়া, একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, আবার আসিয়া বসিল।

(৫)

কমলা বলিতে লাগিল—

"তারপরে যাহা হইল, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া যাইব বৌদি! এতক্ষণ আমার জীবনের সুখের কথা বলিয়াছি ; শেষে যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহার তুলনায়, আমি এখন অনেক সুখে আছি।

"অজিতবাবু, ওকালতী পাশ করিয়া,লক্ষ্ণৌ 'বারে' যোগ দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ইন্দিরাকে লইয়া যান। কিন্তু, সেসময়ে—অল্প-বয়সেই, ইন্দিরার সন্তান-সম্ভাবনা হওয়ায়, তাহা ঘটিল না। তিনি, 'ঠাকুর' ও চাকর লইয়া, সেখানে গেলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম, সেখানে গিয়া অবধি তিনি বড় একটা পত্রাদি লেখেন না! ইন্দিরাকে সপ্তাহে একখানি পত্র লিখিতেন, তাহাও অতি সংক্ষেপে। —'সময় নাই, ভাল-আছি'-গোছের পত্র! তিনি নূতন উকীল। দেওয়ানজী মাসে মাসে তাঁহাকে ৭০৲।৮০৲ টাকা পাঠাইয়া দিতেন—তাহাতেও নাকি তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া উঠিত না।

'তাঁহার আশাপথ চাহিয়া বড়-দিনের বন্ধের অপেক্ষায় ছিলাম—তখন তিনি বাড়ী আসিবেন!—পৌষ মাসেই ইন্দিরার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। মেয়ে দেখিয়া, আট দিন বাড়ী থাকিয়া, অজিত বাবু লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন! আমি খুকীকে বুকে টানিয়া লইয়া, অপার আনন্দ পাইলাম। তাহার মুখে 'তাঁহার' সাদৃশ্য ছিল, গায়ের রং মায়ের মতই 'দুধে-আলতা' ধরণের হইয়াছিল! আমি তার নাম রাখিলাম—'পারুল'।

"মাস-চারেক পরে, অজিত বাবুর একপত্র আসিল—তিনি বিপন্ন, পত্রপাঠ 'টেলিগ্রাফিক্ মণিঅর্ডারে' তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিতে হইবে!—ক্রমে ক্রমে জানিলাম, তিনি মানুষের অমূল্য-রত্ন চরিত্র-সংযম হারাইয়া, পাপের স্রোতে গা ঢালিয়াছেন ;—নৃত্যগীত উপভোগের জন্য ১০০৲ টাকা মাসোহারায় এক বাইজী রাখিয়াছেন!—একথা শুনিবার পূর্ব্বে যদি আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আর আমাকে এই নিদারুণ সংবাদের তীব্র নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।

কমলা আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। আহা সেত নিঃশ্বাস নয়,—তাহার বুকের ভিতর দিন-রাত যে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে, যেন তাহারই একটা জ্বলন্ত শিখা!—যেন নিত্য-দংশন-কারী স্মৃতি-সর্পের একটা লোল জিহ্বা!

"তার পরে, বৌদি, ক্রমে নগদ সব গেল—সম্পত্তিতে হাত পড়িল। যার বিষয়, সে যদি উড়ায়, তবে যাইতে কতক্ষণ লাগে? যে দিন প্রথম একটি জমী বন্ধক দিয়া দেওয়ানজী, বাবুকে ৫০০০৲ টাকা পাঠাইলেন, সেই দিন বিকালে গৃহিণী 'বুক যায়, বুক যায়' বলিয়া খুকীকে কোল হইতে ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বারকয়েক রক্ত-বমি করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রাণ ফুলের মত কোমল ছিল, দুঃখের রৌদ্র লাগিতে না লাগিতে ঝরিয়া পড়িল। মরিবার আগে আমার কাণে কাণে বলিলেন, 'ডাক এসেছে!—দেখিস্, মা, ইন্দুকে ছাড়িস্ না।'

"শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিবস অজিত বাবু বাড়ীতে আসিলেন। সে কান্তি নাই, লাবণ্য নাই, ভাসা ভাসা চোখে কালি পড়িয়া বসিয়া গিয়াছে! বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে! হায়, কি করিলে ভাল হইবেন! আমি সম্মুখে গেলাম না।

"শ্রাদ্ধান্তে আরও ৩০০০৲ টাকার সংস্থান করিয়া আমাকে ও ইন্দিরাকে লইয়া লক্ষ্ণৌ চলিলেন। ইন্দিরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের কাছে বিদায় লইল। আর আমি! আমার চোখের জল জমিয়া গিয়াছিল, কাঁদিব কি করিয়া?

"দুঃখ কি আর একা আসে? পথের ঠাণ্ডায় খুকীর জ্বর হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ আসিয়াই দেখিলাম, তাহার গায়ে হাম বাহির হইয়াছে। খুকীর মারও শরীর খারাপ হইয়াছিল। দিনরাত্রি প্রাণপণ করিয়া খুকীর সেবা করিলাম, ডাক্তার কবিরাজ, ঔষধ-পথ্য কিছুরই ত্রুটী হইল

না, কিন্তু হায় পারুল অভাগিনী আমার কোলে শুইয়া—চার দিন অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া—স্বর্গে চলিয়া গেল; তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। বুকের এক-খানা হাড় ভাঙ্গিয়া ছিল—আর একখানা ভাঙ্গিয়া গেল।

"ক্রমে ইন্দিরার অবস্থাও শোচনীয় হইল। বাবু দিনে তাঁহার মক্কেল, এবং রাত্রে সুরা-দেবী ও মতিয়া বিবিকে লইয়াই বিব্রত থাকিতেন। ইন্দিরার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে, বরং আমাকে ডাকিয়া দুএকটি কথা বলিতেন; কিন্তু খুকীর মৃত্যুর পর ইন্দিরাকে আর ডাকেন নাই।

"আমার বয়স তখন ১৮ বৎসর মাত্র। একে বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তারপরে সংসারের কাজকর্ম্ম দেখা-শুনা, ও রোগিণীর পরিচর্য্যায় এক মুহূর্ত্তও অবকাশ পাইতাম না। ইন্দিরা ঔষধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল। আমি এক দিন অজিত বাবুকে বলিলাম, 'আপনি ঘরে না থাকিলে, বৌদি ওষুধ খেতে চায় না, ওকে বাঁচান; এখন আপনার হাত!'

"তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'না খায় মরবে; মেয়ের মরা সইল, আর ও'র মরা সইবে না?—তার পর তুমি আছ, আর আমি আছি!'

"আমি তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলাম। তার পরে, আর বেশী কি বলিব! ভাগ্যবতী ইন্দিরা দুই মাস রোগযন্ত্রণা ভুগিয়া, এই ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রে জ্বালা এড়াইয়া পালাইল। বলিয়া গেল, 'ঠাকুরঝি! জীবনে সুখও অনেক পেয়েছি, জ্বালাও অনেক সইলুম্। আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন মেয়ে মানুষ হ'য়ে বাঙ্গলা মুল্লুকে, না আসতে হয়। আজ কি আরামের দিন ভাই!—তুমি যে আমার কে, তা' আমি এখানে এসে বুঝেছি। কত জন্মের বোন্ আমার, আমায় আগ্‌লাতে এসেই এত কষ্ট পাচ্ছ! আজ আমার সব ফুরুলো ভাই!' তারপর কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, 'মরণরে তুঁহু মেরি শ্যাম সমান'—আর বলিতে পারিল না;—হঠাৎ দম বন্ধ হইয়া মারা গেল।

"তারপর দিনই আমি গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া, কলিকাতায় চলিয়া যাই। শেষে, কলিকাতা হইতে কেমন করিয়া তোমাদের সঙ্গে আসিয়াছি, তা' তো তুমি জান। এখানে এই এক বছর আছি,—তোমাদের জ্বালাতন করিতেছি; কিন্তু আমি বড় সুখেই আছি।"

আমি অনেকক্ষণ পরে কথা কহিলাম—"তোমার আবার সুখ!"

সে বলিল, "সত্যি ভাই, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার এই সুখটুকুই যেন বজায় থাকে;—আমার এ সুখটুকুর উপর যেন আর বিধাতার রোষদৃষ্টি না পড়ে। আমি কল্পনায় যে সুখ পাই, তার তুলনা নাই। 'কুরুক্ষেত্র-কাব্যে' নাগ-নন্দিনী শৈলজার যোগের কথা পড়িয়াছ বৌদিদি—মনে আছে?—

'কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা,
কভু পার্থ পুত্র আমি, স্নেহে আত্মহারা,
কভু পার্থ সখা আমি, সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ পতি আমি, পত্নী-প্রেমাথিনী!'

"আমিও তেমনি মনে মনে তাঁর সখী হয়ে—স্ত্রী হয়ে, আমার মানুষ-জীবনের সকল অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করি। তা'তে কি সুখ, কি আনন্দ! বৌদিদি! তোমরা তত সুখ পেয়েছ, কি না, আমার সন্দেহ হয়! আমি কত কি ভাবি, কত কি করি, তা বল্‌লে তোমরা আমায় পাগল বল্‌বে। এম্‌নি করে এ বছরটা আমার বড় সুখেই কাটিয়াছে!"

ঘড়িতে ১১টা বাজিল। বাহিরে শিকল নাড়িবার শব্দ ও গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাইলাম। বারান্দায় গিয়া দেখিলাম—ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল—"অজিতবাবু কোন্ দেশের—কোন্ শ্রেণীর জানোয়ার?—বাঙ্গালায়, 'ডাক্তারবাবু'র মত, দেবতাই হওয়া উচিত! অজিতের পশুভাব, কোথা থেকে এল?—অথবা, পুরুষের প্রাণই বুঝি বহুরূপী! কে জানে বাপু!"

(৮)

পরদিন ভাত খাইতে খাইতে ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ওগো! শুনেছ? আমাদের সেই দাশু—ভূতনাথ বাবুর ভাগ্নে—তা'র সঙ্গে একত্র পড়েছি, সে এখানে এসেছে। বড্ড বদমায়েস হ'য়ে প'ড়েছিল। এখন লিবারে ভুগ্‌চে—তাই মামার কাছে এসেছে; মামার শাসনে দুমাস ভাল আছে। বৌটা, মেয়েটা ম'রে গেছে।—তার জীবনের কথা যদি শোন!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূতনাথ বাবুর কোন্ বোনের ছেলে?"

তিনি বলিলেন, "মেজ বোনের,—ঐ কোননগরে যাদের বাড়ী ছিল। দাশুর ভাল নাম হ'ল অজিত চাটুয্যে। লক্ষ্ণৌ 'বার'টা এখন বড় খারাপ;—পাঁচটা বদ্ ইয়ারের সঙ্গে পড়েই, দাশু উচ্ছন্ন যাবার পথে ব'সেছে। ও যা বল্লে, তা'তে গোটা তিনেক মানুষ খুন করলে যে পাপ হয়, ও সেই পাপে পাপী! তবে, ইংরেজের দণ্ডবিধি-আইনে, এমন সকল অপরাধের দণ্ড নাই।—নইলে আমি, এখনই ওকে ধরিয়ে দিয়ে, ফাঁসীর যোগাড় করে দিতুম;—হতভাগাও অনুতাপের জ্বালা থেকে বেঁচে যেত! আজ এখানে বেড়াতে আস্‌বে এখন।"

ও হরি! এতক্ষণে অজিত চাটুয্যে যে কে, তাহা আমি বুঝিলাম। বুকের উদ্বেগ বুকে চাপিয়া, খাওয়া শেষ হইবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি মুখ ধুইয়া ঘরে গেলে, তাঁহার মুখে গোটা দুই পান পুরিয়া দিয়া, চুপি চুপি বামুন দিদির 'আদি ও অকৃত্রিম' পরিচয়টা শুনাইয়া দিলাম।

ডাক্তার বাবু শিহরিয়া উঠিলেন!—"এই সেই কমলা! তাইত, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তা' আজ ত অজিত আস্‌বে, তুমি ওদের দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পারবে ত? অজিত যদি কোনগতিকে এখনো শোধরায়, তা'হলে বাঁচ্‌লেও বাঁচতে পারে!—নচেৎ, এর উপর মদ চালালে, নির্ঘাত মারা পড়্‌বে।"

আমি বলিলাম, "আমি একটা ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারি, তা খেলে ও আর মদ ধর্‌বে না।"

আগ্রহের সঙ্গে ডাক্তার বাবু বলিলেন, "সে কি!—তুমিও ডাক্তার হয়ে উঠ্‌লে নাকি?"

আমি তাঁহার কাণে কাণে আমার ঔষধের নাম বলিলাম;—তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সাক্ষাৎ ধনন্তরী!"

কমলার ঘরে গিয়া দেখি, সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছে, "সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।" আমি বলিলাম, "দমকল এসেছে, ঘর পুড়তে দেব না, ভাই! অজিত বাবু তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাচ্ছেন;—এই ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলেছি। ভাল হয়ে উঠে বোস।"

কথাটা সে ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই, আমি তিন লাফে পেছনের বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলাম।—উদ্দেশ্যটা যে বড় মহৎ, তা নয়;—অজিত, তাহার উপেক্ষিতা প্রেমিকা—উপাসিকার সঙ্গে, কি আলাপ করে—লুকাইয়া শুনিব। তোমরা পাঁচজন নব্য-ভব্য শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা, আমার মুণ্ডপাত করিতেছ?—তা কর! কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, আমি পাড়াগেঁয়ে অসভ্য-বর্ব্বর; আমি দেখিতেছিলাম, অজিত সুপুরুষ, সত্য;—তবে, আমাদের ডাক্তার বাবুর মত কালো নধর গড়ন; কোঁকড়ান চুল, টানা ভুরু, মস্ত চোখ তা'র নাই! রংটা ফর্সা বটে—কিন্তু সে যেন রক্তশূন্য পাংশুবর্ণ!

অজিতকে দেখিয়া, কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল—অতিমাত্র বিস্ময়ে বলিল, "আপনি—আপনি! এখানে কোথা থেকে"?

স্বামীর কাছে অজিত সব শুনিয়াছিল; সে সেখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হাঁ, কমলা—সেই নিষ্ঠুর, শিশুঘাতী—নারীঘাতী, মাতাল, আবার তোমাকে তা'র কালা-মুখ দেখাতে এসেছে। আমার বড় অসুখ হ'য়েছিল; মামা আমায় এখানে এনেছেন। একটু ভাল হ'লে, আবার চলে যাব। তোমায় দেখা দিয়ে বড় অন্যায় করেছি।—না কমলা?"

কমলা বাতাহত কদলীপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল।

সহসা, অজিত নতজানু হইয়া বসিয়া, হাত দুটি একত্র করিয়া বলিল, "কমল, তুমি দেবী! আমি মহাপাপী, তোমার গায়ের বাতাস গায়ে লাগিয়ে জ্বালা জুড়োতে, তীর্থ-রেণু মেখে পবিত্র হতে, এসেছি! মা'র অভিসম্পাতে, তোমার মনস্তাপের দীর্ঘনিঃশ্বাসে, আমার সাজান সংসার ভেঙ্গে গেল। কমল, তুমি যদি আমায় মার্জ্জনা করতে পেরে থাক, তা' হ'লে, বোধ হয়, এখনও আমি আবার মানুষ হতে পারি! যদি একটা নির্লজ্জতার পরিচয় দিতে অনুমতি দাও—তা' হ'লে, একটা ভিক্ষা চাই।"

কমলা ধরা-গলায় বলিল,—"বলুন, কি বল্‌তে অনুমতি দিতে হবে?"—"আমি অভিশপ্ত, মনস্তাপ-পীড়িত; তুমি যদি আমায় ক্ষমা ক'রে আমার হও, তবে বুঝি আমি আমার চরিত্রের কালী মুছে ফেল্‌তে পারি।"

পূর্ণযৌবনা রূপসী কমলা কি বলিতে গেল,—বলিতে পারিল না!

* * * * *

ক্ষণেক পরে, অজিত যখন সেই গৃহ হইতে বাহিরে যায়, তখন তাহার রোগশীর্ণ মুখে আনন্দের হাসি

ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কমলমুখী কমলার চোখে জল কেন?—আর কি কাঁদ্‌বার দিন পেলে না?

* * *

তারপর? তারপর কমলা অজিতের হৃদয়-কমলাসনে অচলা হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। বিবাহ বাসরে, অজিত বাবুর উপর রাগ করিয়া, আমি, আমার বামুন দিদিটির হাত দুটিতে, এক জোড়া "শ্রী"মূর্ত্তি সমন্বিত হীরকখচিত ব্রেস্‌লেট্ পরাইয়া দিয়াছিলাম।—সে বাসরে জনৈকা বয়োবৃদ্ধা রসিকা আত্মীয়া একটা পুরা'ণ গান গায়িয়াছিলেন—

"না হ'লে রসিক সুজন, প্রেম কি সবাই
রাখ্‌তে পারে?"—ইত্যাদি

অজিত বাবু, আমার চিকিৎসায় আরোগ্য হ'য়ে, আমাকে এক ছড়া "নেক্‌লেস" উপহার দিয়াছিল—তাহাতে তাহাদের যুগল মূর্ত্তির একটি ফটো-লকেট্ ঝুলান ছিল।

আমার ঔষধ যে সর্ব্বরোগ-হর—তাহাতে নির্ধনের ধন হয়, বিপত্নীকের পত্নী হয়, অপুত্রকের পুত্রাশা হয়!—তা'র নাম?—থাক্ বলিব না—ডাক্তার বাবুদের ভাত মারিয়া লাভ কি?
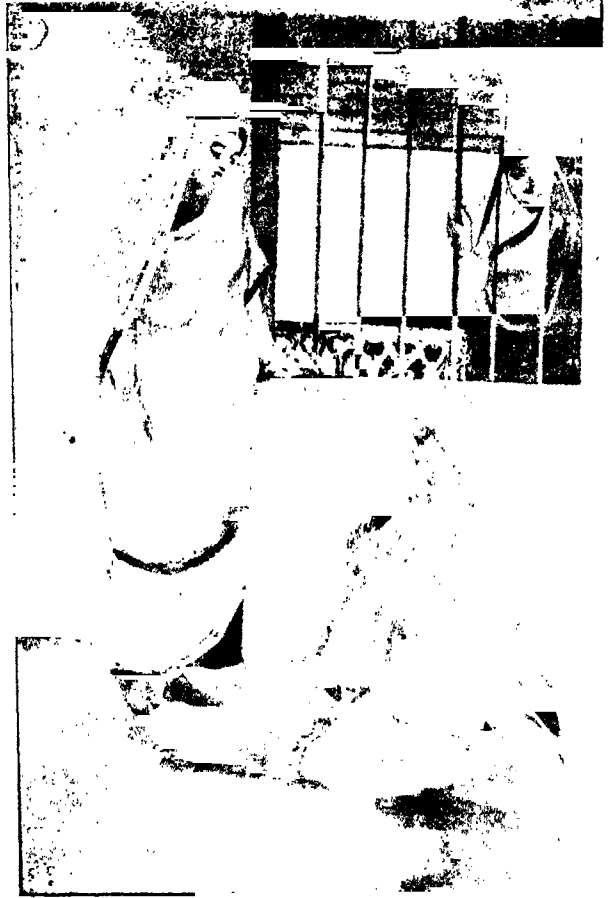
অজিত বলিল, "কমল, তুমি দেবী!"—

রাজপুত

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু]

বন্দি, ওগো বীরের জাতি! বন্দি, ওগো কর্ম্মবীর!
জগৎ-যোড়া যশঃ তোমাদের, তোমরা যে গো দেশের শির।
জীবন-চরিত সব যাহাদের আত্মদানের মধুরগীতি;
তৃপ্ত যা'রা ত্যাগের সুখে, জান্‌তো না'ক শত্রু-ভীতি;
উঠ্‌তো নাচি' যুদ্ধে সাজি' বৃদ্ধ-যুবক-পুরুষ-নারী;
বন্ধ হোত সিংহ-দুয়ার—ফির্‌তো যদি যুদ্ধে হারি';
জান্‌তো না'ক প্রবঞ্চনা;—শত্রু সনে? তাও কভু নয়;
কোর্‌ত ক্ষমা শত্রুদলে—কোর্‌ত তা'দের হৃদয় জয়—
জীবন চেয়ে—মরণ যা'রা বরণ করে হাস্যমুখে,
বন্দি মোরা—বন্দি তাদের, অটল যারা দুঃখে সুখে।

পরের দুঃখে কাঁদ্‌তো যা'দের ক্ষুদ্র—কিন্তু মহৎ প্রাণ;
বন্ধু ছিল ধর্ম্ম যা'দের, সঙ্গী অসি ধনুর্ব্বাণ;
অশন যাদের পর্ণপুটে, বসন যা'দের সমর-সাজ,
শয়ন ছিল মরুভূমে—ভূধরশিরে—শিবির মাঝ;
আলস্য, আর বিলাস, বলি আছে কিছু—জান্‌তো না;
দশের কাজে—দেশের কাজে—পুত্র-পিতা মান্‌তো না;
শত্রু যা'দের—মুগ্ধ হ'য়ে কোর্‌ত সেবা দিবস-রাত্;
মন্ত্র যা'দের সিদ্ধ হ'ত—নয় তো হ'ত শরীর-পাত
জীবন চেয়ে—মরণ যা'রা বরণ করে হাস্যমুখে,
বন্দি মোরা—বন্দি তা'দের, অটল যা'রা দুঃখে সুখে।

শতেক যুবক কোন্ জাতিটির—লক্ষরিপু ধ্বংস করে;
জহর-ব্রত কোর্‌ত নারী-ধর্ম্ম, মান, আর কর্ম্ম তরে;
রাণার তরে তনয়-বলি, পতির চিতায় সতীর প্রাণ—
কোন্ কালে, আর কোন্ দেশেতে, এমন নারীর আত্মদান?
হর্ষে শিশু শত্রু নাশে—নাইকো মুখে ক্লান্তি-রেখা;
বিঁধুক বুকে শত্রু-সায়ক—পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্র লেখা;
উচ্চ তা'রা—পূজ্য তা'রা—নয়তো তা'রা তুচ্ছ কভু;
সবার শিরে তাই তো তাদের স্থান দিয়েছেন জগৎ-প্রভু!
জীবন চেয়ে—মরণ যা'রা বরণ করে হাস্যমুখে,
বন্দি সবে—বন্দি তা'দের, অটল যা'রা দুঃখে সুখে।

প্রাচীন ভারতের ধাতু

[শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, M. A.]

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আর্য্যগণ কোন্ কোন্ ধাতু ব্যবহার করিতেন, ও তাহাদিগকে কি কি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করাই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঐ সকল ধাতুর প্রাচীন নাম অপর কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় কি না, আমরা তাহাও প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতের আদি গ্রন্থ যে "ঋগ্বেদ", ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব, ঋগ্বেদ-রচনার যুগকে আমরা ভারতের আদি-যুগ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সংবাদ পাইবার উপায় আমাদের নাই। তবে, ঋগ্বেদ-পাঠে আমরা বুঝিতে পারি যে, আর্য্যসভ্যতা তখন যে স্তরে বর্ত্তমান ছিল, তাহা নিতান্ত নিম্ন নহে। এই উন্নতি-সাধন করিতে যে, বহুবৎসর লাগিয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঋগ্বেদ-রচনার কালসম্বন্ধে, পণ্ডিতগণের মধ্যে নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। মক্ষমূলর মনে করেন, খৃষ্টের প্রায় ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ রচিত।

প্রথম আমরা সুবর্ণের বিষয় আলোচনা করিব। দেখিতে পাই, 'হিরণ্য', 'হেম', 'কৃশন', 'হরিত-অয়স', 'হিরি' ও 'অয়স্'—এই সকল নাম ঋগ্বেদে 'সুবর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমস্ত নামের মধ্যে, 'হিরণ্য' নাম অধিকাংশস্থলেই প্রযুক্ত এবং 'আয়স' শব্দ সুবর্ণ, লৌহ ও ধাতু অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। নিম্নে আমরা, কতকগুলি "ঋক্" উদ্ধার করিয়া, হিরণ্যশব্দের ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছি—

'ইন্দ্রোন বজ্রী হিরণ্যবাহুঃ।' ৭।৩৪।৪

—ইন্দ্র বজ্রধারী ও সুবর্ণহস্ত।

'সিন্ধু হিরণ্য বর্ত্তনিঃ।' ৮।২৬।১৮

—সুবর্ণ তীরযুক্ত নদী।

'বরাইবে দ্রৈবতসো হিরণ্যৈঃ।' ৫।৬০।৪

—তাঁহারা হিরণ্য-আভরণযুক্ত ধনবান্ (বিবাহের) বরের মত।

'বিভ্রৎ দ্রাপিং হিরণ্যয়ং।' ১।২৫।১৩

—সুবর্ণময় বর্ম (বা পরিচ্ছদ) ধারণ করিয়াছেন।

'শিপ্রা শীর্ষসু বিততাঃ হিরণ্ময়ী।' ৫।৫৪।১১

—মস্তকোপরি হিরণ্ময় উষ্ণীষ রহিয়াছে।

প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ "জেন্দাবেস্তার" 'জরণ্য' শব্দ সুবর্ণকে বুঝাইত। আধুনিক পারসিক ভাষায় সুবর্ণের নাম 'জর্'। 'জরণ্য' হইতে যে 'জর্' শব্দের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন পারসিকগণ যে স্থলে 'জ' উচ্চারণ করিতেন, আর্য্যগণ সেইস্থলে 'হ' উচ্চারণ করিতেন, দেখা যায়; নিম্নে উদাহরণ দেওয়া গেল—

"বেদ"—	"জেন্দাবেস্তা"—
অহি	অজি
মহৎ	মজদ্
হিম	জিম
হোতা	জওতা

অতএব, 'জরণ্য' যে আর্য্যমুখে 'হরণ্য' উচ্চারিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'হরণ্য' ও 'হিরণ্যে' যে প্রভেদ, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। ওয়েল্‌স, করনিশ্‌ ও ব্রিটনদিগের মধ্যে, যথাক্রমে—'হৈ-অরণ্' (Hai-ar-n), 'হী-র্ণ' (Hœ-r-n) ও 'হৌ-অরণ্' (Hou-ar-n) শব্দগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শব্দগুলি যে বৈদিক 'হিরণ্', বা 'হিরণ্যে'র অনুরূপ, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। "অথর্ব্ববেদে" 'আমরা' 'হৈরণ্য' শব্দও প্রাপ্ত হই; যথা—

'বিশ্বান্যো ভুবনো বিচষ্টে হৈরণ্যৈারণ্যং হরিতে বহন্তি।' ১৩.২।১১

সুবর্ণের বর্ণ পীত। ঋগ্বেদে 'হরিত' ও 'পিশঙ্গ' এই দুই শব্দে পীতবর্ণ বুঝায়। সেইজন্য সুবর্ণের এক নাম 'হরিত-অয়স্'; নিম্নলিখিত ঋকে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়—

'সোস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো...।' ১০।৯৬।৩

—সেই (ইন্দ্র) যাঁহার বজ্র পীতবর্ণ অয়স্-নির্ম্মিত।

ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে আমরা পাণ্ডু-রোগকে 'হরিমান' ও 'হরিমা' নামে প্রাপ্ত হই; যথা—

'হৃদ্রোগং মম সূর্য হরিমানং চ নাশয়।'

—ঋগ্বেদ ১।৫০।১১

'যো হরিমা জায়ান্যোঙ্গভেদা বি সল্পকঃ।'

—অথর্ব্ববেদ ১৯।৪৪ ২

'যো হরিদ্বর্ণকারকঃ পাণ্ডাখ্যো রোগঃ'।—ইতি 'সায়নঃ'।

'হরিৎ' শব্দ হইতেই 'হরিদ্রা' ও 'হরিতাল' নাম উদ্ভূত হইয়াছে। উহারা উভয়েই বর্ণে পীত; অতএব, 'হরিৎ' শব্দের এক অর্থ যে 'পীত', তাহাতে সন্দেহ নাই।

পারসিক ভাষায়, পীতবর্ণকে 'জর্দ্' বলে। জরদ্ ও হরিৎ শব্দ যে একই, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ, পারসিক 'জ' স্থলে হিন্দুগণ যে 'হ' উচ্চারণ করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রাচীন-ভাষায় সুবর্ণের যে যে নাম ছিল, তাহা দেখান যাইতেছে—

রুসিয়া	গথিক্	আইস্ল্যাণ্ড্	জার্ম্মণ	এংগ্লো সাক্সন্
Zalato	Gulth	Gull	Gold	Gold

পারসিক 'জরদ্' শব্দের সহিত, উপরি উদ্ধৃত শব্দগুলির যে বেশ মিল আছে, তাহা 'g' কে 'জ' এবং 'l' কে 'র' করিয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে। * পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, 'হরিৎ' ও 'জরদে'র মধ্যে মিল আছে এবং এই দুই শব্দেই পীতবর্ণ বুঝায়। মনে হয়, সুবর্ণের নামকরণের পূর্ব্বে, মনুষ্য-সমাজে পীতবর্ণের নামকরণ হইয়াছিল; সুবর্ণের বর্ণ পীত বলিয়াই, পীতবর্ণের নামের দ্বারা, পরে সুবর্ণের নামকরণ হইয়াছে। তবে, বিভিন্ন ভাষায় পীতবর্ণ-নির্দ্দেশক শব্দে অল্লাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া সুবর্ণের নামকরণ হইয়াছিল। ল্যাটিন্ভাষায়, সুবর্ণের একনাম 'ঔরম' (Aurum)। স্যাবাইনদিগের মধ্যে, 'ঔরম' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ঔসম্' শব্দ প্রচলিত ছিল। 'ঔরম্' ও 'ঔসম্' শব্দ 'উরো' বা 'উষো' হইতে উৎপন্ন। বেদের 'উষা' ও ল্যাটিনের 'উরো' বা 'উষো' একই। 'উষার' অশ্ব অরুণবর্ণ বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণিত—

'বহন্ত্বরুণপ্সবঃ।'—১।৪৯।১

—অরুণবর্ণ গোসকল তোমাদিগকে (উষাগণকে) বহন করুক।

'অশ্বান্ অদ্যারুণান্ উষঃ।'—১।৯২।১৫

—হে উষা! অদ্য অরুণবর্ণ অশ্বগণকে ... ...।

ল্যাটিন 'ঔরম্' ও বেদের 'অরুণ' শব্দে উষার বর্ণ প্রকাশ করিতেছে। উষার বর্ণ ও সুবর্ণের বর্ণ প্রাচীন ল্যাটিনগণ সমান মনে করিতেন, বলিয়া বোধ হয়। এইজন্যই, সুবর্ণের নাম ল্যাটিন ভাষায় 'ঔরম্' দেখিতে পাই। 'ঔরম্' ছাড়া, 'ক্রাইসন্' বা 'ক্রাইসস্' শব্দেও সুবর্ণ বুঝাইত। আমরা এক্ষণে দেখাইব যে, এই শব্দের অনুরূপ শব্দ গ্রীক্ এবং সংস্কৃত ভাষায়ও আছে।

সুবর্ণ-অর্থে "কৃশন" শব্দ ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—

'অভীবৃতং কৃশনৈ বিশ্বরূপং।'—১।৩৫।৪

—সুবর্ণ-নির্ম্মিত নানাবিধ (জীব জন্তুর) মূর্ত্তি-বেষ্টিত।

'অভি শ্যাবং ন কৃশনেভিরশ্বং।'—১০।৬৮।১১

—সুবর্ণ আভরণযুক্ত শ্যাব (ধূসর) বর্ণ অশ্বের মত।

'মদচ্যুতঃ কৃশনাবতো।'—১।১২৬।৪

—সুবর্ণ-আভরণযুক্ত ও শত্রুমর্দ্দনকারী বা মদস্রাবী।

'কৃশনিনো।'—৭।১৮।২৩

—সুবর্ণ-অলঙ্কারযুক্ত।

এস্থলে বক্তব্য এই যে সায়নাচার্য্য 'কৃশন' শব্দের, সুবর্ণ ও লৌহ, দুই অর্থই হয় বলিয়াছেন; যথা—১।৩৫।৪ ঋকের টীকায় বলিয়াছেন—

"কৃশনং লোহমিতি সুবর্ণ নাম সু পাঠাৎ।"

উইল্সন্ তাঁহার ঋগ্বেদ-অনুবাদে 'কৃশন' শব্দের

* 'রস্কো ও সরেমালে'র বিখ্যাত রসায়ন-গ্রন্থে 'হিরণ্য,' 'ক্রুশস্' ও 'গোল্ড' শব্দগুলির উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিখিত হইয়াছে :— "The Greek word xpusos probably derived from the Sanskrit *hiranya*, also signified *to glitter* or *flame*. Our word "gold" probably is connected with *jvalita*, which also occurs in Sanskrit, and is derived from *jval*, which also means to shine."—

Roscoe & Schorlemmer's "TREATISE ON CHEMISTRY." Vol. II.—p. 483. 'ক্রুশস্' সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য, পরে দ্রষ্টব্য।

Mother of Pearl, বা মুক্তা-শুক্তি, অর্থ করিয়াছেন। ১।২ নৈঘণ্টুকে, কৃশন অর্থে হিরণ্য বলা হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদের নিম্নলিখিত স্থান সকলেও 'কৃশন' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়—

'সনো হিরণ্যজাঃ শঙ্খঃ কৃশনঃ পাত্বং হসঃ।'—৪।১০।১

—সেই হিরণ্যজাত শঙ্খ-রূপ 'কৃশন' আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

'দেবানামস্থি কৃশনং বভূব।'—৪।১০।৭

—দেবতাদিগের অস্থি (শঙ্খ-উৎপাদক) কৃশন হইয়াছিল।

দেখা যাইতেছে যে, 'কৃশন' অর্থে শঙ্খও হইতে পারে। কিন্তু কৃশন শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সুবর্ণ যে একটি, তাহা নৈঘণ্টুক হইতে জানা যায়।

আমরা গ্রীকভাষায় একটি শব্দ প্রাপ্ত হই; তাহা ঋগ্বেদের 'কৃশন' শব্দের অনুরূপ। হোমরের 'ইলিয়ডে' 'ক্‌রুশিয়স্' (x p u s e o s) ও 'ক্‌রুশি আয়স্' (x p u s e i o s) শব্দদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; এতদুভয় শব্দেই সুবর্ণকে বুঝাইত। 'ক্‌রুশস্' ও 'ক্‌রুশন্' শব্দদ্বয়ও গ্রীক্‌ভাষায় সুবর্ণ-অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই শব্দই লাটিন ভাষায় 'ক্রাইসস্' ও 'ক্রাইশন্' হইয়াছে। 'কৃশন,' 'ক্রাইশন্,' 'ক্‌রুশন' শব্দগুলি যে অনুরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন হোমারের 'ক্‌রুশি-আয়স্' শব্দের মধ্যে, বৈদিক 'অয়স্' শব্দের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়।

'কৃশন' শব্দের অর্থ, সায়ন একস্থলে—'শব্দতন্ বার্ত্তা" করিয়াছেন। অনুমান হয়, সুবর্ণ কণারূপে নদীতীরে পাওয়া যাইত বলিয়া, আর্য্যগণ উহার 'কৃশন' নাম দিয়াছিলেন। সেই জন্য, গ্রীকভাষায় 'ক্‌রুশি-আয়স্' বা 'কৃশ-অয়স' নাম দেখিতে পাই। পরে দেখান যাইবে, 'অয়স্' শব্দ—ধাতুর সাধারণ নাম অর্থে অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'হিরি' শব্দ, অতি অল্পস্থলেই, সুবর্ণ-অর্থে ঋগ্বেদে প্রযুক্ত আছে—

'হিরি শ্মশ্রুঃ শুচিদন্।'—৫।৭।৭

—সুবর্ণ শ্মশ্রু ও উজ্জ্বল দন্তবিশিষ্ট।

মনিয়র উইলিয়মস্ বলেন—'হিরি' শব্দ লুপ্ত 'হ্রি' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'হ্রি' অর্থে—'পীত' হওয়া, বা 'সবুজ' হওয়া। ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে 'হরিৎ' ও 'হিরণ্য' শব্দও এই 'হ্রি' ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই ধাতুই, পারসিক-মুখে 'জ্রি' হইয়া—'জরদ্', 'জরণ্য,' 'জর্' 'জরি' প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন করিয়াছে।

'হেম' শব্দ, অতি অল্পস্থলেই, ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়; আমরা নিম্নে দুইটি স্থল উল্লেখ করিতেছি—

'হেম্যাবান্তং'।—৪।২।৮

—সুবর্ণ-নির্ম্মিত।

'অশু প্রেষা হেম্না পূয়মানঃ'।—৯.৯৭।১

অপর কোন প্রাচীন ভাষায় 'হেম' শব্দের অনুরূপ শব্দ, সুবর্ণ-অর্থে প্রাপ্ত হাওয়া যায় না। 'সুবর্ণ,' 'কনক,' 'কাঞ্চন' প্রভৃতি নাম, কোন বেদে ধাতু অর্থে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের বহুস্থলে 'অয়স্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মনে হয়, 'অয়স্' শব্দ দ্বারা বৈদিককালে নানা অর্থ বুঝাইত;—কোন-স্থলে উহা সুবর্ণ অর্থে প্রযুক্ত; অপর কোনস্থলে উহা ধাতু (metal)-অর্থে ব্যবহৃত। আবার, অনেকস্থলে উহার অর্থ 'লৌহ'; নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

'আয়োহতং'—৯।১।২

—সুবর্ণদ্বারা আহত।

এস্থলে, 'অয়ঃ'-অর্থে সুবর্ণ করিতেই হইবে। কারণ, সোম-অভিষবণকালে সুবর্ণ হস্তে ধারণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; যথা—

'হিরণ্যপাণিরভিষুণোতীতি'।—আপস্তম্ব—১২।৭।১২

—হস্তে সুবর্ণ ধারণ করিয়া সোম-অভিষবণ করিবে।

'অয়ঃ শীর্ষা'—৮। (৯০ বা ১০১)।৩

—সুবর্ণ-ভূষিত মস্তক সকল।

মস্তকের ভূষণ সুবর্ণের হওয়াই সম্ভব। আমরা পূর্ব্বে 'মস্তকোপরি হিরণ্ময় উষ্ণীষে"র কথা উল্লেখ করিয়াছি।

উপরের উদ্ধৃত ঋক্‌সকলের ব্যাখ্যায়, সায়ন 'অয়ঃ'-অর্থে 'সুবর্ণ' বলিয়াছেন।

নিম্নোদ্ধৃত অংশে, 'অয়ঃ' শব্দ, 'লৌহ'-অর্থে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

'আয়সো ন ধারাং'—৬।৩।৫

—আয়োময় (পরশু প্রভৃতি) ফলার মত।

'বাশীমেকো বিভ হস্তত্তি আয়সীং'—৮।২৯।৩

—আয়োময় বাশ হস্তে ধারণ করিতেছেন।

'যস্যা আয়োমুখম্।...ইষ্বৈদেবো বৃহন্নম্।'— ৬।৭৫।১৫।

—যাহার মুখ অয়োময়, সেই বৃহৎ ইষুদেবকে নমস্কার।

এতদ্ভিন্ন আমরা ঋগ্বেদে 'অসি', 'সূনা', 'শূল', 'ক্ষুর', 'লাঙ্গলের ফাল', শাণ-যন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই; যথা—

'ছিদ্রা গাত্রাণি অসিনা।'—১।১৬২।২০

—অসিদ্বারা গাত্রে ছিদ্র বা ছেদ সকল।

'সূনয়া আভৃতং।'—১।১৬১।১০

—সূনা দ্বারা কর্ত্তিত।

'শূলং নিহতস্য অবধাবতি।'—১।১৬২।১১

শূলের মুখ দিয়া। রক্ত) বাহির হয়।

'সন্নঃ শিশীহি ভুরি জোরিব ক্ষুরং'।—৮।৪।১৬

—আমাদিগকে ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি কর।

'পবির্ ক্ষুরাঃ'।—১।১৬৬।১০

—বজ্রের মত অস্ত্রে ক্ষুরসদৃশ তীক্ষ্ণ-ফলা।

'শুনং ন ফালা বিকৃষন্ত ভূমিং।'—৪।৫৭।৮

—ফালসকল সুখে ভূমিকর্ষণ করুক।

'ক্ষোত্রেণেব স্বধিতিং সংশিশীতম্'।—২।৩৯।৭

—যে রূপ শাণ-যন্ত্রে স্বধিতি (খড়্গ বা পরশু) তীক্ষ্ণ করে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 'অয়স' অর্থে 'সুবর্ণ' ভিন্ন অপর ধাতুকেও বুঝাইত। এই অপর ধাতু 'লৌহ' হওয়াই সম্ভব। তবে, লৌহ ভিন্ন অপর কোন ধাতুকে যে বুঝাইত না, তাহাও বলিতে পারা যায় না। একস্থলে সুবর্ণকে 'হরিত অয়স', বা পীতবর্ণধাতু, বলা হইয়াছে। যথা—

'সোস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো।'—ঋগ্বেদ—১০।৯৬।৩

—তিনি (ইন্দ্র) যাঁহার বজ্র পীতবর্ণ অয়স-নির্ম্মিত।

ইন্দ্রের বজ্র যে হিরণ্ময়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঋকে দেখিতে পাই।

'ইন্দ্র বজ্রো হিরণ্ময়ঃ'।—ঋগ্বেদ—১।৭।২

—ইন্দ্রের বজ্র হিরণ্ময়।

অতএব 'হরিত অয়স' যে 'হিরণ্য'কে বুঝাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথর্ব্ববেদের একস্থানে আমরা নিম্নলিখিত রূপ উক্তি দেখিতে পাই :—

'শ্যামময়োস্য মাংসানি লোহিতমস্য লোহিতং'—১১।৩।৭

—শ্যামময় ইহার মাংস এবং লোহিতময় ইহার রক্ত।

এখানে 'শ্যামময়' বা কৃষ্ণবর্ণ ধাতু ও 'লোহিতময়' বা রক্তবর্ণ ধাতু বুঝাইতেছে। অতএব, 'অয়স' অর্থে, ধাতুগুলির সাধারণ নাম এবং তাহাদের বর্ণ উল্লেখ করিয়া লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুর নামকরণ হইতেছে। ঋগ্বেদে 'তাম্র' শব্দ নাই। সেই জন্যই মনে হয়, 'অয়স' শব্দদ্বারা তখন লৌহ, তাম্র ও কাংস্যকেও বুঝাইত।

পারসিক জেন্দাবেস্তায় 'অয়ণহ' শব্দদ্বারা লৌহকে বুঝাইত। সংস্কৃতের 'স' বর্ণস্থানে জেন্দোবেস্তায় "হ" বর্ণ প্রায় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; যথা—

সংস্কৃত—	জেন্দোবেস্তা—
সপ্তসিন্ধু *	হপ্তহিন্দু
মাস	মাহ
সমা †	হম
সোম	হওম
অসুর	অহুর

অতএব, 'অয়ণহ' ও 'অয়স' শব্দদ্বয় তুল্যরূপ।

ল্যাটীন্‌ভাষায় aes (ইস্) ও aes-is (ইসিস) শব্দ, ahes শব্দ হইতে উৎপন্ন। H পূর্ব্বকালে y এর পরিবর্ত্তে, বসিত। অতএব, Ahes বা Ayes সংস্কৃত 'অয়স্' শব্দের অনুরূপ।‡ ল্যাটীন্‌ভাষায় তাম্রকে Aes Cyprium বা 'কইপ্রিয়ম্' দ্বীপের অয়স বলা হইত। তাম্র ও বঙ্গ (Tin), এই দুই ধাতুর মিশ্রণে এক মিশ্রধাতু (ব্রঞ্জ) প্রস্তুত হয়। রোমাণগণ প্রধানতঃ এই ধাতুকে Aes (ইস্) বলিতেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, 'অয়স' বা 'ইস্' শব্দ ল্যাটিন্ ভাষায় সকল ধাতুর সাধারণ নাম স্বরূপে, এবং প্রধানতঃ 'ব্রঞ্জ' ধাতুকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। আমরা 'শুক্ল যজুর্ব্বেদে' 'অয়স্' শব্দের নিম্নলিখিতরূপ ব্যবহার দেখিতে পাই।

'হিরণ্য চ মে অয়শ্চমে শ্যামং চ মে, লোহং চ মে
সীসং চ মে ত্রপু চ মে, যজ্ঞেন কল্পতাম্।'

—শুক্ল যজুর্ব্বেদ—১৮।১৩

* "সপ্তসিন্ধূন্ যঃ রৌহিণং অক্ষুরৎ।"—ঋগ্বেদ—২।১২।১২

† "উত্তরামুত্তরাং সমাম্।"—ঋগ্বেদ—৪।৫৭।৭

‡ Smith's—Latin-English Dictionary দ্রষ্টব্য।

—আমার হিরণ্য (সুবর্ণ), অয়স্, শ্যাম (লৌহ), লোহ (তাম্র), সীস (সীসা), ত্রপু (বঙ্গ), যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

উদ্ধৃত পদটি হইতে দেখা যাইতেছে—লৌহ, তাম্র, সীসা ও বঙ্গ ভিন্ন অপর এক ধাতু—অয়স্ নামে এস্থলে অভিহিত। ইহা হইতে মনে হয়, রোমান 'ইস' বা 'ব্রঞ্জ' ধাতুই এস্থলে 'অয়স্' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, দেখা যায়—মিশ্রধাতুদিগের মধ্যে 'ব্রঞ্জ' ধাতুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনকালে অপরাপর দেশে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন রোমাণদিগের মধ্যে 'ব্রঞ্জ'কে 'অয়স্' বা 'ইস্' বলা হইত।

গ্রীক্‌ভাষায় সুবর্ণের 'ক্রুশি-আয়স' নামে 'অয়স্' শব্দের চিহ্ন রহিয়াছে। গ্রীক্‌ভাষায় ধাতুদিগের নামের শেষে 'অস্' শব্দ বর্ত্তমান; যথা—Sidyros, Khalkos, Molubdos, Kassiteros, ইত্যাদি। এই 'অস্' শব্দ 'অয়স্' শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। এই অনুমান সত্য হইলে, বুঝা যায়, 'অয়স্' শব্দ গ্রীক্‌দিগের মধ্যে 'ধাতু' বুঝাইত, এবং সেই জন্যই ধাতুসকলের নামের শেষে উক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এংগ্লো-স্যাক্সন্ ভাষায় 'আয়সারেন্' (Is-er-en), 'আয়সেন্' (Is-en), ও 'আয়রেন' (Ir-en) এবং ইংরাজী ভাষায় 'আয়রন্' (Ir-on) শব্দে 'অয়স্' শব্দ বর্ত্তমান—উপরোক্ত সকল শব্দেই লৌহকে বুঝায়। প্রাচীন জর্ম্মাণভাষায় 'ইর' (Er) ও 'আয়রন্' (Iron) এবং আধুনিক জর্ম্মাণভাষায় 'এইসেন্' (Ei-sen) শব্দেও 'অয়স্' শব্দের চিহ্ন বর্ত্তমান। কারণ, প্রাচীন জর্ম্মাণভাষায় অনেক-স্থলে "s"এর পরিবর্ত্তে "r" ব্যবহৃত হইত।

গথিক্‌ভাষায় 'এই-সারন্' (Eis-ar-n) এবং আয়রিশ ভাষায় 'আয়রন্ন' (Ia-rann) শব্দও—'অয়সন্' শব্দমূলক। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ন্ ভাষায় 'আয়রন্' (Iarn), ও সংস্কৃত 'আয়সন্' অভিন্ন দেখা যায়।

অতএব, দেখা গেল—প্রাচীন-ভারতীয় আর্য্য, পারসীক্, গ্রীক্, রোমাণ, জর্ম্মাণ, গথিক, আয়রিশ ও এংগ্লো-স্যাক্সন্ প্রভৃতি আর্য্যজাতিদিগের ভাষায় 'অয়স্' শব্দ কোন না কোন ধাতু অর্থে, বা ধাতুদিগের নামের অংশ-বিশেষে, বর্ত্তমান।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ঋগ্বেদে লাঙ্গল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। লাঙ্গলের যে অংশ লৌহনির্ম্মিত, তাহাকে আমরা 'ফাল' বলি। 'ফাল' শব্দ ঠিক এই অর্থে ঋগ্বেদেও দেখিতে পাই; যথা—

'শুনং নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং।'—৪।৫৭।৮

—আমাদের ফালসকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক।

ল্যাটিন্‌ভাষায় লৌহকে 'ফেরম্' বলা হয়। লৌহ-নির্ম্মিত অনেক দ্রব্যকে রোমাণগণ 'ফেরম্' নামে অভিহিত করিতেন; দেখা যায়, লাঙ্গলকেও তাঁহারা 'ফেরম্' বলিতেন। অতএব লাঙ্গলের লৌহময় অংশই এই নামের প্রকৃত অধিকারী;—ঋগ্বেদে উহার নাম 'ফাল'। "র" ও "ল" অভেদ মনে রাখিলে, দেখা যায়, 'ফারম্' শব্দ 'ফাল্লং' হয়—'ফাল' ও 'ফাল্লং' মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য।

ঋগ্বেদে আমরা 'সীতা' শব্দ প্রাপ্ত হই; যথা—

'ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্লাতু।'—৪।৫৭।৭

সায়নাচার্য্য 'সীতা'—অর্থে 'সীতাধারকাষ্ঠাং' অর্থ করিয়াছেন।

অতএব, উহা এস্থলে 'লাঙ্গল' অর্থে ব্যবহৃত। 'সীতা' অর্থে—'ফালদ্বারা কর্ষিত ভূমি'কেও বুঝায়। মনুতে আমরা 'কৃষি সম্বন্ধীয় দ্রব্য' অর্থে 'সীতা' শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখি; যথা—

'সীতাদ্রব্যাপহরণে শস্ত্রাণামৌষধস্য চ।'—মনু—৯ম অঃ ২৯৩—

সীতাদ্রব্য (কৃষি সম্বন্ধীয় দ্রব্য) হরণে, শস্ত্র কিংবা ঔষধি-হরণে—।

অতএব 'সীতা' শব্দ—'লাঙ্গল', 'কর্ষিত ভূমি' ও 'কৃষি সম্বন্ধীয় দ্রব্য' অর্থে প্রযুক্ত হইত। যে 'অয়স্' এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, তাহাকে সংস্কৃতে 'সীতায়স্' বলিতে পারি। গ্রীক্‌ভাষায় লৌহের নাম 'সীডাইরস্' (Sidyros) এবং ডোরিয়ান্-গ্রীকদিগের মধ্যে 'সীডারস'। 'সীডাইরস' বা 'সীডারস' যে 'সীতায়স্' শব্দ হইতে উদ্ভূত, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

এস্থলে আমরা রস্কো ও সর্লেমারের রসায়নগ্রন্থ হইতে গ্রীক্‌শব্দ 'সীডাইরসে'র উৎপত্তি সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধার করিতেছি—

"The derivation of the Greek word

'Sidyros,' which occurs in Homer, is unknown."—Vol. II, p. 1136.

এই গ্রন্থে, লৌহের প্রথম-আবিষ্কার ভারতে হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে—

"It appears probable that iron was first obtained from the ores in India."--Vol. II, p. 1136.

ল্যাটিন্ 'ফের‍্ম' শব্দের উৎপত্তিসম্বন্ধে এ পুস্তকে কোন উল্লেখ নাই।

ভারতবর্ষই যদি লৌহ-উদ্ধার ও প্রচলনের আদি-ভূমি হয়, তবে সেই দেশের প্রাচীন-ভাষা হইতে লৌহের বিভিন্ন নাম যে অপরাপর জাতি গ্রহণ করিবে, তাহাতে আদৌ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সেই জন্যই প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমাণদিগের ভাষায় 'ফার‍্ম' ও 'সীডাইরস' শব্দদ্বয় পাইতেছি।

রুক্মিণীর প্রতি সত্যভামা

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, M. A., B. L.]

এসেছিস্?—আয়—আয়! পূরব জনমে—মনে নাই কোন্ মায়াপুরে—
ছিলি বদ্ধ মোর স্নেহ-ডোরে!
আয়, সোণার প্রতিমা বোন্! চমকিয়া সৌন্দর্য্যের সাহানার সুরে,
আভাসেই চিনিয়াছি তোরে!
হোমাগ্নি জ্বলিল চিত্তে!—কোন্ গায়ত্রীর তুই সামবেদী সুর?
কে রে তুই--দেবের আরতি লাগি, অফুরন্ত সুরভি-কর্পূর?

গরীব গোপিকা যথা—নাহি সোণা-দানা—ছিন্নবাস, নিতান্ত মলিন—
বালকৃষ্ণে বক্ষমাঝে ধরি,
অনিন্দ্যা সুন্দরীসাজে, যে বরেণ্যরূপে হারি মানে গর্ব্বিতা, সৌখিন,
লীলাময়ী ইন্দ্রের অপ্সরী,—
হে পবিত্রে, সুচরিত্রে! স্পর্শে তোর, প্রাণ মোর—দীন কুঁড়ে ঘর—
আজি কি লাবণ্যময়!—দেবেন্দ্রের অট্টালিকা জিনিয়া সুন্দর!

মানস-কমল নাই—রূপে ঢল ঢল, নাই—নাই সরস বকুল,
ধূপ নাই, নাই রে কর্পূর,
তবু যবে হাতে লয়ে তুলসীর পত্র, সু-বৈষ্ণব, ভকত অতুল,
করে আহা অর্চ্চনা মধুর,
দেবালয় হেসে উঠে,—তোরে পেয়ে, প্রাণ মোর—দীন কুঁড়ে ঘর—
আজি যেন জাগ্রত-দেবতাময়ী পুণ্যভূমি—মধুর, সুন্দর!

আমার এ চিত্তরাজ্যে অশ্রুবৃষ্টিধারা, আন্-দিকে হাসি-রৌদ্ররাশি,—
তুই আসি সৃজিলি নিমেষে
ভকতির ইন্দ্রধনু!—তার তুলনায় লাল নীল সবরঙ বাসি!
গোবিন্দের চরণ-উদ্দেশে,
চল—চল!—রবি-করোজ্জ্বল তোরণের পুণ্যদ্বার দিয়া,
হেরিব—হেরিব—আজি শ্রীগোবিন্দে, দেহ-মন সব নিবেদিয়া!

মেঘ-বিদ্যা

[শ্রীআদীশ্বর ঘটক]

"কি কর শ্বশুর লেখা জোথা,
মেঘেই দেখ্‌বে জলের লেখা।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা,
মধ্যে মধ্যে দিতেছে বা,
কৃষককে বলগে বাঁধতে আল্,
আজ না হয় জল হবে কাল।"

* * *

"পশ্চিমে উঠিল কাঁড়,
ডাঙ্গা ডোবা একাকার।"

* * *

"তপন উঠে সিঁদুর ছড়ায়,
জল ভরে পুকুর কানায়।"

* * *

"সন্ধ্যা বেলা রাঙ্গা আকাশ
তারপর দিন ভারি বাতাস।"

* * *

"চাঁদের সভার মধ্যে তারা,
বর্ষা হবে মুষল ধারা।"

* * *

"পূর্ব্বের ধনু নিত্য খরা
পশ্চিম ধনু বর্ষে ঝরা॥"

* * *

"দিনে জল রেতে তারা
এই জান্‌বে শুকার ধারা।"

* * *

"দূর সভা নিকট জল,
নিকট সভা রসাতল।"

বহু পূর্ব্বকালে আমাদের ঋষি এবং দেবতারা মেঘবৃষ্টি নির্ণয় করিতে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা দেখাইয়াছি। মেঘের গর্ভ-বিচার, এবং সপ্তনাড়ী-চক্রে অধিকাংশ জ্যোতিষিক আলোচনা করিতে হয়। সকলের পক্ষে ঐ সকল পন্থা সুগম নহে। এ জন্য বহু পূর্ব্বকাল হইতেই মেঘ দেখিয়া, বর্ষা বিচার করিবারও চেষ্টা মানুষে করিতেছে। বৃষ্টি-বর্ষার পূর্ব্বে নির্ম্মল আকাশে একটা একটা পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয়। ঐ সকল পরিবর্ত্তন সকলে দেখিতে জানেন না। উহা দেখিতে শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। মেঘের মধ্যে যে সকল প্রাকৃতিক শোভা এবং নয়নমনোহর বর্ণবিন্যাস দৃষ্ট হয়, পার্থিব কোনও বস্তুতে ঐ প্রকার শোভার সমাবেশ হয় না। এ জন্য প্রথমতঃ মেঘসকল চিনিতে হয়। কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়, এবং কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয় না, ইহাও বুঝিতে হয়। এই প্রবন্ধে আমরা মেঘসকলের নাম এবং শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করিব। এই অধ্যায়ের প্রথমে যে কয়েকটি কিংবদন্তি উদ্ধৃত করিলাম, মেঘের বর্ণনাকালে, ঐ শ্লোকগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিবারও সুবিধা হইবে।

মেঘসকল চিনিতে হইলে, শরৎ-কালই উপযুক্ত সময়। এই সময়ে বর্ষার প্রবলতা কমিয়া আকাশ নির্ম্মল হয়, অথচ সর্ব্বপ্রকার মেঘেরও সমাবেশ থাকে।

বায়ুর নানা স্তর আছে। বিভিন্ন বায়ুর স্তরে উত্তাপেরও তারতম্য হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উপরের মেঘের অবস্থা যে প্রকার, সর্ব্বাপেক্ষা নীচের মেঘ সে প্রকার নহে। বায়ুর মধ্যম স্তরের মেঘ আবার বিভিন্ন প্রকার। বৃষ্টি-বর্ষা এই তিন জাতীয় মেঘ হইতেই ঘটিয়া থাকে।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ জাতীয় মেঘেরই বর্ণনা প্রথমে করিলাম।—

(Cirus) কশমেঘ।—পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ উপরে এই জাতীয় মেঘ উৎপন্ন হয়।

এই সকল মেঘ সূত্রাকার, এবং বিমল শ্বেতবর্ণের দেখা যায়। নাবিকগণ ইহাকে 'অশ্বপুচ্ছ' * নাম দিয়াছেন।

কশমেঘ

নির্ম্মল আকাশে এই মেঘ হইলে বোধ হয়, যেন আকাশে শ্বেতবর্ণের সূত্রগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় মেঘ শুকার লক্ষণ। এই জাতীয় মেঘ অনেক সময় পর্য্যন্ত এক প্রকার আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই সকল মেঘের গতিও খুব ধীর।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতে এই মেঘসকল সূক্ষ্ম বরফের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার উচ্চে বায়ুর উত্তাপ বরফের অপেক্ষাও শীতল, সুতরাং নীচের মেঘ-সকল হইতে 'অশ্বপুচ্ছ'-জাতীয় মেঘ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ সকল মেঘ নীচে পড়িয়া যায় না কেন?—একথার সম্যক্ উত্তর এখনও বিজ্ঞান দিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কোনও প্রকার বৈদ্যুতিক স্রোতে ঐ সকল মেঘ গঠিত হয়; একারণ পার্থিব আকর্ষণ উহার উপর কার্য্য করে না। যাহা হউক, উহা যে অতি সূক্ষ্ম তুষারবিন্দু দ্বারা গঠিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সকল মেঘে চন্দ্র এবং সূর্য্যের মণ্ডল, এবং ময়ূরকণ্ঠী বর্ণসকল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই উহার তুষারত্বের প্রমাণ-স্বরূপ গণ্য করা হয়। এই সকল মেঘ দ্বারা ভাবী ঋতু অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

কয়েক দিবস ধরণ করিয়া যখন বৃষ্টি-বর্ষা হয়, সেই সময়ে আকাশে প্রথমে এই সকল সূত্রাকার মেঘ সজ্জিত হইতে থাকে। নীচের বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত থাকে, ঐ সকল মেঘ অনেক সময় তাহা হইতে ভিন্ন গতিতে চলিতে থাকে। এমন কি, ঐ উচ্চ জাতীয় মেঘে যে প্রকার গতি লক্ষিত হইবে, দুই দিন, কি তিন দিন পরে নীচের বায়ুর গতি সেই প্রকার হইবার সম্ভাবনা। এই সূত্রাকার মেঘ বায়ুর যে স্তরে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার উচ্চ বায়ু হইতেই শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাও এক প্রকার নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, ঐ প্রকার উচ্চ জাতীয় মেঘ যখন বর্ষণ করে, তখনই শিলাবৃষ্টি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এই মেঘ বর্ষণ করে না।

(Cirro-Cumulus) কোদালে মেঘ।—মেঘবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণ এই জাতীয় মেঘকে "ছিতরি" বলিয়া থাকেন। বর্ষাকালে এই জাতীয় মেঘ প্রায় নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বপুচ্ছ-জাতীয় মেঘের নিম্নের স্তরে এই সকল ক্ষুদ্রাকার মেঘ উৎপন্ন হয়। ইহারাও উচ্চজাতীয় মেঘ। কোনও কোনও সময়ে সমস্ত আকাশময় এই প্রকার ছোট ছোট টুকরা মেঘ উৎপন্ন হইয়া, অতি ধীর-

কশমেঘ—প্রকারান্তর
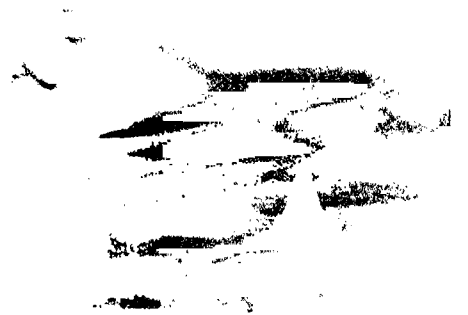
গতিতে চলিতে থাকে। বর্ষাকালে এই জাতীয় মেঘের গতি অনুসারেই বৃষ্টি-বর্ষা হয়। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, এই প্রকার কোদালে মেঘ হইলেই শীঘ্র বৃষ্টি হয়। "কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মধ্যে মধ্যে দিতেছে বা"—

* Mare's Tails.

একথাটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ফাল্গুন অথবা চৈত্র মাসে আমাদের বঙ্গদেশে পশ্চিমা-বাদল আসে। এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে। নিম্ন-স্তরের মেঘসকল প্রবহমাণ (S.W.) বায়ু-ভরে উত্তরপূর্ব্ব দিকে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। ঐ সকল মেঘের উপর স্তরে প্রায়ই এই কোদালে-মেঘ অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এই কোদালে মেঘের গতি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব থাকে। যে দিন অপরাহ্নে পশ্চিমা-মেঘ এবং ঝড় হইবে, সেই দিবস প্রাতঃকাল হইতেই নানাপ্রকার "ছিতরি" দেখা যায়। এই সকল ছিতরি-মেঘের গতি লক্ষ্য করিলে, নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার গতি দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) N.W.—S.E.; এই প্রকার গতি হইলে প্রায়ই অপরাহ্নে ঝড়বৃষ্টি হইয়া থাকে।

(২) (N.W.—S.E.) + (S.W.—N.E.); আমরা এই প্রকার মিশ্রগতি অনেকবার দেখিয়াছি। মিশ্র-গতি হইলে, অপরাহ্নে মেঘাদি হয় মাত্র, কিন্তু শেষে দক্ষিণা বায়ু কর্ত্তৃক মেঘসকল নষ্ট হয়, বৃষ্টি হয় না। কোনও দিন, অপরাহ্নে পরিষ্কার থাকে।
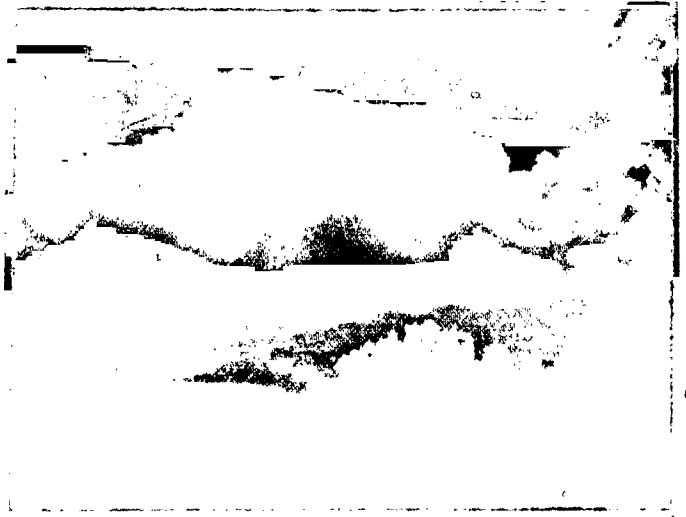
ছিতরি—প্রকারান্তর

(৩) (S.W.—N.E.); দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব্ব গতি হইলে, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, অথবা শ্রাবণ মাসে ঐ প্রকার গতি থাকিলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে বৃষ্টি-বর্ষা হইতে পারে।

(৪) আষাঢ়, শ্রাবণ, অথবা ভাদ্র মাসে ছিতরি-মেঘের গতি প্রায়ই (S.E.—N.W.), (E.—W.), অথবা (N.E.—S.W.) দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সঙ্গে নিম্ন স্তরের মেঘ-প্রবলতা থাকিলে প্রায়ই পূর্ব্বা বাদল (Monsoon) হইতে দেখা যায়।

ছিতরি

(৫) (W.—E.), (S.—N.), (N.—S.); এই তিন প্রকার গতি হইলে প্রায়ই শুকা যায়। কিন্তু বায়ুর বামাবর্ত্ত হইলে, (Cyclone) এই সকল দিক হইতেও প্রবল বৃষ্টি-বর্ষা হইয়া থাকে। ছিতরি-মেঘের বর্ণ যতই শুভ্র শ্বেতবর্ণের দেখাইবে, এবং মেঘসকল যতই ক্ষুদ্রাকার বিন্দু বিন্দু দেখা যাইবে, ততই বৃষ্টি-বর্ষার প্রবলতা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল ছিতরিমেঘ ময়লাটে তৈলাক্তবৎ দেখাইলে, প্রবল বায়ু হয়, বৃষ্টি হয় না।

বড় ছিতরি।—কদাচিৎ এই সকল উচ্চ-

স্তরের মেঘ খুব বৃহদাকার ধারণ করিয়া জলবর্ষণ করিয়া থাকে। ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে এপ্রকার ছিতরি-মেঘের বৃষ্টি আমরা দুই একবার দেখিয়াছি। শরৎকালে (ভাদ্র-আশ্বিন) যে বৃষ্টি হয়, তাহাও কতকটা এই জাতীয় মেঘ হইতে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ একটা খণ্ড মেঘ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এবং একই স্থানে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; ক্রমশঃ উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই প্রকার খণ্ডমেঘ সময়ে সময়ে এত অধিক জলবর্ষণ করে যে, বৃষ্টির পরিমাণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সুত্রাকার অশ্বপুচ্ছজাতীয় মেঘ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে নামিয়া আসিলে, এই প্রকার বড় বড় ছিতরি হইয়া থাকে। এই মেঘের গতি যে দিক হইতে হইতে থাকে, বৃষ্টি-বর্ষাও সেই দিক হইতে আসিবেই। নীচের প্রবহমাণ বায়ুর গতি ভিন্ন হইলে, প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। আর এই সকল ছিতরি-মেঘের অনুকূল প্রবহমাণ বায়ু থাকিলে, প্রায়ই বৃষ্টি-বর্ষা হইয়া থাকে।

কসাউ

(Cirro-Stratus) কসাউ মেঘ।—বায়ুর যে স্তরে 'ছিতরি' (Cirro-Cumulus) জাতীয় মেঘ হয়, সেই উচ্চস্তরে চন্দ্রাতপের মত একটা প্রবল মেঘ উৎপন্ন হয়। দূর হইতে কোনও বাদল দেখিতে পাইলে, এই মেঘ চিনিবার সুবিধা হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গদেশে যে 'পশ্চিমা মেঘ' (Norwester) এবং ঝড় হয়, সেই বাদলে প্রথমতঃ একটা চন্দ্রাতপের মত বৃহদাকার মেঘ আসিয়া, ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলে। তখন নীচের বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতেই বহিতে থাকে, কিন্তু এই কশমেঘটা উপরাকাশে N.W.—S.E. গতি প্রাপ্ত হয়; দেখিলে বোধ হয় যে, ঠিক যেন কোনও ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ী সামিয়ানা খাটানো হইতেছে। সেই সময়ে নিম্নস্তরের মেঘ কিছু থাকে না। সমস্ত আকাশ এই কসাউ মেঘে আচ্ছন্ন হইলে, পশ্চিম-উত্তর দিকে অপেক্ষাকৃত ঘোরবর্ণের অপর একটা বৃহদাকার মেঘ উঠিতে থাকে, এবং সন্ধ্যার সময়ে উহাতে বিদ্যুৎ হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় মেঘ মধ্যম স্তরে উৎপন্ন হইয়া মধ্যমস্তরেই ভাসমান থাকে। এই মধ্যম স্তরের নীচে কৃষ্ণ-লোহিত, কৃষ্ণ-নীল, অথবা হরিৎ-কৃষ্ণ বর্ণের অনেক ছোট মেঘ দৃষ্ট হয়; শেষোক্ত মেঘগুলি তৃতীয় স্তরের। এই প্রকার তিনস্তর মেঘে আকাশ পূর্ণ হইলে, বৃষ্টি পড়িতে থাকে। কোনও সময়ে বৃষ্টি পতনের পূর্ব্বে, উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবল ঝড় উপস্থিত
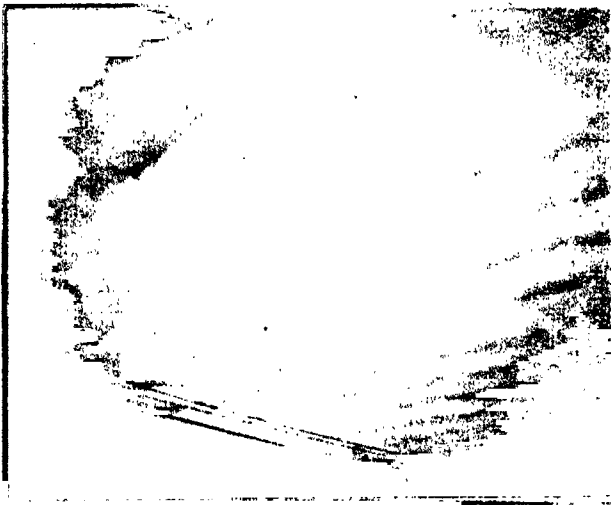
বড় ছিতরি

হয়। এই ঝড় আসিলে প্রবহমাণ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বায়ু ফিরিয়া যায়।

বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে এই "কসাউ" বাদলের আগমন লক্ষ্য করিলে, তিন স্তরের মেঘসকল চিনিবার সুবিধা হয়।

মধ্যমস্তরের পুষ্কর মেঘ (Comulus, বা Cumulus)।—গ্রীষ্মকালে প্রতিদিনই বায়ুর মধ্যমস্তরে অর্থাৎ প্রায় তিন ক্রোশ উপরে, পর্ব্বতাকার শুভ্র মুক্তাসন্নিভ বর্ণের মেঘসকল দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভার এবং গর্জ্জন-শব্দের উৎপত্তি হয়। বজ্রপাতাদি এবং নানাপ্রকার বৈদ্যুতিক শোভার জন্য এই মেঘ দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে যুগপৎ ভীতি, এবং মহান্ সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। বিদ্যুৎ-রেখা কখনও দণ্ডাকার, এবং কখনও বা অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার ন্যায় আকার ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে এই জাতীয় মেঘ হইতে নানাপ্রকার বর্ণ প্রকাশিত হয়। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন যে, ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল এবং মরুৎ অর্থাৎ বায়ু মিশিয়া মেঘ জন্মে। এ কথাও অনেকটা ঠিক। অন্ধকারময় নিশীথে এই মেঘ হইলে, সময়ে সময়ে ঈষৎ আলো হইয়া থাকে। এই আলো কেন হয়?

এই মেঘ প্রবল বিদ্যুতের আধার। মাথার উপর আসিবামাত্র এই মেঘ দ্বারা বৈদ্যুতিক যন্ত্র সকল পরিবর্ত্তিত হয়। বায়ুমানের চাপও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়াছে।

নিম্নস্তরের মেঘ (Stratus)।—শীতকালে আমাদের দেশে যে কুয়াসা হইতে দেখা যায়, নিম্নস্তরের মেঘসকলের গঠন ঠিক সেই প্রকার। ছয় শত হইতে সহস্র ফুট উপরে সেই মেঘ উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে বিদ্যুৎ দেখা যায় না। এই মেঘে বৃষ্টি হয় না। প্রবহমাণ বায়ু মধ্যে একটা জলধি অদৃশ্য বাষ্পাকারে থাকায়, প্রবহমাণ বায়ু আমাদের প্রীতিকর এবং স্নিগ্ধ বোধ হয়। অকস্মাৎ কোনও কারণে প্রবহমাণ বায়ু মধ্যে স্থানে স্থানে শৈত্য উপস্থিত হইলে, নিম্নস্তরে কুয়াসার মত খণ্ডাকার

মধ্যম স্তরের পুষ্কর মেঘ

মেঘ উৎপন্ন হয়; বেলুন যন্ত্র দ্বারা অনেকে এই মেঘ ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছেন। এই মেঘ মধ্যে বৈমানিক-(বেলুন যাজ ?) দিগের কাপড় ভিজিয়া যায়। এই মেঘ ভেদ করিতে কোনও কোনও সময়ে ৫ মিনিট লাগে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল মেঘের গভীরতা ও নিতান্ত কম নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই মেঘে বৃষ্টি হয় না। তাহা না হইলেও এই মেঘ দ্বারা বায়ুর আর্দ্রতা রক্ষিত হয়।

প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল যতই অনুধাবন করা যায়, ততই আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ সকল ব্যাপারের যিনি আদিভূতা, সেই পরম আরাধ্যা প্রকৃতি দেবীর বৈজ্ঞানিক ক্রীড়ন সকল কেমন সুন্দর! নিম্নস্তরের এই Stratus মেঘ না থাকিলে, বোধ হয় বৃষ্টি-বর্ষা অধিক হইত না।

বৃষ্টির সময়ে প্রবহমাণ বায়ু প্রায়ই ভিজিয়া যায়। বায়ু ভিজিয়া যায়, এই প্রকার বর্ণনা দ্বারা আমরা পাঠকবর্গের মনে হয়ত একটা অসম্ভব ব্যাপারের অবতারণা করিতেছি, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আমরা একবার 'শুষ্ক জল' বুঝাইয়াছি।

এক্ষণে ভিজা বায়ু কি প্রকার তাহা বলিব। আমাদের দেশে সকলেরই ধুতিসাড়ী সকল কাচিয়া শুষ্ক করিতে হয়। কোনও দিন একখানা কাপড় মেলিয়া দিবার ২।৩ মিনিট মধ্যেই কাপড় শুষ্ক হইয়া যায়। কোনও দিন উহা শুষ্ক হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা লাগে। কোনও দিন উহা আদৌ শুষ্ক হয় না। শুষ্ক হইতে সময়ের এই প্রকার ভিন্নত্ব কি কারণে হয়?

নিম্নস্তরের মেঘ

যদি প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একখানি রুমাল জলে আর্দ্র করিয়া শুষ্ক হইতে দেওয়া হয়, এবং উহা শুষ্ক হইতে কত সময় লাগিল, ইহা ঘড়ী দেখিয়া লিখিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কোন্ দিন বায়ুতে কত জল আছে, তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়।

যে দিন আর্দ্র বস্ত্র আদৌ শুষ্ক হয় না, সেই দিনের বায়ু ভিজিয়া গিয়াছে; তাহাতে আর জল ধরে না। সুতরাং এই প্রকার আর্দ্র বায়ু বস্ত্র হইতে জলশোষণ করিতে পারে না; ভিজা কাপড় ভিজাই থাকে।
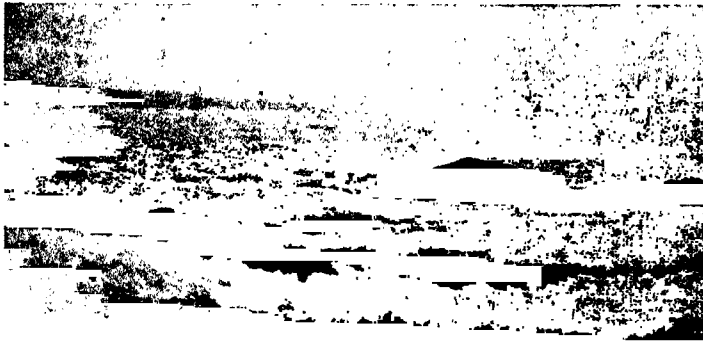
নিম্নস্তরের মেঘ—প্রকারান্তর

প্রবহমাণ বায়ুতে যদি জলের স্থান থাকে, তবে তাহা জল টানিয়া লইবে; সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, মহামেঘ-সঞ্চার হইয়াও বৃষ্টি হইল না; এপ্রকার হইলে বুঝা যায় যে, বায়ু শুষ্ক বলিয়া মেঘের জল সমস্ত টানিয়া লইয়াছে। প্রবল বৃষ্টির সময় নিম্নস্তরের Stratus জাতি মেঘ অনেক উৎপন্ন হইয়া বায়ুকে আর্দ্র করিয়া রাখে, এই জন্য জলবর্ষণকারী মেঘগুলি শুকাইতে পায় না।

পর্ব্বতময় প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পর্ব্বতের মধ্য প্রদেশে শুভ্রবর্ণের মেখলার ন্যায় একজাতীয় মেঘ হয়, তাহাও নিম্নস্তরের Stratus জাতীয় মেঘ।* সন্ধ্যার সময়ে এই জাতীয় মেঘে কোনও কোনও দিন আকাশ পরিপূর্ণ হইলে, বোধ হয়, যেন মেঘের সিঁড় হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিম্নস্তরের এই মেঘ দ্বারা বায়ুর আদ্রতা রক্ষা হয়। এই জাতীয় মেঘে বৃষ্টি হয় না।

প্রবল বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ Cirro-Stratus (কশমেঘ) দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন হয়, তাহার নীচে Cumulus জাতীয় বৈদ্যুতিক মেঘসকল পর্ব্বতাকার দেখা যায়, এবং বহুপরিমাণে নিম্নস্তরের Stratus মেঘও উৎপন্ন হয়; এই তিন স্তর মেঘ উৎপন্ন হইলেই বুঝা যায় যে, নিশ্চয়ই জল হইবে। কিন্তু নিম্নস্তরের অথবা মধ্যমস্তরের Cumulus মেঘের অভাব অথবা অল্পত্ব হইলে, প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। মেঘ দেখিয়া বৃষ্টি-বর্ষা নির্ণয় করিবার পদ্ধতি অতি সহজ, সকলেই ইহা শিখিতে পারেন। এই পদ্ধতি অভ্যাস করিতে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কোনও আবশ্যক নাই।

এই প্রবন্ধের প্রথমে আমরা কয়েকটি বর্ষাবিষয়ক প্রাচীন কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেকেই উহা জানেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সকল কবিতার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-সকল রহিয়াছে, তাহা সকলের জানা নাই; আমরা সেই জন্যই উহার বিশদ অর্থ লিখিলাম।

"কি কর শ্বশুর লেখা জোখা,
মেঘেই দেখ্‌বে জলের লেখা।"

আমাদের বঙ্গদেশে একটা প্রবাদ আছে যে, বৃহৎসংহিতা-প্রণেতা বরাহাচার্য্যের খনা নাম্নী এক পুত্রবধূ ছিলেন। খনা বিদেশিনী। সমুদ্রপারস্থ রক্ষোজাতি খনাকে প্রতিপালন করিয়াছিল। খনা জ্যোতিষ এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রে

* "আমেখলা সঞ্চরতাং ঘনানাং, ছায়ামধঃসানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে, শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥কুমারসম্ভব।

সুপণ্ডিতা ছিলেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য কিছু আছে কি না, এবং খনার বচনসকল সেই বৈজ্ঞানিক বিদেশিনী কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে কি না, সেই সকল ঐতিহাসিক সমস্যার বিচার করিবার উপস্থিত কোনও হেতু নাই। খনা-নাম্নী বিদেশিনী বরাহাচার্য্যের পুত্রবধূ হউন অথবা না হউন, তিনি উজ্জয়িনী প্রদেশেই থাকুন, অথবা আমাদের নদীয়া-শান্তিপুরেই থাকুন, তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে অথবা কোনও গ্রীক-সীমন্তিনী হউন, উপস্থিত আমরা তাহা দেখিব না। খনা-বিষয়ক প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা সকল থাকায়, এবং ঐ সকল কবিতায় মধ্যে মধ্যে 'শ্বশুর' শব্দ থাকায়, আমরা মনে করি, খনা বাঙ্গালা দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; আর তাঁহার শ্বশুরের সঙ্গে তিনি একটু বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা করিতেন। "কি কর শ্বশুর লেখা জোখা," "কি কর শ্বশুর মতিহীন," "এমন যাত্রায় শ্বশুর কভু নহে সুখ" ইত্যাদি বাক্য খনার বচনে থাকায় ইহাও বোধ হয় যে, খনা আপন বিদ্যার একটু দর্পও করিতেন। শ্বশুরের মতসকল খণ্ডন করিতে তিনি কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না।

মেঘের শুভলক্ষণ-বিচার দ্বারা বৃষ্টিবর্ষা নির্ণয় করিতে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করিতে হয়; খনা বলিয়াছেন, উহা অপেক্ষা মেঘ দেখিয়া, বৃষ্টিবর্ষা সহজেই নির্ণীত হইতে পারে। কারণ বৃষ্টি একেবারে হঠাৎ হইতে পারে না; শুষ্ক আকাশে মুহূর্ত্তমাত্রেই বৃষ্টি আসে না। অনেক সময়ে দুই কি তিন দিবস পূর্ব্বে বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ সূচিত হয়। "কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা"—একথায় Cirro-Cumulus অথবা ছিত্তির মেঘ বুঝায়। ফাল্গুন, চৈত্র, এবং বৈশাখ মাসে ইহাই বর্ষার পূর্ব্বলক্ষণ হয়। শীতকালের আকাশে অশ্বপুচ্ছবৎ Cirrus মেঘের প্রবলতা থাকে। দুই চারিদিন S. W. (দক্ষিণ-পশ্চিম) দিক হইতে সামুদ্রিক বায়ু বহিতে থাকিলেই অশ্বপুচ্ছবৎ মেঘসকল অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে নামিয়া পড়ে, এবং ছিত্তরি মেঘ সকল উৎপন্ন হয়। খনা ইহাকেই 'কোদালে কুড়ুলে' মেঘ বলিয়াছেন। কেবল ইহা হইলেই বৃষ্টি হইবে না, ইহার সঙ্গে প্রবল দক্ষিণ-পশ্চিমের বায়ুও থাকা চাই।

বঙ্গদেশের দক্ষিণাবায়ু মাত্রেই সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পরাশি বহন করিয়া, উত্তর দিকে (হিমালয় পর্ব্বতের দিকে) লইয়া যায়। হিমাদ্রির ক্রোড়দেশে ঐ বায়ু বাধা প্রাপ্ত হইয়া উপরে উঠে, এবং উপরিস্থিত শৈত্যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া ঐ বায়ু পুনরায় দক্ষিণাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয় এবং জলবর্ষণ করে। ঐ বায়ু প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে উহার গতি N. W.—S. E. হইয়া, থাকে। ফাল্গুন এবং চৈত্রমাসে বঙ্গদেশের উপরিভাগের বায়ুর অবস্থা পার্শ্বস্থ চিত্র
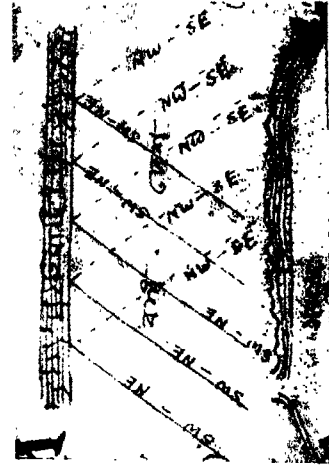
উপরিভাগের বায়ুর অবস্থা

দ্বারা দেখান হইল। নীচের বায়ু-রেখাসকলে S. W.—N. E. এবং হিমাদ্রি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঐ বায়ু দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারেই আমাদের বঙ্গদেশে বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে পশ্চিমামেঘ (Nor'-wester) উৎপন্ন হয়। যতদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাবাদল না আসে, ততদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে পশ্চিমামেঘেই জল হয়। এই পশ্চিমা-মেঘের শোভা দেখিলে, মন মোহিত হয়। এই মেঘ অত্যন্ত উপর আকাশে উৎপন্ন হয়, এবং যে দিন বৃষ্টি হইবে, সেই দিন বেলা ৩টা কি ৪ টার সময় উত্তর-পশ্চিমাকাশে পর্ব্বতাকার Cumulus মেঘ-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই মেঘশ্রেণী এতই উপরে প্রস্তুত হয় যে, অনেক সময় পঞ্চাশ ক্রোশ দূর হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যতই বেলা শেষ হয়, ততই একটা চন্দ্রাতপের মত মেঘ উপর আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিমে প্রবল দণ্ডাকার বিদ্যুৎ দেখিতে পাওয়া যায়; এই বিদ্যুৎ যদি বৃক্ষশাখার ন্যায় সমস্ত আকাশ ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বৃষ্টি অধিক হইবে না। নিম্ন আকাশে চক্রবালের নিকট প্রবল বিদ্যুৎ হইলে, বর্ষার আধিক্য বুঝিতে হয়।

সন্ধ্যার পরে এই বাদল আসিলে, বিদ্যুতের বড় শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। উপর আকাশে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মেঘসকল অগ্রসর হইতে থাকে, এবং তাহার নীচে চক্রবালের উপর যেন একটা আলোকময় চন্দ্রাতপ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়, এবং বৃষ্টির সহিত প্রবল বায়ু বহিতে থাকে। "অমোঘাঃ পশ্চিমমেঘাঃ" এই মেঘ সম্বন্ধেই কথিত হয়।

"পশ্চিমে উঠিল কাঁড়, ডাঙ্গাডোবা একাকার"—কাঁড় অর্থাৎ ধনু। পশ্চিমে যে দিন ইন্দ্রধনু দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দিন এত বৃষ্টি হয় যে, ডাঙ্গা অথবা ডোবা একাকার দেখা যায়; অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টি হয়। সকলেই জানেন যে, ইন্দ্রধনু সূর্য্যের বিপরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকালেই পশ্চিমে ইন্দ্রধনু দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রধনু অপরাহ্ণ কালেই দেখা যাইবার সম্ভাবনা। ইতঃপূর্ব্বে আমরা যে মধ্যম স্তরের পুষ্কর মেঘের বর্ণনা করিয়াছি, বর্ষাকালে কোনও দিন S. W. বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া ঐ প্রকার মেঘে প্রবল বৃষ্টি হয়। রাত্রি শেষে পশ্চিমাকাশে প্রবল বিদ্যুৎ, এবং তৎসঙ্গে স্নিগ্ধ জলবাহী দক্ষিণ-পশ্চিমবায়ু, এই বাদলের পূর্ব্বলক্ষণ। সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই পশ্চিম দিকে পর্ব্বতাকার মেঘশ্রেণী, এবং তাহার নীচে ঘন কৃষ্ণবর্ণের সজল মেঘে উজ্জ্বল ইন্দ্রধনু দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণ দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, সেই দিবস বারম্বার প্রবল বৃষ্টি হইবে; এবং জলাশয়াদি পূর্ণ হইয়া যাইবে।

অপরাহ্ণ-কালে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হইলে, পরবর্ত্তী কয়েক দিবস প্রায়ই ধরণ করিয়া থাকে। বৃষ্টিবর্ষা হয় না। এইজন্য খনা বলিয়াছেন, "পূর্ব্বের ধনু নিত্য খরা।"

"তপন উঠে সিঁন্দুর ছড়ায়"—প্রাতঃকালে আকাশের চারিদিকে যদি সিন্দুর-বর্ণের মেঘসকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইদিন নিশ্চয়ই প্রবল বৃষ্টি হইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, বায়ু-সমুদ্রে জলীয় বাষ্পাধিক্য হইলেই মেঘসকল ঘোর লোহিতবর্ণ ধারণ করে। প্রাতঃকালে যে দিন সিন্দুরবর্ণের মেঘসকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দিন বায়ু এত আর্দ্র হইয়াছে যে, উহা দিবসের উত্তাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জলবর্ষণ করিতে থাকিবে। অপরাহ্ণ-কালে ঐ প্রকার সিন্দূরবর্ণের মেঘ হইলে, ইহার বিপরীত ফল হয়। পরদিবস প্রায়ই প্রবল বায়ু হয়, এবং বায়ু শুষ্ক হইয়া যায়।

"চাঁদের সভার মধ্যে তারা"—আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি যে, চন্দ্রের সহিত কোনও গ্রহ যুক্ত হইলেই বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টি হয়। চন্দ্রসভা প্রায়ই উচ্চ স্তরের মেঘে হইয়া থাকে। অণুপ্রমাণ তুষারকণাসমূহ একত্র হইলেই চন্দ্রসভা (Lunar Corona) দৃষ্ট হয়; ঐ প্রকার হইলে, আকাশে একটা স্বচ্ছ মেঘ হইয়া থাকে। চন্দ্রের জ্যোতিঃ বশতঃ সাধারণ নক্ষত্রাদি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তার উপর আবার একটা মেঘাবরণ থাকিলে, নক্ষত্রাদি একেবারেই অদৃশ্য হইবারই কথা। কিন্তু এপ্রকার অবস্থাতেও যদি চন্দ্রসভার মধ্যে তারা দেখা যায়, তাহা হইলে পরদিবসে নিশ্চয় প্রবল বৃষ্টি হইবে।

বৃহস্পতি, মঙ্গল, অথবা শনি গ্রহ যদি চন্দ্রের নিকট থাকে, এবং সেই সময়ে যদি উপর আকাশে বরফের মেঘ হয়, তবেই চন্দ্রসভার মধ্যে তারা দেখায়। এপ্রকার হইলে বৃষ্টি নিশ্চয়ই হইবে। সাধারণ কৃষকবর্গকে 'চন্দ্রসমাগম' বুঝানো এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং চন্দ্রসভার মধ্যে তারার কথা বলিয়া, খনা অল্প কথার মধ্যে অনেকটা বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব একত্র করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট নাই।

"দূর সভা নিকট জল"—চন্দ্র হইতে সভা যদি দূরে দেখায়, তবে শীঘ্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু হইতে যত নিকটে বরফের মেঘ হইবে, চন্দ্রসভা ততই বৃহদাকার হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, বায়ুসমুদ্রের মধ্যভাগে ভয়ঙ্কর শৈত্য আসিয়াছে; দিনের বেলা সূর্য্যোত্তাপে নদী, তড়াগ, অথবা সমুদ্রের জলরাশি বাষ্পাকারে উপরে উঠিতে থাকে। উপরে উঠিয়া যেই শীতল বায়ুস্তর প্রাপ্ত হয়, অমনি তাহা মেঘাকার ধারণ করে। আর যদি উপরে উঠিবার স্থান না পায়, তবে সেই বাষ্পরাশি শৈত্যবশে বৃষ্টিধারারূপে নীচে পড়িয়া যাইবে। এই জন্য চন্দ্রসভার আকৃতি যতই বড় হইবে, ততই শীঘ্র বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা বুঝিতে হয়।

"নিকট সভা রসাতল"—চন্দ্রের খুব নিকটে সভা হইলে, বুঝিতে হইবে যে, শীতল বায়ুস্তর অনেক উপরে উঠিয়াছে।

এই প্রকার হইলে, অনেক পরিমাণ জলীয় বাষ্পের স্থান থাকে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, সূর্য্যোত্তাপে যতই জল অদৃশ্য বাষ্পাকারে উঠুক, সহজে তাহা মেঘাকার ধারণ করিবে না—বৃষ্টিধারারূপে তাহা নীচে পড়িবে না ; সুতরাং কয়েক দিন বৃষ্টি হইবে না।

"দিনে জল, রেতে তারা, এই জানবে শুকার ধারা"—যে বৎসর রাত্রিকালে আকাশ পরিষ্কার থাকিবে, এবং দিবসেই বৃষ্টিবাদলা হইবে, সেই বৎসর সুবর্ষা হইবে না। উপর আকাশের শৈত্য, অধিক নীচে আসিলেই এইপ্রকার হয়। মোটা কথায় বলিতে গেলে, এইরূপ লক্ষণ হইলে বুঝিতে হইবে যে, বায়ুসমুদ্রে জলীয় বাষ্পের অধিক স্থান নাই। দিনের বেলা সূর্য্যোত্তাপে যেটুকু জল বাষ্প হইল, একটু উপরে উঠিবামাত্র তাহা শীতল বায়ুর সংস্পর্শে মেঘ হইল, এবং বৃষ্টিরূপে পড়িয়া গেল। বেলা অবসান হইলে বায়ুসমুদ্রে আর জলীয় বাষ্প বড় রহিল না। সুতরাং রাত্রিকালের আকাশে নক্ষত্র সকল বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাত্রিকালে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, বায়ুসমুদ্রে জলীয় বাষ্পের অনেক স্থান আছে। শীঘ্রই হউক, অথবা কিছু বিলম্বেই হউক, প্রবল বৃষ্টি-বাদলা হইবেই। আর এই প্রকার প্রবল বৃষ্টি হইতে গেলে মধ্যে মধ্যে একটু ধরণও চাই। বায়ু-সমুদ্রে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প সঞ্চিত না হইলে, প্রবল বৃষ্টি হইবে কি প্রকারে?

মায়ের হাসি

[শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

পত্রে পত্রে আচ্ছাদিত
অরণ্যানী মনোহর,
কি সুন্দর কি মোহন
কুসুমিত তরুবর!
শ্যাম কুঞ্জ মাঝে
উঠে বিহগের কলতান,
সেই শান্ত তপোবনে
সেই শান্ত সাম-গান!
প্রতিধ্বনি মুখরিত
দিকে দিকে উজ্জ্বলতা,
ঘোষণা করিয়া দেয়
আনন্দের ব্যাকুলতা।
সুনীল গগনতলে
রবি শশী ভেসে যায়,
দিক্ হ'তে দিগন্তরে
বহে সে মধুর বায়।
তৃণ-শস্যে তরঙ্গিত
ক্ষেত্রগুলি অপরূপ,
সে তরঙ্গ-শিরে যেন
ভেসে যায় স্বর্ণস্তূপ!
এইত মায়ের হাসি
সন্তান মঙ্গল তরে,
মা ছাড়া কি আর কেহ
সে হাসি হাসিতে পারে?
আনন্দের এই হাসি
তুলে আনন্দের রোল,
আনন্দে পেয়েছি আমি
আনন্দময়ীর কোল!

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা] পুরলক্ষ্মী

Color Blocks & Printings by
K. V. SEYNE & BROS. CALCUTTA

সারস্বত-প্রসঙ্গ

শ্রীরামচন্দ্রের-সীতাবর্জ্জন

[শ্রীসত্যবন্ধু দাস]

"কনকনিকষভাসা সীতয়ালিঙ্গিতাঙ্গো
নব কুবলয়দাম শ্যামবর্ণাভিরামঃ।
অভিনব ইব বিদ্যুন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ
শময়তু মম তাপং সর্ব্বতো রামচন্দ্রঃ॥
কবীন্দুং নৌমি বাল্মীকিং যস্য রামায়ণীং কথাম্।
চন্দ্রিকামিব চিন্বন্তি চকোরা ইব সাধবঃ॥"

অতি সংকুচিতভাবে, অতি ভয়ে ভয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমাজে রামচরিত সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করিতেছি। বিষয় নিতান্তই দুরবগাহ, এবং আমি অতি অকিঞ্চন, তাই আমার আশঙ্কা এবং সঙ্কোচ। বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে মহামাননীয় কীর্ত্তিভাস্বর সম্রাট্ হইতে অনেক অতিরথ, মহারথ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনে এই প্রশ্নটি কখনও উদিত হইয়াছে কি না, তাহা জানি না;—এবং কেহ এই বিষয় লইয়া স্বতন্ত্রভাবে কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন কি না, তাহাও অবগত নহি। তন্নিমিত্ত, সাহিত্য-সমর-ক্ষেত্রে, একজন সাধারণ প্রাইভেট পদাতি বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যতা না থাকিলেও, এই অধম, এই সমস্যাটি লইয়া, সুধী-সজ্জনদিগের শ্রীচরণোপান্তে উপস্থিত হইতেছে,—আশা করি, তাহার ধৃষ্টতা সকলে ক্ষমা করিবেন।

বঙ্গ-সাহিত্যের যে সকল সুযোগ্য লেখক শ্রীরামচন্দ্রের চরিত-কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই আদর্শ-পুরুষের চরিত্রের মধ্যে তিনটি দোষ বা দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়াছেন। বালিবধ, সীতা-পরিত্যাগ এবং শম্বূকবধ, এই তিনটি দোষের কথাই তাঁহারা কহিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন কি না জানি না,—আমার মনে হয়, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন তাঁহার চতুর্থ কলঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সমালোচক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই নানাবিধযুক্তি প্রয়োগ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের কলঙ্কগুলির কৈফিয়ৎ দিয়া, তাঁহাকে দোষমুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন,—কেহ কেহ আবার তদ্রূপ চেষ্টা নিষ্ফল বোধে অভিযোগগুলি স্বীকার করিয়া, 'কবুল জবাব' দেওয়াই ভাল মনে করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের কবিচূড়ামণি শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি কি কৌশল প্রয়োগ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রকে বালিবধরূপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাহা "মহাবীর চরিতের" পাঠকগণ অবগত আছেন। তিনি কিন্তু "উত্তর রাম চরিত" নাটকের স্থানে স্থানে পাত্র-পাত্রীবিশেষের মুখ দিয়া এমন সকল কথা বলাইয়াছেন, যাহাতে মনে হয় যে, তাঁহার মতেও রামচন্দ্রের সীতা-পরিত্যাগ ও শম্বূকবধ ভাল কাজ হয় নাই। অবশ্য, ইহা আমার নিজের ব্যক্তিগত মত;—আমি সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি;—আমার ভুল হওয়ারও বাধা নাই। যাহা হউক, ভবভূতির নাটকদ্বয় যে বাল্মীকি-রামায়ণ-অবলম্বনে রচিত হয় নাই,—তাহা পাঠকমাত্রই জানেন। আমি রামচরিত-সম্বন্ধে বাল্মীকি রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলিয়া মনে করি না।

সত্যই কি শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। পাঠক-মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে আমাকে উপহাস করিবেন, তাহা আমি জানি,—এবং তজ্জন্য আমার দুঃখ নাই। তবে অধমের নিবেদন এই যে, তাঁহারা অগ্রে কৃপা করিয়া, তাহার বক্তব্যগুলি শুনিয়া, তবে যেন "রায়" দেন।

শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে আরও অনেকগুলি কথা পাওয়া যায়, যথা (১) ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকাকের সীতাদেবীর প্রতি দুর্ব্যবহার এবং তজ্জন্য রামের

শরে তাহার একটি চক্ষুর হানি ; (২) রাবণ-কর্ত্তৃক প্রকৃত সীতা অপহৃতা হন নাই,—কুটীরের হোমাগ্নিতে সীতাদেবী প্রবেশ করিয়াছিলেন,—রাবণ কেবল একটা ছায়া-সীতা অথবা মায়াসীতা লইয়া গিয়াছেন—এবং রাবণ-বধের পর অগ্নিদেব রামচন্দ্রকে প্রকৃত সীতা অর্পণ করেন ; (৩) লঙ্কা-সমরের সময়ে রাবণ-পুত্র মহীরাবণ, রাম-লক্ষ্মণকে মায়ামোহিত করিয়া পাতালপুরে লইয়া গিয়া, তাঁহাদিগকে কালিকা দেবীর নিকট বলি প্রদান করিবার বাসনা করেন কিন্তু প্রভুভক্ত হনুমানের দ্বারা তাঁহারা রক্ষা পান ; (৪) লঙ্কা-সমরের সময় রামচন্দ্র শরৎকালে দশভুজা দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন ; (৫) সীতা-বর্জ্জনের পর অশ্বমেধ যজ্ঞ-কালে—যজ্ঞাশ্ব-রক্ষা ব্যপদেশে রামলক্ষ্মণাদির সহিত লব-কুশের যুদ্ধ ; (৬) অসিতারূপে সীতাদেবী কর্ত্তৃক শতস্কন্ধ রাবণ বধ ইত্যাদি।—মহাকবি বাল্মীকি নিজ রামায়ণ মধ্যে এই উপাখ্যানগুলির একটিকেও স্থান দেন নাই এবং তজ্জন্য আমি এই উপাখ্যানগুলিকে সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি।

বাল্মীকি ভিন্ন অন্য কোন ঋষি-প্রণীত উপাখ্যান বিশ্বাস করিতে কেন প্রস্তুত নহি,—তাহার কারণ কি বলিতে হইবে ? প্রধান কারণ এই যে, বাল্মীকি-রামায়ণ ভিন্ন অন্য সমুদায় রামোপাখ্যানই পৌরাণিক সময়ে রচিত। এক মহাভারত ভিন্ন আর সকল পুরাণই অর্বাচীন। বিষ্ণুপুরাণ যে, পুরাণ-গ্রন্থাবলী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সেই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

"ভগীরথাদ্যাঃ সগরঃ ককুৎস্থো
দশাননো রাঘবলক্ষ্মণৌ চ।
যুধিষ্ঠিরাদ্যাশ্চ বভূবুরেতে
সত্যং ন মিথ্যা ক্ব নু তে ন বিদ্মঃ ॥" ১৪৯ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪ অধ্যায়।

স্বয়ং বিষ্ণুপুরাণ যখন এই "কবুল জবাব" দিয়াছেন,—তখন অন্যান্য পুরাণ যে, রামচরিত সম্বন্ধে অধিকতর অজ্ঞতার পরিচয় দিবেন,—তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আমার বিশ্বাস, পৌরাণিক রামচরিত প্রায়ই বাল্মীকি হইতে অধিকাংশ গৃহীত (যেমন অগ্নিপুরাণীয় রামোপাখ্যান), কোথাও কোথাও বা কল্পনার আশ্রয় লইয়া গ্রথিত। বাল্মীকি যে রামচন্দ্রের সমসাময়িক ঋষি এবং সমগ্র রামায়ণ যে রামের রাজ্যকালেই রচিত হইয়াছিল, তাহা রামায়ণ, আদিকাণ্ড, প্রথম হইতে ৪র্থ সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই স্পষ্ট জানা যাইবে। সুতরাং বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

তবে কথা এই যে "সীতা-বর্জ্জন" বাল্মীকি রামায়ণেই আছে। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৫৫ সর্গে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে সীতা নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়াছেন। শুদ্ধ সীতাবর্জ্জন নহে,—শম্বুক-বধ এবং লক্ষ্মণ-বর্জ্জনও এই উত্তরকাণ্ডেই আছে। আমি বলিতে চাই, এই সমগ্র উত্তরকাণ্ডই পৌরাণিক কালের রচনা। বাল্মীকি, যুদ্ধ-কাণ্ডের সহিতই তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছিলেন ; পরে কোন "দামোদর" নিজ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা-বশতঃ আদিকবি-প্রণীত এই মহাকাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। আমি এরূপ সাহসের কথা কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আপনারা শ্রবণ করুন।

একথা সকলেই অবগত আছেন যে, গ্রন্থ-শেষেই তাহার ফলশ্রুতি যোজিত হইয়া থাকে। রামায়ণ মহাকাব্যের ষষ্ঠকাণ্ড অর্থাৎ যুদ্ধ-কাণ্ডের শেষাংশ আমরা পাঠকদিগকে শুনাইব,—তাহা হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, কাব্যের শেষ হইয়াছে কি না।

"রাম রাজা হইলেন,—বানরাধিপতি সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ স্ব স্ব রাজ্যে চলিয়া গেলেন। রাম প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতে চাহিলেন, —কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুতেই যুবরাজ হইতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ রামচন্দ্র কত পৌণ্ডরীক, অশ্বমেধ এবং অন্যান্য যজ্ঞ করিলেন। তাঁহার দশ সহস্র বৎসরব্যাপি রাজত্বে দশবার অশ্বমেধ-যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইল। আজানুলম্বিত বাহু, বিশালবক্ষ, প্রতাপবান্ মহারাজ রাম, লক্ষ্মণের সহায়তায় এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাঘব উৎকৃষ্ট রাজ্যলাভ করিয়া ভ্রাতৃ-বন্ধু-সুহৃদাদির সহিত বহুবিধ যজ্ঞ করিলেন। তাঁহার কোন নারীই রাজত্বকালে বৈধব্য-ক্লেশ পান নাই, প্রজা—ব্যাধি, সর্প এবং দস্যুতস্করাদির ভয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এমন কি, কেহই অনর্থ প্রাপ্ত হয় নাই,—কোন বৃদ্ধকে বালকের শব-দাহ করিতে হয় নাই। রামের আদর্শানুসারে সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরমানন্দে কালাতি-

পাত করিত, কেহ কাহারও হিংসা করিত না। রামরাজ্যে প্রজাগণ সহস্র সহস্র পুত্রের পিতা হইয়া, বীতশোক ও বীতরোগ হইয়া, সহস্র সহস্র বৎসর কাটাইয়া দিয়াছিল। রামরাজ্যে বৃক্ষসকল নিত্যই আবশ্যক ফলমূল ও পুষ্প প্রদান করিত, মেঘ যথাসময়ে বৃষ্টি প্রদান করিত এবং বায়ু সর্ব্বদাই সুখস্পর্শভাবে প্রবাহিত হইত,—সকল প্রজাই স্বীয় কর্ম্মে পরিতুষ্ট ও স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিল। রামচন্দ্র এইরূপে দশ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।"

ইহার পরেই ফলশ্রুতি, যথা :—

"ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাঞ্চ বিজয়াবহম্।
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১০৫॥
যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পুত্রকামশ্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ॥ ১০৬॥
লভতে মনুজো লোকে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।
মহীং বিজয়তে রাজা রিপুংশ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি॥ ১০৭॥
কৌশল্যেয়ং যথা মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণেন চ।
ভরতেন চ কৈকেয়ী জীবৎপুত্রাস্তথা স্ত্রিয়ঃ॥ ১০৮॥
শ্রুত্বা রামায়ণমিদং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি।
রামস্য বিজয়ঞ্চেমং সর্ব্বমক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ ১০৯॥
শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
শ্রদ্দধানো জিতক্রোধো দুর্গাণ্যতিতরত্যসৌ॥ ১১০॥
সমাগম্য প্রবাসান্তে রমন্তে সহ বান্ধবৈঃ।
শৃণ্বন্তি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১১১॥
তে প্রার্থিতান্ বরান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নুবন্তীহ রাঘবাৎ।
শ্রবণেন সুরাঃ সর্ব্বে প্রীয়ন্তে সম্প্রশৃণ্বতাম্॥ ১১২॥
বিনায়কাশ্চ শাম্যন্তি গৃহে তিষ্ঠন্তি যস্য বৈ।
বিজয়েত মহীং রাজা প্রবাসী স্বস্তিমান্ ভবেৎ॥ ১১৩॥
স্ত্রিয়ো রজস্বলাঃ শ্রুত্বা প্রসূয়ন্তে সুতান্ শুভান্।*
পূজয়ংশ্চ পঠংশ্চৈনমিতিহাসং পুরাতনম্॥ ১১৪॥
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
প্রণম্য শিরসা নিত্যং শ্রোতব্যং ক্ষত্রিয়ৈর্দ্বিজাৎ॥ ১১৫॥
ঐশ্বর্য্যং পুত্রলাভশ্চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
রামায়ণমিদং কৃৎস্নং শৃণ্বতঃ পঠতঃ সদা॥ ১১৬॥
প্রীয়তে সততং রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
আদিদেবো মহাবাহুর্হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ১১৭॥
এতদেব পুরাবৃত্তমাখ্যানং ভদ্রমস্তু বঃ।
প্রব্যাহরত বিশ্রব্ধং বলং বিষ্ণোঃ প্রবর্দ্ধতাম্॥ ১১৮॥
দেবাশ্চ সর্ব্বে তুষ্যন্তি গ্রহণাচ্ছ্রবণাত্তথা।
রামায়ণস্য শ্রবণে তৃপ্যন্তি পিতরঃ সদা॥ ১১৯॥
ভক্ত্যা রামস্য যে চেমাং সংহিতামৃষিণাকৃতাম্।
যে লিখন্তীহ চ নরা স্তেষাং বাসস্ত্রিবিষ্টপে॥ ১২০॥

"কুটুম্ববৃদ্ধিং ধনধান্যবৃদ্ধিং
স্ত্রিয়শ্চমুখ্যাঃ সুখমুত্তমঞ্চ।
শ্রুত্বা শুভং কাব্যমিদং মহার্থং
প্রাপ্নোতি সর্ব্বাং ভুবি চার্থসিদ্ধিম্॥ ১২১॥
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং
সৌভ্রাতৃকং বুদ্ধিকরং শুভঞ্চ।
শ্রোতব্যমেতন্নিয়মেন সদ্ভি—
রাখ্যানমোজস্করবৃদ্ধিকামৈঃ॥ ১২২॥"

—১৩০ সর্গ।

—লঙ্কাকাণ্ডং সম্পূর্ণম্॥

উদ্ধৃতাংশ অধিক হইল, কিন্তু নিরুপায়। পাঠকগণ বিবেচনা করুন,—এই লঙ্কাকাণ্ডের সহিত বাল্মীকি, রামায়ণ শেষ করিয়াছিলেন কি না। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই ফলশ্রুতি, মূল-গ্রন্থ রচনার অনেক পরে রচিত হইয়াছে। আমি মূর্খ লোক, সংস্কৃত রচনার ধারা বা ভঙ্গী তুলনা করিয়া কোন কথা বলিবার সামর্থ্য রাখি না; সে কথা পণ্ডিত পাঠক বিবেচনা করিবেন। আমি দেখিতে পাইতেছি, এই প্রশস্তি-রচক এই কয়টি শ্লোকের মধ্যে রামায়ণকে বার বার তিনবার "পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্" এবং একবার "ইতিহাসং পুরাতনম্" এবং একবার "পুরাবৃত্তং" বলিয়াছেন। বাল্মীকি নিজে আর ত তাঁহার নিজকৃত কাব্য সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতে পারেন না। তৎপরে সমস্ত প্রশস্তি-টুকুর মধ্যে পৌরাণিক বা কথক-মহাশয়ের চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গের সৌরভ পাওয়া যাইতেছে। হিন্দিভাষার দেশে কথকের নাম "ব্যাস"; যথা—শ্রী অমুক ব্যাস। বেশ চমৎকার নিয়ম। যাহা হউক, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে রামায়ণের কথা ক্ষত্রিয়গণকে শুনাইবার খুব একটা 'নাড়ীর টান' দেখা যাইতেছে। থাকুক সে কথা,—এখন এই ফলশ্রুতিতে দেখিতে পাইতেছি, ষষ্ঠকাণ্ড পর্য্যন্ত পুস্তককে বারংবার "রামায়ণম্" বলা হইয়াছে,—একবার "কৃৎস্নং"ও

* কেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি!

বলা হইয়াছে। অমরকোষে—দেখিতে পাই আছে—"সর্ব্বং বিশ্বমশেষং কৃৎস্নসমস্তনিখিলাখিলানি নিঃশেষম্ সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদন্যূনকে" এবং আমার মত মূর্খকে তরাইবার নিমিত্ত শ্রীমান্ কোলব্রুক ভট্টাচার্য্য এই শব্দগুলির অর্থ লিখিয়া দিয়াছেন—"All ; entire"। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি যে, প্রশস্তি-কারের মতে যুদ্ধকাণ্ড বা লঙ্কাকাণ্ডের সহিতই "সমগ্র" রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছে। আমার পরম পূজ্যপাদ ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের "সম্পাদিত" (কি অর্থ তাহা জানি না) বঙ্গানুবাদেও লেখা আছে—"সমগ্র পাঠ এবং শ্রবণ করিলে ইত্যাদি"। অতএব একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যাইতে পারে যে, এই প্রশস্তি যে সময়ে রচিত হয়, সে সময়ে উত্তর-কাণ্ড জগতে বিদ্যমান ছিল না। উত্তরকাণ্ড এই প্রশস্তি-রচনারও বহুপরে রচিত এবং উহা আদিকবির লেখনীপ্রসূত নহে। আমার মনে হয়, ইহা অনেক পরের কোন কাঁচা পৌরাণিকের দ্বারা রচিত হইয়াছিল বলিয়া আসল কাব্যখানির সহিত খাপ খায় নাই।

এই উত্তরাকাণ্ডের একটি স্বতন্ত্র সমালোচনা করিবার আমার ইচ্ছা আছে। এখানে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিব যে, এই কাণ্ডের রচয়িতা মূল রামায়ণের সহিত অনেক গোলমাল করিয়াছেন। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে রামরাজ্যের দীর্ঘ বর্ণনা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ আমি উদ্ধৃত করিয়াছি। অথচ উত্তরকাণ্ডের ৪৭ সর্গে রামের রাজ্যাভিষেকের প্রথম দিন হইতে বর্ণনা আছে। প্রথম ৪৬ সর্গ ঠিক পৌরাণিক ফ্যাসানে রাবণ সম্বন্ধে নানা প্রকার আষাঢ়ে গল্পে পরিপূর্ণ। ৫০ সর্গে নূতন করিয়া সুগ্রীবাদিকে বিদায় দেওয়া আছে। জনক এবং যুধাজিৎকে মাথার দিব্য দিয়া "বিদায় করা" অর্থাৎ তাড়াইয়া দেওয়া আছে। * এই উত্তরাকাণ্ডে সীতা-রামের মদ্যমাংস পান-ভোজনের কথা আছে,—আরও যাহা আছে, তাহা আমি বাঙ্গালায় "প্রকাশ করিয়া" বলিতে পারিব না। রামের সম্বন্ধে তাহা মুখে আনা blasphemy বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি। এই দেখুন, আপনারাই দেখুন,—৫২ সর্গে,—

"কুশাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ।
সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেয়কং শুচি ॥ ১৮ ॥
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
মাংসানি স সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ ১৯ ॥
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণমাহরন্।
উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ২০ ॥
অপ্সরোগণসঙ্ঘাশ্চ কিন্নরীপরিবারিতাঃ।
দক্ষিণাঃ রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ ॥ ২১ ॥
উপনৃত্যস্তু কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
মনোভিরামা রামাস্তা রামোরময়তাংবর ॥ ২২ ॥
রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ ॥"

এই কি একপত্নীব্রত, আদর্শ-ধার্ম্মিক, আদর্শ-পতি রামচন্দ্রের সুখভোগের বর্ণনা? "দক্ষিণা" স্ত্রী, একটি দুইটি নহে, সমূহকে সমূহ,—তাহারা কেবল মদমত্তা ও মনোভিরামা নহে—কিন্তু "রামা" আর "ধর্ম্মাত্মা (?) রময়তাংবরঃ রামঃ তাঃ রময়ামাস॥" ছি!—এইরূপ বর্ণনা—তাও এত উৎকটভাবে নহে,—বাল্মীকি রাবণের অন্তঃপুরের সম্বন্ধে করিয়াছেন বটে (সুন্দরকাণ্ড, ৫ম সর্গ) কিন্তু সে বর্ণনা দেশকালপাত্রসম্মত হইয়াছে এবং তাহার বর্ণনায় ছত্রে ছত্রে কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ "মোটা" জঘন্য ইয়ারকী সেখানে নাই। পাঠক যদি অধমের কথায় প্রত্যয় না করেন, মিলাইয়া দেখিবেন। কি সর্ব্বনাশ!—রাম-সীতাকে লইয়া বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়! না, না বিদ্যাসুন্দরেও এমন জঘন্য মদ্যমাংস ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হয় নাই! এ প্রকৃতই পৈশাচিক তাণ্ডব! এ যশোরের "সীতারামী" সুখের † চূড়ান্ত নিদর্শন!

যাঁহারা গম্ভীর বিষয় লইয়া ব্যঙ্গ করিতে পারেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, সখা বিভীষণ অথবা সুগ্রীবের সাহচর্য্যে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে দোষ প্রবেশ করিয়াছিল! স্বর্গীয় দীনবন্ধুমিত্র (রায় বাহাদুর,—সুপ্রসিদ্ধ নাটককার এবং কবি,) এরূপ ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন ; কথায় বলে—"তেজীয়ানের দোষ নাই"—কিন্তু আমার পক্ষে এরূপ ব্যঙ্গ অসহ্য।

উত্তরকাণ্ডের কবিবর কেবল শ্রীরামচন্দ্রকেই মদ্যমাংসপ্রিয় করিয়াই ছাড়েন নাই,—সুগ্রীব, হনুমান্, নীল, নল,

* এই স্থানের বর্ণনা দেখিলে মনে হয়, রাম যেন জনকাদিকে তাড়াইয়া সীতা-পরিত্যাগের পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন। আত্মীয়কে পুনঃ পুনঃ "যাও যাও" কেহ বলেন কি?

† যশোর জেলায় "সীতারাম সুখ" সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে ; তাহা রাজা সীতারাম রায় সম্বন্ধে। সত্য-মিথ্যা ভগবানই জানেন।

প্রমুখ বানরগণকেও মদ্যমাংস খাওয়াইয়াছেন। পাছে পাঠক মনে করেন, মূর্খ আমি ভুল বুঝিয়াছি,—তাঁহারা ফুলের মধু বা মৌচাকের মধু খাইয়াছেন,—তাই একটু তুলিয়া দিতে হইল,—৪৯ সর্গে রামচন্দ্র বানরদিগের খুব প্রশংসাবাদ করিয়া অতঃপর

"এবমুক্ত্বা দদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্হতঃ।
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি সস্বজে চ নরর্ষভঃ॥ ২৫॥
তে পিবন্তঃ সুগন্ধীনি মধুনি মধুপিঙ্গলাঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি মূলানি চ ফলানি চ॥ ২৬॥
এবং তেষাং নিবসতাং মাসঃ সাগ্রো যযৌ তদা।
মুহূর্ত্তমিব তে সর্বে রামভক্ত্যাশ্চ মেনিরে॥ ২৭॥"

বানরের পরিধেয় বহুমূল্য বসনভূষণ, তাহাদের ভক্ষ্য মাংস, তাহাদের পানীয় মদ্য; সুতরাং, বানরেরা সেই প্রাচীন ত্রেতাতেই যে বেশ civil gentlemen হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে! * পাঠক, তবু কি বলিবেন, ইহা বাল্মীকির রচনা?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উত্তরকাণ্ডের পৃথক্ একটি সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। ইহাতে অনেক আজগুবি গাঁজাখুরী বর্ণনা নিতান্ত কাঁচা হাতের রচনায় গ্রথিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, যোগ্যব্যক্তি হাস্যরসাত্মক বেশ একখানি গ্রন্থ লিখিতে পারেন।—আমাদের কিন্তু কান্না আসে। এই লেখক কোন্ অপরাধে মা-জানকীকে এরূপ অপবাদ-গ্রস্তা করাইয়া নির্ব্বাসন দিলেন? কোন্ অপরাধে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম, আদর্শ নরপতি এবং আদর্শ স্বামীর চরিত্রে এরূপ কলঙ্ককালি মাখাইলেন? ইহা অবশ্য প্রকৃত কথা যে, এই সীতার বনবাস-আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করুণরসাত্মক নাটক রচিত হইয়াছে এবং আমাদের মধুর মাতৃভাষায়ও কয়েকখানি মর্ম্মভেদী করুণ কাব্য লিখিত হইয়াছে।—কোনও ভাবুক ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাস"কে "কান্নার জোলাপ" বলিয়াছেন।—তথাপি আমি বলিব যে, ঐ আখ্যায়িকা কেবলমাত্র কল্পনার উপর,—রামচন্দ্রের প্রজা-প্রেমের একটা ঝুটা উচ্চ আদর্শের উপর গঠিত। পাঠক দেখিবেন, কি অকিঞ্চিৎকর কারণে উত্তরকাণ্ডের রাম সীতা-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পুরুষসিংহ, আদর্শনরপতি, সীতাপতি রামচন্দ্র, দুই চারিজন ছোট-লোকের মুখে প্রচারিত অপবাদের ভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! লঙ্কাকাণ্ডে তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, সমীরণ—এমন কি তাঁহার পরলোকগত পিতা দশরথ পর্য্যন্ত আসিয়া—সীতার সচ্চরিত্রতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। তখন রামচন্দ্র কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি সীতা যে নিষ্পাপ তাহা জানিতেন তথাপি পাছে এরূপ কথা উঠে, "দশরথ-পুত্র রাম নিতান্ত কামপরতন্ত্র এবং সাংসারিক ব্যাপারে একান্ত অনভিজ্ঞ" তাই তিনি সীতার পরীক্ষা দেওয়াইলেন। অবশেষে, রাম বলিতেছেন,—

"ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্ত্তেত বেলামিব মহোদধিঃ॥
ন চ শক্তঃ স দুষ্টাত্মা মনসাপি চ মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥ ১৭॥
নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা॥ ১৮॥
বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাত্মবতা যথা॥ ১৯॥"
—১২০ সর্গ।

সেই রাম কি না নিরপরাধা, অন্তর্বত্নী প্রিয়তমা পত্নীকে মনে মনে পবিত্র জানিয়াও হিংস্র-শ্বাপদাদিসঙ্কুল বনে পাঠাইয়া দিলেন! ভগবান্ রামচন্দ্র কি ইচ্ছা করিলে অযোধ্যায় নির্বোধ প্রজাদিগের সম্মুখে দেবীর সচ্চরিত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণ করিতে পারিতেন না? যদি মনে করা যায় যে, তিনি নিতান্ত ভাল মানুষের মত,—অর্থাৎ দৈবী মহিমা প্রকট না করিয়া—রাজ্যশাসন করিতেছিলেন,—তিনি কেমন করিয়া—স্বর্গ হইতে ইন্দ্রচন্দ্রাদিকে আনাইবেন? কিন্তু তাহা ত নয়;—তাঁহার সভায় দেবর্ষিগণ যাতায়াত করেন। এমন কি, অগস্ত্য তাঁহার চিরকালের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া আর্য্যাবর্ত্তে অযোধ্যায় আসিয়া রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া গা তুলিলেন না কেন—তাহার কৈফিয়ৎ কে দিবে? অথবা অগস্ত্য ঋষি ষ্টীমারে আসিয়া কলিকাতা বন্দর দিয়া ট্রেণ-যোগে ফৈজাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া অযোধ্যা গিয়াছিলেন,

* শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের "সম্পাদিত" বঙ্গানুবাদ এখানে নিতান্ত ভীতিবিহ্বলচিত্তে বানর officerদিগের মদ্যপান ও মাংসভোজন বাদ দিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থগুলির অনুবাদের অনেকস্থলেই এইরূপ।

পর্য্যন্ত বিন্ধ্যটা টেরই পায় নাই! কেমন? * অপ্সরোগণ তাঁহার সভায় নৃত্য করেন,—পুষ্পকরথ তাঁহার সহিত কথা কহে,—অর্থাৎ উত্তরকাণ্ডের কবি স্থানে-অস্থানে রামচন্দ্রের দৈবী মহিমার পরিচয় দিয়াছেন। অথচ সীতার বিপদের সময় সে সব মহিমা লোপ পাইল। তুচ্ছ অপবাদের ভয়ে সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র এমন জড়পিণ্ড হইয়া গেলেন যে, পতিপ্রাণা অবলার এবং তাহার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণরক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করিলেন না। লক্ষ্মণ এদিকে এত ভক্ত যে, বনে ছাড়িয়া দিয়া আসিবার সময়ও সীতার দিকে মুখ তুলিয়া চাহেন নাই,—তিনি কিন্তু একজন ঋষি বা ঋষিশিষ্যকে ডাকিয়াও সীতার ভয় দূর করিলেন না! ‡ নৌকা হইতে নামাইয়াই চম্পট। ভাই লক্ষ্মণ বটে! এই অপটু কাঁচা লেখক মহাকবি বাল্মীকির রচনার সহিত রচনা মিশাইতে চায়?—ফলতঃ সীতা নির্ব্বাসন ব্যাপারটিই আগাগোড়া রামচরিত্রের সহিত মিল খায় না,—তা যিনি যতই সিমেণ্টের পোঁচ দিন। উত্তরকাণ্ড—প্রকৃতই 'উত্তর' কাণ্ড অর্থাৎ পরের লেখা।

আরও আমরা দেখিতে পাই যে, রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রথমসর্গে দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির নিকট সমস্ত রামায়ণের আখ্যান বিবৃত করিয়াছেন,—তিনি সেখানে রামকর্ত্তৃক সীতা নির্ব্বাসনের কথা বলেন নাই। এই বর্ণনা বেশ দীর্ঘ, ৯৪ শ্লোকে সমাপ্ত,—ইহাতে রামায়ণের প্রত্যেক কথার মোটামুটি বর্ণনা আছে—এমন কি, ফলশ্রুতি পর্য্যন্ত আছে। তথায় দেবর্ষি রামরাজ্যের সর্ব্ববিধ সুখশান্তির বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামোরাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥ ৯৮॥"

তাহার পরেই প্রশস্তি,—তাহাও কথকতার গন্ধবর্জ্জিত এবং "দেহি দেহি" রবশূন্য; দেখুন,—

"ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্,
যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯৯॥
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ ১০০॥
পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনঃ পুণ্যফলত্বমীয়াৎ
জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ॥ ১০১॥" *

মহাভারত বনপর্ব্বে রামোপাখ্যানপর্ব্ব নামে একটি উপপর্ব্ব আছে, উহাতে (২৭৪ হইতে ২৯১ অধ্যায়, বনপর্ব্ব) রামচরিত্রের এক বিস্তৃত বর্ণনা আছে;—কিন্তু তাহাতে "সীতাবর্জ্জন" নাই; ঐ বর্ণনার শেষ দুই পংক্তি এই,—

"ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে, জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্॥ ৭০॥"
—বনপর্ব্ব, ২৯১ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঠাকুর, আমার মত হতভাগা রাজপুত্র এবং দ্রৌপদীর মত অভাগিনী রাজকন্যা আর কি কেহ এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল?" তাহাতেই ঋষি রামসীতার উপাখ্যান বিবৃত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিস্তৃত আখ্যান যখন রচিত হইয়াছিল, তখন সীতানির্ব্বাসনরূপ উপকথার উদ্ভব হয় নাই;—হইলে, সীতার দুঃখময়ী বনবাস-কাহিনীর বিষয় ঋষি কদাপি ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরাণ;—এই পুরাণ-কথিত রামচরিতে সীতাবর্জ্জন নাই। এইরূপে ঐ আখ্যায়িকা শেষ করা হইয়াছে; যথাঃ—

* পাঠক ক্ষমা করিবেন। হয়ত কোন মৃত humorist-এর ভূত আমার স্কন্ধে চাপিয়াছে! আহা, আজ আমাদের ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত থাকিলে, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতাম। মনের দুঃখ মনেই রহিল।

‡ সীতা বলিলেন—"লক্ষ্মণ, তুমি আমার আকৃতি দেখিয়া যাও, রামকে এই কথা বলিও।" এখানে সীতা তাঁহার গর্ভলক্ষণের কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন; এই কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রাম সে কথা জানিতেন এবং সীতার গর্ভদোহদের তৃপ্তির ছল করিয়াই তাঁহাকে বনবাসে আনা হইয়াছে। যাহা হউক, Puritan বা Quake লক্ষ্মণ বলিল—"বিলক্ষণ, তাও কি হয়, দাদা এখানে নাই, আমি কি আপনার প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারি? পূর্ব্বে আপনার পা ছাড়া আর কিছুই দেখি নাই।"

* শূদ্রও রামায়ণ-পাঠে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, লেখা আছে। ইহা আধুনিক কালের রচনা নহে। আরও দেখুন, এখানে "ব্রাহ্মণ দ্বারা" পাঠ করাইবার আদেশ নাই,—ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নিজে নিজে পাঠ করিবার কথা আছে।

"যথোচিতমভিষিক্তো দাশরথিঃ কোসলেন্দ্রো রঘুকুল-তিলকো জানকীপ্রিয়ো ভ্রাতৃত্রয়প্রিয়ঃ সিংহাসনগত একাদশাব্দসহস্রং রাজ্যমকরোৎ ॥ ৯৯ ॥" + বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ ৪র্থ অধ্যায়।

শ্রীদেবীভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধ, ৩০শ অধ্যায়ে রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতেও এই সীতা পরিত্যাগের কাহিনী নাই।

বাল্মীকির অবতার, ভক্তকবি শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী-প্রণীত জগদ্‌বিখ্যাত হিন্দী রামায়ণে এই সীতাবর্জ্জন বর্ণিত হয় নাই। ‡

এক্ষণে, পাঠক-মহাশয়, সকল দিক বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, সীতা-বর্জ্জন বাল্মীকি-রামায়ণের মধ্যে ছিল কি না এবং ঐ ঘটনাকে প্রাকৃত কোন কবির কপোল-কল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে কি না? আমার মনে হয়, কোন যোগ্যতর লেখক, এ সম্বন্ধে পরিশ্রম করিলে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম, আদর্শচরিত শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী হইতে একটি বড় কলঙ্ক লোপ পাইতে পারে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে আমরা স্বদেশে "রতনের খনি"র অনুসন্ধান পাইয়াছি। এখন ড্রবাল, হীন প্রভৃতির চরিত্র অপেক্ষা রাম, ভীষ্ম এবং কৃষ্ণের চরিত্রের প্রতি দেশের লোকের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে। এ সময়ে দেশের আদর্শচরিত মহাপুরুষদিগের চরিত্রের আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে কাল্পনিক অসত্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, সেগুলি দেশের বালক-বালিকার নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র ও অহল্যার চরিত্রের কলঙ্ক-ক্ষালনের নিমিত্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে বৈদিক শতপথ ব্রাহ্মণের রূপকাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া "সুপ্রভাত" পত্রে আমি দেখাইয়াছিলাম যে, তাঁহাদের কলঙ্কের কথা ভিত্তিহীন—নিতান্তই মিথ্যা কথা। "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি"—এই নীতিকে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্তই ঐ পৌরাণিক আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল। দেশে বৈদিক সাহিত্যের লোপ হওয়ায় ঐ উপকথাই প্রকৃতরূপে লোকসমাজে গৃহীত হইতেছে। কোন কোন বিদ্বান্ লেখক এই চিত্রে মর্ম্মাহত হইয়া, অন্য উপায়ে অহল্যার কলঙ্ক মোচন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, অহল্যা ইন্দ্রের ছলনা বুঝিতে পারেন নাই,—সুতরাং তিনি নিষ্পাপ। কিন্তু এই উপায়ে অহল্যাকে মুক্তি দিবার উপায় নাই, কারণ, বাল্মীকি স্পষ্টই বলিতেছেন,

"মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজ-কুতূহলাৎ ॥১৯॥
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥২০॥
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্ব্বথা রক্ষ গৌরবাৎ।
ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ॥"২১॥ইত্যাদি।
—রামায়ণ, আদিকাণ্ড ৪৮শ অধ্যায়।

ইহার বঙ্গানুবাদ দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। স্বামীস্ত্রীর প্রণয়জনিত ক্রীড়া-কৌতুকের রহস্যজ্ঞা অহল্যাকে নির্ব্বোধ বোকা, idiotic স্ত্রীলোক বানাইলে, পৌরাণিকের গল্প জমিত না। তাই তিনি ঘটনাকে পাকাপাকি দোতরফা করিয়াছেন। সেকালের লোকে বৈদিক রূপকটি জানিত, এই উপকথার মর্ম্ম বুঝিত, সুতরাং কোন ক্ষতি হইত না।*

+ রামের দশ সহস্র বা একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করার সম্বন্ধে বিখ্যাত "রামাভিরামী" টীকাকার—"বৎসর" শব্দে "দিবস" অর্থ করিবে, উপদেশ দিয়াছেন। "বঙ্গবাসী"-সংস্করণের অনুবাদকও এই টীকার মত অবলম্বন করিয়া, পঞ্চম সহস্র বর্ষের অর্থ "চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই" লিখিয়াছেন। (উত্তরকাণ্ডের ৮৬ সর্গের পঞ্চম শ্লোকের অনুবাদ)।

‡ প্রবাদ আছে যে, বাল্মীকিই তুলসীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এ সম্বন্ধে প্রাচীন দোঁহাটি এই,—

"জনক ভূপতি নানক হোয়ে শুকদেব হোয়ে কবীর।
বাল্মীকি তুলসী হোয়ে উধো সুরশরীর।"

গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দীও "রামচরিতম্" দ্ব্যর্থক মহাকাব্য রচনা করিয়া "বাল্মীকি" উপাধি পাইয়াছিলেন।

* বৈদিক রূপকটি সংক্ষেপতঃ এই; "ইন্দ্র অহল্যার জার" এই-রূপ কথিত হয়। ইন্দ্র কে? ইন্দ্র সূর্য্য, বেদে সূর্য্যের অপর নাম ইন্দ্র; আর অহল্যা কে? অহর্দিনং লীয়তে অস্যাং—ইতি—দিন যাহাতে লীন হয়, সেই—অর্থাৎ রাত্রিই অহল্যা। জৄ ধাতুর অর্থ বয়োহানি,—জরা শব্দ এই ধাতু হইতে উৎপন্ন। সূর্য্য রাত্রির জার, অর্থাৎ সূর্য্য রাত্রিকে জরা প্রদান করেন,—সূর্য্য উঠিলেই রাত্রি জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। গোতম কে? গচ্ছতি ইতি গোঃ, যিনি চলেন, তিনিই গো,—তাই পৃথিবীর অপর নাম 'গো'। শ্রেষ্ঠ গো—গোতম—চন্দ্র। সুতরাং আলঙ্কারিক হিসাবে চন্দ্র রাত্রির বা গোতম অহল্যার

আমার মনে হয়, রামায়ণের পরিশিষ্ট বা "উত্তরাকাণ্ডের" কবিও রামকে প্রজারঞ্জনের আদর্শ করিতে গিয়া, এই "সীতাবর্জ্জন" উপকথার সৃষ্টি করিয়াছেন। নিরপরাধা-সাধ্বী অন্তর্বত্নী পত্নীকে মূর্খ ছোট-লোকের কথায় (নিজ মনে মনে স্ত্রীকে সতী সাধ্বী অভ্রান্তরূপে বুঝিয়াও) পরিত্যাগ করা আদর্শ-পুরুষের কার্য্য নহে। রাজা হইলেই যে, তিনি স্বামী বা পিতার কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিবেন, এমন কোন নীতি নাই। গৃহীর পক্ষে স্ত্রী পরিত্যাগ যে, অতিশয় ঘৃণিত পাপ, তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণকার মহারাজ উত্তমের চরিতাখ্যান ব্যপদেশে সুন্দর-রূপে দেখাইয়াছেন।* যিনি সকলরূপ কর্ত্তব্যের তুলারূপে সেবা করিতে পারেন না, তিনি কদাপি আদর্শ-পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। ৺বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণ চরিত্রের" আদর্শে একখানি "রামচরিত" বিরচিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

রামকথা পুরাতন হইলেও চির-নূতন, চেষ্টা করিলেই উহার মধ্য হইতে নব নব রস পাওয়া যায়। যদি পাঠক-মহাশয়দিগের কৌতূহল থাকে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ পুরাতন কথা সাহিত্যিক সুধীসমাজে উপস্থিত করিব।

সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বর-কপীশ্বরৌ॥

দাসবোধ।

[শ্রীরমণীকান্ত নাগ।]

সাধু মহাত্মা রামদাস স্বামীর নাম কে না শুনিয়াছে? একাধারে সন্ন্যাসী—ভগবদ্ভক্ত—কবি—রাজনীতিজ্ঞ—ব্যবহারবিৎ—নিষ্কাম—কর্ম্মযোগী—মহাপুরুষ—শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর নাম কাহার না বিদিত? যাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রভাবে মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত হইয়াছিল, যাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার মাহাত্ম্যে মহারাষ্ট্রের সার্ব্বজনীন জাতীয়-জীবনের উদ্বোধন হইয়াছিল ও যিনি পরোক্ষভাবে তথায় এক স্বাধীন মন্ত্রে এক-চ্ছত্র হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইনিই সেই কল্যাণধর্ম্মী মহাপুরুষ শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী। সনাতন-ধর্ম্মীদের বিশ্বাস, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখা দেয়, তখনই ভগবান্ দুষ্ট দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতারত্ব-গ্রহণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ সিদ্ধান্ত মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন অবস্থার অনুকূলই বটে। সেদিনকার মহারাষ্ট্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, কি সামাজিক, কি ধার্ম্মিক, কি রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়েই সেখানে তখন বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, লোকে সমাজ ও ধর্ম্মের পবিত্র সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কি আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই বিপর্য্যস্ত ও বিভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। রাষ্ট্রীয়সংস্থান বিধর্ম্মীদের হস্তে থাকায় হিন্দুধর্ম্মের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির পরিসীমা ছিল না। তীর্থ-ক্ষেত্র, দেবমন্দির—ভ্রষ্ট, লাঞ্ছিত ও কলুষিত হইতেছিল। মুসলমানের ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুরা অধিকাংশ মুসলমান হইয়া যাইতেছিল ও দেবস্থান ত্যাগ করিয়া, "দাউল-উল-মুল্ক" নামক মুসলমান পীরের ভজনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের অবস্থা দুঃস্থ ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ তাঁহাদিগের অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিত না। স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক-সম্প্রদায়ের উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইবার সীমা ছিল না। বস্তুতঃ তখনকার মহারাষ্ট্রের অবস্থা, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন অবস্থায় ভগবানের অবতার হওয়া শাস্ত্রানুসারে অসম্ভব নহে।

মহারাষ্ট্র-প্রান্তে শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীকে হনুমানের অবতার মানা হয়। ভবিষ্যপুরাণে ইহার একটি প্রামাণিক শ্লোকও দৃষ্টিগোচর হয়:—

"কৃতে তু মারুতাখ্যশ্চ ত্রেতায়াং পবনাত্মজঃ।
দ্বাপরে ভীমসংজ্ঞশ্চ রামদাসঃ কলৌ যুগে॥"

স্বামী এবং ইন্দ্র তাঁহার জার। এই ত ব্যাপার,—ইহার উপর কেমন গল্পটি রচিত হইয়াছে! প্রজাপতি-দুহিতৃসংবাদও এই প্রকার ব্যাপার। "চলাপৃথ্বীস্থিরা ভাতি" একথা বহুপূর্ব্বে, বৈদিক সময়ে এদেশে সুপরিজ্ঞাত ছিল।

* "কায়স্থ পত্রিকায়" "উত্তম মনুর উপাখ্যান" শীর্ষকে এই বিষয়টি প্রকাশিত হইতেছে।

† এই প্রবন্ধ লিখিতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবরাও সপ্রে বি-এ. ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীধর বাজপেয়ী-কৃত "হিন্দি দাসবোধের" সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।—ইতি লেখক।

কৃতে অর্থাৎ সত্যযুগে মহাবীর হনুমান "মারুত" এই আখ্যায়, ত্রেতায় "পবনাত্মজ", দ্বাপরে "ভীম" ও কলিযুগে "রামদাস" এই নামে অবতার গ্রহণ করিবেন। ইহা কতদূর যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও সত্য-সম্মত তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। যাহা হউক, রামদাস স্বামীকে অবতাররূপে গ্রহণ করা হউক বা না হউক, তিনি যে একজন মহাসত্ব, মহাপুরুষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও জাতীয় অপূর্ব্ব শরীরী সম্মিলন স্বরূপ বিরাজিত ছিলেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। অনেকের ধারণা, (কতদূর সত্য-প্রতিষ্ঠিত জানি না) প্রাচীন-ভারত কেবলমাত্র "পরমার্থ" লইয়াই ব্যস্ত ছিল, ব্যাবহারিক জগৎ যে একটা আছে, তাহা তাহার জ্ঞানের বাহিরে। বস্তুতঃ এরূপ হইলে ভারতের এত অভ্যুদয় হইতে পারিত কি না সন্দেহ। ভারত উন্নতির মূল সূত্রটিকেই ধরিয়াছিল ও সেই মূল সূত্রটিকে ধরিয়াই ভারতের অপরাপর বিদ্যা উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিল; এই মূল সূত্রই "পরমার্থ"। "পরমার্থ"-তন্ত্রীতে আঘাত লাগাইতেই অপরাপর তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব, ইহাই ভারতের গৌরব, শ্লাঘা ও গর্ব্ব করিবার বিষয়। যাহা হউক সে ত প্রাচীনের কথা। এ নবীন যুগে ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতখণ্ডের সুদূর একান্তে মহারাষ্ট্রের পুণ্যভূমিতে ইহার যে এক প্রমাণসিদ্ধ, সত্য-সম্মত অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এ অভিব্যক্তির সাধক পুণ্যশ্লোক শ্রীসমর্থ স্বামী রামদাস। ইঁহার শক্তিপ্রভাবেই মহাত্মা শিবজীর এত ক্ষমতা, মাহাত্ম্য ও গৌরব। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, যখনই ভারতে কোন ভাব বা শক্তি, শরীরী হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, তখনই তাহার পশ্চাতে, নেপথ্যে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ অনুক্ষণ রহিয়াছেন। শ্রীসমর্থ ও শিবজীকে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামদাস স্বামী ও শিবজীর কথা আমরা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহাদের শক্তির উৎস কোথায়, তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি কি? রামদাস স্বামীকে জানি বটে, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা-উপদেশের কথা জানি কি? তাঁহার সহিত আমাদের একপ্রকার সম্মিলন হইয়াছে সত্য, কিন্তু যথার্থ সম্মিলন হইয়াছে কি? শ্রীসমর্থ অন্তিম সময়ে,—যখন তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী গুরুর সগুণ মূর্ত্তির সম্ভাব্য বিয়োগ আশঙ্কায় কাতর, চিন্তিত ও শোকগ্রস্ত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হন,—তখন তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—"যে পরে আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে চাহে, সে আমার কৃত "দাসবোধ" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিবে। সেগুলির পাঠ করা প্রত্যক্ষভাবে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহা।"

দুর্ভাগ্য, স্বামীর সঙ্গে আমাদের শারীর-সম্মিলন ত হয়ই নাই; অন্য কোন প্রকার সম্মিলন হইতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধানও আমরা রাখি না। স্বামীর কথিত মতে ভারতের অনেকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে কিন্তু আমাদের হয় নাই। "দাসবোধ" শ্রীসমর্থের এক অমূল্য গ্রন্থ—মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এক উজ্জ্বল রত্ন। গুজরাটী ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবরাও সপ্রে, বি. এ. ও তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীধর বাজপেয়ী হিন্দি ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুবাদ আশাতীত প্রাঞ্জল, বোধগম্য, মনোজ্ঞ ও সরল হইয়াছে। এই অনুবাদ হিন্দি-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অক্ষয় স্থায়ী রত্ন-স্বরূপে বিরাজিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। "দাসবোধ" ডিটেকটিভ উপন্যাস নয়, আধুনিক নবন্যাস, রমন্যাস প্রভৃতি উদ্ভট শব্দসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত পুস্তকরাজির সহিত ইহার কোন অংশেই তুলনা হইতে পারে না। ইহা পরমার্থবিষয়ক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই "দাসবোধ" মাহাত্ম্যেই মহারাষ্ট্রভূমিতে সে দিন এক শোভন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, সমাজশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; লোক ব্যাবহারিক জগতে বিশারদ হইয়াও যে পরমার্থ সাধনে সমর্থ হয়, প্রাচীন ভারতের এ গৌরব-গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। সে সময় "দাসবোধের" এমন প্রচার হইয়াছিল যে, সমস্ত মহারাষ্ট্রময় "দাসবোধ" ছাইয়া ফেলিয়াছিল, লোক মুখে মুখে শুনিয়া তাহার প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এ অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় অজ্ঞানতা-বশেই হউক বা সজ্ঞান অবহেলার জন্যই হউক, এমন মনোজ্ঞ উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থের কোন

অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। ইহা কি যথার্থই ক্ষোভের বিষয় নহে?

যাহা হউক, পাঠকপাঠিকাগণ "দাসবোধের" বিষয় জানিবার জন্য বোধ হয়, বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাদের ঔৎসুক্য কথঞ্চিৎ উপশমিত করিবার জন্য নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম; ইহাতে দিগ্‌দর্শনমাত্র হইবে, মূল গ্রন্থ-পাঠের পরিতৃপ্তি হইবে না।

দাসবোধের নাম ও রচনা

গ্রন্থের নাম দাসবোধ রাখা হইয়াছে। দাস অর্থাৎ রামদাস, রামচন্দ্রের সেবক; "বোধ"—শিক্ষা, উপদেশ, এ অর্থ স্পষ্টই বোধ হইতেছে। শ্রীসমর্থের অপরাপর গ্রন্থ হইতে দাসবোধই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে ২০ দশক, প্রত্যেক দশকে ১০ সমাস বা অধ্যায় ও সর্ব্বসমেত কবিতা সংখ্যা ৭৭৪৯।

বিষয়-বর্ণন

এ গ্রন্থ গুরুশিষ্যের সংবাদরূপে কথিত। প্রথমেই গ্রন্থ-নিরূপণ করা হইয়াছে। শ্রীসমর্থ আদিতেই গ্রন্থের নাম, তাহাতে কি কি বিষয় আছে, কি কি বিষয় প্রতি-পাদিত হইয়াছে, কি কি প্রাচীন গ্রন্থ প্রামাণিকভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, অধিকারী কে, পাঠে কি লাভ প্রভৃতি বিষয় বলিয়াছেন।

সপ্তম দশকের ৯ম সমাসে গ্রন্থের উদ্দেশ্য কথিত হইয়াছে, যথা:—

"জেণেং পরমার্থ বাঢ়ে। আংগীং অনুতাপ চঢ়ে।
ভক্তি সাধন আওড়ে। ত্যা নাভ গ্রন্থ॥ ৩০॥
জেণেং হোয় উপরতী। অবগুণ পালটতী।
জেণেং চুকে অধোগতী। ত্যা নাভ গ্রন্থ" ॥ ৩২॥

অর্থ:—যাহাতে পরমার্থের বৃদ্ধি হয়, যাহাতে চিত্তে অনুতাপ উৎপন্ন হয়, যাহাতে ভক্তি-সাধন হইয়া উপরতির বৃদ্ধি হয়, যাহাতে অবগুণের সংশোধন হয় ও লোক অধোগতি হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাই গ্রন্থ। অতঃপর প্রথম দশকে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী গণেশ, সারদা, গুরু, সাধু, শ্রোতা, কবীশ্বর সভা, পরমার্থ ও পরিশেষে নরদেহের স্তুতি করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দশকে মূর্খ, উত্তম, কুবিদ্যা, বিরক্ত ও পণ্ডিত-মূর্খের লক্ষণ এবং ভক্তি, রজ, তম, সত্ত্বগুণ ও সদ্বিদ্যার নিরূপণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় দশকে গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের "সগুণ পরীক্ষা" নামে বিচার করা হইয়াছে। প্রথম জন্মদুঃখ-নিরূপণে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভাব প্রভৃতি বলিয়া, মৃত্যু ও বৈরাগ্য-নিরূপণে শেষ হইয়াছে।

চতুর্থ দশকে নবধা ভক্তি,—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন প্রভৃতির কবিত্বময় বর্ণনা করিয়া, মুক্তিচতুষ্টয়ে সমাপ্ত হইয়াছে।

পঞ্চম দশকে প্রথম সমাসে গুরুর বিষয় নিশ্চয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সমাসে শ্রী সমর্থ সদ্‌গুরুর বিষয়ে বলিয়াছেন,—"যে গুরু শিষ্যকে সাধনে নিযুক্ত করেন না বা ইন্দ্রিয়দমন করান না, তেমন গুরু এক কড়িতে তিন তিন জন পাইলেও লওয়া উচিত নহে।" যথা—

"শিষ্যায় ন লবিতী সাধন, ন করবিতী ইন্দ্রিয়দমন।
ঐ সে গুরু অড়ক্যাচে তীন, মিলালে তরী ত্যজাত্র।"

এরূপভাবে সদ্‌গুরু লক্ষণ, শিষ্য লক্ষণ, মন্ত্র লক্ষণ, বহুধাজ্ঞান ও শুদ্ধাশুদ্ধের নিরূপণ করিয়া, বদ্ধ, মুমুক্ষু, সাধক ও সিদ্ধের লক্ষণ বলিয়া শেষ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ দশকে পরমাত্মা-নিরূপণ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম পাঁচ সমাসে মায়া ও ব্রহ্ম বিষয়ে বিচার, অনন্তর সার বস্তু-সংগ্রহের উপদেশ করা হইয়াছে।

সপ্তম দশকে চতুর্দ্দশ প্রকার ব্রহ্মের বিষয় শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা কথিত হইয়াছে ও শাশ্বত ব্রহ্ম যে অনির্ব্বচনীয় 'মূকস্বাদনাৎ' তাহা বলা হইয়াছে।

অষ্টম দশক বা "জ্ঞান দশক" অধ্যাত্মবিদ্যার উৎস। ইহাতে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল পঞ্চ মহাভূত, এবং আত্মা, মোক্ষ ও সিদ্ধ পুরুষের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

নবম দশকে ব্রহ্ম-নিরূপণ করিয়া অনেক সন্দেহের সমাধান করা হইয়াছে ও সর্ব্বসংশয়ের ছেদ যে সম্ভব, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

দশম দশকে অন্তরাত্মা যে এক তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (ইমার্সনের 'There is one mind common

to all individual men') । অনন্তর সৃষ্টির উৎপত্তি, পঞ্চ প্রলয়, প্রকৃতি-পুরুষ প্রভৃতি গভীর বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে।

একাদশ দশকে প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপদেশ দিয়া, সাংসারিক বিষয়, রাজনীতি, মহান্ত, প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে।

দ্বাদশ দশকে বিবেক ও বৈরাগ্যের বিষয় বিবেচনা ও বিচারের সহিত মীমাংসা করা হইয়াছে, ও বিবেকহীন বৈরাগ্য যে নিষ্ফল, তাহা দেখান হইয়াছে।

ত্রয়োদশ দশকে আত্মানাত্মবিবেক, সারাসার বিচার, উৎপত্তি, প্রলয় প্রভৃতি বিষয় আছে। শ্রী সমর্থ এই দশকের ৬ষ্ঠ সমাস "লঘুবোধ" শিবজীকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ দশকে নিঃস্পৃহের লক্ষণ, কাব্য কলা, কীর্ত্তন-লক্ষণ, হরিকথার রীতি, চাতুর্য্যলক্ষণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই দশকে কলিযুগের ধর্ম্মশীর্ষক সপ্তম সমাসে তদানীন্তন সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

পঞ্চদশ দশকে পুনর্ব্বার চাতুর্য্যের লক্ষণ, নিঃর্লোভের ও মহান্তের লক্ষণ প্রভৃতি বলিয়াছেন। লোকোদ্ধার ও লোককল্যাণের পক্ষে যতী ও মহান্তদের আবশ্যকতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

ষোড়শ দশকে বাল্মীকি, সূর্য্য, পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু বিষয়ে স্তুতি লিখিয়াছেন ; এ স্তুতি-সংগ্রহে আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিক কথার অবতারণা লক্ষিত হয়। ইহা বড়ই কবিত্বপূর্ণ। অনন্তর তিনি উপাসনার বিষয় লিখিয়াছেন :—

"উপাসনে চা মোটা আশ্রয়ো, উপাসনা বীণ নিরাশ্রয়ো,

উদস্ত কোমংতরী তো, জয় প্রাপ্ত নাহী।"

উপাসনার আশ্রয় অত্যন্ত অধিক, উপাসনা বিনা লোক নিরাশ্রয় ; নিরাশ্রয় অবস্থায় যত চেষ্টা করা যাউক না কেন, তাহাতে জয়লাভ ঘটে না।

সপ্তদশ দশকে শিবশক্তি, অন্তরাত্মাসেবা, অজপা মন্ত্র, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও দেহচতুষ্টয়ের কথা বলিয়াছেন।

অষ্টাদশ দশকে বিবিধ দেবতা, নরদেহের মহত্ব, লোক-স্বভাব ও নিদ্রার বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে।

ঊনবিংশ দশকে লিপিকলা, অভাগী ও দুর্ভাগীর লক্ষণ, বুদ্ধিবাদ, প্রযত্নবাদ, রাজকরণ বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিংশ দশকে পূর্ণাপূর্ণ, সূক্ষ্ম-বিচার, শরীররূপী ক্ষেত্র, আত্মবিবেক, পূর্ণব্রহ্ম প্রভৃতি অতিগভীর তত্ত্ববিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে শ্রী সমর্থ বলিয়াছেন :—

"ভক্তাচেনি সাভিমানেং কৃপা কেলী দাশরথীনেং,
সমর্থ কৃপেচীং বচনেং। তো হা দাসবোধ।"

ভক্তাভিমানী দাশরথি রামের কৃপা-বচনের সংগ্রহই এই দাসবোধ ; তাহা তাঁহারই, আমার নয়। বটেই ত! মহাপুরুষের কথাই ত এই।

দাসবোধের সার্ব্বজনীন মহত্ত্ব

শ্রী সমর্থের দাসবোধ একখানি মৌলিক সার্ব্বজনীন গ্রন্থ, ইহা কোন গ্রন্থের টীকা-স্বরূপে, বা কোন গ্রন্থকে আধার রূপে রাখিয়া, রচিত হয় নাই। যদিও শ্রী সমর্থ বেদবেদান্তের সিদ্ধান্তগুলিকে নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তবুও তাহা নিজের অনুভবসিদ্ধ করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্ম-প্রত্যয়ের নিকষে পরখ করিয়া। ১৭শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র-ভূমিতে, সমাজ ও ধর্ম্মের যেরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছিল ও যেরূপ উপায় অবলম্বনে তাহার সংশোধন সম্ভবপর হইয়াছিল, সে উপায় জগতের যে কোন সমাজে তদনুকূল অবস্থায় সমানভাবে যে প্রযুজ্য, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং দাসবোধ একদেশীয় নয় ;—ইহা সকল দেশের, ইহা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশিষ্ট কালের জন্য নহে—ইহা সার্ব্বজনীন ও সর্ব্ব কালের। মোরপন্ত বামন পণ্ডিত প্রভৃতি বড় বড় মহারাষ্ট্র কবি এই দাসবোধের প্রশংসা করিতে করিতে পরাস্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, এ গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বিশেষ প্রণিধান ও সূক্ষ্ম বিচারের যোগ্য। যাহা লিখিত হইল, তাহা কিছুই হয় নাই।

আমার অসিদ্ধ হস্ত হয় ত কথিতব্য বিষয়ে আশানুরূপ লিখিতে সমর্থ হয় নাই, তজ্জন্য পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে দাসবোধের ন্যায় প্রসিদ্ধ, উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থের একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। তাহা কবে কি ভাবে হইবে, কে জানে?

ওয়ার্ড্‌স ওয়ার্থের কবিতা

[শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, B. A., B. L.]

বাঁশী মূক নহে, বাঁশী মুখর কিন্তু বাঁশী তাহার নিজের সুরে বাজে;—কোন্ বিস্মৃত কালের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত কোন্ অনির্দ্দেশ্য অশরীরী বেদনার করুণ সুরে বাজে—কিন্তু তাহা বাদকের নহে। বাঁশীটি যদি শুধু অধরলগ্ন না হইয়া, বাদকের হৃদয় ছুঁইয়া কাঁদিয়া ফিরিত, তবে সে ভিন্ন ভিন্ন সুরে ভিন্ন ভিন্ন কথা কহিত, অনেক অব্যক্ত বেদনার সমাচার কহিত, নিত্য উদ্বেল নিত্যতরঙ্গিত চিত্তের কল্লোল-গীতি শুনাইত।

এই ত বাদকের বাঁশী—রাখালের বাঁশী, কৃষকের বাঁশী। মানব-প্রাণের কতকটা বেহাগের মূর্চ্ছনায় ঢলিয়া পড়ে, কতকটা খাম্বাজে বিশ্রাম লাভ করে, কতকটা সাহানায় সমাপ্তি ও তৃপ্তি লাভ করে, কতকটা আবার সম্মুখে গোধূলির অলক্ত-রঞ্জিত আকাশ, পশ্চাতে অন্ধকারের নিশ্বাস, পদতলে কল্লোলিনীর অস্ফুট ধ্বনি—জীবনের ব্যর্থ অংশটিকে সূর্য্যাস্ত-সিঁদূরে রঞ্জিত করিয়া দিতে দিতে উদাস পূরবী গাথায় আত্মসমর্পণ করে। মানবের এই চিরন্তন প্রাণ সুরে জমাট বাঁধিয়া বাঁশীতে, আশ্রয়-গ্রহণ করে। বাঁশীর এই নিদ্রিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা বাদকের কৃতিত্ব—সুরের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণু-পুলকে ও সঙ্গীতের সহজাত ঝঙ্কারে রাগিণীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া সঙ্গীতকে মুক্তপক্ষ করিয়া দিবার শক্তির তারতম্যে বাদকের বিশেষত্ব।

কবির বাঁশী স্বতন্ত্র। সে এক মহা-আকাশতলে হৃদয়-সিন্ধুর কল্লোল-মুখে সংলগ্ন, সে এক মহাপ্রকৃতির প্রভাবাচ্ছন্ন আলোছায়া-বিচিত্র দিক্‌চক্রস্পর্শী উদার মানব-প্রকৃতির প্রান্তর-দেশে বহিয়া যাওয়া হুহু শ্বাসের সহিত সংযুক্ত।

অকবির বাঁশী কোনও কথাই কহে না, কুকবির বাঁশী মিথ্যাকথা কয় ও ধনের মানের যশের কাহিনী শুনায়; প্রকৃত কবির বাঁশীর স্বর যুগযুগান্ত ধরিয়া, মানব প্রাণে বহিয়া যায় এবং মানবের চিত্তমণ্ডলে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে।

কুকবি মুহূর্ত্তের পতঙ্গ, ক্ষণিক উজ্জ্বলতাস্পর্দ্ধী, আদরাকাঙ্ক্ষী, কবিত্বাভিমানী, স্বল্পায়ু। প্রকৃতকবি যোগমগ্ন, প্রকৃতির পাদলগ্ন, অমর। কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ অমর কবি।

প্রকৃত কবির এমন একটা বিশেষত্ব, এমন একটু বৈচিত্র্য থাকে, যাহাতে তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করিয়া, অন্যান্য কবিদিগের হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। যে কবিতা কবির এই বিশেষত্বে খচিত ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত নহে, তাহা ভাবপ্রেরণায় রচিত নহে; কারণ মানবের যখন প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ও ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য আছে। তবে কবিপ্রকৃতির অভিব্যক্তি-- কবির কাব্যেও সে বিশেষত্ব বৈচিত্র্য—পরিস্ফুট হইবেই।

এই বিশেষত্ব প্রধানতঃ দ্বিবিধ—ভাবগত ও রচনা-গত। প্রথম, ভাবের মৌলিকতা ও নূতনত্ব এই বিশেষত্বের সাক্ষী। প্রথম উচ্চারিত সত্যই যে শুধু নূতন তাহা নহে, হৃদয়ের প্রথম স্পন্দনের সঙ্গে যে কথা অজ্ঞাতসারে বাহির হয়, তাহারও নূতনত্ব মৌলিকত্বের দাবি কোনক্রমেই হেয় নহে। কথার সঙ্গে প্রাণের যোগ, ও মানবপ্রাণে নূতন ঝঙ্কার তুলিবার শক্তি মৌলিকতারই পরিচায়ক। বহিঃ-প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি হইতে রূপ-রস-গ্রহণে বিচিত্র ও পরিস্ফুট, মানব চিত্তমণ্ডল হইতে ভাবগ্রহণে বর্দ্ধিত ও সমৃদ্ধ চিত্তের ভাবরাজি কখনই 'সৃষ্টি ছাড়া' হয় না—নূতন হইতে পারে। নূতনত্ব বা মৌলিকত্বের পরীক্ষা—'সৃষ্টিছাড়া' বা 'খাপছাড়া' হওয়াতে নহে। চিত্তের সহানুভূতি সম-বেদনার তারে ঝঙ্কার দিল বলিয়া কথাটি যে নূতনত্বের গর্ব্ব করিতে পারে না, তাহা নহে। আমার প্রাণের সঙ্গে যে কথাটি মিলিয়া গেল, তাহা যে নূতন নহে, এ কথা বলিতে আমি অধিকারী নহি। মানব-সমবেদনার বাহিরে কয়টি কথা মানব বলিতে পারিয়াছে? মৃত্তিকার রসে পুষ্ট বিটপীর কি নিজত্ব নাই? উদ্যানের প্রত্যহ অভ্যস্ত ফুলফুটানোতে কি মৌলিকত্ব নাই?

এই ভাগবত বিশেষত্ব মানবচিত্তকে অলক্ষিতে গঠিত করে। কবি মরিয়া যান, কবির নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, অ-দেহী, অ-নাম কবি মানব-প্রাণে বাঁচিয়া উঠেন। সেক্সপিয়ার এখন আর কোনো ব্যক্তির নাম নহে—কোনো বিশ্ববিচিত্র নিত্য-অভিনব, পূর্ণ-সৌন্দর্য্য-ময় অমর অপরাজেয় ভাবশক্তির নাম। যে ক্ষেত্রে সেক্স-পিয়রের গ্রন্থ কাজ করে, সেখানে হ্যামলেট্-ওথেলোর রচয়িতা বিখ্যাত দার্শনিক কিংবা সামান্য অভিনেতা, লণ্ডনে উৎকোচ-গ্রহণাপরাধে দণ্ডিত অথবা ষ্ট্রাটফোর্ডে শৈশবে

মৃগশিশু হরণাপবাদে চিহ্নিত,—এই রহস্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক,—সেখানে এই কলহের স্থান নাই।

আর এক বিশেষত্ব—রচনার ভঙ্গিমায়। ইহা বহিরবয়বগত। কিন্তু মুখ যেমন মনের মুকুর, রচনাগত বিশেষত্বও তেমনই অনেক পরিমাণে ভাবগত বিশেষত্বেরও সূচনা করে।

সমালোচকের কার্য্য এই বিশেষত্বকে ধরাইয়া দেওয়া, এবং অন্য কবি হইতে কবিকে বিশিষ্ট ও পৃথক্ করিয়া চিনাইয়া দেওয়া। আমিও এইভাবে কবিকে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় সর্ব্বত্রই এমন একটু বিশেষত্ব স্ফুটরূপে বিদ্যমান, যাহা দেখিয়া তাঁহাকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়।

ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে উপত্যকাভূমিকে প্লাবিত করিয়া যখন বালকের অনুকার স্বর ও পক্ষীর প্রত্যুত্তর-চীৎকার ছুটিতেছে, তাহারই ক্ষণিক প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় উৎকর্ণ বালকের চিত্তে সহসা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর অস্ফুট ধ্বনি একটি মৃদু আঘাত করিল, অথবা দৃষ্টিগোচর সমগ্র দৃশ্যটি অকস্মাৎ ও অজ্ঞাতসারে তাহার কাননকুঞ্জ এবং স্থির হ্রদের বক্ষে বিম্বিত অব্যবস্থিত আকাশটিকে লইয়া প্রবেশ করিল—তখন আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিত্বের একটু বিশেষত্ব অনুভব করিলাম।

"—And that uncertain heaven, received
Into the bosom of the steady lake."

কোল্‌রিজ্ লিখিয়াছিলেন, "এই পংক্তি কতিপয় যদি আরবের জনহীন মরুপ্রান্তরে একাকী বহিয়া যাইত, সেখানেও আমি বলিয়া উঠিতাম—'ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ'!"

বিশেষত্ব কবিত্বের প্রাণ; এইরূপ ভাব ও তাহার অভিব্যক্তি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতার সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

সহসা কতকগুলি ভাবের বন্যাবেগে পাঠকের হৃদয়কে নাচাইয়া তোলা অথবা, পাঠকের চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলার কৃতিত্ব, অথবা রোমাঞ্চ-সঞ্চার করার চাতুরি আমাদের কবির প্রচুর পরিমাণে নাই; নিদাঘচ্ছায়ায় একাকী বসিয়া, ধীরচিন্তারত চিত্তের জন্য সহজ সুরে সহজ কথায় বেণু-বাদনেই কবির গভীর নিবিড় আনন্দ। কবির নিজের ভাষায়—

"'Tis my delight, alone in shade,
To pipe a simple song for thinking hearts."

প্রভঞ্জনবেগে তাঁহার কবিত্ব আসে নাই, সিন্ধুগর্জ্জনে ও তরঙ্গের লীলা-বিভঙ্গে তাঁহার কবিতা কোথাও অভিব্যক্ত ও লীলায়িত হইয়া উঠিতে চাহে নাই। ভাবগুলি মৃদু চরণক্ষেপে তাঁহার প্রকৃতির প্রাসাদপ্রাঙ্গণে স্থাপিত হৃদয়ে আসিয়া মৃদু আঘাত করে; কবির ভাষায়ও সেই মৃদুভাবের মৃদুসঞ্চার। বুভুক্ষু প্রাণের খাদ্য প্রকৃতি অহরহঃ অবিরত প্রেরণ করেন, গ্রহণশীল ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিতে হয়। গ্রহণশীলতা, অথবা হৃদয় পাতিয়া রাখারই, অপর নাম কি কবির 'Wise passiveness' নহে? এই 'wise passiveness' ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থকে আমি 'of Quiet touches' বা "মৃদুস্পর্শের কবি" আখ্যা দিতে ইচ্ছা করি। ধ্যানমগ্ন কবির শান্ত-স্নিগ্ধ প্রাণে ভাবের মৃদু-স্পর্শ সঞ্চারিত হইয়া, মৃদুস্পন্দনের সৃষ্টি করে, তাহাই কবিতায় মৃদু হাওয়ার মৃদু-স্পর্শের ন্যায় পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়। সহস্র সহস্র মৃদু-স্পর্শে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিত্বের উদ্বোধন;—ইহা তাঁহার বিশেষত্ব।

কবির আর এক বিশেষত্ব, তিনি শুধু 'আর্টে'র খাতিরে 'আর্ট' প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার প্রকৃত কবিতাপদবাচ্য কবিতায়, কলানৈপুণ্য প্রদর্শনের সজ্ঞান-চেষ্টা লক্ষিত হয় না। তাঁহার কথার সঙ্গে প্রাণের একটি অকপট ঐকান্তিক যোগ আছে—ভাণ বা ভণ্ডামি তাঁহার কবিচিত্তে তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করিতে পায় নাই। যেমন ভাবটি, তেমনি ভাষাটি; বাগ্দেবী যেন স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। পোপ্-ড্রাইডেনের কৃত্রিমতার যুগের শেষে, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি হইতে নূতন অব্দ আরব্ধ হইয়াছে। আর্ট-ফলাইবার চেষ্টা না থাকিলেও, তাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র আর্ট বিদ্যমান। সহজ সুরে, সহজ গাথায়, তিনি বাঁশী বাজাইয়াছেন;—কলা-কৌশল আপনিই আসিয়াছে। যেখানেই তিনি ভাষার আড়ম্বর দেখাইতে গিয়াছেন, সেখানেই ভাব আড়ষ্ট—ভাষা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; উদাহরণ—Excursion, Prelude এবং অন্যান্য অনেক কবিতায় মিলিবে। তাঁহার অনেক ভাবহীন, কবিত্বহীন, মত-জটিল, কুকবিতা উপবৃক্ষের মত তাঁহার

অনেক উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ কবিতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ;—ফলে, তাঁহার যশঃও অনেকটা ম্লান ও রাহুগ্রস্ত সদৃশ হইয়াছিল।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ প্রধানতঃ চিন্তাশীলতার - ভাবুকতার কবি। অচপল অচঞ্চল কবিপ্রকৃতির ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহার কবিতা, তাঁহার পারিবারিক জীবনেরই মত, মধুর ও শান্তিময়। এইখানেই, এই প্রকৃতির ধ্যানপরতাতেই, তাঁহার ঋষিত্ব! কিন্তু প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, কখনও কখনও গভীর তত্ত্বান্বেষিতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কবিত্ব-সৌরভহীন জটিল মতবাদের সৃষ্টি করিয়া, অনেকস্থলে তাঁহার কবিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতায় একটি প্রধান, কেন্দ্রগত, ভাব এই ;—তিনি প্রকৃতিকে প্রাণহীন নিস্পন্দ জড় প্রকৃতি বলিয়া ভাবেন নাই। প্রকৃতি—তাঁহার নিকট জীবন্ত, সচেতন, এক অদৃশ্য সত্ত্বায় পূর্ণ। স্বহস্তরোপিত, সযত্নপোষিত বিটপীর একটি শাখাচ্ছেদনে রোপকের মনে বেদনা জাগে, সেই বেদনার মূলে যে প্রেম, যে ধারণা ও বিশ্বাস নিহিত আছে, তাহাই বিরাটমূর্ত্তিতে পূর্ণরূপে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থে বিকশিত। প্রকৃতি তাঁহার নিকট—দেবতা, গুরু, শিক্ষয়িত্রী। তিনি কাণ পাতিয়া, প্রাণ পাতিয়া, প্রকৃতির কথা শুনিতে শুনিতে 'Is laid asleep in body, and become a living soul.'—এবং প্রকৃতিগত প্রাণ, প্রকৃতিতে তন্ময়, ও প্রকৃতির প্রভাবে সমাচ্ছন্ন, হইয়া পড়েন। প্রকৃতির শিক্ষা, তাঁহার নিকট জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা :—

"One impulse from the vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good,
Than all the sages can."

মানব-বুদ্ধি প্রকৃতিতে হস্তার্পণ করিতে গিয়া সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও শিক্ষাকে বিকৃত করিয়া ফেলে ; তাই মানব-বুদ্ধিকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন—

'We murder to dissect.'

আর বলিয়াছেন, মানব—"An intellectual all-in-all ;" বলিয়াছেন, মানব—"One that would peep and botanise upon his mother's grave."

কবি প্রকৃতিকে এক জীবন্ত সত্ত্বায় পূর্ণ দেখিয়া, তাহারই সঙ্গে আলাপনে, প্রাণের যোগ-স্থাপনে নিযুক্ত। বৃক্ষ তাঁহার নিকট কাষ্ঠ নহে, নদী তাঁহার নিকট প্রস্রবণপুষ্ট জলাধার নহে, শৈলরাজি তাঁহার নিকট উন্নতভূমি নহে, মেঘ তাঁহার নিকট বারিবর্ষী ধূমপুঞ্জ নহে, শ্যামল বনভূমি তাঁহার নিকট পত্রপর্ণাচ্ছাদিত মৃত্তিকা নহে। ধ্যানরত কবি প্রকৃতির মন্দিরে—প্রকৃতির জীবন্ত বিগ্রহের সম্মুখে—দাঁড়াইয়া নীরবে নিশ্চলপ্রাণে হস্তমাত্র উত্তোলন করিয়া, শুষ্কনেত্র বেদনাহীন হস্তার্পণে উদ্যত আততায়ীকে বারণ করিয়া বলিতেছেন—

"Gently touch, for there is a spirit in the woods."

প্রকৃতির নিকেতনে তিনি অতিথিমাত্র নহেন। কখনও পুষ্পিত ফলিত বৃক্ষশাখা হইতে তাঁহার মস্তকে, আশীষ-বর্ষণের মত তুষারশুভ্র পুষ্পবর্ষণ হইতেছে,—বসন্তের মেঘ-মুক্ত আকাশের উজ্জ্বল সৌরকর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে খেলিয়া বেড়াইতেছে—অটবী-প্রান্তে একাকী বসিয়া তিনি তাঁহার গতবর্ষের পরিচিত বন্ধু—পাখী আর ফুলদিগকে আবার স্বাগত আহ্বান করিতেছেন। আবার কখনও ছায়া-পথের উপর তারকাপুঞ্জের উপমিত রাশি রাশি Daffodils-পুষ্পের দিকে লাভ-ক্ষতিগণনায় অনবহিত কবি পুলকিত প্রাণে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন ; কখনও ভাবেন না—"What wealth that show to me had brought." কখনও প্রকৃতির চৈতন্যসাগরে ওতপ্রোত-ভাবে নিমগ্ন হইয়া বাসন্তী প্রকৃতির সমস্তটুকু মাধুরী, সমস্তটুকু প্রেম-স্নেহজ্ঞান আকণ্ঠ পান করিয়া, ধন্য হইতেছেন—পূর্ণ প্রাণে পূর্ণ অনুভূতি, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পান, রন্ধ্রে রন্ধ্রে পান করিয়া অমর হইতেছেন—ভাবিতেছেন, তখনই জীবনের অব্দের আরম্ভ—পার্থিব সাধারণ গৃহ-পঞ্জীর নির্দ্ধারিত কোন দিবসবিশেষে নহে। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, চতুষ্পার্শ্বে যে শক্তি সতত তৎপর, তাহাই মানবাত্মার পরিমাণ গঠন সাধন করিয়া তাহাকে প্রেমের তন্ত্রী-সহযোগে সাধিয়া দিবে। কখনও প্রকৃতির প্রদত্ত শিক্ষায় তৃপ্ত ও বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়া জগৎকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—

"Come forth into the light of things ;
Let nature be your teacher."

আর বলিতেছেন, আন ভক্তিপ্রবণ গ্রহণশীল সতর্ক হৃদয়—

"Bring with you a heart
That watches and receives."

আর কখনও দেখিতেছেন, মেঘ কুমারীর দেহে তাহার ভঙ্গিমা গরিমা প্রদান করিতেছে, তাহার জন্য উইলো বৃক্ষ গ্রীবা হেলাইয়া নত হইতেছে,—ভীষণ ঝটিকাবর্তের এমন একটা শোভন ভাব আছে, যাহা নীরব অলক্ষিত সহানুভূতির দ্বারা কুমারীর দেহগঠন-বিন্যাস করিয়া দিতেছে। তারপর? তার পর স্মৃতিখানি—আর স্থির নিশ্চল দৃশ্যটি—যে দৃশ্যে তাহার সমস্ত মধুর সঞ্চার সঞ্চিত আছে, তাহাই—আমার জন্য রাখিয়া দিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার দিন-গুজরান শেষ হইয়া গেল!

প্রকৃতির প্রতি গভীর আস্থাবান আমাদের কবি। প্রকৃতি তাঁহার শোণিতের কণায়, হৃদয়ের প্রতি অণু-পরমাণুতে অনুভূত—তাহাতেই কবি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন যে, প্রকৃতি কখনও বিশ্বাসহন্ত্রী নহে, বিদ্রোহাচারিণী নহে—"Nature never did betray the heart that loved her"—বরং মানব-চিত্তকে আনন্দ হইতে আনন্দে লইয়া যাইতেছে। তাই, প্রকৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাঁহার all-in-all. এই মুহূর্ত্তে প্রকৃতির এই প্রাঙ্গণে বহু ভবিষ্য-যুগের জন্য জীবন ও অন্ন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাজান রহিয়াছে। গভীর আনন্দ ও নিবিড় সামঞ্জস্যের শক্তিতে শান্ত স্তিমিত, জ্বালাহীন নেত্রে প্রতি পদার্থের ভিতরটুকু দেখিয়া লইয়াছেন। শৈশবে প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়াছিলেন—সে শৈশব চলিয়া গিয়াছে—এখন অন্তর্দৃষ্টিতে অন্যভাবে প্রকৃতিকে দেখিতেছেন—কিন্তু তাহাতে ক্ষোভ নাই, কারণ আজ নূতন আনন্দ নূতন সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধিতে তিনি তাই প্রকৃতির প্রগাঢ়তর প্রেমিক। আরও—বিশেষতঃ তিনি বুঝিয়াছেন, প্রকৃতি তাঁহার পবিত্র চিন্তার ত্রাণ ও আশ্রয়, চিত্তের বিশ্রামভূমি হৃদয়ের ধাত্রী, অভিভাবিকা, নেত্রী। কবি বলিতেছেন—সম্পদে হউক, বিপদে হউক, জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে হউক, ঝঞ্ঝাপর্য্যুদস্ত হইয়াই হউক, স্থির থাক,—পরবর্ত্তী সময়ে এই সমস্ত আনন্দ ও বেদনা প্রশান্তভাব ধারণ করিবে; তখন দেখিবে, তোমার চিত্ত যা-কিছু সুন্দর সে সকলের আধারভূমি হইয়াছে—ছবির ত্রিদিব-স্বপ্নে, গানের স্বর-স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কবি প্রকৃতির এতই পক্ষপাতী যে, প্রকৃতির সঙ্গে যাহার সামঞ্জস্য আছে, তাহাই তিনি সুন্দর দেখেন। তিনি দস্যুতার পক্ষপাতী নহেন; কিন্তু পার্থিব দণ্ডধর লোক-সম্মত রাজ-দস্যুর কার্য্য-কলাপের সহিত তুলনায় বিধি-বহিষ্কৃত আরণ্য দস্যু Rob Royএর কার্য্যকলাপও তিনি প্রকৃতির বিধানের সহিত সমধিক সুসমঞ্জস দেখিতেছেন। প্রকৃতি-ভূমিতে Rob Roy যে কবির প্রতিবেশী!

সে কবিতার সার্থকতা তত বেশী, যে কবিতায় জীবনের কথা যত বেশী শোনা যায়। ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ সংসারকে—সঙ্কীর্ণ সংসারকে—পশ্চাতে রাখিয়া, বিপুলা প্রকৃতিকে সম্মুখে রাখিয়া, তাহারই নিকট জীবনের কথা শিখিয়া, মানবকে শিখাইতেছেন। আহার-নিদ্রা, ক্ষুদ্র সাংসারিকতার কথা, লইয়া তিনি ব্যস্ত নহেন—ধাত্রী প্রকৃতির কাছে বসিয়াই তিনি জীবনের কথা, মর্ম্মের কথা শুনাইতেছেন। যে কবিতায় পরিণত-চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে, জীবন-নীতিলাভ করে, এরূপ কবিতাই ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের;—কিন্তু এ নীতি ত চাণক্য-নীতি নহে।

আবার অপর দিকে তিনি—

"Type of the wise who soar but never roam,
True to the kindred points of Heaven and Home."

আমাদের কবির জীবন—শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র, মনোরম। সে জীবনে পার্থিব—মাটির সুখদুঃখের তরঙ্গাভিঘাত খুব কমই হইয়াছে। তিনি প্রকৃতির নিগূঢ় মর্ম্মস্থলে পৌছিয়া আনন্দ আহরণ করিতেছেন—মানব-সমাজের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের মধ্যে আসিয়া পড়িতে তিনি সর্ব্বদাই দ্বিধা-সঙ্কোচ অনুভব ও সতত ইতস্ততঃ করিয়াছেন; যখনই অতি-সন্তর্পণে একটু উঁকি দিয়া দেখিলেন মানব সমাজের কি দুর্দ্দশা, তখনই প্রকৃতিতে বিরাজমান অবারিত প্রীতি, অবাধ সম্মিলন, অকপট সৌভ্রাত্রের পার্শ্বে মানুষের রক্তা-রক্তি কাড়াকাড়ি দেখিয়া আহত-চিত্তে বেদনাপ্লুত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,"What man has made of man!" যে কবি বলেন "Love him or laeve him alone"—তিনি

মানব-চিত্তের এই শোচনীয় পরিণামে ব্যথিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে ?

আর একবার তিনি Veniceএর স্বাধীনতা পদদলিত হইতে দেখিয়া বলিতেছেন—

"Men are we, and must grieve when even the shade
Of that which once was great, is passed away."

এরূপ বেদনার নিঃশ্বাস-ধ্বনি তাঁহার কবিতার মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। মানবের মর্ম্মের অন্তঃস্থলে যে বিষাদ-সিন্ধু লুক্কায়িত রহিয়াছে, যে বিষাদের আর্ত্তোক্তি শেলির—

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থও সে বিষাদের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, কারণ কবির জীবনে সে বিষাদের আস্বাদন না পাইয়া যায় না—

"We poets begin in early youth
In............gladness
............and end in
Despondency and madness."

অন্যত্র—

"We wear a face of joy, because
We have been glad of yore."

ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের স্বাধীনতাপ্রিয় চিত্ত একবার ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতি সবেগে আকৃষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু, বিপ্লব-কারীদিগের দুষ্ক্রিয়ার ফলে, সে চিত্ত প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসিল, তাঁহার সে স্বপ্ন ঘুচিয়া গেল—

"It is past, that melancholy dream."

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের আর এক বিশেষত্ব, তাঁহার ছবি ও গান। কবি যেখানে যে দৃশ্যটি দেখাইয়াছেন, তাহারই ছবির স্বপ্নে তাঁহার চিত্তটি ভোর। যেখানে যে গানটি শুনিয়াছেন, সে গানের স্মৃতি তাঁহার অবসর সময়ে হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। সেই ছবি ও গান আবার মূর্ত্তিতে ও বিচিত্র রাগিণীতে তাঁহার কবিতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দুঃখের যে করুণ-গীতির বিষয়ে কবি প্রশ্ন করিয়াছেন—

"For old, unhappy, far-off things,
And battles long ago,
Or is it some more humble lay
Familiar matter of to-day ?
Some natural sorrow, loss or pain,
That has been and may be again ?"

ইহা সেই গান। আর অবসর সময়ের হৃদয় 'Daffodils'এর যে ছবির সঙ্গে নাচিতে থাকে,—ইহা সেই ছবি।

'Primrose of the Rock'এ কবি অমরতার সন্ধান পাইয়াছেন। আর 'Ode on the Intimations of Immortality' কবিতা, কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা না হইলেও, তাহাতে সর্ব্বত্র কবির 'Idealism' পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মানবাত্মা সুদূর দেশে একটি গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, জীবন-প্রত্যূষে এই ধারণা বলবতী, দিনের সূর্য্য যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে ধারণা তিরোহিত হইয়া যায়, মানব ভগবান হইতে দূরে পড়িয়া যায়। প্রত্যেক সহৃদয় কবির প্রাণে এরূপ অস্ফুট আভাস, এরূপ অব্যক্ত অনুভূতি আসে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থেরও একটি বিশেষত্ব এই 'Idealism'এ।—'Cuckoo' কবিতায় ইহার ক্ষীণধ্বনি।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, প্রেম লইয়া বড় একটা নাড়াচাড়া করেন নাই বটে ; কিন্তু তাঁহার 'Lucy Poems'এ প্রেমের যে অব্যক্ত বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহা অত্যন্ত গভীর—অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু কে সেই 'Lucy' যে 'Turned her wheel beside an English fire' ? কে সেই লুসি, যাহার কথায় কবি বলিতেছেন, সে ছিল 'Half-hidden from the eye', যে 'Lived unknown and few could know when Lucy ceased to be' ; কিন্তু এখন "She is in her grave, and oh ?
The difference to me !"

কে সেই 'Lucy', যে—পার্থিব কালের স্পর্শ অনুভব করিবার মত ছিল না ; এখন পৃথিবীর আহ্নিকগতির সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, এখন সে অন্ধ, বধির, নিস্পন্দ !—কে সেই অদৃশ্য অনির্দ্দেশ্য লুসি ? যাহার কুটীর-পশ্চাতে চাঁদ অস্ত গেল, তখন কবির প্রাণে হঠাৎ ধাক্কা লাগাইয়া চিন্তা জাগিল—"হয়ত লুসি নাই !"

এই রহস্য, 'কবির Lucy Poems'কে একটি অব্যক্ত

বেদনার তীব্রতায়, একটি মাধুরীর মাদকতায় জড়াইয়া রাখিয়াছে। কবির এই ক্ষুদ্র কবিতা কয়টি অনেক কবির সহস্র প্রেম-কবিতাকে পরাস্ত করিয়া দেয়।

আর, কবি তাঁহার পত্নী Mary Hutchinsonএর যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর, পবিত্র মধুময় জীবনের দ্যোতক।

একদিন দুইটি বালিকার কোমল করুণ কণ্ঠের "আপনারা কি পশ্চিমদিকে যাইতেছেন?" এই প্রশ্নে কবির মনের সম্মুখে একটি অপরিচিত, পরিচয়-সম্ভাবনাহীন অসীম বিস্তীর্ণ মহাপ্রান্তর উন্মুক্ত হইয়া পড়িল—সে এক সৌর-করোদ্ভাসিত সুদূর দেশে—আশার উজ্জ্বল আকাশ মাথার উপর রাখিয়া, একাকী সেই পশ্চিমে যাইতে হইবে—অসীম পথের যাত্রী, অদৃষ্টের ভবিতব্যতার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়াও সাহসে বুক বাঁধিতেছি। সে প্রশ্নের স্বরে স্থানকাল ভুলাইয়া দেয়, সীমার বন্ধন ভাঙ্গিয়া দেয়, হৃদয়ে আবার একটি উদাসভাব, একটি নিরাশ্বাস ভাব জাগিল—কারণ, সে যে সুদূর অপরিচিত দেশ—বঙ্গীয় কবির পক্ষে আফ্রিকার জনহীন প্রান্তর। আবার বালিকার কণ্ঠস্বরে একটা মানবীয় কোমলতা কমনীয়তা মাখান ছিল। সেই কণ্ঠস্বরের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি আবার দূরদেশে পরিচিত কণ্ঠস্বরের ন্যায়—আমার সুদূর অনন্ত-পথের যাত্রার নিরাশ্বাস-চিন্তায়, একটুখানি পরিচিতের মাধুর্য্য, একটু মানবীয় কোমলতা, একটু আত্মীয়তার সহানুভূতি মাখাইয়া দিল। আর সুদূর-যাত্রার চিন্তাও মধুর হইয়া উঠিল। এরূপভাব ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের বিশেষত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতা অনেক আবর্জ্জনা-রাশিতে মগ্ন। বিশেষতঃ, কবিতার ভাষা-সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি অদ্ভুত অপধারণা ছিল, সৌভাগ্যক্রমে তিনি নিজে সর্ব্বত্র সে মতের অনুসরণ করেন নাই। যেখানে অনুসরণ করেন নাই, সেখানেই তাঁহার প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, অমরত্ব তাহার ক্ষুদ্র কবিতায়, বৃহৎকাব্যে নহে। আবর্জ্জনামুক্ত করিয়া না লইলে, তাঁহার কবিতার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না।

কবিতার পংক্তিবিশেষের, বা পংক্তি-কতিপয়ের, সৌন্দর্য্যে উৎকর্ষে হয়ত কোন কোন কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন; কিন্তু কবির যেগুলি প্রধান গুণ, প্রধান সম্পদ্, তাহা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহা অন্যান্য অনেক কবির নাই। সমস্ত দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের আসন অনেক উচ্চে।

তিনি আমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন—

"Of truth, of grandeur, beauty, love
and hope,
And melancholy fear subdued by faith,
Of blessed consolations in distress,
Of moral strength and intellectual power,
Of joy in widest commonalty found."

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যে আমরা যে আনন্দের সংবাদ পাই, সে সংবাদ—'Of joy in widest commonalty found,'—সে আনন্দের উৎস সকলেরই পরিচিত, সকলেরই পক্ষে সহজে অধিগম্য।

কিন্তু কবি চান—"Fit audience (let me find) though few". কবির 'Audience' প্রকৃতরূপে 'fit' হইতে গেলে, 'few' ত হইবেই। প্রকৃত রসগ্রাহী শ্রোতা না হইলে কোনও কথা বলা নিরর্থক।

যাহা স্থায়ী, অমর, চিরন্তন, তাহা মানব-চিত্তমণ্ডলে চিরদিন ঝঙ্কৃত হয় বলিয়াই স্থায়ী, অমর ও চিরন্তন।

লক্ষিতে বা অলক্ষিতে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, যাহা মানব-চিত্তের গঠন করে, অথবা মানবচিত্তে পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব ঘটাইয়া মানবজাতির ভবিষ্যৎকে স্থায়িরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়, তাহাই টিকিয়া থাকিবার যোগ্য হয়, বিস্মৃতিকে পরাজিত করে।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থেরও সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাঁহার প্রভাব মানবজাতির হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়াছে—জানি না, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তাহা কল্পনা অথবা আশা করিতে পারিয়াছিলেন, কি না। শুধু যশের জন্য—প্রশংসার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন নাই; প্রশংসার স্তুতিগান শুনিবার জন্য, নরদেহ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ আর উদ্গ্রীব নহেন। কিন্তু, অশরীরী ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ মানবচিত্তে বিরাজিত; মানবপ্রাণে বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, মানবহৃদয়ের উপত্যকা-ভূমিতে আলোছায়ার বিচিত্র-লীলা প্রকটিত করেন; অন্ধকারের শেষে গভীর হৃদয়-উপত্যকা তাহার স্বর্ণরাগ শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া পায়, ঝড়ের শেষে নির্ঝরিণীর

অস্ফুট-ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠে। সেইখানেই কবির রাজত্ব—সৈন্য সমাবেশ, অস্ত্র-চালনা, অ-কবির দ্বন্দ্ব-কলহ সেখানে নাই—কারণ সে যে হৃদয়-রাজ্যের রাজত্ব।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবার্ট বার্ণ্‌সের সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, বার্ণ্‌সের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমিও তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ভাষায় বলি—

"Deep in the general heart of men
His power survives".

লক্ষ্মীছাড়া

[বীরকুমার বধ-রচয়িত্রী]

পাড়াগাঁয়ে দারুণ শীতে—
আকাশখানি মেঘে মাখা,
প্রকৃতি মা আছেন আজি
নীলবসনা—ঘোম্‌টা ঢাকা!
আম-জাম তাল-গাছের সারি
দাঁড়িয়ে যেন ভূতের মত;
বাবুর বাড়ী গাইছে গীতি
"মা আমায় ঘুরাবি কত!"
এমনিতর আঁধার রেতে
হয়েছিলাম পথহারা,
সহসা এক আলোক নিয়ে
এল দুটো "লক্ষ্মীছাড়া"!—
গাঁয়ের মাঝে ভাগ্যবন্ত—
লক্ষ্মীমন্ত অনেক আছে,
ডাকিলে কেউ দেয়নি সাড়া,
কেউ আসেনি দীনের কাছে।—
সভায় যারা সভাপতি—
খ্যাতি "দাতাকর্ণ" ব'লে,
তা'রা কি কেউ খবর রাখে
আমার মত অধম ম'লে?
বৈঠকখানায় রাজা-উজির
দু'বেলা যার কাছে আসে,
দেখ্‌তে কি তার সময় আছে
গরীব মরে বাড়ীর পাশে?—
মা'য় তাড়ানো বা'প-খেদানো
সেই যে দুটো "লক্ষ্মীছাড়া"
এমনি ক'রে কাছে এল—
আমার যেন সোদর তা'রা!
শীতের নিশা, মেঘের জলে
সিক্ত আমার বসনখানি,
সেই যে দুটো, অনায়াসে
ফেলিল সে কাপড় টানি;
নিজের গায়ের র‍্যাপারখানা
জড়িয়ে দিল আমার গা'য়,
আমি কিন্তু অবাক্ হলেম—
না জানি কি "মাশুল" চায়!
আবার এনে গরম মুড়ি
দিয়ে দিলে খিদের মুখে,
খেয়ে বুঝি পায়না কর্ম্ম,
তাই ছুটেছে খেয়াল বুকে!
গরম হয়ে, খেয়ে দেয়ে,
জিজ্ঞাসিলাম—"চাও কি কিছু?"
মাথা নাড়ি—"না—না" বলি
রইল মাথা করি নীচু।
"কিছুই যদি চাওনা তবে,
প্রাণ বাঁচালে কিসের তরে;—
অধম আমি—কাঙাল আমি—
শোধ্ দিব হায় কেমন করে?"
বল্‌তে গিয়ে আঁখির জলে
গেল আমার আনন ভেসে!
পাগল তারা—নয়ন মুছে,
দুজন মিলে বোল্লে হেসে,—
"কিসের তরে চাইব ঠাকুর!
কিসের অভাব কোথায় আছে?—
লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশঃ, খ্যাতি,
নাই তো সে সব মোদের কাছে।
ধন চাই না, মান চাই না,
চাই না কিছুই তেমন ধারা;
এম্‌নি করে বেড়াই ঘুরে
আমরা দু'নের লক্ষ্মীছাড়া!"
ব্রাহ্মণ আমি—হরি শর্ম্মা,
সে কথাটা আশু তুলি,
বল্লেম—"বাবা লক্ষ্মীছাড়া!
দে' আমারে পায়ের ধূলি।"

ভারতের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী

[শ্রীজলধর সেন]

অনেকদিন পূর্ব্বে ভারতের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর আর এতদিন উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কিছু লিখিবার অবকাশ পাই নাই এবং তেমন আগ্রহও হয় নাই। এখনকার দিনে যে পাঠকগণ সাধু-সন্ন্যাসীর কথা শুনিবেন, একথা আমার মনে হয় নাই। কিন্তু দেখিতেছি, কয়েকটি বন্ধু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগের সম্বন্ধে আরও দুই চারিটা কথা শুনিতে চান। এদিকে আমার দৃষ্ট ও শ্রুত অনেক ঘটনা ধীরে ধীরে আমার স্মৃতি-পট হইতে অপসারিত হইতেছে,—যাহা চিরকাল মনে থাকিবে ভাবিয়াছিলাম, তাহারও আর এখন খোঁজ পাই না। তবে এখনও চেষ্টা করিলে দুই চারিটি ঘটনা স্মরণ করিতে পারি, আর কিছু দিন পরে তাহাও মুছিয়া যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণার ইহাও একটি কারণ।

আরও একটা সুবিধা হইয়াছে। আমার পরম স্নেহ-ভাজন, সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একদিন কথা-প্রসঙ্গে সন্ন্যাসীদিগের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার নিকট একখানি ইংরাজী গ্রন্থ আছে; তাহাতে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর কথা আছে। আমি সেই গ্রন্থখানি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাকে দিয়াছেন। গ্রন্থখানি মিঃ জন ক্যাম্বেল ওমানের লিখিত। তাহাতে ভারতের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং লেখক-মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন-কালেও তৎপূর্ব্বে যে সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়াছিলেন এবং যাহাদিগকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহারও কয়েকটি বিবরণ আছে। এই মূল্যবান পুস্তকখানি পাইয়া আমার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগের বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা আরও একটু বাড়িয়া গেল। সেই কারণেও এতদিন পরে আমি এই বিবরণ লিখিতে বসিয়াছি। সুতরাং এখন হইতে আমি যাহা বলিব, তাহার কতকগুলি আমার দৃষ্ট ও শ্রুত, অপর কতকগুলি শ্রীযুক্ত ওমান সাহেবের দৃষ্ট ও শ্রুত। আজকাল যে প্রকার মৌলিকতার (originality) কাল পড়িয়াছে, তাহাতে এই বৃদ্ধ বয়সে আর এমন করিয়া 'ওরিজিনালিটি' দেখাইবার বাসনা নাই।

এইবার সন্ন্যাসীদিগের কথা আরম্ভ করা যাউক। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের সিবিলি ও মিলিটারী গেজেটে (Civil and Military Gazette) একটি সাধুর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বিবরণটিই সর্ব্ব-প্রথমে পাঠক-পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। উক্ত পত্রের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—"একদিন এক যোগী ত্রিবিন্দম সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, কি জাতি, এ সকল কথা কেহই জানে না; তবে ইঁহাকে দেখিয়া হিন্দু যোগী বলিয়াই মনে হয়। ইনি ত্রিবিন্দম সহরে আগমন করিয়া, পদ্মতীর্থ সরোবরের তীরস্থিত একটি পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই স্থানেই তিনি একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল অবস্থান করেন। প্রথম যখন তিনি ত্রিবিন্দমে আগমন করেন, তখন তিনি প্রথম দুই তিন সপ্তাহকাল প্রতি সপ্তাহে দুই দিন কি তিন দিন সামান্য একটু দুগ্ধ এবং একটি কি দুইটি কলা খাইতেন। তাহার দুই তিন মাস পরে দেখা গেল যে, তিনি একেবারে আহার ত্যাগ করিলেন, লোকের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন, সমস্ত দিন সেই বৃক্ষতলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে লাগিলেন; একবারও সে আসন ত্যাগ করিলেন না। কেহ কোন কথা বলিলে তাহার উত্তর দিতেন না, কাহারও দিকে মুখ তুলিয়াও চাহিতেন না। এমন কি, কোন শব্দ শুনিলেও সে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন না। এই ভাবে তাঁহার প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল। তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্যের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল;

দলে দলে লোক এই সাধুকে দর্শন করিবার জন্য সেই স্থানে সমবেত হইতে লাগিল।

"ক্রমে কথাটা ত্রিবাঙ্কোরের মহারাজা বাহাদুরের কর্ণ গোচর হইল। তিনি একদিন এই যোগীকে দর্শন করিবার জন্য সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। মহারাজা বাহাদুর যোগীকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে কথা বলাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যোগিবর মহারাজের একটি কথারও উত্তর দিলেন না, এমন কি তাঁহার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। তাহার পর হইতে প্রতিদিন শত শত লোক এই সাধুকে দর্শন করিবার জন্য সেই স্থানে আগমন করিত, কত জন কত দ্রব্য আনিয়া সাধুর সম্মুখে রাখিত; কিন্তু তিনি সে দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না। তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি কোন দিন জলবিন্দুও স্পর্শ করেন নাই, বা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আসন হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই। একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল যোগমগ্ন থাকিয়া, পরিশেষে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

এইবার সন্ন্যাসীদিগের অলৌকিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর জেলায় অত্যন্ত প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। প্লেগের ভয়ে সেই সময় অনেক লোক প্রাণরক্ষার জন্য দেশত্যাগ আরম্ভ করে; চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। প্লেগ-নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল; কিন্তু কিছুতেই প্লেগের উপশম হইল না, দিনে দিনে প্লেগের আক্রমণ বাড়িতেই চলিল। এমন সময় একদিন এক যোগী অমৃতসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন চেলাও ছিল। যোগী সহরের বাহিরে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর তীরে আস্তানা করিলেন, তাঁহার সঙ্গীরা সেইস্থানে একটা প্রকাণ্ড বস্ত্রাবাস নির্ম্মিত করিল। যোগী প্রকাশ করিলেন যে, তিনি প্লেগ-নিবারণের জন্যই অমৃতসরে আগমন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি কয়েকদিন যজ্ঞ করিবেন; যজ্ঞ-শেষ হইলে প্রথমে তিনি সহরের সমস্ত কুমারী-ভোজন করাইবেন; তাহার পর সেখানে উপস্থিত হিন্দু সাধু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদিগকে ভোজন করাইবেন। এতগুলি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারের ব্যবস্থা করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার একটি পয়সাও সম্বল ছিল না। কিন্তু এসকল কার্য্যে অর্থের অভাব হয় না; সহরের হিন্দু অধিবাসিগণ যখন এই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা দলে দলে যোগীর নিকট আসিতে লাগিলেন এবং যাঁহার যাহা সাধ্য তাহা এই সাধু কার্য্যের জন্য দান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হোমের উপকরণসকল সংগৃহীত হইল। যোগী স্থানীয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে কয়েকদিন হোম-যাগ যজ্ঞ করিলেন; তাহার পর কুমারী-ভোজন, সাধু ও ফকীর দিগের ভোজনও মহাসমারোহে শেষ হইল। তাহার পরই দেখা গেল যে, অমৃতসর হইতে প্লেগ অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহার কিছুদিন পরেই যোগী সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন; কিন্তু সেবার আর অমৃতসরে প্লেগ হইল না।

এইবার একটি সন্ন্যাসিনীর বিবরণ বলিব। ইঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল শ্রীমতী হরিকুমার বাঈ; কিন্তু সকলেই ইঁহাকে শ্রীমাজি বলিয়া

শ্রীমাজি

জানিতেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীরামেশ্বর দেব। ইঁহারা গুজরাটী ব্রাহ্মণ অনেক দিন হইতেই ইঁহারা কাশীধামেই বাস করিয়া আসিতেছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-গৃহে কাশীধামে শ্রীমাজি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা ভ্রাতা-ভগিনীতে ছয় জন ছিলেন, ইনিই সর্ব্ব কনিষ্ঠা। শ্রী মাজির বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়; সেই সময় হইতে তাঁহার পিতাই এই কনিষ্ঠা কন্যাটির

লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। শ্রীরামেশ্বর দেব পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার এই মাতৃহীনা কনিষ্ঠা কন্যাটিকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন; কন্যাটিকে তিনি সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন এবং অতি যত্নসহকারে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়াইতেন। শ্রীমাজির বয়স যখন দশ বৎসর, তখন কাশীধামেই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের তিন বৎসর পরে শ্রী মাজি শ্বশুরের ঘর করিতে গমন করেন। দুই বৎসর পরেই তাঁহার পতিবিয়োগ হয়, বিধবা শ্রীমাজি তখন শ্বশুর-গৃহ ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আগমন করেন। পিতা তখন কন্যাকে সর্ব্বাংশে ব্রহ্মচারিণী করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই কাশীর পণ্ডিতসমাজে শ্রীমাজির শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্ম্মপরায়ণতার কথা প্রচারিত হইয়া পড়ে। কুড়ি বৎসর বয়সের সময় শ্রীমাজি নানা শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই সময় তাঁহার পিতা শ্রীরামেশ্বর দেব তীর্থ-ভ্রমণে যাইবার অভিপ্রায় করেন। তিনি কন্যাকে গৃহে রাখিয়া যাইতে চান না, কন্যাও পিতাকে ছাড়িয়া গৃহে থাকিতে অসম্মত হইলেন, আত্মীয়গণ অনেক নিষেধ করিলেন; সে সময়ে তীর্থ-স্থানে গমনাগমন বিশেষ কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল ছিল, এ কথাও সকলে শ্রীমাজিকে বলিলেন। কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার পিতাও সানন্দে তাঁহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা পিতা-পুত্রীতে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। শ্রীমাজি উভয়ের আবশ্যক দ্রব্যাদির একটা মোট বাঁধিয়া সমস্ত পথ মাথায় বহিয়া যাইতেন। এই প্রকারে তাঁহারা বহু কষ্ট করিয়া, পাঁচ বৎসরে জগন্নাথ ক্ষেত্র, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, বদরীনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বাড়ীতে ফিরিয়া শ্রীরামেশ্বর দেব আর সংসার-ধর্ম্মে মন দিতে পারিলেন না; সমস্ত ত্যাগ করিয়া ধ্যান-ধারণায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। কন্যা শ্রীমাজিও পিতার অনুবর্ত্তিনী হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। শ্রীরামেশ্বর দেবের গুরুর নাম ছিল স্বামী শ্রীসচ্চিদানন্দ। তিনি কাশীধাম হইতে বার মাইল পশ্চিমে একটি নির্জ্জন স্থানে আনন্দ-গুম্ফা নামক একটি ভূমধ্যস্থ গুহায় বাস করিতেন। শ্রীরামেশ্বর দেব যখন তীর্থভ্রমণ *শেষ করিয়া* দেশে আসিলেন, সেই সময় তাঁহার গুরুদেব দেহরক্ষা করিলেন। রামেশ্বর দেব তখন আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, গুরুর সেই আনন্দ-গুম্ফায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিতাপুত্রী সেই গুম্ফায় দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহারা কখনও লোকালয়ে আসিতেন না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে যখন রামেশ্বর দেব দেহত্যাগ করিলেন, তখন শ্রীমাজির আত্মীয়গণ তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি যে পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সে পথ হইতে ফিরিতে চাহিলেন না, একাকিনী সেই আনন্দ-গুম্ফায় ভগবদানন্দে জীবন অতিবাহিত করাই স্থির করিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। তাহার পর ৩৮ বৎসর তিনি একাকিনী ঐ আনন্দ-গুম্ফায় বাস করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কত দূরদেশ হইতে দলে দলে লোক আনন্দ-গুম্ফায় উপস্থিত হইত; কিন্তু তিনি কোন দিন কাহাকেও কোন প্রকার ঔষধ-বিতরণ বা মন্ত্র-প্রদান করেন নাই। সকলেই তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। কত জন কত দ্রব্য তাঁহাকে উপহার দিত, কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শও করিতেন না, যেখানকার জিনিস সেই স্থানেই পড়িয়া থাকিত, বা যাহার ইচ্ছা হইত, সে লইয়া যাইত। তিনি সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সামান্য ফলমূল খাইয়াই জীবনধারণ করিতেন। শ্রীমাজির কথা আমি অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, প্রথম যে দুই একবার কাশীতে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে দর্শন করিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যেবার আমি কাশীতে যাই, সেইবার শ্রীমাজির দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তখন যদি জানিতাম যে, এই সকল ঘটনা কোন দিন আমাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এই সকল কথা আমাকে বলিতে হইবে, তাহা হইলে কত কথা স্মারক-পুস্তকে লিখিয়া রাখিতাম। সে সময় ত তাহা মনে হয় নাই; তাই এখান ওখান খুঁজিয়া এই সকল কথা সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তবে শ্রীমাজিকে আমি যেবার দর্শন করিতে

যাই, এতকাল পরেও সে কথা আমার মনে আছে। আমি একদিন প্রাতঃকালে কাশী হইতে পদব্রজে যাত্রা করি; একাতেও যাওয়া যায়; কিন্তু আমার কাছে তখন ত আর পয়সা-কড়ি ছিল না; এবং একাওয়ালা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য 'একাচালকের' কাজ করে না; কাজেই আমাকে পদব্রজেই যাইতে হইয়াছিল। আনন্দগুম্ফা কাশী হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। যাইবার বাঁধা রাস্তা আছে। আমি যখন আনন্দ-গুম্ফায় গিয়াছিলাম, তখন বোধ হয় বেলা এগারটা হইবে। শ্রীমাজি তখন গুম্ফার মধ্যে ছিলেন। বাহিরে অল্প কয়েকজন লোক বসিয়া ছিল; তাহারাও মাজিকে দর্শন করিবার জন্যই আসিয়াছিল। তাহাদের নিকট শুনিলাম, মাজি তখনও বাহির হন নাই। একটু পরেই তিনি গুহা হইতে বাহির হইলেন। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিল, আমিও প্রণাম করিলাম। তিনি সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। যে কয়জন লোক ছিল, তাহাদের অনেকেই মাজিকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াই বিদায় গ্রহণ করিল; আমি ও দুই কি তিন জন লোক সেখানেই বসিয়া থাকিলাম। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা কতকগুলি কলা ও কিছু পেঁড়া গুম্ফার দ্বারে রাখিয়া গিয়াছিল। শ্রীমাজি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কোথা হইতে আসিতেছি। আমি বলিলাম, বাঙ্গালা দেশে আমার ঘর; আমি এলাহাবাদ হইতে শ্রীমাজিকে দর্শন করিবার জন্যই আসিয়াছি। তিনি সহাস্যবদনে আমাকে হিন্দী ভাষায় যে কয়েকটি কথা বলিলেন, আমি তাহার বাঙ্গালা মর্ম্ম বলিতেছি; এতদিন পরে কথাগুলি ঠিক ঠিক না হইলেও তাহার সার মর্ম্ম আমার মনে আছে। তিনি বলিলেন, "বাবা, দর্শন ত বাহিরের কিছু নহে, দর্শন যে মনের মধ্যে। তুমি আমাকে দর্শন করিতে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছ কেন? দেখিতে জানিলে আর আসিতে হয় না। এই দেখ না, আমি ত কোথাও যাই না, আজ প্রায় ৫০ বৎসর কোথাও যাই নাই; এইখানে বসিয়াই দেখিবার আশায় পথ চাহিয়া আছি।" এই বলিয়াই তিনি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইলেন; তাঁহার বদনমণ্ডলে কি যেন একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল; তিনি ধ্যানমগ্না হইলেন। মূর্খ অন্ধ আমি—কিন্তু তবুও আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, শ্রীমাজি যাঁহার আশায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন—নিশ্চয়ই দর্শন দিলেন; নতুবা মানুষের মুখে এমন জ্যোতিঃ প্রস্ফুরিত হয় না, এমন আনন্দে বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হয় না। দীনহীন আমি, হাঁ করিয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই শ্রীমাজির সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন। তাহার পরই তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "এখানে ত অতিথি-সৎকারের কিছুই নাই; তোমার আহারের কি হইবে বাবা!" আমি বলিলাম—"কিছুরই প্রয়োজন নাই।" যে দুই তিন জন লোক সেখানে ছিল, তাহাদের একজন বলিলেন, "এই যে কলা ও পেঁড়া আছে, ইহাই আহার করুন।" শ্রীমাজি সহাস্যবদনে বলিলেন—"তাই কর বাবা!"

তাহার পর কত যে কথা হইল, তাহা এতদিন পরে মনে হইতেছে না। আমি অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত সেই স্থানেই ছিলাম। তিনটার পর শ্রীমাজিকে প্রণাম করিয়া, সেই আনন্দ-গুম্ফা হইতে বিদায়-গ্রহণ করিলাম। এতকাল পরে শ্রীমাজির কথা বলিয়া, আমি ধন্য হইলাম।

এবার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদিগের সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিতে পারিলাম না; যদি পারি, তবে বারান্তরে আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হইলে অনেক কথা বলিতে পারিতাম, এখন যে সবই গোল হইয়া গিয়াছে, এখন যে আমার সে সকল কথা বলিতে হইলে, অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, পুঁথি খুঁজিতে হয়! হায় অদৃষ্ট!

পুরাতন প্রসঙ্গ

[শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, M. A.]

(৫)

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত

২২এ চৈত্র, ১৩২০।

আজ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম—"আপনার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনার যদি আপত্তি না থাকে,— ।" আমাকে বাধা দিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার বলিবার এমন কি আছে, যাহা আপনি আগ্রহের সহিত শুনিতে পারেন?" আমি বলিলাম—"আপনি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র; সে সম্বন্ধে অনেক কথা আপনি বলিতে পারেন। তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"১৮৩২ সালের ৬ই জুন তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করি; ১৮৪০ সালে বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হই।

"আপনি বোধ হয় জানেন না, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময়ে এদেশে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়। এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ রহিয়াছে, ঐখানে আমাদের বাঙ্গালা স্কুল ছিল। প্রবেশিকা ফী সমেত এক বৎসরের বেতন আগাম দেওয়া হইল—দুই টাকা মাত্র; দ্বিতীয় বৎসরের বেতন চারি টাকা দিতে হইয়াছিল। ইহার পরে যতদিন পর্য্যন্ত স্কুল-কলেজে পড়িয়াছিলাম, বেতন হিসাবে আর একটি পয়সাও আমার খরচ করিতে হয় নাই।

"বাঙ্গালা স্কুলে দুই বৎসর লেখা পড়া করিয়াছিলাম। লর্ড্ অক্‌ল্যাণ্ড মাঝে মাঝে এই বাঙ্গালা স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। আমার শিক্ষকদিগের মধ্যে পণ্ডিত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে বেশ মনে পড়ে; ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন। মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিতেন; কিছু কিছু পড়াইতেন। কি কি পুস্তক পড়া হইত, ঠিক আমার স্মরণ নাই; ভূগোল পড়িতে হইত; রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়িতাম।

"এই বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্য হইতে ছয় জন ছেলেকে বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে পড়াইবার নিয়ম ছিল। আমাদের বৎসরে নির্ব্বাচিত ছাত্রদিগের মধ্যে আমি অন্যতম ছিলাম; বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে প্রবেশ লাভ করিলাম।

"২২ নম্বর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে,—এখন যেখানে মিউনিসিপাল আপিস রহিয়াছে, ঐখানে হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল। হেড মাষ্টার ছিলেন—উমাচরণ মিত্র; তিনি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। গণিতের শিক্ষক ছিলেন —রাধামাধব দে। ইতিহাস পড়াইতেন—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যে সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিতাম, তন্মধ্যে মনে পড়ে, Homer's Illiad, Murray's Grammar, Playfair's Geometry, Goldsmith's Rome.
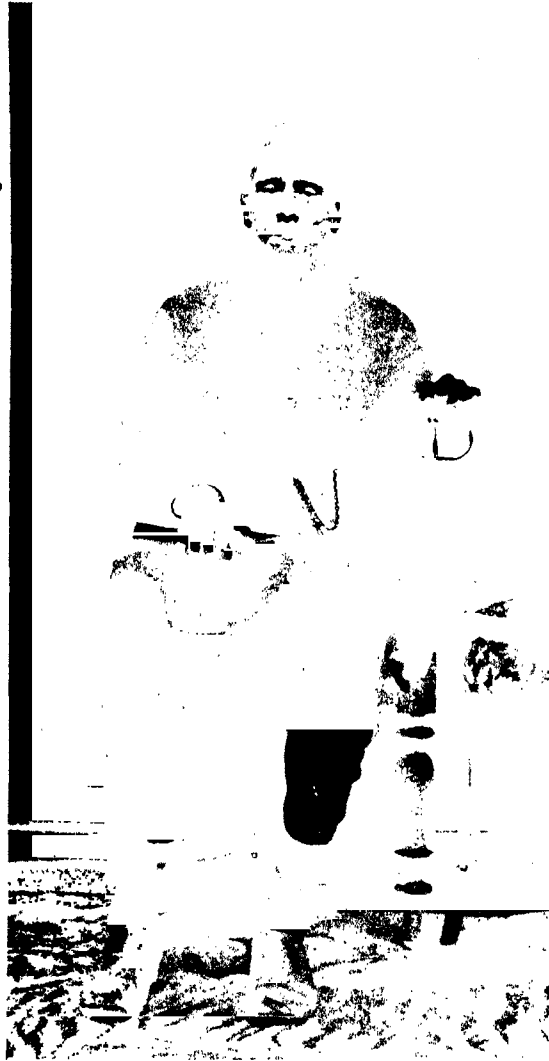
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক

"স্কুলে হেয়ার সাহেব শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন না। প্রথমে তিনি ঘড়ি তৈয়ার করার ব্যবসা লইয়া এদেশে আসেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচারে তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া, কোম্পানি বাহাদুর এক সহস্র টাকা বেতনে তাঁহাকে ছোট আদালতের জজ করিয়া দিলেন। সাহেব প্রতি রবিবারে স্কুলে আসিয়া আমাদিগের জামা খুলিয়া সাবান দিয়া গা ধোয়াইয়া দিতেন। যাহাতে ছেলেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সে বিষয়ে তিনি খুব যত্নবান্ ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই বাঙ্গালায় কথা কহিতেন। তিনি নিজে শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন; মাসান্তে শিক্ষকদিগের বেতন দিবার জন্য স্কুলে আসিতেন। যতদুর স্মরণ হয়, বোধ হয় গ্রীষ্মকালে ছুটি ছিল না; পূজার সময় ছুটি হইত, বড় দিনের ছুটিও ছিল।

"হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেব অন্যতম ছিলেন। তজ্জন্য কলেজ হইতে তিনি প্রতি মাসে তিন শত টাকা allowance পাইতেন। তিনি সেই টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন—'আমি ও টাকা লইব না। উহার পরিবর্ত্তে আমার স্কুলের ত্রিশটি ছাত্র বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে পায়, ইহাই আমার বাসনা।' তদবধি ৩০টি করিয়া হেয়ার স্কুলের ছাত্র হিন্দু কলেজে বেতন না দিয়া অধ্যয়ন করিতে পাইত। সেই ত্রিশজনের মধ্যে আমাদের বৎসরে আমি অন্যতম। এমনি করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ-লাভ করিলাম। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর দিন আমার খুব মনে পড়ে। সব স্কুলে বন্ধ হইল। গোলদীঘীতে গোর দেওয়ার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। ছাত্রেরা নগ্নপদে গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরেও ত্রিশজন ছাত্র বরাবর হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইত। এই ব্যবস্থা প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল।

"হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল—

Pope's Essay on Criticism.
Cowper's Task (Richardson's Selections).
Drama একখানা, বোধ হয় Otway-রচিত Venice Preserved.
Bell's Euclid.
Stewart's Geography.
Goldsmith's Rome.
Keightley's India.
প্রবোধ চন্দ্রোদয়।

"আমাদের হেড মাষ্টার ছিলেন—রিচার্ড জোন্‌স্; (Richard Jones) খুব যোগ্য লোক; অল্প স্বল্প ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন; কিন্তু তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ও ছিলেন; পরে কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার নিজের একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল; সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব বলিতেন—'কলিকাতায় আর কাহারও এত বড় লাইব্রেরি নাই।'

"আমাদের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন—ভন্ সাহেব (Vaughan); তাঁহার নিকটে আমরা একটু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। হেয়ার স্কুলে আমরা Hind's Algebra হইতে অঙ্ক কসিতাম। হিন্দু কলেজে আসিয়া দেখি যে, Wood's Algebra হইতে অঙ্ক কসিবার হুকুম হইয়াছে। তখন সবে মাত্র কলিকাতায় Wood's Algebra আমদানি হইয়াছে; অনেক দাম। হেয়ার স্কুলের ছেলেরা Hind's Algebra হইতে অঙ্ক কসিয়া আনিলে সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'তোমরা এ ক্লাসের উপযুক্ত নও (you are not fit for the class);'—অগত্যা কলেজের একটি ছেলের বই দেখিয়া অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিলাম।

"আমাদের ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষক ভাইনিং সাহেব (Vining) খুব ভাল লোক ছিলেন। বাঙ্গালা পড়াইতেন রামচন্দ্র মিত্র। মিত্রজ মহাশয় আমাদিগকে Geography ও পড়াইতেন। সাহেবদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য তাঁহার প্রাণপণ প্রয়াস ছিল; পাঁচজনের নিকট হইতে খবরের কাগজ লইয়া আসিয়া সাহেবদিগকে পড়িতে দিতেন।

"স্কুল-বিভাগে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া আমি জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পাস করিয়া Fourth College Classএ উন্নীত হইলাম। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল—

Shakespear's King John.
Vanity of Human Wishes.
Spectator (First Half).
Euclid I.—VI. and XI.
Plane Trigonometry—Hindman's.
Wood's Algebra (Up to Binomial Theorem and Summation of Series).
Hume's History of England.
Stewart's Mental Philosophy.

"কলেজের প্রিন্সিপ্যাল লজ্ সাহেব (Edmund Lodge) ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন; বিশেষতঃ তিনি সেক্ষপীয়র ও জন্সন্ পড়াইতে ভালবাসিতেন। তিনি গণিতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। চৌরঙ্গীতে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম; সেখানে আমার সহিত অনেকক্ষণ ইংরাজি কাব্যের আলোচনা করিতেন।

"Spectator পড়াইতেন ফোগো সাহেব (D. Foggo); লোকটি কেম্ব্রিজের বি. এ.; বিবাহ করেন নাই; রুগ্ন

ডেভিড হেয়ার

ছিলেন। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন—সট্‌ক্লিফ্ সাহেব (Sutcliffe)। স্কুলের হেডমাষ্টার জোন্স্ সাহেব দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন।

"দ্বিতীয় বৎসরে আমরা নূতন পাঠ্যপুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

	শিক্ষক
Shakespear's Hamlet	লজ্
Bacon's Essays.	ফোগো
Scott's Lay of the Last Minstrel	লজ্
Potter's Mechanics.	
Geometrical Conic Sections.	
Algebra.	

Guizot's History of the English Revolution.
Physical Geography
Stewart's Mental Philosophy.

"দ্বিতীয় বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করা গেল।

Shakespear's Macbeth.
Do. Henry VIII.
Milton's Paradise Lost I.-II.
Bacon's Advancement of Learning.
Dugald Stewart's Mental Philosophy.
Analytical conics.
Differenfial and Integral Calculus.
Hydrostatics.
Adam Smith's Wealth of Nation.
Smith's Moral Sentiments.
Mill's Logic.
Macaulay's History of England.
Arnold's Lectures on Modern History.
Spherical Trigonometry.
Newton's Principia.

"লজ্ সাহেব প্রথমে আমাদিগের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু Council of Educationএর সেক্রেটরি ডাক্তার মৌআটের সহিত তিনি ঝগড়া করিলেন; কিছু দিনের জন্য ছুটি চাহিয়াছিলেন, ছুটি মঞ্জুর হইল না; তিনি পদত্যাগ করিলেন। সটক্লিফ্ সাহেব আমাদের গণিতের অধ্যাপক হইলেন। জোন্‌স্ ও সটক্লিফ উভয়ে অধ্যক্ষের কাজ (Joint Principals) করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে যখন হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হইল, তখন সটক্লিফ্ সাহেব প্রিন্সিপ্যাল হইলেন; জোন্‌স্ কেবলমাত্র অধ্যাপনা করিতেন।

"গণিতের আর এক জন অধ্যাপক ছিলেন—ভিন্সেন্ট্ রীস্। ইঁহার জন্মস্থান সুইট্‌জার্লাণ্ড্। ইনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া Surveyor Generalএর আপিসে Meterological Reporter নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ বেলা তিনটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কলেজে আসিয়া অঙ্ক কসাইতেন; তিনটা ক্লাসের ছাত্র একত্র করিয়া তিনি পড়াইতেন। একখানি বীজগণিত (Lecroix's Algebra) তিনি ফরাসি ভাষা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই নিরীহ অধ্যাপকটি যে নেপোলিয়নের ধ্বজাধারী (standard bearer) ছিলেন, এমন কল্পনা কাহারও মনে সহসা উদিত হইতে পারে না; কিন্তু প্রত্যহ বেলা চারিটার পর তিনি আমাদিগকে তাঁহার জীবনের সেই পুরাতন কাহিনী শুনাইতেন। য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে নেপোলিয়নের সমরাভিনয় যেন আমরা চোখের উপরে দেখিতাম। যেনা (Jena), অষ্টার্লিট্‌জ (Austerlitz), মস্কো (Moscow),—ছবির পর ছবি দেখাইয়া যাইতেন; আর তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রু বহিয়া যাইত।

"চতুর্থ বৎসরে আমরা Merchant of Venice, Othello, Tempest, Novum Organum, Dryden's Macflecknoe, Dryden's Absalom and Achitophel, Young's Night Thoughts, Mill's Political Economy, Optics, Astronomy, Calculus পড়িয়াছিলাম। সীনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও আমাদিগকে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া চাকরি পাইবার জন্য একটি পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। মহানুভব লর্ড হার্ডিঞ্জের পিতামহের Public Service Resolution অনুসারে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা তিন জন এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম,—রাধাগোবিন্দ দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও আমি। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইলাম।

"আমাদের সীনিয়র পরীক্ষায় স্বয়ং লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্ ইংরাজি প্রবন্ধের প্রশ্নপত্র রচনা করেন,—'Write an essay on Poetry'। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে টাউন্ হলে প্রশ্নপত্র বিতরণের সময় সাহেবেরা বলিলেন—'Try to please the Governor'। শিক্ষাসমিতির সভাপতি ক্যামারণ সাহেব ইংরাজি সাহিত্যের প্রশ্ন করিলেন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে দিলেন।

"স্যর চার্লস্ উডের মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইলে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। আমি প্রথমেই বাঁকুড়ায় স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইলাম। গর্ডন ইয়ং তখন শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ইন্‌স্পেক্টর হইলেন—উড্রো সাহেব; বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা

বিভাগে—হড্‌সন্ প্র্যাট্‌; বেহারে—চ্যাপম্যান্; আসামে—রবিন্সন্। প্র্যাট্ ও চাপম্যান সিভিলিয়ান ছিলেন। উড্রো সাহেব প্রথমে লা মার্টিনীয়র কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কার্য্য অনেকদিন করিলেন; পরে মৌআটের জায়গায় কিছুদিন কাউন্সিল অভ্ এড়ুকেশনের সেক্রেটরির কাজ করিলেন। শিক্ষা-বিভাগের পুনর্গঠন হইলে পর তিনি প্রেসিডেন্সি-বিভাগের স্কুলগুলির ইন্‌স্পেক্টর হইলেন।

"আমি যখন বাঁকুড়ায় যাই, তখন সেখানে কেবলমাত্র একটি জিলা স্কুল ছিল। আমার চৌদ্দ মাস অবস্থান-কালে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন রেলগাড়িতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত; তাহার পরে দামোদর পার হইয়া ঘোড়ার গাড়ী। বাঁকুড়ায় দুধ ও ঘি খুব ভাল পাওয়া যাইত। স্কুল পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় গ্রামের মধ্যে ঘৃতের গন্ধ পাইয়া পাল্কি থামাইয়া ঘি কিনিতাম,—টাকায় সাত পোয়া। উৎকৃষ্ট চাউলের মণ তিন টাকার কম ছিল।

"বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া হাওড়ায় আসিলাম। কিছুদিন পরে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহিত অদল বদল করিয়া লইলাম। সে আসিল হাওড়ায়, আমি গেলাম কলিকাতায়।

"তখন কলিকাতায় 'এড়ুকেশন গেজেট' ওব্রায়ান্ স্মিথ সাহেবের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত। কাগজখানি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। স্মিথ সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধু কানাইলাল পাইনের উপর পত্রিকা-পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইল। আমি তাঁহার কাগজে রণজিৎ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

"১৮৫৮ সালে বন্ধু কানাইলালের সাহচর্য্যে হুঁকাপটিতে আমি একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলাম; তাহার নাম,—Model School। হেড্ মাষ্টার হইলেন, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বেতন পঞ্চাশ টাকা মাত্র। এই তারাপ্রসন্ন বাবু পরে বর্দ্ধমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়া বহু বৎসর দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

"আমি যখন বাঁকুড়ায়, ভূদেব বাবু তখন হাওড়ায় হেড্ মাষ্টার; আমি যখন হাওড়ায় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইলাম, ভূদেব বাবু তখন হুগলি নর্ম্যাল্ স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হইলেন। ভূদেব বাবুর জায়গায় কাউপার সাহেব হাওড়ায় হেড্‌মাষ্টার হইলেন। হুগলিতে অবস্থানকালে ভূদেব বাবু কলিকাতায় এড়ুকেশন গেজেট আপিসে প্রায়ই আসিতেন। পত্রিকাখানি আমার হাত হইতে প্যারিচরণ সরকারের হাতে গেল; তিনি ছাড়িয়া দিলে ভূদেব বাবু ইহার সম্পাদক হইলেন। ভূদেব বাবুর পিতা * খুব পণ্ডিত ছিলেন; নিজে নিত্য পূজা করিতেন। একদিন তিনি

---

* ২৭এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

আজ সন্ধ্যার পর বীডন উদ্যানে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে ভূদেব বাবুর কথা উঠিল। তিনি বলিলেন—"ভূদেব বাবুর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ আমার পিতার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা তাঁহার খুব ছিল; কয়েক বৎসর পঞ্জিকা করিয়াছিলেন। ভূদেবকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার সময় আমার বাবাকে তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন, যাহাতে আমার দাদাকেও হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। বাবা কিন্তু তাঁহার কথায় বিচলিত হন নাই। ছেলেকে সংস্কৃত পড়াইয়া কোনও লাভ নাই, এই রকম ধারণা তর্কভূষণের ছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভূদেব বাবু সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক সদ্গুণ ত ছিলই; তাঁহার মত সুশ্রী পুরুষ সচরাচর নয়নগোচর হয় না। সরল সুদীর্ঘ দেহ, নধর গৌর কান্তি; তাঁহার মত স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে প্রায়ই দেখা যাইত না। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলিলেন "ভূদেব বাবু Comteর দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন, 'Comte যে রকম সুন্দরভাবে তাহার দার্শনিক মতগুলি বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ হয়, সে বোধ হয়, বামুন পণ্ডিতের ধরতাটা কোনও রকমে শিখিয়া লইয়াছে।' কিন্তু Comte যে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সাহিত্য সম্বন্ধে বড় একটা বেশী কিছু জানিতেন, এমন ত বোধ হয় না। তাঁহার Positive Polity'র এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—'যখন আমার ধর্ম্ম সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে, তখন যাঁহারা প্রচারকের কাজ করিবেন, তাঁহারা ইংরাজকে বলিবেন ব্রাহ্মণ চিরদিন স্বাধীনতা ভালবাসে; সে বরাবর স্বাধীনভাবে তাহার সমাজতন্ত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছে; তাহাকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দাও; ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া দাও।' আর একস্থলেও ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর সম্পর্কের অপ্রীতিকর উল্লেখ আছে। সে যাহা হৌক, ভূদেব বাবুর প্রতি অনেক ইংরাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। লজ্ সাহেব তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের ও মনুষ্যত্বের প্রশংসা করিয়া এক উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

বাহিরে গিয়াছিলেন; ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল; আসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার পুত্র ভূদেব আদৌ পূজা করেন নাই। তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল; কারণ পূজা না করাটা যে কত দোষের তাহা তাঁহার ছেলে বুঝিল না। ভূদেব বাবু ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়িতেন। একদিন তাঁহার বাপের এক বন্ধু তাঁহাকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরীক্ষা করেন; তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই; তাঁহার পিতা তাঁহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করেন। ভূদেব গোঁ ধরিয়া বসিলেন—'আমি সংস্কৃত পড়্‌ব না; আপনাদের সংস্কৃত পড়া এমন ধারা যে, না পার্‌লে এত প্রহার! আমি সংস্কৃত পড়ব না।' ভূদেব বাবুর ইংরাজি পড়া আরম্ভ হইল। কলিকাতার হিন্দু কলেজে তিনি মাইকেলের সতীর্থ বন্ধু। বহুদিন পরে মাইকেল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভূদেব বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর বাড়ীতে মাইকেলের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল।

"বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ হয় ভূদেব বাবুর বাড়ীতে। বঙ্কিম বাবু তখন সবে মাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে এড়ুকেশন গেজেটে লিখিতেন। হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় দীনবন্ধু মিত্রের ও মহেন্দ্র সরকারের সহিত আমার খুব জানাশুনা হইয়াছিল; তাঁহারা আমাদের নীচের ক্লাসে পড়িতেন। আমার বিশ্বাস, ১৮৫৪ সালের Education despatch এর ফলে বাঙ্গালা রচনার দিকে অনেকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। হুগলির হেড পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন স্বনামধন্য হইয়াছেন। পরে তাঁহার জায়গায় আমি কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নকে আনাইলাম; ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখেন, তাহার এক অংশ রামগতি ন্যায়রত্ন কর্তৃক রচিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুশিক্ষা লিখিলেন। বিদ্যাসাগর এড়ুকেশন কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট বীটন্ সাহেবকে ধরিয়া বলিলেন—'ইংরাজি হিন্দু কলেজের ছেলেরা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়! আমার কলেজের ছেলেরা কেন হয় না?' সেবার দু জন ডেপুটি হইলেন; মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম।

"প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী পাটীগণিত ও বীজগণিত রচনা করিলেন। ১৮৭১ সালে আমি জ্যামিতি লিখি; সমগ্র পুস্তকখানা মুদ্রিত করি ১৮৭২ সালে। আমার পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্লেফেয়ারের জ্যামিতির প্রথমার্দ্ধ বাঙ্গালায় লিখিয়াছিলেন,—বিশেষ ভাল হয় নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের Encyclopedia Bengalensis' হইতে একটা অংশ (১৮৪৯) ভূদেব বাবু পুনর্মুদ্রিত করেন; তাহাতে মৌলিকতা কিছু ছিল। জ্যামিতির শেষার্দ্ধ ঢাকার কালীকুমার দাস অনুবাদ করেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণপণা দেখাইয়াছিলেন—কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকমল ভট্টাচার্য্য; নানাশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আমার পুস্তকের জ্যামিতিক পরিভাষা সম্পূর্ণ আমারই। নর্ম্মাল স্কুলে প্রসন্ন বাবুর পাটীগণিত ও আমার জ্যামিতি আগাগোড়া পঠিত হইত। উড্রো সাহেবের কথায় আমি বাঙ্গালায় ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) রচনা করি। আর এক খানি বই লিখিলাম; তাহার নাম দিলাম—'জ্যামিতিক অনুশীলনী' (Geometrical Problems); ভূগোল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি নাই।

৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

"শিক্ষাবিভাগে ভূদেব বাবুর উন্নতির কথা আলোচনা করিতে গেলে, একটি রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। আমি

ছাড়া আর কেহ সে ব্যাপারটি সম্যক্ অবগত আছেন কি না, জানি না। মেড্‌লিকট্ যখন ইন্‌স্পেক্টর, ভূদেব বাবু তখন তাঁহার অ্যাসিষ্টাণ্ট। কয়েকজন সিভিলিয়ন "Indian Empire" নামে একখানি কাগজ বাহির করিতেন। সেক্রেটারি অ্যাশলি ইডন্, ও ইন্‌স্পেক্টর মেড্‌লিকট্ তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন; ভূদেব বাবুও লিখিতেন। এই সূত্রে ইডনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের আরম্ভ। ক্রমশঃ তিনি ইডনের কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন—'এ দেশে সিভিলিয়নের সাহায্য ব্যতীত উন্নতি করা অসম্ভব।' একদিন তিনি ইডন্ সাহেবকে বলিলেন—'মেড্‌লিকট্ আমার patron ছিলেন; সিভিলিয়নের সাহায্য না পাইলে এ দেশে উন্নতি হয় না; আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—আপনাকে আমার patron হইতেই হইবে।' অগত্যা সাহেব স্বীকৃত হইলেন। কিছু দিন পরে ইডন্ চিফ কমিশনর হইয়া বর্ম্মায় চলিয়া গেলেন। স্যর জর্জ্জ ক্যাম্পবেল ভূদেব বাবুর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ডাইরেক্টর আট্‌কিসন্‌কে লিখিলেন—'যদি তুমি সতর্ক না হও, তোমার শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বনাশ হইবে।' ভূদেব বাবু কোনও রকমে ছুটি লইয়া বর্ম্মায় গিয়া ইডনের শরণাপন্ন হইলেন। সাহেব বলিলেন—'এখন ত আমি কিছু করিতে পারি না; কোনও রকম করিয়া দিন কতক কাটাইয়া দাও।' সর অ্যাশলি ইডন্ বাঙ্গালার ছোটলাট হইলে শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে একটা পদ খালি হইল। ডাইরেক্টরের মনোনীত লোক একজন ছিল; কিন্তু ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভূদেব কোথায়?" (Where is that old man, Bhudev?). ভূদেব বাবুর দেড় হাজার টাকা বেতন হইল।

আবির্ভাব

[শ্রীকামিনীকান্ত নিয়োগী]

যে দিন তোমার পুষ্প-পরশে, ভরিল হৃদয় গানে ও গন্ধে,
ঝলকে ঝলকে পুণ্য-আলোকে মাতিল মানস বিমলানন্দে;
শিহরি' উঠিল নীপ-নিকুঞ্জ, কঙ্কণ-তালে গভীর হর্ষে,
গায়িল মত্ত-কোকিল-মিথুন, প্লাবিয়া ধরণী অমিয়-বর্ষে!
বিস্ময় মানি' সস্মিত-মুখে চাহিনু তুলিয়া যুগল-নেত্র,
কবিতা-স্বর্ণ কমল-বাসিনি উজলি' র'য়েছ হৃদয়-ক্ষেত্র!
শঙ্কিতপ্রাণ সঙ্কোচ ত্যজি,' উঠিল দাঁড়ায়ে নবীন গর্ব্বে,
বিশ্ব-প্রেমের স্নিগ্ধ-বার্ত্তা, বাজিল হিয়ার পর্ব্বে পর্ব্বে;
আভূমি-নম্র-শ্যাম-সরসতা,—তপনের হেম-কিরণ-কান্তি,
তুষার-শঙ্খ-শুভ্র-জোছনা, জাগা'ল জীবনে প্রথম ভ্রান্তি!
বিস্ময় মানি' সস্মিত মুখে চাহিনু তুলিয়া যুগল-নেত্র,
কবিতা-স্বর্ণ-কমল-বাসিনি উজলি' র'য়েছ হৃদয়-ক্ষেত্র!
চমকি' চাহিল চপল-চম্পা, করি' হৃদে চারু-স্বর্ণ-বৃষ্টি,
শিশির-সিক্ত-শ্যামল-শষ্প, সাজিল করিয়া মুকুতা-সৃষ্টি;
শিথিল-বৃন্ত-শেফালী ঝরিল নব ছায়া-পথ করিতে সজ্জা,
বিদ্যাধরীর রক্ত-কপোল, দেখা'ল করবী ত্যজিয়া লজ্জা;
গুণ্ঠিত হিয়া বিদলি' কুণ্ঠা, ছিঁড়িল যতেক বাধা ও বন্ধ,
নাচিয়া উঠিল নিখিল-বিশ্বে, নৃত্য-নিপুণ নিবিড়-ছন্দ!
বিস্ময় মানি' সস্মিত-মুখে চাহিনু তুলিয়া যুগল-নেত্র,
কবিতা-স্বর্ণ-কমল-বাসিনি উজলি' র'য়েছ হৃদয়-ক্ষেত্র!
গায়িল তটিনী মৃদু-কল-তানে, আঘাতিয়া কর তট-মৃদঙ্গে
শত শশাঙ্ক কুন্তলে পরি' শত তারা-হার দোলায়ে রঙ্গে;
অন্তবিহীন পাপিয়ার গানে, কাঁপিয়া উঠিল কানন-বল্লী,
মুকুল-আকুল-বকুল-কুঞ্জ,—নব কুসুমিতা ভবন-মল্লী;
উর্দ্ধে—নীলিম-নীরদ-রন্ধ্রে, শতমণিময়ী-দামিনী-দীপ্তি,
নিম্নে—পৃথুল-পৃথ্বী-উপরে, কোটি বাসনার নীরব তৃপ্তি!
বিস্ময় মানি' সস্মিত মুখে চাহিনু তুলিয়া যুগল-নেত্র,
কবিতা-স্বর্ণ-কমল-বাসিনি উজলি র'য়েছ হৃদয়-ক্ষেত্র!

ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ

[আচার্য্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী M. A.]

বিজ্ঞান-বিদ্যায় আলোচ্য বাহ্য জগতের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম। * সন্ধানে চলিয়া দুই রকমের জগতের সন্ধান পাইয়াছি। একটা হইল, ব্যাবহারিক জগৎ অর্থাৎ কাজ-চালান জগৎ। আর একটা হইল, প্রত্যক্ষ বা প্রাতিভাসিক জগৎ,—পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে অর্থাৎ যাহাদিগকে ইতর-সাধারণ বলা যায়, সেই মোটা শ্রেণীর মোটা চরিত্রের লোকে জীবনের কাজ চালাইবার জন্য, এই ব্যাবহারিক জগৎকে মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। পৃথিবীতে ইহাদের সংখ্যাই অধিক, কেন না, ইহারাই পৃথিবীতে মোটের উপর successful অর্থাৎ জীবন-সমরে সফল। সফল বলিয়াই ইহাদিগকে প্রকৃতিস্থ বলা যায়। প্রকৃতিস্থ বলিবার আর কোন মানে নাই। প্রকৃতিদেবী যেন ইহাদিগকেই বাছাই করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতিদেবীর লক্ষ্যই ইহাই; যাহারা সেই লক্ষ্য হইতে অধিক দূরে ছট্‌কিয়া পড়িয়া জীবন-সমরে সমর্থ না হয়, তাহারা বড়ই হউক আর ছোটই হউক, তাহাদিগকে এই কারণেই অপ্রকৃতিস্থ বলা হয়। পৃথিবীর জলহাওয়া অন্যরূপ হইলে তাহারাই হয়ত জীবন-সমরে সমর্থ হইয়া টিকিয়া যাইত; তাহাদেরই সংখ্যা তখন অধিক হইত এবং তাহারাই তখন প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমান পৃথিবীতে তাহারা যে প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণ্য হয় না, তাহা তাহাদের দোষ নহে, বর্ত্তমান পৃথিবীর আবহাওয়ার দোষ। যাহাই হউক, বর্ত্তমান পৃথিবীতে জীবনযাত্রাকর্ম্মে তাহারা অক্ষম ও অপটু। যাহারা মাঝারি রকমের মানুষ বলিয়া বর্ত্তমান পৃথিবীতে জীবনযাত্রায় পটু, অতএব যাহারা সংখ্যায় অধিক, তাহারা পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পর ব্যবহারের জন্য, পরস্পর ব্যবহারে জীবনের কাজ চালাইবার জন্য, যে কাজচালান রকমের জগৎটা মানিয়া লয়, তাহাই সেই কাজচালান বা ব্যাবহারিক জগৎ। কিন্তু এই প্রকৃতিস্থ লোকগুলিরও প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ experience সমান নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটু না একটু বিশিষ্ট ভাব আছে, একটু না একটু personal equation আছে। একের experience ঠিক অন্যের experienceএর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মেলে না। এইজন্য প্রত্যেককে নিজের স্বতন্ত্রতা কিছু না কিছু ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়। যেটুকু প্রত্যেকের বিশিষ্ট বা নিজস্ব, সেটুকুকে বর্জ্জন করিয়া, যেটুকু সকলের পক্ষে common বা সাধারণ, সেইটুকুকেই সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে মানিয়া লইতে হয়। ব্যাপারটা ঠিকই যেন ভোটের ব্যাপার; অধিকাংশ লোকে ভোট দিয়া যেটাকে সত্য সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে, সেইটাকেই মানিয়া চলিতেছে। অথবা ইহা যেন conventionএর ব্যাপার; অর্থাৎ সকলে মিলিয়া মিশিয়া, mutual agreementএর দ্বারা আপাততঃ ইহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাক্, এইরূপ একটা সংকল্প বা resolution করিয়া লইয়াছে; অতএব আপাততঃ ইহাই সত্য। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিয়া, এই common experienceটুকু লইয়া যে জগৎ গড়া হয়, সেই সর্ব্বসাধারণের জগৎই এই ব্যাবহারিক জগৎ। সকলে মিলিয়া মিশিয়া যদি এই সাধারণ জগতের অধীনতা স্বীকার না করিত, যদি প্রত্যেকেই আপনার বিশিষ্ট নিজস্ব experienceএর দোহাই দিয়া, তাহাকেই সত্য বলিয়া অন্যের সহিত আদান প্রদান করিতে চাহিত, তাহা হইলে পরস্পরের বিসম্বাদের অন্ত হইত না। পরস্পর লাঠালাঠি করিয়া ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইত; কেননা কাহারও প্রত্যক্ষ experienceএর সহিত অপরের প্রত্যক্ষ experienceএর

* লেখকের নিবেদন—ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানবিদ্যায় বাহ্য জগৎ' এবং তাহার অনুসারী বর্ত্তমান প্রবন্ধ একদিনে একযোগে রিপণ কলেজের অধ্যাপক-সংঘের সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পাঠকগণের নিকট লেখকের বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা এই প্রবন্ধটি পড়িবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপ্রবন্ধটি আর একবার পড়িয়া লইবেন।

মিল হইত না। একজন যেখানে বলিত—"হাঁ", অন্যে সেখানে বলিত—"না"। একের ভাষা অন্যে বুঝিত না; একের প্রশ্নে অন্যে উত্তর দিতে পারিত না। পরস্পর কাটাকাটি করিয়া সকলেই মরিত, অথবা পরস্পরের সাহায্য না পাইয়া সকলে মরিত; তাহাদের বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিত না। সেই জন্যই বুঝি, প্রকৃতি-দেবী দয়া করিয়া, তাহাদিগকে আপনার স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া, এই সর্ব্বসাধারণের common experience-টাকে মানিয়া চলিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন। প্রবৃত্তি দিয়াছেন বলিয়াই তাহারা বাঁচিয়া আছে; অথবা যাহারা দৈবক্রমে এই প্রবৃত্তি পাইয়াছে, তাহারাই বাঁচিয়া যাইতেছে। তাহাদেরই বংশ থাকিতেছে। আর যাহারা আপনার স্বাতন্ত্র্যটুকু পরিহার করিতে চায় না, তাহারা ছটকিয়া পড়িয়া পাগলের ও ভাবুকের খ্যাতি পাইতেছে। অতএব এই জনসাধারণের, এই পনের আনার স্বীকৃত জগৎই ব্যাবহারিক জগৎ। জীবনযাত্রায় না মানিলে চলে না, বলিয়া ইহা ব্যবহারতঃ সত্য। বিজ্ঞানবিদ্যা এই জগতেরই আলোচনা করেন এবং এই জগতের আলোচনা করেন বলিয়াই জীবনযাত্রা-বিষয়ে বিজ্ঞান-বিদ্যার এই আশ্চর্য্য সফলতা। জীবনযাত্রা-বিষয়ে বিজ্ঞান-বিদ্যার আদেশই চূড়ান্ত আদেশ। এই আদেশ যিনি না মানিবেন, তাঁহাকে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যার বলে মানুষ যে বাহ্যজগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতেছে, সেই প্রভুত্বলাভের গোড়ার কথা এই। এই প্রভুত্বলাভের মূলে একটা অধীনতাস্বীকার আছে। নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বর্জ্জন করিয়া, নিজের প্রত্যক্ষকে অমান্য করিয়া, পরের প্রত্যক্ষকে মানিয়া লওয়াতেই এই অধীনতা। এই যে ব্যাবহারিক জগৎ, যাহা আমার নিজস্ব নহে, যাহা সর্ব্বসাধারণের এবং ইতর-সাধারণের, আমাকে প্রাণের দায়ে তাহাকেই মানিয়া লইতে হয়, এবং তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। যাহাকে বাহ্য জগতের উপর প্রভুত্ব বলা হয়, সেই প্রভুত্বের মত দাসত্ব আর কিছুই নাই। এ কেবল নিজের দাসত্ব নহে, পরের দাসত্ব; ছত্রিশ কোটি ইতর অন্ত্যজ লোকের দাসত্ব। ছত্রিশ কোটি ইতর লোকের গরজে বাধ্য হইয়া যাহা মানিতে হয়, তাহারই দাসত্ব। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহার নাম বন্ধন। দেখা গেল, এই যে common experience, সেটার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা ছত্রিশ কোটি মাঝারি মানুষের প্রত্যক্ষের average কষিয়া একটা কাল্পনিক জগৎ খাড়া করেন, সেইটাকেই এই ব্যাবহারিক জগতের স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাই সেই কাল্পনিক Normal Man-এর, বা Mean Man-এর জগৎ;—যে মানুষটার অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল না, নাই, বা হইবে না। এই কাল্পনিক জগতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই জীবনরক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়। সর্ব্বসাধারণের experienceই তাহা বলিতেছে। এই কাল্পনিক জগতের অনুবর্ত্তনই যদি প্রভুত্ব হয়, তাহা হইলে দাসত্ব আর কাহাকে বলা যাইবে! কোনও শিকলের বন্ধন এই বন্ধনের চেয়ে কঠিন হইতে পারে না। এই বন্ধনকে আমরা নিয়মের বা নিয়তির বন্ধন বলি। বৈজ্ঞানিকের কল্পিত সেই ব্যাবহারিক জগতে নিয়মেরই বন্ধন, নিয়মেরই রাজত্ব। তাহাত হইবেই; কেন না গোড়াতেই যখন আমরা স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিয়া, একমত হইয়া, একটা convention মানিয়া চলিব, ইহা স্থির করিয়া লইয়াছি, তখন এই বন্ধন ত থাকিবেই। কোন সভার সভ্যেরা সভার কাজ চালাইবার জন্য অধিকাংশের ভোটে কতকগুলি নিয়ম রচনা করেন, ও আপনাদের রচিত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম মানিয়া চলেন, এও কতকটা সেইরূপ। নিজেরাই যখন একটা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই নিয়ম মানিয়া চলিতেছি, তখন সে নিয়ম ত থাকিবেই। সে নিয়ম কোথা হইতে আসিল, তাহা নিরূপণের জন্য দিশাহারা হইবার প্রয়োজন কি? সভার নিয়ম দেখিয়া কোন সভ্য ত এরূপ বিস্মিত হন না! এই যে নিয়তি, এই যে Uniformity in Nature, ইহার বন্ধন স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রাই চলিত না। জীবনযাত্রা চালাইবার জন্যই, Nature-এর uniformity মানিতে হয়, অথবা Natureকে uniformরূপে দেখিতে হয়। জীবনযাত্রা চালাইবার জন্যই আমাদের বিজ্ঞানবিদ্যা, যে ব্যাবহারিক জগৎকে খাড়া করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই ব্যাবহারিক জগতে যদি uniformity না দেখিতাম, অথবা দেখিবার ক্ষমতা না থাকিত, অথবা দেখিবার প্রবৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কিরূপে জীবনযাত্রা সম্ভব হইত,

কিরূপে পরস্পরের সহিত কারবার করিতাম? কিরূপে কালিকার ব্যবস্থা আজি করিতাম? ফলে বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগতে নিয়মের বন্ধন না দেখিলে আমাদের চলিতই না। বাহ্যজগতে নিয়মের বন্ধন আছে, এই বলিয়াই আমাদের জীবনযাত্রা চলিতেছে,—এমন কথা আমি বলিব না। বরং আমি বলিব,—আমাদের জীবনযাত্রা চালাইবার জন্যই আমরা নিয়মের বন্ধন দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমরাই মিলিয়া মিশিয়া আমাদেরই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নিয়মের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। নিজের হাতে এই লোহার শিকল গড়াইয়া, নিজের পায়ে পরাইয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াছি।

এই যে Uniformity, এই যে নিয়তি, ইহাকে Causality বলা হয়। ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনা কার্য্যকারণ-সম্পর্কের শিকলে আবদ্ধ দেখা যায়। এই Causalityর—এই সম্পর্কের নামান্তর Determinism। ইহা যেন একেবারে বাঁধা-ধরা কাটা-ছাঁটা রহিয়াছে। ইহা আছে বলিয়াই আমরা অতীতের অভিজ্ঞতার বলে ভবিষ্যৎ ঘটনার গণনা করিতে পারি। কাল কিরূপে কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আজ সেইরূপে সেই ঘটনা হইবে, ইহা নিশ্চিত গণিয়া দিতে পারি। যাবতীয় ঘটনাকে একটা formulaর, বা কতকগুলি formulaর, ভিতর ফেলিতে পারি। Formulaর ভিতর ফেলিতে না পারিলে গণনা অসাধ্য হয়। বিজ্ঞানবিদ্যা ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনাকে এইরূপ কতকগুলি formulaয় ফেলিয়া গণনা-কর্ম্মে অগ্রসর হন। বিজ্ঞানবিদ্যার ইহাই কাজ। Astronomy বা জ্যোতিষবিদ্যা তাহার প্রধান সাক্ষী। অন্যান্য বিজ্ঞানও সেই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন; কেবলই formulaয় ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন। যেখানে ঘটনা-পরম্পরা অত্যন্ত জটিল দেখায়, সেইখানে হয়ত formula এখনও বাহির করিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রয়াস কেবলই সেই দিকে। যাবতীয় ঘটনাকে কোন না কোন দিন একটা ছোট formulaয় ফেলিব, এই চরম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া বিজ্ঞানবিদ্যা চলিতেছেন। ফলে তিনি গোড়ায় মানিয়া বসিয়া আছেন, যে তাঁহার ব্যাবহারিক জগৎটা fully determinate। ইহার কোন স্থানে কোনরূপ freedom-এর স্থান নাই। আজিকার অবস্থা যদি সম্পূর্ণভাবে জানা থাকে, তাহা হইলে কালিকার অবস্থা কি হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া গণিতে পারিব।—এখন যে গণিতে পারি না, সে কেবল বিজ্ঞান-বিদ্যার অপূর্ণতামাত্র; কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে। এই পূর্ণতা যদি কখন পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোটি বৎসর পরের ঘটনা এখনই গণা চলিবে। এই যে determinism, এই যে causal connection, এই যে নিয়তি, ইহা অবশ্যম্ভাবী necessary বটে কি না, ইহা দর্শনশাস্ত্রের একটা তুমুল সমস্যা। Hume এর সময় হইতে অথবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে আজি পর্য্যন্ত ইহার সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। কোন নূতন সমাধান দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই; তবে ব্যাবহারিক জগতের যে সংজ্ঞা বা definition দিবার চেষ্টা করিলাম, তাহাতে এই সমাধানের পক্ষে একটা নূতন attitude হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। এই নিয়মের বন্ধন necessary এই অর্থে, যে ইহাকে না মানিলে আমাদের জীবনযাত্রা চলিত না। এই নিয়তি আছে, ইহা আমরা মানিয়া লই; এই নিয়তি আমরা দেখিতে চাই, ও আমরা দেখিতে পাই। এই নিয়তি দেখিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি। প্রাণের দায়ে অভ্যস্ত হইয়াছি; এই অর্থে ইহা necessary। এই necessityকে সত্য বল, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহা একটা ব্যাবহারিক সত্য, একটা pragmatic truth. বর্ত্তমান পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা intelligence-এর বর্ত্তমান অবস্থায়, এইরূপ মানিয়া লওয়াতে বর্ত্তমান ধরণে জীবনযাত্রা চালান সম্ভব হইয়াছে; তাই আমরা উহাকে মানিয়া চলিতেছি। না মানিলে এখন যেন জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। না মানিলে কিরূপে চলিত, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। কিন্তু ইহার অধিক বলা চলে না। অন্য পৃথিবীতে, বা বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্য অবস্থায়, আমাদিগকে অন্যরূপ truth মানিয়া চলিতে হইত না, ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তখনকার pragmatic truth কিরূপ হইত, তাহা এখন আমাদের কল্পনার অতীত। এখনকার যাহা বন্ধন, তখনকার তাহা বন্ধন হইত কি না, কে জানে? এখন আমরা যে ব্যাবহারিক জগতের কল্পনা করি, তখনকার ব্যাবহারিক জগৎ সেইরূপ হইত কি না, কে জানে? এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা যাহা সত্য বলিয়া মানিতেছেন, তখনকার

বৈজ্ঞানিকেরা তাহা সত্য বলিতেন কি না, কে জানে? এখন আমরা অধিকাংশের ভোট লইয়া যে সংকল্প করিয়াছি, তখনকার অধিকাংশের ভোটে সেই সংকল্প কি মূর্ত্তি ধারণ করিত, কে বলিতে পারে? বর্ত্তমানের ব্যাবহারিক জগৎটাই যদি বর্ত্তমান কালের ইতর-সাধারণের কাজ চালাইবার জন্য একটা মনগড়া কাল্পনিক জগৎ হয়, তাহা হইলে সেই কাল্পনিক জগতের মধ্যে যে নিয়তির বন্ধন দেখিতে পাই, সেই বন্ধন, তখনকার জগতে কিরূপে কি মূর্ত্তিতে থাকিত, অথবা আদৌ থাকিত কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

আমি যাহাকে প্রাতিভাসিক জগৎ বলিয়াছি তাহাকে এই ব্যাবহারিক জগতের পাশে রাখিয়া উভয়ের তুলনা করিলে ঐ Law of Causality আমাদের পক্ষে necessary কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে একটা নূতন point of view পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকে যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাই তাহার পক্ষে প্রাতিভাসিক জগৎ। একথা বোধ হয় খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা কতকগুলি feelings ও sensationsএর সমষ্টি মাত্র। Feeling এই সাধারণ নামটিই ব্যবহার করা যাউক। Feeling ভিন্ন আর কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয়, অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, আমাদের immediate perception এর বিষয়, হইতে পারে না। যাহাকে জড়জগৎ বা বাহ্যজগৎ বলি, তাহাও রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ এই কয়টা feelingরূপেই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। এ বিষয়ে কথাকাটাকাটির কোন প্রয়োজন দেখি না। Bain সাহেব এই গুলিকেই object properties বলিয়া ধরিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে যে গুলি সর্ব্বসাধারণের common experience, তাহাকেই Objective বা Material World এর উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন organic sensations, appetites এবং emotions প্রভৃতিকে তিনি subject properties বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এগুলাও মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়। মনে হয়, ইহারা ভিতরের জিনিষ, বাহির হইতে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া যেন ইহারা আসে না। সেইজন্য ইহাদিগকে লইয়া একটা Subjective World বা অন্তর্জ্জগৎ তৈয়ার করা চলিতে পারে, যাহা বহির্জ্জগৎ হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্। প্রকৃত পক্ষে উভয় জগৎই যখন প্রত্যক্ষ বিষয়, তখন উভয়কেই প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ব্যাবহারিক জগৎটা সম্পূর্ণভাবে ষোলআনা বাহ্যজগৎ বলিয়া গৃহীত হয়, কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতের কতকটা মানস প্রত্যক্ষ অন্তর্জ্জগৎ আর বাকিটা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাহ্যজগৎ। ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিক এই দুই জগতের তুলনা করিতে গিয়া প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশটা মানস প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যে অংশটাকে অন্তর্জ্জগৎ বলি, তাহার কথা না তুলিলেও চলে। তুলনার জন্য প্রাতিভাসিক বহির্জ্জগৎ এবং ব্যাবহারিক বহির্জ্জগৎ, এই উভয়কে পাশাপাশি স্থাপন করা যাউক। এখন হইতে প্রাতিভাসিক জগৎ বলিতে সেই প্রাতিভাসিক বহির্জ্জগৎই বুঝিব; কেন না Physical Science বহির্জ্জগতেরই আলোচনা করে, অন্তর্জ্জগতের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহে না। এই প্রাতিভাসিক বহির্জ্জগৎ প্রত্যেকের নিকট রূপরসগন্ধস্পর্শ-শব্দরূপে উপস্থিত হয়। অতএব ইহাকে প্রত্যক্ষগোচর রূপরসগন্ধশব্দ-সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের বোধ হয়, এই রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ যেন আমাদের বাহির হইতে আসিতেছে। আমরা যখন প্রকৃতিস্থ থাকি, তখন ত এইরূপ বোধ হয়ই; যখন নেশার ঝোঁকে রোগের তাড়নায় বা ভাবুকতার মোহে অপ্রকৃতিস্থ থাকি, তখনও বোধ হয়, ইহারা বাহির হইতেই আসিতেছে। এমন কি স্বপ্নাবস্থায় বা clairvoyant অবস্থায় রূপরসাদি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও একটা বহির্দ্দেশ হইতে আসিতেছে, এই রূপই বিশ্বাস থাকে। যখন কোন ব্যক্তি কোন apparition দেখেন, তখন সে apparitionটা বাহিরে আছে, ইহাই মনে হয়। কোন সাধুভক্ত ভাবাবেশে যখন কোন vision দেখেন, কোন দেবতার বা ঈশ্বরের আবির্ভাব বা presence অনুভব করেন, তখনও বাহির হইতে আগত একটা রূপ দেখেন, বা শব্দ শুনেন, বা স্পর্শ অনুভব করেন প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ, সুস্থ বা মুগ্ধ, যে কোন অবস্থায় এই শ্রেণীর যে কিছু প্রত্যক্ষ রূপ, রস, গন্ধ, যে কোন ভাবেই আসুক, তখন তাহাদের বিশিষ্ট ভাব এই sense of out-ness; যাহা কিছু আসে, তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এইরূপ একটা না একটা feelingরূপেই

আসে এবং যেন বহির্দ্দেশ হইতেই আসে। এইরূপে যখন যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহার মত সত্য বস্তু আর কিছু থাকে না। অন্যের পক্ষে তাহা সত্য হউক, আর নাই হউক—যিনি যখন দেখেন, তখন তাঁহার নিকট তাহার মত সত্য কিছুই থাকে না। পরে হয়ত তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া, অপরের কথার উপর আস্থা করিয়া, আপনার প্রত্যক্ষের সত্যতায় সন্দিহান হন, কিন্তু যখন এবং যতক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ থাকে, তখন এবং ততক্ষণ উহার মত সত্য আর কিছুই থাকিতে পারে না। ফল কথা, প্রত্যক্ষের মত সত্য পদার্থ আর কিছুই নাই। অন্যে যাহাই বলুক, যিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ মানেন না, তাঁহাকে ইহা বলিতেই হইবে। যদি কাহাকেও সত্য বলিতে হয়, যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই সত্য; যাহা immediate perceptionএর বিষয়, তাহাই সত্য। আর এই feelingগুলাই যখন একমাত্র প্রত্যক্ষ, একমাত্র objects of immediate perception, তখন এই গুলিই সত্য। যিনি প্রত্যক্ষ দেখেন, যিনি অনুভবকর্ত্তা, তিনি কোন্ অবস্থায় আছেন, তাহা দেখিবার দরকারই নাই; কেন না তিনি প্রকৃতিস্থ কি অপ্রকৃতিস্থ, সুস্থ কি অসুস্থ, ইহা কেবল তাঁহাকে দেখিয়া নির্দ্ধারণ করা চলে না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অবস্থার সহিত তাঁহার অবস্থা মিলাইতে হয়। যদি অধিকাংশ লোকের অবস্থার সহিত তাঁহার অবস্থা মেলে, তাহা হইলেই তাঁহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ বলা যায়; না মিলিলেই অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ বলা হইয়া থাকে। সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ বিশেষণের আর কোন মানেই নাই। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে, যাহা যখন প্রত্যক্ষ, তাহাই তখন সত্য এবং এই সত্যকেই প্রাতিভাসিক সত্য বলা হইতেছে। এই প্রাতিভাসিক সত্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সত্য। অপরের সহিত ইহার মিল আছে কি না, তাহা জানিবার আপাততঃ দরকার নাই।

প্রকৃতিস্থ এবং অপ্রকৃতিস্থ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ line of demarcation বা সীমারেখা টানা চলে না। প্রকৃত পক্ষে সেই কল্পিত Mean Man, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যের কাল্পনিক average, তিনিই প্রকৃতিস্থ;—আর সমুদয় জীয়ন্ত মানুষই তাঁহার তুলনায় কিছু না কিছু অপ্রকৃতিস্থ। সেই মাঝারি মানুষ হইতে কেহ অল্পদূরে, কেহ বেশী দূরে। যে যত দূরে, সে ততটা অপ্রকৃতিস্থ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাতিভাসিক জগৎ তাহার নিজস্ব এবং তাহার নিকট সত্য; কিন্তু একের প্রাতিভাসিক জগতের সহিত অন্যের প্রাতিভাসিক জগৎ সম্পূর্ণ মিলিতে পারে না। প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ স্বতন্ত্র; অতএব পৃথিবীতে যত মনুষ্য, প্রাতিভাসিক জগতের সংখ্যাও তত। যাহাকে ব্যাবহারিক জগৎ বলিতেছি, তাহা যেন সেই বহুসংখ্যক প্রাতিভাসিক জগতের একটা কল্পিত averageমাত্র। অতএব, ব্যাবহারিক জগতের সংখ্যা এক মাত্র। বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ হইতেছে, সেই average বাহির করা। বিজ্ঞান-বিদ্যায় যাহাকে art of observation বলে, তাহা সেই average বাহির করিবার উপায় মাত্র। খাঁটি average বাহির করিতে হইলে, পৃথিবীর দেড়শত কোটি বাসিন্দাকে হাজির করিয়া প্রত্যেকের সাক্ষ্য লইতে হয়; কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। কার্য্যতঃ হাতের কাছে যে কয়জনকে পাওয়া যায়, সেই কয়জনকেই ডাকা হয়; তাহাদের মধ্যেও আবার, যাহারা average হইতে অধিক দূরে ছট্‌কিয়া পড়িয়া অপ্রকৃতিস্থ আখ্যা পাইয়াছে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপেই মোটামুটি তাঁহাদের average বাহির করেন এবং সেই average অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের আলোচ্য ব্যাবহারিক জগৎ খাড়া করেন। এই ব্যাবহারিক জগৎ একটা conceptual জগৎ মাত্র; উহা বৈজ্ঞানিকদের মন-গড়া, বৈজ্ঞানিকদেরই সৃষ্ট। প্রত্যক্ষ Perceptual worldএ সে জগতের স্থান নাই। আর, এই যে প্রাতি-ভাসিক জগৎ, তাহাই প্রত্যেকের preceptional world, প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ-লব্ধ জগৎ, প্রত্যেকের immediate preceptionএর উপলব্ধ জগৎ। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা বহু; যাহা কল্পিত, তাহা একমাত্র। মজা এই, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষবাদী—প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ স্বীকারই করি না; অথচ প্রত্যক্ষলব্ধ প্রাতিভাসিক জগৎকে সত্য না বলিয়া,—মনঃ-কল্পিত ব্যাবহারিক জগৎকেই সত্য বা real world বলিয়া থাকি। আর, প্রত্যক্ষ জগৎ যেখানে সেই কল্পিত জগতের সহিত মেলে না, তখন বলি এই না-মেলা মস্তিষ্ক-বিকারের ফল। আবার,

প্রত্যক্ষদর্শী যখন দেখেন যে, তাঁহার দৃষ্ট প্রত্যক্ষ জগৎ বৈজ্ঞানিকের কল্পিত ব্যাবহারিক জগতের সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না, এই জন্য বৈজ্ঞানিক তাহার অনুমোদন করিতেছেন না, পরন্তু তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া গালি দিতেছেন, তখন তিনিও আপনার প্রত্যক্ষের বলে বলীয়ান্ হইয়া বৈজ্ঞানিককে পাল্‌টা গালি দিয়া থাকেন। উভয়ের মধ্যে বিসম্বাদ, ইতিহাসের গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। আমি উভয়ের এই গণ্ডগোল মিটাইতে চাহি। উভয়কেই সত্য বলিব। প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ জগৎকে বলিব—প্রাতিভাসিক সত্য, আর বৈজ্ঞানিকের জগৎকে বলিব—ব্যাবহারিক সত্য; আরও বলিব, প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক জগতের সংখ্যা বহু, আর কল্পিত ব্যাবহারিক জগৎ একটা মাত্র।

বৈজ্ঞানিক যে নিজের ব্যাবহারিক জগৎকেই সত্য জগৎ বলেন, ইহাকেই মানিয়া চলেন এবং অন্যকেও মানিতে বলেন, অন্যের প্রাতিভাসিক জগৎকে তাঁহার ব্যাবহারিক জগতের অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা distorted প্রতিকৃতি মাত্র বলেন, তাহারও কারণ বেশ বুঝা গেল। প্রাতিভাসিক জগতে যখন মানুষে মানুষে মিল নাই, তখন প্রত্যেকেই যদি আপন প্রাতিভাসিক জগতে ভর দিয়া কর্ম্ম করিতে যায়, তাহা হইলে কর্ম্ম পণ্ড হয়। কর্ম্ম মাত্রই আদান-প্রদান, এবং এইরূপ স্বাতন্ত্র্য লইয়া আদান-প্রদানের একমাত্র ফল পরস্পর লাঠালাঠি। কাজেই সকলে মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্মের জন্য, আদান-প্রদানের জন্য, ব্যবহারের জন্য, জীবনযাত্রার জন্য, আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিয়া, আপন আপন জগৎকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য এই ব্যাবহারিক জগতের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে—সেই আনুগত্যের বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। সেই সাধারণ জগৎকে নিয়মানুগত, শৃঙ্খলা-যুক্ত—কার্য্য-কারণ-পরম্পরার শিকলে বদ্ধ—রূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। দায়ে পড়িয়া জীবন রক্ষার্থ যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, তাহাই causality; তাহাই নিয়তি; তাহাই Uniformity of Nature.—ইহা ছাড়িয়া Uniformity of Natureএর আর কোন অর্থ নাই।

এই কল্পিত ব্যাবহারিক জগতেই নিয়মের প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। প্রাতিভাসিক জগৎ যখন ব্যাবহারিক জগতের সহিত ষোল আনা মেলে না, তখন প্রাতিভাসিক জগতে নিয়ম থাকিতে পারে না, অন্ততঃ ষোল আনা নিয়ম থাকিতে পারে না। কতকটা হয়ত regular, uniform, নিয়মবদ্ধ দেখা যাইতে পারে; কিন্তু খানিকটা সেই নিয়মের অধীন থাকিবে না। আর, নিয়ম পদার্থ টাই এইরূপ যে, উহার কোথাও একটুক্ আল্‌গা দিলে সমস্তটাই আল্‌গা হইয়া যায়। যে নিয়ম ষোলআনাই পূর্ণ, সেই নিয়মই নিয়ম; তাহাই নিয়তি; তাহাই determinism; আর যাহা পৌনে ষোল আনা নিয়ম, যাহার কোন জায়গায় একটুক্ ফাঁক আছে, তাহাকে নিয়তি বলা যায় না, তাহা determinism নহে। এক ফোঁটা অম্লরসে সমস্ত খাঁটি দুধটাই নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই, এই প্রাতিভাসিক জগৎ অথবা প্রত্যক্ষ জগৎ কাহারও পক্ষে নিয়মবদ্ধ নহে। এখানে যদি কিছু নিয়ম থাকে, তাহার অস্তিত্ব কোন প্রকারেই necessary নহে। প্রাতিভাসিক জগৎ কেবল প্রত্যক্ষ পরম্পরামাত্র—succession of phenomena মাত্র। সেখানে প্রত্যক্ষের পর প্রত্যক্ষ সারি বাঁধিয়া চলে,—পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই—একটার পর একটা আসিতে কোনরূপে বাধ্য নহে। প্রত্যেকটা স্ব স্ব প্রধান; কেহ কাহারও ধার ধারে না; কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। এই stream of phenomenaর মধ্যে, এই succession of eventsএর মধ্যে, কোনরূপ regularity থাকে, ভালই;—কোনরূপ regularity থাকিতে বাধ্য বা থাকা উচিত, ইহা বলিতে পারা যাইবে না। একেবারে বৌদ্ধ দার্শনিকদের ক্ষণিকবাদে পৌঁছিতে হয়। প্রত্যেক ঘটনা ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ phenomenon আপনা হইতে আসে, আপনা হইতে যায়;—যাইবার সময় কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না; থাকিবার সময় কাহারও অপেক্ষা করিয়া থাকে না। এটার পর ওটা কেন আসে, তাহা কেহ জানে না; আসিতেই যে হইবে, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। কাহারও পক্ষে আসে, কাহারও পক্ষে আসে না। Empirical philosophyর পক্ষে psychological analysisএর ইহাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। ইহার উপর

কাহারও কোন কথা বলা চলিবে না। ব্যাবহারিক জগতের মধ্যে causal relationকে necessary বলিতে হয়, বল,—না হয়, না বল,—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। বলিতে যে হয়, সে কেবল প্রাণের দায়ে; বলিতে যে হয়, সে for pragmatic reasons; কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে এই causal relation, নিয়তি, বা determinism, কোন প্রকারেই—কোন অর্থেই—necessary বলা চলিবে না; কেন না সেখানে এই uniformityর একেবারে অভাব। Humeএর অনুবর্ত্তী কোন দার্শনিকও বোধ হয়, ইহার অধিক কিছু বলিবেন না। আমার বোধ হয়, এই প্রাতিভাসিক জগৎ, ও এই ব্যাবহারিক জগৎ,—এই উভয় জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্য্যায়ের পদার্থ, এই কথাটা খুব জোরের সহিত বলিবার সময় আসিয়াছে। এই প্রভেদটা ভাল করিয়া ধরা হয় না বলিয়াই বৈজ্ঞানিকে ও দার্শনিকে, দার্শনিকে ও দার্শনিকে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে ঝগড়া মিটিতেছে না। Causality লইয়া চিরন্তন ঝগড়াও মিটিতেছে না। প্রাতিভাসিক জগৎ যে এক পর্য্যায়ের জিনিস, এবং ব্যাবহারিক জগৎ যে অন্য পর্য্যায়ের জিনিস,—প্রাতিভাসিক জগৎটাই প্রত্যক্ষ perceptual জগৎ, এবং এই হিসাবে real জগৎ; এবং ব্যাবহারিক জগৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, conceptual, unreal,—এক হিসাবে বৈজ্ঞানিকের কারখানা-ঘরে manufactured জগৎ, উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্যটুকু স্পষ্ট স্থাপনা করিলে, determinism এবং necessity সম্বন্ধে দার্শনিক সাহিত্যের এই চিরন্তন গণ্ডগোলের একটা মীমাংসা মিলিতে পারে। ব্যাবহারিক জগৎটা বস্তুগত্যা একটা নিয়মবদ্ধ জগৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; উহাকে আমরা প্রাণের দায়েই নিয়মবদ্ধ দেখিতে বাধ্য হইয়াছি এবং সেই নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেছি। উহার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে। উহার একটা ঘটনা দেখিয়া আর একটা ঘটনার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করি এবং প্রত্যাশায় থাকি। এইটার পর এইটা নিশ্চয়ই আসিবে, এই ভরসা করি। উহা যেন একটা যন্ত্র; তাহার চাকায় চাকায় বাঁধা আছে। একখানা চাকা ঘুরিলে যেন আর সকল চাকা ঘুরিতে বাধ্য আছে। একটা কাঁটা নড়িলে অন্য কাঁটা নড়িতে বাধ্য আছে। মিনিটের কাঁটা কতকখানি ঘুরিলে ঘণ্টার কাঁটা কতটুকু চলিবে, তাহা আমরা fully expect করি; এই expectationএ নিরাশ হইলে আমরা দিশাহারা হই, জীবনের গ্রন্থি আল্‌গা হইয়া যায়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড টল্‌মল্ করিয়া উঠে—সবই উলট্‌পালট্ বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কা হয়; কিসের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইব, আমরা তাহার ঠাওর পাই না। কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে এরূপ বাঁধাবাঁধি কিছুই নাই। ঘটনাগুলি পর পর নিয়মমত আসে, তাও স্বস্তি; না আসে তাও স্বস্তি। স্বপ্ন, hallucination, vision, apparition, miracle, যে যখন আসে আসুক, কাহারও কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই, কোনটাকেই অস্বীকারের উপায় নাই। যে যখন আসে, তাহাকে তখন তেমনি অবারিত-দ্বারে স্বাগত করিয়া লইতে হয়। ব্যাবহারিক জগৎ যেন একখানা Drama;—উহার একটা plot আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে,—অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্য purpose লইয়া আসে,—কেহই নিরর্থক আসে আসে না। আর প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা Epic poem; ঘটনাবহুল,—বিচিত্র,—উচ্ছৃঙ্খল; সর্ব্বত্রই একটা উলট্‌পালট্ বিপর্য্যয় ও বিপ্লবের কাণ্ড। দেখিলে, তাক্ লাগে; হাসিতে হয়, কাঁদিতে হয়; অভিভূত হইতে হয়; পুলকিত হইতে হয়;—কিন্তু কোথায় কি উদ্দেশে চলে, তাহা বলা যায় না। প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক জগতের এই পার্থক্য মনে রাখিয়া চলিলে, জগতের অনেকগুলা হেঁয়ালি নূতনভাবে নূতনরূপে দেখা যাইতে পারে, অনেক বিতণ্ডার অবসান হইতে পারে,—ইহাই ক্রমশঃ আমার ধারণা জন্মিতেছে। সে সকল কথা সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। তৎপূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত ব্যাবহারিক জগতের সহিত আর একটু পরিচয় স্থাপন আবশ্যক হইবে। প্রাতিভাসিক জগৎ কোন্ মশলায় নির্ম্মিত, ব্যাবহারিক জগৎই বা কোন্ মশলায় নির্ম্মিত, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার হইবে। আপনাদের যদি ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়, আপনারা যদি অভয় দেন, তাহা হইলে আবার আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহসী হইব।

গুরু-শিষ্য

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

অজয় যেথায় আসি
জননী-গঙ্গা-জীবনে শরণ লইয়া বাঁচিল হাসি—
যুক্তবেণীর সেই উপকূলে ধেয়ান-নিরত অশথের মূলে,
সৌম্য শান্ত কেশব ভারতী আঁখি মেলি চাহি দেখে,
পদতলে তাঁর বসি করযোড়ে কিশোর নিমাই
ভাসে আঁখি জলে,
সুন্দরতনু স্মর-সুকুমার তরুণ মূরতি এ কে ?
সে যে ভুলে গেল সব ধ্যান ;—
চাহিয়া রহিল নিমায়ের মুখে—ফিরিল না সে নয়ান।

"এ কি দেবতার ছল ?
পণ্ড করিতে আমার জীবন-ব্যাপী এ সাধনা-ফল ?
পুষ্পপেলব এ চারু বদনে পাঠাইলা হরি কিশোর-মদনে—
এ কি হলো বুক ভরিয়া উঠে যে, ফিরে নাক' আঁখি আর !
এ কি আনন্দ-পুলক-তাড়িত, এ কি তবে মোর
চির-আরাধিত ?
সেই বটে ওগো এ নহে ছলনা—এ কি রূপ ছলিবার ?
মোর সকল সাধনা-ধ্যান
সার্থক করি দিতে আসিয়াছে—ইথে আর নাহি আন্ !"

ধরি ভারতীর পদ
কহিল নিমাই সুমধুর স্বরে প্রেম-ভাব গদগদ—
"হে ধ্যানী মহান্ আসিয়াছি আমি শিষ্য হইতে তোমার
হে স্বামি,
দাও হে শিক্ষা দাও হে দীক্ষা হরি-নাম মহাগান।
সুদূর নদীয়া নগর হইতে এসেছি গো আমি দীক্ষা লইতে,
দাও মোরে দেব সন্ধান সেই লভিতে শ্রেষ্ঠ দান।
প্রভু, আমি অতি অভাজন,
কর কৃপা দাও সে বীজ-মন্ত্র মৃত্যু-সঞ্জীবন।"

"এসেছ মন্ত্র নিতে ?
একি মোহ ঘোর ঘনায়ে উঠিল এই সন্ন্যাসীর চিতে ?
সব জপতপ বিসরিণু—এ কি ! কে তুমি কিশোর
তব মুখ দেখি,
দাও পরিচয়—ওরে মায়াদূত সুন্দর সুতরুণ,
তাপসহৃদয় বিরোধ ঘর্ষে ফেনায়ে উঠিল অসীম হর্ষে,
তোমার সঙ্গ লাগি এ পিপাসা কেন জাগে সকরুণ ?
ওগো দাও মোরে পরিচয়—
ছলিয়া আমায় কি লাভ তোমার হবে ওগো মহাশয় ?"

চরণে লুটায়ে পড়ি—
উত্তরে গোরা—"কর প্রত্যয়, হে ঠাকুর দয়া করি।"
কহিল ভারতী—"সাধনার পথে অনেক বিঘ্ন,
তুমি কোন মতে
নারিবে চলিতে—বড় কণ্টক, ঋষিরাও পড়ে পাছে !
তুমি ত' বালক নবীন বয়স হৃদয় তোমার প্রবণ অলস,
কেন এ মার্গচ্যুত হয়ে শেষে খোয়াবে যে সুখও আছে ?
তুমি এখনও চপলমতি,
পাকিলে বুদ্ধি বুঝিবে তখন—মোর কথা ঠিক অতি !"

চরণ ছাড়ে না তবু,
কাঁদিয়া ভাসায় মুখে বলে—"তবে ছাড়িব না পদ কভু।"

* * * * *

মুণ্ডিত শিরে কৌপীন ডোরে প্রসারি দুবাহু ডাকে
"আয় ওরে
কে কোথা আছিস্ শুচি কি অশুচি শুনারে হরির নাম !
জীবে দয়া আর সেবা নামে রুচি হরি-ভক্ত শুচি—
অভক্ত অশুচি,
নাহি ভেদ কোন দ্বিজ ও চণ্ডালে"—সমন্বয়ের সাম !
এই গোরার কণ্ঠস্বরে
সর্ব্বত্যাগী প্রেমের ধর্ম্ম ধ্বনিল জগৎজুড়ে।

সারাটি নদীয়াবাসী
এসেছিল যারা ফিরাতে নিমায়ে, ফুটাতে শচীর হাসি—
ভুলে গেল সব এসেছিল কেন ইন্দ্রজালের মোহে তারা যেন
ছুটিল গোরার পিছু পিছু গেয়ে হরিনাম—হরিগান !
দেখিল ভারতী প্রেমই ধর্ম্ম সে সাধনা নহে একার কর্ম্ম
নাহি ভেদ-বাধা নাহি অভিমান—বিশ্বের ভগবান্।
ওগো তাই বুঝি কহে গোরা—
"তরু সম হও, শুধু হরি কও, তৃণ হ'তে নীচ মোরা।"

কেশব-ভারতী ভাবে
নব প্রেমিকের এ নব ছলনা ডুবাতে আমারে পাপে।
কোথায় পাইব আমি ও চরণ তা' না দিয়ে তুমি করিলে বরণ
গুরুপদে মোরে ? ওহে নারায়ণ, একি খেলা প্রাণ-সখা !
আমার সকল সাধনা-গর্ব্ব অশ্রু-পাথারে করিলে খর্ব্ব,
জগদ্গুরুর গুরু করে মোরে দিলে বড় লাজ ব্যথা।
তাই গৌর যেথায় নাচে
লুটায়ে সে রজে গুরুর হৃদয় পুলকে শিহরি বাঁচে।

য়ুরোপে তিনমাস

[মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, M.A., L.L.D., C.I.E.]

শুক্রবার ২১এ জুন।—এত পথ আসিয়াছি, তাহা তত দীর্ঘ মনে হয় নাই। আজ কিন্তু কেন জানি না, শ্রান্তিতে—বুঝি বা কতকটা ভ্রান্তিতেও—আবার ছয় শত মাইল দূরবর্ত্তী স্কটল্যাণ্ডের সেই শীতপ্রধান এবাডিন সহরে যাইতে মন সরিতেছে না। বারবার মনে হইতেছে যে, কর্ত্তৃপক্ষগণকে লিখিয়া দিই, এবাডিন যাওয়া হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে, জোন্‌স্ সাহেবের সহিত শনিবার হ্যাণ্ডেল ফেষ্টিভ্যাল দেখিতে ক্রিষ্টাল প্যালেসে যাইয়া, ৪০০০ লোকের সমস্বরে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণে পরিতৃপ্ত হই।

স্মিথ-পরিবার

কিন্তু ডাক্তার রায়ের সহিত ডার্হাম যাওয়া যখন হইলই না, ও এবাডিনের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করাই হইয়াছে, তখন সেখানে না যাইয়া পরিত্রাণ নাই, এবং কংগ্রেস-সেক্রেটারীর আমাকে এবাডিন যাইবার বারংবার পীড়াপীড়ি মনে করিয়া, অগত্যা যাইতে প্রস্তুত হইয়া ট্রেণে রওয়ানা হইলাম। ভগবান যাহা করেন ও করান, তাহা মঙ্গলেরই জন্য। ট্রেণে আসিতে আসিতে এক উচ্চপদস্থ সাহেবকে এই মন্ত্র-গ্রহণ করাইতে পারিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম, এবং এবাডিনে পৌঁছিবার পাঁচ মিনিট পরেই আমার পক্ষেও এই মহা-মন্ত্রের সার্থকতার প্রমাণ হইল। কিন্তু সেকথা পরে বলিব।

দুই পথে এবাডিন আসা যায়। ইংলণ্ডের পূর্ব্বদিক হইয়া, ইয়র্ক-হাল প্রভৃতি প্রধান স্থান দেখিয়া, 'মিডল্যাণ্ড্

রেল্‌ওয়ে’ পথে, অথবা রাগ্‌বি, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতির মধ্য দিয়া ‘গ্রেট্‌ নরদার্ণ্‌ রেল্‌ওয়ে’-যোগে এই দুই পথেই আসা যায়। আমার ইচ্ছা ছিল, পূর্ব্বের পথে আসিয়া পশ্চিমের পথে ফিরিব। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠিল না। পশ্চিমের পথে আসিয়া দেখিলাম যে, পূর্ব্বের পথে আসিলেও বিশেষ কিছু দেখিতে পাইতাম না। ট্রেণ অতি দ্রুত চলে। প্রধান প্রধান স্থানের গির্জ্জাবাড়ী, রাস্তা-ঘাট দূর হইতে একই রকম দেখায়। ষ্টেশনও সকল স্থানেই একরূপ। তবে কোনটা ছোট কোনটা বড়, এই মাত্র প্রভেদ। অতএব পূর্ব্বের পথে না আসাতে বিশেষ ক্ষতি কিছু হইয়াছে বলিয়া ত বোধ হয় না। বিশেষতঃ, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থান দেখিতে গেলে, পূর্ব্বের পথের কতকটায় পুনরায় যাইতেই হইবে। ডোভর্‌ হইতে লণ্ডন আসিবার সময় ট্রেণে ফার্ষ্ট-ক্ল্যাসে আসিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, খুব বড়মানুষ কিংবা অভিমানী লোক ছাড়া, কেহই ফার্ষ্ট-ক্লাসে অকারণ পয়সা দেয় না। সকল ট্রেণেই ফার্ষ্ট-ক্ল্যাস প্রায় একবারেই খালি। সকল ভদ্র-লোকেই থার্ড-ক্লাসে চড়েন। প্রবাদ এই যে, মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন বলিতেন—যে ফোর্থ-ক্ল্যাস নাই বলিয়া, তিনি থার্ড-ক্ল্যাসে চড়েন। মধ্যবিত্ত ইংরাজ ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা থার্ড-ক্লাসে চড়িতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না, এবং তাহাতে তাঁহাদের মানহানিও হয় না। কিন্তু থার্ড-ক্লাস গাড়ীর বন্দোবস্ত ও ভাড়া প্রায় আমাদের দেশের সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ীরই মত; কেবল ভিড় বেশী। তবে কালা মূর্ত্তি দেখিয়াই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, বড় কেহ আমাদের গাড়ীতে আসিল না। সাধারণতঃ পথের দৃশ্য ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানেরই অনুরূপ। সুন্দর সাজান বাগানের মত কৃষি-ক্ষেত্র, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট পাহাড়, উঁচু নীচু জমী, সব যেন সবুজ কার্পেট-মোড়া, বেড়া দেওয়া খোলা জমিতে গরু, ঘোড়া, ভেড়া চরিতেছে—একটু জায়গা কোথাও ফাঁক নাই। একটা না একটা চাষবাস, কল-কারখানা, বাড়ী—যেখানে যেমন সাজে, তেমনি সাজাইয়া রাখিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের কাছাকাছি স্থানের দৃশ্য কতকটা দক্ষিণ-ফ্রান্সের মত। তারপর, যত হাইল্যাণ্ডের ভিতরে আসিতে লাগিলাম, তত দৃশ্য আরও মনোরম হইতে লাগিল। ক্লাইডের মত জগদ্বিখ্যাত নদী, উৎপত্তি-স্থানের নিকট অতি ক্ষীণকায়া দেখিলাম; গ্লাসগো পৌছিয়া নদীর মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত্রু-দমন-ক্ষম মহা-পরাক্রান্ত যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতি গ্লাসগোর নীচে ক্লাইড নদীর ধারেই তৈয়ার হইয়া থাকে।

সমস্ত দিন মেঘ করিয়া অন্ধকার হইয়াছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছিল। সেই জন্য বেশ শীত ছিল। তবে অসহ্য নহে। পার্থ, ষ্টার্লিং, কার্লাইল প্রভৃতি সহরে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারে দাঁড়ায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ষ্টেশন হইতে সকল সহরই একই রকম দেখায়। সর্ব্বত্র বড় বড় বাড়ী, কারখানা—রাস্তায় তেমনই ভিড়! এক জায়গার কথা বলিলেই, অপর জায়গার এসকল বিষয়-সম্বন্ধে পূর্ণ বর্ণনা হইয়া যায়। তবে বিশেষ করিয়া দেখিলে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দেখিবার ও লিখিবার যথেষ্ট আছে।

পাহাড়ের নীচে ও গায়ে ‘ফর্‌’ ও ‘হীথর্‌’এর শোভা স্কট্‌ল্যাণ্ডে অতি সুন্দর—একথা চিরকাল শুনিয়াই আসিতেছি; আজ চাক্ষুষ দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম—বাস্ত-বিকই বড় সুন্দর। তবে ‘হীথরে’র বেগুনি ফুল ফুটে আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে—সেই বেগুনি রংএর ফুল ফুটিলে নাকি আরও বাহার হয় এবং এবার্ডিন হইতে আরও উত্তর-পশ্চিমে যাইতে পারিলে, ‘Stern & Wild Caledonia’র পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের আরও কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।—কিন্তু শীতকালে এসব স্থানে আসা দুর্ঘট।

রাত্রি ১০॥ টার সময় ট্রেণ এবার্ডিনে পৌছিল। ‘ওল্ড্‌এবার্ডিনে’ প্রাচীন প্রিন্সিপ্যাল্‌ ও ভাইস্‌-চ্যান্সেলর্‌ জর্জ্জ য়্যাড্যাম্‌ স্মিথ্‌ সাহেবের সুন্দর প্রাচীন বাটীতে আসিলাম। রাস্তা, বাড়ী, বাগান—সমস্ত জায়গাটিই মনোরম—তপোবনতুল্য সুন্দর ও নির্জ্জন; মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয়, পুনরায় ইউনিভার্সিটির ছাত্র হইয়া লেখাপড়া করি। প্রায় রাত্রি এগারটা বাজিয়াছে; কিন্তু এখনও এমনি আলো রহিয়াছে, যেন এইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে স্কটল্যাণ্ড আরও বহু উত্তরে—সেইজন্য সূর্য্যালোক এখানে গ্রীষ্মকালে আরও অধিকক্ষণ থাকে। গৃহদ্বারে স্মিথ্‌ সাহেব অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পিতা ভারতবর্ষের বিখ্যাত “ফ্রেণ্ড্‌-অব্‌-ইণ্ডিয়া” সংবাদপত্রের সম্পাদক—জর্জ্জস্মিথ—ভারতবর্ষের অনেকানেক উপকারী

কার্য্যে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন; এখনও জীবিত আছেন—বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। প্রিন্সিপাল স্মিথের ভ্রাতা স্যর্ ডন্‌লপ্ স্মিথ্ এক্ষণে 'ইণ্ডিয়া' আপিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী; ভারতবর্ষে বড়লাট কর্জ্জনের 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারি' ছিলেন। স্মিথ্ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী, রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আমার জন্য জাগিয়া বসিয়াছিলেন! আদর-অভ্যর্থনা অত্যন্তই করিলেন। আমার ঘর-দুয়ার ও বন্দোবস্ত সবই পৃথক্ ও পরিপাটী। ইংলণ্ডে যে সকল কষ্ট-অসুবিধা দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে তাহার কিছুই নাই। যেখানে যখন যেটি প্রয়োজন, সবই রাখা আছে। গরম জল, তোয়ালে, সাবান—আসবাবের অভাব নাই। বিছানার ভিতর গরম জলের বোতলে গরম জল, 'ফায়ার্ প্লেসে' আগুন;—এখানে রাত্রে গ্রীষ্মকালেও এসকল প্রয়োজন। রাত্রে যদি ক্ষুধা বোধ হয়, তাহার জন্য দুধ-রুটি-বিস্কুট পর্য্যন্ত শয্যাপার্শ্বে প্রস্তুত। সাদাসিদার ভিতর বিলাসের যথেষ্ট আয়োজন। ভদ্রলোকের বসত-বাড়ীর, ও বাসা-বাড়ীর বন্দোবস্তই স্বতন্ত্র।

বাড়ীতে আসিয়া বসিতে না বসিতেই প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ বিনীতভাবে বলিলেন, "আমরা ইউনিভার্সিটি হইতে আপনাকে 'ডক্টর অব্ ল' (L. L. D.) উপাধি সম্মান-স্বরূপ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সুখী হইব।" আমি এই প্রাচীন জগন্মান্য ইউনিভার্সিটির নিকট হইতে এই উচ্চ-সম্মান কখনও প্রত্যাশা করি নাই। গ্রেট-বৃটেনের ইউনিভার্সিটিতে আমার এই প্রথম আগমন। আমি একজন অপরিচিত নগণ্য ব্যক্তি;—আমাকে এই আশাতীত সম্মানে ভূষিত করিবার প্রস্তাবে বাস্তবিকই আমি অভিভূত হইলাম।—ভদ্রতার নিয়ম স্মরণ করিয়া, যথাসাধ্য ধন্যবাদ দিলাম।

ডাক্তার পি. সি. রায় জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ। তাঁহাকে এ সম্মানে ভূষিত করিয়া ডার্হাম ইউনিভার্সিটি নিজেই সম্মানিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে তাঁহাকে অনেকে জানেন, তাঁহার এ সম্মান সম্ভব ও যোগ্য। কিন্তু ডার্হাম অপেক্ষা বহু প্রাচীন ও গরীয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, আমা হেন অকিঞ্চনকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়া যে মহান সম্মান অপাত্রে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক, বিশেষতঃ যাহার সহায় বা পৃষ্ঠপোষকের নিতান্তই অভাব, তাহার পক্ষে ইহা অভাবনীয় সম্মান। ভগবানকে পূর্ণপ্রাণে ধন্যবাদ দিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম।

শনিবার ২২এ জুন, ১৯১২।—রাত্রি ৩।০ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল; সাতটা পর্য্যন্ত অতিকষ্টে শয্যায় কাটাইলাম।—সূর্য্যোদয়ের পর তিন ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকা বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে অসাধ্য।

কাল রাত্রে বড় ঠাণ্ডা গিয়াছে, বৃষ্টিও হইয়াছিল। কাজেই, স্নানের সুন্দর আয়োজন থাকা সত্তেও স্নানের বড় ইচ্ছা হইল না। অগত্যা মুখ-হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া, একেবারে সাজসজ্জা করিয়া, ঘরের বাহিরে আসিলাম। আটটার সময় প্রাতভোজন হইল। তাহার পূর্ব্বেই ঘরে চা-বিস্কুট দিয়া আসিয়াছে। আমার কোন্ কোন্ দ্রব্য আহারে আপত্তি, তাহা বলিয়া দেওয়াতে আয়োজনও সেইরূপ। দুই তিনটি ছোট মেয়ে, গৃহিণী ও কর্ত্তার সহিত আহারে বসিলাম;—পরিজ, হেরিং মাছ, স্কচ কেক, স্কন্স ইত্যাদির প্রচুর আয়োজন। নানাকথাবার্ত্তায় সময়টি বেশ কাটিল। এই ভগবদ্‌ভক্ত পরিবার তাঁহাদের প্রাতঃকালীন প্রার্থনার সময় আমায় উপস্থিত থাকিতে অনুমতি দিলেন। পরম হিন্দুও পূর্ণপ্রাণে সে উপাসনায় যোগ দিতে পারেন;—আমিও দিলাম।

মিসেস্ ম্যাকিলন্ কলিকাতা হইতে সিরাজ সাহেবের পত্র পাইয়া, তাঁহার বাড়ীতে আমায় যাইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া চিঠি ও টেলিগ্রাম দিয়াছিলেন; কিন্তু প্রিন্সিপাল স্মিথের আগ্রহাতিশয়ে সে নিমন্ত্রণ আমায় প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। অতএব তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতে হইবে। মিসেস্ স্মিথ স্বয়ং অনুগ্রহ করিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। মোটর গাড়ী আনাইয়া দিলেন; তাহার ভাড়া পর্য্যন্ত আমায় দিতে দিলেন না; কাল রাত্রে ষ্টেশন হইতে আসিবার ভাড়াও দিতে দেন নাই। আমরা বড় অভিমান করি যে, আমাদের মত অতিথিপ্রিয় জাতি জগতে নাই; কিন্তু ইংলণ্ড—স্কটল্যাণ্ড অন্য শিক্ষা দিতেছে। সহর দেখিতে দেখিতে সহরের বাহিরে 'অগস্‌ফিল্ডে' মিঃ ল্যাক্ল্যান্ ম্যাকিননের বাড়ী গেলাম। কাল রাত্রে ভাল করিয়া সহর দেখা হয় নাই;—সহরটি বড় সুন্দর!—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সমুদ্রের ধারেই

অবস্থিত ; ইহার পাদদেশ দিয়া 'ডী' নদী প্রবাহিত। সহরের প্রয়োজনমত নদীর গতি নাকি দুই তিনবার ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা অতি কঠিন কাজ। কারণ, আমাদের দেশের মত চারিদিকে মাটি, কিংবা বালি মাটি, নাই। শক্ত 'গ্রানাইট' পাথরের সহর, তাহা কাটিয়া নদী-ফিরান সহজ ব্যাপার নহে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অদ্ভুত শক্তিবলে নদীর গতি ফিরান হইয়াছে। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় অনেক আছে। রাস্তা সব বেশ চওড়া এবং বড়। পুরাতন সহরে আর সঙ্কুলান হইতেছে না বলিয়া নূতন সহর বাড়িতেছে। বিখ্যাত কবি বার্ণস্, প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ওয়ালেস্ ও গর্ডনের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। গির্জ্জা, থিয়েটার, টাউন হল, দোকান, স্কুল, কলেজ সবই রীতিমত। প্রায় সকল বাড়ীই গ্রানাইট পাথরের তৈয়ারী ; ইটের চলন মোটেই নাই। সহরের মাঝেই গ্রানাইট পাথরের এক খাদ আছে। ১৫০ বৎসর ধরিয়া সেখান হইতে পাথর-তোলা হইতেছে, অথচ এখনও ভাণ্ডার অপর্য্যাপ্ত! এই গ্রানাইট খাদ ৩৯০ ফুট গভীর হইয়াছে ; আরও কত বৎসরে এ পাথর ফুরাইবে বলা যায় না। Compressed air সাহায্যে পাথর কাটা হয় ; দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। করাত করিয়া এ পাথর কাটিতে হইলে, এক এক টুকরা পাথর কাটিতে কত দিন লাগিত, বলা যায় না। কিন্তু 'জমান হাওয়া'র নল লাগাইতেছে, আর পাথর বাস্তবিক মাখমের মত কাটিয়া যাইতেছে বলিলেও হয়। এই সব দেখিতে দেখিতে ম্যাকিলন সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

ম্যাকিলন সাহেব বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া আদর-যত্ন করিলেন, খাওয়াইবার জন্য বিশেষ জেদ করিলেন, সহরের বাহিরে খোলা জায়গায় দিব্য বাড়া-বাগান ; কিন্তু ভাইস-চ্যানসেলার স্মিথের আতিথ্য একবার গ্রহণ করিয়া, তাহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না ;—সেই জন্য এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অন্যান্য 'ডেলিগেট্' অপরাপর ভদ্রলোকের বাড়ী আতিথ্য লইয়াছেন। আমার পক্ষে ভাইস-চ্যান-সেলারের আতিথ্যলাভ অতি সম্মান ও গৌরবের কথা। ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারী সিরাজ সাহেব 'খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা' সম্বন্ধে অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।—মিসেস ম্যাকিলনের নিকট বিদায় লইয়া সিরাজ সাহেবের মাতার সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেখানেও আদর যত্নে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। অধ্যাপক টর্ণার, একনমিক্সের লেক্চরর্' এবং কনিষ্ঠ মিঃ ম্যাকিনন্ 'সলি-সিটারে'র সহিত পরে দেখা হইল। তাঁহাদেরও যত্ন-আত্মীয়তা যথেষ্ট। ইংলণ্ড অপেক্ষা স্কটল্যাণ্ডে যেন আত্মীয়তা ও আন্তরিকতা কিছু অধিক দেখিতেছি।

'পামার হোটেলে' ডেলিগেট্দিগের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল ; কিছু সময় ছিল বলিয়া পথে ক্ষৌরকার-গৃহ সন্ধান করিয়া কামাইয়া লইলাম। হোটেলে উপস্থিত ডেলিগেট্ এবং এবাডিন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, ও সেনেটের সদস্যসকলের সহিত আলাপ-পরিচয় হইল। আহারাদির পর বক্তৃতা হইল। ভারতবর্ষের পক্ষ হইয়া আমাকে কিছু বলিতে হইল।

তাহার পর মোটরে করিয়া ডেলিগেট্‌দিগকে লইয়া সহর-ভ্রমণ, কালেজ-গির্জ্জা ইত্যাদি দেখাইবার পালা। ভাইস-চ্যানসেলার মহাশয়, আমাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য, সহরের গণ্যমান্য লোকদিগকে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। এই উপলক্ষে বিস্তর নূতন লোকের সহিত আলাপ হইল। হোটেলে আমার বক্তৃতার কথা অভ্যাগতদিগের মধ্যে খুব চলিতেছিল ;—একথা বাড়ীর গৃহিণী চুপি চুপি বলিলেন—কাজেই, যেখানে সে কথার জটলা হয়, সেখান হইতে, সরিয়া যাইতে হইল।

সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর রাত্রের খাবার খাইবার স্পৃহা নাই বলিয়া, ছুটি লইয়া শয়ন-ঘরে আসিলাম ; গৃহিণী কিন্তু নাছোড়বান্দা,—ঘরেই চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পুনরায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। দশচক্রে এমনি ভাবটা দাঁড়াইল, যেন আহারে আপত্তি নাই ; কিন্তু, কষ্ট করিয়া রাত্রির কাপড় পরিয়া নামিয়া যাইয়া, গৃহস্থের সঙ্গে ভদ্রতা করিতে ও কথাবার্ত্তা কহিতেই যেন যত আপত্তি!—হা ভগবান! যাহা হউক, সকাল-সকাল শুইয়া পড়িলাম। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য পড়াশুনা চলিতেছে না। গৃহ-স্বামী আমার পাঠের জন্য নানাবিধ পুস্তক শয্যাপার্শ্বে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রাত্রে পুনরায় যদি ক্ষুধা-বোধ হয়, তাহার জন্য এক বাক্স বিস্কুট পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছে। এত অধিক আদর-যত্নে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছে।

রাত্রে অনেকবার নিদ্রা ভাঙ্গিল। দীর্ঘ রাত্রি না হউক, বেলা আটটা পর্য্যন্ত বিছানায় থাকিতে হইলে, এইরূপই হয়। রাত্রে নাকি সমুদ্রে অত্যন্ত কোয়াসা হইয়াছিল। কোয়াসায় জাহাজ মারা যাইবার ভয়ে সমুদ্রতীরে ফগ্‌হর্ণ দ্বারা বিপদের সংবাদ ঘোষণা করা হয়। কাল বেড়াইতে যাইবার সময়, সেই ভীষণ 'ফগ্‌হর্ণ' দেখিয়া আসিয়াছিলাম। শুনিলাম, তাহার শব্দ নাকি আরও ভীষণ; রাত্রে নাকি সেই আওয়াজ হইয়াছিল। কিন্তু আমি শুনিতে পাই নাই, অতএব সুনিদ্রা হয় নাই বলা বড় চলে না।

রবিবার—২৩এ জুন।—স্কটল্যাণ্ডে রবিবার অতি শান্ত নিঃশব্দ দিন। চাকর-দাসীকে একটু বিশ্রামের অবসর দিবার জন্য অদ্য আহারাদি বিলম্বে হওয়াই নিয়ম; কিন্তু আমার সুবিধার জন্য সকাল-সকাল হইবার আয়োজন হইতেছিল জানিয়া, গৃহস্বামিনীকে আমি বিনয় ও দৃঢ়তার সহিত বলিলাম যে; আমার সুবিধার জন্য বাড়ীর নিয়ম-লঙ্ঘন হইলে আমি বড় অত্যন্ত দুঃখিত হইব। অগত্যা নিয়মমত ৯টার সময়ই প্রাতভোজন হইল।

স্নানের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও, আজও ঠাণ্ডা ও শরীর ভার বলিয়া, স্নান করিতে ইচ্ছা ও ভরসা হইল না। প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ তাঁহার কাজ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন; তাঁহাকে গির্জ্জায় 'প্রীচ্' করিতে হইবে, সেইজন্য ব্যস্ত আছেন—আমাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহিণী ও মেয়েদের কাছেই রহিলাম। কথায় কথায় হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের কথা উঠিল; আমি যথাজ্ঞান কিছু বলিলাম। দেখিতে দেখিতে গির্জ্জায় যাইবার সময় হইল; প্রিন্সিপ্যাল পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন, আমি তাঁহার স্ত্রীর সহিত গেলাম। তাঁহাদের সাত বৎসরের মেয়েটি বাগানের ফটকপর্য্যন্ত কি যত্নের সহিত পৌছাইয়া চাবি বন্ধ করিয়া গেল, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম;—মার সঙ্গে যাইব বলিয়া হাঙ্গামা কিছুমাত্র নাই। যেন কলের পুতুলের মত নিঃশব্দে তাহার পিতামাতার আদেশ ও ইচ্ছা পালন করিতে শিখিয়াছে। অপর কন্যাটি—ক্যাথালিন আরও চমৎকার; বয়স ১০।১১ বৎসর হইবে—সর্ব্বদাই হাস্যমুখ—কাহার কি প্রয়োজন, সে যেন সর্ব্বদাই দেখিতেছে; ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করিতে হয় না—নিজে বুঝিয়া মার গৃহস্থালীর সব কাজের সাহায্য করিতেছে। আমাকে যত্ন করিবার জন্য তাহারা যেন সদাই ব্যস্ত, বিব্রত অথচ উল্লসিত। ছোট খুকিটির বয়স ৩ বৎসর। খুব দুষ্ট অথচ খুব ভালমানুষ; মা এবং 'গবর্ণেস্' যাহা বলিতেছে, তাহাই শুনিতেছে। ইহার মধ্যেই সে অনর্গল ফ্রেঞ্চ বলিতে পারে। জ্যানেট্, ক্যামেলীন্; মার্গারেট্—তিন জনেই সুন্দর ফ্রেঞ্চ বলিতে পারে, কারণ; তাহাদের ফ্রেঞ্চ গবর্ণেস্ আছে। তিনটি ছেলে—একজন সিভিল সার্ভিসের জন্য, একজন সৈনিক বিভাগের জন্য, আর একজন স্কুলে পড়িতেছে। বড় মেয়ের বয়স ১৭ বৎসর, সে ইয়র্ক নগরে স্কুলে পড়ে; শীঘ্র বাটী আসিবে। এই ভগবন্তুক্ত, শান্তিপ্রিয় পরিবারটির মধ্যে আসিয়া, কয়দিনের শ্রান্তির ভার যেন অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছি। গৃহিণীর সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে 'কিং'স কলেজ্ চ্যাপেলে' পৌছিলাম।

ডেলিগেট্‌দিগের অভ্যর্থনার জন্য বিস্তর লোকের সমাগম;—এত ভিড় অথচ কোনও গোলমাল নাই। কর্ম্মচারীরা যাহাকে যেখানে বসিবার জায়গা দেখাইয়া দিতেছে, সে সেইখানে বসিতেছে। যাহারা জায়গা পাইল না, তাহারা নিঃশব্দে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। ইহা 'কলেজ চ্যাপেল,' অতএব এখানে কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রধান অধিকার; তাহারা জায়গা পাইলে তবে অন্য লোক বসিতে পাইবে। আমাদের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকলে বসিবার পর, গাউন পরিয়া সারি দিয়া পুরোহিত ও অধ্যাপকগণ আরাধনা-স্থানে উপস্থিত হইলেন। দৃশ্য বড় সুন্দর—বড় গম্ভীর—বড় মর্ম্মস্পর্শী। সেই পুরাতন প্রাচীর 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,' আধ-অন্ধকার, ভগবৎ-পূজার স্থানে শত শত নরনারী-কণ্ঠে গম্ভীর অর্গান-সহযোগে ভগবৎপ্রীতি-সঙ্গীত আকাশপথে যখন উঠিতে লাগিল, মুগ্ধ, প্রীত ও উল্লসিত হইয়া, খৃষ্টান-হিন্দুর প্রভেদ ভুলিয়া গেলাম—একপ্রাণে সেই মহাপূজায় যোগ দিতে কিছুমাত্র বাধা-বিঘ্ন মনে হইল না। এমন সব সঙ্গীত ও উপদেশ আজিকার জন্য প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, যাহাতে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকলেই পূর্ণপ্রাণে যোগ দিতে পারেন। কয়েকটি সুন্দর সঙ্গীত ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠের পর, প্রিন্সিপ্যাল স্মিথের বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাটি যেমন উপদেশপূর্ণ, তেমনি তেজস্বী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া

ছিল। আমাদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত থাকাসত্তেও তাড়াতাড়ি সেরূপ 'সর্ম্মন্' প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ক্ষমতার বিশেষ পরিচায়ক। ইউনিভার্সিটি-কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে অতি বিশদভাবে প্রধান প্রধান কথাগুলি লইয়া তিনি বক্তৃতা করিলেন।

আরাধনা সমাপনান্তে বাটীতে আসিবার সময় মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড্সনের সহিত নানা কথা হইল। তাঁহার, তাঁহার স্ত্রীর, ও অন্যান্য লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপের জন্য স্মিথ্সাহেব তাঁহাদিগকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডাঃ নীয়ল্, তাঁহার স্ত্রী, ডাঃ পাস্টর, এবং এডিন্বরা ও এবার্ডিনের কয়েকটি প্রধান ছাত্র এবং অধ্যাপককেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ছোট ছোট পারিবারিক-সমিতিতে সকলের সহিত আলাপপরিচয় কথাবার্ত্তায় ইউনিভার্সিটি ও দেশসংক্রান্ত কথা জানিবার বেশ সুযোগ ঘটে;—বড় বড় সভাসমিতিতে মুখের কথাই বেশী!

সোমবার,২৪এ জুন।—প্রভাতেই,এবার্ডিন ত্যাগ করিবার উদ্যোগ শেষ করিয়া, বৈঠকখানায় নামিলাম।

আচার্য্য জন্ অ্যাডাম্ স্মিথ্

ক্যাথালিন্ ও জ্যানেট্ আমার যাইবার কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত। পাছে ভোর বেলায় চলিয়া যাই, সেই ভয়ে তাহারা সকাল সকাল প্রস্তুত হইয়া, দেখা করিবার জন্য নামিয়া আসিয়াছে;—আমার জন্য ফুল ও ষ্ট্রবেরী ফল সংগ্রহ করিয়াছে! এই মেয়ে দুটি আমায় বড়ই স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছে। কাল কথার ছলে আমার "বড়ুমার" সব পুরাতন গল্প বলিতেছিলাম।

"বড়ুমা" আমার কনিষ্ঠা কন্যা। ছেলেবেলায় সে (ডাক্তার) সুরেশকে "গাড়ী-কাকা" বলিত। আমি এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে নকাকাকে "গাড়ী-কাকা" বলে কেন?—তাহাতে সে যেন আশ্চর্য্য হইয়া, বলিল, "কেন?—উনি রোজ গাড়ী করিয়া আসেন, তাই ত উনি 'গাড়ীকাকা'। আমি ত স্তম্ভিত! আর একদিন মোটরে বেড়াইয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "আমি যতটা মনে করিতে পারি, মোটর গাড়ী তার চেয়ে বেশী চলিতে পারে, কি না?"—আমি একথার উত্তর দিতে পারি নাই। অপর একদিন শুনিলাম, বড়ুমা তাহার সমবয়স্ক এক বন্ধুকে বুঝাইতেছে যে, "সন্ধ্যার পর এই যে সমস্ত তারা দেখা যায়, এ সব কি জান?—এসব ভগবানের গাড়ীর আলো। আমাদের গাড়ীতে যেমন সন্ধ্যার সময় দুটি বাতি জ্বালা হয়—তেমনি সন্ধ্যার সময় ভগবানের গাড়ীতে অতগুলি বাতি জ্বালা হয়।"—এইসব নানা গল্প শুনিয়া তাহারা মনে মনে বড়ুমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্যাথালিন্ তাহার জন্য,

তাহার নিজের পুস্তক হইতে, পুস্তক বাছিয়া উপহার দিল। কর্ত্তা ও গৃহিণী তাঁহাদের নিজের ছবি দিলেন; ছেলেদের ছবি ও বাড়ীর ছবি পরে পাঠাইবেন। চাকর-বাকরদের বেশী বক্সীস দিয়া পয়সা নষ্ট না করি,—সে উপদেশ গৃহিণী দিলেন। মাল-পত্র রেলে পৌছিয়া দিবার নিজে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যাহাতে আমার বিক্ষেপ বা চিত্ত-চাঞ্চল্য কোনওরূপে না হয়, তাহার জন্য নিজ প্রিয়জনের ন্যায় তাঁহারা সকলেই ব্যস্ত। তাঁহাদিগকে মুখে ধন্যবাদ দিয়া শেষ করা অসম্ভব। প্রিন্সিপ্যাল, মোটরে করিয়া নাপিত-বাড়ী লইয়া গিয়া, স্বয়ং বসিয়া থাকিয়া তাড়া দিয়া, আমার ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া আনিলেন! তারপর, দর্জ্জী-বাড়ী নিজে সঙ্গে করিয়া, 'গাউন্' মাপ দিয়া আসিলেন।

তাহার পর, এবার্ডিন্ 'টাউন্-হাউসে—আমরা যাহাকে 'টাউন্‌হল' বলি, তথায়—বিরাট অভ্যর্থনা-সভায় যাওয়া গেল। সেখানে লর্ড প্রোভোষ্ট্, কেম্প্‌বেলী, টাউন্ ক্লাক, প্রভৃতি সহরের গণ্যমান্য লোক অভ্যাগতগণকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া, "সহরের পুস্তকে" তাঁহাদের হাতের সই লইলেন। প্রাচীন পদ্ধতির বিচিত্র গাউন্, এবং চেন, ও মেডেল—এখনও এই সমস্ত উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিতে হয়। আমাকে তাঁহারা 'কমিটি রুম,' 'কাউন্সিল্ রুম,' 'ডাইনিং হল' প্রভৃতি বিশেষ যত্ন করিয়া দেখাইলেন। ভূতপূর্ব্ব 'লর্ড প্রোভোষ্ট্', রাজারাণী ও অন্যান্য প্রাদেশিক বড় লোকের বিস্তর সুন্দর সুন্দর ছবি রহিয়াছে। অবশেষে, চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিবার জন্য সেই হর্ম্ম্যের চূড়ায় উঠা গেল। দুই শত ফীট্ ঊর্দ্ধ হইতে সহরের শোভা বড়ই সুন্দর দেখাইল। দূরে ছোট ছোট পাহাড়, নিকটে 'ডাউ' ও 'ডী' নদী; পার্শ্বে মহাকায় জর্ম্মণ বা উত্তর সাগর; ওদিকে আবার মার্শাল্ কলেজ, কিং'স্ কলেজ, কেথিড্রাল্, বাজার ইত্যাদি সব স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা গেল। এরূপ সুবিধায় সহর-দর্শন সর্ব্বদা ভাগ্যে ঘটে না। সূর্য্যালোক আজ দেখা দিয়াছে;·সেইজন্য আজ সকলেরই মুখ আনন্দে ভরা, আর সেইজন্য আজ চতুর্দ্দিকের দৃশ্যও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সেখান হইতে 'মারিচাল্' বা মার্শাল্ কলেজে গেলাম।—এই কলেজটি এবং কিং'স কলেজ লইয়াই এবাডিন ইউনিভার্সিটি; প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ্ এতদুভয় কলেজের কর্ত্তা এবং ইউনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলর্।

কলেজ বাড়ী গ্রানাইট্ পাথরের। আমাদের দেশের ধরণে প্রকাণ্ড উঠানও আছে। পূর্ব্বে সকল 'পব্‌লিক্ বিল্ডিং'এ'ই বড় বড় উঠান থাকিত। এখন জমির দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; সেইজন্য উঠান দেখিতে পাওয়া যায় না—কাজেই এখন নূতন ধরণের বাড়ী তৈয়ারী করিতে হইতেছে। কলেজের জন্য আরও জায়গা প্রয়োজন; কিন্তু চারিদিকেই ছোট ছোট বসত-বাড়ী। সেইজন্য কলেজ-বিস্তৃতির কাজ আমাদের দেশের মতই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, অথচ আমাদের দেশের মত নিন্দুকের মুখে অত কথা হয় না। নূতন একটা বাড়ী দূরে হইতেছে; সেখানে 'টেক্‌নিক্যাল্' বিভাগ ও অন্যান্য ক্লাস হইবে। আমরা একে একে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক ঘরগুলি দেখিয়া কোর্ট্ রুমে আসিলাম। কোর্ট্-রুমের সংলগ্ন-গৃহে অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ, এবং সেনেটের সদস্যবৃন্দ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। গাউন পরিয়া সেইখান হইতে 'কোর্ট্ রুমে' আমাদের ইউনিভার্সিটির কন্‌ভোকেশনের মত শোভা-যাত্রা করিয়া যাইতে হইল। প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়া কন্‌ভোকেশনের কার্য্য আরম্ভ ও শেষ হইল। সহরের গণ্যমান্য স্ত্রী-পুরুষ অনেকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সিরাজ সাহেবের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে, আচার্য্য স্মিথ্ বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কারণ, এই প্রবীণ দম্পতি ও তাঁহাদের পুত্র, আমার বন্ধু। তাঁহারা এই উপাধি-দান-সভায় আসিতে পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এদেশের ব্যাপার এই যে, তাঁহাদের মত লোকও এ সব স্থানে সহজে আসিতে পায় না। ভারত-বর্ষের একজন ইংরাজ এটর্নী ভারতবর্ষে বলিয়াছিলেন যে, 'তোমরা ইংলণ্ডে যাইয়া এমন সব স্থানে আদর পাইবে, যেখানে আমাদিগকে চাকরদের দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়।' এও তাই দেখিতেছি।

ল্যাটিন্ ভাষায় ডিগ্রী দেওয়া হইল। ভাইস্-চ্যান্সেলর্ তাঁহার টুপি মাথার উপর ধরিয়া, 'ফর্ম্মিউলা' উচ্চারণ করিলেন এবং একজন কর্ম্মচারী পশ্চাৎ হইতে হুড পরাইয়া দিলেন। ইউনিভার্সিটি হইতে সিল্কের হুড্ দান করে; গাউন নিজে করাইয়া লইতে হয়। আমাকে ডিগ্রী দিবার সময় জানি না কেন—সকলেই—আনন্দ-সূচক করতালিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এবং ভাইস্-চ্যান্সেলর্, সেনেটের সদস্যগণ এবং উপস্থিত বিস্তর ভদ্রলোক ও মহিলা কন্‌ভোকেশনের পর

আনন্দসহকারে আমার করমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। আজ সকলের আশীর্ব্বাদই গ্রহণীয়। আজ আমি—"ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী।"

ভাইস্ চ্যান্সেলারের অনুমতি লইয়া বাড়ীতে তারে শুভ সংবাদ দিলাম। লর্ড প্রোভোষ্ট্ মেট্‌লাণ্ড্ ও তাঁহার স্ত্রী, আমাকে কার্লটন্ হোটেলে জলযোগ করাইয়া, স্মিথ দম্পতীর সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া, আমার সামান্য মালপত্র নিজ হাতে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, আতিথ্যের চূড়ান্ত করিলেন। অবশেষে, বিদায়ের সময় আসিল—দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় লইলাম। এ কয়দিন স্মিথ-পরিবারের আন্তরিক যত্নে বড় সুখেই ছিলাম; সেইজন্য এবাডিন্ ছাড়িতে মনে যথার্থই বড় দুঃখ লইল—নূতন করিয়া যেন পুনরায় বাড়ী-ছাড়া হইলাম। আন্তরিক দয়া ও যত্ন, এই রূপেই মানুষকে বশ করে।

ঘরে আগুন

[প্রমথনাথ রায় চৌধুরী]

হো হো হো হো! চল, প্রিয়ে,
ঘরে আগুন্ দিয়ে পালাই—
সে আগুনে পুড়্‌বে দেশ
ফূর্ত্তি করে' দেখ্‌ব তাই!
বাস্তখানি বাঁধা দিয়ে
কসায়ের ছেলে কল্লে জামাই,
খালাস্—খালাস্—এবার খালাস—
মেয়ে হ'য়ে গেছে জবাই!
ওগো শোন, শাঁখ বাজাও ত—
জ্বল্‌ছে চিতা ধূধূ ওই;
প্রাণ ভরে' আজ দাও না উলু,—
কাঁদ্‌ছ কেন স্নেহময়ি?
কোথায় স্নেহ গেছে উড়ে
ওই শ্মশানের ধোঁয়া হ'য়ে,—
জানোয়ারের দলে চল
পালাই কাচ্চা-বাচ্চা ল'য়ে।

সমাজ-নাড়ীর রস টুক পিয়ে
হাসছেন—হোম্‌রা চোম্‌রা ওঁরা—
বল্‌ছেন, আমরাই দেশের মাথা—
চুলোয় যা না দুঃখী তোরা।
ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য গেছে—
মাথা বিক্রী ঋণের দায়ে,
একটি 'তত্ত্ব' হয় নি বলে'
মাথা খুঁড়লেম বে'য়ের পায়ে;
পণে গেছে যথা-সর্ব্ব
'তত্ত্বে' রক্ত উঠ্‌ল মুখে,
তবু মেয়ে চিতায় পোড়ে—
বাজ পড়ে না দেশের বুকে?
হো হো হো হো! চল প্রিয়ে,
ঘরে আগুন্ দিয়ে পালাই—
সে আগুনে পুড়্‌বে দেশ
ফূর্ত্তি করে' দেখ্‌ব তাই।

সীতারামের ক্রমবিকাশ।

[৩]

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, ভারতী, M. A., B. L.]

যে হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের বিশদ বর্ণনার জন্য বঙ্কিম এত ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সহিত আর একটি ঘটনাও ছিল। সে ঘটনাটিতে সীতারাম প্রথমে কিরূপে চাঁদসাহ ফকিরের সহিত পরিচিত হইলেন, তাহা বর্ণিত হয়। সাম্রাজ্য-স্থাপনের মূল ভিত্তি সর্ব্ব-প্রজার প্রতি—সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমদৃষ্টি। চাঁদসাহ সীতারামকে সেই উপদেশ দিলেন। চাঁদসাহের প্রার্থনায় হিন্দুসাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম শ্যামাপুর না হইয়া মহম্মদপুর হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সকল উপন্যাসেই এক অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষের অবতারণা করিয়াছেন। "সীতারামে" চন্দ্রচূড়কে সেরূপ মহাপুরুষের স্থানে বসাইতে পারি না, কিন্তু চাঁদসাহকে বঙ্কিম প্রথমে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে উক্ত আসন দেওয়া যাইতে পারে। চাঁদ-সাহ হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী, জ্ঞানী ও মানবচিত্ততত্ত্বজ্ঞ; রমাকে দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহার বড় ভয়; এই ভয়েই একদিন অনিষ্ট ঘটাইবে। বাস্তবিক এই ভয়েই পরে গঙ্গারামের সর্ব্বনাশ প্রভৃতি ঘটিয়াছিল।

আমরা এইখানে চাঁদসাহের পরিচয়জ্ঞাপক সেই পরিচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিব। তাহার আগে বলিয়া রাখি যে, বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের যে অতি উদার ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে তাহারই আভাস। সঙ্কীর্ণতা-পূর্ণ ভেদনীতিবহুল হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিতরূপ ইহাতে চাঁদ-সাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, উদার হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞাপক রহস্য ব্যঙ্গময় "গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি" এই সীতারামের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রচারে' প্রকাশিত হইতে থাকে।

এখন দেখা গেল যে, প্রথমে "মুসলমানের অত্যাচার বর্ণনা, পরে সেই অত্যাচার-নিবারণ-কল্পে সীতারামের উদ্যোগ, অত্যাচার-দমনের জন্য সীতারামের হিন্দু সাম্রাজ্য-স্থাপনাভিলাষ, চন্দ্রচূড়ের সহায়তায় ও শ্রীর উত্তেজনায় সেই অভিলাষের দৃঢ়তর ভাব "প্রচারে" প্রকাশিত "সীতারামের" বিশেষত্ব। পরে সেই হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপনের কাল নিকট-বর্ত্তী হইল; তখন সমদৃষ্টির উপদেশ দিতে চাঁদসাহ আসিলেন। নিম্নোদ্ধৃত পরিচ্ছেদটি এই হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপন-চেষ্টাবর্ণনার অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"শ্যামাপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সস্ত্রীক হইয়া চলিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির, নিকটস্থ এক জঙ্গলে ভূমিমধ্যে প্রোথিত ছিল; সীতারামের আজ্ঞাক্রমে ভূমিখননপূর্ব্বক, তাহার পুনর্বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রাচীন দেবদেবী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল; অদ্য প্রথম সীতারাম তদ্দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে শিবিকারোহণে নন্দা ও রমা চলিলেন।

"যে জঙ্গলের ভিতর মন্দির তাহার সীমাদেশে উপস্থিত হইয়া তিন জনেই শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, এবং একজন মাত্র পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া তিন জনে জঙ্গল মধ্যে পদব্রজে প্রবেশ করিলেন। কাননের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতিশয় শ্যামলোজ্জ্বল পত্ররাশি মধ্যে স্তবকে স্তবকে পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। শ্বেত হরিৎ কপিল পিঙ্গল রক্তনীল প্রভৃতি নানা বর্ণের ফুল স্তরে স্তরে ফুটিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। তন্মধ্যে নানা বর্ণের পাখীসকল বসিয়া নানা স্বরে কূজন করিতেছে।

"পথ অতি সঙ্কীর্ণ। গাছের ডাল পালা ঠেলিতে হয়, কখন কাঁটায় নন্দারমার আঁচল বাঁধিয়া যায়, কখন ফুলের গোছা তাহাদিগের মুখে ঠেকে, কখন ডাল নাড়া পেয়ে ভোমরা ডাল ছেড়ে তাহাদের মুখের কাছে উড়িয়া বেড়ায়,

কখন তাহাদের মলের শব্দে ত্রস্তা হইয়া চকিতা হরিণী শয়ন ত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করে। পাতা খসিয়া পড়ে, ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী উড়িয়া যায়, খরা দৌড়িয়া যায়। যথাকালে তাঁহারা মন্দির সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা পথপ্রদর্শককে বিদায় দিলেন।

"দেখিলেন, মন্দির ভূগর্ভস্থ, বাহির হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিবার সোপান প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং অন্ধকার নিবারণের জন্য দীপ জ্বলিতেছিল। তাহাও সীতারামের আজ্ঞাক্রমে হইয়াছিল।

"কিন্তু সীতারামের আজ্ঞাক্রমে সেখানে ভৃত্যবর্গ কেহই ছিল না, কেন না তিনি নির্জ্জনে ভার্য্যাদ্বয়ের সমভিব্যাহারে দেবদর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

"সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিনজনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তি সমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা তুমি?" মুসলমান বলিল, "আমি ফকির!"

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আঃ সর্ব্বনাশ!

ফকির। তুমি এত বড় জমিদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈকি? তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই; যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই, কেবল মুসলমান ইহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন? না আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য। তোমরা মাননা কেন?

ফকির। বাবা, ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

"একটী স্মৃতি-ব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিলে দিতে পারিত কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, এইরূপ আমাদের দেশাচার।

"ফকির বলিল, "বাবা শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু এত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না; তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করতে পারিবে না—তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই একজনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন, উভয়েই তাঁহার সন্তান, উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ; পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমানরাজ্য ছারেখার যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান রাজ্য যাইবে, তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন,

তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি।

যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময় আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতারামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে, সে আবার ফিরিয়া আসিল।

"সীতারাম তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী আরবী উত্তম জানে, তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে, এবং হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে যদিও তাহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা ও রমাও লজ্জা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

"বিদায় কালে সীতারাম বলিলেন, আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অতি ন্যায্য। আমি সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এ উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করাইয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকটে থাকিলে, আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

ফকির। তুমি একটি কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামাপুর নাম আছে, সেই নামই থাকিবে।

ফকির। যদি উহার মহম্মদপুর নাম দিতে স্বীকৃত হও তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হই।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির। তাহা হইলে আমি খাতির জমা থাকিব, যে তুমি হিন্দু মুসলমানে সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিল, "আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করিব না। কিন্তু তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।"

"গমনকালে ফকির তিনজনকে আশীর্ব্বাদ করিল। সীতারামকে বলিল, তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হউক। নন্দাকে বলিল, তুমি মহিষীর উপযুক্ত, মহিষীর ধর্ম্ম পালন করিও। তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রে স্বামীর প্রতি যেরূপ আচরণ করার হুকুম আছে, সেইরূপ করিও, তাহাতেই মঙ্গল হইবে। রমাকে ফকির বলিল, মা তোমাকে কিছু ভীরুস্বভাব বলিয়া বোধ হইতেছে। ফকিরের কথা মনে রাখিও, কোন বিপদে পড়িলে ভয় করিও না, ভয়ে বড় অমঙ্গল ঘটে। রাজার মহিষীকে ভয় করিতে নাই। তারপর তিন জনে গৃহে গমন করিলেন।"

"সীতারাম" নট-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তখন গিরিশচন্দ্র "প্রচারে" প্রকাশিত "সীতারাম"ই বহুস্থলে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালীমন্দিরে চন্দ্রচূড় ও শ্রীর অবস্থান, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরে চাঁদসাহের সহিত সীতারাম ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের সাক্ষাৎ প্রভৃতি নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সীতারামের রাজ্য-সংস্থাপনও নিম্নলিখিত গীতের অংশে বর্ণিত হইয়াছিল—

"জয় সীতারাম বল অবিরাম
হবে ভারতে হিন্দুর রাজধানী।"

কিন্তু সীতারামের হিন্দুসাম্রাজ্য-স্থাপন হইল না। রণদক্ষ মৃণ্ময় সেনাপতি থাকিতে, কৌশলী চন্দ্রচূড় উদ্যোগী থাকিতে, পরম বিচক্ষণ চাঁদসাহ পরামর্শদাতা থাকিতে, আদর্শ-বনিতা নন্দা থাকিতেও সীতারামের সাম্রাজ্য-স্থাপন হইল না! সব ডুবাইল—একা শ্রী; শ্রীর জন্য সীতারামের ধীরে ধীরে অধঃপতন আরম্ভ হইল। 'প্রচারে' প্রকাশিত "সীতারামে" সীতারামের আশাধ্বংস এইরূপে চিত্রিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"সীতারামের হিন্দু-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা হইল না; কেন না, তাহাতে তাঁহার আর মন নাই। মনের সমস্তভাগ

হিন্দু-সাম্রাজ্য যদি অধিকার কারত, তবে সীতারাম তাহা পারিতেন। কিন্তু শ্রী, প্রথমে হৃদয়ের তিল-পরিমাণ অংশ অধিকার করিয়া, এখন হৃদয়ের প্রায় সমস্তভাগই ব্যাপ্ত করিয়াছে। শ্রী যদি নিকটে থাকিত, অন্তঃপুরে রাজমহিষী হইয়া বাস করিত, রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত,—তবে প্রেয়সী মহিষীর যে স্থান প্রাপ্য, সীতারামের হৃদয়ে তাহার বেশী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু শ্রীর অদর্শনে বিপরীত ফল হইল। বিশেষ শ্রী, পরিত্যক্তা, উদাসিনী।—বোধ হয় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেছে, নয় ত কষ্টে মরিয়া গিয়াছে, এইসকল চিন্তায় সে হৃদয়ে শ্রীর প্রাপ্য স্থান বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে, তিল তিল করিয়া, শ্রী সীতারামের হৃদয় অধিকৃত করিল। হিন্দু-সাম্রাজ্যের আর সেখানে স্থান নাই; সুতরাং হিন্দু-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বড় গোলযোগ। শ্রীর অভাবে, সীতারামের মনে আর সুখ নাই, রাজ্যে সুখ নাই, হিন্দু-সাম্রাজ্য সংস্থাপনেও আর সুখ নাই। কাজেই আর হিন্দু সাম্রাজ্য-সংস্থাপন হয় না।

"সীতারাম শ্রীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু শ্রীকে পাওয়া গেল না।

"তখন সীতারাম হিন্দু-সাম্রাজ্যে জলাঞ্জলি দেওয়া স্থির করিলেন। একবার নিজে তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে শ্রীর সন্ধান করিবেন—যদি শ্রীকে পান, ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিবেন; না পান, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। সীতারাম বিবেচনা করিলেন, যে 'রাজধর্ম্ম আমি রীতিমত পালন করিতে, চিত্তের অস্থৈর্য্যবশতঃ সক্ষম হইয়া উঠিতেছি না,—তাহাতে আর লিপ্ত থাকা লোকের পীড়ন মাত্র। নন্দার গর্ভজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নন্দা ও চন্দ্রচূড়ের হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া, আমি স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিব।'

"এ সকল কথা সীতারাম আপন মনেই রাখিলেন; মনের ভাব কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীর যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাও অতিশয় গোপনে এবং অপ্রকাশিত ভাবে। যাহারা শ্রীর সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই যে শ্রীকে তাঁহার আজিও মনে আছে।

"কেহ কিছু জানুক না পারুক,—তাঁহার মনের যে ভাবান্তর হইয়াছে, তাহা নন্দা ও রমা উভয়েই জানিতে পারিয়াছিল। নন্দা ভাব বুঝিয়া, কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মতঃ মহিষী-ধর্ম্ম পালন করিয়া, সীতারামের প্রফুল্লতা জন্মাইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময় সফল হইত। কিন্তু রমা সকল সময়েই স্বামীর অনাস্থা ও অন্যমন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিমর্ষ থাকিত; সীতারামের তাহা বিশেষ অপ্রীতিকর হইত। রমা ভাবিত—'আর আমাকে ভালবাসেন না কেন?' নন্দা ভাবিত, 'তিনি ভাল বাসুন, না বাসুন, ঠাকুর করুন আমার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাহা হইলেই আমার সুখ।' * * * *

"সময়টা বড় অসময়। মহম্মদপুরে সীতারামের অধিকার নির্ব্বিঘ্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে। তোরাব খাঁ রুষ্ট হইয়াও কোন বিরোধ উপস্থিত করে নাই। তাহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তখন বাঙ্গালার সুবেদার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বংশজ পাপিষ্ঠ মুসলমান মুরশিদ কুলি খাঁ। তখনও বাঙ্গালা দিল্লীর অধীন। তোরাব খাঁ দিল্লীর প্রেরিত লোক, সেইখানে তাঁর মুরব্বীর জোর।

"সুবেদারের সঙ্গে তাঁহার বড় বনিবনাও ছিল না। এখন তিনি যদি ছলেবলে, সীতারামকে ধ্বংস করেন, তবে সুবেদার কি বলিবেন! সুবেদার বলিতে পারেন, 'এ বেচারা নিরপরাধ, বিনা ওজর-আপত্তি কিস্তি কিস্তি খাজনা দাখিল করে, বকেয়া-বাকির ঝঞ্ঝাট রাখে না—ইহার উপর অত্যাচার কেন?' তখন মুরশিদ কুলি খাঁ তাঁহাকে লইয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন। তাই, সুবেদারের অভিপ্রায় জানিবার জন্য, তোরাব খাঁ তাঁহার নিকট সীতারামের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ অতি শঠ।—তিনি বিবেচনা করিলেন, যে এই উপলক্ষে তোরাব খাঁকে পদচ্যুত করিবেন।

"যদি তোরাব সীতারামকে দমন করেন, তাহা হইলে মুরশিদ বলিবেন, 'নিরপরাধকে নষ্ট করিলে কেন?' যদি তোরাব তাহাকে দমন না করেন, তবে বলিবেন 'বিদ্রোহী কাফেরকে দণ্ডিত করিলে না কেন?' অতএব, তোরাব যাহা হয় একটা করুক;—তিনি কোন উত্তর দিবেন না। মুরশিদ কুলি কোন উত্তর দিলেন না, তোরাবও কিছু করিলেন না।

"কিন্তু বড় বেশী দিন এমন সুখে গেল না। কেন না, হিন্দুর হিন্দুয়ানী বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। শেষে, তোরাব খাঁ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন, সীতারাম চন্দ্রচূড়কে জানাইলেন—তিনি দিল্লী যাইবেন।

"অসময় হইলেও, তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, যুদ্ধে জয়-পরাজয় ঈশ্বরের হাত। প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিলে, ফৌজদারকে পরাজয় করিতে পারিবেন,—ইহা না হয় ধরিয়া লইলাম। কিন্তু ফৌজদারকে পরাজয় করিলেই কি লেঠা মিটিল! ফৌজদার পরাভূত হইলে—সুবাদার আছে, সুবাদার পরাভূত হইলে—দিল্লীর বাদশাহ আছে। অতএব, যুদ্ধটা বাধাই ভাল নহে। এমন কোন ভরসা নাই, যে আমরা মুরশিদাবাদের নবাব বা দিল্লীর বাদশাহকে পরাভূত করিতে পারিব।

"অতএব, দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ ইহার ব্যবস্থা। যদি দিল্লীর বাদশাহ আপনাকে এই পরগণার রাজ্য প্রদান করেন, ফৌজদার কি সুবেদার কেহই আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবে না। হিন্দুরাজ্য স্থাপন, একদিন, বা একপুরুষের, কাজ নহে। মোগলের রাজ্য একদিনে, বা একপুরুষে, স্থাপিত হয় নাই। এই পত্তনে মাত্র, বাঙ্গালার সুবেদার বা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ হইলে, সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব, এখন অতি সাবধানে চলিতে হইবে। দিল্লীর সনন্দ ব্যতীত ইহার আর উপায় দেখি না; তুমি আজি দিল্লী যাত্রা কর। সেখানে কিছু খরচপত্র করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, কেন না এখন দিল্লীর আমীর-ওমরাহ কি বাদশাহ স্বয়ং, কিনিবার-বেচিবার সামগ্রী। তোমার মত চতুর লোক, অনায়াসে একাজ সিদ্ধ করিতে পারিবে। যদিই ইতিমধ্যে মুসলমান মহম্মদপুর আক্রমণ করে, তবে মৃণ্ময় রক্ষা করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। মৃণ্ময় যুদ্ধে অতিশয় দক্ষ, এবং সাহসী, আর কেবল তাহার বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে তোমাকে বলি না; আমার এমন ভরসা আছে যে, যতদিন না তুমি ফিরিয়া আস, ততদিন আমি ফৌজদারকে স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে পারিব। তুমি, দুই-চারি মাসের জন্য, আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।

"আমি অনেক কল-কৌশল জানি * * *

"ইহার পর, সীতারাম দিল্লী যাত্রা করিলেন। নামে দিল্লী যাত্রা; কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহা সীতারাম ভিন্ন আর কেহই জানিত না।"

"সীতারাম" উপন্যাসের সর্ব্বপ্রধান পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইল। এক্ষণে আর দুইটি কথা বলিতে হইবে। প্রথম জয়ন্তীর কথা; দ্বিতীয় গঙ্গারামের কথা। জয়ন্তী-চরিত্রের সকল কথা আমরা জানি না। জয়ন্তীর পূর্ব্ব-জীবনের কিছুমাত্র আভাস বঙ্কিম দেন নাই। 'প্রচারে' প্রকাশিত সীতারামেও তাহা নাই। তবে, প্রথমে গঙ্গাধর স্বামী ও জয়ন্তীর কথোপকথন একটু বিশদভাবে ছিল। তাহা হইতে জয়ন্তী-চরিত্রের আর কিছু জানিতে পারা যাক্ আর না যাক্, সে যে গঙ্গাধর স্বামীর উপদেশে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বঙ্কিম "সীতারাম" উপন্যাসে কর্ম্মের তিন প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন। প্রথম দুষ্কর্ম্ম। দ্বিতীয় অকর্ম্ম। তৃতীয় নিষ্কাম কর্ম্ম। সীতারামের জয়ন্তীর প্রতি অত্যাচার, শেষাবস্থায় প্রজাপীড়ন, অত্যাচার প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের উদাহরণ; শ্রীর নিশ্চেষ্টতা অকর্ম্মের দৃষ্টান্ত। শ্রী ইচ্ছা করিলে সবই হইতে পারিত। সীতারাম প্রকৃতিস্থ থাকিতেন। রাজ্যও অটুট থাকিত। আর জয়ন্তীর কার্য্য নিষ্কাম কর্ম্মের উদাহরণ। এই নিষ্কাম কর্ম্ম বঙ্কিম বিবিধ-ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিম, "সীতারাম" গ্রন্থশেষে নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পরে, তিনি এ পংক্তিগুলি পরিবর্জ্জন করেন। কিন্তু এ পংক্তিগুলিতে সীতারামের স্থূল মর্ম্ম অতি সহজেই পাঠকের মনে জাগিয়া উঠা সম্ভব।

"সর্ব্ব ফলদাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, পাঠকেরা সীতারামের দুষ্কর্ম্ম এবং শ্রীর অকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্ম্মানুকারী হউন।"

এই নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা, জয়ন্তী গঙ্গাধর স্বামীর নিকট পাইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত, অধুনা পরিবর্জ্জিত, অংশ-টুকু পাঠ করিলে বোধ হয়—জয়ন্তী যখন গঙ্গাধর স্বামীর কাছে গিয়াছিল, তখনও পর্য্যন্ত তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু "সীতারাম" গ্রন্থে জয়ন্তীর যে উচ্চস্থান, তাহাতে অপূর্ণ-শিক্ষা লইয়া জয়ন্তীর আবির্ভাব বাঞ্ছনীয়

নহে। তাই, বঙ্কিম, পরে এটুকু একেবারে পরিত্যাগ করেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর সঙ্গে তখন কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে ভৈরবীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বৎসে! তোমার মঙ্গল? তোমার ব্রত সাঙ্গ হইয়াছে?"

ভৈরবী। এ জন্মে হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বামী। পাপ!

ভৈরবী চুপ করিয়া মুখ নত করিল।

স্বামী। এক্ষণে কি করিবে?

ভৈরবী। যাহা করিতেছি, তাহাই করিব। আমার কোন দুঃখ নাই। যদিই থাকে, তবে একটা দুঃখের ভার মরণ পর্য্যন্ত বহা যায় না?

স্বামী। একটা কেন, সহস্র দুঃখভার বহন করা যায়। যাহার সহস্র দুঃখ, সে সহস্র দুঃখেরই ভার মৃত্যু পর্য্যন্ত বহন করে। গর্দ্দভের পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিলে, সে কি ফেলিয়া দেয়? যাহারা বহন করে, তাহারা মনুষ্য-বেশে গর্দ্দভ। যে দুঃখ মোচন করে, সেই মানুষ। তুমি আপনার দুঃখ মোচন করিতেছ না, কেন?

ভৈরবী। তাহার উপায় জানি না। স্ত্রীলোক বলিয়া, আপনি যোগাভ্যাস নিষেধ করিয়াছেন।

স্বামী। যোগ কি? জ্ঞানই যোগ। জ্ঞানে কে অনধিকারী? বেদে ভিন্ন কি জ্ঞান নাই? জ্ঞানই আনন্দ। তোমার ত জ্ঞানের অভাব নাই। দুঃখ কেন?

ভৈরবী। আমি উপদেশ লইয়াছি; কিন্তু আমার শিক্ষা হয় নাই।

স্বামী। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান নাই।

ভৈরবী। আমার কর্ম্ম হয় নাই।

স্বামী। এখন কোথা যাইতেছ?

ভৈরবী। পুরুষোত্তম দর্শনে।

স্বামী। কেন?

ভৈরবী। আর কোন কাজ নাই।

স্বামী। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর না কেন? তীর্থ-দর্শন ত সকাম কর্ম্ম।

ভৈরবী। আমার ইহাতে কোন কামনা নাই। কেবল তাড়িত হইয়া ফিরিতেছি।

স্বামী। ভাল, দর্শন করিয়া ফিরিয়া আইস। আমি তোমাকে উপযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া দিব।"

শেষ-পরিবর্ত্তন গঙ্গারামের চরিত্র। এখন গঙ্গারামকে আমরা প্রভু-দ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতকরূপে দেখি বটে; কিন্তু প্রথমে তাহার চিত্র আরও কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল। এখনকার গঙ্গারাম বিবাহিত কি না, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তাই তাহার, রমার প্রেমে পড়া, ঘৃণিত হইলেও আমরা ইহা তাহার জীবনে প্রথম অনুরাগ-সঞ্চার ভাবি। কিন্তু পূর্ব্বে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—

"গঙ্গারামের প্রথম স্ত্রী গত হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সে পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা, এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছিল। প্রথম পত্নীর গর্ভজাত গঙ্গারামের কোনও সন্তানাদি ছিল না।"

এইটুকু পড়িয়া, আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাই। স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে, গঙ্গারামের রমার প্রতি অনুরাগ তাহাকে নীচতার আর একস্তরে নামাইয়া দেয়।

শুধু তাই নয়, আগে বঙ্কিম গঙ্গারামকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সে রমার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইতে চাহিয়াছিল! এই ধর্ম্ম-বিসর্জ্জনের ইচ্ছারূপ নীচতা, তাহার চরিত্রে আর একটি অতিরিক্ত দুরপনেয় কলঙ্ক ছিল। গঙ্গারামের, রমাকে পাইবার জন্য পাপ-সঙ্কল্প, তাহার ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ ও রমাকে প্রার্থনা, হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইবার বাসনা-প্রকাশ, নগর আক্রান্ত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা, প্রভৃতি বঙ্কিম প্রথমে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। পরে, এগুলি পরিবর্জ্জন করিয়া, গঙ্গারাম-চরিত্র অনেকটা ভাল করেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণী চরিত্র, 'রজনী'তে অমরনাথের চরিত্র, প্রভৃতি এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে। নিম্নোদ্ধৃত, 'প্রচারে' প্রকাশিত, "সীতারামে"র তুলনা করিলে পাঠক বুঝিবেন, বঙ্কিম কিরূপ কৌশলে গঙ্গারামের চরিত্র-পট হইতে কিয়দংশ কালিমা অপসারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

রমা বাঁচিয়া গেল; কিন্তু গঙ্গারাম বাঁচিল না। তখন

গঙ্গারাম শয্যা লইল। রাজকার্য্য সকল বন্ধ করিল। সেও রমার মত স্থির করিল, বিষ খাইয়া মরিবে। কিন্তু রমাও বিষ খায় নাই, গঙ্গারামও বিষ খাইল না।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর জানিতে পারিলেন,—নগর রক্ষার কাজ, এ দুঃসময়ে, ভাল হইতেছে না, নগর-রক্ষক আদৌ দেখেন না। শুনিলেন, নগররক্ষক পীড়িত, শয্যাগত। তিনি নগররক্ষককে দেখিতে গেলেন। গঙ্গারাম বলিল, "দশ পাঁচ দিন আমায় অবসর দিন। আমার শরীর ভাল নহে, আমি এখন পারিব না।"

চন্দ্রচূড়। শরীর ত উত্তম দেখিতেছি। বোধ হয় মন ভাল নহে। সেইরূপই দেখিতেছি।

গঙ্গারাম বিছানায় পড়িয়া রহিল। বিছানায় পড়িয়া অন্তর্দ্দাহ আরও বাড়িল—নিষ্কর্ম্মারই বড় অন্তর্দ্দাহ। কাজ-কর্ম্মই অন্তরের রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া শেষ গঙ্গারাম যাহা ভাবিয়া স্থির করিল, তাহা এই,—"ধর্ম্মে হোক, অধর্ম্মে হোক, আমার রমাকে পাইতে হইবে। নাহলে মরিতে হইবে। তা মরি তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু রমাকে না পাইয়া মরাও কষ্ট। কাজেই মরা হইবে না, রমাকে পাইতে হইবে। ধর্ম্মপথে পাইবার উপায় নাই, কাজেই অধর্ম্ম পথে পাইতে হইবে। ধর্ম্ম যে পারে সে করুক; যে পারিল না, সে কি প্রকারে করিবে?"

গঙ্গারামের যে স্থূলভুল হইল, অধার্ম্মিক লোক মাত্রেরই সেইটি ঘটিয়া থাকে। তাহারা মনে করে,—ধর্ম্মাচরণ পারিয়া উঠিলাম না, তাই অধর্ম্ম করিতেছি। তাহা নহে; যে চেষ্টা করে, সেই ধর্ম্ম করিতে পারে; অধার্ম্মিকেরা চেষ্টা করে না, কাজেই পারে না।

গঙ্গারাম তার পর ভাবিয়া ঠিক করিতে লাগিল—অধর্ম্মের পথে যাইতে হইবে, কিন্তু তাই বা পথ কই? রমাকে হস্তগত করা কঠিন নহে। আমি যদি আজ বলিয়া পাঠাই, যে কাল মুসলমান আসিবে, আজ বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে এখনই চলিয়া আসিতে পারে। তারপর যেখানে লইয়া যাইব, কাজেই সেই খানে যাইতে হইবে। কিন্তু নিয়া যাই কোথায়?—সীতারামের এলাকায় একদিনও কাটিবে না। সীতারাম ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা সহিবে না। এখনই চন্দ্রচূড় আমার মাথা কাটিতে হুকুম দিবে, আর মেনা হাতী আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কাজেই, সীতারামের এলাকার বাহিরে, যেখানে সীতারাম নাগাল না পায়, সেইখানে, যাইতে হইবে। সে সবই মুসলমানের এলাকা। মুসলমানের ত আমি ফেরারি আসামী; যেখানে যাইব, সংবাদ পাইলে, আমাকে সেই খান হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া, শূলে দিবে। ইহার কেবল এক উপায় আছে;—যদি তোরাব খাঁর সঙ্গে ভাব করিতে পারি। তোরাব খাঁ অনুগ্রহ করিলে, জীবনও পাইব, রমাও পাইব;—ইহার উপায় আছে।

গঙ্গারাম এই ভাবিয়া বন্দে আলিকে ভূষণায় পাঠাইল। ফৌজদারীতে তার চেনা লোক ছিল। ফৌজদারী-সরকারে, কারকুণ-দপ্তরের বখশী, চেরাগ আলির সঙ্গে তাহার দোস্তী ছিল। বন্দে আলি চেরাগ আলিকে ধরিল যে, ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দাও, আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে। বখশী গিয়া কারকুণকে ধরিল, কারকুণ পেস্কারকে ধরিল, পেস্কার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল।

বন্দে আলি সব বন্দোবস্ত করিয়া আসিলে, গঙ্গারাম গিয়া ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। ফৌজদার বলিল, "কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত?"

গঙ্গা। নলদী পরগণা আমাকে দিবেন।

ফৌজদার। মহম্মদপুর আর হিন্দুর হাতে রাখিব না। কিন্তু তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে এখানে শিপাইশালার কর্ত্তা করিতে পারি। আর, টাকা ও গ্রাম দিতে পারি।

গঙ্গারাম। তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর এক ভিক্ষা আছে। সীতারামের দুই মহিষী আছে।

ফৌজ। তাহারা নবাবের জন্য। তাহাদের পাইবে না।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠাকে মুরশিদাবাদে পাঠাইবেন। কনিষ্ঠাকে নফরকে বখশিস করিবেন।

ফৌজদার তামাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি সীতারামের স্ত্রী নিয়া কি করিবে? সীতারাম যেন মরিল, কিন্তু তবু ত হিন্দুর সমাজে বিধবার বিবাহ নাই। যদি মুসলমান হইতে, তবে বুঝিতাম যে তুমি রাণীকে নিকা করিতে পারিতে।"

গঙ্গারাম ভাবিল, এ পরামর্শ মন্দ নহে। যদি নিজে মুসলমান হইয়া, রমাকে ফৌজদারের সাহায্যে মুসলমান

করিয়া, নিকা করিতে পারে,—তবে সীতারাম জীবিত থাকিলে, আর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না; গঙ্গারাম নির্ব্বিঘ্নে রমাকে ভোগ দখল করিতে পারিবে। অতএব ফৌজদারকে বলিল,

"মুসলমান ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম; এইরূপ আমি ক্রমে বুঝিতেছি। মুসলমান হইব, এখন আমি স্থির করিয়াছি। কিন্তু রমাকে না পাইলে মুসলমান হইব না।"

"ফৌজদার হাসিয়া বলিলেন, "রমা কে? সীতারামের কনিষ্ঠা ভার্য্যা? সে নহিলে যদি তোমার পরলোকের গতি না হয়, তবে অবশ্য তুমি যাহাতে তাহাকে পাও, তাহা আমি করিব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু আর একটা কথা, সীতারামের অনেক ধনদৌলত পোতা আছে না?"

গঙ্গা। শুনিয়াছি আছে।

তোরাব খাঁ। তাহা তুমি দেখাইয়া দিবে?

গঙ্গা। কোথায় আছে, তাহা আমি জানি না।

তোরাব খাঁ। সন্ধান করিতে পারিবে?

গঙ্গা। এখন করিতে গেলে লোকে আমায় সন্দেহ করিবে।

তোরাব খাঁ আর কিছু বলিলেন না।

... ...

"চাঁদসাহ ফকির পরদিন নিভৃতে চন্দ্রচূড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আহ্লাদের সংবাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছি। ইস্‌লামের জয় হইবে।" চন্দ্রচূড় জানিতেন, চাঁদসাহের কাছে হিন্দু মুসলমান এক—সে কোন পক্ষে নহে—ধর্ম্মের পক্ষ এবং সীতারামের পক্ষ। অতএব এ কথার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

চাঁদসাহ। হিন্দুরাও ইসলামের পক্ষ।

চন্দ্রচূড়। কোন কোন হিন্দু বটে।

চাঁদ। আপনারাও।

চন্দ্র। সে কি?

চাঁদ। মনে করুন, নগরপাল গঙ্গারাম রায়।

চন্দ্র। গঙ্গারাম খাঁটি হিন্দু—রাজার বড় বিশ্বাসী।

চাঁদ। তাই কাল রাত্রে ভূষণায় গিয়া তোরাব খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

চন্দ্র। অ্যাঁ? না মিছে কথা।

চাঁদ। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই বলিয়া চাঁদসাহ সেখান হইতে চলিয়া গেল। চন্দ্রচূড় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার তেজস্বিনী বুদ্ধি যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"কালে বুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রচূড় ভাবিতে লাগিলেন, ইহার বিহিত কি কর্ত্তব্য? এখন গঙ্গারামকে পদচ্যুত করিয়া আবদ্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই! কিন্তু তাহাকে পদচ্যুত বা কারাবদ্ধ করিব কি প্রকারে? সে যদি না মানে? নগর-সিপাহী সবইত তার হাতে। সে আমারে উল্‌টিয়া কারারুদ্ধ করিতে পারে। মৃণ্ময়ের সাহায্য ভিন্ন তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিব না—কিন্তু যদি গঙ্গারাম অবিশ্বাসী, তবে মৃণ্ময়কেই বা বিশ্বাস কি? তবে সাবধানের মার নাই—সতর্ক থাকাই ভাল। বিপদ ঘটে, তখন নারায়ণ সহায় হইবেন। এখন প্রথমতঃ গঙ্গারামের মন বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া চন্দ্রচূড় এখন আর কাহার সাক্ষাতে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। পরে গুপ্তচর সংবাদ দিল, ফৌজদারী-সৈন্য আসিতেছে।

"চন্দ্রচূড় বলিলেন, "আমার বিবেচনায়, গঙ্গারামও দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়া মৃণ্ময়ের সাহায্যার্থ যাওয়া ভাল।"

গঙ্গারাম চুপ করিয়া রহিল—দেখিতেছিল মৃণ্ময় কি বলে।

"মৃণ্ময়ের একটু রাগ হইয়াছে,—আমি কি একা লড়াই করিতে পারিব না যে, আমার সঙ্গে আবার গঙ্গারাম! অতএব মৃণ্ময় রুষ্টভাবে বলিল, তা চলুন না—বেশ ত!

গঙ্গারাম তখন বলিল, "আমি যাব ত নগর রক্ষা করিবে কে?"

চন্দ্র। মৃণ্ময় না হয় সেজন্য একজন ভাল লোক রাখিয়া যাইবেন।

গঙ্গারাম। নগর রক্ষার জন্য রাজার কাছে জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। অতএব আমি নগর ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

চন্দ্র। আমি নগর রক্ষা করিব।

গঙ্গা। করিবেন। কিন্তু আমার উপর যে কাজের ভার আছে তাহা আমি করিব।

তখন চন্দ্রচূড় মনে মনে বড় সন্দিগ্ধ হইলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "যাহা তোমরা ভাল বুঝ তাই করিও।"

শেষ কথা—মুরলার রসিকতা পরবর্ত্তী সংস্করণে বঙ্কিম অনেকটা সংযত করিয়াছেন। আগে মুরলার রসিকতা কিরূপ ছিল, তাহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি। পাঠক ইহা পাঠ করিয়াই বুঝিবেন, এগুলি পরিবর্জ্জন করা কত বাঞ্ছনীয়।

"আমি জেতে কৈবর্ত্ত। বিবাহ আড়াইটা হইয়াছে, তাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমারও সাড়ে তিনটায় আপত্তি নাই।"

"অনেকেই মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আমি' আড়াইটার উপর তিনটা হয় না ?'

মুরলারও লজ্জা নাই। সে উত্তর দিল ; 'হয়—তোর রাধাকে ডেকে আন্‌গে যা'।

যে বঙ্কিম বঙ্গভাষায় অশ্লীলতাপূর্ণ হাস্যরস দূর করিয়া সংযত নির্ম্মল হাস্য-প্রবাহ ছুটাইয়াছেন, উপরে উদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাঁহার যোগ্য নহে। বঙ্কিম নব্য লেখকদের উপদেশ দিয়াছিলেন—"অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না।" পূর্ব্বোদ্ধৃত রসিকতা, রসিকতা হিসাবে জঘন্য, রুচি হিসাবেও নিন্দনীয়,—তাই উহার পরিবর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে সমীচীন হইয়াছে।

"সীতারামে"র ক্রমবিকাশের ইতিহাস এইখানে শেষ হইল। আমরা দেখিলাম, "সীতারাম" গ্রন্থখানি পরিবর্ত্তিত আকারে কত ছোট হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল। ক্ষুদ্র হউক, এই পরিবর্ত্তনে শ্রীচরিত্রের দোষ-পরিহার গঙ্গারামচরিত্রের কিঞ্চিৎ দোষক্ষালন ও সীতারাম-চরিত্রের সামঞ্জস্যবিধান করা হইয়াছে।" অবান্তর ঘটনা সকল পরিহার করায় "সীতারাম" সুসংবদ্ধ, সুন্দর, দোষরহিত ও মনোমদ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আশা করি, এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাস, বাঙ্গালার নবীন লেখক-দিগকে নিজ রচনা সাবধানে সংস্কার করিতে উৎসাহিত করিবে।

বিনয়

[শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী]

জনম লভেছ মাটিতে—
মাটিতে মিলিবে ফিরে,
উঠিতে বসিতে হাঁটিতে
মাটি হ'তে দোষ কি রে ?

জ্ঞান

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী]

সুখেরে খুঁজিয়া কভু লভি নাই সুখ,—
দুঃখ বিঁধিয়াছে লক্ষশরা।
প্রেমেরে বরিতে যবে পাতিলাম বুক,
আনন্দে ভরিল বসুন্ধরা !

আয়ুর্ব্বেদোক্ত অস্ত্র-চিকিৎসা

[শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, M.A., F.C.S.]

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্তগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত অস্ত্র-চিকিৎসা ও তৎপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির চিত্রসম্বলিত একখানি অতি মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন।* এই পুস্তকখানি ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের প্রভূত গবেষণা, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পরিচায়ক। এতদিন ভারতের প্রাচীন মহত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিবিধ শাস্ত্রের পরিচয় পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রকাশিত করিবার ভার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের উপর ন্যস্ত ছিল। সুখের বিষয়, এই ভার ক্রমশঃ ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রহণ করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এইরূপে যেমন একদিকে ডাক্তার ওয়াইজ, রয়েল, হর্ণেল, জলী, কর্ডিয়ার, ওসানৌসি প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রভূত গবেষণা করিয়াছেন, সেইরূপ অন্যদিকে স্বর্গীয় ডাক্তার উদয় চাঁদ দত্ত, গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব, ডাক্তার রায় প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদের বিবিধ বিভাগ হইতে অনেক নূতন তথ্য ও ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় উন্নত অস্ত্র-চিকিৎসার পরিচয়-প্রদানপূর্ব্বক ভারতের অতীত গৌরবের এক অধ্যায় জগতের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।
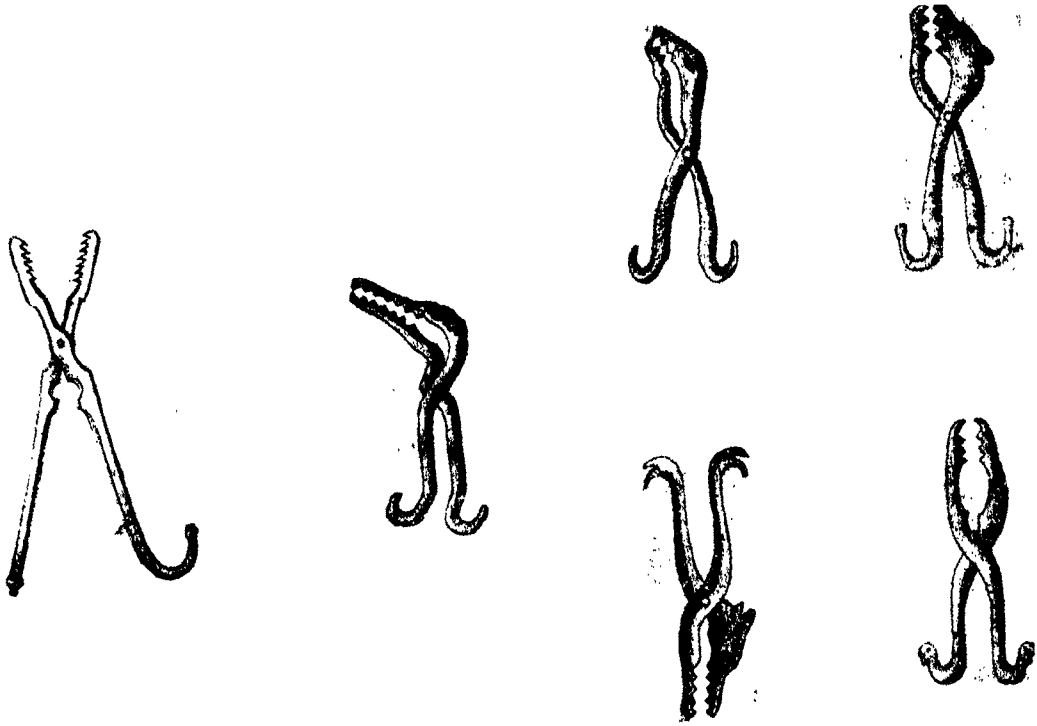
১। গ্রীকদিগের ব্যবহৃত হাড় বাহির করিবার যন্ত্র, ২। মকর মুখ, ৩। হরিণ মুখ, ৪। মার্জ্জার মুখ, ৫। শৃগাল মুখ, ৬। ঋক্ষ মুখ,

*"THE SURGICAL INSTRUMENTS OF THE HINDUS" by Girindra Nath Mukhopadhyaya, B.A ; M.D.(Griffith-Memorial Prize Essay for 1909 ; 2 Vo's ; published by the Calcutta University, pp. 444, with 82 plates)

আয়ুর্ব্বেদ হইতে অস্ত্র-চিকিৎসা বহুকাল বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তবিক সুশ্রুতের কাল হইতে বাগভটের সময় পর্য্যন্ত অস্ত্র-চিকিৎসা ভারতে সজীব ছিল। বাগভটের পর হইতে উহা ক্রমশঃ ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গিরীন্দ্র বাবুর পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে অঙ্কিত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রশস্ত্রের চিত্রগুলি দেখিয়া অনেকে এখন হয়ত বিশ্বাসই করিবেন না, যে এইগুলি প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল।

অস্ত্র-চিকিৎসার উৎপত্তি

আয়ুর্ব্বেদোক্ত অস্ত্র-চিকিৎসার উৎপত্তি বিষয়ে ডাক্তার মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেন নাই। শারীর-বিদ্যা (Anatomy) ও অস্ত্র-চিকিৎসার উৎপত্তি-স্থল সামবেদ। কায়-চিকিৎসার উৎপত্তি অবশ্য অথর্ব্ব-বেদে। অথর্ব্ববেদ যে ভারতের কায়-চিকিৎসার আদি গ্রন্থ, তাহা অথর্ব্ববেদোক্ত "আয়ুষ্যানি" ও "ভৈষজ্যানি" মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।* অপর দিকে বৈদিক সাহিত্যে যে শারীর-বিদ্যা ও শল্যবিদ্যার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন।† বৈদিক যজ্ঞে নিহত পশুর বিবিধ ছেদিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর-বিদ্যার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। আশা করি, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া, সামবেদ ও বৈদিক সংহিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

তারপর বৈদিক কালের পর হইতে সুশ্রুতের কাল পর্য্যন্ত অস্ত্র-চিকিৎসা-বিষয়ক বহু উন্নতি সাধিত হইয়া থাকিবে; কারণ সুশ্রুতে আমরা যে অতি উন্নত অস্ত্র-চিকিৎসার পরিচয় পাই, তাহা একদিনে সম্ভবপর হয় নাই। এই মধ্যবর্ত্তী সময়কার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। শুধু এই জানা যায় যে, স্বর্গ বৈদ্য ধন্বন্তরির অবতার কাশীরাজ দিবোদাস অস্ত্র-চিকিৎসার প্রবর্ত্তক। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য ছিল;—সুশ্রুত, ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য ও গালব। ইহাদের মধ্যে ঔপধেনব, ঔরভ্র, সুশ্রুত এবং পৌষ্কলাবত কর্ত্তৃক রচিত শল্যতন্ত্রের বিষয় সুশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল শল্যতন্ত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাঁহারা সুশ্রুতের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, কি সুশ্রুতের আগে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এটা ঠিক যে, বৈদিক যুগের পরে ও সুশ্রুতের আগে বহু অস্ত্র-চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

সরাব-সম্পুট

চরক, সুশ্রুত ও বাগভটের কাল *

ভারতে সুশ্রুতই অস্ত্র-চিকিৎসার আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।* বাগভট সুশ্রুতের অস্ত্র-চিকিৎসার সারসঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে কয়েকটি নূতন অস্ত্রেরও সমাবেশ দেখা যায়। ভারতীয় অস্ত্র-চিকিৎসায় পাঠকের সুশ্রুত ও বাগভটই অবলম্বন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় এই দুই গ্রন্থ ও তাহাদের টীকা অবলম্বনেই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে, সুশ্রুত ও বাগভটের গ্রন্থ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। হর্ণেল সাহেব সুশ্রুতকে বৈদিক যুগে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু শুধু নাম দেখিয়া সুশ্রুতকে অথর্ব্ববেদের আগে স্থান-দান করা সম্পূর্ণ অনুচিত। বৈদিকযুগে সুশ্রুত বা চরক গ্রন্থ রচিত হওয়া যে আদৌ সম্ভবপর নহে, তাহা শেষ বেদ অথর্ব্ববেদ (১০০০ খৃঃ পূঃ) পাঠেই জানা যায়। অথর্ব্ব-বেদে মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা যেরূপ রোগ আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা

* সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় "আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি" শীর্ষক মদীয় প্রবন্ধ দেখুন।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১২, ২০৫।

* যাঁহারা অল্প কথায় সুশ্রুতের অস্ত্রচিকিৎসার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভারতীতে প্রকাশিত মদীয় "বৈজ্ঞানিক জীবনী—সুশ্রুত" পাঠ করিতে পারেন।

আছে, তাঁহার সময়ে বা আগে চরক বা সুশ্রুতের সুসন্নিবদ্ধ উন্নত কায়-চিকিৎসা বা অস্ত্র-চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা কোনও সাহেব স্বীকার করিলেন বলিয়াই তাঁহার নামের জোরে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অথর্ব্ববেদের পরে ও চরক-সুশ্রুতের মধ্যে
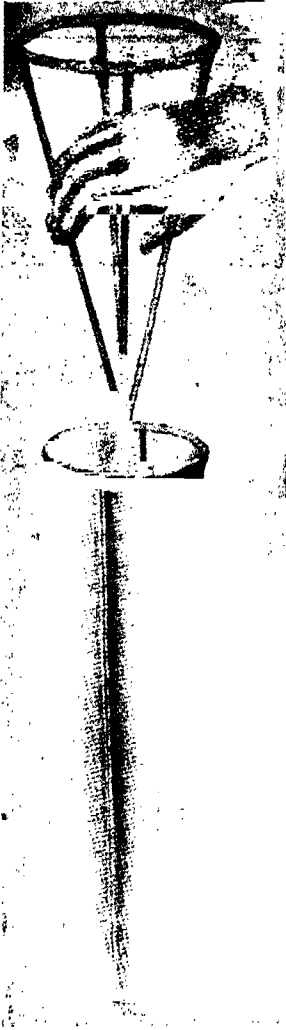
যোনি-ব্রণেক্ষণ যন্ত্র

অন্ততঃ সাত আট শত বৎসর গত হইয়াছিল, এবং এই সময়ের মধ্যে ক্রমশঃ চিকিৎসা-বিদ্যা উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমিও সেইজন্য মদীয় "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়নে" চরক-সুশ্রুতকে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীতে স্থান দান করিয়াছি। চরকের ভাষা শেষ ব্রাহ্মণযুগের ভাষা, সুশ্রুতের ভাষা আরও সুসম্বদ্ধ। চরক সম্বন্ধে ঠিক সংবাদ জানা যায় যে, পতঞ্জলি চরকের টীকা লিখিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, তিনি চরকের প্রতিসংস্কারও করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার দুই শত বৎসর আগে ধরিলে চরকের কাল খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার পূর্ব্বে চরকের কাল লইয়া যাওয়া যায় না।

সুশ্রুত সম্বন্ধে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, ডল্বণাচার্য্যের মতে বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন এবং তিনি সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রের রচয়িতা। নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সুশ্রুত খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হওয়াই সম্ভব। সুশ্রুত যে প্রাচীন গ্রন্থ তাহা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত "বাউয়ার পাণ্ডুলিপি" (Bower Manuscript) হইতে জানা যায় যে, পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই সুশ্রুত অতি প্রাচীন গ্রন্থরূপে গণ্য হইয়াছিল।

বাগভটের কালও অনিশ্চিত। হর্ণেল সাহেবের মত অনুসরণ করিয়া, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় প্রথম বাগভট ও দ্বিতীয় বাগভট করিয়াছেন। "অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ"-কার বাগভট—প্রথম বাগভট, "অষ্টাঙ্গ হৃদয়"-কার বাগভট—দ্বিতীয় বাগভট। কিন্তু যে শ্লোকের উপর ভিত্তি করিয়া এই দুইজন বাগভট কল্পিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ ইঁহারা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শ্লোকটি অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের শেষ দিকে আছে :—

"অষ্টাঙ্গ বৈদ্যকমহোদধি-মন্থনেন যোঽষ্টাঙ্গসংগ্রহমহা-
মৃতরাশিরাপ্তঃ।
তস্মাদনল্পফলমল্পসমুদ্যমানাং প্রীত্যর্থমেতদুদিতং
পৃথগেব তন্ত্রম্॥"

ইহার ব্যাখ্যায় ডাক্তার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"In the Uttara-sthana, Vagbhata the younger distinctly states that his compendium is based on the compilation of Vagbhata the elder." কিন্তু শ্লোকটির অর্থ কি তাই? আমার মনে হয়, উহার ঠিক বিপরীত। শ্লোকটির অর্থ হইতেছে—"আয়ুর্ব্বেদের অষ্টভাগরূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া, "অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ"-রূপ যে মহা অমৃত পাইয়াছিলাম (আপ্তঃ—ময়া) তাহা অপেক্ষা অল্পকালোপযোগী এই পৃথক্ তন্ত্র অল্পপাঠীর প্রীতির জন্য

রচনা করিলাম।" "অল্প" কথাটা অবশ্য লেখকের বিনয়-মূলক। এখানে Vagbhata the elder কোথা হইতে আসিল? উভয় গ্রন্থের রচয়িতা বৌদ্ধ—উভয় গ্রন্থে বুদ্ধ, তথাগত, অর্হৎএর প্রতি নমস্কার আছে। তফাৎ এই যে, সংগ্রহ—গদ্য ও পদ্যে লিখিত, হৃদয়—পদ্যে রচিত।

'বনৌষধিদর্পণ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমার বোধ হয়, বাগ্‌ভট অষ্টাঙ্গসংগ্রহ লিখিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ ধারণ-স্মরণ-সুখ হইল না, অতএব তিনি অষ্টাঙ্গসংগ্রহের গদ্যপদ্যাত্মিকা পদ্ধতি সম্যক্ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল বিবিধ মধুরছন্দে অষ্টাঙ্গহৃদয় লিখিয়া, বৈদ্যকের কটুতিক্ত ভেষজে কাব্যের মধুর রস সিঞ্চন করিয়াছিলেন।" এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। বাগভট—সংগ্রহ পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, হৃদয়—শেষ বয়সের লেখা

এখন কথা হইতেছে, বাগভট কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন? বাগভটের পিতার নাম সিদ্ধগুপ্ত, পিতামহের নাম বাগভট, জন্মস্থান সিন্ধুদেশ, কিন্তু জন্মকাল অজ্ঞাত। হর্ণেল সাহেব বলেন যে, বাগভট সপ্তম শতাব্দীর লোক। তাহার প্রমাণ সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক ইট্‌সিং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"আগে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টভাগ আটভাগে বিভক্ত ছিল, সম্প্রতি এক ব্যক্তি একস্থানে উহাদিগকে গ্রথিত করিয়াছেন।" এই "সম্প্রতি" কথাটার উপর জোর দিয়া বাগভটকে সপ্তম শতাব্দীতে ফেলা হইয়াছে। ইট্‌সিং-কথিত ব্যক্তি অন্য কেহ হইতে পারেন, বাগভটও হইতে পারেন। কিন্তু "সম্প্রতি" কথাটার উপর এত জোর দেওয়া হইতেছে কেন? (মূলে কি কথা আছে?) বাগভটের কাল নিরূপণকল্পে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ—

প্রথম। বাগভট নাগার্জ্জুনের পরে ও নিদানকার মাধবের আগে। মাধব অষ্টাঙ্গহৃদয় হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়। বাগভট ও নিদান, অষ্টম শতাব্দীতে আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ না হইলে আরবী ভাষায় উভয় গ্রন্থই অনূদিত হইত না। অতএব মাধব, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন, বাগভট, তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক।

তৃতীয়। তিব্বতীয় টেঙ্গোরে চরক, সুশ্রুত ও বাগভটের তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। এই টেঙ্গোর-গ্রন্থাবলী অষ্টম খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। বাগভট, চরক-সুশ্রুত অপেক্ষা অনেক অপ্রাচীন হইলেও টেঙ্গোরের রচনার চারি পাঁচ শত পূর্ব্বে রচিত না হইলে, উহাতে স্থান পাইত না।

বস্তি-যন্ত্র

চতুর্থ। তির্য্যক্‌পাতন (distillation) প্রণালী নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। উহা বাগভটে স্থান না পাওয়াতে মনে হয়, বাগভট নাগার্জ্জুনের দুই এক শতাব্দীর মধ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রমাণের দ্বারা অনুমিত হয় যে, বাগভট তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক।

তবেই দেখা যাইতেছে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-পরে তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় আট শত বৎসর বা তদূর্দ্ধ কাল ভারতে অস্ত্রচিকিৎসা বেশ উন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাগভটের পর অস্ত্রচিকিৎসার আর মৌলিক গ্রন্থ দেখা যায় না—কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ, টীকার টীকা, তস্য টীকা।

হাঁসপাতাল ও ঔষধালয়

অনেকে মনে করেন যে, হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় আধুনিক আবিষ্কার। সুপ্রসিদ্ধ আমির আলি সাহেব বলিয়াছেন যে, সাধারণ ঔষধালয় আরবীয় আবিষ্কার। এ যুক্তির কোনও অর্থ নাই। আরবীয়গণের অপেক্ষা হিন্দু-জাতি অনেক প্রাচীন। যখন খৃঃ পূঃ তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চরক-সুশ্রুতের ন্যায় চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ছিল, তখন চিকিৎসকগণের ঔষধালয় ছিল না, একথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। সুশ্রুত লিখিয়াছেন যে, চিকিৎসক "ভেষজাগারের" ঔষধপত্র কাঠের তাকের উপর

পোড়ান মাটির ভাঁড়ে রাখিয়া দিবেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় একটি অধ্যায়ে অতি সুন্দরভাবে প্রাচীন ভারতে হাঁসপাতাল ও ঔষধালয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। কোনও গ্রন্থে হাঁসপাতাল সম্বন্ধে এতগুলি প্রমাণ একত্র দেখি নাই। এই অধ্যায়টি সকলকে মনোযোগ দিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। চরক সংহিতায় অবস্থাপন্ন লোকদের বাটীতে সুশ্রুষাগার, সূতিকাগার প্রভৃতির যেরূপ বিশদ ও সুন্দর বর্ণনা আছে, তাহা হাঁসপাতাল সম্বন্ধে যে কোনও আধুনিক গ্রন্থে গৌরবের সহিত স্থান পাইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ—অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। সেই জন্য দেখিতে পাই, পুণ্যাত্মা রাজা অশোক শুধু মানুষের জন্য নহে, পশুদিগের জন্যও হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল দাতব্য চিকিৎসালয়কে পুণ্যশালা বা আরোগ্যশালা বলা হইত। "আরোগ্যশালা" ও "ভেষজাগার" এই দুইটি কথা ইংরাজি hospital এবং dispensary'র বেশ সুন্দর পারিভাষিক শব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি হইতে আরোগ্যশালা সম্বন্ধে বহু পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, পৌরাণিক যুগেও আরোগ্যশালা-স্থাপনা অতি পুণ্যের কাজ ছিল এবং ধনী ব্যক্তি ও রাজারা বহু আরোগ্যশালা স্থাপন করিতেন।

সম্মোহনী (Anæsthetic.)

অস্ত্রচিকিৎসার পূর্ব্বে রোগীকে অজ্ঞান করিবার জন্য কোনও সম্মোহনীর ব্যবহার দেখা যায় না। তবে চরক ও সুশ্রুতে মদ্যপান করাইয়া রোগীকে কখন কখন অজ্ঞান করাইবার কথা আছে। ভোজপ্রবন্ধে (দশম খৃষ্টাব্দ) "মোহচূর্ণের" দ্বারা অজ্ঞান করিয়া রাজা ভোজের উপর অস্ত্রচিকিৎসার কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই "মোহচূর্ণ" সম্ভবতঃ গাঁজার গুঁড়া। গাঁজার ধোঁয়াতে অজ্ঞান করিবার প্রথা ভারতে অবিদিত ছিল না।

অস্ত্রচিকিৎসার শস্ত্রাদি

ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রাদি। তিনি এই সকল শস্ত্রের যেরূপ বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের কার্য্য যেরূপ সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন, এরূপ বিশদব্যাখ্যা ও বর্ণনা কোনও গ্রন্থে দেখি নাই। প্রাচীন ভারতীয় শস্ত্রগুলি ও আধুনিক কালে সেই সেই কার্য্যে ব্যবহৃত শস্ত্রগুলি পাশে পাশে দেখাইয়া তিনি ভারতীয় শস্ত্রগুলির যথাযথ স্বরূপ-নির্ণয় (identify) করিয়াছেন। সেই সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়গণের ব্যবহৃত অস্ত্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন। ডাক্তার ভিন্ন অন্যে এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না।
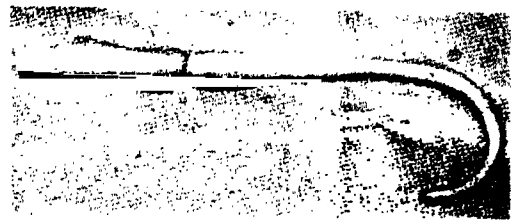
গর্ভ-শঙ্কু যন্ত্র

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় এই অস্ত্রগুলির কেবল বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের প্রতিকৃতিও দিয়াছেন। এই ছবিগুলি অবশ্য কল্পিত সন্দেহ নাই, তবে বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এইরূপ কল্পনা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তাঁহার পূর্ব্বে ডাক্তার ওয়াইজ ও গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব কতকগুলি শস্ত্রের এইরূপ প্রতিকৃতি দিয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও তাঁহার 'কবিরাজি শিক্ষা'য় বহু শস্ত্র ও বন্ধনী (bandage) প্রভৃতির প্রতিকৃতি দিয়াছেন। গিরীন্দ্র বাবু তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। গিরীন্দ্র বাবু তাঁহাদের অপেক্ষা আরও বহুসংখ্যক শস্ত্রের ছবি অঙ্কিত করাইয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের সমগ্র দ্বিতীয় ভাগ এই সকল ছবি লইয়া। তিনি ৮০ খানি প্লেটে আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাবৎ শস্ত্র, যন্ত্র, উপযন্ত্র, বন্ধনী প্রভৃতি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রচনায় ও গ্রীকগণের দ্বারা ব্যবহৃত এবং আধুনিক যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল চিত্র পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের অপেক্ষা অধিকতর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিকল্পিত এবং মূলের সহিত তাহাদের অধিক পরিমাণে মিল আছে বলিয়া মনে হয়। গিরীন্দ্র বাবুর এই বিরাট আয়োজন খুবই প্রশংসার্হ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মূলের বর্ণনার সহিত সাদৃশ্য

রাখিয়া এই সকল প্রতিকৃতি কল্পিত হইয়াছে। ভারতে অস্ত্রচিকিৎসা প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন নমুনা আর মিলে না। পাঠকগণ কেহ কেহ অবগত থাকিতে পারেন যে, ১৯১২ সালে আমি বঙ্গীয় পরিষদ্‌কে একখানি পত্র লিখি; সেই পত্রে আমি প্রস্তাব করি যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদির দুই সেট অন্ততঃ এক সেট standard নমুনা প্রস্তুত করাইবার ভার পরিষদ্ লউন। তাহা হইলে এই অস্ত্রশস্ত্রগুলি কিরূপ ছিল, তাহা সকলে অবগত হইতে পারিবেন এবং আধুনিক কবিরাজ-গণের মধ্যে আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসার স্পৃহা ইহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। পরিষদ্ এ বিষয়ে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন; তাঁহারা বঙ্গের বড়বড় ডাক্তার, কবিরাজ, রাসায়নিক লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। তার পর এক বৎসর গেল—কমিটির অধিবেশন হয় না। দিনাজপুরের উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে আর একটি প্রবন্ধে পুনরায় এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে কমিটির দুই একটি অধিবেশন হইয়াছিল। একটি অধিবেশনে জিজ্ঞাস্য হইল যে, কোন্ নমুনাকে ভিত্তি করিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইবে? প্রাচীন নমুনা মিলে কি না তাহার অনুসন্ধান করা হউক। সভায় চাঁদসীর একজন কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া আসিতে-ছেন বটে, তবে এখন তাঁহারা আধুনিক অস্ত্রাদিই ব্যবহার করেন। দৈনিক খবরের কাগজে এ বিষয়ে আমি সকলের নিকট নমুনার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। দুই চারি জন লিখিয়াছেন যে, কয়েকটি প্রাচীন নমুনা দিতে পারিবেন। ফলে কিছুই এ যাবৎ হয় নাই। প্রাচীন রোমীয়গণের দ্বারা ব্যবহৃত বহু অস্ত্রশস্ত্র সুপ্রসিদ্ধ পম্পে (Pompeii) নগর খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে, সেইজন্য প্রাচীন ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কল্পিত চিত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কিন্তু ভারতে সেরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া যায় না। সেইজন্য মনে হয়, ডাক্তার ওয়াইজ, গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন ও বিশেষতঃ—গিরীন্দ্র বাবুর এই সকল পরিকল্পিত চিত্র অবলম্বন করিয়া, এক সেট নমুনা প্রস্তুত করাইয়া, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের গৌরব-স্থল এই সকল অস্ত্রশস্ত্র সাধারণের কাছে উপস্থিত করা একান্ত কর্ত্তব্য—অন্ততঃ কতকটা আভাষ ত পাওয়া যাইবে।

অস্ত্র-চিকিৎসার লোপ

শেষ কথা হইতেছে এই উন্নত অস্ত্র-চিকিৎসা লোপ পাইল কেন? প্রশ্নটা একটু শক্ত। শুধু অস্ত্র-চিকিৎসা কেন—বহু জিনিষই তো লোপ পাইয়াছে। এই যে বিশাল উন্নত লৌহ-শিল্প এককালে ভারতের গৌরবস্থল ছিল,—যাহার নমুনা দিল্লীর লৌহস্তম্ভ, ধারের লৌহস্তম্ভ, উড়িষ্যার সুদীর্ঘ লৌহের কড়ি প্রভৃতি এখনও বহু শতাব্দীর
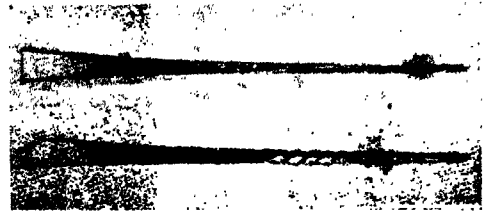
নখ-শস্ত্র

রৌদ্র-বৃষ্টি-শিলাপাত উপেক্ষা করিয়া সগৌরবে অবস্থিতি করিতেছে—তাহা লোপ পাইল কেন? ভারতের অদ্বিতীয় স্থপতি বিদ্যা, কলাবিদ্যা লোপ পাইল কেন? যে ভারত একদিন বহির্বাণিজ্যে ও রাষ্ট্রবিস্তারের দ্বারা জাভা, কাম্বোডিয়া, সায়াম, মালয় দ্বীপ প্রভৃতি ভারতের উপনিবেশরূপে অধিকার করিয়াছিল, সেই ভারতের অদ্ভুত নৌবিদ্যা লোপ পাইল কেন? ইহার কারণ কোন একটা বিশেষ ঘটনা হইতে পারে না। অবশ্য ছোট ছোট বিশেষ কারণ থাকিতে পারে কিন্তু প্রধান কারণ স্বাধীন চিন্তার অভাব। সমগ্র জাতির স্বাধীন চিন্তার স্রোত একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেলে, জাতিটা একেবারে নিশ্চেষ্ট ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। স্বাধীন চিন্তার অভাবই এই সকল লোপের প্রধান এবং প্রথম কারণ।

অস্ত্রচিকিৎসা-লোপ সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার অভাব অনেক কারণে ঘটিয়াছিল। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় অনেক গুলি কারণ দেখাইয়াছেন :—

(১) স্মৃতি-শাস্ত্রের অভ্যুদয়ে মৃতদেহ-স্পর্শে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আরম্ভ হইল। শবব্যবচ্ছেদ-প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া গেল। শবব্যবচ্ছেদ প্রথা উঠিয়া গেলে শারীরবিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসার অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

(২) বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্র "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।" ইহাতে যেমন বৌদ্ধগণকে মানুষ ও পশুর জন্য আরোগ্য-শালা প্রভৃতি স্থাপনে নিয়োজিত করিয়াছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রচিকিৎসা ক্লেশকর বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগে ভারতে অস্ত্রচিকিৎসার ক্রমশঃ অবনতি ঘটিয়াছিল।

(৩) মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুচিকিৎসা-প্রণালী অনাদৃত হওয়াতে তাহার আর উন্নতি হয় নাই। কেবল টীকার টীকা, তস্য টীকাই হইয়াছে।

তাহা ভিন্ন অস্ত্রচিকিৎসার লোপের দুইটি বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয়ঃ—

(১) কায়-চিকিৎসার উন্নতিতে, বিশেষতঃ—তান্ত্রিক যুগে বিবিধ ধাতু-ঘটিত ঔষধের দ্বারা তাবৎ রোগের চিকিৎসার প্রবর্ত্তনে, অস্ত্রসাধ্য রোগসকলও কেবল চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

(২) কোনও রূপ সাধারণ সম্মোহনী (Anæsthetic) আবিষ্কৃত না হওয়াতে অস্ত্রচিকিৎসা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল এবং নিতান্ত নিরুপায় না হইলে, লোকে স্বভাবতঃ অস্ত্র-চিকিৎসার ধার দিয়াও যাইত না। বলা বাহুল্য, আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসার অদ্ভুত উন্নতি ক্লোরোফর্ম্মের সম্মোহনী ক্রিয়ার আবিষ্কারের দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে।

সে যাহা হউক, বিগত সহস্র বৎসর ভারতে কোনও প্রকার অস্ত্রচিকিৎসা প্রবর্ত্তিত ছিল না—এ কথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ ত কোনও দিন কম ছিল না! যুদ্ধে আহত সৈনিকগণ কি বিনা অস্ত্রচিকিৎসায় মারা যাইত? অঙ্গচ্ছেদন (Amputation) বন্ধনী-প্রকরণ (Bandage) সৈনিকগণের জন্য কি প্রচলিত ছিল না? মুসলমান রাজাদিগের সৈন্যগণের মধ্যে না হয় হাকিমী চিকিৎসা ও অস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যা প্রচলিত ছিল। হিন্দু রাজাও তো বহু ছিল? তাঁহারা কি মুসলমান হাকিম রাখিতেন—না ক্ষৌরকারেরা যুদ্ধে অস্ত্র-চিকিৎসকের কার্য্য করিত? আমার ত তাহা বোধ হয় না। উন্নত না হউক, অনুন্নত অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রচিকিৎসা ভারতে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল। ইউরোপীয় জাতিগণের ভারত-আগমনের পর হইতে উন্নত পাশ্চাত্য অস্ত্রচিকিৎসা ভারতে প্রচলিত হইলে, দেশীয় অস্ত্রচিকিৎসা একেবারে ভারত ছাড়িয়া পলাইয়াছে। মনে হয়, গিরীন্দ্র বাবুর মূল্যবান পুস্তকখানি পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া, আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়িগণের মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসার পুনঃপ্রবর্ত্তন-কল্পে সহায়তা করিবে।

ভারতবর্ষের অরণ্যানী

[শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার]

অরণ্য বলিয়া মোরে ঘৃণিয়ো না, হে বিলাসী
ভারতের নব্য অধিবাসী!
ভারতের গৌরবের অবিনাশী ইতিহাস
মোর বক্ষে আছয়ে প্রকাশি'!
তামসিকতায় পূর্ণ, ধর্ম্মহীন এই কালে
কেহ মোর করে না সম্মান;

ছিল দিন—ছিল দিন,— ধনী নিঃস্ব সবে যবে
মোর প্রতি ছিল ভক্তিমান্।
অতীত-গৌরব-স্মৃতি এখনো হৃদয়ে জলে
স্থিরা সৌদামিনী-লেখা মত!
অতীত গৌরবে মোর আজো বক্ষ হয় স্ফীত—
সে সম্মান কোথা আজ গত!

তোমরা ভুলেছ, বুঝি, পুরাতন সে কাহিনী,
তাই আজ, হে ভারতবাসী !
কহিব আপন কথা তোমাদের কাছে আমি,
শুনিবে কি তোমরা বিলাসী ?
গম্ভীর, উদাত্ত স্বরে ঋষি-কণ্ঠে উচ্চারিত
সামগীতি, বক্ষ মোর ভরি,'
উঠিত গগন ভেদি' পশিয়া অমর-ধামে
টলাইত ত্রিলোকের হরি !
আমারি—আমারি ক্রোড়ে বাল্মীকির পূত কণ্ঠে
নিঃসারিত কবিতা প্রথম,
মোর (ই) শ্যাম-শোভা মাঝে রচিলেন মহাকবি
মহাবাক্য—পূত "রামায়ণ !"
শান্তিময় মোর (ই) অঙ্কে মহামুনি ব্যাস-কণ্ঠে
জন্ম হ'ল "মহাভারতের" ;
মোর (ই) স্নিগ্ধ-ছায়া-তলে মানব-মনীষা হ'তে
সৃষ্টি হল "ষড়দর্শনের"।
সংহিতা, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, উপনিষদাদি,
বিরচিত আমারি ছায়ায় ;
কত যোগী,—কত ঋষি—আমারি আমারি ক্রোড়ে
সিদ্ধ হ'ল উগ্র সাধনায়।
আমারি—আমারি বুকে পবিত্রা সাবিত্রী সতী—
মহাকালে করি পরাজিত,
সগর্ব্বে ফিরা'য়ে নিল মৃতপতি জীবনে গো,
ধর্ম্মরাজ বিস্মিত—স্তম্ভিত !
সুকুমার শিশু ধ্রুব বিমাতা পরুষ বাক্য
লাঞ্ছিত, ব্যথিত যবে হায় !
আমি তা'রে মাতৃসম লইলাম অঙ্কপাতি'
সিদ্ধ শিশু কৃচ্ছ্র, তপস্যায় !

সত্য-পালনের তরে সত্যসন্ধ রামচন্দ্র
তেয়াগিয়া পিতৃ-সিংহাসন,
জানকী, লক্ষ্মণ সহ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল
মোরি বক্ষে করিল ভ্রমণ।
আমারি উৎসঙ্গ হ'তে পতিপ্রাণা বৈদেহীরে
হরি' নিল দুর্ব্বৃত্ত রাবণ ;
সঙ্কট অনলে হ'ল সতীত্ব উজ্জ্বলতর !
সীতা নাম গায়িল ভুবন !
বাধিল তুমুল রণ দেবতা রাক্ষসে তবে—
ধরা স্বর্গ উঠিল টলিয়া ;
নির্ম্মূল রাক্ষস-কুল, পাপের বিনাশ হ'ল,
ধর্ম্ম জয়ী আহবে জিনিয়া।
দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশরী-তানে
দেহে মম রোমাঞ্চ ফুটিত !
রাধার পবিত্র প্রেমে ছিনু সদা গদগদ,—
ভক্ত-গোপী-রূপে উদ্ভাসিত।
আমারি নিভৃত অঙ্কে সিদ্ধার্থ—নৃপতি-পুত্র
সর্ব্ব ত্যজি' লইল শরণ ;
"অহিংসা পরমধর্ম্ম"—প্রচারিয়া ধরাতলে,
লভিলা গো নির্ব্বাণ রতন।
সুব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী করুণাময়ী,
মোর(ই) অঙ্কে লালিত পালিত ;
আমারি আমারি বুকে শান্তিভরা, ক্ষেমভরা
বাণপ্রস্থ হ'ত আচরিত।
কত আর কব বল ?—বলিতে বিদরে হিয়া,
মর্ম্মব্যথা ঝরে অশ্রুধারে ;
কে ছিল আমার মত ভাগ্যবতী ধরাতলে ?
কে শুনিবে—বলি আজ কা'রে ?

মৈথিলী-ভাষা

[শ্রীরসিকলাল রায়]

উপক্রম

"মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব ?"

এই করুণ, মধুর, মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতের ঝঙ্কার যে ভাষার সম্পদ, তাহার নাম মৈথিলী। বিহার প্রদেশে হিন্দী ভাষার তিনটি প্রধান শাখা-(অপ) ভাষা প্রচলিত আছে ; তন্মধ্যে মৈথিলী অন্যতম। গঙ্গার উত্তর তীরে মৈথিলীর রাজত্ব, দক্ষিণবিহারে মাগধী ও ভোজপুরী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। গণ্ডকের পশ্চিমে গঙ্গাসরযূ পার হইয়া, ভোজপুরী-ভাষা উত্তর-বিহার অধিকার করিয়াছে। মৈথিলীও নিশ্চেষ্ট নাই, বিহারের পূর্ব্বাঞ্চলে গঙ্গার খর-স্রোত মৈথিলীর গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। শোণনদের পূর্ব্বে গঙ্গার দক্ষিণে দক্ষিণ-বিহারে ও ছোটনাগপুরের উত্তরাংশে মাগধী-ভাষার প্রচলন। ছোটনাগপুরের দক্ষিণাংশে ও শোণনদের পশ্চিমে গঙ্গার উভয়তীরে কাশী পর্য্যন্ত ভোজপুরী-ভাষা লোকমুখে জীবিত রহিয়াছে। মাগধীর সহিত মৈথিলীর যেরূপ নৈকট্য দেখিতে পাওয়া যায়, ভোজপুরীর সহিত মাগধীর বা মৈথিলীর সেরূপ সাদৃশ্য নাই।

ব্যাপ্তি

মূলতঃ মৈথিলী মিথিলার ভাষা। ত্রিহুতের প্রাচীন নাম মিথিলা বা তৈরভুক্তি। মিথিলা-মাহাত্ম্য-নামক গ্রন্থের মতে উহার উত্তর সীমায় হিমালয়, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে গণ্ডক এবং পূর্ব্বে কুশী। অতএব বর্ত্তমান চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জিলা মিথিলার অন্তর্ভুক্ত। মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা পূর্ব্বে একই জিলার অন্তর্গত ছিল; তখন উহার নাম ছিল ত্রিহুত। এখনও এই অঞ্চলের সাধারণ নাম ত্রিহুত। স্থানীয় লোকেরা কথোপকথনে সাধারণতঃ মজঃফরপুর বা মুদাফঃরপুরকে ত্রিহুত এবং দ্বারভাঙ্গাকে মিথিলা কহে। চম্পারণের অধিকাংশ স্থলেই আজকাল ভোজপুরী ভাষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কুশী উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণিয়ার অধিকাংশ স্থানে মৈথিলী-ভাষা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গঙ্গার দক্ষিণে ভাগলপুরের সর্ব্বত্র, মুঙ্গেরের পূর্ব্বাংশে ও সাঁওতাল পরগণার উত্তর-পশ্চিমাংশে মৈথিলী-ভাষা প্রচলিত। জনগণনায় দেখা যায়, বিহার প্রদেশে—

মৈথিলী ভাষা প্রায় „ „ ১০,০০০,০০০
মাগধী „ „ „ ৬,২৪০,০০০
এবং ভোজপুরী ২০,০০০,০০০ লোকে ব্যবহার করে।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে প্রায় দুইলক্ষ এবং আসামে প্রায় ৬৫ হাজার মৈথিলী-ভাষাভাষী লোকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একমাত্র কলিকাতাতেই ৩৪,০০০ লোকে মৈথিলীতে কথোপকথন করে। কিন্তু বিহারী-ভাষাভাষী যে সকল লোক ভারতের সর্ব্বত্র এবং পৃথিবীর নানাস্থানে বিভিন্ন বিষয়কর্ম্মে ও শ্রমজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদের সংখ্যা কত, কে বলিতে পারে ?

বিভাগ*

দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়ার পশ্চিম-প্রান্তবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বিশুদ্ধ মৈথিলী-ভাষায় কথোপকথন করেন। দ্বারভাঙ্গার দক্ষিণে এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের যে অংশ গঙ্গার উত্তরতীরে অবস্থিত, তথায় যে আংশিক-ভাবে বিকৃত মৈথিলী-ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে 'দক্ষিণী মৈথিলী' বলা যাইতে পারে।

পূর্ণিয়া জিলাতে মৈথিলী-ভাষার সহিত বাঙ্গালা মিশ্রিত হইয়াছে। পূর্ণিয়ার পূর্ব্বাংশে যে প্রান্তিক ভাষার প্রচলন দেখা যায়, উহার নাম সিরিপুরী (শ্রীপুরী)। শ্রীপুরী—

---

* Vide—An Introduction to the Maithili Dialect by Dr. Grierson, p. XI.

মৈথিলীর একটা শাখা, কিন্তু উহাতে মৈথিলী অপেক্ষা বাঙ্গালার প্রভাবই অধিক। উহা কায়েথী অক্ষরে লিখিত। পূর্ণিয়া জিলার বাঙ্গালাশব্দমিশ্রিত মৈথিলী-ভাষাকে 'পূর্ব্বমৈথিলী' আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে মৈথিলীর সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে মাগধী ও বাঙ্গালার মিশ্রণ হইয়াছে। উহার ক্রিয়াপদে 'ছিক'-প্রত্যয়ের ব্যবহার-বাহুল্যে উহাকে লোকে সাধারণতঃ 'ছিকাছিকি বোলী' কহে।

সারণজিলায় ভোজপুরী-ভাষা প্রচলিত। সারণের পূর্ব্বাংশে মজঃফরপুরের পশ্চিমভাগে প্রচলিত ভোজপুরী-মিশ্রিত মৈথিলীভাষায় নাম 'পশ্চিম মৈথিলী' রাখা যাইতে পারে। মিথিলবাসী মুসলমানেরা এক স্বতন্ত্র ভাষায় কথোপকথন করে; তাহাদের ভাষার সহিত অযোধ্যাঞ্চলের প্রচলিত ভাষার সাদৃশ্য আছে। এই ভাষায় স্থানীয় নাম 'শেখাই', 'মুসলমানী' বা 'জোল্হা বোলী'। দ্বারভাঙ্গার জোলারা পারসী ও আরবী শব্দমিশ্রিত একপ্রকার বিকৃত মৈথিলী-ভাষা ব্যবহার করে, তাহাই প্রকৃত আদর্শ 'জোলাবুলী'। অতএব দেখা যাইতেছে, মৈথিলী-ভাষা ৬টি প্রধান শাখা বা অপভাষাতে বিভক্ত; যথা, ১। বিশুদ্ধ মৈথিলী, ২। দক্ষিণী মৈথিলী, ৩। পূর্ব্বমৈথিলী, ৪। ছিকাছিকি, ৫। পশ্চিম মৈথিলী এবং ৬। জোলাবুলী, শেখাই বা মুসলমানী।
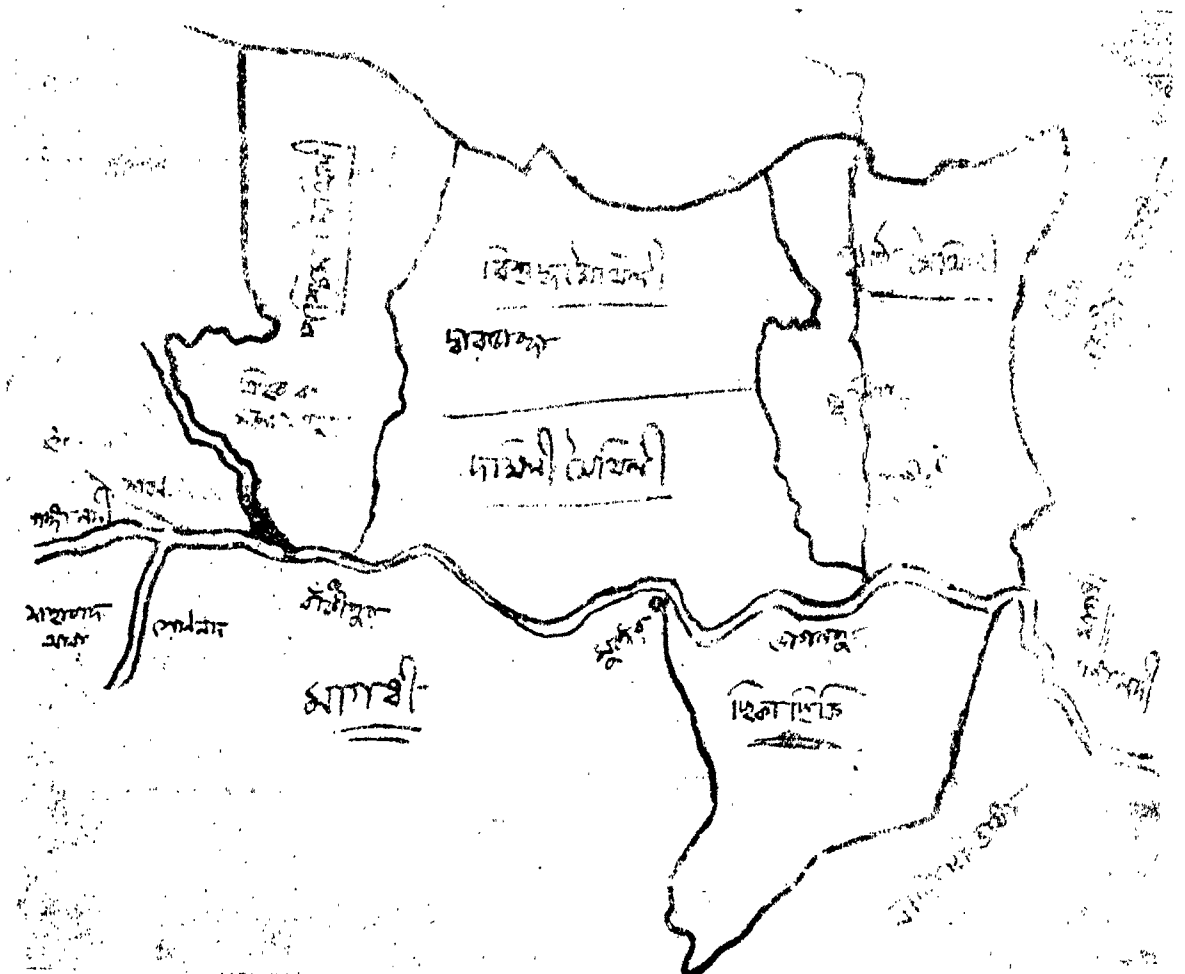
মৈথিলী-ভাষার প্রসার ও বিভাগ

অধ্যয়ন

শিল্পী—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে।

মৈথিলী-ভাষার প্রায় এককোটি সন্তান। তন্মধ্যে স্থূলগণনায় কুড়িলক্ষ বিশুদ্ধ ভাষার, ২৫ লক্ষ দক্ষিণীয়, ১৫ লক্ষ পূর্ব্বীয় মৈথিলীর, ১৭ লক্ষ ছিকাছিকির, ১৮ লক্ষ পশ্চিমী মৈথিলীর এবং তিন লক্ষের উপর জোলাবোলীর সেবক। †

বর্ণমালা

মৈথিলীভাষা সাধারণতঃ কায়েথী (কৈথী) অক্ষরে লিখিত। ব্রাহ্মণেরা নাগরী অক্ষর ব্যবহার করেন। কায়েথী, দেবনাগরী বর্ণমালার অপভ্রংশ। মুসলমান রাজত্বে পূর্ব্বে রাজকার্য্যে উর্দ্দূ অক্ষর ব্যবহৃত হইত। দ্রুতলিপির জন্য শিকস্ত উর্দ্দূ অত্যন্ত উপযোগী। কেহ কেহ মনে করেন, পিটম্যানের সাঙ্কেতিক লিপি-প্রণালী অপেক্ষা দ্রুতলিখনের পক্ষে উর্দ্দূ কম উপযোগী নহে। ‡ কায়েথী এই বিষয়ে উর্দ্দূকেও পরাস্ত করিয়াছে। শিকস্ত উর্দ্দূ সহজে পাঠ করা যায় না, কিন্তু কায়েথী পাঠ করিতে তত কষ্ট হয় না। অনেক সময় জার-জর-পেশ নোক্তার অভাবে একই উর্দ্দূ কথা বিভিন্ন ভাবে পাঠ করা যায়; কিন্তু কায়েথীতে সেরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি হাস্যকর গল্পের উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

কথিত আছে একবার বঙ্গের বড়লাট সাহেব বাহাদুর মফঃস্বল পরিদর্শনের নিমিত্ত 'সফরে' বাহির হইয়া মোকামা ঘাটের নিকট গঙ্গাপার হইবেন, প্রোগ্রাম ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বেই পরোয়ানা পাঠাইয়াছিলেন যে, 'তত্রত্য' থানার দারোগা সাহেব লাটসাহেবের পারের জন্য ২০।২৫ খানা উৎকৃষ্ট নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। বলা বাহুল্য, সেকালের দারোগার ইংরাজী জ্ঞান ছিল না। সরকারী কাজকর্ম্ম উর্দ্দূ ভাষাতেই চলিত। অতএব, এই হুকুম-নামাও উর্দ্দূতেই লিখিত হইয়াছিল। উর্দ্দূতে নৌকাকে 'কিস্তী' বলে। ইহার 'ই' কারের কাজও নোক্তা (জের) দিয়া সারিতে হয়। শিকস্ত লেখায় 'ফ্, সে, ত ও ইয়ে' লিখিয়া কিস্তী বানান করিতে হয়। নোক্তা (চিহ্ন) না দিলে 'তে' ও 'বে'র মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান থাকে না। সুতরাং দারোগা সাহেব হুকুম পড়িলেন, 'লাট সাহেব আসিতেছেন, তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য 'কস্‌বী'র প্রয়োজন।' বোধ হয়, মোকামায় দরবার হইবে, অতএব মোগল বাদসাহ-দিগের ন্যায় নিশ্চয়ই 'নাচ-গান-মুজুরা'র আয়োজন করা চাই। আক্কেল-অনুসারে সমঝদার দারোগা সাহেবের সরকারী হুকুম বুঝিতে কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। তিনি তৎপর হইয়া বহু পরিশ্রমে চারিদিক অন্বেষণ করিয়া বিশ পঁচিশটি সুগায়িকা সুন্দরী নর্ত্তকী (কস্‌বী) সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন এবং ছোটলাট আসিলে মহোল্লাসে অপ্সরাদিগকে নজর দিয়া কুর্ণিশ করিয়া তরক্কীর উমেদ করিলেন।

কায়েথীতে এরূপ বিভ্রাটের সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্য প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে আদৌ নাই, এরূপ নহে। বাঙ্গালী পাঠকেরা অনেকেই সেই 'তেরা ভাই আজ মর গীয়া' এবং 'জীয়া জীয়া, আজ মরা নেহী—আজমীর গীয়া' গল্প শুনিয়াছেন।

গ্রিয়ার্সন সাহেব মৈথিলী ভাষার যে সকল হস্তলিপির নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার একটি বাঙ্গালা ও কায়েথীর মিশ্রঅক্ষরে লিখিত। (১) তিনি বলেন, দ্বারভাঙ্গার ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ বর্ণমালা ব্যবহার করেন। ঐ মিশ্রিত বর্ণমালায় নিম্নলিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত সাক্ষাৎ হইল,—

উ, এ, ঐ, ও, ঔ, ক, খ, গ, ঞ, ট, ড, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ব, ভ, ম, য, স, ও ক্ষ।

মৈথিলী খ্ন বাঙ্গালার ঝ, তাহার ঘ আমাদের ধ বিশেষ, মৈথিলী ণ বাঙ্গালার স্পষ্ট ল।

যুক্তপ্রদেশের হিন্দীতে, ভোজপুরীতে ও মাগধী ভাষায় ব্যবহৃত কায়েথী অক্ষর হইতে কোন কোন মৈথিলী কায়েথীবর্ণ একটু পৃথক্।

উচ্চারণ

মৈথিলী-ভাষাভাষী নরনারীদিগের উচ্চারণ বাঙ্গালী ও কাশী-অযোধ্যাঞ্চলের হিন্দুস্থানীদিগের উচ্চারণের মাঝামাঝি।

---

†. Vide—Grierson's Maithili Grammar part 1, Introduction, p. XIII.

‡ "There was a clerk in my office in Madhubani who could write excellent Kaithi more quickly than even the most practised of the old Persian Muharries". Garierson,

(১) Vide Linguistic Suruvy of India, Vol V. part II plate I.

বাঙ্গালীরা উচ্চারণ-কালে অন্ত্য অকার ওকারে পরিণত করেন ; যেমন, 'কোন' লিখিয়া 'কোনো' পাঠ করা হয়, 'কত' লিখিয়া 'কতো' পাঠ করা হয়। হিন্দীর অন্ত্য অ যথাযথ উচ্চারিত হয়। মৈথিলীতে অন্ত্য 'অ'কার অ এবং ও, এই উভয় স্বরের মধ্যবর্ত্তী-রূপ ধারণ করে। পদের অন্তস্থিত অকার যেমন 'অঃ' বা 'ও' এই দীর্ঘরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আকারও মৈথিলীতে উচ্চারণ সময়ে হ্রস্ব অকারে পরিবর্ত্তিত হয় ; যথা, 'পানিয়া' উচ্চারণকালে 'পনিয়া'। গদ্যে অন্ত্য অকার বাঙ্গালার ন্যায় মৈথিলীতেও অনেকস্থলে উচ্চারিত হয় না। 'গুণ' ও 'ফল' হসন্তভাবে উচ্চারিত হয়। 'দেখব', 'দেখল' প্রভৃতিরও অন্ত্য অকার উচ্চারণকালে অদৃশ্য হয়। কিন্তু পদ্যে অন্তিম অকার সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়। শব্দের অন্তস্থিত 'ই' ও 'উ' এতদূর হ্রস্ব ও অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় যে, তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মে। 'অছি' ও 'দেখথু' প্রায় 'অছ' ও 'দেখথ' এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। স্থলবিশেষে অন্তিম 'ই'কার স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, যেমন, 'লোকনি' 'পানি' প্রভৃতি শব্দে। খাঁটি মৈথিলী শব্দে বিসর্গের ব্যবহার নাই। অনুস্বারের প্রয়োগ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উহা যুক্তবর্ণে 'ঙ, ঞ, ণ, ন, ম'তে পরিবর্ত্তিত হইয়া লিখিত ও উচ্চারিত হয়। অতএব 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গলা' লেখাই বোধ হয়, মৈথিলীর অনুমোদিত। মৈথিলীতে ঁ চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগের ও উচ্চারণের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। যেমন, আঁখিয়া, মেঁ, বাঁহি (বাহু) ইত্যাদি। ড, ও ঢ শব্দের আদিতে আপন আপন উচ্চারণ ঠিক রাখিয়াছে, কিন্তু শব্দের মধ্যে ও অন্তে উহারা 'ড় ও ঢ়'তে পরিণত হয়। অনেকস্থলে 'ড় ও ঢ়'রও 'হ'তে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। 'ণ' উড়িষ্যায় স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, হিন্দীতেও উহার সম্মানের হানি ঘটে নাই। কিন্তু বাঙ্গালাতে 'ণ' শবদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছে। মৈথিলীতেও 'ণ' কোন কোন স্থলে 'ন'কে আসর দিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে। মৈথিলাতে অন্তঃস্থ 'য ও ব' উচ্চারিত হয় না। তাহাদের স্থান বর্গীয় 'জ ও ব' অধিকার করিয়াছে। লিখিবার সময় অনেকে 'য ও ব' লিখিলেও পাঠকালে সকলেই বাঙ্গালার ন্যায় 'জ ও ব (বর্গীয়), উচ্চারণ করে! আমরাও ত 'যৌবন' লিখিয়া 'জোবন' পড়ি, 'কাজ' পড়িয়া কায লিখিতে চাই।

দন্ত্য 'স' বাঙ্গালায় 'শ'তে পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা লিখি 'ঘাস'—পড়ি 'ঘাশ' ; লিখি 'সর্ব্বত্র' কিন্তু পড়ি 'শর্ব্বত্রো'। কিন্তু 'শ্রী', 'শৃঙ্গার', 'শৃগাল' প্রভৃতি উচ্চারণ-কালে তালব্য 'শ'কে দন্ত্য 'স'তে পরিবর্ত্তিত করিয়া সুদেআসলে পূর্ব্বের ত্রুটী সংশোধন করিয়া লই। পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলায় কেহ 'শ' উচ্চারণ করিতে পারে না। তথায় তালব্য 'শ', দন্ত্য 'স' (ছ)তে পরিবর্ত্তিত হইয়া উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় 'শ', 'স' এবং 'ষ' উচ্চারণ-কালে সাম্যনীতি মানিয়া একাকার হইয়া যায়। হিন্দী ও মৈথিলীতে মূর্দ্ধণ্য 'ষ' উচ্চারণ কালে 'খ' হইয়া যায়। সে দেশের লোকেরা 'ভাষা'কে 'ভাখা' বলে। 'মনুষ্য'কে 'মনুখ্য' বলে, 'বিষম'-কে 'বিখম' বলে। আমরা তাহাদের 'লক্ষ্মী'র উচ্চারণ 'লক্ষ্মী'তে কতকটা ঠিক রাখিয়াছি, কিন্তু তাহারা লক্ষ্মীকে কখন 'লক্ষ্মী', কখন 'লছ্মী' কখন 'লখিমা' করিয়া ফেলে। মৈথিলীতে 'স', ছ, 'ষ' খ, এবং 'ক্ষ' চ্ছ। যুক্তবর্ণে (যথা র্ষ) মূর্দ্ধণ্য ষ সংস্কৃত উচ্চারণ অনুকরণ করে। মোটের উপর 'ক্+ষ্ (অর্থাৎ উচ্চারণ কালে 'ক্+খ্') আমাদের বাঙ্গালাতে 'ক্ষ' হইয়া হিন্দীর উচ্চারণ বহাল রাখিয়াছে। মৈথিলীর 'হ্য' বাঙ্গালার 'গ্রাহ্যে ও সহ্যে' উচ্চারিত হয়।

উৎপত্তি

ভাষা-পরিবারে মৈথিলীর স্থান আর্য্য শ্রেণীতে। উহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া এদেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ ভারতীয় আর্য্যদিগের ভাষা 'সংস্কৃত' সাহিত্যে উন্নীত হইবার পূর্ব্বে যে আকারে লোকমুখে প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে মৈথিলী 'ভাষার' উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব।* এই কথ্য ভাষা অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া 'মৈথিলী'রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, 'মাগধী প্রাকৃত' মৈথিলীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ। এক সময় বিহারের সর্ব্বত্র এই মাগধী প্রাকৃতের প্রচলন ছিল। খৃষ্টের পূর্ব্বের পঞ্চম

* It is descended from an ancient form af Indo-Aryan speech akin to but not the same as that which became fixed by ancient literary use in the form of Sanskirt.—Grierson.

শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত মাগধী ভাষা রূপান্তরিত হইতে হইতে পরিশেষে উত্তর-বিহারে মৈথিলী ভাষায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয়, বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়া ভাষাও এইরূপে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়া মাগধীর অঙ্কে লালিত পালিত হইয়া বর্ত্তমান যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক মৈথিলী—বাঙ্গালার মাতা, মাতৃষসা, সহোদরা, কি বৈমাত্রেয় ভগ্নী তাহা নিরূপণ করিবার সময় আসিয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞান এখনও স্থির-সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই যে, হিন্দী বাঙ্গালার সহিত মিশিয়া মিশ্রভাষা মৈথিলীতে * পরিণত হইয়াছে,কি বাঙ্গালা আবর্ত্তে আবর্ত্তে রূপান্তরিত হইয়া দেশজ শব্দের সহিত মিশিয়া মৈথিলার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। মৈথিলী শব্দের অর্থবোধ করিতে হইলে কেবল সংস্কৃত অভিধানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, প্রাকৃতের প্রয়োগও অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুখের কথা, ব্যাকরণ-বিভীষিকার আলোচনা উপলক্ষে কোন কোন বঙ্গীয় লেখক পত্রান্তরে এবিষয়ে বাঙ্গালী পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সাহিত্য

বিহারে প্রচলিত কথিত ভাষা-সমূহের (১) মধ্যে একমাত্র মৈথিলীই সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করিবার গৌরব-ভাজন হইয়াছে। মিথিলার পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রালোচনা ইতিহাসবিশ্রুত। নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্র, মিথিলা হইতে কি উপায়ে আমদানী করা হইয়াছিল, তাহা বঙ্গভাষার পাঠকগণ বিদিত আছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের স্বনামধন্যা বিদুষী মহিলা লখীমা ঠাকুরাণী মিথিলা প্রদেশে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীর ধ্বনি, বোধ হয়, প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। মধুর ভাষায়, মধুর ছন্দে, মধুর রসের সঙ্গীত-তানে বঙ্গে ও বিহারে আনন্দহিল্লোল প্রবাহিত করাইয়া, বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন (১)। তিনি মৈথিল কবি। বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুগাওনের মহারাজ শিবসিংহের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন,—

'বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥' (২)

বিদ্যাপতির সংস্কৃত সাহিত্যেও অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত পুরুষ-পত্রিকা বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার সুললিত মৈথিলী পদাবলী যে কোন ভাষায় অতি উপাদেয় বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গ দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদবধি কীর্ত্তনীয়ারা সঙ্গীত আসরে আমাদের দেশের নিরক্ষর জনমণ্ডলীর মধ্যেও বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাব সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা অধিকাংশ স্থলেই বিদ্যাপতির পদাবলী অনুকরণদুষ্ট, বিকৃত ও অপকৃষ্ট রচনার সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তরকালে অনেক অনুকরণকারী বৈষ্ণব-কবির আবির্ভাব হইয়াছিল (৩)। তাঁহাদের রচিত পদাবলী বিদ্যাপতির রচনাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পদাবলীর কীর্ত্তন ও সংগ্রহকারিগণ আপন আপন রুচি ও প্রাদেশিক ভাষানুযায়ী বিদ্যাপতির মূল মৈথিল পদাবলী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন। একমাত্র 'পদকল্পতরু'তেই

---

* তৃতীয়-হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীমান্ পণ্ডিত বদরীনারায়ণ চৌধুরী বলিয়াছেন,—"হমারী ভাষাকে প্রধান তিনরূপ হৈ। * * উনকে দুসরে রূপ ব্রজভাষা। * * উনমেঁ প্রধান আর্য্যজাতীয় সুকবিয়োঁকী কই শ্রেণী হৈঁ। জৈসে কবির, কমাল, বিদ্যাপতি, দাদু, নাভা আদি, জিনকী ভাষাএঁ কুছ পুরানী, মনমানী, ঔর প্রান্তবিশেষকী বোলিয়োঁ সে মিশ্রিত হৈঁ।"

(১) গ্রিয়াসন সাহেবের মতে বিহারে ৩৬টি বিভিন্ন প্রাদেশিক অপভাষা প্রচলিত আছে।

(১) Bidyapati Thakur was founder of the school of master singers which in after yours spread over the whole of Bengal, and his name is to the present day a household word from the Karmnasa to Calcutta. p. 9 The Modern Literary History of Hindustan.

(২) রাজা শিবসিংহ সম্বন্ধে ত্রিহুতে লোকমুখে অনেক গ্রাম্য কবিতা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের দুইটি মাত্র নিম্নে আহৃত হইল—"পোখরি (পুকুর) রজোখরি ঔর সভ পোখরা, রাজা সিবসিঙ্গ ঔর সভ ছোকরা॥" এবং "তালত ভোলান তাল ঔর সভ তলৈয়া। রাজা ত সিব সিঙ্গ ঔর সভ রজৈয়া॥

(৩) Subsequent anthors have never done anything but, longo intervallo, imitate him. &c., Ibid.

বিদ্যাপতির পদাবলীর একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় (১)। মিথিলার বৈষ্ণব ভক্তদিগের গৃহে এবং কীর্ত্তনীয়াদিগের মুখে বিদ্যাপতির আরও অনেক মধুর পদ প্রচলিত আছে। মিথিলাতেও তথাকার অধিবাসিগণ প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির ভাষা আধুনিক ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন। অতএব এখন বিদ্যাপতির রচিত সে কালের সেই খাঁটি, আসল, অকৃত্রিম পদাবলী দুর্লভ। বিদ্যাপতির অনুকরণকারীদিগের মধ্যে উমাপতি, নন্দিপতি, মোদনারায়ণ, রমাপতি, মহীপতি, জয়ানন্দ, চতুর্ভুজ, সরসরাম, জয়দেব, কেশবভঞ্জন, চক্রপাণি, ভানুনাথ ও হর্ষনাথের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিথিলার উর্ব্বর সাহিত্যক্ষেত্রে পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে হরিবংশপ্রণেতা মনবোধ ওঝা খ্যাতনামা ছিলেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরলোক গমন করেন। মৈথিলী ভাষায় যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার একখানাও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। মৈথিল নাটকের বিশিষ্টত্ব এই যে, মূল নাটক সংস্কৃতে প্রণীত, কিন্তু তাহার গানগুলি মৈথিলী ভাষায় রচিত। (১) বিদ্যাপতি ঠাকুরের পারিজাত-হরণ ও রুক্মিণীহরণ, (২) কবিলালের গৌরী-পরিণয়, (৩) হর্ষনাথের উষাহরণ এবং (৪) ভানুনাথের প্রভাবতীহরণ, মৈথিলী ভাষার উল্লেখযোগ্য অপ্রকাশিত নাটক।* দ্বারবঙ্গের মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক লেখক চন্দ্রঝা 'মিথিলা ভাষা রামায়ণ' রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাদ্রী আন্টোনিও কর্ত্তৃক ছিকাছিকি ভাষায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।†

(১) শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বিদ্যাপতি কৃত পদাবলী' ও 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ', শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রণীত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' ও বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' দ্রষ্টব্য।

* Vide Introduction to the Maithili Dialect. Part I. p. XV.

† Vide Grierson's Introduction to Maithili Grammar, P. XV.

মৈথিলী হিন্দীরই অপভ্রংশ। অতএব হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করিলে মৈথিলী অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ভাষাবিৎ গ্রিয়ার্সন সাহেব মৈথিলী-ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া মিথিলাবাসীর ও বঙ্গবাসীর, ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।* তাঁহার সম্পাদিত বিখ্যাত Linguistic survey of India নামক পুস্তকেও মৈথিলী-ভাষার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে; ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক সাহেব তাঁহার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধে মৈথিলী-ভাষার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদবধি একাধিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মৈথিলী ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মৈথিলী ভাষার ব্যাকরণ-প্রণেতাদিগের মধ্যে ডাঃ হর্ণলী, ডাক্তার গ্রিয়ার্সন ও রেভাঃ কেলগ্ প্রধান। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মৈথিলী ভাষার ক্রিয়াপদ সাধিতে সাহস করি না। তাহার ব্যাকরণের খুটিনাটি আলোচনা করিয়া, পাঠকগণের ধৈর্য্য শক্তির পরীক্ষা করিতেও ইচ্ছা করি না। কিন্তু যাঁহারা বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা মৈথিলী-ভাষার পরিচয় লইতে অনুরোধ করি।

উদাহরণ

পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে মৈথিলী-ভাষার কয়েকটি নমুনা প্রদত্ত হইল,—

১। বিশুদ্ধ মৈথিলী (দারভাঙ্গা জিলা)

গদ্য

"কোনো মনুখ্যকে দুই বেটা রহৈহিঁ। ওহিসে ছোটকা বাপসোঁ কহলকৈহিঁ যে ঔ বাবু ধন সম্পত্তিমেঁজো হমর হিস্‌সা হোহে সে হামারা দীঅ। তখন ও হুনকা অপন সম্পত্তি বাটি দেলথিন্হি।"

—'এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তাহাদের কনিষ্ঠ পিতাকে বলিল, 'বাবা আমার অংশে ধনসম্পত্তি যাহা কিছু (প্রাপ্য) হয় আমাকে দাও।' তখন (তাহাতে) তিনি তাহার সম্পত্তি অংশমত ভাগ করিয়া দিলেন।'

* Maithili Dialect, published by the Asiatic Society, 1909.

পত্র

শ্রীচম্পাবতী নিকট দুরমিল ঝা লিখিত পত্র—

"স্বস্তি চিরঞ্জীবি চম্পাবতীকে আশীখ, (১) আগা (২) লছুমনক (৩) জুবানী ও চীঠীসোঁ অহাঁ সভক (৪) কুশল ছেম (৫) বুঝল, মন আনন্দ ভেল (৬)। শ্রীলছমী দেবিকেঁ নেনা (৭) ছোট ছৈন্হি, (৮) জেহিসোঁ ওকর পরবরস হোইক সে অবশ্য কর্ত্তব্য থীক। হুনিকা (৯) মাতা নহি, অহেঁ (১০) লোকনিক ভরোস তেল কুঁড়ক (১১) নিগাহ রহৈন্হি। এক বকস পঠাওল অছি, সে অহাঁক হেতু, অহাঁ রাখব, বকসমেঁ ছৌ ৬৲ টা রূপেআ ও আধা আধা সভ মসালা লছমী দাইকেঁ অপনে চুপ্পে দেবৈন্হি, দুইটা রূপেআ মসালা বকস অপনে রাখব, অহেঁ লৈ ভেজাওল অছি। কোনো বাতক (১২) মনমেঁ অন্দেশা (১৩) মতি (১৪) রাখো, জে চীজ বস্তু সভ অহাঁক লোকসান ভেল অছি, সে সভ অহাঁক পহুঁচত তখন হম নিশ্চিন্ত হৈব।

"শ্রীসমধীজীকে প্রণাম আগা ভোলা সাহুকেঁ বহুত দিন ভেলৈন্হি অহাঁ লোকনি তকাজা (১৫) নহিঁ করৈছিঐন্হি। হমার বেটা জেহন ছথি সে খুব জনৈছী জল্দী রূপেআ অসুল করূ নহিঁ ত পীছূ পছতাএব (১৭)। বখারীক (১৮) ধান সভ বেঁচ লেলন্হি। এহ বেকুফ কেঁ কহাঁতক নীক অকিন হৈতৈক।

"শ্রীবাবু গোবিন্দকেঁ আশীখ।"

পদ্য। দারভাঙ্গা।

(মনবোধ কৃত হরিবংশ)

"কতো এক দিবস জখন বিতি গেল,
হরি পুনু হথগর গোড়গর ভেল।
সে কোন ঠাম জতৈ নহিঁ জাথি,
কৈ বেরি অগঁনহুঁ সো বহরাথি।
দ্বার উপর সোঁ ধরি ধরি আনি,
হরখিত হসথি জসোমতি রানি।
কৌসল চলথি মারি কহুঁ চান,
জসোমতি কাঁ ভেল জিবক জঞ্জাল।
কৈ বেরি আগি হাথ সোঁ ছীনু,
কৈ বেরি পকলাহ তকলা বীনু।"

—'কিছুদিন অতীত হইলে যখন (বালক) হরি হস্তপদ চালনা করিতে শিখিল, এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে শিশু যাইত না, কতবারই না সে আঙ্গিনার বাহিরে চলিয়া যাইত। বাহিরের দ্বার হইতে বারবার তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিয়া মা যশোমতি কতই হর্ষিত হইতেন। সুচৌর ন্যায় কি কৌশলে বালক বাহির হইয়া পলাইয়া যাইত, (দুরন্ত) শিশু মা যশোদার জীবনের জঞ্জালস্বরূপ হইয়া উঠিল। কয়বার তিনি (মা) তাহার হাত হইতে আগুন কাড়িয়া লইলেন, তিনি অন্যমনস্ক থাকিলে কতবারই বা সে হাত পুড়াইয়া ফেলিল।'

নিম্নশ্রেণীর ভাষা দ্বারভাঙ্গা।

"এক গোটাকেঁ দুই বেটা রহৈক। ছোটকা বেটা বাপসোঁ কহলকৈ ক জে বাপ হমর হিস্সা সভ ধন দৈ দহ। বাপ ওকর হিস্সা ধন বাটি দেলকৈক। থোরেক দিনপর ছোটকা বেটা অপন সভ ধন একট্ঠা কৈ বড়ী দূর দেস চলি গেল।" ইত্যাদি।

২। দক্ষিণী মৈথিলী

গদ্য (মধিপুরা, ভাগলপুর)

"কোএ আদমাকে দুই বেটা ছলৈ। ছোটকা বেটা অপনা বাপকে কহলকৈ কি হম্মর হিস্সা ধন বাঁএট দেঅ। ওকর বাপ দূনো ভাইকে ধন বাঁইট দেলকৈ। কুছ দিন ক বাদ ছোটকা বেটা ধন সব জমা করি কৈ কোঁ কোনো আউর মুলুককে চলৈ দেলকৈ।" ইত্যাদি।

অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

ঐ (বেগুসরাই, মুঙ্গের)

"কোই গাঁবমেঁ এগো জোলহা রহৈ। জব ও কমায়ত কমায়ত দশ পনদরহ রূপেআ জোর কৈলক, তব অপনা মৌগীসেঁ কহলক কি—হে রূপেআ সেঁ হম ভৈঁস মোল লেঁব আর ওকর দূধ দহীঁ খাএব।" ইত্যাদি।

—'এক গ্রামে একজন 'জোলা' বাস করিত। সে যখন দশ পনর টাকা রোজগার করিয়া জমাইল, তখন তাহার

(১) আশীর্ব্বাদ (২) আগে (৩) লক্ষ্মণের (৪) সকলের (৫) ক্ষেমমঙ্গল (৬) হইল (৭) বালিকা (৮) আছে, হয় (৯) উহার (১০) তুমি (১১) ভাণ্ড (১২) কথার (১৩) চিন্তা-উদ্বেগ (১৪) না (১৫) তাগাদা (১৬) আমার ছেলে যেমন তাত জানই (১৭) দুঃখ করিতে হইবে (১৮) গোলার।

স্ত্রী (জুলনী) কে বলিল 'এই টাকা দিয়া আমি মহিষ কিনিব ও তাহার দুধ দই খাইব।' ইত্যাদি।

৩। পূর্ব্ব মৈথিলী

গদ্য (পূর্ণিয়া)

"এক গোটাকে দুই বেটা রহৈল। ওকরামেঁসে ছোটকা বাপসে কহলক কি হো বাপ হমর বখরা জে সমপত হোয়েতহ্ হমরা দে দা। তখনী উ ওকরা সমপত বাঁট দেলকৈ।" ইত্যাদি।

পদ্য (গান)

"কথী বিনু মুহমা মলিন ভেল সখিআ হে,
কথী বিনু দেহিআরে ঝমরী গেল না।
পানবিনু মুহমাঁরে মলিন ভেল সখিআ হে,
পিআ বিনু দেহিআরে ঝমরী গেল না।
গরজী উঠল ঘনঘোর সখিয়া হে,
সেহো দেখি ডরল জিব মোর সখিয়া হে।
ধরবৈ জোগিনি কর ভেস মেঁ সখিয়া হে,
করবৈ মেঁ জিআকে উদেস সখিআ হে।"

—'হে সখি, কিসের অভাবে তোমার মুখ মলিন (হইয়াছে)? কিসের অভাবে(ই বা) তোমার শরীর শীর্ণ (হইয়াছে)?

'হে সখি, পান বিনা আমার মুখ মলিন হইয়াছে, প্রিয়-বিরহে আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে। হে সখি, ঘনঘোর (আকাশে) গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার প্রাণে আতঙ্ক হইয়াছে। হে সখি, আমি যোগিনীর বেশ ধারণ করিয়া প্রিয়তমের অন্বেষণ করিব।'

৪। ছিকাছিকি (দক্ষিণ ভাগলপুর)

"এক আদমীকে দূ বেটা রহৈ। ওকরামেঁসে ছোটকা আপ নো বাপসে কহলকৈ কি বাবু জে ধন হমরা বখরামেঁ হোয় উ হমরা দৈ দে। একরা পর উ অপনো ধন ওকর বাঁটী দেলকৈ।" ইত্যাদি।

৫। পশ্চিম মৈথিলী (উত্তর মজঃফরপুর)

"এক কেহু আদমীকেঁ দূ লড়িকা রহৈ। ওহ মেঁসে ছোটকা বাপসে কহলক, হো বাবূ, ধন সর্ব্বস মেঁ সে জে হম্মর হিস্‌সা বখরা হোয় সে হমরা কে দে দ।" ইত্যাদি।

ঐ (মধ্য ও দক্ষিণ মজঃফরপুর)

"এক জনাকে দুগো বেটা রহলইন। ওকরামে যে ছোটকা আপনা বাবূসে কহলকইন হো বাবূ ধনকে বখরা জে কুছ হমর হো সে দ। তো উ ওকনী কে বাঁট দেলকইন।" ইত্যাদি।

৬। জোলাবোলী

"কোনো আদমীকে দো বেটা ছলৈন। ওই মেঁ সে ছোটকা বেটা অপনা বাপসে কহলন হে বাপ ধন মেঁ সে জে হম্মর হিস্‌সা হোয় সে হমরা বাঁট দত্র তব উ উনকা অপ্পন ধন বাঁট দেলখিন।" ইত্যাদি।

নিম্নে আরো কতকগুলি আদর্শ মৈথিলীর নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"কামিনি করএ (১) সিনানে (২) হেরইতে হৃদএ (৩)
হরএ পচবানে (৪)।
চিকুর (৫) গলএ জলধারা, মুখসসি ডরজনি (৬) রোঅএ
অঁধারা। (৭)
তিতল বসন তনু লাগ্ (৮) মুনিহুঁক (৯) মানস মনমথ
জাগ্। (১০)
কুচজুগ চারু চকেবা, নিঅকুল আনি মিলাওল দেবা।
তে সঁকাএ ভুজ পাসে, বাঁধি ধরিঅ ঘন উড়ত
অকাসে। (১২)
ভনহি বিদ্যাপতিভানে সুপুরুখ কবহুঁন হোএ
নদানে।" (১৩)
—বিদ্যাপতি

"এহি অবসর পহুমিলন জেহন সুখ
জকরহিঁ হোএ সে জান।"

—'এই অবসরে (সময়ে) প্রিয়সহ মিলনের যে সুখ, (তাহা) যাহার হইয়াছে, সেই জানে।'

"গোবিঁদ গমন সুনল ব্রজনারি
জে ছলি জতএ বৈসলি হিঅ হারি।"

---

(১) বাঙ্গলা সংস্করণে 'করই', (২) ঐ সিনান, (৩) পাঠান্তর হানল, (৪) বাং পাঁচবাণ, (৫) বাং চিকুরে, (৬) বাং ভয়েকিয়ে (৭) বসুমতী 'আন্ধিয়ারা', (৮) বাং লাগি, (৯) বাং মুনিহক, (১০) বাং জাগি, (১১) বাং শঙ্কা, (১২) বাং বান্ধি ধয়ল জমু উড়ব তরাসে। (১৩) বাং পাঠান্তর—'কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে, গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে।'

—'গোবিন্দ ছলনা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ ভগ্ন হৃদয় হইয়া বসিয়া পড়িল।'

"কে তোঁ থিকাহ করুর কুল হানি,
বিমু পরিচয় নহিঁ দেব পিঢ়ি পানি।
থিকই পথুকজন রাজ কুমার।
ধনিক বিওগ ভরমি সংসার।"

—'কে আপনি কোন কুলে (জন্ম)? বিনা পরিচয়ে আমি জল পীড়ি দিই না। আমি পথিক জন, রাজপুত (রাজকুমার), প্রিয়া (ধনী)-বিরহে (সারা) সংসারে ভ্রমণ করিতেছি।'

"বিদ্যাপতি এহ গাওল, সজনী গে,
ইথিক নবরস রীতী।
বয়স জুগল সমচিত থিক সজনী গে,
দুহ মন পরম হুলাসে।"

—'বিদ্যাপতি এই গীত গাহিয়াছে, হে সজনি, নবরসের এই রীতি। তাহাদের বয়স তুল্য, চিত্ত সমান, হে সজনি! দুজনের মনে (ই) পরম উল্লাস।'

"চাননসোঁ অনুরাগল থিকইন্‌হি
ভসম চঢ়াবথি অঙ্গ।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনি ঐ মনাইনি
থিকাহ দিগম্বর ভঙ্গ।"

—'ইঁহার চন্দনে চর্চ্চিত (দেহ) অঙ্গে ভস্মলেপন করা হইয়াছে। বিদ্যাপতি কহে, শুনহে, ও মেনা, ইনি (স্বয়ং মহেশ) দিগম্বর-ভঙ্গি।'

"বিদ্যাপতি ভন ইহো ন নিক থিক,
জগভরি করাইছি নিন্দা।"

—'বিদ্যাপতি কহে, ইহাও ঠিক নহে, জগৎশুদ্ধ লোকে নিন্দা করিতেছে।'

"ভনহিঁ বিদ্যাপতি তৌ পয় জীবে
অধর সুধারস জোঁ পয় পীবে।"

—'বিদ্যাপতি কহে, (মধুকর) ততদিন জীবিত থাকিবে, যতদিন (সে) তোমার সুধারস পান করিবে।'

"জুগ জুগ জিবথু বসথু লথ কোস
হমর অভাগ হুনক কোন দোস?"

—'(আমা হইতে) লক্ষ ক্রোশ দূরে থাকিয়াও (সে) যুগ যুগ বাঁচিয়া থাকুক। আমার(ই) দুর্ভাগ্য, তার কোন্ দোষ?'

"এহন বএস তেজি পহু পরদেস গেল
কুসুম পিউল মকরন্দা।"

—'প্রভু আমাকে এমন (নবীন) বয়সে ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেল এবং (তথায়) কুসুমের মধু পান করিল!'

"জখনহিঁ লেল হরি কঞ্চু অছোরি,
কত পরজুগুতি কয়ল অঙ্গ মোরি।"

—'হরি যখন আমার কাঁচুলি ছিনাইয়া নিল, আমি অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া কতই না কৌশল করিলাম।'

"হরি হরি কয় পুনি উঠতি ধরণি ধরি
রৈনি গমাবয় জাগী।"

—'হরি হরি বলিয়া সে পুনঃ ধরণী ধরিয়া উঠিতেছে, সে (সারা) নিশি জাগিয়া কাটায়।'

"পহিল বচন উতরো নহিঁ দেলি,
নৈন কটাছ সঁ জিব হরি লেলি।"

—'আমার প্রথম কথার উত্তর দিলে না, (কিন্তু) নয়নের কটাক্ষে (আমার) প্রাণ হরণ করিলে।'

"তোহর বদন সন চাঁদ হোঅথি নহিঁ,
জৈও জতন বিহ (বিধি) দেনা।"

—'(পূর্ণ) শশী তোমার বদনের সমতুল্য নয়, বিধি যতই যত্ন করুন না কেন।'

"কৈ বেরি কাটি বনাওল নবকায়
তৈও তুলিত নহিঁ ভেলা।"

—'(তিনি) কতবার (চাঁদ) কাটিয়া নূতন করিয়া গড়িলেন, (কিন্তু) তথাপি (তোমার সৌন্দর্য্যের) তুল্য হইল না।'

বিদ্যাপতির নিম্নোদ্ধৃত পদত্রয় বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত মৈথিলীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।*

"শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষির বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না
নিধন বলিয়া পিয়া না কলু যতন
এবে হম জানল পিয়া বড় ধন"

* গ্রিয়ার্সন সাহেবের Linguistic Survey of India, Maithili Dialect, বিদ্যাপতির পদাবলী এবং Behar Peasant Life হইতে উল্লিখিত উদাহরণ সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে।

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥"

এবং

"কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়লু
না বুঝলু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন গেলি॥"

উপসংহার

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, এইবার আমাদিগকে বাধ্য হইয়া উপসংহার করিতে হইল। মৈথিলী ভাষার সহিত আমাদের মাতৃভাষার কিরূপ নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিষয় হইবে। বাঙ্গালীর চরিত্রের সহিত মৈথিলী চরিত্রের সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা 'Stalwart Bhojpuri' * বা 'বীর পঞ্জাবীগণ' বিচার করিবেন। অযোধ্যার ক্ষত্রিয়দিগের চক্ষে তাঁহাদের রাজরাজেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুরের দেশের লোকেরা কিরূপ উন্নত ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়,—

"গৃহে শূরা রণে ভীতাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ।
কুলো হভিমানিনো যূয়ম্ মিথিলায়াম্ ভবিষ্যথ॥"

—এই অভিসম্পাতের ফলে, মিথিলা আজ মেকলে-বর্ণিত বাঙ্গালীর আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাহাই হউক, অতীতের শিলালিপি অনুসন্ধান করিলেও বোধ হয়, মৈথিলী জাতির শৌর্য্যবীর্য্যসাহসের সবিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজর্ষি জনক তপশ্চর্য্যায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং একটি কিশোর কুমারকে একখানি জীর্ণ ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে তাঁহার করে প্রাণের দুহিতা অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। লিচ্ছাবীদিগের পরাক্রমবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, মগধরাজকে জাহ্নবীতীরে দারুময় দুর্গ রচনা করিতে হইয়াছিল, সত্য বটে; কিন্তু উত্তরকালে মিথিলাবাসীরা অসি ছাড়িয়া মসী ধরিয়াছিল এবং ধনুক ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইয়া ব্রজলীলা ও কৃষ্ণ-প্রেমের রসে বিভোর হইয়াছিল। বীর জটায়ু ও খগপতির স্বরে কোকিল, পাপিয়া ও কলহংসের কোমলতা ও মাধুর্য্য সম্ভবে না। মৈথিলী পদাবলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে, স্তরে স্তরে, উচ্চাঙ্গের মধুর ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে। মিথিলার মৎস্য-ভোজন ও প্রাচীন-ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমের ঢেউ আসিয়া বঙ্গের নিম্নভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। বিদ্যাপতির রাধা-প্রেমের বিরহ-বিলাপের ধ্বনি শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ 'রা—রা' বলিয়া শ্রীবাস-আঙ্গিনায় অচেতন হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। নবনীতের ন্যায় কোমল কণ্ঠে মকরন্দগন্ধে ভুবন আমোদিত করিয়া, শ্যামল বঙ্গের গহনকুঞ্জ মুখরিত করিয়া, আবার কি কোন পিকরাজ তেমনি মধুর কলস্বনে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিবে না?—

'না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ,
না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥

* * *

'কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া পরশনে॥ †'

* গ্রিয়ার্সন সাহেবের উক্তি।

† বৃন্দাবনে তমালবনে বন্ধুবর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথের সুধাকণ্ঠের সঙ্গীতের ঝঙ্কার এখনও কাণে বাজিতেছে। এ প্রবন্ধ পরোক্ষে তাঁহারই পরিণতি।

ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত

[শ্রীজলধর সেন]

আমি যখন আমাদের গ্রামের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন সতীশ আমাদের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয়। তাহার বাড়ী ছিল, পাবনা জেলায় ; সেখান হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে আমাদের গ্রামে তাহার মামার বাড়ীতে থাকিয়া পড়া আরম্ভ করে। সতীশের মামা হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুগলীর কলেক্টরীতে কাজ করিতেন ; তিনি স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া, হুগলীতেই থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, নিঃসন্তান বিধবা ভগিনী ও একটি চাকর থাকিত। সতীশের মাসীমা ও দিদিমা তাহাকে যথেষ্ট আদরযত্ন করিতেন।

সতীশ খুব চালাক চতুর ছিল। কিন্তু পড়াশুনায় তাহার তেমন মন ছিল না ; সে খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদই ভালবাসিত। বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক ছিল না ; সুতরাং সতীশ অনেকটা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল ; দিদিমা ও মাসীমা তাহাকে পড়াশুনার জন্য তেমন তাড়নাও করিতেন না।

আমাদের শ্রেণীতে যে কয়েকজন ছাত্র ছিল, তাহার মধ্যে সতীশের সহিতই আমার বিশেষ ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সে পড়াশুনায় অমনোযোগ করিত, দিনরাত সুধু আমোদ-আহ্লাদ করিয়াই বেড়াইত ; সকলে তাহাকে ভাল ছেলে বলিয়া প্রশংসাও করিত না। তবুও আমি তাহাকে ভালবাসিতাম ; মধ্যে মধ্যে পড়ার জন্য তাহাকে তাড়নাও করিতাম ; দুই চারিটা সদুপদেশও দিতাম। সে অন্যের কথায় মোটেই কর্ণপাত করিত না ; কিন্তু আমি যখন বিষণ্নমুখে গম্ভীরভাবে তাহাকে কোন কথা বলিতাম, তখন সে আমার কথা নীরবে শুনিত, কোন দিন আমার কোন কথার প্রতিবাদ করিত না। আমি যেমন তাহাকে ভালবাসিতাম, সেও আমাকে তেমনই ভালবাসিত। কিন্তু তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। লেখাপড়া শিখিয়া বিদ্বান হইবে, দশজনের একজন হইবে, এ ইচ্ছাই যেন তাহার ছিল না। সে কোন রকমে দিন কাটাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইত। আমার অভিভাবকগণ এবং স্কুলের মাষ্টার মহাশয়েরাও অনেক সময়ে আমাকে সতীশের সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিতেন। তাহার সঙ্গে থাকিয়া যে আমার পড়াশুনার ক্ষতি হইত, অনেক সময় যে তাহার সহিত গল্পেই কাটিয়া যাইত, তাহা আমিও বুঝিতাম ; কিন্তু সতীশের কেমনই একটা আকর্ষণী-শক্তি ছিল যে, আমি অনেক চেষ্টা, অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিতাম না। একটু অবকাশ পাইলেই তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতাম। সেও সময়ে অসময়ে আমাদের বাড়ীতে আসিত এবং দুই তিন ঘণ্টা নানা গল্প করিয়া আমার পড়ার ব্যাঘাত জন্মাইত। আমাদের দুইজনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল ; তবুও কি জানি কেন, আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম।

এই ভাবে আমরা দুই বৎসর কাটাইয়াছিলাম। দুই বৎসর পরে যে বার আমরা দুইজনেই প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম, সেই বার সতীশের মামা তাহাকে হুগলীতে লইয়া গেলেন। সতীশ ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল ; কিন্তু আমাদের গ্রামে থাকিলে সে কিছুতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না বুঝিয়া, তাহার মামা তাহাকে হুগলীতে লইয়া গেলেন। এক বৎসরের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল।

সেই বৎসরের শেষে আমি আমাদের গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম, সতীশও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে পরীক্ষা দিল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। গেজেটে দেখিলাম, সতীশ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমিও পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম।

এই সময়ে সতীশ একদিন আমাদের গ্রামে আসিল। অনেকদিন পরে তাহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। সতীশ বলিল, সে যদি বৃত্তি পায়, তাহা হইলে সে

কলিকাতায় পড়িবে, বৃত্তি না পাইলে তাহাকে অগত্যা মামার নিকট থাকিয়াই হুগলী কলেজে পড়িতে হইবে। আমিও কলিকাতায় পড়াই স্থির করিয়াছিলাম। তিন চারিদিন মামার বাড়ীতে থাকিয়া সতীশ বাড়ী চলিয়া গেল।

সতীশ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিল। সে আমাকে পত্র লিখিল যে, সে কলিকাতায় জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্‌ কলেজে পড়া স্থিরক রিয়াছে। আমিও তাহাকে জানাইলাম যে,আমিও জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্‌ কলেজেই পড়িব; কিন্তু তাহার দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারিলাম না;—সে আমাকে তাহার সহিত এক ছাত্রাবাসে থাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। আমাদের অবস্থা ভাল নহে, আমি দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলাম; তাই আমি কলেজে পড়িবার সাহস করিয়াছিলাম। কিন্তু দশ টাকায় ত কলিকাতার খরচ চলে না; বাড়ী হইতে প্রতি মাসে খরচের টাকা পাওয়াও অসম্ভব; সুতরাং আমাকে কলিকাতায় কোন এক আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। আমার এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া সতীশ দুঃখিত হইল; কিন্তু সেও ত বড়মানুষের ছেলে নহে যে, আমার কলিকাতার খরচ সে চালাইতে পারে।

কলিকাতায় যাইয়া আমি কুমারটুলীতে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া জেনারেল এসেম্‌ব্লিজে পড়া আরম্ভ করিলাম; সতীশ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে একটা মেসে রহিল। এক বৎসর পরে আবার আমরা দুই বন্ধুতে মিলিত হইলাম। কলেজে আমরা এক সঙ্গে বসি, কলেজ হইতে এক সঙ্গে বাহির হই; প্রায় সর্ব্বদাই সতীশের মেসে যাই; সে আমাকে বিশেষ যত্ন করে; অনেক বিষয়ে সাহায্যও করিতে লাগিল। বড় সুখে, বড় আনন্দে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল।

চারি পাঁচ মাস পরে একদিন সতীশ আমাকে বলিল যে, সে বাসা পরিবর্ত্তন করিবে। তাহার পিতার ইচ্ছা যে, সে শ্যামবাজারে তাহার পিতার এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকে। তাহার নিকট শুনিলাম যে, তাহার পিতৃ-বন্ধু মারা গিয়াছেন; তাঁহাদের পরিবারের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। সতীশ যদি সেখানে থাকে, তাহার পিতা তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সেই দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করিতে পারেন। এমন কে আছে যে, এ প্রস্তাব অস্বীকার করিতে পারে; আমি সতীশকে সেই বাড়ীতে যাইতেই পরামর্শ দিলাম; সতীশও সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, তাহার পিতাকে পত্র লিখিল এবং এক সপ্তাহ পরেই শ্যামবাজারের সেই বিপন্ন ব্রাহ্মণ-গৃহে গমন করিল।

সতীশ যখন গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে থাকিত, তখন প্রায়ই কলেজের ছুটীর পর আমি তাহার সহিত তাহাদের ছাত্রাবাসে যাইতাম। কিন্তু শ্যামবাজার অনেক দূর, আমার পথেও নহে; সুতরাং আমি সতীশের এই নূতন বাসায় খুব কমই যাইতাম।

যাঁহার বাড়ীতে সতীশ বাস করিত, তিনি একটি নাবালক পুত্র, বিধবা পত্নী ও একটি যুবতী বিধবা কন্যা রাখিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন। বাড়ীটি তাঁহার নিজের। আমি যখন এই বাড়ীতে সতীশের নিকট যাইতাম,—তখন বাড়ীর নিয়তলের কয়েকটি ঘর ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। উপরে যে চারি পাঁচটি ঘর ছিল, তাহাতেই বাড়ীর সকলে বাস করিতেন। সতীশের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, গৃহ-স্বামী এই বাড়ীটি ব্যতীত নগদ টাকা বা অন্য কোন বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। বাড়ীর কিয়দংশ ভাড়া দিয়া যাহা পাওয়া যাইত, এবং সতীশ মাসে মাসে যাহা দিত, তাহার দ্বারাই কোন রকমে তাহাদের সংসার চলিয়া যাইত। সতীশের নানা অসুবিধা হইত; কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করিত না; একটি বিপন্ন ব্রাহ্মণ-পরিবারকে যে সে সাহায্য করিতে পারিতেছে, ইহাই মনে করিয়া সে হৃষ্টচিত্তে সমস্ত অসুবিধা সহ্য করিত। অন্ততঃ সতীশের কথাবার্ত্তায় ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই ভাবে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। ইহারই মধ্যে আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সতীশ পড়াশুনায় তেমন মনোযোগ দিতেছে না, সর্ব্বদাই সে যেন কি ভাবে; তাহাকে অনেক সময়ই অন্যমনস্ক দেখি। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, তাহার শরীর তেমন ভাল নাই। কোন প্রকার ঔষধ খাইতে বলিলেও সে তাহা গ্রাহ্য করে না। ক্রমে সে কলেজ কামাই করিতে আরম্ভ করিল; দুই তিন দিন কলেজে আসে, তাহার পরই হয় ত দুই দিন অনুপস্থিত। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই একই উত্তর—"শরীর ভাল নাই, একটু একটু জ্বর হয়।" অথচ তাহার জন্য কোন ব্যবস্থাও সে করে না।

মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাঁচ ছয় দিন সে কলেজে আসিল না। দুই তিন দিন যখন তাহাকে কলেজে দেখিলাম না, তখন তাহার সংবাদ লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলাম; কিন্তু নানা কাজের জন্য আরও দুই তিন দিন তাহার বাসায় যাওয়া হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যে যখন সে একদিনও কলেজে আসিল না, তখন সেই রবিবার অপরাহ্ণকালে আমি তাহার বাসায় গেলাম। বাড়ীর বাহিরের দ্বার বন্ধ ছিল; আমি দ্বারের কড়া নাড়িতেই গৃহস্বামীর নাবালক পুত্রটি দ্বার খুলিয়া দিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সুরেশ, সতীশ বাসায় আছে ?"

আমাকে দেখিয়া এবং আমার কথা শুনিয়া সে ছেলে মানুষ, কি জানি কেন, বেশ একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তিনি চলে গেছেন ?"

আমি বলিলাম—"চলে গেছেন ? কোথায় গেছেন ? বাড়ী ? তোমাদের কিছু ব'লে যান নাই ?"

সুরেশ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহাদের বাড়ীর ঝি আসিয়া বলিল—"কি জানি বাবু, সে কোথায় গেছে! তোমাদেরই বন্ধু, তোমরা খুঁজে দেখগে! আয় খোকা ভিতরে আয়।" এই বলিয়া সুরেশকে ভিতরে টানিয়া লইয়া ঝি অতি দ্রুত দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আমি ভাবিলাম, এ কি ব্যাপার! আরও কতদিন ত এ বাড়ীতে আসিয়াছি; আমি ইঁহাদের নিতান্ত অপরিচিতও নহি। পূর্ব্বে যখনই আসিয়াছি, তখনই বাড়ীর সকলে বিশেষ আদরযত্ন করিয়াছেন। আর আজ এ কি ? এ রকম অপমান ত কখনও ভোগ করি নাই। সতীশ যদি না বলিয়া কহিয়াই কোথাও চলিয়া যাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে জন্য আমার সহিত এ প্রকার রূঢ় ব্যবহারের ত কোন কারণ নাই। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হতভম্ব হইয়া দ্বারের বাহিরেই একটু দাঁড়াইয়া থাকিলাম। একবার মনে হইল, আর একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু তাহাদের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া আর কাহাকেও পুনরায় ডাকিতে ইচ্ছা হইল না। পল্লীগ্রাম হইলে না হয় পাড়া-প্রতিবেশীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম; কিন্তু এ কলিকাতা সহরে এক বাড়ীতে দুই গৃহস্থ থাকিলেও কেহ কাহারও সংবাদ রাখে না। এখানে পাশের বাড়ীতে অনুসন্ধান করিয়া কোনই লাভ নাই। তখন আর কি করিব, সেই বাড়ীর সম্মুখ হইতে রাস্তায় গেলাম। একবার বাড়ীটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু দ্বিতলের জানালায় কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সতীশ কোথায় গেল, তাহার কি হইল, তাহার ত কোন দুর্ঘটনা হয় নাই, এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর সতীশের সংবাদ জানিবার জন্য বাড়ীতে পত্র লিখিলাম। সেই পত্রের উত্তরে জানিলাম যে, সতীশের দিদি মা বা তাহার মাসীমা তাহার কোন সংবাদই রাখেন না। তাহার পরেই গ্রীষ্মের ছুটীতে যখন বাড়ী গেলাম, তখন শুনিলাম, সতীশ নিরুদ্দেশ, সে বাড়ীতে যায় নাই। এই দুই মাস তাহার পিতা অনেক স্থান অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু কোথাও তাহার উদ্দেশ পান নাই। কেন যে সে এমন ভাবে নিরুদ্দেশ হইল, তাহার কারণও কেহ জানে না। সতীশ যে এমন করিয়া পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া, নিরুদ্দেশ হইবে, এ কথা আমি কোন দিনই ভাবি নাই। প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে তাহার কথা মনে হইত; তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার কথা ভুলিয়া গেলাম; সতীশ নামে যে আমার একজন পরম বন্ধু ছিল, সে কথা কালেভদ্রে মনে হইত।

* * * *

তাহার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এ দশ বৎসরের মধ্যে আমি সতীশের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। আমার জীবনের উপর দিয়া কত বিপদ, কত কষ্ট গেল। হৃদয়ের গভীর বেদনার জ্বালায় অস্থির হইয়া আমি দেশত্যাগ করিলাম। নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে সুদূর পশ্চিম প্রদেশে হিমালয়ের বক্ষে দেরাদুনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে সকল কথা আর বলিয়া কি হইবে? সে কথা বলিবার জন্যও এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। যাহা বলিতে বসিয়াছি, যে শোকাবহ কাহিনী বর্ণনা করিতে চাহিতেছি, সেই কথাই বলি।

আমি দেরাদুনে যে বাড়ীতে থাকিতাম, তাহা ত্রিতল ছিল। সর্ব্ব নিম্নতলে গৃহস্বামী তাঁহার গরুমহিষাদি রাখিতেন; দ্বিতীয় তলে যে কয়েকটি ঘর ছিল, তাহাতেই আমরা বাস করিতাম; তৃতীয় তলে কেবল একটি ঘর

ছিল। সেখানে কেহ বাস করিত না। সেটিকে আমরা উপাসনা-গৃহ করিয়াছিলাম। সেখানে দুই তিন খানা ব্যাঘ্র ও মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত থাকিত। সে ঘরের অন্যান্য আসবাবের মধ্যে একটি মৃণ্ময় আধারে একটি তৈলের প্রদীপ, একটি ধূপদান ও কিঞ্চিৎ ধূপ থাকিত। এতদ্ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই সে ঘরে থাকিত না। কেহ এই বর্ণনা শুনিয়া মনে করিবেন না যে, আমি প্রতিদিন এই ঘরে বসিয়া উপাসনা করিতাম। আমার সঙ্গী মাষ্টারজি থিয়জফিষ্ট ছিলেন; তিনি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর এই ঘরে বসিতেন। আমি সে ঘরে অতি কমই যাইতাম। ভগবানের নাম করিবার মত কি তখন আমার অবস্থা ছিল? আমি কি তখন মনস্থির করিয়া বসিতে পারিতাম? মাষ্টারজির বিশেষ আগ্রহে এক আধ দিন সন্ধ্যার পর তাঁহার উপাসনা, জপতপ শেষ হইলে, আমি সেই ঘরে যাইতাম এবং তাঁহার সম্মুখে বসিয়া যাহা মনে আসিত, তাহাই গান করিতাম। আমাদের এই বাসাটা সাধু-সন্ন্যাসীর একটা আড্ডা ছিল। দেরাদুনে সাধুসন্ন্যাসী আসিলে অনেকেই কৃপা করিয়া আমাদের এই প্রবাসগৃহে পদধূলি প্রদান করিতেন এবং কেহ কেহ বা আতিথ্য-গ্রহণ করিতেন। সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের এই ত্রিতলস্থ গৃহে স্থান দিতাম। পরলোকগত পূজনীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় তখন অনেক সময় দেরাদুনে থাকিতেন। তিনি আমাদের এই গৃহ দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—"ওহে, তোমাদের এই বাড়ীটা বেশ! ইহার নীচের তলায় পশ্বালয়, দ্বিতীয় তলে লোকালয়, আর তৃতীয় তলে দেবালয়।" এই বাড়ীতে আমরা দুইটি জীব বাস করিতাম—আমাদের মাষ্টারজি, আর আমি। আমিও তখন একজন মাষ্টারজি। যখন দেরাদুনে থাকিতাম, তখন আমাদের মাষ্টারজির স্কুলে আমিও মাষ্টারজি-গিরি করিতাম —সময় কাটান ত চাই!

এই সময় এক রবিবার প্রাতঃকালে আমি এ পাড়া, সে পাড়া, এ বাড়ী, সে বাড়ী টো টো করিয়া বেলা প্রায় এগারটার সময় বাসায় ফিরিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িতেছি, এমন সময় মাষ্টারজি বলিলেন—"আজ আমাদের বাড়ীতে একজন বাঙ্গালী সাধু আসিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাঙ্গালী সাধু! কৈ কোথায়?"

মাষ্টারজি বলিলেন—"সাধু কি আপনার মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া চায়ের শ্রাদ্ধ করিবেন, না পরনিন্দার আসর জমকাইবেন। সাধু সাধুর স্থানেই আছেন।" আমি বুঝিতে পারিলাম, সাধু আমাদের দেবালয়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন।

আমি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সাধুদর্শনের জন্য আমাদের ত্রিতলস্থিত দেবালয়ে গমন করিলাম। সেখানে যাইয়া দেখি, সন্ন্যাসী মহাশয়ের আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা—তিনি নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে জাগাইয়া আলাপ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে মনে করিয়া, নীচে আমাদের লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে তখনই নামিয়া আসিতে দেখিয়া মাষ্টারজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাইতে যাইতেই চলিয়া আসিলেন যে? সাধুকে মনে ধরিল না নাকি?"

আমি বলিলাম—"আপনার সাধু যে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন, আলাপ করিবার উপায় দেখিলাম না।"

মাষ্টারজি বলিলেন "আপনিও যেমন! এই অসময়ে বুঝি কেহ ঘুমায়। সাধু হয় ত ধ্যানে নিবিষ্ট আছেন।"

আমি বলিলাম—"কি জানি মশাই, আগা গোড়া কম্বল ঢাকা দিয়া চৌদ্দ পোয়া হইয়া ধ্যান করিতে ত বড় একটা দেখি নাই।"

মাষ্টারজি বলিলেন—"একটু সাড়া দিলেই পারিতেন।"

আমি বলিলাম—"তার দরকার বোধ করিলাম না। সাধুসন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে এলিয়ে গিয়েছি মশাই! যাক্, ক্ষুধার জ্বালা ধরিলে সাধুর আপনা হইতেই ধ্যানভঙ্গ হইবে; তখনই আলাপ করা যাইবে।"

তাহার পর আমরা স্নানাদি শেষ করিলাম। একাধারে ভৃত্য ও পাচক দেবানন্দ সংবাদ দিল যে, থানা প্রস্তুত। মাষ্টারজি তখন দেবানন্দকে সাধুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমরা তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় রহিলাম।

একটু পরেই সাধু নীচে নামিয়া আসিলেন। সাধুর বয়স উনত্রিশ ত্রিশ বৎসর হইবে; গৌরবর্ণ পুরুষ, তবে শীতাতপে তাঁহার চেহারা মলিন হইয়া গিয়াছে; মাথায় দীর্ঘ কেশ, দুই চারিটি জটাও বাধিয়াছে, দাড়ি আছে। সাধু আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া আমাকে দেখিয়াই স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার গতিশক্তি

লোপ হইল। তাঁহার বদনমণ্ডলে মহা বিস্ময়ের ভাব প্রকটিত হইল। আমি তাঁহার এই ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু কেন তাঁহার এপ্রকার ভাব-পরিবর্ত্তন হইল, তাহা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

সাধু ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি —তুমি এখানে! আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

আমি সাধুকে চিনিতেই পারি নাই। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আর একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম; কিন্তু কোথাও কখন যে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহা ত মোটেই স্মরণ করিতে পারিলাম না।

সাধু বুঝিতে পারিলেন যে, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। তিনি তখন অগ্রসর হইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন; তাহার পর অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "ভাই জলধর, এই দশ বৎসরের মধ্যেই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ—আমাকে চিনিতে পারিতেছ না! আমি—আমি সতীশ!"

সতীশ! সতীশ!—যে সতীশকে আজ দশ বৎসর হইল হারাইয়াছি,—যে সতীশকে দশ বৎসর পূর্ব্বে কত খুঁজিয়াছি,—যে সতীশের জন্য তখন মধ্যে মধ্যে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিত, সেই সতীশ! সেই সতীশ এতকাল পরে—এই দীর্ঘ দশ বৎসর পরে কি না অকস্মাৎ আমারই হিমালয়-ক্রোড়-স্থিত প্রবাস-ভবনে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

আমি তখন সতীশকে দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ করিলাম; আনন্দে আমি এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে সময়ে একটি কথাও আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কোথায় সেই সুদূর বাঙ্গালা দেশের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী আমি—আর সতীশ; আর কোথায় এই হিমালয় ক্রোড়স্থ দেরাদুন! কবে সেই ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ, আর আজ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ! এতদিন পরে সতীশের সহিত সাক্ষাৎ!

আমাকে কোন কথা বলিতে না দেখিয়া সতীশ বলিল—"আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই পাহাড়ের মধ্যে তুমি! তোমাকে যে এখানে দেখিব, এ কথা যে আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। তুমি ত ভাই, আমাকে চিনিতেই পার নাই; আমি কিন্তু তোমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছিলাম।"

এইবার আমি কথা কহিলাম; বলিলাম—"সত্যই তোমার চেহারা ভয়ানক বদ্‌লে গিয়েছে। যারা দশ বছর আগে তোমাকে দেখেছে, তারা এখন দেখ্‌লে তোমাকে চিন্‌তেই পারবে না। তুমি একেবারে আর একজন হ'য়ে গিয়েছ। সতীশ! অ্যাঁ—আমাদের সতীশ!"

মাষ্টারজি দূরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের এই অপ্রত্যাশিত মিলন দেখিতেছিলেন। তিনি এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। এখন তিনি বলিলেন, "আপনারা দেখিতেছি, পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু! হঠাৎ দেখা হওয়া খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। তা, সে সব এখন থাক্; চলুন আহার করা যাক্। পাখী যখন আপনি এসে ধরা দিয়েছে, তখন সারাদিন রাত্রি কথা বল্‌বার সময় পাওয়া যাবে।"

মাষ্টারজির আদেশক্রমে আমরা আহারে উপবিষ্ট হইলাম। আহার করিতে করিতেই আমি সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা সতীশ, কথা নাই বার্ত্তা নাই, বলা নাই কওয়া নাই, তুমি হঠাৎ এমনভাবে নিরুদ্দেশ হলে কেন? আর সন্ন্যাসী হয়েই বা এমন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"

আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া সতীশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে আমার কথার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার ভাব দেখিয়া মাষ্টারজি বলিলেন, "খাবার সময় খেতেই হয়, আর বাজে কথা বল্‌তে হয়। খেয়ে দেয়ে নিরিবিলি ব'সে কথা বল্‌বেন।"

মাষ্টারজির এই কথা শুনিয়া সতীশ যেন অব্যাহতি লাভ করিল; কিন্তু সে ভাল করিয়া আহার করিতেও পারিল না। আমাকে দেখিয়া অবধিই সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। আমি আর কোন কথা বলিলাম না। আহার শেষ করিয়াই সতীশ উপরে আমাদের দেবালয়ে চলিয়া গেল; আমি একটু পরেই তাহার নিকট গেলাম। যাইয়া দেখি, সতীশ শুইয়া পড়িয়াছে। এবার ত আর সাধু নহে যে, নিদ্রা বা ধ্যানভঙ্গ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিব,—এবার যে আমাদের সতীশ!

আমি দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সতীশকে ডাকিলাম। সতীশ আমার ডাক শুনিয়াই উঠিয়া বসিল; আমি তাহার নিকট উপবেশন করিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই সতীশ বলিল, "ভাই,

আমাকে তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না; আমি তোমাকে কিছুই বলিব না। ইহাতে যদি সম্মত হও, তাহা হইলে তোমাদের এখানে দুই একদিন থাকিতে পারি; নতুবা আমি এখনই বাহির হইয়া পড়িব।"

আমি বলিলাম, "সে কি কথা? তুমি এখনই কোথায় যাইবে? তোমাকে ত আমি ছাড়িয়া দিতেছি না। এতকাল পরে যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিতেছ; বেশ, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তা হ'লে ত তোমার কোন আপত্তি নেই। আমার কথা ত তুমি শুনবে?"

সতীশ কাতরবচনে বলিল, "তোমার কথাও আমার শুনে কাজ নেই, আমার কথাও তোমার শুনে কাজ নেই। যে দিন গিয়েছে, তা গিয়েছে।" এই বলিয়াই সতীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমি বলিলাম, "তুমি ত সন্ন্যাসী; আমিও একরকম তাই। তবে তোমার মত ভেক ধরিতে পারি নাই, সে ইচ্ছাও নাই। যাক্, সে সব কথা যাক্। পূর্ব্বের কথা জিজ্ঞাসা করছিনে; আজ তুমি কোথা থেকে এলে?"

সতীশ বলিল, "হরিদ্বার থেকে বেরিয়ে মনে হ'ল, একবার দেরাদুন হয়ে যমুনোত্রীর দিকে যাবো। এখানে এসে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম; এর মধ্যে তোমাদের বাসার ঐ বাবুটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ব'লেই হয় ত আমি এখানে আসতে সম্মত হয়েছিলাম, নইলে আমি গৃহস্থের বাড়ীতে মোটেই যাই না। ভাই, আর একটা কথা এখনই ব'লে রাখি। সারাদিন তোমার এখানে থাকতে রাজি আছি; কিন্তু সন্ধ্যা হলেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

আমি বলিলাম—"কেন?"

সতীশ বলিল—"তা আমি তোমাকে বল্‌ব না। আমি রাত্রিতে লোকালয়ে বাস করি না" এই বলিয়া সতীশ কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া গেল, তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল, তাহার দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হইল।—আমি তাহার ভাবগতি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "আমাদের বাড়ীতে থাক্‌লে তোমার সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হবে মনে ক'রে কি তুমি সন্ধ্যার সময় যেতে চাচ্ছ। দেখ, আমাদের এ দেবালয় অতি নির্জ্জন স্থান; এখানে কেহই থাকে না; কেহই তোমাকে বিরক্ত কর্‌তে আসবে না। তুমি এখানে বসে নিশ্চিন্তমনে সাধনভজন, যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পার; তোমার কোন অসুবিধাই হবে না।"

সতীশ পূর্ব্ববৎ কাতর স্বরে বলিল—"না, না, সে সব কিছু নয়, সে সব কিছু নয়। কথা এই যে, আমি রাত্রিতে লোকালয়ে থাকি না।"

আমি বলিলাম—"বেশ ত, আমাদের এটা ত লোকালয় নয়—এটা যে দেবালয়। এখানে থাক্‌তে তোমার আপত্তি কি? না, তোমাকে আমি ছাড়ছি না। তুমি ঐ ব'লে বেরিয়ে যাবে, আর আসবে না।"

সতীশ বলিল—"না ভাই, আজ সন্ধ্যার সময় যাবো, আবার কা'ল সকালে আসবই। তোমার সঙ্গে কি ছলনা করতে পারি।"

আমি বলিলাম—"একবার করেছিলে ভাই! আমাকে একটা কথাও না ব'লে চলে এসেছিলে।"

সতীশ আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার পর বলিল—"না, আর তা হবে না। আমার ভাই, ঘুম পাচ্ছে। আমি রাত্রিতে ঘুমোতে পারি না, দিনেই ঘুমাই।"

আমি বলিলাম—"তা হ'লে আমি নীচে যাই, তুমি একটু ঘুমোও। কিন্তু আমাকে না ব'লে তুমি চলে যেও না। তোমার সঙ্গে কত সুখদুঃখের কথা বল্‌তে আছে।"

সতীশ মলিনমুখে বলিল, "আর সুখদুঃখ!" এই বলিয়াই সে শয়ন করিল; আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

নীচে নামিয়া আমি কোন কাজেই মনঃ-সংযোগ করিতে পারিলাম না। সুধু মনে হইতে লাগিল—এই সেই সতীশ! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কি অভাবনীয় ব্যাপার! সে কোন কথাই বলিতে চায় না—আমাকেও না। যে সতীশ আমার পরম বন্ধু ছিল, এখন আমি তাহার পর হইয়া গিয়াছি। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলেই যেন বাঁচে। এতদিন পরে দেখা হইল—এই হিমালয়ের মধ্যে দেখা হইল; অথচ আমি কেন এখানে আসিয়াছি, কি করিতেছি, আমার

দেশের খবর, আমার নিজের কোন কথা,—কিছুই শুনিবার জন্য, কিছুই জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ নাই। নিজের কথাও সে বলিবে না। এ কি পরিবর্ত্তন! দশ বৎসরে মানুষ কি এমন বদল হইয়া যায়? কৈ, আমার ত কিছুই হয় নাই। আমি কি কম কষ্ট, কম যন্ত্রণা পাইয়াছি—পাইতেছি। কিন্তু তাতে ত আমার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই—আমি যেমন তেমনই আছি। সব ছাড়িয়া আসিয়াছি—অথচ কিছুই ত ছাড়িতে পারি নাই। এখনও ত সেই ছায়ায় ঢাকা, পাখী-ডাকা পল্লীভবনের কথা মনে হইলে সেখানে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে;—এখনও শতদিক হইতে শত গ্রন্থি আমাকে আটক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; সে সকলের মায়া ত একটুও কাটাইতে পারি নাই। আর সতীশ—বাড়ীতে তাহার বাপ আছে, মা আছে, ভাই ও ভগিনী আছে, কত আত্মীয়স্বজন আছে। তাহাদের কাহারও কথা কি তাহার একবারও মনে হয় না! এ কি মানুষ! বসিয়া বসিয়া এই সকল কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিছুই ভাল লাগিল না। তখন একখানি বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। অন্য সময় হইলে পথে বাহির হইয়া পড়িতাম; কিন্তু আজ তাহা পারিলাম না; কারণ আমার অনুপস্থিতি সময়ে সতীশ যদি চলিয়া যায়—আর যদি না আসে। কিছুক্ষণ পড়িবার পরই শুনিতে পাইলাম দেবালয়ে গান হইতেছে—সতীশই গান করিতেছে। আমি তখন পা টিপিয়া টিপিয়া ত্রিতলে যাইবার সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম এবং দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। সতীশ গায়িতেছে,—

'ভোলা মন, কি করিতে কি করিলি
        সুধা ব'লে গরল খেলি।
সংসারে সোণার খনি, পরশমণি
        রতনমণি না চিনিলি;
কি ব'লে অবহেলে, সোণা ফেলে,
        আঁচলে কাচ বেঁধে নিলি।'

গানের এই একটা অন্তরাই সে বার বার গায়িতে লাগল; আমিও অতৃপ্ত হৃদয়ে গানটি শুনিতে লাগিলাম। সতীশ গায়িতে পারিত; তাহার গান দশ বৎসর পূর্ব্বেও শুনিয়াছি; কিন্তু এমন প্রাণ খুলিয়া, এমন সব ভুলিয়া তন্ময় হইয়া গান করিতে কখনও শুনি নাই।

একটু পরেই সতীশ চুপ করিল। আমি তখন ধীরে ধীরে দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলাম—'সতীশ, তুমি ঘুমাও নাই?"

সতীশ বলিল—"না, ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘুম হইল না। তুমি আমার সব ওলটপালট করিয়া দিয়াছ। আগে জানিলে তোমার এখানে আসিতাম না।"

আমি বলিলাম—"তুমি কি ইচ্ছে ক'রে এসেচ? যাঁর আন্‌বার দরকার হয়েছিল, তিনিই তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছেন।"

সতীশ বলিল—"বোসো ভাই! আমার আজ ভাল লাগ্‌ছে না। তোমার সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হ'ল; তোমার সঙ্গেও দুটো কথা বল্‌তে ইচ্ছা করছে না। আমি এখনই বেরিয়ে পড়ি?"

আমি বলিলাম—"তুমি কোথায় যাবে?"

সতীশ বলিল—"এই বন-জঙ্গলের দিকে, লোকালয়ের বাহিরে।"

আমি বলিলাম—"লোকালয় দেখে তোমার এত ভয় কেন?" আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া সতীশ শিহরিয়া উঠিল; তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে পাগলের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি! বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা, এমন নরক-ভোগ কারও কখন হয় নাই। বড় পাপের বড় শাস্তি।"

আমি বলিলাম—"সতীশ, আমি তোমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমাকে তোমার কষ্টের কথা, তোমার যন্ত্রণার কথা, তোমার বেদনার কথা বলিবে না ভাই! দুঃখকষ্টের কথা অন্যের কাছে বল্‌লে বেদনা অনেকটা কমে যায়, তা কি তুমি জান না?"

সতীশ বলিল, "না, না,—আমার কথা তোমাকে বল্‌তে পারব না—কাউকেই না—কাউকেই না—কোন দিন না। কখনও না।" এই বলিয়া সতীশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রায় দশ মিনিট পরে সতীশ মুখ তুলিয়া আমার' দিকে

চাহিয়া বলিল, "তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। বেলা গেল, আমি এখন উঠি।"

আমি বলিলাম, "নিতান্তই তুমি যাবে? কা'ল সকালে আবার আসবে, প্রতিজ্ঞা কর।"

সতীশ একটা ভীষণ হাসির সহিত বলিল, "প্রতিজ্ঞা —প্রতিজ্ঞা! এ কথা আবার তুমি কোথায় শিখ্‌লে। এ কথা আবার তোমাকে কে বলিল? প্রতিজ্ঞা—না, না, প্রতিজ্ঞা আর করছি নে—আর না। আমি যাই। আমি ব'লে যাচ্ছি, কা'ল আবার তোমার কাছে আস্‌ব। যে কয়দিন ভাল লাগে, তোমার কাছে থাক্‌ব। ওগো বল্‌ছি,—আমি থাক্‌ব।" এই বলিয়াই সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর তাহার কম্বলখানি গায়ে জড়াইয়া সে সিঁড়ির নিকট গেল;—তাহার সঙ্গে আর কোন দ্রব্য ছিল না।

সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া সে বলিল, "ভাই, তুমি মনে কিছু কোরো না। তোমার সে সতীশ আর নাই; এ তার প্রেতাত্মা! বুঝেছ ভাই, প্রেতাত্মা—প্রেতাত্মা!" এই বলিয়া সে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল; সে হাসি শুনিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল;—সে ত হাসি নহে; আমার মনে হইল, পিশাচের চীৎকার! তাহার পরই সে দুম দুম করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহার অনুসরণ করিতে পারিলাম না—তখন ইচ্ছাও হইল না।

সতীশ যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল, পরদিন বেলা আটটার সময় সে ফিরিয়া আসিল এবং বরাবর দেবালয়ে যাইয়া, তাহার সেই কম্বলখানি দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিল। সে দেবালয়ে যাওয়ার একটু পরেই উপরে যাইয়া আমি তাহাকে তদবস্থায় দেখিলাম। তখন তাহাকে বিরক্ত করা অকর্ত্তব্য মনে করিরা নীচে নামিয়া আসিলাম।

আহারাদি প্রস্তুত হইলে তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল; সে নীরবে আহার করিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"সতীশ, আমি ত এখন স্কুলে চলিলাম। চারিটার পরই আসিব। আমি না এলে তুমি বাহির হইও না। আজ যে তোমার সঙ্গে মোটেই কথা হ'ল না।"

সতীশ আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "চারটা পর্য্যন্ত আমি শুয়েই থাক্‌ব। আর যদি চলেই যাই, তা হ'লেও আজকার মত ঠিক ফিরে আস্‌ব। তোমাকে না ব'লে আমি এখান থেকে চলে যাবো না।"

উপর্য্যুপরি তিন দিন সতীশ সমস্ত দিন আমাদের দেবালয়ে ঘুমায়, আর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া যায়। কোথায় যায়, কি করে, জিজ্ঞাসা করিলে এমন মলিনমুখে, এমন কাতরনয়নে চায় যে, কথাটা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবার উপায় থাকে না।

চারি দিনের দিন স্থির করিলাম যে, সতীশ কি করে, কোথায় যায়, দেখিতে হইবে। রাত্রিতে বনে জঙ্গলে যাইতে আমারও তেমন ভয় ছিল না। তখন বৈশাখ মাস, রাত্রিতে শীতও তেমন প্রবল ছিল না। সে দিন আমি একটু সকালে সকালেই স্কুল হইতে চলিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া দেখি, সতীশ দেবালয়ে নিদ্রা যাইতেছে। আমি নীচে বসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সতীশ অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন বেশী ঘুমাইল। সে যখন জাগিয়া উঠিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। ইহাতে আমার একটু সুবিধা হইল; কারণ সে যদি বেলা থাকিতে বাহির হইত, তাহা হইলে তাহার অনুসরণ করা সুবিধাজনক হইত না।

আমি প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিলাম। সতীশ যখন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, আমি তখন তাহার অনুসরণ করিলাম।

আমি মনে করিয়াছিলাম, সে হয় ত সহরের পশ্চিম দিকে টপকেশ্বরের দিকে যাইবে; কিন্তু বাহির হইয়া দেখি, সে আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়া যে পথ পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। আমিও একটু দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আমাদের বাসা হইতে পূর্ব্ব দিকে কিছু দুর গেলেই রিচপানা নদী। এ নদীতে সকল সময় জল থাকে না। যখন পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হয়, তখন এই নদীতে ঢল নামে, তাহার পর আবার নদীগর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়; তখন জুতা পায়ে দিয়া নদী পার হওয়া যায়।

সতীশ ধীরে ধীরে সেই নদীর তীরে উপস্থিত হইল। আমি মনে করিলাম, হয় ত সে নদী-তীরে বসিয়া রাত্রি কাটাইবে। কিন্তু সে নদীর তীরে বসিল না, নদীর মধ্যে নামিয়া গেল। তখন অন্ধকার হইয়াছে; কিন্তু সে

অন্ধকার এত গভীর নহে যে, নিকটের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সতীশ নদীর মধ্যে নামিলে আমিও অগত্যা নদীর মধ্যে নামিলাম। নদীর মধ্যেই একস্থানে কয়েকখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া ছিল। সতীশ তাহারই একখানির উপর বসিল। আমি কি করি; একটু দূরে বালুকারাশির উপরই চাপিয়া বসিলাম। দাঁড়াইয়া থাকিলে পাছে সতীশ আমাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমাকে বসিয়া পড়িতে হইল।

এই ভাবে প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। সতীশ সেই প্রস্তরখণ্ডের উপরই বসিয়া রহিল। সে জপ-তপ করিতেছিল কি না, তাহা আমি অন্ধকারে দেখিতে পাইলাম না। আধঘণ্টা পরে হঠাৎ সে একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া আমি ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। এমন আর্ত্তনাদ আমি কখনও শুনি নাই—আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। আমি তখন কি করিব, তাহা প্রথমে ভাবিয়াই পাইলাম না; আমি ভয়ে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে সময়ে সতীশের নিকট উপস্থিত হইবার শক্তিও আমার ছিল না।

সতীশ সেই বিকট চীৎকার করিয়াই চুপ করিল—আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইল। আমি তখন একটু যেন সাহস পাইলাম। একবার মনে করিলাম, সতীশের নিকট উপস্থিত হই; কিন্তু পরক্ষণেই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। সতীশ কি করে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা চলিয়া গেল, সতীশের কোন সাড়াই পাইলাম না। তখন আমার মনে হইল, হয়ত সতীশ ভয়ে চীৎকার করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এই কথা মনে হইবা মাত্রই আমি সতীশের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু দুই তিন পদ যাইতে না যাইতেই সতীশ পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল; এবার তাহার কথা বেশ শুনিতে ও বুঝিতে পারিলাম। সতীশ চীৎকার করিয়া বলিল—"ছেড়ে দাও—ওগো ছেড়ে দাও।" তাহার পরেই আবার সে চুপ করিল। আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না—আমার পা দুইখানিতে কে যেন দশ মণ লোহা বাঁধিয়া দিল। বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে একাকী অনেক সময় ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক বিনিদ্র রজনী পর্ব্বত-গহ্বরে একাকী কাটাইয়াছি, অনেক জনশূন্য স্থানে গভীর অন্ধকারে বৃক্ষমূলে রাত্রি কাটাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে ত কোন দিন হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু আজ সতীশের কার্য্য দেখিয়া, তাহার বিকট আর্ত্তনাদ শুনিয়া, সত্যসত্যই আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। একবার মনে হইল, আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই, বাসায় ফিরিয়া যাই; আবার মনে হইল, সতীশের নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু এখন তাহার যে অবস্থা, তাহাতে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে ভয় হইল,—সে ত এখন প্রকৃতিস্থ নাই। অথচ এমন অবস্থায় থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

সেই সময় সতীশ পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল—"রক্ষা কর—বাঁচাও।" এবার আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার ভয়-ডর তখন আর রহিল না—আমার মনে হইল, বড়ই বিপন্ন হইয়া, সতীশ কাহারও আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছে। আমি তখন এক দৌড়ে সতীশের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভয় নাই—আমি আসিয়াছি।" আমি দেখিলাম—সতীশ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে; আমার মনে হইল, তাহার সংজ্ঞা-লোপের মত হইয়াছে।

আমি সতীশকে একেবারে আমার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলাম; সতীশ তখনও কাঁপিতেছিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল; আমি যে তাহাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছি, তাহাও বোধ হয় সে বুঝিতে পারে নাই। আমিও আর কথা বলিতে পারিলাম না।

একটু পরেই সতীশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কে, কে? কে তুমি? তুমি কে? ছাড়—ছাড়! কে তুমি?"

আমি বলিলাম—"ভয় নাই সতীশ, আমি আসিয়াছি।"

সতীশ বলিল—"তুমি—তুমি—কে তুমি? তুমি ত সে নও—তোমাকে ত আর কোন দিন দেখি নাই। কে তুমি?"

আমি বলিলাম—"সতীশ, তোমার কি হইয়াছে? তুমি অমন করিতেছ কেন? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?"

আমার এই কথা শুনিয়া সতীশের জ্ঞানসঞ্চার হইল;

সে বলিল—"তুমি এসেছ!—কেন ভাই, তুমি আমার এ নরকযন্ত্রণা দেখ্‌তে এলে। কেন তুমি এলে ভাই!" বড় কাতরভাবে, বড়ই মর্ম্মভেদী করুণস্বরে সতীশ এই কয়েকটি কথা বলিল।

আমি বলিলাম—"সতীশ, তোমার কি হইয়াছে? তুমি অমন করিতেছ কেন? ভয় কি, আমি যে তোমার কাছে রহিয়াছি।"

সতীশ তখন অতি কাতরবচনে বলিল—"ভাই, আজ আট বৎসর আমি ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি—আট বৎসর—এক দিন দুই দিন নয়—আট বৎসর। এই আট বৎসর রাত্রিতে আমার নিদ্রা নাই—রাত্রিতে আমি ঘুমাইতে পারি না। সারা রাত্রি আমি এমনই করিয়া বনে জঙ্গলে চীৎকার করিয়া ফিরি। সে যে আমায় কিছুতেই ছাড়ে না—কিছুতেই না—কিছুতেই না। রাত্রি হইলেই সে আমাকে পাইয়া বসে, সারারাত কতবার কত রকমে আমাকে কষ্ট দেয়। বড় যন্ত্রণা—বড় কষ্ট!" এই বলিয়াই সতীশ পার্শ্বের অন্ধকারের মধ্যে উঠিয়া যাইতে কহিল। আমি তাহাকে জোর করিয়া বসাইলাম; বলিলাম—"কে সে? কে তোমার উপর এমন অত্যাচার করে?"

সতীশ পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিল—"কে—কে? ঐ দেখ, কে? ছাড়—ছাড়—ওগো ছাড়।" এই বলিয়া সতীশ মাটির উপর শুইয়া পড়িল। আমি তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলাম; বলিলাম—"কৈ, কে? আমি ত কাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না—এখানে ত কেউ নেই।"

সতীশ আমার কথার কোন উত্তর দিল না। সে কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"ভাই, তুমি এখানে কেন এলে? তুমি আমার কিছুই করতে পার না—কাহারও সাধ্য নাই—আমাকে উদ্ধার করে। আমি যে পাপ করিয়াছি—তাহার শাস্তি আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। কি ভীষণ শাস্তি! কি ভীষণ! কি ভয়ানক!"

আমি বলিলাম—"সতীশ, আর এখানে নয়, বাসায় চল। সেখানে গিয়ে স্থির হ'য়ে সব কথা আমাকে খুলে বল। দেখি, আমি তোমার এ যন্ত্রণার অবসান করতে পারি কি না।"

সতীশ নিরাশভাবে বলিল—"তুমি পাগল! আমার এ যন্ত্রণা আমার আজীবনের সঙ্গী—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন করিয়া যে করিতে হইবে, তাহা আমি জানিতাম না। এ রোগের ঔষধ নাই! যে দিন প্রাণ বাহির হইবে—যদি সেই দিন আমি শান্তি পাই! তা ত হবে না—আমার ত মরণ নাই। আমি মরলে প্রায়শ্চিত্ত করবে কে? তুমি ফিরে যাও ভাই! আমি রোজ রাত্রেই এ কষ্ট পাইয়া থাকি; তাই আমি রাত্রিতে লোকালয়ে থাকি না। তুমি বাসায় যাও। প্রাতঃকালে তোমার বাসায় যাইব। তুমি যাও।"

আমি বলিলাম—"তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি কি ক'রে যাই। আমি যেতে পারব না। আমি—"

আমার কথায় বাধা দিয়া সতীশ বলিল—"থেকে কি করবে? তাকে কেউ তাড়াতে পারবে না। সে আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। তুমি যাও; তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।"

আমি বলিলাম—"সতীশ, তোমার যন্ত্রণার কথা না শুনে আমি এখান থেকে নড়ব না।"

সতীশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তুমি বাসায় যাও। আমি বল্‌ছি, কা'ল তোমাকে সব কথা বল্‌ব। তুমি যদি থাক, তাহা হইলে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না; তুমি আমাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। আমি ঠিক কথা বল্‌ছি। যদি আমার পাপের কাহিনী শুন্‌তে চাও, তবে আজ তুমি ফিরে যাও; কা'ল তোমাকে সব বল্‌ব। যে কথা কাউকে কোন দিন বলি নাই, সে কথা তোমাকে বল্‌ব—স্বীকার করছি তোমাকে বল্‌ব। আর দেরী কোরোনা ভাই! ঐ সে আস্‌ছে।" এই বলিয়াই সতীশ "বাবা গো—" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহাকে পুনরায় বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম।

একটু পরেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সতীশ বলিল—"যাও ভাই, তুমি বাসায় যাও। আর দেরী করিও না।"

আমি আর কি করিব। সতীশকে সেই অবস্থায়, সেই নদীর মধ্যে একাকী অন্ধকারে ফেলিয়া আমাকে চলিয়া আসিতে হইল। পাগলের সঙ্গে সারারাত্রি সেই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারিলাম না। আমি তাহার এই শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া

আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার নিদ্রা আসিল না; সমস্ত রাত্রি সতীশের ভীষণ যন্ত্রণার কথাই ভাবিতে লাগিলাম—তাহার সেই বিকট আর্ত্তনাদ ক্রমাগত আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। হায় হতভাগ্য সতীশ!

পরদিন যথাসময়ে সতীশ ফিরিয়া আসিল। আমি সে দিন আর স্কুলে গেলাম না; সতীশের কথা শুনিবার জন্য বাসায় থাকিলাম।

আহারান্তে সতীশ আমাকে দেবালয়ে যাইবার জন্য আহ্বান করিল। অমি বলিলাম, "আগে একটু বিশ্রাম করিয়া লও, তাহার পর আমি যাইব।"

সতীশ বলিল—"আমি আজ আর ঘুমাইব না—তুমি আমার সঙ্গে এস।"

আমি তখন তাহার সঙ্গে দেবালয়ে গেলাম এবং তাহার সম্মুখেই একখানি মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট হইলাম। সতীশ প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তাহার পর তাহার জীবনের কথা যাহা বলিল, তাহা ঠিক তাহার ভাষায় এতদিন পরে বলিতে পারিব না; যতদূর মনে আছে, চেষ্টা করিয়া বলিতেছি। সতীশ ধীরে ধীরে বলিল:—

"আমার কথা বড় বেশী নহে, অল্প কয়েকটি কথা শুনিলেই তুমি সব বুঝিতে পারিবে। আমি শ্যামবাজারে যে বাসায় ছিলাম, তাহা তোমার মনে আছে। ভট্টাচার্য্যের একটি বিধবা যুবতী কন্যা ছিল, জান। তাহাকে দেখেছ বই কি? সে বড় সুন্দরী ছিল—না? সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইল। সে সকল কথা বর্ণনা করিয়া কাজ নাই। আমি তাহাকে ক্রমাগত প্রলোভন দেখাইয়া পাপের পথে লইয়া আসিলাম। তখন আমি এমন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, অনেক দিন কলেজে পর্য্যন্ত যাইতাম না। তোমার মনে পড়ে, তুমি তার জন্য আমাকে কত বকিতে—কত উপদেশ দিতে। তখনও যদি তোমার কথা শুনিয়া সাবধান হইতাম! তা ত হোলো না। তারপর একদিন তাহাকে লইয়া পলায়ন করিলাম। একেবারে কাশীতে আসিলাম। তোমরা আমাকে খুঁজিয়া পাইলে না। বুঝেছ!" এই বলিয়া সতীশ নীরব হইল; আমিও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

একটু পরেই একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সতীশ বলিল—"তার পর আর কি? কাশীতে আমরা প্রায় এক বৎসর কাটাইলাম। তখন আমাদের সম্বলও ফুরাইয়া গেল, দিন চলা ভার হইল। আমারও হৃদয়ে কেমন একটা অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। এক একদিন মনে করিতাম, রজনীকে ফেলিয়া পলায়ন করি—আর ভাল লাগে না। কিন্তু তাহা পারিলাম না। শেষে কি হইল জান? রজনীর সন্তান সম্ভাবনা হইল। তখন আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুই জনেরই চলে না,—আবার আর একটি! আমি তখন কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না—আমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইলাম। শেষে কি করিলাম জান? একদিন বাজার হইতে বিষ কিনিয়া আনিলাম; রজনীকে আগে বিষ খাওয়াইয়া মারিব, তাহার পর আমিও সেই বিষ খাইয়া মরিব। তাহার ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া দিলাম, বিষের কার্য্য আরম্ভ হইল। সে ছটফট্ করিতে লাগিল। সে যে কি যন্ত্রণা;—আমার ভয় হইল—আমি মরিতে পারিলাম না। তাহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়াই আমি পলায়ন করিলাম।" সতীশ আবার চুপ করিল। আমারও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল না।

একটু পরেই সতীশ বলিল—"তুমি একটু বোসো; আমি নীচে থেকে আস্‌ছি।" এই বলিয়া সতীশ নীচে চলিয়া গেল; আমি তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

কৈ, সতীশ ত আসে না! আমি মনে করিয়াছিলাম সে তখনই ফিরিয়া আসিবে। দশ মিনিট অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহাকে দেখিলাম না, তখন আমার মনে হইল, সতীশ হয়ত কোথাও চলিয়া গেল। আমার কথাই ঠিক হইল। আমি নীচে আসিয়া অনুসন্ধান করিলাম, সতীশকে দেখিলাম না। রাস্তায় গেলাম, সেখানেও সতীশ নাই। তাহার পর তাহার কত অনুসন্ধান করিয়াছি, কত স্থানে ঘুরিয়াছি; কিন্তু সতীশকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এখনও সে বাঁচিয়া আছে কি না, কেমন করিয়া বলিব। আহা! সে যদি মরিয়া থাকে, তবে সে বাঁচিয়াছে!

দুঃখ-বরণ

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

দুর্ল্লিত, কপট, শঠ, এস গো এসো ফিরে,
এ আঁখি বরাটকেরি সম
হইয়াছে যে শুষ্কতম,
সরস কর—শীতল কর— আবার আঁখিনীরে।
ছিঁড়িয়া ফুল লুটিয়া ফল
কাঁপায়ে তুলে যমুনা জল,
ঝাঁপায়ে পড়ি কালিয়াদহে মাতায়ে তুলো দিক।
কাঁদায়ে সারা গোকুলটিরে
উঠগো উঁচু তরুর শিরে
বেতস সম কাঁপিয়া চা'ক জননা অনিমিখ।
গহন ঘন আঁধার রাতে
এসগো তুমি পাচনী হাতে,
ভাঙিয়া হৃদয়-ভাণ্ডগুলি প্রেমের দধি হর';
নিত্য নব অত্যাচারে
ফির গো তুমি গোপের দ্বারে,
যা'কিছু মোরা গড়িয়া তুলি চূর্ণ সবি কর'।
ফিরিয়া এসো নিঠুর নেয়ে,
মগ্নপ্রায় তরণী বেয়ে,
কালীন্দীরি মধ্য জলে মোদের চলো নিয়া;
তটিনী যবে ঝঞ্ঝাময়,
হাসিয়া তুমি দেখাও ভয়,
জড়ায়ে তোমা ধরিব মোরা কাঁপিলে ভয়ে হিয়া।
হৃদয়-হারা গোপিকাগণ
এস গো এস নিদয় জন,
বিড়ম্বনা চাহে গো তারা কদম্বেরি তলে;
লুকায়ে রাখ তাদের হার,
আগুলি রহ ঘরের দ্বার,
অকরুণ হে ভেটিবে তোমা অরুণ আঁখি-জলে।
দ্বন্দ্ব-দ্বিধা, লজ্জা-ভয়,
ব্যাকুলতা, এ গোকুলময়,
আনিয়া হৃদি উতলা কর অকূল পরমাদে;
দলিয়া ফুট কমল হিয়া,
অধরে মধু লহ গো পিয়া,
মৃণালগুলি লুলিত কর শিথিল অবসাদে।
কলঙ্কেরি পঙ্ক মাঝে,
যেন গো পাদপদ্ম রাজে
কালীয় ভোগ-বিষমবিষে শাসনে দাও দূরি।
পণ্ড কর সকল শ্রম,
গৃহের কাজে আনগো ভ্রম,
তোমার বাঁশী শুনিয়া যেন সকলি যায় চুরি।
ঘরের বা'র করিয়া তুমি,
মুছায়ে আঁখি নয়ন চুমি'
লুকাও পুনঃ ছলনা করি' বেতস-কাঁটা-বনে;
তোমারে যেন খুঁজিয়ে ফিরে,
হারায় ভূষণ, অঙ্গ ছিঁড়ে
অভিমানিনী পাগলিনীরা নিতি প্রমাদ গণে।
যাহার প্রতি তোমার প্রীতি,
জানিগো তার বিপদ্ নিতি,
দোলের দিনে সমর-ভূমি আবিরে তার গেহে;
তোমার নখ-দশন-ঘায়
ডরি না, হৃদি তাই যে চায়,
সোহাগ, জয়-চিহ্ন তুমি আঁকিয়া দাও দেহে।
এ কূল তুমি চূর্ণ কর;
হে শঠ মনোহ্কুল হর,
নগ্ন যেন মগ্ন রয় তোমারি প্রেম-জলে;
লজ্জা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-হারা,
রাসের রাতে পাগলপারা,
সকলি যেন সঁপিয়া দেয় নিবিড় বাহুতলে।
হে নট, শঠ, কপট চোর এস গো এস ফিরে
নীরব জড় গোকুল হায়
হলো শ্মশান মরভু প্রায়,
হে শ্যাম তারে শ্যামল কর আবার আঁখি-নীরে।

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

[মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ K. C. S. I., K. C. I. E., I. O. M.]

দ্বাদশ-পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক লণ্ডন

এই পরিচ্ছেদে আমি রাজনীতি সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি কথার আলোচনা করিব, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে যে কয়েকজন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত আমার দেখা-শুনা হইয়াছিল, তাঁহাদের কথাও বলিব। ৩১এ মে তারিখে আমি ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইণ্ডিয়া হাউসে গমন করিয়াছিলাম। মিঃ জন মর্লীর বয়স ৬৫ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁহার কার্য্যে কেমন উৎসাহ! তিনি ভারত-শাসন কার্য্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ; যে গুরুভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন; তাঁহার বাক্যে এবং কার্য্যে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, লোকটি কি অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন; এমন প্রতিভা ও শ্রী-মণ্ডিত বদন আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমার সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই তিনি ষ্টেট সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট-ভাবে স্বীকার করিলেন যে, এই অল্পদিনের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত ভারতের মহাসমিতি (Indian National Congress), বঙ্গ-বিভাগ (Partition of Bengal), লর্ড কর্জ্জনের শাসন প্রভৃতি ভারত-শাসন-সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। আমি নিজে রক্ষণশীলমতাবলম্বী; সুতরাং আমি যখন দেখিলাম যে, মিঃ মর্লী অন্যান্য র‍্যাডিকাল দলের লোকের মত কতকগুলা অযৌক্তিক কথার অবতারণা করিলেন না, তখন আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতের

লর্ড রিপণ

পরে ভারতবর্ষে অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। আমি অতীব আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমি মিঃ মর্লীর

নিকট যে প্রকার আশা করিয়াছিলাম, ভারতশাসন সম্বন্ধে কয়েকটি কার্য্যে তিনি ঠিক সেই প্রকার রাজনীতিজ্ঞতা ও মানসিক বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল যে, আমি মিঃ মর্লীর স্বভাব সম্বন্ধে যাহা ধারণা করিয়াছিলাম, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি যে, এমন কি যাঁহাদের উদ্দেশ্য ও মনের ভাব অতীব উদার, এমন লিবারেল ইংরাজেরাও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া থাকেন। ইংরাজের কাছে ভারতশাসন ব্যাপার যেন একটা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহারা

মিঃ মর্লি

ইহার কোন একটা মীমাংসার পথ দেখিতে পান না। কিন্তু ভারতশাসন ইংরাজের একটি পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম; সেই জন্য আমি বলিতে চাই যে, আমাদের শাসনব্যাপারটা দলাদলির অর্থাৎ party politicsএর বিষয় না হয়। এ কথা ঠিক যে, ভারতের জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, একটা উত্থানের ভাব ভারতে পরিদৃষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায়, যাঁহারা ভারতবর্ষে এই শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, ভারতবাসীকে তার ন্যায়সঙ্গত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সুপথে পরিচালিত করিয়া তাহার প্রসার বৃদ্ধি করা। তেমনই আবার প্রত্যেক ইংরাজেরই কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে বৃথা আশা প্রদান করিয়া উদ্বোধিত না করেন; অথবা তাঁহারা যেন এ কথা না বলেন যে, ভারতবাসীদিগকে তাঁহারা হয় ত কালে কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত স্বতন্ত্র শাসন-ক্ষমতা প্রদান করিবেন। ইহাতে ভারতবাসীর মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হইয়া থাকে; কারণ, এ প্রকার সুখ-স্বপ্নের প্রতিকূলে গভীর সাম্প্রদায়িকতা দণ্ডায়মান হইয়া যে তাহা অসম্ভব করিয়া ফেলিবে, এ কথা ভারতবাসী ক্ষণিক আনন্দ ও উত্তেজনার মোহে বিস্মৃত হইয়া থাকে। এই সকল বৃথা আশা ও আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনার জন্য বিলাতের র‍্যাডিকেল ও ব্যর্থ-মনোরথ এংলো ইণ্ডিয়ানগণই প্রধানতঃ দায়ী; কারণ, তাঁহারাই এই সকল রাজনীতির বিরুদ্ধে, অবাস্তব আশায় উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। তাহার পর, আর একটি কথাও আছে; ভারতের রাজদণ্ড যাঁহার হস্তে রহিয়াছে তিনি পশ্চিমদেশবাসী, সুতরাং তাঁহার ভারতশাসননীতি যে পশ্চিমদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের কথা নহে; তাহা হওয়াই খানিকটা স্বাভাবিক; কিন্তু ভারতশাসনযন্ত্রটাকে একেবারে পশ্চিম-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিলে, তাহা কিছুতেই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতে পারে না। কাণ্ডজ্ঞানহীন র‍্যাডিকাল এবং ব্যর্থ-মনোরথ এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ বিলাতের সাধারণ মহাসভায় (House of Commons) বসিয়া ভারতবাসীদিগের প্রতি যে সহানুভূতি (Sympathy) প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার ফলে শুধু যে ভারতের বক্তাগণ বক্তৃতামঞ্চে গগনভেদী চীৎকার করিয়া থাকেন, তাহা নহে; তাহার ফলেই ভারতের সর্ব্বত্র উন্মত্ততারও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে হাইড পার্কে অনেকে রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক বড় বড় বক্তৃতা করিয়া থাকেন; সেই সকল বক্তৃতাস্থানে অল্পসংখ্যক শ্রোতাও উপস্থিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু এই অল্পসংখ্যক শ্রোতৃমণ্ডলী, এই সকল আধপয়সা-কিস্মতের বক্তাদিগের বক্তৃতা শুনিয়া কোন প্রকার মত গঠন করেন না; তাঁহারা আমোদ দেখিতে বা হুজুগ করিতেই এই সকল বক্তৃতাস্থলে সমাগত হইয়া থাকেন; তাঁহারা স্বাধীনজাতি, তাই তাঁহারা এ সকল বক্তৃতাকারীকে নিরস্তও করেন না; যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলিয়া যায়; এবং সেই সকল বক্তৃতা কেহই, মনোযোগের বিষয় বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা ত তেমন নহে; আমাদের দেশের লোক স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ; তাহারা অতি সহজেই কোন

বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এ অবস্থায়, আমাদের দেশে এই প্রকার ভাবোদ্দীপক বক্তৃতায় অনেক কুফল হইয়া থাকে, এবং এইরূপ বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতার অনেক-স্থানে অপব্যবহার হইয়া থাকে। আমাদের দেশে মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা ইংরাজেরাই দান করিয়াছেন; সেই স্বাধীনতা লাভ করিয়া, ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের মারফৎ অনেকে যে সেই স্বাধীনতার পূর্ণ অপব্যবহার করিতেছেন, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া, আমার মনে হয় যে, মিঃ মর্লী ও তাঁহার ন্যায় মহানুভব লিবারালগণ আমাদিগের দেশ-শাসন সম্বন্ধে কোন প্রকার আশা দিবার সময়, বিশেষভাবে সকলদিক্ চিন্তা করিয়া দেখেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেমন পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, আমাদের ভারতবর্ষেও সেই প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে এবং তাহার চিহ্নও পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেই জন্য আমি বলিতে চাই কি, যে, আর যা হয় কর, কিন্তু পূর্ব্বদেশকে 'ঝাঁকানি' দিও না। আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি যে, লর্ড কর্জ্জনের যদি কিছু অপরাধ থাকে, তাহা তাঁহার এই 'ঝাঁকুনি'—তিনি আমাদের দেশটাকে বড়ই 'ঝাঁকুনি' দিয়াছিলেন। তাঁহার চারিদিকের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন এত অধিক এবং এত তাড়াতাড়ি, এমন একটার পর একটা, তাঁহার কার্য্যাক্ষমতা, কার্য্যতৎপরতা এত অধিক যে, আমাদের শ্লথ ও ধীর-স্থির প্রাচ্যদেশ তাহার সহিত চলিয়া উঠিতে পারে না, সে ধাক্কা সে ঝাঁকুনি সহিতে পারে না; কাজেই এদেশের লোক সে সকল পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য অধিগত করিতে পারে না। তাহার ফলে এই হইল যে, ভারতবর্ষ কখনও যে প্রকার অক্লান্তকর্ম্মী ও নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজ-প্রতিনিধি পায় নাই, তেমন একজন রাজপ্রতিনিধি পাইয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; শুধু যে চিনিতে পারিল না তাহা নহে, লর্ড কর্জ্জন যথেষ্ট লোকাপবাদ ও তর্জ্জন-গর্জ্জনই তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার লাভ করিয়া গেলেন। যাক্, সে কথায় আর কাজ নাই। হয় ত কেহ কেহ মনে করিবেন, আমি যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহা ছাড়িয়া একটু দূরে গিয়াছি; কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, এ রকমের দুই চারিটি কথা আসিয়াই পড়ে।

মিঃ মর্লীর সহিত আমার আর একদিন সাক্ষাৎ হয়, লর্ড কর্জ্জনের ভবনে। কয়েকজন ইংরাজ রাজনৈতিক মহাশয়, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট ও এংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকদিগের সহিত আমার দেখা-সাক্ষাতের জন্য লর্ড কর্জ্জন তাঁহার ভবনে একটা জলযোগের আয়োজন করেন। লর্ড ল্যান্সডাউন ও লর্ড এলগিন, কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকায়, সেই সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেদিন মিঃ মর্লী ও লর্ড কর্জ্জন ত ছিলেনই; আমিও ছিলাম; আর ছিলেন ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ব্যাল্‌ফুর, ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলি ও সার হিউ বারনেস্; আর ছিলেন সার জন হিউয়েট
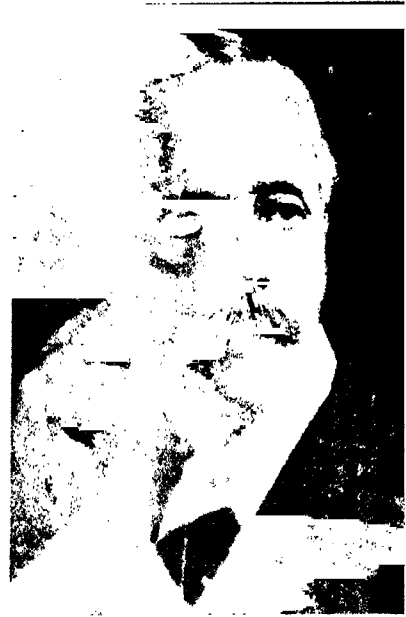
মিঃ ব্যাল্‌ফুর

ইনি পরে যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট হইয়াছিলেন। 'দি রাইট অনারেবল' মিঃ আর্থার ব্যালফুর একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ; কিন্তু তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে অতি সুন্দর প্রকৃতির লোক বলিয়া আমার বিশেষ ধারণা জন্মিয়াছিল। জলযোগের সময় তাঁহার সহিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার যে কথোপকথন হইয়া-ছিল, তাহা এখনও আমার স্পষ্ট মনে রহিয়াছে। সেই সময়ে তিনি মিঃ মর্লীর সহিত যে সকল দলাদলিমূলক রহস্যালাপ করিয়াছিলেন, এবং ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয়

তাহার যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও আমার বেশ মনে আছে।

৫ই জুলাই তারিখে মিঃ মর্লীর পার্লামেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ এলিস্ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে হাউস অব কমন্সের একটা বাদবিতণ্ডা শুনিবার জন্য উক্ত গৃহের বিশিষ্ট বিদেশী দর্শকদের মঞ্চে (Distinguished Strangers' Gallery) লইয়া গিয়াছিলেন। সে রাত্রিতে পররাষ্ট্র সচিব (Foreign Secretary) সার এড্ওয়ার্ড গ্রে মহোদয় ইজিপ্টের 'ডেনসুই' (Denshewi) ব্যাপারের পক্ষে বক্তৃতা ও বাদানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বাদানুবাদ আগাগোড়া শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারি নাই। এই বাদানুবাদ শুনিবার মত ব্যাপারই বটে। একদিকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সার হেনরী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান, মিঃ এসকুইথ, মিঃ মর্লী, মিঃ ফাউলার, মিঃ হ্যালডেন, মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ ব্রাইস প্রভৃতি বড় বড় রাজনৈতিক বীর ; আর অপর দিকে মিঃ ব্যালফুর এবং কনসার্ভেটিব-দলের অন্যান্য মহারথী। সুতরাং বাদানুবাদ যে শুনিবার মত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি প্রায় চারি ঘণ্টা ধরিয়া এই বাদানুবাদ শুনিয়াছিলাম। যদি আমার সেই সময়ে অন্য একস্থলে গমনের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে এই বাদানুবাদের শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া আমি স্থানত্যাগ করিতাম না। আইরিশ জাতীয় দলের (Irish Nationalist Party) নেতা মিঃ জন রেডমণ্ড যদিও অনেক সময়ই চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু অনেকগুলি আইরিস সদস্য এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এমন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশের কোন পল্লীর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণও তাঁহাদের মিউনিসিপাল-সভায় তাহা অপেক্ষা অধিক ভদ্রব্যবহার করিয়া থাকেন। যখন কয়েকজন এংলো-ইণ্ডিয়ান মেম্বর দণ্ডায়মান হইয়া কতকগুলি বাজে ও সর্ব্বথা অযৌক্তিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, তখন আমি সত্যসত্যই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না ; কিন্তু দেখিলাম, মিঃ মর্লী এই সকল প্রশ্নেরও উত্তর অতি গম্ভীর অথচ দৃঢ়ভাবে প্রদান করিলেন। এই সকল ব্যর্থমনোরথ এংলো-ইণ্ডিয়ান যে সকল প্রশ্ন মিঃ মর্লীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, তাঁহারা ভারতবর্ষে রাজকার্য্যে ইচ্ছানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে না পারিয়াই, দরিদ্র ভারতের হিতকামী ও শুভানুধ্যায়ী হইয়াছেন। মিঃ মর্লী এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন, তাহা আমার নিকট যথাযথ বোধ হইল ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমার ইহাও মনে হইল যে, এপ্রকার বাজে ও অনর্থক প্রশ্নের উত্তর দিয়া ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয় সময় নষ্ট না করিলেও পারিতেন ; এবং তাহাই রাজনীতি-সঙ্গত হইত। এই সকল 'ভারত-হিতৈষী' বন্ধু বঙ্গভঙ্গ ও ঐ প্রকারের একরাশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভারতের জাতীয় উন্নতির পরিপোষক বলিয়া, নিজদিগকে জাহির করিয়া,—ভারতবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী কাহাকেও কাহাকেও প্রতারিত করিতে পারেন, কিন্তু যে সকল ভারতবাসী বা বঙ্গবাসী আসল কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা এই সকল হিতৈষীর হিতৈষণার প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিয়া থাকেন। মিঃ মর্লী যে একজন উৎকৃষ্ট ও সুদক্ষ ষ্টেট সেক্রেটারী, একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু সকল দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, আমার মত রক্ষণশীল ব্যক্তির মনে হয়, রক্ষণশীল (Conservative) গবর্ণমেণ্টই ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এবং তাহাই সর্ব্বাংশে

মিঃ চর্চ্চিল্

প্রার্থনীয়। যদি এত দিন আমরা বেশ ভালই আছি, তবুও আমার মনে হয়, লিবারেল গবর্ণমেণ্ট সময় সময় ভারতের পক্ষে ভয়ানক। কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলি; লিবারেল দল বড় বড় লম্বা লম্বা প্রতিজ্ঞা করিতে, আশার কথা বলিতে বড়ই ভালবাসেন; কিন্তু কাজের সময় তাঁহারা সমস্তই তাল পাকাইয়া বসেন। ভারতবর্ষের লোক ঘুরিয়া 'হাঁ' কথা শোনা অপেক্ষা সোজাসুজি "না" শুনিতেই ভাল বাসেন। লিবারেল দল এই প্রকার ঘুরাইয়া "হাঁ" বলিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাদের সমস্ত "হাঁ" একেবারে "না" হইয়া যায়। লণ্ডনের হাউস অব কমন্‌সের বাদানুবাদ কিন্তু আমার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমি যদি আরও কিছুদিন লণ্ডনে থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আরও দুই চারিবার পার্লামেণ্ট ভবনে গমন করিতাম। হাউস অব লর্ডসের কোন অধিবেশন দেখিতে না পাইয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। আমি যে সময় লণ্ডনে ছিলাম, তখন হাউস অব লর্ডসের অতি অল্প কয়েকটি অধিবেশনই হইয়াছিল, কারণ লর্ডমহাশয়েরা তখন বিশেষ বিশেষ কমিটির (Select Committee) কার্য্যেই ব্যস্ত ছিলেন।

বোম্বাইয়ের স্যর কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর ও লেডী জাহাঙ্গীর ১১ই জুলাই তারিখে সিসিল হোটেলে যে "At Home" দিয়াছিলেন,তাহারই কথা বলিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ করিব। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রিপণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এই সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। লর্ড রিপণ যখন ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, তখন আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম; তাই এই সদাশয় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। লর্ড রিপণের ইল্‌বার্ট বিল্ কিন্তু আমার নিকট বড়ই অসৌভাগ্যজনক বলিয়া মনে হয়। তোমাদের ইচ্ছা না হয়, আমাদিগকে কিছুই দিও না; কিন্তু আমাদিগকে বৃথা আশা দিয়া প্রলুব্ধ করিও না;—কারণ তাহাতে আমাদের কোন উপকারই হয় না।

অপেক্ষা

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, B. L.]

১

যেথায় রাজ- সভায় তব
বন্দী গাহে গান,
উচ্ছ্বসিয়া স্বর্ণবীণা
যন্ত্রে উঠে তান,
ভক্ত তব বহিয়া আনে
অর্ঘ্য ভারে ভারে,
প্রার্থী যত মাগিছে পথ
প্রাসাদ পুরোধারে;
সেথায় আমি সাহস করে'
যাইনি কোন দিন,
দীর্ঘ বেলা বসিয়া আছি
হেথায় দীন হীন।

২

দিনের আলো সঙ্গে ল'য়ে
সূর্য্য ডুবে যায়,
সন্ধ্যা তারা আকাশ হ'তে
ধরার পানে চায়;
কর্ম্ম শেষে ক্লান্ত দেহে
ফিরিছে যারা ঘরে,
হেরিছে পথ- প্রান্তে মোরে
মলিন ধূলি' পরে।
থমকি থাকে কেহ বা কভু
চাহিয়া মুখ পানে,
গুপ্ত মম উচ্চ আশা
কেহ না তাহা জানে।

৩

দীনের সাথে তোমার আছে
গোপন পরিচয়—
এমন কথা বিশ্বে কে বা
করিবে প্রত্যয়!
আমিই জানি— আসিবে তুমি
আসিবে মোর পথে,
লইবে ধূলি- শয্যা হ'তে
তুলিয়া তব রথে;
কমল-কর- পরশ তব
নিমেষে সেই ক্ষণে
সঞ্চারিবে সুধার ধারা
সর্ব্ব দেহ মনে।

মৌলিক গবেষণা

কলের লেখা*

(অর্থাৎ, বাঙ্গালা লেখার কল, বা 'টাইপ্-রাইটার')

[অধ্যাপক শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

বঙ্গসাহিত্যের কোনও এক মহারথের নিকটে সেদিন একখানি চিঠি দিয়াছিলাম, (যেমন দস্তুর) বঙ্গভাষায়; তিনি কৃপা করিয়া উত্তর লিখিলেন—ইংরাজীতে; ওজুহাত দিলেন—"বাঙ্গালায় টাইপ্-রাইটার নাই, তাই ইংরেজী টাইপ্-রাইটার ব্যবহার করিতে গিয়া চিঠিখানি ইংরেজী ভাষাতেই লেখা হইল।"

তাঁহার যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে এখানে সমালোচনা করিব না। কিন্তু বাঙ্গালায় টাইপ্-রাইটার নাই, ইহা বাস্তবিক বড়ই অসুবিধাজনক। হাতের লেখার প্রতিও আমরা আজকাল বড়ই কম মনোযোগ দিয়া থাকি;—বিশেষতঃ মাতৃভাষায়। এই যে সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রিকায় এত ভুল, তাহার প্রধান কারণ হাতের লেখার অস্পষ্টতা। আমরা ক্রমশঃ সভ্যতার সমস্ত উপকরণই আত্মসাৎ করিয়াছি; এটাই বা বাকি থাকিবে কেন?

জানি না বাঙ্গালায় এই "কলের লেখা" চালাইবার জন্য কেহ কোনও রূপ চেষ্টা করিয়াছেন কি না। একথা দুই চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আমি এপর্য্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। যদি এবিষয়ে ইহার মধ্যে কোনও কিছু হইয়া থাকে, ভালই; যদি না হইয়া থাকে, এই প্রবন্ধ দ্বারা উহার সামান্য পরিমাণেও সহায়তা হইলে কৃতার্থ হইব। ইংরেজীতে টাইপ্-রাইটার সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহাতে অক্ষর-সংখ্যা ছোট-বড় ধরিয়া মোট ৫২টি; কিন্তু স্বর-ব্যঞ্জন যোগে বঙ্গীয় অক্ষরের যে নানারূপ বিকৃতি ঘটে, তাহা ইহাতে নাই। ফলতঃ বাঙ্গালা টাইপ্-রাইটার চালাইতে গেলে যথাসম্ভব অক্ষরচিহ্ন কম করিতে হইবে। অথচ 'দুই ন' স্থলে 'এক ন' 'তিন শ' স্থলে 'এক শ', স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ বিলোপ, ইত্যাদি উদ্ভট ব্যবস্থা করিয়া মাতৃভাষার বিশেষত্ব লোপ করিয়া যদি 'কলের লেখা' প্রচলিত করিতে হয়, তবে তাহাতে অন্ততঃ আমি মত দিতে পারি না।

যাহা হউক যে যে অক্ষর-চিহ্নের ব্যবহার দ্বারা কলের লেখা চলিতে পারে, সম্প্রতি তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে:—

ইংরেজী 'ইয়োষ্ট' টাইপ্-রাইটারে ৭৮টি থানা আছে—এ স্থলে মাত্র ৬০টি (একটি খালি ঘর ধরিয়া) † দেওয়া হইয়াছে; প্রয়োজন পড়িলে আরও ১৮টি সজ্জিত করা যাইতে পারে—তথাপি ইয়োষ্টের অপেক্ষা অধিকতর থানা হইবে না।

এই চিহ্নগুলি দ্বারা কাজ চালাইতে হইলে, সব্যসাচী হইতে হইবে—তা' টাইপ্-রাইটার যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের উভয় হস্তেই কাজ করিতে হয়। একটি ঘরে ঘা' দিবামাত্রই অক্ষর-চিহ্ন বসিয়া কাগজ কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইবে, কিন্তু অনেকস্থলে এক ঃ অক্ষর লিখিতে একাধিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে—তখন বাম হাত দিয়া কাগজ আবশ্যকমত সরাইয়া আনিয়া, পূর্ব্ব-মুদ্রিত চিহ্নের

---

* "কলের গান" সুন্দর চলিয়াছে; আশা করি "কলের লেখা"ও চলিতে পারে।

† এস্থলে ৬০নং ঘরটি খালি রাখা হইয়াছে। ইহাতে ঘা দিলে কাগজ সরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দটিকে পরেরটি হইতে পৃথক্ রাখিবে।

অক্ষর চিহ্ন

১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।

৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২।

১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮।

৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪।

৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।

উপরে, নীচে অথবা গায়ে অপর একটি বা ততোধিক চিহ্ন বসাইতে হইবে। কোন্ অক্ষরে কোন্ কোন্ চিহ্নের ব্যবহার করিতে হইবে, প্রদর্শিত হইতেছে।

অ = ১ + ২। আ = ১ + ২ + ৩।

ই = ৪ + ৫। ঈ = ৬ + ৫।

উ = ৭ + ৫। ঊ = ৭ + ৮ + ৫।

ঋ = ৯ + ১০ + ২। ৠ = ৯ + ১০ + ১১ + ২।

ঌ = ১২।

[দীর্ঘ ঌ বঙ্গভাষায় নাই ; প্রয়োজন পড়িলে পাশাপাশি দুইটা 'ঌ' বসাইলেই হইবে।]

এ = ১৩। ঐ = ১৩ + ৫।

ও = ১৪। ঔ = ১৪ + ৫।

ং = ১৫ + ১৬ (অথবা কেবল ১৫)। ঃ = ১৫ + ১৭।

ক = ১০ + ১৮। খ = ৯ + ১৯। গ = ৯ + ৩।

ঘ = ২০ + ১৯। ঙ = ৭ + ১৫। চ = ২১।

ছ = ২১ + ২২। জ = ৭ + ২৩। ঝ = ১০ + ২।

ঞ = ১৩ + ১৪। ট = ২৪ + ৫। ঠ = ২১ + ৫
ড = ৭। ঢ = ২৪। ণ = ২৫ + ৩।
ত = ১। থ = ২৫ + ১৯। দ = ২৬।
ধ = ২০ + ,০। ন = ২৭ + ৩। প = ২৮ + ৩।
ফ = ১৯ + ১৮। ব = ১০। ভ = ২৯।
ম = ৩০ + ৩। য = ১৯। র = ১০ + ১৭।
(এইরূপ য়, ড়, ঢ় ইত্যাদি ১৭ নং যোগে হইবে।)
ল = ৩১ + ৩। শ = ৩২ + ১। ষ = ৩৩ + ৩।
স = ৩৫ + ৩। ঃ = ৪। ক্ষ = ৩৫ + ১৮।
ৎ = ৩৬।
ক্য = ১০ + ১৮ + ৩৭। ক্র = ১৩ + ১৮, অথবা
১০ + ১৮ + ৩৭।
ক্ল = ১০ + ১৮ + ৩৯। ক = ১০ + ১৮ + ৪০।
ক্ব = ১০ + ১৮ + ৪১ ক্ম = ১০ = ১৮ + ৪২।
কঁ = ১০ + ১৮ + ৪৩।
কা = ১০ + ১৮ + ৩। কি = ৪৫ + ১০ + ১৮।
কী = ১০ + ১৮ + ৪৫। কু = ১০ + ১৮ + ৪৬।
কৃ = ১০ + ১৮ + ৪৭। কে = ৪৮ + ১০ + ১৮।
কৈ = ৪৮ + ৫ + ১০ + ১৮। কো = ৪৮ + ১০ + ১৮ + ' ।
কৌ = ৪৮ + ১০ + ১৮ + ৩ + ৫।

স্বর ব্যঞ্জনযোগে কতিপয় বিকৃতাক্ষর প্রদর্শিত হইতেছে :—

ক্ত = ১৪ + ১৮। ক্ষ্ম = ৩৫ + ২৩।
ঙ্ক = ৬ + ১৫। ক্ম = ১০ + ১৭ + ২৩।
ঙ্ক = ৯ + ১০ + ২৩। ঞ্চ = ২৫ + ১০ + ১৪।
হ্ন = ৪ + ২৩। হু = ৩১ + ২২ ইত্যাদি।

কিন্তু সমস্ত বিকৃতবর্ণ ইঁহাদ্বারা কুলাইবে না। তবে ভবিষ্যতে যদি চিহ্ন-সংখ্যা বাড়াইতে পারা যায়, তবে এ বিষয়ে অনেকটা সফলতা লাভ করা যাইতে পারিবে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে সংযুক্তবর্ণ—যেগুলির আকার অবিকৃত অথবা ঈষদ্বিকৃত হয়—তাহা লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না ; যথা—

ক্ক = ১৫ + ১০ + ১৮ (আকার 'ক' হইবে)
স্ক = ৩৫ + ১০ + ১৮। শ্চ = ৩২ + ২১।
ষ্ট = ৩৩ + ২৪ + ৫। স্ত = ৩৪ + ১ (অথবা ৩৪ + ৭ দ্বারাও চলিতে পারে।)
প্ত = ২৮ + ১ (অথবা ২৮ + ৭)
ণ্ট = ২৫ + ২৪ + ৫। ন্ত = ২৭ + ১।
ম্প = ৩০ + ২৮ + ৩। ইত্যাদি

দুই-একস্থলে সংযোগ হসন্ত-চিহ্নদ্বারাও চলিবে ; যথা—

ক্ষ্ণ = ১০ + ১৬ + ৭ + ২৩।

গণিতের সংখ্যা ও চিহ্নাদি অনায়াসে সমস্তই লিখিত হইবে—

১ = ১৮। ২ = ১২। ৩ = ১। ৪ = ৪৯। ৫ = ৫০।
৬ = ৭। ৭ = ৫১। ৮ = ২৪ + ৫২। ৯ = ১২।
১০ = ১৮ + ১৫।
+ = ৩ + ৫২। − = ৫২
× = ৫৩ + ৫৬। ÷ = ১৫ + ৫২ + ১৭।
/৹ = ৫৩ + ১৭। ৵০ = ২৫ + ৫৩ + ১৭।
৶০ = ৫৪ + ১৭। ।০ = ৩ + ১৭।
৸০ = ২৬ + ১৭। = = ৫৫ + ৫২।
( ) = ৪৮ + ৪৮ ইত্যাদি।

বিরামাদি চিহ্নগুলি যথা—

দাঁড়ি = ৩। প্রশ্নচিহ্ন = ৫৭।
কমা = ৫৯। কোটেশন = ২০ + ৫৯।

অক্ষরগুলির মাত্রা দেওয়া হয় নাই। অনেকে, হাতের-লেখায় মাত্রার ব্যবহার খুব কম করেন। যাঁহারা করেন, তাঁহারা ৫৫ নং চিহ্ন মাত্রাযুক্ত অক্ষরের মাথায় চড়াইয়া দিতে পারেন।

অনেকগুলি চিহ্ন এপ্রকার, যে ঐগুলি অপর অক্ষরের বা অক্ষর-চিহ্নের উপরে, নীচে বা পার্শ্বে বসাইতে হইবে ; এবং তদর্থে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কাগজ বাম হাত দিয়া ডান-দিকে অল্প বিস্তর সরাইতে হইবে। তবে, বাঙ্গালা টাইপ্-রাইটারের যন্ত্র যদি এরূপ বিশেষভাবে নির্ম্মিত হয়, যে চিহ্নের উপর ঘা-মারিলে কাগজ যখন বামদিকে সরিয়া যাইবে, তখন (১) এমন একটি কল থাকিবে যাহা টিপিলে কাগজ পুনশ্চ সরিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিবে ; তাহা হইলে,

---

(১) প্রয়োজন বোধ করিলে, স্বতন্ত্র দুইটি চিহ্ন '১' এবং '০'এর নিমিত্ত উদ্ভাবিত হইতে পারে। তাহা হইলে, ঘরের সংখ্যা ৬২ দাঁড়াইবে।

উপরের ও নীচের মাত্রা বা ফলা ইত্যাদি বসাইবার সুবিধা হইবে; আবার (২) আর একটি কল থাকিবে, যাহা টিপিলে, কাগজ পূর্ব্বস্থানের অর্দ্ধপথে সরিয়া আসিবে, যেন অপর অক্ষর-চিহ্নের উপর ঘা মারিলে, তাহা পূর্ব্বের অক্ষর বা চিহ্নের ঠিক্ গায়ে গিয়া লাগিয়া বসিতে পারে; তাহা হইলে, যে যে স্থানে দুই বা ততোধিক চিহ্ন দ্বারা একটি অক্ষর কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা অখণ্ড ও সুন্দর দেখাইবে।

আশা করি, কোনও 'টাইপ্-রাইটারে'র ব্যবসায়ী এই বিষয়টিতে প্রণিধান-পরায়ণ হইয়া দেশের একটি অভাব দূর করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন।*

* প্রায় সাত আট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার "রেমিংটন্ টাইপ-রাইটার কোম্পানী"র অধ্যক্ষ মিঃ A. P. Stockwellর অনুরোধে আমাদের পরম-আত্মীয় শ্রীমান্ গণদেব গাঙ্গুলী, তাঁহার পিতা স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় বেণীমাধব গাঙ্গুলী মহাশয়ের উপদেশক্রমে, বাঙ্গালা-লেখার এইরূপ একটি কল-প্রস্তুতের বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিতেছি, উক্ত কোম্পানী সম্প্রতি বাঙ্গালা-লেখার ঐরূপ কল আমদানী করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল —ভাঃ সঃ

ভারতনারীর সাধনভূমি

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

এইত আমার সাধন ভূমি এইত তপোবন,
এই খানে কর্ যা তোর সাধন, ওরে পাগল মন!
ওই যে হোথায় পথের বাঁয়ে, ঘন সবুজ গাছের ছায়ে,
শ্বশুর-কুলের কুটীরখানি বড়ই দুঃখের ধন,
প্রথম যে দিন নিয়ে দীক্ষা করতে ত্যাগের সাধন-শিক্ষা
ফেলে এলে ভাইএর আদর, বাপমায়ের যতন,
কতই কঠিন লেগেছিল এই মহা-সাধন!
এ সাধনের এম্নি ধারা, পাখীর মতন এ'ল কা'রা,
তোরই ভাই আর বোনের পারা মধুর আলাপন;
যোগা'লি তার নীবার বীজে, মায়ের মতন যত্নে নিজে,
প্রাণ-কাড়া তা'র কাকলীতে ভুল্‌লি জ্বালাতন,
এরাই দেবর ননদ এরা, যত্নে ছেলেমেয়ের সেরা,
আবদারেতে সবার বাড়া; প্রথম এই সাধন—
ছোট্ট সহজ প্রথম যোগ এই শিখায় তপোবন।
হৃদয়-নদীর স্নেহের জলে, কলসী ভরে' লীলার ছলে
কঙ্কণেতে ঝঙ্কারিয়া মধুর আবাহন,
মিটিতে তাদের তৃষ্ণাক্ষুধা, মরম-মথন-করা সুধা,
কি যতনে জীবন ভরে' কর্‌বি বিতরণ,
তাদের মুখের তৃপ্তহাসি, উদ্বেলিত শান্তিরাশি,
স্বর্গ সে তোর—মোক্ষ সে তোর, সফল আরাধন,
সাধন-ভূমি এইত নারীর, এইত তপোবন।

আমরা নারী—ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, "নিরাকারে"র সাধন উচ্চ
বুঝ্‌তে নারি "অরূপের" সে কেমন আকর্ষণ,
রূপধরে তাই 'অরূপ' এসে, "অনন্ত" ওই "সান্ত" বেশে
পতির মাঝে মিশে করেন প্রেমের সম্ভাষণ,
রাখিস্‌নে আর 'আমি' 'তুমি', ভাবিস্‌নে আর বিশ্বভূমি,
এই জোয়ারে ভাসিয়ে দে' তোর সকল আকিঞ্চন,
মৃত্যুরে জয় করে নারীর এই মহা সাধন।
হর্ষভরা বর্ষ কত, কালসাগরে হ'ল গত
প্রাঙ্গণে তোর ও কোন্ পাখীর কণ্ঠ-আলাপন?
বল্‌রে ও কোন্ সুধার বৃষ্টি, ভাসিয়ে দিল সকল সৃষ্টি
অঙ্কে ও তোর এলরে কোন্ কল্পলোকের ধন!
কোন্ সেতারের মূর্ত্ত গীতি, কোন্ স্বরগের সোহাগপ্রীতি
এ কোন্ সোণার কাঠির পরশ পেয়েছ মোর মন!
তোর আঙ্গিনায় এ'ল যে আজ গোপের বৃন্দাবন!
আমরি! আজ দেখ্‌গো চেয়ে, জগৎজোড়া ছেলেমেয়ে
বিশ্বনাথের বিশ্বে যে তোর সবাই আপন জন,
নরক-ত্রাতা ওই যে 'পুত্র', ভুলিয়ে দিল তর্কসূত্র,
ওরা, যীশুর সাধের শিশু, গোপাল পরিজন,
চাইনে ও ভাই, চাইনে স্বর্গ, চাইনে আমি চতুর্ব্বর্গ,
বল্‌গো তোরা ধন্য হোক্ এই আমার আরাধন,
স্বর্গ মোর এই—মোক্ষ মোর এই—এ মোর তপোবন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মধ্যশ্রেণীর অবস্থা ও প্রতিকার

[শ্রীনিঃ—]

বিগত মাঘ সংখ্যায় আমরা বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণীর সংখ্যা কত, * এবং তাঁহাদের কি কি অভাব, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান সংখ্যায় ঐ সকল অভাবের সম্ভব-মত কি প্রতিকার হইতে পারে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১৮৮৭ সালে, লর্ড ডফরিণের ইচ্ছা হয়, যাহাতে এদেশে Technical Education বা শিল্প-শিক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা হয়; সেই উদ্দেশে তিনি তখনকার রাজস্ব-সচিব ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবকে স্বহস্তে এইরূপ এক পত্র † লিখিয়া পাঠান ;—

My dear Westland,

Is there any body in your Office, who could make me out a list of articles (rather a minute one) which could, not only without difficulty, but with advantage, be made in India, if only the art of making them was known, that are now imported from abroad? Special mention should be made of the articles of which the raw-materials exist, either in superior quality, or in superior abundance, in India.

Yours truly
Sd/- Dufferin.

তাঁহার আদেশক্রমে একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হয়; কিন্তু সেই তালিকার নিম্নে এই নোট লিখিত হয়। "ভারতবর্ষে এই সকল দ্রব্যের মাল-মসলা (Raw materials) প্রচুর পরিমাণে এবং অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল শিল্প-দ্রব্য (Manufactured articles) সুলভে প্রস্তুত করিতে গেলে, কলের সাহায্য আবশ্যক, বড় বড় কারখানার আবশ্যক—তাহা করিতে গেলে যে মূলধন প্রয়োজন হইবে, তাহা বোম্বে ভিন্ন এ অঞ্চলে পাওয়া দুর্ঘট হইবে। সুতরাং; এরূপ শিক্ষা এদেশে পণ্ড হইতে পারে।"—যে কারণেই হৌক, এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হইল না। আর হইলেও ফলে কি হইত, বলা যায় না ; কারণ, মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে স্থাপিত Science Association যে সকল যুবককে শিল্প শিখিতে ইংলণ্ড, এমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া এ পর্য্যন্ত একটিও উল্লেখযোগ্য কারখানা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।* সম্প্রতি স্বদেশ-দুঃখ-কাতর স্বর্গীয় স্যর তারকনাথ পালিত, এবং মান্যবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষের প্রদত্ত ২৫ লক্ষ টাকায় যে University College of Science প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষা হইবে ; সুতরাং তাহার দ্বারা অল্পদিনে অর্থাৎ ১০।১৫ বৎসর মধ্যে, মধ্যশ্রেণীর অধিক লোকের

---

* মুদ্রাকরের ভ্রমে গত সংখ্যার ৩০৭ পৃষ্ঠায় ২৬শ পংক্তিতে উক্ত হইয়াছে, "মধ্যশ্রেণীর লোকই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।" ইহার পরিবর্ত্তে "সংখ্যায় কম নহে" এইরূপ পাঠ হইবে; ঐ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতেও "সংখ্যা কম নহে" এই পাঠ হইবে।

† স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত।

* মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বরাট্‌-কর্ত্তৃক স্থাপিত, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র দেব-পরিচালিত 'পটারি ওয়ার্কস্,' ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার স্থাপিত 'ট্যানারি' ও 'সোপ্ ফ্যাক্টরি,' শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী-স্থাপিত 'সোপ্-ফ্যাক্টরি,' শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ-পরিচালিত 'যশোহর চিরুণী ফ্যাক্টরি' প্রভৃতি যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি আশানুরূপ চলিতেছে কৈ?—মাননীয় টাটার 'লৌহের কারখানা' ও শ্রদ্ধেয় ডাঃ পি. সি. রায়-পরিচালিত 'বেঙ্গল্ কেমিক্যাল কোং'—মাত্র এই দুইটি কারবারই বেশ সচল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই দুইটির সহিত ঘোষজ মহাশয়ের সভার কোন বিদেশ-প্রত্যাগত কৃতীযুবক সংসৃষ্ট আছেন, কি না, জানি না।—ভাঃ সঃ।

উপার্জ্জন-উপায়ের সুবিধা হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। বরং লর্ড ডফরিণের প্রস্তাবিত শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী (Art of making them) শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, অধিক লোকের শীঘ্র শীঘ্র শিখিবার ব্যবস্থা হইতে পারিত। তবে, ডাক্তার ঘোষ ও স্যর তারক পালিতের কলেজ দ্বারা কিছুকাল পরে যে প্রচুর উপকার সাধিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—যদি ভবিষ্যতে দেশীয় ধনীরা আবশ্যক-মত মূলধন সরবরাহ করেন, অথবা যদি দেশীয়েরা নিষ্ঠাচরণে যৌথ-কারবার চালাইতে শিখে।

কিন্তু মোট কথা এই যে, Manufacturing Industryর প্রসার হইলেও তাহাতে অধিক ভদ্রলোকের সচ্ছল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, উন্নত প্রণালীতে কলকব্জা দ্বারাই অধিকাংশ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; তাহাতে কারখানার অধিকারী মূল-ধনী, ইঞ্জিনীয়র ও প্রধান বিশেষজ্ঞ (Expert)—এই কয়জনেরই সচ্ছল মত উপার্জ্জন হইতে পারে;—অবশিষ্ট লোকের মজুরা সর্ব্বত্র যে স্বল্প তাহাই থাকিবে। তাহাতে অধিকসংখ্যক মধ্যবিত্ত ভদ্র-লোকের বিশেষ সচ্ছল হইবে, মনে হয় না।

তবে, ইংরাজীতে যাহাকে Cottage Industry **কুটীর-শিল্প** বলে, অর্থাৎ নিজের নিজের অর্থে চেষ্টায় ও শিক্ষায় যে শিল্পকার্য্য চলিতে পারে, তাহারই প্রচলন হইলে, দুঃস্থ মধ্যবিত্তের অনেকের অবস্থায় উন্নতি হইতে পারে।

তবে ইহাও ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অর্থ-সাহায্য ও কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবৃত্তি সাপেক্ষ।

কারণ, নিজ নিজ সামর্থ্যে এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পকার্য্য সম্পাদিত হইলেও, তাহা য়ুরোপীয় যন্ত্র-শিল্পোৎপাদিত পণ্যের সমকক্ষ হওয়া আবশ্যক, না হইলে গুণে ও 'দর্শন-ডারি'তে নিকৃষ্ট হইলে—কেহই তাহা ক্রয় করিবে না। য়ুরোপীয় দ্রব্যের ন্যায় সুদৃশ্য অথচ সুলভ পণ্য প্রস্তুত করিতে গেলে, যন্ত্রের আবশ্যক, শিক্ষার আবশ্যক।—মধ্যশ্রেণীর সে সামর্থ্যও নাই, সে শিক্ষাও নাই। প্রতিকার-স্বরূপ **বয়ন-শিল্প** সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বস্ত্র-বয়ন জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক লোকেই তাহাতে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। যদি 'বঙ্গলক্ষ্মী'র ন্যায় বৃহৎ কলে সূতা প্রস্তুত হইয়া ক্ষুদ্র কারখানার আঞ্জাম হয়, তবে একজন ভদ্রলোক দশটি কলের তাঁত, একটি টানা-কল, এবং একটি ক্ষুদ্র 'অয়েল এঞ্জিন্' বা মোটর সাহায্যে কেবল বয়ন-কার্য্য বেশ চালাইতে পারেন। এ প্রকার ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিতেও পাঁচ ছয় হাজার টাকা ব্যয় হয়। অবশ্য মধ্যশ্রেণীর অনেকের সে মূলধনও নাই; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরে বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় বয়ন-বিদ্যা এখন সহজলভ্য হইয়াছে।

এক একটি কোম্পানী গঠনে, বা জনকয়েক ধনবান ভদ্রলোকের অর্থ-সাহায্যে, অথবা National Fund-এর যে টাকা আছে, তাহাতে, মধ্যশ্রেণীর এক একজন বয়ন-শিক্ষিত যুবককে এইরূপ এক একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া চলে।

একলক্ষ টাকা মূলধনে এইরূপ ২৫টি কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। পাঁচ-বৎসরব্যাপী কিস্তিবন্দীতে তাহার মূল্য লইলে, মাসে মাসে সুদ সমেত ২ হাজার আদায় হয়; তাহাতে আবার পাঁচ বৎসরে আরও ৩০টি কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপে দশ জন মূলধনী কারখানা-স্থাপনে মনোযোগী হইলে, ৫ বৎসরে পাঁচ ছয় শত কারখানা স্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে।

তাহার পর, কালে এই কারখানার উপযোগী এঞ্জিন, মোটর, কলের তাঁত, টানা-কল ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য একশতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। এই সকল কারখানার কার্য্যবিষয়ে, Cossipur Gun Foundry, Railway Work-shop ইত্যাদি স্থানে শিক্ষা করিয়া অনেকেরই বিশেষ পারদর্শিতা, পটুতা, এবং শিক্ষা জন্মিয়াছে। কেবল মূলধন দিয়া কারখানা-স্থাপন করিলেই চলিতে পারে।

বলা বাহুল্য, এই সূত্রে বয়ন-শিল্পের জন্য সূতা এবং লোহার কারখানার দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য, এবং কারখানা-জাত দ্রব্য বিক্রয় উপলক্ষে অনেকেরই ব্যবসায় চলিতে পারে। তদ্ভিন্ন, আরও কয়েকটি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা

প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ নহে। য়ুরোপে তৈলের জন্য এখান হইতে কোটি কোটি টাকার তিসি ও সরিষা রপ্তানী হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল-স্থাপন করিয়া তিসি-

সরিষার তৈল করিতে পারিলেও কত শত লোকের কার্য্য চলিতে পারে।

ছোট ছোট চিনির কারখানা করিলেও কতশত লোকের অন্ন হইতে পারে। এইরূপে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র-কারখানা স্থাপিত হইতে পারে।

কিন্তু যাঁহাদের অর্থ আছে, শিক্ষা আছে, প্রতিপত্তি আছে, তাঁহাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি, কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সহানুভূতি, সততা, একনিষ্ঠা দেশের লোকের প্রতি সম্প্রসারিত না হইলে এ সকল অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। তারপর,

কৃষি কথা

সম্প্রতি স্মিথনামে গবর্ণমেণ্ট Agriculture Department এর জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন যে—'ভদ্রলোকে যদি ১০০ বিঘা জমী লইয়া লোক রাখিয়া চাষ করেন, তবে মাসিক ২০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।' কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীও এইরূপ চাষের পরামর্শ দিয়াছিলেন। দেশের লোকে এতই অপদার্থ হইয়া গিয়াছে যে, জীবিকার্জ্জন বিষয়ে এই সৎপরামর্শ পাইয়া—তাহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক্—'বেঙ্গলী' ও 'সঞ্জীবনী' পত্রে লিখিয়া বেড়াইতেছেন যে, স্মিথ সাহেবের কথা একেবারেই অলীক ও ভিত্তিশূন্য; বিঘাপ্রতি বৎসরে ।।০ আনাও লাভ করা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 'বেঙ্গলী'-প্রমুখ পত্র-পরিচালকগণ এই সকল লেখককে প্রশ্রয় দিয়া লোককে অধিকতর নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম করিতেছেন।

এই সকল লেখকের জানা আবশ্যক, ধান্যের চাষ ভিন্ন আরও অনেকপ্রকার ফল, ফুল, মূল, কন্দ, আঁস, বীজ, তৈল, রঙ্, আঠা প্রভৃতি উৎপাদক অসিদ্ধ পণ্যের চাষ আছে, যাহাতে প্রতিবিঘায় বৎসরে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। বঙ্গদেশে কোটি কোটি টাকার পাটের চাষ হইয়া থাকে। পাট প্রতি বিঘায় আট-নয় মণ জন্মে। পাটের মূল্য মণ ৮।৯৲ টাকার কম নহে। তবে, পাট প্রক্ষালন সম্বন্ধে অনেক আপত্তি আছে; কিন্তু কল-কৌশল করিয়া তাহারও প্রতিকার হইতে পারে। এমন আরও ২০।২৫ প্রকার ফসলের তালিকা দিতে পারা যায়, যাহাতে প্রতি বিঘায় ৫০৲ টাকা লাভ হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে।

তবে ভদ্রলোকের চাষ সম্বন্ধে মহা

গুরুতর সমস্যা

এই যে, একত্র দুই তিন শত বিঘা উর্ব্বর জমী—এমন কি ৫০।৬০ বিঘা জমীও—একত্র পাওয়া সুকঠিন। বেশী মূল্য দিলে অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে।* কিন্তু কেবল খাজানা ও সেলামী দিয়া জমীদারের নিকট এরূপ জমী পাওয়া সুকঠিন। বেশী পরিমাণ 'পতিত' জমী, যাহা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা 'উঠিত' করিতে, বাঁধ দিতে, জলের ব্যবস্থা করিতে, জঙ্গল কাটিয়া চাষের যোগ্য করিতে, এত অধিক টাকার প্রয়োজন যে, তাহা একজন মধ্যশ্রেণী সাধারণ ভদ্রলোকের ক্ষমতার অতীত। এই সকল পতিত জমী, হয় গবর্ণমেণ্ট, নয় কোন জমীদার, বা 'জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানী'

---

* ভারতবর্ষের ভূমির পরিমাণ ১১৩, ৬৪, ৭৯,০১৫ একর বা ১৭,৭৬,৩৭৩ বর্গ মাইল। ইহার লোকসংখ্যা ২৯ কোটি ৮০ লক্ষ। তন্মধ্যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভূমির পরিমাণ ৭৫,৪৩,৫০,১৯৯ একর ও ইহার লোকসংখ্যা ২৫,২৪,৫৩,৩৫০ জন। করদ ও মিত্ররাজ্যের ভূমির পরিমাণ বাদ দিলে ৬২,৩১,৩৪,০১২ একর ভূমি অবশিষ্ট থাকে। এই ভূমির ½ অংশের অপেক্ষাও অল্প ভূমিই কর্ষণযোগ্য। মোট ৮,২৮,৮৯,২৬৮ একর ভূমি অরণ্য-সমাবৃত। চাষের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, ইমারত ও গৃহ এবং রাস্তাঘাট পভৃতিতে, অর্থাৎ কৃষি ভিন্ন অন্য কার্য্যে, ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ ১৫,৭৬,৩৬,২৪৯ একর। অবশিষ্ট ৩৮,১২,৫৮,৬১২ একর ভূমি কর্ষণীয় হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ৫,১৮,০৩৯,৯১ একর ভূমি কর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং, বিগত বৎসর প্রায় ১১,৩০,৬৫,৭৯৬ একর ভূমি অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভূমি কর্ষণীয় হইয়াও, অকর্ষিত বা পতিত রহিয়াছে। গত ১৯১২।১৩ সালের সরকারী কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, সমগ্র বঙ্গের ভূমির পরিমাণ পনের কোটি বিঘা, চাষের অযোগ্য ভূমি তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ বিঘা। পতিত জমি এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ বিঘা। বনভূমি এক কোটি কুড়ি লক্ষ বিঘা আছে। ইহাতে জানা গেল, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অর্দ্ধেক পরিমাণ জমিতে অর্থাৎ কেবল সাড়ে সাত কোটি বিঘা জমিতে চাষ হইতেছে। আর প্রায় এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ বিঘা জমি পতিত রহিয়াছে। পরন্তু এই চাষের উপযোগী অথচ পতিত জমি কোন্ বিভাগে কি পরিমাণে আছে, তাহার তালিকা এইরূপ—

প্রেসিডেন্সি বিভাগে	...	৩০ লক্ষ বিঘা।
বর্দ্ধমান	... ...	৬০ „
রাজসাহী	... ...	৮ „
ঢাকা	... ...	৫ „
চট্টগ্রাম	... ...	৫ „—ভাঃ সঃ

আবাদ-যোগ্য করিয়া দিলে, তবে মধ্য-শ্রেণীর পক্ষে সুবিধা-জনক হইতে পারে। এই জন্য রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন, জাপানে প্রতিষ্ঠিত 'Agricultural Bureau'র কথা উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ প্রতিষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব বলিয়া আমাদের মনে হয়।

যাঁহারা 'ব্রিণ্ডিসি' হইতে রেলপথে বিলাত গিয়াছেন, বা য়ুরোপে রেলে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভদ্রলোক Farmerদিগের পরিচ্ছন্ন কুটির, শ্যামল 'আঙ্গুর ক্ষেত্র' (Vine-yard) প্রভৃতি দর্শন করিয়া থাকিবেন। আমাদের দেশের ভদ্রলোকেও এই প্রকার শস্য-শ্যামলা, সুজলা, সুফলা ক্ষেত্রের মধ্যে বাস করিয়া, স্বীয় ক্ষেত্রজাত শস্য, উদ্যানজাত তরকারী, পুষ্করিণীর মৎস্য, গৃহ-পালিত গাভীর দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনীত নিজে ও সন্তানদিগকে আহার করাইয়া, উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয় করিয়া, কিরূপ সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন, তাহা মনে করিলেও মন পুলকিত হয়।*

ভদ্রলোকের পক্ষে পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কৃষিকার্য্য করার পক্ষে আরও এক প্রধান অন্তরায়

মেলেরিয়া

এখন লোকে সামান্য চাকুরী অথবা সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবার সুবিধা পাইলেই—মেলেরিয়া হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়—হয় কোন সহরে কিংবা অন্য যে-কোনস্থলে পক্ষীপিঞ্জরের ন্যায় ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিতেছেন। নির্ব্বাসিত হইবেন, সেও ভাল, তথাপি নিজের গ্রামের জঙ্গল উচ্ছেদ করিবার ও আবদ্ধ-জল-নিকাশের কোন চেষ্টা বা উদ্যমই করিতে পারেন না। ইহার প্রধান কারণ—

(১) দেশের সকলেই ভগ্নোৎসাহ ও নিরুদ্যম;

(২) জীবিকা চলিবার মত কোন বৃত্তি সেখানে নাই;

(৩) ভদ্রলোকের কৃষিকার্য্যের উপযোগী, একত্র ৫০ বা ১০০ বিঘা জমী পাওয়া যায় না;

(৪) জমী পাওয়া গেলেও চাষী মজুর পাওয়া যায় না;

(৫) জমী ও মজুর যদি বা মিলে, কার্য্য চালাইবার মত মূলধন নাই;

(৬) কৃষি বা দেশসম্ভব কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী শিক্ষা নাই;

(৭) হয়ত সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় নাই;

(৮) নচেৎ উপযুক্ত চিকিৎসক এবং ঔষধের অভাব।

কিন্তু যদি সকল বিঘ্নহারী বিশ্বপাতার উপর অচল বিশ্বাস এবং সকল বিঘ্নহর উদ্যম থাকে, তবে এ সকল বাধা-বিঘ্নের অচিরে প্রতিকার হইতে পারে।

প্রথম—বাস-বাটীর কথা; যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ দুই চারিবিঘা ভূমি হইতে বৃহৎ বৃক্ষ সমেত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কেবল তৃণাবৃত মাঠ, অথবা পুষ্প-বীথিকা, বা তরকারির উদ্যান করিয়া রাখেন, এবং ঐ জমী ঢালু করিয়া জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মেলেরিয়া সহসা আক্রমণ করিতে পারে না।

সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে, বিশুদ্ধ পানীয়ের সুরক্ষিত জলাশয়ের বন্দোবস্ত সহজেই হইতে পারে।

নূতন গ্রাম

ইহাতেও যদি সুবিধা না হয়—অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বিভক্ত, শরিকি বিবাদে জটিলতা-প্রাপ্ত পৈতৃক ভদ্রাসনের চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিবার যদি সুবিধা না হয়, তবে সে স্থান ত্যাগ করিয়া, জনকয়েক মিলিত হইয়া, অদূরবর্ত্তী কোন সুপ্রশস্ত মুক্তক্ষেত্রে নূতন গ্রাম করাই মঙ্গল।

পূর্ব্ব হইতেই প্ল্যান করিয়া, সেখানে প্রশস্ত সরল পথ, তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ-শ্রেণী, পরিচ্ছন্ন জলাশয় বা জলাধার, পুরাঙ্গনা ও বালকদিগের ভ্রমণের জন্য প্রত্যেক বাটীর অন্দরের দিকে সুবেষ্টিত তৃণাচ্ছন্ন ময়দান, এবং বাটি—কুটীর হইলে তাহাও আবশ্যকমত দীর্ঘায়ত দ্বারজানালা-বারান্দাদি দিয়া স্বাস্থ্য-কর, এবং নয়ন-শোভন-ভাবে প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সেথায় নিত্য প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি-সুরভিত সদা-প্রবহমাণ মুক্তসমীরণ মনোমধ্যে নিয়তই কত আনন্দ—কত উৎসাহ—কত উদ্যম উপচিত করিবে! সেই উৎসাহ নিজের এবং পরের কত কার্য্য-সাধন করিয়া জীবন সার্থক করিবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা উন্মেষিত করিবে।

---

* শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, M. A., B. L., তাঁহার 'অরণ্যবাস' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে একটি মনোরম-বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন!—ভাঃ সঃ

সামান্য যৌথ উদ্যোগ উৎসাহ ও অকিঞ্চিৎকর ত্যাগ-স্বীকারে যখন এমন নব-জীবনসঞ্চারী, ভবিষ্যবংশোন্নতকরী উপায় হয়, হেলায় বিমুখ হইয়া, যদি আমরা স্বেচ্ছায় সহর-বাসের মোহে মুগ্ধ হইয়া পিঞ্জরোপম কোটরে, অথবা স্বগ্রামত্যাগের ভাবনা-ভয়ে কাতর হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত, দিবসে অন্ধকারময়ী, পেচক-শৃগালের হাহাকারে পরিপূর্ণ জঙ্গল-পরিবৃত বাটীতে বাস করি — শৈবালদামপূর্ণ পৈতৃক পঙ্কিল পুষ্করিণীর জল পান করি—তাহা হইলে, প্লীহা ও যকৃতে জরাজীর্ণ হওয়া এবং পরিজন ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সন্তান-বর্গের রোগ-শীর্ণদেহ নিত্য নিরীক্ষণ করা—তাহাদের অকাল মৃত্যু অবলোকন করা এবং চিরতরে বংশাবলীকে অধঃপতিত করা অবশ্যম্ভাবী।

আমরা উপরে যে নূতন গ্রামের কথা বলিয়াছি, সে গ্রাম, যেখানে গ্রামস্থ সকলের পক্ষে নিকটে কৃষি-কার্য্যোপযোগী প্রচুর জমী পাওয়া যাইতে পারে, সেইখানে হওয়া চাই। সেখানে সকলে মিলিয়া একটি Portable Engine আনিয়া রাখিলে, তাহার সাহায্যে, সকলের জমীতে লাঙ্গল দেওয়া, সকলের ধান্য-ছাটাই করা, সকলের গোধূম চূর্ণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত, নিজেদের ও বিক্রয়ের জন্য তৈল-নিষ্পেষণ, বাটীতে বাটীতে পানীয় জল সরবরাহ করা—উপরন্তু, তিন-চারি শত টাকা মূল্যে একটি Dynamo খরিদ করিলে সেই এঞ্জিন সাহায্যে নূতন গ্রামের সরল পথে ৩।৪টা ইলেক্‌ট্রিক আলোকও দেওয়া যাইতে পারে; তাহাতে অধিক খরচেরও সম্ভাবনা নাই।

অচিরে সেই নূতন গ্রামে প্রতি বৎসর গিরিরাজ-তনয়া মা আনন্দময়ী আগমন করিয়া, সেই গ্রাম আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ করিয়া তুলিবেন; আর নিতাই সন্ধ্যালোকে, গ্রামস্থ কুসুম-বাটিকার মধ্যে, তৃণাচ্ছন্ন আস্তরণে, গ্রামস্থ বালক-বৃদ্ধ মিলিয়া কীর্ত্তন গায়িয়া, মাথুর গায়িয়া, ভগবানের বিরহ-বেদন পাশরিয়া নিয়তই কি অপার আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া থাকিবেন। তখন অপ্রতিহত মুক্ত প্রাণে, নিশ্চিন্ত উৎসাহে, নবীন-তরুণ বংশধরগণ অশেষ শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় কত নূতন তত্ত্বের তথ্য আবিষ্কার করিয়া, দেশের বিষাদ-কালিমা অপনয়ন করিবেন।

তখন আর কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজিয়া মরিতে হইবে না; কারণ, তখন প্রচুর শাকান্ন ও দুগ্ধ-নবনীত-পুষ্ট পাত্র ঘরে ঘরে মিলিতে পারিবে।

গৃহস্থ-জীবন-সম্ভব সকলপ্রকার সমস্যার প্রতিকারের জন্য কলিকাতায় একটি Central Council, প্রত্যেক গ্রামে এক-একটি 'ক্লব,' বা 'সোসাইটি,' বা সঙ্ঘ, এবং দুই-তিনটি গ্রাম লইয়া একটি Union প্রতিষ্ঠিত হওয়াও আবশ্যক।

গ্রাম্য সংঘ বা সমিতিগুলি নিম্নলিখিত সংবাদাবলী সংগ্রহ করিবেন:—

১। কাহার কত জমী আবশ্যক;

২। নিকটে পতিত, জঙ্গলময়, বা জলাবদ্ধ জমী কত আছে?

৩। তন্মধ্যে গোচারণের উপযোগী জমী আছে কি না?

৪। বিশুদ্ধ পানীয় জলাশয় আছে কি না?

৫। গ্রামে যে সকল কারিকর আছে, তাহারা কি কি শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং সেগুলির অবস্থা কি রূপ?

৬। গ্রামে কি কি কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ দ্রব্য পাওয়া যায়?

৭। সেগুলির স্থানীয় ব্যবহার ও ব্যবসায় (রপ্তানি) আছে কি না?

৮। গ্রাম-সম্ভব কোন দ্রব্য অপচয় হয় কি না?

৯। গ্রামে কাহারও ভদ্রাসনের নিকটে জঙ্গল বা জলা জমী আছে, কি না?

১০। গ্রামের নিকটে ভাল ঔষধালয় ও সুচিকিৎসক আছে, কি না?

১১। নিকটে বিদ্যালয় ও দেবালয় আছে, কি না?

এই সকল বিবরণ সংগ্রহের পর, উক্ত সঙ্ঘ বা সমিতি নিম্ন-লিখিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন,—

১। জঙ্গলাবৃত বাটীর অধিকারীকে জঙ্গল উচ্ছেদ করিতে পরামর্শ দিবেন, এবং সানুনয় অনুরোধ করিবেন।

২। স্বাস্থ্য ও শিশু-পালন বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

৩। স্বাস্থ্য, শিশুপালন, কৃষি এবং গ্রামস্থ শিল্পাদির উন্নতি-বিষয়ক পুস্তিকা বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা প্রণয়ন করাইয়া, মুদ্রিত ও প্রচার করিবেন।

৪। গ্রামবাসীর আবশ্যক দ্রব্য ও ঔষধ সুলভ মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন।

৫। যে সকল দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে গ্রামবাসীর এক বৎসরের উপযোগী পণ্য সঞ্চিত রাখিয়া অবশিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার কাউন্সিলে পাঠাইবেন।

৬। গ্রামের বিবাদ-বিসংবাদ সালিস-মীমাংসার চেষ্টা করিবেন।

৭। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

৮। Central সমিতি-কর্ত্তৃক নিযুক্ত কথক-মহাশয় দ্বারা পুরাণাদি পাঠ, স্বাস্থ্য-বিষয়ক ও অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং সংগীতের ব্যবস্থা করিবেন।

৯। Central সমিতির সাহায্যে লোকের চাষের, বাসের, বাগানের জমী, পানীয় জল ও মৎস্যাদির চাষ প্রভৃতির জন্য পুষ্করিণী সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

এই সকল কার্য্য বর্ত্তমান ও প্রস্তাবিত নূতন গ্রামের গ্রাম্য সমিতিগুলি ধারাবাহিকরূপে নির্ব্বাহ করিলে, অনেক উপকার সাধিত হইতে পারিবে। নিম্নলিখিত হিসাবের দশভাগের এক-ভাগ কার্য্য হইলেও দীর্ঘকালে অনেক কার্য্য পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

জমা

গত বৎসরের গোলাজাত ধান্য ৫০০০ মণ বিক্রয়ে লাভ—	২,৫০০৲
গ্রামের অন্যান্য উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রয়ে লাভ—	৫০০৲
গ্রামের ঔষধ-কাপড়াদি সরবরাহে লাভ—	৫০০৲
মোট	৩,৫০০৲

খরচ

গ্রামে ঔষধ বিতরণ—	২০০৲
স্বাস্থ্যাদি বিষয়ক পুস্তিকা-বিতরণ—	২০০৲
গ্রামস্থ জঙ্গল-নিকাশ—	২০০৲
জল-নিকাশ—	২০০৲
প্রাইমারি শিক্ষা—৩ জন শিক্ষক—	৩০০৲
সঙ্ঘের মূলধন ২০ হাজার টাকার সুদ—	১২০০৲
কথকের বেতন—	৬০৲
গোচারণের জমীর কিস্তিবন্দী ও খাজনা—	১৫০৲
পানীয়জলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার অথবা নূতন পুষ্করিণীর কিস্তী—	১৫০৲
সঙ্ঘের লোকের বেতন—	২৪০৲
	২৯০০৲

আরও অন্য বিষয়ে ৬০০৲ টাকা ব্যয় হইতে পারে।—

আমরা যে সকল প্রতিকারের কথা উপস্থিত করিলাম, তাহার অনেক বিষয়েই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং,

অর্থের কথা

বলা আবশ্যক।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবানের চরণে অচল বিশ্বাস থাকিলে, কিছুরই অপ্রতুল হইতে পারে না।

বিস্তৃত জমী-সংগ্রহ ও তাহার জঙ্গল ও জলনিকাশ জন্য, কলিকাতা কৌন্সিল্ একটি 'কো-অপরেটিভ্ সোসাইটি' স্থাপন করিবেন। এই সোসাইটি জমীর উন্নতি করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া মেম্বরগণকে বিলি করিবেন এবং তাহার মূল্য ১২ বা ১৫ বৎসর ব্যাপী কিস্তাবন্দীক্রমে আদায় করিবেন। তাহাতে ২০০৲ টাকার জমীর জন্য মাসে মাসে ২৲ টাকা মাত্র কিস্তীবন্দী দিতে হইবে। সুতরাং, অনেকেই তাহাতে অসমর্থ হইবেন না। একত্র অনেক জমী লইলে, পতিত জমীর সেলামী ও জঙ্গলনিকাশ খরচে ১০০ বিঘা দুই-তিন শত টাকায় পাওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। কিস্তীবন্দীর ২৲ টাকাও কেহ দিতে অপারক হইলে, তাহারও উত্তমরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে;—তবে সেকথা পরে বিবেচ্য।

বিস্তৃত জমী-সংগ্রহ ও আবাদ করিতে এই 'কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি'র অনেক মূলধনের প্রয়োজন। 'জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী' করিয়া এই টাকা তুলিতে হইবে। কিন্তু কি ভয়ানক দুঃখের কথা, 'জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী' করিতে গিয়া, আমাদের দেশের গণমান্য লোকে যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কেহই আর ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন না;—না পারিবারই কথা।

তবে, সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার একটা সদুপায় বিধান করিয়াছেন। ১৯১৪ সালের ১৭ই জুন তারিখের গবর্ণমেণ্ট রেজোলিউসনে এই মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, যে 'কো-অপরেটিভ্ সোসাইটি' সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের Control থাকা মন্দ নহে। তাহা যদি হয়, তবে আমাদের প্রস্তাবিত

'কো-অপরেটিভ্ সোসাইটি'র ভার একজন ডেপুটি কলেক্টরের হস্তে ন্যস্ত থাকিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়া সফলকাম হইতে পারা যায়।

১। তাহা হইলে ঐ ডেপুটি কলেক্টর, মূলধনের টাকা ও কিস্তিবন্দীর আদায়ী টাকা রাখিবেন।

২। তাহা হইতে বিস্তৃত জমী খরিদ করিবেন।

৩। কণ্ট্রাক্ট বিলিদ্বারা গ্রামের জঙ্গল ও জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিবেন।

৪। সোসাইটির মেম্বরগণকে ১২।১৪ বৎসরব্যাপী কিস্তিবন্দীতে ঐ জমী খণ্ড খণ্ড করিয়া বিলী করিবেন।

৫। উক্ত মূলধন বা কিস্তীবন্দীর টাকা হইতে জমীর উন্নতিব্যতীত আর কোন ব্যয় তিনি করিবেন না।

৬। আর সকল ব্যয়, যথা—লোকজনের বেতন, বাটী-ভাড়া ইত্যাদি যে কোন মেনেজ্‌মেণ্ট-খরচ, কোম্পানী বা ব্যক্তি নিজ হইতে করিবেন; সেজন্য তিনি সোসাইটির লাভের কিছু অংশ পাইবেন।

এইরূপ করিয়া সোসাইটি করিলে, ৫।৬ বৎসরে, সোসাইটি লোককে ১০ লক্ষ টাকার জমী দিতে পারিবেন অথচ ১০।১৫ লক্ষ টাকা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

ইহা যে সম্ভব, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা নিম্নের লিখিত হিসাব দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আশা করি, সহৃদয় দেশবাসিগণ, তাঁহাদের হতভাগ্য প্রতি বেশীর কুমার-কুমারীগণের এইরূপে দুঃখের প্রতিকার করিতে পারেন, কি না, নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন। ইহা ব্যতীত, কেহ যদি অন্য উপায় স্থির করিতে পারেন, তাহাও জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।*

* এ সম্বন্ধে কেহ কোন কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইলে, অথবা কোন ভ্রম প্রদর্শন করিলে, অনুগ্রহ করিয়া 'ভারতবর্ষ' সম্পাদকের নিকট অথবা ৩১ নং মোহন বাগান রো শ্রীযুক্ত কালীকুমার দত্ত, B. Sc, B.L এর নামে পত্র লিখিবেন।

প্রথম ৬ বৎসরের হিসাব—

জমা

মূলধন—	১০ লক্ষ টাকা
২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সুদে আসলে কিস্তীবন্দী আদায় মাসে ২০ হাজার করিয়া— ৬ বৎসরে—	১৪ লক্ষ ৪০ হাজার
মোট	২৪ লক্ষ ৪০ হাজার

খরচ

চাষের ও বাসের জমী খরিদ—	১৩ লক্ষ
জঙ্গল ও জল নিকাশ—	২ লক্ষ
বাটী নির্ম্মাণ—	১ "
মূলধনের সুদ ৬ বৎসর ৬৲ হারে—	৩ লক্ষ ৬০ হাজার
ডেপুটি কালেক্টর এবং অফিস খরচ—	৭০৲ হাজার
মোকদ্দমা খরচ—	২০৲ হাজার
মূলধন শোধ—	৩ লক্ষ
মোট	২৪,৪০০০০৲

শেষ ৬ বৎসরের হিসাব

জমা

বাকী ৬ বৎসরের কিস্তীবন্দী আদায়—	১৪ লক্ষ ৪০ হাজার

খরচ

বাকী মূলধন ৭ লক্ষ টাকার ৪ বৎসরের সুদ, ৭৲ হারে	৯০ হাজার
ডেপুটি ও আফিস—	৬০ "
মোকদ্দমা—	২০ "
জঙ্গল ও বাটী মেরামত—	৭০ "
	২৪০০০০
মূলধন শোধ—	৭ লক্ষ
লাভ—	৫ লক্ষ
	১৪৪০০০০৲

ভাষা, ভাব ও সাহিত্য

[শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়]

জড় ও জীব—জড় ও জীবের মধ্যে প্রধান এক পার্থক্য এই, জড় অচেতন বা অনুভবশক্তিবিহীন আর জীব চেতন অর্থাৎ ভাবময়। ডাক্তার জগদীশ বসু-প্রমুখ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বটে, জড়ও ষোল-আনা ভাব-বর্জ্জিত বা অনুভবশক্তিবিহীন নহে; তথাপি একথা এখনও আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, জড়ের অনুভবশক্তি নিতান্ত অবিকশিত বা সহজে বুঝা যায় না, আর জীবে ইহা স্ফুটতররূপে প্রকটিত। এই অনুভবশক্তি বা ভাবের জন্যই জীবের জীবত্ব, ভাবকে ছাড়িয়া জীব প্রায় কিছুই নহে। গর্ভস্থ ভ্রূণে যতকাল ভাবের উন্মেষ না থাকে, জীবন-সত্ত্বেও জীব ততকাল যেন জড়-শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। আবার সূর্য্যের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে জীবের জীবত্বও যেন অস্তোন্মুখ হয়। পক্ষাঘাত রোগে দেহ যদি অনুভবশক্তি হারায়, সুষুপ্তাবস্থায় মন যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন জীবন থাকিলেও জীব যেন জড়ে পরিণত হয়। জরা বা মরণে মনের ভাব-গ্রহণ-শক্তি যদি ক্ষুণ্ণ না হয়, মরিবার সঙ্গে সঙ্গে মনও যদি না মরে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, জীবন গেলেও জীব বেঁচে আছে। মনুষ্য-জীবনে ভাবের প্রভাব বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

ভাষা ও ভাব—এইবার, এই ভাব ও ভাষার সম্বন্ধটি একটু আলোচনা করা যাউক। ভাষার সাহায্যে ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভাষা ও ভাব অন্যোন্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের সাহায্যে অন্যটি পুষ্ট হয়। ভাষা না থাকিলে ভাব পরিস্ফুট হয় না, এবং ভাব না থাকিলে ভাষা বাহির হয় না; অথবা কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ভাববিহীন ভাষা যেন প্রাণহীন দেহ, শববৎ উপেক্ষণীয় ও পরিত্যাজ্য। ভাষা দেহ, ভাব আত্মা-স্বরূপ; দেহ ও আত্মার সমবায়ে যেমন দেহী, ভাষা ও ভাবের সংমিশ্রণে তেমনই সাহিত্যের উৎপত্তি।

শাস্ত্রকারগণ যেমন মানবের দেহটিকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ইত্যাদি নানা কোষে বিভক্ত করেন, সাহিত্যও সেইরূপ একাধিক কোষের সমবায়-সমুদ্ভূত। ভাবের দেহ যেমন ভাষা, ভাষার দেহ আবার তেমনই বর্ণমালা বা অক্ষর। অক্ষর শব্দের অর্থ নিত্য। অক্ষররূপে অক্ষয় বর্ম্মে আবৃত রহিয়া সাহিত্য প্রায় অমরত্ব লাভ করে। মানুষ চলে যায়, কিন্তু সাহিত্যরূপী তাহার প্রায় চিরজীবী মানস-পুত্রগুলিকে প্রতিনিধিস্থলীয় ক'রে রেখে যায়।

সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়—ভাষা-ভাবের সংমিশ্রণে সাহিত্য সঞ্জাত। সুতরাং যত কিছু ভাবিবার ধারণা করিবার বিষয় আছে,—কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি আমাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয়ই সাহিত্যের অন্তর্ভূত। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে এই সমস্ত লক্ষণই পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের মহাকাব্যগুলি এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সমাজের উপর এই সাহিত্যের প্রভাব বুঝিতে হইলে, এই ভাষা ও ভাব আমাদের মাঝে কি ভাবে কার্য্য করে, সে বিষয়টা আগে একটু ভাবিয়া দেখা ভাল।

মানব-চিত্তে ভাষার কার্য্য—যত কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ আছে, চিত্ত-ক্ষেত্রের ভাবের জননী হিসাবে ভাষার তুলনায় সবই যেন নগণ্য। ভাষার সাহায্য না পেলে চিত্ত-বিনিময় এত সহজে সংঘটিত হত না। বাইবেলে একটা গল্প আছে, প্রাচীন যুগে মানুষরা একবার একত্র হয়ে গগনস্পর্শী এক উচ্চ সৌধ-নির্ম্মাণে প্রয়াসী হয়েছিল, শেষে ভাষার গোলমাল ঘটায় চিত্ত বিনিময়ে অসুবিধা হল ও সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গেল। দার্শনিক-গণ প্রমাণ-নিচয় মধ্যে শাব্দ-প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছেন। আমরা যাহা কিছু জানি বলিয়া অভিমান করি, অধিকাংশের মূলই এই শাব্দ-প্রমাণ মাত্র। সংসারের কয়টা বিষয়েই বা আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে অভিজ্ঞ, বা সেরূপ করিতে চেষ্টা পাই? শাস্ত্রকারগণ উপমা দেন, সর্ব্ববিধ সংস্কারমুক্ত মনটি যেন একটা কাচ বা স্ফটিকের স্বরূপ। বিভিন্ন বর্ণের সান্নিধ্যে এসে নির্ম্মল স্ফটিক যেমন নানা বর্ণে রঞ্জিতবৎ হয়, বহির্ব্বিষয়ের সংসর্গে এসে আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্রও সেইরূপ কোন না কোন ভাবে মুহুর্মুহুঃ রঞ্জিত হইতেছে। এই রঞ্জন, বা ছোপ যদি তুলিয়া না ফেলি, বা পরিবর্ত্তিত না করি, তাহলে হৃদয় সেইভাবেই রঞ্জিত থাকিয়া যায়। ইহারই নাম সংস্কার বা বিশ্বাস। আমরা

যাহাকে জ্ঞান, বা ধারণা নামে অভিহিত করি, তাহা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর। ভাষা হৃদয়মধ্যে অহর্নিশ এই ভাবের জ্ঞান বা সংস্কারের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে। কোন কিছু শ্রবণ মাত্র, আমাদের হৃদয় তদ্ভাবে রঞ্জিত হয়ে, তৎক্ষণাৎ একটা বিশ্বাস বা সংস্কারের জন্ম দেয়; তারপর,আমরা বিচারাদি সাহায্যে এই বিশ্বাস বা সংস্কারের ছোপটি মুছিয়া ফেলি, পরিবর্ত্তিত করি, অথবা আরও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করি। সংসারে কিন্তু সকলে সব সময়ে এবং সম ভাবে এইরূপ বিচার-বুদ্ধির সাহায্য লয় না। তপ্ত খোলায় লুচিভাজা হইতেছে, পাতে পরিবেশন করিবামাত্র খাইয়া ফেলি; সংসারে কোন বিষয় বিচারের সময় অনেকেরই এই অবস্থা। ভাষার সাহায্যে সাহিত্য এইরূপ 'সু' বা 'কু' ভাবে আমাদের হৃদয় অনবরত রঞ্জিত করিতেছে। বিশ্বাস বা সংস্কাররূপ বীজ-সমূহের জন্মদানই বিষয়সংসর্গের পরিণাম। ভাষা যদি ইহা করিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহা নিরর্থক ও নিষ্ফল।

ভাববিকাশের ইতিহাস—ভাবের পরিণতিও এই বিশ্বাস বা সংস্কার-রূপ বীজ-সমূহের জন্মদানে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলেন, প্রাক্তন-সংস্কাররূপ বীজসমূহ বিকশিত হইয়াই জীব জন্মলাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। এ তত্ত্বটি আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই বা না-হই, ভাববিকাশের ইতিহাসটি ভাবিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি, বৃক্ষের বীজের ন্যায় জীবশিশু কতকগুলি ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তির একটা শক্তিবীজরূপে জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে সেগুলি নিতান্ত অবিকশিত থাকে, ও ক্রমে পরিণতি লাভ করে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে, একই প্রাকৃতিক উপাদান হইতে, বিভিন্ন বৃক্ষে বিভিন্ন রূপ উপাদান-রস প্রভৃতি আকৃষ্ট হয়; এবং উহার বীজেও এই সব শক্তি সঞ্চিত হয়। জীব-জগতেও ইহার অন্যথা দেখি না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, শিশুর রোদন ও রোদন নিবৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, ইহা অল্লাধিক পরিমাণে সুখদুঃখ-বোধরূপ জ্ঞান, কর্ম্মেচ্ছা ও কর্ম্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই অবস্থায়, ইহা যেন অনেকটা প্রকৃতির করচালিত পুত্তলিকা-স্বরূপ; অনিচ্ছা বা জড়শক্তি এবং পরেচ্ছা দ্বারাই প্রধানতঃ পরিচালিত। ক্রমে সে হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতে শিখে, স্বপ্নে কখন হাসে, কখন বা কাঁদিতে থাকে। উহার স্বপ্নে এই হাসি-কান্না প্রভৃতি উপমা হইতে অনুমিত হয়, কর্ম্মশক্তি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার জ্ঞানও ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, সুখদুঃখ বোধ তীব্রতর হইতেছে, স্মৃতি বা ধারণাশক্তি বিকশিত হইতেছে। সম্ভবতঃ এখনও উহার কল্পনা, বা সুখকর ও পীড়াদায়ক বিষয়সমূহের ইচ্ছামত সংযোগবিয়োগের ক্ষমতা, জন্মায় নাই; এখনও সে বহুপরিমাণে যেন জড়শক্তি-বলেই চালিত হয়। ক্রমে এই সব ভাব আরও পরিস্ফুট আকারে দেখা দেয়, ইচ্ছাশক্তির স্পষ্ট উন্মেষ বুঝিতে পারি। এখনও সে সুখবৃদ্ধির ও দুঃখবর্জ্জনের অভিলাষ জানায়, প্রিয় ও পরিচিত মুখ দেখিলে ঝাঁপাইয়া কোলে উঠিতে যায়, মুখস দেখিলে হয়ত ভয় পায়। শিশুর দেহে এই ভাববিকাশের ইতিহাসটি একটু ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, ভাব-বিকাশের যেন তিনটি স্তর। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায়, প্রথমে জড়শক্তি বা প্রাক্তন সংস্কার প্রভৃতি হইতে লব্ধ সুখদুঃখ বোধ, কর্ম্মেচ্ছা ও কর্ম্ম; অনন্তর ক্রমশঃ বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছা, ইচ্ছাসহ কৃত-কর্ম্ম ও কল্পনার উন্মেষ; ইহাদের পরিণাম-স্বরূপ নূতন নূতন সংস্কার-বীজের জন্ম। ইচ্ছার নাম দেওয়া যাউক, অনুরাগ বা ভক্তি। জ্ঞান এবং ভক্তির ফলে নূতন নূতন কর্ম্ম, এবং এই কর্ম্মফলে আবার নূতন নূতন জ্ঞান বা ধারণার উত্তরোত্তর বিকাশ; অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি, এবং ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞান এই ভাবে আমাদের অন্তরস্থ ভাবগুলি যেন পরিস্ফুট হইয়া থাকে; জ্ঞানে ইহাদের উৎপত্তি এবং জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি। এই যে জ্ঞান বা ধারণা, ইহা বিশ্বাস বা সংস্কার নামে অভিধেয়। এই সংস্কার বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, আবার নূতন ইচ্ছা, নূতন কর্ম্ম, নূতন জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের ফলে ইচ্ছা, ইচ্ছার ফলে কর্ম্ম, এবং কর্ম্মের ফলে জ্ঞান, বিশ্বাস বা সংস্কার-গঠন ইত্যাদি। এই সংস্কার-বীজ বিকশিত বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, কোষসমূহেই সমবায়-সম্ভূত দেহের ন্যায় ভাব-দেহ সংগঠিত করে।

সুতরাং, সংস্কার, বা বিশ্বাসই ভাবের পরিণত ও পরিপক অবস্থা। সে সাহিত্য নিরর্থক ও নশ্বর, যাহা বিশ্বাসের জন্ম-দানে অক্ষম।

ভাবের হাটে সাহিত্য, ভাবের বেপারি। বিশ্বাস্য, অর্থাৎ অন্তরের সহিত গ্রহণীয়, কোন সত্যের সন্ধান যদি

উহা দিতে পারে, তবেই উহা উহার খরিদদার বা পাঠক-কুলের নিকট সমাদর পায়, উহা স্থায়ী হয়, নতুবা দুদিন বাদে দোকানপাট গুটাইয়া উহাকে 'ফেল' হইতে হয়।

আমাদের এই জগৎ, শত্রু-মিত্র উদাসীন এই তিন ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত। ইহার মধ্যে যে অংশটুকুর সহিত আমাদের সুখদুঃখের স্পষ্ট সম্পর্ক, ততটুকু লইয়াই আমরা মাথা-ঘামাই মাত্র। অবশিষ্ট জগৎটা উড়িয়া-পুড়িয়া অস্তিত্বহীন হয়ে গেলেও, আমরা তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি মনে করি না। উদাসীন জগৎটুকু সত্য হয়েও, আমাদের নিকট যেন অসত্য বা অস্তিত্বহীন।

সত্যের এই ভাবে দুটিরূপ—মুখ্য সত্য ও গৌণ সত্য। দুর্ভিক্ষকালে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অর্থকে অকিঞ্চিৎকর ও নিতান্ত মূল্যহীন পদার্থ মনে করে, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলের পরিবর্ত্তে সুমিষ্ট সন্দেশ পাইলেও উহা দূরে নিক্ষেপ করে; অতএব বলিতে হয়, সত্যমাত্রই সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে সমাদৃত হয় না; সত্য হইলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে উহা সুন্দর, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়-আকর্ষণেও সমর্থ, হওয়া চাই; এইরূপ মুখ্য সত্যই প্রকৃত আদরণীয়।

ভাবের পরিণতি এইরূপ বিশ্বাস-গঠনে, ভক্তির উন্মেষে, এবং আদর্শের সৃষ্টিতে। যে ভাবটি আমাদের শ্রদ্ধা-উৎপাদনে সমর্থ, যাহাকে আদর্শরূপে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া, জীবনের ধ্রুবতারারূপে বরণ করিয়া, জীবনপথে লক্ষ্যনির্ণয় করি ও পরিচালিত হই, সেইটাই পরিণত বা পরিপক্ক ভাব। হৃদয়মন্দিরে এই সত্য-শিবসুন্দরের আবাহন, উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা, হৃদয়-বৃন্দাবনে ভাব-নিকুঞ্জ মাঝে শ্যামসুন্দরসহ মিলনই, পরিণত ও পরিপক্ক সাহিত্যের কার্য্য, ইহাতেই ইহার সফলতা। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই ধ্যান, ধারণা ও উপাসনা; কৃষ্‌ধাতুর অর্থ আকর্ষণ এবং উৎকর্ষ বা উন্নতিসাধন লক্ষ্য করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণভজনই বল, বা সত্য শিবসুন্দরের অথবা সেই অতিসুন্দরী পরাৎপরা পরমেশ্বরীর উপাসনা নামে অভিহিত কর; কিংবা সর্ব্বপ্রকাশক সবিতৃদেব বা, সুসমাপ্তি ও সিদ্ধি-স্বরূপ গণপতিদেবের উপাসকের দলে নাম লিখাও, তাতে কিছু যায়-আসে না; ঘোরতর অদ্বৈতবাদীও, এই আদর্শসুন্দরে আকৃষ্ট হন বলিয়াই, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। এই আদর্শ-সুন্দর সহ মিলনই সাহিত্যের প্রকৃতকার্য্য। সাহিত্য যেন হৃদয় বৃন্দাবনেও বৃন্দাদূতী, অথবা আমাদের ভাব-জগতের গুরুস্বরূপ।

সর্ব্বাপেক্ষা সজীব সাহিত্য কি? —উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্মবিষয়ক সাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা সজীব সাহিত্য। কারণ, শাস্ত্রের কথা সকলে বিশ্বাস করে এবং উপদেশগুলি আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা পায়।

বিশ্বাস্য ও বরণীয় আদর্শসমূহের সৃষ্টি করিতে পারিলে, কাব্য-উপন্যাসাদি সাহিত্যও কিয়ৎপরিমাণে এই ধর্ম্মশাস্ত্রের তুল্য বলশালী হয়। ভিক্টর হুগোর 'Les Miserable' গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে উপন্যাস পড়িতেছি, কি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেছি, সময়ে সময়ে যেন ভ্রম হয়। শুনা যায়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই 'আনন্দমঠে'র 'বন্দেমাতরং' মন্ত্র এক সময়ে যে ভারতবাসীর উপর মহা প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহার আভাস দিয়াছিলেন। অনুভব ও বিশ্বাস উৎপাদনের বলে জড়বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির প্রভাব, সময়ে সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাবকেও ক্ষীণ-ভাবাপন্ন করে।

মানব মনের উপর প্রভাব-বিস্তারের জন্য সাহিত্যে একটি বিশেষ কৌশল পরিলক্ষিত হয়। শুষ্ক উপদেশে সব সময় মন ভিজে না। সৎকাব্যের একটা লক্ষণ এই যে, ইহা "কান্তাসম্মিততয়োপদেশ"-দানে সমর্থ; অর্থাৎ 'প্রেয়সীর স্মিতমুখের মধুর বাণীর ন্যায়' ইহা আমাদের মনকে অজ্ঞাতসারে বশীভূত করিয়া ফেলে। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি এই কারণেই বোধ হয়, মহাকাব্যের আকারে বিরচিত। চিত্ত অধিকারের যত প্রকার কৌশল আছে, তাহাদের কোনটিই প্রায় আজ কালকার সাহিত্যে উপেক্ষিত হয় না। ভাষার ন্যায় চিত্রাবলির সাহায্যেও আজকাল সাহিত্যের অঙ্গ সমলঙ্কৃত করিবার জন্য চেষ্টা দেখা যায়; ভাষার মানস-চিত্র ইহাতে স্ফুটতর হইয়া উঠে; অবিশ্বাস্য হইবার ভয়ে, যথাসম্ভব সত্যের অনুকরণের চেষ্টা পাওয়া হয়। 'আরব্য উপন্যাস', 'পঞ্চতন্ত্র' প্রভৃতির ধরণের অসম্ভব, বা অদ্ভুত কাহিনীপূর্ণ সাহিত্য, আজকালকার দিনে ক্রমশঃ বিরল-প্রচার হইতেছে। কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেকার মানবের ধারণা, এখনকার ঠিক অনুরূপ ছিল না;

অথবা এ জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বিত হইত না। প্রাচীন ও নব্য সাহিত্যের মধ্যে এই একটা প্রধান প্রভেদ, সহজেই আমাদের নজরে পড়ে।

বিশ্বাস ক্ষীণবল হইলেও, আদর্শের প্রভাব সহজে নষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ, বিশ্বাসের উপর ষোল আনা নির্ভর করে না। যাহা অতীত, তাহা ত স্বপ্নবৎ অসত্য। বুদ্ধদেব, শ্রীরামচন্দ্র, ভীষ্ম প্রভৃতি কোন কালে সত্য সত্যই জীবিত থাকুন, বা নাই থাকুন, এখন তাঁহারা মৃত, বা অস্তিত্বহীন। ইঁহাদের চরিত্রে যে ভাবের সৌন্দর্য্যের দেখা পাই, সেইটুকুর সহিতই আমাদের সম্পর্ক। হনুমানজি সত্য সত্যই রোমে রোমে পর্ব্বত বাঁধিয়া থাকুন বা নাই থাকুন, তাঁহার ন্যায় অভিমানবর্জ্জিত কর্ম্মবীরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলে, চিরকালই আমরা আমাদের জীবন সার্থক মনে করিব। যাহা সুন্দর, তাহা এইরূপ চিরবিদ্যমান সত্য—অন্ততঃ উপাসকের নিকট।

সাহিত্য বলহীন হয় কিসে?—বিশ্বাসের অভাবে, আদর্শ সম্পূর্ণ বলহীন হয় না বটে; তথাপি, বিশ্বাসনাশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের প্রভাবও যে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে মন্দীভূত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বলিতে কি, এই দোষে বহুচিত্তের উপর ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাব আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকেই আমরা আদি ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে পরিগণনা করিতে অভিলাষী। কি কি কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রভাব কমিয়া যায় ভাবিলে, সাহিত্য বলহীন হয় কিসে, ও সাহিত্যের বলাধানের উপায় কি, অনেকটা বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিয়াছি, বিশ্বাস সাহিত্যের সৃষ্টি ও বরণীয় আদর্শসমূহের প্রচার, সাহিত্যের বলাধানের উপায় এবং উহাদের অভাবে সাহিত্য বলহীন হয়। পাঠক-সংখ্যাবৃদ্ধি সাহিত্যের বলবৃদ্ধির আর একটি উপায়। বর্ত্তমান কালে সংবাদপত্রগুলির সাহায্যে যেরূপ দ্রুত বেগে ভাববিস্তার হয়, পূর্ব্বে আমরা তাহার ধারণা করিতেও পারিতাম না। সংবাদপত্রগুলিই সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে প্রধান সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইবে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ, কথকতা, ব্রত, অভিনয় ইত্যাদি উপায়ে সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর শাস্ত্রপ্রভাবের বশীভূত হইত। এখনকার দিনে সংবাদপত্রসমূহ, এক মুদ্রা-যন্ত্রের প্রসাদে পাঠকমহল যেন একচেটিয়া করিয়া লইতেছে।

ভাবে অরুচি জন্মাইলে, সাহিত্য বলহীন হয়। সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, মাঝে মাঝে নূতন ভাবের সমাবেশ চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক। আহারকালে, মাঝে মাঝে নূতন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা না হইলে, অরুচি হয়। পঞ্জিকাগুলিতে দেখা যায়, তিথিভেদে এক একরূপ খাদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। মানবের স্বভাবই এই, নিদ্রিতাবস্থাতেও সে মাঝে মাঝে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করে। ভাবরাজ্যেও এইরূপ একঘেয়ে কথা শীঘ্রই শক্তি হারায়। নূতন নূতন ভাবের আমদানী ঘটাইতে পারিলে, সাহিত্যে যেন নূতন যুগের উদয় হয়। নব নব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই জন্য সাহিত্যও যেন একটা নূতন বলে বলীয়ান্ হয়। বৌদ্ধগণের সময় পালি সাহিত্যের, এবং চৈতন্যদেবের পর বৈষ্ণব সাহিত্যের, এইরূপ অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ইংরাজি সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইয়া, নূতন নূতন ভাবের সন্ধান মিলাতেই, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের এত উন্নতি ও পুষ্টি। ইংরাজী ভাবগুলা যত পুরাতন ও পরিচিত হইয়া আসিতেছে, বঙ্গসাহিত্যে নূতন কথা শুনাইবার সুযোগও সেই পরিমাণে কমিতেছে। প্রথম যখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির হয়, তেমন মাসিক-সাহিত্য আর হল না, ইত্যাকার অনুযোগ যে মাঝে মাঝে শুনা যায়, তাহার ইহাই কারণ। নূতন কথা শুনাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করা, আজকাল আর পূর্ব্বের ন্যায় সহজ নহে।

ইহা স্বীকার্য্য বটে, প্রতিকূল ভাবের সংসর্গে এলে, পুরাতন ভাবটা অনেক সময় একটু শিথিল হ'য়ে পড়ে। এইজন্য নূতন ভাবের সংস্রবে আসিতে, সময় সময় নিষেধ-বিধির প্রচারও আবশ্যক হয়। এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্যধর্ম্ম সম্প্রদায়সহ সংসর্গ করিতে নাই, অন্যের শাস্ত্র পড়িতে নাই, গুরুনিন্দা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিবে, বা তথা হইতে উঠে যাবে, অনধিকারীকে নিজ ধর্ম্মকথা শুনাবে না, গোপনে নিজ মণ্ডলী লয়ে ধর্ম্মসাধনারত রহিবে, 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ,' ম্লেচ্ছদেশে গমনে, ও ম্লেচ্ছসংসর্গে প্রায়শ্চিত্তার্হ হ'তে হয়, ইত্যাদিরূপ বিধিব্যবস্থার ইহাই, বোধ হয়, কারণ। ভাবের রক্ষাসাধনে ইহাতে সহায়তা

হলেও, ইহার ফলে কূপমণ্ডূক-ভাবটাও বৃদ্ধি পায়; এবং তাহা হইতে অনেক কুফলের উৎপত্তি হয়।

বাস্তবিক, অনুকূল ও প্রতিকূল সাহিত্য—উভয় ভাবের মধ্য দিয়াই সমাজকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পাওয়াই উচিত। নতুবা ঝড় সহিবার শক্তি বাড়ে না, একচোখো, একভাবে ভাবান্বিত, একটা কৃত্রিম-সমাজ গঠিত হয় মাত্র। বহুভাবের মাঝ দিয়া আসিলেই, সংস্কারে সংস্কারে কাটাকাটি হয়ে গিয়ে, শেষে সংস্কারমুক্ত নির্ম্মল সত্যের ধারণায় সমাজের সামর্থ্য জন্মায়।

ইহা কি বিপরীত-বিহারের একটা নূতন অর্থ বলা সাজে না? মায়ার মধ্যে বিহার করে; মায়ার সাহায্যেই জীব, মায়াতীত সত্যকে গর্ভে ধরিতে সমর্থ হয়। জীব পুরুষ হ'য়েও স্ত্রীধর্ম্ম পায়, আর প্রকৃতি স্ত্রী হ'য়েও পুরুষের মত, জীবকে লয়ে নানাভাবে বিহার করেন; শেষে উহার গর্ভে সত্যরূপ সন্তানের জন্ম দেন।

সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব ও সাহিত্যের উপর সমাজের প্রভাব—এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝিতে আমাদের কষ্ট হবে না। তথাপি, মুখ্যভাবে এইবার এবিষয়ে দু এক কথা বলিয়া, আমরা আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সাহিত্য যেমন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সমাজও তদ্রূপ সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এ যেন সেই পুরাতন তৈলাধার পাত্র, বা পাত্রাধার তৈলের দৃষ্টান্ত। সুলেখকের চিন্তাশক্তি দ্বারা সমাজের চিন্তাস্রোতের গতি ফিরছে, আবার সমাজের চিত্তের অবস্থাগুণেই তাদৃশ প্রচারককুলকে স্বদেশী-ভাবের জন্মদাতা, বলিলে কি ভুল বলা হইবে না? বেদ অপৌরুষেয়, ঋষিগণের প্রসাদে ইহা জগতে প্রচারিত মাত্র। ভাবেরও সেইরূপ প্রচার মাত্র আছে; মানুষ উহার জন্মদাতা, কি উহার হাতের গড়া পুতুল, সহজে মীমাংসা হইবার নহে। সমাজ যেমন সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের গুণেই তেমনই গঠিত ও পুষ্ট হয়। এবিষয়ের নানা দৃষ্টান্ত, একটু ভাবিলেই নজরে পড়িবে।

"সংসর্গজাঃ দোষগুণাঃ ভবন্তি।" যখন যে ভাবের সংসর্গে আসা যায়, সাবধান না হ'লে, চিত্ত সেইভাবে রঞ্জিত হয়। এবিষয়ে আলোচনা পূর্ব্বে একবার করা গিয়াছে। সাহিত্য, সমাজের উপর এইভাবে অহরহঃ প্রভাব-বিস্তার করিতেছে; এবং ইহার নানা উদাহরণ আমরা যথাতথা দেখিতে পাই। যে সব সাহেব সংস্কৃতের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা প্রায়ই হিন্দু-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন; তেমনই আবার ইংরাজি-চর্চ্চার ফলে নব্য-হিন্দুসম্প্রদায়ের অনেকেই সাহেবিয়ানায় হাড়ে হাড়ে অভ্যস্ত হন। Rider Haggard-প্রমুখ প্রতীচ্য লেখককুলের লেখার ভিতর জন্মান্তরবাদ, অতিপ্রাকৃত ঘটনাসমূহের সমাবেশ ও অন্য অনেক বিষয়ে প্রাচ্যভাব বেশ ধরা পড়ে; সম্ভবতঃ ইহা প্রাচ্য-সাহিত্য-চর্চ্চার ফল। এদেশেও, ব্রাহ্ম, থিয়সফিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায় এইরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের মিলিত প্রভাবের দৃষ্টান্ত। মুসলমানী আমলে, আরবি ফারসি পড়ার ফলে, সমাজে অনেক মুসলমানী ঢং ঢুকেছিল; পক্ষান্তরে হিন্দুর শাস্ত্রদর্শনাদির প্রভাব, আকবর ও তৎসভাসদ্গণের উদার ভাব এবং সুফি-সম্প্রদায়ের মতবাদ-গঠনে যে সাহায্য করিয়াছিল, স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেকেই বিশ্বাস করেন, ভল্‌টেয়ার, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকগণের লেখার ফলেই ফরাসী-বিপ্লবের প্রলয়ের ঝড় অমনভাবে য়ুরোপীয় সমাজের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ ভল্‌টেয়ার, রুশো প্রভৃতিই আবার সমাজের চিদাকাশে বিহরণশীল মানস-পুত্রগণের হাতে-গড়া পুতুল মাত্র হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

ফলতঃ, সাহিত্য যেমন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সাহিত্যের উপর আবার সেইরূপ সমাজের প্রভাব নানা অপরূপ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, কবির, তুকারাম, চৈতন্য,—ইঁহাদের জন্ম কি সহসা বিনা কারণেই ঘটেছিল? এই সময়কার সামাজিক অবস্থাই ইঁহাদের জন্মদানের এবং ইঁহাদের বিরচিত সাহিত্যসমূহের কি প্রকৃত কারণ নয়? ভারতচন্দ্রের 'ব্যাসকাশীর উপাখ্যানে', তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ইচ্ছাই কি ভাষার আবরণে সমূর্ত্ত হইয়া দেখা দিতেছে না? 'ভক্তমাল' গ্রন্থের স্থানে স্থানে এইরূপ নবানুরাগের প্রবল একচোখো ভাব পরিস্ফুট। 'শিবায়ন' গ্রন্থে, মানুষের হাতে পড়ে দেবাদিদেব মহেশ্বর, আমাদেরই পাঁচজনের একজনের মত হয়ে, আমাদের কাছে বিরাজ করিতেছেন; দরিদ্র সংসারের

কলহ-কচকচিতে ভুগিয়া, কখন ত্যক্ত বিরক্ত, কখন বা প্রেয়সী ভগবতীর শাঁখাপরার সাধ মিটাইতে ব্যস্ত। এ সব সাহিত্যের উপর সমাজের প্রভাব বিস্তারের উদাহরণ মাত্র —অধিকেন অলম্।

মাতৃহারা

[শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়]

"বাবা!
দেখনা কোথায় একাকী কে যায়
মাথায় ঘোমটা দিয়ে—"
কহিল সেদিন মোর শিশু-মেয়ে
হাত খানি টেনে নিয়ে।
"শুধাও না বাবা! কোথা হ'তে এল,
চলনা ওদের বাড়ী,
মার মত ঠিক! দেখনা পরেছে
—সেই রাঙা পেড়ে সাড়ী!
কহিবে না কথা, কত দূরে কোথা,
পোড়া ডাক্তার-খানা?
বুড়ি ঝির সাথে যাব মার কাছে
শুনিব না তোমা মানা;
ওই গাড়ী যায়— এই গাড়ী আয়,
মার কাছে যাব আমি"—
বলিয়া সহসা কোলে হতে খুকি
যেতে চায় পথে নামি'।

চারি পাশে চেয়ে, ভাঙা বুকে তুলে,
বাহু পাশে যত ঢাকি,—
সদ্য মাতৃহারা কন্যা মোর তত
কেঁদে উঠে থাকি' থাকি'।
ছুটীর দুপুরে বসি গৃহ-দ্বারে,
দুঃখিনীরে লয়ে বুকে,
কত বাঁশী, ফুল, খেলনা, পুতুল,
কত চুমা দেই মুখে,—
ঠোঁটে হাসি হেসে আঁখি জল চেপে
বুঝাই ভুলাই কত,
অবুঝ তনয়া বুঝেও বুঝে না,
কাকে খুজে অবিরত।
দাসীর গলাটি আঁকড়িয়া ধরি,
সজলনয়নে চায়,
মুছাইতে গিয়া 'বুড়ি' মুছে আঁখি,
কাঁদে দোঁহে উভরায়।

কল্পতরু

ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলের কথা

[শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়]

"হাতি পর হাওদা ঘোড়ে পর জীন্
জলদি যাও জলদি যাও ওয়ারেণ হেষ্টিন্"

এই প্রবাদটি হেষ্টিংসের বারাণসী হইতে চুণারে প্রত্যাগমন-সময়ে রচিত হইয়াছিল। বারাণসীর হত্যাকাণ্ড, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মাধোদাসের বাগান হইতে পলায়ন, এ সব কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যভুক্ত নহে। কলিকাতা, আলিপুরের সহিত, হেষ্টিংসের কতটুকু সম্বন্ধ ছিল তাহাই দেখাইবার জন্য বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নূতন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার শাসনকালের ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অজ্ঞাত নহে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ধরিতে গেলে, বাঙ্গালায় ইংরেজাধিকৃত স্থানসমূহের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল। তিনি অনেক দিন এ দেশে ছিলেন, এ দেশের লোকের চালচলন জানিতেন, হাতেকলমে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক কুটীতে, ফ্যাক্টারিতে কাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন—এজন্য তাঁহারা প্রভুগণ, অর্থাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তাঁহাকেই লর্ড ক্লাইভের বিজয়লব্ধ বঙ্গরাজ্যের প্রথম অধিনায়করূপে নিযুক্ত করেন। বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হইয়া তিনি কি কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রকাশ।

হেষ্টিংসের কলিকাতায় দুইটি বাসভবন ছিল; একটি খাস কলিকাতার মধ্যে—অপরটি বাহিরে। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের, অর্থাৎ "সেণ্টজন গির্জ্জা"র, সান্নিধ্যে, যে বাড়ীটিতে এখন "বর্ণ কোম্পানীর" আপিস আছে, তাহাই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কালিকাতার আবাসবাটী ছিল।

হেষ্টিংসের আবাস-স্থান হইবার পূর্ব্বে, এই বাটীর অবস্থা অন্যরূপ ছিল। আজকাল যে রাজবর্ত্মটী "হেষ্টিংস ষ্ট্রীট" নামে প্রখ্যাত, তাহা পূর্ব্বে একটি খাল বা "ক্রীক্" ছিল। হেষ্টিংসষ্ট্রীটের এই খালটি, বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রীক্ রো ও ডিঙ্গাভাঙ্গার মধ্য দিয়া, ধাপা বা Salt Water Lakeএর সহিত মিলিত হয়। ভবিষ্যতে, খাল বুজাইয়া যখন রাস্তা করা হইয়াছিল, তখন, তাহা হেষ্টিংসের নামানুসারে আখ্যাত হয়। অদ্যাবধিও ইহা হেষ্টিংসষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত।
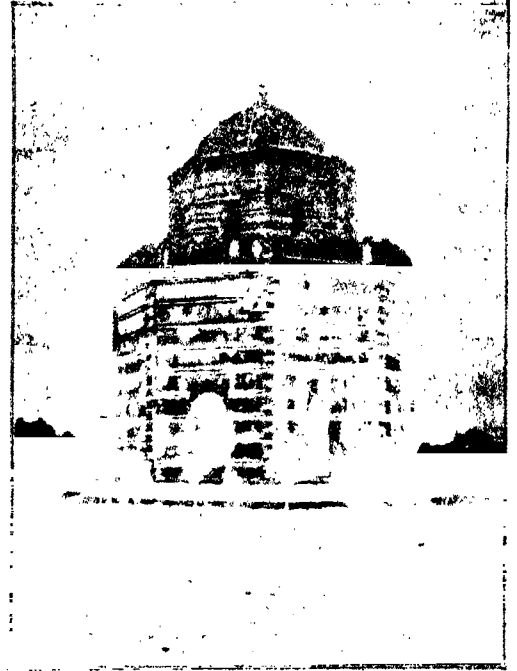
জব চার্ণকের সমাধি

সেণ্টজন গীর্জ্জায় এখন যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা পূর্ব্বে একটি "সমাধিক্ষেত্র" ছিল। এই সমাধিক্ষেত্র কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকের আমলের। কলিকাতা তখন একটি ক্ষুদ্র সেটেল্‌মেণ্ট, বা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যকেন্দ্র। যেসকল ইংরাজ কলিকাতায় মরিতেন, কিংবা বিলাত হইতে আসিবার পথে জাহাজে যাহাদের মৃত্যু হইত, তাঁহাদের জন্যই এই সমাধিক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। তখন পার্ক ষ্ট্রীটের নূতন ও পুরাতন গোরস্থান নির্ম্মিত হয় নাই।

এই সমাধি-প্রাঙ্গণের একদিকে সেণ্টজন গির্জ্জা, বা পাথুরে গির্জ্জা, এবং গির্জ্জার ভার-প্রাপ্ত পাদরী সাহেবের আবাস-বাটী, এবং অন্য অংশে এখনও সেই অতি পুরা-কালের সেই সমাধিগুলি বর্ত্তমান। এইস্থানে কলিকাতার চার্ণকী আমলের গবর্ণর গোল্ডস্‌বরা, সুবিখ্যাত ইংরাজ চিকিৎসক, সর্জ্জন্‌, হ্যামিল্টন্‌, কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক, পলাশী-বিজয়ী এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সনের সমাধি আজও বর্ত্তমান। আমরা এই সমাধিক্ষেত্রভুক্ত সেণ্টজন গীর্জ্জা ও জব চার্ণকের সমাধিমন্দিরের একখানি চিত্র পাঠকগণের দর্শনার্থে সংযোজিত করিলাম।

এই সেণ্টজন গির্জ্জার সান্নিধ্যেই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কলিকাতায় আবাসবাটী ছিল। আর, ইহা ছাড়া সহরের উপকণ্ঠে, আলিপুরে হেষ্টিংসের একখানি বাগানবাড়ীও ছিল, তাহা আজও "হেষ্টিংস হাউস্‌" বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

সেকালের বড় বড় সাহেব-সুবোরা বাগানবাড়ীতে বাস করিতে বড়ই পছন্দ করিতেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম চিফ্‌জাষ্টিস্‌—স্যর ইলাইজা ইম্পি পার্ক ষ্ট্রীটের একখানি বাগান-বাড়ীতে থাকিতেন। তখন চৌরঙ্গীর মাঠ, বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ইম্পির বাটীর চাকর-বাকরেরা কাজকর্ম্ম করিয়া, এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া গভীর রাত্রে কলিকাতা সহরে ফিরিতে হইলে, দলবদ্ধ না হইয়া আসিত না; পালকীর বেহারারা, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সওয়ারি লইয়া চলিয়া আসিত; সন্ধ্যার পর কেহই আসিতে চাহিত না। যদি বা কেহ কোন বাহকদল দুঃসাহসে ভর করিয়া ভাড়া খাটিত, তাহা হইলে তাহারা তিনগুণ, চারিগুণ ভাড়ার দাবি করিত। ইম্পির বাটীর সান্নিধ্যে একটি "ডিয়ার পার্ক" (Deer Park), বা হরিণী-বিচরণ-ক্ষেত্র, ছিল। অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, ইহা হইতেই এই স্থানের নাম পার্ক ষ্ট্রীট হইয়াছে। ইম্পির সহযোগী জজ্‌ চেম্বার্স ভবানীপুর-অঞ্চলে এক বাগানবাড়ীতে থাকিতেন। কাশীপুর বরাহনগরেও তাঁহার আর একখানি বাগানবাটী ছিল। বহুভাষাবিৎ সুপ্রীম কোর্টের পরবর্ত্তী চিফ্‌জষ্টিস্‌ স্যর উইলিয়াম জোন্স, গার্ডন-রিচে এক বাগানবাড়ীতে থাকিতেন। হেষ্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য বার-ওয়েল সাহেব খিদিরপুরে থাকিতেন। তাঁহার প্রাসাদ-তুল্য আবাসবাটীটি আজও বর্ত্তমান। আমরা ইহার একখানি ছবি দিলাম। ইহা Kidderpore house বলিয়া আজও বিখ্যাত।

"হেষ্টিংস্‌ হাউস"

আজকাল যাহা "টলিস নালা" বলিয়া কথিত, যে খাল খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জ হইতে আরম্ভ হইয়া খিদিরপুর, আলিপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট হইয়া টালিগঞ্জের দিকে প্রবাহিত, তাহা হেষ্টিংসের আমলেই প্রথম খনিত হয়। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট, কাপ্তেন টলিকে এই খাল খনন করিবার অনুমতি দেন। কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী এই গঙ্গা চিরদিনই "আদিগঙ্গা" বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে এই গঙ্গা একবারে মজিয়া গিয়াছিল। আবার এই শতাধিক বৎসর পরে পুনরায় এই আদিগঙ্গার সেই দশা। কাপ্তেন টলি, বহু অর্থব্যয়ে, দ্বিতীয় ভগীরথ-রূপে, এই মজা গঙ্গাকে পুনবার সজীব করিয়া তোলেন। ইহা খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জ হইতে আরম্ভ হইয়া ভবানীপুর, কালীঘাট, টালিগঞ্জ হইয়া সুন্দরবনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে কাপ্তেন টলিকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। তিনি, এই খালখনন-কার্য্যে, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করেন ও দেউলিয়া হইবার মত হন; কিন্তু টালিগঞ্জে নিজের নামে এক গঞ্জ বা বাজার স্থাপন করিয়া ও খনিত গঙ্গার বক্ষবাহিনী বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ নৌকাসমূহের উপর টোল আদায় দ্বারা, পরিশেষে তিনি প্রচুর বিত্তশালী হইয়া উঠেন। টালিগঞ্জ, বা "টলিগঞ্জ", আজও তাঁহারা কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে।

কলিযুগের ভগীরথ, এই কাপ্তেন টলি আলিপুরে বাস করিতেন। বর্ত্তমান বেল্‌ভেডিয়ারের সান্নিধ্যেই তাঁহার

বাসভবন ছিল। টলি সাহেবের বাসভবনের অতি নিকটেই হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। কেন এ যুদ্ধ ঘটে, তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হইবে। মোটের উপর পাঠক এই টুকু জানিয়া রাখুন, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস—যিনি গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মন্ত্রি-সভার একজন সদস্য ছিলেন,—তিনি তাহার কার্য্যারম্ভ-কালের প্রথম হইতেই হেষ্টিংসের ঘোর শত্রু ছিলেন। এই ফ্রান্সিস্ সাহেবের বিরুদ্ধে কৌন্সিলের মন্তব্য বহিতে হেষ্টিংস এক অপমানজনক মন্তব্য প্রকাশ করেন। এইজন্য এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা।

এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান, বর্ত্তমান 'জুওলজিক্যাল' বাগানের অতি সন্নিকটে। বেলভেডিয়ারের পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া আলিপুর শান্ত্রী লাইনের মধ্য দিয়া যে রাস্তাটি ডায়মণ্ড হারবার রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহারই উত্তর প্রান্তে বেলভেডিয়ারের পার্শ্ববর্ত্তী এক উন্মুক্ত স্থানে হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। এইস্থান এখন "Duel Avenue" বলিয়া চিহ্নিত। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ, ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর এই স্থানটিকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে বহুদিন পূর্ব্বে একটি সুবৃহৎ গাছ দেখা যাইত। এই বৃক্ষতলেই নাকি যুদ্ধ হইয়াছিল; এইজন্য বহুদিন পর্য্যন্ত সেই গাছটি "Tree of Destruction" বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল।

এই প্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারে চিরপ্রচলিত প্রথামত উভয় পক্ষেরই এক একজন সহকারী উপস্থিত থাকেন। হেষ্টিংসের সহকারী হইয়াছিলেন লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল পিয়ার্স; আর ফ্রান্সিসের সহকারী হইয়াছিলেন—কর্ণেল ওয়াটসন্। খিদিরপুর "ওয়াট্‌গঞ্জ বাজার" আজও কর্ণেল ওয়াটসনের নাম ঘোষণা করিতেছে। ওয়াট্‌সন্, ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের 'চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার' ছিলেন। খিদিরপুরের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ডক-ইয়ার্ড তাঁহারই কীর্ত্তি। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের ১৭ই আগষ্ট, প্রাতঃকালে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। হেষ্টিংসের সহকারী পিয়ার্সের রোজ-নামচা হইতে, পাঠকবর্গের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য, আমরা কেবল সেইদিনের ঘটনা-টুকুর সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি।

পিয়ার্স লিখিতেছেন—"পরদিন প্রাতঃকালে (বৃহস্পতি-বার ১৭ই আগষ্ট) আমি চেরেট গাড়ি করিয়া, হেষ্টিংসের বাড়ীতে গেলাম। হেষ্টিংসকে লইয়া আমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হই। দেখিলাম, আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই, ফ্রান্সিস্ ও ওয়াট্‌সন্ সেখানে পৌছিয়াছেন। আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম যে, তখন প্রায় ৫.৩০ সাড়ে পাঁচটা। আমি উচ্চৈঃস্বরে স্যর্ ফ্রান্সিস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"মহাশয়!

"খিদিরপুর হাউস্"

সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে।" ফ্রান্সিস্ তাঁহার ঘড়ী দেখিয়া বলিলেন,—"সাড়ে পাঁচটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমার ঘড়ীতে প্রায় ছয়টা।" আমি কাজেকাজেই তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইলাম,—"আমার ঘড়ীই ঠিক। কেন না, এ ঘড়ী আমার বাড়ীর জ্যোতিষিক যন্ত্রযুক্ত ঘড়ীর (Astronomical Clock) সহিত মেলান।" যে স্থানে তাঁহারা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, সে স্থানটি ঠিক এ কাজের উপযুক্ত নয়। নিকটের রাস্তাটি প্রকাশ্য রাজপথ; আলিপুরের দিকে এই পথটি চলিয়া গিয়াছে। নিকটেই দুই ধারে বৃক্ষাদিশোভিত একটি ভ্রমণ-পথ; ইহা বেলভেডিয়ার বাগানের উদ্যানের অংশভুক্ত। কর্ণেল ওয়াট্‌সন্, ফ্রান্সিসের পিস্তল আনিতে গেলেন; কিন্তু এ স্থানে যুদ্ধ করিতে হেষ্টিংসের মত হইল না; তিনি আপত্তি তুলিলেন – "এ স্থানটি তত সুবিধা কর নহে। চারি দিকে জঙ্গল ও খাগড়া বন; এজন্য অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময়।" শেষ আলিপুরের পথটিকেই যুদ্ধস্থানরূপে প্রস্তাব করা হইল; কিন্তু ইহাতেও আবার আপত্তি উঠিল; কারণ, তখন প্রভাত হইয়াছে।

পথটিও সাধারণ রাজ-পথ; অনেক ইংরাজ প্রভাত-বায়ু-সেবনের জন্য অশ্বারোহণে সে দিকে আসিতে পারেন। পরিশেষে, বারওয়েল সাহেবের বাড়ীর দিকেই অগ্রসর হওয়া স্থির হইল। * এই স্থানে আর একটি ক্ষুদ্র পথ ছিল। স্থানটি বেশ পরিষ্কার ও উন্মুক্ত। আমরা এই স্থানটিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান বলিয়া ঠিক করিয়া লইলাম।

"দ্বন্দযুদ্ধের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচিত হইবার পর আমি হেষ্টিংসের পিস্তলটি ভরিয়া দিলাম। ফ্রান্সিস্ সাহেবের পিস্তলটি আগেই ভরা হইয়াছিল। পিস্তল ভরা হইবার পর আমি দেখিলাম, তাঁহাদের দুই জনেই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আবশ্যক বিধানগুলি সম্বন্ধে একবারে অনভিজ্ঞ। আমি তাঁহাদের দুই জনকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—'যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্থানের দূরত্ব আগে ঠিক করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আর এ দূরত্ব নির্ণয়-কার্য্য সহকারীরাই করিয়া থাকেন।' কর্ণেল ওয়াট্সন বলিলেন—'ফক্স্ ও আডাম্সের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময়, দূরত্ব-পরিমাণ চৌদ্দহাত স্থির করা হইয়াছিল; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হউক।' হেষ্টিংস বলিলেন—'পিস্তলের গুলি চালাইবার পক্ষে এতটা দূরত্ব ঠিক নহে।' কিন্তু শেষ তর্কাতর্কির পর এই দূরত্বই ধার্য্য হইয়া গেল। ওয়াট্সন, পা গণিয়া জমী মাপিতে লাগিলেন, আমি এক-দুই করিয়া গণিতে লাগিলাম। ইহার পর হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিস্ এই মাপা স্থানটির দুই মুখে দাঁড়াইলেন। হেষ্টিংস, ফ্রান্সিস্‌কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন—'আপনি ঠিক লাইনের মুখে দাঁড়ান নাই—পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন!' ফ্রান্সিস্ বলিলেন—'আমি পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছি।' এই কথা শুনিয়া হেষ্টিংসও তাঁহার লাইনের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম—'পিস্তল না ছুঁড়িয়া তাঁহাদের কেহই স্থানত্যাগ করিতে পারিবেন না। ইহাই হইতেছে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম।' 'কর্ণেল ওয়াট্সন্ বলিলেন—ইঁহারা দুই জনেই এক সঙ্গে পিস্তল ছুঁড়ুন; তাহা হইলেই ঠিক নিয়মিত কাজ হইবে। আমাদের একজন—এক, দুই, তিন এই রূপ বলিব। তিন-শব্দটি বলা শেষ হইলেই, আপনারা পিস্তল ছুঁড়িবেন।' এই সময়ে ফ্রান্সিস তাঁহার পিস্তলটির ঘোড়া টানিয়া পরীক্ষা করিতে গেলেন; কিন্তু বারুদ ভিজা থাকায় পিস্তল হইতে আওয়াজ বাহির হইল না। হেষ্টিংস্ তাঁহার পিস্তল ছোঁড়া বন্ধ রাখিয়া বলিলেন—'আমার পিস্তল ঠিক আছে; ফ্রান্সিস্‌কে একটি অতিরিক্ত "কার্ট্রিজ" দিলাম, ও নূতন বারুদ দ্বারা তাঁহার পিস্তল ভরিয়া দিলাম।'

"তারপর, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। এক – দুই—তিন এই সঙ্কেত-শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সিস্ আগে পিস্তল ছুঁড়িয়া বসিলেন। তাঁহার পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, অর্থাৎ হেষ্টিংসকে লাগিল না। হেষ্টিংস্ ঠিক এই সময়ে পিস্তল ছুঁড়িলেন। তাঁহার গুলিতে আহত হইয়া ফ্রান্সিস্ সাহেব টলিতে টলিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন—ও কম্পিত স্বরে বলিলেন—'ওঃ! আমি মরিলাম।' হেষ্টিংস্ এই কথা শুনিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন—'মঙ্গলময় ঈশ্বর করুন, যেন তাহা না হয়।' এই বলিয়া হেষ্টিংস সাহেব আহত ও ভূপতিত ফ্রান্সিসের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন। কর্ণেল ওয়াট্সন্‌ও তদ্রূপ করিলেন। আমি চাকরদের ডাকিতে গেলাম!"

কর্ণেল পিয়ার্স ইহার পর লিখিতেছেন ঃ—"আমি এক্ষণে অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া চাকরদের ডাকিতে গিয়াছিলাম। ফ্রান্সিসের সেই আহত স্থান বাঁধিবার জন্য, একজন ভৃত্যকে চাদর আনিতে আদেশ করিলাম। এই কার্য্য করিতে আমার মোটে দুই মিনিট সময় লাগিল। ঘটনাস্থলে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি—হেষ্টিংস সাহেব, আহত ফ্রান্সিসের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, ও কর্ণেল ওয়াট্সন্ বেলভেডিয়ার হইতে একখানি ডুলি, বা পাল্কী, আনিতে গিয়াছেন। পাল্কী আনার উদ্দেশ্য এই, আহত ফ্রান্সিস্‌কে এই পাল্‌কী করিয়া সহরে লইয়া যাওয়া হইবে। চাদরখানি লইয়া আমি ও হেষ্টিংস সাহেব, উহা দ্বারা তাঁহার আহত স্থানের চারি দিকে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিলাম। বড়ই সুখের বিষয় যে, ফ্রান্সিস্ সাহেবের শরীরের কোন মর্ম্মস্থান আহত হয় নাই। ফ্রান্সিস্ সাহেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনিও আমাদের অনুমানের সমর্থন করিলেন। পাল্‌কী আসিয়া পৌঁছিল। আমি প্রস্তাব করিলাম যে, পাল্‌কী অপেক্ষা আমার গাড়ীতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। মিঃ হেষ্টিংসও

* বর্ত্তমান Kidderpore House বা Orphan Asylumই—বারওয়েলের বাসভবন। আজও যেমন আছে, তখনও এই ভাবেই এই বাটীর চারিদিকে প্রকাণ্ড ময়দান ছিল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রকৃত স্থান কোন্ জমীটুকু, তাহা আজও ঠিক সনাক্ত হয় নাই।

এই প্রস্তাবের সমর্থন করায় ফ্রান্সিস্ সাহেব, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, আমাদের সম্মুখে একটি গভীর নালা পড়িল। পাল্‌কী সমেত এটি পার হওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, আমরা ফ্রান্সিস্ সাহেবকে লইয়া বেল্‌ভেডিয়ারে গেলাম।" ইহাই কর্ণেল পিয়ার্সের লিখিত, ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাহিনী! বর্ত্তমান বৎসর হইতে ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় উপকণ্ঠবর্ত্তী আলিপুরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মাননীয় ওয়ারেণ হেষ্টিংস

কেবল হেষ্টিংস, ফ্রান্সিস্ ও বার্‌ওয়েল্ নহেন, নবাবমীরজাফরের স্মৃতির সহিতও এই আলিপুরের নাম বিজড়িত। কেহ কেহ অনুমান করেন—নবাব মীরজাফর আলি খাঁ এখানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম আলিপুর হইয়াছে। অন্য মতে, নবাব সেরাজউদ্দৌলা, কলিকাতা-আক্রমণের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য, কলিকাতার "আলিনগর" নামকরণ করেন। "আলিপুর", আলিনগরেরই পরিবর্ত্তিত নামকরণ। যে কারণেই হউক না কেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে আলিপুর খুব জাঁকিয়া উঠে। এখনও আলিপুরের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি পল্লী "বেগমবাড়ী" "সাহেব বাগান" প্রভৃতি নামে পরিচিত।

নবাব মীরজাফর, আলিপুরের কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। পলাশীযুদ্ধের তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, গবর্ণর ভান্সিটার্ট তাঁহাকে নবাবী মসনদ হইতে অপসৃত করেন। তাঁহার জামাতা মীরকাশেম আলি খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইলেন। সিংহাসন হইতে নবাব, কলিকাতা বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করেন—"সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ইংরাজদের রক্ষাধীন না থাকিলে—বঙ্গদেশের কোন স্থানেই আমি নিরাপদ নহি। এজন্য আমি কলিকাতাতেই বাস করিতে চাই।" বোর্ডের নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া, নবাব কলিকাতায় আসেন ও কলিকাতার উপকণ্ঠ আলিপুরে বসবাস করেন। নবাব মীরজাফর যে বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য এখন বর্ত্তমান নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্ত্তমান 'জজ-কাছারি' যে স্থানে আছে, সেই স্থানে তাঁহার আবাসবাটী ছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বাঙ্গালার মসনদে বসেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার কলিকাতার আবাসবাটী, বাগান ও তৎসন্নিহিত জমীগুলি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে দান করিয়া যান। ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে সম্ভবতঃ বিনামূল্যে এই জমীগুলি দান করিয়াছিলেন; কারণ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট হইতে নবাব যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিলেন।*

দানসূত্রেই হউক, বা ক্রয়সূত্রেই হউক, এই সম্পত্তি হেষ্টিংস ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে লাভ করেন। ঐ বৎসরে মীরজাফর, আলিপুর ত্যাগ করিয়া, মুরশিদাবাদে চলিয়া যান। ঐ বৎসরেই দেখা যায়, হেষ্টিংস কালীঘাটের টলিস্ নালার

* নবাব মীরজাফরের এরূপ দান, আর একস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড ক্লাইবের সহায়তায় ও সমর্থনে, তিনি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবীপদ লাভ করেন। তিনি ক্লাইভকে যে সমস্ত দান করেন, তাহার তালিকা নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজীটুকু হইতেই জানা যায়—

"Three lacs fifty thousand rupees in money, fifty thousand rupees in jewels, one lac in gold Mohurs, in all 5 lacs of rupees in money and effects, to the Light of my eyes, the Nabob firm in war, Lord Clive the Hero.

লর্ড ক্লাইভ, নবাবের এ দান গ্রহণ করেন নাই। অকর্ম্মণ্য ও আহত সৈনিকগণের পরিবার ও পুত্রগণের সাহায্যার্থ যে ফণ্ড স্থাপিত হয়, ক্লাইভ সেই সৎকার্য্যার্থ এই টাকা দান করেন।

উপর এক সেতুনির্ম্মাণের জন্য "কলিকাতা বোর্ডের" অনুমতি চাহিতেছেন। বলা বাহুল্য, 'বোর্ড' হেষ্টিংসের এ প্রস্তাবে সম্মতিদানে কুণ্ঠিত হন নাই।

এইবার আমরা "হেষ্টিংস হাউসের" কথা বলিব। এই বাড়ী হেষ্টিংস পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মাণ করেন। গবর্ণরী পদ ত্যাগ করিয়া বিলাত যাইবার সময় পর্য্যন্ত, তিনি এই বাটীতে বসবাস করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান হেষ্টিংস হাউসের পশ্চিমদিকে আর একখানি বাড়ী ছিল। হেষ্টিংস সর্ব্বপ্রথম এই বাড়ীতেই বাস করিতেন। হেষ্টিংস হাউসের চারিদিকের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত ছিল। আজকাল জজ্ কোর্টের সম্মুখ দিয়া যে পথটি 'কালীঘাট ব্রিজে'র উপর পৌঁছিয়াছে, তাহা অধুনাতন কালের। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আমরা দেখিয়াছি, একটি রাস্তা এই হেষ্টিংস হাউসের সীমানার পার্শ্ব দিয়া, বরাবর ফৌজদারী কোর্টের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই রাস্তার পার্শ্বে 'সুবার্ব্বন্ মিউনিসিপ্যালিটী'র পুরাতন আফিস ছিল। তখন ভবানীপুর, খিদিরপুর, কালীঘাট প্রভৃতি এই সুবার্ব্বন্ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে ছিল।

বর্ত্তমান জজ্‌কোর্টের পার্শ্ববর্ত্তী পথের অপর দিকে আজকাল যে সমস্ত প্রাসাদতুল্য দ্বিতল ত্রিতল সাহেবী বাড়ীগুলি নির্ম্মিত হইয়া, আলিপুরকে "ছোট চৌরঙ্গী" করিয়া তুলিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি, বহুদিন পূর্ব্বে এইস্থানে একটি সুবৃহৎ 'আরারুট' বাগান ছিল। ইহার ফটকের উপর "The Penn" বলিয়া একটি প্রস্তর-ফলক মারা ছিল। যাহারা সুবিধার জন্য এই 'পেনে'র মধ্য দিয়া জজ্-কোর্ট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে যাইতেন, তাঁহাদের একটি করিয়া পয়সা পারাণী বৃত্তি দিতে হইত। এখন এই 'পেনে'র অধিকৃত স্থানে প্রাসাদতুল্য বাটীগুলি নির্ম্মিত হওয়ায় ও জজের কোর্টের আশে-পাশে নূতন পথ প্রস্তুত হওয়ায়, সাবেক হেষ্টিংস-হাউস সংলগ্ন সুবৃহৎ বাগানের-সীমানা নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমানে বড়ই দুরূহ ব্যাপার! হেষ্টিংসের এই ভূসম্পত্তির সীমা-সরহদ্দ নিরূপণ করা, বর্ত্তমান কালে দুরূহ হইলেও, ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের কলিকাতা গেজেটে ইহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

হেষ্টিংসের সমস্ত সম্পত্তি, তিনটি "লটে" বিভক্ত হইয়া, বিক্রয়ের জন্য ঘোষিত হয়। প্রথম দুইটি লট, টর্ণার ও জ্যাক্‌সন্ সাহেব ক্রয় করেন। তৃতীয় লট্, বা "প্যাডক্" গেট-সংযুক্ত ভূমিখণ্ড, সুপ্রীম কোর্টের তৎসাময়িক বিখ্যাত এটর্ণি মিঃ হনিকুম্ব ক্রয় করেন। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে শেষোক্ত ভূমিখণ্ড ডিঃ ডব্লু. স্পিড্ নামক একজন সাহেব ক্রয় করিয়াছিলেন। স্পিড্ সাহেব এই জমী ক্রয় করিয়া, এখানে এরারুটের চাষ করিয়াছিলেন। এই সময়ে, এই ভূখণ্ডের নাম "পাডক্" হইতে "পেন্"এ পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা এরারুট গাছ-পরিপূর্ণ "পেনের" মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পথ দিয়া বহুবার যাতায়াত করিয়াছি। এই জমীর প্রবেশপথে, একটি "প্যাডক্", বা ঘোরান-গেট, ছিল বলিয়া ইহার "প্যাডক্ গেট" নামকরণ হইয়াছিল। এই গেটটি সম্ভবতঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের। যে সময়ে হনিকুম্ব সাহেব এই "প্যাডক্" ক্রয় করেন, সেই সময়ে ইহার সংশ্লিষ্ট দলিল-পত্রের মধ্যে হেষ্টিংসের দানপত্রও ছিল। সম্ভবতঃ এ দানপত্র নবাব মীরজাফরের প্রদত্ত। এখন এই দানপত্র বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসে আছে। *

৭৮৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়—

"ওল্ড কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীটে মেসার্স উইলিয়ম্ ও লি কোম্পানী আগামী ১০ই মে তারিখে (১৭৮৫) ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের সম্পত্তির কতকটা অংশ প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবেন। এই অংশটি তিনটি "লট্" বা টুকরায় বিভক্ত করা হইয়াছে। ক্রেতা ইচ্ছা করিলে উক্ত কোম্পানীর আপিসে ইহার নক্সা দেখিতে পারেন। †

১ নং লট।—প্যাডক্ গেটের সম্মুখের দিকে একটি বাড়ী। এই বাড়ীটিতে একটি হল আছে। হলের দক্ষিণ-দিকে বারান্দা, ছয়টি কামরাও আছে। এই বাটীর সান্নিধ্যে দুইটি ছোট ছোট "বাঙ্গলো" ও পরিষ্কার জলপূর্ণ পুষ্করিণী। জমীর পরিমাণ ৬৩ বিঘা। ইহার কতকাংশ তৃণাচ্ছাদিত

* Calcutta Englishman, 27-5-1892—(Dr. Busteed's Article).

† To be sold by Messrs. Williams and Lee at the Old Court House on the 10th May (.1785) next (a map of the Estate now lying for inspection at the Library) part of the Estate of Warren Hastings at Alipur in 3 Lots. (Calcutta Gazette, 1785).

জমী। বাকি অংশ নানাবিধ ফলন্ত বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান। বাগানে যে সমস্ত গাছ আছে, তাহার অধিকাংশই ফলের গাছ। বাগানের মধ্যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীও আছে।

"২নং লট—একটি দ্বিতল বাটী। প্রত্যেক তলেই একটি করিয়া সুবৃহৎ হল কামরা। হল কামরার পার্শ্বে দুইটি বড় বড় ঘর। দ্বিতলে উঠিবার জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর সিঁড়ি। মাদ্রাজী চূণে দেওয়ালগুলি চুণকাম করা। নীচের হল কামরার আশে পাশে চারিটি শয়ন-গৃহ। শয়নগৃহের পার্শ্বেই স্নানাগার। বাটীর দেওয়ালগুলির আদ্যোপান্ত মাদ্রাজী চূণে "পংথের" কাজ করা। চৌদ্দটি ঘোড়া রাখিবার উপযুক্ত আস্তাবল। চারিখানি কোচ্, বা গাড়ী রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ। এই পাকা আস্তাবল ও গাড়ী রাখিবার ঘর ছাড়া আর একটি চালা আস্তাবলও আছে। শেষোক্ত আস্তাবলে ১২টি ঘোড়া ও ছয় খানি গাড়ী রাখা যাইতে পারে। জমীর পরিমাণ ৪৬ বিঘা।

"লট নং ৩—প্যাডক্ গেট-সম্বলিত ৫২ বিঘা জমী। এই জমীর চারি দিকে কাষ্ঠের রেলিং দেওয়া।"

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনগুলির ইংরাজী অংশ উদ্ধৃত করিতে গেলে, অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়; এজন্য তাহা পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা ২৪।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানগুলি দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনগুলি পড়িয়াই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আলিপুরের সম্পত্তির অবস্থান-স্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই দীন লেখক, সুপ্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান ও ঐতিহাসিক মিঃ হেন্‌রী বেভারিজের সহিত, "হেষ্টিংস হাউস" দেখিতে গিয়াছিল। বেভারিজ্ সাহেব সেই সময়ে আলিপুরের 'সেসন্-জজ' ছিলেন এবং আলিপুরের "দিল্‌খুসী" নামক বাটীতে থাকিতেন। এই বাটী, হেষ্টিংস হাউসের ও পূর্ব্বোক্ত "প্যাডক্" বাগানের অতি নিকটে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই স্থানগুলিকে যে ভাবে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত; পুরাতনকে চিনিবার ও সনাক্ত করিবার উপায় বড়ই কম।

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনের ১নং লটভুক্ত জমী সনাক্ত করিতে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। এখন যে জমী "হেষ্টিংস হাউসের" পশ্চিম দিকে, আলিপুর বোর্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাই এই ১নং লটভুক্ত ৬৩ বিঘা জমী। এখন এই জমীর একাংশ দিয়া জজকোর্টের মধ্যবর্ত্তী একটি পথ চলিয়া গিয়াছে ও তাহার পার্শ্বেই ২৪ পরগণার জজসাহেবের ও মুন্সেফদিগের কাছারি গৃহ। এই জমীর অধিকাংশই, আগে তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ছিল। বাগানের চারিপার্শ্বে অনেক সুমিষ্ট ফলের গাছ, এমন কি দারুচিনি বৃক্ষ পর্য্যন্ত
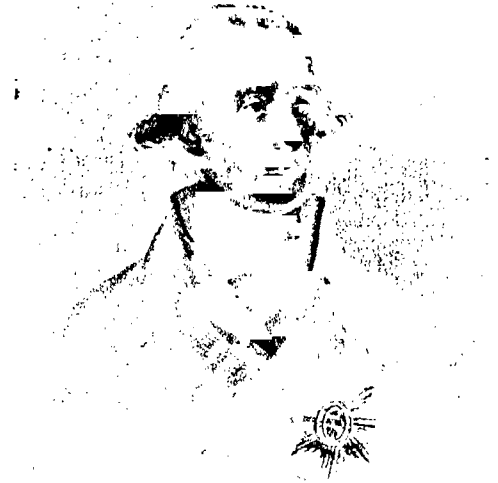
মাননীয় জোসেফ ফ্রান্সিস্

এই বাগানে দেখা যাইত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাগান-বাগিচার খুব সখ ছিল। তাহা না হইলে, তিনি, কলিকাতা সহরের আবাসবাটী ছাড়িয়া, এই জঙ্গলপূর্ণ আলিপুরে বাস করিতেন না। যে সকল গাছ বাঙ্গালার মাটিতে জন্মে না, তিনি চেষ্টা করিয়া সেই সমস্ত গাছ সংগ্রহ করিয়া, নিজের বাগানে রোপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার "হেষ্টিংস হাউসে" কমলা লেবুর গাছ পর্য্যন্ত জন্মিয়া ছিল।

২নং লটে যে দ্বিতল গৃহের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান হেষ্টিংস হাউসের মধ্যের অংশটি ঠিক মিলিয়া যায়। হেষ্টিংসের আমলের সেই পাথরের সিঁড়ি এখনও বর্ত্তমান। পিছনের দিকের সেই পুরাকালের সিঁড়িটি আজও রহিয়াছে। তবে মাদ্রাজী চূণে পলস্তারা দেওয়া দেওয়ালের অবস্থা এখন অন্যরূপ। বহুবার তাহা চুণকাম, মেরামত ও চিত্রিত হওয়া তাহার উপর অনেকগুলি চুণের

স্তর পড়িয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যস্থিত সাবেক ঝিল, বা পুষ্করিণীটি, এখনও বর্ত্তমান।

এই প্রবন্ধে আমরা "হেষ্টিংস হাউসের" এক খানি চিত্র দিলাম। হেষ্টিংস হাউসের প্রাচীন স্মৃতি-রক্ষার জন্য, আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর, এই পুরাতন বাটীটি ও তৎসংলগ্ন জমীগুলি কিনিয়া লইয়া, তাহা State Guest House, বা গবর্ণমেণ্টের অতিথি-নিবাসে, পরিণত করিয়াছেন। যে কোন করদ, বা মিত্র নৃপতি গবর্ণমেণ্টের অতিথিরূপে কলিকাতায় আসেন, তাঁহারা এই বাটীতেই বাস করেন। হেষ্টিংস হাউস সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভবপর,তাহা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল। ভবিষ্যতে "বেলভেডিয়ারে"র কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

তরুণ জাপান

[শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

জাপান রাজ্যে, কি প্রকাশ্য রাজপথে খেলা-ধুলায় মত্ত গরীব-দুঃখীর সন্তান, কি ফুল্ল-কুসুম-শোভিত উদ্যান বিহারী ধনি-সন্তান,—শিশুমাত্রেই স্বজাতিসুলভ বেশ বিন্যাসে অতি প্রিয়-দর্শন—সর্ব্বদাই আনন্দোৎফুল্ল; সভ্যতাগর্ব্বিত পিতামাতা বিজাতীয় সাহেবী পরিচ্ছদে যে সকল সন্ততিকে সজ্জিত করেন, তাহারাই কেবল অস্বস্তি ভোগ করে। রামধনু-বর্ণ 'কে্প', কিংবা নীলবর্ণ কার্পাস-বস্ত্র-নির্ম্মিত পরিচ্ছদে তাহাদিগকে স্ব স্ব পিতৃপিতা-মহের এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ স্বরূপ মনে হয়—মাথায় বিচিত্র টুপি, গলায় 'বিব্'-শোভিত শিশুগুলিকে যেন দেবালয়-গাত্রশোভিত ছোট ছোট পুতুলের মত দেখায়।

আদমসুমারীর হিসাব দেখিয়া জানা যায় যে, প্রতি বর্ষে প্রায় পাঁচ লক্ষ জাপ-শিশু জন্ম-গ্রহণ করে। পরবর্ত্তী দশ বৎসরকাল, তাহাদিগকে পথে ঘাটে বিচরণ করিতে দেখা যায়। যদিও একটা প্রবাদ আছে যে, জাপানী শিশুরা কাঁদিতে জানে না, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে যন্ত্রণা বা বিরক্তি-বশে চীৎকার করিতে শুনা যায়। তবে, সভ্য-প্রদেশে, শিশুপালনের নানা উন্নত কৃত্রিম-বিধান প্রবর্ত্তিত থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের যে পরিমাণ দুর্ভোগ ঘটিতে দেখা যায়, এ সকল প্রাচীন-রীতিপ্রধান দেশে ততটা ঘটে না; ইহাদের স্বাস্থ্যাদি অনেকটা ভালই থাকে।

জাপানীরা, শিশুসন্তানগুলিকে ফেলিয়া কোথাও যায় না—যেখানেই যায়, শিশুরা তাহাদের সঙ্গের সাথী, মাতা পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পৃষ্ঠারূঢ় হইয়া নিদ্রা যায়—
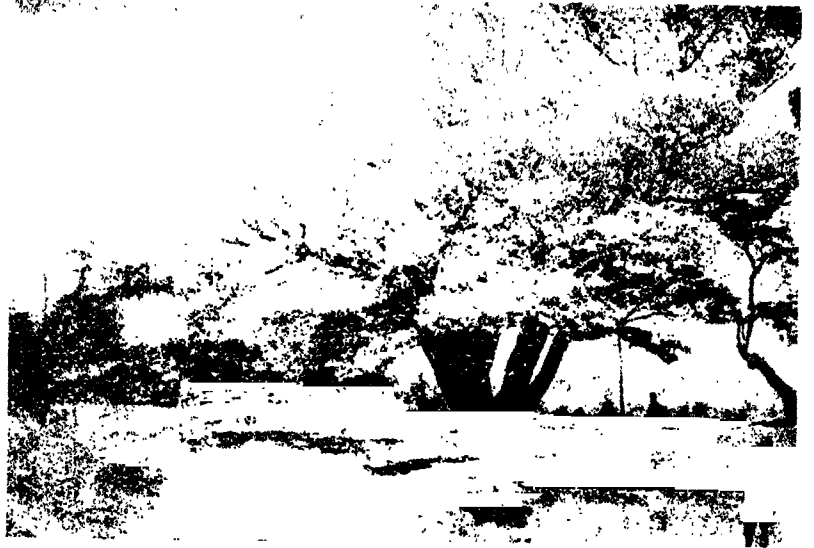
পুষ্পিত সকুরা বৃক্ষ

অনেক সময়েই স্থিরভাবে থাকে। শীতকালে, উষ্ণ-বস্ত্রাবৃত হইয়া ইহারা যখন তাহাদের পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান করে, তখন বাহকদিগকে 'কুব্জদেহ' বলিয়া মনে হয়।—দোকানে, বাজারে, মন্দিরে যাইতে,—গৃহ-মার্জ্জন বা জলোত্তোলন

কালে—সকল সময়েই শিশুগুলি তদবস্থায় অবস্থান করে ; একটু বড় হইলেই বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই ভগ্নীর সহিত খেলায় রত হয়।

বালক বা বালিকা, একটু বড় হইলেই, পৃষ্ঠদেশে শিশু ভাই-ভগিনীগুলিকে বহন করিতে আরম্ভ করে। শত-সহস্র অধিবাসীই প্রায় এইরূপ 'দ্বিতল' বেশে বিচরণ করে—তথাপি পথে ঘাটে অসংখ্য ক্রীড়াশীল বালক বালিকার অভাব নাই। এক-এক সময় এক একটি বালক-বালিকাকে মোটা-সোটা—প্রায় তত্তুল্য আকৃতিবিশিষ্ট শিশুকে অনায়াসে বহন করিয়া ফিরিতে দেখা যায়। কখনও বা, এক একজন পিতা এইরূপ দ্বিতল যুগল সন্তানকে বহন করিতেছেন, দেখা যায়!

স্নানে ক্রন্দন

সুইজর্ল্যাণ্ডের মত এখানেও প্রাতঃকালেই স্কুল বসে। বিদ্যালয়গুলি সুপ্রশস্ত জানালা-দরজাবিশিষ্ট এবং অব্যাহত বায়ুশীল বিদ্যালয় গৃহগুলি কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপিত করা বায়সাধ্য বলিয়া, শীতের মধ্যভাগটায় প্রায় দীর্ঘ-অবকাশ থাকে। প্রতি সহরে প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্ণে পথে সামরিক শিরোপা-ভূষিত বালক এবং রক্তবর্ণ 'হাকামা' নামক পরিচ্ছদ-ভূষিত বালিকা অগণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, এবং ইহাদের জ্ঞান-তৃষা ও বিদ্যানুরাগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অবসরকালে অসংখ্য ক্রীড়াকুশল—দলবদ্ধভাবে অঙ্গ-চালনা ও ব্যায়ামাদি শিক্ষাকার্য্যে নিরত—বালকবালিকাপূর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্র দেখিয়া বিদেশীর পক্ষে বিদ্যালয়গুলি চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য হয় না। শিশু-বিদ্যালয়গুলিতে বালক-বালিকাদিগকে বিদ্যা ও ব্যায়াম একত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে যখন, বালকেরা অঙ্গে 'নিকার-বোকা'র, চূড়াকৃতি টুপি মস্তকে, পৃষ্ঠদেশে কেতাবের 'তল্পী' ভূষণে: বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ

শয্যাত্যাগ

শিশু ও শাবক

aid) আহতের প্রাথমিক সাহায্য ও শুশ্রূষা কার্য্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ, জাপানীরা সকলেই দীর্ঘপথ চলিতে পারে; তাহাদের পাদুকাগুলি এ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমেরিকার সার্ব্বজনীন 'অস্বস্তি'—'থ্যাবড়া'পা জাপানে নাই; জাপানী সামরিক অস্ত্রচিকিৎসকদিগকে 'পা-ভারা'র কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তরুণ জাপানীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রতিবর্ষে 'ডাইমিও'র অনুসরণে 'যেড্ডো' পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিত—সুদূরস্থিত তীর্থ বা সুপ্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে যাত্রা করিত। বর্ত্তমানকালের তরুণ জাপানীরাও বসন্ত ও শরৎকালে প্রতি শনিবার সামরিক রীত্যনুসারে সহর প্রদক্ষিণ বা সুদূর নগরভ্রমণে যাত্রা করে। এই সকল দিনে অতি প্রত্যুষে কোলাহল করিতে করিতে বা কোনও কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে—ইহাদিগকে যাত্রা করিতে দেখা যায়। এ বৎসর যাবতীয় মধ্য-জাপানবাসী 'মমোয়ামা' যাত্রা করিয়াছিল।—সেখানে 'গুরু মীজি'র সমাধি আছে—বাঁশবনের ভিতর দিয়া গিয়া শৈল-শৃঙ্গস্থিত শ্যামল জাঙ্গাল-মধ্যস্থ এই সমাধি স্থলে উপনীত হইতে হয়। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ট্রেণে করিয়া এই স্থলে করে—তখন ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে সামরিক কৌশলাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। অতঃপর উচ্চ-মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে বালকদিগকে 'জিউজ্যুৎসু' এবং বাঁশের তরবারি সাহায্যে অসিচালন-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

কোন কোন বিদ্যালয়ে—বিশেষতঃ টোকিওর 'পীয়ারেস্' এবং অন্যান্য স্কুলগুলিতে— বালিকাদিগকেও বংশ-নির্ম্মিত বর্শা সাহায্যে 'নাগানেটা' শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহারাও ছোট খাট সৈন্যদের মত কুচ-কাওয়াজ ও ব্যূহ-রচনাদি করিতে এবং Red Cross-নিয়মাবলী অনুসারে (First

ছেলে-খেলা

উপস্থিত হইয়াছিল—এক এক-দিন প্রায় দেড় লক্ষাধিক তীর্থ-যাত্রী সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভক্তিভাব এতই প্রগাঢ় যে, সেই তরুণ-বয়স্ক-দিগের মধ্যেও অণুমাত্র কোলাহল, ছুটোপাটি, চীৎকার, বা কৌতুক শুনা যায় নাই।

চিত্রাঙ্কন-শিক্ষা

'মীজি' সম্রাট্‌কে তাঁহার প্রজাবর্গ কিরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা করিত, নিম্নলিখিত ঘটনাতেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে; যখন তিনি অন্তিমশয্যায় শায়িত—সে সময়ে দলে দলে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্রাসাদভিত্তির বহির্ভাগে কঙ্করাকীর্ণ পথপার্শ্বে হেটমুণ্ডে বা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া সেই মহানুভবের জীবন-রক্ষার প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ সম্রাট্ যখন যেখানে গমন করিতেন, দলেদলে ছাত্রেরা তাঁহার সম্মানার্থে শ্রেণীবদ্ধভাবে সমবেত হইত। স্পার্টান্ জাতির মত কঠোর শিক্ষায় এবং দুর্লঙ্ঘ্য সুনীতিতে জাপানী বালকবালিকা সুশিক্ষিত—ইহারা শীতগ্রীষ্ম-ঝড়বৃষ্টি-উপেক্ষা করিয়া চিত্রবৎ, সেনানীর মত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে অভ্যস্ত; পক্ষীদিগের ন্যায় নিদাঘ-বৃষ্টিতে ইহাদের আদৌ ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। একদা মুক্ত-ক্ষেত্রে ঘোর তুষার-পাতের মধ্যে দলবদ্ধ ছাত্রবর্গকে অবস্থান করিতে দেখিয়া মীজি সম্রাট্ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া-ছিলেন, স্থানীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং রাজপারিষদগণ তাঁহাকে কখনও সেরূপ রাগ প্রকাশ করিতে দেখেন নাই; দয়ার্দ্র-হৃদয় নরপতি বলিয়াছিলেন—"আমার সন্ততিবর্গের প্রতি এরূপ আচরণ, অতঃপর আর কখনও যেন না হয়।" সেই হইতে এক্ষণে যখনই বালক-বালিকারা সম্রাটের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ গমন করে, —সকলেই স্ব স্ব পৃষ্ঠদেশে খাদ্য-পেটিকার সহিত এক একটি ছত্রদণ্ড বাঁধিয়া লইয়া যায়।
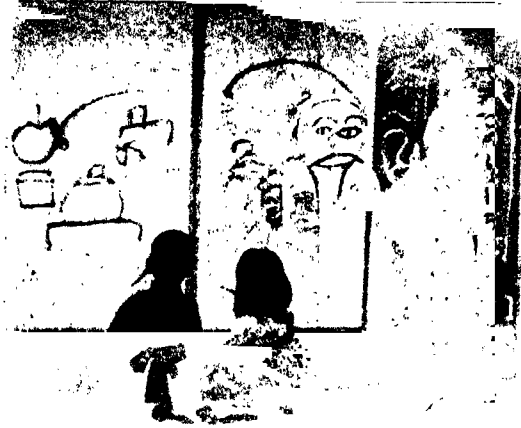
প্রীতিভোজ

পিতামাতা এবং শিক্ষক-বর্গের সমক্ষে জাপানী বালক-বালিকারা শিষ্ট শান্ত হইয়া
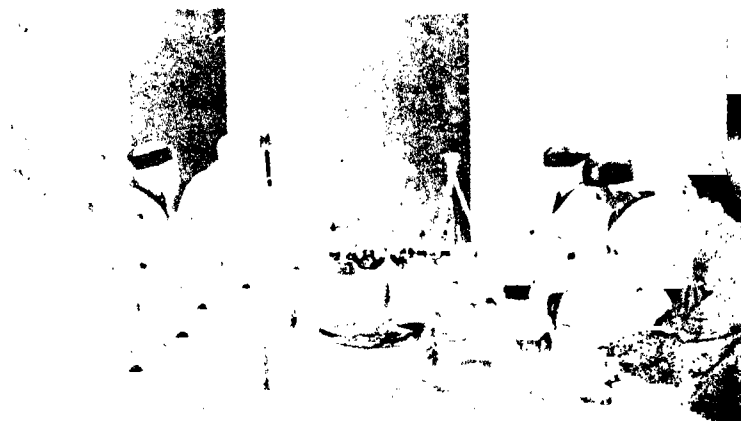
থাকিলেও, সমবয়স্কদিগের সহিত যখন একত্র থাকে, তখন তাহারা বয়োধর্ম্মসুলভ দুষ্টামি হইতে বিরত থাকে না। জাপানের পথে-ঘাটে যে সকল বালক-বালিকা দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে সুসভ্যদেশের পথচারী বালকবালিকাদিগের স্বভাবসুলভ সয়তানী ক্বচিৎ দেখা যায়। তবে অধুনা, ফুটবলাদি ক্রীড়া প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়া, বোধ হয়, ইহাদের মধ্য হইতে শিষ্টাচার লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। 'লুকোচুরি' 'কানামাছি' 'ঘোড়দৌড়ী' প্রভৃতি খেলায় ইহারা অভ্যস্ত। গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া যে সকল খেলাধূলা হয়, তাহার অধিকাংশ গুলিতেই যে হারে, তাহার মুখে কালি মাখাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ একদল ছোকরা, কিছুক্ষণ খেলিবার পর, দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা কয়লার খনি হইতে আসিল। বালকেরা গ্রীষ্মকালে সমুদ্রতীরে বালির কেল্লা নির্ম্মাণ করে, শীতকালে যত্রতত্র তুষারের মানবমূর্ত্তি গঠন করে।

শিশুর আহার

গৃহের বারেণ্ডার দিকে যে শ্বেত কাগজাবৃত অপসরণশীল—ঠেলা পর্দা ('শোজি') থাকে, শিশুগণ তাহাতে অন্য সময়ে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু বসন্তাগমে যখন সেগুলির সংস্কার হয়, তাহার পূর্ব্বেই স্বেচ্ছামত সেগুলিকে চিত্রবিচিত্র করিয়া ছিন্নভিন্ন করে।

পথে ঘাটে বাজিকর, গায়ক, নর্ত্তক প্রভৃতির অভাব নাই—ছেলেরা ইহাদের ক্রীড়া-কৌতুক দেখিতে দেখিতে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে! খর্ব্বাকৃতি নর্ত্তক সুদীর্ঘ ছদ্মবেশে দেহাবৃত করিয়া যখন নৃত্য করে, বৃদ্ধেরা রবারের মুখোস পরিয়া যখন নানারূপ মুখভঙ্গী করে, বালকবালিকারা তখন আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের অনুকরণ করিতে থাকে।

পুষ্প-চয়নে

বয়োবৃদ্ধদিগের মত তরুণ-জাপানীও অতিশয় চা-পানপ্রিয় এবং বালক-বালিকাও যেরূপ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ভোজন-কাষ্ঠিকাদ্বয় সাহায্যে আহার করে, বিদেশীয়েরা
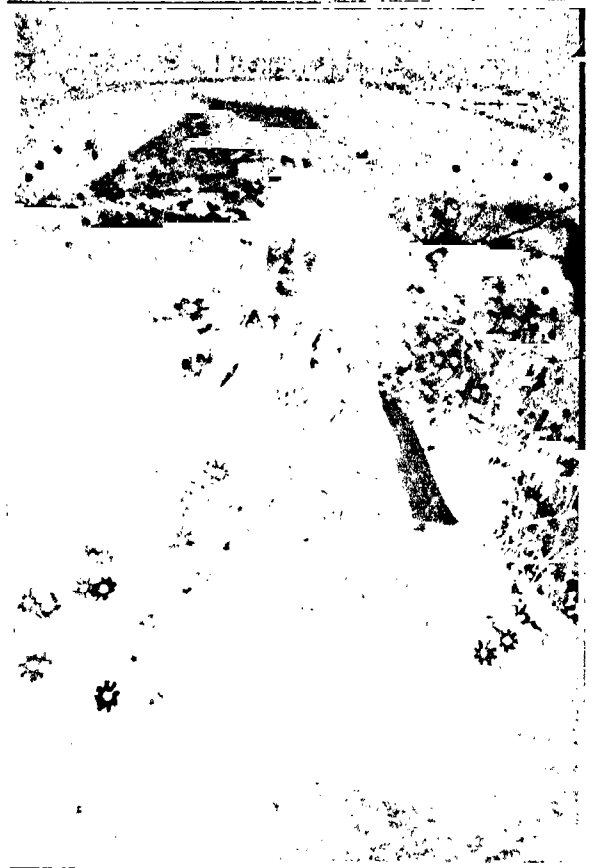
তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাকে; ভোজনকালীন রীতি প্রভৃতিতে ইহারা যেরূপ অল্পবয়সে সুশিক্ষিত হয়, সে বয়সে প্রাচ্যদেশবাসী বালক-বালিকারা ছুরি-কাঁটা-চামচ ব্যবহারে আদৌ সক্ষম হয় না। তবে পার্থক্য এই যে, জাপানী আহার্য্যগুলি পরিপাটিরূপে প্রস্তুত করিয়া রন্ধনশালাতেই পরিবেশন করা হয়—মাংসগুলি অস্থিহীন সুচ্ছেদিত, এবং অখাদ্য অংশগুলি বাদ দিয়া পাতে দেওয়া হয়; সুতরাং লঘুতর ভোজন-কাষ্ঠিকাযোগে সেগুলি আহার করিতে সহজেই শিক্ষা লাভ ঘটে। প্রাচ্য-প্রদেশে কিন্তু আহার্য্য-পরিবেশনের সে ব্যবস্থা নাই, উপরন্তু কাঁটা-চামচ ছুরিগুলিও অপেক্ষাকৃত ভারি।
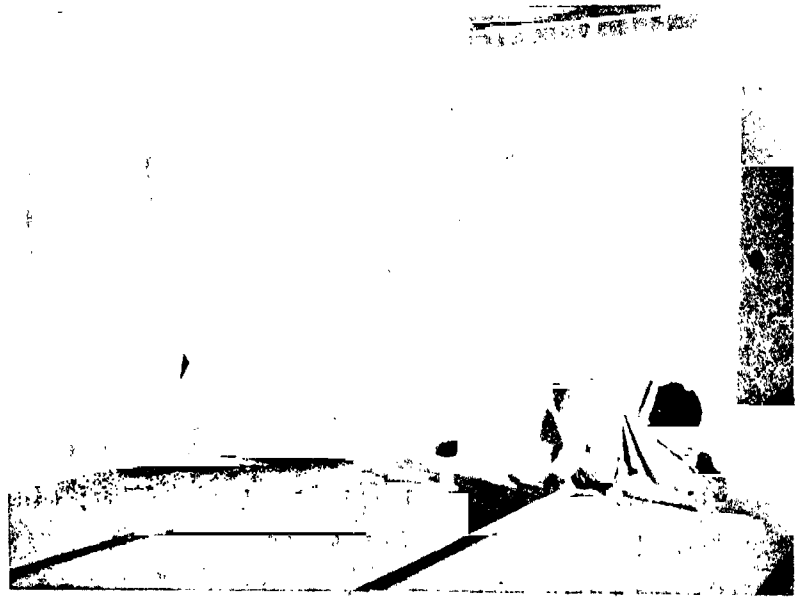
প্রণতি

জাপানী বালিকারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশেষ যত্নের সহিত বিবিধ গার্হস্থ্য-শিল্প ও গৃহস্থালীর কার্য্যাদিতে সুশিক্ষিত হইয়া থাকে। ফুল-সাজান, অভ্যাগতবর্গের জন্য চা-প্রস্তুত, বাক্স বা বারকোষে নিসর্গ-দৃশ্যের চিত্র-অঙ্কন এবং 'কোটো' ও 'পিয়োনো'-বাদন প্রভৃতি তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদেশী 'পিয়োনো'র প্রতি ইহাদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও, সম্প্রতি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী তথাকার পিয়োনো, মায় শিক্ষয়িত্রীকে বিদায় দিয়াছেন!

কৃত্রিম উপায়ে অনতিগভীর পাত্রমধ্যবর্ত্তী জল হইতে স্বভাবের মত পত্রবৃন্ত-সমন্বিত পুষ্পোৎপাদন-প্রকরণ শিক্ষা ও অনুশীলন করিতে তিন বৎসরেরও অধিক সময় লাগে না।

জাপানী উদ্যানগুলি যেমন পুষ্পের বর্ণাদিক্রমে সুসজ্জিত তেমনই যথাসম্ভব সুরক্ষিত। পাছে, কঠোর পাদবিক্ষেপে তৃণশষ্পসজ্জা নষ্ট হইয়া যায়, তাই জাপানী বালিকারা তৃণনির্ম্মিত কোমল পাদুকা পায়ে দিয়া পুষ্পাহরণে প্রবৃত্ত হয়।

অতিথি-সম্ভাষণ, আপ্যায়ন, এবং বিদায় ব্যাপারেও জাপানী শিষ্টাচারের অবধি নাই। তাহাদের গৃহ-সজ্জা যেমন কোমল ও বর্ণ-বৈচিত্র্যময়ী, পুরাঙ্গনাদিগের বেশ-ভূষাও তদুপযোগী। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে মহিলাদিগের রাজ-সভার উপযোগী পরিচ্ছদের জন্য বিলাতী মেমেদের পরিচ্ছদই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, এবং সে সময় অনেক রমণীই সাধারণ্যে সেই পোষাক পরিধান করিতেন। অধুনা কিন্তু সে প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত হইয়াছে—বিশেষ উৎসবে এবং রাজপ্রাসাদে ভিন্ন ধনীদিগের পুরাঙ্গনারা প্রায় স্বজাতিসুলভ পরিচ্ছদাদিই ব্যবহার করেন। প্রত্যেক বর্ষে রাজার নববর্ষের কবিতায়, অভিনব পরিচ্ছদপরিকল্পনা ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের ইঙ্গিতাভাস থাকে; প্রতি বর্ষের 'ফ্যাসান' তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ঋতুবিশেষে বিভিন্নবর্ণের বিভিন্ন বস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ছেলেদের জন্য উজ্জ্বল রং-বেরঙের বিবিধ বিচিত্র ধরণের বস্ত্রাদি প্রচলিত আছে। জাপানী রমণীকুল চিরকালই দক্ষিণদিকে মুড়িয়া পরিচ্ছদ পরিধান করে; কেননা ভূমিষ্ট হইবার সময় পাড়টা যথাযথভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে। —মাত্র মৃত্যুকালে বামদিকে 'কিমোনো' মুড়িয়া দেওয়া হয়। জাপ-ললনাগণ সহজেই মেমের পোষাক পরিতে পারে, কিন্তু মেমেরা জাপ-বেশে সজ্জা করিতে গেলে কৌতুকজনক হাস্যোদ্দীপক বিভ্রাট ঘটাইয়া বসে।

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

(২৩)

বহুদিনের কথা। যথাযথ স্মরণ করিতে মস্তিষ্ক-নিষ্পীড়নে অলৌকিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্নেরও সর্ব্বশরীরে অবসাদ আসে। তবু সেদিনের ঘটনা আমি সম্পূর্ণ স্মরণ রাখিয়াছি। এখনও যেন তাহা পূর্ব্বদিনের ঘটনা বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তাহার পর আজ! মধ্যে যেন দিনের ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়াছে! প্রভাতে জাগরণ-মুখে এক একটা ক্ষুদ্র অনুপলের স্বপ্ন যেমন যুগব্যাপী জীবনকে কুক্ষিগত করে, আমার মনে হয়, গত রাত্রিতে আমিও সেইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি। মনে হইতেছে, কাল সন্ধ্যায় আমি একাদশ বর্ষীয় বালক ছিলাম। আজ সূর্য্যোদয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি, রাত্রির সেই বিপুল শক্তিধর স্বপ্ন অগণ্য তরঙ্গে আমাকে উত্থিত নিপতিত করিয়া, আমার জীবনের সমস্ত রস নিজের অঙ্গে বিলীন করিয়া লইয়াছে—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এ বৃদ্ধ দেহে আর কৈশোর যৌবনের লীলাভার-বহনের শক্তি নাই। তাহা আমাকে স্পর্শ মাত্রেই দুষ্ট চপল শিশুর মত নখপ্রহারে আমার শুষ্ক দেহকে জর্জ্জরিত করে; অথচ পরিত্যাগ করা দুরূহ। শিশুকে কোল হইতে ভূমিতে নামাইতে মন যায় না। সেই জন্য সে দিনের কথা আমি বলিব। একদিকে পিতা ও মাতা, অন্যদিকে পিতামহী; আমি মধ্যে পড়িয়া,উভয়ের সম্মিলন পথ-অবরোধ করিয়াছি। পুত্রমুখ-দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী মাতার দৃষ্টিপথ রোধ করিতে বল্মীক-স্তূপ বিশাল শৈলের আকার ধারণ করিয়াছে। কেমন করিয়া করিয়াছে বলিব।

আমি পিতামহীকে জড়াইয়া ধরিলাম, কিন্তু তাঁহাকে পাইলাম না। পিতার সক্রোধ সম্বোধনে তাঁহাকে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করিতে হইল।

পিতা পিতামহীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। এবং তখনও পর্য্যন্ত পিতামহীর সঙ্গে সংলগ্ন আমার কর্ণ ধরিয়া আমাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

অপমানে ও কর্ণের যাতনায় আমি মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইলাম। কি জানি কেন, চক্ষু হইতে আমার জল নির্গত হইল না।

পিতামহীর কথা আমার কর্ণগোচর হইল। "তুমি কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক পর্য্যন্ত রাখিতে চাও না অঘোরনাথ?"

'সম্পর্ক তুমি রাখিতে দিলে কই?"

"আমি রাখিতে দিলাম না?"

"তোমার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার আমার অবসর নাই। যদি এখানে আসিবার জন্যই তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল, তা হইলে একটু ভাল পরিচ্ছদ পরিয়া আসিলে না কেন? তোমার গর্ভে স্থান লইয়াছিলাম, এ দুর্ভাগ্যের কথা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে, তা হইলে তখনি লজ্জায় আমাকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে হইবে। হুগলী সহরে আর কারও কাছে আমি মুখ দেখাইতে পারিব না।"

"বিধবার আবার কিরূপ বেশ পরিচ্ছদ হয়?"

"কুসংস্কারাপন্ন হতভাগ্যের দেশে বাস কর, তোমাকে বেশের কথা কেমন করিয়া বুঝাইব? বিধবার এ বেশ সাহেব বুঝবে কেন? তাহাদের দেশে তোমাদের মত কত বিধবা, বিবাহ করিয়া আবার সংসার করে।"

"বেশ অঘোরনাথ, এখন হইতে আমি মনে করিব, তোমার মত পুত্রকে আমি গর্ভে ধারণ করি নাই।"

পিতা একথার কোনও উত্তর না করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া আবার আমার কাণ ধরিলেন। তবে এবার সবলে ধরিলেন না—অতি সন্তর্পণে ধরিয়া বলিলেন—"মূর্খ! কাল তোমার পরীক্ষা! তুমি এমনি করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ!"

কথাগুলি আজিকালিকার ইংরাজীনবীশ ভদ্রলোকদিগের কথোপকথন যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ। কতক ইংরাজী, কতক বাংলা। আমাকে তিরস্কার করিয়াই পিতা আমার কাণ ছাড়িয়া হাত ধরিলেন।

পিতার সঙ্গে গৃহাভিমুখে ফিরিলাম। পিতামহীর দিকে মুখ ফিরাইতে আমার আর সাহস হইল না। কেবল মাত্র দেখিলাম, গণেশ খুড়া পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া পিতার পানে চাহিয়া আছে। পিতা ও পিতামহীতে যখন কথোপকথন হয়, তখন সে আরও কিছু দূরে ছিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সে বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। শুনিবার জন্য খুড়া নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। এমন সময় আমার হাত ধরিয়া পিতাকে ফিরিতে দেখিয়া সে যেন কেমন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইল।

গণেশ ভাবিয়াছিল, যখন এক বৎসর পরে মাতা-পুত্রের মিলন হইয়াছে, তখন পুত্রের মনোভাবের পরিবর্ত্তনে এই মিলন শুভফলপ্রসূ হইবে। পরাজিতের মত পিতার অনুসরণে সে যে পলাইয়া আসিয়াছিল, এখন তাহার জেঠাই মাকে সঙ্গে করিয়া সে জয়ের উল্লাসে আমাদের গৃহে পুনঃপ্রবেশ করিবে। খুড়া সেই শুভ জয়ের প্রত্যাশায় দূরে দাঁড়াইয়া ছিল।

এখন খুড়া বুঝিল, জয় হওয়া দূরে থাক, ঘটনা বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে পিতামহীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"কি হইল জেঠাই মা ?"

"পিতামহী খুড়ার কথার উত্তর না দিয়া, পিতাকে বলিলেন—"একটা কথা শুনিয়া যাও।"

পিতা এ কথারও উত্তর না দিয়া চলিলেন। আমি একবার সন্তর্পণে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, পিতা বাড়ীর দিকে চাহিয়া পথ চলিতেছেন। আমিও তাঁহার দৃষ্টির অনুসরণে বাড়ীর পানে চাহিয়া দেখি, মাতা বারান্দার রেলিংএ ঝুঁকিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন।

আমি মনে করিলাম, মাকে দেখিয়া পিতা অন্যমনস্ক হইয়াছেন। তাই পিতাকে বলিলাম, "ঠাকুরমা আপনাকে ডাকিতেছেন।"

পিতা বলিলেন—"আমি শুনিয়াছি। তোমার ওকথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যত শীঘ্র পার, তোমার মায়ের কাছে চলিয়া যাও।"

এই বলিয়াই পিতা আমাকে হস্তচ্যুত করিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে পিতামহীর ঈষদুচ্চ উচ্চারিত কথা আমার কর্ণগোচর হইল—"একটা কথা—আর তোমাকে বিরক্ত করিব না।"

পিতাও ঈষৎ রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—"যা বলিবে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বল। এখনি এ পথে লোক চলাচল করিবে। আমি পথে দাঁড়াইয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না।

"আমি ম্লেচ্ছের ঘরে প্রবেশ করিব না।"

"তবে ওইখান হইতেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাও। বামনাই বুজরুকি ঘরে গিয়া দেখাও। এ চাকরা-স্থানে চলিবে না। তুমি কি জন্য আসিয়াছ, আমি কি বুঝিতে পারি নাই ?"

এই বলিয়া পিতা আবার আমার হাত ধরিলেন, এবং দ্রুতপদসঞ্চারে আমাকে ছুটাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কার্ত্তিক তখনও পর্য্যস্ত ফটকের পার্শ্বে বসিয়া প্রহার-যাতনার শেষাংশ ভোগ করিতেছিল। আমরা বাটীর উঠানে প্রবেশ করিবামাত্র সে সম্ভস্তভাবে দাঁড়াইল। পিতা তাহাকে ফটক বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

কার্ত্তিক ফটক বন্ধ করিতেছে, এমন সময়ে এক প্রবল শক্তি অপর পার্শ্ব হইতে রোধে তাহাকে বাধা দিল। সে বাধা অতিক্রম করিতে কার্ত্তিকের ক্ষমতায় কুলাইল না। ফটক বন্ধ হইল না।

পিতা দেখিতে পান নাই, মা বারান্দার রেলিং ধরিয়া তখনও দাঁড়াইয়া। তিনিও দেখিতে পান নাই।

মাতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ীকে পথ হইতেই বিদায় না করিয়া বাড়ীতে আনিলে না কেন ?"

পিতা এ কথার কোনও উত্তর না করিয়া মাকে ভিতরে যাইতে আদেশ করিলেন। আর আমাকে বলিলেন—"এখনি নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পড়িতে বস।"

মা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ কোপভরে পিতাকে তিরস্কার করিলেন। পিতার ভীরুতার জন্যই তিরস্কার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতাকে অভয় দিলেন। বলিলেন—"তুমি উপরে আসিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাক। একে পুরুষ মানুষ—তায় হাকিম, তোমার অত ভয় করিলে চলিবে কেন ?"

পিতা তথাপি মাকে বলিলেন—"কাজ কি, তুমি ঘরেই যাও না।"

"কেন ? আমি কি লোকের চোক রাঙানীতে ছেলেকে যমের মুখে তুলে দিব ? আমি যে ওখানে যাইতে পারিলাম

না। পারিলে সে কত বড় ডাইনী আমি দেখিয়া লইতাম। দেখিয়া লইতাম কি দাঁতের জোরে সে আমার ছেলে খাইতে আসিয়াছে।"

"বাকী থাকে কেন একবার দেখিয়াই এস।"—কথা শুনিবামাত্র আমরা সকলেই ফিরিলাম। দেখি—গণেশ খুড়া আবার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সে প্রবেশ করিবে, আমি আগে বুঝিয়াছিলাম। পিতামাতা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা উভয়েই খুড়ার বাটীর মধ্যে প্রবেশে বিস্মিত হইলেন।

পিতা ডাকিলেন—"আরদালী!"

গণেশ খুড়া হাসিয়া বলিল—"বাগ্‌দীবেটা ওই বাহিরে পড়িয়া আছে। আমি লাথী মারিয়া তাহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছি। হাকিম সাহেব! তুমি ও বেটাকে পালোয়ান মনে করিতে পার, আমি করিব কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে স্ত্রীবশ হইয়া তুমি পদার্থহীন হইয়াছ। আমি ত হই নাই।"

মা এই কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"তোমার কি জেলে যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে?" খুড়া এইবারে একটু কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"বারবার জেল জেল করিয়ো না, মেম সাহেব! হাকিমী তোমার এই আঁচলধরা স্বামীর কাছে কর। আমার কাছে করিও না। আমি গণ্ডমূর্খ। কোনও রকমে চেষ্টা করিয়া এখনও তোমাদের মান রাখিতেছি। বার বার জেল জেল করিলে জেলে যাইবার কাজ পাকাপোক্ত করিয়া লইব।"

মা বলিলেন—"আমাকে মারিবে নাকি?

"তুমি স্ত্রীলোক। তোমার গায়ে হাত তুলিয়া এত কালের সন্ধ্যা-আহ্নিক পণ্ড করিব কেন? মূর্খ বটে, তবু আজও আমি ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল মুখে দিই না। মারিতে হইলে এই মাতৃঘাতী কুলাঙ্গারের দাঁতক'টা ভাঙ্গিয়া দিব। ও কুলাঙ্গারের সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নাই।"

এরূপ তেজস্বিতার সম্মুখে মা ও বাবা উভয়েই যেন নিষ্প্রভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

গণেশ খুড়া এইবারে পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তোমার হাকিমীতে ধিক্। তোমার লেখাপড়াকে ধিক্। তুমি বাক্যবাণে আমার অমন সোণার মাকে মারিয়া ফেলিলে!"

পিতা শিহরিয়া উঠিলেন।

খুড়া বলিতে লাগিল—"একটা নীচের মেয়ের মোহে এমনি হীন হইয়াছ যে, অমন দেবতাকে তুমি চিনিতে পারিলে না? আবার বলি—তোমাকে ধিক্।"

মা বারান্দা ত্যাগ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। খুড়ার বাক্যবাণ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। পিতাও বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি তাঁহার এই ক্রোধ দেখিয়া উচ্চ চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিলাম।

পিতা দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন—"দাঁড়া উল্লুক। তোকে গুলি করিয়া মারিব।"

খুড়া ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিল—"এখনি—কাল বিলম্ব করিয়ো না। আমাকেও যদি তোমার মায়ের সঙ্গে হত্যা করিতে পার, তাহ'লে তোমাদের মুখ দেখিয়া যে মহাপাপ হইয়াছে, তা হইতে মুক্ত হই।"

আমিও পিতামাতার দেখাদেখি, সে স্থান হইতে পলাইবার উদ্যোগ করিলাম।

খুড়া ক্ষিপ্রতার সহিত আমার হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল—"তোমার ভয় কি হরিহর! তুমি পলাইতেছ কেন?"

আমি কাঁদিয়া বলিলাম—"তোমার পায়ে পড়ি গণেশ কাকা, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

ঠিক এই সময়ে বাহির হইতে কে যেন বলিল—"গণেশ! বালককে পরিত্যাগ কর। বলিয়া আইস, মায়ের সংজ্ঞা ফিরিয়াছে।"

গণেশ খুড়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল। আমি অমনি দ্রুতপদে উপরে উঠিলাম। বারান্দা হইতে নিম্নে মুখ ফিরাইয়া দেখি, খুড়া উঠান পরিত্যাগ করিয়া ফটকের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ফটক খোলা—কাত্তিক নাই। দূরে বকুলবৃক্ষের সন্নিকটে পথে জনতা। কারণ বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। বুঝিলাম, পিতার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া পিতামহী সংজ্ঞা হারাইয়াছিলেন। কোনও দয়াবানের শুশ্রূষায় তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়াছে।

আমার দেখিতে আর সাহস নাই—অধিকার নাই। নিষ্ঠুর পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার মনে হইল, যেন আমি পরিত্যক্ত। পিতামাতার স্নেহের আবরণ মধ্যে বাস করিয়াও আমি সহায়হীন।

বালককে পরিত্যাগ করিতে কোন্ নির্ম্মম আদেশ করিল? তাহার গভীরস্বর আমার কর্ণে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই স্বরই না গত নিশায় মধুর মাদকতায় বকুলবৃক্ষতলে আমার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিল!

(২৪)

জগৎ চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল। কাল যা দেখিয়াছি, আজ তাহা থাকিবে না। পরিবর্ত্তন বোধগম্য না হইলেও বুঝিতে হইবে, কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিশোর এইরূপ অলক্ষ্য পরিবর্ত্তনেই যৌবনে পদার্পণ করিয়া থাকে। পিতামাতা—নিত্যসঙ্গীপুত্রের এ পরিবর্ত্তন সহসা বুঝিতে পারেন না। তবে যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতায়—পুরাতনের প্রতি বিকটবিরাগে নূতনটা বড় শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইখানেই অকালবার্দ্ধক্য—বিসদৃশ বিকট—অকাল-মৃত্যুর সকল বিভীষিকার আধার।

অর্দ্ধশতাব্দীপূর্ব্বে আমাদের সমাজটা সেইরূপ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহাকর্ষণে সনাতন ধর্ম্মপুষ্ট আমাদের সেই পুরাতন সমাজ সহসা আমাদের চক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নূতন হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু অন্যদেশে যেমন পুরাতনের উপর ভর করিয়া নূতন অল্পে অল্পে কৈশোর হইতে যৌবনে চরণ রাখিয়া আত্মনির্ভরতার শক্তি সঞ্চয় করে, আমাদের দেশে নূতনের সে বিলম্বও সহ্য হয় নাই। শিশু মাতৃঅঙ্ক পরিত্যাগ করিয়াই উল্লম্ফনে যৌবন-রবিকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার আর তার অবকাশ রহিল না। পুরাতনের কি ভাল, কেন ভাল, কি মন্দ, কেন মন্দ—এ সব বিচার করিবার আর তাহার সময় রহিল না। সে কেবল ছুটিল—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। অবাধবেগ আকর্ষণে আকর্ষণে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। তথাকথিত সভ্যতার বহিঃসৌন্দর্য্যের বিষম আকর্ষণে সুদূরাকৃষ্ট 'নূতন' পুরাতনের অন্তঃসৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাইল না। তখন বৃদ্ধ দেহের বহিরাবরণ তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতনের আর কিছুই তাহার প্রীতিকর রহিল না।

শিশু ধীরে ধীরে প্রকৃতির স্নেহাবলম্বনে বর্দ্ধিত হইবার অবকাশ পাইল না। ফলে তাহার চাপল্যসম্প্রাপ্ত যৌবন অকালবার্দ্ধক্যে পরিণত হইল।

সনাতনধর্ম্ম অম্বুনিধি। অগণ্য ভাবতরঙ্গ ইহার কোলে জনম লইয়া নাচিতে নাচিতে আবার ইহার কোলে মিলাইতেছে। আবার উঠিতেছে, নাচিতেছে, মিলাইতেছে। ইহার দ্রবণশক্তি অপূর্ব্ব। পাথর পর্য্যন্ত ইহার ভিতরে পড়িলে যোগ্যকালে গলিয়া যায়। গলে না কেবল অঙ্গার। অম্বুনিধি ইহাকেই কেবল আত্মগত করিতে পারে না। মিশাইতে গেলে চূর্ণ হইয়া ইহা জলের উপরে ভাসিয়া উঠে।

আমরা সে সময়ে অতি আগ্রহে নূতনকে অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। ব্যাকুলতায় আমরা আমাদের আমিটাকে এই নূতনের সম্মুখে বলি দিলাম। আমার কিছু ভাল নয় এইরূপ চিন্তাতে কালে আমাদের আমিত্বের উপরও ঘৃণা জন্মিল। আমাদের ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া,আচার-ব্যবহার, প্রকৃতি-প্রতিষ্ঠান—আমাদের একটাও সামগ্রী এই আত্মহারা নূতনের প্রীতিকর রহিল না। সে উন্মত্ততার যুগে আমরা যদি আমাদের গোত্রপতি গৌতমাদি ও ঋষিগণের সাক্ষাৎকার কোনও প্রকারে লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই লোষ্ট্রনিক্ষেপে তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে এবং পাশ্চাত্যবিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট পিতৃপুরুষের অন্বেষণে আফ্রিকার ঘনারণ্যে গরিলার পাদমূলে আশ্রয় লইতে পশ্চাৎপদ হইতাম না।

পুরাতনকে পরিত্যাগ এই বিচিত্র পুরুষকারের ফল! —পুরাতন বৃদ্ধ নূতন শিশুর মুখচুম্বন করিতে আসিয়া নিষ্ঠীবনবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

"পুরাতনী" মা আমার পিতামহী আমাকে সস্নেহে ধারণ করিতে আসিয়া মুখ ফিরাইয়া—বোধ হয়, চোখে অঞ্চল দিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আমি আমার গর্ভধারিণী সভ্যতাভিমানিনী "নূতন" মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। জননী চিরকল্যাণময়ী। কল্যাণ কোন্ দিক হইতে কি মূর্ত্তিতে কেমন ভাবে আসে, বিচার-বিতর্কে তাহা বুঝিতে ক্ষুদ্র

জীবের সাধ্য নাই। আমার মনে হয়, তাহা বুঝিবার প্রয়াসও আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র।

সে সময়ে আমরা বুঝিয়াছিলাম, আমরা পিতামহীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন বুঝিতেছি, আমরা তখন পিতামহী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।

যাক্, এখন আমার বাল্যের ইতিহাসের শেষাংশ টুকু বলিয়া যাই।

পিতা বন্দুক আনিতে গিয়া আর ঘর হইতে বাহির হন নাই। মাতা তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন, কিংবা তিনি নিজেই সদ্বুদ্ধির প্রেরণায় নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি পিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, উভয়েই একস্থানে বসিয়া আছেন। প্রবেশমুখে তাঁহাদের কাহারও কোনও কথা আমি শুনিতে পাইলাম না। আমাকে প্রবিষ্ট দেখিয়াও কেহ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমিও নীরবে তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া পিতার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। বসিলাম বলি কেন—একটা তাকিয়ায় পৃষ্ঠ দিয়া আধাআধি শয়ন করিলাম। উপর্য্যুপরি কতকগুলা ঘটনায় আমার সকল শক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

আমার শয়নের অল্পক্ষণ পরেই পাঁচু একটা কাঁসার থালার উপরে দুই বাটী চা আনিয়া পিতা ও মাতার সম্মুখস্থ টেবিলে রক্ষা করিল। আজকালিকার মত তখন চায়ের এত প্রচলন ছিল না। এখন হাটে বাজারে মুটে মজুরে চা ধরিয়াছে। তখন এক সাহেব অথবা এদেশীয় ধনী ভিন্ন সাধারণে ইহার ব্যবহার জানিত না। চা এবং তাহার ব্যবহারের সাজসরঞ্জামও তখন সুলভ ছিল না। পিতা প্রতিদিন চা-পান করিতেন। সর্দ্দি অথবা অন্য কোনও কারণে শরীর অসুস্থ হইলে, মা চা ব্যবহার করিতেন—সর্ব্বদা করিতেন না। আমিও মায়ের মত কদাচিৎ ইহা পান করিতাম। দুই বাটী আসাতেই বুঝিলাম, মাও আজ চা-পানের অভিলাষ করিয়াছেন।

এ তুচ্ছ কথার অবতারণার অর্থ আর কিছুই নহে। পিতা ও মাতা উভয়েই প্রাতঃকালের ঘটনাটা অতি তুচ্ছ, এমন কি অগ্রাহ্যের মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন। পিতামহীর মূর্চ্ছা ও অবজ্ঞাতার মত প্রস্থান তাঁহাদিগের মনে ক্ষোভের রেখা মাত্রও অঙ্কিত করিতে পারে নাই।

পিতা ও মাতার কথোপকথন হইতেই এ বিষয়ের উপলব্ধি হইবে। মা বলিলেন—"আবার আমার জন্য চা আনাইলে কেন?"

"তুমিও একটু খাও। তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, কাল হইতে নানা ঘটনায় তোমার বিশেষ ক্লান্তি উপস্থিত হইয়াছে।"

"কাল সারা রাত্রি চোখের পলক ফেলিতে পারি নাই।"

মা যে কিরূপ নিদ্রাশূন্য অবস্থায় রাত্রিযাপন করিয়াছেন, আমিই ত তাহার সাক্ষী। চিৎ হইয়া কড়িকাঠের পানে চাহিয়াছিলাম। মায়ের কথা শুনিয়া শরীরের সেই অবসন্নতাতেও মুখে হাসি আসিল।

পিতা বলিলেন—"তাহা কি আমি বুঝি নাই! আমারও কাল ভাল নিদ্রা হয় নাই।"

আমি আর একবার হাসিলাম।

মাতা। কি কুক্ষণেই হতভাগ্য মূর্খটাকে পাঠাইবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম!

পিতা। কুক্ষণ কেন? ভাগ্যে পত্র দিয়াছিলে, তাই আজ বুড়ীকে চৈতন্য দিতে পারিয়াছি।

মাতা। চৈতন্য কি হইয়াছে?

পিতা। তুমি কি মনে কর হয় নাই?

মাতা। আমি তাই মনে করি। আবার কোনদিন ডাইনী হঠাৎ আসিয়া বিভ্রাট না বাধাইয়া বসে।

পিতা। এরূপ কথাবার্ত্তার পর আবার কি সে আসিতে পারে?

মাতা। খুব পারে। ডাইনী বুড়ীর কি কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে? বিশেষতঃ সেই মড়ুই-পোড়া বামুন সর্ব্বদা তার পিছু লাগিয়া আছে। হরিহর—হাকিমের পুত্র। তাকে সে ফাঁকতালে জামাই পাইবে! বিবাহে একটি কানা কড়ি খরচ করিতে হইবে না। ম'লেও কি বামুন এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে?

পিতা। এবারে আসিলে তার ভাগ্যে অপমান আছে। বিলাতের এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে দেখিয়াছি, এডাম বিড্ বলিয়া একব্যক্তি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহার মাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেছে। আবার পরক্ষণেই করুণায় গলিয়া তাহার প্রিয় কুকুরটিকে আদর করিতেছে। কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যের কাছে কুকুর-জননীতে ভেদ নাই,

আদরের প্রয়োজন হইলে, বাক্‌শক্তিহীন কুকুরকেও আদর করা যায়। তিরস্কারের প্রয়োজন হইলে, মাকেও তিরস্কার করা যায়।

মাতা। বটে বটে! এমন অপূর্ব্ব বই বিলাতের লোকে লিখিয়াছে।

পিতা। আবার আশ্চর্য্যের কথা শুনিবে? যিনি এই পুস্তক লিখিয়াছেন, তিনি একজন মহিলা।

মাতা। বাঃ রে বিলাত বাঃ! এরূপ না হইলে, সে দেশের এত উন্নতি হয়! আর, আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগুলা, কেবল স্ত্রীলোকদের নিন্দা করিয়া মরিতেছে। তাই, আজ হতভাগাদের দেশের দুর্দ্দশার সীমা নাই। যেমন-তেমন লোকের মা নয়, একটা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—হাকিমের মা! বুড়ী কি কাপড় পরিয়া আসিয়াছিল, দেখিলে? বেটী ঠিক যেন বাগ্‌দিনী!

পিতা। এই যে বলিলাম—এবারে ওরূপভাবে আসিলে লাঞ্ছনা ত হইবেই, অধিকন্তু তাকে আর 'মা' বলিব না।

মাতা। আমি ত আজই পারিলাম না। ঝি ওই বুড়ীর পরিচয় জানিতে চাহিল; আমি বলিলাম—'বাবুর মা ছিল না বলিয়া, ও-বুড়ী বাবুকে ছেলের মতন মানুষ করিয়াছে।'

সে দিন শনিবার। পরের পর সোমবার দিন ইস্কুলে আমাদের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারিলে, পিতার মনস্তুষ্টি হইবে না। এই জন্য, বাড়ীতে আমাকে পড়াইবার জন্য, পিতা ইস্কুলের আমাদের শ্রেণীর মাষ্টার মহাশয়কেই শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য অন্য সময়ে, তিনি সন্ধ্যাকালেই আমাকে পড়াইতেন। পরীক্ষা অতি সন্নিকট বলিয়া তিনি দুই একদিন প্রাতঃকালেও পড়াইয়া যান। পিতামাতার কথোপকথন শেষ না হইতেই, তিনি বাহির হইতে আমাকে ডাকিলেন—'হরিহর'!

পিতা আমাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কি না, বুঝিতে পারিলাম না। মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিবামাত্র, তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কি রে! পড়া না করিয়া, এখানে আসিয়া শুইয়া রহিয়াছিস্ যে?"

আমি বলিলাম—"শরীরটে আমার কেমন করিতেছে।"

"কি করিতেছে?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

পিতা তৎক্ষণাৎ, আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, আমার গাত্র পরীক্ষা করিলেন।

পরীক্ষা করিবার কারণ, তখন হুগলীতে সবে মাত্র ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে! সহরে তখনও তাহার প্রকোপ সম্যক্ উপলব্ধি না হইলেও, সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে সেবৎসর সে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে। সহরেও দুই চারিজন মরিয়াছে। বিশ-পঞ্চাশজনের প্লীহাজনিত উদর স্ফীতিও ঘটিয়াছে। তবে শীতের সঙ্গে, রোগের প্রথম আক্রমণের কাল গিয়াছে। তথাপি, আমার শরীরের অসুস্থতার কথা শুনিয়াই, পিতা আমার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে আসিলেন।

মাতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্বর নয় ত?"

পিতা বলিলেন—"না।"

"যাক্—বাঁচিলাম। যে জাত ডাইনীর নজর পড়িয়াছে, তাহাতে ছেলেটা আমার বাঁচিলে বাঁচি।"

এই বলিয়াই, মা আমাকে শুইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন—"যাক্, ওর এখন আর আর পড়িবার প্রয়োজন নাই। তুমি মাষ্টারকে বলিয়া আইস। এক্‌জামিন্ হইবার পর, ইস্কুলের ছুটিটা হইয়া গেলে, আমি দিন কয়েকের জন্য ওকে ওর মামার বাড়ী লইয়া যাইব।"

আহারাদির যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিতে মাকে আদেশ দিয়া, পিতা বাহিরে গেলেন। মা, আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, পিতার মত হস্তদ্বারা গাত্রস্পর্শ করিলেন। পরীক্ষায় বুঝিলেন, আমার জ্বর নয়। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অসুখ করিতেছে?"

"বুঝিতে পারিতেছি না।"

"গাধাটা তোকে কিছু কি বলিয়াছিল?"

"কিছু না।"

"আমি না আসিয়া পড়িলে গাড়োলটার অপঘাত-মৃত্যু হইত। আমি ভাগ্যিস্ তাঁহার হাত হইতে বন্দুকটা কাড়িয়া লইয়াছিলাম!

আমি এ কথার কোনও উত্তর করিলাম না। ডাইনী-বুড়ী আমাকে কিছু বলিয়াছে, কি না, মা তা'ও জিজ্ঞাসা

করিলেন। আমি উত্তর দিলাম না। বাস্তবিক আমার ভিতরটা কেমন করিতেছে!

কি করিতেছে বুঝিতে না পারিলেও, এটা যেন আমার মনে হইতেছে, যেন কেমন একটা দুর্ব্বোধ্য রোগ আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। মা পরীক্ষায় তাহা বুঝিতে পারিলেন না। আমিও বুঝাইতে পারিলাম না। মা গাত্র হইতে হস্ত তুলিয়া বলিলেন—"অসুখ বোধ করে, শুইয়া থাক্। আজ আর ইস্কুল যাইবার প্রয়োজন নাই।"

তিনি গৃহত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে ঝি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মা ও তাহার কথোপকথনে বুঝিলাম, মা গোপনে সন্ধান লইবার জন্য, এবং আমাদের সম্বন্ধে কি কি কথা হয় শুনিবার জন্য, তাহাকে পিতামহীর কাছে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার কথায় বুঝিলাম, পিতামহী নৌকায় আরোহণ করিয়াছেন। এক গণেশ খুড়া ছাড়া, তাঁহার সঙ্গে আর যে কেহ ছিল, তাহা ঝি বলিল না। পিতামহীর হুগলী-ত্যাগের কথা বিদিত হইয়া, মা যেন আপনাকে বিপন্মুক্ত বোধ করিলেন।

মাতা গৃহত্যাগ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ঝি পৈতা সুতায় বাঁধা একটা তামার মাদুলী মায়ের হাতে দিয়া বলিল—"মা! এইটা দাদাবাবুর হাতে পরাইয়া দিন।"

মাতা সবিস্ময়ে বলিলেন—"কি এ?"

"দেখিতেই ত পাইতেছ মা!"

"এ মাদুলী কে দিল?"

"এক ব্রাহ্মণ।"

"কেন?"

"তা জানিনা! ব্রাহ্মণ এই মাদুলী দাদাবাবুর হাতে পরাইতে বলিয়া দিল। বাঁধিয়া দিবে তুমি। অন্যে বাঁধিলে ফল হইবে না। দাদাবাবুর যদি কোনও গ্রহের আপদ থাকে, আমার বোধ হয়, এই মাদুলী পরিলে আর তা আসিতে পারিবে না।"

"কে সে ব্রাহ্মণ, তুই জানিস্?"

"আপনারা ব্রাহ্মণ। মিথ্যা কথা কহিব কেন মা,—তিনি দাদাবাবুর শ্বশুর।"

"শ্বশুর" কথা শুনিবামাত্র, মাতা সহসা প্রজ্বলিত দারুণ ক্রোধে ঝিকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেন। দ্বিতীয়বার একথা মুখে উচ্চারিত হইলে, তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিবার ভয় দেখাইলেন; এবং মাদুলীটা ঘরের জানলা দিয়া বাগানের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

ঝি বলিল—"দূর করিতে হবে কেন মা,—আমি নিজেই চলিয়া যাইতেছি।"

"এখন কোথায় যাইবি? আর একটা ঝি না পাইলে তোকে ছাড়িবে কে?"

"বেশ মা, আর একটা ঝিয়ের সন্ধান দেখ। তবে আমি বলিয়া রাখি, এ গৃহে আর আমি চাকরী করিব না।"

"কোন্ চুলায় এমন সুখের চাকরী পাইবি?"

"চুলা আমার মিলিয়াছে। জীবনের শেষে একমাত্র চুলাই যখন সকলের আশ্রয়, তখন আমি একটু আগেই তাকে অবলম্বন করিব।"

ঝিয়ের এ হেঁয়ালী কথা, আমরা কেহই বুঝিলাম না। মা, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, চলিয়া গেলেন। ঝিও নীরবে মায়ের অনুসরণ করিল। আমার সঙ্গেও একটা কথা কহিল না।

সেই দিনের সন্ধ্যায়—কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ আমার জ্বর আসিল।

ভারত-ভারতী

'উপদেশ-সাহস্রী'

২। বিষয়-বর্গ,—আত্মার 'দৃশ্য'

[শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, M. A.]

'আমি' যখন বিষয়-বর্গের অনুভব করিতে থাকি, তখন আমার যে এই 'আমিত্ব' টুকু, ইহার দুইটি অংশ আছে। দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অংশ দ্বারা এই 'আমিত্ব' টুকু গঠিত। 'আমি' বৃক্ষটিকে অনুভব করিতেছি, 'আমার' হর্ষ উপস্থিত হইল, পত্রখানি পাঠ করিয়া 'আমি' বড় দুঃখিত হইলাম। এই প্রকারেই আমরা বিষয়-বর্গের অনুভব করিয়া থাকি। এস্থলে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, আমরা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখিতে পাই। আত্ম-চৈতন্যই ত সকল বস্তুক প্রকাশ করিয়া থাকেন; আত্ম-চৈতন্যই ত সকল বস্তুর অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং, এস্থলে যে বস্তুগুলিকে অনুভব করা যায়, সেই বস্তুগুলি একটি অংশ। ইহাকে জড়াংশ বা বিষয়াংশ বলা যায়। আর, যিনি এগুলিকে অনুভব করিতেছেন, সেটি চেতনাংশ বা আত্মাংশ। আমাদের 'আমিত্বের' এই দুইটি অংশ। কিন্তু এস্থলে আরও একটি সূক্ষ্ম কথা আছে—আমরা বিষয়ানুভব-কালে, বিষয়ের সহিত আত্মাকেও মিশাইয়া ফেলি; আত্মার স্বতন্ত্রতার কথাটা ভুলিয়া যাই। শব্দস্পর্শাদি বিষয়বর্গ, ইন্দ্রিয়যোগে, বুদ্ধিকে ঐ সকল বিষয়ের আকারে পরিণত করিয়া ফেলে। আমাদের বুদ্ধিটি, বিষয়-গ্রহণকালে, বিষয়াকার ধারণ করে; আমাদের আত্মাও এই বুদ্ধির সহিত অভিন্ন হইয়া উঠে। বিষয়ের যে আকার, বুদ্ধিরও সেই আকার হয়; আবার এই বুদ্ধির যে আকার হইল, আত্মারও অবিকল সেই আকার উপস্থিত হয়। এই জন্যই আমরা হর্ষ-শোকাদি-পীড়িত বলিয়া আত্মাকে মনে করিয়া লই। বাস্তবিক পক্ষে, বুদ্ধির হর্ষ-শোকাদি অবস্থা বা আকারের সহিত, আত্মার কোন সম্পর্ক নাই। আত্মা ইহাদিগকে প্রকাশ করেন মাত্র, কিন্তু আত্মা ইহাদের সঙ্গে এক হইয়া যান না। কিন্তু, তথাপি, আমরা আত্মাকেও ইহাদের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলি। হর্ষ-শোকাদি, বুদ্ধিরই অবস্থা-ভেদ বা আকার-মাত্র। বিষয়বর্গ, ইন্দ্রিয়পথে উপস্থিত হইয়া, বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া তোলে। বুদ্ধির এই বিকার-গুলির মূলে, ইহাদের দ্রষ্টা আত্মা অবস্থিত আছেন। আমরা, ভ্রম-বশে, আত্মাকে এই বুদ্ধির বিকার-গুলির সহিত অভিন্ন করিয়া অনুভব করিয়া থাকি। বুদ্ধিকে যে আত্মা এইরূপে অভিন্ন বলিয়া বোধ করে, ইহাকেই 'অভিমান', বা 'আমি' 'আমার' বলে। এই অভিমান স্থাপনের ফলে, বুদ্ধির ক্রিয়া উপস্থিত হইবামাত্র, আত্মাকেও ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হইলে, আত্মাকেও নিষ্ক্রিয় মনে হয়।—ইহা অবিবেকের ফল। আত্মা যে বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, এই কথাটা মনে না রাখাতেই, এইরূপ ভ্রম উপস্থিত হয়।

বুদ্ধির এই যে অবস্থাগুলি, বা বিকার-গুলি, এগুলি বিষয়াংশ, জড়। বুদ্ধির, দ্রষ্টারূপে, মূলে আত্ম-চৈতন্য অবস্থিত রহিয়াছে। বিষয়ের যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন জড় বিষয়বর্গ ইন্দ্রিয়-পথে আমাদের জড় বুদ্ধিকেও আপনার আকারে পরিণত করে। বুদ্ধির এই বিকারগুলির মূলে যে আত্ম-চৈতন্য আছেন, তাঁহাকে আমরা এই বিকারগুলির সহিত একেবারে মিশাইয়া ফেলি। এই মিশানর ফলে, আত্মা যে স্বতন্ত্র থাকিয়াই উহাদের অনুভব-কারী, এ কথাটা আদৌ মনে আসে না। আত্মার এই মিশ্রিত-ভাবই —'আমি' বা 'আমার' অংশ।

এই প্রকারে, বুদ্ধিস্থ তরু-লতাদি বিষয়বর্গের সহিত, আত্মাও অভিন্ন হইয়া পড়েন বলিয়া, আমরা আর আত্মাকে ঐ সকল বিষয়বর্গ হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে পারি না।

এইরূপে, আত্মাকেও বিকারী বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিকার। তিনি বিষয়বর্গ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিষয়ানুভবের সময়ে, আমরা কিন্তু আত্মার এই স্বতন্ত্রতার কথাটা আদৌ লক্ষ্য করি না। হর্ষ-শোকাদি বুদ্ধির বিকার-গুলির সহিত, আত্মাকেও জড়াইয়া ফেলি, অভিন্ন-ভাবে মিশাইয়া দেই, আত্মাকে ঐ সকল বিকারের মধ্যে হারাইয়া ফেলি। মনে করি,আমিই ত বিকৃত হইলাম; আমারই ত সুখদুঃখাদি বিকার উপস্থিত হইল। আমিই ত এই এই বৃক্ষটি দেখিতেছি; এই বৃক্ষটি ত আমারই অনুভব। অতএব, এই যে 'আমি' ও 'আমার ভাবটি,—এটি, স্বরূপতঃ আত্ম-চৈতন্য হইলেও, আমরা যখন আত্ম-চৈতন্যকে বিষয়বর্গের সঙ্গে মিশাইয়া লইয়া—অভিন্ন ভাবে—এই 'আমি' 'আমার' বোধ করিয়া থাকি, তখন এই বোধটিকেও আমরা একরূপ বিষয়াংশ বা জড়াংশ বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। অতএব, আমরা দেখিতেছি যে, বিষয়ানুভবের সময়ে, আমাদের যুগপৎ দুইটি বোধ জন্মে—একটি 'আমি' 'আমার' অংশ; অপরটি বৃক্ষ, লতা, সুখ-দুঃখাদি বিষয়াংশ। এই উভয় অংশই জড়। ইহারা কেহই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে। আত্মা, —ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র।

এই উভয় অংশই আত্মার দৃশ্য। আত্মা ইহাদের দ্রষ্টা ও অবভাসক। দৃশ্যবর্গ হইতে দ্রষ্টা অবশ্যই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। সুতরাং আত্মা স্বতন্ত্র। বিষয়ানুভবকালে, এইরূপে আত্মার স্বতন্ত্রতা পরিস্ফুট করিয়া লওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিষয়ানুভব-কালে আত্মা,—এই বিষয়বর্গের, এই বুদ্ধির অবস্থানান্তরগুলির সাক্ষী, বা দ্রষ্টা মাত্র। আত্মা দ্রষ্টা, এবং বিষয়বর্গ তাঁহার দৃশ্য। আত্মা প্রকাশ-স্বরূপ, বিষয়বর্গ তাঁহার প্রকাশ্য মাত্র। তিনি অবভাসক, আর বুদ্ধিস্থ বিষয়-সকল তাঁহার অবভাস্য। এইরূপে বিষয়বর্গকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া দিতে পারিলে, তবে আত্মার প্রকৃত স্বতন্ত্রতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে আত্ম-চৈতন্য পরিস্ফুট থাকেন; কিন্তু তৎকালে উহাতে 'আমি', 'আমার' এই অংশটি আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হইতে পারে না। প্রকৃত স্বরূপ হইলে, সুষুপ্তি সময়ে ইহা থাকিত। কেন না, যেটি যাহার স্বরূপ, কোন অবস্থাতেই তাহা নষ্ট হয় না। গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেই আবার, এই 'আমি' 'আমার' বোধও আসিয়া পড়ে। সুতরাং, এটি আগন্তুক বোধ। আগন্তুক বলিয়াই, এটি হইতে আত্মা পৃথক্ বা স্বতন্ত্র। সুতরাং, এই বোধটি আত্মার দৃশ্য—আত্মা ইহার দ্রষ্টা। অতএব, 'আমি', 'আমার' বোধকেও আমরা বিষয়াংশ বা জড়াংশ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারি। জড়ের সঙ্গে সংমিশ্রিত ভাবেই এই বোধটি আত্মায় উপস্থিত হয়। গাছ, বৃক্ষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিও যেমন আত্মাদ্বারাই প্রকাশ্য, আত্মারই দৃশ্য; 'আমি' দুঃখী হইলাম, 'আমার' পুত্র, ইত্যাদিরূপে এই যে 'আমি' 'আমার' বোধ, ইহাও আমার দৃশ্য এবং আত্মার দ্বারা প্রকাশ্য। অতএব, আত্মার যেটি প্রকৃত স্বরূপ, তাহা—এই উভয় অংশ হইতেই স্বতন্ত্র, পৃথক্। এই বিষয়বর্গ আত্মারই প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে; এই সকল বিষয়াদি এক আত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়া সমর্পিত; সুতরাং ইহারা সকলেই আত্মার দৃশ্যমাত্র। ইহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মার স্বরূপ হইতে পারে না; ইহারা আত্মা হইতে পৃথক্; ইহারা জড়। এই জড়াংশটিকে, বিষয়ানুভবের সময়ে, পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই আত্মার স্বতন্ত্রতার কথা জাগিয়া উঠিবে। বিষয়াংশকে বর্জ্জন করিলেও, আত্মার স্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না।

অন্য এক প্রকারেও আত্মার প্রকৃত স্বতন্ত্রতার কথাটি পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

নীর ও ক্ষীর

প্রাচীন ভারতে লৌহ *

[শ্রীহংসেশ্বর দেবশর্ম্মা, M. A.]

ভূ-স্বর্গ-ভারতবর্ষ, প্রকৃতিদেবীর অমিত বিচিত্র লীলার সুবিশাল রঙ্গস্থল—অমিত বৈভবের অতুলনীয় রত্নভাণ্ডার। কোনও কালে কোনও পদার্থের জন্যই রত্নপ্রসূ ভারত-ভূমিকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় নাই। স্বনামধন্য ভূতত্ত্ব-বিশারদ ভূতপূর্ব্ব 'ডিরেক্টর্ অব্ জিওগ্রাফিক্যাল্ সর্ভে অব্ ইণ্ডিয়া', স্যার্, রবার্ট বল্, তাঁহার "ইকনমিক্ জিয়লজি অব্ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"Were India wholly isolated from the rest of the world, or were her mineral productions protected from competition, there cannot be the least doubt that she would be able from within her own boundaries to supply very nearly all the requirements, in sofar as the mineral work is concerned, of a highly civilised community."

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী

* "IRON IN ANCIENT INDIA"—by P. Neogi, M. A., F. C. S., being Bulletin No. 12 issued by the Indian Association for the Cultivation of Science. Price Rs. 2-4 or 3 S. net.

পৃথিবীর সভ্যতাভিমানী সকল জাতিই মহাত্মা বলের এই সত্যোক্তির সমর্থন করিয়া থাকেন।

প্রাচীন হিন্দুগণ কি কি ধাতুর বিষয় অবগত ছিলেন, এবং বিবিধ ধাতু ও মিশ্রধাতু সম্বন্ধে তাঁহাদের কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, সাহিত্য-সেবী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বহুদিন হইতেই চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ, এবং প্রত্নতত্ত্ব ও ধাতুবিদ্যা গত প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করিয়া যথা-সম্ভব অভ্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন। বিগত ১৯১৪ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডাঃ শ্রীযুক্ত পি. সি. রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-প্রচারিণী সভার একটি অধিবেশন হয়। অধ্যাপক নিয়োগী সেই সভায় 'প্রাচীন ভারতে লৌহ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাই সুপরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক নিয়োগী ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ, সায়ণাচার্য্য কৃতভাষ্য, তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়ণী সংহিতা, ছান্দগ্যোপনিষদ, জৈমিনি উপনিষদ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ এবং প্রোক্ত বিষয়াবলী-সংক্রান্ত পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলী-প্রণীত গবেষণাবহুল নানা গ্রন্থ হইতে প্রমাণ-প্রয়োগ যোগে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, অতি-প্রাচীন বৈদিক যুগ (খৃঃ পূর্ব্ব ২,০০০—১,০০০ বৎসর) হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে 'লৌহ' প্রচলিত আছে এবং প্রাচীনেরা লৌহ-নিষ্কাশন ও লৌহ-দ্রব্যজাত প্রস্তুত-প্রকরণ সুবিদিত ছিলেন। প্রাচান শিল্প-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশষসূত্রে অধুনা কতকগুলি প্রাচীন লৌহের নমুনা পাওয়া গিয়াছে; যথা—

(১) তিনেভেলিতে প্রাপ্ত প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের লৌহ-অস্ত্র শস্ত্র;

(২) পিপ্রহ্ব স্তূপস্থিত লৌহ;

(৩) বুদ্ধ-গয়ার বৌদ্ধ-মন্দিরস্থিত লৌহ-'পতর' (খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর);

(৪) দিল্লীর লৌহস্তম্ভ (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর);

(৫) ওড়িশার ভুবনেশ্বর, পুরী এবং কোণার্কের মন্দিরগুলির লৌহ-কড়ি (খৃঃ ষষ্ঠ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর);

(৬) ধারের লৌহ-স্তম্ভ;

(৭) আবু পর্ব্বতের লৌহস্তম্ভ বা ত্রিশূল (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর)।

(৮) সোমনাথের দ্বারস্থিত লৌহ।

(৯) প্রাচীন কামান ও বন্দুক (মুর্শিদাবাদ, বিজাপুর ও গুলবর্গের—খৃঃ ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর)।

নিয়োগী মহাশয় সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক ইতিহাস প্রমাণে ইহাদের নির্ম্মাণকাল এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে ইহাদের উপাদান নিরাকরণ করিয়াছেন। কি কারণে এগুলি এতদিনে মড়িচা ধরিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় লৌহসম্বন্ধে রাসায়নিক তথ্য, লৌহ-মিশ্রিত সঙ্কর ধাতুর বিবরণ, লৌহের খনি ও খনিতে বিমিশ্র অবস্থায় প্রাপ্ত লৌহ উপাদান বিশ্লেষণ, (wrought iron) 'কান্ত' বা বিশুদ্ধ লৌহ-প্রস্তুতের সহজ-প্রকরণ, ভারতীয় প্রক্রিয়ায় (cost iron) 'মুণ্ডায়স' উৎপন্ন না হইয়া 'কান্ত' লৌহ প্রস্তুত হয় কেন? ভারতীয় ইস্পাত, বা 'উৎজ' —উৎজের উৎপত্তি—তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ—প্রস্তুত-প্রণালী—'মুষা'য় 'কান্ত' লৌহ প্রস্তুত-প্রকরণ—ইহা ভারতীয়—মুণ্ডায়স,—এই সকল কথা পুস্তকখানিতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ৯ খানি চিত্রও সন্নিবেশিত আছে।

ভারতীয় লৌহ-শিল্পের প্রাচীনতা এবং ভারতীয় লৌহের উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত এইরূপ—

"In purity of ore and in antiquity of working, the iron deposits of India probably rank foremost in the world." *

প্রতীচ্যের লৌহ-শিল্পের ইতিহাসকে পণ্ডিতেরা তিনটি বিভিন্নযুগে বিভক্ত করিয়া থাকেন—

(১) খনিজ বিমিশ্র উপাদান হইতে প্রত্যক্ষপ্রণালীতে 'কান্ত' লৌহ-প্রস্তুত—সুদূর প্রাগ্-ঐতিহাসিকযুগ;

(২) 'কান্ত' লৌহ প্রস্তুত-প্রকরণ যুগ—খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী;

* "Encyclopœdia Britanica"—Eleventh Edition, vol. 14, p. 393.

(৩) তরল ইস্পাত প্রস্তুত—'বেসেমর্'-উদ্ভাবিত প্রণালী অবলম্বনে (১৮৫৬ খৃঃ)।

আমাদের দেশের কিন্তু এবংবিধ একটা বিভাগ করা বড় কঠিন। ১৯১১ সালে নভেম্বর মাসে 'ডড্‌লি' সহরে মিঃ আইজাক্ ই, লেষ্টর্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'ষ্ট্রাফোর্ড-শায়ার্ আয়র্ণ এণ্ড ষ্টীল্ ইন্‌ষ্টিটিউটে'র যে বৈঠক হয়, তাহাতে, সভাপতির অভিভাষণে, মিঃ লেষ্টর্ বলেন—"ইতিহাস-প্রমাণে জানা যায় যে, বিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে পুরুরাজ,আলেকজণ্ডারকে অনেক খানি 'ডামাসীন্' ইস্পাত উপহার দিয়াছিলেন,—প্রাচীন ব্রিটন্‌গণ যখন নিতান্ত বর্ব্বর ছিল, তখন ভারতে মুদ্রা-প্রস্তুতের জন্য ইস্পাতের ছাঁচ ব্যবহৃত হইত।—প্রাচীনকালে ভারতে এমন উচ্চশ্রেণীর লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হইত যে, যে সকল প্রদেশে লৌহের খনি বিদ্যমান, সে দেশের লোকেও ভারতীয় লৌহের জন্য উৎসুক হইত।—যখন প্রতীচ্য দেশবাসী লৌহের ব্যবহার পর্য্যন্ত জ্ঞাত হয় নাই, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতে সর্ব্বপ্রথম 'Manganese Steel' প্রস্তুত হইত। এতাবৎ প্রাচ্য-প্রদেশে প্রাচীন লৌহ-নির্ম্মিত কোনও দ্রব্যই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন নাই; অথচ, ভারতে সেরূপ প্রাচীন নিদর্শনের অসদ্ভাব নাই। বিশ্বস্ত ইতিহাস-প্রমাণে প্রকাশ যে, ভারতীয় 'লৌহ-যুগে'র আরম্ভ প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৩৭০ সালে। ভারতীয় লৌহে সাধারণতঃ শতকরা ০.৪ হইতে ০.৬ অংশ 'কার্ব্বন্' বর্ত্তমান দেখা যায়—অন্য কোনও দেশে কোন রূপে প্রস্তুত লৌহ বা ইস্পাতে এরূপ দেখা যায় না। "Its toughness combined with softness, was very marked, and the metal generally possessed characteristics of the best Swedish charcoal iron and low carbon steels." "উল্কাপাতে প্রাপ্ত লৌহ ব্যতীত, (charcoal iron) অঙ্গারবিমিশ্র লৌহ, সর্ব্ব-প্রথমে ভারতে কাহার দ্বারা বা কখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না।" ইত্যাদি। মিঃ লেষ্টর্ বিলাতের সুবিখ্যাত Messrs. Akrell & Co.র লৌহ কারখানার অধ্যক্ষ। তিনি বিদেশী; তাঁহার পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা দোষাবহ নহে। অধ্যাপক নিয়োগী মহাশয় তাঁহার এই পুস্তকখানিতে দেশীয়-বিদেশীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, রসায়ন শাস্ত্র, খনিজ-বিদ্যা, ইংরাজী সংস্কৃত ভাষা, প্রভৃতিতে তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও ভারতে লৌহের আদিম-আবিষ্কার কোথায়, কিরূপে, কাহার দ্বারা হইয়াছিল তাহা আদৌ উল্লেখ করেন নাই। উচ্চ-অঙ্গের শাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যার যেমন প্রচুর মূল্যবত্তা, সে হিসাবে দেশ-প্রচলিত উপকথা-প্রবাদের মূল্য অনেক হীন হইলেও, কতকটা সার্থকতা আছেই। আমরা অধ্যাপক নিয়োগী মহাশয়ের পুস্তকের সেই অঙ্গ-হানিটুকু পূরণ করিবার যৎসামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। লৌহ-উৎপত্তি বিষয়ক এই অপরূপ প্রবাদটির জন্য আমরা ভূয়োদর্শী ব্যবহারিক-জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ঋণী। প্রবাদটির মূলে কি-পর্য্যন্ত সত্য কি-ভাবে নিহিত আছে, ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রে ইহার মূল্যবত্তা কতটুকু, সে সকল বিচার করা আমাদের গণ্ডি-বহির্ভূত; সুতরাং, সে ভার বহুমুখী প্রতিভাবান্ অধ্যাপক-নিয়োগী-প্রমুখ বিদ্বন্মণ্ডলীর উপরেই ন্যস্ত রাখিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

লৌহের উৎপত্তি বিষয়ে জঙ্গল-মহলে নিম্নলিখিত বিচিত্র প্রবাদ প্রচলিত আছে।—"অতি প্রাচীনকালে লোহাসুর নামে একটি দুর্দ্দান্ত দৈত্য ছিল। ঘোরতর তপোবলে সে এরূপ বলশালী হইয়াছিল যে, ইন্দ্রও তাহার নিকট পরাজিত হইয়া স্বর্গসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পলায়ন করেন; লোহাসুর, স্বর্গ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, পরম সুখে স্বর্গভোগ করিতে লাগিল।—ইন্দ্রদেব পথের ভিখারী হইয়া অবশেষে দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলেন। আশুতোষ তাঁহার দুঃখে কাতর হইলেন; কিন্তু তিনি সঙ্কটে পড়িলেন—তিনিই যে ইতঃপূর্ব্বে লোহাসুরকে বর দিয়াছেন যে, বিষ্ণুর চক্রই হউক, ইন্দ্রের বজ্রই হউক, আর বরুণের পাশই হউক, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, মনুষ্য মধ্যে যে কোন অস্ত্র প্রচলিত থাকুক,—কিছুতেই তাহার গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগিবে না! অথচ ইন্দ্রের এ দৈন্যদশাও সহ্য করা যায় না! অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেবাদিদেব একটি মনুষ্য সৃজন করিলেন—নিজের আসবাব-পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,তাহাকে কামারের সজ্জায় সজ্জিত করিলেন;—ডমরু ভাঙ্গিয়া 'হাতুড়ি', মড়ার খুলি পিটিয়া 'নেওাই,' সাপটি বাঁকাইয়া 'চিম্‌টা', ষাঁড়ের গায়ের একটু ছাল লইয়া

যোড়া 'জাঁতা' প্রস্তুত হইল। এই সকল সজ্জায় সেই আদি-কামারকে সুসজ্জিত করিয়া, ভবানীপতি তাহাকে আদেশ করিলেন—"যাও, তুমি লোহাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে বধ কর।" এইরূপে সজ্জিত ও আদিষ্ট হইয়া, সেই আদি-কামার 'যুদ্ধং দেহি—যুদ্ধং দেহি' রব করিতে করিতে ভীষণ পর্ব্বতাকার সেই দুর্জ্জয় দানবপতির নিকট উপস্থিত হইল। দেব-দানবজয়ী লোহাসুর এই কীট সদৃশ সামান্য মনুষ্যকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া, তাহার সম্মুখীন হইতে দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল—সে হাসিয়া উপেক্ষা-ভরে কামারের 'challenge' প্রত্যাখ্যান করিল। নিরুপায় দেখিয়া, কর্ম্মকার-প্রবর দানবকে বলিল, "ভাল, যথার্থই যদি তুমি অজর অমর বলিয়া তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে এস—আমি এইখানে কাদা দিয়া একটি ভাঁটি গড়িয়া, তাহার গায়ে আমার এই জাঁতা-যোড়া বসাই, আর তার ভিতর কয়লা সাজাই; তুমি যদি সেই কয়লার উপর খানিক ক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব তুমি যথার্থই শক্তিমান্ বটে।" এই কথা শুনিয়া দানব অবজ্ঞাভরে বলিল, "ইহা আর একটা বিষম, কি কঠিন কার্য্য! তুমি যত-বড় ইচ্ছা ভাঁটি গড়, যত ইচ্ছা কয়লা সাজাও, তাতে আগুন দিয়া যত জোরে ইচ্ছা জাঁতা চালাও—তুমি যতক্ষণ বলিবে, আমি তার ভিতর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিব; তাহা হইলেই ত তোমার যুদ্ধের আশা নিবৃত্ত হইবে?"—ভাঁটি গড়া হইল, জাঁতা বসান হইল, কয়লা সাজান হইল, হাসিতে হাসিতে লোহাসুর গিয়া তার মধ্যে সুখাসনে বসিল!—কামার-অবতার কয়লায় আগুন দিয়া, জাঁতায় 'তাও' আরম্ভ করিয়া দিল। আগুন ধরিয়া উঠিল—কয়লা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—অসুরের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল; কিন্তু, সামান্য মনুষ্যের কৌশলে পরাজয় স্বীকার করিবার অভিমানে, লোহাসুর অচল অটল ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে তাহার শরীর লাল হইয়া উঠিল—গলিতে আরম্ভ করিল—অবশেষে, সমুদয় শরীরটি গলিয়া ভাঁটির বাহিরে গড়াইয়া আসিল।—এই যে সব লোহা দেখিতে পাও,—খাঁটি লোহাই বল, আর লৌহময় প্রস্তরই বল,—এ সবই সেই লোহাসুরের গলিত-শরীর ভিন্ন আর কিছুই নয়। লোহাসুরের দ্রবীভূত শরীর, যেই একটু শীতল হইয়া জমিয়া আসিল, অমনি সেই কর্ম্মকার অবতার তাহা পিটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। পিটিয়া পিটিয়া যে কেবল লৌহ পাওয়া গেল—তাহাই নয়;—লৌহ, পিত্তল, কাঁসা, স্বর্ণ ও রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি নানাবিধ ধাতু বাহির হইল। এই যে মনুষ্যটি লোহাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত সামান্য লোক নহেন—তিনিই কর্ম্মকার প্রভৃতি ধাতু সম্পর্কীয় শিল্পকারদিগের পূর্ব্বপুরুষ-অষ্ট পুত্রের পিতা। লোহাসুরকে বধ করিয়া তিনি যে-সকল বিভিন্ন ধাতু পাইলেন, সেগুলি এইরূপে তাঁহার সন্তানবর্গকে বিভাগ করিয়া দিলেন;—(১) লোহার কর্ম্মকারকে লৌহ, (২) পিত্তল-কর্ম্মকারকে পিত্তল, (৩) কাংস্যকারকে কাঁসা, (৪) স্বর্ণকারকে স্বর্ণ ও রৌপ্য, (৫) ঘট্রাকর্ম্মকারকে এরূপ লৌহ যদ্দ্বারা অনায়াসে কাজল-নাতা, লৌহফল ও পুত্তলিকাদি নির্ম্মিত হইতে পারে, (৬) চাঁদ-কামারকে এরূপ পিত্তল, যাহাতে সুচারু দর্পণ প্রস্তুত করা যায়, (৭) ঢোক্রা ও (৮) তাম্রাকে তাম্র দিলেন।—জঙ্গল-মহলের প্রবাদ, সুতরাং এই যে সকল ধাতুকারদিগের নাম উল্লিখিত হইল, এগুলি জঙ্গলী প্রদেশ-বাসীদিগের নাম।—আমাদের এদেশের কারুকরদিগের প্রত্যক্ষ-দেবতা যেমন শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মা, ইহাদিগের দেবতা তেমনই শ্রীশ্রীভাদু।"

শেষ কথা—পুস্তক খানি যেরূপ মূল্যবান্ গবেষণা তাহাতে মনে হয়, ইহার বাঙ্গালায় একটি সংস্করণ হইলে ভাল হয়। আর সসম্ভ্রমে—সভায় একটু টিপ্পনি করিব?—অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট "The *Well-Known* metallurgist Dr. John Percy in his *Well-Known* treatise" অপেক্ষা সুললিত ইংরেজী আশা করি।

প্রাকৃতিকী *

[শ্রীহংসেশ্বর দেবশর্ম্মা M. A.]

শুষ্ক কঠোর বৈজ্ঞানিক বিষয় সরল ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের শক্তি

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়

অসাধারণ। নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী হইতে কতকগুলিকে লইয়া এই 'প্রাকৃতিকী' রচিত; ইহাতে কয়েকটি অপ্রকাশিত নূতন নিবন্ধও স্থান পাইয়াছে। সর্ব্বসমেত ইহাতে ৩২টি প্রস্তাব আছে;- রেডিয়ম্ এবং ইলেক্ট্রন্ ও নাইটনের কথা, জৈব ও অজৈব 'রসায়নী বিদ্যার উন্নতি', ধাতু ও অধাতুর সীমান্ত রেখা, পদার্থ-বিশ্লেষণ ও প্রকৃতি-নির্ণয়, নূতন বিশ্লেষণ-প্রথা, অদৃশ্য কিরণ, ঈথর, বাতাস বা জল যে কোনও পদার্থে যখন ঢেউ উঠে তখন তাহাতে মজ্জমান নিশ্চল পদার্থ অপেক্ষা সচল পদার্থ যে কখন অধিক এবং কখন কম ঢেউয়ের ধাক্কা খায়, ডপ্লার সাহেবের সেই সিদ্ধান্ত, ভূমি-কম্প, বিশ্ব, লর্ড কেল্ ভিনের জীবনী ও প্রতিভা, মনুষ্যসৃষ্টি, জীবনটা কি, প্রাণিদেহের উত্তাপ, আলোক ও বর্ণজ্ঞান, ঘ্রাণতত্ত্ব, প্রাণী ও উদ্ভিদের বিষ, অমৃত ও গরল, প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য, বৃক্ষের চক্ষু, মৃত্যুর নবরূপ, একটি নূতন আবিষ্কার, কেরাসিন তৈল, দধি, চা-পান, ব্যাবিলোনীয় জ্যোতিষিগণ, পৃথিবীর শৈশব, মঙ্গল গ্রহ, নূতন নীহারিকাবাদ, গ্রহদিগের কক্ষ, বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম গণনা এবং শুক্র-ভ্রমণ—এই সকল বিষয় অতি বিশদভাবে এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। সে আলোচনা অবান্তর কথা নহে; প্রতীচ্য-প্রদেশের জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞান-বিশারদদিগের জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা-লব্ধ—অক্লান্ত গবেষণা-পরীক্ষা-প্রসূত—আপূর্ব্ববর্ত্তমান প্রত্যক্ষীকৃত বিবিধ অমূল্য তথ্যনিচয়ের ধারাবাহিক ইতিকথায় পরিপূর্ণ। কঠোর কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলী রায়-মহাশয়ের ঐন্দ্রজালিক লিপি-ভঙ্গী-প্রভাবে উপন্যাসোপম মনোহারী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; সে সকল তত্ত্ব যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই মহা মূল্যবান্—সকলেরই অবশ্যজ্ঞাতব্য।

বাজে পুস্তকাবলী—কথা-সাহিত্যাদি পাঠে অপরিণত-বয়স্ক কিশোর-কিশোরীর যে কেবল চিত্ত-চাঞ্চল্য ও প্রবৃত্তি-তারল্য ঘটে, তাহাই নহে; উহারফলে ক্রমে চরিত্রাবনতি ও মানসিক তেজোহীনতা ঘটে। তাই মনে হয়, গল্প-উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি লঘু সাহিত্য পরিপ্লাবিত বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে এই পুস্তকখানি যেমন সময়োপযোগী, তেমনই চরিত্র বলাধানের সম্যক্ উপযোগী; অথচ,কার্য্যক্ষেত্রে এই পুস্তকোল্লেখিত বিষয়াবলীর মূল্যবত্তা—প্রয়োজন—হিত-কারিতা অসাধারণ। পুস্তকখানি বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহা পাঠে যে, কেবল ছাত্রদিগেরই জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইবে তাহাই নহে—ছাত্র-দিগের পিতা ও অভিভাবকগণও এই পুস্তক-পাঠে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য হিতকর তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। ছাপাই-বাঁধাই-কাগজ সবই অতি সুন্দর; অথচ সে অনুপাতে মূল্যও অল্প—মাত্র ২৲ টাকা। পুস্তকখানিতে ৩৫ খানি অতি সুন্দর 'হাফ্-টোন্' চিত্র সংযোজিত থাকায়, ইহার সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। শেষ কথা, পুস্তকখানি যেমন বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসে পূর্ণ, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহার দ্বারা বঙ্গভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর অভাব প্রভূত পরিমাণে দূরীভূত হইবে। ইহাতে গতি-বিজ্ঞান, তাপ-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, তাড়িত-বিজ্ঞান,-চুম্বক-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ের যথাসম্ভব সুসংবদ্ধ আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

* শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত,—মূল্য ২৲ দুই টাকা।

পত্র পুষ্প*

[শ্রীহংসেশ্বর দেবশর্ম্মা M.A.]

নূতন কাব্য 'পত্র-পুষ্পে'র সমালোচনা করিতে বসিয়াছি। কাব্যখানি পড়িবার সময় এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া

শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

ছিলাম। বহুদিন এমন আনন্দ কাব্যপাঠে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যাহা সহজ ও স্বাভাবিক, তাহাকে জটিল করিয়া, নবত্বের বেশে দাঁড় করাইবার চেষ্টা গিরিজা-নাথের আদৌ নাই; তাঁহার ভাববৈচিত্র্য নূতন-বর্ণ-ভূষিত হইয়া সর্ব্বত্রেই দেখা দিয়াছে। পদ্মের পেলবাঙ্গে নূতন রং ফলাইতে অথবা চামেলিকে অধিকতর সুরভিত করিবার আশায় তাহার বক্ষে 'অটো' প্রদান করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। সৌন্দর্য্যের মেধ্যতা পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য তিনি সংযমীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। Luxurious Sentiments এর চাপে পড়িয়া, তাহার সৌন্দর্য্য কোথাও আপন শুচিত্ব নষ্ট করে নাই।

'বাগ্‌ ভূষণং ভূষণং'—'বাক্যরূপ ভূষণই যথার্থই ভূষণ' ইহার কখন বিনাশ নাই। গিরিজানাথ শব্দ-গুম্ফন-কৌশল-পটীয়ান্, আবার সেই পটুতার ভিতর রসের প্রাচুর্য্য প্রত্যেক কবিতাটিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা পড়িতে গেলে, অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের ভিতর শ্বিত্র-দোষ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। কিন্তু গিরিজানাথের কবিতা প্রভাত-পবন-সঞ্চারিত মৃদুমধুরহসনশীল নলিনীবৎ মাধুর্য্য-সমষ্টি। অনেক উদীয়মান কবি লঘুগুরু-জ্ঞান ভ্রষ্ট হইয়াও মাত্রিক ছন্দে কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহা-দের লেখায় কবিত্বসুরভি-সম্ভারের অভাব না হইলেও, কুসুম অঙ্গে দদ্রুর বিকাশ-দর্শনে স্বতঃই ক্ষোভের উদয় হয়; —কিন্তু গিরিজানাথ মাত্রিক ছন্দে লিখিতে চেষ্টা করেন নাই। এই রবীন্দ্রযুগে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কবিতা লেখা বড় সহজ নহে। বিরাট বায়রণের সমীপস্থ ক্ষুদ্রোজ্জ্বল মূরের ন্যায় শত শত মনীষা প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে অবস্থিত। এই শুনিতেছি কবির প্রাণের গান—আনন্দ অনুভূত হইতে না হইতে আপনাকে অধিকতর মিষ্ট করিতে গিয়া অমনি কবি গায়িয়া বসিলেন—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করিছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে!
হৃদয় আমার নাচের আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে!"

ইহাকেই বলে আত্মহত্যা। রবীন্দ্রনাথের মায়ামৃগ ধরিতে গিয়া, কত কবির অকাল মৃত্যু চক্ষুর সম্মুখে দেখি-লাম ও দেখিতেছি। কিন্তু গিরিজানাথ রবীন্দ্রনাথের দুর্ব্বার ভাবস্রোতে ভাসিয়া যান নাই। গিরিজানাথের কবিতা তীর্থোদকের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র এবং রসদুষ্ট নয় বলিয়াই বড় গৌরবের জিনিষ। 'The concrete hearts of the real men' আজি ইহা উপভোগ করিবে।

একটু রসের কথার অবতারণা করিতে হইতেছে। উজ্জ্বল-রস নীলমণি রসিক নাগর মহাশয় যে রস চাহেন, এ সে রস নহে। বর্ষার বৃষ্টি যেমন চাতকের মনোরঞ্জন করিয়া উদ্ভিদের লাবণ্য-বিস্তার করে, আমার এ রসও তদ্রূপ

* শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কাব্যের কোমল হৃদয় মধ্যে মধু-সঞ্চার করিয়া, ইহাকে সৌন্দর্য্যনিবদ্ধ করিয়া তোলে।

রস নিজে কোন পদার্থ নহে। উদ্দীপন ও আলম্বন বিভাব-সংযোগে এক অপূর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আত্মপ্রকাশ করে—ইহার স্বরূপ যে কি, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা এখনও জন্মে নাই। মার্জ্জিত ও সুশিক্ষিত হৃদয়ে ইহার অলৌকিকত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। কাব্যই ইহার আশ্রয়—ইহাকেই অবলম্বন করিয়া রস সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হয়। বাঙ্গালায় অনেক রসাত্মক কাব্য কয়েক বৎসরের মধ্যে বাহির হইয়াছে। করুণানিধানের 'শান্তিজল', দেবকুমারের 'মাধুরী', যতীন্দ্রের 'অপরাজিতা', জীবেন্দ্রের 'তপোবন', প্রমথনাথের 'পাথার' উল্লেখযোগ্য। আজ বাঙ্গালা ভাষা কাব্যমাহাত্ম্যে গরীয়সী। যেমন কৌমার ও যৌবনের মিলনজনিত লাবণ্য ও মধুরিমা একত্র স্ফুরিত হইয়া, আপনা হইতে নয়নের প্রীতি উৎপন্ন করে, তদ্রূপ বাঙ্গালা কবিতার কৌমার্য্যের সহিত যৌবনের সঙ্গমজনিত অপূর্ব্বতা ও বৈচিত্র্য, হৃদয় মধ্যে সৌন্দর্য্যানুভূতি সৃষ্টি করিয়া, প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া তুলিতেছে। উর্ব্বশীর যৌবন ছানিয়া আজি বঙ্গকোবিদ্‌বর্গ বাঙ্গালা ভাষার দেহ, লাবণ্যে অনুলিপ্ত করিতেছেন। ভাবের নির্ম্মাল্যে ভাষা পরিস্ফুট হইয়া উঠে—কবির প্রত্যেক শব্দ সোমরসস্নাত হইয়া অমরাবতীর রাজটীকা ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আস্বাদ অমৃতায়মান হইয়া প্রত্যেক ধমনীকে—মাধুর্য্য অনুভব করাইবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতে থাকে। তাই কোনো মহাত্মা বলিয়াছেন—

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গলোকে কামধুক্‌ ভবতি।"

কাব্য সৌন্দর্য্যের আশ্রয়স্বরূপ। সৎশব্দ ইহার অপঘন ও পেলবতা—ধ্বনি ও রস ইহার আত্মা এবং উপমিতি প্রভৃতি ইহার দেহের কুসুম-মালিকা। কবি যখন বিশেষ ভাবে নিমগ্ন হইয়া ইহাকে মূর্ত্তি প্রদান করেন, তখনই সেই রসাল বাঙ্‌নির্ম্মিত বাক্য, গুটির মধ্য হইতে বহির্ভূত প্রজাপতিবৎ নানা বর্ণে ও রসে শোভিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। পৃথিবী অনন্ত শোভার খনি—শ্যামল স্নিগ্ধ তরুরাজি, অভ্র-কিরীটিনী শৈলমালা, নির্ম্মল-তরঙ্গ-বাহিনী তটিনীনিচয়, বালার্ককিরণোজ্জ্বল সুরভিত কুসুমাবলী, যিনি দেখিবার মত দেখিতে জানেন, তিনিই যথার্থ কবি। তাই রস্কিন্‌ বলেন—

"The greatest thing a human soul ever does in this world is to see something and tell what it saw in a plain way."

বাইবেল বলিলেন—ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেকটি সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার শক্তি কয় জনের আছে? কবি ভাব-মুগ্ধ যোগী। আমাদিগের অন্তর বহির্জ্জগতের প্রতিবিম্ব—এই প্রতিবিম্বের মধ্যে প্রেম,ভক্তি,সুষমাসক্তি প্রভৃতি বৃত্তি-নিকর আপনাপন কার্য্য করিতেছে। বিশ্বকাব্য অন্তরের মধ্যে অহর্নিশ মধুর রস সেচন করিয়া, ইহাকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছে; এই রসাস্বাদন করিতে করিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অচ্যুতের আস্বাদস্পৃহা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে।

"Speak to the earth and it shall teach thee." কিন্তু প্রকৃতির এই শিক্ষা শুনিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি কয়জনের আছে? "The love of nature is a great gift." এই প্রকৃতিদত্ত উপায়ন পৃথিবীর মধ্যে অল্প লোকই পাইয়া থাকেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতর পূজার জন্য যাইতে হইলে এই সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া কেহই যাইতে সমর্থ হন না।

আজ বাঙ্গালা ভাষা অভিনব কবিনিচয়ের গুঞ্জনে ও কুহরণে নিত্য মুখর। শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত পরিচিত। তাঁহার 'পরিমল' যোজনব্যাপী মন্দারগন্ধবৎ হৃদয়হারী। 'পরিমলে' মুগ্ধ না হইয়াছেন, এমন পাঠক অতি অল্প। তাঁহার নব-প্রকাশিত 'পত্রপুষ্প' অপূর্ব্বতায় পরিপূর্ণ। কবি যেন তাঁহার সঞ্জীবনী সুধা হৃদয়গাগরী হইতে বিশ্বের আলবালে সেচন করিয়া ইহার জড়িমা অপনোদনপূর্ব্বক ইহাকে নব-জীবনে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। কি মনোহর শব্দ নির্ব্বাচন! বসন্তের রসে ফুলগুলি যেমন সরস হইয়া উঠে, ভাবরস-সিক্ত শব্দগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। আমরা 'মৃত্যু' নামক কবিতা হইতে কয়েকটি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"—সে পরম ক্ষণে তুমি
দিবে যবে দেখা,—

দেখা দিও ব্যক্ত রূপে অভয় মূরতি ধরি'
মুখে শান্তি-লেখা।
স্বস্তি বাণী উচ্চারিয়া তোমার আশিস্-স্পর্শ
দিও মোর মাথে।
তার পর, মুক্ত করি' সকল বন্ধন হ'তে
নিয়ো মোরে সাথে !"

Simonides বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"Poetry is a speaking picture aod painting is mute Poetry." মধুরগুঞ্জনশালিনী এই চিত্রময়ী কবিতাবলীর অর্থপূর্ণ ভাবপূর্ণ স্বরলহরী হৃদয়কে জাগাইয়া তোলে কি না? রবীন্দ্রনাথের সোণার তরীর পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য কবিতা বাঙ্গালায় অতি অল্প। গিরিজানাথের 'পত্রপুষ্পের' অনেক কবিতা প্রতিযোগিতায় নৈবেদ্যের সমকক্ষ। গান, প্রাণ, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের এমন সান্দ্র সম্মিলন অনেক প্রতীচ্য কবির কাব্যে বড় দেখি না।

গিরিজানাথ বিপত্নীক। তাঁহার যৌবনের 'বেলা' প্রেমের কবিতায় পরিস্ফুট হইয়া আছে। তাঁহার 'পরিমল' চাঁদে মেঘে মিশামিশির ন্যায় প্রেমের সহিত নৈরাশ্য ও নৈরাশ্যের সহিত প্রেমের সংযোগ প্রকটিত করিতেছে। তাঁহার নূতনকাব্য 'পত্র-পুষ্প' সাধনার ধন। কবি হৃদয়ের প্রবল আবেগকে সংযত করিয়া, জীবনের অতীত 'ষ্টুডিও' হইতে আত্মকাহিনী কবিতার ছাঁচে ঢালিয়া, এক একটি অলৌকিক ছবি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার perspective line গুলি ছায়ার আধিক্যে ও আলোর অল্পতায় অস্পষ্টী-কৃত না হইয়া বরং ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি গিরিজানাথ জগৎ কাব্যের রচয়িতার চরণসেবাভিলাষে আপনার হৃদয়ের ভক্তিভরা রসানুভূতিকে অর্পণ করিয়া, আনন্দের একশেষতায় উপনীত হইয়াছেন। কবির পুরাতন স্মৃতি কখনও ফুটিয়া উঠিতেছে, কখনও আলেখ্যরূপে পাঠকের হৃদয়ের নিকট স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

"মনে পড়ে—প্রকৃতির শ্যামবাহু ঘেরা
পল্লিখানি মোর; অবারিত মাঠ তার;
মুক্ত নীলাকাশ; সাঁঝে নীড়মুখে-ফেরা
পাখীর কাকলী; শস্য-ক্ষেত্রের বিস্তার
হিল্লোলিত হেমন্তের সন্ধ্যা সমীরণে;
মায়ের অঞ্চলখানি পড়ে মোর মনে।
বাঁধা ঘাট, স্বচ্ছবাপী, ঘনচ্ছায় বট;
ধেনুপাল পিছে পিছে রাখাল বালক;
গ্রাম-প্রান্তে শীর্ণা নদী বালুময় তট,—
তারি পানে দল বাঁধি উড়ে শুভ্র বক!
কৃষক-দম্পতি তার পর্ণ-গৃহবাসী—
সুখে ঘর করে—মুখে সারল্যের হাসি!
সেই মোর প্রিয়ভূমি—জননী সমান,
জন্ম জন্ম তারি কোলে লভি যেন স্থান।"

অন্যত্র

"নাহি সে হৃদয়ে প্রীতি প্রাণে মধু গীতি
সে দেবতা নাহি আর শূন্য সিংহাসন!
কাব্য ছিল যার ভাষে সুধা ছিল যার হাসে,
আজি সে কোথায়! তার বৃথা অন্বেষণ—
কবিত্ব কল্পনা শেষ—শূন্য এ জীবন।"

এটি বিরহের গীতি। প্রেমময় জীবনসঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে শূন্যহৃদয় নিঙাড়ি নিঙাড়ি অশ্রুমিশ্রিত মধুরস কবি ঢালিয়া দিতেছেন। এ বিচ্ছেদে তিনি নিরাশ হন নাই। প্রেম ও বিরহ ঘনীভূত হইয়া ভক্তিতে পরিণত হইতেছে। পার্থিব পদার্থপরম্পরার অসারত্ব জ্ঞান হৃদয় মধ্যে ঊষার ললাটে প্রথম আলোক-লেখার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া, আত্মবিশ্রামসম্ভূত সুখে কবিকে নিশ্চেষ্ট করিতেছে—

"জন্ম জন্ম দুঃখ সহি,
তারি অপেক্ষায় বহি—
সংযোগ-বিয়োগ-ব্যথা জীবনে মরণে!
হে দেবতা, দেখা দিয়ো,
পাপ-তাপ মুছে নিয়ো,
মরণে শরণ তব দিয়ো হে চরণে—
দীন আৰ্ত্ত জনে।

কবির এক একটি গান সহস্র বেদনাক্ষুব্ধ কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অন্ধকারময়ী রজনীতে অনন্তের পথে ছুটিতেছে। প্রিয়জন মরণে ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির ব্যথা-নিবারণের এমন চন্দনস্নিগ্ধ প্রলেপন নিতান্ত সুলভ নহে। গিরিজানাথ দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করুন।

স্বদেশী শিল্প ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট

মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট মিঃ ট্রেসলারকে ডিরেক্টার অব ইণ্ডষ্ট্রীজ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন; তিনি এপর্য্যন্ত যে সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন, গত ১৪ই অক্টোবর তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে কতকগুলি কাচের কারখানা আছে। তিনি মিঃ এরিয়ান স্মিথের সহিত তাহার তত্ত্বাবধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ ও কাচ নির্ম্মিত হইলে, তাহার বিক্রয়ের সুবিধার জন্য দোকানদারদিগের সঙ্গেও বন্দোবস্ত করিতেছেন।

সোণার ফিতা

মান্দ্রাজের কোনও ব্যবসায়ী, ফিতা-নির্ম্মাণের কল ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি সেই ব্যবসায়ীকে ডাকিয়া কল চালাইবার মন্ত্রণা করিতেছেন।

পেন্সিল

মহীশূর-গবর্ণমেণ্ট পেন্সিলের কারখানা স্থাপন করিবার আয়োজন করিয়াছেন। এই প্রদেশের দুই স্থানে পেন্‌সিল নির্ম্মাণের কল আছে; সেই কল লইয়া তিনি পরীক্ষা করিবেন।

সাবান

চিনাবাদামের তৈল দ্বারা সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি ডাক্তার মার্শডেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

দেশলাই

ত্রিবাঙ্কুরে দেশালাই নির্ম্মাণের এক পুরাতন কারখানা আছে। তিনি কারখানার তত্ত্বাবধায়ককে তৎসম্বন্ধে এক রিপোর্ট করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাগজ

তিনাভেলির নিকট কাগজ-প্রস্তুতের এক পুরাতন কল আছে। ডাক্তার মার্শডেন কাঠের শাঁস হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া অবগত আছেন। তিনি তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাঠের কয়লা

মিঃ চেটারটন নীলগিরিতে কাঠের কয়লা প্রস্তুতের আয়োজন করিয়াছিলেন। যাহারা এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এমন লোকের সহিত তিনি পত্র-ব্যবহার করিতেছেন।

পশম

জর্ম্মণী হইতে বহু পশমী বস্ত্র আমদানী হয়। ভারতের পশম খুব ভাল নহে, তিনি অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ড হইতে পশম আনিয়া তাদ্দ্বারা বস্ত্রনির্ম্মাণের এবং ভারতজাত পশম সংগ্রহ করিয়া, গালিচা নির্ম্মাণেরও আয়োজন করিয়াছেন।

তিনি এই সমুদয় ব্যবসায়ের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহার পরীক্ষা করিতেছেন।—বঙ্গবাসী

যৌথকারবার

সম্পূর্ণ স্বদেশী ব্যাপার। উহার প্রাচীন নাম "সম্ভূয়-সমুত্থান।" ঐ কারবার চালাইতে হইলে অংশীদারদিগকে কিরূপ বিধিবিধান মানিয়া চলিতে হয়, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং অর্থশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। অবশ্য, প্রতীচাখণ্ডে প্রবাসকালে এই যৌথকারবার সাফল্য ও বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেই হেতু প্রাচীন কালের সম্ভূয় সমুত্থান হইতে আজকালকার যৌথকারবারের দুই একটি নিয়ম-কানুনের রদ-বদল হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে এই দেশী, তাহা অস্বীকার সম্ভবে না। কিন্তু যাহার অভাবে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছে, শিল্প-বাণিজ্য লুপ্ত হইয়াছে, দেশযোড়া একটা উচ্চ আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, তাহারই অভাবে এই যৌথ কারবার এ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বিদেশে প্রবাস করিতেছে। যত দিন সেই অভাবটির পূরণ না হইতেছে, তত দিন সমাজও

গড়িবে না, শিল্পবাণিজ্যও গজাইবে না—দেশের প্রতিষ্ঠানও দেশে সুপ্রতিষ্ঠ হইতেছে না।

কিসের অভাবে আমাদের এই দোষ জন্মিতেছে, এই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা এক্ষণে আমাদের নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। কেবল জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা থাকিলে, বংশগৌরব ভাবিলে, অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিলে এই দুর্গতি ঘুচিবে না। এই দুর্গতি ঘুচাইতে হইলে প্রীতিশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, পরের স্বত্বকে প্রতিবেশীর অধিকারকে আপনার স্বত্বের ও আপনার অধিকারের সমান দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। অন্যকে আমার সমান ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে,—অন্যের সহিত সকল বিষয়ে সাহচর্য্য করিতে হইবে,—প্রত্যেক প্রতিবেশীর সহিত আপনার সুদৃঢ় ভ্রাতৃভাবটি দৃঢ়বদ্ধ করিতে হইবে। নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।—বসুমতী, ২রা মাঘ

নাইনীর কাচের কারখানা

এলাহাবাদের নাইনীতে কচ্ছনিবাসী শ্রীযুক্ত জগমল রাজা সম্প্রতি এক কাচের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এখানে প্রদীপাধার, চিমনি, গেলাস ও শিশি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।—হিতবাদী

দেশালাইয়ের কারখানা

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এক দেশালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইহাতে কার্য্যারম্ভ হইবে। পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া হইতে প্রচুর দেশালাই এদেশে আসিত, যুদ্ধের জন্য সে আমদানী এক্ষণে বন্ধ। জাপান একাকী কত দেশালাই যোগাইবে? তাই ত্রিবাঙ্কুরে দেশালাইয়ের কারাখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ইহার ফলে যদি অন্ততঃ ত্রিবাঙ্কুরবাসীদিগেরও দেশালাইয়ের অভাব ঘুচে—তাহাদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তবেই ভাল।—সময়, ১লা মাঘ

বাউলের গান

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার, M. A.]

(১)

ওরে আমার ভক্ত-বিটেল! কেবল মন্ত্রে তন্ত্রে কল্লি লড়াই,
(ও তোর) মুখস্ত গৎ তাক্-ত্রি-কিটি মন-মৃদঙ্গে বাজল কই?
ও তুই কোঁদল কল্লি সকল সঙ্গে
ও তার, হাল্লা হলো অঙ্গে বঙ্গে
(তবু) ওরে পাগল! মিট্‌লো না গোল,
ওরে অবশেষে কল্লি কি?
রাগের মাথায়, নিজের পায়ে, নিজেই কুড়ুল মাল্লি কি!

(২)

(ও তোর) ঘরে কবাট রাখ্‌লি এঁটে,
হি জি বি জি চিত্ত-পটে,
হ-য-ব-র লিখলিরে কত!
বাছাই কল্লি মিথ্যা সত্য
ওজন কল্লি সবার তত্ত্ব,
(তবু) তত্ত্ব ছেড়ে তর্কবাগীশ! সহজ কথা ভাবলি না,
জগৎজুড়ে যাঁহার বিকাশ (তাঁর) কোন ঘরে নাই মানা!
সকল ঘটে থাকেন তিনি,
সকল মতে তাঁকেই জানি,
দেশে দেশে, যুগে যুগে, জগৎ সংসারে,
তুমি কচ্ছ মেষের-লড়াই শতেক দুয়ারে।
তবে তুই কেন না—
সন্ধি করিস সকল মতে
সন্ধি করিস সকল সাথে!
চিরটা কাল, ওরে পাগলা বাড়িয়ে-গেলি আপন বড়াই,
(সে ছিল, খুঁজি খুঁজি নারি যে পায় তারি)
এখন হার মান মন! দু'হাত যুড়ে ভুঁএ থুয়ে লড়াই বড়াই!

বীণার তান

হিন্দী

১। ইন্দু, কলা ৫, খণ্ড ২, কিরণ ৬, মার্গশীর্ষ ১৯৭১, দিসম্বর ১৯১৪ ; সম্পাদক—শ্রীঅম্বিকা প্রসাদ গুপ্ত, বার্ষিক মূল্য ৩৷৹।

১। ঘর (ক্ষুদ্র কবিতা)—লেখক শ্রীযুত পণ্ডিত লোচনপ্রসাদ পাণ্ডেয়। হিন্দীতেও আজকাল নূতন নূতন ছন্দের প্রচলন হইতেছে। কিন্তু অমৃতাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিতে এ পর্য্যন্ত কোন হিন্দী কবি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। বর্ত্তমান কবিতাটি আমাদের সেই সুপরিচিত 'Home, sweet home' এর প্রতিধ্বনি।

২। প্রাচীন শাসন-পদ্ধতি ঔর রাজা—লেখক শ্রীযুত বাবু শিবদাস গুপ্ত। প্রবন্ধে লেখকের যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক বলিতেছেন—'দেশ তথা প্রজাকে সাথ রাজাকা বৈসা হী সম্বন্ধ হৈ, জৈসা কি পুত্র কা পিতা কে সাথ, এবং 'ভারতবর্ষ কী প্রাচীনশাসন পদ্ধতি ঠীক সচ্চে পিতা পুত্রকে সম্বন্ধ কী তরহ থী ; ঔর তভী প্রজা সর্ব্বদা রাজাকী কঠিনাইয়োঁ কো দূর করনে কে লিয়ে প্রাণ অর্পণ কিএ রহতী থী।' গুপ্তজী 'শতপথ ব্রাহ্মণ,' 'বৌদ্ধায়নসূত্র' ও তাহার ভাষ্য অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন। চাণক্যনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা আমাদের দেশে প্রাচীন ভারতে রাজা-প্রজার সম্বন্ধের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইন্দুর লেখক বলিয়াছেন, পূর্ব্বে রাজাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়, এই অভিষেক মন্ত্রপাঠ করান হইত—'কৃষ্যৈত্বা ক্ষেমায়ত্বা রয্যৈত্বা পোষায়ত্বেতি সাধবেত্বেতি।' —অর্থাৎ তোমাকে কৃষির উন্নতির নিমিত্ত প্রজার কল্যাণ ও সুখ সম্পাদনের জন্য, ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির হেতু, প্রজাপালনার্থ এবং সাধুজনের সেবার নিমিত্ত রাজা করা হইতেছে।"

এরূপ ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা, এত সংক্ষেপে শেষ করাতে, যে সকল ত্রুটীর আশঙ্কা করা যাইতে পারে, বর্ত্তমান রচনায় তাহার অভাব নাই।

৩। চমৈলী, (কবিতা)—'প্রেম-পথিক' হইতে উদ্ধৃত—শ্রীযুত বাবু জয়শঙ্কর প্রসাদ রচিত।

৪। সুশীলা ঔর ললিতা (গল্প),—লেখিকা শ্রীমতী ঠকুরাণী 'শিবমোহিনী', এবার চতুর্থ প্রস্তাবে পরিশিষ্ট গেল। লেখিকা কাহার পরস্ব, নিজস্ব বলিয়া চালাইতেছেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই। অনেক হিন্দী মাসিকে বেমালুম বাঙ্গালা গল্পের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মৌলিক রচনা বলিয়া প্রকাশিত হয়। শিষ্টতার অনুরোধে কোথা হইতে গৃহীত, উল্লেখ করিলে বৃথা-অপবাদের ভয় থাকে না।

৫। শিল্প-কলা তথা রাষ্ট্রীয় ধন—লেখক শ্রীযুত পরমেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা, এম-এ, বী-এল। অর্থনীতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শমূলক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কৃতী ছাত্র হইয়াও অতিদুঃখে মন্তব্য করিতেছেন—

'আজকল কে স্কুলোঁ কে লড়কোঁ কী আন্তরিক শক্তিয়োঁ কা বিকাশ নহীঁ হোতা।' সে দিন 'সাহিত্য-সঙ্গতে' জনৈক বিলাত-প্রত্যাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান ও কলিকাতার উচ্চতম বিদ্যালয়ের বিচারপতির মুখেও ঐরূপ মন্তব্যের ধ্বনি শুনা গিয়াছিল। আমরা একদেশদর্শী মন্তব্যের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা ও মীমাংসার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

৬। আমেরিকা কা প্রজাতন্ত্র—লেখক শ্রীযুত পং বালমুকুন্দ শর্ম্মা। বাঙ্গালা মাসিক পত্র-বিশেষের—'এক নিবন্ধ কে আধার পর' লিখিত। হিন্দী-মাসিক যদি বাঙ্গালা মাসিকের চুটকী গল্প ও চোরাইমাল অনুবাদ না করিয়া মৌলিক প্রবন্ধ অনুবাদ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হিন্দীর ও হিন্দুস্থানের মঙ্গল হইতে পারে।

৮। প্রাভাতিক গান (কবিতা)—লেখক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রসেন গুপ্ত। এ কবিতার ভাষায় দৈন্যের আভাস থাকিলেও ভাবের সম্পদ্ আছে। নমুনা—

'প্যারে, উঠো, খড়ে হো অবতী তো
+ + + আঁখি খোলো।
দেখো গিরতী হানত ভারত কয় কৈসী আই।'

৮। পরলোক-ভ্রমণ—লেখক এল্-এল্-বী শ্রেণীর জনৈক বিদ্যার্থী। এই শ্রেণীর লেখকই হিন্দী-সাহিত্যের ভবিষ্যতের আশা। ভাষায় জড়তা নাই, ভাবে প্রবীণতা না থাকিলেও নূতনতা আছে। লেখক, স্বপ্নে তাঁহার কোন অল্পায়ু ভগ্নস্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, এল্-এল্-বী মৃতবন্ধুর সমভিব্যাহারে পরলোক-ভ্রমণ করিয়া, ভারতের স্বর্গবাসী বিশিষ্ট হিন্দুমুসলমানদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-তত্বে কংগ্রেস, আর্য্যসমাজ, থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটী, অকাল-মৃত্যু, বাল্য-বিবাহ, মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। পরলোকবাসী বৃদ্ধ নিজামের মুখে উক্তি করান হইয়াছে—"বড়ে শোক সে সুনা হৈ কি হমারে রাজ্য মেঁ মুসলমানোঁ কী তরফদারী হোতী, ঔর হিন্দু বড়ে বড়ে পদোঁ সে হটায়ে জাতে হৈঁ।" কাশ্মীরে ৪ ভাগ মুসলমান, একভাগ হিন্দু প্রজা এবং হায়দারাবাদের

রাজ্যে ৪ ভাগ হিন্দু, একভাগ মুসলমান প্রজা। লেখক বোধ হয়, মন্তব্যকালে সেইকথা ভাবিতে ছিলেন।

৯। বিবাহ-রহস্য—লেখক শ্রীযুত বাং প্যারেলাল গুপ্ত। স্বীকার করা হইয়াছে, ইহা কোন মরাঠী লেখার ভাব লইয়া লিখিত। এই অতি ক্ষুদ্র রচনায় উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই।

১০। স্বদেশ (কবিতা।—১১। ভারতবর্ষ (কবিতা) উভয় কবিতার লেখক—শ্রীযুত পরলোচনপ্রসাদ পাণ্ডেয়। নিম্নে দুই কয়ছত্র নমুনা উদ্ধৃত হইল—

'জয় স্বদেশ, জয় স্বদেশ, জয় স্বদেশ প্যারা।
জীবন ধন, তূ অমুল্য, প্রাণ তূ হমারা॥
* * *
হম হেতু গন্ধ গেহ ধৈর্য্য ধর্ম্ম ধারা।
দুখ মেঁ সুখ মেঁ সদৈব এক তূ সহায়া।'

এবং

'ভারতবর্ষ হমারা হৈ।
সব দেশোঁ সে ন্যারা হৈ।
হম কো জী সে প্যারা হৈ
সুখ সম্পদ কা ছায়া হৈ।'—ইত্যাদি।

১২। জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয় কা কারাগৃহ,—লেখক শ্রীযুত 'সত্যধর'। গল্পাকারে রচিত। কল্পিতনামা লেখক উপসংহারে স্বীকার করিতেছেন—প্রবন্ধ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে লিখিত।

১৩। বহু সময় পর্য্য, (গল্প)—বাবু চম্পালাল জৌহরী কর্ত্তৃক মরাঠী 'লোকমিত্র' অবলম্বনে লিখিত। এই উপন্যাসে গুরুকৃপায় যুবক সাধু দেবদত্তের ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে।

১৪। বিরহিণী রাধিকা কা সন্দেশ (সুদীর্ঘ কবিতা)—শ্রীযুক্ত অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায় প্রণীত 'প্রিয় প্রবাস' হইতে উদ্ধৃত। 'ইন্দু'সম্পাদক স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "উপাধ্যায় মহাশয় কা নাম ইস মহাকাব্য (প্রিয় প্রবাস) সে অজয় অমর ঘটেগা" ইত্যাদি।

১৫। য়োরোপীয় যুদ্ধকে কুছ মুখ্য কারণ—লেখক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মিশ্র, বী. এ। নিতান্ত সাধারণভাবে যুদ্ধের স্থূল স্থূল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৬। অগ্র বালোঁ কী বর্ত্তমান দশা—লেখক জনৈক আগরওয়ালা। আমাদের দেশে অগ্রবালাদিগের সাধারণ নাম, মাড়োয়ারী বা কেরে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংগৃহীত তালিকা হইতে জানা যায়, মাড়োয়ারীর সংখ্যা—পঞ্জাবে সাড়েতিন লক্ষের উপর, সংযুক্ত-প্রদেশে প্রায় তিনলক্ষ, রাজপুতানায় প্রায় দুই লক্ষ, এবং বাঙ্গালায় মাত্র বিশ হাজার। উহাদের নয় লক্ষ হিন্দু, দুই হাজার শিখ এবং ৮৫ হাজার জৈন। লেখক স্বজাতির উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করিতেছেন।

১৭। গুরুজী—লেখক শ্রীযুত বাবু মনোহর দাস চতুর্ব্বেদী। সাড়েতিন কলমের ক্ষুদ্র রচনায় রসিকতা ও ব্যঙ্গোক্তির বৃথা চেষ্টা!

১৮। কসৌটী (কষ্টিপাথর)—বা পরের দ্রব্য বলিয়া কহিয়া আত্মসাৎকরণ। নবেম্বরের 'সরস্বতী' হইতে স্বর্গীয় সাহিত্য-লেখক পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্টের জীবনী অপহৃত হইয়াছে। হিন্দীতে তাঁহার এরূপ সুন্দর জীবনী এপর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই; উহা আহরণের লোভ আমাদিগকেও কষ্টে সম্বরণ করিতে হইল। নবেম্বরের 'পাটলিপুত্র' হইতে 'রিট্রিট' প্রত্যাবর্ত্তন বা (শ্রীযুত ঠাকুর গদাধর সিংহ সুবেদার লিখিত) প্রত্যক্ষজ্ঞান লইয়া দেশীয় যোদ্ধার উচ্ছ্বাসপূর্ণ যুদ্ধবিবরণ। ইহা কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে, পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। হিন্দীতে attack (আক্রমণ)কে 'হমলা' এবং retreat (প্রত্যাবর্ত্তন)কে বাজগস্ত কহে। সুবেদার সাহেব বলিতেছেন, 'সব হৈ য়ুরোপ কী ভূমি মেঁ কতল করতে ইন হিন্দুস্থানিয়োঁ কো য়োরোপিয়নোঁ নে আজ পহলে হী পহল দেখা হৈ। * * খড়্গপাণি শত্রু কো কাটতে চলে জানা; রক্ত, কেস, ধ্বজ, শব আঙ্গ সে ধরতী কো ভয় দেনা ইনকী বহুত পুরানী বাত হৈ।' জ্যৈষ্ঠের 'মনোরঞ্জন' হইতে 'ওবর কোট', গল্পচ্ছলে ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে; প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য।

১৯। বিদ্যাব্যাপিনী, ক্ষুদ্র কবিতা।

২০। কিশোরী (গল্প)—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বালমুকুন্দ শর্ম্মা। লেখক পাদটীকায় স্বীকার করিয়াছেন, 'ভারতবর্ষ'কে এক গল্পকে আধার পর"। এই শিষ্টতা টুকুও সকল লেখকের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না।

২১। সন্তান-শাস্ত্র—১৭শ প্রস্তাব চলিতেছে।

২২। পুস্তক পরিচয়—(সমালোচনা)।

২৩। বিবিধ প্রসঙ্গে—সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীধর পাঠক জীর সভাপতিত্বে পঞ্চম হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন, লক্ষ্ণৌনগরীতে আশাতীত সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কয়েকটি ছোট ছোট যুদ্ধ-সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় সানন্দে জানাইতেছেন যে, 'ইন্দুর' জনৈক লেখক মহাশয়কে মধ্য-প্রদেশের দেব-নগরের রাজকুমার শ্রীমান্ নরেন্দ্র দেব প্রতাপ বাহাদুর একটি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। সাধু!

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম 'ইন্দু' উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে।

২। ঊষা—কার্ত্তিক, ১৯৭১, লাহোর হইতে প্রকাশিত—সম্পাদক সন্তরাম বী-এ; বার্ষিক মূল্য ৩৲। মুখপত্রে বাঙ্গালা সীতার বনবাস হইতে গৃহীত রঙ্গীণ ছবি।

১। অমরীকা মেঁ সামাজিক জীবন কে দৃশ্য,—লেখক শ্রীমান্ ভাই পরমানন্দজী, এম এ, বী-এস্ সি। সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সাধারণ বিবরণ।

২। মায়া ঔর কাল কা প্রভাব—(কবিতারচিত)।

৩। ইবল বতূতা,—উষার প্রায় প্রতিসংখ্যাতেই একটি সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ থাকে; এই প্রবন্ধ তাহারই অন্যতম।

৪। **স্বামী সদানন্দ কী আশা**—প্রচ্ছন্ন লেখক, গুরু-শিষ্যের কথোপকথনছলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। "প্রাচীন সময়োঁ মেঁ ভী যুদ্ধ হোতে থে, ঔর শায়দ আজ কল ভী উনকা হোনা অপরিহার্য্য হো। পর জব মৈঁ বিজ্ঞান কা যুদ্ধ কে লিয়ে অপব্যবহার দেখতা হূঁ, তো মুঝে আপনী সভ্যতা উচ্চতর মালুম হোনে লগতী হৈ! বিজ্ঞান কে অভাব সে যদি মলেরিয়া ফৈলে, তো য়হ ইসসে অচ্ছা হৈ, কি বিজ্ঞান কে হোনে সে রক্তপাত ঔর বধ হো।"

৫। **উপদেশোচ্ছ্বাস** (কবিতা)—দ্বারিকাপ্রসাদ গুপ্ত রচিত। বালক-বালিকাদিগের উপযোগী সরল উপদেশ।

৬। **সৌন্দর্য্য**-লেখক পরমানন্দ জী, বী-এ। লেখক বাহ্য-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের মূল্য অধিক, বলিতেছেন। বিষয়টি আরও যোগ্যতার সহিত আলোচিত হইলে ভাল হইত।

৭। **ইঙ্গলীস্থান কা সন্যাসী**-এডোয়ার্ড কার্পেণ্টরের, সংক্ষিপ্ত জীবনী—লেখক সাগরচন্দ।

৮। **ক্রুপ-কারখানা**—জর্ম্মণী দেশের বিখ্যাত তোপখানার সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

৯। **ভারত কী ভাবী ভলাই কা উপায়**—লেখক টহলরাম গঙ্গারাম, জমীদার, ডেরাইস্মাইল খাঁ। টহলরাম প্রস্তাব করিতেছেন, প্রতিগ্রামে মন্দিরে ও ধর্ম্মশালায় জনসাধারণের পাঠের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

১০। **আর্য্য জাতী কী অধোগতি কে কারণ**—লেখক প্রফেসর গোবিন্দনাথ, এম-এ। শারীরিক দুর্ব্বলতা, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের আবির্ভাব ও বেদান্তের প্রাদুর্ভাবকে লেখক ভারতের দুর্গতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১১। **মনোরঞ্জন শ্লোক**—দুইটী উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোকের হিন্দী পদ্যে অনুবাদ।

১২। **জাগরণ (স্ত্রীপাঠ্য)**—লেখিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী, পূর্ব্বানুবৃত্তি গল্প।

১৩। **নিদ্রাসে লাভ**—Madame Qui Vive—in the Delineator.—নিদ্রা আমাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি আনিয়া দেয়, জীবন-যৌবন স্থায়ী করে, আরও কত কি উপকার করে; এই ক্ষুদ্র সরল রচনায় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। লেখিকা বলেন,—'স্ত্রিয়োঁ কো পুরুষোঁ কী অপেক্ষা অধিক নীন্দ কী জরূরত হৈ।' আমরা জানি, আমাদের দেবতারা বিবুধ, কেননা তাঁহারা চিরকাল জাগিয়া থাকেন!—'স্বাস্থ্য' সমাচারে এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল।

১৪। **জবাহরাত কা কাশীদা**—কাপড়ের উপর সাচ্চা-কাজের কথা ৫০ পৃষ্ঠায় শেষ। বেশ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ।

১৫। **বিবিধ বিষয়**—(ক) হিন্দী য়া আর্য্যভাষা—পঞ্চম 'হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনে'র সভাপতি 'হিন্দীভাষা'র নাম সমর্থন করিয়াছেন। 'ঊষা'-সম্পাদক, এবং আরও অনেকে উহার নাম 'আর্য্যভাষা' রাখিতে চান। ইহা লইয়া উভয়পক্ষের বিবাদ ও বিচার চলিতেছে। আমরা বলি, 'What's in a name?—Call the rose by any other name and it would smell as sweet.' (খ) 'বনাবটী ঔর বাস্তবিক সুধা'র সম্পাদক মহাশয় হিন্দুসভা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলিতেছেন,—'য়াদ রখিয়ে, সংসার মেঁ জীবনসে জীবন উৎপন্ন হোতা হৈ। * * জব তক হিন্দুসভা কে সঞ্চালক স্বয়ম-ক্রিয়াত্মক নহীঁ বনতে, য়হ সারা আড়ম্বর ব্যর্থ হৈ।' (গ) 'পঞ্জাব ঔর আর্য্যভাষা সাহিত্য-সম্মেলন' এবার লক্ষ্ণৌনগরীতে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন বসিয়াছিল। আগামী বৎসর লাহোরে বসিবে। সম্পাদক সেই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। (ঘ) 'ভারতীয় ইতিহাস সে শিক্ষা', শ্রীমান্ ভাই পরমানন্দ জী, এম এ, লিখিত ভারতেতিহাসের প্রশংসাসূচক আলোচনা।

১৬। **চিত্রচর্চ্চা**—দর্শনীচিত্রের পরিচয়।

'ঊষা'র ভাষায় পঞ্জাবী-হিন্দীর আভাস আছে, উহাতে আর্য্যসমাজের গন্ধও বেশ টের পাওয়া যায়। প্রবন্ধসকল অতি ক্ষুদ্রকায়; উহারা অধিকাংশস্থলেই বিষয়টী ধরাইয়া দিয়াই নীরব হইয়া যায়—তাহাতে পাঠকের তৃপ্তি হয় না। বহু প্রবন্ধের সমাবেশ আছে, কিন্তু কোন বিষয়েরই সবিশেষ আলোচনা নাই। তবে, এককথা—এই সুরুচি-সম্পন্ন পত্রিকাখানি বালক-বালিকা ও মহিলাদের জন্য লিখিত।

৩। **বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব**—(নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মাসিক মুখপত্র) প্রথমভাগ, তৃতীয় সংখ্যক, সম্পাদক শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী; বৃন্দাবন। বার্ষিক মূল্য ২৲।

হংসাবতার চরিত—(পূর্ব্বানুবৃত্তি) একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। বর্ত্তমান সংখ্যায় অধিকাংশ লেখাই সম্পাদক ও প্রকাশকদিগের লেখনীপ্রসূত। যুদ্ধ, প্রজা ও রাজভক্তি ভিন্ন এবারকার 'বৈষ্ণব-সর্ব্বস্বে' আর বিশেষ কিছুই নাই। রাষ্ট্রীয় গীতির (National Anthem) অনুবাদ মন্দ হয় নাই।

মহারাষ্ট্রীয়

মনোরঞ্জন—সচিত্র মাসিকপত্র, ডিসেম্বর ১৯১৪, গিরগাঁও, মুম্বই; বার্ষিক বর্গণী ৪৲ রূপয়ে। মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় গোয়ালিয়রাধীশ কর্ণেল শ্রীমাধবরাও শিন্ধে অলিজা-বাহাদুরের চিত্র। তৎপরে আহত হিন্দী সৈনিকদিগের শুশ্রূষার নিমিত্ত সিন্ধিয়া-মহারাজ প্রেরিত হস্পাতাল-জাহাজ 'লয়াল্‌টি'র সাদায় কালোতে অতিসুন্দর দর্শনী চিত্র। কোন দেশীয় কাগজে এরূপ অপূর্ব্ব চিত্রের সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে, আমরা পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই। আলোচ্য সংখ্যায়—

১। মুখবন্ধে—কবিতা 'পুনর্বিকসন'—কবি শ্রীযুতগোবিন্দাগ্রজ। বিরহ গীত—

'দয়াঘনা! বিনতি করিত মন তুজ হেঁ চির বিরহেঁ তাপতা।'
বিরহী করুণ বিলাপ করিতেছেন—

'অগুঞ্জত সূর্য্যানা সুপ্রভাত উদয়ানা,
শুক্র পক্ষি চন্দ্রানা কিরনিবরী পূর্ণতা।
বর্ষা ঋতু সময়ালা প্রতি বর্ষী য়ে চপলা,
প্রতি বসন্ত বৃক্ষ লা জন্ম নবা আণিতা।'

অতএব, আমার মনে কি আশা জাগিবে না?
এই সরস প্রাঞ্জল কবিতাটীর ভাষা প্রাণ স্পর্শ করে।

২। রাগিনী, বৈরাগ্য খণ্ড—লেখক শ্রীযুত বামন মল্‌হার জোসী, এম-এ। সুলিখিত ধারাবাহিক উপন্যাস চলিতেছে।

৩। হালত্যা পিঁপল পানাস (পদ্য)—কবি শ্রীযুক্ত 'গোবিন্দাগ্রজ'। উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ কবিতা। রচনায় লালিত্য আছে।

৪। সমাজো অন্তর্গী আমমেলা স্ত্রিয়াঙ্কা সম্বন্ধ—লেখিকা শ্রীমতী কাশীবাই দেবধর। পুরুষ সমাজ গড়িয়াছে, কি স্ত্রী সংসার গড়িয়াছে,—তর্কের বিষয়। আমাদের মনে হয়, জননী সমাজের মূল-কাণ্ড। বহু সমাজের উন্নতি, তাঁহারই উপর নির্ভর করে। অতএব, জননীর দাবী বুঝাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

৫। তারা (কবিতা)—কবি শ্রীযুক্ত গঙ্গাতনয়। টেনিসনের মানস শিশু, মরাঠী পোষাকে সুন্দর সাজিয়াছে।

৬। একপত্র—লেখক 'জনুভাউ দেশপাণ্ডে।' সম্পাদকের নামে, চিঠির আকারে, এইরূপ আলোচনা মনোরঞ্জনের প্রতি সংখ্যাতেই প্রায় থাকে। লেখায় ছত্রে ছত্রে ব্যঙ্গ ও রসিকতার ঢেউ খেলিতেছে।

৭। দোল মৈত্রিণী—লেখক শ্রীযুত বিনায়ক আত্মারাম তাম্মণে, এল্‌-এল-বী বী-এস্‌সী। ক্ষুদ্র গল্প,—বিশেষত্ব বিহীন।

৮। শ্রীমন্তাঞ্চী দিনচর্চ্চা—লেখক শ্রীযুত বিশ্বনাথ নারায়ণ দেব। গোয়লিয়ার-যাত্রীর (সম্ভবতঃ কল্পনা-প্রসূত) ডায়ারী। ইহাকে, ডায়ারী না বলিয়া, ঘণ্টাওয়ারী বলিলে ভাল হয়।

৯। আত্মানাত্ম বিচার মীমাংসা—লেখক শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত যশবন্ত পুরোহিত। অক্টোবর-সংখক মনোরঞ্জনে প্রকাশিত 'আত্মানাত্ম বিচার' প্রবন্ধ সম্বন্ধে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে আলোচনা।

১০। হিন্দুস্থানাবর হল্লা (দ্বিতীয় প্রস্তাব),—লেখক শ্রীযুত 'মধুপ'। মরাঠী ভাষা সংস্কার-সম্বন্ধে আলোচনা। এই অপ্রকাশিত লেখক যিনিই হউন, তাঁহার চেষ্টা, যোগ্যতা, ও অনুসন্ধিৎসা প্রশংসার্হ।

১১। য়ুরোপিয়ন রাষ্ট্রান্তীল যাদবী—লেখক শ্রীযুত প্রোঃ হরিগোবিন্দ লিমরে, এম এ; পঞ্চমাঙ্ক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সহিত মুসলমান জাতির সম্বন্ধ, তুরুষ্কের ইতিহাস, বর্ত্তমান যুদ্ধে তুরুষ্কের যোগ, তুরুষ্কে জর্ম্মণীর প্রভাব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

১২। জর্ম্মনীন্তীল রাজ্যব্যবস্থা—লেখক শ্রীযুত প্রোঃ ডাঃ পাণ্ডুরঙ্গ দামোদর গুণে, এম-এ, পীএচ-ডী, তৃতীয় প্রস্তাব। ইহাতে যোগ্যতার সহিত জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

১৩। যুদ্ধ ব ব্যাপার, দ্বিতীয় প্রস্তাব,—লেখক শ্রীযুত প্রোঃ বামন গোবিন্দ কালে, এম-এ; বাণিজ্যের সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধের কতটুকু সংস্রব, নজীর ও অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া, তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৪। কুলপী গোলে বা সম্পাদকীয় টিপ্পনী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধঘটিত প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশেষে, কয়েকখানা সাদায়-কালোতে সুন্দর সুন্দর ছবি, যথা—বেলজিয়মের পতিভক্তি পরায়ণা রাজ্ঞী, সৈনিকবেশে রাজস্ত্রী, অশ্বারোহী সৈনিক-বেশে রুশ-সম্রাজ্ঞী, (মরাঠী লেখকেরও এরূপ ব্যাকরণ ভুল!) মার্সেল্‌-বন্দরে হিন্দীসৈনিকবাহী পোত, ফ্রান্সে শিখ-সৈন্য, পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্সা ক্রাকৌ, গুর্খাদিগের প্রখ্যাত অস্ত্র কুর্কী, স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ে জর্ম্মণ রমণীদিগের লৌহমুদ্রা গ্রহণ প্রভৃতি।

গুজরাতী

গুজরাতী পঞ্চ (Punch), ১০ই জানুয়ারী, ইংরাজী ও গুজরাতী ভাষায় লিখিত, আহমদাবাদ হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ২৷৷০।

ইংরাজীতে 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'ভারতীয় শিল্প' উল্লেখযোগ্য আলোচনা। গুজরাতীতে 'মদ্রাসমাঁ মলেলী কোংগ্রেসে', 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল-সম্বন্ধে বিচার,' 'যুদ্ধ-সংবাদ ও সমাচার সংগ্রহ' প্রভৃতি ব্যতীত 'গৃহস্থাশ্রম' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ আছে।

গুজরাতী পঞ্চ—ইংরাজী গুজরাতী সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯১৫।

আলোচ্য সংখ্যায় 'গন্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়' প্রসঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে মন্তব্য, বড়লাট সাহেব বাহাদুরের বক্তৃতার আলোচনা, গ্রন্থ-সমালোচনা, নবীন সমাচার, ড্রইং পরীক্ষার ফল, বাণিজ্য সংবাদ, কর্ম্মবীর গান্ধির প্রশংসা-কবিতা, গত মান্দ্রাজী কংগ্রেসে ভূপেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার সমালোচনা (দ্বিতীয় প্রস্তাব), সম্পাদকীয় টিপ্পনী, সমাচার-সংগ্রহ, য়ুরোপমাঁ ভয়ঙ্কর লড়াই, সুভদ্রা (অসম্পূর্ণ গল্প), ইলেকশন (অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ) প্রভৃতি পাঠ্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'গুজরাতী' পঞ্চ একখানি উচ্চশ্রেণীর সাপ্তাহিক।

হিন্দী-মৈথিলী

মিথিলা মিহির—সাপ্তাহিক পত্র, দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত, ২৩এ জানুয়ারী ১৯১৫. বার্ষিক মূল্য ২৲।

আলোচ্য সংখ্যা, মহারাজ কুমারদিগের উপনয়নের বিশেষ অঙ্ক। হল্‌দে কাগজে, লাল কালীর ছাপা, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের স্থায়, দেখিতে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু পাঠকের প্রাণান্ত। উপনয়ন-

উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমান্ অনরেবল মহারাজ স্যর রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের, মহারাজ কুমার কামেশ্বর সিংহ ও বিশ্বেশ্বর সিংহের, দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা ৺লছমীশ্বর প্রসাদ-নির্ম্মিত আনন্দবাগের ও বর্ত্তমান মিথিলেশ নির্ম্মিত রাজনগর-ভবনের অস্পষ্ট চিত্র বর্ত্তমান সংখ্যার অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছে। মৈথিলী ভাষায় রচিত 'স্তুতি' উপাদেয় হইয়াছে।

সংস্কৃত

বিদ্যোদয়ঃ—স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রিণা প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত মাসিক পত্রম্. ৪৩ খণ্ড, শ্রাবণ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এক সংখ্যা—যুগ্ম সম্পাদক, হৃষীকেশ-তনয় 'শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এম এ, শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্নৌ।' বার্ষিক মূল্য ছাত্রদিগের পক্ষে ১৲ অপরের পক্ষে ২৲।

বঙ্গদেশে একমাত্র সংস্কৃত পত্রিকা 'বিদ্যোদয়' ভূদেব-বৃত্তির সাহায্যে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়, সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচারকল্পে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই, ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি সংস্কৃত-মাসিক পত্রিকার পথপ্রদর্শন করেন। আশাকরি, যোগ্য পুত্রদিগের হস্তে সুযোগ্য পিতার এই কীর্ত্তি-স্তম্ভের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আলোচ্য সংখ্যার বিষয়,—

(১) 'আবাহনাষ্টকম্' (বসন্ত তিলক বৃত্ত), শ্রীইন্দীবর কৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ শর্ম্মণঃ। দেবী ভগবতীর আবাহন।

(২) 'উদ্ভট শ্লোকাঃ,' ক্রমশঃ চলিতেছে। আদিরসের বাসন্তী হাওয়ায় ভরপুর হইলেও, প্রত্যেক শ্লোকে কবিত্বের মাধুর্য্য আছে।

(৩) 'দার্শনিক শব্দ-নির্ঘণ্ট,' পূর্ব্বানুবৃত্তি চলিতেছে। এবার উপোদ্‌ঘাতে 'উ' শেষ হইয়াছে। দর্শন-শিক্ষার্থীরা এই সূচী হইতে প্রচুর সাহায্য পাইবেন, আশা করা যায়।

(৪) গোপালচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন-প্রণীত 'বিচার নির্ণয়ঃ' (অসম্পূর্ণ), সম্পাদকীয়। গোপালচন্দ্র ন্যায়-পঞ্চানন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ছাত্র ছিলেন। 'বিদ্যোদয়' তাঁহার অপ্রকাশিত স্মৃতি-প্রবন্ধসকল সাধারণের হস্তে উপহার দিয়া, আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে।

(৫) 'মাতৃদয়া' (উপাখ্যান) শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্নস্য। বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃতরচনায় নূতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(৬) 'বিবাহযোগ্য বধূবরয়োর্বয়ো নির্ণয়ঃ'—লেখক যৌবন বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। সেকালে উত্তরা, ইন্দুমতী ও দময়ন্তীর যুগে স্বয়ংবর হইত; সুতরাং কন্যারাও পিতৃগৃহে বয়স্থা হইত। একালেও পিতার বরপণ না জুটিলে কুমারী কন্যা পিতৃগৃহে যুবতী হইতেছে। আজকাল অনেক সম্পাদক (অথবা de facto সম্পাদক) তাঁহাদের কাগজে সাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও সম্পাদকীয় গন্ধ আছে কি না সাহস করিয়া বলিতে পারি না। ভাটপাড়ার বিধি পাইলে সামাজিক প্রথা পাকা হইতে পারে।

(৭) 'ভারত-সম্রাড্‌ বৃটিশরাজস্য বিজয় প্রশস্তিঃ,' রাজভক্তিপূর্ণ কবিতা।

হরিবোল

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

ওরে ভক্ত, ওরে পাগল তোল্‌রে ভক্তি-রোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল'।
মোহের ধাঁধায় আর যাবি না,
এমন নাম তুই আর পাবি না,
ভাবে ভোলা পরাণ খোলা নামের তুফান তোল্‌,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল'!
প্রেমেই যে তার চিত্ত ভরা নাই কামনার রোল,
প্রেমেই যে সে আত্ম-ভোলা—নাইকো তাতে ভোল্‌
মানুষ হ'রে মানুষ হ,
প্রেমের কথা সদা ক,
ধরিস্‌ না রে যশ কিনিতে ভাক্ত-বিকট ভোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্‌রে 'হরিবোল'।
হরি বলে—বাহু তুলে বাজিয়ে প্রেমের ঢোল,
গলা ছেড়ে নাম করিতে পড়ুক্‌ 'রগে' টোল
মরণকালে নাম করিলে
ভবের ভাবনা যাবে চলে
ছাড়িস্‌ নেরে অন্তঃকালে প্রেমের মহাবোল
ওরে সাধু ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল'
শব-দেহটা কাঁধে করে, (সবাই) বল্‌বে 'হরিবোল'
শ্মশান ঘাটে, আগুন-কাঠে প্রতিধ্বনি রোল—

ঘন ঘন হরিধ্বনি
শুনায় সবাই নামের মণি—

শোনরে সবে কাণ ভরিয়ে প্রেমের মধুর রোল
ওরে সাধু ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল'।
কষ্ট হলে, প্রেমিক বলে—বল্‌ 'হরিবোল'
সুখের হলে প্রেমিক বলে বল্‌ 'হরিবোল'

প্রেমিকের অই হরি বলা
মুছিয়ে নে যায় মনের মলা

ভুলিয়ে দিয়ে ভবের হাটের যতেক গণ্ডগোল
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল।'

প্রতিধ্বনি

আহোম-আকবর রুদ্রসিংহ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. আহোম-নরপতি রুদ্রসিংহের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রুদ্রসিংহ আহোমজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি জগতের যে কোন মহামহিমময় নরপতির গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন এবং মোগলকুলরবি আকবরের সহিত তাঁহার জীবন ও প্রকৃতির বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। "আকবরের পিতা হুমায়ুনকে যেরূপ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, পর্ব্বত-কান্তারে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল,রুদ্রসিংহ-পিতা গদাধরসিংহকেও সেইরূপ পিতৃ-রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া, অরণ্যগিরিসঙ্কুল নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে হয়। উভয়েরই শৈশবাবস্থা দুঃখকষ্টে অতিবাহিত হয়, এবং উভয়েরই রাজত্বকালে রাজ্যোন্নতির চরম হইয়াছিল।

"আকবর যেরূপ পিতৃভক্তি প্রদর্শনের জন্য হুমায়ুনের সমাধিভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, রুদ্রসিংহও সেইরূপ পিতৃভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ পিতার সমাধিস্থলে পিতৃ-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রিয় খাদ্যদ্বারা তাঁহার দৈনিক পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জননী জয়মতী যে স্থলে প্রাণত্যাগ করেন, সেইস্থানে 'জয় সাগর' নামে এক দীর্ঘিকা ও তাহার তীরে জয়দোল-নামক বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। আকবর যেমন ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের সঙ্গে মৈত্রিবন্ধনকল্পে যত্নবান্ ছিলেন, রুদ্রসিংহও সেইরূপ সুদূর কাশ্মীর, রাজপুতানা, এমন কি, তিব্বত প্রভৃতিস্থানে দূত পাঠাইয়া, সেই সেই স্থানের রাজগণের সহিত সখ্যস্থাপন করেন। রুদ্রসিংহ পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজ্যের বিদ্যাবানের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তিনি বহুছাত্রকে বঙ্গ, বিহার, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া, সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে আসামের পার্ব্বত্য-জাতিসকল এরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল যে, আজ বৃটিশ-শাসনেও তদপেক্ষা অধিকতর শান্তি আসামে হইয়াছে, কি না, সন্দেহ।

"মহারাজ রুদ্রসিংহ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে মহত্ত্বের রাজটীকা লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম সিংহাসনারোহণের সময় আহোম-রাজগণের চিরাগত নিয়ম ছিল, আপনাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার উদাহরণ-স্বরূপ স্বহস্তে কোন নরমুণ্ড ছেদন করা হইত; কিন্তু রুদ্রসিংহ এই নৃশংস প্রথার পরিবর্ত্তে, একটি মহিষের শিরচ্ছেদ করেন।"

—প্রতিভা, পৌষ।

অবতার-বাদ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'পৌরাণিকী কথায়' অবতারবাদ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "পুরাণের অবতারবাদের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চাই একটা মানুষ। মধ্যে মধ্যে, যুগে যুগে একটা আদর্শ-মনুষ্যের উদ্ভব না হইলে, সমাজ ঠিক থাকে না, ধর্ম্ম ঠিক থাকে না, মানুষের মতি কল্যাণপ্রদপন্থায় পরিচালিত হয় না। সে মনুষ্য কিসের আদর্শ দেখাইবার? সে মানুষ positive achievement বা কর্ম্মের দ্বারা সমাজের আদর্শ স্থির করিয়া দিবেন। তিনি সমাজের একটি Character বা বিশিষ্টতা, তিনিই অবতার, তিনিই Superman। বৈদিক সাহিত্যে আর পৌরাণিক সাহিত্যে পার্থক্য এই যে, বেদে ও উপনিষদে কর্ম্মীর কর্ম্ম-শৃঙ্খলার উল্লেখ নাই, পুরাণে তাহাই আছে। মানুষ কেমন কর্ম্ম করিলে কেমন আদর্শের উন্মেষ ঘটাইতে পারে, তাহা পুরাণেতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বের, Individualismএর বিকাশের জন্যই পুরাণের মাহাত্ম্য। আর সেই ব্যক্তিত্ব, অবতারবাদেই পরিস্ফুট। ব্যক্তিত্ব কেবল একটি মানুষের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক নহে; উহা State, উহা জাতির বিশিষ্টতার দ্যোতক। শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, জাতির বিশিষ্টতার সহিত জড়ান—মাখান, তাই তিনি সীতাকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বা পরিবার

উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমান্ অনরেবল মহারাজ স্যার রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের, মহারাজ কুমার কামেশ্বর সিংহ ও বিশ্বেশ্বর সিংহের, দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা ৺লছমীশ্বর প্রসাদ-নির্ম্মিত আনন্দবাগের ও বর্ত্তমান মিথিলেশ নির্ম্মিত রাজনগর-ভবনের অস্পষ্ট চিত্র বর্ত্তমান সংখ্যার অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছে। মৈথিলী ভাষায় রচিত 'স্তুতি' উপাদেয় হইয়াছে।

সংস্কৃত

বিদ্যোদয়ঃ—স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রিণা প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত মাসিক পত্রম্, ৪৩ খণ্ড, শ্রাবণ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এক সংখ্যা—যুগ্ম সম্পাদক, হৃষীকেশ-তনয় 'শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এম এ, শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্নৌ।' বার্ষিক মূল্য ছাত্রদিগের পক্ষে ১৲ অপরের পক্ষে ২৲।

বঙ্গদেশে একমাত্র সংস্কৃত পত্রিকা 'বিদ্যোদয়' ভূদেব-বৃত্তির সাহায্যে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়, সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি ও প্রচারকল্পে, নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই, ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি সংস্কৃত-মাসিক-পত্রিকার পথপ্রদর্শন করেন। আশাকরি, যোগ্য পুত্রদিগের হস্তে সুযোগ্য পিতার এই কীর্ত্তি-স্তম্ভের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আলোচ্য সংখ্যার বিষয়,—

(১) 'আবাহনাষ্টকম্' (বসন্ত তিলক বৃত্ত), শ্রীইন্দীবর কৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ শর্ম্মণঃ। দেবী ভগবতীর আবাহন।

(২) 'উদ্ভট শ্লোকাঃ,' ক্রমশঃ চলিতেছে। আদিরসের বাসন্তী হাওয়ায় ভরপুর হইলেও, প্রত্যেক শ্লোকে কবিত্বের মাধুর্য্য আছে।

(৩) 'দার্শনিক শব্দ-নির্ঘণ্ট,' পূর্ব্বানুবৃত্তি চলিতেছে। এবার উপোদ্‌ঘাতে 'উ' শেষ হইয়াছে। দর্শন-শিক্ষার্থীরা এই সূচী হইতে প্রচুর সাহায্য পাইবেন, আশা করা যায়।

(৪) গোপালচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন-প্রণীত 'বিচার নির্ণয়ঃ' (অসম্পূর্ণ), সম্পাদকীয়। গোপালচন্দ্র ন্যায়-পঞ্চানন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ছাত্র ছিলেন। 'বিদ্যোদয়' তাঁহার অপ্রকাশিত স্মৃতি-প্রবন্ধসকল সাধারণের হস্তে উপহার দিয়া, আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে।

(৫) 'মাতৃদয়া' (উপাখ্যান) শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্নস্য। বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃতরচনায় নূতন আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(৬) 'বিবাহযোগ্য বধূবরয়োর্বয়ো নির্ণয়ঃ'—লেখক যৌবন বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। সেকালে উত্তরা, ইন্দুমতী ও দময়ন্তীর যুগে স্বয়ংবর হইত; সুতরাং কন্যারাও পিতৃগৃহে বয়স্থা হইত। একালেও পিতার বরপণ না জুটিলে কুমারী কন্যা পিতৃগৃহে যুবতী হইতেছে। আজকাল অনেক সম্পাদক (অথবা de facto সম্পাদক) তাঁহাদের কাগজে সাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও সম্পাদকীয় গন্ধ আছে কি না সাহস করিয়া বলিতে পারি না। ভাটপাড়ার বিধি পাইলে সামাজিক প্রথা পাকা হইতে পারে।

(৭) 'ভারত-সম্রাড্ বৃটিশরাজস্য বিজয় প্রশস্তিঃ,' রাজভক্তিপূর্ণ কবিতা।

হরিবোল

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

ওরে ভক্ত, ওরে পাগল তোল্‌রে ভক্তি-রোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল'।
মোহের ধাঁধায় আর যাবি না,
এমন নাম তুই আর পাবি না,
ভাবে ভোলা পরাণ খোলা নামের তুফান তোল্,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল'!
প্রেমেই যে তার চিত্ত ভরা নাই কামনার রোল,
প্রেমেই যে সে আত্ম-ভোলা—নাইকো তাতে ভোল্
মানুষ হ'রে মানুষ হ,
প্রেমের কথা সদা ক,
ধরিস্ না রে যশ কিনিতে ভক্ত-বিকট ভোল,
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক, বল্‌রে 'হরিবোল'।
হরি বলে—বাহু তুলে বাজিয়ে প্রেমের ঢোল,
গলা ছেড়ে নাম করিতে পড়ুক্ 'রগে' টোল
মরণকালে নাম করিলে
ভবের ভাবনা যাবে চলে
ছাড়িস্ নেরে অন্তঃকালে প্রেমের মহাবোল
ওরে সাধু ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল'
শব-দেহটা কাঁধে করে, (সবাই) বল্‌বে 'হরিবোল'
শ্মশান ঘাটে, আগুন-কাঠে প্রতিধ্বনি রোল—

ঘন ঘন হরিধ্বনি
শুনায় সবাই নামের মণি—

শোনরে সবে কাণ ভরিয়ে প্রেমের মধুর রোল
ওরে সাধু ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল'।
কষ্ট হলে, প্রেমিক বলে—বল্ 'হরিবোল'
সুখের হলে প্রেমিক বলে বল্ 'হরিবোল'

প্রেমিকের অই হরি বলা
মুছিয়ে নে যায় মনের মলা

ভুলিয়ে দিয়ে ভবের হাটের যতেক গণ্ডগোল
ওরে সাধু, ওরে প্রেমিক বল্‌রে 'হরিবোল।'

প্রতিধ্বনি

আহোম-আকবর রুদ্রসিংহ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. আহোম-নরপতি রুদ্রসিংহের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রুদ্রসিংহ আহোমজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি জগতের যে কোন মহামহিমময় নরপতির গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন এবং মোগলকুলরবি আকবরের সহিত তাঁহার জীবন ও প্রকৃতির বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। "আকবরের পিতা হুমায়ুনকে যেরূপ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, পর্ব্বত-কান্তারে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, রুদ্রসিংহ-পিতা গদাধরসিংহকেও সেইরূপ পিতৃ-রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া, অরণ্যগিরিসঙ্কুল নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে হয়। উভয়েরই শৈশবাবস্থা দুঃখকষ্টে অতিবাহিত হয়, এবং উভয়েরই রাজত্বকালে রাজ্যোন্নতির চরম হইয়াছিল।

"আকবর যেরূপ পিতৃভক্তি প্রদর্শনের জন্য হুমায়ুনের সমাধিভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, রুদ্রসিংহও সেইরূপ পিতৃভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ পিতার সমাধিস্থলে পিতৃ-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রিয় খাদ্যদ্বারা তাঁহার দৈনিক পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জননী জয়মতী যে স্থলে প্রাণত্যাগ করেন, সেইস্থানে 'জয় সাগর' নামে এক দীর্ঘিকা ও-তাহার তীরে জয়দোল-নামক বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। আকবর যেমন ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের সঙ্গে মৈত্রিবন্ধনকল্পে যত্নবান্ ছিলেন, রুদ্রসিংহও সেইরূপ সুদূর কাশ্মীর, রাজপুতানা, এমন কি, তিব্বত প্রভৃতিস্থানে দূত পাঠাইয়া, সেই সেই স্থানের রাজগণের সহিত সখ্যস্থাপন করেন। রুদ্রসিংহ পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রাজ্যের বিদ্যাবানের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তিনি বহুছাত্রকে বঙ্গ, বিহার, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া, সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে আসামের পার্ব্বত্য-জাতিসকল এরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল যে, আজ বৃটিশ-শাসনেও তদপেক্ষা অধিকতর শান্তি আসামে হইয়াছে, কি না, সন্দেহ।

"মহারাজ রুদ্রসিংহ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে মহত্বের রাজটীকা লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম সিংহাসনারোহণের সময় আহোম-রাজগণের চিরাগত নিয়ম ছিল, আপনাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার উদাহরণ-স্বরূপ স্বহস্তে কোন নরমুণ্ড ছেদন করা হইত; কিন্তু রুদ্রসিংহ এই নৃশংস প্রথার পরিবর্ত্তে, একটি মহিষের শিরচ্ছেদ করেন।"

—প্রতিভা, পৌষ।

অবতার-বাদ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'পৌরাণিকী কথায়' অবতারবাদ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "পুরাণের অবতারবাদের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চাই একটা মানুষ। মধ্যে মধ্যে, যুগে যুগে একটা আদর্শ-মনুষ্যের উদ্ভব না হইলে, সমাজ ঠিক থাকে না, ধর্ম্ম ঠিক থাকে না, মানুষের মতি কল্যাণপ্রদপন্থায় পরিচালিত হয় না। সে মনুষ্য কিসের আদর্শ দেখাইবার? সে মানুষ positive achievement বা কর্ম্মের দ্বারা সমাজের আদর্শ স্থির করিয়া দিবেন। তিনি সমাজের একটি Character বা বিশিষ্টতা, তিনিই অবতার, তিনিই Superman। বৈদিক সাহিত্যে আর পৌরাণিক সাহিত্যে পার্থক্য এই যে, বেদে ও উপনিষদে কর্ম্মীর কর্ম্ম-শৃঙ্খলার উল্লেখ নাই, পুরাণে তাহাই আছে। মানুষ কেমন কর্ম্ম করিলে কেমন আদর্শের উন্মেষ ঘটাইতে পারে, তাহা পুরাণেতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বের, Individualismএর বিকাশের জন্যই পুরাণের মাহাত্ম্য। আর সেই ব্যক্তিত্ব, অবতারবাদেই পরিস্ফুট। ব্যক্তিত্ব কেবল একটি মানুষের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক নহে; উহা State, উহা জাতির বিশিষ্টতার দ্যোতক। শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, জাতির বিশিষ্টতার সহিত জড়ান—মাখান, তাই তিনি সীতাকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বা পরিবার

গত সুখ ত সুখ নহে, তিনি যে রাজা—State, তাই জাতির পরিবাদের দৃষ্টিতে দেখিয়া সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল বাসুদেব নহেন, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ; তাই তিনি কুরুক্ষেত্রের মহারণ-প্রাঙ্গণে পার্থ-সারথি, যদুবংশ-ধ্বংসের সময়ে নির্ব্বিকার। তাঁহার বংশ থাকিলেই কি, না থাকিলেই কি। চাই জাতির পুষ্টি, বিস্তৃতি এবং বিশিষ্টতার রক্ষা। যাহাতে সে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়, তাহা তিনি অম্লান-মুখে করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার—পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ। পুরাণে এই ব্যক্তিত্বের, এই অতি-মানুষ-প্রভাবের বর্ণনা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পান। পুরাণ সকল বৌদ্ধযুগের পরে রচিত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। * * * সে যাহা হউক, পুরাণ মানুষ দেখাইয়াছে, মানুষের কর্ম্মের ও আদর্শের উন্মেষ-পদ্ধতি ও দেখাইয়াছে। অবতারবাদ সেই মানবতা-প্রদর্শনের আকারান্তর মাত্র; ধরা ভারের মাধুরীমণ্ডিত আখ্যায়িকা এবং State ও Humanity-র ধর্ম্মের গ্লানির জন্য দুঃখের উপাখ্যান মাত্র।”—নারায়ণ, মাঘ।

স্বদেশী-শিল্পের উন্নতি

“স্বদেশী-আন্দোলনের দিনে দেশের সকল লোকেরই মনে মনে এই আশার উদয় হইয়াছিল যে, আর কিছু হউক বা না হউক, অন্ততঃ এদেশের শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন হইবে। সে আন্দোলনের আমরা দুইদিক দেখিয়াছি। এক বিদেশীয় দ্রব্যের বর্জ্জন; অপর, দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের উহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। স্বদেশীর জন্য বিদেশীয় দ্রব্য-বর্জ্জন করিতে গিয়া দেখিতে পাই, অধিকাংশস্থলেই বিদেশী দ্রব্যগুলি জর্ম্মাণ-জাত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র সমরানল জর্ম্মাণীর ব্যবসা যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, তাহা নিশ্চিত জানিয়াও, আমরা আর কেহই স্বদেশী-শিল্পোন্নতির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতেছি না কেন? মহৎ হইবার সুযোগ, জাতীয় জীবনে বহুকাল অন্তর এক একবার আসে। বাঙ্গালীজাতির স্বদেশী-আন্দোলনের দিনে সে সুযোগ একবার আসিয়াছিল। তাহা আমরা হেলায় হারাইয়াছি। ভগবানের কৃপায় অত্যল্পকাল মধ্যে পুনরায় আর এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে, আমরা সকলেই সরকারের সাহায্যাপেক্ষী না হইয়া, আত্মনির্ভর হইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই আত্মনির্ভরতা জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় হইলেও, তদ্দ্বারা আমাদের সফলতা লাভ হয় নাই দেখিয়া, নেতাগণ আজ সকলেই সরকারের সাহায্য-প্রত্যাশায় উন্মুখ। কিন্তু সরকারের নিকট আমাদের কিরূপ সাহায্য প্রয়োজন, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রথমতঃ শিল্পোন্নতির জন্য যে টাকার প্রয়োজন, সে টাকার অভাব এখনও আমাদের হয় নাই। সুতরাং, তজ্জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ, যতই আমরা সরকারের সাহায্য লইব, ততই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথে কণ্টক পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলেন, অবাধ বাণিজ্য-প্রভাবে পূর্ব্বে আমাদের শিল্পধ্বংস রহিয়াছে এবং এখনও উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু, বর্ত্তমান মহাসমর হেতু, এ দেশের শিল্পের মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী জর্ম্মাণী শিল্পের এ দেশে আমদানী বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং, সরকার উহার উপর শুল্ক-স্থাপন করিলে যে ফল হইত, সে ফল আমরা তদ্ব্যতিরেকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র কতদিন চলিবে, তাহা নিদ্ধারিতরূপে বলা কঠিন। কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে সামরিক বিদ্যায় যিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার মতে, উহা অন্ততঃ তিন বৎসর হইবে। সুতরাং, আপাততঃ আমরা বিনাশুল্কেই ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। যুদ্ধান্তে যে আরও কিছুকালের জন্য এ দেশে মুখ দেখাইতে পারিবে না, তাহাও নিশ্চিত। অতএব সরকারকে শুল্কস্থাপন করার অনুরোধ করার কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং স্বদেশী-শিল্পের উন্নতির জন্য আমাদিগকে সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের কয়েক বৎসরে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা বীজমন্ত্রের ন্যায় জপ করিয়া, আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আমাদের সফলতা অবশ্যম্ভাবী।”—গৃহস্থ, মাঘ।

পুস্তক-পরিচয়

[সম্পাদকদ্বয়]

বিবেক-গাথা

[সোহং স্বামী-বিরচিত—মূল্য ।• আনা]

কবিতাগুলি বিবেকের গাথা বটে ;—

ভাটা—"জলের প্রবাহে বাণ আসে বারম্বার,
জীবন-যৌবন-স্রোত নাহি ফিরে আর !"—ইত্যাদি।

রূপ—"প্রজ্ঞাজ্যোতি উদ্ভাসিত সদা যার মন,
রূপের প্রভায় মুগ্ধ নহে সে কখন।"—ইত্যাদি।

প্রেম—"স্বার্থবৃক্ষে সুখবৃন্তে ফুটে প্রীতিফুল,
স্বাভাবিক আত্ম প্রেম সে বৃক্ষের মূল।"—ইত্যাদি।

ব্রহ্মচর্য্য

[শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ-প্রণীত—মূল্য /• আনা]

কবিতায় 'ব্রহ্মচর্য্য' সম্বন্ধী উপদেশাবলী—কোমলমতি বালক-বালিকার উপযোগী। দামোদরের জলপ্লাবনের চিত্রখানি বেশ ; সেবা-ধর্ম্মের উৎসাহ প্রদানের যোগ্য।

স্তুতি-পঞ্চক

[শ্রীজগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত—মূল্য /• আনা]

পাঁচটি সংস্কৃত স্তোত্র ;—শ্রীশ্রীসরস্বতীস্তবঃ, শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথাষ্টকং, শম্ভুনাথের জয়মঙ্গল-গীতি স্তোত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, শ্রীশ্রীকালীস্তোত্র। ছন্দ ও ভাষা মধুর।

'বাইওকেমিক' মতে

প্লেগের নিদান ও চিকিৎসা

[শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র আঢ্য, এম্. ডি.-প্রণীত—মূল্য ?]

'বাইওকেমিক' চিকিৎসা অতি অল্পদিন মাত্র জর্ম্মণীর ডাঃ শুজলর্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে—দ্বাদশটি মাত্র ধাতবলক্ষণ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ নিরাময় করা যায়। তাঁহার অভিমত এই যে, 'দ্বাদশটি রাশি-চক্রের সহিত এই দ্বাদশটি লবণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।' এই নিদান মতে, দেহে 'পটাশ্ ক্লোরাইড্' ও 'পটাশ্ ফস্ফেট্' নামক অ-জৈব পদার্থদ্বয়ের অভাবেই 'প্লেগ' রোগ জন্মে ; সুতরাং 'পটাশ্ ক্লোরাইড' ('ক্লোরেট্ অব্ পটাশ্' নহে—তাহা বিষ, ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন) ইহার একমাত্র ঔষধ। এই জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ পুস্তকখানি 'বাইওকেমিক-চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য-তত্ত্বান্বেষী জনসাধারণের আলোচনাযোগ্য।

আর্য রামায়ণ

[শ্রীশ্রীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত—মূল্য ॥• আনা]

প্রসঙ্গের বিষয়টি গ্রন্থকার যে বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া, পরে গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, তাহা, পুস্তক পাঠে বেশ বুঝা যায়। ইহার প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে বশিষ্ঠ চরিত্র রচনার সমালোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাম-লক্ষ্মণের বীরত্বপ্রকাশে বিশ্বামিত্র-চরিত্র বিশ্লেষণ, চতুর্থ অধ্যায়ের রামচন্দ্রের সংসার ; প্রথম অধ্যায়ে রামচরিত্র-সঙ্কলন ও রাম-রাবণের তুলনামূলক সমালোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমালোচনার উত্তর, পঞ্চম অধ্যায়ে মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতা, ষষ্ঠ অধ্যায়ের রামায়ণের ভাষা ইত্যাদি বেশ সুলিখিত। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী।

ব্রাহ্মণের দুর্গতি ও তাহার প্রতিকারের উপায়

[শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়-বিরচিত—মূল্য /• আনা]

এখানি সমাজ-বিষয়ক পুস্তকাবলীর নং ১০ পুস্তিকা। রাজ-গ্রন্থকার বলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই আধুনিক ব্রাহ্মণের দুর্গতিপ্রশমনের উপায়, এবং এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার ভার সমাজের উপরেই অর্পিত। আশৈশব অশাস্ত্রীয় শিক্ষা, এবং অসৎসঙ্গই ব্রাহ্মণের দুর্গতির কারণ ও প্রতিকারের অন্তরায়। লেখকের এ কথাগুলি বেশ, এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও মহৎ। কিন্তু সমাজের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই সমাজ ও ধর্ম্ম সম্পর্কে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে—এই রাজ-গ্রন্থকারের ভাষার চাবুক বিনা-প্রতিবাদে সহ্য করিবেন কি ?—আমাদের মনে হয়, এই প্রতিকার, চাবুক-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না—তাহাতে, অনিষ্ট ভিন্ন, আদৌ ইষ্টসাধিত হইতে পারে না ; এই দুর্গতির প্রকৃত প্রতিষেধক, ভারতে ধনবল ও জ্ঞানবলের সামঞ্জস্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আদর্শ স্থাপনের উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে—অন্ততঃ আমাদের এইরূপ বিশ্বাস।

হাল-ফ্যাসান্

[শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়-বিরচিত—মূল্য ।/• আনা]

পুস্তিকাখানির তিনটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য ;—(১) আধুনিক শিক্ষিতা, বা আধুনিক সভ্যতায় মোহিতা, বাঙ্গালী মেয়েদের পরিশ্রম-কাতরতার ফলস্বরূপ তাহাদের শরীরে অশেষবিধ ব্যাধি আশ্রয় করিতেছে ; (২) আধুনিক শিক্ষিত স্বামীর দোষে কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্পন্না পত্নীর চরিত্রাবনতি সূচিত হইতেছে ; (৩) চাকুরীপ্রিয় বাঙ্গালীর আত্ম-সম্মান জ্ঞানের অভাবে আত্মগ্লানি ঘটিতেছে।—পুস্তকখানির উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু অসংযত ভাষার তীব্রতা নিতান্তই নিন্দনীয়। অসংযত ভাষা প্রয়োগে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সমূহ অন্তরায় ঘটে—ভাষা ওজস্বিনী অথচ সুষ্ঠু, হইলেই তাহার কার্য্যকারিণীশক্তি অসাধারণ হয়।

মাসপঞ্জী

(পৌষ)

১লা—জর্ম্মণ্ নৌ-সেনানী কর্ত্তৃক 'ঈষ্ট্-কোষ্ট' আক্রমণ।
২রা—স্যর জন বারকারের মৃত্যু।
„ ইজিপ্ট "ব্রীটীশ প্রোটেক্টরেট্" হইবার সংবাদ প্রচার।
„ কুমার শ্রীমণ্ডল সিংহজীর মৃত্যু।
৩রা—ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রিন্স হোসেনকে ইজিপ্টের খেদিভ পদে মনোনয়ন।
„ কলিকাতার দরবারে দেশের সম্রাটের জন্মতিথি-উপলক্ষে উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সনন্দ দান।
„ বড় লাট বাহাদুরের পুত্র মাননীয় ই. হারডিংএর মৃত্যু।
৪ঠা -"স্বরাজ"-সম্পাদক কিশোরীমোহন রায়ের মৃত্যু।
„ পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন।
„ এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ে "পোষ্ট বৈদিক" আচার্য্য-পদ স্থাপন।
„ রায় সাহেব চারুচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু।
৫ই—ডাক্তার আই বাইওয়াটার ও মিঃ আরকিবল্ড কাহনির মৃত্যু।
„ বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ ও. প. জোন্সের মৃত্যু।
৬ই – কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসে লর্ড কার্মাইকেল বাহাদুর কর্ত্তৃক "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার অর্ডারের" এক "ইনভেস্‌টিচর"।
„ বিখ্যাত লেখক নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকরের মৃত্যু।
৭ই—প্যারিসে ফরাসী পার্লেমেণ্টের নূতন অধিষ্ঠান।
৮ই—স্যর্ হিউ ফেজারের সভাপতিত্বে 'মান্দ্রাজ চেম্বার্ অফ্ কমার্সে'র বাৎসরিক অধিবেশন।
„ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদ্য ও মধ্যম এম্ বি ফল প্রকাশ।
৯ই—দ্বারবঙ্গ-মহারাজের সভাপতিত্বে ভাগলপুরে 'মৈথিল-মহাসভা'র বাৎসরিক অধিবেশন।
১০ই—অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে 'নববিধান' যুবক-মণ্ডলীর এক কনফারেন্স অধিবেশন।
১১ই—ভাইসরয়ের 'কপ্' ঘোড়দৌড়ে "বেচিলার্স ওয়েডিং" জয়ী।
„ মান্দ্রাজে 'ইণ্ডিয়ান্ ইনডষ্ট্রীয়াল্ কন্‌ফারেন্সে'র ১০ম বাৎসরিক অধিবেশন। মাননীয় শ্রীমনোমোহন দাস রামজী সভাপতি।
„ মান্দ্রাজে 'থিওজফিক্যাল্ কন্‌ভেন্‌সনে'র ৪০শ বাৎসরিক অধিবেশন। শ্রীমতী এনী বেশান্ট সভাপতি।
„ লাল্‌লিমাদিতে "উৎকল ইউনিয়ন্ কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন। শ্রীবিক্রমদেও বর্ম্মা সভাপতি।
১২ই—রাওল্‌পিণ্ডিতে 'মোসলেম এডুকেশন কন্‌ফারেনসের' বৈঠক- মৌলভী রহিম বকস্ সাহেব সভাপতি।
„ জোড়হাটে 'আসাম এসোসিয়েসনে'র বাৎসরিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত পিঃ ও. চালিহা সভাপতি।
„ কলিকাতায় 'তিলি জাতীয় সম্মিলন'। কাশিমবাজারাধিপতি সভাপতি।
„ মান্দ্রাজে 'সোস্তাল কনফারেনসে'র ২৮শ বাৎসরিক অধিবেশন। মহিশূরের যুবরাজ সভাপতি।
„ মান্দ্রাজে 'অল ইণ্ডিয়া থীইস্‌টীক্ কন্‌ফারেনসে'র অধিবেশন। শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র সভাপতি।
„ ছাপরায় 'গোপ জাতীয় মহাসভা'র অধিবেশন। রাও বলদীর সিং সভাপতি।
„ বালিয়ায় 'অল ইণ্ডিয়া চন্দ্রবংশীয় জাতিয় সভা'র অধিবেশন। শ্রীমহাদেব প্রসাদ সিংহ সভাপতি।—ঐ স্থানে হাতোয়ার মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে 'ভূমিহার ব্রাহ্মণ সভা'র ১৯শ বাৎসরিক অধিবেশন হয়।
১৩ই মান্দ্রাজে "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাসানল্ কংগ্রেসে"র ২৯শ বাৎসরিক অধিবেশন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি।
„ বিখ্যাত বক্তা প্রেমতোষ বসুর বিলাতে মৃত্যু।
„ কলিকাতায় 'অল্ ইণ্ডিয়া ক্রিশ্চিয়ান্ কন্‌ফারেনসে'র অধিবেশন। ডাঃ জর্জ্জ নন্দী সভাপতি।
„ ফিরোজপুরে 'পঞ্জাব হিন্দু কনফারেনসে'র বাৎসরিক অধি-বেশন। রায় সাহেব মুরলীধর সভাপতি।
„ লক্ষ্ণৌতে 'এংলোইণ্ডিয়ান এম্পায়ারলিগে'র বাৎসরিক অধিবেশন.
১৪ই—কলিকাতায় 'বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনী'র বাৎসরিক অধিবেশন শ্রীপ্রিয়লাল দাস সভাপতি।
১৫ই—মান্দ্রাজে 'অলইণ্ডিয়া টেম্‌পারেন্স্ কনফারেনসে'র ১১শ বাৎসরিক অধিবেশন। রেভাঃ হারবার্ট এণ্ডারসন্ সভাপতি।
„ কনট্রোলার জেনারেলের আফিসে ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেনডেণ্ট রমাপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যু।
„ মেট্রোপলিটন ইনস্‌টিটিউসনে'র ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আলিগড়ে মৃত্যু।
১৬ই—'অল ইণ্ডিয়া ক্ষত্রিয়-উপকারিণী মহাসভা'র বাৎসরিক অধি-বেশন। ডুমরাওঙের মহারাজা বাহাদুর সভাপতি।
১৭ই—ইংরাজী নববর্ষের উপাধি-তালিকা প্রকাশ।
১৮ই—কলিকাতায় 'অলইণ্ডিয়া আয়ুর্ব্বেদীক্ প্রদর্শনী' উদ্ঘাটন।
„ করাচীতে 'অলইণ্ডিয়া ইউনিটেরীয়ান্ কনফারেনসে'র অধি-বেশন। মীর আইউব খাঁ সভাপতি।
১৯এ—স্যর হারকোর্ট বট্‌লার, বর্ম্মার ছোটলাট পদে নিয়োগ।
„ ভারতবর্ষের নানাস্থানে মহামান্য সম্রাট্ মহোদয়ের মঙ্গলপ্রার্থনা। তদুপলক্ষে পূজা, হোম, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান।
„ অভিনেত্রী সুশীলাবালা দাসীর মৃত্যু।
২০এ—লণ্ডন ও কলিকাতার 'ষ্টক্ একস্‌চেঞ্জ' পুনরুদ্‌ঘাটিত হয়।
২১এ—'ককেশসে' তুরুষ্ক সৈন্য বিধ্বস্ত।
২২এ—'হাউস্ অব্ লর্ডস্' পুনরুদ্‌ঘাটিত হয়।
২৩এ—ফ্রান্সে "এব্‌সিন্‌থ্" মদ্যের বিক্রয় একেবারে স্থগিত।
২৪এ—ডেরাডুনের "কস্‌মোপলিটান্" পত্রের জামিন, বাজেয়াপ্ত।
„ ত্রিপুরার বিখ্যাত ঐতিহাসিক কৈলাশচন্দ্র সিংহের মৃত্যু।
২৫এ—কলিকাতায় 'অলইণ্ডিয়া আয়ুর্ব্বেদীক্ কনফারেনসে'র ৬ষ্ঠ বাৎসরিক অধিবেশন;—পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম স্বামী আচার্য্য সভাপতি।
২৬এ—কুচবিহার রাজের দেওয়ান প্রিয়নাথ ঘোষের ভবানীপুরে মৃত্যু।
২৭এ—পাটনা'র কলেজের অধ্যাপক মিঃ আম্বারাজের মৃত্যু।
২৮এ—তুর্কী-কর্ত্তৃক 'তাব্রিজ্' অধিকার।
২৯এ—আর্ল অভ্ ফিভারসামের মৃত্যু।
„ কলিকাতায় 'ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদ সভা'র অধিবেশন হোলকারের রাজবৈদ্যজী সভাপতি ছিলেন।
৩০এ—ইটালীর নানাস্থানে ভূমিকম্প। এভিড্‌পলো প্রভৃতি স্থান ধ্বংস।
„ মান্দ্রাজে 'ইণ্ডিয়ান্ সাএনস্ কন্‌গ্রেসে'র অধিবেশন হয়। সরজন জেনারেল ডবলু বি, ধানারুমান্ সভাপতি।

সাহিত্য-সংবাদ

এবার গুড ফ্রাইডের ছুটীতে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। এখন হইতেই তাহার বিশেষ আয়োজন হইতেছে। বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন এবং তিনিই সাহিত্য-শাখারও সভাপতি হইবেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দর্শন-শাখার, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ইতিহাস-শাখার, এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইবেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্. এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত হইয়া "প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলী" নামক একটি ধারাবাহিক গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত দুরূহ ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলীর মূল, বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা ও টীকাটিপ্পনীসহ প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ড "বেদান্ত পরিভাষা" যন্ত্রস্থ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন ইহার ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী খণ্ড সমূহে "মীমাংসা-পরিভাষা", "যাস্কের নিরুক্ত" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতার 'চৈতন্য লাইব্রেরী'র রৌপ্য জুবিলি সেদিন ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালার গবর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত উড্রফ মহোদয় তন্ত্র সম্বন্ধে একটি অতি সারগর্ভ ও গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর সেদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি পরিষদের পুস্তকাগার, প্রদর্শনী ও হস্তলিখিত বহু পুঁথি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য পরিষদের সদস্যগণ বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যের চিন্তাশীল লেখক মনস্বী শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্, এ, মহাশয় বিলাতে বসিয়া বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিষয়ে "বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র" নামে যে বহু তথ্যপূর্ণ সন্দর্ভ রচনা করেন, তাহা "গৃহস্থ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি উহা সচিত্রভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ;—মূল্য ॥৵৹ আনা।

আগামী দোলের ছুটীতে রাজসাহীতে 'উত্তর বঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে'র অধিবেশন হইবে। 'সবুজ-পত্রের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয় উক্ত সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় "গৃহস্থ" পত্রিকায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রচারক 'বুকার ওয়াশিংটনের' আত্মজীবনের অনুবাদ বাহির করিতেছেন। শীঘ্রই উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

"গৃহস্থ" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনামূলক নিবন্ধটি "রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ;—মূল্য ॥৴ আনা।

"গৃহস্থ" পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত আলোচনামূলক নিবন্ধগুলি "বিশ্বশক্তি" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ;—মূল্য ১৷৹ টাকা।

"কমলা" নামে যে ধর্ম্মমূলক গার্হস্থ্য উপন্যাস "গৃহস্থ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে ; মূল্য ১৷৹

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "আহেরিয়া" পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ১৲।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রণীত নূতন কবিতা পুস্তক "একাদশী" প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ১৲।

শ্রীযুত ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস "অশোকা" প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত "নবীনের সংসার" নামক সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ১৲।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কবিতা পুস্তক "মর্ম্মগাথা" প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ।৴৹।

শ্রীযুক্ত কালিমোহন সোম প্রণীত সচিত্র "চন্দ্রহাস-বিষয়া" প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ১৷৹।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ গোস্বামী প্রণীত সচিত্র 'বালক বিজয়কৃষ্ণ' নামক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী প্রকাশিত হইল ;—মূল্য ৷৵

৪৯৭ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে লর্ড রীপনের ছবির স্থলে লর্ড এলগিনের ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

চৈত্র, ১৩২১

দ্বিতীয় খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

শ্যামসুন্দর

[৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

রাগিণী—ভৈরবী, তাল—যৎ

গিরি-গোবর্দ্ধন-গোকুলচারী,
যমুনা-তীর-নিকুঞ্জবিহারী,
শ্যাম সুঠাম, কিশোর ত্রিভঙ্গিম,
চিত্ত-বিনোদন-কারী।
পীতাম্বর, বনপুষ্পবিভূষণ,
চন্দন-চর্চ্চিত, মুরলীধারী।

যিনি রবসে মোহিত বৃন্দাবন,

উছলত যমুনা-বারি।

নূপুর-শিঞ্জিত, নৃত্য-বিমোহন,

কপট চপল চতুরালী,

প্রেম-নিমীলিত, নয়ন-বিলোল,

কদম্বতলে বনমালী।

নন্দকি নন্দন, মায়ি যশোদা,

নয়নাঞ্জন, ব্রজ-বাল-পিয়ারী,

যিনি লাগি থি কুল ছোড়ি রাধা

আকুল সব ব্রজনারী।

কংস-বিনাশক, মথুরাপতি জয়

নিখিল-ভকত-জন-শরণ,

দুর্জ্জন-পীড়ক, সজ্জন-পালক,

সুর-নর-বন্দিত-চরণ।

জয় নারায়ণ ! শ্রীশ ! জনার্দ্দন !

জয় পরমেশ্বর ! ভব-ভয়-হারী !

জয় কেশব ! মধুসূদন ! জয়

গোবিন্দ ! মুকুন্দ ! মুরারি !

যুগলরূপ

[শ্রীপরেশনাথ সেন, B. A.]

"অথ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, * * * পরা চাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা-কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি, অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

—'দুইটি বিদ্যা জ্ঞাতব্য,—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে বেদবেদাঙ্গাদি অপরা-বিদ্যা, এবং যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পদার্থ অধিগত হয়, তাহাই পরা-বিদ্যা।'

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে প্রবন্ধের মঙ্গলাচরণ ও সূচনা, উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে। ইহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

কেবল বেদ-বেদাঙ্গই যে অপরা-বিদ্যার অন্তর্গত, ঋষির এরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না। যে সকল বিদ্যা জাগতিক বিষয়সমূহের আলোচনায় পর্য্যবসিত, সে সমস্তই অপরা বিদ্যা; নতুবা কৃষিশিল্পাদি সাংসারিক বিষয় যে সকল বিদ্যার আলোচ্য, সেগুলি কি ঋষির মতে বিদ্যা নহে, অথবা জ্ঞাতব্য নহে? বেদবেদাঙ্গের উল্লেখ কেবল দৃষ্টান্তের স্বরূপে করা হইয়াছে। যে সময়ের এই বাক্য, তখন প্রযত্ন-জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয়ই বেদ-বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই ঋষি অপরা-বিদ্যা বুঝাইবার জন্য শুধু বেদবেদাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক ব্যাবহারিক জগৎ (Phenomenal World) সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সমস্তই অপরা-বিদ্যার অন্তর্গত, ইহাই ঋষির অভিপ্রেত। আর যাহা Phenomena অথবা পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক বিষয়ের অতীত, সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা অক্ষর, অক্ষয়, অপরিবর্ত্তনীয়, যাহা ব্যাবহারিক জগতের মূল (Substance, Substratum, Noumenon), যাহাকে পণ্ডিতপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সর 'The Unknowable' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পদার্থ যে বিদ্যার দ্বারা অধিগত হয়, তাহাই পরা-বিদ্যা।

এই যে দুইটি বিদ্যার কথা হইল, ইহারা দুইটি পৃথক্ বস্তু হইলেও, কখনও সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে থাকে না। যাহারা নিতান্ত সাংসারিক, সাংসারিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা যাহাদের মনে স্থান পায় না, তাহাদের অন্তঃকরণও একান্ত নিত্যত্বের ধারণাহীন নহে। বাস্তবিক নিত্যের ধারণা অনিত্যের ধারণার চিরসঙ্গী। নিতান্ত জড়বাদীও জড় ও শক্তির অনশ্বরত্ব স্বীকার করে। কিন্তু যেখানে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সেখানে অনশ্বর থাকে কি? তাহাই সেই মূল অক্ষর পদার্থ নহে কি? আবার অপরা-বিদ্যার সম্পর্ক-শূন্য পরাবিদ্যারও সম্ভাবনা নাই। নিত্যকে যদি অনিত্যের মধ্যে দেখিতে না চাই, তবে তাহাকে কোথায় দেখিব? অনিত্যকে দূরে ফেলিয়া দিয়া আমাদের কোন প্রকার জ্ঞানই যে সম্ভব হয় না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

"অন্ধতমঃ প্রাবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ,
অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।"

—'যাহারা কেবল অবিদ্যা অর্থাৎ অপরা-বিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে; আর যাহারা কেবল বিদ্যা অর্থাৎ পরা-বিদ্যায় রত হয়, তাহারা তদপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কে যে একত্র জানে, সে অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু পার হইয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ করে।*

কোন্ বৈজ্ঞানিক নিত্যকে ছাড়িয়া বিজ্ঞানালোচনা করিতে পারে? আর ব্যাবহারিক জগতের মধ্য দিয়া ভিন্ন কোন্ সাধক সেই নিত্য পদার্থকে বুঝিতে পারে? যাহা অসম্ভব, তাহা যে করিতে যায়, সে ঘনান্ধকারে নিমগ্ন হইবে না ত কি?

বিদ্যার এই যে যুগলরূপ দেখিলাম, বিদ্যার যে কোন

* কেহ কেহ এস্থলে 'অবিদ্যা' অর্থে 'কর্ম্ম' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। একই কথা; কারণ, 'অপরা' বিদ্যাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও নিয়ামক।

শাখার আলোচনা করি, সেখানেই সেই রূপ যুগলরূপ আমাদিগের সম্মুখে দেখা দেয়। প্রথমে জড়-বিজ্ঞান লইয়া আরম্ভ করা যাউক।

জড়-বিজ্ঞানের আদি, অন্ত, মধ্য,—সর্ব্বত্র দুইটি পদার্থ আমাদের লক্ষ্যীভূত হয়—জড় ও শক্তি (Matter and Energy)। ইহারা পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। জড়কে ছাড়িয়া শক্তির অবস্থান যেমন অসম্ভব, শক্তিহীন জড়ের সত্তাও সেইরূপ অসম্ভব। অবশ্য ঈথরের মধ্যে প্রভূত শক্তি নিহিত আছে, কিন্তু ঈথরকে জড় হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করা নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। বৈজ্ঞানিক কল্পনায় যে সময় দৃশ্যমান জগতের সমস্ত গতি-গত শক্তি তাপে পরিণত হইয়া দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, তখন সেই প্রলয়কালীন একীভূত জড়-পিণ্ডের মধ্যেও স্থিতি-গত শক্তি (potential energy) অনেক পরিমাণে রহিয়া যাইতে বাধ্য; কারণ, তাহার বিভিন্নাংশের কিছুই দুরস্থ থাকিবে না, জড়ের স্থান-ব্যাপ্তি-গুণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এ কল্পনা আমাদের ধারণাতেও আইসে না। আর যদি জড়-পরমাণু বা অতিপরমাণু (electrons) ঈথরের আবর্ত্ত হয়, তবে ত তাহার মধ্যে গতি-গত শক্তিও থাকিবেই থাকিবে। ফলতঃ, শক্তিহীন জড় ও জড়হীন শক্তি, উভয়ই ধারণার অতীত।

জড়-কণাগুলির মধ্যে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, এই উভয়বিধ বলই যুগপৎ কার্য্য করিতেছে। বিকর্ষণ-হেতু উহারা গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে না, তাহাদের মধ্যে ফাঁক থাকে; আর আকর্ষণ-হেতু একেবারে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও হয় না। কেবল যে বৈজ্ঞানিক-কল্পিত প্রলয়ের কথা এই মাত্র বলা হইল, সেই সময়ের একীভূত জড়-পিণ্ডেই শুধু বিকর্ষণ-বলের হয় ত অত্যন্ত অভাব হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা কখনও আসিবে কি না, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। যে পর্য্যন্ত জাগতিক ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এই উভয় বলই সর্ব্বত্র একসঙ্গে বিদ্যমান থাকিবে।

সে যাহাই হউক, কি আকর্ষণ, কি বিকর্ষণ, কি আঘাত, বল মাত্রই দ্ব্যাত্মক। এক খণ্ড দড়ির দুই দিক ধরিয়া দুইজনে টানিলেই টানটা যে কেবল দুই দিক হইতে পড়ে, তাহা নহে। গাছ-পাথরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট পদার্থে দড়ির এক প্রান্ত বাঁধিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া টানিলেও দড়ির উপরে দুই দিক হইতেই টান পড়ে। আমরা দাঁড়দ্বারা জল ঠেলিয়া, অথবা লগীদ্বারা মাটি ঠেলিয়া, নৌকা চালাই; পদদ্বারা ভূমিকে পশ্চাতে ঠেলি, তাই ভূমি আমাদিগকে ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দেয়; এইরূপে আমরা হাঁটি; জোরে কাহাকেও চড় মারিলে, আপন হাতেও ব্যথা পাই। নিউটন তাঁহার গতি-নিয়মের তৃতীয় সূত্রেও এই কথাই বলিয়াছেন,—"যেখানেই ক্রিয়া আছে, সেখানেই তাহার বিপরীতমুখে সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া আছে।" ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ যে সমান, তাহা নানা উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-রূপ বলদ্বয় ঠিক যেন একই জিনিসের দুই দিক। বলের প্রকৃতিই এই যে, তাহা এইরূপ যুগলরূপে প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্বে যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহার ফলে জড়-পদার্থ মাত্রই সংহত ও বিশ্লিষ্ট। কঠিন পদার্থের সংহতিই আমরা দেখি; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, সকল জড় পদার্থই সচ্ছিদ্র। স্বর্ণ যে এমন ঘন-পদার্থ, ফ্লোরেন্স নগরের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ সেই স্বর্ণের এক জলপূর্ণ গোলক প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে পিটাইতে থাকিলে, তাহার গাত্রেও ঘর্ম্মের ন্যায় জল বাহির হইয়া, তাহার সচ্ছিদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল। তারপর, বৈজ্ঞানিকগণের মতে সকল পদার্থেরই অণু ও পরমাণুগুলির মধ্যে ফাঁক আছে, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ভিতরে কোন প্রকার ফাঁক না থাকিলে, চাপদ্বারা পদার্থের সঙ্কোচন সম্ভব হইত না। হঠাৎ মনে হইতে পারে, তরল ও বায়ব পদার্থে সংহতি নাই। কিন্তু একথা ঠিক নহে, কিছু পরিমাণ সংহতি তাহাদের মধ্যেও আছে। তরল-পদার্থের পাহাড়ও হয় না, তেমন একটা স্তূপও হয় না; কিন্তু পদ্মপত্রে জল যে কতকটা পিণ্ডাকারে দেখা যায়, সংহতি না-থাকিলে তাহা হইতে পারিত না। কিয়ৎ পরিমাণে সংহতি আছে বলিয়াই তরল-পদার্থের ফোঁটা ও বুদ্বুদ সম্ভব হয়। দুই-মুখ-খোলা সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট কাচের নলের একদিক জলে ডুবাইলে, তাহাতে জল যে বাহিরের জল অপেক্ষা উপরে উঠে, এবং পারায় ডুবাইলে, তাহাতে পারদ যে বাহিরের পারদ অপেক্ষা নিম্নে অবস্থান করে, এই উভয়ই সংহতির ফল। তরল-পদার্থের

পৃষ্ঠ ভাগের সংহতি ও সঙ্কোচন চেষ্টা-(surface tension) বশতঃ ফোঁটা কতকটা গোলাকার ধারণ করে এবং সহজে ভাঙ্গে না। কাচ জলে ভিজে, পারদে ভিজে না; এইজন্য কাচ নলের মধ্যে জলের উপরিভাগ ন্যুব্জাকৃতি এবং পারদের উপরিভাগ কুব্জাকৃতি হয়; এইরূপ, পৃষ্ঠভাগের সংহতি ও সঙ্কোচন-চেষ্টার ফলে, নলমধ্যস্থ জলে উপর দিকে টান, এবং পারদে নীচের দিকে চাপ পড়ে; তাহাতেই জল ঊর্দ্ধে উঠে, পারদ নীচে নামে। বায়ব-পদার্থের সংহতি তরল-পদার্থ অপেক্ষাও অনেক কম। তাহার অণুগুলির বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা এত বেশী যে, এক বিন্দু বায়ু একটা বৃহৎ পাত্রে পূরিলে, তাহা বিস্তৃত হইয়া সেই পাত্র ত ভরিবেই, আরও বিস্তৃত হইবার চেষ্টায় সেই পাত্রের পার্শ্ব ঠেলিতে থাকিবে। এ হেন বায়ব-পদার্থেও যে কিছু সংহতি আছে, তাহা সময়ে সময়ে বেশ ধরা পড়ে। বায়ব-পদার্থের অণু, কঠিন-পদার্থের গাত্রে লাগিয়া থাকার প্রমাণ ত সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। কোনও গন্ধযুক্ত বায়ব-পদার্থ একটা পাত্রে কিছুকাল থাকিলে, পরে সেই গন্ধ তাহার গাত্র হইতে সহজে দূর করা যায় না। একটি পাত্র জলপূর্ণ করিলে, তাহার ভিতরের সমস্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়; কিন্তু গাত্রসংলগ্ন এক স্তর বায়ু থাকিয়া যায়। তাহা দূর করিতে হইলে, অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কোন কোনস্থলে এই বায়ুস্তর এত পুরু হয় যে, তাহা খোলা-চক্ষেই পাত্রের গাত্রে বুদ্‌বুদাকারে সংলগ্ন দেখা যায়। তারপর, বায়ব-পদার্থ যত বিস্তীর্ণ হইতে থাকে, ততই তাহার ছড়াইয়া পড়িবার প্রবৃত্তি কমিতে থাকে, এবং অবশেষে তাহা একেবারেই থাকে না। নীহারিকার মধ্যস্থ বাষ্পরাশিতে ছড়াইবার প্রবৃত্তি নাই, বরং তাহা যত তাপ বিকিরণ করিতেছে, ততই সঙ্কুচিত হইতেছে—এইরূপই বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন। আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের ছড়াইবার প্রবৃত্তির যদি একটা সীমা না থাকিত, তবে উহা কখনও এরূপভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে পারিত না। অতএব, দেখা যাইতেছে, জড়-পদার্থ মাত্রেই সংঘাত ও বিশ্লেষ, এই দুইটি বিপরীত-ধর্ম্ম যুগপৎ অবস্থান করিতেছে।

শক্তি গতিগত ও স্থিতিগত (Kinetic & Potential) এই দ্বিবিধ আকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এই দুইই যে মূলতঃ এক, তাহার প্রমাণ এই যে, গতিগত শক্তি স্থিতিগত শক্তিতে, ও স্থিতিগত শক্তি গতিগত শক্তিতে সর্ব্বদা পরিণত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক শক্তিতত্ত্বের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদের জন্য এ বিষয়ের একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইবে। কোনও ভারী বস্তু উপরে তুলিতে, অথবা বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে, পৃথিবীর আকর্ষণ, ভূমির বন্ধুরতা প্রভৃতি কতকগুলি বাধা অতিক্রম করিতে হয়; এইরূপ বাধা অতিক্রম করিয়া পদার্থের স্থান-পরিবর্ত্তনের নাম 'কার্য্য'। কার্য্য করিতে হইলে, শক্তির ব্যয় আবশ্যক; এবং যে পরিমাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তদ্দ্বারা ব্যয়িত শক্তিরও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায়। 'শক্তি' শব্দের অর্থ—কার্য্য করিবার ক্ষমতা। চলন্ত-পদার্থ গতি-বেগবশতঃই অল্পাধিক পরিমাণ বাধা অতিক্রম করিতে পারে। দ্রুতগামী তীর ও গোলা কঠিন-পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ, তাহাদের গতিবেগেরই জন্যই, সূর্য্যের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া দূরে অবস্থান করিতেছে; কুঠার কাষ্ঠখণ্ডের উপরে রাখিয়া খুব জোরে চাপিলেও উহা বিদীর্ণ হয় না, কিন্তু সেই কুঠার বেগশালী হইয়া পতিত হইলে কাষ্ঠখণ্ড চিরিয়া যায়। অবশ্য এই গতিগত শক্তি কেবল বেগের উপর নির্ভর করে না; যাহার বেগ, সেই জিনিসের পরিমাণের উপরেও নির্ভর করে; সমান বেগশালী একসের জিনিস অপেক্ষা চারিসের জিনিসের শক্তি চতুর্গুণ। তাই খুব ধারাল ক্ষুরের কোপে যে কাষ্ঠের কিছুই হয় না, তদপেক্ষা অনেক কম ধারাল ভারী কুঠার দ্বারাও তাহা কাটা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, গতিগত শক্তি বেগের বর্গ ও জিনিসের পরিমাণের গুণ-ফলের অনুপাতী।—আর স্থিতিগত শক্তি কিরূপ? মনে করুন, ঊর্দ্ধস্থিত একটা কপিকল হইতে ঝুলান দড়ির একপ্রান্তে একটা ভারী জিনিস উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিলাম, আর ঐ দড়ির অপর প্রান্ত নীচের একটা তদপেক্ষা কম ওজনের জিনিসে বাঁধিলাম। তাহা হইলে উপরের ভারী জিনিসটা যেমন নামিতে থাকিবে, নীচের হাল্‌কা জিনিসটাও তেমনি উপরে উঠিতে থাকিবে। এখানে এই শেষোক্ত জিনিসটাকে ঊর্দ্ধে তুলিবার শক্তি কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই

বলিতে হইবে, সে শক্তি প্রথমোক্ত ভারী জিনিসটার মধ্যে নিহিত ছিল, উহা পড়িতে পড়িতে সেই শক্তি ব্যয় করিয়া অপর জিনিসটাকে তুলিতেছে। এস্থলে ভারী জিনিসটা গতিযুক্ত ছিল না, সুতরাং তন্নিহিত শক্তিও গতিগত ছিল না; এ শক্তি শুধু উহার উর্দ্ধে অবস্থান-জনিত বা স্থিতি-গত। একটা বস্তু যত উর্দ্ধে উঠে, তাহার এই স্থিতিগত শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। যদি তাহাকে সেখান হইতে পড়িতে দেওয়া যায়, তবে সেই স্থিতিগত শক্তি যেমন কমিতে থাকে, বেগ-বৃদ্ধি হইয়া গতি-গত শক্তি তেমনই বাড়িতে থাকে। এস্থলে স্থিতিগত শক্তিই গতিগত শক্তিতে পরিণত হয়। আবার কোন বস্তু উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা যেমন উপরে উঠিতে থাকে, উহার বেগও তেমনই কমিতে থাকে। এস্থলে গতিগত শক্তি স্থিতিগত শক্তিতে পরিণত হয়। দৃশ্যমান গতিগত শক্তি, আবার অনেক স্থলে অদৃশ্য আণবগতিগত শক্তিতে পরিণত হইয়া, তাপরূপে প্রকাশ পায়। তাপই বাষ্পীয় যন্ত্রে দৃশ্যমান গতিগত শক্তিরূপে দেখা দেয়, আর জিনিসের আয়তন বাড়াইয়া, আর কখনও বা কঠিন-পদার্থকে তরল, এবং কঠিন ও তরল পদার্থকে বায়ব পদার্থে পরিণত করিয়া, তাহাদের অণুগুলির দূরত্ব বৃদ্ধিদ্বারা, স্থিতিগত শক্তির আকার ধারণ করে; কিংবা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, আর একপ্রকার স্থিতিগত শক্তির রূপ গ্রহণ করে। রাসায়নিকবিশ্লেষণ-জনিত স্থিতিগত শক্তি রাসায়নিক সংযোগকালে তাপ ও তাড়িত-শক্তিরূপে উদিত হয়। তাড়িত শক্তি অবস্থা-বিশেষে চৌম্বক-শক্তিতে, ও চৌম্বক-শক্তি তাড়িত-শক্তিতে পরিণত হয়। এইরূপে শক্তি নানা-বিধ আকারে প্রকাশ পায়, কিন্তু কেবল স্থিতিগত বা কেবল গতিগত শক্তি কোথায়ও নাই; উভয়ে মিলিত ভাবেই সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছে, এবং সময়ে সময়ে একের কিয়দংশ অপরের অংশরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহারই নাম নৃত্য। বেগ-বৃদ্ধির সময় স্থিতিগত শক্তি গতিগত শক্তিতে, এবং বেগ হ্রাসের সময় গতিগত শক্তি স্থিতিগত শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে; এইরূপ নৃত্য অনবরত চলিয়াছে। 'বিশ্বনৃত্য' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, জাগতিক গতিমাত্রই নৃত্যের প্রকৃতিবিশিষ্ট।

আবার শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দ্বৈতভাব নানারূপে লক্ষ্য করা যায়। চৌম্বক-অবস্থা দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ অবস্থা পরস্পরের সহিত এমন ভাবে জড়িত যে, কোনও চুম্বকের এক প্রান্ত একবিধ অবস্থা যুক্ত হইলে অপর প্রান্ত তাহার বিপরীত অবস্থাযুক্ত হইবেই হইবে। একখণ্ড চুম্বককে দ্বিখণ্ড করুন, তাহার প্রত্যেক খণ্ড দুই প্রান্তে বিপরীত অবস্থাযুক্ত এক একটি সম্পূর্ণ চুম্বক হইবে। স্পষ্টই বুঝা যায়, চুম্বকধর্ম্মী পদার্থের প্রত্যেক অণু ঐরূপ এক একটি সম্পূর্ণ চুম্বক। বৈজ্ঞানিকগণ অনু-মান করেন, সাধারণ লৌহাদিতে অণুগুলি এমন বিশৃঙ্খল-ভাবে থাকে যে, তাহার ফলে কোনও প্রান্তে কোনও চৌম্বক-ধর্ম্ম বিশেষভাবে লক্ষিত হয় না, কিন্তু অন্য চুম্বক বা তাড়িতের সাহায্যে অণুগুলির এমন একটা শৃঙ্খলা সাধিত হইতে পারে যে, প্রত্যেক অণুর একধর্ম্মী প্রান্তগুলি এক দিকে মুখ করিয়া থাকে, এবং অপরধর্ম্মী প্রান্তগুলি অপর দিকে মুখ করে, আর এইরূপে সমগ্র ধাতুখণ্ডের এক প্রান্ত এক ধর্ম্মবিশিষ্ট ও অপর প্রান্ত বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়।

চৌম্বকাবস্থার ন্যায় তাড়িতাবস্থাও দ্বিবিধরূপে আমা-দিগের নিকট আবির্ভূত হয়। সেই দুই অবস্থার তাড়িতকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক (positve and negative) নাম দেওয়া যায়। সমধর্ম্মী চুম্বক-প্রান্তের ন্যায় সমধর্ম্মী তাড়িতের মধ্যেও বিকর্ষণ দেখা যায়, এবং বিষমধর্ম্মী চুম্বকের মত বিষমধর্ম্মী তাড়িতের মধ্যেও আকর্ষণ হয়। পার্থক্য এই যে, চৌম্বক-ধর্ম্ম অণু মধ্যে স্থায়িভাবে অবস্থান করে, আর তাড়িত-ধর্ম্ম (হয়ত পৃথক্ এক প্রকার তাড়িত পদার্থ) পরিচালক পদার্থের সাহায্যে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত হইতে পারে। তাড়িতপ্রবাহ-বাহী কুণ্ডলী (Coil) আবার ঠিক চুম্বকের ন্যায় কার্য্য করে, তাহারও দুই প্রান্ত বিপরীতধর্ম্মী চুম্বক-প্রান্তের ন্যায় ব্যবহার করে।

চৌম্বক ও তাড়িত শক্তির যেমন দ্বিবিধ অবস্থা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হইলেও পৃথগ্‌ভাবে লক্ষিত হয়, শক্তির অন্যান্য প্রকাশের সেইরূপ দ্বিবিধ অবস্থা দেখা যায় না বটে, কিন্তু আকর্ষণের সহিত বিকর্ষণ, গতিগত শক্তির সহিত স্থিতিগত শক্তি মিলিত থাকিয়া, সর্ব্বত্রই শক্তির যুগলরূপ প্রদর্শন করে। আর রাসায়নিক সংযোগকাঙ্ক্ষা সেই সেই পদার্থের মধ্যেই অধিক, যাহাদের গুণগত পার্থক্য খুব বেশী।

উদ্ভিদের মূল ও শাখাপ্রশাখাদির দ্বৈত-ভাব সুস্পষ্ট। বীজ মৃত্তিকায় যে ভাবেই ন্যস্ত হউক, তদুৎপন্ন উদ্ভিদের মূল নিম্নদিকে ও কাণ্ড উর্দ্ধ দিকে গমন করে। মূল চায় মৃত্তিকা ও অন্ধকার, কাণ্ড চায় বায়ু ও আলো। মূল করে রস-গ্রহণ, কাণ্ড করে অতিরিক্ত রসত্যাগ। এইরূপ উভয়ের ধর্ম্ম বিভিন্ন হইলেও ইহারা পরস্পরের পোষণ করে। মূলাকৃষ্ট রস এবং পত্র দ্বারা বায়ুমধ্যস্থ অঙ্গারক বাষ্প হইতে কাণ্ডাকৃষ্ট অঙ্গার, উভয়েই মূল ও কাণ্ড, এই দুয়েরই পোষক। উদ্ভিদের জন্য রস ও অঙ্গার দুইই আবশ্যক; একটির অভাবে উদ্ভিদ্ মরিয়া যায়, পূর্ব্ব-সঞ্চিত রস ও অঙ্গার তাহাকে কিছুকাল মাত্র বাঁচাইয়া রাখিতে পারে।

জীব-শরীরও গ্রহণ-যন্ত্র ও বিসর্গ-যন্ত্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এবং এই উভয়াংশ পরস্পর-সাপেক্ষ। বিসর্গ-ক্রিয়া গ্রহণ ব্যতীত অধিক কাল চলিতে পারে না, এবং বিসর্গ নিয়মিতরূপে সম্পন্ন না হইলে, গ্রহণের ক্ষমতাও কমিতে থাকে, এবং অবশেষে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়; এইরূপে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অধিকাংশ যন্ত্র দ্বারাই গ্রহণ ও বিসর্গ, এই উভয় ক্রিয়াই যুগপৎ নিষ্পন্ন হয়; তবে কোন যন্ত্র প্রধানতঃ গ্রহণ, আর কোন যন্ত্র প্রধানতঃ বিসর্গ-কার্য্যে নিযুক্ত।

জীব ও উদ্ভিদের মধ্যেও দ্বৈত-ভাব আছে। উদ্ভিদ্ বায়ুস্থ অঙ্গারক-বাষ্প হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে, জীব তাহা খাইয়া পুষ্ট হয়; আবার জীব বায়ুকে অঙ্গারকবাষ্প দেয়, উদ্ভিদ্ তাহা হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয়।

জীব ও উদ্ভিদের পুং-স্ত্রী-ভেদ-রূপ যুগল ভাব সৃষ্টি-প্রণালীর এক চমৎকার কৌশল। উদ্ভিদ্-রাজ্যে কোথাও পুং-বৃক্ষ ও স্ত্রীবৃক্ষই পৃথক্, কোথাও একই বৃক্ষে পুং-পুষ্প ও স্ত্রী-পুষ্প পৃথগ্‌ভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাও বা এক পুষ্পের মধ্যেই পুং-কেশর ও স্ত্রী-কেশর পৃথগ্‌ভাবে বিরাজিত দেখা যায়। পুং স্ত্রী শরীর যেখানে পৃথক্, সেখানে পুংজাতির মধ্যেও স্ত্রী-অঙ্গ, এবং স্ত্রীজাতির মধ্যেও পুং-অঙ্গ অপরিস্ফুট অবস্থায় থাকে; আর নপুংসক শ্রেণীর মধ্যে উভয়বিধ অঙ্গ অল্লাধিক পরিমাণে অপরিস্ফুট অবস্থায় বর্ত্তমান দেখা যায়। ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, এখন যে সকল জীব ও উদ্ভিদে পুংস্ত্রী ধর্ম্ম পৃথক্-দেহে অবস্থিত, এক সময়ে তাহাদেরও পূর্ব্বাবস্থায় এক দেহেই উভয় ধর্ম্ম থাকিত, ক্রমে প্রকৃতির বিবর্ত্তনে এই দুই ধর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ দেহে বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। কেবল অতি নিম্ন শ্রেণীর জীব ও উদ্ভিদেই এই পুং-স্ত্রী-ভেদের অভাব দৃষ্ট হয়, এবং কেবল বিভাগ দ্বারা তাহাদের বংশ-বিস্তার সম্পন্ন হয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদেও যে, বিভাগ দ্বারা বংশবিস্তার না হয়, তাহা নহে; অনেক গাছেরই কলম হয় এবং এইরূপে যেখানে শাখামাত্র ছিল, সেখানে মূল ও কাণ্ডরূপ দ্বৈতের উৎপত্তি হয়। তবে কলমের গাছের প্রকৃতি মূল গাছেরই অনুরূপ হয়, স্থানের গুণদোষবশতঃ যে প্রভেদ হয়, মূল গাছটি সম্পূর্ণ উপড়াইয়া-অন্যত্র রোপণ করিলেও সেইরূপ পার্থক্য জন্মিতে পারে; পক্ষান্তরে, বিভিন্ন বৃক্ষের পুষ্পের মিলনোৎপন্ন ফল হইতে যে বৃক্ষ জন্মে, তাহার প্রকৃতি অনেকটা নূতন হইয়া দাঁড়ায়।

জীব-শরীরের বাহিরের অঙ্গগুলির প্রায় সকলেই, এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কোন কোনটি যুগল আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। সুগঠিত দেহের বাহিরের দক্ষিণ ও বাম অংশ ত প্রায় পরস্পরের প্রতিবিম্বের মত। ভিতরেও ফুসফুস, মূত্রাশয় প্রভৃতি কোন কোন অঙ্গের বাম-দক্ষিণ ভাগের দ্বৈত আছে। তদ্ব্যতীত অনেক জন্তুর দুই পাটি দাঁত, মস্তিষ্কের Cerebrum ও Cerebellum নামক দুই প্রধান অংশ, হৃৎপিণ্ডের Auricle ও Ventricle রূপ দুই বিভাগ ও তাহাদের প্রত্যেকের আবার দুই দুই অংশ, সর্পের দুই জিহ্বা প্রভৃতিও যুগল-প্রকাশের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায়।

আবার সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিত, এই উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রাচীন কবিগণ রাজ্যকে রাজার পত্নীরূপে বর্ণনা করিতেই ভালবাসিতেন। রাজার অভাবে রাজ্য থাকিতে পারে না। রাজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্য এমন একজন অথবা একদল লোক থাকা একান্ত আবশ্যক, যিনি অথবা যাঁহারা অপর সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, যাঁহাদের আদেশ সকলে মান্য করে, না করিলে যাঁহারা তাহাদিগকে মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারেন। যে দেশে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত, সেখানেও এক দল লোক শাসকরূপে গৃহীত হন, আর সকলে তাঁহাদের শাসন মান্য করে। যে সমাজে শাসক নাই, অথবা থাকিলেও শাসনে অযোগ্য, এবং যে সমাজে কেহই শাসিত হইতে চায় না, সকলেই শাসকের

স্থান অধিকার করিতে উৎসুক, এই উভয় সমাজেরই পতন নিশ্চিত।

গুরু-শিষ্য, প্রভু-ভৃত্য, অভিভাবক-অভিভাব্য, প্রভৃতি দ্বৈতমূলক সম্বন্ধও সমাজে অপরিহার্য্য। অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে ক্রেতা-বিক্রেতা, দাতা-গৃহীতা, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, নিযোক্তা-নিযোজ্য, মূলধনী-শ্রমজীবী (Capitalists and Labourers) প্রভৃতি সম্বন্ধও অবশ্যম্ভাবী।

সভায় বক্তা ও শ্রোতা, বিচারালয়ে বিচারক ও বিচারার্থী, অথবা বাদী ও প্রতিবাদী, দেবমন্দিরে পুরোহিত ও যজমান,—এইরূপ যেখানে যাই, সেখানেই দ্বৈত সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, কোথাও সহযোগিতা, কোথাও প্রতিযোগিতা স্ফুটতর, কিন্তু বাস্তবিক প্রায় সর্ব্বত্রই উভয়েরই মিশ্রণ, কোথাও স্পষ্ট, আর কোথাও গুপ্ত বা অর্দ্ধগুপ্তভাবে কার্য্য করিতেছে; কেবল যুদ্ধের সময় সহযোগিতা প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ঠিক উদাসীন ভাব কোথাও নাই। যিনি মধ্যস্থ, তিনিও স্বার্থহীন নহেন। এইরূপে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বৈত সম্বন্ধ চিরবিরাজমান।

পুংস্ত্রী-ভেদরূপ যে দ্বৈত সৃষ্টিপ্রবাহরক্ষার জন্যই প্রধানতঃ পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, মানব-সমাজে তাহা হইতে দাম্পত্য সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়া, অতুল সুখ ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ-স্বরূপ হইয়াছে। দাম্পত্য-সম্বন্ধ হইতেই পরিবারের উৎপত্তি। পরিবারে পতি ও পত্নী, জনকজননী ও সন্তান, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে প্রীতি-প্রবৃত্তি যেমন বিকাশ লাভ করে, এমন আর কোথাও নহে।

মানুষে মানুষে যেমন, মানুষ ও তথাকথিত নির্জীব বা নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও সেইরূপ আশ্রয়-আশ্রিত, উপজীবী-উপজীব্য, উপকারী-উপকৃত, দ্বেষ্টা-দ্বিষ্ট প্রভৃতি দ্বৈত সম্বন্ধ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রেম, দয়া, সৌজন্য, ক্ষমা, সত্যপ্রিয়তা, নিঃস্পৃহতা, জ্ঞানলিপ্সা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং ক্রোধ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, লোভ, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, আলস্য প্রভৃতি দোষ, সমস্তই দ্বৈতমূলক। প্রেমাদির কর্ত্তা ও পাত্র, এই দুইএর একের অভাব হইলে, ঐ সকল গুণ ও দোষের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। আত্মেতর পদার্থ না থাকিলে আত্মপ্রেমেরও বিকাশ সম্ভব হইত না। হীন স্বার্থপরতা ত পরার্থের সহিত স্বার্থের আপাতবিরোধ হইতেই উৎপন্ন। স্পৃহা করিবার কিছু না থাকিলে নিঃস্পৃহতা সম্ভবিত না। অন্যের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞান হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি। যদি আত্মেতর কিছু না থাকিত, তবে সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনাই থাকিত না,—সত্যপ্রিয়তা আসিবে কোথা হইতে? যদি কর্ম্মই না থাকিত, তবে শ্রমশীলতাই বা কি, আলস্যই বা কি? আত্মেতর পদার্থের অভাবে কর্ম্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইত্যাদি।

আবার এই গুণগুলির যে কোন একটির বিষয় অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই, যদি তাহার বিপরীত আর একটি গুণ কোথাও না থাকিত, তবে সেই গুণটিরও অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। যদি অপ্রেম কোথাও না থাকিত, তবে প্রেমকে কে চিনিত, কে জানিত? জগতে নিরহঙ্কার মহাজন আছেন, এবং আমাদের হৃদয়েও অহঙ্কারের সহিত অনহঙ্কারের দ্বন্দ্ব সময়ে সময়ে হয় বলিয়াই ত আমরা অহঙ্কার কি, তাহা বুঝিতে পারি। মিথ্যার সহিত তুলনাতেই সত্যের সত্যত্ব, নতুবা সত্য কোথায় থাকিত? বস্তুতঃ যাহা যাহা, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থের সহিত তাহার পার্থক্য দ্বারাই তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝা যায়। একথা কেবল গুণদোষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য এমন নহে, জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রেই এই কথা খাটে। তাই পণ্ডিতগণ বলেন, কোনও পদার্থের সংজ্ঞা (definition) করিতে হইলে অন্য পদার্থ হইতে তাহার পার্থক্য-নির্দ্দেশ (differentia) করিতে হয়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

বাহিরের বিষয় থাকুক, আমরা যে আপনাকে জানি, তাহাও দ্বৈতভাবের মধ্য দিয়া। আমি ছাড়া অন্য পদার্থ আছে, তাই সে সকল হইতে পৃথক্ করিয়া আপনাকে জানিতে পারি, নতুবা আত্ম-জ্ঞানও অসম্ভব হইত। অনাত্ম-পদার্থের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আত্ম-জ্ঞানের উদয় ও উপচয় হয়। শিশুর অনাত্মজ্ঞানও যেমন অপরিণত, আত্মজ্ঞানও তেমনই সেই পরিমাণে অপরিণত। পঞ্চদশীকার যে বলিয়াছেন—"সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা", তাহার অর্থ এই নহে যে, আত্মেতর পদার্থের জ্ঞান হইতে পৃথগ্‌ভাবে আত্ম-সম্বিৎ স্ফুরিত হইতে পারে। বরং তিনিই বলিয়াছেন যে, সুষুপ্তিকালে যখন কোনও বাহ্য

পদার্থের জ্ঞান হয় না, তখনও সেই জ্ঞানাভাবের অনুভব হয়; জ্ঞানাভাবও ত এক প্রকার অনাত্ম পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, সমাধির অবস্থায় অন্য-নিরপেক্ষ আত্মজ্ঞান হয়। সমাধির অবস্থা কিরূপ, তাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। কিন্তু পঞ্চদশীকারের—

'বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ॥' ১।৫৬

অর্থাৎ—'সমাধিভঙ্গের পর আমি সমাধিস্থ ছিলাম, এই যে স্মরণ হয়, তাহা অনুভবমূলক; সেই অনুভবরূপ চিত্তবৃত্তি সমাধিকালে অজ্ঞাত থাকিলেও, তাহার তৎকালীন সদ্ভাব ঐ স্মরণ হইতেই অনুমিত হয়।'—এই বাক্যে বোধ হয়, যেন ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ধ্যাতা ধ্যেয়কে একটু পৃথক্ করিয়াই ধ্যান করেন।

প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, এই দ্বৈতভাব মানুষের মনের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। দেবতা ও অসুর, অর্মজদ্ ও অহিমান, ঈশ্বর ও সয়তান, যেমন একবিধ দ্বৈতভাবের প্রকাশক, তেমনই আবার পিতা ও পুত্র ঈশ্বর, রাধা ও কৃষ্ণ, হর ও গৌরী, হরি ও হর প্রভৃতি অন্যবিধ দ্বৈত-ভাবের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বিরাজমান। ঈশ্বর ও জীব লইয়া যে দ্বৈত, তাহাত আছেই; তাহার উপরে, এইরূপ ঐশ্বরিক ভাবের মধ্যেও দ্বৈত দেখিতে পাওয়া যায়। দুই নহিলে মানুষের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরও যেন তৃপ্তি হয় না, তাই সে ঐশ্বরিক বিভিন্ন ভাবকে যুগলরূপে দেখিতে চায়।

এইরূপে আমরা যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেদিকেই দুইএর খেলা দেখিয়া চমৎকৃত হই। প্রকৃতি যেন আপনাকে যুগলরূপে প্রকাশ করিতেই ভালবাসেন। যেমন বহির্জগতে, তেমনি অন্তর্জগতে,—প্রকাশ মাত্রই কোন না কোন প্রকারে যুগলভাবাপন্ন। প্রকাশ নিজেই আবার অপ্রকাশের সহিত যুগলভাবে বিরাজমান। কোন একটা সামান্য বিষয়েও কি কেহ বলিতে পারেন, তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন? প্রকাশের আলো যত উজ্জ্বল হইতে থাকে, তাহার চিরসঙ্গী অপ্রকাশের অন্ধকারও ততই ঘনীভূত হইয়া দেখা দেয়। অনেকস্থলে এই যুগলরূপের একটিকে ছাড়িয়া, আর একটিকে চিন্তা করিতেও আমরা অক্ষম। আর সেরূপ স্থল ছাড়াও যুগলরূপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক আমাদের জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, চিন্তায়, কল্পনায়—দুই ভিন্ন একের স্থান কোথাও নাই। দার্শনিকগণ সকল পদার্থের মূলভূত যে একব্রহ্ম বা Noumenon এর কথা বলেন, তাহাকে বুঝিতে হইলেও পরিদৃশ্যমান জগৎ (Phenomenal world) এর সাহচর্য্যেই তাহা সম্ভব হয়; নতুবা অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসগোচর। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একথা সুন্দর ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরং অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ; যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ? স এষ নেতি নেত্যাত্মা, অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে"।—ইত্যাদি।

অর্থ—"যেখানে (যেন) দুই হয়, সেখানে একে অন্যকে দেখে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে আস্বাদন করে, একে অন্যের সহিত কথা কহে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যের চিন্তা করে, একে অন্যকে স্পর্শ করে, একে অন্যকে জানে। কিন্তু যেখানে সকলই আত্মা হয়, সেখানে কিরূপে কাহাকে দেখিবে, কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কিরূপে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কিরূপে কাহাকে বলিবে, কিরূপে কাহাকে শুনিবে, কিরূপে কাহাকে ভাবিবে, কিরূপে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কিরূপে কাহাকে জানিবে? যাহার দ্বারা এই সকল জানা যায়, তাহাকে কিসের দ্বারা জানিবে? এই আত্মা 'ইহা নহে, উহা নহে,' এইরূপে বুঝিতে হয়, তাহাকে গ্রহণ করা যায় না"।—ইত্যাদি।

বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও সেই কথাই বলেন। তাঁহারাও অকাট্য যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন,

সকল জ্ঞানই আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ এক পদার্থ ধারণার অতীত—(All knowledge is relative; the Absolute is incomprehensible)।

অতএব দেখিলাম, দ্বৈতহীন এক, আমাদিগের ধারণার অতীত। না, একথা বলিলেও নিষ্কৃতি নাই; কারণ, যাহা ধারণার অতীত, তাহা যে যাহা ধারণার আয়ত্ত, তাহার সহিত দ্বৈতভাবযুক্ত। আধুনিক গণিতবেত্তারা অসম্ভব সংখ্যা (impossible quantities) লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু অদ্বৈত-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলাও অসম্ভব,—আমরা দ্বৈতভাবের সহিত এমনি জড়িত হইয়া রহিয়াছি। তাই পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'ব্রহ্ম পদার্থ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।' বাস্তবিক যেদিকে দেখি, সেই দিকেই যুগলরূপ,—দ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত, তাহার মধ্যে আবার দ্বৈত! সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে, অধোতে,—সকলদিকে দ্বৈত, ভিতরে বাহিরে দ্বৈত। অতীতে দ্বৈত, ভবিষ্যতে দ্বৈত, অতীত-ভবিষ্যতে দ্বৈত। এক দ্বৈতের সহিত আর এক দ্বৈত, সম্বন্ধযুক্ত হইয়া নূতন দ্বৈতের খেলা দেখাইতেছে। যেখানেই এক আছে, সেখানেই, তাহার সহিত কোন-না-কোনরূপে সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া, তাহার জুড়ী আর-একও আছে।

এই সম্বন্ধের বৈচিত্র্য যে কত, কে তাহার অল্পাংশও বলিয়া শেষ করিতে পারে? সকল শাস্ত্র, সকল শিল্প ইহারই প্রকাশে নিযুক্ত রহিয়াছে। বিজ্ঞান তাহার বহু-শাখায় এই যুগলরূপের অসংখ্য-বিচিত্রতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতেছে; ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণিবৃত্তান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র ইহারই বর্ণনায় ব্যাপৃত; ইতিহাস-বিজ্ঞানাদি ইহার যে দিকের সংবাদ লয় না, ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সেই অধ্যাত্ম যুগলভাবের চমৎকার প্রকৃতি ও অদ্ভুত বিচিত্রতা আমাদিগের সমক্ষে ধারণ করিতেছে; দর্শন-শাস্ত্র এই সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যানুসন্ধানে নিরত রহিয়াছে; কাব্য ও শিল্পকলা এই বিচিত্রতাকেই নানাভাবে স্ফুরিত করিতেছে।

সৃষ্টি-প্রণালীর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, প্রকৃতি আপনাকে নানাভাবে যুগলরূপে প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের চিন্তা-প্রণালীর বিশ্লেষণের ফলেও দেখা গেল, যুগলভাবে ভিন্ন আমরা চিন্তা করিতেই অক্ষম। আবার সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের অনুশীলন করিলেও দেখিব, আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতির মূলেও এই যুগলরূপ রহিয়াছে। অনুভব-কর্ত্তা ও অনুভবের পাত্রের মধ্যে যে দ্বৈত সকল-অনুভবের মূলেই থাকা আবশ্যক, আমি তাহার কথা বলিতেছি না; যে বস্তুকে আমরা সুন্দর বলি, তাহারই মধ্যগত বিশেষ-প্রকারের যুগলভাবই তাহাকে সৌন্দর্য্য দান করে, ইহাই আমার বক্তব্য। সংক্ষেপে তাহা দেখান যাইতেছে।

সৌন্দর্য্যের এক উপকরণ Symmetry বা সমগঠন। যদি কোন বস্তু এমন হয় যে, তাহার একার্দ্ধ একদিকে যেরূপভাবে গঠিত, অপরার্দ্ধ তাহার বিপরীতদিকে ঠিক সেইরূপভাবে গঠিত, যেন একার্দ্ধ অপরার্দ্ধের ঠিক প্রতিবিম্ব, তাহা হইলে আমরা সেই বস্তুকে সুন্দর দেখি। এস্থলে এই দুই অর্দ্ধের বিশেষ-প্রকারের যুগলভাবই বস্তুটির সৌন্দর্য্যের কারণ হইল। একার্দ্ধ পৃথক্‌ভাবে থাকিলে যেখানে তাহাকে আমরা কোন মতেই সুন্দর বলিতে পারি না, সেখানেও সেইরূপ দুই অর্দ্ধ-সমগঠিত আকারে একত্র হইলেই কোথা হইতে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। Kaleidoscope নামক বালকদিগের একপ্রকার ক্রীড়নক ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার যেদিক হইতে দেখিতে হয়, তাহার বিপরীত প্রান্তে কতকগুলি নানাবর্ণের কাচ বা উপলখণ্ড যদৃচ্ছাক্রমে অবস্থিত থাকে; সে অবস্থান দেখিলে, তাহাতে কোনও সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না; কিন্তু যন্ত্রমধ্যস্থ কাচ-ফলকে তাহাদের তিনটি প্রতিবিম্বের সহিত যখন সেগুলি দেখা যায়, তখন অতি চমৎকারজনক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

সম-গঠন, সামঞ্জস্যেরই একটি বিশেষ প্রকার ভেদ মাত্র। সম-গঠন ভিন্নও অন্যবিধ সামঞ্জস্যদ্বারা সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়। কিন্তু সামঞ্জস্যের জন্য দ্বৈতের প্রয়োজন; একত্র অবস্থিত বিভিন্ন পদার্থ, বা একই বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়; যেখানে কোন ভেদ নাই, সেখানে কাহার সহিত কাহার সামঞ্জস্য হইবে? আর সেই সকল পদার্থ বা অংশের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত অবস্থানের নামই সামঞ্জস্য; অতএব সামঞ্জস্য-মাত্রেরই মূলে যুগলভাব।

বিচিত্রতা, সৌন্দর্য্যের আর একটি উপকরণ। সৌন্দর্য্যের সহিত বিচিত্রতা অনেকস্থলে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে যে, 'বিচিত্র' ও সুন্দর, এই দুইটি শব্দ অনেক সময়

সমানার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিচিত্রতা দ্বৈতেরই নামান্তর বলিলেও হয়।

বিচিত্রতার মধ্যে আবার বৈপরীত্য (contrast), অনেক সময় বিশেষভাবে, সৌন্দর্য্যপ্রকাশের সহায় হয়। দুইটি পদার্থ না থাকিলে বৈপরীত্য সম্ভবে না।

অতএব বুঝা গেল, দুইকে একত্র করিয়া দেখিতে গিয়াই আমরা সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাই। যে সকল অসামঞ্জস্য প্রভৃতির জন্য একটা জিনিস কুৎসিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও দ্বৈত-মূলক বটে। নিরবচ্ছিন্ন ভেদ-রহিত বস্তু সুন্দরও নহে, কুৎসিতও নহে। কিন্তু প্রকৃতি সাধারণতঃ আপনাকে সুন্দররূপেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর, সাধারণ-চক্ষুর নিকট যাহা কুৎসিত, প্রেমিকের নিকট তাহাও সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রেমের উৎপত্তি যে কারণেই হউক, সে, সকল অসামঞ্জস্য, সকল ত্রুটি, সকল মলিনতা দূর করিয়া দিয়া, প্রিয়বস্তুকে অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে। জগতে আপাতপ্রতীয়মান অসামঞ্জস্যের, অপূর্ণতার, শ্রীহীনতার মধ্যেও যে সামঞ্জস্য, পূর্ণতা, শোভা সর্ব্বত্র লুক্কায়িত আছে, প্রেম তাহা দেখাইয়া দেয়।

যিনি বিশ্বের সহিত বিশ্বপতিকে বাহিরে এবং প্রাণের সহিত প্রাণপতিকে ভিতরে যুগলরূপে দর্শন করেন, তিনিই সৌন্দর্য্যের চরম উপভোগ করেন। তাঁহার অন্তর যেমন মধুময় হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থও তাঁহার নিকট সেইরূপ মধুময়রূপ ধারণ করে। তাঁহার পরমা প্রীতির কাছে কিছুই কুৎসিত বা অপ্রীতিকর থাকে না। তিনি ভিতরে-বাহিরে পরমসুন্দররূপে মগ্ন হইয়া থাকেন, অন্যেও তাঁহার চরিত্র ও হৃদয়ের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়। তাই ভক্ত গায়িয়াছেন, "তোমাতে যখন, মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় সুধাময়"; তাই ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন, "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ"—যাঁহার অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তিনি নিকটে থাকিলেও শত্রু ভাব দূরে চলিয়া যায়, 'শার্দ্দূল-কুরঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইন্দুরে পোষে বিড়াল';—প্রেমের এমনি সংক্রামক-শক্তি!

হায়, কবে সে দিন আসিবে, যে দিন মানুষ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবে;—হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, অসূয়া, ক্রোধ, শত্রুতা, যুদ্ধ, বিগ্রহ পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবে!—আসিবে কি?

লাজের বাঁধন

[মলিনা]

বিপদে পড়িনু একি!
দেখিলে যাহারে লাজে মরে' যাই,
আঁখি ঢাকি করে, আড়ালে লুকাই,
ঘুরিতে ফিরিতে নয়ন খুলিতে
কেন তারে সদা দেখি?

একি মোর হ'ল দায়!
ফুল তুলি যবে আসি ফুল-বনে
সে কেন গো ফিরে চরণে চরণে,
খেলি বসি' যবে কেন সে নীরবে
মুখ পানে এত চায়?

একে রে বিপদ ভারি!
বসে' যবে থাকি সবার মাঝার
নাম ধরে' যেন ডাকে সে আমার,
সরমে ভরমে মরি যে মরমে
বারণ করিতে নারি!

এ বড় বিষম হ'ল!
কাজের ভিতরে লুকায়ে সে রয়,
ভাবনার মাঝে রহে ভাবময়,
ছাড়িলে না ছাড়ে, হাসে আড়ে আড়ে,
কত হিয়া চাপি বল!

কে জানে কি হ'ল মোর!
মুদিলে নয়ন সে হয় স্বপন,
স্মৃতিরূপে রয় ভরি' জাগরণ,
ভালবাসি কিনা জানিনা জানিনা—
তবু হিয়া তাহে ভোর!

ইথে কে বাঁধিবে হিয়া?
আর না মানিব লাজের বাঁধন,
এবার আসিলে ধরিব চরণ,
"নাথ! নাথ!" বলে' দিব পদতলে
সবটুকু মোর নিয়া!

অজন্তা

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, M. A.]

হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ও পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন যুগের সহস্র সহস্র প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীন যুগের চিত্র মাত্র দুইটি স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুইটি স্থানের নাম রামগড় ও অজন্তা। এই দুইস্থানে শত শত বর্ষের পুরাতন পর্ব্বতগুহায় প্রাচীনযুগের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রামগড়, মধ্য-প্রদেশের বনময় ভূভাগের একটি ক্ষুদ্ররাজ্য; ইহার নিকটে বিন্ধ্যপর্ব্বতের গাত্রে কতকগুলি অতি প্রাচীন গুহা আছে। গুহাগুলিতে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর দুই তিনটি খোদিত-লিপি আছে; ইহা হইতে বোধ হয় যে, গুহাগুলিও সেই সময়ের, অথবা কিছু পূর্ব্বের। বারান্তরে রামগড়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অজন্তা, নিজামরাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি পার্ব্বত্যগ্রামের নাম। গ্রামের নিকটে অশ্বক্ষুরাকৃতি গিরিবেষ্টিত উপত্যকা; এই গিরি-গাত্রে অনেকগুলি গুহা আছে। গুহাগুলিতে ভারতের প্রাচীনযুগের চিত্রশিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রামগড়ের চিত্রগুলি অজন্তার চিত্র হইতে প্রাচীন হইলেও তাহা দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, কারণ রামগড়ের চিত্রগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অজন্তার গুহাসমূহের চিত্র অতি সুন্দর, অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়। এই বিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগেও চিত্রগুলি দেখিলে বোধ হয়, যেন সেদিন শিল্পকর তাহা শেষ করিয়া গিয়াছে। অশ্বক্ষুরাকৃতি পার্ব্বত্য উপত্যকায় প্রাচীন গুহাগুলির প্রাচীর, স্তম্ভ, দ্বার, ভিত্তি ও ছাদ—অতি সুন্দর, বহুবর্ণরঞ্জিত, চিত্র-শোভিত। তেমন চিত্র ভারতে আর কোথাও নাই, কখনও হইবে কিনা সন্দেহ। সে চিত্রাবলীর সৌন্দর্য্য-বর্ণন আমার ন্যায় কলাবিদ্যা ও কাব্যরস বিবর্জ্জিত প্রত্নতত্ত্ব ব্যবসায়ী ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা কলাবিদ্যা-বিশারদ, যাঁহারা বাণীর বরপুত্র, যাঁহারা ভাবরাজ্যের অধীশ্বর, বোধ হয়, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষেও অসম্ভব। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় সুপরিচিত প্রাচীন যুগের নিদর্শনের তালিকা (Catalogue) লিখিতে আমরা সিদ্ধহস্ত, কিন্তু সৌন্দর্য্যবর্ণনে আমরা

নাগ-কুমার

একেবারেই অভ্যস্ত নহি—তাহা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। একবার ভাবিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে অজন্তার গুহাবলীর চিত্র সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিব, কিন্তু বন্ধুর অনুরোধে নিরস্ত হইয়াছি। এখন বুঝিয়াছি, যে আমার কল্পিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত মানচিত্র ও পথনির্দ্দেশক চিত্র-সম্বলিত অজন্তার চিত্রাবলীর তালিকা নিরতিশয় সহিষ্ণু বঙ্গীয় পাঠকের নিকটও অসহ্য

ভিক্ষার্থী বুদ্ধের সম্মুখে জননী ও সন্তান

হইবে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অজন্তা দর্শন করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না; অজন্তা সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু লিখিয়া যান, তাহা হইলে বোধ হয় জগতের সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি-বিভাগে একটি নূতন পরিচ্ছেদ লিখিত হইবে।

অজন্তায় যাইতে হইলে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে'র জলগাঁও অথবা পচোরা ষ্টেসন হইতে একা বা টঙ্গাযোগে যাইতে হয়। জলগাঁও ষ্টেসনটি বড় এবং এইস্থানে সদাসর্ব্বদা যানবাহন পাওয়া যায়। পচোরা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর স্থান; শুনিয়াছি, এইস্থান হইতে অজন্তা অপেক্ষাকৃত নিকট। জলগাঁও হইতে অজন্তার দূরত্ব ১৯ ক্রোশ বা ৩৮ মাইল; সমস্ত পথ ভাল রাস্তা আছে। পথে জলগাঁও হইতে ৭ ক্রোশ দূরে নেরি নামক স্থানে, এবং ১২ ক্রোশ দূরে পাহুর নামক স্থানে, পূর্ত্ত-বিভাগের এক একটি বাঙ্গালা আছে। অজন্তা হইতে ২ ক্রোশ দূরে ফর্দ্দা নামক স্থানে

নিজামরাজের একটি বাঙ্গালা আছে। যাঁহারা অজন্তা দর্শন করিতে যান, তাঁহাদিগকে ফর্দ্দার বাঙ্গালায় বাস করিতে হয়। অজন্তার পথে খাদ্যদ্রব্যাদি সহজে পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পরিব্রাজক

ইয়ুয়ান্-চুয়াং, চালুক্যরাজগণের রাজধানী বাতাপিপুরে, অথবা বেঙ্গিতে, অবস্থানকালে অজন্তার গুহা-বিহারসমূহের সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের কয়েকজন ইংরেজ সৈনিকপুরুষ অজন্তার গুহাসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহারাই, বোধ হয়, আধুনিক যুগে অজন্তার প্রথম বিদেশীয় দর্শক। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি Sir James Alexander অজন্তা-দর্শন করিয়া, অজন্তার চিত্রাবলী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের 'রয়েল এসিয়াটীক্ সোসাইটী'র পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সার জন মালকমের (Sir John Malcolm) আদেশে Dr. Bird যখন অজন্তা-দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন অজন্তায় কাপ্তেন গ্রেস্‌লি (Gresley) ও রালফের (Ralph) সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেনেণ্ট ব্লেক (Lieut. Blacke) বম্বের একখানি সংবাদ পত্রে (Bombay Courier) অজন্তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ

জীব ও পুষ্প চিত্র
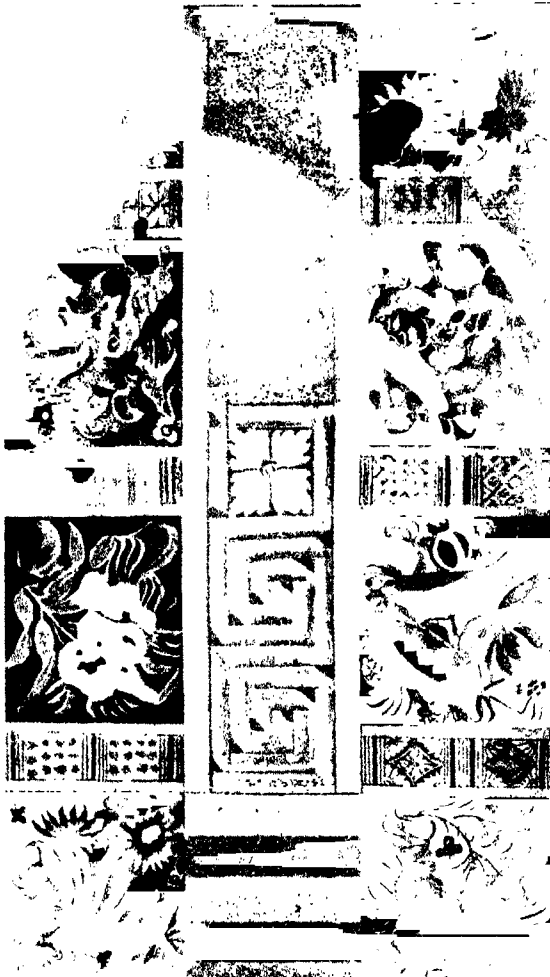
পুষ্প চিত্র

করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফার্গুসনের (Ferguson) 'ভারতীয় শৈল-বিহার ও মন্দির' (Rock-Cut Temples of India) নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে, বিলাতের 'রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটী' অজন্তার গুহা ও চিত্রাবলী রক্ষা করিবার জন্য 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র ডিরেক্টর-সভার নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডিরেক্টর-সভা ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মে তারিখের পত্রে গবর্ণর-জেনারেলকে অজন্তার চিত্রাবলী রক্ষা করিতে, ও চিত্রগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে, অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশে মেজর গিল্ (Gill) অজন্তার চিত্রাবলী অঙ্কন করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সিপাহি-যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে কয়েক বৎসর মেজর গিল্ অজন্তার চিত্রাবলীর প্রতিলিপি-অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত চিত্র বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং 'ক্রিষ্ট্যাল' প্রাসাদের বিখ্যাত মহামেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অগ্নিদাহে যখন 'ক্রিষ্টাল' প্রাসাদ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন মেজার গিল-কর্ত্তৃক অঙ্কিত অজন্তার চিত্রসমূহের প্রতিলিপিগুলিও ভস্মীভূত হইয়াছিল। ফার্গুসনের যত্নে ও চেষ্টায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্‌স্ অজন্তার চিত্রসমূহের প্রতিলিপি

পুষ্প চিত্র

অসিতকুমার হালদার 'অজন্তা' সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

অজন্তা পর্ব্বতগুহার প্রাচীরে, স্তম্ভে ও ছাদে চিত্রাবলী অঙ্কিত আছে। চিত্রাঙ্কনের পূর্ব্বে, পাষাণে প্রলেপ মাখাইয়া চিত্রের ভূমি প্রস্তুত হইয়াছিল। কোন্ কোন্ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া এই প্রলেপ প্রস্তুত হইয়াছিল,তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। কালবশে, গুহাগুলির ছাদ ও প্রাচীর হইতে প্রলেপ

খুলিয়া পড়িয়া যাইতেছে, এবং তাহার সহিত শত শত বর্ষের প্রাচীন চিত্রাবলী বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। অজন্তার চিত্র সমূহ রক্ষার কোন উপায়ই অদ্যাপি সফল হয় নাই; প্রতি-বর্ষে বর্ষার শেষে পাষাণের রন্ধ্রপথে বর্ষার জল আসিয়া প্রলেপের বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে শত শত স্থানের প্রলেপ খুলিয়া পড়িয়া যায়! বলিয়াছি,মেজর গিল্ যে সমস্ত প্রতিলিপি অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা ক্রিষ্ট্যাল প্রাসাদের অগ্নিদাহে ভষ্ম হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সে সময়ে অজন্তার চিত্রাবলী কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার কোনই উপায় রহিল না। কিন্তু গ্রিফিথ্‌স্ যে সকল প্রতিলিপি

গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে 'স্যর জামসেটজি জিজিভাই চিত্রশিল্প-সদনে'র ভারতীয় ছাত্রগণ অজন্তার চিত্রাবলীর প্রতিলিপি অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন। গ্রিফিথ্‌স্ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অজন্তার চিত্রাবলী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে বহু একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী হেরিংহাম্ অজন্তার চিত্রসমূহের প্রতিলিপি গ্রহণ-মানসে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অজন্তার চিত্রের প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে শ্রীমতী হেরিংহামের সহিত অজন্তায় গমন করিয়াছিলেন। অজন্তা-সম্বন্ধে শ্রীমতী হেরিংহামের পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অজন্তার গুহা-সমূহের চিত্রাবলীর অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অসিতকুমার হালদার-প্রমুখ চিত্রশিল্পিগণ অজন্তার চিত্রাবলীর যে সকল প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত গ্রিফিথ্‌সের গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রাবলীর তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অজন্তার চিত্রাবলীর অর্দ্ধাধিক বিনষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধের সহিত যে সকল চিত্র প্রকাশিত হইল, সেগুলি লাহোর শিল্পবিদ্যার সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কর্ত্তৃক সংগৃহীত। প্রথম চিত্রখানি কোন রাজার বিলাস তরণীর-চিত্র। * গ্রিফিথ্‌সের গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইহার একখানি ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইখানি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে, ইহার মধ্যে এই চিত্রখানির কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

প্রত্নবিদ্যার দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে, অজন্তার চিত্রগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হয়। প্রথম বিভাগে, মানব জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার চিত্র; দ্বিতীয় বিভাগে, ফল, ফুল, লতা, পাতার চিত্র। প্রথম বিভাগের চিত্রগুলিকে আরও দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা :—

[১] বুদ্ধচরিতের ঘটনাবলী :—

(ক) জাতকের চিত্র; ছদ্দন্তীয় জাতক;

(খ) গৌতমবুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান চিত্র; মহাভিনিষ্ক্রমণ;

[২] ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রাবলী; দাক্ষিণাত্য রাজসভায় পারস্যরাজ দূতের আগমন;—ইত্যাদি।

[৩] সাধারণ-ঘটনার চিত্রাবলী; মদ্যের পাত্রদর্শনে পানোন্মত্ত পারসীকের নৃত্য, ভল্লুক কর্ত্তৃক মনুষ্য-বধ;—ইত্যাদি।

* 'The Paintings in the Buddhist Cave Temples of Ajanta', Vol. I, p. 21, fig. 59.

চিত্র। চতুর্থ চিত্রে অজন্তার যুগের শোভা-যাত্রার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রের সম্মুখভাগে গৌরবর্ণ ও অসিতবর্ণ মনুষ্য-মূর্ত্তিদ্বয়, তাহাদিগের পশ্চাতে বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত হস্তী ও অশ্ব এবং হস্তীর মস্তকের উপরে তৃতীয় মনুষ্যমূর্ত্তির কিয়দংশ চিত্রিত আছে। পঞ্চম চিত্রে সুরাপাত্র ও পুষ্পহস্তে গন্ধর্ব্বনারী ও তাহার পশ্চাতে বংশীবাদক গন্ধর্ব্বের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। ইহার পরের তিনখানি চিত্র কোন গুহার প্রাচীরে চিত্রিত আছে; এই তিন খান বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ষষ্ঠ চিত্রখানি আটটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথম পংক্তিতে যে চারিটি প্রকোষ্ঠ আছে, তাহাতে :—

(১) ফল (বিল্ব ?), (২) কুমুদ-বনে হস্তী, (৩) পুষ্পরাশি, (৪) পদ্ম-বনে হংসদ্বয় চিত্রিত আছে। দ্বিতীয় পংক্তির প্রকোষ্ঠ চতুষ্টয়ে নানাবিধ পত্রপুষ্প অঙ্কিত আছে। সপ্তম চিত্রেও আটটি প্রকোষ্ঠ আছে; তন্মধ্যে দ্বিতীয় পংক্তির একটিতে দুইটি গন্ধর্ব্বমূর্ত্তি ব্যতীত অপর সমস্ত প্রকোষ্ঠে পত্র-পুষ্পই অঙ্কিত আছে। অষ্টম চিত্রেও আটটি প্রকোষ্ঠ আছে :—

প্রথম শ্রেণীর প্রকোষ্ঠচতুষ্টয়ে,—(১) তিনটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, (২) কতকগুলি কুমুদ, (৩) বীণাহস্তে গন্ধর্ব্ব-নরনারী

এই প্রবন্ধের তৃতীয় চিত্রে অজন্তা-যুগের বিলাস-তরণী চিত্রিত হইয়াছে। নৌকার উপরে মণ্ডপ, তাহার মধ্যে দাস-দাসী-নর্ত্তক-নর্ত্তকী-পরিবৃত রাজা উপবিষ্ট আছেন। মণ্ডপের বাহিরে একজন পরিচারক ছত্র ধরিয়া আছে ও পশ্চাতে কর্ণহস্তে কর্ণধারের অস্পষ্টমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মণ্ডপের উপরে প্রাচীন যুগের মাস্তুল ও পাল চিত্রিত আছে। এই চিত্রখানি কোন শ্রেণীর চিত্র, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে অনুমান হয় যে, ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর

ও (৪) কতকগুলি প্রস্ফুটিত ও প্রস্ফুটোন্মুখ পদ্ম চিত্রিত আছে। দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম ও চতুর্থ প্রকোষ্ঠে পদ্ম, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পুষ্প ও ফল, এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠে দুইটি উড্ডীয়মান হংস চিত্রিত আছে।

ইহার পরের চিত্র-পঞ্চক প্রাচীর গাত্র হইতে গৃহীত; ইহা প্রাচীরের মূলদেশের অথবা শীর্ষদেশের চিত্রমালা (Frieze bands)। নবম, দশম ও একাদশ চিত্রে পদ্মবন চিত্রিত হইয়াছে। দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যে বক্রগতি মৃণাল ও তাহাতে সংলগ্ন অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন আকারের পত্র, কোরক ও পুষ্প চিত্রিত আছে। এই শ্রেণীর চিত্র অতি সুন্দর—ইহার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অসম্ভব। ইহাতে বর্ণবিন্যাসের যে অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জগতের কোন স্থানে কখনও দেখা গিয়াছে কিনা, বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা গৃহে বসিয়া সে সৌন্দর্য্যের কিয়দংশ ভোগ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে গ্রিফিথ্সের গ্রন্থের বহুবর্ণ-চিত্রগুলি পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ চিত্রও এই জাতীয়, ইহাতে পদ্মবনের পরিবর্ত্তে শূকর-মুখ মকরদ্বয়ের প্রেমালাপ চিত্রিত আছে।

অজন্তার গুহাগুলির ছাদে সাধারণতঃ কতকগুলি বৃত্ত অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ চিত্রখানি কোন একটি গুহার ছাদের চিত্র। ইহাতে, একটির মধ্যে আর একটি করিয়া, পাঁচটি বৃত্ত অঙ্কিত আছে। প্রত্যেক বৃত্তের মধ্যে বক্রগতি পত্রপুষ্পশোভিত মৃণাল চিত্রিত আছে। এই সকল চিত্রের বর্ণবিন্যাসেও অত্যাশ্চর্য্য চিত্রকলা কৌশলের প্রমাণ বর্ত্তমান। বৃত্তগুলির বাহিরে, ছাদের প্রতিকোণে, গন্ধর্ব্ব-নরনারী অথবা কিন্নরকিন্নরী-মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। পঞ্চদশ চিত্রখানিও এই জাতীয় ইহাতে কোন একটি গুহার ছাদের চিত্রের প্রতিলিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের আদি ও অন্ত এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। অজন্তার চিত্র, বোধ হয়, ইহার চরম-উৎকর্ষের নিদর্শন। অজন্তার চিত্র দেখিলে বোধ হয়, কে কোন্ সময়ে দীর্ঘকালবিলুপ্ত সভ্যতার আদ্যন্ত-বিহীন একটা অসম্পূর্ণ খণ্ড রাখিয়া গিয়াছে!—তাহাতে প্রত্নবিদ্যাশিক্ষার্থীর মনে একটা প্রবল জ্ঞানলিপ্সা জাগিয়া উঠে, যাহা এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পূর্ণ করা সম্ভব নহে! অতৃপ্ত-পিপাসা এবং তাহার যন্ত্রণা বর্ণন, কবি ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

আমার সমালোচক

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

'পঙ্কু' 'পটল' 'রঞ্জন' 'তারা' 'কালো'
　　এরাই আমার সমালোচক ভাই,
কতক নাহি পড়েই বলে ভালো
　　কতক তা'রা পড়েই বলে ছাই।
কালো কিছু অধিক বিচক্ষণ
　　সে ত সবে নয় বছরের ছেলে
কবিতা সে বোঝে বিলক্ষণ
　　তাহার সাথে খাবার কিছু পে'লে।
তারা জানে সৌন্দর্য্যটাই বটে
　　যত বলো সব কবিতার মূল,
আমার লেখা কাগজগুলা কে'টে
　　গড়ে নিজে নানান রকম ফুল।
কবিতার মোর প্রচার যাতে বাড়ে
　　'রঞ্জনে'র যে চেষ্টা বড়ই তাতে
নৌকা গড়ি' সাত সাগরের পারে
　　পাঠিয়ে দেয় 'নালার' জলে প্রাতে।
'পটল' সে ত ভাবের রাজ্যে ঘোরে,
　　কবিতা ফুল, ভাব যে তাহার মধু,
খাতা ছিঁড়ে ঘুড়ি তৈয়ার করে,
　　তাই সে হাসি উড়িয়ে দেয় শুধু।
'পঙ্কুর' কিছু শব্দের দিকে টান,
　　মগ্ন তাহার অর্থ বিশ্লেষণে,
নিত্য ছিঁড়ে আমার খাতাখান
　　পট্‌কা গড়ে শুনায় বন্ধুগণে।
ম্যাথু আরনল্ড, ড্রাইডেন বঙ্কিম রবি
　　এদের কাছে লাগবে না কেউ মোটে
এমন মধুর তীব্র সমালোচক
　　কাহার ভাগ্যে একসাথেতে জোটে।

কণ্ঠস্বরের উৎপত্তি-বিজ্ঞান

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, M. A.]

যদিও প্রাণিরাজ্যে বিভিন্নশ্রেণীর প্রাণীর বিভিন্নস্বরের সহিত আমরা সকলেই সুপরিচিত, তথাপি এরূপ সব প্রাণী আছে যে, যাহাদের কোনও শব্দই নাই। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণীকে আমরা মূকশ্রেণী সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে পারি, এবং প্রথম শ্রেণীর প্রাণীকে 'শব্দকারী' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে পারি। একই প্রাণিরাজ্যে কোন কোন প্রাণী শব্দকারী ও কোন কোন প্রাণী মূক কেন হয়?—এই জিজ্ঞাসা স্বতঃই মনে উদিত হয়। এই জিজ্ঞাসার উত্তরের মধ্যেই, আমরা স্বরের উৎপত্তিবিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইব।

যে সমস্ত জীবকে আমরা মূকশ্রেণীভুক্ত করিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা জীবজগতে নিম্নশ্রেণীভুক্ত দেখিতে পাই। কীট, মৎস্য প্রভৃতিকে আমরা মূকশ্রেণীর জীব বলিয়া ধরিতে পারি। শব্দকারী জীবের সহিত ইহাদের দৈহিক গঠনের তুলনা করিলে, ইহাদের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকাশ হয় নাই,—ইহাই প্রধান পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গেই শব্দের যোগ থাকা সম্ভবপর, বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

হৃদয়ের সুখদুঃখভাবের আবেগ হইতেই যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা ইতর প্রাণীদিগের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কোন কোন প্রাণীর সুখ-দুঃখ-প্রকাশের শব্দব্যতীত, আর কোন শব্দই নাই। তাহাদের সুখদুঃখ-ভাবের পার্থক্য, স্বরের পার্থক্য দ্বারাই সূচিত হইয়া থাকে।

হৃদয়ভাবের হৃদ্‌যন্ত্রই আধার। হৃদ্‌যন্ত্রে ভাবের আঘাত লাগিলেই, তাহার প্রতিধ্বনি-রূপে শব্দের উৎপত্তি হয়। হৃদ্‌যন্ত্র এইরূপে ভাবের যন্ত্র হওয়াতেই, হৃদ্‌যন্ত্রের অধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অধিক ভাবেরও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ, ভাবেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া, ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে শব্দেরও বাহুল্য সংঘটিত হইবে, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। তাহাতেই, যতই জীব বিকাশের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে থাকে, ততই, যেমন তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের অধিক বিকাশ হয়, তেমনই অধিক ভাবেরও স্ফূর্ত্তি হয়। এই ভাবের প্রতিধ্বনি-রূপেই, শব্দেরও আধিক্য হইয়া থাকে। ইহা হইতেই, উচ্চস্তরের জীবের শব্দসংখ্যা, নিম্নস্তরের জীবের অপেক্ষা অধিক হওয়ার কারণ হইয়াছে। অসভ্য ও অনুন্নত জাতির অপেক্ষা, অধিক উন্নত ও সভ্য জাতির শব্দ-সম্পদের প্রাচুর্য্যেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের ভাষায় আমরা শব্দের যেরূপ ব্যক্তাবস্থা দেখিতে পাই, শব্দের প্রথম-উৎপত্তিতে ইহার সেরূপ ব্যক্তাবস্থা ছিল না; তখন শব্দ একটি অব্যক্তধ্বনি মাত্র ছিল;—কণ্ঠস্বরের ভেদের দ্বারাই মাত্র তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও অর্থ প্রকাশিত হইত। সুতরাং, স্বর-বৈচিত্র্যের দ্বারা ভাব-প্রকাশকেই, জীবের প্রথম প্রাকৃতিক ভাষা বলা যাইতে পারে। পশুপক্ষীর মধ্যে, স্বরভেদের দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-প্রকাশের প্রাকৃতিক ভাষা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের আনন্দের স্বর, ভয়ের স্বর, ও দুঃখের স্বর যে ভিন্ন, তাহা অনায়াসেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে; আবার, তাহাদের ক্রোধের তর্জ্জন গর্জ্জন যে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। মনুষ্যেরও, সুখদুঃখ-ভয়-বিস্ময় প্রভৃতির বিশেষ আবেগের সময়, প্রাকৃতিক সেই স্বরের ভাষাই বাহির হইয়া পড়ে।

স্বরের সরসতা ও বিরসতা, হৃদয়ভাবের কোমলতা ও কঠোরতা দ্বারাই হইয়া থাকে। জন্তুদিগের কোমলভাবের স্বর একরূপ, আর ক্রূর-ভাবের স্বর একরূপ। হিংস্র ও অহিংস্র প্রকৃতি-ভেদে, জন্তুদিগের স্বর-ভেদের বৈলক্ষণ্য বিশেষরূপেই পরিলক্ষিত হয়। অন্য জন্তুদিগকে আক্রমণ করিতে যাইয়া, ভয়-প্রদর্শন করিতে হয় বলিয়া, হিংস্র-প্রকৃতি জন্তুদিগের ভীতিজনক হইয়া থাকে। অহিংস্র-

প্রকৃতি জন্তুদিগের স্বর, কোমলভাবের দ্বারা সরসতা প্রাপ্ত হয়। মাংসাশী জন্তুসকলই হিংস্রপ্রকৃতিক। মাংসাশী জন্তুসকলের স্বর যে কর্কশ ও ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে, তাহাদের হিংস্র-প্রকৃতিই তাহার কারণ। পক্ষান্তরে অমাংসাশী জন্তুদিগের স্বর যে কোমল ও সুশ্রাব্য, তাহাদের অহিংস্র-প্রকৃতিই তাহার কারণ। পক্ষিজাতিই বিশেষরূপে অহিংস্র-প্রকৃতি, ফলই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহা হইতেই ইহাদের স্বর অতিশয় সুমিষ্ট হইয়াছে। হিংস্র-প্রকৃতি পশুপক্ষীদিগের খাদ্য সহজলভ্য নয়, ইহার জন্য তাহাদিগকে বহু কষ্টস্বীকার করিতে হয়, বহু শত্রুতাসাধন করিতে হয়। এইরূপে, আহার্য্য-সংগ্রহের আবশ্যকতা হইতেই, তাহাদের প্রকৃতি কঠোর ও ক্রূর হইয়া থাকে; এবং তাহাদের স্বরে, এই কঠোর ও ক্রূর ভাব সংক্রান্ত হওয়াতেই, তাহা কর্কশ ও ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণ হয়। পক্ষীদিগের খাদ্য অনায়াসলভ্য—তাহার জন্য শত্রুতাভাব-অনুশীলনের কোন প্রয়োজন হয় না; ইহাই তাহাদিগের স্বর কোমল ও সুমিষ্ট হইবার কারণ হয়। পক্ষীদিগের মধ্যে, যে সকল পক্ষীমাংসাশী সুতরাং হিংস্রপ্রকৃতি—যেমন গৃধ্র, চিল, কাক প্রভৃতি—তাহাদিগের স্বর মিষ্ট নহে, পরন্তু বিকট ও ভীতিজনক; কিন্তু এইরূপ ক্রূরস্বভাব জন্তুদিগের হৃদয়েও যখন প্রেমভাবের আবির্ভাব হয়, তখন, ইহার প্রভাবে যেমনই তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়, তেমনই, তদ্দ্বারা তাহাদের স্বরও সরস হইয়া উঠে। *

পক্ষিজাতির নিরুদ্বেগ-কোমলতাময় জীবনের ফলরূপেই সুমিষ্ট স্বরের বিকাশ হইয়াছে। হৃদ্‌যন্ত্রের প্রথম প্রকৃত বিকাশ, পক্ষিজাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, স্বরের প্রথম প্রকৃতবিকাশ তাহাদের মধ্যেই হয়, মনে করা যাইতে পারে। পক্ষিজাতির মধ্যে, হৃদ্‌যন্ত্রের প্রথমবিকাশে ইহার লঘুতা হইতে, ইহাদের প্রকৃতিও লঘু হইয়াছে। মনুষ্যশিশুদিগের হৃদয় যেমন প্রথম লঘু থাকে, পক্ষীদিগের হৃদয়ও তেমনই লঘু। ইহাদিগকেই প্রকৃতির প্রথম মুখর-শিশু বলা যাইতে পারে। শিশুগণ যেমন আপন মনে কতই কথা বলে, ইহারাও তেমনই আপন মনে কতই শব্দ করে। ইংরেজী babbling শব্দে যেমন শিশুর অর্থহীন ভাষা বুঝায়, তেমনই পক্ষীর শব্দও বুঝায়। শিশুর ভাষা অমৃতময়—"অমৃতং বালভাষিতম্"—পক্ষীর স্বরও সুধামাখা।

শিশু সরলতাদ্বারা আনন্দময়—পক্ষীও কোমলতাদ্বারা প্রফুল্লতাময়। এইরূপে উভয়ের স্ফূর্ত্তিময় হৃদয় হইতেই মধুময় স্বর হইয়াছে। স্ফূর্ত্তিভাবের সহিত যে লঘুহৃদয়ের সম্বন্ধ, ইংরেজী Lighthearted কথাতে যে স্ফূর্ত্তিযুক্ত বুঝা যায়, তাহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

হৃদয়ভাবের দ্বারা একজাতীয় জন্তুরও যে স্ত্রী-পুরুষভেদে স্বরভেদ হইয়া থাকে, তাহা আমাদের নিত্য-অভিজ্ঞতারই বিষয়। গাভীর মমতাপূর্ণ 'হাম্বারব', আর বৃষের স্পর্দ্ধাপূর্ণ গর্জ্জন,—উভয়ের পার্থক্য কে না উপলব্ধি করিতে পারেন? বিড়ালীর কোমল 'ম্যাও' শব্দ যেমন হৃদয়কে স্পর্শ করে, বিড়ালের বিকট 'ম্যাও' শব্দ তেমনই হৃদয়কে উত্ত্যক্ত করে। মনুষ্যদিগের মধ্যেও, স্ত্রী-স্বরের প্রভেদ হইতে, "বামাকণ্ঠ" কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

এই প্রকারে, হৃদয়ের সহিত স্বরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম। আমাদের অভিধানে হৃদয়ের এক নাম 'স্বান্ত' পাওয়া যায়; যথা—"চিত্তন্তু চেতোহৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ॥" এই 'স্বান্ত' শব্দটি, 'স্বন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'স্বন্' ধাতুর অর্থ 'শব্দ'। সুতরাং, 'শব্দের আধার' বলিয়াই যে, হৃদয়ের 'স্বান্ত' নাম হইয়াছে, তাহা আমরা মনে করিতে পারি।

আমাদের শব্দশাস্ত্রের স্বরোৎপত্তির এই মূলতত্ত্ব, আধুনিক-বিজ্ঞানের আলোকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞানের উদ্ভাবয়িতা মহামনীষী ডারুউনের মতে হৃদ্‌যন্ত্রই সমস্তকার্য্যের উৎপত্তিস্থান। যে কোন বাহ্য-বিষয়ের সম্পর্কেই হৃদ্‌যন্ত্র উত্তেজিত হয়; এই উত্তেজনা রক্তসঞ্চালনের দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইয়া মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করে। মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুযোগে আবার হৃদয়ের উপর এই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রকারে, শরীরের প্রধান দুইটি যন্ত্র, পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকে। *

* "When male animals utter sounds in order to please the femels, they used naturally emply those which are sweet to the ears speeds".—'The Expression of the Emotions in Man And animals'—By Charles Darwin—p. 92.

* "The heart, which goes uninterruptedly beating

উপরি উক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে, হৃদ্‌যন্ত্র হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া কার্য্যোৎপাদন করে। এই প্রকারে হৃদ্‌যন্ত্রের, এমন কি রক্তের সঙ্গেও শরীরের সমস্ত কার্য্য-কলাপেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। সুখ, দুঃখ, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সময় যে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার বিশেষ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহাতেও সেই সম্বন্ধের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমাদের ভাষায় হৃদয়ের এক নাম 'অন্তঃকরণ',—'অন্তঃকরণ' শব্দের অর্থ 'অন্তরিন্দ্রিয়'। দেহাভ্যন্তরের সমস্ত কার্য্য ইহার দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতেই, ইহা অন্তরিন্দ্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মনস্বী ডারুইন্ হৃদ্‌যন্ত্রকে যেরূপভাবে সমস্ত কার্য্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই 'অন্তঃকরণে' আমরা তাহার মর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপেই সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাইতেছি।

ব্যক্ত-শব্দ যে কিরূপে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যদ্বারা উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে ডারুইন্ লিখিয়াছেন যে, বাহ্য উত্তেজনায় বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশের আকোচন ও বিকোচন হইতেই ব্যক্ত-শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। *

night and day in so wonderful a manner, is extremely sensitive to external stimulants. The physiologist, Claude Bernard, has shown how the least excitement of a sensitive nerve reacts on the heart; even when a nerve is touched so lightly that no pain can possibly be felt by the animal under experiment. * * Claude Bernard also repeatedly insists, and this deserves special notice, that when the heart is affected it reacts on the brain, and the state of the brain again reacts through the pneumo-gastric nerve on the heart; so that, under any excitement there will be much mutual action and reaction between these, the two most important organs of the body."—'The Expression of the Emotions in Man and Animals'—By Charles Darwin —p. 66.

* "Involuntary and purposeless contractions of the muscles of the chest and glottis, exeited in the above manner may have first given rise to the emission of vocal sounds". 'The Expression of Emotions in Man and Animals.'—By Charles Darwin —p. 84.

প্রথম অবস্থায় স্বরের ব্যতিক্রম দ্বারাই শব্দসকলের রূপান্তর সংঘটিত হইত। আমাদের শৈশবজীবনে, আমরা ভাষার সেই প্রথম অবস্থার আভাস এখনও পাইয়া থাকি। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রথম "ওঁয়া ওঁয়া" শব্দে বেদনার ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে। আমরা কষ্টের সময় যে 'উঃ' 'আঃ' শব্দ দুইটি উচ্চারণ করি, 'ওঁয়া' শব্দটি তাহাদেরই সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। শিশুর কান্না যেমন 'ওঁয়া' শব্দে ব্যক্ত হয়, হাসিও তেমনই 'আহু' শব্দে ব্যক্ত হইয়া থাকে। কান্না যেমন কষ্টের প্রাকৃতিক ভাষা, হাসিও তেমনই আনন্দের প্রাকৃতিক ভাষা।

এই প্রকারে শিশুর হাসি-কান্না আমরা 'অ, ই, উ' প্রভৃতি কয়েকটি স্বরের দ্বারা ব্যক্ত হওয়ার প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের ব্যাকরণে অক্ষরাবলী বা বর্ণমালা—স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উপরি উক্ত আলোচনা হইতে, স্বাভাবিক আবেগেরই প্রতিশব্দরূপে স্বরবর্ণ-সকলের প্রথম ব্যবহার হইতেই যে ব্যাকরণে ইহাদের 'স্বরসংজ্ঞা' হইয়াছে, তাহার প্রকৃত রহস্য আমরা উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেছি। বস্তুতঃ, স্বরসকল যে পূর্ব্বে অক্ষর বা বর্ণমাত্র ছিল না, পরন্তু হর্ষ-শোকাবেগেরই স্বর প্রতিরূপ ছিল—হাসির স্বর-প্রতিরূপের বিকাশ সম্বন্ধে ডারুইনের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না—"Laughter may be either high or low. So that with man, as Haller long ago remarked, the sound partakes of the character of the vowels (as pronounced in German) O and A; whilst with children and women, it has more of the character of E and I; and these latter vowel-sounds naturally have, as Helmholtz has shown, a higher pitch than the former; yet both tones of laughter equally express enjoyment or amusement."—'The Expression of the Emotions in Man and Animals.'—By Charles Darwin. p. 79.

এখানে 'অ, ই, এ, ও' প্রভৃতি স্বরবর্ণই যে হাসির প্রাকৃতিক প্রতিশব্দ, তাহা পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব স্বর সকলকেই আমরা ব্যক্ত-শব্দের

প্রাথমিকরূপ বলিয়া মনে করিতে পারি। ইংরেজীতে ইহাদের সাধারণ যে vowel নাম পাওয়া যায়, তাহার মূলানুসন্ধান করিলেও পূর্ব্বোক্ত তথ্যই লাভ করা যাইতে পারে। অভিধানে vowel শব্দটি, লাটীন *vocis* শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। *Vocis*, আমাদের সংস্কৃত 'বাচ্' শব্দেরই প্রতিরূপ। 'বাচ্' শব্দ 'ব্যক্ত ভাষা'রই বাচক। ইহাতে vowel যে প্রথম ব্যক্ত-শব্দ, তাহার স্পষ্ট প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বরের সহিত ব্যঞ্জনের যোগ হইয়াই প্রকৃত ব্যক্ত-শব্দের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে ব্যঞ্জন, ব্যক্ত শব্দের মূলীভূত বলিয়াই, 'ব্যঞ্জন'ও 'ব্যক্ত', এক ধাতুমূলক হইয়াছে। ব্যঞ্জন, ব্যক্ত-শব্দের মূলীভূত হইলেও, ব্যক্ত-শব্দে স্বরেরই প্রাধান্য; কারণ, স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সম্ভবপর নহে। পাণিনি ব্যাকরণে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে শব্দোচ্চারণের যে নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ব্যঞ্জনের যোগসত্বেও, যে প্রথম প্রথম স্বরের ভেদ দ্বারাই শব্দভেদ লক্ষিত হইত, তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পাণিনি অতীব প্রাচীন ব্যাকরণ। ভাষায় যেরূপ প্রাচীন অবস্থা আমরা অনুমান করিতে পারি, তাহাতে আমরা তাহারই স্পষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান দেখিতে পাই। ভাষার বিকাশে প্রথম স্বরগত বা উচ্চারণগত পার্থক্য, শেষে অক্ষর-গত পার্থক্যেই পর্য্যবসিত হয়। সংস্কৃতভাষায় পাণিনির পরবর্ত্তী ব্যাকরণে যে উদাত্ত ও অনুদাত্তাদি স্বরের প্রকরণ পরিদৃষ্ট হয় না,—তাহাতে ভাষা যে ক্রমে অক্ষরগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই।

স্বরকে যেমন আমরা প্রাকৃতিক ভাষা বলিয়া বলিয়াছি, তেমনই আমাদের 'আকার-ইঙ্গিত' ও প্রাকৃতিক ভাষা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে; পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে "Gesture Language" নাম দিয়াছেন। এই আকার-ইঙ্গিত-রূপ প্রাকৃতিক ভাষারও যে রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্রের সহিতই সম্বন্ধ, তাহা পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদের আবিষ্কর্ত্তা মহামনস্বী ডারুইন্ স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্বাস ও রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের বর্ত্তমান গঠন যদি স্বল্পমাত্রায়ও ভিন্নাকার হইত, তাহা হইলেও বাহ্যাকারে আশ্চর্য্যরূপে ভিন্নতা সংঘটিত হইত।*"

আমাদের শব্দ-শাস্ত্রেও ইঙ্গিত 'হৃদ্গতভাব' † রূপে বর্ণিত হওয়ায়, হৃদয়ের সহিতই ইহার যোগ স্থাপিত হইয়াছে।

হৃদয় বা হৃদ্‌যন্ত্র যে শব্দোৎপত্তির মূলস্থান, তাহার আভ্যন্তর প্রমাণের আলোচনা আমরা উপরে করিয়াছি; এক্ষণে, আমরা তাহার বাহ্যপ্রমাণেরও আলোচনা করিব। অন্যের মনোভাব যখন শব্দের আকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের হৃদয়ের দ্বারাই তাহা গৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতেই অন্যের কথা 'হৃদয়ঙ্গম হওয়া,' প্রভৃতি প্রয়োগের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজীতে 'To make imperession on one's heart,' 'Not to make impression on one's heart' প্রভৃতি কথা পূর্ব্বোক্ত ভাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের ভাষায় "হৃদয়স্পর্শী কথা," 'কথাতে হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হওয়া,' 'কথাতে হৃদয় গলিয়া যাওয়া' ও তদনুরূপ ইংরেজী ভাষায় 'Touching words,' Heart-rending news,' 'Heart-melting at one's words' প্রভৃতিতে হৃদয়ের উপর শব্দের প্রভাবেরই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কাহারও হৃদয়ে সান্ত্বনা-প্রদান আমরা কথা দ্বারাই করিয়া থাকি; এমন কি, আমাদের নিজের সান্ত্বনায়ও আমাদিগকে কথারই আশ্রয় লইতে হয়। তাহাতেই কবি বলিয়াছেন :—

"শোকে মোহে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে।"

এই সমস্ত হইতে, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যে অন্তঃকরণকে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় ইন্দ্রিয়াত্মকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। বাহ্যভাব-গ্রহণের দ্বারা ইহা যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়রূপের পরিচয় প্রদান করে—আন্তরিক-ভাব বহিঃপ্রকাশ-দ্বারা ইহা তেমনই অন্তরিন্দ্রিয়ের পরিচয় প্রদান করে। ইহা হইতে হৃদয় যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান ইন্দ্রিয়,—স্বর বা শব্দের মূলাধার—তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

* "From the various facts just alluded to, and given in the course of this Volume, it follows that, if the structure of our organs of rsepiration and circulation had differed in only a slight degree from the state in which they now exist, most of our empressions would have been wounderfully different."—'The Exprssion of the Emotions in Man and Animals'.—By Charles Darwin—p. 387.

† "ইঙ্গিতং হৃদ্গতোভাবো বহিরাকার আকৃতিঃ।"—ইতি সজ্জনঃ।

ভুল

[শ্রীযতীশচন্দ্র বসু, M. A.]

(১)

ডিনারের সময় স্বামী-স্ত্রীতে খুব বাদানুবাদ চলিতেছিল। মিসেস্ দে বলিলেন, "কেন? মিঃ মুখুজ্যে তোমার পরম বন্ধু ব'লে ত কত গুমর কর। আর যতীনের জন্য একবার ব'ল্লেই বুঝি যত দোষ হয়?"—যতীন মিসেস্ দে'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

ডিনার শেষ হইয়া আসিতেছিল। মিষ্টার দে, ন্যাপ্‌কিন্ লইয়া নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "হ'লেই বা তিনি আমার বন্ধু। অপরের কাছে অনুগ্রহ চাওয়া অপমান মনে করি।"

মিসেস্ দে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কই! নিজের কাজে পরের অনুগ্রহ নিতে তোমাকে ত কখন কুণ্ঠিত দেখি নি! বুঝেছি, পরের উপকার ক'র্‌তে হ'লেই তোমার অপমান মনে হয়।" বাদানুবাদ হইতে ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি পাইতেছে দেখিয়া মিষ্টার দে বলিলেন, "মাপ ক'র—তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পার্‌লুম না।" মিসেস্ দে চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নন; তিনিও উত্তরে বলিলেন, "হাঁ গো! সত্যি বল্লেই লোকের গায়ে বেশী লাগে।"

তখন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় আকাশ, তরুশির, গৃহচূড়া সর্ব্বত্র ভরিয়া গিয়াছিল। সমস্ত দিন দারুণ গ্রীষ্মের পর শীতল দক্ষিণ বাতাস মৃদু মন্দ বহিতেছিল। উদ্যানের প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছিল।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য স্বামীস্ত্রীর মনে কোনরূপ ভাবান্তর আনিতে পারিল না—বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিল না। সৌন্দর্য্যে তাঁহারা আত্মহারা হইতে পারিলেন না। প্রকৃতি আপনার পসরা খুলিয়া বসিলেও মানুষ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে না। অপমান-ব্যথিত মিষ্টার দে উত্তেজিত

মিসেস্ দে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কই! নিজের কাজে পরের অনুগ্রহ নিতে তোমাকে ত কখন কুণ্ঠিত দেখি নি!"

হইয়া বলিলেন,"কিছু মনে ক'র না ; স্পষ্ট কথা বলতে কি, তোমার আত্মীয়দের ভার আমি বরাবর বহন করিতে পারিব না।"

অপ্রত্যাশিত উত্তরে মিসেস্ দে'র মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। তোমার ভারবহনের শক্তি যে কত অল্প, তাহা আমি এ চারি বৎসরে বেশ বুঝেছি।"

জানি না, আজ কেন তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে এত আনন্দ অনুভব করিতেছেন! আজ আর কেহ কাহারও কথা নীরবে সহ্য করিবেন না বলিয়া যেন বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। কে কাহাকে অধিক ব্যথিত করিতে পারে, আজ যেন তাহারই প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। মিষ্টার দে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যাই, ব'ল না কেন? তোমাকে বে' করেছি ব'লে, তোমার আত্মীয়দের ভার বহন করতে আমি বাধ্য নই। তবুও তোমার খাতিরে আমি তাঁদের জন্য অনেক ত্যাগ-স্বীকার ক'রেছি।"

রোষ ক্ষোভে মিসেস্ দের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে ভাব গোপন করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বটে! তোমার এত অনুগ্রহ! এত দয়া! তা'দের নিন্দা ও অপমান ছাড়া অন্য কোন উপকার কখনও করেছ ব'লে ত মনে পড়্‌চে না।"

দে সাহেব টেবিল ছাড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। খাদ্যদ্রব্যে তাঁহার আর রুচি ছিল না। আইস্-ক্রীম্ অভুক্তই রহিল।

মিসেস্ দে এবার ক্রন্দনের স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমার যদি তাই মনে হয় যে, আমি ও আমার আত্মীয়েরা তোমার গলগ্রহ, তবে বেশ্ আমাদের দূর ক'রে দাও। তোমার সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া গরীবের মে'য়ে আমি না' হ'য় তা'দেরই সঙ্গে থাকিব।"

পত্নীর উপহাস ও ভৎর্সনা তিনি এতক্ষণ অক্লেশে সহ্য করিতেছিলেন কিন্তু সুন্দর বড় বড় চোখের দুফোঁটা জল পড়িতে দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলেন, "তার মানে?—" মিষ্টার দে'র স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

"তার মানে? তোমার নিষ্ঠুর তিরস্কার ও তীব্র উপেক্ষা আমার আর সহ্য হয় না। আমাকে না হয় বিদায় দাও।"

মিষ্টার দের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সরসি! তুমি পাগলের মত কি বক্‌চ? তুমি কি জান না—"

তাঁহাকে বাধা দিয়া মিসেস্ দে বলিয়া উঠিল, "এককালে মনে হ'ত, তুমি আমাকে ভালবাস। কিন্তু সে বোধ হয়, আমার বুঝিবার ভুল। যদি সত্যই ভালবাস্‌তে, তা' হ'লে তুমি কখনও আমাকে এমন করে অপমান কর্‌তে পার্‌তে না।"

দে-সাহেব এবার নরম হইয়া বলিলেন, "বাঃ, বেশ্‌ত! তুমিই বা আমাকে অপমান করতে কি বাকী রাখ্‌লে? দেখ, ঘর কর্‌তে গেলে দুজনকেই কতকটা ত্যাগ-স্বীকার কর্‌তে হয়। পরস্পর পরস্পরকে বুঝ্‌তে হয়।"

"অনেকদিন থেকেই তোমাকে বেশ্ বুঝ্‌ছি।"

মিষ্টার দে। থাক্—যা' হ'বার হ'য়ে গে'ছে। জান' ত—আমার শরীর খারাপ—সব সময় মেজাজের ঠিক থাকে না।

কিন্তু স্বামীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরসীর কোনদিন সংশয় উপস্থিত হয় নাই। সে জানিত, তাঁহার অসুস্থতা একটা ছলনা মাত্র। রাগের মাথায় অন্যায় করিয়া ফেলিলে, অথবা ভদ্র আচরণের কোনরূপ ত্রুটি হইলে, তিনি অসুস্থতার দোহাই দিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন; সুতরাং সে উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমার যদি অসুখ থাকে ত, ভাল ডাক্তার দেখাও না কেন? চন্দ্র ডাক্তার ত তোমার কোন রোগই খুঁজিয়া পায় না। যদি তা'কে বিশ্বাস না হয়, তবে কলিকাতায় ভাল ডাক্তার দেখাইয়া এস।"

মিষ্টার দে। না, না। ডাক্তারেরা আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

বিদ্রূপ করিয়া সরসী কহিল, "কোন অসুখ থাক্‌লে ত কর্‌বে!"

অপ্রতিভ হইয়া দে-সাহেব কহিলেন, "তোমার বুঝি বিশ্বাস হ'চ্ছে না?"

তখন এক অজানা আশঙ্কায় সরসীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল—স্বামীকে অবিশ্বাস!—যদি সত্য সত্যই তাঁহার অসুখ হইয়া থাকে!—আর ভাবিতে পারিলেন না। ক্রোধ, অভিমান কোথায় ভাসিয়া যাইল। তখন তিনি ধরিয়া বসিলেন যে, কা'লই সকালে কলিকাতায় গিয়া ভাল ডাক্তার দ্বারা

তাঁহার শরীর পরীক্ষা করিতে হইবে। একবার তাঁহার মনে হইতেছিল, কাল রবিবার—মিসেস্ চৌধুরীর বাড়ী টি-পার্টির নিমন্ত্রণ আছে। মিসেস্ চৌধুরী আবার তাঁহাকে বিশেষ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সরসী স্থির করিল যে, টি-পার্টির আমোদ অপেক্ষা তাহার স্বামীর এই অসুস্থতা কাল্পনিক কিনা তাহা মীমাংসা করা প্রয়োজন। তিনি সময়ে অসময়ে যা মুখে আসে তাই বলিবেন, এবং শরীরের দোহাই দিয়া দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিবেন! সে পথ বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইল।

মিষ্টার দে বাজে খরচের দোহাই দিয়া, কাজের ছুতা করিয়া, অনেক ওজর-আপত্তি করিলেন, কিন্তু কিছু হইল না। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পত্নীকে তিনি কোনমতেই টলাইতে পারিলেন না। অগত্যা মিষ্টার দে'কে বলিতে হইল, "বেশ্—তুমি যখন নাছোড়-বন্দা, তখন যাওয়াই যাবে। তা'র উপর, তুমি বলছ, তোমার মনটা নিশ্চিন্ত হবে। তখন আর উপায় কি?"

এতক্ষণ পরে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই! আমার মন থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে যাবে। আমি এখনই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি, তিনি কাহাকে দেখাইতে বলেন। কাল সকালে হয়ত আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।"

মিসেস্ দে তখনই তাড়াতাড়ি নিকটস্থ দর্পণের সম্মুখে কেশের অল্প-বিস্তর পারিপাট্য সাধন করিয়া, ভৃত্যকে লইয়া, ডাক্তারের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

কৌমুদীকিরণে প্রশস্ত রাজপথ প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুভ্র জোৎস্না চরাচর আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। অদূরে চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত দরিদ্রের কুটীরগুলি মনোরম ছবির মত দেখাইতেছিল। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য সরসীর উপভোগ করিবার সময় বা অবসর ছিলনা। চিন্তাক্লিষ্ট মনে তিনি ডাক্তারের বাড়ীর দিকে চলিতেছেন। ডাক্তার তাঁহাদের প্রতিবেশী। তাঁহাদের বিশেষ সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ডাক্তার মহাশয়ের বাটীতে পৌছিয়া দেখিলেন, তিনি সবেমাত্র 'কল' হইতে ফিরিয়া আসিয়া একাকী বিশ্রাম করিতেছেন। গ্রীষ্মাবকাশে পুত্র-পরিবার সব দেশে চলিয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে কেহ ছিল না। সহসা রাত্রিতে এমন সময়ে মিসেস্ দে'কে দেখিয়া ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, মিসেস্ দে! কি হ'য়েচে? কা'র অসুখ?"

ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, মিসেস্ দে! কি হ'য়েচে? কা'র অসুখ?"

"বিশেষ কিছু নয়," বলিয়া মিসেস্ দে আস্তে আস্তে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ ডাক্তারকে দেখাতে পরামর্শ দেন?"

ডাক্তার তাহাদিগকে বেশ জানিতেন। শারীরিক অসুস্থতা অপেক্ষা মনের অসুখই যে, তাঁহাদের প্রকৃত ব্যাধি, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "মিসেস্ দে! আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। মিষ্টার দে'র এমন কোন রোগ হয় নাই যে, কলিকাতায় গিয়া ডাক্তার দেখাতে হ'বে। তাঁর মত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া অনেকেরই আছে। এরই জন্য কলিকাতা যাবার কিছু দরকার নাই। যান—আপনি কিছু ভাব্‌বেন না। কা'ল আমি একটা ঔষধ পাঠাইয়া দিব।"

মিসেস্ দে কিন্তু কিন্তু সেই আশ্বাস বাক্যে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। অনেক কষ্টে তিনি আজ তাঁহার স্বামীকে কলিকাতায় ডাক্তার দেখাইতে রাজী করাইয়াছেন। তাই তিনি ডাক্তারকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "মাপ করিবেন! আমার ভাবনা হ'য়েচে। একবার ভাল করিয়া শরীর পরীক্ষা করাইলে ক্ষতি কি? আমার দুশ্চিন্তা দূর হ'বে।"

ইহার উপর আর তর্ক চলে না। কাজেই ডাক্তার বলিলেন, "আপনি যখন এতদূর চিন্তিত হয়েচেন, তখন পরীক্ষা করানই ভাল। আপনারা ডাক্তার ব্রাউনের কাছে যা'ন। আমার বোধ হয়, তিনিই আজকাল কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তার। আপনাকে আমি একখানি পরিচয়-পত্র লিখে দি'চ্ছি। কাল সকালে তাঁহাকে একখানা টেলিগ্রামও করিয়া দিব। আপনাদের কোন অসুবিধা হ'বে না।"

"ডাক্তার-বাবু! আপনার ঋণ আমরা কখনও শোধ কর্‌তে পার্‌ব না। আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।"

বৃদ্ধ ডাক্তার গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "ও সব শিষ্টাচারের কথা বল্‌বেন না। জানি না, কাল ডাক্তার ব্রাউন কি বল্‌বেন? কিন্তু আমি আপনাদের অনেকদিন ধরে চিকিৎসা কর্‌চি। আপনাদের ধাত আমি বেশ জানি। আপনারা দুশ্চিন্তা ও অশান্তির মধ্যে কখনও থাক্‌বেন না। আমোদ করে, স্ফূর্ত্তিকরে বেড়ান। যদি আপনাদের শরীর অসুস্থ মনে হয়, বায়ু-পরিবর্ত্তনে চলে যান। জান্‌বেন, মন যত প্রফুল্ল থাক্‌বে, শরীরও তত ভাল থাক্‌বে।"

বুদ্ধিমতী সরসীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ডাক্তার তাহাদের পারিবারিক অশান্তির উল্লেখ করিয়াই এরূপ কথা বলিলেন; একথা অন্য কাহারও মুখে শুনিলে, তিনি উহাকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিতেন কিন্তু বৃদ্ধ ডাক্তারকে তিনি বড় শ্রদ্ধা করিতেন, তাই তাঁহার উপদেশ-বাক্য তাহার নিকট তত কর্কশ বোধ হইল না।

পুনরায় ধন্যবাদ দিয়া ডাক্তার ব্রাউনের নামে পরিচয়-পত্র লইয়া তিনি গৃহে চলিয়া গেলেন।

(২)

পরদিন প্রাতে পাঁচটার সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেণের একটা ফাষ্ট ক্লাস কম্পাটমেণ্টে তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন। ট্রেণে বড় ভিড় ছিল না। মিষ্টার দে'র জনৈক উকীল বন্ধু ব্যতীত সে গাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।

দে সাহেব উকীল বন্ধুর সহিত মস্ত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। আইন, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল।

মিসেস্ দে গাড়ীর এক পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কেন সে অসুখী? তাহার কিসের অভাব? তাহার স্বামীর মত ধনবান বুদ্ধিমান স্বামী কাহার? তাহার গৃহের মত অমন মনোরম সুসজ্জিত বিলাসসামগ্রীতে পূর্ণ গৃহ এই সহরে কমই আছে। তাহার অর্থের অপ্রতুল নাই, দাসদাসীর অভাব নাই, বন্ধুবান্ধব যথেষ্ট আছে। তবে তাহার অভাব কিসের?

তাহার কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু তবু কেন সে অসুখী? অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর তীব্র উপহাস! সংসারে যে সকল সামগ্রীতে সুখ পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই ত তাহার করায়ত্ত অথচ কেন তাহার সুখ নাই!

অতীতের কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। একদিন তাহার স্বামীকে সে দেবতার মত ভক্তি করিত। এমন দিন গিয়াছে, যখন তাঁহাকে দেখিলে প্রেম-ভক্তিতে তাহার সমস্ত শরীর পুলকিত হইয়া উঠিত। বিবাহের পূর্ব্বে, কত বিনিদ্র রজনীতে সে শয্যায় শুইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে যে, তাহার হৃদয়ভরা ভালবাসা যেন

নিষ্ফল না হয়, তাহার উপাস্য দেবতাকে পূজা করিবার সুখ হইতে যেন সে বঞ্চিত না হয়। বিবাহের পর, তাহার সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ, এখনও তাহার বেশ মনে আছে। মনে পড়িয়া গেল, তার দুঃখিনীর মার কথা—"সরসী যে এমন বর পাইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।" দরিদ্র বিধবা সরসীকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু এমন সম্বন্ধ তাঁহার পক্ষে আশাতীত ছিল।

সত্যই মিষ্টার সুকুমার দেকে জামাতৃ-পদে বরণ করা গৌরবের কথা। কত কন্যাদায়গ্রস্ত জননী যে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তিনি যেমন ধনবান, বিদ্বান,তেমনি অমায়িক ও লোকপ্রিয়। ব্যারিষ্টারীতে যদিও তাঁহার বিশেষ পসার জমে নাই, কিন্তু তাঁহার অর্থের অপ্রতুল ছিল না। পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। সুতরাং বিধবা-তনয়া সরসীর এবংবিধ শিক্ষিত সচ্চরিত্র স্বামিলাভ করা, বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

সরসীবালা ভাবিতে লাগিল,—কেন এমন হইল! কেন সহসা এরূপ পরিবর্ত্তন হইল! কেমন করিয়া তাহার ভক্তি-ভালবাসা হ্রাস হইয়া গেল!

সবই কি তাহার অপরাধ? এ পরিবর্ত্তনের জন্য সেই কি কেবল দায়ী? সে ত কতদিন তাহার স্বামীর রূঢ় ব্যবহার, নিষ্ঠুর আচরণ নীরবে সহ্য করিয়াছে! পতির তীব্র উপেক্ষা, দারুণ ঘৃণা, কতদিন ত সে গোপনে সহিয়াছে! তাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে এতদিন ত কোনরূপ প্রতিবাদ করে নাই! সহিষ্ণুতারও ত একটা সীমা আছে! তাহার বিদ্রোহী মনকে কতদিন সে সংযত রাখিবে?

সত্যই পতির উপেক্ষা-অনাদর তাহার হৃদয়ে শেলসম বাজিয়াছিল। বিবাহের পর তিনি তাহাকে প্রথম প্রথম কত না আদর করিতেন। তাহার ঘন-কৃষ্ণ কুঞ্চিত-অলকের, তাহার সুললিত দেহ-লতার, তাহার তপ্ত-কাঞ্চন উজ্জ্বলবর্ণের প্রশংসায় তিনি তাহাকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত করিতেন; বেশ-বিন্যাসের পারিপাট্য না হইলে, অথবা বেশ-ভূষার সামান্য বিশৃঙ্খলা হইলে, তিনি কতই তিরস্কার করিতেন। কিন্তু এখন তিনি আর তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। পার্টিতে অন্যান্য রমণীর সৌন্দর্য্যের, তাঁহাদের বেশের তিনি এখনও আলোচনা করেন, প্রশংসা করেন। কিন্তু তাঁহার পত্নীর রূপ ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ উদাসীন। সরসী কি এতই কুরূপা হইয়াছে? তাহার সব সৌন্দর্য্য কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে?

পূর্ব্বে তিনি গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। সন্ধ্যার পর সরসীর গান না শুনিলে, তাঁহার সে দিনটা বৃথা গেল বলিয়া মনে হইত, সমস্ত কাজ-কর্ম্ম বন্ধু-বান্ধব ফেলিয়া, তিনি পত্নীর নিকট গান শুনিতে আসিতেন। কিন্তু হায়! এখন সঙ্গীতও তাঁহার ভাল লাগে না। একদিন রাত্রিতে তিনি স্পষ্টই বলিয়া ছিলেন যে, বাজনার শব্দ শুনিলে তাঁহার এখন কেমন মাথা ধরে। সেই অবধি সরসী সঙ্গীত-চর্চ্চা বন্ধ করিয়াছিল। অভিমানে, দুঃখে, লজ্জায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল।

এ পরিবর্ত্তনের জন্য কে দায়ী? কে তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে? কে তাহার হৃদয়কে পাষাণ করিয়া দিয়াছে?

তাহার হৃদয় আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে; না?—কিসের জন্য সে স্বামীর নিষ্ঠুর শ্লেষ-বাক্য সহ্য করিবে?

সরসী স্থির করিয়াছিল যে, স্বামীর অন্যায় নির্য্যাতন সে আর সহ্য করিবে না। তাঁহার অনাদরের বিনিময়ে সেও স্বামীকে অনাদর করিবে, তাঁহার উপেক্ষার উপেক্ষার দ্বারাই প্রতিশোধ লইবে। তাই মিতভাষিণী সরসী অপ্রিয়-বাদিনী হইয়া স্বামীকে যৎপরোনাস্তি শুনাইয়া দিয়াছিল।

(৩)

ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলে তাঁহারা একেবারে ডাক্তার ব্রাউনের গৃহাভিমুখে চলিলেন। গৃহে প্রবেশ-কালে দেখিলেন, জনৈক পীড়িত ব্যক্তি সম্মুখস্থিত হল হইতে বাহির হইতেছে। পুরুষটির কালিমাময় চক্ষু কোটর-গত, মুখ রক্তহীন বিবর্ণ, দেহ বিশীর্ণ।

মিসেস্ দে তাঁহার স্বামীকে আস্তে আস্তে কহিল, "দেখ্‌লে—বেচারার মুখ দেখ্‌লে?"

মিষ্টার দে।—না! কেন?

মিসেস্ দে।—দেখ্‌লে না? আহা, দেখ্‌লে সত্যই কষ্ট হয়। লোকটা যে যথার্থই পীড়িত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শেষোক্ত মন্তব্যটা মিষ্টার দে'র কাল্পনিক শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছিল।

ডাক্তারের বাড়ীতে আসিয়া মিসেস্ দে'র মনটা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; এখনই তাহার স্বামীর শারীরিক অসুস্থতা যে, অমূলক তাহা প্রমাণিত হইবে ভাবিয়া, তাহার বক্ষঃ যেন স্ফীত হইল। দে সাহেবের শরীর এখনই পরীক্ষা করা হইবে। তাঁহার নীরোগ শরীর পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ব্রাউন নিশ্চয়ই সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন। তাহারই সম্মুখে দে সাহেবকে আজ নিরুত্তর হইয়া নতমস্তকে ডাক্তার ব্রাউনের মৃদু উপহাস সহিতে হইবে। আর কখন অসুস্থতার ভান করিবার তাঁহার উপায় থাকিবে না।

কিন্তু সরসীর আশা নিস্ফল হইল। ব্রাউন সাহেবের এসিষ্টাণ্ট আসিয়া দে-সাহেবকে লইয়া গেলেন। মিসেস্ দেকে বলিয়া গেলেন যে, "তাঁহাকে এই কক্ষেই একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। একাধিক লোকের ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করিবার হুকুম নাই; বিশেষ তিনি কোন রোগীকে কোন আত্মীয়ের সম্মুখে পরীক্ষা করেন না।"

ব্রাউন সাহেবের এসিষ্টাণ্ট আসিয়া দে-সাহেবকে লইয়া গেলেন

অগত্যা মিসেস্ দেকে একাকিনী বসিয়া থাকিতে হইল। তাহার মনটা বড়ই দমিয়া গেল। ডাক্তারদের এ কি বাড়াবাড়ি! রোগীকে কি তাহার স্ত্রীর সম্মুখে পরীক্ষা করিলেও নীতি-বিরুদ্ধ হয়!

টেবিলের উপর হইতে কতকগুলি মাসিক-পত্রিকা লইয়া তিনি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই তাঁহার ভাল লাগিল না। ক্রমাগত ঘড়ি খুলিয়া দেখিতেছিলেন, কিন্তু সময় যেন আর কাটে না।

এক অব্যক্ত অজানা বেদনা কি জানি কেন তাঁহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। তাঁহার স্নেহ-হীন, সুখ-হীন, জীবন অসহ্য বোধ হইল।

হঠাৎ তাঁহার মনে কেমন একটা আশঙ্কার উদয় হইল। সত্যই যদি দে-সাহেব পীড়িত হন, যথার্থই যদি তাঁহার কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে! সরসী শিহরিয়া উঠিল। চিন্তার উদ্বেগে গৃহ মধ্যে উঠিয়া পাদচারণা করিতে লাগিল।

মিষ্টার দে'র পদশব্দ শুনিবামাত্র সরসী স্বামীর নিকট ছুটিয়া গিয়া উদ্বেগবিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তার কি বল্লেন?"

মিষ্টার দে।—ডাক্তার ত বিশেষ কিছু বল্লেন না। চন্দ্র ডাক্তারকে এই চিঠিখানা দিয়াছেন। বলে দিয়েছেন যে, এই চিঠিতেই সব বিবরণ লেখা আছে।

মিসেস্ দে।—তোমাকে কিছুই ব'ল্লেন না?

মিষ্টার দে।—কই না! আমাকে কেবল শরীরের যত্ন নিতে ও সাবধানে থাক্‌তে ব'ল্লেন। রাত্রিতে তোমাকে সব বল্‌ব। আমার এখন কলিকাতায় কতকগুলা কাজ আছে, সেরে নিতে হ'বে।

মিসেস্ দে।—সে কি! আমি কি একলা ফি'রে যা'ব?

মিষ্টার দে।—চাপরাসী তোমার সঙ্গে যা'বে। আমি সন্ধ্যার ট্রেণে নিশ্চয়ই ফি'রে যা'ব।

অভিমানে সরসীর কণ্ঠরোধ হইল; নয়নজলে তাহার দৃষ্টিরোধ করিল।

"তুমি তবে চিঠিখানা নাও, ফিরে গিয়ে চন্দ্র ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিও।" এই বলিয়া পত্নীর হস্তে পত্রখানি দিয়া মিষ্টার দে চলিয়া গেলেন।

(৪)

ট্রেণে বসিয়া মিসেস্ দে স্বামীর নিষ্ঠুর উপেক্ষার কথা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয় দুঃখে ক্রোধে অভিমানে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারই চিকিৎসার জন্য সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল, তাঁহারই অমঙ্গল-চিন্তায় সে এতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তিনি একবার তাহার সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিলেন না,—এমন কি হাওড়া ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়াও গেলেন না। এত অবহেলা—এত অপমান—এত তাচ্ছিল্য! সরসী বালিকার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

ট্রেণ ছুটিতেছিল; কত গ্রাম-পল্লী, কত পথ-মাঠ অতিক্রম করিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল। স্বামীর উপেক্ষায় মর্ম্মাহতা মিসেস্ দে কিছুই লক্ষ্য করিল না।

ডাক্তারের চিঠিখানা তাহার হাতেই ছিল। সে নিশ্চয় জানিত যে, এ চিঠিতে তাহার স্বামীর কোন রোগের উল্লেখ নাই। তাহার সে ক্ষণিক আতঙ্ক, মানসিক উদ্বেগ মাত্র! আজ সন্ধ্যাবেলা দে সাহেবকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি নীরোগ—তাঁহার কোন অসুখ নাই।

কিন্তু—কিন্তু যদি সত্যই তাঁহার কোন অসুখ করিয়া থাকে! সন্দেহ-দোলায় তাহার মন দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য তাহার তখন ছিল না। উচ্চ-শিক্ষিতা হইয়াও চিঠিখানা পড়িবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না। অপরাধীর মত কম্পিতহস্তে খামের একপার্শ্ব ছিঁড়িয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

ব্রাউন সাহেব লিখিতেছেন যে, 'তিনি মিষ্টার দে'র কেস্ বিশদরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। পত্রে তিনি মতামত ও ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছেন।'

আগ্রহসহকারে সরসী ব্যবস্থা-পত্রখানি পড়িতে লাগিল। প্রথমেই লেখা আছে;—

"স্নায়বিক পীড়া; ফুসফুসও আক্রান্ত হইয়াছে। পীড়া সাংঘাতিক। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রোগী মারা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও মনের প্রফুল্লতা একান্ত আবশ্যক। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা বা মানসিক

অপরাধীর মত কম্পিতহস্তে খামের একপার্শ্ব ছিঁড়িয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন

উত্তেজনা রোগীর পক্ষে মারাত্মক। নিম্নলিখিত ঔষধ রোগীকে খাইতে দিবেন।—"

সরসী আর পড়িতে পারিল না;—তাহার কম্পিত হস্ত হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল! মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, বক্ষের স্পন্দন যেন থামিয়া গেল, শ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিল!

কি সর্ব্বনাশ! এ যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা—এ যে বজ্রাঘাত! মিসেস্ দে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। চিন্তা করিবারও তাহার আর সামর্থ্য রহিল না।

(৫)

ট্রেণ বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌছিলে নামিবার সময় মিসেস্ দে তাড়াতাড়িতে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন। ডাক্তারের চিঠিখানা গাড়ীর মধ্যেই পড়িয়াছিল। চাপরাসী তাহা দেখিতে পাইয়া, পত্রখানি তাঁহার হাতে উঠাইয়া দিল।

কোচম্যানকে চন্দ্র ডাক্তারের গৃহাভিমুখে যাইতে আদেশ করিয়া, মিসেস্ দে গাড়ীতে উঠিল। সবল তেজস্বী অশ্ব দ্রুতগতিতে ছুটিল।

ডাক্তারের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিলে সরসী গৃহে প্রবেশ করিয়া শুনিল,—ডাক্তার বাড়ীতে নাই, তাঁহার ফিরিতে বেশী রাত্রি হইবে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষণেক চিন্তার পর তিনি ডাক্তারের ভৃত্যকে কহিলেন, "চল, আমাকে আফিস-ঘরে লইয়া চল। আমি ডাক্তার বাবুর জন্য চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইব।"

ভৃত্য তখনই তাহাকে সসম্মানে আফিস ঘরে লইয়া গেল। মিসেস্ দে চেয়ারে বসিয়া কাগজ লইয়া চিঠি লিখিবার উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু কি লিখিবেন সহসা বুঝিতে পারিলেন না—চোখের জলে চিঠির কাগজখানা নষ্ট হইয়া গেল। আর একখানা চিঠির কাগজে, অনেক কাটাকুটি করিয়া, সরসী কোন মতে চিঠি লেখা শেষ করিল।

বেশী কিছু নয়। সে চন্দ্র ডাক্তার বাবুকে অনুরোধ লিখিল যে, "ডাক্তার ব্রাউনের ব্যবস্থার মর্ম্ম, তাহার স্বামীকে যেন জানান না হয়। ডাক্তারী শিষ্টাচার ইহাতে ক্ষুব্ধ বা আহত হইবে কি না, তাহা সে জানে না, কিন্তু কেবল বন্ধুত্বের অনুরোধে তিনি যেন এ কথা গোপন রাখেন।"

তাহার স্বহস্ত-লিখিত পত্র ও ডাক্তার ব্রাউনের চিঠি, এই দুইখানি, একত্র একখানা বড় খামে বন্ধ করিয়া, চাকরের হাতে দিয়া, বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন, ডাক্তার বাবু আসিলেই যেন এই চিঠিখানা তাঁহাকে দেওয়া হয়।

বাড়ী পৌছিয়া সরসী একেবারে উপরের শুইবার ঘরে চলিয়া গেল; পর্দ্দা ফেলিয়া সে নিকটস্থ একখানা কোচে শুইয়া পড়িল।

অসহ্য মনোবেদনায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। ব্রাউন সাহেবের ব্যবস্থা-পত্রখানি তাহার মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল;—তুমুল ঝড় তুলিয়া দিয়াছিল।

সরসী ভাবিতে লাগিল, "পীড়া সাংঘাতিক—রোগী হঠাৎ মারা যাইতে পারে।"—"কোনরূপ দুশ্চিন্তা অথবা মানসিক অশান্তি রোগীর পক্ষে মারাত্মক।" হায় হায়! আমিই স্বামিঘাতিনী? আমিই ত তাঁহার হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছি, কত মিথ্যা-কলহ করিয়া তাঁহাকে কত না যন্ত্রণা দিয়াছি! আমিই ত স্বামীর প্রাণনাশের কারণ হইয়াছি!—ধিক্ আমার অভিমানে—শতধিক্ আমার হৃদয়-দুর্ব্বলতাকে!—অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্র তাহাকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিল।

এখন কি আর কোন উপায় নাই! তাঁহাকে কি আর কোনমতেই কালের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় না!—শোকে, দুঃখে, অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া সরসী বহুক্ষণ কাঁদিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ তাহারই অপরাধের শাস্তি—তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সহসা বাহিরে শব্দ হইল। "মেম সাহেব!—চা তৈয়ারি" বলিয়া খানসামা ডাকিল। আপনাকে বহুকষ্টে সংযত করিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে উত্তর করিলেন যে, "তিনি আজ চা' খাইবেন না। তাঁহাকে যেন বিরক্ত করা না হয়।"

ট্রেণের সময় হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের শেষ-রশ্মি

দিক্‌চক্রবালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে,—দে'সাহেব এখনিই আসিয়া পড়িবেন।

উদ্বেগের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতেই হইবে, অন্তরের নিদারুণ জ্বালা গোপন রাখিতেই হইবে। তাড়াতাড়ি বেশভূষা করিয়া সরসাবালা ড্রয়িংরুমে নামিয়া আসিলেন। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, সাতটা বাজিয়াছে। ট্রেণ আসিতে এখনও একঘণ্টা বিলম্ব আছে।

অশান্ত মন চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সরসী আপনার ডেস্কের নিকট বসিয়া ছবির বই লইয়া উল্‌টাইতে লাগিলেন।

শোকে দুঃখে, অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল

সহসা লাল-ফিতা-বাঁধা কতকগুলি চিঠি তাঁহার নজরে পড়িল। সেগুলি তাঁহার বাপের বাড়ীর চিঠি। ফিতা খুলিয়া চিঠি-গুলি পড়িতে লাগিলেন।

প্রথম-খানা তাহার ভাই যতীনের চিঠি। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে জামাই-বাবু যে তাহাকে 'গ্রিপ্-ডম্বল্' উপহার দিয়াছেন, এজন্য সে জামাইবাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ করিয়াছে। দ্বিতীয়-খানি বোনের চিঠি। ইহাতেও জামাইবাবুর প্রশংসার উল্লেখ আছে।—এইরূপে সরসী চিঠি-গুলি পড়িতে পড়িতে দেখিল যে, সকলগুলিই দে সাহেবের প্রশংসায় পূর্ণ!

সরসী বুঝিল যে, কাল সে তাহার স্বামীকে সম্পূর্ণ মিথ্যা-তিরস্কার করিয়াছে। সত্যই দে সাহেব তাহার আত্মীয়দের জন্য অনেক করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি আপত্তি-ওজর করিতেন বটে, কিন্তু মোটের উপর তিনি তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সে অকৃতজ্ঞ—মিথ্যাবাদী, তাই সে কাল স্বামীর উপর অলীক অপবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

সরসী তাহার চরিত্র-সংশোধন করিবার জন্য—তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

(৬)

অবকাশকালে দে সাহেব বাহিরে যাইলে, মিসেস্ দে যেমন পতিকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া গৃহে আনিতে গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে যাইতেন, আজও তেমনি যথাসময়ে গাড়ী লইয়া গেলেন।

দূর হইতে জনতার মধ্যে, তিনি দে সাহেবকে দেখিতে পাইলেন; যেন তাঁহাকে অধিকতর অসুস্থ ও বিবর্ণ বোধ হইল।

দে সাহেব পত্নীকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "চল—হেঁটে যা'বে? বেশ চাঁদের আলো হ'য়েছে।" পূর্ব্বেও জ্যোৎস্না-রাত্রিতে তাঁহারা অনেক দিন পদব্রজে গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেন। মিসেস্ দে উত্তর করিলেন, "না—না! তুমি আজ নিশ্চয়ই বড় ক্লান্ত হ'য়েচ। গাড়ীতেই যাওয়া যাক্, চল।"

গাড়ীতে বেশী কিছু কথা হইল না। পাছে রুদ্ধ-সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাই, কথা না কহিয়া, সরসী আবেগভরে স্বামীর হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

ডিনারের সময় খাইতে খাইতে দে সাহেব বলিলেন, "আজ একটা ভাল খবর আছে। অনেক্ কষ্টে আজ মিঃ মুখুজ্যেকে ধরেছিলুম। প্রথমে তাঁর বাড়ী গেলাম, শুনিলাম, তিনি মিটিংএ গেছেন; কিন্তু সেখানেও তাঁর দেখা পেলাম

না। হতাশ হ'য়ে ফিরিতেছিলাম, শেষে, পথে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। যতীনের চাকরী সম্বন্ধে তিনি খুব আশা দিয়েছেন, বলেছেন তিনি যথাসাধ্য কর্‌বেন।"

স্বামীর নিঃস্বার্থপরতায় সরসী মুগ্ধ হইল। তিনি তাহারই কাজে, তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই সমস্ত দিন এই গরমে ঘুরিতেছিলেন। আর, সে কি না তাঁহাকেই সন্দেহ করিতেছিল!—বুঝিবার এমনই ভুল হয়।

কম্পিতকণ্ঠে সরসী উত্তর করিল, "আজ আমি তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি।"

দে সাহেব। না—কষ্ট কিছুই নয়। আমি বড় কুড়ে। কাল যখন তুমি আমাকে ব'লেছিলে, তখন কাজের ভয়ে আমি একটা ছুতা ক'রেছিলাম। কাজের নামে আমার আতঙ্ক হয়।

তখন ডাক্তারের কথা তাহার মনে হইল, "রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক।" জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরে এই দারুণ গ্রীষ্মে, হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া, আজই তাঁহার মৃত্যু হইতে পারিত!—এই দুশ্চিন্তায় সরসী শিহরিয়া উঠিল। তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল—চক্ষু অশ্রুভারাবনত হইল। সে, স্বামীর কথার উত্তর দিতে পারিল না। নীরবে আহার করিতে লাগিল।

আহারের পর ড্রয়িং-রুমে গমন করিয়া, তাহারা একখানা মখমল-মণ্ডিত সুকোমল সোফাতে উপবেশন করিল। সুমার্জ্জিত মূল্যবান আসবাবপরিপূর্ণ ঘরটি সমুজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত হইয়া যেন ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল।

অন্যদিনের মত, আজ আর দে সাহেব নভেল লইয়া পড়িতে বসিলেন না। মিসেস্ দে'ও আজ তাঁহার অভ্যস্ত সেলাই কার্য্য করিলেন না। আজ উভয়েরই হৃদয় পূর্ণ।

পত্নীর সজল শোক-তপ্ত ম্লান মুখখানি দেখিয়া দে সাহেব অনুতপ্ত হইলেন। গত রাত্রির তীব্র ভর্ৎসনায় যে তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে যথেষ্ট আঘাত লাগিয়াছে, তাহা তাঁহার বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

মিষ্টার দে, সস্নেহে পত্নীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "সরসী! কাল তোমার উপর আমি বড় অন্যায় ব্যবহার ক'রেছি;—আমায় ক্ষমা ক'র। আমি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যে, আর কখন এমন রূঢ় ব্যবহার ক'র্‌ব না।—আমাকে ক্ষমা কর্‌বে না?"

সরসীর হৃদয় আর কোন বাধা মানিল না;—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রিয়তম! তুমি ত কোন অন্যায় কর নাই। আমারই অন্যায়। আমি তোমার উপর কত অন্যায় করেছি, তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি,—সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুমি ক্ষমা না কর্‌লে আমি পাগল হ'য়ে যা'ব।"

পত্নীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া দে সাহেব সস্নেহে বলিলেন, "সরসী, ছিঃ! কেঁদো না। তুমি আমাকে কত ভালবাস সে কি আমি জানি না?"

এমন সময় বাহিরে শব্দ হইল। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, ডাক্তার বাবু মেম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।

মিসেস্ দে, মুখ চোখ মুছিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন এবং স্বামীকে বলিলেন, "তুমি ক্লান্ত হ'য়েছ—ব'স; আমি ডাক্তারের সহিত কথা ক'য়ে আসি।" এই বলিয়া তিনি উদ্বিগ্নহৃদয়ে অধীর হইয়া নীচে চলিয়া গেলেন।

মিসেস্ দে'র সজল অক্ষি-প্রান্ত, স্ফীত-কম্পিত ওষ্ঠ দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই ডাক্তার সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না; ভয়ের কোন কারণ নাই;—আপনার স্বামীর কোন অসুখ নাই। যে ব্যবস্থাপত্র দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন, সেটা অন্য রোগীর ব্যবস্থাপত্র, মিষ্টার দে'র নহে। ডাক্তার ব্রাউন, ভুল করিয়া, অন্য এক রোগীর ব্যবস্থাপত্র আমার খামের ভিতর পুরিয়া দিয়াছিলেন। মিষ্টার দে'কে পরীক্ষা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই জনৈক রোগীকে তিনি পরীক্ষা করেন। গোলমালে মিষ্টার দে'র ব্যবস্থাপত্র তাহার চিঠির সহিত চলিয়া গিয়াছে, এবং তা'র ব্যবস্থাপত্র মিষ্টার দে'র চিঠির সঙ্গে এসেছে।"

তখন মিসেস্ দে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; মনের অসহ্যভার অনেকটা লঘু হইয়া আসিল। কিন্তু এত বড় শুভ সংবাদটায় সহসা তাহার বিশ্বাস হইল না; তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বলেন কি? এত বড় ভুলও কি সম্ভব!"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "হাঁ, ডাক্তার ব্রাউন তখনই টেলিগ্রাম করিয়া পাঠান। আমার কোন উত্তর না পে'য়ে,

তিনি একটা লোক পাঠিয়ে দিয়াছেন। এই দেখুন, মিষ্টার দে'র ব্যবস্থাপত্র।"

মিসেস্ দে'র এবার আর অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ রহিল না। ডাক্তার ব্রাউনের গৃহে প্রবেশ করিবার সময় তিনি যে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, তাহার কথা তখন তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার সংশয় একেবারে দূর হইল; উল্লাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার বিবর্ণ ম্লানমুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি যেন মৃত্যুদণ্ডের কঠোর আদেশ হইতে মুক্তি পাইলেন!

ডাক্তার কহিলেন, "চলুন, একবার মিষ্টার দে'র সঙ্গে দেখা করে আসি।"

মিসেস্ দে উত্তরে বলিলেন, "মাপ করবেন! আজ থাক্। আপনিও ক্লান্ত হ'য়েছেন—উনিও শ্রান্ত হয়ে প'ড়েচেন। কাল আমরা উভয়েই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

আজ, পরিপূর্ণ মিলনের দিনে, তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গ সরসীর ভাল লাগিল না।

ব্যর্থ প্রভাত

[শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়]

উঠে গেছে রবি, নাহি তার দেখা,
উঠানে এসেছে রোদ;
তার প্রিয় ফুল সব গেছে ফুটে,
নাহি তার বেলা-বোধ!
ঘাসের মুকুতা আলোকে জ্বলিয়া
কখন্ গিয়াছে মরি,'
সমীর-পরশে ফুলের শিশির
কখন্ গিয়াছে ঝরি!
প্রথম প্রভাত -কাকলী কখন্
দিয়ে গেছে তারে সাড়া;
বেলা বেড়ে যায়, পোষা শারী তার
ডাকিয়া জাগা'ল পাড়া!
কত গালি পাড়ে— তবু ঘুম তার!
পোড়ামুখী নাহি জাগে;
ঝাপটিয়া পাখা কত ব'কে যায়,
গর গর করে রাগে!
'শ্যামলী' 'পিয়ালী'— গাই দুটি তার
আছে বৃথা পথ চেয়ে!
দোহনের বেলা কখন্ হ'য়েছে,
কেহ ত আসে না ধেয়ে!
পড়ে নাই ঝাঁট উঠানে এখনো,
দুয়ারে দেয় নি জল;
গৃহ—দেবতার— পানে চাহি, মোর
আঁখি কেন ছল-ছল!

ব্যর্থ সন্ধ্যা

তুলসীর তলে জ্বলে নাই দীপ,
কুটীরে আমার আলো;
একা ব'সে আছি, ব'য়ে যায় সাঁঝ,
একি ব্যবহার ভালো!
সব গৃহে আজ্ বেজে গেছে শাঁখ,
আজি কেন তার দেরি?
মোর শয্যাটি আগে ভাগে পাতি'
রাখিত,—আজি না হেরি!
বিড়ালটি তার ঘুরিছে ফিরিছে,
ফুকরি' ডাকিছে তারে;
পায় নি আহার— আদর তাহার
ধরা সে দেয় না কারে!
সব তারাগুলি উঠিল জ্বলিয়া—
আকাশে সাঁঝের বাতি,
মোর গৃহে দীপ জ্বলিল না শুধু,
সে কোথায়?—হ'ল রাতি!
বীণাখানি ল'য়ে বাজাইতে যাই
রাখিয়া কোলের' পর,
বে-সুর বাজিতে নামাইয়া রাখি,
গাঢ় হ'য়ে আসে স্বর!
সর-সর করি' ব'য়ে যায় বায়ু,
চমকি ফিরিয়া চাই—
শ্বসি' বায়ু বলে— কি কঠোর ভাষ—
"সে যে নাই—সে যে নাই!"

বর্ণমালার অভিব্যক্তি

[শ্রীতারকনাথ রায়, B. A.]

যে দিন বর্ণমালার আবিষ্কার হইয়াছিল, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সে দিন চিরস্মরণীয় !

সদ্য লাঙ্গূলভার-মুক্ত মর্কটসন্তানের কণ্ঠ হইতে ইতর জীব-সাধারণ জড়তা-বিনির্ম্মুক্ত সুস্পষ্ট ধ্বনি উত্থিত হইয়া যে দিন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই দিন ধরাধামে মানবের প্রথম আবির্ভাব ;—সেই দিন মানব ও ইতর জীবের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি! সেই দিন, জড়ের সাহায্যে চিৎকে ব্যক্ত করিবার উপায় প্রথম সৃষ্ট হয়, বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত মানসিক ভাব ইন্দ্রিয়-গোচর শব্দদ্বারা ব্যক্ত করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হয়। যে দিন মানব এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শব্দ অনুচ্চারিত রাখিয়া চক্ষুগ্রাহ্য চিহ্নদ্বারা তাহাকে জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন সভ্যতার শৈশবস্থে মানব বহুদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সভ্যতার সেই আদিম অবস্থা হইতে এই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে কত-লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল—তাহা কে বলিবে ?

সভ্যতার এই দুই স্তরের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। সুস্পষ্ট ধ্বনির অধিকারী হইয়া মানুষ শব্দদ্বারা পদার্থ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শব্দ ধ্বনির সমষ্টি। পশুপক্ষিগণেরও ধ্বনি আছে ; তাহারাও যে ধ্বনি দ্বারা কিছু ব্যক্ত করে না, তাহাও নয়। কোকিল মনের আনন্দে গান করে, আবার বিপদে পড়িয়া আর্ত্তনাদও করে। কিন্তু গান করিবার সময়ে বলে—'কু', আর্ত্তনাদ করিবার সময়ও বলে—"কু" ; পার্থক্য এই, আর্ত্তনাদ-কালে এই 'কু' শব্দটি দ্রুত উচ্চারিত হয়—কু-কু-কু-কু ; একই ধ্বনি কখনও ধীরোচ্চারিত কখনও দ্রুতোচ্চারিত। একই ধ্বনির উচ্চারণের প্রকার-ভেদ বেশী হইতে পারে না—সুতরাং তদ্দ্বারা মানসিক অবস্থাও বেশী ব্যক্ত হয় না। মানুষের কণ্ঠ বহুবিধ ধ্বনির উচ্চারণ করিতে সমর্থ। এই সমস্ত ধ্বনির নানাপ্রকার সমবায়ে নানা শব্দের উৎপত্তি। নানা শব্দে নানা অর্থ সূচিত হয়। এই ক্ষমতার অধিকারী না হইলে, মানবের চিন্তা কখনও উৎকর্ষ-লাভ করিতে পারিত না ;—মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ইতর জীবের বুদ্ধির মতই চিরকাল রহিয়া যাইত। আমাদের চিন্তা অন্যের গোচর করিবার জন্যই যে কেবল শব্দের প্রয়োজন, তাহা নহে ; চিন্তার উৎকর্ষও শব্দব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে না। ক্ষুধা-শান্তির উপায়-চিন্তা শব্দের সাহায্য ব্যতীত সম্ভবপর হইতে পারে ; কিন্তু আতাফল কেন, বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হয় তাহার অনুসন্ধান শব্দের সাহায্য ব্যতীত কখনই সম্ভবে না। এক-জাতীয় বহুপদার্থজ্ঞাপক শব্দের সাহায্য না পাইলে, মানবের চিন্তা সামান্য কয়েকটি পদার্থেই আবদ্ধ হইয়া থাকিত। শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিলে, মানুষ কখনও একজাতীয় সমস্ত পদার্থকে, একটি মাত্র ভাব দ্বারা, আপনার মনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইত না।

কিন্তু, নানা ভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী শব্দের অধিকারী হইয়াও, যতদিন মানব সেই সমস্ত শব্দকে চক্ষুর্গোচর করিতে না পারিয়াছিল—তত দিন মানব-সভ্যতার গতি অতি মন্থর ছিল। তখন তাহার স্মৃতির উপরেই তাহাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতে হইত। মানবের স্মরণশক্তি সীমাবদ্ধ ;—শব্দকে স্থায়িত্ব দান করি-বার উপায় না থাকিলে, মানুষ অনেক সময় বহুকষ্টে অর্জ্জিত জ্ঞান ভুলিয়া যাইত। একজনের অর্জ্জিত জ্ঞানের ফল, তাঁহার সংসর্গে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাই ভোগ করিতে পারিতেন ;—দূরস্থ কেহই সে জ্ঞানের সন্ধান পাইতেন না। যেদিন শব্দকে দৃশ্যমান আকারে পরিণত করা হইয়াছিল, সেই দিনই মানবের চিন্তা দূরে প্রেরণ করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

পদার্থ বুঝাইবার জন্য কখন মানুষ-কর্ত্তৃক প্রথম

ধ্বনির ব্যবহার হইয়াছিল, অতীতের কুহেলিকায় তাহা সমাচ্ছন্ন। প্রাকৃতিক উদ্বর্ত্তনের ফলে, মানুষ শব্দের ব্যবহার শিখিয়াছিল। প্রথমতঃ, বহিরিন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ বুঝাইতেই শব্দের ব্যবহার হইয়াছিল। পরে, মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করিবার জন্যও, শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু, এই সমস্ত শব্দকে বাহ্য-অবয়ব-দানের চেষ্টা, বহুপরে সংঘটিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে, চিত্র-দ্বারা পদার্থ-প্রকাশের আর একটা চেষ্টা সমুদ্ভূত হইয়া, প্রথমোক্ত চেষ্টাকে বহুপরিমাণে সহজ করিয়া দিয়াছিল।

সে চিত্র-লিপিবিদ্যা বড়ই স্থূল রকমের ছিল। "গরু" বুঝাইতে একটি "গরু"ই অঙ্কিত হইত;—"গরু চরিতেছে" বুঝাইতে একটি চলন্ত গরুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইত। চিত্রবিদ্যা তখন হীন-অবস্থায়; সুতরাং, এই চিত্রগুলিদ্বারা তদুদ্দিষ্ট পদার্থগুলি যে নিতান্ত অস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত পদার্থের অবয়ব নাই;—বায়বীয় ও তরল পদার্থের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা দুঃসাধ্য।—এই সমস্ত পদার্থ বুঝাইতে, তাহাদের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত স্থূলতর বস্তুর চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার সহিত এমন কতকগুলি অতিরিক্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, যাহাতে উদ্দিষ্ট পদার্থের ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। কিন্তু, জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত মানবের পরিচিত পদার্থের সংখ্যা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, উপরোক্ত প্রণালীর অনুপযোগিতাও ততই উপলব্ধ হইতে লাগিল। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য, এক অত্যাশ্চর্য্য উপায় অবলম্বিত হইল।

এতদিন পদার্থকে মুখ্যতঃ প্রকাশ করাই এই সমস্ত চিত্রের উদ্দেশ্য ছিল। গরুর চিত্রদ্বারা সেই চতুষ্পদ জন্তুকেই বুঝাইত; সে জন্তুর নাম, 'গরু' না হইয়া, "কাউ" হইলেও সে চিত্রের কিছু ক্ষতি ছিল না; কেন না নামের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। বিভিন্ন-ভাষাভাষী লোকেরও সে চিত্র ব্যবহারপক্ষে বিশেষ কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু, এই প্রণালীর অসুবিধা উপলব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ উদ্দিষ্টদ পার্থকে ত্যাগ করিয়া তৎসূচক শব্দকেই ব্যক্ত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। তখন, ছোট ছোট শব্দগুলির জন্য, ও বড়বড় শব্দগুলিকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করিয়া—সেই সমস্ত শব্দাংশের (syllableএর) জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিত্র ব্যবহৃত হইতে আরব্ধ হইল।

কিন্তু এ প্রণালীতেও অসুবিধা সম্যক্ বিদূরিত হইল না।—এতদিনে মানবের শব্দসম্পদ বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক শব্দের জন্য স্বতন্ত্র-চিহ্ন ব্যবহার দুঃসাধ্য হইয়াছিল। শব্দাংশের জন্য চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় যদিও কতকগুলি চিহ্নের সমবায়ে অনেক শব্দ লিখিত হইতে পারিত, তথাপি, সেই শব্দাংশসূচক চিহ্নও অত্যধিক হইয়া পড়ায়, প্রচুর অসুবিধার উপলব্ধি হইত। এই অসুবিধা দূরীকরণের চেষ্টা হইতেই বর্ণমালার উদ্ভব। দেখা গেল, মানবকণ্ঠ হইতে যত শব্দই উচ্চারিত হয়, তাহা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক মূল-ধ্বনির সমবায়ে গঠিত। এই মৌলিক ধ্বনিগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত হইল, এবং প্রতি মৌলিক ধ্বনির জন্য একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হইল। এই মৌলিক ধ্বনিসমূহ-সূচক চিহ্নাবলীই বর্ণমালা।

মিশরীয় চিত্রলিপি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমরা বর্ণমালার ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করিব। মিশরীয় ভাষায় "মাত" শব্দের অর্থ 'চক্ষু'। "মাত" শব্দের বহুবচন "মৌই"। একটি চক্ষুর দ্বারা এক চিত্র, চক্ষু এবং দুইটির দ্বারা একাধিক চক্ষু ব্যক্ত হইত।

"বা" শব্দের অর্থ 'আত্মা'; আত্মা, দৃষ্টিগোচর পদার্থ নহে। সুতরাং, কোনও চিত্রদ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা সুসাধ্য নহে। কিন্তু আত্মা—শুদ্ধ পবিত্র পদার্থ। মিশরদেশে "আইবিশ" নামক এক প্রকার পক্ষী ছিল, তাহাকে মিশরীয়গণ দেবতা বোধে পূজা করিত; বৃষও মিশরীয়গণের পূজ্য ছিল। সুতরাং পবিত্রতা গুণটি—আত্মা, আইবিশ পক্ষী ও বৃষ, এই তিনেই সাধারণ ছিল। তাই, "আত্মা" বুঝাইতে, আইবিশ অথবা বৃষের প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু, আইবিশ ও বৃষ হইতে বিশেষ করিবার জন্য, উক্ত প্রতিকৃতির সহিত এক একটি চিহ্ন প্রদত্ত হইত; সেই চিহ্ন দ্বারাই উক্ত প্রতিকৃতিকে "আত্মার" জ্ঞাপক বলিয়া বোঝা যাইত। যথা—

আইবিশ বৃষ

আত্মা—

আইবিশ পক্ষীর উপরে যে রেখা, ও বৃষের নিম্নে যে চিহ্নটি, দৃষ্ট হইতেছে,—উহাদ্বারাই "আত্মা" সূচিত হইতেছে। "নেট" শব্দের অর্থ 'মধু'। একটি মধুমক্ষিকার পশ্চাতে একটি মধুভাণ্ড অঙ্কিত করিয়া 'মধু' বোঝানো হইত।

দুইটি চক্ষুর চিত্র অঙ্কিত করিয়া বামটির উপরে একটি চতুষ্কোন ও দক্ষিণটির উপর অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন দিয়া এই চিত্রদ্বারা "দেখা" ক্রিয়ার অর্থ সূচিত হইত।

নিম্নে শব্দের চিহ্নস্বরূপ চিত্রের ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

মিশরীয় ভাষায় "পা" শব্দের অর্থ 'পক্ষী'। কিন্তু ইংরেজী 'the' শব্দ ও বাঙ্গালা "টা" প্রত্যয় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থেও 'পা' শব্দ ব্যবহৃত হইত। একটি পক্ষীর চিত্র দ্বারা 'পা' শব্দ উভয় অর্থেই লিখিত হইত। এখানে স্পষ্টই পক্ষীর চিত্রদ্বারা "টা" শব্দটিই সূচিত হইত, তৎসূচিত পদার্থ নহে। "মেহ" শব্দের অর্থ ছিল—'পরিপূর্ণ করা।' এই চিত্রটিদ্বারা "মেহ্" শব্দ সূচিত হইত। এই চিহ্নদ্বারা "পেট" ('আকাশ') শব্দ সূচিত এবং একটি পক্ষীর চিত্রদ্বারা "তা" ('পুরুষ') শব্দ লিখিত হইত।

ইহার পরেই অক্ষরের সৃষ্টি। মিশরীয় ভাষার অক্ষর গুলিও নানাবিধ পদার্থের চিত্র। নিম্নে কয়েকটি অক্ষরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল;—

অ = (ঈগল পক্ষীর ছবি)

আ = (শর গাছ)

ই = অথবা

উ = অথবা

এ =

ক =

ট =

থ =

প =

ফ =

ব =

ম = (পেচক) অথবা

হ =

স =

ন =

স = (বাগান)

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উপরে বর্ণমালার ক্রমবিকাশের যে কয়েকটি স্তর প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই প্রাচীন মিশরীয়-লিপিতে বর্ত্তমান ছিল। শব্দের মৌলিক বিশ্লেষণের পূর্ব্বে, যে যে ছবি দ্বারা এক একটি শব্দ লিখিত হইত, পরে সেইগুলিই মৌলিক-ধ্বনি (বর্ণ) গুলি লিখিতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন আর প্রতিশব্দের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র চিত্রের প্রয়োজন ছিল না—অথবা শব্দ-নিরপেক্ষভাবে পদার্থ বুঝাইতেও সেই পদার্থের চিত্র ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মিশরীয়গণ ইহার অনাবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা, বর্ণমালা আবিষ্কার করিবার পরেও, প্রাচীন লিপিপদ্ধতি ত্যাগ করে নাই; বর্ণমালা ও চিত্রলিপির ব্যবহার সমান রূপেই তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনেক সময়ে, তাহারা শব্দাংশবোধক চিত্র অথবা অক্ষরদ্বারা শব্দবিশেষের বানান করিয়া, তৎপার্শ্বেই সেই শব্দনির্দ্দিষ্ট পদার্থের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিত। "কেফ্‌টেন" শব্দের অর্থ 'বানর।' এই শব্দ লিখিতে প্রথমে অক্ষর দ্বারা তাহারা শব্দটি লিখিত, তৎপরে একটি বানরের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিত। "জেন্নু" শব্দের অর্থ 'অশ্বারোহী সৈনিক।' অক্ষর দ্বারা উক্ত শব্দ বানান করিয়া, তৎপরে তাহারা একটি অশ্বের চিত্র অঙ্কিত করিত। "তাটু" শব্দের অর্থ 'পশু'। উক্ত শব্দ লিখিতে প্রথমে অক্ষর ব্যবহৃত হইত; তৎপরে পশুবিশেষের চিত্র ও তৎপশ্চাতে একখানি চর্ম্ম অঙ্কিত হইত। বহুবচন বুঝাইতে, সর্ব্বশেষে তিনটি সরল রেখা টানা হইত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সমস্ত পদার্থের প্রতিকৃতি নাই; সেইগুলি বুঝাইতে, তৎপদার্থদ্যোতক কোনও বস্তুর চিত্র ব্যবহৃত হইত। যাবতীয় ভাষাতেই অনেক শব্দ, একাধিক
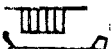
অর্থে প্রযুক্ত হয়। অনেক সময়, অর্থভেদ প্রকাশ করিতে স্বতন্ত্র বানান ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী To, Too & Two শব্দের উচ্চারণ প্রায় একরূপ; কিন্তু বানান স্বতন্ত্র। মিশরীয় ভাষায় একাধিক অর্থবোধক শব্দ, বিভিন্ন চিত্রদ্বারা লিখিত হইত। "পা" শব্দের অর্থ 'পক্ষী', 'টা' (the) ও 'গৃহ'; প্রথম দুই অর্থে একটি উন্মুক্তপক্ষ পক্ষীর চিত্র ব্যবহৃত হইত, কিন্তু 'গৃহ' অর্থে এই চিত্র ব্যবহৃত হইত। 'পাউট' শব্দের অর্থ (১) 'দল' (বহু), (২) 'নয়', (৩) 'উপাদান', (৪) 'উত্তম'। স্বতন্ত্র চিত্র দ্বারা এই সমস্ত অর্থ সূচিত হইত; যথা—
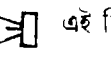
(১) (২) ||| ||| ||| (৩) পর পর তিনটি ভিন্ন-জাতীয় পক্ষীর চিত্র ও তৎপরে এই চিত্র (৪) উন্মুক্তপক্ষ পক্ষীর চিত্র ও তৎপার্শ্বে একটি অর্দ্ধচন্দ্রের নীচে একটি ডিম্বাকৃতি চিত্র।

অনেক সময় এতাদৃশ শব্দ, অক্ষর সংযোগে প্রথম লিখিত হইত, তৎপরে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন চিত্র শব্দের পরে সন্নিবেশিত হইত; যথা—

"উন" শব্দের অর্থ (১) হওয়া (২) খোলা (৩) তীর্থ (৪) আকৃতি (৫) ক্ষৌর-কর্ম্ম (৬) লঘুত্ব (৭) চুল তোলা। প্রথম অর্থে শব্দটি শুধু অক্ষরযোগে বানান করিয়া লেখা হইত। দ্বিতীয় অর্থে উক্তরূপে লিখিত শব্দের পশ্চাতে একটি কুলুপ ও চাবির চিত্র প্রদত্ত হইত। তৃতীয় অর্থে শব্দের নিম্নে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। চতুর্থ অর্থে এই চিহ্ন ও পঞ্চম অর্থে এই চিহ্ন প্রদত্ত হইত। ষষ্ঠ অর্থে শব্দের পার্শ্বে একটি পক্ষীর চিত্র, ও সপ্তম অর্থে তিনগাছি লম্বমান চুলবিশিষ্ট এক মনুষ্য চিত্র অঙ্কিত হইত।

"পেট" শব্দ অক্ষর সাহায্যে এইরূপ লেখা হইত;—"পেট" অর্থে—(১) আকাশ (২) স্বর্গ, ও মর্ত্ত (৩) স্বর্গ, মর্ত্ত ও নরক (৪) দেখা (৫) মালিকা (৬) বিস্তার করা। প্রথম অর্থে শব্দের নিম্নভাগে (আচ্ছাদনের চিত্র); দ্বিতীয় অর্থে শব্দের নিম্নে ও শব্দের পার্শ্বে তৃতীয় অর্থে ব্যবহৃত শব্দও চিত্রের পশ্চাতে প্রথম একটি তারকার চিত্র ও তৎপরে ; চতুর্থ অর্থে অক্ষর যোগে লিখিত শব্দের নিম্নে দুইটি চক্ষুর চিত্র; পঞ্চম অর্থে—উপরে 'পে' ( ) ও তন্নিম্নে কোণাকুণি ভাবে 'ট' ( ) লিখিয়া উভয় অক্ষরের মধ্যস্থলে একখানি হাতের চিত্র ও তৎপার্শ্বে ; ষষ্ঠ অর্থে—অক্ষর যোগে লিখিত শব্দের পার্শ্বে ব্যবহৃত হইত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ বুঝাইতেই প্রথমে চিত্রের ব্যবহার হয়। ফলতঃ, চিত্রদ্বারা যাহা প্রকাশিত হইত, তাহা মনোদর্পণে পতিত বাহ্য-পদার্থের প্রতিবিম্ব মাত্র। বহিঃস্থ পদার্থ বাস্তবপক্ষে কিরূপ, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। আমাদের মনের উপর তাহাদের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকেই আমরা উক্তপদার্থ বলিয়া মনে করি। এই প্রতিবিম্ব যে বাহ্য কোনও পদার্থ হইতে আসে, তাহারও নিশ্চয় নাই। আমরা আমাদের মনের মধ্যেই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হই। বাহ্য-পদার্থ তাহাদিগের উৎপত্তির কারণ হইলেও হইতে পারে—কিন্তু তাহারা আমাদের মনের ভাবমাত্র। সুতরাং চিত্রদ্বারা প্রথমে মানসিক ভাবই ব্যক্ত হইত। শব্দও এই মানসিক ভাবের প্রকাশক। সুতরাং, চিত্র ও শব্দের উদ্দেশ্য অভিন্ন। উভয়ের কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য এই, চিত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উদ্দিষ্ট ভাবের সূচনা করে, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করে। কালে যখন শব্দও চিত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতে আরব্ধ হয়, তখন দুই শ্রেণীর চিত্রের সৃষ্টি হয়। এক শ্রেণী মুখ্যতঃই ভাবের প্রকাশক, অন্য শ্রেণী মুখ্যতঃ শব্দের সূচনা করিয়া গৌণতঃ সেই শব্দের উদ্দিষ্ট ভাবের সূচক। প্রথম শ্রেণীর চিত্র—ভাবপ্রকাশক (ideographic) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র শাব্দিক (phonetic) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শব্দ ও তৎসূচক চিত্রের মধ্যে মুখ্য কোনও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোনও একটি শব্দ লিখিতে চিত্র-বিশেষ কেন ব্যবহৃত হইত, তাহার কারণ নির্ণয় সহজ নহে। অনেক স্থলে যেখানে সমগ্র শব্দটিই কোনও চিত্র দ্বারা প্রকাশিত হইত—সেখানে চিত্রটির হয়ত সেই শব্দের

উদ্দিষ্ট পদার্থের প্রতিকৃতি হইত; কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ ছিল না। পরন্তু বর্ণমালায় বর্ণগুলির সহিত তৎসূচক অক্ষরগুলির এতাদৃশ কোনও সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর নহে। কোনও বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিতে শব্দবিশেষই বা কেন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বলাও অসম্ভব। সূর্য্যকে সূর্য্য না বলিয়া সমুদ্রকে কেন সূর্য্য বলা হইল না, যাওয়া অর্থে 'গম্' ধাতুর ব্যবহার না করিয়া "বিশ্" ধাতুর কেন ব্যবহার করা হয় নাই, তাহা বলা সহজ নহে। ভাবের সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ, এবং ধ্বনির সহিত তৎমূলক চিত্রের সম্বন্ধ, আকস্মিক বলিয়াই অনুমিত হয়। দাবাখেলার গুটীগুলির সহিত বাস্তব গজ, অশ্ব, রাজা, মন্ত্রী, নৌকা ও সৈনিকের যেমন কোনও সাদৃশ্য নাই, ভাব ও ধ্বনির মধ্যে এবং ধ্বনি ও চিত্রের মধ্যেও তেমনি কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে, আমাদের সংস্কৃত বর্ণমালার সহিত তৎসূচিত ধ্বনিগুলির বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল বলিয়া অনেকের কাছে শোনা যায়; তাঁহারা বলেন, শব্দের সহিত রূপের সম্বন্ধ নিত্য। একটি ঢোলের একদিকে কিছু ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া অন্যদিকে আস্তে আস্তে আঘাত করিয়া বাজাইলে এক একরূপ বাদ্যের সহিত ময়দার গুঁড়াগুলিও এক-একভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান-মতে, বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়। বায়ু জড়পদার্থ, সুতরাং তাহাতে যে তরঙ্গ উঠে, তাহার নির্দ্দিষ্ট আকার আছে। এই তরঙ্গের আকার ও প্রকারের উপর তদুত্থ শব্দের প্রকার সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং, প্রত্যেক ধ্বনির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট একটি আকার আছে। আমাদের সংস্কৃত বর্ণগুলির সহিত তাহাদিগের এবংবিধ আকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 'ক' উচ্চারণ করিতে বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেই তরঙ্গের আকার আবিষ্কার করিয়া তৎসাদৃশ্যে 'ক' এর আকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য অক্ষর সম্বন্ধেও একই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। এই মতের যাথার্থ্য নির্ণয় করা বর্ত্তমানে অসাধ্য। কেননা, বর্ত্তমানে সংস্কৃত লিখিত যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রাচীন নহে। ঋষিগণের ব্যবহৃত বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া, বর্ত্তমানে অসম্ভব।

ইংরেজী ভাষায় ২৬টি অক্ষরদ্বারা যাবতীয় শব্দ লিখিত হয়। বঙ্গভাষায় অবশ্য তদপেক্ষা অনেক বেশী অক্ষরের প্রয়োজন হয়; কিন্তু তাহা হইলেও সে বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে বুদ্ধিমান বালকদিগের ৪।৫ দিনের বেশী লাগে না। যে কালে প্রতি-শব্দের জন্য একটি স্বতন্ত্র-চিত্র প্রয়োজন হইত —তখন ভাষায় যতগুলি শব্দ ছিল, ততগুলি চিত্র আয়ত্ত না করিলে সে ভাষায় উত্তমরূপে লিখিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না। উক্ত লিপিবিদ্যায় অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা যে বেশী ছিলনা—তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে। লিপিবিদ্যা, শিক্ষার পক্ষে তখন একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল না। যাজকগণের শিক্ষালয়ে জ্যোতিষ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি নানা বিষয় মুখে-মুখেই শিক্ষা দেওয়া হইত; চিত্রলিপি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা ও ব্যবসা রূপে তখন গণ্য ছিল। যাহারা বহি লিখিয়া জীবিকার্জ্জনে অভিলাষী হইত, তাহারাই উক্ত বিদ্যা অভ্যাস করিত। কিন্তু সমগ্র লিপি-গুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা নিতান্তই বিরল ছিল। বিদ্যার এক এক বিভাগের লিপিগুলি এক এক জনে অভ্যাস করিত, এবং তৎসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি কেবল তাহাদিগেরই দ্বারা লিখিত হইত।

মিশরীয় চিত্রলিপি বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন এই লিপিতে লিখিত একখানা প্রস্তর-ফলক ইয়োরোপীয়গণের হস্তে পতিত হয়, তখন তদুপরি খোদিত চিত্রগুলির রহস্যভেদ করিতে কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এখানে দিবার স্থানাভাব।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(২)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের দীর্ঘকাল মান্দ্রাজ-প্রবাসের বিস্তৃত-বিবরণ জানিবার এক্ষণে আর কোনও উপায় নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মধুসূদনের বিয়োগ-বিধুরা পত্নী রেবেকা লোকান্তরিতা হন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের প্রবাস-কথা জানিবার উপায়ও লোপ পাইয়াছে। তাঁহার সম-সাময়িক অন্তরঙ্গ কেহ তথায় আছেন বলিয়াও জানা নাই।—সুতরাং, মহাকবির মান্দ্রাজ-প্রবাসের কথা, এখন তাঁহার লিখিত কবিতাবলী ও পত্রসমূহ হইতেই যাহা কিছু জানা যায়।

মান্দ্রাজে থাকিতে, তিনি MADRAS CRICULATOR AND GENERAL CHRONICLE, MADRAS SPECTATOR এবং ATHENÆUM-প্রমুখ সংবাদপত্রের কোনটির সহকারী-সম্পাদক, কোনটির বা সম্পাদক রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তবে, তিনি 'এথিনিয়ম্' নামক সুবিখ্যাত ত্রৈ-সাপ্তাহিক (TRI-WEEKLY)-পত্রের প্রধান সম্পাদক-রূপে একাদিক্রমে তিন চারি বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া, সম্পাদন-কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময়ে 'এথিনিয়ম্' মান্দ্রাজের সর্ব্বপ্রধান সংবাদ-পত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

সংবাদপত্র-পরিচালন ব্যতীত, তাঁহাকে মান্দ্রাজ-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরাজী-সাহিত্যের শিক্ষকতাও করিতে হইত। তাঁহার কবি-যশঃ এই সময়ে মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী লেখক ও কবি বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।—কিন্তু হায়! যে সাংসারিক উন্নতির প্রলুব্ধ আশায় তিনি স্বজন-বর্জ্জিত সেই সুদূর প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন, সে আর্থিক উন্নতি তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই!

১৮৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দে 'CIRCULATOR'-পত্রে তাঁহার 'A Vision'—'Captive Ladie', প্রভৃতি কবিতাবলী প্রকাশিত হয়। সে সকল কবিতায় তিনি, নিজ নামের পরিবর্ত্তে, 'Timothy Pen-poem, Esq., এই ছদ্ম-নাম ব্যবহার করিতেন—প্রত্যেক কবিতার শীর্ষদেশে এই নামই মুদ্রিত হইত। এইরূপ উপ-নামে আত্ম-গোপন করিবার রীতি, ইংরেজ লেখক-সমাজে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। মধুসূদনের কবি-যশঃ উপরোক্ত নামেই প্রথমে মান্দ্রাজ-প্রদেশের পাঠক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল—এই নামোল্লেখেই তাঁহার কবিতা প্রভৃতির সমালোচনা হইত—এই নামেই তিনি অভিনন্দন প্রাপ্ত হইতেন। MADRAS CIRCULTORপত্রে তাঁহার যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, পাঠক-পাঠিকদিগের কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত আমরা, প্রভূত চেষ্টা-যত্ন ও ব্যয়সাধ্য অনুসন্ধানে, তাহার কতকগুলি উদ্ধার করিয়াছি। গুণগ্রাহী পাঠক দেখিবেন—কি ভাব-মাধুর্য্যে, কি ভাষা-লালিত্যে, কি কবিত্ব-গরিমায়, প্রথিতযশা কোনও ইংরেজ-কবির রচনাপেক্ষা এগুলি কোন অংশে অণুমাত্রও ন্যূন নহে—বরং তাঁহাদের লেখনী-প্রসূত হইলে, তাঁহাদেরও গৌরব-বৃদ্ধি করিত। প্রথম-প্রকাশকালে এগুলির শিরোদেশে যেরূপ একাদিক্রমিক সংখ্যা সংযুক্ত ছিল, আমারাও সেইরূপ পর্য্যায়ে উদ্ধৃত করিলাম।—

DISJECTA MEMBRA POETÆ

BY

TIMOTHY PENPOEM, ESQ.,

I

STANZAS

(On hearing a Lady sing)

When from Sicilias flow'ry shore
Upon the bosom of the deep,

Amidst the restless billows' roar
The Syren-song in fairy sweep,
Fell, spell-like, rolling far and near,
On the soft breezes' wandering sigh,
And breath'd enchantment on the ear
Of mariner—slow passing by—
Sweet visions of Elysian light
Throng'd in his bosom, gay and bright :—

But, lady !—sweeter is the dream
The voice awakens in the breast,
It tells of Eden's land of beam—
Its glory—and its bow'r of rest ;
Where Seraph on bright harp of gold
Such sweet—ethereal music breathed,
When night on moon-lit wings unroll'd,
Came deckt in smiles and starry-wreathed,
And the fair Mother of Mankind
Smiled as the moon above her shrined !

1842.

৺ভোলানাথ চন্দ্র

II

STANZAS

(On a faded lily given to the author by a Lady.)

I gaze upon thee, faded flow'r !
And sigh to think how the soft bloom
That graced thee in the summer bow'r
Hath fled like beauty—when the tomb
Upon its cell'd and gloomy breast
Hath pillow'd her to dark and dreamless rest !

How many a fond and cherish'd dream
Crowds round thy faded beauty's bier,
And sheds a melancholy gleam—
And wakes the sad and silent tear
To soothe the deep and maddening throe
The sever'd heart alone can feel and know.
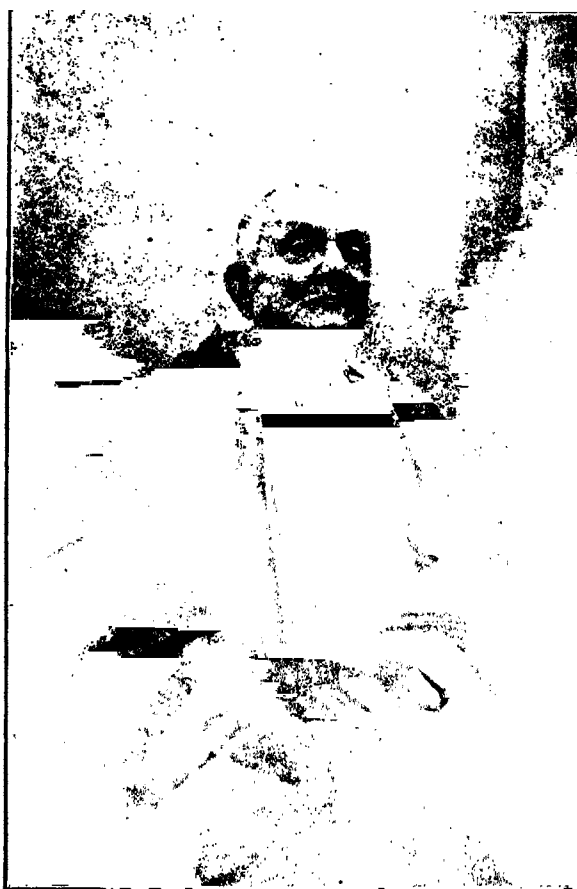
I gaze upon the scene around
Though beautiful and fair it be,
I recognize nor sight nor sound,
That speaks of my far home to me;—
How fearful thus to feel alone
With not a heart responsive to mine own !

Yet when upon thy hueless leaf
I view the past—as if enshrined—
The wildest tumults of dark grief
Vanish,—nor leave a trace behind :

And a soft - still-wing'd calm comes on,
As when the fiercest, darkest storm
is gone.

Fond memory lends a fairy tone
And language to thee, faded flower!
And thy soft breathings--like the lone
Plaint of the breeze at midnight's hour
Come on the bosom bleak and bare
And wake hope's softest—sweetest music
there!

1845.

III

(Comest thou as one in beauty's ray).

Comest thou as one in beauty's ray
To light the starless gloom
That frowns upon the pilgrim's path
To death's domain, the tomb—
Or like the bright and fiery glance
That from the storm god's eye
Bursts but a while among the clouds
When legioned on the sky—
To dazzle with thy glorious beam
Then swiftly fade away
And leave a deeper gloom behind
A darker—cloudier day!—

Ah! fly false hope! why soothe to
dream
Of things that may not be,—
And dazzle but a while—to leave
In gloom and misery!
Or shouldst thou still thus smiling
haunt
The pilgrim's lone-some way
Deck not dim future's shadowy brow
With halo of such ray.

No—whisper not of glory—fame
Or things of Earth that are,
But breathe of Him—the Saviour-
friend—
The day-spring—Juda's star!*

1842.

"VISIONS OF THE PAST" নামক যে খণ্ডকাব্য, 'CAPTIVE LADIE'র সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল, মধুসূদন তাহা প্রথমে 'CIRCULATOR'-পত্রে 'A VISION' নামে এই ধারার চতুর্থরূপে প্রকাশ করেন। আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

DISJECTA MEMBRA POETÆ

BY

TIMOTHY PENPOEM, ESQ.,

IV

A VISION.

Methought I stood within a blushing bow'r
Bosom'd upon a mount: it was the hour
Of Eve: the sun in flaming majesty—
Like a proud dream of glory—had now sunk
Beneath the western wave—his azure home,—
And from the bright—gem-studded firmament
The Moon—sweet Queen of Beauty!—gently
smiled
Like a young mother on the new-born earth
Cradled upon interminable space.—
How lovely!--yea—how lovelier far than
aught
That even Fancy from her fairyland—
Her region of enchantment ever lent
To bard reposing in the noon-tide vale,
Or by the marge of mossy fount - entranc'd!—
Legions of beings with glad wings that beam'd

---

* LUKE—1. 78.

Soft starry radiancy—and diadems
Of sparkling lustre throng'd in
bright array,—
Some flying thro' the dewy-
slumbering air—
Like stars that oft upon their
cars of light—
Night's messengers—walk the
Infinity
Swifter than thought :—while
some on harps of gold
Walked strains like those which
oft-times haunt the ear
When thou, O! gentle charmer—
Hope! art nigh!

*　　　*　　　*

চারি অংশে এই খণ্ডকাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল; তৃতীয় অংশের প্রারম্ভে পত্নী রেবেকা দত্তকে সম্বোধন করিয়া, মধুসূদন বলিতেছেন ;—

To 'R. D.'

Come, list thee, gentle one! and
whil'st the lyre
Breathes softer melody for
thee, mine own!

জর্জ নর্টন

I'll weave the sunny dreams, those eyes inspire,
In wreaths to consecrate to thee alone,—
Love's offering, gentle one!—to Beauty's
Queenly throne.
'Tis sweet to gaze upon those eyes where Love
Has treasur'd all his rays of softest beam ;—
'Tis sweet to see thee smile as from above
Some child of Light,—such as we often
dream
Doth dwell on planet pale,—or star of golden
gleam.

The heart which once has sigh'd in solitude,
And yearn'd t' unlock the fount where
softly lie
Its gentlest feelings,—well may shun the mood
Of grief—so cold—when thou, dear one!
art nigh,
To sun it with thy smile,—Love's lustrous
radiancy!
The home of youth, 'tis far,—Oh! far away,—
The hopes of youth, they 've fled and
taught to weep,—

The friends of youth, e'en they,—Oh! where are they?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep,—
Wing'd messengers and sweet from, Past! thy Donjon keep!

'A VISION' প্রকাশের পর হইতেই মধুসূদনের কবিযশঃ মান্দ্রাজ-প্রদেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সে সময়ে, মান্দ্রাজ-প্রবাসী অনেক ইংরেজই সংবাদপত্রে কবিতা লিখিতেন ; এবং বঙ্গদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজ-প্রদেশে ইংরেজী কাব্যচর্চ্চা অনেক অধিক হইত। কি মাসিক, কি পাক্ষিক, কি সাপ্তাহিক, কি দ্বি-সাপ্তাহিক, কি ত্রৈ-সাপ্তাহিক—সাময়িক-পত্র মাত্রেই "POETS' CORNER"-শীর্ষক একটি স্তম্ভ কবিতা-প্রকাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। এই সুপ্রশস্ত কবিত্ব রণাঙ্গণে আমাদের মধু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া, জয়শ্রীভূষিত হইয়াছিলেন। অনেক ইংরেজ-কবিই তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। 'A VISION' প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই, "CIRCULATOR" পত্রে জনৈক ইংরেজ-লেখক, তাঁহার উদ্দেশ্যে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি সেখানে কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, ইহা হইতেই, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

To the Editor of the MADRAS CIRCULATOR and GENERAL CHRONICLE.

TO TIMOTHY PENPOEM, Esq.

Sir,—Your appearance in the Poets' Corner of the CIRCULATOR ought to be welcomed by every reader of taste. The classical elegance of your composition, the admirable command which you evidently possess over the resources of the English language, and your thorough knowledge of the mysteries of the "Divine Art" are well calculated to attract attention of no ordinary kind. When I read the first two portions of your "VISION" it struck me that you were none of the Benighted. You have since confirmed this by lines of exquisite pathos and melody :—

'The home of youth —'tis far—Oh! far away—
The hopes of youth—they've fled and taught to weep—
The friends of youth—e'en they—Oh! where are they?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep—
Wing'd messengers and sweet from, Past! thy Donjon keep!'

No person acquainted with the state of education afforded here, will find fault with this inference. There are passages in your Poem which "come over the ear" like the music of lyres already consecrated to immortality. I shall content myself with a few,—

'Legions of beings with glad wings that beam'd
Soft starry radiancy—and diadems
Of sparkling lustre throng'd in bright array—
Some flying thro' the dewy-slumbering air—
Like stars that oft upon their cars of light—
Night's messengers —walk the Infinity,
Swifter than thought :——'

* * * *
* * * *

The second portion of your "VISION" everywhere sparkles with inspiration.

'——Melody which came
Soft undulating on the viewless wing
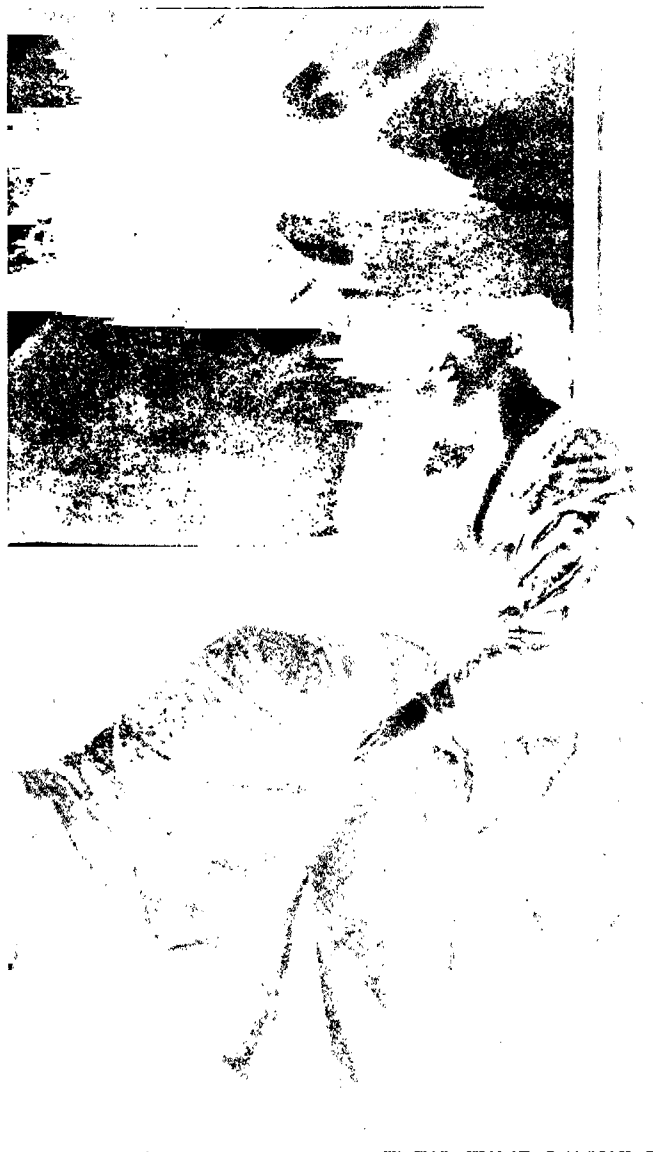
সেণ্ট্ হেলেনা

— 'ক্রস্'-উদ্ভাবনের স্বপ্ন-দর্শন —

শিল্পী—পল্ ভেরোনীজ ।

Of every breeze—from grove and
bow'r now sunk
To low-breath'd wails—such as the
pilgrim hears—
The pilgrim of the midnight deep—
the dirge
Of spirit disenthrall'd from bond
of clay,
It's plaintive dirge, love! o'er thy
watery grave!
The appearence of Satan is grand.-'

* * *

ইহার পর সমালোচক মহাশয় আরও কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া, প্রভূত প্রশংসার পর, উপসংহারে লিখিতেছেন ;—

"In conclusion, I trust, you will not cease to delight us with your Poetry. Though you have already excited jealousy, listen to all *curs* with the contempt they deserve. "The head-groom of the Muses" has already given vent to that hopeless envy which men in his Station feel, for being nothing but a "groom", he cannot aspire to the familiarity which a gentlemanly acquaintance like yourself enjoys with his Nine Mistresses!

Yours sincerely,

27th November, 1848. AN ADMIRER.

নবাব ৺আবদুল লতিফ

একজন পঞ্চবিংশবর্ষীয় বঙ্গ-যুবকের পক্ষে বিদেশীয় লেখকগণের প্রতিযোগিতায়—বিজাতীয় ভাষায় কবিতারচনা করিয়া, এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করা বড় সাধারণ গৌরবের কথা নহে! স্বজাতীয়ের এরূপ সম্মানে পৃথিবীর যে কোন জাতি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিত। কিন্তু তাৎকালিক বাঙ্গালীজাতি মধুসূদনের এই অপূর্ব্ব-কৃতিত্বে তেমন আত্মগরিমা অনুভব করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে, দেখিতে পাই, একমাত্র মনস্বী ভোলানাথ চন্দ 'A VISION'এর প্রসঙ্গে মধুসূদনের কবিত্ব-শক্তির প্রভূত প্রশংসা করিয়া শেষে বলিয়াছেন,—

"But if such were his early and immature productions, what might have been the fruits of his ripened talents,—how far he might have soared, had he continued in his courtship of the European Muse, it is not easy to say.

"Modhu exchanged old Pegasus for the

Indian Pakheeraj. He gave up his addresses to Calliope, and turned an admirer of, and lost his heart to, Sarasvati. In plain words, Modhu took to writing in his native tongue."

'A VISION' প্রকাশের অব্যবহিত পরে, সেই 'CIRCULATOR' পত্রেই মধুসূদনের 'CAPTIVE LADIE' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা তাঁহার সে পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা-ধারার পঞ্চম; আমরা তাহার অতি অল্পাংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

DISJECTA MEMBRA POETÆ

BY

TIMOTHY PENPOEM, ESQ.,

V

THE CAPTIVE LADIE

(A fragment of an Indian Tale.)

To J. R. N——r Esq.

My dear N——r,

Permit me to dedicate the following Poem to you. It was begun, and portions of it sketched, under circumstances which seldom invited the cares of the morrow to interrupt a somewhat ethusiastic devotion to the Camonæ, but, as the song says—

> "——Now, alas ! those days of joy
> Are past, are past for hapless me !"

All that I can at present do, is only to arrange the different sketches; into something like a readable form. The *plot* is a simple one, and will, I trust, sufficiently develope itself in the course of the narrative—appealing, as all fragmentary tales must do, to the imagination of the reader to supply its omissions.

I think, it would be superfluous for me to dwell much on the pleasure which I feel in dedicating to you this literary wreck of bette and happier days.

In conclusion, I subscribe myself,

Your affectionate friend,

ROYAPOORUM,
25th Nov., 1848.　　TIM. PENPOEM.

THE CAPTIVE LADIE.

CANTO I.

The star of Eve is on the sky,
But pale it shines and tremblingly,
As if the solitude around,
So vast—so wild—without a bound,
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear—unrest:
But soon – soon will its radiant peers
Peep forth from out their deep-blue spheres,
And soon the ladie Moon will rise
To bathe in silver Earth and Skies,
The soft—pale silver of her pensive eyes.

*　　*　　*　　*

'Captive Ladie'র সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহার উপহার-পত্র পাঠে জানা যায় যে, মধুসূদন প্রথমে ইহা, জে. আর.৲ নেপিয়ার নামক তাঁহার কোন প্রবাসী-বন্ধুকে উৎসর্গ করেন; কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মান্দ্রাজের তৎকালীন Advocate-General, এবং মান্দ্রাজ-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভাপতি, জর্জ্জ নর্টনের* নামে ইহা উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন;—

"The Captive is nearly ready—I am going to dedicate it to George Norton, Esqr., the

* 'মধুসূদনের জীবনচরিতে' George Nortonকে, কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার Eardley Nortonএর পিতা

Advocate-General of the Presidency and a great encourager of Literature. I wrote to him for his permission to dedicate the poem to him and sent the whole of the 1st. and part of the 2nd. cantos for his perusal. You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says, he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I have great hopes from his patornage."

নর্টন সাহেবের কাছে প্রবাস-কালে মধুসূদন যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি গৌরদাস বাবুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

'You will, I am sure, be surprised - agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate-General, Mr. Norton. The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Govt. employ of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place. * * * We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of Classical Works, as a 'token of his regard.' * *

'CAPTIVE LADIE' যখন অংশে অংশে প্রকাশিত হয়, তখন উত্তর-মালাবার প্রদেশের কানানোর-প্রবাসী জনৈক ইংরেজ, মধুসূদনের কবিত্বে মোহিত হইয়া, 'CIRCULATOR' পত্রে তাঁহার উদ্দেশে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন; পাঠক দেখিবেন—ইহাতে তেমন কবিত্ব-শক্তির বিকাশ না থাকিলেও, তিনি মধুসূদনের চরিত্রের বিশেষত্বগুলি কেমন মনোমদ ও যথাযথভাবে প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন—

POETRY.

(Stanzas for the Circulator)

TO TIMOTHY PENPOEM, Esq.

Is there a man whose genius strong
Rolls like a rapid stream along,
Whose Muse, long hid in cloudless night,
Pours on us like a flood of light;
Whose active comprehensive mind
Walk's fancy's regions unconfin'd,
Whom not the surly sense of pride,
Nor affection warps aside;
Who drags no author from his shelf,
To talk on, with an eye to self,
Careless alike in conversation,
Of censure and of approbation;
Who freely thinks, and freely speaks,
And meets the wit he never seeks;
Whose reason calm and Judgment cool,
Can pity, but not hate a fool;
Who can a hearty praise bestow,
If merit sparkle in a foe;
Who, bold and open, firm and true,
Flatters no friends—yet loves them too?—
Penpoem will be the last to know,
His is the portrait I would show. CXL.

CANNANORE, *18th. Jan., 1849.* } THE SOLDIER-POET.

আমরা মধুসূদনের কলিকাতা হইতে লিখিত একটি প্রেম-পিপাসাপূর্ণ কবিতা এবং একটি পারস্য-কবিতার

বলিয়া ভ্রমক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে এ সম্বন্ধে Mr. Eardley Norton মহোদয় স্বয়ং আমাদিগকে লিখিয়াছেন;—

"George Norton was first Advocate-General of Bombay and then of Madras He was a namesake, and a great personal friend, of Mr. John Bruce Norton, father of Mr. Eardley Norton, who was also himself Advocate-General of Madras"

জর্জ্জ নর্টনের দুর্লভ প্রতিকৃতি ভারতবর্ষের জন্য প্রদান করিয়া Mr. Eardley Norton মহোদয় আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।—লেখক।

অনুবাদ CIRCULATOR পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ পাঠক এই সকল দুর্লভ মধুবর্ষী কবিত্বের রসাস্বাদনে পরম প্রীত হইবেন বিশ্বাসে আমরা এই সকল সংগ্রহে, অর্থব্যয় উপেক্ষা করিয়া, যথাসাধ্য চেষ্টা-যত্ন করিয়াছি—

DISJECTA MEMBRA POETÆ

TIMOTHY PENPOEM, ESQ.

VI

I loved thee!

(1)

I lov'd thee! how oft on thy soft beaming eye
I've gaz'd with deep rapture and heart swelling high!
There was life in thy smile,—there was death in thy frown,—
And thy voice, it was sweeter than Melody's own!

(2)

I lov'd thee! how oft Hope sooth'd me to dreams
Of paths strewn with flow'rs—of days gilt with beams!
'Twas bliss—when on Future's horizon afar,
She shrin'd thee in glory,—my Destiny's star!

(3)

But 'tis past:—like a vision of ethereal ray
Thou comest but to dazzle,—then vanish away!
A seraph forth straying from Heav'ns bright bow'r,
In sun shine and glory to bless—but an hour!

(4)

But 'tis past;—what is past?—Can it be that fond breast
Is now cold as the sod it hath silently prest?—
Can it be—that those eyes so soft and so bright—
Are now quench'd in the grave—in its cold starless night!

৺গৌরদাস বসাক

(5)

Oh! fain would I dream 'tis delusive and vain,—
Oh! fain would I dream thou 'lt come back again!
But Reality lends all a tongue and a tone,
To break the sweet spell by fond Fancy thus thrown!

Calcutta, 1842.

VII

ODE

(*From the Persian of Sadi*).

Oh! Come—gaze on that eye whose beam
Is softer than the ray—so bright—
That lulls to Love's ethereal dream
The maiden in her dewy bow'r,
At midnight's soft and starry hour—
Shed by the moon—the pensive Queen of Night!
Oh! come—gaze on those ringlets there,
That 'round her temples softly play,
Like clouds that hang upon the air
And bask in summer's dazzling ray:

Oh! Come – gaze on that rosy lip,
And mark that gently-budding breast,
And say—Can amorous bee e'er sip—
Soft kisses from a softer flow'r
When music wring'd in the summer-bow'r
He roams at noon's bright sunny hour,—
Hath Paradise a sweeter place of rest?

When the last trumpet sound shall roll,
To wake the dead to sleep no more;
And trembling all from pole to pole,
From every clime and every shore,
The Earth shall yield the dust inurn'd to rest
In dreamless slumber on her silent breast,
And all before the judgment throne
Shall stand to hear the last decree,
Beauty, fair maid! like thine alone
Shall for full many a soul atone
For bowing in idolatory
With deep devotion to Love's shrine—
Or worshipping such heav'nly charms as thine!—*

Calcutta, 1844.

মান্দ্রাজে, দুর্লভ কবিযশঃ ও সার্ব্বজনীন সুখ্যাতি-লাভ করিলেও, মধুসূদনের অশান্ত হৃদয় শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। কি নিদারুণ মর্ম্মপীড়াদায়িনী নিরাশায় তাঁহার সুদূরপ্রবাস-জীবন যাপিত হইয়াছিল, তাহার সংবাদ তখন দেশের কয়জনই বা রাখিতেন! কত আশা করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া জনক-জননী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের অজ্ঞাতসারে, তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। অমানুষিক কবি-প্রতিভা ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিবর্ত্তে, সেই স্বজন-বর্জ্জিত প্রদেশে, তাঁহার ভাগ্যে কি লাভ ঘটিয়াছিল, তিনি তাহাই নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশপদী কবিতা দুইটিতে তাঁহার বিদেশী বন্ধু জোসেফ্ রিচার্ড নেপিয়ারকে সম্বোধন করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এগুলি 'DISJECTA MEMBRA POETÆ' ধারার অন্তর্ভুক্ত নহে;—'SONNETS' শীর্ষক অপর একটি অভিনব শ্রেণীর।

* The reader must remember that the author was a Mahometan, and not a Christian like his translator. Shaik Sadi, "the moral poet of Persia" as my Lord Byron, (in a note to the "Bride of Abydos"—if I mistake not) calleth him, was a terrible old blackguard—worse than all the Anacreons, Hafizes, and Littles in the world.—Read his "Dewan Sadi."—T. P.

অথর্ব্ববেদেও 'সিষাসব' ও 'সিষাসথ' শব্দদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় সায়ন 'আরোগ্য' অর্থ করিয়াছেন ; যথা—

'রেবতীরনাধৃষঃ সিষাসবঃ সিষাসথ।'—৬।২১।৩

অথর্ববেদ ও যজুর্বেদের নিম্নলিখিত ঋকে 'সীসা' শব্দ 'ধাতু' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ;

'সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়চ্ছৎ......।'—অথর্ব্ব, ১।১৬।২

—ইন্দ্র আমাকে সীসা প্রদান করিয়াছিলেন।

'তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো।'—অথর্ব্ব, ১।১৬।৪

—তাহাকে সীসা দ্বারা বিদ্ধ করিব।

'হিরণ্য চ মে আয়শ্চমে শ্যামং চ মে সীসং চ মে

ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম্।'—শুক্ল যজু, ১৮।১৩

শতপথ ব্রাহ্মণে 'সীসা' দ্বারা দ্রব্য ক্রয়ের উল্লেখ আছে ; যথা—১২।৭।২।১০—

"With lead he buys the malted rice."

—Sacred Books of the East Series.

শতপথ ব্রাহ্মণের এই অংশ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, 'সীসা' সেকালে 'ধন'রূপে ব্যবহৃত হইত। অতএব ঋগ্বেদের 'সিষামন্ত' শব্দ থাকায় সেকালেও 'সীসা' ধাতু ভারতে প্রচলিত ছিল মনে হয়। অন্ধ্রাজাদিগের সীসা-নির্ম্মিত মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; মুদ্রায় দুই মাস্তল যুক্ত জাহাজের ছাপ আছে। খৃষ্টের ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে, রাজা যজ্ঞশ্রীর রাজত্বকালে, সীসার মুদ্রা প্রস্তুত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'সীসা' নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা—

'ত্রপুনা সীসং সীসেন লোহং।'—৪।১৭।৭

৭ম শতাব্দীতে 'সীসা'র এক নাম 'নাগ' দেখিতে পাই ; যথা—

'নাগেন ক্ষার রাজেন ধ্মাপিতং শুদ্ধি মৃচ্ছতি।'

—নাগার্জুন-বিরচিত রসরত্নাকর, তারশুদ্ধি ১৩।

—সীসা ও সোহাগা দ্বারা উত্তপ্ত করিলে (রৌপ্য) বিশুদ্ধ হয়।

গ্রীকভাষায় সীসাকে 'মলুব্ডস' বলে এবং ল্যাটিন ভাষায় ইহার নাম 'প্লম্বম্'। ল্যাটিন ভাষায় 'প্লম্বম্ নিগ্রম্' নাম দ্বারা সীসাকে 'রাঙ্' হইতে বিভিন্ন করা হইত। প্রথম শতাব্দীতে লিখিত, প্লিনির গ্রন্থে এইরূপ নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, ৭ম শতাব্দীতে ভারতে সীসা "নাগ" নামে পরিচিত ; এই 'নাগ' নাম 'নিগ্রম্' হইতে আসিয়াছে? ল্যাটিন 'নিগ্রম'নাম, মিসরবাসীদিগকে বুঝাইত ; কারণ, তাহারা কৃষ্ণকায়। কিন্তু মিসরীয়দিগের প্রাচীন-ইতিহাস হইতে আমরা অবগত হই যে, সর্প তাহাদের জাতীয় চিহ্ন ছিল। সেই জন্য, রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত, সকলেই উষ্ণীষের সম্মুখে একটি সর্পের আকার ধারণ করিত। এই চিহ্ন হইতে আমরা তাহাদিগকে 'নাগ'জাতি বলিতে পারি। এই 'নাগ' চিহ্ন হইতে তাহাদিগকে প্রথম 'নিগ্রম্' নাম দেওয়া হইয়াছিল, কি না, বিবেচ্য। কিন্তু ভারতের প্রাচীন-দ্রাবিড়জাতিও নাগোপাসক। পৌরাণিকযুগে আমরা দেখিতে পাই, সর্পরাজ 'বাসুকি' হইতে 'সীসা'র উৎপত্তি-কল্পনা করা হইয়াছে। অতএব, ইহা হইতে 'সীসা'কে 'নাগ' নাম প্রদান করাও সম্ভবপর।

রাঙ—শুক্লযজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদে 'ত্রপু' নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ; 'রঙ্গ', বা 'রাঙ্' সেকালে এই নামে পরিচিত ছিল ;—

'ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম্।'—১৮।১৩ শুক্লযজু।

—ত্রপু ও আমার যজ্ঞদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

'ত্রপু ভস্ম হরিতং বর্ণঃ পুষ্করমস্য গন্ধঃ।'—অথর্ব্ব,১১।৩।৮

—ভস্ম (পাকশেষে) ত্রপু (হইয়াছিল)। (অন্নের) বর্ণ সুবর্ণের মত এবং গন্ধ—পদ্মের সদৃশ।

'ত্রপু' যে এক প্রকার ধাতু—এবং উহা সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা ও লৌহ হইতে বিভিন্ন,—শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও চরক হইতে তাহা স্পষ্ট জানা যায় ; তদ্ভিন্ন অমরকোষেও 'ত্রপু'কে 'রঙ্গ' বলা হইয়াছে ;—

'হিরণ্য চ মে অয়শ্চ মে শ্যামং চ মে লোহং চ মে সীসং চ মে ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম্।'—শুক্ল যজু, ১৮।১৩

'সুবর্ণরূপ্য ত্রপু তাম্ররীতি কাংস্যাস্থি লোহক্রম বেণুদন্তৈঃ।'—৩।৪ চরক, সিদ্ধিস্থান।

'ত্রপু সীসময়শ্চূর্ণং।'—চরক, চিকিৎসাস্থান, ৭।৫১

'ত্রপু পিচ্চটং রঙ্গ বঙ্গে।'—অমরকোষ।

পাণিনি-সূত্রে 'কাস্তীর' শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় ;* ইহা বাহীকদিগের একটি গ্রামের নাম। 'কস্তীর' শব্দের কোন কোন অভিধানে 'রাঙ্' অর্থ করা হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দ চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হই নাই।

---

* পাণিনি—৬।১।১৫৫

অমরকোষেও ইহা 'রাঙ্' পর্য্যায়ে নাই। সম্ভবতঃ ইহা প্রকৃত 'রাঙ্' অর্থে আর্য্যদিগের মধ্যে পরিচিত ছিল না।

গ্রীক ভাষায় 'কস্‌সিটেরস্' (Kassiteros) নামে এক ধাতুর উল্লেখ আছে; হোমরে এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিঃ বেক্‌ম্যান্ মনে করেন যে, উহাই প্রাচীন রোমানদিগের 'ষ্ট্যান্নম্' (Stannum)। তিনি বলেন—রৌপ্য, সীসা প্রভৃতি ধাতুর মিশ্রণে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রাচীনকালে এই দুইটি নাম প্রদান করা হইত। * প্লিনি, খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে, লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'কস্‌সিটেরন' নামক ধাতু সীসা ('প্লম্‌বম্ নিগ্রম্') হইতে বিভিন্ন এবং অধিকতর মূল্যবান্। তিনি উহাকে 'প্লম্‌বম্ কাণ্ডিদং' নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনির 'প্লম্‌বম্ কাণ্ডিদং' যে 'রাঙ্' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব এই কালে গ্রীক 'কস্‌সিটেরন' নামও রাঙ্‌কে বুঝাইত। পরবর্ত্তীকালে ল্যাটিন ভাষায় 'ষ্ট্যান্নম্' শব্দ দ্বারা রঙ্গের নামকরণ হইয়াছে। প্লিনি 'ষ্ট্যান্নম্' অর্থে সীসার সহিত অপর ধাতুর মিশ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। † এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, গ্রীক 'কস্‌সিটেরস্' নাম অতি প্রাচীনকালে 'রাঙ্' বুঝাইত না; খৃষ্টের প্রথম শতাব্দী, বা তাহার কিছু পূর্ব্ব, হইতে রাঙ্‌কে বুঝাইতেছে। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা আছে;—

"ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন সর্ব্ববিধ কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন হয়, তেমনি ইহার কুক্ষিতে সকল প্রকার ধাতুর খনি আছে। এই সকল খনিতে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য, অল্প তাম্র ও লৌহ, এমন কি কাংস্য (টিন বা Kassiteros) ও অন্যান্য ধাতুও প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ‡

উদ্ধৃত অংশে আমরা দেখিতেছি যে, অনুবাদক 'টিন' বা Kassiteros লিখিয়াছেন। 'কস্‌সিটেরস' ধাতু যে সেকালে ভারতের খনি হইতে উদ্ধার করা হইত, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। পাণিনিতে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) 'কাস্তীর' শব্দ প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা বেশ উপলব্ধি করিতেছি যে, মেগাস্থিনিসের পূর্ব্বে ভারতে 'কস্তীর' শব্দ প্রচলিত ছিল। ফণিক বা ফিনীসীয়গণ প্রাচীনকালে নানা দেশ হইতে গ্রীস্‌দেশে 'কস্‌সিটেরস' ধাতু লইয়া যাইত। এখন দেখিতে হইবে—'কস্‌সিটেরস' নাম ফণিকগণ কোন্ দেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল? ভারতে 'রাঙ্' প্রাচীনকাল হইতে 'ত্রপু' নামেই প্রসিদ্ধ। কোন প্রামাণিক গ্রন্থে 'কস্তীর' শব্দ 'রাঙ্' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। অতএব,'কস্তীর'—রাঙ্ নহে—রাঙের তুল্য ধাতুবিশেষ। প্রাচীন 'কস্‌সিটেরস' ধাতুও প্রকৃত রাঙ্ নহে; পরবর্ত্তীকালে ঐ শব্দ দ্বারা রাঙের নামকরণ হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, ফণিকগণ ভারতবর্ষ হইতেই 'কস্তীর' ধাতু ও উহার নাম প্রাপ্ত হন এবং তাহাই গ্রীসে 'কস্‌সিটেরসে' পরিণত হইয়াছিল।

আরবী ভাষায়ও 'কস্‌দীর' শব্দ পাওয়া যায়। 'কস্তীর' হইতে যে 'কস্‌দীর' উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বুঝা গেল, 'কস্তীর' ধাতু ভারত হইতে আরবেও গিয়াছিল।

মহাভারত ও রামায়ণে 'কার্ত্তস্বর' হিরণ্যের নাম পাই;—

'ঈহামৃগসমাযুক্তৈঃ কার্ত্তস্বরহিরণ্ময়ৈঃ।
সুকৃতৈ রজতস্তম্ভৈঃ প্রদীপ্তমিব চ শ্রিয়াঃ॥'

—রামায়ণ, সুন্দর কাণ্ড, ৯।১৩

—কার্ত্তস্বর হিরণ্য ও রজতনির্ম্মিত, ঈহামৃগ (ব্যাঘ্র) যুক্ত সুন্দর স্তম্ভ সকলের দ্বারা উজ্জ্বল ও শ্রীযুক্ত।

এখানে 'কার্ত্তস্বর'কে এক প্রকার 'হিরণ্য' বলা হইল। আমরা দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে 'রজত'কে 'চন্দ্রহিরণ্য' নাম দেওয়া হইয়াছে; অতএব 'হিরণ্য' বলিলেই সেকালে 'সুবর্ণ' বুঝাইত না। অমরকোষে কিন্তু 'কার্ত্তস্বর' সুবর্ণ নামের পর্য্যায়ে ধৃত হইয়াছে; যথা-

'রুক্মং কার্ত্তস্বরং জাম্বুনদমষ্টাপদ ঃ...।'

আমাদের মনে হয়, 'কস্তীর' ধাতুই এস্থলে কার্ত্তস্বর নামে অভিহিত।

'ত্রপু' বা রাঙের ইতিহাস হইতে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতেছি যে, অথর্ব্ববেদের সময় হইতে ভারতে সীসা ও ত্রপুর মধ্যে বিভিন্নতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু রোমান ও গ্রীকগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে উহাদের বিভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

---

* গ্রোটের 'গ্রীকদিগের ইতিহাস,'—২য় খণ্ড, ২১৯ পৃঃ।

† "It is, however, certain that at the beginning of our era the word (cassiteron) was used to specify tin, for Pliny states that cassiteron and plumbum candidum are the same."—Roscoe & Schorlemmer's, Chemistry vol. II p. 823

‡ 'মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ,' ১ম অংশ, 'ডায়োডোরস,' ৩৬। অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহের অনুবাদ পুস্তক, ৭০ পৃঃ।

সুইডেন-ভ্রমণ

[শ্রীবিমলাদাস গুপ্ত]

এই ষ্টকহলমে অনতিদীর্ঘ, অনতিপ্রস্থ, অতি পুরাতনঃ একখানি অর্ণবপোতের ভগ্নাবশেষ-দর্শন নাকি টুরিষ্টদের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে। কারণ, এই নামধেয় পদার্থের ইহা সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টি বলিয়া এদেশের প্রচলিত প্রবাদ। জলনিধিতে যাতায়াতকালে, অকস্মাৎ এক ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে নিপতিত হইয়া ইহা জলমগ্ন হয়; পরে কতিপয় ধীবর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলে, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে সযত্নে সংরক্ষণ করিয়াছেন। এদেশের প্রাচীন-কীর্ত্তির প্রতি আমরা ক্রমশঃই কেমন সন্দিগ্ধচিত্ত হইতেছিলাম। চিত্ত সন্দিহান্ থাকিলে চক্ষের দৃষ্টিকে সরল রাখা যায় না; কাজেই মনে নানা কূট প্রশ্ন আসে। যথা-স্থানে গিয়া, আর-আর সঙ্গীদের সঙ্গে উহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একে একে প্রায় সকলেই তদুপরি আরোহণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল দর্শন করিতে লাগিলেন; আমরা তখন ইহার পৃষ্ঠদেশভঙ্গের আশঙ্কায় সশঙ্ক রহিলাম। যখন সকলে নির্ব্বিঘ্নে নিম্নে পুনঃপদার্পণ করিলেন, তখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

তথা হইতে অনতিদূরে, এক Open-air Museumএ গেলাম এবং ফিরিবার মুখে এক বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একটি নূতন ধরণের Mill দেখিলাম। ইহা বায়ুর সাহায্যে সহজে পরিচালিত হইয়া, দ্রব্যসামগ্রী পিশিয়া গুঁড়া করে। যাইতে যাইতে অসংখ্য পাহাড়পর্ব্বতের দেখা পাইলাম, কিন্তু এদের কাহারই যেন সে প্রাণ নাই, নেহাৎ থাকিতে হইবে বলিয়াই যেন আছে, স্থানান্তরে যাইতে পারিলেই যেন বাঁচে! তখন করুণার্দ্রচিত্তে কামনা করিয়াছিলাম, সমতল সোণার বাঙ্গালায় ইহাদের কতকগুলির আমদানী করি। কিন্তু সে সব "মুরসম্ভবাহা বৃহন্তো হংসাঃ" ত আর এখন নাই! তা ছাড়া বিদেশী জিনিষপত্রে, একেই তো বঙ্গমাতার ক্রোড় বোঝাই,—ইহাদের রাখিবার স্থানই বা কোথায়? ইত্যাদি চিন্তায় এই আজগবী বাসনাকে আর আমল দিতে পারিলাম না।

সুইডেনের আরো ছোটখাটো দুই চারিটি স্থানে গেলাম। কিন্তু, কোথাও কোন পরিবারের সঙ্গে আলাপ না হওয়াতে, এখানকার সামাজিক রীতিনীতি জানিবার সুযোগ ঘটিল না। Swedishরা, Norwegianদের মত তত সুশ্রী না হইলেও, সাধারণতঃ সকলেই বেশ সুদর্শন;
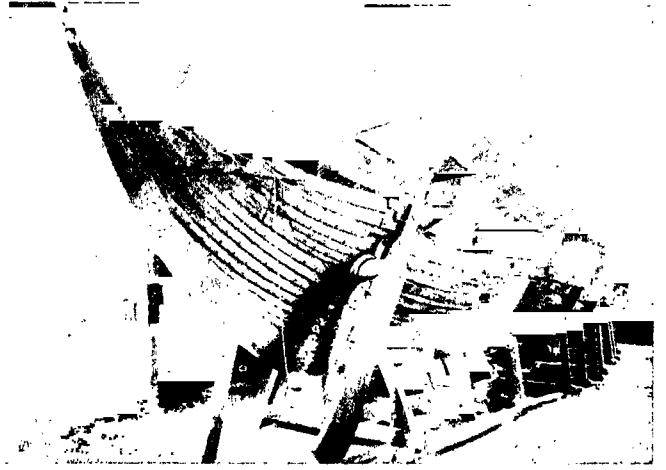
পুরাতন অর্ণবপোত

এদেশে ধনশালীর সংখ্যা বেশী নয়। শ্রমজীবীরা অনেকেই কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনধারণ করে। দীন-দরিদ্রের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের উপায় নাই বলিয়া, সকলকেই খাটিয়া খাইতে হয়। ইহারা যেমন পরিশ্রমী, তেমনই সুস্থকায়। তবে আমাদের অসিত-অঙ্গে যে মলিনতাটুকু একেবারে মিশ খাইয়া যায়, ইহাদের শ্বেতচর্ম্মে তাহা ধরা পড়ে বলিয়া একটু দৃষ্টিকটু হয়। এদেশের 'সার্ডিন্' মৎস্যের বিস্তর রপ্তানী হয়। প্রতিদিন ধীবরগণ-কর্ত্তৃক ইহারা

লাখে লাখে ধৃত হইয়া, সুস্নিগ্ধ তৈলনিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিনাগারে রক্ষিত ও বন্ধীকৃত হইয়া দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়। ইহা বড়ই সুস্বাদু বলিয়া স্থানীয় তাজা মাছ ছাড়িয়া অনেকে ইহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা মৎস্য-প্রধান-দেশবাসী হইয়াও ইহার প্রতি যথেষ্ট পক্ষপাতিতা দেখাইয়া থাকি। বিদেশী বস্তুর নেশা এম্‌নি আমাদিগকে

উন্মুক্ত-ক্ষেত্রে যাদুঘরস্থিত প্রাচীন মঠ

পাইয়া বসিয়াছে!—সুইডেনের দিয়াশলাই ত এখন আমাদের ঘরে ঘরেই দেখা যায়, সুতরাং এ ব্যবসায়ের যে কি পরিমাণ আয়, তা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বিশেষ বৃক্ষের কাষ্ঠে ইহা নির্ম্মিত হয় এবং এ বৃক্ষ এ দেশের যথা তথা জন্মে। এ জন্য বড় বড় কাষ্ঠব্যবসায়ীরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জমীতে ইহা সংরোপণ করিয়া সযত্নে রক্ষা করে। অনেক স্থানে ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। আমরা এই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য বস্তুটির প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়া আসিতে পারিলাম না, এই বড় দুঃখ রহিয়া গিয়াছে। এজন্য কুক্ কোম্পানিই দায়ী, বলিতে হইবে। যদি তাঁহারা, দুই একটা দেখান বাদ দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে সেই সকল কল-কারখানা দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন, তবে আমরাও তফাৎ হইতে যীশুকে উদ্দেশ করিয়া, তাঁহাকে আমাদের অন্তরের ভক্তি জানাইয়া, অনেক উৎপাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতাম। এই ঔষধ-গেলা-গোছ গির্জ্জার পর গির্জ্জা দেখিয়া, আমাদের বস্তুতঃই বড় অরুচি ধরিয়াছে। আমাদের দেশের দেবালয়ের অবধি নাই; কিন্তু তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতে বিভিন্নরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকায়, পর্য্যটকের পক্ষে কৌতূহলপ্রদ হয়। যে দেশে নারীজাতির এত খাতির, সে দেশে দেবীপ্রতিমার পূজা নাই!—এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! একই নরমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, আমাদের নয়নে আয়াস আসে; যদিও প্রকৃত জীবনে আমাদের আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে।

দুই দিনের পর, আজ এই রাজস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ। তখন প্রণত পারাবার আবার দুইদিন তাঁর আতিথ্য-স্বীকার করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন এবং আমাদিগের চালক "তথাস্তু" বলিয়া আমাদিগের শরণ-সদ্ম তাঁহার শরণাগত হইলেন। যাঁহারাই জাহাজে কিছু দিনের পথ যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এ পুণ্যপুরীতে প্রায়ই বহুবিধ প্রণয়-প্রসঙ্গ সম্ভাবিত হয়। তাহার কারণ এই যে, তদুপযোগী স্থান ও জন ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। শুনিয়াছি, সন্তানের শুভ-কামনায় অনেক পিতামাতা, বয়ঃস্থা দুহিতাদিগকে এস্থানে প্রেরণপূর্ব্বক ভাবি-ফলাফলে আশ্বস্ত হন। তবে, বয়সনির্ব্বিশেষে ধৈর্য্যবিলোপী কুসুমায়ুধ অনেক সময়েই অস্থানে শরসন্ধান করিয়া অকারণ অন্তর্জ্বালার সূত্রপাত করেন। আমাদিগের এ প্রবাসে আসা অবধি, প্রতিদিন কত হৃদয় সমর্পণ, গ্রহণ, হারাণো, কুড়ানো,—কত কি হইতে লাগিল। কখনও এক রাঙ্গা পায়, দশটা মাথা লুটা-পুটি যায়, তবুও মন পাওয়া দায়! আবার যেখানেই বয়সটা দোটানা-গোছের হইয়াছে, জীবনস্রোতে ভাটা লাগিয়াছে, সেখানেই প্রায় 'গৌরাঙ্গ মোরে রাখ তব পায়' চলিয়াছে। মোটকথা, এ প্রহসনে নিতান্ত অন্তদন্তহীনা "Wrinkled piece of womanhood" না-হইলে, কোন অঙ্গনাই দর্শকদলভুক্ত হইয়া থাকিতে চান না। এক্ষেত্রে অভিনেত্রী হইবারই অভিলাষ বেশী। এরা প্রেম জিনিষটাকে এত হাল্‌কা করিয়া ফেলিয়াছে যে, যে-সে, যখন-তখন, যা-তা, প্রেম-সঙ্গীত গায়িতে কোনরূপ

দ্বিধা বোধ করে না। আমাদের, ভাবপ্রধান দেশের লোকের, চোখে কিন্তু এসব বড় ঠেকে! কিসে, কে কি ভাবিয়া বসে, সেই তরাসেই তারা সুখের চেয়ে শোয়াস্তি ভালবাসে! স্বভাবতঃ নির্ভীক বলিয়া, এসব দেশের রমণীগণ কিছুতেই প্রায় স্ত্রী-বিজিতা হন না; সুতরাং, তাঁরা মানেরও ধার বড় ধারেন না। ইহা তাঁহাদের পুরুষদের পক্ষে সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, আমরা তার বিচারক নই। তারপর, এ প্রবাসে প্রেম-পত্রের যা ছড়াছড়ি, তার আর বিশদ ব্যাখ্যা কিবা করি! জাহাজে কাহারও কোন জিনিষ হারাইলে একটা নোটিসে "Lost" এবং তার স্বরূপ লিখিয়া, সিঁড়ির সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গাইয়া রাখিবার রীতি। হঠাৎ একদিন সেখানে মহা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। ব্যাপারখানা জানিবার জন্য নিকটে গিয়া দেখি, লেখা আছে—"Lost! One heart last night in the dance,—360 beats in a minute!" এবংবিধ রঙ্গ তামাসা নিত্যই এখানে হইয়া থাকে। অর্থাৎ, জলপথের এই দীর্ঘ দিন কটা আমোদে কাটান লইয়া কথা। কিন্তু এই আমোদজনক বিষয় যদি আসলে গিয়া পরিণত হয়, তখন তাহা শোভনীয় কি শোচনীয় হয়, বলা শক্ত। ভাবিয়া দেখিলে, সুরা-সুন্দরীর সেবায়, আর কন্দর্প-দেবের ভজনায়, অবস্থা উভয়তঃ সমানই গিয়া দাঁড়ায়।

এই সব ভাবিতেছি, এমন সময় কে পরিচিতের মত আমার কাঁধে ভর করিয়া, পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইয়া দেখি, আমার সেই সদ্যঃপরিচিত সুলোচনা। জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই-যে সে-দিন তোমার দেখা পাই নাই কেন?" ঈষৎ হাস্য করিয়া সে বলিল—"আপনাকে আবডাল করিয়া রাখিয়াছিলাম, এই বাহ্য প্রকৃতিটা আমাকে মাঝে মাঝে বড় জব্দ করে। যখন বড় ঝড়-ঝাপ্টা, আমার বুকের ভিতর যেন কি চেপে ধরে!—আমি তখন কেবল কাঁদি—কেবল কাঁদি। যেদিন গুমট্ ভাব দেখি—সেদিন আর আমার মুখ দিয়া কথা সরে না, যেন জীবনে মৃতের মত থাকি। উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে আমি যেন প্রাণ পাই; বড় ধুম করিয়া পোষাক পরি, গহনা গায়ে দিই, বড় আনন্দ মনে হাসি, গাই, খাই, দাই।" ইহার এই অদ্ভুত জীবন-রহস্য আমাকে বড়ই কৌতূহলী করিল। মনে মনে ইহার আসঙ্গ-লিপ্সা বাড়িতে লাগিল। বিশ্রব্ধ সৌম্যভাবে প্রণোদিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"তুমি যে সেদিন বল্লে, তোমার স্বামীর উইলের টাকা তুমি ছোঁও নাই, তবে তা কি কর্‌লে?" সে বলিল কি—"তুমি শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে, জানি না; আমি তার সবটা তোমরা যাদের বড় ঘৃণার চক্ষে দেখ, তাদের দিয়ে দিয়েছি। তারি মধ্যে দু-চার জন সে টাকায় আপনাদের ঘরবাড়ী করে, পরের দুয়ারে খেটে, খেয়ে-দেয়ে আছে। কেউ কেউ তা দিয়ে ভাল লেখাপড়া শিখ্‌ছে, আবার কেউ কেউ, আমায় ফাঁকিও দিয়েছে!

বায়ু-চালিত 'জাঁতা'

ওরা সবাই সুখদুঃখের কথা নিয়ে আমার কাছে আসে—বসে, আমাকে বড়ই ভালবাসে। এজন্য আমাদের স্বর্গ-নরক-ভোগ-বিচারকর্ত্তারা আমার বাড়ীর ত্রিসীমায় পা দেন না। আমিও বেঁচেছি। আমি বেশ দেশ দেখে বেড়াই, তাতেই ভারি ফূর্ত্তি পাই।" এর কাছে ধর্ম্মের বড়াই করিতে লজ্জা বোধ করিলাম। এর মুখে এমনি একটি অলৌকিক জ্যোতিঃ ছিল, যে ইঁহাকে তুচ্ছ করিব, এমন ভণ্ডও হইতে পারিলাম না;—শুধু ভাবিলাম, এওত তাঁরই সৃষ্টি!

কথাবার্ত্তায় জানা গেল, ইহার বেশ পড়াশুনা আছে। অনেক সময়, সে আধ্যাত্মিক মানসিক, বৈজ্ঞানিক বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত। সব কথা আমার বিদ্যা-বুদ্ধিতে বোঝা, বা বুঝাইয়া বলা কুলাইত না,—বিশেষ বিদেশী ভাষায়। কিন্তু যাহা কিছু অজ্ঞেয়, অজ্ঞাতে আমরা—অজ্ঞানেরা—তাহাতে অনেক সময় ভক্তিমতী হইয়া পড়ি। সেটা আমাদের ধাতের ধারা; কি করি! এ ক্ষেত্রে বিদ্যাবিশারদদিগের ব্যঙ্গোক্তিতে আমরা বধির।

পরদিন প্রত্যূষে, ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে জাগ্রৎ হইয়া উঠিলাম। নিশ্চয়ই নিবিড় কুজ্ঝটিকার কুহেলিকায় পড়িয়াছি ভাবিয়া, প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। Port holeএর পরদা সরাইয়া দেখি, দিগ্দিগন্ত যেন ধূমজালে আবৃত। ডাহিনে-বামে, সম্মুখে পশ্চাতে কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না; অথচ অগ্রসর হওয়া চাই।

তবে কি এই মান-বিবর্জ্জিত, অবগুণ্ঠনে অপরিচিত দেশে, মাধুর্য্যলীলার এক অভিনব অনাস্বাদিত রসের সঞ্চার করাইবেন বলিয়া, দিগ্বধূগণ মিলিয়া এ চক্রান্ত করিয়াছেন! মানের অছিলায় একেবারে "বদন-কমল ঝেঁপে বসা"! কিন্তু এ বংশীধর ত আর "স্ত্রাণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু"র বার্ত্তা জানেন না! কেবল বাঁশরী বাজাইলেই হয় না, সেই মনভুলান বাজানো জানা চাই। কাজেই অবগুণ্ঠনও অপসারিত হইতেছে না দেখিয়া ত, ইনি, এক ভয়ঙ্কর বিপদ্ গণনা করিয়া, আতঙ্কে একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হইলেন। তবে কি আজ অপঘাত মৃত্যু? একা হইতেন—ক্ষতি ছিল না, কিন্তু, তাঁর শরণাগত জনকেও যে, তৎসঙ্গে এই লবণাম্বুরাশিতে হাবুডুবু খাইয়া, লবণাক্ত জীবনে লয় পাইতে হইবে! কৌতুকময়ীরা কি করুণাবশে একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? যে দেশে যে রসের অনুভূতি নাই, তাকে তা পাওয়াইতে যাওয়া কেন ভাই? বুঝি বা এ অনুনয়ে কাজ দেখিল! তখন যথার্থই তাঁহাদের এই ললিত-বিভ্রম ব্যর্থবোধে, ধীরে ধীরে আপনাদের অভেদ্য আবরণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন। সকল উৎকণ্ঠার উপশম হইল। সকলেই গা-ঝাড়া দিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে এই প্রমোদভবনের উৎসব আনন্দে উপ-ভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আজ নাকি সারা দিন প্রহসন চলিবে,—বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। আর

সুইডিশ্ জন সাধারণ

এ জলপথে বিদেশে-যাত্রার দিন ত ফুরাইয়া আসিল। অতএব এখানকার সমগ্র লীলা-বিধি সঙ্গে করিয়া, সঙ্গে এক সংস্মরণীয় স্মৃতি লইয়া, তবে ত আপন আপন দেশে ফিরা। তাই আমোদপ্রিয়-জাতটা বাকি দিন ক'টা, প্রাণভরে আশ মিটায়ে হেসেখেলে নিতে চায়। আমরা সবটাতে যোগ দিতে পারিতাম না,—এও আমাদের ধাতের দোষ। নোটিসের আর-আর-সব বাদ দিয়া, বৈকালের "Variety Entertainment" দেখিতে বসিব, ঠিক করিলাম। কে কি করিবে, তার একখানা তালিকা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে এক বেহারী বন্ধু ছিলেন, খোসগল্প বক্তার মধ্যে তাঁহার নাম রহিয়াছে। ছাতু-খোরের দেশের লোক হইলেও, সম্ভ্রান্ত-বংশের সন্তান বলিয়া, আর-আর দশজনের মতই, ইনি সুশিক্ষিত ও সম্মাননীয় ছিলেন।

দিয়াশলাই-কাষ্ঠ চাষ

তবে, এত সব শাদা মুখের সাম্‌নে, লোকটা না জানি কি বলিতে কি ভণে, মনে মনে এই একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। তারপর, এক লাবণ্য-ললামভূতা নাকি বেহালার তান বেহাল করিয়া দেবীর মত বাজাইবেন। ভুজঙ্গের অঙ্গভঙ্গিমায় নর্ত্তনের ভার এক চিত্তহারিণী তরুণীর প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ইতালীদেশীয় এক যুবক পিয়ানো যন্ত্রে তাঁহার সিদ্ধ-হস্তের প্রমাণ দিবেন। গায়ক-গায়িকার নাম নানা জায়গায় লিখা আছে—ইত্যাদি—ইত্যাদি লম্বা 'লিষ্ট'। সময়মত, সকলে সমবেত হইলে, পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে P. & O. কোম্পানীর বেতনভোগী বাদ্যকরেরা গৌরচন্দ্রিকা করিলেন। একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তদুপরি আরোহণ এবং কলাকৌশল প্রদর্শন ও ততঃপর নিষ্ক্রামণ চলিল। ইহার কত কত জায়গায়, আমাদের মতে উচ্চ হাস্য—এমন কি অট্টহাস্য—হইবার কথা ছিল, কিন্তু তথায়ও যখন কেবল "কিঞ্চিল্লক্ষ্যং দ্বিজম্‌" মাত্র হইল, তখন এদের সংযম-শক্তিকে বলিহারি গেলাম! পাছে আমাদের "সাস্রক্ষম্‌" বা "সাংসশিরঃ কম্পাম্‌" হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে জিহ্বাকে পুনঃপুনঃ দন্তপীড়িত করিয়া, তবে গিয়া এই সভ্যসমাজের শিষ্টাচার-বিধি অবলম্বনে সমর্থ হই। এক একজন সুচারুরূপে আপন-আপন কার্য্য সমাধান করিতেছে, আর করতালির চোটে অর্ণবপোতের অন্তঃস্থল মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। যে বরাননা বেহালার তানে সকলকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁকে ত মধুলিহের মত সকলে ঘেরিয়া ফেলিল। তা না হবে কেন? কবিরা বলিয়া থাকেন—"সুলভা রম্যতা লোকে দুর্লভং হি গুণার্জ্জনম্‌"; ললিত-লবঙ্গলতারা যদি আবার কলাবিদ্যা সমন্বিতা হন,
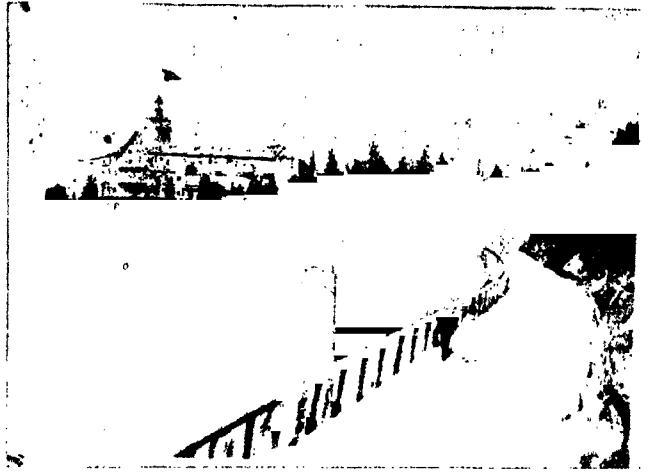
জনকোপিং যাদুঘরের দারু-গির্জ্জার অভ্যন্তর

তবে ত ভ'র ঢুনিয়াই তাঁদের পায়! এবারে আমাদের বেহারী বন্ধুর মঞ্চে আরোহণ।—তা তিনি বেশ সপ্রতিভের মতই আপনার বক্তব্য বলিয়া গেলেন। কৌতুক-কথা বলিবার ধরণটিও প্রশংসনীয় মনে হইল। নিকটে পাইয়া, অনেকেই করমর্দ্দনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। তখন আমরাও, একদেশী বলিয়া, একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম। এই সকল আনন্দ-সজ্জার যথাবিহিত পারিতোষিক দেওয়া আছে। সকলেই জানেন, এজন্য জাহাজে দস্তরমত club গঠিত হয়, এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে পাউণ্ড খানেক, কি তদধিক, চাঁদাও আদায় হয়। এবং সকলেই সন্তুষ্টমনে এ কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। আমাদের সংখ্যাও, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, কম ছিল না; কাজেই, এতদর্থে বহুমূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করাও সম্ভব হইয়াছিল। রাজধানীর বিপণিসকল হইতেই তাহা সংগৃহীত হইতে লাগিল।

কিছুদিন হইতে আমাদের ফিয়ড্-বন্ধুবর যে কখন কোন্ ছলে ভাগিয়াছেন, ভগবান জানেন। আর তাঁর দেখাসাক্ষাৎ নাই।—সিন্ধুরাজেরও ইহাতে কিছু সঙ্কেত ছিল, এরূপ সন্দেহ করি। কেননা নূতনের মোহে পড়িয়া, আমরা পুরাতনে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছিলাম; বুঝিতে পারিয়া, সন্তর্পণে ইনি ইহাকে সরিয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। বেশী ঘনিষ্ঠতায় অনেক সময় মোহের গ্রাহিণী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। মোহের স্মৃতি-টুকুই বড় মধুময়। তাই আজও ফিয়ড্‌কে ভাবিতে, তার বৈচিত্র্য চিন্তা করিতে করিতে এক স্বপ্ন রাজ্যে বাস করি! ভাবি—"কোন সুলগনে আর দেখা হবে কি গো দুজনায়।"

চির-আহ্বান

[শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, M. A., B. L.]

এস জীবনের সখা! জীবনের আলোক :
দ্যুলোকের দ্যুতি যবে ভেসে আসে ভূলোকে,
বিশ্ব যবে ফুলবন,
চিত্ত যেন সমীরণ,
এ জীবন শুধু যেন সঞ্চরণ নন্দনে,
এ হৃদয় লিপ্ত থাকে চিরানন্দ-চন্দনে।

জীবন যখন বহে তটিনীর ধারাতে,
হৃদয় গায়িতে থাকে কলুকলু ভাষাতে,
শ্যাম উভ-উপকূল,
পত্রে স্নিগ্ধ তরুকুল,
এ জীবন নিরুদ্বেগ শান্তি যেন শুইয়া,
এ হৃদয় চলে যায় গীত যেন বহিয়া :

এস এস প্রাণসখা! বনে বনে ভ্রমিয়া,
আমার প্রাণের সাথে ফুলমালা গাঁথিয়া,
মধুর পূরবভাগে,
ঊষার সোনার রাগে,
এস তুমি মধুময় প্রভাতেতে জাগিয়া,
এস ভ্রমণের সখা! দুয়ারেতে ডাকিয়া।

এস চিরহাস্যময়! পূর্ণিমার নিশিতে,
নেমে এস শশি-করে এ ধরাতে মিশিতে।
ছুটে ছুটে জোছনায়
খেলাইব দু'জনায়;
লুকাইয়া থেকো তুমি পাদপের পাতাতে,
ছুটিয়া ধরিব তোমা কুসুমিত লতাতে।

এস এস চিরসখা! জীবনের অমাতে,
সাড়া দিয়ে থেকো তুমি হৃদয়ের সীমাতে;
আঁধারে যে বড় ত্রাস :
থাকিও আমার পাশ,
হৃদয়ে ভরসা দিও বারে বারে ডাকিয়া,
অভয়ে ঘুমায়ে র'ব আমি তোমা ছুঁইয়া।

এস তুমি সে আঁধারে মৃদুদীপ্তি তারাতে,
সুপ্তিহীন নেত্রে মম শান্ত-রশ্মি বিলাতে;
আঁধার বাড়িবে যত,
ফুটিয়া উঠিবে তত
স্থির-ধীর অচঞ্চল অন্তহীন আশাতে,
ব্যক্ত করি আপনার উক্তিহীন ভাষাতে।

এস আলো-আঁধারের চির সম সাথি হে!
থাক হে হৃদয়ে মম চির দিবারাতি হে :
তুমি যে সুখের দীপ্তি,
তুমি যে দুখেতে তৃপ্তি;
তুমি বিনা এ আলোকে কে খেলাবে আমারে?
তুমি বিনা ঘুমাইব কেমনে সে আঁধারে?

কবি রাজশেখর

[অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, M.A.]

সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে কালিদাস ও ভবভূতি প্রখরকর-প্রদীপ্ত দিবাকর ও বিমলকরোজ্জ্বল শশধরের মত পরি-শোভিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছেন। অস্তগত হইলেও এখনও তাঁহাদের প্রতিভার প্রোজ্জ্বলপ্রভা সাহিত্যাকাশ বিচিত্ররূপে রঞ্জিত করিয়া, সহৃদয় কাব্যামোদিগণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের অমিয় ধারা বর্ষণ করে। তাঁহাদের অস্তগমনের পর সাহিত্য-জগৎ একেবারে অমানিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় নাই; তাঁহাদের প্রভার প্রতিফলনব্যতীত আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ কত শত তারকামালার মত কবিবৃন্দ উদিত হইয়া, জ্যোতিষ্কাবলী পরিশোভিত হিমনির্ম্মুক্ত শারদ-রজনীর শোভা বিস্তার করিয়াছিল। রাজশেখর এই নীহারিকা-পুঞ্জের এক উজ্জ্বলতম তারকা। পাঠক, নিশাবসানে শুক-তারার উজ্জ্বলতা কি লক্ষ্য করিয়াছেন? কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার, গাছের কোল, নদীর কূল, বনের পথ, প্রকৃতির সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—সকল শোভা ঘেরিয়া রাখিয়াছে; এমন সময়, শুকতারা উদিত হইয়া, অন্ধকারের নিবিড়তা অপসারিত করিয়া, কিরূপে প্রকৃতির হাস্যময়ী শোভা বিকাশিত করে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন?—রাজশেখরও সেইরূপ অলৌকিক কবিত্বের কিরণচ্ছটায় সংস্কৃত-সাহিত্যাকাশ আলোকিত করিয়াছিলেন।

কালিদাস ও ভবভূতির কবিতা পাঠে আমাদের হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে, কক্ষে কক্ষে যেমন আনন্দহিল্লোল প্রবাহিত হয়, কি যেন একটা ভাবের আবেশে হৃদয় আবিষ্ট হয়,—রাজশেখরের কবিতা পাঠে অবশ্য সেরূপ হয় না; কিন্তু তাঁহার অলৌকিক কল্পনা-কল্পিত বিচিত্র রচনাপাঠে আমরা আনন্দলাভ করি, সন্দেহ নাই;—তবে সে আনন্দ ঠিক হৃদয়ের নহে—মস্তিষ্কের। একটি জটিল অঙ্কের সুনিপুণ পদ্ধতিদ্বারা সমাধান-দর্শনে মস্তিষ্ক যে পরিমাণে পরিতৃপ্ত হয়,—হৃদয় ততটা হয় না। বিসর্পণশীল কল্পনা-প্রসূত কবিতাপাঠেও আমাদের সেইরূপ হইয়া থাকে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ, কাদম্বরীকার বাণভট্ট প্রভৃতির কাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কালিদাস ও ভবভূতি, ভাব ও রসের বন্যায় ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্র আপ্লুত করিলেও, ক্রমে এমন সময় আসিল, যখন ঐ স্রোত ক্রমশঃ স্তিমিত হইলে, পলিপড়া জমির মত কল্পনার উর্ব্বরতা খুবই বৃদ্ধি করিল। কবিগণ, ভাব ও রসের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, ভাষাগত কৌশল পরিপোষণে যত্নশীল হইলেন—অর্থালঙ্কার ছাড়িয়া সমস্ত কল্পনা শব্দালঙ্কারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে নিযুক্ত করিলেন। বড় বড় রাজসভায় এইরূপ কবিতা লইয়া কবিগণের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল। ইহার ফলে যাহা হয়, তাহাই হইল, কবিতা-সুন্দরী বিচিত্র কৃত্রিম-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া, কল্পনার কমনীয় পক্ষবিস্তার করিয়া, সুরসুন্দরীর শোভা ধারণ করিলেন বটে;—কিন্তু তাঁহার অন্তরের ভূষণ, সাধনার ধন—ভাব ও রসের ক্রমশঃ অভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সরল ও প্রাঞ্জল ভাষাত্মক বৈদর্ভী রীতির পরিবর্ত্তে, সমাসবহুল জটিলভাষাত্মক গৌড়ী রীতির প্রবর্ত্তন হইল। কোন একটা বস্তুর উপন্যাসে ভাষার দুর্গম দুর্গ ভেদ করিয়া, বস্তুর অন্বেষণ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। কাদম্বরী পড়ুন, ভাষার গভীরতায়ই আপনার চোখ, কাণ, মুখ ডুবিয়া গিয়া, হাবুডুবু খাইবেন,—বস্তু পাইবেন খুবই কম। এই সময়কার কবিতার ইহাই হইল বিশেষত্ব। রাজশেখরও এই শ্রেণীর কবি।

[রাজশেখর ও সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য]—রাজশেখরের বিশেষত্ব এই যে, তিনি তাঁহার সমস্ত কবিত্ব শক্তি ও কল্পনা নাট্য-সাহিত্যের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তিনখানি নাটক (উত্তর রাম-চরিত, মহাবীর চরিত, মালতীমাধব) লিখিয়াই অমর হইয়াছেন; তাঁহার নামাঙ্কিত কোনও মহাকাব্য নাই। রাজশেখরও

—"স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া"—বলিয়া আপনাকে জন্মান্তরে ভবভূতিরূপে বর্ণন করিতে গৌরব অনুভব করিয়াছেন,—এবং তাঁহারই মত নাট্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি-সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত কবিগণের মধ্যে রাজশেখরের মত অতগুলি, অত বিশাল নাটক লিখিতে আর কাহাকেও দেখি না। তাঁহার মত কবিকে সহায়রূপে পাইয়াছিল বলিয়া সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য অত সমৃদ্ধ হইয়াছিল। অদ্য তাই ভারতীয় সাহিত্যের পরমবন্ধু রাজশেখর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমার বিশ্বাস, যথার্থ প্রেমিক সাহিত্যিকগণ ইঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন না।

জানি না, কেন রাজশেখর বর্ত্তমান সংস্কৃত সাহিত্য-সেবিগণের নিকট এত উপেক্ষিত! পণ্ডিতগণও ইঁহার নাটক পড়েন না, চতুষ্পাঠীতেও এই নাটকগুলির পঠন-পাঠন প্রচলিত নাই। কিন্তু সাহিত্য-জগতে এককালে তাঁহার অপ্রতিমেয় প্রতিপত্তি ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের কি অলঙ্কার, কি ব্যাকরণ, কি কোষ—সকল প্রকার গ্রন্থেই তাঁহার নাটক হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্য চিন্তামণি, কবিকণ্ঠাভরণ, সুবৃত্ত তিলক, প্রাকৃত পিঙ্গল, গণরত্ন-মহোদধি, হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ, মঙ্খের শ্রীকণ্ঠচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে,—ইহা ব্যতীত দশরূপ কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার পুস্তকে রাজশেখরের অনেক শ্লোক উদাহরণ-স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকাকার ক্ষীরস্বামী উক্ত গ্রন্থেরই টীকায় 'গোনস' শব্দের অর্থ-বিশেষের প্রতিপাদনে ও 'তারক' শব্দের লিঙ্গ-নির্ণয়ে রাজশেখর-কৃত বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইত গেল পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সম্মানের কথা।

[সাহিত্য ক্ষেত্রে রাজশেখরের প্রতিপত্তি]—তিনি জীবিত কালেও তাৎকালিক বড় বড় সমালোচকদিগের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। সেরূপ প্রশংসা সহজে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। মহাকবি ভবভূতিকেও নিজের প্রতি সমসাময়িক সমালোচকগণের হতাদর উপলক্ষ্য করিয়া

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি,—তান্ প্রতি নৈব যত্নঃ।
উৎপৎস্যতি মম তু কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

বলিয়া গভীর ক্ষোভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রাজশেখরের সমকালিক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শঙ্করবর্ম্মণ্ তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"পাতুং শ্রোত্ররসায়নং রচয়িতুং বাচঃ সতাং সম্মতাঃ
ব্যুৎপত্তিং পরমামবাপ্তুমবধিং লব্ধুং রস স্রোতসঃ।
ভোক্তুং স্বাদুফলঞ্চ জীবিততরোর্যদ্যস্তি তে কৌতুকং
তদ্‌ভ্রাতঃ শৃণু রাজশেখর কবেঃ সূক্তীঃ সুধাস্যন্দিনীঃ।"

আবার 'মৃগাঙ্কলেখা কথা'-কার সুপ্রসিদ্ধ কবি অপরাজিতও তাঁহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা অবগত হই, কিরূপে রাজশেখর ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিয়া, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন,—কর্পূরমঞ্জরীর প্রস্তাবনায় পারিপার্শ্বিকের মুখ দিয়া অপরাজিতের মত ব্যক্ত হইয়াছে।

—"সুণসু, বণ্ণিদো জ্জেব তক্কাল কঈণং মজ্ঝম্মি মি অঙ্ক-লেহা কধাকারেণ অবরাইদেণ। জধা—

বালকঈ কইরাও নিব্ভররাঅস্‌স তহ উবজ্ঝাও।
ই অ জস্স পএহিঁ পরম্পরাই মাহপ্পমারূঢম্॥
সো অস্‌স কঈ সিরি রাঅ সেহ রো তিহুবণং পিধবলেন্তি।
হরিণঙ্কপাডিসিদ্ধীঅ নিক্কলঙ্কা গুণা জস্‌স॥*"

একদিকে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শঙ্করবর্ম্মা, অন্যদিকে স্বনামধন্য কবি অপরাজিত তাঁহাকে যে ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, পণ্ডিতসমাজে তাঁহার কিরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল।

[কান্যকুব্জ রাজবংশের সহিত রাজশেখরের সম্বন্ধ]—কেবল যে বিদ্বৎসমাজে তাঁহার সম্মান ছিল, তাহা নহে, তৎকালে দুই প্রবল রাজসংসারের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কান্যকুব্জের প্রবলপরাক্রান্ত রাজা মহেন্দ্র পালের তিনি শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন। কর্পূরমঞ্জরীর

---

* "শৃণু, বর্ণিতএব তৎকালকবীনাং মধ্যে 'মৃগাঙ্কলেখা কথা'-কারেণ অপরাজিতেন, যথা,—

বালকবিঃ কবিরাজো নির্ভররাজস্য তথোপাধ্যায়ঃ।
ইত্থং যস্য পদানাং পরম্পরয়া মাহাত্ম্যমারূঢ়ঃ॥
সোঽস্য কবিঃ শ্রীরাজশেখরস্ত্রিভুবনমপি ধবলয়ন্তি।
হরিণাঙ্ক প্রাতিসিদ্ধ্যা নিষ্কলঙ্কা গুণা যস্য॥"

প্রস্তাবনায় 'কে লেখক' এই প্রশ্নের উত্তরে পারিপার্শ্বিক বলিতেছেন—'রহুউল চূড়ামণি নো মহিন্দ বালস্‌স কো অগুরু'। স্থাপক বুঝিলেন, এ আর কেহ নহে, কবি রাজ-শেখর, নতুবা মহেন্দ্রপালের গুরু আর কে হইবেন? তাই উত্তরে বলিতেছেন—"রা অসেহরো"। আবার বাল-রামায়ণের প্রস্তাবনায় এই কথারই উল্লেখ আছে, যথা—

"আপন্নার্ত্তিহরঃ পরাক্রমধনঃ সৌজন্যবারাংনিধি-
স্ত্যাগী সত্যসুধাপ্রবাহশশভৃৎ কান্তঃ কবীনাং গুরুঃ।
বর্ণ্যং বা গুণরত্নরোহণগিরেঃ কিং তস্য সাক্ষাদসৌ
দেবো যস্য মহেন্দ্রপালনৃপতিঃ শিষ্যোরঘুগ্রামণী॥"

মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহীপালের সময়ও কান্যকুব্জরাজবংশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিনষ্ট হয় নাই। এই মহীপালের অনুরোধে তিনি 'বালভারত" রচনা করেন, ইহা আমরা বালভারতের প্রস্তাবনা-পাঠে অবগত হই।

[চেদিরাজবংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক]—সূক্তি-রত্নাবলী গ্রন্থে রাজশেখর-বিরচিত অনেকগুলি শ্লোক দেখিতে পাই, যাহা পাঠ করিয়া প্রতীত হয় যে, চেদি রাজ-বংশের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। এই শ্লোকগুলির মধ্যে একটিতে চেদিবংশীয় নৃপতি রণবিগ্রহ স্তুত হইয়াছেন। এই ঘটনাটি চেদিদিগের বিহারী অনুশাসন-(Inscription) স্থিত ৮৫ সংখ্যক শ্লোকে সুপ্রমাণিত হইতেছে (Epigraphic India. Vol. 1-25). শ্লোকটি এই—

"সুস্মিতবন্ধঘটনা বিস্মিতকবি রাজশেখরস্তুত্যঃ।
আস্তামিয়মাকল্পং কৃতিশ্চ কীর্ত্তিশ্চ পূর্ব্বাশ্চ॥"

এইরূপে কি রাজসভায়,—কি বিদ্বৎসমাজে সর্ব্বত্র অমিত সম্মান লাভ করায় আমরা তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে কালিদাস ও ভবভূতির পর ভারতের কবিসম্রাট্ (Poet Laureate of India) বলিতে পারি।

[রাজশেখরের সময় নির্ণয়] এখন দেখা যাউক, রাজশেখর কোন্ শতাব্দীর লোক ছিলেন? তাঁহার সময় নিরূপণ লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক উইলসন্ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগ তাঁহার আবির্ভাব-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বড়ুয়া "শঙ্কর বিজয়" গ্রন্থের প্রামাণ্য লইয়া রাজ-শেখরকে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িকরূপে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক মাক্সমূলর আবার চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহাকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ম্যাক্সমূলরের এ মত ভ্রান্ত, কেননা "প্রবন্ধ-কোষ"-রচয়িতা রাজশেখর (তিনি আমাদের আলোচ্য কবি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি) চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আনুমানিক ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। পিটরসন্ ও দুর্গাপ্রসাদ কবি রাজশেখরকে অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের যুক্তি এই যে, কাশ্মীররাজ জয়সিংহের শিক্ষাগুরু খ্যাতনামা ক্ষীরস্বামী তাঁহার অমরকোষের টীকায় রাজশেখর-কৃত বিদ্ধশালভঞ্জিকা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। জয়সিংহের রাজত্বকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ। এই ত গেল প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণটি এই যে, 'দিঘোয়া দিবন্তী অনু-শাসনে' (Inscription of Dighwa Dibanti) * অবগত হওয়া যায় যে, রাজা মহেন্দ্রপাল,—যাঁহাকে আমাদের কবি স্বীয় শিষ্য বলিয়া অনেকস্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ৭৬০ অব্দে ও তৎসন্নিহিত সময়ে রাজত্ব করিতেন। এইরূপ দুইটি কারণদ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় শেষোক্ত যুক্তিই আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আবার মিষ্টর ল্যানম্যান "হারবর্ড ওরিয়েণ্টল সিরিজ" এই নামধেয় পুস্তক প্রকাশক সমিতি হইতে প্রকাশিত কর্পূরমঞ্জরীর সম্পাদকরূপে কবি রাজশেখরের জীবনীবিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া-ছেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, "দিঘোয়া দিবন্তী" অনুশাসনের মহেন্দ্রপাল রাজশেখর-নির্দ্দিষ্ট মহেন্দ্রপাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। অস্নি অনুশাসনোল্লিখিত (বিক্রম সম্বৎ ৯৭০=খৃষ্টীয় ৯১৪) মহেন্দ্রপালই কবির শিষ্য ছিলেন, যেহেতু এই অনুশাসনে মহেন্দ্রপাল ও মহীপাল উভয়ই পিতাপুত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা সকল মতভেদের সমন্বয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের আলোচ্য কবি রাজশেখর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে নবম শতাব্দীর অবসান এই সময়ের মধ্যে কোন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়া ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

[রাজশেখরের বংশগত পরিচয়]—এক্ষণে রাজশেখরের

* Fleet Indian Antiquary, 185 XV. এই অনুশাসনের সময় হর্ষাব্দ ১৫৫=৭৬১-২ খৃষ্টাব্দ।

বংশগত কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। তিনি শৈবসম্প্রদায়ান্তর্গত যাযাবর-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে যাযাবর শব্দের অর্থ কি দেখা যাউক। মিষ্টর হল (Mr. Hall) এই শব্দটির অর্থ "The maintainer of a Sacrificial hearth" অর্থাৎ "আহিতাগ্নি" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। নারায়ণ দীক্ষিত 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'র টীকায় দেবলের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'যাযাবর' বলিতে এক শ্রেণীর গৃহস্থ বুঝা যায়। যথা—

"দ্বিবিধো গৃহস্থো যাযাবরঃ শালিনশ্চ"—(দেবল।)

কবি এইভাবে নিজের বংশের পরিচয় দিয়াছেন,—

"সমূর্ত্তো যত্রাসীদ্‌গুণগণ ইবাকালজলীঃ
সুরানন্দঃ সোঽপি শ্রবণপটপেয়েন বচসা।
ন চান্যে গণ্যান্তে তরল কবিরাজপ্রভৃতয়ো
মহাভাগস্তস্মিন্নরমজনি যাযাবরকুলে॥"

অর্থাৎ যে প্রসিদ্ধ যাযাবরকুলে সাক্ষাৎ গুণগণের মত কবি অকাল-জলদ আবির্ভূত হন এবং যে বংশ শ্রুতিমধুর কবিত্বসম্পন্ন 'সুরানন্দ' অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং 'তরল', 'কবিরাজ' প্রভৃতি কত অগণিত কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যাযাবরকুলে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, কবি রাজশেখরের বংশ কিরূপ 'অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ' ছিল। পূর্ব্বোক্ত অকালজলদ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

(১) 'অকালজলদ'—স্বকীয় আবির্ভাবকালে অপ্রতিমেয় যশোলাভ করিয়াছিলেন। সূক্তিরত্নাবলী গ্রন্থে তাঁহার বহুসংখ্যক কবিতা দৃষ্ট হয়। সেইগুলি পাঠ করিলে তাঁহার প্রকৃত কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই।

(২) 'সুরানন্দ'—একটি উদ্ভট শ্লোকে সুরানন্দের পরিচয় পাইয়া থাকি। যথা—

"নদীনাং মেকলসুতা নৃপাণাং রণবিগ্রহঃ।
কবীনাঞ্চ সুরানন্দশ্চেদিমণ্ডলমণ্ডনম্॥"

(৩) 'তরল'—সূক্তিরত্নাবলী ও হরিহারাবলী এই উভয়গ্রন্থেই একটি শ্লোকে তরলের নাম দেখিতে পাই,—

"যাযাবরকুলশ্রেণে র্হারযষ্টিশ্চ মণ্ডনম্।
সুবর্ণবন্ধরুচিরস্তরলস্তরলো যথা॥"

এই শ্লোক হইতেও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে 'তরল'—যাযাবর বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(৪) 'কবিরাজ'—এই শব্দটি আমাদের কবির কোন পূর্ব্বপুরুষের সম্মানপ্রদ উপাধি ছিল, এইরূপ অনুমান অনেকে করিয়া থাকেন। আর যদি এই শব্দটি যথার্থই কাহারও নাম হয়, তবে তিনি যে 'রাঘব পাণ্ডবের' রচয়িতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, 'রাঘব পাণ্ডব'-কার কবি 'কবিরাজ' অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক।

কবি রাজশেখরের নাটকগুলির প্রস্তাবনা হইতে অবগত হই যে, পূর্ব্বোক্ত কবি 'অকালজলদ' তাঁহার প্রপিতামহ ছিলেন,—তাঁহার পিতার নাম দুর্দ্দুক ও মাতার নাম শীলবতী ছিল। 'বাল-রামায়ণের' প্রস্তাবনায় এই তত্ত্বটি স্পষ্টই উল্লিখিত আছে; যথা,—

"তদামুষ্যায়ণস্য মহারাষ্ট্রচূড়ামণেরকালজলদস্য চতুর্থো দৌর্দ্দুকি শীলবতীসূনুরুপাধ্যায় শ্রীরাজশেখরঃ"—ইত্যাদি।

[রাজশেখরের জাতি-নির্ণয়];—রাজশেখরের জাতি-নির্ণয়পক্ষে একটু মতভেদ আছে। মহেন্দ্রপাল ও মহীপালের মত প্রবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় নৃপতিদ্বয়ের গুরুরূপে আমরা তাঁহাকে নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি; কেননা এতবড় রাজার গুরু ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য জাতীয় হওয়া অসম্ভব। আবার চৌহনকুলের অলঙ্কারস্বরূপ 'অবন্তীসুন্দরীর' পতিরূপে আপনাকে বর্ণন করায়, কেহ কেহ তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমান করেন। কর্পূর-মঞ্জরীর প্রস্তাবনায় এই তত্ত্বটির উল্লেখ আছে। যথা,—

"চাহুআণকুল মোলিমালিআ
রাঅ সেহরকইন্দ গেহিনী।
ভত্তুণো কিই মবন্তি-সুন্দরী
সা পউঞ্জইউমে অমিচ্ছই॥" *

[রাজশেখর দাক্ষিণাত্যবাসী],—রাজশেখর যে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশের লোক, সে বিষয়ে আমরা অনেক প্রমাণ পাইয়া

---

* ইহার সংস্কৃত অনুবাদ—
"বেচহনকুল মৌলিমালিকা, রাজশেখরকবীন্দ্র গেহিনী।
ভর্ত্তুঃ কৃতিমবন্তীসুন্দরী সা প্রয়োজয়িতুমিচ্ছতি।"

থাকি। তিনি স্বকীয় প্রপিতামহ অকালজলদকে 'মহারাষ্ট্র চূড়ামণি' বলিয়াছেন, এবং কর্পূরমঞ্জরীর বারাণসী-সংস্করণের গ্রন্থ-সমাপ্তি বিবরণে (colophon) কবি স্বয়ং ঐ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থসমূহে দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক ও আচার-ব্যবহার গত তত্ত্বের বিশদ ও সজীব বর্ণন দেখিয়া আমাদের ধারণা আরও সুদৃঢ় হয়। ক্ষেমেন্দ্রের 'ঔচিত্য বিচার সার' গ্রন্থে রাজশেখর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাই; ইহাতে কর্ণাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রদেশ, লাট দেশ ও মলয়দেশ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় প্রদেশসমূহের সহিত তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ের সম্পর্ক উল্লিখিত থাকায় তিনি যে দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন, তাহা সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্লোকটি এই,—

"কর্ণাটী দশনাঙ্কিতঃ সিতমহারাষ্ট্রীকটাক্ষাহতঃ
প্রৌঢ়ান্ধ্রীস্তনপীড়িতঃ প্রণয়িনীভ্রূভেদবিত্রাসিতঃ।
লাটী বাহুবিবেষ্টিতশ্চ মলয়স্ত্রী তর্জ্জনীতর্জ্জিত
সো হয়ম্ সম্প্রতি রাজশেখর কবিঃ বারাণসীং বাঞ্ছতি॥"

এই শ্লোকটি হইতে তাঁহার ভারতের নানা প্রদেশে পরিভ্রমণ সূচিত হইতেছে। ইহা হইতে এবং বালরামায়ণে দশম অঙ্কস্থিত আকাশপথে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন-মার্গের সুচারু বর্ণনে ভারতীয় ভৌগোলিক তত্ত্বের যেরূপ জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি মহাকবি কালিদাসের মত বা ততোধিক ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় ভৌগোলিক তত্ত্বের এমন প্রকৃত ও বিস্তৃত সন্ধান এই দুই কবি ব্যতীত অন্য কোনও কবির গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয় না।

[রাজশেখরকৃত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়],—এইবার রাজশেখর-প্রণীত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া অদ্যকার মত নিবৃত্ত হইব। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ছয়খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে চারিখানি মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাঁহার যে ছয়খানি নাটক ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে অবগত হওয়া যায়,—

"ব্রূতে যঃ কোপি দোষং মহদিতি সুমতি বালরামায়ণেঽস্মিন্
প্রষ্টব্যোঽসৌ পটীয়ানিহভণিতিগুণো বিদ্যতে বা নবেতি।
যদ্যস্তি স্বস্তি তুভ্যং ভব পঠনরুচি বিদ্ধিনঃ ষট্‌প্রবন্ধান্
নৈবং চেদ্দীর্ঘমাস্তাং নব বটুবদনে জর্জরা কাব্যকন্যা॥"

এই চারিখানি নাটকেই তাঁহার কল্পনার অল্পবিস্তর অপূর্ব্বতা দৃষ্টিগোচর হয় এবং সকলগুলিতেই অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই। এই নাটকগুলির বিশেষত্ব ইহাদের বৃহদায়তনে। কেবল সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, আমাদের পরিচিত ইংরাজী কি বঙ্গসাহিত্যে এইগুলির মত একখানিও বড় নাটক দেখিতে পাই না। আবার এইগুলির মধ্যে কর্পূরমঞ্জরীর বিশেষত্ব এই যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। অলঙ্কার শাস্ত্রে যে নাট্যসাহিত্যে 'সট্টক' * নামে একজাতীয় নাটকের উল্লেখ আছে, কেবল 'কর্পূরমঞ্জরী' ইহার উদাহরণস্থল। পূর্ব্বে আর কোনও 'সট্টক' ছিল কি না আমরা জানি না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা যতটা খোঁজখবর পাই, তাহাতে কেবল কর্পূরমঞ্জরী ব্যতীত অন্য 'সট্টক' দেখিতে পাই না। † কবি রাজশেখর-প্রণীত যে চারিখানি নাটকের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাদের নাম যথা,—(১) কর্পূরমঞ্জরী (২) বিদ্ধশালভঞ্জিকা, (৩) বালভারত, (৪) বালরামায়ণ। এ প্রবন্ধে এই সকল নাটকের আখ্যায়িকা-অংশ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা সম্ভবে না, ভবিষ্যতে একে একে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে যতদূর পারি, সংক্ষেপে উহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া অদ্যকার মত নিবৃত্ত হইব।

(১) কর্পূরমঞ্জরী—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্পূরমঞ্জরী নাট্যসাহিত্যে 'সট্টক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কবির রচিত

---

* সট্টক—

সট্টকং প্রাকৃতাশেষপাঠ্যং স্যাদপ্রবেশকম্।
ন বিষ্কম্ভকোঽপ্যত্র প্রচুরশ্চাদ্ভুতোরসঃ।
অঙ্কাঃ যবনিকাখ্যাঃ স্যুঃ স্যাদন্যন্নাটিকাসমম্॥

† এ সম্বন্ধে মিষ্টর ল্যানম্যান বলেন.—"At all events Raj Sekhara's work is the only extant pure Prakrit Drama, and its cheif importance is the history of Prakrit literature lies in the fact that he has given to us a unique specimen of a kind of literature which has perhaps a history of its own."—Introduction to Karpura Manjuri. Hurdbard Oriental Series.

নাটকগুলির মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম। ইহা চারিটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার গল্পাংশ অনেকটা রত্নাবলী বা মালবিকাগ্নিমিত্রের মত। ইহার নায়ক রাজা চন্দ্রপাল তৎকালের প্রথা অনুসারে বহুপত্নীক ছিলেন, তন্মধ্যে একজন অবশ্য পাটরাণীও ছিলেন। এরূপ অবস্থায় এক গণককার গণিয়া বলে, যদি রাজা কুন্তল-রাজকুমারী কর্পূরমঞ্জরীকে বিবাহ করিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি 'রাজচক্রবর্ত্তী' হইবেন। এই গণনার ফলেই কর্পূরমঞ্জরীর সহিত চন্দ্রপালের বিবাহ সংঘটিত হইল, রাজাও অব্যবহিত পরে 'রাজচক্রবর্ত্তী' হইলেন। তবে অবশ্য চন্দ্রপাল ও কর্পূরমঞ্জরীর মিলন-সংঘটনের মধ্যে পাটরাণীর হিংসা, অভিমান এবং অনেক পরিপন্থী আচরণ অন্তরায়রূপে অবস্থিত। কিন্তু কর্পূরমঞ্জরীর সহিত চন্দ্রপালের শুভ বিবাহেই সট্টকখানির সমাপ্তি হইয়াছে।

(২) বিদ্ধশালভঞ্জিকা—কর্পূরমঞ্জরীর পর বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা রচিত হয়। শালভঞ্জিকার অর্থ প্রতিমূর্ত্তি। নায়িকার প্রতিমূর্ত্তিই এই নাটিকার আখ্যায়িকা-ভাগের কেন্দ্রস্থল। এইজন্য ইহার এই নামকরণ। অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণানুসারে আমরা ইহাকে নাটিকা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকি।* পূর্ব্বোক্ত সট্টকের লক্ষণে "স্যাদন্ননাটিকা সমম্"—এই বিধান থাকায়—"স্যাদন্তঃপুর সম্বন্ধসঙ্গীত ব্যাপৃতা হথবা......পদে পদে মানবকী তদ্বশঃ সঙ্গমো দ্বয়োঃ।" এই লক্ষণাংশে সট্টক ও নাটিকার সাম্য অবশ্যম্ভাবী। কবি স্বয়ংই কর্পূরমঞ্জরীর প্রস্তাবনায় সট্টক ও নাটিকার পার্থক্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সো সট্টও ত্তি ভণ্ণই দূরং জো নাচি আই অণুহরই
কিং উণ পবেস বিক্খম্ভাষ্কাইং কেবলং ণ দীসন্তি॥ †

এইরূপ লক্ষণগত সাম্য থাকায় সট্টক ও নাটিকার গল্পাংশে যে অনেকটা মিল থাকিয়া যাইবে, ইহা একরূপ সুনিশ্চিত। এইজন্য গল্পাংশেও কর্পূর মঞ্জরীর সহিত বিদ্ধশাল ভঞ্জিকার বিশেষ সাম্য দৃষ্ট হয়। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে এ শ্রেণীর অনেকগুলি নাটক দেখিতে পাই। নায়কনায়িকা ও তৎসম্বন্ধে অবান্তর চরিত্রগণের নাম-গুলির পার্থক্য তুলিয়া দিলে একখানি নাটক হইতে অপর একখানির পার্থক্য করা দুরূহ হইয়া উঠে। গল্পাংশে তাহাদের এতই মিল। কবি শক্তি বা প্রতিভার মান্দ্য-হেতু কবিগণের লেখনী আলঙ্কারিকগণের ধরাবাঁধা পথে চলিয়াছে, একটানা স্রোতে তৃণগাছটির মত চলিয়াছে, উজান বহিবার ক্ষমতা নাই। এইজন্য নাটকগুলি যেন এক ছাঁচে ঢালা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রকৃতি একইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের জীবন-হীন দুর্দ্দশাই জ্ঞাপন করিতেছে। কৃত্রিমতার পঙ্কিল পথে কল্পনার সজীবতা বিলুপ্ত হইয়াছে। কালিদাসের অমৃতময় লেখনী হইতে মালবিকাগ্নিমিত্র পূর্ব্বোক্তরূপ গল্পাংশ লইয়া প্রথম প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যিকগণের হৃদয় মোহিত করিল কিন্তু কিছুদিন পরে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' ঐরূপ গল্পাংশ লইয়া বাহির হইল। শ্রীহর্ষের লেখনী ও কল্পনার উৎস হইতে নির্গত হইয়া যতই অভিনবরূপ ধারণ করুক না কেন, রত্নাবলী-মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠকের একেবারেই হৃদয়রঞ্জন হইল না। কাব্যের চেষ্টা প্রাণ—সেই 'বস্তু' অর্থাৎ আখ্যায়িকা ভাগ যদি এক হইল, তাহা হইলে যতই আমি ওলট পালট করি না,—মালবিকার স্থানে রত্নাবলী, কি অগ্নিমিত্রের স্থানে যৌগন্ধারায়ণ করি না, সেটা একঘেয়ে বা অনুকৃত বলিয়া পাঠকগণের মন কখনই হরণ করিতে পারিবে না। সংস্কৃত সাহিত্যের অবসান দিনে এইরূপ কত নাটিকা যে রচিত হইয়াছিল, তাহার কে গণনা করিবে? রাজশেখরের 'কর্পূর মঞ্জরী' ও 'বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা, ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'বিদ্ধশাল ভঞ্জিকার' বিশেষত্ব এই যে, সেক্সপিয়রের 'কমেডি'গুলির মধ্যে অনেকগুলিতে যেমন স্ত্রী-চরিত্রগুলি (Portia, Viola, Rosalind ইত্যাদি) পুরুষের পরিচ্ছদে আত্মগোপন করিয়া আসরে নামিয়াছেন, বিদ্ধশাল ভঞ্জিকার নায়িকাও সেইরূপ বালকের বেশে প্রথম

---

* নাটিকাক্লৃপ্তবৃত্তা স্যাৎ স্ত্রী প্রায়া চতুরঙ্কিকা।
প্রখ্যাতো ধীরললিত স্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ॥
স্যাদন্তঃপুর সম্বন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতা হথবা।
নবানুরাগা কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা॥
সম্প্রবর্ত্তেত নৈতস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ।
দেবীপুনর্ভবেজ্জ্যেষ্ঠা প্রগলভা নৃপবংশজা।
পদে পদে মানবতী বদ্বশঃ সঙ্গমো দ্বয়োঃ॥

† সসট্টক ইতি ভণ্যতে দূরং যো নাটিকা অনুহরতি।
কিং পুনঃপ্রবেশ বিষ্কম্ভকানি ন দৃশ্যন্তে॥

আবির্ভূত হইয়াছেন। গল্পাংশ—লাট দেশের নৃপতি চন্দ্র বর্ম্মন্ অপুত্রক ছিলেন, তিনি একমাত্র কন্যা মৃগাঙ্কাবলীর মুখ চাহিয়া দিন যাপন করিতেন! রাজকুমারীকে রাজা এতই স্নেহ করিতেন যে, তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভাবিতেন এবং পুরুষোচিত পরিচ্ছদপরিহিত করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন এবং নামও রাখিয়াছিলেন—'মৃগাঙ্কবর্ম্মন্।' কারণব্যপদেশে রাজা মৃগাঙ্ক বর্ম্মন্‌কে নৃপতি বিদ্যাধর মল্লের মহিষীর নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজকুমারী বিদ্যাধর মল্লের প্রাসাদে বালকবেশে প্রবেশলাভ করেন। অমাত্যের প্ররোচনায় সেই কন্যা, আলোচ্য গ্রন্থের নায়িকা,—রাজার শয়নাগারে প্রবেশ করেন। রাজা তন্দ্রাবস্থায় তাঁহাকে দেখিলেন। নায়িকার সহিত নায়কের ইহাই প্রথম দর্শন। প্রমোদোদ্যানে রাজা ইঁহাকে পুনরায় দেখেন এবং তৃতীয় বার ইঁহার প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন ও তাহার গলে মাল্য অর্পণ করেন। প্রথম দর্শন অবধি উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত হন। তৃতীয়াঙ্কে বিদূষকের সাহায্যে নায়ক ও নায়িকার মিলন সংঘটিত হয়। রাজার প্রধানা মহিষী প্রথমতঃ অন্য রমণীর সহিত সহিত তাঁহার মিলন সংঘটনের পরিপন্থিনী হন, ইহা স্বাভাবিক ; কথাই আছে—"ন মানিনী সংসহতে হন্যসঙ্গমম্।" কিন্তু পরিশেষে যখন শুনিলেন যে, এই কন্যার সহিত বিবাহে রাজা রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, তখন উহার সহিত রাজার বিবাহ অনুমোদন করিলেন,—এই বিবাহেই এই নাটিকার পরিসমাপ্তি।

(৩) বালভারত—এই নাটকখানির আর এক নাম প্রচণ্ড পাণ্ডব। নাটকের লক্ষণানুসারে ইহার অন্ততঃ পাঁচটি অঙ্ক থাকা উচিত। যেহেতু লক্ষণে স্পষ্টই উল্লেখ আছে, "পঞ্চাদিকা দশপরা স্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" কিন্তু বস্তুতঃ এ নাটকখানিতে মাত্র দুইটি অঙ্ক দেখিতে পাই। ইহার নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাভারতের আখ্যায়িকার উপরই হইয়াছে এবং দ্বিতীয়াঙ্কে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় ও ভ্রাতৃগণের সহিত বনগমন বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) বালরামায়ণ:—এ নাটকখানি দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ। বোধ হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে এতবড় নাটক আর দ্বিতীয় নাই। নাটকখানি বৃহদায়তন হেতু সাহিত্যিকগণের নিকট ততটা আদৃত হয় নাই। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—"ব্রূতে যঃ কোঽপি দোষং মহদিতি সুমতির্বালরামায়ণে যস্মিন্।"—ইহাতে রামের তাড়কাবধার্থ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক আহ্বান ও সীতা-স্বয়ংবর হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণ-বধ ও অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। নাটকের প্রারম্ভ হইতেই রাবণ রামের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং তিনি সীতাস্বয়ংবরে সীতার পাণিপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই নাটকের একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, মূল রামায়ণ হইতে স্থানে স্থানে বিসদৃশ আছে। রামায়ণপাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, কৈকেয়ীই রামের বনবাসের কারণ, কিন্তু এ নাটকে কৈকেয়ী সম্পূর্ণ নিরপরাধা। দশরথ ও কৈকেয়ী কার্য্যব্যপদেশে স্বর্গে গিয়াছেন, ইত্যবসরে সূর্পনখা-মায়াময় দশরথ ও কৈকেয়ীর বেশ ধারণ করিয়া রামের বনবাসের আজ্ঞা প্রদান করেন। ইহারই ফলে রাম বনে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ছদ্মবেশী রাক্ষসদ্বয় পলায়ন করিল এবং প্রকৃত দশরথ ও কৈকেয়ী স্বর্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শোকে অভিভূত হইলেন এবং রামের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রাম ফিরিলেন না। তিনি বলিলেন, যখন তিনি ঐ আদেশ পিতার মূর্ত্তিধারীর নিকট পাইয়াছেন,—সে যে কেহ হউক না, সে আদেশ অবশ্য পালন করিবেন। এই নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি বাল্মীকি ও ভবভূতির নিকট নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন ; এই শ্লোক হইতে তাহা অনুমিত হইবে—

"বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া সবর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ॥"

রামায়ণের গল্পের উপর নাটক লিখিতে গিয়া রামায়ণ অনুসরণ করিবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। যেখানে যেখানে ইতরবিশেষ অছে, সে সকল স্থানে তিনি ভবভূতির অনুসরণ করিয়াছেন। এই নাটকখানি লিখিবার সময় ভবভূতির মহাবীর চরিত যে তাঁহার আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত। দশম অঙ্কে লঙ্কা ও অলকার আলাপ ভবভূতিরই অনুকরণ। ভৌগোলিক স্থানাদি বর্ণনে তিনি যে কালিদাসের নিকট অনেক ঋণী, তাহাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বাল-রামায়ণের দশম অঙ্কে যে আকাশপথে রামের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে কবি রাজশেখর মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের ত্রয়োদশ-সর্গস্থিত রামচন্দ্রের বিমানমার্গ বর্ণন ও মেঘদূতে মেঘের পথবর্ণন এই দুয়ের সমন্বয় করিয়া এক অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

একটি পুরাতন কথা

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

কাশীধামে, একদিন সন্ধ্যাকালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের নিকট বসিয়াছিলাম। কয়েকজন সাহিত্যিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেইরূপ সম্মিলনে প্রায়ই সাহিত্যচর্চ্চা হইত। তাঁহাদের সহিত সাহিত্যচর্চ্চা করিবার স্পর্দ্ধা কখনই আমার ছিল না; কিন্তু শ্রবণ-স্পৃহা প্রবল ছিল। এবং তাঁহার স্নেহে ও সারল্যে মুগ্ধ হইয়া আমি প্রায়ই তাঁহার বাটিতে সন্ধ্যাকালটি সুখে কাটাইতাম। প্রসঙ্গক্রমে এইদিন আধুনিক পরিচয়প্রণালীর কথা উত্থাপিত হইল। প্রথমে সেই কথা একটু বলিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিব।

আজকাল দেখা যায়, আলাপ-পরিচয়ে আমাদের ভিতর হইতে বিদেশীয় ভাব ও ভাষা অনেকটা কমিয়াছে। আগে দুইজন বাঙ্গালীতে দেখা হইলে, অনেক সময়ে "Good morning" ব্যবহৃত হইত; সৌভাগ্যের বিষয় এখন "নমস্কার"ই সমধিক প্রচলিত। পূর্ব্বের "Good-bye"এর পরিবর্ত্তে এখন বিদায় কালে পুনরায় 'আসি, নমস্কার' প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে। 'সেক্‌হ্যাণ্ড' একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও আবার পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছে। চিঠিপত্রে 'My dear Father or Mother', 'My dear—' এ সকল প্রায় দেখা যায় না; তৎপরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'শ্রীচরণকমলেষু'; বন্ধুকে 'সুহৃদ্বরেষু' 'প্রিয়বরেষু'—অধিক লিখিত হইয়া থাকে। এমন কি উভয়পক্ষ বিদেশীভাষায় পণ্ডিত হইলেও পত্রাদি বিশুদ্ধ ও চলিত বাঙ্গালায় লেখা হইতেছে। আমাদের সর্ব্বজনপূজ্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ ক্কচিৎ ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন; আমার বিশ্বাস, ব্যারিষ্টার প্রভাতকুমার 'কেস্ কণ্ডক্‌ট্' করা ব্যতীত ইংরেজী ভাষা অতি অল্পই ব্যবহার করেন। যাঁহারা স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, তিনি কেমন সুমিষ্ট বাঙ্গালায় কথা কহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। শুনিতে পাই, সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোন সুহৃদ্বরের 'সেক্‌হাণ্ডের' জন্য উদ্যত হস্ত ফিরাইয়া দিয়া, হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন "ভাই, সে দিন আর নাই!" আমরা স্বভাবতঃ অনুকরণ-প্রয়াসী; কাজেই আমরাও এ সকল শুভলক্ষণগুলিও অনুকরণ করিতে শিখিতেছি। পরিত্যক্তা, দলিতা বঙ্গভাষা পুনরায় যে আমাদের হৃদয় মনে আসন পাইয়াছে, ইহা জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এখনকার মত তখন সাক্ষাৎ-পরিচয়ে 'একঘেয়ে' ভাব পরিলক্ষিত হইত না। তখন অপরিচিত কোন ব্যক্তি অপরিচিতের সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিলে দস্তুর মত পরীক্ষা দিতে হইত। অবশ্য সে পরীক্ষা ঠিক এক্‌জামিনেসনের মত ছিল না। তাহার প্রত্যেক প্রশ্ন ও উত্তর—রসপূর্ণ, ভাব ও কবিত্বময়। আমরা অতি অল্পই সে সকল বিষয় অবগত আছি। তেমন লোক আর নাই, যাঁহার নিকট শুনিতে পাওয়া যাইবে। বোধ করি, আমাদের মধ্যে অনেকের শুনিবার স্পৃহাও নাই, কাজেই সে সকল কথা লোপ পাইতেছে।

কথাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত যাদবেশ্বর আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন —সেই ধরণের কোন গল্প শুনিবার ইচ্ছা আছে কি না?

আমি আগ্রহ প্রকাশ করিলে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি যথাযথ সে কথাগুলি বিবৃত করিতেছি। আশা করি, অনুসন্ধিৎসু কোন পাঠকের তাহা ভাল লাগিলেও লাগিতেও পারে।

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন—"ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম শুনিয়াছ ত? হয়ত সেই প্রাচীন কবির বিষয় তোমরা অতি অল্পই জান। শুধু তোমরা কেন, তাঁহার বিষয় কেহই ভাল করিয়া কিছু জানে না। তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা কেহ করে নাই। একমাত্র স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

"অনুসন্ধান করিলে মৃত মহাত্মাদিগের জীবনী, কার্য্য-কলাপ হইতে আমরা শিখিবার অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হই। আজকাল অনেক সাহিত্যিকের সে চেষ্টা হইয়াছে। প্রার্থনা করি, তাঁহারা সফল হউন।

"যখনকার কথা বলিতেছি, তখন দেশে 'প্রভাকর' দীপ্তি পাইত। তাহার সহযোগী পত্র সকলের মধ্যে রংপুরের 'বার্ত্তাবহ' বর্ত্তমান ছিল। দুইখানিই উচ্চঅঙ্গের কাগজ। 'প্রভাকর' ঈশ্বর গুপ্তের সম্পত্তি, তিনিই সম্পাদক; 'বার্ত্তাবহ'—রংপুর কাণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সাহিত্যানুরাগী ৺বাবু কালীচন্দ্র রায়ের সম্পত্তি। কালীচন্দ্র সম্পাদক ছিলেন না বটে, তবে বার্ত্তাবহের প্রধান লেখক ছিলেন। এই কালীচন্দ্রের কথা আমরা খুব কমই জানি। অনেকেই বোধ করি জানেন না, যে সেই মহামনা ভূম্যধি-কারীর আগ্রহ ও চেষ্টাতে আমাদের দেশে প্রথম নাটক 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' প্রকাশিত হয়। তাঁহারই ইচ্ছায় ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মিনী' উপাখ্যান লিখিত হয়। সাহিত্যের জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তখনকার দিনে নাম জাহির করিবার ঢক্কা থাকিলে কালীচন্দ্রের নাম বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের নিকট অজ্ঞাত থাকিত না।

"কালীচন্দ্র ইংরাজী ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। এই উভয়বিধ সাহিত্যালোচনা করিয়া, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, ইংরাজীতে Drama আছে, সংস্কৃতে 'দৃশ্যকাব্য' 'নাটক' আছে, বাঙ্গালায় তদ্রূপ কিছু নাই। তিনি ঘোষণা করিয়া দেন —'যে ব্যক্তি বঙ্গভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে উচ্চ পুরস্কার দেওয়া যাইবে।' সাহিত্যের সঙ্গে সমাজেরও যাহাতে উপকার হইতে পারে, এই আশায় তিনি বিষয়-নির্ব্বাচন করিয়া দেন—কৌলীন্য প্রথার ফল দেখাইয়া নাটক লিখিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কয়েকখণ্ড হস্তলিখিত নাটক তাঁহার নিকট পৌছিল। তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার-কৃত "কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব" নাটককেই শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচিত করেন। রামনারায়ণ প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। কালীচন্দ্রের অর্থেই নাটকখানি মুদ্রিত ও জনসমাজে প্রকাশিত হইল।

"এই সাহিত্যানুরাগী পুরুষের নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে খুব অস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি সাহিত্যের যেরূপ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহা অনেক সাহিত্যিকের দ্বারা সাধিত হয় নাই।

"তোমরা "পদ্মিনীর" ভূমিকায় দেখিতে পাইবে, 'পদ্মিনী' তাঁহার উৎসাহে ও আগ্রহে রচিত হইয়াছিল। কবি 'পদ্মিনী' উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া, যখন পাণ্ডুলিপির সহিত কালীচন্দ্র বাবুর রংপুরের বাটিতে উপস্থিত হইলেন, তখন কালীচন্দ্র আর ইহ সংসারে নাই। কবি গভীর দুঃখের সহিত, তাঁহার সে মর্ম্মবেদনা গ্রন্থভূমিকায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

"তখন মাসিকপত্রেরও এত ছড়াছড়ি ছিল না; ক্ষণে ক্ষণে লেখকও জন্মগ্রহণ করিত না। সুতরাং তখনকার কোন কাগজে কোন লেখকের উত্তম রচনা প্রকাশিত হইলে, তৎপ্রতি অন্যের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা জন্মিত ও লেখকের সন্ধান লইবার আগ্রহ হইত। এখনকার মত লেখককে বহুকষ্টে, বহুদিনে পাঠকের মনে স্থান পাইতে হইত না।

"তখনকার সাহিত্যিক সমাজ ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের প্রভায় প্রভান্বিত। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' বঙ্গসাহিত্যে সমুজ্জ্বল পত্র। তাঁহারই শিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র তখন শিক্ষিত হইতেছেন। রংপুরের বার্ত্তাবহ সে সকল সংবাদ রাখে। কাঁচড়াপাড়ার 'প্রভাকর'ও 'বার্ত্তাবহে'র সকল সংবাদ রাখে। ঈশ্বরগুপ্ত ও কালীচন্দ্র রায়ের মধ্যে আলাপ-পরিচয় আদৌ ছিল না। তবে উভয়ের রচনা পাঠে উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। উভয়েই উভয়কে সাহিত্যিক জ্ঞানে অন্তরে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

"—পথ বহুদূর। উভয়েই কর্ম্মী। তখন রেলওয়ে বা ষ্টীমার হয় নাই। কাজেই বহুদিনের পথ অতিক্রম করিয়া কেহই আসিতে পারেন না।

"ক্রমে কালীচন্দ্রবাবুর কাব্যানুরাগ, তাঁহার সাহিত্য-প্রীতি, প্রভৃতির কথা শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে উৎসুক হইলেন।

"তিনি নৌকাযোগে রংপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুদিন জলপথে অবস্থান করিয়া অবশেষে তিনি রংপুরের সন্নিকটে অবতীর্ণ হইলেন। সে স্থান হইতে কাণ্ডী প্রায় সাত ক্রোশ পথ। পদব্রজে পথ পার হইয়া অবশেষে জমিদার কালীচন্দ্র রায়ের ভবনে উপস্থিত হইলেন।

"প্রাতঃকাল। প্রকাণ্ড দরবার-গৃহ জনপূর্ণ। নানা প্রার্থীর সহিত ঈশ্বরগুপ্তও সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আবেদন, নিবেদন, স্তুতি—যাহার যাহা প্রয়োজন ছিল, শেষ করিয়া প্রায় সকলেই চলিয়া গেল। তখন, জমিদারের দৃষ্টি, সেই গৃহকোণে দণ্ডায়মান প্রভাকর-সম দীপ্ত, সমুজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি পতিত হইল।"

তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইল, তাহাই বলিবার জন্য আমার এই প্রবন্ধ রচনা। সে আলাপে পাঠক-পাঠিকা দেখিবেন যে, তখনকার কবিতা কেমন সহজ, সরল ও স্বচ্ছ গতিতে চলিত। তন্মধ্যে অবোধ্য ভাষা ও ভাব না থাকিলেও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ছিল। যদিও আজকাল কবিতায় আলাপ-পরিচয় ও কথোপকথন উঠিয়া গিয়াছে। বাঁচা গিয়াছে! মাসিকপত্র ছাড়িয়া লোকের মুখে মুখে কবিতার স্রোতঃ বহিলে প্রাণ বাঁচান দায় হইত! কিন্তু তখন এই প্রথাই সমধিক প্রচলিত ছিল। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই নীরস (!) গদ্যে আলাপ করিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতি প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই কালীচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন :—

"কে তুমি? কোথায় বাস? কোথা হ'তে এসেছ?
কিবা প্রয়োজনে মম সন্নিধানে ভাতিছ?"

ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

"নামে ধামে কিবা কাজ—নরপতি মহাশয়?
অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা উচিত নয়।"

কালীচন্দ্র বলিলেন—

"এখনও মধ্যাহ্নের রয়েছে অনেক বাকী;
কি করি অতিথি হ'বে? মিছে কেন দেও ফাঁকী?"

ঈশ্বরগুপ্ত গুপ্তভাবে পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—

"প্রভাকর-দীপ্তি হেরি, তৃপ্তি পায় সরোবরে,
ঢল ঢল করে পদ্ম আপন গৌরব-ভরে।
সৌরভ বহিয়া তার আনি দেয় সমীরণ,
সৌরভ পাইয়া অলি ধায় তথা অগণন।
না জিজ্ঞাসি তাহাদেরে পদ্ম করে মধুদান,
জগতের এ নিয়ম কর না কি অবধান?"

কালীচন্দ্র প্রকৃত ধারণা করিয়াছেন যে, এ ব্যক্তি কখনই হীন নহেন। যে তাঁহার সহিত সমভাবে কবিতায় আলাপ করিতেছে, নিশ্চয়ই সে জ্ঞানী, কবি, বিদ্বান্ ও প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ।

কালীচন্দ্র বলিলেন—

"গুন্ গুন্ গানে পদ্ম চিনি লয় ভ্রমরেরে,
কেন আর জিজ্ঞাসিবে বল দেখি তাহাদেরে?
পাতার আড়ালে থাকি পঞ্চমে কোকিল পাখী,
ভাষার সুস্বরে বিশ্ব, চিনিতে কি থাকে বাকী!
শুনিয়াছি, কালিদাস হেরি কবিতার গতি
চিনেছিল রাক্ষসেন্দ্রে, চিনেছে বানর-পতি।
প্রত্যুত্তর করিতেছ কবিতায় তুমি কবি,
কবিতার গতি দেখি ধরিব তোমার ছবি॥"

ঈশ্বরচন্দ্র তখন স্পষ্টভাবে পরিচয় দিতে লাগিলেন; কহিলেন—

"ডুবে যায় রেতে বিশ্ব আঁধারেতে,
কে চিনে তখন কারে?
উঠি 'প্রভাকর', ঢালি নিজ কর,
চিনায় সে সবাকারে।
হেরি 'প্রভাকর', যদি নরবর
না চিন মানুষ পশু—
সুস্পষ্ট এ দিবা, পরিচয় কিবা—
ব্যর্থ তবে এত 'বসু'।"

পাঠক দেখিতেছেন—ঈশ্বরগুপ্ত, তৎসম্পাদিত সুবিখ্যাত 'প্রভাকর' নামক মাসিকপত্রের নামোল্লেখ করিয়া, পরিচয় প্রদান করিলেন; কিন্তু তাহাতে কবিতার ভাব বা ভাষার হানি হইল না। প্রভাকর'—প্রথমটি 'সূর্য্য' আখ্যাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং 'বসু'র অর্থে কালীচন্দ্রের জমিদারী ব্যক্ত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত উত্তরটি কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত ত্রিপদীতে দিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে উভয়েই দ্বিপদী ব্যবহার করিতেছিলেন;—কালীচন্দ্র, তাহা উল্লেখ করিয়া, বলিলেন—

"দ্বিপদেতে করি ভর দাঁড়ায় মানুষ
যাহার শক্তিতে উঠে আকাশে ফানুস;
দ্বিপদেতে করি ভর দাঁড়াইয়া ছিলে—
হঠাৎ ত্রিপদে কহ কেন দাঁড়াইলে?

কাহার প্রভায় প্রভা পেয়ে প্রভাকর—
বল বল ফুটাইছে বিশ্ব-চরাচর ?”

ঈশ্বরগুপ্ত—

“বলিগৃহে এসেছিল দ্বিপদে ঈশ্বর
পরে ত্রিবিক্রম হ'ল জান নববর।
লীলাময় লীলাকরে, জানহ 'ঈশ্বর'—(ক)
'চন্দ্রে'র প্রভায় প্রভা পায় 'প্রভাকর' (খ)।”

কালীচন্দ্র—

“সূর্য্যের প্রভায় চন্দ্রে প্রভা মোরা জানি—
চন্দ্রের প্রভাব সূর্য্যে কভু নাহি মানি।”

ঈশ্বরগুপ্ত—

“ঈশ্বরের নখচন্দ্রে 'প্রভাকরে' প্রভা (গ)
নয় কি গড়িতে পারে আকাশেতে সভা ?” (ঘ)

কালীচন্দ্র অনুমান করিয়াছেন, যে এ ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—প্রভাকর-সম্পাদক। তাঁহার এ অনুমান সত্য কি না, নিরূপণ করিতে পুনরায় বলিলেন—

“বুঝেছি তা যে, 'ঈশ্বর' প্রাণ দেয় জড়ে, (ঙ)
'দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রে'রে হাতে গড়ে।”

কালীচন্দ্র অবগত ছিলেন যে, বঙ্গজননীর দুইটি বরপুত্র তখন ঈশ্বরগুপ্তের নিকটে বসিয়া সাহিত্য শিক্ষা করিতেছেন। সেই দুই মহারথীর নাম সকলেই জানেন—দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র। কালীচন্দ্র তাহা বুঝিয়াই ঐ কথা বলিলেন। ঈশ্বরগুপ্তও উত্তর দিলেন :—

“তুমি বুঝি কালীচন্দ্র সুধা বরিষয়, (চ)
তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু হয় ;
মৃত্তিকা না হ'লে আর্দ্র, ঈশ্বরও কভু
গড়িতে সমর্থ নয় জানিবে তা প্রভু।”

এই কথাটিতে গুপ্ত কবির মাহাত্ম্য ও শিষ্যপ্রিয়তা বেশ অনুভূত হয়। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে—'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল' ('মৃত্তিকা না হ'লে'—প্রভৃতি); নতুবা ঈশ্বরগুপ্তের সাধ্য হইত না যে, ঐ দুই মহাপুরুষ কালে দুই বিশ্রুতকীর্ত্তি সাহিত্যরথী হইয়া দেশ উজ্জ্বল করিতে পারেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের কথা শেষ হইবামাত্র কালীচন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ; সোল্লাসে অগ্রসর হইয়া গদগদকণ্ঠে কহিলেন—

“তুমি-ই ঈশ্বরচন্দ্র! দেহ আলিঙ্গন।”

ঈশ্বরচন্দ্র ততোধিক বিনয়ী ছিলেন ; তিনি মধুর কণ্ঠে কহিলেন—

“আলিঙ্গন যোগ্য নহি দেহ শ্রীচরণ।”

উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। এক প্রতিভা, অপর প্রতিভার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল। এক বিদ্যুৎ-জ্যোতিঃ অপর বিদ্যুৎজ্যোতিঃকে আলিঙ্গন করিয়া প্রোজ্জ্বল হইল।

তখন উভয়ে আসরে বসিলেন ; নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় ছয় মাসকাল কালীচন্দ্রের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছিল ; সেই বন্ধুত্বের ফলে, ঈশ্বরগুপ্ত নানা কার্য্য স্বত্বেও তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই।

তাঁহাদের মধ্যে যে সমস্ত হাস্য-কৌতুক ও কথাবার্ত্তা হইত, তাহা কেহ লিখিয়া রাখিতে পারিলে, আজ এক অমূল্য দ্রব্য হইত। কিন্তু, যে ব্যক্তি (কালীচন্দ্রের

(ক) 'লীলাময় লীলাকরে জানহ'—পর্য্যন্ত এক কথা; আর 'ঈশ্বর-(পরপংক্তিতে) চন্দ্রের প্রভায় প্রভা' ভিন্ন কথা। (খ) “ঈশ্বর-চন্দ্রে”র প্রভায় 'প্রভাকর' প্রভান্বিত।

(গ) ইহার অর্থও ঐরূপ।

(ঘ) তখন বঙ্গদেশে লেখক বা সুলেখক ছিল না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন সাহিত্যাকাশ শূন্য ছিল, সেই শূন্যাকাশে তিনি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলেন।

(ঙ) 'জগদীশ্বর জড়ে প্রাণ দান করেন'—ইহাও যেরূপ সত্য, ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যত্বে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্য চর্চ্চা করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। তখনকার বঙ্গভাষা মৃতার মত ছিল। তিনিই তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন।

(চ) এই 'তুমি বুঝি' বাক্যটিতে ঈশ্বরচন্দ্র পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ভূমি হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর উন্মেষ হইতেছিল। কেহই অস্বীকার করিবেন না—যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম অবতারণা—এই গুপ্ত কবির উৎসাহে, এবং তাঁহার গদ্য-রচনাও এই গুপ্ত কবির ইঙ্গিতে। তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রকে গদ্য লিখিতে বলেন। তিনি ঠিক বলিয়াছিলেন, নহিলে আমরা 'প্রতাপকে' পাইতাম না : নহিলে নিষ্কাম 'প্রফুল্ল' আমাদের নিষ্কামধর্ম্ম শিখাইতে আসিত না।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি তর্করত্ন মহাশয় দ্ব্যর্থ বাক্যগুলির অর্থ-বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন।—লেখক।

জনৈক গোমস্তা) উল্লিখিত অংশটুকু লিখিয়া রাখিয়াছিল, সে আর কিছুই রাখে নাই।—সে বোধ হয় ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে নাই !

আর একদিনের একটি কথা সে লিখিয়া রাখিয়াছিল ; তাহা এইরূপ—কালীচন্দ্রের গৃহে অবস্থানকালে, উভয় বন্ধুতে সন্ধ্যাকালে সন্নিকটস্থ কোন সরোবর-সোপানে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার শান্ত আকাশ আলোকিত করিয়া, চন্দ্র সবেমাত্র উদিত হইতেছেন। সুন্দর, রমণীয় সে দৃশ্য দেখিয়া, কালীচন্দ্র বলিলেন—

"বলহ, বলহ, বলহ, আকাশে উদিল কে কহ।"

ঈশ্বরগুপ্ত প্রকৃতির সেই রমণীয়, শুভ্র, অনিন্দ্য মূর্ত্তি দেখিলেন ; বলিলেন—

"তারকার ফুল ফুটিছে, গগন বাগান দুলিছে,
প্রকৃতি যুবতী একেলা, তাহাতে খেলিছে সে খেলা।
ঘোম্‌টা খুলিয়া হাসিছে ; তারি মুখচন্দ্র ফুটিছে,
যারে কবি করে তুলনা ; সে এ মুখখানি ভুল না।"

—কি সুন্দর কত সহজ ! *

---

* দুইটিই অপ্রকাশিত রচনা ;—পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।—লেখক।

স্মৃতি

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

আজও মনে পড়ে মোদের শুভদৃষ্টির ক্ষণ
জন্মান্তরের সেই যে দেখা—আবার সে মিলন !
একটি নিমেষ সেই যে দেখা, হর্ষ-আবেগ-ভয়ে,
তা'তেই আবার পড়্‌নু বাঁধা অতীত-পরিচয়ে।
এমন নিমেষ আর কখনো পাইনি জীবন ভ'রে,
আস্‌বে কবে পুনঃ সে দিন—অদূর জন্মান্তরে !
তারপর, সেই বর-কনেদের ফুলশয্যার রাতি ;
হৃদয়-ভরা কথা—নীরব, নিমীল আঁখির পাতি ;
রেশমী-কাপড় খশমশিয়ে একটি পাশ পানে
লজ্জাজড় সসঙ্কোচে ছিলে নিদ্রা-ভাণে ;
বাইরে ছিল লুব্ধ-গোপন কর্ণ-মেলার তৃষা—
সারা জীবন মধ্যে সে এক পৌর্ণমাসী নিশা !

যখন তোমার তনুলতায় সুযৌবনের ফুল
উঠ্‌'ল ফুটে দিব্য-শোভায় শশি-সমতুল,
মধুর রূপের মদির-নেশায় মত্ত ছিলাম নিতি
তুচ্ছ কথায় মান-অভিমান—আবার হ'ত প্রীতি।
দিনে দুয়ার-আড়াল হ'তে নীরব আলাপন,
হ'ত হাসি চাহনিতে নীরব সম্ভাষণ !

সব সুখ মোর ঠেক্‌তো মিছে—দিনেক অদর্শনে,
একটু কোথাও যেতে হ'লে কাঁদ্‌তে সঙ্গোপনে ;
বিদায়কালে তোমার যে সেই অশ্রুভরা আঁখি
অনিমিষে থাক্‌'ত চাহি—বুঝ্‌তে কি আর বাকি !
ফির্‌বো কখন, বারে বারে সেই যে প্রতিশ্রুতি,
প্রবাস হ'তে টান্‌তে পথে, এম্‌নি কঠোর দূতী !

গিন্নী যখন হ'লে তুমি, খোকা-খুকীর মা,
খোকা-খুকী-ভিন্ন তখন ঝগড়া ছিল না !
আমার মতে ছেলেই ভাল, তুমি বল্‌তে মেয়ে—
বাপকে দোষী কর্‌তে, যবে কাঁদ্‌তো বায়না নিয়ে !
আমার উপর রেগে তুমি বক্‌তে তাদের কত,
এক সে ছিল সোণার সময়—অনেক দিন তা' গত !

তা' পর তুমি উঠ্‌লে যেদিন খেয়া-তরীর 'পর,
বৈঠা-তালে মিলিয়ে গেল তোমার কণ্ঠ স্বর ;
বাপের বাড়ীর ভয় দেখাতে,—ভাবনু আমি তাই,
সেথায় গিয়ে তোমার বুঝি আমায় মনে নাই !
এমন দেরী কখনো তো হয়নি তোমার প্রিয়ে—
অসুখ হলেও আস্‌তে যে গো সেকথা লুকিয়ে !

তোমার খোকা—তোমার খুকী—অনেক বড় আজ,
তোমার বধূ—তোমার জামাই—ঘুর্‌চে ঘরের মাঝ !
ছিলে যখন—তোমার ছবি ছিল আমার চোখে,
(এখন তুমি কোথায় ওগো কোন্ সে সুদূর লোকে ?)
নয়ন-ছাড়া নও এখনো—মিশে আঁখির নীরে
সদাই তুমি পড়্‌চ' বুকে,—চুমি কপোল—ধীরে !

করুণা

[শ্রীপ্রফুল্লনলিনী সরস্বতী]

সংসারের দেনা-পাওনা না-চুকাইয়া দিয়া, বহুকালের সুখের সঙ্গী দুঃখের সাথীকে এমন করিয়া নিঃসঙ্গভাবে একাকী ফেলিয়া, সরমা যখন নিতান্ত নির্দ্দয়ের মত কোন্ এক অজানা-জগতে চলিয়া গেল, চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হেমকুমার বাবুর নিকট তখন সমস্ত সংসার শূন্য ঠেকিল। জগতের আলো তাঁহার চক্ষে নিভিয়া গেল, বিশ্বছন্দ বেসুরে বাজিল; সুদীর্ঘ বার' বৎসর যাহার সহিত একত্রে ছিলেন,—সহসা তাহাকে হারাইয়া ডেপুটীবাবু হৃদয়ে বড় ভয়ানক আঘাত পাইলেন বক্ষ; ভরিয়া—পৃথিবী জুড়িয়া হেমকুমার দারুণ শূণ্যতা অনুভব করিলেন।

তাঁহার সেই আদরের সরমা—সোহাগের সরমা, কে আজ তাঁহার বক্ষ হইতে তাঁহার জীবন-প্রিয় সরমাকে কাড়িয়া লইল?—কেহ যে কখনো তাঁহার নিকট হইতে সরমাকে লইয়া যাইতে পারে, ইহা ডেপুটীবাবুর কখনো মনেই হইত না—অথবা মনে হইলেও তিনি কখন মনে করিতে পারিতেন না। একদিন যাহার বিচ্ছেদ অসহনীয় বলিয়া মনে হইত, আজ তাঁহার সেই কৈশোরের সাথী—যৌবনের—সহচরী অনন্তের সঙ্গিনী সরমা তাঁহার নিকট হইতে দূরে—বহুদূরে, আর এক জগতে;—মাঝে মৃত্যুর বিষম ব্যবধান!

বহু—বহুদিন পূর্ব্বে সেই একদিন বিবাহ-উৎসবে আত্মীয়গণ বালিকা সরমার পুষ্প-সুকোমল ছোটহু'টি কর-পল্লবের সহিত হেমকুমারের হস্তযুগল কুসুম মালো বাঁধিয়া দিয়াছিল; তাহার পর জীবনের একটি আবেশময় মধু-প্রভাতে কোন্ এক অজানা-মিলনকর্ত্তা অলক্ষ্যে থাকিয়া দু'খানি হৃদয় অটুট-প্রেমের সুক্ষ্মসূত্রে জন্মের মত বাঁধিয়া দিয়াছিলেন;—সে বাঁধন আজ ছিঁড়িল কে!

স্বামীর অযত্ন হইবে, এই ভয়ে সরমা পিত্রালয়ে যাইতেও চাহিত না; আর, আজ তাঁহাকে একা ফেলিয়া সে কোন্ দূরদেশে চলিয়া গেল!—কেন, কি অপরাধে?

পূর্ব্বে, কাছারি হইতে আসিলে কত মিষ্ট কথা বলিয়া—আদর-সোহাগ করিয়া—সে, স্বামীর সারাদিনের শ্রমক্লেশ ভুলাইয়া দিতে চেষ্টা করিত; এখন আর কেহ আদর করিয়া মধুমাখা কথা বলিয়া তাঁহার শ্রান্তি অপনোদন করে না। সারাদিনের কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহ ও শোক-শ্রান্ত হৃদয় খানি লইয়া কাছারি হইতে আসিয়া ডেপুটীবাবু শয্যাশ্রয় গ্রহণ করেন; শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার বহুকালের পার্শ্ব-সঙ্গিনীকে মনে পড়িয়া যায়, আর তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া বক্ষ-প্লাবিত করিয়া অশ্রু বন্যা ছুটে!

ঘর দোর—ভিতর-বাহির—সকলস্থানই সরমার মধু-স্মৃতিতে ঘেরা। এই ঘর—সরমা এইখানে বসিয়া কার্পেট বুনিত; বাগানের এই শেফালি-তলায় সরমা শিবপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিত; এই যুঁইফুলের গাছগুলি সরমা স্বহস্তে পুঁতিয়াছিল;—তাহার স্বহস্ত-সিঞ্চিত বারি বর্দ্ধিত পুষ্পবৃক্ষগুলি স্তবকে স্তবকে কুসুমসম্ভার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু সরমা তাহার শ্রম-সাফল্য দেখিয়া হাসিতেছে কই! সরমার পোষা পাখীটি তাহার পূর্ব্বাভ্যাস মত সন্তো-মাতৃহীনা বালিকা সুরমার নামে নালিশ করিয়া—"মাগো! সুমি মারে—মাগো! সুমি মারে" রবে গলা ফাটায়; কিন্তু পাখীর নালিশে কেহ ছুটিয়া আসিয়া 'কি রে গঙ্গারাম, কি হয়েছে' বলিয়া আদর করে না!—শুধু সেই মাতৃক্রোড় বিচ্যুত অভাগিনী বালিকাটি খাঁচার নিকট দাঁড়াইয়া আকুল-নয়নে কাঁদে! একদিন হেমকুমার সে পাখীটিকে উড়াইয়া দিল; ভাবিল—বুঝি তাহা হইলেই সে সরমাকে ভুলিতে পারিবে! কিন্তু তাহা হইল না;—সরমার হাসি, সরমার গান, সরমার আদর, সরমার সোহাগ, সরমার স্মৃতি মনে পড়িয়া গৃহবাস যেন ডেপুটীবাবুর অসহ্য হইয়া উঠিল। দিন দিন ডেপুটী-বাবুর শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; কাজ-কর্ম্মে তাঁহার আর মন লাগিত না, লোকালয় তাঁহার ভাল লাগিত না;—জনহীন পর্ব্বত-কন্দরে, অথবা নির্জ্জন নদীতটে, বসিয়া

তিনি একাকী উদাস-প্রাণে তাঁহার দেবীর আরাধনা করিতেন; আবেগোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া কতবার বিজন নদীতীরে দাঁড়াইয়া হেম ডাকিতেন—'সরমা! সরমা!' ও-পারের গহন বন হইতে নিষ্ঠুর প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিত;—কেহ উত্তর দিত না!—বনের মধ্যে কিছু খস্ খস্ শব্দ হইলে, হেমকুমার উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন—বুঝি সরমা আসিতেছে!

এক বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল—বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিল, শাখে শাখে কোকিল ডাকিল, পাপিয়া গাহিল, মলয় মৃদু বীজন আরম্ভ করিল, ডালে ডালে ফুল ফুটিল, সমস্ত জগতে নবীনতার একটা সাড়া পড়িয়া গেল; আর, হেমবাবুর হৃদয়ে প্রাণের সেই ব্যথাভরা করুণ রাগিনীটি আরও অধিকতর করুণ হইয়া উঠিল!—তাঁহার জীবনে আর যেন শান্তি নাই; শুধু যেন এক প্রকাণ্ড মরুভূমি ধূ—ধূ করিতেছে!

এমন করিয়া আর কতদিন কাটিবে!—হেমকুমারের অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত হইল। বন্ধুরা বলিল—"হেম বুঝি এবার লোটা-কম্বল নিয়ে বিবাগী হ'য়ে বেরোয়!" আত্মীয়-স্বজন বলিল—"হেম বোধ হয় আর বাঁচিবে না!" হেমকুমারের বৃদ্ধা জননী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন—"বাবা, তুমি আবার বিয়ে কর!"

পুনর্ব্বার বিবাহ-প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র হেম আরও আকুল আবেগে—অধিকতর দৃঢ়ভাবে—সরমার স্মৃতিকে বক্ষমাঝে আঁকড়িয়া ধরিল।

এও কি সম্ভব! সে আবার বিবাহ করিবে! কেন—কিসের জন্য? সংসারের কাজ?—সে ত একটা বেতন-ভোগী দাসী রাখিলেই চলিয়া যাইবে! তাহার দেবীর সিংহাসনে সে কি একটা দাসীকে আনিয়া বসাইবে?—না—কখনই না! সরমাকে সরাইয়া দিয়া কোথাকার কে-একটা নোলক-পরা অশ্রুভরা ছোট-খাটো মেয়ে আসিয়া তাহার হৃদয় দখল করিয়া বসিবে? সরমার বার' বৎসরের প্রাণ-ঢালা প্রেম-প্রীতির কি এই প্রতিদান! জীবনের অপরাহ্নে আবার বিবাহ করিয়া সে কি শুধু একখানি প্রহসনের অভিনয় করিবে? না—কিছুতেই না! আজীবন স্মৃতিটুকু বুকে করিয়া কাটাইয়া দিবে; তার পর, জীবনের শেষে, সেই দুঃখহীন বিচ্ছেদশূন্য রম্যদেশে গিয়া সরমাকে লইয়া যুগান্তকাল সুখে থাকিবে। তাহার আকাশে, তাহার বাতাসে, তাহার স্বপনে, তাহার ভুবনে শুধু সরমাই থাকিবে; আর কাহাকেও তথায় তিলমাত্রও স্থান দিবে না—কোন মতেই না!

(২)

কর্ম্ম হইতে ছয় মাসের অবসর লইয়া, হেমকুমার বৈদ্যনাথে, তাঁহার বন্ধু ডেপুটী সীতানাথবাবুর বাটীতে, বেড়াইতে আসিয়াছেন। বৈদ্যনাথে আসিয়া অবধি তিনি একটু যেন শান্তিতে আছেন, বন্ধু-বান্ধবগণের কথাবার্ত্তায় গল্প-গুজবে তাঁর অন্তরের শোক-বহ্নির তীব্রতা যেন কতকটা প্রশমিত হইয়াছে।

রিম্-ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; মাঝে মাঝে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি বিদ্যুত লেখা—দুরন্ত শিশুর মত—খেলিয়া বেড়াইতেছিল, মধ্যে মধ্যে জানালা দিয়া বাদলের জলভর বাতাস ঘরে আসিতে-ছিল। বান্ধবমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত ডেপুটীবাবু বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। মনিবের আজ্ঞামত ভৃত্য বেগুনি-ফুলুরি ও চা আনিয়া দিল। সীতানাথবাবুর হিন্দুস্থানী চাকরটা চা'য়ের ঠিক আন্দাজ বুঝিত না—সে আজ চা'য়ে জলের ভাগটাই খুব বেশী দিয়া ফেলিয়াছিল; হতভাগা বামুনঠাকুর বেগুনি-ফুলুরি করিয়াছে—তাহাতে এত কম নুন দিয়াছে যে, একেবারে দেয়ই নাই বলিলেও চলে। আহারের সুখ হইল না;—তাঁহাদের সখের খানাটা মাটী হইয়া গেল! সীতানাথবাবু দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"ভাদ্দর মাসটা কেটে গেলে বাঁচি; এমন করে আর পারা যায় না!"

বন্ধু রমেশবাবু বলিলেন—"কেন সীতানাথবাবু, ভাদ্দর মাসের উপর এত নারাজ কেন? খোস-গল্প করে মুড়ী-ফুলুরি খেয়ে বর্ষার দিনগুলি ত বেশ কেটে যায়!"

"তা যায় বইকি! তবে এই ত ফুলুরির ছিরি! এ রকম খাওয়ার চেয়ে না-খাওয়াই ভাল। হিরণ থাকলে, আজ এই বাদলের দিনে তার হাতের তৈরি বেগুনি-ফুলুরি খেলে জন্মে ভুলতে পারতে না! সে বাপের বাড়ী যাওয়া অবধি আমি খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়েই দিয়াছি।"

অপর বন্ধু ব্রজেন্দ্রবাবু হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বলেন কি মশাই? হিরণ বাপের বাড়ী গেছে বলে, আপনি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন! এ বয়সে না-

খেয়ে, হিরণের জন্য কেঁদে কেঁদে, আর বাঁচ্‌বেন ক'দিন!—শীঘ্র হিরণকে আনার ব্যবস্থা করুন!—সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধবয়সে বিয়ে কর্‌লে প্রেমটা এমনি বেগবতীই হয়! হিরণকে আনাবার উদ্যোগ করা যাক্; নতুবা কি জানি, সে তরুণীর বিরহে যদি আমার বৃদ্ধ-বন্ধুটী—"আবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

সীতানাথবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"তা নয় হে, তা নয়—ঠাট্টা কর কেন? ছাই-পাঁশ কি-যে রাঁধে ঠাকুর, আদতেই খেতে পারি না! গৃহলক্ষ্মী না-থাকলে কি সংসারে লক্ষ্মীশ্রী থাকে?"

রমেশবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ এটা খুব সত্য; স্ত্রী না থাক্‌লে সংসারে শ্রী থাকে না; স্ত্রী একলা যেমন সুন্দর ভাবে সংসার-চালায়—খাওয়া-নাওয়া সব যেমন সময় মত হয়—পঞ্চাশটে চাকর রাখলেও তা হয় না!"

ব্রজেন্দ্রবাবুও এই কথায় যোগ দিয়া বলিলেন—"তা ত বটেই!" আমাদের উদ্ভ্রান্ত-হৃদয় বিপত্নীক হেমকুমার, নীরবে বসিয়া রমেশবাবুর কথার বাস্তবিকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন।—সত্যসত্যই, পঞ্চাশটা চাকর থাকিলেও, স্ত্রীশূন্য-সংসারে কোনও শৃঙ্খলা থাকে না। সরমা যখন বাঁচিয়াছিল, তখন প্রতিদিন তাঁহার জল-খাবারটীও প্রস্তুত থাকিত; এখন, চারিটা চাকর থাকা-সত্ত্বেও, কাছারি হইতে আসিয়া পা' ধুইবার একঘটী জল ও গামছা খানি, আধ-ঘণ্টা ধরিয়া না-চাহিলে, পাওয়া যায় না।

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন—"হেমবাবু, কি ভাব্‌ছেন এক-মনে?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া হেম বলিলেন, "কিছু না।" কিন্তু তাঁহার সেই "কিছু না" কথাটিই যে "কিছু"—তাহা নিশ্চয় করিয়া জানাইয়া দিল, এবং তাঁহার ভাবনাটা যে কি, তাহাও বন্ধুমণ্ডলীর অবিদিত রহিল না।

রমেশবাবু বলিলেন—"হেমবাবু, কেন মিছে শরীর-মন মাটী কর্‌ছেন?—যা হবার তা হয়ে গেছে, তার ত প্রতিকারের কোনও উপায় নেই। কত লোকের ত স্ত্রী মারা যায়, বচ্ছর পুর্‌তে না-পুর্‌তে আবার বিয়ে ক'রে বসে। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, আর আপনি তাঁকে ত্যাগ করে আর একটা বিয়ে করতেন—তাহ'লে আপনার অন্যায় বল্‌তুম; কিন্তু যখন ভগবান তাঁকে ডেকে নিলেন, তখন আর বিয়ে করতে দোষ কি! উপযুক্ত যত্নাভাবে শরীর আপনার দিন-দিন ভেঙ্গে পড়্‌ছে তা দেখ্‌ছেন?—হেমবাবু, আমরা আপনার হিতৈষী-বন্ধু—আমরা বল্‌ছি, আপনি বিয়ে করুন।"

সীতানাথবাবু বলিলেন—"সত্যি হেম; রমেশ যা বল্লে, ঠিক কথা। কেন মিছে কষ্ট সহ্য করছ? বেশ দেখে-শুনে দিব্য ডাগর একটা মেয়ে বিয়ে করো। 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' সে সব কথা ভুলে যাও—তোমার এভাব দেখে, আমার বাস্তবিক বড় কষ্ট হয়। এই আমিই কি কল্লুম? প্রথম স্ত্রী যখন মারা যা'ন, আমার মনটাও দিনকতক তোমারই মত উদাস হয়ে গিয়েছিল; ভেবেছিলাম—আর বিয়ে করব' না; শেষে কিন্তু যখন পাঁচ জনে ব'লে-ক'য়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিয়ে দিলে, তারপরই মনটা বদলে গেল। আমার মনের যে এত পরিবর্ত্তন হ'তে পারে—এটা আমি কখন 'এক্‌সপেক্ট'ও করিনি!—বেশ একটা মনের মত পাত্রী দেখে, বিয়ে করো।"

রমেশবাবু বলিলেন—"এই ত আমাদের তহশীলদার বাবুর একটী মেয়ে আছে।"

সীতানাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ মেয়েটী?—মেজটী?"

"হ্যাঁ; শুনেছি মেয়েটী বড় লক্ষ্মী, দেখতেও মন্দ নয়, লেখা-পড়া বেশ জানে; বয়স বছর চৌদ্দ-পনেরো।"

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আরে মেয়ের অভাব কি! এ না হয়, অন্য দেখা যাবে। এমন সুপাত্র—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে—মেয়ে দিতে পাল্লে কত লোক ভাগ্য ব'লে মানবে।"

সীতানাথবাবু বলিলেন—"হেম, আমাদের কথা রাখ—বিয়ে কর; তোমার শরীর-মন, সব ভাল হবে।"

রমেশবাবু বলিলেন—"হেমবাবু, চলুন একদিন মেয়েটীকে দেখে আসুন,—পছন্দ হয় বিয়ে করবেন, না হয় করবেন-না।—দেখে আসতে দোষ কি? জানেন সীতা-নাথবাবু, সেদিন কথা-প্রসঙ্গে তহশীলদারবাবুর কাছে সেই মেয়েটীর সঙ্গে হেমবাবুর বিবাহের কথা তুলেছিলাম; তিনি রাজি আছেন। আমি সে মেয়েটীকে দেখিনি বটে;

তবে যা শুনি, তাতে খুব ভালই বলে বোধ হয়। চলুন, হেমবাবুকে নিয়ে একদিন মেয়ে দেখে আসি।"

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তাই হোক্; চলুন না, একদিন দেখেই আসা থাক্।"

সেদিন সভাভঙ্গ হইল।

হেমবাবু বন্ধুদের কাহারও কথার উত্তর দেন নাই, তাঁহারাও তাঁহাকে বেশী পীড়াপীড়ি করেন নাই; তবে, মৌন সম্মতি-লক্ষণ অনুমান করিয়া, সকলেই মনে মনে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

সারাদিন কাটিল— বর্ষার রাত্রি। ভগ্ন-প্রাচীরের উপর-বর্ত্তী কম্পমান অশ্বত্থশাখার অন্তরালে চাঁদ উঠিয়াছে, জানালা দিয়া বকুল-সৌরভ-সিক্ত শীতল মৃদুবাতাস আসিতেছে, আকাশ ভরিয়া থম্‌থমে মেঘ করিয়াছে। হেমকুমার শয্যায় শুইয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। আজিকার এই নিশীথে, তাঁহার সুখশূন্য আশাশূন্য উদ্দেশ্যশূন্য নিঃসঙ্গ জীবনটা যেন বড়ই খাপছাড়া ঠেকিতেছিল। হেমকুমার শুইয়া শুইয়া কত চিন্তা করিতেছিলেন— কত ভাঙ্গিতে ছিলেন— কত গড়িতেছিলেন। একবার ভাবিলেন—'আচ্ছা, যদি আবার বিবাহ করি তাহা হইলে কি হয়?'

মন উত্তর করিল—"কি আর হইবে?—আবার সংসার সোনার হইবে, জীবনে মধুবসন্ত দেখা দিবে, প্রাণের শূন্য স্থানটী নবীন-সুখে নব-আনন্দে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিবে!"

হেম কুণ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন—"বিবাহ করিব!—আর সরমা যদি দেখিতে পায়, ত কি মনে করিবে?"

মন অমনি বলিল—"পাগল, অত ভয় কেন পাও? মরা মানুষ কি দেখিতে আসে? আর যদি-ই দেখে, ত তোমার দোষ কি? সে মরিল কেন?"

মনের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, হেম স্থির করিলেন—কাল বন্ধুদের সহিত গিয়া, একবার তহশীলদার বাবুর মেয়েটিকে দেখিয়া আসিবেন। বিবাহ করুন, আর না করুন, একবার দেখিয়া আসিতে দোষ কি!

পরদিন প্রাতে রমেশবাবু আসিয়া বলিলেন—"হেমবাবু, কাল আমি তহশীলদারবাবুকে ব'লে এসেছি; আজ আমরা মেয়ে দেখ্‌তে যাব—চলুন।"

সীতানাথবাবু বলিলেন—"চল হেম।"

হেম অনিচ্ছার স্বরে বলিলেন—"তা-ই-ত; আপনারা দেখ্‌ছি নেহাৎ না-ছোড়-বন্দা,—চলু—ন।"

হেমকুমার অনিচ্ছার ভাব দেখাইলেন বটে; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইত, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার একটুও অনিচ্ছা ছিল না; বরং যেন একটু আগ্রহ-ই ছিল।

সীতানাথবাবুর ও রমেশবাবুর সহিত হেমকুমার তহশীলদারবাবুর বাটীতে মেয়ে দেখিতে আসিলেন। তহশীলদার-বাবু যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে বসাইলেন; রমেশবাবু, হেমকুমারকে দেখাইয়া দিয়া, বলিলেন—"তহশীলদারবাবু, ইনিই আমার বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হেমবাবু।"

প্রাপ্ত-বয়স্ক তহশীলদারবাবু হেমকুমারের পানে চাহিলেন,—তাঁহার দৃষ্টিতে বেশ একটু সহানুভূতি, একটু গৌরব, একটু স্নেহের আভাষ ছিল। তহশীলদারবাবু ভাবিলেন—'এরই হাতে যদি মেয়েটিকে দেন ত কেমন হয়?—মন্দ হয় না, বেশই হয়।'

তহশীলদারবাবু ভৃত্যকে ডাকিলেন—"গোল্‌কা।" ভিতর হইতে, শ্যাম-চিক্কন-ছিপ্‌ছিপে ছোকরা উড়ে চাকর, গোলকচাঁদ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এজ্ঞে বাবু, ডাকুচি কেনে?"

তহশীলদারবাবু বলিলেন—"পান-তামাক নিয়ে আয়।"

রমেশবাবু বলিয়া দিলেন—"শিগ্‌গির আনিস্ গোলক।"

তহশীলদারবাবুর সহিত হেমবাবুর গ্রামের স্বাস্থ্য-বায়ু সম্বন্ধে দুই-একটা কথা হইল। তারপর-পান-তামাক খাইয়া, সীতানাথবাবু বলিলেন—"মেয়েটিকে আনান মশাই একবার।"—"যে আজ্ঞে" বলিয়া তহশীলদারবাবু কনিষ্ঠা কন্যা মলিনাকে বলিলেন—"যা—তোর মেজদি'কে ডেকে আন।"

মলিনা গিয়া মেজদিদিকে ডাকিল,—সর্ব্বাঙ্গে রাজ্যের লজ্জা ও কুণ্ঠা জড়াইয়া মলিনার সহিত মেজদিদি আসিয়া অবনত শিরে দাঁড়াইল। রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তোমার নাম কি?"

লজ্জা-নমিত নয়নে সুধাবর্ষী স্বরে বালিকা উত্তর করিল—"শ্রীমতী করুণা নিয়োগী।"

রমেশবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি সেলাই জান ?"

"হাঁ জানি।"

তহশীলদারবাবু ববিলেন—"লেখাপড়া, শিল্প, গৃহকর্ম্ম--করুণা আমার সবাই জানে।"

সীতানাথবাবু বলিলেন—"মেয়েটি খুব লক্ষ্মী ; এমন শান্ত নম্র-মেয়ে আজকাল প্রায় দেখা যায় না।"

করুণা একটু মিষ্ট হাসিল।

হেমবাবু অবসর বুঝিয়া, মাঝে মাঝে করুণার কারুণ্য মণ্ডিত সিগ্ধ-মধুর চেহারা খানি দেখিয়া লইতেছিলেন। সহসা একবার রমেশবাবুর নিকট ধরা পড়িয়া হেমবাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন ; সীতানাথবাবু ও রমেশবাবু পরস্পরের গা-টেপাটেপি করিয়া হাসিলেন।

তহশীলদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন কি ?"

সীতানাথবাবু বলিলেন --"না,—যাও মা তুমি।"

করুণা চলিয়া গেল।

চা-পানাদির পর সকলে বাটী ফিরিলেন ; পথে রমেশবাবু হেমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন দেখ্‌লেন্ মেয়েটিকে ?"

"মা, তোমার নাম কি ?"

গম্ভীর হইয়া হেমবাবু বলিলেন—"মন্দ নয়।" রমেশবাবু বলিলেন—"বিয়ের কথা ঠিক হয়ে যাক্ তবে ?"

আরও অধিকতর গম্ভীরভাবে হেমবাবু বলিলেন—"আর—বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে নেই।"

সীতানাথবাবু একটু স্নেহের তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"হেম, আর বাজে-ভণ্ডামি করিস্‌নে ; তোতে আমাতে সেই ছেলেবেলা থেকে ভাব—তোর মন কি আর আমি বুঝিনে ?"

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন—"এ ত বড় মজা !"

রমেশবাবু বলিলেন—"এই বেলা বলুন ; তা নইলে—শেষে—সময় বহিয়া গেলে, আক্ষেপ করা বৃথা হবে। আর আত্ম-প্রবঞ্চনা করবেন্ না !"

সীতানাথবাবু বলিলেন—"ভেবে-চিন্তে বল একটা ; আর কেন ? ঝট্ ক'রে শুভকার্য্যটা সম্পন্ন হয়ে যাক্ ; ছেলেমানুষি রাখ।"

সে দিন আর বিবাহের কথা বড় বেশী হইল না।

রমেশবাবু আপনার বাসায় ফিরিলেন। আহারাদির পর—মধ্যাহ্নে ডেপুটিবাবুও আপনার শয়নকক্ষে গুড়-গুড়ির নল মুখে দিয়া শয়ন করিলেন। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর ধরিয়া হেমবাবু যে চিন্তা করিয়া আসিতেছেন, আজ তাঁহার সে-চিন্তা নয় ; আজ হেম ভাবিতেছেন—করুণার

করুণ-কোমল ঢলঢলে মুখখানি বড় সুন্দর! করুণা! নামটিও বড় মধুর! কণ্ঠস্বর যেন বীণার রেশ্‌! কি সুন্দর তাহার লজ্জা-ছল-ছল চোখ দু'টি! করুণা একদিন তাহারই হইবে!—জগদীশ্বর কি এই অভাগ্যের হৃদয় আলো করিবার জন্যই করুণাকে গড়িয়াছিলেন!

হেমকুমার স্থির করিলেন—আর এমন করিয়া উদাসীন-ভাবে জীবন কাটাইবেন না, করুণাকে বিবাহ করিয়া আবার নূতন সংসার পাতিবেন।

সেদিন সহসা ছাড়াছাড়িতে মন একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সংসার নিতান্ত লঘু ঠেকিয়াছিল; তাই সে দিন হেম তখন মনে করিয়াছিলেন, সংসারের আর কিছু না হইলেও তাঁহার চলে!—বিবাহ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তারপর, আজ দেখিলেন—এমন করিয়া জীবন আর কাটানো যায় না, বিবাহ করা অতিমাত্র আবশ্যক! আজ নূতন সুখ-আশার নবীন-নেশার মোহ-আবরণে সরমার সকল স্মৃতি ঢাকা পড়িয়া গেল!

* * * *

করুণার সহিত হেমকুমারের বিবাহ হইয়া গেল।

৩

ডেপুটীবাবুর ছুটি ফুরাইল; তিনি চট্টগ্রামে আবার সেই পুরাতন স্মৃতির মাঝখানে আসিয়া পড়িলেন; নববধূ করুণাও সঙ্গে আসিল।

বউ দেখিয়া—হেমের জননী পরমানন্দিতা হইলেন, আত্মীয়-বন্ধু সকলেই সন্তুষ্ট হইল।

করুণা আসিয়া যখন শ্বশ্রূদেবীর পদবন্দনা করিল, তখন তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"দুর্গার মতন স্বামী-সোহাগী হ'য়ে চিরকাল সুখে থাক!" কিন্তু বৃদ্ধার এ আশীর্ব্বাদ কতদূর সত্যে পরিণত হইবে, তাহা সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বদেবতাই জানেন।

চট্টগ্রামে আসিবার তিনদিন পরে, একদিন হেম স্বপ্ন দেখিলেন—যেন স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া আকুল-নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে সরমা তাঁহাকে বলিল, "স্বামি! আজ তোমার হৃদয়ে আমার এতটুকুও স্থান নাই? আজ তোমার সে ভালবাসা কোথায় গেল? আমার চিরজীবনের সেবা-শ্রদ্ধার কি এই প্রতিদান দিতেছ? আমিই যেন আজ তোমার নিকট হইতে দূরে;—কিন্তু আমাকে স্মরণ করিবার মত চিহ্ন কি কিছুই নাই? আমার কত তপস্যার ফল—বুকভরা স্নেহের ধন—আমার প্রণয়ের একমাত্র অমূল্য উপহার সুষমা রহিয়াছে—তাহাকেও কি একবার চাহিয়া দেখিতে নাই?—সে যে আমারই রূপান্তর মাত্র!" স্বপ্ন দেখিবা মাত্র হেমের নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্বপ্নদৃষ্ট সরমার আকুল অশ্রুময় দীন ছবি নয়নপথে ভাসিয়া উঠিল, তাহার করুণ কথাগুলি প্রাণে বাজিতে লাগিল। হায় সরমা! মৃতা সরমা! স্বর্গেও হেম তাহাকে কাঁদাইতেছেন! অকৃতজ্ঞতার আত্মগ্লানিতে হেমকুমারের বুক ভরিয়া গেল; ভাবিলেন—না—আর না!—আজ হইতে সরমার প্রেম-নিদর্শন সুষমাই তাঁহার সব হইবে। ইহার পর হইতেই এই ডেপুটী-দম্পতির মধ্যে কেমন একটা অশান্তি—কেমন একটা ব্যবধান, প্রাণের মর্ম্মস্থলে বিরাজ করিতে লাগিল। করুণার প্রতি হেমকুমারের অপ্রত্যাশিত ঔদাসীন্য দেখা দিল;—আর তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না, আদর করিয়া একটিবারও তাহাকে কাছে ডাকিতেন না।

করুণা, হেমকুমারের ভাব দেখিয়া, প্রথম প্রথম বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। 'সে কি কিছু করিয়াছে? তাহার কোনও কার্য্যে কি স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? যদিই সে কোনও অপরাধই করিয়া থাকে, তবে তিনি কেন তাহাকে বুঝাইয়া দেন না? এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন কেন?' করুণার চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত, এইরূপ কত কি ভাবিত, কিন্তু কোনও কূল-কিনারা পাইত না। নূতন নূতন দুই তিনদিন করুণা, হেমকুমার না ডাকিলেও, তাঁহার নিকট গিয়া বসিত, কত কথা বলিত, কত অভিমান করিত; হেম যেন করুণার সে সব উপদ্রবে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন—কোনও অছিলায় করুণার নিকট হইতে সরিয়া পড়িতে পারিলে যেন তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন।

করুণা ভাল করিয়া দেখিল—হেম সংসারে শুধু একা তাহারই নিকট হইতে পাশ কাটাইতেছেন—সেই যেন শুধু কাহার কাছে কি একটা মিথ্যাকে সত্য-প্রমাণ করিয়া দিতেছে! শুধু তাহারই জন্য যেন তিনি কাহার নিকট সঙ্কুচিত—কুণ্ঠিত—লজ্জিত!

তারপর, একদিন করুণা স্বামীর অব্যক্ত মনের কথা বুঝিল; কিন্তু কেমন করিয়া যে জানিল, তাহা সে

আপনিই বুঝিল না। যেদিন করুণা স্বামীর মনের ভাব বুঝিল, সেইদিনই সে আপনা হইতেই হেমকুমারের নিকট হইতে একটু দূরে যাইয়া দাঁড়াইল। গয়নার হিসাব, দাসী-চাকরের মাহিনা, ধোপার হিসাব প্রভৃতি সাংসারিক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন সে হেমের সহিত আর কোন কথা কহিত না। সে নিকটে গেলে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, হেমকে এক আধটি কথা বলিতে হইত—হেমের স্মৃতি-সুখে বাধা পড়িত দেখিয়া, করুণা আর পূর্ব্বের মত সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে হেমকুমারের নিকট যাইত না। করুণা মনে ভাবিত—স্বামীকে যদি সুখীই না করিতে পারিলাম—তবে কিসের স্ত্রী! আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া—যেমন করিয়া—যত বড় ত্যাগ—যত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়া হোক্, করুণা আপনি সব করিবে; কিন্তু স্বামীর সুখের পথে এতটুকু বাধা দিবে না। করুণা জানিত—সে যদি চেষ্টা করে, তাহা হইলে, হেমকুমারের নিকট হইতে সে তাহার প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে পারে—কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিল—সে তাহা লইবে না।—যদিও সেটুকু পাইলেই তাহার নারীজন্মের সার্থকতা হয়, সেটুকু পাইলে জগতের সকল সুখদুঃখের ভিতর দিয়া সগৌরবে অম্লান-হাসি মুখে সে চলিয়া যাইতে পারে, সেইটুকুই তাহার সাধনার ধন; কিন্তু তবু করুণা সেটুকু ছাড়িয়া দিল। স্বামী যাহা দিতে চাহেন না, সে ভুলাইয়া তাহা কেন লইবে?—সে জন্য তাহার জন্ম ব্যর্থ হইবে—জীবন অন্ধকার হইবে—হউক, করুণা কিন্তু তাহা কখন চাহিবে না। স্পর্দ্ধার প্রাপ্য—পূর্ণাধিকারের দ্রব্য—সে ভিখারিণীর মত চাহিয়া লইতে যাইবে কেন? স্বামীর সুখের জন্য, সে আপনার স্ত্রীত্বের সমস্ত দাবীটুকু ছাড়িয়া দিল। করুণা সেই দিন হইতে স্ত্রীর অধিকার ছাড়িয়া দিয়া, দাসীর মত শুধু সেবা, শুধু যত্ন, শুধু ভক্তি, করিবার অধিকার নিল; সে মনে করিত, তাহার যেন এতটুকুই যথেষ্ট, কি জানি নিষ্ঠুর অদৃষ্ট যদি এটুকু হইতেও বঞ্চিত করে! সে চাহে—স্বামীকে প্রাণভরিয়া ভালবাসিতে—হৃদয়ঢালিয়া ভক্তি করিতে—সেবায় জীবন-উৎসর্গ করিয়া দিতে,—যেটুকু চায়, সেইটুকুই যখন পায়, তবু যে কেন, কিসের জন্য, তাহার প্রাণে এমন দীন হাহাকার, চোখে জল-ভরা, বুকে এমন দারুণ-ব্যথা, তাহা সে বুঝি, বুঝিয়াই উঠিতে পারিত না!

একদিন আড়ালে থাকিয়া করুণা শুনিল, হেম সুষমাকে কোলে করিয়া বলিতেছেন—"সুষমা! আমার জীবনের আলো, তুই-ই আমার সব। তোকে ছেড়ে এক মিনিট থাক্‌তে আমার কি যে কষ্ট হয়, তা কি বলব। কাছারি থেকে আস্‌বার সময় সারাপথ মনে কর্‌তে কর্‌তে আসি—এসেই তোকে দেখ্‌তে পাব; তা কিন্তু একদিনও পাই না;—তুই কেন মা আমার আসবার সময় দোরে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে?"

তারপর, সেদিন হেম কাছারি যাইলেই, করুণা ছুটিয়া গিয়া, ক্রীড়ারতা ধূলামাখা বালিকা সুষমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, চুম্বনে চুম্বনে বালিকার ছোট শুভ্র মুখখানি রাঙা করিয়া দিল, বলিল - "সুষমা, তুই যখন আমার স্বামীর সব, তখন আমারও সব।"—তাহার চক্ষু দিয়া বড় বড় দু' ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বালিকা করুণার কথার মর্ম্ম বা অকস্মাৎ এ প্রকার উচ্ছ্বসিত ভালবাসার কোনও অর্থ, গ্রহণ করিতে পারিল না। সেই দিবস হইতে হেমবাবুর কাছারি হইতে ফিরিবার সময়, করুণা সুষমাকে কোলে করিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিত;—"সুষমা, মা আমার আয়" বলিয়া হেম সুষমাকে কোলে করিয়া ভিতরে আসিতেন, করুণাকে একটি সম্ভাষণ মাত্রও করিতেন না। স্বামীর অনাদর-উপেক্ষার তীক্ষ্ণছুরি করুণার কোমল হৃদয়খানির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি একটা দারুণ বিদারণ-রেখা টানিয়া দিত, চক্ষে জল ছাপাইয়া পড়িত;—সে তাড়াতাড়ি নিভৃতে গিয়া চোক মুছিয়া, অন্তরের দীনতা বহু কষ্টে ঢাকিয়া, বাহিরে প্রফুল্লভাব দেখাইতে চেষ্টা করিত। এই রকমে চারিটি বৎসর কাটিয়া গেল;—করুণার প্রতি হেমের বিরাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এমনও অনেকদিন কাটিল, যেদিন করুণা নিকটে বসিয়া বাতাস করিয়াছে, জুতা পরাইয়া দিয়াছে, অথচ হেমকুমার তাহার সহিত একটিও কথা কহেন নাই।

অন্তর্বেদনায় করুণার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া গেল; দারুণ দুঃখের কীট, তিল তিল করিয়া, তাহার বক্ষের শোণিত শুষিয়া লইল। অযতনে, দুঃখেকষ্টে শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, কাশি প্রভৃতি কত কি

রোগ দেখা দিল—চিকিৎসা হইল না! দেহ মধ্যে রোগ দৃঢ়রূপে বাসা বাঁধিল; করুণা কাহাকেও কিছু জানাইল না।

সর্ব্বাঙ্গে পাণ্ডুরতা দেখা দিল, দেহ অতিমাত্রায় ক্ষীণ হইয়া গেল, মুখে চোখে আশু-বিদায়ের একটি বিবর্ণ শ্রীহীন আভাষ ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না!—লক্ষ্য করিয়া—খুঁজিয়া দেখিবার মত স্নেহবান্ আপনার লোক অভাগীর এ জগতে কে আছে, যে দেখিবে! অপূর্ণতার মাঝখানে জীবনের প্রভাতেই বুঝি তাহার ডাক পড়ে!

একদিন সহসা রোগের প্রকোপ অতি অধিক মাত্রায় বাড়িল; সেদিন আর করুণা উঠিতে পারিল না।

দাসী গিয়া বলায় হেম ডাক্তার আনাইল; রোগী দেখিয়া ডাক্তার জানাইলেন—"পীড়া নিতান্ত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পূর্ব্বে রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল—এখন জীবনের আশা বড়ই অল্প।"

হেম একটু তিরস্কার করিয়া করুণাকে বলিল—"রোগ হইয়াছিল, বল নাই কেন? স্বেচ্ছায় এমন কাণ্ড কেন বাধাইলে?"

করুণার প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল; সে বলিতে যাইতে ছিল—"আমি সাধিয়া বলিতে যাইব কেন প্রভু? বাড়ীর ঝিয়ের সহিতও তুমি কথা কও, তাহার সুখ-দুঃখের খবর নাও, কিন্তু আমাকে কি কখনো একটিবার কিছু জিজ্ঞাসা করেছ?" কিন্তু কিছু বলিল না, শুধু চোখের জলে বিছানা ভাসাইল।

করুণা সুষমাকে কোলে করিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিত;

হেম বলিল—"করুণা! কাঁদ কেন? ঝি-চাকর টাকা-কড়ি-গয়না, তোমার ত সবই আছে—কিসের অভাব?"

করুণার নয়নে দ্বিগুণ অশ্রু ছুটিল—তাহার কিসের অভাব, সে কি বলিবে? বলিয়া বুঝাইবার মত ভাষা তাহার কই! সে শুধু একবার হেমকুমারের পানে চাহিয়া চোখ নামাইল।

হেম চলিয়া গেল।

ঔষধ আসিল। করুণা গোপনে শিশিশুদ্ধ নর্দ্দামায় ঢালিয়া দিল। ঔষধ খাইল, কি না, একথা সারা-দিনরাতেও কেহ একটিবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না।

পরদিন হেম দাসীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইল, 'করুণা কেমন আছে? ডাক্তার আনিতে হইবে, কি না?' করুণা বলিল—'সে ভাল আছে, আর ডাক্তারের প্রয়োজন নাই।'

তিন দিন কাটিল, পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; করুণা আজ বুঝিল—জীবনের মেয়াদ এবার ফুরাইয়াছে, আর বড় বেশী সময় নাই। সন্ধ্যাকালে করুণা সুষমাকে ডাকিয়া কোলে লইল, অনেক আদর করিল, তারপর গহনার বাক্স খুলিয়া সরমার ও আপনার সমস্ত গহনাগুলি একে একে কোনও রকমে তাহাকে পরাইল,

সন্ধ্যা কাটিয়া রাত্রি হইল। সুষমাকে লইয়া শয়নকক্ষে হেমকুমার ঘুমাইতেছেন।

রাত দুইটা বাজিল। সেদিন শারদ-পূর্ণিমা, আকাশ ভরিয়া পৃথিবী ছাইয়া চাঁদের আলো হইয়াছিল, ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল, সকলেই নিদ্রার শান্তি-অঙ্কে শায়িত, সমস্তই স্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু দূর হইতে এক আধটা নীড়ভ্রষ্ট পাখীর ডাক বা প্রতিবেশী শিশুর অস্ফুট রোদনধ্বনি বায়ুভরে উড়িয়া আসিতেছিল। এ সময় জাগিয়াছিল—দীপহীন নির্জ্জন কক্ষে বেদনাবিধুর শুধু এক অভাগিনী।

করুণা শয্যায় উঠিয়া বসিল; কি ভাবিয়া উঠিয়া একেবারে গৃহ হইতে বাহির হইয়া হেমকুমারের শয়নগৃহের নিকট আসিল, অত্যধিক দুর্ব্বলতায় করুণা দাঁড়াইতে পারিল না, পড়িয়া গেল, কঠিন প্রস্তরখণ্ডের উপর পড়িয়া যাওয়াতে তাহার শীর্ণ বক্ষে বড় ভয়ানক আঘাত লাগিল! কিন্তু তবু অতি কষ্টে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, হেমকুমারের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—"দেবতা! আমার সর্ব্বস্ব! আমার সব দিয়াও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না—এই বড় দুঃখ রহিল। এজন্মে ত কাঁদিতে কাঁদিতে মরিতেছি—পরজন্মে যেন তোমার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত না হই।—কোন্ ক্ষমাহীন অপরাধের জন্য এ শাস্তি দিলে প্রিয়তম?"

করুণার বুক বহিয়া অশ্রু পড়িল; সে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে শয্যায় উঠিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া শুইল, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই জগতের সব জ্বালা-যন্ত্রণা অনাদর-উপেক্ষা ভুলিয়া জনমের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে হেমকুমার চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া করুণা পড়িয়া রহিয়াছে! তখন জানালা দিয়া ঊষার আলো আসিয়া করুণার প্রাণশূন্য পাণ্ডুর মুখখানির উপর পড়িয়াছিল, করুণার নয়নপ্রান্তে তখনও অশ্রুবিন্দু শুকায় নাই!

তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া করুণা পড়িয়া রহিয়াছে

চুল বাঁধিয়া, মুখ মুছিয়া, কপালে একটি ছোট খয়েরের টিপ কাটিয়া দিল, তারপর তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল—"সুষমা, আমি এবার যাচ্ছি, তুই তোর বাবাকে দেখিস্, আমার জন্য কাঁদিস্নে মাণিক!" বলিতে বলিতে করুণা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুষমাও কাঁদিল; বলিল—"তুমি চলে যাবে, বাবার কাজ কে করিবে? আমায় কে কোলে নেবে, খাইয়ে দেবে? না মা—তুমি যেও না।"

করুণার মুখে আর কথা সরিল না; সে, বালিকার মাথায় হাত রাখিয়া, নীরবে আশীর্ব্বাদ করিল।

"নিসর্গ-দৃশ্য—কানপুর"
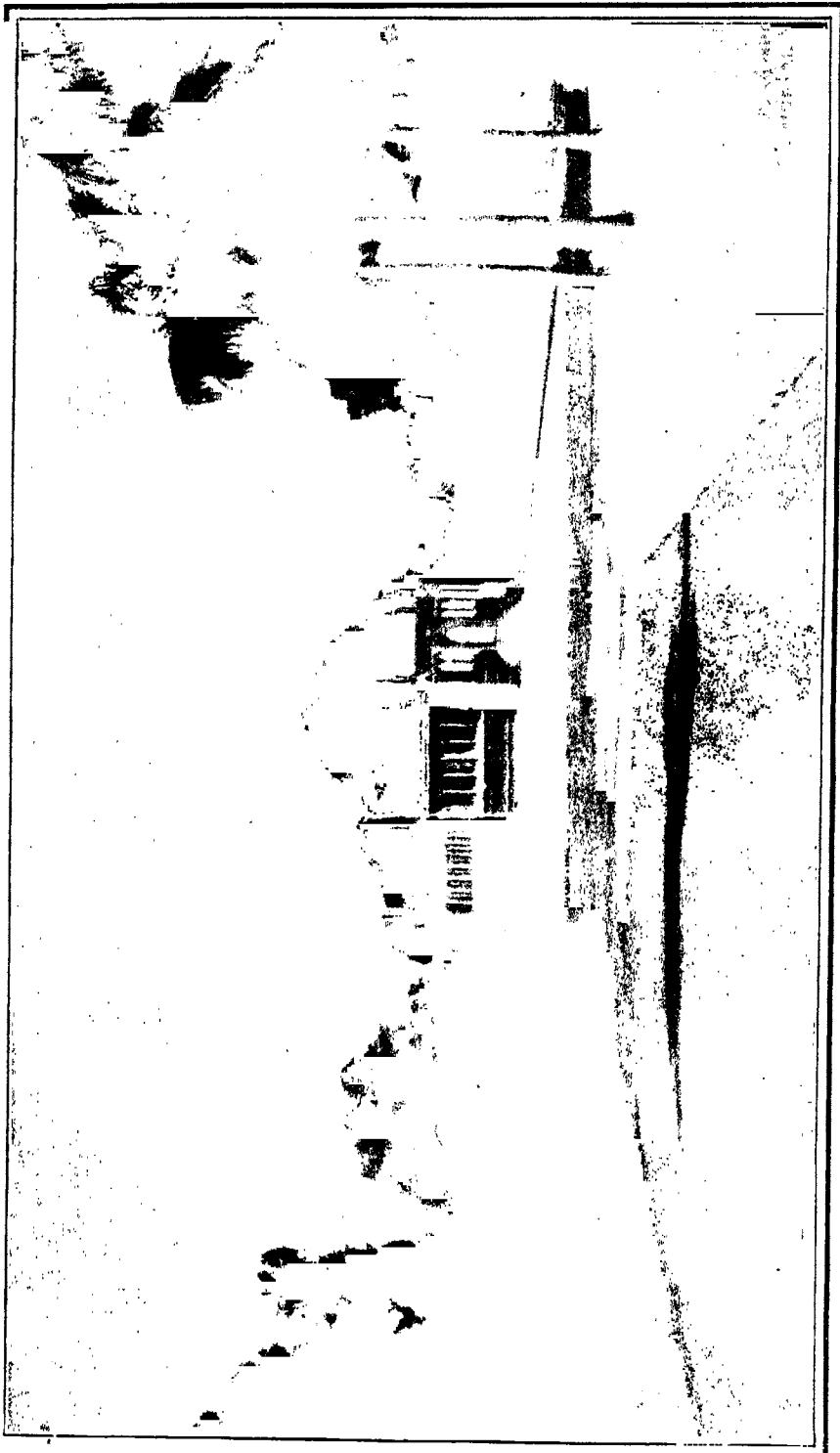
ভারত-ভারতী

[শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, M. A.]

'উপদেশ-সাহস্রী'

৩। বিষয়-বর্গ,—আত্মার 'বিশেষণ' ও 'জ্ঞেয়'।

বিষয়বর্গ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র থাকিয়াই, উহাদিগকে অনুভব করিয়া থাকেন। যেটি যাহার স্বরূপ, তাহার উচ্ছেদ করা যায় না। স্বরূপটিকে নষ্ট করিলে, বস্তুটিও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। উষ্ণতাই অগ্নির স্বরূপ। উষ্ণতাকে ধ্বংস করিলে, অগ্নিও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, অগ্নি-সত্ত্বে, অগ্নির উষ্ণতাকে নষ্ট করা যায় না। কিন্তু বস্তুর যেটি 'বিশেষণ', তাহার উচ্ছেদ করা যায়। কতকগুলি বিশেষণের নাশ করিয়া দিলেও, বস্তুটি নষ্ট হইয়া যায় না। আমার হস্ত যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমি হস্ত-বিশিষ্ট রহিয়াছি। হস্তটি কাটা যাইবার পর, আর আমাকে হস্তবিশিষ্ট কেহ বলিবে না। সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ —ইহারাই আত্মার স্বরূপ-ভূত। ইহারা আত্মার বিশেষণ নহে। সত্তা-চৈতন্য-আনন্দকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার স্বরূপ বুঝা যায় না। কিন্তু আমি কৃশ, স্থূল, গৌর; আমি দ্রষ্টা, বক্তা, শ্রোতা; আমি ক্রোধী, জ্ঞানী, কর্ত্তা, ভোক্তা; আমি সুখী, দুঃখী,—এগুলি আত্মার বিশেষণ মাত্র;—ইহারা আত্মার স্বরূপ নহে। গাঢ় নিদ্রার সময়ে আত্ম-চৈতন্য থাকেন, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি থাকে না। সুতরাং এ গুলিকে পরিত্যাগ করিলেও, আত্মার স্বরূপ ঠিকই থাকে।

অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, যেগুলি জড়ের ধর্ম্ম, আত্মাকে সেই ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য নহে। সুখ-দুঃখ, কৃশ-স্থূল-গৌরাদি সমস্তই, সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহের ধর্ম্ম; আত্মা এই সকল ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ-বর্জ্জিত। এই ধর্ম্ম বা বিশেষণগুলি সর্ব্বদাই রূপান্তরিত হয়; ইহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আত্ম-চৈতন্য সদা একরূপ। আমরা ভ্রম-বশতঃ এই সকল জড়-ধর্ম্মকে আত্মাতে আরোপিত করিয়া লই—এই সকলের সঙ্গে আত্ম-চৈতন্যকে মিশাইয়া ফেলি।

আত্মা সকলের প্রকাশক, সকলের জ্ঞাতা। বিষয়বর্গ মাত্রই আত্মার জ্ঞেয়। যাহা জ্ঞেয়, যাহা আত্মার গ্রাহ্য—সে সকলই জড়। আত্মা এই জ্ঞেয়বর্গের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। গাঢ় নিদ্রায় 'আমি'-বোধও থাকে না। সুতরাং, এই যে 'আমি'ত্ব, ইহাও আত্মার জ্ঞেয়, বা দৃশ্য। সুতরাং, ইহা হইতেও আত্মা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র থাকিয়াই, আত্মা সকল বোধের অনুভবকারী। অতএব, আত্মা যখন কোনরূপ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইতেছেন না, তখন আত্মা অবশ্যই নির্ব্বিশেষ হইতেছেন। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। আত্ম-সত্তার সিদ্ধি করিবার জন্য, অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন করে না। কিন্তু, আত্ম-সত্তার উপরেই অন্যান্য সকল বস্তুর সত্তা ও স্ফুরণ নির্ভর করে।

একটা দুঃখ উপস্থিত হইলে, তখন আমি নিজকে দুঃখী, বা দুঃখ-বিশিষ্ট, বলিয়া বোধ করিয়া থাকি; কিন্তু এই দুঃখ ত পরে আসিয়াছে—দুঃখ উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ত আমি বর্ত্তমান ছিলাম। এইরূপ, সুখ, দুঃখ, আমিত্ব, কৃশত্ব—প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্ব হইতেই, আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব আত্মার অস্তিত্ব অপর কোন বস্তু বা ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করে না।

অতএব, আত্মা—নির্ব্বিশেষ, স্বতঃসিদ্ধ এবং সকলের সাক্ষী। বিষয়বর্গের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইলে, বুদ্ধি বিষয়ের আকার ধারণ করে। বুদ্ধি যখন যে বিষয়ের আকার ধারণ করে, আত্মা তখনই তাহার অনুভব করেন। ইহাতে আত্মার কোন বিকার হয় না। তিনি বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার বিকারের সাক্ষী বা অনুভবকারী। যাহা জড়,

তাহার অংশ আছে। এই অংশগুলিরই পরিবর্ত্তন, বা বিকার হয়। আত্মার কোন অংশ নাই; আত্মা নিরবয়ব। সুতরাং আত্মার বিকার হইবে কিরূপে? আত্মা অবিকৃত থাকিয়াই, সকল বিকারের সাক্ষী। জগতের তাবৎ বস্তু, বুদ্ধির ক্রোড়ীকৃত হইয়াই, অনুভূত হয়। সুতরাং, আত্মা, বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার অবস্থার অনুভবকর্ত্তা;—বুদ্ধির সর্ব্ব-প্রকার বিকারের সাক্ষী।

স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট একটি জবাপুষ্প স্থাপিত হইলে, স্ফটিকের রক্তবর্ণ উপস্থিত হয়। সূর্য্যালোক যখন এই স্ফটিককে প্রকাশিত করে, তখন সূর্য্যালোক রক্তবর্ণ হইয়া উঠে না। এইরূপ, বিষয় উপস্থিত হইবামাত্র, বুদ্ধি সেই বিষয়াকার ধারণ করে। আত্মা, এই বুদ্ধির প্রকাশক। সুতরাং, আত্মা, অবিকৃত থাকিয়াই, বুদ্ধির অবস্থান্তরগুলিকে প্রকাশিত করেন। যেখানে বুদ্ধি নাই, সেখানে বিষয়ের অনুভব হয় না। জাগ্রতাবস্থায় আমাদের বুদ্ধিতে যাবতীয় বস্তু—যাবতীয় দৃশ্য—অনুভূত হইতে থাকে; কিন্তু গাঢ় নিদ্রাকালে, বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়; কাজেই, তখন দৃশ্যবর্গেরও অনুভূতি হয় না। কোন দৃশ্য আছে, অথচ আত্মা তাহাকে অনুভব করিতেছেন না, ইহা কখনই হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালে, এই জড়ীয় দৃশ্য থাকে না বলিয়াই, তাহা অনুভূত হয় না। অতএব, ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, দৃশ্যবর্গ থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে;—ইহারা সর্ব্বদাই অবস্থান্তর গ্রহণ করে—কিন্তু আত্মার অবস্থান্তর নাই; আত্মা চির-বিরাজমান।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*

চার্ব্বাক-দর্শন

[শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সাংখ্য-বেদান্ত-সর্ব্বদর্শন-তীর্থ]

গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থ-প্রণেতা নির্ব্বিঘ্নে সন্দর্ভ-পরিসমাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অভীষ্ট দেব মহেশ্বর ও গুরুদেবের প্রণতি করিতেছেন।

প্রথম শ্লোকের ন্যায়-পক্ষে অর্থ—(যিনি) নিত্য-জ্ঞানের আশ্রয় (অধিকরণ) নির্ব্বাণের (মোক্ষের) নিধিস্বরূপ, যৎকর্ত্তৃক বা (যাহা হইতে) (সূক্ষ্ম ভূত ও) পরিদৃশ্যমান্ ক্ষিতি প্রভৃতি (স্থূল ভূত) প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, (সেই হেতু) তদ্দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকর্ত্তৃক (অতএব) গ্রন্থারম্ভে সেই দেবাদিদেব শিবকে অভিবাদন করি। [নৈয়ায়িকগণের মহেশ্বরই অভীষ্ট দেবতা, ইহা ন্যায়-দর্শনের অনুবাদকালে পরে ব্যক্ত করিব।]

বেদান্ত-পক্ষে শ্লোকার্থ,—যাহা হইতে এই জগৎ (আকাশাদি সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতাত্মক) প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; যাহাতে এই দৃশ্যমান্ প্রপঞ্চ সকর্ত্তৃক (কর্ত্তৃ-জন্য) সেই নিত্য জ্ঞান-স্বরূপ নির্ব্বাণ-নিধি পরমেশকে (গ্রন্থের আরম্ভে) নমস্কার করিতেছি। বেদান্তমতে পরমেশ বা পরমাত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, তিনি মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হইয়া, তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বিশ্ব-প্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়ের নিমিত্ত-কারণ হইয়া থাকেন।

ন্যায়-মতে জ্ঞানের অধিকরণ (আধার বা আশ্রয়) আত্মা, তাহাতে জ্ঞান সমবেত থাকে। অতএব আত্মা বা ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা, এই জগৎ তাঁহার কার্য্য, কার্য্য হইলে তাহার অবশ্য কর্ত্তা আছে; যিনি বিশাল অমিত-জগতের কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর, এইরূপ অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

যিনি সমস্ত দর্শন-সাগরের পরপার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার স্বীয় (সদ্গুণ) উচিতকার্য্যসমূহ দ্বারা সকল লোক কৃতকার্য্য, (চরিতার্থ) সেই সকল আগম-(বেদাদি-শাস্ত্র) বেত্তা শ্রীশার্ঙ্গপাণি-নন্দন সর্ব্বজ্ঞ-বিষ্ণু-নামক গুরু-দেবকে পশ্চাৎ (ভগবানের স্তুতির পর) আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

* শ্রীমৎ (সায়ণাচার্য্য) মাধবাচার্য্য-প্রণীত 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে'র বিশদ বঙ্গানুবাদ। এই 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' ষোলখানি দর্শনের নিগূঢ় রহস্য-পূর্ণ সারমর্ম্ম সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে প্রথমে 'চার্ব্বাক-দর্শন' লিখিত হইয়াছে সুতরাং সেই ক্রমে বঙ্গানুবাদও করা হইল।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে (সম্বৎ ১৯২১) সংস্কৃত কলেজের দার্শনিক অধ্যাপক ৺স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের অতি স্থূল স্থূল অংশের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল, দার্শনিক অংশের কোন স্থানের অনুবাদ তিনি করেন নাই; ক্রমে উক্ত অনুবাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় সংস্করণও ঐরূপেই বাহির হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বম্বে ও কলিকাতায় হিন্দী এবং বঙ্গানুবাদ সহ অপর দুইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে,—এই দুই সংস্করণেও দার্শনিক অংশ স্পর্শ করে নাই। বিশ্ব-নিয়ন্তৃ-মঙ্গলময়ের কৃপায় ও গুরুলব্ধ উপদেশঅনুসারে এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা এবং বিশদ বঙ্গানুবাদ করিতে ব্রতী হইয়াছি। অনুবাদ শেষ হইলেই ক্রমশঃ টীকা বাহির (পুস্তকাকারে) হইবে।

শ্রীমান্ (বিপুল-বৈদুষ্য-সম্পন্ন) সায়ণাচার্য্য-দুগ্ধ-বারিধি (সম্ভূত—জাত বা) কৌস্তুভমণির ওজঃশক্তি-(মনীষা কিংবা প্রতিভা) দ্বারা (সাহায্যে) মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক এই সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ-বিরচিত হইতেছে। [মাধবাচার্য্য 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন] ॥ ৩॥

বক্তব্য—সায়ণাচার্য্য পাণ্ডিত্যে অগাধ বারিধি-স্বরূপ, কৌস্তুভমণি তাঁহার প্রতিভার স্থানীয়; প্রতিভা (নিরন্তর উন্মেষশালি-বুদ্ধিশক্তি) প্রতিভার নির্ম্মলতা মহৌজ শক্তির স্থানীয়। মাধবাচার্য্য তাহার ভ্রাতা মহামতি সায়ণাচার্য্যের উপদেশে ও সহায়তায় এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য এই দুই নাম একই ব্যক্তির; বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় মাধব, সায়ণ, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছিল। অনুবাদ শেষ হইলে, ইঁহার জীবনীতে এই সকল কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিবার ইচ্ছা আছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রণীত শাস্ত্রসমূহ অতীব দুরূহ; অতএব, সজ্জনদিগের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য উক্ত শাস্ত্র-নিচয় ভূয়ো ভূয়ঃ (বহুবার) সমালোচন-পূর্ব্বক আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ (বিশ্বৈশ্বর্য্য-যুক্ত) সায়ণ-মাধব (*) এই নিবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন; (অতএব) সুধীবৃন্দ স্বীয় মৎসরতা (পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা) পরিহার করিয়া, সরলমানসে ইঁহার প্রতিপাদ্য-বিষয়সকল শ্রবণ করুন; [যেহেতু] মনোহর সৌগন্ধ্যময় প্রসূনাবলি দ্বারা গ্রথিত মালা কাহার না প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত হয়? ॥ ৪॥

চার্ব্বাক-দর্শনের অনুবাদ—

পরমেশ্বরকে কিরূপে [সৃষ্টিকর্ত্তা এবং] মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়, যেহেতু বৃহস্পতির মতানুসারী (বৃহস্পতির শিষ্য) নাস্তিক-শ্রেষ্ঠ (†) চার্ব্বাক-কর্ত্তৃক তাহা (ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মোক্ষ-দাতৃত্বাদি) সুদৃঢ়ভাবে পরিহৃত হইয়াছে। চার্ব্বাকের সে সমুদয় যুক্তি-খণ্ডন দুরুচ্ছেদ্য (নিরাকরণীয় নয়)। এই সংসারে প্রায় সকল প্রাণীরই এইরূপ অভিলাষ দেখা যায়,—'যতকাল বাঁচিয়া থাকিবে, ততকাল সুখেই থাকিবে (যেহেতু) মৃত্যুর হাত কোনও প্রাণী ছাড়িতে পারিবে না—অর্থাৎ জন্ম হইলে মরণ যেন হইবেই, এই নিশ্চিত বিষয় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য (সতত সুখের চেষ্টা না করিয়া) অপর কোন দুঃখ-কর উপায়ের চেষ্টা করা বৃথা। বর্ত্তমান দেহ বিনষ্ট হইলে তাহার আর এই সংসারে পুনরাগমন নাই; অতএব বর্ত্তমানে ঐহিক-সুখ ভিন্ন পারলৌকিক-নির্ব্বাণ বা সুখ-বিশেষের চেষ্টা বৃথা' [প্রত্যক্ষ ত লোকে দেখিতে পায় যে, শরীরীর (জীবের) মরণের পর কাহার বা শরীর পচিয়া যায়, কাহার বা ভূমিসাৎ হয়, কাহারও পশু প্রভৃতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়, অপর কাহারও অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়; সুতরাং পরলোক বা কোথায়? সেখানে যাবে বা কে?

এইরূপ লোকপরম্পরাগত গাথা (প্রসিদ্ধ লোক-প্রবাদ) অনুগামিগণ (অনুসরণকারি-লোকসকল) নীতি শাস্ত্র (শুক্র, বিদুর, ধৌম্য, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কৌটিল্য, কামন্দক প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থ) ও কামশাস্ত্র (বাৎস্যায়ন —কামসূত্র, যশোধরীয় সন্দর্ভ, রতি-রহস্য প্রভৃতি) অনুসারে অর্থ ও কামকে প্রধান পুরুষার্থ জানিয়া, ধর্ম্ম-মোক্ষ প্রভৃতি পারলৌকিক বিষয়ের অপলাপ করিয়া চার্ব্বাক-মতের বশবর্ত্তী হয় বলিয়াই জানা যায়।

অতএব সেই চার্ব্বাকমতের একটি নাম লোকায়ত (প্রবাহরূপে—লোকপরম্পরায় আয়াত—আগত বা প্রাপ্ত) বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সেই মতের যাঁহারা আচরণ করেন, তাঁহারা "লৌকায়তিক" নামে শাস্ত্রে অভিহিত হন। এই নাম অন্বর্থপর—অর্থাৎ যোগার্থ-পর হইয়াছে, ইহা রূঢ় (প্রসিদ্ধ) বা * প্রাতিপদিক নয়, [লোক-প্রত্যক্ষ পরম্পরায় আগত বলিয়া উক্ত যোগার্থ (প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ) অনুসারে 'লোকায়ত' নাম হইয়াছে]। চার্ব্বাক-দর্শনের এখন প্রতিপাদ্য (বক্তব্য—দার্শনিক-বিষয়) বলা যাইতেছে। এই দর্শনে পৃথিবী প্রভৃতি (ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল, চারিটি ভূতই তত্ত্ব (দর্শনে উক্ত-পদার্থ); পঞ্চম ভূত (আকাশ) প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না বলিয়া

(*) সায়ণ, মাধব দুই ভ্রাতা কিংবা একই জনের নামান্তর, তাহা প্রবন্ধান্তরে তাঁহাদের ইতিবৃত্তে প্রকাশ করিব।

(†) "অস্তি নাস্তি দিষ্টংমতিঃ"—পাণিনিঃ (সূঃ ৪ ৪ ৬৩)
"নাস্তিকো বেদ-নিন্দকঃ"—মনুঃ (২—২১)
"—সম্মোহো ভয়ং নাস্তিক্যং অজ্ঞানম্"—(মৈত্র্যুপনিষৎ)

(*) "রূঢ়ংসংকেতবন্নাম" "যৎপ্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নোনাতি-রিচ্যতে"। (শব্দশক্তি প্রকাশিকা)

তাহা এই দর্শনের মতে পদার্থের মধ্যে গণ্য নয়।* সেই ভূতচতুষ্টয় দেহরূপে পরিণত হইলে (অর্থাৎ পরিণতি-সময়ে) যেরূপ কিণ্বসমূহ (†) (সুরার বীজ বা সুরার উৎপাদক—পর্য্যুসিত অন্ন, সিদ্ধ ধান্য প্রভৃতি) হইতে মাদক শক্তির উদ্ভব হয়, তাদৃশ চারিভূতের মিলন হইতে উক্ত ভৌতিক দেহে চৈতন্যের বিকাশ হয়। চেতনা শক্তি বা চৈতন্য (আত্মা) দেহ হইতে পৃথক্ নয়। সুতরাং দেহের উপাদান-ভূতসকল বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, চেতনা শক্তিও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়—দেহনাশের পর আর পরিশেষে কেহ থাকে না। এই সম্বন্ধে বাজসনেয়ী শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞানঘন (আত্মা বা চৈতন্য) ভূতচতুষ্টয় হইতে উত্থিত হইয়া, সেই ভূতসকল নাশের পর চৈতন্যও স্বয়ং নাশ প্রাপ্ত হয়" (অতএব) বিনষ্ট জীবের প্রেত্য-ভাব নাই—অর্থাৎ দেহনাশের পর জীবের আতিবাহিক দেহ বা প্রেত-দেহ কিংবা স্বর্গদেহ-সংজ্ঞা হয় না। ‡ ইহা বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে সুব্যক্ত আছে; [চারিভূত হইতে উৎপন্ন ভৌতিক দেহে চৈতন্যের বিকাশ হয়।] দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত পদার্থের (স্বাভাবিক) যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহা অপর পদার্থের সহিত মিলিত হইলে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে দুই বা ততোধিক পদার্থের সম্মিলনে অভিনব শক্তির আবির্ভাব হয়; যেমন হলুদ-চূণের যোগ হইলে রক্তিমার বিকাশ হয়। এরণ্ড-নির্য্যাস মসীর-সংযোগে শ্বেতবর্ণের প্রাদুর্ভাব হয়। আমর্দ্দিত (রগড়ান) দ্রাক্ষা-রসের সহিত খেজুরের রস যোগ করিলে অতিশয় মাদকতা প্রকাশ পায়] কারণ-নাশে কার্য্য-নাশ হয়—এই নিয়মে ভৌতিক দেহ-জাত চৈতন্য দেহ নাশের সঙ্গে অবশ্যই নাশ হইবে। চৈতন্যযুক্ত দেহই আত্মা, দেহ হইতে ভিন্ন অথচ দেহে অবস্থিত, এমন কোন আত্মার (দেহাতিরিক্ত সত্তাতে) প্রমাণ নাই; যেহেতু প্রত্যক্ষ ভিন্ন (অপর) অনুমান প্রভৃতি দোষযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় না; অতএব অনুমানাদির প্রামাণ্যও নাই।

সুন্দরী-সমাশ্লেষণ প্রভৃতি জনিত সুখই পুরুষার্থ (পুরুষের মুখ্য প্রার্থনীয়)। পূর্ব্বাপর দুঃখের দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া, তাদৃশ সুখের যে পুরুষার্থতা নাই—এইরূপ বলিতে পার না; কেন না দুঃখানুভব ভিন্ন কেবল সুখের অসীমতা ও গভীরতা নাই (*)। অপরি-হার্য্য বলিয়া সুখের সহচর দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া সুখ মাত্রকেই ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। যেরূপ যাহার মৎস্যের প্রয়োজন সে শল্ক (আঁইস) ও কাঁটা প্রভৃতি যুক্ত মৎস্যই গ্রহণ করে, (যে হেতু কাঁটা প্রভৃতি ভিন্ন মৎস্য পাওয়া সম্ভবপর নহে) পরে কাঁটা প্রভৃতি ফেলিয়া উপাদেয় ভোক্তব্য মাংসল অংশ গ্রহণ করে। অথবা যাহার ধানের প্রয়োজন, সে ব্যক্তি পলাল-(চিটাধান যাহার ভিতরে চাউল থাকে না) যুক্ত ধান গ্রহণ করে, তৎপরে তাহা হইতে চাউল গ্রহণ করিয়া, পলাল, তুষ প্রভৃতি ত্যাগ করে, কেন না প্রয়োজনীয় শুদ্ধ চাউল ক্ষেত্রে জন্মে না (এই রূপ সংসারে সকল বিষয়ই পূর্ব্বাপর দুঃখসম্মিশ্রিত, অতএব দুঃখকে হেয় মনে করিয়া, সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ খর্জ্জুর বৃক্ষ-চ্ছেদনে রস-নিষ্কাশনের ন্যায় অশেষ দুঃখ হইতে লব্ধ সুখ ভোগ করিবে)। সেই হেতু দুঃখের ভয়ে অনুকুল-বেদনীয় (সতত হিতজনকরূপে অনুভবনীয়) সুখ ত্যাগ করা উচিত নয়। মৃগ, শূকর প্রভৃতি শস্যোপঘাতক জীবগণের ভয়ে কৃষকগণ (জীবনোপায়) শালি, যব প্রভৃতি কি বপন করিবে না? অভ্যাগত ভিক্ষুকের ভয়ে কি গৃহস্থগণ চুলায় হাঁড়ীতে চাউল চাপাইবে না? (†) যদি কোন ভীরু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ সুখকে ত্যাগ করে, তবে সে বিবেক-শূন্য পশুর ন্যায় মূর্খ ভিন্ন আর কি হইবে? তাই অভিজ্ঞগণ বলিয়াছেন,—"বিষয়-সম্বন্ধজনিত সুখ-দুঃখ

(*) "তাবানেবহিলোকোঽয়ংযাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ।" (ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়টীকা)।

(†) "কিণ্বংসুরোৎপাদকং" কিণ্বংসুরাবীজং" (মেদিনীকারঃ ভরতঃ, বাচস্পতিঃ)।

(‡) "ভূতেন্দ্রিয়াণাং নাশাৎ আত্মাঽপি প্রমাণাগোচরত্বমাপন্নঃ বিনষ্টইব ভবতি ন তস্য (মৃতস্য) ইতঃ প্রেতস্য সংজ্ঞাঽস্তি ইতি যাজ্ঞ-বল্কেনোক্তে মৈত্রেয়ী চোদয়তিস্ম" (বৃহদারণ্যকে) ন্যায়দর্শনে চ প্রেত্য ভাবোঽস্তি। চার্ব্বাকমতে ইয়মর্থঃ—কারণানাং ভূতানাং নাশাৎ তৎ-কার্য্যং অনুপশ্চাৎ চৈতন্যমপি নশ্যত্যেব ইতি।

(*) "সুখংহি দুঃখান্যনুভূয়শোভতে ঘনান্ধকারেষ্বিবদীপদর্শনম্।" "নহিসুখং দুঃখৈর্ব্বিনালভ্যতে।"

(†) পূর্ব্বে হিন্দু গৃহস্থগণের অতিথি-অভ্যাগত-সেবা একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল, তাহাতে গৃহস্থের কল্যাণ, নৈরুজ্য, আয়ু প্রভৃতি

সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুরুষদিগের ত্যাগ করা উচিত—এই কথা মূর্খগণেরই বিচারে আসে (পণ্ডিতগণের নয়)। উত্তম স্বচ্ছ তণ্ডুলপূর্ণব্রীহি (ধান যব প্রভৃতি) সমূহকে তুষ-কণাদি (খুঁদকুড়াদি) যুক্ত বলিয়া কোন্ হিতকামী ব্যক্তি পরিহার করিতে ইচ্ছা করে? কেহই নয়"। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগে সুখ না থাকে, তবে কেন অধিক ক্লেশ ও প্রচুর ধনব্যয় করিয়া 'অগ্নিহোত্র' প্রভৃতি যজ্ঞ কার্য্যে জ্ঞানবৃদ্ধগণ প্রবৃত্ত হন? (প্রাজ্ঞগণ উক্ত অগ্নিহোত্রযাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন বলিয়াই যে তাহার ফল স্বর্গাদির কোন প্রমাণ আছে, তাহা ঠিক বলা যায় না, অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদিতে যেরূপ ক্লেশ ও ধনব্যয় হয়, তদ্রূপ উৎসব, বন্ধুসমাগম, পান ভোজন-জনিত দৃষ্টিসুখও হয়; কিন্তু যাগ-জন্য স্বর্গাদি ফল অবশ্যই যে হইবে, তাহাতে এমন কি প্রমাণ আছে?) যদি বল, বেদই তাহার প্রমাণ, বেদনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নয়—যেহেতু তাহা (*) অনৃত, ব্যাঘাত, পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষে দূষিত বলিয়া, এবং বৈদিক-গণ প্রায় স্বার্থপর ধূর্ত্ত বক (†) কর্ত্তৃক পরস্পর (একের প্রতি অন্য দ্বেষ) দোষপ্রদর্শন করাতে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের প্রামাণ্য-বাদিগণ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি এবং কর্ম্মকাণ্ড প্রামাণ্য-বাদিগণ জ্ঞানকাণ্ডের (উপনিষদ্ ভাগের) তাঁহাদের মত হেয় বলিয়া প্রতিক্ষেপ (নিন্দোক্তি) করাতে বেদের উক্তি ধূর্ত্তের (শঠের) ন্যায় প্রলাপ (বৃথা উক্তি) মাত্র হেতু অগ্নিহোত্র প্রভৃতি পুরোহিতগণের কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রয়োজন দেখা যায়। এই বিষয়ে চার্ব্বাক-গুরু (‡) বৃহস্পতি বলিয়াছেন—'অগ্নিহোত্র যাগ, বেদত্রয় (সাম, যজুঃ, ঋক্) ত্রিদণ্ড (বাগ্দণ্ড, কায়দণ্ড, মনোদণ্ড, অথবা যজ্ঞোপবীত) এবং সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন-কার্য্য নিরুপায় শক্তিহীন নির্ব্বোধেরই জীবিকামাত্র বই আর কিছু নয়'। অতএব পারলৌকিক সুখ প্রভৃতির অভাবে, ঐহিক কণ্টক প্রভৃতি বেধ জন্য দুঃখই নরক। লোক-প্রসিদ্ধ নর দেবতা নৃপতিই পরমেশ্বর, দুঃখের উচ্ছেদই (পরিহার বা বিনাশ) মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। শরীরই আত্মা—এইমতে 'আমি কৃশ,' 'আমি কৃষ্ণ,' 'আমি গৌর,' এইরূপ বাক্যনিচয় দ্বারা দেহ ও আত্মার (§) সামানাধিকরণ্য) সম্ভব হয়; (দেহের অভাবে আত্মার উপলব্ধি হয় না বলিয়া শরীর ও আত্মার একাধিকরণতা বা ঐক্য সন্নিধান আছে)। 'আমার শরীর'—এই বাক্য যেমন, একশিরমাত্র রাহুতে শিরের ভেদ ব্যবহার করা হয়; তাহার ন্যায় আরোপিত ভেদ-ব্যবহার, দেহ এবং আত্মার ঔপচারিক কিংবা কাল্পনিক জানিবে। এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া চার্ব্বাক বলিয়াছেন।—"এই দর্শনে (কিংবা লোকে) ভূমি, বায়ু, সলিল, অনল—এই চারিটি ভূতই তত্ত্ব। চারি প্রকার ভূতের মিলন হইতে উৎপন্ন দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। যেরূপ কিণ্ব (সুরার উৎপাদক বীজ) প্রভৃতি সম্মিলিত দ্রব্য হইতে অভিনব মদশক্তির (মদিরার) প্রাদুর্ভাব হয়; সেরূপ দেহের উপাদান-ভূতচতুষ্টয় হইতে (চারিভূতের সংযোগে) চৈতন্য। 'আমি স্থূল, ও আমি কৃশ',—এইরূপ সমানাধিকরণতা (দেহ ও চৈতন্যের সহ উপলব্ধি) বশতঃ এবং দেহের স্থূলতা-কৃশতা হেতু, দেহই আত্মা (অন্য কেহ আত্মা নয়); আর 'আমার দেহ' এইরূপ উক্তি ঔপচারিক (মিথ্যা-কথন) জানিবে।" "অঙ্গনা-সঙ্গ-জনিত সুখই পুরুষার্থ, কণ্টক প্রভৃতি বেধ-(কাঁটা ফুটা) জনিত দুঃখই নরক। এই ভিন্ন পরভবিক (মরণের পর) কোন নরক নাই। নিয়ত লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, (অপর অলৌকিক ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নাই)। দেহের নাশই মুক্তি, (জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না; কারণ দেহের সহিত চেতন-বিনষ্ট হইলে মুক্তি আর কাহার হইবে)"। (||)

যাহা হউক, যদি অনুমান-প্রভৃতির প্রমাণত্ব না থাকে, তবে (ঈশ্বর, পরকাল, স্বর্গ প্রভৃতি) উক্ত বিষয়ে তোমার অভীষ্ট (মত বা সিদ্ধান্ত) ঠিক হইতে পারে। অনুমানাদির

বৃদ্ধি পাইত; এখন ঐ সকল ত্যাগ করাতে রোগ, শোক, ক্ষীণায়ু প্রভৃতি গৃহীদিগের নিত্য-সহচর হইয়াছে। মাধুকরী বৃত্তিতে ভিক্ষুকগণ অন্নগ্রাস পাইত বলিয়া গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ স্থালী-আরোপণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

(*) ন্যায়দর্শন দ্রষ্টব্য।

(†) "বৈড়ালব্রতীকো শঠঃ" (মনুঃ)।

(‡) "বৃহস্পতি শ্চার্ব্বাকগুরুঃ"।—(মহাভারত-শান্তিপর্ব্বণি)।

(§) এক-অধিকরণতা।

(||) "চৈতন্য বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষার্থঃ" "কামএবৈকঃ পুরুষার্থঃ"। "প্রত্যক্ষমেকং প্রমাণং"।—"ইতিবার্হস্পত্যহত্রম্"। কোন কোন পুস্তকে শ্লোকগুলির অধিক পাঠ আছে।

প্রামাণ্য আছে—ইহাত আমরা দেখিতেছি। যদি অনুমানাদির [অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য, (*) প্রাতিভ, (+) চেষ্টা, (‡)] প্রমাণতা না থাকে, তবে কিরূপে ধূমদর্শনের পর ধূমধ্বজে (অগ্নিজ্ঞানে, ধূম হইয়াছে, ধ্বজ, শিখা, যার ; বহুঃ ব্রীঃ সঃ দ্বারা—বহ্নি বিষয়ে) সমীক্ষ্যকারিগণের প্রবৃত্তি হয়। 'নদীতীরে ফলসমূহ রহিয়াছে'—এই বাক্য শ্রবণের পর বাক্য-লিঙ্গক-অনুমিতি দ্বারা ফলার্থী (ফল যাহার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার) ব্যক্তির নদীতীরে ফল আনয়নের জন্য গমনে প্রবৃত্তি হয়। এই সকল তোমাদের মানসিক (আন্তরিক) বিষয়ে কল্পনা বা ভ্রান্তি মাত্র। তার্কিকগণ, ব্যাপ্তি (হেতুর সহিত সাধ্যের নিয়ত-স্থিতি) পক্ষতা-(§) বিশিষ্ট লিঙ্গ (হেতু)কে (সাধ্যের) অনুমাপক বা বোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্কিত ও সমারোপিত (¶) (এই) (‖) উপাধিদ্বয়-রহিত (শূন্য) সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে, [উপাধিরূপ দোষ হইলে হেতু ব্যভিচারী বা দুষ্ট হয়, সেই ব্যভিচারী হেতুদ্বারা সাধ্যের নিশ্চয় হয় না, অতএব অনুমানের বেলায় হেতুর দোষ-প্রদর্শনে চার্ব্বাকের বিশেষ আগ্রহ ; ব্যাপ্য—হেতু, লিঙ্গ, গমক। ব্যাপক—লিঙ্গী, অনুমেয়, সাধনীয়—পক্ষে প্রকৃত-হেতু দ্বারা নিশ্চেয়] সেই উভয় উপাধি-বর্জ্জিত যে সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাত হইয়াই অনুমানের অঙ্গ হয়, (পূর্ব্বে মহানস প্রভৃতিতে হেতু-সাধ্যের সহকার জ্ঞাত ছিল) চক্ষু প্রভৃতির ন্যায় স্বীয় সত্তা বা বিদ্যমানতা মাত্রে নয়, অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি স্বরূপ সৎভাব যে প্রত্যক্ষাদিতে কারণ হয়, সেরূপ ভাবে উক্ত সম্বন্ধ অনুমানের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাব-জ্ঞানই অনুমান ; অনুমানজনিত যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার নাম 'পরামর্শ'। সেই পরামর্শের পর, অনুমিতি বা সাধ্য-জ্ঞান জন্মে। 'বহ্নি-ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত' প্রভৃতিই পরামর্শের স্বরূপ। কিন্তু 'ধূম-বহ্নি-ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত'—এইরূপ পরামর্শের আকার হইতে পারে না। অথবা কোন স্থানে (সপক্ষে) উভয়ের বিশেষ (অব্যভিচারিত্ব) ভাবে জ্ঞাত-সম্বন্ধ দর্শনের পর অন্য স্থানে সে দুইএর মধ্যে যে একদেশ-দর্শনে অপরের যথাযথ স্মরণ হয়, তাহার নাম অনুমিতি। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া, যে হেতুর অব্যাপক হয় (সামান্য ভাবে) তাহাকে উপাধি বলে। শঙ্কিত—সন্দিগ্ধ, সমারোপিত—নিশ্চিত ; সন্দিগ্ধ উপাধি ও নিশ্চিত উপাধি, এই দুই উপাধিই ব্যভিচার-জ্ঞানদ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। যে স্থানে সাধনের অব্যাপকতার সন্দেহ হয়, কিংবা সাধ্যের ব্যাপকত্বের সন্দেহ হয়, অথবা উভয়ের (যেস্থলে) সন্দেহ হয়, সে স্থলে হেতু ব্যভিচারের (দোষের) সংশয়জনক বলিয়া, তাহাকে (সন্দেহযুক্ত) সন্দিগ্ধ উপাধি বলা হয়। মিত্রাতনয়ত্ব-হেতু গর্ভস্থপুত্রে শ্যামত্বক সাধ্য করিলে, শাকাদি-আহার পরিণতিজন্য উপাধি হইবে ; [অর্থাৎ মিত্রার অপরপুত্রে শ্যামত্বের সদ্‌ভাব হেতু (বর্ত্তমান-তনয়ে) শাক-পাকজত্ব-উপাধি স্বীকৃত হয়] সাধ্যের ব্যাপকত্ব হেতু সাধনের অব্যাপকত্ব (অনুমিতি-কালে) হইলে, ব্যভিচারের সন্দেহ-জনক বলিয়াও, তাহাকে নিশ্চিত উপাধি বলা হয়। যেমন বহ্নিমত্ত্বাহেতু ধূমবত্ত্ব সাধ্য হইলে, আর্দ্র-ইন্ধন-(ভিজাকাঠ) জন্য বহ্নিমত্ত্ব উপাধি হয়। [এই সকল উপাধিতত্ত্ব "তত্ত্বচিন্তামণির" 'উপাধিবাদে' বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে ; সন্দর্ভের বিশেষ বাহুল্য হইয়া পড়িবে—এই ভয়ে ক্ষুদ্র সন্দর্ভে সে সমুদয় বিষয় উদ্ধৃত করিলাম না]। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—দ্বিবিধ উপাধিরহিত-সম্বন্ধ, চক্ষু-শ্রোত্রাদির ন্যায় কেবল স্বীয় বর্ত্তমানতা দ্বারা, অনুমানের অঙ্গীভূত হয় না—জ্ঞাত হইয়াই হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্ব্বে সাধ্য ও হেতুর অবিনাভাব-দর্শন (কোন স্থানে) করে নাই (জ্ঞাত হয় নাই), তাহার হেতু দর্শনে (একদেশদর্শনে) সাধ্যের (নিয়ত সংবন্ধের অপর দেশের) নিশ্চয় হয় না। তবে জ্ঞানের উপায় কে হইবে ? প্রত্যক্ষ প্রমাণকে জ্ঞানের উপায় বলিতে পার না ; যদি বল, তবে সে কি বাহ্য-প্রত্যক্ষ ? কিংবা আন্তর-প্রত্যক্ষ ? [বাহ্য

(*) সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদ্যাম্। বেদান্তসিদ্ধান্তাদর্শে চ।

(+) বৈশেষিকদর্শনভাষ্যটীকাদিষু।

(‡) তান্ত্রিকানাং—"বৈষ্টিকোঽপি ইতি তান্ত্রিকাঃ"—ইতি ন্যায়-বোধিন্যাম্।

(§) "সিসাধয়িষয়া শূন্যাসিদ্ধির্যত্র ন তিষ্ঠতি সপক্ষঃ; সিসাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্টঃ সিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা"। 'পর্ব্বতে বহ্ন্যনুমিতির্যায়তাং'—ইতি সিসাধয়িষা।

(¶) যত্র উপাধিঃ সমারোপ্যতে সসমারোপিত উপাধিঃ, 'সশ্যামো-মিত্রাতনয়ত্বাৎ'—(তত্ত্বচিন্তামণৌ উপাধিবাদে)।

(‖) "শঙ্কিত-সমারোপিতোপাধি-নিরাকরণেন বস্তুস্বভাব-প্রতিবন্ধং ব্যাপ্যম্"—(তত্ত্বকৌমুদী)। 'সমারোপিতো নিশ্চিতো, ব্যভিচারস্য নিশ্চয়াধায়কত্বেন' ইত্যর্থঃ।

প্রত্যক্ষ, বিষয় ও নির্দোষ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষরূপ (নৈকট্য সম্বন্ধ) ব্যাপার দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে; আন্তর-প্রত্যক্ষ বাহিরের ইন্দ্রিয়-ব্যাপারশূন্য মানসিক প্রক্রিয়ায় হয়], এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি অভীষ্ট? প্রথম কল্পে—বাহ্য প্রত্যক্ষ নয়, কেন না বহিঃ প্রত্যক্ষ, বর্ত্তমানকালে উপস্থিত-বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষাদিদ্বারা ঘটিলেও, ভূত (অতীত) ভবিষ্যকালে বিষয়ের তাদৃশ প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা নাই বলিয়া, সার্ব্বকালিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্যতা-রূপব্যাপ্তি দুর্ব্বোধ্য জানিবে, অথবা ত্রৈকালিক পদার্থের এক প্রত্যক্ষ-বিষয়তা-স্বরূপ-ব্যাপ্তি দুনিশ্চেয়; [বাহিরের প্রত্যক্ষের বিষয় (পট, গৃহাদি) ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য (সংযোগজনিত) জ্ঞানের জনক বলিয়া বর্ত্তমানকালে তাহার অবসর (অবকাশ বা সম্ভব) হইলেও অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না, বলিয়া সকলের উপসংহারস্বরূপ ব্যাপ্তি-জ্ঞান ত্রৈকালিক পদার্থের সমনৈয়ত্য সম্বন্ধরূপ স্পষ্ট প্রতীতি হওয়া সুকঠিন, অতীত বিষয়ের সঙ্গে বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষাদি হইতে পারে না। ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে সামান্যবিষয়কও (হেতু সাধ্যের সাধারণতা) মনে করিতে পার না, ব্যক্তিদ্বয়ের (ব্যাপ্য-ব্যাপকের) অবিনাভাবের অভাব হইতে পারে, অর্থাৎ ব্যাপ্তি জ্ঞান যদি সামান্যকে (জাতিকে) বিষয় করে, তবে ব্যক্তিদ্বয়ের অবিনাভাব কিরূপে হইবে? (*) না হইলেও দোষ হয়। আন্তর প্রত্যক্ষও অঙ্গীকার করিতে পার না; যেহেতু অন্তঃকরণ (বুদ্ধি, মনঃ, অহঙ্কার) বাহ্যেন্দ্রিয়ের অধীন-হেতু, বহিরিন্দ্রিয় ভিন্ন, স্বয়ং অন্তঃকরণের (মনের) বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তাই অভিজ্ঞ (বৌদ্ধ পণ্ডিত) ব্যক্তি বলিয়াছেন, (†) 'মন আন্তরিক ইন্দ্রিয়, কিন্তু চক্ষু প্রভৃতির সঙ্গে সম্বদ্ধ বলিয়া বিষয়-সংপৃক্ত বহিরিন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অধান'। অতএব, বাহ্যইন্দ্রিয় ভিন্ন, শুদ্ধ মন দ্বারা আন্তরিক প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? [কিংবা বাহ্য বিষয়ে বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষে, মন পরাধীন বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত-ভাবে প্রত্যক্ষের জনক হয়]। অনুমান ও ব্যাপ্তি জ্ঞানের উপায় স্বরূপ নয়, তাহাতে (সে সে স্থলেও অব্যবস্থিত একেতে অপরের আরোপ-রূপ) অনবস্থা দুর্গতি প্রসঙ্গ হয়। (‡) অনুমান ও প্রত্যক্ষের উপজীবক বলিয়া, (§) অর্থাৎ প্রত্যক্ষমূলক হেতু পূর্ব্বে বাহ্য প্রত্যক্ষ না হইলে, হইতে পারে না; যেহেতু, ব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতা-শীল-লিঙ্গই সাধ্যের অনুমাপক হয়। পক্ষেতে সাধ্যের সন্দেহ-বত্তাই (বিদ্যমানতাই) পক্ষধর্ম্মতা; অর্থাৎ পক্ষে (পর্ব্বত প্রভৃতিতে) সাধ্য (বহ্নি প্রভৃতি) আছে কি না—এই রূপসংশয়বত্তা থাকা আবশ্যক, যাহাতে থাকে সে পক্ষ। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন, ব্যাপ্যের (হেতুর) পর্ব্বতপ্রভৃতিতে যে বৃত্তিতা (বর্ত্তমানতা রূপ সম্বন্ধ), তাহাই পক্ষধর্ম্মতা। অনুমিতিতে ব্যাপ্তি-জ্ঞান করণ হয়।

(*) অবিনাভাব যদি হেতু-সাধ্যের না হয়, তবে ব্যাপ্তি-নিশ্চয়াদিও হইবে না।

(†) এই শ্লোকটি মীমাংসা বার্ত্তিকের ৬০ শ্লোকের ছায়ার অনুরূপ, কিন্তু বার্ত্তিকে অবিকল শ্লোকার্দ্ধ পাই নাই। "বহির্ব্বিষয়ে বহিঃ প্রত্যক্ষে মনঃপরতন্ত্রম্, বহিরিন্দ্রিয় সহকারেণৈব প্রত্যক্ষজনকমিত্যর্থঃ। পরন্ত ইদং চিন্তনীয়ং ভূতভবিষ্যতোঃ প্রত্যক্ষানঙ্গীকারাৎ।" "চক্ষুরাদ্যক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মনঃ"—ইতি মূল ধৃত-শ্লোকার্দ্ধং দিঙ্‌নাগস্যেতি অনুমীয়তে।

(‡) "অব্যবস্থিত-পরম্পরা রোপাধীনানবস্থা"—(ন্যায়দর্শনে)।

(§) "অনুমানস্য প্রত্যক্ষোপজীব্যত্বাৎ"—(তত্ত্বচিন্তামণৌ)।

অভয়

[সেখ ফজলল করিম]

মানুষে বলে,—"নিমেষে শেষ—জীবন কিছু নয়,
রক্ত-রাঙা মেঘের মত ক্ষণেকে পায় লয়!"
আমার তাহা মোটেই যেন দেয় না প্রাণে শান্তি,
তবে কি এই মানব জন্ম বিফল—শুধু ভ্রান্তি?
মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা, আত্মার নাই লয়,
অন্তহীন জীবন-পথ, সে কোথা শেষ হয়?

"দেবতা হ'তে মানুষ বড়"—অমর শাস্ত্র-বাণী
সত্য নয় বলিয়া আমি কেমনে বল, মানি?
ধর্ম্মরাগে রাঙিয়া যদি মানুষ কর্ম্ম করে,
উদার প্রাণে বাঁধিতে পারে নিখিলে প্রেমডোরে,
কীর্ত্তি তাহার বিশ্ব-জোড়া—হবে না কভু লয়,
কোথায় লাগে দেবতা সেথা?—কিসের কর ভয়?

য়ুরোপে তিন মাস

[মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, M. A., L. L. D., C. I. E.]

গ্লাসগো

এবার্ডিন হইতে গ্লাসগো আসিবার পথে ডাক্তার স্কট, ডাক্তার ইয়ং, রেভাঃ পাওয়েল ও সস্ত্রীক ডাক্তার চাল্‌টন ট্রেণে সহযাত্রী ছিলেন। দিনের বেলায় পথের দৃশ্য ও সৌন্দর্য্য দেখিবার খুবই সুবিধা; সঙ্গীরাও সযত্নে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ষ্টো হাভেন, এব্রোথ, ডণ্ডি, টেপার্ট, নিউফোর্ট, টে ব্রিজ, ফোর্থ-ব্রিজ, ইঞ্চবেথ, লীথ, লেন্‌বেথ্‌গো, কার্কল্‌ডন, মণ্ট্রোজ প্রভৃতি স্থানের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। টে-ব্রিজ ও ফোর্থ-ব্রিজ পৃথিবীর দুই প্রধান প্রসিদ্ধ সেতু—যত্ন করিয়া, চেষ্টা করিয়া, দেখিবার বস্তু। ফার্থ-অব-ফোর্থেএ বিস্তর টর্পিডোবোট ও ছোট ছোট যুদ্ধের জাহাজ থাকে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে অবশেষে গ্লাসগো পৌঁছিলাম। Temperance Workers, যাঁহারা গ্লাসগো আসিবার জন্য এত জেদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি শ্রীযুক্ত টিকল্‌ সাহেব আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত খাতির যত্ন করিলেন এবং আমার নানা কার্য্যের মধ্যেও যে, তাঁহাদের ঐকান্তিক অনুরোধ রক্ষা করিতে আসিয়াছি, তজ্জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে 'গ্রাণ্ড হোটেলে' আসিয়া উঠিলাম; কিন্তু হোটেল-বাস আর ভদ্রলোকের বাড়ীতে আতিথ্য-গ্রহণে বহুপ্রভেদ! যাহা হউক, কিছু আহারান্তে ঘণ্টা-দুই টিকল্‌ সাহেবের সহিত নগর-ভ্রমণ করিয়া আসিয়া, শ্রান্ত দেহে শুইয়া পড়িলাম। ইউনিভার্সিটির কাজে আসিয়া আজ L. L. D. উপাধি লাভ হইল। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের, এবং যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমায় এই উচ্চ সম্মানে আপ্যায়িত করিলেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। প্রিয়জনও এ গৌরবে তুষ্ট হইবে ও শ্লাঘা জ্ঞান করিবে।

২৫এ জুন বুধবার।—"Palter" "Palter" "Palter" —টনি সাহেবের সেই সুন্দর আবৃত্তি মনে পড়িল। আবার মেঘবৃষ্টি অন্ধকার করিয়া আসিল। শরীরও যেন হিম হইয়া যাইতেছে; তাহাতে দেশভ্রমণের আনন্দ হইবে কিরূপে? এদিকে ঠাণ্ডার ভয়ে স্নান ত বহুদিন হয় নাই; আজও এমন দিনে ইচ্ছা হইল না। অগত্যা কোনরূপে আহারাদি সারিয়া, ইউনিভার্সিটিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল; অগত্যা মোটর ট্যাক্সির সাহায্যে যাইতে হইল।

উচ্চ পাহাড়ের মত জমির উপর ইউনিভার্সিটির সুন্দর বাড়ী; চারিদিকে বাগান, নীচে কেল্‌ভিন্‌ নদী। এই নদী ও নগরের সমনামীয় লর্ড কেল্‌ভিন্‌, বিজ্ঞান-জগতে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কেল্‌ভিন্‌, লেস্‌লি, হুকার, ওয়াট, এডাম স্মিথ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত সকলেই গ্লাসগোর ছাত্র, কিংবা অধ্যাপক।

অতি সমারোহে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির Biennial Commemoration ও Graduation Ceremony সম্পন্ন হইল।

ভাইস্‌-চ্যান্সেলার ম্যাকএলেষ্টার ও অন্যান্য বহু মাননীয় লোকের সহিত পরিচয় হইল। অদ্যকার সভায় এবার্ডিনের এল. এল. ডি. "হুড" ব্যবহার করিয়া, গরিমা বোধ হইতে লাগিল;—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হুডের সহিত সংযোজিত হওয়ায় গরিমার যেন প্রসারতা হইল। "ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী" নামে পরিচয়টা প্রথম প্রথম কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। নূতন উকীল হইয়া, প্রথম পাগড়ী পরিয়া, আদালতে যাইবার সময় এইরূপ কেমন কেমন বোধ হইয়াছিল। সকল নূতন অবতারণাতেই এইরূপ ভাবের উদয় হয়। ইউনিভার্সিটির কার্য্য সমাপনান্তে, টিকল্‌ সাহেবের সহিত

প্রথমে "আর্টগ্যালারি" দেখিতে গেলাম। বিস্তর নূতন ও পুরাতন ছবি, প্রস্তরমূর্ত্তি এবং অন্যান্য দেখিবার বহু জিনিস আছে। ভারতবর্ষের হস্তিদন্তের সামগ্রী ও অন্যান্য শিল্প-সম্ভার কিছু কিছু আছে। কিন্তু সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার সময় হইল না। বিলাতের দ্বিতীয় শ্রেণীর, এমন কি আরও নিম্নতর শ্রেণীর, সকল সহরেই মিউজিয়াম, লাইব্রেরী ও আর্টগ্যালারির যেরূপ বিস্তার ও বাহুল্য, বম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতাতেও তাহা নাই। আর্টগ্যালারি হইতে প্রধান গির্জ্জা ক্যাথিড্রাল দেখিতে গেলাম। মাটির নীচে খিলানকরা দালান-ঘর দেখিয়া, পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দির মনে পড়িল। নিকটে, পাহাড়ের উপর, জন্ নক্স প্রভৃতি প্রধান পুরুষের স্মৃতি-চিহ্ন

ফার্থ্ অব্ ফোর্থ্ নদী

আছে। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, এমন অনেক মহাত্মার সমাধি ও স্মরণ-চিহ্ন দেখিলাম। জেল, পাগলা গারদ, অন্ধাশ্রম, হাঁসপাতাল, পোষ্ট আপিস প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে মিউনিসিপাল আপিস দেখিতে গেলাম। কাউন্সিলার ডোরমণ্ড বিশেষ আপ্যায়িত করিলেন এবং যত্ন করিয়া সব দেখাইলেন। তাহার পর, এক বিরাট Temperance Meeting এ গেলাম। বহু গণ্যমান্য লোক সেখানে, আমাকে (অর্থাৎ কলিকাতা টেম্পারেন্স ফেডারেশনের সভাপতিকে) অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। টিকল্ সাহেব এ সভার সভাপতিরূপে আমার অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা করিলেন, আমাকেও বাধ্য হইয়া বক্তৃতা করিতে হইল। সকলেই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কেবল রেভাঃ ক্রেগ্ নামে এডিনবর্গের একজন পাদ্রীর, আমাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক কোন কোন বিষয়ে প্রাধান্য-দাবির কথা ভাল লাগিল না।

রাত্রে পুনরায় ইউনিভার্সিটির ভোজে যাইতে হইল; বিস্তর লোকের সমাগম, বক্তৃতা, গানবাজনা ইত্যাদির চূড়ান্ত হইল। মদ খাইবার জন্য অনেকে পীড়াপীড়ি করিলেন; পঞ্চাশ বৎসর মদ ও চুরুট না খাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, একথা পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুগণ ধারণাই করিতে পারিলেন না।—স্কচম্যানেরা মদ ও চুরুটের কিছু অধিক ভক্ত। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে কোন রকমে বুঝাইয়া পরিত্রাণ পাইলাম।

এডিনবার্গ

বৃহস্পতিবার, ২৬এ জুন।—রেলে গ্লাসগো হইতে এডিনবার্গ, দুই তিন ঘণ্টার অধিক লাগে না। সকালের ট্রেণেই এডিনবার্গ পৌছিলাম; ষ্টেশনের নিকটেই আমাদের হোটেল। অল্প বিশ্রামান্তে নগর পরিদর্শনে বাহির হওয়া গেল।

প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীটই এখানকার এখন প্রধান রাস্তা। তাহার ধারে, পাহাড়ের উপর, ইতিহাস এবং সাহিত্য-প্রসিদ্ধ এডিনবার্গ কাস্ল্। পুরাকালের ধরণের দুর্গ—অনেক আক্রমণ-উপদ্রব-আমোদ সহ্য করিয়াছে; অনেক পাপের অভিনয় দেখিয়াছে—অনেক দুঃখসুখের মধ্যে গিয়াছে; দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও দুর্গটি যে কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত, সে কার্য্য করিবার যথেষ্ট উপযোগী ছিল। রাস্তার ধারে সুন্দর বাগান। চতুর্দ্দিকে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজিত; ইহার মধ্যে স্যার ওয়াল্টার স্কটের মনুমেণ্ট অতি প্রসিদ্ধ ও অতি সুন্দর—উচ্চ মনুমেণ্টের মধ্যে শ্বেত প্রস্তর-মূর্ত্তি; স্কটের প্রিয় কুক্কুরী তাঁহার পার্শ্বে শয়ান রহিয়াছে। বার্ণস্এর মনুমেণ্ট, নেল্সন্ মনুমেণ্ট, জর্জ্জ ষ্টাচু, ওয়েলিংটন ষ্টাচু ইত্যাদি অনেক স্মৃতিস্তম্ভ—কীর্ত্তি-অপকীর্ত্তির স্তম্ভ দেখিলাম। সমস্ত প্রধান প্রধান সহরেই প্রায় সকল বড় লোকেরই একাধিক মূর্ত্তি আছে। মৃত

ব্যক্তির স্মৃতির সম্মান কিরূপে করিতে হয়, তাহা ইহারাই জানে। তাই, ইহাদের মধ্যে মহত্ত্বের এত আদর এবং কাজেই মহত্ত্বের এত পরিচয়। এডিনবার্গ সহরটি ছবির মত ;—Picturesque, Romantic, যে কোন বিশেষণে অভিহিত করিতে পারা যায়। এডিনবার্গকে য়ুরোপের বর্ত্তমান এথেন্‌স বলে। বাড়ীঘরের একটু পারিপাট্য আছে। পুরাতন ও নূতন সহর ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু পুরাতন সহরেও একটা যেন বিশেষত্ব আছে। এডিনবার্গ কাস্‌ল্ হইতে হোলিরুড প্রাসাদ পর্য্যন্ত এক মাইল দীর্ঘ হাই-ষ্ট্রীট—ইহাই পুরাতন সহর। তাহার পর সহর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ইউনিভার্সিটিতে উপস্থিত হইলাম। ইউনিভার্সিটি বিলডিংটি নূতন সহরে; কিন্তু বাড়ীটি পুরাতন। নূতন একটিও হইয়াছে; তাহার নাম ম্যাক্ ইউয়ান্ হল। "হলটি" প্রকাণ্ড; মিউজিয়মটিও তদনুরূপ। মেডিকেল স্কুল নূতন বাড়ীতে। আর্টস্, সায়েন্স, ল, মেডিসিন্, ইঞ্জিনিয়ারিং—সকল বিদ্যাচর্চ্চার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। এখানে ভারতবর্ষীয় ছাত্র বিস্তর আছে; কিন্তু তাহাদের নানা বিষয়ে অসুবিধা। কলোনিয়েল ছাত্রেরা তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। ইংলিশ ছাত্রেরাও সেইরূপ আরম্ভ করিয়াছে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাহারা স্থান পায় না। ভাল বাসায়ও স্থান পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। পুরাতন ইউনিভার্সিটি বাড়ীতে ভাইস-চ্যান্‌সেলার বিখ্যাত এনাটমিষ্ট—স্যর ওয়ালেস্ টার্ণার আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চারিদিক দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। সকল কথাতেই তাঁহার বড় বড় বক্তৃতা। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার বক্তৃতায় আমরা শ্রান্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপকদিগের সহিত আলাপপরিচয় করিয়া, জ্ঞাতব্য বিষয় সব জানিয়া লইতে লাগিলাম। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে ইউনিভার্সিটীর পক্ষ হইতে এক ভোজ ও সভা হইল। ভোজ না হইলে যেন ইহারা এক পা চলিতে পারে না। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত ভোজের কার্য্য চলিল।

তাহার পর, ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নে—ছাত্রদিগের বিশেষ সভাতে বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। প্রকাণ্ড সভা; অধ্যাপক, ছাত্র, এবং ভদ্রমহিলা ও পুরুষে সভাস্থল পরিপূর্ণ। ভারতের পক্ষে বক্তৃতার ভার আমার উপর পড়িল। সত্য হউক, আর আদর করিয়াই হউক, প্রশংসার ক্রটী কিছু হইল না। সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন ছাত্রজীবনের একটা দেখিবার বস্তু। ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য সকল বন্দোবস্তই এখানে আছে; কিন্তু ভারতবর্ষের ছাত্রেরা ইহার পূর্ণ উপকার পায় না।—ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

সভা-সমাপনান্তে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। এত পরিশ্রমে শরীর অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা ছাড়িল না। তাহারা কয়েকজন গ্লাসগো পর্য্যন্ত—আগ-বাড়াইয়া গিয়া, আতিথ্য-স্বীকার করাইয়া আসিয়াছিল যে, তাহাদের পৃথক্ সভায় যাইতেই হইবে। অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া আহারাদি পর্য্যন্ত না করিয়া, শুইয়া পড়িয়াছিলাম; এমন সময়ে তাহারা গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বহু অনুনয় ও ক্লান্ত-শরীরের অজুহাত দেখাইলেও তাহারা ছাড়িল না। অগত্যা যাইতেই হইল। পার্শী, মুসলমান, বেহারী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী,—প্রায় ২০০ ভারতবাসী ছাত্র আছে। সভাস্থলে উপস্থিত পরিচিত বিস্তর ছাত্রের সহিত দেখা হইল। গান-বাজনা-বক্তৃতা—কোন অঙ্গেরই ক্রটী হইল না। তাহার পর তর্ক (Discussion) আরম্ভ করিল। ছাত্রদের মধ্যে সকলেই যে বিনয়ী ও ভদ্র—তাহা নয়। বৃথা তর্কবাজও অনেক। তাহাদের জন্যই ভারতীয় ছাত্রদিগের সাধারণতঃ অনেক ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক, কোন রকমে আজিকার পালা সাঙ্গ করিয়া, হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া, শুইয়া পড়িলাম।

২৭এ জুন শুক্রবার।—সকালেই সেণ্ট এণ্ড্রুজ রওয়ানা হইলাম। সঙ্গে অন্যান্য ডেলিগেটও কয়েকজন ছিলেন; তাঁহাদের সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ভ্রমণটা বেশ সুখেরই হইল। এইরূপ আলাপে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানাশুনা ও আলোচনা হইল। রেলপথে ভ্রমণের মুখে যথার্থ কংগ্রেসের যত কাজ হইতেছে, সভা-সমিতি-বক্তৃতাতে তাহার কিছুই হয় নাই। আবার সেই পূর্ব্বোল্লিখিত ফোর্থব্রিজ্ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে সেণ্ট

এণ্ড্রুজে প্রায় ১২টার সময় পৌছান গেল। ডেলিগেটদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেসনে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মধ্যে কলেজের লাইব্রেরিয়ান মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সহর দেখাইয়া লইয়া গেলেন।—গির্জ্জা, লাইব্রেরি ইত্যাদি দেখিয়া টাউনহলে গেলাম। সেখানে এক সুন্দর প্রাচীন দৃশ্যের অবতারণা দেখিলাম। ভাইস্-চ্যান্সেলর স্যর্ ডোনাল্ড্কে সহরের কর্তৃপক্ষগণ Freedom of the City উপহার দিলেন। একরূপ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ-পদবীতে উন্নীত হওয়া গেছে! এই অনুষ্ঠানের পর কলেজে অভ্যর্থনা-ভোজে উপস্থিত হইতে হইল। না, ঠিক বোঝা যায় না। লাইব্রেরীর বন্দোবস্ত বড়ই সুন্দর। এরূপ সুন্দর বন্দোবস্তের লাইব্রেরী প্রায় দেখা যায় না। মিউজিয়মের সাজসজ্জা দেখিয়াও চমৎকৃত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা মিউজিয়ামের এনান্ডেল্ সাহেব, আমাদের মিউজিয়াম সাজাইবার বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য, এখানের মিউজিয়াম দেখিতে আসিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ভোজ ত শেষ হইল।—ভোজের পর বক্তৃতা। ভারতের পক্ষে বক্তৃতার ভার পুনরায় আমার উপরেই পড়িল। ভগবানের কৃপায় মুখ ও মান রক্ষা হইয়া যাইতেছে, ইহাই যথেষ্ট। উপস্থিত সকলেই বিশেষ

ফোর্থ-সেতু

এদেশের লোক ভোজটা বোঝে খুব। সকল কাযেই আগে একটা ভোজ! কলেজের বাড়ী, মিউজিয়ম্, লাইব্রেরী অতি চমৎকার। লেখা-পড়া শিখিবার পক্ষে এই সকল নির্জ্জন স্থানই প্রশস্ত; শান্তচিত্তে জ্ঞানান্বেষণ করিবার সুবিধা যথেষ্ট ঘটে। বাঙ্গালী ছাত্র এবার্ডিন, সেণ্ট এণ্ড্রুজের মত জায়গায় যায় না। লণ্ডন, এডিনবার্গের মত কোলাহল ও প্রলোভনময় বড় বড় সহরে যাইয়া, কষ্টসহ, অর্থব্যয় ও সময় সময় অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করে। তাহা না করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এইসকল স্থানে থাকিয়া অল্পব্যয়ে লেখা-পড়া করিতে পারে; কেন যে তাহা করে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, আপ্যায়িত করিলেন। সর্ব্বত্র এরূপ সম্মান ও স্নেহলাভে আমি ধন্য!

অবশেষে, বিদায় লইয়া এডিনবার্গে ফিরিয়া আসিলাম। শরীরের উপর এত অত্যাচার চলিতেছে যে, শরীর বুঝি আর বয় না। প্রত্যহ এত বেড়ান আর ত চলে না। বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক। সেইজন্য, এবং এডিনবার্গ দেখাশুনা বিশেষ কিছুই হয় নাই বলিয়া, এখানে আর এক দিন থাকিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

শনিবার, ২৮এ জুন।—"স্কটস্‌ম্যান" পত্রে প্রকাশ যে, সেণ্ট এণ্ড্রুস্ ইউনিভার্সিটিও আমাকে অনরারি এল. এল.

ডি. ডিগ্রী দিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার আভাস কালই কতক পাইয়াছিলাম। আমাকে পুনরায় ১৭ই জুলাই সেন্ট্ এণ্ড্রুস্ যাইবার জন্য তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন; ১৬ই জুলাই 'কেন'-পত্নী আমার সম্মানার্থে এক পার্টী দিবেন; ১৮ই জুলাই লণ্ডনে সেক্রেটারি অব ষ্টেটের নিকট 'টেম্পারেন্স ডেপুটেশন' যাইবে;—এই তিন ক্ষেত্রেই আমায় উপস্থিত থাকিতেই হইবে। কি করিয়া হইয়া উঠিবে, তাহা ত ভাবিয়া পাইতেছি না।

সকালেই স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ল্যাম্বের সহিত দেখা করিতে গেলাম। পুরাতন কথাবার্ত্তা বিস্তর হইল। তিনি যথেষ্ট যত্ন ও আত্মীয়তা দেখাইলেন। গিয়াছেন। ঝি-টিও গৃহস্থের মেয়ের মত সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন। ছেলেটি বাড়ী আসিয়া জল খাইয়া আবার স্কুলে গেল; এ সবও দেখিবার শিখিবার বিষয়। আহারান্তে মুখ মুছিবার জন্য, কর্ত্তা নিজহস্তে তোয়ালে আনিয়া দিয়া, আতিথ্যযত্ন-সৌজন্যের চূড়ান্ত করিলেন! ফ্রেজার সাহেব আমার উপাধি-প্রাপ্তিতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এবডিনের প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ ইঁহার বিশেষ পরিচিত; তিনি নাকি আমার সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া ফ্রেজার সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন, একথা বিশেষ আনন্দ ও প্রীতির সহিতই বলিলেন।—যাহা হউক, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন প্রভৃতি ছাত্রজীবন-সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি দেখিয়া আসিলাম।—
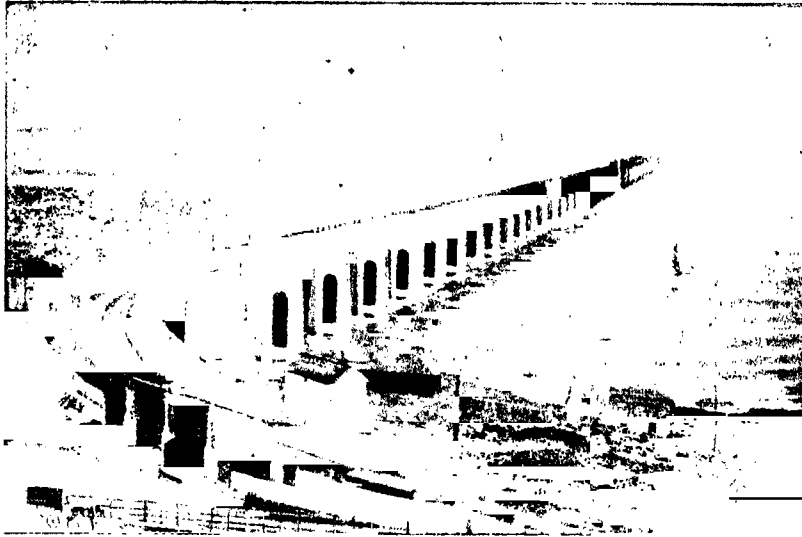
'টে সেতু

তাহার পর আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর এণ্ড্রু-ফ্রেজারের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমার সাক্ষাৎ পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। যত্ন করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করাইলেন। তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা হইল। যিনি একদিন সমগ্র বাঙ্গালার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি আজ সাধারণ নাগরিকের ন্যায়, সাদা-সিধা ধরণে বাস করিতেছেন এবং পূর্ব্বপরিচিত ভারতবাসীর প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ সহৃদয়তা দেখাইতেছেন,—ইহা এক চমৎকার দৃশ্য। শিক্ষার বিষয়ও বটে। তবে স্থানকাল-ভেদে বুঝি সবই সম্ভব! লেডি ফ্রেজার রোগা হইয়া

পূর্ব্বোক্ত ল্যাম্ব সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া, নিজে সঙ্গে থাকিয়া, সমস্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া, অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সারিয়া দিলেন। এডিনবার্গ ক্যাণ্টনমেণ্ট, হাইষ্ট্রীট, হোলি রুড্, মিড্লোথিয়ান্ ষ্ট্রীট—এসকল স্থানই, ইতিহাস ও সাহিত্য সাহায্যে, আমার মনের সহিত গ্রথিত; স্যর ওয়াল্টার স্কটের অমর গ্রন্থাবলী ও অসংখ্য সাহিত্যিকগণ অন্তরের স্তরে স্তরে ইহা গাঁথিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন ভীষণ দুর্গের মধ্যে কোথায় কুইন মেরীর ঘর—কোথায় তৎপুত্রের জন্মস্থান—কোথায় স্কটিশ পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইত—এই সকল দেখিতে

দেখিতে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। এডিনবার্গ কাস্‌ল্ ও হোলি রোড কাস্‌ল্ উভয়েরই গঠন ক্ষুদ্রায়তন ও পারিপাট্যশূন্য। কিন্তু তৎকালীন কার্য্যোপযোগী। সে সময়ের হিন্দু-মুসলমান রাজাদের রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির তুলনায় এইগুলি নিতান্ত নগণ্য; কিন্তু ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠায় এই সকল স্থানের কীর্ত্তি জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। স্কটের অমর লেখনী এই সমস্ত স্থান সম্বন্ধে কতই চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। Author's Seat পাহাড়টি স্কটের অতিশয় প্রিয়স্থান ছিল। রাজবাটী এই পাহাড়েই ঠিক নীচে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু দৃশ্যগুলি যেন এখনও চক্ষের সম্মুখে নাচিতেছে।

২৯এ জুন, শনিবার। সকাল হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল। এখানে বৃষ্টির মত ঝকমারির জিনিষ আর কিছু নাই। সমস্তেতেই যেন একটা অবসাদ আনিয়া ফেলে। আজই লণ্ডনে ফিরিতে হইবে। অগত্যা গাড়ী করিয়া কোনও প্রকারে ক্যালিডোনিয়ন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে এডিনবরার বিস্তর ভারতীয় ছাত্র দেখা করিতে ও বিদায় লইতে আসিয়াছিল। সেণ্ট এণ্ডুজ ইউনিভার্সিটি—উপাধি দিতেছে শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত। ফিরিবার সময় নূতন পথে ইয়র্ক, নিউ কাস্‌ল্ অন্ টায়র প্রভৃতি স্থান দেখিয়া যাইব, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হইয়া উঠিল না। অগত্যা পুরাতন পথেই পুরাতন দৃশ্য নূতন করিয়া দেখিতে দেখিতে ফিরিলাম। ক্যানেডিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ম্যাকে সঙ্গে ছিলেন। কানাডার শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্ত্তা হইল। মধ্যে বৃষ্টি ধরিয়া যাওয়াতে পথের দৃশ্য ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল। রাত্রি ৭টার সময় লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্কটল্যাণ্ডের অমন সুন্দর শান্তিময় স্নিগ্ধ দৃশ্যাবলীর মধ্য হইতে একেবারে নগরীর এই অবিরাম কোলাহলময় জনস্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া, যেন কতকটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। এই জন্যই বোধ হয়, মধুপুরের কোন Charm না থাকিলেও—মধুপুর আমার এত প্রিয়!

ভ্রান্তি-বিনোদ

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী]

পঙ্কেরে ছানিলে তবে মেলে পদ্মফুলে;
তেমনি সত্যেরো জন্ম সন্দেহ ও ভুলে।
এ জীবন নহে তুচ্ছ, এ যে সেই খনি,—
খুঁড়িলে এ মাটি মেলে সে বাঞ্ছিত মণি!

প্রতিহিংসা ও ক্ষমা

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

বাড়ায় হিংসার শক্তি প্রতিহিংসা, পাপে বাড়ে পাপ,
হিংসারে যে হিংসে সেত নহে হিংসা, সে যে অনুতাপ।
হিংসকের হিংসা সে'ত নব পাপ সৃষ্টির কারণ,
হিংসা-শমীবনে ক্ষমা,—অগ্নিময় মন্ত্র-উচ্চারণ।

মহানিশা

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী]

হুগলীজেলার পাণ্ডুয়া ষ্টেশন হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বাকুল নামে গ্রামখানি, আকারে আয়তনে তেমন বড়-সড় না হইলেও, তাহার মধ্যে গ্রামলক্ষ্মী কমলার অবস্থিতি-চিহ্ন সুপরিস্ফুট ছিল; দু-পাঁচ ঘর সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস থাকিলেই সেকালে সমস্ত গ্রামখানি সেই সমৃদ্ধির অংশলাভে বঞ্চিত হইত না। সহরের টানে তাঁহারা যদিও এখন অনেকেই দেশছাড়া, কিন্তু তথাপি এখনও সেই সব পূর্ব্বকীর্ত্তি-কলাপের উপর প্রত্নতাত্ত্বিকের অধিকার জন্মাইবার কাল উপস্থিত হয় নাই। গাঁয়ের ভিতরকার পুষ্করিণীগুলির অধিকাংশেই সবুজের পরিবর্ত্তে জলের বর্ণ ঈষৎনীলাভ; দু-একটায় পদ্ম ফুটিতেছে, শৈবালও ভাসিয়া বেড়ায়; কিন্তু পঙ্কজের অনুযাত্রী পঙ্কের এখনও শৈশব-লীলা চলিতেছে মাত্র। এই গ্রামের একপ্রান্তে রাধিকাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস। ইঁহারা মুখ্য কুলীন, গ্রামের মস্তকস্বরূপ; বহুদিনাবধিই এই গ্রামে ইঁহারা প্রতিষ্ঠিত। ইদানীং ভগ্নাবস্থা—তা সে বিষয়ে সাক্ষী দিবার জন্য বেশি দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না—বাড়ী-খানি নিজেই তাহার প্রধান সাক্ষ্যস্থল। এই বাড়ীর তেতলার ঘরখানিতে খান-দুই-চার রামলীলার চিত্র লম্বিত, একখানি কাঠের জলচৌকির উপর ঠাকুরের মূর্ত্তি—চন্দনে অর্দ্ধলুপ্ত বসনভূষণে আবৃত। পুরোহিত—বাড়ীর পুরাতন সরকার; সেই পূজা করে, আরতি করে, ভোগ দেয়, আবার আবশ্যক হইলে নিজেই সে ভোগ রাঁধে। ভাঁড়ারের চাবি তাহারি কাছে, মাস-খরচের জিনিষপত্র সেই খরিদ করে, বাজার আনে, হিসাব লেখে, গোয়ালা দুধ না দিলে ঝগড়া করে, ধোপার কাছে কাপড় বাকি থাকিলে তাহার দাম কাটে, আবার অবসর পাইলেই কর্ত্তার হুঁকার উপর কলিকাটি বসাইয়া দিয়া সামনে বসিয়া 'দেবী-ভাগবতে'র 'শুম্ভ-নিশুম্ভের পালা'র গদ্যানুবাদ শুনাইয়া যায়। গৃহস্বামীর বয়স—তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে। বয়সের চেয়ে চেহারা যেন বেশি শুষ্ক, মন ততোধিক—তাঁহার তিন-কুলে কেহ কোথাও বাঁচিয়া আছে কি না, এ সংশয় অনেক লোকের মনেই জাগিতে দেখা গিয়াছে; এবং, তাঁহার মৃত্যুর পরে, উত্তরাধিকারীর অভাবে যে সরকার মশাই-ই বুড়ার সমুদয় সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিয়া লইবে, এ বিষয়েও কাহার মতদ্বৈধ ছিল না। কারণ, উক্ত প্রৌঢ় সরকারটি ব্যতীত, এই পরলোক-যাত্রা-পথের পথিক বৃদ্ধের অপর কোন একজন দূর বা নিকট আত্মীয়, অথবা জ্ঞাতি, বন্ধুর সমাচার প্রতিবেশিবর্গের জানা ছিল না। গ্রামের প্রাচীনেরা জানিতেন যে, এক সময় এক জন মাত্র ছিল; বহুদূর-অতীতে তাহার সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটায়, সেই হইতে অদ্যাবধি তাহার নাম, স্মৃতি অবধি এখান হইতে লোপ হইয়া গিয়াছে;—সে দিকের সাড়াটিও কেহ আর পায় নাই! সে আজও এই নশ্বর পৃথিবীর আলো-বায়ু ভোগ করিতেছে, কি অমর-লোকের অধিবাসী হইয়াছে, তাহাও কেহ ঠিক জানিত না!

যে দিনের কথা আমরা বলিব, সে দিন আরতি সমাপ্ত হইয়া গেল; কিন্তু প্রতিবেশী-গৃহের কচি বাচ্চাটি পর্য্যন্ত 'শীতলের' দুখানি বাতাসার লোভ-দমন করিয়া, স্বগৃহে থাকিয়া, শ্রাবণের বর্ষণ-শ্রান্ত যামিনীকে যেন অধিক নিরানন্দ করিয়া তুলিল। ঘণ্টার শব্দ, বর্ষার আর্ত্তনাদে মিশিয়া, বারম্বার ব্যর্থ-আহ্বানে নিষ্ফল-আক্ষোভে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কাঁসর সেদিন মোটে বাজিল না—বাজাইবার লোকই ছিল না। ম্লানমুখে সরকার মহাশয়, ঘৃতদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া দ্বারের শিকল টানিয়া দিলেন। বৃদ্ধ রাধিকাপ্রসন্ন দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নিজের ঘরে সহজভাবেই প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কোন কিছুর জন্যই যে, তাঁহার একটুখানিও আসিয়া যায় না, এই শিক্ষাই তিনি ছোটবেলা হইতে নিজের কাছে শিখিয়া আসিয়াছেন; আজও এই জীবন-সায়াহ্নের নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহার অণু-মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ঘরে বসিবার আসনের উপর, দীপের সম্মুখে, একখানা পত্র পড়িয়া আছে। বোধ হয়, বৈকালে ডাক-হরকরা জানলার ফাঁক দিয়া পত্রখানি ফেলিয়া গিয়া থাকিবে। বায়ুতাড়িত-শিখ প্রদীপলোকে, স্তিমিত-দৃষ্টি মেলিয়া, বৃদ্ধ কোনমতে পত্রখানা পাঠ করিলেন। সে পত্রখানা এই—

"প্রণামা শতকোটি নিবেদনমিদং—

আমরা পরস্পরের সহিত অতি নিকটতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেও, আমি আপনার নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিতা। সেই জন্য, সর্ব্বপ্রথমে, নিজের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া লিখিতেছি যে, আমি—আপনার চিরবিস্মৃতা পরিত্যক্তা কন্যা শশিবালার হতভাগ্য সন্তান সৌদামিনী।

হয় ত,এ পরিচয়ের ফলে, ক্রোধে আপনি আমার এ পত্রখানি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন—পাঠও করিবেন না। কিন্তু, তথাপি, যখন আজ এই জীবনের মধ্যভাগে এই প্রথম আপনার কৃপাভিক্ষা করিতেই প্রস্তুত হইয়া পত্র লিখিতে বসিয়াছি, তখন আমার আবার সে কথা মনে করিয়া এ বৃথা লজ্জাভোগ করা কেন ?

ভিখারীর মান-অভিমান সাজে না। যদি জগতে দ্বিতীয় কোন পথ থাকিত, তাহা হইলে আপনার মত নির্ম্মম আত্মীয়ের দয়াপ্রার্থনা আমি করিতে আসিতাম না। একথা কতদূর সত্য, এই সুদীর্ঘ অতীত বৎসরগুলিই তাহার সাক্ষী। আমি আজ অনাথা, সহায়-সম্বল-বিহীনা—ভিখারিণী। বলিয়াছি, ভিখারীর মানমর্য্যাদা নাই ; পাঁচজনের দ্বারে যাহাকে আঁচল পাতিতে হয়, ছয়জনের দ্বারকে উপেক্ষা করা তাহার পক্ষে শোভা পায় কি ?

অধিক বাক্যাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, আপনার ভালও লাগিবে না। কথা এই,—আমি যে কোনরূপে সামান্য সাহায্যপ্রার্থী ; যদি ভিক্ষাপাত্রের বিচার অপ্রয়োজন মনে করেন, তবে তাহা যেরূপে ইচ্ছা পাঠাইলে বাধিত হইব। নিকটে গিয়া গ্রহণ করিতে চাহি, এরূপ ধৃষ্টতা-প্রদর্শন করিতে সাহসী নহি।

আর কি লিখিব ?—কত কথা, কত সুখ-দুঃখের আলোড়নে এ বুক ভরিয়া উঠিতেছে ; কিন্তু হায়! এ বন্যার ধারা কোন্ মরু-লক্ষ্যে ছুটিতে চাহে ?—কে শুনিবে যে বলিব ?

প্রণাম-গ্রহণে বাধা আছে কি ? যদি না থাকে, তবে অসংখ্য প্রণাম।

সেবিকা—অভাগিনী সৌদামিনী।"

সৌদামিনী!—দামিনী!—আহা কত দিন পরে! কি সুদীর্ঘ যুগান্তর ভেদ করিয়া দূর অতীতের ধূলি-মেঘজাল বিদীর্ণ করিয়া এ ক্ষুদ্র দামিনীলতা আজ আবার এই মেঘাড়ম্বরভরা দুরুদুরুকম্পিত বর্ষা-নিশীথে প্রকাশ হইল রে! সে কতদিন! সে কি এই জীবনেরই কথা ? না অপর কোন জন্মের ?

বৃদ্ধ, চশমার নিকট হইতে পত্রখানা সরাইয়া শিরাবহুল শীর্ণ অঙ্গুলিমধ্যে সেখানা চাপিয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ চশমার পরকলাখানার মধ্য হইতে ক্ষণকম্পিত দীপশিখার নর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন,তাঁহার মনের ভিতরকার বর্ষা-বাতাসেও বোধহয় একটা নর্ত্তনশীল আলোকরশ্মি আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা খেলিতেছিল। মনের মধ্যে কোন স্মৃতির জ্বালা লবণাক্ত হইয়া উঠিতে সময় পাইল না, বুদ্ধি—অহঙ্কার কেহ কাহাকেও আমল দিতে রাজী হইল না, কেবল একটা উদ্দাম সুখ বা তীব্রতম দুঃখ—ঠিক বলা যায় না—সেটা ঐ মেঘসঞ্চারি-তড়িতের মতই বুকের অন্ধকার চিরিয়া খান-খান করিতে লাগিল ;—বজ্র হাঁকাইল না।

রাত্রি হইলেও, বিছানায় শয়ন করিয়া, বৃদ্ধের নিদ্রা আসিল না। তখনও আকাশের কুল-কিনারা মেঘসমুদ্রে ঢাকিয়া আছে। অদূরবর্ত্তী পুষ্করিণী ভেকরবে মুখরিত, সেই সঙ্গে ছাদের নল হইতে পতিত জলধারার পতনশব্দ মিশিয়া যাইতেছিল। লণ্ঠনের তেজ বাড়াইয়া দিয়া, আলোক-হস্তে, বিনিদ্র গৃহস্বামী, চোরের মত পা টিপিয়া, নিজেরই জনশূন্য দ্বিতলের একটা চাবিবদ্ধ গৃহের বহুদিনকার বন্ধন-মোচন করিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ঘরখানা দেখিলে, মনে হয়, বিশ-ত্রিশ বৎসর সেখানে মানব-সংস্পর্শ ঘটে নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে, কোন একটি ক্ষুদ্র মানব এ গৃহের অধিষ্ঠাতা ছিল, এখনও এই অপর্য্যাপ্ত ধূলিজাল ভেদ করিয়া, সাবধান পর্য্যালোচনপটু দৃষ্টি এটুকু অতিসহজেই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়। বড় একখানি খাটের পাশে ছোট একটি কাঠের রেলিং-ঘেরা দোলা ; তাহার উপর, দড়ি দিয়া ঝুলান, কি একটা ধূসর পদার্থ,—

গঠন দেখিয়া, শিশুর নয়ন-শোভনার্থ পূর্ব্বতন বিচিত্রবর্ণ কাঠের 'ঝারা'-রূপে ইহাকে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় না। একপাশে, একখানি জলচৌকির উপর, অমনি ধূলিরঞ্জিত বাঁধা-হুঁকা, সরপোষ, পানের বাটার সহিত মাটির সিংহ, আহ্লাদী ও কৃষ্ণরাধা, পুতুলগুলা কাহার ছোট দুখানি স্নেহস্পর্শ-স্মৃতি স্মরণ করিতে থাকে! চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া রাধিকাপ্রসন্ন কিছুক্ষণ এই রাক্ষসীপুর-তুল্য, অকস্মাৎ-পরিত্যক্ত গৃহের প্রতি বস্তুটির পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তারপর, একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া, রুদ্ধদ্বার গৃহের পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া দিয়া, নীচে নামিয়া ডাকিলেন—"বেহারি!"

কাঁচা বয়সে ঘুমের যেরূপ গাঢ়তা থাকে, একটু বয়স হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটুকু কমিয়া আইসে। এমন নিশুতি বর্ষা-রাত্রির আরাম-শয্যা ছাড়িতে, তাই, সরকার-মহাশয়ের অধিক বিলম্ব ঘটিল না। উঠিয়া বসিয়া, দুইহস্তে নেত্র-মার্জ্জনা করিতে করিতে, বিহারী উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে!"

"দেখ বেহারি! এ আবার এক মহা ফ্যাঁসাদ জুটেছে দেখ!—ভাল গ্রহেই পড়া গেছে!" এই বলিয়া, সন্ধ্যায় প্রাপ্ত পত্রখানা সরকার-মহাশয়ের হস্তে দিয়া, বৃদ্ধ লণ্ঠনটা তাহার দিকে সরাইয়া দিলেন।

পত্রপাঠ-সমাপ্তির সঙ্গে সরকার-মহাশয়ের বাকি ঘুমের ঝোঁকটুকু কাটিয়া গিয়াছিল। সে, একটু সঙ্কোচের সহিত কহিল—"তা' হ'লে এটা কাল একবার ভালরূপে বিবেচনা করে, যা হয় কিছু মনিঅর্ডারে না হয় পাঠান যাবে।—"

তাহার আর কিছু, বোধ হয়, বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু মধ্যপথে সে ইচ্ছায় হঠাৎ বাধাপ্রাপ্তি ঘটিয়া গেল। রাধিকা-প্রসন্ন অসন্তোষের সহিত সবেগে কহিয়া উঠিলেন—"ঐ তোমাদের কেমন এক রোগ 'পরামর্শ করিব—সভা বসাইব—অত ঘটা, আমাদের পছন্দ হয় না বাপু! তা ছাড়া, ঐ মনিঅর্ডার ফর্ডারে টাকা পাঠান, ওসব আমি পারিব না! কেন্‌রে বাপু, অত ঝক্কি সহিতে গেলাম কেন?"

সরকার-মহাশয় প্রভুর ধাতুর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। তিনি আর কিছু না বলিয়া ভূমিলগ্ন দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। এসব সময় উত্তর-প্রত্যুত্তর সঙ্গত হইবে না, একথা তাঁহার ভালই জানা ছিল।

রাধিকাপ্রসন্ন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া, তারপর, সমধিক বিরক্তভাবে কহিতে লাগিলেন—"ভিক্ষে করিতে বাহির হইয়াছেন, তবু তেজ দেখিতেছ না? সাপের 'শলুই' কি না! কত ভাল হইবে? বাপ-বেটা অতি পাষণ্ড, অতি আহম্মক ছিল। আমার খাইয়া মানুষ; সেই আমাকে অপমান করিয়া, স্ত্রী-কন্যা কাড়িয়া লইয়া, তেজ দেখাইয়া গেলেন;—আমিও রাধিকাশর্ম্মা—এমন ব্রাহ্মণ নহি! আজ ত্রিশ বৎসর সেই অকৃতজ্ঞ গোষ্ঠীর নাম কেহ আমার মুখে শুনিতে পাইয়াছ?—কেন করিব?—আমার কিসের দরকার? এমন জন্ম হয় নাই যে, যাহারা আমার নয়, আমি তাহাদের মায়ায় বদ্ধ হইয়া, 'হরে-নরের' মত কাঁদিয়া, মরিব। আমি মনে করি, আমি চিরদিনই নিঃসন্তান ছিলাম। যাক্—সে বেটাও বিক্রমপুরে কুলীনের ছেলে; কথা রাখিয়াছে বটে! মরিয়া গিয়াছে,—তবু আমার দ্বার মাড়াইবে না বলিয়াছিল, সেটুকু ঠিক রাখিয়া গিয়াছে।—বেশ করিয়াছে! শুধু এই মনুষ্যত্ব-টুকুর জন্যই আমি তাকে যা একবিন্দু শ্রদ্ধা করি; আর কিছু না! যাক্ ওসব তো চুকিয়াই গেছে; হ্যাঁ, আজ এতদিন পরে, এ নবাব-কন্যা যে হঠাৎ মানের বোঝা নামাইয়া ভিক্ষার—" বিহারী দৃষ্টি উঠাইয়া কাতরনেত্রে চাহিল; বলিল, "বোধ হয়, দিদিঠাকরুণ বড়ই বিপন্ন। না হ'লে, এমন করিয়া কখন তিনি চিঠি লিখিতেন না; তাঁকে কিছু সাহায্য—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তুমিও যেমন ক্ষেপিয়াছ! তিনি তাঁর মানের বোঝা লইয়া, সিংহাসনের রাণীর মত, বসিয়া থাকুন; আর আমি তাঁর পাইক-পেয়াদা, ঘাড়ে বহিয়া খাজনা দাখিল করিতে থাকি!—আমার এত দায় পড়ে নাই! তাঁর যদি তেমন দরকার হইত, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া নিজেই এখানে আ——যাক্ যাক্, ওসব কথা যাইতে দাও। বেশ বৃষ্টি বাদলের রাত্রি, ভাল করিয়া ঘুমাও। আমাকেও একটু ঘুমাইতে হইবে তো; সারারাত্রি ধরিয়া তোমার যুক্তি-তর্ক শুনিলে চলিবে কেন?" এই বলিয়া বৃদ্ধ নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ঘুমাইবার ইচ্ছা বা চেষ্টা তাঁহার মধ্যে আর উঁকি দিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। জানালার কবাটটা খুলিয়া ফেলিয়া, বৃদ্ধকে সেই খানে ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িতেই দেখা গেল।

এই ঘটনার দুই দিন পরে, একদিন দুপুর বেলা, বর্ষণ-

ক্ষান্ত মেঘের স্তর ছুটাছুটি করিয়া, যে যাহার নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য যখন ব্যতিব্যস্ত ছিল, এবং সেই ধূসর-পিঙ্গল-শুভ্রাদি-বর্ণবিশিষ্ট-মেঘপুঞ্জ-বিভক্ত-পথে সূর্য্যকিরণ ছড়াছড়ি করিয়া তাঁহার প্রতিদিনকার ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছিলেন, সেই সময় রাধিকাপ্রসন্নের গৃহদ্বারে একখানি গরুর গাড়ি পথ-কর্দ্দম মথিত করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ির উপর গো-চালকের পশ্চাতেই, বিহারী বসিয়া ছিল। গাড়ি থামিতেই সর্ব্বপ্রথম সে শশব্যস্তে নামিয়া দাঁড়াইয়া গাড়ির ছইয়ের সামনের ময়লা পর্দ্দা মুক্ত করিয়া ধরিল। আরোহী দুইটিই স্ত্রীলোক; তাহার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া সম্ভ্রমের সহিত সে কহিল—"আসুন মা, নামিয়া আসুন।"

ভিতর হইতে দুইটি অর্দ্ধমলিনবসনা নারী নামিয়া সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত পদে বিহারীর পশ্চাতে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গের অল্পস্বল্প জিনিষ-পত্র গাড়োয়ান্ ও বিহারী নিজেই বহন করিতে পারিয়াছিল—কারণ, সে অল্প যথার্থই অল্প। স্ত্রীলোক দুজনের মধ্যে একজন অন্যূন ত্রিশ বর্ষ-বয়স্কা, শীর্ণা, চিন্তাম্লান-মুখী, বিধবা—তিনিই রাধিকাপ্রসন্ন বাবুর দৌহিত্রী সৌদামিনী; অপরজন তাঁহারই কিশোরী কন্যা অপর্ণা,—বয়স সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে আমরা সাহসী নহি, কারণ মেয়েটি কুমারী। অধিকাংশস্থলেই দেখা যায়, আইবড় মেয়ের বয়স—যেখানেই গিয়া পৌঁছুক না কেন—ঘড়ির বড়-কাঁটাটার মত, ঘুরিয়া ফিরিয়া সে ঠিক সেই বারোর অঙ্কেই পৌঁছায়।

অন্দরের সহিত সদরের যোগ যে ক্ষুদ্র দ্বারটির মধ্য দিয়া, ঠিক সেই সন্ধি-স্থলটিতে পৌঁছিয়া, সৌদামিনী একবার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া, বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন—"কই? দাদা বাবুকে তো দেখ্‌ছিনে বেহারীমামা?—তাঁর কাছে আমাদের আগে নিয়ে চল।"

বিহারী, হাতের বোঁচকাটা নামাইয়া রাখিয়া, প্রথমে সদরের দিকেই আবার ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু তখনি, আবার কি মনে করিয়া, পরিত্যক্ত ভার দুই হস্তে একটু জোর করিয়া মাটি হইতে উঠাইয়া লইল। তারপর, পূর্ব্ববৎ দ্বারের দিকেই অগ্রসর হইতে হইতে মৃদুস্বরে কহিল, "আসুন, প্রথমে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিন, তারপর দেখা-শোনা সবই হবে।—তাড়াতাড়ি কি!" সৌদামিনী কিন্তু এ কথায় বেশ সন্তুষ্ট হইয়া মনের সঙ্গে সায় দিতে পারিলেন না। তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটু উদ্বিগ্ন-ভাবে আবার প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু আমরা এলাম; অবিশ্যি গাড়ির শব্দে তিনি তা জান্‌তেও পেরেচেন; তা, কই তিনি তো এখনও বাইরে এলেন না!"

বিহারী, এ রকম জেরায় পড়িবে, আশা করে নাই। তাই, প্রথমটা কি উত্তর দিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, একটু থতমত খাইয়া ভেকা হইয়া রহিল। তারপর, চট্ করিয়া একটা উত্তর ঠিক করিয়া ফেলিয়া, একটু ম্লান হাস্যের সহিত কহিয়া উঠিল—"আহা মরি,—ওঁনার আজ মনের কখনও স্থিরতা থাক্‌তে পারে? তুমিই বিবেচনা করো দেখি! তাই তো বলচি, তোমরাও একটু হাতেমুখে জল দিয়ে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি হয়ে নাও; আমিও ততক্ষণ একবার ওঁর কাছে গিয়ে দেখে আসি—হয় ত মুখ গুঁজে একলাটি পড়েই কাঁদ্‌চেন। তা দেখ, মা ঠাক্‌রুণ! তোমায় একটা কথা বলে রাখি;—উনি শোকেতাপে, আর বয়সও তো হয়েচে, একটু খিট্‌খিটে মেজাজী হয়ে প'ড়েছেন; তা, যদি দুটো কথা বলেন, তুমি কিছু দুঃখ ক'রোনা—যা বল্‌বেন, জবাবটি না-দিয়ে, সয়ে থেকো। পরে বুঝ্‌বে—যা বলেন, তা ভেতর থেকে বার হয় না;—সবটুকুই মুখে। আচ্ছা, এখন এই নাও, তোমার ঘর-কন্না সব দেখে নাও।—ঐ দেখ কুয়া তলা, ঐ চৌবাচ্চায় জলধরা আছে; এইটে রান্না-ঘর, কুলুপ-দেওয়া যেটা—ঐটে ভাঁড়ার, এটায় কাঠ-কয়লা সব থাকে, বাকিগুলো সবই খালি; কি আর হবে বলো—মানুষ-জন তো নেই!"

সৌদামিনী, রোয়াকের এক পাশে গায়ের মোটা চাদর খানা খুলিয়া জড় করিয়া রাখিয়া, হাত-পা ধুইবার জন্য উঠানে নামিলেন; মায়ের দেখাদেখি, মেয়েও তাঁহার অনুসরণ করিল। তাহারা, হাতমুখ ধুইতে কূপের নিকট গেলে, বিহারী কাদামাখা জুতাজোড়া খুলিয়া ফেলিয়া, ঘড়ার জলে পা ধুইয়া, ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। নারী-বিবর্জ্জিত গৃহস্থালীর সেই দীর্ঘকাল ধরিয়া গৃহিণীর কার্য্য করিয়া আসিতেছে, কাজেই পাকা গৃহিণীর যে কিছু গুণপনা, সে সকল পুরা-মাত্রায়ই তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। সে কাচা-কাপড়ে এক ঘটি গঙ্গাজলে খানিকটা মিছরি

ভিজাইয়া দিল, এবং একপাশে একখানি কুশাসন পাতিয়া, একটি সুপরিষ্কৃত পিত্তলের চুম্‌কি ঘটিতে গঙ্গাজল ঢালিয়া আহ্নিকের স্থান করিল। চালের জালার মধ্যে দু'একটা আধ-পাকা-গোছের পেঁপে মাত্র সম্বল; সেইগুলি কাটিয়া, একটা রেকাবে রাখিতেছে, এমন সময় স্নান সারিয়া সৌদামিনী ভিজাকাপড় হাতে দ্বারের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাপড় কোথায় শুকুতে দিই, বেহারী মামা?"

"ঐ যে উত্তর-ধারের র'কে দুটো বাঁশ দেওয়া রয়েচে"—বলিতে বলিতে বিহারী উঠিয়া বাহিরে আসিয়া কথিত স্থান দেখাইয়া দিল।—"নাও! আহ্নিক সেরে মুখে একটু জল দাও। বেলা কি আর আছে, কই দিদিঠাকুরুণ কোথা? আয় না বোন্ তুই আর কেন দেরি করচিস্! তেষ্টা পায় নি! নে একটু সরবত আগে খা।"

অপর্ণা, বিহারীর হস্তস্থিত সরবতের পাত্রটা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ করিতেছে দেখিয়া, তাহার জননী বিহারীর দিকে চাহিয়া, একটু হাসিয়া, কহিলেন—"বেহারীমামাকে তোর লজ্জা করতে হবে না অপি! বেহারীমামা আমার মার সহোদর ভাই—মামা!—মা আমার বেহারী বলতে অজ্ঞান হতেন! শুনেচি, আর একটু মনেও পড়ে, ছোট বেলা বেহারীমামা আমায় বড্ডই আদর করতো। আমি বড় আবদেরে ছিলাম,—তা, তিন-ভাগ আবদার সইতো আমার বেহারী মামা।" সৌদামিনী সহসা থামিয়া গিয়া চোখের দৃষ্টি কমাইয়া লইলেন, এবং একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব-স্মৃতি গুলিকে প্রশ্রয় দিলে আজ কি আর তাহারা রক্ষা রাখিবে!

পূজা-আহ্নিক ও জলযোগেই প্রায় বেলাটুকু শেষ হইয়া আসিল। রান্নার জোগাড় করিয়া দিয়া, রাঁধিবার জন্য বেহারী যথেষ্ট জিদ্ করিল; কিন্তু সৌদামিনী কোন মতেই এবেলায় রন্ধন করিতে স্বীকার পাইলেন না; বলিলেন—"অপি তোমাদের সঙ্গে রাত্রে তখন খাবে, আমার এই খুব হয়ে গেল।" বিহারী খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কহিল—"এ' কি হলো মা, কিছুইতো ছিল না;—এমন জানলে না হয় কিছু মিষ্টি টিষ্টি কিনে আনতাম।" সৌদামিনী একটু হাসিয়া বাধা দিলেন—কহিলেন, "এতও যে আজকাল আর সকল দিন জোটাতে পারিনে মামা। এ আমার যথেষ্ট হয়েচে! আমার পেটে কি ক্ষিধের জোর আছে আর? এত দুঃখে কষ্টে ভাবনা-চিন্তায় এখনও যে এই উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি, পোড়া পেটে অন্ন-জল দিচ্চি, এইতেই আমার বাহাদুরী দাও বেহারী মামা!—আমি যাই মেয়ে, তাই এখনও শুয়ে পড়িনি! আর কেউ হলে কি এমন করে বাঁচতে পারে?"

বিহারী অতি করুণদৃষ্টিতে তাঁহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখখানা এককালে বোধ হয়, ঐ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী নম্রমুখী মেয়েটির মতই দুই চোক ভরিয়া দেখিবার মত সামগ্রীই ছিল; কিন্তু এখন?—তা এখনও কিছু এমন মুখ-ফিরানর মত মন্দ হইয়া যায় নাই। ফুলটি বাসি হইয়া ঝরিবার প্রতীক্ষা করিতেছে,চাঁদ যেন দিনের আলোর উজ্জ্বল প্রভায় ম্লানায়মান ও ডোবো ডোবো হইয়াছে!—সে পুরাণ লোক, রক্তসম্বন্ধে-সংযুক্ত না থাকিলেও কৃতজ্ঞতার বন্ধনে, ভক্তি-ভালবাসার সম্বন্ধে সে এ সংসারের সহিত চির-সম্বদ্ধ। সে এতটুকু বেলা মাতৃহীন ও পিতৃত্যক্ত হইয়া রাধিকা-প্রসন্নের স্নেহময়ী পত্নীর নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত হয়। সেই অবধি আজ সুদীর্ঘকাল, ন্যূনাধিক ৩৪।৩৫ বৎসর ব্যাপিয়া এই ক্ষুদ্র সংসারটির সঙ্গে তাহার ঘটনা-বিরল একটানা জীবনের স্রোত একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার মাঝখানে আর কোনই ফাঁক নাই। কারণ, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নিরাত্মীয় বিহারী, আত্মীয়জন হইতে বঞ্চিত রাধিকাপ্রসন্নের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপই হইয়া পড়িয়াছে। তাই, সেই রাধিকাপ্রসন্নের অবিচার-দণ্ডে চির দণ্ডিত, দুঃখ-অভাবের কঠোর পীড়নে নিষ্পেষিত সৌদামিনীর অকাল-বার্দ্ধক্যের জরা-জর্জ্জরিত মুখে চাহিয়া তাহার চোখের জলরোধ করিতে পারা দায় হইয়া উঠিল! কথার সুরটুকুতেও একটা বিরাট অভাব এবং মর্ম্মভেদী বিয়োগ-কাহিনী যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে মুখটা অপর দিকে ফিরাইয়া, তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"তবে এইবার আমি কর্ত্তার কাছ হতে একবার হয়ে আসি। তারপর, তোমায় সেখানে নিয়ে যাব, মা। দিদিমণি এ ঘরেতো পান-মসলার পাঠ নেই, কুলুঙ্গিতে কাগজে মোড়া হত্তুকি আছে, তাই দুখান কেটে নাও। কাল বাজারে পানের সাজ-টাজ কিনে এনে দোবো এখন।"

বিহারী চলিয়া গেলে, মার কাছে সরিয়া আসিয়া, অপর্ণা কহিল, "লোকটি বড্ড ভাল—না, মা?"—"খুব ভাল"

বলিয়া সৌদামিনী চুপ করিয়া রহিলেন। অপর্ণা আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার মা নিঃশব্দে বড় কান্নাই কাঁদিতেছেন; তাই,সে আর কিছুই না বলিয়া, চুপ করিয়া তাঁহার কাছটিতে বসিয়া রহিল।

বিহারী কর্ত্তার বসিবার ঘরে তাঁহার সাড়াশুড়ি না পাইয়া, সরাসর একেবারেই তাঁহার শয়নগৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত।—অল্পক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পরে একটু সঙ্কুচিতভাবে, গৃহে প্রবেশ করিল। না জানি, তাঁহাকে কি অবস্থায় দেখিবে! কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই সে দেখিল—কর্ত্তা মেঝেয় মাদুরে বসিয়া, তাঁহার তেজারতি ব্যবসার পুরাতনখাতা খুলিয়া, চশমা চোখে হিসাবের অঙ্ক কষিতেছেন। বিহারীর নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ, তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; হাত-চালান বন্ধ না করিয়া, চোখ না উঠাইয়াই, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হে? বেহারীবাবুর যে আর দেখা-সাক্ষাৎ পাওয়াই যায় না! বলি, বুড়োটা বাঁচলো কি মরলো, সে খবরটাও তো একটু একটু রাখ্‌তে হয়!"

বিহারী, এ খোঁটা-খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। সে, নিরুত্তরে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, ঝুঁকিয়া খাতাটার পাতাখানা দেখিবার চেষ্টা করিতে করিতে, সসঙ্কোচে কহিল, "আপনি বলে দিন, আমিই ওটা লিখে ফেলি।"—এই বলিয়া, হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক খাতাখানায় হাত দিতে গেল। কোন অস্পৃশ্য জাতি ঠাকুর-পূজার উপকরণ স্পর্শ করিতে গেলে মানুষ যেমন হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া বাধা দেয়, তেমনি করিয়া মনিব খাতা সরাইয়া ফেলিলেন। শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "করো কি!—আহাহা! করো কি! যাও—যাও, তোমার নিজের ভাল ভাল কাজ করগে। আমার সাহায্য কাউকে করতে হবে না, আমি নিজেই ওসব পেরে উঠবো।" বিহারী অর্দ্ধ-অপ্রতিভভাবে হাত সরাইয়া লইল; কর্ত্তা কলমের উপর জোর দিয়া গড় গড় করিয়া লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। ভয়ানক ব্যস্তভাব, কোনদিকে চোখ কাণ দিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার নাই।

অনেকক্ষণ এই রকম করিয়া কাটিল। সহিষ্ণু বিহারী, তখন সৌদামিনীর উৎকণ্ঠা মনে করিয়া, মনের ভিতর কিছু অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমন সময় কর্ম্মব্যস্ত রাধিকাপ্রসন্ন, বারেকের জন্য কাজ থামাইয়া, চশমাটা খুলিয়া মুছিতে মুছিতে, তাহার দিকে চোখ তুলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর, বেহারীচন্দ্র! ব'সে আছেন কি মনে করে?"

বিহারী একটু উস্‌খুস্‌ করিয়া নড়িয়া স্থির হইয়া বসিল; চোখ নত করিয়া, ঢোক গিলিয়া, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর দিল, "এই ... ... রয়েচি—"

কর্ত্তা চশমার কাঁচ জোরে জোরে কোঁচার খুঁটে মুছিতেছিলেন; খালিচোখ তাহার দিকে বিস্তৃত করিয়া কহিয়া উঠিলেন,—"সেটা আমি দেখ্‌তে পাচ্চি; মশা মাছিটি নও, যে তোমার অস্তিত্বে কারুরও ভ্রম জন্মাতে পারে!—কোন কাজকর্ম্ম কি নাই? ওবেলা উপসের ব্যবস্থা করে, হাওয়া খেতে যাওয়া হয়েছিল; এবেলাও বুঝি কর্ত্তার ওপাড়ায় কোথাও বামুন-ভোজনের নেমন্তন্ন আছে?—তাই রাঁধা-বাড়ায় চাড়্‌টি নেই? বুড় মিন্‌সে খেলে, না খেলে, তো বড় বয়েই গেল;—না?"—এসব নূতন কথা নয়, চিরাভ্যস্ত সম্ভাষণের বাঁধাগৎ! বিহারী মৃদুস্বরে কহিল, "সকালে পলাস্‌ডাঙ্গা গেছ্‌লাম্।" —"তবে আর কি? আমি একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে গেছি! সেখানে কি শ্বশুরঘর-টর হয়েচে নাকি? কই এতদিন তো কখন যাওয়া হ'তো না?" বিহারী সুযোগ বুঝিয়া, এইবার ঝাঁ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "আগে সেখানে মাঠাকুরুণ ছিলেন? কাল চিঠিখানা পড়ে, মনে বড় কষ্ট হলো—তাই থাক্‌তে না পেরে আপনার অনুমতি না নিয়েই, চলে গেছ্‌লাম। সে অপরাধ আমার"—"হ্যাঁ, হ্যাঁ 'ক্ষমা করো,'ও সাহেবদের মত গালে চড় মেরে—আর 'বেগ্‌ ইওর পার্ডন্‌' এতে আর কাজ নেই, ঢের হয়েচে! আমি কে কোথাকার একটা মড়িপোড়া হাবাতে বুড়ো, একপাশে পড়ে আছি,—আমার অনুমতিই বা কি, আর 'সনুমতি'ই বা কি? যা প্রাণ চায়,তাই করোগে না, বাপু! আমি কি কারু হাত পা বেঁধে রেখে দিইচি? না কারুকে কোন দিব্যি দেওয়া আছে? হ্যাঃ!" বিহারী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ কহিয়া উঠিল, "মার আর আমার দেহে কিছু নেই, কেবল হাড়ের বোঝাখানি! দুঃখ কষ্টের পরিসীমা ছিল না; আর মাসকতক থাকলেই, জন্মের শোধ আক্ষেপ থেকে যেতো!" রাধিকাপ্রসন্ন বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—"হ্যাঁগো হ্যাঁ—থেকে যেত! অমন সবই থেকে যায়। তা' এই মাটি তোমার কি

রকম সম্পর্কে মা হন? নিজের মাকে তো কোন্ সত্যকালে খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েই আছ! কি জাত এ?—সৃষ্টি ছুঁয়ে তো এক কর্‌লে! শাশুড়ী হয়েচেন বুঝি?"

বিহারী ধীরস্বরে কহিল, "সৌদামিনী মা, খুব ভাল কুলীনের মেয়ে!"—"অ্যাঁ! সেই দেমাকে মাগীটে আমার বাড়ী চড়াও হয়ে এসেছে বুঝি? বার করে দাও, বার করে দাও—"

বিহারী শশব্যস্তে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল; তাহার মনে একটু ভয় হইল—যদি সৌদামিনী এদিকে আসিয়া থাকেন, এবং এই নির্ম্মম মন্তব্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে! আহা! দুঃখিনী যে বড় জ্বালা সহিয়া,একমুঠা ভাত ও এতটুকু স্নেহ-ভিক্ষার জন্য আসিয়াছে! এক্ষেত্রে কথা-কাটাকাটি সঙ্গত নয়,বুঝিয়াই সে,আর কোন কথাটি না কহিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং প্রস্থানোদ্যত হইল। দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে ডাক পড়িল—"ওহে লাট্! খট্ মট্ করে যে চলেই যাচ্চো? শোনই না একটা কথা; বলি, মাঠাক্‌রুণের পাদোদক জল খেলে তো আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাবে না,—এবেলা রান্না-বান্না হবে, না চিঁড়ে ভিজাব?"

বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, কহিল—"আজ্ঞে, মাঠাক্‌রুণ এতক্ষণ হয় তো রান্না চড়িয়েই দিয়ে থাক্‌বেন। তখনি তো ঐদিকে গেলেন।"—"সে কি! বলো কি তুমি, বেহারি! কে কোত্থেকে একটা শুঁট্‌কে মাগীকে ধরে নে' এলে; তাঁর জাতের খপর জানে কে, তার ঠিক নেই! অম্‌নি দুম্ ক'রে তিনি হেঁসেলে গিয়ে হাঁড়ি ধর্‌লেন! আবার এদিকে বিনিয়ে বিনিয়ে বলা হচ্ছিল—'দেহে আর কিছু নেই, হাড়ের বোঝাখানি!' সব জোচ্চুরি—সব জোচ্চুরি! আমি কি আর কিছু বুঝিনে!—হুঃ—চালাকি আর আমার সঙ্গে চালাতে হবে না! তুমি বেড়াও ডালে ডালে তো আমি বেড়াই পাতায় পাতায়! আচ্ছা,এখন চলো, কোথায় তোমার রাণী ঠাক্‌রুণ—না মাঠাক্‌রুণ—কৃপা করে এ গরীবের কুঁড়েয় পদার্পণে পবিত্র কর্‌তে এসেছেন, দেখাবে চলো; আমার মতন ছোট লোকের বাড়ী যখন পায়ের ধুলো দেছেন্, তখন গলায় কাপড় দিয়ে অভ্যর্থনা কর্‌তে হবে তো। ভাল এক আপদ জোটালে তুমি বেহারি! অতি নিমকহারাম বদমায়েস তুমি! এই এতদিন ধরে পুষলাম তোমায়, আমার দিকে তোমার এতটুকু টান নাই, যত টান সেই—যাক্—যাক্—ও সব কলির ধর্ম্ম যে—হবেই তো!"

সৌদামিনী, কোন মতে বুকের মধ্যের উদ্বেলিত অদম্য অশ্রুস্রোতের পূর্ণ-নির্ঝরকে ঠেলিয়া রাখিয়া, পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেই, মাতামহ দুইপদ পিছাইয়া গিয়া কহিয়া উঠিলেন, "থাক্—থাক্—আর গরু মেরে জুতো দানে কাজ নেই। এই তো কালই চিঠিতে আচ্ছা করে জুতিয়ে দিয়ে এখন আবার বড় ভক্তি দেখান হচ্চে! যেমন বাপের কন্যে, তা আর কত হবে? বাপ যে অতি ইতর—অতি চামার ছিল!"

সৌদামিনীর অর্দ্ধাবনত মস্তক আর নামিল না; ক্ষণকাল তিনি সেই নতজানু অবস্থায় রহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "আমি আপনার দ্বারে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, আমায় আপনি যত খুসী মন্দ কথা শুনাতে পারেন; কিন্তু আমার মরা বাপকে আপনি অনর্থক কেন গাল দিচ্চেন? পথের ভিখারীর সঙ্গে কি এই রকমই ব্যবহার ক'রে থাকেন?"—"না, তা করিনে, কেন কর্ব্বো? তাদের বাপ কি ওই রকম পাজী—অত বড় নেমকহারাম—বেইমান, যে কর্‌বো?—তারা দুঃখী কিন্তু ছোটলোক নয়!"—এবার সৌদামিনীর নাসারন্ধ্র স্ফীত ও অধর সঘনে কম্পিত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে তিনি উত্তর করিলেন, "কেন আপনি এমন করে তাঁকে অকথা-কুকথাগুলা বল্‌চেন্? মনে অবশ্য ভালই জানেন যে, তিনি বড় ছোট লোকছিলেন না!"—"না ছিলেন না! ছোটলোককে ছোটলোক বল্লে, কি কুকথা বলা হয়? এই বেহারী বদমায়েসটাকে যদি তালপাতার সিপাই বলি, তোমায় শুঁট্‌কি বলি, সেটা কি গাল দেওয়া হবে?—যার যা বিশেষণ! তা আচ্ছা, এখন বাড়ী বয়ে এসে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবে? না দুটো খেয়েদেয়ে আজকের রাতটা একটু ঘুমিয়ে, ঐ ধুক্-ধুকে প্রাণটুকু ধরে রাখবার চেষ্টা কর্‌বে?—আমি বাপু এখনি ঘটাটটা করে যে তোমার মেয়ের চতুর্থীর জোগাড় করে দেবো, তা মনে করো না! আমার অত টাকাও নেই, আর সে গতরও নেই!—যাও—যাও—একটু শুয়ে পড়গে; পাদুটো যা কাঁপচে, এখনি ধড়াস্ করে পড়ে কি এই সন্ধ্যেবেলা কাঁধে করাবে? যত সব বদমায়েসী! সেই এলিই যদি বাপু, তো প্রাণটা ঠোঁটের আগায় ক'রে এলিই বা কেন?—সীতারাম বল, সীতারাম!"

সারস্বত-প্রসঙ্গ

নৈষধ-চরিত

[শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, M. A.]

পিতার নিকট উপহার-স্বরূপ এক নূতন পুস্তক আসিয়াছে—"রবীন্দ্র-প্রতিভা"। গ্রন্থকর্ত্তা একজন মুসলমান মৌলবী। তাই, স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের বশে প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইতেই একস্থানে দৃষ্টি পড়িল,—লেখক বলিতেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের ধারায় এক নূতন তরঙ্গ উঠাইয়াছেন, এবং সে তরঙ্গ উঠিয়াই নিমেষে মিলাইয়া যায় নাই, সে তরঙ্গভঙ্গে প্রতিভার বিপুলশক্তির প্রণোদন থাকায় তাহা নিজের গণ্ডীকে বিস্তৃত করিয়াছে। মোট কথা, কবীন্দ্রের লেখনী পরিবর্ত্তন-বিমুখ বিশ্বতন্ত্রে আপনার বিশেষত্বটুকু জয়যুক্ত করিয়াছে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখিতেছেন যে—

"এখন আর বড় আগমনী ও বিজয়ার গানে কাহারও হৃদয় উছসিয়া, অশ্রুজলে দুনয়ান ভাসিয়া যায় না। গোকুলের গোপালগাথা ভূপালী মুলতান সুরে কিম্বা সাহানা সুরে মর্ম্মে গিয়া বড় বাজে না, অধুনা যেন পাখী লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা গানই শিক্ষিত সমাজে অধিকতর আদরণীয়।" অতএব রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই লেখক পরিচ্ছেদ সমাপ্তি করিতেছেন—

"হেথা হ'তে যাও পুরাতন
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।"

কথাটি পড়িয়াই আমার মনে একটা বিরোধ লাগিয়া গেল। পরে, "প্রবাসী"-পত্রের গত পৌষ-সংখ্যায় দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন—

"প্রাচীন সাহিত্যে যে ব্যক্তি এখন রস পাইতে চায়, তাহাকে এই আধুনিক কালের আবহাওয়া হইতে সরিয়া পড়িতেই হইবে, তার মানে তাহাকে প্রাচীন হইতে হইবে—তাহার মনের মস্তকে পাকাচুল দেখা দিবে, তাহার বুদ্ধিতে ঘুণ ধরিবে, তাহার অন্তরের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিবে। যৌবনের উৎসবের মাঝখানে তাহার স্থান হইতে পারে না।"

বর্ত্তমানের এই অতিরঞ্জিত মাহাত্ম্যের চিত্র, আমি মাথা পাতিয়া লইতে পারিলাম না। মনের মধ্যে বিরোধটা যেন বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল। আমি ভাবিলাম, কথাটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে—অন্তরের অনুভূতির নিকষে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

সম্মুখের বাটীতে একজন সুদক্ষ গায়ক "ইমন কল্যাণ" আলাপ করিতেছেন—মনে হইল, উপযুক্ত অবসর। একবার পুরাতনের এই অস্তমিত প্রভাবের কথাটা সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই প্রথমে নির্ণয় করা যাউক। বাঙ্গালার জলবায়ুর এখনও অপরিবর্ত্তিত কোন গুণেই বোধ করি,—শরতের প্রসন্ন আকাশের তলে, রবিকরোদ্ভাসিত গ্রামখানির মাঝে—প্রাচুর্য্যের ও প্রফুল্লতার কোলে, আজও যখন পথভিখারীর কণ্ঠে আগমনী-গানের—

"গিরিরাজ গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, মা মা বলিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী (মা আমার) কোথা লুকাইল—"

এই ভণিতা ধ্বনিত হয়—তখন অতিধ্রুব মানসপ্রত্যক্ষের সম্মুখে—স্নেহ-করুণার অবিরলপ্রস্রবণ মাতৃহৃদয় বৎসরান্তে নয়নের পুতলী নন্দিনীর দর্শনের জন্য উথরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—এই চিত্র অতি স্পষ্টপ্রভায় ভাসিয়া উঠে। গায়কপ্রবর-অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তীর ভ্রমরগুঞ্জন মধুরস্বরে—

"দেখো রি এক বালা যোগী দ্বারমে মেরি আয়া হ্যায়"

এই ভজন যখন শব্দতরঙ্গে বাতাস কাঁপাইতে থাকে—তখন অবিশ্বাসের ক্ষীণভক্তির যুগে লালিত আমার হৃদয়ও নন্দ-নন্দনের দ্বারপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হয়। আমি যোগিবরের সরল বিশ্বাসের কথায় তন্ময় হইয়া যাই—গোপালদেব অবলোকনের ঐকান্তিক আগ্রহের বেদনা আমাকে পীড়িত

করে। যখন সঙ্গীতের এই দেশকালের ব্যবধানবিলোপকরী শক্তির উপলব্ধি হয়, তখন মন উদ্ধৃত বাক্যদ্বয়ের সত্যতার অনুমোদন করে না।

সঙ্গীতের প্রকৃত সার্থকতা কোথায়—এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকা স্বাভাবিক। অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, মধুর স্বরলহরীর সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ ভাবদ্যোতক পদাবলীর অধিকতর অভিব্যঞ্জনই—সঙ্গীতের উপযোগিতা। তাই এদেশে শুদ্ধ স্বরগ্রামের আলাপ—"কালোয়াতি কসরত্" বলিয়া অধঃকৃত হইয়া থাকে। এবং স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রবাবুর "হরিপদর ধ্রুপদশিক্ষা"-শীর্ষক কৌতুকপ্রদ প্রবন্ধের মর্ম্ম এই ধারণারই সমর্থন করিতেছে। এদিকে সঙ্গীতকলা-বিশারদ রাগদ্রষ্টা Wagner বলেন,—"Inarticulate tones can not only suggest ideas but express them". তাঁহার মতকে সর্ব্বাংশে মানিয়া না লইলেও অবিরোধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক কলারই একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সার্থকতা আছে—এবং সে সার্থকতা কলান্তরের ছন্দানুবর্ত্তিতায় সিদ্ধ হয় না। এই প্রসঙ্গে নিজের একটা অনুভূতি স্মরণ হইতেছে।

একবার মধ্য-ভারতবর্ষে বেড়াইতে গিয়াছিলাম—স্থানটি কোন দেশীয় রাজার অধীনে। রাজধানীর কিছু দূরে রাধা-কিষণ জীর এক মন্দির ছিল। প্রায়ই সন্ধ্যাকালে সেখানে বেড়াইতে যাইতাম—নিকটের মধ্যে উহা একটি দর্শনীয় জিনিষ ছিল। প্রতিদিনই শুনিতাম, সেতার ও মৃদঙ্গের সহযোগে আলাপ হইতেছে। বিশেষ এই যে, দেবতার স্তুতি নির্ব্বাক্ কলাপ্রসাধনেই সম্পাদিত হইত। তৎকালে, পরিণামরমণীয় গ্রীষ্মদিবসের অবসানে কণ্ঠঘণ্টিকার তালে তালে গাভীসমূহের গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের ধ্বনি যখন আভীরপল্লীর মাঝে মিশাইয়া যাইত—দিবসের কোলাহল যখন কুটীরাস্তরণের অন্তরে সুপ্তির আশ্রয় লইতে উদ্যোগ করিত, অদূরে গ্রামের ঘরে ঘরে যখন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিত, তখন পূরবী, শ্যাম বা ছায়ানটের বিশুদ্ধ আরোহ-অবরোহ গোধূলির সেই স্তিমিত বাতাসের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব বেদনা-লহরীর সৃষ্টি করিত—তাহা প্রকাশ করিতে ভাষায় কুলায় না। আমার মনে হইত, আমি বিংশ শতাব্দীর জীব না হইয়া, ভারতের শান্ত গম্ভীর সনাতন আত্মার মাঝে লুকাইয়া পড়িতেছি।

বলিতে চাহি যে, সঙ্গীত-কলার সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি পুরাতনের উপর—প্রাচীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। Association of Ideas বলিয়া মনোজগতের একটা নিয়ম সকলেই জানেন—ইহাকে "ভাবের শৃঙ্খলা" বলিয়া অনেকটা অনুবাদ করা যাইতে পারে। জালের একটি সূতা ধরিয়া টানিলে সমগ্র অংশে যেরূপ টান পড়ে,—ইহাও সেইরূপ। মানুষের মনের মধ্যে এমন একটা বন্ধন—এমন একটা ওতপ্রোত অনুস্যূতি আছে- যে, এক জায়গায় একটু আঘাত দিলে সমস্তটা চঞ্চল হইয়া উঠে। আলঙ্কারিক যাহাকে বাক্যের লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তি আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহা এই বিচিত্র নিয়মেরই কার্য্য,—ভাষার ঝঙ্কার, রসের উদ্বোধ, ইহারই পরিণাম। এই "ভাবের শৃঙ্খলা" সভ্যতার ভিত্তি-স্বরূপ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্র ও কলা সকলেরই মূলে। কালের গতির সঙ্গে মানবশিশুর সহজাত ভাবের সম্বল বা সংস্কারের রাশি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এই ভাবের শৃঙ্খলা সেতুর মত যুগযুগান্তরের ব্যবধানকে বিলুপ্ত করিয়া—সভ্যতার ধারাকে স্থায়ী করিতেছে। বিশেষতঃ সঙ্গীতে ও সাহিত্যে এই Association of Ideas প্রবলভাবে কার্য্য করিতেছে। এই দুই স্থলে—অতিপরিচয় 'তাচ্ছিল্যে'র কারণ হয় না—বরং আমাদের অনুভূতিকে, রসবোধকে আরও ঘন, আরও ব্যাপক করিয়া তুলে। যখন ভৈরবী কিংবা আশাবরীর মূর্চ্ছনা হয়, তখন প্রাতঃকালের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আমাদের সত্তাতে স্বতঃই যেন জাগিয়া উঠে। যখন পূরবীর ঔদাস্যব্যঞ্জক পরদাগুলি সুরের তরঙ্গ তুলিতে থাকে, তখন আপনিই যেন "দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়া মন"—এই নির্ব্বেদের ভাব হৃদয়কে আকুল করে। হৃদয়ের বৃত্তিগুলির সহিত স্বরগ্রামের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—এই যে একের উন্মেষে অপরের উন্মেষ, ইহা পুরুষ-পরম্পরাগত একজাতীয় অনুভবের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈদেশিক এই ভাবের স্বর্ণশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত সঙ্গীতের এই অপ্রত্যক্ষ ঝঙ্কারে চমকিত হইতে পারে না। এই যে Ideal Tint—এই যে কল্পনার অনুরঞ্জন বা অনুরণন—ইহা তাহাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক—ইহা মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে কথা সত্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা। চতুর্দ্দশ ও ততোধিক পুরুষ

যে কবিত্বের মাধুর্য্যে সিক্ত হইয়া আসিয়াছে—সে কবিত্বের মাধুর্য্য অধস্তন পুরুষের যে প্রকৃতিগত আগ্রহেরও উপভোগের সামগ্রী হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। পিতৃপিতামহের গুণাগুণ সন্তানে কতদূর বর্ত্তে—এই বিষম সমস্যার সমাধা না করিয়াও আমরা ইহা মানিয়া লইতে পারি। যদি তাহা না হইত, সকল জাতির মধ্যে পুরাণ-কাব্যের সমাদর বর্দ্ধিত না হইয়া কমিয়াই যাইত। কিন্তু ইহার অন্যথাই ত আমরা দেখিয়া থাকি। অন্যজাতির সাহিত্যের ধার না ধারিয়াও—গৃহকোণে বসিয়াও—আমরা ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব দেশের লোকের উপর অক্ষুন্নই রহিয়াছে—এবং আশা করি, যাবচ্চন্দ্রদিবাকর অপরিহীনই থাকিবে। কোন কোন সমালোচক বলিয়া থাকেন যে, পৃথ্বী যত বয়ঃস্থা হইতেছেন—মানব জাতির কবিত্ব-শক্তিরও তত হ্রাস হইতেছে। ইহাকে উপমানমূলক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারি না। ব্যক্তির বয়ঃপরিণামে এইরূপ ঘটিতে পারে, অতএব সমষ্টির বা জাতির পক্ষেও ইহা ঘটিবে, এরূপ অনুমানের মূলে উপমিতি ভিন্ন আর কি প্রমাণ? তাই বিশ্বাস আছে প্রাচীন কাব্যকলা বিধ্বস্ত বৈজ্ঞানিক মতের ন্যায় কখনও বাজে কাগজের ঝুড়িতে স্থান পাইবে না। তাহার কারণ মানুষের সমাজবদ্ধ অস্তিত্বের ভিত্তি সাহিত্যে—তাহার উপস্থিত সত্তা অতীত সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া চলিতে পারে না।

তবে একটু কথা আছে, পুঁথি থাকিলেই যে তাহার রীতিমত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইবে, ইহা মনে করা ভ্রম। চর্চ্চার ধারাও অবিচ্ছিন্ন থাকা আবশ্যক। অন্যথা মিশরের অক্ষর-চিত্রণ এখন শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের সম্পদে দাঁড়াইত না। তাহার মধ্যে তৎকালের যে জীবনের প্রতিচ্ছবি রক্ষিত আছে—সে জীবনের রসটুকু উপলব্ধি করিবার শক্তি, সম্প্রদায় সাহায্যে জীবিত রাখিতে হইবে। যদি দেশীয় সভ্যতার ধারা লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যসম্ভার পাঠকের অভাবে—বোদ্ধার অভাবে অর্থহীন অঙ্কনে পর্য্যবসিত হইবে—তাহা অসম্ভব নহে।

এই চর্চ্চার ধারাকে জীবিত রাখার অর্থ—জরাগ্রস্ত, পলিতকেশ অকর্ম্মণ্য হওয়া কখনই নহে। বৃক্ষ যেরূপ শিকড়ের দ্বারা রসগ্রহণ করে, রসগ্রহণ করিয়া আপনাকে যেরূপ সঞ্জীবিত রাখে—আধুনিক সমাজে প্রাচীন সাহিত্য-চর্চ্চার প্রয়োজনও সেইরূপ। জরাজীর্ণ প্রতিভায় সাহিত্যের সৃষ্টি কখনই হয় নাই। যখন প্রাণ থাকে—ধমনীতে ধমনীতে সরস অনুভূতি যখন খেলিতে থাকে—তখনই জাতীয় শক্তি সাহিত্যকে দ্বার করিয়া আপনার প্রকাশ করে। এরূপ সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিলে—সমাজের প্রাণ যৌবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে একবার নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া লয়। সাহিত্য-জগতে ইহা Renaissance বা পুনর্জন্ম—জরাপ্রাপ্তি বা Decadence নহে।

বঙ্গের উপস্থিত যুগের একটা শুভলক্ষণ ইহাই দেখিতে পাই যে, আধুনিক "কৃতবিদ্য" ব্যক্তিরা স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। ইহা আশার কথা—আনন্দের কথা—সন্দেহ নাই—কিন্তু এই অনুরক্ত দৃষ্টিক্ষেপের পরিধি আপাততঃ সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। একটা উদাহরণে ইহা স্পষ্ট হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের যুগ—বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালকেই পরাকাষ্ঠার কাল বলিয়া সচরাচর ধারণা করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এ ধারণা ভ্রান্ত—একথা বলিতে চাহি না। কিন্তু সচরাচর এই মত যাঁহারা পোষণ ও প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ ভিত্তির আশ্রয় করিয়া নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, একথা বলিলে বোধ হয়, অযথা বা দোষাবহ হইবে না। Norway দেশের নবযুগের শক্তিমান্ নাট্যকার Ibsen তাঁহার Ghosts নামক নাটকে একটি কথোপকথনের অবতারণা করিয়াছেন—তাহা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রযোজ্যবোধে উদ্ধৃত করিলাম:—

"Mrs. Alving—For the rest, what do you object to in these books?

Manders -Object to in them? You surely don't suppose that I have nothing to do but study such productions as these?

Mrs. Alving—That is to say, you know nothing of what you are condemning.

Manders—I have read enough about these writings to disapprove of them."

সংস্কৃতে একটি অতি প্রচলিত প্রবচন আছে—তাহা এই—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবং।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।"

বিশ্ববিদ্যালয়-ভারতীর পদতলে যাঁহারা দেবভাষার শিক্ষা করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এ বাক্যের যথার্থতা বা অযথার্থতা, সত্যতা বা অন্যথাত্ব নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? কয় জন আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডে বিচার করিয়া, এই প্রসিদ্ধ কবিচতুষ্টয়ের রচনা-গুণের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? এক কালিদাস ব্যতীত অপর কয়জনই শিক্ষিত যুবকগণের নিকট কেবল নামতঃ পরিচিত বা দুরূহ দুর্বোধ্য 'হিজিবিজি' বলিয়া অবজ্ঞাত নহেন কি? বিশ্বসাহিত্যের সহিত সমভাবে পরিচয় যে যুগের সাহিত্যালোচনার আদর্শ—সে যুগে স্বদেশের অতীত ও বর্ত্তমানের চির গৌরবস্থল—সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি—দেশের শিক্ষিত সমাজের অনুরাগ যে একান্ত স্পৃহণীয় ও সুশোভন—ইহা কে অস্বীকার করিবে?

Milton বলিয়াছেন—"Poetry should be simple, sensuous and impassioned"—অর্থাৎ কাব্য সরল, প্রত্যক্ষকল্প ও রসাত্মক হইবে। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এই উক্তিকে মাথায় করিয়া লইয়াছেন—এবং মনে করি, এই মতেরই অনুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল উজ্জ্বল রত্নের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন। কিন্তু সৎকাব্যের এই লক্ষণকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রধানতঃ বিচার্য্য হইতেছে—এস্থলে simple বা সরল বলিতে আমরা কি বুঝি? কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের আধুনিক যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইতেছে—আশা করি, ভাষার হিসাবে, শুধু পদগুলির অর্থের দিক্ হইতে—তাহারা অত্যন্ত সরল বলিয়াই পরিগণিত হইবে। "উদীয়মান" বঙ্গ কবিবৃন্দের ইহাই যেন উদ্দেশ্য মনে হয় যে, তাঁহারা আপন আপন রচনা "মেঠো চাষার"ও সুবোধ্য করিতে চাহেন। কিন্তু পদগত সরলতা সত্ত্বেও জনসাধারণের পক্ষে এই সকল কবিতা হেঁয়ালির মতই মনে হয় না কি? প্রকৃত কথা ইহাই যে, কবিতার রসগ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ প্রকার চর্চ্চা ও শিক্ষার প্রয়োজন। যতদিন সে শিক্ষালাভ না হয়, ততদিন অরসিকের পর্য্যায়ে পড়িয়া থাকিতেই হইবে, উপায় নাই।

দেশের বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কবিতার রসানুসন্ধানে Icelandএর Sagas আলোচনা করিয়া, ঘর্ম্মাক্ত হইতে প্রস্তুত, Beowulf বা Neibelungen Leidএর মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য মুহুর্মুহুঃ টীকার সাহায্য গ্রহণে অপরাঙ্মুখ। Goethe বা Heineএর চমৎকারিত্ব আস্বাদনের জন্য দুরুচ্চার্য্য ও দুর্ব্বোধ্য জর্ম্মণ ভাষার অনুশীলন তাঁহারা সার্থক মনে করেন। এ সকল প্রযত্ন সর্ব্বথা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই—কিন্তু এই প্রযত্নের কিয়দংশ সংস্কৃত সাহিত্যের অপরিচিত ও অনাদৃত রত্নরাজির আবিষ্করণে ও উদ্ধারার্থে যদি ব্যয়িত হইত—তাহা হইলে কত সুখকর হইত? Tourgeneif একস্থলে বলিতেছেন—"Cosmopolitanism is all twaddle, the cosmopolitan is a nonentity, without nationality is no art, no truth, nor life, nor anything"—যদি দেশের প্রাণের সহিত আমাদের শিক্ষার সাযুজ্য রক্ষা করিতে হয়—যদি শিক্ষাকে অন্তরতম উপলব্ধির সামগ্রী করিতে হয়—যদি মনোবৃত্তিসমূহের সহিত ইহাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত করিয়া কার্য্যপ্রসূ শক্তিরূপে পরিণত করিতে হয়—তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে উপস্থিত অবহেলার মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। স্তন্যপায়ী সন্তানের সহিত প্রসূতির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষারও তাহাই। পরিপুষ্টিলাভের জন্য এখনও বহুদিন ধরিয়া বঙ্গভাষাকে এই প্রাচীন ভাষাজননীর বক্ষঃসংলগ্ন থাকিতে হইবে। সরলতার দোহাই দিয়া সংস্কৃতসাহিত্য-চর্চ্চাকে অবজ্ঞা করা সমীচীন হইবে না।

Macdonell সাহেব তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে বলিতেছেন যে, নৈষধচরিতকার শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন। তদবধি এই সাতশতবৎসরাধিককাল তাঁহার নৈষধচরিত যে, ভারতীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতেছে—ইহাকে অলীক কিংবা অন্যায্য বলিলে চলিবে না। রুচির পরিবর্ত্তনে আদর্শের বিপর্য্যয়ে ইহার চমৎকারিতা এখন অনাদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দেশে যখন আবার অন্তর্মুখী প্রীতির মন্দাকিনী বহিয়াছে—এই সুযোগে ঐ চমৎকারিতাকে কথঞ্চিৎ সহৃদয়গণের সমক্ষে উপস্থিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের অতিরিক্ত শৃঙ্খলাপ্রিয়তা

আধুনিক সাহিত্যিকের মনোনীত নহে—ইহা পুনরুক্তি মাত্র। এই সংযমপ্রিয়তার একটি স্ফুট উদাহরণ—"কবি-সময়খ্যাতানি।" সাহিত্যদর্পণকার সপ্তম পরিচ্ছেদে এই সকল Convention-এর নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন যে—এই কবিপ্রসিদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ দোষহেতু রসের অপকর্ষক। নৈষধকার এই প্রসিদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া, কি ভাবে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আপন ব্যক্তিত্ব—আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পদে পদে লক্ষণীয়। কয়েকটি উদাহরণে ইহা স্পষ্টতর হইবে। "যশসি ধবলতা" এই কবিপ্রসিদ্ধিগণের অন্যতম। কবি বলিতে চাহেন যে, নিপুণ যোদ্ধৃবৃন্দের আনুকূল্যে নলরাজের প্রতাপ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কবির ভাষায় ইহা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

"সিতাংশুবর্ণৈর্ব্বয়তি স্ম তদ্‌গুণৈ-
র্মহাসিবেম্নঃ সহকৃত্বরী বহু।
দিগঙ্গনাঙ্গাভরণং রণাঙ্গনে
যশঃপটং তদ্ভটচাতুরীতুরী॥"

অর্থাৎ, নলরাজের শুভ্রবর্ণ গুণরাশি গুণ বা সূত্রের মত দিগ্বধূগণের অঙ্গশোভাকর যশঃপট সৃষ্টি করিয়াছিল। এবং তাঁহার সৈনিকগণের রণচাতুরী তুরী (মাকু) স্বরূপ হইয়া এই বয়নকার্য্যে তাঁহার বিপুল খড়্গরূপ বেমার সহায়তা করিয়াছিল।

অতিশয়োক্তির স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অন্যত্র কবি লিখিতেছেন—

"যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ
স্ফুরৎ-প্রতাপানলধূমমঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ
দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥"

নলরাজের অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যা ইহা হইতেই অনুমান করিয়া লইতে হইবে। চন্দ্রদেব সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন—ইহা কে না জানে?—নলদেব সৈন্যসামন্ত লইয়া যখন রণযাত্রা করেন, তখন প্রচণ্ডধূলি উত্থিত হয়—তাহা শুধু তাঁহার জলন্ত প্রতাপের ধূম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং সেই ধূলিই সমুদ্রে পতিত হইয়া, কর্দ্দমে পরিণত হয়, এবং চন্দ্রে কলঙ্কের লেপ দেয়।

এবম্ভূত অলৌকিক রূপ ও গুণসম্পন্ন নলরাজার কীর্ত্তি-কথাকালে ভাটমুখে কুণ্ডিন নৃপতি ভীমের কন্যা দময়ন্তীর কর্ণগোচর হইল। এবং প্রচলিত কীর্ত্তন-গানের ভাষায় তাহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে। পশিল আকুল করিল মনপ্রাণ।" দূত-দ্বিজ-বন্দি-চারণের মুখে দময়ন্তীর অলোক-সামান্য রূপ ও আপনার প্রতি অপূর্ব্ব অনুরাগের বার্ত্তা শুনিয়া নলরাজও মেঘদূতবর্ণিত যক্ষের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন এবং

"রাজকার্য্য অবহেলি রম্য উপবনে
লইলা আশ্রয়"।

এই পুরোপকণ্ঠে যাত্রাকালে—

"মুনিদ্রুমঃ কোরকিতঃ শিতিদ্যুতি
বনেঽমুনামন্যত-সিংহিকাসুতঃ।
তমিস্রপক্ষক্রটিকূটভক্ষিতং
কলাকলাপং কিল বৈধবং বমন্॥"

অর্থাৎ, প্রস্ফুটিত বকবৃক্ষ দেখিয়া নৃপতির মনে হইল—ইহা বোধ হয়, স্বয়ং রাহু—প্রতি কৃষ্ণপক্ষে যে সকল চন্দ্র-কলা গ্রাস করিয়া থাকে, তাহা যেন এক সাথে উদ্গীরণ করিয়া শাখায় শাখায় লম্বমান রাখিয়াছে।

কিন্তু সেই উপবনে "পিকোপগীত ও শুকস্তুত" হইয়াও, সুন্দর দৃশ্যরাশি ও মধুর গন্ধসমূহ উপভোগ করিয়াও—তিনি অন্তরে কোনরূপ তৃপ্তিলাভ করিলেন না। অনন্তর একদিন স্বর্ণময় এক হংস আসিয়া বনমধ্যস্থিত তড়াগতীরে পতিত হইল। তাহার দর্শনে

"প্রিয়াবিয়োগাদ্ বিধুরোঽপি নির্ভরং
কুতূহলাক্রান্তমনাঃ মনাগভূৎ॥"

এবং পল্বলতীরে গ্রীবা বাঁকাইয়া ক্লমালস দেহকে নিদ্রায় অর্পণ করিয়া পক্ষী যখন বিশ্রাম করিতেছিল—তখন তাহাকে হস্তগত করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে ত্রাসে ও তাহার বিরহে আকুল হইয়া, তাহার সঙ্গীরা কাতরভাবে কূজন করিয়া উঠিল। মনে হইল, হংসের বর্ত্তমানে পল্বলের যে শোভা বা শ্রী হইয়াছিল—এক্ষণে পলায়মানা সেই শ্রীদেবীর সম্ভ্রান্ত পদক্ষেপে নূপুরগুলি বাজিয়া উঠিল। প্রবলের হাতে পড়িয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজাকে ধিক্কার দিয়া হংস বলিল—

"ধিগস্তু তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ
সমীক্ষ্য পক্ষান্ মম হেমজন্মনঃ।
তবার্ণবস্যেব তুষারশীকরৈ-
র্ভবেদমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্ ॥"

হে রাজন্! ধিক্ তোমার সুবর্ণের প্রতি লোভে। আমার এ কয়টা সোণার পাখায় তোমার মত পৃথ্বীপালের কি কমলা বা লক্ষ্মীবৃদ্ধি হইবে—তুষারবর্ষে সমুদ্রের কবে কমল বা জলের উপচয় হইয়া থাকে?

এইরূপে খগরাজ করুণারসের সরিৎস্বরূপ আপন বাক্যরচনাকে দয়ার সমুদ্রতুল্য নৃপতির মানসে সঙ্গত করিল। এবং তাহার ফলে নলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দময়ন্তীর লোকাতিশয় রূপের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল।

"ভুবনত্রয় সুভ্রুবামসৌ
দময়ন্তী কমনীয়তামিদং।
উদিয়ায় যতস্তনুশ্রিয়া
দময়ন্তীতি ততোঽভিধাং যযৌ ॥"

দময়ন্তীর নাম সার্থক হইয়াছে—নিঃসন্দেহ। কারণ, ত্রিভুবনের যাবতীয় সুন্দরীর রূপের গর্ব্ব তিনি দমন করিয়াছেন—তাই তাঁহার পিতৃদত্ত দময়ন্তী অভিধা।

নায়িকার মুখের বর্ণনায় চন্দ্র, পদ্ম, খঞ্জন, এ সকলই কবিদিগের চিরন্তন উপকরণ। শ্রীহর্ষ দময়ন্তীর উৎকর্ষ-প্রমাণের জন্য ইহাদের এক একটার সহিত তুলনা না করিয়া সমষ্টিতে ইহাদের হীনতা প্রতিপাদন করিতেছেন। তাঁহার মতে দময়ন্তীর নয়নদ্বয় নলিনীকে মলিন করিয়াছে, হরিণীকে ত আমলেই আনে না, আর যখন কজ্জল-পূরিত হয়, খঞ্জনকেও রম্যতার গর্ব্বে দরিদ্র বা দীন করে। কবি ইহাও ভাবেন যে, ভগবান্—চন্দ্রের মধ্য হইতে সার অংশটুকু তাঁহার মুখনির্ম্মাণের জন্য তুলিয়া লইয়াছেন—ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ—অন্যথা চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে ঐ যে প্রকাণ্ড খাত তাহার কারণ কি? অথবা ইহাও সম্ভব যে, সাধারণ লোকে যেরূপ গোময়লিপ্ত আলিপনাদেওয়া প্রদীপে আরতি করিয়া থাকে—দময়ন্তীর মুখের নীরাজনার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা সকলঙ্ক চন্দ্রকেও সেইরূপ "সাঁঝের বাতিতে" পরিণত করিয়াছেন।

"সদসৎসংশয়গোচরাদরী" সেই রমণী হংসরাজের নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিল। রূপ-বর্ণনার এই তীব্র আক্রমণে নৃপতি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন এবং "অপি সাধয় সাধয়েপ্সিতং স্মরণীয়াঃ সময়ে বয়ংবয়ঃ" এই বলিয়া খগরাজকে বিদায় দিলেন।

যথাসময়ে পক্ষিরাজ সখীগণপরিবৃতা দময়ন্তীর সমীপে উপস্থিত হইল এবং মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কৌশলে রাজকন্যাকে কিঞ্চিৎ দূরে নির্জ্জনে লইয়া গেল। তৎকালে—

"হংসোঽপ্যসৌ হংসগতেঃ সুদত্যাঃ
পুরঃ পুরশ্চারু চলন্ বভাষে।
বৈলক্ষ্যহেতো র্গতিমেতদীয়াং
অগ্রেঽনুকৃত্যোপহসন্নিবোচ্চৈঃ ॥"

মরালগামিনী সুদতীর অগ্রে যাইতে যাইতে সেই হংস মধুর আলাপ করিতে লাগিল। মনে হইল, সে যেন দময়ন্তীকে লজ্জা দিবার জন্যই তাঁহার চলনভঙ্গীর অনুকরণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিতেছে। মিতভাষিণী দময়ন্তী হংসের প্রশ্নের উত্তরে ইঙ্গিতে বলিলেন—

"মনস্তু যং নোজ্ঝতি জাতু যাতু
মনোরথঃ কণ্ঠপথং কথং সঃ।
কা নাম বালা দ্বিজরাজপাণি-
গ্রহাভিলাষং কথয়েদলজ্জা ॥"

যে মনোরথকে আমার মন ক্ষণেকের তরেও ত্যাগ করিতে পারে না—সেই মনোরথ কিরূপে আমার কণ্ঠপথে নির্গত হইবে অর্থাৎ বাক্যে প্রকাশিত হইবে? হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিবার বাতুলতা কি লজ্জার বিষয় নহে? বালিকার মুখে বিবাহের অভিলাষও কি লজ্জাহীনতার পরিচায়ক নহে?—বিশেষতঃ নৃপতিকে বররূপে পাইবার আশা, হে খগরাজ, সর্ব্বথা বালিকার মুখে অশোভন।

রাজহংস এই Enigmatic উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া, দময়ন্তীকে স্পষ্টভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল এবং আশ্বাস দিয়া বলিল—

"পর্য্যঙ্কতাপন্নসরস্বদঙ্কাং
লঙ্কাপুরীমপ্যভিলাষি চিত্তং।
কুত্রাপি চেদ্বস্তুনি তে প্রযাতি
তদপ্যবেহি স্বশয়ে শয়ালু ॥"

সমুদ্রের ক্রোড়ে পালঙ্কশায়িনীর মত বিরাজমানা লঙ্কাপুরীতেও যদি তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হয়—বা অন্য কোন অতি দুর্লভ বস্তুতেও যদি তোমার বাসনা হয়—তাহা

নিজ করগত বোধ করিতে পার। অগত্যা কতক লজ্জিতা কতক বা প্রীতা হইয়া দময়ন্তী উত্তর করিলেন—

"চেতো নলঙ্কাময়তে মদীয়ং
নান্যত্র কুত্রাপি চ সাভিলাষং।"

আমার মন লঙ্কাপুরী যাইতে চায় না—অন্য কোন বিষয়েরও অভিলাষ রাখে না। কিন্তু নলকে—এবং তদ-ভাবে অনল বা অগ্নি প্রবেশ কামনা করে। অতএব

"মমাস্থ তৎপ্রাপ্তিরসুব্যয়ো বা
হস্তে তবাস্তে দ্বয়মেবশেষঃ।"

নলপ্রাপ্তি অথবা প্রাণত্যাগ—এ দুই এখন তোমার হস্তে। এবং এই দুইএর অন্যতরই আমার চরম পরিণাম।

পরে হংসদূতকে আপন সন্দেশ-নিবেদনের জন্য দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে নিপুণ পরামর্শ দিয়া বলিলেন—

"বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্দ্রে
তস্মাত্ত্বয়াস্মিন্ সময়ং সমীক্ষ্য।
আত্যন্তিকাসিদ্ধিবিলম্বিসিদ্ধ্যোঃ
কার্য্যস্য কার্য্যস্য শুভা বিভাতি।"

হে বিজ্ঞ, সময় বুঝিয়া রাজসদনে আমার প্রার্থনা নিবে-দন করিবে, একেবারে নিষ্ফলতা ও বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি তোমার ঈপ্সিত মনে হয়?

তখন রাজহংস বলিল—

"ইদং যদি ক্ষ্মাপতিপুত্রি তত্ত্বং
পশ্যামি তন্ন স্ববিধেয়মস্মিন্"

হে রাজপুত্রি, ইহাই যদি সত্য, তোমার মনোভাব হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার করণীয় আর কিছুই দেখিতেছি না; কেননা, মনোভব একশরেই তোমাকে ও নিষধ নৃপতিকে বিঁধিয়াছে। এইরূপ প্রবোধবচন উচ্চারণপূর্ব্বক পক্ষিরাজ উড্ডীন হইলে, দময়ন্তীর সখীগণ এইরূপ পরিহাস-পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে লইয়া গেল—যথা

"কান্তারে নির্গতাসি প্রিয়সখি পদবীবিস্মৃতা
কিন্নু মুগ্ধে মা রোদী রেহি যাম"

গহন কান্তারে বহির্গত হইয়াছ, প্রিয়সখি সরলে, বোধ করি, পথ হারাইয়া থাকিবে! রোদন করিও না—এস—আমরা যাই।

তির্য্যক্‌মুখে এই অন্যোন্যপরিচয়ের কি ফল হইতে পারে—তাহা সহজেই অনুমেয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে দর্শনের পূর্ব্বেই বিরহবেদনা অনুভূত হইতে লাগিল এবং কাংস্যপাত্র অপেক্ষা মৃৎপাত্রেই অধিক আঘাত লাগায় দময়ন্তী ক্রমে উন্মাদ, পরে প্রলাপ—এই অবস্থা পাইলেন।

যাঁহারা Shakespeareএর King Lear পড়িয়াছেন, তাঁহারা হয়ত দময়ন্তীর চিত্তবিকারের উপসর্গগুলিকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কবির উদ্দাম কল্পনা যে, দময়ন্তীর কথাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে নাই, একথা বলিতে চাহি না। তবে কবিকুলের নিরঙ্কুশত্ব এ দোষের কতকটা লাঘব করিতে পারে। দেশকালপাত্রের কথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। উন্মত্ত বচনেও King Lear রাজভাব ত্যাগ করেন নাই। বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা অন্তঃপুরচারিণী, কাব্যে ও কলায় প্রাচীন ভারতীয় ভাবের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিতা রাজনন্দিনীর মুখে কোন্ কথা অসম্ভব, তাহা জোর করিয়া বলা দুরূহ। শ্রীহর্ষের কল্পনা কত উচ্চগ্রামে উঠিতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় এইখানে। তাহাতে উৎকটতা বা উদ্ভটতার সীমা লঙ্ঘিত হইয়াছে কি না—তাহা সহৃদয়গণের স্ব স্ব অনুভব-সংবেদ্য।

রাজহংস অন্তর্হিত হইলে অনঙ্গশরাহতা দময়ন্তী অতি-মাত্র অধীর হইয়া পড়িলেন। কবি বলিতেছেন—

"ধ্রুবমধীতবতীয়মধীরতাং
দয়িতদূতপতত্রগতবেগতঃ—"

অর্থাৎ প্রিয়ের দূত-স্বরূপ সেই হংসের পক্ষসঞ্চালন হইতেই দময়ন্তী এই অধীরতা শিক্ষা করিয়াছেন—কেননা,

তদুদিতঃ সহি যো যদনন্তরঃ।

Immediate sequence বা আনন্তর্য্য কারণের লক্ষণ; যে বস্তু যাহার অব্যবহিতপরক্ষণবর্ত্তী তাহা তাহা হইতে উৎপন্ন, ইহা ত নৈয়ায়িক মাত্রেরই মত।

বিরহের অন্যতম উপসর্গ—গাত্র-সন্তাপ—দময়ন্তীর পক্ষে শ্রীহর্ষ ইহার এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনারা যে Absorption and Radiation of Heatএর বিষয় অবগত আছেন—ইহা তাহারই একপ্রকার প্রয়োগ বা application। কবি বলিতেছেন—

"করপদাননলোচননামভিঃ
শতদলৈঃ স্বতনোর্বিরহজ্বরে।

রবিমহো বহুপীতচরং চিরা-
দনিশতাপমৃষাদুদসৃজ্জত ॥"

অর্থাৎ—সূর্য্যকরপাতে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হয়—ইহা সর্ব্বজনবিদিত। দময়ন্তীর হস্ত, পদ, মুখ ও চক্ষু শুধু বিভিন্ন নামে পদ্মেরই বিকাশ। পদ্মগুলি এখন প্রফুল্লতা-নিদান সূর্য্যকর ত্যাগ করিতেছে—দময়ন্তীর বিরহজ্বর শুধু সেই বিসৃজ্যমান সঞ্চিত উত্তাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"অথ মুহুর্বহুনিন্দিতচন্দ্রয়া
স্তুতবিধুন্তুদয়া চ তয়া পুনঃ।
পতিতয়া স্মরতাপময়ে গদে
নিজগদে হশ্রুবিমিশ্রমুখী সখী।"

অনন্তর বিরহতাপপীড়িতা দময়ন্তী—অশ্রুপূর্ণেক্ষণা সখীকে উদ্দেশ করিয়া নানাপ্রকারে চন্দ্রের নিন্দা এবং রাহুর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

"অয়ি বিধুং পরিপৃচ্ছ গুরোঃ কুতঃ
স্ফুটমশিক্ষ্যত দাহবদান্যতা।
গ্লপিতশম্ভুগলাদ্গরলাত্ত্বয়া
কিমুদধৌ জড় বা বড়বানলাৎ ॥"

অয়ি চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কর যে, কোন্ গুরুর নিকট তাহার এই দাহিকা শক্তির শিক্ষা হইয়াছে—হরশিরে বাস-হেতু শম্ভুগলস্থিত গরল হইতে, অথবা সমুদ্রে জন্ম বলিয়া বড়বানল হইতে?

"অয়মযোগিবধুবধপাতকৈ-
র্ভ্রমিমবাপ্য দিবঃ খলু পাত্যতে।
শিতিনিশাদৃষদি স্ফুটমুৎপতৎ
কণগণাধিকতারকিতাম্বরঃ ॥"

অহরহঃ চন্দ্র বিরহিণীর বধ-সাধনে যে পাপ অর্জন করে—নিশ্চয় ইহাই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। প্রত্যহ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ভগবান্ তাহাকে প্রতিমাসে অমাবস্যার ঘন অন্ধকার-রূপ প্রকাণ্ড শিলাতে নিক্ষেপ করেন। এবং চূর্ণীকৃত চন্দ্রমণ্ডলের কণাসকল লাভ হওয়াতে সেই রাত্রিতে নক্ষত্রগুলি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

অতএব এ চন্দ্রের বিনাশ কর—কিন্তু তাহাকে হস্তগত করা যে দুরূহ। দময়ন্তী উপায় বলিতেছেন—

"কুরু করে গুরুমেকমযোঘনং
বহিরিতো মুকুরঞ্চ কুরুষ্ব মে।
বিশতি তত্র যদৈব বিধুস্তদা
সখি সুখাদহিতং জহিতং দ্রুতং ॥"

সহচরি, এক হস্তে তুমি বিপুল লৌহময় মুষল ধর, আর বাহিরে একখানি মুকুর স্থাপন কর—যখন দুর্বিনীত সেই চন্দ্র মুকুরে প্রবেশ করিবে, তখন তাহাকে অনায়াসে চূর্ণ করিও।

পুনশ্চ—"বদ বিধুন্তুদালি মদীরিতৈ-
স্ত্যজসি কিং দ্বিজরাজধিয়া বিধুং।
কিমু দিবং পুনরেতি যদীদৃশঃ
পতিত এষ নিষেব্য হি বারুণীং ॥"

অয়ি সখি, রাহুকে আমার হইয়া বল, যে চন্দ্রকে দ্বিজ-রাজবোধে একেবারে গ্রাস করিতে সে যেন নিরস্ত না হয়। কেননা, দ্বিজত্ব তাহার নষ্ট হইয়াছে। বারুণী-সেবনে ব্রাহ্মণের পাতিত্য,—ইহা শাস্ত্রের বিধি। চন্দ্রও বারুণী অর্থাৎ পশ্চিম দিকে অস্তগমন করিয়া থাকে—অতএব তাহার আর অন্তরীক্ষে উদয় বা স্বর্গলাভের অধিকার নাই।

এইবার অনঙ্গদেবের পালা। দময়ন্তী বলিতেছেন—

"অনুমমার ন মার কথং নু সা
রতিরতিপ্রথিতাপি পতিব্রতা।
বিরহিণীশতঘাতনপাতকী
দয়িতয়াপি তয়াসি কিমুজ্ঝিতঃ ॥"

হে মন্মথ, প্রসিদ্ধ সাধ্বী হইয়াও রতি তোমার কেন অনুমরণ করে নাই, তাহা এখন বুঝিয়াছি। শত শত বিরহিণী কামিনী বধ করিয়াছ বলিয়া তুমি মহাপাতকী—পতিত স্বামীর অনুমরণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। হায়! হায়! পরিশেষে তোমার দয়িতাও কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছে!

"ত্বমুচিতং নয়নার্চ্চিষি শম্ভুনা
ভুবনশান্তিহোমহবিঃ কৃতঃ।
তব বয়স্যমপাস্য মধুং মধুং
হতবতা হরিণা বত কিং কৃতং ॥"

মহাদেব লোচনাগ্নিতে তোমাকে হবিরূপে পরিণত করিয়া যে, ত্রিভুবনের শান্তিকর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন,

ইহা উচিতই হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণ তোমার বয়স্য মধুকে ত্যাগ করিয়া দৈত্য মধুকে বিনষ্ট করিয়াছেন—ইহাতেই যত গণ্ডগোল রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ প্রলাপের পরই—"মুমূর্চ্ছ সা মনসি-মূর্চ্ছিতমন্মথ-পাবকা"। অবিলম্বে ভীমরাজের কর্ণে কন্যার এই দশার কথা পঁহুছিল। রাজা—অমাত্য ও ভিষক্ সহকারে কন্যার অবস্থা নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। মন্ত্রী ও বৈদ্য উভয়েই সমস্বরে বলিলেন—

"দেবাকর্ণয় সুশ্রুতেন চরকস্যোক্তেন জানেঽখিলং
স্যাদস্যা নলদং বিনা ন দলনে তাপস্য কোঽপি ক্ষমঃ।"

শ্লোকটি শ্লিষ্ট। মন্ত্রিপক্ষে—হে রাজন্! অবধান করুন; আমি চরক বা চরের বার্ত্তা, সুশ্রুত বা অভিনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া, এই রহস্যের মর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছি যে, নলকে উপস্থিত করিতে পারে, এরূপ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ এই তাপের উপশম করিতে পারিবে না। বৈদ্য পক্ষে—চরক ও সুশ্রুত পাঠে আমি ইহাই তত্ত্ব বুঝি যে, নলদ অর্থাৎ উশীরানুলেপন ব্যতীত আর কিছুতে এ তাপের লাঘব হইতে পারে না।

কিন্তু বিভিন্নার্থবাচক অথচ সমপদনিবদ্ধ এই উত্তর—

"শ্রোত্রে তু তস্য পপতুর্ন্ পতের্ন কিঞ্চিৎ
ভৈম্যামনিষ্টশতশঙ্কিতয়াকুলস্য।"

কন্যার এই দৈন্যদর্শনে বিমনায়মান নৃপতির কর্ণে পশিল না। কিন্তু,—"ঝটিতি পরাশয়বেদিনো হি বিজ্ঞাঃ"—আকারেঙ্গিতে কন্যার অবস্থা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না—এবং প্রশ্নাদি না করিয়া—

"ব্যতরদথ পিতাশিষং সুতায়ৈ
নতশিরসে সহসোন্নময্য মৌলিং।
দয়িতমভিমতং স্বয়ম্বরে ত্বং
গুণময়মাপ্নুহি বাসরৈঃ কিয়দ্ভিঃ॥"

পিতা তখন ভূলুণ্ঠিতা দুহিতার মস্তক উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"অল্পদিনের মধ্যেই স্বয়ম্বরে মনোমত প্রিয় লাভ কর।" বলা বাহুল্য রাজবুদ্ধির এই চতুর পরিচয়ে সখীগণ কথঞ্চিৎ লজ্জিত ও সর্ব্বথা আশ্বস্ত হইল।

* * *

উপরে নৈষধের প্রথম চারি সর্গের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়াস করিয়াছি। এরূপ দুরূহ গ্রন্থের পরিচয় দিবার উদ্যম মাদৃশের পক্ষে নিতান্তই দুঃসাহসের কথা সন্দেহ নাই। পদে পদে, আশঙ্কা করি, প্রত্যবায়ই ঘটিয়াছে। তবে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণকে সমগ্রের পরিচয় বলিয়া কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হন। তদ্ভিন্ন এ পরিচয়ে ওরূপ গ্রন্থের মর্য্যাদার লাঘব হইয়াছে কি না, এরূপ ব্যাখ্যান অপেক্ষা অপরিচয় ইষ্ট ছিল কি না—এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা বিদ্বন্মণ্ডলীর সমীপে অর্পণ করিলাম।

নৈষধ-চরিত মহাকাব্য বা Epic হিসাবে কোন্ শ্রেণীভুক্ত বা কোন্ কোন দোষদুষ্ট, নায়ক ও নায়িকার চরিত্র বর্ণনে কবি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, গল্পাংশে সামঞ্জস্য ও ক্রমপরিণতি রক্ষিত হইয়াছে কি না—এ সকল প্রশ্নের সমাধান উপস্থিত প্রবন্ধের বিষয় নহে। "কাব্য রসাত্মক বাক্য" শুধু এই লক্ষণের মানদণ্ডে ইহাতে কোন চমৎকারিতা পাওয়া যায় কি না—ইহাই আমাদের আলোচ্য। নৈষধ-চরিতকে কেবল মাত্র উদ্ভট কবিতার রাশি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা ন্যায়তঃ সমীচীন নহে। আমার মনে হয়, বিশ্বের সাহিত্যে এ জাতীয় কবিতার একটি নির্দ্দিষ্ট ও স্থায়ী অধিকার আছে। সে অধিকার প্রকৃত কাব্যের সীমানার বাহিরে নহে,—ভিতরে। ইহাকে অকাব্য বা অসৎকাব্য আখ্যায় আখ্যাত করিলে কাব্য-সংজ্ঞারই মূলতঃ পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক Platoর আবির্ভাব কালের ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে, প্রসিদ্ধ মনীষী Emerson তাঁহার "আদর্শ পুরুষ" (Representative Men) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই এমন একটি মুহূর্ত্ত আসে, যখন পাশব-উদ্দাম-অবস্থা অতিক্রম করিয়া, তাহার অনুভব-শক্তি পুষ্টি ও পূর্ণতা লাভ করে—অথচ আণুবীক্ষণিক বিচক্ষণতা-প্রবণ হয় না—যখন দানব-বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে চরণদ্বয় স্থাপন করিয়াও সে মস্তিষ্ক ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে সৌর ও নক্ষত্র-লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে। ইহাকে সুস্থ যৌবন-সময় আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে—ইহা শক্তি-বিকাশের চরম সন্ধিক্ষণ।"

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলিকে স্থূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। মানুষের জীবন—কৌমার, যৌবন ও জরারূপ যে তিন স্তরে বিশ্লিষ্ট, তাহার এক একটিতে এক একটি বৃত্তির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শৈশব শুধু ভাসা ভাসা সুখদুঃখের অনুভূতি লইয়াই

গঠিত। যৌবনের নামান্তর কর্ম্মজীবন। আর "বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ"—এ সময় জ্ঞানার্জ্জনী বা চিৎপরা বৃত্তিরই একাধিপত্য। জীবনযাত্রার এক এক পর্ব্বে এইরূপ বৃত্তি-বিশেষের প্রাধান্য থাকিলেও সাধারণতঃ মধ্য বয়সে বা যৌবনে এই তিনের এক প্রকার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। এবং ইহাই স্বাভাবিক, কেন না সেই সময়ে সকল শক্তিই প্রখরতা পায়। মনোবৃত্তিসমূহের এই সুষমাই যৌবনের পরিস্ফুট লক্ষণ। সেইরূপ, কোনও জাতি যখন পূর্ণভাবে সজীব ও জাগ্রত থাকে—যখন সে পূর্ণযৌবনের অধিকারী হয়, তখন বৃত্তিবিশেষ পরিশিষ্টগুলিকে ধ্বস্ত বা সঙ্কুচিত না করিয়া, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, অন্যোন্যের উন্নতির পোষকতা করিয়া, মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে এইরূপ এক মহাক্ষণে দার্শনিকগণচূড়ামণি Platoর আবির্ভাব হয়। জাতীয় শক্তিনিচয়ের এইরূপ এক স্বাস্থ্যের দিনে শ্বেতদ্বীপের সৌভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Shakespeare অবতীর্ণ হন। এবং মনে হয়, হিন্দুস্থানের এইরূপ যৌবনসময়ের এক গৌরবোদ্ভাসিত দিবসে কবিকুলভাস্কর কালিদাস লোক-লোচনগোচর হন। কালিদাস—নাটক, গীতিকাব্য ও মহাকাব্য—সাহিত্যের এই তিন বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন—এবং বাণীর বরপুত্রের লেখনীস্পর্শে প্রত্যেক রচনাই বিশুদ্ধ স্বর্ণের আভা ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু চিরদিন কখন সমভাবে যায় না,—তাহা কি ব্যক্তির পক্ষে, কি সমষ্টির পক্ষে। পত্রপুষ্প সম্পূর্ণ উদ্গত ও প্রস্ফুটিত হইয়াই শুকাইতে থাকে, ফলগুলি সুপক্ক হইবার পরই পর্য্যুষিত হইতে আরম্ভ করে। বাহ্যতঃ অশোভন এই শুষ্কতা বা পতন, যে নিয়মে ফুল ফোটে, ফল পাকে—তাহারই বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ মাত্র। এ সকলেই উদ্ভিদ্-জগতের ধারাবাহিক অস্তিত্ব রক্ষার উপায়। আমরা কালিদাসের সমাদরকে স্বাভাবিক বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি কিন্তু তাহার ফলে অন্য কবিবরকে অবজ্ঞা করিতে প্রস্তুত নহি। কালিদাসের পরবর্ত্তী সকল কাব্যে বৃত্তি-নিচয়ের যে সুষমাকে আমরা জাতীয় যৌবনের সন্ধি-পরিচায়ক বলিয়া ধরিয়াছি—সেই সুষমা দেখিতে পাই না। তাহার পরিবর্ত্তে একটা অসামঞ্জস্য যেন প্রকটভাবে লক্ষিত হয়। ভাবের পরিবর্ত্তে যেন ভাষার চাতুরী অধিক প্রশংসনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কাব্যে যেন চিন্তাশক্তির প্রাধান্যই আপনাকে প্রচার করিতেছে।

একদেশদর্শী সম্প্রদায়বিশেষ প্রশংসক সমালোচকের চক্ষে হয়ত এই যুগ সাহিত্যেতিহাসে নিরর্থক, অনুপভোগ্য বা অবনতির চিহ্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়,—কিন্তু মনে রাখা উচিত যে,যে সময়কে আমরা ঘূর্ণীপাক বা আলস্য বা রোমন্থন বা হীন অনুকরণের যুগ বলি, সে সময় পরিশ্রান্ত জাতীয় আত্মা হয়ত বিশ্রাম লাভ করিতেছিল—হয়ত পরবর্ত্তী যুগের বিচিত্র ও অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য শক্তি ও উপকরণ সঞ্চয় করিতেছিল—হয়ত সুপ্তির ঘোরে স্বপ্নের মাধুরী সংগ্রহ করিয়া নববলে বলী হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে জাগরিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিধাতার নিয়মে—জড়প্রকৃতির রাজ্যে বা মানবমনোজগতে অবিমিশ্র ক্ষতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই। একদিকে উপচয় অন্যদিকে অপচয়ের নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র। দুরবস্থা ও অবনতির মধ্যেও মঙ্গলের, সৌন্দর্য্যের, আশার মূর্ত্তি, ক্ষীণ ভাবে হউক, কিংবা বিকৃতভাবে হউক, বিরাজ করে, এবং তাহার অস্তিত্বে উদার বিশ্বাসভরে আস্থান্বিত হইয়া অন্বেষণের চেষ্টাই—মনে করি, বিংশশতাব্দীর সমালোচনা-প্রণালীর বিশেষত্ব।

ইংরাজীসাহিত্যে খ্রীঃ সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপ এক সময় উপস্থিত হয়। তখন বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকবি Shakespeare সাহিত্যাকাশ হইতে অস্ত হইত হইয়াছেন। Ben Jonson প্রভৃতি তাঁহার শক্তিমান্ সহযোগীরাও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন। Englandএর রাষ্ট্রনীতি তখন মহাকুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। পূর্ব্বগামী যুগের অসামান্য মানসিক পরিশ্রমের পর সমস্ত জাতির মস্তিষ্ক তখন যেন বিরাম লাভ করিতেছিল। একা Miltonএর বজ্রনির্ঘোষী কণ্ঠব্যতীত কোন ওজস্বী কবির স্বর তখন অশ্রুত। কবিতা তখন অলস দিবসের বিনোদনোপায়মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। এই যুগের ক্ষীণকণ্ঠ কবিকুলের মৃদুকাকলী সম্বন্ধে Dr. Johnson বলিয়াছেন—"Wit may be considered as a kind of *discordia concors*; a combination of dissimilar images or discovery of occult resemblances in things apparently unlike. Of wit

thus defined, they have more than enough. The most heterogeneous ideas are yoked together by violence; nature and art are ransacked for illustrations, comparisons and allusions; their learning instructs and their subtilty surprises; but the reader commonly thinks his improvement dearly bought; and, though he sometimes admires, is seldom pleased." এই সম্প্রদায়ের কবিগণকে তিনি Metaphysical বা অবাস্তব আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এদেশে এজাতীয় কাব্যকে উদ্ভট কাব্য নাম দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তিষ্কের অপব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন প্রীতিপ্রদ বিশেষত্ব নাই। শ্রীহর্ষের কাব্যের একটা দিক্ উদ্ধৃত সন্দর্ভে সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই কারণেই শ্রীহর্ষকে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও সমান দোষ-গুণভাক্ মনে করা উচিত নহে। দুইয়ের মাঝে পার্থক্য বিস্তর—এবং এ পার্থক্যের ভিত্তি সংস্কৃত ভাষার অনন্য-সাধারণ প্রকৃতিতে নিহিত।

ইংরাজীনবিশ সমালোচক সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে বসিলে, একটা কথায় ভুল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেটা সংস্কৃত ভাষার বিশেষত্ব—শ্লেষানুকূলতা। এই গুণটি যে, লেখকবিশেষের নিজস্ব সৃষ্টি, তাহা নহে—সমগ্র ভাষার মজ্জার সহিত এই একটি ধর্ম্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। প্রথমেই যে Association of Ideas নামক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছি, ইহাকে তাহারই অন্যতম বিকাশ বলা যাইতে পারে। এই Association of Ideas বাক্যের দ্বিবিধ স্বরূপ, শব্দ ও অর্থ, এই দুএরই চারিপাশে মাকড়শার জাল বিছাইয়াছে। শাব্দিক Association গুলিকে কাব্যের সেবায় লাগাইবার চেষ্টা অনুপ্রাস, Alliteration এবং Assonance, Euphony এবং Onomatopœia, রীতি ও গুণের আকার ধারণ করিয়াছে। অর্থকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল Associations আছে, সেই ভাবের তন্তুগুলিকে রঞ্জিত করিয়া অসংখ্য অর্থালঙ্কারের উৎপত্তি। কিন্তু শব্দ ও অর্থ এই উভয়েরই পারিপার্শ্বিক ভাবের জালকে অনুস্যূত করিয়া, সাহিত্যের এক বিচিত্র আভরণ হয়, তাহার নাম শ্লেষ। শাব্দিকেরা বলিয়া থাকেন যে, মোট ১৯৪৪ সংখ্যক root বা ধাতু দ্বারা সংস্কৃত ভাষা গঠিত। এই কয়টি root লইয়া, প্রত্যয়ের সাহায্যে, এই বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য-কানন রচিত হইয়াছে। মেদিনী, হেমচন্দ্র ও অমরকোষ-ধৃত অপার শব্দসাগর, এই মুষ্টিমেয় প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অশেষবিধ যোগাযোগেরই রচনা। আবার সন্ধি ও সমাস, এই বৈচিত্র্যের বিধানে সহায়তা করে। সংস্কৃত ভাষার এই যে বিচিত্র 'টানাপড়েন' 'web and woof'—ইহাকে হিন্দু-সমাজ-সংস্থাপনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কিংবা এক বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের সদৃশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অল্পসংখ্যক মূলপুরুষ হইতে যেখানে প্রকাণ্ড সমাজের উদ্ভব, সেখানে যেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত প্রত্যেক অপর ব্যক্তির সম্বন্ধ নানাসূত্র আশ্রয় করিয়া থাকে—এবং আত্মীয়তার অশেষ প্রকার জটিল বন্ধনের কারণ হয়—সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলির মধ্যেও সেইরূপ। এবং ধাতুগত মূল ঐক্যের ফলেই সংস্কৃত ভাষায় শ্লেষের সুকরতা ও প্রাধান্য। এক্ষেত্রে অনূদ্যতা বা ভাষান্তরিত করার সুবিধা বা translatability—কাব্যের সার্ব্বজনীনতার universalityর পরীক্ষার উপায়—এই প্রবচনের প্রয়োগ চলিবে না। সংস্কৃত ভাষার এমন যদি কোন বিশেষ ধর্ম্ম থাকে, যাহা পরিবর্ত্তিত ও অনূদিত না হইয়াই সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির হেতু হয়—সেই বিশেষত্বের জন্য লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না, বা সেই বিশেষত্বকে অসৎকাব্যের অলঙ্কার মনে করিবার যুক্তি দেখি না। আম্রবৃক্ষ শীত-প্রধান দেশে জন্মায় না—বরং রোপিত হইলে মরিয়া যায়—অতএব ভারতবর্ষে জাত, বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক আম্রফল, সেই দেশের লোকের তৃপ্তিকর হইবে না—তাহা মনে করা মহা ভ্রম। ভারতের সহিত ইউরোপের পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে—চূতফলের সুতারও সার্ব্বজনীন তৃপ্তির বস্তু হইয়াছে। সেইরূপ, সংস্কৃত সাহিত্য যদি সাধারণ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়—তাহা হইলে, সংস্কৃত ভাষার ঐন্দ্রজালিক গণ্ডীর মধ্যে, এখন যে সকল বৈচিত্র্য আবদ্ধ রহিয়াছে—তাহা বিশ্বের আনন্দপ্রদ সম্পদে দাঁড়াইবে।

অন্তঃকরণের বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে যে দুইটিকে, চিৎপরা বা intellect, এবং রসপরা বা emotion, আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে—কাব্যের সৃষ্টিবিষয়ে সে উভয়েরই সমান উপযোগিতা।

সাহিত্যদর্পণকার রসস্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে অতি সারবান্ ও অবিসংবাদনীয় ভাবে এই তত্ত্বটি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "রসোঽয়ং আনন্দচিন্ময়ঃ লোকোত্তরচমৎকার-প্রাণঃ"। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এবংবিধ রসের উপলব্ধিতে উক্ত উভয় বৃত্তির সাঙ্কর্য্য অপরিহেয়—অনিবার্য্য। পদ্যকাব্যে এই চমৎকারিতার উৎপাদনে ছন্দোবন্ধন সমধিক সহায়তা করে—ইহা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। কিন্তু কবিপ্রতিভার বৈলক্ষণ্য হিসাবে কোথাও একটি বৃত্তির অল্পতা কোথাও বা আধিক্য থাকাই স্বাভাবিক। ইংরাজীতে যাহার Didactic বা শিক্ষামূলক কবিতা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে এবং যে পর্য্যায়ে আমাদের পৌরাণিক সাহিত্য প্রায়শঃ অন্তর্ভুক্ত—সেই Didactic Poetryতে, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত Metaphysical বা উদ্ভট কবিতায়, এই চিৎপরা বৃত্তিরই প্রখর পরিচয় পাইয়া থাকি। এই জাতীয় পদ্যরচনাকে কাব্যের গণ্ডীর মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত কি না—তাহার নির্দ্ধারণকল্পে Watts Dunton বলিতেছেন—

"Unless the rhythm of any metrical passage be so vigorous, so natural, and so free, that it seems, that it could live, if need were, by its rhythm alone, that passage has no right to exist, and should be, if the substance is good, forthwith demetricized and turned into prose."

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই উক্তির সমর্থন করি, এবং এই মতবাদের উপরই দণ্ডায়মান হইয়া বলি, যে চিৎপরা বৃত্তির প্রাধান্যের জন্য নৈষধচরিতকে কাব্যের বাহিরে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহিলে—ইহার ছন্দোবন্ধনের কৌশল ও পদ-লালিত্য তাহার প্রধান অন্তরায় হইবে। এই পদলালিত্যের প্রমাণের জন্য শ্লোকবিশেষ আর উদাহৃত করার প্রয়োজন নাই। ইহার নিদর্শন প্রতি শ্লোকে—প্রতি ছত্রে বর্ত্তমান—অন্বেষণ নিরর্থক।

রসের প্রাণ যদি "চিত্তবিস্তাররূপঃ বিস্ময়াপরপর্য্যায়ঃ" হয়, তাহা হইলে নৈষধে এই চমৎকারিতার বিস্তর উপাদান রহিয়াছে। তবে একটু মজা আছে। কোন একটা রস বা emotion যখন আমাদের সমস্ত হৃদয়কে আঁকড়াইয়া ধরে—তখন আমরা বাহ্য পদার্থনিচয়ের মধ্যে, যে একটা পরিমাণবৈষম্য বা অনুপাত আছে, তাহা ঠিক রাখিতে পারি না; উপস্থিত ক্ষণটা বড়ই দীর্ঘ মনে হয়। প্রত্যক্ষগুলি বিকৃত আকার ধারণ করে, সু-কে কু দেখি, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মাঝে গোল করিয়া ফেলি। যখন কাব্যে বা নাটকে সেই রসের অবতারণা করিতে হয়, তখন মাত্রা-বিলোপী এই অনুভববিকারটিকে পাঠকের প্রত্যক্ষ করিয়া দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্য চিৎপরা বৃত্তিকে দ্বার করিয়াও সিদ্ধ হইতে পারে এবং রসপরা বৃত্তির একমাত্র সাহায্যেও সম্ভব। রসপরা বৃত্তির ব্যবহারে কবি যদি ইহা সমাধা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে Absolute Vision বা নাট্যকারের নাটকীয় বস্তুর সহিত একাত্মতার অধিকারী হইতে হয়। শ্রীহর্ষ প্রায়শঃই তাহা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই—তাই তিনি বহু স্থলে শুধু Intellectual Images-এর দ্বারা কায সাধিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। sublimity বা দিব্যানুভূতির বা উদাত্ততার অভাবে অতিশয়োক্তি ও উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় লইয়াছেন। কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গ ও নৈষধচরিতের চতুর্থ সর্গের তুলনায় এই পার্থক্য প্রস্ফুট হইবে।

উপরি নিবদ্ধ মতামত হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি নৈষধকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কাব্য বলিয়া পরিগণিত করি। নৈষধের দোষ আছে—অন্যথা ইহা আধুনিক পাঠকের নিকট অপরিচয় ও অবজ্ঞার শাস্তি ভোগ করিবে কেন? কিন্তু সে দোষ—অবোধ্যতা বা জটিলতা নহে। শিশুপালবধে, বোধ করি, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ বেশী হইবে। শব্দবিন্যাসের যে চাতুরী ইহাতে আছে—তাহাকে কৃত্রিম চিত্রকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত নহে। কল্পনা প্রাকৃত পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া, সময়ে সময়ে উৎপথ-গামী হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—কিন্তু তাহা মোটের উপর রসাপকর্ষক হইয়াছে বলিয়া, পূর্ব্বসূরিরা মনে করেন নাই—আমারও মনে হয় না।

নৈষধচরিতের উপযুক্ত সমাদরের পথে—প্রকৃত অন্তরায়, আমার ধারণায় ইহাই যে, কবি proportion সুসংস্থান বা অনুপাতের দাবী আদবেই রক্ষা করেন নাই। কতদূর বলিলে যথেষ্ট হয়—কিসের অধিক বলিলে, তৃপ্তির মাত্রা ছাড়াইয়া, আমরা তিক্ততার মাঝে পৌঁছাই—

অনির্দ্দেশ্য হইলেও, সকলেরই বোধগম্য, সেই সূক্ষ্ম বেষ্টনীর মধ্যে তিনি আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। প্রতি সর্গেই ১৫০ শ্লোক থাকিবে। তা' সমস্ত সর্গ দময়ন্তীর প্রলাপ-বচনেই পূর্ণ হউক—কিংবা আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ দেহবর্ণনাতেই পূর্ণ হউক। এবিষয়ে কবি নিজের কথাই ভুলিয়া যান—

"অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা
স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা ॥"

আর সকল দোষের মূলাধার যে দোষটি, তাহা এই যে, তিনি অত্যন্ত Subjective বা চিন্তাজড়, আপনার কল্পনাতে আপনি বিভোর! যেখানে আমরা impressions বা অনুভব চাই—সেখানে তিনি reflections বা কল্পনা দিয়া পূরাইতে চাহেন। তাই, তাঁহার বর্ণনায় সচরাচর কল্পনার চাতুরীই প্রকাশ পায়—বর্ণিত বস্তুর স্বরূপ আমাদের মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠে না। এই চিন্তার কূটজাল ছেদ করা ব্যস্ত, চঞ্চল, কর্ম্মপ্রিয় এই যুগে অকর্ম্মণ্যের সময়ক্ষেপের উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে নৈষধচরিতের প্রতি উপস্থিত বিরাগ, সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে, যুগধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। Lord Byron তাঁহার গ্রন্থের প্রকাশক John Murrayকে একপত্রে লিখিয়াছেন—"So far are principles of poetry from being invariable, that they never were nor ever will be settled. These principles mean nothing more than the predilections of a particular age, and every age has its own, and a different from its predecessor. It is now Homer, and now Virgil; once Dryden, and then Sir Walter Scott; now Corneilele now Raeine; now Crebillon, and now Voltaire". এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও ইহা যে আংশিক সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আশা হয়—

"This strange disease of modern life,
With its sick hurry, its divided aims,
Its heads o'er-tared, its palsied hearts"—

চিরদিন স্থায়ী হইবে না। ভারতেতিহাসের যেরূপ অধ্যায়ে শ্রীহর্ষের মত কবির গান ভারতীকে প্রীত করিয়াছিল—নৈষধ বোধ করি, সেইরূপ কোন সময়ের প্রতীক্ষায় আছে। "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ।" এখন আমরা সকল জিনিষই লাভক্ষতির চক্ষে দেখিয়া থাকি—শুধু অনাবিল আনন্দ পাইবার উদ্দেশ্যে কিছুই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দুরূহ জটিল দার্শনিক চিন্তার অবসরে কাব্যকে আশ্রয় করিতেন। এখন আমরা সাহিত্যের সকল বিভাগের উপরই চিন্তার গুরুভার—mass of thoughts—আরোপ করিতে চাহি। সেইজন্য যে কাব্য 'Criticism of life' নহে—যাহাতে জীবন-সংগ্রামের কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হয়—সে কাব্যে আমাদের মন উঠে না। তাই মনে হয়, আবার যখন ভারতে অর্থলালসাবর্জ্জিত লাভক্ষতিবিচার-বিমুক্ত, শুদ্ধ আনন্দ উপভোগের অবসর ও প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবে—তখন শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতকে গুরু-গৃহের শান্ত কুটীরে আদরে বরণ করিয়া লইব—রাজার প্রাসাদে ও বিদ্বানের পরিষদে সম্মানের স্বর্ণাসনে বসাইয়া ইহার কল্পনার উচ্ছ্বাসে মাধুর্য্যরসসিক্ত হইতে পারিব।

রাস-পূর্ণিমায়

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

আজিকে পূর্ণিমা রাত্রি—রাস পৌর্ণমাসী,
গত পূর্ণিমায় মোরা ছিনু এক ঠাঁয়ে,
অঙ্কে মোর রাখি শির সে কহিল হাসি—
"বিশ্বস্রোত হেথা কেহ রাখে না থামায়ে ?
এই ঠাঁই, এই নিশি, এ প্রিয়-মিলন,
স্থির হয়ে যাক বিশ্ব হেথায় রহিয়া !"
আমি কহিলাম, "মূঢ়ে—হেরিছ স্বপন,
বিশ্বেরে সৃজিতে চাও নূতন করিয়া ?"
দেশ-কাল চলিয়াছে আপনার পথে
নানা সাজে মিলে ছাড়ে ঘুরে দুটি রথে,
পারেনি'ক প্রিয়া মোর দুটি ক্ষীণ করে
একত্র বাঁধিতে দোঁহে রথচক্র ধরে,
কাল সে ফিরেছে আজ—আজি জ্যোৎস্না রাতে
সে দিনের দেশ, হায়, আজি নাই সাথে !

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

(২৫)

প্রাতঃকালের ঘটনায় সমস্ত দিনটাই আমাদের একরূপ গোলমালে কাটিয়াছিল। গণেশ-খুড়ার প্রহারে কার্ত্তিকও কিছু হতভম্ব হইয়াছিল। সেইজন্য যে রাঁধুনি বামুনকে তাহার আনিবার কথা ছিল, তাহাকে সে আনিতে পারে নাই। অগত্যা মাকে নিজেই আজ পিতার জন্য অন্ন-প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

কাজের ব্যস্ততায় দিবসে মা আমার দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। অপরাহ্ণে আমার চক্ষু ছলছল করিতেছে দেখিয়া তিনি আমার গাত্র পরীক্ষা করিলেন। বুঝিলেন, আমার জ্বর হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার মহাশয় আসিলেন। মাতৃ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনিও আমার নাড়ী-পরীক্ষা করিলেন। তিনিও বুঝিলেন জ্বর। তবে জ্বর অতি সামান্য। গাত্র ঈষদুষ্ণ। নাড়ী সামান্য চঞ্চল। আমার আর পড়া হইল না। পরীক্ষার মুখে পাঠের ব্যাঘাত হইল বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় আশ্বাস দিলেন, সামান্য সাবধানতায় পর দিবসেই আমি সুস্থ হইব।

সন্ধ্যার সময় পিতা কাছারী হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই আমার জ্বরের সংবাদ পাইলেন। সংবাদ আমারই মুখে পাইলেন। যদি আহারের ব্যাঘাত না হয়, অথবা শরীরের কোন যন্ত্রণায় কাতর হইতে না হয়, তা হইলে জ্বরটা বালকের পক্ষে একটা খুব আমোদের জিনিষ। পড়া-শুনাটা বন্ধ হইয়া যায়, একটু আধটু দুষ্টামি করিলে পিতা-মাতার কাছে তিরস্কারের ভয় থাকে না। তাঁহাদের মমতা সে সময় ঘনাকারে পুত্রের দেহের চারিধারে বেষ্টন করিয়া থাকে।

জ্বর হইয়াছে শুনিয়া সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তিতে আমি গৃহের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলাম। সন্ধ্যামুখে পিতা বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। পড়া ছাড়িয়া আমাকে ঘুরিতে দেখিয়া, তিনি আমাকে তিরস্কারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমার মুখে অসুখের কথা শুনিবামাত্র তাঁহার ক্রোধ মমতায় পর্য্যবসিত হইল। গা নাড়াদিলে অসুখ বাড়িবে, বাড়িলে পরীক্ষা দিতে পারিব না, এইরূপ অনেক প্রকারের ভয় দেখাইয়া তিনি আমাকে শয্যায় আশ্রয়-গ্রহণের আদেশ করিলেন। বস্ত্রপ-রিবর্ত্তনাদি করিয়া তিনিও একবার জ্বরের পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় বুঝিলেন, জ্বর অতি সামান্য—শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ হইতে এক ডিগ্রী বেশী। মাকে বুঝাইলেন—মানসিক উত্তেজনাই ইহার কারণ। রাত্রিতে উপবাস দিলে, এবং একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিলেই পরদিন আর ইহা থাকিবে না।

মা এ আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি পিতাকে বলিলেন—"ডাক্তারকে ডাকিয়া দেখাও।"

পিতা বলিলেন—"তুমি কি পাগল হইয়াছ? সে ব্যক্তি কোম্পানীর চাকর বলিয়া কি এই সামান্য অসুখেও তাহাকে আনাইতে হইবে? আনিলে সে যে আমাকে বাতুল মনে করিবে।"

"বেশ, কার্ত্তিককে দিয়া তাঁহাকে জ্বরের সংবাদ দাও। ডাক্তার বাবু না আসেন, একটা ব্যবস্থাও ত বলিয়া দিতে পারিবেন। অন্য সময় হইলে বলিতাম না। সোমবার ও'র পরীক্ষা।"

মায়ের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পিতা ডাক্তার-বাবুকে পত্র পাঠাইলেন। পত্রে তাঁহার আসিবার অনুরোধ না থাকিলেও ডাক্তারবাবু আমাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি হাঁসপাতালের ডাক্তার। সহরে তাঁহার বহুদর্শিতার ও চিকিৎসার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। তিনিও পরীক্ষায় বুঝিলেন, জ্বর অতি সামান্য। পিতার মুখে প্রাতঃকালের ঘটনা তিনি কতকটা অবগত হইলেন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, একমাত্র উত্তেজনাই আমার

অসুখের কারণ স্থির করিয়া, তিনি ঔষধ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিলেন না।

এক, দুই, তিন দিন—সেই সামান্য জ্বরের বিচ্ছেদ হইল না। পিতা চিন্তিত হইলেন। মাতা ব্যাকুল হইলেন। ডাক্তার বাবু এ দুই দিনও আসিয়াছেন। বিরাম না হইলেও জ্বর কিছু নয় বলিয়া তিনি জনক ও জননীকে আশ্বাস দিয়াছেন। জনক আশ্বস্ত হইয়াছিলেন কি না মনে নাই। জননী আশ্বস্ত হইলেন না। আমার পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

এ তিন দিনের মধ্যে বাড়ীর অপরাপর অবস্থা পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইয়াছে। রাঁধুনী আসিয়াছে। সে ব্যক্তি দুই দিনেই কার্য্যতৎপরতা ও রন্ধনকুশলতা দেখাইয়া মাকে তুষ্ট করিয়াছে। পাঁচু ও কার্ত্তিক যেমন কাজ করে, তেমনই করিতেছে। কেবল ঝি নাই। আমাদের নিকট হইতে প্রাপ্য বেতনাদির অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, রবিবার প্রাতঃকালেই সে চলিয়া গিয়াছে। বিকালে ঝিয়ের পরিবর্ত্তে অপর এক ঝি আসিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিয়া তুষ্ট হই নাই।

ঝি আমাকে ভালবাসিত। চাকরীর জন্য প্রভু-পুত্রকে ভালবাসিতে হয় বলিয়া বাসিত না। কি জানি কেন, আমার প্রতি তাহার আন্তরিক একটা টান ছিল। আমাদের হুগলীতে আসার পূর্ব্বেই পিতৃ কর্ত্তৃক সে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই অবধি সে আমাদের কাছে ছিল। আমার জননীর তৎপ্রতি সময়ে সময়ে প্রযুক্ত অতি কঠোর বাক্য সহিয়াও সে আমারই জন্য আমাদের গৃহ ত্যাগ করে নাই। সেই ঝি চলিয়া গেল—আমার অসুখের কথা শুনিয়াও চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিল না।

এই তিন দিবস জ্বরের জন্য যে একটা বিশেষ কষ্ট, তা আমি অনুভব করি নাই। কষ্টের মধ্যে এক কষ্ট—উপবাস। ডাক্তারবাবুর আদেশমত দুই দিন আমি ভাত খাইতে পাই নাই। দ্বিতীয় কষ্ট—ঝির অদর্শন। সে রাত্রিতে আমার ঘরে শয়ন করিত। তাহার কাজ সারিয়া আমার গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে যদি না আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে সে আমাকে কত গল্প শুনাইত। ভূতের গল্প, পরীর গল্প, বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমীর গল্প—নানা সামাজিক কথা—কত ইতিহাস এই সংবৎসরের মধ্যে সে আমাকে শুনাইয়া গিয়াছে। তন্তুবায়দিগের পূর্ব্ব সৌভাগ্যের অবস্থা, দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ, পরে বিলাতী বস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্যদিগের ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারীতে অকালমৃত্যু এবং কালে তাহাদের ইন্দ্রভবনতুল্য অট্টালিকাদির ধ্বংস—এই সকল শোকোদ্দীপক ইতিহাসও সে আমাকে শুনাইতে বিরত হয় নাই। সেই ইতি-কথা হইতে বুঝিয়াছিলাম, একটি ধনাঢ্য বণিকের পৌত্রবধূ সর্ব্বস্বহারা ও অকালে স্বামীহারা হইয়া, অবশেষে একটি বন্য পল্লীর কুটীর হইতে একমাত্র শিশুপুত্রকে শৃগালের মুখে সমর্পণ করিয়া, পেটের দায়ে আমাদের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছে। এই একবৎসরের সাহচর্য্যে আমি ঝিয়ের পরম প্রিয় হইয়াছিলাম। ঝিয়ের সঙ্গও আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। ঝিয়ের অভাবটা আমি যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

যাক্ সে কথা। ডাক্তারবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, চতুর্থ দিবসে জ্বরের বিরাম হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তারপর পঞ্চম—ষষ্ঠ—সপ্তম—জ্বর গেল না। এইবারে ডাক্তার বাবুও চিন্তিত হইলেন। জ্বর কিন্তু সেই সামান্য। নিরেনব্বুই হইতে একশোর মধ্যে। তিনি বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, উদর সমস্তই সযত্নে পরীক্ষা করিলেন। ফুসফুস-যকৃতাদি কোনও যন্ত্রের তিনি দোষ দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং এই এক-জ্বরের কারণ-নির্ণয়ে তিনি অক্ষম হইলেন। তখন স্থির হইল, পর দিন সাহেব ডাক্তারকে আনাইয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

ডাক্তারবাবু আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নিষেধ সত্ত্বেও ঘরে কেহ না থাকিলে, আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের ইতস্ততঃ বিচরণ করি। সপ্তম দিবসের অপরাহ্নে বিছানা ছাড়িয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেখি, মা বাগানের ভিতর কি যেন একটা সামগ্রীর অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণে মা তন্ময়—কোনও দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এ গাছের তলা হইতে ও গাছের তলা—কখন উদ্যানপার্শ্বস্থ পথে কখন পরস্পরনিবদ্ধ গুল্মকুঞ্জে—কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া, কখন বা অর্দ্ধাবনমিত দেহে তীব্রদৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠ যেন বিদীর্ণ করিয়া, মা কোন হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। প্রথমে মায়ের এ অন্বেষণের মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণের

পরেই সেইস্থানে মায়ের মাদুলী-নিক্ষেপের কথাটা আমার মনে হইল। স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। এই সাত দিনের মধ্যে প্রথমতঃ আমি স্পষ্টতঃ দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পাছে মেজের উপর পড়িয়া যাই, এইজন্য তাড়াতাড়ি ফিরিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শয়নের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। যেন একটা মোহ—বেশ মিষ্ট মোহ—আবেশকর। চক্ষু মেলিতে ইচ্ছা হইতেছে না। অথচ নিদ্রাতন্দ্রা কিছু নয়। মুদ্রিত পলকের ভিতরে আমি চাহিয়া আছি। আমার চোখের উপর দিয়া লাল, নীল, পীত প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট এক মনোহর চন্দ্রাতপ যেন আকাশপথে ভাসিয়া যাইতেছে! সে চন্দ্রাতপের যেন অন্ত নাই! তাহার বর্ণবৈচিত্র্যেরও ইয়ত্তা নাই।

পিতার শয়ন-কক্ষের পার্শ্বেই আমার ঘর। মধ্যে একটি বড় দরজা। পিতার ঘরের দিক হইতেই তাহাকে খোলা ও বন্ধ করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আগে রাত্রিতে ঝি এই ঘরে আমাকে আগুলিয়া থাকিত। এই দুই দিন মা অবস্থান করিতেছেন।

আমার শয়নের বহুক্ষণ পরে মা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি বুঝিলাম, কিন্তু চক্ষু মেলিলাম না। আমাকে ডাকিলেন—আমি উত্তর দিলাম না। চক্ষু মুদিয়া মায়ের ক্রিয়াকলাপ আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। মা শয্যা-পার্শ্বে আসিলেন। আমার বক্ষ ও মস্তকে কর-স্পর্শ করিলেন। তার পর পার্শ্বের গৃহে চলিয়া গেলেন। আমি ঘুমাইতেছি মনে করিয়া আমাকে আর ডাকিলেন না।

ইহার পরেই পিতা কাছারী হইতে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাছারীর কাগজপত্রাদিপূর্ণ বাক্স মাথায় কার্ত্তিক আসিল। পিতা প্রথমে তাঁহারই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মাতাকে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

মাতা উত্তর করিলেন—"পোষাক ছাড়িয়া আগে একটু বিশ্রাম লও। তার পর নিজে দেখ। আমার মনে হইতেছে, হরিহরের আজ জ্বরের বিরাম হইতেছে। তাহার বুকে কপালে ঘাম। সে সুস্থ হইয়া ঘুমাইতেছে। তবে তুমি একবার না দেখিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।"

পিতা আর বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা করিলেন না। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়াই মায়েরই মত আমার বুকে ও কপালে হাত দিলেন। আমাকে একবার ডাকিলেন। আমি চোখ বুঝিয়াই উত্তর দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেমন আছি। ভাল আছি শুনিয়াই তিনি কার্ত্তিককে বলিলেন—"এখনি ডাক্তার বাবুকে খবর দে। বলে আয়, এখনি তাঁহাকে আসিতে হইবে।" কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি বাক্স রাখিয়া ডাক্তারকে খবর দিতে ছুটিল।

মাতা সন্ত্রস্তার মত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেখিলে?"

"খোকার জ্বর বিচ্ছেদ হইতেছে।"

"বাঁচলুম! তুমি যেভাবে কার্ত্তিককে হুকুম করিলে, শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে।"

"জ্বরের বিরাম অবস্থা বুঝিলে ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলিয়াছিলেন।"

"তা হলে তোমাকে বলি—"

এই বলিয়া মাতা মাদুলী সম্বন্ধে সমস্ত কথা পিতাকে শুনাইলেন। আমি সেইরূপই চোখ বুঝিয়া শুইয়া আছি। আমি শুনিতেছি ও দেখিতেছি। আমার চোখের উপর দিয়া ছবির পর ছবি ভাসিয়া যাইতেছে। আমি সে দৃশ্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

মায়ের কথা শুনিয়া পিতা একটু মৃদুহাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—"তুমি বেশ করিয়াছ। তুমি যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার সৎসাহস দেখাইয়াছ, তাহাতে আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বাড়ী হইতে আসিবার সময় শালতীতে উঠিবার মুখে বামুন আমার হাতে কতকগুলা ফুল দিয়াছিল। আমি তখনই সেগুলা জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।"

মা বলিলেন—"সে বামুন দেখিয়াছিল?"

পিতা বলিলেন—"না, মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া আমি তাহাকে দেখাইয়া নিক্ষেপ করি নাই। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, করা উচিত ছিল। বামুনপণ্ডিতগুলার দেখিতেছি কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, মর্য্যাদা-বোধও নাই। এসমস্ত তাহারই কাণ্ড। গণ্ডমূর্খ গণেশ ও সেই বোকা বুড়ীকে ওই বামুনই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। আনিয়া গণেশ আর বুড়ীকে সম্মুখে রাখিয়া, শিখণ্ডীর মত অন্তরাল হইতে সে আমাদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে।"

"মায়ের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে! ছেলে একটা হাকিম! রাজা-জমীদার পর্য্যন্ত যাঁর কাছে মাথা নোয়ায়, সাহেব দেখিলে সেলাম করে, তার মা হোয়ে বাগ্‌দিনীর পোষাকে এখানে কেমন কোরে আসিল ?"

"তার কথা আর তুলিয়ো না। অমন মায়ের বাঁচিবার আর প্রয়োজন নাই। হুগলী সহরে অনেকেই আজিকার দুর্ঘটনার কথা জানিয়াছে। হাকিমের দেউড়ী বলিয়া জনরব আমার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। নহিলে লোকলজ্জায় অস্থির হইয়া আজই আমাকে সহর ত্যাগ করিতে হইত।"

"হরিহর সারিয়া উঠুক। গর্ম্মির ছুটি পড়িলেই আমি কিছুদিনের জন্য উহাকে ওর মামার বাড়ী লইয়া যাইব। যত নষ্টের মূল সেই বামুন। সে কাণ্ডজ্ঞানহীন। আবার হয়ত আসিয়া কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসিবে।"

"হরিহরকে আর লইয়া যাইতে হইবে না। আমি আর একটা গ্রেডে উঠিলাম। এবারে আমি মহকুমার মেজেষ্টারী পাইব। কোথায় যাইব, এখনও ঠিক হয় নাই। যেখানেই হ'ক, গ্রামের কাউকে আর সে খবর দিব না।"

ইহার পরেই বুঝিলাম, পিতা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে, আমার কপালে একবার মাত্র অতি সন্তর্পণে করস্পর্শ করিয়াই মাতা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ঘর নিশীথের জনশূন্য প্রান্তরবৎ নিস্তব্ধ। আমি সে মধুর নিস্তব্ধতা এখন পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেছি। আমার চক্ষুর উপর দিয়া পূর্ব্ববৎ সেই বিচিত্র বর্ণমালা ভাসিয়া যাইতেছে। মনে হইতেছে, যেন অসংখ্য বর্ণাভি-মানী দেবশিশু আমার অপাঙ্গপার্শ্বে আমার দৃষ্টিসীমান্তে অবস্থিত এক নীলবর্ণ নদী-স্রোতে অবগাহন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে।

আমিও যেন তাহাদের একজন সঙ্গী। আমিও যেন সেই নদী স্রোতে গা ভাসাইবার জন্য তাহাদিগেরই মত ব্যাকুলভাবে, তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছি।

কিন্তু পা আমার চলিতেছে না। দেবশিশুগণ প্রতি পদক্ষেপে যেন দূর হইতে আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে আমি সঙ্গিহীন হইয়া পড়িলাম। সেই সুবিস্তীর্ণ নীলপ্রান্তরপথ দেখিতে দেখিতে জীবশূন্য হইল। আমার উল্লাস ভয়ে পরিণত হইল। আমি সঙ্গী খুঁজিবার জন্য চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম।

সেই অবস্থাতে আমার যেন অন্তশ্চক্ষুও মুদ্রিত হইয়া আসিল। আমি প্রাণপণে চোখ মেলিবার চেষ্টা করিলাম। পলক মুক্ত হইল না। তাহার উপরে কে যেন একটা বিশমণ ওজনের পাথর চাপাইয়া দিয়াছে। আমার সম্মুখে আর কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না।

তৎপরিবর্ত্তে শুনিতে পাইলাম। শুনিতে পাইলাম, নীল প্রান্তরের নিস্তরঙ্গ বায়ুসাগরপারে কে যেন করুণ কণ্ঠে রোদন করিতেছে।

আমি উৎকর্ণ হইয়া রোদনের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বুঝিতে পারিলাম না। স্বর পিতামহীর। আমার শ্রবণের আকুল আগ্রহে কর্ণরন্ধ্র লক্ষ্যে ছুটিয়া আসিতে ভাগীরথীর কুলকুল ধ্বনির ন্যায় এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতধারায় বাধা পাইয়া আবার সে সাগরপারে ফিরিয়া চলিল। কেবল তিনটি মাত্র কথা—ভাগীরথীর উজানবাহী বাণমুখে চরে প্রতিহত তরঙ্গের ন্যায় তিনটি মাত্র উচ্ছ্বাস—আমার হৃদয়তটে আঘাত করিল।

"হরিহর, হরিহর, হরিহর।"

কে যেন আমাকে বুঝাইয়া দিল—"তোমার ক'নে গুরূপদিষ্টা হইয়া তোমার নাম জপ করিতেছে।"

আবেগে বোধ হয়, চক্ষুর পলকবদ্ধ অবস্থাতেই আমি শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। উঠিতে পড়িয়া গিয়াছি। তারপর মৃদু-কর-স্পর্শ স্মৃতি। শুনিয়াছি, মাতা পতন শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। আমার আর কিছু মনে নাই।

(২৬)

এই পর্য্যন্তই আমার বাল্যের ইতিহাসের কথা। কহিতে কতকগুলা পিতৃমাতৃনিন্দা প্রয়োগ করিয়াছি। এতগুলা কথা না কহিলেও যে বিশেষ ক্ষতি হইত, তাহা নহে, বরং বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষায় শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যকে বিষম উৎপীড়িত করিতে হইত না। কিন্তু কি করিব, আমার দুর্ভাগ্য। যে নায়ক ও নায়িকার চরিত্রালোচনায় পরস্পরের প্রেমাভিব্যক্তিতে উপন্যাসের মূল্য, তাহা আমার করিবার উপায় নাই। উপায় পিতামাতা রাখেন নাই। তাঁহারা আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া রাখেন নাই, একথা

বলিলে মহাপাপ। তাঁহারা আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহবশেই এইরূপ করিয়াছিলেন। একদিকে পিতামহীর জ্ঞানে সত্যরক্ষা, অন্যদিকে পিতা ও মাতার বোধে কর্ত্তব্য-পালন। এই দুয়ের সংঘর্ষণের মধ্যে পড়িয়া আমরা একটি বালক ও বালিকা-পিষ্ট হইয়াছি।

পিতৃনিন্দা করিয়াছি। তাঁহাদের যদি কিছু অপরাধ থাকে, তাহার সমস্ত পাপ ভারে ভারে আমাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করুক। আমি একাকীই সেই ফলভারে চূর্ণ হই।

পিতা আমার কখনও নিষ্ঠুর ছিলেন না। বরং গ্রাম মধ্যে অতি সৎপ্রকৃতি যুবক বলিয়াই তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। পিতামহের জীবদ্দশায় মাতার প্রকৃতিও কখন কঠোর হইতে দেখি নাই। তবে এমন হইল কেন? হইল—আমার ভাগ্যবশে। আর হইল—বোধ হয়, ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের চাকুরী-অঙ্গীকারে। সন্তোষামৃত-তৃপ্ত শান্তচেতা আজ সহসা ধনলুব্ধ হইয়াছে।

এটা শুধু ব্রাহ্মণের কথাই কহিয়াছি। অন্যবর্ণের উপর কটাক্ষ করি নাই। অন্নাভাবেভীত ব্রাহ্মণ স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিজের যা অনিষ্ট করিয়াছে, অন্যবর্ণের তাহা হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম অর্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম বাদ দিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকে না। আজ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষ জাগিয়া উঠিয়াছে। আমিও তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের একটু গালি দিলাম। আপনারা ক্ষমা করিবেন। ব্রাহ্মণ-সন্তান আমাকে গালি দিলে আমি বহুমানে তাহা মাথা পাতিয়া লইব।

পিতা নিষ্ঠুর ছিলেন না। কিন্তু সেদিন তিনি পিতামহীর প্রতি যে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, অতি অর্ব্বাচীনেও তাহার মাতার উপর ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয়। তাহার ফলে সুখ জন্মের মত পিতার অন্তর হইতেও চলিয়া গেল; আমি মূর্চ্ছা-রোগগ্রস্ত হইলাম। আর পিতামহী?—অপেক্ষা কর, একটু পরে বলিতেছি।

পরদিন ডাক্তার-বাবুর সুচিকিৎসায় যদিও আমি মুক্তি-লাভ করিয়াছি, কিন্তু রোগ একেবারে সমূলে দূর হয় নাই। পরবর্ত্তী সপ্তাহে—যদিও অল্প সময়ের জন্য—আমি আরও দুইবার আক্রান্ত হইলাম। পিতা ও মাতা উভয়েই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

বিশেষতঃ এই কয়দিন পিতা অল্পে অল্পে মলিন হইতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে মাতার সঙ্গে তাঁহার সামান্য বচসা হইতেছিল। কিন্তু আমি তাহার কারণ-নির্ণয়ে সমর্থ হই নাই।

পিতার সঙ্গে দেশের লোকের যে পত্র-ব্যবহার হইত, তাহা আমার জানিবার উপায় ছিল না। তাহার কিছু কিছু পরে জানিয়াছি।

পিতামহী চলিয়া যাইবার প্রায় সপ্তাহ পরে পিতা দেশ হইতে তিনখানি পত্র পাইয়াছিলেন। একখানি লিখিয়াছিলেন গোবিন্দ-ঠাকুরদা—অথবা লিখাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—তিনি পূর্ব্বে গণেশ-খুড়ার হাতে পিতার নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তাহার উত্তর পান নাই বলিয়া আবার পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমার পিতামহের গচ্ছিত এখনও অনেক টাকা আছে। পিতা ও মাতা তাঁহার সততায় সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনীয় দশহাজার মুদ্রা ব্যতীত তিনি অধিক দেন নাই। পিতামহের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের সময় তিনি পিতার দেশে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতেছে। পিতার মত শিক্ষিতের মনের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভয় হইতেছে। যে কাল আসিতেছে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রেরা যে, আমার পিতাকে ডাকিয়া টাকা অথবা বিষয়ের দলীল-পত্রাদি দিবে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হয় না। সেইজন্য তিনি পিতাকে সত্বর দেশে যাইতে লিখিয়াছেন। পিতার যথেষ্ট সম্পত্তি তিনি করিয়া দিয়াছেন। আমার ভবিষ্যতে চাকুরী করিবার প্রয়োজন হইবে না। আমি অপব্যয় না করিলে দুই পুরুষ বসিয়া খাইতে পারিব।

দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছেন, বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত-মহাশয়। এ পত্রের মর্ম্ম বড়ই বিচিত্র। তিনি লিখিয়াছেন, কন্যার কন্যাকাল উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া, আর পিতা আমার বাল্য-বিবাহ কিছুতেই দিবেন না বুঝিয়া, পাগল বামুন এক শালগ্রাম শিলার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়াছে। শুধু তাই নয়, দেশের লোকও এমনি পাগল, সেই বিবাহোৎসবে যোগ দিয়াছে। পণ্ডিত-মহাশয়ও কৌতূহলপরবশ হইয়া, সেই পাগলামি দেখিতে গিয়াছিলেন। কতকগুলি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোককে নারায়ণ-শিলা

স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া, তুই একজন পণ্ডিত মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাদের বুঝাইয়াছেন, তাঁহার কন্যা নারায়ণ-বরা হইবে—ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী; তাঁহার শিলা-স্পর্শে দোষ নাই। কন্যার কুশণ্ডিকা হইবার পরেই দশমবর্ষীয়া বালিকাকে সব পাগলগুলা লক্ষ্মী-জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছিল। পণ্ডিত-মহাশয় প্রণাম করিয়াছিলেন কি না লেখেন নাই; তবে আরও একটি পাগলামির কথা তিনি লিখিয়াছেন। বালিকার কুশণ্ডিকা-কার্য্য শেষ হইবার পর আমার পিতামহী তাহাকে আমাদের গৃহে আনাইয়াছিলেন এবং আমার পিতামহের সত্য-অনুসারে বালিকাকে আমাদের কুলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাহাতেও একটা বিরাট সমারোহব্যাপার হইয়া গিয়াছে। সেই সমারোহের প্রধান পাণ্ডা গোবিন্দ-ঠাকুরদা। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ বালিকার স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছেন।

তৃতীয় পত্র আমার পাঠদ্দশার বন্ধু রামপদ লিখিয়াছে। লিখিয়াছে,আমার নামে। আমাদের বাসার ঠিকানা জানে না বলিয়া, কাছারীর ঠিকানায় লিখিয়াছে। তা হইলেও পত্র আমাদের বাসায় আসে। কিন্তু আমি পাই নাই। আমি অসুস্থ ছিলাম বলিয়া পাই নাই। হয় পিতা, না হয় মাতা, চিঠি খুলিয়াছিলেন। যে সংবাদ তাহার ভিতরে ছিল, সে ভীষণ সংবাদ সে পিতাকে দিতে সাহস করে নাই। আমাকে তাই দিয়াছে। আমার পিতামহী আমাকে চিঠি পাঠাইবার পূর্ব্বরাত্রিতে গ্রামের কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। পত্রপাঠে ইহাও বুঝিলাম, ঝি—পিতামহীর সঙ্গে দেশে গিয়াছিল। সেও পিতামহীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। গ্রামের বহুলোক চারিদিকে তাঁহার সন্ধানে ছুটিয়াছে। কেহই সে সময় পর্য্যন্ত সন্ধান পায় নাই। এই তিনখানি পত্র উপর্য্যুপরি আসিয়া তুই একদিনের ভিতরেই আমাদের সংসারকে যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। পিতা ও মাতা, কাহারও মনে যেন সুখ নাই। আমারও অসুখ। জানিয়াও তাঁহারা তাহার বিশেষ প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। ডাক্তারের অভিমত,আমাকে কিছু দিনের জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তন করাইতে অথবা দেশে পিতামহীর কাছে পাঠাইতে। ডাক্তার বাবু আমাদের ভিতরের অবস্থা কিছুই জানিতেন না। এ লজ্জার কথা তাঁহাকে জানাইবারও উপায় ছিল না।

পিতার ইচ্ছা—আমাদের সঙ্গে লইয়া দেশে যান। লোক-লজ্জা-ভয়ে মায়ের সেখানে যাইতে সাহস হইতেছে না। তিনি তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে স্থিরসঙ্কল্প।

একদিন মায়ের সঙ্গে এইরূপ বিতর্ক চলিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে কুকুর তুইটা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। সেদিন শনিবার—সময় সন্ধ্যা। পরবর্ত্তী সোমবার হইতে পিতার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। কাছারীর অনেক উকীল-আমলার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার সম্ভাবনা।

আর একদিন ঠিক এমনি সময়ে কুকুরের চীৎকার হইতে নানা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া, পিতা সন্ত্রস্ত, ভাবে নিজেই বাহিরে ছুটিয়া গেলেন। আমি পিতার অনুসরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; মাতা আমাকে যাইতে দিলেন না—হাতে ধরিয়া বসাইলেন।

পিতা প্রস্থান করিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে, আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি ?"

আমি এ প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কোথায় যাইবে ?"

"কোথায় কোন চুলায় যাইব, তা কেমন করিয়া বলিব ? তোদের ঘরে আর আমার স্থান হইবে না।"

"বাবা কি তোমায় কিছু বলিয়াছেন ?"

"পাকে প্রকারে বলিয়াছেন বই কি। আমিই তোদের ঘর ভাঙ্গিয়ে দিয়াছি। আমার অত্যাচারেই তোর ঠাকুর-মা বিবাগী হইয়া গিয়াছে।"

পিতামহীর গৃহত্যাগের কারণ আমি পিতাকেই নির্ণয় করিয়াছিলাম। আমি মাকে সে কথা বলিলাম।

মাতা বলিলেন—"তথাপি আমি অপরাধী। বাবু চাকুরী ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছেন। শুধু তাই নয়। তিনি তোমার ঠাকুরমাকে খুঁজিতে যাইবেন। যদি না পান, আর বাড়ী ফিরিবেন না। তিনি বাড়ী না ফিরিলে, আমি কোন্ কালামুখ লইয়া দেশে থাকিব ?"

"ঠাকুরমা বুড়া মানুষ। সে কোথায় যাইবে ? দেশের কোন না কোন স্থানে ঠাকুরমা লুকাইয়া আছে।"

"তা যেখানেই থাকুন, তুই আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি ?"

"কেন তোমাকে ছাড়িব ?"

"ছাড়িতেই হইবে। আমি থাকিতে তোদের ঘরে আর মঙ্গল হইবে না।"

"কোন্ পাষণ্ড একথা বলে ?"—আমরা চমকিতের মত দ্বারের দিকে চাহিলাম। দেখি, গোবিন্দ-ঠাকুরদা ধীরে ধীরে ঘরের দিকে প্রবেশ করিতেছেন। সঙ্গে গণেশ-খুড়া, তাহার পশ্চাতে পিতা। পিতার পশ্চাতে আমাদের পুরাতন ভৃত্য সদানন্দ। তাহার একহাতে একটি ক্যাম্বিশের বড় ব্যাগ। বোধ হয়, তাহার ভিতরে ঠাকুরদা'র বস্ত্রাদি, অন্য হস্তে হুঁকা, তাহার পশ্চাতে পাঁচু। কার্ত্তিক বোধ হয়, ইহাদের অনুসরণে ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই।

মাতা তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। আমিও প্রণাম করিলাম।

বৃদ্ধের সেই সহাস্যবদন। বিশেষতঃ আমাদিগকে দেখিয়া, তাঁহার আনন্দ আজ যেন বার্দ্ধক্যের নিগড় ভাঙ্গিয়া, দন্তহীন মুখের ওষ্ঠাধরে শৈশবের মাধুর্য্য ঢালিয়া দিতে বসিয়াছে।

ঠাকুরদা—মা ও আমার মস্তকে করস্পর্শে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং মাকে বলিতে লাগিলেন, "কোন্ পাষণ্ড বলে ? তুমি লক্ষ্মীরূপে দাদার গৃহে আসিয়াছিলে! মা! আমি সাক্ষী—আমি একমাত্র সাক্ষী। দাদা কবে কি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সমস্তই আমার খাতায় জমা আছে। অবশ্য বৌ-ঠাকুরাণীও লক্ষ্মী। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দাদার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তুমি তাঁর চারগুণ লক্ষ্মী। তোমার আগমনের পর হইতে দাদা ঘরে ভারে ভারে টাকা আনিয়াছে। সব লেখা আছে। সে টাকায় জমি কিনিয়া, ধার দিয়া, যা করিয়াছি, সব লেখা আছে। দেশে চল মা, সমস্তই তোমাদের বুঝাইয়া দিব। আমার কাছে তোমাদের দশহাজারের বেশি টাকা আছে, একথা বলিতে ভরসা কর নাই। আমি শুনিয়া হাসিয়াছিলাম। তার চেয়ে ঢের বেশি মা, ঢের বেশি। সব লেখা আছে।"

মা আর পূর্ব্বের মত বৃথা লজ্জায় নিরুত্তর রহিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন—"টাকা আর চাই না। আপনার যে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি, তাই যথেষ্ট। শুনিলাম, মা আমার উপর রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আপনারা তাঁকে ফিরাইয়া আমার কলঙ্কমোচন করুন।"

গোবিন্দ-ঠাকুরদা মাকে আশ্বাস দিলেন। শুধু মাকে কেন, মাতৃদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া, আমাদের সকলকেই আশ্বাস দিলেন। আর আমরা সাহেব হইয়াছি বলিয়া, গণেশ-খুড়া তাঁহার কাছে যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিল, তাহার জন্য মূর্খত্বের নানাজাতীয় বিশেষণে তাহার শ্রবণমূল চরিতার্থ করিয়া দিলেন।

গণেশখুড়া কোনও উত্তর না করিয়া, মেজের উপরে বসিয়া, ঠাকুরদার জন্য তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিল। পাঁচু পিতার আদেশে সদানন্দকে নিজের বসিবার স্থানে লইয়া গেল। সত্য কথা বলিতে কি, গোবিন্দ-ঠাকুরদার আগমনে বহুকাল পরে আমাদের হুগলীর বাসায় সেই পূর্ব্বযুগের আনন্দ ফিরিয়া আসিয়াছে।

এমন মহদাশয় ব্রাহ্মণ, —আমাদের ঘরে সাহেবিয়ানার নানা চিহ্ন বিদ্যমান থাকিতেও তিনি যেন সে সমস্ত দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না।

একবার কেবল কথায় কথায় গণেশখুড়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"শিরোমণির ছেলে কি ম্লেচ্ছ হ'তে পারে রে! ও যে হাকিম—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তাই ওকে অমন পোষাক পরিয়া থাকিতে হয়। ওর ওই পোষাক তুলিয়া দেখ—দেখবি উহার ভিতরে গৌতমের সুবর্ণকান্তি ঝক ঝক্ করিতেছে।"

সে রাত্রিতে ঠাকুরদা কর্ত্তৃক মাতাই রন্ধনাদির ভার প্রাপ্ত হইলেন। বহুকাল পরে "মাতা অন্নপূর্ণা"র কল্যাণে গোবিন্দ-ঠাকুরদার আমাদের সম্মুখে ভূরিভোজন হইল।

পরবর্ত্তী সোমবারে রাত্রির প্রথম প্রহরে আমরা হুগলী হইতে রওনা হইলাম। সেদিন শুক্লানবমী। মাস জ্যৈষ্ঠ। সন্ধ্যা হইতেই একটা হুহু বাতাস ভাগীরথীর রজতধারাকে কোলে তুলিতে আসিয়াছিল। সেইজন্য ভাগীরথীবক্ষ বড়ই আন্দোলিত হইতেছিল। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রওনা হইতে পারি নাই। তা করিলে আমরা রাত্রি থাকিতে থাকিতে কালীঘাটে পৌছিতে পারিতাম।

পৌছিতে পারিলে আমাদের সুখের সংসার দীর্ঘযুগব্যাপী নিরানন্দের ভারে নিষ্পেষিত হইত না। হুগলী

সতী

K. V. SEYNE & BROS. CALCUTTA

হইতে যাত্রার পূর্ব্বে আমরা সকলেই বুঝিয়াছিলাম আমরা কেবল পিতামহীর অন্বেষণেই চলিয়াছি। পিতার বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া, ঠাকুর-মা কিছুদিনের জন্য কোনও স্থানে আত্মগোপন করিয়া আছেন। কোন না কোন আত্মীয়ের গৃহ অনুসন্ধান করিলেই তাহাকে খুঁজিয়া পাইব। হয়ত তাঁহার অভিমান দূরীভূত হইলেই তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। আমরা ঘরে পৌছিলেই সমস্ত পরিবারের মিলন হইবে।

আমরা সকলেই সেই আশাতে বুক বাঁধিয়া সমস্ত রাত্রি নদীবক্ষে যাপন করিয়াছি। কালীঘাটে যখন পৌছিলাম, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। পৌছিয়াই বুঝিলাম, আমাদিগকে শুধু পিতামহীর অন্বেষণ করিতে হইবে না। সেই সঙ্গে আর একজনকেও খুঁজিতে হইবে; সেই আমাদের দেশস্থ অগ্নি-ব্রাহ্মণ সমক্ষে নারায়ণ-নিবেদিতা বালিকা।

আদি-গঙ্গার ঘাটে এক আত্মীয়া রমণীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারই মুখে শুনিলাম, পিতামহী ও তাঁহার পৌত্রবধূ সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে স্নান সারিয়া দেবী-মন্দিরে গমন করিয়াছে।

বলিতে হইবে না আমরা সকলেই তাহাদের দর্শনের আশায় উৎফুল্ল হইয়া, নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম।

এইস্থানেই সর্ব্বপ্রথমে মাতা ও পিতা—সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত আমার সম্বন্ধ জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিলেন, গোবিন্দ-ঠাকুরদা ও গণেশ-খুড়ার কাছে। আমাকে বাধ্য হইয়া সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইল। বকুল বৃক্ষের তলদেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেরূপে ঘটিয়াছিল, ঠাকুর-দাদার সাহস ও পিতা-মাতার স্নেহের আশ্বাস পাইয়া আমি সব স্বীকার করিলাম।

তাহা শুনিয়া কি জানি কি এক সহসোদিত মমতায় মাতা ও পিতা উভয়েই ব্যাকুল হইয়া, তাহাদের খুঁজিতে দেবীমন্দিরের দিকে চলিলেন।

কিন্তু কোথায় তাহারা! দেবীমন্দিরে তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। কালীঘাটের যেখানে যে চটি-দোকান, সব তন্নতন্ন করিয়া অন্বেষণ হইল। তাহাদের দেখা মিলিল না।

দেশে ফিরিয়া ঘর খুঁজিলাম—ঠাকুরমা ঘরে ফিরেন নাই। সার্ব্বভৌমের কাছে সন্ধান লওয়া হইল। ব্রাহ্মণ বলিতে পারিল না।

তাঁহার সঙ্গে পিতার অনেক কথা হইয়াছিল। সে সব কথা কহিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। পিতা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও দীনবেশী সার্ব্বভৌমকে এতকাল চিনিতে পারেন নাই। এতদিন পরে পিতৃকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব অনুভূত হইয়াছে। সত্যরক্ষার্থ ব্রাহ্মণ 'কন্যা'-আখ্যাধারিণী কুমারীকে "হরিহর" নামধারী নারায়ণকে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কন্যার উপর মমতার অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর সত্যপালনার্থ সে অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন, আমার পিতামহী।

পিতা বুঝিলেন, তাঁহার কিংবা পুত্রবধূর উপর ক্রোধ অথবা অভিমান করিয়া, তাঁহার জননী গৃহত্যাগ করেন নাই। কাম-লালসার নিঃশ্বাস-স্পর্শে পাছে এই অনাঘ্রাত দেব-নির্ম্মাল্য কলুষিত হয়, তাই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি কোনও আত্মীয়কে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানান নাই। এমন কি, সাধু সার্ব্বভৌমকেও এসম্বন্ধে কোনও কিছু আভাষ দেন নাই। এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লন নাই। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, যেখানের যে সামগ্রীটি, সেইখানেই পড়িয়া আছে। কেবল যাঁর উপর আমাদের গৃহদেবতার পূজার ভার আছে, তাহার হস্তে ঘরের চাবী দিয়া গিয়াছেন।

পিতা সমস্তই বুঝিলেন। বুঝিলেন, মাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। খুঁজিয়া পাইলেও তাঁহাকে গৃহে ফিরানো অসম্ভব। বুঝিয়া তিনি আপনাকে ধিক্কার দিলেন। শৈশব হইতে তাঁহার সেই অল্পভাষিণী অল্পাশিনী জননীর স্থিরমূর্ত্তি তাঁহার মনে পড়িল। ফিরাইতে পারিবেন না বুঝিয়াও তিনি পিতামহীর অন্বেষণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

প্রতিবাদ

বৌদ্ধ-গন্ধ

[শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ]

বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশ হইতে একেবারেই সরিয়া পড়িয়াছে, কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে এখনও অবস্থান করিতেছে, এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রিমহাশয় অনেক দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের আবিষ্কার সাধন করিয়া, সাধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন। সাহেব-লেখকগণ বাঙ্গালীর রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে কোন কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হইতে পারে। কারণ, তাঁহারা হিন্দুর আচারব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। শাস্ত্রিমহাশয় দেশের লোক, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁহার নিকট আমরা দেশের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার আশা করিতে পারি। তিনি পুরাতনপুস্তকবিবরণীতে নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক অভিনব অভিমত প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তজ্জন্য বিচক্ষণ শাস্ত্রিমহাশয় সংপ্রতি তাঁহার আবিষ্কৃত গূঢ়তত্ত্বগুলি বাঙ্গালাভাষায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন, ও তন্নিবন্ধন সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কলিকাতা-অধিবেশনে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে ও ১৩২১ সালের বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সভাপতির অভিভাষণে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক গভীর তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং সংপ্রতি "নারায়ণ" নামক মাসিক পত্রেও অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। নানা কারণে তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে না পারায় সন্দেহ দূর করিবার অভিপ্রায়ে, কোন কোন নবাবিষ্কৃত তথ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয় প্রসঙ্গক্রমে অন্ধের হস্তিদর্শনকাহিনীর অবতারণায় পুরাতন কথাকে নূতনের মতই প্রীতিকর করিয়া, তদ্দ্বারা অনেক নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যকে সংশয়পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং, তিনি যে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতেও সংশয় উপস্থিত হইতেছে। তাহাও সূর্পাকার কি স্তম্ভাকার তাহারও আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

তিনি বলিয়াছেন—"এই যে ভারতবর্ষে—বিশেষ বাঙ্গালায়—বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল বলিয়াই শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা কোথায় গিয়াছে? কেমন করিয়া গিয়াছে? তাহাই খুঁজিতেছিলাম। শেষে অল্পায়াসেই বুঝা গেল, বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও লোপ পায় নাই। কয়েকজন অনুসন্ধানকারীর চেষ্টায় এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বাঙ্গালায় অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও চারিদিকে ব্যাপিয়া আছে। আমাদের চক্ষু নাই, তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।" এইরূপে শাস্ত্রিমহাশয় "অল্পায়াসেই" যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা কিরূপে বুঝিলেন, সেকথা ভাঙ্গিয়া না বলায়, অনেকের পক্ষে—"বহ্বায়াসেও" তাহা বোধগম্য হইতেছে না। অনুসন্ধানকারীর অনুসন্ধান-প্রসূত জ্ঞানের প্রামাণ্য স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত, তদ্দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত। কারণ, অনাপ্তের প্রতি আপ্তত্বভ্রমে "অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়ের" অবতারণা হইতে পারে। চক্ষুর অভাবে দেখিতে না পাওয়া বরং ভাল, কারণ কামলাগ্রস্ত চক্ষুর দ্বারা বিপরীত-দর্শনানুযায়ী মন্তব্যের ফলে "শঙ্খ-শশাঙ্ক-বিকাশি-কাসকুসুম"ও পীতবর্ণ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার কারণ আছে বলিয়াই তাঁহার মত বিজ্ঞ বিচক্ষণের কথার উপরও নিঃসংশয়ে আস্থাস্থাপন করিতে সাহস হইতেছে না। ১৩২১ সালের অভিভাষণে বলিয়াছেন—"নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে,

ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম।" নানা কারণের মধ্যে তিনি একটি কারণেরও উল্লেখ করেন নাই। নানা কারণের মধ্যে ভ্রমও একটি কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এবং তাহার ফলে বৌদ্ধ-হিন্দুর নিজস্ব নিরূপণের বিপর্য্যয় ঘটিয়া, হিন্দুর ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণামরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিতে পারে। রাঢ়দেশে যে ধর্ম্মঠাকুর হিন্দুর নিকট পূজা পাইতেছেন, তিনি স্বয়ং দেবদেব মহাদেব-রূপেই পূজা পাইতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গে যে ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি প্রচলিত আছে, তিনি ভগবান্ সূর্য্যদেব-রূপে পরিচিত। আবার মালদহ-প্রদেশে "ধর্ম্ম" নামে যিনি পূজিত হইতেছেন, তিনিও ভগবান্ বিবস্বান্ রূপেই পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মঠাকুর কোনও স্থলেই বুদ্ধদেব-রূপে পূজিত হইতেছেন না। ইহাতে সংশয় দূর হইতে পারিতেছে না। দেবল বলিলে আজকাল 'পূজারী ঠাকুর' বুঝায়। অভিধানে এই অর্থ ত আছেই; অধিকন্তু "ধার্ম্মিক" রূপ একটি অপ্রচলিত অর্থও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভাষ্য প্রভৃতি ব্যাকরণ-গ্রন্থে দেখা যায়,—যাহারা দেবতার পুতুল দেখাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, তাহারা সেকালে "দেবল" নামে পরিচিত ছিল। সেকালে দেবল বলিলে যাহাদিগকে বুঝাইত, একালের দেবলগণকে তাহাদের বংশধর বলিয়া ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ণয় করিতে হইলে, বিড়ম্বিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। এই সকল কারণে, আমাদের দেশে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ে "অল্পায়াসেই" কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প। ধর্ম্মতত্ত্বের ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ণয়ে সে সম্ভাবনা আরও অল্প বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

কোন্ ধর্ম্ম হইতে কোন্ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, কোন্ ধর্ম্মের সহিত কোন্ ধর্ম্মের কোন্ অংশে সাদৃশ্য ও কোন্ অংশে বৈসাদৃশ্য আছে, তাহার বিশ্লেষণ করিতে হইলে, তত্তদ্ধর্ম্ম-বোধক শাস্ত্রে তলস্পর্শিনী শিক্ষা আবশ্যক, এবং সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি, আচারব্যবহারও তন্নতন্ন করিয়া অবগত হওয়া আবশ্যক। কোন্ আচার কাহার নিজস্ব, তাহাও বাছিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুবা কেবল ঐতিহ্য কথার অনুশীলনে যে, ভ্রান্ত সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে অনেক স্থলেই তথ্যানুসন্ধিৎসুর কঠোর পরিশ্রমেও প্রকৃত বিষয় আবিষ্কৃত না হইয়া অপসিদ্ধান্ত উদ্ভাবিত হইতে পারে।

বৌদ্ধ কাহার নাম, হিন্দু কাহার নাম, প্রথমতঃ তাহাই নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রের সাহায্যে যতটুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মোটামুটি এই মাত্র বলা যায়,—বুদ্ধ যাহাদের দেবতা অর্থাৎ বুদ্ধকে যাহারা ভজন করে, তাহারাই বৌদ্ধ। ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়ের টীকাকার মণিভদ্র এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—"বুদ্ধো দেবতা অস্যেতি বৌদ্ধং সৌগত দর্শনম্"। মাঘের টীকায় মল্লিনাথও বলিয়াছেন,— সুগত যাহাদের ভজনীয়,তাহারাই সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ। (১) হিন্দুর লক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে,—যাহারা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থোপদিষ্ট বিধি-নিষেধ যথাশক্তি পালন করে, এবং যাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণভেদ ও গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমভেদ আছে, তাহারাই হিন্দু। মাধবাচার্য্য হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া, প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রেই নিবন্ধ-প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, এবং তন্ত্রজ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্রে বৌদ্ধগন্ধের সন্ধান পাইবার উল্লেখ করেন নাই।

শাস্ত্রি মহাশয়ই কেবল গন্ধ পাইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাইলেও সন্দেহ দূর হয় না। "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" এই যোগ-সূত্রের (২।১)• ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন,— "মন্ত্র দুই প্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক"। (২) এই উক্তিতে বুঝা যায় যে,মাধবাচার্য্য নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন,— যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বৈদিক-তান্ত্রিক মন্ত্রের একতর জপকে "ক্রিয়াযোগ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং মাধবাচার্য্যের মতে বেদব্যাসের পূর্ব্বে তন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; কারণ, উক্ত যোগসূত্রের ভাষ্যকার স্বয়ং ব্যাস-দেব। পরমভাগবত শ্রীমদানন্দতীর্থ "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে" বেদের সহিত আগম-তন্ত্র-যামল-শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, (৩) কিন্তু এইগুলিকে বৌদ্ধগন্ধী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা যে সমস্ত তন্ত্রের আদ্যোপান্ত তন্নতন্ন করিয়া পাঠ

(১) সুগতো ভক্তির্ভজনীয় এষাং সৌগতা বৌদ্ধাঃ। ভক্তিঃ—ইত্যন্।

(২) তে চ মন্ত্রা দ্বিবিধা বৈদিকা তান্ত্রিকাশ্চ।

(৩) সকলবেদশাস্ত্রাগমতন্ত্রযামলাদিষু বিষ্ণুপরত্বং পুরুষসূক্তস্য সূচয়তি। (১।২)

করিয়াছি, সেগুলির মধ্যে বেদের অনুসরণ, স্মার্ত্তাচারের অনুবর্ত্তন প্রভৃতির পরিচয় পাইয়াছি। বেদের অপ্রতিহত গৌরব সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইয়াছে। ব্রহ্মের কথা নাই, এইরূপ তন্ত্র অল্পই দেখা যায়। শ্রাদ্ধ-তর্পণ প্রভৃতি স্মার্ত্ত-ক্রিয়ার আবশ্যকতা-খ্যাপনে তন্ত্রের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদিবর্ণের অনুষ্ঠেয় দৈনিক ক্রিয়াকলাপের একটা বিশেষ ক্রম-নির্দ্দেশও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বৈদিক স্নানের অনন্তর তান্ত্রিক স্নান, বৈদিক সন্ধ্যার অনন্তর তান্ত্রিক সন্ধ্যা, বৈদিক তর্পণের পর তান্ত্রিক তর্পণ ইত্যাদি। শ্রাদ্ধের কতকগুলি পরিপাটী কেবল তন্ত্রশাস্ত্রেই দেখা যায়। সুতরাং তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের "ভরভর" গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বহুদর্শী শাস্ত্রিমহাশয় যে, একটা বিষয় বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বিবাদ নিজস্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মপূজাকেও বৌদ্ধের নিজস্ব বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না। কারণ, "ধর্ম্মের" অর্চ্চনায় হিন্দু চিরকালই অভ্যস্ত। সুপ্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার বৌধায়ন "ধর্ম্মের" তর্পণ-বিধান করিয়াছেন। দুর্গাপূজা প্রভৃতি পৌরাণিক অনুষ্ঠানেও পীঠপূজায় "ধর্ম্মের" অর্চ্চনা হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক হিন্দু মাত্রই এই সকল বিষয় অবগত আছেন। সুতরাং "ধর্ম্মপূজায়" বৌদ্ধের নিজস্বের দাবি টিকিতে পারে না। সুগত-সেবক বৌদ্ধগণই হিন্দুর সুপরিচিত "ধর্ম্মের" অর্চ্চনা করিতে শিখিয়াছিলেন, একথা বলিতেও বাধা দেখা যায় না। জৈনধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অদ্যাপি হিন্দুর বিবিধ দেবতা-পূজনে ব্যাপৃত দেখা যায়। এমন কি হিন্দুকেও মুসলমানের অনুষ্ঠেয় "রোজা" পালন করিতে দেখা গিয়াছে। পক্ষান্তরে মুসলমান্‌গণও হিন্দুর কালীবাড়ীতে শিববাড়ীতে পূজোপ-করণ পাঠাইতে অভ্যস্ত। এই অনুষ্ঠানের দরুণ হিন্দুও মুসলমান হয় না, মুসলমানও হিন্দু হয় না। অনুষ্ঠান-প্রধান হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে দৈনিক-দেবপূজার আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে, এবং পাপ-বিশেষের প্রায়শ্চিত্তরূপেও দেবতা-বিশেষের পূজা বিহিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানের পরিপাটী বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। পূজার খুটিনাটি তন্ত্রে এবং পুরাণে বিশেষ করিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং, যে সময় হইতে হিন্দু আছে, সেই সময় হইতেই তন্ত্রও আছে, একথা স্বীকার করিতে হয়। বৈদিকানুষ্ঠানে পূজায় ত্রৈবর্ণিকের অধিকার; তান্ত্রিকানুষ্ঠানে শূদ্রাদিরও অধিকার আছে। সুতরাং শূদ্রাদির উপাসনার জন্য চিরদিনই তন্ত্রের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে।

শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার অভিভাষণের ৫৬ পৃষ্ঠায় বলিয়া-ছেন যে,—"সহজযান, নাথপন্থ, কালচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ প্রভৃতি যত লোকায়ত ধর্ম্ম ছিল, ইদানীন্তন লোকে তাহার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, সমুদয়গুলিকে তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।"

বহুদর্শিশাস্ত্রিমহাশয়ের এই কথাতে মনে বড়ই একটা খট্‌কা বাধিয়াছে। কারণ অল্পশিক্ষায় যেটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে "লোকায়ত" শব্দের অর্থ "নাস্তিক এবং তাহাদিগের মত" এই দুইটি অর্থই প্রতিভাত হয়। অমর-টীকাকার ভানুজীদীক্ষিত এই সংস্কারকে আরও পাকা করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"লোকে আ যতন্তে পচাস্তচ। চার্বাকাঃ। তেষামিদং শাস্ত্রম্। তন্ত্রেদ-মিত্যণ্।"

বাচস্পতিমিশ্রের উক্তিতেও বুঝা যায়, লোকায়তিকগণ অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না। (৪) লোকায়তমতাবলম্বীই "লৌকায়তিক", একথা অনায়াসেই বুঝা যায়। ইহলোক-সর্ব্বস্ব নাস্তিক ছাড়া কেহই অনুমানের অপলাপ করে না। শাস্ত্রিমহাশয়ের কথিত "লোকায়ত" শব্দের যদি কোনও গুহ্য অর্থ না থাকে, তবে যে কয়টি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সমস্ত নাস্তিকপদবীতে সমারূঢ় হয়। কিন্তু তাঁহার সমস্ত মতগুলির সহিত পরিচয় না থাকিলেও, যামল-ডামরের সহিত যতটুকু পরিচয় আছে, তাহার ফলে এই দুইটিকে নাস্তিকের শাস্ত্র বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কারণ, এই শ্রেণীর গ্রন্থে পূজা-হোম-তর্পণ প্রভৃতি পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপেরই বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রিমহাশয় "নারায়ণ" পত্রিকার ৬৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন —"বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এ বিচারের প্রয়োজন চিরদিন ছিল, এখনও আছে। ইহার মীমাংসা কি? বৌদ্ধেরা জাতি মানেনা যে, ব্রাহ্মণাদির মত জন্মিবা মাত্রই ব্রাহ্মণ

(৪) নানুমানং প্রমাণমিতি বদতা লৌকায়তিকেন। তত্ত্ব-কৌমুদী। ৫।

হইবে বা ক্ষত্রিয় হইবে বা শূদ্র হইবে বা বৈষ্ণব হইবে বা শাক্ত হইবে।" ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই,—যদি বৌদ্ধই অদ্যাপি স্থির না হয়, তবে তাহার "গন্ধ নির্ণয়" কি প্রকারে হইল? যে ব্যক্তি চন্দনও জানে না, কর্পূরও চিনে না, সে চন্দন-কর্পূরের গন্ধ-বিশ্লেষণে সমর্থ হইতে পারে কি? বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানিত না, অথচ তাহাদের গন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র ভরভরায়িত, এই উভয় কথার সামঞ্জস্য হইতেছে না। তন্ত্রশাস্ত্রে জাতি-ভেদের ও আশ্রম-ভেদের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং জাতি-বিহীন বৌদ্ধের গন্ধ তাহাতে কি প্রকারে প্রবেশ করিল?

শাস্ত্রিমহাশয় জাতি ও সম্প্রদায় এই উভয়কে এক করিয়া তুলিয়া, বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছেন। একাশ্রয়ানুপ্রবেশে ব্রাহ্মণত্ব-রাক্ষসত্বের মত শৈবত্ব-বৈষ্ণবত্বের সহিত ব্রাহ্মণত্বের জাতিবাধক সাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণাদি চারি "বর্ণ", ইহার অতিরিক্ত হিন্দু "সঙ্কীর্ণ" নামে অভিহিত। শৈব, বৈষ্ণব, এমন কি,বৌদ্ধ পর্য্যন্ত "সম্প্রদায়"-রূপে পরিচিত। সুতরাং হিন্দুর অন্তর্গত যে কোনও জাতি—শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত বা বৌদ্ধ হইতে পারে। এমন কি, যাহারা "বাহ্য" অর্থাৎ "ম্লেচ্ছ" নামে পরিচিত, তাহারাও দেবতার তামসিক পূজার অধিকারী। সুতরাং জাতিহীন মানবের বৌদ্ধত্ব-শাক্তত্বের কোনও বাধা দেখা যায় না।

শাস্ত্রিমহাশয় "নারায়ণ" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, তন্ত্রে গুরুর অপ্রতিহত প্রভাবের যাহা পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত,—হিন্দুর সংসারে আগন্তুক। এই সিদ্ধান্তের কোনও মূল আছে কি? পূর্ব্বে হিন্দুর "গুরুভক্তি" ছিল না, একথা তিনি কোন্ প্রমাণবলে স্থির করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন, "তন্ত্রের মতে গুরুই পরমেশ্বর, গুরুর পদে পূজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়, গুরু শিষ্যের সর্ব্বস্বের অধিকারী।"

গুরুতে পরমেশ্বরবুদ্ধির সমারোপে আপত্তি কি? হিন্দুর শাস্ত্রে প্রতীকোপাসনার কথা আছে, শাস্ত্রিমহাশয় তাহা উড়াইয়া দিতে পারেন না। শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুবুদ্ধি, প্রতীকোপাসনারই নিদর্শন। গুরুপাদপদ্মপূজার সহিত হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রের বিরোধ হইতেছে? শাস্ত্রিমহাশয় তাহা প্রকাশ করিয়া কৌতূহল-নিবৃত্তি করিয়া দেন নাই। গুরুর উভয় পাদপদ্ম ধারণ করিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়; উপনয়নসময়ে বেদারম্ভ-ক্রিয়ায় ইহা সুবিদিত; ব্রাহ্মণমাত্রই সে কথা অবগত আছেন। গুরুর উচ্ছিষ্টভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে, কোন্ শাস্ত্রে? স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার বিপরীত প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌধায়ন বলিয়াছেন, "প্রসাধনোচ্ছাদনস্নপনোচ্ছিষ্টভোজনানি গুরোঃ। প্রসাধনোচ্ছাদনস্নপনবর্জ্জনঞ্চ তৎ পত্ন্যাম্।" গুরুর প্রসাধন (সাজান) উচ্ছাদন (শরীর-মার্জ্জন) স্নপন (স্নানকরান) ও উচ্ছিষ্টভোজন করিবে। গুরুপত্নীর প্রসাধনাদি করিবে না, কেবল উচ্ছিষ্টভোজন করিবে। এই সকল শাস্ত্রব্যবস্থার উল্লেখ ও মীমাংসা না করিয়া, গুরুর উচ্ছিষ্টভোজনকে বৌদ্ধাচার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, পরিহাস-প্রিয় লোকে বলিতে পারে,—

"অস্মন্দরাক্ষোয়মিতিব্রুবাণঃ কাণোপিহাস্যাস্পদতামুপৈতি"

অন্ধগণ হস্তীর একদেশ স্পর্শ করিয়া, যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহা হাস্যাস্পদ হইলেও, একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় শাস্ত্র না দেখিয়া, যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা একেবারে ভিত্তিহীন। দেশের লোকে এরূপ ভাবে দেশের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিলে, বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে—

"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?"

শাস্ত্রের খবর না লইয়া, এবং শাস্ত্রার্থ বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়া, তথ্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক প্রসিদ্ধ বিষয়ও অনুসন্ধেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। শাস্ত্রিমহাশয়ের ২১ সালের অভিভাষণের ৩১ পৃষ্ঠার মন্তব্যে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—"আমি মনে করি, বাঙ্গালা পুঁথি-খোঁজার এইটি প্রথম ও প্রধান সুফল। ইহার দ্বারা আমরা বেশ জানিতে পারি যে, কেন ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে আদিশূর রাজা বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেন ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়া বসাইবার জন্য রাজারা এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং কেন বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি জাত আচরণীয় এবং কতকগুলি জাত একেবারে অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে।" দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ রূপে স্থির করিয়াই শাস্ত্রিমহাশয়

আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন, ব্রাহ্মণস্থাপন, গ্রামদান, আচরণীয়-অনাচরণীয় জাতিবিভাগের কারণ, স্থির করিয়া দিয়াছেন। ভ্রান্তিবশে অনেকে বিপরীত দেখিতে পায়, তাহাতে পদার্থের স্বরূপের হানি হয় না। এই অবস্থায় কবি বলিয়াছেন—

"সহসি প্লবগৈরুপাসিতো নহি গুঞ্জাফলমেতি সোম্যতাম্"

কেবল বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে কুত্রাপি সমস্ত জাতির "আচরণীয়তা" নাই। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও অনুলোমজাত সঙ্কর জাতি "আচরণীয়"। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত। অন্ত্য-অন্ত্যজ-অন্ত্যাবসায়ী প্রভৃতি জাতি কোন্ যুগে কোন্ দেশে "আচরণীয়" ছিল? পশ্চিম দেশে অন্ত্যজাদির সহিত এক ঘরে উত্তম জাতির আহার-ব্যবহারে যবনাক্রমণেরই পরিণাম বুঝা যায়। ইহাকে প্রকৃত আর্য্যাচার মনে করিয়া, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্য-ঘোষণা ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম-নির্দ্দেশ করা ভ্রান্তিরই নিদর্শন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ব্যবসায়ের ব্যতিক্রমে এক নামের জাতি একদেশে আচরণীয়, অন্যদেশে অনাচরণীয়-রূপে দেখা দিতেছে। কোন প্রতিলোমজ সঙ্কর বারজীবীর কাজ করিয়া, দেশবিশেষে "অনাচরণীয়", পক্ষান্তরে প্রকৃত বারজীবী দেশান্তরে "আচরণীয়" হইতেছে। এই সকল কারণের অনুসন্ধান না করিয়া, সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্য খোঁজা ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কল্পনা করা কতদূর সমীচীন, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সংগ্রাহকদিগের উক্তিতে অধিকাংশস্থলেই রামচন্দ্র-বিতাড়িত মারীচের অবস্থা দেখা যাইতেছে। রামের তাড়া খাইয়া মারীচ এতই ভীত হইয়াছিল যে, দ্বিতীয়বার রামের সমীপে যাইবার জন্য রাবণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলিয়াছিল—

"রকারাদীনি নামানি রামত্রস্তস্য রাবণ!
রত্নানিচ রথাশ্চৈব বিত্রাসং জনয়ন্তি মে"॥

হে রাবণ! আমি রামের ভয়ে এতই ভীত হইয়াছি যে, রত্ন, রথ প্রভৃতি রকারাদি নাম শুনিলেই আমার ত্রাস উপস্থিত হয়। আজ বৌদ্ধধর্ম্মতল্লাসী ঐতিহাসিকের কথাতেও সেই মারীচ-রীতিই প্রকটিত হইতেছে। ধর্ম্ম বলিতেই বৌদ্ধ, শূন্য কথা শুনিলেই বৌদ্ধের শূন্যবাদ স্থির হইয়া যায়। শূন্য কি, বাদ কি, আর শূন্যবাদই বা কি, তাহা ভাবিবার অবসর হয় না। শাস্ত্রিমহাশয় অভিভাষণের উপসংহারে দুইটি অভাবের কথার উল্লেখ করিয়াছেন! "বঙ্গদেশের ধনিগণ ইহার (ইতিহাসের) জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন, অর্থব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অভাব কেবল দুইটি জিনিষের, যাহারা পথ দেখাইয়া দিবে তাহার অভাব ও যাহারা সেই পথে চলিয়া কাজ করিবে তাহার অভাব।"

আমরা কিন্তু দেখিতেছি, তাঁহার চক্ষে প্রধান অভাবই প্রতিভাত হইতেছে না। তাহা পথ-প্রদর্শনের যোগ্য-লোক-নির্ণয় করিবার শক্তি, ও তদনুযায়ী নিয়োগ। এই প্রধান কার্য্যের অভাবে বাঙ্গালার ইতিহাসসঙ্কলন-প্রসঙ্গে ইতিহাস-প্রণেতার স্বার্থসিদ্ধির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে কত প্রকার বিপ্লব দেখা দিয়াছে, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। ইতিহাসসংগ্রহের উপক্রমেই—

"বর্ষারম্ভ-প্রথমদিবসে দারুণো বজ্রপাতঃ"

এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে, সেই গুলিতে সত্যের কোনও প্রকার সম্পর্ক আছে কি না, আদৌ তাহাতেই সন্দেহ। সাহেবেরা যে সকল অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ভারতবাসীর প্রধান অবলম্বন। সুতরাং তাঁহারা মূল বুঝিতে পারিয়াছেন কিংবা না বুঝিয়াই শাস্ত্রিমহাশয়ের ন্যায় "নানাকারণে সংস্কার" বশতঃ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহারই বিচার আবশ্যক। সাহেবদিগের ভ্রান্তির ফলে হয়শীর্ষ "হস্তুবায়" রূপে দেখা দিয়াছেন। (৫) পালিভাষায় প্রাকৃতভাষায় ত ভ্রম হইবার কারণই রহিয়াছে। যাহা ব্যাকরণাদির দ্বারা বিশেষরূপে নিয়ন্ত্রিত, সেই সংস্কৃত ভাষাতেও স্থূলে ভুল দেখিয়া, সর্ব্বত্রই অনাশ্বাসপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে।

শাস্ত্রিমহাশয় সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ "রামচরিত" হইতেই যখন আকাশকুসুমকল্প মায়ন রাজা পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারিয়াছেন, তখন "অন্যে পরে কা কথা?" শাস্ত্রিমহাশয়ের দীর্ঘকালের পরিশ্রম মধ্যে "রামচরিত" পুস্তক-প্রকাশ যেরূপ বিস্ময়াবহ হইয়াছে, ইহাতে আর হস্তলিখিত মূলপুস্তক

---

(৫) হাভেল সাহেব শিল্পের পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন।

না দেখিয়া, ঐতিহাসিকের কথায় স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাস হইতে পারে না। এই স্থলে শাস্ত্রিমহাশয়ের তন্ত্রজ্ঞতার এবং তদনুযায়ী রিপোর্ট-প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্যের সারবত্তার সম্পূর্ণ প্রতিকূল একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্ণানন্দকে তাঁহার পুস্তকবিবরণীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং রাজসাহী তাঁহার নিবাসভূমিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। জেলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কাটিহার নামক স্থানে তাঁহার বংশধরগণের প্রধান বাসস্থান বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। "তত্ত্বচিন্তামণি" তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয়ের রিপোর্টে পূর্ণানন্দ সম্বন্ধে আরও অনেক অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার একটি প্রতিবাদ করিয়াছি, তাহা ময়মনসিংহের সৌরভ পত্রিকায় (৬) মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয় পূর্ণানন্দ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহার একটিও সত্য নহে। আমি পূর্ণানন্দের সন্তান। আমার বাড়ীও ময়মনসিংহ, আমার জ্ঞাতিগণ অনেকেই পূর্ণানন্দের নিবাসগ্রামে বাস করিতেছেন। আমরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—পাকড়াসি গাঁই; সুতরাং পূর্ণানন্দের শরীরে বারেন্দ্ররক্ত একেবারেই নাই। উক্ত সিদ্ধপুরুষ কাটিহালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্ততি অদ্যাপি তথায় আছেন, ময়মনসিংহে কাটিহার-নামক কোনও গ্রাম নাই। অধিকন্তু পূর্ণানন্দ গিরির প্রধান গ্রন্থের "তত্ত্বচিন্তামণি" নাম নির্দ্দেশ করিয়া—বিপরীত লক্ষণায় শাস্ত্রিমহাশয় অতীব তন্ত্রজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তান্ত্রিকসম্প্রদায়ে ষোড়শীদেবী "শ্রীবিদ্যা" নামে অভিহিত ও সুপরিচিত। এই বিদ্যার যাবতীয় বিবরণসম্বলিত গ্রন্থ "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" নামে অভিহিত। সুতরাং শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিকে তত্ত্বচিন্তামণি-রূপে অভিনব নামে নির্দ্দেশ করায় তন্ত্রানভিজ্ঞাতারই পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র বুঝিতে হইলে, কিরূপ বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন, রাঘবভট্টের উক্তিতেই তাহা পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তিনি বেদান্তাদি নানাশাস্ত্রবেত্তা পূর্ব্বপুরুষদিগের বর্ণনা করিয়া, মহারাষ্ট্র হইতে ৺বারাণসীধামে সমাগত তাঁহার পিতৃদেবের গুণগরিমার কীর্ত্তনানন্তর বলিয়াছেন—

"তস্মাদ্রাঘবভট্ট এষ সমভূদ্বেদান্ত-সন্ন্যায়বিৎ
খ্যাতো ভট্টনয়ে সমস্তগণিতে সাহিত্যরত্নাকরঃ।
আয়ুর্ব্বেদনিধিঃ কলাসু কুশলঃ কামার্থশাস্ত্রে গুরুঃ
সঙ্গীতে নিপুণঃ সদাগমনিধেঃ পারং প্রয়াতঃ পরম্।"

উক্ত কবিতার অর্থানুসারে বুঝা যায়, রাঘবভট্ট বেদান্ত, ন্যায় ও ভট্টানুসারি-মীমাংসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি গণিত, সাহিত্য ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছিলেন, সমস্ত কলাতে নিপুণ ছিলেন, কামশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে গুরু নামে পরিচিত এবং সঙ্গীতে কুশল হইয়া সদাগমরূপসমুদ্রের (তন্ত্রসাগরের) পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের আদ্যোপান্ত বুঝিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিলে, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেকালের তান্ত্রিক সমাজে কোন্ কোন্ শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন ছিল, তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাও বুঝা যায় যে, সেকালে "শূন্যপুরাণ", "ধর্ম্মমঙ্গল" প্রভৃতি গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে প্রমাণপদবীসমারূঢ় শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইত না।

শাস্ত্রিমহাশয় এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণের অবতারণা প্রায়ই দেখা যায় না। ধারণা, সংস্কার, বা বিশ্বাস, এতন্ত্রিতয়ের সমাবেশ হাকিমের রায়-প্রকাশেই শোভা পায়। ইতিহাসের উপাদানরূপে অনুল্লিখিত নানাকারণলব্ধ সংস্কারের উপন্যাস শাস্ত্রিমহাশয়ের অভিনব রচনারীতি বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই রচনারীতির সুবিধা এই যে, ইহাতে রচনা কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে, কোন্ প্রমাণের বলে কোন্ কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কাহারও ধরিবার বা বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং প্রতিবাদের পথ যথাসম্ভব রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

(৬) অগ্রহায়ণ ১৩২১।

মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা

[শ্রীরাখালরাজ রায়, B. A.]

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ২১শ ভাগ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ মহাশয়ের "মানভূম জেলার গ্রাম্য-ভাষা" সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ভরসা করি, প্রবন্ধলেখক ইহাকে প্রতিবাদ মনে করিবেন না।"

প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন, "অন্যান্য স্থানে যে প্রকার আকারান্ত শব্দের 'আ' স্থানে 'এ' সংযুক্ত করিয়া কোমলতা-বিধান হয়, এখানে তাহা হয় না।"—'আ' স্থানে 'এ' করিলে কোমলতা-বিধান বাস্তবিকই হয় কি? না, প্রবন্ধলেখক স্বয়ং যেরূপ উচ্চারণ করেন, তাহার ব্যতিক্রম হইলেই প্রবন্ধলেখকের কর্ণে শ্রুতিকটু বোধ হয়? "বাঙ্গালা ভাষার" লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই 'আ' স্থানে 'এ' উচ্চারণ হওয়াকে উচ্চারণের বিকার বলিয়াছেন। এরূপ বিকৃত উচ্চারণ কোন জাতির স্বেচ্ছাকৃত নহে। কাজের লোক তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতে যাইয়া, এইরূপ বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করিয়া ফেলে। তাই বিবাহ কলিকাতায় 'বে' হইয়াছে। আর শুধু আকারান্ত শব্দের 'আ' স্থলে 'এ' হয় না, উপান্ত 'আ' স্থলেও 'এ' হয়; যেমন রাঁধিয়া—রেঁধ্যে, থাকিয়া—থেক্যে। (শেষে 'য' ফলা বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুকরণে দেওয়া হইল)। আবার 'উ' পরস্থিত 'আ' স্থানে 'ও' হয়। যথা জুতা—জুতো, খুড়া—খুড়ো।

প্রবন্ধলেখক অন্যত্র লিখিয়াছেন "শব্দান্তক 'ই' বা 'ইয়া' মানভূমে 'য্যা'তে পরিণত হইয়াছে। 'মতি' এখানে লিখিত ভাষায় 'মত্যা', গড়িয়া—গড়্যা ইত্যাদি।...এই য্+আ বা 'য্যা'র উপদ্রব স্থলবিশেষে সাধারণ বাঙ্গালা বানানের নিয়মকে প্রতিরুদ্ধ করিয়াছে। র্+য্ সংযুক্ত হইলে 'র্য্যা' হওয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের রীতি।"—কলিকাতা অঞ্চলে মতিকে ডাকিতে হইতে 'ম'তে' বলিয়া ডাকে। কিন্তু ইহাতেও ঠিক উচ্চারণ প্রকাশিত হইল না। বিদ্যানিধি মহাশয় 'এ'র এইরূপ উচ্চারণ প্রকাশ করিবার জন্য 'মত্যে' লিখিবেন। (এখানে 'ত'এর দ্বিত্ব উচ্চারণ হইবে না) ইহার অন্তঃস্থিত একার 'বেটা'র একারের ন্যায় একটু বাঁকা উচ্চারণ করিলেই মানভূমের উচ্চারণ আসিয়া পড়ে। এরূপ উচ্চারণ মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থানে ও বীরভূম জেলার কিয়দংশে প্রচলিত আছে। লেখক মহাশয় যদি 'য'এর প্রকৃত উচ্চারণ ধরিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, 'করিয়া' স্থানে 'কর‍্যা' লিখিলে, কোন ব্যাকরণেরই নিয়মভঙ্গ হয় না। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় বহু স্থানে 'র‍্যা' লিখিয়াছেন—'র্য্যা' লেখেন নাই। কৃ+য=কার্য্য, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম, বাঙ্গালা ব্যাকরণের নহে। শেষের 'এ' কারের বক্র উচ্চারণ পূর্ব্বে বহু পুস্তকেই ছিল। কলিকাতার জয়-গোপালেরা তাহাকে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অধুনা মুদ্রিত পুরাতন পুস্তকে এই বাঁকা উচ্চারণের বানান ঠিক রাখা হইতেছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রাম-রসায়ন' গ্রন্থ হইতে ২।১ স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। গ্রন্থকারের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার মানকরের সন্নিকট। তিনি প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ও মুদ্রিত প্রাণচন্দ্রের হরিহরমঙ্গল হইতেও উদ্ধৃত করিতেছি। প্রাণচন্দ্র বর্দ্ধমান-সহরবাসী ছিলেন।

(১) কৃতাঞ্জলি হয়্যা করি ব্রাহ্মণ প্রণাম।
(৩ পৃঃ রামরসায়ন)

(২) ধর‍্যাছিলা তেন রামে জঠরমাঝার। ঐ

(৩) বেণ্যা বউ নিজ বিম্ব বাটীতে দেখান। ঐ

(৪) আছেন প্রভু মোর ত্রিভঙ্গ হয়্যা। করে বংশী বামে শ্রীরাধা লয়্যা (হরিহরমঙ্গল ২৬ পৃঃ)

আবার সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ব্যাকরণের রীতির অনুসরণ করিলে আমাদিগকে 'হ্যারিসন রোড' উচ্চারণ করিতে হইত না; 'হ্যারিসন' হইত।

প্রবন্ধলেখক আর একস্থানে লিখিয়াছেন "'তুমি' শব্দের সম্বন্ধ পদ 'তোমার' হওয়া উচিত।" কেন?—শূন্য পুরাণে দেখিতে পাই—"এতিন ভুবন জিনি রাজত্বি তুহ্মার।" এই "তুহ্মার' হইতে 'তুমার' হইয়াছিল। সাধু ভাষায় ও বহু স্থানের কথিত ভাষায় 'তোমার' চলিয়াছে। কিন্তু এখনও মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশে 'তুমার' বাঁচিয়া আছে। বোধ হয়, তাহার হিন্দি প্রতিবেশী 'তুম্হারা' তাহাকে এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

লেখক মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, "পদের প্রথম

অক্ষর 'ন' থাকিলে মানভূমে সাধারণতঃ ঐ 'ন' স্থানে 'ল' আগম হয়।" সাধু ভাষার দেশ হুগলী, নদীয়া ও কলিকাতায় ইহার বিপরীত সূত্রটি খাটে। এ অঞ্চলে লবণ—নুন, লক্ষ্মী—নক্‌খী, লইয়া—নিয়া। এই 'নিয়া, কথাটির 'নতুন' কৈফিয়ত দেওয়া হইতেছে যে, ইহা 'নী' ধাতু হইতে উৎপন্ন! কিন্তু পূর্ব্বের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কিংবা বঙ্কিমবাবুর নভেলেও তো ইহার সাধু আকার পাই না।

মানভূমবাসী 'বাতাস' স্থানে 'বাসাত' বলে, তাই তাহাদিগকে অপরাধী করিয়াছেন। সে অপরাধ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র দেখিয়াছি। বোধ হয়, ইহা ভাষার ব্যক্তিগত উচ্চারণ-দোষ। যেমন বাক্স—বাস্ক, ডেস্‌কো—ডেক্‌সো, বাসক (ফুল)—বাকস্‌। বিদ্যানিধি মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, বীরভূমের 'বাসাত', রাঢ়ের 'বাকস' ও কলিকাতার 'নতুন' অপভ্রষ্ট উচ্চারণের উদাহরণ।

'গেছে' স্থানে 'গেলছে' ও 'হয়েছে' স্থানে 'হ'লছে' মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশেও প্রচলিত। মানভূমবাসীর এই 'ল' যোগ অনর্থক নহে। করিতে+আছে=করিতেছে, করিয়া+আছে=করিয়াছে, সেইরূপ হইল+আছে=হ'ল্‌ছে।

'আছাড়' কথার পূর্ব্বে মানভূমে 'ক' আগম হয় না। 'আছাড়' অর্থে 'কাছাড়' কথা বর্দ্ধমানেও প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে এ অঞ্চলের পুস্তকেও একথা ব্যবহৃত হইত। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে আছে—"শরণে কাছাড় খেয়ে সর্ব্বাঙ্গেতে কড়া।"

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "ভবিষ্যৎকালে সমাপিকা ক্রিয়ার পর তৃতীয় পুরুষে বিকল্পে 'ক' প্রয়োগ সাধারণ বাঙ্গালা ভাষায় আছে। পরমপূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকে উক্ত প্রকার 'ক'এর দান সাগর করিয়া গিয়াছেন। মানভূমে উপরোক্ত স্থলে একটিও 'ক'-বর্জ্জিত পদ ব্যবহৃত হয় না।"—পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে এককালে রাঢ়ের ভাষারই প্রাধান্য ছিল। লেখক ভুল বুঝিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইচ্ছা করিয়া দানসাগর করেন নাই। লেখক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাঙ্গলা ব্যাকরণের ১৩৩ পৃঃ পাঠ করিবেন। পাঠকের অবগতির জন্য এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। "প্রাচীন বাঙ্গলায় 'করিবাক' 'হইবাক' ছিল। আমরা বাল্যকালে জানিতাম—'করিবেক', 'হইবেক'।…………উত্তর রাঢ়ে 'দিলেক' ও দক্ষিণরাঢ়ে 'খেলেক' স্ত্রীলোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন যাহা সাধু ভাষা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। আমরাও বাল্যকালে চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম, 'তাহারদিগের' তৎপরে হইল—'তাহাদিগের'—এখন হইয়াছে 'তাহাদের'। নদীয়া জেলার লেখকগণ বোধ হয়—'যাইবা' 'খাইবা' প্রচলন করিয়াছিলেন; এখনও নদীয়া, মুর্শিদাবাদের চলিত কথায় 'খাবা' 'যাবা'র ব্যবহার আছে। কলিকাতার লোকে 'যাইবা' স্থানে 'যাইবে' চালাইলেন। চলিত কথায় 'যাবে' দাঁড়াইয়াছে। এই 'বা' 'বে' এর দান-সাগর কে করিয়াছে?

প্রবন্ধলেখক বলেন, "এখানে 'কে'র অপর একপ্রকার ব্যবহার আছে। যিনি মানভূমে না আসিয়াছেন, তিনি এই প্রকার ব্যবহারের কথা কল্পনায় আনিতে পারেন না। যেমন জল আনিতে যাও=(মানভূমে) জল্‌কে যাও।" লেখক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, আমি একবার মাত্র ৫।৬ ঘণ্টার জন্য পুরুলিয়া গিয়াছিলাম, কোন মানভূমবাসীর সহিত আলাপ করি নাই তথাপি আমি "জল আনিতে চল্‌" অর্থে "জল্‌কে চল্‌" এর ব্যবহার বহুস্থানে দেখিয়াছি। মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশে এরূপ 'কে' এর ব্যবহার আছে। রবিবাবু পুরুলিয়ার গ্রাম্যভাষার সহিত পরিচিত কি না জানি না কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন—"বেলা যে পড়ে এল জল্‌কে চল"।

'কিহে' শব্দের স্থানে মানভূমে 'হৈঃ' ব্যবহার হয় না। আমি বাঁকুড়াবাসীর 'হৈঃ' ব্যবহার দেখিয়াছি। ইহা বিস্ময়সূচক অব্যয়। এরূপ স্থলে অন্য স্থানে 'বাঃ' 'এই' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন "বাঃ, তুমি এর মধ্যে এসে পড়েছ!" "এই, তুমি এর মধ্যে এসেছ!" "একি, তুমি এর মধ্যে এসেছ!" ইত্যাদি

মানভূমে "তিনি ভাল লোক" না বলিয়া "তিনি ভাল লোক বটেন" বলে; তাহার কারণ, হিন্দির সংস্রব। হিন্দিতে 'হৈ' ক্রিয়াটুকু না দিলে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। মানভূমেও 'বটে' না দিলে বাক্য অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করে। যুক্ত-প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীকে বলিতে শুনিয়াছি—"তিনি

আমার কাকা হচ্ছেন।' এই 'হচ্ছেন' ক্রিয়াটুকু না দিলে ইঁহারা কিছুতেই তৃপ্ত হন না।

বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের বহুস্থানে 'পারিব না' অর্থে 'নারিব' বা 'না'র্‌বো' শব্দের ব্যবহার আছে। বাঁকুড়াবাসীও কৃ-ধাতু-যোগে ণিজন্ত নিষ্পন্ন করে।

লেখক 'মেয়ে' বা 'মাইয়া' কথা লইয়া মানভূমবাসীকে যেরূপ অপরাধী করিয়াছেন, তাহারা ঠিক তেমন অপরাধী নহে। ইহাতে যদি কাহারও অপরাধ থাকে, সে দক্ষিণ বাঙ্গলার লোকের।

'কন্যা' অর্থে 'মেয়ে' শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্বে ছিল না। ঝি বা বেটি কথাই 'কন্যার' চলিত প্রতিশব্দ ছিল। যেমন—

রামপ্রসাদের গানে—

সেকি এমনি মেয়ের মেয়ে! (স্ত্রীলোক অর্থে)

যার নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে।

দেওয়ান মহাশয়ের গানে—

রঙ্গভূমে উলঙ্গী হয়ে নাচে কার মেয়ে (স্ত্রী অর্থে)
অর্দ্ধেন্দুভালে কেশ দোলে পদে লুটায়ে।

ভারতের অন্নদামঙ্গলে—

এতো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়। (স্ত্রীলোক অর্থে)

এখন দক্ষিণ-বঙ্গবাসী 'কন্যা' অর্থে যদি 'মেয়ে' শব্দের ব্যবহার করিয়া অপদস্থ হন, তাহা হইলে দোষ কার? মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের বহুস্থানে 'স্ত্রী' অর্থে 'মেয়ে' শব্দের প্রয়োগ হয়।

ভরসা করি, লেখক মহাশয় শব্দসংগ্রহে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন। কাহারও প্রতি কটাক্ষপাতের প্রয়োজন নাই। ইহা উপদেশ নহে, অনুরোধ মনে করিয়া আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

বউ কথা কও

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

বল দেখি পাখী তুমি বসিয়া শাখায়,
বউ কথা কও বলি সাধিছ কাহায়?
করেছে কি অভিমান,
তাই কি ভাঙ্গিতে মান
সাধিতেছ প্রেয়সীরে তুষিবার ছলে,
বউ কথা কও—বউ কথা কও ব'লে?
বসিয়া কি অধোমুখে প্রেয়সী তোমার,
অভিমানে মৌনবতী, করি মুখ ভার!
আরক্ত নয়নে তার,
ঝরে কি নয়না'সার,
ফুলে কি হৃদয়খানি সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
কহেনা কি কথা, পাখী তব প্রিয় ভাষে?
শুন শুন পাখী এক যুকতি আমার,
ভাঙ্গিবে না মান সুধু কথায় তোমার।
দূরে রাখি অপমান,
ভাঙ্গিবে তাহার মান,
কাতরে ধরিবে পদ, লুটিয়া ধরায়,
বউ কথা কও বলি সাধিবে তাহায়।

হতাশ প্রেমিক, মান-তরঙ্গে পড়িয়া,
ভাঙ্গিবার সুকৌশল শিখেছে ঠেকিয়া;
যাও তার পদে ধরি,
ডাকিবে বিনয় করি,
বউ কথা কও—বউ কথা কও বলে,
মান ত্যজে মানিনী কি, পায়ে না ধরিলে?
লাজ নাই ইথে পাখী, কত মহাজন,
ভাঙ্গিতে দুর্জ্জয় মান ধরেছে এমন;
গোলোকবিহারী হরি,
শ্রীরাধার পদে ধরি,
হয়ে ছিল পার নাকি মান-পারাবার,
ধরিতে প্রেয়সী পদ, লজ্জা কি তোমার!
বহিছে মস্তকে যারা মানের পসরা,
মানিনীর মানে তারা দিনে দেখে তারা!
ভাঙ্গিতে প্রিয়ার মান
পায়ে গড়াগড়ি যান,
আছে হে অনেক পাখী, তুমি একা নও!
ঘরে ঘরে ডাকে কত—বউ কথা কও।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ক্ষৌম-বস্ত্র

[শ্রীঅভয়চরণ লাহিড়ী]

কিছু দিবস পূর্ব্বে "চণ্ডী"র একটি শ্লোকের অর্থ লইয়া কিছু বিব্রত হই। শ্লোকটি এই,—

"বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যং অগ্নি-শৌচে চ বাসসী।"

—দেব্যা দূতসংবাদঃ, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৯৯।

শুম্ভকে কোন্ কোন্ দেবতা কি কি ঐশ্বর্য্য উপহার দিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা-প্রসঙ্গে দূত শুম্ভকে বলিতেছেন—"বহ্নিদেবও তোমাকে অগ্নি দ্বারা শুদ্ধীকৃত দুইখানি বসন দিয়াছেন।"

'অগ্নিদ্বারা শুদ্ধীকৃত' এই কথার অর্থ কি? কাপড়কে অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ করিব কি প্রকারে? কাপড়ে অগ্নিস্পর্শ করাইলে তাহার আর কিছু থাকে কি?

চণ্ডের সহিত শুম্ভের পরিহাসের সম্পর্কও ছিল না যে বলিতে পারি, তিনি ভস্ম উপহার দিয়াছিলেন।

একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিলেন যে, অগ্নিদেব স্বয়ং পবিত্র, অতএব তাঁহার হস্ত-স্পর্শেই ঐ বস্ত্রদ্বয় শুদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আর একজন বলিলেন, "অগ্নির মতই শুদ্ধ" এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহার কোনটাই আমাদের মনঃপূত হইল না। অকস্মাৎ একদিন এক বন্ধুর গৃহে একখানি পুস্তক দেখিলাম। পুস্তকখানি অতি পুরাতন। ইহার নাম—

The History Of Ancient Egypt

From

Rollin and the Encyclopaedia Britanica.

Calcutta, 1847.

ইংরাজির পার্শ্বেই বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া আছে। ইহার অন্তর্গত Manners or Customs of the Egyptians নামক অধ্যায়ে ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"Priests were always habited in linen and never in woollen and all persons of distinction, generally wore linen clothes. This flax formed a considerable branch of the Egyptian trade, and great quantities of it were exported into foreign countries.

"*Byssus.* This was another kind of flax extremely fine and delicate, which often received a purple dye. It was very dear, and none but rich and wealthy persons could afford to wear it. Pliny, who gives the first place to the Asbeston or Asbestinuon (i. e. the incombustible flax), places the Byssus in the next rank; and says that the dress and ornaments of the ladies were made of it (A flax is now found out, which is proof against the violence of fire; it is called living flax; and we have seen table-napkins of it glowing in the fires of our dinning rooms; and receiving a lustre and cleanliness from flames, which no water could have given it.)"

"তথাকার পুরোহিতেরা সর্ব্বদা ক্ষৌম-বস্ত্র পরিধান করিতেন, রোমজ বস্ত্র কদাচ ধারণ করিতেন না। প্রধান লোকেরাও প্রায় সকলে অহরহ ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিতেন। ইজিপ্তদেশে পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ক্ষুমা অতি প্রধান ছিল এবং তাহা রাশিরাশি পরিমাণে দেশদেশান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত।

"এই বৃক্ষের (ক্ষুমার) ত্বচেও ধূম্রবর্ণ সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু তাহা অত্যন্ত মহার্ঘ্য ছিল, ধনাঢ্য লোক ব্যতীত অন্য কাহারও তাহা পরিধান করিবার সঙ্গতি

হইত না। 'প্লিনি' (Pliny) একপ্রকার ক্ষুমার প্রসঙ্গ করতঃ কহেন, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। তাহাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এবং বিশস-নামক ক্ষুমাকে তাহার দ্বিতীয়রূপে গণ্য করতঃ কহেন, সেই দুকুল বসনে স্ত্রীলোকদের উত্তম শোভা হইত।"

এরূপ গুণযুক্ত "ক্ষৌম"-নামধেয় দুষ্প্রাপ্য বসন উপহার-দানেরই উপযুক্ত। উক্ত শ্লোক হইতে এক্ষণে আমাদের সহজেই মনে হয় যে, এক সময়ে ঐ বস্ত্র ভারতেও পাওয়া যাইত।

অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণই স্থির করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীন কালেও ভারতের সহিত মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য চলিত। আর্য্যেরা স্বদেশ-জাত প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য দ্রাবিড়দিগের হস্তে দিতেন। দ্রাবিড়েরা তাহা লইয়া সুবৃহৎ অর্ণবপোতের সাহায্যে মহাসাগরের পারে দেশবিদেশে লইয়া যাইতেন। কাঠিয়াওয়াড় জেলায় এখন ঐ বণিক্‌দিগের অতি প্রাচীন বন্দরের ধ্বংসাবশেষ আছে। কোথাও বা সমুদ্র সরিয়া গিয়াছে। বাণিজ্য সূত্রেই এই সকল বণিকের "দ্রাবিড়" নামের উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের মধ্যে এখনও "ণ"—কে "ড়"—এর মত উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। বোধ হয়, দ্রব্য শব্দ হইতে "দ্রবিণ"—তাহা হইতে "দ্রবিড়"—তাহা হইতে "দ্রাবিড়" শব্দের উৎপত্তি।

যাহা হউক, এই বাণিজ্য-সূত্রে ভারত ও মিশরে, ক্ষৌম-বস্ত্রের আদান-প্রদান হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাও অসম্ভব নহে যে, ভারতেও ঐ বীজ আনিয়া চাষ করা হইত। যুগ-যুগান্তের অব্যবহারে এক্ষণে উহার আবাদ নাই। কিন্তু এখনও কোনও কোনও স্থানে দেখা যায় যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা নূতন বস্ত্র পরিধান বা দান করিবার পূর্ব্বে কাচিয়া শুকাইয়া লন। তৎপরে সন্ধ্যার সময় একবার অগ্নির কাছে লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ সরাইয়া ল'ন। পরদিবস পরিধান করেন। পূর্ব্বে ক্ষৌম-বস্ত্র অগ্নিতে দিলে, তাহার ময়লা পুড়িয়া যাইত এবং বস্ত্র শুদ্ধ হইত।

ইজিপ্তের ইতিহাসকারেরা বলেন যে, তদ্দেশীয় সভ্যতা যীশুখৃষ্টের ১২।১৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বের। Pliny (প্লিনি) কর্ত্তৃক ইতিহাস-প্রণয়নের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে ক্ষৌমবস্ত্রের প্রচলন ছিল। মিশরের সভ্যতারম্ভের সময় হইতে ভারতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধস্থাপনের সময় পর্য্যন্ত দুই হাজার বৎসর ছাড়িয়া দিলে, দশ হাজার বৎসর থাকে।

কোনও ঐতিহাসকই এই বাণিজ্য-সম্বন্ধ-স্থাপনের সময় স্থির বলিতে পারেন না। আমরা আন্দাজ-মত খৃঃ পূঃ দশ হাজার বৎসর পাইতেছি। সম্ভবতঃ এই সময়ের কিছু দিবস পরে ভারতে ক্ষৌমবস্ত্রের আমদানী হয় এবং তাহার কিছু পরে চণ্ডী লিখিত হয়।

চণ্ডীতে সন্নিবেশিত আখ্যায়িকাকে অনেক ঐতিহাসিকে—বিশেষতঃ য়ুরোপীয়েরা—উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেন। হিন্দুরা যাহাই ভাবুন না কেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের তর্ক করিবার কিছুই নাই, পাশ্চাত্য-মতানুগামী ব্যক্তিগণের জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। উক্ত ঐতিহাসিকগণের মত এই, যে সময়ে আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্তে অগ্রসর হইতে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা পরাক্রমশালী অনার্য্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ন। সেই ব্যাপারকে রূপকে পরিবর্ত্তিত করিয়া চণ্ডীতে দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডী কোন্ সময়ে লিখিত হয়, ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

একদল বলেন, আর্য্যগণকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে সেই সময়েই চণ্ডী লিখিত হয়। অন্যদল বলেন যে, ঐ সকল ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া, আর্য্যদিগের বীরত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে পরে (অর্থাৎ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত দখল করিবার পরে) চণ্ডী লিখিত হয়। উহা কবির কল্পনার সাহায্যে সুচারুরূপে বর্ণিত।

যে সময়েই লিখিত হউক না কেন, সেই সময়ে যে ক্ষৌম-বস্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, নহিলে কবি জানিলেন কিরূপে ?

পূর্ব্বোক্ত প্রথম দলের কথা যদি সত্য হয়, তবে মানিতে হইবে যে, খৃষ্টের ১০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যে অনার্য্যে যুদ্ধ হয়, এবং সেই সময়েই অথবা তাহার বহুপূর্ব্বে দ্রাবিড়গণ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন।

যদি দ্বিতীয় দলের কথা সত্য হয়, তবে মানিতে হইবে যে, খৃষ্টের ১০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত

অধিকার করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহাদের সহিত দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড়দিগের পরিচয় হয়।

একটি কথা এই স্থলে জানাইতে ইচ্ছা করি। অর্থ-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলেন—

(১) প্রাচীন মানবজাতির মধ্যে প্রত্যেকে শুদ্ধ নিজের ব্যবহারের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত।

(২) পরে কয়েক জনকে লইয়া একটি দল হইল, তাহাতে পরস্পরের অভাব-মোচনের চেষ্টা চলিত।

(৩) পরে সমস্ত গ্রামের অভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত হইল এবং গ্রামে গ্রামে বাজার বসিল।

(৪) সমস্ত জাতির অভাব-মোচনোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইত। এই উপলক্ষে বণিকেরা দেশের মধ্যেই এক সহর হইতে অন্য সহরে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইত।

(৫) সর্ব্বশেষে সভ্যতার চরম সময়ে একজাতি অন্য-জাতির সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হইল।

অতএব ভারতবাসীরা যে সময়ে বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে যে তাঁহারা সভ্যতার চরমে উঠিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষোক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ২৩শত বৎসর লাগিয়াছিল। সুবিস্তৃত ভারতের পক্ষে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ কে করিবে!

চণ্ডী-লিখনের সময় যদি খৃঃ পূঃ দশ হাজার বৎসর হয়, তবে কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদাদি লিখিত হইয়াছিল!

যে মহাত্মারা বেদের উৎপত্তি হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্তকে মাত্র ৫ হাজার বৎসরের গণ্ডীর ভিতর ফেলিতে চাহেন, তাঁহারা কি বলেন?

জৈন-নীতি

[শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, M. A.]

জৈন প্রার্থনা-পুস্তক হইতে কতকগুলি নীতি-উপদেশ সঙ্কলন করিয়া দিলাম; আমার মনে হয়, এইগুলি পাঠে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেই যথেষ্ট নীতি শিক্ষা করিতে পারিবেন।

অর্থ না হইলে অসুখী হইও না; কদাচ অসৎ পথে যাইও না।

দেশকালের দোষ দেখা অপেক্ষা, আমাদেরই দৈনিক অভ্যাসগত দোষ দেখাই যুক্তিসঙ্গত।

মনে করিও না যে, জীবিকা-উপার্জ্জনের নিমিত্তই বিদ্যা শিক্ষা; পরন্তু ইহার উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া।

সকল কার্য্যসাধনে পরিশ্রমশীল ও দক্ষ হইবে; কখন অলস হইও না।

শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতাবশতঃ কোন সৎকার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে কাতর হইও না; কিন্তু সারা-জীবন এমন কোন কার্য্য করিও না, যাহা তোমাকে লোকের নিকট তিরস্কারের বা উপহাসের পাত্র করিয়া দিবে।

যদি ধারণা জন্মিয়া থাকে যে,আত্মীয়গণকে এই পৃথিবীতে রাখিয়া তোমাকে এখান হইতে একা যাইতে হইবে, তাহা হইলেই যথেষ্ট; কারণ,যাহা তোমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হইবে, নশ্বর সে সকল কিছুই তোমাকে আর মায়ামুগ্ধ করিতে পারিবে না।

জীবনের প্রথম ভাগে এমন কার্য্য করিবে, যাহার ফলে বার্দ্ধক্য সুখকর হইতে পারে।

সমস্ত জীবন ধরিয়া এমন কার্য্য করিবে, যাহাতে মৃত্যুর পর জীবনেও সুখী হইতে পার।

যাহা কাল করিবে, মনে করিয়াছ, তাহা আজই সম্পন্ন কর, এবং যাহা আজ করিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছ, তাহা এখনই কর; কারণ, কোন ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে কি না, আসন্ন-সম্ভব মৃত্যু তাহা লক্ষ্য করিবে না।

পার্থিব সমস্ত পদার্থই নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর জানিয়াও যদি তুমি তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, সে নির্বুদ্ধিতা কিছুতেই ক্ষমার্হ নহে।

জীবনের শেষমুহূর্ত্তে ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না; ইহা জানিয়াও পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপে কেন মনোযোগী হইতেছ না?

এই অপদার্থ জীবনে এমন কিছুই নাই, যাহা মানবকে মুগ্ধ করিতে পারে; মোক্ষ ব্যতীত লোভনীয় পরম সুখের উৎস আর কিছুই নাই।

সর্ব্বদা মনে রাখিও, পৃথিবীতে একা আসিয়াছ ও একা যাইতে হইবে; তোমার কেহই নাই, তুমিও কাহারও নও।

পার্থিব পদার্থের মধ্যে কোন্‌টা তোমার আয়ত্ত, তাহা বেশ করিয়া চিন্তা কর এবং দেখিতে পাইবে যে, আত্মা ব্যতীত কিছুই তোমার নিজস্ব নহে।

ধনের অহঙ্কার এতই প্রবল যে, কিছুতেই তাহা চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না।

নিম্নলিখিত অমূল্য রত্নগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিবে।

মন ও জিহ্বাকে দমনে রাখিবে।

অপরিচিত লোকের নিকট তোমার গৌরব বা অপযশসূচক কিছুই বলিও না।

সর্ব্বদা বিনয়ী হইবে।

সকলের সহিত শান্তিতে বাস করিবে; যে ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ করিয়া সুখের আশা করে, সে নিজের দুঃখের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি করে এবং নূতন বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করে।

অতিরিক্ত হাসির প্রশ্রয় দিও না; কদাচ গর্ব্বিত বা ভণ্ড হইও না।

বাহ্যাড়ম্বর-বিশিষ্ট সাজসজ্জা করিও না; সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে,—বেশভূষা শাদাসিদে ধরণের করিবে।

যাহাতে নিজের ও অপরের মঙ্গল সাধিত হয়, সেইরূপ কার্য্য করিবে।

সুখের সময় যাহারা তোমার অপেক্ষা বেশী সুখী, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

নিজের ক্ষমতায় সন্তুষ্ট থাকিবে।

সম্ভবপর হইলে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদেরও উপকার করিবে।

পল্লীমহিলার একটি ব্রত

[শ্রীসত্যভূষণ দত্ত]

কথায় বলে, "হিন্দুদের বার মাসে তের পার্ব্বণ।" পল্লীমহিলাগণ কিন্তু মাসেই প্রায় তেরটি ব্রত-পার্ব্বণ করিয়া থাকেন। এইসকল গ্রাম্যব্রত কুসংস্কারই হোক, আর যাই হোক,—একটু তলাইয়া দেখিলে এই ব্রতাদিই যে, সেকালের সমাজচিত্রের নিদর্শন-স্বরূপ তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়।

আমি যে ব্রতটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহা কোন আনুষ্ঠানিক ব্রত নহে, অর্থাৎ দূর্ব্বা-তুলসী-পুষ্প-বিল্বপত্র সংযোগে পুরোহিতের দ্বারা কোনও পূজার্চ্চনা—করাইতে হয় না। ব্রতটি সম্পূর্ণ নিজস্ব অথচ কোন উপাস্য নাই; ব্রতটিতে কেবলমাত্র সেকালে বাঙ্গলা দেশে অতিথিসৎকারের কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহারই অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়।

ব্রতটির নাম শুনিলে হয় ত অনেকেই হাস্য-সংবরণ করিতে পারিবেন না। ব্রতটির নাম "আচম্বিতের ব্রত।" অন্যান্য ব্রতের ন্যায় ইহাতে কোনও প্রকার উপবাসাদি করিতে হয় না। ব্রতদিবস নিজ বাড়ীতে আহার নিষিদ্ধ। সেদিন পরের বাড়ীতে এক বেলা আহার করিতে হইবে। এমন বাড়ীতে আহার করিতে হইবে, যে বাড়ীতে পূর্ব্বে কখনও খাওয়া হয় নাই; অথবা যার রান্না কখনও খাওয়া হয় নাই। ব্রতচারিণীকে কেবল একঘটি জল ও একখণ্ড কদলী-পত্র লইয়াই উপরিউক্ত বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মৌন থাকিতে হইবে। আহারাদির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও শব্দ করিতে পারিবে না। শব্দ করিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে। কদলী-পত্র ও জলের ঘটি দেখিয়াই গৃহিণীকে মনে করিতে হইবে, এ বেলা আহার করিবার মানসেই সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে। তাই বাক্যব্যয় না করিয়া, অতীব যত্নসহকারে আগন্তুককে উপস্থিতমত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্বারা পরিতৃপ্তরূপে খাওয়াইতে হইবে; ব্রতচারিণীকেও গৃহিণীপ্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী আহারে পরিতৃপ্ত হইতে হইবে। ইহাই উক্ত ব্রতের সংস্কার বা বিধি।

বাস্তবিক বিনা বাক্যব্যয়ে যে দেশে অতিথিসৎকার হয়, এক কপর্দ্দকও হাতে না করিয়া যে, দেশ বেড়াইতে পারা যাইত, ইহা আর অসম্ভব কি?

আর এখনও প্রাচীনদের মুখে পল্লী-কবির

"অতিথির রূপে আমি শ্রীহরি,
ঘরে ঘরে ফিরে ছলনা করি"

অন্যত্র বঙ্গ-বধূর উক্তিতে—

"অতিথি ফিরিয়া যায়, কেমনে রাখিব তায়"

প্রভৃতি কবিতা শুনিতে পাওয়া যায়।

পাড়া গাঁয়ে এখনও অতিথিকে নারায়ণ-জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকে।

বসন্তে নির্দ্বন্দ্বভাব

[শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী]

শ্যাম স্নেহ উচ্ছলিয়া,
লতিকায় মঞ্জরিয়া,
মৃদুবায়ে প্রকম্পিয়া,
ঋতু রাণী ওই বুঝি আসে রে!
বিচঞ্চল সমীরণ,
আকুল ব্যাকুল মন,
ফুলবনে বনরাণী হাসে রে।
কোন্ পুরাতন কথা—
মরম-নিভৃত-ব্যথা,
কার সাড়া পেয়ে যেন জাগে রে।
যুগযুগান্তর পরে,
কে আমারে স্নেহভরে,
ডাকিল আবার নব রাগে রে।
স্নেহ-সিক্ত চোখ্ দুটি,
সেই মুখে আছে ফুটি,
চির-লাবণির ওই ঘরে রে।
প্রেম-ঢাকা সেই স্মিত,
রস-ঘন পুলকিত,
বিলায় হরষ আমা তরে রে।
ব্যথা এবে ব্যথা নাই,
সুখের পরশে তাই,
প্রতি অঙ্গ আজি মোর ভরা রে।
বিচ্ছেদ ফেলে না শ্বাস,
দূরে গেছে হা-হুতাশ,
সন্তাপ ছেড়েছে এই ধরা রে।
আদরিণি! রে আমার,
অন্তিমের ঘন-সার,
জীবনের অমৃত নিরিতি রে!
মদালসহীন প্রাণ,
নাহি স্বপ্ন নাহি ভান,
হয়ে গেছে মধুর পিরীতি রে।
সুখ বেদনায় ভরা,
বেদনা সুখেতে গড়া,
চেতনায় করেছে সরস রে।

অয়ি রসময়ি! প্রিয়ে!
ভোগ-সুখে নিরাশিয়ে,
আজি দিলে অমৃত-পরশ রে।
কোকিলের কুহরণে,
ফুলের হসিতাননে,
রসময়ি! তুমি ওই হাস রে।
সুধাতুরা চন্দ্রিকায়,
গন্ধভরা মল্লিকায়,
বিপুল পুলক আজি ভাসে রে।
কাণে পশে কত গান,
সুখ-স্নাত দু-নয়ান,
রূপ-রস-গন্ধে যাই ভাসে রে।
অধর চুম্বনে আঁকা,
মৃদু স্পর্শে অঙ্গ ঢাকা,
চারি ধারে আনন্দের রাশি রে।
সৌন্দর্য্যে মাতাল প্রাণ,
পেয়েছে বিপুল দান,
কোথা ছিল এত রূপরাশি রে?
নিবৃত্তি-দুয়ার খুলি,
রূপ-স্রোত এল ভুলি,
যারে পাই তারে ভাল বাসি রে।
জাহ্নবীর কল তান,
শৈলের গভীর ধ্যান,
বিহঙ্গের মধুর কূজন রে।
সব আজি এক হ'য়ে,
আমার পরাণ লয়ে,
করিতেছে প্রিয় সম্বোধন রে।
পরিপূর্ণ সুষমায়,
পরাণ মিশিতে চায়,
থাকিতে না চাই আমি "আমিরে"।
হা বিভু হা পরাৎপর,
সৌন্দর্য্যে বিলীন কর,
সুধাতুর পরাণের স্বামীরে।

"কান-মাইরি"

[শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

জাপানের আধুনিক এত অধিক দ্রুত উন্নতি সত্ত্বেও প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের যে দুইএকটা কুসংস্কার এখনও বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে এই 'কানমাইরি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কানমাইরি' অর্থে 'হিম-স্নান'। জানুয়ারি মাসের দিনগুলা যখন অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ হইয়া অন্ধকারময় শিশিরসিক্ত শীতের সন্ধ্যায় পরিণত হইতে থাকে, তখন সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া হ্রস্বকায় সূক্ষ্ম-শ্বেতবস্ত্রপরিহিত—ক্বচিৎ বা বিবস্ত্রপ্রায়—কটিতটবিলম্বিত কিঙ্কিণী ধ্বনি করিতে করিতে ক্ষিপ্র ধাবনশীল জীবকুলকে রাজপথে দেখিতে পাওয়া যায়। কিঙ্কিণীরব শুনিয়াই ফিরিয়া দেখিলে, একটা শ্বেতবর্ণ পদার্থ অন্ধকার মধ্য হইতে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইবে। সেটা কি, ভাবিতে ভাবিতেই দেখিবে, তাহা তোমাকে ছাড়াইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! সেই ধ্বনি শুনিয়া আবার যেমন পিছনে চাহিলে, আবার একটা আবাছায়া মূর্ত্তি দেখিতে না দেখিতে, ঠাহর হইতে না হইতেই তাহা প্রধাবিত হইয়া—ঘোর অন্ধকারে দূরে মিশাইয়া গেল! ঠিক যেন শিশিরসম্পাতবিঘোরা নিশীথে অশরীরী ভূতের ন্যায় লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে। প্রতি পথে শত শত ছায়া মূর্ত্তি ধাবমান হইয়া ফিরিতেছে, আর সারা সহরটা কিঙ্কিণীরবে মুখরিত! ফলে এগুলি ভূতও নহে—ছায়ামূর্ত্তিও নহে—একটা প্রাচীন কুসংস্কারের অবশেষ—পাঞ্চভৌতিক মানবমূর্ত্তি। ইহারা সারা শীতকাল সন্ধ্যাকালে অনাচ্ছাদিত দেহে মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে—এক মঠ হইতে মঠান্তরে ধাবিত হইতে থাকে। এবং প্রত্যেক মন্দির-মঠে যাইবামাত্র তত্রত্য পুরোহিতগণ তাহাদের গাত্রে শীতল জলসেক করিতে থাকেন—সেই সিক্তদেহে তাহারা আবার মন্দির-মঠান্তর উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। এই সকল ভক্তের বিশ্বাস যে, এই প্রক্রিয়ায় তাহাদের কৃত পাপাচারের ও অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং দেবদেবীগণ প্রসন্ন হইয়া তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি করিবেন। জল এখানে পবিত্রতার সাধন ও শুচিকারক; যে পাপী শুচি হইবার চেষ্টা করে নাই, দেবগণ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না। শৈত্যাদি কষ্ট অগ্রাহ্য করিলেও দেবতা প্রীত হন। বাস্তবিকই তাহারা যে কিছু লাভ করে, তজ্জন্য যথেষ্ট আত্মনির্য্যাতনও সহ্য করে। আত্মনির্য্যাতনে যদি পুণ্য থাকে, তবে তাহা

পথে 'কান-মাইরি' ব্রতাচারিগণ

ইহাদেরই প্রাপ্য। তাহাদের কম্পমান উলঙ্গপ্রায় শরীরের কটিদেশ মাত্র সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্রের কৌপীন দ্বারা আবৃত থাকে;—পথে দিগম্বরবেশে ভ্রমণের নিষেধ-বিধি প্রচলনের পূর্ব্বে ইহারা উলঙ্গ হইয়াই এ কৃচ্ছ্রব্রত সাধন করিত। বিষম

শীতের সময় যথাসম্ভব অনাবৃতদেহে এই প্রায়শ্চিত্ত-সাধনই হিতকর বলিয়া তাহারা মনে করে। এক মন্দির হইতে তুষারশীতল জলে অভিষিক্ত হইয়া মন্দিরান্তরে গিয়া সময়ে সময়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কম্পমান-দেহে তাহার পর্য্যায় আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। টোকিওর একটি মন্দিরের কূপপার্শ্বে বিগত শীতকালে একদিন ১৩০০ যাত্রীকে একযোগে জলসেচনের জন্য অপেক্ষা করিতে দেখা গিয়াছিল। জাপানীরা গরম জলে স্নান করিতে যেমন ভালবাসে—য়ুরোপবাসীদিগের অপেক্ষাও যেরূপ উষ্ণতর জলে স্নান করে, তদনুপাতে এই শীতল জলসেক-প্রক্রিয়া তাহাদের পক্ষে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশে 'মাঘে পৈরাগে' কল্পবাস, সর্ব্বজয়াব্রত, প্রভৃতির অনুষ্ঠানে এইরূপ নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় বটে কিন্তু কান-মাইরি সে সকল অপেক্ষাও কষ্টসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। সাধারণ জাপবাসীরা মনে করে যে, আত্মার সদ্গতির জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার ইহা একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া।

জলসেক

স্নাতক এইরূপে কম্পিতকলেবরে মনে করে, মন্দির-মধ্যস্থ তাহার ধ্যানমগ্ন দেবতার সমক্ষে এইরূপে উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতি দেবতার দয়াদৃষ্টি হইবে; তখন সে তাঁহার নিকট স্বীয় অভীষ্ট-প্রার্থনা ব্যক্ত করে। ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য বিদেশী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে প্রার্থনা শুনিবার প্রয়াস করে; —কিন্তু সে যে কি বিচিত্র, তাহার ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশ লোকেরই প্রার্থনা—সৌভাগ্যের জন্য, সকলেরই উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন—কচিৎ কেহ অসুস্থ বা দুঃস্থ পিতামাতার অবস্থার উন্নতি-সাধনে অথবা গার্হস্থ্য কোন সমস্যা সুসমাধানের জন্য কিংবা কোন অন্যায় অত্যাচার-নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। কেহ বা পার্থিব ধনসম্পদ্ প্রার্থনা করে। তবে কেহই বড় একটা দেবতাদিগকে অধিকক্ষণ বিরক্ত করে না—কারণ, তাহা করিতে হইলে শীতে জমিয়া যাইবে। সত্বরই স্বীয় অভীষ্ট জ্ঞাপন করিয়া, সে আবার মন্দিরান্তরের উদ্দেশ্যে দৌড়াইতে আরম্ভ করে। পথের শীতবায়ুর মধ্য দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে থাকে, উহাতে শীতবোধ কতকটা কম হয়। শীতাধিক্যে তাহাদের দন্তে দন্তঘর্ষণ শব্দ ঘুঙুরের রবে ডুবিয়া যায়। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত-সাধনোদ্দেশে মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে দৌড়িয়া, তাহারা প্রতি সন্ধ্যায় ৫।৭ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে।

বিষম শীতের আরম্ভে কান-মাইরি-অভিযান আরম্ভ হয় এবং কিছু দিন চলিতে থাকে। শৈত্যের পূর্ণ প্রভাবের সূচনা অর্থাৎ 'Kan-no-iri' 'কান্-নো-ইরি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'Kan-no-ake' 'কান্-নো-এক' অর্থাৎ অবসান পর্য্যন্ত ইহা অনুষ্ঠিতব্য। ইহাদের বিশ্বাস, শীতের প্রভাব যত প্রবল হইবে, প্রায়শ্চিত্ত তত কার্য্যকরী—দেবতা তত প্রসন্ন হইবেন। কৃচ্ছ্রব্রতে যে দেবতা সন্তুষ্ট হন, ইহা মানবের অতি প্রাচীন ধারণা। সকল কুসংস্কারের মূলেই যেমন একটা সত্য নিহিত আছে, ইহাতেও তেমনই একটা কিছু অবশ্যই আছে। কোনও সদুদ্দেশ্যে কষ্টস্বীকার করিলে, সাধু-সজ্জন, দেবতা—সকলেই প্রীত হন। সৎলোক মাত্রেই সত্যের জন্য কষ্টস্বীকার করিতে কাতর নহেন—এবং অপরের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন পুণ্যকার্য্যরূপে পরিগণিত। মানুষে স্বেচ্ছায় কষ্টস্বীকার করে—মানবপ্রীতি, আত্ম-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি এবং স্বার্থসাধন-উদ্দেশে। এগুলি কর্ত্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

যাবতীয় প্রকৃত উন্নতিসাধনের মূলেই আত্মত্যাগ-বিধি নিহিত আছে। ইহাই ধর্ম্ম, সন্নীতি, এবং প্রকৃত সভ্যতার জীবন। তবে কান-মাইরিকে কুসংস্কার বলি কেন?—কারণ তাহা কৃত্রিম আত্মকৃচ্ছ্র মাত্র। কর্ত্তব্য যথাযথরূপে সাধনকল্পে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, তাহা অবশ্যই প্রশংসার্হ। দেবরোষ-প্রশমনের জন্য কৃত্রিম বা স্বেচ্ছা-সাধিত আত্মনির্য্যাতনকেই আধুনিকেরা কুসংস্কার বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত-সংস্কার বলিয়া থাকেন। কান-মাইরি অনুষ্ঠাতৃ-গণ বলিতে পারেন যে, শল্যবিত্তাবিশারদ ভিষক্প্রবরেরা রোগীদিগের অঙ্গে যে অস্ত্রাঘাত করেন, তাহাও ত কৃত্রিম-নির্য্যাতন; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহারা রোগীদিগকে নিরাময় করিয়া থাকেন।—অনেকের কিন্তু ধারণা অন্যরূপ; তাঁহারা বলেন, রোগী স্বাস্থ্যের জন্য—স্বীয় জীবনরক্ষার জন্যই—অস্ত্র-চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত সহ্য করেন। কানমাইরি-অনুষ্ঠাতৃগণ যদি শারীরিক কোন উন্নতি-বিধানকল্পে এইরূপ আত্ম-কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন, তাহা হইলে আর ইহাকে কুসংস্কার বলা চলিত না—সে উদ্দেশ্যটা বেশ সমীচীন মনে হইত। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনের উদ্দেশ্য, দেবতাকে প্রসন্ন করা—সুতরাং এই অনুষ্ঠানে দেবতাকেও যেমন হীনমনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়—নিজেরও জ্ঞানবত্তা তেমনই ক্ষুণ্ণ হয়। কান-মাইরি অনুষ্ঠাতৃগণের সুধু এইটুকু বুঝা উচিত যে, যদি দৈনিক কোন কার্য্য সুসমাধান বা জীবনের কোন কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য যদি কোনও কৃচ্ছ্র-সাধন করিতে হয়, তাহাই আত্মার পক্ষে হিতকরী—কিন্তু এইরূপ নিরর্থক কষ্টসাধনে ভগবান কদাচ প্রসন্ন হইতে পারেন না, অথবা এই উপায়ে যে দেবতা পরিতুষ্ট হন, তিনি দেবপদবাচ্যই নহেন। ইহাতে আত্মার উন্নতি আদৌ সম্ভবপর নহে। জীবনে স্বতঃই যথেষ্ট দুঃখভার থাকে, সেগুলি অকাতরে সহ্য এবং সাধ্যপক্ষে বিদূরিত করিতে পারিলেই জগদীশ্বর প্রসন্ন হন। ইহার উপর স্বেচ্ছায় দুঃখ-সৃষ্টি করা মূর্খতা মাত্র। তবে যাহারা নিরীশ্বরবাদী—আত্মসর্ব্বস্ব, তাহাদের অপেক্ষা এই সকল দেবভীরু কৃচ্ছ্র-সাধন-তৎপর কুসংস্কারা-পন্নগণ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ;—পূর্ব্বোক্তদিগের আর উন্নতির সম্ভাবনা বা আশা নাই; শেষোক্তগণের কালে উন্নতি হইতে পারে।

চারিগাঁএর প্রসিদ্ধ 'বাস্তবৃক্ষ'

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু]

বিক্রমপুরের অন্তর্গত চারিগাঁ গ্রামে একটি অতি প্রাচীন সুবিশাল হিজলগাছ আছে। স্থানীয় লোকের নিকট উহা 'বাস্তবৃক্ষ' নামে পরিচিত। গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় ১৩৫০০ বর্গফুট জমি জুড়িয়া এই বিপুলকায় বৃক্ষটি সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এত বড় হিজলগাছ সচরাচর দেখা যায় না। লোকের বিশ্বাস, স্বয়ং বাস্তদেব এইবৃক্ষে জাগ্রৎভাবে অবস্থান করিতেছেন। প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি-দিনে এই বৃক্ষমূলে মহাসমারোহে বাস্তদেবের পূজা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে এখানে একটি জমকাল রকমের মেলা বসিয়া থাকে; নানা প্রকার তামাসা ও ক্রীড়াকৌতুকই এই মেলার প্রধান অঙ্গ।

কখন কি ভাবে এখানে বাস্তপূজার সূচনা হয়, প্রচলিত জনশ্রুতি ভিন্ন তাহা নির্ণয় করিবার আর কোন উপায় নাই। এ বিষয়ের কিংবদন্তী বড়ই কৌতুকাবহ। প্রকাশ, একদা কোন ব্যক্তি পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস দ্বিপ্রহরের সময়ে বাস্তপূজা করিবার মানসে কয়েকটি পাকা কলা লইয়া, এই হিজলগাছের তলা দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। দৈবাৎ সে দেখিল, যেন এক ব্রাহ্মণ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভাই বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে দুইটি পাকা কলা দিয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া লোকটি পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। ভাবিল, কলা কাপড়ে ঢাকা রহিয়াছে, এ ব্রাহ্মণ না দেখিয়া তাহা কিরূপে জানিতে পারিলেন? অনন্তর প্রকাশ্যে কহিল,—"ঠাকুর, আমি বাস্তদেবের নামে কলা আনিয়াছি, ইহা অপর কাহাকেও দিতে পারিব না;—দিলেও আমার ভাল হইবে না।"

"আচ্ছা, যাও"—বলিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে বিদায় দিলেন। লোকটি বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, পাকা কলাগুলি সব কাঁচা হইয়া গিয়াছে! লোকটিত দেখিয়াই অবাক্; তেমন পাকা তুল্‌তুলে কলাগুলি যেন শক্ত কাঠ হইয়া গিয়াছে! তখন তাহার সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল; সে অমনি

দৌড়িয়া হিজলতলে গেল; কিন্তু ব্রাহ্মণ কি আর সেখানে আছেন!

সে পল্লীবৃদ্ধদিগের নিকট আদ্যন্ত সকল কথা জানাইল; তখন গ্রাম ভরিয়া একটা হৈ চৈহ পড়িয়া গেল। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল; কিন্তু বিস্তর আলোচনার পর স্থির হইল, ব্রাহ্মণ স্বয়ং বাস্তুদেব,—অতএব কলাগুলি দিয়া ঐ হিজলগাছের কাছেই পূজা দিতে হইবে।

কি আশ্চর্য্য, এরূপ স্থির হইবার পর দেখা গেল, কলাগুলি আবার পাকিয়া উঠিয়াছে! তখন সকলে মিলিয়া মহা-বয়স সবেমাত্র ৭।৮ বৎসর। নানাদিকে নানাভাবে কত খোঁজখবর করা হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের সন্ধান মিলিল না। দুই ভাই সন্তানশোকে দিশাহারা হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

সংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রিতে কাম ও রূপ দুই ভাই, একই স্বপ্ন দেখিলেন,—বাস্তুদেব যেন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শাসাইতেছেন যে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করার ফলেই তাঁহারা পুত্রকন্যা হারাইয়াছেন; বাস্তুপূজা না করিলে তাঁহারা আর কোন ক্রমেই উহাদিগকে ফিরাইয়া পাইবেন না।

বাস্তুবৃক্ষ—চারিগাঁ।

সমারোহে সেখানে বাস্তুদেবের পূজা দিলেন। সেই হইতে তথায় বাস্তুপূজা হইয়া আসিতেছে এবং হিজলগাছটি 'বাস্তুবৃক্ষ' নামে পরিচিত হইয়াছে।

স্থানীয় দেবভৌমিকেরা বলেন, প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের বংশে কামদেব ও রূপদেব নামে দুই সহোদর ছিলেন। ইঁহারা নাকি এই বাস্তুদেব মানিতেন না বা বাস্তুপূজা করিতেন না। কামদেবের একপুত্র, ও রূপদেবের এক কন্যা ছিল। একদা পৌষ-সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহারা নিরুদ্দেশ হয়; তখন তাহাদের

ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল; স্বপ্নাবস্থাতেই তাঁহারা বাস্তু-পূজা 'মানত' করিয়া করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবস্তুতিতে বাস্তুদেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, আমি এবার ক্ষমা করিলাম। কাল ভোরে বাস্তুবৃক্ষে—আমার কোলে পুত্রকন্যার দেখা পাইবে।"

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। কাম ও রূপ 'বাস্তু-খোলায়' ছুটিয়া চলিলেন; দেখিলেন, সেই বিশাল হিজলগাছের কোটরে সত্যই দুই ভাইবোন অঘোরে ঘুমাইতেছে।

এতদিন পরে পুত্রকন্যার দর্শন পাইয়া, তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল।

সেই দিন—সেই পৌষসংক্রান্তির দিন—তাঁহারা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহা আড়ম্বরে বাস্তবৃক্ষমূলে বাস্তদেবের পূজা দিলেন। এই ঘটনায় বাস্তবৃক্ষের মাহাত্ম্য সাধারণের হৃদয়ে আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

মূলবৃক্ষটি এক্ষণে শায়িত অবস্থায় আছে। ইহার গুঁড়ির অভ্যন্তরভাগ একবারে ফাঁপা; দুই তিনটি বালক স্বচ্ছন্দে উহার ভিতরে অবস্থান করিতে পারে। একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত ধুতুরা ফুল মাটিতে পড়িয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, এই বৃক্ষটিকেও বৃহদাকারে অবিকল সেইরূপ দেখাইতেছে। যুগযুগান্তর ধরিয়া ইহা একই ভাবে পড়িয়া আছে।

আদিবৃক্ষ হইতে চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে ২৮টি বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বৃক্ষগুলি যে স্বতন্ত্রভাবে জন্মে নাই এবং ইহারা যে মূলবৃক্ষেরই অংশমাত্র, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মূল বৃক্ষ হইতে মোটা মোটা লম্বা শিকড় লতাইয়া যাইয়া, এক একটি বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছে; তন্মধ্যে বৃহত্তম বৃক্ষটির গুঁড়ির বেড় (মাটি হইতে ১ফুট উচ্চে) ১৯½ ফুট এবং উচ্চতা ৬১ ফুট। এখানে অন্য কোন বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায় না।

পরিজন-বৃদ্ধির সহিত গ্রামের তালুকদারগণ অংশানুসারে নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইতেছেন; কিন্তু এই 'বাস্তখোলা' আজ পর্য্যন্ত এজমালিতে রহিয়াছে; এখানে ছোটবড় সকলেরই সমান অধিকার।

এই গাছের ডাল কেহ ভাঙ্গে না, পাতা কেহ ছিঁড়ে না; লোকে ইহাকে এমনই পবিত্র মনে করে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা, এক ব্যক্তি জ্বালানি কাঠের জন্য ইহার একটি মরা ডাল কাটিতে গিয়াছিল; দুইচারি কোপ দেওয়ার পরেই তাহার শরীর আড়ষ্ট হইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে গৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! হতভাগা সেইদিন রাত্রিতেই রক্তবমন করিতে করিতে ভবলীলা সাঙ্গ করিল। সেই অবধি আর কেহ এই গাছের সামান্য অনিষ্ট করিতেও সাহস পায় না।

জর্ম্মণি-প্রত্যাগত বাঙ্গালী ছাত্র

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র আচার্য্য, B. A., B. E.]

শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সম্প্রতি জর্ম্মাণি হইতে "পি. এচ্. ডি."—পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

অবিনাশচন্দ্র, ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত চুন্টাগ্রামবাসী এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশের যুবক। "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" সপ্তম বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া, "ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতির" কলিকাতা বহুবাজারস্থ বিজ্ঞানাগারে প্রায় দুই বৎসরকাল রসায়নবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, তিনি নিয়মিত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। তৎপরে, ১৯১০ সালের আগষ্ট মাসে, ভারতীয় "শিল্প ও বিজ্ঞান উন্নতিসাধন সমিতি" হইতে পাথেয় লইয়া, ইংলণ্ড গমন করেন; কিন্তু তথায় গিয়া শুনিলেন, 'মেট্রিকুলেশন্, পাস না করিলে কোন কলেজে ঢুকিতে দেয় না। অগত্যা কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে বার্লিনে তাঁহাদের বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের নিকট উপস্থিত হন। ইনিও প্রায় দুই বৎসর হইল, "পি- এচ্. ডি." উপাধি-লাভ করিয়াছেন। বার্লিন্ হইতে অবিনাশচন্দ্র 'হালে' (Halle) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, তথায় গমন করেন। বার্লিন্ নগরের প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে 'সালে' (Säale) নদীতীরে 'হালে' অবস্থিত। অপরিচিত দেশে, অজ্ঞাতভাষাভাষী লোকের মধ্যে বাস প্রথম তাঁহার পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

অবিনাশচন্দ্র দেশ হইতে সুদূর প্রবাস-যাত্রার প্রাক্কালে যখন জানিতে পারিলেন যে, নিরামিষভোজী না হইলে জাহাজে গো-শূকরের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই, তখনই তিনি ও তাঁহার সহযাত্রী কতিপয় বাঙ্গালী যুবক জাহাজে ভাত, ডাল, তরকারীর বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ও অপর দুইটি বাঙ্গালী যুবক বার্লিনে একত্র বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহারা সেই সুদূর বিদেশেও বাঙ্গালীর মত ভাত, ডাল, মাছ, তরকারী প্রভৃতি আহার করিতেন। অবিনাশচন্দ্র হালে পৌছিয়াও সেই ভাবেই আহারাদি করিতে লাগিলেন।

নিজেকেই নিজের আহার্য্য গ্যাসষ্টোভে প্রস্তুত করিতে হইত। হলুদ, ধনে প্রভৃতি মসলার চূর্ণ এদেশ হইতে মাঝে মাঝে পাঠাইতে হইত। যদিও জর্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের কোটি কোটি টাকা মূল্যের নানাবিধ পণ্য, অবাধ-বাণিজ্যরীতির ফলে, বিনা শুল্কে এদেশের বাজারে বিক্রয়ার্থ স্থানলাভ করিতেছে, তথাপি এই সামান্য ২।৩ সের পরিমাণ মসলা-চূর্ণও সে দেশে

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, Ph. D.

শতকরা প্রায় এক শত টাকা শুল্কের কমে গ্রাহকহস্তে পৌঁছিতে পায় না। অবিনাশচন্দ্রকে প্রায় এক বৎসর কাল নিজহস্তে নিজের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে হয়। পরে, বৃদ্ধা গৃহস্বামিনী বিদেশী যুবকের উপর দয়াপরবশ হইয়া, বাঙ্গালী-প্রথায় রন্ধন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া লইলেন, ও তাহার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন।

আহারের রীতি-নীতি সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "এখানে গরীবলোকের খাদ্য, আলু সিদ্ধ ও আধসিদ্ধ ঘোড়ার মাংস। আর, মধ্যবিত্তেরা আলুভাজা (চর্ব্বিতে ভাজা) গরু-শূকরের মাংসই সাধারণতঃ আহার করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সকালে বিকালে, চা' ও কাফির সঙ্গে, এবং অনেক সময় রাত্রিকালে ভোজনেও, Bhürst নামক এক পদার্থ সহযোগে রুটী আহার করে। Bhürst জিনিষটা কি, তাহার একটু পরিচয় দেই ;—জবাইখানায় যাবতীয় জীব-জন্তুর নাড়ী-ভুঁড়ী মেসিনের সাহায্যে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া, অর্দ্ধসিদ্ধ-অবস্থায় লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মোটা নাড়ীতে পুরিয়া দুই মুখ সেলাই করিয়া লয়। দুর্গন্ধে দোকানের ধার দিয়া চলা যায় না ; এরা নাকি গন্ধ পায় না!"

অবিনাশচন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়া, প্রথম-সেসনে কেবল বিজ্ঞানাগারে কাজ করিবার জন্যই ফিস দাখিল করিলেন। ভাষা শিক্ষা হয় নাই, কাজেই অধ্যাপকের বক্তৃতা বুঝা অসম্ভব। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপকের নিকট, শিক্ষালাভ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইলে, সেসনের প্রারম্ভেই প্রত্যেক বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র ফিস্ দাখিল করিতে হয়। বৎসরে সেসন দুইটি ;—অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিয়া মার্চ্চের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত শীতের সেসন, এবং এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের সেসন। প্রত্যেক সেসনের পর, যথাক্রমে শীত ও গ্রীষ্মের অবকাশ। অবিনাশ চন্দ্র শীতের সেসনেই প্রথম কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেসনের শেষে প্রথম অবকাশে বিশেষ মনোযোগের সহিত জর্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করেন ও পরবর্ত্তী সেসনেই অধ্যাপকদিগের বক্তৃতা বুঝিবার মত জ্ঞানলাভ করেন। এদেশে বিশেষ উচ্চ শিক্ষা লাভ না করায় তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

প্রথমবর্ষের গ্রীষ্মাবকাশে অনেকটা সময় অনর্থক নষ্ট হইবে, অথচ কাজ শেষ করিতে হয়ত এক সেসন অধিক সেখানে থাকিতে হইবে, এই ভাবিয়া অবিনাশচন্দ্র হেমবুর্গ (Hamburg) নগরের এক বিজ্ঞানাগারে, ৬৫ মার্ক ফিস্ দাখিল করিয়া, দুই মাস কাজ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন ; এবং সেই কাজ তাঁহার নিজ কলেজের কাজ বলিয়া যাহাতে গ্রাহ্য হয়, অনেক চেষ্টায় প্রধান অধ্যাপকের নিকট হইতে সেইরূপ আদেশলাভ করিলেন। এইরূপে যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে, বিগত বৎসর মে মাসে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ছাত্রগণ মৌলিক-গবেষণার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

'হালে' সহরে বাড়ীভাড়া মাসিক ৩০ মার্ক (এক মার্ক ৸০ আনা)—সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬০ মার্কেই অবিনাশচন্দ্রের সমুদয় ব্যয় সঙ্কুলান হয়। কিন্তু রসায়ন-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীকে নিজ ব্যয়ে বিজ্ঞানাগারে অনেক জিনিষ ক্রয় করিতে হয় ; বৎসরে দুই বার সেসনের ফিস্ দিতেও অনেক টাকার আবশ্যক

হয়; প্রতি বৎসর দুই একটি পোষাক ও পুস্তকাদি ক্রয় করিতেও ২০০।২২৫ মার্কের কমে হয় না। কাজেই তাঁহার মোট বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১৫০০।১৬০০ টাকাতে প্রথম প্রথম সঙ্কুলান হইয়াছে। তাঁহার এক চিটি হইতে এক সেসনের ফিসের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

		মার্ক
"(১)	Chemistry—Practical—প্রত্যহ ৮-১০ ঘণ্টা	৮২
(২)	Physical Chemistry—Do. সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা—	২৫
(৩)	Gas and Technical Analysis—প্রত্যেক শনিবার—	২০
(৪)	Inorganic Chemistry—সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা	৪০
(৫)	Experimental Physics— " " ৪ "—	৩০
(৬)	Physical Chemistry— "—২ ঘণ্টা	১৪
(৭)	Technology— " ২ "	১০
(৮)	On the Complex Salts and Double Salts ১ "	free
(৯)	On the Important—Alkaloids—১ "—	"
(১০)	" Theory of Physics— ১	"
(১১)	Sugar Industry ১ "	"
(১২)	Practice in English Senior Debating Club মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬—৮ টা	"
	মোট—	২২১ মার্ক

"তাহা ছাড়া, পুস্তকাগারের চাঁদা, বিদেশীর ফি প্রভৃতিও কিছু কিছু দিতে হইয়াছে। আগামী সেসনে এত লাগিবে না। যে সকল Lecture দুইবার লওয়া হইবে, অথবা যাহারা প্রথম কিংবা দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয়বার লইতে চাহিবে, তাহার জন্য আর নূতন করিয়া ফিস্ দাখিল করিতে হইবে না।"

এই বৎসর হইতে এই সব ফিস্ বিদেশীদিগকে দ্বিগুণ হারে দিতে হইয়াছে। তাহার উপর, পরীক্ষার ফিস্ ও Thesis ছাপাইবার খরচ প্রভৃতিতেও কিছু টাকা ব্যয় হইয়াছে।

মৌলিক-গবেষণা শেষ হইলে, অবিনাশচন্দ্র তাঁহার Thesis অধ্যাপককে দেখাইয়া, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করাইয়া লইলেন; পরে, যখন তাহা ও পরীক্ষার

বিজ্ঞানাগারে অবিনাশচন্দ্র

ফিস্ দাখিল করিবেন, তখন এক গোল বাধিল। অবিনাশ চন্দ্র কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস. সি. নহেন—পি. এচ্. ডি. কিরূপে হইবেন, এই প্রশ্ন উঠিল। তাঁহাকে তবে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল কেন, জিজ্ঞাসা করায় Dean বলিলেন, বিদ্যা-শিক্ষায় কাহাকেও বাধা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু ডাক্তার হওয়া সম্বন্ধে যে সব বিধি আছে, তদনুসারে চলিতেই হইবে। সেখানকার সংস্কৃতের জর্ম্মাণ অধ্যাপক না কি একবার ভারতে আসিয়া, মান্দ্রাজের কোন স্থানে কিছুদিন ছিলেন; ভারতবাসী বলিতে তিনি কুলিই বুঝেন। সাধারণতঃ জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ ভারতবাসীকে একটু সম্মানের দৃষ্টিতেই দেখেন; কিন্তু ইঁহার ধারণা স্বতন্ত্র। ইঁহার সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের দুইএকবার আলাপ হইয়াছে; ইঁহার এই ভ্রান্ত-ধারণা শুনিয়া অবিনাশ বেশ দুই একটি মিষ্টি কথা শুনাইয়া দিলেন। ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে ইঁহারই জ্ঞান হালে সহরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; কাজেই ইঁহারই উপর অবিনাশচন্দ্রের বিষয় মীমাংসার ভার পড়িল! অবিনাশচন্দ্র প্রমাদ গণিলেন, এবং গোপনে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখিতে লাগিলেন। পরে, Wuerzburg বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহার Thesis ও সার্টিফিকেট আদি দেখিয়া, পরীক্ষায় অনুমতি প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে কয়েক মাস অবিনাশচন্দ্রকে অত্যন্ত মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাইতে হইয়াছে। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, একখানি পত্র হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল;—

"আইনতঃ B.A., M A., বা B Sc., M. Sc. ছাড়া, ইংরেজ কিংবা আমেরিকাবাসীদিগকে এখানে ভর্ত্তি করার নিয়ম নাই—পরীক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা। Ambassadorএর সার্টিফিকেট দ্বারা যদি ঠিক বলিয়া বোধ হয়, তবে ভর্ত্তি হওয়া ও পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। প্রত্যেক বৎসর Rector ও Dean পরিবর্ত্তিত হয়। কোন কোনও Rector, ভর্ত্তির সময় নিজ ক্ষমতায় ভর্ত্তি করিয়া লন; আবার কোন কোনও Deanও পরীক্ষার বেলায় ইচ্ছা করিলে অনুমতি দিতে পারেন। যা'দের কাগজপত্র কম ও একটু গোলমেলে আছে, অর্থাৎ যাহা এদেশের লোকে পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারে না—তাহার অদৃষ্ট Dean ও Rectorএর বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমার কাজে সংস্কৃতের অধ্যাপকই গোল বাঁধাইয়াছেন। আমি গত সপ্তাহ Wuerzburg হইতে চিঠি পাইয়াছি; কবে পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিব, জানিতে চাহিয়াছেন; পত্র পাইলেই Official Invitation পাঠাইবেন।"

তৎপরে Wuerzburg এ গিয়া, অবিনাশচন্দ্র পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সব গোলমাল না ঘটিলে, যে মাসেই পরীক্ষা দিতে পারিতেন; এবং যে সব অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই নিকট পরীক্ষা হইলে, পরীক্ষাও তাঁহার পক্ষে অনেক সহজ হইত। মোট কথা, বিগত সেসনে Ph. D. উপাধি লাভ করা, তাঁহার ঐকান্তিক একাগ্রতা ও অসীম অধ্যবসায়েরই ফল।

অবিনাশচন্দ্রকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে কি না, তাহা লইয়া তাঁহার স্বগ্রামে সম্প্রতি বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। এসম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কোনও মতামত প্রকাশ করিলাম না। তবে, এই আন্দোলনের পরিণাম জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

দোল-লীলা

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

বসন্ত আসিল ফিরে পিয়া ত এল না আর
কত দিনে ফুরাইবে আশা-পথ চাওয়া তার!
শুকাল শিশির জল, তরল মুকুতা-ফল,
কত দিন রবে সখি, অভাগিনী রাধিকার
পথ-চা(ও)য়া দুটি চোখে অফুরাণো বারিধার!

আবার তেমনি করে' বসন্তে হাসিল ধরা,
লতাপাতা ফলে ফুলে সাজিল কি মনোহরা!
প্রিয় সখি! দেখ চেয়ে, বনপথ গেছে ছেয়ে'
ছোট ছোট সাদা যূঁই আর সে বকুল ঝরা,
ফুরা'ল যে বনপথে মোর যাওয়া আসা করা!

কে তোরা বলিলি, হ্যাঁ রে, নিঠুর সে শ্যামরায়
ভুলে গেছে একেবারে পদানতা গোপিকায়!
সে যে দয়ালের শেষ— নাহি বিস্মৃতির লেশ,
তার সে বিশাল প্রাণে; জানি আমি জানি তা'য়—
জানি বলে' প্রেম তার বিরহে মধুর হায়!

ভুলিতে সে পারেনি ক এ চোখের অশ্রুধার,
রাজ্যসুখে শৈলসম সে স্মৃতি আছেরে তা'র!
কুসুম-কোমল চিত, এ মুখ সে ভোলেনি ত,
আমি যে রে কেঁদে মরি, দুঃখ ভেবে বঁধুয়ার,
তোরা কি জানিবি তারে—কি নিধি সে রাধিকার!

ফিরে এল দোল-লীলা আবার বসন্ত সনে,
সে যুগের সেই কথা ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মনে!—
এক দিকে প্রাণ-বঁধু হাসে সুখে মৃদুমধু—
আবির লইয়া করে দাঁড়িয়েছি জনে জনে,
কি প্রেমের হোলি সখি, খেলেছি রে বৃন্দাবনে!

চোখে ছিটাইয়া জল, হেরি মোর মুখ ম্লান
অমনি বুঝেছে সে যে মোর পোড়া অভিমান।
ক্ষমা চেয়ে—পায় ধরি' লুটাল প্রাণের হরি
কহিল কাতর কণ্ঠে, "মান ভিক্ষা কর দান!"—
গলিল না, টলিল না, তবু এ কঠোর প্রাণ!

অভাগীরে একবার দেখিলে নয়ন খুলি',
এত দিবসের ব্যথা তিলেকে সে যেত ভুলি'।
ভুলে যেত রাজকাজ, খুলে নিত রাজসাজ,
বলিত সে চূড়া, সখি, দে' আবার শিরে তুলি'—
মুছিতাম অশ্রু তা'র এ নীল আঁচল খুলি'!

অভাগীর মত দুঃখ কেহ নাহি দিবে তা'রে—
আজো সে ভোলে নি বুঝি, সেই মান অশ্রুধারে—
যার তরে প্রাণধন, করেছিনু ভৎর্সন
মুখে ক্রোধ—চোখে হাসি, ভোলে নি' সে একেবারে;
রাধার জীবন-নিধি, তারে যে গড়েছে বিধি,
রাধার মতন সখি, কে আদর করে তা'রে।
কে তোরা বলিবি বল হেন বঁধু ভুলিবারে!

পল্লী-চিত্র—(শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত বক্সী)

সাঁঝের আলো

পল্লীঘাট

বীণার তান

হিন্দী
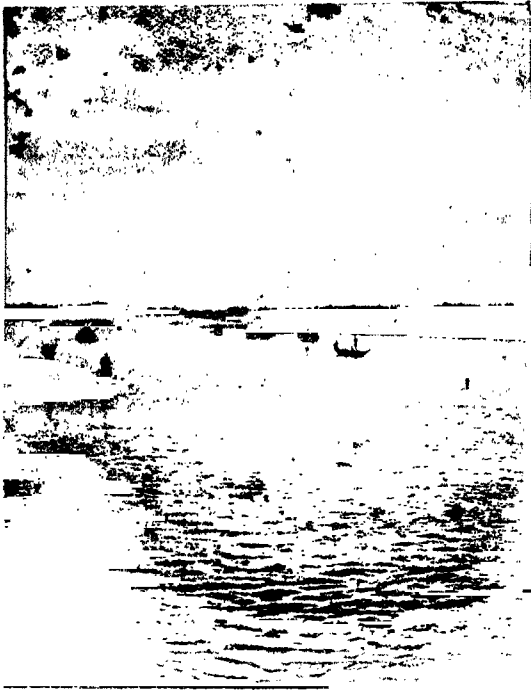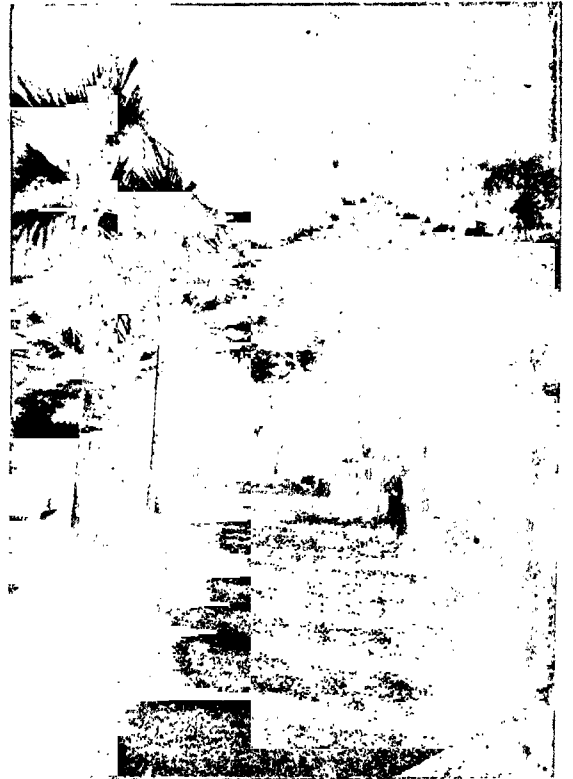
১। মর্য্যাদা (সচিত্র), মাসিক পত্রিকা, ৯ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, মাঘ, সংবৎ ১৯৭১, বার্ষিক মূল্য ৩, অভ্যুদয় প্রেস, প্রয়াগ হইতে প্রকাশিত। আলোচ্য সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বিষয়-সূচী (১) হমারা নয়াবর্ষ, (২) জাতীয় ভাষা (কবিতা)—কবি পণ্ডিত অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায়, (৩) যুদ্ধকে অন্তর্রাষ্ট্রীয় কানুন (Inter-National Laws) অধ্যাপক টি, জি, লরেন্স-প্রণীত গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত—লেখক শ্রীযুত সুপাশ্বদাস গুপ্ত, (৪) সামুদ্রিক লড়াই ('ইণ্ডিয়ান রিভিউ' হইতে গৃহীত)—অনুবাদক শ্রীযুত রাজারাম, (৫) প্রাচীন ভারতবর্ষ মেঁ যুদ্ধ (ইণ্ডিয়ান রিভিউকে আধার পর)—অনুবাদক পণ্ডিত প্রয়াগপ্রসাদ ত্রিপাঠী, (৬) তিব্বারতী লড়াই—লেখক শ্রীযুত সৈয়দ হৈদর হুসেন (৭) ইংলৈণ্ড কী শাসন-পদ্ধতি, (প্রিন্সিপ্যাল দামোদর গণেশপাধ্যে লিখিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে সঙ্কলিত) —লেখক শ্রীযুত শিবনারণ দ্বিবেদী, (৮) লার্ডমেয়ো—লেখক শ্রীযুত পুত্তনলাল বিদ্যার্থী, (৯) সম্পাদকীয় টিপ্পনিয়াঁ। এবার চিত্র প্রায় সমস্তই য়ুরোপীয় মহাসমর সংক্রান্ত। ইহা সাদায় কালোতে হইলেও অস্পষ্ট নহে।

নববর্ষের অভিভাষণে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন, মর্য্যাদার বয়স এখন চার বৎসর হইল। গত বৎসর নানা কারণে পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, এবার 'আশা হৈ কি সময় সে প্রকাশিত হোনে কে রোগ কা হম মুলোচ্ছেদ কর সকেঙ্গে'। তথাস্তু। এবার জানুয়ারী হইতে বৎসর আরম্ভ হইল। মর্য্যাদা-সম্পাদক স্পষ্ট কথায় কহিতেছেন, 'মর্য্যাদাকা একমাত্র উদ্দেশ্য রাজনৈতিক লেখোঁকা প্রকাশ করনা তথা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তোঁ কা প্রচার করনা হৈ।' এবং 'মর্য্যাদা কা উদ্দেশ্য জনতা মেঁ স্বতন্ত্রতা, সমতা ঔর ভ্রাতৃভাব কী স্থাপনা, তথা অত্যাচারোঁ কা চাহে বে সামাজিক, চাহে ধার্ম্মিক ঔর চাহে সরকারী হোঁ, বিরোধ করনা হৈ।' 'মনুষ্যোঁ কো মনুষ্যোচিত, ঔর মনুষ্যপ্রাপ্ত, অধিকার প্রাপ্তকরানা ইস্‌কা লক্ষ্য হৈ।' শ্রীহরি মর্য্যাদার অভীষ্টপূর্ণ করিয়া মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

জাতীয় ভাষা—সুদীর্ঘ কবিতা, কবি হিন্দীভাষার সেবকগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

'খোলকর আঁখেঁ নিরখিয়ে বঙ্গভাষা কী ছটা।
মহরঠী কী দেখিয়ে কৈসী বনী উঁচী অটা।
ফারসী সাহিত্য নভমেঁ গুর্জরী কী হৈ ঘটা।
আহ! উর্দ্দু কা হৈ কৈসা চৌতরা উঁচা পটা॥'

অতএব হিন্দুস্থানের হিন্দুগণ হিন্দী-ভাষার কল্যাণ-সাধনে অগ্রসর হও, তোমাদের সকল অভাব ও দুর্গতি দূর হইবে।

'জোঁ ন জীয়েগা কভী জাপান জাপানী বিনা।
জোঁ ন জীয়েগা মুসলমাঁ পারসী-অরবী বিনা।
জী সকোগে হিন্দুও বৈসে হী ন তুম হিন্দী বিনা।'

কবিতাটি গত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের জন্য 'লিখিত' হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংখ্যা মর্য্যাদার অধিকাংশ প্রবন্ধ অনুবাদ, আহরণ ও সঙ্কলন হইলেও সারগর্ভ। আশা করি, আগামী বর্ষে মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাইব।

২। ইন্দু (সচিত্র), জানুয়ারী ১৯১৫, পৌষ ১৯৭১, সম্পাদক ও প্রকাশক অম্বিকাপ্রসাদ গুপ্ত, কাশী হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ৩।০। বর্ত্তমান সংখ্যার কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে—(১) তুম্‌হারা স্মরণ (কবিতা) কবি শ্রীযুত বাবু জয়শঙ্করপ্রসাদ। এই কবিতাটিতে আমরা রবীন্দ্রবাবুর ও ৺রজনী সেনের ছন্দের আভাস পাই—

'সকল বেদনা বিস্মৃত হোতী,
স্মরণ তুম্‌হারা জব্ হোতা।
বিশ্ববোধ হো জাতা হৈ,
জিসমে ন মনুষ্য কভীরোতা।' ইত্যাদি

এইরূপ কিছুদিন চলিলে হিন্দী কবিতাও ক্রমে ক্রমে প্রাণ হারাইবে বলিয়া আমাদের ভয় হয়। (২) ব্রজভাষামেঁ কবিতা—লেখক শ্রীযুত পণ্ডিত কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, বি, এ। লেখক ব্রজভাষায় হিন্দী কবিতা রচনার পক্ষপাতী। গত পঞ্চম হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুত শ্রীধর পাঠকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। (৩) হমারা দেশ (কবিতা) কবি লোচনপ্রসাদ পাণ্ডেয়। ইহা দ্বিজেন্দ্রলালের সেই 'আমার দেশ' গানের প্রতিধ্বনি। কবিতার শেষাংশ—

'রামকৃষ্ণ চৈতন্য নে জহাঁ লিয়ে অবতার।
তুলসী বিদ্যাপতি ভয়ে জহাঁ সুকবি—পরদার।
সুযশ সবশেষ হৈ।
প্যারা হমারা দেশ হৈ॥
প্যারা হমারা দেশ হৈ॥'

(৪) দুধ কী রসায়ন (Chemistry of Milk)—লেখক শ্রীযুত বাবু রাম অবস্থী, বি-এস সি, (৫) কালিদাস কা রামগিরি—লেখক পণ্ডিত রামদহিন মিশ্র কাব্যতীর্থ। ইনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রামগিরি দণ্ডকারণ্যে—'গোল গোল বাত য়হ হৈ কি যে সবস্থান দণ্ডক বন মেঁ আজাতে হৈঁ।' (৬) আমেরিকা কা প্রজাতন্ত্র—শ্রীযুত বালমুকুন্দ শর্ম্ম-লিখিত প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাব। Duma, House of Lords,

Insurance Bill প্রভৃতি কথার হিন্দী অনুবাদ দেওয়া সম্ভব না হইলে, হিন্দী অক্ষরে দেওয়া উচিত ছিল। (৭) বিগত পঞ্চম হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ – শ্রীযুত পণ্ডিত শ্রীধর পাঠক মহাশয়ের অভিভাষণ বর্ত্তমান সংখ্যা ইন্দুর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। (৮) অগণ্ড অঙ্গরেজী আতঙ্ক বা অজেয় সমর পোত-পুঞ্জ পরাজয় বা 'Spanish Armada'—লেখক শ্রীযুত কৃষ্ণবিহারী মিশ্র বি-এ; ক্রমশঃ চলিল। (৯) ফ্রান্স-দেশীয় রাজ্যক্রান্তি ঔর প্রজা-সত্তাক রাজ্য কী স্থাপনা—লেখক শ্রীযুতবাবু মহাদেবপ্রসাদ সেঠ। প্রোঃ সেল্‌বী-লিখিত ফ্রান্স কী রাজ্যক্রান্তিপর এডমণ্ড বর্ককে বিচার (Burke's French Revolution)—সোমেশ্বর দত্ত শুক্ল লিখিত – ফ্রান্সকা ইতিহাস—মিস্ বকলী-লিখিত। 'ইংলৈণ্ডকা ইতিহাস এবং লগ-লিখিত ফ্রান্স ঔর ফ্রান্সকী রাজ্যক্রান্তি'-অবলম্বনে লিখিত ফরাসী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত, প্রথম প্রস্তাব; (১০) সন্তান-শাস্ত্র, অষ্টাদশ প্রস্তাব; শিবনন্দনবাবুর এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইলে হিন্দী-ভাষার এক সম্পদ হইবে। (১১) আলোচনা-প্রত্যালোচনা—

(ক) হিন্দীকে সমাচার পত্র, জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার উত্তরে 'সাঁবলজী নাগর' কহিতেছেন, 'বঁগলা, গুজরাতী, ঔর মরাঠী ভাষাওঁ মেঁ জৈসী জৈসী পুস্তকেঁ,জৈসে জৈসে লেখ,ঔর জৈসে জৈসে সমাচারপত্র নিকলতে হৈঁ, উনকী সমতা করনে কে লিএ হিন্দী-বালোঁ কো কুছ সময় চাহিয়ে।' তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ মরাঠীপত্র 'মনোরঞ্জন' ও 'কেসরী' প্রভৃতি, বঁগলা 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি এবং গুজরাতী গোবর্দ্ধনরাম মাধবরাম ত্রিপাঠী-সম্পাদিত 'সমালোচক' পত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, এবং হিন্দীর মাসিকপত্র 'সরস্বতী, ইন্দু, মর্য্যাদা, চিত্রময় জগৎ' প্রভৃতির নাম করিয়া, হিন্দীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করিতেছেন।

ইন্দু এবার ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় ইন্দুর উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি। এবারকার রঙ্গীন দর্শনী-চিত্রের ব্লক 'পদ্মাদেবী' অতি সুন্দর হইয়াছে।

৩। **নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা**, জানবরী সংখ্যা, সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র শুক্ল, কাশী নাগরী-প্রচারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ১৷৷০। বর্ত্তমান সংখ্যায় বিগত পঞ্চম হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ, এবং স্বাগতকারিণী সভার সভাপতির অভিভাষণ প্রদত্ত হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে, বড়দিনের ছুটিতে, লক্ষ্ণৌ-নগরে সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা রামপালসিংহ, স্বাগতকারিণী সভার সভাপতি, এবং সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী-কবি পণ্ডিত শ্রীধর পাঠক, সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। উক্ত উভয় সভাপতির অভিভাষণই বঙ্গভাষায় অনুবাদ-যোগ্য। স্থানাভাবে, এবার উহাদের সারমর্ম্ম দিতে পারা গেল না।

৪। **উষা**, মার্গশীর্ষ—পৌষ, ১৯৭১, লাহোর হইতে প্রকাশিত, —সম্পাদক শ্রীসান্তরাম, বি-এ, বার্ষিক মূল্য ৩৲। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ (১) 'স্বচ্ছ বায়ু ঔর বালরক্ষণ,'—প্রোফেসর ছোটালাল বালকৃষ্ণ পুরাণী, এম-এ-লিখিত সন্তানপালন ('বালরক্ষণ') নামক পুস্তক হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। পশ্চিমে ঘন বসতি, তথায় শিশুদিগের এইরূপ স্বচ্ছবায়ু-সেবনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। (২) মহাভারত কা কাল (প্রতিবাদ)—লেখক আত্মা। হরিদ্বার গুরুকুলের ইতিহাস, ও অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত বালকৃষ্ণ এম এ, এফ-আর-সি-এস, ইত্যাদি;. তাঁহার নব-প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল ১৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক বহু প্রমাণ-প্রয়োগ উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন, 'মহাভারত কা যুদ্ধ ৩১০০ বর্ষ পুঃ হুয়া।' প্রতিবাদকারী প্রসঙ্গক্রমে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—'দো চারকে সিবা, বাকী সব লোগ প্রাচীন ভারতবর্ষকে গৌরব কো ঘটানে মেঁ যত্নশীল হো রহে হৈঁ।' অতএব, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ভারতসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত অম্লানবদনে গ্রহণ না করিয়া, 'আত্মা' ঐতিহাসিকদিগকে মৌলিক গবেষণা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা 'স্বতন্ত্র খোজ' বা 'ঐতিহাসিক অনুসন্ধান' কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিবে, ততদিন আমাদিগের প্রচলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া উপায় কি? প্রতিবাদকারী মহাশয়ও স্বয়ং তাঁহার মত সমর্থনের জন্য—উইলসন, হণ্টার, ম্যাকক্রিণ্ডল, বেলী, পোলক প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের শরণাপন্ন হইয়াছেন। (৩) শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরীর জাগরণ—৪র্থ প্রস্তাব চলিতেছে। বাঙ্গালী মহিলার এরূপ উপাদেয় হিন্দী রচনা, আমাদের অতি আদরের ও গৌরবের বিষয়। উষার তরুণ-অরুণচ্ছটা ক্রমে উজ্জ্বল সৌরকরে পরিণত হইতেছে দেখিয়া, আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

সংস্কৃত

বিদ্যোদয়ঃ, ১৩২১ বঙ্গীয়াব্দীয় কার্ত্তিকতঃ পৌষ পর্য্যন্তম্। ৺গোপাল ন্যায়পঞ্চানন-প্রণীত 'বিচার নির্ণয়ঃ' (পূর্ব্বানুবৃত্তি) উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ। বর্ত্তমান সংখ্যাকে 'রাখালদাস ন্যায়রত্ন সংখ্যা' বলিলেও চলে। ইহাতে উক্ত স্বর্গীয় পণ্ডিতকুলরাজের সম্বন্ধে পদ্যো-গদ্যে আলোচনা আছে।

মহারাষ্ট্রীয়

মনোরঞ্জন, সচিত্র মাসিকপত্র, জানেবারী সংখ্যা,—বার্ষিক মূল্য ৪৲ মটো 'যত্র নার্য্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। মনোরঞ্জনের মলাট এবার মোহনরূপ ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য-বেশ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার অকলে মণি-মুক্তার সম্ভার হ্রাস পায় নাই। সারগর্ভ প্রবন্ধ সমাবেশে ও বিষয়-বৈচিত্র্যে মনোরঞ্জনের সমকক্ষতা করিতে পারে, ভারতে যে কোন ভাষায় এরূপ মাসিকপত্র নিতান্ত বিরল। বর্ত্তমান সংখ্যার নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়েকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) শ্রীযুত ডাক্তার না স্থ, হর্ডীকর লিখিত—'ক্ষুধাসম্বন্ধী পাশ্চাত্যাঞ্চী

কালজী (সচিত্র)। (২) আকাশ যানে (সচিত্র),—লেখক শ্রীযুত প্রোঃ কেশব রাঃ কালিটকর,এম-এ, বি-এস্ সী, ; ইহাতে জেপেলিন একপত্র, দ্বিপত্র, ত্রিপত্র, চতুষ্পত্র, বিমান প্রভৃতি বিভিন্ন আকাশযানের চিত্রসহ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (৩) প্রেম সংন্যাস (গ্রন্থ-সমালোচনা),—লেখক প্রোঃ জাঃ ড়াঃ পাঁ, দা, গুণে, এম এ, পি-এচডী। এতদ্ভিন্ন 'হবা-পালট' গল্পে ধর্ম্ম প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে,—'পণ ধর্ম্মাপেক্ষাং প্রাণাঙ্কী কিঁমত কা অধিক আহে?' বালকরাম লিখিত—রিকামপণাচী কামগিরী সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। 'সাদাকালো' চিত্রের মধ্যে স্বনামধন্য শ্রীযুত মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী, শ্রীমতী সৌঃ কস্তুরীবাই গান্ধী ও ডাক্তার জীবরাজ এন্. মেহতার ফটো সমধিক উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত যুবকের বয়স ২৬ বৎসর মাত্র। ইনি এল-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এম-বি-বি এস হইয়াছেন এবং লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির গত এম-ডি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি এম-ডি পাশ হইবার পূর্ব্বে, কয়েকমাস বর্ত্তমান সময়ে 'ইণ্ডিয়ান এম্বুলেন্স কোর' মধ্যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুজরাতী

৩। গুজরাতী পঞ্চ, ইংরাজী-গুজরাতী সাপ্তাহিক পত্রিকা, ২৪এ জানুয়ারী হইতে ২৮এ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় সংখ্যা, বার্ষিক মূল্য আহমদাবাদে ১॥৹, অন্যত্র ২॥৹। এই সাপ্তাহিক পত্রে পড়িবার, বুঝিবার ও আলোচনা করিবার অনেক বিষয় আছে। কিন্তু আমরা সাপ্তাহিক সমালোচনায় বিরত থাকিলাম।

মানুষ কর

[শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, M. A.]

দুঃখে পুড়ায়ে অমৃতে জুড়ায়ে
একবার শুধু মানুষ কর,—
আমার এ পাপ, এ তাপ হর।
জীবনে আমার ছিল কত সাধ,
মিটিল না কিছু—গেল না বিবাদ,
সকল স্বার্থ মুছিয়া ফেলিয়া
হৃদয় আমার তুলিয়া ধর,—
একবার শুধু মানুষ কর!
জীবনের যত জীর্ণ কপাট
নূতন করিয়া গড়িয়া তোল,—
বন্ধ দুয়ার খোল গো খোল।
বহাও রুদ্র কর্ম্ম-বাতাস,
দ্রুত বহে যাক বিশ্বের শ্বাস,
বজ্র-ভাষায় মর্ম্ম-কাহিনী
নূতন করিয়া বল গো বল,—
বন্ধ দুয়ার সকলি খোল।
অসার কিছুই রেখো না—রেখো না,
মিথ্যা বিধিরে রেখো না প্রাণে,
আকুল হতাশ তুলো না কাণে।
মোর আশা চেয়ে তুমি দয়াবান,
যদি মোর সাধ সবি কর দান,
তার মাঝে যদি ভুল এসে পড়ে,
বিঁধিও তোমার তীক্ষ্ণ বাণে,—
আকুল হতাশ তুলো না কাণে

দুঃখে পুড়ায়ে—অমৃতে জুড়ায়ে
একবার শুধু মানুষ কর,
এ পাপ, এ তাপ, এ দুখ হর।
ছেড়ে দাও মোরে অসীমের মাঝে,
মরণের সাথে দুঃখের কাজে,
সকল বিশ্বে সকল আকাশে
আমার জীবন-কাহিনী গড়,—
এ তাপ, এ পাপ, হর গো হর।
বিশ্বে এসেছি বিশ্ব-বিন্দু
পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তোল,—
কত দিন—কত যুগ যে গেল!
তারার প্রাণের কাহিনী শোনাও,
নিখিল বিশ্ব প্রাণে গেঁথে দাও,
তরু-মর্ম্মরে—জল-কল্লোলে
আমার প্রাণের দুয়ার খোল,—
পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তোল।
অসীমের মাঝে রেখেছ যখন
জীবন আমার অসীম কর,—
মিথ্যা জন্ম-মরণ হর।
দুর্ব্বল বাহু বক্ষে বাঁধিয়া
ধূলির মাঝারে মরি যে কাঁদিয়া,
অক্ষম এই দুর্ব্বল প্রাণ—
তোমার স্বরূপে সবল কর,—
মিথ্যা জন্ম-মরণ হর।

প্রতিধ্বনি

কবিতার কথা

আজ কালকার কবিতা পড়িলে মনে হয়, যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ, সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অন্য প্রকারের, আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে, সাদাসিধে লোকে বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মতন বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগ-রাগিণী আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে, সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই, সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতেই পারে না।

আমাদের কবিতার এই শোচনীয় অবস্থার হয় ত যথাযথ কারণ আছে। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে সুপণ্ডিত, তাঁহারা বলিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে ত মন মানে না। প্রাণ যে চায় সেই বৈষ্ণব কবিদিগের সব জুড়ান সুধা-স্রোত। মন যে চায় সেই বাঙ্গালীর কবিতা। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেই হইবে। কবিতা লইয়া আর খেলা-ধূলা ভাল লাগে না। সংসারের খেলা ঘরে খেলিতে খেলিতে যাহারা প্রাণের বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, তাহারা বাস্তবিকই ধন্য। কিন্তু যাহারা প্রাণের বস্তু লইয়া খেলা করিতে বসে, তাহাদের মত দুর্ভাগ্য আর কার? বঙ্গসাহিত্যের সেই হারাণ ধারাকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে মরে নাই,—একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই,—সরস্বতী নদীর মত বালুকারাশির মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুঁড়িয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে।—নারায়ণ—ফাল্গুন।

বিভীষিকার অভয়লাভ

একটা মহিমান্বিত সভ্যতা আপনার সমস্ত বেশভূষা, অলঙ্কার, সমস্ত শ্রী ও সৌন্দর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া নগ্না কুৎসিতা হইয়া, হস্তস্থিত খড়্গের দ্বারা আপনাকে হত্যা করিল, এবং আপনার রুধির আপনি পান করিয়া নিজ বিপরীত বুদ্ধি ডাকিনী যোগিনীকে তপ্ত রুধির ধারায় তৃপ্ত করিতে লাগিল। উন্মাদিনী ডাকিনী যোগিনীকে সঙ্গে লইয়া অসংখ্য নরনারীকে পদদলিত করিয়া, উদ্দাম আবেগে সন্তানের বক্ষে নাচিতে লাগিলেন।

বিশ্বমানব! তুমি ছিন্নমস্তার এই বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পাইও না। এ যে নরনারী লীলা,—তুমি যাহাকে এমন ছিন্নমস্তা দেখিতেছ,তিনিই আবার ভুবনেশ্বরী হইয়া তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আশীর্ব্বাদ দিবেন। বর্ত্তমান সভ্যতা! তুমি আত্মঘাতী হইলে, তাহাতে অনুশোচনা করিও না। তোমার আত্মহত্যায় পাপ নাই।

বিশ্বমানবের রঙ্গমঞ্চে এই দৃশ্যই ত অভিনীত হয়। অভিনেতার মত কত সভ্যতা আসে যায়, কত খেলা দেখায়, আবার নূতন সভ্যতাকে রঙ্গমঞ্চে আমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় লয়। তোমাদের ধর্ম্ম যে প্রজাপতির ধর্ম্ম। ডিম্বে সন্তানের পুষ্টি সাধনের জন্য তোমরা আপনাদিগকে বলি প্রদান কর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ডিম্ব—নূতন সভ্যতা সেই সন্তান। যুগে যুগে সভ্যতার জন্ম ও মৃত্যু বিশ্বমানব নিরীক্ষণ করিতেছে। সভ্যতার মৃত্যুযন্ত্রণায় আমরা কাতর হই, মানুষ কাতর হয়; কিন্তু সভ্যতার পক্ষে তাহা মৃত্যুযন্ত্রণা নহে, জীবনসঞ্চারের নিবিড় আনন্দ। বিশ্ব মানবের পক্ষে তাহা নারায়ণের নিষ্ঠুর লীলা নহে, উহার মুক্তির জন্য তাঁহার অমোঘ বিধান।—উপাসনা—পৌষ।

মানুষ হওয়া

আর কেহ আমাদের জন্য কিছু করিয়া দিবে, এ বাসনা, এ আশা আমরা যেন পরিত্যাগ করি। মানুষ মানুষকে টাকা দিতে পারে, জমি দিতে পারে, পদ দিতে পারে, উপাধি দিতে পারে,—কিন্তু মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। মনুষ্যত্বত দূরের কথা, বিদ্যা দিতে পারে না, প্রতিভা দিতে পারে না।

জাতীয় উন্নতির সোপানের অনেকগুলি ধাপ। প্রথমে বুঝি, আমাদের কতদূর দুর্গতি হইয়াছে। তাহার পর বুঝি, যে আমাদেরও অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তাহার পর বুঝি যে, এই অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা আমাদেরও মানুষ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর,তাহার পর বুঝি যে কেহ কাহাকেও মানুষ করে না, নিজেই নিজের প্রদীপ নিজেই নিজের যষ্টি, নিজেই নিজের অবলম্বন, অতএব অপরের অনুগ্রহ কামনাই মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান অন্তরায়। তাহারপর আত্মোন্নতি চেষ্টারূপ দৃঢ় কঠোর তপস্যার প্রবৃত্ত হই, যিনি এই যুক্তিমার্গ দেখাইয়াছেন, তিনিই লক্ষ্যস্থলে ঠিক পৌছাইয়া দিবেন।—প্রবাসী—ফাল্গুন।

শোক-সংবাদ

৺গোপালকৃষ্ণ গোখলে

ভারতের সুসন্তান, দেশের গৌরব, তেজস্বী, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর গোপালকৃষ্ণ গোখলে আর ইহজগতে নাই; জগজ্জননী তাঁহার প্রিয়তম শ্রেষ্ঠ সন্তানকে অকালে কোলে টানিয়া লইয়াছেন! বিগত ৭ই ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় গোখলে মহোদয় দেশের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের মমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সাধকোচিত-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। য়ুরোপ-আমেরিকার লোকে সাধারণতঃ যে সময় কার্য্য আরম্ভ করেন, সেই সময়ে—৪৯ বৎসর মাত্র বয়সে গোপালকৃষ্ণ গোখলে সমস্ত কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন! সমস্ত ভারতবাসী—হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-জৈন, পার্শী-য়িহুদী—সকলেই গোখলের এই অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ চলিয়া গেলেন;—গোপালকৃষ্ণ গোখলের ন্যায় একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, দেশহিত-ব্রত, মহাত্মার তিরোভাবে যে ক্ষতি হইল, এক্ষণে তাহার পূরণ হইবে না। আমরা গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয়ের বিয়োগ শোকে সান্ত্বনার বিষয় কিছুই দেখিতেছি না।

৺গোপালকৃষ্ণ গোখলে

৺মন্মথলাল *

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

শৈশবেরি সঙ্গী আমার, আমার প্রাণের সাথীর তরে,
রয়ে রয়ে আজ্‌কে যে প্রাণ কেমন করে—কেমন করে!
নিব্‌লো প্রতিপদের আলো, রামধনু যে মিলিয়ে গেল,
ঝলসে গেল শ্যামল তরু,
নবীন মুকুল পড়্‌লো ঝরে— প্রাণ যে আমার কেমন করে!

আকুল প্রাণে ডাকছি আজি— কোথায় ভ্রাতা, বন্ধু কোথা!
মাধবীর ওই শুষ্ক মুকুল কইছে তাহার মর্ম্ম ব্যথা;
মেঘঢাকা ওই বালক রবি, আঁকছে প্রাণে তাহার ছবি;
অশ্রু-জোয়ার শুষ্ক নয়ন
পলে পলে দিচ্ছে ভ'রে;— প্রাণ যে আমার কেমন করে!

পড়ছে মনে মূর্ত্তি তাহার— ফুলের মত হৃদয়খানি;
পড়ছে মনে মধুর হাসি, অতুল দয়া—মধুর বাণী,
প্রাণের মাঝে আসছে ভাসি অতীতের সেই কান্না হাসি,
সলিলভরা মেঘের মত
সুখের স্মৃতি ফিরছে ওরে— প্রাণ যে আমার কেমন করে!

যে বীণা তার মিলন-দিনে সাহানাতে ঝঙ্কারিল,
বিসর্জ্জনের বেহাগ-গীতি কেমনে সে গাইবে বল!
নয়নজলে ভাসছে যে বুক, মুখর ভাষা হচ্ছে রে মূক,
সকল সুর যে ডুবছে গিয়ে
তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে;— প্রাণ যে আমার কেমন করে!

---

* স্বর্গগত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পৌত্র মন্মথলাল সরকারের অকাল বিয়োগে।

স্বাস্থ্য

বসন্তের প্রতিষেধক

উচ্ছে—সর্ব্বপ্রকার বসন্ত রোগেরই প্রতিষেধক; এ কথা প্রমাণের জন্য শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রলাল কবিভূষণ মহাশয় ক্রমাগত সাতদিন কাল উচ্ছে খাইয়া, তাহার পর বসন্তের টিকা লয়েন। টিকা লইবার পরও উচ্ছে খাইতে লাগিলেন; টিকা উঠিল না। আরও তিনবার তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনবারই টিকা উঠে নাই; গত বৎসর অন্য সাত ব্যক্তিকে দিয়া এই পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এ বৎসরও কুড়িজনকে দিয়া এই পরীক্ষা করিয়াছেন—ফল একই রূপ হইয়াছে। ইহাদের কাহারই টিকা উঠে নাই। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে—উচ্ছে সমস্ত বসন্ত ব্যাধির প্রবল প্রতিষেধক। উচ্ছে সম্বন্ধে "সুশ্রুত" লিখিয়াছেন—"উচ্ছে কুষ্ঠ, দুষ্ট ব্রণাদি রোগে রক্তশোধক।" "চক্রদত্ত" লিখিয়াছেন—'উচ্ছে হাম ও সকল প্রকার বসন্ত-ব্যাধির প্রশমনকারক। বাত, প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি রোগেও আরোগ্যকারক এবং বলকারক-রূপে ব্যবহার্য্য। কুষ্ঠ ও দুষ্ট ব্রণে ইহার চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।' আমাদের এ অঞ্চলের চতুর্দ্দিকেই এখন বসন্তের ভীষণ প্রকোপ চলিয়াছে। আজকাল হাটে-বাজারেও উচ্ছে আমদানী কম হয় না। সুতরাং, বসন্তের এই ভীষণ প্রাদুর্ভাবকালে, সকলের এই সহজলভ্য বসন্তের প্রতি-ষেধকটির পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।—অমৃতবাজার পত্রিকা।

"টিকা লওয়াই" বসন্তের সর্ব্বপ্রধান প্রতিষেধক। এতদ্ভিন্ন হোমিওপ্যাথিক মতে "ম্যালাণ্ড্রিণাম," বসন্তের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ;—"ভেরিওলিনাম্" বসন্তের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হয়। অনেক চিকিৎসক "স্যাবাসিনিয়া" বসন্ত-রোগের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন। বসন্ত-রোগে "স্যাবাসিনিয়া" ঔষধের আরোগ্যকারী ও প্রতিষেধক উভয় ক্ষমতাই আছে।

নিম্নে বসন্তের কয়েকটি প্রতিষেধক মুষ্টিযোগ প্রদত্ত হইল—

(১) হরিতকীর বীজ পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে সূতার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, বসন্ত হইবার ভয় থাকে না।

(২) কণ্টকারীর মূলের ছাল সিকি তোলা, ২১টি গোলমরিচের সহিত বাটিয়া একদিন খাইলে, সেই বৎসর বসন্ত হইবার ভয় থাকে না;—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ২১টি মরিচ ব্যবহার্য্য, বয়স কম হইলে মরিচের পরিমাণও কম হইবে—তবে কণ্টকারী কাঁচা হওয়া চাই। অভাবে, শুক্‌না কণ্টকারী দুই তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই জল দুই দিন খাইয়া অনেকে সুফল পাইয়াছেন।

(৩) প্রত্যহ কাঁচা সোণামুগ অল্প পরিমাণে খালি-পেটে খাইবে। প্রত্যহ মুগের ডাল আহার করিবে। ইহার গুণ চারিদিন পর্য্যন্ত থাকে।

(৪) শরীরে তৈল মাখা নিষিদ্ধ; নিতান্ত অসুবিধা পক্ষে মাথায় তৈল দিতে পারা যায়। নিরামিষ আহার প্রশস্ত ব্যবস্থা। মাদকদ্রব্য, পান প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। ব্যঞ্জনে তৈলের বদলে ঘৃত খাইলে ভাল হয়।

(৫) গৃহে দুইবার ধুপ্‌ধুনা দিবে, গোবর দিয়া অঙ্গনাদি লেপন করিবে।

(৬) বসন্ত-রোগ দেখা দিলে, তৎস্থানের লোকেরা প্রত্যহ কিঞ্চিৎ গাধার দুগ্ধ পান করিবে; অভাবে সোণামুগ বা চাউল অন্ততঃ দশ বার ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া প্রত্যহ ঐ মুগ বা চাউল তিন চারিটা খাইবে।

(৭) সিমুলের বীজ (একজনের পক্ষে দশ বারটা, বা অধিক হইলে ক্ষতি হইবে না), গুড়, ঘৃত ও মধুর সহিত খাইবে। অথবা কতকগুলি বীজ, পাঁচ ছয় ঘণ্টা ভিজাইয়া

রাখিয়া, পরে ঐ জল ছাকিয়া শর্করা যোগে খাওয়া যাইতে পারে।

আনুষঙ্গিক উপায়।—রোগীকে শীতল ঘরে শোয়াইয়া রাখিবে। তাহার বিছানার কাপড় আদি বারংবার পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। বসন্ত-রোগীর গৃহ বেশ বড়, বায়ুযুক্ত ও কিছু অন্ধকারময় হওয়া আবশ্যক। রোগীর গৃহ, শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্ব্বদা সুপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধশূন্য ভাবে রাখা উচিত। দুর্গন্ধ ও সংক্রমণ নিবারণের জন্য 'পটাশ পার্ম্যাঙ্গানেট', কিংবা 'কার্ব্বলিক এসিড' জলে দ্রবীভূত করিয়া ঘরে ও বিছানায় ছিটাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চিকিৎসক ও যাঁহারা রোগীর সেবাশুশ্রূষাদি করেন, তাঁহারা যতবার রোগীর গাত্র স্পর্শ করিবেন, ততবারই 'কার্ব্বলিক লোসনে' তাঁহাদের হস্ত ধৌত করা বিধেয়। ১০০ ভাগ গরম জলে একভাগ কার্ব্বলিক এসিড দিয়া এই লোসন প্রস্তুত করিতে হয়।

রোগীর ঘরে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু যাতায়াত করিতে পারে এবং দূষিত বায়ু সহজে নির্গত হইয়া যায়, এরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বসন্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু অত্যন্ত উপকারী। রোগের সকল অবস্থাতেই,—বিশেষতঃ যখন চর্ম্ম উষ্ণ,বেদনাযুক্ত হয়, চড়মড় করে,তখন—উষ্ণ জলে এক চামচ ম্যাসন্‌স্ পার্ফিউম্‌ড্ কার্ব্বলিক এসিড (Masson's perfumed Carbolic Acid) মিশাইয়া, উহা দ্বারা রোগীর সমুদয় শরীর মুছাইয়া দিয়া নরম নির্ম্মল এক খণ্ড শুষ্ক কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা রোগীর যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়। গুটিগুলি পরিপক্ক হইয়া, উহা ফাটিয়া পূঁজ নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে, পূঁজ শুষ্কাবস্থায় রাখিবার জন্য শরীরে ময়দা ছড়াইয়া দিবে। রোগের শেষাবস্থায় ঈষৎ উষ্ণজল দ্বারা রোগীকে বারংবার মুছাইয়া দিয়া তাহার শরীর পরিষ্কার রাখিবে। রোগীকে নখ দ্বারা গুটিগুলি চুলকাইতে দিবে না। গুটিগুলি চুলকাইলে, নরম তুলি বা দূর্ব্বার স্তোক বাঁধিয়া, তদ্দ্বারা রোগীর শরীরে বারংবার বুলাইবে। গ্লিশিরিন্ (Glycirine) ⅓, জল ⅔ একত্র মিশাইয়া রোগীর শরীরে বারংবার দিবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে রোগীর শরীরে গভীর দাগ হইতে পারে না। রোগীর গায়ের চুলকানি নিবারণের জন্য, সর্ব্বাঙ্গে নিমগাছের পাতা বুলানও ভাল। রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীকে ভাত,বার্লি,এরারুট, দুগ্ধ, মুগের যূষ প্রভৃতি লঘুপথ্য আহার দেওয়াই ব্যবস্থা। পানার্থে যথেষ্ট পরিমাণে শীতলজল দেওয়া যাইতে পারে। রোগ আরোগ্যে, শেষাবস্থায়, অর্থাৎ বসন্ত ভাটি পড়িতে আরম্ভ করিলে—রুটী, মসূরের যূষ, ফলাই মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি দেওয়াই ব্যবস্থেয়। এই সময়, রোগীকে কিঞ্চিৎ মেষ দুগ্ধ খাওয়াইলে ভাল হয়।

রোগ-শান্তির পর রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি পুড়াইয়া ফেলাই, সংক্রমণ-নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। যদি পুড়ান না হয়, তাহা হইলে তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া ও পরে কাচিয়া দেওয়া আবশ্যক। রোগীর ব্যবহৃত গৃহের দ্বার, জানালা বন্ধ করিয়া গন্ধক পুড়াইলে, ঘরের সর্ব্বত্র কার্ব্বলিক লোসন ছিটাইলে, প্রায়ই সংক্রমণ নিবারিত হইয়া থাকে। —নীহার।

নারিকেল বা অন্য প্রকার তৈলের সহিত চন্দনের তৈল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে এবং বসন্তের প্রকোপ সময়ে প্রত্যহ কয়েক ফোটা চন্দন-তৈল জল বা চিনিতে মিশাইয়া পান করিলে, বসন্তের ভয় থাকে না।

—জলপাইগুড়ি য়্যাডভার্টাইজার্।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক

কালমেঘ, পেঁপের আটা প্রভৃতি দ্বারা কিরূপে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক মহৌষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহাই লিখিতেছি—

কালমেঘ চূর্ণ ১ ভরি
গুলঞ্চের চিনি ১ ভরি
পেঁপের আটা ১ ভরি
চিতামূল চূর্ণ (রক্ত) ॥০ ভরি

প্রথমে কালমেঘ চূর্ণ ও চিতামূল চূর্ণ—এই দুইটী দ্রব্যকে তিন দিন নিমের কাথে ভাবনা দিয়া, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, পেঁপের আটা ও গুলঞ্চের চিনি মিশ্রিত করিবে। পরে, উত্তমরূপে খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক, দুই রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বরকালীন প্রতিদিন ইহার দুইটী করিয়া বটিকা, তিনবার সেবন করিবে। ইহাই পূর্ণ মাত্রা। বালকগণকে সেবন করাইতে হইলে, বয়সের তারতম্যানুসারে মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হইবে। রাশি রাশি কুইনাইন সেবন করিয়া যাহাদের জ্বর বন্ধ হয় নাই, আমি এরূপ রোগীকে ১০ হইতে

২০ বটিকায় আরোগ্য করিয়াছি। যাঁহারা ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত, আমার অনুরোধ, তাঁহারা এক সপ্তাহ মাত্র এই বটিকা সেবন করিয়া দেখুন, পীড়ার অর্দ্ধেক উপশম হইবে।

—জাগরণ।

যক্ষ্মা

এ দেশে যক্ষ্মার প্রকোপ-প্রশমনকল্পে অনুসন্ধানের ভার সরকার ডাক্তার ল্যাঙ্কস্টারকে দিয়াছেন। সে দিন মান্দ্রাজ সহরে অধ্যাপক গেডেস্ যে সভায় সহরগঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, ডাক্তার মহাশয় সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, যখন স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লোকের চিত্তাকর্ষক গৃহ নির্ম্মিত ও লোকের পক্ষে সুলভ হইবে, তখনই এ দেশে যক্ষ্মার প্রকোপ প্রশমিত হইবে—তৎপূর্ব্বে নহে। এ দেশে যক্ষ্মা সচরাচর দৃষ্ট হইত না। এ দেশের লোক সাধারণতঃ খোলা জায়গায় বাস করিত—পল্লীতে বায়ুর ও আলোকের গতি প্রহত হইত না, এক বাড়ীতে লোকও অধিক থাকিত না—কলকারখানায়ও লোক কাজ করিত না। এখন সে সব ব্যবস্থাই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার নানা কারণে লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে। দুর্ব্বল-দেহে রোগবীজ সহজেই প্রবল হয়।

—ঢাকা গেজেট।

দীর্ঘ জীবনের উপায়

স্যার জেম্‌স্ ময়ার নামক কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তার, দীর্ঘজীবন লাভের অনুকূল নিম্নলিখিত কতিপয় উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—(১) আটঘণ্টা নিদ্রা যাইবে, (২) দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়ন করিবে, (৩) শয়ন-গৃহের দুই একটা জানালা সমস্ত রাত্রি খুলিয়া রাখিবে, (৪) গৃহের সম্মুখে একটী পরদা ঝুলাইয়া রাখিবে, (৫) গৃহের দেওয়াল হইতে কিছু দূরে শয়ন করিবে, (৬) প্রাতে শীতল জলে স্নান না করিয়া শরীরের উত্তাপের সমপরিমাণ উষ্ণজলে স্নান করিবে, (৭) প্রাতঃকালে জলযোগের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করিবে, (৮) পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুগ্ধপান প্রশস্ত, (৯) আহারকালে চর্ব্বিময় পদার্থ আহার করিবে, (১০) মাদকদ্রব্য সেবনে বিরত থাকিবে, (১১) খোলামাঠে ব্যায়াম করিবে, (১২) শয়ন-গৃহে গৃহপালিত জন্তু প্রভৃতি প্রবেশ করিতে দিবে না, (১৩) সম্ভব হইলে সহরের বহির্ভাগে পল্লীগ্রামে বাস করিবে, (১৪) পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, (১৫) সর্ব্বদা এক রকম কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে না, (১৬) মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে, (১৬) সর্ব্বপ্রকার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবে, (১৮) মেজাজ শীতল রাখিবে।—সুরমা।

পুস্তক-পরিচয়

লিখন—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার-প্রণীত—মূল্য ॥০ আনা। পুস্তকখানিতে মোট নয়টি ছোট গল্প আছে। ছোট-গল্প, ওরফে কথা-সাহিত্যের লক্ষণ, আধুনিক সাহিত্যসেবিগণের মতে, অনেকটা Lyricএর ন্যায়, অর্থাৎ "গদ্য Lyric"ই 'কথা-সাহিত্য' পদ-বাচ্য। আমাদের কিন্তু মনে হয়, সেটা সম্পূর্ণ ফরাসী-আদর্শ। আমাদের ধারণা, যে গল্পে এক বা বহু চরিত্র সম্পূর্ণভাবে ফুটান হইয়াছে, তাহা ছোট বা বড় উপন্যাস; আর যে গল্পে এক বা একাধিক চরিত্রের ভাব বা প্রবৃত্তির ক্রমোন্মেষ বা বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই কথা-সাহিত্য বা ছোট গল্প শ্রেণীর। যাহা হউক, সে সম্বন্ধে আলোচনার স্থান ইহা নহে। ফলে, সুবোধবাবুর এই গল্পগুলি ফরাসী প্রথার অনুকরণে লিখিত। বিদেশীয় 'হ্যাট্ কোট,' 'গাউন-বডিস্' ছাড়াইয়া নায়কনায়িকাকে দেশীয় 'মির্জ্জাই-পিরান', 'সাটী-আঙ্‌রাখা' পরাইতে সুবোধবাবুর কতিত্ব আছে। এই নয়টি গল্পের—দুইটি বিলাতী, একটি, রাজপুতানার, একটি দিল্লীর, বাকি পাঁচটি বঙ্গদেশের চিত্র। এই লিখনচিত্রের প্রত্যেকটিতেই বেশ একটা রসাভাস আছে, সে ভঙ্গী প্রকৃতই প্রশংসনীয়।

নির্ম্মাল্য—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-বিরচিত—মূল্য ৷৵০ আনা। এখানিও দশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি রবিবাবুর ছোট গল্পের অনুকৃতি 'খাতা' ও 'সার্থক' গল্পদ্বয়ে রবিবাবুর 'খাতা' ও 'শুভদৃষ্টি' শীর্ষক গল্প দুইটির ভাব ও ভাষার অনুসৃষ্টি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। লেখিকার লিখন-ভঙ্গী বেশ—মনোরঞ্জনের যথেষ্ট শক্তি আছে। তাঁহার এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশে, ঘর-সংসারে, ভাবের অভাব নাই। অতঃপর, তাঁহাকে দেশীয় মৌলিক ভাব লইয়া, তাঁহার স্বভাবসুলভ মনোমদ ভঙ্গী ও ভাষায় গল্পাদি লিখিতে দেখিলে পরম প্রীত হইব।

---

৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত—মূল্য ১৲ টাকা। জুলস্ভার্ণের 'Around the World in Eighty Days' নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। গল্পাংশের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব, তাহা জুলস্ ভার্ণের। ভাষান্তরিত করিতে রাজেন্দ্রবাবু বেশ মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি ভাষা স্থানে স্থানে পিঁয়াজ-রশুনের গন্ধে ভরপুর—যেমন, ৬৬ পৃষ্ঠায় 'অসভ্য প্রথা জীবিত আছে,' ১৫৬ পৃষ্ঠায় 'একেবারেই আহত হইয়াছিলেন না' ইত্যাদি।—সামান্য যত্ন করিলেই, আচার্য্য মহাশয় অনায়াসেই এই সকল দোষ বিদূরিত করিতে পারিতেন; কেন করেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! পুস্তকখানির ছাপাই ও বাঁধাই সুন্দর, মূল্যও সে হিসাবে অল্প।

হরিপ্রেমামৃতম্—শ্রীহৃষীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-প্রণীতম্—মূল্য •পুস্তকখানি সংগ্রহ, কিন্তু অতি সুনির্ব্বাচিত সংগ্রহ। পড়িতে পড়িতে, ভাবের আবেশে অন্তরে বিমল আনন্দ হয়। 'ত্বং লক্ষবানসি গিরীশমদীপ্সিতং ত্বং'—(হে গিরীশ! তোমার প্রেমাবেশ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি আমার ঈপ্সিততমকে পাইয়াছ!) অতি সুন্দর। 'আহুয় পশ্যামি যদি প্রলভ্যতে, ন চান্যথা জীবিতু মিষ্যতে ময়া'—(ডাকিয়া দেখি, যদি তাঁহার দর্শন পাই। অন্যথা, জীবনধারণ করিতে আমার অভিলাষ নাই।)—'অস্তোবরেণৈব বরস্তদীক্ষণাৎ ত্বদীক্ষণান্নৈব বরং ততো বৃণে'—(হে বাঞ্ছিততম! তোমাকে যে দেখিলাম, ইহা আমার পরম ভাগ্য; ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ বর হইতে পারে না; অতএব, তোমার দর্শন ব্যতিরেকে, আর অন্য বর গ্রহণ করিব না।)—ভাগবতের সেই সুন্দর কথা—'আত্মরূপে আমি সর্ব্বজীবের অন্তরে রহিয়াছি; সুতরাং জীবগণের সন্তোষই আমার সন্তোষ!'—পুস্তকখানি বাস্তবিকই ভক্তের পরম নিধি!

অমিয় প্রশ্নাবলী—শ্রীজং বাহাদুর সিং-কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ৵০ আনা। স্বামী জ্ঞানানন্দ জী সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলী ও হিন্দু জনসাধারণ—কেনো আলোচনা করিতে সমুৎসুক?—মহাজন-জীবন-কথা আলোচনায় নিশ্চয়ই প্রভূত সুফল ফলে।

হাসন্ হোসেন্—শ্রীরামকানাই দত্ত-প্রণীত—মূল্য ।॰ আনা। ধর্ম্মবীর হাসন্ হোসেনের করুণ কাহিনী ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী মাত্রেরই অবশ্য-পাঠ্য। মহামতি হাসনের অমূল্য উপদেশচতুষ্টয় ঈশ্বরের প্রসন্নতালাভের প্রকৃষ্ট উপায়;—(১) জীবিকা-বিষয়ে নিশ্চিন্ততা, (২) সৎকার্য্যে অনুরাগ, (৩) পাপপুরুষের সঙ্গ-ত্যাগ, (৪) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।—কারবালাক্ষেত্রে দ্বিসপ্ততি (৭২) জন বীরপুরুষ ধর্ম্মার্থ যুদ্ধে প্রাণদান করিলে, এমাম্ হোসেন্ বাহাত্তর ঘা আঘাত সহ্য করিবার পরও জীবিত ছিলেন,—সেই আঘাতেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

অশ্রুহার—শ্রীমতী নীহারনলিনী দাসী রচিত—মূল্য • আনা। সহোদরের মৃত্যু-উপলক্ষে শোক-গীতি; গীতি গুলি বড়ই করুণ। সান্ত্বনাচ্ছলে লেখিকা বলিয়াছেন—

"মিছা সুখ, মিছা দুঃখ, মায়ার ধরণী' পরে
চল এবে গৃহে যাই সাক্ষী রাখি' বৈশ্বানরে।" চমৎকার কথা!

আরতি মৌলবী মহাম্মদ আমিন উল্লা রচিত—মূল্য ।॰ আনা। এই পুস্তকে উনবিংশতিটি কবিতায় মুসলমান কবি আমিন উল্লা ভক্তিভরে দেবী বাণীর আরতি করিয়াছেন।

সংসার—"কবে, ত্যজি ভব বন, উড়ি ফুল্লমনে,
যে বনের পাখী আমি—যাব সেই বনে?" ইত্যাদি।

আসক্তি—"আসক্তির মলিনতা লাগিয়াছে গায়,
নন্দনের পূত জলে ধুয়ে দাও তায়।" ইত্যাদি।

প্রেম—"তোমার হাতের গড়া এই যে হৃদয়,
সঁপিলাম তব করে—জয় প্রেমময়!" ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়—"পঞ্চ-অরি পঞ্চপথ র'য়েছে ঘেরিয়া,
তোমায় পাইব বল কোন্ পথে গিয়া।" ইত্যাদি।

যৌবন—"অশুচিবিহনে যদি না রহে যৌবন,
প্রয়াসী নহি গো আমি যৌবনে কখন।" ইত্যাদি।

কবিতাগুলিতে এইরূপ বেশ মনোমদ পদ সকল আছে।

পরিণয়—শ্রীললিতকুমার ঘোষ-প্রণীত মূল্য ৷৷॰ আট আনা। এখানি সচিত্র গীতিকবিতা-পুস্তক; গ্রন্থকারের কতকগুলি গান ও ব্যঙ্গ কবিতা লইয়াই ইহা রচিত। বিবাহ-বাসরের জন্যই যে বইখানি রচিত,—নামেই তাহার পরিচয়। প্রথম খণ্ড 'বন্দনা' 'আবাহন', 'মাঙ্গলিক', 'জলভরা', 'সাজান', 'বাসন', 'মিলন' ও 'শুভাশীষ', এই কয়টি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগে অনেকগুলি গান ও ছবি আছে। 'যৌতুকে-কৌতুক' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু কতকগুলি ব্যঙ্গ কবিতা; তা ছাড়া সামাজিক 'কুপ্রথা' বিদ্রূপচ্ছলে চিত্রিত হইয়াছে। 'বরের বাজার' চিত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশধারী যুবকবৃন্দকে উচ্চমঞ্চের উপর চড়ান হইয়াছে এবং কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধপিতৃদলের মুখে বিষাদকরুণ উপায়হীনতার ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বিবাহ-উপলক্ষে গাহিবার উপযোগী বিস্তর নূতন গান আছে। পুস্তকখানি তকতকে ঝকঝকে, বিবাহ-বাসরে উপহার দিবার উপযুক্ত।

একলব্য—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়-প্রণীত—মূল্য ৵৹ ছয় আনা। গ্রন্থখানি ছেলেদের জন্য লিখিত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই 'শিশু রঞ্জনে'র উপযোগী। ভাষা সরল, কয়েকখানি হাফ্‌টোন চিত্রও আছে। শিশু-সাহিত্যের রাজ্যে, দাম্পত্য প্রণয়চিত্রের বাহুল্য কিছু কমাইয়া, একলব্যের মত কাহিনীর অবতারণা করিলে লাভ আছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নানা সৎসাহিত্য-রচয়িতা—'ছেলেদের চণ্ডী' 'সর্ব্বানন্দ' প্রভৃতি বহুধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নূতন পুস্তক 'গয়া-কাহিনী' এই মাসেই প্রকাশিত হইবে। কবি সম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় ইহার একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে পৌরাণিকী ও ঐতিহাসিক বিচিত্র বিবরণী হইতে 'শ্রাদ্ধবিধি,' 'পরলোক রহস্য' পর্য্যন্ত,—সকল কথাই স্থান পাইয়াছে। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ছাপাই-বাঁধাইও সুন্দর, অনেকগুলি মনোরম চিত্রদ্বারা সুশোভিত। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

উক্ত গ্রন্থকারের 'উপনিষদের উপাখ্যান' গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড 'নচিকেতা'ও যন্ত্রস্থ। অতুলবাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় শঙ্করভাষ্যের অনুযায়ী এই উপাখ্যানমালা লিখিতেছেন। এই শ্রেণীর পুস্তকের একটা মহা উপকারিতা—এইগুলি পাঠে বালকবালিকাগণের চিত্ত, মূল উপনিষদের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। 'নচিকেতা'র ভূমিকা লিখিতেছেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। প্রতি খণ্ডের মুখপত্রে এক একখানি বহুবর্ণ চিত্র থাকিবে। মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

Home University Library Seriesএর অন্তর্গত "Evolution of Industry" নামক পুস্তক অবলম্বনে রচিত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা প্রবন্ধের জন্য, 'চৈতন্য লাইব্রেরি'র কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, "বিশ্বম্ভর সেন পারিতোষিক" হিসাবে, একশত টাকা পুরস্কার দিবেন। আগামী ৩০এ নবেম্বরের মধ্যে, 'চৈতন্য লাইব্রেরি'র সম্পাদক, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় প্রবন্ধ প্রেরিতব্য।

বিগত 'খৃষ্টমাস্' পর্ব্বের অবকাশে, ১৩ই ও ১৪ই পৌষ, শিলচরে যে 'সাহিত্য সম্মেলন' হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে অধিকতর সাহিত্য চর্চ্চার উদ্দেশে একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশের যে সঙ্কল্প হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। আগামী বৈশাখ মাসে শ্রীহট্ট-করিমগঞ্জ হইতে এই পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হইবে।

স্বনামখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি একখানি পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন। ইহার নাম 'হুমায়ুন'। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রণীত 'হামির' নামক আর একখানি নাটক 'ষ্টার থিয়েটরে' অচিরেই অভিনীত হইবে। পুস্তক দুইখানি ছাপা হইতেছে, সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় এবার 'লাইব্রেরী পুস্তক'-রূপে যে আটখানি পুস্তক মনোনীত করিয়াছেন, তন্মধ্যে চারিখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, B A,-প্রণীত —'ইংরেজের কথা', এবং 'সমসাময়িক ভারত' প্রথম তিন খণ্ড।

প্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্য-রসিক মার্ক টোয়েনের কয়েকটি গল্প ও বর্ণনা, 'গল্পগুচ্ছ' ও 'ভিনাস্-চিত্র' নামে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার চৌধুরী মহাশয় ইহার সঙ্কলক ও অনুবাদক।

ধর্ম্মপ্রাণ, শক্তিমান্ চিন্তাশীল সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, M A.,-প্রণীত "পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ" এই মাসেই প্রকাশিত হইবে।

সুপ্রতিষ্ঠ মোসলেম্ লেখক মৌলভী শেখ আবদুল জব্বর সাহেব প্রণীত 'মক্কা-শরীফের ইতিহাস'—তৃতীয় সংস্করণ, এবং 'জেরুসালেমের ইতিহাস'—দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হইল।

ভ্রম-সংশোধন

৫৭২ পৃঃ—'অজন্তা' প্রবন্ধের যাবতীয় চিত্র উল্টাপাল্টা হইয়া গিয়াছে—যে ভাবে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত সংখ্যক চিত্রগুলি এইভাবে সন্নিবিষ্ট আছে -৩, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১, ১৫,

৫৮১ পৃঃ—প্রথম স্তম্ভের পাদটীকাটি এইরূপ হইবে—

"When male animals utter sounds in order to please the females, they would naturally employ those which are sweet to the ears of the species."

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH.
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

গৃহ-লক্ষ্মী

চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ]

দ্বিতীয় খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

যোগ না বিয়োগ ?*

[শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

ঘুম নয়—ঘুম নয়—হে ব্রাহ্মণ ! এ যে জাগরণ !
শুষ্ক পত্র ঝ'রে যায়,- পুনরায় শীত-অবশেষে
তরুরে সাজায় আসি বসন্তের অভিরাম বেশে ;—
মৃত্যুর মঙ্গল-ঘটে জীবনের মৃত-সঞ্জীবন !

সেই মহাসিন্ধুপারে আছে এক রণক্ষেত্র নব,
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি—কভু রথী, কখনও সারথী—
তোমারে চাহেন বীর, সেথা সেই অগতির গতি,
ভাগ্যবান্ আপনি সে ভক্তবাঞ্ছা ভক্তশ্রেষ্ঠ তব।

মঙ্গল—না অমঙ্গল—তব ক্ষতি নাহি যায় বুঝা !
আমরা ভুলের শিশু,—স্থূল নিয়ে মোদের বিচার।
এই যে ভারতব্যাপী কোটি কণ্ঠে এক হাহাকার,—
মহাভবিষ্যের বীজ রোপিছে না এই বীরপূজা ?

* মহামতি গোখলের অন্তর্দ্ধানে।

অন্তরে অন্তরে এ যে নবশক্তি কোলাহল করে!
তব ত্যাগ—বজ্রসম পড়ে নাই কালের মাথায়?
দশের কল্যাণ-যজ্ঞে দশহস্তে নিজে চরু খায়,—
মর্ম্মে মর্ম্মে লজ্জা পেয়ে সেই স্বার্থ অশ্রু হ'য়ে ঝরে।

এ ভূমির প্রতি-অণু অন্তরের জীবন্ত প্রেরণা;
এ দেশ—সামান্য নয়—অভিশপ্ত নয় এই মাটি!—
এই ধূলা ধ'রে যদি থাকি মোরা, প্রাণপণে খাঁটি,
তুমি শিক্ষা দিলে,—মরু বহাইবে অমৃত-ঝরণা।

এ ভূমি সামান্য নয়!—কত সতী সাধুর এ ঠাঁই;
গাছ-পাথরেও হেথা ভগবান্ কথা কন্ এসে;
সাধে রাজা রাজ্য ছাড়ি বনে যায় ভিখারীর বেশে!—
যুগে যুগে আসে ত্রাতা, জীয়াইয়া রাখে এর ছাই।

মহারাষ্ট্র-ব্রহ্মচারী, ব্যাপ্ত তুমি নিখিল-আত্মায়;
কাছে থাকি ছিলে দূরে, দূরে গিয়ে এলে বড় কাছে।
প্রতিভার প্রতিষ্ঠার আছে মাত্রা—সীমা—শেষ আছে;
চরিত্রের মন্ত্রশক্তি জয় করে জগৎ হেলায়।

হে মহাপুরুষ! তব ছাই না ত—ও যে অগ্নিকণা!
সেই উত্তরাধিকার দেশময় পড়ে'ছে ছড়ায়ে;
একের শ্মশান মাঝে কি অমৃত চলে'ছে গড়ায়ে!
লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি জীবনের হয়ে'ছে সূচনা।

অকাল-মৃত্যুর তব হয় ত বা ছিল প্রয়োজন;
মরণ ও জীবনের এ সঙ্কটে, ঘোর সন্ধিস্থলে,
স্বর্গ হতে অন্ধকারে মুহুর্মুহু তব দীপ জ্বলে;—
জাতির সাধনা-তীর্থে করিতেছ পথ-প্রদর্শন।

ঢাল—ঢাল বরাভয় স্বর্গ হ'তে, হে স্থিরবিশ্বাসি!
ও পদাঙ্ক—পদধূলি শিরে শিরে, নির্ম্মাল্যের প্রায়;
তব অশরীরী বাণী গরজিছে কি যেন আশায়—
'মাভৈঃ মাভৈঃ' ভীমরবে—আশ্বাসিয়া এ ভারতবাসী!'

মৃত্যু-রহস্য

[শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, M.A., B.L., M.R.A.S.]

বকরূপী ধর্ম্ম, মহাপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কি ?' দিক্‌পালের ন্যায় তেজস্বী চারি ভ্রাতা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত—মহাবল ভীম স্পন্দহীন—মহাজ্ঞানী ফাল্গুনী চিরনিদ্রিত—সুকুমার নকুল বিবর্ণ—প্রিয়তম সহদেব ধূলিশয্যায় লীন। সংসারের চরম সত্য তখন যুধিষ্ঠিরের মন আলোড়িত করিল; রুদ্ধকণ্ঠে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥"

তাই প্রতীচ্যের মহাজ্ঞানী প্লেটো বলিয়াছেন—"Philosophy is mediation upon death." এই করুণ সঙ্গীতে জগতের কাব্যগঠিত!—এই সুখদুঃখময় জীবনের পরপারে মানবের গতি কি ?—এই প্রশ্নের রহস্য উদ্ঘাটনই দার্শনিকের যুক্তির চরম লক্ষ্য। যদি এই সংসার বাস্তবিকই রঙ্গমঞ্চ, যদি নরনারী ইহাতে অভিনেতা বা অভিনেত্রী, যদি আমরা রাজবেশে মন্ত্রিবেশে অথবা ভিখারীর বেশে পূর্ব্বায়ত্ত কবিতার আবৃত্তি করিতে মাত্র আসিয়া থাকি, যদি ইহার যবনিকার সঙ্গে জীবন-নাটকের পরিসমাপ্তি হয়, তবে জীবনের কঠোরতা অনেকটা কোমল হইয়া যায়, ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায়—দুঃখে কষ্টে কয়েকটা দৃশ্য অভিনয় করিয়া, আমরা শান্তির আশা করিতে পারি। বাস্তবিকই মৃত্যুর সঙ্গে মানবাত্মার পরিসমাপ্তি, চিতাবহ্নির ধূমের সহিত জীবনের লীলাসাঙ্গ হইলে, আমাদের দায়িত্ব অনেকটা লাঘব হইত। বুকটাকে হাল্‌কা করার জন্য যতই আমরা ভাবিতে চেষ্টা করি যে, মরণ হইলেই সব শেষ হইবে, বুকের এক কোণে কে যেন গুরুগম্ভীরস্বরে বলে—"জীবাত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যু জীবের রূপান্তর মাত্র; মানবের কর্ম্মবীজ, দেহের বিনাশ হইলেও, স্বীয় তেজ বিকাশ করে। দেহের মৃত্যু আছে; কিন্তু প্রাণের মৃত্যু নাই।" যে কবি তরলতানে গায়িলেন—

"Death is the end of life ; ah ; why
Should life all labour be ?
Let us alone. Time driveth onward fast,
And in a little while our lips are dumb.
Let us alone.—What is it that will last ?"

তিনিই আবার আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া বজ্রগম্ভীর ধ্বনিতে প্রচার করিলেন—

"No longer half-akin to brute,
For all we thought and loved and did,
And hoped, and suffer'd, is but seed
Of what in them is flower and fruit ;
Whereof the man, that with me trod
This planet, was a noble type,
Appearing ere the times were ripe,
That friend of mine who lives in God."

প্রাচ্যের কর্ম্মতত্ত্ব প্রতীচ্যের দার্শনিক কবি একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। জীবনটা হাসিয়া খেলিয়া কাহার কথায় কাটাই ?—অনেকে বলিবেন, কবির উক্তি গ্রাহ্য নহে—উহা মাদকতা-পূর্ণ, যুক্তির আগুনে উহা পরীক্ষিত নহে। বৈজ্ঞানিক মীমাংসা ব্যতীত, মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ইহা বিজ্ঞানের ইন্ধনে পরীক্ষা করা সম্ভব কি না ? জড়জগতের ঘটনার ন্যায়, মৃত্যু-রহস্য প্রমাণ অসম্ভব; কেননা, এ ঘটনা মানবের ভৌতিক জ্ঞানের বহির্ভূত—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইহার সত্যতা অনুভূত হইতে পারে না। জীবিত ব্যক্তি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা—মৃত্যুর পারে—জীবনের স্থায়িত্ব অনুভব করিতে অক্ষম। ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে, লোকের একবার মরিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু একবার অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া, যদি কেহ কায়া-পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আইসে, তাহার

পূর্ব্বজীবনের জ্ঞান বিস্মৃতিগর্ভে নিহিত থাকে;—মরিয়া ফিরিয়া আসিলেও এ বিষয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান কাহারও থাকে না। একটা দুর্ব্বোধ্য অভেদ্য প্রাচীরে জীবন ও মৃত্যু পরস্পর হইতে বিভক্ত। মহাজ্ঞানী, মহাদার্শনিক, মহাবৈজ্ঞানিক এই প্রাচীরের কঠিন ভিত্তি ভেদ করিতে পারেন না;—যুক্তিতর্ক, বিশ্বাসীর আর্ত্তনাদ, অবিশ্বাসীর দম্ভ, সন্দিগ্ধের বাচালতা, বাতাসে মিলিয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র জাতির হৃদয়ের অন্তর্নিহিত আস্তিক-বিশ্বাস (theistic faith) এই যে, মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের শেষ হয় না।—মৃত্যুর পর জীবন অবিকৃতভাবে থাকে। হিন্দুর পক্ষে এ বিশ্বাসের অনুকূলে নজির দেখান আবশ্যক। হিন্দুর পরম গ্রন্থ "ভগবদ্গীতা", ও হিন্দুর বিগলিত হৃদয়ের অত্যুচ্চ উক্তি "উপনিষদ্", ইহার স্বপক্ষে অজস্র প্রমাণ দিতেছে। পঞ্চভূতে পঞ্চপ্রাণ মিশিয়া গেলেও মানবের একেবারে বিনাশ হয় না—আদিম, মধ্য ও বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বদেশেই মানবজাতির প্রাণের এই এক অমোঘ ও একান্ত বিশ্বাস। ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট, পারস্য, গ্রীস্, রোম—সর্ব্বত্রই এই অগাধ বিশ্বাস চিরকাল মানবপ্রাণে খোদিত। য়িহুদি, মুসলমান, খৃষ্টান্, হিন্দু—সর্ব্বজাতিরই এই অকাট্য ধারণা। সমগ্র মানবহৃদয়ের আস্তিক-বিশ্বাসের প্রমাণ অগ্রাহ্য করা বিজ্ঞানসম্মত নহে। জড়-বিজ্ঞানও এই আস্তিক-বিশ্বাসের উপর নীরবে নির্ভর করিতেছে। কোন একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক লিখিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিক-সত্যও মানবের আস্তিক-বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত; আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া, আমরা স্বীকার্য্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত করি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সূর্য্য আগামী কল্য বাস্তবিকই না উদয় হয়, সে পর্য্যন্ত এই উক্তি একটি বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাধারণ বা বিজ্ঞানসম্মত, যে কোন বিশ্বাসই হউক না কেন, অন্ধকারে ঝম্পপ্রদান মাত্র। কারণ, যে সময়ে এই সত্য আমরা বিজ্ঞান-প্রতিপাদিত বলিয়া গ্রহণ করি, সে সময়ে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইহার প্রমাণ হয় না।" ভৌতিক দেহ বিনাশের সহিত এবং তৎপরে, জীবের অস্তিত্ব জীবিত ব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয়াবোধ্য বিচারবহির্ভূত; এবং ইহার (experimental verification) ইন্দ্রিয়গোচর প্রমাণ হওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু এ জ্ঞান কাহারও প্রত্যক্ষ নহে—কেবলমাত্র বিশ্বাসমূলক—এই বলিয়া ইহা উপেক্ষণীয় নহে। কেননা, আগামী কল্য সূর্য্য উদয় হইবে, কিংবা পরশ্ব সূর্য্যগ্রহণ হইবে, এগুলিও ত আজ প্রত্যক্ষ-দৃষ্টির অন্তর্গত নহে। আজ ত কেহ দেখিতে পাইতেছে না যে, সূর্য্য আগামী কল্য উঠিবে, কিংবা পরশ্ব সূর্য্যগ্রহণ হইবে। শেষোক্ত ঘটনাদ্বয় কেবলমাত্র যুক্তিগর্ভ বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত; কিন্তু বাস্তবতার দ্বারা আজ উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ব্যতীত সমস্ত তত্ত্ব ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করা, যুক্তির গণ্ডির বাহিরে। সীমাবদ্ধ মানবজ্ঞানের যুক্তিরও সীমা আছে। মহাকবি মিল্টন্ বলিয়াছিলেন—

"But knowledge is as food, and needs no less
Her temperance over appetite, to know
In measure what the mind may well contain,
Oppresses else with surfeit and soon turns
Wisdom to folly, as nourishment to wind."

আদমের প্রতি দেবদূতের এই সাবধান বাক্য, তাঁহার সন্তানসন্ততির পক্ষে অবনতমস্তকে পালনীয়।

মৃত্যুই যদি সুখদুঃখের শেষ করিয়া দিতে পারিত—অবিরত যে কর্ম্মজালে আমরা জড়ীভূত, উহার বন্ধন যদি জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত শেষ হইত—তাহা হইলে সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিতাহিত সমস্তই কাল্পনিক বিষয়মাত্র; তাহা হইলে নিজের সুখসম্পদ্ আয়ত্ত করিবার জন্য মানব যথেচ্ছাচারী হইলেও কোন ক্ষতি নাই। যে কোন প্রকারে হউক, ঐহিক উন্নতি ও বাসনার তৃপ্তিসাধন করিয়া, জীবনটা ভোগ করিয়া যাওয়াই ভাল। কিট্সের সহিত আমরাও একতানে গাহিতে পারিতাম—

"Give me women, wine and snuff—
Until I cry out 'hold enough'!
You may do so sans objection,
Till the day of resurrection;
For, bless my beard, they aye shall be
My beloved Trinity."

কোন কোন অতিসাহসী লেখক, পারত্রিক চিন্তা অসার ও কল্পনামূলক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, বলিয়াছেন যে,

ধর্ম্মাধর্ম্ম—নৈতিক নিয়মাবলী কেবল সমাজ-গঠনের জন্য একটা সামাজিক (contract) চুক্তিপত্রের উপরে গঠিত। কিন্তু কাহার প্রাণের বীণা এ যুক্তিতে শান্তি-রাগিণী বাজাইতে পারে? মৃত্যুর পরে, অজ্ঞাত-দেশের চিন্তা প্রত্যেক মানবকে ভাবুক করিয়া তুলে। পৃথিবীর চিন্তাশীল সমগ্রজাতি ও সমুদয় যুক্তিগর্ভ ধর্ম্ম, একবাক্যে পুনর্জন্মবাদ স্বীকার না করিলেও, মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্ব ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বিশপ বট্‌লার বলেন, 'দেহের ধ্বংসই মৃত্যুর অপর নাম; অতএব মৃত্যুর যথার্থ অর্থ এই যে—দেহ কতকগুলি পরমাণু দ্বারা গঠিত, মৃত্যু দ্বারা ঐ পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। "মানব" বলিতে এই পরমাণুর সমষ্টি বোঝা যায় না। জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত "দেহ", মানব দেহ হইতে স্বতন্ত্র; আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত জড়-পদার্থ রহিয়াছে, উহাদের যেমন আমরা "মানব" হইতে পৃথক্ মনে করি, সেইরূপ জড়পদার্থ-গঠিত "দেহ"—"জীব" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। "দেহ"—"আমার" অংশের কণামাত্রও নহে। "আমি"—দেহসংশ্লিষ্ট না হইয়াও বাস করিতে পারি এবং দেহান্তের পরে অন্য ভৌতিক দেহকে অনুপ্রাণিত করিতে পারি। এক একটি ভৌতিক দেহের বিনাশের পর, নব নব ভৌতিক দেহ সঞ্জীবিত করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে;

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি—
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
> ন্যনানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

আমাদের দেহের বহির্ভূত জড়পদার্থ বিনাশে যেমন আমাদের জীবাত্মার কোন ক্ষতি নাই, সেইরূপ জীবাত্মার আধার দেহ-ধ্বংসেই বা তাহার ক্ষতি কি? এইরূপ যুক্তির দ্বারা নব নব দেহে আত্মার লীলা অনুভব সহজসাধ্য। "বর্ণের" বিকাশ চক্ষুর সাহায্যে হয় এবং "শব্দের" বিকাশ কর্ণের সাহায্যে হয়; কিন্তু তাই বলিয়া চক্ষু অন্ধ হইলে, বা কর্ণ বধির হইলে, "বর্ণের" কিংবা "শব্দের" বিনাশ হয় না। এইরূপ, দার্শনিক হিসাবে, মৃত্যুর পরে আত্মার অবিনশ্বরত্ব কল্পনা করা যায়। কিন্তু কল্পনা আর হৃদয়ের অনুভূতি,—দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। যুক্তিমূলক অজ্ঞেয় ভাব হৃদয়ের পিপাসা মিটাইতে পারে না। জল কি উপাদানে গঠিত—উহার শক্তি কি—উহার আকার কি—উহার ক্রিয়া কি—এ সমস্ত তর্কদ্বারা জলপানের শান্তি পাওয়া যায় না, প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না। বুকে হাত দিলে যেটি ধরিতে পারি, সেই যুক্তিই, সেই বিশ্বাসই, সমগ্র বিজ্ঞানের—সমগ্র দর্শনের যুক্তির শীর্ষে।

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক—মহামতি কার্লাইল বলিয়াছেন—যথার্থ ইষ্টক-ভিত্তিতে গৃহনির্ম্মিত না হইলে, গৃহটি পড়িয়া যায়। আর যে বিশ্বাসের উপর লক্ষ লক্ষ প্রাণী নির্ভর করিয়া আছে, সে বিশ্বাস কি কখন মিথ্যা হইতে পারে? বিশপ বট্‌লারের উক্তি এবং ভগবদ্গীতার সত্য, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।—এই বিশ্বাসের একতা দেখিয়া, ইহার সত্যগর্ভতা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হয়।

জীবের কর্ম্মফল-ভোগ হিন্দুর অতিরঞ্জিত কল্পনামাত্র নহে। হিন্দুর কল্পনা গভীর ও গম্ভীর, অটল ও সনাতন, অকাট্য ও সুবোধ্য সত্যের উপরে নিহিত। বিধাতার ইচ্ছার উপরেও কর্ম্মের দুর্জ্জয় শক্তি নিহিত হইয়াছে। অনাসক্ত কর্ম্ম ব্যতীত কর্ম্মফল রোধ অসম্ভব। বর্ত্তমান দেহে, কিংবা দেহান্তে, স্বীয়কৃত কর্ম্মফল অনিবার্য্য ও তাহার ভোগের জন্য জীবাত্মার পুনরাগমন অবশ্যম্ভাবী। তাই গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

> "যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
> জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥
> ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
> কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥"

ম্যাক্‌বেথ স্বীয় রাজা, প্রভু ও প্রতিপালক ডন্‌কানের নৃশংস হত্যার জন্য প্রস্তত; কিন্তু এই দুরন্ত কর্ম্মের দুষ্টফল সেই মুহূর্ত্তেই যেন সে হাতে হাতে পাইতেছে—যেন সম্মুখে ভীষণদর্শন রুধিরলোলুপ তীক্ষ্ণধার তরবারি তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে; কঠিনহৃদয় ম্যাক্‌বেথের হৃদয় ফাটিয়া দুরন্ত কর্ম্মফল স্বীয় শক্তির প্রচার করিয়া উঠিল:—

> "If the assassination
> Could trammel up the consequence and catch
> With his surcease success: but this blow

Might be the be-all and end-all here,
But here, upon this bank and shoal of time
We'd jump the life to come. But in these cases
We still have judgment here ; that we may but teach
Bloody instructions, which being taught, return
To plague the inventor. This even-handed Justice
Commneds the ingredients of our poisoned chalice
To our own lips".

জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব ও কর্ম্মফলের দুর্জ্জয়ত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস এতদপেক্ষা কি বিশদ ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে ?

"অশরীরং শরীরেষনবস্থেষবস্থিতম্ ।
মহান্তং বিভুমাত্মানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ।"
—কঠোপনিষৎ ।

—দেহশূন্য আত্মা পরিবর্ত্তনশীল দেহে বিরাজ করেন। তিনি মহৎ, এই জ্ঞানে ধীর ব্যক্তি শোকাদি-বর্জ্জিত। গীতা ও উপনিষৎ উভয়ে একবাক্যে বলেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

—আত্মার জন্ম কিংবা মৃত্যু নাই। ইহা কোন জড় দ্রব্য হইতে সৃষ্ট নহে, কিংবা অপর কোন জড় পদার্থ ইহা হইতে উদ্ভূত নহে। আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত এবং শাশ্বত। দেহের বিনাশের সহিত আত্মার বিনাশ হয় না। দেহের বিনাশ আছে; আত্মা অজর, অমর ও চিরন্তন—ইহা আস্তিক-বিশ্বাসী প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণের তারে তারে চিরশব্দায়মান।

"অন্তবন্ত ইমেদেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।"

—ব্যথিত প্রেমিক কি আশায় বুক বাঁধিয়া অপ্রাপ্য হৃদয়ের রাণীকে ধ্যান করে? যদি দেহের সঙ্গে সব লয়, তবে কি সাহসে এই তীব্র জ্বালা মানুষ সহ্য করিতে পারে? দেবহস্ত তাহাকে উর্দ্ধে চাইতে বলে,এই জীবনের শেষ নহে—বিশুদ্ধ প্রেমের পরিসমাপ্তি এখানে নহে। কবিসম্রাট্ বঙ্কিম-চন্দ্র কি উজ্জ্বল—কি মহান্ ভাবে এই মৃত্যুরহস্য প্রতাপ-শৈবলিনীর চরিত্রে বিশ্লেষণ করিয়াছেন! শৈবলিনীকে প্রতাপ জীবনমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মবিজয়ী মহাপুরুষ শৈবলিনীর চাঞ্চল্য উপেক্ষা করিয়া, কেবল দেহান্তে চিরমিলনের জন্য বুক বাঁধিয়াছিলেন। যদি একটা জড়ময় দেহই জীবনের প্রতিশব্দ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তবে এ বৃশ্চিক-দংশন প্রতাপ কেন সহ্য করিলেন? কেন স্রোতে গা ভাসাইয়া জীবনের ক্ষণিক সুখ ভোগ না করিলেন? ইহার একমাত্র উত্তর—জীবনটা খেলার সামগ্রী নহে। প্রতি কর্ম্ম রক্তবীজের ন্যায় আমাদের সম্মুখে বদন-ব্যাদান করিয়া আছে; জীবনটাও তুচ্ছ ভাবে দেখার জিনিস নয়। যদি সম্মুখে অনন্ত সুখ, অনন্ত আরাম, চিরমিলন হৃদয়পটে সুচিত্রিত দেখি, তবে ক্ষণস্থায়ী মরীচিকার জন্য কেন ছুটিয়া বেড়াইব! আমাদের প্রাণ বলে—"তৃষ্ণা ভাল মরীচিকা চেয়ে"। যখন শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে ও-রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়া দিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, কেন আবার তাহা উদ্দীপ্ত করিয়া দিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম, ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম, ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমার রূপ ধ্যান করিয়া, গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি। নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

"শুনিয়া প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি

বৃশ্চিক-দংশনে পীড়িত হইয়া সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।"

জিজ্ঞাসা করি—কেন? প্রতাপ কি শৈবলিনীকে ভালবাসিতেন না? মহাপুরুষ প্রতাপ শৈবলিনীকে যেরূপ সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা দিয়া নিজের সর্ব্বস্ব নাশ করিয়াছিলেন, রমণী শৈবলিনী তাহার এক কণা ভালবাসা দিতে পারে, তাহার সাধ্য কি? তাহার হৃদয়ের বিস্তৃতি কতটুকু? আর প্রতাপ—প্রেমের সাগর। জীবনের প্রারম্ভেই ত দেখিয়াছি, সন্তরণ দিতে দিতে প্রতাপ বলিল—"শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে।" শৈবলিনী বলিল, "আর কেন—এইখানেই।" প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল—কেন মরি? প্রতাপ আমার কে? তবুও আজ প্রতাপ উপযাচিত প্রেম উপেক্ষা করিয়া, বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় কেন বেগে পলায়ন করিলেন!—মহাজ্ঞানী প্রতাপ জানিতেন, দেহ ও প্রাণ স্বতন্ত্র; দেহের সুখই জীবনের লক্ষ্য নহে—অনন্তজীবন মৃত্যুর পরে আহ্বান করিতেছে—তুচ্ছ ক্ষণিক সুখের জন্য সেই অসীম অনন্ত প্রণয় বিসর্জ্জন দিব? তাই প্রতাপ আশায় বুক বাঁধিলেন; কিন্তু শৈবলিনীর প্রেম তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত ছিল। আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতাপকে সংযম শিক্ষা দিল। তারপরে, কি সাহসে প্রতাপ মরিতে প্রস্তুত হইলেন? যদি দেহান্তে শৈবলিনীর প্রেম ছায়াবাজির মত লুক্কায়িত হইত, তাহা হইলে কি প্রতাপ মরিতে পারিতেন? কেন প্রতাপ মরিতে গেলেন, তাঁহার নিজের মুখেই শুনুন; "ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রামানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন—'শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড জয়, তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?' সুপ্তসিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ বলিষ্ঠ চঞ্চল উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল—'কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে—শোণিতে শোণিতে—অস্থিতে অস্থিতে আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখনও মানুষ তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না। এই মৃত্যুকালে আপনি ও কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে। কি জানি, শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম'।"

আর মানব-প্রাণের অনন্ত বিশ্বাস আত্মার অমরত্ব অতুলনীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—

"তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও।"

টেনিসন্, স্বীয় প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগে শোকে মুহ্যমান হইয়া, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ করুণ কাব্য "In Memorium" লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম পর্য্যায়ে শোকের উচ্ছ্বাস—যেন বুক ফাটিয়া গেল—যেন ধৈর্য্য-গণ্ডি অতিক্রম করিয়া প্রবল শোকবন্যা সব ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু বিশ্বপ্রেমী মহাকবি দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আশার সুমোহন দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তৃতীয় পর্য্যায়ে মৃত্যুর নির্দ্দয়তা ভুলিয়া গিয়া, শান্তিরসে হৃদয় পূত হইল। চতুর্থ পর্য্যায়ে মহামহীয়ান্ ভাবের গরিমাময় অভিব্যক্তি। এ সঙ্গীতের সুর বিষাদ নহে, কেবল মাত্র আশা নহে, শুধু শান্তিও নহে। মৃত্যুতে আজ চিরানন্দ। টেনিসন্ হৃদয়পটে দেখিলেন, প্রাণপ্রিয়তর সুহৃদ্ তাঁহার আরও নিকটে আছেন। দেহে যখন সেই প্রিয়তম সখা আবদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থিতি একস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন দেখিলেন, সেই প্রাণোন্মাদকর রূপ সর্ব্বত্রই বিরাজমান। এখন তিনি সেই সর্ব্বোচ্চ রাজ্যে বাস করিতেছেন, যেখানে কেবল মাত্র প্রেমের অবিরাম বিমল ক্রীড়া—যেখানে অক্ষয় অনন্ত প্রণয়। তাই, বিষাদসুরে যে বীণার তার প্রথমে টেনিসন্ বাঁধিয়াছিলেন, উহার শেষ দৃশ্যে পরিণয়-সঙ্গীতের মোহিনী রাগিণী বাজিয়া উঠিল! যেন মৃত্যুকে একটা কল্পনা মাত্র মনে করিয়া, বঙ্গের কবীন্দ্রের সহিত সুর মিলাইয়া, টেনিসন্ গায়িলেন—

"তুমি মৃত্যু—আমি মৃত্যু—মৃত্যু সকলেই,
হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে।"

বিষণ্ণ জননি! মৃত্যু কোথায়? শোকাবেগ ক্ষান্ত কর। ঊর্দ্ধপানে নয়ন মেলিয়া দেখ—তোমার সন্তানের বিনাশ হয় নাই। হে ধ্বংস! তোমায় আমি আহ্বান করি। যতই হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেখিতেছি, ততই যেন সংসারের দৃশ্য মলিন বোধ হইতেছে। প্রেমবিহীনা চতুরা রমণীর কুটিল দৃষ্টির ন্যায় ইহার কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিতেছি। এই ভাবে বিভোর হইয়া আরাধ্য কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখিয়াছিলেন, "শ্যামল শস্যক্ষেত্র, কল্লোলিনী তরঙ্গিণী, প্রকৃতির মনোমোহন রূপরাজি আর ভাল লাগে না; যেন সংসারের মাধুর্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। যেন একটা মোহ কাটিয়া গিয়াছে।" আমাদের জন্ম একটা স্বপ্নমাত্র, একটি গভীর বিস্মৃতি। যে জীবাত্মা আমাদের সঙ্গে এই স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছেন, তাঁহার বাসস্থান অন্য কোন মধুর দেশে। জন্মের সময় আমাদের চতুর্দ্দিকে বিমল স্বর্গ, কিন্তু তাহার পরেই আমরা দেহকারাগারে বন্দী। তাই, সেই চিরানন্দময় গৃহে ফিরিয়া যাইতে প্রেমিক মাত্রেই ব্যগ্র—

"Hence in a season of calm weather,
Though in land far we be,
Our souls have sight of that imomortal sea
Which brought us hither,
Can in a moment travel thither,
And see the children sport upon the shore,
And hear the mighty waters rolling
ever more."

মৃত্যুর বিভীষিকা কোথায়? ইহার রহস্যই বা কোথায়? মৃত্যু আমাদের পরম বন্ধু। স্যর টমাস মোর যথার্থই বলিয়াছেন—"মৃত্যু নিদ্রার সহোদর।" ক্লান্ত-দেহ সংসারের দুর্ব্বহ ভারবহনে অক্ষম; বিকলঅঙ্গ কার্য্যকরণে অপারগ; তখন আত্মার দেহান্তর-গ্রহণে শোকের কারণ কি? আর, যদি কর্ম্মফলের শেষই হইয়া থাকে, যদি সে শুভদিন আসিয়াই থাকে, তবে সেই স্নেহময় পিতার ক্রোড়ে লীন হওয়ার একমাত্র পন্থা—"মৃত্যু"। দেহের বিনাশ না হইলে চিদানন্দসম্মেলন অসম্ভব—

"যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে
লোলুপ নিয়ত মম মন মধুকরে,
যে নিত্য-উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত
হে মৃত্যু! তাহার তুমি শরণি—নিশ্চিত।"

স্বাগত

[শ্রীহেমনলিনী দেবী]

মধু-ঋতু শেষ, উদয় মাধব, তাহারি রচিত পথে,
বিবশা ধরণী করে মাথা নত, হেরি সে সোণার রথে।
আনন্দে সভয়ে কামিনী ছড়ায় আঁচলের ফুলগুলি,
বিবশা মালতী, হেসে উঠে শুধু মল্লিকা লাজ ভুলি!

চম্পক নহে কম্পিত কভু প্রভুরে হেরিয়া তার,
সুপীত উত্তরী বাঁধিয়া অঙ্গে সাজায় পূজার ভার।
কবরীর বন নিশি-জাগরণ করিয়া গেঁথেছে মালা,
বিমল সলিল মলিন হাসিয়া ধরিল কমল-ডালা।

সলাজে জাগিছে মধুময়ী বধূ মাধবীলতার কুঞ্জে;
বিভোল মধুপ কাণ পাতি শোনে—কোথায় নূপুর গুঞ্জে!

বাতাসে বাজিছে স্বর্ণ-বীণায় তাঁরি আগমনী-গান;
অনুকারী তায়, পঞ্চম স্বরে কোকিল তুলেছে তান!

স্বাগত মাধব, অমল প্রভাতে অর্চ্চিত দেবরূপ!
দাঁড়াও উদয়-শিখরে তপন, নবীন-বর্ষ' ভূপ!
পুরনারীগণ বাজায় শঙ্খ, ব্রাহ্মণ আনে জল;
তোমার ভোগের থালি ভরা আজ তোমারি সুশীত ফল!

বসন্তের রাতি মদিরার গীতি হয়ে গেছে অবসান;
তোমার পুণ্য প্রভাত গায়িছে গম্ভীর সাম-গান।
পিতৃলোকের বিষুব-আশীষে চিত্ত রয়েছে ভরি—
এস ভাবুকের হৃদয়রঞ্জন! এস হে ভক্তের হরি!

বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, B. A., প্রত্নতত্ত্ববাগীশ]

"Nalanda belonged to the age of artistic cultivation, and skill ; of a gorgeous and luxurious style of architecture ; of deep philosophical knowledge ; of profound and learned discussions ; and of rapid progress in the path of civilisation."—BRODLEY'S ANTIQUITIES OF BIHAR.

যতই দিন যাইতেছে, ততই ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে যাইতেছে। অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন দুরধিগম্য গহ্বর হইতে সেই সকল কীর্ত্তি উদ্ধার করা ত দূরের কথা—তমসাচ্ছন্ন সেই সকল কীর্ত্তির ইতিহাসও বিলুপ্ত হইতেছে। শ্মশানক্ষেত্রের ভস্মস্তূপের ন্যায়, অতীত গৌরবগাথার ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র রহিয়া যাইতেছে।

বিহার প্রদেশ আবহমানকাল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল, ইংরাজ—সকল রাজত্বের সকল কালেই বিহার তাহার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। জরাসন্ধ, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত,—বিহার সকলেরই লীলাক্ষেত্র ছিল। পাঠান রাজত্বকালে ও মোগলশাসনাধীনেও বিহারের প্রাধান্য সম্পূর্ণ খর্ব্ব হয় নাই। ইংরাজ-আমলে যেটুকু লুপ্ত হইয়াছিল, অশোকের বিশ্ববিশ্রুত রাজধানীতে আবার রাজধানী স্থাপিত হওয়াতে, সেই হৃতসৌন্দর্য্য পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতেছে। বিহারের প্রতিপল্লীতে - প্রতিক্ষেত্রে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু না কিছু নিদর্শন রহিয়াছে।

বিহার শুধু ইতিহাসের সহিত যে জড়িত, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তথাগত বুদ্ধের ও মহাবীরের লীলাস্থান বলিয়াও বিহার যথেষ্ট গৌরবানুভব করিতে পারে। আর বিহার গৌরবানুভব করিতে পারে—প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মস্থান বলিয়া। যে বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যালয়ের কথা শুনিয়া দিগ্‌দিগন্ত হইতে পাঠার্থীরা তাহার প্রবেশদ্বারে সমাগত হইত, যে বিদ্যালয়ের সিংহদ্বারের রক্ষীরই সহিত তর্কে মহামহা পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়া প্রবেশাধিকারলাভ না করিয়া, ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, সহস্র সহস্র পাঠার্থী—ভারতবর্ষের প্রান্ত-সামান্ত স্থানের কথা দূরে থাকুক—সুদূর চীন, জাপান, কোরীয়া হইতে সমাগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতেন, এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রদেশে অবস্থিত, সে প্রদেশ অবশ্যই গৌরবানুভব করিতে পারে। আমরা আজ এই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাইব।

স্থানের বর্ণনা

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনা জিলার বিহার নামক মহকুমায় রাজগৃহ হইতে উত্তরে সাত মাইল দূরবর্ত্তী বড়গাঁ নামে একটি গ্রাম আছে। ই. আই. রেলওয়ের বক্তিয়ারপুর ষ্টেসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া, "বিহার-বক্তিয়ারপুর" লাইনে বড়গাঁনামক যে রেলষ্টেসন আছে, ঐ ষ্টেসনেই অবতরণ করিলে, প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তথায় পৌছান যায়। ষ্টেসন হইতেই ধ্বংসাবশেষের চিহ্নগুলি দৃষ্ট হয়। ষ্টেসন হইতে সেগুলি প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী। ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত অনেকগুলি প্রাচীন পুষ্করিণীও সেইস্থানে বর্ত্তমান। বড়গাঁ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বহুপ্রকার মূর্ত্তি দেখা যায়। প্রায় প্রতি গৃহেই বৌদ্ধযুগের কোন না কোন প্রকার মূর্ত্তি—কোনটি অটুট কোনটি বা ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। নালন্দা-খনন করিলে যে, প্রচুর পরিমাণে দর্শনীয় দ্রব্য পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। আমরা যে সময়ে নালন্দা-পরিদর্শনে গমন করি, তাহার কয়েকদিবস পূর্ব্বে তত্রত্য জনৈক কৃষক স্বীয় ভূমি খননকালে ১৩।১০ (১৩ফীট ১০

ইঞ্চি) দীর্ঘ ও দুই ফুট অপেক্ষা অধিক প্রস্থ, প্রস্তরনির্ম্মিত একটি সুন্দর রেলিং প্রাপ্ত হয়। অন্য একজন গ্রামবাসী একটি অক্ষুণ্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, এখানকার সরকারী উকীল লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও দার্শনিক রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ মহাশয়কে উপহার প্রদান করিয়াছে। মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর। পাটলিপুত্র-খননেও এরূপ রেলিং বা মূর্ত্তি গত দুই বৎসরে আবিষ্কৃত হয় নাই। নালন্দা খনন করিলে যে, যাদুঘরে রক্ষণোপযোগী অনেক সুন্দর সুন্দর দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

নালন্দার উল্লেখ

'দীঘ নায়ক' * নামক সুপ্রাচীন গ্রন্থে রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী নালন্দা-নামক গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানেই জনৈক গৃহস্থ বুদ্ধদেবকে তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে ভৌতিক ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। তখন নালন্দা বহুজনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিশালী, বৌদ্ধবহুল গ্রাম ছিল। আম্রলতিকা নামক একটি বিশ্রামগৃহেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তথাগত নালন্দা-সন্নিকটস্থ এই বিশ্রামগৃহেই এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

তিব্বতীয় কিংবদন্তীতেও নালন্দার উল্লেখ পাওয়া যায়। নাগার্জ্জুনের † সামসময়িক সুবিষ্ণু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, নালন্দায় এক শত আটটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া কথিত আছে। তিব্বতীয় অন্য একটি কিংবদন্তীতে আমরা অবগত হই যে, নাগার্জ্জুন নালন্দায় অধ্যয়নার্থ শুভাগমন করিয়াছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের অন্যতম পর্য্যাটক‡ ফা-হিয়ানের গ্রন্থে নালন্দার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁহার পর্য্যটন-কাহিনীর ২৮ অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, 'নাল'নামক গ্রামে সারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ফা-হিয়ানের অন্যতম অনুবাদক লেগী, এই নালগ্রামকেই নালন্দা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; এবং আমরাও তাঁহার মতাবলম্বন করিয়া নাল-গ্রামকেই নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা নাল গ্রামকে নালন্দা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। ফা-হিয়ানের অন্যতম অনুবাদক বীল, ফাহিয়ান-লিখিত নালকে হিউয়েন-সিয়াং-লিখিত 'কাল-পিনক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও চৈনিক ভাষায় সুপণ্ডিত, হিউয়েন-সিয়াংয়ের অন্যতম টীকাকার, ওয়াটার্স'ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, ফা-হিয়ান যখন এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন নালন্দার বিশ্ব-বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই;—হইলে ফা-হিয়ান নিশ্চয়ই নালন্দার অধিকতর পরিস্ফুট বর্ণনা করিতেন।

হিউয়েন-সিয়াংই নালন্দার সঙ্ঘ, বিদ্যালয়, শিক্ষক, ছাত্র—সকল বিষয়েরই বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের বিস্তৃতিভয়ে আমরা সেসকল বিষয় এই স্থানে উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করিলাম না।

হিউয়েনসিয়াংয়ের বর্ণনার সহিত তৎপরবর্ত্তী পর্য্যাটক ইৎসিংয়ের বর্ণনা যোজিত করিলে নালন্দা সম্পর্কীয় সকল বিষয়ই জানিতে পারা যায়। ইৎসিং নালন্দার শিক্ষণীয় বিষয়, যতিগণের ব্যবহার, বৌদ্ধধর্ম্মের তৎকালীন অবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ই যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন।

নিম্নোদ্ধৃত চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণের সহিতও নালন্দার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

১। শ্রমণ হিইয়েন-চিউ সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দায় আগমন করেন। ইনি ভারতবর্ষে প্রকাশমতি নাম গ্রহণ করিয়া, সুপরিচিত হইয়া ছিলেন। প্রকাশমতি তিন বৎসরকাল নালন্দায় অতিবাহিত করিয়া অধ্যয়নাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

২। টাও-হি নামক অন্যতম চৈনিক যতি নালন্দায় আসিয়া শ্রীদেব নাম গ্রহণ করিয়া মহাযান-সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

৩। কোরীয়াবাসী আর্য্যভট্ট নামক পরিব্রাজক নালন্দায় কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া বহু সূত্র নকল করিয়াছিলেন।

৪। অন্যতম কোরীয়াবাসী হুই-নিচ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দায় উপনীত হইয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ছিলেন।

* ডাঃ রীস ডাভিড্‌সের মতে এই গ্রন্থ পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়।

† নাগার্জ্জুন সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

‡ "সমসাময়িক ভারত,"—দ্বিতীয় কল্প, প্রথম খণ্ড—দ্রষ্টব্য।

৫। ইৎসিং নালন্দায় বুদ্ধধর্ম্ম নামক এক চৈনিক পর্য্যাটকের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন।

৬। টাও-ফাং নামক যতি চন্দ্রদেব নাম ধারণ করিয়া কয়েক বৎসর নালন্দায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৭। মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত টাং নামে এক জন পরিব্রাজক নালন্দায় আগমন করিয়াছিলেন।

৮। কোরীয়াদেশীয় হুই-লাং নামক যতি নালন্দা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি প্রাজ্ঞবর্ম্মা নামেই সাতিশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমরা সেই বৃত্তান্তের সারাংশ প্রদান করিব।

৯। শীলপ্রভ নামক যতি নালন্দায় বাস করিয়া কোষ-শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১০। হিউয়েন টাটা নামক পরিব্রাজকও নালন্দা ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি নালন্দায় দশ বৎসর অতিবাহিত করেন।

১১। প্রাজ্ঞদেব নামক শ্রমণ, নালন্দায় কয়েক বৎসর বাস করিয়া, কোষ, যোগ এবং অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

যে সকল চৈনিক পরিব্রাজক নালন্দায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়াই তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং নালন্দার দর্শনীয় বিষয়াদি লিপিবদ্ধও করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অনেক ইংরাজ লেখকও নালন্দার বৃত্তান্তে আকৃষ্ট হইয়া, উহা দর্শন করিয়া, চিত্তাকর্ষক বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে সুবিখ্যাত পর্য্যাটক মার্টিনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্টিন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি যে সকল মূর্ত্তির আলেখ্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সকলগুলি এক্ষণে দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম তাঁহার রিপোর্ট সমূহে নালন্দার বিস্তৃত বর্ণনা এবং দর্শনীয় স্থান ও দ্রব্যগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। বিহার মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ এ. এম্. ব্রডলী বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর মুখপত্রে ও "নালন্দার ভগ্নাবশেষ" নামক সুলিখিত প্রবন্ধে নালন্দার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা করিয়াছেন।

নালন্দার নাম

কোথা হইতে এবং কি প্রকারে নালন্দা নাম আসিল, এই সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। পর্য্যাটক-প্রবর হিউয়েন-সিয়াং লিখিয়াছেন যে, প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে এই সঙ্ঘারামের দক্ষিণস্থ আম্রকুঞ্জের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীস্থ সর্প নালন্দা নামে অভিহিত এবং তজ্জন্যই গ্রামটিরও নাম নালন্দা হয়। হিউয়েন-সিয়াং এই কিংবদন্তীতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন যে, পুরাকালে তথাগত এই স্থানে বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন। জীব-জন্তুদের দুঃখক্লেশ নিবারণের জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন এবং কৃতকার্য্য হইলে প্রভূত আনন্দানুভব করিতেন। এই গুণের জন্য তিনি—'না—অলম্—দ' (Charity without intermission) নামে কথিত হইয়াছিলেন এবং এই নামানুকরণ করিয়াই পরে রাজধানী নালন্দা নাম ধারণ করিয়াছিল।

অন্যতম পর্য্যাটক ইৎ-সিং কিন্তু বলিয়াছেন যে, নাগানন্দ হইতেই ইহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। অন্য একজন চৈনিক পর্য্যাটক বলিয়াছেন যে, নন্দনাগ হইতেই বিহারকে শ্রীনালন্দ বিহার বলা হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বলিয়াছেন যে, সঙ্ঘারামের দক্ষিণস্থ পুষ্করিণীতে নালন্দ নামক নাগ বাস করিত বলিয়াই, ঐ নাগের নামানুসারে নালন্দা নাম হইয়াছে। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি এই স্থানে যে দুইখানি প্রাচীন শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার উভয় খানিতেই নালন্দা নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

নালন্দার সঙ্ঘারামের নির্ম্মাণের সময়

হিউয়েন-সিয়াং লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেই শক্রাদিত্য নামক এতদ্দেশীয় এক রাজা এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। তাঁহার পুত্র রাজা, বলাদিত্য, পিতার আরব্ধ কার্য্য শেষ করেন এবং পূর্ব্বতন সঙ্ঘারামের দক্ষিণে অন্য একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। রাজা তথাগত গুপ্ত দ্বিতীয় সঙ্ঘারামের পূর্ব্ব-দিকে অন্য একটি সংঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। বলাদিত্য রাজ-নামক নরপতি চতুর্থ ও তৎপুত্র বজ্ররাজ পঞ্চম সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন।

তৎপরে, বিভিন্নবংশীয় অন্য এক রাজা একটি সুবৃহৎ

সঙ্ঘারাম ও তৎসঙ্গে এই সকল সঙ্ঘারাম বেষ্টন করিয়া এক উচ্চ বেষ্টনী নির্ম্মাণ করেন। এই বেষ্টনীতে একটিমাত্র সুবৃহৎ দ্বার ছিল। সম্ভবতঃ, হিউয়েনসিয়াং এই দ্বারের কথাই নিজগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যদেশীয় কেহ বেষ্টনী-মধ্যস্থ সঙ্ঘারামাদিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, দ্বারবানের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত। পর্য্যটকপ্রবর লিখিয়াছেন যে, দশজনের মধ্যে সাত-আটজন প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হওয়ায় অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করিত না।

পূর্ব্বোক্ত কোরীয়াবাসী পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, রাজ-ভোজ নামক উত্তরদেশীয় একজন ভিক্ষুর জন্য শ্রীশক্রাদিত্য নামক এক বৃদ্ধ রাজা নালন্দার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শক্রাদিত্য মন্দির-নির্ম্মাণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ মন্দিরনির্ম্মাণ শেষ করেন এবং সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রাপ্য মূল্যবান্ দ্রব্য সকল দ্বারা মন্দির সুশোভিত করিয়াছিলেন। কেবল এই মন্দিরেই সম্রাটের আদেশানুযায়ী জল-ঘড়ী রাখা হইত।

মন্দির-নির্ম্মাণের কাল সম্বন্ধে কানিংহাম বলিয়াছেন যে, ফা-হিয়ান নালন্দার মন্দির সম্বন্ধে যখন কিছুই উল্লেখ করেন নাই, তখন ইহা প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে নালন্দা প্রসিদ্ধি-লাভ করে নাই। সুতরাং, নিশ্চয়ই ইহা ৪১০ খৃষ্টাব্দের পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখন তিনশত ফীট উচ্চ, সর্ব্ব শোভার আধার মন্দির থাকিলে, তাহা নিশ্চয়ই ফা-হিয়ানের বর্ণনায় স্থান পাইত। সুতরাং ফা-হিয়ান ও হিউয়েন-সিয়াংয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়েই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল; অর্থাৎ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ৪২৫ হইতে ৬২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নালন্দার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিউয়েন-সিয়াং আরও বলিয়াছেন যে, বলাদিত্য-নির্ম্মিত মন্দির বুদ্ধগয়ার পিপুল বৃক্ষ-সন্নিকটস্থ মন্দিরের সদৃশ। শেষোক্ত মন্দির যে শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ মন্দিরও সেই শতাব্দীতেই নির্ম্মিত। সে হিসাবে ৪৫০ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে নালন্দার মন্দিরাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার বলা যাইতে পারে।

বুদ্ধগয়ার মন্দির

উত্তর হইতে দক্ষিণদিকব্যাপী যে কতক-গুলি মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গুলিই যে নালন্দার মন্দির ছিল, তাহা সম্ভবপর মনে করা যাইতে পারে এবং ষোড়শ শত ফীট দীর্ঘ ও চারিশত ফীট প্রস্থ যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, উহাই খুব সম্ভব প্রাচীন নালন্দা-সঙ্ঘারাম।

তৎকালীন শিক্ষা

চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত গ্রন্থাদিতে আমরা তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই। সুতরাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি বিষয় অধীত হইত,
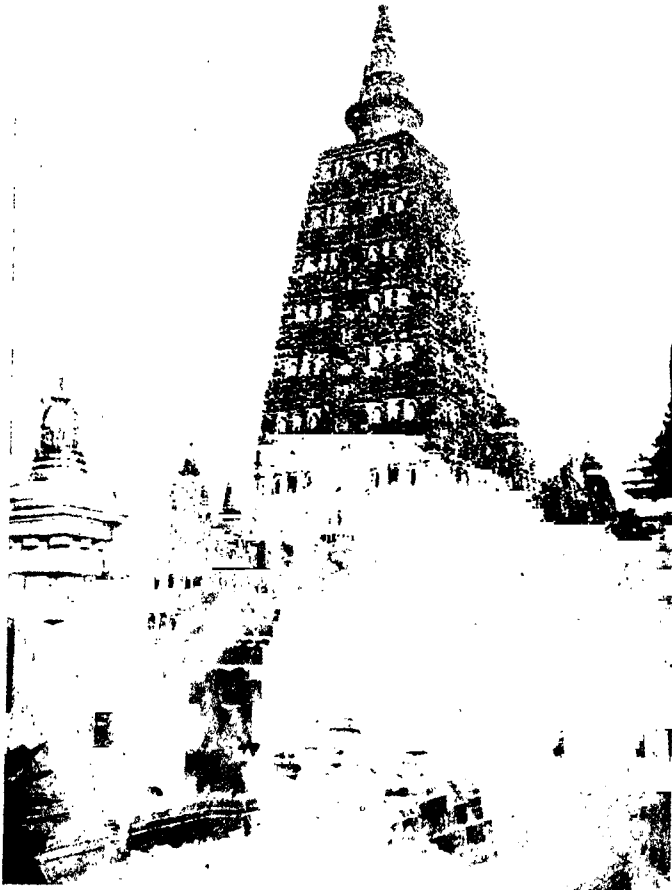
সে সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। আমরা যৎসামান্য আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে নালন্দার দর্শনীয় বিষয়গুলি বর্ণনা করিব।

সর্ব্বপ্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হইত। তৎপরে—

(১) প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য সিদ্ধ (২) সূত্র

(৩) ধাতুসম্পর্কীয় পুস্তক

(৪) অষ্টধাতুসংক্রান্ত পুস্তক

(৫) বৃত্তিসূত্র।

বৃত্তিসূত্র অধ্যয়ন হইলে গদ্য ও পদ্য পাঠারম্ভ হইত। তৎপরে ন্যায় (হেতুবিদ্যা) ও অভীধর্ম্ম-কোষ শিক্ষা প্রদান করা হইত। পরে জাতকমালা শিক্ষা দান হইত। এই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ সম্পন্ন হইলে, শিক্ষার্থিগণ নালন্দায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতেন। নালন্দায় বিদ্যা সমাপ্ত হইলে রাজসকাশে উপনীত হইয়া বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত, যতিগণকে বিনয় শিক্ষা করিতে হইত।

নালন্দায় কয়েক সহস্র বিদ্যার্থী ও যতি বাস করিতেন। হিউয়েন-সিয়াং বলিয়াছেন যে, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল শিক্ষকগণের বাদানুবাদে বিচারস্থল মুখরিত হইত। বিভিন্ন প্রদেশে হইতে সমাগত পণ্ডিতগণ এই স্থানে সমবেত হইতেন, এবং অনিসন্ধিৎসুগণ এইস্থানেই সকল সন্দেহ অপনোদন করিতে সমর্থ হইতেন।

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়েই ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, এবং শীলভদ্র প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতগণ অধ্যাপনা করিতেন।

নালন্দার দার্শনীয় দ্রব্যাদি

বর্ত্তমানে নালন্দায় দর্শনীয় বিশেষ কিছু নাই। বিহারের ভূতপূর্ব্ব মহাকুমাধ্যক্ষ, নালন্দায় যাহা কিছু উত্তম দ্রব্য পাইয়াছেন, তাহার কতকগুলি বিলাতের যাদুঘরে—কতক কলিকাতার যাদুঘরে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহা গুরুভারের জন্য স্থানান্তরে লওয়া সম্ভবপর হয় নাই, তাহাই তিনি এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অটুট ও ভগ্ন মূর্ত্তির তবুও অন্ত নাই। প্রায় প্রতি গৃহস্থেরই গৃহপ্রাঙ্গণে বুদ্ধমূর্ত্তি ভগ্ন ও অভগ্ন-অবস্থায় পূজিত হইতেছে। এখন আর কেহ সেগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে না—এখন সেগুলি হিন্দু দেবদেবীরূপে পূজিত হইতেছে। কালের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! যে নালন্দার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া সুদূর চীন হইতে বৌদ্ধ যতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিতেন, সহস্র বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া যে স্থানে শুভাগমন করিতেন, আজ সেখানে একটি বৌদ্ধও নাই।

আমরা পূর্ব্বে কতকগুলি মৃত্তিকাস্তূপের বা ভগ্নাবশেষের উল্লেখ করিয়াছি; এতদ্ব্যতীত, আর তিনটি মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য। এই তিনটিরই আলোকচিত্র আমরা এইস্থানে প্রদান করিলাম—

ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি

প্রথমটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাদদান ও মূর্ত্তি একখণ্ড প্রস্তরে গঠিত। কথিত আছে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রডলী সাহেব কয়েকটি হস্তীর সাহায্যে মূর্ত্তিটি স্থানান্তরিত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বুদ্ধমূর্ত্তিটির পশ্চাদ্দিকের উচ্চতা ৫ ফীট ১০ ইঞ্চি; প্রস্থে ৩ ফীট ৬ ইঞ্চি; গলদেশ ৩ ফীট ২ ইঞ্চি এবং বক্ষঃস্থল ৫ ফীট ৯ ইঞ্চি; মস্তকের চূড়া হইতে আসন ৭ ফীট। ইহার এক একখানি বাহু ৪ ফীট ৮ ইঞ্চি, এবং পদের পরিমাণ ১ ফুট ৫

ইঞ্চি। মূর্ত্তিটী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট—তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপরে রক্ষিত এবং অঙ্গুলি সিংহাসন স্পর্শ করিয়াছে। দ্বিতীয় হস্তখানি ক্রোড়ের উপরে রক্ষিত। উরুবিল্লে তথাগত অশ্বত্থরূপী বোধিবৃক্ষতলে যখন "সম্বুদ্ধিলাভ" করিতেছিলেন, তখন "মার" নানাপ্রলোভন, ও সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ভয়প্রদর্শন, করিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতেছিল। অবশেষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, 'তুমি যে সম্বুদ্ধ-লাভ করিলে, তাহার ত কোন সাক্ষী রহিল না।' ইহা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধদেব পৃথিবীস্পর্শ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ পৃথিবীই তাহার সাক্ষী রহিলেন; এইজন্য এই শ্রেণীর মূর্ত্তিকে ভূমিস্পর্শমুদ্রা বা সাক্ষীমুদ্রা বলা হয়। ইহার সাধন এইরূপ—

"শ্রীমদ্বজ্রাসনবুদ্ধ ভট্টারকং আত্মানং ঝটিতি নিষ্পাদয়েৎ। দ্বিভুজৈকমুখং পীতং চতুর্মারসঙ্ঘটিত মহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যাঙ্কসংস্থিতং বামোৎসঙ্গস্থিত বামকরং ভূস্পর্শমুদ্রাদক্ষিণকরং বন্ধূক রাগারুণ বস্ত্রাবগুণ্ঠিততনু সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনকবিগ্রহং বিচিন্ত্য ওঁ ধর্ম্ম ধাতুস্বভাবাত্মকোহং ইত্যহঙ্কারং কুর্য্যাৎ।"—*

মূর্ত্তির আসনস্থ পদ্মের উপরে লিপি আছে। কিন্তু উহা আমি পাঠ করিতে পারি নাই। মূর্ত্তিটি বর্ত্তমানে ভৈরব নামে পূজিত এবং ইহার মস্তকোপরি হিন্দুপূজকগণ তৈল ও ঘৃত প্রদান করিয়া ভক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি বড়গাঁর প্রান্তস্থিত জগদীশপুর গ্রামে অবস্থিত। কানিংহাম এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "জগদীশপুরে একটি স্তূপের প্রান্তদেশে সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ-মূলে কতকগুলি মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যস্থ একটি মূর্ত্তির ন্যায় বড় ও সুন্দর মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।" ইহাও একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। বুদ্ধ, বোধগয়ায় বোধিবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট—চতুর্দ্দিকে
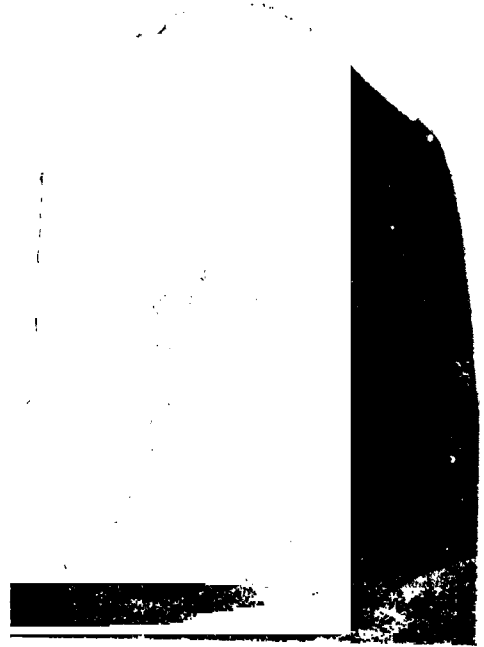
বড়গাঁর বুদ্ধমূর্ত্তি

নানারূপ দৈত্যদানব এবং মায়াবিনী নারীগণ। মূর্ত্তির দুইদিকে তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনা, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার নির্ব্বাণ অঙ্কিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ড—পঞ্চাদশ ফীট উচ্চ এবং ৯, ফীট প্রস্থ। অধিবাসীরা এই মূর্ত্তিকে রুক্মিণী দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে এবং সময়-বিশেষে ইহার সম্মুখে বলিদানও করে। কানিংহাম এই মূর্ত্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া ইহার ফটোগ্রাফ লওয়া উচিত, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ইহার ফটোগ্রাফ দিলাম।

তৃতীয় মূর্ত্তিটিকে কানিংহাম বজ্রবরাহী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূর্ত্তিটি প্রকৃতপক্ষে মরীচি নামে খ্যাত। ইহার তিনটি মস্তক, তন্মধ্যে একটি বরাহাকৃতি। ইহার কয়েকটি প্রতিরূপ কলিকাতা যাদুঘরে রহিয়াছে।

'সাধনমালা তন্ত্রে' মারীচির নিম্নলিখিত বর্ণনা রহিয়াছে।—"সূর্য্য-পীতনাংকার ধ্যাত্বা তদ্বিনির্গতরশ্মিনিবহৈরাকাশে সমাকৃষ্য ভগবতীমগ্রতঃ স্থাপয়েৎ। গৌরীং ত্রিমুখীং ত্রিনেত্রামষ্টভুজাং রক্তদক্ষিণমুখীং বজ্রাঙ্কুশ শরসূচীধারি দক্ষিণকরামশোকপল্লবচাপসূত্রতর্জ্জনীধরা বামচতুরকরাং বৈরোচনমুকুটিনীং নানাভরণবতীং

---

* সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত 'Etude Sur L 'Iconographic Bona dhique De L' Inde'—by A. Foucher-র গ্রন্থ হইতে ইহা প্রদত্ত হইল। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় রাখালবাবু এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন মনে হয়; কিন্তু উক্ত সংখ্যা আমার নিকটে নাই; থাকিলে পাঠকগণের জন্য অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম।

—লেখক।

চৈত্যাগর্ভস্থিতাং রক্তাম্বরকঞ্চুক্যুত্তরীয়াং সপ্তশূকররথারূঢ়াং প্রত্যালীঢ়পদাং এংকারজবায়ুমণ্ডলে হংকারজচন্দ্র-

সূর্য্যগ্রাহি মহোগ্ররাহুসমধিষ্ঠিতরথমধ্যাং দেবচতুষ্টয়-পরিবৃতাং তত্র পূর্ব্বাদিশি বর্ত্তালীং রক্তাং বরাহমুখীং চতুর্ভুজাং সূচাঙ্কুশধারিদক্ষিণহস্তাং পাশাশোকধারিবামহস্তাং রক্তকঞ্চুকাঞ্চেতি। তথা দক্ষিণে বদালীং পীতমশকোস্চী-বামদক্ষিণভুজাং বজ্রপাশদক্ষিণবামকরাং কুমারীরূপিণীং নবযৌবনালঙ্কারবতীং। তথা পশ্চিমে বরালীং শুক্লাং বজ্রস্চীবদ্দক্ষিণভুজাং পাশাশোকধর বামকরাং প্রত্যালীঢ়-পদাং সুরূপিণীং চৈতি। তথোত্তরদিগ্‌ভাগে বরাহমুখীং রক্তাং ত্রিনয়নাং চতুর্ভুজাং বজ্রশরবদ্দক্ষিণকরাং চাপা-শোকধরবামকরাং দিব্যরূপিণীং ধ্যাত্বা।"

উপসংহার।

বর্ত্তমানে নালন্দায় দর্শনীয় আর বিশেষ কিছুই নাই। তবে, খনন করিলে যে, প্রভূত সুন্দর সুন্দর নিদর্শন মৃত্তিকাভ্যন্তরে পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই হেতু নাই। খুব সম্ভব পাটলিপুত্র খননে যেরূপ দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতেছে, তদপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্যাদি নালন্দায় পাওয়া যাইবে। যে নালন্দার দর্শন সমস্ত পৃথিবী ব্যাপৃত হইয়াছিল, যে নালন্দার শিল্পচাতুর্য্য সকলকে বিমোহিত করিত, সেই নালন্দার শ্মশানে বসিয়া কত কি মনে আসিতেছে! প্রথিতনামা লেখকের কথায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, "কোথায় সেই শিল্প? কোথায় সেই অম্বর-চুম্বিতপ্রায় প্রাসাদসকল, কোথায় সেই দৃষ্টিসীমাযুক্ত দেবালয় সকল, কোথায় সেই নির্জ্জনকাননমধ্যস্থ কারু-কল্পিত গিরিগুহা সকল—যাহার আমূলচূড়াব্যাপ্ত ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির কেহ ধ্যানস্তিমিতনেত্রা, কেহ নৃত্য-বঙ্কিমা, কেহ হাস্যে বিকসিত-আস্যা, কেহ অভিমানে স্ফুরিতাধরা, কেহ প্রেমে পুলকোজ্জ্বলনয়না, কেহ করুণায় বিগলিত-প্রাণা ও কেহ ক্রোধে কুঞ্চিতভ্রূ; যাহার নিরন্তরাল ক্ষোদন-চিত্রের লতাগুলির কোনটি পুষ্পিতা, কোনটি মুকুল-আকুলিতা, কোনটি বঙ্কিমপত্র-সৌন্দর্য্যকমা ও কোনটি ফলদলফলিতা, যাহার অভ্যন্তরে কত অমলজল জলাশয়,—কত গৃহ, গৃহের পর গৃহ—কোনটি উপাসনার, কোনটি বিশ্রম্ভালাপের, কোনটি ভোজনের ও কোনটি শয়নের,—আজ এই রাজলোভনীয় শিল্প কঙ্কালাবশেষে পরিণত, মহাকালের বিরাট ত্রিশূল তাহারও উপরে উদ্যত, দুদিন বাদে যাহা আছে, চূর্ণ ইষ্টক, ভগ্ন মন্দির, কল্পিত নাশা ক্ষয়িত মূর্ত্তি তাহাও থাকিবে না, তাহাও যাইবে—কিন্তু তাহার স্মৃতি যাইবে কি? সেই স্মৃতি অমর—তাহার জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিও।"

ঋগ্বেদের ঐতিহাসিক তত্ত্ব

[শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, M. A.]

ঋগ্বেদে হিন্দু ধর্ম্মের বীজ।—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার প্রথম অবস্থায় আপনাদের অজ্ঞতা-বশে বেদগুলিকে "কৃষকের গীত" বলিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করিতেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রাচ্যসাহিত্যালোচনা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সে মোহান্ধকার ঘুচিয়াছে;—তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাশ্চাত্য বিদ্বদ্গণের অগ্রণী অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল (A. A. Macdonell, M. A., Ph. D.) স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে—"The Rigveda is not a collection of primitive popular poetry, as it was apt to be described at an earlier period of Sanskrit studies."—ইহাই ত বিদ্বানের কথা,—সুবিবেচকের কথা। কেন না হিন্দুর আচার, হিন্দুর পূজাপদ্ধতি, হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য—এক কথায় হিন্দুর জাতীয় জীবনের প্রারম্ভ, আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। হিন্দু ধর্ম্মের বীজ ঋগ্বেদে নিহিত এবং হিন্দুর সভ্যতা ঋগ্বেদের প্রতি চরণে প্রতিফলিত। হিন্দুগণ কিরূপে এই সকল বৈশিষ্ট্যগত ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া, এই বিশাল ভারতভূমিতে বিস্তার লাভ করিলেন, তাহার আদিম ইতিবৃত্ত জানিতে হইলে, ঋগ্বেদই প্রধানতম সহায়। হিন্দুর মধ্যে যে এক সম্প্রদায়—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বীকার করেন, এবং তদপেক্ষা বিস্তৃততর সম্প্রদায় ত্রিমূর্ত্তির পূজা করে, এবং প্রায় আপামরসাধারণ যে ৩৩ কোটী দেবতাকে পূজ্য বলিয়া মানিয়া থাকে—ধর্ম্মগত এই সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতিই ঋগ্বেদে প্রথম সূচিত হইয়াছে।

একেশ্বরবাদ।—সত্য বটে, ঋগ্বেদে প্রকৃতি-পূজার প্রকৃষ্ট আদর দৃষ্ট হয় এবং বৈদিক কবিগণ প্রকৃতির প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির অলৌকিক কার্য্যকলাপ দর্শনে মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া, ঐ গুলিকে মরুৎ, সবিতৃ, বরুণ ইত্যাদি দেবতা-রূপে কল্পনা করিয়া, অশেষ প্রকার স্তব করিয়াছেন। ঐ স্তুতিগুলির বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঐ সকল দেবতা স্ব স্ব প্রধান। ইহা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদীয় ধর্ম্মকে Henotheism আখ্যা দিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে কি যেন এক অদ্বিতীয়—বিশ্বের আত্মা-স্বরূপ প্রধানতম দেববিশেষের জন্য অনুসন্ধিৎসা দৃষ্ট হয়। ১০ম মণ্ডলের ৩১সূক্তে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে—

"নৈতাবদেনা পরো অন্যদ
স্ত্যুক্ষা স দ্যাবাপৃথিবী বির্ভর্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবা
ন্যদীং সূর্য্যং ন হরিতোবহংতি"॥

অর্থ।—দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহারাই শেষ নহেন, ইঁহাদিগের উপর আরও এক আছেন। তিনি প্রজা-সৃষ্টি কর্ত্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু। যে সময়ে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই,—সেই সময় তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। *

আবার দেখুন, একেশ্বরের অনুভব পরবর্ত্তী ঋকে কিরূপ স্ফুটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

"এক এবাগ্নি বহুধা সমিদ্ধ এক সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্ব্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বং॥"

অর্থ।—একই অগ্নি বহুস্থানে, বহুপ্রকারে হুত হন; একই সূর্য্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হইয়া রহিয়াছেন, একই ঊষা সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন; সেইরূপ এ ব্রহ্মাণ্ডে একজন মাত্র আছেন, যিনি একাই সর্ব্বদ্রব্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

পুনরায় সৃষ্টির আদিম অবস্থাবর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাদ-বিষয়ক আরও একটি স্পষ্টতর ঋক্ দেখিতে পাই—

---

* এই ঋকে বর্ণিত দেব পরমেশ্বর না হইয়া যাইতে পারে না। কেন না, এই গুণযুক্ত দেব দ্যুলোক ও ভূলোকের উপর বিদ্যমান, অন্নের প্রভু, সৃষ্টিকর্ত্তা, সূর্য্য অপেক্ষা পুরাতন এবং স্বয়ম্ভু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিং চ নাম ॥"

অর্থ।—তখন মৃত্যুও ছিল না—অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না; কেবল একমাত্র বস্তু (ব্রহ্ম) বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এক্ষণে পাঠক দেখুন, যে সময়ের বর্ণনা হইতেছে—সে সময়ে কিছুই ছিল না; কেবল একটি মাত্র স্বাধীন বস্তু বিদ্যমান ছিল। এই একটি মাত্র বস্তু 'ব্রহ্ম' ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক ঋক্ ঋগ্বেদের প্রতি মণ্ডলেই বহুসংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় সমুদয় ঋক্ সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তাই নিবৃত্ত হইলাম। আবার দশমমণ্ডলের রচনাকালে ঐ পরমেশ্বর-বাদ বা একেশ্বরের অনুভব বিস্তৃতিলাভ করায়, ঐ মণ্ডলে উক্তবিষয়ক ঋকের সংখ্যারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে ১০ম ১২১সূক্তস্থ—"যো দেবেষু আদিদেব এক আসীৎ"—এই বাক্যটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এইরূপ অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত দেব পরবর্ত্তিযুগের উপনিষৎ নিবন্ধে—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো" অথবা "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং বেদান্তদর্শনে "তত্ত্বমসি" বা "ওঁ তৎসৎ" বীজের আধার হইয়া, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্রহ্মের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হিন্দুর ৩৩ কোটি দেবতা।—আবার ঋগ্বেদে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩টি দেবতার স্তুতিকরা হইয়াছে। দেবতাগণের সংখ্যা যে ত্রয়স্ত্রিংশ, তাহা ১ম ৩৪ সূক্তস্থিত "আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা"—(অর্থাৎ হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! ত্রিগুণ একাদশ (৩৩) দেবগণের সহিত মধুপানার্থ এখানে আইস) এবং ১ম ৪৫ সূক্তস্থ—"তান্ রোহিদশ্ব গির্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতমাবহ" (হে স্তুতিভাজন রোহিদশ্ব অগ্নে! তুমি সেই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে এইস্থানে লইয়া আইস) ইত্যাদি ঋকে এবং অন্যান্য স্থলেও (৩ম ৬সূ ৯ঋ,—৮ম ২৮সূ ১ঋ,—৮ম ৩০সূ ২ঋ,—৯ম ৯২সূ ৪ঋ) উল্লিখিত হইয়াছে, এই ৩৩জন বৈদিকদেব কে? "তৈত্তিরীয় সংহিতায়" লিখিত আছে যে, আকাশে একাদশ, পৃথিবীতে একাদশ এবং অন্তরীক্ষে একাদশ,—সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা। তৈঃ সং ১।৪।১০।১। "শতপথ ব্রাহ্মণে" এই ৩০ জনের বিভাগ দেওয়া হইয়াছে; যথা—৮বসু, ১১রুদ্র, ১২ আদিত্য, দ্যু (আকাশ, এবং পৃথিবী। শ, ব্রা ৪।৫।৭।২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" অনুসারে বিভাগ যথা,—১১প্রযাজদেব, ১১ অনুযাজদেব, ও ১১ উপযাজদেব,— এই ৩৩ দেবতা। ঐ,ব্রা ২।১৮। বিষ্ণুপুরাণের মতে ১১রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৮বসু এবং প্রজাপতি ও বষট্কার,—এই ৩৩ জন দেবতা। এই ৩৩সংখ্যায়ই শেষ নহে, ৩য় মণ্ডলের ৯ম সূক্তের ৯ম ঋকে ৩৩, ৩৯টি দেবের উল্লেখ আছে। যথা,—

"ত্রীণিশতা ত্রীসহস্রাণ্যগ্নিং
ত্রিংশচ্চদেবা নব চাসপর্য্যন্ ॥"

তিন সহস্র তিন শত ত্রিংশৎ ও নবসংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন। এই ৩৩৩৯ সংখ্যক দেব সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন,—দেবতা কেবল ৩৩জন, ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমা মাত্র! খুব সম্ভবতঃ এই ৩৩ এবং ৩৩শত কবিকল্পনা দ্বারা পরম্পরাক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ৩৩ কোটিতে পরিণত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেবতাদিগের সংখ্যা ৩৩কোটি বলিয়াই মানিয়া থাকি।

ত্রিমূর্ত্তিপূজা।—আবার ঋগ্বেদে স্পষ্টতর ত্রিমূর্ত্তিপূজার উল্লেখ না থাকিলেও অগ্নির প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্তগুলির বিশেষ আলোচনা করিলে, প্রতীত হইবে যে, অগ্নি হইতেই ত্রিমূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে। কেন না অগ্নির (১) গার্হপত্য (২) আহবনীয় ও (৩) দক্ষিণ—এই ত্রিবিধ ভেদ কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথমেই ত ত্রিমূর্ত্তি ও অগ্নির ত্রিবিধ ভেদের সংখ্যাগত সাম্য দেখা যাইতেছে। আবার ঋগ্বেদের অসংখ্যস্থলে অগ্নি ও সূর্য্যের অভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে; প্রমাণস্বরূপ পাঠকমহোদয়গণকে ৩য় মণ্ডলের ১৪শ, ১৫শ, ২২শ এবং ২৫শ সূক্তস্থিত কতিপয় ঋকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি। এই সূর্য্য আবার রুদ্র বা শিবের মূর্ত্তি-অষ্টকের একতম। ইহা ব্যতীত ৩য় মণ্ডলের ২৭ সূক্তস্থ ৯ম ঋকে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে—"ভূতানাং গর্ভমাদধে দক্ষস্য পিতরং

তনা" অর্থাৎ "দক্ষস্য তনা ভূতানাং গর্ভং পিতরং আদধে"— ভূতগণের গর্ভস্বরূপ এবং পিতৃস্বরূপ অগ্নিকে দক্ষের তনয়া ধারণ করিলেন। এই "দক্ষস্য তনা" কথাটি বেদে যজ্ঞ-ভূমি বা বেদি অর্থে ব্যবহৃত হইলেও পুরাণে যে উহা দক্ষতনয়া জগজ্জননী, ভূতধাত্রী শিবারূপে কল্পিত হইয়াছে, তাহা বিদ্বান্‌মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং "ভূতানাং গর্ভং" এবং "ভূতানাং পিতরং" এই দুইটি বিশেষণ "দক্ষতনয়া কর্তৃক ধৃত হইলেন" এইরূপ বাক্যাংশের সহিত অন্বিত হইয়া যে, ভূতনাথ শিবের বোধ করাইতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এই ত গেল, অগ্নি ও মহেশ্বরের অভিন্নতা। আবার অনেক স্থলে অগ্নিকে বিশ্বব্যাপী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই ব্যাপকত্ব ধর্মটি "বিষ্ণুর" একচেটিয়া, এবং "বিষ্ণু" শব্দের যৌগিক অর্থ—ব্যাপক, সুতরাং এ বিষয়ে অগ্নি ও বিষ্ণুর সাম্য দেখা যাইতেছে। আর অগ্নিকে ব্রহ্মারূপে কল্পনা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং অগ্নিকে ত্রিমূর্ত্তির বীজরূপে কল্পনা করা খুব অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, এ সকল বিচার সম্পূর্ণ কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করে। যাঁহার কল্পনা-শক্তি যত অধিক, এ বিষয়ে তিনি ততই নব নব তত্ত্বের অবতারণা করিতে সমর্থ হন। অতএব এইরূপ স্থলে মাদৃশ কল্পনাশক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা ছাড়িয়া বাস্তবের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

ঋগ্বেদীয় যুগে তপোবনের চিত্র।— এক্ষণে ঋগ্বেদেই প্রতিফলিত সেই সুখময় যুগের শান্তিময় ঋষি-আশ্রমের একখানি বিমল চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে ধরিব। পাঠক! ইহা দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য মনঃপ্রাণ শীতল কর। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, পাঠক! চিন্তা করিবে কি,—তাহা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় কত সুখময়,—কেমন শান্তিময়! তুমি তোমার বাহ্যেন্দ্রিয়কে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করিয়া, অন্তশ্চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, সুদূর নদীসপ্তক-মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগের প্রতি চাহিয়া দেখ,—দেখ সেই তরঙ্গিণীগণের উপকূলবর্ত্তী তরুরাজিরচিত বনগুলি—যে খানে পুষ্পিতা লতা প্রণয়ভরে আবেশে বিভোর হইয়া তরুবরকে বেষ্টন করিয়া উঠিয়াছে, আবার পাদপ আকাশ-সঞ্চারী জলধরাবলীর মধুর মিলন-আশায় উচ্চতায় আকাশ ভেদ করিয়াছে! আর দেখ,—ঐ বনভূমির মধ্যস্থিত সমতলদেশে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ—কংবিধ বেদি, যাহার উপর বসিয়া সুলম্বশ্মশ্রু,—দীর্ঘকায়,—জ্বলদনলপ্রভ তপস্তেজোদীপ্ত মহাপুরুষগণ যেন কাহারও অপেক্ষায় গগননিবদ্ধ স্থিরদৃষ্টি হইয়া, সমুচ্চস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তী অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন,—হুতাশন "হু হু" জ্বলিয়া উঠিল, তাহার ইচ্ছা ঐ উদ্দিষ্ট দেবতাকে তাঁহার আহুতি পৌঁছিয়া দেয়,—যেহেতু অগ্নি দেবদূত। প্রাজ্য আজ্য অগ্নি-স্পর্শে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখসংবিধায়ক,—চিত্তকল্মষাপহারী গন্ধ বিকীরণ করিল,—গন্ধবহ মৃদুসঞ্চারে সেই গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল,—বৃক্ষ কোমল পত্রশব্দ দ্বারা ঐ গন্ধে তাহার প্রসন্নতা জ্ঞাপন করিল। আবার দেখ,—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, স্বভাবসরলতাময় পুত্তলীতুল্য ঋষিকুমারগণ এক-তানে উদাত্ত,—অনুদাত্ত, ও স্বরিত সংযোগে সূক্ত গায়িয়া উঠিল,—বনবিহারী মৃগগণ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, গায়ে গায়ে ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া বসিয়া, নির্নিমেষলোচনে গীতি-ঝঙ্কার পান করিতে লাগিল,—শাখাস্থিত শুকগণ ঐ গীত কণ্ঠস্থ করিবার মানসে নিস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিল। অন্যদিকে কোন এক বর্ষীয়ান্ ঋষি পর্য্যন্যদেবের উদ্দেশে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে গায়িয়া উঠিলেন—

"অভিক্রন্দস্তনয় গর্ভমাধা
উদন্বতা পরিদীয়া রথেন।
দৃতিং সুকর্ষং বিষিতং ন্যঞ্চং
সমাভবন্তূদ্বতো নিপাদাঃ॥ ১।
মহান্তং কোশমুদচা নিষিঞ্চ
স্যন্দন্তাং কুল্যা বিষিতাঃ পুরস্তাৎ।
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী ব্যুন্ধি
সুপ্রপাণং ভবত্বঘ্ন্যাভ্যঃ॥ ২।" *

* ১। হে পর্য্যন্য গর্জ্জন কর,—জলযুক্ত মেঘরূপ রথে চতুর্দ্দিকে গমন কর,—নিম্নাভিমুখে মেঘ আকর্ষণ করিয়া জলবর্ষণ কর, যাহাতে উন্নতাবনত দেশ সমতল হয়।

২। মেঘরূপ বৃহৎ কোশ হইতে জলবর্ষণ কর, যাহাতে নদীসকল স্ফীত হইয়া প্রবাহিত হয়,—জল দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী পূর্ণ কর, গো প্রভৃতি প্রাণিগণের পানের জন্য প্রচুর জল হউক।

গীত শেষ হইতে না হইতেই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল,—দলে দলে মেঘ তদভিমুখে ছুটিয়া আসিল,—ঐ ভাষা, ঐ আহ্বান যেন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। মেঘ প্রচুর জল ঢালিল,—উন্নতাবনত স্থান জলপূর্ণ হইয়া সমতল হইল,—নদীসকল খরতর বেগে প্রবাহিত হইল,—গবাদি পশুর পানীয়ের কষ্ট দূর হইল,—ইষ্টসিদ্ধ হইল। তখন ঋষি আবার গায়িলেন—

"অবর্ষী বর্ষমুদুষূ গৃভায়া
কর্ষন্বান্যত্যেত বা উ।
অজীজন ওষধী র্ভোজনায়
কমুত প্রজাভ্যো ঽবিদো মনীষাম্॥৩॥" *

অমনি ইঙ্গিতানুসারে দূতের ন্যায় গগনতল হইতে মেঘ উধাও হইতে লাগিল,—বারিধারা ক্রমশঃই কমিয়া আসিল,—আকাশ নির্ম্মল হইল।

ঋগ্বেদ, মানব ও প্রকৃতির একতানের ইতিহাস।—পাঠক, দেখিলে ত এ যুগে প্রকৃতি কত উদার,—কত স্বচ্ছন্দ,—কত স্বাধীন,—কত শোভাময়! আর দেখিলে,—মানব ও প্রকৃতির মধ্যে কেমন বন্ধুত্ব! বন, লতা, পশু, পক্ষীর সহিত মানবের কিরূপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা! চেতন, অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ-জনিত কিরূপ পবিত্র মাধুর্য্য! এই জন্যই কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "তপোবন" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"তরু, লতা, পশু, পক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্চে এর ভিতরকার ভাব।" ঐ প্রবন্ধেই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—"এর ভিতরকার কথাটা হচ্চে ঐ।—তরু, লতা, জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর ক'রে তপোবন প্রকাশ পাচ্চে, এই পুরাণকথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।" † বস্তুতঃ আলোচ্য যুগে মানব প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত; বর্ত্তমান যুগের মত প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন বা তাহার বিরোধী নহে;—যে সময়ের সর্ব্বপ্রধান প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) মানব ও প্রকৃতির অনন্ত ও মধুর সুরের একান্ত অভাব দর্শন করিয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা অনুভব করিতে করিতে লিখিয়াছেন—

"To her fair works did nature link
The human soul that through me ran;
And much it grieved my heart to think
What man has made of man."

... ...

"If this belief from heaven be sent,
If such be nature's holy plan,
Have I not reason to lament
What man has made of man?"

এইরূপ খেদ বা ক্ষোভ-প্রকাশ ঋগ্বেদের কোন স্থলে দেখি না। এ যুগে মানব প্রকৃতির পূজায় ব্যস্ত, প্রকৃতিও মানবের উপকারে যত্নবতী এবং তাহাদের ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ; এইরূপে প্রকৃতি ও মানব সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ভারতকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছিল, এবং উহারই জন্য আজও,—ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও,—মানব ও প্রকৃতির ঘোর বিরোধের দিনেও,—ভারত উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় বৈদিক যুগের ইতিহাসকে আমরা অভ্রান্তভাবে মানব ও প্রকৃতির একতানের ইতিহাস বলিতে পারি। কেননা প্রকৃতির অযত্নরক্ষিত,—অথচ সুন্দর ও সুসন্নিবেশ তপোবনে তাঁহাদের বাস,—প্রকৃতির বড় আদরের মৃগপোতগণের সহিত তাঁহারা বর্দ্ধিত, প্রকৃতির আদৃত বন্যজাত ফলমূলে এবং প্রকৃতির স্তন্য-সদৃশ নির্ঝরিণী-জলে তাঁহাদের শরীর পুষ্ট। আবার প্রকৃতিই তাঁহাদের উপাস্য, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের অধিষ্ঠাতৃগণ ব্যতীত তাঁহারা অন্য কাহারও স্তুতি করেন না। তাই তাঁহাদের স্তুত্য হইলেন আদিত্য, সোম, উষা, অগ্নি, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি—যাঁহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের বাহেন্দ্রিয়ের নিকট নিয়ত স্পষ্টভাবে পরিভাষমাণ, যাঁহাদিগকে দেখিতে হইলে, চক্ষু মুদ্রিত করিবার আবশ্যকতা নাই,—দুষ্টকল্পনা—পাঁচ সাতটি মাথা বসাইয়া, দশ বিশটা হাত লাগাইয়া, যাঁহাদের যথার্থ শক্তির অপপ্রয়োগ

---

* ৩। তুমি যথেষ্ট বর্ষণ করিয়াছ, জলশূন্য দেশ জলপূর্ণ করিয়াছ,—প্রাণিগণের খাদ্যরূপে প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন করিয়াছ এক্ষণে আর বর্ষণের আবশ্যক নাই,—জগদ্বাসীর স্তুতি গ্রহণ কর।

† প্রবাসী—নবমভাগ, নবম সংখ্যা (পৌষ, ১৩১৬) পৃষ্ঠা ৬৮০—৬৮১।

করে নাই,—অথবা নিরাকার অথচ মুদ্রিত চক্ষুর গোচর করিয়া সাধারণকে বিস্ময়রসে আপ্লুত করে নাই।

প্রকৃতি তাঁহাদের কিরূপ পরিচিত, তাহা ৩য় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তটি পাঠ করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে;—এই সূক্তের ঋষি যে, প্রকৃতির কার্য্যপরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে ঐক্য দেখিয়া, তৎতদধিষ্ঠাতৃ দেবগণেরও কার্য্যের ঐক্য ও ঐশ্বরিক বলের অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কেননা ঋষির বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে, যে অগ্নি বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হন, আকাশে উৎপন্ন হন, পৃথিবীতে বিকাশিত হন [৪ ঋক্] তিনি উত্তাপরূপে শস্য উৎপাদন করেন [৫ ঋক্] সূর্য্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গিয়া পূর্ব্বদিকে উদিত হন [৬ ঋক্], আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন [৭ ঋক্] দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হইয়া আসিতেছে ও যাইতেছে [১১ ঋক্], আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্প-রূপে রসদান করিতেছে [১২ ঋক্] এবং নৈসর্গিক নিয়মে একদিকে বজ্র হইতেছে এবং অন্যদিকে বৃষ্টি হইতেছে [১৭ ঋক্] এইরূপ অনন্তকার্য্য-পরম্পরাকেই ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে স্তুতি করা হইয়াছে। সেই কার্য্য-পরম্পরার একতা দেখিয়া, ঋষি বলিতেছেন—"মহদ্দেবানা-মসুরত্বমেকং"—দেবতাগণের বল এক ও মহৎ। ইহা অপেক্ষা আর্য্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকৃতির আদর ও তাহার তত্ত্ব-পরিদর্শন-প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় আর কি হইতে পারে?

সার্থকতা

[শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়]

আমি স্তব্ধ প্রাণ শস্য সম—তণ্ডুলের মত—
ভাণ্ডার-পার্শ্বেতে রব ভিখারীর তরে;
তুমি দয়াময়ী মাতৃরূপে অঞ্জলি ভরিয়া,
বিলায়ে তুলিয়ে দিয়ো ক্ষুধাতুর-করে।
আমি নদীকূলে—তরুমূলে—বিজন প্রান্তরে,
ফুলসম ফুটে র'ব দেবসেবা তরে;
তুমি সহোদরা-বেশে স্নেহে তুলে ল'য়ো মোরে,
কনক অঙ্গুলি দিয়া হৃদিপাত্র'পরে।
আমি গৃহকোণে রব দীপ্ত সফলতা তরে,
সন্ধ্যার প্রদীপ সম আপনারে ভুলে;
তুমি বধূ বেশে দিবা-শেষে দীপ্ত করি মোরে
রাখি দিয়ো নিজ করে তুলসীর মূলে।
আমি পথপাশে নিশা-শেষে সিক্ত আঁখিনীরে,
দূর্ব্বাসম পড়ে র'ব আকুল আগ্রহে;
তুমি কন্যারূপে তুলে ল'য়ো মুছায়ে শিশিরে
সার্থক করিতে মোরে জগৎ-প্রবাহে।

বৃন্দাবন-চন্দ্র

[শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, B. A.]

'নন্দকুলচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' আজ!—
কি কথা শোনালে কবি! শুনি' মোর চোখে আসে জল;
নীরব কোকিল-কণ্ঠ কুসুমিত কুঞ্জবন মাঝ?
বহে না মলয়ানিল লুটি' আর পুষ্প-পরিমল?
আজো হেথা উন্মাদিনী রাধিকার গুপ্ত অভিসার,
চকিত চরণপাতে বাঁশরীর আকুল আহ্বানে,
মানিনীর গণ্ড-প্লাবী ঝর ঝর নয়ন-আসার,
মুখর মাধবী-কুঞ্জ রুনুঝুনু নূপুর-শিঞ্জনে।
আজো শ্যামবেণুরবে গোপিকার উতলা পরাণ,
ব্রজের যমুনা-তটে মধু-রাতে রাস-অভিনয়;
শ্যামলী ধবলী লয়ে গোঠে মাঠে রাখালের গান,
কানুর আনন চুমি' যশোদার বিভল হৃদয়!—
অনন্ত এ ব্রজলীলা; নিখিলের চিত্ত-দল 'পরি
নন্দকুলচন্দ্র আজো বৃন্দাবন আছে আলো করি'।

সহধর্ম্মিণী

[শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা]

রমা পিতার পারলৌকিক কাজ শেষ করিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, আজ সব শেষ হ'য়ে গেল! আর কেন? এখন আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও।"—এই একটি কথায় আজন্ম-চাপা ছোট বোনটির সমস্ত জীবনের সঞ্চিত বেদনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আজ আবার সতীশকে নূতন করিয়া বিষম আহত করিল।

মাতৃহীনা রমা পিতার মৃত্যুতে আপনাকে একেবারে বন্ধন-মুক্ত বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। সন্তানের বেদনায় পিতার যে দারুণ দুঃখ, সেই দুঃখের বোঝাও রমা অনেকটা নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া পিতাকে সুখী করিবার জন্য নিজের চিত্তকে যথাসাধ্য প্রফুল্ল রাখিয়াছিল। এত দিনের যোঝাবুঝিতে আজ সে চিত্ত অবসাদভরে একেবারে এলাইয়া পড়িল।

তার জীবনের মত বিচিত্র জীবন কা'র? সে যখন নয় বছরের বালিকা, তখনই তাহার অনিন্দ্য রূপের খ্যাতি আশেপাশের গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাই শুনিয়া, রামনগরের জমিদার-গৃহিণী তাঁহার একমাত্র পুত্র কেশবের সঙ্গে রমার বিবাহ দেন। সেও আজ নয় বছরের কথা। কেশব বড় জমিদারের একটি মাত্র ছেলে, তাহাতে আবার ছেলে-বেলা বাপ মরিয়া গিয়াছে; কাজেই সে মায়ের সমস্ত স্নেহ, মমতা ও আদর দখল করিয়া বসিয়াছিল। অপরিণত অবস্থায় প্রচুর সম্পদের সঙ্গে যদি প্রচুর সাদর প্রশ্রয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ মানুষের যাহা হইয়া থাকে, কেশবেরও তাহাই হইল। সে নাবালকত্বের সীমারেখাটি পার হইয়াই সুখ ও আমোদ-প্রমোদের সন্ধানে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। কয়েকজন বন্ধুও জুটিয়া গেল। সেই বন্ধুরা তাহার চোখের সামনে সুখের যে আদর্শ গড়িয়া তুলিল, সে সেই সুখ কিনিবার জন্য ধুলা-মুঠার মত সোনা-মুঠা ছড়াইতে লাগিল। মা যে ইহাতে খুব সুখী ও নিশ্চিন্ত ছিলেন, তা নয়। কিন্তু তাঁহার মৃদু আপত্তি ছেলের প্রবল ইচ্ছার স্রোতে পড়িয়া, টিকিতেই পারিল না। রমার পিতা কৈলাস বাবু জামাতার কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া, কন্যা-জামাতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, আকুল হইয়া রামনগরে চলিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, বাধাহীন পিচ্ছিল পথ পাইয়া, কেশব এত নীচে নামিয়া গিয়াছে যে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে উঠান, দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বুঝিলেন, তাঁহার দু'এক দিনের উপদেশে বা সাময়িক শাসনে এখন আর কোন ফলই হইবে না। সময়োচিত রীতিমত শাসন ও শিক্ষার অভাবেই যে কেশবের এমন শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, তাহা বেশ করিয়া বৈবাহিকাকে বুঝাইয়া বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জামাতার উদ্দেশে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না। কুটুম্বের সহিত বিবাদ বাধাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না বটে, কিন্তু জমিদার-গৃহিণী তাঁহার কথাগুলি নিঃশব্দে পরিপাক করিতে পারিলেন না। যে সে আসিয়াই যে, তাঁহার ছেলেকে যা-খুসি বলিয়া যাইবে, এমন কি কথা? তিনিও বৈবাহিককে দু'চারটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া শেষে বলিলেন যে, যাদের টাকা থাকে, তাদের আমোদ করার ইচ্ছা একটু হয়েই থাকে। সেজন্য শ্বশুরের শঙ্কিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এ কথার উপর আর কোন কথা বলা চলে না। চলিলেও স্ত্রীলোকের সঙ্গে মুখো-মুখি তর্ক বা বিবাদ করা পুরুষের পক্ষে যেমন অশোভন, তেমনই অসাধ্য। কাজেই কৈলাস বাবু চুপ করিয়া রহিলেন এবং মনে মনে খুব বিরক্ত হইয়া, রমাকে লইয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন। কাজটা ভাল করিলেন কি না, রাগের ঝাঁজে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কেশব আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কেন না রমা রামনগরে থাকিলে, মা তাহাকে মধ্যে মধ্যে অন্দরে থাকিতে বলেন। সে আপদ আজ ঘুচিয়া গেল। এগারো বছরের বালিকা রমা, কি হইল না হইল, সেটা বুঝিতেই পারিল না। সে বধূত্বের

গণ্ডী ছাড়িয়া আসিয়া, ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া, বেশ হৃষ্টমনে খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। শ্বাশুড়ী বধূকে লইতে লোক পাঠাইলেন না। এত দিন তিনি কখনও রমাকে বাপের বাড়ী রাখিতেন না। কৈলাস বাবু তখন বুঝিলেন, সে দিন বৈবাহিকা রাগ করিয়াই রমাকে লইয়া যাইতে নিষেধ করেন নাই। পাঁচ ছয় মাস পরে তিনি নিজেই যখন রমাকে রামনগরে রাখিয়া আসিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন একদিন সহসা শুনিলেন, বৈবাহিকা আবার ছেলের সম্বন্ধ খুঁজিতেছেন। শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তিনি ঘৃণায়, রাগে, লজ্জায়, দুঃখে ও অপমানে ক্ষিপ্তের মত হইয়া উঠিলেন। কতকগুলি অপ্রিয় কথার পর রমাকে সেদিন লইয়া আসায় কেশবের মা সত্যই খুব চটিয়া ছিলেন। তারপর প্রত্যেকদিনই আশা করিতেছিলেন, কৈলাস বাবু তাঁহার ক্রোধ শান্তির জন্য আজই রমাকে পাঠাইয়া দিবেন। ছয় মাসেও যখন তাহা হইল না, তখন তাঁহার কোপ সহিষ্ণুতার বাঁধ ছাপাইয়া উঠিল। বধূর গরিব বাপের এই ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয় অপরাধরূপে গণ্য করিয়া, তিনি ছেলের সম্বন্ধ খুঁজিতে লাগিলেন। কেশব কিন্তু আর বিবাহ করিতে রাজি হইল না। সে যে পথে চলিয়াছে, সে পথ হইতে তাহার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ রমার প্রতি তাহার যেমন স্নেহের অভাব ছিল, তেমনই বিদ্বেষেরও অভাব ছিল। যাহা হউক, বছর খানেক পরে কেশবকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও নিরঙ্কুশ করিয়া দিয়া, কেশবের মা স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন আর কৈলাস বাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না, রমাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেশবের কোন কালেই ছিল না, যে টুকু ছিল, তাও মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইল। শ্রাদ্ধাদির পরে সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। বছরের দশ মাস সে কলিকাতাতেই থাকিত। একরত্তি মেয়ে রমা নামে এখন অন্দরের কর্ত্রী, কিন্তু দাসদাসীরা তাহাকে তেমন মানিত না এবং তাহারই স্বামীর অন্নপুষ্ট দূরসম্পর্কীয় শ্বাশুড়ী-ননদরূপ ফৌজ, শিক্ষাদানের অজুহতে তাহাকে এমন ভাবে আক্রমণ করিয়া বসিল যে, সে অতিষ্ঠ হইয়া, বাপকে লিখিতে বাধ্য হইল, "আমাকে লইয়া যান।" কৈলাস বাবু রমার চিঠি পাইয়া, তাহার বর্ত্তমান অবস্থার স্বরূপ অনুমানেই বুঝিলেন। তিনি রামনগরে আসিয়া, সব দেখিয়া শুনিয়া, রমাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর—দিন, সপ্তাহ, মাস—এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। কেশব ইহার মধ্যে স্ত্রীর কোন খোঁজ-খবরই লইল না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে বালিকা রমার নারীত্ব বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বামীর ঘর-কন্নার অতৃপ্ত অশান্ত আকাঙ্ক্ষাকে তাহার মন সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়াও কোন মতেই দমন করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। স্বামীর দারুণ উপেক্ষায় ও বিতৃষ্ণায় যে, নারী-জীবন শুধু দুঃখময় হয়, তাহা নহে, অপমানের অসহনীয় ভারে গুঁড়া হইয়া, ধূলার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়। তার পর সে সঙ্কল্প করিল, যেমন করিয়াই হউক, সে স্বামীর প্রাসাদতুল্য গৃহে একটুখানি স্থান যোগাড় করিয়া লইবেই। সে তাহার জন্য তাহার পিতার মাথা আর কোন রকমে নত করাইতে চাহিল না। স্বামীর স্নেহভাগিনী হওয়ার আশাকে সে মনের কোণেও স্থানে দিতে পারিল না বটে, কিন্তু যাহার ভাত খাইয়া অনেক লোক বাঁচে, যাহার ঘরে অনেক নিঃসম্পর্কীয় লোক আশ্রয় পায়, তাহার ঘরে সেও একটু জায়গা পাইতে পারে, এটাকে সে দুরাশা মনে করিল না। তাই সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া—মনে মনে অনেক ভাঙ্গিয়া গড়িয়া—কেশবের নিকট একখানি চিঠি লিখিল। রমার নিকট এক বৎসরের মত দীর্ঘ হইয়া এক পক্ষ কাটিয়া গেল, চিঠির জবাব আসিল না। চিঠিখানা হয়ত কেশবের হস্তগত হয় নাই! অবশেষে সে কিছুদিন পরে আর একখানা চিঠি লিখিল। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারও উত্তর আসিল না। হায়, এক মুঠো ভাত,—একটু স্থান দিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই! তাঁহার বুকের কঠিন হাড়গুলির নীচে প্রাণ বলিয়া কি কোন কিছুই নাই? নিশ্চয়ই নাই। রমা মনে মনে একথা পুনঃ পুনঃ ভাবিয়া, কোন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার হৃদয় ব্যথিত—মথিত হইতে লাগিল।

সে বরাবরই একটু গম্ভীর প্রকৃতি। এখন সে তাহার নিজের বেদনার অংশী পিতাকে অন্যমনা করিবার জন্য গত শৈশবের প্রফুল্লতা ও পুলক-চাঞ্চল্য ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইল। দেখিয়া শুনিয়া পিতা অধিকতর ব্যথিত হইলেন। রমার বিবাহের কিছু পরেই কৈলাস বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ

হইয়াছিল। তিনি আর বিবাহ করেন নাই। নানাবিধ আঘাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অল্পদিন রোগ-ভোগের পর একদিন তিনি রমার হাতখানি ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশের হাতে তুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিলেন।

২

সময় আর কাটে না। ঘণ্টা-মিনিটগুলাও রমার নিকট কি দীর্ঘ! সে তাহার ক্ষিপ্ত চিত্তকে সংসারের শত কাজের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া, সময়ের দৈর্ঘ্য কমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। দেখিয়া সতীশের স্ত্রী কুসুম বলিল, "এ কি করছ ঠাকুর-ঝি! আমি ঘুম থেকে উঠ্‌বার আগেই যে, ঘরের প্রায় সব কাজ শেষ করে রাখ। হেঁসেলে ত আমাকে যেতে দিতেই চাও না!"

একটুখানি হাসিয়া রমা উত্তর করিল, "তুমি আজকাল ভারি নোংরা হয়েছ। তোমার কোন কাজ আমার পছন্দই হয় না, বৌ-দিদি! আর তোমার রান্নাটাও আজকাল আমার ভাল লাগে না মোটেই।" তখন সতীশ আসিয়া বলিল, "তোমরা কি বলছ?"

কুসুম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দেখ, ঠাকুর-ঝি আমাকে কোন কাজ করতে দিতে চান না।"

রমা বলিল, "নালিশ ত করলে, নিজের দোষের কথা ত কিছুই বললে না।"

আজন্ম একত্র প্রতিপালিত হইয়া,সতীশের রমার স্বভাব জানিতে বাকি ছিল না। কাকার সবে একটি মেয়ে রমা— তাঁহার কত স্নেহের—কত আদরেরই ছিল! সেই স্নেহাদরের অভাব আজ রমাকে কি পীড়াই দিতেছে! সে পীড়া-জ্বালাকে বাহ্য হা হুতাশে আমল দিতে চাহিতেছে না। সেটাকে কোণ-ঠ্যাসা করিয়া রাখিবার জন্যই এই ব্যর্থ প্রয়াস। সতীশ ব্যথিত হইয়া বলিল, "না না রমা, তুই দিন-রাত এমন ক'রে' খাটিস্‌নে, শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে। তুই শুধু পড়াশুনা করবি, আর খোকাকে নিয়ে থাক্‌বি।"

দাদার আদেশ রমা পালন করিল না। ভালরূপে ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতেই সে উঠিয়া কাজে লাগিয়া যাইত। শেষে কুসুমও রমার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যাত্যাগ করিত। তারপর দুই ননদ-ভাজে কাজ লইয়া কাড়াকাড়ি করিত।

আজও সকাল বেলা রমা যখন কলসী কক্ষে লইয়া, নদীর ঘাটে জল আনিতে যাইতেছিল, তখন কুসুম আসিয়া, বিস্তর নিষেধ করিয়াও যখন তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না, তখন সেও আর একটা কলসী লইয়া তাহার সঙ্গে চলিল। নদীর নিকটেই তাহাদের বাড়ী। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর ঘাটে পৌঁছিল। তখনও নদীর ঘাটগুলি স্নানার্থী দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠে নাই, তখনও সে স্থান বালক-বালিকার কোলাহলে মুখর হইয়া উঠে নাই। ঘাটে শীঘ্র পুরুষের সমাগম হইবার আশঙ্কায় কুসুম তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া, উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু রমা আর উঠিতে চায় না। সে নদীর জলে পা-দু'খানি ডুবাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছা করছে সাঁতার দিতে।"

কুসুম ব্যস্তভাবে বলিল, "না, না, এখনি কত"— বলিতে বলিতে সে সহসা দেখিতে পাইল, ঘাটের কিছু দূরে একখানা বোট বাঁধা রহিয়াছে। বোটের কামরার জানালা খোলা। সেই খোলা জানালার নিকটে বসিয়া এক যুবা অনিমেষনেত্রে রমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার দু'টি চক্ষু যেন শত চক্ষু হইয়া রমাকে দেখিতেছে। কি লজ্জার কথা! তাহারা গল্পগুজবে অন্যমনস্ক ছিল; বোটখানা এতক্ষণ দেখিতেই পায় নাই। কুসুম তাড়াতাড়ি রমার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ঐ দেখ, বোট থেকে কে তোমায় দেখ্‌ছে।"

কুসুমের কথা শুনিয়া রমা সেইদিকে চাহিল। যদিও ছয় বৎসরের মধ্যে কেশবের সঙ্গে রমার দেখা শুনা নাই, তথাপি সে সেই মুহূর্ত্তেই চিনিল, সে যুবা কেশব। তাহার হৃৎপিণ্ড অতিদ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে কলসী-গামছা ফেলিয়াই ত্রস্তভাবে উঠিয়া, দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিল। কুসুম বলিল, "ও ঠাকুরঝি, একটু দাঁড়াও। ও ঠাকুরঝি—" ঠাকুরঝি তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। কুসুম তখন শূন্য কলসী দুইটি লইয়া রমার অনুসরণ করিল।

রমার বিবাহের সময়ে কিছুক্ষণ এবং তাহার কয়েক মাস পরে একদিন মাত্র কুসুম কেশবকে দেখিয়াছিল, আর দেখে নাই। তাই চকিতে একবার দেখিয়াই সহসা সে কেশবকে চিনিতে পারে নাই। রমা তাহা অনুমানেই বুঝিয়াছিল। সে তখন কিছু বলা সঙ্গত মনে করিল না। রমার মনে একটা কথা তোলপাড় করিতেছিল;—পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তবে কি কেশব তাহাকে লইতে

আসিল ? কুসুম বাড়ী আসিয়া দেখিল, রমা কাপড় ছাড়িয়া, বঁটি লইয়া, আলু কুটিতে বসিয়া গিয়াছে। সে হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "ঠাকুরঝিকে লোকটা গ্রাস করে ফেলেছিল আর কি! পালিয়ে প্রাণটা বাঁচালে!" রমা কোন জবাব দিল না দেখিয়া, কিছুক্ষণ পরে সে সহজভাবে বলিল, "ছুটে আস্‌তে কাঁটায় তোমার পা টা ছড়ে গেছে দেখ্‌ছি। লোকটা যতই অসভ্য হোক্‌, বাঘ ত নয়ই, দৌড়ে আসবার দরকার কি ছিল ?"

রমা নিরুত্তরে একান্ত মনোযোগের সহিত দ্রুতভাবে হাতের কাজই করিয়া যাইতেছে দেখিয়া, কুসুম নিজের কাজে চলিয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে রমা উঠানে জুতার মস্‌ মস্‌ শব্দ শুনিয়া, যেমন খুব ত্রস্তভাবে উঠিয়া, ঘরের মধ্যে যাইতে উদ্যত হইল, অমনি অসতর্কতায় তাহার পায়ের আঙ্গুলের খানিকটা বঁটিতে কাটিয়া গেল। তৎপর মুহূর্ত্তেই সতীশ তাহার নিকটে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা রমা! আঙ্গুলটা যে প্রায় দু'খান করে ফেলেছিস রে!" সমস্ত দিনটা প্রত্যেকের পায়ের শব্দ—এমন কি,পাতা-পড়ার শব্দটি পর্য্যন্ত রমার হৃৎপিণ্ডকে অস্বাভাবিক চঞ্চল গতি দান করিয়া, শেষ হইয়া গেল। যখন দিনের আলো নিবিয়া যাওয়ায় সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল, তখন রমা সতীশের শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, ঘুম-পাড়ানিয়া ছড়ার আবৃত্তি করিতে লাগিল।

"ঐ দেখ, বোট থেকে কে তোমায় দেখ্‌ছে"

গভীর স্তব্ধ নিশীথে অনেক কথার সঙ্গে তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল ; কেশব মাঝে মাঝে বোটে করিয়া বেড়াইয়া থাকে, এখনও বোধ হয়, বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। কোন একটা অনিবার্য্য ঘটনাচক্রে পড়িয়াই হয় ত এই নদীর ঘাটে তাহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের চকিত চঞ্চলভাবের যে টুকু অবশিষ্ট ছিল, সে টুকুও বাহির হইয়া, বাহিরের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। সে ঘুমাইয়া পড়িল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক দিন পিয়ন সতীশের নামের কতকগুলি চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে রমার নামের একখানা চিঠি রমার হাতে দিয়া গেল। চিঠিখানা সুদৃশ্য লেফাফায় বন্ধ। কে তাহাকে চিঠি লিখিল ? সে মহা কৌতূহলী হইয়া, লেফাফাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, প্রথমেই লেখকের নামটা পড়িল। কেশব তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে! এও কি সম্ভব! কোন কোন সময়ে অসম্ভবও আশ্চর্য্যরূপে সম্ভব হইয়া যায় মনে করিয়া, সে কম্পিতবক্ষে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল। চিঠি দীর্ঘ

নহে, পড়িতে অধিক সময় লাগিল না। কয়েক মাস হইল, কেশব রমার দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছে, নানাকারণে এত দিন উত্তর দিতে পারে নাই। রমা কবে সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে, জানাইলেই কেশব আসিয়া রমাকে লইয়া যাইবে,—এই কথা কয়টিই চিঠিতে লেখা ছিল। রমা ঘণ্টা খানেক বসিয়া ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিল না যে, কেশব সহসা তাহার সম্বন্ধে এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল কেন? যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিবার ক্লেশটুকুও স্বীকার করিতে চাহে নাই, এই সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী বলিয়া একটা জীব সংসারে আছে, এ কথাটাও যাহার মনে হয় নাই, এবং যে ছয় সাত মাসের মধ্যে একখানা চিঠির উত্তর দিবার অবকাশ পায় নাই, সে আজ স্বয়ং আসিয়া রমাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত। ভাগ্যদেবতার এ কি অচিন্তানীয় প্রসাদ! এ কি শুধুই ভাগ্য-দেবতার প্রসাদ, না ইহার মধ্যে আর কোন গূঢ় কারণ আছে? কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। এই চিঠি লেখারূপ কার্য্যটার কারণ কি সেই দিন সকাল বেলায় নদীর ঘাটে দেখা-শুনা? ভাবিতে ভাবিতে রমার দৃষ্টি গৃহপ্রাচীরের উপর পড়িল। প্রাচীরের বৃহৎ দর্পণে নিখুঁত সুন্দরী তরুণী রমার প্রায় সমস্ত অবয়বের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। চাহিয়া দেখিয়া দেখিয়া রমা নিঃসন্দেহে স্থির করিয়া লইল, সেই সাক্ষাৎই এই চিঠির কারণ। সেই দিনের সেই বিস্মিত মুগ্ধ অনিমিষ চাহনিতেই যেন সে এই চিঠির পূর্ব্বাভাষ পাইয়াছিল। অদৃষ্টের একি তীব্র নির্ম্মম উপহাস!

রমা চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহার নারীত্বের মর্য্যাদা-বোধ আহত ফণীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল। তারপর ভূমিতলে জানু পাতিয়া বসিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, মনে মনে বলিল, "হে ভগবান্, তুমি কাহাকেও ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিতে পার না, কাহাকেও আদরের ছলনায় অপমানও করিতে জান না। এ চিত্তের সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, হে দেবতা, পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ কর।"

বলা বাহুল্য, রমা কেশবের পত্রের উত্তর দিল না।

৩

সতীশ বি. এল. পাস করিয়া, এই চারি বৎসর আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস করিতেছে। দুইটি কারণে এতদিন সে কুসুমকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। প্রথম কারণ, কৈলাস বাবু পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া নড়িতে চাহেন নাই,—(প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিবার প্রলোভনেও নয়) এবং সতীশের ছেলেটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাহাকে না দেখিয়া থাকা, তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইত। দ্বিতীয় কারণ, আজিকালকার দিনে তরুণবয়স্ক নূতন উকিলের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া সপরিবার সহরে বাস করাটা অত্যন্ত দুঃসাহসিকের কাজ। এতদিন তেমন দুঃসাহস সতীশের ছিল না। এখন কৈলাস বাবু বাঁচিয়া নাই, দুইটি স্ত্রীলোককে পুরুষ-অভিভাবক-শূন্য গৃহে রাখিয়া যাওয়া সতীশ সঙ্গত মনে করিল না, সে পুরাতন ভৃত্য লোচনকে বাড়ী-ঘর দেখিবার ভার দিয়া কুসুম ও রমাকে লইয়া চলিয়া আসিল।

সতীশের বাসা ছিল ভবানীপুরে। সতীশ যখন রমার টেলিগ্রাম পাইয়া, শেষশয্যাশায়ী খুল্লতাতকে দেখিতে গিয়াছিল, তখন তাহার বাসায় ছিল, পাচক রামধন ও উড়িয়া চাকর দধিরাম। পুরুষের বাসা, কিছুমাত্র গোছগাছ নাই, চারি দিকে বিশৃঙ্খলা। সুতরাং রমা আসিয়াই অনেকটা কাজ পাইল। গৃহকর্ম্মে রমা চিরদিনই অগ্রবর্ত্তিনী ও নিপুণা, কুসুম তাহার অনুগামিনী। সতীশ বা কুসুম কাহারও এমন ইচ্ছা নয় যে, যাহার সংসারে কোন বন্ধন বা আকর্ষণ থাকিবার কথা নয়, সে এমনি করিয়া সংসারের খুঁটিনাটিতে আপনাকে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু রমার সঙ্গে তাহারা পারিয়া উঠিত না। রমা যখন অনেকগুলি কাজ আগুলিয়া নিঃশব্দে অথচ দ্রুতভাবে সম্পন্ন করিতে থাকিত, তখন কুসুম আসিয়া তাহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইত; রমা ধীরগম্ভীরস্বরে তাহাকে বলিত, "এদিকে আসতে হবে না তোমার, খোকার খাবার সময় হলো বুঝি; যাও, তাকে খাওয়াওগে।"—অথবা এমনি একটা সহজসাধ্য কাজের ভার তখনই তাহার হাতে তুলিয়া দিত। রমার সেই কথার মধ্যে এমনি একটা সুর থাকিত যে, কুসুম সে কথা কর্ত্রীর আদেশের মত তৎক্ষণাৎ পালন না করিয়া থাকিতে পারিত না।

অল্প দিনের মধ্যেই বাড়ীঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জিনিস-পত্র সাজানগুছান শেষ হইয়া গেল। এমন কি, সতীশের অনেক দিনের পরিত্যক্ত আলনার একধারে সঞ্চিত মলিন

সার্ট ও উড়ানীগুলিও রজকগৃহ হইতে ধৌত হইয়া আসিল। এখন অনেক সময়ে রমাকে অবশ্যকরণীয় কাজের অভাবে অকর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকিতে হইত, একদিন সে সতীশকে বলিল, "রাঁদুনীকে বিদায় করে দাও দাদা, রান্না আমরাই চালাইতে পারব।" সতীশ রমার একথা কাণে তুলিল না। সে তাহার ভগিনী ও স্ত্রীর হাতে স্চ, পশম ও বই যেমন শোভন দেখিত, হাতা-বেড়ি তেমন নয়।

মানুষের চর্ম্ম ও অস্থির আবরণের মধ্যে হৃদয় নামে যে একটা ঘর আছে, সেটাকে কোন মতেই শূন্য রাখা চলে না। সেটাকে রীতিমত ভরিয়া না রাখিলে, মানুষের জীবন একান্ত দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। সতীশ, খোকা ও কুসুমের জন্য রমার হৃদয়ে স্নেহের অভাব ছিল না এবং তাহাদের নিকটও সে অনেকখানি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন তাহার হৃদয়ের শূন্যতা দূর হইতেছিল না। তাই সে শূন্য গৃহ পরিপূর্ণ করিবার জন্য একটা উপায় খুঁজিতে লাগিল। ভবের হাটে মানুষ যখন বার বার ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যায়, তখন আর কোন কিছু না পাইলে অনন্যোপায় হইয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই দাঁড়াইতে চাহে। নরজন্ম দুর্লভ। রমা এজন্মটাকে হেলায় ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহিল না। সে ধর্ম্ম অবলম্বনে দাঁড়াইয়া নিজের অন্তর্জগৎ পূর্ণ করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইল। মানুষের জীবনে ধর্ম্মকে পণ্ডিত ও ধর্ম্মবেত্তারা কোন্ কোন্ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা বা শক্তি কিছুই রমার ছিল না। সে হিন্দু নারীর চিরাচরিত অনুষ্ঠানগুলিকেই জীবনের ধর্ম্ম বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিল। তাহার শয়নকক্ষে কয়েকখানা সুন্দর বিদেশী চিত্র ছিল। সেগুলিকে সে অপসৃত করিয়া, একখানা হরগৌরীর চিত্র সংগ্রহ করিয়া, প্রাচীরে টাঙ্গাইল। চিত্রখানা দক্ষ শিল্পীর অঙ্কিত। শিল্পীর সাধনা সার্থক করিয়া, ভাব যেন সেখানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘনপল্লবযুক্ত বিল্বতরুমূলে বিশ্বেশ্বর বসিয়া যোগতত্ত্ব কহিতেছেন, বিশ্বমাতা তাঁহারই পদতলে বসিয়া একাগ্রমনে তাহা শুনিতেছেন। তুষারশুভ্র শৈলশৃঙ্গ, পত্রবহুল বৃক্ষ ও পুষ্পিত লতাগুলি নব অরুণালোকে ধীরে ধীরে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই গৌরীর লক্ষ্য নাই, পত্নী-জীবনের সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম স্বামিপদে অর্পণ করিয়া—স্বামীর সঙ্গে 'যোগযুক্তাত্ম' হইয়া বসিয়া আছে, এমনি একটা ভাব। প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া, সে কক্ষতল ধুইয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিত। তারপর চন্দন ঘষিয়া, ফুল সাজাইয়া, ধূপ গুগ্‌গুল জ্বালাইয়া, গরদ পরিয়া, ভিজাচুল পিঠে এলাইয়া দিয়া হরগৌরীপূজায় বসিয়া যাইত। কি মন্ত্রে, কি ভাবে পূজা করিত, তাহা সেই জানে, কিন্তু অনেকক্ষণ দরজা খুলিত না। সন্ধ্যার সময়েও তাহার ঘর ধূপ, গুগ্‌গুল ও ফুলের মিশ্র গন্ধে ভরিয়া যাইত। এমনি করিয়া সে প্রভাতে প্রদোষে, স্তব্ধ গভীর নিশীথে দেবতাযুগলের পাদ-পদ্ম হইতে শান্তি ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইতে চেষ্টা করিত। রমার ভাব দেখিয়া সতীশ অনেকটা আরাম বোধ করিল। দিনরাত হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনির চেয়ে নিরালায় বসিয়া ধ্যানপূজা করাটা ঢের ভাল। তবে তাহার মাঝে মাঝে আশঙ্কা হইতেছিল যে, এই দারুণ শীতে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া এবং ধর্ম্মের নামে মাসে চারি পাঁচ দিন উপবাস করিয়া, রমা একটা অসুখ বাধাইয়া না বসে। সে আশঙ্কার কথাটা ব্যক্ত করিতেই রমা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। গঙ্গাস্নান এবং ব্রতনিয়মে হিন্দুর মেয়ের নাকি আবার অসুখ হয়! সতীশ বলিল, "হাস্‌ছিস কেন? জানিস নে, শরীর মাদ্যং—" রমা হাসিয়া উঠিল। বলিল, "হয়েছে, থাম। এতে আমার শরীর নষ্ট হয়নি ত। আজকাল আমি খুব ভালই আছি। অসুখ হবে না, ভয় নেই তোমার।"

সতীশকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কুসুম বলিল, "ও সব করতে ঠাকুরঝিকে বারণ ক'র না তুমি।"

সতীশ একটু বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "কেন কুসুম?"

"তোমার এ বোন্‌টি এমন ধাতেরই নয় যে, কোন কাজ না করে, অমনি বসে থাকবে। বেশী বাড়াবাড়ি করলে হয়ত রাঁধুনীকে বিদায় করে দিয়ে হাতা-বেড়ি নিয়ে বসবে।"

"কিন্তু এমন করলে রোগ হবে যে।"

"ওগো না, তা হবে না। কলেজে পড়ে তোমাদের বুদ্ধি পেকে যায় কি না! তাই মনে কর, ধর্ম্মকর্ম্মে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।"

স্ত্রী ও ভগিনী উভয়ই যখন স্পষ্টভাবে ও ইঙ্গিতে সতীশের বিদ্যাবুদ্ধির দোষ উল্লেখ করিল, তখন সে চুপ করিয়া না থাকিয়া আর কি করিবে ? কেন না, তাহাদের কাছে বিদ্যা জাহির করিয়া জয়ী হইয়া আনন্দ-লাভের আশা ত নাই। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে তর্কে বা বিচারে হারাইয়া সুখী হইতে পারি না।

শীতঋতুটা কাটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয়, রমার মনের কুয়াসাও অনেকটা কাটিয়া গেল। কিন্তু সহসা এক দিন একটা গোল বাধিয়া উঠিল। রমার গঙ্গাস্নান বাদ যাইত না। একদিন সে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিল, দেখিতে পাইল, ঘাটের ধারেই একটা বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া কেশব! এখানেও তাহার সেই অপলক দৃষ্টি রমার অনুসরণ করিতেছে! রমা বাড়ীটা পিছনে রাখিয়া তাড়াতাড়ি অনেক দূর চলিয়া গিয়া, সঙ্গের ঝি মঙ্গলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও বাড়ীটা কাদের জান ?"

মঙ্গলা বলিল, "কোন্ বাড়ীটা ? ঘাটের ধারের সেই বাড়ীটা, যার বারান্দায় একজন সুন্দর বাবু দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেছি ?"

"আমি যে সেই বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করছি, তা কি করে বুঝলে ?"

"বাড়ীটা বেশ সুন্দর কি না, তাই বলেছি। ও বাড়ীটা কাদের তা আমি জানিনে মা ?"

সহরের মধ্যে কেশবের একটা বাড়ী আছে, এখানে আসিয়া সেই বাড়ীতেই সে থাকে। কিন্তু আজ এখানে কেন ? রমা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ কথাবার্ত্তা বন্ধ করায় মঙ্গলা কি ভাবিতেছে, মনে করিয়া, কিছুক্ষণ পরে বলিল, "তোমার ছেলে কেমন আছে ?" মঙ্গলা বলিল, "ভাল আছে মা। তুমি টাকা দিয়েছিলে, তাই ডাক্তার ডাক্‌তে পেরেছিলাম। ডাক্তার খুব ভাল ওষুধ দিয়েছিল গো, দু'দিনে অসুখ ভাল হয়ে গেছে। মা কালী তোমার ভাল করুন, তোমায় রাজরাণী করুন।"

রমা ফিরিয়া আসিয়া পূজায় বসিল। পূজা আর সেদিন শেষ হয় না। অবশেষে কুসুম আসিয়া, রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমার পূজা কি আজ হবে না ঠাকুরঝি ? খোকা যে কেঁদে খুন হচ্ছে, তুমি খাইয়ে না দিলে সে খাবে না। দোর খোল।" অগত্যা রমা তখন দরজা খুলিল। রমার সর্দ্দি হইয়াছিল। সতীশ তাহা জানিতে পারিয়া পরদিন তাহাকে গঙ্গাস্নান করিতে দিল না। ইহাতে রমার মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। সে বলিল, "তবে চল, কালীদর্শন করে আসি ?"

সে দিন রবিবার। রমাকে খুসী করিবার জন্য সতীশ যাইতে প্রস্তুত হইল। তাহার মুখ ধুইতে, চা খাইতে, কাপড় পরিতে, প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল, ততক্ষণে রমা তাহার নিত্য পূজা সারিয়া লইল। সতীশ প্রস্তুত হইয়া রমাকে ডাকিল। রমা আসিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল। হাতে এক সাজি সচন্দন পুষ্প, পরিধানে কৌষেয় বাস, চন্দন-চর্চ্চিত ললাট, মুখে শক্তির ছায়া ; দেহ অলঙ্কারভারে পীড়িত নহে, হাতে সধবার চিহ্ন-স্বরূপ অতি সামান্য দু'খানি অলঙ্কার। সে মূর্ত্তি ক্ষণকালের জন্য সতীশের চিত্তে শ্রদ্ধা-সমন্বিত সম্ভ্রমের ভাব জাগাইয়া দিল। সে রমাকে লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী যথাস্থানে পৌছিল। গাড়ী বাহিরে রাখিয়া তাহারা মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। সতীশ নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েকটি পরিচিতা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সঙ্গে রমা পূজা-প্রদক্ষিণাদি করিতে গেল। পূজা-প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া রমা মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়া, শেষবার প্রণাম করিয়া, সতীশের অবস্থিতি জানিবার জন্য নাটমন্দিরের দিকে চাহিল। দেখিল, সতীশের নিকট কেশব দাঁড়াইয়া আছে ; উভয়ের কি কথা হইতেছে। সে চক্ষু ফিরাইতেই তাহার দৃষ্টির সঙ্গে কেশবের উৎসুক দৃষ্টির বিনিময় হইয়া গেল।

৪

তারপর খুব দ্রুতগতিতে একটি মাস চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে চারি পাঁচ দিন কেশব ভবানীপুরে সতীশের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে, অবশ্য সতীশের সাদর নিমন্ত্রণ উপলক্ষেই আসিয়াছে। সতীশও কয়েক দিন কেশবের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া বেড়াইয়া আসিয়াছে। কেশব—সতীশ ও কুসুমের বহুদিনের আত্মীয় হইলেও তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় অল্প দিনের। অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা এই নবপরিচিত পুরাতন আত্মীয়টির পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। সতীশের তিন বছরের ছেলেটির সঙ্গেও কেশব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কেহ খোকার

নিকট যদি জিজ্ঞাসা করিত, 'কাকে বেশী ভাল বাসিস ?'—তবে সে পিসীমার কথাই বলিত। এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, সে দ্বিধাশূন্যচিত্তে অম্লানবদনে কেশবের কথাই বলিয়া থাকে। বর্ত্তমানে কেশবের আচরণ দেখিয়া, সতীশ ও কুসুম কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে, এত দিন সে কেন রমার খোঁজখবর লয় নাই। সতীশের সঙ্গে কেশবের এই নূতন ঘনিষ্ঠতার কারণ বুঝিবার জন্য রমাকে বেশী ভাবিতে হইল না। কাজেই এ ঘনিষ্ঠতা তাহার কোন রূপে বাঞ্ছনীয় হইল না। আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে, সে কথাটা সতীশ বা কুসুমকে বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। নিষ্ফল ক্রোধ তাহার অন্তরের মধ্যে একবার গর্জ্জিয়া উঠিয়াই থামিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্ধ ছিল। বৈকালে সতীশ তাহার বসিবার ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। তাহারই পাশের ঘরে বসিয়া রমা খোকার সঙ্গে খেলা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়াই রমা বুঝিতে পারিল, কেশব সতীশের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেছে। সে উঠিয়া তাহার নিজের ঘরে যাইয়া সূচ ও পশম লইয়া বসিল। সে ঘর হইতেও অস্পষ্টভাবে সতীশ ও কেশবের কথোপকথন শুনা যাইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে কুসুম সেখানে আসিয়া বলিল, "খোকার সঙ্গে খেলা করছিলে দেখলাম, এরি মধ্যে সূচ নিয়ে বসে গেছ! ও হরি! একি করেছ ঠাকুরঝি, সবুজের ঘরগুলিতে জরদ দিয়ে ভরে দিয়েছ ?"

রমা নিজের অসাবধানতা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "তাই ত! খুলতে হলো দেখছি।"

"পরশু যে খোকার একটু অসুখ করেছিল, তাই কা'র কাছে শুনে ঠাকুর-জামাই তাকে দেখতে এসেছেন।"

"খোকা ত আজ ভালই আছে। সেদিন আলিপুরের বাগানের সব জন্তুগুলি ভাল করে দেখা হয়নি, আজ চল না একবার বেড়িয়ে আসি।" "বেশত, চল। গাড়ী-ভাড়াও লাগবে না, ঠাকুর-জামাইয়ের গাড়ীতেই যাওয়া যাবে।"

রমা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে কেশব আসিয়া ডাকিল, "বৌ দিদি!"

কুসুম ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আসুন, ভিতরে আসুন।" কেশব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। কুসুম তাহাকে বসিতে আসন দিল। রমা আর তখন উঠিয়া যাইতে পারে না, অগত্যা একটু বসিতে হইল। কেশব আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি, গাড়ীর কথা কি বল্‌ছিলেন ?"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "আমরা বলছিলাম কি, আপনার গাড়ী নিয়ে আমরা চিড়িয়াখানা দেখতে যাব, আপনি ততক্ষণ আমাদের ঘরে পাহারায় থাকবেন।"

রমা যে কেশবের গাড়ীতে বেড়াইতে চাহিয়াছে, একথা রমা স্বয়ং বলিলেও কেশব বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ। কেশব কিছু বলিল না। রমা মনে মনে কুসুমের উপর চটিয়া লাল হইল। কেশব সেখানে উপস্থিত না থাকিলে, কুসুমের কি দশা হইত, বলা যায় না। কুসুম "পান নিয়ে আসি" বলিয়া, উঠিয়া গেল। রমার রাগ আরও বাড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, যেন অনেক চেষ্টা করিয়া, কেশব মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বেড়াতে যাবে? যাও না। আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে থাক্‌ব। আমার গাড়ী নিয়েই যেতে পার।"

রমা সংক্ষেপে "না" বলিয়া নিঃশব্দে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। কুসুম আর আসে না। পান তৈয়ারী করিতে কতক্ষণ লাগে? এক একটা মুহূর্ত্ত রমার কাছে একটা যুগের মত বোধ হইতেছিল, আর তাহার নীরব ক্রোধের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। খানিক পরে একটা মৃদু নিশ্বাসের শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কেশবের আয়ত উজ্জ্বল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থাপিত। সে সূচ-সূতা টেবলের উপর রাখিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বৌদিদি বুঝি আসবে না; আমি পান নিয়ে আস্‌ছি।"

কেশব বলিল, "না, না, পানে দরকার নেই। শোন, একটা কথা আছে।"

রমা একটু বিস্মিত হইয়া, একটু সরিয়া গিয়া, দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইল। টেবলের উপর একখানা আল্‌বম্ ছিল, কেশব সেখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "মনে করছি, একবার পশ্চিমে বেড়াতে যাব।" কেশব উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুকাল অধীরভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া, শেষে হতাশ হইয়া বলিল, "কবে যাব, কবে ফিরব, কৈ কিছুই ত জিজ্ঞেস করলে না?"

তাহাতে রমার কিছু দরকার আছে নাকি ? তবু শিষ্টাচারের খাতিরে সে বলিল, "কবে যাওয়া হবে ?"

"চা'র পাঁচ দিনের মধ্যেই বোধ হয়।"

"ফিরতে কি বেশী দেরী হবে ?"

"হ'তে পারে, নাও হ'তে পারে ; ঠিক করে বলতে পারলাম না এখন।" কেশব আরও কি বলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু বলা হইল না ; তখন কুসুম—মিষ্টান্নের থালা ও জলের গ্লাস এবং মঙ্গলা—আসন ও পানের ডিবা লইয়া সেই ঘরে আসিল। দেখিয়া রমা মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কেশব যে দিনই রমার সঙ্গে দেখা করিয়াছে, সেই দিনই পুঞ্জীভূত অনাদর ও উপেক্ষার জ্বালা ও বেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে যে, তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল না তাহা নহে, কিন্তু কি করিবে ? উপায় নাই! রমা একেবারেই তাহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রমা কোন সময়ে নিতান্ত অনাবশ্যক জিনিসের মত তাহার অন্তঃপুরের একধারে পড়িয়াছিল, সেই রমাই যে, একদিন তাহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় হইয়া বসিবে, এ সম্ভাবনা ইহার পূর্ব্বে তাহার মনের কোণে একদিনও জাগে নাই। রমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়ে অপরাধী কেশবের লজ্জা ও সঙ্কোচের গুরুভার কুসুম ও সতীশ কৌশলে খানিকটা লঘু করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কেশব সে আলাপ-পরিচয়ের বিনিময়ে কি পাইয়াছে ? কল্পনাতীত বিষম বিতৃষ্ণা। ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কি সে যাচিয়া এই উপেক্ষার গুরুভার বুকে চাপাইয়া দিত ?

টেবলের উপর একখানা আলবম্ ছিল, কেশব সেখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "মনে করছি, একবার পশ্চিমে বেড়াতে যাব।"

সে দিন কেশবের থিয়েটারে যাইবার কথা ছিল। বন্ধু-দলের দুই তিন জন সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে থাকিত। যথা-সময়ে তাহাদের একজন আসিয়া বলিল, "কেশব বাবু চল—এখন যাওয়া যাক।"

কেশব বলিল, "অসুখ করেছে—যাব না আমি ; তোমরা যেতে পার।" বন্ধু কেশবের ভাব দেখিয়া ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিস্মিত হইল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কেশব বলিল, "আজ বাড়ী যাব। তখনই ভৃত্যমহলে উদ্যোগ-আয়োজন ও মোট বাঁধিবার সাড়া পড়িয়া গেল।

কেশব রামনগরে পৌঁছিয়াই তাহার প্রতিবেশী ও বাল্যকালের বন্ধু সুধীরকে ডাকিয়া পাঠাইল। বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থায় সুধীরের সঙ্গে কেশবের বন্ধুত্বটা খুব ঘনিষ্ঠ

হইয়া উঠিয়াছিল; তারপর কেশবের যখন আরও অনেক বন্ধু জুটিয়া গেল এবং সে যখন নূতন বন্ধুবর্গের উৎসাহে নিজের জীবনের গতি ভিন্ন পথে পরিচালিত করিল, তখন সুধীর গতিক ভাল নয় দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িয়াছিল। কেশবের সঙ্গে এখন তাহার তেমন ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও, কেশবের দৃঢ় বিশ্বাস, সুধীর ধার্ম্মিক ও তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী। সুধীর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডেকেছ কেন কেশব?"

কেশব বলিল, "বস। কিছু ভাল লাগে না, তাই তোমাকে ডেকেছি।" কেশব যে সোফায় বসিয়াছিল, সুধীর তাহারই এক পাশে বসিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "কিছুই ভাল লাগে না? নাচ গানও নয়?—ইয়ার দলের চাটুবাদও নয়?"

"না, কিছু না।"

"তবে ত বড় মুস্কিলের কথা। ব্যাপারখানা কি?"

"ঠাট্টা ক'রনা ভাই, আমার মন বড় খারাপ হয়ে আছে। কেন যে এমন হয়েছে, তাও ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

কেশবের স্বরে আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া, সুধীর মনে করিল, বড় রকমের একটা কিছু হইয়াছে, নিশ্চিত। প্রকাশ্যে বলিল, "তা আমাকে কি করতে হবে?"

"পশ্চিমে বেড়াতে যাব, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। যাবে ত?" বলিতে বলিতে কেশব সুধীরের ডানহাতখানি তুলিয়া নিজের কোলের উপর রাখিল। সুধীর খানিক চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল; তারপর বলিল, "তোমার নলিন, বিপিন, নরেন প্রভৃতি সঙ্গে যাচ্ছে ত?"

কেশব হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই, তারা কেউ যাবে না। তুমি, আমি, আর একটা রাঁধুনি ও চাকর। বুঝলে?"

বহুদিন পরে বন্ধুর আহ্বান পাইয়া, সুধীর বাড়ী হইতেই কিছু বিস্মিত হইয়া আসিয়াছেন। এখন এই নূতন সখের কথা শুনিয়া, তাহার বিস্ময়ের মাত্রা চরমে উঠিল। কিন্তু কেশবের কাতরতায় সে কেশবের সঙ্গে যাইতে অস্বীকৃত হইতে পারিল না।

৫

সময়ে সময়ে এক রকমের লোক দেখা যায়, তাহারা নামিতেও যেমন তৎপর, উঠিতেও তেমনি। পতনের নিম্নস্তর হইতে তাহাদের অদ্ভুত উত্থান সমাজের দৃষ্টিতে বিস্ময়পূর্ণ বোধ হয়। কেশবও অনেকটা সেই প্রকৃতির লোক। সে যখন পূর্ণ এক বৎসর পরে রামনগরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাকে অদ্ভুত পরিবর্ত্তিত দেখিয়া, রামনগরবাসীরা আশ্চর্য্য বোধ করিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলাবলি করিতে লাগিল, তীর্থদর্শনের—দেবদর্শনের কি ফল দেখ!" ইয়ার-দল কেশবের ভাব দেখিয়া তাহার অসাক্ষাতে বলিতে লাগিল, "সুধরে বেটা নিশ্চয়ই কেশবকে যাদু করেছে।"

কোন কোন ব্যক্তির অন্ধকার নীরস জীবনক্ষেত্রের অলক্ষ্যে দেবতার করুণালোক ও আশীর্ব্বাদ-ধারা পড়িয়া, তাহা এমন অভাবনীয়রূপে উজ্জ্বল ও সরস হইয়া উঠে যে, তাহারা নিজেরাই তাহাতে অতিশয় বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কেশব নিজেই যখন তাহার নবজীবনের নূতনত্ব অনুভব করিতে লাগিল, তখন সে ইহাকে দেবতার অযাচিত আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারিল না। সে এতদিন যাহাকে সুখের চরম আদর্শ বলিয়া মনে করিত, এখন তাহার স্মৃতিও তাহাকে দারুণ লজ্জা ও বেদনা দিতে লাগিল। এই বেদনা শান্ত করিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি স্বগৃহে ছুটিয়া আসিল। গৃহে কাহার নিকট—কোথায় শান্তি পাইবে? গৃহ শূন্য—একেবারেই শূন্য! যে মা তাহাকে পতিত বলিয়া, তাহাকে বিন্দুমাত্র ঘৃণা করা দূরে থাক্,—তাঁহার জীবনের সমস্ত স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা সেই পতিত পুত্রের উদ্দেশেই অর্পণ করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি আজ নাই! মাতার মৃত্যুসময়ে কেশবের শোক হয় নাই বলিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়, কিন্তু সে শোক আজ যেমন তাহার বুকে বাজিতেছে, তখন তেমন বাজে নাই। আজ মা বাঁচিয়া থাকিলে, তাঁহার মমতা ও সান্ত্বনার স্রোতে তাহার সমস্ত বেদনা ভাসিয়া যাইত, তাহার সব জ্বালা জুড়াইয়া যাইত।

একদিন কেশব দ্বিতলের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল, রাস্তায় কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া কি বলাবলি করিতেছে। অনেক লোক এক সঙ্গে কথা কহিতেছে, কাজেই একটা গোল বাধিয়া উঠিয়াছে। কেশব কৌতুহলী হইয়া একজন ভৃত্যকে বলিল, "ওখানে ওরা কি করছে, দেখে আয় ত।" ভৃত্য চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া

আসিয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই,—বিধু-নাম্নী একটি স্ত্রীলোক,—যৌবনে সে চরিত্রহীনা ও অপ্রিয়ভাষিণী ছিল। ইদানীং বার্দ্ধক্যে সে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, বাতরোগে তাহার একখানা পা অবশ হইয়া গিয়াছে, লাঠি ভর দিয়া চলিয়া থাকে। এখন ভিক্ষা তাহার উপজীবিকা। গাঁয়ের সকল লোক তাহার প্রতি বিরক্ত ও কুপিত, ভিক্ষাও সে সহজে পায় না। আজ ক্ষুধার জ্বালায় জ্বর গায়েই সে অতিকষ্টে ভিক্ষা করিতে যাইতেছিল,—জ্বরের কষ্টে, পায়ের অবশতায় সে নর্দ্দমার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কেহই তাহাকে উঠাইতে চাহিতেছে না, সেও নিজে উঠিতে পারিতেছে না। লোকগুলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে। শুনিয়া কেশব বলিল, "ওকে তুলে নিয়ে আয়। একলা না পারিস, আর একজনকে ডেকে নিয়ে যা। ওকে চার পাঁচদিনের খাবার দিয়ে দিস, জ্বর আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত ওকে যেন ভিক্ষেয় বেরুতে না হয়।"

ভৃত্য প্রভুর আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। কেশব ভাবিতে লাগিল, "হায় অন্ধ মানুষ! তোমরা পদে পদে কত শত অপরাধ করিতেছ, ভগবান্ যদি তাহার সাজা দিতেন, তাহা হইলে শতশত জন্ম তোমাদের নিরবচ্ছিন্ন সাজা-ভোগই করিতে হইত। অপরাধের তুলনায় আমরা অতি অল্পই শাস্তি পাই। দেবতার এমন করুণা ও ক্ষমা পাইয়াও আমরা মানুষকে ক্ষমা করিতে শিখি না।"

রাত্রিতে সে দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "দেখুন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, মা'র আত্মার প্রীতির জন্য একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করি, আর তার সঙ্গে একটা অনাথ আশ্রম স্থাপন করি। আশ্রমে অনাথ-অনাথারা প্রত্যহ দেবতার প্রসাদ পাবে।"

কেশবের প্রপিতামহের "ঠাকুরবাড়ীতে" অনেক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সে সব দেববিগ্রহের দৈনিক পূজা-ভোগাদিতে বৎসরে অনেক টাকা ব্যয় হয়। আবার একটা দেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতকগুলি আলসে-কুঁড়ের খাওয়ার সুবিধা করিয়া দিলে যে বাবুর কি লাভ হইবে, দেওয়ানজি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু বাবুর ইচ্ছার গতিরোধ করা যে অসাধ্য, তাহাও তিনি এখানে কুড়ি বৎসর কাজ করিয়া উত্তমরূপেই বুঝিয়াছেন; তাই তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "এ ত অতি সদিচ্ছা।"

পরদিনই মন্দির ও আশ্রম-নির্ম্মাণের আয়োজন আরম্ভ হইল। এই কাজে হাত দিয়া কেশবের মনে হইল, গরিবের ছেলেদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিলে বেশ হয়। সঙ্কল্প মাত্র তাহাও কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। মন্দির, আশ্রম, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্য অনেকগুলি রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত হইল। কেশব প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা বসিয়া তাহাদের কাজ দেখিত এবং তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাহাদের পারিবারিক সুখদুঃখের কথাগুলি শুনিত। প্রত্যহ বৈষয়িক কাজও দেখিত, কোন কোন দিন বা অশ্বারোহণে ভ্রমণচ্ছলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে যাইয়া প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া আসিত এবং তাহাদের অভাব দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। দেখিয়া শুনিয়া মধ্যে মধ্যে সুধীর হাসিয়া বলিত, "চিরদিনের অভ্যস্ত কাজগুলি ছেড়ে দিয়ে, এ কি করছিস রে কেশব? এ সব তোর ধাতে সইবে নারে;—চট ক'রে মরে যাবি! তা হলে আমার কিন্তু ভারি দুঃখ হবে। তোর ওস্তাদজীর সেতারের সুমিষ্ট ভৈরবীর আলাপ আর শুনতে পাব না।"

মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ শেষ হইতে বছর খানেক লাগিল। এই এক বৎসর কেশব তাহার দেহ ও মনকে বড় বিশ্রাম দেয় নাই। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের কাজ আরম্ভ করা হইবে, স্থির করা হইল। মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। চতুর্দ্দশীর দিন সন্ধ্যার পরে কেশব চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ইদানীং সুধীর অনেক সময়েই কেশবের গৃহে আসিত। তখন সে আসিয়া বলিল, "একা বসে কি ভাবছ কেশব? তোমার ওস্তাদজী কোথায়?"

কেশব বলিল, "এসেছিল, বিদায় করে দিয়েছি। ভাল লাগে না।"

"আবার মন্দ লাগল কেন? এত দিন ত বেশ ছিলে!"

"কেন যে, ভাল লাগে না, তা ঠিক করে বলতে পারিনে, কিন্তু ভাল যে লাগে না তা ঠিক। কাল হ'তে এসব কাজ শেষ হয়ে যাবে, পরশু কি করব, ভাবছি।"

"তোমার এই ক'টা কাজ ছাড়া দুনিয়ায় বুঝি আর কোন কাজ নেই?"

"থাক্, তাতে আমার কি? আমার কিছু ভাল লাগে না, আমি আর এখানে থাক্‌ছিনে; পরশু কোথাও চলে যাব।"

"আবার কোথায় যাবে? ফিরবে কবে?"

"কোথায় যাব তা এখনো ঠিক করিনি; ফিরতে ইচ্ছা নেই। কেনই বা ফিরব? গৃহে আমার কিসের বন্ধন?"

"কেন— তোমার স্ত্রী ত আছে?"

"স্ত্রী! সে আমাকে ঘৃণা করে।"

"স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করে, এও কি সম্ভব?"

"সম্ভব নয় কেন? আমি ত ঘৃণার যোগ্য।"

"তবু ঘৃণা করেন না, ভুল বুঝেছ। তুমি বরাবর তাঁর প্রতি অবিচার ক'রেছ, এখন আর কোর না।"

কেশব মনে মনে বলিল, "হায়, অবিচার করিব! এত দিন যাহা করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইয়া কি আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, তাহা যদি তুমি জানিতে! রমা সব করিতে জানে, শুধু ক্ষমা করিতে জানে না।" সুধীর ভিতরের খবর কিছু জানিত না। সে বলিল, "তোমার স্ত্রীকে আন্‌তে আজই লোক পাঠাও না কেন?"

কেশব মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর যা বল, সব পারব, শুধু ঐটি পারব না, সুধীর, মাপ কর।"

একগুঁয়ে কেশবকে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্ফল বুঝিয়া সুধীর অন্য কথা পাড়িল।

পরদিন কেশব খুব ভোরে উঠিল। সেদিন তাহাকে অনেক কাজ দেখিতে শুনিতে হইবে। মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বহু লোক তাহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা-সময়ের কিছু পূর্ব্বে পুরোহিত কেশবকে বলিল, "বাবু, সময় হলো, এখন স্নান করে আসুন।
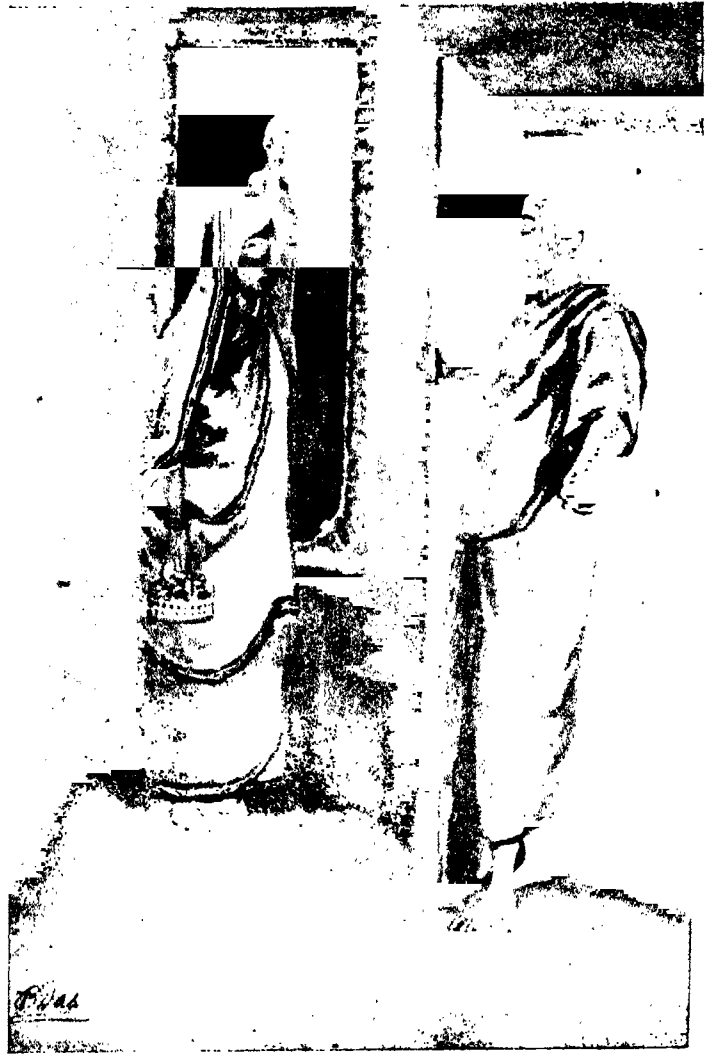
কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া স্মিতমুখী রমা—মন্দিরের সেই পূজার্থিনী মূর্ত্তি!

কেশবের মাতার শয়নকক্ষে কেশবের পিতামাতার বৃহৎ তৈল-চিত্র রক্ষিত ছিল। সে স্নান করিয়া, সেই চিত্র-তলে প্রণাম করিবার জন্য অন্তঃপুরে গেল। কক্ষের দ্বারে আসিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া স্মিতমুখী রমা—মন্দিরের সেই পূজার্থিনী মূর্ত্তি! কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে কাটিল। তারপর রমা ধীরভাবে অগ্রসর হইয়া, স্বামীকে প্রণাম করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "অমন করে চেয়ে আছ কেন? তোমার অনুমতি না নিয়ে এসেছি, তাই কি রাগ করলে?" কেশব তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। বলিল, "রাগ! রমা, এক সময়ে তোমাকে পেলে, বোধ হয়, জগতে আর

কিছুই চাইতাম না, কিন্তু এখন আমার জীবনের অন্য পথ স্থির করে ফেলেছি। কেন এসেছ তুমি?"

রমা হাসিল। বলিল, "তাও আবার বলতে হবে? শুনেছি, এখন তুমি একাগ্রমনে কেবল ধর্ম্মাচরণ করছ। আমিও তোমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করতে এসেছি, মনে কর।"

"আমি ত ঘৃণার্হ রমা, আমার সঙ্গে কি ধর্ম্মাচরণ করবে তুমি? তুমি ত অনেক দিন আগেই ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করেছ!"

"তা যদি পারতাম! চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি। তুমি আমায় পায়ে ঠেলে ছিলে বলেই ভগবানের পায়ে শান্তি চাইতে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া আমার আর কি উপায় ছিল?"

"আমি ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েছিলাম।"

"তুমি যে অপরাধের কথা বলছ, সে অপরাধের বিচার করিবার ইচ্ছা তখন আমার না থাকলেও আমি তখনি বুঝে ছিলাম, তুমি আজ যা বলছ তখন তা তোমার মনেও হয় নি। এ কথাটা তোমাকে আজও বোঝাতে হবে? রাগ-অভিমান সব মানুষেরই আছে; আমিও মানুষ—যাক্ সে কথা। আমার দেবপূজা নিষ্ফল হয় নি। দেবতার আশীর্ব্বাদে আমি আজ যা পেয়েছি, তার বিনিময়ে কোন দিন দেবতাকেও চাই নি। তোমার যদি কোন কাজ থাকে, তবে তুমি যেতে পার। আমি থাক্‌তে এসেছি, যাব না নিশ্চয়ই। আমাকে তাড়াবার জন্যে দাঁড়িয়ে থেক না।" বলিয়াই রমা সেই কক্ষের বিশৃঙ্খল আসবাবগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল, কেশবের পানে আর ফিরিয়াও দেখিল না। কেশব বিহ্বলদৃষ্টিতে নির্ব্বাক হইয়া, রমার কার্য্য দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া কেশবকে জানাইল যে, পুরোহিত বলিতেছেন, প্রতিষ্ঠার শুভ সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

রমা ফিরিয়া বলিল, "যাও তুমি।"

কেশব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমার হাত ধরিয়া বলিল, "এস রমা, মা ও বাবাকে প্রণাম করি।" উভয়ে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে সেই চিত্রতলে প্রণত হইল।

ভালবাসা

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

বুঝি তাই এসেছে,
　　সে যে ভালবেসেছে!
সে যে　সকল হৃদয় নিয়ে,
　　চরণে লুটায়ে দিয়ে,
　　নিমিষে আপনা ভুলে—
　　　　ভালবেসেছে!
সে যে　সরম বাঁধন টুটি,
　　ছল ছল আঁখি দুটি,
　　মুখপরে রাখি ধীরে,
　　　　ম্লান হেসেছে!
সে যে　　ভালবেসেছে!

কবে কোন্ নদীকূলে,
কি জানি কি এক ভুলে,
কাহারে নয়ন তুলে,
　　শুধু দেখেছে!
কোথাকার দুটি আঁখি,
জোছনার সনে মাখি,
স্বপনের ডোরে আঁকি,—
　　বুকে রেখেছে!
জনমের তরে সে যে
　　ভালবেসেছে!

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

[শ্রীজলধর সেন]

গ্রহাচার্য্য মহাশয় যেমন প্রতি বৎসরের আরম্ভ সময়ে নূতন পঞ্জিকা গৃহে গৃহে পাঠ করিয়া থাকেন, আমাকেও দেখিতেছি, তেমনই প্রতি বৎসর একবার করিয়া উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কথা 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকাগণকে শুনাইতে হয়। তবে গ্রহাচার্য্য মহাশয় তদুপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য লাভ করিয়া থাকেন; আমার ভাগ্যে তৎপরিবর্ত্তে যাহা মিলিয়া থাকে, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নহে। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, মামুলী প্রথা আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। অতএব আপনারা এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ শ্রবণ করুন।

এবার রাজসাহীতে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরে যখন পাবনায় উক্ত সম্মিলনের বৈঠক হয়, তখন নাটোরাধিপতি পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর নাটোর রাজধানীতে সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করেন। এ অধমও তদুপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছিল। আমরা সকলেই জানিতাম, এবার উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন নাটোরেই হইবে। কিন্তু সম্মিলনের কিছু দিন পূর্ব্বে শুনিতে পাইলাম যে, খোদ রাজসাহীতেই অধিবেশন হইবে; সব ডিবিজনে না হইয়া, একেবারে জেলার উপরই সম্মিলনের বৈঠক বসিবে। এ পরিবর্ত্তন কেন হইল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমাদের নাই, আর সে কারণ জানিবারও প্রয়োজন নাই; কারণ, রাজসাহী জেলার উপর না হইয়া, যদি 'চলন বিলের' মধ্যে সভার অধিবেশন করিয়া, নাটোরাধিপতি আমাদিগকে সেখানেই যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন, আমরা সেখানেই যাইতাম; অন্ততঃ আমি ত যাইতাম।

এবার দোলযাত্রার ছুটিতে সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। দোলযাত্রার ছুটি কিন্তু একদিন; তাহা হইলে কি হয়, সেই দিনটা যে সোমবার; সুতরাং রবি ও সোম এক সঙ্গে মিলিয়া দুইদিনের ছুটি হইয়াছিল। এই দুই দিনের সুবিধা পাইয়া, রাজসাহীর সাহিত্যিকগণ সম্মিলনের আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোন অপরাধ নাই; কিন্তু যাঁহারা দূরদেশে থাকেন, তাঁহাদের যাতায়াত ত দুই দিনে শেষ হয় না, তাহার উপায় কি? ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ভাগলপুর, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানের বেকার সাহিত্যিকগণ অবশ্যই যে কোন সময়ে আসিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা পেটের দায়ে দশটা হইতে ছয়টা অর্থোপার্জ্জন করেন এবং সখের দায়ে অথবা প্রাণের টানে সাহিত্য-সেবা করেন, তাঁহারা এই দুইদিনের ছুটিতে সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন না। সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তাদিগেরও কোন হাত নাই; হাটের পরদিন পিতৃশ্রাদ্ধের দিন স্থির করা ত সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না। তবুও এবার রাজসাহীর অধ্যক্ষগণ একটা কাজ করিয়াছিলেন;—শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন যে, শিক্ষাবিভাগের কেহ যদি এই সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য দুই একদিনের বিদায় প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রার্থনা যেন মঞ্জুর করা হয়। সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু আর কোন বিভাগ ত সাহিত্যের ধার ধারেন না;—জজ সাহেব, কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব, কি সওদাগর কোম্পানী—এই সম্মিলন উপলক্ষে কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় দিবেন কেন? এ অসুবিধা কোন প্রকারেই দূর করা যায় না।

আমি কিন্তু নিমন্ত্রণ পাইবার পূর্ব্ব হইতেই রাজসাহী যাইবার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলাম। তাহার একটু বিশেষ কারণ আছে। রাজসাহী আমার বাড়ী বা আমার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে হইলেও ঐ স্থানটির সহিত আমার একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমার আবাল্যবন্ধু ও সখা শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া আমার স্বগ্রামবাসী হইলেও এখন

রাজসাহীর স্থায়ী অধিবাসী। আজ ৪০ বৎসর কাল—অবসর পাইলেই—হয় আমি রাজসাহীতে যাই, আর না হয়, অক্ষয় ভায়া আমার কাছে আসেন। এ অবস্থায় আমি যে, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়াই রাজসাহীতে যাইবার কেন সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার যুক্তিযুক্ততা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সুবক্তা, প্রধান সাহিত্যিক ; তিনি এখন "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি"র কর্ণধার। এ সকলের জন্য তিনি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন ; কিন্তু তিনি এখনও আমার 'অক্ষয়'—আর আমিও এখনও তাঁহার 'জলদা'।—থাক্, সে কথা আর অধিক বলিব না।

রাজসাহীতে যাওয়া স্থির করিলাম। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। বয়স গুণে আমিও তাঁহার 'দাদা' শ্রেণীভুক্ত। এ অবস্থায় আমার রাজসাহী যাওয়ার সঙ্কল্প যে দৃঢ়তর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! কলিকাতার সাহিত্যিকগণের কেহ কেহ যাইবেন বলিলেন, কেহ কেহ বা অনেক খঞ্জ আপত্তি (lame excuse) উত্থাপন করিলেন, কেহ কেহ বা একেবারে ঝাড়া জবাব দিলেন। তবুও পাঁচ সাত জন সঙ্গী পাইবার আশা হইল।

প্রথমে শুনিলাম, কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলনীর সভাপতি হইবেন। তাহার পর অবগত হইলাম যে, তিনি যাইতে পারিবেন না, কারণ তৎপূর্ব্বেই তিনি নাকি জাপান, চীন প্রভৃতি দেশভ্রমণে গমন করিবেন। আরও শুনিলাম, তিনি যদি দেশে থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয় যখন সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন রাজসাহীর কর্ম্মকর্ত্তা-মহলে খুব একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। যে পদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিবেন বলিয়া চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল, সে পদে এখন কে বসিবে, এই কথা লইয়া চারিদিকে—অবশ্য সাহিত্যিক মহলে,—একটা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল ; নানাজনে নানা লোকের নাম আঁচিতে লাগিলেন। অবশেষে আমরা শুনিলাম যে, বারিষ্টার-প্রবর, বীরবল-আখ্যাধারী, 'সবুজপত্রের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সত্য কথাই বলি, সংবাদটা শুনিয়া, কেহ বা দুর্ব্বাক্য বলিলেন, কেহ বা নাক সিঁটকাইলেন, কেহ বা বলিলেন, 'যাক্ মন্দের ভাল ত!' আমার মত নগণ্য ব্যক্তির মতের কোন মূল্য নাই, তাহা জানি। তবুও অনেক সময় 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' সাজিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি না। আমি কিন্তু মত প্রকাশ করিলাম যে, এ নির্ব্বাচন অতি সুন্দর হইয়াছে ; আমার পক্ষের প্রমাণ—'বয়সেতে বৃদ্ধ নয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে।' শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় যে, পণ্ডিত ব্যক্তি ও চিন্তাশীল সাহিত্যিক, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে তাঁহার ও তাঁহার 'বীরবলী' ভাষা লইয়া আজকাল বেশ একটু হৈ চৈ হইতেছে। তাহা হউক না, তাহাতে কি আসে যায়? বহুভাষাবিৎ, সুপণ্ডিত চৌধুরীকে সেই ভাষার অজুহাতে আমি ত কিছুতেই অযোগ্য বলিতে পারিব না। বুড়াদের কাল চলিয়া গিয়াছে, এখন 'সবুজের' আমল। সেই আমলের একজন প্রধান রথীকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের আসন প্রদান করিয়া, রাজসাহী-সম্মিলন খুব ভাল কাজই করিয়াছেন, এ কথা আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি।

২৮এ ফেব্রুয়ারী রবিবারে সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল ; আমরা ২৭এ শনিবার রাত্রির গাড়ীতে লালগোলা ঘাট হইয়া, রাজসাহী গমনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। মঙ্গলবারে শ্রীমান্ অক্ষয়ের এক পত্র পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। অক্ষয় লিখিয়াছেন, রবিবারে তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, আমি একেবারে উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িলাম, রাজসাহী যাইবার আর ইচ্ছা হইল না। তাহার পর হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, পরবর্ত্তী বুধবারে অক্ষয়ের মাতার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। আমাকে বিশেষ কার্য্যবশতঃ বুধবারে কলিকাতায় থাকিতেই হইবে। আমি স্থির করিয়াছিলাম, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে সম্মিলনের অধিবেশন শেষ হইলেই রাজসাহী ত্যাগ করিব এবং পরদিন প্রাতঃকালে কলিকাতায় পৌঁছিব। কিন্তু এখন দেখিলাম, বুধবারে শ্রাদ্ধ, অথচ আমাকে তাহার পূর্ব্বদিনই চলিয়া আসিতে হয়। এই সমস্ত কথা ভাবিয়া অক্ষয়কে পত্র লিখিলাম। অক্ষয় লিখিলেন যে, অন্ততঃ একদিনের জন্য আমাকে

পাইলেও তিনি শান্তিলাভ করিবেন। তখন যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হইলাম।

ইহার মধ্যেই বর্দ্ধমান হইতে সংবাদ পাইলাম যে, আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ, বি. এ. মহাশয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রতিনিধিরূপে রাজসাহী-সম্মিলনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন। তিনি আমার সঙ্গী হইবেন। তিনি শনিবার বোম্বে মেলে কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং রাত্রি সওয়া নয়টার গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাইবেন। যাহা হউক, একজন সঙ্গী ত পাওয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর বাবু, শনিবার অপরাহ্নকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং এই ব্যবস্থা হইল, আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। সেই সময়েই সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়গণও সেই রাত্রির গাড়ীতেই আমাদের সঙ্গী হইবেন। নাটোরের মহারাজ বাহাদুর এবং সভাপতি চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বদিনই গমন করিয়াছিলেন।

রাত্রি সওয়া নয়টার সময় লালগোলার গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে ছাড়ে। আমি আটটার একটু পূর্ব্বেই সিদ্ধেশ্বর বাবুর সন্ধানে হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সিংহ মহাশয়ের বাসায় চলিলাম। সেখানে যাইয়া দেখি, বড় একটা মজলিশ বসিয়া গিয়াছে; হাইকোর্টের পাঁচ ছয়টি উকিল উপস্থিত আছেন, দিঘাপাতিয়ার রাজা-বাহাদুরের জামাতা বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ও রহিয়াছেন। তখন আমরা সেখানেই একটা বেশ সম্মিলন করিয়া বসিলাম। কিন্তু আমরা ত অনেকক্ষণ এ সম্মিলনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিব না। তাই সজনী বাবুকে একখানি গাড়ী ডাকিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি কিন্তু কাজটা একেবারে উল্টা করিয়া ফেলিলেন। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দুই মিনিটের মধ্যেই ডাকিয়া আনিতে পারা যায়; কিন্তু সজনী বাবু তাহা করিলেন না। তিনি তাঁহার ঘরের গাড়ী জুতিয়া আনিবার জন্য ভৃত্যের উপর আদেশ প্রচার করিলেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, আমরা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ষ্টেশনে যাইব, ইহা আমাদের পক্ষে অসম্মানজনক হইবে; তাই তিনি ঘরের গাড়ী আনিতে লোক পাঠাইলেন। সজনীবাবুর এ প্রকার মনোভাবের জন্য তাঁহার নিকট মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম বটে, কিন্তু গাড়ী আসিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ঘড়ির কাঁটা যতই অগ্রসর হইতে হইতে সাড়ে আটটা পার হইয়া গেল, তখন আমরা একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। সজনী বাবুও লোকের পর লোক আস্তাবলে পাঠাইতে লাগিলেন; সকলেই একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে আমাদের বন্ধু উকিলপ্রবর শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু মহাশয় বলিলেন "আরে রাম! গাড়ীর জন্য এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার কি? ডাক্তার সাহেবের মোটর দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; ঐ মোটরে ওঁদের শিয়ালদহে পৌঁছাইয়া দিলেই ত হয়।" তখন সকলেই বলিলেন "হাঁ, হাঁ, তাইত, তাইত।" ডাক্তার সাহেব মহা আগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি স্বয়ং মোটর চালাইয়া, আমাদিগকে তিন চারি মিনিটের মধ্যে শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহারই নাম 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বহেন!'

আমার সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল না; পথে চলিতে গেলে লটবহর লইয়া আমি চলিতেই পারি না। কোন রকমে নিজের এই স্থূল দেহটাকে সামাল করিতে পারি; কিন্তু সচেতন বা অচেতন লগেজ সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইতে আমি সম্পূর্ণ নারাজ। সঙ্গে কিছু না লইয়া আমাকে কোন দিনই কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। শয়নের জন্য বিছানায় প্রয়োজন আমি কোন দিনই স্বীকার করি না; সুবোধ বালকের মত যা পাই তাই খাইতে পারি; তাহাতে অম্ল বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার কোন ভয়ই রাখি না। তবে বলিতে লজ্জা করিয়া কি করিব,—আমার এক বদ্ অভ্যাস চুরুট। চুরুট সঙ্গে থাকাই চাই। পথে ঘাটে যে না মিলে তা নয়; তবে কি জানেন, আমি ত ভদ্রলোকের উপযুক্ত চুরুট খাই না—আমার জন্য আস্ত দা-কাটা চুরুটের প্রয়োজন। সে দ্রব্যটি সকল স্থানে মিলে না। তাই আমাকে চুরুট কয়েকটি সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। এতগুলো চুরুট ত আর পকেটে যায় না; আর আমার জামাও সাহেবী কোট নহে যে, তাহার আষ্টেপৃষ্ঠে সাড়ে সাত গণ্ডা পকেট থাকিবে। সুতরাং একটা অতি ক্ষুদ্রতম ব্যাগ সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। আজকাল মেমসাহেবেরা জাপানী

ঘাসের প্রস্তুত যে অতি ক্ষুদ্রকায় ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া চলাফেরা করেন, আমার সখা শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আমাকে সেই রকম একটা ব্যাগ দিয়াছিলেন। এতদিন আর সেই ব্যাগটা ব্যবহার করিবার সুযোগ বা সময় পাই নাই। রাজসাহী যাইবার সময় ব্যাগটিতে চুরুটগুলি রাখিয়া তাহার উপর একখানি বস্ত্র ও একখানি গামছা চড়াইয়া দিতেই ব্যাগ মহাশয় জবাব দিয়া বসিলেন—নস্থানং আর একটি চুরুটের! সুতরাং আমার জিনিসপত্রের মধ্যে ঐ ক্ষুদ্রতম ব্যাগটি। কিন্তু আমার বন্ধু সিদ্ধেশ্বর বাবু একে জমিদার মানুষ, তাহার পর শ্রীল শ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছেন; তিনি ত আর আর একখানি ধুতি আর একখানি গামছা লইয়া যাইতে পারেন না! তাঁহার সঙ্গে বড় একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ, ততোধিক বৃহৎ একটা বিছানা, সঙ্গে একজন ভৃত্য এবং সেই ভৃত্যেরও বিছানা, ব্যাগ ইত্যাদি। রাজ-জামাতার মোটর হইলে কি হয়, আমরা রাজার হালে যাইতে পারিলাম কৈ? সেই মোটরের মধ্যে এই সকল লটবহর লইয়া অমনি জড়সড় হইয়া বসিতে হইল। ইহারই নাম অদৃষ্ট!

মোটরচালক স্বয়ং রাজ-জামাতা মহাশয়। তিনি তিন চারি মিনিটের মধ্যেই আমাদিগকে শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌছাইয়া দিলেন এবং আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের রথচালক হইয়া, তিনি যে বিশেষ গৌরব অনুভব করিলেন, এই কথা বলিয়া আমাদিগকে একেবারে চুপ করাইয়া দিলেন।

রাজসাহীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ রেলকোম্পানীর নিকট দরখাস্ত করিয়া, এক ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সস্তায় কিস্তী পাইয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত ছাড়পত্র দেখাইয়া, এক ভাড়ায় যাতায়াতের একখানি করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিলাম। গাড়ীর নিকট যাইয়া দেখি, দুইখানি হরগৌরী গাড়ী আছে—অৰ্দ্ধেক প্রথম শ্রেণী—অপরাৰ্দ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণী। তাহার মধ্যে আধখানি প্রথম শ্রেণী ও আধখানি দ্বিতীয় শ্রেণী মহিলাদিগের জন্য রিজার্ভ। বাকী থাকিল—আধখানি প্রথম, ও আধখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইয়া দেখি, নীচে চারিখানি বেঞ্চ এবং দুইখানি দোদুল্যমান আসন মস্তকোপরি রহিয়াছেন। যাত্রী দেখিলাম—দুইটি ভদ্রলোক, এবং দুইটি আসন রিজার্ভ। রিজার্ভের টিকিট পড়িয়া দেখিলাম, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সেই দুইটি বেঞ্চ রিজার্ভ করিয়াছেন। উপরের দুইখানি তখনও খালি আছে। আমি সিদ্ধেশ্বর বাবুকে উপরের একটা আসন দখল করিতে বলিলাম; তিনি তাঁহার বিছানার রাশি তাহার উপর বিস্তৃত করিয়া বসিলেন। আমি হীরেন্দ্রবাবুর টিকিট-মারা একটা আসনে বসিলাম, সঙ্গে বিছানাপত্র নাই যে, তাহা বিছাইয়া আমার দখল সাব্যস্ত করিয়া রাখি। একটু পরেই শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দ্বিতীয় কোন মহাত্মাকে দেখিলাম না। তিনি একটি রিজার্ভ আসন দখল করিলেন, এবং তাঁহার রিজার্ভ করা দ্বিতীয় আসন আমি লইলাম; কারণ তিনি বলিলেন যে, তাঁহার ত একাধিক আসন রিজার্ভ করিবার কথা ছিল না। এই সময়ে তালপত্রের সিপাহী আমাদের শ্রীমান্ ব্যোমকেশ মুস্তফী ভায়া আসিয়া জুটিলেন এবং আমাদের গাড়ীতে আসিয়া বলিলেন "কৈ, আমার রিজার্ভ কৈ?" আমি বলিলাম "তুমি কি রিজার্ভ করিয়াছ?" ব্যোমকেশ বলিলেন "হাঁ, আমি হীরেন্দ্রবাবুর নামে দুইটি 'বংক্' রিজার্ভ করিয়াছি। আপনার আসিবার সন্দেহ ছিল বলিয়া আর অধিক রিজার্ভ করি নাই।" ভাল কথা। আমি তখন বলিলাম, "তা হ'লে তোমার আসন আমিই অধিকার করিয়াছি। তুমি তালপত্রের সিপাহী, তুমি অনায়াসে উপরের ঐ আসনে যাইতে পারিবে; তুমি ঐ খানে যাও। আমি এখানেই থাকি; আমাকে উঠাইতে গেলে কপি-কলের দরকার হইবে।" ব্যোমকেশ ভায়া বলিলেন—"না, আপনি ওখানেই থাকুন, আমিই উপরে যাইতেছি।"

ইহার একটু পরেই দেখি, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রা। তাঁহাদের স্থানাভাব। টিকিট কলেক্টর মহাশয় তখন দেখিলেন যে, মহিলাগণের জন্য রিজার্ভ করা দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে কোন মহিলাই অধিষ্ঠান করেন নাই; তিনি তখন সেই রিজার্ভখানি তুলিয়া লইয়া, সেই কক্ষে পাঁচকড়ি বাবু ও বাণী বাবুর স্থান করিয়া দিলেন। ক্রমে শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং আরও দুই, চারি জন

সম্মিলন-যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আর আর সকলে বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলেন। আমি বেশ রাজার মত হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির শোভা দেখিতে দেখিতে ষ্টেসনের পর ষ্টেসন পার হইতে লাগিলাম; নিদ্রাদেবীকে সে রাত্রির মত বিদায় করিয়া দিলাম। তিনি মধ্যে মধ্যে দুই একবার উকিঝুঁকি মারিয়া অবশেষে একেবারে অন্তর্হিতা হইলেন।

সামান্য একটু রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আমাদের গাড়ী পদ্মা নদীতীরে লালগোলা ঘাটে উপস্থিত হইল। আমি আমার সেই ক্ষুদ্র ব্যাগটি হাতে করিয়া নামিয়া পড়িলাম; আর আমার সঙ্গীমহাশয়েরা 'কুলী, কুলী' করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কুলী মহাশয়গণের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া বাক্স-বিছানা ভূতলে অবতীর্ণ করাইলাম; কিন্তু সেখান হইতে ষ্টীমার একটু দূরে ছিল। অনেক খুঁজিয়া ডাক হাঁক করিয়া দুইটি কুলী পাওয়া গেল। পাঁচ জনের বোঝা দুইজনে লইয়া যাইবে কি করিয়া? অবশেষে সকলেই যথাসম্ভব কুলীর কার্য্য করিয়া ষ্টীমারে যাওয়া গেল।

সাতটার সময় ষ্টীমার ছাড়িবে; ষ্টীমারের সারং বলিল যে, বেলা বারটার সময় আমাদিগকে সে রাজসাহীর ঘাটে পৌছাইয়া দিতে পারিবে। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত একেবারে অনাহারে থাকা কাহারও মতে কর্ত্তব্য বোধ হইল না, অথচ কেহই বাড়ী হইতে কোন দ্রব্য লইয়া যান নাই। তখন শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও আমি তীরে উঠিয়া একটা দোকানে গেলাম। নলিনী ভায়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া এমন দোকানে আমাকে লইয়া গেলেন, যে দোকানের মালিক পুরুষ নহে, একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক। শ্রীমান্ তাহাকে নানা কথা বলিয়া, নানা শাস্ত্র-কথা শুনাইয়া, নানা পুণ্যের প্রলোভন দেখাইয়া, গরম লুচি ও আলু-ভাজার ব্যবস্থা করিলেন। আমি হইলে কিন্তু তিনদিন পূর্ব্বের প্রস্তুত লুচি ও মিঠাই কিনিয়া আনিতাম। লুচি, আলু-ভাজা, রসগোল্লা এবং সের খানেক মুড়ি লইয়া আমরা ষ্টীমারে উঠিলাম। তখন সকলেই আশ্বস্ত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাণী বাবু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু প্রভৃতি সেই শীতের মধ্যেই স্নানের জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু আমাদের কাহারও নিকট ত তৈল ছিল না—রাজসাহীতে কাহাকেও তৈলদান করিবার প্রয়োজন হইবে না, মনে করিয়াই হয়ত কেহই তৈল আনেন নাই। তৈলের প্রশ্ন উঠিলে, শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন বলিলেন "সেজন্য ভাবনা কি? আমি সব দিতেছি। কার কি চাই?" এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রকাণ্ড বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে দ্বিতীয় একটি বাক্স বাহির করিয়া আনিলেন এবং আমাদের সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর বাক্সটি রাখিয়া তাহার ডালা খুলিয়া দিলেন। আমি ত অবাক্! সে বাক্সে নাই, এমন জিনিস দেখিলাম না। একটু নাম করিব কি? চা আছে, চিনি আছে, দুগ্ধের কৌটা আছে, দাঁতের মাজন আছে, দুই তিন রকমের তৈল আছে, সাবান আছে, ক্ষৌর কার্য্যের সমস্ত সরঞ্জাম আছে, বাতি দিয়াশালাই আছে, আয়না-চিরুণী-বুরুষ আছে, সুপারি আছে, মসলা আছে, এমন কি,—দাঁত খুঁটিবার কাঠি পর্য্যন্তও আছে; আরও যে কত জিনিস আছে, তাহা আর বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, শ্রীমান্ পাকা ভ্রমণকারী বটে! আমাদের মত লোটা-কম্বল লইয়া সে ঘরের বাহির হয় না। সকলেই শ্রীমান্‌কে সাধুবাদ করিলেন এবং তাঁহার বাক্সের দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করিলেন। তাহার পর আহারের পালা; সকলেই লুচি মিঠাই খাইলেন; সুধু হীরেন্দ্রবাবু মুড়ী খাইলেন। ষ্টীমারের উপর নানাপ্রকার গল্পগুজব চলিতে লাগিল।

বেলা প্রায় পৌনে বারটার সময় আমাদের ষ্টীমার রামপুর বোয়ালিয়ার ঘাটে লাগিল। একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের প্রতীক্ষায় ঘাটে ছিলেন। তাঁহারা সকলের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। আমার জন্য শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার পৃথক্ একখানি গাড়ী পাঠাইয়া ছিলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিগণ অভ্যর্থনা-সমিতির নির্দ্দিষ্ট ভবনে চলিয়া গেলেন, আমি একাকী শ্রীমান্ অক্ষয়কুমারের বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। অক্ষয় আমার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন, তখনও তাঁহার হবিষ্য হয় নাই! তখন তাড়াতাড়ি স্নানাদি শেষ করিয়া, আমিও সে দিনের মত হবিষ্যই করিলাম এবং অপরাহ্ণ প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়কে সঙ্গে লইয়া স্থানীয় থিয়েটার গৃহে গমন করিলাম—সেই স্থানেই সম্মিলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সম্মিলন মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেখি, একেবারে লোকারণ্য। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রতিনিধি প্রায় দেড় শত উপস্থিত হইয়াছিলেন। দর্শকের সংখ্যাই অধিক। এক টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া, অনেকে সম্মিলন দেখিতে আসিয়াছিলেন; মহিলাগণের স্থানও নাকি একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শুনিলাম, দেড় হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। মফস্বলে থিয়েটার-সারকাস দেখিবার জন্যই লোকে টিকিট কিনিত; এখন সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্যও লোকে টিকিট কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে! আপনারা দশ জনে বলুন, বাঙ্গালা সাহিত্যের—তথা বাঙ্গালাদেশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে কি না?

অন্য কথাতেই ত এতক্ষণ গেল; এইবার সম্মিলনের কথা বলি। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি. এ. মহাশয়ের রচিত একটি অতি সুন্দর ও সময়োপযোগী গান গীত হইল। তাহার পরেই নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। যাঁহারা বিগত পাবনা-সাহিত্য-সম্মিলনে মহারাজ বাহাদুরের অভিভাষণ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, মহারাজের রাজসাহীর অভিভাষণ তদপেক্ষাও সুন্দর হইয়াছে—যেমন ভাষা, তেমনই বর্ণন-কৌশল, তেমনই পাঠের কায়দা। সে অভিভাষণ সকলেই কোন না কোন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন; সুতরাং তাহার পরিচয় প্রদান না করিলেও চলে।

তাহার পরই শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রমথ (নাথ) চৌধুরী মহাশয়কে সভাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য একটি সুললিত ও কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতাটি অতি সুন্দর হইয়াছিল, সকলে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমানের প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে, শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা অতি নিকটে বসিয়াছিলাম, সুতরাং আমরা বক্তৃতা শুনিতে পাইলাম, মণ্ডপ-গৃহের অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত সভাপতি মহাশয়ের স্বর পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু অপরার্দ্ধে উপবিষ্ট মহাশয়গণ এবং মহিলাবর্গ অভিভাষণ শুনিতেই পান নাই। সভাপতি মহাশয় এ অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাঁহার অভিভাষণ মুদ্রিত করিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত অভিভাষণ সে দিনের ডাকে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই; পরদিন আসিয়াছিল এবং সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই অভিভাষণটি সভাপতি মহাশয়ের সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' পাঠ করিয়াছিলাম।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ সম্বন্ধে মত-প্রকাশ করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। তিনি বিদ্বান, সুপণ্ডিত, সুলেখক ও দার্শনিক ব্যক্তি; তাঁহার অভিভাষণ যে, ভালই হইবে, সে কথা না বলিলেও চলে। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি, তাঁহার অভিভাষণ তাঁহারই লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই পাইয়াছি—একটু বেশীও নয়, একটু কমও নয়। অভিভাষণ এখন ছাপার হরপে জাহির হইয়াছে; যাঁহার যাহা মন্তব্য, তিনি অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারেন।

অভিভাষণ-পাঠ শেষ হইলে, 'বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি' গঠিত হইল এবং সন্ধ্যার পর স্থানীয় লাইব্রেরী গৃহে তাহার অধিবেশন হইবে, এই কথা ঘোষিত হইবার পর, সম্মিলনের কার্য্য তখনকার মত শেষ হইল। আমি মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া দীঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুরের নবনির্ম্মিত প্রাসাদে নানাস্থানাগত সাহিত্যিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম এবং অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিয়া, শ্রীমান্ অক্ষয়ের বাসায় ফিরিয়া গেলাম। সেখানে যাইয়া দেখি, শ্রীমান্ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে যাইবেন। আমি একেবারে ঝাড়া জবাব দিয়া বলিলাম যে, অমন দুষ্কর্ম্ম আমার দ্বারা সাধিত হইবে না। বাঙ্গালা দেশে আমরা—যাঁহারা সাহিত্যিক বলিয়া জাহির হইয়াছি এবং জাহির হইবার উমেদারী করিতেছি, তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। আমরা কাগজের উপর কালীর আঁচড় দিয়া যে সকল তত্ত্বকথা বলি, তাহার সহিত আমাদের কার্য্যের অনেক প্রভেদ। অন্যের কথা বলিতেছি না, নিজের কথাই বলি;—আড়াআড়ি, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতি ত অঙ্গের ভূষণ। মুখে খুব উঁচু কথা অনেক বলি, কিন্তু কাজের সময় আমার নীচ প্রকৃতি বিকট

মুখভঙ্গী করিয়া, যে হলাহল ঢালিয়া দেয়, তাহার জ্বালায় অতি বড় যে মিত্র, সেও জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। সম্মিলনে দুই দিনের জন্য আসিয়াছি ; এই দুই দিনটাও কি হাসিয়া খেলিয়া, ভাই ভাইকে আলিঙ্গন করিয়া কাটাইতে পারিব না? এখানেও কি বিষ ঢালিতে হইবে? সম্মিলনের বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি সম্বন্ধে আমার অতি বিকট অভিজ্ঞতা আছে। দেখিয়াছি—হিংসা, দ্বেষ, কথান্তর, মনান্তর—অনেক স্থলে হাতাহাতির উপক্রম পর্য্যন্ত—এই সকল স্থানে হইয়াছে। আমরা যে কেহই ছোট হইতে চাই না, আত্মমতকে প্রতিষ্ঠিত না দেখিলে কেহই যে ছাড়ি না! সুতরাং বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিকে আমি অনেক সময়েই দূর হইতে নমস্কার করি। বছরের তিনশত ষাট দিন ত ঝগড়া-বিবাদের পসরা খুলিয়াই বসিয়া থাকি,—পরের নিন্দা না করিলে যে ভাত হজম হয় না, আত্মপ্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে যে সোয়াস্তি বোধ হয় না। ইহারই মধ্যে দুইটা সম্মিলনে যদি বা পাঁচ ছয় দিনের জন্য মিলিত হই, সেখানেও কি ঐ বিষের হাঁড়ি খুলিয়া বসিব?

শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার আমার আবাল্যসখা; তিনি আমাকে যেমন জানেন, এ পৃথিবীতে আর কেহ আমাকে তেমন জানেন না। তিনি বলিলেন, "তা হ'লে তুমি থাক। আমার না যাওয়াটা ভাল দেখায় না। তুমি ঘুমিও না, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এবং পুত্রকন্যা, দৌহিত্রীদিগকে লইয়া, সেই নিরানন্দপূর্ণ গৃহেও আনন্দের হাট বসাইলাম। রাত্রি দশটার সময়ও যখন অক্ষয়কুমার আসিলেন না, তখন আমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় অক্ষয়কুমার আসিয়া আমাকে টানিয়া তুলিলেন এবং বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে না যাইয়া যে, বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছি, তাহা বার বার বলিলেন এবং তাহার পর সেই রাত্রিতে বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতিতে যে সকল ব্যাপার হইয়াছে,—যে প্রকার কথান্তর মনান্তর ইত্যাদি ইত্যাদি হইয়াছে—এবং অবশেষে ক্ষমা-প্রার্থনা পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিলেন। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক, ভীষণ প্রত্নতাত্ত্বিক, কঠোর সমালোচক, তাহা জানি; তিনি যে একজন পাকা ফৌজদারী উকিল তাহাও জানি, এবং তিনি যে মিথ্যা কথা বলেন না এবং কোন ঘটনা অতিরঞ্জিত করেন না, তাহাও ত বাল্যকাল হইতেই জানি। তবুও কথাটা কি জানেন? ইংরেজের আদালতে শোনা কথা (Hearsay) প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না—তা সে কথা অক্ষয় মৈত্রেয়ই বলুন, আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরই বলুন। এ অবস্থায় ইংরেজরাজের আইন-শাসিত দেশে বাস করিয়া আমি একটা বে-আইনী কাজ করিতে যাইব কেন? অতএব সে রাত্রির কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা আমি যবনিকার অন্তরালে রাখিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটায় পুনরায় সম্মিলনের অধিবেশন হইল। এ দিনে দুইবার অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল; এবং এই দুই বেলায় সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রভৃতি যত রকম 'তত্ত্ব' আছে, সমস্ত বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ হইবে। শুনিলাম, প্রায় আড়াই কুড়ি—বড়, ছোট, মাঝারি—প্রবন্ধ আসিয়াছে; সরস, মধ্যম ও নীরস নানারকমেরই প্রবন্ধ আছে। সভাপতি মহাশয় না কি বেগতিক দেখিয়া, প্রবন্ধ-গুলিকে কবন্ধ করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, নতুবা দুই তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে গেলেই যে দুই বেলার ছয় সাত ঘণ্টা সময় কাটিয়া যায়। আমি আজ কয়েক বৎসর হইতেই সম্মিলনে প্রবন্ধপাঠের এই দুর্গতি দেখিয়া আসিতেছি। প্রবন্ধ লেখকগণের অপরাধ নাই। সম্মিলনীতে ত আর সামান্য বিষয়ের আলোচনা করা সঙ্গত নহে; গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, ছোট করিতে গেলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। বিষয়ও চাই গবেষণাপূর্ণ, অথচ সময় দিব দশ কি পনর মিনিট। এ অবস্থায় সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ-গুলির যে কি দুর্দ্দশা হয় এবং প্রবন্ধ-পাঠের সময় বহুযত্নে ও বহুপরিশ্রমে লিখিত প্রবন্ধগুলিকে স্বহস্তে জবাই করিবার সময় প্রবন্ধলেখক মহাশয়গণের বদনমণ্ডল যে প্রকার মলিন ও বিষাদক্লিষ্ট হয়, তাহা দর্শন করিলে অতি-বড় পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যায়। কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের উপায়ান্তর নাই; তাঁহার সেরেস্তা দুরস্ত (file clear) করিতেই হইবে; সুতরাং তিনিই বিষণ্ণবদনে প্রবন্ধ-পাঠকের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত

হইলেই ঘণ্টাধ্বনি করেন; আর প্রবন্ধের মধ্যপথেই পাঠক মহাশয়কে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, উপসংহার করিতে হয়। ইহা অপেক্ষা যাঁহাদের প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়, তাঁহারা সৌভাগ্যশালী—পড়া না হওয়াও ভাল, কিন্তু এমন করিয়া 'লেজামুড়া' কাটিয়া 'তছনছ' করার দায় হইতে ত তাঁহারা রক্ষা পান। রাজসাহীতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষতঃ, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে এবার রাজসাহী-সম্মিলনে অধিকসংখ্যক প্রবন্ধ আসিয়াছিল এবং শুনিলাম তাহার মধ্যে কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু উপায় নাই।

এত জানিয়া শুনিয়াও 'নেড়া বেলতলায় গিয়াছিল।' নাটোর মহারাজের আদেশ, বন্ধুবর শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাহার পর শ্রীমান্ অক্ষয়কুমারের সুপারিস—এই 'তেরস্পর্শ' আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হইয়াছিল, আমাকেও একটা প্রবন্ধ লিখিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। আমি তাহা বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির বৈঠকে দাখিল করি নাই; তবুও তাঁহারা এই দীনের প্রবন্ধটি তৃতীয় স্থানীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটি যেমন সুন্দর হইয়াছিল, তেমনই মণ্ডপের অপরপ্রান্ত কেন—বাহিরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণও শুনিতে পাইয়াছিলেন—বৃদ্ধ পণ্ডিতরাজের কণ্ঠস্বরের এমনই তেজ! তাহার পরই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয় "সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি" সম্বন্ধে অতি সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রবন্ধ পাঠ করিলেন; অর্দ্ধেক লোক শুনিতে পাইল, আর অর্দ্ধেক লোক এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি শুনিতে পাইল না। দুই দুই জন সুবিখ্যাত পণ্ডিত দুইটি প্রধান বিষয় সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর সভাপতি মহাশয় এই দীনকে "বাঙ্গালা ছোট গল্প" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। আমি কেন, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, পতনটা বড়ই গুরুতর হইল;—কোথায় 'সংস্কৃত অলঙ্কার' আর 'নাট্যশাস্ত্র,' আর কোথায় "বাঙ্গালা ছোট গল্প!" মহাকবি মিল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"Oh, from what height fallen!"—কিন্তু উপায় নাই। আমি যখন আমার পকেট হইতে প্রকাণ্ড একখানি 'এক্সারসাইজে'র খাতা বাহির করিয়া দণ্ডায়মান হইলাম, তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"সময় কিন্তু দশ মিনিট"; আমি বলিলাম—"তত সময়ও লাগিবে না।" শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার আমার পার্শ্বেই ধরাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন—"খাতা যে প্রকাণ্ড!"—আমি বলিলাম "ওটা ভয় দেখাইবার জন্য; লেখা বড় বড় অক্ষরে মোটে সাত পৃষ্ঠা।"—দশ মিনিট দূরে থাকুক, আট মিনিটও লাগিল না; আমি ঠিক ছয় মিনিটের মধ্যেই আমার বাগাড়ম্বর শেষ করিয়া সভাস্থ জনমণ্ডলীকে অব্যাহতি প্রদান করিলাম—সভাপতি মহাশয় আর ঘণ্টায় হাত দিতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য যে, আমি প্রাণপণ চীৎকার করিয়া পড়িয়াছিলাম; তাই সকলে শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং শীঘ্রই ঢক্কা-নিনাদের মধুরতা উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন।

আমার নিজের কথা যখন বলা শেষ হইয়া গেল, তখন আর সকলের কথা অতি সংক্ষেপে বলাই এখনকার দিনে ব্যবস্থাসঙ্গত—ভদ্রতাসঙ্গত কি না, তাহা বলিতে পারি না। যাক্ সে কথা। তাহার পর, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম. এ. মহাশয় পুরাতন পদাবলী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। "প্রবন্ধ পাঠ করিলেন" বলাটা বোধ হয়, ঠিক হইল না; তিনি তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সার কথা দশ মিনিটের মধ্যে মুখে বলিলেন; অথচ তাঁহার প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত পঠিত হইলে আমরা কত সুন্দর পদের কথা শুনিতে পাইতাম। তৎপরে, শ্রীমান্ ব্যোমকেশ মুস্তফী, সাহিত্য-পরিষদ্ এতদিন কত বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কত পুথির খোঁজ পাইয়াছেন, তাহার বিবরণ দাখিল করিলেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ-পাঠ এদিনের মত এই স্থানেই শেষ হইল এবং সভাপতি মহাশয় অতি সংক্ষেপে প্রবন্ধ কয়টি সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন। এই স্থানেই সভাপতি মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি প্রবন্ধ কয়টি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন, তাহা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই সুযুক্তি পূর্ণ।

এইবার দর্শনশাস্ত্রের পালা। প্রথমেই শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় "বৈষ্ণব দর্শন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাদ সাদ দিয়া পাঠ করিলেন। তাহার পরই,

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে "দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ" সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু সম্মিলনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবেন না, অর্থাৎ সেই দিনই বেলা এক-টার ষ্টীমারে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে; এই জন্যই সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে এই অসময়ে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু একটি অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া, অতি সংক্ষেপে এই তিন 'বাদের' সারমর্ম্ম জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়, পণ্ডিত পীতাম্বর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লিখিত 'চার্ব্বাক দর্শন' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তখন বেলা প্রায় এগারটা, সুতরাং সম্পাদক মহাশয়গণ অনুপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের প্রেরিত পত্রাদি পাঠ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় পুনরায় সম্মিলনের অধিবেশন হইল। এবার ইতিহাসের বৈঠক। প্রথমেই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত, এম. এ.-মহাশয় শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের 'হিন্দু জাতির' আদিম নিবাস সম্বন্ধে মতের সমালোচনা ও তাহার প্রতিবাদমূলক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তৎপরে, পাবনার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় 'বঙ্গের সেন রাজগণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাঁহার এই প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। তৎপরে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম. এ.-মহাশয় "বঙ্গের গুপ্তরাজগণ" সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাহার পরই, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণী-ভূষণ তর্কবাগীশ "কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাহার প্রতিবাদ করিলেন। তৎপরে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ.-মহাশয় "যৌদ্ধেয় জাতি" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছিল। তাহার পর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম. এ.-মহাশয় অনেক বাদ দিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধ "আদিম ভারতে রাষ্ট্রনীতি" পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, বি. এল.-মহাশয় 'আদিম ভারতে যুদ্ধ' এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন মহাশয় 'মহাস্থান' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধগুলির অনেক অংশ বাদ দিয়াই পড়িতে হইয়াছিল। তাহার পরই, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'র কার্য্য ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে একটি সুললিত বক্তৃতা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইলে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে 'পঞ্চানন' ও গৌহাটী কলেজের শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে 'সরস্বতী' উপাধি প্রদান করিয়া সনন্দ প্রদান করিলেন। 'পঞ্চানন' ভায়া এই সনন্দ মাথায় করিয়া লইলেন; 'সরস্বতী' মহাশয় অনুপস্থিত ছিলেন।—তাহার পরই সভাভঙ্গ হইল এবং সমাগত ভদ্রমণ্ডলী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রদর্শনী দর্শন করিতে ও সান্ধ্য-সমিতিতে উপস্থিত হইবার জন্য স্থানীয় লাইব্রেরী গৃহে গমন করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রদর্শনাগার আমি ইতঃপূর্ব্বে দেখিবার অবকাশ পাই নাই। এই দিনে যখন এই স্থান দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম, তখন মনে করিলাম, সকলের সঙ্গে দেখিতে গেলে, ভাল করিয়া দেখিতে পাইব না, কেবল একটা হট্টগোল হইবে। সেই জন্য মধ্যাহ্ন-কালে সম্মিলনীতে যাইবার পূর্ব্বেই আমি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির এই অতুল কীর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেক দিন হইতে এই সমিতির আহৃত দ্রব্যাদির প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছিলাম। এবার স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে বলিতে পারি যে, এত অল্পদিনের মধ্যে যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এত লুপ্তরত্নোদ্ধার করিতে পারিয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা ঘরের কাছে, মাটির তলায়, জঙ্গলের মধ্যে, অনাদৃত অবস্থায় এত রত্ন রাখিয়া, এতদিন পরের উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করিয়া আমাদের জাতীয় গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এখন এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া আমাদের চক্ষু ফুটিল; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সত্যসত্যই অসভ্য বর্ব্বর ছিলেন না, তাহার জলন্ত প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিয়া বুক যেন ফুলিয়া উঠিল! বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির জন্য যাঁহারা প্রাণপণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিলাম এবং তাঁহারা যদি সেই স্থানে তখন উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত

শরৎকুমার রায় মহাশয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া এবং অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দকে উদ্দেশে সস্নেহ অভিবাদন করিয়া, আমি সেই পরম পবিত্র দেব-নিকেতন হইতে বাহির হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা-সমিতিতে এক পেয়ালা চা পান করিয়া, বাসায় ফিরিয়া গেলাম এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীমান্ অক্ষয়ের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া, রজনীর শেষ যামে বিশ্রাম করিতে গেলাম ;—১লা মার্চ্চের পালা শেষ হইল।

পরদিন ২রা মার্চ্চ,মঙ্গলবার,প্রাতঃকালে শেষ অধিবেশন। এই দিনে বিজ্ঞান-বিষয়ে প্রবন্ধাবলি পঠিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিবার জন্য একজন ঠিকে সভাপতি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। তখন সকলের অনুরোধে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় এই ঠিকে কাজের ভার লইলেন, এবং যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত বহু অনুসন্ধানে লিখিত উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির যথারীতি সৎকার করিতে লাগিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ছয়জন প্রধান বৈজ্ঞানিকের ছয়টি প্রবন্ধের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন। তাহার পর বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল। আমি অল্প কয়েকজনের নাম করিতেছি। (.) শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায়ের 'কলঙ্কভঞ্জন' (২) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ অধিকারীর 'অণু ও পরমাণু' (৩) শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসুর 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান' (৪) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসুর 'চর্ব্বণ' (৫) শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সরস্বতীর 'পর্য্যায় রত্ন-মালা' (৬) শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যালের 'জমির সার' (৬) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর 'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা' (৭) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তের 'তন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ' (৮) শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'মৃত্যুর পর' (৯) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র লাহিড়ীর 'বাঙ্গালা বর্ণমালা'। প্রবন্ধের ও লেখকগণের নাম পড়িয়াই পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহার প্রত্যেকটিই অমূল্য রত্ন ; কিন্তু 'কুস্থানে পতিতা অতীব মহতা—এতাদৃশী দুর্গতি' অবশ্যম্ভাবী।

তাহার পর, শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দ ভায়া দণ্ডায়মান হইয়া, কুড়ি পঁচিশটি প্রবন্ধের সপিণ্ডকরণ করিলেন। প্রবন্ধগুলির নাম শুনিয়া আমি সত্যসত্যই হায় হায় করিতে লাগিলাম—এমন সুন্দর প্রবন্ধগুলির দুই চারি লাইনও শুনিতে পাইলাম না। সে সকল প্রবন্ধ-লেখকের নাম উল্লেখ করিয়া কোন লাভই নাই, শুধু আক্ষেপ বৃদ্ধি করা।

ইহার পরেই ধন্যবাদের পালা। ইনি বলিলেন—"আমরা কিছুই করিতে পারি নাই," উনি বলিলেন "খুব আয়োজন হইয়াছে, আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি" ; তিনি বলিলেন—"নিজের ঘরে আসিয়াছি,ভালমন্দের বিচার করিব কেন ?"—ইত্যাদি—ইত্যাদি। সভাপতি মহাশয়, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ, স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রভৃতি সকলের উপর ধন্যবাদ বর্ষিত হইল। সত্য কথা বলিতে কি, রাজসাহীর আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরই হইয়াছিল। তাহার পরেই পর-লোকগত কবিবর রজনীকান্ত সেনের মর্ম্মস্পর্শী বিদায়-সংগীত রাজসাহী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রমোহন ঘটক মধুর কণ্ঠে গান করিয়া, সকলকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রাজসাহী-সম্মিলন শেষ হইল। আগামী বৎসরে ধুবড়ীতে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে দেখিতে যাইব।

তাহার পরই আমাদের বিদায়ের আয়োজন। তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া, অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণের প্রদত্ত সন্দেশের হাঁড়ি এবং শ্রীমান্ অক্ষয়কুমারের সহধর্ম্মিণীর প্রদত্ত আর এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন পাথেয় লইয়া, বেলা দুইটার সময় ষ্টীমারে উঠিলাম। এবার ষ্টীমারে কয়েকটি নূতন সঙ্গী জুটিলেন। তাঁহারা আর কেহই নহেন—স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ. মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম. এ. মহাশয় এবং ঢাকা মিউজিয়মের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম. এ. মহাশয়। সুতরাং ষ্টীমারের উপর আমরা ছোট খাট একটা সাহিত্য-বৈঠক করিয়া বসিয়াছিলাম।

যথাসময়ে ষ্টীমার লালগোলায় আসিল ; আমরা রাজ-সাহী হইতে আনীত দুইটি হাঁড়ি ও শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দের সহধর্ম্মিণীর প্রদত্ত রসদের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে একেবারে কলিকাতায় দাখিল। তাহার পর আর কি ?—সেই খাড়া-বড়ি-থোড়, আর থোড়-বড়ি-খাড়া।

দুগ্ধজাত খাদ্য

[শ্রীবিপিনবিহারী সেন, B. L.]

সচরাচর আমাদের দেশে দুগ্ধ হইতে যে সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে—ক্ষীর-সর, মাখন-ঘৃত, দধি-ঘোল, ও ছানা-পনিরই প্রধান।

ক্ষীর—দুগ্ধ জ্বাল দিতে দিতে তাহার জলীয়াংশ কমিয়া গিয়া যখন ঘনীভূত হয়, তখন তাহাকে ক্ষীর বলে। বাজারে আমরা দুই প্রকার ক্ষীর দেখিতে পাই; (১) চাপ বা খোয়া ক্ষীর, যাহার জলীয়াংশ শুকাইয়া গিয়াছে; এবং (২) পাতলা বা চন্দনী বা লালী ক্ষীর ও রাবড়ী যাহাতে কতকটা জলীয়াংশ বিদ্যমান আছে। দুগ্ধের সমস্ত উপাদানই ক্ষীরের মধ্যে বিদ্যমান, কেবল জলের ভাগ কম। ইহা অতিশয় গুরুপাক। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ক্ষীরের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সন্দেশ, ক্ষীরমোহন, বিবিধ পিষ্টক ও অন্যান্য নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। চতুর অসৎ ব্যবসায়িগণ দুগ্ধের সহিত পালো প্রভৃতি ভেজাল দিয়া, ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ক্ষীর প্রস্তুত করিবার সময় উহার মধ্যে অল্প পরিমাণে চিনি দেওয়া হয়।

সর—দুগ্ধ, না নাড়িয়া, জ্বাল দিতে থাকিলে, উহার সারাংশ উপরে ভাসিয়া উঠে এবং শীতল বায়ুস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া, একখানি পর্দ্দার আকারে জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহাকে আমরা সর বলি। সদ্যঃ দোহিত দুগ্ধে উহার মেদ-কণিকাগুলি সূক্ষ্ম নির্ম্মল অণুর আকারে ভাসমান থাকে। দুগ্ধ জ্বাল দিবার সময় উহার উপরিভাগস্থ দুগ্ধ-লালের (ল্যাক্‌টো-য়্যাল্‌বুমেনের) কণিকাগুলি তাপ-সহযোগে এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জমাট বাঁধিতে থাকে; ঐ সময়ে সূক্ষ্ম মেদ-কণিকাগুলি, তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দুগ্ধলালের কণিকা এবং শর্করা প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থ লইয়া, সরের আকার ধারণ করে। সরের মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা ২৬·৭৫ ভাগ মেদময় পদার্থ, ৩·৫২ ভাগ দুগ্ধ-শর্করা, ৩·৬১ ভাগ অন্নসার, ০·৬১ ভাগ লবণময় উপাদান, এবং ৬৫·৫১ ভাগ জল থাকে। মোটের উপর ধরিতে গেলে, ইহার মধ্যে দুগ্ধের যাবতীয় সারাংশই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান; তন্মধ্যে মাখন, ছানা, ও দুগ্ধ-শর্করার অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—এই নিমিত্ত ইহা অতিশয় সুস্বাদু এবং গুরুপাক। ইহা হইতে সরভাজা, সরপুরিয়া, মনোহরা, "আবার খাবো" প্রভৃতি রসনারঞ্জন মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়।

সরের গুণ—

"সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্র বাতনুৎ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা, বলাসবলশুক্রলা॥"

—অর্থাৎ, দুগ্ধের সর—গুরু, শীতবীর্য্য, রতিশক্তিবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক ও স্নিগ্ধ। ইহা কফ, বল এবং শুক্রজনক।

মাখন—দুগ্ধের মেদময় অংশকে মাখন বলে। যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধ হইতেই মাখন প্রস্তুত হইতে পারে। মেষীর দুগ্ধ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মাখন পাওয়া যায়; তাহার নিম্নে ছাগদুগ্ধ। ঘোটকীর দুগ্ধে মাখনের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা কম। আমরা যে সমুদায় দুগ্ধ ব্যবহার করি, তাহার মধ্যে গর্দ্দভীদুগ্ধে মাখনের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা কম। সাধারণতঃ, দুই প্রকারে মাখন প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধ-মন্থন করিয়া যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাকে "দুধের-মাখন" বা নবনীত (ননী) এবং দধি-মন্থন করিয়া যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাকে "ঘোলের মাখন" বা মাখন বলে। সদ্যঃদোহিত দুগ্ধের মধ্যে তাহার মেদ-কণিকাগুলি সূক্ষ্ম নির্ম্মল অণুর আকারে ভাসমান থাকে; সেগুলি একপ্রকার ঘন আবরণের মধ্যে আবদ্ধ। এই কোষনিবদ্ধ মেদকণিকাগুলি দুগ্ধের জলীয়াংশ অপেক্ষা লঘু। মন্থনকালে, দুগ্ধ অথবা দধি-মধ্যস্থ এই মেদকণিকাগুলির বহিরাবরণ মন্থন-দণ্ডের আলোড়নে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাওয়াতে,

ভক্তিময়ী

[চিত্র-শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা]

তাহার অভ্যন্তরস্থিত পদার্থ বাহির হইয়া পড়ে। অনেক গুলি কোষের মেদ এইরূপে একত্র হইয়া, দুগ্ধের উপর মাখনের আকারে ভাসিয়া উঠে; তখন সেইগুলি ক্রমশঃ সংগ্রহ করা হয়। বিশুদ্ধ মাখনের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ খাঁটি মেদময় পদার্থ, ৩ হইতে ৫ ভাগ পনির, ৫ হইতে ১০ ভাগ জল, ½ হইতে ২ ভাগ লবণময় উপাদান, এবং প্রায় একভাগ দুগ্ধ-শর্করা পাওয়া যায়। দধি হইতে প্রস্তুত মাখনে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধাম্ল (lactic acid) এবং অন্য এক প্রকার উদ্বায়ী অম্লরস দেখা যায়। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া, দুগ্ধ অথবা দধি হইতে আমরা যে মাখন পাই, তাহার পরিমাণ ঐ দুগ্ধের মেদময় অংশ অপেক্ষা অধিক। একসের খাঁটি গোদুগ্ধ হইতে আমরা এক ছটাক হইতে দেড় ছটাক পর্য্যন্ত মাখন প্রাপ্ত হই। মাখনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সুগন্ধময় উদ্বায়ী (volatile) অম্লরস বিদ্যমান থাকায়, উহার স্বাদ ও গন্ধ অতিশয় প্রীতিকর হয়। কিছুদিন রাখিয়া দিলে মাখনে যে দুর্গন্ধ হয়, ইহার মধ্যস্থিত পনিরের অংশই তাহার কারণ। পনির সহজে পচিয়া উঠে। "দুধের মাখন" অপেক্ষা "ঘোলের মাখনে" পনিরের অংশ কম থাকে বলিয়া, ঘোলের মাখন অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ঘোলের মাখন উত্তমরূপে ধুইয়া, তাহার জল উত্তমরূপে নিষ্কাশন করিয়া দিয়া, একটি বায়ু-প্রবেশপথ-বিহীন আবদ্ধমুখ পাত্রে রাখিয়া দিলে, তাহা প্রায় এক বৎসরকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এইরূপে প্রস্তুত মাখনকে "টেপা মাখন" বলে। মাখনের মধ্যস্থিত পনিরের পচনক্রিয়া নিবারণের জন্য, উহাতে সামান্য পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করা হয়। হল্যাণ্ড, আলিগড় প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত টিনের কৌটাবদ্ধ মাখনে লবণমিশ্রিত থাকে। মাখনে সামান্য দুর্গন্ধ হইলে, উহা শীতল জলে ধুইয়া লইলে সেই দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়।

আমাদের দেশে দ্বিবিধ মাখন প্রচলিত;—'গব্য-মাখন' ও 'মহিষা-মাখন।' গব্য-মাখন অপেক্ষা মহিষা মাখন অধিকতর শুভ্রবর্ণ ও স্বল্পমূল্য। এই জন্য নানা কৃত্রিম উপায়ে মহিষা-মাখন রং করা হয়। ইহাতে অনেক সময় মাখনের স্বাদ ও গন্ধ খারাপ হইয়া যায়; কিন্তু নিম্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন করিলে, খারাপ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না।—কড়াই-শুঁটীর ন্যায় জাফ্‌রানেরও এক একটি বীজ-কোষ বা শুঁটীর মধ্যে কয়েকটি করিয়া বীজ থাকে। বীজ সমেত ঐ শুটিগুলি শুকাইয়া একটি বোতলের ভিতর রাখিয়া দিলে অনেকদিন অবিকৃত থাকে। মহিষ-দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিবার সময়, অথবা "দই পাতিবার" সময় প্রতি সেরে দুই চারিটি হিসাবে জাফ্‌রান বীজ পরিষ্কার একখানি পাতলা কাপড়ের টুক্‌রাতে বাঁধিয়া, উহা দুই তিন মিনিটকাল দুগ্ধ মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া দিবে; তৎপরে উক্ত কাপড়ের পুটুলিটি টিপিয়া, উহার রং বাহির করিয়া, দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিয়া, ঐ দুগ্ধ—অথবা উহা হইতে প্রস্তুত দধি মন্থন করিলে গব্য-মাখনের ন্যায় অতি সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট মাখন পাওয়া যাইবে। এইরূপে 'দাগ' করা ভিন্ন, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য মাখন-ব্যবসায়িগণ মাখনের সহিত, চর্ব্বি, পাকা কলা প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য ভেজাল দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং, বাজার হইতে মাখন ক্রয়কালে এবিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। মাখনের গন্ধ হইতে, এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, মাখন খাঁটি, কি মিশ্র, জানা যায়। বিশুদ্ধ মাখন ৩০° হইতে ৩৪° ডিগ্রী উত্তাপে গলে; উহা দ্বারাও বিশুদ্ধতা নির্ণীত হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে নানাপ্রকার মাখনের পরীক্ষা-সিদ্ধ গুণ বর্ণিত আছে।

মাখনের গুণ ও ব্যবহার—

'নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ।
সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্‌ক্ষয়াশোঽর্দ্দিতকাসহৃৎ॥
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ॥'

—অর্থাৎ, গব্য নবনীত হিতকর, পুষ্টিকর, বর্ণপ্রসাদক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ধারক। ইহা, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, অর্শ, বাতব্যাধি ও কাস-রোগ-নাশক। নবনীত বালক-বৃদ্ধ সকলেরই উপকারী, বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য। ইহা গেল, দধি হইতে প্রস্তুত মাখনের গুণ ও ব্যবহার। দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত মাখনের গুণ ও ব্যবহার নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

'দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।
বৃষ্যং বল্যমতিস্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহিশীতলম্॥'

—অর্থাৎ, দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত নবনীত চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুর রস, ধারক এবং শীতবীর্য্য, অর্থাৎ ঠাণ্ডা।

সদ্য মাখনের গুণ—

'নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু।
মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্লমীষৎ তক্রাংশসংক্রমাৎ ॥'

—সদ্য :—মাখন, মধুর রস, ধারক, ঠাণ্ডা, লঘুপাক ও মেধা-জনক। ইহার মধ্যে ঘোলের অংশ থাকায় কিঞ্চিৎ কষায়াম্লরসযুক্ত।

মহিষা মাখনের গুণ—

'নবনীতং মহিষাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।
দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃ শুক্রবিবর্দ্ধনম্ ॥'

—অর্থাৎ, মহিষা-নবনীত বাতশ্লেষ্মকর, গুরুপাক, মেদো-বর্দ্ধক ও শুক্রজনক; ইহা দাহ, পিত্ত ও শ্রমনাশক। কিন্তু রাজনির্ঘণ্টকার মহিষ-নবনীতকে দোষযুক্ত মনে করেন না; তাঁহার মতে, ইহা কষায় মধুর রস, শীতবীর্য্য, শুক্র-বর্দ্ধক, বলকারক, ধারক, পিত্তঘ্ন, এবং শরীরের স্থূলতা বৃদ্ধিকর (অর্থাৎ মহিষা-মাখন নিয়ম মত সেবন করিলে ভুঁড়ি বড় হয়)—

মাহিষং নবনীতন্তু কষায়ং মধুরং রস।
শীতং বৃষ্যপ্রদং বল্যং গ্রাহি পিত্তঘ্নতুন্দদম্ ॥'

কৃত্রিম মাখন—ঝুনা নারিকেলের দুগ্ধ মন্থন করিলে, উহার তৈলময় অংশ উপরে ভাসিয়া উঠে। উহা দেখিতে ঠিক মহিষা-মাখনের ন্যায়, এবং সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। কিন্তু এদেশে এখনও পর্য্যন্ত নারিকেলের মাখন বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। বটরিণ (butterine) নামক আর এক প্রকার কৃত্রিম মাখন পাওয়া যায়। উহা প্রধানতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত;—গো-বসা, মেষ-বসা এবং মেষের পাকস্থলী হইতে প্রস্তুত হয়। এই কৃত্রিম মাখন, প্রকৃত মাখনের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট করিবার নিমিত্ত, উহা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাখন প্রস্তুত ও রং করা হয়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রকৃত মাখনের অভাব, আজকাল এই সমুদায় কৃত্রিম স্নেহ-পদার্থের দ্বারা পূরণ করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের অবস্থা কিন্তু এখনও ততদূর শোচনীয় হইয়া উঠে নাই। তবে, আমরা গোজাতির প্রতি যেরূপ 'হেনস্থা' করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়ার বোধ হয়, আর অধিক বিলম্ব নাই।

ঘৃত—মাখনের সারাংশকে আমরা ঘৃত বলি। মাখন, মৃদু উত্তাপে জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া লইলে, ঘৃত প্রস্তুত হয়। ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইলে, মাখন জ্বালে চড়াইয়া ফুটাইতে থাকিবে; যখন দেখিবে, উহার ফেনাগুলি সম্পূর্ণ-রূপে মরিয়া গিয়াছে, তখন উহা নামাইয়া পরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রা দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। ঘৃতের পাক ঠিক হইলে, উহার বর্ণ স্বর্ণাভ হয়। মাখন জ্বাল দিতে থাকিলে, প্রথমে উহার উদ্বায়ী পদার্থগুলি, এবং পরে উহার জলীয়াংশ, বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এই জলীয় বাষ্প উঠাতেই উহার উপরিভাগে ফেনপুঞ্জের উদ্ভব হয়; এবং বাষ্প উঠা শেষ হইলেই উহা অদৃশ্য হয়। ঐ সময়ে মাখনের মধ্যস্থিত পণির ভর্জ্জিত হইয়া "খাক্‌রি"র আকারে কটাহের তলায় অধঃস্থ হইয়া পড়ে; তখন অবশিষ্ট থাকে, কিঞ্চিৎ লবণময় উপাদানমিশ্রিত বিশুদ্ধ দুগ্ধ-মেদ। "কড়া-জ্বালে" প্রস্তুত ঘৃতে, পণির এবং জল না থাকায়, উহা বহুদিবস অবিকৃত অবস্থায় থাকে। মৎস্য-মাংসপ্রভৃতি আমিষভোজীদিগের পক্ষে না হইলেও, নিরামিষভোজী-দিগের আহারের ঘৃত একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। প্রবাদ আছে—"ঘৃত ছাড়া ডাল, আর লক্ষ্মীছাড়া গা'ল" কাহাকেও দিতে নাই। আমিষভোজিগণ মৎস্য-মাংস প্রভৃতি হইতে আবশ্যক জান্তব তৈল গ্রহণ করে, কিন্তু নিরামিষভোজীদিগের খাদ্য মধ্যে জান্তব তৈলসংযুক্ত পদার্থ না থাকায় তাহাদিগকে ঘৃত, মাখন, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করিয়া উক্ত অভাব পূরণ করিতে হয়। একপ্রকার উদ্বায়ী পদার্থ বিদ্যমান থাকায় গব্যঘৃত অতিশয় সুগন্ধযুক্ত, এমন কি, উহা দগ্ধ করিলেও দগ্ধ-আমিষের গন্ধ নির্গত না হইয়া, সুগন্ধ নির্গত হইতে থাকে। ঘৃতই যে কেবল সুস্বাদু এবং সুগন্ধি, তাহা নহে; সামান্যমাত্র ঘৃতসংযোগে যাহা পাক করা যায়, তাহাকেও উহা সুগন্ধি ও সুস্বাদু করিয়া তুলে। এই নিমিত্ত আমাদের অধিকাংশ রন্ধনে ঘৃত সম্ভরা দেওয়া হয়। ভাতের সহিত গব্যঘৃত মাখিয়া লইলে, উহা সুস্বাদু ও সুগন্ধবিশিষ্ট হয়। পোলাও, খিচুরি, লুচি, কচুরি প্রভৃতি সুখাদ্যগুলি এবং জিলাপি, সীতাভোগ, মিহিদানা, রসাবলী প্রভৃতি মিষ্টান্নগুলির ঘৃতই প্রধান উপকরণ। এই সমুদায়ের ভালমন্দ হওয়া, না হওয়া, ঘৃতের উপরই নির্ভর করে। যিনি ঘৃতসংযুক্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবেন, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ খাদ্যগুলি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আদিম বৈদিক সময় হইতেই, ভারতে ঘৃত বিশেষ সমাদৃত

হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ ঘৃতের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঘৃতকে কেবল মানবভোগ্য করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই; উহাকে শ্রেষ্ঠ দেবভোগ্য পদার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন, ঘৃতের গন্ধে দেবতারাও মর্ত্তে আগমন করেন। ঘৃতব্যতীত যজ্ঞ অথবা দেবপূজা হয় না; ঘৃতব্যতীত হিন্দুর পিতৃলোকের শ্রাদ্ধকার্য্য হয় না; এক কথায় বলিতে গেলে, হিন্দুজীবনে প্রতিপদে ঘৃত আবশ্যক—এমন কি, ঘৃত দর্শন করিয়া যাত্রা করিলেও সেই যাত্রার ফল শুভ হয়। ঘৃত দুর্ভাগ্য এবং পাপ বিনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। এহেন ঘৃতের গুণসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় মতামত কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ঘৃতের সাধারণ গুণ ও ব্যবহার—

'ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্।
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মীপাপপিত্তানিলাপহম্॥
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবৃদ্ধিকৃৎ
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্ গুরু॥'
'উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদশূলানাহব্রণান্ হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃ ক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ॥'

—অর্থাৎ, ঘৃত লোককে দীর্ঘজীবী করে, ইহা মধুর রস, চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দীপক ও শীতবীর্য্য। ইহা বিষ, অলক্ষ্মী (অর্থাৎ দুর্ভাগ্য), পাপ, পিত্ত ও বায়ুনাশক। ইহা অল্প অভিষ্যন্দি (অর্থাৎ যাহাতে শরীরের রস নির্গত করিয়া দেয়), কান্তিজনক, ওজোবর্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, মেধাজনক, আয়ুর্বৃদ্ধিকর, বলকারক এবং গুরুপাক। ইহা উদাবর্ত্ত (অন্ত্র-পীড়া-বিশেষ) জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ এবং ব্রণ রোগ নাশক। ইহা স্নিগ্ধ ও কফবর্দ্ধক, এবং রক্ষোঘ্ন ক্ষয়রোগ, বিসর্প, এবং রক্তদোষনাশক।

এইত গেল ঘৃতের সাধারণ গুণ; ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন প্রকার ঘৃতের পরীক্ষা-সিদ্ধ গুণ ও আময়িক প্রয়োগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অত্যাবশ্যক কয়েকটি, অনুবাদ সহ শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গব্যঘৃতের গুণ ও ব্যবহার—

'গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্॥
মেধালাবণ্যকান্ত্যোজস্তেজো বৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥
বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধি রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেযু গুণাধিকম্॥'

—অর্থাৎ, গব্য-ঘৃত চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, সুস্বাদু, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বাতপিত্তকফনাশক (ত্রিদোষ-নাশক), মেধাজনক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোবর্দ্ধক, ও অত্যন্ত তেজোবৃদ্ধিকর। ইহা অলক্ষ্মী, পাপ ও রক্ষঃ বিনাশক, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকারক, পবিত্র, পরমায়ুবৃদ্ধিকর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধি, রুচিকর ও মনোজ্ঞ। ইহা সমস্ত ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মাহিষ ঘৃতের গুণ ও ব্যবহার—

'মাহিষন্তু ঘৃতং স্বাদু, পিত্তরক্তানিলাপহম্।
শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে॥'

—মাহিষ-ঘৃত মধুররস, রক্তপিত্ত এবং বায়ুরোগনাশক, শীতবীর্য্য, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক, গুরু এবং বিপাকে মধুর।

রাজনির্ঘণ্টকার মাহিষ ঘৃতের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন; তাঁহার মতে—

'সর্পিমাহিষমুত্তমং ধৃতিকরং, সৌখ্যপ্রদং কান্তিকৃদ্।
বাতশ্লেষ্মনিবর্হণং বলকরং বর্ণপ্রদানে ক্ষমম্॥
দুর্নামগ্রহণীবিকারশমনং মন্দানলোদ্দীপনম্।
চক্ষুষ্যং নবগব্যতঃ পরমিদং হৃদ্যং মনোহারি চ॥'

—অর্থাৎ, ঘৃতসমূহের মধ্যে মাহিষ-ঘৃত উত্তম; ইহা ধৃতিশক্তিবর্দ্ধক, সুখপ্রদ, কান্তিপ্রদ, বাতশ্লেষ্মানাশক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, দুর্নাম, গ্রহণী ও বিকারনাশক, মন্দাগ্নির উদ্দীপক, নব গব্যঘৃত অপেক্ষা চক্ষুর হিতকর, অতিশয় হৃদ্য এবং মনোহারী।

ছাগঘৃতের গুণ ও ব্যবহার—

আজমাজ্যং করোত্যগ্নিং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎ কটু॥'

ছাগঘৃত অগ্নিবৃদ্ধিকর, চক্ষুর হিতকারক, বলকারক, ও কটুবিপাক এবং ইহা কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা রোগে হিতকর।

নূতন ও পুরাতন ভেদে ঘৃতের ব্যবহার। ভোজন, তর্পণ, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা ও চক্ষুরোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে। চক্ষুরোগে—বিশেষতঃ দৃষ্টিক্ষীণতা, নিকটদৃষ্টি,

নৈশান্ধতা প্রভৃতি রোগে এবং স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে গব্যঘৃতের ন্যায় ঔষধ কমই দেখিতে পাওয়া যায়। শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে পুরাতন ঘৃতের বাহ্যপ্রয়োগ বিশেষ হিতকর।

'যোজয়েন্নবমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে।
বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ॥'

—অর্থাৎ, ভোজন, তর্পণ, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডু, কামলা ও নেত্র রোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে।

'বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষনুৎ।
মূর্চ্ছাকুষ্ঠ বিষোন্মাদাপস্মারতিমিরাপহম্॥
যথা যথাঽ খিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্॥'

—যে ঘৃত এক বৎসরের অধিক প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে পুরাতন ঘৃত বলা যায়। পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষনাশক এবং ইহা মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমির রোগ বিনাশ করে। পুরাতন ঘৃত, যত অধিক বৎসরের পুরাতন হইবে, ততই তাহার গুণ অধিক হইবে।

নিম্নলিখিত রোগগুলিতে ঘৃত-সেবন নিষেধ।

'রাজযক্ষ্মণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে।
রোগে সামে বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধেচ মদাত্যয়ে॥
জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পির্বহুমন্যতে॥'

—অর্থাৎ,বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে এবং রাজযক্ষ্মা,কফ-রোগ, আমজনিত রোগ, বিসূচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয় (অতি-রিক্ত মদ্যপানজনিত পীড়া), জ্বর ও মন্দাগ্নি রোগে ঘৃত উপকারী নহে। এই সকল স্থলে ঘৃত ব্যবহার না করিয়া আবশ্যক মতে মাখন ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু বিসূচিকা এবং আমাশয় রোগে মাখনও ব্যবহার করা উচিত নহে।

মাধুকরী

[শ্রীহরিচরণ মিত্র]

ভগবদ্গীতা পড়িতেছে কবি একদা বরষা-রাতে—
ললিত কণ্ঠে আর্দ্র নয়নে প্রিয়ারে লইয়া সাথে;
"কামনার নহি ত্যাগের কেবলি বাঞ্ছিত আমি যার,
নিজ শিরে বহি যোগাই নিয়ত সকল অভাব তার।"
পড়িতে পড়িতে সহসা কবির নীরব হইল স্বর,
"হের পদ্মাবতী!" কহিল প্রিয়ারে জয়দেব কবিবর।
"বহি নিজ শিরে একথা সুধীরে! লিখেছেন কেহ ভুলে,
"ভোগের বিষয় ঠাকুর আপনি আনিবে মাথায় তুলে!"
ভক্ত আকুল, হৃদয় ব্যাকুল না পারে ভাবিতে কভু—
স্পর্দ্ধা এত কি হবে মানবের বাহক হইবে প্রভু?
ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু বহিল কাতর কবির চক্ষে,
লেখনী লইয়া দিলেন আনিয়া ত্বরিতে আথর বক্ষে।
ভাদর প্রভাতে প্রবল বাদর ছুটিছে ঝঞ্ঝা রথে,
কবি জয়দেব ভিক্ষা মাগিছে জনহীন রাজপথে।
"ভিক্ষা দাও গো! ভিক্ষা দাও গো! ওগো দাতা পুরবাসী!
আছি অনাহারী আমি গো ভিখারী গৃহে নারী উপবাসী।"
তখন গগন গরজে গভীর বিজলী চমকি হানে,
তরুণ কবির করুণ কাহিনী কেহ শুনিল না কাণে।
ডাকিয়া ডাকিয়া বিকল হইয়া কবি ফিরে এল ঘরে,
কহিল প্রিয়ায় "ভিক্ষা মেলেনি, ফিরেছি শূন্য করে,
"বারিধারা ঘোর, প্রার্থনা মোর শুনিতে পায়নি কেহ,
"উপবাসী আজি রবে বুঝি সতী! কি করি বলিয়া দেহ!"—
"ছল কেন প্রভু!" কহিল পদ্মা "পাঠায়েত' দেছ সিধা!
"এনেছে বালক দেখে এস নাথ! মনে যদি থাকে দ্বিধা।"
কিশোর শিশুর সুকুমার দেহে দেখিয়া বেত্রাঘাত,
শুধাইনু তারে "কে মেরেছে তোরে" আদরে ধরিয়া হাত;
কহিল বালক—"কালি রজনীতে লেখনী লইয়া মোরে,
"মারিয়াছে সতী, তোর মত্ত পতি প্রেম-মদিরার ঘোরে।"
"ওলো পদ্মাবতি! ধন্য তুমি সতি! প্রভুরে হেরেছ তুমি"—
বলিতে বলিতে কবি আত্মহারা পড়িল ধরণী চুমি!

অকর্ম্মণ্য

[শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী]

নবাব সরকারে চাকরী করিতে করিতে সে বুড়া হইয়া গিয়াছে, চোখে ভাল দেখিতে পায় না, চলিতে গেলে হাত-পা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। চক্ষু দুটির পিঙ্গল তারকার উপরে ক্রমে ক্রমে একটা সূক্ষ্ম শুভ্র আবরণ পড়িয়া আসিতেছে, তাহার জন্য নয়ন দুইটি সদাই যেন ছল ছল করে। তাহার নাম—কুদ্‌রৎ।

কুদ্‌রৎ কবে চাকরী করিতে আসিয়াছিল, কাহার আমলে আসিয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। নবাব-সরকারে সেই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ভৃত্য, সে নবাব-বংশের দুই-তিন পুরুষ সিংহাসনে বসিতে দেখিয়াছে, এবং পুরুষানুক্রমে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছে। তাহার সম্মুখে কত উজীর, কত দেওয়ান, কত বখ্‌শী, কত দারোগা আসিল গেল, তাহার সংখ্যা নাই। তাহাকে এখন কোন কাজই করিতে হয় না;—সে কেবল ছায়ার মতন তরুণ নবাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নবাব যখন দিবসের প্রথম প্রহরে মহলের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তখন দেখিতে পাইতেন যে, জরিদার দিল্লীওয়াল জুতা-যোড়াটি হাতে লইয়া, বৃদ্ধ কুদ্‌রৎ স্তম্ভের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া সে জরা-ভারে অবনত দীর্ঘ দেহখানি নোয়াইয়া কুর্নিস করিত, এবং কম্পিতহস্তে নবাবের পদ হইতে অন্দরের কোমল মখ্‌মলের জুতা-যোড়াটি খুলিয়া লইয়া, সদরের জুতা পরাইয়া দিত। জুতা পরাইতে কোন কোন দিন বিলম্ব হইলে, নবাব মনে মনে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু কিছুই বলিতেন না; কারণ, কুদ্‌রৎ তাহার পিতা ও পিতামহের আমল হইতে নিত্য এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

বার্দ্ধক্যের অক্ষমতার জন্য বাধ্য হইয়া, তাহাকে তাহার চিরাভ্যস্ত কার্য্যগুলি একে একে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে কোনও মতে এই অধিকারটি পরিত্যাগ করিতে চাহিত না। চিরপ্রিয় প্রভুসেবা হইতে তাহাকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সে কখনও ছুটি লইয়া দেশে যাইত না। সংসারে তাহার কেহ আছে, বলিয়া বোধ হইত না। সে প্রাসাদের নিম্নতলে একটি কক্ষে বাস করিত, বিশ্ব-জগতে বুঝি তাহার দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল না। প্রভুর সেবায় তাহার দীর্ঘজীবন অতিবাহিত হইয়াছে; বয়সদোষে বাধ্য হইয়া, সে সকল কার্য্যভার ত্যাগ করিতে তাহার বড়ই বেদনা লাগিয়াছিল। এখন কেবল এই অধিকারটি, কৃপণের ধনের মত, সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল।

সে সমস্ত দিন ছায়ার মত প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত; রাত্রিতে নবাব যখন মহলে ফিরিতেন, তখন সে মহলের ফটকে দিল্লীওয়াল জরিদার জুতার পরিবর্ত্তে কোমল মখ্‌মলের অন্দরের জুতা পরাইয়া দিয়া বিদায় লইত। সে, সেই অতীত জগতের ঢিলা পায়জামা, আপাদলম্বিত চাপকান ও সাদা টুপি পরিয়াই বেড়াইত; সেইজন্য ইংরাজের দোকানের নূতন সাজে সজ্জিত নবীন ভৃত্যবর্গের মাঝখানে সে যেন মোটেই খাপ খাইত না। বিদ্যুৎ-উদ্দীপ্ত নূতন প্রাসাদে হঠাৎ তাহাকে দেখিলে মনে হইত যে, কে যেন লতাগুল্মমণ্ডিত পরিত্যক্ত প্রাচীন প্রাসাদের একটা অংশ তুলিয়া আনিয়া, এই সুন্দর সুসজ্জিত আধুনিক প্রাসাদটিকে বিসদৃশ করিয়া রাখিয়াছে!

কুদ্‌রৎ যে কখনও নবাব-সরকারের কোন কাজে আসিবে, তাহা কেহই স্বপ্নেও ভাবিত না। তবে, প্রাচীন বংশের প্রাচীন কুলপ্রথা অনুসারে পুরাতন ভৃত্য অকর্ম্মণ্য হইয়াও বেতন পাইত। দেওয়ানখানার হিসাবের খাতায় বর্ষের পর বর্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত যে, কুদ্‌রৎ আলি, নবাব-সাহেবের খাস পরিচারক এবং তাহার বেতন বার্ষিক কোম্পানীর সিক্কা আটচল্লিশ টাকা। কতকাল হইতে দেওয়ানখানার সেরেস্তায় তাহার এই পরিচয় চলিয়া আসিতেছে!—তাহাতে কেহই আপত্তি করে নাই, বা

তাহা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বা সঙ্গত মনে করে নাই।

কালের গতির সহিত পুরাতন নবাব-সরকারের দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছিল; পুরাতন ভৃত্য কুদ্‌রৎ তাহা দেখিয়া, বড়ই মর্ম্মপীড়া অনুভব করিত। কিন্তু সে কি করিবে? সে ত সামান্য ভৃত্যমাত্র; যিনি তাহার নিকট দীন-দুনিয়ার মালিক, শাহান শাহ বাদশাহ, তিনি যদি বহুদিনের প্রতিষ্ঠালব্ধ প্রচলিত আদব-কায়দা পরিত্যাগ করিয়া, নিজ মত প্রচলিত করেন, তাহা হইলে সে কি করিতে পারে? তিনি তঞ্জাম ছাড়িয়া বিলাতী ঘোড়ার গাড়ীতে চড়েন; হাতীর উপরের সোণার সিংহাসন ফেলিয়া, হাওয়া-গাড়ীর আশ্রয় লয়েন; সে তাহাতে কি বলিতে পারে? সে তাহার অন্ধকারময় ক্ষুদ্রকক্ষের কোণে বসিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং হৃদয়ের বেদনাটি হৃদয়েই আবদ্ধ রাখে!

রাত্রিতে কুদ্‌রৎ নবাবের পায়ে অন্দরের জুতা পরাইয়া দিয়া বিদায় লইত

পুরাতন দেওয়ান, বখ্‌শী, দারোগা, এমন কি, আবদার, চোপদার, হরকরা পর্য্যন্ত মরিয়া গিয়াছে; কেবল সেই আছে। নূতন দেওয়ান, জুতা পায়ে দিয়া, কেদারায় বসিয়া থাকে; খাটো আচকান ও লাল তুর্কী টুপি পরিয়া আসে; কুর্ণিশ করিতে জানে না! নবাব-সাহেবের সম্মুখে জুতা পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে! তাহার যখন যৌবন ছিল, তখন যদি কোনও দেওয়ান এমন ব্যবহার করিত, তাহা হইলে তখনই তাহার মস্তক গ্রীবাদেশের সম্বন্ধ ছাড়িয়া যাইত! পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে—তাহার গর্দ্দানা না গেলেও, নিশ্চয়ই চাকরি যাইত; আর এখন তাহা দেখিয়া, কেহ কিছু বলেও না! কুদ্‌রৎ এই বে-আদবী দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে!

নূতন নবাব, ফরাশ্‌খানা ও মজ্‌লিস্‌ ছাড়িয়া, প্রাসাদের একটা ক্ষুদ্রকক্ষে উপবেশন করিতেন; বিলাতী সাজ-পোষাক পরিয়া, নূতন নকীব, হরকরা ও চোপদার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত! কুদ্‌রৎ সেখানে দাঁড়াইতে পারিত না, তাহার বড়ই অপমান বোধ হইত। হরকরার খাটো কুর্ত্তা, ও ইংরাজী বাজাওয়ালার মত টুপি দেখিলে, তাহার বড়ই মর্ম্মদাহ হইত! হরকরার তখ্‌মা দেখিয়া, ক্রোধে তাহার দেহ জ্বলিয়া যাইত! যখন হরকরার লাল পোষাকের উপরে সোণার তখ্‌মা ঝক্‌ ঝক্‌ করিত, তখন পারসী হরফে কাজ চলিত; আর এখন, তাহার পরিবর্ত্তে একটা পিতলের তখ্‌মা থাকে; কিন্তু তাহাতে—হায়রে দুনিয়া! বুড়া কুদ্‌রৎ কি ইহাই দেখিবার জন্য বাঁচিয়া আছে!—তাহাতে 'আংরাজী' হরফ—সেগুলা যেন মুখ বাড়াইয়া কুদ্‌রৎকে ব্যঙ্গ করিত। সে তখন খোয়াবগাহের

মর্ম্মর-আচ্ছাদিত গৃহতলে বসিয়া সেকালের কথা ভাবিত।

কুদ্‌রৎ ভাবিত যে, এমন করিয়াই তাহার বাকী দিন কয়টা কাটিয়া যাইবে। দিন ত কাটিয়াই গিয়াছে, এখনও খোদা তাহাকে কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে না। যাহারা তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারাও চলিয়া গিয়াছে! তবে সে একা কেন এখনও বাঁচিয়া আছে! সময়ে সময়ে, এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাহার মন কেমন হইয়া যাইত। সে জনাকীর্ণ প্রাসাদে বসিয়া মনে করিত যে, সে একা, তাহার কেহই নাই, তাহাকে কেহ চেনে না, সে একটা অজ্ঞাত দেশে অপরিচিতের মধ্যে পড়িয়া আছে!—তখন তাহার মনে বড় ভয় হইত। সে যখন জগতে ফিরিয়া আসিত, তখন দেখিত যে, সে খোয়াবগাহের শীতল মসৃণ গৃহতলে বসিয়া আছে; না হয়, বহুজনাকীর্ণ মহলসরার ফটকে দাঁড়াইয়া আছে। সে দেশ ত তাহার অপরিচিত নহে, সে দেশ যে তাহার চির-পরিচিত। অথচ সে, এখন তাহার সেই চির-পরিচিত স্থানে অজ্ঞাতকুলশীল, অপরিচিত।

বর্ত্তমান নবাব ও তাঁহার ভগিনীকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। তাহাদের পিতা ও খুল্লতাতকেও সে, কোলে-পিঠে করিয়া বেড়াইয়াছে; তাহাদের পিতামহীর বিবাহ দিয়া আনিয়াছে; কিন্তু সে সকল কথা এখন আর তাহার ভাল মনে পড়ে না। সময়ে সময়ে এক একটা পুরাতন দ্রব্য, এক একটা পুরাতন কথা, খণ্ডস্বপ্নের মত অতীতের একটা বর্ণবহুল অংশ তাহার মনের চিত্রপটে প্রতিফলিত হয়, আবার তখনই তাহা স্বপ্নের মত মিলাইয়া যায়! কুদ্‌রৎ তখন বিনা কারণে তাহার সুদীর্ঘ জীবনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে!

হঠাৎ একদিন একটা অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ঘটনা সেই অকর্ম্মণ্য অনাবশ্যক পুরাতন ভৃত্যকে নবাব-সরকারে মহিম-মণ্ডিত করিয়া তুলিল! তখন সে, একদিনের জন্য, অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল!

(২)

যে দিন নবাব মজ্‌লিসে বসিতেন, অথবা আহারের পরে পুরাতন ফরাশখানায় নাম দেখিতেন, সেদিন তাঁহার অন্দরে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া যাইত। কুদ্‌রৎ তাহার পরে যখন তাহার কক্ষটিতে ফিরিয়া আসিত, তখন রজনী প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব থাকিত না। সে দিন দিনের বেলায় বড় গুমট হইয়াছিল, কুদ্‌রৎ খোয়াবগাহের শীতল শুভ্র মর্ম্মরমণ্ডিত গৃহতলে মর্ম্মর-সিংহাসনের পাদমূলে পড়িয়া সমস্ত দিন ঘুমাইয়াছিল; নবাব কখন খাস্‌মজ্‌লিস্ ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সন্ধ্যার পরে, হুজুরী-মজ্‌লিস্ আরম্ভ হইল; রূপসী তরুণী য়িহুদী তওয়াইফ নাচিতে আরম্ভ করিল; কুদ্‌রৎ গোলখানার বারান্দায় বসিয়া, একমনে তামাসা দেখিতে লাগিল। আমীর, ওমরাহ,রইস,রাজা, মহারাজা আসিলেন; তামাসা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল;—যখন মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিল, তখন নিশার তৃতীয় প্রহর। নবাব যখন অন্দরে চলিয়াছেন, তখনও একদল মোসাহেব তাঁহার সঙ্গ লইল। নানা কথায়—বিশেষতঃ বাইজীর রূপগুণের কথা পাড়িয়া, আরও বিলম্ব করিয়া দিল। যখন মহলসরার ফটক ছাড়িয়া, কুদ্‌রৎ তাহার গৃহে ফিরিল, তখন অমানিশার নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া, ত্রিপোলিয়া দরওয়াজার তামার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া প্রহর বাজিল—চতুর্থ প্রহর আরম্ভ হইল, তৃতীয় শেষ হইয়া গিয়াছে!

কুদ্‌রৎ,ফরসিটি হাতে লইয়া,ক্ষুদ্র দ্বারে বসিল; চকমকি ঠুকিয়া আগুন ধরাইয়া, তামাক সাজিল, এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল। তখনও গুমট করিয়া আছে; বড় গরম—বৃদ্ধের তখনও নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। এই সময়ে, হঠাৎ গুমট ভাঙ্গিয়া হু হু করিয়া, একটা হাওয়া আসিল, এবং কুদ্‌রতের মাথার গোল টুপিটা উড়াইয়া রাশি রাশি শুষ্ক পত্র ও লঘু আবর্জ্জনার সহিত নদীতীর-পানে লইয়া চলিল! কুদ্‌রাৎ "আল্লা" "আল্লা" করিতে করিতে, কম্পিত পদে, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল। নদীতীরে আসিয়া বুড়া থমকিয়া দাঁড়াইল; তাহার টুপি অন্ধকারে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল! টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, ঘন কালো কালো মেঘ অমাবস্যার অন্ধকার ঘন করিয়া তুলিতেছিল,—এমন সময়ে দূর হইতে কুদ্‌রতের কর্ণে ক্ষীণ রোদন-ধ্বনি প্রবেশ করিল। কুদ্‌রৎ, টুপির অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া, স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

প্রাসাদের সম্মুখে কলনাদিনী নদী, তাহার তীরে একটি পুরাতন মস্‌জিদ্ বিনাশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে;

রোদনধ্বনি যেন সেই দিক হইতেই আসিতেছে। শব্দ মাঝে মাঝে থামিয়া যাইতেছে, আবার যখন বেগে বায়ু বহিতেছে, তখন শ্রুত হইতেছে।—কুদ্‌রৎ নদীতীর অবলম্বন করিয়া মস্‌জিদের দিকে চলিল।—এককালে সেখানে ফুলের বাগান ছিল; প্রাসাদের আর তিনদিকে এখনও ফুলের বাগান আছে, কেবল নদীর দিকে নাই; নদী ক্রুদ্ধ হইয়া তীরভূমি গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাথরের বাঁধা-ঘাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বিস্তৃত উদ্যানের অধিকাংশ জলগর্ভে। নদীর কূলে, যেখান দিয়া কুল কুল করিতে করিতে জলরাশি সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, সেই খানে, পুরাতন মস্‌জিদটি অস্তের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। মস্‌জিদের দুয়ার বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে; কুদ্‌রৎ সেই মস্‌জিদে প্রবেশ করিল।

মস্‌জিদের অঙ্গনে একটি পুরাতন শ্বেত পাথরের বার-দুয়ারি। কুদ্‌রৎ কাণ পাতিয়া শুনিল, বার-দুয়ারির মধ্যে কে কাঁদিতেছে! চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে বিজলীর উজ্জ্বল আলোকে সাদা পাথর যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে। বহুপূর্ব্ববিস্মৃত স্বপ্নের মত একটা পুরাতন কথা কুদ্‌রতের মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠিল;—এই পুরাতন মস্‌জিদ ও বার-দুয়ারি তাহার যে চির-পরিচিত, তাহাদের প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড যে তাহাকে চিনে। বহুদিন পূর্ব্বে একটি দীর্ঘকায় কুঞ্চিতকেশ গৌরবর্ণ যুবক গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে এই জনহীন মস্‌জিদে বসিয়া থাকিত, এবং অগ্নিতেজোপম তপ্ত বায়ুহীন রাত্রিতে বার-দুয়ারির কঠোর শীতল শ্বেত মর্ম্মর-আচ্ছাদনের উপরে রজনী-যাপন করিত। অন্যদিন এসমস্ত কথা মনে উদয় হইলে, কুদ্‌রৎ রাগিয়া উঠে; কিন্তু আজি আর তাহার ক্রোধোদয় হইল না। কে জানে কেন অতীতের এই স্মৃতিটুকু আজি তাহার বড়ই মিঠা লাগিতেছিল। সে সুদূর অতীতে হাওয়া গাড়ী ছিল না, বিলাতী উর্দ্দী ছিল না!

কুদ্‌রৎ মস্‌জিদের দ্বারের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়াছিল; সেই সময়ে বোধ হয়, পদশব্দ শুনিয়া ক্রন্দন বন্ধ হইয়াছিল। অনেকক্ষণ পদশব্দ না পাইয়া, আবার রোদন আরম্ভ হইল, তাহা শুনিয়া কুদ্‌রৎ নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে বার-দুয়ারির দিকে অগ্রসর হইল। এইখানে সেকালে দুইটা সোপান ছিল;—পুরাতন কথাগুলি কুদ্‌রতের স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। সোপানের উপরে একটা শ্বেত পাথরের জালি, তাঁহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বার; এই দ্বারপথে বার-দুয়ারিতে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে যখন এইস্থানে মজ্‌লিস্ হইত, তখন বার-দুয়ারির এই অংশে বেগমেরা বসিতেন—সেই জন্য ইহার চারিদিকে সুন্দর চিক্কণ শ্বেত-পাথরের জাফরি দিয়া ঘেরা। কম্পিতপদে, ধীরে ধীরে, বৃদ্ধ কুদ্‌রৎ জালির ভিতরের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বার-দুয়ারিতে প্রবেশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে রোদন থামিয়া গেল। বার-দুয়ারির ভিতরে অন্ধকার—ঘন-ঘোর সূচিভেদ্য অন্ধকার; বিদ্যুতের আলোক সকল সময়ে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতেছে না। একবার বহুবক্র প্রখরকরোজ্জ্বল রেখা গগন বিদীর্ণ করিল—তাহার প্রভায় ঘোর তমসাচ্ছন্ন জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তখন কুদ্‌রৎ দেখিল, বারদুয়ারির মর্ম্মর আচ্ছাদনে শ্বেতবস্ত্রাবৃত কি একটা দ্রব্য পড়িয়া আছে; তাহার পার্শ্বে স্তম্ভের অন্তরালে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে।

কুদ্‌রৎ দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে"? বিদ্যুদ্দীপ্তি নিবিয়া গেল; অপরিচিত ব্যক্তি কোন উত্তর দিল না। কুদ্‌রৎ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এবারও সে জবাব পাইল না। তখন সে তাহার দিকে সরিয়া গেল, কিন্তু শ্বেত বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি ক্রমশঃ পিছু হটিতে লাগিল, কুদ্‌রৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল! বয়সের ধর্ম্মে তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল; অন্ধকারে দূরে কে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে আবার বিজলী হাসিল; কুদ্‌রৎ দেখিল যে, তাহার সম্মুখে স্তম্ভের অন্তরালে আপাদমস্তক শুভ্রবস্ত্রাবৃত একটি রমণী দাঁড়াইয়া আছে! তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?—ভয় নাই, আমি কুদ্‌রৎ।" তাহার কথা শুনিয়া, বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি অন্ধকারে তাহার নিকটে সরিয়া আসিল; কিন্তু সে তাহা দেখিতে পাইল না। আবার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল; কুদ্‌রৎ দেখিল—রমণী-মূর্ত্তি নিকটে, তাহার সম্মুখে; বুর্খার অবগুণ্ঠন উঠিয়া গিয়াছে, দুইটি সজল উজ্জ্বল আয়ত নীলাভ নয়ন তাহার মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

বিদ্যুদ্দীপ্তি নিবিয়া গেল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে কে আসিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল, এবং কাহার কমলের মত কোমল

"কে তুমি ?—ভয় নাই, আমি কুদ্‌রৎ"

একখানি মুখ তাহার শীর্ণ বক্ষের জীর্ণ পঞ্জরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রমণী, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; বুড়া, সাঁমলাইতে না পারিয়া পড়িতে পড়িতে, একটা স্তম্ভ ধরিয়া বাঁচিয়া গেল। প্রথমে কুদ্‌রৎ বড়ই ভয় পাইয়াছিল; সে ভাবিয়াছিল যে, পুরাতন পরিত্যক্ত প্রাসাদে এত রাত্রিতে মানুষ কোথা হইতে আসিবে? নিশ্চয়ই "জিনি", না হয় "হুরি!" কিন্তু স্পর্শে, যখন সে বুঝিল যে, তাহা মানুষ, তখন জিজ্ঞাসা করিল, "কে?—কে তুমি?"

রমণী রুদ্ধকণ্ঠে তাহার বুকে মুখ রাখিয়া বলিল, "কুদ্‌রৎ—আমাকে মহলে রাখিয়া আয়।—আমি—আমি জমানিয়া—"

(৩)

বৃদ্ধের সম্মুখ হইতে যেন একটা যবনিকা সরিয়া গেল; তাহার সহিত অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার-ঘন মেঘে বিজলীর খেলা কোথায় চলিয়া গেল। কুদ্‌রতের জীবন যেন অষ্টাদশ বর্ষ পিছু হঠিয়া গেল। অমাবস্যার অন্ধকারের পরিবর্ত্তে, বর্ষাজলস্নাত নাতিপ্রখর রৌদ্র ফুটিয়া উঠিল; নদী-বক্ষ শত হস্ত দূরে সরিয়া গেল, তাহার পরিবর্ত্তে শ্যামল তৃণ-ক্ষেত্র ও সযত্নসজ্জিত কুসুমকানন দেখা দিল। সে দেখিল, নদীধারে ঘটা করিয়া, কাল কাল মেঘ যুদ্ধসজ্জা করিতেছে, উপরে নীল আকাশ—তীব্র রবিকর ধরণীর মুখে, ক্রন্দনের পর, হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে একটা গোলাপ গাছ, একটা উচ্চ ডালে গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহার ক্রোড়ে একটি ক্ষুদ্র বালিকা, তাহার মুখখানিও ফুল্ল গোলাপেরই মত। সে, তাহাকে ফুলটি পাড়িয়া দিতে বলিতেছে, কুদ্‌রৎ তাহা পাড়িয়া দিতে যাইতেছে; এমন সময়ে চঞ্চলা বালিকা অস্থির হস্তে গোলাপ গাছের একটি ডাল ধরিল, তাহার কোমল অঙ্গুলিতে কণ্টক বিঁধিয়া গেল—সে যাতনায় গোলাপ কলিকার মত ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"আমি—আমি—জমানিয়া—আমাকে মহলে রাখিয়া আয় কুদ্‌রৎ!"—আট বৎসর পূর্ব্বে সে আর একদিন এমনি করিয়া বলিয়াছিল, তখন সে দশ বৎসরের। তাহারা দুটি ভাই-ভগিনী তখন দিবারাত্রি কুদ্‌রতের কোলে কোলে ফিরিত, বুড়া এক নিমেষের জন্যও তাহাদিগকে কোল হইতে নামাইত না। কন্যাটি বড়ই সুন্দরী হইয়াছিল, নবাব তাই তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—মালিকা জমানিয়া। মাতৃ-হীন কন্যা-পুত্রের ভার বৃদ্ধ বিশ্বস্ত ভৃত্যের উপর দিয়া, তিনি

নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কুদ্‌রৎ সেই অবধি এক নিমেষের জন্যও তাহাদিগকে কাছ ছাড়া করিত না। সে যখন বড় হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে দেখিয়া, লোকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত ;—তাহার রূপে নয়ন ঝলসিয়া যাইত। তখন সে কিশোরী, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে চাহিত ; তৃষ্ণালোলুপ দৃষ্টি কণ্টকাঘাতের মত তাহাকে ব্যাকুল করিত, তখন সে লজ্জাবতী লতাটির মত জড়সড় হইয়া যাইত। তাহার পিতৃব্য-পুত্র রহিমকে দেখিলে, সে বড়ই ভয় পাইত ; তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বালার কোমল হৃদয় বিঁধিয়া ফেলিত,—সে ভয়ে লজ্জায় কুদ্‌রতের বুকে মুখ লুকাইত। একদিন—সেদিন প্রাসাদে কি একটা উৎসব ছিল ; তখন সে, বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর অধিক দিন সদরে আসিবে না—সে, রহিমের বক্র কঠোর দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, এমনি করিয়া বলিয়াছিল—"কুদ্‌রৎ, আমাকে মহলে রাখিয়া আয় !"

বৃদ্ধ, অষ্টাদশ বর্ষের কথা মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল ; রমণী তাহার নিকট গোলাপ-কলিকাবৎ মাতৃহীনা বালিকা হইয়া উঠিল। সে তাহাকে তিরস্কারের তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"জমানিয়া, তুই এত রাত্রিতে বাহিরে আসিয়াছিলি কেন ?" রমণী তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, স্তম্ভিত হইয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল !—সে দশবৎসরের পুর্ব্বে খেলা করিতে করিতে অবাধ্য হইলে, যেমন তিরস্কৃত হইত, কুদ্‌রৎ আজি তাহাকে তেমনই ভাবে তিরস্কার করিল ; নবাব-কন্যা কোন কথা কহিল না ! কুদ্‌রৎ তাহার বুক হইতে জমানিয়া বেগমের মাথা তুলিয়া দিয়া, যেমন অগ্রসর হইতে যাইবে, অমনি অন্ধকারে কাহার বস্ত্রাবৃত দেহ বাধিয়া পড়িয়া গেল।

কুদ্‌রৎ উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কে ?" কেহই উত্তর দিল না। তখন রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"জমানিয়া এ কে ?" রমণী পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন কুদ্‌রৎ তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া, সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ধীরে ধীরে রমণী দুই একটি কথা কহিতে আরম্ভ করিল ; তখন কুদ্‌রৎ ক্রমে ক্রমে অতীত হইতে বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। জমানিয়া আর বালিকা নহে ; সে যুবতী, বিবাহিতা এবং অস্পৃশ্যা—তাহারও অস্পৃশ্যা। বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিয়া, কুদ্‌রৎ আবার অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িল ; তাহার দেহের বল, মনের বল, কোথায় চলিয়া গেল ! রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে নানা কথায় তাহাকে জানাইল যে, অপর ব্যক্তি পুরুষ—সে তরুণ নবাবের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু—জাহানকাদের ; রাত্রিতে অসহায় অবস্থায় পাইয়া, তাহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে আসিয়াছিল ;—সে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পদাঘাত করিয়াছে, সেই পদাঘাতেই সে ধরাশায়ী হইয়াছে—হয়ত মরিয়া গিয়াছে। কুদ্‌রৎ তাহাকে দুই তিনবার ডাকিল, তাহার দেহ নাড়িয়া দেখিল, এবং বুঝিল যে, জাহানকাদের সত্যসত্যই মরিয়াছে।

সংভ্রান্তবংশীয়া রমণী অবরোধবাসিনী ; একাকী অন্ধকার রাত্রিশেষে নির্জ্জন পরিত্যক্ত পুরাতন মস্‌জিদে কেন আসিয়াছিল, দুর্বৃত্ত চরিত্রহীন জাহানকাদের কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছিল, এ সকল কথা কুদ্‌রতের মনে উদয় হইল না। পরান্নভোজী হীন মোসাহেব যে নবাব-কন্যা ও নবাবের ভগিনীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহা ভাবিয়াই সে ক্রোধে জলিয়া যাইতেছিল। সে বলিয়া উঠিল—"মারিয়াছ, বেশ করিয়াছ ; চল তোমাকে মহলে রাখিয়া আসি।" উভয়ে মস্‌জিদ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। প্রাসাদের অঙ্গন পার হইয়া কুদ্‌রৎ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোন্ পথে আসিয়াছিলে ?" রমণী বলিল—"মহলের বাগানের ভিতর দিয়া।" তাহা শুনিয়া, কুদ্‌রৎ, মহলসরার সদরের ফটক ছাড়িয়া, পশ্চাতের দিকে চলিল। মালতীকুঞ্জের অন্তরালে মহলের অনুচ্চ প্রাচীর ; বেগম ক্ষিপ্রপদে তাহা লঙ্ঘন করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কুদ্‌রৎ ধীরে ধীরে মস্‌জিদে ফিরিল।

সে জাহানকাদেরের মৃত দেহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। বার-দুয়ারিতে ফিরিয়া, শব দেখিয়া, কুদ্‌রৎ চম্‌কাইয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; প্রভাতে লোকে দেখিলেই নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবে। যদি কেহ মৃতদেহ না দেখিতে পায়, তাহা হইলেও নবাব স্বয়ং বয়স্তের সন্ধান করিবেন,—তখন ত সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে ! জমানিয়াকে কেমন করিয়া বাঁচাইবে, কেমন করিয়া প্রভুর সম্মান রক্ষা করিবে, কেমন করিয়া প্রাচীন বংশ-গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবে, এই চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছিল। সে একবার ভাবিল যে, মৃত দেহটা

নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিবে; কিন্তু তাহার দেহে তখন এত শক্তি নাই যে, সে তাহা লইয়া যায়।

কুদ্‌রৎ চির-পরিচিত বার-দুয়ারির মর্ম্মর-আচ্ছাদনে বসিয়া পড়িল, এবং মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। সে কুদ্‌রৎ, অতি বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, পুরাতন ভৃত্য,—দুনিয়ার কেহই তাহাকে আবশ্যক বলিয়া মনে করে না। কিন্তু জমানিয়া? একথা প্রকাশ হইলে, তাহার যে দুরপনেয় কলঙ্ক জগতে ঘোষিত হইবে!—সে রমণী—অপরের পত্নী—তাহার স্বামী কি মনে করিবে?—সেই জমানিয়া, যাহাকে সে, কোল হইতে নামাইত না। লোকে তাহাকে অপমান করিবে! পুলিশ আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে! না—কখনই না—সে প্রাণ থাকিতে লইয়া যাইতে দিবে না। কিন্তু সে কে? কে—তাহার কথা শুনিবে? চিন্তার অকূল সমুদ্রে কূল না পাইয়া বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, পুরাতন ভৃত্য স্থির করিল যে, সে স্বয়ং মরিবে তথাপি জমানিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবে না।

সে কেমন করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে?—সে বলিবে যে, সে স্বয়ং জাহানকাদেরকে মারিয়াছে। প্রভাতে যখন লোকজন জাগিয়া উঠিবে, তখন সে স্বয়ং অপরাধ স্বীকার করিয়া ধরা দিবে—জমানিয়ার নাম পর্য্যন্ত কেহ শুনিতে পাইবে না। তাহার জন্য কেহই কাঁদিবে না—কেহই তাহার অভাব বোধ করিবে না। সে বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, হালের আদব্-কায়দা বুঝে না, অনর্থক বাঁচিয়া থাকিয়া নবাব-সরকারের ক্ষতি করিতেছে। জুতা!—আর একজন জুতা বহিবে—সে হয় ত বিলাতী উর্দ্দী পরিয়া আসিবে! তাহা হইলে—সে ত তখন আর দেখিতে আসিবে না।

নীল, শ্বেত, পীত, লোহিত, নানাবর্ণে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব দেখা দিলেন; কুদ্‌রৎ তখন পুরাতন বারদুয়ারি ছাড়িয়া বাহির হইল। দফ্‌তরখানার সম্মুখে বসিয়া, নায়েব-দেওয়ান ফজলদীন খাঁ, মুখ ধুইতেছিলেন; কুদ্‌রৎ কম্পিতপদে সম্মুখে গিয়া, তাঁহাকে সেলাম করিয়া কহিল—"দেওয়ান সাহেব, কাল রাত্রিতে আমি জাহান-কাদের খাঁকে খুন করিয়াছি।"

(৪)

তাহার কথা শুনিয়া, ফজল্‌দীন খাঁ অবশ্য প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; কিন্তু তাহার পরে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, বুড়া কুদ্‌রৎ তাঁহাকে তামাসা করিয়াছে। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া, কুদ্‌রৎ গম্ভীরভাবে আবার বলিল, "আমি মস্কারা করিতেছি না, আপনি ছোট মস্‌জিদে লোক পাঠাইয়া দেখুন, জহানকাদেরর মৃতদেহ এখনও সেই খানে পড়িয়া আছে।" একজন হরকরা মস্‌জিদের দিকে ছুটিয়া গেল। তখন দেওয়ান বলিলেন—"কুদ্‌রৎ, কাল রাত্রিতে কি মোটে ঘুম হয় নাই?" কুদ্‌রৎ বলিল, "না।" "সেই-জন্যই, বদ হাওয়া মাথায় চড়িয়া, মগজ গরম করিয়া দিয়াছে।"

জাহানকাদেরের ন্যায় বলিষ্ঠ যুবককে যে, কুদ্‌রতের ন্যায় শীর্ণ অকর্ম্মণ্য জরাজীর্ণ বৃদ্ধ একাকী মারিয়া ফেলিতে পারে, ইহা ফজ্‌লদীনের এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস হয় নাই। ইহারমধ্যে হরকরা ছোট মস্‌জিদ হইতে ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, জাহানকাদের সত্যসত্যই ছোট মস্‌জিদের সম্মুখে পুরাণো বারদুয়ারিতে মরিয়া পড়িয়া আছে। কুদ্‌রৎ আবার বলিল—"আমিই তাহাকে মারিয়াছি।" সে কেন মারিয়াছে, তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া, নায়েব দেওয়ান বলিয়া উঠিলেন, "কুদ্‌রৎ, তুমি বড় ভয় পাইয়াছ; এই খানে একটু বসিয়া মগজ ঠাণ্ডা কর।" কুদ্‌রৎ বিনা বাক্যব্যয়ে দেওয়ানখানার বারান্দায় বসিল।

একদণ্ডের মধ্যে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, ছোট মস্‌জিদের বারদুয়ারিতে কাল রাত্রিতে কে জাহানকাদেরকে মারিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ক্রমে নবাব-সাহেবের কর্ণে হত্যাকাণ্ডের কথা উঠিল; তিনি মহলের ফটকে সেদিন কুদরতের চিরপরিচিত মূর্ত্তিটি দেখিতে না পাইয়া, বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রিয় বয়স্যের অকালমরণে তিনি বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। পুলিশ আসিল, তদন্ত আরম্ভ হইল। তখন বৃদ্ধ কুদ্‌রৎ কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সম্মুখে গিয়া, সজলনয়নে যুক্তকরে বলিল "জনাব আলি! জাহানকাদেরকে আমি খুন করিয়াছি।" নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?" কুদ্‌রৎ বলিল "আপনার বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য।" কুদ্‌রৎকে সহস্র প্রশ্ন করিয়াও আর কেহ কোনও কথা জানিতে পারিল না। পুলিশ তদন্ত শেষ করিয়া, কুদ্‌রৎকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য পুরাতন ভৃত্য, হাসিমুখে সাশ্রুনয়নে চিরজীবনের মত প্রভুগৃহ হইতে বিদায় লইল। তুমি যদি তখনই দেখিতে,

তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে, অন্দরমহলের রুদ্ধদ্বার-কক্ষে কঠোর শীতল শুভ্রমর্ম্মরের গৃহতলে লুটাইয়া পড়িয়া, কোমলাঙ্গী জমানিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল!

প্রাসাদ ছাড়িয়া, সহরের ত্রিপোলিয়া ফটকের নিকট আসিয়া, কুদ্‌রৎ একবার দাঁড়াইল। আজি তাহার জীবনের সন্ধ্যা, এ জীবনের প্রভাতে সে একদিন নগ্নপদে মলিন বস্ত্রে ঐ ত্রিপোলিয়া ফটকের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, জীবনে প্রথম প্রভুগৃহ দর্শন করিয়াছিল। কুদ্‌রৎ পিছন ফিরিয়া একবার শেষ-দেখা দেখিয়া লইল। সে দেখিল যে, ত্রিতলের বারান্দায় নবাব বসিয়া আছেন। তখন তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, সেদিন আর সে জুতা লইয়া মহলসরার ফটকে দাঁড়াইতে পারে নাই। তখন সে, নতজানু হইয়া, ফটকের পার্শ্বে শ্যামল তৃণক্ষেত্রে নমাজ পড়িতে বসিল; কিন্তু নমাজের মন্ত্রতন্ত্র তাহার মনে আসিল না। তখন কেবল বারবার জমানিয়ার শৈশবের শান্ত সরল মুখখানি মনে পড়িতে লাগিল। সে নমাজ ভুলিয়া মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিল—"অয়্ আল্লা! জমীন্ ও আসমানের ঈশ্বর, মুসলমান ও কাফেরের একমাত্র ঈশ্বর,—আমি ক্ষুদ্র, সামান্য, বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য; তুমি আমার একটি মাত্র প্রার্থনা পূরণ কর। আমি মরি, আমার প্রাণ যেন আমার প্রভু-বংশের কলঙ্ক-রেখা মুছিয়া লয়। আমি মরি তাহাতে দুঃখ নাই, অসীম অপার আনন্দ! কেহ আমার অনুসন্ধান করিবে না, কেহ আমার অভাব অনুভব করিবে না, কেহ আমার জন্য কাঁদিবে না। আমি মরি, কিন্তু আবদুল্লা আর জমানিয়া যেন সুখে থাকে; এই বন্ধুর উপল কণ্টকময় সংসারের পথে তাহাদের দুখানি কোমল চরণ যেন ব্যথা না পায়। জমানিয়া যদি পাপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার প্রাণ লইয়া, তুমি তাহার পাপক্ষয় কর; সে যেন—" প্রার্থনা শেষ হইল না, প্রহরী তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া চলিল।

কুদ্‌রতের বিচার আরম্ভ হইল গেল। কুদ্‌রতের মত বুড়া যে, জাহানকাদেরের মত জওয়ানকে একাকী হত্যা করিতে পারে, গোরা হাকিম একথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কুদ্‌রৎ কথাটা বুঝিতে পারিয়া, হাকিমকে বলিল—"হুজুর, আমি সত্যই খুন করিয়াছি। আমি বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য, প্রভুর বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে হত্যা করিয়াছি।" হাকিম বলিলেন—তাহার দেহে এমন শক্তি নাই যে, সে একজন বলিষ্ঠ যুবককে খুন করিতে পারে! কুদ্‌রৎ দন্তহীন মুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"হুকুম হইলে সে দেখাইয়া দিতে পারে যে, তাহার দেহে এখনও বল আছে।" তাহার হাতে লৌহ-শৃঙ্খল ছিল। সে, প্রাণপণ শক্তিতে, তাহা ছিড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার শীর্ণ জরাজীর্ণ দেহ ঘামিয়া উঠিল, মণিবন্ধের অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল, কোটর-গত চক্ষুর্দ্বয় বাহির হইবার উপক্রম হইল; তখন বৃদ্ধ মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। দুর্ব্বলের কাতর প্রার্থনায় বধির ভগবানের শ্রুতিশক্তি, তখন বোধ হয়, নিমেষের তরে ফিরিয়াছিল,—শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া গেল!—দায়রার বিচারে কুদ্‌রতের ফাঁসির হুকুম হইল।

প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে সাহেব-ডাক্তার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাহাকেও দেখিতে চাও?"—কুদ্‌রৎ বলিল—"একবার আবদুল্লাকে ডাকিয়া দাও।" আবদুল্লা, বর্ত্তমান নবাবের নাম। বৃদ্ধ ছল ছল নয়নে, হাসিমুখে, তরুণ নবাবকে বুকে জড়াইয়া ধরিল; তাহার দীপ্তিহীন নয়নদ্বয় হইতে দুইটি উষ্ণ অশ্রুবিন্দু শীর্ণ কপোল বহিয়া আবদুল্লার মস্তকে পড়িল। বৃদ্ধ আত্মসংবরণ করিয়া কহিল—"ভাই, আমি ত চলিলাম। আমার কোন দুঃখ নাই, বুড়া বয়সে যে তোমাদের রাখিয়া যাইতেছি, ইহাই সুখ। জমানিয়ার আর কেহ রহিল না; বোনটিকে ভালবাসিও, তিরস্কার করিও না।" দশবৎসর পূর্ব্বে প্রাসাদের উদ্যানে কলহরত বালক-বালিকাকে সে এমন করিয়াই বলিত। সে নবাবকে 'নবাব' বলিয়া সম্বোধন করিল না;—নবাবও, বংশ-মর্য্যাদা—নবাবী মানসম্ভ্রম ভুলিয়া, কারাগারের ধূলিধূসর গৃহতলে বসিয়া, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন।

কুদ্‌রতের ফাঁসির দিন আসিল, বৃদ্ধ হৃষ্টচিত্তে হাসিমুখে মঞ্চে উঠিল। সে, পুলিশ-সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবার অনুমতি লইয়া, মঞ্চের উপর জানু গাড়িয়া বসিল, এবং বলিল—"হে অন্তর্য্যামি! আমি তোমর নিকট চলিয়াছি। তোমার রাজ্যে পুণ্যের পুরস্কার আছে কি না জানি না, কিন্তু পাপের শাস্তি আছে। জমানিয়ার "পাপের' শাস্তি আমি লইলাম, তাহার চরণে যেন কখন কণ্টকও না বিদ্ধ হয়।" বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য পুরাতন ভৃত্যের প্রার্থনা অসীম অনন্ত নীল

আকাশের অন্তঃস্থিত অন্তর্য্যামীর চরণতলে পৌছিল কি না, কে বলিতে পারে!

*　*　*　*

তাহারা যখন শবাধার স্কন্ধে লইয়া ফিরিতেছিল, দূরে রক্তবর্ণ রাজপথে ধূলির লালমেঘ সৃষ্টি করিয়া, একখানি হাওয়া-গাড়ী আসিতেছিল, শববাহকেরা তাহা দেখিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাড়াইল। শবাধার দেখিয়া, গাড়ী থামিল, আরোহী—নবাব আবদুল্লা খাঁ। বাহকেরা নবাবকে দেখিয়া, শবাধার নামাইল। নবাব বিশ্বজগতের সম্মুখে বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য পুরাতন ভৃত্যের শবদেহের পার্শ্বে পড়িয়া, "কুদ্‌রৎ, কুদ্‌রৎ" বলিয়া. চীৎকার করিয়া, আকুল হইয়া, কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময় একজন হরকরা আসিয়া, একজন শব-বাহককে বলিল—"লাট সাহেব কুদ্‌রতের খালাসের হুকুম দিয়াছেন, তার আসিয়াছে।" কুদ্‌রৎ তখন লাটের যিনি লাট, তাঁহার দরবারে হাজির হইয়া, প্রভুভক্তির পুরস্কারলাভ করিয়াছে!

বর্ষ-বরণ

[শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়]

এস—শুভ্র—নিষ্কলঙ্ক—নবীন অতিথি,—
কি এনেছ নব বার্ত্তা করিয়া বহন ;
এস, অকুণ্ঠিত-পদে—বহি' পুষ্প-বীথি,
দিকে দিকে গায় পাখী তব আবাহন।
স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুপ্রভাত,—প্রসন্ন গগন,
দাঁড়াও সম্মুখে দেব, শুভ-শঙ্খ করে ;
লুণ্ঠিত চরণে ধরা অর্ঘ্য-নিবেদন
করিবে কুসুমে রচি' তব পাদ'পরে।
বাজাও তোমার শঙ্খ সঘন ফুৎকারে,—
দাও জাগাইয়া যেই—সুষুপ্তি-মগন ;
ডাক কর্ত্তব্যের পথে,—ডাক বারে বারে,
আপনার সুখে মত্ত—বিস্মৃত যে জন!
দাও, দাও,—দাও দেব, বেদনা-আঘাত,
নিষ্ঠুর নয়নে আন' অশ্রুর প্রবাহ ;
দাও, দাও পাপে দণ্ড, কর বজ্রপাত—
দ্রোহী—অত্যাচারী-শিরে—বুকে জ্বাল' দাহ।
তোমারে বুঝিতে দাও—তোমারি আঘাতে,
করুণা মানিব সেই—পুরস্কার তব ;
বিক্ষত করুক্ প্রেম, দণ্ড তব হাতে
সে হোক্ আশিস্ সম—তাই যাচি' লব।
এ প্রাণ আহুতি দিব,—এ হৃদয় আর—
ভেঙ্গে-চুরে গড়ি' লহ আপনার মত ;
যুগে যুগে ভাঙ্গিতেছ, রোধে সাধ্য কার?
যুগে যুগে তুমি নব গঠনে নিরত!
মূর্ত্ত-প্রলয়ের মত ওহে শক্তিমন্,—
চূর্ণ কর আছে যাহা, ধূলিসাৎ তারে।
নব রাজ্য গড়ি' তোল, মানব নূতন,
হিংসা-দ্বেষ-আর্ত্তপীড়া না থাকে সংসারে।
তোমার মঙ্গল-শঙ্খ বাজুক্ সঘনে,
খসিয়া পড়ুক অস্ত্র আততায়ী করে।
রুদ্ধ হোক্ মিথ্যা-কণ্ঠ, তোমার শাসনে
দূরে যাক্ জাতি-ধর্ম্ম-দ্বেষ পরস্পরে।
ভারতবর্ষের দীক্ষা শুনাও আবার,—
জ্ঞান-ভক্তি-ত্যাগ—মন্ত্র, লক্ষ্য—লোক-হিত ;
পশুবলে মানবের হ'বে না উদ্ধার,
রাষ্ট্রজয়—রণ-হিংসা-ধর্ম্ম-বিপরীত।
প্রশান্ত প্রভাতে আজি দাও সে আশ্বাস,—
আজি হোক্, কালি হোক্—বর্ষ শত পরে—
পূর্ণ হয় যেন বিশ্ব-মানবের আশ,
ধ্যানে জ্ঞানে—যেই বীজ র'য়েছে অন্তরে।

পণ্ডিত বালকৃষ্ণভট্ট

[অধ্যাপক শ্রীরসিকলাল রায়]

জন্ম—সংবৎ ১৯০১, আষাঢ়, কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, রবিবার, ৩রা জুন, ১৮১৩।
মৃত্যু—সং ১৯৭১, শ্রাবণ, কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, সোমবার, ২০ জুলাই, ১৯১৪।

সূচনা

বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে যে সকল মহাপুরুষ নিষ্ঠার সহিত হিন্দীসাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট তাঁহাদের অন্যতম। সাহিত্যের আসরে কেহ আসেন—প্রতিষ্ঠার লালসায়, কেহ আসেন—যশের কামনায়, কেহ আসেন—অর্থাগমের উপায়-চিন্তায়, কেহ আসেন—'শিবেতর-ক্ষয়' হেতু, কেহ আসেন—অবসর-কালে চিত্ত-বিনোদনের জন্য, অথবা আর কোন অভিপ্রায় লইয়া। কিন্তু প্রতিভার প্রেরণায়, ত্যাগ-স্বীকার করিয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় থাকিতেও তাহা পায়ে ঠেলিয়া, দুঃখ-ক্লেশ-দারিদ্র্য-অভাব আলিঙ্গন করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের ভীম-ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া, সাহিত্যেরই জন্য সাহিত্য-সেবায় তনু-মন ধন-প্রাণ কয় জন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত? সাহিত্যের আহ্বানে আকুল হইয়া, সাহিত্যের স্পর্শে অবশ-তনু হইয়া, মধুর সাহিত্যরসসম্ভোগে হতচেতন হইয়া, যাঁহারা সাহিত্যের চরণে আত্মবিক্রয় করেন, তাঁহারা ধন্য! ভারতী দেবীর মোহন বীণার তান যাহার—

'পশিয়া মরমে, ঘুচায় ধরমে
পরাণ সহিত টানে,'

সে কি আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারে? পণ্ডিত বালকৃষ্ণের জীবনে আমরা এইরূপ সাহিত্যানুরাগের ও সাহিত্যোন্মাদনার পরিচয় পাইয়াছি।

বংশ

পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্টের পূর্ব্বপুরুষেরা মালবদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী, বা অবন্তী নগরীর সমীপে শিপ্রানদী-তীরে বাস করিতেন। তাঁহারা মালবীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুসলমানরাজত্বকালে রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশত্যাগ করিয়া, উঁহারা কাল্পীর নিকটবর্ত্তী 'বেতবে' * নদীর তটে, 'জিটকরী'-নামক গ্রামে যাইয়া বসবাস করেন। ভট্টজীর প্রপিতামহের নাম শ্যামজী। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, এবং 'কুলপাহাড়ে'র রাজার অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার অধস্তন চারিপুরুষের বংশ-লতায় বালকৃষ্ণের স্থান নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

* কবি কেশবের বাসস্থানও 'বেতবৈ' নদীর তীরে অবস্থিত ছিল ;—"নদী বেতবৈ তীর জহঁ তীরথ তুঙ্গারণ্য।" ভারতবর্ষ, ২য় বর্ষ, ২য় খঃ, ১৭৪ পৃঃ।
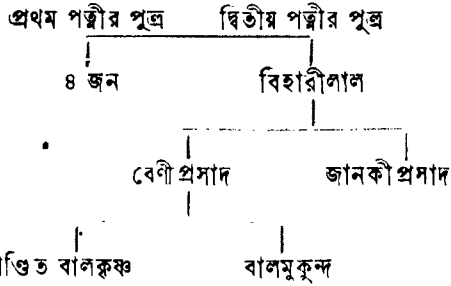
পণ্ডিত বিহারীলাল, জিটকরী পরিত্যাগ করিয়া, প্রয়াগে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। অতএব, পুণ্যতীর্থ প্রয়াগই বালকৃষ্ণের স্বর্গাদপিগরীয়সী জন্মভূমি।

শিক্ষা

হিন্দীতে যাঁহারা বালকৃষ্ণ ভট্টের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে—ভট্টজীর বাল্যকালে সৎসঙ্গে রুচি ছিল; তিনি পৌরাণিক গল্প ও কথকতা শুনিতে ভাল বাসিতেন; তাঁহার ধারণাশক্তিও প্রবল ছিল। কথক ঠাকুরদিগের মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া আসিয়া, তিনি যাহা যেরূপ শুনিতেন, অবিকল অনুকরণ করিতে পারিতেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে বালকৃষ্ণ এক কাণ্ড অমরকোষ ও সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর কিয়দংশ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে বালককৃষ্ণের বাল্যজীবন মাতুলালয়ে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতুলালয়ে সকলেই সংস্কৃত-শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। বালক বালকৃষ্ণও 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' অনুসারে ১২ বৎসর বয়স † পর্যান্ত সংস্কৃতপাঠ আওড়াইয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর, পূর্ণপ্রতাপে ইংরেজী প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইলে, বালকৃষ্ণের দূরদর্শিনী জননী, তাঁহাকে স্থানীয় মিশন-স্কুলে ইংরেজী শিখিতে প্রেরণ করেন। বালকৃষ্ণের মাতৃদেবী বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা ‡ ও উদার-প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। গৃহে এইরূপ জননীর স্নেহপুষ্ট শিক্ষাগুণে বালকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ জীবনের মেরুদণ্ড দৃঢ় হইয়াছিল। তিনি মাতুলালয়ে সংস্কৃত পাঠ করিতেন, মিশন স্কুলে ইংরেজীবিদ্যা শিক্ষা করিতেন এবং বাইবেল-ক্লাসে পাদরীসাহেবদিগের নিকট তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক আগ্রহের সহিত আয়ত্ত করিতেন। বাইবেল-পরীক্ষায় এই হিন্দু মালবীয় ব্রাহ্মণ কুমার একবার প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। অতএব, অল্পদিনের মধ্যেই বালকৃষ্ণ পাদরীদিগের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মালা-তিলক, স্বধর্ম্মে আস্থা ও আচারনিষ্ঠা অনেক সময় তাঁহাকে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন করিত।

এইরূপে নানাবিধ শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়া বালকৃষ্ণের জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। তৎপর তিনি সেই মিশন স্কুলেই অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু মতের মিল না থাকাতে স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচেতা, তার্কিক ভট্টজী অধিকদিন মিশনস্কুলে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই।* তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিতে কর্ম্ম ছাড়িয়া, পুনরায় সংস্কৃত-অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্র পাঠ করিতে তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। এই সময়, সুবিখ্যাত মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের পিতৃব্য, পণ্ডিত গদাধর মালবীয়ের সহিত ভট্টজীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। গদাধর পণ্ডিত সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার কৃপায় ভট্টজী সংস্কৃত-সাহিত্যের রসাস্বাদনে অধিকারী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ইতোমধ্যে কিছুদিন 'যমুনা মিশনস্কুলে'ও অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন; কিন্তু তথায়ও অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই। †

গৃহধর্ম্ম

লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরবিবাদ স্বর্গীয় সাহিত্যসেবক বালকৃষ্ণ ভট্টের জীবনে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছিল। দৈন্য, অভাব, অনটন ও অর্থকৃচ্ছ্রতার নিরবচ্ছিন্ন ধারা তাঁহার সাংসারিক জীবনের মূলসূত্রস্বরূপ ছিল। কিন্তু এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াও, তিনি কখনও বিচলিত বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার বিদ্যানুরাগ, সকল দুঃখকষ্ট উপেক্ষা করিয়া, মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

† 'প্রতাপ' ও 'নবনীত' নামধের হিন্দী মাসিকপত্রদ্বয়ের মতে ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।

‡ "ইন্‌কীমাতা বড়ী বিদুষী থী'।"—'নবনীত'।

* "য়ে আপনে হিন্দু ধর্ম্মপর হৃদয় সে দৃঢ় থে। ঊর ইসী কারণ সে উস স্কুলকে পাদরী হেড মাস্টর সে বাদবিবাদ হো পড়নে পর ইন্‌হোঁনে স্কুল ছোড় দিয়া।"—'নবনীত', শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্যা, ১৯৭১।

† 'কোবিদরত্নমালা,' 'প্রতাপ' ও 'নবনীত' দ্রষ্টব্য।

অতএব, তিনি আনন্দে দুঃখ, ক্লেশ, অনাহার, অনটন আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।—প্রাণে এই প্রকার অনুরাগ না থাকিলে, সাধনা কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

ভট্টজীর পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বালকৃষ্ণের দুর্ভাগ্য যে, তিনি তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, ব্যবসায়-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি আশৈশব সরস্বতীর মন্দিরে সেবকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যা-প্রীতি, তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। তাঁহারা স্বয়ং সুশিক্ষিত ছিলেন না, এবং শিক্ষার সমুচিত সমাদরও জানিতেন না। অতএব,উভয়ে বালকৃষ্ণকে দোকানদারী শিখাইতে চেষ্টা করিলে, বালকৃষ্ণ মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি বিধাতা বালকৃষ্ণের অদৃষ্টফলকে অঙ্গার-লেখনীতে লিখিয়াছিলেন,'হতভাগ্য চিরদরিদ্র।' কিন্তু তাঁহার উপাস্যদেবতা হংসবাহিনী দেবী শুচিস্মিতা বীণার ঝঙ্কারে তাঁহার কর্ণে যে অতুল সম্পদের আশার বাণী শুনাইয়া দিলেন, তাহাতেই বালকৃষ্ণের প্রাণমন মুগ্ধ হইয়া গেল।

বালকৃষ্ণের অনুজ, ব্যবসায়-শিক্ষা করিয়া অর্থশালী হইলেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি অসাধারণ ছিল: অতএব, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে লক্ষাধিকমুদ্রা লাভ করিলেন। ভট্টজী মাসিক ২০।২৫৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতেন; তাঁহার কনিষ্ঠ লক্ষপতি ধনী! সংসারের চক্ষে তিনি কিরূপ হীনদশা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভট্টজী স্বোপার্জ্জিত অর্থসঞ্চয় করিয়া, তদ্দ্বারা একখানি ক্ষুদ্রগৃহ ক্রয় করিয়া, পিতৃদেবের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। কিন্তু যাঁহার একপুত্র লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ভেটদিয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, তাঁহার নিকট এইক্ষুদ্র উপহার অতি অকিঞ্চিৎকর। এই উপহারের বহিরাবরণের অভ্যন্তরে বালকৃষ্ণের সরল হৃদয়ের যে অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ গঙ্গাজলের উৎস খেলিতেছিল, তাহা তাঁহার স্বার্থান্ধ ঘোর বৈষয়িক জনকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ভট্টজীর দিকে পরিবারের কেহই প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিল না। তিনি সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য, আত্মীয়-পরিজনের চক্ষুতে, তিনি খৃষ্টান বা আর্য্যসমাজী বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। এই সময় বালকৃষ্ণের জনকজননী, তাঁহার চরণে পরিণয়ের সুবর্ণ-শৃঙ্খল পরিধান করাইয়া, তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির দিকে মনোযোগী করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই, ভট্টজীর অনাদরের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে, তাঁহার নব বধূর উপর নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। ভট্টজী, নিরুপায় হইয়া, ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রীপুত্র বক্ষে লইয়া, অকূল সংসার-সাগরে ঝম্প-প্রদান করিলেন। 'অর্থাতুরাণাং ন পিতা ন বন্ধুঃ'। পরিধেয় বস্ত্রব্যতীত তিনি পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। বালকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীর পতিভক্তি ও সহগুণ অসামান্য ছিল; তিনি, পুত্রকন্যাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া, অনাহারে ও একাহারে থাকিয়া, বহুদিনপর্য্যন্ত দারিদ্র্যের সহিত তুমুল সংগ্রামে স্বামীর সহায় হইয়াছিলেন। এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও স্বামীস্ত্রী উভয়েই যাহাতে সন্তানগণের সুশিক্ষার কোনরূপ ত্রুটী না হইতে পারে, তৎপক্ষে যত্নশীল ছিলেন। ভট্টজীর ভ্রাতার প্রচুর ঐশ্বর্য্যের পার্শ্বে, তাঁহার এই দীন কুটীরের ধর্ম্মের ও শিক্ষার ভাতি, মলিন কি উজ্জ্বল, তাহার বিচারভার সাধুসজ্জনদিগের হস্তে ভবিষ্যতের গর্ভে।—বিলাসভোগে জীবন নহে, জীবনের বিকাশ প্রতিকূল-অবস্থার জীবন-সংগ্রামে। প্রতিভার পরিচয় কষ্টিপাথরে—স্বর্ণকৌটায় সিন্দুরের আবরণে নহে। সুতরাং ভট্টজীর সম্মুখে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা আসিয়াছিল, এবং তিনি তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিপদাপদ, ঝঞ্ঝাবাত ও প্রতিকূল তরঙ্গ-শিখরে আপন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

ভট্ট বালকৃষ্ণের দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহার বন্ধুদিগের চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টজী সম্মত হইলেন না। তাঁহার দুইজন পরম মিত্র, তাঁহাকে কেবল ওকালত-নামায় সহি করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া, সম্পত্তি-উদ্ধারের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ভার ও পরিশ্রম নিজেরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ভট্টজী বীরের ন্যায় উত্তর করিলেন, "অর্থ সমস্তই আমার কনিষ্ঠের উপার্জ্জিত; আমি অন্যায়পূর্ব্বক তাহার অংশী হইব কেন? আপন শক্তিতে যাহা লাভ করিতে পারি, তাহাই

* "বে পঢ়েলিখে তো বহুত ন থে; পর ইস ওর উনকে স্বয়ং চিত্তকী প্রবৃত্তি, ঔর রুচি বিশেষ থী।"—'নবনীত,' বর্ষ ১, সংখ্যা ১১।

আমার যথার্থ প্রাপ্য। তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকারে লব্ধ অর্থ আমার নিকট 'হারাম'।"*

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তুচ্ছ সম্পত্তির লোভে অসত্যোক্তি দ্বারা উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চনা করিতে স্বীকার করেন নাই। বালকৃষ্ণ সাহিত্য-সেবার লোভে সত্য কহিয়াও আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন না! এরূপ মহত্ত্ব, উদারতা ও তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত আজকাল সকল দেশেই অতি বিরল। মানুষে অর্থ উপার্জ্জন করে সত্য, কিন্তু অর্থ যখন মানুষকে গ্রাস করে, তখন মানব-জীবনের কি দুর্দ্দশা! সে সময় বালকৃষ্ণের অর্থাভাবে দিনপাত চলিত না। তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন। এমন অভাব ও অনটনের সময় ন্যায্য স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া, অতুল বিভবের প্রতি ঔদাসীন্য ও বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করা, সাংসারিকের পক্ষে সাধারণ কথা নহে! বালকৃষ্ণের জীবনের অসাধারণত্ব এই খানে যে, তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যদুঃখ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

'দারিদ্র্যায় নমস্তভ্যং সিদ্ধোঽহং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
জগৎ পশ্যামি যেনাহং ন মাং পশ্যন্তি কেচন॥'

পরিবার-প্রতিপালনের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, বালকৃষ্ণ উদরান্নের জন্য অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।† বাল্যে ব্যবসায়ে পদাঘাত করিয়া, ব্যাকরণ কণ্ঠের ভূষণ করিয়াছিলেন; সংসারচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া, তিনি পুনরায় সেই ব্যবসায়ের সাধ্যসাধনা করিতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন;—কিন্তু ব্যবসায় তাঁহার সহিল না। তিনি, ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া, কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে প্রতিবর্ত্তন করিলেন। বিধাতা তাঁহাকে যে দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেত করিয়া চালাইতেছিলেন, তিনি আশার ছলনায় তাহার বিপরীতমুখে চরণচালনা করিতে চেষ্টা করিয়া, প্রতিপদক্ষেপে বাধা পাইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই পথেই অগ্রসর হইলেন।

সাহিত্য-সেবা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, বিদ্যাচর্চ্চা তাঁহার প্রকৃতির অনুকূল সাধনা,—বাণিজ্য-বাণিজ্য তাঁহার ধাতুতে সহিবে কেন? ভট্টজীর জনৈক বন্ধু, প্রয়াগে 'শিবরাখন স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ভট্টজীকে তাঁহার স্কুলের প্রধানপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন। বালকৃষ্ণ, বন্ধুদিগের পরামর্শে তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং ঐ স্কুলে কয়েক বৎসর অধ্যাপনা-কার্য্য করিয়া, পরে 'কায়স্থ পাঠশালা'র ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট স্বর্গীয় মুন্সী রামপ্রসাদের অনুরোধে, 'কায়স্থ কলেজে' সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিয়া, স্বদেশী-আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্রব থাকাতে, পণ্ডিতজী রাজপুরুষদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তেজস্বী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধবয়সে ছিন্নপাদুকার ন্যায় পরসেবা জীবনবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বাধীন মত, সাহিত্য ও স্বদেশসেবা পরিত্যাগ করেন নাই।

সাহিত্যসেবা

বালকৃষ্ণের প্রাণে সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল—অসাধারণ সাহিত্য-সেবক ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভা। একথা তাঁহার কোন জীবন-চরিত-লেখক স্বীকার করুন, আর নাই করুন, জগতের লোক অস্বীকার করিবে না। বাবু-সাহেব (হরিশ্চন্দ্র) আধুনিক হিন্দীভাষার জীবনসঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি যে উদ্বোধনের মন্ত্রপাঠ করিয়া সেবক-সম্প্রদায় আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন অনেকে। ভট্ট বালকৃষ্ণ এই সেবক-সম্প্রদায়ের অন্যতম *। ভট্টজী 'কবিবচন সুধা,' 'কাশী পত্রিকা' ও 'বিহার বন্ধু'তে প্রবন্ধ লিখিয়া ভাষা-রচনায় হাত পাকাইয়াছিলেন।† প্রয়াগে কলেজের ছাত্রেরা হিন্দীভাষার উন্নতি-সাধন জন্য

* ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরের 'ইন্দু', এবং নবেম্বরের 'সরস্বতী' দ্রষ্টব্য।

† 'পরন্ত ইসী বীচমেঁ, জব ইনকা বিবাহ হো গয়া, তব কমানে কী ফিক্র হুই।'—'প্রতাপ' হইতে উদ্ধৃত 'নবনীতে'র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* "মিশ্রবন্ধু বিনোদ" নামক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে বালকৃষ্ণকে হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী 'দয়ানন্দীযুগে'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

† 'প্রতাপের' লেখক বলেন, বালকৃষ্ণ তাৎকালিক সমস্ত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন,—

"উস সময়কে সমস্ত সাপ্তাহিক ঔর মাসিক হিন্দী পত্রোঁমেঁ লেখ লিখ লিখ কর ভেজনে লগে।"

'হিন্দী বর্দ্ধিনী সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সভায় নির্দ্ধারিত হয় যে, পাঁচ পাঁচ টাকা চাঁদা তুলিয়া যৌথ মূলধন দ্বারা কোন হিন্দী সংবাদপত্র প্রচার করা হইবে। 'হিন্দীবর্দ্ধিনী সভা'র সভ্যগণ, বাবু হরিশ্চন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দী-সাহিত্যের উন্নতিসাধনে সর্ব্বদাই অগ্রসর ছিলেন। অতএব, ভারতেন্দু সেই সভার সভ্য হইয়া, যুবকদিগকে নানা প্রকার উৎসাহ প্রদান করেন। সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার নাম 'হিন্দী-প্রদীপ' রাখা হইয়াছিল। ভারতেন্দু স্বয়ং তাহার 'মটো' রচনা করিয়া দিয়াছিলেন,—

'শুভ সরস দেশ-সনেহ পূরিত হবৈ আঁনদ ভরৈ,
বচি দুসহ দুরজন বায়ুসোঁ মণিদীপসম থির নহীঁ টরৈ।
সুঝৈ বিবেক বিচার উন্নতি কুমতি সব যামেঁ জরৈ,
'হিন্দী প্রদীপ' প্রকাশিত মূরখতাদি ভারত তম হরৈ।'

১৮৭৭ সনের ডিসেম্বর মাসে 'হিন্দী প্রদীপ' ভূমিষ্ট হইয়াছিল। ঐ বৎসর 'ভর্ণাকুলার প্রেস্ একট' জারি হয়। 'হিন্দী প্রদীপে'র রচনায় আপত্তিজনক গন্ধ ছিল বলিয়া, রাজপুরুষের খরদৃষ্টি ঐ পত্রের সম্পাদক ও পরিচালক-দিগের উপর পতিত হয়। তাহাতে ভীত হইয়া, অনেক সাহসী-সাহিত্যসেবকই পশ্চাৎপদ হইয়া পত্রিকা বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ভট্টজীর সাহিত্য-প্রেম 'ওজন করা ভালবাসা' ছিল না। তিনি স্বয়ং প্রদীপের সকল ভার গ্রহণ করিয়া, পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন। একবার, 'রামলীলা ও মহরম' উপলক্ষে, তিনি তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাসানুযায়ী অপ্রীতিকর কঠোর মন্তব্য করিয়া, মুসলমান-দিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। বিরক্ত ও উত্তেজিত মুসলমানগণ সভা করিয়া, তাঁহার নামে নালিশ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কেহ কেহ তাঁহার পশ্চাতে গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়া সরাসরি বিচার করিলেন। বালকৃষ্ণকে অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হইল বটে; কিন্তু তাঁহার লেখার ভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি, পূর্ব্ববৎ অকুতোভয়ে লেখনী পরিচালনা করিয়া, ন্যায় ও সত্যের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু একাদিক্রমে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ-নৈতিক চর্চ্চা করিয়া, ইদানীং তিনি, 'মৌনং হি শোভনং' নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক, কেবল সামাজিক ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিতেন।

হিন্দী প্রদীপের প্রবন্ধ 'নিতুই নূতন'। তাঁহার রচনায়, আলোচনায় ও বিষয়-নির্ব্বাচনে প্রতিবারই নূতনত্বের ও মৌলিকতার ছায়া থাকিত। ভট্টজী যাহা ভাল বুঝিতেন, বিশ্বসংসার বিরোধী হইলেও, মত-বিসর্জ্জন দিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি কখনও বন্ধুত্বের বা স্বার্থের খাতিরে অসৎ ও অন্যায় পক্ষ সমর্থন করিতেন না। এই মতের স্বতন্ত্রতা ও বিচার-বুদ্ধির নিরপেক্ষতার জন্য, তিনি কখনও আর্য্যসমাজের পক্ষ অবলম্বন করিতেন, কখনও বা হিন্দুসমাজকে তীব্র আক্রমণ করিতেন। লোকে বুঝিতে পারিত না, তিনি কোন্ পন্থী। তিনি ছিলেন হিন্দু, কিন্তু হিন্দুসমাজের উন্নতির পরিপন্থী সামাজিক দুর্নীতি তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। এজন্য লোকে ভাবিত, বুঝি তিনি আর্য্যসমাজের দিকে ঢলিয়া পড়িতেছেন। তাঁহার দল ও গণ্ডী ছিল না; ন্যায় ও সত্যের পতাকা উড্ডীন করিয়া, তিনি সাহিত্যে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া গিয়াছেন। যাহার যাহা ভাল, তিনি শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতেন; যাহার দোষ ও ত্রুটী তাঁহার চক্ষে পড়িত, তিনি আত্মপর ভুলিয়া, তাহাকে উচিত কথা শুনাইতে ছাড়িতেন না।

তাঁহার স্বাধীন মত, উচিত সমালোচনা ও নির্ভীক ব্যবহারে গ্রাহকেরা বিরক্ত হইয়া, একে একে হিন্দী প্রদীপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রদীপ-সম্পাদক অর্থের লালসায় সাহিত্যসেবা করিতেন না। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁহাকে এপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তিনি মুষ্টিমেয় গ্রাহকের * অনুগ্রহ, অঞ্জলি ভরিয়া মস্তকে লইয়া, অসীম সাহসে ৩৩ বৎসর পর্য্যন্ত একইভাবে যোগ্যতার সহিত হিন্দী প্রদীপ পরিচালনা করিয়াছিলেন। (১) কখনও কখনও অর্থা-ভাবে প্রদীপ যথাসময়ে প্রকাশিত হইত না। তৈলাভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ হইলেও প্রদীপের ভাতি কখনও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই। অনেকবার এমনও হইয়াছে যে, মাসের শেষে বেতন পাইয়া, তিনি সমস্ত প্রাপ্ত অর্থ পত্রিকার জন্য

* "ইস পত্রকী গ্রাহক-সংখ্যা দোসৌ সে অধিক,কভী নহীঁ হুই।" —'সরস্বতী'তে শ্রীরাসবিহারী শুক্ল।

(১) 'সংবৎ ১৯৩৪ মেঁ প্রয়াগসে হিন্দীপ্রদীপ নামক এক সুন্দর মাসিক পত্র প্রায়ঃ ৩২ বর্ষ তক নিকলতা রহা। ভট্টজী উসকে সদৈব সম্পাদক রহে।'— মিশ্রবন্ধু বিনোদ, ১২০৭ পৃঃ।

ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কেবল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক, এত ক্লেশ সহিয়াও প্রদীপের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। অবশেষে, গত ১৯০৭ সনের 'প্রেসএক্‌টের' চাপে পড়িয়া প্রদীপের ক্ষীণ আলোক একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল। চিরদরিদ্র ভট্টজীর জামিনের টাকা কে দিবে?

হিন্দী প্রদীপের ভাষা, বালকৃষ্ণের নিজস্ব। তিনি 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' ভালবাসিতেন না; দোষী ও অপরাধীকে উচিত কথা শুনাইয়া দিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না। তাঁহার বিদ্রূপবাণ, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের কটাক্ষ যাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিষের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে, পরিচয়ে, কথোপকথনে অমায়িকতা, সহৃদয়তা ও মাধুর্য্যের উৎস উচ্ছ্বসিত হইত। ব্যঙ্গ, তেজস্বিতা, প্রাঞ্জলতা, দৃঢ়তা, সত্যানুরাগ, সুরুচি ও লালিত্য তাঁহার ভাষার ও রচনার বিশিষ্ট গুণ ছিল। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে (বিশেষতঃ সামাজিক দুর্নীতির উপর আক্রমণে) আমরা সংযম ও ধৈর্য্যের অভাব উপলব্ধি করিয়াছি। তাঁহার শাসন ও সমালোচনা, জননীর তাড়নার ন্যায় বা কান্তার পরামর্শের অনুরূপ ছিল না; গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের ন্যায়, পিতার আরক্তলোচনের ন্যায়, রাজার শাসনদণ্ডের ন্যায় ত্রাসজনক ছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, লেখকের কোমল চিত্ত—লেখার তীব্রতা হইতে কত বিভিন্ন বুঝিতে পারা যাইত। ভট্টজী হিন্দীরচনার আধুনিক প্রণালীর পুরোহিত ছিলেন। বাবু হরিশ্চন্দ্র বলিতেন, 'হিন্দী রচনায় আমার পরেই ভট্টজীর স্থান' †। পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, রাধাচরণ গোস্বামী প্রভৃতি হিন্দীলেখকদিগের রচনায়ও বালকৃষ্ণের রচনাভঙ্গী ধরিতে পারা যায়। তাঁহার সুন্দর, সরস, প্রাঞ্জল, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বাভাবিক রচনাপ্রণালী, পাঠকের চিত্তাকর্ষণ না করিয়া পারে না। তিনি অকারণ সংস্কৃতশব্দের প্রয়োগদ্বারা ভাষার কর্কশতা বৃদ্ধি করিতেন না, এবং কষ্ট-কল্পনা করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, গ্রাম্য প্রাদেশিক সহজ শব্দ ব্যবহার করিয়াও ভাষা মোলায়েম করিবার চেষ্টা করিতেন না। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ সাবধানে বিজাতীয় উর্দ্দূ শব্দসকলও তাঁহার রচনা হইতে বিদূরিত করিতেন না। বাগ্‌দেবীর বরে তাঁহার লেখনীমুখে জননী জন্মভূমির দান যে ভাষা আসিত, তাহাতেই তিনি মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার ভাষার রূপ পরিবর্ত্তিত হইত *। রহস্যরসে ভাষার লঘুতা আসিত, শৃঙ্গার রস ভাষায় মাধুর্য্য আনিত। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া, উত্তরকালের নিরপেক্ষ সমালোচকেরা সাহিত্যসেবকের পংক্তিতে বালকৃষ্ণকে প্রতিভাশালী লেখকের আসন প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভট্টজীর 'কলিরাজকী সভা' 'রেলকা বিকট খেল,' 'বালবিবাহ নাটক', 'সৌ অজান এক সুজান', 'নূতন ব্রহ্মচারী', 'জৈসা কাম বৈসা পরিণাম', 'আচার বিড়ম্বনা', 'ভাগ্যকী পরখ', 'ষড়দর্শন সংগ্রহকা ভাষানুবাদ' 'গীতা ঔর সপ্তশতীকী সমালোচনা' প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। পদ্মাবতী, শর্ম্মিষ্ঠা ও চন্দ্রসেন নামক তিনখানি উৎকৃষ্ট হিন্দী নাটকও তাঁহার লেখনী-প্রসূত †। সাহিত্যসেবার জন্য পণ্ডিত বালকৃষ্ণ পিতামাতার বিরাগভাজন হইয়া, গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। সাহিত্যসেবার জন্য তিনি স্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকমণ্ডলীর বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন; বলিতে গেলে, সাহিত্যসেবার জন্যই তিনি বার্দ্ধক্যে শেষ-অবলম্বন অধ্যাপকতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি 'শ্যাম'ই রাখিয়াছিলেন, 'কুল' রক্ষা করেন নাই ‡। তাঁহার সাহিত্য-সেবার মূলে ছিল—আনন্দ সম্ভোগ ও আনন্দ-বিতরণ। তিনি সাহিত্যরসে রসিক হইয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন; অতএব, শত কষ্ট সহ্য করিয়াও সে পথ পরিত্যাগ করেন নাই। 'কায়স্থ পাঠশালা'র কর্ম্মে 'ইস্তাফা' দিয়া তিনি মাসাবধি 'সম্রাট্'

† 'বাবু হরিশ্চন্দ্র কহা করতে থে কি হমারে বাদ, দুসরা নম্বর ভট্টজী কা হৈ। সো ঠীক হী থা।'—নবনীত, পৃঃ ৭৭৬, বর্ষ ১, সংখ্যা ১১। 'য়ে মহাশয় সংস্কৃত কে অচ্ছে বিদ্বান্ ঔর ভাষাকে এক পরম প্রাচীন লেখক হৈঁ। ভারতেন্দুজী ইনকে লেখ পসন্দ করতে থে।'—মিশ্রবন্ধুবিনোদ, ভাগ ৩, পৃঃ ১২০৭।

* 'ভট্টজী জিস বিষয় পর লিখতেথে, উসকে অনুসার ভাষা ভী বৈসীহী লিখতেথে।'—ইন্দু, ৫৬৮ পৃঃ, ১৯১৪ ডিসেম্বর সংখ্যা।

† 'মিশ্রবন্ধুবিনোদ' ও 'হিন্দী কোবিদ-রত্নমালা' দ্রষ্টব্য।

‡ 'আপ হিন্দীকে সচ্চে ঔর অবিভক্ত সেবক থে।'—নবনীত-সম্পাদক।

নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তৎপর বাবু শ্যামসুন্দর প্রসাদের অনুরোধে 'সম্রাট্'।* পরিত্যাগ করিয়া, 'হিন্দী শব্দসাগর' সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করেন। এই অভিধানের পীড়নে তাঁহাকে কাশী-প্রয়াগ-কাশ্মীর পর্য্যটন করিয়া, বৃদ্ধবয়সে অনেক কষ্ট সহিতে হইয়াছিল। অবশেষে, তিনি ভগ্নদেহে পঙ্গু ও অন্ধ হইয়া, কণ্টকমুকুট শিরে ধারণ করিয়া, অপমানের ক্রুশকাষ্ঠে জীবনবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যিনি নিষ্ঠার সহিত সাহিত্য-সেবা করিবেন, তাঁহার ভাগ্যে বাণীর বরে যশের 'হেলেনা' লাভ হইলেও, কমলার কোপে তাঁহাকে আজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া 'খাক' হইতে হইবে!—ইহাই প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধান।

মত

ধর্ম্ম—উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, হিন্দু বালকৃষ্ণ ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস ও অনুদারতার প্রশ্রয় দিতেন না।§ তাঁহার রচনা হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। ভারতের যে সমাজেরই হউক না কেন, উন্নতির অন্তরায়-জনক দোষসকল তাঁহার দৃষ্টিতে পতিত হইলেই, তিনি ভীমবিক্রমে তাহা আক্রমণ করিতেন। তিনি আর্য্য-সমাজের ধর্ম্মমতের অনুকূল ছিলেন না। দেশের ও সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি যাহাতে হয়, তাহাই তাঁহার মতে ধর্ম্ম এবং তাহার অন্যথাই অধর্ম্ম। তিনি হিন্দুসমাজের তামসিক জড়তার বিরোধী এবং আর্য্যসমাজের জীবনী-শক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সনাতন ধর্ম্মকে কখনও অনাদর করিতেন না। শুনা যায়, একবার তাঁহাকে মাসিক ৭৫৲ বেতনে 'ভারতমিত্রে'র সম্পাদকতা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়; তিনি কার্য্য গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আর্য্যমত স্বীকার করিতে অনুরোধ করায়, তিনি ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ স্বামীর অনেক সামাজিক সংস্কার-মত তিনি সমর্থন করিতেন; কিন্তু তাই বলিয়া, ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, পরের গোলামী করিতে বালকৃষ্ণের স্বাধীন প্রকৃতি সম্মত হইতে পারে নাই। ভট্টবালকৃষ্ণ প্রথমে বল্লভাচার্য্যের মতাবলম্বী বৈষ্ণব ছিলেন, এবং মালা-তিলক ধারণ করিতেন। ঐ সম্প্রদায়ের প্রায় ৫০ জন গোস্বামীপ্রভু 'প্রদীপের' গ্রাহক ছিলেন; কিন্তু বোম্বাই নগরের 'মহারাজ লাইবেল্' মকর্দ্দমাকালে বালকৃষ্ণ মালা-তিলক বর্জ্জন করিয়া-ছিলেন, এবং গোসাঁই প্রভুদের কুকীর্ত্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 'প্রদীপে' প্রবন্ধ লিখিয়াছেন;—তাহাতে গোস্বামী-গ্রাহকেরা সকলে একযোগে পত্রিকা-গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রদীপের জীবনে, এই আকস্মিক আঘাত* সাংঘাতিক হইলেও, বালকৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

তাঁহার কোন বন্ধু একবার ভট্টজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, 'আপনি কোন্ মতের উপাসক? সনাতনধর্ম্মের—না আর্য্যসমাজের?' তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'বুদ্ধিকে'—অর্থাৎ, 'বুদ্ধির'। পাদরীদিগের পাঠশালায় ইংরেজী ও বাইবেল শিক্ষা, অলক্ষিতভাবে তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ-মতের উপর যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমাজ—বালকৃষ্ণ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার জনৈক জীবনীলেখক বলিয়াছেন,—

"বে কহা করতেথে কি জবতক কুরীতিরূপী কোঢ় সমাজসে দূর নহীঁ হোতা, তবতক দেশ কী রাজনৈতিক তথা অন্যপ্রকার কী উন্নতি হোনা অসম্ভব হৈ।"

হিন্দীপ্রদীপে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

'জিসমে সাতহী বর্ষ কী কন্যা ব্যাহী জায়, (১) জিসমেঁ আঠ কনৌজিয়ে (২) নৌ চুল্হে (৩) হোঁ, জিসমেঁ লড়কপনসে (৪) ক্ষীরকণ্ঠ বালক কা ব্যাহ করকে স্বচ্ছন্দ জীবন কা পাঁব তোড় দিয়া জায়, (৫) * * * জিসমেঁ এক জাতিবালা দূসরে জাতিবালে কা ছুআ ভোজন কর লেনে পর পতিত হো

* 'প্রতাপে'র প্রবন্ধানুসারে বালকৃষ্ণ 'সম্রাটে'র সম্পাদকতা করিবার পর, 'কায়স্থ পাঠশালা'র অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; আমাদের মনে হয়, এটা anachronism.

§ "আপ সনাতন ধর্ম্ম কে অনুযায়ী থে; পর অন্ধপরম্পরাকে পক্ষ-পাতী নহী থে।"—নবনীত।

* 'ইন্দু',—১৯১৪ ডিসেম্বরের সংখ্যা, ৫৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১) বিবাহিতা হয়, (২) কনৌজী ব্রাহ্মণ, (৩) নয়চুলী অর্থাৎ পৃথক পৃথক রান্নাঘর, (৪) শৈশব হইতে (৫) চরণ ভঙ্গকরা হয়।

জায়, বহ সনাতন ধর্ম্ম ক্যা বিচারবান্ লোগোঁকে পোষণ-যোগ্য হৈ ?' ইত্যাদি।

ভট্টজী, বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ—উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, বাল্যবিবাহ রহিত হইলে, বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তাই থাকিবে না। তিনি আরও বলিতেন, দুঃখ কষ্টের ও নানা পরীক্ষার মধ্যে জীবনের পবিত্রতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করাই হিন্দু কুলবধূর গৌরব ও বিশিষ্টত্ব। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বিলাতযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'বহুপ্রজার' ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কাহারও সন্তান হইলে, তিনি তাহাতে আদৌ আনন্দপ্রকাশ করিতেন না। 'বহুপ্রজা ইতি দরিদ্রতা', এই শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করিয়া এবং আপনার দুরবস্থা বিচার করিয়া, তিনি বংশবৃদ্ধির প্রতিকূল ছিলেন। আমাদের দেশে পিতামাতারা সন্তানগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন না; কিন্তু শৈশবেই তাহাদিগের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দেন। এজন্য বালকৃষ্ণ এদেশের নরনারী ও অভিভাবকগণের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন।

বালকৃষ্ণ 'সহভোজন' (dining in company) সমর্থন করিতেন। তাঁহার মতে, ভারতীয় হিন্দুমাত্রের একত্র পান-ভোজন, এখনও সুদূর-পরাহত। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশবাসী একজাতীয় লোকদিগের পংক্তি-ভোজন, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেন।—

'ইসমেঁ ক্যা বুরাই (১) হৈ কি ব্রাহ্মণ মাত্রকা এক সহভোজন হো জায়; ইসী তরহ (২) ক্ষত্রিয় ঔর বৈশ্যভী আপস মেঁ বেধড়ক (৩) খানেপীনে লগেঁ; ঐসাহী বারহোঁ জাতি কায়স্থোঁ তথা অন্তবর্ণোঁকী এক রোটী (৪) হো জায়'। —ইত্যাদি।

তাঁহার মতে 'সব জাতাহো তো আধা দেকর পিণ্ড ছুটাবেঁ—সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' বালকৃষ্ণ হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, এবং জননীর ন্যায় সতত উহাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। এই হিতৈষণার প্রেরণায় তিনি সমাজসংস্কার প্রচার করিতে বদ্ধকটি হইয়া, বীরের ন্যায় গত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে সাহিত্যক্ষেত্রে 'যুঝিয়া' ছিলেন।

(১) দোষ, (২) এইরূপ, (৩) নিঃসঙ্কোচে, (৪) একত্র ভোজন।

রাজনীতি—ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের সহিত প্রতিনিধিরূপে তিনি জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতেন। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় তিনি 'হিন্দী প্রদীপ' ক্রোড়ে করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবং শেষজীবনের একমাত্র জীবিকা—কলেজের অধ্যাপকতা—অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যৌবনে যিনি মতের স্বাধীনতার জন্য লক্ষ মুদ্রার পৈতৃকসম্পত্তি তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার পক্ষে ৫০৲ টাকা বেতনের অধ্যাপকতার প্রতি বৈরাগ্যপ্রদর্শন করা কঠিন কার্য্য ছিল না। আমাদের দেশে আধুনিক কবি, লেখক, বক্তা ও গ্রন্থকারদিগের অনেকেই জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত। ভট্টজী স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণকামনা করিতেন বলিয়া, হিন্দুজাতির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ম্রিয়মাণ হইতেন। তাঁহার সাহিত্যসেবার উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বজাতি-সেবা ও স্বদেশ-সেবা বলিয়া বোধ হয়। সমাজ ও ধর্ম্ম যদি জাতীয় উন্নতির সহায়ক না হয়, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। জাতির প্রাণে শক্তি-সঞ্চয়ই তাহার প্রকৃত উন্নতি। সমাজ, ধর্ম্ম ও শিক্ষা এরূপভাবে সংস্কৃত ও গঠিত করা আবশ্যক, যাহাতে জাতির শরীরে শক্তি ও জীবন সঞ্চার হয়। এই নিমিত্তই বালকৃষ্ণও, সম্প্রদায়ভেদ ভুলিয়া, যাহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করিতেন, তাহারই প্রশংসা করিতেন। তাঁহার লেখা ও ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, তিনি রাজনীতিতে মধ্যপন্থী ছিলেন (ariston metron), এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যের পতাকার নিম্নে ভারতের জাতীয় শক্তি-বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন।

চরিত্র

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ভট্ট বালকৃষ্ণের চরিত্রের অনেক আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনে মতের দৃঢ়তা, মনের একাগ্রতা, ধনে স্পৃহাহীনতা, উদারতা, মহানুভবতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরতা, বিদ্যানুরাগ, স্বদেশপ্রেম, নৈতিক বল, অধ্যবসায়, সৎসাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। মনুষ্যত্বের উপাদান তাঁহার চরিত্রে

ছিল বলিয়া, তিনি সর্ব্বত্র বরেণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী যেসকল হিন্দীলেখক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁহারা বালকৃষ্ণের চরিত্রসম্বন্ধে প্রচুর আস্থাযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। 'প্রতাপ'-সম্পাদক লিখিয়াছেন—

'আপকী মৃত্যু সে ন কেবল আপকে কুটুনিয়োঁ কো হী, বল্কি সারে দেশ—খাসকর হিন্দী সংসার কো জোঁ দুঃখ হুয়া হৈ, উসে প্রকট করনা কঠিন হৈ। ভট্টজী সরল চিত্ত, সত্যপ্রিয়, ঔর নিস্বার্থী পুরুষ থে। জিসনে আপকে দর্শন একবার ভী কিয়ে থে, উসে পতা লগ গয়া হোগা কি আপমেঁ কিস প্রকার দেশভক্তি ঔর হিন্দীপ্রেম থা।'

'নবনীত'-সম্পাদক বলিতেছেন—'ঐসে স্বতন্ত্রবিচার ঔর স্বাতন্ত্র্যভক্ত পুরুষকে দেহান্ত সে হিন্দী সংসারকা এক রত্ন ছিন গয়া।'

পঞ্চম হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের স্বাগতকারিণী সমিতির সভাপতি রাজা রামপাল সিংহ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—"ইস বর্ষ হিন্দী আকাশকে ভট্টভাস্করকে অস্ত হো জানে সে, হিন্দী সংসার মেঁ অন্ধকার ছা গয়া হৈ। স্বর্গীয় ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্রকে সহযোগী, হিন্দীকে মর্ম্মজ্ঞ লেখক ঔর প্রচারক পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট ইস বর্ষ ইস অসার সংসার কো ত্যাগ দেবলোক কো পধার গয়ে। পঃ বালকৃষ্ণ ভট্ট নে জৈসী মাতৃভাষা কী নিঃস্বার্থ সেবা কী, উসকা সাঙ্গোপাঙ্গ বর্ণন করনা বড়া হী কঠিন হৈ। স্বর্গীয় ভট্টজী মহারাজ সদ্‌গুণোঁকে সমূহ থে। মাতৃ-ভাষা-ভক্তি, দেশভক্তি, ধীরতা, সভ্যতা, স্পষ্টবাদিতা, দৃঢ়তা আদি সদ্‌গুণ উক্ত মহাত্মা কী নস নস মেঁ ভরে হুয়ে থে।"—ইত্যাদি।

ভট্টজীর অসাধারণ বিদ্যানুরাগ, তাঁহার জীবনের প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সমভাবে প্রবল ছিল। যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া, তিনি একমনে, একচিত্তে সাহিত্যসেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সাংসারিক ক্লেশ ভুলিতে, আত্মীয়-স্বজনের নির্ম্মম ব্যবহারের ব্যথা বিস্মৃত হইতে, স্ত্রীপুত্রের অনাহারজনিত কষ্টের চিত্র স্মৃতি হইতে বিদূরিত করিতে, তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা বাগ্‌দেবীর চরণে শরণ লইয়াছিলেন। চিরদিন একাগ্রচিত্তে, নিঃস্বার্থভাবে তিনি বিদ্যানুশীলন করিয়া জীবনের উন্নতিসাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা উপাধিমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও উপাধি-পরীক্ষা-পরিচালক-সমিতিসকল যুবকদিগকে যোগ্যতার ও কৃতিত্বের প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়া, বিদ্যানুশীলনের পথ প্রদর্শন করে। কিন্তু হতভাগ্য দেশের অদৃষ্টগুণে, এদেশে অধিকাংশ যুবকই, সাধ্য ও সাধন ভুলিয়া, উপাধিকেই জীবনের শেষ লক্ষ্য মনে করেন—বিদ্যারম্ভেই তাঁহাদের বিদ্যানুশীলন শেষ হয়। কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন,—

'উপাধি র্ব্যাধিরেব স্যাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে।'

ভট্টজী ব্যাধিহীন হইলেও বিদ্যা-মন্দিরের নৈষ্ঠিক পুরোহিত ছিলেন। বিদ্যাপ্রেমে মত্ত হইয়া তিনি সংসার ভুলিয়াছিলেন, স্ত্রীপুত্রের সেবা ভুলিয়াছিলেন, আহার-নিদ্রা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়াছিলেন এবং জীবনের সার করিয়াছিলেন—সরস্বতীর সাধনা। বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, দর্শন তাঁহার অধ্যয়নের বিষয় ছিল। জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পাঠ-পিপাসা প্রবল ছিল এবং পাঠানুরাগই তাঁহার নেত্র-হীনতার কারণ হইয়াছিল।

সদা প্রফুল্লভাব, সন্তোষ ও প্রসন্নতা—দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বালকৃষ্ণের মন, ভাষা, আলাপ ও ব্যবহার সরস রাখিয়াছিল। হাসি-কৌতুক, ঠাট্টা-চাতুরী তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এজন্য তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। আর কেহ তাঁহার ন্যায় বালবৃদ্ধযুবা সকলের সহিত সমভাব প্রদর্শন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করিত, তিনি তাহারই নিকটতম বন্ধু। মতের অনৈক্যহেতু তাঁহার ব্যবহারে ও আলাপে কেহ কোন প্রকার তারতম্য অনুভব করিতে পারিত না। এজন্য, ঘোরতর বিরোধী ব্যক্তিও, তাঁহার সঙ্গ ও সাহচর্য্যের জন্য লালায়িত হইত। বালকৃষ্ণ, হাসিমুখে যাঁহাদিগের মত ও ব্যবহার সমালোচনা করিয়া, অজস্র গালাগালি বর্ষণ করিতেন, তাঁহারা হাসিমুখেই তাহা গ্রহণ করিতেন। বালকৃষ্ণের বালকের ন্যায় সুন্দর-সরল-স্বচ্ছ স্বভাব, পবিত্রতা, প্রেম ও দয়া তাঁহার জীবনে মাধুর্য্য বিতান করিয়াছিল। তাঁহার বাহ্যব্যবহার দেখিয়া বন্ধুরা কেহই তাঁহার চরিত্র-সমালোচনা করিতেন না। স্বভাবতঃ তার্কিক, বালকৃষ্ণ বাদানুবাদ করিতে ভালবাসিতেন, এবং অনেক সময়, আত্ম-

মত গোপন করিয়া, উকীলের ন্যায় যে-কোন পক্ষ সমর্থন করিতেন। বালকৃষ্ণের চরিত্রে ব্রাহ্মণস্বভাবসুলভ ক্রোধ বিষম ছিল; কিন্তু তাঁহার ক্রোধ কখনও স্থায়ী হইত না,—খড়ের আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিবিয়া যাইত। স্পষ্টবাদিতা, দুর্নীতির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, পরোপকার-প্রবৃত্তি ও চরিত্রবল, তাঁহার দরিদ্রজীবনের ভূষণ ছিল। চরিত্রসম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

'মনুষ্যমেঁ চাহে বিদ্যা, ধন, বৈভব আদি কুছভী ন হো, পর যদি বহ চরিত্র কা শুদ্ধ হৈ, তো উসকা জীবন বহুত হী আনন্দময় বীতে গা; ঔর বহ সমাজমেঁ শ্রেষ্ঠ সমঝা জায়গা।'

বালকৃষ্ণ বালকের ন্যায় ভোজনের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মিষ্টান্ন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ভোজনদ্রব্য ছিল। তাম্বুল-চর্ব্বণ তাঁহার ব্যসন-স্বরূপ ছিল। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল ছিলেন; কিন্তু যৌবনে সুস্থ, সবল ও দৃঢ়কায় হইয়াছিলেন। শুনা যায়, বালকৃষ্ণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। বালকৃষ্ণ নির্লোভ, নিরহঙ্কার, স্বতঃসন্তুষ্ট, সংযমী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি, ইন্দ্রিয় জয় করিয়া, অশন-বসন-ভোগবিলাসে উদাসীন হইয়াছিলেন। অতএব, মনুর সেই সুপ্রসিদ্ধ উক্তি—'সর্ব্বমাত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখং'—তাঁহার জীবনে আমরা সজীব সত্যের আকারে দেখিতে পাইয়াছি। বালকৃষ্ণ প্রেরিতপুরুষ ছিলেন না, অলোকসামান্য প্রতিভার অবতারও ছিলেন না (Davus sum, non Œdipus); তিনি ছিলেন আমাদেরই মত দশজনের একজন। তথাপি তিনি তাঁহার চরিত্র-বিশেষত্বে, নলিনীদলগত সলিলবিন্দুর ন্যায়, দশজন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাহিত্য-সেবা করেন অনেকেই, দেশের ও দশের সেবা করেন অনেকেই, প্রতিভাশালী কৃতবিদ্য এদেশে জন্মিয়াছেন বহুব্যক্তি; কিন্তু চরিত্রগুণে বালকৃষ্ণ সকলের নমস্য ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। চরিত্রহীন লেখকের প্রতিভা উজ্জ্বল হইতে পারে; কিন্তু তিনি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না। ভট্টজীর ন্যায় চরিত্রবান্ চিন্তাশীল লেখক সকলদেশেই লোকমণ্ডলীর স্বাভাবিক নেতা। আমরা ডিমস্থিনিসের বক্তৃতা-পাঠে মুগ্ধ হই, প্রয়োজন হইলে তাঁহার বিচার-বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করি; কিন্তু কোসিয়নের ন্যায় চরিত্রবান্ নেতার পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া, পরিচালিত হইতে ইচ্ছা করি। যাহার চরিত্রের মেরুদণ্ড নাই, বিশ্বাস করিয়া তাহার হস্তে জীবন-মরণের সমস্যার ভার কে অর্পণ করিবে?

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দীকবি শ্রীযুক্ত শ্রীধর পাঠক পরলোকগত বালকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে শেষ কথা বলিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া, আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

'জীবন তব অতি ধন্য সবহি বিধি অহো পূজ্যবর!
অনুদিন অনুকরণীয় চরিত, পাবন প্রশস্যতর।
ধনি স্বদেশ শুচি-প্রেম, নেমপ্রিয়প্রানহুঁসোঁ পর।
সাত্ত্বিক শুদ্ধ বিচার সতত ভারতোদ্ধারকর।
ধনি 'হিন্দীদীপ' প্রকাশি জগমূরখতাতমত্রাসহর।
তব পুণ্য নাম প্রিয় ভট্ট শ্রীবালকৃষ্ণ জগমে অমর।'

---

* স্বর্গীয় পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্টের জীবনী সম্বন্ধে বিগত নবেম্বরের 'সরস্বতী' মাসিকপত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী শুক্ল-লিখিত প্রবন্ধ, পৌষ-মাঘের 'নবনীতে,' 'প্রতাপ' হইতে উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত ও সম্পাদকীয় মন্তব্য, জানুয়ারী সংখ্যা 'নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা'য় প্রকাশিত ৫ম হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ, মিশ্রবন্ধু বিনোদ', 'হিন্দী কোবিদ-রত্নমালা' প্রভৃতি হইতে বর্ত্তমান সন্দর্ভের উপাদান ঋণ করা হইয়াছে।—লেখক।

কবি ও চিত্রকর

[শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়]

বহু বর্ণে চিত্রকর আঁকে চারু ছবি,
তবু তার পরিচয় হয় প্রয়োজন।
মসী মাত্র যাঁর চিত্র-অঙ্কন-সহায়,
কবি তিনি, শ্রেষ্ঠ তিনি, তিনি অতুলন।

চিত্রকর ও কবি

[শ্রীবিজয়মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভাবে রঙ্গে চিত্রকর আঁকে যেই ছবি,
স্বতঃ সপ্রকাশ যেন প্রাণময় কায়া।
কবির চিত্রিত চিত্র বিচিত্র অদ্ভুত,
তথাপিও মনে হয় প্রাণহীন ছায়া॥

ভূদেববাবু ও ছেলেদের শিক্ষা

[শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভূদেব বাবু যাহাদের মানুষ করিবার ভার লইয়াছিলেন, আমি ত ঝড়ের মত, অতি দ্রুত,—এক নিশ্বাসে বলিলেও বলা চলে—তাহাদের সহিত, ভূদেব বাবুর দৈনন্দিন সম্পর্ক বলিয়া, শেষ করিয়া দিলাম। এক্ষণে সেই শিক্ষার প্রকৃতিটির স্বরূপ বর্ণন করিবার চেষ্টা করিব। তাহা বুঝান দুরূহ, তবে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব। পাঠকগণ আমার অক্ষমতা মার্জ্জন করিবেন।

ভূদেববাবু লিখিয়াছেন, "স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল শরীর। অতএব ছেলের শরীর সবল করিবার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদের আবশ্যক। শৈশবাবধি ব্যায়াম-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া দেওয়া পিতামাতার কার্য্য।" * ছেলেকে শুধু বিদ্যা শিখাইলে হয় না। বিদ্যা শিখিবার জন্য যে পরিশ্রম করা আবশ্যক, সেই পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে, এমন শরীর সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। একটি বাড়ী তৈয়ারি করিতে হইলে, ভিত গাঁথিতে হয়। এই ভিত যত মজবুত হইবে, তত বড় বাড়ী এই ভিতের উপর খাড়া করা যাইতে পারে। প্রথমে একতালা বাড়ী তৈয়ার করিয়া লও। আবশ্যক, সময়, ও সুবিধামত ঐ দৃঢ় ভিত্তির উপর ক্রমে ক্রমে দ্বিতল, ত্রিতল, অথবা যততল ইচ্ছা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভিত্তি কমজোর হইলে, উপরে যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে, সর্ব্বদা ভয় থাকিবে, কখন বা সেই সমুদায় সশব্দে ভূপতিত হয়। ছেলের শরীরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, যদি কেবল পড়ার চাপ দেওয়া যায়, ত প্রথম কিছুই বুঝা যাইবে না, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন পড়ার চাপে ছেলের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িবে, তাহার পাঠ-সাঙ্গ আর ত হইবেই না অধিকন্তু ব্যাধি-সমষ্টি হইয়া, সে জড়পিণ্ডবৎ সংসারের একটা ভার হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ রুগ্নদেহ অপেক্ষা অন্য যে কোনও দুরবস্থা সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ। দুর্ব্বল শরীরে নিজের ত কোনও সুখই নাই; অধিকন্তু অপরের অসুখের হেতু হইয়া, নানা গোলযোগের কারণ হইয়া উঠিতে হয়। পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে হইবে, এই ইচ্ছা স্বতঃই সকল তীক্ষ্ণধী বালকেরই মনে হয়। আর এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য জ্ঞানশূন্য হইয়া, বালকেরা যে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, তাহা বর্ণনায় ব্যক্ত করা যায় না। এ বিষয়ে ছেলেদের দোষ দিলে চলিবে না; দোষ—যদি তাহাদের ঐরূপ পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত দেহ তাহাদিগকে গঠন করিয়া না দেওয়া হয়, অথবা পাঠে পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম ছেলে করিতেছে কি না, তদ্বিষয়ে অভিভাবকের দৃষ্টি না থাকে। বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ মস্তিষ্ক-সঞ্চালন করিতে হয়, এমন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই শরীরের অনিষ্ট হয়। বিশেষতঃ, যদি ছাত্রের শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল থাকে, এবং তাহার কেবল পুস্তক অধ্যয়নেই আনন্দ হয়, তাহা হইলে সেরূপ ছাত্রের সকল প্রকার মনোবৃত্তি এককালে নষ্ট হইয়া যায়। এবিষয়ে ছাত্রদের সাবধান হওয়া উচিত; কেননা, অনেকস্থলে এইরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। ভূদেববাবুর এই অভিজ্ঞতা ছিল; সেই জন্য তিনি ছেলেদের যাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন হয়, যাহাতে তাহারা ব্যায়াম করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বুঝে, নানারূপে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছেলেদের তিনি 'উঠ-বস' করাইতেন। ছেলেদের বিকালে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতে কখনও বাধা দিতেন না। 'জল-ডিঙ্গাডিঙ্গি' 'লুকোচুরি' ইত্যাদি দেশীয় খেলায় ছেলেরা সমুদায় বিকালটা অতিবাহিত করিত। তাঁহার গঙ্গারধারের বাটীতে যে যায়গা ছিল, তাহাতে ছুটাছুটি করিবার স্থানের অকুলান হইত না। দ্বিতল হইতে আরম্ভ করিয়া, গঙ্গাতীর ও রাস্তার ধার পর্য্যন্ত বাটীর সর্ব্বত্র ছেলেদের গমনাগমন হইত, ও কলহাস্য শ্রুতিগোচর হইত। আর বাড়ীতে একটি-আধটি ছেলে-

* পারিবারিক প্রবন্ধ, পৃঃ ১১৪।

মেয়ে ত ছিল না ;—অনেকে মিলিয়া খেলায় বেশ স্ফূর্ত্তি হইত। বাল্যকালের এই নির্ম্মল একত্র ক্রীড়া পরম-সুখকর। ভূদেববাবুর পৌত্রেরা ইহা পড়িলে, তাঁহাদের গঙ্গাধারের বাটীর গোলঞ্চ গাছে চড়িয়া, তথা হইতে ছাদে উঠা, ও পাঁচিলের উপর দিয়া গিয়া, দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের ছাদে চড়ার কথা স্মরণ করিয়া, অতীতের সেই সুখময় দিনের জন্য আক্ষেপসহকারে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন। ভূদেববাবুর এক পুত্র মুগুর ভাঁজিতেন; অপর পুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। ভূদেববাবু ছেলেদের জন্য ইংরাজী ব্যায়াম-চর্চ্চার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। "গলির ঘাটের" দিকে Parallel Bar, Horizontal Bar, Ring Swinging ইত্যাদি আবশ্যক যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। শুধু স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ;—প্রথম প্রথম সপুত্র আপনি হাজির থাকিয়া, ছেলেদের দেখাইয়া দিতেন, কেমন করিয়া, কিরূপভাবে দুলিতে হইবে; অবশ্য তিনি আপনি উঠিতেন না, দেখাইয়া দিতেন, কোন্ দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—সমস্ত শরীর কেমন ভাবে রাখিতে হইবে—কিরূপে অল্পে অল্পে শরীর নত করিতে হইবে—কিরূপেই বা ব্যায়াম কৌশলে ঘুরিতে ফিরিতে হইবে ইত্যাদি। এইরূপে উৎসাহ পাইয়া, ছেলেরা যথানিয়মে ব্যায়ামে মনোযোগ দিতে শিখিয়াছিল। তাঁহারই আদেশে ছেলেরা সাঁতার দিতে শিখিয়াছিল। অনেকে এক সঙ্গে স্নানে যাইয়া, প্রতিযোগিতা করিয়া, গঙ্গার অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিত। নৌকা-চালনও কেহ কেহ একটু একটু শিখিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনার ত চরম হইয়া থাকে; কিন্তু সেখানকার ঐ দুই বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নৌকাবাহন(Boat Race)এর প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে; আর, এই নৌকাবাহন-প্রতিযোগিতায় জেতারা বিশেষভাবে সম্মানিত হন। নৌকাবাহিগণকে উৎসাহিত করিবার জন্যই হলণ্ডের জনসাধারণ সব কাযকর্ম্ম ফেলিয়া, নদীকূলে সমাগত হন—হলণ্ডেশ্বর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উৎসাহবর্দ্ধন করেন। আমাদের দেশে শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চায় তেমন উৎসাহদান নাই। ভূদেববাবু ইহা দেখিয়া স্বয়ং ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থায় স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর এক পৌত্র, পাটনা কলেজে পাঠকালে, সর্ব্বপ্রকার Sportsএ প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহারও সূত্রপাত—সেই চুঁচুড়ার বাটিতে, তাঁহার দাদাবাবু করিয়াছিলেন। অধুনা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রত্যেক স্কুলে Drillএর ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে শরীরের ব্যায়াম অতি অল্পই হইয়া থাকে *। এত সামান্য সামান্য বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি ছিল, যে তাহা বলিবার নহে। ছেলেরা পাঠে বসিবে বা কোনও কায করিবে—সে সময়ে ছেলেরা যেন সামনে বেশী ঝুঁকিয়া না বসে—বেশ সোজা হইয়া বসে। "এই রকমে আগেকার মুনিঋষিরা বসিতেন বলিয়া, নিজে সর্ব্বদা সোজা হইয়া বসিয়া ছেলেদের বুক চিতাইয়া বসিতে শিখাইতেন। সোজা হইয়া বসিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য স্বাভাবিকরূপ হইয়া থাকে, এই জন্য

---

* প্রোফেসর ব্লাকী ব্যায়াম সম্বন্ধে বলেন:—'শরীর পটু ও কার্য্যক্ষম রাখিবার পক্ষে Games and Gymnasticএর মত আর কিছু নাই। প্রাতে আহারের পূর্ব্বে এক ঘণ্টা পদব্রজে ভ্রমণ করিবার উপকারিতা অনেকে বুঝেন না। কেমন করিয়া আমোদ-আহ্লাদে ইহা করা যায়, তাহা অনেকে জানেন না। যাঁহারা ইহা কষ্টকর মনে করেন, তাঁহারা অনেকে মিলিয়া জিম্‌ন্যাষ্টিক করিয়া আমোদ পান। ছেলেদের ও যুবকদের পক্ষে ক্রিকেট ক্রীড়া, শান্তপ্রকৃতি লোক ও অবিবাহিত বয়ঃস্থগণের জন্য Bowls, আর সব বয়সের সকল লোকের পক্ষে মাঠে ঘাটে খেলিতে হয় (Golf) তাহারই ব্যবস্থা। নৌকা-বাহন যখন সামর্থ্যানুরূপ করা হয়, বেশ। অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে প্রতি-যোগিতায় বড় বাড়াবাড়ি করা হয়, সেটা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।...... যাঁহারা কল্পনাপ্রিয় ও ভাবুক, তাঁহাদের পক্ষে দেখা যায়, মাছ-ধরাটা বড় আমোদের কায। বর্ষায় যখন বাড়ী হইতে বাহির হওয়া যায় না, তখন বিলিয়াডের মত ভাল খেলা আর নাই। এই খেলায় শীঘ্র শীঘ্র চক্ষু দিয়া চারিদিক দেখিয়া বুঝিয়া ঠিক করিবার ক্ষমতা, ঠুক্ করিয়া 'কিউ' দিয়া কেমন করিয়া বলটি ছুটাইতে হইবে, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা, আর আঘাতে বলটি কেমন করিয়া, কোন্ কোন্ স্থানে ঘুরিয়া, কোথায় পঁহুছিবে, তাহা ভাবিয়া লইবার ক্ষমতা, এত বৰ্দ্ধিত করে যে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এর তুলনায় তাস-খেলায় বুদ্ধিমত্তার কোনও পরিচয় দিতে হয় না। হুইষ্টে ত কেবল স্মরণ-শক্তির কার্য্যে নিয়োগ হয়। দাবা-খেলাকে খেলা বলে না। উহা পড়া-শুনার সামিল—মাথার চালনা বড় বেশী হয়। যাহাকে মাথার কাজ বেশী করিতে হয় না, তাহার কিছু আমোদ হইলেও হইতে পারে, চিন্তাশীলের মস্তিষ্কের সঞ্চালন কমায় না।'

এ বিষয়ে চেষ্টা। ছেলেরা গা-দোলাইলে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইতেন। ছেলেরা পাঠের অংশ-বিশেষ চেঁচাইয়া পড়ে, এইরূপ ইচ্ছা করিতেন। চেঁচাইয়া পড়িলে শব্দ-উচ্চারণ-নালীর সম্যক্ পরিচালন হয়, শব্দোচ্চারণ ঠিক হইতেছে কি না ধরা পড়ে, আর অশুদ্ধ উচ্চারণ সংশোধন করিয়া দিবার বহু সাহায্য হয়। অশুদ্ধ উচ্চারণ বাল্যকালে সংশোধিত হওয়া দরকার, নতুবা বরাবর থাকিয়া যায় ও পশ্চাতে ঐ উচ্চারণের জন্য উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

ভূদেববাবুর বাড়ী একবারে গঙ্গাতীরে—তীরের অতি নিকটে। তথাকার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে কলিকাতা অঞ্চল হইতে বহুলোক আসিতেন। ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেববাবুর বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে আসিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ছিলেন। ক্রমে গঙ্গার দুই ধারে অসংখ্য কল হওয়ায়, ঐ সকল কলের দূষিত জল গঙ্গা-গর্ভে পতিত হওয়ায় দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাত্রিকালে ছেলেরা আপন আপন পিতামাতার নিকট শয়ন করিত। ভূদেববাবুর বাটীতে "মোটা খাওয়া ও মোটা পরা" বরাবর প্রচলিত ছিল। তবে কর্ত্তার ইচ্ছামত সময়ে সময়ে আহারীয়ের পরিবর্ত্তন হইত। বার মাস এক রকম খাওয়া চলে না; মাঝে মাঝে মুখ-বদলান আবশ্যক হয়। আহারীয়ে অধিক মশলার সংযোগ অধিকাংশ সময়ে হইতে দিতেন না; সহজে যাহা হজম হয়, তাহারই ব্যবস্থা ছিল। ভূদেববাবু প্রচুর পরিমাণে দুধ ও মাংস খাইতে পারিতেন। মাংস তিনি প্রায় রোজই খাইতেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া, ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাংস রাঁধার সকল প্রকার ভেদে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। ইনি পোলাও ইত্যাদি রন্ধনে অতি মজবুত ছিলেন। ভূদেববাবু প্রাতে 'কোকো' খাইতেন কিন্তু বাড়ীর কোনও ছেলেকে চা অথবা কোকো খাইতে দিতেন না। আর অদ্যাবধি তাঁহার বাটীতে "চা"র নিত্য-সরবরাহ হইতে পায় নাই। অবশ্য চা-পানে অভ্যস্ত জামাতারা আসিলে, বাটীতে চা যে পান না, তাহা নহে। আজকাল সাধারণ আয়ের বাঙ্গালীর গৃহে চা না হইলে দিন চলে না, এইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আর চার সঙ্গে সঙ্গে—পুরাতন, পচা, কবে টিনে পোরা কে জানে—জমান দুগ্ধ, বাটীর আবালবৃদ্ধবনিতার উদরে প্রবেশ করিয়া, দেশের অর্থ বিদেশে নীত ও দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভগ্ন ও সকলকে চিররুগ্ন করিয়া তুলিতেছে। শুধু এই পর্য্যন্ত নহে, সামান্য আয়ের বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আজ অন্নের পরিবর্ত্তে লুচি ও অন্যান্য রাজভোগ ও নানাবিধ মশলা-সংযুক্ত তরকারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঘৃত বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না—অখাদ্য বিমিশ্রঘৃতদ্বারা ভাজা লুচি অবশ্য রাত্রিকালে খাইতে হইবে! আগেকার ভাত-ডাল এখন অতি হেয় ও গরীবের খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগেকার সেই সরলতা, স্বচ্ছন্দতা, ও স্বাস্থ্যের বদলে, এখন প্রতিগৃহে কুটিলতা, অনটন ও রোগ প্রসার লাভ করিতেছে। ভূদেব বাবু ১৩০১ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পর এই ২০ বৎসরে বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্য ও পরিচ্ছদের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার আমলে আমরা শাল-আলোয়ানের বাহুল্য দেখি নাই—আজকাল, যে কোনও স্কুলের বালকের শীতবস্ত্র দেখিলে, পরিবর্ত্তনটা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদের বিলাসিতা তখন হইতে বাড়িবার উপক্রম করিতেছিল। এখন অভিভাবকগণ নিজে বিলাসী, সুতরাং সন্তান-সন্ততির বিলাসিতায় বাধা দিবে কে? ভূদেববাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কোনও বিষয় এড়াইবার যো ছিল না; তাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—"দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্র জাতি। আমাদের সুখোপ-ভোগ চেষ্টা ভাল নয়। গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ বিজয়ী ধনশালী প্রবলপ্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে; আমাদের মধ্যে গান, তামাসা, নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোনও মতেই শোভা পায় না। অতএব, সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান্, তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপা ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাই-কার্গস হইতে হইবে। কারণ, বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার জন্য রাজকীয় লাইকার্গাস জন্মিবে না।" *

* পারিবারিক প্রবন্ধ।—লাইকার্গাস-প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে Smith-লিখিত Greeceএর ইতিহাস হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল;—"At the age of seven, a child would be taken from his

শত উপদেশ অপেক্ষা একটি দৃষ্টান্তে অনেক বেশী কাজ হয়। সেই জন্ত দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। ভূদেব বাবুর পুত্র রায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ৺বঙ্কিম বাবু, ও গৌরদাস বসাক মহাশয় এক সময়ে তিন জনে হাবড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কাছারী বন্ধ হইবার পর, বাড়ী যাইবার জন্য তিনজনে তিনখানি গাড়ী ডাকাইলেন। শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবুকে কোন কার্য্যের উপলক্ষে সেদিন রেভিনিউবোর্ডে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে অনেকক্ষণ দেরী হওয়ায় গাড়োয়ানকে ঘণ্টা হিসাবে ২৷০ ভাড়া দিতে হয়। শ্রীযুক্ত মুকুন্দবাবু মাসের শেষে আপনার খরচের খাতার নকল পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলে, ভূদেব বাবুর চোখ পড়িল, সেই ২৷০ গাড়ীভাড়ায় ভাড়াটা অতিরিক্ত বোধ হইল। এত খরচ কেন করা হইল জিজ্ঞাসা করায়, পুত্র বলিলেন, কলিকাতায় কাজ থাকিলে—"হাঁটিয়া হাবড়ার পুলপার হইয়া, ট্রামে করিয়া অন্য দিন যাই। কিন্তু ঐদিন আর দুই জন ডেপুটী গাড়ী ডাকাইলে, আমিও তাঁহাদের মত গাড়ী ডাকাইয়া ছিলাম।" ভূদেববাবু আর কিছু বলিলেন না। পরে যেদিন তিনি ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশনে যান, ফিরিয়া আসিবার পর, পুত্রের সহিত চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা হইলে, বলিলেন—"আমি আজ এই বয়সে, হাবড়ার পুল হাঁটিয়া পার হইয়া, ব্যবস্থাপক-সভায় যোগদান করিতে গিয়াছিলাম—গাড়ীর খরচ বাঁচাইয়াছি! অপ্রয়োজন ব্যয় মাত্রই অপব্যয়।" পুত্রের ভ্রম কাটিয়া গেল—ঐ সময়ে তিনি আরও বলেন, "নিজের শরীরের উপর ব্যয়-সঙ্কোচে লজ্জার কোন কারণ নাই। সৎপথে যখন চলিবে, তখন নিন্দা বা লোকলজ্জার ভয় করিতে নাই। সেখানে বরং যাহাতে সাধারণের মতি সৎপথে যায়, সেজন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি রেলে করিয়া কোথাও যাইতে হইলে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করেন কেন?' উহার উত্তরে গ্লাডষ্টোন বলেন—'কি করি—চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ী নাই যে!' গ্লাডষ্টোনের এই উক্তিতে ইংলণ্ডের ধনী মাত্রেরই চক্ষু ফুটিয়াছে, আর তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের কত সুবিধা হইয়াছে। আর আমরা, সাবেক মোটা চাল-চলন ছাড়িয়া দেওয়ায়, আমাদের 'কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ' হইতেছে। চটী পায়ে, দোবজা গায়ে, পদব্রজে আগত পবিত্রচরিত্র পরমপণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পায়ে ধনীর মস্তক অবনত হওয়া এদেশের আদর্শ ছিল।" *

ভূদেববাবু একথা বেশ বুঝিতেন যে, 'If the body which is the support of the curiously complex fabric, acts with a sustaining influence of the mind, the mind, which is the impelling force of the machine, may, like steam in steam engine, for want of a controlling and regulative force, in a single fit of untempered expansion, blow all the wheels and pegs, and close compacted plates of the machine, into chaos. No function of the body can be safely performed for a continuance without the habitual strong control of a well-disciplined will.' এই মনোবল ও সংযম সহকারে সমুদয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। যখন আলস্য ধরিল, তখন কিছুই করিব না; আবার অন্য সময়ে ঝোঁক চাপিল, তখন একেবারে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলাম;—আমাদের ধরণটা এমনই হইয়া গিয়াছে। এরূপ আচরণ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। শ্রম করিতে হইবে। বঙ্গদেশের বায়ু সজল ও উষ্ণ; বাঙ্গালীর

---

mother's cane and handed over to the public classes. His training was under the special charge of an officer nominated by the State and subject to the general superintendence of the elders. He was not only taught all the gymnastic games which would give vigour and strength to the body......but he was also subjected to severe bodily discipline, and was compelled to submit to hardships and sufferings without repining or complaint......No means were neglected to prepare them for the hardships and strategems of war. They were obliged to wear the same garment winter and summer, and to endure hunger and thirst, heat and cold. They were purposely given an insufficient quantity of food, but were permitted to make up the defficiency by hunting in the woods and mountains of Laconia."
—p. 67, 13th. Edition.

* সদালাপ—১৯০, ১৯১, পৃঃ

শরীরও দুর্ব্বল; বাঙ্গালী সহজেই শ্রমবিমুখ। অতএব, সন্তান যাহাতে শ্রমশীল হয়, তজ্জন্য পিতামাতাকে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী শ্রমশীল, তাঁহাদেরও পরিশ্রম দোষশূন্য নয়;—একবার খুব হয়, আবার কিছুই থাকে না। এরূপ অনিয়মে দুর্ব্বল শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেকে ওরূপ করিতে দিতে নাই। যেরূপ পরিশ্রম সয় বয়, সেইরূপ নিয়মিত পরিশ্রম অভ্যাস করাইতে হইবে। বস্তুতঃ 'আলস্যং হি মনুষ্যানাং শরীরস্থো মহারিপুঃ। নাস্ত্যদ্যমসমোবন্ধু কৃত্বাযন্নাবসীদতি।' বালককাল হইতে যখনকার যে কায, তখন তাহা করা, ও যেখানকার যে জিনিষ, সেখানে সেটি স্থাপন করিতে, অভ্যাস করান উচিত। কায যদি জমিতে না পাইল, ত একবারে অনেক কাযের চাপ পড়ে না; আর স্বস্থানে জিনিসটি পাওয়া গেলে, শীঘ্র কাযটি শেষ হইয়া যায়। অনর্থক আবশ্যক বস্তুর জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে হয় না, সব জিনিষ উটকাইয়া পাটকাইয়া তছনছ করিয়া অধিকতর বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে হয় না; এ জিনিষটা কোথাও দেখিয়াছ কি—এ জিনিসটার সম্বন্ধে কিছু জান কি—বলিতে পার কি—ইত্যাদি নানা প্রশ্নে অপরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে হয় না—সুব্যবস্থায় জিনিষপত্র রাখিলে ঘরটিও বেশ পরিষ্কার ও ঝরঝরে বলিয়া বোধ হয়। জিনিষপত্র গোলমাল ও ছড়াইয়া রাখা, অশেষ অসুখের কারণ। ছেলেরা বাল্যকাল হইতে যাহাতে গোছাল হয়, যাহাতে আপন আপন জিনিষের যত্ন করিতে শিখে—যাহাতে কোনও জিনিষ অযত্নের জন্য নষ্ট না হয়, ইহা শিখে,—এই অভিপ্রায়ে তিনি পৌত্র ও দৌহিত্রগণকে এক একটি ডেস্ক ও চাবিতালা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেকের দোয়াত, কলম, পেন্সিল, বহি, ছুরি ও খাতা আলাদা আলাদা করিয়া দিতেন—যে কেহ অপরের দ্রব্য লইয়া টানাটানি না করে। ছেলেরা কে কতদূর গোছাল হইয়াছে—তাহা তাহারাই বলিতে পারে। আলস্যকে জয় করিবার প্রধান উপায়—প্রতিদিন একই কায নিয়মমত অল্প অল্প করিয়া, সেই কায করাটিকে আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ করিয়া লওয়া। "জলবিন্দুনি পাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।" এইরূপ রোজ রোজ অল্পে অল্পে কৃত কার্য্যের সমষ্টি বৎসরান্তে অনেক বলিয়া প্রতীত হইবে। এক কার্য্য করিয়া, কার্য্যান্তরে প্রবেশে যখন অপ্রসন্নতা না আসিয়া, সুখবোধ হইবে, তখনই বুঝা যাইবে যে, আলস্য আর তোমাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না। কার্য্য করিয়া, আবশ্যক হইলে বিশ্রাম লইতে পার; ধনুর ছিলা মাঝে মাঝে খুলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু আবশ্যকমত বিশ্রামের পর নবোৎসাহে অন্যকার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে হইবে, এ অভ্যাস ছেলেবেলা হইতে হওয়া চাই। বাল্যকালে বৃথা ফষ্টিনষ্টি, আমোদ আহ্লাদ, বা গানাদি কার্য্যে লিপ্ত হইতে নাই। বাল্যকালে মনে দৃঢ় ধারণা হওয়া উচিত—'Life is short, Art is long, Time is fleeting, Opportunity slippery.' ভূদেববাবু সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিয়া, ছেলেরাও যাহাতে সেইরূপ ভাবিতে শিখে, তাহার চেষ্টা করিতেন।

ভূদেববাবু ছেলেদের সর্ব্বদা চোখের উপর রাখিতেন। তাহাদের দেহের বৃদ্ধি (growth) তিনি যত বুঝিতেন, এমন কেহই বুঝিত না; ছেলের শরীর না গড়িলে পড়াশুনা হইবে না, তথাপি এই আশঙ্কা মনে পোষণ করিয়া, চক্ষুর দর্শনে যদি ভুল হইয়া থাকে, ত সেই ভুল-সংশোধনের জন্য মাসান্তে কখনও বা দুইমাস অন্তর—কখনও বা তদপেক্ষা দেরীতে ছেলেদের তুলা দণ্ডে ওজন করিয়া, তাহাদের ওজন লিখিয়া লইতেন। সম্ভবমত একই অবস্থায় পুনঃপুনঃ ওজন লইতেন, ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ওজনের সহিত মিলাইয়া দেখিতেন, ছেলে ওজনে বাড়িতেছে না কমিতেছে। যদি দেখিতেন যে, কেহ ওজনে সমান আছে বা কমিতেছে, ত তাহার খাদ্য-দ্রব্যের স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত বন্দোবস্ত হইত। ছেলেকে লেখাপড়া শিখইলেই হয় না, তাহার জন্য কত চিন্তা, কত দূরদৃষ্টি থাকা আবশ্যক, তাহা একবার দেখুন।

এ পর্য্যন্ত যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে ভূদেববাবু ছেলেদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে যে ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন ও নিজে করিতেন, সেই সকলের মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে যে ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করিতেন, ও নিজে যে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিব।

ছেলেরা শ্লোক-আবৃত্তি করিয়া, গৃহশিক্ষকের নিকট পড়িতে যাইত, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এখন গরীব লোককেও গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিতে দেখি। আর সব না হইলেও চলে, কিন্তু গৃহশিক্ষক নহিলে চলিবার উপায়

নাই। সন্তানের শিক্ষা অবশ্যদেয়, একথা এখন সকলেরই উচিত বলিয়া মনে হয়। আপনি যদি তাহার লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান না করিতে পার, ত গৃহশিক্ষক-নিয়োগ ব্যবস্থা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। ইহা করিলেও আপনার দায়িত্বভার সম্পূর্ণভাবে না হইলেও কতকাংশে বহন করা হয়। নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। সুতরাং গৃহশিক্ষকের নিয়োগ তত দোষাবহ নহে। তবে সমর্থ পক্ষে—গৃহশিক্ষককে যেরূপ অল্প বেতন দেওয়া হয়—শুধু পয়সা বাঁচাইবার যে চেষ্টা হয়—তাহাতে প্রভূত অপকার হইতেছে। যিনি পারিবেন, তিনি যেন শুধু নিজের দিকটাই না টানেন—গৃহশিক্ষকের সম্পূর্ণ যত্ন লইতে হইলে, তাঁহার বেতন সম্বন্ধে উদার হইতে হইবে। Penny wise & Pound foolish—যেন কেহ না হন। গৃহশিক্ষক রাখ—তাহার সকল অভাব যতদূর সম্ভব দূর করিতে পার, করিয়া দাও। গৃহশিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কাযও তাহার নিকট হইতে লও এবং তজ্জন্য তাহাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাও। দ্বিতীয় কথা—এই গৃহশিক্ষক যাঁহাকে নিযুক্ত করিবে—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শিত গুণবত্তা দেখিবার কালে তাঁহার বংশমর্য্যাদাও দেখিবে। ভালবংশের ছেলে হইলে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী হিসাবে কিছু কম হইলেও উচ্চবংশের লোক নিয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। কেননা উচ্চ বংশের চরিত্র উচ্চ হওয়া খুব সম্ভব। আর শিক্ষক-নিয়োগের পর তাঁহাকে বেশ মানিয়া চলিবে, বয়স-অনুসারে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবে। কেন না তাহা করিলেই, তোমার ছেলেকে উচ্চ আদর্শে শিক্ষিত করিবার ইচ্ছা ও একাগ্র চেষ্টা শিক্ষক-মহাশয়ের না হইয়া থাকিতে পারে না। বেতন মাসের প্রারম্ভে আপনি ডাকিয়া দিবে। সামান্য এক আধদিনের অনুপস্থিতির জন্য মাহিনা কাটিতে নাই। নিযুক্ত ও নিয়োগকর্ত্তার মধ্যে সম্বন্ধ যেন প্রীতিকর হয়।

গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, 'নাকে তেল দিয়া ঘুমাইলে' হয় না। শিক্ষক মহাশয়ের আচরণ, ব্যবহার ও শিক্ষাদান বিষয়ে অবলম্বিত পন্থা ভাল অথবা মন্দ, বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। ভুলধরা অনেকের অভ্যাস। তাহা করিতে গেলে চটাচটি হইয়া যায়। আর বালকগণের সম্বন্ধে শিক্ষকের ত্রুটি ধরিতে নাই। শিক্ষাদান শেষ হইলে, শিক্ষক-মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া, নিজে যাহা ভাবিতেছ, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও; তিনি নিজের ভুল বুঝিলে, অবশ্য তোমাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত উৎকৃষ্টতর পন্থা অবলম্বন করিবেন। ভূদেববাবু ছেলেদের শিক্ষাভার গৃহ-শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বদা শিক্ষক ও বালকগণের উপর খর দৃষ্টি রাখিতেন। শিক্ষক মহাশয় সময়ে আসেন কি না, সময়ে যান কি না, তিনি আপনার আজ্ঞা-পালনে বালকগণকে বাধ্য করিতে পারেন কি না, সমুদায় বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। যদি গৃহশিক্ষকের হস্তে বালকগণকে শিক্ষার ভার তুলিয়া দিলেই, নিজে যে কর্ত্তব্য করিতে পারিব না, তাহার পরি-সমাপ্তি হইত, তাহা হইলে যে কেহ গৃহশিক্ষক বাড়ীতে রাখিয়াছেন, তিনিই মনে করিতে পারেন, তাঁহার কর্ত্তব্য-পালন শেষ হইয়া গিয়াছে। ভূদেববাবু মাঝে মাঝে যাইয়া শিক্ষকমহাশয়ের পাঠনার রীতি দেখিতেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, শিক্ষক-মহাশয় শ্রুতলিখন শিখাইতেছেন। এক একটি বাক্য তিনি দুই তিনবার বা তাহারও অধিকবার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। কোনও ছাত্র "স্যর (Sir) শুনিতে পাই নাই" বলিলেই তিনি পূর্ব্ব-উচ্চারিত ও ছাত্রের অমনোযোগিতা হেতু অশ্রুত বাক্য পুনর্ব্বার বলিতেছেন। ভূদেববাবু শিক্ষক-মহাশয়ের এরূপ করা আদৌ পছন্দ করিলেন না। তিনি শিক্ষকমহাশয়কে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রুতলিখনের উদ্দেশ্য—ছাত্রদের মন একাগ্র করা। যদি ছাত্র বুঝিল যে, আমি শুনি নাই বলিলেই শিক্ষক-মহাশয় আমি যাহা শুনি নাই, সেটি আবার আমাকে শুনাইবেন, তাহা হইলে ছাত্রদের একাগ্রতা দূরের কথা, অবহিত হইয়া শুনা যে আবশ্যক, তাহা মনেও করিবে না ও তাহার সে বিষয়ে কোনও কালে চেষ্টা হইবে না, তাহারা ইচ্ছা করিয়া অন্য-মনস্ক হইবে। সব ছেলে কিছু শান্তশিষ্ট নহে। দলের মধ্যে দুষ্ট ছেলেদের অনবরত চেষ্টা হইবে, যাহাতে শিক্ষক মহাশয় বেশী না লিখাইতে পারেন। শ্রুতলিখনের প্রধান উদ্দেশ্য যে, চিত্তচাঞ্চল্য ও অমনোযোগিতা দমন করা, তাহা এককালে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ভূদেববাবুকে ক্রমে ক্রমে অন্যূন ২০ লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল *। তিনি ছাত্রদের বেশ চিনিতেন।

* মধু-জীবনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, ৬৬০ পৃঃ।

শিক্ষক-মহাশয় পরে কেবল একবার মাত্র যে বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাহা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিতেন না।

ভূদেববাবুর পৌত্র ও দৌহিত্রগণ তখন নর্ম্মাল স্কুলের (হুগলীর) একটি শ্রেণীতে পড়ে। ইংরাজী পাঠ্য Longman's Reader, No. 2 or 3। নূতন ক্লাসে উঠিয়া নূতন নূতন বই পাইয়াছে। তাহারা মূল ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের সহিত এক একখানি অর্থপুস্তকও খরিদ করিয়া আনিয়াছিল। ভূদেববাবু এবিষয় জানিতেন না। একদিন তিনি তাহাদের পাঠ দেখিতেছিলেন। মানে জিজ্ঞাসা করায় যতগুলি অতীতকাল-ক্রিয়ার মানে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকেরা সকলগুলির মানের শেষে "য়াছিল" যোগ করিয়া বলিল; যথা—said বলিয়াছিল, met দেখিয়াছিল, did করিয়াছিল। 'The'র মানে সর্ব্বত্র 'ঐ' বলিয়া গেল। ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ, সেই অর্থপুস্তকে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত, উচ্চারণ করিল। ভূদেববাবু অসন্তুষ্ট হইলেন। কে এই সব মানে বলিয়া দিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বুঝিলেন যে, বালকেরা অর্থপুস্তক হইতে মানে মুখস্থ করিয়াছে ও উচ্চারণও তাহা হইতে শিখিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে আপন আপন অর্থপুস্তকগুলি আনিতে বলিয়া দিলেন। সেগুলি তাঁহার কাছে আনা হইলে, তিনি সেগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন—আর ফিরাইয়া দেন নাই। বস্তুতঃ ঐরূপ অর্থপুস্তক পাঠে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হওয়ায় আমাদের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না। অর্থপুস্তকে মানে লেখা আছে;—তাহা ভুলই হউক, আর ঠিকই হউক, একবার দেখিয়া লইলেই হইবে ভাবিয়া, ছেলেরা পাঠে যতটা সময় দেওয়া উচিত, ততটা সময় তাহাতে দেয় না। মানে আর একজন বলিয়া দিলে, নিজে চেষ্টা করিয়া, স্থলবিশেষে প্রযুক্ত শব্দের যথার্থ অর্থ নিরূপণে আদৌ চিন্তাশীলতার পরিচালনা করে না।—অভিধান খুলিয়া, মানে দেখিতে গেলে, একই কথার কত অর্থ হইতে পারে, তাহা খানিকটা দেখিতে পাওয়া যায়। আর বড় অভিধান দেখা অভ্যাস করিলে, শব্দের প্রকৃত অর্থ, দৃষ্টান্ত ধরিয়া করিয়া লইবার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। একই কথা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নানাস্থানে দেখিয়াও হতবুদ্ধি হইতে হয় না। অর্থপুস্তকে যে অর্থটি দেওয়া আছে, তাহা ছাড়া অন্য অর্থ আছে, তাহা জানি না, এমন অবস্থা হয় না। অর্থপুস্তকে কাগজের সাশ্রয় করিতে হয়। সুতরাং এক কথার সকল অর্থ দেওয়া সম্ভবপর নয়। সকলের চেয়ে মুস্কিল হইতেছে যে, অর্থপুস্তকে প্রত্যেক ছত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া থাকায়, বালকেরা তাহা সমুদায় বর্ণে বর্ণে মুখস্থ করিয়া লয়। নিজে যে দুইটা কথা জোড়াতাড়া দিয়া ব্যাখ্যা করিবে, সে সামর্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি দৈবক্রমে মুখস্থ করা বিষয়ের একটি কথা ভুল হইয়া গেল, মনে না পড়িল, তাহা হইলেই সব নষ্ট। সেই একটি কথা যতক্ষণ না মনে পড়িবে, ততক্ষণ সব লেখা বা বলা, বন্ধ হইয়া গেল, বালকের আর সাধ্য নাই যে, অন্য কথায় আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে। ভূদেববাবু বহুদিন পূর্ব্বে ১৮৯০-৯১ সালে যাহা করিয়াছিলেন, অল্প দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে, সেই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা অতীব সুখের বিষয়। ব্যাখ্যা-পুস্তক-প্রণেতা কোনও পরীক্ষার পরীক্ষক হইতে পারিবেন না ও বালকগণ আপন আপন ভাষায় যতদূর সম্ভব প্রশ্নের উত্তর দিলে তবে নম্বর পাইবে, এই দুইটি ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণের হিতকল্পে করিয়াছেন *।

ছেলেদের পড়িবার ঘরে একখানি বোর্ড টাঙ্গান ছিল। শিক্ষকমহাশয় ও বালকগণকে অধিকাংশ কার্য্য বোর্ডে লিখিয়া করিতে হইত। একবার লিখিলে যে কায হয়, যত সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে হয়, যেরূপ নির্ভুলভাবে হয় (অথবা ভুল করিলে যত সহজে ধরা পড়ে) দশবার পড়িলে পাঠাভ্যাস তত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। শ্লেট চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রাখিলে অতি প্রীত হইতেন। সেজন্য নিয়মমত কাঠের কয়লা দিয়া শ্লেট মাজিতে হইত, যেন শ্লেটে তেল না পড়ে। থুতু দিয়া শ্লেট মোছা বা মুখের ভাপ দিয়া শ্লেট মোছা ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ জিহ্বায় ঠেকাইয়া তাহাতে লালাস্পর্শ করাইয়া, তৎসাহায্যে বইএর পাতা উল্টান, (অন্যের দেখাদেখি) খামের আটায় জিহ্বা স্পর্শ করাইয়া চিঠি-মোড়া—ভূদেববাবু আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। এবিষয়ে বাল্যকাল হইতে তিনি ছেলেদের উপদেশ দিয়াছেন। ছেলেরা "নেতি" লইয়া তবে লিখিতে বসিতে পারিত।—ছেলেদের হাতের লেখা যাহাতে ভাল হয়, তদ্বিষয়ে ভূদেব বাবুর বিশেষ মনোযোগ ছিল।

---

* অঙ্কশাস্ত্রের প্রশ্ন-পত্রের শীর্ষ-দেশে "আপন আপন" ভাষায় লিখ, লেখা দেখিলে, কেমন কেমন ঠেকে।

ভূদেববাবু ছেলেদের কোনও একটা জিনিষ দেখাইয়া, সে জিনিষটা কতটা লম্বা ও কতটা চওড়া ইত্যাদি তাড়াতাড়ি বলিতে বলিতেন। পরে লম্বাই-চওড়াই মাপিয়া ছেলেদের অনুমিত মাপের সহিত মিলাইয়া দেখিতে বলিতেন। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই:—"বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যদিও স্বভাবতঃ কোনও জাতীয় লোকের অপেক্ষা হীনতেজ নয়, তথাপি শিক্ষার অভাবে ইন্দ্রিয়গণ বহুস্থলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধিতে অক্ষম হইয়া থাকে। দর্শনাদি দ্বারা দূরতা, নৈকট্য, সংখ্যাভাব, প্রভৃতির অববোধ বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায়ই ঠিক হয় না। অতএব বাল্যাবধি ঐসকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা পিতামাতার কার্য্য।" * অনেককে এমন বলিতে শুনা যায় যে, সাহেবদের যে সে অবস্থায় বা পোষাকে চিনিতে পারি না—উহারা সকলেই একপ্রকার। সুতরাং কোনও সাহেবকে সম্মুখে দেখিলে, চিনিতে না পারার দরুণ আমার সেলাম করিতে ভুল হইয়া যায়। আর অনেকস্থলে সেজন্য অপ্রস্তুত হইতে হয়। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, বক্তার দর্শন শক্তির সম্পূর্ণ উন্মেষ হয় নাই। সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধে—"চিনিতে পারিলেন না প্রবন্ধে"—তিনি নিজে এসম্বন্ধে কিরূপ অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহা বেশ করিয়া লেখা আছে। ভূদেব বাবু ঐ প্রবন্ধে কেন এমন হয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়া, বাড়ীর ছেলেরা যাহাতে সূক্ষ্মদর্শনসম্পন্ন হয়, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে বি. এ. পরীক্ষা দিবার পাঠ্যের মধ্যে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা গ্রহণ করাইয়াছিলেন; এবং ইংরাজী উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত নাতিদের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ গাছের (আপনার ফুলবাগানের) পাতা, ফুল ও কাণ্ড লইয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, আপনার নোট বহিতে লিখিয়া রাখিতেন, ছেলেদের লইয়া সেই সমস্ত বিশ্লেষণ-কার্য্য তাহাদের সমক্ষে করিয়া দেখাইতেন এবং ছেলেদের আপন হাতে সেই বিশ্লেষণ করাইতেন। যে সকল সামান্য সামান্য সাদৃশ্য ও পার্থক্য, তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিত, তৎসমস্ত দেখাইয়া দিতেন, ছেলেদের এই সাদৃশ্য-উপলব্ধি ও পার্থক্যজ্ঞানের—তন্ন তন্ন করিয়া খুঁটিনাটি দেখিবার প্রবৃত্তির—উন্মেষ করিয়া দিতেন। ভূদেববাবুর হাতে লেখা সে নোট বহিখানি আছে কি না, জানি না—থাকিলে ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্ বিষয়ে সেখানির সাহায্যে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে পারে। এইরূপে ভূদেব বাবু আপনাতে যে দোষ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা যাহাতে পরবর্ত্তী পুরুষে শুধরাইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতেন।

এতদ্ব্যতীত ভূদেববাবু বাঙ্গালীর ছেলের আর একটি দোষোল্লেখ করিয়া, তাহা শুধরাইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন:—"বাঙ্গালীর স্মৃতিশক্তি অতীব প্রখরা। যাঁহারা বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, তাঁহারাও ঐ কথা স্বীকার করেন; কিন্তু বলেন, ইহাদের ধীশক্তি ও উদ্ভাবনীশক্তি তেমন অধিক নয়। নিন্দকদিগের সহিত বিচারের প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে স্মৃতি একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে। মনোবৃত্তি মাত্রেরই কারণ-শক্তির নাম স্মৃতি অর্থাৎ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল মনোবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। সুতরাং স্মৃতিতে প্রখরা বলিলে মনোবৃত্তি মাত্রেই তেজস্বিনী বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি তেজস্বিনী বলিয়াই শিক্ষার একটী দোষ জন্মে। তার সমস্ত সুপরিস্ফুট না হইলেও বাঙ্গালীর মন সেগুলি গ্রহণ করিয়া রাখে, একেবারে পরিত্যাগ করে না, তাহাতে

---

* পারিবারিক প্রবন্ধ ১১৪ পৃঃ।—

রবিবাবুর বোলপুরের ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। ইহা দ্বারা ছেলেদের ইন্দ্রিয়গ্রামের পূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনা।—রবিবাবুর "চোখের বালী"তে এ শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে এইটুকু পাওয়া যায়:—"বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালী-মতে শিক্ষা দিতে লাগিল।............

বিহারী তাহার দোতালার বড় ঘরে আলো জ্বালিয়া লইয়া, বসন্তকে লইয়া নিজের নূতন প্রণালীর খেলা করিতেছিল।

'বসন্ত, এঘরে কটা কড়ি আছে, চট করিয়া বল। না-গুণিতে পাইবে না।

বসন্ত—কুড়িটা।

বিহারী—হার হইল—আঠারটা।

ফস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ খড়খড়িতে কটা পাল্লা (বোধ হয় পাখী) আছে?—বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

বসন্ত—ছয়টা।

জিৎ। এই বেঞ্চিটা লম্বায় কত হইবে। এই বইটার ওজন কত?

এম্‌নি করিয়া বিহারী বসন্তের ইন্দ্রিয়-বোধের উৎকর্ষ-সাধন করিতেছিল'।"—চোখের বালী ২০২ পৃষ্ঠা।

কার্য্যকালে ক্ষতি হয় এবং কৃতি-সামর্থ্যও ন্যূন হইয়া পড়ে। এইজন্য বাঙ্গালীর ছেলেকে শিখাইবার সময় যাহাতে ভাব সমস্ত পরিস্ফুট হয়, তজ্জন্য কি শিক্ষক, কি পিতামাতা সকলেরই যত্ন করা বিধেয়।" *

বালক-কালই নীতি শিখাইবার উপযুক্ত সময়। এ সময়ে হৃদয়ে যাহা বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা বয়সের সহিত ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রথমতঃ আজ্ঞাপালন করাইতে অভ্যাস করান উচিত। আমরা যতক্ষণ কেবল আমাদের নিজের সম্পর্কীয় কাজ করি, ততক্ষণ আমরা স্বাধীন। কিন্তু যেই আমাদের স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখনই উভয়পক্ষের স্বাধীনতার কথঞ্চিৎ সঙ্কোচ হয়। এমন ভাবে আপন আপন কার্য্য এ সময়ে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত, যাহাতে পরের অনিষ্ট না কর, পরও যেন তোমার অনিষ্ট না করিতে পারে। আমি যাহা ইচ্ছা হয় করিব, তাহাতে অপরের ইষ্টানিষ্ট হয় কি না, আমার দেখিবার আবশ্যকতা নাই, এমন ভাবিয়া সমাজে থাকা চলে না। সামাজিক নিয়ম আপনার ইচ্ছায় ভাঙ্গা বা গড়া চলে না। সমাজ-নেতৃগণ সকলের মঙ্গলের জন্য—সকলের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং সুসামাজিক হইতে হইলে, সমাজ-প্রচলিত নিয়ম বা আজ্ঞাপালনে অভ্যস্ত হইতে হইবে। যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন কর না কেন, সর্ব্বত্র এই বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। ভূদেববাবু বলেন—"বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না। একটী গল্প বলি। একখানি জাহাজে একজন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারিজন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। একদিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময় তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটী মগ্নশিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।' আর একজন বলিল—'তবে একথা কাপ্তেনকে বল না কেন?' সে উত্তর করিল,—'সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম্ম করিতেছেন, —তাঁহার কথা শুনামাত্র আমাদের কাজ; তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে, গায়ে পড়া হইয়া, কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে?' কেহ কিছু বলিল না। জাহাজ বিনষ্ট হইল। এরূপ বশ্যতা পাগলামি বটে কিন্তু হিন্দুদিগের উন্নতিকালেও ঐরূপ পাগলামি ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত-পাঠীদিগের তাহা অবিদিত নাই। যেদিন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামি পুনর্ব্বার জন্মিবে, সেদিন বাঙ্গালীর শুভদিন।"—যে বশ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যখণ্ড অযোধ্যার মায়া পরিত্যাগ করিয়া, জননী কৌশল্যার যুক্তিতর্কজাল অমান্য করিয়া, সুমিত্রা-কুমারের মত বদলাইয়া, বিমাতার মুখনিঃসৃত ও পিতার মৌনভাবে তাহাতে সম্মতিসূচিত বাক্যপালনে তিলমাত্র দ্বিধা করেন নাই, ক্ষমতাপন্ন পাণ্ডুপুত্রগণ যেমন যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে, বা চক্ষুর ইঙ্গিত মাত্রে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য বলিয়া মানিয়া লইতেন, যে আদেশ-পালনের অভ্যাসে Casabianca ভগ্ন ও প্রজ্বলিত পোতে অবস্থিতি করিয়া, প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,

He would not stir without his father's word
That father lay in death below,
His voice no longer heard.

যে আজ্ঞাপালনের অভ্যাসে টাইটানিক বা বার্কেনহেড জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে দেখিয়া, মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও সকলে স্ত্রীলোকগণের বোটে উঠিতে সাহায্য করিয়াছিল, সেইরূপ বশ্যতা আবশ্যক। গুরুজন যে আদেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ন্যায়ান্যায়বিচার করিতে হইবে না, গুরুজন বলিয়াছেন, সুতরাং অবশ্য করিতে হইবে, ছেলেদের মনে এই ভাবটি হওয়া উচিত। আর আদিষ্ট কার্য্য তৎক্ষণে বা যথাসময়ে নিষ্পন্ন করা উচিত। যে সময়ে কার্য্য করে, তাহার উপর লোকে কার্য্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তাহার উপরে লোকের অগাধ বিশ্বাস হয়। ইংরাজদিগের এই সময়ানুবর্ত্তিতাটির অনুকরণ করিতে ছেলেদের সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই গুণটি পাইলে আলস্য আর তত বল করিতে পারে না। ছেলেরা আদিষ্ট কার্য্য বিনা প্রতিবাদেও যথাসময়ে করিতেছে কি না, ভূদেববাবু সর্ব্বদা খোঁজ রাখিতেন। ছেলেদের দোষ দেখিলে রুষ্ট ও গুণ দেখিলে তুষ্ট হইতেন। "দাদা বাবু" রাগ করিবেন, এ ভয় সকলের খুব ছিল। সেইজন্য যথাসময়ে আদিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য নাতিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিত।

* পারিবারিক প্রবন্ধ, ১১৫ পৃঃ।

এই বশ্যতা উপলক্ষ করিয়া, ভূদেব বাবু আরও একটি ভাল কথা বলিয়াছেন:—"বহুকাল হইতে বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি; এইজন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বশ্যতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বলবানের নিকট দুর্ব্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা, তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না। বাঙ্গালী প্রায়ই বাঙ্গালীর বশ হইতে চায় না। অন্য জাতীয়ের বশ হয়, এবং তাহাই হইয়া আছে। বশ্যতা ভক্তিমূলক—ভক্তি শৈশবে শিক্ষণীয়, পিতামাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া, ঐ ভাবটিকে অঙ্কুরিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে পারেন। যে বাঙ্গালী পিতামাতাকে ভয়ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, সে বাঙ্গালী নেতারও বশীভূত হইতে পারিবে। যে বাঙ্গালী ছেলেবেলায় পিতামাতাকে মান্য করিতে শিখে নাই, সে দুই চারিখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া বা লোকের দুই একটী ইংরাজী সংবাদ শুনিয়া বাবাকে মূর্খ জ্ঞান করিবে এবং বাবার স্বজাতীয় বাঙ্গালী মাত্রকেই তাচ্ছিল্য করিয়া একটী প্রকাণ্ড বিচারক হইয়া পড়িবে।" *

"অন্যান্য মনোবৃত্তি যেমন প্রবলা বাঙ্গালীর দূরদর্শিতা এবং কল্পনাশক্তিও তদনুরূপ। তদ্ভিন্ন, শরীরের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন বাঙ্গালী ভীরুস্বভাব. এই দুই ও অন্যান্য কারণে বাঙ্গালীর ছেলের অনৃতবাদিতা দোষ জন্মিতে পারে। যাহাতে তাদৃশ দোষ না জন্মে, তজ্জন্য পিতামাতার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দূরদর্শিতা বর্দ্ধিত করিয়াই অনৃতবাদিতার শাসন করা বিধেয়। সত্যই টেঁকে, মিথ্যা কখন টেঁকে না, এই তথ্যটী সর্ব্বদা সন্তানের মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক।" বালকেরা প্রধানতঃ ভয়ে মিথ্যা কথা কহে। দোষ করিয়াছি, স্বীকার করিলে, পাছে মার খাইতে হয় বা বকুনি খাইতে হয়, সেই জন্য মিথ্যা কথা কহিয়া অপরাধ-গোপনের চেষ্টা করে। দোষ স্বীকার করিলে, তাহাতে প্রথমতঃ মনে আর ভয় থাকে না যে, পিছনে কোনও কালে গুপ্ত অপরাধ প্রকাশ পাইবে; মন একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। যাহা হয়, বলিবার সময়েই হইয়া গেল, আর কিছু হইবে না। কিন্তু মিথ্যা কথা দ্বারা অপরাধ লুকাইলে, সেই মিথ্যা কথা—এই প্রকাশ হইল, এই প্রকাশ হইল, বলিয়া যে, একটা আশঙ্কা মনকে অধিকার করিয়া বসে, তাহা অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক আর কিছুই নাই। এই ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণা অপেক্ষা একবার কায়িক বা বাচনিক যাতনা সহ্য করা সহস্র গুণে ভাল। উদাহরণস্বরূপ জর্জ্জ ওয়াসিংটনের গল্পটি সর্ব্বত্র কহা গিয়া থাকে। জর্জ্জ ওয়াসিংটনের পিতা তাহাকে একখানি কুড়ুল দিয়াছিলেন। ছেলেদের অভ্যাস—হাতে কোনও যন্ত্র পাইলে, হাত নিশপিশ করিতে থাকে; কখনও এটা কাটে, কখনও ওটা কুচিকুচি করে। ওয়াসিংটন কুড়ুল পাইয়া, কুড়ুলের ধার কেমন দেখিবার জন্য, দুই চারিটা গাছ বাগানে গিয়া কাটিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে ছিল একটি চেরী (cherry) গাছ। তাহার বাবা ঐ গাছটি আনিয়া নূতন পুঁতিয়াছিলেন, গাছটার উপর তাঁর বড় মায়া—রোজ রোজ যাইয়া গাছটিকে দেখিতেন। ওয়াসিংটন গাছটি কাটিয়াছেন, অত্যল্পক্ষণ পরে ওয়াসিংটনের বাপ আসিয়া দেখেন, তাঁহার এত যত্নের গাছটি কে কাটিয়াছে! তাঁহার বড় রাগ হইল। অল্প দূরে পুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"জর্জ্জ এ গাছ কে কাটিল?" জর্জ্জ উত্তর করিল—"আমি, বাবা।" পিতার ক্রোধ দূর হইল—তিনি পুত্রকে আদর করিয়া বলিলেন—"সর্ব্বদা এইরূপ সত্য কথা বলিও।" জর্জ্জ ইচ্ছা করিলে বলিতে পারিত, আমি জানি না—আমি কাটি নাই বা অন্য কাহারও নাম করিয়া, তাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারিত। কিন্তু পিতা সব না জানিয়া ছাড়িতেন না—সবশেষে জর্জ্জের দোষ প্রকাশ হইত। তখন কি এইরূপ আদর হইত! এক মিথ্যা ঢাকিতে কত মিথ্যার অবতারণা করিতে হইত, তাহা বলা যায় না। ভূদেববাবু সত্য কথা বলিলে বালককে আদর করিতেন। যে মিথ্যা

---

* এবারে বর্দ্ধমানের জলপ্লাবনে বঙ্গের যুবকগণ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা দেশী নেতার অধীনে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক নহেন। তাঁহাদের যথাসময়ে ও সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য দেখিয়া ইংলিশম্যান-প্রমুখ ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রশংসা ধরে নাই। তাহাদের Grit-এর প্রশংসা একবাক্যে সকলে করিয়াছেন। নেতা নিজে কথা শুনিতে জানিলে, অপরকে কথা শুনাইতে পারেন। নেতার চরিত্র—acts like an electric spark. অনুচরগণও তদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। বর্ত্তমানে যুবকদের আচরণ দেখিয়া, বাঙ্গালী যে বাঙ্গালীর অধীনে পরিচালিত হইতে পারিবে, তাহার বিলক্ষণ আশা হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার সুফল বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর একতাও ক্রমে ক্রমে এইরূপে আসিবে।

কথা কহিত, তাহারা সেই আদর দেখিয়া, যদি সত্যপথের পথিক হয়। মিথ্যাকথার দোষ বুঝাইয়া দিতেন, তাহাতেও না শুধরাইলে, তবে প্রহার করিতেন। মিথ্যাকথা বলার অভ্যাস যাহাতে বাল্যে ঘুচিয়া যায়, তাহার সতত চেষ্টা করিতে তিনি সকল প্রকার প্রযত্ন করিতেন। আলস্য-বশে লোকে যাহা করে না, তাহা ও মিথ্যা ঢাকিবার চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ। কোনও কায করিতে বলা হইল—কুঁড়েমি করিয়া তাহা করিলাম না। কেন কর নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বলা হয়, সময় ছিল না—বাড়ীতে কায ছিল—মাথা ধরিয়াছিল বা পেট কামড়াইয়াছিল। আসলে এ সবের কিছু হয় নাই। যত নষ্টের গোড়া—কুঁড়েমি। প্রেসিডেন্সি কলেজে লিট্‌ল্‌ সাহেব অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রায় রোজই বাড়ী হইতে ছাত্রদের অঙ্ক কসিয়া আনিতে দিতেন। অনেকে অঙ্ক কসিয়া আনিত না। কেন অঙ্ক কসিয়া আন নাই জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ কেহ বলিত, অঙ্ক কসিয়াছি কিন্তু আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এ ওজর দিন কতক শুনিয়া, তিনি এই সকল দুষ্ট বালককে জব্দ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। পরে কোনও দিন এক বালক ঐরূপ উত্তর করায়, সে কোথায় থাকে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহার বাসা অতি সন্নিকটে। তাহাকে বলিলেন—তোমায় ১০ মিনিট সময় দিতেছি, কসা অঙ্কের খাতাখানি লইয়া আইস। বালক বুদ্ধিমান, কিঞ্চিৎ বিলম্বে একখানি খাতায় অঙ্কগুলি কসিয়া আনিয়া হাজির করিল। কালী দেখাইয়া দিল যে, কসা অঙ্কগুলি নূতন লিখিত। পরে দুই জন বালক দূরে বাড়ী বলায় সাহেব তাহাদের ট্রামভাড়া দিয়া বলিলেন, যাও অঙ্ক লইয়া আইস।—এক মিথ্যা কথা ঢাকিতে অনন্ত মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। সময়ে কায করিলে এ অবস্থা হয় না। আপনাদের অনেক আছে ইত্যাদি জাঁক করিবার প্রলোভন অনেকে সংবরণ করিতে না পারিয়া খুব লম্বা চৌড়া গল্প করেন, বিশেষতঃ আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে। পরিশেষে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, সে সব আগা-গোড়া মিথ্যা। যে তিনটি কারণে মুখ্যতঃ লোকে মিথ্যা কথা বলিতে উৎসাহিত হয়, বাল্যে সেই তিনটি কারণের অঙ্কুর যাহাতে না হইতে পারে, সে বিষয়ে ভূদেববাবুর মত সকলের দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

একজন পারস্য-কবি একখণ্ড মৃত্তিকাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বল দেখি মৃত্তিকা, তোমার অঙ্গে এরূপ সদ্‌গন্ধ কিরূপে হইল?" মৃত্তিকা বলিতেছে—"তা জান না, আমি যে এই এতকাল গোলাপের একটি পাপড়ী ঢাকা হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার অঙ্গ হইতে সেই জন্য গোলাপের সুগন্ধ বাহির হইতেছে।" ইংরাজীতেও বলে, একটি পচা আপেল এক ডালা আপেলের মধ্যে রাখিয়া দাও, কালে সবগুলি পচিয়া যাইবে। আর সংস্কৃতে —"কীটোঽপি সুমনঃসঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ। তথা সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতাহি সাধবঃ।" যাহার যেমন সঙ্গ, তাহার তেমনই চরিত্র। আমায় যদি দেখাইয়া বল যে, এ ওর বন্ধু—আমি সেই বন্ধুর স্বভাবচরিত্র দেখিয়া তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব মোটামুটি বলিয়া দিতে পারি। মানুষে একলা থাকিত পারে না, সেটা মনুষ্য-প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মানুষ কথা কহিবার—মনের কথা বলিবার লোক খোঁজে। আর বালককালে যাহার সহিত মনের মিল হইয়া যায়, তাহার মত অন্যের সহিত খাঁটি বন্ধুত্ব আর হয় না। সে বন্ধুত্ব "সমপ্রাণ সখাঽমতঃ" এর আকার ধারণ করে। বন্ধুর শোকে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতে হয়। তা ছাড়া হৃদয়ের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হইতে থাকে, সেইটা হইতেছে, লক্ষ্যের বিষয়। বন্ধুর ভাল মন্দ সব গুণ অন্যে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য ছেলে কাহার সঙ্গে বেড়াইতেছে বা বেড়াইতে ভালবাসে, ক্লাসে কাহার কাছে বসে, কি কি পড়িতে ভালবাসে, কিরূপ আমোদে যোগ দিতে যায়, এসব বিষয়ে খরতর দৃষ্টির প্রয়োজন। ভূদেব বাবুর এক দৌহিত্র নর্ম্মাল স্কুলে পড়িবার সময় ঐরূপ এক বালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এক দিন ঐ বালক ভূদেববাবুর চুঁচুড়ার বাটীতে আসে। ভূদেববাবু বাড়ীর ছেলেদের বাড়ীর মধ্যে খেলিতে বলিলেন। ঐ বালকও খেলা করিতে আসে। ভূদেব-বাবু তাহাকে কাছে ডাকিয়া, কি কি জিজ্ঞাসা করেন—তাহার এই কথার উত্তর দিবার ধরণ লক্ষ্য করেন, আর আর কোনও কোনও বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া, তবে তাহাকে বালকদিগের সহিত মিশিতে দিয়াছিলেন। এক দিনে ঐ পরীক্ষা শেষ হইয়া যায় নাই। ঐ বালকের উপর কয়েক দিন সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই সঙ্গ-

দোষের প্রতীকার-চেষ্টা না হওয়ায় কত বালক যে অধঃপাতে যায়, তাহা বলা যায় না। বন্ধুত্ব যাহার সহিত হইবে তাহার গুণগুলির অনুকরণ আপনা আপনি হইয়া যায়। কেননা বন্ধুতে যে গুণ পরিলক্ষিত হয়, তাহা বন্ধুর চক্ষে এত ভাল বলিয়া বোধ হয় যে, আপনিও তদনুরূপ গুণ-বিশিষ্ট হইতে ইচ্ছা করে, সে সময়ে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কলিকাতার থিয়েটার দেখা অনেকের পক্ষে সুবিধা-জনক নহে। হাতে পয়সা নাই এমন ছেলেও বন্ধুর কথায় ধার করিয়া সাজগোজ করিয়া থিয়েটার দেখিতে গিয়া পড়ে। কেননা সে বন্ধুর সঙ্গত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু আগে হইতে সঙ্গ-নির্ব্বাচন-কালে যদি ওরূপ বন্ধু না করিত, তাহা হইলে হয়ত তাহার অন্যরূপ মতিগতি হইত।

বাল্যকাল হইতে উচ্চ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা-পোষণ করা ভাল। হিন্দু কলেজে ৺ ভূদেব বাবু ৺ মধুসূদন দত্ত, এবং স্বর্গীয় আবদুল লতিফ খাঁ সাহেব সহপাঠী ছিলেন। উঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। একদিন উঁহাদের মধ্যে কথাবার্তা হইতেছিল যে, উত্তর কালে তাঁহারা কে কি হইতে চাহেন। নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বলেন, আমি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইতে চাই। তিনি পরে ভূপালের প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। মধুসূদন বলেন, আমি বড় কবি হইব। মেঘনাদবধ রচনা করিয়া, ইনি বঙ্গীয় কবিগণের বরেণ্য হইয়াছেন। ভূদেব বাবু বলেন, "যেন আমি অণুমাত্রও দেশের কাযে লাগিতে পারি।" পরে ইনি পারিবারিক, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধে অধুনা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য সুপরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়া, সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃত শিক্ষার পরিপোষণকল্পে বিশ্বনাথ ফণ্ড স্থাপন করিয়া এবং নিজের পবিত্র স্বদেশভক্ত জীবনে আর্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত পাশ্চাত্য স্বদেশভক্তির শুভ সম্মিলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া, জগতের অন্তকাল পর্য্যন্ত ভারতের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছেন। * বিদ্যাপতি বলেন—"আশাভঙ্গ দুঃখ মরণ সমান"—তাহা জানিয়াও পশ্চাৎপদ হইলে হইবে না—"বাঙ্গালী প্রবলতর জাতীয়দিগের পদমর্দ্দিত হইয়া ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যাইতেছে। অতএব আশার বৈফল্য হেতু সন্তানের ভবিষ্যতে যতই ক্লেশ হউক, পিতামাতার কর্ত্তব্য তাহাকে উচ্চাশয়সম্পন্ন করেন। যেমন সান্নিপাতিক বিকার প্রাপ্তরোগীর পক্ষে ধাতু-উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগ বিধেয়, তেমনি বাঙ্গালীর মনে উচ্চ-আশার উদ্রেক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। দুবেলা দুমুটা খেতে পেলেই হইল, এবংবিধ বাক্য সন্তানের কর্ণগোচর হইতে দিতে নাই।" *

"এক্ষণকার বাঙ্গালী নিস্তেজ। নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষ্যা করিয়া থাকে। ঈর্ষ্যাদোষটী সত্বর যাইবার নয়, তবে উহার বাগ ফিরাইতে পারা যায়। অতএব ঐ ঈর্ষ্যা যাহাতে স্বজাতীয়ের প্রতি না জন্মে, অন্য জাতীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।" † বেকন লিখিয়াছেন;—"হিংসা একবার শরীরে প্রবেশ করিলে, আর তাহার কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। ইহা অষ্টপ্রহর মানুষের মনে বাস করে। অন্যান্য মনোবৃত্তির কার্য্য কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কিন্তু হিংসার একদিনও বিরাম নাই। (Envy takes no holidays). কারণ, হিংসুকের মন একজন না একজনের হিংসা করিতেছে। অন্যান্য মনোভাবের প্রাবল্য সব সময় থাকে না সুতরাং হিংসায় যেমন মানুষ "সল্‌তে হইয়া যায়" এমন আর মনের অন্য কোনও রোগে হয় না। হিংসার মত অপকৃষ্ট মনোবৃত্তি আর নাই—ইহা মানুষকে যত হীন করে, এমন অন্য কিছুতেই না। হিংসুক সে চুপে চুপে অন্যের অলক্ষ্যে পরের মন্দে রত" The envious man that soweth tares amongst the wheat by night, envy worketh subtlty and in the dark. ‡ হিংসা আপনার লোকের মধ্যে—জ্ঞাতির মধ্যে—সহধর্ম্মিগণের মধ্যে—আর যাহারা একত্র লালিতপালিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যদি আপনাদের মধ্যে কেহ কোনও বিষয়ে উচ্চ হইল বা কাহার ভাল হইল, অমনি হিংসায় আর আর সকলে জ্বলিয়া উঠেন। কাহারও পদবৃদ্ধি হইলে—ভাল হইলে—অন্য সকলে আপন আপন অদৃষ্টকে

* রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় কৃত সদালাপ, ১২৮-১২৯ পৃঃ।

* পারিবারিক প্রবন্ধ ১১৫ পৃঃ।

† পারিবারিক প্রবন্ধ ১১৬ পৃঃ।

‡ Bacon's Essays—no. 9, towards the end. বিবিধ-প্রবন্ধ ১১৫-১১৬ পৃঃ।

ধিক্কার দেন; আর যাহার উন্নতি হইল—তাহার কথা ভাবেন—তার কথা অনবরত মনে করিতে থাকেন। অন্যের কাছে তার কথা শুনিয়া আরও বিরক্ত হইয়া উঠেন। আর অন্যের কাছে যত তাহার কথা ও প্রশংসা শুনেন, ততই তাহার হিংসায় আহুতি পড়ে। 'কেনে'র ভাইএর প্রতি হিংসার প্রবল কারণ ছিল না। আবেলের পূজা দেবতা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু কেনের পূজা দেবতা গ্রহণ করিলেন না—একি সহ্য হয়?—হিংসায়—ক্ষোভে—কেন কি করিলেন? আবেলকে হত্যা করিলেন। হিংসায় মানুষ সব করিতে পারে।—ভূদেববাবু সকলকে সমান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। সমান সমান হইলে কেহ কাহারও হিংসা করে না। আবার একজনের কিছু হইল অথচ অপরের তাহা কেন হইল না, একথা যাহাতে ছেলেরা না বলিতে শিখে, তজ্জন্য চেষ্টা দেখিতেন। বালককাল হইতে বালকগণের এইরূপ শিক্ষা হইলে, ক্রমে সকলে অপরের উন্নতিতে বা বস্তুবিশেষ প্রাপ্তিতে আনন্দ-প্রকাশ করিতে শিখিবে। ভূদেববাবু লিখিয়াছেন:—"যদি কোনও বাঙ্গালীর কোনও উচ্চপদ অথবা অন্যরূপ সুবিধা হইল, অমনি, অনেকে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সকল সময়েই ওরূপ করা ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে বলিয়াছেন, দেখ অমুক কর্ম্মটি আমি অমুককে দিলাম বলিয়া—অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক—এই পাঁচজন আপন আপন মনের দুঃখে কান্দিয়া গেল। ওরূপ করিলে কি কোনও প্রকারে মনের সন্তোষ লাভ করা যায়? কাজ একটা, তোমরা কয়জনই তাহার উপযুক্ত। অতএব একজনের বই ত ছয়জনেরই ও কাজটী হইবে না? যাহার হইল, সে অযোগ্য কি না দেখ; যদি অযোগ্য না হয়, তাহা হইলেই আর দোষ ধরা বা দুঃখ করা উচিত নহে। ফলতঃ তোমাদের তুষ্ট করিবার জন্যই ত একটী ভাল চাকরী ইংরাজকে না দিয়া তোমাদের একজনকে দেওয়া হইল। ইহাতেও যদি তোমরা সকলেই তুষ্ট না হইলে তবে কিজন্য আমরা স্বদেশীয় একজনকে বঞ্চিত করি?" কথাগুলি ঠিক বলিয়াই আমার মনে হয়। আমি অনেকবারই দেখিলাম, যখন কাহারও একটা কিছু ভাল হইয়াছে, অমনই তাহার হইল কেন, অমুকেরই বা হইল না কেন, এই ভাবে গোল উঠিয়াছে। ওটা ভাল নয়। স্বদেশীয় যাহার যখন কিছু ভাল হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই ভাল হইল, মনে করা উচিত। তবে নিতান্ত অযোগ্য লোকের উন্নতি হইলে, তাহা অবশ্য দূষিতে হয়। কিন্তু উনিশ-বিশ এমন কি পনর-বিশ লইয়াও দোষ ধরিতে নাই।" * অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন:—"বড় দেখিবার ও বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে, আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড় লোক জন্মিয়া যাইতে পারে। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য, সে দেশে প্রকৃত বড় লোক জন্মিতে পারে না। ভারতের এই অধঃপতিত দশায়, অসূয়া-দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতবাসী স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় কাহাকেও বড় লোক বলিয়া জানিতে চাহে না। তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই নকড়ে ছকড়ে। যেমন সাধনা, সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা নকড়ে ছকড়ে অতএব নকড়ে ছকড়ে দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে, দেশে বড় লোকের আবির্ভাব হইবে না। ফলতঃ অনুবর্ত্তী লোক থাকে বলিয়াই বড় লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন।" †

---

* বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ ১১৭, ১১৮ পৃঃ।

'আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, সে সময়ে শ্রীযুক্ত জে. এন. দাসগুপ্ত মহাশয় কিছুদিনের জন্য ইণ্ডিয়ান এড়ুকেশনাল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। পার্শিভ্যাল সাহেব, দাসগুপ্ত মহাশয় অপেক্ষা পুরাতন কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহাকে টপকাইয়া দাসগুপ্ত মহাশয় ঐ কর্ম্ম পান। সেই সময়ে আমার যতদূর স্মরণ হয়—বেঙ্গলীপত্রে এই নিয়োগের প্রতিবাদ করিয়া ও পার্শিভ্যাল সাহেবের ঐ কায পাওয়া উচিত ছিল বলিয়া, উক্ত নিয়োগে দুঃখপ্রকাশ করিয়া, একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পার্শিভ্যাল সাহেব ঐ পত্র প্রকাশিত হইবার পরদিন আমাদের ক্লাসে আসিয়া বলেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ঐ পত্র লিখিয়া থাক ত, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। দাসগুপ্ত মহাশয় ঐ কার্য্য পাওয়ায় আমি অত্যন্ত খুসী হইয়াছি। আমি খুসী হইয়াছি এই জন্য যে আমারই একজন স্বদেশবাসীকে ঐ কায দেওয়া হইয়াছে। দেশের যে কোনও লোককে ঐ কাযটি দিলেই আমি সুখী হইতাম। তোমরা দুঃখিত হইও না। দেশের লোকে বড় কায পাইলেই সুখী হইবে; যিনিই কায পাউন না কেন—আর তিনি যে জাতিই হউন না কেন।" পার্শিভ্যাল সাহেবের মনটি যেন ভূদেব বাবুর ছাঁচে ঢালা। যেমন আদর্শ অধ্যাপক ছিলেন—তাহার মত প্রশস্তমনার উপযুক্ত কথাই বটে। তাঁহার শিষ্যেরা যেন ঐরূপ মহদন্তঃকরণ হয়।'

† সামাজিক প্রবন্ধ, ২১৯ পৃঃ।

আমাদের মজ্জাগত দোষ—যাহার জন্য আমাদের উন্নতি হইতেছে না—এইরূপে চোখে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন; আর বাল্যকাল হইতে আপন নাতিগণকে ভূদেববাবু শিখাইয়াছেন :—

"সন্তোষপরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥"

বাঙ্গালীর সহানুভূতি নিজ সমাজের মধ্যে তেমন অধিক হয় না। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীর প্রশংসায় যথোচিত পরিতৃপ্ত অথবা বাঙ্গালীর তিরস্কারে তাদৃশ ক্লিষ্ট হইতেছে না। ইংরাজের প্রশংসা ও ইংরাজের নিন্দাই যেন বাঙ্গালীকে অধিক লাগে। এটি সাংঘাতিক রোগ। ভূদেববাবু ইহার প্রতিবিধানের কিছুই উপায় অনুসন্ধান করিয়া যান নাই। তবে বোধ হয়, ছেলেকে বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করা অর্থাৎ কিছু কিছু বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া এবং যাহাদের লিখিবার ক্ষমতা জন্মে তাহাদের বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতে দেওয়া ভাল। *

ইংরাজ আপনার জাতির স্বার্থে ও নিজের স্বার্থে অনেকটা অভিন্নতা দেখিতে পায়। কোনও জেলায় একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, দেশী ছুতারেরা কাযে দেরী করে ও খারাপ কায করে বলিয়া, কোনও ইউরোপীয় কণ্ট্রাক্টর কোম্পানীকে কার্য্যের ভার দিলেন। কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী আসিল এবং স্থানীয় ছুতার দ্বারাই কার্য্য নিষ্পন্ন করিল। দেরী এবং কাযের ধরণ পূর্ব্ববৎ হইল কিন্তু বিল দ্বিগুণ হইল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন—কিন্তু বলিলেন, "তা হউক, টাকাগুলা ভদ্রলোকের হাতে যাইতেছে—'হাভাতে' কেহত পাইল না। ইংরাজ সর্ব্বদা স্বজাতীয়ের স্বার্থানুসন্ধানে মনোযোগী, স্বজাতীয়ের প্রশংসাবাদে শতমুখ, স্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ ও উদ্যতপ্রহরণ। তাঁহার চরিত্র হইতে এই স্বজাতিবাৎসল্যটি শিখিতে পারিলে, ভারতবর্ষে ইংরাজের সমাগম হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মবর্দ্ধক হইতে পারে। উহার কতকটা বাহ্যলক্ষণও সম্প্রতি দেখা দিতেছে। ঐ লক্ষণগুলি ক্রমশঃ জনগণের হৃদয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেলে, ভারতবাসীর অনেক দুঃখ ঘুচিবার পথমুক্ত হইবে। যাহাকে ইংরাজের উন্নতি বলা যায়, তাহার হেতু ইংরাজের স্বার্থপরতা নহে—ইংরাজের স্বজাতিবাৎসল্য। ভারতবাসী যদি ইংরাজের ন্যায় স্বজাতিবৎসল, স্বজাতিপক্ষপাতী, স্বজাতিগুণগ্রাহী স্বজাতিদোষপ্রচ্ছাদক হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইয়া উঠিবে। *

ভূদেববাবু ছেলেদের আদরে বশ করিতে চাহিতেন। তাহাতে অপারগ হইলে, অবশ্য "দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" করিতে হইত। কিন্তু সাধ্যপক্ষে যাহাতে প্রহার না করিয়া, ছেলেকে কথা শুনাইতে পারেন, সে চেষ্টা করিতেন। মারিতেন বটে কিন্তু তাহাতেও একটু চিন্তাশীলতা দেখা যাইত। তিনি বলিতেন যে, চড়চাপড় যাহা মারিবে, পিঠে মারিও। আঘাত পাছায় করিবে। রগে মারায় বড় ভয়—অস্থানে লাগিলে সর্ব্বনাশ হইতে পারে। হাতে জোরে বেতমারা তাঁহার মনঃপূত ছিল না। সেইরূপ শরীরের অন্যত্র যদি কোনও শির মারের চোটে টানিয়া যায়, ত যাবজ্জীবন অঙ্গহীন হইতে পারে। মাথায় মারা আদৌ উচিত নহে, ইহাই তাঁহার মত ছিল। মাথায় প্রহারে শিরঃপীড়া অবশ্যম্ভাবী।

ভূদেববাবুকে তাঁহার পৌত্র ও দৌহিত্রগণ "দাদাবাবু" বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার কাছে এই প্রাথমিক শিক্ষালাভ অতি মধুর বলিয়া অনেকের এখনও মনে থাকিতে পারে। বস্তুতঃ পিতামহ ও মাতামহই শৈশবের অদ্বিতীয় সুশিক্ষক। কারণ, পিতামহ পৌত্রের দোষগুণ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান, অথচ তিনি বয়স্য-ভাবও ধারণ করিতে পারেন। এই দুই কারণের সমাবেশ অন্যে হয় না। ইংরাজীতে বলে, মাতা অপেক্ষা সুশিক্ষা অপর কেহ দিতে পারে না। পিতামহ ঠাকুর—পিতার পিতা—মহাগুরুর মহাগুরু—ঈশ্বরের ঈশ্বর—তিনি কেমন ভয় ও ভক্তির

* পারিবারিক প্রবন্ধ। বিবিধ প্রবন্ধে ভূদেববাবু লিখিয়াছেন :—"যাঁহারা স্বজাতীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন, আমরা কি তাঁহাদেরও বেশ গৌরব করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র কি সামান্যলোক! আজিকাল উঁহার দুই একখানি পুস্তক ইংরাজীতে ও জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে দেখিয়া, আমাদের মনে যদি একটু প্রকৃত ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে, বলিতে পারি না কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উনি কতটা যে ভক্তির পাত্র তাহা সকলে বুঝিতে পারে নাই ⋯যদি বাঙ্গালী স্বজাতীয়ের প্রধান লোকদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠে, তাহা হইলে এখনও দেখিতে পায় যে, বঙ্গভূমি সত্য সত্যই রত্নপ্রসবা।"—রবিবাবুর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে লিখিত কথাগুলি খাটে না।

* সামাজিক প্রবন্ধ ৮৪ পৃঃ।

পাত্র! কিন্তু তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের বাক্যমনের অগোচর থাকেন না। আমাদের ক্রীড়া-কৌতুকে, হাস্য-পরিহাসে, ফষ্টিনষ্টিতে যোগ—শুদ্ধ যোগ দেন না—স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকাদির উত্তেজনা করেন। বঙ্গ-ভাষায় পিতামহকে যে ঠাকুরদাদা বলে, তাহা ভালই বলে। তিনি ঠাকুর অর্থাৎ দেবতা এবং তিনি দাদা অর্থাৎ ভাই, সমকক্ষ ব্যক্তি ও দেবত্ব সম্বন্ধ একাধারে সন্নিবিষ্ট। বাপ-মায়ের মন সন্তান সম্বন্ধে সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। এই তাহাকে খুব ভাল ছেলে মনে করিয়া, আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন, আবার পরক্ষণেই অতি সামান্য কারণে তাহার বুদ্ধি, চরিত্র এবং ভাগ্য মন্দ হইবে ভাবিয়া, দুঃখে অবসন্ন হইতেছেন। পিতামহের মন অত আন্দোলিত হয় না। পৌত্রের দোষগুণ তিনি প্রায় যথাযথভাবে দেখিতে পান। —পিতামহের স্থানে প্রথম শিক্ষালাভ যদি কাহারও ভাগ্যে ঘটে, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন, সেই শিক্ষার ফলবত্তা মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষা অধিক।

উপসংহারে সন্তানের শিক্ষা-বিধান সম্বন্ধে প্রত্যেক পিতাকে কতদূর উন্নতমনা হইতে হইবে, যদি না দেখাই, ত এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সন্তানের শিক্ষাদান সম্বন্ধে ভূদেববাবু সকলের সমক্ষে যে উচ্চ আদর্শ ধরিয়া গিয়াছেন তাহা এই :—

ভগবদ্‌বাক্যে আছে—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্॥

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উদয় হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্ট করি।

ঐ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে, ভারতবাসীর কার্য্যকলাপ, ব্যবহার-প্রণালী, এবং মনের ভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে।

নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে সত্য; কিন্তু কোথায় হইবে, কখন হইবে, তাহার কোনও অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব সেই ঘটনা তাঁহার নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতিব্যক্তিকেই এরূপ মনে করিতে হয়; এবং ইহা মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্ব্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুৎসিত এবং নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। আপন আপন সন্তানাদি সম্বন্ধে সকলকে ইহাও মনে করিতে হয় যে, আমার এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন। ইহা হইতে ভারতবাসীর সম্মিলন-সূত্রের আবিষ্কার হইতে পারে, ইহা হইতেই আমাদের জন্মভূমি যশের মালা ধারণ করিতে পারেন, ইহা হইতেই পৃথিবীতে ধর্ম্মধনের সংবর্দ্ধন হইয়া, মানুষ বিমুক্ত-পাপাচার এবং অভূতপূর্ব্ব পুণ্য ধনে ধনী হইয়া উঠিতে পারেন। কোন একটি মানব-শিশুর ভাবি অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে, বা কি হইতে পারে না, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিতে সমর্থ? মনোমধ্যে নেতৃমহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপ স্থিরতর ও ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রাখিয়া, আপনারা পবিত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু ও যুবাদের সুশিক্ষার প্রতি নির্দ্দিষ্টরূপে নিরন্তর যত্ন করিলে, সকল লোকের মন উন্নত উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাদৃশ উন্নত, পবিত্র ও একাগ্র হওয়াতেও নেতৃমহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্যতর হেতু উপস্থিত হইবে। একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে, কোনও দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতে উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তি-দিগের মধ্য হইতেই উচ্চতর মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয় অধিত্যকা দেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে; নিম্নদ্রোণী-দেশ হইতে উঠে নাই। অতএব দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। শিক্ষাকার্য্য ও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, উদারতা ও ওজস্বিতা বর্দ্ধন-চেষ্টার সহিত স্বজাতিবাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া, পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ

(টাঙ্গাইল উপবিভাগ)

[শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত]

টাঙ্গাইল মহকুমা বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার একটি প্রসিদ্ধ উপবিভাগ। এই বিভাগে বহু প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার, ধনশালী বণিক্ এবং শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। এক দিকে শিক্ষার বহুলপ্রচার হইয়াছে, অপর দিকে কৃষি ও বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

টাঙ্গাইল উপবিভাগকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম বিভাগ—ঢাকা-জেলার ভাওয়াল হইতে উত্তরাভিমুখে গারো পাহাড় অভিমুখে বিস্তৃত সমুচ্চ কঙ্করময় রক্তবর্ণ ভূমির কিয়দংশ। এই অংশ গড় জয়েনশাহী বা গড়গজালী (সাধারণ নাম মধুপুরের জঙ্গল) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় অংশ—সমভূমি এবং প্রথম অংশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মুসলমানের আগমনের পূর্ব্বে এই ভাগের অধিকাংশ বিল ও নদীনালা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, অবশিষ্টাংশে নিম্নজাতীয় লোকসকল বাস করিত; তাহাদেরও বিরলবসতি ছিল। টাঙ্গাইল উপবিভাগের সমতল বা দ্বিতীয় বিভাগ আধুনিক স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু প্রথম বিভাগ বা গড়-গজালী প্রাচীন স্থান; অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহোদয়ের অনুসন্ধানে গড়-গজালী, প্রাচীন স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ ভূখণ্ডের বনজঙ্গলের অভ্যন্তরস্থিত প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, দীর্ঘিকা-পরিখাদির নিদর্শন প্রভৃতি বহুকীর্ত্তি-চিহ্ন এবং জনপ্রবাদ, এই স্থানের পূর্ণ সমৃদ্ধি ও সভ্যতার পরিচায়ক।

আমরা টলেমির ভূগোলবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া, পরিজ্ঞাত হই যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লৌহিত্য অথবা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। টাঙ্গাইল উপবিভাগ (টাঙ্গাইল' অত্যন্ত আধুনিক নাম, এই নাম ৪০ বৎসরের বেশী নহে, কিন্তু আমরা যে স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার অন্যনামের অভাবে টাঙ্গাইল নামই ব্যবহৃত হইবে।) লৌহিত্য তীরবর্ত্তী রাজ্যের শাসনাধীন ছিল।

পুরাকালে অনেক রাজ্যে এই প্রথা ছিল যে, রাজার অধীন দ্বাদশজন সামন্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সকল সামন্ত ভৌমিক বা বারভূঁইয়া নামে পরিচিত হইতেন। পরবর্ত্তী কালে অনেক সময় সামন্ত শাসনকর্ত্তার সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু 'দ্বাদশ ভৌমিক' নাম বিলুপ্ত হয় নাই। রাজপুতানা প্রভৃতি রাজ্যে প্রাগুক্ত প্রথা পরিদৃষ্ট হইত। ভারত-বর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত লৌহিত্য-তীরবর্ত্তী (আসাম) এবং অন্যান্য রাজ্যেও দ্বাদশ ভৌমিকের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। *

টাঙ্গাইল উপবিভাগ লৌহিত্য-রাজ্যের অধীন ভৌমিকের আধিপত্যভুক্ত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতবর্ষে আসিয়া সমগ্র দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অঞ্চলে পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। এই সকল রাজ্যের নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি, সমতট এবং কামরূপ। কামরূপ রাজ্যের সীমানির্দ্দেশ কালে ৺ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের আসাম, মণিপুর, শ্রীহট্ট এবং ময়মনসিংহ জেলা প্রাচীন কামরূপ। ফলতঃ বর্ত্তমান আসামে পুরাকালে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, টাঙ্গাইল উপবিভাগ অন্যূন সাতশত বৎসর কাল তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হিউ-য়েন সাং বর্ণিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত

---

* "প্রতাপাদিত্য"।

ও সমতট রাজ্যের সমগ্র এবং কামরূপ-রাজ্যের কিয়দংশ যে সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত ছিল, খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তথায় দুইটি অভিনব রাজবংশ প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। এই দুই বংশের নাম পাল ও সেন। অনুমান ৮৫০ খৃষ্টাব্দে পালনামধারী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একটি পরাক্রান্ত বংশের অভ্যুদয় হয় এবং অনুমান ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে সেনবংশীয় রাজন্যগণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। কালক্রমে সেনবংশীয়েরা সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠেন এবং পালবংশের আধিপত্য বিলুপ্ত করিয়া সমগ্র দেশ গ্রাস করেন। সেনবংশের বল্লাল সেন সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্য পঞ্চ অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই পঞ্চ অংশের নাম—রাঢ়, বাগড়ী, বারেন্দ্র, মিথিলা এবং বঙ্গ। সেনবংশের রাজধানী বঙ্গ-বিভাগের অন্তর্গত বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল। এই কারণ বঙ্গ-বিভাগ অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। এবং তজ্জন্য ক্রমে ক্রমে সেনবংশের শাসিত সমস্ত দেশ বঙ্গদেশ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ব্রহ্মপুত্র নদকে সেন রাজ্যের অর্থাৎ বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* এই নির্দ্দেশ হইতে উপলব্ধি হয় যে, টাঙ্গাইল উপবিভাগ সেনবংশের আধিপত্যাধীন ছিল।

পাল ও সেন বংশের আধিপত্য সময়ে বঙ্গদেশের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ দ্বাদশ ভৌমিকের অধিকারে ছিল। তৎকালে তাঁহাদের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু তাঁহারা বার ভূঁইয়া নামেই অভিহিত হইতেন।†

আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে মুসলমানের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত টাঙ্গাইল উপবিভাগ ভূঁইয়ার শাসনাধীন ছিল। টাঙ্গাইল উপবিভাগ এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিতে নানা স্থানে প্রাচীন সুবৃহৎ অট্টালিকা এবং দীর্ঘিকা ও পরিখাদির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত চিহ্নসমূহ সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, সেই সকল স্থানে স্বাধীন হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজন্যগণ রাজত্ব করিতেন। এই সকল অধিপতি সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব ঘোর তমসাচ্ছন্ন। টাঙ্গাইল উপবিভাগ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির নানাস্থানে যে সকল শাসনপতির বাস ছিল, তাঁহাদের ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য,তাঁহাদের অধিকারের সীমা, তাঁহাদের বংশের বিবরণ, কোন তথ্যই নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই; কেবল জনপ্রবাদ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, সাধারণভাবে দুই এক কথা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে মাত্র এবং আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

জামালপুর মহকুমার অধীন সাবাজপুর নামক স্থানে ভগদত্তনামক শাসনপতির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি আপনার মাতার স্নানের জন্য তড়াগ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাতে দ্বাদশ তীর্থের জল মিশ্রিত করিয়াছিলেন। সে সুবৃহৎ তড়াগ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং তাহার তীরে প্রত্যেক বৎসর বৈশাখ মাসে মেলা হইয়া থাকে।

মিরজাপুর থানার ভাওরা নামক স্থানে একজন শাসনপতির বাস ছিল; তিনি বৈদ্যকুলোদ্ভব ছিলেন। ভাওরাতে পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। দীর্ঘিকার দক্ষিণ তীর এখনও বিদ্যমান। রাজান্তঃপুরের তড়াগের প্রস্তরগঠিত ঘাট ছিল।

টাঙ্গাইল থানার অধীন হিঙ্গানগর-নামক স্থানে রাজা কংসরাম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সুবৃহৎ পুরী সপ্ত তড়াগ-পরিবেষ্টিত ছিল। এই সকল জলাশয়ের চিহ্ন আজও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তৎসমুদয় সম্বন্ধে নানা প্রকার জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে।

ঢাকা-জেলার তালিপাবাদ পরগণার মাধবপুরনামক স্থানে যশোপাল-নামক একজন বৌদ্ধ শাসনকর্ত্তা রাজত্ব করিতেন। যশোপালের রাজধানীর চিহ্ন এখনও পথিক-বৃন্দের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

ঢাকা-জেলার সাভার-থানার অদূরে হরিশ্চন্দ্র-নামক একজন অধিপতি রাজত্ব করিতেন। হরিশ্চন্দ্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শিশুপাল-নামক আর একজন বৌদ্ধ অধিপতির নাম আমরা জানিতে পারি। ঢাকা-জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়া-নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। "শিশুপালের কতকগুলি কীর্ত্তিচিহ্ন ঢাকার সীমা অতিক্রম করিয়া, ময়মনসিংহে পড়িয়াছে। ময়মনসিংহের দক্ষিণ অরণ্যে শিশুপাল দীঘীনামক বৃহৎ দীঘী ও ভগ্ন ইষ্টকরাশি তাহার প্রমাণ।" *

* B. Hamilton.

† শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়-প্রণীত প্রতাপাদিত্য।

* শ্রীযুত কেদারনাথ মজুমদার।

টাঙ্গাইল উপবিভাগের মুসলমানের আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজত্ব-বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এখন আমরা মুসলমান শাসনকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। ১১৯৮ বা ১২০৩ খৃষ্টাব্দ মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের সময়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একদিকে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানা, অন্যদিকে বীরভূম-জেলার উত্তরাংশ, কেবল এই দুই সীমামধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বক্তিয়ার খিলিজীর অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশ স্বাধীন ছিল।*

বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় এবং নবদ্বীপ মুসলমানের হস্তগত হইলে, লক্ষ্মণসেন সপরিবারে বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তদীয় বংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গে ১২০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। †

তবকাৎ-ই-নাশেরী নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস পাঠ করিলে আরও জানিতে পারি যে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা বিলোপ করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সেন-রাজা তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মুসলমান সেনানায়কগণ যে ক্ষেত্রে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, কতিপয় মুসলমান দরবেশ সেখানে সাফল্য লাভ করেন। কতিপয় দরবেশের উৎকট সাধনায় পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরাজত্ব বিনষ্ট হইয়া, মুসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছিল।

শেষ হিন্দু রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেনের সময়ে—অনুমান ১৩২০ খৃষ্টাব্দে—আদম সাহিদ (সাধারণতঃ বাবা আদম নামে পরিচিত) একদল সুশিক্ষিত সৈন্যের সহিত বিক্রমপুরে আগমন করেন এবং দ্বিতীয় বল্লালসেনকে পরাজিত করিয়া মুসলমানের অধিকার স্থাপন এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হন। তারিখ-ই-বার্নি-নামে গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তোগলক শাহের রাজত্ব কালে ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে সোণার গাঁও নামক স্থানে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, সেন-রাজন্য-বৃন্দ ভৌমিক-উপাধিধারী সামন্তগণের সাহায্যে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুসলমানের আগমনে সেন-রাজন্য-বৃন্দের আধিপত্য পূর্ব্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ হইবার পরেও এই প্রথা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে সামন্ত অধিপতিগণ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এই জন্য সেন-বংশের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের অধিকার স্থাপিত ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার হয় নাই।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে গৌরগোবিন্দ নামক একজন হিন্দু শাসনকর্ত্তা শ্রীহট্ট অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। শাহজালাল-নামক একজন দরবেশ সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া, গৌরগোবিন্দকে পরাজয় করিতে যাত্রা করেন; তাঁহার পরাক্রমে গৌরগোবিন্দ শ্রীহট্ট হইতে বিতাড়িত হন এবং তদবধি শ্রীহট্টে মুসলমানের অধিকার ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই শাহজালালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া ছিলেন। শাহজালাল শ্রীহট্টের মৃত্তিকা পরীক্ষাপূর্ব্বক ইহা আধ্যাত্মিকতার বিশেষ অনুকূল বিবেচনা করিয়া, এই স্থানেই জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হন। তদনুচর ৩৬০ জন আউলিয়া শ্রীহট্টের নানা স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। কেবল যে শ্রীহট্ট অঞ্চলেই এই সকল আউলিয়ার কার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের বংশধরগণের চিহ্ন বিদ্যমান আছে।* কিরূপে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের অধিকার ও ইস্‌লামের প্রভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রদর্শন জন্য বিক্রমপুর ও শ্রীহট্টে স্বাধীনতা-নাশের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে

---

* Blochmann's Contributions to the 'Journals of the Asiatic Society of Bengal.

† মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।—'সেন রাজন্যগণের প্রথম রাজধানী বিক্রমপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কালক্রমে রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে উহা গৌড় এবং নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তারপর মুসলমানের আগমনে সেন রাজগণ পুনর্ব্বার বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং শতাধিক বৎসর রাজত্বের পর তাঁহাদের বংশ লোপ প্রাপ্ত হয়।'

* সাহিত্য—১৩১৫।

আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ের অর্থাৎ টাঙ্গাইল উপবিভাগে মুসলমানের অধিকার ও প্রভাব-বিস্তার-প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

টাঙ্গাইল উপবিভাগে প্রচলিত একটি গীতের প্রথম চরণ এইরূপ; "বারভূঁইয়ার মুলুক ছিল শানশা হইল বৈরী।" জন-প্রবাদ অনুসারে এই ভূঁইয়ার নাম রাজা কংসরাম, পূর্ব্বেই তাঁহার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। যে সময় প্রসিদ্ধ হোসেন শাহ বঙ্গের সুলতান, তৎকালে (১৪৯৯—১৫২০) শাহান শাহ, কংসের বিনাশসাধন করিয়া, মুসলমানের অধিকার ও ইস্‌লামের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শাহান শাহের প্রকৃত নাম আদম; তিনি কাশ্মীর হইতে এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন; ৪০ জন শিষ্য তাঁহার সহচর ছিলেন।

টাঙ্গাইলের উপবিভাগের আটীয়া-নামক পল্লীগ্রামে শাহান শাহের এবং তদীয় শিষ্য-বর্গের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। শাহান শাহের সমাধির প্রস্তরলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে (হিজিরী ৯১৩) পরলোক প্রাপ্ত হন। হিন্দু মুসলমান সকলেই শাহান শাহের সমাধি-ক্ষেত্র পবিত্র বলিয়া মনে করে এবং মঙ্গল-কামনায় সেখানে সিন্নি প্রদান করিয়া থাকে। সন্ধ্যা-কালে শাহান শাহের ও তদীয় শিষ্যবৃন্দের সমাধিসমূহে চেরাগ (প্রদীপ) দিবার বন্দোবস্ত আছে। টাঙ্গাইল উপবিভাগের মুসলমান জমিদারগণ-প্রদত্ত সম্পত্তির আয়ের একাংশ দ্বারা ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। প্রাগুক্ত সম্পত্তির আয়ের অপরাংশ দ্বারা শাহান শাহের সমাধি-ক্ষেত্রে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অতিথিশালায় প্রত্যহ বহুসংখ্যক আগন্তুক এবং আটীয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমূহের গরীবদুঃখী খিচুড়ী পাইয়া থাকে।

শাহান শাহের সমাধি-ক্ষেত্রের সম্মুখে একটি ভগ্নাবশেষ মসজিদ এবং লুপ্তপ্রায় সমাধি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 'পোড়ারাজা' গিয়াসউদ্দীন এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
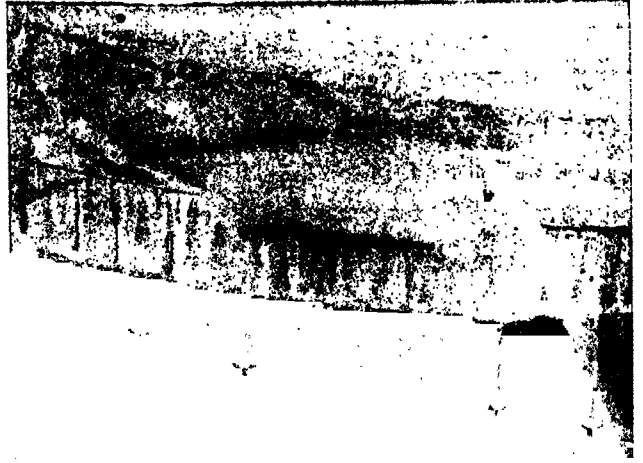
শাহান শাহের সমাধি

সমাধির নিম্নে তাঁহার মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল। পোড়া রাজা গিয়াসউদ্দীন সম্বন্ধে জনশ্রুতি নীরব। আমাদের অনুমান এই যে, গিয়াসউদ্দীন, শাহান শাহের প্রধান শিষ্য ছিলেন। এবং তাঁহার পরলোকগমনের পর পরিত্যক্ত শাসনভার তিনিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গিয়াসউদ্দীন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, শিষ্যপরম্পরায় বা উত্তরাধিকারক্রমে শাহান শাহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অধিকারের (টাঙ্গাইল উপবিভাগ এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।) শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল।

এরূপ সময়ে বঙ্গদেশের মুসলমান রাজশক্তির কেন্দ্র-ভূমি টাণ্ডা পাঠান-বংশীয়দের হস্তচ্যুত এবং তথায় মোগল বাদশাহ আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠান রাজন্যবৃন্দ সামন্ত শাসনপতিগণের সাহায্যে বঙ্গ-

দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।* এই জন্য এদিকে পরাজিত পাঠানগণ এবং অন্যদিকে বঙ্গের সামন্ত শাসনপতিগণ রাজপরিবর্ত্তনে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিপ্লবকারীদের মধ্যে পাঠানবংশীয় ওসমান খাঁ এবং অন্যতম সামন্ত ভূঁইয়া ঈশা খাঁ প্রধান ছিলেন। ভাটি-প্রদেশ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ ঈশা খাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৮৬—৮৭ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ বশ্যতা স্বীকার করিয়া মোগল-দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রীত হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে দ্বাবিংশতি পরগণার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঈশা খাঁর বিরুদ্ধাচরণ অপেক্ষা পূর্ব্ব-বঙ্গের পাঠানদের শত্রুতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে রাজপ্রতিনিধি ইসলাম খাঁ তাঁহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছিলেন।

মোগল রাজস্বসচিব টোডরমল বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। টাঙ্গাইল উপবিভাগ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল এবং তিন পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল;—পরগণে পুখরিয়া বাজু, পরগণে বড় বাজু এবং পরগণে আলেপ শাহী। পরগণা পুখরিয়া হইতে রাজস্ব বাবদ ১৭১৫১৭০ দাম বা ৪২৮৭৯।০ সংগৃহীত হইত। বড়বাজুর সরকারী রাজস্ব অপর চারিটি মহালের সহিত ৪১৭৮১৪০ দাম বা ১০৪৪৫৩।০ আনা নির্দ্দিষ্ট ছিল। আলেপ শাহীর রাজস্ব ৭৬৬৩৭ দাম অর্থাৎ ১৯০৬১৷৷০ ছিল।

এই আলেপ শাহী বর্ত্তমান সময়ে আলেপ শাহী, আটিয়া এবং কাগমারী নামক তিনটি পরগণায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের নির্দ্দেশে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু এই নির্দ্দেশের প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিলেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন হইবে। আটিয়া পরগণার অধিকারী মুসলমান জমিদার ১২০৪ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহের কালেক্টরীতে অনেক রিটার্ণ দাখিল করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রিটার্ণ আমরা দেখিয়াছি; কতিপয় রিটার্ণের হেডিংএ পরগণার নামের স্থানে আলেপ শাহী লিখিত আছে, অবশিষ্ট রিটার্ণের হেডিংএ পরগণা আলেপশাহী মোতালক আটিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ খোদা নেওয়াজ খাঁ পাণি কর্ত্তৃক প্রদত্ত বহু সনদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তৎসমুদয়ে পরগণার নামের স্থানে আলেপ-শাহীর উল্লেখ আছে। যে সূত্রে আলেপশাহীর একাংশ কাগমারী নামে পরিচিত হইয়া স্বতন্ত্র পরগণায় পরিণত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শন করিব। এই প্রবন্ধে কেবল ইহাই বলা আবশ্যক যে, খোদা নেওয়াজ খাঁর সময়ের পূর্ব্বেই কাগমারী পরগণার উদ্ভব হইয়াছিল এবং ১৫৪০ বঙ্গাব্দেও বর্ত্তমান আটিয়া পরগণা আলেপ-শাহী নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ১২০৪ অব্দের পূর্ব্বেই, অর্থাৎ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে খণ্ডিতদেহ আলেপ-শাহীর বিপুল অংশ পূর্ব্বোক্ত করটীয়ার মুসলমান জমিদারের পূর্ব্বপুরুষদের অধিকারচ্যুত হইয়া, হিন্দুর হস্তগত হইয়াছিল। যে প্রকারে এইরূপ হয়, তাহা প্রবন্ধান্তরে বর্ণিত হইবে। টাঙ্গাইল উপবিভাগে আটিয়া-নামক একটি প্রাচীন পল্লী বিদ্যমান আছে। এই স্থানে আলেপশাহী পরগণার প্রথম অধিকারী বাস করিতেন। তদীয় উত্তরাধিকারিগণ স্থানান্তরে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া, আটিয়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় পল্লী ধর্ম্মকার্য্যে উৎসর্গ করেন। এইসূত্রে আলেপশাহী পরগণার বক্ষঃস্থলে আটিয়া-নামক একটি ক্ষুদ্র পরগণা হয়। খোদা নেওয়াজ খাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সেলিম খাঁ পাণি, আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে স্বীয় জমিদারীর সনদ লাভ করেন। এই সনদে আলেপশাহী এবং আটিয়া পরগণার উল্লেখ রহিয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বে ক্ষুদ্র আটিয়া বৃহৎ আলেপশাহী গ্রাস করিয়াছে। কেবল হিন্দু জমিদারের জেলাভুক্ত অংশ এখনও আলপশাহী অথবা আলেপ সিংহ নামে পরিচিত রহিয়াছে। আলেপশাহী যে আটিয়া পরগণাভুক্ত হইয়াছে, তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, অদ্যাপি দলিল-দস্তাবেজে পরগণার নাম আটিয়া গয়রহ লেখা হইয়া থাকে।

ঈশা খাঁ, আকবর শাহের নিকট বশ্যতা জ্ঞাপন করিয়া, দ্বাবিংশতি পরগণার বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরগণা পুখরিয়াবাজু এবং পরগণা বড়বাজু এই দ্বাবিংশতি পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে ঈশা খাঁর বংশধরগণ হতশ্রী হইয়া পড়েন এবং বহু পরগণা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এই সময় পুখরিয়া পরগণার ইস্পিঞ্জর খাঁ এবং

* Stewart's History of Bengal.

মনোহর খাঁর পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং বড়বাজু পরগণায় আবজাল মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকার সংস্থাপিত হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত আবজাল মহম্মদ "একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। ইঁহার নামে বড়গাছ পরগণার সর্ব্বত্র দরগা স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান এখনও সমভাবে সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের নামে সিন্নি মানত করে। লোকের বিশ্বাস যে, তাঁহার নামে সিন্নি মানিলে অসাধ্য সাধন করা যায়। এই সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। আবজল মহম্মদের লোকান্তরের পর তদীয় বংশধরগণ জমিদারী প্রাপ্ত হন।" * তাহার পর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হইতে বড়গাছ পরগণা বহুধা বিভক্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে করটিয়া, কাগমারী, টিকরি পাড়া, ভাঙ্গনি প্রভৃতি স্থানের জমিদার বৃন্দ এই পরগণা ভোগ দখল করিতেছেন।

"অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুখরিয়া পরগণা ধনবাড়ীর ইস্পিঞ্জর খাঁর অধিকার হইতে নাটোরের মহারাজার হস্তগত হয়। ঐ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নাটোরের রাজবংশ উহা শাসন করেন; অবশেষে কোম্পানার বাকী রাজস্বের দায়ে এই পরগণা, নীলাম হইয়া যায়।" * বর্ত্তমান সময়ে আম্বারিয়ার এবং পুটিয়ার জমিদারবৃন্দ এই পরগণা ভোগ-দখল করিতেছেন।

মোগল আধিপত্যের সূচনায় সৈয়দ খাঁ বিস্তীর্ণ আলেপ-শাহী পরগণা হস্তগত করিয়াছিলেন। তদীয় বংশধরগণ অদ্যাপি টাঙ্গাইল উপবিভাগের বিপুল অংশ জমিদারী-সূত্রে ভোগদখল করিতেছেন।

সৈয়দ খাঁ আলেপশাহীর অধিকার লাভ করিয়া, আটিয়াতে এক প্রকাণ্ড সুদৃশ্য মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। এই মসজিদের গাত্রে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সৈয়দ খাঁ পানির মস্জিদ

"শাহনূর উদ্দীন জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। সৈয়দ খাঁ পাণিও পরকালে ফললাভের মানসে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিলেন। আমি (শিলালিপিলেখক) স্বীয়জ্ঞানের নিকট মসজিদ-নির্ম্মাণের তারিখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলাম এবং

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের বিবরণ।

(*) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার।

তদুত্তরে পদ্যের একচরণ পাইলাম। সে চরণ এই, 'হে সৈয়দ, (ঈশ্বর) এই কার্য্যের সুফল তোমাকে দিবেন।"*

আমরা এই শিলালিপি পাঠে দুইটি বিষয় জানিতে পারি; প্রথম, হিজিরী ১০১৮ অব্দে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে, সৈয়দ খাঁর মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়, সৈয়দ খাঁ পাণিবংশসম্ভূত ছিলেন।

সৈয়দ খাঁ যে,পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভদ্রতা, উদারতা এবং প্রজা-হিতৈষিতার নিমিত্ত বিখ্যাত। সৈয়দ খাঁর উত্তরাধিকারিগণের ঐকান্তিক যত্নে নিম্নজাতীয় লোকের বাসভূমি আলেপশাহী—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থের বাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। সৈয়দ খাঁর উত্তরাধিকারিগণ এই জন্য অসংখ্য নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। সুবিস্তীর্ণ আলেপশাহী পরগণাতে এরূপ ভদ্র হিন্দু বিরল, যিনি মুসলমান জমিদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত নিষ্কর ভূমিভোগী নহেন। যদি এরূপ কোন ভদ্র অধিবাসী দেখা যায়, তবে তাহার অর্থ যে, তিনি পরবর্ত্তী কালে আলেপশাহীতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই বংশের একজন জমিদার বিরামআলি খাঁ বহু খারিজা তালুক সৃষ্টি করিয়া, সামান্য নজর গ্রহণে তৎসমুদয়ের বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন। সৈয়দ খাঁর বংশীয়গণের উদারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁহারা মুসলমান হইয়াও বহু দেবোত্তর ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহাদের প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমির উপস্বত্বদ্বারা অনেক স্থানে দেবদেবীর পূজার্চ্চনা নির্ব্বাহিত হইতেছে। সৈয়দ খাঁর বংশীয়দের প্রজা-হিতৈষিতার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে লিপিবদ্ধ হইতেছে, এবং এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহাদের প্রজা-হিতৈষিতার গভীরতা প্রতীয়মান হইবে। সৈয়দ খাঁর জনৈক বংশধর (অতীব দুঃখের বিষয় যে, তাদৃশ মহাত্মার নাম পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই) সমস্ত প্রজাকে তাহাদের জমির এক পঞ্চমাংশ নিষ্কর ভোগ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই আদেশ অদ্যাপি বলবৎ আছে; আলেপ-শাহী (বর্ত্তমান আটিয়া) পরগণার সমস্ত প্রজা স্ব স্ব জমির এক পঞ্চমাংশ নিষ্কর ভোগ করিতেছে। তাদৃশ নিষ্কর ভূমি 'মরকমি' নামে কথিত। বর্ত্তমান জমিদারগণ এই ভূমির করগ্রহণে অক্ষম; প্রজাবর্গও জমি বিক্রয়কালে তাহার এক পঞ্চমাংশের মূল্যগ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।

* মূল পার্শীতে আছে,—"কে আয় সৈয়দ জাজা কাসিতোহো খয়জ" ;—এই শব্দগুলি হইতে ১০১৮ অঙ্ক নিষ্পন্ন হইতেছে।

নবলীলা

[শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, B. L.]

(১)

করব এবার নবলীলা ! তুচ্ছ করে উচ্চ শিলা,
বহিয়ে দিব কর্ম্মধারা—বুদ্ধদেবের দয়ার মত।
বসুন্ধরার ভিত্তি নেড়ে ছুটুক সিন্ধু গর্জ্জে তেড়ে ;
ধৈর্য্যধরে ভাস্‌ব আমি, অকুল জলে—'বয়া'র মত।
বিশ্বজনের হতাশ্বাসে, হিংসা-দ্বেষের ঝড়-বাতাসে,
প্রীতির বাঁধা কুঁড়ে ঘরে থাক্‌ব অটল স্থাণুর মত।
অন্ধ করে' দৃষ্টি আমার, আসচে—আসুক আরও আঁধার;
ভীষণতা দল্‌ব পায়ে, জল্‌ব দীপ্ত ভানুর মত।

(২)

বুকের শিলায় মাথা খুঁড়ে, শিরায় শিরায় হাত-পা ছুঁড়ে,
আকাঙ্ক্ষা ওই কেঁদে মরে—অবুঝ—পাগল শিশুর মত।
"আর পাবনা"র চিন্তা-দাহে, মরুক যে বা মরতে চাহে,
রক্ত ঢেলে নর-সেবায় ঝুল্‌ব ক্রুশে—যীশুর মত।
নিভুক দৃষ্টি—চক্ষু-হারা, ডুবুক সূর্য্য-চন্দ্র-তারা,
বিশ্ব-সেবায় ফুটবে আলো—ভগবানের জ্যোতির মত।
ভেঙ্গে-চুরে কঠোর শিলা, করব সেবার নবলীলা ;
বহিয়ে দিব কর্ম্মধারা—পাহাড়-ঝরা নদীর মত।

সূর্য্য-সংবাদ

[শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়]

বৈজ্ঞানিকগণ যেদিন সূর্য্যকে একটি নক্ষত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন, জ্যোতিষশাস্ত্রে সে এক নূতন দিন! বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদগণের দৃষ্টি সেইদিন হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে সূর্য্য সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা ছিল, সে সকল ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া, নূতন সত্যের আলোকে জ্যোতির্বিদগণ দেখিতে পাইলেন—
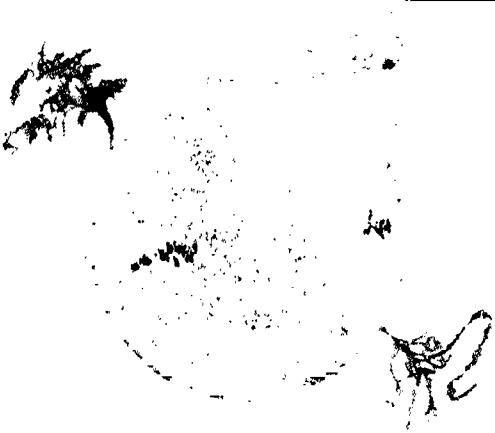
অনন্ত আকাশ-পথে যে সকল নক্ষত্র অহোরাত্র ঘুরিতেছে, আমাদের সূর্য্যদেবও তাহাদেরই অন্যতম। নক্ষত্র বলিয়া সূর্য্যদেবের পরিচয় পাইবার পর হইতে, জ্যোতির্বিদগণ তৎসম্বন্ধে যে সকল নব নব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমস্ত সত্যই জ্যোতির্বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম যে নক্ষত্রটি, তাহার দূরত্ব সূর্য্য অপেক্ষা যে নিতান্ত অল্প, তাহা নহে। সূর্য্যই পৃথিবীর নিকটতর নক্ষত্রগণের মধ্যে দ্বিতীয়। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব নয় কোটি একত্রিশ লক্ষ মাইল। সুতরাং সূর্য্য আমাদের নিতান্ত হাতের নিকটেই আছে! ইচ্ছা করিলেই তাহাকে লইয়া নাড়াচাড়া করা যাইতে পারে। আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রদ্বারা নক্ষত্রালোক বিশ্লিষ্ট (analyse) করিয়া, বর্ণচ্ছত্র বা Spectrum হইতে তাহার গঠনোপাদান বিষয়ে নানা নূতন তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে। পৃথিবীতে নানা ধাতু-পদার্থ দগ্ধাবস্থায় যে সকল বর্ণের বর্ণচ্ছত্র প্রদান করে, সেই সকল বর্ণ সূর্য্যবর্ণচ্ছত্রে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং, সূর্য্যদেহের, জলন্ত দ্রব্য-নির্দ্ধারণ সহজ হইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না।

সূর্য্যকে নক্ষত্র না-বলিবার জন্য, আমাদের পূর্ব্ব-বর্ত্তিগণকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, কারণ, আমাদের পৃথিবী ত সূর্য্যেরই উপগ্রহ। কেবল উপগ্রহ হইলে ত সূর্য্যদেব বাঁচিয়া যাইতেন—অধিকন্তু পৃথিবী যে চিরকালই তাঁহার গলগ্রহ হইয়া আছে! সূর্য্যের অভাবে, পৃথিবীর যে পৃথিবীত্বই মুছিয়া যায়! সূর্য্য আলো না দিলে ত পৃথিবীর ঘরে আলো জ্বলে না, ফসল জন্মে না, প্রাণ বর্ত্তিতে পারে না এবং সমগ্র উদ্ভিদ্ ও জলস্থলবাসী জীবজন্তুগণ তিষ্ঠিতেই পারে না। এমন সূর্য্যকে মানুষ, দেবতা বলিয়াই আদিম কালে বন্দনা করিয়াছিল। এই দেবতাতুল্য, প্রাণিগণের জীবনদাতাকে মানুষ কখনও কি সামান্য একটা নক্ষত্রের সহিত তুলনা করিতে পারে?

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার ভক্তবৃন্দ দেবতা বলিয়াই জানিতেন; কিন্তু যেদিন ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, তিনিও সকলের মত পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন এবং ননীচুরি করিয়া আহার করেন, তখন ভক্তগণ ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ঘরের কথা অনেক জানিতে পারিলেন। আমাদের জ্যোতির্বিদগণও ভগবান্ দিনমণিকে (নিত্য যিনি "জবাকুসুমসঙ্কাশং" মন্ত্র পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে) যেদিন নক্ষত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন, সেদিন দিনমণির ঘরের কথা, জন্মতিথি, নক্ষত্র ও মাসের কথা মর্ত্ত্যবাসিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল! কিন্তু আজও ঐ সুচতুর

তেজীয়ান্ চিরভাস্বর ভাস্করের অনেক অত্যাশ্চর্য্য লীলা আমাদের চক্ষে রহস্যময় এবং অজ্ঞাত রহিয়াছে। জ্যোতিষী ভক্তবৃন্দ, আজ কতবৎসর হইতে ভাস্কর-মন্দিরে সাধনা করিয়াও, দেবতা আদিত্যের বরলাভ করিতে পারিলেন না। সূর্য্যদেব যে, আমাদের ধরা-গ্রহটির একমাত্র প্রাণদাতা, তাহা বোধ হয়, কেহ অস্বীকার করিবেন না; অপর কোনও উপগ্রহের ধ্বংস সম্ভাবনা দেখিলে, জ্যোতিষিগণ নির্বিকার থাকেন; কিন্তু যখনই পৃথিবীর সহিত অপর কোনও গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র বা ধূমকেতুর একটু ঘেসাঘেঁসি হইবার সম্ভাবনা দেখেন, তখনই একেবারে লাফাইয়া উঠেন। কারণ, সূর্য্যহীন ধরণী এবং মূলহীন বৃক্ষ, উভয়ই সমান। সূর্য্য আমাদের কি কাজই না করিতেছে? আমাদের ইষ্ট, অনিষ্ট, সমস্তই ত ঐ ভানুর উপর নির্ভর করে। সূর্য্যই ত আমাদের মহামারি, দুর্ভিক্ষ, চর্ম্মরোগ ও প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা উৎপন্ন করে। তাহার দেহস্থিত কলঙ্ক, পৃথিবীতে চৌম্বক ঝটিকা প্রবাহিত করিতেছে, বাণিজ্যের জাহাজ ডুবাইতেছে, নরহত্যা ঘটাইতেছে! এমন কি, ইতিহাস খুঁজিলে প্রমাণ হয় যে, সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সহিত পৃথিবীতে আত্মহত্যা, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বৈজ্ঞানিকগণ যখন বলিতেছেন যে, এই পৃথিবী এককালে সূর্য্যেরই দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহার সহিত সূর্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাটা বিশেষ আশ্চর্য্য-জনক নহে, অধিকন্তু, না-থাকাটাই আশ্চর্য্য!

প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য্যসম্বন্ধে বিশেষ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। তাহাতে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে, একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ ব্যতীত অপর কোনও গতির কথা পাওয়া যায় না। ইহার পর, জ্যোতিষিগণ বলিতে আরম্ভ করেন, পৃথিবী স্বীয় বর্ত্তুলদেহ লইয়া অহোরাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া, বৎসর ও ঋতুবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে; এবং পৃথিবী, নিজেকেই নিজে প্রদক্ষিণ করিয়া, দিন ও রাত্রির সৃষ্টি করিতেছে। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার—অতি মহান্ সত্যের আবিষ্কার! এই আকর্ষণ কেবল চন্দ্র-সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যেই কার্য্য করিতেছে না;—সমগ্র বিশ্বের এবং (Solar System) সবিতৃ-মণ্ডলের প্রত্যেক অণু, অপর অণুকে এই আকর্ষণে পরস্পর পরস্পরের নিকটে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। তুচ্ছ ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া, অনন্ত আকাশের সুবৃহৎ গ্রহ-উপগ্রহ এবং তারকা-নীহারিকায়, এই নিয়ম সমান ভাবেই প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক গ্রহ ও উপগ্রহ স্ব স্ব কক্ষায় নিয়মিত আবর্ত্তিত হইতেছে। এই প্রবল আকর্ষণের বলেই বিরাট্ সৌরজগৎ যথানিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; অন্যথা অনিয়ন্ত্রিত এবং স্বেচ্ছাচারী বন্য ঘোটকের ন্যায় সৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা এবং ধূমকেতুগণ পরস্পরের সহিত প্রবল সংঘর্ষণে ধ্বংস হইয়া যাইত। ধূমকেতুরও কক্ষা আছে; পৃথিবীর যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য একবৎসর সময়ের আবশ্যক হয়, হ্যালির ধূমকেতুও তদ্রূপ স্বীয় সুদীর্ঘ ভ্রমণপথদ্বারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ৭৫ বৎসর গ্রহণ করে। ধূমকেতুর ভ্রমণ-কক্ষা এত সুদীর্ঘ এবং বিশাল যে, সবিতৃমণ্ডলের মধ্যে তাহার পথের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। সবিতৃমণ্ডল অতিক্রম করিয়া, কোন অজ্ঞাত পথদ্বারা, ঠিক ৭৫ বৎসর পরে ঐ ধূমকেতু পুনর্ব্বার উদিত হইবে। পৃথিবীর ভ্রমণপথ ও ধূমকেতুর ভ্রমণপথ যে স্থানে রেলওয়ে জংসনের ন্যায় মিলিত হয়, সংঘর্ষ লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেই সকলস্থানেই সংঘর্ষ লাগে। সৌভাগ্যের বিষয়, এ'কথা বলাই বাহুল্য যে, এরূপ সংঘর্ষ আজও বাধে নাই। গতবার হ্যালির ধূমকেতু উদয়ের সময় বৈজ্ঞানিকগণ একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। কারণ, হিসাবদ্বারা জানা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ একটি জংসনে পৃথিবী এবং হ্যালির ধূমকেতু একত্র মিলিত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সূক্ষ্মহিসাবদ্বারা জ্যোতিষিগণ দেখিলেন, ধরিত্রী ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া যাইবার তিনমিনিট পরেই, ধূমকেতুটি স্বীয় বিরাট্ বপু লইয়া, অদম্য ও কল্পনাতীত বেগে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইবে। সুতরাং, গতযাত্রায় তিন মিনিটের জন্য আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি। পৃথিবীটা ট্রেণ হইলে, যদি তাহা তিন মিনিট লেট্ হইত, তবে নিশ্চয়ই এই স্থানে কলিশন্ বা সংঘর্ষ বাধিত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বিধাতা পুরুষ পৃথিবীটাকে মানুষ ড্রাইভার দিয়া চালিত করেন নাই! তিনি যে এই অনন্ত ঈথর-সমুদ্রে ধরিত্রীর কর্ণধার হইয়া আছেন; তাই পৃথিবী-গ্রহবাসী তাঁহার অপার অনুগ্রহ সন্দর্শন করিয়া চমকিত হইল। বিজ্ঞান তাঁহারই অপার মহিমার স্তোত্র। যুগ-যুগান্তরে সেগুলি ক্রমশঃই

জাগিয়া উঠিতেছে ;—এই স্তোত্র-পাঠেই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন হয়।

মাধ্যাকর্ষণের জন্যই, ধরাপৃষ্ঠের জল স্ফীত হইয়া, জোয়ারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই মাধ্যাকর্ষণদ্বারা যেমন সূর্য্য পৃথিবীকে নিকটে আনিতে চেষ্টা করিতেছে, পৃথিবীও তদ্রূপ এই আকর্ষণের দ্বারা সূর্য্যকে আপনার নিকটে আনিতে প্রয়াস পায়। সুতরাং, আমরা দেখিলাম যে, মাধ্যাকর্ষণের প্রকাশ কখনই একাকী সম্ভব হয় না, দুইটি বস্তু বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এই মাধ্যাকর্ষণ দুই দেহের মধ্যে বর্ত্তমান। বৃন্তচ্যুত ফল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ হেতু ভূপতিত হইল, ফলটিও পৃথিবীকে টানিতে চেষ্টা করে। পৃথিবী যেমন বৃষ্টিবিন্দুকে আকর্ষণ করিয়া আনে, বৃষ্টিবিন্দুও তদ্রূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণের এই নিয়ম বৈজ্ঞানিকগণ নানা উপায়ে প্রমাণ করিয়াছেন। যে জিনিষের mass বা বস্তু পরিমাণ যত অধিক, তাহার আকর্ষণও তত অধিক হয়। এই আকর্ষণের মাত্রা, উভয় বস্তুর দূরত্ব ও বস্তু-পরিমাণের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

বিজ্ঞান-জগতের অগ্রণী পণ্ডিতবর ডার্বিন্ সর্ব্বপ্রথমে বলেন যে, সূর্য্য-কর্ত্তৃক ধরাপৃষ্ঠের জলভাগের স্ফীতি, অনেক পরিমাণে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কার্য্য করে। ইহার পর, জ্যোতির্ব্বিদ্ মহামতি গ্যালিলিও, দূরবীক্ষণ-যোগে সৌর কলঙ্ক (Sun spot) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, বলেন যে, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যেরও দৈনিক, অর্থাৎ আহ্নিক, গতি আছে। তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী যেমন পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নিজেকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য্যও তদ্রূপ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতেছে। একথা সত্য হইলে, বলিতেই হয়—পৃথিবীতে যেমন সূর্য্য স্বীয় আকর্ষণদ্বারা জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি করিতেছে, সূর্য্য-দেহেও তদ্রূপ পৃথিবীর আকর্ষণ কেন জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি করিবে না? বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবী সূর্য্যদেহে জোয়ার ও ভাঁটার সৃষ্টি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকারের। সূর্য্যদেহের আকর্ষণহেতু পৃথিবীর জলভাগের আকস্মিক উচ্ছ্বাস ও স্ফীতিকেই আমরা জোয়ার, এবং তাহার ক্রমশঃ অপসরণকেই ভাঁটা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই স্ফীতি একমাত্র যে জলেরই সম্ভব তাহা নহে। তরল এবং বায়বীয় পদার্থের ইহা একটি বিশেষগুণ। বিজ্ঞানবিদ্ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সূর্য্যদেহ সতত দাহ্যমান্ বহুবিধ বায়বীয় পদার্থের আবরণদ্বারা বেষ্টিত। পৃথিবী যেমন বায়ুদ্বারা শতাধিক মাইল অবধি বেষ্টিত, সৌরমণ্ডলও তদ্রূপ নানাপ্রকারের জ্বলন্ত বায়বীয় পদার্থের দ্বারা মণ্ডিত রহিয়াছে। পৃথিবী সততই সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং সূর্য্যও সর্ব্বদা পৃথিবীকে টানিয়া রাখিতেছে। সূর্য্য নিজের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ইহার দেহের বিশেষ বিশেষ অংশ, অপর অংশগুলি অপেক্ষা, পৃথিবীর নিকটতর হয়, তখন পৃথিবী সেই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী অংশগুলিকে অধিকতর জোরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহার ফলে, সূর্য্যদেহে বায়বীয় পদার্থের জোয়ার, বা স্ফীতি, লক্ষিত হইয়া থাকে। সৌর-দেহের বায়বীয় অংশের এই স্ফীতি আমাদের পৃথিবীর জলভাগের অনুরূপ বলিয়া, উভয়কেই জোয়ার নামে অভিহিত করিলাম। এখন পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন, মাধ্যাকর্ষণের জন্য একমাত্র বায়বীয় ও তরল পদার্থকে বিচলিত হইতে দেখা যায় ; কিন্তু ধরাপৃষ্ঠের কঠিন অংশ কি সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না? বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীতেও মাটির জোয়ার হয়। তবে কি বলিতে হইবে, আমাদের কলিকাতার বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, দোকান, গাড়ীঘোড়া, জীবজন্তু, ট্রেন-ট্রাম্ লইয়া সমস্ত সহরটা সূর্য্যের আকর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠের সহিত একবার উঠিতেছে ও একবার নামিতেছে?—জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন, কতকটা তাহাই বটে ; কিন্তু এই স্থলভাগের স্ফীতি পরিমাণ করিবার যন্ত্র আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে মাটি একবার একটুখানি নড়িয়া উঠিলেই ঘরবাড়ী হুড়দাড় করিয়া ধরাশায়ী হয়, সেই মৃত্তিকা সমগ্র সহর কাঁধে করিয়া, এট্‌লাস্ দৈত্যের মত একবার উঁচু ও নীচু হইতেছে, তাহা ভাবিতেও পারা যায় না! কিন্তু মানুষ যাহা ভাবিতে না পরিয়াছে, তাহাও ভবিষ্যতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, দেখিয়া মনে হয়, বিষয়টা খুব অসম্ভব নয়। চোখ দুটাকে যে খুব বিশ্বাস করা চলে, তাহা নহে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে চাও, তবে তোমার চোখ দুইটাকে মোটেই বিশ্বাস করিয়ো না। কারণ এই চোখই এখনো মানুষকে মরুভূমিতে

সন্ধ্যায় সমুদ্রতটে
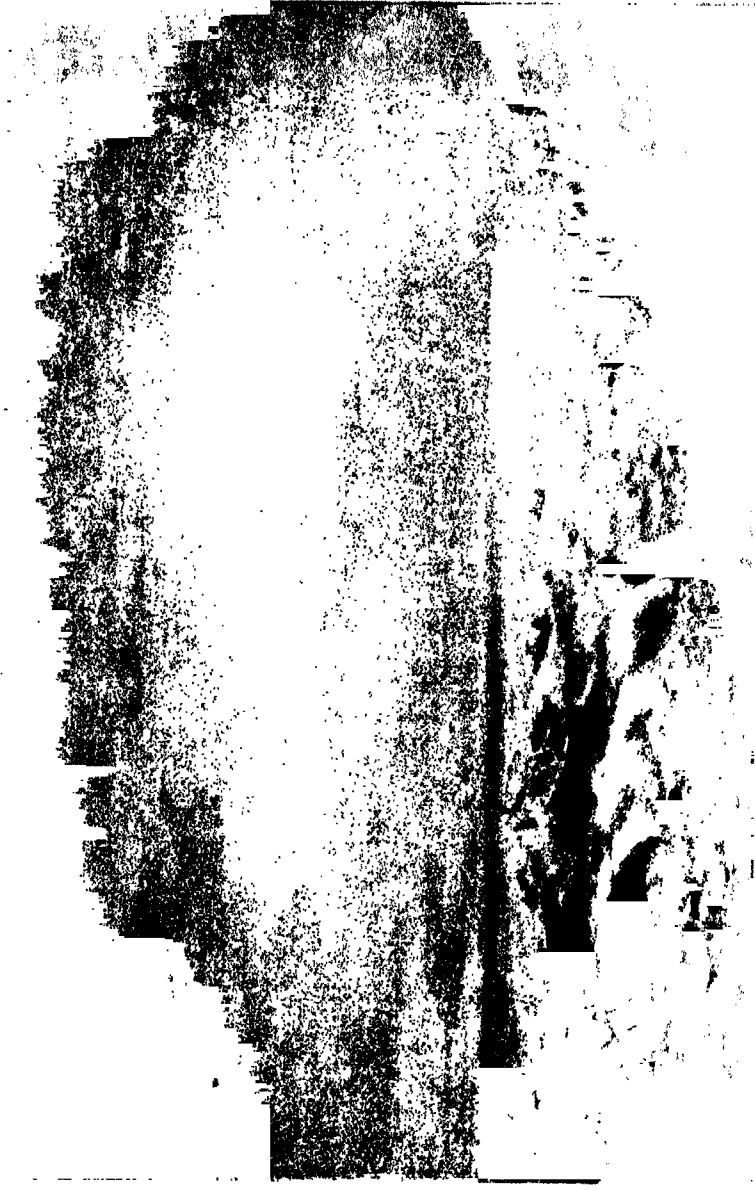
চিত্র-শিল্পী—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ]

মরীচিকা দেখাইয়া ভ্রান্ত করে। একদিন এই চোখদুটাই, আপাতঃ-দৃষ্টিতে সূর্য্যকে আকাশপথ অতিক্রম করিতে দেখিয়া, নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে ঘোষণা করিয়াছিল, সূর্য্যই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং এই চোখদুটার সাহায্যে প্রমাণ পাইয়াই মানুষ একদিন ঘোষণা করিয়াছিল যে, উদ্ভিদ্‌রাজ্য চিরমৌন রহিয়াছে; অতএব তাহারা জড়, প্রাণহীন বস্তু-পিণ্ড। যাহা হউক্, এত প্রমাণ দর্শাইবার পর, চক্ষু দুইটা নিশ্চয়ই তাহাদের অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছে; যদি না করিয়া থাকে, তবে পাঠকপাঠিকাগণ, তাহাদিগকে সোণার ফ্রেম্-ওয়ালা চস্‌মা দিয়া বন্দী করিয়া, তাহাদের অপরাধ চোখে চোখে ধরাইয়া দিন।

সূর্য্যকে, একমাত্র পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া, সম্মান করিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ ক্ষান্ত হন নাই। ইঁহারা বলেন, সমগ্র সবিতৃ-মণ্ডল একমাত্র সূর্য্যালোকদ্বারা এবং সূর্য্যের আকর্ষণীশক্তিদ্বারাই আজ পর্য্যন্ত অবাধে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং, সূর্য্যহীন আকাশ সবিতৃমণ্ডলের ধ্বংসচিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বৈদিকগণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে তড়িৎ শক্তির সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কোথায় আকর্ষণীশক্তি—আর কোথায় তড়িৎপ্রবাহের বেগ; এই উভয় বস্তু কি কখনও তুলনীয় হইতে পারে? যাহাদের মধ্যে একটু না একটু সাম্য আছে অথবা যাহারা সমান ধরণের, তুলনা তাহাদেরই মধ্যে সম্ভব। মাধ্যাকর্ষণকে তড়িৎ-শক্তির সহিত কিরূপে তুলনা করা যাইতে পারে? তড়িৎশক্তি বলিতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপই সহজে মনে আসে; কারণ তড়িৎ-প্রবাহদ্বারা আলো জ্বালাইতে পারা যায় এবং প্রবল উত্তাপেরও সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সৌর কলঙ্কের কৌতূহলজনক বিবরণ এবং সূর্য্যগ্রহণের সময় সৌরজ্যোতিঃ (Solar-flame) সূর্য্যের তড়িৎ-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। সৌর-জ্যোতিঃর অত্যুজ্জ্বল বর্ণ-বিন্যাস এবং সুদীর্ঘ অগ্নিশিখাকারে তাহাদের স্ফীতি সত্যই দেখিতে বিস্ময়কর!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সৌর-কলঙ্ক পৃথিবীতে চৌম্বক-ঝটিকার কারণ। ইহা চুম্বকরাজ্যের উপর দিয়া ভীষণবেগে দৌরাত্ম্য করিয়া যায় বলিয়াই, ইহাকে চৌম্বক-ঝটিকা বলা হইয়াছে। তড়িৎ ও চুম্বকে খুব নিকট সম্বন্ধ। কারণ, তড়িৎ চুম্বকের সৃষ্টি করিতে পারে এবং চুম্বকও তড়িৎবেগের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। একই ঈথর-সমুদ্রে শক্তির নবনব লীলাদ্বারা চৌম্বকশক্তি, তড়িৎ ও তাপালোক উৎপাদিত হইতেছে। সহসা, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বলিয়া বোধ হইলেও, মূলে তাহাদের উৎপত্তিস্থান এক এবং একই শক্তি প্রত্যেকের ভিতর বীজাকারে নিহিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বিশ্বরাজ্যে প্রকাশমান সমগ্র শক্তির মূল-আকর সূর্য্যদেহ, শক্তিরাশিকে এই প্রভাকরই অবিরত দিকে দিকে বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছেন। আমরা সেই শক্তিরাশিকে কখনো মাধ্যাকর্ষণ, কখনো বা আলোকরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিতেছি; কিন্তু মূলে সমস্ত শক্তিই সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইতেছে। সুতরাং, মাধ্যা-কর্ষণ ও সূর্য্যদেহের শক্তির বিশেষ প্রকাশ। বৈজ্ঞানিক-গণ বলেন, সূর্য্য যে কত প্রকারের শক্তি মহাব্যোমে অবিরাম বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছেন, তাহার অন্ত নাই! আমাদের ইন্দ্রিয় ঐ বিরাট্‌শক্তিপুঞ্জের কয়েকটি প্রকাশকে মাত্র প্রকাশিত দেখিতে পাইতেছে। সে চক্ষুদ্বারা একটি পরমাশ্চর্য্য শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হইল; সে শক্তিকে সে "আলোক" নামে অভিহিত করিল। ঐ সৌরশক্তিদ্বারা কত শতসহস্র বর্ণের আলোক উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু আমাদের চক্ষু কেবল বেগুনে, নীল, পীত, সবুজ, হরিদ্রা, গোলাপী ও লাল, এই সাতটি বর্ণকেই দেখিতে পায়। এই সকল ব্যতীত, আরও যে কত বিচিত্র বর্ণালোকের আকাশে সৃষ্টি হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে! শব্দ, চৌম্বক শক্তি, উত্তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদিও তদ্রূপ শক্তির অতি অল্পাংশের প্রকাশ মাত্র। হার্ম্মোনিয়মের প্রত্যেক পর্দ্দা টিপিয়া আমরা 'সা, রে, গা, মা,' ইত্যাদি সপ্তসুরের অধিক সুর বাহির করিতে অক্ষম; কিন্তু এই সপ্তসুরের অধিক সুর কি আর বাতাসে ধ্বনিত হয় না? নিশ্চয়ই হয়; তবে, আমাদের দুর্ব্বল শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল সপ্তসুর ও তাহার সংমিশ্রণজাত সুরনিচয়কে শ্রবণ করিতে পারে। প্রকৃতির বিরাট্ হার্ম্মোনিয়মে ঐ সাতটি পর্দ্দার দুইপাশে অসংখ্য পর্দ্দা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং তাহাতে অবিরত প্রকৃতি রাণীর হাত পড়িতেছে; কিন্তু আমরা হতভাগ্য মানব, দেবতার অভিশপ্ত জীব, কেবল মাত্র ঐ সাতসুরের খেলাই শুনিতে পাই; তাহার দুইপাশে যে কি

বিরাট্ সুরের লীলা চলিতেছে, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত। এই সাতসুরের পর্দ্দার পরেই প্রকৃতি একবার অজ্ঞান-পর্দ্দায় অমাদের ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

যেমন শ্রবণ-শক্তিতে আমরা দুর্ব্বল, দর্শন-শক্তিতেও আমরা তদ্রূপ অক্ষম। সেখানেও সাতটি সুরের ন্যায় সাতটি বর্ণ আমাদের চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ। পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন যে, সূর্য্যের এই শুভ্রালোক—বেগুনে, নীল, পীত, সবুজ, হরিদ্রা, গোলাপী ও লাল এই সপ্তবর্ণের সমষ্টি মাত্র। তাহার প্রমাণ, শুভ্র সূর্য্যালোককে যন্ত্রযোগে বিশ্লিষ্ট করিলে, পর পর সজ্জিত সপ্তবর্ণের এই বর্ণরেখাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। হার্ম্মোনিয়মের সুরের পর্দ্দার মতই এই সাতটি বর্ণ বিশ্লিষ্ট হইয়া, বিস্তৃত রেখা আকারে পর পর একসূত্রে সজ্জিত হইয়া পড়ে। সাতটি সুরের পর পর সজ্জিত যন্ত্রকে যেমন হার্ম্মোনিয়ম্ বলা হয়, সাতটি বর্ণের পরপর সজ্জিত বর্ণরেখাবলীকেও তদ্রূপ 'স্পেক্‌ট্রম্' (Spectrum) বা বর্ণচ্ছত্র বলা হইয়া থাকে। যে যন্ত্র দ্বারা শুভ্রালোকের এই বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়, তাহাকে 'স্পেক্‌ট্রোস্কোপ্' (Spectroscope) বা আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র কহে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, আলোকের বর্ণ কেবলমাত্র এই সপ্তবর্ণেই সমাপ্ত নহে; এই সপ্তবর্ণ বর্ণচ্ছত্রের দুইপাশে বহুবিধ বর্ণের আলোক রেখা-বলী বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু আমাদের চক্ষু-বিশেষ কতকগুলি বর্ণকে গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া, অসংখ্য বর্ণাবলীর মধ্যে কেবল সাতটি বর্ণ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে। আরও যে, কত শতসহস্র বর্ণের নব নব আলোকে গগনমণ্ডল নিত্য জ্যোতিষ্মান্ তাহা আমাদের মানবের কল্পনাতীত। দেবতার অভিশপ্ত মানব, ঐ দুর্লক্ষণা-ক্রান্ত সপ্তসংখ্যায় আসিয়া আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, এ সমস্ত শক্তিরই আদিস্থল সূর্য্য-দেহ। তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা সূর্য্যের প্রচণ্ড শক্তির কণা-পরিমাণ শক্তিও প্রত্যক্ষ, বা অনুভব, করিতে পারিতেছি না। অনন্ত-আকাশপথে বিকীর্ণ সূর্য্যালোকের সম্মুখে, পৃথিবী, একটি সরিষার ন্যায় অবস্থান করিয়া, আলোকগ্রহণ করিতেছে; কিন্তু সে আলোক কতটুকু? বিরাট্ অগ্নিকুণ্ডের নিকট একটি চঞ্চল ভাসমান্ ধূলিকণা যে পরিমাণ আলোক গ্রহণ করিতে পারে, পৃথিবী সূর্য্য-বিচ্ছুরিত আলোক হইতে তাহারও অল্প আলোক গ্রহণ করিতেছে! সেই আলোকেই আমাদের দিনের সৃষ্টি করিতেছে, এবং সেই সামান্য আলোক যতটুকু উত্তাপ বহন করিয়া আনিতে পারে, ততটুকু উত্তাপদ্বারা পৃথিবীর নদী ও সমুদ্র হইতে বিরাট্ বারিরাশি মুহূর্ত্তের মধ্যে বাষ্পাকারে আকাশে মেঘ হইয়া উঠিতেছে, এবং সেই উত্তাপেই ঝড় জন্মিতেছে, নদী ও সমুদ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে এবং দ্বিপ্রহরে মানুষ সেই উত্তাপেই অতিষ্ঠ হইয়া কহিতেছে, —"উঃ কি উত্তাপ!" এই উত্তাপেই বৈজ্ঞানিকগণ থার্ম্মো-মিটার দিয়া পরিমাপ করিতেছেন এবং বীক্ষণাগারে বসিয়া নব নব তথ্যের কথা বলিতেছেন; কিন্তু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে ত আমরা বাঁচিতামই না! কোনও থার্ম্মোমিটার দিয়াই সূর্য্য-দেহের সে দারুণ উত্তাপ পরিমাপ করা যায় না।

সূর্য্যের আলোককে যন্ত্রযোগে বিশ্লিষ্ট করিবার পর, সপ্তবর্ণ যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া গিয়াছে, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—এই সপ্তবর্ণের রেখাবলীর দুই পার্শ্বে গণনাতীত বর্ণরেখা-মালা স্ব স্ব বিচিত্র বর্ণ লইয়া বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মানুষের চক্ষুব্যতীত কি আর কিছু দিয়াই ঐ অদৃশ্য বর্ণমালার অস্তিত্ব ধরা পড়ে নাই?—অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে বটে; কিন্তু তাহাদ্বারা বলিয়া দিতে পারা যায় না যে, তাহাদের বর্ণ কিরূপ! যে দ্রব্যটি একবার দর্শন করিয়াছি, আমরা সেই বস্তুটির একটা নাম দিয়াছি। ঐ নাম বলিবামাত্র, আমাদের মনে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুটির ছবি ভাসিয়া উঠে; কিন্তু যে জিনিষ কোনও কালে দেখি নাই, কেমন করিয়া তাহার নামকরণ করিব? সুতরাং বর্ণচ্ছত্রের দুই পার্শ্বে যেসকল বর্ণের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের কেহ কখনও দেখে নাই। চক্ষুব্যতীত আমাদের অপরাপর ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেইজন্য বর্ণচ্ছত্রের বামপার্শ্বের সীমান্ত প্রদেশস্থিত বেগুনে বর্ণের পরবর্ত্তী অদৃশ্য বর্ণসকলকে ULTRA-VIOLET RAYS এবং দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সীমান্তবর্ত্তী লালবর্ণের পরবর্ত্তী অদৃশ্য বর্ণাবলীকে INFRA-RED RAYS নামে কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ শুনা গিয়াছে যে—যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ প্রখর, বেগুনে ও লালবর্ণের সীমানা অতিক্রম করিয়াও যে সকল অদৃশ্য বর্ণ বর্ত্তমান আছে, তাহারা সেগুলির দুই একটি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ULTRA-VIOLET-

RAYS-গুলি, চক্ষুর রেটিনা (Retina) নামক দৃষ্টবস্তুর প্রতিকৃতি গঠনকারী পর্দ্দাটিকে, উত্তেজিত করিতে না পারিলেও, Retina হইতে অধিক সূক্ষ্ম এবং সম্পূর্ণ যন্ত্রের উপর তাহাদের কার্য্য দেখা যায়। পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে, চক্ষুর Retina অপেক্ষা ফটোগ্রাফের প্লেট, স্বল্প উত্তেজনাতেই সাড়া দিয়া থাকে; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা আমরা যেসকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, ফটোগ্রাফের প্লেটে অনায়াসে সেগুলির প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইতে দেখা যায়। যেমন, মনে করা যাউক, বন্দুকের চলন্ত গুলি;—আওয়াজ্ করিবার পরই, বন্দুক হইতে নির্গত গুলিটিকে কেহ দেখিতে পায় না—কারণ, গুলিটি এত দ্রুত-গতিতে বাহির হইয়া পড়ে যে, আমাদের চক্ষু তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু ফটোগ্রাফার অনায়াসে প্লেটের উপর ঐ চলন্ত গুলির ফটো তুলিয়া দিতে পারে। চলন্ত টেনিস্ বলের প্রতিকৃতি—প্রবল গতিতে ধাববান্ অশ্বের প্রতিকৃতি গ্রহণ সহজ; কিন্তু চলন্ত বন্দুকের গুলির প্রতিকৃতি লওয়া সত্যই কঠিন ব্যাপার! Ultra-Violet Rays গুলি ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদের চক্ষু, বেগুনী বর্ণের পরবর্ত্তীস্থলে অন্ধকার দেখিলেও, সেস্থানে যে সত্যই অদৃশ্য আলোক-রশ্মি আছে, তাহা ফটোগ্রাফের প্লেটের দ্বারাই ধরা পড়ে।

বর্ণচ্ছত্রের দ্বারা কিরূপে নক্ষত্র ও সূর্য্য-দেহের গঠনোপাদান নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহা বোধ হয়, অনেকে জ্ঞাত আছেন। বর্ণচ্ছত্র যে একমাত্র শুভ্র সূর্য্যালোককেই বিশ্লিষ্ট করিলে পাওয়া যায়, তাহা নহে; যে কোন জ্বলন্ত জিনিষকে আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিলে, জিনিষটি বিচিত্র বর্ণের একটি অথবা বহু সরলরেখা-সমন্বিত বর্ণচ্ছত্র বা Spectrum প্রদান করিয়া থাকে। যেমন সোডিয়াম্ নামক ধাতু-পদার্থকে দগ্ধ করিলে, স্বর্ণ-হরিতাভ একটি মাত্র উজ্জ্বল রেখা পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন্ নামক মূলপদার্থ দগ্ধ করিলে, ঐরূপ পাঁচটি উজ্জ্বল বর্ণের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাই হইতেছে, হাইড্রোজেনের বর্ণচ্ছত্র। পোটোসিয়ম্ নামক ধাতুর তদ্রূপ সাতটি উজ্জ্বল রেখাযুক্ত বর্ণচ্ছত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র বিচ্ছেদহীন-ভাবে পর পর সাতটি বর্ণরেখা দ্বারা গঠিত নহে। তাহারা পর পর সজ্জিত হইলেও, সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র অনেকগুলি কৃষ্ণরেখাদ্বারা খণ্ডিত আছে; মোটামুটি ৫৭৫টি ঐরূপ কৃষ্ণ রেখা যন্ত্রদ্বারা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি, অনুসন্ধান করিতে গিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—সূর্য্যমণ্ডলে অর্থাৎ সূর্য্যের বহিরাবরণে অল্প উত্তাপে, এবং সূর্য্যদেহে প্রবল উত্তাপে, যেসকল ধাতু পদার্থ দগ্ধ হইতেছে, একমাত্র তাহাদেরই দহনজাত বর্ণচ্ছত্র সৌর বর্ণচ্ছত্রে (Solar Spectrum) খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং, তাহারা সৌরবর্ণচ্ছত্রের যে সকল নির্দ্দিষ্ট অংশে রেখাপাত করিত, সেসকল অংশ অনুজ্জ্বল অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ফলতঃ, সৌর বর্ণচ্ছত্রে যতগুলি কৃষ্ণরেখা (Dark Line) দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য্যদেহে ততগুলি মূলপদার্থ দগ্ধ হইতেছে বলিলে, ভুল বলা হয় না। সৌরবর্ণচ্ছত্রে মোট ৫৭৫টি কৃষ্ণরেখা দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত আকাশের অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আরও শত শত কৃষ্ণরেখার অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি, সূর্য্যদেহে ৫৭৫টি ধাতু-পদার্থ দগ্ধ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত যে সাতটি উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাই, তাহা সাতপ্রকারের আলোকের বর্ণ। কোন মতেই কি ঐ ৫৭৫টি ধাতু পদার্থ কি, তাহা জানিতে পারা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। পৃথিবীতে নানাধাতু দগ্ধ করিয়া, যেসকল বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, সেগুলির সহিত কৃষ্ণরেখা-খণ্ডিত সৌরবর্ণচ্ছত্রের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তথাকার কৃষ্ণরেখাগুলি সৌরবর্ণচ্ছত্রের যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, অপর অপর ধাতুর বর্ণচ্ছত্রের ঠিক্ ঐসকল অংশে উজ্জ্বল রেখাপাত দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং, সৌরবর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণ অংশে কোন্ ধাতুটির বর্ণচ্ছত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। হাইড্রোজেন্, সোডিয়ম ও পোটাসিয়ম্ ধাতুগুলি, সৌরবর্ণচ্ছত্রের ঠিক্ কৃষ্ণরেখাগুলির বিশেষ বিশেষ অংশে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া থাকে। সুতরাং, ইহা হইতে সহজেই বলা যাইতে পারে যে, সূর্য্যদেহে, হাইড্রোজেন্, সোডিয়ম্ ও পোটাসিয়ম দগ্ধাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা সূর্য্য-দেহে নানা মূল-পদার্থের দাহন প্রত্যক্ষ করিতে পারা গিয়াছে। সমস্ত কৃষ্ণরেখারই যে সমাধান হইয়াছে, তাহা নহে। তবে অধিকাংশ কৃষ্ণরেখার স্থানে পৃথিবীর

নানাধাতুর বর্ণচ্ছত্রে উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, সূর্য্যে যে সকল পদার্থ জ্বলিতেছে, পৃথিবীতেও প্রায় সেগুলি সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং পৃথিবী এককালে সূর্য্যেরই একটি অংশ ছিল। কোনও নৈসর্গিক কারণে ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির নিমিত্ত (Centrifugal) তাহা এক কালে সূর্য্যদেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া আসিয়াছিল। ইহা কেবল অনুমান নহে। বর্ণচ্ছত্রের এই প্রমাণব্যতীত, জ্যোতিষিগণ আরও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বর্ণচ্ছত্রই অন্যতম। কিন্তু সূর্য্যে যেসকল ধাতু-পদার্থ জ্বলিতেছে, পৃথিবীতে তাহাদের সব গুলিরই অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। সুতরাং, সৌরবর্ণচ্ছত্রের কতকগুলি কৃষ্ণরেখার সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই বর্ণচ্ছত্রদ্বারা কেবলমাত্র সূর্য্যে যে কি কি মূল পদার্থ দগ্ধ হইতেছে, তাহাই জানা যায়, তাহা নহে। নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্র হইতে নক্ষত্র কি কি পদার্থ দ্বারা গঠিত, তাহাও বলিয়া দিতে পারা যায়। সূর্য্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া, নক্ষত্রের কথা আলোচনা অবান্তর-বোধে ক্ষান্ত হইলাম।

সূর্য্যের আয়তন ও গুরুত্ব, এবং পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব, জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল আছে। সকলের কৌতূহল আছে বলিয়াই, এবিষয়ে নানা অদ্ভুত এবং অসম্ভব কথা প্রচলিত আছে। সেগুলি বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া ভিত্তিহীন। আমরা বিজ্ঞানবাদিগণের মত কি, তাহাই জানিতে চেষ্টা করিব।

সূর্য্যকে একটি গোলাকার অগ্নি ও জ্বলন্ত ধাতু-পিণ্ড বলিয়া মানিয়া লইলে, বলিতে হয়, উহার ব্যাস্ আট কোটী পঁয়ষট্টি লক্ষ মাইল। সূর্য্যের সহিত পৃথিবী, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি গ্রহগণের আয়তনের তুলনা-মূলক প্রতিকৃতি, পাঠকপাঠিকাগণ পাঠ্যপুস্তকে এবং মানচিত্রে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; কিন্তু ইহার বস্তু-পরিমাণ কত? ("আয়তন" বা "আকার" এবং "বস্তু-পরিমাণ" আমি ইংরেজী Size বা Volume এবং Mass এর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেছি। এইদুইটি যে পৃথক্, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।) সূর্য্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শতধা করিলেও, তাহার এক একটি খণ্ড, আকারে পৃথিবীর আকার হইতে যথেষ্ট অধিক হইবে; কিন্তু তাহার বস্তু-পরিমাণ (Mass) পৃথিবীর বস্তু-পরিমাণ হইতে কম হইবে। এখানে বুঝা গেল, বস্তু-পরিমাণ ও আকারে পার্থক্য কোথায়। আর একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে;—এক বস্তা তুলা ও এক বস্তা চাউল, আকার বা আয়তনে সমান হইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তু-পরিমাণে তুলা অপেক্ষা চাউল শ্রেষ্ঠ। পাঠকগণ বলিতে পারেন, সোজা কথাটা অত প্যাঁচাইয়া লিখিবার দরকার কি? বস্তু-পরিমাণ আর বস্তুর গুরুত্ব বা "ভার" ত একই। সুতরাং "বস্তু-পরিমাণের" পরিবর্ত্তে "বস্তু-ভার" লিখিলেই ত চলে। এই রূপ সিদ্ধান্তে যদি পাঠকগণ উপনীত হন, তবে তাঁহারা ভুল করিবেন। কারণ বস্তুর "গুরুত্ব" বা "বস্তুভার" একমাত্র (Gravitation) মাধ্যাকর্ষণের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি কোনওক্রমে মাধ্যাকর্ষণকে লোপ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কোনও জিনিষেরই ভার থাকিবে না—সে লোহাই হউক, আর তুলাই হউক; সব জিনিষই তখন সমানভাবেই ভারহীন বলিয়া বোধ হইবে। তথাপি জিনিষের "বস্তু-পরিমাণ" অবিচলিত থাকে। এক ফুট্ চৌকা (One square foot) লোহায় যে পরিমাণ লোহা বর্ত্তমান থাকে, এবং এক ফুট চৌকা (One square foot) কাঠে যে পরিমাণ কাষ্ঠ বর্ত্তমান থাকে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বিলুপ্ত হইলে তাহাদের গুরুত্ব বা ভার লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাদের বস্তু-পরিমাণ বরাবর সমান থাকিয়াই যায়। সূর্য্য, পৃথিবী হইতে আকারে বা আয়তনে কোটী গুণ হইলেও, ইহার বস্তু-পরিমাণ বা (MASS) পৃথিবী হইতে তিন কোটী গুণের অধিক হইবে না। সুতরাং, পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন, পৃথিবী হইতে সূর্য্য আয়তনে কত বৃহৎ এবং ওজনে কি পরিমাণ গুরুতর।

Density বা ঘনতা, বস্তুর আকার ও বস্তু-পরিমাণের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহাকেই বুঝাইয়া দেয়। কোনও জিনিষকে একটি নির্দ্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে যতবেশী ধরাণো যায়, জিনিষটির ঘনতাও তত বেশী বাড়িতে থাকে। চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এবং এক বায়ু মণ্ডলের চাপে, জল যে পরিমাণ ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে ঘনতা মাপিবার গজকাটি (Standard) স্বরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। জলকে ঘনত্ব মাপিবার গজকাটিরূপে ধরিলে, এই জল-

স্থলময়ী ধরণীর ঘনতা সাড়ে পাঁচ হইতে দেখা গিয়াছে ;— অর্থাৎ পৃথিবীর আকারের গোলাকৃতি জলপিণ্ড এবং এই জলস্থলময়ী পৃথিবীকে ওজন করিলে, ঐ আকারের জলের ওজন অপেক্ষা সাড়ে পাঁচগুণ হইবে। এই অনুপাতে সূর্য্যের ঘনতা বা (Density) মাত্র ১·৪, অর্থাৎ পৃথিবীর ওজন ১ মণ হইলে সূর্য্যের ওজন ১·৪ মণ হইবে। তাহা হইলে দেখা গেল যে, সূর্য্য অপেক্ষা পৃথিবী চারগুণ (৪·১) ভারী ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সূর্য্যের ঘনতা বাহির হইতে ভিতরের অংশে অধিক। কারণ, সূর্য্যের বহিরাবরণ কেবল অতি লঘু বাষ্পদ্বারা গঠিত। এই নিমিত্ত সূর্য্যমণ্ডলের ঘনতা খুব অল্প, অথচ ইহার অন্তর্বর্ত্তী অংশ ঘনতায় অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বলিখিত সূর্য্যদেহের ঘনতা-নির্দ্ধারণ-কালে আমরা সূর্য্যের বহিরাবরণ এবং অন্তর্বর্ত্তী সমগ্র অংশ লইয়াই হিসাব করিয়াছি।

সূর্য্যদেহের কেন্দ্রস্থলে গলিত ধাতুপিণ্ড এবং উত্তপ্ত বাষ্পরাশি প্রবল উত্তাপে অনবরত দগ্ধ হইতেছে। এই উত্তাপের পরিমাণ এত অধিক যে, তাহা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত করিলে সকলে হাসিবেন। সুতরাং, পাঠক-পাঠিকাগণ যতসম্ভব অধিক উত্তাপ কল্পনা করিতে পারেন, সে কল্পনা ততদূর সূর্য্যোত্তাপের নিকটবর্ত্তী হইবে। বৈজ্ঞানিকগণের মুখে এইরূপ শুনা যায়, মহামতি, পাণ্ডিত্যের আধার এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের নেতা নিউটন্ একবার এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন যে, সূর্য্য জীবের বাসোপযোগী হইতে পারে। ঘটনা কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু নিউটনের ন্যায় জ্ঞানী এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।

সম্প্রতি বর্ণচ্ছত্রের আবিষ্কারদ্বারা সূর্য্যসম্বন্ধে নব নব তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সূর্য্যের উত্তাপ সর্ব্বত্র সমান নহে ; সূর্য্যের নানা-স্থানে উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই হ্রাসবৃদ্ধি, সৌরমণ্ডলের বাষ্পোচ্ছ্বাস, কম্পন ইত্যাদি নানা নৈসর্গিক কারণের উপর নির্ভর করে। একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যদেহের উত্তাপের মাত্রা (সেন্টি-গ্রেডের) ত্রিশ সহস্র ডিগ্রী হইতে নয় হাজার ডিগ্রী-পর্য্যন্ত হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ নানাস্থানে উত্তাপের মাত্রা নানারূপ। পাঠকপাঠিকাগণ উক্ত উত্তাপের সংখ্যা হইতে কল্পনা করিতে পারেন, সূর্য্যদেহ কিরূপ উত্তপ্ত। অপর একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া সূর্য্য-দেহের যে পরিমাণ তাপ-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা হইতে সহস্র গুণ অধিক। সুতরাং, পাঠকগণ বুঝিয়া লউন, কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য, এবং কোন্‌টি বা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। যাহা হউক, বিজ্ঞানরথীগণের "নানান্ মুনির নানান্ মত।" আমাদের এই জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সূর্য্যের তাপের মাত্রা এত অধিক যে, জীবদেহের গঠনের জন্য যেসকল ধাতু-পদার্থ একত্র মিলিয়া থাকে, ঐ প্রবল তাপে তাহারা কখনও যৌগিকরূপে (Compound) অবস্থান করিতে পারে না। এমন কি, অতিসাধারণ এবং বহুক্ষণস্থায়ী জল, লবণ, কার্বনিক্ এসিড্ প্রভৃতিও তথায় তিষ্ঠিতে পারে না ;—এত অধিক উত্তাপ! তথায় জল লইয়া যাইলেই, তাহা তৎক্ষণাৎ দুই পরমাণু হাইড্রোজেন্ ও এক পরমাণু অক্সিজেনে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ লবণ (Sodium-Chloride) তথায় এক পরমাণু সোডিয়ম্ ও এক পরমাণু ক্লোরিনে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং, সূর্য্যে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা একাধিক মূলপদার্থ দ্বারা গঠিত। পৃথিবীতে Chemistry, বা রসায়ন শাস্ত্রটা, ঐ যৌগিক পদার্থের বাহুল্যে পরিপূর্ণ। এখানে যত ধাতুপদার্থ আছে, তাহাদের পরস্পর সংমিশ্রণে তাহার তিন চারিগুণ যৌগিক (Compounds) পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে ; কিন্তু সূর্য্যের রাজ্যে সবই ধাতুপদার্থ। সেখানকার Chemistry বা রসায়নশাস্ত্র কেবলমাত্র মূলপদার্থের। সূর্য্য বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া যে তাপ বিকীরণ করিতেছে, তজ্জন্য কি তাপের একটুও হ্রাস হয় নাই ?—বৈজ্ঞানিকগণ আজও সূর্য্যের উত্তাপের বিন্দুমাত্রও হ্রাস দেখিতে পান নাই। বহুযুগ পূর্ব্বে সূর্য্য যেমন তেজস্বী এবং তাপবান্ ছিল, আজও ঠিক তেমনি তাপবান্ ও তেজোময় রহিয়াছে। একটা জিনিস কখনও অবিনশ্বর হয় না, ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্তির পর তাহা বিকৃত হইয়া যায়। আগুন জ্বালাইলে যে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা আগুন নিবিবার সঙ্গেসঙ্গেই লোপ পায় ; কিন্তু সূর্য্যে এমন কি আলোক জ্বলিতেছে, যাহার তেজঃ সহস্র সহস্র বৎসরেও একটুও ম্লান হইল না! সূর্য্যভাণ্ডারে এই অক্ষয়

জ্যোতিঃ কোথা হইতে আসিল? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করিলে, আমাদের এই প্রবন্ধ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে; সুতরাং অদ্য সে আলোচনা স্থগিদ রাখিলাম।—আমাদের সহজবুদ্ধিদ্বারা সূর্য্য-উত্তাপের কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, দেখা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সূর্য্যে কোন মূল পদার্থ অপর মূল-পদার্থের সহিত যুক্তাবস্থায় থাকিতেই পারে না; কারণ, তথাকার উত্তাপ এত অধিক যে, তাহারা মিলিত হইবার পূর্ব্বেই প্রবল উত্তাপ তাহাদের পরস্পরকে বিযুক্ত করিয়া দেয়। সুতরাং, তথায় কোনও জিনিষ দগ্ধ হইতেই পায় না। কারণ, দহন-ব্যাপারটি অক্সিজেনের সহিত দাহ্যপদার্থের রাসায়নিক মিলনব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু সূর্য্যে যখন রাসায়নিক মিলনই অসম্ভব, তখন আর দাহন হইবে কিরূপে? সুতরাং, সূর্য্যকে একটি জ্বলন্ত অগ্নিগোলক বলিলে, ভুল হইবে; জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কি বলিয়া ব্যক্ত করিব? যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, মনে রাখিবেন যে, সূর্য্যের আলোক-দহন-জাত আলোক নহে। কারণ, পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, তথায় দহনই অসম্ভব। সুতরাং, আমরা জানিতে পরিলাম, সূর্য্যের তেজের কারণ, ধাতু ও বাষ্পরাশির দহন নহে; অপর কোনও কারণ আছে।

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব লইয়াও নানা মুনির নানা মত আছে। আমরা সকলেই জানি যে, সূর্য্যকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে। যে পথে পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সে পথ ঠিক বৃত্তাকার নহে; পরন্তু কতকটা ডিম্বরেথাকার। সুতরাং, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব বৎসরের সকল সময়েই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের হিসাবেই বর্ষা, শরৎ, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ইত্যাদি ছয় ঋতুর সৃষ্টি। পৃথিবী যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন গ্রীষ্মকাল; কারণ, সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, পৃথিবী সূর্য্যদেহ হইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপ ও আলোক গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ পৃথিবী যখন সূর্য্য হইতে দূরে সরিয়া যায়, তখন সূর্য্যের তাপ ভাল করিয়া পৃথিবীতে লাগিতে পারে না; সুতরাং, তখন শীতকালের প্রাদুর্ভাব হয়। এইরূপে পৃথিবী ও সূর্য্যের দূরত্বের অনবরতই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমরা কোন্ দূরত্বটাকে "সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব" বলিতেছি, তাহা নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর এই নিত্য-পরিবর্ত্তিত দূরত্বের হিসাব দ্বারা গড়পড়তায় (average) যে দূরত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নয়কোটী একত্রিশ লক্ষ মাইল। সূর্য্যের ওজন ও আকার বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

সূর্য্যের ব্যাস আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার তিনশত মাইল এবং ইহার বস্তু-পরিমাণ বা MASS, পৃথিবী হইতে ৩,৩৪,৫০০ গুণ অধিক। পৃথিবী স্বীয় অক্ষরেখার চতুষ্পার্শে যেমন একদিন, বা চব্বিশঘণ্টায়, একবার প্রদক্ষিণ শেষ করে, সূর্য্যও তদ্রূপ নিজের চতুষ্পার্শ্বে লাটিমের ন্যায় একবার প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া আসিতে পঁচিশ দিন, অথবা ছয়শত ঘণ্টা যাপন করিয়া থাকে। সুতরাং, সূর্য্যের একদিন, আমাদের পঁচিশ দিনের সমান। সূর্য্যসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির মধ্যে, এই গুলিই বিশেষ আবশ্যক।

সমগ্র সবিতৃমণ্ডলের রাজা সবিতার বিষয়ে আমরা যেসকল তথ্য-সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আজ তাহাই পাঠকসমাজে উপস্থিত করিলাম। এই গ্রহ-রাজ—সমগ্র বিশ্ব-রাজ—ভাস্করকে বৈজ্ঞানিকগণ যেদিন আপনাদের নব-প্রতিষ্ঠিত বেদিকাতে আহ্বান করিয়া, তাঁহার ঘরের কথা জানিতে পারিবেন, সেইদিনই বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ ধন্য হইবে। এই অবিনশ্বর, অজ্ঞাত, রহস্যময়, অক্ষয় সৌর জ্যোতিঃকে বন্দনা করিয়া, আমাদের আর্য্য ঋষিগণ যে স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজও বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠে ধ্বনিত। ভক্তবৃন্দের নিত্যবন্দিত, বৈজ্ঞানিক-গণের গবেষণা-কেন্দ্র, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা সবিতাকে আমরাও বন্দনা করিয়া, আজ প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]
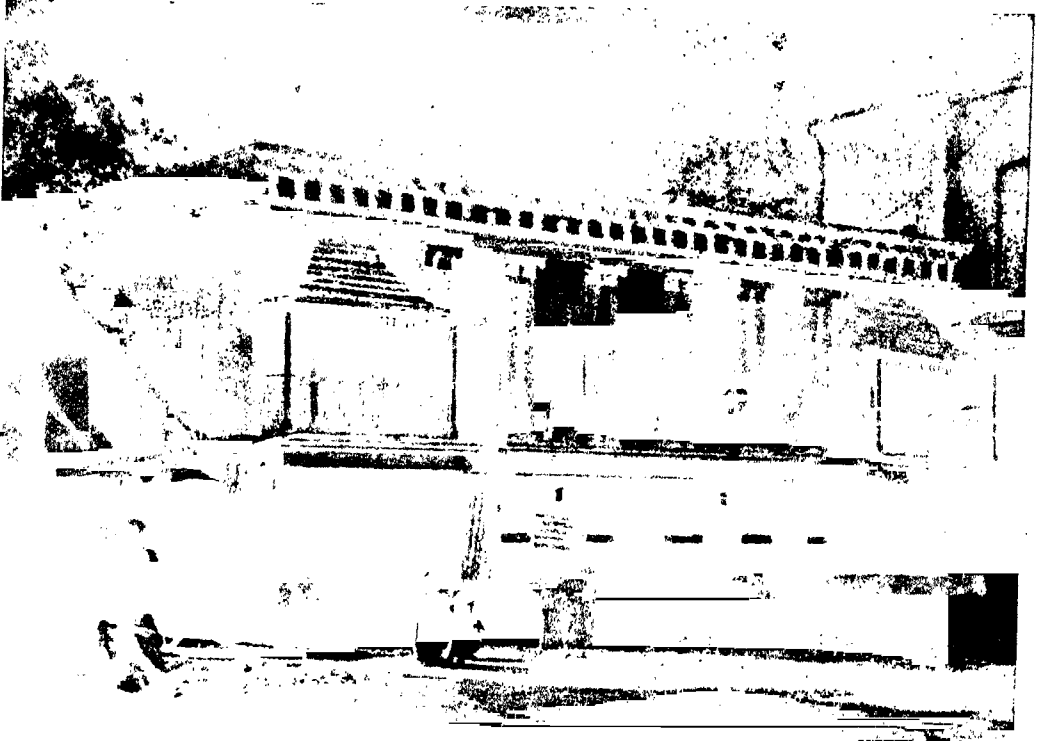
মধুসূদনের পৈতৃক বাসভবন—খিদিরপুর

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মধুসূদন, কলিকাতায় পুনঃপদার্পণ করিয়াই, সর্ব্বাগ্রে খিদিরপুরের পৈতৃক বাস-ভবন-সন্দর্শনে গমন করেন। তথায় গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার কোমলহৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন,—তাঁহার কৈশোরের বিমল সুখস্মৃতিরাশি-বিজড়িত আবাস ঘোর-বিষাদ-তমসাবৃত!—নয়নতারা-হারা, বিহ্বলা, উন্মাদিনী জননী জাহ্নবী বহুপূর্ব্বেই স্বর্গগতা!—বিরহবিধুর পিতৃদেব রাজনারায়ণও নাই! তৃতীয়া বিমাতা হরকামিনী যৌবন-মধ্যাহ্নেই বৈধব্যতাপে মৃতকল্পা!—মাতার রত্নালঙ্কারাদি পরহস্তগত!—পৈতৃক বিভব সমুদায় অন্যের ভোগায়ত্ত! এই প্রতিকূল অবস্থানিচয় দর্শনে তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে, চিন্তাবিষাদক্লিষ্ট মুখে, শোক-মুহ্যমান হৃদয়ে, আবাল্য-সুহৃৎ সহৃদয় গৌরদাস বসাকের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

সুদীর্ঘ প্রবাসপ্রত্যাগত বন্ধুর বিষাদ-বিবরণ অবগত হইয়া, গৌরদাস উহার প্রশমনের উদ্দেশ্যে সেই দিনই এক সান্ধ্য প্রীতিভোজের আয়োজন করিলেন। সেই ভোজে মধুসূদনের শুভানুধ্যায়ী বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ—স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা দিগম্বর মিত্র, পুলিশম্যাজিষ্ট্রেট্‌ কিশোরীচাঁদ মিত্র-প্রমুখ—অনেকেই সাহ্লাদে ও সোৎসুকে যোগদান করিলেন, এবং সকলেই সেই অমায়িক মধুরপ্রকৃতি মিত্রবরের বিষাদ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হৃদয়ভার-লাঘবে যথাসাধ্য কৃতযত্ন হইলেন।

কলিকাতায় আসিয়া, তিনি প্রথমে কিছুদিন রেভারেণ্ড

কৃষ্ণবন্দ্যোর অতিথিরূপে 'বিশপস্ কলেজে' বাস করেন। পরে, গৌরদাসের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

অতঃপর, মধুসূদনকে কলিকাতায় স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, এই সকল কৃতী বন্ধুবান্ধব, তাঁহাকে কিশোরীচাঁদের অধীনে, কলিকাতা পুলিশ আদালতের হেড্‌ক্লার্কের পদগ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন; মধুসূদন সে উপরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তবে, এইপদে স্থায়িভাবে অধিকদিন তাঁহাকে থাকিতে হয় নাই।* কর্ম্মসূত্রে অধীন কর্ম্মচারিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিলেও

৺কিশোরীচাঁদ মিত্র

সুহৃৎ কিশোরীচাঁদ তাঁহাকে অনুজের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বন্ধুত্ব ভিন্ন, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিবার অন্যতম সূত্র এই যে, খিদিরপুরে মধুসূদনের পৈতৃক নিবাসের অদূরেই কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণীর জ্যেষ্ঠতাত ৺রামধন ঘোষ (তৎকালীন কলিকাতার কালেক্টর) মহাশয়ের বাসভবন ছিল; প্রতিবেশী উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায়, কিশোরীচাঁদের পত্নী মধুসূদনকে 'দাদা' বলিতেন। মধুসূদনও চিরদিনই তাঁহাকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

পুলিশকোর্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরে, মধুসূদন, কিশোরীচাঁদের একান্ত আগ্রহে তাঁহার পাইকপাড়াস্থিত ১নং দমদম্ রোডের উদ্যানবাটিকায় তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান করেন। একত্রে অবস্থানকালে, অবকাশ পাইলেই উভয়ের মধ্যে নানাবিধ আলোচনা হইত। কিশোরীচাঁদের রোজ-নাম্‌চায় একদিনের কথা এইরূপ লিখিত আছে:—

"20th July, 1856—Mr. M. S. Dutt gave me the following song;—

"When I was a young 'nd gay recruit
Just landed at Madáras;
I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass.

---

* এই প্রসঙ্গে ৺কিশোরীলাল হালদার মহাশয় বলিয়াছেন—

"As regards pecuniary circumstances, Mr. Dutt was no better off in Bengal than in Madras. A poet, like a prophet, is not honoured in his own country. Although Mr. Dutt came back to Bengal with reputation as a good poet and an able Journalist, it was some petty appointments that were raserved for him in his own country. On his return from the Madras Presidency in 1856, we find him employed first as Clerk, and afterwards as Interpretor, to Babu Kissory Chand Mitter, then Junior Police Magistrate of Calcutta. Such was the appointment that was thought fit for a man who could write a poem like Byron or Scott and edit a paper in English with acknowledged ability and success. His was the case of a man of undoubted merit, with no influential patron to appreciate it. At the same time some of his contemporaries, with not even an one-tenth part of his talents and abilities, were basking in the sunshine of official favour and patronage. But there is no remedy, it is the curse of service; preferment goes by letter and affection." —*The National Magazine, May 1892.*

—এই কেরাণী-পদের বেতন ছিল—মাসিক ১২০৲ টাকা। ৺দ্বারকানাথ মিত্র (যিনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের 'জজ্' হইয়াছিলেন) এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই পদত্যাগ করিলে, মধুসূদন তৎস্থলে নিযুক্ত হয়েন।

I roved about from place to place
Until I found my Mathonia ;
Oh ! What a charming girl she was,
With her 'Thannania'."

রহস্যচ্ছলে—তরলোচ্ছ্বাসে রচিত হইলেও এই গীতে আমরা মধুসূদনের মান্দ্রাজ-প্রবাস-সূচনায় যুবজনসম্ভব উচ্ছৃঙ্খলতার কতক আভাস পাই।

কিশোরীচাঁদের এই উদ্যান-বাটিকা সাহিত্য-চর্চ্চার একটি কেন্দ্র—সুহৃৎ-সম্মিলনের একটি প্রীতি-নিকুঞ্জ-স্বরূপ ছিল। দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রায়ই এখানে বসবাস করিতেন; প্রত্যহ সায়াহ্নে অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ অনেকেই আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় প্রতি শনি-রবিবার প্রীতি-ভোজানুষ্ঠানজনিত আনন্দোৎসবে সে বিজন-বাগ মুখরিত হইয়া উঠিত!—সেকালে সুধী-সম্ভ্রান্ত জনগণের এইরূপ একটা সাপ্তাহিক—দৈনিক—সম্মিলনের নির্দ্দিষ্টকেন্দ্র ছিল; গল্পগুজব—সংবাদ-বিনিময়—সাহিত্যচর্চ্চা প্রভৃতি বিবিধ বিশেষ প্রয়োজনীয় নানাবিষয় এইক্ষেত্রে আলোচিত হইত; ফলে, তখনকার লোকের মধ্যে একটা আন্তরিকতা—একটা জীবনীশক্তির প্রভাব পরিদৃষ্ট হইত। নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে ৺জয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটী—বাগ্‌বাজারে বসুদের বাটী—ভবানীপুরে ৺দ্বারকানাথ মিত্রের বাটী—খিদিরপুরে ৺যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাটী প্রভৃতি নানাঅঞ্চলে, নানাকেন্দ্রে নিত্য এইরূপ সুহৃৎ-সম্মিলন হইত; সে সম্মিলনে কতপ্রকার ভাবের আদান-প্রদান চলিত! একটা অস্থির উজ্জ্বল জীবনীশক্তি-প্রভাবে সে-কালের সমাজ সমুদ্দীপ্ত ছিল—অবস্থা-নির্ব্বিচারে সুহৃৎ-প্রীতি সে সময়ে সুলভ ছিল! সে জীবনী-লক্ষণ—সে ঐক্যলিপ্সা—সে ঐকান্তিক সহৃদয়তা—সে গভীর প্রীতি-প্রবণতা এখন বিলুপ্ত—চিরতরে তিরোহিত!

কিশোরীচাঁদের সেই সুবিস্তৃত নয়নমনোরঞ্জন বিবিধ বিচিত্র চারুপুষ্পপত্রশোভিত তরুলতারাজি সুশোভিত উদ্যানবাটিকার তরুচ্ছায়াসমন্বিত রক্তবর্ণ কঙ্করসমাচ্ছন্ন প্রবেশ-পথের উভয় পার্শ্বে বায়ুবিক্ষোভিত কাকচক্ষুনিভ স্বচ্ছতোয়পূর্ণ বাঁধাঘাট-সুশোভিত দুইটি সুবৃহৎ সরোবর ছিল। বাঁধাঘাটের চত্বরে সমান্তরালে সম্মুখীনভাবে অবস্থিত মর্ম্মরাচ্ছাদিত সুপ্রশস্ত দুই দুইখানি আসন বিরাজমান। আসন-পার্শ্বে প্রোথিত ঘনপত্রপল্লব-সমাচ্ছন্ন পুষ্পিত শেফালি-বকুল চন্দ্রাতপরূপে অবস্থিত। কোকিল, পাপিয়া, ভৃঙ্গরাজ, দধিয়াল, বুলবুলের কলকণ্ঠে দিগ্‌দেশ মুখরিত। এই বারিবায়ু-সুশীতল, স্নিগ্ধপুষ্প-সুরভি-সমাকুল, মোহনবিহগ-গীতি ও ঝিল্লীরব-নিনাদিত প্রাকৃতিক সুষমা-রাজি পরিশোভিত, বাপীতটবর্ত্তী রমণীয় মণ্ডপে সায়াহ্নে সুহৃৎমণ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্য-চর্চ্চা—রহস্যালাপ—ভাববিনিময় করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর, মহাশয়ের সহিত বাঙ্গালা-ভাষা-গঠনসম্বন্ধে মধুসূদনের মহাতর্ক উপস্থিত হয়। প্যারীবাবু তখন "মাসিক পত্র" নামক একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত; তাঁহার "আলালের ঘরের

৺প্যারী চাঁদ মিত্র

দুলাল" সেই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যনুসারে বাঙ্গালা ভাষা-লিখনের যুগ প্রচলিত; প্যারীবাবু সেই 'পণ্ডিতি' রীতির পরিবর্ত্তন এবং সহজ চলিত—কথিত ভাষায়-পুস্তক-লিখনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, তদাদর্শ ভাষাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছেন। সুতীক্ষ্ণ ধী-শক্তিসম্পন্ন মধুসূদন গুণমুগ্ধ অনুরক্ত বন্ধুবান্ধবের ঐকান্তিক আগ্রহে বাঙ্গালা ভাষায় স্বীয় রচনাশক্তির বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা মানসে, সেই সবে মাত্র বিজাতীয় 'মিউস্' দেবীর পরিবর্ত্তে, বিরলে—বিজনে—গোপনে স্বজাতি-উপাস্যা

সরস্বতী দেবীর আরাধনায় ব্রতী হইয়াছেন; বিশিষ্ট দুই চারিজন অন্তরঙ্গ ব্যতীত সে সংবাদ তখনও অন্যে জানে না। মধুসূদন, প্যারীবাবুর উক্ত ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি এ আবার কি কুকীর্ত্তি করিতে বসিয়াছেন!—লোকে ঘরে ঠেঁটি—আটপৌরে—যাহা-হয় পরিয়া—আত্মীয়জন-সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে, সে বেশে যাওয়া চলে না—'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি দেখিতেছি—'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে-বাহিরে—শয়নাগারে-সভা-সমাজে সর্ব্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন!—ইহাও কি কখন সম্ভব!" ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুসূদন যে বাঙ্গালা ভাষার কোনও ধার ধারেন, একথা কেহ তখনও অঙ্কুরেও জানিত না—এরূপ ধারণা কাহারও ছিল না। তাঁহার মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি, সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়া, উত্তেজিত ভাবে সদম্ভদর্পে প্যারীবাবু বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে! তবে, জানিয়া রাখ, আমার লিখিত—আমা-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে!" মধুসূদন স্বভাবসুলভ হাস্যসহকারে কৌতুকব্যঞ্জক স্বরে তদুত্তরে বলিলেন, "It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit.—উহা কি আবার একটা ভাষা! মুদী-বাকালীর ভাষা, তাহাদেরই নিকট সমাদৃত হইতে পারে,—পণ্ডিতের নিকট পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষাই চির সম্পূজিত—সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে!—দেখিবেন, সে ভাষার সৃষ্টি আমি করিব; আর তাহাই চিরস্থায়ী হইবে!" এই কথা শুনিয়া সম্পূর্ণ রহস্যবাক্য মাত্র মনে করিয়া, সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা লিখিবে, আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হইবে!—সে ত আর একালে নহে—সেই ক্ষুদে মঙ্গলবারে (till the Greek Calends!)" পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখুন, কতটা অগাধ আত্মবিশ্বাস থাকিলে, লোকে এইরূপে দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে! আরও বিচার করুন, সেই সুদূর অতীতকালে প্রকটিত এই দুই দিগ্‌গজ মহারথীর অভিমতের মধ্যে, কোন্‌টি কালের কঠোর পরীক্ষায় অভ্রান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে!

মনে হয়, এই উদ্যান-সম্মিলনে এবংবিধ সাহিত্য-প্রসঙ্গেই বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বরাগ বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হয়—মাতৃভাষা-সেবারূপ কল্পবৃক্ষের বীজ মহাকবির হৃদয়ে প্রথম উপ্ত হয়—এবং এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার সে অনুরাগ ও উদ্যম প্রবলতর—প্রগাঢ়তর হয়। কারণ, ইহার কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার "শর্ম্মিষ্ঠা" রচিত ও প্রকাশিত হইল।—'শর্ম্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হইলে, তাঁহার সহচরবর্গ সাশ্চর্য্যে মধুসূদনের সেদিনকার সেই দম্ভবাক্য স্মরণ করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন।

বৈকাল হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত এই বাপীতটে প্রীতি-প্রসঙ্গ চলিত! তার পর, নৈশ-ভোজ—বর্ণ-নির্ব্বিচারে সকল বন্ধুতে মিলিয়া একত্রে, এক টেবিলে, পরমপুলকে পান-ভোজন হইত। এক একদিন 'সান্ধ্যকৃত্য' সম্পন্ন করিতে গিয়া, মধুসূদনের ফিরিতে বিলম্ব ঘটিত—কিশোরীচাঁদ প্রমুখ বান্ধবেরা তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন; তিনি যে চক্রপতি—মধু না হইলে কি মধুর ভাবে কেহ আসর জমাইতে পারে?—'Table-talk'—বিশেষতঃ 'dinner table-talk'এ তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না।

একত্রে অবস্থানকালে, কিশোরীচাঁদের সহিত অবান্তর-প্রসঙ্গে মধুসূদনের পরহস্তগত পৈতৃক বিত্তোদ্ধারের উপায় ও পরামর্শ-নির্দ্ধারণের জল্পনাকল্পনাও চলিত। পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে মধুসূদন কিশোরীচাঁদের নিকট যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন—সেসকল উপকারের কথা তিনি জীবনে বিস্মৃত হন নাই—তজ্জন্য মধুসূদন আজীবন কিশোরীচাঁদের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে যখন মহানুভব কিশোরীচাঁদ গ্রহবৈগুণ্যে বিষম বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া পড়েন, তখন মধুসূদন যে সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে ত্রুটী করেন নাই, আমরা তাঁহার 'জীবনী'তে তাহার বিশদ উল্লেখ দেখিতে পাই। ফলে, সে উপলক্ষে তিনি এবং স্বদেশ ও স্বজনগত-প্রাণ পুণ্যশ্লোক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে ইতিহাসের বিষয়ীভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেরাণীরূপে মধুসূদনকে অধিককাল থাকিতে হয় নাই—অনতিবিলম্বেই তিনি উক্ত কাছারীরই দ্বৈভাষিক (Court Interpretor) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই পদলাভ করিয়া, তিনি কিশোরীচাঁদের উদ্যানবাটিকা পরিত্যাগ করিয়া, তদানীন্তন—সম্প্রতি-পরিত্যক্ত—লালবাজার পুলিশকোর্টের পূর্ব্ব-পারে, লোয়ার চিৎপুররোডের উপর অবস্থিত (No. 6, Lower Chitpore Road) দ্বিতল ভবন ভাড়া করিয়া, তিনি তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই বাটীতেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত 'মেঘনাদ বধ কাব্য,' 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য,' 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক,' 'পদ্মাবতী নাটক,' 'কৃষ্ণকুমারী নাটক,' 'একেই কি বলে সভ্যতা,' 'বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন "রত্নাবলী" ও "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকের ইংরাজী অনুবাদও এই বাটীতে অবস্থান-কালেই সমাধা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থই ১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুলিশ-আদালতে দ্বৈভাষিকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে রচিত। এই ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে অদ্ভুতকর্ম্মা মধুসূদন এই পবিত্র কীর্ত্তি-মন্দিরে তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব সাহিত্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।
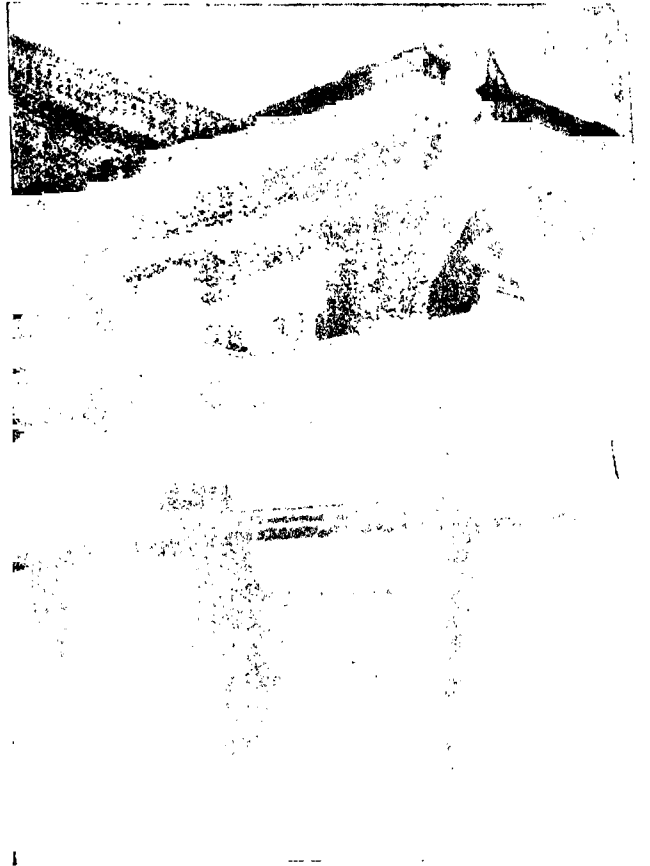
৺দয়ালচন্দ্র সোম

নং ৬, লোয়ার চিৎপুর রোড্

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক ডাক্তার ৺দয়ালচন্দ্র সোম* ছাত্রাবস্থায় একটি বন্ধুর সঙ্গে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের সহিত পুলিশ আদালতে কয়েকবার সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, আদালতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামকক্ষে, অবসরকালে মধুসূদন হ্যাটকোট খুলিয়া, নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত থাকিতেন।—মুখে চুরুট লাগিয়াই আছে; অবিরত ফুৎকারে ধূম-উদ্গিরণ করিতেছেন; টেবিলের উপর পান-পাত্র ঢাকা রহিয়াছে।

* শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ৺দয়ালচন্দ্র সোম মহাশয় আগ্রায় অবস্থানকালে (১৮৬৮—৭৪) উর্দ্দু ভাষায় অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ (DARS—I—JARRAHI, বা LECTURES ON SURGERY, AGRA, 1874) রচনা করেন; এবং পরে, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে ইংরেজীতে আর একখানি পুস্তক (TEXT BOOK OF MIDWIFERY, SIMLA, 1891) প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত পুস্তকখানি গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

তখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' সবে মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা নূতন অমিত্রছন্দ পাঠ করিতে পারেন কি না, জানিবার জন্য, মধুসূদন তাঁহাদিগকে কাব্যের কোন কোন অংশ পড়িতে বলিতেন ;—না পারিলে, স্বয়ং আবৃত্তি করিয়া শিখাইয়া দিতেন। মধুসূদনের মধুর সস্নেহ ব্যবহারে তাঁহারা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

উক্ত বাটীসম্বন্ধে গৌরদাসবাবু বলিয়াছেন—

"Modhu was then living in a two-storied house close to the Police Court, on the eastern side of the Chitpore Road. It was in this memorable house that he wrote his principal works—Sarmistha, Tilottama and Meghnadbadha. Had Bengal been England, this house would have been purchased and maintained by the public, for being visited by the admirers of his genius."

—*'Reminiscences of Michael M. S. Dutta.'*
—*G. D. Bysack.*

ভোলানাথ চন্দ্র বলেন—

* * * "The spot ought to be memorable in our literary annals. Modhu, I have been told, used to dictate to three or four amanuenses together. He moved about in the room, and told each in his turn what he was to write. To carry so many and so different matters in his head, all at the same time, is possible only for a genius."

—*'My Recollections of Michael Modhu.'*
—*Bholanath Chunder.*

এই বাটীতে অবস্থানকালে মধুসূদন যখন ইচ্ছা, দুইচারি পদ-বিক্ষেপেই, আফিসে গিয়া পৌঁছিতেন। তাঁহার কোন বন্ধু লিখিয়াছেন—

"Modhu then lived close by the Police, and walked in a trice to his office."

পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটেরাও তাঁহাকে বন্ধু-ভাবেই দেখিতেন। তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিত স্বর্গীয় রামকুমার বিত্তারত্নের মুখে শুনিয়াছি—ম্যাজিষ্ট্রেট রে (George Octavius Wray L. L. D.) সাহেব বলিতেন—'"Data" থাকিলে, আমি ঘণ্টায় শতাধিক মামলা চুকাইতে পারি ; কিন্তু তিনি যে দিন না থাকেন, সে দিবস দুইটা মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করাও আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে।'—ম্যাজিষ্ট্রেট রে সাহেব মধুসূদনকে Duttএর পরিবর্ত্তে 'Mr. Data' বলিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট ফেগ্যান (G. S. Fagan, Bar-at-Law) সাহেবও * তাঁহাকে ঐ নামে সম্বোধন করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটসম্বন্ধে মধুসূদন তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন ;—"The present Magistrate —Mr. W.—is such a d—d slow coach, that cases which a smart fellow would get through in an hour and a half, occupy four or five hours of his time. However, this chap is going away to Small Causes Court, and we are to have Mr. Briefless F."

ফেগ্যান সাহেব মধুসূদনকে মোকর্দ্দমায় cross examination করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে এতই ভালবাসিতেন যে, মধুসূদন বেলা ১২টা-১টার পর আদালতে আসিতেন, তথাপিও কিছু বলিতেন না। কোন কোন দিন, বিশেষ বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া, সাহেব তাঁহাকে 'পাক্‌ড়াও' করিয়া আনিতেন। দুই জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। মধুসূদনের সাহিত্য-জ্ঞানে Fagan সাহেব মোহিত ছিলেন। †

স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন, মধুসূদনের এক বার্ষিক স্মৃতি-সভায় বলিয়াছিলেন যে, "একবার রবার্টস্ সাহেবের এজলাসে, একটি মকর্দ্দমা উপলক্ষে, এজাহার দিতে দিতে, একজন মাড়োয়ারী নিজ মাতৃ-ভাষায় একটি কবিতা আবৃত্তি করিল। মধুসূদনও সঙ্গে সঙ্গে সেই কবিতাটি ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ করিয়া সাহেবকে শুনাইয়া দিলেন ; সাহেব তাঁহার এই অদ্ভুতশক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন।"

---

* ইঁহার সঙ্কলিত "Acts of the Legislative Council of India." (1834—66). ব্যবহারাজীব মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত।

† ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে, বিলাত-যাত্রাকালে, সমুদ্রবক্ষে জাহাজের উপর, ফেগ্যান সাহেবের মৃত্যু হয়।

৺প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ

তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি বিবরণ শুনা যায়। মধুসূদন দ্বৈভাষিকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে, সেকালের সেই সর্ব্বজনবিদিত "জৈন মানহানির মোকর্দ্দমা" উপস্থিত হয়। জনৈক ব্যক্তি জৈনসমাজের নিন্দাবাদপূর্ণ সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া, পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে। তাহাতেই জৈনধর্ম্মাবলম্বী মাড়ওয়ারীমণ্ডলী লেখকের বিরুদ্ধে কলিকাতা পুলিশকোর্টে মানহানির দাবীতে নালিশ করেন। এই উপলক্ষে উভয়পক্ষেই, সে সময়ের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল-ব্যারিষ্টার নিয়োজিত হইয়াছিলেন। বিচার-কালে, মধুসূদন মোকর্দ্দমার মূলীভূত কবিতাটি মুখে মুখে ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ করিয়া বলিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া প্রতিপক্ষীয় কৌন্সিলি বলেন যে, "দ্বৈভাষিক আপন মনে যে ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি করিলেন, তাহা কদাচ মূলানুগত হইতে পারে না।" ইহা শুনিয়া মধুসূদন সদর্পে উত্তর দেন যে, "মোকর্দ্দমার মূলীভূত পদগুলি সংস্কৃত কবিতাকারে আছে বলিয়াই, আমি তাহা ইংরেজী কবিতাকারেই অনুবাদ করিয়া বলিয়াছি। আমি সদম্ভে বলিতে পারি যে, ইহা যথাযথ ও মূলানুগত অনুবাদ—প্রতিপক্ষের ব্যারিষ্টারের ক্ষমতা থাকে, তিনি ভ্রম দেখাইয়া দিন।" পরে, মনোযোগ সহকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণে, মধুসূদনের উক্তিই যখন যথার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইল; তখন উপস্থিত সকলেই মধুসূদনের অদ্ভুতশক্তির পরিচয় পাইয়া, আশ্চর্য্যান্বিত—হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে, মধুসূদন যখন ইংলণ্ডগমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট উইলসন সাহেব তাঁহাকে বলিলেন যে, "আপনি ত চলিলেন, এক্ষণে আমাকে আপনার ন্যায় একটি লোক দিয়া যান।" সাহেবের এই কথায় মধুসূদন হাসিয়া রহস্যভাবে বলিলেন, "দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার ন্যায় মাত্র এই একটি লোকই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং দৈবাৎ সে আপনার নিকট জুটিয়াছিল!—এমনটি আর দ্বিতীয় কোথায় পাইব?" পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন—"প্রাণকৃষ্ণ ঘোষকে আমি যথাসাধ্য আমার কার্য্য শিখাইয়াছি; আমার বিশ্বাস, তাঁহার দ্বারা আপনার কার্য্য আমার অপেক্ষাও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে।" বলা বাহুল্য, পরে প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় * অতিশয় দক্ষতার সহিতই তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পুলিশ-আদালতের কার্য্যে থাকিতে থাকিতে মধুসূদন এক অতি অসমসাহসী কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক নির্ভীকতা ও সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে কোন কথা এপর্য্যন্ত তাঁহার কোন জীবনচরিতে প্রকাশিত হয় নাই। এ কার্য্য অপর কিছুই নয়—"নীলদর্পণ" নামক বিখ্যাত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ।

* ৺প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় 'POLICE COURT COMPANION' এবং 'CRIMINAL COURT COMPANION' নামক ফৌজদারী আইনবিষয়ক দুইখানি পুস্তক সঙ্কলন ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সাধারণে জানেন যে, পাদরী লং সাহেব (Rev. James Long) নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া, কারারুদ্ধ ও ঘোরতর অপমানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের প্রকৃত অনুবাদ-কার্য্য মধুসূদনই সম্পাদন করিয়াছিলেন; লং সাহেব প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। ভূমিকাতে লং সাহেব লিখিয়াছেন, "The original Bengali of this Drama—the 'Nil Durpan, or Indigo Planting Mirror'—having excited considerable interest, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been made by a Native; both the original and translation are *bona fide* Native productions and depict the Indigo Planting System as viewed by Natives at large." গ্রন্থের (title page) নামের পৃষ্ঠায় মধুসূদনের নাম ছিল না; থাকিবার কথাও নয়।

গ্রন্থের উপরে লেখা ছিল:—"Nil-Durpan or the Indigo Planting Mirror.—A Drama translated from Bengali by *A Native*."*

মধুসূদন তখন রাজকার্য্যে নিযুক্ত। মূলগ্রন্থ প্রকাশ-কালে, যখন গ্রন্থকার দীনবন্ধু স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই, তখন অনুবাদকও একজন রাজকর্ম্মচারী হইয়া, কি করিয়া আপনার নাম গ্রন্থে সংযুক্ত করিতে পারেন!

দীনবন্ধুবাবুর পুত্র, ছোট-আদালতের জজ্, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বলেন যে, "ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকুরস্থ বাসভবনে § ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন এক রাত্রির মধ্যে নীলদর্পণের অনুবাদকার্য্য সমাধা করেন। একজন নীলদর্পণ পাঠ

৺তারকনাথ ঘোষ

করিয়া বলিতেছেন, আর মধুসূদন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর, অবিরত লেখনী-সঞ্চালনে, ইংরেজীতে উহার ভাষান্তরিত করিয়া যাইতেছেন।" †

যে গৃহে নীলদর্পণের অনুবাদ লিখিত হয়, সে গৃহ অদ্যাপি বর্ত্তমান। দীনবন্ধুর ভ্রাতৃ-জামাতা, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়, এই অনুবাদের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন।

* লণ্ডন নগরে সিম্পকিন্ মার্শল কোম্পানী (Simpkin Marshall & Co) মধুসূদন কৃত ইংরেজী অনুবাদ পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন; এবং উক্ত ইংরাজি অনুবাদ হইতে আরও অনেক য়ুরোপীয় ভাষায় নীলদর্পণের একাধিক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

§ ঝামাপুকুরে স্বর্গীয় তারকনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটী, একটি সারস্বত-কুঞ্জ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তারকনাথ ঘোষের সহিত মধুসূদনের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার আলয়ে সাহিত্য-মহারথ মধুসূদন, নাট্যরথী দীনবন্ধু, ও ঔপন্যাসিককুল-তিলক বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল। এখানে সময়ে সময় সাহিত্যিক-বৈঠক বসিত। তারকবাবুর গৃহ সাহিত্যিকদিগের (Litterateur rendezvous) সম্মিলন স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সম্মুখেই রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটী। মধুসূদন এবাটী হইতে ও বাটীতে যাতায়াত করিতেন। তারকবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সহিত মধুসূদনের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ৺গিরিশচন্দ্রের পত্নী মহাশয়ার স্মৃতিপটে তাঁহাদের ভবনে সমাগত সাহিত্য রথিগণের স্মৃতি চিরাঙ্কিত রহিয়াছে।

† "The Rev. James Long took upon himself the task of having the drama translated in English to

সাহিত্য-সম্রাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দীনবন্ধু-চরিতে' লিখিয়াছেন ;—"এই গ্রন্থরচনা করিতে করিতে দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া

৺দীনবন্ধু মিত্র

গিয়াছেন—লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।"—সঞ্জীবচন্দ্র স্বহস্তে মধুসূদনের অনুবাদের কথা উক্ত গ্রন্থে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

open the eyes of the Government and the English community. The actual translation was made by the immortal poet of the Meghnadbadh—Michael Madhusudan Dutta. The translation was hurried through a single night. In spite of all, the translation did not fail to present a glimpse of the original to English readers. This was borne out by the testimony of the great historian Marshman himself. In his letter to the *Friend of India* occurs the following passage :—

'We have with some little surprise heard of the extraordinary sensation created in Bengal, and more especially in Calcutta, by the (English translation) Nil-Durpan. In spite of all the disadvantages of the translation, it is evidently written with talent'."—*History of Indigo Disturbance in Bengal.*

'বঙ্কিম যুগের কথা'-লেখকও বলেন ;—"অবিলম্বে 'নীলদর্পণ' ইংরাজীতে অনূদিত হইল! অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ;—কিন্তু লং সাহেবের নামেই তাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। * * * এই 'নীলদর্পণের' সংস্রবে আসিয়া মাননীয় মিঃ সিটনকারও কিছু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'নীলদর্পণে'র অনুবাদ করিয়া একেবারে পরিত্রাণ লাভ করেন নাই ; গোপনে তিনিও তিক্তমধুগোছের কিছু কিছু পাইয়াছিলেন।" *

নীলকরদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে যত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই লেখকেরা মধুসূদনকেই 'নীলদর্পণের' প্রকৃত অনুবাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লং সাহেবের উপর অনুবাদের ভার অর্পিত হইয়াছিল ; কিন্তু লং সাহেবের বাঙ্গালাভাষায় যতই জ্ঞান থাকুক না কেন, 'নীলদর্পণের' ন্যায় কৃষকদিগের জটিল গ্রাম্যভাষা-পরিপূর্ণ নাটকের অনুবাদ তাঁহার সাধ্যাতীত। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে মধুসূদন 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া য়ুরোপীয় সুধীসমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা উক্ত নাটকদ্বয়ের অনুবাদে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে নীলদর্পণের ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের অনুবাদের ভার সুবিজ্ঞ লং সাহেব, মধুসূদন ভিন্ন আর কাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন? এ কার্য্যে তাঁহার অপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে ছিলেন? †

* ভারতী পত্রিকায় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন "লং সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন, একজন বড় সিভিলিয়ান অপদস্থ হইলেন ও অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রিম কোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন।"

† এই নাটকের ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া, হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর মর্ডণ্ট ওয়েলস্‌ (Sir Mordaunt Lawson Wells) ইহা দেশীয় লোকের অনুবাদ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, লং সাহেব এই অনুবাদ না করুন, অপর কোন বাঙ্গালাভাষাবিজ্ঞ কৃতবিদ্য ইংরাজকর্ত্তৃক ইহা অনূদিত হইয়া থাকিবে। কিরূপ ভাষায় নীলদর্পণ বিরচিত ও তাহার অনুবাদকার্য্য কিরূপ কঠিন ও জ্ঞানসাধ্য, সে ধারণা বাঙ্গালীবিদ্বেষী, উদ্ধতস্বভাব স্যর মর্ডণ্ট ওয়েলসের ছিল না।—যাহা হউক, অনুবাদের পক্ষে ইহা বড় অল্প গৌরবের কথা নহে।

নীলদর্পণের মকর্দ্দমার সময় ইংরাজেরা—এমন কি, স্বয়ং বিচারপতি ওয়েল্‌স সাহেবও, অনুবাদকের নাম প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য লং সাহেবকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। নামটি প্রকাশ করিলেই তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন, এ কথাও লং সাহেবকে বলা হইয়াছিল; কিন্তু মহাত্মা লং কিছুতেই এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। কারাবাস ও নানা নির্য্যাতন ভোগ করিবেন, তাও ভাল, কিছুতেই মধুসূদনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবেন না, এই দৃঢ়সঙ্কল্প অবিচলিতভাবে শেষমুহূর্ত্তপর্য্যন্ত বজায় রাখিলেন;—কেহই তাঁহাকে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করাইতে সমর্থ হইলেন না।

লং সাহেবের এই অত্যাশ্চর্য্য সৎসাহস দেখিয়া, মধুসূদনের বন্ধুগণ কালীপ্রসন্ন সিংহকে লং সাহেবের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন; সিংহ মহোদয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বাভাবিক মহানুভবতা প্রণোদনে লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করিয়া ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করিয়া সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিলেন।

মধুসূদন যে উক্তগ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, এ কথা কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গৌরদাস বসাক, দীনবন্ধু মিত্র, তারকনাথ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি প্রভৃতি বন্ধুগণের অবিদিত ছিল না। পাছে মধুসূদনের কোন বিপদ ঘটে, পাছে তিনি কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হন, এই আশঙ্কায় মধু-গত-প্রাণ গৌরদাস আমরণ এই কথা গোপন রাখিয়াছিলেন;—এমন কি, মধুসূদনের 'জীবনী'লেখককেও বলেন নাই। মধুসূদন জীবনে, নানা মহাবিপদের অধীন হইয়া, মহাক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু নীলদর্পণ-ঘটিত ব্যাপারের নিষ্ঠুর-নির্য্যাতন হইতে এককালে মুক্ত না হইলেও, তিনি তেমন কিছু বিপদগ্রস্ত হন নাই। *

মহাত্মা লং সাহেব মধুসূদন-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠে অতীব প্রীত হইয়া, যে কথা গৌরদাস বাবুকে

পাদ্রী লং

বলিয়াছিলেন, মধুসূদন তদুল্লেখে রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—

"Old Father James Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day—'In the course of four or five years, Dutt will, if spared, revolutionise the language of your Country!'"

মধুসূদন, স্বরচিত 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের ও ইংরাজি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। যদি তিনি ইহা কোন প্রকারে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীজাতির গৌরব বৃদ্ধি হইত। বাঙ্গালী জগৎকে দেখাইতে পারিত যে, বিজাতীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া কাব্য লিখিতে তাহাদের কতদূর অধিকার জন্মিয়াছে। ইংরাজি তিলোত্তমার ভাষা, গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে মিল্টনের কাব্যের অনুরূপ।

* পুলিশ-আদালতে কার্য্যকালে, একবার 'Citizen' নামক পত্রিকায় কতকগুলি ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখাতে মধুসূদনকে বিলক্ষণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদক, মধুসূদনের নাম প্রকাশ না করিয়া, স্বয়ং অন্তর্দ্ধান হওয়াতে মধুসূদন সে যাত্রাও নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সংবাদপত্রে লেখা সম্বন্ধে সেই অবধি মধুসূদনের বিরাগ জন্মিয়াছিল। পরজীবনে একার্য্যে তাঁহার আর আদৌ আস্থা ছিল না। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে—মার্চ্চ মাসের প্রথমে, তাঁহার য়ুরোপগমনের কিছুদিন পূর্ব্বে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, হিন্দু-পেট্রিয়ট (Hindoo Patriot) পত্রিকার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল দেখিয়া, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুসূদনকে 'পেট্রিয়ট'-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। মধুসূদন তিনমাস কাল পত্রিকা-সম্পাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আন্তরিক প্রবৃত্তি না থাকায়, ও ইংলণ্ডগমনের ব্যস্ততায়, তিনি সে কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা তাঁহার কৃত অনুবাদের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

English Translation of the 1st. Canto of

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য

"Dhabala by name, a peak
On Himalaya's kingly brow—
Swelling high into the heavens,
Ever robed in virgin snow;
And endued with soul divine.
Vast and moveless like the Lord
Siva, mightiest of the gods,
By holiest anchorites adored,
When with spotless garment clad, he
Stands sublime immersed in prayer,
With his arms uplifted high,
His towering head hid in the air;
Forests, groves and trees and creepers,
Blossoms flowers, and all that gem
Every mountain's airy brow,
Like gold and emerald diadem—
Grow not here; as if Earth's lord,
Of earthly pleasures sick, disdains
Life's gay vanities and follies,
Breaking their delusions' chains.
Birds that ever sweetly warble,
Bees that wander on the wing,
Seeking honey from each flower,
Come not here; the forest-king
Mountain-bodied elephant,
Tiger, bear and all that move
And live and breathe in woodland-bower,
In dark dim forest, boundless grove,—
Of the wilderness the lotus,
She—the long-eyed gazelle,
And the she-snake in whose locks
The brightest gems are said to dwell,
And the snake with poison hoarded,
Ne'er approach this frowning hill.—
Awful wild, majestic, stands it—
Solitary—stern and still!
Hoarsely in its sunless glens
Aye the torrent flood is sounding
Like the roaring Bhogabaty
Through hill's darksome valley bounding.
Round it blows the howling tempest,
Like tremendous Rudra's breath,
When with terrors clad, he dooms
This vast creation all to death!
And clouds arround it lower,
Fierce and gloomy night and day.
Like the demons that round Siva
Dance in wild and demon-play."

১৮৬২ খৃঃর পর বঙ্গদেশে তিনি আর কোন গ্রন্থরচনা করিবার অবকাশ পান নাই। সুদূর য়ুরোপের সুসভ্য ফরাসী রাজ্যের ভার্সেল্ নগরে (Versailles, France) অবস্থানকালে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি আরও চার-পাঁচখানি পৌরাণিক কাব্য এবং 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' দ্বিতীয় ভাগ আরব্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই! জীবনের শেষভাগে গ্রহবৈগুণ্যে তিনি যে ভীষণ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, সে অবস্থায় ধীরচিত্তে কাব্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

মানুষ উদ্ভিন্ন যৌবনাবস্থায় ভবিষ্যৎ সুখসম্পদ্-কল্পনা-ঘোরে—বয়ঃসুলভ উৎসাহ ও উৎফুল্লতায় আকাশকুসুম-রচনায় বিভোর হইয়া থাকে। তখন জীবনটা বড়ই মধুর—মোহময়—মোহন মনে হয়; তখন নিজের প্রতি অসীম বিশ্বাস, আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বতঃ কৃতকার্য্যতা-সম্বন্ধে অগাধ—অপরিমেয়—ধারণা। আশার দৃষ্টিতে—কল্পনার স্বপ্নে—কালের ব্যবধান হারাইয়া যায়, পরিণাম দৃষ্টি বিলুপ্ত হয়, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ আপাততঃ একই হইয়া পড়ে। তখন সে নিজ বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিব্যতীত

আর কিছুই দেখে না! এই সঙ্কটময় বয়ঃসন্ধিকালে—এই কেন্দ্রহীন আত্মপ্রসারাবস্থায়—এই অন্তঃহীন কল্পনা-প্রভাব-মধ্যে অতর্কিতভাবে অগ্রসর হইতে হইতে, যখন ক্রমে সত্যের কঠোর ভিত্তিতে শিরোদেশ আহত হইয়া, গতি প্রতিহত হয়, তখন তাহার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হয়!—নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দারুণ নৈরাশ্যে সে অভিভূত হইয়া পড়ে!

আমাদের মধুসূদনের জীবনেও আমরা এই ভাবরাশির অভিব্যক্তি পরিস্ফুটরূপে প্রকটিত—প্রকৃষ্টরূপে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। জীবনের উষায়, ভবিষ্যৎ জীবনের যে সমুজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানসপটে—কল্পনাচক্ষুসমক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহার আলোকে অন্ধ—আহ্লাদে উন্মত্ত—হইয়া, তিনি সম্মুখে পথের শতবাধা বিপত্তি আদৌ দেখিতে পান নাই; আর যতদিন সেসকল দৃষ্টিগোচর হয় নাই, ততদিন তিনি অদম্য উৎসাহে—অমিত উল্লাসে—বীণাপাণির আরাধনায় উন্মত্ত—বাহ্যজ্ঞান শূন্য—হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! সে কত দিন!—কয়টা সীমাবদ্ধ অঙ্গুলি-পর্ব্বপরিমেয় বৎসর ত্রয়-চারি মাত্র! অনন্তর, অপরিণামদর্শী অমিতব্যয়ী সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞ মধুসূদনের সংসার-প্রসারতা, তথা অপব্যয়, জনিত অর্থকৃচ্ছ্রতা—বিষকুম্ভপয়োমুখ বন্ধুচয়ের কৃতঘ্নতা—আত্মীয়স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির বিকট দাহনে, হৃদয় নির্ঝরের কবিত্ব সুষমা অকালে অযথা সঙ্কুচিত—বিশুষ্ক হইয়া গেল! স্বদেশের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, য়ুরোপ-যাত্রার প্রাক্কালেই তিনি যেন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভাকে মহা-মৌন সমাধি গহ্বরে নিহিত করিয়া গেলেন!

সুন্দর ও কালো

[শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়, B. A.]

সুন্দর তুমি,—
রূপটি তোমার শতেক দৃষ্টি ঘেরা
কাঁচা সোণার বর্ণ তোমার—
চোখটি পটল-চেরা;
ভণ্ড-প্রেমিক গণ্ড দুটি
—ধূর্ত্ত শঠের সেরা,—
ব্যর্থ আশার জ্বালার ভেতর ডোবা;—
শোন্ কথা মোর,
রাখ্ ঢেকে তোর
তিক্ত কঠোর শোভা!

কুৎসিৎ আমি,—
বর্ণ আমার 'জেটে'র মতন কালো,
নাক-চোখ-মুখ—কর্ণ আমার,
একটিও নয় ভালো;
সবাই, আমার নিন্দা লয়ে,
লক্ষ প্রদীপ জ্বালো,
—ঘিরে মরা প্রাণের ভাঙ্গা কুঁড়ে;
—তৃপ্ত বুকে
মর্‌ব সুখে—
মাঝখানে তার পুড়ে।

কিন্তু—
তুমিই যা'দের প্রিয়-প্রাণের
তোমার যারা প্রি'ও'
শেষের দিনের আঁধার রাতে—
সঙ্গে তাদের নিও।
ভেদ-ঘুচানো মৃত্যু-কোলে
বস্‌ব তোমায় ঘেঁসি
দেখ্‌বে তারা বর্ণ তোমার—
উজল কতই বেশী!

বঙ্কিমচন্দ্রের-"সীতারাম"

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক, M. A.]

গীতা অনেকেই পড়ে, কিন্তু পড়ার মত পড়ে কয়জন? বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাবে গীতা পড়িয়াছিলেন ও গীতার তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "সীতারাম", 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'আনন্দমঠ' এই তিনখানি পুস্তক প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। তিনি এই তিনখানি পুস্তকে এক একটী মনোরঞ্জন গল্পচ্ছলে 'জ্ঞানযোগ', 'কর্ম্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' এই তিনের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমন স্থূলদৃষ্টি ও জড়বুদ্ধি যে, তাঁহার প্রতিপাদিত প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিচিত্র লীলা উপলব্ধি করিতে পারি না। যাহা হউক, আমি আপাততঃ বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি-প্রকাশের চেষ্টা করিব। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে তুলিতে সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমার সাধ্য কি যে, সেই তূলি ধরিতে পারি বা সেই রং ফলাইতে পারি? তবে মা কালীর এক পয়সা মূল্যের পটও তো লোকে কেনে! কেনে কেন-না তাহাতে মায়ের মূর্ত্তি লেখা আছে। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির লিখিত প্রতিলিপিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভালোকের ক্ষীণ ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া, লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, সেই ভরসায় ও জনৈক সাহিত্যসেবী বন্ধুর অনুরোধে এই ধৃষ্টতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম খণ্ড

[দিবা—গৃহিণী]

গঙ্গারাম নামে এক ব্যক্তি মাতার কঠিন পীড়ার জন্য কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল, পথে একজন ফকির আড় হইয়া শুইয়াছিল। অনেক সাধ্যসাধনায়ও ফকির সরিল না, সুতরাং গঙ্গারাম বাধ্য হইয়া, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল। ফকির কাজির কাছে এই অপমানের জন্য নালিস করিল, গঙ্গারাম গ্রেপ্তার হইল, কাজি গঙ্গারামকে জীয়ন্ত পুতিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। পরদিন তাহার জীয়ন্তে কবর হইবে স্থির থাকিল। প্রথম পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বিবৃত।

গঙ্গারামের এক ভগিনী ছিল, তাহার নাম 'শ্রী'। 'শ্রী' সধবা বটে কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা। সীতারাম রায় ভূষণা গ্রামের জমীদার। তাঁহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা ও রমা। বিবাহের এক মাস পরে শ্রীর কোষ্ঠীফল দেখিয়া, দৈবজ্ঞ তাহাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং এই কথায় সীতারামের পিতা পুত্রবধূকে ত্যাগ করেন ও পুত্রকে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে আদেশ করেন। সীতারাম আরও দুইটি বিবাহ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, শ্রীকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই পূর্ব্ব-ইতিহাস-টুকু পরে ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এই টুকু না জানিলে গল্প বুঝিবার সুবিধা হইবে না, তজ্জন্য আমরা এইখানেই তাহা নির্দ্দেশ করিলাম।

ভ্রাতার এই ঘোর বিপদে শ্রী অনন্যগতি হইয়া 'পাঁচকড়ির মা' নামে এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনীর সহিত চুপি চুপি পরামর্শ করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সীতারামের গৃহে গেল। তথায় পাঁচকড়ির মা 'জীবন'-ভাণ্ডারীর নিকট সুপারিশ করিল, জীবন-ভাণ্ডারী শ্রীকে সীতারামের নিকট পৌঁছিয়া দিল। শ্রী—গঙ্গারামকে রক্ষা করিতে স্বামী সীতারাম রায়কে অনুরোধ করিল। সীতারাম তাহার কাতর প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বিবৃত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে, সীতারাম চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে গঙ্গারামের উদ্ধার সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। চন্দ্রচূড় একাধারে সীতারামের গুরুঠাকুর ও প্রধান সচিব (Prime Minister)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে, এক প্রকাণ্ড ময়দানে গঙ্গারামের

জীবন্ত কবরের ব্যবস্থা। ময়দানে লোকারণ্য। সীতারাম কাজি সাহেবের নিকট গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, বিনিময় যথাসর্ব্বস্ব। যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও যখন গঙ্গারামের উদ্ধার হইল না, তখন সীতারাম প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত হইলেন। যখন তাহাতেও কোন ফল হইল না, তখন সীতারাম ও চন্দ্রচূড়ের গোপন-পরামর্শের ফলে কালান্তক যমের ন্যায় কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ ফৌজদারের সিপাহিদিগের সহিত দাঙ্গা বাধাইয়া দিল। এই সুযোগে গঙ্গারাম অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া পলায়ন করিল। কাজি সাহেব সীতারামকে যত অনিষ্টের মূল মনে করিয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিলেন। তখন মহামহীরুহের দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে শ্রী হাঁকিতেছে—মার! "মার! শত্রু মার"—যেন সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! এই দাঙ্গায় সীতারামের জয় ও ফকিরের মুণ্ডচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে, প্রান্তর জনশূন্য, লোকজনের মধ্যে কেবল চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর সেই বৃক্ষতলে মূর্চ্ছিতা ভূতলস্থা 'শ্রী'। সীতারাম গঙ্গারামকে অশ্বারোহণে বড়নদী পার হইয়া, শ্যামপুরে যাইয়া, প্রাণ রক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন। এবং তথায় তাঁহার দেখা পাইবে আশ্বাস দিলেন। তিনি চন্দ্রচূড়কেও গঙ্গারামের অনুবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত করিলেন। বৃক্ষতলে থাকিলেন—'সীতারাম' ও 'শ্রী'। শ্রী এক্ষণে চেতনাপ্রাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, সীতারাম শ্রীকে শ্যামপুরে যাইতে বলিলেন, সেখানে শ্রীর তাঁহার সঙ্গে ও গঙ্গারামের সঙ্গে দেখা হইবে বুঝাইলেন। শ্রীকে বিপদের আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রী বলিল, "আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী, তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী। আমাকে ত্যাগ করিয়াছ কেন, সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে আমি এখান হইতে যাইব না।" সীতারাম বলিলেন, "আগে স্বীকার কর, কথাগুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না।" এদিকে সিপাহিদের বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল, সেখানে বসিয়া পরামর্শ চলিল না, তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদে, নদীকূলে সীতারাম ও শ্রী একত্র। সীতারাম কেন শ্রীকে ত্যাগ করিয়াছেন, সে সকল কথা বলিলেন। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রসঙ্গে সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।) শ্রী তাহা শুনিয়া সীতারামকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, সীতারামের বারণ শুনিল না; অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু এই ক্ষণিকের দেখায় সীতারামের মনোরাজ্যে কি একটা তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদে, শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই দিকে কত খুঁজিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সীতারাম ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া আক্ষেপ করিলেন। "সময়ে খুঁজিলে হয়ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুঁজিতে জানি না, তা কি করিব—আরও খুঁজি।" শেষে সীতারাম শ্রীকে না পাইয়া, শ্যামপুরে গঙ্গারামের নিকট গেলেন। সেখানেও শ্রীকে না পাইয়া, গঙ্গারামকে শ্রীর অন্বেষণে পাঠাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদে, ভূষণার হাঙ্গামার পর সীতারাম আত্মরক্ষার জন্য ভূষণা ত্যাগ করিয়া, মধুমতীতীরে শ্যামপুরে নূতন সহর স্থাপন করিলেন। এবং চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও গঙ্গারাম এই তিনজন উপযুক্ত সহায়ের গুণে রাজ্যগঠন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুসলমানের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিরোধ না করিয়া সদ্ভাব রাখিলেন ও জমীদারীর খাজনা পূর্ব্বমত রাজ-কোষাগারে পৌছিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময় চাঁদশাহ নামে একজন মুসলমান ফকির সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিল, তাহার সহিত সীতারামের সম্প্রীতি হইল। তাহারই পরামর্শ-মতে, নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন মহম্মদপুর। ফকির আসে যায়, জিজ্ঞাসামতে পরামর্শ দেয়, কেহ বিবাদের কথা তুলিলে, তাহাকে ক্ষান্ত করে।

দশম পরিচ্ছেদে, সীতারামের পরম শত্রু কনিষ্ঠা পত্নী রমা। রমার সদাই ভয়, কখন মুসলমান আসিয়া সীতারামের সর্ব্বনাশ করিবে। রমা তাই বলে—"হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারেখারে যাক্, আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি।" রমার কথায়

কিন্তু সীতারাম কাণ দিলেন না। বিরক্ত হইয়া, সীতারাম আর তত রমার দিকে আসিতেন না। সুতরাং নন্দাই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"হায়! শ্রীকে ত্যাগ করিয়া কি রমাকে পাইলাম'?" সীতারাম মনে করিলেন, আমি শ্রীর কাছে যে পাপ করিয়াছি, রমার কাছে তাহার দণ্ড পাইতেছি, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত চাই। সীতারাম ভাবিলেন—'নয়ন মুদিলেই শ্রী মিলিবে, শ্রী অনন্তের অংশ, হরিনামে অনন্ত মিলে, তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যতদিন না শ্রী মিলে, এস আমরা বুক বাঁধিয়া হরিনাম করি।'

একাদশ পরিচ্ছেদে, জয়ন্তীর সহিত শ্রীর সাক্ষাৎ। জয়ন্তীর সন্ন্যাসিনীবেশ। সে অতিশয় সুন্দরী, বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। উভয়েই শ্রীক্ষেত্রে বৈতরণীপারের কাণ্ডারীকে খুঁজিতে যাইতেছে; দুজনে একত্র চলিল। শ্রীও সন্ন্যাসিনী সাজিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, শ্রী ও জয়ন্তী ললিতগিরিতে হস্তি-গুম্ফায় পরমযোগী মহাত্মা গঙ্গাধরস্বামী জ্যোতির্ব্বিদের নিকট শ্রীর করকোষ্ঠীগণনার জন্য শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, গঙ্গাধরস্বামী শ্রীর করকোষ্ঠী গণনা করিলেন, পূর্ব্বজ্যোতিষীর কথাই দৃঢ়ীকৃত হইল। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিলেন, "তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে, সময় উপস্থিত হইলে স্বামিসন্দর্শনে যাইও, আগামী বৎসরে সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।" তিনি জয়ন্তীকে বলিলেন—"তুমিও আসিও।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে যুগল সন্ন্যাসিনী পুরুষোত্তমাভিমুখে প্রস্থিতা।

পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য উপাখ্যানের প্রথম খণ্ডের স্থূল মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই চোদ্দটি পরিচ্ছেদে সীতারামের প্রথম খণ্ড। গ্রন্থকার ইহার নাম দিয়াছেন, প্রথম খণ্ড—দিবা—গৃহিণী।

এখন দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি? সীতারামই বা কে? উপাখ্যানবর্ণিত অন্যান্য ব্যক্তিগণই বা কে? 'দিবা—গৃহিণী' এই রহস্যাবৃত শব্দ দুইটির তাৎপর্য্যই বা কি? পুস্তকের প্রারম্ভে গীতাবাক্য উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজনই বা কি? সাধারণ পাঠক গ্রন্থে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সীতারামের চরিত্রবিকৃতিতে উন্মত্ত হইয়া উঠেন, কেহ বা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের গন্ধ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠেন, কেহ আবার শ্রী, নন্দা, রমার সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি শুনিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনা—না প্রেমকাহিনী-বর্ণনা—না আর কিছু?

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥"
—১৪শ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক।

এই উপাখ্যানে সীতারাম = জীবাত্মা, গঙ্গারাম = মন, চন্দ্রচূড় = বিবেকবুদ্ধি, জয়ন্তী = ভক্তি, শ্রী = জ্ঞানাত্মক সত্ত্ব-গুণ, ("জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ" 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং'); নন্দা = রজোগুণ, রমা = তমোগুণ, রমার সদাই ভয় সদাই মোহ ('তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং) (অজ্ঞানং তমসঃ ফলং), পাছে শত্রু আক্রমণ করে। রমার ইচ্ছা ভূষণা = সামান্য দেহ লইয়া সীতারাম সুখভোগ করুন, মন (গঙ্গারাম) শ্রীর (সত্ত্বগুণের) কাছে থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মন (গঙ্গারাম) ছিলও শ্রীর (সত্ত্বগুণের) কাছে। হঠাৎ মনের (গঙ্গারামের) মহা বিপদ্, মন পাপস্পর্শে (ফকিরঘটিত ব্যাপার ২য় পরিচ্ছেদ) কলুষিত, কে মনকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে? (মহা-ভারতে পাণ্ডব-কৌরব-বিরোধের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান-বিরোধকে পুণ্য ও পাপের বিরোধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।) জ্ঞান (শ্রী) মনকে (গঙ্গারামকে) ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবাত্মাকে (সীতারামকে) অনুরোধ করিল। শ্রীর সঙ্গে আসিল পাঁচুর মা বা পাঁচের মা (মমতা)। ধ্বংস হইতে রক্ষা করার জন্য মমতাই সকলের হৃদয়ে বিরাজমানা। সুতরাং জ্ঞানের সহায় মমতা অগ্রসর হইয়া মিশ্রঠাকুরকে ভুলাইল, জীবন-ভাণ্ডারীকেও ভুলাইল অর্থাৎ লাউকুমড়ার প্রলোভন দিয়া জীবন-ভাণ্ডারীকে (আহার ভিন্ন জীবন সন্তুষ্ট নহে) ও প্রহরী মিশ্রঠাকুরকে অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় চক্ষুঃকর্ণাদিকে ভুলাইয়া,

পাঁচের মা (মমতা) অবগুণ্ঠনবতী শ্রীকে সীতারামের কাছে পৌছাইয়া দিল। মিশ্রঠাকুর বা জীবন-ভাণ্ডারী, শ্রী কেমন তাহা দেখিল না, দেখার দরকারও নাই, লাউ-কুমড়া প্রভৃতি ভোজ্য বা ভোগ্য বস্তু পাইলেই তাহারা তৃপ্ত, শ্রীর (জ্ঞানের) রূপ (জ্যোতিঃ) তাহাদের কোন প্রয়োজনে লাগে না। শ্রী সীতারামের নিকট গেল,—জ্ঞান জীবাত্মার সম্মুখীন হইল। যেমন জ্ঞান গিয়া 'মনকে পাপের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে হইবে'—এই নিবেদন জীবাত্মার গোচর করিল, অমনি জীবাত্মা (সীতারাম) বিবেকবুদ্ধির (চন্দ্রচূড় ঠাকুরের) শরণাপন্ন হইল।

জীবাত্মা পাপের কবল হইতে মনকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে তথাপি পাপ মনকে ছাড়ে না। সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে সত্বগুণময়ী জ্ঞানরূপিণী শ্রীর প্রেরণায় চন্দ্রচূড়ের (বুদ্ধির) ব্যবস্থায় মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রু পরাজিত হইয়া পলাইল বটে—কিন্তু গঙ্গারামও আপাততঃ পলাইল অর্থাৎ মন কোথায় জীবাত্মা তাহা জানে না। তাহার পর শত্রুজয় হইল, কিন্তু শ্রীও চলিয়া গেল। জীবাত্মা জ্ঞানের অদর্শনে কাতর হইয়া মনকে (গঙ্গারামকে) তাহার সন্ধানে পাঠাইল।

ভূষণা=দেহ, শ্যামপুর=অন্তর। চন্দ্রচূড় (বিবেক-বুদ্ধি) মৃন্ময় (বাহুবল) ও গঙ্গারাম (মন) এই তিনের সাহায্যে জীবাত্মা (সীতারাম) শ্যামপুরে (অন্তরপুরে) রাজত্ব স্থাপন করিলেন। ভূষণা (অর্থাৎ ভোগায়তন দেহ) দূরে রহিল, কিন্তু দখল একেবারে যায় নাই। সব আছে কিন্তু শ্রী নাই। দিবা=আলোক=জ্ঞান। শ্রী দিবা, শ্রী গৃহিণী। এমন গৃহিণী আসিয়াও নাই, জীবাত্মা জ্ঞানের আলোকে ভরিয়া উঠিল, সীতারাম মজিল কিন্তু তাহার পরেই আর নাই। শ্রীকে না পাইয়া গঙ্গারাম ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রচূড়ের পরামর্শে কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু শ্রী ক্রমে ক্রমে সীতারামের সিংহাসনের আধখানা জুড়িয়া বসিল। তথাপি সীতারামের বিবেক-বিষয়বুদ্ধি যে লোপ পাইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। চাঁদশাহ ফকির=বিষয়বুদ্ধি, সে একেবারে বিদ্রোহ-বিরোধ করিতে চায় না, মুসলমানের সঙ্গে (ইন্দ্রিয়াদি কামক্রোধাদি রিপুগণের সহিত) সদ্ভাব রাখিয়া, শ্যামপুরের রাজত্ব বজায় থাকে, ভূষণাও দখলে থাকে, এই তাহার ইচ্ছা। চন্দ্রচূড় (বিবেকবুদ্ধি) মুসলমানের সঙ্গে একেবারে সংস্রব রাখিতে চান না। রিপুগণকে একেবারে ধ্বংস করাই বিবেকের ইচ্ছা। বিবেকবুদ্ধি ও বিষয়বুদ্ধির এই প্রভেদ, চন্দ্রচূড়ে ও চাঁদশাহ ফকিরে এই প্রভেদ। ফৌজদার (ইন্দ্রিয়গণের রাজা) আপনার প্রাপ্য রাজস্ব পাইতে লাগিল; সীতারাম একেবারে ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারিলেও সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গণের অধীনও নহেন। শত্রুদমন হইল, নূতন নগর নির্ম্মিত হইল, নূতন রাজত্ব স্থাপিত হইল। ধরিতে গেলে সবই শ্রীর সেই একটি মাত্র অনুরোধের (অনুরোধ, মনকে পাপের গ্রাস হইতে উদ্ধার করা) অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

কর্ম্মের ফল জ্ঞান আসিল। কিন্তু সে শ্রী কোথায়? জ্ঞান শুধু কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু সে জ্ঞানকে ধরিয়া রাখা যায় না, ভক্তি যদি তাহার সঙ্গে না থাকে। ভক্তি জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাই জয়ন্তী বুঝি শ্রী অপেক্ষাও সুন্দরী। জ্ঞানাত্মক সত্বগুণ ভক্তির পথ অনুসরণ করে, তাই শ্রী জয়ন্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে—চলিয়াছে কোথায়? পুরুষোত্তমে দেবদর্শনে। দুইজন সন্ন্যাসিনী একত্র শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিয়াছে, সে কি পবিত্র দৃশ্য! যখন জ্ঞান ও ভক্তি একত্র শ্রীক্ষেত্রের পথে চলে—পুরুষোত্তমে দেবদর্শনের জন্য লালায়িত করিয়া তুলে, তখন আর ভাবনা কি? হায়, সীতারাম, কেন তুমি ইহাদের সঙ্গ লও নাই? এমন সঙ্গ আর কোথায় পাইবে? তোমার ভাগ্যে দেবদর্শন নাই। অনেক কর্ম্মের ফলে এরূপ সঙ্গ মিলে। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান ও ভক্তিকে একত্র পাওয়া যায় না। আর সে কর্ম্ম অনাসক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম হওয়া চাই। সীতারাম, তুমি কর্ম্ম করিয়াছ বটে, মনকে পাপের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছ বটে, কিন্তু সে কর্ম্ম নিষ্কাম নহে। তুমি অনাসক্ত নও, তাই ইহাদের সঙ্গ পাইয়াও পাইলে না। রাজত্ব পাতিয়াছ, অনাসক্ত কর্ম্ম কর, দেখিবে ইহারাও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই আসিয়া তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইবে। গুরুর আদেশে শ্রী আসিবে, জয়ন্তী সঙ্গে আসিবে।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥"

—গীতা, ৩য় অঃ, ১৯ শ্লোক।

দ্বিতীয় খণ্ড

[সন্ধ্যা—জয়ন্তী]

দিবার অবসানে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। আলোকের পর অন্ধকার—জ্ঞানের অভাবে সন্দেহ। সত্ত্বরূপিণী শ্রীর অনুসন্ধানে অনেক দিন কাটিয়া গেল। গঙ্গারামকেও কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া শ্রীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত করা হইল, কারণ শ্রীকে তো সকলে চেনে না। হতাশ হইয়া সীতারাম রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি রাজা হইলেন বটে কিন্তু তখনও প্রকৃত রাজা নন। দিল্লীশ্বরের সনন্দ পান নাই,—শ্রীভগবানের কৃপা হয় নাই। জীবাত্মা কেবল কর্ম্মদ্বারা আত্মজয়ী হইতে পারে না, শ্রীভগবানের কৃপা চাই, তাহা হইলে আর শত্রুর ভয় থাকে না। এদিকে হিংসাদ্বেষাদি শত্রুগণের গাত্রদাহ হইতে লাগিল, তোরাব খাঁ (কুবুদ্ধি) তাহাদের নেতা হইলেও মুরশিদ কুলী খাঁর * সাহায্য ব্যতীত মহম্মদপুর ওরফে শ্যামপুর বা অন্তরপুর ধ্বংস করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। জ্ঞানের অভাবে সন্দেহের আবির্ভাবে রিপুগণ মাথাঝাড়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মুরশিদ কুলী খাঁর আদেশ—'সীতারামকে বিনাশ কর'। সীতারামের তখন আর অন্য উপায় নাই, ক্রমশঃ শত্রুদিগের বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল, চন্দ্রচূড়ও কিন্তু বলবৃদ্ধি করিতে ক্ষান্ত নহেন। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। ভূষণা আক্রমণের জন্য যে আজ্ঞা আসিয়াছিল, তাহা চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর সংগ্রহ করিয়াছিল। তাই সীতারাম দিল্লীশ্বরের সনন্দ পাইবার আশায় যাত্রা করিলেন। এই তো গেল দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রমার কান্নাকাটি, রমার বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। নন্দা রমাকে বুঝাইতেছে। রমা বুঝিবার নয়। নন্দা সাহস, রমা ভয়; নন্দা রজঃ, রমা তমঃ। উভয়েই কিন্তু দিন কতকের জন্য স্বামিহারা। জীবাত্মা পরমপুরুষের কৃপালাভের আশায় ব্যস্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে, সীতারাম দিল্লীযাত্রা করিয়াছে শুনিয়া, তোরাব খাঁ মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সীতারামের অভাবে সহরে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মৃন্ময় (বাহুবল) ও গঙ্গারাম (মন) চন্দ্রচূড়ের (বিবেকের) মন্ত্রণায় আটঘাট বন্ধ করিয়া দুর্গের মধ্যে থাকাই স্থির করিলেন। বাহুবল অসমসাহসী কিন্তু বিবেকবুদ্ধি চারি দিক্ দেখিয়া কায করে (Discretion is the better part of valour) তাই মৃন্ময়ের ইচ্ছা অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করা, চন্দ্রচূড়ের ইচ্ছা আটঘাট বাঁধিয়া কায করা। নন্দারও তাই মত। রমার কিন্তু ভয়, অন্য অন্তঃপুরবাসিনীরাও তমোগুণান্বিত, তাহারাও সর্ব্বদা সশঙ্ক। জীবাত্মা জ্ঞানহারা হইলে এইরূপই হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে, রমা গঙ্গারামকে আচ্ছন্ন করিল। মন তমোগুণে আচ্ছন্ন হইল। মোহে সে একেবারে 'ভ্যাবা গঙ্গারাম' হইয়া গেল। সহায় মুরলা, রমার সহচরী অর্থাৎ প্রলোভন, পাপের সহচরী, অন্তরপুরের প্রহরী পাঁড়ে ঠাকুরকে (বাহেন্দ্রিয়কে) প্রলোভনে ভুলাইয়া গঙ্গারামকে পাপের পথে লইয়া চলিল। মন মজিতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে, রমা ও গঙ্গারামের পরামর্শ। আশ্চর্য্য কি, জীবাত্মা যদি জ্ঞানহারা হইয়া পরমপুরুষের ধ্যানে মগ্ন হইতে চায় কিন্তু মনকে সঙ্গে লইয়া না যায়, তাহা হইলে তমঃ আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে। মন পাপের দিকে ছুটিয়া যায়। একা চন্দ্রচূড় মৃন্ময়কে লইয়া কি করিবে? মৃন্ময়ও আবার গঙ্গারামের অধীন। দেহ কি মন ছাড়া কোন কায করিতে পারে? গঙ্গারাম রমার রূপে ভুলিয়াছে। ঠিক্ হইল, শত্রুকে বিনাযুদ্ধে দুর্গ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বেচারা চন্দ্রচূড় একা আর কি করে? কাযেই পুরীরক্ষার জন্য শত্রুদের সহিত মৌখিক সদ্ভাব দেখাইতে লাগিলেন, দরদস্তর চলিতে লাগিল, উদ্দেশ্য সময় কাটান, যতদিন না সীতারাম ফিরিয়া আসেন। বিবেকবুদ্ধি কৌশল অবলম্বন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেও ঐ রূপ চলিল। মুরলা আবার গঙ্গারামকে সঙ্গে হইয়া রমার কাছে পৌঁছাইয়া দিল। প্রলোভন ক্রমেই পাপের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদে, দেখা যায়, গঙ্গারাম একেবারে জাহান্নমে যাইতে বসিয়াছে। 'সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ'। এদিকে চন্দ্রচূড়ের কৌশল সেই ভাবেই চলিতে লাগিল।

---

* মুরশিদ কুলি খাঁ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য দেখুন।

এখানে মহম্মদপুরে এইরূপ অবস্থা—শ্রীহারা সীতারাম দিল্লীতে; উপেক্ষিতা রমা গঙ্গারামকে মজাইয়াছে; রজোময়ী নন্দা একা, সহায় চন্দ্রচূড় ও মৃন্ময়। দ্বারে শত্রু। পাঠক চল, একবার আমরা শ্রীর অনুসন্ধান করিয়া আসি। আমাদের ভাগ্যে কি কখনও শ্রীদর্শন আছে—না ঘটিবে? সত্ত্বগুণময়ী শ্রী ভক্তিরূপিণী জয়ন্তীর সঙ্গে বিরূপাতীরে ললিতগিরির হস্তিগুম্ফায় মনোরম নিভৃত স্থানে গুরুর নিকট উপস্থিত। সেথায় গুরুর আদেশ হইল—'স্বামিসন্দর্শনে যাও', 'জয়ন্তী তুমিও সঙ্গে যাও'। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ে একত্র না যাইলে সীতারামকে কে রক্ষা করিবে? উভয়ে ভৈরবীবেশে ত্রিশূলহস্তে মহম্মদপুরের দিকে চলিল, চলিল জ্ঞান ও ভক্তি—অন্তরপুরে জীবাত্মাকে বাঁচাইতে। জ্ঞান ও ভক্তি একত্র না হইলে জীবাত্মাকে কে রক্ষা করে? সঙ্গে সঙ্গে গুরুকৃপাও চাই, নতুবা জ্ঞান ও ভক্তি জীবাত্মার উদ্ধারের জন্য যত্নশীল হইবে কেন? দুইজনে পথ আলো করিয়া চলিল বটে, কিন্তু সীতারামের নাম কেহই মুখে আনিল না। যে সীতারাম এই শ্রীর জন্য পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল, সে কি গণ্ডমূর্খ! পাঠক বোধ হয়, দুটাকেই ডাকিনীশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিবেন কারণ এই দুইটার হাতে পড়িলে রাজ্য ছারখার। আর রাজ্যেরই বা প্রয়োজন কি? গ্রন্থকারের কি ইহাতে সম্পূর্ণ মত ছিল? আমার কিন্তু সে মত নয়। যদি গুরুকৃপায় জ্ঞান ও ভক্তি, এই দুই ডাকিনীকে পাওয়া যায়, আমি আর সব ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কি পাগলের মত বকিতেছি? সব ছাড়িয়া দিলে তবে গুরুকৃপা, তবে এই দুই ডাকিনীর আবির্ভাব। অষ্টম পরিচ্ছেদের এই সারকথা।

নবম পরিচ্ছেদে, এক বন্দে আলি আসিয়া জুটিল। রমার যেমন মুরলা, ইনি সেইরূপ তোরাব খাঁর অনুচর। ইনি গঙ্গারামকে অভয় দিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁর সহিত গঙ্গারামের মিলনের দিনস্থির করিয়া গেলেন। গঙ্গারাম তমোজনিত মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমেই পাপের পিছল পথে অগ্রসর হইতেছে। ফিরিয়া যাইবার সময় চাঁদশাহের সহিত বন্দে আলির সাক্ষাৎ। বিষয়বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে।

দশম পরিচ্ছেদে, গঙ্গারামের সহিত ফৌজদারের পরামর্শ। রমার মোহে অর্থাৎ তমোগুণের আতিশয্যে গঙ্গারাম এতদূর মুগ্ধ যে, সীতারামের রাজ্য নির্বিঘ্নে ফৌজদারের হাতে তুলিয়া দিবে, সঙ্কল্প করিল। ইহাও ফৌজদারের সঙ্গে পরামর্শ হইল যে, ফৌজদার একপথে নদী পার হইবেন, মৃন্ময়কে ফৌজ দিয়া অন্যপথে পাঠান হইবে। যে পথে মৃন্ময়কে পাঠান হইল, সাবধান হইবার জন্য কৌশলে চন্দ্রচূড়কে সেই পথে নিযুক্ত রাখা হইল। মন পাপানুগামী হইলে দৈহিকবল বা বিবেকবুদ্ধি অনেক সময়ে বিপথগামী হইয়া পড়ে; কিন্তু চাঁদশাহ ফকির পরামর্শের সময় গঙ্গারামের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সংসার বা বিষয়বুদ্ধি তখনও মনকে ছাড়ে নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদে, রমার আজ্ঞায় মুরলা আবার গঙ্গারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। মুরলা রমার প্ররোচনায় গঙ্গারামের সহিত দেখা করিতেছে। প্রলোভন মনকে মোহাচ্ছন্ন করিতে আসিয়াছে। হঠাৎ যুগল ভৈরবীমূর্ত্তির আবির্ভাব। ভয়ে মুরলার মুখ কালি হইয়া উঠিল। উভয় ভৈরবী—জ্ঞান ও ভক্তি—প্রথমে মুরলাকে (প্রলোভন) আটক করিয়া চন্দ্রচূড়ের (বিবেকের) সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, চন্দ্রচূড়ের চাঁদশাহ ফকিরের মুখে গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদপ্রাপ্তি। বিষয়বুদ্ধি এখনও বিবেকবুদ্ধির সহায়। পরে চন্দ্রচূড়ের জয়ন্তীর দর্শন-লাভ। বিবেকের সহিত ভক্তির সমাযোগ, শ্রী (জ্ঞান) আসে নাই, নাই আসুক, একা ভক্তিই যথেষ্ট। বিবেক হতাশ হইয়া ভক্তিকে বলিতেছেন—'মা আমার সাধ্য আর কিছু নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগররক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগর রক্ষা করিতেছে না, সৈন্য আমার বশ নয় (সবই মনের অধীন) আমি কি করিব?' কথোপকথনের পর চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে 'ভক্তিভাবে' জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন। "তবে আমিই এই পুরীরক্ষা করিব"—এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল। শ্রী বাহিরে ছিল। জ্ঞান না থাকিলেও কেবল ভক্তিতে মুক্তি হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, জয়ন্তী পাপচিন্তায় দুর্ম্মনায়মান তমোমোহাচ্ছন্ন গঙ্গারামের সমক্ষে উপস্থিত; গঙ্গারাম তটস্থ। মন এখন ভক্তির নিকট চোরের ন্যায় দণ্ডায়মান। গঙ্গারাম একেবারে যেন নিবিয়া গেল। গঙ্গারামের সকল পাপচিন্তাই জয়ন্তীর পরিজ্ঞাত সুতরাং সে দ্বিরুক্তি না

করিয়া জয়ন্তী যাহা যাহা চাহিল, সকলই দিল। গঙ্গারামকে ছাড়িয়া গোলাগুলি-বারুদ লইয়া জয়ন্তী পুরীরক্ষা করিতে চলিলেন। সহসা ছদ্মবেশী সীতারামের আবির্ভাব। ভক্তি মালমস্‌লা যোগাইতেছে, পুরুষ সীতারাম পুরীরক্ষার্থে নিযুক্ত, কিন্তু শ্রী সেখানে নাই। পুরুষ ভাবিতেছে, পুরীরক্ষা করিলেই বা কি? 'ততঃ কিং?' নির্ব্বেদগ্রস্ত পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল 'যা চাই, পুরীরক্ষা করিলে তা পাইব কি?' ভক্তি বলিল 'পাইবে'। ভক্তি জানে, পুরুষ জ্ঞান চায়, সীতারাম শ্রীকে চায়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে, চন্দ্রচূড় দেখিলেন, তোপের মুখে যবনসৈন্য উড়িয়া গেল। কয়খানা নৌকা কিন্তু ডুবে নাই, সেই কয়খানা নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া অপর পারে পলায়ন করিল। শত্রু পলাইল, সমূলে ধ্বংস হইল না। দুর্গরক্ষা হইল, কিন্তু পুনরাক্রমণের ভয় রহিল। চন্দ্রচূড় একেবারে মুগ্ধ, বলিতেছেন—"জয়, জগদীশ্বর, জয় দৈত্যদমন ভক্তত্তারণ ধর্ম্মরক্ষণ হরি, আজ বড় দয়া করিলে। আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নয় ত এই পুররাজলক্ষ্মী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, নহিলে তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে, তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মানুষের সাধ্য নহে।" কথাও ঠিক্। ভক্তি-প্রণোদিত সীতারামই শত্রুদমনে কামান দাগিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, সব ষড়যন্ত্র পণ্ড হইল দেখিয়া গঙ্গারামের রাগ। কিন্তু গঙ্গারাম যখন সীতারামকে দেখিল, তখন গঙ্গারাম আর নাই। সীতারামকে দেখিয়া গঙ্গারাম সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইল।

> "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
> ক্রোধাদ্ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ॥
> স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"
>
> —দ্বিতীয় অঃ, ৬২।৬৩ শ্লোক।

ষোড়শ পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। সন্ধ্যার পর সংবাদ আসিল, বিজয়ী মৃন্ময় সশরীরে ফিরিয়া আসিতেছে। শুনিয়া; চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন—'মহারাজ আর দেখেন কি? নদী পার হইয়া ভূষণা দখল করুন।' এই ভূষণা-দখলের কথা তৃতীয় খণ্ডে আছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে, শ্রী ও জয়ন্তীর কথোপকথন। ভক্তি জ্ঞানকে উপদেশ দিতেছে। জ্ঞান কিছুতেই জীবাত্মার কাছে যাইতে রাজি নয়। শ্রী সহসা রাজাকে দর্শন দিল না, তাহার ভরসা হইতেছে না। এইখানে দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তি।

ভক্তি আসিয়াছে, জ্ঞানও আসিয়াছে, তখনও সন্ধ্যা, তখনও সন্দেহ। সীতারামের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। চকিতের ন্যায় একবার জয়ন্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, একবার মাত্র ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট, রাজ্যরক্ষা হইল। সীতারাম (জীবাত্মা) কিন্তু এখনও সন্দেহদোলায়। তাই দ্বিতীয় খণ্ড—সন্ধ্যা—জয়ন্তী।

তৃতীয় খণ্ড

[রাত্রি—ডাকিনী]

ভূষণা দখলের কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার অর্থ, জীবাত্মা এখন ইন্দ্রিয়জয় করিয়া দেহের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। গল্পটি যে ইতিহাস নয়, গ্রন্থকার তাহা এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। "উপন্যাস-লেখক অন্তর্ব্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান্।" বাহুবলে ও দিল্লীর সনন্দের বলে রাজত্ব স্থাপন হইল—দ্বাদশ ভৌমিকের উপর অর্থাৎ সমস্ত চিত্তবৃত্তি—আশ্রয়-স্থানের উপর।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথা উঠিল। গঙ্গারাম তমোগুণে আচ্ছন্ন, রমার দোষ কি? রমা তো সীতারামের আছেই, দোষ গঙ্গারামের। মনই পাপী। সাক্ষী মুরলা (প্রলোভন) ও চাঁদশাহ (বিষয়বুদ্ধি) ও পাঁড়ে ঠাকুর (বাহেন্দ্রিয়)। মনের বিচার হইবে। রমা নিজের জন্য কাঁদিয়া ভাসাইতেছে, নন্দা শান্ত করিতেছে—বিপদ্ উভয়েরই। নন্দার পরামর্শে রমা বুক বাঁধিল, ঠিক্ হইল রমা দরবারে উপস্থিত হইয়া সকলের সমক্ষে সকল কথা প্রকাশ করিবে। সীতারাম মত দিলেন, চন্দ্রচূড়ও অমত করিলেন না। কিন্তু উভয়ের ভয়, রমা কথা কহিতে পারিবে না। বিচার হইবে কার? মনের; মন তমো-গুণাচ্ছন্ন হইয়া পাপের দিকে চলিয়াছে—জীবাত্মার সর্ব্বনাশ করিতে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটিই তো জীবাত্মার নিজস্ব

(গীতা ১৪ অঃ ৫ম শ্লোক)। ইহাদের প্রত্যেকটি অপর দুইটিকে অভিভব করিয়া আপন প্রাধান্য জাহির করে (১৫ অঃ ১০ম শ্লোক)। এখানে তাহাই হইয়াছে। শ্রী (সত্ত্ব) নাই, নন্দা (রজঃ) থাকিয়াও না থাকার মধ্যে, কাযেই রমার প্রাধান্য হইয়াছিল। মন প্রলোভনে ভুলিয়া রমার কাছে যায়। এখন জীবাত্মা (সীতারাম) রিপু দমন করিয়াছেন, দিল্লীর সনন্দ পাইয়াছেন, আর কি রমার প্রাধান্য থাকে ? সে কাঁদিয়া ভাসাইতেছে, আর কি তাহার কথা কহিবার যো আছে ? এখন পাপগ্রস্ত মনের প্রায়শ্চিত্ত চাই। তাহারই আয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, দরবার-বর্ণনা। রমা প্রকাশ্যসভায় যাইতে প্রস্তত। বিচারক স্বয়ং জীবাত্মা, আসামী মন, সাক্ষী মুরলা (প্রলোভন), চাঁদশাহ (বিষয়বুদ্ধি) ও পাঁড়ে ঠাকুর (বাহেন্দ্রিয়); অপরাধ তমোগুণসৌন্দর্য্যমুগ্ধ মন দ্বারায় জীবাত্মার রাজত্বধ্বংসের চেষ্টা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিচার। ১ম সাক্ষী চন্দ্রচূড়, ইনি মনকে শত্রুদমনে ভুয়োভুয়ঃ উত্তেজনা করিলেও মন শুনে নাই। ২য় সাক্ষী চাঁদশাহ, সে মনকে জীবাত্মার বিরুদ্ধে রিপুগণের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়াছে। চাঁদশাহ পরামর্শের সময় সঙ্গে সঙ্গে ছিল। ৩য় সাক্ষী পাঁড়ে ঠাকুর, বাহেন্দ্রিয়গণও মনের কু অভিসন্ধি প্রকাশ করিল। ৪র্থ সাক্ষী মুরলা (প্রলোভন), কিরূপে সে মনকে ভুলাইয়াছিল প্রকাশ করিল। ৫ম সাক্ষী রমা স্বয়ং। রমা বলিতেছে—"আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতোয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, কোতোয়াল আসিয়া আজ্ঞা শুনিয়াছিল মাত্র, তার আর বিচারই বা কেন ? আর আমি বলিবই বা কি ?" নগরবাসীরা সন্তুষ্ট হইল না। চিত্তবৃত্তিসমূহ পরিতৃপ্ত হইল না। রাজা বিচার করিতে বসিয়া বড়ই গোলে পড়িলেন, কে দোষী, মন না তমঃ ? রমা গঙ্গারামকে দোষী বলিতেছে, গঙ্গারাম রমার ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছে. এই সমস্যার মীমাংসা হইবে কিরূপে ? জয়ন্তী (ভক্তি) স্বয়ং আসিয়া মধ্যস্থতা করিল। ভক্তিস্পর্শে মন তখন আপনার লোভ, মোহ, বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা সবই কবুল করিল। বিচারে গঙ্গারামের বধদণ্ডের আদেশ হইল, কিন্তু আপাততঃ সে কারারুদ্ধাবস্থায় থাকিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই মুরলার (প্রলোভনের) বিদায়। পরে অভিষেকের উদ্যোগ। অবস্থা কি ? জীবাত্মা প্রলোভনকে সরাইয়া পাপানুগামী মনকে আবদ্ধ করিয়াছে। রমাও একরকম পরিত্যক্তা। আছে কেবল রজোগুণময়ী নন্দা, চন্দ্রচূড়, ও মৃন্ময়। আর আছে, বৃত্তিসমূহ—প্রজাবৃন্দ, ইহাদের উপরেই প্রভুত্বস্থাপনের ব্যবস্থা অর্থাৎ অভিষেক। প্রজাবৃন্দ চরিতার্থ হইলে পর অর্দ্ধরাত্রের পর বিশ্রাম। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীর আবির্ভাব, গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা—বিনিময় শ্রী। জীবাত্মা তখন আপনার ভাবেই আপনি ভোর, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, অহংজ্ঞানে মুগ্ধ, অন্ধকার চারিদিকে ঘেরিয়াছে, রাত্রি উপস্থিত, তাই শ্রীকে চাই, জ্ঞানের আলোক পাইলে অন্ধকার ঘুচিবে, এই আশা। দিবার আলোক উপভোগ করিবেন এই আশা, ঠিক্ হইল তাহাই হইবে। মন নির্ব্বাসিত হইবে, শ্রীকে পাইবেন, শ্রীকে লইয়া সুখে রাজত্ব করিবেন। কিন্তু এদিকে যে অন্ধকার ঘেরিয়াছে, সে জ্ঞান নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে, গঙ্গারাম কারাগারে (মন বদ্ধাবস্থায়) শ্রীর (সত্ত্বগুণের) কথা ভাবিতেছে। সে এখন রমার (তমোগুণের) ঘোর শত্রু। তাহার পর গঙ্গারামের মুক্তি। মুক্তি দিলেন স্বয়ং ভক্তি—জয়ন্তী। জয়ন্তী বলিতেছে, "শ্রী বাঁচিয়া আছে, তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবনভিক্ষা পাইয়াছি"। গঙ্গারাম পলাইল, সেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রমার পীড়া। রমা যাইতে বসিয়াছে, তবুও সীতারামের দেখিতে যাইবার অবসর নাই, ইচ্ছাও নাই। সীতারাম শ্রীর ধ্যানে মগ্ন, জয়ন্তীকে চায় না, নন্দার উপরও মন নাই। হঠাৎ শ্রী আসিয়া দেখা দিল। যে মূর্ত্তিতে আসিল এ সে শ্রী নয়, দেবীমূর্ত্তি! "মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল, দেবী লইয়া কি করিবে ?" রাজা যে জ্ঞানের জন্য লালায়িত, এ সে জ্ঞান নয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদে, সীতারাম ও শ্রীর আলাপ। শ্রী শিক্ষা দিতেছে। কে কাহাকে শিক্ষা দিতেছে ? জ্ঞান শিখাইতেছে—ভক্তিযোগ—অহংকারাচ্ছন্ন জীবাত্মাকে। শ্রী বলিতেছেন—"ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভালবাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখদুঃখ নাই। ঈশ্বরের অংশ, স্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই, ইত্যাদি"।

অহংকারাচ্ছন্ন সীতারামের কি তাই ভাল লাগে ? তিনি বলিতেছেন—"আমি তোমার স্বামী, আমার সহবাসই তোমার ধর্ম্ম, তোমার ধর্ম্মান্তর নাই"। শ্রী সীতারামের কাছে অবস্থান করিতে রাজি হইল বটে কিন্তু প্রাসাদে নয়, সন্ন্যাসিনীবেশে কুটীরে। শ্রী আরও বলিল—"ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ, আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া শুদ্ধচিত্তে আমার সহিত আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বসন ছাড়িব।" হায় সীতারাম, এ শ্রী তো তোমার শ্রী নয়। আসক্তি ছাড়, তা না ছাড়িলে কি এ শ্রীকে রাখিতে পারিবে? জয়ন্তী যে নাই কে ধরিয়া রাখিবে? ভক্তি বিনা জ্ঞান কি থাকে ?

অষ্টম পরিচ্ছেদে 'চিত্তবিশ্রাম' নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রী তাহাতে পৃথক্ আসনে বসিল। মন নাই, গিয়াছে, এ আবাস চিত্ত-বৃত্তি-গঠিত, তাই ক্ষুদ্র, তাই মনোরম। শ্রীর সহিত আলাপটা কি রকম হইল মনে কর? শ্রী বলিত জ্ঞানের কথা, কত ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, কর্ম্ম-অকর্ম্মের কথা। কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা। কার সহিত কার কথা হইতেছে? জ্ঞান বুঝাইতেছে, চিত্ত-বৃত্তি-বেষ্টিত জীবাত্মাকে। শুধু জ্ঞানের সাধ্য নয় যে, জীবাত্মাকে উদ্ধার করে। সীতারাম বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। প্রথম প্রথম শ্রীর সহিত অল্প সময়ের জন্য দেখা, ক্রমে সময় বাড়িতে লাগিল, ক্রমে বিশ্রামভবনেই বাস, আসক্তিতে ডুবিলেন, রাজকার্য্য এক রকম ছাড়িয়া দিলেন। সেখানে যাইবার কাহারও হুকুম নাই, আসক্তি ঘেরিয়া রাখিয়াছে, চন্দ্রচূড় ভাসিয়া গেল, চাঁদশাহেরও আর দেখা নাই। রাজার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি অহংকার-রূপ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আসক্তি বেশ ঘেরিয়াছে। শ্রীকে (জ্ঞানকে) পাইয়াও পাইতেছেন না। শ্রী ভিন্নআসনে আসীনা, শ্রী (জ্ঞান) ধরা দিয়াও ধরা দিতেছে না। রাজকার্য্যে আদৌ মন নাই।

নবম পরিচ্ছেদে নগরবাসীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কতক পলাইল, কতক পলাইবার চেষ্টায় ঘুরিতেছে, কেউ বা ঘর-বাড়ীর মায়া ত্যাগ করিতে পারিতেছে না ইত্যাদি ব্যাপার। তাই এই পরিচ্ছেদে শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদের অবতারণা। ঘোর চিত্তবৃত্তিবিপর্য্যয় ঘটিল। রাজার সবই যায় যায়।

দশম পরিচ্ছেদে, স্থূল তত্ত্ব-জ্ঞান আসিয়াছে বটে কিন্তু সীতারাম (জীবাত্মা) কামনাপূর্ণ হৃদয়ে আসক্তির সহিত জ্ঞানকে আত্মসাৎ করিতে চাহেন, তাই কি পাওয়া যায়? হায় সীতারাম এখনও সাবধান! আসক্তি ছাড়, কামনা ছাড়, অনাসক্ত হইয়া জ্ঞানের সেবা কর। এখনও শত্রু আসে নাই, এখনও তোমার চন্দ্রচূড় আছে—মৃন্ময়ও আছে। জয়ন্তীকে চলিয়া যাইতে দিয়া ভাল কর নাই। অত আসক্তি থাকিলে ডুবিবে, শ্রী পলাইবে, নিজে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, অন্ধকারে মিশাইবে। সীতারামের উভয় সঙ্কট। শ্রী ছাড়ি—কি কামনা ছাড়ি? 'রাজার তখন ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবলা।' উভয়ই পাওয়া অসম্ভব। আসক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, সব যায়, সীতারাম সাবধান! অনাসক্ত না হইলে সবই পণ্ড হইবে।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

—২য় অঃ ৬২।৬৩।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

—৩য় অঃ ১৯।

একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে জীবাত্মার একটা বন্ধন খসিল। রমার রোগবৃদ্ধি, পরে মৃত্যু। তমোগুণের তিরোভাব।

ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে রাজার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। রমা গেল, শ্রী ধরা দেয় না, নন্দা থাকায় না থাকা। আর বাকি কি? বাকি ঘোর অহংকার, ঘোর আসক্তি। চন্দ্রচূড়ের কথাও ভাল লাগে না। চাঁদশাহ তো অনেক দিন হইল বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। বিষয়বুদ্ধি অনেক দিন লোপ পাইয়াছে। বিবেকও যায় যায়। দিল্লীশ্বরের প্রাপ্য কর দেওয়া হয় না, আদায় হয় না, প্রজারাও দেয় না। পীড়নের আদেশ হইল, অনেকে পলাইল, আগুন লাগিল, ঘর পুড়িল। শ্রী না আসিলে রাজ্যশাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিতেন। শ্রী আসিয়াই গোল বাধিল। যদি শ্রী আসিয়া নন্দার সহিত যোগ দিত, তাহা হইলে এতটা অবনতি হইত না।

কেবল অহংকার ও ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইতেছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুর একেবারে লোপ না হউক, কিছু খর্ব্বতা হইত। কিন্তু শ্রী এখন সত্ত্বগুণময়ী—বন্ধনরূপিণী নয়, জ্ঞানরূপিণী দেবী। এমন দেবী সম্মুখে থাকিতেও সীতারাম একপ্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায়। ভোগলালসাই তাহার কারণ। চন্দ্রচূড়ও পলাই পলাই ডাক ছাড়িতেছেন।

যোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদে জয়ন্তী শ্রীর সহিত দেখা করিয়া স্থির করিল—'জয়ন্তী একা থাকিবে, শ্রী পলাইবে।' যেমন কথা অমনি কায। জ্ঞানের অন্তর্দ্ধান, ভক্তি একা। জ্ঞানহীনা ভক্তিকে ডাকিনীবোধে সীতারাম বেত্রাঘাতে বিদায় করিবেন ঠিক্ করিলেন। নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হিন্দুর চক্ষে ভক্তিই রাজ্যরক্ষার ভিত্তি ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পাঠক অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথা আর কি বলিব? হিন্দুর সে কথা কাণে আনাই উচিত নয়। সাক্ষাৎ ভক্তির অপমান। আজকাল কিন্তু এটা তত দোষের নয়। ভক্তি আবার কি? ভক্তি কি গাছে ফলে? ভক্তিতে কি ভাতকাপড় মিলে? তাই আমরা প্রায় সকলেই সীতারামের দশাপ্রাপ্ত, ভক্তিকে চাবুক মারিয়া বিদায় করিয়াছি, অথচ শ্রীর (জ্ঞানের) সঙ্গে আমাদের দেখাই নাই। সীতারামের অন্তঃপুরে কিন্তু নন্দা তখনও ছিল। নন্দা আসিয়া জয়ন্তীকে আদর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। কিন্তু জয়ন্তী অন্তঃপুর হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন, অন্তঃপুরের মালিক যে তাঁহাকে চায় না। সীতারাম, কি করিলে? একে একে সব হারাইলে? এতই গর্ব্ব, এতই মোহ, ঘোর অন্ধকার—ভক্তিকে ডাকিনী বোধে বেত্রাঘাতে তাড়াইলে? ভক্তিরও গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। জয়ন্তী মনে করিয়াছিল, শ্রীকে বিদায় করিলে রাজার আসক্তি যাইবে, রাজা অনাসক্ত হইবে, আমি একাই আসর জমাইব। তাহা তো হইবার নয়। জ্ঞানকে সহায় না করিলে, ভক্তি একা দাঁড়াইতে পারে না, একা কিছুই করিতে পারে না। জ্ঞানহীনা ভক্তি তো অহংকারাচ্ছন্ন জীবাত্মার নিকট ডাকিনীবোধে বেত্রাঘাতে বিতাড়িতা হইবেনই। হইলও তাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে চন্দ্রচূড় (বিবেক) পলাইতেছেন, পথে চাঁদশাহের (বিষয়বুদ্ধির) সহিত দেখা। সীতারামের বুদ্ধিভ্রংশের চূড়ান্ত ঘটিল।

"ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বিংশ পরিচ্ছেদে জয়ন্তী আবার শ্রীকে শিক্ষা দিতেছে—

"কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।"
—১৮ অঃ ৯ শ্লোক।

ভক্তি এত লাঞ্ছিতা হইয়াও জীবাত্মার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলা। ভক্তি ও জ্ঞান আবার একত্র হইয়া মহম্মদপুরের দিকে চলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রথমেই সীতারামের অবস্থা দেখাইতেছেন। গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল, তবু সীতারামের চৈতন্য নাই—বাকি মৃন্ময় (শারীরিক বল) আর নন্দা (রজোগুণ)। যতক্ষণ দেহ, ততক্ষণ এ দুটিও রহিবে। শত্রু আসিয়া পৌঁছিল, গড় ঘেরাও করিল, মৃন্ময় মরিল, শারীরিক বলও এত দিনে লোপ পাইল। রিপুগণের শেষ চেষ্টায় তাহার আজ শেষ, ভোগবিলাসের শেষ, রাজ্যের শেষ, জীবনের শেষ। তখন সীতারামের মোহ কাটিল, আসক্তিও গেল সবই গেল। এখন সীতারাম মরিয়া হইয়া নন্দার নিকটে উপস্থিত। আবার রজোগুণের বিকাশ। সীতারাম দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিলেন, বাহিরে শত্রুর কামান গর্জ্জিতে লাগিল। সীতারাম আবার যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময় দেখিলেন, যে বেদিতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদিতে শ্রী ও জয়ন্তী বসিয়া রহিয়াছেন। যে বেদিতে ভক্তি অপমানিতা হইয়াছিলেন, আবার সেই বেদিতে ভক্তি, পাপীর উদ্ধারের জন্য পুনরাবির্ভূতা। ভক্তির স্বরূপই এই। তাই নদীয়ার প্রেমাবতার গাহিয়াছিলেন—

"মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

জ্ঞান ও ভক্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন, আসক্তিও গিয়াছে। কিন্তু শেষ সময়। ইহাও সীতারামের ভাগ্য। আমাদের ভাগ্যে তাহাও হয়ত ঘটিবে না। শেষ পর্য্যন্ত আসক্তি থাকিবে, আর জ্ঞানভক্তিও আসিবে না। যাক্ সে কথা। জয়ন্তী বলিল—"মহারাজ, নিরুপায়ের এক উপায়

আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? জানিতেন, জানিয়াও ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়ে না?" সীতারামের মনে পড়িল। তখন সীতারাম মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন—"হে অগতির গতি,আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?" গর্ব্ব গিয়াছে, অহঙ্কার আর নাই। তখন সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী শ্রী ও জয়ন্তী দুই হাত যুক্ত করিয়া, উর্দ্ধনেত্র হইয়া, ডাকিতে লাগিল—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।"

শুনিয়া সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন, আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন। চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদে, দুর্গমধ্যে যে কয়জন মাত্র রক্ষী বাকি ছিল, তাহারা আবার উৎসাহে লাফাইয়া উঠিল—তাহারই বর্ণনা। রক্ষীরা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল—"জয় সীতারামকি জয়!" সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কাণে গেল।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদে সীতারামের মহাপ্রয়াণ। সীতারাম সূচিব্যূহ রচনা করিলেন, স্বয়ং সূচিমুখে, অগ্রে শ্রী ও জয়ন্তী ত্রিশূলহস্তে। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা। শ্রী ও জয়ন্তী ত্রিশূলাঘাতে পথ সাফ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সূচিব্যূহ অবলীলাক্রমে যবনসেনা ভেদ করিয়া চলিল। জীবাত্মা দেহ ছাড়িয়া যাইতেছে। রজোগুণ তখনও রন্ধ্রগত, ভক্তি ও জ্ঞান, পথ সাফ করিয়া চলিয়াছে। কামনা, আসক্তি, ইন্দ্রিয়বিকার প্রভৃতি রিপুগণকে পরাস্ত করিয়া জীবাত্মা চলিয়াছে। এখন সীতারামের মনে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা, জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া তাঁহার নিদেশবর্ত্তী হইয়া মরিবেন। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" জয়ন্তীর মুখে হরিনাম শুনিয়া সীতারাম এখন আত্মজয়ী হইয়াছেন—'ভক্তি ভাবে ডাকলে তবে হরি মিলে।' এখন রিপুগণ তাহার কাছে কোন্ ছার!

মন একবার পাপকলুষিত হইলে, যতই কেন নিগৃহীত হউক না, তবু সর্ব্বনাশ করিতে ছাড়ে না। শেষ সময়েও একবার মরণকামড় কামড়াইতে চায়। পথে গঙ্গারাম আবার গোলন্দাজ-বেশে কামান লইয়া, সীতারামকে তোপে উড়াইয়া দিবার জন্য পথ আটকাইল। শ্রী তোপের মুখে বুক দিল। গঙ্গারাম সরিয়া দাঁড়াইল। এবার জ্ঞান বুক দিয়া বাঁচাইল। সীতারাম তাহার মস্তকচ্ছেদ করিয়া, তাহারই কামান লইয়া শত্রু তাড়াইতে তাড়াইতে চলিল। চলিল কোথায়—বৈরিশূন্য স্থানে। যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, আসক্তি নাই, বিকার নাই,—যেখানে চিরশান্তি বিরাজমানা, সেইখানে যাইয়া পৌছিল।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদে, জ্ঞানভক্তি মনের যথারীতি সৎকার করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। দুই ডাকিনী সেই ঘোর রাত্রে কোথায় মিলাইয়া গেল। আসক্তির ফল ফলিল। ইতি তৃতীয় খণ্ড, রাত্রি—ডাকিনী।

পরিশিষ্ট। সীতারামের (জীবাত্মার) শেষ কি হইল, কোথায় গেল, কেহ জানে না। যে যা ইচ্ছা তাই বলে। তাই রামপ্রসাদের গানটি মনে পড়িল—

"বল্ দেখি ভাই কি হয় মলে?
এই বাদানুবাদ করে সকলে!
কেহ বলে ভূত-প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মিলে।—"
ইত্যাদি॥

সম্যক্ দৃষ্টি

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

মোরা হেরি মধ্য শুধু—তাই হেরি শতদ্বন্দ্বভেদ,
আদি অন্তে নাহি জানি, যথা মিলে সকল বিচ্ছেদ।
মোরা হেরি অংশ শুধু—তাই হেরি সবি লক্ষ্যহারা,
সমগ্রেরে নাহি জানি, যথা সবি নিয়ন্ত্রিত তারা।
কমলের শতদলে হেরি মোরা বৈচিত্র্যে বিকাশ,
রহে ঢাকা বৃন্ত তার অবলম্ব—মিলন-নিবাস।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, M. A., B. L.]

"ওই শুন, পুন বাজে—
মজাইয়া মন রে,—
মুরারির বাঁশী !"

কেমন করিয়া ঘরে থাকি—ঐ যে বাঁশী বাজিতেছে ! প্রাণকে আকুল করিয়া, পূর্ব্বজন্মের সুখস্মৃতির ঢেউ তুলিয়া, সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা অতি তীব্র মধুর স্বরলহরীতে ভাসাইয়া, ঐ শুন মুরলী বাজিতেছে—

'নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদু বেণুং'

না,—আমি কোন মতেই ঘরে থাকিতে পারিলাম না।

'নাচিছে কদম্বমূলে
বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকারমণ।'

বিশ্ব-কদম্বমূলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন। ভক্ত তাহা শুনিয়া, সংসার-ধর্ম্ম—বিষয়-সেবা ফেলিয়া—ইন্দ্রিয়-গণের অধীনতা ছিন্ন করিয়া, ঐ বংশী ধ্বনি শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটিয়া আসিলেন ; প্রাণের হরির অঙ্গে ও প্রাণে, নিজের অঙ্গ ও প্রাণ মিশাইয়া দিলেন।

যাহা হঠাৎ অশ্লীল ইন্দ্রিয়সেবার উৎসব মনে হয়, তলাইয়া বুঝিয়া দেখিলে, সেটা যে চমৎকার আধ্যাত্মিক রূপক, তাহা বুঝা যায়। তাই যোগী স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"রাধা-কৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম্ম ও যোগ-পথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই, মনে করি। রাধা—ভক্ত, কৃষ্ণ—উপাস্য, দেবতা, পরমেশ্বর। এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আমি ঐ ভাব-সাধনের চেষ্টা করি, এবং যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান, তাঁহাদিগকে লইয়া একত্র রাধাকৃষ্ণের গান করিয়া থাকি।"

বিষয়-নিষ্ঠা বা ইন্দ্রিয়-সেবাতে জীব যখন মগ্ন থাকে, তখন এ বাঁশী শুনিতে পায় না,—তখন সে বধির। যখন ভগবানের দিকে মতিগতি হয়, তখন মানুষ ঐ বাঁশী শুনিতে পায়, ঐ বংশীধ্বনি শুনিয়া যেন হৃদয়ের মধ্যে একটা নূতন আলোক দেখিতে পায়। তখন সে ভক্ত, যোগী, সংযমী। তখন তাহার সহিত সাধারণ লোকের অনেক ব্যবধান। অজ্ঞ ভূতগণ যেখানে ঘোর আঁধার দেখে, ভক্ত সেখানে দিবালোক দেখিতে পান। আর অজ্ঞ ব্যক্তি যাহা আলোক মনে করে, ভক্তের নিকট তাহা অন্ধকার। তাই শাস্ত্রকার বলেন—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

দেহ ও আত্মার মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। এক দিকে নিজের দেহের সুখে নিজের সুখ, আর একদিকে অন্যের সুখে নিজের সুখ। একদিকে নিজের সঙ্কীর্ণ কায়িক সুখে আবদ্ধ থাকিবার ইচ্ছা, আর এক দিকে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় জীবের সহিত মিশিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা—এই দুইটি প্রবৃত্তি অনবরত মানব-হৃদয়ক্ষেত্রে যেন সুরা-সুরের সংগ্রাম করিতেছে। যেন দেবী স্বর্গের দিকে উঠিতেছেন,—দৈত্য তাঁহাকে ধরিবার জন্য, নরকে নিক্ষিপ্ত করিবার জন্য, তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী যেমন গোপীগণকে, সংসার-ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, বৃন্দাবনচন্দ্রের নিকট আনিত,—তেমনি ভগবৎ-প্রীতি ভক্তগণকে, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের বিলাসগৃহ হইতে বাহির করিয়া, ভক্তিময় আত্মজ্ঞান সুখে বিভোর করে।

বিলাসিতাকে দমন করিয়া মানব-প্রেমকে—"সর্ব্ব-ভূতে-দয়া"কে ফুটাইয়া তোলাই সভ্যতার উদ্দেশ্য, ধর্ম্মের সাধনা, সৃষ্টির পরিণাম।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই, ক্ষুধা ও কাম জীবের প্রাথমিক পরিচালক। আদিমনিবাসী ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য নরমাংসও ভোজন করে। একজন সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, এক নরমাংস-ভোজী

তাহার মাংসল যুবতী সঙ্গিনীকে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিল—এবং সাহেবকে বলিল—"এই মাংস বড়ই সুস্বাদু!" এই ব্যক্তির সহিত হাউয়ার্ড ও জনষ্টুয়ার্ট মিল, ঈশা ও বুদ্ধের কত প্রভেদ! বিজ্ঞানের দ্বারা ডার্বিন প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পশুজাতি হইতে মানবজাতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই সহচরীমাংস-ভোজীর সহিত বুদ্ধদেবের তুলনা করিলে, বোধ হয় যে, মনুষ্যজন্মেই পশুভাব হইতে মনুষ্যভাবের উদ্বর্ত্তন হইয়াছে। মনুষ্যের প্রথম অবস্থা—পরস্পরের সহিত শত্রুভাব। ঐ যে মৃত্তিকা-নিক্ষিপ্ত অন্নমুষ্টির জন্য "কেলো" ও "ভুলো" কুকুরদ্বয় কামড়া-কামড়ি করিতেছে, প্রথম অবস্থায় মানুষও তেমনি করিত। তখন মানুষে মানুষে শত্রুতাভাব—কামড়া-কামড়ি। মানুষ যখন পরিবারগঠন করিতে শিখিল, তখন তাহার এই কামড়া-কামড়ি—এই শ্বপ্রকৃতি—পরিবারমণ্ডলের ভিতর হইতে তিরোহিত হইল, মানুষ তখন স্বর্গের সোপানের প্রথম ধাপে উঠিল—তখন তাহার ভিতরে আত্মার অঙ্কুর উদ্গত হইল! তখন দেহের সুখের অতীত একটা পদার্থ—অর্থাৎ অন্যের প্রতি স্নেহ—অনুভব করিল। মনুষ্যের ভিতর এইরূপে আত্মা স্ফুরিত হইতে লাগিল। যাউক সে কথা—তাহা অন্যত্র বলিব।

জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ প্রথমে ক্ষুধা ও কামকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করে। যখন তাহা পরিতৃপ্ত হয়, তখন দেহ-সেবার জন্য বহুশ্রমসাধ্য নব নব দ্রব্য ভোগ করিতে চাহে—তাহার অপেক্ষা যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা তাহার অধীন, তাহাদিগের দ্বারা এই সকল সুখ-ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করাইয়া লয়।—ইহাই হইল বিলাসিতার জন্মবৃত্তান্ত।

বিলাসিতা বিষবৃক্ষ! তাহার মূল, কাম বা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা; তাহার কাণ্ড, অহঙ্কার! তাহার পুষ্প, ভোগ! আর তাহার ফল—দুঃখ। দুঃখ,—বিলাসী ব্যক্তির নিজের দুঃখ; আর যে সকল লোক বিলাসী ব্যক্তির ভোগের জন্য শ্রম করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগের দুঃখ। একটা কথা এইখানে আগেই বলিয়া রাখি—এ কথাটা হঠাৎ একটা ধোঁকা মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য।—কতক লোক দরিদ্র না থাকিলে বিলাসিতা চলে না;—যদি সকলের অবস্থা ভাল হয়, কেহ কাহারও দাসত্ব না করে, তাহা হইলে বিলাসিতা বর্দ্ধিত হইবার অবকাশ পায় না। মনে করুন, কোন বিলাসী ধনীব্যক্তির বৃহৎ অট্টালিকা, বিস্তীর্ণ উদ্যান, বহু অশ্ব ও অশ্বযান আছে। কল্পনা করুন,—সমাজের সকলেই সঙ্গতিসম্পন্ন—কেহ কাহারও দাসত্ব করিতে আসে না। ধনীর সেই বৃহৎ অট্টালিকা, সংস্কার না করিলে থাকে না—খসিয়া পড়ে; সুতরাং নিজে ও নিজ পুত্র, তাহার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র সংস্কার করিতে লাগিলেন—অবশিষ্ট বৃহৎ অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল! পঞ্চাশটি ঘোটক আছে; ধনী স্বয়ং দুইটি ঘোটকের জন্য তৃণ-সংগ্রহ করিতে ও তাহাদিগের নিত্য সেবা করিতে পারেন; সুতরাং, অবশিষ্ট আটচল্লিশটি ঘোড়া বনে ছাড়িয়া দিলেন! তাঁহার বাগানে একশত বিঘা জমী আছে;—তাঁহার পুত্রকন্যা শ্রম করিয়া দুই বিঘা জমী মাত্র আবাদ করিতে সমর্থ হইলেন; অবশিষ্ট জমি জঙ্গল হইয়া গেল! ধনীর ভাণ্ডারে বহু কনক ও রজত মুদ্রা, বহু মণিমাণিক্য রহিয়াছে; কিন্তু সকলেরই গৃহে প্রচুর খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে; সুতরাং, সেই বিলাসী ধনীর অর্থের লোভে কেহ দাসত্ব করিতে চাহিল না! অগত্যা ধনী ও তাহার পরিবারবর্গ দায়ে পড়িয়া সংযমী হইলেন, এবং সমাজ হইতে বিলাসিতা বিতাড়িত হইল।

এখন পাঠক দেখিলেন, দারিদ্র্য না থাকিলে বিলাসিতা থাকে না। অন্যদিকে বিলাসিতা না থাকিলে—অর্থাৎ সকলেই যথাসাধ্য পরিশ্রম করিলে, এবং বহুবক্তির শ্রমজাত দ্রব্য একজন নষ্ট, বা আবদ্ধ করিয়া না রাখিলে—সমাজ হইতে দারিদ্র্য তিরোহিত হয়। এই কথাটা Karl Marks প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ মূলধনের ব্যাখ্যায় আভায দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন—"That only is capital which is a means of production owned by one person (or group of persons), and used to produce things for the benefit of another, generally by means of hired labour of a third, in such wise that the first has *the opportunity of plundering or exploiting the other*."—রস্কিন এই কথাটা, অতি পরিস্ফুট করিয়া, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু Plundering or exploiting the other"—এই বাক্যবাণে ধনিগণ কুপিত হইলেন,

যুদ্ধ বাধিল; সেই যুদ্ধ এখনও চলিতেছে—সে যুদ্ধ প্রাচীনে ও নবীনে, কামে ও দয়ায়, বিলাসিতায় ও সংযমে।

য়ুরোপের বিলাসিতার দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাস ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে। তাই ভারতবাসী, অধুনা নর নারায়ণের সেবা ভুলিয়া, বিলাসযজ্ঞে আহুতি দিতেছে—বিলাস-ভোগ্য দ্রব্যসম্ভারের বন্যায় দেশটা ছয়লাপ হইবার উপক্রম হইয়াছে! য়ুরোপীয় বিলাসের কোটাল বান ডাকিয়াছে—ভক্তিতত্ত্বের নাবিকগণ "সামাল সামাল" ডাক ছাড়িতেছেন—ভক্তির তরী টলমল করিতেছে, ডুবু ডুবু হইয়াছে! গগনে অজ্ঞানের নিবিড় ঘনঘটা গর্জ্জন করিতেছে; ধরায় "বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গং" জলনিধিবৎ জড়াত্মক বিলাসোন্মাদ উচ্ছ্বসিত হইতেছে!—আমাদিগের বড়ই সঙ্কট, বড়ই দুর্দ্দশা উপস্থিত! বিলাসমোহে চন্দনবোধে পুরীষে গাত্র চর্চ্চিত করিতেছি, সুধাজ্ঞানে বিষপান করিতেছি, এবং মৃত্যুকে জীবন বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি! একদিকে বাহ্য চাক্‌চিক্য—বাহ্যাড়ম্বর, আর একদিকে ভীষণ দারিদ্র্য;—একদিকে বিলাসভোগপ্রমত্ত ভাগ্যবান্‌দিগের সুখসঙ্গীত, আর একদিকে দারিদ্র্যনিপিষ্ট জনসঙ্ঘের দীর্ঘনিশ্বাস;—একদিকে ঐশ্বর্য্যের তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, আর একদিকে অভাবের অতলস্পর্শ নিখাত!—ইহা আধুনিক জড়াত্মক য়ুরোপীয় সভ্যতার অনিবার্য্য ফল! এই জন্য আমি বিলাসতত্ত্বটা একটু আলোচনা করিতেছি।

সহৃদয় হেনরী জর্জ্জ, দীনহীন জনের দুঃখে কাতর হইয়া, 'PROGRESS AND POVERTY' গ্রন্থে মার্কিণ ও য়ুরোপীয় সমাজে জ্বালাময়ী চিন্তার বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে জেনারল বুথ, এই দারিদ্র্যের প্রতিকারের জন্য, 'IN DARKEST ENGLAND' প্রণয়ন করিলেন এবং, তাঁহার 'Salvation Army' গঠন করিয়া, দরিদ্রদিগকে আহার ও আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আর বার্ণাডো ও প্রাতঃস্মরণীয় মূলার, কত অনাথ বালক-বালিকাকে আশ্রয় দিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে রস্কিন, রুষিয়াতে টলষ্টয়—আমাদিগের প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম নূতন প্রণালীতে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্যদিকে সাম্যবাদিগণ, Socialists নাম লইয়া, প্রচার করিতে লাগিলেন যে—"From each according to his capacity. To each according to his wants!"—সমাজে, যাহার যেমন শক্তি তাহার তেমনি, শ্রম করা উচিত; আর, যাহার যেমন অভাব, সমাজের ভাণ্ডার হইতে তাহাকে সেইরূপ প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি দেওয়া কর্ত্তব্য।—ইহা হিন্দুদিগের "সর্ব্বভূতে দয়া"—সেই প্রাচীন নীতির রূপান্তর মাত্র!

Adam Smith, Richards, J. S. Mill প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ সমাজে দেহ-সেবা ও অহঙ্কার, অর্থাৎ স্বার্থপরতা-চালিত হইয়া লোকে যে ব্যবহার করে, তাহার ফল অনুসারে ধনতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। Robert Owen, John Ruskin, Karl Marks ইত্যাদি মনীষিগণ, সমাজের লোকের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাই বিবৃত করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণ ধনসম্বন্ধে সংসারে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই লিখিলেন। পশ্চাল্লিখিত অর্থনীতি-বিদ্‌গণ সমাজে ধনসম্বন্ধে যাহা হওয়া উচিত, তাহাই প্রচার করিলেন। কেনওয়ার্দি (Kenworthy)-প্রণীত THE ANATOMY OF MISERY নামক গ্রন্থখানি শেষোক্ত শাস্ত্রের গীতা। ক্রমে আধ্যাত্মিক ভাব বিলাস-প্রধান প্রাচীন ধন-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে লাগিল; তাই, বিলাসভোগ্য দ্রব্য-সম্বন্ধে ধনতত্ত্ববেত্তা মার্শাল, তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে, একরকম আপোষ করিয়া লিখিলেন,—'বিলাস ভোগে সমাজে শ্রমশীলতা ও উন্নতি বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু সেখানে শ্রমের সাফল্য ও শক্তি বর্দ্ধিত হয় না। সেখানে বিলাসিতাকে দমন করিয়া সারবান্ ও স্থায়ী দ্রব্যজাত—যাহা ভবিষ্যতে শ্রমি-সহায় হইবে, এবং সমাজের নানাবিধ উপকার সাধন করিয়া জীবনকে মহত্তর করিবে, এমন দ্রব্যজাত—উৎপাদন করিলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়।'

"The enjoyment of luxuries affords an incentive to exertion, and promote progress in many ways. But, if the efficiency and energy of industry are the same the true interest of a country is generally advanced by the subordination of the desire for transient luxuries to the attainment of those more solid and lasting resources, which will assist industry in its future work and will

in various ways, tend to make life larger."
—Marshall.

এখন প্রশ্ন এই—বিলাস-দ্রব্য কাহাকে বলা যায়? এক সময় যাহা সৌখীনদ্রব্য মনে হয়, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা নিতান্ত আবশ্যক, অপরিত্যাজ্য সামগ্রীশ্রেণী-ভুক্ত হয়! একদিন জুতা মাত্র বিলাস-সামগ্রী বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু এখন জুতা অপরিত্যাজ্য!—তামাক ও চা এক সময়ে সখের জিনিস ছিল, এখন তামাক ও চা না হইলে, জীবন-ধারণ যেন আর চলে না!—পূর্ব্বে তালপত্রের আতপ-বারণ হইলেই চলিত, এখন বিলাতী আতপত্র না হইলে চলে না! —সুতরাং, বিলাস-দ্রব্যের বা সৌখীন বস্তুর লক্ষণ কি তাহাই নির্ণয় করা যাউক। দেখা যায়—

(১) যে দ্রব্য জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আবশ্যক হয় না, অথচ তাহার ব্যবহারে সুখবোধ হয়;

(২) যাহার ব্যবহারে যে পরিমাণে সুখভোগ হয়, তাহার উৎপাদনে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে কষ্টভোগ হয়; সুতরাং, নিজে উৎপাদন বা সংগ্রহ করিতে হইলে, কেহ যাহা ব্যবহার করিত না;

(৩) যে দ্রব্য একজনের সুখের জন্য, অনেক ব্যক্তি শ্রম করিয়া উৎপাদন করে;

এইরূপ বস্তুবর্গকে বিলাস-দ্রব্য বলা যাইতে পারে।

যাঁহারা নাস্তিক, তাঁহারা বিলাসপক্ষপাতী। চার্ব্বাক ইন্দ্রিয়ারাম বিলাসকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছেন; তিনি বলেন—

'স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগে দেহযোগ,
পরকাল ভোগাভোগ—নাহি কিছু—নাহি কিছু।'

তিনি বলেন—ঈশ্বর নাই, কেন না—

'নয়নের অগোচর,
আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশ্ব
বল কোথা রয় হে—
বল কোথা রয়।
কি কহিব আহা আহা,
কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা,
কিছু কিছু নয় হে—
কিছু কিছু নয়।'

যেহেতু ঈশ্বর নাই, পরকালও নাই,—তখন কি করা বুদ্ধিমানের কার্য্য? তাহার উত্তর দিতেছেন—

'কলেবর মনোহর,
কেবল ভোগের ঘর;
সেই কর্ম্ম সদা কর
যাহে সুখোদয় হে—
যাহে সুখোদয়।'

শাস্ত্র, দেহের অসংযত সুখ-ভোগকে দূষিয়াছেন,—তাহা অন্তিম দুঃখের আকর বলিয়া মানুষকে সাবধান করিয়াছেন। কিন্তু চার্ব্বাক বলিতেছেন—

'শাস্ত্রকার ভাঁড় যত,
লিখিয়াছে নানা মত,
তাদে'র অলীক মত
প্রাণে নাহি সয় হে—
প্রাণে নাহি সয়।'

সুতরাং, বিলাসের স্রোতে ইন্দ্রিয়-সুখতরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া—

'রসাভাষ রসরঙ্গে
কর কালক্ষয় হে—
কর কালক্ষয়।'

চার্ব্বাকের এই মতটা যে ভারি সূক্ষ্ম, ইহার উদ্ভাবনে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। অরণ্যের পশুরাও চার্ব্বাকের মতে কার্য্য করে—দৈহিক সুখ অন্বেষণ করে; তাহাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য কোন চার্ব্বাকের আবশ্যক হয় নাই। চার্ব্বাকের মতে চলিলে মানুষ পশু হইয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, মনুষ্য আদিম অবস্থায় পশু ছিল—কেবল ক্ষুধা ও কাম পরিতৃপ্ত করিত। তৎপরে তাহার হৃদয়ে নিজ পরিবারের প্রতি স্নেহের আবির্ভাব হইল;—তখন সে নিজের সুখের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সুখের জন্য ব্যস্ত হইল। তখন তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে দুইটি কমনীয় কুসুম ফুটিল—তাহার স্বর্গীয় শোভা ও সৌরভে তাহার হৃদয় পুলকিত হইল; ইহার একটি পুষ্প—বাৎসল্য; আর একটি প্রসূন—দাম্পত্য-প্রণয়। মানুষ তখন অন্যের সুখের জন্য কষ্টস্বীকার করিতে শিখিল।

বলিয়াছি,—তখন তাহার হৃদয়নিহিত আত্মার অঙ্কুর হইল। দেহের ভিতর দেহের প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন। ইনি যতই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, ততই দেহের দোর্দ্দণ্ডশাসন খৰ্ব্ব করিতে লাগিলেন, এবং জীবকে প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে—দেহের সুখের অতীত, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ অতিক্রম করিয়া, একটা অনির্ব্বচনীয় সুখশান্তি বিরাজ করিতেছে। দেহকে সুস্থ রাখিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া, সেই সুখশান্তি লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়-সুখের অপেক্ষা সেই সুখ স্থায়ী, সমাজের পক্ষে—পরস্পরের পক্ষে—মঙ্গলজনক। আত্মার বিকাশ হইলে জীব অনুভব করিল যে, এই যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়জগৎ রহিয়াছে—এই যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত দেখিতেছি, ইহার অন্তরালে একটি সত্ত, একটি শক্তি বিরাজ করিতেছেন। যেমন দেহের অন্তরালে আত্মা আছে, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবরণের ভিতর, এক পরমাত্মা আছেন। মনুষ্যের যখন এই জ্ঞানটি পরিস্ফুট হইল, তখনই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইল—তখন দেহের উপর আত্মার আধিপত্য আরও দৃঢ়-ভাবে স্থাপিত হইল। তখন হইতে মনুষ্য, বিলাসিতা বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা যে দোষের আকর, সমাজের অনিষ্টজনক, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল!

কিন্তু চার্ব্বাক যেমন নাস্তিকতার পোষকতা করিয়াছেন, তেমনি অনেকে, তর্কের দ্বারা, বিলাসিতার পোষকতা করেন। তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বিলাসিতা সমাজের পক্ষে ইষ্টজনক। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিলাসিতা দারিদ্র্যবৰ্দ্ধক; কিন্তু ইঁহারা বলেন, বিলাসিতা দরিদ্রদিগের কার্য্যের ও অন্নের সংস্থান করে—বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য বহু দরিদ্রের জীবিকানির্ব্বাহ হয়।

যদি ইহা হইত, তাহা হইলে বিলাস-ভোগহুতাশনে যত অধিক পরিমাণে বিলাস-দ্রব্যের আহুতি দিবেন, তত অধিক পরিমাণে (বিলাস-দ্রব্য-নির্ম্মাতা) শ্রমীদিগের মুখে খাদ্য বর্ষিত হইবে! যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে বিলাসের কুসুমাস্তৃত সহজ সোপান দিয়া ধনী বিলাসিগণ অনায়াসে ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিলাসীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; উদাহরণদ্বারা এই ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি।—

ধরুন—সংযমী রামের ২০০ বিঘা জমী আছে; তাহাতে ৮০০ মণ চাউল উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে ২০০ মণ চাউল তিনি ভিক্ষুকদিগকে দান করেন। রামের মৃত্যু হইল। রামের পুত্র, শ্যাম ঐ ২০০ বিঘা জমী পাইলেন। শ্যাম কিন্তু বিলাসী। তিনি ভিক্ষা দেওয়া একেবারে বন্ধ করিলেন; এবং আদেশ দিলেন যে, আমি ৮০০ মণ চাউল চাহি না। ৬০০ মণ চাউল চাহি, এবং ২০০ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে, রেশম চাহি। সুতরাং, এখন ১৫০ বিঘা জমিতে চাউল উৎপন্ন এবং বাকী ৫০ বিঘাতে তুঁতের আবাদ হইতে লাগিল।

এখন দেখুন—রামের সময়, রামের জমিতে যাহারা চাষ করিত, তাহারা তখন যেমন খাইতে পাইত, শ্যামের সময়—এখনও তাহারা তেমনি খাইতে পাইতে লাগিল; কিন্তু ভিক্ষুকগণ ত্যাগী রামের সময় যাহা খাইতে পাইত, ভোগী শ্যামের সময় তাহা মোটেই পাইল না। তবেই, এখানে শ্যামের রেশম-উৎপাদন করাই যে সেই ভিক্ষুকগণের অনাহারের কারণ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

সুতরাং, আমরা এখানে দেখিতেছি যে, ভিক্ষুকগণ সম্বন্ধে ২০০ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে রেশম-উৎপাদন করাও যাহা, আর ২০০ মণ চাউল গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়াও তাহাই। তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত করায় মোটের উপর লোককে বৰ্দ্ধিত আহার দেওয়া হয় না, বরঞ্চ লোককে আহার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কেহ কেহ আমার এই মীমাংসায় আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন,—

'ধরুন—রামের সময় যেমন সমুদয় জমিতে ধানের চাষ হইত, শ্যাম তাহা বজায় রাখিলেন; রাম যেমন ভিক্ষুক দিগকে ২০০ মণ চাউল দিতেন, শ্যামও তাহাই দিতে লাগিলেন; কিন্তু ভিক্ষুকদিগের দ্বারা তিনি এখন রেশম-প্রস্তুত করাইয়া লইতে লাগিলেন। এস্থলে খাদ্যের পরিমাণ কমিল না,—ভিক্ষুকগণ পূর্ব্বে যেমন খাইতে পাইত, এখনও সেই পরিমাণে খাইতে পাইতে লাগিল; কিন্তু এখন আর তাহারা ভিক্ষুক থাকিল না, এখন তাহারা শ্রমী হইল। উপরন্তু, একটা নূতন দ্রব্য, অর্থাৎ রেশম, প্রস্তুত হইল; ইহাতে, গরীব লোকের খাদ্যের পরিমাণ না কমিয়া, ধনীর বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত হইল।'

ইহার উত্তর—শ্যাম যদি তাঁহার সমুদয় জমীতে রামের

ন্যায় ধানের আবাদ করেন, তাহা হইলে অবশ্য পূর্ব্বের অপেক্ষা খাদ্যের পরিমাণ কমে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে—শ্যাম যদি তাঁহার সমুদয় জমীতে ধানের চাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার রেশমের জন্য তুঁতের আবাদ হইবে কোন্ জমীতে?—গাছ ব্যতীত রেশম হয় না। গাছ কেন —যে কোন দ্রব্য চাহ, তাহার উৎপাদনের জন্য মূলে জমির আবশ্যক; সুতরাং, বিলাস-ভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে, অবশ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে পরিমাণে সমাজে বিলাসোপকরণ বৃদ্ধি হয়—সেই পরিমাণে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়।

আমি উপরে যাহা বলিলাম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"Demand for commodities, is not demand for labour." তিনি যে ভাবে এই কথাটা বুঝাইয়াছেন, তাহা ঠিক। কিন্তু 'Demand for commodities is not demand for labour,' এই ভাষাটা আপত্তিজনক। তাই Dr. Pearson লিখিয়াছেন—"This assertion has been rightly discribed paradoxical; demand for goods, is certainly demand for labour."—আমরা অর্থনীতির এই জটিল তর্কে প্রবেশ করিতে চাহি না। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রতিপাদ্য বিষয় আমি অন্যত্র যে সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই উপরে উদ্ধৃত করিলাম।

বিলাসতত্ত্ব দুই প্রকার—কাম-বিলাসতত্ত্ব ও ভক্তি-বিলাসতত্ত্ব। দ্বিবিধ বিলাসতত্ত্বই আমার আলোচ্য বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি জীবকে কায়িক বিলাসবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ভক্তি-বিলাসতত্ত্বে লইয়া গিয়া, ভগবৎপ্রেমস্বরূপ পরমানন্দে বিভোর করে। তজ্জন্য, এই বিলাসতত্ত্ব সন্দর্ভের আরম্ভে ও শেষে কেশবের মুরলীধ্বনির উল্লেখ করিলাম। আমার এই প্রবন্ধ "শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি"র গীতি।—ওঁ ভগবতে নমঃ।

সন্ন্যাসী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

গার্হস্থ্য সুখ ত্যাজ্য করে, নগ্নদেহে ভস্ম মাখি,
বেড়াও শত তীর্থে ভ্রমি—কাহার পদে মনটি রাখি?
মাথায় তোমার জটিল জটা, মান যে তোমার অপমানই,
পোষাক তোমার ক্ষুদ্র কৌপীন—ভবন তোমার ভারতখানি,
মুক্ত তুমি বেড়াও ভবে, মুক্ত দেহে মুক্ত প্রাণে,
রাজা তোমার শরণ যাচে, হিন্দু তোমার মরম জানে,
ভণ্ড বেড়ায় তোমার সাজে—তোমায় লোকে ভণ্ড বলে,
ধন্য তুমি পুণ্য তুমি—লুটাই তোমার চরণতলে!
আঁধার গিরিগহ্বরমাঝে, বৃষ্টি-শিশির-রৌদ্র-বাতে—
অনাহার ও অর্দ্ধাশনে জাগো তুমি কাহার সাথে?
স্তিমিত আঁখি—অচল দেহ—মগ্ন রহ কাহার ধ্যানে—
মুখে তোমার পুলক-জ্যোতিঃ—কোন মহাধন উপার্জ্জনে?
পেয়ে কাহার কৃপার কণা তুচ্ছ কর ধরায় তুমি—
অধিকারী আনন্দেরি হলে কাহার চরণ চুমি!
দারুণ ধরা-কারার ব্যথা জুড়াই আমি তোমায় দেখে—
ধন্য কর দাসকে তোমার চরণ-রজের অভিষেকে।
অপমান ও দুঃখকে লও তুমিই শুধু বরণ করে,
সংসারেরি বিষটুকু লও—পীযূষ রাখি পরের তরে।
পিয়ে হরির প্রেমামৃত—লভি সরস পরশ তাঁরি,
জীবকে করো আপন তুমি—ইন্দ্রিয়কে আজ্ঞাকারী—
চরণ-ধূলায় পুণ্য ভূতল—পুণ্য গগন হোমের ধূমে—
পুণ্য সলিল—পুণ্য অনিল, তোমার লাগি ভারতভূমে।
তীর্থ আছে—দেবতা আছে—আমরা আছি তোমার বলে,
ধন্য তুমি—পুণ্য তুমি—লুটাই তোমার চরণ-তলে!

নিবেদিতা

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

(২৭)

সত্য কি? দেশে পদার্পণ করিয়াই শুনিলাম, সত্য-পালনের জন্য ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম তাঁহার শিশুকন্যাটিকে বালক আমার হস্তে সমর্পণ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পিতামহীও আমার বিবাহ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন;—পত্রে পত্রে পিতাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। সমস্ত গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-শূদ্র, এমন কি দেশের কৃতবিদ্য জমীদার পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই জেদের পোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরও প্রেরিত অনেক অনুরোধ-পত্র পিতার নিকটে আসিয়াছিল।

কেহই আমার অথবা বালিকার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। এত অল্প বয়সে বিবাহ যে, নরহত্যার সঙ্গে তুলনীয়, ইহা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একজনও বুঝেন নাই, অথবা বুঝিতে চাহেন নাই। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া, আমাকে লইয়া পিতার দেশে প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সকলের মুখে এক কথা—ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা। ব্রাহ্মণের মনঃপীড়া নিজেরই মনে করিয়া, প্রত্যেক গ্রামবাসী এই এক বৎসর ধরিয়া আপনাকে উৎপীড়িত বোধ করিয়াছে।

কিন্তু পিতা কিছুতেই তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই এক বৎসরের মধ্যে দেশে ফিরিলেন না। শুধু এক বৎসর কেন—পূর্ব্বোক্ত ঘটনা না ঘটিলে—তিনি বোধ হয়, আর দেশে পদার্পণ করিতেন না। এই বিবাহের ভয়েই পিতামহের সাম্বৎসরিক কার্য্য পর্য্যন্ত অনিষ্পন্ন রহিয়াছে। পাছে, লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া, আমার বিবাহে সম্মতি দিতে হয়। পিতা সমস্ত লোকনিন্দার ভার চিরজীবনের জন্য বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এ বিবাহ না দিলে তাঁহাকে একঘরে হইতে হইবে, আমারও ভবিষ্যতে বিয়ে হওয়া দুর্ঘট হইবে—এরূপ অনেক বিভীষিকার পত্রও তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। এ সকল ভয়-প্রদর্শনে পিতা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সঙ্কল্প, কিছুতেই এই বর্ব্বরোচিত সামাজিক প্রথার সম্মুখে তিনি পুত্রবলি—আত্মবলি দিবেন না।

পত্রে পিতামহীকে তিনি বহুবার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতামহী তথাপি পিতাকে উত্ত্যক্ত করিতে নিরস্ত হন নাই। শেষে তাঁহার জেদ তাঁহাকে হুগলীতে পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়াছে। সেখানে পিতার কাছে তাঁহার কেবল তিরস্কার—দারুণ তিরস্কার—লাভ হইয়াছে।

ইহাও শুনিলাম, সার্ব্বভৌম স্বহস্তে পিতাকে এক পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পিতাকে তাঁহার সত্যরক্ষার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "সামান্য মাত্রও আড়ম্বর না করিয়া হরিহরের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দাও। কেবলমাত্র আমার সত্যরক্ষা—আমার ধর্ম্মরক্ষা কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বিবাহের পর কন্যাকে তোমার গৃহে পাঠাইব না। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার পুত্রের সঙ্গে অন্য কন্যার বিবাহ দিয়ো। আমি আপত্তি করিব না। কেহ ভবিষ্যতে উৎপীড়ন না করে, তাহারও ব্যবস্থা আমি করিয়া যাইব। তুমি শুধু আমার সত্যরক্ষা করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।"

পিতা এ পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। অতি অর্ব্বাচীনের মত লেখা বলিয়া, বোধ হয়, পত্রের উত্তর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। অগত্যা ব্রাহ্মণকে আমার সম্বন্ধে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

কিন্তু—সত্য কি? ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষার কথা লইয়া দেশমধ্যে কিছুদিন ধরিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল—কিছুদিন গ্রামবাসীদিগের মধ্যে জল্পনা চলিয়াছিল। এ সত্য কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার্ব্বভৌম মহাশয় বিবাহ করিয়া

বহুকালের মত দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। বালিকা পত্নীকে গৃহে রাখিয়া, শাস্ত্রশিক্ষার জন্য ভারতের নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বেদ শিখিতে দ্রাবিড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া যখন তিনি দেশে ফিরিয়াছেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিজ্ঞা—স্বামীর স্মরণ মাত্র অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্যে পূর্ণাভ্যস্তা। এ ত্রিশ বৎসর একেবারে তিনি নিরুদ্দিষ্টের মত কালযাপন করেন নাই। এক এক চতুষ্পাঠী হইতে এক এক প্রকারের দর্শন শেষ করিয়া, তিনি এক একবার গৃহে ফিরিতেন। দিন কয়েকের জন্য গৃহে অবস্থান করিয়াই, আবার অন্যশাস্ত্র শিক্ষার জন্য অন্য দেশে যাইতেন।

কিন্তু তিনি আসিতেন ব্রহ্মচারীর বেশে। পিতামাতার চরণদর্শন করিতে, ব্রহ্মচারিণী পত্নীর পতি-দর্শনলালসা চরিতার্থ করিতে, তিনি মাঝে মাঝে এক একবার তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলে, একান্ত সত্যনিষ্ঠ না হইলে, বেদবেদান্তে কাহারও অধিকার জন্মে না। সেই ব্রাহ্মণ সত্যরক্ষার জন্য কাতরভাবে আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এ সত্য কি? রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেট তাঁহার বিচারমন্দিরে আনীত বদ্ধহস্ত যিশুখৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সত্য কি?" কিন্তু তিনি ইহার উত্তর শুনিবার অপেক্ষা করিতে পারেন নাই; মহাপুরুষের শ্রীমুখ-বিনির্গত বাণী শুনিবার পূর্ব্বেই তিনি বিচারাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মনে হয়, সত্য কি শুনিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই।

পিতৃসত্যপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে গিয়াছিলেন। একথা ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা হিন্দুর একজনেরও বোধ হয় অবিদিত নাই। অথচ এখনকার জ্ঞানের হিসাবে তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিলে, তাঁহাকে গণ্ডমূর্খ বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। যেদিন রামচন্দ্র—ঋষি অষ্টাবক্রের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন—"প্রজারঞ্জনের অনুরোধে যদি প্রাণসমা জানকীকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না;"—ঠিক সেই দিনেই দুর্ম্মুখ প্রজার নিকট হইতে জানকী সম্বন্ধে দুঃসংবাদ আনিয়া উপস্থিত হইল। ফলে জানকী নির্ব্বাসিতা হইলেন। সতীশিরোমণি একটা নীচ রজকের অনবধানতায় উচ্চারিত তুচ্ছ কথায় জন্মের মত পতিসঙ্গ হইতে বঞ্চিতা হইলেন। পুরুষের এরূপ নিষ্ঠুরতা ত আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। অথচ সমগ্র হিন্দুর চক্ষে সেই রাম শান্ত, শাশ্বত, অপ্রমেয়, অনঘ!

দস্যুর আক্রমণ হইতে এক নিরীহকে রক্ষা করিতে অস্ত্র আনিবার জন্য, অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সহিত অবস্থিতা দ্রৌপদীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে। ফলে দ্বাদশ বৎসরের জন্য তাঁহার নির্ব্বাসন!

এ তাঁহার স্বেচ্ছাগৃহীত শাস্তি। পরোপকার-প্রবৃত্তির দোহাই দিয়া, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে গৃহে থাকিতে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সত্য!—সত্যভঙ্গভয়ে তৃতীয় পাণ্ডব গৃহত্যাগ করিলেন! কাহারও অনুরোধ রহিল না!

ন্যায়-দর্শনকার ঋষি গৌতম বনগমন হইতে রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্তি করিতে যথেষ্ট যুক্তিতর্ক অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিজকৃত ন্যায়ের সাহায্যে তিনি রামচন্দ্রকে এমন বুঝাইয়াছিলেন যে, যুক্তিশেষে তাঁহার বোধ হইয়াছিল, চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস না করিলেও পিতা দশরথকে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না।

বাল্যকালে আমার নৈয়ায়িক পিতামহের মুখে গৌতম ঋষি সম্বন্ধে এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছিলাম। সবটা ভাল মনে নাই। তবে সে গল্প কতকটা এই রকম।

মনে কর কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কতকাল চাকরী করিতেছ?" তুমি উত্তর করিলে—"পাঁচবৎসর।" ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, তুমি এই পাঁচবৎসর দিবারাত্রই চাকরী করিতেছ! তুমি চাকরীও করিতেছ, ঘরেও রহিতেছ—অবকাশমত যখন যে কার্য্য করিবার—করিতেছ।

গৌতম রামচন্দ্রকে বুঝাইলেন, যদি কৈকেয়ীর কথামত তাঁহাকে বনবাসেই যাইতে হয়, তাহা হইলে বৎসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছুদিনের জন্য বনে অবস্থান করিলেই তাঁহার সত্যপালন হইবে।

আবার বনে যাইতে হইলেই যে হাজার ক্রোশ দূরের দণ্ডকারণ্যের ন্যায় ঘনবনেই তাঁহাকে যাইতে হইবে,

তাহারই বা মানে কি? যেখানে কতকগুলা ঘনসন্নিবিষ্ট শালতালতমালাদি গাছ আছে, তাহাকেই অভিধানে বন কহে। সে সময়ে অযোধ্যার কাছে এরূপ বনের অভাব ছিল না।

গৌতম বলিলেন—"রামচন্দ্র! অযোধ্যার উপকণ্ঠে তুমি এইরূপ একটা বনে গিয়া বাস কর না কেন!" তোমারও পিতৃসত্য পালন হইবে, কৈকেয়ীরও অভিপ্রায় ব্যর্থ হইবে।"

আসল কথা, যুক্তিতে রাম গৌতমের কাছে পরাস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহারা বোধ হইল, গৌতমের মতানুযায়ী কার্য্য করিলে দোষ নাই। করিলে, তাঁহাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না। করিলে, পুত্রবৎসল রাজা দশরথের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

শুনিয়াছি, প্রকৃতিস্থ হইতে—প্রকৃত সত্যনির্দ্ধারণ করিতে রামচন্দ্রের অনেক সময় লাগিয়াছিল। যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, দেশে এ শাস্ত্রের প্রচার হইলে ধর্ম্মের অবশিষ্ট তিন পাদ দেখিতে দেখিতে ভগ্ন হইয়া যাইবে, ত্রেতা একদিনে কলিতে পরিণত হইবে!

বুঝিতে পারিয়া, রঘুরাজ—গৌতম-প্রণীত শাস্ত্রের উপর অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন—"এ শাস্ত্র যে অধ্যয়ন করিবে, সে শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত হইবে।"

তোমরা কেহ কি বলিতে পার, এ সত্য কি? বড় বড় কথা আমরা অনেক কহিয়াছি। এখনও অনেক বড় বড় কথা কহিতেছি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম," "সত্যমেব জয়তে", "নাস্তি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ," "সত্যং বলং কেবলং" —এইরূপ মহাবাক্য আমরা মুখে কতবারই না উচ্চারণ করিয়াছি! কিন্তু যদি আমরা কোন সাধুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, হৃদয়ে হস্ত দিয়া, মুখের পানে চাহিয়া—প্রশ্নকরি, সত্য কি, আমার এখনও বিশ্বাস, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেকেরই হস্ত হৃদয়-প্রদেশ হইতে নামিয়া পড়ে। প্রশ্নের উত্তর শুনিতে সাহস থাকে না—পাইলেটের মত সাধুর মুখ হইতে উত্তর বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমাদের স্থান-ত্যাগে বাধ্য হইতে হয়। যে শুনিবার জন্য দাঁড়াইতে পারে, তুমি বুঝিবে, তাহার কতকটা সত্যের উপলব্ধি হইয়াছে।

সত্য কই—কোথায়? বর্ত্তমান যুগের এই উন্নতিশীল মানবসমাজ একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য ইহার অঙ্গে সত্যের অনুসন্ধান কর,—মস্তকের কেশাগ্র হইতে চরণ-তলের নখাগ্র পর্য্যন্ত দেখিবে—দেহের প্রতি পরমাণু ত্রেতার অভিশপ্ত ন্যায়ের ফাঁকিতে ঢাকা পড়িয়াছে।

হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন এই বাংলায় আসিয়াছিলেন, তখন এখানে একটি লোককেও মিথ্যাবাদী দেখিতে পান নাই। এই অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠ জাতিকে তিনি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হাজার বৎসর পরে মিথ্যাবাদীর 'কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া, সেই বাঙ্গালীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কাছে গালি খাইতে হইয়াছে। একথা শুনিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে! অথচ যাহারা বলিয়াছে, তাহারাও সত্য কি, এই প্রশ্ন করিলে প্রাচ্যের উত্তরের অপেক্ষায় ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াইতে সাহস করেন না।

বর্ত্তমান সভ্যতার অনুভূতির সীমান্তে অবস্থিত সেই সত্য এক সময় বাঙ্গালীর অবলম্বন ছিল। তাহার স্বরূপ কি, এখন আমাদের বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যে কার্য্য এখন আমাদের পুরুষকারের সাধ্যায়ত্ত নহে, এখন আমরা কেবল তাহার দোষানুসন্ধানেরই চেষ্টা করি। এবং তৎপরিবর্ত্তে একটা মিথ্যার প্রতিষ্ঠায় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের কার্য্যকলাপের উপর দোষারোপ করি।

সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার অনুপস্থিতির অবকাশে বাঙ্গালার প্রকৃতি কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর পূর্ব্ব চরিত্রের উপর দিয়া কি প্রবল ঝঞ্ঝা চলিয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি এই বাগ্দান ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কিছুদিন অবস্থানের পর এ পরিবর্ত্তন তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি দেখিলেন, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ-গৃহ হইতে ব্রহ্মচর্য্য ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। এখন যেভাবে তাহাদের শিক্ষা, তাহাতে ব্রাহ্মণবালকের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থারক্ষা বড়ই দুরূহ।

কিন্তু তখন আর উপায় নাই। কার্য্য আগে হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহদেবতার সম্মুখে ঘটস্থাপন করিয়া, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে তিনি আমাকে কন্যাদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। যেমন করিয়া হউক, সে সঙ্কল্প তাঁহার রক্ষা করিতেই হইবে।

সে সময়েও গ্রামবাসী তাঁহার সঙ্কল্পের মর্ম্ম সম্যক্

বুঝিতে পারে নাই। প্রতিজ্ঞারক্ষায় পিতার অনাস্থা দেখিয়া তাহাদের অনেকে দুঃখিত হইয়াছিল মাত্র। এমন কি, গোবিন্দ ঠাকুরদাও বুঝিতে পারেন নাই, কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইবার দুই একমাস পরে কন্যার বিবাহ হইলে, সার্ব্বভৌমের ধর্ম্মসম্বন্ধে কি অনিষ্ট হইবে! তিনি আমার সঙ্গে তৎকন্যার বিবাহের আশ্বাস তাঁহাকে দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"অঘোরনাথকে বাধ্য করিবার উপায় আমার কাছে আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনার কন্যার বিবাহের জন্য আমি দায়ী রহিলাম। দুই দিনের বিলম্বে আপনি ভীত হইবেন না।"

ব্রাহ্মণ এ আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হ'ন নাই। আশ্বাস বাক্য কাণেও তুলেন নাই। তিনি ধর্ম্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আমার পিতা যদি আমার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে, কি উপায়ে তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা হয়, সেই উপায় তিনি গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। একজন কেবলমাত্র তাঁহার সঙ্কল্পের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতামহী।

পিতামহী বুঝিয়াছিলেন, পিতা সার্ব্বভৌমের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। যদিও দেন, তাহা এমন সময়ে দিবেন, যাহাতে ব্রাহ্মণের বাগ্‌দানের কোনও ফল হইবে না। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা হইবে না। তিনিই কেবল ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিতে পারেন নাই। কোন্ মুখে তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিবেন! ব্রাহ্মণের বিপদে, স্বামীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ না হওয়ায় তাঁহার যে দুঃখ, তিনি সে দুঃখ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন।

তিনি ব্রাহ্মণকে দেখিলে, কেবলই কাঁদিতেন। তাঁহার কাছে আশ্বস্ত হইতে আসিয়া, ব্রাহ্মণের তাঁহাকেই আশ্বাস দিতে হইত।

প্রতীকারের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া পিতামহী ব্রাহ্মণের সমক্ষে কাঁদিতেন। এবং তাঁহার অন্তরালে কুলদেবতার কাছে তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার প্রার্থনা করিতেন। অনেকদিনের প্রার্থনায়ও যখন কিছু ফল হইল না, বৃদ্ধা যখন দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আর কিছুতেই রক্ষা হয় না, তখন মনের আবেগে কুলদেবতার সম্মুখে তিনি এক সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। করযোড়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন—"ঠাকুর! বালিকার দশবৎসর উত্তীর্ণ না হইতে যেমন করিয়া হউক, হরিহরকে আনিয়া দাও। আমি চক্ষুর উপর ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনাশ দেখিতে পারিব না। যদি না আন, তোমার সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি এই গৃহ পরিত্যাগ করিব।"

তাঁহার প্রতিজ্ঞার পর দিবসেই প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ পাগলের মত পিতামহীর নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। এবং তাঁহার সম্মুখে এক শালগ্রাম শিলাস্থাপন করিলেন। শিলা স্থাপন করিয়া বাষ্পগদগদস্বরে বলিলেন—"মা! আমি হরিহর পাইয়াছি। আমার ধর্ম্মরক্ষা হইবার উপায় হইয়াছে। এই মাসেই বিবাহের এক প্রশস্তদিনে তোমার এই পৌত্রের হাতে আমার দাক্ষায়ণীকে সমর্পণ করিব।" পিতামহী দেখিলেন শিলা—শিলা অপূর্ব্ব! তাহার একাংশ তুষারশুভ্র। অপরাংশ ঘনকৃষ্ণ। একদিকে হরির—অপরদিকে হরের অঙ্গকান্তি।

অন্যে এই সকল কথা শুনিলে, তাঁহাকে পাগল মনে করিত; পিতামহী কিন্তু তাহা করিলেন না। সার্ব্বভৌমের জ্ঞানের উপর তাঁহার অনুমাত্রও সংশয় ছিল না। তিনি সমস্ত বুঝিলেন। ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি নিজে শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইলেও, এটা জানিতেন, সার্ব্বভৌমের তুল্য পণ্ডিত ও সাধু, সে দেশে—সে দেশে কেন—সমস্ত বঙ্গ-দেশে তখন একজনও ছিল না। পিতামহী—পিতামহের কাছে একথা শুনিয়াছিলেন। স্বামি-বাক্যে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

সুতরাং সার্ব্বভৌমকে তিনি পাগল মনে করেন নাই। বুঝিয়াছিলেন, হরিহরের অভাবে এই শালগ্রাম শিলাতেই তাঁহার পৌত্রত্বের আরোপ করিয়া, ইঁহাকেই ব্রাহ্মণ কন্যাদান করিবেন।

দেবতার উপর অগাধ ভক্তি থাকিলেও—এক শিলাকে লক্ষ্য করিয়া, ব্রাহ্মণের কন্যাদানের চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইবামাত্র পিতামহীর প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। হৃদয়ের আবেগে তিনি নয়নযুগলকে অশ্রুশূন্য করিতে পারিলেন না।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ত আনন্দের কথা! নারায়ণ পৌত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া তোমার কোলে আসিতেছে! তবে তুমি কাঁদিতেছ

কেন মা?" পিতামহী উত্তর করিলেন—"আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। তবে কি জানেন ঠাকুর, আপনার মত আমার দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই। আপনি ইঁহাকে যেরূপ দেখিতেছেন, এ মমতান্ধের সেরূপ দেখিতে সামর্থ্য নাই। আমার অনুরোধ, এই দেবতাকে কন্যাদানের পূর্ব্বে আপনি একবার আমার সঙ্গে হুগলী যান।"

"বেশ যাইব।"

ঠিক এমনি সময়ে গণেশ খুড়াকে হুগলীতে পাঠাইবার জন্য পিতামহীর কাছে পিতার পত্র আসিল। পিতামহীরও হুগলী-যাত্রার সুযোগ ঘটিল। যাত্রার ফল সমস্তই পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

(১৮)

এখন শুধু পিতামহীকে ও তৎসঙ্গে অভাগিনী সার্ব্বভৌম-কন্যাকে ঘরে ফিরাইবার কথা। "অভাগিনী"—তাহার ভাগ্য ভাল কি মন্দ, একথা বিচার করিবার কাহারও সে সময় অবসর ছিল না। তাহার বিবাহের তত্ত্ব বুঝিতেও অতি অল্প লোকেরই সে সময় সামর্থ্য ছিল। সার্ব্বভৌমের কন্যাদান-মহোৎসবের প্রকৃতি দেখিয়া, সে দেশের প্রায় সমস্ত লোকেই আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিল। আত্মীয়স্বজন ব্রাহ্মণের মন রাখিতে এই বিবাহ-ব্যাপারে যোগ দিলেও, অনেকেই অন্তরালে অশ্রু-বর্ষণ করিয়াছিল। দক্ষিণ রায়ের আস্তানার সম্মুখ হইতে যে প্রৌঢ়া রমণী আমাকে বনভোজন করাইতে আমলকী-তলে রমণীমণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত করাইয়াছিল—শুনিয়াছি, বিবাহের দিন হইতেই "দাখীর" শোকে অন্নজল ত্যাগ করিয়া, সে একরূপ মরিতে বসিয়াছে।

আর দাক্ষায়ণীর মা? এতকাল আমি কেবল আমাদের দিক হইতেই এ ইতিহাসের কথা বলিয়া যাইতেছি। সত্যকথা বলিতে গেলে, সে বালিকার সঙ্গে আজিও পর্য্যন্ত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাতে আমাদের সে সম্পর্ক লইয়া, এতটা বাগাড়ম্বরের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। যাহা কিছু বলিবার, তাহা সেই মহীয়সী রমণী সম্বন্ধে বলিলেই সমীচীন ও শোভন হইত। যাহা কিছু ক্ষতি হইবার তা তাঁহারই হইয়াছে! তাঁহার "বত্রিশনাড়ী"-ছেঁড়া ধন আজ পথে পরিত্যক্ত হইয়াছে! সংসার পথে অগণ্য পথিক—সকলেই কি পথ দেখিয়া চলে? ধূলি-ধূসরিত এ অমূল্য রত্ন কত রূঢ় চরণতলে পড়িয়া যে পিষ্ট হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

পুত্র বলিতে—কন্যা বলিতে—বংশধর—এমন কি, ব্রাহ্মণ-দম্পতির সাধনার ফল বলিতে ওই একমাত্র কন্যা দাক্ষায়ণী; তাহার পরে অথবা পূর্ব্বে তাঁহাদের পুত্র কিংবা কন্যা কিছুই হয় নাই। এমন অমূল্যনিধি তাঁহাদের—বুঝি জন্মের মত—চোখের অন্তরাল হইয়াছে! এ বিয়োগ বালিকার মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়,—না মৃত্যু হইতেও ভীষণ! মৃত্যুতে একটা সান্ত্বনা আছে। অন্য অন্য পুত্রকন্যাহীনের অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার একটা তুলনা আছে। পৃথিবীর সুখ দুঃখ—বিয়োগের জ্বালা-যন্ত্রণা বৈতরিণী পার হইয়া স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীকে স্পর্শ করিতে পারিবে না বুঝিয়া, সময়ে সময়ে মনের একটা নিশ্চিন্ততা আছে। এমন কি, শোকের তীব্রতা কালবশে অপসারিত হইলে, হারানিধির স্মরণে নৈরাশ্যের মধুময় নিশ্বাস-স্পর্শের একটা অবসাদ আছে। সেই মমতাময়ী প্রিয়-স্মৃতি আকাশপান্থগামিনী অবিরাম হাস্যময়ী কাদম্বিনীর দূরাগত ইঙ্গিতের মধ্যদিয়া কত আশ্বাস-কথা বায়ুসাগরে মিলাইয়া মিলাইয়া, "মধুতোঽপিচ মধুরং" করিয়া, নীরবতার মাদকতা মাখাইয়া, বিয়োগীর অন্তঃশ্রবণে ঢালিয়া দেয়!

কিন্তু এ বিয়োগ ত তাহা নয়! আমার প্রিয় জীবিত আছে—এ বিশাল ধরণীর কোন্ অন্তরালে, আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে লুকাইয়া আছে! আমি দেখিবার জন্য ব্যাকুল অথচ তাহাকে দেখিতে পাইব না। একথা মনে করিতে গেলেই বিশাল ধরণী দেহসঙ্কোচে সমস্ত ভার কেন্দ্রস্থ করিয়া, যেন হৃদয়ের জীবন-স্পন্দনটাকে চাপিয়া ধরে! জীবন তখন একটা প্রচণ্ড যাতনার কারণ হইয়া উঠে। অথচ মরিতে সাহস নাই! কি জানি, মরণের পরমুহূর্ত্তেই যদি প্রিয়তম কাছে আসিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া বসে!

এইরূপ দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহন করিতে যিনি একমাত্র বালিকা কন্যাকে গৃহ হইতে কোন অজ্ঞাত দেশে বিদায় দিয়াছেন, সেই সাধ্বী জননীর কথা একটিও কি কহিতে পাইব না?

কেমন করিয়া কহিব! তখন আমি বালক—পিতামাতার মমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ—বন্দী! গৃহের দ্বার

হইতে বাহিরের পথে একটি পদও অগ্রসর হইবার আমার ক্ষমতা নাই। কাহারও কাছে তাহার অবস্থা জানিবারও আমার উপায় নাই। কেমন করিয়া বুঝিব, আপনাদের কেমন করিয়া বুঝাইব, কিভাবে তাঁহার দিন যাইতেছে!

তথাপি কালস্রোতে প্রকৃতির পুষ্পাঞ্জলিদানের মত পরস্পরে অসম্বদ্ধ যে দুই একটা কথার গুচ্ছ সেই সময় ভাসিয়া আমার কাণে লাগিয়াছিল, তাহাই আমি বলিব। এবং এই বর্ণনা হইতেই সার্ব্বভৌম-পত্নীর মহত্বের পরিচয় দিতে যথাসময়ে চেষ্টা করিব।

অনেক কথা গণেশ-খুড়ার মুখেই শুনিয়াছি। আমাদের গ্রামত্যাগের পর হইতে খুড়াই একাকিনী পিতামহীর অনুচরের কার্য্য করিয়াছে। ভৃত্য সদানন্দ ও খুড়া—উভয়ে মিলিয়া—ঠাকুরমার যখন যা অভাব হইত, পূরণ করিত। ঠাকুরমার আদেশে তাহাকে মাঝে মাঝে সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইতে হইত। সেখানে সার্ব্বভৌম-গৃহিণীর সঙ্গে তাহার মাঝে মাঝে অনেক কথা হইত। দাক্ষিণাত্য-বৈদিকের "বাগ্‌দান" প্রথা বিবাহেরই সঙ্গে একরূপ তুলনীয়। পুত্র অথবা কন্যা—এ উভয়ের মধ্যে একজন মৃত্যুমুখে না পড়িলে, উভয়ের বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। বর বাঁচিয়া থাকিতে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ হয় নাই, ইহা আমাদের দেশে কেহ কখন শুনে নাই। এই জন্য সার্ব্বভৌম-গৃহিণী এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নাই যে, তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে না। বন-ভোজন দিবসে মহিলা-মণ্ডলী মধ্যে মায়ের আচরণ দেখিয়া, তিনি কেবল একটু শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন—"কোপন-স্বভাবা শাশুড়ীর হাতে পড়িয়া, তাঁহার প্রিয় নন্দিনীকে সময়ে সময়ে কিছু লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইবে। দাক্ষায়ণীর শ্বশ্রূ-সৌভাগ্য ঘটিবে না।"

এইজন্য আমাদের প্রথম মিলনের পর হইতেই তিনি কন্যাকে ভাবীশ্বশুর-গৃহবাসের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। শাশুড়ীর মেজাজ বুঝিয়া কেমন করিয়া চলিতে হইবে, কিরূপ ভাবে চলিলে, স্বভাবকে কিরূপ ভাবে গঠিত করিলে কোপন-স্বভাবারও প্রিয়পাত্রী হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল বিষয় লইয়া, তিনি কন্যাকে বধূর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছিলেন; এমন সময় তিনি শুনিলেন, আমার পিতা তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। অথবা যদি বিবাহ দেন, তাহা হইলে, আমার বি. এ.-পাশ করা না পর্য্যন্ত তিনি কোনমতেই বিবাহ দিতে পারিবেন না। সে সময় আমার বয়স হইবে, আন্দাজ একুশ এবং দাক্ষায়ণীর আঠারো কিংবা উনিশ। যদি প্রথম পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারি, তাহা হইলে বয়স আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। এই দীর্ঘ সময় যদি সার্ব্বভৌম কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে পারেন, তবেই বিবাহ হইবে। নতুবা তিনি কন্যাকে অন্যপাত্রস্থা করিতে পারেন।

পিতা—পিতামহীকে উক্ত মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং পত্রমর্ম্ম ব্রাহ্মণকে অবগত করাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই কথা ব্রাহ্মণকে শুনাইবার ভার গণেশ-খুড়ার উপর পড়িয়াছিল।

গণেশখুড়ার কথাতেই আমি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

"আমি মূর্খ—গণ্ডমূর্খ। গণেশের মা'র পুত্র, এই গৌরবের উপাধি লইয়াই মত্ত। আমি নিজেকে লইয়া, আর নিজের সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতাম। অন্যের ঘরের ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বুঝিতাম না। সুতরাং অঘোর দা'র বাড়ীতে হরিহরের বিবাহ লইয়া কি যে গোলমাল চলিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। মূর্খ বলিয়া আমার কোম্পানীর চাকরী করা ঘটিবে না, আর চিরকালের দাদাকে হুজুর বলা চলিত না বলিয়া, আমি মনে মনে ভবিষ্যতের চাকরীকে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি।

"এখন আমি মাকে বুঝাইয়া, স্ত্রীকে বুঝাইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছি। প্রথম প্রথম শালতী হইতে পলাইয়া আসিবার দরুণ উভয়েরই অনেক মুখনাড়া খাইয়াছিলাম। জেঠাই মা কৃপা করিয়া, দাদার হাকিম হইবার ফলে নিজের অবস্থা দেখাইয়া, উভয়কে বুঝাইয়া দিয়াছেন। জেঠামশায়ের সপিণ্ডকরণে দাদা দেশে ফিরিল না দেখিয়া, মায়ের চক্ষু ফুটিয়াছে। এখন সকলের ভয় হইয়াছে, হঠাৎ কোন রোগ হইলে, নিঃসন্তান স্ত্রীলোকের মত লোকাভাবে বুঝি জেঠাই-মাকে ঘরে মরিতে হয়!

"তাই গোবিন্দ-খুড়া আমাকে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে। তাহাতে খুড়া আমার সংসার-প্রতিপালনের ঝঞ্ঝাটটাও মিটাইয়া দিয়াছে।

"আমি জেঠাইমা'র কাছে থাকি, কিন্তু তাঁহার অবস্থা

দেখিয়া, আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়। অমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান উপযুক্ত পুত্র, অমন সোণার চাঁদ নাতী, সব থাকিতে জেঠাইমার যেন কেহ নাই! আমার পাঁচ বছরের ছেলে এখন তাঁর একমাত্র আদরের পাত্র হইয়াছে! আমার তিন বছরের মেয়ে তাঁর ঘাড়ে পিঠে চাপিয়া, তাঁর পূজার সামগ্রী ফেলিয়া, তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতেছে! দাদার বাড়ীটা অরণ্যের মত বোধ হইত বলিয়া ছেলে-মেয়েটাকে তাঁর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়াছি। আমার বউ এখন তাঁর পদসেবা করে। আপনার সামগ্রীগুলিকে যেন হারাইয়া দয়াময়ী এ দরিদ্র গণ্ডমূর্খের পরিবারগুলাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন।

"মনে মনে ভাবি, দাদার হাকিমীতে জেঠাইমা'র কি লাভ হইল—দেশেরই বা কি উপকার হইল! লাভের মধ্যে তুচ্ছ দু'দশটা টাকার জন্য ঘরের ছেলে পর হইতে বসিয়াছে! বৈকুণ্ঠের লোভেও বৃদ্ধ মা-বাপকে ত্যাগ করিতে নাই। যার করুণায় পৃথিবীতে আসিয়াছি, তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ মানের লোভে সেই গর্ভধারিণীকে পরিত্যাগ! আমি মায়ের উপর মাঝে মাঝে রাগ করিতাম। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া থাকিব, একথা একদিনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। দাদার সঙ্গে বিদেশে যাইবার সময় মায়ের মুখ মনে পড়াও আমার পথ হইতে পলাইয়া আসিবার আর একটা কারণ। আমি এক এক সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া অঘোরদা'কে উদ্দেশে ধিক্কার দিতাম। আর বউ-ঠাকুরাণীর উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতাম। আমার বোধ হইত, বউ-ঠাকুরাণীই দাদাকে আমাদের পর করিয়া দিয়াছে। স্ত্রীবশ হইয়া দাদার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তবে আমি গণ্ডমূর্খ। পণ্ডিতের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য আমার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

"আমার সকল কথা তোমরা ধরিয়ো না। আমি যেটা সত্য মনে করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। বাস্তবিকই বউ-ঠাকুরাণীর উপর মাঝে মাঝে আমার রাগ হইত। পুত্র-পৌত্রের স্মরণে সদানন্দময়ী জেঠাইমা'র মুখ এক একদিন বড়ই মলিন হইয়া যাইত। আমাদের মত অভাগ্যগুলাকে আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ করিয়া, এক একদিন জেঠাইমা সকলকে লুকাইয়া, নির্জ্জনে বসিয়া, হাপুষনয়নে কাঁদিতেন। মাঝে মাঝে আমি তা দেখিতে পাইতাম। সে সময় তাঁহার কাছে যাইতে আমার সাহস হইত না। তবে দূরে দাঁড়াইয়া, মনে মনে দাদা ও বউ-ঠাকুরাণীকে গালি পাড়িতাম। রাগটা চড়িয়া চড়িয়া ক্রমে বউ-ঠাকুরাণীর বাপ সেই পেস্কার বুড়োর ঘাড়ে পড়িত। বউ-ঠাকুরাণীর উপর রাগ মনে মনে প্রকাশ ছাড়া তাহাকে প্রকাশ্যে কিছু বলিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু মনে হইত, পেস্কার বুড়োকে যদি পাই, তাহা হইলে তাকে উত্তম-মধ্যম কিছু শিক্ষা দিয়া দি। সেই বুড়াই ত কুশিক্ষা দিয়া তার মেয়েকে ঘর-ভাঙ্গানী করিয়াছে!

"আমি যেমন মূর্খ, তেমনি মূর্খেরই মত বুঝিয়াছিলাম। স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই, জেঠাইমা কেবল হরিহরের বিবাহের চিন্তাতেই এত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। বুঝি নাই, তাঁহার যে নির্জনে বসিয়া রোদন, সে পুত্র-পৌত্রকে না দেখিবার জন্য নয়, সার্ব্বভৌমের কন্যার সঙ্গে হরিহরের বিবাহ দিতে দাদার ইচ্ছা নাই বলিয়া!

"যখন বুঝিলাম, দাদা হরিহরের বিবাহ দিবে না, তখন কন্যার দশবৎসর পূর্ণ হইতে সবে মাত্র একটি মাস অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে আবার বিবাহের দুইটিমাত্র দিন। এই দুইদিনের যে কোন একদিনে বিবাহ হইল ত হইল, নহিলে দশমবৎসরে আর সার্ব্বভৌমের কন্যার বিবাহ হইল না।

"এ কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে! আমাদের সমাজে আজও পর্য্যন্ত কেহ যাহা করে নাই, করিবার কথা মনেও আনিতে পারে নাই, আমার পাঁচটা পাশ করা 'ধর্ম্মাবতার' দাদা কি না তাই করিবে! নারায়ণ-ব্রাহ্মণের সম্মুখে করা যে বাগ্‌দানের প্রতিজ্ঞা, ও ভঙ্গ করিবে!

"সত্য কথা বলিতে কি, অনেকদিন অঘোরদা'কে দেখি নাই বলিয়া, তাহাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। এক-বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও বাড়ীতে না আসিলেও, মনে মনে বিশ্বাস ছিল, হরিহরের বিবাহ দিতে তাহাকে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাড়ীতে আসিতেই হইবে। সেই আশায় নির্ভর করিয়া একরূপ নিশ্চিন্তের মতই দাদার দেশে ফিরিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

"আমি যখন জেঠাইমা'র কাছে প্রথম একথা শুনিলাম, তখন কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু শেষে বিশ্বাস করিতে হইল। বিবাহ সম্বন্ধে দাদা

জেঠাইমাকে অতি নিষ্ঠুর পত্র লিখিয়াছে। সেই পত্র সার্ব্বভৌম-মশায়ের কাছে লইয়া যাইবার ভার আমারই উপর পড়িয়াছে। পত্রের মর্ম্মকথা শুনিয়া আমার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমার মাথা টলিতে লাগিল। সেই অবস্থাতেও জেঠাইমা'র আদেশে ব্রাহ্মণের কাছে আমাকে পত্র লইয়া যাইতে হইল।

"সার্ব্বভৌম-মহাশয়ের বাড়ীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। সন্ধ্যা না হইলেও তার ছায়া আগে হইতেই যেন ব্রাহ্মণের সদর বাড়ীর উঠান অধিকার করিয়াছে! ইহার পূর্ব্বে যতবার যখনই আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি, একটিবারও তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপ আমি লোকশূন্য দেখি নাই। ছাত্র-প্রতিবেশী, প্রবাসী, সাধু-সন্ন্যাসী, যখনই গিয়াছি, অন্ততঃ একজনকেও তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে দেখিয়াছি।

"আশ্চর্য্যের বিষয়, সেদিন সেখানে একটি প্রাণীও ছিল না। কেবল কতকগুলা ছেলেমেয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ীর সম্মুখের গ্রাম্যপথে ধূলা উড়াইয়া খেলা করিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপে কেহ নাই দেখিয়া, আমি একটু যেন বিপদে পড়িলাম! সার্ব্বভৌম-ম'শায় যদি বাড়ীর ভিতর থাকেন, তাহা হইলে চীৎকার করিয়া না ডাকিলে, তিনি শুনিতে পাইবেন না। অথচ তাঁহাকে ডাকিতে আমার সাহস নাই।

"আমি কিছুক্ষণের জন্য উঠানটায় পায়চারী করিলাম। তবু সার্ব্বভৌম-ম'শায়, অথবা অন্য কেহ সেখানে আসিল না। ছেলেগুলা থাকিয়া থাকিয়া, প্রকাণ্ড বটগাছে রাত্রিবাসী পাখীগুলার মত এক একবার গণ্ডগোল করিয়া উঠিতেছিল। মনে করিলাম, ব্রাহ্মণের কন্যা এই বালকবালিকাদের ভিতর থাকিতে পারে।

"এই মনে করিয়া একবার তাহাদের নিকটে গেলাম। সেখানে দাক্ষায়ণী অপেক্ষা বড়, ছোট, সমবয়সী, অনেক ছেলেমেয়ে দেখিলাম, কিন্তু দাক্ষায়ণীকে দেখিতে পাইলাম না। তাহারা সেস্থানে আমার আগমন লক্ষ্য না করিয়া, আপনার মনে খেলিতে লাগিল। আমি তাহাদের মধ্যে যে কোন একজনকে—সার্ব্বভৌম-ম'শায়কে আমার আসার খবর দিতে অনুরোধ করিলাম। কেহ আমার কথায় কাণ দিল না।

"আবার আমি ফিরিলাম। এবারে আর উঠানে পায়চারী না করিয়া, যতক্ষণ হয়, সার্ব্বভৌম ম'শায়ের অপেক্ষা করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলাম। দেয়ালে ঠেসানো মাদুর লইয়া, বারান্দায় পাতিয়া বসিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখি, দাক্ষায়ণী চণ্ডীমণ্ডপে বিছানো সপের একধারে বসিয়া রহিয়াছে! তাহার সম্মুখে খোলা একখানা পুঁথি—পুঁথির লেখার উপর চোখ রাখিয়া, মাথাটি নামাইয়া, বালিকা আসনপিঁড়ি হইয়া যেন পূজার ভাব করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাব দেখিয়া, মাদুর-হাতে আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইলাম। এই বয়সে দাক্ষায়ণী কি পুঁথি পড়িতে শিখিয়াছে!

"অনেকক্ষণ আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই সময়ের মধ্যে একটিবারের জন্যও সে মাথা তুলিল না। মাথাটি অল্প অল্প নড়িতেছিল। বুঝিলাম, তাহার দৃষ্টি পুঁথির এক দিক হইতে অন্যদিকে যাতায়াত করিতেছে। পরণে এক খানি সুন্দর চেলি। মাথাটি খোলা, এলো চুলগুলি পিঠ ঘেরিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কতকগুলা মাদুর স্পর্শ করিয়াছে। চেলির আঁচলাও পুঁথির পাশে পড়িয়া লুটাইতেছে; হাতে-জড়ান হাত কোলের উপর রাখা। যেন ধ্যানের মূর্ত্তি। গণ্ডমূর্খ আমি সে শোভার কথা কেমন করিয়া বলিব? সরস্বতীর সঙ্গে আমার চিরশত্রুতা। পাঠশালে তালপাতায় লেখা, কিল্লী আর্ক পর্য্যন্ত আমার বিদ্যার মাপ। সেই দিন দাক্ষায়ণীকে দেখিয়া সর্ব্ব প্রথম সরস্বতী ঠাকুরাণীর উপর আমার ভালবাসা জন্মিল। সার্ব্বভৌমের সেই মেয়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল, মা যেন আজ বালিকা দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তি ধরিয়া, পুঁথির ভিতর হইতে তাঁরই ছড়ান বিদ্যা দৃষ্টিতে ধরিয়া, আঁচল পাতিয়া, কুড়াইয়া লইতেছেন।

"মা আমার মাথাও তুলে না, আমাকেও দেখিতে পায় না। ভাবিলাম, কি করি? মূর্খ আমি—বিদ্যার মর্ম্ম জানি না—তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলে কি পাপ হইবে, কে জানে?

"আর কি বলিয়াই বা তাহাকে ডাকিব! ইহার পূর্ব্বে এখানে যতবার আসিয়াছি, ততবার মাকে 'বউমা' বলিয়া ডাকিয়াছি। যে খবর আজ আমি তাহার বাপকে দিতে আসিয়াছি, তাহাতে তাকে বউমা বলিয়া আবার আমি কেমন করিয়া ডাকিব? ও মধুর নামে তাহাকে

ডাকিতে আমার মুখ রহিল না। দাক্ষায়ণীকে আমাদের ঘরের সামগ্রী বলিতে আমার আর ভরসা কই?

"তাহাকে ডাকিতে গিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কে যেন একটা কঠিন হাত দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল।

"শুনিয়াছি, বেদও যা 'সত্যও তা'। সেই বেদ আমাদের বংশের আদি। আমাদের জাতির জন্ম বেদে—সত্যে; তাই আমাদের উপাধি বৈদিক। সত্যেই আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠা। সেই বৈদিকের ঘরে সত্যের মর্য্যাদা থাকিবে না, 'বাগ্‌দানের' প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না, আমাদের এমন দুর্দ্দিন আসিবে, তা কি আমি জানি! আমি তাহাকে বউমা বলিতে পারিলাম না, কাজেই কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। দুঃখে ক্ষোভে আমার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

"কিন্তু আর কথা না কহিলে চলে না। সন্ধ্যা নিকট হইতেছে! চণ্ডীমণ্ডপে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের হস্তে চিঠি দিয়া এখনি আমাকে ফিরিতে হইবে। জেঠাইমা উৎকণ্ঠার সহিত আমার ফিরিবার অপেক্ষা করিতেছেন। চিঠি পড়িয়া ব্রাহ্মণ কি উত্তর দেয়, জেঠাই-মাকে বলিতেই হইবে।

"আমি বলিলাম—'আর কেন মা দাক্ষায়ণী?'—নাম করিবা মাত্র বালিকা মাথা তুলিল। আমার পানে চাহিল। দেখিলাম, এখনও তার শূন্যদৃষ্টি। বুঝিলাম, পুঁথি হইতে তাহার চোখ উঠিয়াছে বটে, মন কিন্তু এখনও উঠে নাই!

"এ শূন্যদৃষ্টির কারণ নির্ণয় করিয়াছি মনে করিয়া আমি আবার বলিলাম—'মা! অন্ধকারে পড়িলে চোখের ক্ষতি হইবে।'

"ইহার পূর্ব্বে দাক্ষায়ণী আমাকে যতবার দেখিয়াছে, ততবারই—বউ-মানুষ শ্বশুরকুলের গুরুজন দেখিলে যা'করে—সরম দেখাইতে গায়ে মাথায় কাপড় ঢাকিয়া, যত সত্বর পারে, চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে।

"আজ দুই দুইবার সে আমার কথা শুনিল, কিন্তু পূর্ব্বের মত পলাইল না। প্রথমে সে আঁচলটি উঠাইয়া কাঁধে ফেলিল। তারপর পুঁথি-জড়ানো কাপড়ে পুঁথিখানিকে সযত্নে বাঁধিতে লাগিল। আমি তাহার ভাব দেখিয়া কিছু অপ্রতিভের মত হইলাম। তাহাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ মা! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?' ঈষৎ হাসিয়া—ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া—দাক্ষায়ণী আমাকে বুঝাইল—'চিনি।'

"তারপর পুঁথিখানি কুলুঙ্গির উপরে রাখিয়া, একটি আসন লইয়া, সে তাহা সেই সপের উপরই পাতিল, এবং আমাকে তার উপর বসিতে অনুরোধ করিল। বলিল—'বাবা স্নানে গিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ না ফিরেন, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।'

"এতকাল তাহাদের বাড়ী আসিয়াছি,কিন্তু একটি দিনের জন্যও তার মুখের কথা শুনি নাই। আজ শুনিলাম। সরস্বতীর কৃপা কখন পাই নাই—এজন্মে আর পাওয়া ঘটিবে না জানিয়া, মূর্খের যতটুকু শক্তি, প্রতি বৎসরের শ্রীপঞ্চমীতে এক একবার বোবা সরস্বতীরই পূজা করিয়াছি। তাই বুঝি আজ মা আমার প্রতি কৃপা করিলেন! সরস্বতী কথা কহিলেন। কথা কি মধুর! ইহজন্মে এমন মিষ্ট কথা শুনি নাই। রূপ—আগে দেখিয়াও দেখি নাই—এখন দেখিলাম! হা হতভাগ্য অঘোর দা'! এমন মেয়ের সঙ্গে তুমি ছেলের বিবাহ দিলে না! এরূপ সুশ্রী 'কনে' শুধু এদেশে কেন, সারা বঙ্গের ভিতরে কি আর তুমি খুঁজিয়া পাইবে! পায়ে-পড়া এলো চুল, ময়ূরকণ্ঠী চেলিতে ঢাকা অঙ্গ, চাঁদমুখে চোক দুটা বসা'তে গিয়া বিধাতার হাতটা যেন কাঁপিয়া গিয়াছে! আজও পর্য্যন্ত যেন সে কম্প চক্ষুদুটিকে ছাড়িতে পারে নাই। আমি দেখিতে লাগিলাম। মুখ দেখিলাম, চোখ দেখিলাম—শাঁখার বরণ হাতখানিতে শাঁখা দেখিলাম,—সবার শেষে দুটি চরণ দেখিলাম। চরণ থেকে চোখ আর উঠিতে চাহিল না। ভিতর হইতে কে যদি কলসীখানেক জলের স্রোতে চোখ দু'টাতে আমার আঘাত না করিত—যদি না হঠাৎ আমি অন্ধের মত হইয়া যাইতাম, তাহা হইলে কতক্ষণ সে রাঙ্গা চরণ দেখিতাম, তার ঠিক কি?

"মাদুর রাখিবার ছলায়, মনের ভাব চাপিয়া, আবার আমি কথা কহিলাম। একবার শুনিয়া তৃপ্তি পাই নাই, আবার তাহার কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইল। আর ত আমি তার কথা শুনিতে পাইব না! সে মর্ম্মভেদী খবর দিবার পর, আবার কোন মুখে আমি সার্ভৌম-মহাশয়ের

বাড়ীতে আসিব! দাদার আচরণে আমাদেরও পর্য্যন্ত মাথা হেঁট হইতে চলিয়াছে।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। যে কোন উপায়ে তার মুখের দু'একটা কথা শোনা চাই বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার বাবা কি দু'বেলা স্নান করেন?'

'ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার স্নান করেন।'

'তুমিও তাই কর নাকি? তোমার এলোচুল দেখিয়া আমার তাই বোধ হইয়াছে।'

'আমি দুইবার করি।'

'কতদিন হইতে করিতেছ?'

'প্রায় একমাস।'

'কোনও কি ব্রত লইয়াছ?'

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল না। তৎপরিবর্ত্তে সে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বুঝিলাম, সে একথার উত্তর দিবে না। আমি কিন্তু, সাভ্যোম-ম'শায়ের না আসা পর্য্যন্ত সময়টা মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া দিব মনে করিয়াছি। সে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাঁ মা! আমি তোমাকে পুঁথিতে চোখ দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তুমি কি পুঁথি পড়িতে শিখিয়াছ?'

"বালিকা মৃদুহাসিল—উত্তর করিল না।

"আমি যেন একটু ক্ষোভের সহিত বলিলাম-'হাঁ মা, আমি মূর্খ জানিয়া কি তুমি আমার কথার উত্তর দিতেছ না?'

"প্রশ্ন করিতে না করিতে লজ্জায় ও সঙ্কোচে বালিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সোণার কমলে কে যেন চোখের পালটে জবার বরণ ঢালিয়া দিল।

"ঠিক এমনি সময়ে বাড়ীর ভিতরে সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দিক হইতে কে তাহাকে ডাকিল—'দাক্ষায়ণি!' দেখিলাম, সাভ্যোমের গৃহিণী পিছন হইতে একটি দীপ হাতে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতেছেন।"

নাম

[শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী]

এই বিচিত্র বিশ্ব গাঁথা
নামের হারে!
তাই তো ভাবি—নইলে কে আর
চিন্ত কারে?
আঁধার ছেয়ে মিলায় যখন
বিশ্ব-ছবি,
মলিন মহী করুণ শ্বাসে—
'কোথায় রবি!'
রবিরে আর চিন্ত কি তার
নামটি বিনে?
নামের রূপেই আপন-পরে
সবাই চিনে।
নামটি যখন শুনি তখন
পাই যে নিজে,
নামটি ছাড়া জানত কি কেউ
আপনি কি যে?
আপন পরে অখিল ভরে'
এমনি ভাবে
সবাই যে রে বাঞ্ছিতেরে
পাবেই পাবে।
আজকে গো তাই, 'কোথায় তুমি'-
বল্‌তে গিয়ে
তাই তো তোমায় ডাকি 'দয়াল'
নামটি নিয়ে।
একটি সাধা তারেই তোমার
নামটি করে,
সব রাগিণী সেই সুরেতেই
কাঁপিয়ে মরে!

জীবন জুড়ে একটি সুরেই
বাজ্‌লে কেন ?—
একটি শক্তি-সূতায় বিশ্ব
গাঁথ্‌লে হেন !
একতারাতে কি গান বাজে
না পাই দিশা,
এমনি মোহেই গোঁয়াই জীবন
দিবস-নিশা।
স্বপ্নে হেরি—নাই রে দেরি,
একটি নামে
আপ্‌নি এসে পূরাও হেসে'
মনস্কামে !
নামের মাঝে মোহন সাজে
বারেক এসে
নিজেই আবার লুকাও কেন
মুচ্‌কি হেসে ?
জীবন চলে নামের বলেই
অতল তলে
আনন্দের সে সিন্ধু-বুকেই
রতন জ্বলে !
নামটি নাচাই মুখে, ভরে
নয়নখানি,—
দ্বন্দ্ব-বিরোধ লুটায় চরণ
শরণ মানি' !
একটি সুরে মর্ত্ত্য জুড়ে'
ঝঙ্কারিয়া,
মিলাই আমি জীবনস্বামি,
তোমায় গিয়া !
তখন তুমি অঙ্গে আমার
পুলক হান',
ওগো আমার, এতও রকম
রঙ্গ জান !

আধ-আধ অফুট ভাষে
তখন খালি
নামটি করি স্মরণ, আর যে
নয়ন ঢালি !
নামের রূপে যখন ফোটে
তখন—তখন
সে যে কেমন, কইতে নারি
হৃদয়-রমণ !
কইতে বচন হার মেনে যাই,
তখন তুমি
আদর কর কতই তপ্ত
ললাট চুমি' !
সেই সোহাগে সরম লাগে,
তাই তো সে সব
কইতে নারি, আপন ভাবেই
রই যে নীরব !
সাধন-ভজন নাই গো আমার
ভরসা কিছুই ;
কেবল নামের জালটি বুনি,
তাই তো বিছুই।
জীবন মাঝে জনম লভি'
নামের জোরে
ধর্‌ব তোমায় কুটীর-কোণায়
এম্‌নি করে' !
পালিয়ে র'বে সাধ্য কি আর—
আমায় ফেলে ?
এই যে তুমি—ডাকটি দিতেই
শুন্‌তে পেলে !
জীবন মাঝে নামের বলেই
জনম মেলে ;
সেই কাছে মোর এলেই যখন,—ঐ
নামেই এলে !

শ্রীচৈতন্যচরিতের বৈচিত্র্য

[শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ]

প্রেমভক্তির পূর্ণাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জগৎপাবন চরিতাবলীর অনুশীলন করিলে, মহাকবি ভবভূতির সেই উক্তিটির সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়—

"বজ্রাদপিকঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহনুবিজ্ঞাতুমর্হতি।"

অর্থাৎ "অলৌকিক মহাপুরুষগণের চিত্তসকল কি প্রকারভাবে গঠিত হয়, তাহা কে বুঝিতে পারে?—কারণ, উহা বজ্র হইতে কঠোর অথচ কুসুম হইতেও কোমল।"

কলির অধঃপতিত জীবগণের মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ভগবৎপ্রেম ও ভক্তির ত্রিতাপহর অমৃতরসের মহাবন্যার প্রবর্ত্তনই যাঁহার উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যিনি করুণার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে নাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন, পরমভক্ত সাধু-সম্প্রদায়ের গঠন দ্বারা যিনি—

"জীবে দয়া নামে রতি বৈষ্ণব সেবন"

রূপ মহাসাধনার পথ প্রশস্ততর করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিতাবলীর মধ্যে যদি শান্ত গম্ভীর করুণাপ্রবাহের অনাবিল আবর্ত্তের মধ্যে তীব্র কঠোরতার বাড়বানল জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায়, করুণা বা ক্ষমার পরিবর্ত্তে অপরাধজনিত শাস্তির তীব্র কঠোরতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে, হঠাৎ যেন প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠে, পরিণত শরচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকারাজিতে যেন প্রচ্ছন্ন বাড়বানলের তীব্র সন্তাপচ্ছটার অনুভূতিতে চিত্ত স্বতঃই চঞ্চল হইয়া উঠে। কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার এই চরিত্র-বৈচিত্র্যের পরিচয়-প্রদানে অগ্রসর হইতেছি।

মহাপ্রভুর জগৎপ্লাবন প্রেমবন্যার বর্ণনপ্রসঙ্গে বাঙ্গালার অমর কবি চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ একস্থলে বলিয়াছেন—

"এই পঞ্চতত্ত্ব মেলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিঞা পিঞা হয় মহামত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র নাহি বিচার নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার! প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥"

ধর্ম্মের সার—জীবনের পরমার্থ—পরমেশ্বর-প্রেমের যে ভাণ্ডারের দ্বারে কালবশে, তুচ্ছ অহমাভিমানরূপ এক দুর্ভেদ্য মুদ্রা (অর্থাৎ মুদ্রাঙ্কিত কুলুপ) পড়িয়াছিল, সেই মুদ্রা উদ্‌ঘাটন করিয়া, এই পঞ্চতত্ত্ব (অর্থাৎ ভক্তরূপ সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) ভক্তস্বরূপ (শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু) ভক্তাবতার (অদ্বৈতাচার্য্য) ভক্ততত্ত্ব (শ্রীনিবাস প্রভৃতি) এবং ভক্তশক্তি (গদাধর প্রভৃতি) শোকতাপজরাব্যাধি-পীড়িত দুঃখময় মরজগতে আনন্দময় শান্তিময় প্রেমের মহাবন্যা ভাসাইয়াছিলেন, সেই বন্যায় তাঁহারা প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া নিজেরাও ডুবিয়াছিলেন এবং জগৎকে ডুবাইয়াছিলেন—এই প্রেমময় মহাবন্যায় ডুবিবার সৌভাগ্য হইতে কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি যুবা, কি স্ত্রী কেহই বঞ্চিত হয় নাই—এই সুধাময় প্রবল বন্যায় সজ্জন-দুর্জ্জন সকলেই ভাসিয়াছিল—সকলেই জীব প্রেমের অমৃতরসাস্বাদন করিয়া অমর ও ধন্য হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই প্রেমবন্যার উৎস যে স্থান হইতে প্রথম আবির্ভাবপ্রাপ্ত হয়, সেই করুণাময় প্রেমময় শ্রীগৌরচন্দ্র যখন প্রেম-ভক্তিরস বিলাইবার জন্য, শ্রীক্ষেত্রের পথেঘাটে শ্রীমন্দিরে

কুঞ্জে উপবনে নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দীক্ষিত—সেই সময় তাঁহার একজন একনিষ্ঠ সেবক, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, বৈষ্ণবদীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক এই মহা-যজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিকের কার্য্য করিতেছিল, সেই মহাত্মার নাম ছোট হরিদাস। "চৈতন্যচরিতামৃত"-কার এই ছোট হরিদাসের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"ছোট হরিদাস নামে প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া॥
মোর নামে শিখী মাহিতীর ভগিনীস্থানে গিয়া।
শুক্লচালু একমান আনহ মাগিয়া॥"

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেব যখন কীর্ত্তন-মহোৎসব দ্বারা প্রেমভক্তির প্রচার করিতেছিলেন, তৎকালে ভগবান্ আচার্য্য নামে একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব—মহাপ্রভুর সেবা-পর হন। মহাপ্রভুর একান্ত প্রীতিপাত্র কীর্ত্তনদক্ষ স্বরূপের সহিত আচার্য্যের বিশেষ মৈত্রী ছিল। এই আচার্য্য একদিন নিজগৃহে মহাপ্রভুকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। দয়াময় মহাপ্রভু ভক্তপ্রধান বৈষ্ণবের এই প্রেম-নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। তাই আচার্য্য যেখানে যাহা কিছু ভাল বস্তু পাওয়া যায়, তাহার সংগ্রহ করিতেছিলেন; মহাপ্রভুরই অন্নের জন্য একমান উৎকৃষ্ট তণ্ডুল অন্য কোন স্থানে না পাইয়া, প্রভুর পরমভক্ত শিখী মাইতির ভগিনী মাধবীর গৃহে উৎকৃষ্ট তণ্ডুল আছে জানিতে পারেন এবং তাহাই চাহিয়া আনিবার জন্য প্রভুর একনিষ্ঠ সেবক ছোট হরিদাসকে তথায় প্রেরণ করেন। সেই মাধবীর চরিত্র ও আচার সম্বন্ধে 'চরিতামৃত'-কার এই প্রকার বলিয়াছেন—

"মাহিতীর ভগিনী সেই নাম মাধবী দেবী
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী।"

এই তপস্বিনী বৈষ্ণবী মাধবীকে মহাপ্রভু কি ভাবে দেখিতেন?

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন।
স্বরূপ গোঁসাঞি আর রায় রামানন্দ,
শিখী মাইতী তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন।"

এই প্রকার সাধুচরিতা বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্য হরিদাস যখন তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, তখন—

"তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস"

এবং এইভাবে পরম শ্রদ্ধার সহিত সংগৃহীত উপকরণ লইয়া মহানন্দে আচার্য্য মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য—

"স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন
দেউল প্রসাদ, আদা চাকি নেম্বু সলবণ।"

মহাপ্রভু ভোজনে উপবিষ্ট হইয়া—

"শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা
উত্তম অন্ন এ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।"

তখন—

"আচার্য্য কহে মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা।"

তারপর—

প্রভু কহে কোন যাই মাগিয়া আনিলা,
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিলা।"

এই উত্তর শুনিয়া মহাপ্রভু আর কিছুই বলিলেন না। ভক্তপ্রধান আচার্য্যের প্রযত্নকল্পিত অন্নব্যঞ্জনাদি পরম পরিতোষসহকারে ভক্ষণ করিয়া, বিশেষ পরিতোষ জ্ঞাপন করিলেন—সেবাপর একনিষ্ঠ ভক্তপ্রধান আচার্য্যের অন্তঃ-করণ আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। এই ব্যাপার হইতে যে কি ভীষণ দাবানল পর মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার ভাবনা কাহারও মনে ক্ষণকালের জন্য উদিত হইল না।

এদিকে মহাপ্রভু ভোজনানন্তর নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—তখন অসম্ভাবিত বজ্রপাতের দারুণ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মহাপ্রভু—

"নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা
ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা।"

এই ভীষণ কঠোর শাস্তি ছোট হরিদাসের প্রতি কেন হইল, তাহা তখন কেহই বুঝিতে পারিল না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা লোকপরম্পরায় অবগত হইয়া, শ্রীচৈতন্যৈকপ্রাণ হরিদাস মর্ম্মে মরিয়া গেলেন, তাঁহার মুখে আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। কেন যে অকস্মাৎ নীলাকাশ হইতে এই ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হইল, তাহা হরিদাস কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

"দ্বার মানা—হরিদাস দুখী হৈলা মনে
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে।"

তখন কঠোর শাস্তির যন্ত্রণায় অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া—

"তিন দিন হরিদাস করে উপবাস"

তিন দিনের পর ব্যাপার কি তাহা বুঝিবার জন্য—

"স্বরূপাদি তবে পুছিল মহাপ্রভুর পাশ।
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস
কি লাগিয়া দ্বার মানা—করে উপবাস।"

প্রেমাবতার করুণাময় মহাপ্রভু তখন অপ্রকম্প্য হিমাদ্রি-শৃঙ্গের ন্যায় স্থির। তাঁহার করুণাপ্রবণ হৃদয়ে যে করুণার উদ্বেল সাগর ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, তাহা হইতে এক বিন্দু বারিও বাহির হইল না। তখন—

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ—
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

তখন ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর এই প্রকার কঠোর সংকল্প দেখিয়া, আর কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না—পরদিন আবার সকলে মিলিত হইয়া, কাতরভাবে হরিদাসের অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিলেন—

"আর দিন সবে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈলা নিবেদনে॥
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ॥"

হরিদাসের জন্য ভক্তগণের নির্ব্বন্ধ দেখিয়া, তখন—

"প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজ কার্য্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবে হেথা॥"

মহাপ্রভুর এই প্রকার দৃঢ়তা দেখিয়া—ভক্তগণ অগত্যা কিছু দিনের জন্য আর হরিদাসের কথা তাঁহার সম্মুখে অবতারিত করিতে সাহসী হইলেন না। এ দিকে ছোট হরিদাস প্রভুর দর্শনে বঞ্চিত হইয়া, একান্ত কাতরতার সহিত দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে—

"আর দিনে সবে পরমানন্দ পুরী স্থানে
প্রভুকে প্রসন্ন কর' কৈল নিবেদনে।
তবে পুরী গোসাঞি একা প্রভু স্থানে আইলা
নমস্কার করি তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা
পুছিলা কি আজ্ঞা? কেন হৈল আগমন?"

একটু আশ্বস্ত হইয়া তখন পরমানন্দপুরী—

"হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈলা নিবেদন।"

তখন

"শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোসাঞি!
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥
আজ্ঞা দেহ মোরে মুঞি যাও আলাল নাথ।
একেলা রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ॥
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা॥
আস্তে ব্যস্তে পুরী গোসাঞি প্রভুস্থানে গেলা।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা॥
তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর।
লোক হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার॥"

পুরী গোস্বামীর মুখে এই সকল ব্যাপার শুনিয়া ভক্তবৃন্দ মর্ম্মাহত হইলেন। তখন

"হরিদাস স্থানে গেলা সব ভক্তগণে
স্বরূপ গোঁসাঞি কহে শুন হরিদাস
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস।
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর।
তুমি হঠ করিলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কর তবে আপনি ক্রোধ যাবে।
এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন ভবন আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া।"

এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল; ভক্ত হরিদাসের হৃদয়ে যে দারুণ ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহার উপশম করিবার জন্য ভক্তবৎসল দয়াময় মহাপ্রভুর একটি করুণা কটাক্ষ তাহার উপর পতিত হইল না। দক্ষিণাপথে ভ্রমণকালে একজন নিঃসহায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিয়া, যাঁর হৃদয় করুণায় গলিয়া গিয়াছিল এবং প্রিয়তম সখার ন্যায় আলিঙ্গন

করিয়া ক্রোড়ে লইয়া তিনি সেই অধঃপতিত পরিত্যক্ত মহা-রোগীকে সকল তাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; সেই মহাপ্রভু—প্রেমাবতার মহাপ্রভু—একান্ত ভক্ত হরিদাসের সামান্য অপরাধ সহিতে পারিলেন না—অপরাধ-ক্ষমার প্রার্থনা সমবেত ভক্তবৃন্দের দীনবচনেও কর্ণপাত করিলেন না, একবার হাসিয়া একটি কথা কহিলে যে জীবনকে সার্থক বলিয়া বোধ করিত, সেই ভক্তের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের দিকে চাহিয়াও তাঁহার অন্তঃকরণরূপ প্রেমসাগরে একটি মাত্রও করুণার তরঙ্গ উত্থিত হইল না! তিনি হরিদাসের শাস্তি দিয়া নিবৃত্তি-প্রধান ত্যাগময় বৈরাগ্যধর্ম্মের কঠোর সাধনার একান্ত আবশ্যকতা ভাল করিয়া ভক্তবৃন্দকে বুঝাইবার জন্য যে লীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অকম্পিত হৃদয়ে সেই লীলার সমাপনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাপ্রভুর প্রাত্যহিক প্রেম-নৃত্য ও কীর্ত্তনের সদা-সহচর ছোট হরিদাস তাঁহার সঙ্গলাভের বিমল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া, দিন দিন নিদাঘতপ্ত কোমল কেতকী-পত্রের ন্যায় বিবর্ণ ও শুষ্ক হইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু যখন ভগবৎ-সন্দর্শনের পর কীর্ত্তনললিত লীলানৃত্যে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই সময় একবার দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া হরিদাস প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন, পাছে এই অনভ্যনুজ্ঞাত উপস্থিতি জানিয়া, গৌরাঙ্গদেব আরও কুপিত হন, এই ভয়ে তিনি দূর হইতেই দর্শন করিতেন; এমন স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিয়া যাইতেন, যাহাতে মহাপ্রভু তাঁহার এই প্রকার দর্শনের বৃত্তান্ত অবগত হইতেন না। ক্রমে—

"এই মত হরিদাসের একবৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভু মনে প্রসাদ নহিল॥"

তখন নিরাশ হইয়া দূর হইতে—

"রাত্রি শেষে প্রভুরে তিঁহ দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া।"

তথায় উপস্থিত হইয়া অনুতপ্ত ব্যথিত হরিদাস কি করিলেন? তিনি তখন

"প্রভুপাদ প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল
ত্রিবেণী-প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল।"

এইভাবে গৌরাঙ্গদেবের একান্ত ভক্ত ছোট হরিদাস কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিলেন—বৈরাগীর ধর্ম্ম যে কত কঠোর তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ছোট হরিদাসের এই জীবন বৃত্তান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত করিয়া দিল, সঙ্গত্যাগের কঠোর কর্ত্তব্য ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অঙ্কিত করিবার জন্য দয়াময় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে লীলার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এইরূপ বিষাদের যবনিকাপাতে সেই বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুম হইতে মৃদু লীলা-নাটকের যবনিকাপাত হইল। তাই বলিতেছি—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি"?

এই মহাকবি বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে মহাপ্রভুর এইরূপ লোকবিমোহন লীলাবলীর অনেক স্থলই অনুকূল হইয়া থাকে। অদ্য এই পর্য্যন্ত—বারান্তার আরও কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা এই লীলা-রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে।

মহতের আকিঞ্চন

[শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী]

যুগ যুগ ধরি' ভক্ত মগ্ন তপস্যায়;
একদিন ভগবান্ ক'ন,
"মুগ্ধ তব ধ্যানে আমি, আসিয়াছি তাই,
লহ বর যাহা আকিঞ্চন।"
উত্তরিলা ধীরে ভক্ত গদগদ স্বরে,
"দিতে যে আর রাখিয়াছ বা কি?
না চাহিতে দিলে সব, হে করুণাময়,
চাহিবার এই শুধু বাকী—

নহে তাহা ধনৈশ্বর্য্য—মাণিক-রতন
নহে স্বর্গ কিংবা যশোমান,
নিখিল পাপের বোঝা দিয়ে মোর শিরে
জগতেরে কর মুক্তি-দান।"
ভগবান্ ক'ন—মুগ্ধ করুণা-বিভল—
"দিতে যাহা এসেছিনু তোরে,
লক্ষ্যগুণে তুই আজি একি মায়া ছলি'
শূন্য ক'রে নিয়ে গেলি যে রে!"

য়ুরোপে তিনমাস

[মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, M.A., L.L.D., C.I.E.]

যে কয়দিন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, সে কয়দিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কোথায় কি করিয়া যে দিন কাটিয়াছে, তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রত্যহই বেলা ১০টার মধ্যে কোনরূপে আহার সারিয়া, London University Buildingএ তাড়াতাড়ি যাইতে হইত। বেলা ১টা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বৈঠক বসিত। মধ্যে একঘণ্টা জলযোগের জন্য বিশ্রামের পর পুনরায় ৫টা পর্য্যন্ত বৈঠক চলিত। বৈকালে বা সন্ধ্যায়ও বিশ্রাম নাই। এখানে আজ ডিনার, ওখানে কাল Reception, সেখানে Evening Party. কোন কোন দিন এরূপ পার্টি, দুই তিনটাও থাকিত! অতএব সর্ব্বত্র সব দিন যাওয়া দেহে কুলাইলেও সময়ে কুলাইবে কেন? সময়, অর্থ, শরীর, মস্তিষ্ক—এই কয়দিনে অতিব্যয়িত হইতেছে। আর কখনও এরূপ অতিব্যয় হয় নাই এবং হইবে কি না, জানি না। কাষে ত বিশেষ কিছুই হইল না! আমাদের দেশের কংগ্রেস প্রভৃতির যে দশা, এখানেও ঠিক তাহাই! কয়দিন কেবল বাক্যাড়ম্বর ও হুজুগ—এই হইল।

যাহা হউক, প্রথম দিন ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী বিখ্যাতলেখক ও বক্তা, লর্ড রোজবেরি সভাপতি হইলেন। দ্বিতীয় দিনে লর্ড কার্জ্জন এবং তৃতীয় দিন লর্ড ষ্ট্রাথকোনা সভাপতি হইলেন। সে দিন বিকালে স্যর থিয়োডোর মার্কারা ভারত-ডেলিগেটদিগকে লইয়া এক অতিরিক্ত বৈঠক করেন।

তৃতীয় দিন প্রাতে লর্ড ষ্ট্রাথকোনা, দ্বিতীয় দিবস লর্ড কার্জ্জন ও তৃতীয় দিবস বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড র‍্যালে সভাপতি ছিলেন। চতুর্থ দিবস প্রাচীন স্থবির লর্ড ষ্ট্রাথকোনা ছিলেন। তৃতীয় দিন বিকালে স্যর থিয়োডোর মরিসন ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিগণকে লইয়া এক পৃথক্ সভা করিলেন।—এ সভাতেও নূতন কিছুই হইল না। পুরাতনেরই চর্ব্বিত চর্ব্বণ! এই চারিদিন অধিবেশনের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনার সময় বা ক্ষমতা আমার নাই!

লণ্ডন্—ল্যাম্বেথ্ প্যালেস্

দ্বিতীয় দিন আমার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রণালীর উপর আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা লু-গার্ড সাহেব• (যিনি হংকঙ্গের গবর্ণরপদে বৃত হইয়াছেন) অনেক আক্রমণ করিলেন। সভাপতি-মহাশয়ও তাঁহার স্বপক্ষেই বলিলেন। অগত্যা উত্তরে আমাকে দেশের—ধর্ম্মের ও সমাজের মর্য্যাদা-রক্ষার যথাযথ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

আমাকে ভারতীয় ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পাঠ করিতে পূর্ব্বে অনুরোধ করা হয়। আমিও সেইরূপ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সভাস্থলে দেখিলাম যে, লু গার্ডকে সেই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে তাহার উত্তর দিতে হইবে। অতএব যে সকল কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম, সে সকল কথা বলিবার অবকাশ পাইলাম না। এরূপ সভায় যতদূর সম্ভব ভারতের পক্ষসমর্থন না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইত, এই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইল। লু গার্ডের

ন্যায় গবর্ণরপদে বৃত ও ব্যালফুরের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর officialদিগের মধ্যে কেহ কেহ চটিয়াছেন কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ ও বক্তার বিরুদ্ধবাদ করাতে সাধারণ প্রায় সকলেই বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এবং আমার স্বদেশের সম্মান-রক্ষা চেষ্টার সাফল্যে তাঁহারা বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সভাভঙ্গের পর অনেক অপরিচিত সাহেব-বিবি কার্ড দিয়া আলাপ করিলেন এবং নিমন্ত্রণ করিলেন, আদর-আপ্যায়নের কথাও কম বলিলেন না। ধীরভাবে সময়মত স্পষ্ট কথা যথাযথভাবে না বলিলে, এরূপ স্থলে দেশের মর্য্যাদা-রক্ষা অসম্ভব এবং অকারণ আক্রমণের হস্ত হইতে উদ্ধারেরও উপায় নাই। শেষ দিন আমাকে বিদেশী প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইয়া ধন্যবাদ দিয়া কিছু বলিতে হয়। কংগ্রেসে দুইবার কথা কহিবার অধিকার বড় অধিক লোকে পায় নাই। আমার এ সম্মানলাভে বন্ধুগণ বড়ই সন্তুষ্ট।

বিদ্যার রাজসূয়-যজ্ঞবৎ এই মহা-কংগ্রেসে দেশবিদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। বিখ্যাত বক্তা-দিগের সহিত পরিচিত হইয়া ও তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। এক তক্তে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের সহিত বক্তৃতা করিয়া এবং প্রয়োজনমত তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ ও গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা করিয়া ধন্য হইলাম। বাধ্য হইয়া, প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ব্যালফুরের বিরুদ্ধবাদী হইতে হইয়াছিল, ইহাতে আমি দুঃখিত, কিন্তু শ্লাঘাও মনে করিলাম। আনুষঙ্গিক আমোদ-আহ্লাদের পালার বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নহে। প্রথম দিন, ইংলণ্ডের প্রধান হোটেল 'স্যাভয়'তে রাজরাজেশ্বরের পক্ষে প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত হইয়া, আর্ল্‌বোশান্ ভোজ দেন, প্রিন্স্ আর্থার অব কনট উপস্থিত ছিলেন। লর্ড রোজবেরি, রাইট অনরেবল লুইস হারকোট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তারাও বক্তৃতা করেন। লোকে লোকারণ্য। রাজ-খানসামাদের সোণা-রূপা-মোড়া পোষাক ও আহার্য্য-পানীয়ের বিচিত্রতা দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। লর্ড কার্জ্জন এবং বিখ্যাত কেমিষ্ট স্যর হেন্‌রি রস্‌কোর মধ্যস্থলে আমার আসন হইয়া-ছিল। উভয়েই কত আত্মীয়তার কথা কহিলেন, বলিতে পারি না। বিশেষতঃ লর্ড কার্জ্জন—তিনি যেন ভারতের বড়লাট সে লর্ড কার্জ্জনই নন! যেন কত কালের আত্মীয়, এইভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সমস্ত সময়টা আমার সহিত পরম উৎসাহ ও উল্লাসে কথাবার্ত্তায় কাটাই-লেন। বুধবারের Manchester Guardian সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"People wandered that the long and animated conversation could be about between Lord Curzon, the Partitioner of Bengal and the Hon'ble Dr, Sarvadhikary." দ্বিতীয় দিন লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ী, যাহাকে 'Select few' বলে, এইরূপ লোক লইয়া ভোজ। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কেবল আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অতএব খাতিরটা যেন কিছু বেশী বেশী দেখিলাম। ম্যান্-সন্ হাউসে লর্ড মেয়র জাঁকাল রকম Reception দিলেন। এত সোণার বাসনের ছড়াছড়ি কখন দেখি নাই। লর্ড মেয়র লেডি মেয়রেস্, অল্ডারম্যান—সকলেরই সোণার মোটা মোটা চেন-পরা। সোণার আশাসোঁটা চাকরদের হাতে, চারিদিকে স্বর্ণবৃষ্টি! মহাধূম। এখানেও "বাঙ্গালী বক্তৃতার" তারিফ অনেক শুনিতে হইল। লুগার্ড-দমনে অনেকেই বিশেষ আনন্দিত এবং তাহা লইয়া আলোচনা হইল।

"অনারেবল্ কোম্পানী অফ্ ফীস্‌মনগারস্" মহা আড়ম্বর ও সমারোহ-সহকারে এক বিরাট ভোজ দিলেন। আরল্ অফ্ পোর্টল্যাণ্ড সভাপতি। এখানেও সভাপতির কণ্ঠে প্রকাণ্ড মোটা সোণার চেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার গামলা করিয়া গোলাপজলে হাতমুখ ধুইতে দিল। আহার্য্য দ্রব্যের আড়ম্বর ও বাহুল্যের বর্ণনা করা যায় না। ১৮২৪ সালের শেরি মদ দেওয়া ইত্যাদি বড়মানুষির চূড়ান্ত দেখাইল। পরিশেষে সকল অতিথিকে সুন্দর একবাক্স চ্যাকোলেট এবং একটা সোণালী কাজ-করা অলি—স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ উপহার দেওয়া হইল। এ সকল বড় বড় ব্যাপার ছাড়া—খুচরা আমোদ-প্রমোদ কতস্থানে কত যে হইল, তাহার আর গোণাগাঁথা নাই। এই কংগ্রেস উপলক্ষে যথার্থ কায কিছুই হইতে দেখিলাম না। আমোদ-প্রমোদেরই চূড়ান্ত হইল। আমার কিন্তু এই সুযোগে অনেক লোকের সহিত পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা এবং বোধ হয়, কাহারও কাহারও সহিত বন্ধুত্বও স্থাপন হইল। ইহাই পরম লাভ। যাহা হউক, কংগ্রেসের পালা শেষ হইল। আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম! কিন্তু এখনও অনেক স্থলের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করা বাকী আছে।

অতএব, কিছু বিশ্রাম করিয়াই পুনরায় দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অক্‌স্‌ফোর্ড, ৬ই জুলাই। আজ অক্‌স্‌ফোর্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-জগতের এই পুণ্যতীর্থে আসিবার বহুদিনের একান্ত ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হইল। রেল হইতে অক্‌স্‌ফোর্ডের দ্বাবিংশতি মহাবিদ্যালয়ের উচ্চচূড়া দেখিয়া, মনে কত ভাবেরই যে উদয় হইল, তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। ভ্রমণ-সহচরগণের অকারণ প্রগল্‌ভ বাক্য তখন ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল যে, একা নিঃশব্দে আনন্দে ভাবস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিই; কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ডাক্তার পি.সি. রায়ের সহিত অক্‌স্‌ফোর্ডসম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হইল।

আবর্ডিনের সম্মানচিহ্ন, এল. এল. ডির হুড্‌টা, হারাইয়া কয়দিন স্থানে স্থানে অনুসন্ধানের জন্য পত্র লিখিয়া সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম; কিন্তু আমারই 'হোল্ড অলে'র ভিতর অজ্ঞাতবাসান্তে যখন তিনি প্রকট হইলেন, তখন বেদব্যাসের "বৈমাত্রেয় সহোদর"-হস্তে নূতন বিরাট পর্ব্বের সূচনা হইল। "বাড়ীর ভিতরের" সর্ব্বাঙ্গীণ গৃহস্থালী-তন্ত্রের অহিফেন-তন্দ্রা যে কতদূর অকর্ম্মণ্য করিয়াছে এবং স্বাতন্ত্র্যপরিচালিত প্রফুল্লচন্দ্র যে কতদূর স্বাধীন ও কর্ম্মঠ, তৎসম্বন্ধে অনেক বাদবক্তৃতা শুনিতে হইল।

কথাটা সত্য। প্রফুল্ল ভায়ার গর্ব্ব যে, তাহার এসব বাবুগিরির অভ্যাস হইয়া নষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই। সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইবার সুবিধাও দেখিতেছি না। ডাক্তার রায়ের সঙ্গদোষে আমারও এককালে সে অবসর হইতে গিয়াও হইতে পায় নাই। এখন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সু-অবসর বলিয়া মনে হয় না। যাহা হইয়াছে, তাহাতে আমি পরমতুষ্ট এবং সুখী—অনেক জিনিস নূতনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। "বাড়ীর ভিতরের" গুণের কথা, সর্ব্বদা প্রফুল্লচন্দ্র পীতাভ চস্‌মা-সাহায্যে সমালোচনা না করেন, এমন দিন যায় না। তাহাতে প্রবাস-বাসের সাহায্য হয়, কিংবা রামগিরির যক্ষের অবস্থা পূর্ণ প্রকট করিয়া তোলে, তাহা বোঝা কঠিন বলিয়া, এ কথা লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই দীর্ঘ ও ক্লেশকর প্রবাসে পরিবারবর্গের কথার আলোচনা, সহৃদয় বন্ধুমুখে শুনিয়া নূতন ধরণের আনন্দলাভ হয়।

সমস্ত দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সকালের গাড়ীতেই আসিলাম। লণ্ডন হইতে অক্‌স্‌ফোর্ড দেড় ঘণ্টামাত্র সময় লাগে। পথের স্বাভাবিক দৃশ্য, স্থানে স্থানে, অতি চমৎকার; সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জননীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। ইংলণ্ডের গ্রীষ্ম কালে স্থানে স্থানে দৃশ্য বাস্তবিকই অতি মনোরম।
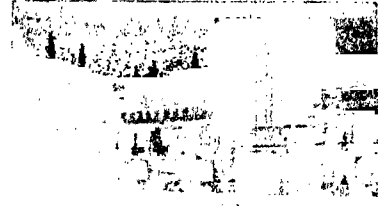
অক্‌স্‌ফোর্ড—ম্যাগডেলেন্ কলেজ্

টেম্‌স্‌নদী ক্ষীণকায় লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, অনুচ্চ শৈল ও হরিদ্বর্ণ বনরাজীর মধ্য দিয়া বড়ই মনোহারিণী রূপ ধারণ করিয়াছে। পথে' হর্‌লিক্‌স্ মল্‌টেড্‌-মিল্কে'র কারখানা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আখ্যানমঞ্জরীতে প্রথমপরিচিত রেডিংনগরে আবাল্যপরিচিত'হণ্টলি পামারে'র বিস্কুটের কারখানা দেখিলাম। পথের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং ডাক্তার রায়ের সহিত পরের আলোচনা করিতে করিতে, ১১॥০ টার সময় অক্‌স্‌ফোর্ড পৌঁছিলাম। "অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং ন বুবুধে বুধোপম।'

আমার বাসা ওয়াল্‌থ্যাম কলেজের ওয়ার্ডেন, অর্থাৎ অধ্যক্ষের বাটীতে হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী নাই, কন্যা মিসেস্ পিটার্‌সন্ বাটীর গৃহিণী। আবর্ডিনে প্রিন্সিপাল স্মিথের বাটীতে যেরূপ পূর্ণপ্রাণ সস্নেহ সযত্ন আতিথ্য পাইয়াছিলাম, এখানেও তাহাই। ইংরাজের বাড়ীতে আসিয়া না থাকিলে, তাহাদের প্রাণের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। সকলে যেন আমার আরাম ও সুবিধার জন্য নিশিদিন ব্যস্ত হইয়াছে। এইরূপ স্থানে প্রধান অধ্যক্ষের বাটীতে বাসা পাইয়া, নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। কারণ, সকলের পক্ষে এ সম্মান-লাভ ঘটে না। ডাক্তার রায় ট্রিনিটি কলেজে বাসা পাইলেন।

মিসেস্ পিটার্‌সন্ নিজে সঙ্গে করিয়া ক্যালিডোনিয়ন থিয়েটার, বোডলিয়ন লাইব্রেরী, ক্রাইষ্ট কলেজ, ওরীয়েল্ কলেজ, ইউনিভার্সিটি কলেজ প্রভৃতি দেখাইয়া লইয়া

আসিলেন। পরে, জলযোগান্তে কলেজের অতি সুন্দর বাগানে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার মেয়ে দুটিও উপস্থিত ছিল। অতিথির সহিত ব্যবহারে মেয়েদের কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা নাই। বৃদ্ধ অধ্যক্ষ রুগ্ন; তিনি আতিথ্যকার্য্যে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতে বড় সমর্থ নহেন; কাযেই কন্যা ও দৌহিত্রীদিগের প্রতি এই সকল ভার।

অক্স্‌ফোর্ড ও তাহার উপনগরসমস্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। বাইশটি কলেজে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্র পড়ে। এখন ছুটির সময় বলিয়া, ছাত্রগণ এখানে নাই। সকল কলেজের অধ্যক্ষগণও নাই। এসময় কলেজের বাড়ী ও লাইব্রেরী দেখা ছাড়া অগত্যা অপর কিছু দ্রষ্টব্যও নাই। এখানে অধিকাংশ ছাত্রই যে Residential Systemএ বাস করে, তাহা নয়; অনেকেই বাসায় বাস করে। তবে, বাসায়ও যথেষ্ট তদারক হয়।
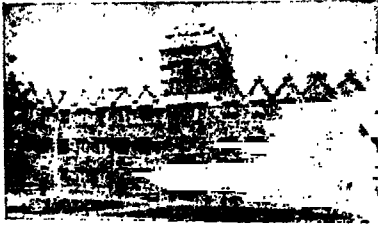
অক্স্‌ফোর্ড—ইউনিভার্সিটি কলেজ

Manchester কলেজের প্রিন্সিপাল কার্পেণ্টারের সহিত দেখা করিতে গেলাম। প্রিন্সিপাল কার্পেণ্টার ঋষিতুল্য ব্যক্তি। Unitarian Christian; ভারতের একেশ্বর-বাদ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখেন। তাঁহার সহিত অতি প্রীতিকর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও হৃদয়ের উদারতায় মুগ্ধ হইলাম। ট্রিনিটি কলেজে, পি. সি. রায়ের বাসায় দেখা করিয়া ও কলেজ দেখিয়া, নিউ কলেজ, ইউনিভার্সিটি একজামিনেশন হল্, ইউনিভার্সিটি চার্চ্চ, কুইন্‌স কলেজ দেখিয়া, ম্যাগডেলেন্ কলেজে গেলাম। প্রফেসর কুক্‌সন্ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ম্যাগ্‌ডেলেন কলেজ অতি পুরাতন ও প্রকাণ্ড। Cloister like walksএ বেড়াইতে বেড়াইতে মনে কত অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল, বলিতে পারি না! যেন পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল; যেন চিরপরিচিত অথচ অপূর্ব্বদৃষ্ট স্থানে আসিয়াছি, মনে হইতে লাগিল। সকল কলেজেরই প্রকাণ্ড বাড়ী—প্রকাণ্ড উঠান; সুন্দর লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারি, ক্লাশরুম, রেসিডেন্‌সিয়াল কোয়ার্টার, ইত্যাদি দেখিবার জিনিস বটে। তবে, পুরাতন বাড়ীগুলি সর্ব্বাংশে সুবিধার নয়; সেই জন্য এখন অনেক জায়গায় নূতন বাড়ী হইতেছে।

কুক্‌সন্ সাহেব অতি পণ্ডিত ও প্রিয়ভাষী। আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য কয়েকজন পণ্ডিত অধ্যাপককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ও ভারতের শিক্ষাসম্বন্ধে নানা কথায় রাত্রি দশটা বাজিল। তাঁহাদের নিয়মানুসারে আমায় ওজন করা ও নামসহি করান হইল। ওজন দেখা গেল—১১ ষ্টোন ৪ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় একমণ ৩৯ সের; শরীর বেচারী ভ্রমণ-ক্লেশে ওজনে দুইসের বাড়িয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে;—বাঙ্গালা, দেবনাগরী ও ইংরাজীতে সহি করিলাম।

অদ্যকার প্রাতর্ভোজন লণ্ডনে, মধ্যাহ্ন-ভোজন ওয়াদ্যাম কলেজে, চা-খাওয়া প্রিন্সিপাল কার্পেণ্টারের বাড়ীতে এবং রাত্রির খাওয়া ম্যাগ্‌ডেলেন কলেজে; চলিতেছে ভাল! তবে কতদিন এরূপ চলিবে, বলিতে পারি না।

রবিবার, ৭ই জুলাই। প্রায় দেখা যায়, বিলাতের অন্যান্য জায়গায় স্নানের ঘর স্বতন্ত্র; কিন্তু অক্স্‌ফোর্ডে তাহার বিপরীত। শয়ন-কক্ষেই কম্বল পাতিয়া, প্রকাণ্ড বাথে স্নান সারিয়া লইতে হইল। স্নানের মর্য্যাদা ইংরাজ সম্প্রতি শিখিয়াছে; এখনও সর্ব্বত্র প্রচার হয় নাই। অক্স-ফোর্ড-কেম্ব্রিজের কলেজ-বাড়ীর মত পুরাতন, অ-নব্যতন্ত্র-পরিচালিত স্থানে সে মর্য্যাদার এখনও পূর্ণ অধিকার সাব্যস্ত হয় নাই।

মিসেস পিটার্সন্ আজ আমার জন্য যত্ন করিয়া, ভাত, ছেঁচকী ও চিংড়ী মাছ ঝাল্ দিয়া রসুই করিয়াছিলেন; আমিও তৃপ্তিপূর্ব্বক খাইয়া পরিতুষ্ট হইলাম। মিসেস পিটার্সনের কলিকাতায় শিক্ষিত রন্ধন-কলা নৈপুণ্য প্রকট করিবার অবকাশ পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

কাল অধ্যাপক হেওার্সনের সহিত অধিক কথা-বার্ত্তা হয় নাই বলিয়া, আজ বাগানে তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ বেড়াইলাম ও কথাবার্ত্তা কহিলাম। ইঁহারা সকলেই ভদ্রতার চূড়ান্ত করেন বটে, কিন্তু ভারতীয়

ছাত্রদের উপকারের কোন কথা পাড়িলেই কথা চাপা দেন! ইহা সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। ট্রিনিটী কলেজে ডাক্তার রায় ও নেগল নামক কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপককে লইয়া যীশস্‌ কলেজ, বেলিয়াল কলেজ, সেণ্ট জন্‌স্‌ কলেজ প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। সর্ব্বত্রই বাড়ী, বাগান, উঠান, ছাত্রাবাস প্রভৃতির মোটামুটি ধরণ প্রায় একই রকমের। একখানা গাইড বুকে অক্‌স্‌ফোর্ড কলেজ সম্বন্ধে লিখিয়াছে, "He who knows one, knows all"—সে কথা যথার্থ। বেলিয়ল কলেজ,—স্যর টমাস র‍্যালে, লর্ড কর্জ্জন, আমাদের বন্ধুবর জে. এন. দাসগুপ্ত প্রভৃতির কলেজ; প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জোয়েট এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানকার হল অতি সুন্দর। জোয়েট, কেয়ার্ড, ম্যাগি, লক প্রভৃতি প্রধানপুরুষগণের ছবি রহিয়াছে। ল্যাবরেটরী গুলিতে আমাদের দেশের ল্যাবরেটরী অপেক্ষা বড় অধিক কিছু দেখিলাম না। কেমিষ্ট্রির মহাপ্রভুরা Scientific Vanityতে পরিপূর্ণ হইয়া, সময়ে সময়ে অতি অর্ব্বাচীনের মত কথাবার্ত্তা কহেন ও কাজ করেন।

ট্রিনিটি কলেজ হলে, ব্রাইসি, ফ্রিম্যান, রলিনসন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের ছবি দেখিলাম। যীশস কলেজে ইতিহাসবেত্তা গ্রীণের ঘর দেখিলাম। সেণ্ট জন্‌স্‌ কলেজের বাগানটি অতি সুন্দর, দেখিবার যোগ্য বটে। লাটিমার, ল্যাণ্ড প্রভৃতি 'মার্টার' দিগকে যেখানে পোড়াইয়া মারিয়াছিল, সেখানে এক সুন্দর মনুমেণ্ট এই অমানুষী কীর্ত্তির স্মৃতিমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে!

মধ্যাহ্ন-ভোজন যীশস কলেজের অধ্যক্ষ স্যর্‌ জন্‌ রীস্‌-এর ওখানে হইল। কলেজের স্বর্ণ-রৌপ্যের বিস্তর বাসন আছে, তাহা দেখাইলেন;—সাড়ে তিন শত বৎসরের সব বাসন রহিয়াছে। আহারের পর এস্‌মোলিয়ন্‌ মিউজিয়ম দেখিতে গেলাম। ছবি, প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি অজস্র এবং অপূর্ব্ব। সর্ব্বত্র এইরূপ বিস্তর মিউজিয়ম থাকাতে, এদেশে লোকশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়।

শরীর শ্রান্ত ও বৃষ্টির উদ্যোগ দেখিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; বিশ্রাম বড় হইল না। কারণ, যীশস কলেজে ডাক্তার হেজেল, সাতটার সময় বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এখানে কেমিষ্ট—চ্যাপম্যান, স্যর জন রীস, ডাক্তার হোলইস প্রভৃতির সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তার পর, রাত্রি ১০৷৷টার সময় বাড়ী পলাইয়া আসিলাম। ইংরেজ—কাজে, গল্পে, আহারে, ভ্রমণে, বৃদ্ধ বয়সেও পশ্চাৎপদ হয় না; কিন্তু আমাদিগকে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হয়!

বর্ম্মিংহাম, ৮ই জুলাই, সোমবার—ওয়ার্ডেন হেণ্ডার্সন্‌, মিসেস পিটার্সন্‌ এবং তাঁহার কন্যাদিগের নিকট বিদায় লইয়া বর্ম্মিংহাম যাত্রা করিলাম। এখনও গৃহস্থের দয়া ফুরায় না।
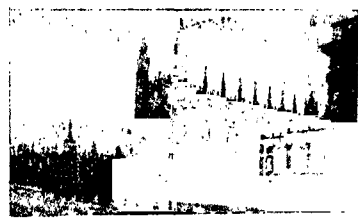
কেম্ব্রিজ্‌—কিংস্‌ কলেজ

নিজে সমস্ত গোছগাছ করিয়া জিনিসপত্র বাঁধাইয়া দিলেন। বেলা ১১টার সময় ট্রেনে উঠিলাম। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; পথে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টির হাত কি কিছুতেই এড়াইবার যো নাই!—রাস্তার দুইদিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর; গাছপালা, মাঠ, পাহাড়, নদী ইত্যাদির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পশ্চিম-ইংলণ্ডে অতি চমৎকার—এমন নাকি আর কোথাও নাই।

বার্ম্মিংহাম সহরটি বেশ বড়। লণ্ডনের মত না হউক, মফঃস্বলের সহরের মধ্যে বার্ম্মিংহাম খুব বড় সহর। কলকারখানার চিমনি, ও কুলীমজুরে সহর পরিপূর্ণ। বাড়ীঘর-দ্বার-রাস্তা, প্রস্তরমূর্ত্তি, পুলিস-পাহারা, ট্রাম, প্রভৃতি সবজিনিষই সকলসহরেই প্রায় একই রকমের—বাঙ্গালা দেশেও যেমন, এখানেও প্রায় তাহাই। কোন্‌টা কোন্‌ সহর, হঠাৎ বোঝা যায়না; কিন্তু অন্যান্য সহর অপেক্ষা বর্ম্মিংহাম কিছু বেশী অপরিষ্কার;—বোধ হয়, কলকারখানার আধিক্যেই এইরূপ হইয়াছে।

আমাদের বাসাটি সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে, একটি সুন্দর নির্জ্জন উদ্যানবহুল উপনগরে। এ বাড়ীটি কলেজের মেয়েদের থাকিবার বোর্ডিং। এখন ছুটীর সময়; অধিকাংশ ছাত্রী বাড়ী গিয়াছে বলিয়া, ডেলিগেটদের এইখানেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখানকার অধ্যক্ষ বিখ্যাত আইনগ্রন্থ-প্রণেতা স্যর্‌ এড্‌ওয়ার্ড ফ্রাই'র কন্যা মিস

ফ্রাই। বিখ্যাত গ্রন্থকার সিজ্‌উইকের কন্যা মিস্ সিজ্‌উইক এবং ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর জেনারেল্ অব্ এজুকেশন মহোদয়ের ভগ্নী মিস্ অরেঞ্জ্ এখানকার শিক্ষয়িত্রী। বড় বড় লোকের কন্যা ও ভগিনীগণ এখানকার অধ্যক্ষ ও শিক্ষয়িত্রী; এটিও একটি দেখিবার জিনিস। টেনিসনের 'প্রিন্সেসে' অনধিকারচর্চ্চাকারী পুরুষগণ-কর্ত্তৃক, পুরুষ-বিদ্বেষী মহিলাগণের বিদ্যালয়ে অনধিকারপ্রবেশ কথা বর্ণিত হইয়াছে; আমাদের এখানে বাসা পাওয়া কতকটা সেই রকমের। অতিথিবৎসলা রমণীগণকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে, বিদেশীর মুখে একথা শুনিয়া তাঁহারা কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। মিস্ সিজ্‌উইক্ সঙ্গে করিয়া, বোর্ণভিল গ্রামে 'ক্যাডবরির কোকো'র কারখানা ইত্যাদি দেখাইয়া আনিলেন; অতি বৃহৎ অদ্ভুত কারখানা! তিন হাজার স্ত্রীলোক ও দুই হাজার পুরুষ কাজ করিতেছে; কিন্তু নিঃশব্দে সুন্দরভাবে কাজ চলিতেছে। সর্ব্বত্র একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শান্তি বিরাজমান।

স্ত্রীপুরুষ—সকল কারিকরই অল্পবিস্তর লেখা-পড়া জানে। অধ্যক্ষদিগের বন্দোবস্তে এখানেও তাহারা লেখা-পড়া, ব্যায়ামচর্চ্চা, খেলা, প্রভৃতি সবই করে; যেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী খেলাচ্ছলে এই প্রকাণ্ড কারখানা চালাইতেছে! ব্যবসায়ে লাভও হয় বিস্তর। ইহাদের লেখাপড়া, খেলা, স্বাস্থ্য-উদ্ধারক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত আছে, অনেক বিদ্যালয়ে ও বাড়ীতে সেরূপ নাই। সকল কারখানা যদি এভাবে চলিত, তাহা হইলে কোন দেশে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে অশান্তি ও অভাব থাকিত না।

কারখানাটি প্রকাণ্ড। কোথাও কোকো, কোথাও চকলেট, কোথাও বিস্কুট, কোথাও লজেঞ্জেস তৈয়ারী হইতেছে—প্যাক হইতেছে। প্যাক করিবার বাক্স, উহাতে বসাইবার ছবি, কাগজ, প্রভৃতি সমস্ত জিনিষই এই কারখানাতেই তৈয়ার হইতেছে। বাক্সবন্ধ হইয়া একেবারে রেলে করিয়া চালান দিবার জন্য, কারখানার ভিতর পর্য্যন্ত রেল-লাইন পাতা আছে। কারবার করা ইহাকেই বলে;—অথচ অতি সামান্য জিনিষের কারখানা!

দর্শকদিগকে অভ্যর্থনারও চূড়ান্ত আয়োজন।—টাট্‌কা চকলেট কোকো প্রভৃতি যত্ন করিয়া খাওয়াইল। শেষে, বিদায়কালে কিছু চকলেট ভোজন-দক্ষিণারূপে, অথবা পাথেয়ের পরিবর্ত্তে দিল। একজন স্ত্রীলোক-অধ্যক্ষ যত্ন করিয়া, সমস্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া গাড়ী পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া গেলেন—দর্শকদিগের পুস্তকে নাম সহি করাইয়া লইয়া ধন্য জ্ঞান করিলেন;—অথচ বাস্তবিক ধন্য ও প্রীত হইলাম আমি।

বাসায় আসিয়া দেখি, অন্যান্য সব ডেলিগেট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। খাওয়ার টেবিলে যাইবার সময় অধ্যক্ষমহোদয়, আমায় আহার-স্থানের সহচর নির্দ্দেশ করিয়া ও দক্ষিণে বসাইয়া, বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। কোন বাড়ীর গৃহিণী, বা বিদ্যালয়ের মহিলা-অধ্যক্ষ, আহার-স্থানে গমন সময়ে যাহার হাতে হাত দিয়া প্রবেশ করেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ খাতির-যত্ন করা হয়; একথা বোধ হয়, স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। অতএব, এক্ষেত্রেও আমার সম্মানটা খুবই হইল।

আহারের পর 'পার্টি' উপলক্ষে অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যথানিয়মে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান-বাজনা, কথা বার্ত্তা হইল। শয়নকক্ষে সব বন্দোবস্তই ভাল; কিন্তু ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জানালার উপরটা খুলিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত আছে; সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা বন্ধ করিতে পারিলাম না। হিম—ঠাণ্ডার ভয়ে কম্বলমুড়ি দিয়া রাত্রি কাটিল। এই দারুণ শীতে জানালা খুলিয়া শয়ন কত আরামের তাহা আর বর্ণনা করিয়া কায নাই!

মঙ্গলবার, ৯ই জুলাই—কুমারী ফ্রাই অনুরোধ করিলেন যে, যদি বৃষ্টল্ যাই, তাহা হইলে তাঁহার পিতা, বিচারপতি ও আইন-গ্রন্থলেখক ফ্রাই সাহেবের বাড়ীতে যাইয়া আতিথ্য-গ্রহণ করিতেই হইবে;—আমি আতিথ্যস্বীকার করিলে, তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

উচ্চ পাহাড়ের মত জায়গায় বার্ম্মিংহাম ইউনিভার্সিটি বিলডিংস্। জোসেফ চেম্বারলেনের যত্নে প্রকাণ্ড বাড়ী, লেবরেটোরী, হল, লাইব্রেরী, ওয়ার্কসপ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে। এখনও সমস্ত বাড়ী তৈয়ার হইয়া উঠে নাই। স্যর অলিভার লজ এখানকার অধ্যক্ষ। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত আলাপ হইল। ইংলণ্ড যাঁহাদের নামে ও কার্য্যে পবিত্র ও ধন্য হইতেছে, স্যর অলিভার লজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম; প্রাচীন ঋষিতুল্য ব্যক্তি; যেমন বিজ্ঞানবিৎ তেমনি ধর্ম্মপ্রিয়—বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্মের

প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহার বিজ্ঞানে যেমন শ্রেষ্ঠ স্থান, ধর্ম্মতত্ত্বেও তাই। পরলোক ও আত্মার গতি সম্বন্ধে ইনি বিশেষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু।

ইউনিভার্সিটি দেখিয়া, সহর দেখিতে দেখিতে,ইম্পিরিয়াল হোটেলে যাওয়া হইল। সেখানে ভোজ ও বক্তৃতা যথারীতি হইল। ভোজ-বক্তৃতা না হইলে, ইহাদের কোন কার্য্যই সমাধা হয় না। তাহার পর, গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। এখানে, বার্‌ণ্‌ জোন্‌সের চিত্রের অনুকরণে, সুন্দর Stained glass-window আছে। এবার ভ্রমণ উপলক্ষে অনেক গির্জ্জা দেখা ঘটিল; কিন্তু এরূপ সুন্দর Stained glass-window বড় কোথাও দেখি নাই। সহরের আরও দুই একটি দর্শনীয় দৃশ্য দেখিয়া, বিকালে বার্মিংহাম ত্যাগ করিলাম।

ম্যাঞ্চেষ্টার

অন্যান্য ডেলিগেটদিগের সহিত শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, ম্যাঞ্চেষ্টারে রওয়ানা হইলাম। পথে প্রধান নগরের মধ্যে ক্রু ও ষ্টাফোর্ড। ষ্টাফোর্ডশায়রে চীনার বাসনের কারবার অধিক। অধিকাংশস্থলই কলকারখানা, চিমনি, ধোঁয়া এবং বহুলোকের একত্র বসতিতে পরিপূর্ণ। তবে মধ্যে মধ্যে সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্যও আছে।

অভ্যর্থনা করিবার জন্য ইউনিভার্সিটি হইতে প্রতিনিধি, ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন; বাঙ্গালীছাত্রও জনকয়েক গিয়াছিলেন। ছাত্রগণ বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করাতে, ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষগণের আমীরি বন্দোবস্ত উপেক্ষা করিয়া, ছাত্রদিগের বাসাতেই বাস করা স্থির করিলাম; তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়া আমার সেবাশুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন; যেন বাড়ীর মত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, বাহির হইয়া পড়িলাম; কিন্তু শরীর তত ভাল ছিল না বলিয়া, শীঘ্রই বাসায় ফিরিতে হইল।

১৩ই জুলাই, শনিবার।—বার্ম্মিংহ্যাম হইতে বুধবার রওয়ানা হইবার পর—আর লিখিবার সময় হয় নাই। শনিবার হইতে সোমবার সকাল অক্‌স্‌ফোর্ড, সোমবার-মঙ্গলবার বার্ম্মিংহাম, মঙ্গলবার-বুধবার ম্যাঞ্চেষ্টার, বৃহস্পতিবার লিভারপুল, শুক্রবার লীড্‌স; এই এক এক স্থানে এক এক দিনে কত দেখিতে হইয়াছে, কত শুনিতে হইয়াছে, কত বেড়াইতে হইয়াছে, কত বলিতে হইয়াছে, কত ভাবিতে হইয়াছে, কত পরিশ্রম হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে মাথা স্থির থাকে না। আজ প্রাতর্ভোজনের পর, একটু সময় পাইয়া মোটামুটি এই কয়দিনের কথা লিখিতেছি;—বিস্তারিত লেখা অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন।
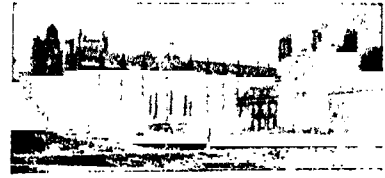
কেম্‌ব্রিজ্‌—ট্রিনিটি কলেজ

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সাড়ে দশটার সময় আবার কেম্‌ব্রিজে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে হইবে।

এদিকের সহরগুলি, সবই প্রায় এক ধরণের। সকল সহরের প্রধান রাস্তাগুলিও প্রায় একই রকমের। কল-কারখানা, চিমনি, ধুঁয়া, ধূলা, মাল, লোকের ভিড়—ইহাই চতুর্দ্দিকে! ইংরাজীতে এ প্রদেশটাকে ব্ল্যাক্‌-কন্ট্রি, অর্থাৎ "কাল'দেশ" বলে। চতুর্দ্দিক কাল'। পাথরের সুন্দর সুন্দর সাদা বাড়ীগুলি, এক বৎসরের মধ্যেই কাল' হইয়া গিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারে একটা বাড়ী সাফ করিতেছে, দেখিলাম;—হরকালী মূর্ত্তি! কতকটা কাল—কতকটা সাদা। দেখিলেই বোঝা যায় যে, ধুঁয়ার জন্য এই সকল বাড়ী অল্পদিনের মধ্যেই এইরূপ কাল'মূর্ত্তি ধারণ করে; অথচ এই ধুঁয়াই ইহাদের লক্ষ্মী! ইহারই জন্য, শুধু ভারতবর্ষের নয়—পৃথিবীর শিল্প ও বাণিজ্য ইংরাজের করায়ত্ত; এবং ইহা রক্ষার জন্যই ইহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের এত রণতরী ও সৈন্যসম্ভার! স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর পাহাড়, বন, নদী, উপত্যকা-অধিত্যকার সন্নিবেশ আছে বটে; কিন্তু সাধারণতঃ এ অঞ্চলে ধোঁয়া, কয়লা, চিমনি ও মালের প্রাদুর্ভাব অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও তদনুরূপ। বার্ম্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার ও লিভারপুল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। শিল্পবিদ্যা ও বাণিজ্যের প্রসারতাকল্পে বিদ্যাশিক্ষাই এই সকল ইউনিভার্সিটিতে অধিক। অন্যান্য বিদ্যার আলোচনা

যে আদৌ নাই, তাহা নহে ; কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যাতেই ইহারা অধিক মন দিতেছে। আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য স্থানে ইহার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু এই চেষ্টার প্রসারতা আবশ্যক। সেইজন্য, আমাদিগেরও এসকলসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া দেখা-শুনার প্রয়োজন হইয়াছে ; এবং বিশেষজ্ঞেরা এসকল বিষয়ে, বিশেষ গবেষণাপুর্ব্বক উভয়পক্ষীয় শিক্ষার দোষগুণ বিচার করিয়া, যে সকল নিয়ম নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাও সম্যক্‌রূপে জানা উচিত। সর্ব্বত্রই ইউনিভার্সিটির পক্ষে সকল বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত ! কোন কষ্ট বা অসুবিধা নাই। এক একদিন এক এক স্থানে বাস !—চলিতেছে মন্দ নহে। প্রাতে গৃহস্থবাড়ীতে আহার, মধ্যাহ্নে সাধারণ ভোজ, রাত্রিতেও তাহাই ; সবই প্রায় একই ধরণের। যে যে স্থানে আমাকে কিছু বলিতে হইয়াছে, সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর বক্তৃতা-কৌশলসম্বন্ধে সমালোচনা ও মতপ্রকাশ একই প্রকারের—বাঙ্গালী অদ্ভুত জীব ; ইংরাজের মত, এবং সময়ে সময়ে ইংরাজের অপেক্ষাও ভাল, ইংরাজী বলে ; ইহা একটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা মনে করিয়া, সকলেই আনন্দপ্রকাশ করেন, ধন্যবাদ দেন, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বপ্রকাশ করিয়া, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের বাড়ী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন ! এও বড় আশ্চর্য্যের কথা ! কিন্তু সকল স্থলে ও সকল সময়ে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ সম্ভব নহে। বার্ম্মিংহামে ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার পত্নী লেডী লজ্, তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া থাকি নাই বলিয়া, অভিমান করিয়াছেন এবং পুনরায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের স্যর্ ফ্রাঙ্ক এডামও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। লীড্‌সের ভাইকার-পত্নী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহাদের বাড়ীতে দুই একদিন কাটাইতে বলিয়াছেন ; ইনি স্বর্গীয় স্যর্ মনীয়র উইলিয়ম্‌সের কন্যা। ইঁহাদের সকলের নিমন্ত্রণ, গ্রহণ ও রক্ষা সম্ভব হইল না ; কারণ দেহ ত একটা, সর্ব্বত্র বিরাজমান হয় কিরূপে ? কিন্তু এরূপ আন্তরিক আদর-অভ্যর্থনায় মোহিত হইতে হয়। ভারতের ইংরাজ ও ইংলণ্ডের ইংরাজের প্রভেদ দেখিয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইতে হয় !—ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই ?

মঙ্গলবার প্রাতে ইউনিভারসিটি দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী ! লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী, ক্ল্যাসরুম, ওয়ার্কসপ, সমস্তই যথোপযুক্ত। ঋষিতুল্য এখানকার অধ্যক্ষ, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান উভয় বিষয়ে সমান অধিকারী। উভয়ের তুল্য স্থাননির্দ্দেশে জীবন অতিবাহিত করিয়া, বিজ্ঞানবিৎ ও তত্ত্ববিৎ উভয়েরই ধন্যবাদার্হ হইতেছেন। ভারতে এ সকল ঋষির পদার্পণে ভারতবাসী ধন্য হইবে, একথা জানাইলাম। তিনিও ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প প্রভৃতির যথেষ্ট গুনগান করিয়া, বলিলেন যে, তাঁহার কখনও ভারতদর্শন ঘটিলে ধন্য হইবেন ! এই সমস্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তির সহিত আলাপ ও পরিচয়ে নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। ইউনিভার্সিটীর নানাবিভাগের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ফিজিক্‌স্‌এর প্রফেসর মহাশয় এক নূতন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন ; তাহার সাহায্যে অন্ধ, আলোর শব্দ (sound of light) শুনিতে পাইয়া, চলিতে পারিবে। ইহার পরিশ্রম সফল হইলে, বাস্তবিকই এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার হইবে। তারপর, কয়লার খনিতে Gas explosion হইলে, মানুষের প্রাণরক্ষা করিবার নূতন যে যন্ত্রাদির উদ্ভাবন হইতেছে, তাহার বিস্তারিত প্রমাণপ্রয়োগ দেখিলাম। অক্‌সিজেন-এর ব্যাগ পিঠে লইয়া, মুখস-পরা rescue party, explosionএর পর কিরূপে উদ্ধার-কার্য্য করে, তাহার জীবন্ত চিত্র সব দেখান হইল। যখন আমরা বার্ম্মিংহামে কৌতূহলনিবৃত্তিচ্ছলে এই সব দৃশ্য দর্শনে নিযুক্ত, প্রায় সেই সময়েই ইয়র্কের নিকট একটি খনিতে এইরূপ Gas explosion হইয়া প্রায় নব্বই জন লোক মারা যাইতেছিল ! এ সংবাদ ম্যাঞ্চেষ্টারে আসিয়া পাইলাম। এই সকল যন্ত্রের পুরাতন-সংস্করণ কয়লার খাদে প্রচলিত আছে ; নূতন যন্ত্র সব জায়গায় এখনও প্রবেশলাভ করে নাই ; করিলে, বোধ হয়, এ দুর্ঘটনায় এত লোক মারা যাইত না। মারা গিয়াছে, শুধু কুলী-মজুর নহে ; রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত তিনজন প্রধান ইন্‌স্পেক্টরও এই বিষম দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, আমাদের ভারতপরিচিত স্যর্ টমাস হলাণ্ডের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ; স্যর্ টমাস হলাণ্ড সেই জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারে আমাদের অভ্যর্থনাক্ষেত্রে আসিতে পারেন নাই ;—বন্ধুর পরিবারবর্গের সান্ত্বনার জন্য ইয়র্কে গিয়াছেন। লণ্ডনে, ইউনিভার্সিটি কংগ্রেসে, স্যর টমাসের সহিত দেখা হইয়াছিল। তাঁহাকে আমি, কংগ্রেসের 'বুরো কমিটি'র জন্য ভারতের

প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে সাহায্য করিয়া, কোন কোন ভারতীয় সাহেবের কিছু বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। কারণ বলিতে পারি না; কেননা ইংলণ্ডের সাহেবেরা মহাপ্রাণ লোক ও ভারতবাসীর বিশেষ হিতৈষী। ম্যাঞ্চেষ্টারের যে বাড়ীতে বাসা হইয়াছিল, সে বাড়ীর মেয়েরা চোগা চাপকান পাগড়ী ও তদনুরূপ শীলতায় প্রীত হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, ভারতবর্ষের একজন রাজপুত্র আসিয়াছেন! তাঁহারা খাতায় আমার হাতের লেখা লিখাইয়া লইলেন; আমিও মিণ্টন হইতে এক একছত্র কবিতা লিখিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্য করিলাম। আমাদের যুবকবৃন্দ অনেক সময়ে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া, সহজে রাজপুত্র পদে উন্নীত হইয়া, মাথা হারাইয়া ফেলে এবং নিজেরা বিপদে পড়ে, ও পরকে ফেলে।

ম্যাঞ্চেষ্টারে বুধবার সকালে ইউনিভার্সিটি দেখা ও ফীল্ডেন স্কুল দেখা হইল। ডাঃ রদারফোর্ড, রেডিয়ম সম্বন্ধে আশ্চর্য্য 'এক্‌সপেরিমেণ্ট' দেখাইলেন। তাহার পর, টাউনহলে লর্ড মেয়রের জলযোগ। লর্ড মেয়র ও লেডি মেয়রসের নিকট আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটী হইল না। প্রসিদ্ধ কেমিষ্ট, ডাঃ লেভেনসনের সহিত আলাপ হইল। তিনি এবং মিষ্টার ও মিসেস্ রিচার্ড, তাঁহাদের বাড়ী যাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন; কিন্তু ছাত্রগণের আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া, তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। লেভেনসন্ অন্ততঃ মোটরে করিয়া সহর দেখাইয়া বেড়ান, বাড়ী পৌছান, এসকল কার্য্য করিবার অধিকার পাইয়া, যেন কৃতার্থ হইলেন। অথচ ইঁহারাই বিশ্ববিখ্যাত দিগ্‌গজ পণ্ডিত! পণ্ডিতের বিনয় ও নম্রতায় যত মুগ্ধ হইতে হয়, ধনীর নম্রতায় তত হয় না। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ সকল অভ্যর্থনাকারীতেই ধন ও পাণ্ডিত্য—উভয়ই, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। সর্ব্বত্রই লর্ড মেয়র ও ইউনিভার্সিটি ভাইস-চ্যান্সেলারগণ, সমান খাতির ও সমান যত্ন করিয়াছেন;—এটা ভাগ্যের কথা বটে!

'স্কুল অফ্ টেক্‌নলজি'তে কেমিষ্ট্রি, ডাইং, উইভিং, কেলিকো-প্রিণ্টিং ইত্যাদি ডিপার্টমেণ্টের জটিল কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাঙ্গালীর ছেলে বেচারারা এই সকল জায়গায় যাহা শিখিয়া যাইতেছে, তাহাও কাজে লাগাইতে না পারিয়া, শেষে কেরাণীগিরিতে তাহাদের জীবন পর্য্যবসিত করিতেছে। ইহার একটা উপায় না হইলে, বিদেশে শিল্পশিক্ষার জন্য ছেলেদের পাঠানই লাঞ্ছনা—বিড়ম্বনা!

ম্যাঞ্চেষ্টার—পিকাডেলি

লিভারপুল

বৃহস্পতিবার সকালেই লিভারপুলে পৌছিলাম। ভাইস চ্যান্সেলার স্যর আলফ্রেড ডালের বাড়ী বাসা। রাজার হালে বাস, রাজার হালে আহার, আর কুলীর মত ঘুরিয়া বেড়ান—এই চলিতেছে! মহারাজ বালানান্দ স্বামী যথার্থই বলেন যে—"রাজার মত বুদ্ধি, আর চাষার মত, শরীর না হইলে কার্য্যক্ষেত্রে কাহারও রক্ষা নাই!"—আমাদের ঠিক বিপরীত। রাজার মত দেহ, কুলীর মত বুদ্ধি। যখন ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ী পৌছিলাম, তিনি তখন ইউনিভার্সিটিতে, এবং তাঁহার গৃহিণী বিদেশে। অগত্যা বৈঠকখানায় বসিয়া, বাড়ীতে চিঠিপত্র লিখিয়া, ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং,-ইলেক্‌ট্রিকেল, ফিজিকেল সব ডিপার্টমেণ্ট দেখা হইল। লিভারপুল বাণিজ্যপ্রধান স্থান; কাজেই শিল্পবাণিজ্যের আদরই এখানে অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহারই ছায়া। লিভারপুলের 'স্কুল অফ্ ট্রপিকেল মেডিসিন্' দেখিবার জিনিস। ভারতবর্ষের ম্যালেরিয়া ও মশকতত্ত্বের বিচার করিয়া যিনি ধন্য হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত ডাক্তার স্যর ডোনাল্ড রস এখানকার অধ্যক্ষ; তিনি যত্ন করিয়া সব দেখাইলেন;—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বেরী-বেরী, স্লিপিং সিক্‌নেস ইত্যাদি সম্বন্ধে ও সর্পাঘাত-চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তর অনুসন্ধান চলিতেছে।

দুই প্রহরে ভাইস্ চ্যান্সেলরের বাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজন ও সন্ধ্যার সময় এলেডফি হোটেলে সকল ডেলিগেটের একত্র

ভোজন যথারীতি হইল, একথা বলাই বাহুল্য। ভাইস চ্যান্সেলার নিজে মোটরে করিয়া হোটেলে লইয়া গেলেন, ও লইয়া আসিলেন। স্ত্রীর অভাবে, নিজেই যথাসাধ্য আদরযত্নের ত্রুটী করিলেন না; নিজের শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। বাস্তবিক অতিথিসেবা কাহাকে বলে, ইঁহারাই জানেন; আমরা কেবল ভাণ করি বই ত নয়! ইঁহাদের আন্তরিকতায় একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

বিকালে এথার্টন কোম্পানীর বড় সাহেবকে লইয়া,লিভার ব্রাদার্সদিগের 'সন্‌লাইট সোপ'-এর কারখানা, লিভারপুল
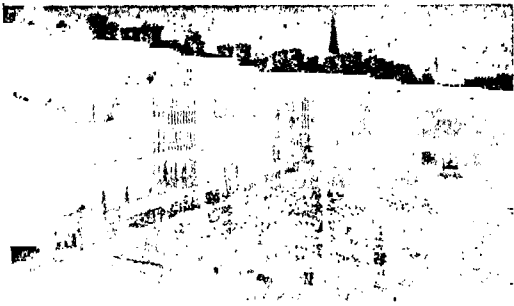
লিভার পুল—বেভিংটন্ ষ্ট্রীট

ডক্‌স্ ইত্যাদি দেখিয়া আসিলাম। আমেরিকাযাত্রী প্রকাণ্ড 'লাইনা'র কয়েকখানি মার্সি নদীতে দেখিলাম। টিটানিক-বিভ্রাটের পর, জাহাজ আর অত বড় করা হইবে না, স্থির হইয়াছে। কিন্তু মোরালেনস্ প্রভৃতি প্রকাণ্ড যে সব জাহাজ দেখিলাম, তাহাতেই চক্ষুস্থির হইল। মার্সি নদীটী বরং আমাদের দেশের নদীর মত কতকটা বিস্তৃত। অন্য অন্য যে সব নদী দেখিয়াছি, সেগুলি ত "খাল" বলিলেই হয়। ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে আহারের পর ভাইস চ্যান্সেলার ডালির সহিত সাহিত্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে, ও প্রধান প্রধান লেখক ও রাজনীতিজ্ঞগণসম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইল। অনেক নূতন তথ্যও পাইলাম। ঘুরিয়া বেড়াইয়া কষ্টস্বীকার, অর্থব্যয় ও শরীর নষ্ট এত যে হইতেছে, তাহা এই সকল দেশবিশ্রুত পরমপণ্ডিতগণের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট পোষাইয়া যাইতেছে; এবং ইহাতেই কংগ্রেসের যথার্থ কায হইতেছে; আমারও দেশভ্রমণ সার্থক হইতেছে!

লীড্‌স্

শুক্রবার প্রাতে লীডস যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন হইতেই আতিথ্যসৎকারের আরম্ভ, এবং পরদিন ষ্টেশনে তাহার সমাপ্তি; নিজেদের কোন বিষয়ই কিছুমাত্র আমাদিগকে দেখিতে হইল না। বরের মত সর্ব্বত্র গমন ও আদরগ্রহণ! কেবল শরীরের কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেই হইল।

স্যাড্‌লার শিক্ষা বিষয়ে এক প্রধান অথরিটি। সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের মেম্বার ছিলেন, এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন, কভাটরটো ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট হইবার কথাও হইয়াছিল।

বরোদার গাইকওয়াড় তাঁহাকে ভারতবর্ষে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; স্যার থিয়োডোর মরিসন্, ইঁহার ভারতবর্ষে যাইবার কথা সেদিন ইণ্ডিয়া ডেলিগেটদের কন্‌ফারেন্সে উল্লেখ করিয়াছিলেন। স্যাড্‌লার সাহেব কলেজ-লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করিয়া সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর ডাইং, উইভিং, কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্‌স্, ট্যানিং, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং—মায় এক্‌স্‌প্লোজন টেষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাশুনা হইল।

বেলা ১॥ টার সময় ভোজ, বক্তৃতা ইত্যাদি সব যথারীতি হইল। টেবিলে আমার একদিকে বিশপ অব্ রীপণ, অপরদিকে ভিকার অফ লীড্‌স্— শ্রীভগবানের কৃপায় এইরূপ মহাসম্মান সর্ব্বত্রই পাইতেছি। হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টানধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল; বুদ্ধ-চৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া, রামমোহন রায় প্রভৃতির কথা হইল। বুঝাইয়া বলিলে, মহা-গোঁড়া খৃষ্টানও হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বকথা মন দিয়া শোনেন, ও যথাযোগ্য সম্মান করিতে বাধ্য হন।

ইহার পর গ্রামার স্কুল দেখিতে যাওয়া গেল। ইংরাজ বালকের প্রাথমিকশিক্ষা এই সমস্ত স্কুলেই হয়; সেইজন্য ইহাদের মানও এত বেশী। সেখান হইতে মেয়েদের স্কুল, ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি দেখিতে যাওয়া গেল। সর্ব্বত্রই সুচারু ব্যবস্থাবন্দোবস্ত দেখিয়া, হাঁ করিয়া থাকিতে হয়; দেশে অনুকরণ করিব কি করিয়া, ভাবিয়া পাই না। ট্রেনিং কলেজ-সংক্রান্ত ১২০ বিঘা জমি ঘিরিয়া যে ৫।৭।১০টা বড় বড় বাড়ী আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ এখানকার ছাত্রছাত্রীরা মাত্র এলিমেণ্টারি স্কুলের শিক্ষক হইবেন। ৩০০ ছাত্রছাত্রী পড়াইতে ৮০ জন

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আছে। এই সকল ব্যাপারের অনুকরণে আমাদের বিদ্যালয় গঠন করা সুদূরপরাহত।

বাড়ী ফিরিবার পথে মহা ঝড়জল দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল; ঘন ঘন বজ্রাঘাতও হইতে লাগিল। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা নাকি অভিনব দৃশ্য! আমিও বড় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; কোন গতিকে বাসায় পৌছান গেল। আমি লিডনহল্ নামে ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ, ডাক্তার ক্যামিরণের অতিথি। আজ আহারে নিতান্ত অরুচি; বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন। অগত্যা তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া,

লিভারপুল—সেণ্ট্ জর্জ্জেস্ হল্

ডিনার টেবল হইতে অবসর লইয়া, খুব খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইলাম। তাহার পর, পুনরায় ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংএ রিসেপসন সভায় যাইতে হইল। মহা সমারোহ ব্যাপার। প্রো-চ্যান্সেলর্ লপ্টনের সহিত লণ্ডন লর্ড মেয়ররে রিসেপসন পার্টিতে আলাপ হইয়াছিল; তিনিই আজ সভাপতি। ভাইস চ্যান্সেলার স্যাডলার অপূর্ব্ব বিদ্যা ও বাগ্মিতা বিস্তার করিয়া "Present Tendencies in Education"সম্বন্ধে এক সুন্দর ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ভাইস চ্যান্সেলার স্যাড্লার ও প্রো চ্যান্সেলার লপটন্, উভয়েই আমায় কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলিবার সময় মাত্র দশ মিনিট ধার্য্য ছিল; আমি সেই দশ মিনিট বলিয়াই বসিতে যাইতেছি, এমন সময় করতালি ও জয়ধ্বনি করিয়া, আমায় আরও কিছুক্ষণ বলিবার জন্য সভাস্থ সকলেই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা বকিলাম; অবান্তর কত কি যে বকিলাম, মনে নাই। আমায় কিছু বলিতে হইবে, এমন কথা ছিল না; সেইজন্য প্রস্তুতও ছিলাম না। কাজেই জিহ্বার দুষ্ট সরস্বতী চাপিয়া বসিলেন। আর এইরূপ "অপ্রস্তুত" অবস্থাতেই আমার বলিবারও সুবিধা হয়। চেয়ারম্যান মহাশয় মুক্তকণ্ঠে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সভাভঙ্গে অনেকেই নিকটে আসিয়া সজোরে করমর্দ্দন ও আলাপ করিলেন; এবং আতিথ্যগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মঙ্গলকামনা অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়া—পরিশ্রান্ত দেহে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে, পূর্ণপ্রাণে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, বাসায় ফিরিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কেম্ব্রিজ

সকালেই লীড্স্ হইতে বিদায় লইলাম; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অতিথিসৎকার, আর ফুরায় না। তাঁহারা ষ্টেসন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া জিনিষপত্র নিজেরা হাতে করিয়া তুলিয়া দিয়া, ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখাইলেন। ট্রেনে সহযাত্রী ডেলিগেটদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সময়টা বেশ কাটিয়া গেল। আজ "ইয়র্কসায়ার পোষ্ট" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রে কল্য লিড্সের সভার কার্য্যবিবরণ ও তৎসঙ্গে আমার বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যও বাহির হইয়াছে। "ইয়র্কসায়ার পোষ্ট" যত লিখুক আর না লিখুক, ট্রেনে বন্ধুবর্গ তাহাকে শতগুণে বাড়াইয়া, আমার বক্তৃতায় প্রশংসা করিয়া আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার যোগাড় করিলেন। টরেণ্টোর প্রেসিডেণ্ট ফাকোনার, মেলবোর্ণের ডাঃ ব্যারেট, ম্যাকগিলের ডাঃ পোর্টার প্যাক্ষেশুনা, প্রফেসর ম্যাকে, সকলেই একবাক্যে "লাঙ্গুল স্থূলীকরণের" চেষ্টা করাতে কিছু বিস্মিত হইলাম। মনে হইল, বানর নাচাইতেছে নাকি! কিংবা হয় ত ইঁহারা মনে করেন, আমাদের দেশের লোক এতই অকর্ম্মণ্য যে, তাহাদের মধ্যে যে কেহ দুইটা ইংরাজী কথা ভাল করিয়া বলিতে পারিলেই তাহাকে যথেষ্ট বাহবা দেওয়া উচিত! অথবা কে জানে, সত্য সত্যই ইঁহারা হয়ত আমার কথায় তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটির মাষ্টার, পণ্ডিত-প্রবর ডাক্তার বাট্লার পর্য্যন্ত বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই পাঁচ সাতবার বিলাতে আসিয়া এখানের ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা লাভ করিয়া এমনভাবে বলিতে শিখিয়াছ"! চতুর্দ্দিকে

এইরূপ স্তুতিবাদে যদি মাথা ও মেজাজ একটু বিগড়াইয়া যায়, তাহা হইলে মাথা ও মেজাজের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি ? কিন্তু বিগড়াইতে দিলে চলিবে না। কোনরূপে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। যাহা হউক, বিকালে কেম্ব্রিজ পৌছিলাম। ষ্টেসনে ডাঃ বটলার অপেক্ষা করিতেছিলেন ; ইনি ট্রিনিটির মাষ্টার, অতি সম্মান ও সমৃদ্ধির পদ। গৌরবে ট্রিনিটি কলেজ, কেম্ব্রিজের সকল কলেজের শীর্ষস্থানীয়। ভারতের শিক্ষা-সচিব স্যর হার্কোট বটলার, এই ডাক্তার বটলারের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পূজ্যপাদ খুল্লতাতের মন্দিরে আমি আজ সম্মানিত ও পূজ্য অতিথি। আমার জন্য "এক নম্বরের" ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, জজ সাহেব সার্কিটে আসিয়া এই ঘরে বাস করেন। ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া চমক লাগিয়া যায় ;—শয্যা, ছবি, আসবাব প্রভৃতি সমস্ত গৃহসজ্জাই অতি উচ্চ অঙ্গের। এই ঘরের উপরেই "রাজার ঘর"। রাজরাজেশ্বর সেই ঘরে আসিয়া রাত্রিবাস করিবেন বলিয়া, ঘর-সাজানর বন্দোবস্ত হইতেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, কেম্ব্রিজে আসিলে এই ঘরে বাস করিতেন। কেম্ব্রিজে এই গৃহে সম্মানিত অতিথি হওয়া অপেক্ষা গৌরব ও সম্মানের আর কি আশা করা যাইতে পারে ? ট্রিনিটির মাষ্টার মহাশয় কালা আদমিকে এতটা সম্মান করিয়া—নিজে যাইয়া গাড়ী করিয়া লইয়া আসাতে—বিদেশীয় ডেলিগেটগণ কতকটা আশ্চর্য্য হইলেন। বাস্তবিক আমিও এইরূপ সম্মান পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, সামান্য বিশ্রাম করিয়া কলেজ দেখিতে গেলাম ;—বটলার সাহেব নিজেই লইয়া গেলেন। ক্ষীণকায়া "ক্যাম" নদীর উপর সুন্দর সুন্দর বাড়ী-বাগান, সেতু দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। অক্‌স্‌ফোর্ডে দ্বাবিংশতিটি কলেজ আছে। অপরিসর রাস্তার উপরে সকলগুলিই প্রায় একত্র অবস্থিত ; কিন্তু এখানে সেরূপ নহে। নদীর উপর কলেজের বাগানগুলিকে "কলেজ ব্যাক" বলে। এগুলি বড়ই সুন্দর! এখন ছুটির সময়—একটা কেমন যেন নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্তির ভাব চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে !

এই কেম নদীতেই মিলটন-এর বন্ধু ডুবিয়া মারা গিয়াছিলেন ; তাহাতেই লাইসিডাস-এর সৃষ্টি। মিলটন ক্রাইষ্ট্‌স্‌ কলেজের ছাত্র ছিলেন ; তাঁহার নিজের হাতের লিখিত লাইসিডাসের পাণ্ডুলিপি ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত ;—দেখিয়া পড়িয়া ধন্য হইলাম। বায়রন, মিল্‌টন, টেনিসন, ডারুইন, নিউটন, কোলব্রুক্‌ ইত্যাদি মহামতিগণের হস্তাক্ষর বিস্তর রক্ষিত রহিয়াছে। তাঁহাদের ছবি ও প্রস্তরমূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে সজ্জিত লাইব্রেরীর সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। চারিদিকেই যেন একটা মহিমময় গৌরব বিরাজমান।

প্রেমব্রোক কলেজ, সেণ্টজন্‌স্‌ কলেজ, ট্রিনিটি হল প্রভৃতি কয়েকটা কলেজের বাড়ী ও "Back" বাহির হইতে দেখা গেল। সময় ছিল না অতএব সব তন্নতন্ন করিয়া দেখা সম্ভব হইল না।

রাত্রিতে আহারের সময় বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর এডওয়ার্ড ক্যাণ্ডি ও অধ্যাপক শর্লি ও তাঁহাদের স্ত্রীদের সহিত আলাপ হইল। Mrs. Sorley, আবর্ডিনের প্রিন্সিপাল জর্জ্জ এডাম স্মিথের ভগিনী ; তাঁহার সহিত স্মিথ পরিবারের অনেক কথা হইল। Mrs. Sorley ও Mrs. Butler উভয়েই সুশিক্ষিতা ; তাঁহাদের সহিত আলাপে বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

১৪ই জুলাই রবিবার।—আজ সকালেই কোথাও যাইতে হইবে না ; এই আনন্দে বেলা ৮॥০ টা পর্য্যন্ত বিছানায় শুইয়া থাকিতেই প্রাতর্ভোজনের সময় আসিয়া পড়িল। কাযেই স্নান করিতে অবসর পাইলাম না! জলযোগের পর সহর ও বাকী কলেজগুলি দেখিতে গেলাম। একটি বাঙ্গালী যুবকের সহিত রাস্তায় দেখা হইল ;—কথা কহিল না। জানি না এই মহাপ্রভুই নাম জিজ্ঞাসা করিতে কাল ডাক্তার রায়ের উপর রুষ্ট হইয়াছিল কি না। কোন্‌ জানোয়ারের ল্যাজে পা পড়ে, এই ভয়ে আমিও কথা কহিলাম না। এই সব কুলাঙ্গারের জন্যই সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে !

প্রথমে কিংস কলেজ ও তৎসংক্রান্ত চ্যাপেল দেখিতে গেলাম। ট্রিনিটি কলেজের পরেই কিংস কলেজ প্রধান ; বাড়ী-বাগান প্রভৃতি সবই প্রকাণ্ড ও সুন্দর। আমাদের দেশে এই সকল কলেজের অনুকরণে লেখাপড়া শেখান অসম্ভব। কিংস কলেজটি অতি সুন্দর। গথিক ষ্টাইলের খিলান-শোভিত, এরূপ সুন্দর চ্যাপেল বুঝি আর নাই। এলাহাবাদের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর অফ পবলিক ইন্‌ষ্ট্রক্‌সন্‌, মিঃ লিউইসের সহিত দেখা হইল। তাঁহার সহিত বেড়াইতে

বেড়াইতে কিংস কলেজ, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, পিটপ্রেস্, সেনেট হাউস, ক্যাথারাইন কলেজ ইত্যাদি দেখিয়া সেন্ট-পিটর্স্ কলেজ দেখিতে গেলাম। এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কলেজ; ইহার চ্যাপেল, হল ও কম্বিনেশন রুম (এখানে Common Room বলে না) ছোট হইলেও সুন্দর। কয়েকটি stained glass-window আছে, যেন কয়েকখানি সুন্দর painting. অনেকে বলেন যে, এত সুন্দর ছবি থাকিলে নাকি প্রার্থনা ও ভজনার ব্যাঘাত হয়!

তারপর পেম্ব্রোক কলেজে; গেলাম কলেজ দেখিয়া, লিউইস সাহেবের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। পথে রবিবাবুর ছেলের সঙ্গে দেখা হইল; ইঁহারা কেম্ব্রিজে বেড়াইতে আসিয়া ছিলেন। লিউইস সাহেবের পরিপাটী বাড়ী-বাগান দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। ইনি এখনও টি্নিটি কলেজের ফেলো হইয়া গণিত-চর্চ্চা করেন। ইঁহার পুত্র সিভিল সার্ভিস পাস করিয়া, নূতন বাঙ্গালা শিখিতেছে; আলাপ হইল। লিউইস সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া জলযোগ করাইলেন; তাহার পর তাঁহার পুত্র টি্নিটি কলেজের দরজা পর্য্যন্ত আমাকে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। ভারতবর্ষেও ইঁহার এইরূপ মনোভাব থাকিলে সুখের বিষয় হইবে। মধ্যাহ্নে নিউহাম কলেজ দেখিতে যাইলাম। এখানে কলেজের অধ্যক্ষ জষ্টিশ ষ্টীফেনের ভগিনী মিশ ষ্টীফেন। নিউহাম ও গার্টেন কলেজ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের জন্য; পুরুষ অধিকারবর্জ্জিত। মিশ ষ্টীফেন যত্ন করিয়া লাইব্রেরী, হল, বাগান সব দেখাইলেন। মেয়েরা বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া পড়াশুনা করিতেছে। অনেক-গুলি বাড়ী ছাত্রীদিগের থাকিবার স্থান। লাইব্রেরীতে পিত্তলের "কালী" ও "নাড়ুগোপাল" মূর্ত্তি রহিয়াছে। এগুলিকে 'Funny little creatures' বলিয়া বর্ণনা করাতে মিস ষ্টীফেনকে বলিতে বাধ্য হইলাম যে, ভবিষ্যতে কোন হিন্দুর সম্মুখে অজ্ঞানতাবশতঃ যেন এইরূপ কোন ভ্রম প্রকাশ না করেন। এবং আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত তাঁহাকে এই মূর্ত্তিগুলির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলাম। তিনিও অনুতপ্তচিত্তে তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। আশ্চর্য্য! ভদ্র ইংরাজ—কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই প্রকৃতি একরূপ!—অজ্ঞানতা-বশতঃ প্রথমে একটা কথা বলে বটে; কিন্তু বুঝাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া ক্ষমা চায়!

কেম্ব্রিজের নীচেই স্বল্পতোয়া ক্যাম নদী প্রবাহিত। নৌকারোহণে কলেজ "ব্যাক্স" দেখিয়া কিছুক্ষণ বেড়ান গেল। বহুকাল পরে দাঁড় টানিয়া আনন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম বোধও হইল। যৌবনে এসকলের খুবই চর্চ্চা ছিল; ইহার জন্য প্রাইজও পাইয়াছি। কিন্তু এখন কি আর চলে? কেম্ব্রিজের কলেজ ব্যাক্গুলির মত সুন্দর বাগান অতি অল্পই দেখিয়াছি। নৌকা হইতে উহাদের শোভা আরও মনোহর। বেড়াইয়া শরীর ও মন বড়ই তৃপ্ত হইল।
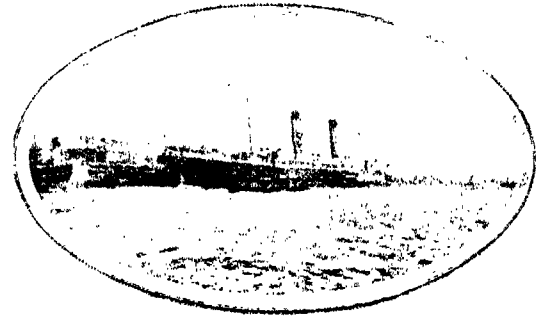
লিভারপুল্—বন্দর

সন্ধ্যার সময় নৈশভোজ কলেজ হলে হইল। প্রকাণ্ড হলের চতুর্দ্দিকে মহামনা মনস্বিগণের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত; তথায় অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণকে একত্র আহার করিতে হয়। হাইটেবলটি অন্যান্য টেবল অপেক্ষা কিছু উচ্চস্থানে রক্ষিত। অধ্যক্ষমহাশয় ও অধ্যাপকগণ সেই স্থানে বসেন—ছাত্রেরা নীচে বসে। আজ অধ্যক্ষের দক্ষিণে আমার স্থাননির্দ্দেশ করিয়া, সেই মহা পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে আমায় বিশেষ সম্মানিত করা হইল। ফিজিক্সের অধ্যাপক স্যর জোসেফ টমশন কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক টেমর, মিঃ লিউইস প্রভৃতি বহু পণ্ডিতব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আহারের পর নানা কথাবার্ত্তা হইল। ডাঃ বটলার ৬০ বৎসরের সকল খবর বলিতে পারেন; এমন বড় লোক নাই, যাহার সম্বন্ধে তিনি দুই চারিটা গল্প বলিতে না পারেন। তিনি চল্লিশবৎসর হ্যারোস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতা ২৫ বৎসর হেডমাষ্টার ছিলেন; এবং ইঁহার পুত্র এখন সেখানে একজন শিক্ষক। কনিষ্ঠ পুত্রটি সেই স্কুলে পড়িতেছে!—অদ্ভুত বংশ বলিতে হইবে!

লণ্ডন, ১৫ই জুলাই, সোমবার।—আজ লণ্ডনে ফিরিতে হইবে। এত আদরযত্নের মধ্যে "রাজার হালে" থাকিয়া কিরূপে লণ্ডনের সেই পচা বাসাবাড়ীতে থাকিব, তাই ভাবিয়া পাই না! যাহা হউক,সকালসকাল আহারাদি সারিয়া বটলার সাহেব ও তাঁহার গৃহিণীর নিকট বিদায় লইলাম। কেবলডাক্তার রায় সঙ্গে ছিলেন; কাযেই সুখদুঃখের আলোচনাটা জমিল ভাল। লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলাম। শরীর অতিশয় ক্লান্ত; গরমও বেশ পড়িয়াছে। বাড়ী আসিয়া কিছু ভাল লাগিল না। অগত্যা শয্যার আশ্রয় লইলাম।

বার্ম্মিংহামের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিৎ স্যর অলিভার লজ্ 'Man and Woman' নামে আত্মা ও বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া, আমায় উপহার পাঠাইয়াছেন। আমার নিকট ইহা ঋষির আশীর্ব্বাদ ও স্নেহোপঢৌকন বলিয়া চিরকাল শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। বহিখানি পড়িতে পড়িতে মনে হইল যে, খৃষ্টানভাবঅনুপ্রাণিত হইলেও ইহার ভাবগুলি হিন্দুর সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। আমার মনে হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ভারতের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানচর্চ্চা উভয়েরই সাহায্য সম্ভাবনা।

মা

[শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

কে তুমি মা বক্ষে করি লক্ষ লক্ষ অসহায় জীব,
দিতেছ মা জানাইয়া প্রতি প্রাণে জীবনের শিব!
অপরূপ ক্ষমামূর্ত্তি ধৈর্য্যময়ী পুত্রগতপ্রাণ,
স্নেহের বিমল দানে করাইলে শান্তিসুধা পান।
মা আমার, মা আমার, দয়াময়ী জননী আমার,
আমার উপাস্য দেবী—হাস্যময়ী করুণা আধার,
নিঙাড়িয়া স্নেহসুধা বড় ক্ষুধা দিলে মিটাইয়া,
যাতনার অগ্নিরাশি ভালবাসি দিলে নিবাইয়া।
হেরিলে তোমার অই দেবীমূর্ত্তি, সহাস্য আনন,
এ সংসার মনে হয় জীবনের আনন্দভবন।
আজ(ও) যেই—কাল(ও) সেই—স্থিরমূর্ত্তি চির অবিচল,
মূর্ত্তিময়ী প্রকৃতির শক্তিময়ী সাধন-সম্বল।
সেই আমি কচি শিশু—বক্ষে করি ছিলে মা আমায়,
আজিও মা কত স্নেহে রাখিয়াছ চরণ-ছায়ায়।
কেন এই বিশ্বে আসি, কেন কাঁদি—কেন মোরা হাসি,
বলিতেছ মূলমন্ত্র সন্তানেরে সদা ভালবাসি।
কোথায় জগৎ-জোড়া সুখ দুঃখ শান্তির নিদান,
ধীরে ধীরে প্রকাশিছ নিত্য মাগি আমার কল্যাণ!
তোমার মহিমাবলে ভুবনের সকলি আমার,
কোমল স্নেহের ডোরে বিশ্ব বাঁধা চরণে তোমার।
যারা আসে—যারা হাসে—যারা এই বিশ্ব ভালবাসে,
সকলে, মা, সম্মিলিত তোমার এ শ্রীচরণ পাশে।
যারা করে হাহাকার—কাঁদে মাগো দুঃখে অনিবার,
অর্থহীন, অন্নহীন, যন্ত্রণায় সহে গুরু ভার,
না কাঁদিয়া এক দিন নাহি পায় মুষ্টিভিক্ষা আর—
তারাও, মা, কোটি কোটি সম্মিলিত চরণে তোমার!
তুমি শুধু দয়াময়ী সর্ব্বজীবে কর স্নেহদান,
তোমার স্নেহের সুধা বিশ্ব করে অবিরত পান।
হেন সেবাব্রত মাগো লয় নাই ভবে কেহ আর,
কেহ ত, মা, করে নাই স্বার্থরিপু সমূলে সংহার।
অবিরাম সেবা শুধু—চিরতৃপ্তি মহতী সেবায়,
বিসর্জ্জিত স্বার্থ তব সন্তানের সংসার খেলায়।
নিত্য তব দিব্যদান তব ধ্যানে হেরিছে সন্তান,
নিত্য তুমি স্নেহে চুমি মাগিতেছ পুত্রের কল্যাণ!
কত শক্তি আছে গুপ্ত, ভক্তিময়ী, হৃদয়ে তোমার;
অভক্তেরে ভক্ত করি বক্ষোপরি লও তার ভার!
অকৃতজ্ঞে—চির অজ্ঞে—তুলে দাও পুণ্যস্বর্গ দেশে,
স্নেহের জননী হও সিদ্ধিময়ী ভকতির বেশে।
সতত কামনাহীন—নিয়ত মা জীবের লাগিয়া,
শিশুরে লইলে কোলে চিরদিন স্নেহ বিতরিয়া।
আপনি শেখালে তারে জীব-দুঃখে সঁপিতে জীবন,
তোমার বক্ষের শিশু করিল মা আত্ম-বিসর্জ্জন।

যমুনাতীরে

চিত্র-শিল্পী—শ্রীবীরেশ্বর সেন।

ইয়াঙ্কিস্থানের

জাতি-সমস্যা ও অন্ন-সংস্থান

[শ্রীআমেরিকা-প্রবাসী]

বিলাতের লোকেরা সাদা চামড়া ও কাল চামড়ার প্রভেদে নরনারীগণকে দুই জাতিতে বিভক্ত করিবার সুযোগ বেশী পায় না। ইংলণ্ডে কৃষ্ণকায় লোকজনের বসবাস অতি অল্প। বিদেশ হইতে যে সকল কালচামড়ার লোক ওখানে যায়, তাহাদিগকে দেখিয়া ইংরাজ জনসাধারণ কথঞ্চিৎ বিস্মিত হয় মাত্র; তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার তীব্র মনোভাব পোষণ করে না। কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানে বর্ণ-ভেদের বিষময় ফল দেখিতেছি। এখানে কৃষ্ণকায় নিগ্রো-দিগের সংখ্যা বড় কম নয়। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা—ইয়াঙ্কিস্থান, কি নিগ্রোস্থান, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। কাজেই কৃষ্ণসমস্যা বা নিগ্রোসমস্যা, যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় সমস্যা। বিশেষতঃ নিগ্রোসমস্যাটা কেবলমাত্র রঙের সমস্যা নয়। নিগ্রোরা ইয়াঙ্কিদের ক্রীতদাস ছিল। গত ৫০ বৎসরের ভিতর ইহারা স্বাধীন জীব হইয়াছে। সুতরাং আইনের চোখে ইহারা শ্বেতাঙ্গগণের সমকক্ষ। কিন্তু যাহা-দিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত কেনা গোলামরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বত্র একপংক্তিতে বসা কি রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য?

মানবজাতির বারইয়ারিতলা

নিগ্রোসমস্যার কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু যুক্ত-রাষ্ট্রের জাতিসমস্যা এখানেই চুকিয়া গেল না। ইয়াঙ্কিদের শ্বেতাঙ্গসমস্যাও অত্যধিক। ইয়াঙ্কিস্থানে দুনিয়ার শ্বেতাঙ্গ নরনারী আসিয়া বসবাস করিতেছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের সকল জাতিই আমেরিকায় উপ-নিবেশস্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের রক্ত, তাহাদের ভাষা, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের রীতিনীতি—সবই এই উপনিবেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কাজেই আমেরিকাভূখণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রুশিয়া, ক্ষুদ্র ফ্রান্স, ক্ষুদ্র ইংলণ্ড, ক্ষুদ্র হলাণ্ড, ক্ষুদ্র স্পেন ইত্যাদি স্থাপিত। আমেরিকার অন্যান্য অংশ ছাড়িয়া কেবল যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাউক।—এখানে ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয়, ইহুদি, ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ বাস করিতে আসিতেছে। ইয়োরোপ হইতে ঔপনিবেশিকগণের আমদানী কোনদিনই বন্ধ হইয়া যায় নাই। উপনিবেশস্থাপনের ধারা এখনও চলিতেছে। ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপের লোকেরা ধর্ম্ম কলহের দৌরাত্ম্যে নবীনজগতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আজকাল অন্নসংস্থানের জন্য ইয়ো-রোপীয়েরা দলে দলে এদিকে আসিয়া থাকে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রীয় অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, বহু পোল, আইরিশ ও রুশ স্বদেশসেবকগণ যুক্তরাষ্ট্রে বসতিস্থাপন করিয়াছে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রে মানবজাতির একটা বিরাট মিউজিয়াম বা চিড়িয়াখানা সৃষ্টি হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে আমাদের ভারতের সঙ্গে এদেশের তুলনা করা চলে।

এক নিউ-ইয়র্কনগরের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক বিদেশী। ইহারা নিজ মাতৃভাষায় কথা কহে, নিজ নিজ ধর্ম্মমত মানিয়া চলে, নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র প্রচার করে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের বহুবিধ আইন স্বত্বেও নিজ নিজ মাতৃভূমির প্রতিই চিরকাল আসক্ত থাকে। এইরূপ দেশীয় শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে বর্ত্তমানে আইরিশ, জার্ম্মাণ ও পোল জাতীয় নরনারীই প্রধান। ত্রিধাবিভক্ত পোলাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্র অখণ্ডদেশে পরিণত করিবার জন্য, পোল স্বদেশ-সেবকেরা আমেরিকায় বসিয়া আন্দোলন চালাইয়া থাকেন। সেইরূপ আইরিশ স্বদেশ-সেবকেরাও আমেরিকায় আয়র্লাণ্ডের স্বাধীনতার ভিত্তিস্থাপন করিতে প্রয়াসী। ইয়োরোপের বর্ত্তমান কুরু-ক্ষেত্রব্যাপারেও দেখিতেছি, জার্ম্মাণেরা যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র নিজ মাতৃভূমির জন্য আন্দোলনে ব্যস্ত। এইরূপ কর্ম্ম-

প্রণালী ইতালীয়েরাও অনুসরণ করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ইতালীয়দিগের উপনিবেশ অল্পকাল হইল আরব্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি এই আন্দোলনসম্বন্ধে একজন ইতালীয় পররাষ্ট্র-সচিবের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম 'Italy's Colonial and Foreign Policy'—(Smith Elder & Co, London). গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইতালীয়েরা আমেরিকায় টাকা রোজগার করিতে আসিয়াছে মাত্র; কিন্তু ইতালীকেই "জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" বিবেচনা করিবে।

অনৈক্য নিবারণের উপায়

বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গসমস্যা ইয়াঙ্কিস্থানের একটা প্রধানতম সমস্যা। ধর্ম্ম, ভাষা, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকলদিক হইতেই প্রশ্নটা অতি জটিল। ইহার মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটিমাত্র পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। এসম্বন্ধে গণ্যমান্য নানাধুরন্ধর ও জননায়কের সঙ্গে আলোচনা করিলাম। ফেডারেল কংগ্রেসের প্রসিদ্ধ সভা হইতে আরম্ভ করিয়া উকীল, অধ্যাপক, জজ, সংবাদপত্রের সম্পাদক পর্য্যন্ত সকলেই এক উত্তর দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন,"আমাদের বিদ্যালয়গুলিই এই জাতিসমস্যার একমাত্র সমাধানক্ষেত্র। সকলগুলিকে মিলাইয়া খিঁচুড়ি পাকাইবার ব্যবস্থা আমাদের আর দ্বিতীয় নাই। বর্ণসংমিশ্রণ, রক্ত-সংমিশ্রণ, রীতি-সংমিশ্রণ, ভাবসমীকরণ, রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধান ইত্যাদি—সকলই আমরা এই সকল শিক্ষাকেন্দ্র হইতে আশা করিতেছি।"

কাজেই শিক্ষাপ্রচার যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইতেছে। বিলাত, জার্ম্মাণি অথবা ইয়োরোপের অন্যান্য স্বাধীনদেশ হইতে ইয়াঙ্কিস্থানের শিক্ষাসমস্যা এই হিসাবে যথেষ্ট বিভিন্ন। কারণ, এদেশের জাতিসমস্যা ঐসকল দেশে নাই। কাজেই, ঐ সকল স্থানে শিক্ষাসমস্যা কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রণালীতে আলোচিত হইয়া থাকে।

নিউ-ইয়র্কের অনেকগুলি ছোট-মাঝারি-বড় বিদ্যালয় দেখিলাম। দিবাবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, চিত্রবিদ্যালয়, ব্যবসায়বিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, ইত্যাদি বহুবিধ পাঠাগার দেখা গেল। এক কথায় বলিতে গেলে, আমাদের দেশ সাধারণতঃ কলেজসমূহে যেরূপ আসবাব্-পত্র, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী ইত্যাদি থাকে, এখানে মামুলি মধ্য-বিদ্যালয়ে তাহা অপেক্ষা বেশী বা প্রায় তাহার সমান। আমরা মধ্য-বিদ্যালয়ে যে সমুদায় শিক্ষার উপকরণ দেখিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা বেশী জিনিষ এখানকার নিম্নতম বিদ্যালয়ে দেখিলাম; অধিকন্তু, বলিয়া রাখা উচিত যে, এখানে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিষয়ক শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম ক্ষুদ্রতম এবং নিম্নতম পাঠশালায়ও আছে। কিন্তু এই সমুদয় পদার্থ আমাদের মধ্য-বিদ্যালয়েও নাই। তাহা ছাড়া, বাড়ীঘর প্রায়ই প্রাসাদতুল্য; টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ আলমারী ইত্যাদি—সবই উচ্চ অঙ্গের।

মানবজাতির এই বারইয়ারিতলায় শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিকে জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত করিবার প্রয়াস অতি স্বাভাবিক। বিনামূল্যে বিদ্যাবিতরণের আয়োজন করা, এখানে সর্ব্বপ্রধান নীতির মধ্যে পরিগণিত। নানাজাতির বালক-বালিকাকে এককারখানার মধ্যে ফেলিয়া একছাঁচে ঢালাই করা অন্য কোন উপায়ে সম্ভবপর নহে।—রাষ্ট্রপরিচালকেরা ইহা বেশ বুঝিয়াছেন। এজন্য এদেশের নিম্নবিদ্যালয়, উচ্চ-বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সবই অবৈতনিক। এমন কি ছাত্রদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। এই সকল সুযোগ না থাকিলে ইহুদি, খৃষ্টান, পোল, জার্ম্মাণ, হাঙ্গারিয়ান, আইরিশ, ইতালীয়ান ইত্যাদি বিচিত্র সমাজের অন্তর্গত শিশুগণ একাকাররূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। এত চেষ্টাসত্ত্বেও যথার্থ ঐক্য স্থাপিত হইতে পারিবে, কি না, সন্দেহ হয়।

অসংখ্য বিভিন্নতা ঘুচাইয়া, ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা নিউ-ইয়র্কের সকল বিদ্যালয়েই দেখিতে পাইলাম। একটা বিদ্যালয়ে দেখি ৬০০০ বালিকা ও যুবতী লেখা-পড়া শিখিতেছে। চিত্রাঙ্কন, কাপড় সেলাই, রন্ধনকার্য্য মূর্ত্তিগঠন, ইত্যাদি অভ্যাস করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন কামরায় প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; বুঝিলাম, প্রত্যেক গৃহই মানবজাতির একএকটি মিউজিয়াম—বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্নভাষাভাষী রমণী-দিগের আবেষ্টন। পৃথিবীর কোন বিদ্যালয়ে এরূপ সমাবেশ, বোধ হয়, আর নাই। তাহা ছাড়া, জগতের কোন বালিকা

বিদ্যালয়ে ৬০০০ ছাত্রী আছে, কি না, জানি না! নিউইয়র্কে এত বড় স্ত্রীশিক্ষার কেন্দ্র আর নাই—যুক্তরাষ্ট্রে ইহা অদ্বিতীয়।

কতকগুলি শিল্পবিদ্যালয়, ব্যবসায়বিদ্যালয় এবং চিত্রবিদ্যালয়েও এইরূপ বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যনাশের উপায় লক্ষ্য করিলাম। প্রকৃত পক্ষে, যে নগরে শতকরা ৮০ জন লোক বিদেশীয় তাহার প্রত্যেক বিদ্যালয়ই যে একটা 'Epitome of the world', or 'Babel of tongues' হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

প্রায় সকল বিদ্যালয়েই ছাত্র ও ছাত্রী একসঙ্গে লেখা-পড়া করে। শিক্ষকেরাও কোনস্থলে রমণী, কোনস্থলে পুরুষ।

বিদ্যালয়গুলি প্রায় সবই, ছাত্রগণকে হাতেকলমে কাজ শিখাইবার জন্য গঠিত। জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় দেখাইয়া দেওয়া, শিক্ষাপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা গেল। দেশের ভিতর যে সকল ব্যবসায় চলিতেছে, ঠিক সেই সমুদয় ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া বালক ও বালিকদিগকে বিদ্যালয় হইতে বাহির করা হয়। স্থানীয় শিল্প-কারখানায় লোক যোগাইবার জন্যও শিক্ষা-ধুরন্ধরেরা বিদ্যালয় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অন্নসংস্থানের জন্য কোন যুবক বা যুবতীকে ভাবিতে না হয়—বিদ্যাশিক্ষার পরেই যাহাতে প্রত্যেকে কোন না কোন কাজে লাগিয়া যাইতে পারে, তাহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি।

জীবিকা ও শিক্ষাপ্রণালী

এই জন্য যে সকল বিদ্যালয়ে কোনরূপ ব্যবসায় বা কারখানার কার্য্য শিখান হয় না, সেই সমুদয়েও কিছু কিছু কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। চিত্রাঙ্কন, সূত্রধরের কাজ, রসায়ন, যন্ত্রব্যবহার ইত্যাদি বিষয় আজকাল প্রত্যেক ক্ষুদ্রবৃহৎ সাংসারিক ও বৈষয়িক অনুষ্ঠানে অত্যাবশ্যক। কাজেই, সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা এই সকল বিষয় শিখিয়া থাকে। ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলে, তাহারা খাঁটি শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। সেই শিক্ষার ফলে, শিল্পজগতে কর্ম্ম পাওয়া অতি সহজ হয়। অথবা তাহারা উচ্চতর সাধারণ বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। তখন ঐ কার্য্যকরী শিক্ষার সুফল সর্ব্বদা কাজে লাগে। প্রত্যেকেই করিত-কর্ম্মা লোক হয়।

বিশেষভাবে শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষাদিবার জন্য যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের অধ্যাপকগণের সঙ্গে আলোচনা হইল। একজন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিক্ষা দিতেছেন। একজন কাদামাটির কাজ শিখাইতেছেন। ইঁহারা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক নন—উভয়েই সহরের ভিতর বড় বড় স্থাপত্য-ভবনে কর্ম্ম করেন। ব্যবসায়-মহলে যে সকল দোকানের নাম আছে, সেই সকল দোকানে যাঁহারা মূর্ত্তিগঠন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। কাজেই, ছাত্রদিগের শিক্ষা অতিশয় পটু ব্যক্তিবর্গের হস্তে ন্যস্ত। এইরূপে গৃহনির্ম্মাণ-বিদ্যা শিখাইবার জন্য পাকামিস্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং শিখাইবার জন্য সহরের প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ারিং কারখানার কারিগর নিযুক্ত। একটি নৈশ বিদ্যালয়ে দেখিলাম, এক গৃহে চিত্রাঙ্কন শিখান হইতেছে। ২৫।৩০ জন যুবক ও যুবতী ছবি আঁকিতেছে। সম্মুখে একজন উলঙ্গ রমণী কোন নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গিতে বসিয়া আছে। অধ্যাপক প্রত্যেক ছাত্রের নিকটে যাইয়া তাহার রচনা সংশোধন করিয়া দিতেছেন। ছাত্রেরা নানাস্থানে বসিয়াছে, সুতরাং একই বস্তুর চিত্র বিভিন্ন ধরণের হইতেছে। এই উপায়ে শরীরের মাংশপেশীগুলির বিভিন্ন গঠন ছাত্রেরা বুঝিয়া লইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল চিত্রশিক্ষকের নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "ইনি anatomy বা অস্থিবিদ্যার অধ্যাপক—সহরের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক।" অস্থিবিদ্যায় পারদর্শী না হইলে, মানুষের মূর্ত্তি-চিত্রন অশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

জীবন্ত মানুষ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রাঙ্কন বা মূর্ত্তি খোদাই করিতে হয়, তাহা গ্লাস্‌গো নগরের চিত্রভবনে প্রথম শুনিয়াছিলাম; এই প্রথম দেখা হইল। ইতঃপূর্ব্বে নিউইয়র্কের বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, জীবন্ত মাছ, ফড়িং, ব্যাং, কাঁকড়া এবং গাছ, পাতা, লতা, ফুল, ফল ইত্যাদি অবলম্বনে চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা দেখিয়াছি। কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তি বা কল্পনা, বা বোর্ডে আঁকা, কিংবা মাটির পুতুল হইতে নক্‌সা করান চিত্রশিক্ষকগণ পছন্দ করেন না। চিত্রগুলি ঠিক যেন জীবিত ও সচেতন দেখায়; প্রত্যেক চিত্রকরের এই লক্ষ্য থাকে। আবার, বাজারেও এই ধরণের জীবন্তপ্রায় ছবি

ভিন্ন অন্য প্রকার চিত্রের কাটতি হয় না। কাজেই, চিত্র-বিদ্যালয়ে এই বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থায় সচেতন পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ভাব-ভঙ্গীর সহিত শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করান হয়।

বিজ্ঞাপন-প্রচার

ব্যবসাদারী কাহাকে বলে, আমাদের দেশে এখনও তাহা বেশী লোকে জানে না। কাজেই ব্যবসাদারীর দেশে শিক্ষার বিষয় কত প্রকার থাকিতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে অসমর্থ। বিজ্ঞাপন-প্রচারের কথা ধরা যাউক। ইহা যে একটা বিদ্যাবিশেষ, তাহা ভারতবাসীর কল্পনায়ও আসিতে পারে না। কিন্তু যুক্ত-রাষ্ট্রে শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র অসংখ্য—ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধে একথা খাটে। এই সকল কেন্দ্রের জন্য বিজ্ঞাপন-প্রচার অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞাপন-প্রচার নানা উপায়ে হইতে পারে। এই উপায়গুলির সংখ্যা ও প্রকারভেদ এত বেশী যে, এইগুলি বুঝিবার জন্য এবং শিখিবার জন্য ১৭।১৮ বৎসর-বয়স্ক উচ্চ-শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীর অন্ততঃ চারি বৎসর লাগে। নিউইয়র্কের প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়েই দেখিলাম, বিজ্ঞাপন-প্রচার শিখাইবার জন্য ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা আয়োজন রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়। কাজেই এই বিদ্যা শিখাইবার নানাপ্রণালী অবলম্বিত। সাধারণতঃ এইরূপ বুঝিলাম যে, চিত্রবিদ্যা বিজ্ঞাপন-প্রচারের অতি মুখ্য সহায়। ব্যবসায়-মহলে এই সুকুমার কলার অত্যধিক প্রয়োগ হইতেছে। ছবি আঁকা, রং ফলান, ভাব ফুটান ইত্যাদি বিষয় ছাত্রদিগের বিশেষ সতর্কতার সহিত শিখিতে হয়। চিত্রাঙ্কনের Technique বাহ্যরীতি সম্বন্ধে ছাত্রেরা ওস্তাদ হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই—কিন্তু যে সকল বস্তু অঙ্কন করিতে শিখান হয়, তাহা অতি জঘন্য শ্রেণীর অন্তর্গত। অথচ এইরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচারিত চিত্রাবলী দুনিয়ার সর্ব্বত্র হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই সমুদয় নিকৃষ্ট চিত্র দেখিয়াই আজকালকার জনসাধারণ চিত্রকলার ধারণা করে। ফলতঃ, প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ এবং উচ্চ অঙ্গের শিল্পকলা জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে চলিয়াছে। যে দুই চারিখানা উৎকৃষ্ট নিদর্শন বাহির হয়, সেগুলি জনসাধারণের সম্মুখে পৌছে না—চিত্রকরের গৃহে, অথবা Art Gallery, কিংবা মিউজিয়ামের অল্পসংখ্যক দর্শকগণের চক্ষুগোচর হয়। এদিকে বাজারের ব্যবসাদারী চিত্রাবলীই লোকরুচি গঠন করিতেছে।

শাশ্বতী পূজা

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

একবার শুধু দেখে
একবার শুধু লভি'
একবার দরশনে
একবার পরশনে
এস ও গো এস মনে
সেথা তোমা হেন ধনে
একবার শুধু লভি—,
আজ এ ইন্দ্রিয়চয়
সে পথ তোমার নয়
বহি'পথ মনোময়
তথা যেন তব রয়
একবার শুধু লভি'
হৃদয়-মন্দিরে রাখি',
দ্বিধা ভয়হীন থাকি'

একবার নমি' প্রভু,
তৃপ্ত হব না কভু।
একটি শুনিয়া কথা,
যাবে না এ' ব্যাকুলতা।
যথা দুখ-সুখ-ব্যথা
লুকায়ে রাখিব প্রভু,
তৃপ্ত হব না কভু।
রুদ্ধ করিনু আমি,
বুঝিয়াছি ও গো স্বামি!
এস ও গো, দিবা-যামী—
ধ্রুব জ্যোতিঃ ও গো প্রভু,
তৃপ্ত হব না কভু।
ইন্দ্রিয়-দ্বারগুলি
তখন দিব গো খুলি;

পড়িব না কভু ফাঁকি
ঢুলে পড়ে যদি আঁখি
একবার শুধু লভি'
মম বাতায়ন শত
আরতির ধ্বনি তত
দ্বারে হ'বে অবনত
ভক্ত জুটিবে কত
একবার শুধু লভি,
তার পর যদি মরি
মানস-মন্দির ভরি,
মন আর তুমি হরি
যা'ব সেবায়েত করি'
একদিন শুধু পেরে

যদি বা কখনো ভুলি,
হারাব না তবু প্রভু,
তৃপ্ত হব না কভু।
খুলিব, হেরিবে সবে
সকলে শুনিবে তবে,
পূজাফুল সৌরভে
চারি পাশে মম প্রভু,
তৃপ্ত হব না কভু।
দেহ হবে ধূলি লীন
তুমি র'বে সমাসীন,
স্থির রবে চিরদিন।
নিখিল জনেরে প্রভু,
তৃপ্ত হব না কভু।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বৰ্দ্ধমানাধিপ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
মাননীয় স্যর শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্তাব্
কে,সি,এস,আই ; কে,সি,আই,ই ; আই,ও,এম.

অষ্টম অধিবেশন—বৰ্দ্ধমান

"রাঢ়ের রাণী" বৰ্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কমলাকান্তের সাধনা-পীঠে বাণী-সেবকগণের এই সম্মিলনে কমলার বরপুত্র বৰ্দ্ধমানাধিপতি বৰ্দ্ধমান-পক্ষ হইয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশনোপলক্ষে বর্দ্ধমান অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, বর্দ্ধমানাধিপতি, মহারাজাধিরাজ মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব বাহাদুরের অভিভাষণ :—

সমবেত বঙ্গের সাহিত্যসেবী সভ্যবৃন্দ,

বর্দ্ধমান সাহিত্য-শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে, বর্দ্ধমান-পুরবাসিগণের পক্ষ হইতে, এবং এই নগরে প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধমানরাজের পক্ষ হইতে আমি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি স্বরূপে আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। আপনারা অদ্য এই স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন প্রারম্ভ করিয়া আমাদের সকলের প্রীতি ও উৎসাহ বৰ্দ্ধন করুন ও এই সম্মিলনে দেশের সাহিত্য-প্রচার সম্বন্ধে নববল প্রদান করুন। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্দ্ধমান রাঢ়ের একটি প্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত, এবং সেই কারণেই বোধ হয়, আমার পূর্ব্বপুরুষগণও বর্দ্ধমানে আসিয়া ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে অনেক সময়ে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশ-বাসিগণ রাজনৈতিক আলোচনা ও গবেষণায় এত অধিক পরিব্যাপ্ত যে, দেশের ও সমাজের অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার যথোপযুক্ত অবসর তাঁহাদের মিলে না ; ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। এই উপেক্ষিত কর্ত্তব্যের কিয়দংশ পালন করা সাহিত্য-পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই কারণে আমি এই পরিষদের কার্য্যে বিশেষরূপে আকৃষ্ট এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনাদের এই সদৃষ্টান্ত পূর্ব্বকথিত রাজ-নৈতিকগণের অনুকরণীয় হউক এবং আপনাদের সাধু চেষ্টা সম্যক্‌ ফলবতী হউক। আপনারা যে রাঢ়ের রাণী বর্দ্ধমানকে এতদিন ভুলিয়াছিলেন, তাহা কেবল কাল-বৈগুণ্যে ; তবে সন্তান যেমন অশেষ দোষ করিলেও কেবল একবার "মা" বলিয়া মার কাছে আসিলেই জননী তাহাকে বুকে টানিয়া লন, তেম্‌নি আপনারা তত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্য-প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া, আজ যখন রাঢ়-জননী বর্দ্ধমানের ক্রোড়ে সমবেত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিয়া, তাঁহার ও বঙ্গের সুসন্তানগণকে নিজ সাধ্যানুরূপ সমাদর করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনারা যে কার্য্যে ব্রতী, তাহা সাধু ও স্বদেশানুরাগ-প্রণোদিত সন্দেহ নাই পরন্তু এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এইটুকু মাত্র যে, আপনারা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, বনে বনে বহু পরিশ্রমে পরিভ্রমণ করিয়া, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ, ইষ্টক ও প্রস্তর-ফলকাদি সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহা হইতে যে অভিনব তত্ত্ব ও বিস্মৃত বা বিকৃত ইতিহাসের যথার্থ কাহিনী আবিষ্কার করিয়া, তাহার প্রচারকল্পে বিপুল অর্থব্যয়ে গ্রন্থাদি মুদ্রণ করিতেছেন, তাহার ফল যাহাতে স্থায়ী হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ইহা শুধু অর্থ-বল সাপেক্ষ নহে—লোক-বল ব্যতীত এই চেষ্টা কদাচিৎ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইতে পারে না। আপনারা যদি আপনাদিগের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে না বুঝাইয়া, পল্লীবাসি-গণের নিকট হইতে তাহাদের পুঁথি-পত্র-বিগ্রহাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন, তাহা হইলে হয়ত তাহারা কিছুকাল পরে আপনাদিগকে স্বদেশবৎসল, লোকহিতব্রত মহাপুরুষ-স্বরূপ মনে না করিয়া, কোনও নূতন জাতীয় তস্কর মাত্র মনে করিতে পারে। কারণ নিরীহ অৰ্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত পল্লীবাসিগণ সাধারণতঃ সাহিত্য-পরিষদের বড় একটা ধার ধারে না বা নবপ্রচারিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির কোন খোঁজ-খবরও রাখে না। যদি বলেন, "এ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য ?" তাহার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে—যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্নতত্ত্বের বা পুরাতত্ত্বের আলোচনার্থে কোনও দ্রব্য সংগৃহীত হইবে, তাহাদের প্রত্যেককে তত্তৎ বিষয়ের আলোচনা-সম্বলিত সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা ত উচিতই ; অধিকন্তু সেই স্থানে যদি কোনও লোকপূজ্য, চিরস্মরণীয় কবি বা মহাপুরুষের সংশ্রব থাকে, তাহা হইলে তাহার নিদর্শনার্থে কোনও রূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য ও প্রাচীন প্রথার অনুকরণে কথক বা গায়ক-সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাঁহাদের পবিত্র কাহিনী স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বদেশানুরাগ ও স্মৃতিপূজার ইহা একটি প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আমার মনে হয়। যদি জনসাধারণের হৃদয়ে এই অনুরাগ বদ্ধমূল না হয় এবং মহাপুরুষগণের উজ্জ্বল আদর্শ যদি আমরা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে আমরা ক্রমে জনসাধারণের সহানুভূতি, লাভে বঞ্চিত হইয়া পরিণামে বিফল-প্রযত্ন হইব।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পক্ষে এরূপ আলোচনা

করা বোধ হয় সমীচীন নহে সুতরাং পরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই টুকু মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে আমাদের এই সম্মিলনের যিনি প্রধান সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, যাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্বানুধাবন-তৎপরতা ও ধীশক্তি আপনাদের কাহারও অবিদিত নহে, তাঁহার নিকট ও বঙ্গের অন্যান্য কৃতী সন্তানগণ, যাঁহারা বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা এবং সমবেত বঙ্গের উজ্জ্বলতম সাহিত্য-সেবিগণ অদ্য এই স্থানে উপনীত হওয়ায় আমরা সকলেই সাতিশয় গৌরবান্বিত অনুভব করিতেছি। এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করুন। পরিশেষে আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, এ বৎসর বর্দ্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনী আমন্ত্রণের প্রধান উদ্যোগী কাসিমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়; যে মহানুভবের অমায়িকতায় বঙ্গবাসী মাত্রেই আপ্যায়িত, তাঁহারই দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম; আপনারা নিজগুণে আমাদের সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া, সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিলেই আমরা নিজ নিজ শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রধান সভাপতির সম্বোধনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রথম গৌরব—হস্তি-চিকিৎসা।—ঋগ্বেদে হস্তী শব্দ থাকিলেও উহা হাতী বুঝাইত কি না সন্দেহ। তবে তৈত্তিরীয় সংহিতায় হাতীর উল্লেখ আছে। খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী-পোষা খুব প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। হাতী ধরা, তাহার সেবা, তাহার চিকিৎসা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এ সব প্রথম কোথায় হইয়াছিল? যে দেশের একদিকে হিমালয়, একদিকে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদ ও একদিকে সাগর—আমাদের মাতৃভূমি সেই বঙ্গদেশেই হাতী বশ করিবার আদি শিক্ষা স্থল। পালকাপ্য নামে এক মহানুভবই 'হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ' প্রণেতা। চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ লেখা ও প্রচার হয়; কিন্তু আসলে তিনি বাঙ্গালা দেশেরই লোক। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নহে।

দ্বিতীয় গৌরব—নানা ধর্ম্ম-মত।—জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, আজীবক ধর্ম্ম, এবং যে সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক মত বলিত, সে সকল ধর্ম্মই বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির ধর্ম্ম প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন নীতির উপর স্থাপিত। আর্য্যজাতির ধর্ম্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না—এ সকল ধর্ম্মই বৈরাগ্যের ধর্ম্ম। ইহা বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নহে।

তৃতীয় গৌরব—রেসম।—য়ুরোপীয়দিগের সংস্কার চীনই রেসমের জন্মস্থান, চীনেরাও তাহাই বলে। কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশে খৃষ্টের ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে রেসমের চাস খুব হইত। রেসমের খুব ভাল কাপড়ের নাম পত্রোর্ণ অর্থাৎ পাতার পশম। উহা তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণ-কুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল ও বট গাছে এই পোকা জন্মিত। মগধ—দক্ষিণ বেহার, আর পৌণ্ড্র—বারেন্দ্র-ভূমি। প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কামরূপের নিকট এখন যে রেসম হয়, তাহা ভেরাণ্ডা পাতায়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। যদি বল, চীন হইতে রেসম চাস সেই পুরাকালেও বাঙ্গলায় আসিয়াছে—তাহার প্রমাণাভাব। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেসমের চাস আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও গৌরবের সীমা নাই। আর যদি চীনেই উহা সর্ব্বপ্রথমে হয়, তথাপি বাঙ্গালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে যে রেসমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারা চীনেদের ন্যায় তুঁত-পাতা হইতে রেসম বাহির করিতেন না। আবার আর এক বিশেষত্ব—চীনের সব রেসম সাদা, বাঙ্গলার রেসম রঙ করিতে হইত না, গাছ বিশেষের পাতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের সূতা হইত।

চতুর্থ গৌরব—বাকলের কাপড়।—প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিত; তারপর ছাল পিটিয়া বাকল পরিত;

তারপর বাকল হইতে সুতার কাপড়। বাকল হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম ক্ষৌম। উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম "দুকূল"। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাতেই বাকলের কাপড় বুনা হইত আর দুকূল একমাত্র বাঙ্গলাতেই হইত। মুসলমান আমলে মসলিনের কথাও বাঙ্গালার গৌরবের বিষয়।

কালে নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেক রূপ ছিল—দোণা, ডুণি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালান, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। বড় জাহাজও ছিল। ৭০০ অনুচরের সহিত বিজয়ের সিংহল-যাত্রা, দশকুমার চরিত
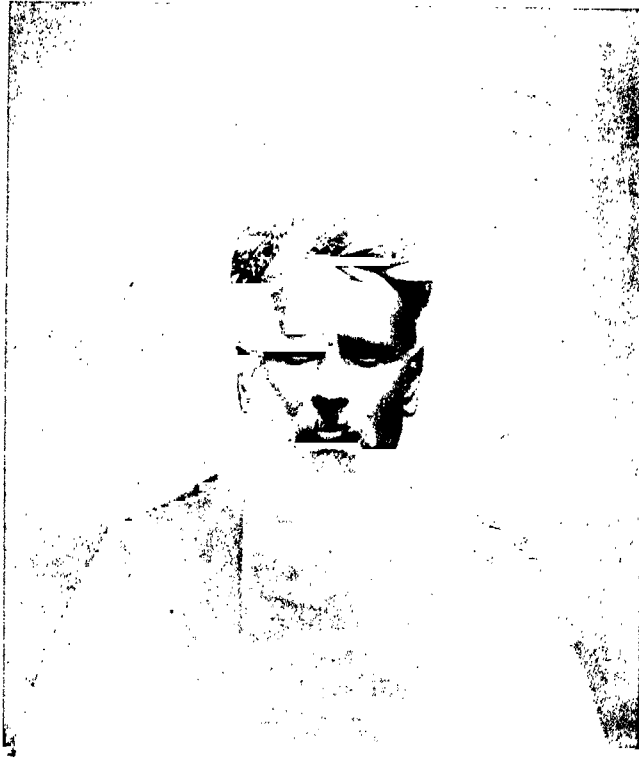
অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
এম, এ ; সি, আই, ই.

পঞ্চম গৌরব—থিয়েটার।—খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গলার কম গৌরবের কথা নহে।

ষষ্ঠ গৌরব—নৌকা ও জাহাজ।—বাঙ্গলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীন

নামক প্রাচীন (খৃষ্টাব্দের পরে বা পূর্ব্বে রচিত) গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি হইতে পোতযোগে দূর সমুদ্র-যাত্রা, চীন ও জাপান-যাত্রা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন—বাঙ্গালার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার ভাসানে লেখা আছে, ১৩ দিন

মহাসমুদ্রে যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠিল। পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা যখন বাঙ্গলায় বড় অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন বাঙ্গালী মাঝী দিয়া সায়েস্তা খাঁ তাহাদের শাসন করিলেন।

সপ্তম গৌরব—বৌদ্ধ শীলভদ্র।—চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, যুয়াং যুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। যাঁহার পদতলে তাঁহার শিক্ষা লাভ হয় তিনি একজন বাঙ্গালী—নাম শীলভদ্র। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত অতি বিরল।

অষ্টম গৌরব—বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব।—বৌদ্ধ ধর্ম্মের কয়েকখানি চলিত পুথি লেখক শান্তিদেব সম্ভবতঃ বাঙ্গালী।

নবম গৌরব—নাথপন্থ।—আমাদের দেশে এখন যে সব যোগী আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি—নাথ। নাথপন্থ নামে এক প্রবল ধর্ম্ম সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গলায় ও পূর্ব্ব ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। নাথপন্থকে আমি বাঙ্গালী মনে করি।

দশম গৌরব—দীপঙ্কর।—পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমণীপুরে ইঁহার বাস। তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীল বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তিনি তিব্বতে মহাযান মতের প্রচার করেন। তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ সমুদায়েরই মূল তিনি।

একাদশ গৌরব—জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র।—মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিস্কবিহার, কলোম্বোতে যেমন দীপদত্তম বিহার, সেইরূপ বাঙ্গলায় মহাবিহার জগদ্দল। এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই প্রধান।

দ্বাদশ গৌরব—লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ।—তিনি আদি সিদ্ধাচার্য্য। তিনি বাঙ্গালী। রাঢ়ে তাঁহার পূজা হয়, ময়ূরভঞ্জেও হয়। তিব্বতীরা তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা করে।

ত্রয়োদশ গৌরব—ভাস্করের কাজ।—ভারতে নানাস্থানে ভাস্কর্য্য থাকিলেও বাঙ্গলায় উহার চরম বিকাশ। মাটির মূর্ত্তিতে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এখনও বোধ হয়, ভারতে অদ্বিতীয়।

চতুর্দ্দশ গৌরব—বাঙ্গলায় সংস্কৃত।—লোকে বলে, বাঙ্গলায় বেদের চর্চ্চা ছিল না—একথা সত্য। অন্য জায়গায় যেমন সমস্ত বেদটা মুখস্থ করে, বাঙ্গালীরা তাহা করিত না, তাহারা তত আহাম্মক ছিল না। তাহারা যে টুকু পড়িত, অর্থ করিয়া পড়িত। প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়। সায়ণাচার্য্যের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণের বেদ ব্যাখ্যা সৃষ্টি করেন। দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, সর্ব্বশাস্ত্রেই বাঙ্গার বিশেষ চর্চ্চা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভবদেব যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ ধন্য।

পঞ্চদশ গৌরব—বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ, ও রঘুনন্দন।—ইঁহারা আমাদের সমাজ বাঁধিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজিও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছি।

যোড়শ গৌরব—ন্যায় শাস্ত্র।—নৈয়ায়িকগণ এখনও ভারতে বাঙ্গলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। বাঙ্গলার স্মার্ত্তকে অন্য দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাঙ্গলার নৈয়ায়িকদের না চিনিলে, ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

সপ্তদশ গৌরব—চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর।

অষ্টাদশ গৌরব—তান্ত্রিকগণ।

একোনবিংশ গৌরব—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, শুধু বাঙ্গলার নয়, সমস্ত ভারতেরই গৌরব স্থল। বাঙ্গলার ন্যায় এত বড় একটা অনার্য্য দেশকে হিন্দু-ধর্ম্মের দেশ করিয়াছে—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।

বিংশ গৌরব—কায়স্থ ও রাজা।—পুস্তকাদি লিখিয়া, জ্ঞান প্রচারে ও রাজশক্তিরূপে কায়স্থ ব্রাহ্মণের প্রধান সহায়।

বাঙ্গলা ভাষায় গতি-প্রকৃতি আলোচনা করিয়া, শাস্ত্রি মহাশয় আরও বলেন, ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত। বাঙ্গলাকে সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এবং স্বেচ্ছাচারিতা না করিয়া, কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, তাহার একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে। নহিলে কথার সংখ্যা অভিধানে অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথায় ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিবে।

বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আমরা যে বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতেছি, তাহা ধনশালী ইয়ুরোপের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যয়সাধ্য—ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় আরও ব্যয়সাধ্য। অথচ আমরা সে দেশের সিদ্ধির সহিত —এ দেশের কৃতকর্ম্মের তুলনা করিতে চাই। বসু কিংবা রায়ের ন্যায় দুই চারিজন, ভাগ্যবান ছাত্রের দ্বারা দেশের দশা ফিরিতে পারে না। যে সমাজ জ্ঞানৈষণীয় আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু উপায় করে না, সে সমাজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিনা। নিশ্চিন্ত মনে চুপ করিয়া বসিয়া

বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি
অধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
এম, এ

থাকিলেও দেশে বিজ্ঞান বিস্তার ঘটিবে না। যখন বিজ্ঞান-বিস্তার খুঁজি, তখন ধন বৃদ্ধিও খুঁজি।

আমাদের দেশে কর্ম্মশালা, বিজ্ঞানশালা প্রভৃতি বিজ্ঞানানুশীলনে অত্যাবশ্যক নানা অভাব থাকিলেও একটি প্রধান কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—মানুষই বড়—যন্ত্র নহে।

বামুনের গরু সুলভ নহে। যে ছাত্রের নিকট অন্নচিন্তা চমৎকারা, তাহার নিকট অন্য চিন্তা উপহাস্য নহে কি? আমরা চাই, আমাদের ছাত্রেরা ধন মান তুচ্ছ করিয়া, মরি বাঁচি পণ করিয়া, জ্ঞানমার্গে ধাবিত হউক। কিন্তু চাইলেই আকাশের চাঁদ হাতে আসে না। এই ঘোর কলিকালে জ্ঞানার্থে জ্ঞান অর্জ্জন, ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মাচরণ কদাচিৎ সম্ভব। ডাঃ

দর্শন-বিভাগের সভাপতি
যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ ; বি, এল

দর্শন বিভাগের সভাপতির অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঋক্ সংহিতায় দর্শন শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই ইহার মৌলিক অর্থ। এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'দর্শনায় চক্ষুঃ'। 'দৃশ্যতে অনেন' এই ব্যুৎপত্তিতে যদ্দ্বারা দর্শন করা যায়, সেই চক্ষুকে 'দর্শন' বলা স্বাভাবিক। দর্শন শব্দের নিরুক্ত লইয়া বহু আলোচনা ও দার্শনিক মতবাদ ও মতভেদ থাকিলেও একটা কথা বলা যাইতে পারে, বঙ্গদেশে যে ভাবে দর্শনালোচনা হইতেছে, তাহা সন্তোষজনক নহে। অন্য পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনাও আশানুরূপ হইতেছে না।

দর্শন-ক্ষেত্রে আমাদের একটি প্রধান কার্য্য দার্শনিক পরিভাষা-সংকলন। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, দার্শনিক সাহিত্য রচিত না হইলে দর্শনের পরিভাষা নিশ্চিত করা অসম্ভব। পরিভাষা রচনা ও শব্দসূচী সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ভাষার সৌষ্ঠব-সাধনের জন্য অনুবাদ পর্য্যাপ্ত নহে। যদি বাংলা সাহিত্যের দার্শনিক শাখাকে সজীব ও সৌষ্ঠবময় করিতে হয়, তবে মৌলিক গ্রন্থ ভিন্ন হইবে না। মৌলিক দার্শনিক চিন্তার কথা বলিতেছি না। তাহা উড়ুম্বর পুষ্পের ন্যায় শতাব্দে একবারের অধিক প্রস্ফুটিত হয় না।—সহজ ভাষায় সরল প্রণালীতে দার্শনিক নিবন্ধ গ্রন্থসকল রচিত হওয়া আবশ্যক। এই অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য আমি সাহিত্য-সম্মিলনকে আহ্বান করিতেছি। আমাদের এ সম্মিলন কেবল উৎসবক্ষেত্র নহে—ইহা কর্ম্ম-ক্ষেত্র। আসুন—কর্ম্মের সফলতায় মণ্ডিত করিয়া আমরা এই সম্মিলনকে সার্থক করি।
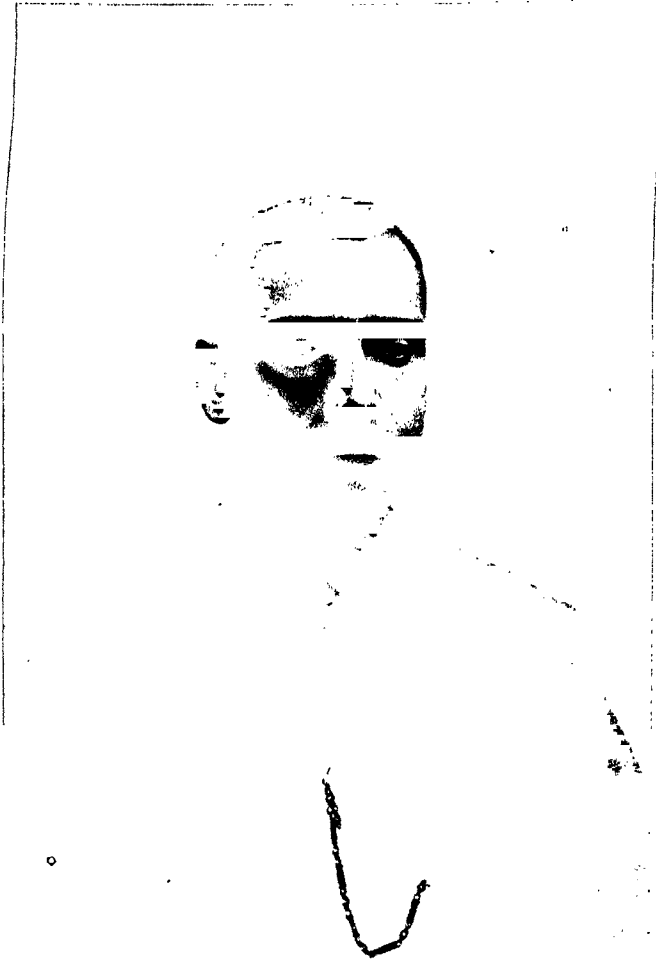
ইতিহাস বিভাগের সভাপতি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম. এ

ইতিহাস-শাখার সভাপতির সম্ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দেশময় ইতিহাস চর্চ্চার একটা প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য, এই নব জাগ্রৎ ইতিহাস-সেবার চেষ্টাকে সমবায়সূত্রে বাঁধি, সংযত ও উচিত-পথে চালিত করি। যেন যন্ত্রের বা প্রণালীর দোষে ঐতিহাসিক প্রস্তুত দ্রব্যগুলি অঙ্গহীন বা ভঙ্গুর না হয়।

"মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন।"

সত্য প্রিয় হউক আর অপ্রিয় হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। যে পরিমাণে অতীতের উপদেশগুলি বর্ত্তমানে লাগাইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণ-মন উচিত পথে ধাবিত হইবে, আমাদের সমবেত শক্তি ফলপ্রসব করিবে। আর যে পর্য্যন্ত আমরা অসত্য বা অর্দ্ধসত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিব, সেই পরিমাণেই আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বাধা পড়িবে।

ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। কিসে জাতীয় উত্থান-পতন, রোগ-স্বাস্থ্য, নবজীবন লাভ ও মৃত্যু ঘটে, এই মহাশিবতন্ত্র, এই জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, সাধনা বিনা, সত্যনিষ্ঠা বিনা, ক্রমোন্নতির অদম্য স্পৃহা বিনা লাভ করা সম্ভব নহে।

প্রথম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি
শ্রীযুত ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডি. লিট.
কাসিমবাজার, কার্ত্তিক, ১৩১৪।

দ্বিতীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি
শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়,
পি. এইচ. ডি. ; ডি. এস. সি. ; সি. আই. ই.
রাজসাহী, মাঘ ১৩১৫।

তৃতীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম. এ. ; বি. এল.
ভাগলপুর, ফাল্গুন, ১৩১৬।

চতুর্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি
ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু,
এম. এ. ; ডি. এস. সি. সি. এস. আই. ; সি. আই. ই.
ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩১৮।

পঞ্চম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

চুঁচুড়া, ফাল্গুন, ১৩১৮।

ষষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি. এল.
চট্টগ্রাম, চৈত্র, ১৩১৯।

সপ্তম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
কলিকাতা, চৈত্র, ১৩২০।

মহানিশা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৩)

পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই বিহারীর সাড়া পাওয়া গেল। সে ঝিকে ডাকিয়া কয়েকটি নূতন কার্য্যের উপদেশ প্রদান করিতেছিল এবং তদুত্তরে মুখ বাঁকাইয়া ঝি বলিতেছিল—"তোমরা অপর লোক দেখ বাবু, আমার দ্বারা অত লোকের অত কাজ হবে না, তা পষ্ট বলে দিচ্চি।"

সৌদামিনীকে তাহাদের দিকেই আসিতে দেখিয়া উভয়ে থামিয়া গেল, নতুবা একটা কলহ-কল্লোল না উঠিয়া, শীঘ্র শান্ত হইত না।

বিহারী তাহার দিকে চাহিয়া, মুখে একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টাপূর্ব্বক কহিয়া উঠিল—"বেশ ঘুমটুম হয়েছিল তো, মা? কোন অসুবিধা হয় নি?" পাছে ঝির কথা কাণে গিয়া সৌদামিনীকে দুঃখিত করিয়া থাকে, এই ভয়েই সে তাঁহাকে তাড়াতাড়ি অন্যমনা করিয়া দিবার চেষ্টায় অবান্তর কথা পাড়িতে গেল। নতুবা সে জানিত, সৌদামিনী যে অবস্থা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে এখানে তাঁহার কোন বিষয়েই কষ্ট হওয়া সম্ভবই নয়। সৌদামিনী ঘাড় নাড়িয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর সাঙ্গ করিয়াছিলেন; আবার কি ভাবিয়া বলিলেন—"অসুবিধা কিসের হবে বেহারি মামা? তুমি কত যত্নই যে করচো! এত যত্ন যে, কতকাল পাই নি, তা মনেও পড়ে না!"

বিহারী এ প্রশংসায় আকর্ণ লাল হইয়া মুখ নত করিল। "আমি আর কি করতে পারলাম ছোট মা! রামচন্দ্র করতে আর দিলেন কই?"—সৌদামিনীর এ কথায় হঠাৎ চোক ছল ছল করিয়া আসিল, অঞ্চলে পতনোন্মুখ অশ্রু মুছিয়া তিনি কহিলেন—"এতোই বা কে'কার জন্য করে, মামা? আপন জনেই আজকালকার দিনে দীনদুঃখী দেখলে মুখ ফিরোয়, তা যেখানে রক্ত-সম্বন্ধ নেই, সেখানে কিসের টান থাকে বল দেখি?"

বিহারী, সজল নেত্রে ঈষৎ হাসিয়া, উত্তর দিল—"ভালবাসা—কৃতজ্ঞতার টান যে সব চাইতে বড় টান মা, যে অন্ন শরীরে গিয়ে রক্তে পরিণত হয়, এ যে তারই টান!"

সৌদামিনী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার মনের মধ্যে তখন সেই কৃতজ্ঞতারই একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়তন্ত্রিগুলি আবেগ-স্পন্দিত করিতেছিল। এই অবসরে শতমুখীধারিণী বামা ঝি তাহার আপাদমস্তক ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করণান্তে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিল। সে একটু আশ্চর্য্যের স্বরে কহিল—"হ্যাঁগা, ভদ্দর লোকের ঘরে এমন কাঁটাসার চেহারা কেন গা? গরীবদুঃখীর ঘরেই তো জানি যে, খাওয়া-পরার দুঃখে এমন ধারা শ্বেত-মূর্ত্তি হয়ে যায়!"

শুনিয়া সৌদামিনী একটুখানি হাসিলেন,—বিহারী কম্পিতস্বরে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"তোমাগীর সে খবরে দরকার কি? তুই কাজ করতে পারিস কর, না পারিস চলে যা, আমি এক্ষুণি লোক খুঁজে নে' আসচি—বুঝলি!"

"ও মাঃ, এদের ভাল বল্লেও মন্দ হয় গো! যেন কেল্লার গোরা!" বলিতে বলিতে বামা সম্মার্জ্জনী আস্ফালনপূর্ব্বক ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সত্তঃ প্রস্থানের কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

সৌদামিনী হঠাৎ কহিয়া ফেলিলেন—"এবার আমাদের ঘুঘুডাঙ্গায় রেখে আসবে চলো, বিহারী মামা! না মামা, দাদাবাবুর অমতে অপছন্দয় আমি জোর করে তাঁর বাড়ী দখল করে বসতে চাই নে! এখন তো আবার চেনা-শোনা

হলো, মধ্যে মধ্যে দুমাস ছমাস বাদ একবার করে গিয়ে, তুমি আমাদের খোঁজখবর নিসে এসো, তা হলেই ঢের হবে। এক ভাবনা অপির জন্য, তা যা ওর কপালে লেখা আছে, সে তো আর খণ্ডন হবে না!"

এই সময় অপর্ণা কাপড় কাচিয়া আর্দ্রবস্ত্রে উঠান হইতে র'কে উঠিতে-ছিল, মায়ের শেষ কথা কটা কর্ণগোচর হইতেই সে থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় দিয়ে আসবে মা?"

মার উত্তর শুনিয়া তাহার অতি সূক্ষ্ম গোলাপি অধর ঈষৎ হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, সে স-তাচ্ছল্য-ভঙ্গিতে ভ্রু-বিস্তার করিয়া, কহিয়া উঠিল,—"ইস্ আমরা গেলাম তো! তোমার দাদাবাবুকে তুমি চেন নি মা, আমি কিন্তু ওঁর ধাত একবার দেখেই বুঝে নিইচি! উনি মুখে যত মন্দ ভিতরে তত নন।"

বিহারী সৌদামিনীর সুদৃঢ় আপত্তিতে এতক্ষণ একটু কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; কি বলিবে, ঠিক কথাটি তাহার মনে আসিলেও মুখে যোগাইতেছিল না, কিন্তু এবার তাহার স্বপক্ষে আর একজনকে পাইয়া, সে সোৎসাহে উঁচু গলায় বলিয়া উঠিল—"ঐ দেখ! আমিও তো তোমায় কাল ঠিক এই কথাই বলেছি মা, দুদিন থাক—তখন বলো যে, হ্যাঁ—বেহারির কথা বটে!"

অপর্ণা সগর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গির সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল—"ঝঞ্ঝাট আবার কিসের?—"

সৌদামিনী তাঁহার দিকটাই দুর্ব্বল দেখিয়া অগত্যা, স্থির-সঙ্কল্প হইতে আপাততঃ নিজেকে নামাইলেন। মৃদু মৃদু কহিলেন—"কে জানে বাবা, আমার এই জ্বালার শরীরে আর কোন কিছুই বরদাস্ত করতে পারিনে, তার চেয়ে মনে হয় যেন নিঃঝঞ্ঝাটে উপোস দেওয়াও ভাল।"

অপর্ণা একটুখানি সরিয়া থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া, গামছা নিঙড়াইতে ছিল; সে সগর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গির সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল—"ঝঞ্ঝাট আবার কিসের? কেমন করে উনি আমাদের বিদায় করেন, আমি দেখচি দাঁড়াও না। যা বল্লেই অমনি যাওয়া পড়ে রয়েচে আর কি! ওসব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি কাপড়চোপড় ছেড়ে পুজো করগে তো।"

বিহারী এই কথায় সায় দিয়া গেল—"ঠিক বলেচে দিদিমণি, ও সব ঠিক হয়ে যাবে, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আর তুমি কি মনে করেচ, কর্ত্তা-মশাই এখন

তোমায় ছেড়ে দেবেন? না, মা, তুমি ওঁকে চেনো না—তাই, মন ওঁর সেই থেকে পৃথিবীর উপর জ্বলে আছে, নৈলে জান্‌লে—ভিতরটায় বড় সরেস জিনিষ ছিল। আরও এককথা—দেখ মা, তোমায় বলি, জান্‌লে—কিছু মনে করোনা তুমি, ধর্‌তে গেলে এ ক্ষেত্রে ওঁর চাইতে—জান্‌লে!—"

উপর হইতে ডাক আসিল—"বেহারি—বেহারি—বলি, ও বাদ্‌শা বাহাদুর! সকাল কি আজ আর হবে না?—না নেশা-টেশা কর্‌তে আরম্ভ করেচো? ওরে নেমক হারাম! সাড়া নেই কেন?"

অপর্ণা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, অন্তরাল হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিয়া উঠিল—"ঐ বেহারিদা'র শুভ সম্ভাষণ আরম্ভ হয়েচে! যাও, যাও—"

বিহারী ত্রাস্তেব্যস্তে যাইতে যাইতে "তুইও বাদ পড়বিনে দিদি, তোরও তোলা আছে!" বলিয়াই চলিয়া গেল। কাপড়খানা বাঁশের উপর মেলিতে মেলিতে অপর্ণা কহিল—"বেহারিদাদা খুব মজায় থাকে, না, মা?"

মা এ কথায় হাসিয়া ফেলিয়া উত্তর করিলেন—"খুব! আমি কিছুদিন এই রকম 'মজায়' থাকলে, নিশ্চয় পাগল হয়ে যেতাম।"

"না মা, তা হতে না। দেখ্‌চো তো—বেহারিদার মাথা অনেক লোকের চাইতে ঢের বেশি ঠাণ্ডা আছে। তোমারও থাকতো।" এই বলিয়া অপর্ণা ভাঁড়ারে ঢুকিয়া বঁটি ও তরকারির চাঙ্গারি বাহির করিয়া আনিল। বলিল—"তুমি আর দেরি করো না যাও। আমি উনুন ধরলেই রান্না চাপাচ্চি। রাত্রেই আমি হাঁড়িকুঁড়ি সব বার করে দিয়েচি। বগ্‌নোয় রাঁধলে তোমার শুদ্ধ হতে পারবে।"

আহারকালে অপর্ণা পরিবেষণ-পাত্র-হস্তে গিয়া দাঁড়াইতেই গৃহস্বামীর দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইল; তিনি যে তৎপূর্ব্বে তাহাকে একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই, এমনও বোধ হয় না। তথাপি কি মনে করিয়া তিনিই বলিতে পারেন, তাহাকে যেন না চিনিবার ভাণে বিস্ময়-সূচিত স্বরে কহিয়া উঠিলেন—"এ রাঁধুনীটি আবার কবে থেকে বাহাল হলো? বেহারি, কই খাতায় ওর ভর্ত্তি-তারিখ লেখা দেখলাম না তো? মাইনে টাইনে সব ঠিক হয়েচে?"

বিহারী অদূরে দাঁড়াইয়া হাতের কোষে করিয়া তৈল লইয়া, অপর হস্তে অঙ্গে মাখিতেছিল, সে ঈষৎ ভয়-ব্যথিত দৃষ্টি মুহূর্ত্তে দ্বারের অর্দ্ধান্তরালে অর্দ্ধাবরিতা সৌদামিনীর দিকে ফিরাইল। সৌদামিনী চোখ নত করিয়াছিলেন, তাহার সে বিপন্ন দৃষ্টি তাঁহার চোখে পড়িল না। অপর্ণা ঈষৎ নতদেহে তিলপিঠালির বেগুনভাজাগুলা পাতের উপর ঢালিয়া দিয়া কহিয়া উঠিল—"না—মাইনের কথা এখনও কিছু ঠিক করা হয় নি। বেহারিদার অত সাহস নেই বোধ হয়, তাই তিনি ওকাজটা আপনার জন্য বাকি রেখেছেন। কত দেবেন?"

রাধিকাপ্রসন্ন ঘাড় তুলিয়া, ভাল করিয়া, মেয়েটির দিকে চাহিলেন—মুখ খুব গম্ভীর হইয়া আসিল; কহিলেন—"আমার পুরণো রাঁধুনির তোলা চার টাকা মাইনে ছিল, দিন-রাতের লোক আমি রাখিনে, তাতে খরচা বেশি পড়ে।"

অপর্ণা কহিল—"কাজ বুঝে তো দাম দেবেন? আপনার সে রাঁধুনি কি আমার মতন রাঁধতে পারত? রান্নাটা কেমন হয়েচে?"

বস্তুতঃ এ জাঁক বালিকা করিতে অধিকারিণী ছিল। এই অল্পবয়সে এমন পাকা রাঁধুনীর মত রান্নার হাত প্রায় সহজে দেখা যায় না। ভোজনকর্ত্তা কচি আমড়ার অম্বল আস্বাদ করিয়া বলিলেন—"যাচ্ছে তাই! একি মুখে দেওয়া যায়!"

"কই কিছুই তো পাতে পড়ে রইলো না!"

"পড়ে থাকলে নিত্যি উপোসের পালাও পড়ে যায় যে! তুমি যে বিদায় হবে, এমন ত কিছু ভরসা দেখছিনে!" অপর্ণা শুধু সংক্ষেপে উত্তর করিল—"ঠিক বুঝে-চেন।"

সৌদামিনী এতক্ষণ কোনমতে চুপকরিয়া, এই বাদানু-বাদ শুনিতেছিলেন কিন্তু সহসা 'বিদায়ে'র কথা কর্ণগোচর হইতেই তাঁহার মনের মধ্যে সন্তপ্ত অভিমান উথলাইয়া উঠিতে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন—"ও আমার মেয়ে অপর্ণা, দাদাবাবু।"

"তোমার মেয়ে!—অন্নপূর্ণা! তা আমি কেমন করে জান্‌বো বলো? কাল তুমি একবার একটা 'ঠেলামারা পেন্নাম' করতে এসেছিলে বটে, আর কেউ তো কই

উঁকিটিও পাড়েন নি? কেমন করে জান্‌বো যে, কোন্ বাদশাজাদী আমায় কৃতার্থ করতে এসেছেন!"

অপর্ণার এখানে এখন কোন কাজ ছিল না, কিন্তু তাহার মনে কোন্দল করিবার একটা প্রবৃত্তি প্রবলভাবেই জাগ্রত ছিল, তাই সে ব্যঞ্জনপাত্রহস্তে সেই খানেই দণ্ডায়মান ছিল। তাহার সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি প্রকাশ পাইলে, সে অবিলম্বেই উত্তর দিল—"মায়ের প্রণামের ফল দেখে আর এগোতে সাহস হয় নি, কর্ত্তাবাবু! কি জানি, মায়ের বাপ-চৌদ্দপুরুষ তো খুব ভালই অভ্যর্থনা পেলেন! আমি কি শেষে আবার ধনঞ্জয় পাবো? তাই সরে পড়ে ছিলাম।"

রাধিকাপ্রসন্ন এই মুখরা বালিকার কাছে নিজেকে ঈষৎ হতমান বোধ করিয়া ফেলিবার উপক্রম ঘটিয়াছিল, এইবার নবোৎসাহে আস্ফালন করিয়া উঠিলেন—"তোমার মার বাপকে গাল দোব না?—দুশো বারদোব পাঁচশোবার দোব।" অপর্ণা কহিল—"আমিও তো মাকে তাই বলি,—দিলেনই বা? ওঁর নিজের সন্তানদের গালিগালাজ করে, উনি যদি একটু আমোদ করেন, তোমার তাতে ক্ষতি কি?" "আমোদ করি!"—এবার যেন বৃদ্ধের চির-উড্ডীন বিজয়বৈজয়ন্তী নত হইয়া আসিল। তিনি পরাস্ত ভাবে থামিয়া গিয়া, সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দামিনি! তোর এমন ব্যারিষ্টার মেয়ে থাকতে তোর ভাবনা কিসের? একটা গাউন কিনে দিলে, হাইকোর্টে গিয়ে জজিয়তিও করতে পারে।"

"বেশতো আপনিই দেবেন" বলিয়া, আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই দ্রুতপদে সে রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধ যে তাহার কাছে মনে মনে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছেন, এইটুকু সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল। মায়ের কল্যকার আঘাতের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ হইয়াছে মনে করিয়া, তাই সে মনের মধ্যে ঈষৎ প্রীতি অনুভবও করিল। মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—"যে দেবতার পূজার যে মন্ত্র! এতে আমি কি করবো?"

রাধিকাপ্রসন্ন আচমন করিতে উঠিয়া গিয়াছেন, বিহারী স্নানার্থ গামছাকাপড় হাতে নদীর দিকে গিয়াছে, সৌদামিনী সে সব কিছুই জানিতে পারেন নাই। যাহার নামে তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে এই কতক্ষণ হইল সম্বোধন করিয়া কথা কহিয়াছেন, সেই মহাচঞ্চলা এই ছুতায় তাঁহার শরীর মধ্যে শিরায় শিরায় ঢুকিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া এক করিতেছিল। "দামিনী!" 'তোর'!—এমন দুটি স্নেহের ভাষা শুনিলে কি আর বুকের কান্না চাপিয়া রাখা যায়? তিনি সেইখানে দেওয়ালে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মাতামহের বিরক্তির ভয়ও আর সে মর্ম্মবিদারী ক্রন্দন রোধ করিতে পারিল না।

রাধিকাপ্রসন্ন ঘটিটা নামাইয়া গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিছুক্ষণ তাহার অর্দ্ধব্যক্তযন্ত্রণা রোদন দর্শন করিবার পর আর একটু সরিয়া আসিয়া ডাকিলেন—"দিদি!"

"দাদাবাবু?"

"চুপকর, কি করবি দিদি, কপালে সুখ নেই কি করবি?"

সৌদামিনী এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া কহিলেন—"দাদাবাবু, আমার বড় কষ্ট, কত কষ্ট কেউ জানে না!"

"জানে ভাই, জানে। সবাই ওই কথাই মনে করে দিদি, নিজের দুঃখ সংসারে কে না বড় দেখে? তুমি ভাব, তোমার দুঃখটাই সবার চাইতে বড়, আমি ভাবি আমার;—ঐ রে তোর কোঁদুলি মেয়ে আসচে। অতি বদমাস্ মেয়েটা, একরত্তি মেয়ে—মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য! পালাই!"

(৪)

আমাদের দেশে,—বোধ হয়, সকল দেশেই—পিতৃনামে পরিচয়কে 'মধ্যম'-শ্রেণীতে ফেলা হইয়া থাকে। 'স্বনামে'ই পুরুষ ধন্য হইয়া থাকেন। তা স্বনাম-ধন্য পুরুষ মুরলীধরেরও এই পিতৃনামের বড় বালাই ছিল না। দরিদ্র মুরলীধর বাল্যে মাতুলালয়েই প্রতিপালিত এবং অতিক্রান্ত প্রায় কৈশোরেই তিনি সেই দুঃখদারিদ্র্যের জ্বালায় উদ্‌ব্যস্ত হইয়াই দেশ-ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবন-যাপন সংগ্রহের চেষ্টায় সুদূর 'মগের মুল্লুকে' আগমন করেন। সে অনেক দিনের কথা। ইংরেজ-অধিকার তখন কেবল মাত্র নিম্নব্রহ্মেই নিবদ্ধ ছিল—সমগ্র ব্রহ্মদেশে বিস্তীর্ণ হয় নাই। ১৮২৪ সাল হইতে যুদ্ধারম্ভ ও ২৬ সালে ইংরাজ ব্রহ্মরাজ ফাগাদুর নিকট হইতে আরাকান, তেনাসেরিম ও আসাম কাড়িয়া লইবার পর যখন ব্রিটিশ-বর্ম্মার সৃষ্টি করেন, তখন চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে অনেক লোকই ব্যবসা-বাণিজ্য-ব্যপদেশে সেই নিম্নবর্ম্মা বা ব্রিটিশ বর্ম্মায় যাতায়াত আরম্ভ

করিয়াছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকটায় এই মধ্যভাগের মত চাকরী-প্রীতি রোগটা এত বড় সংক্রামক হইয়া উঠে নাই। বরং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও সুবিচারের সুযোগ প্রথম প্রথম বাঙ্গালীদের চিত্তে লক্ষ্মীর বাস-স্বরূপ বাণিজ্যের প্রতি একটা আকর্ষণ ও আগ্রহ আনিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে ইহার প্রমাণ এখনও অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বর্ম্মাযুদ্ধের পর যখন রেঙ্গুন, প্রোম, বেসিন এবং পেগু—ইংরাজ-রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইল, তখন ব্রহ্মদেশের প্রতি বহুব্যবসায়ীরই দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বর্ম্মা যদিও তখনও অংশতঃ 'মগের মুল্লুক' এবং গৃহকোটর-ভক্ত বাঙ্গালী যদিও গৃহ ছাড়িয়া অতটা দূরে জীবিকার্জ্জনে যাওয়ার অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইবার সহজ উপায় স্বল্পাহার-নীতিই শ্রেষ্ঠ অনুভব করিয়া থাকে, তথাপি আবার যাহাদের নিকট অর্থ কেবল অনর্থই নয়, সংসারে এমন লোকও দেখা যায়। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ", সেটা আবহমান কাল হইতেই। শাস্ত্রও বিভিন্ন, শাস্ত্রার্থগ্রাহীও বিভিন্ন। কাজেই "উপবাস-নীতি" ও "স্বল্পাহার-বিহার নীতি", সাধারণ বঙ্গবাসী কেন—ভারতবাসী মানিয়া চলিলেও ইহার মধ্যে ব্যতিক্রমও যে নাই, এমনও নয়। চাণক্য-নীতি বলে, "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যাং অর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" বাঙ্গালীর ঘরের কবিছেলেটি শুদ্ধ "অনিত্যসংসারমায়া, কে বা কার সুতজায়া" ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে শিক্ষা করে, কিন্তু খুব অল্প দুদশ জনেই ওই চাণক্য শ্লোককে মুখস্থ করিলেও তাহার নির্দ্দিষ্ট বস্তুদ্বয় লাভের জন্য নিজেকে 'অজর অমর'-বোধে চেষ্টা-যত্ন করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য এখানে এটুকু বলিয়া রাখিলেও বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না যে, এই শ্লোকার্দ্ধ যেমন 'দুদশ জনের' উপরই কাজ করে, ইহার অপরার্দ্ধের সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। জীবনের অনিত্যতা, সংসরণশীল সংসারের নশ্বরত্ব, ভারতবাসী-হৃদয়ে যেমন সুপরিস্ফুট, এমন আর কোন দেশের লোকের ধারণার মধ্যেই নাই; কিন্তু তাই বলিয়াই কি "বিদ্যাং অর্থঞ্চ" চিন্তাকে তাঁহারা একদিকে সেই নশ্বরত্বের সামিল করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনাং" এই বোধে ধর্ম্ম-আচরণই করিতেছেন?

কোথায়? এখানেও সেই ব্যতিক্রম। সেই দুদশ-জনের উদাহরণ দেখান ছাড়া উপায় নাই। তাঁহারা না ইহ—না পর—কোন দেশের সঞ্চয় রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। নিতান্তই "বেদে-বৃত্তির" উপাসক। কোন ক্রমে দুমুঠা না যুটে, একমুঠা হইলেও দিন কাটিয়া যায়। ছেলেপিলেগুলা বর্ত্তমানে যদি কদর্য্যাহার ও বদ্ধরুদ্ধ দুর্গন্ধ গৃহের বিষাক্ত বায়ু সহিয়াও বাঁচিয়া থাকে;—তো ভবিষ্যতে চরিয়া খাইবে! আর কি? দু'ছিলিম তামাক টানিয়া, দুখানা তাস পিটাইয়া, জীবনের দিনকয়টিকে একবার কাটাইয়া যাইতে পারিলেই হয়। তার পর? তারপর আবার কি? জীবন নশ্বর বটে! সংসার অনিত্য, তাও সত্য! অদৃষ্টও মানা যায়, সেও ঠিক! তবু এর পরের কথায় কাজ কি? পরে যে কি হয়, কেহই দেখিয়া আসিয়া খবর দেয় না। যা হইবার তাই হয়। অথবা শাস্ত্র বলে, যেমন কর্ম্ম করে, তারই ফল পায়। নৈষ্কর্ম্মই ফলনিবৃত্তির উপায়; তাই বুঝি, তাঁহারা কর্ম্মফলত্যাগের সহিত কর্ম্মত্যাগও করিতেছেন! কিছুদিন পূর্ব্বেও এই রজোশক্তি আর একটুখানি প্রবল ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। চাকরীর মৃগতৃষিকা তখনও প্রবল না ছিল, এমন নয়, তবু যেন তাহাতে এমন সর্ব্বনেশে জোয়ার বহে নাই।

মুরলীধর চট্টগ্রামের বাসিন্দা নয়; তাঁহার মামার বাড়ী জেলা মেদিনীপুর—গ্রামের নাম নন্দীগ্রাম। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মাতুল যজমান সাধিয়া, কোনমতে সংসার প্রতি-পালন করিতেন। গৃহে পোষ্যসংখ্যা সংসারের আয়ের চেয়ে সংখ্যায় কিছু বেশিই ছিল। টাকায় তখন একমণ—দেড়মণ চাল ও আঙিনায় শাকসবজি, চালে চালকুমড়া, চরকায় কাটাসুতায় বোনা একবৎসরের পুরা গ্যারান্টি-দেওয়া, মোটা ঠেঁটি কাপড়; এ না থাকিলে মুরলীধরের মাতুল-গৃহে বোধ হয়, নিত্য একাদশীর ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু সেই স্বর্ণযুগে ঐ ব্রতের বিশেষ করিয়া একটি মাত্র তিথি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; আর কোন দিনের জন্য ব্যবস্থা হয় নাই। যদি ঐ শাস্ত্রকার আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি এই ব্রতধারিগণের একটা শ্রেণী-বিভাগ করিয়াও দিতেন।—"বড়লোকেরা এই ব্রত করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে, দরিদ্রের বা সাধারণ গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই।" এইরূপই বোধ হয়, ব্রত-প্রকরণের সূচনারম্ভ হইত। কারণ ঐ শ্রেণীর লোকেরা এ

যুগে ঐ ব্রতটি মধ্যে মধ্যে পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শরীরের তেজ চেষ্টা করিয়া কমান আবশ্যক করে না; স্বতঃই কমিয়া যাইতেছে।

মুরলীর মাতা ইচ্ছাময়ী কুলীন-পত্নী, ভ্রাতার ঘরে তিনিই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, ভ্রাতৃবধূগণ গৃহে ছয় মাসের পালা খাটিয়া পর্য্যায়ক্রমে যাওয়া আসা করিয়া থাকেন, সংখ্যায়ও তাঁহারা ছাব্বিশটি, (অবশ্য সব কয়টিকেই যে আনা হয়, তা নয়। যাঁহাদের পিতা বা ভ্রাতা যাওয়া-আসার খরচ ও ঘর করিতে আসার 'সামগ্রী-পাতি' যোগাইতে সমর্থ, তাঁহাদের কপালেই এ দুর্লভ স্বামিগৃহ-দর্শন ঘটে।) কাজে কাজেই একজনের দুইবার ঘুরিয়া আসিতে হিসাবমত তের বছর সময় লাগে। সুতরাং তাঁহারা এ গৃহে অপরিচিতা আগন্তুক মাত্র; বধূ বই গৃহিণী হইতে পারেন না। সংসারে ছাত্র, পিসীমাতা, ভগিনীগণ ও তাঁহাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যাই অধিক। ইদানীং এক-জন মাতুলানী ছয় মাসের শেষ দিনে ভায়ের অক্ষমতা জানাইয়া, ভ্রাতৃগৃহ গমন বন্ধ করিয়াছিলেন এবং নিজের ঘরে চাপিয়া বসিয়া দখলী-সত্ব প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মুরলীর মামা কুলীনসন্তান হইলেও নিজে যে তিনি পিতৃ-পিতামহবৎ উগ্রতেজা কুলীন নহেন, তাহা তাঁহার এই পালা-স্বীকারেই দেখা যায়। নহিলে কোন্ কুলীন-স্বামী তাঁহার কুলীন-পত্নীকে ঘরের-ভাত ছয়মাস খাওয়াইতে স্বীকৃত হইয়া থাকেন? কাজেই চণ্ডী যখন ভৈরবীরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার বক্ষারূঢ়া হইতে চাহিলেন, তখন তিনি তাঁহার পদতলে শববৎ নিজেকে সমর্পণ করা ভিন্ন আর কোন পথই খুঁজিয়া পাইলেন না। যে ব্যক্তি কখনও প্রচুর আহার পায় নাই সে, যখন সম্মুখে অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য পায়, তখন অপর সকলকে বঞ্চিত করিয়া গোগ্রাসে নিজের মুখে সবটা তুলিয়া দিতে চাহে। কাজেই তখন যে যার নিজের পথ খুঁজিতে চেষ্টিত হইল। ইচ্ছাময়ীর বোনেরা, পিসী ও তাঁহার ছেলেপিলেরা একেএকে যখন বাক্যবিদ্ধ হইয়া চিরদিনের আশ্রয়ের বাহির হইয়াছেন, তখন হঠাৎ একদিন ইচ্ছাময়ীর উপরেও সেই আক্রমণের বেগ খুব প্রবলতর হইয়া উঠিল। ইচ্ছাময়ী সকলের বড় বোন, এতদিন সবার উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন, আজ হঠাৎ এক অপরিচিত বধূ আসিয়া, তাঁহাকে নাক তুলিয়া দুটা চোটা চোটা কথা শুনাইয়া দেয়, ইহা তাঁহার সম্মানের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। ভাইকে ডাকিয়া অনুযোগ করিলে, ভাই ঔদাস্যসহকারে উত্তর দিলেন—"আমি ওসব মেয়েলি ঝগড়ার মধ্যে নাই। এমনি সর্ব্বদা 'খেচাখেচি' করিতে করিতে তোমরা আমার ঘরের লক্ষ্মী ছাড়াইয়া দিবে, দেখিতেছি।"

দিদি রাগিয়া বলিলেন—"কি! আমরা তোর লক্ষ্মী ছাড়াইয়া দিতেছি! এতদিন তোর ঘরের লক্ষ্মী কোথায় ছিল—হ্যাঁরে লক্ষ্মীছাড়া? তা থাক, তুই তোর লক্ষ্মী নিয়াই থাক, আমরা আলক্ষ্মী সব বিদায় হই।"

কিশোর পুত্র মুরলীর হাত ধরিয়া, মুরলীর মা সেই যে ভ্রাতৃগৃহ ছাড়িয়া বাহির হইলেন, ভায়ের অনুরোধ-উপরোধ আর তাঁহাকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিল না।

ইহার মধ্যেই মুরলীর চট্টগ্রামে এক ঢাকা-প্রবাসী ভদ্র-কন্যার সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। শ্বশুর শালা, কেহই বর্ত্তমান নাই। ইচ্ছাময়ী বেহানের আগ্রহে সেইখানেই গিয়া উঠিলেন, এবং এইরূপে তাঁহার কিশোর কাল হইতেই স্বাবলম্বন অভ্যাস করিতে হওয়ায়, তাঁহার ভবিষ্যতের যবনিকাতলে উপস্থিত সৌভাগ্যের উদয়চ্ছটা অল্পে অল্পে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে আরম্ভও করিল। মুরলীধর বিশেষ লেখাপড়া শিখিবার অবসর পান নাই, কিন্তু তার চেয়ে এক বড় শিক্ষার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। দুঃখের পাঠশালে পড়িয়া মানুষ হইবার উদ্যমের চেয়ে বেশি শিক্ষা আর কিছু নাই। মায়ের অবস্থা তাঁহার 'কৌলীন্য'-গর্ব্বের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া, নিজের সে পরিচয়ের স্পৃহা-টুকুও রক্ষা করে নাই। অতবড় কুলীন মুরলীধর শর্ম্মা—সামান্য ব্যবসায়-লিপ্ত হইয়া, যখন একমাত্র পত্নী সঙ্গে সুদূর ও দুর্গম ব্রহ্মদেশে চলিয়া গেলেন, তখন প্রতিবেশী মহলে বিস্ময়, ক্রোধ ও লজ্জার সীমা রহিল না। শাশুড়ী এবং মা কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না, শুনিবার লোকই নাই। মামার নিকট খবর দেওয়া হইল। পিতার সংবাদ অজ্ঞাত; কাজেই তাঁহাকেও এতবড় লজ্জাকর সংবাদে অজ্ঞই থাকিতে হইল। তখনকার দিনে ব্রহ্মদেশে যাত্রা এখন-কার বিলাত-যাওয়ারই কাছাকাছি ছিল। ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ প্রতিবেশিগণ মনে মনে স্থির করিয়া রহিলেন যে, মুরলীধর ফিরিয়া আসিলে, তাঁহারা তাঁহাকে একঘরে করিয়া

রাখিবেন। কিন্তু তাঁহাদের একান্ত প্রার্থিত সে আশা আর মিটাইতে পারা যায় নাই; কারণ, মুরলীধর সেই হইতেই আর দেশে ফিরিলেন না।

পেগু-জয়ের পর হইতেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেগুনের চালানি কারবারে বিশেষ করিয়া মনোযোগী হইলেন। এতবড় লাভবান ব্যবসা, বোধ হয়, অল্পই আছে। কাজেই বণিক-কোম্পানি এ ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অস্ত্র না ধরিবেন কেন? মুরলীধর অতিকষ্টে পেগু পৌঁছিয়া, অসামান্য চেষ্টায় দু' তিন বৎসরের পর সামান্য কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া, তখনকার স্বাধীন-ব্রহ্মের রাজধানী আভায় গমন করিলেন। ব্রহ্মে তখন আকাশভরা মেঘ, মধ্যে মধ্যে অশনিও গর্জ্জিতেছিল, কখন্ কোথায় পড়ে, কিছুই স্থিরতা নাই। মুরলীর গ্রহগণ তখন সুপ্রসন্ন এবং তাহার মাথার উপরকার আকাশ নির্ম্মলই ছিল। যদিও প্রথম দিকটায় অনেক গড়িয়া গড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছে, অনেক বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও হইয়াছে, তবুও সে সব আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বাধাবিপত্তি ঠেলিয়াও তাঁহার উদ্যমের ফল অল্পদিনেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কখনও আভা, কখনও ভামো, কখনও একেবারে প্রোমে কোন সময় মিন্‌বু সহরে, কোন সময় আবার মৌলমিনে—এমনি করিয়া উপর ও নিম্ন ব্রহ্মের নগরে নগরে—কখনও ইরাবতী—কখনও সালবীন তীরে—কোন সময় পেগু, যোমা বা আরাকান পর্ব্বতের দুর্গম উপত্যকা সকলে ঘুরিয়া ফিরিয়া, অসীম অধ্যবসায় সহকারে সেগুনের ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিলেন এবং ক্রমেই তাহা তাঁহার পক্ষে মহা লাভজনক হইয়া দাঁড়াইল। ব্রহ্ম-রাজসরকারে মুরলীধরের পসার-প্রতিপত্তি জন্মিয়া যাওয়াতে রাজধানী আভায় তাঁহার 'হলুৎসভা' বা মন্ত্রি-সভার মধ্যেও কতকটা সম্মানের সূচনা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু এমন সময় সেখানকার রাজনৈতিক গগনের খণ্ড মেঘ সহসা জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল, এবং দেখিতে দেখিতে প্রবল বেগে ঝটিকা উত্থিত হইয়া, সমস্তটাকেই আগাগোড়া লণ্ডভণ্ড বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল।

ব্রহ্মরাজ থিবো অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ইংরাজবিদ্বেষী। বারংবার বিবাদ-বিসম্বাদে পুনঃ পুনঃ সাবধানতাসূচক পত্রাদি ব্যবহারের পরও তিনি বৈদেশিক-কোম্পানির প্রভুত্ব সহনীয় করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বে-বর্ম্মা-ট্রেডিং কোম্পানি ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক ৩৫,০০০০০, পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় তৃতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই তৃতীয় যুদ্ধই স্বাধীন-ব্রহ্মের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংরাজ জয়ী হইয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশ নিজের রাজ্যাধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং হতভাগ্য ব্রহ্মরাজ থিবো সুদূর দ্বীপ রত্নগিরিতে চিরনির্ব্বাসিত হইয়া জীবনাতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। আজও সেই স্বাধীন রাজ্যের হতভাগ্য নরপতির অধীন-জীবনের শেষ হইয়া যায় নাই। আজও তিনি সেই সাগরতীরে নির্জ্জন দ্বীপে সামান্য বন্দী মাত্র। রাজপরিবর্ত্তনের অনিবার্য্য ফল রাষ্ট্রবিপ্লব। কখন সামান্য, কখন অসামান্য মূর্ত্তি ধরিয়া সে দেখা দেয়;—কিন্তু দেখা দেয়ই। অপর পাঁচজনের সঙ্গে মুরলীধরকেও ইহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি যখন শেষ বর্ম্মাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে রেঙ্গুন সহরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সঙ্গে তাঁহার আসন্নপ্রসবা পত্নী, একটি শিশু সন্তান এবং অতি সামান্য কয়েকখানি পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নিজের বলিতে নাই। দুতিনটি সন্তান এবং অজস্র ধনসম্পত্তি বিপ্লবের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া আসিতে হইয়াছিল।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর নিজের একটা খেয়াল আছে। যেমন মানুষের মধ্যে—দেবতাদের ভিতরও তেমনই; খেয়াল-মতই তাঁহারা কাহারও সহিত বা ডাকিয়া কথা কন, কেহ বা তাঁহাদের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে গলা ফাটাইয়াও সাড়া পায় না। জয়াবতীর উপাখ্যানে যেমন শোনা যায়, জয়মঙ্গলবার ব্রত করিবার ফলে আখ্যানের নায়িকা জয়াবতীর স্বামী 'সাততরী' হারাইয়া সতেরো-তরীর' অধিনায়ক হইয়া, দেশে ফিরিয়াছিলেন, মুরলীধরের স্ত্রীরও বোধ করি, ঐ প্রকারই কোন পুণ্যবলে তাঁহারও স্বামী একগুণ হারাইয়া দ্বিগুণ লাভ করিয়া বসিলেন। ব্যবসায়-লক্ষ্মী তাঁহার করুণাঞ্চল বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া, তাঁহার এই ভক্তটিকে দুহাতে তাঁহার আঁচলে-বাঁধা ধনের রাশি তুলিয়া লইতে দিলেন।

কেবল ঐ ব্রত-কারিণীর ন্যায় "অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পোড়ে না," এইটিই তাঁহার ভাগ্যে কালগুণে ফলে নাই। যে জিনিষ দাম দিলে ফিরিয়া পাওয়া যায় না, সেই বস্তু

কয়টিই আর ফিরিল না। তা ভিন্ন ধনের সঙ্গে সঙ্গে আর সবই ফিরিয়া আসিল। মুরলীধরের অবশিষ্ট দুইটি সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানটির নাম ব্রজরাজ। দ্বিতীয়টি কন্যাসন্তান। ব্রজর পরের দুই তিনটি পুত্র এবং কন্যা কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবার পর এই ক্ষীণশক্তি সন্তানটিকে অনেক মাদুলি-কবচ ধারণ করাইয়া, বহুযত্নে কৌটায় ঢাকা আঙ্গুরটির মত করিয়া রাখিয়া, এই বৃদ্ধ বয়সের শেষ সন্তানটিকে মৃত্যুর হস্ত হইতে ছিনাছিনি করিয়া কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সকল মহৎ কর্ম্মেরই যে মহৎ ফল কর্ম্মকারকগণ সকল সময় উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, এমন দৃষ্টান্ত সংসারে আমরা সব সময়ই দেখিতে পাই না। সেই জন্যই হিন্দুর কর্ম্মফলান্বেষণ নিষিদ্ধ। এই উদ্যম, চেষ্টা, অর্থব্যয়, এবং মানসিক ব্যগ্রতার ফলে যে জীবনটি রক্ষিত হইল, অদূর ভবিষ্যতে একদিন পত্নীহারা বৃদ্ধ করলগ্নকপোলে বসিয়া, হতাশ চিত্তে মনে মনে বলিতে বাধ্য হইলেন, "ভগবান যাহা করিতেছিলেন, হয়ত ওর পক্ষে সেই ভাল ছিল।"

মুরলীধর যখন শেষ বর্ম্মাযুদ্ধের পরে রেঙ্গুন সহরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সঙ্গে তাঁহার আসন্নপ্রসবা পত্নী ও একটি শিশুসন্তান

মুরলীধরের প্রতি ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর যে অপর্য্যাপ্ত করুণা ছিল, সে দিক দিয়া দেখিলে, তাঁহার অসাধারণ সৌভাগ্য সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। কিন্তু মানুষের মন অর্থ-সংগ্রহকেই প্রধানতঃ তাহার আনন্দের উপাদান করিয়া রাখিলেও যেমন রাত্রিদিন বীণাধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহা আর তেমন শ্রুতিসুখকর থাকে না, তার চেয়ে তখন হয়ত মনসা-পিসীর তেপান্তরের মাঠের গল্পও ভাল লাগে, চিরজীবন রাত্রিদিন টাকাকড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া তেমনি বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মন সেই মধুঠুনঠুনানির পরিবর্ত্তে নাতি-নাতিনীর মলপাঁয়জোরের ঝুনুঝুনানি শুনিবার জন্য বেশি লালায়িত হইয়া পড়ে। এই পরমধনী ব্যক্তিটিরও তেমনি এবয়সে আর কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনেই দিন কাটান মনে ধরিতেছিল: না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, উপযুক্ত পুত্র ব্রজরাজ এইবার তাঁহার কার-কারবার বুঝিয়া লইয়া, তাঁহাকে ছুটি দেয়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি ফুটফুটে কনেবধূ ঘরে আসিয়া, দুচারিটি টুকটুকে ছেলে-মেয়ে তাঁহার খেলার সাথী করিয়া দেয়। এ বয়সে এ স্বপ্নের মত এমন লোভের স্বপ্ন আর নাই। কিন্তু পুত্র ব্রজর সেদিকে লক্ষ্যমাত্রও ছিল না। সে ছেলে নিজের আয়েসটুকু কেমন করিয়া বজায় রাখিতে পারা যায়, সে খবরটুকু বিলক্ষণ জানিত। লেখা-পড়া যখন শিখিয়াছিল, তখন তাহাদের এত বড় বাড়ী, এমন অফিস ও এত লোকলস্কর হয় নাই; কিন্তু যেদিন সে জানিতে পারিয়াছে যে, সে বড়লোকের সন্তান, সেই দিন

হইতেই সে বাপের অংশীদার সাহেবদের ও তাঁহাদের ছেলেদের সহিত ভাব করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ভাবের কল্যাণে, তাঁহাদের মেয়েরাও তাহার পক্ষে অভাব পদার্থ হইয়া দাঁড়ান নাই। এখন তাঁহাদের সহিত পাল্লা দিয়া ফ্যাসানের সহিত যুদ্ধ করিয়া, জয়ী হওয়া, তাহার প্রধান একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে। এই উপলক্ষে বিলাত হইতে ফ্রান্স হইতে আমেরিকা হইতে পোষাকের, টুপির, টাইয়ের, ট্রাউজারের, আনকোরা আনকোরা ফ্যাসানের আমদানি করা, গাড়িঘোড়া মটর সর্ব্বশেষ ফ্যাসানের উঠিলেই তাহা খুব উচ্চ দরে কিনিয়া, আবার নূতন সৃষ্টি আর একটা উঠিলেই পূর্ব্বেরটা জলের দামে বেচিয়া ফেলা, এইরূপ অনেক কাজেই সে দিনরাত ব্যস্ত। কাজেই বুড়াবাপ মুখের রক্ত উঠিয়া খাটিয়া মরিলেই বা কি? সে কখন তাঁহার কাজ দেখে? তাহার সময় কোথায়? এ দিকে ক্লাবে না যাইলেই নয়। ইহার পূর্ব্বে এ সম্মান, এই রেঙ্গুনসহরের কোন কালা-আদমীর ভাগ্যেই ঘটে নাই। এমন কি যে মুরলীধরেরও সাহেব-মহলে এত খাতির ছিল না। কাজে কাজেই সেটা বজায় রাখা দরকার! আবার এই সম্মান যে সকল পার্টি প্রভৃতির ফল, সেগুলাও ছাড়া সম্ভব হয় না। অগত্যা টেনিশ, পোলো, বিলিয়ার্ড, হকি, গার্ডেনপার্টি, টি-পার্টিশিকার এবং বল প্রভৃতি আধুনিক আমোদপ্রমোদ লইয়াই তাহার দিন কাটে। অবশ্য এই আমোদ-উৎসবগুলার অধিকাংশই তাহাদের বাড়ীতে বা তাহার খরচেই সম্পন্ন হয়। সে শীত-ভোর বড় বড় ভোজ দিয়া, কোন বছরই 'আলেনা'। সাহেব বিবির নাচ দেখিয়া চক্ষু সার্থকও হয়—আবার শ্বেতাঙ্গী-সঙ্গিনীর সহিত নাচিয়াও জীবন সফল হইয়া যায়। মুরলীধর সবই দেখেন, বাধা কিছুতেই তিনি দেন না। এ বীজ তিনিই উহার মধ্যে উপ্ত করিয়াছেন। বংশদণ্ড হইতে কঞ্চি তো চিরদিনই দড় হইয়া থাকে। কেবল তাঁহার বুক খালি করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া যায়। উপার্জ্জন যে তাঁহার!

বৈশাখী

[মলিনা]

আমি—
বসে' আছি নাথ বিরহ-নিদাঘে
পথ চেয়ে নিশিদিন;
দিবাগুলি মোর কাটে যুগ সম,
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ।
কে জানে কখন্ হৃদয় ভরিয়া
ঢালিয়া দিবে গো মধু,
অমিয়-পরশে ডুবায়ে আমারে
আলিঙ্গন দিবে বঁধু!

একি!
সহসা যেন রে মেঘ-গরজনে
শুনিনু ডাকিছ মোরে;
চমকি চাহিনু, চরণের ধ্বনি
বাজিল অঙ্গন 'পরে!
দেখিতে দেখিতে নবঘন বেশে
বাঁকায়ে বিজলি-চূড়
স্বরগ হইতে গলি' প্রেমাবেশে
হৃদয় করিলে পূর!

তুমি
বিরহ-পীড়িত তৃষিত তাপিত
হৃদযে পশিয়া মোর
মরম ভরিয়া সুধা বরষিয়া
আবেশে করিলে ভোর।
যেন রে সহসা কুহক-পরশে
কুসুমিত হ'ল তরু,
নব অনুরাগে নবীন সোহাগে
সরস জীবন-মরু!

ওগো!
এতেক দিবসে বুঝিনু মানসে
নিঠুরতা শুধু ছল,
দাব-দাহ চিতে সোহাগ বাড়া'তে
শোষণ বরষে জল!
যে চাহে জীবনে মিলিতে চরণে
বিরহ করহ সার;
তবু যে না ছাড়ে তুহার পিরীতি,
কর তারে গল-হার!

বীণার তান

হিন্দী

১। সরস্বতী (সচিত্র মাসিক পত্রিকা), জানুয়ারী ১৯১৫, সম্পাদক শ্রীমহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী, বার্ষিক মূল্য ৪৲, প্রয়াগ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত। বর্ত্তমান সংখ্যায় 'ফ্রান্স মেঁ জর্ম্মনী কে জাসুস (গুপ্তচর)', 'সাধুবেলা তীর্থ,' কণিষ্ক কাল-নির্ণয়' ও 'অঘোর মত প্রবর্ত্তক বাবা কিনারাম জী' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি ১৯০৮ সনে প্রকাশিত একখানি ফরাসী পুস্তকে ইংরাজীর অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত। জর্ম্মন দেশে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র পুলীস বিভাগ আছে। স্বরাষ্ট্র-গুপ্তচর-বিভাগ আমাদের 'সি আই-ডি' পুলীসের ন্যায় প্রজাদিগের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখে। উভয় বিভাগের গুপ্তচরেরাই কফিঘরে, মদের দোকানে, কারখানা প্রভৃতিতে নানাপ্রকার

সাধুবেলাতীর্থক্ষেত্র

চাকরী গ্রহণ করে, অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করিতে থাকে। যে সকল স্ত্রীলোক গুপ্তচরবি-ভাগে প্রবেশ করে, তাহাদের অনেকে এমন কি গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও বিদেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নিকট হইতে গুপ্তসন্ধি জানিয়া লয়। অনেকে পত্নীত্ব স্বীকার করিয়া স্বামীর গুপ্ত কথা জানিয়া রাজসরকারে সংবাদ দেয়। গুপ্তচর-বিভাগের স্থাপয়িতা ষ্টেবর সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কিরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমান, সুচতুর ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বর্জ্জিত (unprincipled) ব্যক্তি ছিলেন।

সাধুবেলা তীর্থ সিন্ধুনদের উপরিস্থিত সুবিখ্যাত সক্‌খর (Sukkur) সেতুর সন্নিকটে নদীগর্ভে একটি মনোরম দ্বীপে অবস্থিত। তীর হইতে নৌকা করিয়া পার্ব্বত্য দ্বীপে যাইতে হয়, যাতায়াতের ভাড়া এক পয়সা মাত্র। উহা নানকসাহী (শিখ) তীর্থ। মন্দিরে 'গ্রন্থসাহিব' সযত্নে রক্ষিত, যাহার ইচ্ছা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। মন্দিরে অন্নসত্র আছে, পুস্তকালয় ও পাঠশালা আছে এবং নানাপ্রকার দেবদেবী ও সাধুমহাত্মার চিত্রাবলী আছে। তীর্থাধীশের আজ্ঞাব্যতীত সে দ্বীপে কেহ রাত্রিবাস করিতে পারে না। এক্ষণে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ স্বামী হরিনামদাস জী সাধুবেলা তীর্থের অধীশ্বর। শ্রীবনখণ্ডী মহারাজ এই তীর্থের স্থাপয়িতা।

স্বামী হরনারায়ণ দাস

বনখণ্ডীমহারাজ ও তাঁহার গুরু নেপাল রাজ্যে অরণ্যে তপস্যা করিতেন। তাঁহাদের অদ্ভুত যোগবলের খ্যাতি শুনিয়া রাজগুরুর মনে হিংসার উদ্রেক হইল। তিনি নানাপ্রকার কৌশল ও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহারা নেপাল রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশে অবতরণ করিয়াছিলেন। নেপাল-রাজমন্ত্রী দলপতি সিংহ এই সংবাদে দুঃখিত হইয়া, নেপাল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনখণ্ডী সাধুর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, তাঁহার নূতন নামকরণ

হইল হরনারায়ণ দাস। হরনারায়ণ হইতে সাধুবেলা তীর্থাধীশের 'গদি' আরম্ভ হইয়াছিল।

কুশ বা কুশনরাজ কনিষ্কের রাজ্য-কাল সম্বন্ধে বহুমত প্রচলিত আছে,—(১) ডাঃ ফ্লিট প্রভৃতির মত তিনি ৫৭ পুঃ খৃঃ জীবিত ছিলেন এবং বিক্রমাব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন, (২) ডাঃ ওল্ডেনবর্গ ও রাখাল বাবু প্রভৃতি বলেন, কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং শকাব্দা প্রচলিত করিয়াছিলেন, (৩) কনিংহাম সাহেবের মতে ৯১ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ক রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, (৪) ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেব বলেন, কনিষ্ক ১২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি রাজ্যলাভ করেন, (৫) শ্রীযুত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে ২৭৮ খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াছিল। সরস্বতীর প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিরামচন্দ্র দিবাকরের মতে কনিষ্ক কুজ্জলু কডফিসিস ও বিভাকডফিসিসের বংশধর এবং খৃষ্টীয় 'দুসরী সদীকে পুর্ব্বার্দ্ধ মেঁ' বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এখনও জানিতে বাকী আছে, "কি নিশ্চিত রূপসে কিস বষ মেঁ কনিষ্ক কো রাজগদ্দী হুই তথা বিভাকডফিসিস কে অনন্তর হী কণিষ্ক রাজা হুয়া যা (অথবা) বীচ মেঁ দুসর কোই রাজা হো চুকা থা।"

কাশীধাম হইতে ১৫ মাইলদূরে বাণগঙ্গার দক্ষিণতটে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে অঘোরমত প্রবর্ত্তক বাবা কিনারামজী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শৈশবেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন; ১৩শ বর্ষ বয়সে তাঁহার 'গৌনা' (দ্বিরাগমনের) উদ্যোগ হইয়াছিল। যাত্রার দিন তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'গৌণা কাহার করিবে ? সেত চলিয়া গিয়াছে।' তাহার কিছু পরেই সংবাদ আসিল, বধূ মারা গিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে পিতা পুনরায় বিবাহের চেষ্টা করিলে, বালক গৃহত্যাগী হইলেন। তিনি বৈষ্ণব সাধু শিবারামজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব পূর্ব্বে অঘোরপন্থীদিগকে প্রথমতঃ বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু এখন উভয় সম্প্রদায়ের সাধুরা প্রথম হইতেই স্বতন্ত্র। কিনারাম তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে গিরিনার পাহাড়ে দত্তাত্রেয় নামক এক সিদ্ধপুরুষের উপদেশে অঘোর মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিনারাম প্রণীত রামরসাল, রামগীতা, রামচপেটা, রামমঙ্গল ও বিবেকসার গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত পুস্তক অঘোরমতবিষয়ক।

বিবিধ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে পরলোকগত বিখ্যাত মরাঠী লেখক বিনায়ক কোণ্ডদেব ওক ও রায় বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী (জন্ম আগষ্ট, ১৮৬৭, মৃত্যু ১৭ নবেম্বর, ১৯১৩) বাহাদুরের (প্রতিকৃতিসহ) সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। বিপিনবিহারী ঢাকা, পঞ্চসার গ্রামে দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিধবা জননীর অঙ্কে লালিতপালিত হইয়া, অসাধারণ অধ্যবসায় ও বিদ্যানুরাগের ফলে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে রুড়কী কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কালে তিনি যুক্ত-প্রদেশে মাসিক সহস্রাধিক মুদ্রা বেতনে ইঞ্জিনিয়ারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

এবার সরস্বতীর দর্শনীচিত্র সার যোশুয়া রেণল্ড-অঙ্কিত ভক্ত

বিনায়ক কোণ্ডদেব ওক

সামুয়েলের রঙ্গীণ ছবি। বালকের মুখে ব্যাকুলতা ও আগ্রহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে; শান্তি, প্রসাদ ও আনন্দের ছায়া তাহাতে ধরিতে

রায় বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

পারা যায় না। আজকাল 'সরস্বতী' হিন্দী মাসিক সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

২। **মর্য্যাদা** ফাল্গুন সংখ্যা, ১৯৭১ সংবৎ। শ্রীযুত রাধামোহন গোকুল 'প্রাচীন ভারত মেঁ প্রজাতন্ত্র' প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছেন ভারতে মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল, যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালী (Absolute Monarchy) এদেশে নূতন আমদানী। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১) বৈদিককাল, (২) উপনিষদকাল, (৩) স্মৃতিকাল, (৪) পৌরাণিককাল ও (৫) পূর্ব্বমুসলমানীকাল। তিনি বলিতেছেন, 'বৈদিককালসে মহাভারতকাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশকা শাসন তীন ভাগোঁ মেঁ বিভক্ত রহা':—

(১) রাজার্যপরিষদ্ (Political Department)
(২) ধর্ম্মার্যপরিষদ্ (Religious Department) এবং
(৩) বিদ্যার্যপরিষদ্ (Educational Department)

প্রমাণস্বরূপ লেখক বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া আত্মমত পোষণানুযায়ী তাহাদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন;—

'ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরুণি পরিবিশ্বাণি ভূষথঃ সদাংসি।'

—ঋক্, মং ৩, সূ ৩৮

—অর্থাৎ, শাসক সমুদায় এবং সাধারণ প্রজাগণ মিলিত হইয়া, আপনাদের কল্যাণের নিমিত্ত তিনটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিবে। এখানে রাজা অর্থে লেখক সভাপতি বুঝিয়েছেন।

লিচ্ছাবি এবং ব্রিজ্জি বা বিদেহ রাজ্যে যে প্রাচীন কালে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী বিদ্যমান ছিল, সে কথা ঐতিহাসিকদিগের মুখেও পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আমাদের মতে এই প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও মূল্যবান্।

'ভারতবর্ষকে বিশ্ববিদ্যালয়োঁ মেঁ হিন্দীকা স্থান' প্রবন্ধে শ্রীমান্ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম-এ, বি-এল বলিতেছেন, "যদি কিসি জাতি কা জীবন নষ্ট করনা অভীষ্ট হো তো উসকী ভাষা কা নাশ কর দেনা হী উসকে নষ্ট করনেকা সবসে সুগম উপায় হৈ, ক্যোঁকি ভাষা জীবিত রহনে পর ঔর সব কুছ নষ্ট হো জানেপর ভী ফির বহ মৃতপ্রায় জাতি জীবিতাবস্থা কো প্রাপ্ত হো সকতী হৈ।" এবং "বম্বই প্রান্ত মেঁ মারাঠী ভাষা এম-এ উপাধি পরীক্ষাকে লিএ ভী পাঠ্যবিষয়োঁ মেঁ হৈ। কুছ হী দিন হুএ কি কলকত্তা বিশ্ববিদ্যালয় কে ভাইস্ চান্সলর মাননীয় ডাক্টর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় নে কহা থা কি বহ দিন অব দূর নহীঁ হৈ জব বংগলা কো ভী বহী স্থান দিয়া জাবেগা জো অঙ্গরেজী ঔর অন্য দূসরী ভাষাওঁ কো মিলা হৈ।" আমাদেরও ব্যাকুলপ্রশ্ন, সেই শুভদিন কবে আসিবে?

৩। **বৈদিক সর্ব্বস্ব**, বৈষ্ণব মহাসভার মুখপত্র, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত; সম্পাদক—অধিকারী শ্রীজগন্নাথ দাস, ভরতপুর। 'শ্রীবিভীষণ জী কী শরণাগতি' পণ্ডিত সরযুদাস লিখিত। বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে ছয় প্রকার শরণাগতির বর্ণনা আছে; যথা,—

'আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ব বরণম্ তথা॥
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্য ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।'

লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে, তুলসীকৃত রামায়ণ হইতে বচন-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিভীষণের জীবনে এই ষড়্বিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখক ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রবৃত্তিরূপ লঙ্কার অধিপতি মোহাবতার রাবণকে যখন জীবাবতার বিভীষণ অনেক প্রকার বুঝাইলেন, দুরাত্মা প্রবোধ না মানিয়া বিভীষণকে পদাঘাত করিল। তখন বিভীষণ নিরুপায় হইয়া রঘুবীরের শরণাপন্ন হইলেন। শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার বীরের উল্লেখ আছে; যথা,—

ত্যাগবীরো দয়াবীরো বিদ্যাবীরো বিচক্ষণঃ।
পরাক্রম মহাবীরো ধর্ম্মবীরঃ সদাস্বতঃ।
পঞ্চবীরাঃ সমাখ্যাতা রাম এব স পঞ্চধা। ইত্যাদি।

বিভীষণ দারাপুত্র পরিজন ধনবিত্ত ত্যাগ করিয়া রঘুবীরের শরণাগত হইয়াছিলেন—

'পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ ধনানিচ।' অতএব তাঁহার ব্রহ্মলাভ হইয়াছিল—

'নির্মল মন জন সো মোহিপাবা,
মোহি কপট ছল ছিদ্র ন ভাবা।'

'তপ্ত চক্র ধারণ ক্যোঁ করনা চাহিয়ে?' এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পঞ্চসংস্কারের প্রথম সংস্কার তপ্ত শঙ্খচক্র ধারণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। লেখক আটটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—"(১) লক্ষ্মস্বাদাত্মভর্ত্তৃঃ, (২) প্রকৃতি পরিণতি গ্রন্থি-দাহায়কত্বাৎ, (৩) কর্মাঙ্গত্বাৎ, (৪) হিতত্বাৎ, (৫) তনুতনুশরয়োস্সংস্কৃতিত্বাৎ, (৬) প্রিয়ত্বাৎ, (৭) হেতুত্বাৎ স্বগৃহীতেরিতর পরিহৃত্যেঃ, (৮) দ্রাবণাৎকিঙ্করাদেঃ ধার্য্য চক্রাদিচিহ্নং কৃতিভিরকৃতিভিশ্শ্রেয়সে মুক্তয়েচ"; এবং সংক্ষেপে উহাদের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের নিকট এরূপ আলোচনা অত্যন্ত আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

৪। **সাহিত্য পত্রিকা**, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী সংখ্যা, আরা নাগরী-প্রচারিণী সভাদ্বারা প্রকাশিত মাসিকপত্রিকা, বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৲; বিদ্যার্থীদিগের পক্ষে ১। সাহিত্য-পত্রিকায় শিক্ষ গুরুদিগের জীবনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। আলোচ্য সংখ্যায় পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর শ্রীগুরু অঙ্গদ, অর্জ্জুন, হরগোবিন্দ, হররায়, হরকৃষ্ণ, গোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

৫। **ভারতমিত্র**, দৈনিক ও সাপ্তাহিক হিন্দী পত্রিকা, কলিকাতা, ১০৩ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, মূল্য—দৈনিক সংস্করণ বার্ষিক ১০৲; সাপ্তাহিক সং ২৲। ভারতমিত্র আজকাল

হিন্দী পাঠকসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক। আনন্দের কথা, এই হিন্দী দৈনিক বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। দোলের রঙ্গীন সংখ্যায় হোলিকোৎসবের আলোচনা আছে। প্রহ্লাদের ভগিনী হোলিকার একখানা অদ্ভুত বস্ত্র ছিল; উহা আগুনে পুড়িত না। এই কাপড়ের ভরসায়, সে প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া অনলে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার কুমতলব ছিল; প্রহ্লাদ পুড়িয়া ছাই হইবে, কিন্তু সে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিবে। নারায়ণের চক্রে উল্টা ফল ফলিল। সেই দৈত্যকন্যা হোলিকা রাক্ষসীর মৃত্যুউৎসবই দোলের বহ্নিউৎসব। বাঙ্গালাসাহিত্যে অনেকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে, বসন্তোৎসব ও বহ্নি-উৎসব মিলিয়া দোলের লীলা উৎসবে পরিণত হইয়াছে। সম্পাদক বলিতেছেন, 'কুছ লোগোঁকা য়হ মত হৈ কি জৈসে শ্রাবণী ব্রাহ্মণোঁকা, দশহরা ক্ষত্রিয়োঁকা দিবালী বৈশ্যোঁকা ত্যোহার হৈ, বৈসে হী হোলী শূদ্রকা তিওহার হে। ঔর ইসীলিয়ে হোলীকা দিনোঁমেঁ বীভৎস প্রকার দেখনে মেঁ আতে হৈঁ।' আরও বলেন, 'তাহা নহে, উহা আমাদের জাতীয় পর্ব্ব এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলের পক্ষেই সমান।' পরে সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, 'আজকল কুছলোগ সব প্রচলিত ত্যোহারোঁকো বন্দকর নবীন ত্যোহার বনানেকী চিন্তামেঁ হৈঁ, উনকে হমারী ইতনী হী প্রার্থনা হৈ কি, আপ চাহেঁ তো অপনে নবীন ত্যোহার ধরেঁ পরন্ত প্রচলিত ত্যোহারোঁকো বন্দকরনেকী চেষ্টা ন করেঁ। কিন্তু উন ত্যোহারোঁমে প্রচলিত কুরীতিয়োঁহীকে দূর করনে মেঁ যত্নবান হোঁ।' এই সমীচীন মন্তব্য অনুমোদন করি।

৬। **সত্য সমাচার**, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশিত, মূল্য বার্ষিক ২৲। 'বসন্তী আখ্যায়িকা' নামক অসম্পূর্ণ গল্পের মটো 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' রাধাশ্যামের লীলা-নিকেতনে এরূপ শিক্ষা দেশকালোপযোগী হইয়াছে, কি না পাঠকগণ বিচার করিবেন।

মহারাষ্ট্রীয়

মনোরঞ্জন, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। বালকরাম লিখিত 'কবীঁকা কারখানা (পাঁচবা অধ্যায়)' গতাঙ্কের পর এবারও অসম্পূর্ণ রহিল। মরাঠী কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এই মৌলিক আলোচনাটি সুযোগ্য ভাবে লিখিত হইতেছে। 'আশাদেবী' কবিতাটি আমাদের বড়ই মধুর লাগিয়াছে। ভয়ঙ্কর রণরোলে পাশ্চাত্য সভ্যতার জীবন সঙ্কটাপন্ন। এসময় কবির আশাদেবী, ভূগোলকপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, ভগ্ন বীণার সুরে প্রাচ্যসভ্যতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন গান করিতেছেন। রাগিণী, অসূয়া খণ্ড চলিতেছে। 'মতিবিকার' নূতন গল্প, নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অপহরণ নহে ত? 'আজকাল চে জর্ম্মনলোক' (৪র্থ প্রস্তাব), জর্ম্মণ দেশের আভ্যন্তরিক শাসন প্রণালী ও সাধারণ অবস্থার বিবরণ;—সময়োপযোগী প্রবন্ধ। 'য়ুরোপিয়ন রাষ্ট্রাস্তীল যাদবী', বিলাতী মহাযুদ্ধের কথা; গতমাসের ঘটনাবলীর সারাংশ প্রবন্ধাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। একজন লেখক বলিতেছেন, মরাঠী বর্ণমালার সংস্কার আবশ্যক। কয়েক মাস হইতে 'হিন্দুস্তানাবর হল্লা' প্রবন্ধে এসম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্ক চলিতেছে। আলোচ্য সংখ্যা মনোরঞ্জনে 'মরাঠী টাইপাংত সুধারণা' নামক প্রবন্ধেও সেই আলোচনা চলিয়াছে। সম্পাদকমহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, 'ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণ প্রভৃতি পাশ্চাত্যভাষার বর্ণমালার সহিত মরাঠী বর্ণমালার তুলনা করিলে বোধ হয়, উহারা বিমানবিহারী ব্যোমযান, আর মরাঠী অক্ষর গোযান (বৈলগাড়ী)। অক্ষরের দোষে মরাঠী ভাষার সম্যক উন্নতি ও পরিপুষ্টি সম্ভব হইতেছে না। 'জোড়াক্ষর', মাত্রা, উকার, ইকার, অনুস্বার, বিসর্গ চিহ্ন প্রভৃতি কম্পোজ করা ত্রাসজনক, ইত্যাদি।' উল্লিখিত মন্তব্য বাঙ্গালা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করিবেন। কিন্তু বর্ণমালা, প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তনের পথে আরও অনেকদূর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইবে। হঠাৎ কোন সিজারের প্রতিভা চীনবাসীদের শিখা-কর্ত্তনের ন্যায়, ভারতীয় বর্ণমালার ফলাফলানান সংশোধন করিতে সমর্থ হইবেন, কি না, বলিতে পারি না।

গুজরাতী

গুজরাতী পঞ্চ (Gujrati Punch), ফেব্রুয়ারী মাসের তিন সংখ্যা। ২১এ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় সম্পাদকীয় 'লিডারে' কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত মান্দ্রাজের অধিবেশন উপলক্ষে, সম্পাদক মহাশয় আশঙ্কা করিতেছেন, ভবিষ্যতে কংগ্রেসে একতার অভাবচিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্য-পদ্ধতিসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, আমাদিগের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

পুস্তক-পরিচয়

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

[কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা মাত্র]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, সুগায়ক, সুবক্তা ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই সুন্দর জীবন-চরিতখানি প্রণয়ন করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রি-মহাশয় এই পুস্তকের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রি-মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—"সাক্ষাৎভাবে পরিচিত না হইয়াও লেখক যত কথা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্য।" আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভবসিন্ধু বাবু যদিও মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই কিন্তু তিনি যে ভাবে মহর্ষির সহিত পরিচিত হইয়াছেন, প্রকৃত জীবনী-লেখকের পক্ষে তাহাই আমরা যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। লেখক লিখিবার জন্য লেখেন নাই, ইহা তাঁহার একটি পরম পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়াই তিনি লেখনী-ধারণ করিয়াছিলেন; এবং আমরা বলিতে পারি, তাঁহার লেখনী-ধারণ সার্থক হইয়াছে; তাঁহার লিখিত এই পবিত্র জীবন-চরিত তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। জীবন-চরিত অনেকেই লিখিয়া থাকেন; কিন্তু ভবসিন্ধু বাবু তদ্গতচিত্ত হইয়া, বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার লিপিচাতুর্য্য যথেষ্ট আছে, ঘটনা-পরম্পরার সংযোজনও সুন্দর হইয়াছে; সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ফুটিয়াছে তাঁহার একাগ্রতা। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

সন্তান

শ্রীযুক্ত রামকানাই দত্ত-প্রণীত মূল্য ।৶০ ছয় আনা

গ্রন্থখানিতে রামকানাইবাবু গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। জৈন ঋষভ, বুদ্ধদেব ও খ্রীষ্ট এই তিনটি মহাপুরুষের কথা লইয়া এই পুস্তকখানি রচিত। তিনটি চরিত্রই নব-আলোকে দৃষ্ট ও নব-প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে। নবীন এবং প্রবীণ উভয়বিধ পাঠকেরই মনোরঞ্জন করিবার জন্য গ্রন্থকার যথোপযুক্ত স্থানে বিবেচনার সহিত কিংবদন্তি ও তত্ত্বালোচনার অবতারণা করিয়াছেন। ফলে, এই অতিপুরাতন কাহিনীগুলিও আমাদিগের নিকটে অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ ও তত্ত্বপ্রিয় পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি পড়িয়া ভাবিবার ও চিত্তের ক্ষুধা নিবারণ করিবার সামগ্রী পাইবেন। কোমলমতি বালকবালিকারাও ইহার কৌতুকপ্রদ ও নির্ম্মল উপাখ্যান-ভাগ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন।

জন্ম ও কর্ম্ম

মূল্য একটাকা মাত্র।

এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় সঙ্কলিত। ইহাতে তিনি লিপিকুশলতা দেখাইবার অবকাশ পান নাই, তাহার প্রয়োজনও নাই, আমাদের দেশে সন্তান জন্মিলে তাহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করা পিতামাতার অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল; কিন্তু এখন দেখিতে পাই, কেহ ডায়ারীর পৃষ্ঠায়, কেহ পঞ্জিকার গায়ে, কেহ বা একখণ্ড কাগজে সন্তানের জন্মসময়, নক্ষত্র প্রভৃতি লিখিয়া রাখেন; কেহ বা স্মৃতির উপরই নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিছু দিন পরে হয় ত দেখা যায়, সে লিপির আর খোঁজ হইতেছে না, স্মৃতিও নাই; তখন অনেক সময় আন্দাজ করিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ভুবন বাবু এই সুন্দর পুস্তকখানি ছাপাইয়াছেন; ইহাতে দশটি সন্তানের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান আছে। পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি এমন সুন্দর যে, কেহই ইহা অযত্নে ফেলিয়া রাখিতে পারিবেন না; সুতরাং এই পুস্তকে সন্তানগণের জন্ম-বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিলে, ভবিষ্যতে আর হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

গীত গোবিন্দ

মূল্য বার আনা

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় গীত-গোবিন্দের এই অতি সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। গীত-গোবিন্দের অনেক পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর অনুবাদ অতি কমই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়, বঙ্গ সাহিত্যের একজন মহারথী। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে না। এই অনুবাদ এমন সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে যে, এই অনুবাদ পড়িলে, কোন টীকার প্রয়োজন হইবে না। আমরা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি; বাঙ্গালা ভাষায় অনেক বিষয়ের গুরুতর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও যিনি এমন সরস, এমন সরল, এমন সুন্দর অনুবাদ করিবার সময় পাইয়াছেন, তাঁহার মনীষার ধন্যবাদ করিতে হয়। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, অথচ জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর রসাস্বাদন করিতে চান, তাঁহারা একবার এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন; তাহা হইলেই জয়দেবের কাব্যের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

পদ্মা পুরাণ

৺বংশীদাস রায় বিরচিত। শ্রীরামনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি, এল সম্পাদিত।

মূল্য দেড় টাকা।

৺বংশীদাস রায়ের এই পদ্মা পুরাণ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এতকাল ইহার প্রকাশের কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে দেশের সুসন্তান, হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া এই পুথিখানিকে রক্ষা করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়গণ অনুমান করেন যে, পদ্মাপুরাণ প্রথমে ময়মনসিংহে রচিত হইয়াছিল। ইহার স্বপক্ষে তাঁহারা অনেক প্রমাণও উপস্থাপিত করিয়াছেন। একথা অনেকেই বলে যে, নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণের আদি রচয়িতা; ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধীন বুড় গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। নারায়ণ দেবের সময় এখন হইতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে; তাহার পরই বিজয়গুপ্ত ও বংশীদাস পঞ্চদশ শকে কি তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। অন্য দুই রচয়িতা, ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসের সময় দেড়শত বৎসরের অধিক হয় নাই। ইঁহারা প্রায় সকলেই নারায়ণ দেবের গ্রন্থ অবলম্বনেই মনসার ভাসান লিখিয়াছেন; কেবল বংশীদাসই অনেক স্থানে নারায়ণ দেবের পন্থা অনুসরণ করেন নাই। পদ্মাপুরাণের রচনা সম্বন্ধে সম্পাদক-মহাশয়দ্বয় যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য রচয়িতা অপেক্ষা বংশীদাস যে কেন শ্রেষ্ঠ, তাহা অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরাও মনসার ভাসান বা পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে যে কয়েকখানি পুস্তক দেখিতে পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে বংশীদাসের এই পদ্মাপুরাণ সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এখন আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পুরাতন পুস্তকাদির উপর পতিত হইয়াছে; এ সময়ে বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ সম্পাদন করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় একখানি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য বাঙ্গালীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই পদ্মাপুরাণ যথেষ্ট জনাদর লাভ করিবে।

সুধা

[শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল]

সাগর ছেঁচিয়া যে সুধা উঠেছে, তাকি শুধু দেবতার!
মর্ত্ত্যে যাহারা বাস করে, তা'রা স্বাদ কি পাবে না তার?
দেবতারা সুধা লুটিবে, ফেলিবে,—মোরা চাতকের মত
আশায় আশায় থাকিব কি শুধু,—মরিবে বাসনা যত!
মিটিবে না স্বাদ, মোরা কি শুধুই আকাশে পাতিব ফাঁদ;
সুধা কি সদাই রহিবে সুদূরে, যেন আকাশের চাঁদ?
নন্দন হ'তে সুরভিটুকু কি শুধুই মাতাবে প্রাণ?
আশায় রহিব,—অমরেরা যত হেসে হবে আটখান!
কিসের গরব, কেন এত হাসি, এত তেজ দেবতার;
না হয় অমৃত পান করি' আজি প্রাণ তার মাতোয়ার!
সুধাপান,—সেকি শুধু দেবতার,—মোরা কি পাইনি তাহা;
'অমৃতপুত্র' মোরা কি অমৃতে বঞ্চিত আছি আহা!
পৃথিবীতে আছে যে অমৃতরাশি, দেবতা কি কভু পায়?
—স্বর্গের সুধা তুচ্ছ তার কাছে, সে কি, ওগো লাগে তায়!
মোরা নিতি নিতি এ মর-জগতে যে অমৃত করি পান,
দেবতার সুধা ধিক্ তার কাছে, ধিক্ তার গুণগান!
প্রকৃতিরাণীর সে মূরতিখানি যে স্বরগ সুধাভরা,—
কোকিলকণ্ঠে যে সুধা ক্ষরিছে,—প্রাণ করে মাতোয়ারা;
শিশুর মুখের মধুর হাসিটি,—কিশোরীর কথাগুলি,—
যুবতীর মৃদু মধুর কটাক্ষ,দেয় যা' পরাণ ভুলি',
জননীর স্নেহ, রমণীর প্রেম, ভগিনীর ভালবাসা;—
এ সকলি দেয় নব সুখরাশি,—পূরে প্রাণে নব আশা;
এর চেয়ে সুধা সে কি বেশী ভাল, সে কি বড় সুমধুর?
দেবতার সুধা থাক্ দেবতার, হোক প্রাণ ভরপুর!
মোদের যা' আছে থাক্ শুধু তাই,—করি না অধিক আশ;
অমৃতের খনি পেয়েছি যে মোরা কেন মিছে হাহুতাশ!

মাস-পঞ্জী

ফাল্গুন

১লা—রেভঃ ফাদার জে, ড, সিওয়েলের মৃত্যু হয়।

„—কলিকাতায় 'এক সোসিয়েল সার্ভিস্ লীগ্' গঠিত হয়।

„—মাধিপুরায় 'সিংহেশ্বর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী' খোলা হয়।

২রা—চাটগাঁর মাঝিগণ ধর্ম্মঘট করে।

৩রা—কমন্স মহাসভার মিঃ লয়ড্ জর্জ্জ "এলাই"-দিগের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা জানান। মিঃ চর্চ্চহিলও ইংরাজ রণতরীর অবস্থা কি, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

৪ঠা—ঢাকা 'পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজে'র বাৎসরিক কন্‌ভোকেসন হয়। মাননীয় লর্ড কার্মাইকেল বাহাদুর সভাপতি ছিলেন।

„—বোম্বায়ের বিখ্যাত ডাক্তার ভি, এম্, সেনজ গিরির মৃত্যু হয়।

„—কলিকাতা পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্‌টার মহম্মদ ফাজিলের মৃত্যু হয়।

„—রায় সাহেব নন্দলাল বসুকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। কয়েকজন যুবককে সন্দেহ করিয়া পুলিশ ধরে।

„—কলিকাতা 'ট্রাক্‌ট্ ও বাইবল সোসাইটী'র বাৎসরিক অধিবেশন হয়। রেভঃ সি, অলডার সভাপতি।

„—দিল্লীতে "এনিমি ট্রেড একজিবিশন" খোলা হয়।

৫ই—বেহার গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতিবিষয়ক এক "রেজোলিউসন" প্রকাশ করেন।

„—"ইউনিটি ও মিনিষ্টার"-সম্পাদক শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু হয়।

„—'মুফিদ প্রেসে'র মালিক শ্রীধরম সিং টাহিল সিংহের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেল।

„—মেদিনীপুরের উকীল শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকারের মৃত্যু হয়।

„—মেজর জেনারেল জেমস্ রীড্, কর্ণেল ক্যাম্পবেল ও প্রফেসার টীন্ (বাইবেল-তত্ত্ববিশারদ) ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

৬ই—নকীপুরের জমীদার রায় বাহাদুর হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যু হয়।

„—কলিকাতার 'ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্‌স্‌টিটিউটে'র বাৎসরিক অধিবেশন।—

৭ই—দেবালয় এসোসিয়েসনে'র বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

„—নবাব মহম্মদ রাজা খাঁ বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

„—পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্লেগ-প্রতিষেধ-বিষয়ক এক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

„—মাননীয় শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের মৃত্যু হয়।

৮ই—কলিকাতায় বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীজ্ কনফারেন্সের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। মাননীয় লর্ড কার্মাইকেল সভাপতি।

„—পানামা প্রদর্শনী খোলা হয়।

৯ই—"মিউটিনী ভেটারেন" কর্ণেল জন রবার্টসনের মৃত্যু হয়।

১০ই—কর্ণেল গোল্ডেনের মৃত্যু-সংবাদ জানা গেল।—কানপুরে অপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্সে'র বাৎসরিক অধিবেশন হয়।

১১ই—স্যর কে, জি, গুপ্তের স্থলে সর্দ্দার দলজিৎ সিংহের নিয়োগ-বার্ত্তা প্রচারিত হয়।

১২ই—ঢাকা স্কুল অফ্ ইঞ্জিনিয়ারীংএর সর্ভে ফাইনেল পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

„—দিল্লীতে এক নীলচাষ সংক্রান্ত কনফারেন্স্ বসে।

১৩ই—লাহোরের মেডিক্যাল স্কুলের মিলিটারী ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

১৪ই—রায়বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউর মৃত্যু হয়।

„—কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে'র বার্ষিক অধিবেশন হয়।

„—কলিকাতায় 'ইমপোর্ট ট্রেড এসোসিয়েসনের' বার্ষিক অধিবেশন হয়।

১৫ই—কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ বি, এল, ও মধ্য বি, এল, পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

„—রয়টার-টেলিগ্রাম কোংএর জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হয়।

১৬ই—গুপ্তঘাতকের হস্তে ইন্সপেক্টার শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাণত্যাগ করেন।

„—হুগলীর সবজজ্ শ্রীতারকনাথ দত্তের মৃত্যু হয়।

„—রাজসাহীতে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্যিক কন্‌ফারেন্সের ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী সভাপতি।

১৭ই—কর্ণেল হোমস্ (ইম্পিরিয়ল ব্যাকটীরিয়লজিষ্ট) ও মেজর জেনারেল ক্রক চেম্বার্সের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেল।

„—বিখ্যাত গ্রন্থকার মিঃ ফ্রাঙ্ক বুলেনের মৃত্যু হয়।

„—ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ শ্রীহরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

১৮ই—বড়লাট মহোদয়ের সভাপতিত্বে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্‌সিলের অধিবেশন হয়। বজেট পেস হয়। নূতন কোন কর স্থাপিত হইল না।

„—কলিকাতায় মাননীয় গোখলের স্মৃতিসভা হয়।

„—কলিকাতায় ইউরোপীয়ন এসোসিয়েসনের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। মিঃ এল, পী, পিউ সভাপতি।

„—হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডপণ্ডিত শ্রীকেদার নাথ ঘোষের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গেল।

১৯এ—প্রাথমিক বি, এল. পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

„—অধ্যাপক জেমস্ গেকীর মৃত্যু হয়।

„—কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীশরচ্চন্দ্র বসুকে কোন গুপ্ত ঘাতকে হত্যা করে।

„—বড় লাট বাহাদুর সারাপুল খোলেন। তিনি কলিকাতায় লর্ড রিপন ও লর্ড মিণ্টোর প্রস্তরমূর্ত্তি উন্মোচন করেন।

„—কাকিনার জমীদার রমণীমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

২০এ—দিল্লীতে এক 'নাইট কন্‌ফারেনস্' বসে।

২১এ—কলিকাতা 'টী এসোসিয়েসনে'র বার্ষিক অধিবেশন। মিঃ আর, গ্রেহাম সভাপতি।

„—'ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসনে'র বার্ষিক অধিবেশন। মিঃ উড সভাপতি।

২২এ—ওয়াই, এম, সি,র বার্ষিক অধিবেশন। মাননীয় ডবলু. আর, গুর্লে সভাপতি।

„—মেদিনীপুর কলেজের প্রফেসার রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

২৩এ—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কন্‌ভোকেশন' হয়। মাননীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় সভাপতি।

„—বোম্বায়ে 'এঞ্জিনিয়ারীং কংগ্রেসে'র অধিবেশন হয়।

„—কাশীর 'হিন্দুকলেজে'র বার্ষিক উৎসব হয়।

„—'গ্রীক ক্যাবিনেট' পদ ত্যাগ করেন।

২৪এ—কলিকাতায় 'ক্যালিডোনিয়ন সোসাইটী'র বার্ষিক অধিবেশন হয়। মাননীয় মিঃ কমিং সভাপতি।

„—সিঙ্গাপুরে মার্শাল ল' জারী হয়।

২৫এ—'এংলো ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে'র বার্ষিক অধিবেশন হয়। মিঃ এটকিন্সন সভাপতি।

„—স্যর জন্ এম, সীটনের মৃত্যু হয়।

২৬এ—'সেণ্ট এনড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে'র অধ্যক্ষ স্যর জেমস্ ডোনাল্ড্‌সনের মৃত্যু।

„—কলিকাতা 'বাইবেল সোসাইটী'র বার্ষিক অধিবেশন। মাননীয় মিঃ গুর্লে সভাপতি।

„—জানজিবারের ভূতপূর্ব্ব বিশপ রেভঃ উইলিয়ম রিচার্ডসনের মৃত্যু।

২৭এ—কলিকাতায় "বোর্ড অফ্ স্যাংস্ক্রিট্ একজামিনেসনের" বার্ষিক কন্‌ভোকেশন হয়। মাননীয় লর্ড কার্মাইকেল সভাপতি।

২৮এ—মিসেস্ অ্যাটাইন্ রিয়েল ও ক্যানন টমাস স্কেল্টনের মৃত্যু।—আসাম-ব্যবস্থাপক সভায় ফাইন্যানসিয়াল ষ্টেট্‌মেণ্ট পেস হয়।

„—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মিঃ রলফ্ বলডার উডের মৃত্যু হয়।

„—হাইকোর্টের অনুবাদক রায় বিপিনমোহন সেনের মৃত্যু।

২৯এ—স্যর জর্জ্জ টর্ণারের মৃত্যু।

„—কাউণ্ট উইটীর মৃত্যু।

৩০এ—বিখ্যাত গল্‌ফ্ খেলোয়াড় মিস্ ম্যাজ্ ফ্রেজারের মৃত্যু।

„—ইংরাজ-রণতরী জার্ম্মাণ-রণতরী "ড্রেস্‌ডেন"কে ডুবাইয়া দেয়।

সাহিত্য-সংবাদ

সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম. এ., পি. আর. এস., এফ. সি এস, মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন" ও "বৈজ্ঞানিক জীবনী" নামক দুইখানি অভিনব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বনামপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত প্যারী শঙ্কর দাসগুপ্ত-প্রণীত বাল্মীকি 'রত্নাকর' থিয়েটারে অভিনয়ার্থ নাটকাকারে পরিণত হইতেছে।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত নূতন নাটক 'সাইন অব দি ক্রস' ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় চলিতেছে, পুস্তকও ছাপা হইয়াছে ; মূল্য ১৲।

সর্ব্বজনবিদিত অভিনেতা শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'আহুতি' নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে, পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৷৷৹।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম, এ,-প্রণীত 'নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর' প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৷৷৹।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়-প্রণীত নূতন ডিটেক্‌টীভ উপন্যাস 'বুদ্ধির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৸৹।

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী-প্রণীত নূতন উপন্যাস 'নুরজাহান' প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৷৷৹।

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী হালদার-প্রণীত "পাগল" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৷৷৵৹।

বসন্ত-প্রয়াণ-রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা সরযূবালা দাসগুপ্তা-প্রণীত 'ত্রিবেণী সঙ্গমে' প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৷৷৹।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs, Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Ptg. Works,
12, Simla Street, CALCUTTA

'ভারতবর্ষে'র পরিচয়

বাঙ্গালা

"প্রবন্ধবাহুল্যে ও চিত্রবৈচিত্র্যে 'ভারতবর্ষ' প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। অধিকাংশ প্রবন্ধ সারবান্, পরন্তু বহু জ্ঞাতব্য তথ্যনির্দ্দেশক। * * অধিকাংশ চিত্র প্রশংসনীয়।"

—বঙ্গবাসী।

"'ভারতবর্ষ' সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবে এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বসমন্বয়ে ভারতবর্ষের সার্ব্বজনীনতাটি বেশ কার্য্যতঃ পরিস্ফুট হইতেছে।"

—সময়।

"ছবি, প্রবন্ধ, সবই ভাল হইতেছে।"

— এড়ুকেশন গেজেট।

"বিবিধ প্রকার প্রবন্ধে পূর্ণ। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত, সারগর্ভ, বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। ছবি গুলিও মনোরম।"

—প্রসূন।

"চিত্রগুলিতে শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্য বর্ত্তমান। কবিতাগুলি মধুর, প্রবন্ধচয় গবেষণাপূর্ণ, শিক্ষাপ্রদ, চিত্তাকর্ষক ও মৌলিক আলোচনা।"

—মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী।

"এত বড় পত্রিকা, বাঙ্গালাভাষায় আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। কবিতাগুলি প্রায়শঃ সিদ্ধহস্ত-রচিত। প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য, মনোজ্ঞ, জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে পূর্ণ। 'কল্পতরু' না পড়িয়া, কেহ যেন এই অতিকায় পত্রিকা রাখিয়া না দেন। একমাত্র ছবির গুণেই 'ভারতবর্ষ' সর্ব্বত্র আদৃত হইতে পারে।"

—মালদহ সমাচার।

"কি বিষয়-নির্ব্বাচনে, কি চিত্র-সজ্জায়, ভারতবর্ষ উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। যে ভাবে ভারতবর্ষ পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য মাসিক পত্রিকার তুলনায় ইহার মূল্য সুলভ। অনেক সুলেখক এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র—মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি, মান্যবর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ বিদ্বান্ ও বঙ্গজননীর কৃতিসন্তানগণের লেখনীপ্রসূত অনেক প্রবন্ধ ভারতবর্ষে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে।"

—দর্শক।

"অধিকাংশ প্রবন্ধ সুলিখিত—পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে পূর্ণ।"

—সুরাজ।

"ইহার ন্যায় বৃহদাকার মাসিকপত্রিকা বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার কাগজ ও ছাপাই অতি সুন্দর, এবং ইহাতে অনেকগুলি সুরঞ্জিত ও সুচিত্রিত চিত্র থাকে। চিত্রগুলি বেশ মনোরঞ্জক। প্রত্যেক সংখ্যাতেই অনেকগুলি গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রভৃতি থাকে। কেবল চিত্রসংখ্যার অনুপাতেই বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা ধার্য্য হওয়া, অধিক হয় নাই।"

—বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

"এত বড় মাসিকপত্র বঙ্গে কখন প্রকাশিত হইয়াছিল, কি না, জানি না। প্রত্যেক প্রবন্ধই বিভিন্নবিষয়ক—এমন ৩০।৪০টি প্রবন্ধ, ৪।৫ খানি রঙিল ছবি থাকে। পাঠ শেষ হইলে মনে হয় যেন, ৩০।৪০ রকমের চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় পোলাও লুচি প্রভৃতি ৫০।৬০ রকম তরকারি ও চাটনির সহিত পরিতোষে ভোজনে তৃপ্ত হইলাম। এপ্রকার সাহিত্যিক আহার পূর্ব্বে কখন ঘটে নাই। রন্ধন পরিপাটী হইতেছে।"

—বীরভূমবাসী।

"আয়তনে 'ভারতবর্ষ' ভারতবর্ষের মতই হইতেছে। বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। 'ভারতবর্ষ' ভারতের গৌরব।"

—পাবনা-বগুড়া হিতৈষী।

"কাগজ, ছাপা, ছবি, বিষয় ও চিত্রনির্ব্বাচনে কৃতিত্ব আছে। স্বীয় গুণবত্তায় ইহা মাসিকপত্রিকা সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।"

—খুলনাবাসী।

"পরিচারকমণ্ডলী পত্রিকাখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যেরূপ অক্লান্ত যত্ন পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। পত্রিকাখানির ছাপা, ছবি ও কাগজ অতি সুন্দর। খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাগণের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় বিবিধপ্রবন্ধ—ভ্রমণবৃত্তান্ত, পুরাকাহিনী, ঐতিহাসিক চিত্র, প্রত্নতত্ত্ব, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গীতিকবিতা আদিতে ইহার বিশাল কলেবর পূর্ণ।"

—নীহার।

"নানাবিধ প্রবন্ধ-সম্ভারে 'ভারতবর্ষ' শোভা পাইতেছে। পদ্যগুলিতে জিনিষ—ভাব আছে। ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে লেখকদিগের, অল্প কথায় বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার কৌশলের এবং ভাষার উপর অসাধারণ অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। যাবতীয় প্রবন্ধেই পর্য্যবেক্ষণ শক্তির, গবেষণার পরিচয় আছে। ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি শক্তিশালী শিল্পীদিগের নিপুণ হস্তের তুলিকায় অঙ্কিত। গল্পগুলির এক একটি এমন করুণরসোদ্দীপক যে, পড়িয়া অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। ইহার প্রত্যেক পত্রে নয়নমোহন ছবি আছে।"

—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

"প্রবন্ধগুলির সংখ্যা যেমন অধিক, আবার সেগুলি তেমনই প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক। প্রতি সংখ্যাতেই এক রঙ্গের ও নানা রঙ্গের বহু চিত্র সন্নিবেশিত হয়।

ভারতবর্ষ প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাই খুব প্রশংসনীয়।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

"'ভারতবর্ষ' একাধারে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, কবিতা, কাব্য ও কলা-পরিপুষ্ট মহাগ্রন্থ। স্বর্গগত অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষাগণ বঙ্গ ভাষার একান্ত সাধকবৃন্দ যে দলিতা, পরিত্যক্তা ভাষার নবজীবন দান করিয়া গিয়াছেন, 'ভারতবর্ষ' বুঝি সেই ভাষার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে।"

—পুরুলিয়া দর্পণ।

"'ভারতবর্ষ' একখানি বৃহদাকার মাসিকপত্র। সৌন্দর্য্য-সম্পদে পূর্ণ—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের মহিমোজ্জ্বল কীর্ত্তি। বিপুল সাজসজ্জায় সজ্জিত।"

—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

"ভারতবর্ষের প্রবন্ধগুলি জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। চিত্র-সম্পদে 'ভারতবর্ষ' অতুল্য মাসিক পত্রিকা।"

—মালদহ সমাচার।

"অন্যান্য মাসিকপত্রিকা হইতে ইহার কলেবর অত্যধিক বড়। সুপরিচিত লেখক-লেখিকার ৩০।৩২টি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিবারে বাহির হয়। চিত্রগুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। ছাপাও মনোরম, প্রবন্ধগুলিও সুচিন্তিত ও সুমধুর। ইহা যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে ও গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

—বরিশাল হিতৈষী।

"এ প্রকার বৃহদায়তনের বাঙ্গালা মাসিকপত্র কখনও বাহির হইয়াছে, কি না, সন্দেহ। প্রবন্ধ-সৌরভেও 'ভারতবর্ষ'কে ভালই বলিতে হইবে।"

—জ্যোতিঃ।

"ভারতবর্ষে বিবিধবিষয়ের আলোচনা ও অনেক কৃতি লেখকের প্রবন্ধ পড়িয়া, আমরা অনেক শিখিয়াছি ও বুঝিয়াছি। অনেক ছবি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। ছবি-সম্পদে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য। ছবি দিয়া বর্ণিত বিষয় পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিবার উদ্যম বাঙ্গালা মাসিকে এইবার সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

—পল্লীচিত্র।

ইংরেজী

"The Magazine is uptodate, not only in its mechanical aspect, but also in respect of its contents; for the text deals with several important subjects of present day interest. Short poems and short stories form a fair porprotion of each issue, illustrations making an attractive feature of the stories, these being contributed invariably by writers of distinction. The interest of Science are not neglected. In a word, the scope of the Magazine is as wide as the Geographical name it bears —each number containing papers and illustretions of great variety and grave interest."

—The Indian Mirror.

"The Magazine is replete with informing articles on various phases of culture. In point of its wealth of illustrations, it evenly maintains its well-merited reputation."

—The Bengalee.

"The latest numbers of this well-known Bengalee Magazine are decided improvements on their predecessors and no one will have any hesitation in ranking them with the very best of the vernacultr journals of the Province."

—The Amrita Bazar Patrika.

"Both in matter and manner this bulky Bengalee Magazine is exceedingly interesting. The contributions are mostly interesting and of varied interest. The pictorial side is being well developed. Some of the best Bengalee writers have been pressed into the service."

—The Indian Daily News.

"It now claims to be the leading monthly Magazine in Bengalee. It contains over 200 pages of reading matter and is replete with interesting articles, novels, poems and short stories and contains, among others, four coloured half-tone reproductions of the pictures of great masters."

—The Empire.

"It seems there is a galaxy of the best Bengalee writers and thinkers of the day huddled together in its production. It appears also that, there is not a single phase, our yet incomplete literature can afford to display, that has not been touched or attempted at. This is novel, and this novelty is the life of the paper. Another important feature of the journal is its portraits and pictorial gallery. Special mention has to be made of the many multi-coloured pictures in each issue."

—The Indian Empire.

'भारतवर्ष' नामक बँगला मासिकपत्र

कुछ समय से बँगला भाषामें एक नया मासिक पत्र बड़ी सजधज से निकलने लगा है। इसका नाम है—भारतवर्ष। यह कलकत्ते से निकलता है। गुरुदास चैटर्जी एन्ड सन्स (२०१, कर्णवालिस ष्ट्रीट) इसके प्रकाशक हैं। मूल्य ६) साल है। पृष्ठसंख्या हर अङ्क की कोई २००

होती है। पतले चिकने कागज़ पर बड़ी सफाई से छपता है। इसके हर अङ्क में दो तीन रङ्गीन और अनेक सादे चित्र रहते हैं। जितने चित्र इस पत्र में रहते है उतने हमने बँगला भाषा के और किसी सामयिक पत्र में नहीं देखे। ज़रा इसके कुछ लेखकों की नामावली तो देख लिजिए:—

(१) महाराजा बाहादुर बर्दवान (श्रीयुत विजयचन्द महताव, के० सी० आई० ई० इत्यादि)

(२) माननीय श्रीयुक्त देवप्रसाद सर्वाधिकारी, एम०ए०, एल०एल० डी०, सी० आई० ई०

(३) आचार्य्य रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी, एम०ए०

(४) अध्यापक श्रीविपिनबिहारी गुप्त, एम०ए०

(५) पण्डित श्रीक्षीरोदप्रसाद विद्याबिनोद, एम०ए०

(६) अध्यापक श्रीकोकिलेश्वर शास्त्री विद्यारत्न, एम०ए०

(७) श्रीशशाङ्कमोहन सेन, एम०ए०, बी०एल०

(८) श्रीशरच्चन्द्र घोषाल, एम०ए०, बी०एल०

(९) श्रीक्षितिभूषण भादुड़ी, एम०एस-सी०

(१०) श्रीमती विमला-दास-गुप्ता

हमारे प्रान्त के महामहोपाध्यायों, आचार्य्यों और अध्यापकों की दृष्टि में बङ्गदेश के इन विद्वानों का बँगला लिखना शायदही हितकर, यशस्कर या प्रतिष्ठाजनक जँचे। क्योंकि उनमें से अधिकांश महारथी महाशय अपनी भाषा बोलना या लिखना अपने गौरव को गिरा देना समझते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा अँगरेज़ी बोलने और अँगरेज़ी लिखने में ही समझ रक्खी है। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने इन विचारों को अब बदल दें और अपनी भाषा लिखना सीखें। उसकी उन्नति करें। देशोपकार और परोपकार के लिए इसकी आवश्यकता है। शिक्षित होकर जिसने अपने देशवासियों को शिक्षित न किया —उनकी ज्ञानवृद्धि न की—उसकी शिक्षा सफल नहीं। क्योंकि—"काकोऽपि जीवति चिराय बलिञ्च भुंक्ते"।

बँगला की प्रस्तुत मासिक पुस्तक में कभी कभी हिन्दी के नामी नामी कवियों का चरित और उनके ग्रन्थों की समालोचनायें भी रहती हैं। उसके गत माघ मास के अङ्क में कविवर केशवदास पर एक लेख है। पत्र-सम्पादक हिन्दी, मराठी और गुजराती की मासिक पुस्तकों पर भी अपनी सम्मति प्रकट किया करते हैं। सम्मति कभी कभी बड़े मारके की होती है। हिन्दी के पत्रों और उनके लेखकों पर कभी कभी वे इस तरह गोली चलाते हैं कि मृदु-मन्द होने पर भी वह ठीक निशाने पर जा लगती है। गुणों का वे अभिनन्दन भी करते है।

भारतवर्ष—वंग भाषा का यह अभिनव सचित्र मासिक पत्र अभी हालही में कलकत्ते से निकलने लगा है। अभी तक इसके पाँच अङ्क हमने देखे हैं। सभी अङ्क एक से एक बढ़कर हैं। बंगभाषामें ही क्यों हिन्दुस्तानकी किसी भी भाषा में ऐसा बढ़िया मासिकपत्र आज तक नहीं निकला यह निस्संशय कहा जा सकता है। छपाई, कागज़, चित्र, लेख सभी इसमें अपूर्व और मूल्यवान निकलते हैं। एक संख्यामें छः छः सात २ रंगीन चित्र रहते हैं और सादे चित्रों की संख्या ५०।६० रहती है। प्रस्तुत अङ्क में ८ रंगीन और ८७ सादे चित्र हैं। लेख और कविताएं भी अच्छी हैं। इसबार गल्प अधिक और विशेष मनोरंजक हैं। इसको वंग-भाषा के प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय श्रीयुक्त द्विजेन्द्रलाल राय एम० ए० ने निकालनेका

ठीक ठाक किया था ; किन्तु विधिवशात् इसकी एक भी संख्याको भी वे अपनी जीवितावस्थामें प्रकाशित नहीं देख सके। वर्त्तमान समय में इसके सम्पादक श्रीयुत प्रो॰ अमूल्यचरण विद्या-भूषण और श्रीयुक्त जलधर सेन हैं, जो बंग-साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक हैं। इस अद्वितीय और उपादेय मासिक पत्र मूल्य ६) वार्षिक ख़ूब सस्ता है। हमारे जो पाठक बंगला जानते हों उन्हें इसका ग्राहक होना चाहिये।

पता—गुरुदास चटार्जी एण्ड सन्स,

२०१ कर्णवालिस ष्ट्रीट, कलकत्ता।

—मनोरञ्जन

'भारतवर्ष'।

इस नामका एक मासिक पत्र बङ्गभाषा में गत वर्ष से प्रकाशित होने लगा है। रङ्गीन और सादे चित्र देने में यह पत्र अपना स्थानी नहीं रखता। भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी ऐसे सचित्र पत्र कम होंगे। लेखक समुदाय में के॰ सी॰ आई॰ ई; एम॰ ए॰ एल॰ एल॰ डी॰ : एम॰ ए॰बी॰ एल : एफ॰ आर॰ एच॰एस॰ कितने हो ई ; पिछली संख्या में "कवि केशव-दास" पर एक बहुत सुन्दर ही लेख है। हिन्दी के केशव पर कभी हिन्दी में ऐसा लेख निकला कि नहीं इसमें सन्देह है। "आर्य्य भो अनार्य्य साहित्य, सभ्यता बनाम बर्बरता, विज्ञान विधाय बाह्य जगत" आदि कितने ही अन्य सुपाठ्य लेख है। गल्पों और कविताओं की भी कमी नही है। राजनैतिक विषयों को यदि इसमें चर्चा हुआ करती तो इसके सामने कोई भी बङ्गला मासिक ठहर पाता कि नहीं इसमे सन्देह है। इसका वार्षिक मूल्य ६) है।—अभ्युदय

भारतवर्ष

बँगला भाषा में अनेक प्रसिद्ध पत्र बड़ी सज धज से निकलते हैं। पर "भारतवर्ष" ने सबको मात कर दिया। इतना बड़ा, इतना सुन्दर, इतना चित्रपूर्ण और सुलेखसम्पन्न पत्र बँगला में ही क्या, भारत की किसी भाषा में भी दिखाई नहीं देता। 'भारतवर्ष' अपने ढंग का एक ही पत्र है। यह मासिक है। ठीक समय पर निकल जाता है। हम चाहते हैं कि बँगला भाषा जानने वाला प्रत्येक मनुष्य 'भारतवर्ष' को ख़रीद कर पढ़े। इसके लेख बड़े ही महत्त्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। बड़ी साँचो के कोई २०० पृष्ठ प्रति अङ्क में छपते हैं। कई चित्र रंगीन होते हैं और सादे चित्र तो नहीं मालुम कितने होते हैं। मूल्य ६) वार्षिक, षाण्मासिक ३), एक संख्या ॥) मिलने का पता—श्रीगुरुदास चट्टोपाध्याय एण्ड सन्स, २०१ कर्णवालिस ष्ट्रीट कलकत्ता।

निवेदन।

ईश्वर की कृपा से 'विद्यार्थी' दूसरे वर्ष में प्रविष्ट होता हैं। हमारी प्रार्थना है, यह नवीन वर्ष सबके लिए मङ्गलकारी हो। इस संख्या में जो रङ्गीन चित्र दिया गया है वह "भारतवर्ष के संचालकों की विशेष कृपा का फल है। एतदर्थ आप को अनेक धन्यवाद। यदि 'विद्यार्थी' के में विशेष सहायता दी तो विद्यार्थी में इसी प्रकार उत्तम उत्तम चित देने का पक्का प्रबन्ध कर दिया जा सकेगा।

निवेदक—मैनेजर, 'विद्यार्थी'।

মালাগাঁথা

"আমি সারা সকালটা বসে বসে এই সাধেরই
মালাটা গেঁথেছি"।

দ্বিজেন্দ্রলাল

চিত্র-শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

দ্বিতীয় খণ্ড] দ্বিতীয় বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

তুমি মধু

[শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, M.A., B.L.]

কীর্ত্তন

মনোহরসাই—খয়রা।

তুমি মধু—তুমি মধু—তুমি মধু !
মধুর নিঝর, মধুর সায়র, আমার পরাণ-বঁধু।
(আমার সকল তুমি—বঁধু হে,)
আমি যা কিছু চাই এ সংসারে, আমার সকল তুমি ;
আমার সাধন-ভজন তুমি ; আমার তন্ত্র তুমি—মন্ত্র তুমি ;
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— বঁধু হে,—আমার সকলই তুমি।
যেন তোমার ঐ রূপের ধ্যানে ডুবে থাকি হে, বঁধু আমার!
(কিবা) মধুর মুরতি, মধুর কীরতি,
মধুর মধুর ভাষ ;
মধুর চলনি, মধুর দোলনি,
মধুর মধুর হাস।
(রূপের কি মাধুরী ! বালাই লয়ে মরি মরি !)
মধুর সাজনি, মধুর চাহনি,
মধুর রূপের লেখা ;
মধুর মধুর, মধুর মধুর,
মাহেন্দ্রক্ষণের দেখা।

—আর কি ভুল্‌তে পারি ?
সেই ক্ষণের কথা, আর কি ভুল্‌তে পারি ?
কি ক্ষণে দেখা হ'য়েছিল !
আর ভুল্‌ব না হে, ইহকালে—পরকালে,
সেই ক্ষণের কথা আর ভুল্‌ব না হে।—
ও মধুর রূপের, মধুর কাহিনী, মধুর কণ্ঠে গায়,
শুনিতে শুনিতে, গলিতে গলিতে, প্রাণ মধু হয়ে যায়।
—বিশ্ব হয় মধুময়,
ঐ রূপে নয়ন দিলে বিশ্ব হয় মধুময় !
তখন সকলই মধুর,
বিশ্বে যা দেখি তাই সকলই মধুর !—
তখন দৃষ্টি মধুর, শ্রুতি মধুর, বাক্য মধুর, তখন যা দেখি, তাই সকলই মধুর,
যা শুনি তাই সকলই মধুর, যা বলি তাই সকলই মধুর,
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর,
বিশ্বে যা দেখি, তাই সকলই মধুর !—
ঠুংরি—
(তখন) অনলে অনিলে জলে, মধু-প্রবাহিণী চলে,
মেদিনী হয় মধুময়।
—"মধুবাতা ঋতায়তে", মধু-বায়ু যে বহে গো,
"মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" মধুসিন্ধু উথলে যে,
"মধুমৎ পার্থিবং রজঃ", মধুকণা ধূলিরেণু—
(তখন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
(বাজে—"মধুরং মধুরং" "সত্যং শিবসুন্দরং"
বাজে—"মঙ্গলং মঙ্গলং")
(তখন) যে রূপ ভাতে যেখানে, যে কথা পশে গো কাণে,
স্তুতিনিন্দা সকলই মধুর।
(তখন কটু কথাও মিঠা লাগে, তখন গালিও যে মধু ঢালে,
তখন ভালমন্দ থাকে না যে !)
(তখন) বজ্রনাদ কুহুধ্বনি গুরু, সোম, রাহু, শনি,
মধুরসে সকলই ভরপূর।
—বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়,
ঐ রূপে নয়ন দিলে,
বিশ্ব মধুময় হয়ে যায়।—

বর্ত্তমান দর্শন ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার প্রভাব *

[শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত, M. A., B. L.]

হিন্দু দার্শনিকের জাতি। হিন্দুজাতির সাহিত্য, দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। তত্ত্বালোচনা, হিন্দু-সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই হিন্দুকে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মে বিনিয়োজিত করে; সুতরাং কি ধর্ম্মাচরণে, কি বিজ্ঞান চর্চ্চায়, কি শিক্ষানুশীলনে (সুকুমার ও ব্যাবহারিক) সর্ব্বত্রই হিন্দুর দার্শনিকতা। সাহিত্যের সমস্ত বিভাগে—ধর্ম্ম গ্রন্থে, বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থে, ও শিল্প-সাহিত্যেও সেই তত্ত্ব-কথা। অন্যান্য জাতির ও দেশের সাহিত্য, যদিও ধর্ম্মকে ধারণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই স্ব স্ব দেশ ও জাতির বিশেষত্বানুসারে তত্ত্বমূলক ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুর দার্শনিকতা তাহার অস্থিমজ্জাগত থাকায়, হিন্দু-সাহিত্য কখনও দার্শনিকতা হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই।

হিন্দু-জাতির বিশেষত্ব, প্রাকৃতিক নিয়মে হিন্দু-সাহিত্যে প্রকট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জীবনের ছবিই সেই সেই জাতির সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়; বস্তুতঃ সাহিত্যের ন্যায় সুস্পষ্ট ও প্রামাণিক ইতিহাস আর কিছুই হইতে পারে না।

কোন জাতির চরিত্র, শিক্ষার ব্যাপ্তি ও পরিধি এবং বিশেষত্ব জানিতে হইলে, কেবল সেই জাতির ইতিহাস পাঠ করিলেই চলে না; পরন্তু, ইতিহাস-পাঠে অনেক সময়ে ভ্রম-সঙ্কুল ধারণাই জন্মিয়া থাকে; কারণ, ঐতিহাসিকগণ প্রায়শঃ স্বদেশ বাৎসল্য, আত্মাভিমান ও একদেশদর্শিতার রঙিল আলোক-বর্ত্তিকার সাহায্যে সত্যের প্রকৃত জ্যোতিঃ দর্শন কি প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু সাহিত্যে সে প্রকার একদেশদর্শিতা, আত্মাভিমান ও স্বদেশবাৎসল্যের সম্ভাবনা নাই। কোন জাতির সমগ্র সাহিত্যে সেই জাতির শিক্ষা-দীক্ষা, সুরুচি-কুরুচি, প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান, আশা-নিরাশা, আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও মূর্খতা সমস্তই প্রতিফলিত। প্রাচীন হিন্দু জাতি কিরূপ ছিল, তাহা পরিষ্কাররূপে জানিতে হইলে হিন্দুর বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, নাটক, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ, কলা, উপ-পুরাণ, উপাখ্যান, গল্প প্রভৃতি সমস্তই জানিতে হয়। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার স্বরূপ জানিতে হইলে, মিসরীয় সাহিত্যানুশীলন আবশ্যক। আধুনিক ফরাসী বা ইংরেজ জাতিকে জানিতে হইলে, বর্ত্তমান ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যয়ন আবশ্যক। আমাদের নবীন বঙ্গ-সাহিত্যও সে নিয়মের বহির্ভূত নয়। অর্থাৎ আধুনিক বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ছবি দেখিতে হইলে, এই নবীন বঙ্গসাহিত্যেই তাহা প্রতিবিম্বিত দেখিতে হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে বর্ত্তমান দর্শনের প্রভাবের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত চিন্তাসমূহ মনোমধ্যে স্বতঃই উদয় হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্য, যে সাহিত্যের জনক, ইংরেজী-শিক্ষা যে সাহিত্যের ধাত্রী—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত, উপনিষদ্, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রালোচনায় যাহার পুষ্টি—দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভৃতির ব্যাখ্যান ও আখ্যানে যাহার শক্তিসঞ্চয়;—বঙ্কিম, ভূদেব, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় যাহার পরিণতি—তাহাতে দার্শনিকতার অভাব কখনই হইতে পারে না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী যে সাহিত্যে প্রকৃতি ও পুরুষের লীলা, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি তত্ত্বের ব্যাখ্যানেই যে সাহিত্যের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি—সৃষ্টি ও সমাজরহস্য যে সাহিত্যে 'দশ মহাবিদ্যা', 'রৈবতক', 'প্রভাস' ও 'কুরুক্ষেত্রাদির' ন্যায় কাব্যেও বিবৃত - 'কৃষ্ণ-চরিত্র' ও 'অনুশীলন-তত্ত্বে' যে সাহিত্যের বিকাশ—সে সাহিত্যে যে সর্ব্বতোভাবে 'দার্শনিক', ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

---

* বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন-শাখায় পঠিত।

তবে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যে যে 'দার্শনিকতা'র ছায়া নিপতিত, সে দার্শনিকতা ঠিক্‌ দর্শন-শাস্ত্র নয়। দর্শন-আলোচনায়, যে সমস্ত তত্ত্বের উদ্ধার হয়, তাহা যখন সাধারণ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়, তখন সেই সমস্ত প্রচলিত তত্ত্বও, প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর আদান-প্রদান ও বিনিময়ে প্রচলিত মুদ্রার ন্যায় সদ্ভাব ও সচ্চিন্তার আদান-প্রদানের ও বিনিময়ের উপায়ীভূত হয়। সেই সদ্ভাব ও সচ্চিন্তার লিখিত ভাষায় অভিব্যক্তিই সাহিত্য।

হিন্দু-দর্শনের মূল-তত্ত্বগুলি ঠিক্‌ দার্শনিকভাবে না হউক্‌, সাধারণভাবে প্রায় সকল শিক্ষিত হিন্দুর মুখে মুখেই বিচরণ করে। যথা,—'প্রকৃতি ও পুরুষ,' 'বিদ্যা ও অবিদ্যা বা মায়া', 'গুণত্রয়', 'বস্তু ও অবস্তু', 'জীব ও ব্রহ্ম', 'জীবাত্মা ও পরমাত্মা', 'পুনর্জ্জন্ম ও পরজন্ম', 'ইহকাল ও পরকাল', ইত্যাদি বহু তত্ত্ব-কথা, শিক্ষিত কেন অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হিন্দুর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যে জাতির মধ্যে দার্শনিক মূল-তত্ত্বগুলির আদান-প্রদান এত স্বাভাবিক, সে জাতির সাহিত্যে দর্শনের প্রভাবে যে অত্যন্ত প্রবল, তাহা নিশ্চিত। কেবল ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থে, বা দার্শনিক গ্রন্থেই যে দার্শনিকতা তাহা নয়, সাহিত্যের সকল বিভাগেই দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পে ও উপন্যাসে, কাব্যে ও কথায়, নাটকে ও প্রহসনে, যাত্রায় ও পাঁচালীতে সর্ব্বত্রই এই দার্শনিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট।

এই দার্শনিকতা বঙ্গ-সাহিত্যে এত অধিক যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যবিদ্‌ অনেকেই ইহাকে সাহিত্যের এক বিশেষ "কুলক্ষণ" বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভ্রম ও বিষয়-বিভাগের আদর্শ অনুধ্যান করিয়া মনে করেন যে, 'কাব্যে ও নাটকে' দার্শনিকতা বা তত্ত্ব-কথার প্রতারণা বড়ই অশোভন। দার্শনিক কি ধর্ম্ম-গ্রন্থেই তাহা শোভা পায়। তাঁহারা বলেন, কাব্যে ও নাটকে থাকিবে—শুধু 'রস', মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ ও সমাজ-চিত্র অঙ্কন। ধর্ম্মের ও দর্শনের কথা শুনিতে কেহ কাব্য কি ও নাটক পাঠ করে না; কিন্তু তাঁহারা একটি কথা ভুলিয়া যান যে, কাব্য ও নাটক, গল্প ও উপন্যাস, যদি আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি হয়, তবে আর যাহা আমাদের চরিত্রের মূলে, তাহা পরিহার করার উপায় কি? কদলী কখনও আম্রবৃক্ষে পরিণত হয় না। মূল বা জৈবিকপ্রকৃতি, অপরিহার্য্য। শিক্ষা, সংস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে অনেকটা পরিবর্ত্তন আনয়ন করা যায়, এই মাত্র। যতদিন আমরা বাঙ্গালী হিন্দু থাকিব, ততদিন আমাদের এই জাতিগত দার্শনিকতা থাকিবে এবং তাহা বঙ্গ-সাহিত্যেও প্রকাশমান রহিবে।

কেহ মনে করিবেন না যে, দার্শনিক আলোচনা-প্রণালী সমস্ত বঙ্গ-সাহিত্যেই বহমানা, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। ষড়্‌দর্শনের কোন দর্শনের যুক্তি ও তর্ক-প্রণালী সাহিত্যের সকল বিভাগে অবলম্বিত হইতে পারে না। তবে তাহার স্থূল কথাগুলি সমস্ত সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট। 'দর্শন' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঠিক্‌ সে ভাবে 'দর্শন' শব্দটি গ্রহণ করেন না। আমাদের 'দর্শন'—তাঁহাদের 'Metaphysics বা জড়াতীত বিজ্ঞান বা অধ্যাত্মতত্ত্ব। কিন্তু তাঁহাদের Philosophy বহুধা বিভক্ত; প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানকেও তাঁহারা Natural Philosophy আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন এবং Psychology মনোবিজ্ঞান সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অধুনা যে জড়বিজ্ঞানকেই শুধু বিজ্ঞান বলিয়া থাকি, তাহা সঙ্গত নয়। এই সম্মিলনেরও 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান' দুই বিভিন্ন শাখা দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ দর্শন ও বিজ্ঞানে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই—দর্শন শাস্ত্রই প্রকৃত বিজ্ঞান। সত্যের দর্শনই 'দর্শন' এবং সার সত্যের জ্ঞানই 'বিজ্ঞান'। যাহা হউক, প্রচলিত পরিভাষা অবলম্বন করিয়াই, আমরা দর্শন ও বিজ্ঞানকে দুই বিভিন্ন বিভাগে আলোচনা করিব।

আমাদের নূতন কোন 'দর্শন' নাই; আর থাকিবেই বা কেন? বোধ হয়, দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের আলোচনা ও সিদ্ধান্তই পূর্ণালোচনা ও চরম সিদ্ধান্ত। সুবিধার জন্য মুখ্যতঃ জড়পদার্থাবলম্বী দর্শনকে বিজ্ঞান বলি এবং মনঃ, আত্মা, বা জড়াতীত ব্যাপারাবলম্বী বিজ্ঞানকে দর্শন বলি।

তবে 'বর্ত্তমান দর্শন' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা অবশ্যই 'প্রাচীন দর্শন' হইতে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতা সূচনা করিবার জন্যই 'প্রাচীন ও নব্য', 'পুরাতন ও নূতন', 'ভূত ও বর্ত্তমান' প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ। 'বর্ত্তমান

দর্শন' কি? প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শন বা বিজ্ঞান। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, আমাদের শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়েরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনে কিঞ্চিৎ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছেন; এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের গতি ও ধারার সহিত পরিচিত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহারা যে নবীন সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি বিধান করিতেছেন, তাহা যে, অল্পাধিক পরিমাণে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানানুপ্রাণিত হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছায়াবহ; এটা বঙ্গসাহিত্যের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে যতই মুগ্ধ হইয়া থাকি না কেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিশেষত্বগুলি আমরা অদ্যাপি আয়ত্ত করিতে পারি নাই। সুতরাং সে বিশেষত্ব আমাদের সাহিত্যেও পরিস্ফুট হইতেছে না। এ সম্বন্ধে মনস্বী ভূদেবচন্দ্র তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন, "ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে যে এতদ্দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার প্রবেশ হয় নাই, তাহা ইংরেজী শিক্ষা প্রণালীর, এবং ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতিগতির পর্য্যালোচনা দ্বারা যেমন সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, দেশের কৃষি-শিল্পাদির বর্ত্তমান অবস্থা বিচারপূর্ব্বক বুঝিলেও, তেমনি বিস্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।" সে বিশেষত্ব কি?—আমার মতে, সেই বিশেষত্বই **বৈজ্ঞানিকতা বা বর্ত্তমান দার্শনিকতা।**

বর্ত্তমান দর্শন সর্ব্বতোভাবে বস্তুতন্ত্র এবং প্রত্যক্ষবাদী। ইহা দ্বারা যে কেবল কোমৎ-দর্শনই লক্ষ্য করিতেছি, তাহা নয়। দুরবগাহ বর্ত্তমান দর্শনও মূলতঃ বস্তুতন্ত্র ও প্রত্যক্ষের উপর অবস্থাপিত। সেখানে অদ্ভুত রসের (Mysticism) সমাবেশ নাই; 'অদৃষ্ট' কারণাদির ধ্যান অত্যল্প, এবং তাহা অসাধারণত্বে' অনুরাগ বা আসক্তি পরিশূন্য।

মূলতঃ বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ (Observation and Experiment) ই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তি। 'মনোবিজ্ঞান' হইতেই, দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্তি। অতিমানুষ বা অতি-প্রাকৃত বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান দর্শনালোচনার সীমাবহির্ভূত।

হার্টমেন্, সপেন্‌হুয়া প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী ও অশুভবাদী দার্শনিকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্য অপর প্রায় সমস্তই দার্শনিক পণ্ডিতই দর্শনশাস্ত্রকে শুভফলপ্রদ জ্ঞানসমষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হিন্দুদর্শনের ভিত্তি দুঃখবাদে—পাশ্চাত্য-দর্শনের ভিত্তি হিতবাদে, সুখবর্দ্ধনে ও সুখান্বেষণে। জড়বিজ্ঞানও যেমন মানবের সুখবর্দ্ধনের জন্যই বিনিযোজিত, বর্ত্তমান দর্শনও সেই উদ্দেশ্যেই আলোচিত। বঙ্গসাহিত্যের উপর প্রাচীন দর্শনের প্রভাবের বিষয় পূর্ব্বেই কিছু বলা হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রসমূহের আলোচনা, বিশেষতঃ গীতা ও উপনিষদাদির বহুল প্রচারে—সেই প্রাচীন দর্শনই বিশেষভাবে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। দর্শনশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা না হইলেও, সর্ব্বদর্শন-সার গীতা-শাস্ত্রের আলোচনায় হিন্দুদর্শনের সারকথাগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এ স্থলে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে দার্শনিক গ্রন্থসমূহের চূড়ামণি, 'গীতায় ঈশ্বরবাদের' উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। গ্রন্থখানির উদ্দিষ্ট বিষয় যদিও 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-প্রতিপাদন, কিন্তু উহাতে সমগ্র হিন্দুদর্শনের সার কথা-গুলি এমনই প্রাঞ্জল ও মনোমদ ভাষায় গ্রন্থকার-কর্তৃক বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, হিন্দু-দর্শনানভিজ্ঞ পাঠকও উহা পাঠে ষড়্‌দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি অতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন। এই গ্রন্থখানি প্রকৃতই বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে (Epoch-making); এই গ্রন্থের প্রভাব বর্ত্তমান লেখকদিগের রচনায় প্রচুর পরিমাণে পরি-লক্ষিত হইবে। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার 'প্রভাব'ও বস্তুগত্যা সেই প্রাচীন দর্শনেরই প্রভাব, বর্ত্তমান দর্শনের নয়।

বর্ত্তমান দর্শনের প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অতি অল্প। অদ্যাপি 'মনোবিজ্ঞান'-বিষয়ক প্রণিধানযোগ্য কোন গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশ হয় নাই;—বোধ হয়, ইংরেজী মনো-বিজ্ঞানের একখানা অনুবাদগ্রন্থও প্রকাশ হয় নাই। যদিও অন্যান্য বিভাগে বঙ্গ সাহিত্যে অত্যাশ্চর্য্য উন্নতিই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগে সে প্রকার উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। তবে কোন

কোন লেখকের রচনায় বর্ত্তমান দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিতবর রামেন্দ্র বাবুর 'জিজ্ঞাসা' 'প্রকৃতি,' প্রভৃতি গ্রন্থে, বর্ত্তমান দর্শন বা বিজ্ঞানের তত্ত্ব সুরসাল ও কবিত্বময়ী ভাষায় বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অনেকটা পরিচিত হইয়াছে।

'দৃষ্ট' অপেক্ষা 'অদৃষ্ট' বিষয়ে, 'প্রত্যক্ষ' অপেক্ষা 'অপরোক্ষ' বিষয়ে, 'সহজ' অপেক্ষা 'অদ্ভুতে,' 'প্রাকৃত' অপেক্ষা 'অতি-প্রাকৃতেই' আমাদের রুচি। এই রুচির জন্য বর্ত্তমান কালের জীবন-সংগ্রামে আমরা কিছুতেই পাশ্চাত্যদিগের সমকক্ষ হইতে পারিতেছি না। ব্যাবহারিক শিল্প ও বাণিজ্যে আমার এত পশ্চাৎপাদ হইয়া পড়িতেছি। প্রত্যক্ষ বিষয়ের বা 'বাস্তবের' জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়াতেই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অদ্ভুতরসাত্মক কাব্যকলাদির সৃষ্টি করিতেছি।

আমাদের যোগশাস্ত্রের কথাই ধরুন। ইহার ভিত্তি সর্ব্বতোভাবে শরীর ও মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা কল্পনার কুহকজালে এই 'শাস্ত্রকে' সমাচ্ছন্ন করিয়া, এই প্রত্যক্ষমূলক শাস্ত্রটিকেও কি প্রকার অদ্ভুত দর্শনেই পরিণত করিয়াছি!

কিন্তু পাশ্চাত্যেরা এই যোগশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাষ গ্রহণ করিয়াই, শরীর ও মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং 'যম নিয়মাদি' যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন দ্বারা (যম-নিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি) যে চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্যসম্পাদন করা যায়, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিক্ষিপ্ত চিত্ত-বৃত্তিসমূহের নিরোধ দ্বারা যে, মানবের বহুবিধ প্রচ্ছন্নশক্তি বিকাশিত হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া, মনোবিজ্ঞানের এক সূক্ষ্ম ও কার্য্যকরী অধ্যায়ের সমাবেশ করিয়াছেন। আমরা যাহা অদ্ভুত, বিচিত্র, অর্দ্ধদৃষ্ট, কুয়াসাচ্ছন্ন বলিয়া মনে করি, তাহাই তাঁহারা প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে সচেষ্ট। আমরা অদ্ভুত-রস-সমাশ্রয়ী (Mystics), তাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী (Positivists) ; পাশ্চাত্যেরা প্রত্যেক বিষয়কে পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের মানদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করিয়া গ্রহণ করেন, আর আমরা ভক্তি ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই সেই বিষয়ের ধারণা করি। আমাদের সাহিত্যেও সেই ভাব। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যে, বর্ত্তমান দর্শনের প্রভাব অতি সামান্যই বলিতে হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক কি 'দার্শনিক' সাহিত্যের সৃষ্টি-জাতীয় চরিত্র, রুচি ও শিক্ষার উপরে নির্ভর করে। বঙ্গদেশে যতটুকু বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা চলিতেছে—তাহা বঙ্গ ভাষায় নয় ; বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা-প্রদান, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান বা দর্শনবিষয়ক গ্রন্থের অভাব, এবং পারিভাষিক শব্দের স্বল্পতা প্রভৃতি তাহার প্রতি-কারণ হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর চরিত্র, রুচি ও শিক্ষাও তজ্জন্য দায়ী। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'চারুপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা যে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৃষ্টি আরব্ধ হইয়াছিল—তাহার পরে সে সাহিত্য আর বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই—বাঙ্গালীর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অনাস্থা তাহার এক প্রধানতম কারণ। বঙ্গীয় পাঠকের যদি বিজ্ঞানালোচনায় রুচিই থাকিত, তবে আর 'বিজ্ঞানে' বঙ্গ-সাহিত্য এত দীন হইত না। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লকুমার প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির দর্শনালোচনার ফলে, বঙ্গ-সাহিত্য এতদিন কতই ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিত। বঙ্গের খ্যাতনামা মাসিকপত্রসমূহে, উপন্যাস, গল্প, প্রত্নতত্ত্ব, কবিতা, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনা যথেষ্টই আছে—কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও বর্ত্তমান দর্শনের আলোচনা অতি বিরল। মাসিকপত্রগুলিকে, স্বীয় স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতেই পাঠক-বর্গের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। দর্শন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের পাঠক অতি অল্প। ডারউইন, ওয়ালেস প্রভৃতির বিবর্ত্তন বা 'ক্রম-বিকাশ'-বাদের কথা অনেক লেখকই উল্লেখ করিয়া থাকেন ; স্পেন্সার, টাইলর, লর্ড এডেবারি প্রভৃতির সমাজ-বিজ্ঞান, মানব-বিজ্ঞান ও বর্ত্তমান দর্শনালোচনার কথাও কোন কোন লেখকের রচনায় লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে ও যে প্রণালীতে ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, সেই ভাবে ও প্রণালীতে কোন বাঙ্গালী লেখকই অদ্যাপি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই।

ঠিক দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া, পাশ্চাত্যদিগের সুকুমার সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিলেও আমরা তাহাতে বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। ডারউইন, ওয়ালেস, লামার্ক প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনার ফল, কাব্যে নাটকে ও উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়; জার্ম্মাণির গেটে, টেনিসন্ ব্রাউনিং প্রভৃতির কবিতায়, ওয়েল্‌স্, কোনান্ ডয়েল্, ষ্টিভেন্‌সন্, মেরি করেলি প্রভৃতির উপন্যাসে, বর্ত্তমান যুগের দর্শন ও বিজ্ঞানালোচনার চিহ্ন পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান। পাশ্চাত্য সাহিত্যপাঠক অনেকেই এই প্রকার আরও বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে জাতির চিন্তা, ভাব ও কল্পনা, যে খাতে ও প্রণালীতে প্রবাহিত, সে জাতির সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগেই, সেই খাত ও প্রণালীর আকার অল্পাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হয়। আমরা তত্ত্বালোচনায় ও তত্ত্বচিন্তনেই বিশেষ আনন্দানুভব করি, সুতরাং আমাদের সেই আনন্দপ্রবাহই কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, কথায় ও সুকুমার শিল্পে বহমান; কিন্তু প্রবন্ধের আরম্ভে আমি যাহাকে 'বর্ত্তমান দর্শন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার প্রভাব বঙ্গ-সাহিত্যে অতি অল্পই বটে।

বর্ত্তমান দর্শনের মধ্যে কোমৎ-দর্শন ও মিলের দার্শনিক আলোচনা এক সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎপ্রবর্ত্তিত বঙ্গদর্শনের যুগে অনেক লেখকের প্রবন্ধাদিতেই কোমৎ ও মিলের দর্শনের ছায়া-পাত হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রভাব বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে আর নাই বলিলেই চলে। শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ত্তৃক প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রাদির বিশেষ আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই, সে প্রভাব তিরোহিত হইয়াছে।

যদিও প্রাচীন হিন্দুদর্শনের দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়া থাকুক, কিন্তু তন্মধ্যে বেদান্ত, গীতা ও উপনিষদাদির প্রভাবই, বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান। একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ইহার কারণ, আমরা নিরীশ্বর দর্শনালোচনা, জড়বাদ, শূন্যবাদ, ক্ষণিকবাদ প্রভৃতিকে কখনও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারি নাই। দর্শন ও নীতিকে কখনও ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞান, কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্ম ও নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা দ্বারা কেহ মনে করিবেন না যে, বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞান 'নাস্তিক্য'-বুদ্ধি-প্রণোদিত। পাশ্চাত্যেরা আলোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার সৌকর্য্যার্থে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়-বিভাগ ও তদালোচনায় শ্রম-বিভাগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াই, দর্শন ও বিজ্ঞানালোচনার সহিত ধর্ম্মালোচনা ও তত্ত্বালোচনাকে সংমিশ্রিত করিতে চান না। এমন কি, নীতিশাস্ত্রকেও এক বিশেষ বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া, নীতি বিজ্ঞানের (Ethics or Science of Morals) সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয়-বিভাগ ও আলোচনায় শ্রম-বিভাগ যে, সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানের পরিধি-বিস্তারের পক্ষে উপযোগী, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এবং বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণের পক্ষেও যে সেই পন্থাই অবলম্বনীয়, তাহাও স্বীকার করিবেন। সমাজের শৈশবে যেমন শাস্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, চিকিৎসক ও যোদ্ধা একই ব্যক্তি; তখন শ্রম ও কর্ম্মবিভাগ থাকে না, হয়ত সাহিত্যের শৈশবেও সেই প্রকার শ্রম-বিভাগ থাকে না। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্য এখন শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। এই অবস্থায়, বোধ হয়, শ্রম-বিভাগ আরম্ভ হওয়া আবশ্যক এবং কিয়ৎ পরিমাণে আরম্ভও হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যের উপর বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাবের স্বল্পতার যে সমস্ত কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের অভাব প্রধান এবং সেই অভাবের জন্য বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীও দায়ী। দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা ইংরেজী ভাষাতেই দেওয়া হইয়া থাকে। যদি বাঙ্গালা ভাষায় সে শিক্ষা দেওয়া হইত, তবে এতদিনে, দর্শন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক অনেক গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারকে নিশ্চয়ই সমলঙ্কৃত করিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা কিয়ৎ পরিমাণেও বঙ্গ-ভাষায় সম্পাদিত হইলে, তাহার প্রভাব সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যেই পরিলক্ষিত হইত। যদিই বা কোন লেখক, দর্শন বা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার পাঠকের অভাব সর্ব্বদাই অনুভূত হইবে। পাঠকসংখ্যা-বর্দ্ধনের এক এবং প্রধানতম উপায়, বঙ্গভাষায় লিখিত দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তন; এবং

দ্বিতীয় উপায়—বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানানুশীলনে রুচির উদ্ভাবনা ও সম্বর্দ্ধন। দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বনের সেতু—বাঙ্গালার মাসিক ও সাময়িক পত্রসমূহ, অর্থাৎ তাহাতে যদি দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে হয়ত কালে, বঙ্গ-সাহিত্যসেবীর দর্শন ও বিজ্ঞানানুরাগ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

উপসংহারে আমার মন্তব্য ও বক্তব্য এই যে, 'বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে' নূতন ভাবে, সঞ্জীবিত, নূতন পথে প্রধাবিত এবং জগতের বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও দীক্ষার উপযোগী করিতে হইলে, বঙ্গ-সাহিত্যকে বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানানুপ্রাণিত করিতে হইবে। আমাদের দার্শনিকতা বা তত্ত্বজ্ঞান, পৈতৃক সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, তৎসমুদায় হারাইবার কোন আশঙ্কাই নাই। সেই পৈতৃক সম্পত্তির সহিত যদি আমরা স্বোপার্জ্জিত বর্ত্তমান যুগের দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পদ্‌রাশি যোগ করিতে পারি—কি তাহার কিয়দংশের বিনিময়েও যদি আমরা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের ফলানুসন্ধিৎসা, ব্যবহারোপযোগিতা প্রভৃতি লাভ করিতে পারি, তবেই বঙ্গ-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের এক অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে, এবং সেই সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে—প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালী নবজীবন লাভ করিবে।

দেবযানীর প্রতি কচ

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

নহে মম ভোগ্যা, শুভে, ও রূপ মোহিনি
মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা নাশিলে কি পাপে ?
কি কাজ করিলে চিত্ত-আবেগে ভামিনী,
সহস্র বর্ষের শিক্ষা ব্যর্থ অভিশাপে !
দেবকার্য্যে ব্রতী তনু ত্যজি' সুখ-আশ,
করেছি সাধনা সঁপি জীবন-যৌবন ;
প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে বিগত বিলাস,
আত্ম-স্বার্থ বলিদানে বর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ।
ভুল ওই প্রেমতৃষা হে বররমণি !
তোমাতে শোভে কি কভু কামনা চঞ্চল ?
ব্রহ্মচর্য্যে সমুজ্জ্বলা তারাকারা ধনী,
পিতৃশিষ্যে হেরি কেন হতেছ বিহ্বল ?
রবে না নৈরাশ্য ক্ষোভ হৃদয়ে তোমার,
কিন্তু কর্ম্মদোষে হবে ক্ষত্রিয়া এবার।

কুন্তীর প্রতি দুর্ব্বাসা

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

তুষ্ট আমি তব প্রতি হে রাজনন্দিনী,
তৃপ্ত এ ঋষির প্রাণ তোমার সেবনে ;
কি যত্ন-আগ্রহ মোরে দেখালে কামিনী,
দুদিন অতিথি আমি এ ভোজ-ভবনে।।
এই বর দিনু তোমা শুন সুবদনি,
যখন যে দেবতারে স্মরিবে সুন্দরি,
লভিবে কৃপায় তাঁর পুত্ররূপ মণি,
রূপে, গুণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে এ ধরা ভিতরি।
যেই যশঃ, ধর্ম্ম, রাজ্য, পৃথ্বী করে আশা,
লভিবে জীবনে ভদ্রে, মহাভাগ্যবলে,
ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমি মহর্ষি দুর্ব্বাসা,
হবে না আমার বাক্য অন্যথা ভূতলে।
লভিবে মহান্ শক্তি সান্ত্বনা পরাণে,
ছায়া সম তব পাশে হেরি ভগবানে।

বঙ্গ-সাহিত্যে চট্টগ্রাম

[আবদুল করিম]

এই শৈলকিরীটিনী সাগরাম্বরা চট্টলভূমি—নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন আমার এই পবিত্র জন্মভূমি—প্রকৃতিদত্ত অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া, পুণ্যতোয়া কর্ণফুলীর কলনাদে আবহমানকাল নিখিলনাথের মহিমা কীর্ত্তনে নিরতা ও আপন গৌরব-প্রভায় উদ্ভাসিতা রহিয়াছে। নির্ম্মম কালের কত কঠোর ঝঞ্ঝাবাত ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, নিয়তির তাড়নায় কতবার ইহার কত অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বিধিদত্ত অনন্যসাধারণ বিভূতিনিচয় বুকে করিয়া, আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি চিরদিনই লোকচিত্ত হরণ করিয়া আসিতেছে। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, দেশ-দেশান্তর হইতে কত শান্তিকাম সাধক-শিরোমণি ইহার সুস্নিগ্ধ শান্তিছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন! আজ তাঁহাদের পদরেণু-সংস্পর্শে চট্টগ্রাম পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মহিমায় মহিমান্বিত বলিয়া নহে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকায়, চট্টগ্রাম রাজনৈতিক লীলা-ক্ষেত্র এবং ঐতিহাসিকের গবেষণার প্রকৃষ্ট স্থানও বটে।

এদেশে কতবার কত বিভীষণ রাজবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে এবং কত রাজত্বের উত্থান-পতনের ক্ষীণচ্ছায়া আজও ইহার বক্ষোপরি বিরাজিত রহিয়াছে! আত্ম-প্রাধান্য-স্থাপন-চেষ্টায় মগে-মুসলমানে, ইংরেজে-পর্ত্তুগীজে কতবারই এখানে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার জন্মভূমি আপনার গৌরবে আপনি চিরদিনই তেমনই সত্য শিব-সুন্দর রহিয়া গিয়াছে! পরমার্থ-তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে চট্টগ্রাম যেমন পুণ্যপীঠ, প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর পক্ষেও ইহা তেমনই প্রশস্ত গবেষণাক্ষেত্র।

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের ললামভূতা এই চট্টলভূমি চিরদিনই কবিত্বের পরম রমণীয় লীলোদ্যান—বীণাপাণির প্রিয় বিহার-কানন। বসন্তের সমাগমেই শুধু কোকিল-কুলের সুধানিষ্যন্দিনী কাকলী শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু আমার জন্মভূমিতে যেন চিরবসন্ত বিরাজমান! বিধাতার অপার অনুগ্রহে চট্টগ্রাম স্মরণাতীত কাল হইতেই কলকণ্ঠ কবি-কোকিলের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত। বুঝি বা সে মধুর ঝঙ্কার কখনও থামিবার নয়! কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে সেই পিককুল কবে কোন্ স্বপ্নময় রাজ্যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধুর স্বর-লহরীর মধুস্রাবী ঝঙ্কার আজও বিষয়-কোলাহল-ক্লিষ্ট মানবের শ্রুতিবিবরে ধ্বনিত হইয়া অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে! সে অমৃতের রসাস্বাদনে চট্টলবাসী চিরকাল বিভোর থাকিবে, সন্দেহ নাই।

"সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ ॥

বিধাতার অসীম করুণায় এই মহাজনোক্তি চট্টগ্রামবাসীর পক্ষে চিরসত্য। রাজর্ষি বায়েজিদ রোস্তামী, হজরত বদর আউলিয়া, সাহ আমানত, সাহ মোহন আউলিয়া প্রভৃতি অসংখ্য তাপসের পূত পদরেণুস্পর্শে যে দেশ ধন্য, যে দেশ বার আউলিয়ার আশ্রয়স্থান, সীতাকুণ্ডাদি তীর্থ যে দেশে অবস্থিত, আলাওল-প্রমুখ অসংখ্য কবির বীণাঝঙ্কারে যে দেশ মুখরিত, সে দেশ ধরাতলে অতি সৌভাগ্যশালী, —দেশভক্ত সন্তানের দৃষ্টিতে সে দেশ তুলনা-রহিত মহাপুণ্যতীর্থ।

চট্টগ্রামের নৈসর্গিক অবস্থা কবিত্ব-শক্তিস্ফুরণের পক্ষে একান্ত অনুকূল। এজন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই চট্টগ্রাম অসংখ্য কবির প্রসূতি। চট্টগ্রামবাসীদের কাব্যরস-পিপাসার তীব্রতা সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিবে, একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। তাঁহারা কেবল নিজে নিজেই মধুচক্র রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—চট্টগ্রাম-অধিবেশনে পঠিত।

নানা দিগ্দেশ হইতে মধু আহরণ করিয়া আনিয়া, তাঁহারা আপনাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। আধুনিক সাহিত্যের কথা যাহাই হউক না কেন, এই কারণে চট্টগ্রামের প্রাচীন সাহিত্য বহুদূরপ্রসারী ; সে বিষয়ে বঙ্গের অন্য কোন জেলার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে কি না সন্দেহের বিষয়।

চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত অসংখ্য পুঁথি বিরাজ করিতেছে। সে সমস্ত অযত্নে বা সযত্নে রক্ষিত হইয়া, অধুনা কাল-প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। সত্যকথা বলিতে গেলে, বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে চট্টগ্রামে অদ্যাপি রীতিমত কোন চেষ্টাই হয় নাই। অধুনা লোকান্তরিত প্রতিভাশালী নবীনযুবক ভূতপূর্ব্ব 'আলো'-সম্পাদক নলিনীকান্ত সেন মহাশয় এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কাল আমাদের সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেয় নাই ; তাঁহার অকালবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কার্য্যও কর্ণফুলীর অতল জলে ডুবিয়া যায়। তদনন্তর একমাত্র এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্রশক্তি লেখক আপন অযোগ্যতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, সহায়-সম্বল-হীনভাবে প্রাচীন সাহিত্যের বহুল রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত স্বীয় চেষ্টায় ছয় শতের অধিক বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুঁথি ও সন্দর্ভপুস্তক এবং তিনি শতের অধিক কবির পদাবলী সংগ্রহ ও উদ্ধার হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য অনেকগুলি বিদেশীয় কবি আছেন। অবশিষ্টের মধ্যেও সকলে চট্টগ্রামবাসী না হউন, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রামে এত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল যে, আরও বহুদিন অব্যাহতভাবে অনুসন্ধান-কার্য্য চলিলেও সমস্ত গ্রন্থের উদ্ধার হইবে কি না, বলা যায় না। কতগ্রন্থ এখনও গৃহস্থের নিভৃত নিকেতনে কাষ্ঠচাপে নিষ্পিষ্ট থাকিয়া, কীটকুলের আহার এবং হুতাশনের আহুতি যোগাইতেছে, কে বলিবে? অধুনা চট্টগ্রামে শিক্ষিত লোকের অসদ্ভাব নাই এবং মাতৃভাষার সেবায়তেও অনেকের অনুরাগ জন্মিয়াছে। আশা করা যায়, স্থানীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় আমাদের এই সকল বিলোপোন্মুখ রত্নরাজি-উদ্ধারের একটা উপায় অবলম্বিত হইবে। চট্টগ্রামে এত সাহিত্যোপকরণ অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে যে, সে সকল সংগৃহীত হইলে একদিকে দেশের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে, অপরদিকে আমাদের মাতৃভাষার মহোপকার সাধিত হইবে। এই সকল উপকরণ হস্তগত হইলে, প্রাচীন সাহিত্যে চট্টগ্রাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম আসন অধিকার করিবে, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। একমাত্র এই নগণ্য প্রবন্ধ-লেখকের প্রযত্ন চেষ্টায় চট্টগ্রাম ইহার মধ্যেই প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গের অন্য যে কোন জেলার সহিত সমান আসন দাবি করিবার অধিকারী হইয়াছে। নিরন্তর নানা সংঘর্ষে পীড়িত হইয়াও চট্টগ্রাম-বাসিগণ ভুবনদুর্ল্লভ কাব্যামোদ উপভোগে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই। সাহিত্যামোদ উপভোগে তাহাদের প্রবৃত্তি এত বলবতী ছিল বলিয়াই প্রাচীনকালে চট্টগ্রামে এত অধিক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। এখনো কত কবি নির্জ্জন-বাসে লোকের অনাদর ও উপেক্ষার মধ্যেও কোনও রূপে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন, কে বলিতে পারে?

এ পর্য্যন্ত যতটা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহারই সাহায্যে আজ চট্টগ্রাম সাহিত্য জগতে অগ্রগণ্য স্থানাধি-কারে সমর্থ হইয়াছে।

প্রাচীন-বঙ্গ-সাহিত্যে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিই শ্রেষ্ঠ ও পরম মনোজ্ঞ বলিয়া সমাদৃত। চট্টগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম ততটা লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারে নাই বলিয়া, এখানে বৈষ্ণব-কবির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু যত বৈষ্ণব-কবি এখানে ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই চট্টগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট অপেক্ষাও বেশী বলিয়া মনে হয়। চট্টগ্রাম পূর্ব্বে শৈবপ্রধান ছিল, এখন ইহা শাক্ত-প্রধান। এজন্য এখানে বৈষ্ণবগ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থই অধিক পরিদৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীই প্রাচীন কবিগণের একমাত্র অব-লম্বন ছিল। এই কারণে, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রায় সমস্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্যই ধর্ম্ম। প্রাচীন সাহিত্যে এক এক সময়ে এক এক জন দেবতার প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, মনসা ও চণ্ডীর প্রভাবই যে প্রাচীন সাহিত্যে খুব বেশী, তাহা মাননীয় দীনেশবাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতার প্রভাব অল্প বটে, কিন্তু তাঁহাদের মাহাত্ম্য-দ্যোতক গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে নিতান্ত বিরল

নহে। এদেশে অনেকগুলি দেবতার মাহাত্ম্যপ্রকাশক গ্রন্থ বা কবিতা পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, এক সময়ে চট্টগ্রাম ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরে আকণ্ঠপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত দেবতারা মানব-মনে যে সংস্কার-বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন এরূপ প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হইয়াছে যে, তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। কুসংস্কার কি ভক্তির বশে জানি না, হিন্দুগণ মুসলমান আউলিয়া ও দরবেশের এবং মুসলমান-গণ—হিন্দুর দেবতার পূজা করিতেও কুণ্ঠিত বা বিরত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজও চট্টগ্রামে মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ কাত্যায়নীর ব্রত পালন করে; অনেক হিন্দুও সত্যপীর, মাণিকপীর ইত্যাদির সিন্নি দিয়া থাকে। চট্টগ্রাম সহরের বদর আউলিয়া ও সাহ আমানত প্রভৃতি মুসলমান সাধুপুরুষগণ—হিন্দুগণেরও বিশেষ ভক্তি এবং সম্মানের পাত্র। অতি অল্প দিন হইল, মুসল-মান সমাজ হইতে মনসা-পূজা লোপ পাইয়াছে। হিন্দু-সমাজ হইতেও ক্রমে গাজী কালুর সম্মাননা উঠিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের এতটা পরিচয় বঙ্গের আর কোথাও পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। সেকালে শিক্ষার এত প্রসার না থাকিলেও হিন্দু-মুসলমানে বর্ত্তমান কালের মত এমন অহি-নকুল-ভাব বিদ্যমান ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধুনা এই দুই জাতির মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে। এ বিষয়ে উভয় সমাজের শিক্ষিত লোকগণের দৃষ্টিপাত একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উপস্থিত মহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, আমার সংগৃহীত বহুল পুস্তকরাশির সংক্ষিপ্ত বিবরণ "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" এবং সাধন-সঙ্গীত ও পদাবলী প্রভৃতি লেখকদের পদাদি বঙ্গের বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার সংগৃহীত গ্রন্থরাজির মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশযোগ্য গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে "রাধিকার মানভঙ্গ" নামক গ্রন্থখানি মাত্র "সাহিত্য-পরিষৎ" কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আর সবগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় আমার নিকট পড়িয়া রহিয়াছে। আমার আবি-ষ্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে বহুল ঐতিহাসিক কথা নিহিত রহিয়াছে। এস্থলে তৎসমস্তের আলোচনা সম্ভব নহে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে দুইটি মাত্র কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মুসলমান মহাকবি সৈয়দ আলাওল সাহেব আপনার রচিত গ্রন্থসমূহে গৌড়ের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থান তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মাননীয় দীনেশবাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উক্ত ফতেয়াবাদ বর্ত্তমান ফরিদপুরের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম সহরের আটমাইল উত্তরে ফতেয়াবাদ নামক এক বহু প্রাচীন গণ্ডগ্রাম আছে। ঐ গ্রামে "আলাওলের ডিঘী" নামে এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা অদ্যাপি উহার প্রতি-ষ্ঠাতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। অনেকে বলেন, সেই ডিঘী কবি আলাওলেরই প্রতিষ্ঠিত। এই ফতেয়াবাদ যে কোন সুদূর অতীত কালে একটা নগর বা উপনগর ছিল, তাহা ঐ গ্রামের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। "লায়লী মজনু" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যাইতেছে, এই ফতেয়াবাদ তখন চট্টগ্রামের নামান্তর ছিল। যথা—

"নগর ফতেয়াবাদ, দেখিতে পুরএ সাধ,
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।"

আলাওলের সারাটি জীবন যে রোসাঙ্গেই অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কাব্যাদিতে স্বপ্রদত্ত বৃত্তান্ত হইতেই জানা যায়। অনেকেই অবগত আছেন, রোসাঙ্গও এক সময়ে চট্টগ্রামের অন্তর্গত ও নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুর নামক স্থান আলাওলের জন্মস্থান ছিল বলিয়া তৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। আমাদের কথিত ফতেয়াবাদেরও অতি সন্নিকটে জালালপুর নামক এক গ্রাম পাওয়া যাইতেছে। চট্টগ্রাম যখন গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন আলাওল যে চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ-কেই গৌড়ের অন্তর্গত ফতেয়াবাদরূপে পরিচিত করিয়া যান নাই, তাহাই বা কিরূপে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে? সুতরাং এই সব নানা কারণে আমরা কবি আলাওলকে এখন বিদেশীয় লোক বলিয়া অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ হইলে, আমরা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করিব, বাসনা রহিল।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই, অনেকে মাণিকচাঁদ

ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র রাজাকে উত্তর বঙ্গের রাজা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। রঙ্গপুরে ধর্ম্মপালের গড়, মাণিকচাঁদ রাজার গান ও তৎপত্নী ময়নামতীর কোট প্রভৃতি কীর্ত্তি-নিচয়-প্রাপ্তিই তাঁহাদের এরূপ সিদ্ধান্তের মূল। কিন্তু সম্প্রতি আমি যে প্রাচীন "ময়নামতীর পুঁথি" পাইয়াছি; তাহাতে দেখা যায়,মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্র রাজা, ত্রিপুরার অন্তর্গত বর্ত্তমান মেহারকুলেরই রাজা ছিলেন। সে সম্বন্ধে উক্ত পুঁথির নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি দ্রষ্টব্য :—

(গোবিন্দচন্দ্র রাজার উক্তি)

"এহি সব এড়ি জাবে আপনে জানিয়া।
নয়ানগর এড়ি জাবে উনশত বানিয়া॥
বাপের মিরাশ এড়ি জাইনু গৈরব সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি জাবে কামনাক নগর॥
তুমি মাএর জত বাড়ি কালিকা নগর।
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর॥"

(স্থানান্তরে ময়নামতীর উক্তি)

"অত্রেথা হৈল সিদ্ধা ক্ষেতির উপর।
এক নাম রাখি জাবে মেহ্রাকুল সহর॥"

(স্থানান্তরে হাড়িপাসিদ্ধার উক্তি)

"থেণেক রহ বসুমতি থেণেক রহ তুমি।
মেহারকুলের রাজারে পরীক্ষা দেথাই আমি॥"

উপরে উল্লিখিত স্থানগুলির মধ্যে অধিকাংশই ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। "গৈরব" সহর কোথায়, আমি স্থির করিতে পারি নাই। কামলাক বোধ হয়, কমলাঙ্ক শব্দেরই অপভ্রংশ। কমলাঙ্ক যে কুমিল্লারই অপর বিশুদ্ধ নাম, তাহা বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের লালমাই ষ্টেসনের সংলগ্ন লালমাই পাহাড়ে ময়নামতী বলিয়া একটা স্থান আছে। উহা রাণী ময়না-মতীর একটা বাড়ী ছিল বলিয়া বিখ্যাত। উক্ত পাহাড়ে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের একটা বাঙ্গালা আছে। সেখ ফয়জুল্লার কৃত সুপ্রাচীন "গোর্থ (গোরক্ষ), বিজয়" নামক গ্রন্থেও আমরা গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী মেহারকুল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা কথাটা সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিলাম। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ভিন্ন ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে।*

দেশীয় কালী ও দেশীয় কাগজ লিখিত প্রাচীন পুঁথি-গুলি কালের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া, ২০০।৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, ইহা দেখিলে অন্তরে কি ভাবাবেশ হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐ সকল কাগজ পূর্ব্বে এ জেলারই পটীয়া থানার অদূরবর্ত্তী আহ্লাই গ্রামে প্রস্তুত হইত। উক্ত গ্রামের সেখ আমান আলী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সরকার বাহাদুরকে কাগজ যোগাইবার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে "কাগজী মহাল" নামে এক তরফ দেওয়া হইয়াছিল। তখন উক্ত আহ্লাই (প্রকাশ "কাগজী পাড়া") গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের শণ,পাট, ঝাড়িবার শব্দে নাকি রাত্রিতে সুনিদ্রায় ব্যাঘাত হইত। সেই গ্রামবাসীদের সুখ-সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। উহার ব্যবসায় হইতে উক্ত আমান আলী "চৌধুরী"ও বড় লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন। কলের কাগজ প্রচলিত হওয়ার পর হইতে ঐ কাগজ একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রের জন্য ফরমাস-মত এখন ঐরূপ কাগজ অত্যল্প পরিমাণেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর কিছুদিন পরে ইহা স্বপ্নের কাহিনীতে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ কাগজে লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই আজ আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিরাজির উত্তরাধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু সে কি ব্যাপার! রোগীর দেহও ততটা সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করিতে হয় না, প্রাচীন পুঁথির যতটা করিতে হয়। সম্মিলনের পুঁথি প্রদর্শনী বিভাগে আমার এইকথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে।

আমি এ পর্য্যন্ত পুঁথি প্রভৃতিতে ৫৯২ খানি প্রাচীন গ্রন্থ এবং তিনশতের অধিক সঙ্গীত ও পদাবলী প্রভৃতির লেখক কবির সন্ধান করিয়াছি। তুলনায় হিন্দু-কবির সংখ্যা অবশ্য অনেক বেশী, কিন্তু মুসলমান-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার অনুপাতে মুসলমান-কবির সংখ্যাই অধিক বলিতে হইবে।

* এ সম্বন্ধে ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যক "মানসী"তে প্রকাশিত, "ময়না-মতীর পুঁথি" ও ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যক "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত, "গোবিন্দ-চন্দ্র রাজার কথা" শীর্ষক মল্লিখিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য। লেখক

এই সকল পুঁথি ও কবির মধ্যে অন্ততঃপক্ষে তিনভাগের দুই ভাগ কবি আমাদের নিজস্ব বলিয়া আমরা অনায়াসেই দাবি করিতে পারি। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামের এক অঞ্চল হইতেই এ সকল কবি ও কাব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই হিসাবে সমস্ত চট্টগ্রামে কত কবির আবির্ভাব হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যে সকল কবিকে আমরা খাঁটি চট্টগ্রাম-বাসী বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি। সময় ও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু এখানে কোন কবির বা কাব্যের বিস্তৃত বিবরণপ্রদান সম্ভব নহে; বিশেষতঃ এস্থলে তাহার প্রয়োজনও নাই।

হিন্দু কবিগণ

১। শঙ্কর দাস—জাগরণ। কবি পটীয়া থানার অন্তর্গত ছনহরা গ্রামের বিশ্বাস-বংশ-সম্ভূত। প্রকাণ্ড ও সুন্দর গ্রন্থ।

২। মুক্তারাম সেন—সারদা-মঙ্গল নামক চণ্ডী কাব্য। ১৩৬৯ শকাব্দায় রচিত। সুতরাং ইহা বাঙ্গালার আদি চণ্ডী কাব্য। কবি আনোয়ারার প্রসিদ্ধ সেন-বংশ-জাত।

৩। ভক্তরাম দাস—গোকুল মঙ্গল। কবি সম্ভবতঃ আনোয়ারা-বাসী। অতি সুন্দর ও বৃহৎ কাব্য।

৪। ব্রজলাল সেন—চণ্ডীমঙ্গল। সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। কবি পূর্ব্বোক্ত মুক্তারামসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৫। ফকির চাঁদ—সত্যপীরের পাঁচালী। কবি পটীয়া থানার অন্তর্গত সুচিয়া গ্রামবাসী ছিলেন।

৬। দ্বিজ রতিদেব—১। মৃগমুগ্ধ-নামক শিব-মাহাত্ম্য জ্ঞাপক গ্রন্থ। ২। মনসার ধূপাচার। প্রথম খানি প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। কবি পটীয়ার পার্শ্ব-বর্ত্তী আমার স্বগ্রাম সুচক্রদণ্ডী-নিবাসী ছিলেন। মৃগলুব্ধের রচনাকাল এই:—"রস অঙ্ক রবি শশী শাকের সময়। তুলা মাস সপ্ত বিংশ গুরুবাস রয়॥" অর্থাৎ ১২১৬ কি ১২১৯ শকাব্দা।

৭। বলরামদেব—স্বপ্নাধ্যায়। আনোয়ারার নিকটবর্ত্তী নবগ্রাম-(আধুনিক খিলপাড়া) বাসী। পিতার নাম-কমলাপতি।

৮। তারিণীদেবী—১। সুবচনী ব্রত। ২। একটি শাক্ত সঙ্গীত। সুচক্রদণ্ডীনিবাসিনী। ইনি সম্ভবতঃ 'জ্যোতিঃ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের বংশীয়া।

৯। রামজীবন বিদ্যাভূষণ—১। মনসা মঙ্গল। ২। সূর্য্যব্রত পাঁচালী। বাঁশখালীর অন্তর্গত বালীগ্রাম-বাসী। পিতার নাম গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্য। ১৬১১ শকাব্দায় সূর্য্যব্রত পাঁচালী ও ১৬২৫ শকাব্দায় মনসা মঙ্গল বিরচিত।

১০। নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ন—১। কালিকা মঙ্গল নামক বিদ্যাসুন্দর। ২। পূর্ণানন্দ গীতা। প্রথম খানি পলাসী যুদ্ধের বৎসর বিরচিত ও বঙ্গ সাহিত্যে ৫ম বিদ্যাসুন্দর। কবির পিতার নাম দুর্ল্লভ আচার্য্য ও মাতার নাম লক্ষ্মী। সম্ভবতঃ পটীয়ার নিকটবর্ত্তী চক্রশালার লগ্নাচার্য্য-বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন।

১১। নীলকমলদাস—বৌদ্ধ রঞ্জিকা। পালি ভাষার 'থাহুত্তোয়াং' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ধরম বকস্ খাঁ বাহাদুরের মহিষী সুপ্রসিদ্ধা কালিন্দী রাণীর আদেশে রচিত। কবি দক্ষিণ রাউজানের অন্তর্গত কোরে পাড়া নিবাসী ছিলেন।

১২। শ্রীকরনন্দী—মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব্বের বঙ্গানু-বাদ। চট্টগ্রামের সেনাপতি পরাগণ খাঁর পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে রচিত। ইহা এখন 'ছুটিখাঁর মহাভারত' নামে প্রথিত। পটীয়ার অন্তর্গত জঙ্গল খাইন গ্রামের নন্দী-বংশে কবির জন্ম হয়।

১৩। কবীন্দ্র পরমেশ্বর—মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। প্রাগুক্ত পরাগণ খাঁর আদেশে রচিত। এখন ইহা 'পরাগণী মহাভারত' নামে পরিচিত।

১৪। শঙ্করভট্ট
১৫। সদানন্দভট্ট
} —নিমাই সন্ন্যাস। উভয় কবির যুক্ত রচনা। কবিগণ সম্ভবতঃ উত্তর-রাউজানের অন্তর্গত কদলপুর-বাসী। চৈতন্যচরিত সম্বন্ধে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত একমাত্র গ্রন্থ।

১৬। রামতনু আচার্য্য—তারিণী চৌতিশা। ২। দেবীর কালীর আর্য্যা। ৩। উদ্ধব সংবাদ—রাধিকার বারমাস্। ইনি চট্টগ্রামের শুভঙ্কর ও আনোয়ারাবাসী।

১৭। ভৈরবচন্দ্র আউচ—ষড়ানন ব্রত—গুয়া মেলানী পুস্তক। আনোয়ারাবাসী। অদ্যাপি বংশ বিদ্যমান।

১৮। রামলোচন দাস—১। ত্রিপদী চৌতিশা। ২। আত্ম নিবেদনী চৌতিশা। ৩। বৈষ্ণব পদ। পটীয়া থানার অন্তর্গত কাশীয়াইস গ্রামবাসী। শিবচরণ দেওয়ানজীর জামাতা। পিতার নাম রামদুলাল মুন্দার (মজুমদার)।

১৯। কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার—১। শনি চরিত্র। ২। শুকাখ্যান লহরী। ৩। ভদী বিদ্যানিধির সং। ৪। সীতারাম সম্মিলন। ৫। শ্যামা সঙ্গীত। সুচক্রদণ্ডীর স্বনামধন্য কবিরাজ। ইঁহার জীবনকাহিনী অদ্ভুত ঘটনাবলীপূর্ণ। ইনি ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করেন এবং জম্মুরাজের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। চট্টগ্রামের একতম গৌরবস্তম্ভ।

২০। দুর্গাচরণ পাঠক—১। যাত্রার অনেকগুলি পালা। ২। গান। প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের পরিচালক। সুচক্রদণ্ডী-নিবাসী ও প্রাগুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের দীক্ষাগুরু।

২১। দ্বিজ রঘুনাথ—১।–মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী। ২। সত্য নারায়ণের পাঁচালী। ৩। বৈষ্ণব পদাবলী।

২২। দেবীদাস সেন—শ্রীমন্তের চৌতিশা।

২৩। রামকেশবদেব—সহস্রগিরি রাবণ বধ।

২৪। রামশরণসেন—রাধিকার বারমাস। আনোয়ারা গ্রামের প্রসিদ্ধ সেনবংশ-সম্ভূত।

২৫। সীতারাম—প্রহ্লাদ ভক্তের চৌতিশা।

২৬। রতিরামদাস—সারগীতা; ২। চৈতন্যবিষয়ক সঙ্গীত।

২৭। কৃষ্ণরাম দত্ত—রাধিকা মঙ্গল

২৮। নরোত্তম কেরাণী—১। বাত্যাবর্ত্ত বিবরণ। পটীয়ার অন্তর্গত কধুরখীল গ্রামবাসী।

২৯। রণজিৎ রামদাস—লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালী। ১৭২৮ শকাব্দায় রচিত। সম্ভবতঃ পরৈকোড়া-গ্রামবাসী।

৩০। রামরাজা বা রাজারাম
৩১। শ্যামরায়
—মৃগলুব্ধনামক শিব-মাহাত্ম্য জ্ঞাপক গ্রন্থ। উভয়ের যুক্ত রচনা।

৩২। বাণীরাম ধর—শীতবসন্ত পুস্তক।

৩৩। দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ—কৃষ্ণমঙ্গল নামক অতি সুন্দর গ্রন্থ।

৩৪। কালীচরণ ভট্ট—শ্রীরামকাহিনী। সম্ভবতঃ কদলপুরবাসী ভট্ট ব্রাহ্মণ-বংশজাত।

৩৫। তনুরাম ভট্ট কবিরত্ন—বস্ত্রহরণ ঐ।

৩৬। রসিকচন্দ্র দাস—অষ্টমঙ্গলার গুণ-কথন। কবির নিবাস পটীয়া থানার অন্তর্গত পরৈকোড়া গ্রাম।

৩৭। বৃন্দাবন সেন—১। জ্যোতিষ বচন। ২। শ্যামা-সঙ্গীত। সম্ভবতঃ আনোয়ারার সেনবংশ-সম্ভূত।

৩৮। দীনেশ—নামহীন সুন্দর পারমার্থিক তত্ত্বসম্বন্ধে গ্রন্থ।

৩৯। ফকিরচাঁদ দাস—পদ্মলোচন বধ। কবির নিবাস বাঁশখালীর অন্তর্গত সাধনপুর।

৪০। দুর্গারাম নাথ—লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত পাঁচালী। ১১৪৫ মঘী সনে রচিত। পটীয়া থানার অন্তর্গত মাহমাদপুর-নিবাসী।

৪১। মধুসূদন—মনসার পাঁচালী। ইহা একখানি নূতন মনসা পুঁথি।

৪২। জগদীশ গুপ্ত—ভারত সাবিত্রী।

৪৩। বনদুর্ল্লভ—দুর্গাবিজয়।

৪৪। দীনদয়াল—দুর্গাভক্তি চিন্তামণি।

৪৫। মহীধর দাস—একাদশী-মাহাত্ম্য।

৪৬। অভয়াচরণ—কানকো কুমারের ব্রত পাঁচালী।

৪৭। ঈশানচন্দ্র দে—কৃষ্ণলীলা। আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বারশত গ্রামবাসী।

৪৮। উমাচরণ রায় কানুনগো—মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত। গদ্যগ্রন্থ। পরৈকোড়া গ্রাম-নিবাসী।

৪৯। কৃষ্ণদাস ভট্ট—১। হরগৌরীর কোন্দল; ২। শিববন্দনা। সম্ভবতঃ কদলপুর-গ্রামবাসী।

৫০। রামদয়াল দ্বিজ—শনির পাঁচালী।

৫১। রামজয় দাস—১। শশীচন্দ্রের পুঁথি। ২। বৈষ্ণব পদ।

৫২। শ্যামাচরণ থাস্তগির—১। সীতাহরণ যাত্রা। ২। গান। আমাদের সুচক্রদণ্ডী-নিবাসী স্বনামধন্য পুরুষ। সচরাচর "শ্যামাচরণ বাবু" নামে পরিচিত। ইনি প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল তৎকালীন চট্টগ্রাম-সাহিত্যের কর্ণধার ছিলেন। দেশের একতম গৌরবস্তম্ভ।

৫৩। বংশীদাস দাস—বৈষ্ণব পদাবলী।

৫৪। মাধব দাস " "

৫৫। যদুনাথ " "

৫৬। নন্দলাল রায় " "

৫৭। জয়রাম দাস " "

৫৮। হরিহর দাস " "

৫৯। নন্দ দাস " "

৬০। শ্রীধর বানিয়া—১। নীলার বারমাস। ২। যদুনাথ বারমাস ইত্যাদি।

৬১। রামজীবন—সাধন-সঙ্গীত।

৬২। কৃষ্ণরাম দাস " "

৬৩। নসীরাম " "

৬৪। গোবিন্দ রাম " "

৬৫। জয়দেব দাস " "

৬৬। রাজকিশোর " "

৬৭। দ্বিজহরি " "

৬৮। ঈশ্বর " "

৬৯। দ্বিজ দুঃখীরাম " "

৭০। স্বরূপ দাস " "

৭১। রামমোহন " "

৭২। দ্বিজ শ্রীরাম " "

৭৩। রামলোচন " "

৭৪। রামদুলাল— " "

৭৫। লক্ষ্মীকান্ত " "

৭৬। শিবচরণ দাস—বৈষ্ণব পদাবলী।

৭৭। দ্বিজ পার্ব্বতী " "

এই তালিকায় ৭৭ জন হিন্দুকবির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, সুবিধা ও সময় অভাবে এই তালিকা সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতার নাম প্রকাশিত না থাকায় এই তালিকাভুক্ত হইতে পারে নাই। মোটের উপর হিন্দুকবির সংখ্যা আড়াই শতের কম নহে।

মুসলমান কবিগণ

১। আলাওল—১। পদ্মাবতী; ২। ছয়ফল মুল্লুক বদি উজ্জামান; ৩। সেকান্দরনামা; ৪। সপ্তপয়কর; ৫। সতীময়না ও নোরচন্দ্রানী (উত্তর ভাগ); ৬। তউফা; ৭। রাগনামা; ৮। বৈষ্ণব কবিতা।

২। দৌলৎ উজীর—লয়লা-মজনু। প্রায় দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। অতি সুন্দর কাব্য।

৩। দৌলতকাজি—সতীময়না ও নোরচন্দ্রানী (পূর্ব্বভাগ)।

৪। কমরআলী—১। রাধার সংবাদ—ঋতুর বারমাস; ২। বৈষ্ণব পদাবলী—পটীয়া থানার অন্তর্গত করুলডেঙ্গা-নিবাসী।

৫। সেখ জালাল—সখার বারমাস।

৬। মোহাম্মাদ হারিপণ্ডি—১। জৈগুনের বারমাস; ২। মেহের নেগারের বারমাস৭ পটীয়া থানার অন্তর্গত ভিঙ্গরোল-নিবাসী।

৭। মতিউল্লা—রসরঙ্গের বারমাস।

৮। মোহাম্মা খাঁ—১। মুক্তান হোসেন; ২। কেয়ামতনামা; ৩। কাশিমযুদ্ধ। ইনি বহুকালের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। পুঁথিতে ইঁহার বিস্তারিত পরিচয় আছে।

৯। মুজাফর—হানিফার পত্রের উত্তর; ২। ইনান দেশের পুঁথি।

১০। সৈয়দসুলতান—১। জ্ঞানপ্রদীপ; ২। সরে মেয়ারাজ; ৩। জ্ঞান চৌতিশা; ৪। অকাণ্ড রছুল; ৫। হজরত মোহাম্মদ চরিত।

১১। নছরউল্লা খাঁ—জঙ্গনামা।

১২। সাহ বদিউদ্দিন—১। ফাতেমার ছুরতনামা; ২। দরবেশী বা বৈষ্ণব পদ।

১৩। আলিরাজা ওরফে কানুফকির—১। জ্ঞানসাগর; ২। ধ্যানমালা; ৩। সিরাজ কুলুপ; ৪। যোগ কানন্দর; ৫। দরবেশী ও বৈষ্ণব কবিতা। পটীয়ার অন্তর্গত ওসখাইন-গ্রামবাসী।

১৪। নুরমোহাম্মদ—মদনকুমার ও মধুমালার পুঁথি।

১৫। চান্দ—সাহাদুল্লা পীর পুঁথি।

১৬। নছরউল্লা—মুছার ছওয়াল।

১৭। জীবন আলী পণ্ডিত—রাগতালের পুঁথি। পটীয়ার অন্তর্গত খানমোহনা-গ্রামবাসী।

১৮। মোহাম্মদ আকবর—জেবলমুল্লুক সামারোখের পুঁথি।

১৯। [illegible] পাণ্ডত—১। বৈষ্ণব কবিতা; ২। রাগতালের পুঁথি; ৩। সৃষ্টিপত্তন।

২০। কাজি হাসমতআলী চৌধুরী—১। ফগফুর সাহ; ২। আলেপ লায়লা বা আরব্য উপন্যাস।

২১। সরিফ—লালমতী সরফল মুল্লুক।

২২। করিমউল্লা—যামিনী ভান।

২৩। মোতালিব—কিফায়তোল মোছলিন।

২৪। সৈয়দনুরউদ্দিন—১। রাহাতুল কুতুব, ২। দাকায়েৎ।

২৫। সেখ মনসুর—আমির জঙ্গ।

২৬। আরিফ—লালমনের কেচ্ছা।

২৭। মোহাম্মদ রাজা—তমিম গোলাল—চৈতন্য ছিলাল।

২৮। হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুর—সুপ্রসিদ্ধ পারস্য ইতিহাস "তওয়ারিখী হামিদী" প্রণেতা। ১। ক্লীবত্বমোচন; ২। ত্রাণপথ।

২৯। মোজাম্মেল—ছাহাৎনামা।

৩০। বালক ফকির—নামহীন পুঁথি।

৩১। মোহাম্মদ আলী—১। কিফায়তোল মোছল্লিন; ২। মুর্ষিদের বারমাস।

৩২। মোহাম্মদ কাসিম—১। সোলতান জমজমার পুঁথি।

৩৩। মোহাম্মদ সফি—নুরকন্দিল।

৩৪। সেরবাজ—১। মল্লিকার হাজার ছওয়াল; [illegible]ক্রেরনামা।

৩৫। জৈনউদ্দিন—নামহীন পুঁথি।

৩৬। হাসিম পণ্ডিত—১। রাধিকার বারমাস, ২। [illegible]বষ্ণব ও পারমার্থিক কবিতা।

৩৭। সেখ ফয়েজউল্লা—গোর্খ (গোরক্ষ) বিজয়।

৩৮। রফিউদ্দিন—জেবলমুল্লুক সামারোখের পুঁথি।

৩৯। হাজি মোহাম্মদ—নামহীন পুঁথি।

৪০। কবির মোহাম্মদ—রঙ্গমালা।

৪১। সমসের আলী—রেজওয়ান সাহা।

৪২। ফকির হোসেন—আমছেপারার ব্যাখ্যা।

৪৩। কমর আলী (২য়)—নামহীন পুঁথি।

৪৪। বদিউদ্দিন কাজি—চিপ্তইমান।

৪৫। গোলাম মাওলা—সুলতান জমজমার পুঁথি।

৪৬। সমছদ্দিন ছিদ্দিকী—ভাবলাভ।

৪৭। আবদুল হাকিম—১। ইউসুপ জেলেখা; ২। লালমতী ছয়ফল মুলুক।

৪৮। বণিজ মোহাম্মদ—ইমাম সাগর।

৪৯। সের তনু—ফাতেমার ছুরৎনামা।

৫০। দানিস কাজি—১। সৃষ্টিপত্তন; ২। পারমার্থিক সঙ্গীত।

৫১। মোহাম্মদ হানিফ—বৈষ্ণব পদাবলী।

৫২। মীর্জা ফয়েজউল্লা „ „

৫৩। মীর্জা কাঙ্গালী „ „

৫৪। আবাল ফকির „ „

৫৫। পীর মোহাম্মদ „ „

৫৬। সের চাঁদ „ „

৫৭। সৈয়দ আবদুল্লা „ „

৫৮। নসির মোহাম্মদ „ „

৫৯। সৈয়দ আইনুদ্দিন „ „

৬০। নসির উদ্দিন „ „

৬১। মোছনআলী „ „

৬২। বক্‌সাআলী „ „

৬৩। এবাদউল্লা „ „

৬৪। লালবেগ „ „

৬৫। আবদুল মাগী „ „

৬৬। সৈয়দ মর্ত্তুজা „ „

৬৭। সেখ ভিখন „ „

৬৮। সানবেগ „ „

৬৯। কবির „ „

৭০। আকবরসাহ „ „

৭১। সেখ ফতন (পোতন) „ „

৭২। আলিমদ্দিন „ „

৭৩। দুলামিঞা „ „

৭৪। মনোহর (আলী) „ „

৭৫। আফজল „ „

৭৬। সমসের আলী „ „

৭৭। আবদুল ওয়াহেব „ „

৭৮। আমান „ „

৭৯। এর্শাদউল্লা—পারমার্থিক সঙ্গীত।
৮০। সর্ফতউল্লা " "
৮১। আমিরআলী " "
৮২। আলিমিঞা " "
৮৩। দেওয়ান আলীসাহ "
৮৪। আব্বাছ আলী " "
৮৫। সৈয়দ জাফর—শাক্ত সঙ্গীত।
৮৬। আলী আকবর " "
৮৭। মীর্জা হোসেনআলী "
৮৮। আবদুল্ করিম—নুরফরামিস নামা।
৮৯। আবদুল হাকিম—নুরনামা।
৯০। হামিদউল্লা—ভেলোয়াসুন্দরীর পুঁথি।

এই তালিকায় ৯০ জন মুসলমান কবির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত থাকায় এই তালিকাভুক্ত হয় নাই। সুতরাং এই তালিকাও সম্পূর্ণ নহে।

হিন্দু কবির ত কথাই নাই, মুসলমান কবিগণের মধ্যেও প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন অথচ রচিত গ্রন্থাদি আরবী, পারসী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া, এইরূপ নামকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অত্যল্প কবিই স্ব স্ব গ্রন্থে আপনার পরিচয় বা আবির্ভাবকালের সামান্য উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রায় সমস্ত কবিই একশত হইতে তিনশত পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হইবেন। কেবল "মৃগলুব্ধ"-রচয়িতা দ্বিজ রতিদেব ৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া জানা যায়। অবশিষ্ট কবিগণের মধ্যে অবশ্য ২।৪ জন কবি খুব আধুনিকও হইতে পারেন।

আমাদের চট্টগ্রামে হিন্দু কবিগণের মধ্যে যে অনেক উচ্চশ্রেণীর কবি আছেন, এই কথা বলাই বাহুল্য। এস্থলে তাঁহাদের কবিত্ব-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের একান্ত সময়াভাব। সর্ব্বোপরি চট্টগ্রামে মুসলমান লেখকের প্রাধান্যই সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিবে, সন্দেহ নাই। মুসলমান-কবিগণের মধ্যে অমরকবি সৈয়দ আলাওল, দৌলত কাজি, সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খাঁ ও দৌলত উজির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন। হিন্দুকবিগণের মধ্যেও আলাওল ও দৌলতকাজির সমকক্ষ কবি বড় বেশী আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা বঙ্গভাষার গৌরব বর্দ্ধন এবং মুসলমান জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহা চট্টগ্রামের ও মুসলমান সমাজের পক্ষে অবশ্য বিশেষ গৌরবের কথা। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এইখানে অনেক মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের লীলারস-বর্ণনায় লেখনী-চালনা করিয়াছিলেন এবং অনেকে তাহাতে বিশেষ কৃতিত্বও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি কয়েক-জন কবি হিন্দু বৈষ্ণব-কবিদের সহিত সমান আসন পাইবার উপযুক্ত। চট্টগ্রামের মত খাঁটি মুসলমানের দেশে মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। আজ পর্য্যন্ত ৪০ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলী লেখক মুসলমান-কবি এখানে পরিচিত হইয়াছেন।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহাতে চট্টগ্রামে প্রাচীন সাহিত্যের প্রসার সম্বন্ধে সব কথা বলা হইয়াছে, আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, চট্টগ্রামে প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধারের জন্য অদ্যাপি রীতিমত কোন চেষ্টাই হয় নাই। মাদৃশ ক্ষুদ্র লোকের ক্ষীণশক্তিতে যাহা হইয়াছে, তাহাতেই চট্টগ্রাম প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে উচ্চতম আসন পাইবার অধিকারী। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রামের স্থান কোথায় ও প্রভাব কতদূর, তাহার বিচার এরূপ সঙ্কীর্ণ স্থানে হওয়া সম্ভব নহে। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আধুনিককালে আমাদের একমাত্র নবীনচন্দ্রের প্রতিভার ভাস্বর মধুর স্নিগ্ধ আলোকেই সমগ্র পূর্ব্বগগন সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে। একমাত্র নবীনচন্দ্রকে লইয়াই আমরা স্ফীতবক্ষে বঙ্গসাহিত্যের আসরে দণ্ডায়মান হইতে পারি। কিন্তু হায়! আজ আমাদের সেই গৌরব-স্তম্ভ কালের ঝঞ্ঝাবাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! আমাদের সেই গৌরবরবি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হওয়ায় আজ জননী চট্টলভূমি অমানিশার গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আশা আছে, শশাঙ্কের উদয়ে, জীবেন্দ্র প্রমুখ কবিগণের প্রতিভার আলোকে, পুনরায় এক দিন সেই তমিস্রা অপসারিত হইবে এবং আমাদের পরম পূজ্যা জন্মভূমি আবার মেঘমুক্ত তপনের ন্যায় আলোকিত হইয়া উঠিবে!

চিতোর

[শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, B. A.]

কার্ত্তিকমাসের সাড়ে দশটা রাত্রির ডাকগাড়ী ধরিয়া; আমরা আজমীর হইতে চিতোর যাত্রা করি। আরাবল্লী
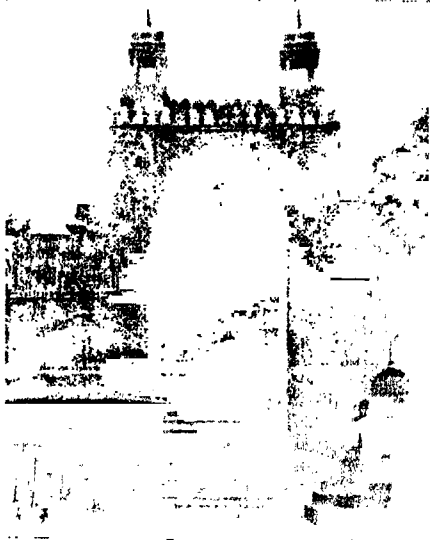
আজমীরের আড়াইদিনকা ঝোপড়া গেট

পর্ব্বতমালার অনুর্ব্বর উপত্যকার মধ্যদেশ দিয়া বাষ্পীয়শকট যতই দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, শীতের প্রাদুর্ভাব ততই অধিক অনুভূত হইতেছিল। আমার বন্ধুর আত্মীয়েরা দিল্লী হইতে এক বৃহৎ বালাপোষ সঙ্গে দিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা নিজের শালের চাদরের উপরে উহা চাপাইয়া লম্ব-শাটপটাবৃত হইয়া, পাশাপাশি বেঞ্চ-দ্বয়ে শয়ন করিয়া, আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলাম। রাজপুত স্বাধীনতার লীলনিকেতন, বহুকালের আকিঞ্চনের ধন চিতোর দর্শন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হইবে, এই চিন্তাও হৃদয়ে প্রবল ছিল, অধিকন্তু 'গুড়ুকে গম্ভীর বুদ্ধি'-নীতির উদ্দাম উপাসক বন্ধুবর ঘন ঘন তামাক সাজার ক্লেশ গ্রাহ্যও করেন নাই; কাজেই অন্তরে বাহিরে গরমের বড় অভাব হইল না। রাজপুতানা-মালব রেলের ক্ষুদ্রতর বাষ্পীয়যান ৮ ঘণ্টায় ১১৬ মাইল অতিক্রম করিল; প্রায় ৬৷৷০ টায় চিতোর ষ্টেসনে গাড়ী পৌছিল। তৎপূর্ব্বেই জ্যোৎস্না ও প্রত্যূষের আলোকে উভয় পার্শ্বের শৈলমালা ও গিরি-কন্দরের প্রাকৃতিক শোভা সর্ব্বত্র নয়নপথে পতিত হইয়া-ছিল। দূর হইতে 'কিষণ গড়' দেখিয়াই ঐ বুঝি চিতোর বলিয়া, একবার উৎফুল্ল ও হইয়াছিলাম; কিন্তু শুনিলাম, চিতোর তখনও অনেক দূরে। প্রাতে চিতোর ষ্টেসন উপনীত হইয়া দেখিলাম, স্থানটি অনুর্ব্বর সমতলক্ষেত্রের মধ্যে। অদূরে সমুন্নত শৈলের উপরে চিতোরের প্রাকার এবং অতীত গৌরবের অঙ্গুলিনির্দ্দেশের মত রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ

আজমীর হ্রদ

দৃষ্ট হইল। আজমীর হইতে নবপরিচিত বাঙ্গালী বন্ধুর নিকট চিতোরের ষ্টেসন-মাষ্টারের নামে এক পত্র লওয়া হইয়াছিল। ষ্টেসন-মাষ্টার সেদিন পীড়িত, সুতরাং আসিষ্টাণ্ট বাবুকেই পত্রখানি দেওয়া গেল। মাণ্ডু অঞ্চলের অধিবাসী সে যুবক অতি ভদ্রলোক; সাধ্যমত ইংরাজীতে বলিলেন, "অল্প সময় থাকিবার জন্য ষ্টেসন-মাষ্টারকে বলিতে হইবে কেন? আপনারা Waiting Roomএ সচ্ছন্দে থাকুন।" বাক্স-বিছানা তথায় রাখিয়া চা-পান চলিতেছে, এমন সময়ে দক্ষিণের ট্রেণে রটলাম্ হইতে এক সাহেবপুঙ্গব

চিতোর—জয়স্তম্ভ
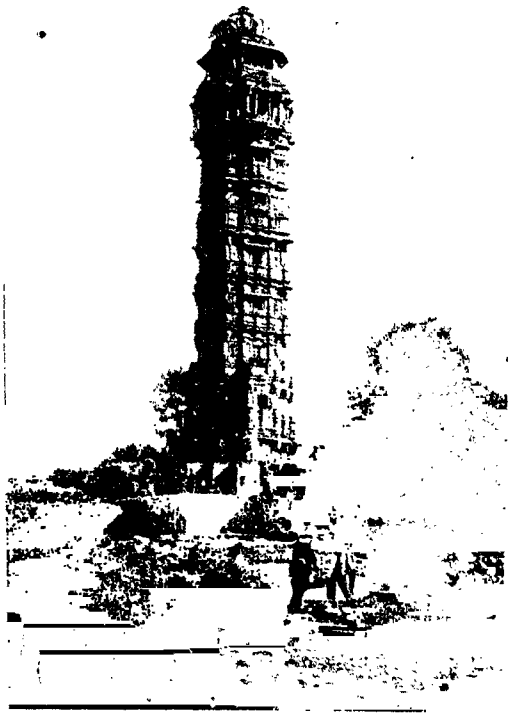
আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি Second Class আমরা Inter. আসিষ্টাণ্ট বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া Ladies Roomএ আসিলে ভাল হয়।" আমি হাসিয়া ইংরাজীতে বলিলাম, "আমরা বাঙ্গালী, চিতোরে আসিয়া লেডি হইবার অধিকার আমাদের যথেষ্ট আছে।" তিনি প্রত্যুত্তরে বাঙ্গালীর বর্ত্তমান পুরুষকারের কাহিনীর অবতারণা করিয়া, বাঙ্গালীই দেশের মুখপাত্র বলিয়া আপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর লেডিজ্ রুমেই দ্রব্যাদি রাখিয়া, ডাকবাঙ্গালা হইতে টোঙ্গা সংগ্রহ করিয়া, চিতোর-গড় অভিমুখে অগ্রসর হওয়া গেল।

বীরত্বের বরণীয় তীর্থক্ষেত্র আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব ভাবিয়া, মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। টোঙ্গায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, রেল লাইন পার হইয়া, পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত পাহাড়ের উপরিভাগে চিতোর-দুর্গ স্পষ্ট দেখিলাম; সে দৃশ্য কত ঐতিহাসিক স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। এই কি বীরপ্রবর বাপ্পারাওর চিতোর! বীর হাম্বির, কুম্ভ ও প্রতাপের লীলাভূমি! টোঙ্গা কিয়ৎক্ষণ থামাইয়া, মোহিত হইয়া, সেই দৃশ্য দেখা গেল। একখানি গণ্ডশৈল যেন চতুর্দ্দিকের ভূমিখণ্ড হইতে সগর্ব্বে মস্তক-উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! অদূরে চিতোরের পাদবাহিনী গিরিনদীগামেরী শরতের শেষে সম্পূর্ণ গাধা হইয়াছেন। (তীর ভূমিতে শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণের গাধার দলও কম চরিতেছে না!) অগ্রসর হইয়া নদীর সুদৃঢ় প্রস্তর সেতুর উপর দিয়া, প্রশস্ত পথ বাহিয়া, চিতোর 'তল্ হাট'-এ উপনীত হইলাম। পর্ব্বতের পশ্চিমের পাদমূলে এই ক্ষুদ্র নগর; এখানে টাউন্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে পাশ লইয়া দুর্গদর্শনে যাইতে হয়। গিরিদুর্গে উঠিবার জন্য একটি ঢালু সুন্দর পথ কখনও ঋজুভাবে কোথাও বা ক্রমোচ্চ ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়াছে। টোঙ্গা ভিন্ন গোযানও চলে;—অবশ্য সময়ে সময়ে থামাইয়া পশুকে বিশ্রাম করাইতে হয়। পথের পার্শ্বে ও পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাকার; সানুদেশ পার্ব্বত্য বৃক্ষ ও আতাগাছে আবৃত। পথমধ্যে স্থানে স্থানে সুরয, গণেশ, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি স্থাপিত এবং এই সকল নামের সাতটি গেট। একটি নূতন দরজার নাম রাখা হইয়াছে, 'কার্জ্জন্ গেট'! উপরে উঠিয়া বামদিকে বর্ত্তমানের ব্যারাক্। দক্ষিণে দক্ষিণাভিমুখ রাস্তার দুইদিকে অর্দ্ধভগ্ন গৃহে নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি লোক বাস করে। আরও দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রাকার ও তোরণ; তৎপরে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ভগ্নদশায় দণ্ডায়মান। বর্ত্তমান মহারাণার পিতা উহার সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। শুনিলাম, মার্ব্বল দিয়া পুরাতনের সহিত মিলান বহুব্যয়সাধ্য বলিয়া, ঐ উদ্যম পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ উদয়পুরে মার্ব্বলের ছড়াছড়ি!

চিতোর-প্রদর্শক নাগোরা জুতা পায়ে বণিক্‌জাতীয় একব্যক্তি এইস্থানে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দেখাইতে লাগিল। প্রাসাদ-অঙ্গন হইতে অনেক দূর দক্ষিণে সতীক্ষেত্রের বাঁধান পুষ্করিণী পর্য্যন্ত এক সুরঙ্গপথ ছিল,—সেই দিক্ দিয়া না কি মহিলারা যাতায়াত করিতেন। রাজপ্রাসাদ হইতে দক্ষিণে অন্দরমহলের উদ্যানের মধ্যে দেবমন্দির প্রভৃতির ভগ্নদশা দেখা গেল; তাহার দক্ষিণভাগে রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ। প্রাসাদের পূর্ব্বদিক্ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যে রাস্তা আছে, তাহাই এখানকার প্রধান শরণি। এই শরণির পশ্চিম পার্শ্বে প্রথমে জয়-মল্লের বাটী ও রাজপরিবারভুক্ত আর দুই এক জনের বাটীর ভগ্নাবশেষ; আরও দক্ষিণে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী মহাকালীর মন্দির দেখিয়া—'মে ভুখা হুঁ' মনে পড়িল। অল্পদূরে নীলকণ্ঠের মন্দির। মহাকালীর মন্দির রাস্তা হইতে অনেক উচ্চে নির্ম্মিত; মন্দিরের ভিতরে ও বারান্দায় পাঠানের অত্যাচারের নিদর্শন স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইল। কালীপ্রতিমা স্থানান্তরিত হওয়ায় রক্ষা হইয়াছিল। প্রতিমার পার্শ্বে এক নবনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু অঙ্গনে বলিদান চলে। আরও কিয়দ্দূর দক্ষিণে গিয়া পথের বামভাগে 'পদ্‌মুনী মহাল' দৃষ্টিগোচর হইল। এই প্রাসাদের যথাসম্ভব সংস্কার করিয়া, উদয়পুরের অতুলনীয় তুষারধবল প্রাসাদের শ্বেতরঙ্গের অনুকরণে চুণ দিয়া সাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। শুনিলাম, সম্ভ্রান্ত পরিদর্শক আসিলে, এই পদ্মিনী মহলেই স্থান পান। পদ্মিনীমহলের দক্ষিণ পার্শ্বসংলগ্ন স্বভাবজ পার্ব্বত্য খাদটির কিয়ংদশ মাত্র জলে পূর্ণ থাকে; কিন্তু তাহার নীলজলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাসাদটি উদয়পুর-যাত্রীর ভবিষ্যৎ বিস্ময় কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই রমনীয় উদয়পুর রঙ্গমহালের উজ্জ্বল ছবি—আর কোথায় এই 'পদ্‌মুনী মহালের' নূতন সংস্করণ! স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের প্রভেদের কথা তুলিলেও ঠিক্ বলা হইবে না। পদ্মিনী মহালই চিতোর-দুর্গের দক্ষিণ পার্শ্বের দ্রষ্টব্যস্থানের শেষ বলিতে হয়। তাহার দক্ষিণে পাহাড় অনেকটা আছে। আকবরের বিজয়ী সেনাদল যে পথে দুর্গপ্রাকার ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাও দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে; কিন্তু বর্ত্তমানে আর সেদিকে দেখিবার কিছু নাই। পদ্মিনী মহালের দিক্ হইয়া,
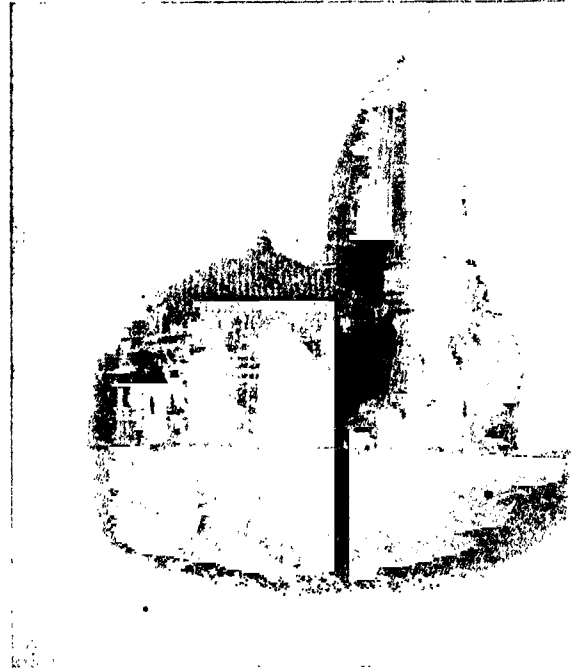
মিরাবাইয়ের মন্দির

ফিরিয়া আবার কালীতলা পার হইয়া, পূর্ব্বাভিমুখী এক বন্ধুর পথে যাইতে লাগিলাম। এই পথের বামপার্শ্বে মীরা বাইএর প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির; অনেকে ইহাকে জৈন-মন্দির বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। ইহার যেটুকু সৌন্দর্য্য এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাই চিত্তবিভ্রম জন্মাইতে পারে।

এখান হইতে আতা গাছের বনের ভিতরের পূর্ব্ব শরণির পদচিহ্নের উপর দিয়া আরও কিছু পূর্ব্বমুখে গিয়া এক প্রাচীন প্রাসাদ ও স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইল। ইহা বীর হাম্বিরের জয়স্তম্ভ; কিন্তু কোন কোন লেখকের মতে খোটান্ রাণীর প্রাসাদ। সম্ভবতঃ খোমান রাজার নাম করিতে ছাপার ভুলে খোটান দাঁড়াইয়াছে! এই প্রাচীন জয়স্তম্ভের বর্ত্তমান অবস্থা পার্থিব গৌরবের ক্ষণিকতার প্রমাণ দিতেছে! এখন ইহার দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তিমাত্র আছে। কখন পড়িয়া যাইবে, এই সন্দেহ হয়! এই জন্যই ইহার সিঁড়ীর প্রবেশ-দ্বারে চাবী দেওয়া আছে। ইতিহাসের অত্যধিক প্রকোপে আমাদের মত কোন যাত্রী যদি উপরে উঠিতে গিয়া ইঁদুর-মারা কলে চাপার মত হন! এখনকার চিতোরে দ্রষ্টব্য পদার্থ এই গুলির অধিক আর নাই। কিন্তু প্রাচীন স্মৃতির উদ্রেক করিতে এই যা কিছু আছে, তাহাই

রাণা কুম্ভের মন্দির
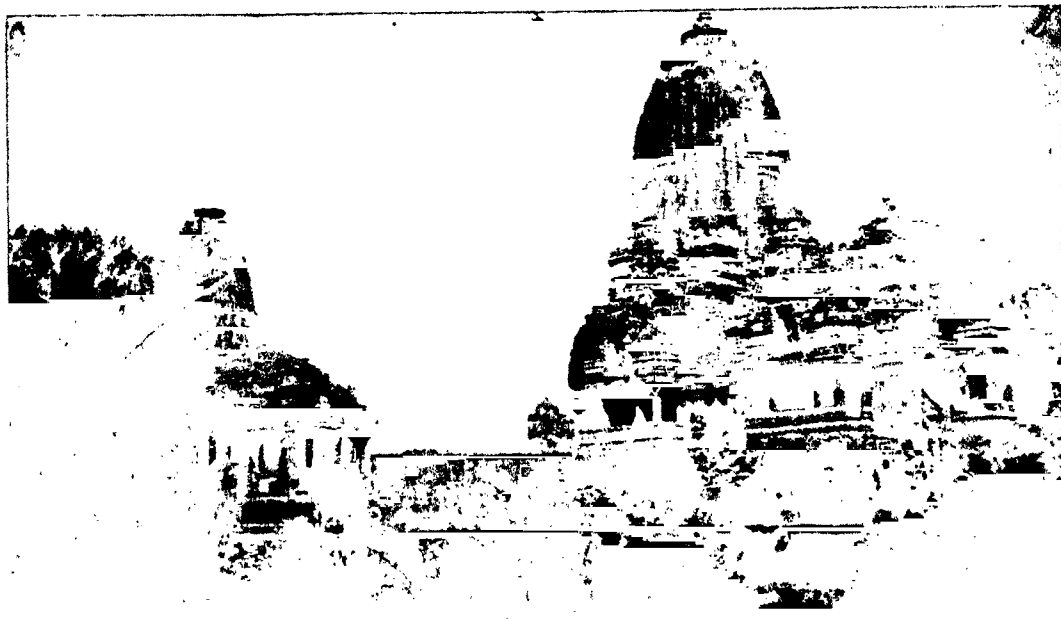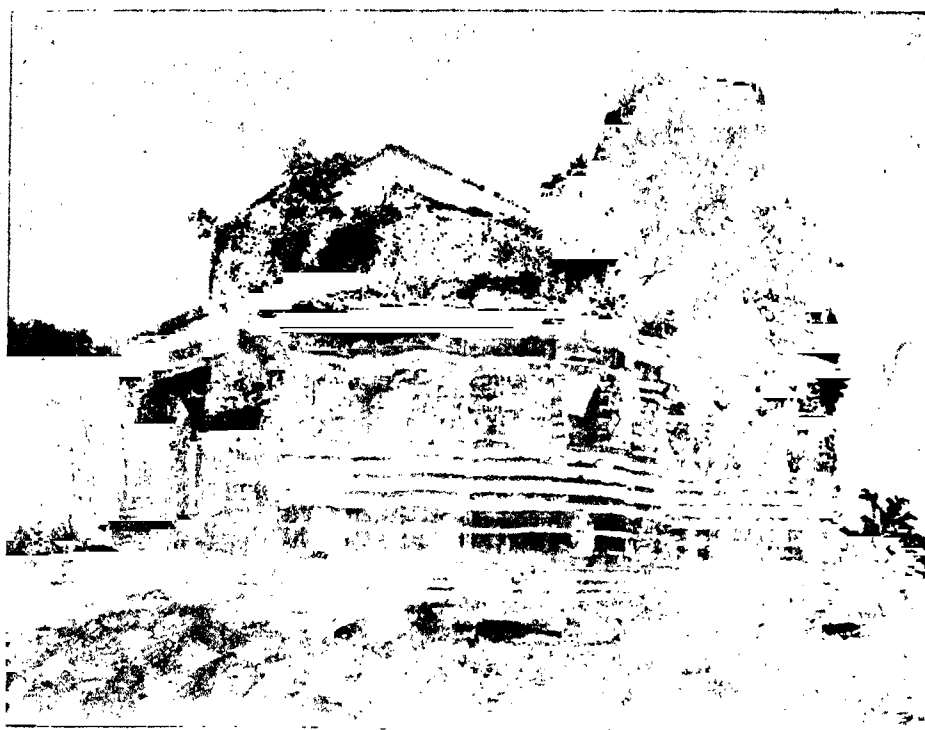
কুম্ভ-মন্দিরের নিকট জৈন মন্দির

যথেষ্ট। আমরা যে দিন পূর্ব্বাহ্ণে চিতোর দেখিয়া আসি, সেইদিনই অপরাহ্ণে এক খ্যাতনামা বাঙ্গালী বন্ধু চিতোর ষ্টেসনে উপনীত হইলেন। 'একবারের রোগী অন্যবারে ওঝা' এই কথায় সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া, আমিই প্রদর্শক হইয়া বিকালে তাঁহাকে চিতোর দেখাইয়া আনিলাম।

সেই বন্ধুর সহিত অপরাহ্ণে পুনরায় বাহির হইলাম। প্রাণ ভরিয়া বারংবার এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াও আশা মিটিল না। ইহার প্রতি ভগ্নস্তূপের প্রত্যেক প্রস্তরের সহিত প্রাণের গৌরব যোদ্ধৃদল যেন সম্মুখ দিয়া বীরসাজে পতাকা উড্ডীন করিয়া চলিয়া গেল।

চিতোরের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না দুঃখে ব্যথিত হইবে! যে চিতোর বীরপ্রবর বাপ্পারাওএর অতুল বীরত্ব, সমরসিংহের সমর-কুশলতা, সংগ্রামসিংহের সিংহত্ব ও প্রতাপসিংহের প্রতাপ-সমন্বিত অপ্রতিম জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের কাহিনী বক্ষে ধারণ করিতেছে—তাহার বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া

উদ্যান চত্বর

যেন এক নূতন টান অনুভূত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে জ্যোৎস্নালোকে ষ্টেসনের প্রান্তবর্ত্তী মুক্ত প্রান্তর হইতে আবার দেখিলাম; চিতোরের ইতিহাসের মনোমোহন উপাখ্যানগুলি যেন দুর্গের নৈশ ছবির সঙ্গে সঙ্গে মানস পটে প্রতিভাত হইতে লাগিল;—অষ্টম হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আটশত বর্ষ ব্যাপিয়া, এই শৈলখণ্ডের পট-মণ্ডপে যে মনোরম দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা যেন ক্রমে ক্রমে মানসপটে উদিত হইয়া আত্মাকে বিভোর করিয়া তুলিল। বায়স্কোপের দৃশ্যের ন্যায় বাপ্পারাও হইতে প্রতাপসিংহ পর্য্যন্ত মিবারশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গে সঙ্গে চিতোর-

না কাঁদিয়া কে থাকিতে পারে? রাজপুত বীরকুলের বীর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি চরিত্র লক্ষ্য করিয়া, মহানুভব কর্ণেল্ টড চমৎকৃত হইয়া, স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের গুণগাথা লিখিয়া বলিয়াছেন—"বীরত্ব ও মহত্ত্বে তেজস্বিতা বা সহিষ্ণুতায় জগতের কোন্ জাতি রাজপুতের সমকক্ষ? তাহারা নির্ভীক এবং দুর্দ্দান্ত কঠোর প্রকৃতি হইয়াও দুঃখ-দুর্দ্দিনে সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ দেখাইয়াছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী নির্ম্মম হৃদয় বর্ব্বর শত্রুদলের পীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়া নানা বিঘ্ন ও বিপদের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ স্বদেশের গৌরব ও স্বজাতির মুখরক্ষা করিয়াছে।"

সমগ্র রাজপুতকুলের মধ্যে মিবারের মহারাণার আসন অতি উচ্চ। নয়শত-বৎসরব্যাপী বিদেশীয় অধিকারের মধ্যে একমাত্র মিবারই স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আক্রমণকারীকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আকবরের রাজনীতি-কৌশলে অন্যান্য প্রধান রাজপুত রাজন্যবর্গ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কুলের অভিমানও বিসর্জন দিয়া, কন্যাদানে মোগলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন; কিন্তু চিতোরের মহারাণা ঐ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তাহাতেই এখনও রাজপুত সমাজে তিনি বরেণ্য। তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বা আর্থিক আয় বর্ত্তমানে অল্প হইলেও তিনিই এখনও সম্মানে শ্রেষ্ঠ। সেই রাণার রঙ্গ-ভূমি চিতোরের সেকালের কথা চর্ব্বিতচর্ব্বণ হইলেও সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তিতে দোষ কি? মহাত্মা টড সাহেব গল্পগুজব ও কাব্য অবলম্বন করিয়া, এই ইতিহাস রচনা করিয়াছেন; কিন্তু কিংবদন্তীর মধ্যেই প্রাচীন ইতিহাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, একথা স্মরণ রাখিতে হয়।

সূর্য্যবংশীয় গিহ্লোট বা গ্রহীলোট্ শাখার জনৈক রাজকুমার কনকসেন, কোশল হইতে সৌরাষ্ট্রে আসিয়া ২০১ সংবতে বীরনগরের প্রতিষ্ঠা করেন। বলিয়া, প্রসিদ্ধি আছে। কালে বল্লভীপুরে এই বংশের রাজধানী হয়। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৈদেশিক আক্রমণে বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইলে, কনকসেনের বংশীয়গণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। কনকসেনের অধস্তন অষ্টম পুরুষে শিলাদিত্য স্বীয় মন্ত্রীর কূট কৌশলে ম্লেচ্ছের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার সসত্ত্বা মহিষী পিতৃগৃহে ছিলেন। ভবানী-মন্দির হইতে পূজা করিয়া ফিরিয়া রাজার নিধন সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াও গর্ভে সন্তান থাকায় তিনি সহমৃতা হইতে পারেন নাই; কিন্তু পিতৃগৃহে গমন না করিয়া, এক পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই গিরি-গুহায় তাঁহার এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। গুহায় জন্ম বলিয়া কুমারের নাম 'গুহ' হইল। সমীপবর্ত্তী গ্রামের কমলাবতী নাম্নী এক দয়াশীলা ব্রাহ্মণীর হস্তে নবকুমারকে সমর্পণ করিয়া, রাণী তনুত্যাগ করিলেন। কমলাবতীর যত্নে দিন দিন নবকুমার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ কতদিন ভস্মাবৃত থাকে? কৈশোরে বালক নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠিল, বিদ্যাশিক্ষায় মন দিল না;

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

মহাকাল মন্দির—জৈন মন্দির

আহারের দ্বার (সম্মুখ)

ভীল-বালকগণের সহিত মিশিয়া, যুদ্ধক্রীড়ায় পশুবধে এবং নানা দুঃসাহসী কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিল। অবশেষে যুবক গুহ ভীলগণের রাজা হইল। গুহ হইতে অষ্টম পুরুষে নাগাদিত্য ভীলগণের হস্তে নিহত হইলেন; তাঁহার বালক পুত্র বাপ্পা পলায়ন করিয়া, কমলাবতীর বংশের ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় লইলেন। তাঁহারাই শেষে রাজবংশের কুল-পুরোহিত হইয়াছিলেন।

বাপ্পারাওএর বাল্যজীবনের ইতিবৃত্ত নানা অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ; বাল্য-লীলা-চ্ছলে ত্রিকুট পর্ব্বততলে নগেন্দ্রনগরের রাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ,—রাজভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিয়া, ভীল-বালক সঙ্গে গহন বনে বাস ও গোধন-চারণ,—ভগবান একলিঙ্গের উপাসক যোগিবরের প্রসাদ—এবং তৎকর্ত্তৃক দেবদত্ত অসিলাভ, একলিঙ্গের দেওয়ান নাম করণ ইত্যাদি কাহিনী এখনও রাজস্থান-পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। বাপ্পা অবশেষে মাতামহবংশীয় মোর-নৃপতি মানের নিকট চিতোর দুর্গে সমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্রমে স্বীয় অসাধারণ বীর্য্যবত্তায় শত্রুদল নির্জ্জিত ও মান ভূপতির মান রক্ষা করিয়া প্রধানতম সামন্তপদে অধিরূঢ় হইলেন। এখন রাজ্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অন্যান্য বিদ্রোহী সামন্তগণের অধিনায়ক হইয়া বাপ্পা শেষে মান-নৃপতিকে নিহত করিয়া, চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বাপ্পার বিজয় বৈজয়ন্তী চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইল। তিনি 'হিন্দু-সূর্য্য,' 'রাজমুকুট' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ এবং সুদীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিবার পরে শতবর্ষ বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ৭৮০ সংবতে তাঁহার রাজ্যারম্ভ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

জৈন-মন্দির

বাপ্পার বংশের বীর-কাহিনীতে রাজবারার ইতিহাস পরিপূর্ণ। কোন্‌টি ত্যাগ করিয়া কোন্‌টির উল্লেখ করিব, এই ভাবিয়া, 'বাঁশ বনে ডোম কাণার' মত হইতে হয়। বাপ্পার বংশধরগণের মধ্যে খোমান্ রাজার নাম প্রসিদ্ধ। তাঁহার নেতৃত্বে রাজপুতেরা কয়েকবার মুসলমান আক্রমণ-কারীদিগকে নির্জ্জিত করে বলিয়া কথিত আছে। 'খোমান্ রাস' নামক মিবারের ইতিবৃত্ত তাঁহার বংশের কীর্ত্তি-গাথা। খোমান্ বংশের পঞ্চদশ জন রাজার পরে সুপ্রসিদ্ধ সমরসিংহ চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ১২০৬ সংবতে তাঁহার জন্ম হয়। দিল্লীপতি তুয়ার অনঙ্গপাল, কনোজের জয়চন্দ্র এবং আজমীরের বীরপ্রবর পৃথ্বীরাজ তাঁহার সামসময়িক। অমর কবি চাঁদভট্টের "পৃথ্বীরাজ রাসৌ" মহাকাব্যে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের কীর্ত্তিগাথা
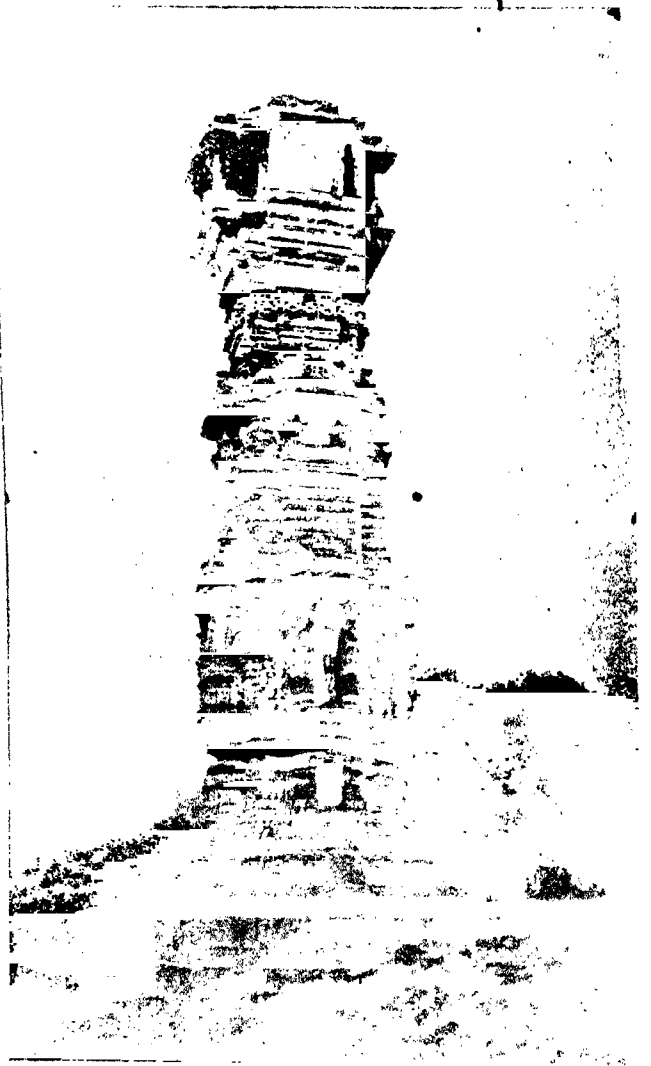
সতী দেওয়াল—জৈন-মন্দির

উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত হইয়াছে। সমরসিংহের সহিত পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথার বিবাহ হয় এবং বীর্য্যবত্তা ও চরিত্রসাম্যে উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য জন্মে। জয়চাঁদ দিল্লীরাজ্য প্রাপ্তির আশায় বিফলমনোরথ হইয়া, দারুণ ঈর্ষায় পৃথ্বীরাজের অবমাননার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অনুকূল রাজন্যবর্গকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। শেষে জয়চাঁদ রাজচক্রবর্ত্তী পদবী অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত কনোজে একটি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পৃথ্বীরাজ বা সমর সিংহ তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব অস্বীকার করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে জয়চাঁদ স্বীয় কন্যা সংযোগিতার (সংযুক্তা) স্বয়ংবর-সভারও আয়োজন করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ উপস্থিত না হওয়ায় অবমাননার নিমিত্ত তাঁহার এক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তি দ্বারবান-স্বরূপে তোরণদ্বারে স্থাপিত হইয়াছিল। সংযুক্তা পূর্ব্ব হইতেই বীরপ্রবর পৃথ্বীর অনুরক্তা ছিলেন, স্বয়ম্বর-সভায় অন্যান্য রাজন্যবর্গকে অতিক্রম করিয়া, তিনি দ্বারস্থিত পৃথ্বীরাজ মূর্ত্তির গলদেশেই বরমাল্য প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরাজ অবিলম্বে সমরসজ্জায় কনোজে গিয়া জয়চন্দ্রকে পরাভূত করিয়া, সংযুক্তাকে আনয়ন করিলেন। কোন কোন মতে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অদূরে ছিলেন,—বরমাল্য-প্রদান মাত্র দ্বারদেশ হইতে সংযুক্তাকে লইয়া প্রস্থান করেন। যাহা হউক, এই অবধি জয়চাঁদের বিদ্বেষানল আরও প্রজ্বলিত হইল। এই গৃহবিচ্ছেদই ভারতের মুসলমান-বিজয়ের প্রধানতম কারণ। জয়চাঁদ না কি গোপনে বিদেশীর সহায়তাও করিয়াছিলেন।

মুসলমান-আক্রমণে দিল্লীরাজের সাহায্যের নিমিত্ত সমরসিংহ বারংবার অভূতপূর্ব্ব সমর-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্যূহরচনায় এবং অশ্বারোহী সৈন্যচালনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। সরস্বতী-তীরে নারায়ণের প্রথম যুদ্ধে সুবিখ্যাত সমরকুশল মহম্মদ ঘোরী বীরপ্রবর পৃথ্বীরাজের নিকট সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া, অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। রাজপুত কবির মতে তিনি এইরূপে বারংবার পরাস্ত হইয়াছিলেন। শেষ যুদ্ধে কাগারতটে তিরৌরীর প্রান্তরে সমরসিংহ এবং সামন্ত রাজার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শাহাবুদ্দীন দুই বর্ষের আয়োজনে বিপুল সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। কথিত আছে, হিন্দুরাজগণ পূর্ব্বপরাভব স্মরণ করাইয়া ঘোরীকে বলিয়া পাঠাইলেন—'এ তোমার বৃথা উদ্যম; মানে মানে প্রাণ লইয়া দেশে পলায়ন কর।' চতুর মহম্মদ উত্তর লিখিলেন—'আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা; তাঁহার আদেশেই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। তাঁহাকে পত্র দিলাম, কিছু সময় চাই।' হিন্দুরা সেই রাত্রি নিশ্চিন্ত রহিল। নিশাশেষে মুসলমানের প্রবল আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। সমরসিংহের সহিত চিতোরের বহুসংখ্যক প্রধান সামন্ত রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রার আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

মহিষী পৃথা ও অন্যান্য অনেক রাজপুতরমণী চিতাগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া আপন আপন পতির অনুগামিনী হইলেন। চিতোর কয়েক বৎসরব্যাপী বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় মলিন হইয়া রহিল। •

দেখিতে দেখিতে এক শতাব্দী অতীত হইল। নবীন উদ্যমে বলীয়ান মুসলমানের প্রতাপে হিন্দুগৌরব অস্তমিত হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে উত্তর ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলি অধিকৃত ও বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু চিতোর পর্য্যন্ত বিজয়ীর রণভেরীর শব্দ পৌঁছায় নাই। চিতোরের রাজবংশ এই সময় হইতে শিশোদিয়া নামে কথিত হইত। খিলজী আলাউদ্দীন্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, রাজপুতরাজ্যগুলি আয়ত্ত করিবার কল্পনা করিলেন। রিন্তাম্বরের (রণস্তম্ভপুর) দুর্গ-অধিকার ও রাজবংশীয় সকল ব্যক্তিকে দুর্গরক্ষক সমেত নির্দ্দয়ভাবে বর্ব্বরের মত নিহত করিয়া, আলাউদ্দীন চিতোরের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন (১৩০১)। কবিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, শান্তস্বভাব লক্ষ্মণসিংহ তখন চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের ললামভূতা পদ্মিনী তাঁহার পত্নী ছিলেন। আজি পর্য্যন্ত রাজবারায় তাঁহার রূপগুণের যশঃ প্রথিত আছে :—

"গড় ত চিতোরগড় আওর সব গড়ৈয়া।
রাণী ত পদ্মাবতী আওর সব গাধৈয়া॥"

পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া, আলাউদ্দীনের হৃদয়ে পদ্মিনী-লাভের প্রবলবাসনা জাগিয়া উঠিল। তিনি সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ ও অবরোধ করিলেন। কয়েকমাসের বহু চেষ্টাতেও বিফলমনোরথ হইয়া, বাদশা প্রচার করিয়া দিলেন যে, পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখিতে পাইলেই, তিনি অবরোধ ত্যাগ করিয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন। যুদ্ধে যথেষ্ট লোকক্ষয় হইতেছে, দুর্গে আহার্য্যের অভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া, ভীমসিংহ মহিষীর

একলিঙ্গের মন্দির

পরামর্শ লইয়াই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সত্যপ্রিয় রাজপুতের হৃদয়ে এ প্রস্তাবে কোন অবিশ্বাসের ভাব উদিত হয় নাই। আলাউদ্দীনকে সমাদরে দুর্গমধ্যে আনিয়া দর্পণে পদ্মিনীর ছায়া দেখান হইল। আলাও শিষ্টাচারে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া নিজ শিবিরের দিকে চলিলেন; ভীমসিংহ দুর্গদ্বার হইতে কিয়দ্দূর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া অতিথির সম্মান রাখিতে গেলেন। এই সময়ে আলাউদ্দীনের নিয়োজিত সশস্ত্র প্রহরিদল হঠাৎ আক্রমণ করিয়া, ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া পাঠান-শিবিরে লইয়া গেল। আলা প্রচার করিয়া দিলেন—পদ্মিনীকে পাইলে ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দিয়া দিল্লী যাত্রা করিবেন।
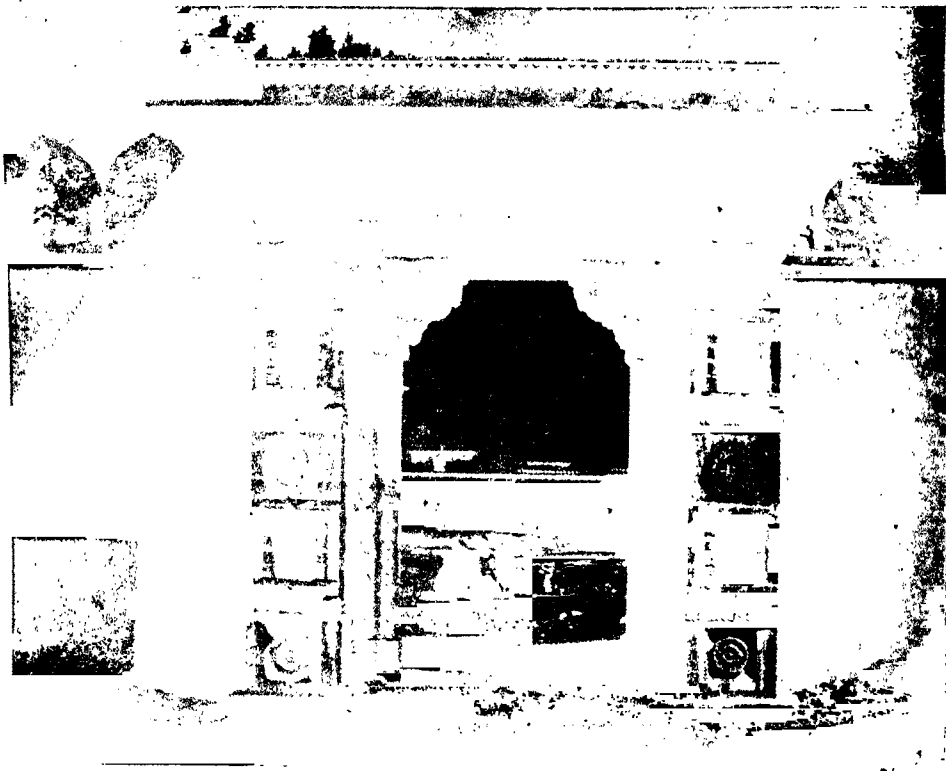
পদ্মিনী মহাল

বিশ্বাসঘাতকের এই প্রস্তাবের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সরলস্বভাব রাজপুতেরও বড় অধিক বিলম্ব হয় নাই। প্রধানবর্গ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণ ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। পদ্মিনী লোকমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রিদলকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রাণাধিক পতির উদ্ধারের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করুন। রাণীর মাতৃকুলের আত্মীয় মহাবীর গোরা ও অন্য কতকগুলি বীরপুরুষ 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতির আশ্রয় লওয়াই স্থির করিলেন। আলাউদ্দীনের নিকট সংবাদ গেল, 'রাণী সহচরীদল সঙ্গে পাঠান-শিবিরে যাইতেছেন, তিনি অবরোধ উঠাইয়া লউন'। রাজপুতের কথায় কেহ কখনও অবিশ্বাস করে নাই—আলাউদ্দীনও করিলেন না; আপনার উদ্দেশ্যের সফলতা অদূরবর্ত্তিনী ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মুসলমান প্রহরীরা দেখিল, পটাবৃত বহুসংখ্যক শিবিকা-রোহণে সঙ্গিনীদলের সহিত পদ্মিনী আসিতেছেন; ভীমসিংহের সহিত অল্পক্ষণ সাক্ষাতের পরেই রাণী বাদশার পটমণ্ডপে আসিবেন, এই কথা ছিল। কয়েক-খানি ডুলী অবরুদ্ধ ভীমসিংহের নিকটে পৌঁছিল। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পরে তাঁহাকে এক শিবিকায় উঠাইয়া দুর্গের দিকে রওনা করা হইল। পাঠানেরা ভাবিল, যে সকল রাজপুত-ললনা পদ্মিনীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদায় লইয়া ফিরিতেছেন। অধিক বিলম্বে আলাউদ্দীনের পক্ষে ধৈর্য্যরক্ষা কঠিন হইয়া উঠিল। এ দিকে শিবিকা হইতে দাড়িগোঁফওয়ালা যোদ্ধৃদল বাহির হইল; বাহকেরাও সশস্ত্র সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। ভীমসিংহের গন্তব্যপথ রক্ষা করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। পাঠান ও রাজপুতে ভীষণ খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীমসিংহ ইত্যবসরে বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, চিতোরে পৌঁছিলেন। রাজপুত-নায়ক গোরা, অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়া পাঠানের উদ্যম ব্যর্থ করিলেন এবং চিতোরের রক্ষার ব্যবস্থা হইল মনে করিয়া, সানন্দে সদলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

আলাউদ্দীন এক্ষেত্রে ব্যর্থমনোরথ হইয়াও সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না, পুনরায় অধিকতর আয়োজন করিয়া দুর্গের

সিঙ্গার কৌড়ী
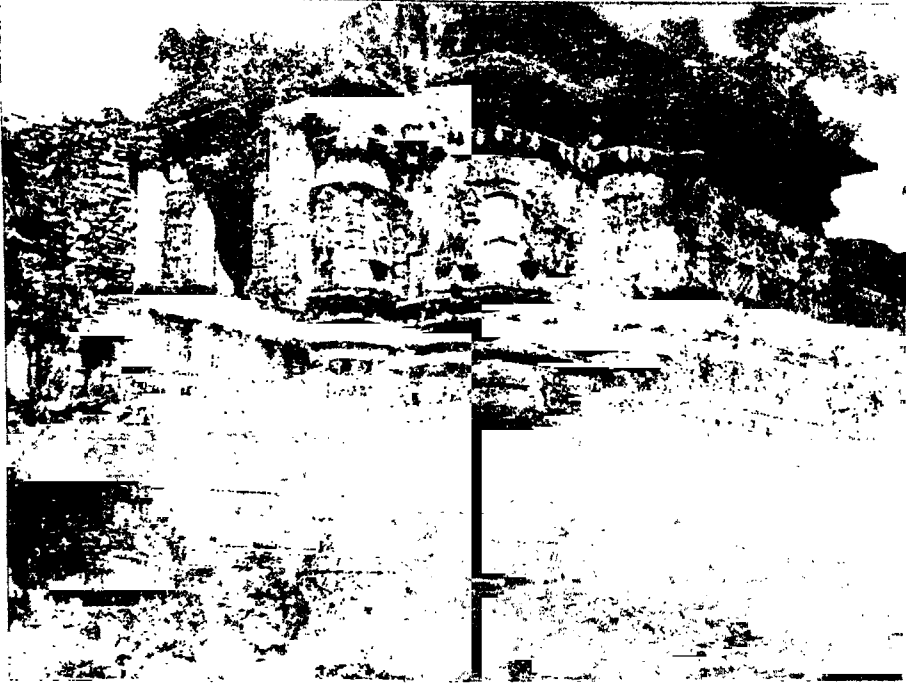
চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন। রাজপুতবীর-দল জন্মভূমির নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিহত করিতে পারিলেন না। চিতোরগড়ের পূর্ব্ব পার্শ্বের প্রাচীরের কিয়দংশ যন্ত্রদ্বারা উড়াইয়া দিয়া, পাঠানেরা সেই ভাগ অধিকার করিয়া বসিল। কবি লিখিয়াছেন, "প্রতিদিন মহাযুদ্ধে লোকক্ষয় হইতেছে; দুর্গরক্ষী প্রধানেরা প্রায় সকলেই নিহত, ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়, এই চিন্তায় ব্যথিত রাণা লক্ষ্মণ 'অর্দ্ধ রাত্রে' স্তিমিত প্রদীপে—'মৈঁ ভুখা

তিনঘার প্রাসাদ—উদয়পুর
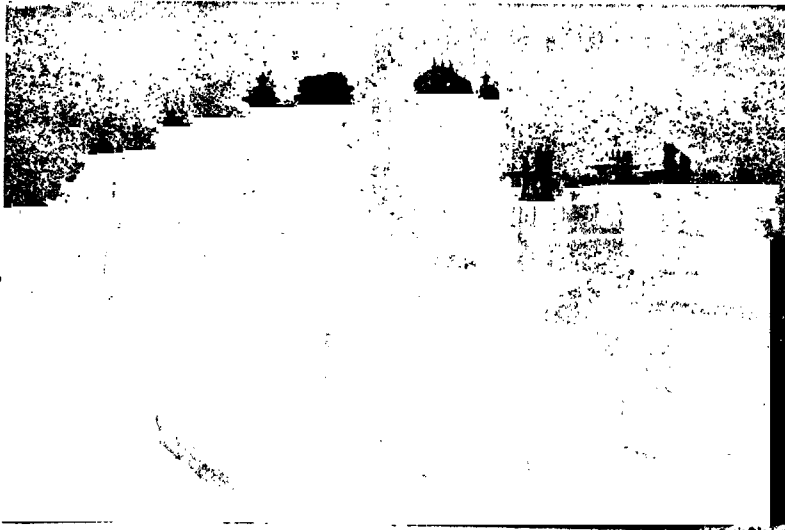
হু’ এই গভীর শব্দ শুনিয়া, স্তম্ভিত ভাবে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন ; দেখিলেন, প্রকোষ্ঠ-স্তম্ভের মধ্যস্থলে এক অপরূপা দেবীমূর্ত্তি—চিতোরাধিষ্ঠাত্রী কালীমাতা ! রাজা বলিলেন, ‘মা আমার বংশের অষ্ট সহস্র বীরপুরুষ তোমার সম্মুখে যুদ্ধে আত্মবলিদান দিয়াছে, ইহাতেও কি তৃপ্ত হও নাই মা !’ ‘রাজমুকুটধারী দ্বাদশ ব্যক্তি প্রাণ উৎসর্গ না করিলে চিতোর রাজ্য-তোমার বংশের হস্তে থাকিবে না,’ বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। কাব্যে বর্ণিত আছে, রাজা পাত্রমিত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রদিগকে সকল কথা বলিলেন। কুমারেরা দেশরক্ষার জন্য রাজপুতকুলে অভ্যস্ত যুদ্ধে জীবনদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রতিদিন এক একজন রাজা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়তম অজয়সিংহকে বৃদ্ধ রাণা কিছুতেই যুদ্ধে যাইতে দিবেন না। শেষে রাজপুরীতে জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান হইল। রাজা স্বয়ং অবশিষ্ট সেনাসহ মহাহবে অবতীর্ণ হইলেন। রাণী পদ্মিনীপ্রমুখ রাজপুতমহিলা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়া, দুরাত্মা পাঠানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।—প্রাচীনগণ প্রাসাদের মধ্যে এখনও একটি গহ্বর দেখাইয়া দেয় ? সুরঙ্গ-পথে তন্মধ্যে বিশাল অগ্নিকুণ্ডের চিহ্ন আছে, এবং এক বৃহৎ অজগর সর্প দ্বার রক্ষা করিতেছে ইত্যাদি কথায় লোকের বিস্ময় ও ভীতি সঞ্চার করে।

এদিকে রাণার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কুমার অজয়সিংহ নিশাযোগে অত্যল্প অনুচর সঙ্গে চিতোর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, কৈলবারার পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। রাণা লক্ষ্মণের সঙ্গে যে সকল রাজপুতবীর পাঠানসেনাতরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধরাশায়ী হইলে পাঠানেরা নগরপ্রবেশ করিল। নগরের রাজপথ ও উন্মুক্ত দ্বার দিয়া রক্তের নদী প্রবাহিত হইল ; চিতোরপুরী এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া পাঠানের পদানত হইল। চিতোরের গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দান্ত পাঠানের হস্তে উহার প্রাচীন শোভাসমৃদ্ধিরও বিনাশ-সাধন হইল।

আলাউদ্দীন সদলে চিতোর-দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া, দেবমন্দির ও মূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসসাধন করিয়া, বর্ব্বরতার একশেষ দেখাইলেন। প্রথম কিছুদিন নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চিতোরের শাসনকর্ত্তা করিলেন, পরে ঝালোরের অধিপতি মল্লদেব পাঠানের অধীনে দুর্গরক্ষকের কার্য্য পাইলেন। আলাউদ্দীন অল্পদিন মধ্যেই রাজপুতানার প্রধান রাজ্যগুলি করতলগত করিয়া দক্ষিণ দেশেও পাঠান-প্রভাব বিস্তার করিলেন।

উদয়পুর প্রাসাদ ও হ্রদ

অজয়সিংহ বা তাঁহার পুত্রেরা চিতোর-উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারেন নাই। কিংবদন্তী আছে যে, অজয়ের দ্বিতীয় পুত্র সুজনসিংহ দুর্জ্জনের মত ব্যবহার করায় পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া, দক্ষিণাপথে গিয়া বাস করেন। তাঁহারই বংশে নাকি মহারাষ্ট্র-কুলতিলক শিবাজীর জন্ম হইয়াছিল। অজয় সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবর হাম্বির, বলে ও কৌশলে প্রনষ্ট পূর্ব্বগৌরবের সহিত পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া, মুসলমানের প্রভাব খর্ব্ব করিলেন। হাম্বির ৬৪ বৎসর রাজ্য করেন বলিয়া কথিত আছে।
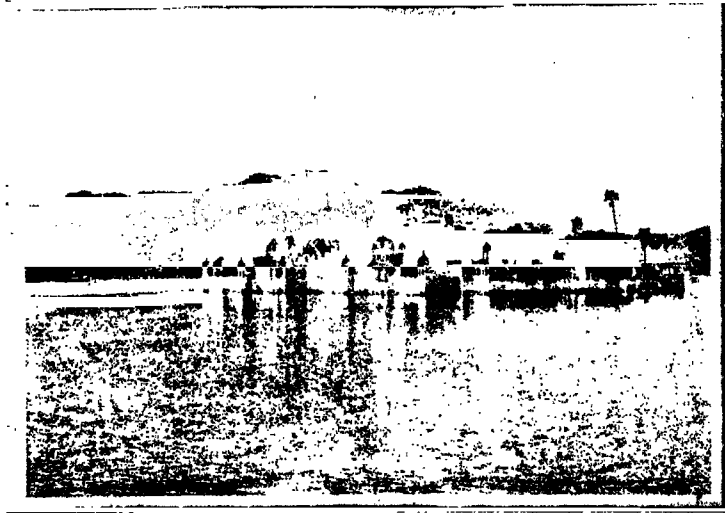
উদয়পুর-প্রাসাদ ও হ্রদ

স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, তিনিই পূর্ব্ব পার্শ্বের প্রাচীন জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া শত্রুদমনের স্মৃতিরক্ষা করেন। রাণা হাম্বিরের পর প্রায় দুই শতাব্দীকাল চিতোরের রাণার-রাজস্থানে স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ রাণা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার সময়ে মালব ও গুজরাটের মুসলমান রাজারা একযোগে চিতোর আক্রমণ করিয়া কুম্ভের হস্তে নির্জ্জিত হন। অতঃপর কুম্ভ তাঁহার সুবিখ্যাত জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। কুম্ভ নাগোর রাজ্য জয় করিয়া তথাকার হনুমানের বিশাল মূর্ত্তি চিতোরে আনিয়া 'হনুমান দ্বার' প্রস্তুত করেন। আবু পর্ব্বতের উপরে কুম্ভের এক দুর্গ ও জয়স্তম্ভ অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মিবার-রক্ষার জন্য কুম্ভ চতুর্দ্দিকে আরও কয়েকটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, কুম্ভ বর্ণচর্য্যায় ও রাজ্যকার্য্যে যেমন কৃতী ছিলেন, কবিত্বশক্তিও তাঁহার তদনুরূপ ছিল। তিনি গীতগোবিন্দের এক পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বিদুষী ও ধর্ম্মপরায়ণা মীরাবাই কুম্ভের পত্নী। মীরাবাই ও কুম্ভ সম্বন্ধে অনেক গল্পগুজব আছে। মীরার রসময়ী কৃষ্ণগীতি ও কবিতা এখনও পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত আছে। বৃন্দাবনে তাঁহার জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত হইয়াছিল। রাণা কুম্ভ শেষ বয়সে পত্নী ও পুত্রের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। কেহ কেহ মীরাবাইএর চরিত্রেও কলঙ্কারোপ করিয়া থাকে। কুম্ভের পরে সংগ্রামসিংহই চিতোরের নষ্টগৌরব সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

আশা

[শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, সাহিত্য-ভূষণ]

শীতের সুতীব্র ঝঞ্ঝা,
পত্রশূন্য করে তরুশির;
বসন্তের প্রতীক্ষায় তবু—
মরে নাক হইয়া অধীর।

তেমতি হে সখা মোর,
বিরহের শত জ্বালা সয়ে,
আছি বেঁচে শুধু তব—
মিলনের আশা-পথ চেয়ে

গুপ্তপল্লীর পণ্ডিতসমাজ *

[শ্রীননীগোপাল মজুমদার]

যে সময় নবদ্বীপধাম সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় বঙ্গদেশে জ্ঞানের শুভ্র-বিজয়কেতন উড়াইয়া ছিল, সে সময় হুগলি জেলার অন্তঃপাতী বিদ্বদ্ভূয়িষ্ঠ গুপ্তপল্লী গ্রামও বঙ্গের পণ্ডিতসমাজে গৌরব-রাজটীকা পরিয়া, নবদ্বীপের সহিত একত্র সারস্বত-পূজায় ব্যাপৃত হইয়াছিল। এই স্থানের বিদ্যাচর্চ্চার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, অনেক উল্লেখ-যোগ্য বিবুধজনের জীবন-কথা আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। আমরা সংক্ষেপে এই সকল সার্থকনামা ব্যক্তিগণের পবিত্র জীবনী ও সাধনার আভাস পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়া গ্রাম কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ এবং সে সকল আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সুনিভৃত ভাণ্ডারে গুপ্তিপাড়া সমাজের অনেক পুরাতন কথা চির-সঞ্চিত রহিয়াছে; কালজীর্ণ কুলগ্রন্থাদিতে ইহার সামাজিক ইতিহাস অনেক পরিমাণে লুক্কায়িত রহিয়াছে। যিনি বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ করিতে উৎসুক ও প্রয়াসী হইবেন, এ সকল কথা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিবে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালাভাষার খাঁটি কবি মুকুন্দরাম তদীয় চণ্ডীগ্রন্থে শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা প্রসঙ্গে গুপ্তিপাড়ার উল্লেখ করিয়াছেন; নুলো-পঞ্চাননের কারিকায় অম্বিকা-সমীপবর্ত্তী, ভাগীরথীতরঙ্গ-নিষেবিত গুপ্ত-পল্লীর উল্লেখ আছে; এতদ্ভিন্ন শীতলামঙ্গল, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রভৃতি সুপ্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থে ইহার নিদর্শন বিরল নহে। নাট্যকার দীনবন্ধুবাবু এইস্থানের কথা তদীয় সুরধুনীকাব্যে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন।

অতীত যুগে গুপ্তিপাড়া সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বর্গগত হাণ্টার সাহেব ইহা তাঁহার গ্রন্থে † স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে গুপ্তিপাড়া এক সময় বঙ্গীয় শাস্ত্রচর্চ্চার কেন্দ্র-ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া ও ত্রিবেণী এই কয়টি স্থান সংস্কৃত-অধ্যাপনার প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া পূর্ব্বে বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজে বিদিত ছিল। ‡ গুপ্তিপাড়ায় এখনও প্রবাদ আছে,—

'গুপ্তিপাড়ার মাটির গুণে।
দেবের ভাষা মানুষ জানে॥'

বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃতচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল হওয়ায় এইস্থান সাধারণের নিকট এক সময়,এমন কি, তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। একজন লুপ্ত গ্রাম্য কবির গান এখনও শুনিতে পাওয়া যায়,—

"সুরধুনী গঙ্গা উত্তরভাগে রয়েছে।
গুপ্তিপাড়া তুল্য কাশী তীর্থ হ'য়েছে॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুপ্তিপাড়ায় অনেক স্বনামধন্য পণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "গুপ্তিপাড়া নিদান-টীকাকার বিজয় রক্ষিতের ও অমরকোষাভিধানের টীকাকার ভরত মল্লিকের জন্মস্থান।" § এতদ্ভিন্ন মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সারস্বতচর্চ্চায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। [গুপ্তিপাড়ার শোভাকরবংশ, চিরঞ্জীববংশ ও শৌনকবংশে বহু বিদ্বৎ-

* ভবানীপুর-সাহিত্যসমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

† Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. —III. Hugli.

‡ Bengal Past and Present.

§ বিশ্বকোষ—'গুপ্তিপাড়া'-শব্দ।

কুল-শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে মত-প্রকাশ করিয়াছেন, "এই শোভাকরকে ভ্রমক্রমে কেহ কেহ দেবীবরের গুরু বলিয়া মনে করেন। এই শোভাকর অবসথী চট্ট সর্ব্বেশ্বরের প্রপৌত্র।" * শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রবাবুর মত আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অবসথী সর্ব্বেশ্বর, গৌড়ে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম দক্ষের বংশসম্ভূত; তাঁহার কাশ্যপ গোত্র। স্বর্গীয় মহাত্মা প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় স্বরচিত রাঘব-পাণ্ডবীয় কাব্যের টীকায় আপনার বংশ-বর্ণনকালে এই সর্ব্বেশ্বরের একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন;—

"আসীদসীমগরিমাস্পদকশ্যপর্ষি—
বংশপ্রশংসিতজনুর্ম্মুতোঽপ্যনূনঃ।
সর্ব্বেশ্বরোঽনবরতক্রতুকর্ম্মনিষ্ঠা-
নির্ব্বর্ত্তিতাবসথিসংজ্ঞতয়া প্রতীতঃ॥"

দেবীবরের গুরু শোভাকরও দক্ষের বংশসম্ভূত। এখন দেখা যাউক, শোভাকরনামে অবসথী সর্ব্বেশ্বরের কোনও প্রপৌত্র বর্ত্তমান ছিলেন কি না। "সম্বন্ধনির্ণয়-গ্রন্থে"র ৪৪৭ পৃষ্ঠায় অবসথী-সর্ব্বেশ্বরের বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে; এই তালিকায় দৃষ্ট হইবে, শোভাকর নামে সর্ব্বেশ্বরের কোনও প্রপৌত্র ছিলেন না; তাঁহার একজন প্রপৌত্রের নাম প্রভাকর। সম্ভবতঃ এই প্রভাকরকে শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় ভ্রমক্রমে শোভাকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গুপ্তিপাড়ার শোভাকর-বংশে মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, বিষ্ণুচন্দ্র, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি, চিরঞ্জীববংশে চিরঞ্জীব ভট্ট, ব্রজদেব তর্কবাগীশ প্রভৃতি এবং শৌনকবংশে রাম-গোপাল বিদ্যাবাগীশ, রাধামোহন তর্কভূষণ, গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গুপ্তিপাড়ার শিরঃশোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

মথুরেশ শ্রীশ্যামাকল্প-লতিকা নামে তন্ত্রবিষয়ক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হন। এই গ্রন্থ ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় রচিত হয়।† অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মথুরেশ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং নানাতীর্থ পর্য্যটনের পর জয়পুরের সন্নিহিত সাবিত্রী পর্ব্বতে সর্ব্বানন্দ নামে একজন পরম সাধুপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মথুরেশ সর্ব্বানন্দের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। কালে বহুসাধনার ফলে ভক্ত ভগবানের চিদানন্দময়ভাবে বিভোর হইলেন; বাসনার সকল বন্ধন একে একে খসিয়া পড়িল, সকল তৃষ্ণা ভগবানের স্বরূপ মধ্যে বিলীন হইয়া গেল—মথুরেশ দ্বাদশবর্ষকাল কঠোর তপস্যা করিয়া চিরাকাঙ্ক্ষ্য সিদ্ধিলাভ করিলেন। এই সময় তিনি বারাণসী-ক্ষেত্রে গমন করেন; তথায় গুরুদেব সর্ব্বা-নন্দের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। সর্ব্বানন্দের আদেশ-ক্রমে মথুরেশ স্বগ্রাম গুপ্তিপাড়ায় আগমন করেন। এই সময় ভক্তির প্রবল-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া তিনি পবিত্র শ্যামাকল্পলতিকাগ্রন্থ রচনা করিলেন। সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীধামে পরমভক্ত মথুরেশের দেহত্যাগ হয়।

মথুরেশের শ্যামাকল্পলতিকা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে ১০০টি শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

"গুণাতীতো দীনঃ পরমপুরুষঃ শক্তিরহিতঃ
কলাযুক্তঃ সচ্চিৎসুখবিভবপূর্ণোঽথ সগুণঃ।
ততঃ শক্তির্নাদস্তদনু পরবিন্দুস্তদনু যা
রবোৎপত্তিঃ সা ত্বং, জননি, জগদিত্থং জনয়সি॥১
স্ফুরচ্চৈতন্যাত্মা সকলজগদাধারকুহরা—
তড়িৎপুঞ্জপ্রায়া পবনবশগোল্লঙ্ঘ্য রসনাম্।
মনোযুক্তা মুক্তাবলিমিব পদালিং বিদধতী
ত্বমম্ব ব্যাপ্নোসি ত্রিভুবনমহো বাঙ্ময়সি॥২"

গ্রন্থমধ্যে কবি আপনার কুলের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন;—

"তপস্যাব্রহ্মণ্যোজ্জ্বলসগুণ-শোভাকরকুলে
বিরাজদ্বিদ্যাবৎপ্রবর মথুরানাথকবিতা।
ভবদ্ভক্তিশ্রদ্ধা-মহিমগুণসূত্রেণ রচিতা
সতাং কণ্ঠে দেবি, স্রগিব তনুতাং মোদমতুলম্॥১০৬"

গ্রন্থের অবসানে আছে;—

"শিবস্য চরণৌ নমন্ শিবশিবেতি সঙ্কীর্ত্তয়ন্
চরাচরমিদং জগৎ শিবশিবাত্মকং ভাবয়ন্।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড—১ম খণ্ড—১১০ পৃষ্ঠা।

† "বেদাঙ্কতিথিশাকেষু তুলাস্থে চণ্ডরোচিষি।
অকারি মথুরেশেন শর্ম্মণা কালিকাস্তুতিঃ॥"
(বেদ+অঙ্ক+তিথি=৪৯৫১=১৫৯৪ শাক।

শিবস্য চরণাম্বুজে সকল ধর্ম্মকর্ম্মাহর্পয়ন্
ব্রজামি শিবতাং সদা নহি শিবাৎ পরং কিঞ্চন ॥ ১০৭
অধীতং বিজ্ঞাতং সুজনকুলমধ্যার্পিতমপি
ব্যতীতং কর্ত্তব্যং যদুচিতমভূৎ কর্ম্মনিখিলম্।
ইদানীং হে মাতস্তব চরণমাত্রস্মৃতিমতা
যদি প্রাণাপায়স্তদিহ মম সার্থং জনুরিদম্ ॥ ১০৮"

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই শ্যামাকল্পলতিকাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সপ্তদশশতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশশতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ মথুরেশ প্রভৃতিকে তন্ত্রশাস্ত্রের পক্ষপাতী দেখিতে পাই। মথুরেশ শ্যামাকল্পলতিকা নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।" * এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে এই নামে আর একখানি পুঁথি আছে; কিন্তু তাহার রচয়িতার নাম মথুরেশ নহে—রামচন্দ্র কবি-চক্রবর্ত্তী। তাঁহার রচিত গ্রন্থও তন্ত্রশাস্ত্রমূলক। কোলব্রুক সাহেবের অমরকোষের ভূমিকায় দেখা যায়, ১৬৬৬খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আমদের মথুরেশের সমকালে আর একজন মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার "সারসুন্দরী" নামে অমরকোষের টীকা রচনা করেন। † কেহ কেহ বলেন, এই মথুরেশ এবং আমাদের আলোচ্য মথুরেশ অভিন্ন কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উক্ত দ্বিতীয় মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ‡ লণ্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়মে মথুরেশ-বিরচিত শ্যামাকল্পলতিকা গ্রন্থের একখণ্ড পুঁথি সংরক্ষিত আছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় শ্রীপতি কবিরত্ন মহাশয় শ্যামাকল্পলতিকার এক সটীক সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হয় নাই, কিছু কিছু বিতরিত হইয়াছিল মাত্র; সুতরাং সাধারণে এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিত মধুর কাব্যের বিষয় অবগত নহেন। কবিবর মথুরেশ অনেক বৈরাগ্যরসাত্মক শ্লোক রচনা করেন। তন্মধ্যে দুইটি মাত্র শ্লোক আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

"নবীনস্ফুরন্নীরদাকারকায়া
যদীশানজায়া সমায়াতি চেতঃ।
অলং যাগযোগপ্রয়াগপ্রয়াণৈঃ
অলং কাশীবাস সন্ন্যাসপুণ্যৈঃ ॥"

অর্থাৎ যখন নবীননীরদের ন্যায় দেবী ভগবতী হৃদয়াকাশে উদিত হন, তখন যাগ-যোগ, প্রয়াগগমন, কাশীবাস, সন্ন্যাসগ্রহণ আবশ্যক হয় না।

"বিষয়ো বিসিনী-দলাম্বুবৎ
বপুরস্থায়ি ন সম্পদঃ স্থিরাঃ।
অনপায়ি গিরীন্দ্রনন্দিনী
চরণারাধনসেবাকেবলম্ ॥"

সন্ন্যাসী মথুরেশের কবিতানিচয়ে সংসারের যাহা অতীত, তাহারই বিম্ব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; তাহা সর্ব্বত্রই মধুর ও গভীর ভাবোদ্দীপক।

কবিবর মথুরেশের সময় গুপ্তিপাড়ায় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভূত অনুশীলন হইয়াছিল। অত্রত্য শোভাকরবংশ বহুপূর্ব্ব হইতেই তন্ত্রের চর্চ্চায় প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একসময় এই বংশীয় পণ্ডিতগণ গুপ্তিপাড়া-সমাজের মুখপাত্র ছিলেন। মথুরেশের সমকালীন আর একজন কবির কথা শুনা যায়। ইঁহার নাম বিষ্ণুচন্দ্র; ইনিও শোভাকরবংশীয়। তিনি কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না; তবে তাঁহার কবিত্বের নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে। তাঁহার রচিত দুইটি কবিতা পাঠকগণের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"গঙ্গাজল-নয়নানল-মিলনান্নৈকত্র কল্যাণম্।
তৎ কিং ধূর্জ্জটি-মূর্দ্ধনি মধ্যস্থা বৈষ্ণবী-লেখা ॥"

—মহাদেবের জটায় গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ, করাল নেত্রে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, উভয়ের মিলন মঙ্গলজনক নহে; তাই বুঝি, চন্দ্রলেখা মধ্যস্থা হইয়াছেন!

"গতেরর্দ্ধং মতেরর্দ্ধং রতেরর্দ্ধার্দ্ধকার্দ্ধকম্।
দ্বৈগুণ্যং কবিচন্দ্রস্য ধনাশাজীবিতাশয়োঃ ॥"

—বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আমার গতিশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির অর্দ্ধাংশ লোপ পাইয়াছে। কামপ্রবৃত্তির ষোড়শভাগের দুইভাগ মাত্র আছে, কেবল ধনাশা ও জীবিতাশা দ্বিগুণ হইয়াছে। বিষ্ণুচন্দ্র আপনার কবিত্বের জন্য 'কবিচন্দ্র' উপাধি প্রাপ্ত হন। গুপ্তিপাড়ায় এখনও প্রবচন শুনিতে পাওয়া যায়, "গুপ্তপল্লীকবির্বিষ্ণুঃ মথুরেশো মহাকবিঃ"।

* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—১ম খণ্ড—৩৩৯ পৃষ্ঠা।

† Colebrooke's Umarakosha.

‡ ইনি নবাব মুর্চ্ছা খাঁর সভায় অবস্থান করিতেন। এইখানেই তাঁহার "সারসুন্দরী" নামে টীকাগ্রন্থ রচিত হয়।

যে শোভাকরবংশ কবি-মথুরেশের জন্মগ্রহণে পবিত্র হইয়াছিল, সেই শোভাকরবংশে কবিবর বাণেশ্বরের জন্ম হয়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন।* এখানে কবিচূড়ামণি ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তিনি কৃষ্ণনগরের রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ চিত্রসেন রায়ের সভায় গমন করেন। * বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে তৎকর্ত্তৃক "জগন্নাথমঙ্গল" নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচিত হয়। ইহার পর নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সভায় বাণেশ্বর অবস্থান করেন। তাঁহার শেষ জীবন শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় অতিবাহিত হইয়াছিল। বহু উদ্ভট শ্লোক কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে বঙ্গের একাদশজন পণ্ডিতের দ্বারা "বিবাদার্ণবসেতু" নামে এক বিপুল স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তৎসঙ্কলিত "সংস্কৃত পুথির পরিচয়ে" এই স্মৃতিগ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র-প্রচারের পর এত বৃহৎ স্মৃতিগ্রন্থ আর সঙ্কলিত হয় নাই। † উক্ত একাদশজন পণ্ডিতের মধ্যে বাণেশ্বর তর্কালঙ্কারেরই প্রথমে উল্লেখ আছে। বিবাদার্ণবসেতু ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় হ্যালহেড সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। ‡ বিগত কার্ত্তিক মাসের 'বিজয়া' পত্রিকায় "কবি বাণেশ্বর"-শীর্ষক প্রবন্ধে এসকল কথা আমরা সম্যক্ আলোচনা করিয়াছি।

* শ্রীবিপিনবিহারী মিত্র-প্রণীত "মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনচরিত।"—ভারতচন্দ্রের সহিত বাণেশ্বরের বিরোধ ছিল বলিয়াই বোধ হয়, অন্নদামঙ্গলের সভাবর্ণনে বাণেশ্বর নামের উল্লেখ নাই।

† H. P. Shastry's notices of Sanskrit Manuscripts.—Vol. I. No. 335

‡ "The first impulse to the study of Sanskrit was given by the practical administrative needs of our Indian possessions. Warren Hastings at that time Governor-General., clearly seeing the advantage of ruling the Hindus as far as possible according to their own laws and customs, caused a number of Brahmans to prepare a digest based on the best ancient Indian legal authorities. An English version of this Sanskrit-compilation, made through the medium of a Persian translation, was published in 1776."—Macdonnel's Sanskrit Literature (London)—P. 2, also P. 438, Bibliographical notes.

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, সেই সময় গুপ্তিপাড়ার শোভাকরবংশীয় কালিদাস সিদ্ধান্ত কৃষ্ণনগরের রাজসভার প্রধান পণ্ডিতের পদে সমাসীন ছিলেন। * কবিবর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' তাঁহার নাম দৃষ্ট হয়। যথা—

"কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ॥"

কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কালিদাস সিদ্ধান্তের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। † উক্ত সময়ে গুপ্তিপাড়ার অনেক পণ্ডিত কৃষ্ণনগরের রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন।

গুপ্তিপাড়ার চিরঞ্জীববংশের মূল পুরুষ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য। তিনি বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়া গুপ্তিপাড়ায় বাস করেন। ঠিক কোন্ সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা বলা যায় না। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে একজন লেখক তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মা 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়া, তাৎকালিক বঙ্গের পণ্ডিতসমাজে বিশেষ পরিচিত হন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, চিরঞ্জীব-শর্ম্মা-প্রণীত উক্ত কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ‡ কলিকাতা রিভিউ পত্রের লেখক বলেন, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী বিরচিত হয়; কিন্তু এই উক্তি কতদূর সত্য বলা যায় না। § গুপ্তিপাড়ার চিরঞ্জীব বংশের বংশলতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্বংশীয় ব্রজদেব তর্কবাগীশ ১১৪৮ সালে, অর্থাৎ ইংরাজি ১৭৪১ সালে

* The Calcutta Review, 1872. p. 103.

† বিশ্বকোষ—'কৃষ্ণচন্দ্র' শব্দ।

‡ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

§ "In 1770, Chiranjib Bhattacharjya of Guptapara composed in Sanskrit, the Vidyanmodtarangini;

বর্দ্ধমানরাজ ।ত্রসেনের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, সুতরাং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের মূল-পুরুষ চিরঞ্জীবের বর্ত্তমান থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। গুপ্তি-পাড়ায় শুনিয়াছি, চিরঞ্জীব শ্যামাকল্পলতিকা-রচয়িতা মথুরেশেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর চিরঞ্জীব-বিরচিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। *

এক্ষণে আমরা গুপ্তিপাড়ার শৌনকবংশের কথা বলিব। ইঁহাদের আদিবাস কোটালিপাড়া গ্রামে; ইঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বংশের রামকৃষ্ণ তর্ক-পঞ্চানন গুপ্তিপাড়ায় আসিয়া বাসস্থাপন করেন। তাঁহার আগমনে প্রচলিত তন্ত্রমত বাধা পাইল, পুনরায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ গ্রামে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিল। ১০৯০ সালে উক্ত বংশীয় শ্রীরামদাস্ বাচস্পতি নবদ্বীপদর্শনে আসিয়া, নৌকাযোগে প্রত্যাগমনকালে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দর্শনমানসে গুপ্তিপাড়ায় অবতরণ করেন। তখন রামানন্দ আশ্রম, গুপ্তিপাড়া-শঙ্করাচার্য্যমঠের মোহন্ত ছিলেন। তাঁহার সাদর-আমন্ত্রণে শ্রীরামদাস গুপ্তিপাড়ায় আবাস স্থাপন করেন। এই বিদ্বদ্ভূয়িষ্ঠ স্থানের তদানীন্তন অধিপতি, রাজা বিশ্বেশ্বর রায় তাঁহার ভদ্রাসন বাটীর জন্য ৩ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন। রামদাসের বংশধরগণ এখনও এই ভূমি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

শৌনকবংশের রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ একজন অসা-ধারণ তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পর, গুপ্তিপাড়ায় এত বড় আগমবিৎ আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ১১৮২ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন তিনি গঙ্গাসলিলে অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময় সাতশৈকা পরগণার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী আকবর খাঁ নৌকাযোগে ঐপথ দিয়া যাইতেছিলেন। যে ঘাটে দাঁড়াইয়া রামগোপাল সন্ধ্যা করিতেছিলেন, আকবর খাঁর নৌকা সেই ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। মাঝিরা ব্রাহ্মণকে সরিয়া যাইতে বলিল, কিন্তু তিনি না সরিয়া, তাহাদিগকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে আর এক ঘাটে নৌকা লাগাইতে সঙ্কেত করিলেন। তাহারা তাহা না শুনিয়া সেই ঘাটের দিকে নৌকা চালাইল কিন্তু অধিকদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না; সহসা মধ্যপথে ব্রাহ্মণের অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে মাঝিরা অবসন্ন ও স্তম্ভিত হইল, হস্ত অবশ ও শিথিল হইয়া পড়িল। আকবর খাঁ রামগোপালের ঈদৃশ অসাধারণ ক্ষমতাদর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া, তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন এবং রাম-গোপালকে ১০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রদান করিলেন। মুসলমানের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যের জন্য সম্পত্তি পাইয়াছেন, ইহা কৌতূহলজনক বটে! এই ভূমির সনন্দ এখনও বর্ত্তমান; পত্রখানি অতিশয় জীর্ণ হইয়াছে, স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়াও গিয়াছে। আমরা যতদূর পড়িতে পারিলাম, পত্রখানি অবিকাল উদ্ধৃত হইল:—

"ইয়াদিকার্য্যামঙ্গলালয়—

শ্রীরামগোপাল বিদ্যাবাগিষ—

সচ্চরিত্রেষু ব্রহ্মোত্তরজমীপত্রমিদং—

সন ১১৮২ এগার শত বিরাসি অব্দে

লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে। আমার অধিকারে পরগণে সাতশৈকা ওগয়রহর মধ্যে তোমাকে ১০/ দষ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দিলাম। জমী * * * পৌত্রাদীক্রমে পরম্পর ভোগদখল করহ। ইতি।

(স্বাক্ষর) আকবর খাঁ।"

শৌনকবংশীয় গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন গুপ্তিপাড়ার শেষ বড় পণ্ডিত। তাঁহার মত নৈয়ায়িক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি ১২২০ সালে গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। নৈয়ায়িক-চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশধর বিখ্যাত ন্যায়বেত্তা রামদাস বাচস্পতির নিকট গঙ্গাধর প্রাচীন ও নব্য ন্যায় অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে, একদা গঙ্গাধর পূর্ব্ববঙ্গে কোনও নিমন্ত্রণোপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমদিন সভায় তাঁহার নিকট যে পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছিল, তিনি তাহার উত্তর দিতে অক্ষম হন। পরদিবস তিনি বিষণ্ণমনে স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কাক-মুখভ্রষ্ট দুইখানি পুরাতন পুঁথির পত্র তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল। তাহা পড়িয়া তিনি সভাস্থলে যাইয়া পূর্ব্বপক্ষের সদুত্তর প্রদান করেন এবং পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক জয়মাল্যে

it treats of Hindu Philosophy, and is in high repute among the natives."—The Calcutta Review, 1846. On the Bank of the Bhagirathi.

* Ibid.

বিভূষিত হন। গঙ্গাধর বিগত ১২৯৫ সালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে এক্ষণে তিনজন বর্ত্তমান আছেন। নৈয়ায়িক গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, স্মার্ত্ত রামধন বিদ্যালঙ্কার ও ক্ষুদিরাম ন্যায়ভূষণ এবং অশেষ শাস্ত্রাধ্যায়ী নীলকমল বিদ্যাসাগর—এই কয়জনের মৃত্যুর পর গুপ্তিপাড়ায় এতদিনের প্রজ্জ্বলিত স্তিমিত জ্ঞান-প্রদীপ সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল। অতীতযুগে গুপ্তিপাড়ায় শত শত বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ইহাকে সারদার লীলানিকেতন করিয়া তুলে। শত শত অধ্যাপক বহুবর্ষ ধরিয়া কায়মনোবাক্যে বীণাপাণির অর্চ্চনায় পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিয়ত-শাস্ত্রচর্চ্চা এবং সুপবিত্র জীবন প্রকৃত হিন্দুর পবিত্র আদর্শকে সমুন্নত রাখিয়াছিল। এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবার পরমুহূর্ত্তেই, সংহারক ব্যাধির ভীষণ প্রকোপে গুপ্তপল্লীর কীর্ত্তিসৌধ খসিয়া পড়িয়াছে।

এখন হইতে একশত বৎসর পূর্ব্বেও গুপ্তিপাড়ায় বীণাপাণির লীলাকুঞ্জ ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। বাঙ্গালা ১২০৯ সালে গুপ্তিপাড়ায় রামধন ন্যায়রত্ন, রামপ্রসাদ চূড়ামণি, রামকিশোর তর্কপঞ্চানন, কালীকিশোর বিদ্যাবাচস্পতি, রঘুনাথ সিদ্ধান্ত, রামলোচন ন্যায়ালঙ্কার, রামজয় তর্কভূষণ, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, শ্যামসুন্দর তর্কালঙ্কার প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিত জীবিত থাকিয়া সনাতন বিদ্যার চর্চ্চা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, এই স্থানে একশত বিশজন অধ্যাপকের টোল ছিল। * এই সকল টোলে সংস্কৃত অধ্যয়নের নিমিত্ত ঢাকা, ফরিদপুর, কোটালিপাড়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ছাত্রগণ গুপ্তিপাড়ায় আগমন করিত। এখন আর সে সকল টোল নাই—আছে তাহাদের ধ্বংসাবশেষ-মাত্র; তাহা দেখিলে অতীতের রঙ্গভূমির শাস্ত্রচর্চ্চার একখানি মধুর চিত্র নয়ন-পথে উদিত হয়! হায়, বঙ্গদেশের প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার, প্রকৃত বিদ্যাচর্চ্চার দিন চলিয়া গিয়াছে—প্রকৃত সুখের দিন পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্তাল তরঙ্গে দূরে ভাসিয়া গিয়াছে—এখন যাহা আছে, তাহা গৌরবরবির অবসান-রেখার ন্যায়—তাহা দূর অতীতের স্মৃতিমন্দিরের ভগ্নাবশেষমাত্র!

* ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও গুপ্তিপাড়ায় সংস্কৃত চর্চ্চা অব্যাহত ছিল। তখনও এই স্থানে পনেরখানি টোল বর্ত্তমান ছিল এবং বহুসংখ্যক ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন।—The Calcutta Review—Vol. VI.

ভক্তের মহিমা

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

ভক্ত ভিন্ন দেবতারে তবে রক্ষা করিবে কে?
বিনা দধীচির বুকের অস্থি স্বরগ শ্মশান যে।
ভক্তের কাছে লভি' পরাজয়,
ধন্য হইল দেবতা-হৃদয়,
ভক্তের পদচিহ্ন বক্ষে ভগবান বয় রে।
ভক্ত নহিলে বুকে ধরি' তা'য় মানুষ করিবে কে?
ভক্তের চিত্ত-তরণী বাহিয়া দেশে দেশে দেব চলে,
সে তরী ডুবিলে ডুবিবে দেবতা গভীর অতল জলে;
ভক্ত নহিলে কেবা বলো আর,
নিতি নিতি নানা স'বে আবদার?
কে হবে তাহার জনক-জননী-সখা-সখী ধরাতলে
মনের মতন কে সাজা'বে তায় চন্দন-ফুল-দলে?
ভক্ত ভিন্ন চিরদিন রাম বনে কেঁদে হ'ত সারা!
বিদুর ভিন্ন হায় দেবতার কে মোচিবে বল কারা?

ভক্তমানস-মন্দির মাঝে
দেবতা সে যে গো চিরদিন রাজে,
মন্দির বিনা হ'বে যে দেবতা একেবারে গৃহহারা—
হিয়ার পিয়াসা কে মিটাবে তা'র ভক্তির সুধা ছাড়া?
ভক্ত ভিন্ন কে দেখা'বে পথ দুর্গম কান্তারে?
ভক্ত ভিন্ন সর্ব্বগ্রাসী সে ভিক্ষা কে দিতে পারে?
ভক্তে ছাড়িলে নাহি ভগবান,
কেবা রাখে প্রাণ-কেবা রাখে মান!
ভক্তের পদ নিজে ভগবান ধোয়াইল জলধারে,
ভক্তের রথে সারথি তাইতে দুয়ারী ভক্ত দ্বারে!
ভক্তের চেয়ে দেবতা যে বড় সন্দেহ নাই তায়,
কা'র কাঁধে ভর দিয়া সে বাঁচিবে ভক্ত ভিন্ন হায়!
ভক্তের জয়—ভক্তির জয়
গীতি নিতি তাই এ নিখিলময়,
দেবতা বন্দী ভক্তের দ্বারে নিষ্কৃতি নাহি পায়,
দেবতা কাতরে ছল ছল আঁখি ভক্তের কৃপা চায়।

সাগর-সঙ্গমে

[শ্রীজলধর সেন]

এবার একটা প্রায় তাজা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি; সুতরাং এবার আর সে মামুলী নাকেকাঁদুনী—বহুদিনের কথা,—মনে নাই—সে দিন নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি বলিবার আর উপায় নাই। তবে নাকেকাঁদুনী না থাকিলেও একটা কথা বলিবার আছে; তাহা এই যে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবার শক্তিসামর্থ্য যে সামান্য—অতি সামান্য, যে একটুকু ছিল, তাহা আর এখন নাই;—এখন দশটা কথা একসঙ্গে যোড়া দিয়া বলিতে গেলে যোড়া মিলে না, কেমন খাপছাড়া হইয়া যায়; যাহা বলিবার ইচ্ছা করি, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না;—নিজের দুর্ব্বলতায়, নিজের অক্ষমতায় অধীর হইয়া পড়ি। তবুও যে লিখিতে বসি, সেটা অভ্যাস-দোষ। বহুদিনের বদ্ অভ্যাস,—এ বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার বেশ মনে পড়ে, জুবেয়ার সাহেব কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে মেলা করেন, আমি সেই মেলা দেখিতে আসিয়াছিলাম। মেলা হইতে ফিরিয়া দেশে যাওয়ার পর সেই মেলার বিবরণ লিখিবার জন্য আমার ইচ্ছা হয়। আমি সেই মেলার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রথম অংশ লিখিয়া, আমার সাহিত্য-গুরু কাঙ্গাল হরিনাথের নিকট প্রেরণ করি। তিনি তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন; এবং আমার লিখিত বিষয়ের কোন কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া, তাঁহার সম্পাদিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায়' সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত করেন এবং আমাকে লেখেন যে, তিনি আমার ভাষার প্রশংসা করিতে পারেন না, কিন্তু আমার বলিবার ভঙ্গীর প্রশংসা করেন। সেই যে তিনি সেই বহুকাল পূর্ব্বে আমাকে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহারই বলে আমি পরজীবনে কয়েকটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়াছি এবং এখনও সেই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিয়া, যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিতে দ্বিধাবোধ করি না। যৌবনের প্রারম্ভকালের সেই 'বাহোবা'ই আমার কাল হইয়াছিল, নতুবা পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলিতে পারিতাম—

'হ'লেও হতে পার্ত্তেম আমি মস্ত একটা কবি'—

নিদেন একটা ঐতিহাসিক! যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি! আর কিছুই যখন জানি না, কিছুই যখন পারি না, তখন বিনা বিদ্যায়, বিনা পাণ্ডিত্যে, বিনা গবেষণায় যাহা হয়, সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অর্থাৎ পাঁপরভাজাই লিখি।

আমি এবার গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গিয়াছিলাম—এইবারই, এই পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে সশরীরে গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। এবার আর "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ" নহে—এবার একেবারে সাগরসঙ্গমে—এবার "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজীনীলা"য় গিয়াছিলাম। সুতরাং এবার আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার হক্ জন্মিয়াছে। আর গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন নাই, আমি কথা আরম্ভ করি।

আমার একজন আত্মীয় আছেন; তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যতই মধুর হউক না কেন, তিনি সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে না পারিলেও সেই সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে কেমনই যেন একটু লজ্জা-অনুভব করেন; অপরের সহিত সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলে ত একেবারে ডিফামেশন (defamation)! সেই আত্মীয়প্রবর প্রতি বৎসরই গঙ্গাসাগরের জঙ্গল পরিষ্কার, বাসকুটীর নির্ম্মাণ, পানীয়জল সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যের কণ্ট্র্যাক্ট গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবার আবার তিনি তদতিরিক্তও কিছুর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গা-সাগরে যে সকল যাত্রী গমন করিয়া থাকে, তাহারা বিনা দক্ষিণায় গঙ্গাস্নানের অধিকারী হয় না, সাধুসন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যান্য সকল যাত্রীকেই দুই আনা হিসাবে প্রণামী বা দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। যাহারা দোকান লইয়া যায়, তাহাদিগকেও বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হিসাবে খাজনা দিতে হয়; আবার নৌকার দাঁড়ি মাঝিদিগকেও প্রণামী দিতে হয় এবং তাহাদের প্রণামীর হার আটটি পয়সা নহে;—মাঝি-মহাশয়ের মূল্য দশ আনা এবং প্রত্যেক

দাঁড়ির মূল্য আট আনা। দাঁড়ি-মাঝিতেই বোধ হয় পোষাইয়া যায় ; তাই অচেতন নৌকাখানির জন্য আর স্বতন্ত্র কিছু দিতে হয় না। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর এই গঙ্গা-সাগর-মেলা উপলক্ষে যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, উপরি উক্ত প্রণামী বা দক্ষিণার দ্বারা তাহার কিয়দংশ ওয়াসিল করিয়া লন। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই পাওনা আদায় করিবার জন্য কণ্ট্রাক্‌ট দেওয়া হয়। আমার আত্মীয় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে একবার এই ট্যাক্‌স আদায়ের কণ্ট্রাক্‌ট লইয়া বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ লোকসান দিয়াছিলেন। তাহার পর এ কয় বৎসর আর তিনি যাত্রীর ট্যাক্‌স আদায়ের কণ্ট্রাক্‌ট্ গ্রহণ করেন নাই। এ বৎসর তিনি এই কণ্ট্রাক্‌ট গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট যখন এই সুসংবাদ শ্রবণ করিলাম, তখন তাঁহার বুদ্ধিবিবেচনা ও বর্ত্তমান সময়ের অভিজ্ঞতার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই দুর্ব্বৎসরে লোকের কষ্ট, ব্যবসায়বাণিজ্য বন্ধ, পাট-বিক্রয় বন্ধ হওয়ায় বাঙ্গালা দেশে হাহাকার উপস্থিত, যুদ্ধের জন্য সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে, মারোয়াড়ী ও হিন্দুস্থানীরা অনেকে দেশে চলিয়া গিয়াছে, জর্ম্মণীর 'এমডেন' জাহাজের ভয় এখনও অশিক্ষিত সাধারণ লোকের চিত্ত হইতে দূরীভূত হয় নাই ; এ সময়ে—এই দুর্ব্বৎসরে—গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়াসী যে অতি কম লোকেই হইবে, এই কথা—এই সোজা কথাটা সুশিক্ষিত আত্মীয়প্রবর কেন যে ভাবিলেন না, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। হয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, হাজার-দশহাজার টাকা লাভ না হইলেও একেবারে যে ষোল আনাই হইবে না, তাহা নহে। তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ে সজ্ঞান করিতে যাইয়া, আমি বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম—মুরুব্বিয়ানার ফল আমাকে যথারীতি ভোগ করিতে হইল। তিনি আমাকে একেবারে চাপিয়া ধরিলেন যে, এবারে আমাকে গঙ্গাসাগরে যাইতে হইবে এবং তাঁহার এই ট্যাক্‌স-আদায়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আজ কুড়ি বাইশ বৎসরের অভিজ্ঞতা তিনি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। যে ব্যক্তি অনেক সময় নিজের পরিধেয় বস্ত্রের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা রক্ষা করিতে পারে না, তিনি কি না ঐ প্রকার একটা বৃহৎ ব্যাপারের ম্যানেজারী করিবেন ! আমি আমার অযোগ্যতা, অক্ষমতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াও যখন তাঁহার নিকট হইতে অব্যাহতি-লাভ করিতে পারিলাম না, তখন আমার এখানকার কাজকর্ম্মের অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করিলাম এবং তিনি যে দিন আমাকে যাইতে বলিতেছেন, সে দিন আমার কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না, তাহাও বলিলাম। বন্ধুবর তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। আমি যে দিন যাইতে পারি বলিলাম, সেই দিনেই আমার গমনের ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতএব বুঝিলাম, এবার ব্যাগারের খাতিরে গঙ্গাস্নান আমার অদৃষ্টলিপি। তাহার খণ্ডন করা বিধাতারও সাধ্যাতীত। আমি গঙ্গাসাগরে যাওয়াই স্থির করিলাম।

আত্মীয়প্রবর বলিলেন যে, তিনি অন্যান্য লোকজন, কুলীমজুর, পানীয় জলের নৌকা ইত্যাদি লইয়া বহু পূর্ব্বেই যাত্রা করিবেন ; যাঁহারা পরে যাইবেন, তাঁহাদের জন্যও ডায়মণ্ডহারবারে নৌকার ব্যবস্থা ঠিক রাখিবেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আমি যে দিন যাইব, সে দিন তাঁহার দলের একটি লোকও আমার সঙ্গী হইতে পারিবেন না—তাঁহার বিপুল রেজিমেণ্টের আমিই সর্ব্বশেষ সৈনিক। আমাকে যখন এত বিলম্বে যাইতে হইবে, তখন আমার জন্য বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন। আত্মীয়বর বলিলেন, আমাকে তাহা হইলে কিলবরণ কোম্পানীর ষ্টীমারে যাইতে হইবে ; কারণ, কিলবরণ কোম্পানীর ষ্টীমার বাহির-সমুদ্র দিয়া গঙ্গাসাগরে গমন করিয়া থাকে। সেই জন্য তাহারা সর্ব্বশেষে কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। তাঁহার এ প্রস্তাব আমি একেবারে না-মঞ্জুর করিয়া দিলাম। আমি বলিলাম—"ভাই, ষ্টীমারে যাইতে আমি মোটেই রাজী নই। কয়লাঘাটে ষ্টীমারে উঠিলাম, ঘণ্টাদশ বার বসিয়া ঢেউ গণিলাম ; তাহার পর গঙ্গাসাগরে নামাইয়া দিল। এমন ভ্রমণ আমি করি না।" আত্মীয় মহাশয় বলিলেন—"তাহা হইলে আপনাকে বাহির-সমুদ্র দিয়া ছোটে (এক রকম নৌকা) যাইতে হইবে। তাহাতে সম্মত আছেন ?" আমি বলিলাম—"বন্ধু, আপনি কি ভুলিয়া গেলেন যে, জীবনের প্রথম সময় আমার পদ্মার তীরে কাটিয়াছে। আমি নৌকায় চড়িতেও ভয় পাই না, সমুদ্র দেখিয়াও ডরাই না।" তিনি বলিলেন—"তাহা হইলে আপনার জন্য ডায়মণ্ডহারবারে একখানি 'ছোট' থাকিবে, আপনি যদি ভয় না পান, তাহা হইলে মাঝিরা আপনাকে এক

ভাটার সাগরে পৌঁছাইয়া দিবে।” আমি বলিলাম—তথাস্তু।

আত্মীয়বর যথাসময়ে চলিয়া গেলেন, তাঁহার অপরাপর লোকেরাও যথানির্দ্দিষ্ট দিনে চলিয়া গেলেন; শেষে যাইবার জন্ত আমি রহিলাম। এবার আর খালি হাতে একখানি ধুতি আর একখানি গামোছা লইয়া যাওয়া ঘটিল না। সে দিন আর নাই! এখন ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দিকাসি হয়, জ্বর হয়; এখন একটু নিয়মমত না থাকিলে, শরীর জবাব দিয়া বসে। সে দিন নাই, কিন্তু সে দিনের স্মৃতি ত যায় নাই; তাই বাড়ীতে নানা প্রকার আয়োজনের প্রস্তাব হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে লাগিলাম। তবুও কিঞ্চিৎ আয়োজন করিতেই হইল। এখন ত আমি একেলা নহি; এখন আমার মুখের দিকে যে একপাল নাবালক-নাবালিকা চাহিয়া আছে।

নিতান্তই একাকী যাইব!—অন্ততঃ পথে কথা বলিবারও ত একটা লোক চাই! তখন সঙ্গী খুঁজিতে লাগিলাম। ‘ভারতবর্ষের’ ফটোগ্রাফার সুরেশচন্দ্রকে আমার সঙ্গে যাইতে বলিলাম। সে মনে করিয়াছিল, ষ্টীমারে সেকেণ্ড ক্লাসে বাবুর মত যাইবে; কোন ভয় নাই, বিশেষ কোন অসুবিধাও নাই; তাই সে আমার প্রস্তাব শুনিবামাত্রই সাহ্লাদে সম্মতি-প্রদান করিল। কিন্তু তাহার পরই যখন আমি যানের কথা বলিলাম, তখন বেচারী একেবারে বাঁকিয়া বসিল; বলিল—“নৌকায় যেতে হবে; তা আবার সমুদ্রে! সে আমি কিছুতেই পারব না মশাই!” বলা বাহুল্য—সুরেশ বাবু কলিকাতার লোক; নদীর নাম শুনিলে, নৌকায় উঠিতে হইবে শুনিলে, তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন আর কি করি—স্থির করিলাম—‘একাই যাব’— পুণ্যলাভ অবশ্যই হইবে না; লাভ হইবে—কিঞ্চিৎ লবণাক্ত জলপান। আর পুণ্যসঞ্চয়ের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি যে, জীবনে এত পাপ করিয়াছি যে, সামান্ত একটু পুণ্যে সে পাপসমুদ্রের তিলপ্রমাণও কমিবে না।

সুরেশ বাবু যখন রণে ভঙ্গ দিলেন, তখনও হাল ছাড়িলাম না; অপর একজন সঙ্গীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীমান্ প্রমথনাথ সিংহ ভায়া বলিলেন, তিনি যাইতে প্রস্তুত আছেন। যাইবার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ২৭এ পৌষ, রবিবার শ্রীমান্ প্রমথ আসিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া গেলেন। পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটার যে গাড়ী ডায়মণ্ডহারবার যাইবার জন্ত কলিকাতা বেলিয়াঘাটা ষ্টেসন হইতে ছাড়ে, সেই গাড়ীতে যাইতে হইবে। প্রমথ ষ্টেসনে আমার জন্ত অপেক্ষা করিবেন। তিনি আরও বলিয়া গেলেন যে, আমি যেন জলখাবার প্রভৃতি সঙ্গে না লই; তাঁহারই গৃহিণী-মহাশয়া সে সমস্ত ঠিক করিয়া দিবেন। ভাল কথা।

পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে একটি ব্যাগে থান দুই কাপড়, একটা জামা, এবং অভ্যাসদোষে একখানি ইংরাজী বই লইলাম; বলা বাহুল্য যে, ব্যাগে গণ্ডা তিনেক চুরুটও লইয়াছিলাম। আত্মীয়প্রবর বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি আমার জন্ত দা-কাটা চুরুট যথেষ্ট লইয়া যাইবেন, আমি সুধু পথের সম্বল লইয়া গেলাম। বিছানার মধ্যে দুইখানি কম্বল এবং একটি বালিস।

যথাসময়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেখি, শ্রীমান্ প্রমথ নাই; তখনও তিনি পৌঁছেন নাই! গাড়ী ছাড়িবার তখনও প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। আমি পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; কত যাত্রী-বোঝাই গাড়ী আসিল, কত লোক পদব্রজে ষ্টেসনে আসিল, কিন্তু প্রমথ আর আসে না। একটু পরে দেখিলাম, আমার আর একটি বন্ধু ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত; আমার আত্মীয় মহাশয় ইঁহাকে আমার সঙ্গী হইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, এক জন সঙ্গী ত মিলিল—কথা বলিবার একজন দোসর ত হইল। তিনি বলিলেন যে, তিনি একাকী নহেন; তাঁহার সহিত আর একটি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আছেন। বন্ধুবর সেই ভদ্রলোকটির সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। টিকিট কিনিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, গাড়ী ছাড়িবার দশ মিনিট বিলম্ব আছে, তবুও প্রমথর দেখা নাই। তখন অপর দুইটি ভদ্রলোককে টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিতে বলিলাম; আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রমথনাথের অপেক্ষা করিব বলিলাম। তাঁহারা গাড়ীর দিকে গেলেন, আমি পথ চাহিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিলাম। গাড়ী ছাড়িবার যখন দুই মিনিট বিলম্ব, তখন আর কি করিব, প্রমথনাথের আশা

ত্যাগ করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এইবার সেই ব্রাহ্মণ-সঙ্গীর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। তাঁহার বাড়ী শিবপুরে। তিনি দেখিলাম সবজান্তা লোক, বাক্যে অদ্বিতীয়; এমন কোন কথা নাই, এমন কোন ব্যাপার নাই, যাহার খবর তিনি না রাখেন! কলিকাতা সহরটা তাঁহার নখদর্পণে;—কলিকাতার আপিস-আদালত, উকিল-ব্যারিষ্টার, বড়মানুষ, সকল মহলেই তাঁহার গতিবিধি আছে, সকল খবরই তিনি রাখেন; যুদ্ধের সংবাদ সম্বন্ধে তিনি যেন একটা প্রকাণ্ড 'অথরিটি'। তিনি তামাক খাইতেও অদ্বিতীয়; শুনিলাম, তিনি প্রতিদিন যথানিয়মে দুইবার অহিফেনও সেবন করিয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গে একটি বোঁচকা দেখিলাম। তিনি যখন সেটি খুলিলেন, তখন তাহার মধ্যে না দেখিলাম, এমন জিনিষই নাই; তামাক আছে, টিকে আছে, দিয়াশলাই আছে, একটা টিনে আট্‌কান হাত ধুইবার জল আছে, হুঁকা আছে, কলিকা আছে, কলিকাতে 'ঠিকরি' দিবার জন্য তিন চারিটি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড পর্য্যন্তও আছে। এক টুকরা কাগজে মোড়ক করা খানিকটা চা আছে, ঐ প্রকার আর একটা ক্ষুদ্র মোড়কে কিঞ্চিৎ চিনি আছে, আর একটা ক্ষুদ্র মোড়কে খানিকটা তেঁতুলও দেখিলাম। এই সকল দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণপ্রবরের বোলচাল শুনিয়া, আমার কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবির' দাদামহাশয়ের কথাই মনে হইতে লাগিল। বোধ হয়, এই রকমের একটি ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই কবিবর দাদামহাশয়ের ছবি আঁকিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ আমাকে সাহস দিলেন যে, পথে আমার কোন কষ্ট হইবে না; তিনি পথঘাট সব জানেন, পূর্ব্বে দুই তিনবার তিনি ষ্টিমারে এবং নৌকাযোগে গঙ্গাসাগরে গিয়াছিলেন। এমন সঙ্গিলাভ যে পরম সৌভাগ্যের কথা, তাহা কি আর বলিতে হইবে! আমি আমার সঙ্গীটিকে বলিলাম যে, সঙ্গে ত জলখাবার আসে নাই, যিনি সে সকল আনিবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি ত ফেরার হইলেন। আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ঠাকুর মহাশয় বলিলেন—"তাতে ভয় কি? ডায়মণ্ডহারবার হইতে কিছু জলখাবার লওয়া যাইবে; চাল, ডাল, ঘৃত, লবণ, আলু লওয়া যাইবে। আমি নৌকায় বসিয়া উৎকৃষ্ট খিঁচুড়ি রাঁধিয়া আপনাদিগকে খাওয়াইব। আমি সব ঠিক করিয়া লইব।" ঠাকুর-মহাশয়ের কথায় আশ্বস্ত হইলাম। ডায়মণ্ডহারবারের দুইটি ষ্টেসন এদিকে দেউলা নামক একটি ষ্টেসন আছে। সেই ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিলে, একটি ভৃত্য তাড়াতাড়ি আমাদের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হস্তে একটি মুখ-বাঁধা হাঁড়ি। সে হাঁড়িটা নামাইয়া রাখিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"জামাইবাবু, মা-ঠাকরুণ এই জলখাবারের হাঁড়িটা আপনার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।" এই বলিয়া সে হাঁড়িটা গাড়ীতে তুলিয়া দিল। কথাটা কি আরও খোলসা করিয়া বলিতে হইবে? এই ষ্টেসনের অনতিদূরেই আমার শ্বশুরালয়। আমি যে এই গাড়ীতে গঙ্গা-সাগরে যাইব, তাহা আমার শ্বশুর-শাশুড়ী বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এবং তাঁহাদের এই বৃদ্ধ জামাতাটি যে অনেক বিষয়ে নাবালক, তাহাও তাঁহারা খুবই জানেন; তাই আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী আমাদের অনাহার-কষ্ট দূর করিবার জন্য এক হাঁড়ি জলখাবার প্রেরণ করিয়াছিলেন। বুঝিলাম—যাত্রা শুভই বটে! সঙ্গী হইলেন, বিয়াল্লিশকর্ম্মা ঠাকুর-মহাশয়, আর পথের মধ্যে পাওয়া গেল—জলখাবারের প্রকাণ্ড হাঁড়ি!

ডায়মণ্ডহারবারে গাড়ী পৌঁছিল। আত্মীয়প্রবর কন্‌ট্রাক্টর মানুষ কি না, তাঁর সব কাজ একেবারে গোছালো। ষ্টেসনে সাত আটজন নৌকার মাঝিমাল্লা উপস্থিত ছিল। তাহারা আমাদের ব্যাগ, বিছানা, ঠাকুর-মহাশয়ের 'বোঁচ্‌কা' প্রভৃতি লইল। ষ্টেসন হইতে অনতিদূরেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আবাসস্থলের নিকট নদীতে আমাদের নৌকা ছিল। আমরা সেই নৌকার নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন ঠাকুর-মহাশয় বলিলেন, "এইবার টাকা দিন, হাটবাজার তাড়াতাড়ি করিয়া, নৌকা ছাড়িয়া দিতে হইবে, ভাটা পড়িয়াছে।" আমি তাঁহার হাতে দুইটি টাকা দিলাম। তিনি নিজে আর বাজারে গেলেন না, আমার সঙ্গী মহাশয়ের হস্তে টাকা দুইটি দিয়া এক লম্বা ফর্দ্দ মুখে মুখে করিয়া দিলেন এবং বলিলেন—"আপনি চট্ করে এইগুলো কিনে আনুন। আমি স্নানটা সেরেই আগে চায়ের জোগাড় করি। কি বলেন মশাই?" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি মাঝিদের নিকট হইতে

একটু তৈল লইয়া স্নানের উদ্যোগ করিলেন। বন্ধুটি যখন একটু দূরে গিয়াছেন, তখন ঠাকুর-মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন"—ওগো, দুইটা জিনিসের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; সেরখানেক দুধ আনিবেন, আর গোটা চেরেক ডাব।" আমি বলিলাম—"সেরখানেক দুগ্ধের দরকার কি? এক ছটাক দুগ্ধ হইলেই ত চা খাওয়া হইবে। ডাবই বা কি হবে,—নৌকায় ভাল জল আছে।" তিনি বলিলেন, "কি জানেন, আফিংখোর মানুষ, একটু দুধ না হলে চলে না। আর ডাব সঙ্গে থাকা ভাল। এই জল ত দেখ্‌ছেন—একেবারে নোনা, মুখে দেবার যো নেই। যদ্যপিস্যাৎ জলের কলসীটা হঠাৎ ভেঙ্গেই যায়, তা হলে যে তেষ্টায় মরে যেতে হবে।" ভাল কথা! এত 'যদ্যপিস্যাৎ' ভাবিতে গেলে ত শয়নঘর হইতেও বাহির হওয়া যায় না।

ঠাকুর-মহাশয় স্নান শেষ করিয়াই মাঝিদের একটা লোহার কড়া লইয়া, তাহাদের মেটে উনানে জল গরম করিতে লাগিয়া গেলেন এবং আমাকে তখনই স্নান করিয়া লইতে বলিলেন। আমি স্নানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন—"আরে না না, স্নান কি বন্ধ করতে আছে। আমি এই যে আফিংখোর মানুষ, আমিই কোন দিন স্নান বাদ দিই না। আপনি নেমে পড়ুন। স্নান করলে শরীর বেশ ভাল বোধ হবে।" কি করি, স্নান করিয়া লইলাম। ইহার মধ্যেই বন্ধু মহাশয় চাল, ডাল, লবণ, ঘৃত, আলু, লঙ্কা এবং ঠাকুর মহাশয়ের ফরমাস-মত এক সের দুগ্ধ ও পাঁচটা ডাব সহ উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর-মহাশয় বলিলেন, "আর দেরী নয়। ও রে, নৌকা ছেড়ে দে। উত্তুরে বাতাস আছে, ছোট একখানা পাইল তুলে দে। আমি এই চা-টুকু করেই খিঁচুড়ির আয়োজন করি।" মাঝিরা ঠাকুর-মহাশয়ের আদেশ-মত ছোট একখানি পাইল তুলিয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল; সকলে সমস্বরে বলিল—"দরিয়ার পাঁচপীর গাজির বদর!" ঠাকুর-মহাশয়ও পাঁচপীরের বদর দিলেন। তখন বেলা ঠিক বারটা।

এইবার সত্য সত্যই আমি বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। আমাদের এই 'ছোট' নৌকাখানি পাল তুলিয়া দিয়া, সেই বিশালকায় নদীর বক্ষ ভেদ করিয়া কেমন দ্রুতবেগে যাইতেছিল, চারিদিক কেমন সুন্দর দেখাইতেছিল, নদীতীর কেমন বিপরীত দিকে দৌড়াইতেছিল, দেখিতে দেখিতে ডায়মণ্ডহারবারের কেল্লা কেমন অতিক্রম করিয়া গেল, ঐ কুল্‌পী গ্রাম দেখা যাইতেছে—ঐ গ্রামের নিকটে আসিলাম—ঐ গ্রামখানি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, ঐ একখানি ষ্টিমার আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল--ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা করিতে গেলে যে কবি হইতে হয়! সে বিষয়ে এ দীনের অসামর্থ্য জানিতে কাহারও বাকী নাই। অতএব আমাদের এই নৌ-যাত্রার একটা বেশ মানানসই বর্ণনা দিতে পারিলাম না—সুতরাং ভ্রমণ-বৃত্তান্তের তিনভাগ সৌন্দর্য্য ত এখানেই একেবারে মাটি হইল। কি করিব, উপায় নাই।

ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়া একটু ভাটিতে গেলেই নদীটাকে সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হয়; কারণ, নদীর অপর পার মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না; সুধু অপার জলরাশি ধূধূ করিতে থাকে। যাক্—বর্ণনাই যখন করিতে পারিব না, তখন সে কথা তুলিয়া আর কষ্ট পাই কেন? অন্য সাধারণ কথার অবতারণা করি, অর্থাৎ চা-পান ও জলযোগের কথাটাই বলি; কারণ, তাহাতে মিষ্টতা থাকিলেও কাব্যি মোটেই নাই।

ঠাকুর-মহাশয় অতি সুন্দর চা প্রস্তুত করিলেন। তাঁহার এই নৈপুণ্য দর্শন ও আস্বাদন করিয়া, মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইল যে, অনতিবিলম্বেই অতি সুস্বাদু খেচরান্ন আমাদের রসনার তৃপ্তি ও উদরের শান্তি বিধান করিবে। চায়ের সহিত আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রদত্ত উৎকৃষ্ট লুচি-তরকারী, বেগুনভাজা, আলুর দম ও পানতোয়ার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা গেল। তখন আর খেচরান্নের প্রয়োজন অনুভূত হইল না; কিন্তু ঠাকুর-মহাশয় নাছোড় হইলেন। তিনি বলিলেন—"শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি শেষ না করিলে মাঝিরা ডবল পাল তুলিয়া দিতে পারিতেছে না। ডবল পাল তুলিয়া দিলে নৌকা মেল ট্রেণ অপেক্ষাও বেগে চলিবে।" এই বলিয়া তিনি রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; আমরা সেই অনাবৃত নৌকায় বসিয়া, তাঁহার রন্ধনপটুতা দেখিতে লাগিলাম—নৌকা চলিতে লাগিল।

সাড়ে বারটার সময় খিঁচুড়ী পাক আরম্ভ হইল, দেড়টা বাজিয়া গেল, তখনও হাঁড়ি নামেন না। এক ঘণ্টা কি খিঁচুড়ী পাক করিতে লাগে! ঠাকুর-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"জল একটু বেশী হইয়াছে।

জলটা মরিতেছে না।” ভাল কথা, আরও আধ ঘণ্টা গেল। তখন আমার সঙ্গী-মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ঠাকুর মশাই, যাহা হইয়াছে তাহাই নামাও।” ঠাকুর মহাশয় কি করেন, হাঁড়ি নামাইলেন। তাহার পর দেখা গেল যে, চাউল, ডাল, আলু, এই তিনটি দ্রব্যের রূপান্তর হইয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ খিঁচুড়ী না হইয়া, চাউল-ডাল-আলু সুন্দরভাবে মিশিয়া গিয়া, একটা অতি সুন্দর পানীয় দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। তখন আর কি করা যায়! তাহাই থালায় ঢালিয়া লইয়া চুমুক দিয়া পান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করা গেল! আবহমানকাল সকলেই খিঁচুড়ী আহার করিয়াছি আসিতেছেন—কেহ ত পান করেন নাই! আমার সাগর-সঙ্গম-যাত্রায় ইহা একটা নূতন অভিজ্ঞতা, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

এতক্ষণে আমরা যেখানে পৌছিলাম, সেখান হইতে আমাদিগকে সমুদ্রে পড়িতে হইবে। এইস্থান হইতে বামদিকে একটা নদী সুন্দরবনের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে; সেই নদী দিয়া আসাম-কাছাড়-ডেস্‌পাচ-ষ্টীমার সকল পূর্ব্ব বঙ্গ হইয়া যাইয়া থাকে। সম্মুখভাগ দিয়া যে নদী গিয়াছে, তাহা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া সাগর দ্বীপের অপর পার্শ্ব দিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। এই নদীপথেই নৌকা-সকল এবং হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমার সাগরের মেলা, স্থলে যাইয়া থাকে। এই পথে গেলে নৌকার বিশেষ কোন ভয়ের কারণ থাকে না। এই পথে যাহারা যায়, তাহারা অনেক দূর যাইয়া, নদী পাড়ি দিয়া, সাগর-দ্বীপের তীরবর্ত্তী হয়; তাহার পর কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই একটি অতি ছোট নদী দেখিতে পায়। সেই নদীটি সাগর-দ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যেখানে মেলা বসে, সেইস্থানে সাগরে পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র নদীর তীরে একটি গ্রাম আছে; তাহার নাম ধবলাট। সেখানে কয়েক ঘর গৃহস্থ আছে, কয়েকখানি দোকান আছে। এতদ্ব্যতীত সাগর-দ্বীপে আর অধিক বসতি নাই; স্থানে স্থানে কৃষকগণ এখন আড্ডা করিয়া, দ্বীপের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যাক্, সে কথা পরে বলিব।

আমরা যখন এইস্থানে পৌছিলাম, তখন মাঝি বলিল, “এইবার আপনারা স্থির হয়ে বসুন। আমরা এখন বড় পাল তুলে দেব। এবার এ নদী ছেড়ে আমরা সমুদ্রে পড়ব।” আমি চাহিয়া দেখিলাম, এই নদীই ত সমুদ্র-বিশেষ; ইহার পরও সমুদ্রে পড়িতে হইবে! মাঝি আরও বলিল—“যে রকম উত্তুরে বাতাস পাওয়া গেছে, তাতে নাগাদ সন্ধ্যা, কি দুই চারি দণ্ড রাত্রির মধ্যেই আমরা সাগর-দ্বীপে যেতে পারব। ঐ ত দেখুন না;—ঐ—ঐ যে কালো কালো দেখা যাচ্ছে, ঐটে সাগর-দ্বীপ। ওই দ্বীপে গিয়ে ওরই গায়ে গায়ে নৌকা চালিয়ে, একেবারে দক্ষিণ দিকে গেলে, মেলার যায়গায় পৌছান যাবে।” মাঝি ত ঐ—ঐ বলিয়া দেখাইল; আমরা কিন্তু অপার জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বামদিকের যে নদী দিয়া আসাম-কাছাড়ের ষ্টীমারগুলি যায়, সেই নদীর মোহানার একপার্শ্বে পেড়া-তলার বাঁক, অপর পার্শ্বে ঘোড়ামারা।

পূর্ব্বে যে পাল ছিল, সেটিকে আর মাঝিরা নামাইল না। তাহার সম্মুখে তাহারা একটি বড় মাস্তুল তুলিয়া দিল, এবং তাহাতেই বড় পা'ল উড়াইয়া দিল। তখন আমাদের নৌকা তীরবেগে অপার জলরাশি ভেদ করিয়া ছুটিতে লাগিল। আমার মনে হইল, দ্রুতগামী ষ্টীমারও বোধ হয় আমাদের নৌকার সঙ্গে চলিতে পারিত না। আমরা যে জাতীয় নৌকায় যাইতেছিলাম, তাহার নাম ‘ছোট’; এ জাতীয় নৌকার এ নামকরণ কেন হইয়াছে, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম; এ জাতীয় নৌকা এই ভাবে ছুটিয়া চলে বলিয়াই ইহার নাম ‘ছোট’ হইয়াছে। মাঝিরা নৌকার পশ্চাৎ দিকে এখন দুইখানি হাল বাঁধিয়া লইল এবং দুই দুই জনে এক একখানি হাল জোরে ধরিয়া রহিল; তবুও বোধ হইতে লাগিল যে, হাল যেন তাহাদের হাত হইতে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। নৌকায় মাঝি-মাল্লায় এগার জন ছিল; তাহার মধ্যে চারি জন দুইখানি হাল ধরিল, চারিজন দুইখানি পালের প্রান্তদেশ ধরিয়া বসিল। নৌকায় অনেক চড়িয়াছি; পদ্মা নদীর মধ্যে ভয়ানক ঝড়তুফানেও পড়িয়াছি; দুইখানি পাল তুলিয়া দিয়া অনেকবার পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী পার হইয়াছি; কিন্তু এমন সাগরে এই প্রচণ্ড উত্তুরে বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া, এমন দ্রুতবেগে কখন কোন নৌকা যাইতে দেখি নাই। নৌকায় কোন আচ্ছাদন নাই, কারণ দশখানি দাঁড়েই নৌকা জুড়িয়া থাকে। আমরা সেই বেলা বারটার

সময় নৌকায় উঠিয়াছি, আর এখন প্রায় চারিটা; এই কয়েকঘণ্টা রৌদ্রের মধ্যেই বসিয়া আছি। শীতকাল তাই রক্ষা, গ্রীষ্মকাল হইলে কি এমন করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতাম!

মাঝিরা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল; পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই আমরা অতিদূরে তীরভূমি দেখিতে পাইলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমাদের নৌকা সাগরদ্বীপে উপস্থিত হইল। মাঝিরা সেখানে নৌকা লাগাইল; আমরা তীরে অবতীর্ণ হইলাম; কিন্তু মাঝিরা বলিল, আমরা যেন উপরে না উঠি, বালুকাপূর্ণ চড়াতে হাত মুখ ধুইয়া লই; কারণ, উপরেই জঙ্গল, এবং সেই জঙ্গলের অধিবাসীরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী নহে; তাহারা রক্তলোলুপ ব্যাঘ্র। তখন আর উপরে উঠিতে সাহস হইল না; তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। মাঝিরা বলিল, একটু বিশ্রাম করিয়াই আধঘণ্টা পরেই নৌকা ছাড়িয়া দিবে। অন্ধকার রাত্রি, জনমানবের সাড়া নাই, দ্বিতীয় নৌকাখানি পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এমন সময়ে নৌকা ছাড়িয়া দিবে! এ দিকে বাতাসের জোর বাড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম—"রাত্রিটা এখানেই নঙ্গর করিয়া থাকিলে হয় না?" মাঝিরা বলিল—"এখানে কি থাকা যায়! যে বাতাসের জোর, তাতে আমরা দুই তিনঘণ্টার মধ্যেই সাগরের বাতিঘরের কাছে যাবো। সেখানে নৌকা বেঁধে আমরা রান্না-খাওয়া করব। তারপর শেষ রাত্রে যখন ভাটা পড়বে, নৌকা ছেড়ে ভোর হতে হতে মেলায় লাগিয়ে দেব।" আমি বলিলাম—"রাত্রিতে সমুদ্র দিয়ে যাবে, পথ হারাবে না ত।" আমার কিন্তু তখন কপালকুণ্ডলার কথা মনে হইতেছিল। মাঝি হাসিয়া বলিল—"বাবু, আমরা এই সাগরেই যাওয়া আসা করি, পথ কি আমরা ভুলি? সমুদ্রের ভিতর এখনই সব বাতি জ্বলে উঠ্‌বে। সেই সব বাতি আমরা চিনি। তাই দেখে দেখে আমরা যাব।"

মাঝিরা তখন নৌকা ছাড়িয়া দিল। আবার দুইখানি পাল উঠিল; আবার সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, আমাদের নৌকা চলিতে লাগিল। মাঝিরা যদি তীরের নিকট দিয়া নৌকা চালাইত, তাহা হইলেও কথা ছিল, ভয় একটু কম হইত; কিন্তু তাহারা নৌকাখানিকে ক্রমেই তীর হইতে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের মধ্যে যে সমস্ত 'বয়া' আছে, তাহাতে আপনা হইতেই আলো জ্বলিয়া উঠিল। ঠাকুর-মহাশয় বলিলেন, ও সকল আলো দিনেও জ্বলিতে থাকে, তবে সূর্য্যের আলোকে তেমন দেখা যায় না। চারিদিকে অন্ধকার, দূরে দূরে একটা আলোক জ্বলিতেছে; মাঝিরা সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। আমি যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে গায়িতাম—

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।"

কিন্তু সেই গভীর অন্ধকারে, সেই সাগরবক্ষে আমার আর তখন সে কথা মনে হইল না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমাদের নৌকা বাতিঘরের নিকট উপস্থিত হইল। মাঝিরা পাল নামাইয়া দিয়া নৌকা নঙ্গর করিল। তাহার পর তাহারা আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমরা ঠাকুর-মহাশয়ের অনুগ্রহে একটু চা-পান করিয়া, কম্বল মুড়ি দিয়া, সেই নৌকার উপর অনাবৃত আকাশতলে শয়ন করিলাম। কিন্তু কি ভয়ানক শীত! তাহার পর বাতাস,—একেবারে সোণায় সোহাগা!

মাঝিদের আহারাদি শেষ হইলে, তাহারা আমাদের শিরোপরে একখানি পাল বিস্তৃত করিয়া দিয়া, শীতের প্রকোপ হইতে আমাদিগকে নামমাত্র রক্ষা করিল। বলা বাহুল্য, সারাদিন সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে আমরা একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন মনে করিলাম, একটু নিদ্রা যাইব। কিন্তু নিদ্রা যাইবার কি যো আছে। নৌকাখানি ক্রমাগত নাচিতে আরম্ভ করিল, আমরা গড়াগড়ি খাইতে লাগিলাম।

রাত্রি আর কাটিতে চায় না। অনেক কষ্টে রাত্রি শেষ হইল; ভাটা পড়িল। তখন মাঝিরা শয্যাত্যাগ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। এবার তাহারা আর দুইখানি পাল তুলিল না। ছোট পালখানি তুলিয়া দিল। ভোর হইতে না হইতেই আমরা মেলা-স্থলে পৌঁছিলাম।

এবার এই স্থানেই আমার সাগর-সঙ্গম ভ্রমণের কথা শেষ করিতে হইতেছে। পাঠকগণের সহিষ্ণুতার ত একটা সীমা আছে। আমি হয় ত অনেকক্ষণ আগেই সে সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়াছি। মেলার কথা, পারি ত পরে বলিব।

আমার ডাক্তারি

[শ্রীরাধারঞ্জন ধর, B.A.]

হোমিওপেথিতে নাকি আমার বেশ একটু জ্ঞান আছে, তাই আমাদের 'মেসে' সকলেই আমাকে "ডাক্তার" বলিয়া ডাকিতেন। যদিও মাঝে মাঝে দুই তিনটি ছেলের পেটফাঁপা, পেটের অসুখ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি ছাত্রমহলের দুই একটি সাধারণ রোগ আরোগ্যও করিতে পারিতাম, তথাপি ঐ "ডাক্তার"-এর মতন উচ্চ এক পদবীর যে আমি কতদূর অযোগ্য ছিলাম, তা শুধু আমিই জানিতাম। সৌভাগ্যক্রমে আর কাহারও কখনও জানিবার সুযোগ হয় নাই, যেহেতু কোন ঔষধ দিতে গেলে সর্ব্বদাই আমি সতর্কভাবে উহার নামটি লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতাম। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, আমার ডাক্তারি ছিল শুধু একটা ঔষধ নিয়া,—সেটি নক্সভমিকা। যাহা হউক, এক ঔষধের ডাক্তার হইলেও আমাদের 'মেসে' সকলেই আমাকে একটু আদর ও সম্মান করিতেন। তারপর, সেই 'মেসেই' যে, শুধু আমার ডাক্তারি শেষ হইত এমন নহে, অন্যান্য 'মেস' হইতেও মাঝে মাঝে আমার ডাক আসিত ; দর্শনী ছিল—চা-পান।

একটা কথা কিন্তু আপনাদের বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, —আমি যে ডাক্তার, সে শুধু দায়ে পড়িয়া, স্বেচ্ছায় নহে। পেটের ব্যথা আমার লাগিয়াই থাকিত (যেহেতু আমি তখনও কলেজে পড়িতাম), তাই নক্সভমিকর একটা শিশি চাবির তোড়ার মতন সর্ব্বদাই সঙ্গে করিয়া রাখিতাম।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমি ঢাকা কলেজে third yearএ পড়িতাম। আমার পিতাঠাকুর তখন চাঁদপুরে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট। অতি নিকটেই ছিলাম বলিয়া, প্রতি শনিবারই প্রায় একবার চাঁদপুর যাইতে হইত ; সোমবারে আসিয়া পুনরায় কলেজ করিতাম।

এইরূপে কার্ত্তিক মাসের এক শনিবারে প্রায় ১২ ঘটিকার সময় ঢাকা ছাড়িলাম। সর্ব্বদাই আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইবার ভাড়া পাইতাম, কিন্তু প্রায়ই তৃতীয়শ্রেণী কি অগত্যা মধ্য শ্রেণীতে চলিয়া যাইতাম ; বাকি পয়সা দিয়া, হয় "ঈশেন" ময়রার "পরোটা" খাইতাম, আর না হয় মেরী করেলীর নভেল কিনিতাম। যে দিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন আমার সেকেণ্ড ক্লাসেই যাইতে হইয়াছিল ; কারণ ষ্টেশনে পৌছিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছিল ; অন্য কোথাও একটুকুও জায়গা ছিল না।

ষ্টেশন হইতে আমাদের 'মেস' বেশী দূর না হইলেও আসিবার কালে "হানিমান হল" হইতে ছয় ও ত্রিশ শক্তির দুইটি নক্সভমিকার শিশি কিনিতে গিয়াছিলাম, তাই একটু ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী ধরিতে হইল। গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলাম, কামরায় একজন ভদ্রলোক রহিয়াছেন—সঙ্গে এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ও দুটি মেয়ে। একবার ইচ্ছা হইল, ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করি, কিন্তু তখন তিনি তার 'food-carrier' হইতে কি যেন বাহির করিতে ছিলেন, তাই অগত্যা 'বেঙ্গলী'-খানা লইয়া বসিলাম। 'সম্পাদকীয় অংশ' ছাড়িয়া যখন London letterএর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছি, গাড়ী নারায়ণগঞ্জ পৌছিতে যখন আর মাত্র ৮।১০ মিনিট বাকি রহিয়াছে, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তাঁহার নাম—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—তিনি ময়মনসিংহের একজন মুন্‌সেফ, তাঁর বাড়ী চাঁদপুরের নিকটেই আর একটু বড় গ্রামে। চার মাসের বিদায় লইয়া কয়েকটি সাংসারিক গোলমাল মিটাইবার জন্য তিনি তাঁহার অগ্রজের সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়াছেন—সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি মেয়ে—প্রীতিবালা ও অমিয়া (ওরফে লিলি); লিলি দেখিতে খুব ছোট—বয়স পাঁচ কি ছয় হইবে ; আর প্রীতিবালার বয়স বার কি তের'র কম ছিল না।

দেখিতে দেখিতে আমরা আসিয়া নারায়ণগঞ্জ

পৌঁছিলাম। ষ্টীমার ঘাটেই প্রস্তুত থাকে; দলে দলে আরোহী গিয়া ষ্টীমারে উঠিতে লাগিল; আমরাও একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা দখল করিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গে একটি 'ব্যাগ' ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তাই তাঁদের একটু ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আমি 'ডেকে' বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন আমি পুনরায় আসিয়া তাঁদের সঙ্গে মিশিলাম, তখন দেখিলাম, গিরিজা-বাবুর বড় মেয়ে তাঁর মার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে, আর নিকটেই গিরিজাবাবু মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—আগের দিন রাত্রিতে প্রীতিবালা ও লিলি তাদের সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া অনেক সন্দেশ খাইয়াছিল; পরে বাসায় ফিরিয়া ও জিনিষপত্র গুছাইতে প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল (যেহেতু মেয়েদের—এমন কি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরও—জিনিষ গুছান কোনকালেই একবারে হইয়া উঠে না)। ফলে, সেদিন ভোর হইতেই প্রীতিবালার পেট ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল; ষ্টীমারে আসার পর দু'বার দাস্তও হইয়াছে।

এদিকে "পেট ফাঁপা" ও "রাত্রি-জাগরণ"—এদুটি কথা শুনিয়াই আমার অমোঘ নক্সভমিকার সাহায্যে একবার ডাক্তারি করিতে ইচ্ছা হইল। প্রকাশ্যে তাঁহাকে বলিলাম, "আমি হোমিওপেথি নিয়া মাঝে মাঝে একটু নাড়াচাড়া করি; আর দু একটা ঔষধও সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বলেন্ ত, আমি একটা ঔষধ দিয়া দেখিতে পারি।" গিরিজা বাবু যেন হাতে চাঁদ পাইলেন; অমনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "পারেন ত দেখুন, আমি চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাক্‌বো! রাস্তা-ঘাটে এ বিপদ, আমি কি যে করি, কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে।" এবার একটু ডাক্তারি-মুরুব্বীয়ানার সুরে গম্ভীরভাবে বলিলাম, "Symptoms না জেনে ত আর ঔষধ দেওয়া চলে না? উনি এখন ঘুমুচ্ছেন, জাগ্‌লে পরে, সব জানা যাবে এখন!"

তখন প্রীতিবালার একটু তন্দ্রার মতন হইয়াছিল, আমাদের কথাবার্ত্তার সময়ই বোধ হয়, তার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; কারণ, আমার কথা শেষ হইতে না হইতে সে উঠিয়া বসিল। দেখিলাম—দুবার দাস্তের দরুণই তার চোখের কোলে একটু কালিমা পড়িয়াছে, আর ঠোঁট্ দুটি যেন শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। চকিতে একবার আমার দিকে চাহিয়া, সরলতামাখা তার চোথ দুটি তখনই আবার নামাইয়া লইল।

এখন আমার তাকে প্রশ্ন করিবার পালা! প্রথমতঃ কি যে জিজ্ঞাসা করিব, তাই ঠিক করিতে পারিলাম না; কারণ,

"উনি এখন ঘুমুচেন, জাগলে পরে সব জানা যাবে এখন।"

মহেশ ভট্টাচার্য্যের সেই ক্ষুদ্রকায় "পারিবারিক চিকিৎসা" মাত্র একখানা বই যা আমার কোন কালে ছিল এবং "পেট-ফাঁপা" ও "রাত্রিজাগরণ" এই দুইটি কথাই মনে পড়িতে-ছিল। এ দুটি বিষয় সম্বন্ধে ত আমি সবই গিরিজাবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম, তবে তাকে আর কি জিজ্ঞাসা করি? যাহা হউক, পরে একটু অসংলগ্নভাবেই একটা প্রশ্ন করিয়া বসিলাম—"কাল রাত বুঝি জাগিয়াছিলেন? ঘুম কি মোটেই হয় নি?" মস্তক নত করিয়াই প্রীতিবালা একটু ইতস্ততঃ করিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"খুব কম।" (পরে জানিয়াছি, উত্তরটি সম্পূর্ণ অলীক। রাত বারটা হইতে সে খুব ঘুমাইয়াছিল; তবু লজ্জাবশে একটা ছোট-খাট উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করিয়া,"খুব কম" ও "এক রকম" এই দুইয়ের মধ্যে বাছাই করিয়া উত্তর করিয়াছিল—"খুব কম"। তথনকার মতন "রাত্রিজাগরণ" সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, "পেটফাঁপা"র কথা তুলিব, মনে করিতেছিলাম। কিন্তু এখনও পেটফাঁপা ছিল কি না, তা দেখা একটু শক্ত মনে করিয়া, কথাটা একটু ঘুরাইয়াই জানিতে হইল। তাই প্রশ্ন করিলাম "ঢেঁকুর উঠ্‌ছে কি?" মুহূর্ত্তের জন্য একবার আমার দিকে তাকাইয়া পূর্ব্বের মতন ক্ষীণস্বরেই সে উত্তর করিল—"হাঁ।"

বাঃ আর চাই কি? 'ডাক্তার' বলিয়া আমার যত বল, তা ত শুধু এই নক্সভমিকা দিয়া; আর নক্সভমিকার জ্ঞান ত আমার শুধু "রাত্রিজাগরণ" ও "পেটফাঁপাতেই" পর্য্যবসিত; এই দুইটি Symptomই যখন আমার রোগিণীর মধ্যে বিদ্যমান, তখন আর ভাবনা কি! অমনি একটু পরিষ্কার জলের 'অর্ডার' করিলাম। গিরিজাবাবুর স্ত্রী, নারায়ণগঞ্জের 'কল' হইতে ভাল জল তুলিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহা হইতেই একটু জল একটা গ্লাসে করিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে আমি ঔষধের শিশি খুঁজিতে লাগিলাম। তখন, আর একটি সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল; নক্সভমিকার ৬ ও ৩০ শক্তির দুইটি শিশি আমার নিকট ছিল, এখন কোন্‌টি দি? মহাভাবনায় পড়িলাম—দায়ে পড়িয়া তখন শিখিলাম যে, হোমিওপেথিতে ডাইলিউশন ঠিক করা একটি অতি কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক, যখন কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না,তখন বলিতে লজ্জাও হয়, হাসিও পায়,—চোক বুজিয়াই একটা শিশি তুলিয়া লইলাম; দেখিলাম, হাতে উঠিয়াছে,—Nux Vomica 30. মেজার্ গ্লাসের অভাবে সেই বড় গ্লাসটাতেই একটু জল কমাইয়া নিয়া, এক ফোঁটা ঔষধ ঢালিলাম ও তাড়াতাড়ি প্রীতিবালাকে খাইতে দিলাম। (কারণ, শুনিয়াছিলাম—হোমিওপেথিতে ঔষধের গুণ নাকি অতি সহজেই নষ্ট হইয়া যায়।) ঔষধ খাইলে পরে, আমি তাকে একটু ঘুমাইতে বলিলাম; গিরিজা-বাবুও আমার কথায় সায় দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ষ্টীমারে আর কোন উপদ্রব হইল না, আমিও একরকম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সন্ধ্যার পর আমরা চাঁদপুর পৌছিলাম। সিঁড়ি ফেলিবার আগেই দেখিলাম, আমার কনিষ্ঠ ভাই নলিনী আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই গিরিজাবাবুর লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন তাঁদের নিকট বিদায় নিতে গেলাম। গিরিজাবাবু বলিলেন, কাল তিনি একবার আমাদের বাসায় যাইবেন। লিলি কথাটা ঠিক বুঝিল না, তাই দৌড়িয়া আসিয়া আমার হাত দুটি ধরিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল—"কাল আমাদের বাসায় যাবেন ত? বলুন?" পরে একটি অঙ্গুলী হেলাইয়া ও মাথা দোলাইয়া আবার একটু জোর দিয়া বলিতে লাগিল,—"কেমন, যাবেন ত? ঠিক যাবেন?" অগত্যা আমি "হুঁ" বলিলে পর সে আমার হাত ছাড়িল। এদিকে, গিরিজা-বাবুর স্ত্রী আমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শেষ করিতে পারিলেন না; আর প্রীতিবালা একবার মাত্র আমার দিকে তাকাইল। আমি সেই সরল কৃতজ্ঞতা মাখা দৃষ্টিকেই আমার "ফিস্" মনে করিয়া, তাদের স্মৃতিটুকু লইয়া, নলিনের সঙ্গে বাসায় চলিয়া গেলাম।

পরদিন সকলে বাবার সঙ্গে 'মেসের' কথা, কলেজের কথা, প্রভৃতি কত কথাই আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় গিরিজাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়াই আমি বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ করাইয়া দিলাম। তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, প্রীতিবালা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, আমার ডাক্তারি বিফল হয় নাই। তাঁদের নানা কথার মাঝখানে আমি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলাম; যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন দেখিলাম, গিরিজাবাবু গাত্রোত্থান করিয়া বাবাকে বলিতেছেন—"আমার ইচ্ছা ছিল, আরও দু'

এক দিন থাকিয়া, আপনাদের সঙ্গে একটু ভাল করিয়া পরিচয় করিয়া যাই, কিন্তু আজই চলিয়া যাইতে হইল, ইত্যাদি"। গিরিজাবাবু বিদায় হইলেন। বাবাও বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন, আর আমি সেখানে দাঁড়াইয়া তারা আজই চলিয়া যাইবে, আর তাদের সঙ্গে আমার দেখা নাও হইতে পারে,—এই সব ভাবিতে ভাবিতে কেন যেন একটু অশান্তিই ভোগ করিতেছিলাম; এমন সময় বন্ধুবর সুরেন আসিয়া উপস্থিত হইল; উভয়ে রাস্তায় বাহির হইলাম।

কিন্তু চিন্তাকে চাপিয়া রাখিবার যো নাই! বন্ধুবরের সঙ্গে একটু অন্যমনস্কভাবেই কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া, বাসার দিকে ফিরিলাম। যেই সুরেন আমার সঙ্গ ছাড়িল, অমনি আবার সেই তাদের চিন্তা আসিয়া, কি বিপদ্, আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। কেমন যেন একটু কষ্টও অনুভব করিতে লাগিলাম। বুঝি, তাদের সঙ্গে আর দেখা না হয়! নাই বা হলো? তারা আমার কে? তাদের মধ্যে কারো কি এমন কোন ভাবনা হচ্ছে? সংসারের কত লোকের সঙ্গেই এইরূপ ক্ষণিকের জন্য দেখা হয়। তখন অতীতের অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল। বাবা যখন নোয়াখালি হইতে রাজাবাড়ী বদলী হইয়াছিলেন, তখন ষ্টীমারে "কমল ডেপুটীর" পাঁচ বছরের মেয়ে লীলার সঙ্গে আমার খুব ভাব হইয়াছিল। কই, তার কথা ত আমার একবারও মনে হয় না? এমন কি, রাজাবাড়ীতে যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল, (কমল বাবু তখন কুষ্ঠে যাইতেছিলেন)। তখনও মনে এমন কোন কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ত মনে পড়ে না। তারপর কত নানাস্থানে নানা লোকের সঙ্গে দেখা হইল, Inspector Jones তার ছেলে Tom, ডাক্তার বাগচী, তার ভাইপো ক্ষিতীন্, Browne সাহেবের মেয়ে Lizzie

"কই ঠাকুরপো, আজ পান চাইলে না?"

প্রভৃতি কত বাল্যসখা ও সখীদের কথাই না মনে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কই, তাদের কারো জন্যই ত আমি কোন কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম না? সুতরাং, এদের কথাও আমি ভাবিব না বলিয়া, অনেকটা জোর করিয়াই যেন মনকে একরকম বুঝাইলাম।

(২)

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ননিকে নিয়া যখন তার আধ আধ কথাগুলি শুনিয়া বেশ আমোদেই সময়টা কাটাইতেছিলাম, তখন বৌদি "কই, ঠাকুরপো, আজ পান চাইলে না" বলিয়া, হাতে পানের বাটা নিয়া হাজির হইলেন। তাও ত বটে, আজ ত ভাত খেয়ে পান খাই নাই! তখনই হাসিয়া উত্তর করিলাম—"আর বৌদি, তোমার ননিকে

পেলে কি আর কিছু মনে থাকে? সত্যি বল্‌ছি, ওকে পেলে আমি সবই একরকম ভুলে যাই!"

"কই, ঠাকুরপো, তার অসুখই মোটে ছাড়্‌ছে না; দেখ্‌ছনা দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে! হাঁ, হাঁ, শুনলুম, তুমি নাকি ডাক্তারি শিখেছ! তবে আমার ননিকে একটা ওষুধ দাও না? সর্দ্দি, কাশি, ত ওর একরকম—"

"আরে থামো, বৌদি, থামো; তোমাকে আবার বল্‌লে কে যে আমি ডাক্তার?"

"শুনেছি গো শুনেছি—সবই শুনেছি; বাবা এসে সবই —ঐ, মা ডাক্‌ছেন! যাই—"

বৌদি ত চলিয়া গেলেন, আর এদিকে ডাক্তারির উল্লেখ হইতে আমার রোগিণী, রোগিণী হইতে গিরিজাবাবু প্রভৃতি সকলের কথাই আবার মনে পড়িল। যা চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, তা আবার ভাসিয়া উঠিল। আবার মনে যেন কেমন একটা 'হা হুতাশ' ভাব জাগিয়া উঠিল। ক্ষণেক্ষণে প্রীতিবালার কথা মনে পড়িতে লাগিল। সমস্ত দিনটাই একরকম উদাসভাবে কাটিয়া গেল।

সেই রাত্রিতেই আবার ঢাকা রওয়ানা হইলাম। সেখানে গিয়াও মনটা বিষণ্ণ রহিয়া গেল—কি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি, এমনই ভাব! কোন কাজেই আর মন বসিত না; এমন কি শেষে এক "Circle Examination"এ ফেইল করিয়া বসিলাম। এইরূপ ভাবে প্রায় দেড়মাস কাটিয়া গেল; হঠাৎ একদিন বৌদির একখানা চিঠি আসিয়া উপস্থিত—আমার বিয়ে! লিখিয়াছেন—"সেই মুনসেফ তার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকদিন ধরিয়া কুমিল্লা হইতে চিঠি লেখালেখি করিতেছেন; তাঁর এক কনিষ্ঠ ভাই তোমার দাদার কাছেও অনেক পত্র দিয়াছেন; এখন প্রায় সবই ঠিক হইয়া গিয়াছে। খুব খুসী, না? তুমি নিজেই ত মেয়ে দেখিয়াছ, তবে আর আমি কি বলবো? শুন্‌লুম মেয়ে নাকি খুব সুন্দরী, আর আমাদের মতন মুখ্‌খুও নয়—ইত্যাদি।"

মানবহৃদয় যার অভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিয়া থাকে, তাহা লাভ করিবার অতি ক্ষীণ আলো কোথাও পাইলেই—একেবারে নাচিয়া উঠে! বৌদির চিঠিখানা পাইয়া আমারও তাই হলো, আমি যেন আর আমাতে ছিলাম না! প্রকৃতপক্ষে কিয়ৎক্ষণের জন্য আমি কি করিব, কাহার নিকট আমার এই আশাতীত সুখের খবরটি জানাইব—তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। অথচ, কাহারও নিকট বলিতেই হইবে! এত বড় একটা সুখ কি করিয়া হৃদয়ে লুকাইয়া রাখি?—এই ভাবিয়া শশীর 'রুমের' দিকে ছুটিলাম। হায়, 'হতভাগাটা'ও কোথায় তালা দিয়া চলিয়া গিয়াছিল! তখন অগত্যা বৌদিকে চিঠি লিখিয়াই হৃদয়টা একটু হালকা করি, মনে করিয়া, কলম হাতে নিয়া বসিলাম। পূর্ব্বে চিঠির অন্যান্য কথা পড়িবার আর অবসর পাই নাই, কিন্তু উত্তর দিতে হইলে ত চিঠিটা আগাগোড়া পড়া দরকার! তাই পুনরায় চিঠিখানা পড়িতে হইল। অকস্মাৎ সম্মুখে কোন বন্য জন্তু দেখিলে লোকে যেরূপ চমকিয়া উঠে, আমারও তাই হইল—ওকি! লেখা রহিয়াছে—"কুমিল্লা হইতে!" কুমিল্লা হইতে? সেকি? তাদের বাড়ী যে চাঁদপুরের নিকটে! তবে তারা কুমিল্লা যাবে কি কর্‌তে? এরা নিশ্চয়ই তারা নয়—আর কেউ হবে! বৌদি লিখিয়াছেন—"নিজেই ত মেয়ে দেখিয়াছ।" তখন আমার কুমিল্লার মুনসেফ বিপ্রদাস বাবুর কথা মনে পড়িল। তিনি বাবার একজন বন্ধু, তাই সহরটি দেখিতে গিয়া তাঁর বাসায় দুদিন থাকিয়াও আসিয়াছিলাম। হা, তাঁর একটি মেয়েও ছিল। বুঝিতে আমার আর বাকি রহিল না যে, বিপ্রদাস বাবুই বৌদির "সেই মুনসেফ"। রাগে আমার তখন সমস্ত শরীর গর গর করিতেছিল। মনে মনে ঠিক করিলাম—আমার দ্বারা একাজ হইবে না। রাগের মাথায় তখনই বৌদিকে চিঠি লিখিলাম—"আমাকে না জানাইয়া তোমাদের কোন কথা পাকাপাকি করা খুবই অন্যায় হইয়াছে। আমিও একটা মানুষ, আমারও একটা মতামত আছে—জান্‌বে। ইতি

—কামিনী।"

ক্রোধের বশে চিঠিতে পাঠ পর্য্যন্ত দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

দুদিন পরে বাবার চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন—"যদি আমার মুখ রাখিতে চাও, পত্রপাঠ চলে এস। তাহারা লোক খুব ভাল; এখানে সকলেই সম্বন্ধটি পছন্দ করিয়াছেন। আশা করি, তুমি আর অমত করিবে না—ইত্যাদি।" পত্র পড়িয়া কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে

পারিলাম না। একদিকে পরিবারের সুখ ও পিতৃ-আজ্ঞা, অপরদিকে নিজের সুখ ও আত্মচিন্তা। ভাবিতে লাগিলাম—সকলেই ইহাতে সন্তুষ্ট, শুধু আমিই আপত্তি করিতেছি! তার-পর, যাদের জন্য আমি সকলের অসন্তোষের ভাজন হইব, তারাও যদি আমায় না চায়, তবে! তারা কিরূপ ব্রাহ্মণ, তাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ চলে কি না, তার বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না। কে জানে যে, প্রীতিবালার বিয়ের সম্বন্ধ আর কাহারও সঙ্গে স্থির হয় নাই? তখন একটু একটু করিয়া বুঝিতে লাগিলাম যে, আর আমার সেই বালুকাস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া স্বপ্নের বাসরঘর তৈয়ার করা বাতুলতা মাত্র; শুধু সকলের বিরাগভাজন হওয়াই সার হইবে। তাই আর বিলম্ব না করিয়া, পরদিনই চাঁদপুর রওয়ানা হইলাম।

বাসায় পৌঁছিতেই বৌদি আসিয়া বলিলেন—"ডাক্তার, এবার খুব ডাক্তারি কর্ত্তে পাবে; কেমন—নয় কি?" মা কাছেই ছিলেন, একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। বাহিরে যদিও কিছু প্রকাশ করিলাম না, তবু রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। এরা সকলেই কি আমার উপর জিদ মিটাইতে ছিল? মাও এর মধ্যে? কিন্তু তখন ত আর ফিরিবার যো ছিল না; তাই নীরবেই সব সহ্য করিলাম। দেখিতে দেখিতে বিয়ের দিনও আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমিল্লা হইতে কন্যাপক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম—ভবিষ্যতে যিনি আমার শ্বশুর হইবেন, তাঁর অসুখ করিয়াছে। তিনি আসিতে পারেন নাই, তাই তাঁর অগ্রজ আসিয়াছেন। এই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া তাঁর মতনই কা'কে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া, মনে হইতেছিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

যথাসময়ে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। শুভদৃষ্টিতেই সব গোলমাল মিটিয়া গিয়াছিল। গিরিজাবাবু প্রীতিবালাকে নিয়া কুমিল্লাতেই তাঁর অগ্রজ রামকুমার বাবুর বাসায় গিয়া-ছিলেন; বাড়ী যান নাই। তখন সকল কথাই একটু একটু করিয়া বুঝিতে লাগিলাম। মাঝখানে আমি যা অশান্তি ভোগ করিয়াছিলাম, তা অনেকটা আমারই দোষে, আর বৌদির দোষও যে কিছু ছিল না, তাও নয়। মা বৌদিকে সব খুলিয়া লিখিতে বলিয়াছিলেন; তিনি বিষয়টাকে ঘুরাইয়া বলিতে গিয়াই ত এ গোলমাল বাধাইয়া-ছিলেন।

হোমিওপেথির সঙ্গে ছেলেখেলা সেদিন হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছি। "রাত্রিজাগরণ" ও "পেটফাঁপা" শুনিলেই আর এখন শুধু নক্স্‌ভমিকা দিই না। এ কয়-বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি বইও পড়িয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তবু বিশেষ কিছু শিখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

প্রেমের বেসাতি

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

প্রেম চাই, প্রেম চাই, বলি দিবা-রাতি,
করিছে বণিক এক প্রেমের বেসাতি,
মাথায় লইয়া ভরি প্রেমের পসরা,
ফিরিতেছে প্রতি দ্বার প্রতি পাড়া পাড়া।
বড়ই সুলভে প্রেম বিতরণ তরে,
প্রেমিক বণিক সদা ডাকিছে সাদরে।
দর দাম নাই প্রেম করে বিনিময়,
দিন নাই ক্ষণ নাই সকল সময়!
প্রেমিক বণিক প্রেম এক বিন্দু নিয়া
পসরা উজাড়ি দেয় হৃদয় ভরিয়া!
সুলভ দেখিয়া প্রেম হয়ে ছিল চিতে
বিন্দু-বিনিময়ে তার পসরা লইতে;
কিন্তু পোড়া ভাগ্য দোষ খুঁজি সব ঠাঁই
পাতি পাতি ক'রে দেখি এক বিন্দু নাই!

মহর্ষি গোতমের আশ্রম

[শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী]

কিছুকাল পূর্ব্বে মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিত্রধর মিশ্র-মহাশয় কলিকাতায় আগমন করেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারেন, আমরা ন্যায়দর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি গোতমের আশ্রম দেখিবার জন্য উৎসুক। মিশ্র-মহাশয় দরভঙ্গায় পৌঁছিয়াই আমাদিগকে মিথিলায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। কিন্তু আমরা পরাধীন-বৃত্তি, ইচ্ছা হইলেই কোথাও যাইব, সে শক্তি আমাদের নাই। এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হয়। বিগত ১৮৩৫ শকাব্দের (ইং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের) ২০এ আশ্বিন শরদীয়া সপ্তমী পূজার দিবস রাত্রি নয়টা পনর মিনিটের সময় পঞ্জাব মেলে আমি এবং আমার তৃতীয় সহোদর মহামহোপাধ্যায় শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা হইতে মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করি। পর দিন মহাষ্টমী পূজার দিবস মধ্যাহ্ন ১২টার সময় দরভঙ্গা-ষ্টেসনে নামিয়া দরভঙ্গা-রাজের সভাপণ্ডিত ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ পূর্ব্বোল্লিখিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিত্রধর মিশ্র-মহাশয়ের বাস-ভবনে উপনীত হই। মিশ্র-মহাশয় অতি সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি আমাদের দুই ভ্রাতাকে বিশেষ স্নেহ করেন। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং একটু অনুযোগসহকারে বলিলেন,—"আমি মহারাজকে বলিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনারা একখানা চিঠি লিখিয়াও আসিলেন না; আমি ষ্টেসন হইতে লইয়া আসার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। আরও ক্ষোভের বিষয়, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি আমার মুখে বিদ্যাভূষণ-মহাশয় আসিবেন শুনিয়া আনন্দিত-চিত্তে বলিয়াছিলেন—"বিদ্যাভূষণ দরভঙ্গায় আসিলে আমি যেন অবশ্য জানিতে পারি। মহারাজ রাজগঞ্জের বাটীতে শরদীয়াদুর্গাপূজায় ব্রতী। সমস্ত রাজকীয় কর্ম্মচারীই সেখানে, আমিই কেবল এ বৎসর যাই নাই।" যাহা হউক, আমরা তাঁহার কথার সংক্ষেপে উত্তর দিয়া সন্নিহিত সরোবরে স্নান-সন্ধ্যা শেষ করিলাম। আসিয়া দেখি, পাকের সমুদয় প্রস্তুত! অতিশীঘ্রই রন্ধন-কার্য্য সমাপ্ত হইল। মিশ্র-মহাশয়ের যত্নের অবধি নাই; নির্জ্জল দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ ঘৃতের এত প্রাচুর্য্য যে, সে সমুদয় উপযোগ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। আহারান্তে মিশ্র মহাশয়, তাঁহার শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য দুই একটি অধ্যাপক আসিয়া সমবেত হইলেন। তখন মিথিলার পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, মহামহোপাধ্যায় চিত্রধর মিশ্র-মহাশয় একজন অসাধারণ কৃতবিদ্য অধ্যাপক। তিনি মীমাংসা-দর্শনে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইলেও বেদান্ত, ন্যায় ও অন্যান্য দর্শনেও তাঁহার খ্যাতি অল্প নহে। বিশেষতঃ তিনি মিথিলার একটি জীবন্ত ইতিহাস। এই সপ্ততি বৎসর বয়সেও তাঁহার স্মৃতি-শক্তি এতদূর প্রখর যে, স্বচক্ষে দৃষ্ট ঘটনার ন্যায় তিনি অনেক প্রাচীন বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। আমরা তাঁহার নিকট শ্রুত ঘটনার কোন কোন অংশ লিখিয়া লইলাম।

মিথিলা অতি প্রাচীন ও পবিত্র দেশ। এমন কি, বৈদিক-কালেও এই জনপদ সভ্যতার সমুচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। আর্য্যেরা যখন মিথিলায় আসিয়া আবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বেদের কতকগুলি সূক্ত তাহার অনেক পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছিল। রাজর্ষি জনক এই দেশেই রাজ্য করেন। ইতিহাসাতীত কালে যে সকল রাজা ও ঋষি এই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম মাত্র জানা যায়, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত ইতিবৃত্ত এখন কালগর্ভে বিলীন। মিথিলার বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত। চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষিগণের পর যদুবংশীয় নরপতিগণ মিথিলার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। এই যদুবংশীয় রাজগণের রাজত্বের অবসানে কর্ণাট হইতে সমাগত পরমার-বংশীয় ক্ষত্ররাজগণের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ-

কালের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। মুসলমান আক্রমণে বিত্রস্ত হইয়া কর্ণাটাগত রাজা নান্যদেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা হরিসিংহদেব নেপালের অরণ্যানী আশ্রয় করিলে ত্রিহুতের সিংহাসন শূন্য হয়। দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজসার সময়ে জগৎপুর-নিবাসী ওয়েনঠাকুরের অধস্তন পুরুষ ভোগীশ্বর-ঠাকুর ত্রিহুতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইঁহার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ রাজা শিবসিংহদেব। ইঁহার রাজধানীর নাম ছিল—দেবকূলী নগরী। এখন উহার নষ্টাবশেষ দরভঙ্গা-মিউনিসিপালিটীর মধ্যেই অবস্থিত। সুরসিকা রাণী লছিমা, শিবসিংহের সহধর্ম্মিণী ও পদাবলী-কর্ত্তা বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা শিবসিংহের ভ্রাতা রাজা পদ্মসিংহ। এই পদ্ম-সিংহ হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজা কংসনারায়ণ লক্ষ্মীনাথ পর্য্যন্ত ভোগীশ্বর-ঠাকুরের বংশীয়গণ ত্রিহুত রাজ্য শাসন করেন। তাহার পর, ত্রিহুতের রাজলক্ষ্মী বংশান্তর আশ্রয় করেন।

মধ্যভারতবর্ষের খাণ্ডেবালা ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত চাঁদঠাকুর পূর্ব্বোক্ত ত্রিহুত-রাজ্যের অধিপতি রাজা শিবসিংহের পিতামহ রাজা ভবসিংহের পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়া ত্রিহুত-রাজ্যে বাস করেন। তাঁহার পুত্র মহেশ-ঠাকুর একজন বিদ্বান্ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার কৃতবিদ্য ছাত্র ত্রিহুতের অন্তর্গত রামপুরনিবাসী রঘুনন্দনরায় দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের সভায় শাস্ত্রার্থ করিয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করেন। রঘুনন্দনের বিদ্যাবত্তায় পরিতুষ্ট হইয়া ৯৭৫ ফসলি শালে (১৫৬৮ খ্রীঃ) সম্রাট্ আকবর তাঁহাকে পণ্ডিত উপাধি ও ত্রিহুতের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ হাতী-পরগণার জমিদারি প্রদান করেন। রঘুনন্দন দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ঐ জমিদারি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার অধ্যাপক মহেশঠাকুরকে গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপ অর্পণ করেন। মহেশ-ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপাল-ঠাকুর পিতার নামীয় দানপত্র-বলে দিল্লীর দরবারের বিচারে হাতী-পরগণায় মহেশঠাকুরের স্বত্ব স্থির করিয়া আগমনকালে কাশীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর মহেশঠাকুরের চতুর্থ পুত্র পরমানন্দ ঠাকুর উক্ত জমিদারির অধিকারী হন। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিলে মহেশঠাকুরের পঞ্চম পুত্র শুভঙ্কর ঠাকুর

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিত্রধর মিশ্র

পূর্ব্বোক্ত বিস্তৃত জমিদারির অধিকার প্রাপ্ত হন। এই শুভঙ্করঠাকুরের প্রপৌত্র রঘুসিংহ এই বংশে রাজা উপাধি লাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহেশঠাকুর হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মীশ্বরসিংহ বাহাদুর, কে, সি, আই, ই, মহোদয় দরভঙ্গার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অপুত্রক অবস্থায় পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিলে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ রমেশ্বরসিংহ বাহাদুর, কে, সি, আই, ই, মহোদয় দরভঙ্গার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই ত গেল, দরভঙ্গার রাজবংশের বৃত্তান্ত। এইবার আমরা রাজবাটীর বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিত্রধর মিশ্র-মহাশয়ের সহিত আমরা রাজবাটী দেখিতে চলিলাম। রাজবাটীর আয়তন অতিবিস্তৃত—অনুমান চারিবর্গ মাইল হইবে। উহার মধ্যে প্রাসাদ, অট্টালিকা-শ্রেণী, উদ্যান, জলাশয়, কৃত্রিম শৈল, দেবমন্দির প্রভৃতি
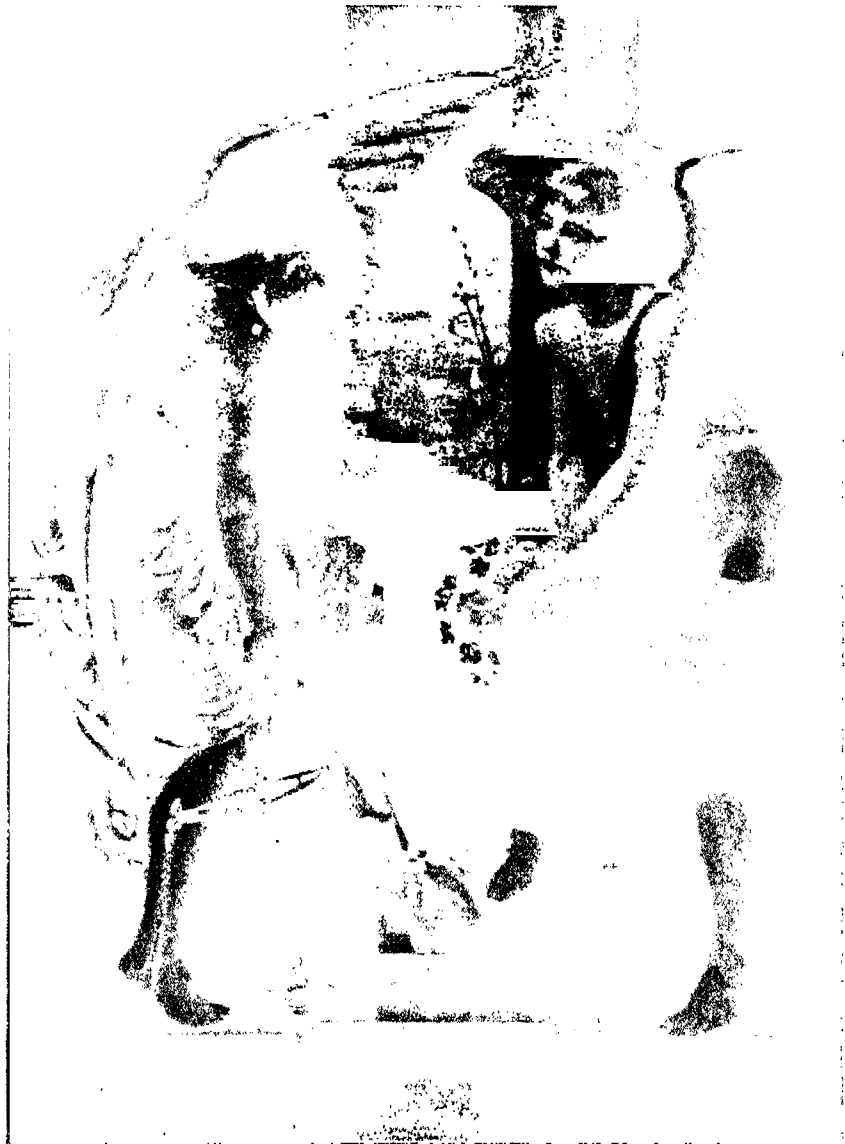
স্বর্গদ্বার

চিত্র-শিল্পী—ম্যানালী মোরিট্‌]

বিদ্যমান। আমরা প্রথমেই উদ্যান-মধ্যে কঙ্কালী দেবীর মন্দির দর্শন করিলাম। তাহার পর, রাজবাটীর প্রধান দ্বারে উড্ডীন ইন্দ্রধ্বজ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। একটি সমুন্নত বংশ-দণ্ডের মস্তকে চতুরস্র ধ্বজ। ইন্দ্রধ্বজ পূজা অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে ইন্দ্রধ্বজ-উৎসবের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই আমরা ঘোড়ার গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। সম্মুখে গোঁসাইনীঘর (গোস্বামিনীগৃহ) নয়নপথে পতিত হইল। এই অট্টালিকা-শ্রেণী মহিলা-অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট। দূর-দেশস্থ কোন উচ্চকুলোদ্ভবা বিধবা, কিংবা তীর্থ-পর্য্যটনকারিণী ব্রহ্মচারিণী, অথবা সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভবা রাজ-কুটুম্বিনীরা এই স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করেন। কিছু দূরে হরিমন্দির। এই মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত। তাহার পর, ছত্রসিংহেশ্বরীর বিশাল এবং সমুচ্চ মন্দির। এখানে পাষাণময়ী কালিকা-মূর্ত্তি বিদ্যমান। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমৎরমেশ্বরসিংহ বাহাদুরের ঊর্দ্ধতন পুরুষ মহারাজ ছত্রসিংহ এই কালিকা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরের ভিত্তিতে ঐ দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময় ও প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রভৃতি সংস্কৃত শ্লোকে উৎকীর্ণ আছে। মহা আড়ম্বরে ছত্রসিংহেশ্বরীর দৈনিক সেবা নির্ব্বাহিত হয়। রামবাগের অট্টালিকাশ্রেণীও রমণীয়, ঐ অংশে রাজমহিলারা বাস করেন। তাহার পর, দরবার হল দেখিলাম। এ পর্য্যন্ত যতগুলি অট্টালিকা আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহার শোভা ও সৌন্দর্য্যই অপেক্ষাকৃত চিত্তাকর্ষক। চতুর্দ্দিকে পুষ্পবীথী প্রফুল্ল কুসুমসম্পদে নয়নাভিরাম। নানাবর্ণে চিত্রিত মর্ম্মর-প্রস্তরে গৃহকুট্টিম অলঙ্কৃত; ভিত্তি-গাত্রে যে সকল অপূর্ব্ব ছবি রহিয়াছে, তাহা দেখিলে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। ঐ গৃহের আলোকাধার ঝাড়-লণ্ঠন হইতে আরম্ভ করিয়া, আসন উপকরণ প্রভৃতি সমস্তই সুবর্ণ ও মণিমুক্তা-খচিত। এই দরবার-গৃহের নাম নবগোণা। উহার অনতিদূরে গেষ্টহাউস্ (বিশিষ্ট-অতিথিশালা); এখানে ইউরোপীয় কিংবা ইউরোপীয় সভ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিরা আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইহার সৌন্দর্য্য নিতান্ত সামান্য নহে। পূর্ব্ব-দিগ্‌বর্ত্তী বৃহৎ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া কিছুক্ষণ আমরা মৎস্যের ক্রীড়া সন্দর্শন করিলাম। জলাশয়ের স্বচ্ছ জলে বিরাটমূর্ত্তি রোহিত, মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যকুল নির্ভীকভাবে সানন্দে বিহার করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর-মধ্যে রামচন্দ্র মন্দিরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ, এবং ভরত, শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি বিরাজিত। এই মন্দির অতিপুরাতন ও স্থানটি দিব্য শান্তিময়। মন্দির হইতে কিয়দ্দূরে মতিমহল নামক সুন্দর সৌধ। তাহার পর, রাজকীয় লাইব্রেরি বা পুস্তকালয়, মহারাজের হাইস্কুল্, প্লে-গ্রাউণ্ড প্রভৃতি। ব্যায়াম-ক্ষেত্রে অনেক প্রফুল্লমুখ বাঙ্গালী বালককেও খেলা করিতে দেখিলাম। তাহার পর, মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত পুরুষদের হাঁসপাতাল ও রমণীদের হাঁসপাতাল। কিছু দূর যাইতে যাইতে হরাইনামক সাগরতুল্য দীর্ঘিকার তীরে উপনীত হইলাম। এই দীর্ঘিকায় মহারাজ জলবিহার করেন। অনেক সুচিত্রিত ময়ূরপঙ্খী নৌকা নানা সুন্দর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহার পর, মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরসিংহ-প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা। এখানে সাধু, সন্ন্যাসী, দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, অভ্যাগতগণ আশ্রয় পায়। আর কিছু দূর গেলেই বড়মহারাণী শ্রীমতী রমেশ্বরলতা দেবীর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী দৃষ্টিগোচর হইল। এই চতুষ্পাঠীটি একটি উচ্চভূমিতে পুষ্পিতা লতা ও নানাবিধ সুরসাল বৃক্ষ-রাজিতে শোভিত। এখানে দর্শনাদি-শাস্ত্র অধীত ও অধ্যাপিত হয়। অনেক বিদ্যার্থী এই চতুষ্পাঠীতে বাস করে। অধ্যাপকগণের মাসিক বৃত্তি ও বিদ্যার্থিগণের আহারাদির ব্যয় মহারাণীই প্রদান করেন। পথমধ্যে যাইতে যাইতে মহামহোপাধ্যায় মিশ্র-মহাশয়ের মুখে দরভঙ্গা রাজবংশের বধূদের নামকরণ সম্বন্ধে একটি নূতন পদ্ধতির কথা শ্রুত হইলাম। দরভঙ্গারাজ মৈথিল ব্রাহ্মণ, সুতরাং ইঁহাদের বিবাহকালে মৈথিল-ব্রাহ্মণ-কুল হইতে কন্যা-সংগ্রহ করা হয়। পূর্ব্বে কোন মৈথিল-ব্রাহ্মণেরই জানা থাকে না যে, তাঁহার কন্যা দরভঙ্গা-রাজবংশে পরিণীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবেন কি না? সুতরাং নিজ নিজ রুচি অনুসারে নবজাতা বালিকার নামকরণ করেন। যদি ভগবৎ-প্রসাদে ঐ বালিকার দরভঙ্গা-রাজবংশে বিবাহ হয়, তাহা হইলে মাতাপিতা কিংবা অভিভাবকগণের প্রদত্ত নাম তামাদি হইয়া যায়। পুনরায় স্বামীর নাম-পূর্ব্ব লতান্তক নাম রাখা হয়। যেমন,

মহারাণী শ্রীমতী রমেশ্বরলতা দেবী। তরুকে বর ও লতাকে কন্যা কল্পনা করা ভারতীয় কবিগণের অতি প্রাচীন প্রথা। তজ্জন্য বিশিষ্ট-পণ্ডিত দরভঙ্গারাজের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ত্তমান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্র-প্রদেশেও কতকটা এই রূপ রীতি প্রচলিত আছে। কন্যার যে নামই থাকুক না কেন, বিবাহের সময় বরের নামানুসারে উহা বদলাইয়া যায়। বরের নাম যদি শঙ্কর হয়, তবে কন্যার নাম হইবে—দুর্গা, ভবানী, কিংবা শঙ্করী। বরের নাম যদি হয় নারায়ণ, তাহা হইলে কন্যার নাম লক্ষ্মী, কমলা কিংবা রমা রাখিতে হয়।

তাহার পর, বাসায় আসিয়া অগ্রে গোতমাশ্রম যাইবার ব্যবস্থা করা হইল। তৎক্ষণাৎ মিশ্র-মহাশয় কামতৌল ষ্টেসনে লোক পাঠাইলেন। শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে রাত্রি কাটিল। পরদিন প্রত্যূষে মহামহোপাধ্যায় মিশ্র-মহাশয়, আমরা দুই সহোদর, স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার (রাজকীয় ফটোগ্রাফার) কোন কোন বিদ্যার্থী, ভৃত্য, দ্বারবান্ প্রভৃতি সমবেত হইয়া গোতমাশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দরভঙ্গা ষ্টেসন হইতে কামতৌল-ষ্টেসন ১৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত, সেখান হইতে গোতমাশ্রম প্রায় চারিক্রোশ। রেলপথের উভয় পার্শ্বে অনন্ত ধান্য-ক্ষেত্র ও আম্রবন। সেই অসীম হরিৎ শস্য-প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে লোহিতবর্ণ ষষ্ঠিকা-ধান্যের ক্ষেত্রগুলি নীলাকাশে রাঙ্গা মেঘের মত শোভা পাইতেছে। গমন-কালে মিশ্র-মহাশয় রেলপথের দক্ষিণ-পার্শ্বে দূরে একটি গ্রামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঐ যে দূরে প্রাচীন বৃহৎ বৃক্ষ-রাজি শোভিত গ্রামখানি দেখিতেছেন, উহাই মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি উচ্চপীঠ গ্রাম। এখন উহা উচ্চৈট-নামে খ্যাত। ঐ গ্রাম কমলা নদীর তীরে অবস্থিত।" তাহার পর, তিনি কালিদাসের কিংবদন্তীটি সবিস্তার উল্লেখ করিলেন। কামতৌল-ষ্টেসনের প্রায় সন্নিহিত হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে আর একখানি গ্রাম দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ বিসপী গ্রাম। ঐ গ্রামে কবিবর বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন।"

কামতৌল-ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিলেই মিশ্র-মহাশয়ের প্রেরিত পদাতিক আসিয়া বলিল, "হাতী মিলিল না, কাছারির সমস্ত হস্তীই রাজগঞ্জের বাটীতে, অগত্যা এক-খানা গরুর গাড়ী আনিয়াছি।" প্রকৃত কথা, আমরা যে স্থান সন্দর্শনে যাইতেছি, সেখানে একমাত্র হস্তিযান ব্যতীত অন্য কোন যানই সুবিধাজনক নহে। মিশ্র-মহাশয় গোযানে আরোহণ করেন না, তিনি আমাদের মধ্যাহ্ন-আহারের উদ্যোগের জন্য অহল্যাস্থান অভিমুখে পদব্রজে রওয়ানা হইলেন, আমরা অগত্যা গোশকটে গোতমাশ্রম লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। প্রায় পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ ঘটিকার সময় গোতম-প্রান্তরের পূর্ব্বপ্রান্তে উপনীত হইলাম। আর কিছু দূর গিয়াই শকট-চালক বলিল—"আর গাড়ী যাইবে না।" সেখান হইতে ধানের ক্ষেতের আ'ল ঘুরিয়া দেড় মাইল পথ পদব্রজে যাইতে হইবে। ঐসকল ধান্যক্ষেত্রে কেউটে সাপের অত্যন্ত উপদ্রব। যখন আসিয়া পড়িয়াছি, তখন কোন বাধা-বিঘ্নের প্রতিই লক্ষ্য করিলে চলিবে না। গরু ও গাড়ী সেখানেই রহিল, আমরা গাড়োয়ানকে পথ-প্রদর্শক-রূপে সঙ্গে লইয়া গোতমাশ্রমগামী সেই জলমগ্ন ও কর্দ্দমাক্ত গলিপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধান্যক্ষেত্রের আ'ল ঘুরিয়া প্রায় ৯॥ ঘটিকার সময়ে গোতমাশ্রমে পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিকে প্রায় ছয়ক্রোশ-ব্যাপী প্রান্তরের মধ্যভাগে একটি কুল্যার (কৃত্রিম-নদীর) পশ্চিমতীরে একটি জাঙ্গালের মত উচ্চভূমির উপরিভাগে কথিত গোতম ঋষির পবিত্র আশ্রম বিরাজিত। ক্ষুদ্র ইষ্টকে নির্ম্মিত একটি অপ্রশস্ত জীর্ণ কোঠা আছে, উহাই গোতমের গৃহ বলিয়া বিশ্রুত। ঐ গৃহটি যে পরবর্ত্তী কালে গোতমের আশ্রমের চিহ্নরূপে কোন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, স্থানীয় লোকদের মুখে তাহা শ্রুত হইলাম। জীর্ণকুঠরীটির উত্তর পার্শ্বে একটি খোলার ঘরে গোতমাশ্রমের একমাত্র পুরোহিত গৌড়-ব্রাহ্মণ বনোয়ারি দাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নৃসিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। নৃসিংহ-মন্দিরের উত্তরে দুইটি বটবৃক্ষ। আর গোতমের নামে পরিচিত সেই জীর্ণ কুঠরীটির দক্ষিণভাগে একটি বটবৃক্ষ। সম্মুখভাগ দিয়া পূর্ব্বোক্ত কুল্যা বা কৃত্রিম সরিৎ প্রবাহিত। সেই কুল্যার মধ্যে পাঁচটি সারি সারি কূপ আছে। এই কূপের বিবরণ ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকে ও কুল্যার বৃত্তান্ত ব্রহ্মপুরাণের গৌতমী-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে। পরে যথাস্থানে উহার আলোচনা করা যাইবে। গোতম-প্রান্তরের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উহার সূচ্যভূমিও অকর্ষিত নাই। সর্ব্বত্রই হরিদ্বর্ণ ধান্যরাজিতে প্রান্তরটি শ্যামায়মান। এই

প্রান্তরের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, কখনও নিষ্ফল হয় না। তজ্জন্যই বলিতেছি, মহর্ষি গোতমের যে শুধু দার্শনিক প্রতিভাই ছিল, তাহা নহে, তাঁহার অপার বৈষয়িক বুদ্ধিও ছিল। এই ঋষির কৃষি-কার্য্যের উপযোগী ভূমি-নির্ব্বাচনের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মিথিলা-প্রদেশের যে ভূমি-খণ্ড সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং স্বর্ণপ্রসূ, মহর্ষি গোতম কৃষি-কার্য্যের নিমিত্ত তাহাই অধিকার করিয়াছিলেন। বৎসরের মধ্যে একাদশ মাস কাল প্রাচীন যুগের এই পবিত্র আশ্রম, মহর্ষি গোতমের ক্ষীণ স্মৃতি লইয়া নীরবে অবস্থান করে। প্রতি বৎসর সমস্ত কার্ত্তিকমাসব্যাপী অহল্যাস্থানে (আহিরিয়ায়) একটি মেলা হয়। সেই সময় কতক কতক যাত্রী—বিশেষ পণ্ডিতশ্রেণীর লোকেরা—ক্লেশস্বীকারপূর্ব্বক এই আশ্রম সন্দর্শন করিতে আসেন। সেই যাত্রিগণের প্রদত্ত দুই চারিটি পয়সা তীর্থপুরোহিত বনোয়ারিদাসের জীবনোপায়। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, একমাত্র বনোয়ারিদাস এই তীর্থের রক্ষক। বর্ষাগমে যখন অপরাহ্নে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়, নিরন্তর মুষলধারে বৃষ্টি ও করকাপাত হইতে থাকে, কৃষকগণ স্ব স্ব আবাস-গ্রামে প্রস্থান করে, তখনও বনোয়ারিদাস এই তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তরে একাকী বাস করে। তাহার ভয় নাই, আলস্য নাই, কোন বিষয়ে বাসনা নাই—বনোয়ারিদাস একজন সাধক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে একখানা মুদী-দোকান কেহ করে না কেন?" বনোয়ারিদাস বলিলেন, "কাহার সাধ্য এখানে দোকান খোলে? আমি ত একজন গরিব ব্রাহ্মণ, সকলেরই দয়ার পাত্র। যদি দুই তিন ক্রোশস্থ দোকান হইতে এক পয়সার বাতাসা, কি দুপয়সার তৈল ক্রয় করিয়া আনি, তৎক্ষণাৎ তাহা লুট হইয়া যায়। আমার চক্ষের উপরে আমাকে না বলিয়া তেলের ভাঁড়টি নিজের মাথার উপরে উপুড় করে ও বাতাসা কখানি মুখে ফেলিয়া দেয়।" আমি বলিলাম, "কাহারা লুট করে?" ব্রাহ্মণ ভীত ভীত ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এই মাঠের কৃষকেরা।" দিনান্তে যখন কৃষকেরা গৃহগমনোন্মুখ হয়, তখন ব্রাহ্মণ কোন সুগুপ্ত স্থান হইতে আটা বাহির করিয়া রুটী করিতে বসে। আমরা সেই গোতমের আনীত কুল্যায় স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তীর্থ-পুরোহিত বনোয়ারিদাস সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করাইলেন। আমরা দক্ষিণান্ত শেষ করিয়া জলে অবতরণ করিলাম। আমাদের সঙ্গের লোকেরা বস্ত্রাদি লইয়া বহুদূরভ্রমণপূর্ব্বক ঐ কুল্যার অপ্রশস্ত স্থান পার হইয়া পূর্ব্ব তীরে গেল। আমরা স্নানকালে জলে নিমজ্জিত হইয়া হাতড়াইয়া দেখিলাম—উত্তর-দক্ষিণে সেই কৃত্রিম নদীর মধ্যে সারি সারি পাঁচটি কূপ আছে। ঐ কূপসকল হইতে নিয়ত সুশীতল জল উত্থিত হইতেছে। কূপগুলির মধ্যে জল যেরূপ গভীর ও শীতল, নদীর অন্য অংশে সেরূপ নহে। কূপগুলির মুখ প্রস্তরে গ্রথিত। আমরা সেই পুণ্যনদীতে স্নানসন্ধ্যা শেষ করিয়া, পূর্ব্বতীরে উঠিলাম। ঐ সময় আমাদের লোকেরাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রান্তরের পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া আমরা শকটে আরোহণ করিলাম। যখন অহল্যাস্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন পূর্ব্বাহ্ণ একাদশ ঘটিকা।

গোতমাশ্রম ও অহল্যাস্থান, দুই ক্রোশমাত্র ব্যবধান। গোতম-প্রান্তর পার হইলেই পূর্ব্বদিকে অহল্যাস্থান পাওয়া যায়। অহল্যাস্থানের বর্ত্তমান নাম আহিরিয়া। অহল্যা কথা হইতেই "আহিরিয়া" কথার উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে বাজারহাট কিছুই নাই। কেবল দরভঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজ রমেশ্বর সিংহ বাহাদুরের প্রপিতামহ স্বর্গীয় মহারাজ ছত্রসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ মন্দির বিদ্যমান। ঐ মন্দিরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি পরিপূজিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আম্রকানন। দক্ষিণদিকে বৃক্ষতলে একটি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের বেড়া নাই, তিনদিক অনাবৃত। তাহার মধ্যে ভস্ম ছড়ান, তাহার উপরিভাগে পুষ্পমালা, সিন্দূর, চন্দনে চর্চ্চিত একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে। উহাই গোতমপত্নী অহল্যার পাষাণী মূর্ত্তি বলিয়া প্রদর্শিত হয়। একটি সধবা ব্রাহ্মণী, স্রক্, চন্দন ও সিন্দূরাদি দ্বারা অহল্যার পরিচর্য্যা ও পূজা করেন। পুরুষেরা দর্শন, বন্দনা, প্রদক্ষিণ ও দূর হইতে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে পারেন কিন্তু স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। অহল্যার কুটীরের কিঞ্চিৎদূরে দক্ষিণ দিকে অহল্যাহ্রদ। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই হ্রদের জল দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কিন্তু ঐ হ্রদের পশ্চিমদিকে আর একটি বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহার জল অন্যান্য জলাশয়ের তুল্য। রামশরণ আগরওয়ালা নামক একজন ধনী অল্প দিন হইল, অহল্যা-হ্রদের সিঁড়ী-বাঁধা ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা মন্দিরে উপস্থিত

হইয়া দেখিলাম, পাক প্রায় শেষ হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় চিত্রধর মিশ্র-মহাশয় আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আমরা মৈথিল ব্রাহ্মণ, অন্য ব্রাহ্মণের হাতে আহার করি না, কিন্তু এখানে এক কনোজিয়া ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি অতি শুদ্ধাচার ও হরিপরায়ণ, তাঁহার হস্তে আমি আহার করিয়া থাকি; বোধ হয়, আপনাদেরও কোন আপত্তি হইবে না।" আমরা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আহারের স্থান হইল। মিশ্র-মহাশয় পঞ্চাশ বৎসরের পর হইতে অন্ন ও রুটী সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন; তিনি ফল, মূল, দুগ্ধ,দধি, ঘৃত, নবনীত ইত্যাদি ভোজন করিয়াই জীবন রক্ষা করেন। প্রধানতঃ অপক্ক কদলীই তাঁহার ভক্ষ্য। যেখানে তিনি গমন করেন, কিছু কাঁচা কলা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। যাত্রাকালে কদলী-দর্শন শুভফলপ্রদ নয় বলিয়া অদ্য প্রাতঃকালে এখানে আসিবার সময় তাঁহার অন্তেবাসিগণ একছড়া সুপুষ্ট কাঁচা কলা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া আনিয়াছিল, তদ্দ্বারা রোটিকা প্রস্তুত হইল। প্রথমে কাঁচাকলার বোঁটা ও অগ্রভাগ কাটিয়া সিদ্ধ করিতে হয়, তাহার পর উহার ত্বক্ উন্মোচনপূর্ব্বক চটকাইয়া রুটী করিতে হয়। সেই রুটী সেকিয়া ঘৃতে নিমজ্জিত করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, উহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। মিশ্র-মহাশয়ের বয়স এখন ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। অতএব প্রায় ২১ বৎসর কাল তিনি এই খাদ্য আহার করিয়া বিলক্ষণ বলিষ্ঠ আছেন। আমাদের জন্য গ্রাম্য রমণীদের পেষা মোটা আটার তাল পাকাইয়া প্রায় আধপোয়া ময়দার এক একখানি রুটী করা হইল, সেকিবার কৌশলে উহার সমুদয় অংশ বিলক্ষণ পরিপক্ক হইল। ঐ উষ্ণ রুটীগুলি সুগন্ধি গব্য ঘৃতে ছাড়িবা মাত্র চোঁ করিয়া ঘি শুষিয়া লইতে লাগিল এবং বিলক্ষণ হাল্‌কা বোধ হইল। অহল্যাস্থানের দধি বড়ই উৎকৃষ্ট, ছুরি দিয়া কাটিয়া বিক্রয় করে। দধিভোজনের সময় হাতে মাখন জড়াইয়া যায়, আস্বাদ অতি উত্তম। দধির সের ৵০ মাত্র। মিষ্টান্ন এখানে প্রস্তুত না হইলেও শর্করা পাওয়া যায়। এখানে দোকান না থাকায় ঘৃত, আটা, দুগ্ধ, শর্করা, ডাল, তরকারী, গৃহস্থদের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বৈদেশিক আগন্তুকদের পক্ষে ঐ দ্রব্যসকল সংগ্রহ করা সহজ নহে। মিশ্র-মহাশয়ের যত্নে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার উত্তমরূপ সম্পন্ন হইল। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, ভারি রুটী সহজে হজম হইবে না, কিন্তু এখানকার ইঁদারার স্বচ্ছ সুপেয় জল পান করার পর সে আশঙ্কা দূর হইল। গ্রামটি নিতান্ত ছোট নহে; এখানে একঘর কনোজিয়া ব্রাহ্মণ, পাঁচ সাত ঘর মৈথিল ব্রাহ্মণ, দুই চারিঘর ছত্রি ও গোয়ালা, অবশিষ্ট সমস্তই বাভন। গোতম-প্রান্তরের অধিকাংশ ভূমি কৃষিজীবী বাভনদের অধিকৃত। তজ্জন্য বাভনদের এখানে অত্যন্ত প্রতাপ। গ্রামে বিদ্যা-চর্চ্চার অত্যন্ত অভাব, একটি পাঠশালাও নাই। যাহার ছেলের লেখা-পড়া শিখাইবার ইচ্ছা হয়, সে ছেলেকে কামতৌল-ষ্টেসনের সন্নিহিত পাঠশালায় পাঠায়। দরভঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজ রমেশ্বরসিংহ বাহাদুর কামতৌল-ষ্টেসন হইতে অহল্যাস্থান হইয়া গোতমাশ্রম পর্য্যন্ত একটি উচ্চ রাজপথ ও গোতমাশ্রমে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু অহল্যাস্থান ও গোতম-প্রান্তর এক মুসলমান জমিদারের জমিদারির অন্তর্গত। উক্ত জমিদার আপত্তি করায় এপর্য্যন্ত মহারাজ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

আহারান্তে মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দায় ছোট খাট একটি সভা বসিয়া গেল। গোতমাশ্রম ও অহল্যাস্থান সম্বন্ধে স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট অনুসন্ধান করাই ঐরূপ বৈঠকের উদ্দেশ্য। মন্দিরের নিকটে কোন লোকালয় নাই, বিশেষ গ্রামবাসী সকলেই কৃষিজীবী, দিবসে সকলেই প্রান্তরে থাকে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অদূরে একটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমে ললিতকিশোরীশরণ নামে এক রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আছেন। ইনি জাতিতে বাভন (ভূঁইহার ব্রাহ্মণ), মিথিলারই কোন গ্রামে বাড়ী ছিল। বাল্যকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও ইদানীং রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছেন। নানা তীর্থ পর্য্যটনের পর, কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই বিজন অহল্যাস্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন। আপন মনে পূজাপাঠ করেন এবং সায়ংকালে গ্রামের প্রধানদের বাটীতে গিয়া, দুই এক ঘণ্টা করিয়া গল্পচ্ছলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন। গ্রামবাসীরা যাহা দেয়, তাহাতেই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এই ললিতকিশোরীশরণ এখানে পণ্ডিত-বাবাজী

বলিয়া বিলক্ষণ সম্মানিত। মিশ্রমহাশয় বলিলেন—"এই বাবাজী পুরাণ-শাস্ত্রে যেমন পণ্ডিত, তেমনি বশী!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইনি ত সন্ন্যাসী, স্বহস্তে পাক করিতে পারেন না, পাক করিয়া দেয় কে?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"এক মাতাজী হৈ, ও আপনা ঠাকুরকা ভোগ বানাতে হেঁ, উসকোবি দেওতাকা ভোগ বানাতে হেঁ। ওবি এহি তীরথমেঁ তপস্যা করতেহেঁ।" মিশ্রমহাশয় ললিত-কিশোরীশরণকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি আসিলেন। মস্তকে একটি জটা, ললাটে ব্রহ্মানুজসম্প্রদায়-সম্মত তিলক, গৈরিক বসন, পায়ে কাষ্ঠ-পাদুকা, শরীরের আকৃতি দীর্ঘ. স্থূল অস্থি ও মাংসপেশী দেখিয়া মনে হইল, বাবাজী এক সময়ে অতি বলবান্ পুরুষ ছিলেন। এখন বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছে, চক্ষুদ্বয় কথঞ্চিৎ কোটরস্থ এবং জ্যোতিঃহীন বোধ হইল। তিনি বলিলেন—"আপনারা গোতমের আশ্রমে গোতমী গঙ্গা বা ক্ষীরোদধির মধ্যে যে পাঁচটি কূপ দেখিলেন, উহা দেবদত্ত কূপ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে গোতমের ঐ কূপ-লাভের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।" তাহার পর, তিনি তাঁহার খাতা হইতে একটি ঋক্ লিখিয়া লইতে বলিলেন। আমি উহা লিখিয়া লইলাম। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৪শ অধ্যায়ের ৮৫ সূক্তে ঐ ঋক্‌টি আছে। কিন্তু ললিত-কিশোরীশরণের প্রদত্ত ঋকের পাঠের সহিত একটু অমিল হইল। যাক, সে অমিল ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। নিম্নে সায়ণের ভাষ্যের সহিত ঐ ঋক্‌টি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা;—

"জিহ্মং নুনুদ্রেঽবতং তয়া দিশা
সিংচন্নুৎসাং গোতমায় তৃষ্ণজে।
আ গচ্ছংতীমবসা চিত্রভানবঃ
কামং বিপ্রস্য তর্পয়ংত ধামভিঃ॥ ১১॥"

সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য।—'মরুতোঽবতমুদ্ধৃতং কূপং যস্যাং দিশি ঋষির্বসতি তয়া দিশা জিহ্মং বক্রং তির্য্যংচং নুনুদ্রে। প্রেরিতবংতঃ। এবং কূপং নীত্বা ঋষ্যাশ্রমেঽবস্থাপ্য তৃষ্ণজে তৃষিতায় গোতমায় ঋষয়ে তদর্থমুৎসং জলপ্রবাহং কূপাদুদ্ধৃত্যাসিংচন্। আহাবেঽবানয়ন্। এবং কৃত্বেমমেনং স্তোতারমৃষিং চিত্রভানবো বিচিত্রদীপ্তয়স্তে মরুতোঽবসেদৃশেন রক্ষণেন সহাগচ্ছংতি। তৎসমীপং প্রাপ্নুবংতি। প্রাপ্য চ বিপ্রস্য মেধাবিনো গোতমস্য কামমভিলাষং ধামভিরায়ুষোধারকৈরুদকৈস্তর্পয়ংত। অতর্পয়ন্।'

উদ্ধৃত ঋক্‌টির ব্যাখ্যা বিশদ করিবার জন্য বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য তাঁহার ভাষ্য-মধ্যে পুরাকাল হইতে প্রচলিত একটি আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা;—

'অত্রেয়মাখ্যায়িকা। গোতম ঋষিঃ পিপাসয়া পীড়িতঃ সন্ মরুত উদকং যযাচে। তদনন্তরং মরুতোঽদূরস্থং কূপমুদ্ধৃত্য যত্র স গোতম ঋষিস্তিষ্ঠতি তাং দিশংনীত্বা ঋষি সমীপে কূপমবস্থাপ্য তৎপার্শ্বে আহাবংচকৃত্বা তস্মিন্নাহাবে কূপমুৎসিচ্য তমৃষিং তেনোদকেন তর্পয়াংচক্রুঃ।'

প্রথমে আমরা সায়ণাচার্য্যের অভিপ্রায় অনুযায়ী ঋক্‌টির মর্ম্ম বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করিতেছি। যথা;—দেবতারা উদ্ধৃত কূপটি যে দিকে ঋষি বাস করেন, সে দিক্ দিয়া বক্রভাবে প্রেরণ করেন। এইরূপে কূপ লইয়া গিয়া ঋষির আশ্রমে স্থাপনপূর্ব্বক তৃষিত গোতম ঋষিকে তাঁহার জন্য উৎস অর্থাৎ জলপ্রবাহ কূপ হইতে তুলিয়া সেচন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই জল কূপের সমীপস্থ আহাবে (চৌবাচ্ছায়) আনয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ করিয়া এই ঋষির সমীপে বিচিত্র দীপ্তিশালী দেবগণ ঈদৃশ সাহায্য সহ আগমন করেন। আগমনের পর, সেই মেধাবী ঋষি গোতমের অভিলাষকে আয়ুর ধারক (অর্থাৎ জীবনরক্ষার উপায়, জল দ্বারা) তৃপ্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ গোতমের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

আখ্যায়িকাটি সহজ এবং উহার অভিপ্রায় ঋক্‌টির অভিপ্রায় হইতে অভিন্ন। সুতরাং বাঙ্গালা অনুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। এই ঋক্‌টি যে আর্য্যগণের মিথিলায় উপনিবেশ-স্থাপনের পর গোতমের আবাদে কূপ-খনন ও অন্য কোন জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া জল আনয়নপূর্ব্বক কূপ-সমীপস্থ চৌবাচ্ছা পূর্ণ করার ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন যেমন পাহাড় কাটিয়া যেখানে সেখানে নদী আনয়ন করাও নিত্য ঘটনার মধ্যে গণ্য তখন কিন্তু তিন চারি ক্রোশ হইতে জল আনয়ন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এরূপ ঘটনাও বোধ হয়, এই প্রথম ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য ঐ ঋক্‌সূক্তের রচয়িতা ঋষি রূপকের সাহায্যে ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। স্থানটির প্রাকৃতিক অবস্থা দেখিলেও তাহাই মনে হয়। ক্ষুদ্র নদীটি উত্তর দিক্ হইতে (বোধ হয়, কোন নদী বা হ্রদ হইতে) অতি অপ্রশস্তভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া

আসিয়া গোতমের আশ্রমের সম্মুখে একটি দীর্ঘ পুষ্করিণীর আকার ধারণপূর্ব্বক অতিসূক্ষ্মভাবে দক্ষিণাভিমুখে গিয়া প্রান্তরের প্রান্তদেশে মিলাইয়া গিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ ঋকে "অবত" ও "উৎস" এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ আছে। এই বৈদিক "অবত" শব্দ হইতেই প্রচলিত "অবট" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 'অবট' শব্দের অর্থ 'গর্ত্ত' আর 'উৎস' অর্থে 'ঝরণা'। ঝরণা পর্ব্বত ব্যতীত কখনও সমতল ভূমিতেও দেখা যায়। বোধ হয়, মহর্ষি গোতম যখন খাল কাটিয়া জল আনয়ন করেন, তখন তাঁহার আশ্রম সমীপে ঝরণা বাহির হইয়াছিল। তাহার পার্শ্বে পুষ্করিণী খনন করিয়া জলের সংস্থান করিয়াছিলেন।

তাহার পর, আমরা প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম—"গোতমের আশ্রম-প্রান্তরের মধ্যভাগে, অহল্যার স্থান দুই ক্রোশ দূরে হইল কেন ?" তাহার উত্তরে ললিতকিশোরীশরণ বলিলেন—"মহর্ষি গোতম ছিলেন রাজা, বৈদিক কালে যাঁহার অধিক ধান্য ও গোধন থাকিত, তাঁহাকেই লোকে রাজা বলিত। গোতমের একটি আশ্রম ছিল, ছাপরা নগরীর সন্নিহিত ভাগীরথীতীরে*—আর একটি এই গোতম-প্রান্তরে। এই অহল্যাস্থান ছিল তাঁহার উদ্যান। মহর্ষি গোতমের প্রতি বিরক্ত হইয়া অহল্যা-ঠাকুরাণী গোসা করিয়া কিছু কাল এখানে বাস করিয়াছিলেন। শেষে ঋষি অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া অহল্যাকে গৃহে লইয়া যান। প্রকৃত পক্ষে অহল্যার কোনই দোষ ছিল না। আমি এদেশে প্রচলিত কিংবদন্তীটি আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি; তাহা শুনিলেই যথার্থ ঘটনাটি কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। গঙ্গাতীরে গোতমের একটি আশ্রম থাকিলেও এই গোতম-প্রান্তরে স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমিতে যে আশ্রম ছিল, এই আশ্রমেই অহল্যা সহ গোতম ঋষি, বৎসরের অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। এখানে তাঁহার কয়েকটি অন্তে-বাসীও ছিল। তিনি প্রতিদিন প্রান্তরটি বিচরণ করিয়া কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন; অবশিষ্ট সময় আশ্রমে বসিয়া ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। ধরিতে গেলে অতি অল্প সময়ই তিনি আশ্রমে থাকিতেন। এই সামান্য অবকাশে তাঁহার পত্নী-সম্ভাষণ অল্পই ঘটিত। এই আশ্রমে অহল্যা অধিকাংশ সময় একাকিনী থাকিতেন। যাঁহার বাক্‌শক্তি আছে, তিনি কি কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন ? অনেক সময় তাঁহাকে ছাত্রদের সঙ্গে কথোপ-কথন করিতে হইত। এক সময় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। গোতম ছিলেন ধান্যের রাজা, তাঁহার বহুধান্য সঞ্চিত ছিল। নানাদিগ্ দিগন্ত হইতে ঋষিগণ সপরিবারে আসিয়া গোতমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোতমও অতি আদরের সহিত তাঁহাদিগকে আশ্রমে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। জল লইয়াই যত অনর্থপাত। ঋষি-পত্নীরা যখন কূপের ধারে স্নান করেন, গাত্র ধৌত করেন, ছাত্রেরা তখন জল আনিতে যাইত। ঋষিপত্নীরা মনে মনে বিরক্ত হইয়া ছাত্রদের আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তাহারা জল পায় না, অহল্যার নিকটে অভিযোগ করিল। অহল্যা ঋষি-পত্নীদিগকে বলিলেন—'কেন, উহারা জল লইবে না, তবে কি পিপাসায় মরিয়া যাইবে ? আপনারা অতিথি, উহারাও ছাত্র, সকলেই কূপের জল ব্যবহার করিবেন।' সুতরাং ছাত্রেরা আর বারণ মানিল না, যখন তখন জল আনিতে যাইত। ইহাতে ঋষিপত্নীদের অভিমানে দারুণ আঘাত লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন—এই উন্মুক্ত প্রান্তরে আমাদের স্নানকালে ছাত্রদের আসা যে অবৈধ, অহল্যা রমণী হইয়াও তাহা বুঝিলেন না, ছাত্রদেরই পক্ষ অবলম্বন করিলেন ? নারী জাতি স্বভাবতঃ ঈর্ষ্যাপরায়ণ। অহল্যা একে স্থির-যৌবনা অলৌকিক সুন্দরী, তাহাতে আবার সর্ব্ব-সৌভাগ্যের অধিকারিণী; সুতরাং তাঁহার উপর ঋষিপত্নীদের অসূয়া উৎপন্ন হইবে না কেন ? তাঁহারা অহল্যার ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতির একটা কদর্থ কল্পনা করিলেন। ঋষি আশ্রমে আসিলে, তাঁহারা অহল্যা ও ছাত্রসংক্রান্ত নানা কথা নানা ছাঁদে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেন। ঋষির মনের মধ্যে হয় ত ঐ বিষয়ের একটা আলোচনা চলিতেছিল; এই অবস্থায় একদিন ঋষি আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, একটি বিদ্যার্থী আশ্রমের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। এরূপ ঘটনা কিছু নূতন নহে; তথাপি ঐ দিন সহসা ঋষির হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি ছাত্রটিকে তিরস্কার

* এই ছাপরা নগরীর সন্নিহিত গোতমের আশ্রম এখন গোধনা নামে খ্যাত। কেহ কেহ গোটনা লেখেন। কিছু দিন পূর্ব্বে মহর্ষি গোতমের স্মরণার্থ ঐ স্থানে "গোতম পাঠশালা" নামে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ চতুষ্পাঠীর সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৫০৲টাকা প্রদান করেন।

করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং অহল্যাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। অহল্যা একে নির্ম্মলস্বভাবা, তাহাতে আবার অত্যন্ত অভিমানিনী। সেই দারুণ প্রান্তরে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ঋষিপত্নীদের তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া, এখানে কুটীরনির্ম্মাণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল মৌনভাবে অবস্থিতি করেন। তিনি ভস্মের উপর শয়ন করিতেন, অতি সামান্য ফলমূলের দ্বারা তাঁহার জীবন রক্ষিত হইত। তিনি কাহারও দৃষ্টিপথে উপনীত হইতেন না। এই রূপে অনেকদিন অতিবাহিত হয়। তাহার পর, মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন রামলক্ষ্মণকে লইয়া এই পথে মিথিলা নগরীতে (বর্ত্তমান জনকপুরে) গমন করেন, তখন মিথিলারাজ্যময় উৎসব হয়। মহর্ষি গোতম অহল্যাকে অতি আদরের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক সপত্নীক হইয়া রামলক্ষ্মণকে অভ্যর্থনা করেন। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ ব্যাপার। অহল্যার কোনই দোষ ছিল না, তাঁহার বিরুদ্ধে রামায়ণাদিতে যে সকল উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সমস্তই কবিকল্পনা।" তাহার পর, মহামহোপাধ্যায় মিশ্র-মহাশয়ও বলিলেন—"বাবাজীর কথাই সত্য, অহল্যার কোনই দোষ ছিল না। আমাদের দেশে এই রূপ গল্পই প্রচলিত আছে।" চতুর্দ্দিকে মন্দিরের পূজারি, পাচক, ভৃত্য, দ্বারবান্ দাঁড়াইয়া প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা শুনিতেছিল, তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "অহল্যার কোন দোষ নাই!" তখন আক্রোশে তাহারা অশ্রাব্য ভাষায় গুন্‌গুন্ করিয়া দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ঋষিপত্নীদের উপর গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া আমার হাসি পাইল। তখন মনে হইল, যেন অহল্যার আচরণসম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত কমিশন বসিয়াছে, আমরা তাহার সাক্ষীসাবুদ লইতে আসিয়াছি!

আমি বলিলাম—"বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিতগণের সহিত বিখ্যাত মীমাংসক কুমারিলভট্টের যখন বিচার হয়, তখন বৌদ্ধগণ প্রশ্ন করেন, 'যাঁহারা সদাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদেরও ত ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাহার পর, তাঁহারা বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ হইতে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে * 'ইন্দ্রোবৈ অহল্যাজারঃ' এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলেন—যিনি যজ্ঞেশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র তিনিও এই গুরুতর পাপ করিয়াছিলেন।' উহার উত্তরে কুমারিলভট্ট বলিয়াছিলেন—'উদ্ধৃত শ্রুতি রূপক মাত্র। ইন্দ্র অর্থ সবিতা, অহল্যা অর্থ রাত্রী, জার অর্থ ক্ষয়কারী। সূর্য্যোদয়ে রাত্রি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া ঐ শ্রুতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। অথবা ইন্দ্র জলবর্ষণ দ্বারা অহল্যা (অকৃষ্টা) ভূমিকে জীর্ণা (কর্ষণযোগ্যা) করেন, এ অর্থও করা যাইতে পারে।' উহার উত্তরে ললিতকিশোরীশরণ যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই; —"কুমারিলভট্ট বিচার-স্থলে বাদী জয় করিবার উদ্দেশ্যে যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন, অহল্যা-গোতমের বৃত্তান্ত যে বাস্তব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা যুগযুগান্তর হইতে ধারাবাহিকরূপে লোক-স্মৃতিতে বিরাজ করিতেছে, যাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল বিদ্যমান, তাহা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।" প্রকৃতপক্ষেও স্থানটি দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটি দৃঢ় ধারণা হয়, ঐ প্রান্তর-মধ্যেই গোতমের আশ্রম ছিল এবং অহল্যা বিরক্ত হইয়া কিছু দিন ঐ প্রান্তর-সন্নিহিত উপবন-মধ্যস্থিত আশ্রমে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ, বাল্মীকি-রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই অহল্যা-গোতমের বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক কালের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা না হইলে ঐ সকল গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত স্থানপ্রাপ্ত হইত না। তবে ঘটনা অতিসামান্য, অহল্যা ও গোতমের একটু প্রণয়কলহ মাত্র। বৈদিক ঋষিদেরও নষ্টামি বুদ্ধির একান্ত অভাব ছিল না। সুরসিক ঋষিদের মুখরোচক হইবে ভাবিয়া "ইন্দ্রো বৈ অহল্যাজারঃ" এই শ্রুতি রচনা করিয়া, এই সামান্য ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। নতুবা কোথায় মিথিলা, আর কোথায় ইন্দ্র! বোধ হয়, মানহানির অভিযোগের ভয়ে, দ্ব্যর্থক শ্রুতির অবতারণা করা হইয়াছিল। কবিদের লেখনী দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়া উহা পরে একখানি কাব্যের আকার ধারণ করিয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৪৮ সর্গে এই ঘটনাটি এরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইচ্ছাসত্ত্বেও ঐ রূপ অনবগুণ্ঠিত আদিরসের শ্লোক-কয়টির বঙ্গানুবাদ করিতে সমর্থ হইলাম না। বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস, বাল্মীকি-রামায়ণে অবর্ণিত ইন্দ্রের শরীরে অশ্লীলচিহ্নের আরোপ করিয়া বাল্মীকির উপরেও টেক্কা দিয়াছেন। এই ঘটনাটি ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে

* "সমস্ততেজঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যং সবিতৈব অহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যা শব্দবাচ্যায়া ক্ষয়াত্মক-জরণ হেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রী-ব্যভিচারাৎ।"

ভিন্ন ভিন্ন আকারে বর্ণিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষকালে যে ঋষিগণ সপরিবারে গোতমের আশ্রমে আসিয়া, সুদীর্ঘ কালের জন্য আতিথ্যস্বীকার করেন এবং ঋষিগণের অনুরোধেই গোতম তপস্যাদ্বারা গোতমী-গঙ্গাকে আনয়ন করেন, এ বৃত্তান্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বর্ণিত আছে। সেই পুরাকালের ঘটনা পরবর্ত্তী ঋষিগণের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবার সময়ে দেশকাল সম্বন্ধে কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে। সর্ব্বশেষে শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রশ্ন করিলেন ;—

"এই প্রান্তরেই যে, মহর্ষি গোতমের আশ্রম ছিল এবং অহল্যা কিছুকাল অত্রত্য উপবনে বাস করিয়াছিলেন, তাহা যেন বৈদিক সূক্ত, রামায়ণ, পরম্পরাগত কিংবদন্তী ও লৌকিক বিশ্বাস দ্বারা স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই গোতমই যে ন্যায়সূত্রকার গোতম, তাহার প্রমাণ কি ?"

ইহার উত্তরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিত্রধর মিশ্র-মহাশয় বলিলেন—"এই গোতমই যে ন্যায়সূত্রকার গোতম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ দেখুন, ঋগ্বেদে গোতম মেধাবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মেধাবী ব্যতীত ন্যায়-দর্শনের ন্যায় অতি সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচায়ক দর্শনশাস্ত্রের সূত্র রচনা করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। বেদ, স্মৃতি, পুরাণে এক-মাত্র গোতমেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি সংহিতাকার, তিনি গোতম। আর এই ন্যায়দর্শন মিথিলা প্রদেশেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, ইহা সর্ব্বদেশ-বিদিত।"

প্রকৃতপক্ষেও মিথিলার গোতমই যে, ন্যায়সূত্রকার এবং এই প্রান্তরেই যে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার আশ্রম ছিল, নানা কারণ-পরম্পরায় আমাদেরও ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ বিশ্বাস হইল। বৌদ্ধ এবং জৈন তার্কিকদিগের মত খণ্ডন করিতে গিয়াই যে, ন্যায়দর্শন পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ইহা বহু পণ্ডিতের মত। সে দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও এখানেই ন্যায়সূত্রকারের আশ্রম থাকা বিশেষ সম্ভব বোধ হয়। কারণ, মিথিলার এই অংশটিই ইতিহাসাতীত কাল হইতে জ্ঞান-চর্চ্চার স্থান বলিয়া পরিচিত। কামতৌল ষ্টেসনের একক্রোশ উত্তরে কমলা নদীর পশ্চিম তীরে যাগবন (যাজ্ঞবল্ক্য-বন) দৃষ্ট হয়। মহামহোপাধ্যায় মিশ্র-মহাশয় বলিলেন—"ঐ স্থানেই প্রাচীন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আশ্রম ছিল।" এই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই রাজর্ষি জনকের আত্ম-জ্ঞান-পরীক্ষার্থ মিথিলা নগরীতে (বর্ত্তমান জনকপুরে) জনকের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাগবনে (যাজ্ঞবল্ক্য-বনে) একটি পাঁচবিঘা-ভূমি-ব্যাপী বটবৃক্ষ আছে। ঐরূপ বৃক্ষ ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে আছে বলিয়া জানা যায় নাই। বহু-লোকে ঐ প্রাচীন পবিত্র মহীরুহ সন্দর্শন করিতে আসে। গোতমাশ্রমের পশ্চিমে (প্রান্তর-শেষে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে) রত্নপুর নামে একটি অতি প্রাচীন গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে জৈনগণের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে ১৫শ তীর্থঙ্কর ধর্ম্মনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এখনও রত্নপুর জৈনসম্প্রদায়ের একটি তীর্থস্থান। আর্যকালের পরে এদেশে যে, জৈনধর্ম্মের ও জৈনন্যায়েরও বিলক্ষণ আলোচনা হইয়া-ছিল, তাহা বিলক্ষণ অনুমান হয়। মিথিলা প্রদেশের সন্নিহিত শাক্যরাজ্যের কপিলবস্তু নগরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। অতএব জৈন পণ্ডিত ও বৌদ্ধপণ্ডিতগণ গোতমের ন্যায়সূত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াই যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের যুক্তির অনুকূল ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে মিথিলার অধিকাংশ নৈয়ায়িকের বাস গোতম-প্রান্তরের চতুর্দ্দিকেই বিদ্যমান। তীর্থঙ্কর ধর্ম্মনাথের জন্মস্থান রত্নপুরে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক নৈয়ায়িকের বাস ছিল। এখনও রত্নপুরের নিকটবর্ত্তী বহরম্পুরে ও গোতমস্থানের একক্রোশ পশ্চিমে চকৌটী গ্রামে অসংখ্য নৈয়ায়িকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মিথিলার গোতম-প্রান্তরেই যে, ন্যায়সূত্রকার গোতমের আশ্রম ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

দিবা অবসান-প্রায়। আমরা ষ্টেসনে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। মিশ্র-মহাশয়, নির্ব্বন্ধসহকারে সেই রাত্রি অহল্যাস্থানে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আপনাদের সহিত এইরূপ স্থানে আর যে কখনও মিলন ঘটিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। অতএব আসুন, এই তীর্থস্থানে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে আনন্দে সকলে মিলিয়া রাত্রি কাটান যাউক।" কিন্তু আমাদের এই শরদীয়া-পূজার অবকাশে আব্রহ্মস্তম্ভ-পর্য্যন্ত বহু স্থান সন্দর্শন করিতে হইবে, সুতরাং আমার ভ্রাতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পূজারি, পাচক, ভৃত্য প্রভৃতিকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। ললিতকিশোরীশরণ তাঁহার আশ্রম-সন্দর্শন

করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া, বৈকালিক স্নানের নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। মিশ্র-মহাশয় বলিলেন— "চলুন, যাইবার কালে ললিতকিশোরীশরণ ও তাঁহার ধর্ম্ম-ভগিনীর (ধরম্ বহিন) দেবমূর্ত্তিসকল সন্দর্শন করিয়া যাইবেন। ললিতকিশোরীশরণের ধর্ম্মভগিনী আশ্রমের অঙ্গনেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমাদিগকে দেখিয়া, অতি আগ্রহ-সহকারে আহ্বান করিলেন। আমার স্মরণ হইল, যখন মন্দিরের বারান্দায় গোতমের আশ্রম-সংক্রান্ত আলোচনা হইতেছিল, তখন মন্দিরের পাশে দাঁড়াইয়া, ইনি কাণ পাতিয়া সকল শুনিতেছিলেন। আকার-প্রকারে বোধ হইল, ইঁহার কিছু লেখাপড়া জানা আছে। আশ্রমবাসিনী উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী, বয়স প্রায় ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে। দীর্ঘাকৃতি, কিঞ্চিৎ স্থূল নিটোল দেহ। নিতম্ববিলম্বী কৃষ্ণ-বর্ণ কেশরাজি, দন্তগুলি মুক্তার মত শাদা চিক্ চিক্ করিতেছে। নাসিকার অগ্রে একটি রুচিসঙ্গত ক্ষুদ্র তিলক। শাদা ধব্ধবে একখানি কাপড় পরিধানে। যেন একটি প্রফুল্ল গন্ধরাজ ফুলের মত আশ্রম আলো করিয়া আছেন। আমার ভ্রাতা, রমণী দেখিলে সে স্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করেন। তিনি আশ্রমের দেববিগ্রহের নিকট প্রণিপাতপূর্ব্বক একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, মিশ্র-মহাশয়ের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে গো-শকটের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। আমি আশ্রমবাসিনীর আগ্রহে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া, তাঁহার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর করিলাম এবং কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া লইলাম। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই, "তিনি মধ্য-ভারতের রেবারাজ্যের এক পুরোহিতের কন্যা, বালবিধবা এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-গুরুগণের শিষ্যা। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা যে গুরুর নিকটে, ললিতকিশোরীশরণের শিক্ষা দীক্ষাও তাঁহারই নিকটে। তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এই ধর্ম্মভ্রাতা ললিতকিশোরীশরণের সহিত এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া পূজা, পাঠ, ধ্যান, ধারণা দ্বারা জীবনযাপন করিতেছেন। পুরোহিত-নন্দিনী রেবা রাজ্যকে "রীঁমা" এইরূপ উচ্চারণ করিলেন। ইঁহার কলিকাতা সম্বন্ধে বড়ই কৌতূহল দেখিলাম। আশ্রম-বাসিনী পুনঃ পুনঃ "কলকত্তা" সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার ধারণা ছিল, মধ্যভারতের রেবারাজ্যটি জঙ্গলপরিপূর্ণ, সেখানে শিক্ষা ও সভ্যতার তত প্রভাব নাই; কিন্তু পুরোহিত-নন্দিনীর রুচি-সঙ্গত আকৃতি, বর্ণ, পরিচ্ছদ, বিনয়পূর্ণ বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় কথা বলিবার পদ্ধতি, এই সমস্ত দেখিয়া আমার পূর্ব্বের সংস্কার দূর হইল। প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধুর ভাব স্বভাবতঃই মানুষের হৃদয়কে সরস করে; তাহার উপর এই আশ্রমবাসিনীর ঐকান্তিক দেবভক্তি ইঁহার স্বভাবকে আরও মধুরতর করিয়াছে।

সঙ্গীরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। এই অপরিচিত বিজন পল্লীতে পাছে পথ হারাইয়া ফেলি, এই আশঙ্কায় বিলম্ব করিতে পারিলাম না। আশ্রম-বাসিনীর মুখে কত প্রশ্ন রহিয়া গেল, কত প্রশ্নের উত্তর বাকী রহিল। আমি বিনীতভাবে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে আসিয়া সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইলাম। এদেশে সর্ব্বত্র কেবল হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র ও আম্রকানন। আম-বাগানের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে কত সুমধুর বিহগ-কাকলী শুনিতে লাগিলাম। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত কিরণে বৃক্ষপত্র রঞ্জিত হইয়াছে। এই সময় সেই দূরে শান্তিময় আহিরিয়া গ্রামখানিকে গোতম-প্রান্তরের কোলে ফেলিয়া আসিতে যেন প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। সেই বেলাটা সেখানে থাকিলে যেন মনের অতৃপ্তি দূর হইত। সায়ংকালে কামতৌল ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। মিশ্রমহাশয় আমা-দিগকে দরভঙ্গায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমরা এখান হইতে অযোধ্যা যাইব। দরভঙ্গা হইতে কাশী হইয়া অযোধ্যা যাওয়ার এক রেলপথ আছে। আবার দরভঙ্গা হইতে সোজা অযোধ্যা যাওয়ার এক রেলপথ আছে। এখান হইতে গোরক্ষপুর পথে অযোধ্যা হইয়া নেপাল-রাজ্যের সীমানার মধ্য দিয়াও অযোধ্যা যাওয়ার রেলপথ আছে। গোরক্ষপুরের সন্নিহিত কুশীনগরে (কুশীনারা) বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। সেখানে মহারাজ অশোকের নির্ম্মিত এক স্তূপ আছে। ঐ স্থান সন্দর্শন আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য, সুতরাং উপস্থিত ট্রেণে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিত্রধর মিশ্র-মহাশয় ও তাঁহার লোকজনকে বিদায় দিয়া, আমরা গোরক্ষপুর-গামী ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য বিচার

[শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা, B.Sc.]

ঋষিকল্প ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়'-পুস্তকে বলিয়াছেন, "আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহা তিন প্রকার, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্।" আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন—"আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তৎসমুদয়কে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—'খনিজ, উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ।" উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে যে সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে মাত্র তাহার কথাই আলোচিত হইবে।

বর্ত্তমানকালে আমরা যাহাদিগকে 'প্রাণী' সংজ্ঞায় অভিহিত করি, প্রাচীনেরা তাহাদিগকে 'জীব' নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহাদিগের ধারণা ছিল যে, 'উদ্ভিদ্' নির্জ্জীব পদার্থ, এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিই সজীব। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভিদেরও জীবনীশক্তি আছে, সুতরাং উহারা নির্জ্জীব পদার্থ নহে। অতএব 'উদ্ভিদ্'কেও 'সজীব' সংজ্ঞার অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একথা বিজ্ঞানানুমোদিতও বটে। কিন্তু তাই বলিয়া, সাধারণ ভাষায় 'জীব' ও 'উদ্ভিদ্'—এই দুইটি শব্দের সাহায্যে আমরা যে দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের ধারণা করি, এবং স্বতঃই আমাদের মনে এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্যের ভাব সঞ্চারিত হয়, তাহা সহসা হৃদয় হইতে অপসারিত করা সম্ভবপর নহে।

প্রাণী—প্রথমে দেখা যাউক, কাহাকে 'প্রাণী' এবং কাহাকেই বা 'উদ্ভিদ্' বলা যায়। প্রাণ+ইন্= প্রাণী ; যাহাদের প্রাণ বা জীবন আছে, তাহাদিগকেই 'প্রাণী' বলা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদেরও জীবন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চেতনা, স্বেচ্ছা-সঞ্চালন-শক্তি প্রভৃতি সম্পন্ন জটিল শরীর-যন্ত্র-ভূষিত সজীব পদার্থসমূহকে বুঝাইবার জন্যই আমরা, অন্য উপযোগী শব্দের অভাবে, 'প্রাণী' শব্দ দ্বারা বুঝাইয়া থাকি।

উদ্ভিদ্—উৎ+ভিদ্+কিপ্=উদ্ভিদ্। সাধারণতঃ মৃত্তিকানিহিত বীজ হইতে যাহা ঊর্দ্ধ দিকে ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তাহাকেই উদ্ভিদ্ বলা যায়। কিন্তু এমন অনেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ও আছে, যাহা আদৌ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে না। সুতরাং উদ্ভিদ্ শব্দটি সর্ব্বত্র ঠিক আভিধানিক অর্থে আমরা প্রয়োগ করি না।

প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় কোথায়, তাহা বিদিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং স্থূল পার্থক্যগুলি উল্লেখ করি—

১।—প্রাণি-শরীরের আণবিক ও বাহ্য জটিলতা, উদ্ভিদ্ শরীর অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক।

২।—প্রায় সকল প্রাণীরই (স্পঞ্জ ইত্যাদি ব্যতীত) স্বেচ্ছা-সঞ্চালনশক্তি আছে ; উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় তাহা নাই।

৩।—উদ্ভিদ্-শরীরে 'ক্লোরোফিল্' নামক এক প্রকার সবুজ রং দেখা যায় ; প্রাণি-শরীরে তাহা স্বভাবতঃ থাকে না।

৪।—খাদ্য-পরিপাক, রস-সঞ্চালন ইত্যাদি ক্রিয়ারও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি হয়।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি,—তুলনায় সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ বিচার করিতে হইলে, উভয় জাতির সমপর্য্যায়ের সহিতই পরস্পরের তুলনা করিয়া দেখা উচিত ; অর্থাৎ, প্রাণিরাজ্যের অধম, মধ্যম ও উত্তম শ্রেণীর সহিত ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদ্রাজ্যেরও অধম, মধ্যম ও উত্তম শ্রেণীর তুলনা করাই আবশ্যক। নতুবা অসমাবস্থা হেতু অনেকস্থলে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হওয়াই সম্ভব। সুতরাং আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বোন্নত প্রাণী 'মানবের' সহিত উদ্ভিদ্-শ্রেষ্ঠ 'বৃক্ষ'-সমূহের এবং মধ্যম ও অধম শ্রেণীর প্রাণীদিগের সহিত যথাক্রমে মধ্যম ও অধম শ্রেণীর উদ্ভিদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ দেখাইতে প্রয়াস পাইব। উদ্ভিদ্-রাজ্যে সংযুক্ত দলসম্পন্ন

কল্মীলতা ইত্যাদি 'কন্‌ভলভিউলস্' শ্রেণীর অন্তর্গত উদ্ভিদ্-সমূহই সর্ব্বোন্নত। এডওয়ার্ড ক্লড লিখিয়াছেন :—

"The highest and the most perfect of all, are plants in which the petals are united together in bell shape or funnel fashion. Such are the convolvulus and honeysuckle, the olive and ash, and, at the top of the plant-scale, the family of which the daisy is the most familiar representative. Its position among plants corresponds to man's position among animals."*

মধ্যবর্ত্তী অবস্থা

উদ্ভিদ্—না প্রাণী ?

মধ্যবর্ত্তী অবস্থা—এমন কয়েকটি প্রাণী ও উদ্ভিদ্ আছে, যাহাদের গুণাবলী ও কার্য্যাবলী বিচার করিলে, তাহাদিগকে প্রাণিবর্গের অন্তর্গত ধরা উচিত, কি উদ্ভিদ্ রাজ্যের অন্তর্গত ধরা উচিত, সে সম্বন্ধে বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হয়। ইহারা প্রাণী ও উদ্ভিদের সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত। শারীরিক জটিলতা প্রভৃতি যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা প্রাণীসমূহকে উদ্ভিদ্ হইতে পৃথক্ করা হইয়া থাকে, সেই জটিলতা ইত্যাদিও ইহাদের মধ্যে অত্যল্প পরিমাণে লক্ষিত হয় বলিয়াই ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা বিহিত, স্থির করা কঠিন হইয়া উঠে।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে 'প্রাণীর' সহিত 'উদ্ভিদের' সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—

উৎপত্তি—অতি প্রাচীন যুগে 'প্রাণী' ও 'উদ্ভিদের' উৎপত্তি সম্বন্ধে মানবসমূহের কি ধারণা ছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা দুষ্কর। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উপনিষদ্‌কারদিগের মতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ 'অন্ন' হইতেই প্রাণিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় বল্লীর ১ম শ্লোকে দেখা যায়—

"পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ।" ইত্যাদি।—অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ওষধি (ফল-পাকান্ত উদ্ভিদ্, যথা—কদলী ইত্যাদি), ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে মনুষ্য সম্ভূত হইয়াছে।' সুতরাং ভেষজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেই মনুষ্যের বিকাশ হইয়াছে, ইহাই যে, উক্ত উপনিষদ্‌কারের ধারণা ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় বল্লীর ২য় অনুবাকে লিখিত আছে—

"অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ জায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীংশ্রিতাঃ
অন্ন হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্ অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে।"

—অর্থাৎ, 'পৃথিবীতে যত প্রাণী বাস করিতেছে, সেই সমুদয়ই অন্ন হইতে জন্মে। অন্ন সমস্ত প্রাণীর জ্যেষ্ঠ।...... অন্ন হইতে সমুদয় প্রাণী জন্মে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এস্থলে 'অন্ন' শব্দে খাদ্য সূচিত হইয়াছে; ইহা মনে না করিলেও, অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত উপনিষদ্‌কারের মতে পৃথিবীতে আদিতে উদ্ভিদ্ সৃষ্ট হইয়াছিল; তৎপরে ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।'

এতদ্ব্যতীত মুণ্ডকোপনিষদের ২য় মুণ্ডক ১ম খণ্ড ৭ম শ্লোকে লিখিত আছে—

"তস্মাচ্চ দেবা বহুধাসম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥"

—অর্থাৎ, 'তাঁহা (সেই দিব্য পুরুষ) হইতেই নানাপ্রকার দেবতা, সাধ্য (দেবতা-বিশেষ), মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রাণ, (অর্থাৎ উৰ্দ্ধগামী বায়ু), ব্রীহি (অর্থাৎ ধান্য), যব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বিধি উৎপন্ন হইয়াছে।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌সমূহ মূলতঃ পরম পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মুণ্ডক-উপনিষদ্‌কার বিশ্বাস করিতেন। অর্থাৎ মোট কথা এই যে, পরম পিতা পরমেশ্বর প্রথমে 'অন্ন' বা 'খাদ্যে'র সংস্থান করিয়া, পরে প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ত গেল হিন্দু শাস্ত্রের কথা।

বাইবেলের জেনেসিস্ (Genesis) নামক খণ্ড পাঠে জানা যায় যে, 'ভগবান স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃষ্টি করার পর তৃতীয় দিবসে, ঘাস, লতা, গুল্ম ও ফলবান বৃক্ষাদির সৃষ্টি করেন। ষষ্ঠ দিবসে মনুষ্য সৃষ্ট হয়।' সুতরাং কালের হিসা' উদ্ভিদ্ যে মনুষ্যের জ্যেষ্ঠ, তাহা বাইবেল-পাঠেও ধারণা জন্মে।

* Clodd's 'STORY OF CREATION.'

দুর্ভাগ্যবশতঃ মহম্মদীয় ধর্ম্ম-পুস্তকাদির সহিত সুপরিচিত নহি, সুতরাং উক্ত ধর্ম্মের মত কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি জালালউদ্দিনের "মস্‌নবী" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই—"মনুষ্য মূলতঃ নির্জ্জীব পদার্থ হইতে ক্রমশঃ উদ্ভিদ্‌রূপ পরিগ্রহ করিয়া, অবশেষে নিম্ন-প্রাণি-সমূহের মধ্য দিয়া মানবত্বের অধিকারী হইয়াছে" হয়ত, কথাটা কবিজনসুলভ কল্পনামাত্র—ইহার আসল কোন মূল্য নাই।

স্যাক্‌স্ (SACHS), গ্রাণ্ট্ য়্যালেন্ (GRANT ALLEN) ও এড্‌ওয়ার্ড ক্লড্ (EDWARD CLODD)-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত কারণে, পূর্ব্বকথিত হিন্দুমতের অনুরূপ-মত পোষণ করেন। এর্ড্‌ওয়ার্ড ক্লড্ বলেন যে, "The plant alone has the power to convert the elements of lifeless matter into living solid state (forming hydrocarbons).........If the animal is entirely dependent upon the plant for this, it would seem that plants were developed first". †

অর্থাৎ, 'একমাত্র উদ্ভিদেরাই নির্জ্জীব পদার্থকে সজীব পদার্থে পরিণত করিতে সক্ষম। যদি প্রাণিসমূহকে একমাত্র উদ্ভিদের দ্বারাই জীবন রক্ষা করিতে হয় (আদি যুগে, পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ে, উদ্ভিজ্জ ব্যতীত প্রাণীদের অন্য কোন খাদ্য নিশ্চয়ই দুষ্প্রাপ্য ছিল) তাহা হইলে, বোধ হয়, উদ্ভিদ্‌ই সর্ব্বপ্রথমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।' উদ্ভিদ্‌সমূহ, পত্রস্থ 'ক্লোরোফিল্' (*Chlorophyll*) নামক সবুজ রঙের অণু বা কণার সাহায্যে, নির্জ্জীব পদার্থসমূহকে সজীবপদার্থে পরিণত করিয়া থাকে। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, সময় হিসাবে উদ্ভিদ্ প্রথমে সৃষ্ট হওয়াই সম্ভব; অর্থাৎ, অন্য পদার্থের তুলনায় উদ্ভিদ্ জ্যেষ্ঠ। জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক (SACHS) বলেন—"As all animals are devoid of chlorophyll containing organs, and are thus unable to form organic substances from carbon dioxide and water, although they build up their bodies from such substance, it follows that the substance of the bodies of animals is originally produced in the chlorophyll cells of plants. The few lower animals, which apparently contain chlorophyll —certain Infussoria, Sponges, and Planarioe—contain chlorophyll as a matter of fact, not as a proper constituent of the body, but have vegetable cells containing chlorophyll in their bodies." ‡

অর্থাৎ, "যে হেতু কোন প্রাণীর শরীরেই ক্লোরোফিলের অস্তিত্ব দেখা যায় না, অথচ সকল প্রাণীই মূলতঃ অঙ্গারাম্লজান (*Carbon dioxide*) হইতে উদ্ভূত জৈব পদার্থ এবং জলদ্বারা নিজ নিজ শরীর পোষণ করিয়া থাকে, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সমস্ত প্রাণী-শরীরই মূলতঃ ক্লোরোফিল্-যুক্ত 'উদ্ভিদ্' শরীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে। স্পঞ্জ ইত্যাদি যে সমস্ত প্রাণি-শরীরে ক্লোরোফিল্ বর্ত্তমান দেখা যায়, তাহা (ক্লোরোফিল্) তাহাদের শরীরে অংশরূপে অবস্থিত নহে (খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে ভুক্ত হইয়া) উহা তাহাদের শরীরে সঞ্চিত থাকে মাত্র।"

সুতরাং, স্যাক্‌স্ যে শুধু উদ্ভিদ্‌কে অন্য পদার্থের 'জ্যেষ্ঠ' স্বীকার করেন, তাহাই নহে; তিনি সমস্ত 'প্রাণী'-শরীরই ক্লোরোফিল্‌যুক্ত 'উদ্ভিদ্'-শরীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে, মনে করেন।

গ্র্যাণ্ট্‌য়্যালেন সাহেব অধ্যাপক স্যাক্‌স্ অপেক্ষাও দৃঢ়ভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, "No chlorophyll, no life". "Protoplasm plus chlorophyll is the physical basis of life." §

অর্থাৎ, 'উদ্ভিদ্ ব্যতীত প্রাণীর উৎপত্তি অসম্ভব। প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক প্রাথমিক জৈব পদার্থের সহিত ক্লোরোফিলের সংযোগই প্রাণিগণের উৎপত্তির মূল কারণ।'

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতসমূহের বিরুদ্ধে বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক রে লেঙ্কেষ্টার (RAY LANKESTER) এবং

† Clodd's 'STORY OF CREATION'.

‡ Sach's PHYSIOLOGY OF PLANTS, *pp.* 298—99.

§ Extract from 'GENTLEMAN'S MAGAZINE' (1885)—on "*Genesis.*"

উদ্ভিদ্-শাস্ত্রবিশারদ থিসল্টন ডায়ার (THISELTON DYER) প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে, "The earliest protoplasm was destitute of chlorophyll". "Since chlorophyll is a modification of certain parts of protoplasmic cells, it is not a thing of primary origin, but a latter acquirement slowly attained". "Certain form of fungi represents more closely than any other living forms the original ancestors of the whole organic world which existed before plants possessed chlorophyll at all" *

—অর্থাৎ, "অতি প্রাচীন যুগে প্রোটোপ্লাজমে ক্লোরোফিল্ আদৌ ছিল না।" "ক্লোরোফিল্ প্রোটোপ্লাজমেরই কাল-ক্রমে লব্ধ একটি রূপান্তরিত অবস্থামাত্র; সুতরাং ইহা প্রোটোপ্লাজমের অন্তর্বর্ত্তী কালে সৃষ্ট।" 'অতএব প্রাণি-সমূহ মূলতঃ উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন যে, বরং "ছত্রক বা ব্যাঙের ছাতা (*Fungus*)-জাতীয় উদ্ভিদসমূহের খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি আলোচনা করিলে, তাহাদিগকেই উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যবর্ত্তী অবস্থা প্রাপ্ত এবং প্রাণিজগতের মূলের অনুরূপ বলিয়া অনুমান হয়।"

প্রসিদ্ধ শারীর তত্ত্ববিৎ হক্স্লি (HUXLEY)ও এই শেষোক্ত মতের অনুবর্ত্তী। †

আচার্য্য ডারুইন্ ও অন্যান্য কতিপয় মনীষী বহুবর্ষব্যাপী গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়েরই মূলে প্রোটোপ্লাজম্ বর্ত্তমান আছে; প্রোটো-প্লাজম্—জীবন-মূল। ইহা চঞ্চল এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন অসংখ্য কণিকাময় একটি মৌলিক পদার্থ। ইহা কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই ৪টি মূল পদার্থের সমবায়। § ইহা হইতেই সমস্ত জীবজগৎ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে অনেকে অনুমান করেন। উক্ত মনীষীরা অনুমান করেন, যে, একদিকে যেমন প্রোটোপ্লাজমের সহিত মৌলিক ক্লোরোফিল্ নামক সবুজ রঙের সংযোগে ক্রমবিকাশ এবং সূক্ষ্মরূপান্তরের ফলে অতিনিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ্ হইতে কাল-ক্রমে পত্রপুষ্পফলসুশোভিত বিশাল মহীরুহের বিকাশ হইয়াছে, তদ্রূপ আবার শুধু প্রোটোপ্লাজম হইতেই কালক্রমে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সরীসৃপ ও সলাঙ্গুল মর্কট ইত্যাদির মধ্যদিয়া ক্রমবিকাশের প্রভাবে সমগ্র মানবজাতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই উভয় প্রক্রিয়া পৃথক্, সমবর্ত্তী এবং সমোন্নতির পরিচায়ক। কিন্তু উভয়ে সমসাময়িক নহে। ভূস্তরসমূহের এবং তন্নিহিত জৈব ও উদ্ভিদ্ ধ্বংসাবশেষসমূহের পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আদি যুগে প্রথমে উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎপরে ক্রমে ক্রমে প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাণি সমূহের মধ্যে আবার পর্য্যায়ক্রমে প্রথম জলচর, পরে উভচর, তৎপরে ভূচর ও খেচর উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দু-দিগের মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি দশাবতারের মধ্যে—এবং বাইবেলোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেও—উক্ত পর্য্যায়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত উক্তির সমর্থনের জন্য এবং উহাদিগকে ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত, নিম্নে দুইটি তালিকা (Table) উদ্ধৃত হইল; তালিকাদ্বয়ে ইংরেজী নামসমূহ বিজ্ঞানানুমোদিত বলিয়া, বঙ্গ-ভাষায় ভাষান্তরিত না করিয়া অবিকৃত রাখা গেল।

* Article on, '*Protozoa*' & '*Biology*'—ENCYCLOPÆDIA BRITANICA.

† Huxley's 'CRITIQUES & ADDRESSES' দ্রষ্টব্য।

‡ DARWIN'S 'ORIGIN OF SPECIES'.

§ Roscoe's 'PRESIDENTIAL ADDRESS TO THE BRITISH ASSOCIATION', 1887.

(৯) E. Haeckel's 'EVOLUTION OF MAN.'

পৃথিবীর বিভিন্নস্তরের সহিত সামসময়িক প্রাণী ও উদ্ভিদের তালিকা *

Epochs.	Systems.	Animals.	Plants.
Primary or Paleozoic (Earliest known life forms).	Laurentian.	Eozoon Canadeuse ; Foraminifera.	Sea-weeds and Club mosses (Lycopods).
	Cambrian.	Sponges ; Corals ; Crustacea ; Shell fish.	
	Silurian.	Huge crustacea ; the lowest known vertebrates (ganoids or armoured fish).	
Age of Ferns and Fishes.	Devonian.	Insects ; Swarms of Ganoids.	Ferns; Calamites; Cycads.
	Carboniferous.	Land vertebrates (Labyrinthodouts). Reptiles.	
	Permian.		
Secondary or Mesozoic. (Age of reptiles and pinus).	Triassic.	Immense reptiles ; Sea lizards ; Marsupials Mammals.	Conifers ; Palms.
	Jurassic.	Immense bird reptiles ; tree birds.	
	Cretaceus.	Bony skeletoned fish ; Large ammonites.	
Tertiary or Cainozoic (Age of mammals and leaf forests).	Eeocene.	Huge placental animals ; Serpents ; Nummulites.	Trees, shrubs herbs allied to existing sub-tropical species.
	Miocene.	True whales ; Manlike apes.	
	Pliocene.		
Glacial period intervening and continuing into the :—			
Quarternary.	Post pliocene.	Mammoth and other woolly quadrupeds. Man.	Arctic and temperate existing species.
	Recent or Historic *Do.*	Existing species of animals.	

* Clodd's "STORY OF CREATION"

নিম্নের তালিকায় প্রাণী ও উদ্ভিদ্, ক্রম বিকাশের ফলে, কি পর্য্যায়ে প্রোটোপ্ল্যাজম্ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল।†
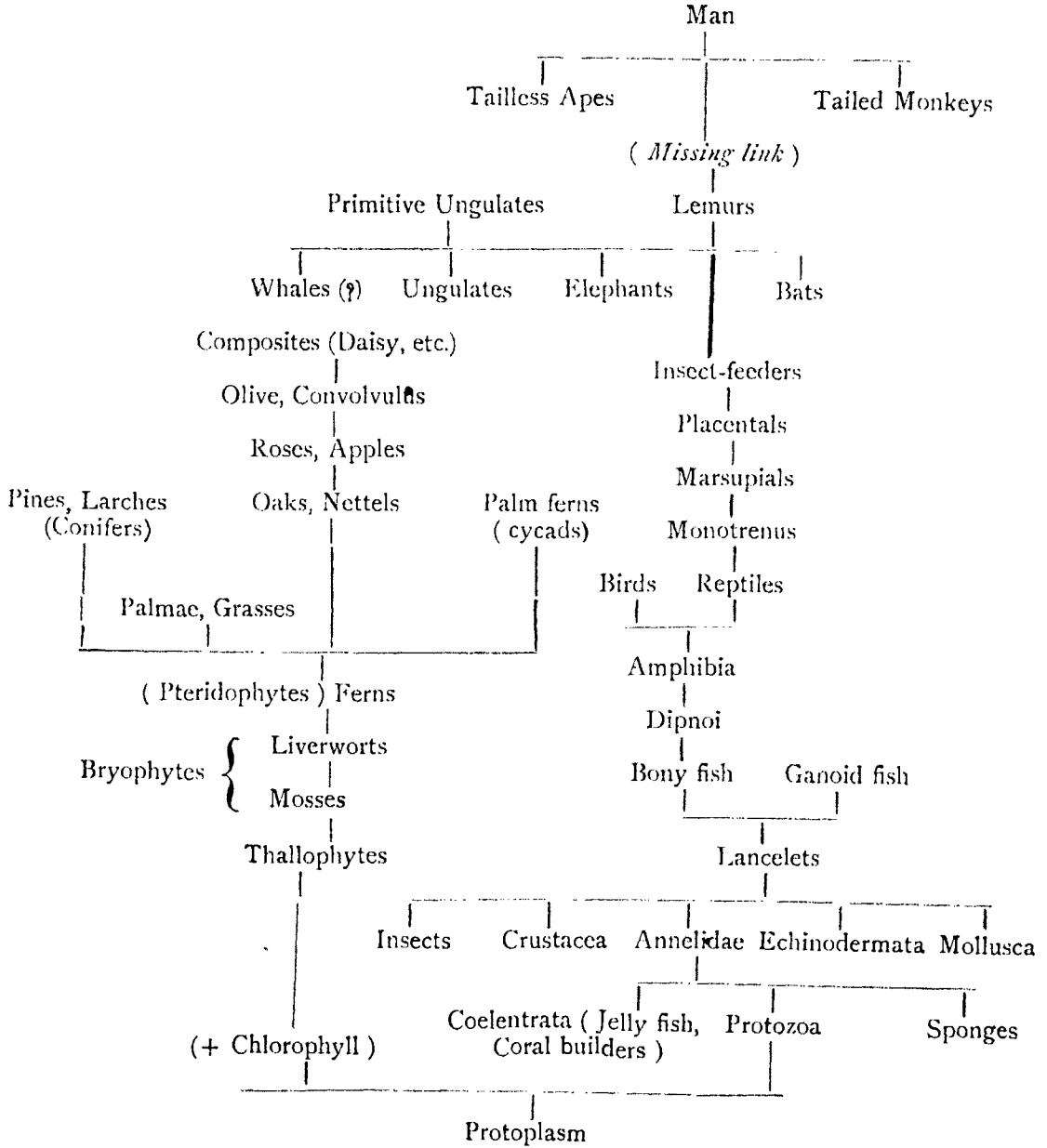
ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী বিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় বলেন যে, "এইখানে জড়ের শেষ ও উদ্ভিদের আরম্ভ এবং এইখানে উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ, এ প্রকার রেখা টানা অসম্ভব।" ‡

বর্ত্তমান প্রবন্ধেও এরূপ কোন রেখা টানা হয় নাই; তবে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে হইলে, পার্থক্যও লক্ষ্য করা আবশ্যক; তাই পূর্ব্বে একস্থলে, আবশ্যক বোধে, দুই একটি স্থূল-পার্থক্য মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

† Clodd's "STORY OF CREATION." ‡ "আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার"—৪৬ পৃষ্ঠা।

সত্যবাদী ইস্কুল

[রায়সাহেব শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, M.A., F.R.M.S.]

আমরা গত সরস্বতীপূজার দিন সত্যবাদী ইস্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। কটক হইতে পুরী যাইবার পথে, পুরীর ১০।১১ মাইল এদিকে, সাক্ষীগোপাল নামে রেল ষ্টেসন আছে। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সাক্ষীগোপাল প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির সাক্ষীগোপাল নাম হইতে গ্রামের ও নিকটস্থ রেলষ্টেসনের নাম সাক্ষীগোপাল হইয়াছে। এই গ্রামের অপর নাম সত্যবাদী। এই কারণে এই গ্রামে নূতন স্থাপিত ইস্কুলের নামও সত্যবাদী। আমরা অপরাহ্ণ ৪।।০'টার সময় সাক্ষীগোপাল ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ইস্কুলে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এক শিক্ষক অপেক্ষা করিতেছিলেন। ষ্টেসন হইতে দশ-পনর মিনিট পথ দূরে সত্যবাদী গ্রাম। গ্রাম ক্ষুদ্র; পচাপুকুর-ডোবা আছে; কিন্তু শুনিলাম মেলেরিয়া নাই। সাক্ষী-গোপালের মন্দিরের নিকট অনেক হিন্দুস্থানী যাত্রী ছিল। কেহ ভাত রাঁধিতেছিল, কেহ বা বিশ্রাম করিতেছিল। সময়ে সময়ে সেখানে অনেক যাত্রী আসে। যে গ্রামে যাত্রিসমাকুল হয়, সে গ্রামে ইস্কুল-স্থাপনা ভাল বোধ হইল না। কারণ, একদিকে মড়ক, অন্য দিকে ছাত্রের চিত্তচাঞ্চল্যের আশঙ্কা থাকে। আমাদের পথপ্রদর্শক এই মন্দির ছাড়াইয়া কিছু দূরে লইয়া গেলেন। যেদিকে তাকাই, সেদিকে গাছ। কোথায় ইস্কুল বুঝিতে পারিলাম না। এক স্থানে আসিয়া সঙ্গী বলিলেন, আমরা ইস্কুলের প্রাঙ্গণদ্বারে আসিয়াছি। কিন্তু কোথায় বা প্রাঙ্গণ, আর কোথায় বা ইস্কুল-বাড়ী। কতকগুলি খড়ের দো-চালা ঘর দেখিতে পাইলাম। লম্বা লম্বা দো-চালা, ছিটা-বেড়ার কাঁথ। এগুলি ছাত্র-গৃহ, কুলগৃহ। এখানে ইস্কুলের ছেলেরা থাকে। এই রকম ঘরে অধিকাংশ ছাত্র বাড়ীতেও থাকে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের এক স্থানে ছেলেরা কপি-শাকের ক্ষেত করিয়াছে। গাছ দেখিয়া বুঝিলাম, বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছে; মাটি বালিয়া, প্রচুর জল দিয়াছে। ক্ষেতের এক এক কেয়ারীর ধারে বাঁশের শলার গায়ে এক দুই ইত্যাদি অঙ্ক লেখা আছে। এক এক কুলগৃহের অঙ্ক-অনুসারে কেয়ারীর অঙ্ক হইয়াছে। পাশে আর এক ক্ষেত দেখিলাম। সেটা শিক্ষকদিগের। তাঁহারাও নিজহাতে কপি ও আলু-শাক-পালা করিয়াছেন।

কুলগৃহ ও রান্না-বাড়ীর একটু দূরে একটা পাকা বাড়ী গাঁথা হইতেছে। সেটা পরে ইস্কুলবাড়ী হইবে। কিন্তু এখন কোথায় ইস্কুল বসে? [আমি আমার ছাত্রদিগকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করি। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ দাস, এম. এ. আমার ছাত্র; অন্য শিক্ষকেরাও কটক কলেজের ছাত্র। তাহারাও তুমি-পদ-বাচ্য হইয়া আসিতেছে। এখন তাহারা গৃহী হইয়াছে, বয়সে বাড়িয়াছে; ইস্কুল স্থাপন করিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বের অভ্যস্ত "তুমি"তেই প্রীত হয়। যাহাদিগকে "তুমি" বলি, লেখাতে তাহাদিগকে "তিনি" বলিতে আমারও বাধ-বাধ ঠেকিতেছে।] আমাদের সঙ্গী শিক্ষক স্মরণ করাইয়া দিলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে ইস্কুলবাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। খড়ের চালের মাটির কাঁথের ঘর; দুর্বৃত্তেরা চালে আগুন লাগাইয়া, বহুকষ্ট-সংগৃহীত চারিহাজার টাকার ইস্কুলবাড়ী, লাইব্রেরী, বেঞ্চি ইত্যাদি সমুদায় পোড়াইয়া দিয়াছে। এই কারণে এবার পাকা বাড়ী হইতেছে। এই বাড়ী সম্পূর্ণ করিতে ত্রিশহাজার টাকা লাগিবে। চৌদ্দ-হাজার টাকা জুটিয়াছে। বাকি এখনও অনিশ্চিত। সব টাকা ভিক্ষা করিয়া তুলিতে হইয়াছে।

এতদিন কোথায় ইস্কুল হইতেছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, এমন সময় ইস্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীগোপবন্ধু দাস, বি. এল., এবং প্রধান শিক্ষক আমাদিগকে দেখিয়া একটা বনের দিকে লইয়া গেলেন। নিকটে গিয়া দেখিলাম, সেটা বন নহে, উপবন। যে-সে গাছের উপবন নহে; পুন্নাগ, বিশেষতঃ সুর-পুন্নাগ-পরিপূর্ণ উপবন। বঙ্গদেশে

পুন্নাগ গাছ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সুরপুন্নাগ সেদেশে অজ্ঞাত। কিন্তু এমন সুন্দর সুঠাম শ্যাম ডাল-পালার গাছ অল্প আছে। বসন্তকালে ফুল ফোটে; তখন না জানি কি সৌরভে সমস্ত উপবন পূর্ণ হয়। ইস্কুল বলিলে, আমরা একটা বাড়ী, প্রায়ই পাকা বাড়া, কল্পনা করি। বাড়ীতে অন্যূন দশবারখানা ঘর থাকে, ঘরে ঘরে বেঞ্চি টেবিল চেয়ার থাকে। কিন্তু উপবনে পাকা কেন কাঁচা ঘরও নাই। চারিদিকে গাছ; ছোট ছোট সুরপুন্নাগের গাছ, মাঝারি পুন্নাগ গাছ, কদাচিৎ বকুলগাছ বাড়িয়া উঠিয়াছে। বড় গাছের নিকটে খানিকটা স্থান প্রায়ই ফাঁকা থাকে। এইরূপ এক এক গাছের তলায় লইয়া গিয়া গোপবন্ধুবাবু বলিলেন, এখানে আমাদের অমুক শ্রেণী বসে; একটু দূরে এ-গাছ সে-গাছের পাশদিয়া গিয়া, আর এক স্থানে লইয়া গিয়া বলিলেন, এখানে অমুক শ্রেণী বসে। এইরূপ নয়-দশটা বৃক্ষ-গৃহে ইস্কুলের নয়দশটা শ্রেণীর বালকেরা পড়া-শুনা করে। পাশের বড়গাছে দড়ীবাঁধা শ্যামপট্ট লম্বিত আছে। ছেলেরা (বালি) মাটিতে চাটা পাতিয়া বসে; সম্মুখে বেঞ্চির খানিকটা পা মাটিতে পোতা থাকিয়া বেঞ্চিগুলি ছেলেদের লেখনাধার বা ডেস্‌ক হইয়াছে। একটু দূরে এইরূপ উপবন-গৃহে শিক্ষকদিগের বিশ্রামস্থান। কয়েকখানা বেঞ্চি না দেখিলে, সেখানটা গৃহ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত না।

এই উপবন সাক্ষীগোপাল ঠাকুরের। নাম গুপ্ত-বৃন্দাবন। আমি বৃন্দাবন দেখি নাই; সেখানে তমাল গাছ আছে; কিন্তু সে তমাল আর দাক্ষিণাত্য প্রদেশের তমাল এক নহে। কালিদাসের 'তমালতালী'র, তমাল বৃন্দাবনের তমাল নহে। তমাল শব্দ তম্বালরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দীতে দম্পাল হইয়াছে। তম্বালতুল্য সুন্দর নীলশ্যামল বৃক্ষ অল্পই আছে। পুন্নাগ ও সুরপুন্নাগ, তম্বাল-সদৃশ। সুরপুন্নাগ বহুকালে বড় হয়। বছরে তিন চারিটা পাতা হয়। আশ্চর্য্য এই, ছেলেরা এই দুর্লভ সুরপুন্নাগের ডাল-পাতা ছেঁড়ে না! নূতন ছেলেরা ইস্কুলে আসিলে পুরাতন ছেলেরা তাহাদের আশ্রমের সুরপুন্নাগ চেনাইয়া দেয়। যে গাছ "আমাদের" সে গাছের ডালপালা ভাঙ্গিতে হাত ওঠে কি? পাশের নিবিড় শাখা গৃহ-প্রাচীর হইয়াছে, উপরে চিরশ্যামল চিক্কণ স্থূল পত্র মধ্যাহ্নের আতপ নিবারণ করে।

একটুদূরে সরস্বতী দেবীর প্রতিমা দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে পাশে শতাবধি বালক; হৃষ্টচিত্তে কেহ পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে, কেহ দাঁড়াইয়া আছে, কেহ বেড়াইতেছে। প্রতিমার একটু দূরে ভোগের বড় বড় হাঁড়ী থরে থরে সাজান আছে। ৫টা বাজিতে চলিল, পুষ্পাঞ্জলি প্রায় শেষ হইয়াছে।

অদূরে একটা উন্মুক্ত স্থানে ছেলেরা নিত্য ব্যায়াম করে। পাশে বড় বড় অশ্বত্থ ও বকুল, আম ও কাঁঠাল গাছ। এখানে দুই তিন শিক্ষকের অবধানে ছেলেরা খেলে—হাড়-ডুডু খেলে; কেহ গাছে চড়ে, গাছে চড়িয়া লুকা-চুরি খেলে। অন্য সময় কেহ বা নির্জ্জনে পড়িবার ইচ্ছায় নীচু ডালে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করে।

আমরা দেখিতেছি, শঙ্খঘণ্টাবাদ্য হইল। ভোগ-প্রসাদ পাইবার সময় হইয়াছে। পূজা-প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দুই সারি, আঁকা-বাঁকা সারি করিয়া—কারণ গাছ আছে—বালির উপর সম্মুখে পাতা লইয়া, বালকেরা বসিয়া গিয়াছে। যাহারা দূরে ছিল, তাহারা আসিয়া জুটিতে লাগিল, সারি লম্বা হইতে লাগিল। জাতি-ভেদের চিহ্ন মাত্র নাই। আহারে জাতিবিচারে ছাত্রেরা স্বাধীন;—বিধি নাই, নিষেধ নাই। হরিদ্বারে গুরুকুল-বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা প্রথমে দীক্ষিত হয়, পরে সকলে একজাতি গণ্য হয়। এখানে দীক্ষা নাই, বিধি নাই, নিষেধ নাই; ছাত্র-দিগের পরস্পর প্রণয়ে আহারে জাতিবিচার উঠিয়া গিয়াছে।

ওড়িশা একটি বিচিত্র দেশ। এখানে অত্যল্পকারণে জাতি নষ্ট হয়। যাহার যে পৈতৃক জাতিব্যবসা, তাহার এক চুল এদিক ওদিক হইলে, "পাপীকে" প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এমন নিকৃষ্ট জাতি আছে, যাহার স্পর্শের কথা নাই, লম্বা কাঠদ্বারা স্পর্শেও শূদ্রের জাতি যায়। কাঠরিয়া ক্লান্ত হইয়া কাঠের বোঝা নামাইয়াছে, পাশ দিয়া কতলোক চলিয়া যাইতেছে, কেহ মাথায় বোঝা তুলিয়া দিয়া পাতক-গ্রস্ত হইবে না। খেজুর-রসে তাড়ী হয়; শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ খেজুরগাছ স্পর্শ করিবেন না। এক ব্রাহ্মণের গৃহপ্রাঙ্গণে অকস্মাৎ এক খেজুর চারা উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ সঙ্কটে পড়িলেন। পরে দূরগ্রাম হইতে পয়সা দিয়া লোক

আনাইয়া খেজুর-চারা উৎপাটিত করান। এই লোক খেজুরগাছ ছুঁইতে পারে। স্পর্শজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের অর্থ—বহুব্যয়-সাধ্য স্বজাতিভোজন। অপরদিকে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের প্রসাদে জাতিবিচার নাই। সুধু সেখানে নহে, ভুবনেশ্বরে মহাদেব শিবের ভোগেও জাতিবিচার নাই। গত বিশ-বাইশ বৎসর হইতে এই ব্যবহার অল্পে অল্পে আরম্ভ হইয়া, এখন বিধির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অন্যত্র এক জমিদারের রাধা-শ্যাম বিগ্রহ আছেন। জমিদার মহাশয় ইঁহার প্রসাদেও জাতিবিচার ঘুচাইয়া দিতেছেন।

সত্যবাদী ইস্কুলের প্রধান প্রধান শিক্ষক, যুবক শিক্ষক যাঁহারা ইস্কুল চালাইতেছেন তাঁহারা, এবং স্বয়ং অধ্যক্ষ মহাশয় ব্রাহ্মণ। যেমন-তেমন ব্রাহ্মণ নহেন, পুরীর শাসনী ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বকালে কোন কোন হিন্দুরাজা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ-গ্রামের নাম শাসন। পুরী জেলায় এইরূপ ষোল শাসন প্রসিদ্ধ। অন্য রাজারা, এমন কি, রাজকর্ম্মচারীরাও কয়েকটা শাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ষোড়শ শাসনের প্রতিপত্তি দিতে পারেন নাই। জগন্নাথদেবের মন্দিরে ষোড়শশাসনের ব্রাহ্মণে এক্ষণে মুক্তিমণ্ডল সভায় বসিতে পান, অন্যে পান না। প্রত্যেক শাসনে দুই সারি ব্রাহ্মণের বাড়ী, মাঝে বড় পথ। বাড়ীর পেছুতে কৃষির নিমিত্ত ক্ষেত ও নারিকেলবাগান। গ্রামের এক প্রান্তে শিবালয়, অন্য প্রান্তে ব্রাহ্মণসেবক জাতির বাস। এই ব্রাহ্মণ-শাসনের মাঝ দিয়া, কেহ জুতা পরিয়া, মাথায় ছাতা ধরিয়া, যাইতে পায় না। বিদেশী যাইতে পারে, কারণ শাসনের পূর্ব্ব-গৌরব লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু গ্রামের কেহ—ইংরেজীশিক্ষিত হউন, স্বাধীনচেতা হউন—সে শাসনের আচার-ব্যবহার রক্ষা না করিলে, তাহাকে নির্যাতন সহিতে হয়। সত্যবাদী-ইস্কুলের নবযুবকেরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া, পায়ের জুতা খুলিত না, মাথার ছাতা বন্ধ করিত না। অনেকে ইহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। কেহ কেহ ইহাদিগকে ভ্রষ্টাচার মনে করিতে লাগিল। যখন দেখিল, ইহারা দেশীয় রীতি-অনুসারে গোঁফ-দাড়ী কামায় না, দাড়ী কামাইলেও গোঁফ কামায় না, তখন সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল। পরে যখন শুনিল, ইহারা জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলকে নমস্কার করে, তখন শাসনে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। শুনিল—ইস্কুলে কুলগৃহে ইহারা আহারের সময় জাতিবিচার করে না, নিম্নশ্রেণী ব্রাহ্মণের পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে, ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকটে বসিয়া করে। শত্রুরা রটাইয়া দিল, ইংরেজী পড়িয়া যুবকেরা ম্লেচ্ছ হইয়াছে। পুরীর মন্দিরে যেখানে অন্ত্যজ ব্যতীত অপর সকল হিন্দুর প্রবেশ অবারিত, সেখানে যুবকদিগের প্রবেশ এবং তৎসঙ্গে তাহাদের বাড়ীর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। অনেক বকা-বকি লেখা-লেখি চলিল। শোনা যায়, শত্রুপক্ষেরা ইস্কুলবাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছিল। ইহা আজি দুইবৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। এখন দেখি, সরস্বতী পূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া, ছেলেদের বাবা-খুড়া-জেঠা ও অন্য অভিভাবক পূজা-প্রাঙ্গণে ভোজনে বসিয়াছেন! ইস্কুলের একটু অধিক বয়সের ছাত্রেরা, পুষ্ট-বলিষ্ঠদেহ ব্রাহ্মণের ছেলেরা ভোগ পরিবেষণ করিতে লাগিল। মোহনভোগ, পায়স, মালপোয়া পাতে পাতে পড়িতে লাগিল। সমুখে ছেলেরা খাইতেছে, ছোট বড় ছেলেরা বসিয়াছে; আশ্চর্য্য, বসিবার সময় শব্দ নাই, ছাড়া ছেলেদের স্বাভাবিক কোলাহল ও ব্যগ্রতা নাই, যেন কলের পুতুল বসিয়া গিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু শাসন প্রয়োজন হইল না। এই প্রকার নিত্য জীবনে যে বিনয় দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রকৃত।

এত ছেলে, এত অভিভাবক, কাহারও পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই। অনেকে উত্তরীয় দ্বারা দেহ আবৃত করিয়াছে, কারণ তখন একটু শীত ছিল। কেহ বা উত্তরীয় স্কন্ধে লম্বিত রাখিয়াছে। দূর গ্রাম হইতে আগত দুই এক ছেলের গায়ে জামা আছে, কিন্তু পায়ে জুতা নাই। শিক্ষকদিগেরও দেহে উত্তরীয়, কাহারও বা স্কন্ধে লম্বিত। তাঁহারা খোলা গায়ে সচ্ছন্দে বেড়াইতেছেন। তা ছাড়া, ওড়িশায় জামা-জোড়া পরিবার রীতি তাদৃশ চলিত হয় নাই। গ্রীষ্মদেশে জামা-জোড়ার প্রয়োজন হয় না; যে দেশে দুইবার স্নান না করিলে দেহ নির্ম্মল থাকে না, সে দেশে জামা-জোড়া আঁটিয়া দেহ সমল করা হইত না। পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও জামা-জোড়া কদাচিৎ দেখা যাইত। ওড়িশার বড় বড় প্রতাপশালী সামন্ত রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি; তাঁহারা

উত্তরীয় ধারণ করিয়া বাহিরে আসিয়া সচ্ছন্দে দেখা করিয়াছেন। বাড়ীতে তাঁহারা বিনা উত্তরীয়ে থাকেন না। স্নানের পর উত্তরীয়, ভোজনের সময় উত্তরীয়, বসিয়া আলাপের সময় উত্তরীয়। ধুতি ও উত্তরীয়—এই দুই লইয়া সভ্যতা! ইহাই আমাদের জাতীয় সভ্যতা। যাঁহারা পুরীদর্শনে আসিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, ধনশালী পাণ্ডা ২০।৩০ টাকা মূল্যের গরদের জোড় পরিয়া আছেন। ইঁহারা দুই এক টাকা মূল্যের জামা কিনিতে পারিতেন। কটক কলেজেও বহু ছাত্র এক উত্তরীয় গায়ে দিয়া নিত্য পড়াশুনা করিতে আসে। সকলে দরিদ্র নহে, কিন্তু জামা, কোট, জুতো প্রভৃতির প্রয়োজন দেখে না। তবে বোধ হয় এ ভাব আর অধিক দিন টিকিবে না। আমরা বাঙ্গালী, দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি; খোলা গা পা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতেছি! পোষাকে সভ্য-অসভ্যের বিচার করিতেছি। ইহারই মধ্যে কৃতবিদ্য ওড়িশা-যুবক আপিশের নিমিত্ত হেট, কোট, গলবন্ধ পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কালের স্রোত-রোধ কঠিন। বাঙ্গালী, ওড়িয়া, আসামী চিরদিন নগ্নশির; এক বিবাহের দিনে মাথায় মুকুট পরিয়া রাজবেশ পরে। কিন্তু প্রত্যহ রাজবেশ সাজে না, পূর্ব্বে কেহ পরিত না।

ছাত্র ও অভিভাবকদিগের ভোজন সমাপ্ত হইল। আমাদিগকেও ভোজন করিতে হইবে। আমরা কটক রাজধানী হইতে গিয়াছি ভাবিয়াই হউক, বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়াই হউক, প্রধান শিক্ষকের গৃহে আমাদের ঠাঁই হইল। নিজের বলিতে তাঁহার একখানি ঘর যুটিয়াছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি তক্তাপোষ ও কয়েকটা টুল আছে। সেখানে প্রধান শিক্ষকের পিতার সহিত পরিচয় হইল। তিনি যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে পুত্রের অনুষ্ঠানে অবশ্য যোগ দিতে হইবে। তাঁহার একটা কথায় আমরা মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার একমাত্র পুত্র লেখা-পড়া শিখিয়া গ্রামের ও দেশের ছেলেকে লেখা-পড়া শিখানই জীবনের ব্রত করিয়াছে, তাহাতে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন। পুত্রের শিক্ষা সার্থক হইয়াছে যে, পুত্র বিদ্যা-দানে রত হইতে পারিয়াছে।

এই পুত্র এম.-এ. পাশ। চাকরি করিলে অক্লেশে মাসিক ৭৫৲ টাকার চাকরি পাইতেন। চেষ্টা করিলে হাকিম-ডেপুটিও হইতে পারিতেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় শিক্ষকও এম.-এ. পাশ। তাঁহারাও দলে যুটিয়াছেন। কিন্তু পিতা-মাতার, নিজের ও ভার্য্যার ভরণপোষণ নিমিত্ত প্রত্যেক মাসিক ৪০৲ টাকা করিয়া লইয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইঁহারা ব্রাহ্মণের ছেলে। ওড়িশার এক বিচিত্র রীতি যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিশু-বিবাহ প্রচলিত আছে। করণ (কায়স্থ) জাতি ও অন্যান্য জাতির বাল্য-বিবাহ নাই। যুবক-শিক্ষকদিগের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাঁহারা ভালমন্দ কিছু বুঝিতেন না, পরে যে বিদ্যা-দানে জীবন কাটাইতে হইবে, তাহা জানিতেন না। ইদানীং অল্পে অল্পে ব্রাহ্মণের ছেলে, কলেজের ছেলে, অধিক বয়সে বিবাহিত হইতেছে। বিবাহের নামে শিক্ষিত যুবকদিগের বিক্রয়ও আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদিগকে রাত্রি ৭।।০ টার সময় ট্রেন ধরিতে হইবে। আর বিলম্ব করা চলিল না। অথচ ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবারও সময় নাই। এই জন্য কুলগৃহের আটদশটি ছোট ছোট ছেলেকে আমাদের সঙ্গে ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিতে আহ্বান করিলাম। পথে ইহাদের সহিত কথা জুড়িয়া দিলাম। এ কথা, সে কথা, বাড়ীর কথা, ইস্কুলের কথা, হইতে লাগিল। দেখিলাম সঙ্কোচ নাই, সম্ভ্রম আছে। হাসি হাসি মুখ, আমরা যেন কতকালের পরিচিত তাহাদিগকে হঠাৎ দেখিতে আসিয়াছি! আমার এক এক প্রশ্ন শুনিয়াও তাহাদের হাসি পাইতে লাগিল। ইস্কুলে কেমন আছ, বাড়ী নিকটে—কত দিন অন্তর যাও, শনিবারে শনিবারে কেন যাও না—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সচ্ছন্দভাবে দিতে লাগিল। ইস্কুলে দুঃখ কেন হইবে, তাহারা তাহা কখনও ভাবে নাই! শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে কি মন্ত্র শিখাইয়াছেন, জানি না। ছেলেরা বনের পাখীর মতন স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, অথচ সংযম আছে। ওড়িশায় দুর্বৃত্ত দুষ্ট ছাত্র নাই নহে; কিন্তু অধিকাংশই বিনীত।

একথাও ঠিক, গ্রামের ছেলেরা যত আত্মনির্ভরশীল, নগরের ছেলেরা তত হয় না। গ্রামে ছেলেরা প্রকৃতির সম্পর্কে—দেশের সম্পর্কে থাকে। নগরে ছেলেদের সে সুবিধা হয় না; অকপটতা ও স্বচ্ছন্দতা ফুটিতে পায় না। সত্যবাদী ইস্কুলের প্রায় দুই শত ছাত্র নিকটবর্ত্তী

গ্রাম হইতে আসিয়াছে; অবশিষ্ট দূরদেশ হইতে,—সম্বলপুর গঞ্জাম হইতে কটক বালেশ্বর হইতে গিয়াছে। নিকটে ইস্কুল থাকিতে দূরে যাইবার কারণ অবশ্য আছে।

একটা কারণ, সত্যবাদীতে অল্পব্যয়ে লেখাপড়া হইতেছে। মাসিক ৬৲ হইতে ৮৲ টাকার মধ্যে থাকাও পড়া সব হইতেছে। ডাল-ভাত, একটা নিরামিষ ব্যঞ্জন ও অম্বল নিত্য ভোজ্য। মাছ মাংস, না খাইলেও দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। শুনিয়াছি, চট্টগ্রামে যে জগৎ-আশ্রম আছে, তাহার ব্রহ্মচারী ছাত্রেরা তৈললবণও খাইতে পায় না, ব্রহ্মচারিণী কন্যারা ভাতও পায় না, কন্দমূল খাইয়া লেখাপড়া করিতেছে। কেহ নাকি শীর্ণদেহও নহে। ওড়িশার অধিকাংশ লোক মাছ-মাংস খায় না, কিংবা খাইতে পায় না। বঙ্গদেশে গ্রামে মাংস দুর্লভ; মাছও ক্রমে দুর্লভ হইতেছে; দুধ-ঘিও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। ওড়িশায় যে পারে, সেই ঘি খায়; দুধ খাওয়া অধিকাংশের অভ্যাস নাই। কিন্তু তা বলিয়া পুষ্ট বলিষ্ঠ দীর্ঘাকার দেহের অভাব নাই, দীর্ঘজীবীরও অসদ্ভাব নাই। ইহাদের সহিত বাঙ্গালীর তুলনা করিলে, মেলেরিয়া বঙ্গদেশের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সত্যবাদী কুলগৃহে কয়েকটি গাই আছে। রুগ্ন ছাত্রের নিমিত্ত গাই পুষিতে হইয়াছে। এখানেও দুধ-সাবু চলিত হইয়াছে। কুলপতি এবং প্রধান শিক্ষক হোমিওপ্যাথী শিখিয়াছেন। সামান্য অসুখ-বিসুখ হইলে তাঁহারা চিকিৎসা করেন। রোগ কঠিন হইলে পুরী হইতে কবিরাজ কিংবা ডাক্তার আনেন। তাঁহারা বিনা অর্থে চিকিৎসা করেন। যে মাসে আমরা সত্যবাদী গিয়াছিলাম, সে মাসে ২৫৮ জন ছাত্র কুলগৃহে ছিল। তখন ছাত্র বাড়িতেছিল। বোধ হয়, এখন ইস্কুলে ৪০০ ছাত্র হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ৩০০ কুলগৃহে আছে। ৩০০ ছাত্র ২৮ দলে বিভক্ত; এক এক গৃহে যত থাকে, তত দল। প্রতি গৃহে এক এক 'শিরকো পড়ুয়া' থাকে। সে প্রতি গৃহের কর্ত্তা। প্রত্যেক ছাত্র নিজে জমাখরচ রাখে, 'শিরকো পড়ুয়া' তাহা মাঝে মাঝে দেখে। সাত আট জন গৃহশিক্ষক ছাত্রদিগের পড়াশুনার সংবাদ লইয়া থাকেন। ইহাদের উপরে কুলপতি আছেন। তিনি সকল ছেলের পিতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় হইয়া সকলের সহিত মেলা-মেশা করেন, নানাবিধ উপায়ে ছেলেদের মন ইস্কুলের প্রতি আকৃষ্ট রাখেন। ইঁহার কাজ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ছাত্রদিগের ভোজনাদি দেখিবার নিমিত্ত একজন অধিকারী আছেন। ইঁহার সাহায্যের নিমিত্ত ছেলেরা ১৫ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। মাসে মাসে অধিকারী ও প্রতিনিধিদিগের সভা হয়। প্রধানশিক্ষক সভাপতি। তিনিই একদিকে ইস্কুলের—অন্যদিকে কুলগৃহের অধিপতি।

এই যে বৃহৎ গোষ্ঠী, গুরুশিষ্যকুল, তাহার দিননির্ব্বাহ যেমন-তেমন কথা নহে। সত্যবাদীর মতন ছোট গাঁয়ে এত গুলির আহার নির্ব্বাহ সোজা নহে। ছেলেরা অধিকারী ও কুলপতির সহিত হাটে যায়, শাক-পাতা কিনিয়া আনে। প্রত্যহ দুই দুই জন ছাত্র সেবক হয়, কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে পরিচর্য্যা করে। সাক্ষীগোপালে দিগ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। তাহাদের অসুখ হইলে, পুরীতেও যাত্রীদিগের রোগের প্রকোপ হইলে, সত্যবাদী ইস্কুলের সেবকদল সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

এত কথা ছোট ছোট ছেলেরা সব বলিতে পারিল না। কি করে, কেন করে, তাহারা জানে না। তাহাদের সঙ্গে যে শিক্ষক আসিতেছিলেন, তিনি একটু বলিলেই ছেলেরা হাঁ হাঁ করিতেছিল। চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। ছাত্রেরা শিক্ষিত হইতেছে, কিন্তু জানে না।

রাত্রি অন্ধকার; পথে আসিতে আসিতে মনে হইল, দিগ্-ভ্রম হইয়াছে। একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ মুখে আসিতেছি? সে তৎক্ষণাৎ বলিল, উত্তর মুখে। "কেমনে জানিলে?" "ঐ যে আকাশে সপ্তর্ষিনক্ষত্র দেখা যাইতেছে।"—এই উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম, ছেলেরা কেবল পাঠ মুখস্থ করে না, কেবল গাছে ডালে চড়ে না, কেবল যাত্রীর সেবা করে না, বিদ্যাও শেখে। শিখাইবার পদ্ধতি দেখিবার জানিবার সুযোগ হয় নাই। তবে বুঝিলাম, সেটা একেবারে কৃত্রিম হইবে না। মাতৃভাষায় সব শেখান হয়। শিক্ষা ইংরেজী-প্রধান করা হয় নাই। শিক্ষকেরা এখনও নব্য; কিন্তু যাঁহারা স্বেচ্ছায় শিক্ষক হইয়াছেন, পরের ছেলেকে শিখাইতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শিখাইবার রহস্য অজ্ঞাত থাকিবে না।

কিন্তু কি গুরু পরিশ্রম করিতে হইতেছে! দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত পাঠ-পড়ানই কাজ নহে; ছেলেদের সহিত ভোর হইতে, রাত্রি নয়টা-দশটা পর্য্যন্ত থাকিতে

হইবে। ভোরে ছেলেরা প্রাতঃস্নান করিবে, শিক্ষকও করিবেন। ছেলেরা স্তোত্র পাঠ করিবে, কেহ বা নিজের ঠাকুর পূজা করিবে, শিক্ষক সেখানে আছেন। খাইতে বসিবে, শিক্ষকও বসিবেন। ইস্কুলে যাইবে; শিক্ষকও চলিয়াছেন। খেলিতে বেড়াইতে শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে আছেন। গত বৎসর প্রধান-শিক্ষক—যাঁহার উপরে সমস্ত কাজের ভার—তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পায়ে জুতা নাই; উত্তরীয়ের ভিতর দিয়া আকার দেখিয়া বুঝিলাম, নীলকণ্ঠ পীড়িত হইয়াছে, কণ্ঠের হাড় বাহির হইয়াছে। বুঝিলাম, গুরু পরিশ্রম;—একদিন নহে দুই দিন নহে, বৎসরের ৩৬৫ দিন—শরীরে সহিতেছে না। বলিলাম, 'একটু একটু দুধ খাও, দিনকয়েক একটু পৃথক্ ভোজ্য খাও। কারণ, দেহ রুগ্নপীড়িত হইলে কাজ করিবে কে?' কিন্তু, পৃথক্ খাইতে পারে কি? যে অল্প দুধ হয়, তাহা ছেলেদিগেরই—যাহাদের নইলে নয়, তাহাদেরই—কুলায় না; সে খাইবে! শুধু নীলকণ্ঠ নহে, কটকে থাকিবার সময় নব্যশিক্ষকেরা ছাত্রাবস্থায় যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিল, সেরূপ দেখিলাম না। সেদিন তাহাদিগকে শীর্ণ দেখিয়া কষ্ট হইল, আনন্দও হইল। একদিনে এক বৎসরে পরার্থপরতা আসে নাই। আমরা নগণ্য—নির্ধন, অথচ কি করিতে পারি,—এই চিন্তা হইতে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। চেষ্টা সফল হইবে কি না, আদর্শ ঠিক হইয়াছে কি না, কে জানে! কিন্তু এটা ঠিক, প্রেম ব্যতীত আর কিছু দিবার নাই।

ওড়িশার কোথায় কর্ম্মক্ষেত্র করিবে, তাহা যুবকেরা বিবেচনা করিয়াছিল। শেষে সত্যবাদী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। সাক্ষীগোপাল ঠাকুরের প্রায় ১৫০ বিঘা উপবন, বিদ্যালয়ের নিমিত্ত অমনই লাভ হইয়াছে; আর কোথাও পাওয়া যাইত না। সত্যবাদীর চারিপাশে ব্রাহ্মণ-শাসন। এই সকল শাসনের ছেলে বিদ্যাহীন থাকিতেছিল। অপর ছেলে না পাওয়া যাউক, ইঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে। শিক্ষকদিগের বাড়ী নিকটে; ইহাতে তাহাদের কাজের অন্তরায় হইয়াছে, প্রথম প্রথম নির্যাতনের কারণ হইয়াছিল। সত্যবাদীর সমাগত যাত্রীর সেবাদ্বারা একদিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইয়াছে, অন্যদিকে ছেলেরা ভারতবর্ষ দেখিতে পাইতেছে;—আর কিছু না হউক, দেশের ইতিহাসের এক অংশ প্রত্যক্ষ করিতেছে।

অবশ্য বর্ষাকালে উপবনে ইস্কুল বসিতে পারে না। পূর্ব্বকালে দেশে বর্ষাকালে কেন চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইত, তাহা বুঝিতেছি। সেকালে মেঘগর্জ্জন হইলে অনধ্যায় হইত, কি জানি যদি বৃষ্টি হয়! তা ছাড়া, মেঘগর্জ্জনের সময় চিত্তের বিক্ষেপ হয়, অধ্যাপনায় নিবেশ থাকে না। মাসে মাসে দুই অষ্টমী, দুই চতুর্দ্দশী, দুই প্রতিপৎ, এবং এক অমাবস্যা—এই সাতদিন অনধ্যায় ছিল। এখন মাসে চারি দিন; কিন্তু সে চারিদিন ছাত্রের অত্যধ্যায়ের দিন হইয়াছে!

নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে সত্যবাদী ইস্কুলে ছাত্র আসে; নতুবা প্রাতে ও অপরাহ্ণে ইস্কুল বসিতে পারিত। যাহাতে সব ছাত্র কুলগৃহে বাস করে, তাহার উপায়-চিন্তা চলিতেছে। উপায় হইলে, দশটা হইতে চারিটা, এই যে বিদ্যাভ্যাসের অসময়, তাহার অবসান হইবে। আহারান্তে ইস্কুলে ধাবিত হওয়া, আর সেখানে মস্তিষ্কের চালনা, স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। বিদ্যালয়ে কিংবা বাড়ীতে পড়াশুনার নিমিত্ত ক্ষীণ আলো ভাল নয়, প্রখর আলোও নয়। প্রখর আলোকে চোখ ধরিয়া যায়, ক্ষীণ আলোকে বিকৃত হয়। ছাত্রের বামদিক্ হইতে আলো আসিবে, কি দক্ষিণদিক্ হইতে আসিবে, কোন্ দিকের আলো চক্ষুর অনিষ্টকর নহে, অধুনা বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা তাহা বিচার করিতেছেন। উপর হইতে আলো ছড়াইয়া পড়িলে, বিশেষতঃ গাছের ডালপালার মাঝ দিয়া আসিলে চোখের কষ্ট হয় না। পূর্ব্বে কেবল কলেজের ছাত্রেরা কেহ কেহ নিকট-দৃষ্টি হইত, এখন ইস্কুলের ছেলেরাও হইতেছে। ডাঃ 'রে লাঙ্কষ্টার দেশের যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, তিনি বিদ্যালয় দেখিতেছেন। তিনি সত্যবাদী বিদ্যালয়ের উপবন-বিদ্যালয়ের নানাদিক্ হইতে চিত্র লইয়া গিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, সব বিদ্যালয় উপবনে হইলে, যক্ষ্মারোগের অন্ততঃ একটা কারণ দূর হইত।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১২ জন বালক লইয়া সত্যবাদী ইস্কুল আরম্ভ হইয়াছিল। এখন সেখানে প্রায় ৪০০ ছাত্র। ইহাদ্বারা শিক্ষা-বিষয়ে দেশের অভাব কিছু পূরণ হইয়াছে। এই ইস্কুল একবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, ওড়িশার অন্য অন্য স্থানেও বিদ্যালয় স্থাপনা হইতে পারিবে। কর্ত্তৃপক্ষেরা আশা করেন, সত্যবাদী ইস্কুলের কোন কোন

ছাত্র পরার্থপর হইবে। আজিকালি কেবল বঙ্গে নহে, ভারতের সর্ব্বত্র 'শিক্ষা' 'শিক্ষা' রব উঠিয়াছে। কিন্তু কি ভাবে শিক্ষা পাইলে দেশের ছেলেরা মানুষ হইবে, সে বিষয়ে তেমন রব শোনা যাইতেছে না। ইস্কুল চাই—কলেজ চাই; কিন্তু কেন চাই? যাহা চাই তাহা পাইতেছি কি? অধিকাংশ ইস্কুল গতানুগতিক ন্যায়ে চলিতেছে। কিন্তু প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষ। ছেলেরা কিছু শিখিতেছে না, এমন নহে। ইংরেজী শিখিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পার হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বহু ইস্কুলের, কেবল উপরের একটা দুইটা শ্রেণী নহে, নীচের শ্রেণীতেও আদর্শ হইয়াছে। ইস্কুলে ছেলেরা "লেক্‌চর্‌" শোনে, ঘরে গিয়া মাষ্টার-মশায় ও পণ্ডিতমশায়ের নিকটে পড়া মুখস্থ করে। অনেক ইস্কুলে ছেলেরা বহির বোঝা বহিতে বহিতে কাতর হইতেছে। এক ইংরেজী ভাষা শিখাইতে কত ব্যাকরণ, কত সাহিত্য, কত গল্পপুস্তক, বাঙ্গালা হইতে ইংরেজী অনুবাদশিক্ষা, ইংরেজী রচনাশিক্ষা ইত্যাদি গদ্য-পদ্য কত বহি পড়ান হইতেছে। এমন ইস্কুল আছে, যেখানে বর্ষে বর্ষে বহি পরিবর্ত্তিত হইতেছে; পাটী-গণিত—বীজগণিতের বহিও হইতেছে! হঠাৎ দেখিলে এসব পরিবর্ত্তন জীবনের লক্ষণ মনে হয়। মনে হয়, শিক্ষার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কি কৌশলে অল্প সময়ে ছেলেরা পণ্ডিত হইতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষা লঘু হইয়াছে, এবং সে কারণে বহু ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছে। আমার মনে হয়, পরীক্ষা লঘু হয় নাই; পরীক্ষা পার হইবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারি-পাঁচ বৎসর ধরিয়া, যদি প্রবেশিকা-পরীক্ষা জপ করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধি না হইবে কেন? উদ্দেশ্য দেখিলে, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট, তাহা বলিতেই হইবে। কিন্তু মানুষের অভাব-আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত হইতেছে; পরীক্ষাপারগতা জীবনের লক্ষ্য হইতেছে না। এইসব ভাবিয়া চিন্তিয়া সত্যবাদী ইস্কুলের যুবক-শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে থাকিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু ইস্কুলে পাঠ পড়িলেই ত হয় না; সংসার আছে। এই হেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন; এইবৎসর হইতে পাইয়াছেন। তথাপি প্রচুর স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন। ইহার খর্ব্বের আশঙ্কায় সরকারী অর্থসাহায্য অদ্যাবধি গ্রহণ করেন নাই। মাসিক ব্যয় ৫০০৲ টাকা, ৪০০ ছাত্র হইতে উঠিতেছে। অর্থাভাবে সকল দিকে মন দেওয়া হইতেছে না; কিন্তু নাই বলিয়া বসিয়া থাকাও চলে না। বস্তুতঃ দেশের পক্ষে ইস্কুলের পরীক্ষা—শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা আবশ্যক হইয়াছে। দেশের যাবতীয় বালক-বালিকাকে এক পাকা বাঁধা রাস্তায় চালাইয়া তাহাদের মন হইতে অন্য পথের সম্ভাবনা লুপ্ত হইতেছে। এমন কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন, তিনি যে পথ উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তাহাতেই সমস্ত সিদ্ধি হয়। সুখের বিষয় ইস্কুলের ইন্‌স্‌-পেক্‌টর হইতে সরকারী শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টার সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই সত্যবাদী ইস্কুলের প্রশংসা করিয়াছেন। দুই মাস হইল, সত্যবাদী ইস্কুল হইতে "সত্যবাদী" নামক এক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। "মীন" মাসের "সত্যবাদী" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতেছি—বাঙ্গালা অনুবাদ আবশ্যক নাই—

"ভারত আজি নানাবিধ দুঃসহ দুর্ব্বিপাক ভোগ করুঅছি। এ সময়রে এ দেশরে জন্মকু কেহি কেহি অতিশয় [অনভিলষিত] মনে করি পারন্তি। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী এবং স্বদেশবৎসল প্রাণপক্ষরে ভারতেরে জন্মলাভ করিবা চিরস্পৃহণীয়। বিশ্বসেবা নিমন্তে [নিমিত্তে] ভারত প্রশস্তক্ষেত্র। ভারতীয় আর্য্যমানে [সকলে] চিন্তাদ্বারা এবং কার্য্যদ্বারা বহু পুরাকালরু বিশ্বপ্রাণতা লাভ করিবা লাগি যে পরি [যেমন] ঔৎসুক্য এবং প্রয়াস দেখাই অছন্তি এবং ফলরে এথিরে [ইহাতে] যেতেদূর কৃতিত্ব লভি অছন্তি তাহা অন্যত্র দেখা যাএ নাহিঁ।" নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং সেবাধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিলে, অসাধ্যসাধনও হয়।

নীর ও ক্ষীর

শশাঙ্ক *

[শ্রীহংসেশ্বর দেবশর্ম্মা, M. A.]

একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। অধুনাতন পুরাতত্ত্বানু-

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, M.A.

সন্ধিৎসু সম্প্রদায়ে শ্রীযুত রাখালদাস বাবু একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। আমি ইঁহাকে এই প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-পথের পথিক হওয়ার প্রথম দিন হইতে দেখিতেছি এবং দিনের পর দিন দেখিয়া আসিতেছি যে, এই পথের পথিক হইবার যোগ্যতা রাখাল-বাবুর কত বেশী। এ পথ অতি দুর্গম। কত ধৈর্য্য, কত অধ্যবসায়, কত অর্থব্যয় ও কত ধীশক্তি থাকিলে যে, এই পথে চলাফেরা যায়, তা যাঁহারা এ পথের প্রকৃতযাত্রী, তাঁহারাই অবগত আছেন। বলিলে হয়ত' বড় বেশী কথা বলা হইল বলিয়া কাহারও কাহারও কাণে বাজিতে পারে; কিন্তু যাহা সত্য, তাহা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া বলিতে পারি যে, বঙ্গবাসিগণের বা ভারতবাসিগণের মধ্যে ঐ একজন মহামহোপাধ্যায়-পথিকের পার্শ্বেই বুঝি রাখালবাবু দাঁড়াইয়াছেন।

সেই রাখালবাবুই এই শশাঙ্কের প্রণেতা। রাখালবাবু ঐতিহাসিক; ঐতিহাসিকের হাত হইতে উপন্যাস যেন পাহাড়ের বুক হইতে প্রস্রবণ। বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি বটে! কিন্তু ইহাই ঘটিয়া থাকে; পাহাড়ের প্রস্রবণেই দেশ জীবনধারণ করিয়া থাকে।

ঐতিহাসিকেরাই দেশের জীবনদাতা। দেশের মনে পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যাবলীর ফলাফল—দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া, দেশকে চলিতে শিখাইতে ঐতিহাসিকেরাই দক্ষ। ঐতিহাসিকের কাছে দেশ বড় আদরের। রাখালবাবু তাঁহার আদরের দেশের জন্য উপন্যাসাকারে এই শশাঙ্ক লিখিয়া, প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য্য করিয়াছেন।

অনেকেই জানেন যে, শশাঙ্ক একজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ। ইনি বঙ্গের কর্ণসুবর্ণের রাজা। হর্ষচরিতের কবি বাণভট্ট ও চৈনিক পর্য্যাটক হিউন্থ্ সাঙ্গের নিকট হইতে আমরা ইঁহার পরিচয় পাই। কিন্তু এই পরিচয়ে শশাঙ্ককে একজন বড় কাপুরুষ, কুৎসিতকর্ম্মা ও অতিথি-হত্যাকারী, নিতান্ত জঘন্য ব্যক্তি বলিয়াই জানি। অথচ, প্রকৃতই কি তাই? যাহার বাপ-পিতামহের সন্ধান নাই, পুত্র-পৌত্রাদির খবর নাই, সেই যে স্বনামধন্য ভাগ্যবান্ জীবটি, তাহার কি ইহাই পরিচয়? বঙ্কিমবাবুর যেমন, একদিন সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কথাটায় স্বাভাবিক একটা অযৌক্তিকতার ধারণা হওয়ায়, 'মৃণালিনী'-রচনায় প্রবৃত্তি হয়, রাখালবাবুর 'শশাঙ্ক'-রচনায় যেন তেমনি একটি ভাবের কথা মনে হয়। স্বনামধন্য রাজা শশাঙ্কের ঐ অমন অপবাদটায় রাখালবাবু সন্দিহান হইয়া তাঁহার 'শশাঙ্ক' লিখিয়াছেন। ইতিহাস যাহাই হউক, 'মৃণালিনীতে' যেমন বিষম একটা ষড়যন্ত্রই বঙ্গপতনের মূল বলিয়া সুন্দররূপে

* মূল্য দুই টাকা; ডাকমাশুল চারি আনা।

সমাহিত হইয়াছে, শশাঙ্কেও তেমনি এই বৌদ্ধ ষড়যন্ত্রের বেশ যুক্তিবিশুদ্ধ অবতারণা হইয়াছে। রাখালবাবু শশাঙ্ককে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন বটে; আমার কিন্তু মনে হয়, সেই অজ্ঞাতপূর্ব্বাপরবৃত্তান্ত স্বনামধন্য পুরুষপ্রবর শশাঙ্কের ইহাই যেন ইতিহাস। যে দুইজন পূর্ব্ববর্ত্তীর কাছে আমরা শশাঙ্কের খবর পাইয়াছি, তাহার একজন শশাঙ্কের বিরোধী; একজন রাজার আশ্রিত কবিপণ্ডিত ও অপরজন বিদেশী এবং সেই কবিপণ্ডিতের শব্দের প্রতিশব্দকারী মাত্র; সুতরাং উহা যে কতদূর সত্যমূলক, তাহা নিশ্চয়ই ভাবিবার বিষয়।

ইতিহাস সহজেই বড় নীরস; এই ইতিহাস লইয়া নাড়াচাড়া করায়, ঐতিহাসিকেরাও নীরস। এই নীরস ঐতিহাসিকের কৃতিত্ব তখন পরিস্ফুট হয়, যখন ইতিহাসের শুষ্ক অবয়বে সাহিত্যের সুন্দর বেশভূষা পরানো হয়; রাখাল বাবু তাহা করিয়াছেন। রাখালবাবুর শশাঙ্ক পড়িয়া, আমাদের জাতীয় মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থার ছবিটি পরিস্ফুটভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছি। যখন আমরা মরি নাই, তখন আমরা কেমন ছিলাম; আর তাহার পর, কেমন করিয়া মরিলাম—শশাঙ্ক পড়িয়া তাহা যেন চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি। দেখিতে পাইতেছি যে, আত্মবিরোধই আমাদের ধ্বংসের মূল। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে চাহে না;—বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণকে সজীব দেখিতে চাহে না। ইহা লইয়া আবার রাজায় রাজায় দলাদলি। ফলে উভয়েরই মৃত্যু। শশাঙ্ক ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংসপথের ইহা প্রস্ফুট ছবি। রাখালবাবু এই ছবিটি আঁকিয়া দেশে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছেন। এখনই কেহ বুঝি বা না বুঝি, এই পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণে আমরা কেহ না কেহ কখনও না কখনও বুঝিতে পারিব যে, আমরা আপনা-আপনিই কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছি; আর তাহা বুঝিয়া যদি কখনও আবার বাঁচিয়া উঠিবার সাধ হয়, তখন, আমাদের পূর্ব্ব-দোষ স্মরণ করিয়া, সংসারপথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিব।

রাখালবাবুর 'শশাঙ্ক'-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য, আমি ইহাই বুঝিয়াছি। গ্রন্থকার মিশর-বাবিলনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, তাঁহার এ গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে অতদূর যাইতে চাহি না। আমরা যে আমাদের রামায়ণ-মহাভারতাদির কাহিনী লইয়া এতকাল কাব্যরচনা করিয়া আসিতেছি, আমাদের সেই পুরাতন উদ্দেশ্যেই এই শশাঙ্ক নির্ম্মাণ। অতি পুরাতন কাহিনী ছাড়িয়া দিয়া, কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' রচনার উদ্দেশ্যের সহিত শশাঙ্ক-রচনার উদ্দেশ্য বড় সন্নিহিত। অত দূরের কথাও ছাড়িয়া দিয়া, আমরা দেখিতে পাই, 'বাল্মীকির জয়' ও 'ভারতমহিলা'র কবি এই উদ্দেশ্যেই ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাখালবাবু যে, এই সব মহাজনক্ষুণ্ণমার্গের অনুগমন করিয়াছেন, ইহা বড় আনন্দের বিষয়। ধন্যবাদের সহিত রাখালবাবুকে আশীর্ব্বাদ করি, তিনি দীর্ঘজীবী ও সুযশস্বী হউন। তাঁহার মত বিশিষ্ট ইতিহাসজ্ঞের নিকট হইতে আমরা কাব্যরূপে যেন আরও অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব দেখিতে পাই।

এখন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার কথা পরিত্যাগ করিয়া, ইহার কাব্যাংশ আলোচনা করিব। প্রথম আলোচ্য কাব্যের নায়ক। শশাঙ্ক ইহার নায়ক। শোণসঙ্গমে বালক-মূর্ত্তিতে প্রথম ইহাকে দেখিতে পাই। শশাঙ্ককে কবি যে ছাঁচে ঢালিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এই বালককে আমরা শোণসঙ্গমের নাবিকগণের নৌকাবাহন ব্যাপার হইতেই তাহা জানিতে পারি। জানিতে পারি যে, ঐ বিধাতৃহস্তনির্ম্মিত আকাশের কলামাত্র উদিত শশাঙ্কে যেদীপ্তি—যে স্বচ্ছতা—যে রমণীয়তা অতি সূক্ষ্মমাত্রায় প্রকাশমান, কবির 'শশাঙ্কে'ও তাই। বিধাতার কলামাত্র শশাঙ্ক যেমন ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া, পূর্ণচন্দ্র হয়, কবির শশাঙ্কও তাহাই হইয়াছে। ইহাতেই যেন কবির কৃতিত্ব অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ কাব্যে আমরা নায়ককে পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতেই দেখিতে পাই। একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প-অঙ্কন অপেক্ষা আমার যেন মনে হয়, যিনি ফুলটির কলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার তদ্‌গত রূপলাবণ্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতায়তনে অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই সুচিত্রকর। সৃষ্টিকর্ত্তার হাতের কাজের মত, যেন তাঁহার নৈপুণ্য অনুভূত হয়। শোণসঙ্গমে প্রথম যখন আমরা রাখালবাবুর শশাঙ্ককে দেখি, তখন শশাঙ্ক দশ-বার বৎসরের বালক। বালক—পুরাতন ভৃত্য লল্লের সহিত প্রাসাদ-বাতায়নে সান্ধ্যবায়ু-সেবন করিতেছে। নীচে শোণ ও

"কাজল-বিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ো।"
— রবীন্দ্রনাথ

* শ্রীবীরেশ্বর সেন কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে
শিল্পীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

গঙ্গার সন্ধিস্থলে জলরাশি আস্ফালিত হইতেছে। দৃশ্য বড় বিভীষিকাময় ও কমনীয়তা-পরিশূন্য। বালকের চক্ষু কিন্তু সেই খানে। আরও কত সুন্দর ও অনুদ্বেগকর দৃশ্য ত ছিল, বালক কিন্তু সে সব দেখিল না। পরে যাহাকে কেবল ভীষণ দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার প্রাণের প্রথম উন্মেষ এইরূপে না আঁকিলে, পরে তাহা ফুটিবে কেন? তাহার পর নাবিকেরা তাহা পার হইতে পারিল না জানিয়া, বালকের যে নৈরাশ্য, তাহা বীরহৃদয়োচিত দুর্গমকে সুগমকরণ প্রবৃত্তির পূর্ব্বাভাষ। কবি, শশাঙ্ককে যে আকারে নির্ম্মাণ করিবেন, ইহা হইতেই তাহার সূচনা বুঝা যায়। বুঝা যায় যে, কবির শশাঙ্ক, আত্মসুখাভিলাষী পরদুঃখানপেক্ষী পরমর্য্যাদানভিজ্ঞ স্বার্থান্ধ, নীচাশয় অপদার্থ কাপুরুষ জীবরূপে সৃষ্ট হইতেছে না। কবির শশাঙ্ক হইতেছে, স্বসুখ-নিরভিলাষ দুঃখাভীরু লোকহিতার্থী জ্যেষ্ঠসম্মানকারী প্রেমপূর্ণ কর্ত্তব্যপরায়ণ মহদাশয় একজন যথার্থ বীর। নহিলে কি ঐ সুখলালিত দুঃখানভিজ্ঞ রাজপুত্র আনন্দময় দৃশ্যসকল পরিত্যাগ করিয়া, ঐ অশান্ত জল-রাশির দিকে দৃষ্টিপাত করে; না, ঐ নাবিকদিগের দুর্দ্দশায় চিন্তিত হয়! আবার শশাঙ্কের মুখে যখন লল্লকে দাদা সম্বোধন করিতে শুনি, তখন ঐ বালহৃদয়ে কত ঔদার্য্য দেখিতে পাই। শশাঙ্ক—রাজরাজেশ্বরের পুত্র, সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী; আর লল্ল হীনজাতি সামান্য ভৃত্যমাত্র। শশাঙ্ক কি না তাহাকে ডাকিল—দাদা বলিয়া! ইহাতে ঐ বালহৃদয়ে কতই নিরভিমানিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। উচ্চ-হৃদয়-চিত্রণে এ বর্ণ ব্যবহার অতি উপযোগী। তাহার পর বালকের গরুড়ধ্বজ লইয়া, ক্রীড়া-ব্যাপারে ভাবী মহাপুরুষ-ভাবের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সুরূপের সমক্ষে কুৎসিতের অবতারণায় সুরূপের সৌন্দর্য্য যেমন অধিক মনোরম হয়, তেমনি ঐ শশাঙ্ক সমীপে মাধবের অবতারণা করাইয়া কবি তাহা বেশ ফুটাইয়াছেন। মাধবের যেমন আকার, তেমনই প্রকার দিয়া গঠিত করিয়া, কবি তাহাকে তাঁহার বালনায়কের নিকটে আনিয়া দিয়া, নায়ক চরিত্র বড় উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। সত্যের নিকট অসত্য, ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্ম ও বীর্য্যের নিকট ভীরুতার মত শশাঙ্কের নিকট মাধব আসিয়া দেখা দিয়াছে। শশাঙ্করূপ ধর্ম্মবৃক্ষের ঐ মাধব পাষণ্ডই যে কুঠার, তাহা যেন এইখান হইতেই বুঝা যাইতেছে। এইরূপে কবি নিপুণতাসহকারে প্রথম পরিচ্ছেদেই তাঁহার কাব্যের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। চিত্রা কাব্যের নায়িকা, সুতরাং নায়কের উহা দ্বিতীয় আকার। মাধব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, বালিকা-চিত্রার শশাঙ্কসমীপে দৌড়িয়া আসায়, নায়িকা প্রেমের প্রথম উন্মেষটি বেশ স্পষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যখন আবার আমরা শশাঙ্ককে দেখি, তখন কবি তাহাকে যদুভট্টের মুখ হইতে প্রত্নকথা শুনাইতেছেন। ভূমির উপযোগী বীজ ছড়ানয় কৃষকের যেমন কৃষিবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, কবির এখানে সেইমত কার্য্য হইয়াছে। সম্রাট্ আসিয়া পড়ায় যখন তাহাদের সে বার্ত্তায় আঘাত পড়িল, তখন শশাঙ্কের ক্রন্দন দেখাইয়া, কবি শশাঙ্কের হৃদয় প্রায় গড়িয়া ফেলিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে একটি কথা বলিবার আছে। অমন প্রীতিকর কথা শুনিতে শুনিতে শশাঙ্কের ঘুমাইয়া পড়াটা যেন খাপ খায় না। কবিও যে তাহা না ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি তাহার সমাধানের জন্য যুদ্ধবিগ্রহের কথা ব্যতীত কথাবসরেই..তাহার ঘুমের কৈফিয়ৎটা দিয়াছেন। সেটা কিন্তু ঠিক্ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; যুদ্ধবিগ্রহের ফল যে রাজ্যলাভাদির কথা, তাহা যুদ্ধপ্রিয় হৃদয়ে আলস্যদায়ক নহে।

দেহে ও মনে কৈশোরাবস্থায় সমাগত শশাঙ্ককে আমরা আবার দেখি, চতুর্থ পরিচ্ছেদে। শশাঙ্ক তখন বুঝিয়াছে, গুপ্তসাম্রাজ্য ক্ষীয়মাণ। স্বসম্পর্ক স্থাধীশ্বর-রাজের লোলদৃষ্টি সম্রাট্‌কে কম্পিত করিতেছিল। শশাঙ্ক তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া, জাগ্রত হইবার বাসনা করিতেছিল। সম্রাটের বসিবার স্থানে প্রভাকরবর্দ্ধনের জন্য স্থাপিত সিংহাসন পদাঘাতে চূর্ণ করাইয়া, কবি তাহা অতি নিপুণতার সহিত দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রভাকরবর্দ্ধনের সৈনিকগণের যথেচ্ছ ব্যবহার দমন ও অসহায় দুটি বালকবালিকাকে উদ্ধার করাইয়া, পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহার পুনরভিনয়টি বড়ই সন্তোষজনক হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদে শশাঙ্ককে দেখি, একেবারে শিশুজনোচিত ক্রীড়ারত। পঞ্চম পরিচ্ছেদের শশাঙ্কের কার্য্যাবলীর পর এরূপ ক্রীড়াটি এখানে ক্রমবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তবে শক্রসেনের দুরন্ত ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াও কুমারের নির্ভীকতা

দেখানটুকু যথাযোগ্য হইয়াছে। নির্ভীক হইলেও আপনার অদৃষ্টকথা শুনিয়া, আলোড়িতচিত্ত কুমারের এইখানে যশোধবলের মত লোকের সহিত সাক্ষাৎটি বড় কালোচিত করা হইয়াছে।

ইহার পর হইতেই শশাঙ্ককে আমরা পূর্ণাবয়বে দেখিতে পাই। কবি যে ইহাকে এতক্ষণ ধরিয়া, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, পরদুঃখকাতরতা, আত্মসম্মানপ্রিয়তা, পরসম্মানকারিতা, ভৃত্যপ্রিয়তা, অনুগতবৎসলতা, সহৃদয়তা ও প্রেমপ্রবণতা প্রভৃতি প্রকৃত সৎপুরুষোচিত লক্ষণে বিভূষিত করিতে ক্রমে ক্রমে অঙ্কন করিতেছিলেন ; এইবার হইতে তাহার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। "সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপিহি পুণ্যেন ভবতি।"

শশাঙ্কের সহিত যশোধবলের মিলন সেইরূপ এক পুণ্যময় ব্যাপার। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এই পুণ্যমিলনের এক অভূতপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট্ মহাসেনগুপ্ত সভায় আসীন ; সংবাদ হইল, যুবরাজ শশাঙ্ক রোহিতাশ্ব-দুর্গাধিপতি বৃদ্ধ যশোধবলের সহিত দ্বারে দণ্ডায়মান। একদিন যে যশোধবল সম্রাটের দক্ষিণ বাহু ছিল, বিধিবিড়ম্বনায় বহুদিন হইতে সাম্রাজ্যে তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিস্ময় বিজড়িত একটা নিস্তব্ধতা সম্রাট্ ও সভাকে কাহাকে দেখাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। অসম্ভব সত্যসত্যই সম্ভব হইল—সমবেত জয়ধ্বনিতে সে নিস্তব্ধতা আকুল হইয়া পড়িল। কবির তূলিকা এই চিত্রে যে রঙ্ ফলাইয়াছে, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। সম্রাটের বাহুপাশ ছিনাইয়া যখন যশোধবলের আগ্রহে সম্রাট্ সম্রাটের আসনে আর যুবরাজ যুবরাজাসনে উপবিষ্ট, তখন কবি যে একটি কারুগিরি করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই কারুগিরিতে শশাঙ্কের মনস্বিতা একেবারে ছড়াইয়া দেখান হইয়াছে। সম্রাট্‌কে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া, সপ্ততিপর বৃদ্ধ যশোধবল যেমন যুবরাজকেও অভিবাদন করিল, অমনি যুবরাজ করিল কি,—না আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বৃদ্ধের চরণতলে পতিত হইল! এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার! আমি যুবরাজ, আজ বাদে কাল রাজাধিরাজ হইব, আমার কাছে তোমরা সবাই তুচ্ছ, এই না সংসারে সাধারণভাব। কিন্তু শশাঙ্কের কাছে কই তাহাত' দেখিলাম না। ভৃত্য হইলেও বৃদ্ধের সে সম্মান দেখাইয়া কি যে এক অনন্যসাধারণ মনস্বিতা দেখাইয়া ফেলিল। কবি! তুমি ইহাতে তোমার আত্মহৃদয়ের যেন ঔদার্য্য দেখাইয়া ফেলিয়াছ, তোমার মঙ্গল হউক।

শশাঙ্কের কার্য্যধারা দেখিয়া যাইয়া তাহাকে যেমন ক্রমে ক্রমে পূর্ণবয়স্ক ও পূর্ণগঠিত চিত্তবৃত্তি দেখিতে সাধ হয়, কবি সময়ে সময়ে সেইখানটায় কিছু নৈরাশ্য আনিয়াছেন। যশোধবল-শশাঙ্কের ঐ অমন চিত্রের পর চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে ফুলতোলার ব্যাপারটায় প্রক্রমভঙ্গ ঘটিয়া গিয়াছে। শশাঙ্ককে আর বালক বালক বলিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় না, আর তাহার গাড়ী গাড়ীখেলা ভাল দেখায় না। নায়ক-নায়িকার একটা পূর্ব্বরাগ দেখাইবার সময় আসিয়াছে, ইহা সত্য ; এবং তাহা দেখাইবার এই অবসরই বটে ; কিন্তু তাহা এই শিশুক্রীড়ায় জমিবে কেন? ইহা পরিবর্ত্তনের নিতান্ত আবশ্যক।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে রাজ্যভার গ্রহণ উপলক্ষে শশাঙ্ককে কবি আবার ঠিক্ ক্রমোন্নতি-পথেই আনিয়াছেন।

এখন হইতে যশোধবলে মিলিত শশাঙ্ককে যতবার দেখিতে পাই, ততবারই কবির শশাঙ্কনির্ম্মাণে সঙ্কল্পিতার্থকে সুসিদ্ধ বলিয়াই বুঝিতে পারি। সেই স্ববংশগৌরবপ্রিয় নির্ভীক বীররূপে বঙ্গদেশবিজয়যাত্রা-ব্যাপার, শঙ্করনদ প্রভৃতিতে যুদ্ধাবলী শশাঙ্ক অতি সুন্দরভাবে সমাহিত করিয়াছেন।

শশাঙ্ক-চরিত্রে আর একটি জিনিষ কবি বড় সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। সেটি শশাঙ্কের কলঙ্ক-মোচন। বোধিবৃক্ষহন্তা ও রাজ্যবর্দ্ধনঘাতক বলিয়া শশাঙ্কের যে কলঙ্ক, কবি তাহা সুন্দররূপে মোচন করিয়া দিয়াছেন। প্রথমটি নৃশংস কাপুরুষ বন্ধু গুপ্তের সন্ধানদ্বারা ও দ্বিতীয়টি দ্বৈরথযুদ্ধের ফলস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া। এ সমাধানটি বড়ই মনোরম হইয়াছে।

শশাঙ্ক-চরিত্রে, রাজনৈতিক ভাব বাদে, কবি যে ইহাতে একটা প্রেমভাব দিয়াছেন, তাহার বিষয় কিছু আলোচনা আবশ্যক।

চিত্রা ইহার পাত্রী। শোণসঙ্গমের পর্ব্ব হইতে কবি এই চিত্রা-প্রীতি দেখাইয়া আসিয়াছেন। শশাঙ্কের এই

কার্য্যে বয়োবৃদ্ধির সহিত এই ভাবস্ফুটনের তারতম্যের নৈপুণ্য প্রদর্শনের অভাবটুকু ব্যতীত বরাবরই বেশ সরলতা দেখান হইয়াছে। ইহাতে ঐ প্রক্রমভঙ্গরূপ দোষ-টুকু না থাকিলে, উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। পাঁচ বৎসর নিরুদ্দেশের পর, গুপ্তবেশে পাটলীপুত্রে আসিয়া, মাধবের সহিত চিত্রার বিবাহ কথা শুনিয়া, রাস্তায় পড়িয়া, শশাঙ্কের যে অচেতনভাব—তাহাতে প্রকৃতই সমবেদনা অনুভব করিতে হয়। বেদনার উপর বেদনা, যখন আবার শশাঙ্ককে দেখি, একেবারে রাজপ্রাসাদের ছাদে চিত্রার সম্মুখে। চিত্রা তখন অপরের।—কি দারুণ অবস্থা! আমার জ্ঞান আছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার প্রাণ আর আমার দেহের ভিতর নাই। শশাঙ্কের তখন এই অবস্থা! কবি ইহা চিত্রিত করিয়া-ছেন। এ নৈপুণ্যের সীমা নাই। এ অবস্থায় যাহা হইয়া থাকে, কবি তাহাই করিয়াছেন। সংসারের মুখে ছাই দিয়া, শশাঙ্ক বিদায় লইল। কিন্তু এ কি! যে প্রাণ আমার নাই বলিয়া বুঝিয়াছি, সে যে আমারই জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল! নিমেষ অতীত হইতে দিল না, শশাঙ্ক তাহার অনুগমন করিল। সুন্দর!—অতি সুন্দর! প্রেমভাবের ইহা অতি উচ্চ আদর্শ। সব ফুরিয়া যাওয়াই এভাবের স্বভাব। বইখানির এইখানেই যেন শেষ হইয়া গেলেই ঠিক্ হইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। কবিকে এইখানে আমার একটু বক্তব্য আছে। বক্তব্য এই যে, এই ব্যাপারের পর, শশাঙ্কের হঠাৎ পুনরায় সংসার-প্রবেশটা যেন কিছু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কোনরকম-কিছু যুক্তিপূর্ণ কৈফিয়ৎ দিয়া প্রবেশ করাইলে যেন বড়ই ভাল হইত। মৃত্যুপর্য্যন্ত শশাঙ্ক-হৃদয়ে এই চিত্রামমতা দেখান হইলেও, এইখানে একটা কৈফিয়ৎ থাকা নিতান্ত দরকার বলিয়া মনে হয়।

শশাঙ্ক সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। ধীবর-গৃহে সেই এক জ্ঞানহীন পাগল অবস্থায় শশাঙ্ককে চিত্রিত করিয়া, কবি একটি নূতন রকমের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কলচালিতের মত হাত নাড়ে, পা নাড়ে, হাঁসে, কাঁদে, কথাও কয়, অথচ যেন প্রাণ নাই—সেই এক অদ্ভুত রকমের হইয়াছে। ইহা আমাদের ঠিক দেশীয় ভাব না হইলে বড় সুন্দর হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ইহা আমাদের সাহিত্যের অঙ্গশোভা সম্পাদন করিতেছে।

নায়কই গ্রন্থের প্রাণ বলিয়া, শশাঙ্ক-সমালোচনায় কিছু কালক্ষেপ করিয়া ফেলিলাম কিন্তু বুঝিলাম, গ্রন্থখানিতে-শশাঙ্ক প্রাণটি বেশ সজীবরূপে বিদ্যমান আছে।

এখন ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমালোচনা করিব। পুরুষ-দিগের মধ্যে প্রথম যশোধবল। শশাঙ্করূপ প্রাণ লইয়া যে অবয়বটি আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, যশোধবল তাহার মস্তক। যশোধবল না থাকিলে, শশাঙ্ক দাঁড়াইতে পারিত না। রোহিতাশ্ব-দুর্গে যশোধবলের প্রথমদর্শনেই কবি উহাকে গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, ধৈর্য্যে পৃথিবী ও বীর্য্যে হুতাশনতুল্য করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। ক্রমে সম্রাট্-সকাশে যশোধবল যখন আসিয়া পড়িল, তখন দেখি যশোধবল একজন অদ্বিতীয় প্রভুপরায়ণ। সম্রাটের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়াও বৃদ্ধের কর্ত্তব্যপরায়ণতার ক্ষুণ্ণতা নাই। বৃদ্ধ যশোধবল সম্রাট্‌কর্ত্তৃক বন্ধুরূপে গৃহীত হইলেও, সম্রাটকে যে মর্য্যাদা দেখাইয়াছিল, তাহা যথার্থই চিত্তাকর্ষক। নিজের দুর্দ্দশা ভুলিয়া, সাম্রাজ্যের দুর্দ্দশায় বৃদ্ধের ঐ পুনরুদ্যম প্রভু-পরায়ণতার চরম দৃষ্টান্ত। এক কথায় এই বৃদ্ধই শশাঙ্কের নির্ম্মাতা। ইহার পর নরসিংহ দত্ত। শশাঙ্কের দক্ষিণ বাহু। নরসিংহ চিত্রার ভ্রাতা। চিত্রা মরিয়া যাইলে, নরসিংহ ক্ষুব্ধ হইলেও শৈশবে অসহায়ের সহায় রাজপুত্রের নিকট চিরকৃতজ্ঞই রহিয়াছিল। ইহা কৃতজ্ঞতার একটা বড় দৃষ্টান্ত। তাহার পর, অনন্তবর্ম্মা, বসুমিত্র, মাধববর্ম্মা প্রভৃতি সকলের চরিত্রই বেশ সুন্দররূপে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। ইহারা সব শশাঙ্কের যেন হাত-পা; সবাই যেমন উপযোগী, তেমনই আবশ্যক।

এই যশোধবল-মস্তক ও নরসিংহ দত্ত প্রভৃতি হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট শশাঙ্ক-মূর্ত্তির জনকরূপে আমরা যাঁহাকে দেখিতে পাই তিনি মহাসেন গুপ্ত। ইনি গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট্। কবি ইঁহাকে দুর্ব্বল-নখদন্ত প্রাচীন সিংহের মত গড়িয়াছেন। ঠিক্‌ই হইয়াছে। যাহার দুরদৃষ্টফলে তাহার বংশগৌরব বিলুপ্ত হইবে বলিয়া বিধিবিধান হইয়া রহিয়াছে তাহার ঐ রকমইত হওয়া চাই। কবি বেশ কৃতিত্বসহকারে মহাসেনগুপ্তকে সমালোচিত করিয়াছেন। মহাসেনগুপ্ত ও প্রভাকরবর্দ্ধনের সমক্ষে চরণাদ্রিদুর্গেরই সে

নির্ব্বাসিত ছোট বালক-বালিকা—ভাইভগিনীর অভিনব ব্যাপারে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির কণা-কণা স্ফুলিঙ্গ ছুটাইয়া, কবি মহাসেনগুপ্তকে প্রাচীন সিংহেরই মত দেখাইয়াছেন। অধিক বলিয়া আর সময় নষ্ট করিতে চাহি না—মহাসেন গুপ্ত, এইরূপ সর্ব্বত্রই সমানভাবে চিত্রিত হইয়া, কবির কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। আর, উহার ঐ বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সমাবেশে বৃদ্ধ মহাসেনগুপ্তের অবস্থা বেশ জমিয়া গিয়াছে।

এইবার শশাঙ্কের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়ের কথা বলিব। প্রভাকরবর্দ্ধনপ্রমুখ স্থাণ্বীশ্বর রাজগণ, নিজ ভ্রাতা মাধব, ও বন্ধুগুপ্ত, শক্রসেন, বুদ্ধঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, শশাঙ্কের দুষ্টগ্রহ! ইহাই যখন বিধিলিপি, শশাঙ্কের অনেক শুভগ্রহ থাকিলেও এই সব দুষ্ট গ্রহেরাই উহাকে বিনষ্ট করিবে, তখন দুষ্টগ্রহ, গুলিকে যে যে বস্তু দিয়া গঠন করিবার আবশ্যক, কবি তাহা বেশ নিপুণতাসহকারে করিয়াছেন। প্রথম, প্রভাকর পাটলিপুত্রে আসিয়া যেসব ঔদ্ধত্য দেখাইয়া গিয়াছে তাহা দুষ্টগ্রহেই সম্ভব। বধুগুপ্ত একটি নৃশংস দুষ্টগ্রহ। যশোধবলের পুত্রকে এ ব্যক্তি যে ঘৃণিতরূপে হত্যা করিয়াছে, তাহা পড়িলে উহার নামোচ্চারণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ হয়। যশোধবলের হস্তে ইহার বধব্যাপার, আরও কষ্টদায়ক হইলে তবে যেন মনের শান্তি হয়। শক্রসেন, দুষ্টগ্রহ হইলেও, শশাঙ্কের জীবনদাতা। শক্রসেন, শশাঙ্কের ভ্রাতা মাধব অপেক্ষা, ভদ্রলোক। মাধবে তাহার ভ্রাতার জন্য যে প্রাণটুকু থাকা উচিত ছিল, শক্রসেন, শত্রু হইলেও, তাহাতে তাহা ছিল। বন্ধুগুপ্ত-হস্তে আহত হইয়া, শশাঙ্ক যখন জল-মগ্ন, শক্রসেন তখন শত্রুতা ভুলিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই জলে ঝাঁপ দিয়াছিল। তাহার পর, ধীবরগৃহে শক্র-সেনই শশাঙ্ককে আরোগ্য করে। শক্রসেনের এ কার্য্যটি বড়ই প্রশংসনীয়। আর দুরাত্মা মাধব, আপন ভ্রাতাকে অসহায় পাইয়া, কাপুরুষের মত স্বহস্তে বধ করিল। এ সব পাপচিত্র। কিন্তু এ চিত্রও যথাযথ হইলে, কবির প্রতিভা ইহাতেও সুন্দররূপে ফুটিয়া থাকে। রাম ও রাবণের চিত্রাঙ্কনে যে কৃতিত্ব, শশাঙ্ক ও মাধবের চিত্রেও কবির তাহাই দেখিতে পাই। কাব্যকর্ত্তার ইহা বিশেষ গুণ।

পুরুষগণের মধ্যে, দেশানন্দ ঠাকুরটির কথা কিছু বলা হয় নাই। যাত্রায় বা নাটকে যেমন মনোভাব বদলাইবার জন্য সঙের প্রয়োজন হয়, তেমনি শুষ্ক রাজনৈতিক ও দুরন্ত দুরদৃষ্টের কঠোর ভাবে পরিপূর্ণ গ্রন্থখানিতে দেশানন্দের মত একটা মজাদার জিনিষের বড়ই আবশ্যক হইয়াছিল এবং দেশানন্দকে কবি বাঁদর নাচ নাচাইয়া সে আবশ্যকটিকে বেশ ফুটাইয়াছেন। তবে ঐ বেচারিটির উপর আমার কিছু একটু সহানুভূতি হয়। যাহাই হউক, লোকটা নিরপরাধত বটে, ওটাকে অমন করে জেলখানায় ছাড়িয়া দিয়া, একেবারে তাহার কিছু খোঁজ খবর না লওয়াটা তরলার পক্ষে ভাল হয় নাই। ঐ সুযোগে ওটাকে একেবারে তরলাকে 'মা' বলাইয়া, তথাগতের আস্তানায় পাঠাইয়া দিলে ভাল হইত।

গ্রন্থের প্রধান পুরুষচরিত্র ছাড়িয়া দিয়া, এবার প্রধানা স্ত্রী-চরিত্রের আলোচনা করিব। তক্ষদত্তের কন্যা চিত্রা ইহার নায়িকা; যশোধবলের পৌত্রী লতিকাও তাহাই। তবে চিত্রার দাবী কিছু বেশী। সে লতিকা অপেক্ষা রাজসংসারে আগে আসিয়া ঢুকিয়াছে। লতিকা যখন আসে তখন চিত্রা জানে, শশাঙ্ক আমার; কাজেই চিত্রা কিছু প্রগল্‌ভা। এই প্রগল্‌ভতা মিশ্রিতই চিত্রার প্রেম। সেই প্রথম পরিচ্ছেদে মাধবের তাড়া খাওয়া হইতে চিত্রাকে আমরা যত বারই দেখিয়াছি, তত বারই চিত্রার শশাঙ্কের প্রতি এই একাধিপত্য প্রবৃত্তিই দেখিয়া আসিতেছি। মুগ্ধার প্রেমের মত ইহা তত অসাধারণ মধুর না হইলেও সাধারণ মধুর বটে। কবির চিত্রা সেই ফুলতোলা ব্যাপারে লতিকা-ঘটিত অভিমান হইতে একই সুরে বাঁধা আছে। চিত্রার মৃত্যুর দিনে চিত্রার এই প্রেম ফুটিয়াছে বড় ভাল। সেই যুদ্ধযাত্রার দিনে তুমি আসিবে বলিয়া সেই যে চলিয়া গেলে আর আসিলে না; তারপর যা শুনি সে কথাত' ভাবিতেও পারি না। পাঁচ বৎসর পরে জড়ভরতের মত আমার দেহটাকে আর একজন কাড়িয়া লইয়াছে মাত্র; আর তুমি স্বপ্নাবির্ভূতের ন্যায় আসিয়া আমায় দেখা দিলে; কিন্তু আমি যখন তোমার আছে শুনিলাম, এখন আর আমার সেই তত সাধের তোমাকে ভাবিবারও অধিকার নাই—তখন আমি ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারিব। আমি মরিলাম। এইখানে চিত্রার প্রগল্‌ভা শশাঙ্ক-প্রেম অত্যন্ত প্রগল্‌ভ্য সহকারে সাম্রাজ্য-ময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে জাতীয় প্রেম যতদূর উঠিলে

ঠিক্ তাহার উচ্চসীমায় উঠে, ইহা তাহাই উঠিয়াছে। কবির এই গঠন-প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে হয়।

এইবার লতিকা। মেয়েটি বড় মুগ্ধা-নায়িকা। লতিকাও শশাঙ্কে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে ; কিন্তু সে চাহে না, তাহার এই প্রাণসমর্পণ আর কেহ দেখুক—এমন কি, যাহাকে প্রাণ সঁপিয়াছে, সেও না দেখুক। লতিকাতে প্রগল্‌ভতা একটুকুও নাই ; তাই তাহার ঈর্ষাও নাই—অভিমানও নাই। এ প্রেম অসাধারণ মধুর। চিত্রা, জন্মের মত চলিয়া যাইলেও, মুগ্ধা লতিকা শশাঙ্কের কাছে প্রেম-পরিচয় দিতে পারে নাই। রোহিতাশ্ব-দুর্গে তরলা একদিন ধরিয়া বাঁধিয়া লতিকাকে শশাঙ্কের কাছে আনিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে লতিকার মুগ্ধত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। লতিকা পট্টমহাদেবী হইতে চাহে নাই—সিংহাসন, রাজমুকুট চাহে নাই—এমন কি চিত্রাগতপ্রাণ শশাঙ্কের প্রেম-ভালবাসাও চাহে নাই ! চাহিয়াছিল, শুধু দাসী হইতে—চাহিয়াছিল, শুধু ভালবাসিবার অধিকার পাইতে। এ প্রেম প্রকৃতই অসাধারণ মধুর প্রেম। তাহার পর, যখন তাহাও পাইল না, তখন লতিকার যে পুরুষবেশে শশাঙ্কের অনুগমন ও শেষে সমুদ্র-সৈকতে হৃদয়েশ্বরের চিত্রাময় প্রাণের একপার্শ্বে সামান্য একটু স্থান-ভিক্ষা করিয়া যে মরণ, তাহা সেই মুগ্ধার যোগ্য।

ধীবর-কন্যা ভব।—ছোটলোকের মেয়ের মত প্রেমই বটে। অতদিনের নবীনকে ছাড়িয়া, বড় সুন্দর ছেলেটি বলিয়া,শশাঙ্ককে ভালবাসিয়া ফেলাটা 'ইৎরমো' তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু গরীবের ঐ রূপজ মোহটা কবি যখন অমন সাংঘাতিক করিয়া ফেলিলেন যে, সে বেচারী যখন জানিল যে, তাহার ঐ টুকটুকে পাগলছেলেটা একটা দিগ্‌গজ রাজা এবং তার মত গরীবের পক্ষে একবারে দুষ্প্রাপ্য, তখন সে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল—ইহাতে কিন্তু উহার ভালবাসাটা কিছু মূল্যবান্ হইয়া উঠিল। এই মূল্যবান্ ভালবাসাটাকে একেবারে চির-নিরুদ্দিষ্ট না রাখিয়া, শেষকালে সৈকতে আনিয়া ফেলিয়া, শশাঙ্কের পাদমূলে মারিয়া ফেলিলে যেন ভাল হইত। ভালবাসাটায় আত্মত্যাগ আছে ; সুতরাং তাহার কিছু ফলও পাওয়া চাই।

যূথিকা।—ইহার প্রেম দেখিতে পাওয়া গেল না, কেবল শুনিয়াই গেলাম। বহুৎ আচ্ছা, তাহাতে কিছু আসে যায় না ; তবে প্রেমের দায়ে কুলকন্যকার গোপনে পিতৃগৃহ-ত্যাগটা বড়ই দূষণীয়। স্বৈরিণী বলিয়া লোকে ইহাকে ঘৃণা করিতে পারে। বসুমিত্রকে বৌদ্ধকবল হইতে উদ্ধার করিয়া, কবি উহাকে যেমন রাজসংসারে আশ্রয় দেওয়াইয়াছেন, তেমনি বসুমিত্রের পিতাও ভাবী শ্বশুরকে অনায়াসেই রাজদলভুক্ত করিয়া, মেয়েটির আত্ম-সম্মান বজায় রাখিতে পারিতেন।

তরলা।—সরলা ও চতুরা স্ত্রীলোকের বেশ চিত্র। প্রেমিক যুগলের মিলন-সহায় হইয়া তরলা নিঃস্বার্থভাবে যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে, তাহাতে রাজরাণী হইবারই সে উপযুক্ত।

উপসংহারে, দুইটি রাজমাতার কথা বলিব। প্রথম মহাসেনগুপ্তা স্থাণ্বীশ্বররাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের মাতা। ইনি একজন বড় রাজনীতিবিশারদ স্ত্রীলোক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি মগধসম্রাট্ মহাসেনগুপ্তের ভগিনী। ইঁহার বুদ্ধিমত্তায় ও পিতৃকুলগৌরব রক্ষাকারিণী মতিগতির গুণে শশাঙ্কের বয়ঃপ্রাপ্তির অগ্রে মগধসাম্রাজ্য রক্ষিত হইয়াছে। ইনি শিশু শশাঙ্ককেও রক্ষা করিয়া, তাহাকে বড় হইবার পথে আনিয়া দিয়া গিয়াছেন।

পট্টমহাদেবী।—ইনি শশাঙ্কের মাতা। রাজমাতার মতই ইঁহাকে চিত্রিত করা হইয়াছে। তবে তিনি একটি দোষে বড় দূষিতা হইয়াছেন। চিত্রার মুখে শুনি, ইনিই নাকি জোর করিয়া, তাঁহার শশাঙ্কের চিত্রাকে মাধবের করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়হীনতা ও পুত্র-বাৎসল্যের বড় অভাব লক্ষিত হইয়াছে। কবি তাঁহাকে গণকের মুখে ও মহারাজার ভবিষ্যদ্‌বাণীতে শশাঙ্কের আগমনের কথা জানাইয়া দিয়াও, কেন তাঁহাকে দিয়া চিত্রার হত্যাসাধন করিলেন, তাহা বুঝিলাম না। মাধবরাজা স্থাণ্বীশ্বর-রাজদূত ; মাধবের মন্ত্রী যশোধবল নগণ্য কর্ম্মচারী মাত্র ; এ অবস্থায়, চিত্রার উপর জোর করিবার লোকের অভাব ছিল না।

আমাদের দেশে আমাদের জাতীয় জীবনের জীবিত কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্গভাষায় এই নূতন। রাখাল-বাবু বঙ্গভাষায় এ রত্ন উপহার দিয়া, তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি, রাখালবাবু দীর্ঘজীবী ও যশস্বী হউন।

ফিজিদ্বীপে ভারতবাসী

[শ্রীহংসেশ্বর দেবশর্ম্মা, M.A.]

শ্রীযুক্ত তোতারাম সনাঢ্য-প্রণীত "ফিজিদ্বীপমেঁ মেরে ২১ বর্ষ" নামক একখানা হিন্দী পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তোতারাম* ব্রাহ্মণ সন্তান, আগরা ফিরোজাবাদের অন্তর্গত হিরনগৌ-নামক স্থানে ১৮৭৬ সনে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর—প্রৌঢ়। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া দুরবস্থার পীড়নে সতর বৎসর বয়সে তোতারাম কর্ম্ম-অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া, পদব্রজে চলিতে চলিতে ষোল দিনে প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আড়কাটীর হাতে পড়িয়া, তাহার ছলনায় ও প্রলোভনে ভুলিয়া, কুলী-ডিপোতে বন্দী হইলেন। তিনি,তাঁহার বিষাদময় জীবনের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিতে করিতে বলিয়াছেন, "ইসী তরহ ধোখে মেঁ আকর সহস্রো ভারতবাসী আজন্ম কষ্ট উঠা'তে হৈঁ।" ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া কুলীদিগের সম্মতি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ধূর্ত্ত আড়কাটী বুঝাইয়া রাখিয়াছিল যে, "কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হাঁ বলিও, নতুবা 'তুমপর নালিশ কর দী জাবেগী',—তোমাকে জেল খাটিতে হইবে।" সুতরাং সরল, নিরীহ, গ্রাম্য এবং অধিকাংশ নিরক্ষর ও অপরিপক্কবুদ্ধি 'কুলীরা' ভয়েভয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সম্মতি জানাইয়াছিল। তোতারাম বলিতেছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কহো তুম্ ফিজি জানেকো রাজী হো?"† কিন্তু 'য়হ নহীঁ বতলাতা থা কি ফিজি কহাঁ হৈ, বহাঁ ক্যা কাম করনা পড়েগা, তথা কাম ন করনে পর ক্যা দণ্ড দিয়া জাবেগা।" ফিজি কোথায়, কি কাজ, তাহার সর্ত্ত কি, এ সকল কথা, জানিতে না দিয়া, প্রতারণা করিয়া ভদ্রঘরের স্ত্রীপুরুষ আড়কাটীতে দ্বীপান্তরে পাঠাইতেছে! তোতারাম বলিতেছেন, তাঁহাদের

ফিজিপ্রবাসী ভারতীয় কুলী—মধ্যে উপবিষ্ট তোতারাম

দলের ১৬৫ জন কুলীর নাম ২০ মিনিটের মধ্যে রেজেষ্টরী শেষ হইয়া গিয়াছিল। তৎপর রেলে চড়াইয়া, তাঁহাদিগকে হাবড়া পাঠান হইল। রেলে তাঁহাদিগকে অপর লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে দেওয়া হইল না। "যদি কোই আপসমেঁ (পরস্পর) বাতচীত করতে তো উঠা দিয়ে জাতে থে।" কলিকাতা সদর ডিপোতে আসিলে, 'এমিগ্রেশন

* ফিজিদ্বীপমেঁ মেরে ২১ বর্ষ, তোতারাম সনাঢ্য-প্রণীত, ফিরোজাবাদ (আগরা) ভারতীভবন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৵০।

† ফিজিদ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরে, সংখ্যা প্রায় ২০০, ১৮০° দ্রাঘিমা, ১৫° হইতে ২২° অক্ষরেখা, অষ্ট্রেলেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাজধানী সুবা (Suba)। ইহা ইংরেজের একটা Crown Colony.

অফসর' তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, "তোমরা ফিজি যাইতেছ, সেখানে ৷৵০ রোজ মজুরী পাইবে, পাঁচ বৎসর পর ঘরে ফিরিতে পারিবে, কিন্তু তাহা হইলে জাহাজ-ভাড়া নিজে দিতে হইবে। ১০ বৎসর পর ফিরিলে সরকারী ভাড়ায় আসিতে পারিবে। সেখানে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিবে। ফিজি ত স্বর্গ ইত্যাদি।" আড়কাটী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী-সঙ্কেত করিতে ছিল। তৎপর তাঁহাদের টাকা-পয়সা, বাসন-কোশন, বাক্স-পেঁটরা, কাপড়-চোপড় যাহা কিছু ছিল, আড়কাটী আত্মসাৎ করিয়া গা-ঢাকা দিল। "ফির কৌন দেতা হৈ ঔর কৌন লেতা হৈ।" এমিগ্রেশন অফিসর বুঝাইবার সময় তোতারামের মনে সন্দেহ হইল। গ্রামের পাঠশালায় তিনি হিন্দী লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলেন; অতএব সাহেবকে বলিলেন—"মৈঁ ফিজী ন জাউঙ্গা।" তাহা শুনিয়া সাহেব তাঁহাকে বাঙ্গালীবাবুর হাওলা করিয়া দিলেন। তোতারামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামলাল কলিকাতায় রেলী-ব্রাদার্সের অধীন মুনীমগিরি কাজ করিতেন। তোতারাম ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দরোয়ান মতাইন করিয়া একঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। "একদিন একরাত মৈঁ ভূখা প্যাসা উসী কোঠরী মেঁ রহা।" তারপর 'লাচার' হইয়া তিনি জীবনের ভয়ে 'ফিজি' যাইতে রাজি হইলেন।

তোতারাম বলিতেছেন—সদর ডিপোতে "জবরদস্তী চমার, কোরী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সবকো এক হী জগহ বৈঠাকর ভোজন করায়া জাতা হৈ।" প্রায় সকলকেই 'জুঠেবর্ত্তনোঁ মেঁ ভোজন করায়া গয়া ঔর পানী পিলায়া গয়া।" কেহ আপত্তি করিলে "খূব পীটা গয়া।" জাহাজে চড়িবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে ডাক্তারি পরীক্ষা হইল। স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষাও পুরুষ ডাক্তারেরা করিলেন। তারপর কয়েদী-দিগের মত জামাটুপী ও পায়জামা পরাইয়া, কুলীদিগের প্রত্যেককে টিনের থালা ও লোটা ও এক একটা 'থৈলা' দেওয়া হইল। জাহাজে প্রত্যেক কুলীর জন্য মাত্র ৬ ফিট লম্বা ও ১½ ফিট চওড়া স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং যে বিস্কুট খাইতে দেওয়া হইল, তাহা দাঁতে ভাঙ্গা দুষ্কর। তোতারাম যে জাহাজে জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন, তাহাতে প্রায় ৫০০ ভারতবাসী বিদেশে অন্নের অন্বেষণে যাইতেছিল। জাহাজে কুলীদিগকে খাটাইয়া লওয়া হইল। অনেকের দ্বারা "টোপসের" অর্থাৎ টাট্টি সাফ করার কাজ করান হইল। "সারে জাহাজমেঁ ত্রাহি ত্রাহি কা শব্দ গূঁজনে লগা।" + তিন মাস ও ১২ দিন পর সিঙ্গাপুর ও বোর্ণিওর পথে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে ফিজীদ্বীপে উপস্থিত হইল।*

ফিজিদ্বীপ পুঞ্জের অন্তর্গত নকুলাও নামক এক দ্বীপে তোতারাম ও তাঁহার সহযাত্রী শ্রমজীবীরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। সেখানেও ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিল। সকলকে ডিস্‌ইনফেক্‌ট্‌ করাইয়া ডিপোতে প্রবেশ করান হইল। প্রত্যেক কুলীর ব্যয় ২১০৲ টাকা অগ্রিম লইয়া, ভিন্নভিন্ন এষ্টেটে কুলী ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। তোতারাম যাইতে, ইতস্ততঃ করিলে, গলাধাক্কা দিয়া, তাঁহাকে নৌকায় আরোহণ করান হইল। "গোরে সিপাহিয়োঁনে ধকে দে কর মুঝে, নাব পর চঢ়া দিয়া।" তোতারাম বলিতেছেন, এষ্টেটে স্নানের কষ্ট, আহারের কষ্ট, শ্রমের কষ্ট বর্ণনাতীত। ভুক্তভোগী তোতারাম তাঁহার নিজ জীবনের যে সকল লোমহর্ষণ অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। ভারতবাসী শ্রমজীবীদিগের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সুবিধা-বিধানের জন্য কতকগুলি বিধি ও নিয়ম প্রণয়ন করা হইয়াছে; কিন্তু কর্ম্মচারীদের ঔদাসীন্যে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। তোতারাম বলিয়াছেন, "তাঁহাকে ফিজিদ্বীপে নৌসুরী কুঠী (Factory) তে নিযুক্ত করিয়াছিল। সেখানে তাঁহাকে এক ক্ষুদ্র গৃহে একজন মুসলমান ও একজন চামার সহবাসীর সহিত থাকিতে হইবে।" (১১১ পৃঃ দেখ) একই লৌহপাত্রে সকলকে রাঁধিয়া খাইবার ব্যবস্থা ছিল। তোতারাম ফিজিদ্বীপের স্বাধীন ভারতবাসীদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া কোন মতে ধর্ম্মরক্ষা ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতেন।

প্রথম ছয় মাস কুলীদিগকে কুঠী হইতে রসদ দেওয়া হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের প্রাপ্য বেতন হইতে সপ্তাহে ২ শিলিং ৪ পেন্স (১৷৵০ টাকা) করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। প্রতিদিন ॥৵০ ছটাক আটা, ৵০ ছটাক ডাল ও আধছটাক ঘি রসদের পরিমাণ। প্রত্যহ দশ ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রমের

---

* মূল পুস্তকের ১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য

পর হিন্দুস্থানী জোয়ানের জঠরানলে আড়াই পোয়া আটা অনলে ঘৃতাহুতি !

প্রত্যহ ভোরে ৪টার সময় উঠিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া, কুলীদিগকে ৫টার সময় ক্ষেতে কায করিতে যাইতে হয়। প্রতি কুলীকে ১২০০ হইতে ১৩০০ শত ফিট লম্বা ও ৬ ফিট চৌড়া ক্ষেত্র কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। ইহার নাম Full task বা পূরা কাম। কোন কুলী পূরা কাম আদায় দিতে না পারিলে, তাহার নামে আদালতে নালিশ করা হয়। অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ১০ শিলিং (৭৷৷০ টাকা) হইতে ১ পাউণ্ড (১৫৲ টাকা) পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড করেন। প্রতি মাসে পূরা কাম করিলে, এক এক কুলী ১ পাউণ্ড দুই শিলিং (১৬৷৷০ টাকা) বেতন পাইতে পারে। কিন্তু পূরা কাম কেহই সমানভাবে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত করিতে পারে না। অতএব তোতারাম কহিতেছেন—সাধারণ লোকে "১০ শিলিং য়ানী ৭৷৷০ রু০ প্রতিমাস সে অধিক নহীঁ কমা সকতে।" ফিজীতে খাদ্যসামগ্রীও অতিশয় মহার্ঘ্য—"ভারতবর্ষ সে দুনে তেজ হৈঁ।" * তার উপর ওভারসিয়ার অর্থাৎ পরিদর্শকদের অত্যাচার, স্ত্রীলোকের সতীত্বে হস্তক্ষেপ, বণিকদিগের অত্যাচার এবং উকীল-ব্যারিষ্টার দিগের অর্থগৃধ্নুতা, ধূর্ত্ততা ও অত্যাচার তোতারাম যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়। ১৯১১ সনের আদমসুমারীতে দেখা যায়, ফিজিদ্বীপে ৪০২৮৬ জন (পুং ২৬০৭৩, স্ত্রী ১৪২১৩) ভারতবাসী আছে। সেখানে য়ুরোপিয়ন সাহেবের সংখ্যা, স্ত্রীপুরুষ মোট, ৩৭০৭। ভারতবাসীদের সকলেই সর্ত্তবন্দী কুলী নহে, অনেকে স্বাধীন হইয়া সেখানেই বসবাস করিতেছে। সমাজের ও জাতির ভয়ে তাহারা দেশে ফিরিতে পারে না। সে দেশে তাহাদের অবস্থা আদিম-নিবাসী জঙ্গলীদের অবস্থা অপেক্ষাও হেয়। স্ত্রীলোকের সংখ্যার ন্যূনতাবশতঃ খুন, মারামারি, আত্মহত্যা প্রায়ই হইতে দেখা যায়। বিবাহিত পত্নীকেও সেখানে রেজেষ্টরী করিয়া না লইলে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হয় না। ভারতবাসীদিগের শিক্ষার, নীতির ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতির কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত নাই। ৫ বৎসরের সর্ত্ত শেষ হইলে, তোতারাম বীরের ন্যায় ফিজিদ্বীপের কুলীদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য একাদিক্রমে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বনামধন্য পুরুষপ্রবর

মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী

মিঃ গান্ধী* ও মরিশশদ্বীপনিবাসী মিঃ মণিলাল, ফিজিপ্রবাসী ভারতীয় শ্রমজীবীদিগকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন।

গান্ধী পত্নী শ্রীমতী কস্তুরা বাঈ

শ্রীযুক্ত মণিলাল, এম্-এ, এল্-এল্ ডি, বার-এট-ল, স্বয়ং ফিজিতে গিয়াছিলেন। ফিজিবাসীরা আনন্দোৎসব করিয়া

* শিলিং প্রতি ৬ পাউণ্ড আটা, (প্রায় ৩ সের) ৪ পাউণ্ড (প্রায় ২ সের) চাউল বা ৪ পাউণ্ড অড়হরের ডাল পাওয়া যায়। এক পাউণ্ড আমাদের ৭½ ছটাকের সমান, এক শিলিং আমাদের ৸০ আনা।

* গত ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার মহামতি শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী সস্ত্রীক কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার

তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। সে আনন্দে ফিজিদ্বীপের আদিম-অধিবাসীরাও যোগদান করিয়াছিল।* কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী দৈনিক ভারতমিত্র সর্ব্বপ্রথম ফিজি দ্বীপের কুলীপ্রথার বিরুদ্ধে লেখনী-ধারণ করিয়াছিলেন। সকল অত্যাচারের ও দুর্দ্দশার মূলে সর্ত্তবন্দী শ্রম-প্রথা বা কুলী-প্রথা (INDENTURE SYSTEM)। তোতারাম নিজেও বলিতেছেন, "ইসমেঁ দোষ কিসীকা নহীঁ হৈ, অসলী দোষ হৈ ইস্ Indenture system য়ানী কুলীপ্রথাকা।" এ সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের মতও প্রণিধানযোগ্য। অষ্ট্রেলিয়ান মেথোডিষ্ট মিশনারী মিস্ ডড্‌লে (Miss H. Dudley) বলিতেছেন—

"Living in a country where the system called "Indentured labour" is in vogue, one is continually oppressed in spirit by the fraud, injustice, and inhumanity of which fellow creatures are the victims. * * They (the women) would tell me of this trouble and how they had been entrapped by the recruiter or his agents. * * The look on those women's faces haunts me. * * I beg of you not to cease to use your influence against this iniquitous system till it be utterly abolished." *

"যে দেশে সর্ত্তবন্দী কুলীপ্রথা প্রচলিত আছে, তথায় বাস করিলে, মানুষের সহিত মানুষ যে ছল, প্রতারণা, অন্যায় ও অমানুষিক অত্যাচারপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া প্রাণে নিরন্তর বিষম যাতনা উপস্থিত হয়। * * তাহারা (স্ত্রীলোকেরা) আমাকে তাহাদের কষ্টের কথা শুনাইত এবং কিরূপে তাহারা আড়কাটীদিগের কথায় ভুলিয়া জালে পতিত হইয়াছিল, তাহাও খুলিয়া বলিত। * * তাহাদের বিষাদপূর্ণ কাতর দৃষ্টি বারংবার আমার স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমার অনুরোধ, যতদিন এই কুপ্রথার সমূলে উচ্ছেদ না হয়, ততদিন আপনি নিবৃত্ত হইবেন না।"

রেভঃ জে, ডব্লিউ বর্টন (J. W. Burton) তাঁহার প্রসিদ্ধ FIJI OF TO DAY নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"The young and brutal overseers on Sugar estates (of Australian and Newzealand origin) take all sorts of liberties with good looking Indian women and torture them and their husbands in case of refusal. * * Women are known to have been fastened in a row to trees and then flogged in the presence of their little children. এবং

"The system is a barbarous one, and the best supervisions cannot eliminate cruelty and injustice. * * It is bad for the coolie ; it is not good for the Englishman. †

"চিনির কুঠীর অপরিণতবয়স্ক, ওভারসিয়রেরা সুন্দরী ভারতীয় কুলীরমণীদিগের সহিত নানাপ্রকার স্বেচ্ছাচার

জন্য হাবড়া ষ্টেসনে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী বহু মান্যগণ্য ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুনা যায় শ্রীযুক্ত গান্ধীর বার্ষিক আয় মাসিক প্রায় দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা হইলেও তিনি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালী নেতারা নাকি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে তাঁহাকে না পাইয়া হতাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুস্থানীরা তৃতীয় শ্রেণী হইতে তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ভারতমিত্র (১৪ই মার্চ্চ) বাঙ্গালী নেতাদিগের উপর বেশ একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। শ্রীমতী গান্ধীর পরিধানে ছাপমারা থান কাপড় ছিল। শুনিলাম, শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রভৃতিরা সকলে শ্রীমতী গান্ধীকে রজতপাত্রে পট্টবস্ত্রাদি উপহার অর্পণ করিলে, তিনি তাহা স্পর্শ করিয়াছিলেন মাত্র, গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধী বিনয়বচনে কহিয়াছিলেন, 'আমরা টল্‌ষ্টয়ের শিষ্য, কর্ত্তব্য করিয়া যাই, কাহার নিকট হইতে কোন প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পারি না, ক্ষমা করিবেন।' শ্রীযুক্ত গান্ধীর আহার কেবল দুধ ও ফল, কোন প্রকার পক্বদ্রব্য তিনি স্পর্শ করেন না। হিন্দু-বিধবার তিন দিনের অম্বুবাচী তাঁহার জীবনব্রত হইয়াছে। গোলদীঘীর পার্শ্বে ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবার দিন (৩১এ মার্চ্চ) মিঃ গান্ধী রিক্তপদে মাথায় পাগড়ী বান্ধিয়া স্বদেশী গুজরাতীবেশে আসিয়াছিলেন।

* আলোচ্যগ্রন্থ—৪৩ পৃঃ—"জঙ্গলী লোগোঁনে ভী মণিলাল জীকা স্বাগত বড়ী ধুমধাম কে সাথ কিয়া" ইত্যাদি।

* আলোচ্য পুস্তকের ৭২ পৃঃ

† ঐ ৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ব্যবহার করে। তাহারা আপত্তি করিলে, তাহাদের ও তাহাদিগের স্বামীর প্রতি অত্যাচারের একশেষ হয়। স্ত্রালোকদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে গাছে বাঁধিয়া, তাহাদিগের পুত্রকন্যাদিগের সমক্ষে নিষ্ঠুরভাবে প্রহারিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই কুলী-প্রথা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কোন প্রকার পরিদর্শনের সুব্যবস্থা দ্বারা ইহা হইতে অন্যায় ও নৃশংসতা বিদূরিত করা সম্ভব নহে। কুলীদিগের পক্ষেও ইহা (সর্ত্তবন্দী কুলীপ্রথা) অমঙ্গলজনক ; ইংরাজের পক্ষেও ইহা মঙ্গলজনক নহে।

সুপ্রসিদ্ধ Capital পত্রের সম্পাদক বলিয়াছেন,—

"In no country in the world would this state of matters be tolerated for a moment and we think the position serious."

পৃথিবীর কোন দেশেই এই অবস্থা মুহূর্ত্তের জন্য সমর্থন করা যায় না এবং আমাদের মনে হয়, ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯১২ সনের সরকারী গেজেটে (৩১৬ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে—

"It is perfectly true that terms of the contract do not explain to the coolie the fact that if he does not carry out his contract or for other offences he is to incur imprisonment or fine."

ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, চুক্তির সর্ত্ত হইতে কুলী জানিতে পারে না যে, সে সর্ত্ত অনুসারে কাজ না করিলে, বা অন্যরূপ অপরাধ করিলে, তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইবে এবং জেলে যাইতে হইবে।

ভারতবর্ষে বিলাতের ন্যায় শ্রম-সমস্যা এখনও উপস্থিত হয় নাই। সর্ব্বগ্রাসী মূলধনের অত্যাচারে শ্রমের বিদ্রোহ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা এদেশে এখনও নূতন। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত মূলধন, ক্ষেত্র ও শ্রম—এই তিনের সমবায়ের প্রয়োজন। আমাদের ক্ষেত্র আছে, শ্রম আছে, কিন্তু মূলধন নাই। ধনীর ভাণ্ডারে অর্থ থাকিলেই তাহাকে মূলধন বলা যাইতে পারে না। যে টাকা ব্যবসায়ে খাটে, তাহাই মূলধন। এই মূলধনের আকর্ষণে ভারতবাসী শ্রম-বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন করিবে—দক্ষিণ আফ্রিকায়, মরিশশে, ত্রিনিদাদে, ব্রিটিশগায়েনায় ও ফিজীদ্বীপে যাইয়া দেশচ্যুত ও জাতিহীন হইয়া নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। তাহারা স্বেচ্ছায় সকল অবস্থা বুঝিয়া জানিয়া শুনিয়া স্বাধীন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলে, তজ্জন্য কাহাকেও দায়ী করা যাইতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞ, অশিক্ষিত, সরলপ্রকৃতির ভারতবাসী স্ত্রীপুরুষে দুষ্ট লোকের কথায় প্রতারিত হইয়া, অশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছে, ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক। স্বর্গীয় মহামতি গোখলে কুলীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। গত ২০এ ফেব্রুয়ারীর Indian Daily News নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, মিঃ রবার্টস—হাউস অব কমন্‌স্ মহাসভায় Indentured Indian Immigrantদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"Some proposals had been made for remedying defect." ক্রটী-নিরাকরণের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত তোতারাম বলিতেছেন—

"সর্ত্তবন্দী কুলীপ্রথা সম্বন্ধে প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য (১) কুলীপ্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন। (২) সমাচারপত্র সকলের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য কুলীপ্রথার বিরুদ্ধে 'সৈকড়োঁ লেখ ছাপেঁ।' (৩) জমীদারদিগের উচিত, গ্রামের প্রজাদিগকে আড়কাটীর কুহকে ভুলিলে কিরূপ পরিণাম হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। (৪) বক্তাদিগের কর্ত্তব্য—অবসর উপস্থিত হইলেই কুলীপ্রথার বিরুদ্ধে বাক্‌শক্তির প্রয়োগ। (৫) আইন-সভার সভ্যদিগের কর্ত্তব্য "হৈ কি ইস প্রথাকে বিরুদ্ধ প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভামেঁ পেশ করেঁ।"

তিনি সরকার বাহাদুরের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, (১) "গবর্ণমেণ্টের উচিত, অবিলম্বে এই প্রথা তুলিয়া দেওয়া। (২) কংগ্রেসের উচিত যে, বিশেষ এজেন্সী গঠিত করিয়া, প্রবাসী ভারতবাসীদিগের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে চেষ্টা করা এবং জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদিগকে যথাকালে জানান। (৩) Commerce Industry বিভাগের কর্ত্তব্য —ভারতবাসী যাহাতে স্বদেশে কার্য্য পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা।" (৪) তোতারাম তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে—"যেখানে সেখানে কুলীডিপো

আছে, তথায় যাইয়া তিনি ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীর দুরবস্থা বর্ণন করিবেন।" (৫) অবশেষে তিনি আশা করিয়াছেন,—

"জব হমারে দেশকে নেতা মহাশয় গোখলে উস কে বিরুদ্ধ আন্দোলন কর রহে হৈঁ তো ফির হমেঁ নিরাশ কভী ন হোনা চাহিয়ে।" কিন্তু হায়, গোখলে আর ইহধামে নাই! তাঁহার হাতের কাজ কে মাথা পাতিয়া লইতে অগ্রসর হইবেন? ভারতসরকার ব্রিটিশশাসিত ভারতবাসীর 'জান ও মাল খবরদারী' (protection of person and property) করিতে প্রতিশ্রুত। গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে, বিদেশে ভারতরমণীর সতীত্ব ও ভারতবাসীর স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় কখনও উদাসীন থাকিবেন না। ১৯১২ সনে ফিজিদ্বীপের ভারতীয় কুলীদিগের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণের অভাব ও অভিযোগ শুনিবার নিমিত্ত ভারতগবর্ণমেণ্ট এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তোতারাম বলিতেছেন, "ওভারসিয়ার ও কুঠীওয়াল সাহেব-(Planter) দিগের চক্রান্তে কমিশনের সাক্ষ্য তথ্য প্রকাশ হইতে পারে নাই।" তিনি বলেন, কমিশনের 'কর্ত্তব্য হৈ কি খেতমেঁ জাকর হম লোগোঁকে কষ্টোঁ কি জাঁচ করেঁ।'

তোতারাম তাঁহার (allegations) উক্তির সমর্থনের জন্য কোন প্রমাণ-প্রয়োগ উপস্থিত করেন নাই। যাহা হউক, ভারতসরকার ভারতীয় কুলীর দুর্দ্দশা-মোচন করিতে নিশ্চেষ্ট নাই। তবে, আমাদের মনে হয়, যতদিন এদেশের ধনিবৃন্দ সিন্দুকের টাকা মূলধনে পরিণত করিতে সাহস না করিবেন, যতদিন এদেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিশ্বাসী উচ্চশ্রেণীর শ্রমোপজীবীর দল গঠিত না হইবে, যতদিন ভারতবাসী যৌথকারবার করিতে না শিখিবে, যতদিন জনসাধারণের মধ্যে বর্ণজ্ঞান ও সাধারণশিক্ষা-বিস্তার না হইবে, যতদিন আমাদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও আত্ম-সম্মান-বোধ না আসিবে, যতদিন ভারতবাসী (আড়কাটি) একমুষ্টি অন্নের লোভে স্বদেশবাসীর গলায় ছুরীদিতে ঘৃণাবোধ না করিবে, ততদিন সকলে শত চেষ্টা করিলেও এই ঘৃণিত কুলি (ওরফে দাসত্ব) প্রথা একেবারে উঠিয়া যাইবে না; কিন্তু Out of evil cometh good, অমঙ্গল হইতে অনেক সময় মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। সর্ত্তবন্দী কুলী-প্রথায় ভারতবাসী বিদেশে হিন্দুউপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, পশ্চিমভারতে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে হিন্দুর সামাজিক সংস্কার শিথিল করিয়াছে, বিদেশে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তা, একপ্রাণতা, সমবেদনা ও সংগঠন শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, সাগরপারে আদিম অসভ্যজাতি ও ভারতবাসীর মধ্যে সৌহার্দ্দ-বন্ধন স্থাপন করিয়াছে* এবং ঔপনিবেশিক ভারতবাসীর মধ্যে মিঃ মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী, মিঃ মণিলাল ও শ্রীযুক্ত তোতারামের ন্যায় স্বদেশপ্রেমী, ভারতগৌরব মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।

* ফিজিদ্বীপের জঙ্গলী আদিম নিবাসীরা ভারতীয় শ্রমীদিগকে তাহাদের অপেক্ষা উন্নততর ও সভ্যতর বলিয়া মনে করে না। তাহাদের ধারণা, 'ইণ্ডিয়া বহুত বুরা দেশ হৈ জহাঁকী স্ত্রিয়াঁ মজদূরী করনে কে লিয়ে পর দেশমেঁ ফিজীকো আতী হৈঁ" ইত্যাদি। আলোচ্য পুস্তক—৫৭ পৃঃ

প্রেমের ঠাকুর

[শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী]

শৈশবের ধূলা-খেলা, কৈশোর চাঞ্চল্য তা'র,
কি জানি কি মন্ত্র গুণে ভাল না লাগিল আর।
ভেঙ্গে গেল, ভেসে গেল, পাণ্ডিত্যের অভিমান,
নব ভাবে নব সুরে ভরিল তাহার প্রাণ।
জীবের দারিদ্র্য-দুঃখ, রোগ, শোক, যাতনায়,
সে ভাবিয়া, সে কাঁদিয়া হারাইল আপনায়।
খেলা-ধূলা রঙ্গ তা'র হইল গো অবসান,
নূতন রঙ্গের চ'খে দেখিল সে ধরাখান।
নব তত্ত্ব প্রচারিতে সে হ'ল সন্ন্যাসী হায়,
জননী ও প্রেয়সীর কেঁদে কেঁদে দিন যায়।
ত্যজিলে সে জন্মভূমি, ত্যজিলে আত্মীয়গণ,
কাঁদিল তাহার তরে শত ও সহস্র জন।
সে এল আবার ফিরে—তখন সে প্রেমময়,
প্রেমের ঠাকুর দেখে বিশ্ব গায় জয় জয়!

আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লণ্ডনের ধর্ম্মবিষয়ক ও দেশহিতকর অনুষ্ঠান

[মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ্ মহ্তাব্ বাহাদুর, K.C.S.I. K.C.I.E., I.O.M.]

এই অধ্যায়ে আমি লণ্ডনের তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। এখানে অবস্থান সময়ে আমি কয়েকজন খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম; আমি সেই সম্বন্ধে অল্প দুই চা'রিটি কথা বলিব। তাহার পর, এখানকার সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কিরূপ ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম; সে কথাও বলিব; এবং এখানে যে সকল জনহিতকর সভা-সমিতি, অনাথভবন আশ্রম প্রভৃতি আছে, সে সম্বন্ধেও আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম; তাহারও অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

১৩ই জুন তারিখে আমি ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপ ডাক্তার র‍্যান্‌ডল্ ডেভিড্‌সনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ল্যাম্বেথ প্রাসাদে (Lambeth Place) গিয়াছিলাম। অনেকেই অবগত আছেন, ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপ মহোদয়ই ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক। দেখিলাম—ভদ্রলোকটি বড়ই অমায়িক। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সহিত কথোপকথন করিলেন; ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথা হইয়াছিল। তিনি আমাকে তাঁহার প্রাসাদের নানা স্থান দেখাইয়াছিলেন। এই প্রাসাদের সহিত অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে। আমি এই প্রাসাদদর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম।

সেই দিনই অপরাহ্নকালে আমি ফুলহাম প্রাসাদে (Fulhum Place) রাইট অনারেবল রাইট রেভারেণ্ড লণ্ডনের বিশপ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। লণ্ডনের তদানীন্তন বিশপ মহোদয়ের নাম ডাক্তার উইনিংটন ইনগ্রাম। ইনি অতি সদাশয় ব্যক্তি। ইঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইনি অতি সজ্জন ও সাধুব্যক্তি। ইনি যে প্রাসাদে বাস করেন, সেই ফুলহাম প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি বৃহৎ উদ্যান আছে; লণ্ডন রাজধানীতে এই উদ্যান একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

৬ই জুলাই তারিখে আমি ষ্টেপনির বিশপ (Bishop of Stepney) রাইট রেভারেণ্ড কস্‌মো গর্ডন ল্যাঙ (The Right Reverend Cosmo Gordon Lang) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিলে অধিকবয়স্ক বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু তাঁহার বয়স অল্প হইলেও তিনি তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল। ইঁহারই চেষ্টায় আমি লণ্ডনের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার অবকাশ লাভ করিয়াছিলাম। সে কথা পরে বলিতেছি। কলিকাতার বিশপ কপ্‌লষ্টন (Copleston) মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া লণ্ডনের কয়েকজন প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট পরিচয়-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতেই আমি এই সকল ধর্ম্মযাজকের সাক্ষাৎলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম।

১৮ই জুন তারিখে ইণ্ডিয়া আফিসের সাহায্যে আমি ফুলহামের কর্ম্মশালা (Work house) ও আতুর-আশ্রম (Infirmary) দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানকার কার্য্যপ্রণালী অতি সুন্দর ও সুব্যবস্থিত। শিশুদিগের বিভাগ, আতুর-বিভাগ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। আমি এখানকার প্রবেশ-রেজেষ্টরী-পুস্তকখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম। এই আশ্রমটি পার্লিয়ামেণ্টের ব্যবস্থাধীনে রক্ষিত হইয়াছে; সুতরাং ইহাকে এক প্রকার সরকারী আশ্রমই বলা যাইতে পারে।

তাহার পর আমি কুইন ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে মুক্তিফৌজের (Salvation Army) প্রধান কার্য্যালয় দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম। প্রধান কার্য্যালয়ের সম্পাদক মিঃ জোলিফির (Mr. Jolliffe) সমভিব্যাহারে আমরা সকলেই পুরুষদিগের জন্য সংস্থাপিত নিশা-আশ্রম (Night shelter) দেখিয়াছিলাম। এই স্থানে একরাত্রির জন্য অথবা সপ্তাহের সমস্ত রাত্রির জন্য দরিদ্র শ্রমজীবীদিগকে আশ্রয় প্রদান করা হয়। দেখিলাম, প্রত্যেকে দুই পেনি দিয়া একরাত্রির জন্য এখানে শয়নের স্থান ও বিছানা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যাহারা এই শ্রেণীর বিছানা ও স্থান হইতে আরও একটু ভাল রকমে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে প্রতিরাত্রির জন্য চারিপেন্স দিতে হয়। আহারেরও সুবন্দোবস্ত আছে; তাহার জন্য একপেনি বা তদূর্দ্ধ মূল্য ইচ্ছানুসারে দিতে হয়। মোট কথা এই যে, এখানে দরিদ্র শ্রমজীবীরা তিন পেন্স হইতে ছয় পেন্স দিয়া একরাত্রির জন্য আহার ও শয়নস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কোন শ্রমজীবী ইহা অপেক্ষাও ভাল ভাবে থাকিতে চায়, তাহা হইলে, তাহাকে প্রতি সপ্তাহে অর্দ্ধ ক্রাউন বিছানা-ভাড়া দিতে হয় এবং পূর্ব্বোক্ত হিসাবে আহারের ব্যয় দিতে হয়। মুক্তি-ফৌজের লোকেরা দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া বড়ই সুন্দর কাজ করিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষে মুক্তিফৌজের নাম শুনিয়া এবং তাহাদের রকম সকম দেখিয়া অনেকেই রহস্য করিয়া থাকেন; তাহাদের জয়ঢাকনাদ ও গীত আমাদের দেশের হাটে বাজারে যথেষ্ট আমোদের উপকরণ যোগাইয়া দেয়; কিন্তু ইংলণ্ডে, কি বৃটীশ উপনিবেশসমূহে, কি য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশে, এই মুক্তিফৌজ অনেক প্রকৃত সৎকার্য্য করিয়া থাকে। এই আশ্রম ব্যতীত লণ্ডন নগরীতে এই ফৌজের অনেক শাখা-আশ্রম আছে। এই ফৌজের অধীনে স্ত্রীলোকদিগেরও আশ্রম আছে। ইহাদের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত অতি পরিপাটী; এই সকল স্থানে লোকদিগের রাত্রিতে শয়নের জন্য যে বিছানা দেওয়া হয়, তাহা মলিন নহে, এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে আরামদায়ক। আমি ইহার একটা বিছানায় বসিয়া দেখিয়াছিলাম; বিছানা বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন ও কোমল। এই সকল শ্রমজীবীকে যে আহার প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাও দেখিলাম মূল্যের হিসাবে মন্দ নহে। এই সকল স্থান সন্ধ্যার সময়ই দেখিতে যাইতে হয়, কারণ সেই সময়েই শ্রমজীবিগণ এই সকল স্থানে সমাগত হইয়া থাকে।

হোয়াইট চ্যাপেলে (White Chapel) এই মুক্তি-ফৌজের সংস্থাপিত একটা কর্ম্মশালা আছে; আমরা তাহাও দেখিতে গিয়াছিলাম।
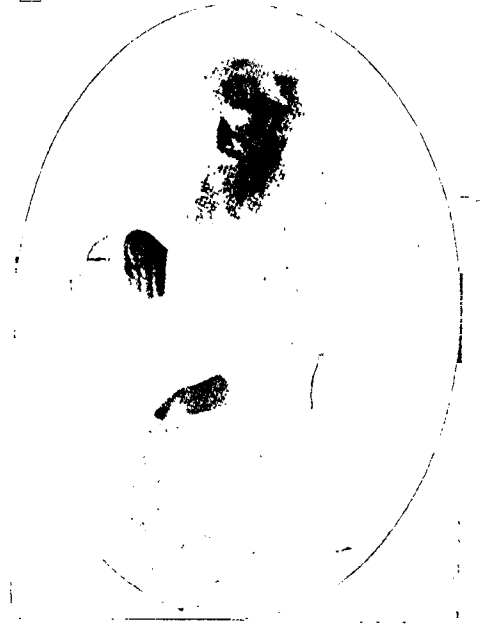
জেনারেল বুথ

এখানে যে সমস্ত দরিদ্রলোক আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি আসবাব পত্র, দ্বার-জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল স্থানে যে সমস্ত ভবঘুরে লোক আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কাজকর্ম্ম করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে; তাহাদিগকে এই প্রকারে কাজে লাগাইয়া, মুক্তিফৌজ বড়ই সুন্দর উপায়ে তাহাদিগকে কার্য্যকুশল করিয়া দিয়া থাকে। যে সমস্ত লোক এখানে কেবল রাত্রিযাপনের জন্যই আসিয়া থাকে, তাহারাও এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। মুক্তিফৌজের ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপ্রচার-প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা সাধারণের হিতকর যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহার প্রশংসা সকলেই করিবে, এবং এজন্য মুক্তিফৌজের অধিনায়ক জেনারেল বুথ মহোদয় যে সকলেরই ধন্যবাদভাজন, তাহাতে অণুমাত্রও

সন্দেহ নাই। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোক এবং শ্রমজীবি-সম্প্রদায় যাহাতে সদ্ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে এবং নানাবিষয়ে কার্য্যকুশল হয়, তাহার জন্য মুক্তিফৌজ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমি যে কয়টি আশ্রম দর্শন করিলাম, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যম অনেকাংশে সফল হইয়াছে। মুক্তি-ফৌজের সহিত প্রচলিত প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়;—(১) মুক্তিফৌজের দলভুক্ত ব্যক্তিগণের বাপ্তাইজ ক্রিয়া (Baptism বা Holy Communion) নাই; (২) তাহাদের বিবাহপদ্ধতির ও প্রোটেষ্টাণ্ট বিবাহপদ্ধতির অনেক স্থলে অমিল হইয়া থাকে। মুক্তিফৌজের লোকেরা তাহাদের নিশাযাপনকারী অতিথিদিগের জন্য দৈনিক উপাসনা-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে বটে, কিন্তু এবিষয়ে তাহারা অতিথিদিগকে স্বাধীনতা প্রদানে পরাঙ্মুখ নহে। তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় উপাসনালয়ে সমবেত হইয়া থাকে; নিশাযাপন-কারী অতিথিগণের মধ্যে যাহার ইচ্ছা, সেই এই উপাসনায় যোগদান করিতে পারে; তাহারা কাহাকেও এই উপাসনায় যোগদান করিতে বাধ্য করে না; বা কেহ উপাসনায় উপস্থিত না হইলে, তাহাকে আশ্রয়স্থান হইতে বিতাড়িত করে না। কিন্তু আমি জানি, আমাদের ভারতবর্ষে এমন অনেক খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার-সমিতি আছে, তাহার মধ্যে দুই চারিটি চিকিৎসা-মিশনও (Medical Mission) আছে, যাহার কর্ত্তারা এ বিষয়ে একটু কড়াকড়ি করিয়া থাকেন। মিশনের দাতব্য ঔষধালয়ে যাহারা ঔষধ আনিতে যায়, তাহারা যদি ঐ মিশনের উপাসনায় যোগদান না করে, তাহা হইলে তাহারা অনেক সময়েই ঔষধ বা ব্যবস্থা পায় না।

আমরা তৎপর একদিন ধর্ম্ম ফৌজ (Church Army) দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে মিঃ কার্লাইল নামক এক ব্যক্তি এই ধর্ম্মফৌজ গঠন করেন। ইহা মুক্তি-ফৌজের অনুকরণেই গঠিত; তবে মুক্তি-ফৌজের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা ইংলণ্ডের খৃষ্ট-ধর্ম্ম-সমাজের অন্তর্গত। লণ্ডনের বিশপ মহোদয়ের উদ্যান-সম্মিলনকল্পে মিঃ কার্লাইলের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং তিনি আমাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম দেখিতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ব্রায়ান্‌ষ্টন ষ্ট্রীটে মার্ব্বল আর্টের নিকট এই সমিতির প্রধান কার্য্যালয়। আমি সেখানে উপস্থিত হইলে মিঃ কার্লাইল মহোদয় উক্ত সমিতির সম্পাদক মিঃ হুইট্‌ল্‌কেই (Mr. Whittle) আমাদের সঙ্গে দিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে এই আশ্রম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মশালা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম; এখানে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে। দেখিলাম—পুরুষদিগের বিভাগে কাঠ চেলা করাই প্রধান কার্য্য। ইহার জন্য মজুরীর ব্যবস্থা আছে। প্রতি শত বাণ্ডিল চেলা কাষ্ঠের জন্য প্রত্যেকে দশ পেন্স করিয়া পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়; এই উপার্জ্জন হইতে তাহাদের প্রত্যেককে বাড়ীভাড়া, শয়ন ও আহারের জন্য প্রতি সপ্তাহে ছয় শিলিং করিয়া আশ্রমে দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা প্রতি সপ্তাহে পকেট-খরচের জন্য এক শিলিং হিসাবে পাইয়া থাকে। কার্য্যের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রত্যেকের যাহা প্রাপ্য হয়, তাহা হইতে উপরিউক্ত ব্যয় বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই ধর্ম্ম ফৌজের আফিসে প্রত্যেকের নামে জমা হয়। এই সঞ্চিত অর্থ হইতে তাহারা মধ্যে মধ্যে দরকার মত পরিবারের সাহায্যের জন্য কিছু কিছু করিয়া লইতে পারে। এই স্থানে যাহারা কাজ করে, তাহারা যদি অন্য কোন স্থানে ভাল কাজ লইয়া যায়, তখন তাহাদের জমা টাকা হিসাব করিয়া দেওয়া হয়। এই আশ্রমে স্ত্রীলোকেরা বিনা ব্যয়ে থাকিতে পায় ও আহার পায়; কিন্তু তাহাদিগকে অলসভাবে থাকিতে দেওয়া হয় না; তাহারা এখানে সূচের কার্য্য করিয়া থাকে, এবং এই সকল সূচী-শিল্প-দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা আশ্রমের ভাণ্ডারভুক্ত হয়। এই আশ্রম আরও একটি ভাল কাজ করিয়া থাকে। যে সমস্ত লোক কারাগার হইতে বাহির হইয়া ভালভাবে জীবনযাপন করিতে চায়, এই সমিতি তাহাদিগের কাজকর্ম্ম সন্ধান করিয়া দিয়া থাকে। এই সমিতির উদ্দেশ্য অতি সুন্দর; কিন্তু আমি যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে মনে হইল যে, মুক্তি-ফৌজের ন্যায় ইহার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত এখনও তেমন পাকা হয় নাই।

লণ্ডনে আর একটি স্থান দেখিবার আমার বড়ই বাসনা ছিল। ডাক্তার বার্ণার্ডো (Dr. Barnardo) একটি সুন্দর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'ডাক্তার

বার্ণার্ডোর আশ্রম (Dr. Bardanardo's Home). যে সকল বালকের চালচুলা কিছুই নাই, যাহারা পথে পথে ভবঘুরের মত জীবনযাপন করে, তাহাদের আশ্রয় দানের জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ডের (East End) মধ্যে স্থাপিত। আমরা একদিন এই আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশে এই প্রকার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা অতীব প্রয়োজন; আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোকেরা যদি এই প্রকারের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অর্থেরও সদ্ব্যবহার হয় এবং এক শ্রেণীর নরনারীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। অবশ্য ডাক্তার বার্ণার্ডোর আশ্রম যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যে প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে, আমাদের দেশে সে ভাবে সে প্রণালীতে আশ্রম চলিতে পারে না; আমাদের দেশের অবস্থা অনুসারেই কার্য্যপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতে হয়। এই আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিয়া ডাক্তার বার্ণার্ডো অমর হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে আনন্দ হয় যে, কত শত অনাথ, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, অসমর্থ বালক এই আশ্রমে থাকিয়া নানা কার্য্য শিক্ষা করিয়া, সৎভাবে জীবনযাপনের উপায় করিয়া লইয়া থাকে। তাহারা ইংলণ্ডেও ভাল ভাল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে; অনেকে দেশান্তরে যাইয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এখানে দেখিলাম, বালকেরা সূত্রধর, দরজী, কামার প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা মাদুর-বোনা ও বুরুষ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখানকার সরকারী হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল অকর্ম্মণ্য চালচুলাহীন পথে কুড়ান বালকেরা শেষে ভাল দরজী, কর্ম্মকার, ছুতার প্রভৃতি হইয়া বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে অল্প দুই চারিজনকে ডাক্তার, ধর্ম্মযাজক, শিক্ষক, বারিষ্টার প্রভৃতিও হইতেও দেখা গিয়াছে। অনেকে কানাডায় যাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। তাহারা যখন আশ্রম ত্যাগ করিয়া যায়, তখন তাহাদের বাল্য ও শিক্ষা-জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদের হস্তে দেওয়া হয়। সে সকল বিবরণ বড়ই সুন্দর। ডাক্তার বার্ণার্ডোর পরলোকগমনের পর যিনি তাঁহার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম মিঃ বেকার। তিনি এই কার্য্যে বিশেষ আগ্রহের সহিত নিযুক্ত আছেন।

অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল, লণ্ডনের অতি নীচ পল্লী দর্শন করিব এবং সেখানকার অধিবাসীদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিব। লণ্ডনের ধনী ও বড়মানুষদিগের যাহা কিছু দেখিবার তাহা ত কতক দেখিয়া লইয়াছি; এখন একবার এই বিচিত্র রাজধানীর দুঃখদারিদ্র্য কষ্ট হাহাকারের আড্ডা দেখিব। দেশে থাকিতে অনেক সময়েই অনেক সহৃদয় এংলো ইণ্ডিয়ানের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি, অনেকেই বলিয়াছেন—'Oh! the Slums London! go and see what poverty is like in London, and then you will understand that even the poorest Indian is better off than the London poor" কথাটার ভাবার্থ এই—"আহা, লণ্ডনের দরিদ্রপল্লী! একবার যাইয়া দেখ—লণ্ডনের দরিদ্র্য কি ভীষণ! একবার দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ভারতের অতি দরিদ্র ব্যক্তিও লণ্ডনের দারিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা কত ভাল অবস্থাপন্ন!" এই কথা আমার যখন তখনই মনে হইত। এখন লণ্ডনে আসিয়াছি। এখন একবার এখানকার দরিদ্রপল্লী না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন আমি ষ্টেপনির বিশপ-মহোদয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন লণ্ডনের বিশপ-মহোদয়ের পরামর্শ অনুসারে আমি তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। তদনুসারে একদিন সন্ধ্যার সময় অতি সাধারণ বেশ পরিধান করিয়া, একখানি নিম্নশ্রেণীর ভাড়াটিয়া গাড়ী লইয়া, আমি অক্‌স্‌ফোর্ড মিশনের প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র আশ্রম দেখিবার জন্য বেথনাল গ্রীনে (Bethnal green) অক্‌স্‌ফোর্ড হাউসে (Oxford House) গিয়াছিলাম। তখন এই আশ্রমের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার নাম মিঃ উলকুম্ (Mr. Woolcombe); তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া, আমাকে উক্ত আশ্রমের শ্রমজীবী ও বালকদিগের বিভাগ দেখাইয়াছিলেন। যে সমস্ত লোক দেখিলাম, তাহাদের প্রায় সকলেই যে বস্ত্রাদি পরিয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই ধনী লোকদিগের পরিত্যক্ত মলিন ছিন্ন পোষাক। কতকগুলি লোকের পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন। এই স্থানগুলি তাহাদের আড্ডা (Club)। ইহার একটি আড্ডায় উপস্থিত হইয়া, আমি কয়েকজন লোকের সহিত বিলিয়ার্ড খেলায় যোগদান করিলাম; একজন কৃষ্ণকায় ভারতবাসীকে তাহাদের

খেলায় যোগ দিতে দেখিয়া, তাহারা বেশ আমোদ অনুভব করিল। তাহারা আমার সহিত নানাপ্রকার রহস্যালাপ করিতে লাগিল এবং কথায় বার্ত্তায় কোন প্রকার সঙ্কোচ-বোধ করিল না। তাহারা তাহাদের মলিন হস্ত প্রসারিত করিয়া আমার করকম্পন করিতে লাগিল; তাহাদের সে মলিন হস্ত স্পর্শ করিতে তখন কিন্তু আমার মনে একটুও ঘৃণা বা দ্বিধা বোধ হয় নাই। আমার তখন মনে হইয়াছিল যে, আমি যে অবস্থাপন্ন, সে অবস্থা যদি আমার না হইত, তাহা হইলে আমি আমার জীবন এই দরিদ্রগণের সেবায় ও তাহাদের উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিতাম। মিঃ উলকুম্ বলিলেন যে, আমরা যে সকল পথ দিয়া এই স্থানে আসিয়া-ছিলাম, তাহার দুই একটি পথে রাত্রিতে চলাফেরা করা অতিশয় বিপজ্জনক; কারণ, সেই সকল পথে যে সমস্ত ক্ষুধার্ত্ত লোক পথের মধ্যে জটলা করে, তাহারা যদি কোন প্রকারে জানিতে পারে যে, কোন পথিকের সঙ্গে টাকা-কড়ি আছে, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল পথে অনেক দাগী চোর-বদমায়েস লোকেরা আড্ডা করিয়া থাকে। সুখের বিষয় এই যে, এই প্রকার বিপজ্জনক নীচ পল্লীর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, লণ্ডনের নগর-কাউন্সিল এই সকল স্থানের উন্নতির জন্য মনোযোগী হইয়া-ছেন। তাঁহারা এই সকল নীচ পল্লীর অন্ধকারময় বায়ু-চলাচলশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, সেই সকল স্থানে ভাল ভাল বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন; দরিদ্র লোকেরা এই সকল বাড়ীতে অতি সামান্য ভাড়ায় বাস করিতে পায়। কিন্তু এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে অতি ক্ষুদ্র একটি বাড়ীর অতি ক্ষুদ্রতম একটি কক্ষে একটা বৃহৎ পরিবার অতি কষ্টে বাস করিয়া থাকে। এই দরিদ্রপল্লী দেখিয়া সে দিন আমার মনে অনেক চিন্তার উদয় হইয়াছিল। সে দিন সন্ধ্যার পর এই সকল স্থান হইতে ফিরিয়া আমি আমার মন হইতে এই সকল দরিদ্র পল্লীর দৃশ্য অপসারিত করিতে পারি নাই। আমার শুধুই মনে হইতে লাগিল যে, এই সকল স্থান হইতে দুই এক মাইল দূরেই যে সকল স্থান রহিয়াছে, সেখানকার ধনীর প্রাসাদ, হোটেল, ভোজনালয়, বিশ্রামশালা, বিলাসনিকেতন হইতে প্রতি সন্ধ্যায় রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, আর এই সকল স্থানের দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট নরনারীগণ সামান্য এক টুকরা রুটীর জন্য, বিষম উদরজ্বালায় মারামারি কাটাকাটি করিতেছে।" আমি তখন অক্স্‌ফোর্ড মিশনের স্থাপয়িতাদিগকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম। তাঁহারা সত্যসত্যই লণ্ডনে এই ইষ্ট্ এণ্ডের দরিদ্রদিগের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহাদের চেষ্টায় ও যত্নে এই সকল স্থানের পাপের প্রবাহও অনেক হ্রাস হইয়াছে। তাঁহাদের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকে পরোপকার-ব্রতের শ্রেষ্ঠত্বই বুঝিতে পারিতেছে।

লণ্ডনের এই সকল নিম্ন শ্রেণীর লোকের কোন ধর্ম্মজ্ঞানও নাই; দারিদ্র্যের তাড়নায় তাহারা অপরাধের ও পাপের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এ দেশের দরিদ্রদিগের কথায় আমার আর একদিনের একটি ঘটনার কথা মনে হইল। আমি সেদিন ডার্বি ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য এপ্‌সম্ ডাউন্‌সে (Epsom Downs) গিয়াছিলাম। এখানে দেখিলাম যে, ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা গাড়ী-জুড়িতে ঘোড়দৌড় দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের গাড়ীজুড়িতে বসিয়া চুর্ব্বচষ্য লেহ্যপেয়ে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের আহার শেষ হইলে ভুক্তাবশিষ্ট সামান্য দ্রব্যাদি যখন গাড়ী হইতে রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, তখন দলে দলে ক্ষুধার্ত্ত লোকেরা তাহাই আহার করিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যে, এই সকল ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রেরা বড় লোকের বদননিক্ষিপ্ত লেবুর ছিবড়া, রুটির টুকরা, কুড়াইয়া লইতেছে এবং তাহাই আহার করিয়া জঠরজ্বালা নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া আমার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। কথাটা নিতান্ত স্বার্থপরের মত হইলেও আমার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, ভগবানকে ধন্যবাদ করি যে, আমাদের ভারতবর্ষ দরিদ্র কৃষিজীবীর দেশ হইলেও এখানে দৈনিক জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ-ব্যাপারে দারিদ্র্যের এমন ভীষণ দৃশ্য আমাদিগকে দেখিতে হয় না।

জসদ

[শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, M. A.]

চলিত ভাষায় যাহাকে দস্তা বলে, তাহার সংস্কৃত নাম জসদ এবং ইংরাজী নাম জিঙ্ক্ (Zinc), ইহা একটি মূল-ধাতু। প্রাচীন কালে এই ধাতুর অস্তিত্ব জানা ছিল না। তাম্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা হইতে পিত্তল হয়।

খ্রীঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক্ দার্শনিক অরিষ্টট্‌ল্ পিত্তল ধাতুর উৎপত্তি-প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উহাকে তিনি মস্‌সিনিসির তাম্র নাম দিয়াছেন। কৃষ্ণ-সাগরের তীরে এক প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যাইত, সেই মৃত্তিকার সহিত গলাইলে তাম্র হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিত। তাম্রের রক্তবর্ণ কেন যে পীতবর্ণে পরিণত হইত, তখন তাহা জানা ছিল না। খ্রীষ্টের ১ম শতাব্দীতে বিখ্যাত প্লিনি ও ডাইওস্‌কোরাইদিস্ এই মৃত্তিকাকে কাদ্‌মিয়া নাম প্রদান করিয়াছিলেন। আল্‌কেমিষ্টদিগের যে সকল গ্রন্থ ল্যাটিন্ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা এই মৃত্তিকাকে তুঁতিয়া* বলিতেন। এই সকল আল্‌কেমিষ্টের কাল খ্রীষ্টের ৯ম হইতে ১৩শ শতাব্দী ধরা যাইতে পারে। পারসিক আল্‌কেমিষ্ট অবিচেন্নার গ্রন্থে (১০ম শতাব্দী) তুঁতিয়া, হীরাকষ ও রসককে যথাক্রমে নীলা, হুরা ও সফেদ্ তুঁতিয়া আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কোন্ যুগে পিত্তল-প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তবে অথর্ব্ব বেদের যুগে, পিশঙ্গ সদৃশ রয়ির উল্লেখ দেখিতে পাই †। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ সংজ্ঞা সেকালে পিত্তলকে প্রদান করা হইয়াছিল। চরকে পিত্তলের রীতি নাম হইয়াছে।

যথা—"সুবর্ণ রূপা-তাম্রাণি ত্রপু রীতি-ময়ানি চ।"

—চরক, সূত্রস্থান, ৫।২৬।

বেদে হরিত শব্দের অর্থ অনেক স্থলে পীতবর্ণ। অনুমান হয়, পিত্তল পীতবর্ণ বলিয়া হরিতায়স্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া হরিতী ক্রমশঃ রীতি শব্দে পরিণত হইয়াছে। বাগ্ভটের পুথিতে রীতি-কুসুম (calx of brass) শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‡ অতএব এই শব্দ যে প্রাচীন চরকে প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

চরক খ্রীঃ পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে রচিত। সেই প্রাচীন কালে পিত্তল ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রস্তুত-প্রক্রিয়া জানা যায় না। চরকে তুত্থ শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। § এই তুত্থ শব্দ দ্বারা সেকালে তুঁতিয়া (copper sulphate) বুঝাইত। পূর্ব্বে, উদ্ধার করিয়া দেখান গিয়াছে যে, পারসিক ভাষায় তুঁতিয়া শব্দ বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা তুঁতিয়া, হীরাকষ, ও রসকের সাধারণ নাম। বাঙ্গালা ভাষার তুঁতিয়া শব্দ সম্ভবতঃ পারসিক ভাষা হইতে আসিয়াছে, পারসিক তুঁতিয়া শব্দ কিন্তু সংস্কৃত তুত্থ শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই অনুমান হয়। যে মৃত্তিকা তাম্রকে পিত্তলে পরিণত করে, তাহা ভারতবর্ষে রসক নামে অভিহিত হইত। কিন্তু এই নাম চরকে বা সুশ্রুতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৭ম শতাব্দীর নাগার্জ্জুন-বিরচিত রস-রত্নাকর গ্রন্থে রসক

* In Persian, sulphate of zinc is called *suffid* (white) tutia ; sulphate of copper, neela (blue) tutia ; and sulphate of iron, hura (green) tutia ; so in Avicenna, different kinds are described under this name which occurs also in Geber." (Royle) Dr. P. C Roy's Hindu Chemistry, vol. I. p. 159.

† রয়িমুরুং পিশঙ্গসদৃশম্। অথর্ব্ববেদ, ৬।৩৩।৩, সায়ণ ইহার কাঞ্চন অর্থ করিয়াছেন।

‡ Red ochre, rasot, galena, realgar, calx of brass (রীতিকুসুম) in equal parts......

Dr. P. C. Ray's Hindu Chemistry, Vol, I. p. 54.

§ তুত্থং বিড়ঙ্গং মরিচানি কুষ্ঠং। সূত্রস্থান, ৩।৫।

দ্বারা তাম্র, কাঞ্চনে পরিণত করিবার এইরূপ প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে।

"ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে—রসক (নামক) রসের দ্বারা……ক্রমশঃ অম্বুধরের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া তাম্রকে তিন পুটে কাঞ্চনে পরিণত করে।" *

উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, রসক একটি রস-পদার্থ। ইহার পুটে শুল্ব (তাম্র) কাঞ্চনে পরিণত হয়। আমরা দেখিয়াছি, পিত্তল সে কালে রীতি নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এস্থলে পিত্তল কাঞ্চন-আখ্যা প্রাপ্ত হইল কেন? বুঝা যাইতেছে যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা জসদের অংশ অধিক পরিমাণে তাম্রের সহিত মিশিয়া স্বুবর্ণের মত বর্ণ উৎপাদন করিত। বর্ত্তমান কালেও,বিভিন্ন প্রকারে পিত্তল প্রস্তুত হয়। তাহাদের মধ্যে যাহাতে জসদের পরিমাণ অধিক, তাহাকে "ঘড়ানির্ম্মাতার ,স্বুবর্ণসদৃশ ধাতু" (gold-like alloy of watch-makers) বলা হয়। † অতএব সেকালে রীতি শব্দে সাধারণ পিত্তল, এবং কাঞ্চন শব্দে স্বুবর্ণসদৃশ পিত্তল বুঝাইত বলিয়া অনুমান হয়।

একাদশ শতাব্দীতে রচিত ভিক্ষু-গোবিন্দের রসহৃদয়ে রসককে অষ্টরসের মধ্যে একটি বলা হইয়াছে। †

দ্বাদশ শতাব্দীর রসার্ণবে আমরা রসক ও খর্পর, দুই নাম প্রাপ্ত হই। কিন্তু খর্পর শব্দ এ গ্রন্থে ঠিক্ কোন দ্রব্যকে বুঝায়, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন কোন গ্রন্থে রসকের অপর নাম খর্পর বলা হইয়াছে। রসার্ণবের অষ্ট মহারস; যথা—

"মাক্ষিক (copper pyrites), বিমল, শৈল (Bitumen), চপল, রসক, (calamine)," সস্তক (copper sulphate)," দরদ (হিঙ্গুল) ও স্রোতঞ্জন (stibnite), এই আট প্রকার মহারস।" * রসার্ণবে খর্পর নামের উল্লেখ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়।

"খর্পরং সিকতাকারং কৃত্বা তস্যোপরি ন্যসেৎ।
অপরং খর্পরং তত্র শনৈ মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥"

খর্পর—বালির মত করিয়া, তাহার উপর রক্ষা করিবে। অন্য খর্পর সেই স্থানে শীঘ্র শীঘ্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ‡

রসক দ্বারা তাম্র প্রভৃতি ধাতু যে, স্বুবর্ণে পরিণত হয়, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"লৌহ, সীসা ও তাম্র—রসক দ্বারা রঞ্জিত করা যায়। সমস্তই কুমড়া-ফুলের রঙযুক্ত স্বুবর্ণ হইয়া পড়ে। †

তাম্রকে রসক দ্বারা কাঞ্চনে পরিণত করিবার প্রক্রিয়াও বর্ণিত হইয়াছে।

"ইহাতে আশ্চর্য্য আর কি আছে—রসক নামক রসের

* কিমত্র চিত্রং রসকো রসেন
* * * *
ক্রমেন কৃত্বাম্বুধরেণ রঞ্জিতঃ
করোতি শুল্বং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্॥ রসরত্নাকর

* মাক্ষিকং বিমলং শৈলং চপলোরসকস্তথা।
সস্তকো দরদশ্চৈব স্রোতোঽঞ্জনমথাষ্টকম্॥
অষ্টৌ মহারসাঃ * * * ॥

‡ ঐ পৃঃ ৮। হিন্দু কেমিষ্ট্রি ১ম ভাগ, পৃঃ ১২।

† Roscoe and Schorlemmer's Chemistry, Vol II. p. 642, (1907).

	Gold-like alloy used by watch-makers.	Aich's metal.	Brass.			Tombac.	
			Ocker.	Stöllberg.	England	English.	Viennese.
Copper	58·86	60·20	62·24	65·80	70·30	86·38	97·8
Zinc ...	40·22	38·10	37·27	33·80	29·30	13·61	2·2
Tin ...	——	——	0·12	0·25	0·17	——	——
Lead ...	1·90	——	0·59	0·28	0·28	——	——
Iron ...	——	1·60	0·12	——	——	——	——

* বৈক্রান্তকান্ত-সস্তক-মাক্ষিক-বিমলাদ্রি-দরদ-রসকশ্চ।
অষ্টৌ রসাস্তথৈষাং সত্ত্বানি রসায়নি স্যুঃ।
ডাঃ প্রফুল্লরায়ের হিন্দু কেমিষ্ট্রি,২য় ভাগ, সংস্কৃত টেক্‌ষ্টের ৩৪ পৃঃ।

† তীক্ষ্ণং নাগং তথা শুল্বং রসকেন তু রঞ্জয়েৎ।
সমস্তং জায়তে হেম কুষ্মাণ্ডকুসুমপ্রভম্॥
হিন্দু কেমিষ্ট্রি ১ম ভাগ। পৃঃ ৮।

দ্বারা ভাবিত হইলে, ক্রমশঃ ও শীঘ্র রঞ্জিত করিয়া তাম্রকে তিনপুটে কাঞ্চন করে।" *

ত্রয়োদশ শতাব্দীর যশোধর-বিরচিত রসপ্রকাশ-সুধাকরেও রসক ও খর্পর নাম পাওয়া যায়। যথা—

"রসক দ্রাবিত হইয়া, রসপূরকে (ইহার অর্থ ঠিক বুঝা যায় না) সম্যক্ প্রকারে সাত বার নিক্ষিপ্ত হইয়া ডুবিয়া থাকিলে শুদ্ধ হয়। কাঁজিতে, ঘোলে, বা নরমূত্রে বা মেষ-মূত্রে খর্পর, সম্যক্ প্রকারে দ্রাবিত ও প্রক্ষালিত হইলে পরিশুদ্ধ হয়। নরমূত্রে স্থাপিত হইয়া রেচিত (ক্ষালিত) ও শুদ্ধ খর্পর একমাসে তাম্রকে শ্রেষ্ঠ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করে।" †

১৩শ—১৪শ শতাব্দীর রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশের সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের তুলনা করুন। ‡

উদ্ধৃত দুইটি অংশ তুলনা করিলে, রসক ও খর্পর যে, একবস্তু তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

নাগার্জ্জুন যে রসক জানিতেন, তাহাও এ গ্রন্থে বর্ত্তমান। §

"পারদ ও রসক, দুইটিই দেহ ও ধাতুর উপর কার্য্যকারী। নাগার্জ্জুন দুইটিকেই সিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠরস বলিয়াছেন।"

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রসক প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় রসবিদ্‌গণের নিকট পরিচিত। ইহার দ্বারা তাম্র যে স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাও নাগার্জ্জুন জানিতেন। তবে প্রাচীন কালের রীতি (পিত্তল) প্রস্তুত প্রক্রিয়া আমরা প্রাপ্ত হই নাই। ত্রয়োদশ—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থে আমরা পিত্তল নাম প্রাপ্ত হই।* যথা—

"পিত্তল দুই প্রকার; রীতিকা ও কাকতুণ্ডী। পোড়াইয়া কাঁজিতে রাখিলে, যাহা তাম্রবর্ণ হয়, তাহাকে রীতিকা বলে এবং যাহা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে কাকতুণ্ডী বলে।"

১৬শ শতাব্দীর রুদ্রযামল তন্ত্রান্তর্গত ধাতুক্রিয়া বা ধাতুমঞ্জরী গ্রন্থে আমরা পিত্তলপ্রস্তুতির প্রক্রিয়া দেখিতে পাই।

তাম্র ও খর্পর সংযোগে সুন্দর পিত্তল উৎপন্ন হয়। †

তাম্র ও জাসত্ব যোগে ন্যরা ধাতু (রীতি) উৎপন্ন হয়। ¶

এই গ্রন্থের মতে খর্পর ও জাসত্ব, জসদের নাম। ‡ যথা—

জাসত্ব, জরাতীত (যাহাতে জরা বা মরিচা ধরে না), রাজত (রৌপ্যসদৃশ) যশদায়ক (যশদ), রূপ্যভ্রাতা, বরীয়, ত্রোটক (?), কোমল, লঘু, চর্ম্মক, খর্পর, রসক, রসবর্দ্ধক, সদাপথ্য, বলযুক্, পীতবর্ণকারী, ও সহজভস্মশীল; খর্পরের এই সকল নাম কার্য্যকালে সিদ্ধি প্রদান করে।

দেখা যাইতেছে যে, এ কালে খর্পর ও রসক নাম খনিজ

---

* কিমত্র চিত্রং রসকে রসেন
　　* * * * ভাবিতঃ।
　ক্রমেণ ভূত্বা তুরগেণ রঞ্জিতঃ
　করোতি শুল্বং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্॥
　　　　হিন্দু কেমিষ্ট্রি, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩।

† রসকো দ্রাবিতঃ সম্যক্ নিক্ষিপ্তো রসপূরকে।
　নির্ম্মলত্বমবাপ্নোতি সপ্তবারং নিমজ্জিতঃ॥
　কাঞ্জিকে বাথ তক্রে বা নৃমূত্রে মেষমূত্রকে।
　দ্রাবিতং ক্ষালিতং সম্যক্ খর্পরং পরিশুদ্ধতি॥
　খর্পরং রেচিতং শুদ্ধং স্থাপিতং নরমূত্রকে।
　রঞ্জয়েন্মাসমেকং হি তাম্রং স্বর্ণপ্রভং বরম্॥
　　　　হিন্দু কেমিষ্ট্রি ২য় ভাগ, ৬০ পৃঃ।

‡ খর্পরঃ পরিসন্তপ্তঃ সপ্তবারং নিমজ্জিতঃ।
　বীজপূররসস্যান্ত নির্ম্মলত্বং সমশ্নুতে॥
　নৃমূত্রে বাম্বমূত্রে বা তক্রে বা কাঞ্জিকেঽথবা।
　প্রতাপ্য মজ্জিতং সম্যক্ খর্পরং পরিশুধ্যতি॥ ২।১৫৪ ১৫৫।

§ পারদো রসকশ্চৈক দেহলোহকরাবুভৌ।
　নাগার্জ্জুনেন কথিতৌ সিদ্ধৌ শ্রেষ্ঠৌ রসাবুভৌ॥
　　　　হিন্দু কেমিষ্ট্রি, ২য় ভাগ, পৃঃ ৬০।

* রীতিকা কাকতুণ্ডী চ দ্বিবিধং পিত্তলং ভবেৎ।
　সন্তপ্তা কাঞ্জিকে ক্ষিপ্তা তাম্রাভা রীতিকা মতা॥
　এবং যা জায়তে কৃষ্ণা কাকতুণ্ডী চ সা মতা॥
　　　　হিন্দু কেমিষ্ট্রি; ১ম ভাগ, পৃঃ ৫২।

† শুল্বখর্পরসংযোগে জায়তে পিত্তলং শুভম্।
　　　　ঐ ২য় ভাগ, পৃঃ ১০৯

¶ তাম্রজাসত্বয়োর্যোগে নারীধাতু প্রজায়তে।
　　　　ঐ ১ম ভাগ, পৃঃ ৯৮।

‡ জাসত্ব চ জরাতীতং রাজতং যশদায়কম্।
　রূপ্যভ্রাতা বরীয়শ্চ ত্রোটকং কোমলং লঘু॥
　চর্ম্মকং খর্পরং চৈব রসকং রসবর্দ্ধকম্।
　সদাপথ্যং বলোপেতং পীতরাগং সুভস্মকম্॥
　এতত্তু খর্পর নাম কার্য্যকর্ম্মসু সিদ্ধিদম্।
　　　　হিন্দু কেমিষ্ট্রি—২য় ভাগ, পৃঃ ১০৬ ও ১০৭।

পদার্থ হইতে, জসদধাতুতে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব তাম্র ও জসদ এই দুই ধাতু মিশ্রিত করিয়াই এই কালে পিত্তল প্রস্তুত করা হইত।

ইউরোপে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাম্র, রসক, (calamine) ও অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া, উত্তাপযোগে পিত্তল প্রস্তুত করা হইত। *

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ইউরোপের বহু পূর্ব্বে ভারতে তাম্র ও জসদ মিশ্রিত করিয়া পিত্তল প্রস্তুত হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কুন্‌কেল এই মত প্রকাশ করেন যে, পিত্তল একটি মিশ্র ধাতু। † অষ্টাদশ শতাব্দীতে ষ্টাল প্রচার করেন যে, রসক—জসদে পরিণত হইয়া তাম্রের সহিত মিশ্রণে পিত্তল উৎপাদন করে। ‡

কিন্তু ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বে পিত্তল মিশ্র ধাতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, এবং তাম্র ও জসদ-যোগে প্রস্তুত হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন রসশাস্ত্র হইতে পিত্তল যে মিশ্রধাতু, তাহার প্রমাণ উদ্ধার করা যাইতেছে।

(ক) সৌরাষ্ট্র, রীতি ও বর্ত্ত এই তিন মিশ্রধাতু। ¶

(খ) সুবর্ণ তিন প্রকারে জন্মে; যথা—রস (পারদ) ক্রিয়া দ্বারা; ভূমি হইতে এবং ধাতুদিগের মিশ্রণ দ্বারা; চতুর্থ প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। §

ধাতুদিগের মিশ্রণে সঙ্কর ধাতু উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা কাঞ্চনরূপে পরিণত হয়, পিত্তল যে তাহাদেরই মধ্যে একটি, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণ করা গিয়াছে; অতএব পিত্তলকে সঙ্কর ধাতু বলিয়া জ্ঞান সেকালের রসবিদের ছিল। ১৩শ—১৪শ শতাব্দীর রসসমুচ্চয়েও পিত্তলকে মিশ্রধাতু বলা হইয়াছে। যথা—

"মিশ্রধাতু তিন প্রকার বলা হয়—পিত্তল, কাংস্য ও বর্ত্ত। * জসদ ধাতু কবে ভারতবর্ষে রসায়ন-বিদ্যাবলে খনিজ পদার্থ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব। খ্রীষ্টিয় ৭ম শতাব্দীর প্রধান রসবিদ্ নাগার্জ্জুন তাঁহার রসরত্নাকর নামক গ্রন্থে রসক হইতে কুটিল বা রাঙের মত এক প্রকার সত্ত্ব-বহিষ্করণ-প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। † যথা—

"রসককে ক্ষার, তৈলাক্ত দ্রব্য ও কাঞ্জি দ্বারা বহুবার ভাবিত করিয়া ঊর্ণা (মেষলোম), লাক্ষা ও পথ্যা নামে ভূলতার ধূম সহিত মিশ্রিত করিয়া, বদ্ধ মূষায় স্থাপন করিয়া, সোহাগার সহিত ভাতি দ্বারা উত্তপ্ত করিলে, কুটিল, (রাঙ) এর মত সত্ত্ব পতিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই।"

দ্বাদশ শতাব্দীর রসার্ণবে আমরা নাগার্জ্জুনের রসরত্নাকর-বর্ণিত প্রক্রিয়া রসকসত্ত্ব-বহিষ্করণে উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই।

"মূষায় স্থাপন করিয়া সোহাগার সহিত ভাতি দ্বারা উত্তপ্ত করিলে, কুটিল-(রাঙ্) এর মত সত্ত্ব পতিত হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ‡

ভিক্ষু গোবিন্দ-বিরচিত রসহৃদয়ে (১১শ শতাব্দীতে লিখিত) রস ও উপরস হইতে সত্ত্ব-পাতনের সাধারণ বিধি বর্ণিত আছে। ¶

---

* Brass which has long been known, was up to the year 1780 always made by strongly heating copper together with calamine and charcoal or coal.

Roscoe and Schorlemmer's Chemistry. Vol. II. p. 642.

† The virtue that brass is an alloy was first put forward by Kunkal at the end of the 17th century.

‡ Stapl afterwards gave it as his opinion that calamine could turn copper into brass by being first converted into zinc.

Rosoe and Schorlemmer's Chemistry. Vol. II. p. 635.

¶ স মিশ্র লোহত্রিতয়ং সৌরাষ্ট্ররীতিবর্ত্তকাঃ।

—১৩শ শতাব্দী, যশোধরের রসরত্ন সুধাসার, হিন্দু কেমিষ্ট্রি, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৯।

§ রসজং ক্ষেত্রজঞ্চৈব লোহসঙ্করজং তথা।
ত্রিবিধং জায়তে হেম চতুর্থং নোপলভ্যতে॥

১২শ শতাব্দী, রসার্ণব, হিন্দু কেমিষ্ট্রি, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪।

* মিশ্রং লোহং ত্রিতয়মুদিতং পিত্তলং কাংস্যং বর্ত্তং।

হিন্দু কেমিষ্ট্রি, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৩

† ক্ষারম্লৈশ্চ ধান্যাম্লৈ রসকং ভাবিতং বহু।
ঊর্ণা লাক্ষা তথা পথ্যা ভূলতাধূমসংযুতম্॥
মূক মূষাগতং ধ্মাতং টঙ্কনেন সমন্বিতম্।
সত্ত্বং কুটিলসঙ্কাশং পততি নাত্র সংশয়ঃ॥ ২।৩২

‡ ঊর্ণা লাক্ষা তথা পথ্যা ভূলতা ধূমসংযুতঃ।
মূকমূষাগতোধ্মাত টঙ্কনেন সমন্বিতঃ॥
সত্ত্বং কুটিলসঙ্কাশং মুঞ্চত্যত্র ন সংশয়ঃ॥ ৭।৩৭—৩৮।

¶ সূর্য্যাবর্ত্তঃ কদলীকন্দা কোশাতকী চ সুরদালী।
শীগ্রুশ্চ বজ্রকন্দো নীরকণা কাচমাচী ১॥

রস বা উপরসকে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ, লবণ, ক্ষার ও অম্ল দ্বারা প্রথম শুদ্ধ করিয়া, পরে ভাতি-যোগে উত্তপ্ত করিয়া, সত্ত্ব বাহির করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণিত প্রক্রিয়ায় নাগার্জ্জুন-কথিত প্রণালীর আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থে রসক প্রভৃতি রসের শোধন-প্রক্রিয়াও উক্ত হইয়াছে, দেখা যায়।

প্রথম ক্ষার ও তৈল দ্বারা পশ্চাৎ অম্লের দ্বারা ভাবিত হইলে, বিমল, রসক, দরদ ও মাক্ষীক শুদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়া নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বোদ্ধৃত রসক-শোধন প্রক্রিয়ার সহিত ঠিক মিলিয়া যায়। * (সামদেব-বিরচিত রসেন্দ্রচূড়ামণি গ্রন্থে (১২শ শতাব্দী) নিম্নোদ্ধৃত প্রক্রিয়া পাওয়া যায়। †

"পূর্ব্ব হইতে পিষ্টীকৃত রসেন্দ্রের (পারদের) সহিত রসকের সত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত কল্কের সহিত যোগ কর।"

অতএব ১২শ শতাব্দীতেও রসক-সত্ত্বের উল্লেখ দেখা গেল। ইহা যে নূতন আবিষ্কৃত, তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না।

যশোধর-বিরচিত রসপ্রকাশ সুধাকরে (১৩শ শতাব্দী) আমরা খর্পর-সত্ত্ব উৎপাদন প্রক্রিয়া এইরূপ বর্ণিত দেখিতে পাই।

"বচ, হরিদ্রা, ও ত্রিফলা, ঝুল (lamp-black), সৈন্ধব, ভল্লাতক, সোহাগা, ক্ষার, ও অম্লের দ্বারা মর্দ্দিত (কর)। বেগুনের আকারসদৃশ মূষাতে পাদাংশ সংযুক্ত করিয়া ঢাকিয়া শুষ্ক কর, এবং পরে মূষামুখে স্থাপন করিবে।

ভাতিদ্বারা উত্তপ্ত করিতে করিতে জ্বালা (শিখা) শুভ্র ও নীলবর্ণ হইলে, লৌহ-সাঁড়াশি দ্বারা মূষাকে ধরিয়া, অধোমুখ করিয়া সত্ত্বভূমিতে এরূপে ঢালিতে হইবে যে, নল ভাঙ্গিয়া না যায়। তখন সীসার সদৃশ সত্ত্ব পতিত হইবে সংশয় নাই।"‡

মদনান্তদেব সূরি-বিরচিত রসচিন্তামণি গ্রন্থে খর্পরসত্ত্ব-পাতন-বিধি এইরূপ বর্ণিত আছে।

"খর্পরকে প্রথম কুলথ (এক প্রকার কলাই) জলের, বটারোহ (?) জলের ও চূর্ণপত্রের স্বেদ দিতে হইবে। গুড়, সোহাগা মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলার কাথ মর্দ্দন করিতে হইবে। মাটির কূপে রাখিয়া ভাতি দ্বারা অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে, শ্বেত ধুম উৎপন্ন হইলে পর, কূপকে উঠাইয়া সাবধানে ভূমিতে অধোমুখ করিতে হইবে। পুনরায় কূপকে উত্তপ্ত করিতে হইবে। পুনরায় তাহাকে সেইরূপ করিলে সীসারূপ খর্পর-সত্ত্ব নিম্নে পতিত হয়।" *

১৩শ—১৪শ শতাব্দীর রসরত্নসমুচ্চয় বর্ণিত খর্পর-সত্ত্ব-নিষ্কাশনের প্রক্রিয়ার সহিত তুলনা করুন। †

হরিদ্রা, ত্রিফলা, ধূনা, সৈন্ধব, ধুম (ভূমৈঃ ঝুল, ধূমৈঃ হইবে); সোহাগা, পাদাংশ সারুষ্কর (?) সহিত, অম্লের সহিত খর্পর মর্দ্দিত কর। বেগুনের মত আকারবিশিষ্ট মূষাতে লেপ দিয়া, শুকাইয়া, বদ্ধ করিয়া অপর মূষার উপর

আসামেক্ত রসেন তু লবণক্ষারাম্লভাবিতা বহুশঃ।
শুদ্ধন্তি রসো পরমা ধাত্বা মুক্তন্তি সত্বানি ॥

* ক্ষারৈঃ স্নেহরাদৌ পশ্চাদম্লেন ভাবিতং বিমলম্।
শুধ্যতি তথাচ রসকং দরদং মাক্ষীকমপ্যেবম্।

† ততঃ সাররসেন্দ্রেণ সত্ত্বেন রসকস্য চ।
পিষ্টীং কৃত্বা তু পূর্ব্বেন পূর্ব্বকল্কেন যোজয়েৎ ॥

‡ "বচা হরিদ্রা ত্রিফলা গৃহধূমৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
ভল্লাতকৈষ্টঙ্কনৈশ্চ ক্ষারৈরম্লৈশ্চ মর্দ্দিতম্ ॥

পাদাংশসংযুতৈ মূষাং বৃন্তাকফলসন্নিভাম্।
নিরুধ্য শোষয়িত্বা চ মূষামুখোপরি ন্যসেৎ ॥
প্রধ্মাতে খর্পরে জ্বালা সিতা নীলা ভবেদ্ যদি।
লোহ সংদংশকে মূষাং ধৃত্বা কৃত্বা অধোমুখীম্ ॥
ভূম্যামাচালয়েৎ সত্ত্বং যথানালং ন ভজ্যতে।
তদা সীসোপমং সত্ত্বং পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥"

* "খর্পর স্বেদ্যতে পূর্ব্বং কৌলত্থেন জলেন চ।
বটারোহজলেনাপি পর্ণচূর্ণেন শোভনঃ ॥ ৭৫
গুড়টঙ্কণসংমিশ্র ত্রিফলাকাথমর্দ্দিতঃ।
মৃন্ময়ে কূপকে কৃত্বা ধাম্যমানো ভৃশং চ সঃ ॥ ৭৬
শ্বেতধূমোদ্গমে জাতে তত উত্থাপ্য কূপকং।
সাবধানং করেণৈব ভূমৌতং চাধঃ আনয়েৎ ॥ ৭৭
পুনশ্চ ধাম্যতে কূপঃ তথাজাতং চ তং পুনঃ।
সত্ত্বং খর্পরকস্যৈতৎ নাগরূপং পতত্যধঃ ॥" ৭৮

† "হরিদ্রা ত্রিফলা রাল সিন্ধু ভূমৈঃ সটঙ্কণৈঃ।
সারুষ্করৈশ্চ পাদাংশৈঃ সাম্লৈঃ সম্মর্দ্দ্য খর্পরম্ ॥
লিপ্তং বৃন্তাক-মূষায়াং শোষয়িত্বা নিরুধ্য চ।
মূষাং মুখোপরি ন্যস্য খর্পরং প্রধমেত্ততঃ ॥
খর্পরে প্রহুতে জ্বালা ভবেন্নীলা সিতা যদি।
তদা সন্দংশতো মূষাং ধৃত্বা কৃত্বা অধোমুখীম্ ॥
শনৈরাস্ফালয়েদ্ভূমৌ যথা নালং ন ভজ্যতে।
বঙ্গাভং পতিতং সত্ত্বং সমাদায় নিয়োজয়েৎ ॥ ৩।১৫৭-১৬১।"

রাখিয়া খর্পরকে ভাতি দ্বারা উত্তপ্ত কর। খর্পর-উত্থিত নীলশিখা যখন শুভ্রবর্ণ হইবে, তখন সাঁড়াশিদ্বারা মুষা ধরিয়া অধোমুখ করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি ভূমিতে ঠুকিতে হইবে—যেন নল না ভাঙ্গে। বঙ্গসদৃশ পতিত সত্ত্ব গ্রহণ করিয়া নিয়োগ করিতে হইবে।

রুদ্র-যামলান্তর্গত রসকল্প গ্রন্থে (১৩শ শতাব্দী) রসক একটি মহারস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রসক-সত্ত্ব-নিপাতনের নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। *

"জ্ঞানিব্যক্তি রসককে প্রথম সুন্দররূপে চূর্ণ করিয়া চারি পাট বস্ত্রে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া সজলভাণ্ডে ৫মাস ধরিয়া স্বেদ দিবেন। পরে ঐ রসক উদ্ধার করিয়া খলে চূর্ণ করিবেন। পাদাশা (?), মালতীজাত (?), গুড়, জীর্ণকূঁচ, গৃহধুম, নীলবৃক্ষ, নিশাম (?), কুল্লজীরক (?) এই সকল চূর্ণ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা ভাবিত করিতে হইবে। পরে বড়ী পাকাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। পরে দুইটি ভাতি দ্বারা কোষ্ঠ-যন্ত্রে অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিবে। স্থির রাঙ্ সদৃশ দৃঢ় সত্ত্ব অনেক পতিত হইবে সন্দেহ নাই। যদি রসক একমাস বা দুই মাস স্বেদিত হয়, তবে কোষ্ঠযন্ত্রে উত্তপ্ত করিবে না—নাল মুষায় উত্তপ্ত করিবে।"

১৩শ—১৪শ শতাব্দীর রসরত্ন সমুচ্চয় গ্রন্থে রসক-সত্ত্ব-বহিষ্করণের দুইটি পদ্ধতি লিখিত আছে। পূর্ব্বে একটি প্রক্রিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয়টি উদ্ধৃত করা যাইতেছে; † যথা—

"লাক্ষা, গুড়, সরিষা, পথ্যা, হরিদ্রা, ধূনা ও সোহাগার সহিত (রসক) সম্যক্ চূর্ণ করিয়া, গোদুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পাক কর। বড়ী পাকাইয়া বৃন্তাক-নামক মুষায় রাখিয়া ঢাক। ভাতি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া শিলার উপর ঢালিয়া দাও। রাঙের মত মনোহর রসকের সত্ত্ব উৎপন্ন হইবে।"

'রসপ্রকাশ সুধাকরে, রসক-সত্ত্ব-নিষ্কাশন করিবার জন্য যে মুষার উল্লেখ দেখি, তাহাতে নাল সংযুক্ত আছে, দেখিতে পাই। রসকল্প গ্রন্থেও নাল-মুষার উল্লেখ রহিয়াছে। রসরত্ন সমুচ্চয়েও নালযুক্ত মুষা দেখা যায়। এই নালযুক্ত মুষা কিরূপ? ইহার প্রকৃতি যদ্যপি জানিতে হয়, তবে জসদ-নিষ্কাশনের ইংরাজী প্রক্রিয়া আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। পাঠকের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে এই প্রক্রিয়া উদ্ধৃত করা গেল।

"The reduction of the Zinc ores was formerly carried on in England by a process termed distillation per descensum. The mixture of ore and coal was heated in *crucibles closed at the top but having a pipe leading from the bottom* closed by a wooden plug. The latter was quickly carbonised, thus becoming porous and allowing the vapour of the reduced zinc to pass down the tube, where it was condensed. This plan necessitated a large consumption of fuel and has therefore been abandoned."

—Roscoe and Schorlemmer's Chemistry.

Vol. II. page, 636—637.

ইংলণ্ডের এই পুরাতন প্রক্রিয়ায় ভারতের নালমুষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; নিম্নোদ্ধৃত অংশে ইউরোপে জসদ-নিষ্কাশনের কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পাঠ করিলেই ইংলণ্ড এ বিষয়ে ভারতের নিকট ঋণী বলিয়া অনুমিত হইবে।

"The preparation of zinc on the large scale

---

* "রসকং স্বেদয়েদাদৌ পটুচূর্ণকৃতং বুধঃ।
চতুর্গুণেন বস্ত্রেণ দৃঢ়ং বধ্বা চ ডোলিকাম্॥
কৃত্বা ভাণ্ডে চ সজলে স্বেদয়েন্মাস পঞ্চকম্।
উদ্ধৃত্য পশ্চাদ্রসকং খল্বমধ্যে বিচূর্ণয়েৎ॥
পাদাশান্ মালতীজাতং সগুড়ং জীর্ণ-গুঞ্জকম্।
গৃহধূমং রেবকীং চ নিশামং কুল্লজীরকান্॥
তৎ সর্ব্বং চূর্ণিতং কৃত্বা গোপঞ্চকবিভাবিতম্।
কৃত্বা তদ্ বটিকাঃ পশ্চাৎ ছায়ায়াং শোষয়েত্ততঃ॥
কোষ্ঠগেনাগ্নিনা পশ্চাদ্ধমেদ্ ভস্ত্রাদ্বয়ানিলৈঃ।
সত্ত্বং পতত্যসন্দেহং স্থিরবঙ্গং দৃঢ়ং বহু॥
একমাস দ্বিমাস বা রসকং স্বেদিতং যদি।
নধ্মাতব্যং তচ্চ কোষ্ঠে ধমেত্তৎ নালমুষয়া॥"

† "লাক্ষা গুড়া সুরী পথ্যা হরিদ্রা সর্জ্জটঙ্কণৈঃ।
সম্যক্ সঞ্চূর্ণ্য তৎ পক্বং গো-দুগ্ধেন ঘৃতেন চ॥
বৃন্তাক-মুষিকা মধ্যে নিরুধ্য গুটিকাকৃতিঃ।
ধ্মাত্বা ধ্মাত্বা সমাকৃষ্য ঢালয়িত্বা শিলাতলে।
সত্ত্বং বঙ্গাকৃতি গ্রাহ্যং রসকস্য মনোহরম্॥ ২।১৬৩-১৬৪"

appears to have been first carried out in England. According to Bishop Watson, zinc-works were first established at Bristol about the year 1743. 'In about the year 1766 Watson visited Mr. Champion's works near Bristol and saw the process of making zinc, which at that time was kept rigidly secret. Many years afterwards, he published an accurate description of this process, which is the same as that hereafter described as the English process', (Percy, Metallurgyi, 521.). The first continual zinc-works were erected in 1807 at Leige."

—Roscoe, Schorlemmer's Chemistry, Vol. II. p. 635.

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা গেল যে, খ্রীষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জসদ প্রস্তুত করিবার প্রথম কারখানা ইংলণ্ডে স্থাপিত হয়। তথায় নাল-মূষায় জসদ নিষ্কাশিত হইত। ঐ প্রক্রিয়া অতি গোপন করাও হইয়াছিল। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই প্রকার মূষার দ্বারা জসদ প্রস্তুত হইত। এই প্রক্রিয়া ইউরোপে কি স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল? জসদ নাম ইউরোপে প্রথম প্যারাসেল্‌সসের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

প্যারাসেল্‌সস্ ষোড়শ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত রসবিদ্। তিনি বলিতেছেন যে, জসদ ধাতু আল্‌কেমিষ্ট্‌গণ জানিতেন না। কোথা হইতে তিনি এই ধাতু প্রাপ্ত হইলেন? সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই। তবে রসবিদ্ লিবেভিয়াস্ ও তৎকালীন ইউরোপীয় রসবিদ্‌গণের গ্রন্থ হইতে জসদ সম্বন্ধে আমরা যে ইতিবৃত্ত † অবগত হই, তাহা হইতে ভারতবর্ষ যে জসদের উৎপত্তি স্থান তাহাই যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে। রসবিদ্ লিবেভিয়াস ইষ্টইণ্ডিস্ হইতে জসদ্ ধাতু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিন্‌ক্ নাম দ্বারা এইকালে ইউরোপে ঐ ধাতু এবং উহার খনিজ পদার্থ উভয়কেই বুঝাইত। আমরা দেখিয়াছি, ষোড়শ শতাব্দীর রুদ্রযামলান্তর্গত ধাতুক্রিয়া বা ধাতুমঞ্জরী গ্রন্থে জসদের নামের মধ্যে খর্পর ও রসক ধৃত হইয়াছে। এই উদ্ধৃত অংশে জসদকে কোমল বলা হইয়াছে। এই কোমল হইতে হলাণ্ড-(ওলন্দাজগণ) বাসিগণ 'কালীম' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি।

১৩শ—১৪শ শতাব্দীতে ভারতে পিত্তল মিশ্রধাতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জসদ ও তাম্রযোগে যে ইহা উৎপন্ন হইত, তাহার উল্লেখও দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে কুন্‌কেল্ প্রথম এই মত প্রচার করেন। ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম যিন্‌ক্ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উল্লেখ তখন কিন্তু দেখা যায় না। যদি নাগার্জ্জুন-বিরচিত রসরত্নাকরের কাল ঠিক্ স্থির হইয়া থাকে, তবে খ্রীষ্টের ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে এই ধাতু ভারতবর্ষে প্রথম নিষ্কাশিত হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ইহা নিশ্চয় উৎপাদিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহার জসদ নাম ১৩৭৪ খ্রী অব্দে রচিত মদনপালের অভিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। * ইহার পূর্ব্বকালে রসক-সত্ত্ব, খর্পর-সত্ত্ব, বঙ্গাভ, কুটিলসদৃশ, সীসোপম, স্থিররঙ্গ, প্রভৃতি নামে জসদ উক্ত হইত। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভারতেই জসদ ধাতু প্রথম খনিজ পদার্থ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল।

* "The word zinc is first found in the writings of Paracelsus, who has pointed out that zinc was a metal. He says in his treatise on minerals: 'There is another metal called the zinken, which is unknown to the fraternity, and is a metal of a very singular kind."

R. and S's Chemistry. Vo I. II. pp. 634—35.

† "The word zinc occurs in many subsequent anthors, and sometimes it is employed to denote the metal, at other times the ore from which the metal is obtained. Libavius was the first to investigate the properties of zinc more exactly, although he was not aware that the metal was derived from the ore known as calamine. He states that a peculier kind of tin is found in the East Indies called Calaem. Some of this was brought to Holland and came into his hands... The exact nature of zinc and its ores continued doubtful during the seventeenth century. Glanber, it is true, stated that calamine was an ore of zinc but Lemery so late as 1675 believed that zinc was identical with Bismuth, and Boyle often employed the names zinc and bismuth indiscriminately for the same substance also employing the word Spianter (Our Engiish Spelter), a name apparently of Eastern origin." Roscoe, Schorlemmer's Chemistry. Vol 1 II. pp 634—35.

* "জসদং রঙ্গসদৃশং রিতি হেতুশ্চ তন্মতম্।"

Dr. P. C Roy's Hindu Chemistry. Vol I. p. 158.

মাষ্টার

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

অগ্রহায়ণ মাস—সবে শীত পড়িয়াছে। ঘোষেদের বাগানে 'শিউলীরা' রস জ্বাল দিতেছিল। নূতন গুড়ের গন্ধে চারিদিক ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল। পরীক্ষা আসন্ন শুনিয়া, ছেলেটাকে লইয়া সকালের মিঠে রোদে দাওয়ায় বসিয়া, তার পড়া-টড়া-গুলো একটু দেখিতেছিলাম। ছেলে তো আর জানিত না, অঙ্কশাস্ত্রে তার বাবার কতখানি ব্যুৎপত্তি! তাই, সে এক জটিল অঙ্ক আমাকে দিয়া বলিল—"এটা বুঝিয়ে দিন না।" মহা মুস্কিলেই পড়িলাম।

অগত্যা ছেলেকে কিছু না বলিয়া আঁকটি কষিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যখন অঙ্ক লইয়া বুড়া বয়সে ঘোল খাইতেছিলাম এবং পুত্ররত্ন নিকটে বসিয়া, পিতার এই দুর্দ্দশা নিবিষ্টচিত্তে দেখিতেছিল, তখন সহসা কে একজন বলিয়া উঠিল—"মহাশয়ের প্রাইভেট টিউটার দরকার আছে?"

হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ঈষৎ চমকিয়া উঠিলাম। লোকটার দিকে চাহিতেই আমার মনে একসঙ্গে অশ্রদ্ধা, ঘৃণা ও কৌতূহলের উদয় হইল। তাহার গায়ে একটা ছেঁড়া সার্ট; সেই শতছিন্ন কামিজের উপর তদনুরূপ একখানা ময়লা শিল্কের চাদর—পায় তালিযুক্ত 'লপেটা শূ'—হাতে এক ক্যাম্বিশের ব্যাগ। তাহার বয়স কেহ বলিবে পঁচিশের বেশী নয়, আবার কাহারও মতে চল্লিশ পার হইতে দেরি নাই। মাথায় বড় বড় চুল—তৈলহীন—কিন্তু লম্বা টেরি। ললাট প্রশস্ত কিন্তু ব্রণে ও বসন্তের দাগে হীনশ্রী; চক্ষু আয়ত—তাহা হইতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছিল; কিন্তু চোখের কোলে গাঢ় কালিমা-রেখা অঙ্কিত! দৃষ্টি চঞ্চল। নাসিকা সমুন্নত। আকৃতি দীর্ঘ, কিন্তু সম্মুখভাগে ঈষৎ নুইয়া পড়িয়াছে। গোঁফ্-জোড়ায় 'কুচপরোয়া নেহি' (দুনিয়াকে দৃক্‌পাত না করার ভাব) পরিস্ফুট! কিন্তু অমিতাচারের দারুণ পীড়নে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন বলিতেছিল—"আর যে সহ্য হয় না!"

যাই হোক্, এই অদ্ভুতাকার আগন্তুকের আগমনে অঙ্ক-কষার আশু দায় হইতে ক্ষণিক মুক্তি পাইয়া, মনে মনে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোত্থেকে আসা হচ্চে?"

লোকটা ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল; বলিল—"মশাইকে যা জিজ্ঞেস কল্লুম তার উত্তর কই?...আমি কোত্থেকে আস্‌চি?—আচ্ছা বল্‌চি—আগে ছোকরার এই আঁকটা ক'ষে দিই—ও বসে আছে।" এই বলিয়াই আমার কাছ থেকে খাতাখানা টানিয়া লইয়া, টক্ টক্ করিয়া দু'মিনিটের মধ্যে অঙ্ক কষিয়া আমার ছেলেকে জলের মতন বুঝাইয়া দিয়া, আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"হাঁ,—কি বল্‌ছিলেন—কোত্থেকে আস্‌চি আমি?"

বলিতে কি, লোকটার ব্যবহারে ও তার শিক্ষা-কৌশলে আমি একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম; বলিলাম—"আজ্ঞে—হাঁ!"

লোকটা যেন আমার অন্তস্থল পর্য্যন্ত এক নিমেষে দেখিতে পাইয়াছিল; বলিয়া উঠিল—"কি মশাই, ছোকরার আঁকটা চট্ করে কষে ফেল্‌তেই যে খাতির আরম্ভ করে দিলেন! ও খাতিরের কিছু দরকার নেই।"

আমি আর কি বলিব, একটু আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলাম। সে বলিল—"লজ্জিত হবেন না—আমায় দেখে লোকের ঘেন্না হওয়াই উচিত;—যে খাতির কর্ত্তে যায়, সে হয় আহম্মক, নয় বোকা!"

দেখিলাম, লোকটা একটানে অনেকগুলা কথা বলিতে গেলে হাঁপাইয়া পড়ে। সে আবার বলিতে লাগিল—"কোত্থেকে আস্‌চি জান্‌তে চাচ্চেন? কিন্তু সে জেনে কোনো ফল নেই; বরং আমি কে, কি প্রকৃতির, সেটা জানা দরকার; বিশেষতঃ যদি আমায় প্রাইভেট্ টিউটার রাখা হয়।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, তাই বলুন।"

লোকটা আবার একরকম ঔদাস্যের হাসি হাসিয়া বলিল—"নাঃ—একটা আঁক কষে দিয়ে দেখছি, আপনার মাথা ঘুরিয়ে দিইচি—কিছুতেই খাতির না করে থাকৃতে পাচ্চেন না! যাক্, এখন পরিচয় শুনুন—আমার নাম হচ্চে কি—কি—ঐ যে মনে এসেও আসচে না—অনেকদিন তা ত্যাগ করেচি কি না"—এই বলিয়া সে মাথা চুলকাইতে লাগিল।

আমার মনে সন্দেহ হইল, হয় লোকটা বদমায়েস, নয় পাগল। ভাবিলাম দেখা যাক্—মজাটা। এমন সময়ে সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিয়া উঠিল—"মনে পড়েচে মশাই, আমার নাম হচ্চে—সুনীতিকুমার, অর্থাৎ কাণা ছেলের 'পদ্মলোচন' নাম যেমন! তাই ভ্যাংচানো নাম ত্যাগ করে, একরকম বে-নামী হয়ে বসে আছি; তারপর আমার জাত হচ্চে"—আবার কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"ধরে নিন্ অতি নীচ জাত! তারপর হচ্চে, আমি কি চরিত্রের মানুষ? তা আমি বেশ বল্‌তে পারব!" লোকটা আবার যেন হাঁপাইয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"শরীরে কোন রকম অসুখ আছে?" সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিল "অসুখ? আছে বৈ কি—আপাদমস্তক!"

আমি বলিলাম, "তবে একটু বিশ্রাম নিন।"

"কিছু দরকার নেই" বলিয়া সে আবার আরম্ভ করিল—"হুঁ—আমি কি চরিত্রের শুনুন;—আমি হচ্চি মাতাল, চরিত্রহীন অর্থাৎ বেশ্যাসক্ত, মনে রাখবেন বেশ্যাসক্ত।" আমি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম—"আঃ, কি পাগলের মত বক্‌চেন—।"

সে আমার পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"ও কথা বলবেন না মশাই, আমি এক বর্ণও মিথ্যে বলি না—শুনে যান শেষ অবধি।" তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল; বলিলাম—"বলুন।"

"আমি মাতাল এবং বেশ্যাসক্ত, কিন্তু আমি ভণ্ড নই—আর আমি সতীসাধ্বীকে ভাইএর চোখে, বাপের চোখে, এবং ছেলের চোখে দেখি। একদিকে যেমন মদ না হ'লে আমার দিন চলে না, বারাঙ্গনা না হলে আমার সময় কাটে না, তেমনি আবার সতীসাধ্বীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে প্রাণ দেওয়া তো তুচ্ছ—একটা আস্ত দিন মদ না খেয়েও থাকৃতে পারি। ভাব্‌চেন ভারী অদ্ভুত আমি—না? বাস্তবিকই তাই! দুনিয়া ঘুরে মরচি—দোসর খুঁজে পেলুম না! এখন কি বলেন, আমায় ছেলের প্রাইভেট্ টিউটার রাখতে ভরসা হয়?"

'হাঁ', না'র কোন্‌টা বলিব, স্থির করিতে না পারিয়া, বলিলাম—"পড়াশুনা কতদূর করেছিলেন?"

"প্রমাণ করবার তো কিছুই রাখিনি—সব পুড়িয়ে ফেলিচি—সুতরাং শুনে কি হবে?"

আমি বলিলাম—"তবু শুনি না!"

"তবু শুন্‌বেন?—বিশ্বাস করবেন—যা ব'লব?" আমি উত্তর করিলাম—"কেন করব না!" "যদি বলি নাইন্‌থ্ ক্লাস অবধি—বিশ্বাস করবেন?" আমি বলিলাম—"তা কি আর বিশ্বাস করা যায়!"

"বিশ্বাস করা যায় না?—তবে কোন্ সাহসে বলব—আমি পি-আর-এস্—যখন প্রমাণ দেখাতে পারব না!"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"আপনি পি-আর-এস্?"

"ক্ষেপেচেন! কথায় কথায় বলচি—তা থাক্, অত পাস্-ফেলের খোঁজে দরকার কি?—পড়াতে পারি তো রাখবেন, নয় তো তাড়িয়ে দেবেন!—কুকুরবেরাল তো আর ঘরের জামাই নয়!"

এমন অদ্ভুত লোককে আবার প্রাইভেট্ টিউটার রাখে মানুষে! তবু জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রাইভেট টিউটার হতে কত মাহিনা চান্?"

লোকটা এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল—"আমাকে মাইনে দেবেন কি মশাই! কিছু না, কিছু না!— দুমুঠো এঁটো কাঁটা পথের ধারে বসে খাব এই—ব্যস্!—কি?—রাজী আছেন?"

লোকটার বুকের ভিতর যে একটা বড় রকমের ব্যথা লুকানো রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিলাম,—তবু কিন্তু বলিতে হইল, "না মশাই রাখ্‌তে পারব না—অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।"

'যে আজ্ঞে'—বলিয়া সে উঠিল। উঠিবার সময় আমার ছেলের পিঠে সস্নেহে চাপড় মারিয়া বলিল—"ভাল করে পড়াশুনা করো ছোক্‌রা—!" আর আমার পানে চাহিয়া বলিল—"তবে আসি মশাই প্রণাম, আপনি ব্রাহ্মণ তো?"

"হাঁ"

"জন্মে কোন রকম—নেই তো?"

রাগে আমার সর্ব্ব শরীর দপ্ করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, বলিলাম—"বেরোও রাস্কেল্!"

আশ্চর্য্য! লোকটা একটুও অপ্রসন্ন হইল না, কেবল একবার উর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিল—"হায়! দুনিয়া থেকে কবে এমনি করে হাঁকিয়ে দেবে!"

কথাটা কাণে যাইতেই প্রাণে কি জানি বড় আঘাত পাইলাম—ইচ্ছা হইল, তাহাকে ডাকিয়া সান্ত্বনা দিই—কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না—সেও দেখিলাম, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল!

(২)

পর দিন ছেলে স্কুল থেকে আসিয়া বলিল—"বাবা, সেই লোকটা আজ আমাদের স্কুলে গেছ্ল।" আমি বিশেষ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাই নাকি? সেখানে গেছ্ল সে?"

"গিয়ে আমাদের হেড্মাষ্টারকে বল্লে—আমায় একটু পড়াতে দেবেন?"

"তার পর?—হেড্মাষ্টার তোদের কি বল্লে?"

"হেড্মাষ্টার তো প্রথমে বিশ্বাসই কল্লেন না—যে সে আবার পড়াতে পারবে! তার পর কি জানি, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—'কোন্ ক্লাসে পড়াতে চাও?' তাতে সে বল্লে—'যে ক্লাস বলেন—ফোর্থ ক্লাসে পড়াতে দেবেন?"

"হেড্ মাষ্টার তো অবাক্—বল্লেন—'আচ্ছা', তখন সে পড়াতে গেল। ছেলেরা বলছিল—সে নাকি ভারী সুন্দর পড়ালে—আমাদের হেড্ মাষ্টারের চেয়েও নাকি ভাল!"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম—"বলিস্ কি?" ছেলে সোল্লাসে বলিল—"হ্যাঁ বাবা, ভারী সুন্দর নাকি পড়িয়েচে, আপনি কেন তাকে থাকতে দিলেন না!"

আমি বলিলাম—"তাকে আস্তে বল্লিনি কেন?"

ছেলে এবার বিজয় গর্ব্বে বলিয়া উঠিল—"তা আর বলিনি!"

"বলিচিস্?—কি বল্লে?—আস্তে চাইলে না—না?"

ছেলে বলিল—"না বাবা, তা তো কই বল্লে না—বরং ভারী খুসী হয়ে বল্লে—আচ্ছা কাল যাব—তোমার বাবাকে সেদিন ভারী চটিয়ে দিয়েছিলুম—কাল ঠাণ্ডা করে আসব!"

এই অতি ভদ্রতায় আমার আবার মনে কেমন একটু সন্দেহও হইতে লাগিল!—কোন কু-অভিসন্ধি নাই তো? কিন্তু পর দিন যখন সে আসিয়া আমায় প্রণাম করিল, তখন তাহাকে দেখিয়া আমার সেই অমূলক সন্দেহের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইলাম। আমি সাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম—"সেদিনকার অপরাধ আমার নেবেন না, সুনীতি বাবু!"

আমার এই ক্ষমাপ্রার্থনায় লোকটা বলিল—"অপরাধ নিতে হয় তো—ঐ 'সুনীতি বাবু' সম্বোধনেই নোব!"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"কেন তাতে দোষ কি?"—এই প্রশ্নে সে আমার পানে চাহিয়া বলিল—"দোষ কি তাতে?—আচ্ছা আপনাকে যদি অঙ্কশাস্ত্রে 'গৌরীশঙ্কর' ব'লে সম্বোধন করা যায়—আপনি খুসী হ'ন তাতে?"

এই জবাবে আমি কাট হইয়া গেলাম। বলিলাম—"দেখ্চি—জ্যোতিষ-শাস্ত্রও অজানা নয়!" লোকটা এবার হাসিয়া বলিল—"কি রকম?" "কেমন করে জান্লেন যে গণিতবিদ্যায় আমি একেবারে ফকির?" কেমন এক-প্রকার কৃত্রিম গর্ব্বের ভাব প্রকাশ করিয়া সে বলিল—"এ দুনিয়ায় জানি না কেবল একটা বিষয়—নয় ত—"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেটা কি?" সে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"আমার ছুটির দিন!" দেখিলাম—তাহার দুই চক্ষু বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সুনীতি নামে দেখচি আপনার ঘোর আপত্তি—তা এখন কি নামে ডাকব বলুন?"

আমার পানে ক্ষণকাল চাহিয়া সুনীতিকুমার বলিল—"কি নামে ডাক্বেন?—কেন—মাতাল বলে!"

আমি বলিলাম—"ও কি একটা কথা!" সে বলিল—"তবে না হয় 'মাষ্টার' বলেই ডাক্বেন!" আমি বলিলাম "সেই ভাল!"

* * *

সেই দিন হইতে মাষ্টার আমার এখানেই আছে। সে খায় এক বেলা—বাহিরে কলাপাতে। সে এক বেলা মাত্র পড়ায়, কিন্তু তাহারই ফলে ছেলে আমার বেশ ভাল রকম পাশ করিয়া প্রমোশান পাইল। আমি একদিন বলিলাম—"আপনার একবেলার শিক্ষাতেই ছেলেটার খুব উন্নতি হয়েচে, যদি দুবেলা পড়াতেন, তাহলে বোধ হয়, আরো ভাল হ'ত!"

মাষ্টার বলিল—"তা হতে পারত।—কিন্তু তাতো আমা দ্বারা হবে না—তা হলে মদ খাব কখন্?"

আমি বলিলাম—"নাই খেলেন—ওটা!—ছাড়তে চেষ্টা করা ভাল নয় কি?"

মাষ্টার বলিল—"হাঁসালেন এবারে!—আমায় 'রিফর্ম্' করতে চাচ্চেন?—" আমি বলিলাম—"বাস্তবিক বড় দুঃখ হয় আপনার জন্যে!"

মাষ্টার বলিয়া উঠিল—"খবরদার!—অমন কাজ করবেন না!—আমার জন্যে দুঃখু কর্ত্তে হলে ফেটে চৌ-চির হয়ে যেতে হবে আপনাকে!"

আমি বলিলাম—"একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব—বল্‌বেন?"

"কি—বলুন?"

"আপনি কে? আর কেনই বা এমন করে জীবনটাকে ক্ষয় করচেন?—নিশ্চয়ই একটা খুব বড় রকম দুঃখ আপনি পেয়েচেন!"

মাষ্টার গম্ভীর হইয়া রহিল—কোন উত্তর করিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বল্‌বেন্—না?"

সে বলিল—"বল্‌ব—কিন্তু আজ নয়!"

আমি আর পীড়াপীড়ি করিলাম না।

৩

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই মাষ্টারের গুণের পরিচয় পাইয়া, যেমন একদিকে মুগ্ধ হইতেছিলাম, আবার তেমনি তাহার অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে লাগিলাম। মাষ্টার শুধু শিক্ষিত নয়, সে মূর্ত্তিমান পরোপকার! কোথায় পথের ধারে ভিখারী বিসূচিকায় অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল—মাষ্টার তাহাকে বুকে করিয়া হাঁসপাতালে হাজির করিল! কোথায় কোন্ অনাথ মরিয়াছে—দাহ করিবার লোকের অভাব হইতেছে—মাষ্টার সেখানে উপস্থিত! কোথায় কোন্ দূর গ্রামে আগুন লাগিয়াছে, জানিবা মাত্র মাষ্টার ছুটিল! একবার মাষ্টারের দিন পনের দেখা নাই; ভাবিলাম পাগল মানুষ কোথায় বলিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার অভাব সকলেই আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দেখি, মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত! আমি বলিলাম—"এতদিন ছিলেন কোথায়?"

সে বলিল—"স্বর্গে—বেশ্যার বাটীতে।" আমি হাসিয়া বলিলাম—"হাঁ স্বর্গটা ঠিক খুঁজে বের করেচেন বটে!—তা' হঠাৎ স্বর্গচ্যুতি হ'ল যে?"

সে বলিল—"কপালে এখনো ঢের ভোগ আছে, তাই মাগী মোল না—সেরে উঠ্‌ল—আমিও চলে এলুম!"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছিল?"

"বসন্ত।"

"তাই তার সেবা করছিলেন?"

"ক্ষেপেচেন!—তার মরবার সুখটা দেখ্‌তে গিছলুম। গরীবের ছেলে যেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধনী-সন্তানের মিঠাই খাওয়া দেখে, তেমনি আর কি?—কিন্তু মাগী ভারি দুষ্টু—কিছুতেই মোল না!"

আমি বলিলাম—"মাষ্টারের মরবার এত সাধ কেন?" সে নির্ব্বিকারভাবে উত্তর করিল—"ও এক রকম সখ!"

কথা শুনিয়া হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। একদিন কোন কারণে সরকারী হাঁসপাতালে গিয়া দেখি, রোগীর ভিড়ের মধ্যে মাষ্টার দাঁড়াইয়া। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে?" সে বলিল—"একবার হার্টটা এক্‌জামিন করাতে।" আমি বিস্মিত বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম—"তবু ভাল, শরীরটার দিকে একটু দৃষ্টি পড়েচে!"—মাষ্টার একটু হাসিল!

ডাক্তার হার্ট এক্‌জামিন করিয়া বলিলেন—"এ রকম কত দিন হয়েচে?"

মাষ্টার প্রফুল্ল হইয়া বলিল—"এ রকমটা কি? খুলেই বলুন না! সঙ্কেতনামে কথাবার্ত্তা বড় বুঝি না।" ডাক্তার বলিলেন—"তোমার যে হার্টডিজিজ্ (হৃদ্‌রোগ) হয়েচে!"

"তা হয়েচে, তা কি করব—কার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব?" ডাক্তার একটু রসিক প্রকৃতির;—বলিলেন—"শুধু ঝগড়া নয়, রীতিমত লড়াই করতে হবে!"

মাষ্টার যেন ভারী আশ্চর্য্য বোধ করিল; বলিল—"বলেন কি? লড়াই করতে হবে?—কার সঙ্গে?"

ডাক্তার চাপা স্বরে বলিলেন—"আর কার সঙ্গে—যমের সঙ্গে!" কথাটা মাষ্টারের কাণে গেল—সে বলিল—"তাঁর সঙ্গে ত আজন্মই ঝগড়া—তাই সে আমার এধারও মাড়ান না!"

ডাক্তার আর অনর্থক কথা-কাটাকাটি না করিয়া

বলিলেন—"ও সব বাজে কথা যাক্, নেশা টেশা কিছু কর ?"

"বিলক্ষণ!—নেশাই তো হচ্চে পেশা!"

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা হোক, এখন দিন কতক ছুটি নিতে হবে।"

মাষ্টার বলিল—"ছুটি ত চাই—পাই কই ?"

ডাক্তার প্রেস্কৃপ্‌শান বহির দিকে মুখ নীচু করিয়া বলিলেন—'ছুটি জোর করে নিতে হবে!' এই বলিয়া তিনি মাষ্টারের জন্য প্রেস্কৃপ্‌শান লিখিতে উদ্যত হইলে, মাষ্টার বলিয়া উঠিল—"ও কি, আমার জন্যে প্রেস্কৃপ্‌শান লিখচেন নাকি ?"

"হুঁ" বলিয়া ডাক্তার একটা ঔষধের নাম লিখিতেই মাষ্টার শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল—"আহা! করেন কি ? থামুন, থামুন—।" ডাক্তার বিস্মিতনয়নে মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিলেন। মাষ্টার বলিল—"আমার জন্যে কিচ্ছু লিখ্‌তে হবে না—আমি শুধু রোগটা কি জান্‌তে এসেছিলুম!" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে দ্রুত সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

ডাক্তার আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"লোকটা কে ? পাগল নাকি ?"

আমি আর বিশেষ কিছু না ভাঙ্গিয়া শুধু বলিলাম—"দেখচি তো!"

ডাক্তার অন্য রোগীকে দেখিতে লাগিলেন। আমি একটা ব্যথিত উদ্বেগের বোঝা লইয়া বাড়ী ফিরিলাম!

৪

ইহার সাত আট মাস পরে মাষ্টার একদিন আমায় ডাকিয়া পাঠাইল। তখন রাত প্রায় বারোটা হইবে! হঠাৎ এমন অসময়ে আমায় ডাকায় মনে কেমন আশঙ্কা হইল। আমি শশব্যস্তে মাষ্টারের ঘরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম—মাষ্টারের শ্বাসনিরোধের উপক্রম হইয়াছে। আমায় দেখিয়া সে ইঙ্গিতে বসিতে বলিল এবং সঙ্কেতে বুঝাইল—ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। প্রায় আধ ঘণ্টার পরে দেখিলাম—সে যেন একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। তখন তাহাকে নিদ্রা যাইতে উপদেশ দিয়া উঠিতে উদ্যত হইলে, সে বলিল—"আমার কিছু বলবার আছে, একটু কষ্ট স্বীকার করে বসুন।" আমি বলিলাম—"আজ থাক্—কাল সুস্থ হয়ে বল্‌বেন এখন!" সে বলিল—"হয়তো বলবার আর সময় পাব না—একটু বসুন—" এই বলিয়া সে আমার পানে এমন মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল যে, তাহার সেই কাতর চোখের করুণ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতীত হইলে সে বেশ সুস্থ হইল।

তখন সে বলিল—"ভারী ভয় হয়েছিল—ভেবেছিলুম—বুঝি এখানেই শেষ হয়ে যাই!" আমি বলিলাম, "কিছুতেই তো ডাক্তারও দেখাবেন না—আর অত্যাচার করতেও ছাড়বেন না!" সে বলিল, "আপনি ভুল বুঝলেন—মরবার ভয়ে কাতর হইনি—পাছে আপনার এখানেই মরি—এই ভয় হয়েছিল!"

আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন তাতে কিসের ভয় ?" সে বলিল—"না—ভয় তেমন কিছু নয়, তবে কিনা আমার একান্ত সাধ, মৃত্যুটা আমার যেন কোন বেশ্যালয়েই হয়!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার এ অদ্ভুত ইচ্ছা কেন ?"

সে এক করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল—"আমার নাড়ীর টান যে তার সঙ্গে!"

বিদ্যুতের একটা চকিত চমকে ঘনান্ধকারময় চরাচর যেমন মুহূর্ত্তের নিমিত্ত উদ্ভাসিত হইয়াই আবার অতল আঁধারে তলাইয়া যায়, তেমনি মাষ্টারের এই একটা কথায় তাহার রহস্যাচ্ছন্ন অজ্ঞাত জীবনের কিয়দংশ যেন পলকের জন্য আমার নিকট আলোকিত হইয়াই আবার জটিল রহস্যের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল! কেমন একটা উৎকট কৌতূহলের উদ্রেক হইল; আমি কহিলাম—"আপনি যে বলেছিলেন, আপনার পরিচয় একদিন আমায় বল্‌বেন ?"

"হাঁ—বল্‌ব।" এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরব হইল। হঠাৎ সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি পরজন্ম মানেন ?"

"মানি।"

"মানেন ?—কিন্তু পরজন্মের প্রমাণ কি ?"

"কেবল সংস্কার।"

"কেবল সংস্কার ?—রক্ষে !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন রক্ষে কিসের ?" সে সভয়ে বলিল—"উঃ—পরজন্ম যদি সত্যি থাকৃত,তা হলে কি হ'ত আমার ?"

আমি বলিলাম—"একেবারে যে পরজন্ম নেই—ই, তাই বা জান্‌লেন কেমন করে ?"

"থাকে—থাক্, আমি কিন্তু নেই বলেই মনে কর্‌তে চেষ্টা করি !"

আমি বলিলাম—"তা হলেই আপনি শান্তি পান ?"

সহসা তাহার চিত্তের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল—সে বলিয়া উঠিল—"আর যদি পরজন্ম থাকেই, তাতেই বা আমার অশান্তি কি ? আমি তো জীবনে কারুর কোন অন্যায় করিনি—যদি কিছু অন্যায় অত্যাচার করে থাকি, সে নিজের ওপরেই করেছি !—"

আমি বলিলাম—"নিজেরও ওপর অত্যাচার করবার অধিকার আপনার নেই !" সে অমনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ—এতো দাসখৎ লিখে দিতে আমি রাজী নই !—আমার শরীর—তা আমারই ; আমি যা ইচ্ছে করি না—তা নিয়ে,—তাতে কার কি ! এতে যদি কৈফিয়ৎ নেবার মালিক কেউ থাকেন, তিনি কেন আমায় অন্য রকম কল্লেন না ?—না—না, ছনিয়ার এপারে কি ওপারে কেউ আমার কৈফিয়ৎ নিতে—বিচারক হতে পারে না !"

আমি বলিলাম—"থাক্, অকারণ মস্তিষ্ক উত্তেজিত করবেন না ;—আপনি ঘুমাবার চেষ্টা করুন—আমি যাই ।"

সে আমার পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"যাবেন—আচ্ছা যান্। আমার পরিচয় আমার এই ক্যাম্বিশের ব্যাগে রইল ।—"

পাছে আমার সঙ্গে কথা কইবার অবসর পাইয়া সে আরো উত্তেজিত হইয়া উঠে,এই আশঙ্কায় আমি 'সেই ভাল' বলিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেলাম !

ইহার পর আর তিনদিন মাষ্টারের কোন তল্লাস নাই ! চতুর্থ দিন সংবাদ পাইলাম—হতভাগ্য অবিশ্রান্ত সুরাপান করিতে করিতে "হার্ট ফেল্" হইয়া, হঠাৎ মারা গিয়াছে। ইহার উপর যখন শুনিলাম, তাহার শবদেহ পোষ্টমর্টম করা হইবে, তখন বুকের ভিতরটা আমার কেমন করিয়া উঠিল ! হায় ! শারীর-বিজ্ঞান তার অনন্ত জীবন ধরিয়াও যদি সেই শবদেহের উপর অশ্রান্ত ছুরিকাঘাত করিতে থাকে, তথাপি কি সেই হতভাগ্যের হৃদয়-ক্ষতের লুকানো রহস্যটুকু উদ্ঘাটিত করিতে পারিবে ?

পোষ্টমর্টম অন্তে আমি সেই শবদেহের সৎকার করিতে অভিলাষী হওয়ায় ডাক্তার বিস্মিতনয়নে আমার দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম—"উনি আমার বাড়ীতে থাকতেন—আমার ছেলের প্রাইভেট টিউটার।"

ডাক্তার এবার আরো বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"খুব উপযুক্ত লোক বেছেছিলেন—দেখচি !"

আমি বলিলাম—"অমন লোক বড় একটা মেলে না।"

ডাক্তার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"খুব চরিত্রবান বটে !—দ্বিতীয় Bacchus ?"

"কিন্তু অন্য বিষয়ে লোকটা দেবতা ছিল !" ডাক্তার সাশ্চর্য্যে বলিলেন—"তাই নাকি ! এর আর কে আছে ?"

"তা জানি না—ওর জীবন নিবিড় রহস্যে ঢাকা !"

* * *

মাষ্টারের নির্দ্দেশ-মত তাহার ব্যথিত জীবনের রহস্যটুকু জানিবার জন্য তাহার সেই ক্যাম্বিশের ব্যাগটা খুলিয়া ফেলিলাম ! দেখিলাম—তাহার মধ্যে আছে—একখানা পুরাতন আরশী—ভাঙ্গা চিরুণী—জীর্ণ ব্রশ—গোটা কয়েক সিগারেট—একখানা দশটাকার নোট (তাহার পিঠে লেখা—'আমার ছুটির দিনের পথখরচা') আর একখানা খাতা !

খাতাখানা হাতে লইয়া খুলিতে গিয়ে হাত কেমন কাঁপিয়া উঠিল ! মনে হইতে লাগিল, যেন আমি ধনরত্নের আশায় দস্যুর মত কোন সমাধিক্ষেত্র হইতে প্রোথিত শবদেহ উত্তোলিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। আর পরপার হইতে গতাসু যেন আমার এই নির্ম্মম দস্যুবৃত্তি দেখিতে পাইয়া, কাতরনয়নে আমার পানে অনিমেষ চাহিয়া আছে ! খাতা খুলিলাম না—রাখিয়া দিলাম। কিন্তু হায় ! পুস্তকাকার সেই পুরু খাতাখানা রাখিয়া দিতে গিয়া, হঠাৎ তাহার শেষ পৃষ্ঠাটা উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। চক্ষের পলকে দেখিয়া ফেলিলাম—বড় বড় অক্ষরে শেষ ছত্রে লেখা :—'আমি জারজ'—পাপ হইতেই আমার জীবনের উদ্ভব সুতরাং তাহারই অনুশীলনে এ কলঙ্কিত জীবনের বিলয় হউক।'

প্রতিবাদের প্রতিবাদ

বৌদ্ধ-গন্ধ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, M. A.]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ 'নারায়ণে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও উত্তরবঙ্গের কতকগুলি ব্যক্তির তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারে নাই। উত্তরবঙ্গের দুইজন অধ্যাপক দুইখানি স্থানীয় মাসিক পত্রিকায় শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রথম নম্বর—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ। ইনি 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩২১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় এক অভিনব সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়া আপনার নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার মতে শূন্যবাদ হিন্দুর সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং তাহা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আনন্দতীর্থের 'ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য' হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের জানা উচিত ছিল যে, আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য খৃঃ ১১১৯ এবং ১১৯৯ এর মধ্যে জীবিত ছিলেন। তখন বৌদ্ধপ্রভাব অন্ততঃ উত্তরপ্রদেশসমূহে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ চিন্তাস্রোত তখন সকল উপনিষৎ ও দর্শনকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। মহাযান-ধর্ম্ম তখনও ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। শূন্যবাদ এই মহাযানের অঙ্গ। ইহা আনন্দতীর্থ উদ্ধৃত মহোপনিষদ্ হইতে পুরাতন। এই মতবাদ খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে পূর্ণ-পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। অতএব পরবর্ত্তী হিন্দু-দর্শনসমূহে যে, ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 'প্রজ্ঞাপারমিতা'-গ্রন্থসমূহে 'শূন্যতা বিবর্ত্ত' নামক অধ্যায়ে শূন্যবাদ যে আকারে পাওয়া যায়, তাহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, ইহার অতীত ইতিহাস অতি সুদীর্ঘ। 'প্রজ্ঞা-পারমিতা'-গ্রন্থসমূহ যে মহোপনিষদ্ ও মধ্যাচার্য্য হইতে পুরাতন, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে লিখিত 'প্রজ্ঞাপারমিতার' পুঁথি এখনও কলিকাতার প্রাচ্যসমিতি-বিশেষের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। অনুসন্ধান করিলে, সিদ্ধান্তভূষণ-মহাশয় তাহা স্বল্পায়াসেই জানিতে পারিতেন। নাগার্জ্জুন এই মতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন; তাঁহার কালনির্ণয় সম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা হইয়া গিয়াছে। জোগড়ে খোদিতলিপিতে তাঁহার প্রশিষ্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। সিদ্ধান্তভূষণ-মহাশয়কে সন্ধান বলিয়া দিলাম, একটু কষ্ট করিয়া দেখিবেন যে, মধ্যমকাচার্য্য নাগার্জ্জুন তাঁহার মহোপনিষদ্ ও মধ্বাচার্য্য হইতে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। অথর্ব্ববেদের অংশবিশেষ এবং ইহার উপনিষদ্‌গুলি অত্যন্ত আধুনিক, সুতরাং মহোপনিষদ্ হইতে শূন্যবাদের মৌলিকত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত-ভূষণ-মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত আপনার পরিচয়াভাব সপ্রমাণ করিয়াছেন। মহাকৌর্ম্মপুরাণের ত কথাই নাই,—ইহা মহাপুরাণ-সমূহের মধ্যে গণ্য নহে, এবং ইহা মহোপনিষদ্ হইতেও আধুনিক।

সিদ্ধান্তভূষণ-মহাশয় যদি জোগড়-লিপি হইতে নাগার্জ্জুনের সময় নিরূপণ করিতে অক্ষম হন ও বুঝিতে না পারেন, ত তাঁহাকে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে নাগার্জ্জুন সৌত্রান্তিকাবর্গ্য কুমারলব্ধ ও অশ্বঘোষের সামসময়িক ছিলেন। চতুঃশতিকা-প্রণেতা আর্য্যদেব—নাগার্জ্জুনের শিষ্য ছিলেন; অতএব খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে, তিনি জীবিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না, এবং খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে শূন্যবাদ সম্যক্ পরিণতি লাভ না করিলে মাধ্যমিক দর্শনশাস্ত্র সে সময়ে এরূপ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারিত না।

ধর্ম্মপূজাকে বৌদ্ধ পূজা বলিয়া কেহই ধরিয়া লইতেছে না; ইহা প্রমাণিত হইতেছে। হিন্দুর পূজা-পদ্ধতির মধ্যে ধর্ম্মপূজার বিশেষ কোনও ব্যবস্থা পাওয়া যায় নাই;

আর যাহা আছে, তাহা যে সম্পূর্ণ আধুনিক বৌদ্ধদিগের নিকট প্রাপ্ত, তাহা সপ্রমাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। ধর্ম্মপূজকেরা যে বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী ছিল, তাহা 'শূন্য পুরাণের' নিরঞ্জনের 'উষ্মা' নামক অধ্যায় পাঠে বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা ধর্ম্মপূজা করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন। হিন্দুর দেবতা হইলে, তাহার পূজা-পাঠ ব্রাহ্মণেরই একচেটিয়া থাকিত। সিদ্ধান্তভূষণ-মহাশয় কি দেখাইতে পারেন যে, কোনও হিন্দুর দেবতা অব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হইবার ব্যবস্থা আছে? তিব্বতীয় প্রমাণ যদিও এখনও পাওয়া না যাইতে পারে, কিন্তু এখন যতটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য-পরিত্যক্ত সদ্ধর্ম্মিগণকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের দেবতাদিগকে উদারভাবে হিন্দুর দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা বহুদিনাবধি ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। সেই ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত দেশের "মামুলী" ধর্ম্মপূজা যে, ব্রাহ্মণের পূজাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত, একথা কেমন করিয়া বুঝিব? ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা-লাভের পর বৌদ্ধ দেবতাগুলিকে যদিও ব্রাহ্মণেরা কখনও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই, তথাপি অনেকটা উদারতার সহিত তাহাদিগকে দেখিতেন, এবং এমন কি বৌদ্ধগণ দ্বারা গঠিত নবনির্ম্মিত হিন্দুসমাজ বৌদ্ধ দেবদেবীগণকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুমোদিত দেবতা-বিশেষের মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দিলে বিশেষ আপত্তি করিতেন না। তাই আজ ধর্ম্মপূজা শৈবাচারের "পরিণাম" বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেছে। কিন্তু যদি সত্য তাহাই হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচালিত হয় না কেন, সিদ্ধান্তভূষণ-মহাশয় এ সমস্যা পূরণ করিবেন কি? ২৪ পরগণার একজন ব্রাহ্মণের রচিত একটা গান এখনও শুনিতে পাওয়া যায়—

"বল মা তারা এরা কারা
বামুনের জল নেয়না এরা, পূজা করে ডোম বেটারা।"

ধর্ম্মপূজা অস্পৃশ্যজাতি দ্বারাই সাধিত হয়, ব্রাহ্মণের তাহাতে অধিকার নাই। দুই একস্থানে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপূজা করিয়া থাকেন।

ইতিহাসের রাজ্যে আপ্তবাক্য নাই—শিষ্য-প্রশিষ্য নাই। প্রমাণ থাকিলে মানিতে হইবে, অপ্রামাণ্য কথা স্বর্গ হইতে আসিলেও ফেলিয়া দিতে হইবে। শাস্ত্রি-মহাশয় যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন; আমরা আশা করি, পণ্ডিতগণ তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন—অযথা বিদ্রূপ ও কটুভাষা ব্যবহার করিয়া, কলঙ্কভাজন হইবেন না।

নম্বর ২—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষের' চৈত্র-সংখ্যায় বৌদ্ধ-গন্ধ নামক প্রবন্ধে ধর্ম্মপূজার আলোচনা করিয়াছেন। সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে সার তত্ত্ব কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার প্রথম আপত্তি—শাস্ত্রি-মহাশয়ের লোকায়ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা। যে অর্থে শাস্ত্রি-মহাশয় ইহার ব্যবহার করিয়াছেন, মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে' সেই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত দেখা যায়। কথাটা যদি তিনি বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। চার্ব্বাকের ধর্ম্ম লোকায়ত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে একটা। বেদান্ততীর্থ মহাশয় বোধ হয়, বুঝিতে পারেন নাই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও তন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও কি প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রের গন্ধ পৌছিতে পারে। তাঁহাকে একথা বুঝাইবার জন্য আমরা ধর্ম্মসমূহের ইতিহাস (History of Religions) ও দর্শনের ইতিহাস (History of Philosophy) কিঞ্চিৎ পড়িতে বলি। তাহা না হইলে, তাঁহার পক্ষে ইহা সুগম হইবে না। এই দুইটি প্রতীচ্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের পর তন্ত্রের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপে মিশিতে পারে এবং কিরূপে তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় আপত্তি, গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন সম্বন্ধে। বেদান্ততীর্থ মহাশয় বলেন যে, ইহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের "মামুলী" প্রথা ও শাস্ত্রানুমোদিত, এবং তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি বৌধায়ন হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে, বৌধায়ন হইতে যাহা তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যপালনের ব্যবস্থা! ব্রহ্মচর্য্য পালনপর শিক্ষার্থী যে, ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য নহে, একথা কি ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? বেদান্ততীর্থ-মহাশয় শাস্ত্রি-মহাশয়ের প্রতি অযথা বাক্যবাণ বর্ষণের পূর্ব্বে গৃহী ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টভোজন যদি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার পরিশ্রম অনেকটা সার্থক হইত; এবং "তারা"ও তাঁহার "দাঁড়াইবার জায়গা" দেখাইয়া দিতেন।

তৃতীয় কথা—রামচরিতের। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি ইহা লইয়া অনেকদিন হইতে গোল করিতেছেন। গোলটা এখনও বাহির হয় নাই। শুধু—"ভুল হইয়াছে, ভুল হইয়াছে" বলিয়া গগন বিদীর্ণ না করিয়া, যদি সাদা কথায় ভুলগুলি দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পণ্ডিত-জনোচিত হইত। যদি ভুলই হইয়া থাকে—ভুল হওয়া অসম্ভব নহে, কারণ শাস্ত্রি-মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং ইতিহাসও অপরাপর বিজ্ঞানের ন্যায় সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। বিদ্বৎসমাজ বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত শাস্ত্রি-মহাশয়ের ভুল দেখাইয়া দিলে, তিনিও তাঁহার বিরুদ্ধ মতবাদ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া, আপনার ভ্রমসংশোধন করিয়া লইবেন। চতুর্থ কথা, পূর্ণানন্দ সম্বন্ধে শাস্ত্রি-মহাশয়ের রিপোর্ট। এই পূর্ণানন্দ নাকি প্রতিবাদকারীর পূর্ব্বপুরুষ। বেদান্ততীর্থ মহাশয় প্রমাণ করিতে পারিবেন কি যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পূর্ণানন্দ এবং রিপোর্টে লিখিত পূর্ণানন্দ একই ব্যক্তি? আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণে অনেকটা ভুল সংশোধিত হইয়া গেল, সে বিষয়ে শাস্ত্রি-মহাশয়ের ত কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না, এবং তিনি তাহা করিবেনও না; তবে গ্রন্থ সম্বন্ধে রিপোর্টে ভুল না থাকিলেই হইল। তত্ত্বচিন্তামণিকে তন্ত্রগ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছে।

শাস্ত্রি-মহাশয় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। বেদান্ততীর্থ মহাশয় যদি আরও প্রমাণের জন্য ব্যাকুল হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এসিয়াটীক্ সোসাইটীতে দিন কয়েক প্রকৃত ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

গ্রীষ্ম-বর্ণনা

[শ্রীবিভূতিভূষণ লাহিড়ী]

(ঋতু-সংহার)

তাপিত তপন করে, গাহনে মানস সরে,
শশী আজ তৃপ্তিদায়ী, প্রিয়ে!
সায়াহ্নে দখিণ বায়, পরাণ উদাসে, হায়,
আজি এই নিদাঘ সময়ে।
বিমল-পূর্ণিমা-শশী— উচ্ছসিত-সিত-নিশি,
জল-যন্ত্র-মণ্ডিত ভবন,
চন্দ্রকান্ত মণিহার, 'নহে আজ গুরুভার'
চাহি আজ সরস চন্দন!'
প্রিয়া! তব মৃদু হাস— বিকম্পিত-সুখোচ্ছ্বাস!—
—আজি তাহে কত ঝরে মধু;—
শীতল শয়ন-পরে কক্ষপূর্ণ গীতস্বরে!
সেই আজি শ্রেষ্ঠসুখ, বঁধু!
দুকূল মেখলা পর', চন্দনে সুস্নিগ্ধ কর
রত্নহার-গর্ব্বিত-উরসে।
কুঞ্চিত কুন্তলরাজি, গন্ধে ভরে' দাও আজি,
মত্ত আমি প্রণয়-রভসে।
লাক্ষারস রাগ দিয়ে, লও তুমি বিরঙিয়ে,
রাঙা দুটি চরণ তোমারি,—
মরালের কলবোলে, নূপুর উঠিবে বোলে',
চিত্ত মোর উঠিবে গুঞ্জরি'!

চন্দনচর্চ্চিত বুকে, মতিমালা পর' সুখে,
নিতম্বেতে কনক-মেখলা,
তরুণ হৃদয় মোর, হেরিয়া এ বেশ তোর,
কেন নাহি হ'বেলো উতলা?
সিক্ত অঙ্গ স্বেদজালে, আজি এ নিদাঘকালে,
গুরুবাস ফেলে দাও দূরে,—
ক্ষতি কিছু নাহি তায়, সুচিকণ বাসে, হায়,
লাজ যদি ঢাকা নাহি পড়ে!
সৌধ শিরে হেরি' তোরে, দূরে ওই দিগন্তরে,
ক্ষীণ দীপ্তি চন্দ্রিমা পলায়—
গৌর তব কান্তি হেরে, সে যে, সখি, লাজে মরে,
মুখ তাই লুকাবারে চায়।
সুগন্ধি-শীকর-বাত, বল্লকী-কাকলী সাথ,
যুবতীর নবীন যৌবন,—
নিদ্রাগত পঞ্চশরে, জাগাইল ধীরে ধীরে,
পুনঃ সে গো বধিবে জীবন।
বিরহের তুষানলে, প্রবাসীর চিত জ্বলে,
বাহিরেতে তপন জ্বালায়;
স্মৃতি আনে অশ্রুজল, ধূলাভরা ধরাতল,
আঁখি নাহি মেলিবারে পায়।

THE BOWER-MEADOW. প্রান্তর কুঞ্জ

চিত্র-শিল্পী—ডি, জি, রসেটি]

বৰ্দ্ধমানের সুড়ঙ্গ

[শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়, B. A., M. R. A. S.]

এবার বর্দ্ধমানে সাহিত্যিকদের বৈঠকে খুব গুরুগম্ভীর বিষয়-সমূহের আলোচনা হইয়া গেল। তাম্রমল ও এসিটোনের উপর নৈত্রিক অম্লের * পীড়া, যুক্তবর্ণের তির্য্যগবর্ত্তন, পালবংশীয় রাজাদের প্রভাবে পালিভাষার ব্যাবর্ত্তনতন্ত্র এবংবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভের জন্য পূর্ব্ব হইতেই চারিদিকে আহ্বান-পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা পয়ার ভাল কি ত্রিপদী ভাল, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ ভাল কি মিহিদানা ভাল, এইরূপ রসাল আলোচনার আশায় লালায়িত ছিলেন, তাঁহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত-ব্যাখ্যাত বর্দ্ধমানের সুড়ঙ্গ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল না! হইলে ভাল ছিল, কারণ ধর্ম্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব গুহার ভিতরেই নিহিত থাকে।

ভারত-ব্যাখ্যাত না হউক, ভারতবিখ্যাত বর্দ্ধমান জেলার সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা বোধ হয়, অসাময়িক হইবে না।

বর্দ্ধমানের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বহুশত সুড়ঙ্গ বর্ত্তমান। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়া, কি দিবা কি রাত্রি, অসংখ্য নরনারী অবিরাম পাতাল রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। বলা বাহুল্য, এগুলি কয়লার খনি। বিদ্যাবলে এমন সুন্দর আকর খনিত হইতে পারে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

এখন শুভ ১৯১৫ সন। ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৫ সনে বিলাত হইতে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত জনৈক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আসিয়া রাণীগঞ্জের গর্ভে কয়লার অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার নাম মিঃ জোন্স্। তিনি সরকারের সাহায্য লইয়া সাবল-খন্তা ধরিলেন। কয়লা উঠিল। আর তৎক্ষণাৎ রাণীগঞ্জের এখানে সেখানে সাহেবেরা কোম্পানি খুলিয়া বসিলেন। বর্দ্ধমানের পশ্চিম সীমায় দামোদরের উদরে কৃষ্ণরত্ন বিরাজমান, এ সংবাদ আমাদের ঋষিগণ জ্যোতিশ্চক্র দেখিয়া বহু পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। প্রমাণ, এ স্থানের শাস্ত্রীয় নাম বরাকর; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আকর ভূমি। বর্ত্তমান মহাসমরে যে 'জড়-মন' জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য, তাহাও আমাদের দেশীয় ভাষার দৈবজ্ঞেরা অরাতির নামে ও মনে জড়ত্বের ছাপ দেখিয়া বহু পূর্ব্ব হইতেই গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।—সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং।—লক্ষ্মীর বরপুত্র সর্ব্বগুণাকর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়াই বরাকরে এক খনি খুলিয়াছেন। তাঁহার মহিমান্বিত ভাগ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন লাভ হউক। দেশীয় মহাজনদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ১৮৩৫ সনে প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'কার-টাগোর কোম্পানি' সাহেবদের কতকগুলি খনির কারবার কিনিয়া লইয়াছিলেন। তদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের নামও উল্লেখযোগ্য। ইনিই বর্ত্তমান সিয়ারসোল মালিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

রাণীগঞ্জে পাথুরিয়া কয়লার খাদ হওয়ার পর এদেশে রেল খুলিবার সাড়া পড়িয়া গেল। হাবড়া হইতে হুগলি হইয়া ১৮৫৫ সনে রাণীগঞ্জের কয়লাক্ষেত্র পর্য্যন্ত রেল বিস্তৃত হইল। সভ্যতার বাহন বাষ্পীয় শকট শৈশবে বর্দ্ধমানের রাণীগঞ্জের ক্রোড়েই লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ভারতের অন্যত্র গমন করিয়াছে। এখনও ভারতবর্ষে যত পাথুরিয়া কয়লা উদ্ভূত হইতেছে, তাহার পনের আনা বর্দ্ধমানের রাণীগঞ্জ-আসানসোল ও তৎসংলগ্ন ঝড়িয়া ক্ষেত্রে উৎপন্ন। পাথুরিয়া কয়লা দ্বারা জল গরম করিলে, তবে ষ্টীম এঞ্জিন চলে। সুতরাং বর্দ্ধমান জেলা প্রায় সমস্ত ভারতের কলকারখানার ইন্ধন প্রদান করিয়া, দেশের শ্রীবৃদ্ধিকে জাজ্বল্যমান ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান রাখিতেছে। অতএব বর্দ্ধমান নামটি সার্থক।

* (Nitric acid সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় গত সংখ্যার [একবিংশ ভাগ—২য় সংখ্যা] সূচি দেখিলে কথার যাথার্থ্য বুঝিবেন।

মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্রের কয়লার খনি, বরাকর

বৰ্দ্ধমান আমাদের রন্ধনের ভারও গ্রহণ করিয়াছে। কাঠ এখন সোণার দরে বিক্রয় হয়। বহুবাজারে চেয়ার, টেবিল, খাটের অগ্নিমূল্য শ্রবণ করিয়া, বহু কন্যাকর্ত্তা চোখে সরিষাপুষ্প দর্শন করিয়া থাকেন, তাহা কে না জানেন? জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবে সুদূর পল্লীগ্রামের রন্ধন-কুটিরেও পাথুরিয়া কয়লা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাগণ পাথুরিয়া-কয়লার জ্বালের পকান্ন আহার করিতেন না। কারণ, উহা সাহেবদের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু কাঠ এখন দুষ্প্রাপ্য। অগত্যা ভট্টাচার্য্যগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন, হাঁ খাবে বই কি; তবে কয়লার গুঁড়া মিশ্রিত গোময়পিণ্ড দ্বারা উননের অগ্নি উদ্দীপন করিলেই দোষ কাটিয়া যাইবে। গোলাপ ফুল দ্বারাও দেবপূজার রীতি অনেক স্থলে প্রচলিত হয় নাই; কারণ উহা বিদেশী। বোধ হয়, গোলাপ ফুলকে সচন্দন না করিয়া গোময়লিপ্ত করিলেই দোষ কাটিয়া যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য, কাঠের কয়লা ও পাথুরে কয়লা দুই-ই বৃক্ষাদির রূপান্তর। জলের নিকট জঙ্গলের বৃক্ষ যুগযুগান্তর ধরিয়া মৃত্তিকাবিশেষের ভিতর প্রোথিত থাকিলে পচিয়া যায়; এবং উপর্য্যুপরি চাপ পাইয়া পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হয়। অবস্থার বিপর্য্যয়ে চাপে পড়িলে কাহার (অঙ্গারবৎ) কিরূপ পরিণতি ঘটে, কে বলিতে পারে?

খনিজ কয়লার সাধারণ ইংরাজী নাম কোল। কোল দুই প্রকার; ব্রাউন কোল (Lignite) এবং ব্ল্যাক কোল বা ষ্টোন কোল অর্থাৎ পাথুরিয়া কয়লা (Anthracite)। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্রাউন কোল হইতে অনেক বেশী। পাথুরিয়া কয়লাকে আমরা ষ্টীম কোল বলিয়া থাকি। ইহা বয়লারের জ্বালে ব্যবহৃত হয়। ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেলে "রাবল" বলা যায়। রাবল ইট পোড়াইবার জন্য পাঁজায় ব্যবহৃত হয়। একেবারে ধূলার ন্যায় গুঁড়া হইয়া গেলে, নাম হয় ডাষ্ট্‌। এ জেলার খাদের কুলিরা কোল ও রাবলকে 'কয়লা' এবং গুঁড়া ও ধূলাকে 'ময়লা' বলিয়া থাকে। ষ্টীম কোল অল্প পোড়াইয়া নিস্তেজ করিলে কোক্‌ প্রস্তুত হয়। ইহাই আমাদের রন্ধনের ইন্ধন। ইহার নাম-নরম কোক। আর এক প্রকার আছে, হার্ড বা শক্ত কোক। ষ্টীম-কোলের গুঁড়া ও জলমিশ্রিত করিয়া চাপ দিয়া, ভাঁটীতে উত্তাপ দিলে, হার্ড কোক প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা লোহা প্রভৃতি শক্ত ধাতু গলাইতে পারা যায়। সংসারে ছোট বড়, নরম গরম সকল রকম জিনিষ ও মানুষেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। পাথুরিয়া কয়লা হইতে আল্‌-কাতরা প্রস্তুত হয়। আর অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও বিস্বাদ পদার্থ হইতে মেজেণ্টা

নামক উৎকৃষ্ট লাল রঙ্ এবং এক প্রকার চিনিও তৈয়ার হয়।

মাটি খুঁড়িলেই কয়লা পাওয়া যায় না। এদেশে প্রথমে বেলে মাটী, তার নীচে বেলে পাথর, তার তলায় নরম পাথর, তার পর কয়লা—ভূপৃষ্ঠ হইতে হইতে ৩০ ফিট ও ১০০০ ফিটের মধ্যে এবং তন্নিম্নে। কয়লার স্তর দৈর্ঘ্যে বিশ পঁচিশ মাইল জায়গা যুড়িয়া রহিয়াছে; কোথাও ৫০ হাত—কোথাও হয় তো ৩ হাত মাত্র পুরু। স্তরের ইংরাজী নাম সিম। তোমার জমির তলা দিয়া সিম চলিয়া গিয়াছে কি না, তাহা তুমি বোরিং করিয়া জানিতে পার। খুব গভীর বোরিং করিতে হইলে কলের আবশ্যক। একরূপ কলের নাম ডায়মণ্ড ড্রিল বোরিং। কলের মুখে এক খণ্ড হীরক থাকে। কল ইস্ক্রুপের মত ঘুরিতে ঘুরিতে পাথর থাকিলেও তাহা ছেঁদা করিয়া পাতালে প্রবেশ করিতে থাকে। তার পর অন্য যন্ত্রের প্রয়োগে অস্তি নাস্তি বুঝিতে পারা যায়। যথেষ্ট কয়লা সাব্যস্ত হইলে, জমিদারের সঙ্গে লেখাপড়া কর এবং কলকব্জা আনিয়া খাদ কাটিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে কয়লা উত্তোলন করিতে থাক। কোনও মৌজায় জমিদারের অধীন মৌরসি মোকররি পাট্টাদার থাকিলে নিম্নস্থ খনিজ স্বত্ব তাঁহার, এইরূপ অনুমান (legal presumption) এতকাল চলিয়া আসিয়াছিল। সম্প্রতি প্রিভি কাউন্সিল ঘোষণা করিয়াছেন, ঐরূপ অনুমান জমিদারের স্বপক্ষে হইবে। শ্রীরাম বনাম হরিনারায়ণ, ১৪ সি-ডবলিউ-এন্; পৃঃ ৭৪৬ এবং ১৬ সি-ডবলিউ-এন্, পৃঃ ২৪১ (১৯১১-১২)। এই চূড়ান্ত নূতন নজিরের আবির্ভাবে অনেক মোকররদারী মালিক প্রমাদ গণিতেছেন।

রাণীগঞ্জে কয়লার খনি; আর "গোলকুণ্ডা প্রদেশেতে হীরার আকর" পদ্যপাঠে পড়িয়াছি। সমুদ্র-মন্থনে যত মণি-মুক্তা-জহরত পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সমস্ত কেবল পিতামহ ব্রহ্মা ব্যতীত আর সকল দেবতা, অসুরদের ভয়ে কোনও কুণ্ডের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের খনিত কুণ্ডটি কূপের মত গোলাকার ছিল। তাই নাম গোলকুণ্ডা —এখন সেই কুণ্ডে কিছুই নাই; একেবারে গোলাকার ০ শূন্য। মণিমুক্তা-হীরা চুণি-পান্না যা ছিল, সবই অসুরেরা সন্ধান পাইয়া লইয়া গিয়াছে; আর কিছু নিজাম-বাহাদুরের তোষাখানায় মওজুদ আছে। ব্রহ্মা তাঁহার নিজ অংশে প্রাপ্ত রত্নগুলি স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য তখন তিব্বতের মানস সরোবর রাজধানী হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এত দিনে সেই লুপ্তরত্নেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং ব্রহ্মদেশে মণির খনির কার্য্য চলিতেছে। পুনশ্চ, কৈলাস-শিখর মধ্যে যত ধাতু মহাদেবের ছিল, তন্মধ্যে লৌহ ও স্বর্ণ পরস্পর বিবাদ করিয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। সোণা মান্দ্রাজের অন্তর্গত—অনন্তপুর জেলায় এবং লোহা ছোটনাগপুরের অন্তঃপাতী সিংহভূমের বিবরে লুক্কায়িত আছে।

রাণীগঞ্জের খনি হইতে ১৮৩৯ সনে ৩৬ হাজার টন কয়লা উত্থিত হইয়াছিল। ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি। ১৮১৩ সনে ৩৯ লক্ষ টন কয়লা উঠে। গত বৎসর ১৯১৪ সনে ৪৪ লক্ষ ১১ হাজার ১০৯ টন কয়লা রাণীগঞ্জের ভূগর্ভ পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহার মূল্য ১৬ কোটী, ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ১১৯ টাকা! গত বৎসর এখানে গড়ে দৈনিক ৩৮,৯৫৬ জন কুলি খাদের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে স্ত্রীলোক বা 'কামিন' ১৩,১৮২ ও বালকবালিকা ৪৯৬। বর্ত্তমান ১৯১৫ সনের প্রারম্ভে রাণীগঞ্জ বা আসানসোল মহকুমায় মোট কোলিয়ারির সংখ্যা ১৬৫ আছে। প্রত্যেক কোলিয়ারিতে অনেকগুলি পিট বা খাদ থাকে। সুতরাং খাদের সংখ্যা বহু শত। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমৃদ্ধ দুইটি কোলিয়ারির নাম চরণপুর (আপকার কোং) এবং দিশেরগড় (ইকুইটেবল কোল কোং)। পাতালে দিন রাত দুইই সমান। কুলিদিগকে লণ্ঠন বা কেরোসিনের ডিবা লইয়া পালী ক্রমে দিবারাত্রি কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু চরণপুর ও দিশেরগড়ে ইলেকট্রিক লাইটের বন্দোবস্ত আছে। কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ণেল আগাবেগ সাহেবের আমন্ত্রণে গত বৎসর বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল চরণপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট উড্‌বার্ণ বাহাদুর দিশেরগড়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া ছিলেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমরা দিশেরগড়ের খনি দেখিতে গিয়াছিলাম। এই স্থান দামোদর নদীর তীরে, বরাকর ষ্টেশন হইতে তিন চারি মাইল দক্ষিণে। অদূরে পঞ্চকোটের পর্ব্বতমালা। কয়লা-কর সাহেবদের রমণীয় অট্টালিকা। দৃশ্য অতি মনোহর। সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট মহাশয় কৃপা

পূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে জনৈক সাহেব কর্ম্মচারী (গাইড) দিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ আমাদের কয়লা তোলার কার্য্য দেখাইতে চলিলেন।

পিটের মুখে উচ্চ পাকা প্লাটফরম। ঊর্দ্ধ হইতে 'কেজ' ঝুলান আছে। কেজ বা পিঞ্জরকে কুলিরা ডুলি বলিয়া থাকে। এঞ্জিনের সাহায্যে ডুলিতে করিয়া কয়লার টব উপরে তোলা হয়। ইহার নাম সাফ্‌ট (Shaft) বা চাণক-খাদ। কয়লার এঞ্জিনগুলি খুব বৃহৎ দেখিলাম। চিমনি-গুলি অন্যত্র ৩০ বা ৪০ ফিট উচ্চ; এখানে ৩০০ হইতে ৫০০ ফিট উচ্চ। ডুলি দুইটা থাকে। একটা কয়লা-পূর্ণ টব উপরে উঠিলে অন্যটা সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া যায়। এই দ্বিতীয়টা হইতে কয়লা পূর্ব্বে প্লাটফর্ম্মের নীচে ঢালিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেজ বা ডুলি উঠা-নামা করিবার জন্য উপরে ও নীচে দুইজন লোক নিযুক্ত থাকে। ইহাদের নাম হুকম্যান। বলা বাহুল্য, কেজ দ্বারা লোকজনও ভূতল ও পাতালে যাতায়াত করে। হুকম্যানদের মধ্যে পরস্পর পূর্ব্বে সিগ্‌ন্যাল দিয়া কার্য্য করার নিয়ম ছিল; নতুবা বিপদের সম্ভাবনা। লেভার ধরিয়া টানিলেই হ্যামারে ঘা পড়িয়া ঢং ঢং শব্দ হয়। এক ঘা দিলে—থাম, দুই ঘা দিলে—ধীরে ধীরে নামাও ইত্যাদি সঙ্কেত। যখন লোক নামিতে যাইতেছে, তখন উপরের হুকম্যান (Banksman) নীচের হুকম্যানকে সঙ্কেত করিবে, হ্যামারে ৩ ঘা। তাহার জবাবে নীচের হুকম্যান (Onsetter) সঙ্কেত করিবে, ঐরূপ ৩ ঘা, অর্থাৎ আমি হুসিয়ার আছি।

কুলিরা দলবদ্ধ হইয়া কাজ করে। এক এক দলে পাঁচ ছয় জন কুলি। এক দল এক দিনে ৪০ টব বা ২০ টন কয়লা কাটিতে ও তুলিতে পারে। কয়লার প্রতি টবে ।০ আনা হইতে ।/০ আনা এবং ডাষ্ট বা ময়লার প্রতি টবে ৵০ হইতে ৵১০ মজুরি পাইয়া থাকে। মজুরি সর্ব্বত্রই সমান। ছোট খাদে সুবিধা, পাতাল গভীর নয়। বড় খাদের সুবিধা পাতালে ট্রাম লাইন আছে, কয়লার টব
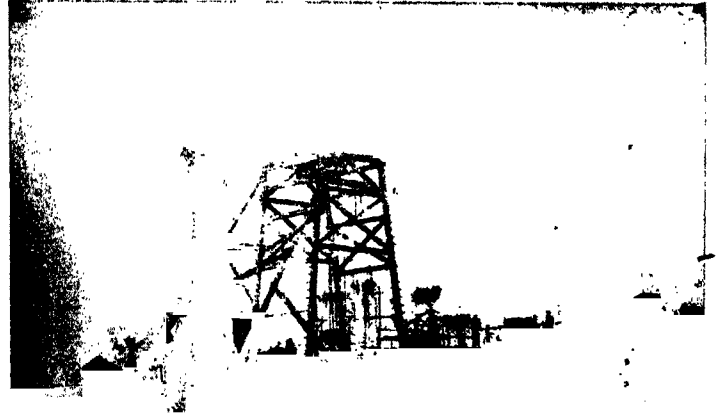
দিশেরগড় ইকুই টেবল কোংর চাণক খাদ

ঠেলিয়া নীচে হুকম্যানের নিকট আনা যায়। চরণপুর ও দিশেরগড়ের বৈদ্যুতিক আলোকের আকর্ষণী শক্তি আছে বটে; কিন্তু অন্যত্র আকর্ষণ এই যে, কুলিরা প্রতি টবে এক ছটাক কেরোসিন তৈল (অর্থাৎ তাহার দাম) লণ্ঠন বা ডিবার জন্য পাইয়া থাকে; তাহাতে লাভ থাকে।

কোন্ দল কত টব কয়লা উঠায়, তাহার হিসাব আছে। নীচে হুকম্যানের কাছে একজন সরকার থাকে। এক একটি টব উপরে উঠিয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সে একখানি পেনসিলে লেখা এক খণ্ড কাগজ দলের সরদারকে দেয়। এই কাগজখণ্ডগুলি কুলিদের ভাউচার। উপরে উঠিলে অমনি উপরের হুকম্যান হাঁক দেয়—"কয়লা রে!"; ডাষ্ট হইলে হাঁকে—"ময়লা রে!" হাঁক শুনিয়া এঞ্জিন ঘরের খালাসী (বা অন্য কেহ) শ্লেটে খড়িমাটির রেখা টানিয়া কয়লা ও ময়লার মোট হিসাব রাখে। এক দলে ৫।৬ জন লোক থাকিলে, তাহারা প্রতি দিন ৪০ টব বা ২০ টন (৫৪০ মণ) কয়লা ও ময়লা তুলিতে পারে। প্রতিদিন কাজ করা অসম্ভব। কুলিরা এক দিন অন্তর এক দিন কাজ করে। যাহারা পরিশ্রমী, তাহারা আহারান্তে বিকাল বেলা খাদে নামে ও পরদিন দুপ্রহরে উঠিয়া আসে। কিছু খাবার সঙ্গেই থাকে। তারপর এক দিন বিশ্রামের জন্য কামাই দেয়। এইরূপ ১৫ দিন কাজ করিলে একজন

কুলি মাসে ১৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। কাজ কঠিন, সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ অনিশ্চিত। সম্প্রতি, এক মাস হইল, গবর্ণমেণ্ট ইহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য আসানসোলে "খনির স্বাস্থ্য-সমিতি" (Mines Board of Health) স্থাপন করিয়াছেন। কুলিরা তাহাদের মজুরির টাকা প্রতি দিন অথবা সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট দিনে পাইয়া থাকে। কিন্তু যাহা রোজগার, তাহার বেশী ভাগ পাচুইমদের দোকানে শুঁড়ির পায়ে ঢালিয়া দেয়। এত খাটুনির পর মদ চাই। কুলিদের থাকিবার জন্য খাদের কর্ত্তারা অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়; সেই বস্তিকে স্থানীয় ভাষায় ধাওড়া কহে। প্রায় প্রত্যেক ধাওড়ার কাছেই পাচুই মদের দোকান আছে।

পাচুই মদের দোকান

বৰ্দ্ধমান জেলায় এক পাচুই মদের দোকান হইতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আবগারী আয় নেহাৎ কম নয়! গত বৎসর ছিল ৪,৪০,৪৪৮৲ টাকা; এ বৎসরের বন্দোবস্তে বর্ত্তমান এপ্রিল হইতে হইল—৪,৭০,৪৯৬৲ টাকা; ইহার মধ্যে এক আসান্সোল্ মহকুমার কয়লার ক্ষেত্র হইতে ৩,৫২,২০৬৲ টাকা!—ভাবিবার বিষয় বটে!

এই জেলায় এক অতি নিম্ন জাতি আছে, নাম বাউরি। বাউরিদের কয়লার খাদে কাজ করা একরূপ জাতীয় ব্যবসায়। ইহারা ও সাঁওতালেরা স্ত্রী-পুরুষে খাদে কাজ করিয়া থাকে এবং উভয়ই পাচুই মদের বিশেষ ভক্ত। অনেকে এক বেলা ভাতের বদলে পাচুই মদ দ্বারা উদর পূর্ণ করে। পাচুই ঘরে তৈয়ার করা অতি সহজ হইলেও উহা আইনে নিষিদ্ধ। যত পার কিনিয়া খাও— তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু খবরদার জিনিষটা নিজ ঘরে প্রস্তুত করিও না। মূর্খ সাঁওতালেরা আইন বোঝে না। ধরা পড়িলে প্রত্যেকের অন্যূন ২০৲ হইতে ৩০৲ পর্য্যন্ত বা তদূর্দ্ধ জরিমাণার আদেশ হয়। এই জরিমাণার টাকা খাদের কর্ত্তারা তৎক্ষণাৎ নিজ হইতে দিয়া, উহাদের কারখানা হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। ফলে বেচারাদের পাতাল-বাস হইতে উদ্ধার নাই। বাউরি ও সাঁওতাল ছাড়া খনির কার্য্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিহার প্রদেশ হইতে দলে দলে দোসাদ, রাজোয়াড়, ভুইঞা প্রভৃতি ইতর জাতির আমদানি হইতেছে। তাহাদের মধ্যে দাগী বদমাইস 'সি ক্লাসের' বিশেষ প্রাচুর্য্য। ইহাদের জন্য আসানসোলের পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের অতিরিক্ত ভাবনা ভাবিতে হয়।

সাফ্‌ট্ (Shaft) পিট বা চাণক-খাদ দেখার পর আমরা 'ইন্‌ক্লাইন পিট' সিঁড়ি-খাদ দেখিতে চলিলাম। ইহাতে নীচে নামিবার জন্য কেজ নাই; গর্ত্তের ভিতর ঢালু পথে হাঁটিয়া নামা যায়। সাহেব বলিলেন, 'ভিতরে নামিবেন কি?' 'হানি কি, যখন এসেছি, তখন একটু দেখা যাক', এই বলিয়া সাহেবকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমরা বিবরে প্রবেশ করিলাম। খাদের মুখ হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত দিনের আলো; তারপর অন্ধকার—ঘোর ও ঘোরতর। সেদিন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইলেক্‌ট্রিক কলের একটা স্ক্রু কোথায় একটু আলগা হইয়া যাওয়াতে বিজলি নিমিয়া গিয়াছিল। পথপ্রদর্শক সাহেবের হাতে লণ্ঠন। পাতালপথের দুই পার্শ্বের প্রাচীর বরাবর পাথর দিয়া গাঁথা। মাঝে মাঝে দুই ধারে বায়ুপ্রবাহের দরজা আছে। সাহেব চলিতে চলিতে প্রত্যেক দরজায় গিয়া ভেণ্টিলেশন বা বায়ু-প্রবাহের তত্ত্ব সমঝাইতে লাগিলেন। Up-cast কাহাকে বলে, down cast কি, ইত্যাদি। আমাদের সে কথায়
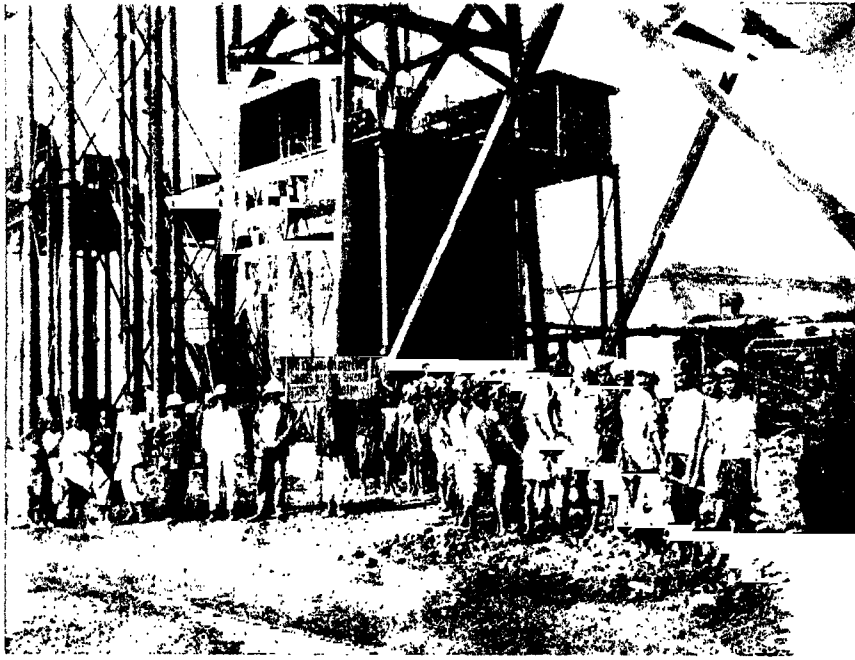
দিশের গড় কোলিয়ারি, ভেণ্টিলেটার বা বায়ু-প্রবাহক যন্ত্র

মন নাই। মনের বিবরে বিষম ভাবনা প্রবেশ করিয়াছে; কারণ, অন্ধকারে ঢালু পথে বহুদূর নামিয়া আসিয়াছি। আমাদের মনেও ঘন ঘন শ্বাসবায়ু বহমান, সুতরাং ভেণ্টিলেশন তত্ত্ব বুঝিতে বাকী ছিল না। এই আঁধারে পৃথিবী ছাড়িয়া পাতালের পথে মহীরাবণের রাজ্যে কোথায় যাইতেছি; আবার ভালোয় ভালোয় দেহটি লইয়া ফিরিতে পারিব তো! পথ আর ফুরায় না। যখন এই ইনক্লাইনের পথে আবার উজান উঠিতে হইবে, তখন কি উপায় হইবে! সাহেবের কথা ছাড়িয়া দাও; তিনি তো বলিরাজা ও মহীরাবণের পাইক। তাহার উপর তিনি মালকোছা-পরা ষণ্ডা মানুষ। মাল-কোছা বলিলাম, কারণ তাঁহার প্যাণ্টের নিম্নসীমা হাঁটুর অনেক উপরে। আর সঙ্গে আছেন—থানার দারোগা। পাতালের অন্ধকারে তাঁহার সে রৌদ্রমূর্ত্তি ও ডাকহাঁক নাই; ভয়ে নীরব। তাঁহার এলাকা মাটির উপরে। এইরূপ ক্রমাগত সোজাসুজি দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিলে পর ইনক্লাইন শেষ হইল, ও কতকগুলি কুলির সঙ্গে দেখা হইল। "না সাহেব, দাঁড়াও, আর পারিব না"—এই বলিয়া, কুলিদের কয়েকটা ঝুড়ি উবুড় করিয়া, তাহার উপর আমরা সকলে বসিয়া পড়িলাম। বেশ ঠাণ্ডা স্থান; বোধ হইল, যেন দেওয়ালের ফাটল দিয়া ঝির ঝির বাতাস বহিতেছে। কিন্তু কোথা হইতে বাতাস আসিতেছে, তাহা ঠিক মস্তকঙ্গম করা কঠিন। দেয়ালের গা দিয়া অল্প অল্প জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

আমরা যে স্থানে বসিয়াছি, সে স্থান হইতে ভূপৃষ্ঠ প্রায় তিন পোয়া মাইল উৰ্দ্ধে! ঘরবাড়ী, শস্যক্ষেত্র, পুকুর এবং এতটা-পাতাল আমাদের মাথার উপর, এই গুরু ভাবনার ভারে মাথা প্রপীড়িত হইতে লাগিল।

কুলিদের সঙ্গে অনেক হাসির কথা হইল। ইহাদের কালিমাথা মুখে অন্ধকারে দন্তবিকাশ অতি সুন্দর। একে অঙ্গ কালো, তার উপর কয়লার কাজ, সুতরাং কুলি নামটি ইহাদের কুলোচিতই হইয়াছে। আমাদের উপবেশন-স্থল হইতে কয়লার সিমের গতি অনুসারে দুই তিন দিকে রাস্তা (গ্যালারি) চলিয়াছে। এই রাস্তার চলিত নাম সুঁদ। সকলই ১০।১২ ফিট প্রশস্ত দেখিলাম। সুঁদেরও শাখা-প্রশাখা বা গলি আছে। সুঁদগুলিতে ট্রাম লাইন বসানো আছে। টব গাড়ীতে কয়লা বোঝাই করিয়া, ট্রাম লাইনে ঠেলিয়া, এক কেন্দ্রস্থানে আনা হয়। কেন্দ্রস্থানে আসিলে চাণক আছে, কেজ বা ডুলিদ্বারা উৰ্দ্ধে তোলা

হয়; এবং ইনক্লাইন খাদে ইন্‌ক্লাইন রাস্তার ট্রাম লাইনে ইঞ্জিন দ্বারা টানিয়া তোলা হয়। শুনিয়াছি, গিরিধির নিকট কড়ারবাড়ী খাদে পাতালে ঘোড়া দ্বারা ট্রামগাড়ী টানা হইয়া থাকে।

দিশের গড় কোলিয়ারির অন্য দৃশ্য

সাহেব আমাদের অনেক সুঁদ ও গলিতে ঘুরাইয়া নানারকম সিম দেখাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পিলার বা স্তম্ভ আছে, ছাদ ভাঙ্গিয়া না পড়ে, এই জন্য। ভূগর্ভের উত্তাপবশতঃ অনেক সময় স্তরের সমতল ভঙ্গ হয়। ইহার নাম ফল্ট। রাণীগঞ্জ ও ঝড়িয়ার ক্ষেত্রে সিমের গতি প্রায়শঃ উত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ঢালুভাবে ধাবমান। বিশেষজ্ঞেরা Fault দেখিয়া, কোন্‌দিকে খুঁড়িতে হইবে, তাহা নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে পারেন। সর্ব্ব উর্দ্ধস্তরের নাম আউট ক্রপ (Outcrop)।

কয়লার খনিতে বিপদ্‌ কালে উদ্ধার দলীদের নিশ্বাস যন্ত্র

আমাদের গাইড সাহেবের পকেটে থাবার ছিল। তিনি জলযোগ করিলেন। এমন স্থলে আহার শ্লাঘা বটে। ঘড়িতে দেখিলাম, প্রায় ১১টা; আমাদের তখনও সন্ধ্যা-আহ্নিক হয় নাই। সাহেব চুরুট ধরিলেন না, বলিলেন—ধূমপান বিপজ্জনক। শুনিলাম, গত ১৯১৩ সনের ২০এ অক্টোবর এই দিশের গড়ের সংলগ্ন চৌড়াশীর খাদে এক লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়াছিল। কোম্পাস-বাবু (সার্ভেয়ার) পাতালে গিয়া দিয়াশলাই কাঠি জ্বালাইয়াছিলেন। সেখানে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন ছিল। তৎক্ষণাৎ উপর্য্যুপরি—সাত আটবার কামানের মত গভীর গর্জ্জন, ২৭ জন নরনারীর জীবন্ত সমাধি বহির্জগতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল।

আর শুনিবার বাসনা রহিল না। ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম। সাহেবকে তাড়া দিলাম। তিনি আমাদিগকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অন্য এক ইনক্লাইন পথে লইয়া চলিলেন এবং হাঁটিয়া উপরে উঠিতে হইবে না, পরম ভরসা প্রদান করিয়া, আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, বড় বড় খাদে আগম-নির্গমের অনেকগুলি মুখ বা দ্বার থাকে। এবার কয়লার টবের গাড়ীতে বসিয়া, ট্রামে চড়িয়া, আমরা অর্দ্ধপথ উপরে উঠিলাম। তারপর সেই

কেজ বা ডুলি। কেজে উঠিয়া রেলিং শক্ত করিয়া ধরিলাম, চোখ বুঝিলাম। এক মিনিট কাল ;ঝমঝম বিষম খট খট বিকট আওয়াজ—উপরে উঠিতেছি কি নীচে নামিতেছি, বুঝিবার সাধ্য নাই। হঠাৎ উপরে আসিলাম। পৃথিবীর মুক্তবায়ু ও সূর্য্যের আলোক পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। চৌড়াশীর খাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। আর সেদিন গৃহে আসিয়া যে, গরম জলে ও সাবানের অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। *

* যাঁহারা কয়লার খনির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পিপাসু, তাঁহারা নিম্নোক্ত গ্রন্থপাঠ করিলে তৃপ্ত হইতে পারিবেন। "MODERN MINING PRACTICE"—by George Bailes; 'LUPTON'S MINING"; "A TEXSTBOOK OF COAL MINING"—by H. W. HUGHES.—লেখক।

আদিনাথে

[শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ]

কানন-কোলের কুচোপাতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চূর্ণ করি'
সায়ংকালীন রক্ত-আকাশ-খণ্ড,
ফিরোজা রং মেঘের রথে সন্ধ্যাতারার চিবুক ধরি'
চুম্বি' তাহার লজ্জা-লোহিত গণ্ড,
শৈল-পাদপ-অন্তরালে চক্রবালের প্রান্তরেখায়
সূর্য্য যখন অস্ত-অচল-লগ্ন—
আদিনাথের শৈলসোপান অতিক্রমি' উঠ্‌ছি মোরা
দিবা-শেষের স্বপন মোহে মগ্ন।
লজ্জাবতী-লতার সারি সোপান-শ্রেণীর উভয় পাশে—
হিল্লোলিত সরস সবুজ কান্তি,
স-সঙ্কোচে লুটিয়ে পড়ে যেন মানব-পরশ-ত্রাসে
ক্ষুব্ধ পাছে হয় বা তাদের শান্তি।
সতর্কিত চরণ-পাতে উত্তরিয়া প্রবেশ-তোরণ,
ধীরে গো তাই এলাম গিরির বক্ষে ;
পূরব সীমার নয়ন-রমা দোপাটী ও গাঁদার শোভা
পরক্ষণেই উঠ্‌লো দুলে চক্ষে।
ধূসর হ'য়ে আস্‌ছে ধরা ; দাঁড়িয়ে আছি সাগর-কূলে ;
শারদ-সাঁজে সিন্ধু-সমীর ঘটায় মলয়-ভ্রান্তি,
বঙ্গ সাগর শিশুর সিত হাস্য-ফেণায় পড়্‌ছে খুলে
উর্ম্মিভঙ্গ-সমুদ্গত শেফালি-শ্বেত কান্তি ;
নির্ব্বাপিত অপর পারের ঘোমটা-ঘেরা দীপ্তি-আভাষ
অন্ধকারের গম্ভীরতায় ক্ষুব্ধ সাগর-শব্দ—
ভুলে যা' মন সকল স্মৃতি, ভুলে যা' সব ভাবনা-ভীতি
বুক পাতি' এই আঁধার তটে দাঁড়িয়ে বিনিস্তব্ধ।
মর্ম্মপুরীর রাগিণী কোন্ পূরবীতে আকার লভি'
সুরের ফাঁসে জড়িয়ে আনে দৃশ্য এবং দৃষ্টি !
কল্লোলেতে হিল্লোলিয়া তারার ফুলে যায় যে ঝরি,
বুকের ভিতর কর্ত্তে কে চায় নূতন ভুবন সৃষ্টি !
খদ্যোতিকরে হীরক-জ্বলা বৃক্ষরাজির প্রাণের কথা
শুনতে শাখা-মর্ম্মরে আজ পাত্‌বো কেন কর্ণ !
সিন্ধু যে গায় আমার গীতি, ভুবন যে মোর শ্যামল প্রীতি
আকাশ যে মোর ভালবাসার স্বচ্ছ-সুনীল বর্ণ !

ছড়িয়ে গেল চন্দ্রকিরণ ঝিনুক-ঝরা বালুর তটে
উদ্ভাসিয়া অন্তরে মোর স্নিগ্ধ-মধুর চন্দ্রা,
গড়িয়ে গেল জ্যোৎস্নাধারা উর্ম্মি-আকুল সাগর-পটে
জড়িয়ে গেল চোখের পাতায় সব-ডুবানো তন্দ্রা !
কোথায় গোপন চাঁদের কোলে লুকিয়ে ছিল কনক-পরী,
রূপের প্রভায় উথ্‌লে দিলে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য !
সাগর-কূলের সন্ধ্যা আমার ! তৃপ্ত আমি দীপ্ত দেখি
স্বর্ণকাঠি স্পর্শে তোর এই দুঃখ-মলিন বিশ্ব।
লঙ্ঘি' পাহাড়, লঙ্ঘি সাগর, স্বার্থতৃষার রাজ্য পার
স্বার্থভরা এই দ্বীপে আজ দাঁড়িয়ে থানিক মৌন,
রুক্ষ কথার দুঃখ ব্যথায় ফিরতে হৃদয় চায় না যে আর,
বিরোধ তবু মুখ্য ধরায় প্রণয় যে হায় গৌণ !
শৈলচূড়ায় ঘণ্টা বাজে অষ্টভুজায় সন্ধ্যারতির
যা হয় হবে, বিদায় তবে সিন্ধুকূলের দৃশ্য !
তোদের ছবি রইলো' গাঁথা আমার মনের চিত্রশালায়,
দীক্ষা লভি' মন্ত্রে নবীন চল্‌লো তোদের শিষ্য।
জাগো,জাগো বন্ধুরা মোর, ঘুমিয়োনা আর ফুরিয়ে যে যায়,
সাগর-কূলের আর-পাবো-না রাত্রি !
এমন বিজন সাগর-তীরে আজ যদি রাত জেগেই পোহায়
ধন্য হব একটি নিশার যাত্রী।
বিরাম-হারা-তরঙ্গ-গান-সম্মিলিত-ঝিল্লীতানের
প্রাণের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে চিত্ত,
ঘুমন্ত এই চন্দ্রিকাতে কোথায় পাব এমন করে
স্বাতন্ত্র্য মোর ভাসিয়ে দিতে, নিত্য ?
শেষ-যামিনীর অন্ধকারে জ্যোৎস্নাবশেষ মিলিয়ে যে যায়
আর কেন দীপ জ্বালিস্ আলোক-ভক্ত ?
একটু পরেই দেখ্‌তে পাবি পূর্ব্বাকাশের রেখায় রেখায়
গড়িয়ে পড়ে আঁধার-বলির রক্ত !
নয়ন মাজি ওঠরে সাজি' শেষ বিদায়ের সময় এ'ল,
ফিরতে হবে—ফিরতে হবে সদ্য :—
স্মৃতির থলি লুকিয়ে বুকে, শয্যা তুলি' কাব্য-শেষে
বরণ করে নিতেই হবে গদ্য।

নিবেদিতা

[শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, M. A.]

(২৯)

সার্ব্বভৌম-গৃহিণীর দর্শন-লাভের পর হইতে গণেশখুড়া যে সকল দৃষ্ট ঘটনার কথা আমাকে বলিয়াছে, আজি-কালিকার বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত যুগে বর্ত্তমান ব্যাবহারিক সত্যের সঙ্গে সে গুলার সামঞ্জস্য করা যায় না; এইজন্য সেগুলার বর্ণনা হইতে আমি যথাসম্ভব বিরত হইলাম।

তবে একটা কথা বলিবার প্রলোভন আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সেটি দাক্ষায়ণী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ব্রতের কথা। কহিলে অনেক শিক্ষিত-শিক্ষিতার কাছে ইহা অবিশ্বাস্য বোধ হইতে পারে। এমন কি, হিন্দুর কুসংস্কার-দলনী বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যার সম্মুখে এরূপ একটা আজগুবি ব্রতের নামোল্লেখ তাঁহাদের অপ্রীতিকর হইতে পারে। তথাপি বলিব—হিন্দুর —বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর—অন্তরের পূর্ব্বকথার সঙ্গে সুর মিলাইয়া কথা কহিতে হইলে এরূপ ব্রতের কথাটা উত্থাপন করিবার লোভ সম্বরণ করা যায় না।

এ দাক্ষায়ণী-সংবাদের শুধু যে শ্রোতাই আছেন, এমন ত নয়—অনেক শ্রোত্রীও গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে বক্তার অলক্ষ্যে কাণ পাতিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিতার ভাগ অপেক্ষা অৰ্দ্ধ-শিক্ষিতার ভাগই অধিক। অর্দ্ধশিক্ষিতাই বা বলি কেন, তাঁহাদের মধ্যে পোনেরো আনাই পাই কড়া-ক্রান্তি শিক্ষিতা।

যিনি পূর্ণশিক্ষিতা তাঁহাকে এ ব্রতের কথা শুনাইবার প্রয়োজন নাই। কেন না তিনি নিজের চিত্তেই সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিখেন নাই। কোন্ সাহসে পরের কথায় তাঁহার আস্থা স্থাপন করাইব? একথা আমি বলিতেছি না। বলিয়াছেন যিনি, তিনি মহাকবি। তিনি সরলপ্রাণে স্বীকার করিয়াছেন—"বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ"—শিক্ষিত সকলকেই বুঝাইতে পারেন; পারেন না কেবল নিজেকে। তিনি বলেন—"আমি জানি" ইহার অর্থ, তিনি সমস্তই জানেন; কেবল তিনি যে জানেন না, এইটি তিনি জানেন না।

একথাও আমি কহিতেছি না। ঋষিগুরু তাঁহার শিষ্যকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ-দানকালে বলিয়াছিলেন—"যিনি বলেন, আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তুমি জানিবে, তিনি ব্রহ্মকে জানেন নাই।"

এই বিচিত্র উপদেশ শুনিয়া শিষ্য কিয়ৎক্ষণের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। চিন্তান্তে উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে মনে করিয়া যেই শিষ্য উত্তর করিল—"গুরুদেব! আমি বুঝিয়াছি।" গুরু উত্তর করিলেন—"তাহা হইলেই তুমি বুঝ নাই।"

সুতরাং শিক্ষিতাকে এ ব্রতের কথা আমি শুনাইবার ধৃষ্টতা করিতেছি না। আমি শুনাইতেছি তাহাদের, প্রতীচ্য শিক্ষার ক্ষীণাভাষে যাহাদের একূল ওকূল—দুকূল গিয়াছে। প্রতীচ্যশিক্ষা নিজের গুণগুলি কম্বলে ঢাকিয়া, নিছাঁক দোষটুকু যাহাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারা শুধু চিঠি লিখিবার মত লিখিতে জানে, আর উপন্যাস পড়িবার মত পড়িতে জানে। আর জানে—কর্ম্মস্থল হইতে দিনান্তে গৃহপ্রত্যাগত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, অনর্থতপ্ত স্বামীকে ভোগবিলাসিতার আবেদন লইয়া উত্ত্যক্ত ও অবসন্ন করিতে। আর জানে—থাক্—সে মর্ম্মভেদী কথা কহিব না। আগে হইতেই কিঞ্জল্ক-কোমল দেহের পূতিগন্ধে বাংলার বায়ুমণ্ডল ভরিয়া গিয়াছে।

এই তথাকথিত শিক্ষিতা ও নিরক্ষরা লইয়াই বাংলার রমণী। তাহাদের তুলনায় সুশিক্ষিতার সংখ্যা এত অল্প যে, দশমিকে পরিণত করিলে, বিন্দুর পরের শূন্যগুলা কলিকাতা হইতে বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

পূর্ব্বে ইঁহাদেরই বঙ্গের গৃহলক্ষ্মী অভিধান ছিল। শান্তি নিত্য ইঁহাদের বসনাঞ্চলে বাঁধা থাকিত। সুখে ঔদাসীন্য,

দুঃখে ভগবন্নির্ভরতা—সর্ব্বকালীন আনন্দের আভাষে ইঁহাদের অধিষ্ঠিত আশ্রম মর্ত্তে দেবনিলয়ের প্রতিরূপ ছিল।

এখন ত্রিশঙ্কুর ন্যায় ইঁহারা উভয়লোক হইতে বিভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই সুশিক্ষিতা—দশমিকের অগণ্যশূন্যের পরে এক—তিনিই কেবল এই অদ্ভুত ব্রতের কথা শুনিয়া,—"নব গোধূলি সময় বেলি", মন্দির হইতে বিচিত্র যানারোহণে কলিকাতার রাজপথে বাহির হইয়া, কখন পতিপার্শ্বগতা, কখন বা একাকিনী, করধৃত অশ্ববল্গায় কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার সারথ্যকেও পরাভূত করিয়া, আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন; তিনিই কেবল—"নবজলধর বিজরীরেখা দ্বন্দ্ব পসারিয়া", বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মীর ব্রতের উপর রহস্য ইঙ্গিত করিয়া, চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু সেই একের নিম্নের, কলিকাতা হইতে হিমালয়-পাদমূলপর্য্যন্ত প্রবাহিত অগণ্য "নয়"—সেই নবালোকগতা, কিন্তু বাস্তবিক ঘনতর-তিমিরগ্রস্তা বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বের জননী আমাদের মাতৃ-কুল? তাঁহারা বহুদিন হইতে এই প্রতীচ্যভাবসাগরের তীরে বসিয়া, কেবল লবণাক্ত তরঙ্গ-প্রহারেই পরিতৃপ্ত হইতেছেন; আজিও পর্য্যন্ত একটিও রত্ন তুলিতে পারেন নাই। লাভের মধ্যে তাঁহাদের সমাজবিদ্যালয়ের প্রথম পাঠ্যপুস্তক ব্রতপূজা ভুলিয়াছে—সঙ্কল্পচ্যুত হইয়াছে। মহাফলানিবৃত্তির মন্ত্র আর তাঁহাদের মনে নাই। আজ একটু সাহস করিয়া তাঁহাদিগকে এই ব্রতের কথা শুনাইব।

এই অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া প্রচারিত উচ্চশিক্ষা তাঁহারা শিখেন নাই—আর শিখিবেন না। তাহার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—আর যে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। তখন তাঁহাদের যুগযুগান্ত হইতে বংশানুক্রমিক আগত সম্পত্তি হইতে তাঁহারা অকারণ অধিকারচ্যুত হন কেন?

দাক্ষায়ণী যে ব্রত লইয়াছিল, তাহার নাম—নারায়ণ ব্রত। আমাদের দেশে এখনও হিন্দুমহিলাদের মধ্যে অনেক ব্রতের প্রচলন আছে। কিন্তু নারায়ণ-ব্রতের প্রচলন নাই। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়েও ছিল না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় দ্রাবিড়ে বেদশিক্ষাকালে সেস্থানের কুমারীগণকে এই ব্রত করিতে দেখিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যাদি লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় এ ব্রতের অনুষ্ঠান নয়। শুধু সংযমে অভ্যস্ত হওয়াই এ ব্রতের একরূপ উদ্দেশ্য ছিল।

তবে এ ব্রতের একটা বিশেষ লোভনীয় ফল ছিল। এ ব্রত-গ্রহণের ফলে কুমারীর নারায়ণ-তুল্য পতিলাভ হইত।

ব্রতের যে সমস্ত নিয়ম, তাহার সমস্ত এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যাহাকে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, তাহাকে এক পূর্ণিমা হইতে পর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সে সকল নিয়ম, সেই গুলি সযত্নে পালন করিতে হয়।

দাক্ষায়ণীও একমাস ধরিয়া সেই কঠোর নিয়ম পালন করিতেছিল। দাক্ষায়ণীকে সারাদিন উপবাসিনী থাকিতে হইত। দিবসে তিনবার, অন্ততঃ পক্ষে দুইবার স্নান করিতে হইত। সন্ধ্যার পর নিজহস্তে ভোগ রাঁধিয়া নারায়ণকে নিবেদনান্তে বালিকাকে প্রসাদ পাইতে হইত। যিনি এ ব্রতের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহাকেও কুমারীর সঙ্গে উপবাসাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হইত।

ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নিয়ম বাক্-সংযম। একান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন সারাদিনের মধ্যে বালিকার বৃথা বাক্যালাপে অধিকার থাকিত না। হয় তাহাকে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, নয়, মৌনী থাকিতে হইবে।

দ্রাবিড়দেশেও কদাচিৎ কোন পিতা কন্যাকে এই কঠোর ব্রত ধারণ করাইতেন। সাহসী তেজস্বী বাঙ্গালী সার্ব্বভৌম সেই ব্রত কন্যাকে গ্রহণ করাইয়াছেন। মৌনী হইয়া থাকা বালিকার পক্ষে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, তিনি তাহাকে শাস্ত্র পড়াইয়াছেন।

তবে অনেকগুলা শাস্ত্র পড়াইয়া কন্যার মনকে সন্দিগ্ধ করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতা তিনি দাক্ষায়ণীকে শিক্ষা দিয়াছেন। একমাস ধরিয়া এ কঠোর উপবাসাদি অন্যের সহ্য হইবে না বলিয়া তিনি নিজেই কন্যার ব্রতের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩০)

চিঠি লইয়া যেদিন গণেশ-খুড়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়, সেদিন দাক্ষায়ণীর ব্রতের একমাস পূর্ণ হইয়াছে। পরদিবসে তাহার ব্রত-উদ্‌যাপন।

খুড়া বলিয়াছিল—"সাভোম ম'শায়ের স্ত্রীকে দেখিবা মাত্র আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি যদি

বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি উত্তর দিব? তাঁহার স্বামীকে পাইলেই আমি তাঁর হাতে চিঠি দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতাম, চিঠি দিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পলাইয়া আসিতাম। তাঁহার কন্যা অথবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, এটা আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ভাগ্যবশে তাহাদেরই সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হইল।

"কন্যার সঙ্গে সাক্ষাতের ভয়টা আমার কাটিয়াছে। ভয়ের পরিবর্ত্তে তাহাকে দেখার ফলে আমি একরাশ বেদনা বুকে পুরিয়াছি। এইবারে মা। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চোখ মুদিয়া আমি নারায়ণকে স্মরণ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ঠাকুর আমাকে আসন্ন সঙ্কট হইতে রক্ষা কর! ব্রাহ্মণকন্যার সম্মুখে আমি ত মিথ্যা কহিতে পারিব না! বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানি কি না প্রশ্ন করিলে, আমিত জানি না বলিতে পারিব না!

"কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্রাহ্মণকন্যা আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক্, চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিলেন না।

"সে দিন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। কথায় তাহা বুঝাইতে ত পারিবই না। লাভের মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টায় বুঝি সেই কতকাল আগে-দেখা ছবিখানির হাড়গোড় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। সে কতদিনের কথা! তারপর দেশের অবস্থা, দেশের মানুষের অবস্থা, কোথা হইতে কি হইয়াছে! কিন্তু যতবারই সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে, অমনি সে ছবি জল্ জল্ করিয়া আমার চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। ব্রাহ্মণ হইয়াও আমি মূর্খ মা ও মেয়ের সে দিনের ক্রিয়ার মর্ম্ম আজিও পর্য্যন্ত বিশেষ বুঝিতে পারি নাই।

"দেখিলাম ব্রাহ্মণ-কন্যা দীপটি দক্ষিণ হস্তে লইয়া, বাড়ীর দিকের সিঁড়ি দিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছেন। উঠিয়াই তিনি সবার উপরের সিঁড়িতে একবার দাঁড়াইলেন। দেয়ালে মাথা দিয়া মণ্ডপকে একবার প্রণাম করিলেন। তারপর চৌকাঠে পা না দিয়াই বাহির হইতেই কন্যাকে ডাকিলেন —"দাক্ষায়ণি!"

"দাক্ষায়ণী উত্তর করিল—'মা!'

"উত্তর করিয়াই দাক্ষায়ণী দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইল; এবং ভূমিষ্ঠা হইয়া দীপধারিণী মাকে প্রণাম করিল। প্রণামানন্তর হাঁটুতে ভর দিয়া, হাত দুটি যোড় করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশে চাওয়ার মত মায়ের মুখের পানে চাহিল।

"বিচিত্র ব্যাপার! মা সেই দীপ দিয়া কন্যার আরতি করিল! আরতি শেষে তিনি আর একবার কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কন্যাও মা বলিয়া উত্তর দিল। মা এইবারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গীতা?" কন্যা বলিল—'সুগীতা।'—"উত্তর পাইয়া মা মণ্ডপেই প্রবেশ করিলেন। এবং হস্তস্থিতদীপ কন্যার হাতে প্রদান করিলেন।

"কন্যা সেই দীপ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং যে কুলুঙ্গিতে সে গীতার পুঁথি রখিয়াছিল, সেইখানে যাইয়া দীপ ঘুরাইয়া পুঁথির আরতি করিল। আরতিশেষে স্তোত্র। সুর যেন কুলুঙ্গির ভিতরে পুঁথিখানিকে বেড়িয়া জমিয়াছিল। দাক্ষায়ণী হাতযোড় করিতেই যেন প্রেমানন্দে গলিয়া গেল—দাক্ষায়ণীর কণ্ঠে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল; আবার নাচিতে নাচিতে বালিকার কণ্ঠ হইতে পুঁথির গায়ে লাফাইয়া পড়িল।

"আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছে। আমিও দাক্ষায়ণীর সঙ্গে করযোড়ে দাঁড়াইয়াছি। বৈশাখ মাস—বাহিরে গাছে গাছে ঝড়ের শব্দ আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মণ্ডপের বায়ু নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ হইয়া আমার সঙ্গে, দাক্ষায়ণীর মায়ের সঙ্গে—দীপের নিথর শিখার সঙ্গে বালিকার গীতাস্তোত্র শুনিতেছে। সুরটা উপরে নাচে ছুটাছুটি করিয়া পৃথিবী বৈকুণ্ঠকে যেন কোলাকুলি করাইতেছে।

"স্তোত্র-পাঠ শেষ করিয়া, দাক্ষায়ণী পুঁথিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিল— 'গঙ্গাগীতাচ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।'

"সমস্ত শ্লোক বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্লোকের এইকয়টি কথামাত্র আমার মনে ছিল। শ্লোকপাঠান্তে যখন মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'দাক্ষায়ণি! তুমি ইহাদের ভিতর কি হইবে?' দাক্ষায়ণী উত্তর করিয়াছিল— 'পতিব্রতা।' মাতা এইবারে অঞ্চল হইতে ফুল লইয়া কন্যার মস্তক স্পর্শ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন— 'পতিব্রতা ভব।' কন্যা আবার মাতাকে প্রণাম করিয়াছিল। এবং মায়ের ইঙ্গিতে, অনাহূত ব্রাহ্মণ ভগবৎ-প্রেরিত জ্ঞানে বালিকা ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকেও একটা প্রণাম করিয়াছিল।

"সর্ব্বশেষে সেই দীপ লইয়া দাক্ষায়ণী চণ্ডীমণ্ডপ হইতে উঠানে নামিল। এবং মাতৃদত্ত একটি ধুচুনীর ভিতর দীপ রাখিয়া, ধীরে ধীরে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ পার হইয়া, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!"

এই গল্প আমার কাছে করিতে করিতে গণেশখুড়ার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইতে আমি দেখিয়াছি। খুড়া বলে—"অপূর্ব্ব নারায়ণ-ব্রতের ফলে দাক্ষায়ণীতে আমি লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়াছিলাম। কড়ির শব্দ শুনিয়াছিলাম, পদ্মের আঘ্রাণ পাইয়াছিলাম। দাক্ষায়ণী চলিয়া গেলে যে সময় গ্রামের ঘরে ঘরে কুলদেবতার সন্ধ্যার আরতি বাজিয়া উঠিল, সেই সময়ে গোলমালের মধ্যে আমি লক্ষ্মীর জননী 'মা দুর্গাকে' সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলাম।"

কিন্তু আঘ্রাণ পাইয়া হইল কি? দাক্ষায়ণীর এ ব্রত-ধারণে কি লাভ হইল? বালিকা একমাস ধরিয়া দিবসের পর দিবস উপবাস-ক্লেশ ভোগ করিয়াছে—পিতাও কন্যার সঙ্গে সমান ভাবে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কন্যা সারাদিন মুখে জলবিন্দুটি পর্য্যন্ত দিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ-জায়া তাই দেখিয়া কোন্ প্রাণে নিজের মুখে অন্ন দিবেন? তিনিও পতি-পুত্রীর সঙ্গে একমাস ধরিয়া সমভাবে নিয়ম পালন করিয়াছেন!

কিন্তু তিন তিন জনের অনুষ্ঠিত এই কঠোর ব্রতের ফল কি হইল? ব্রত-উদ্‌যাপনের পূর্ব্ব দিবসেই চিঠিতে যে ফল পূরিয়া, গণেশ খুড়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর হস্তে উপহার প্রদান করিয়াছে, ব্রাহ্মণ সে সুপক্ক ফলের আঘ্রাণে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী মূৰ্চ্ছিতার মত হইয়াছিলেন। গণেশ-খুড়া ব্রাহ্মণের হাতে পত্র দিয়াই পলাইয়া আসিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণীর অনুরোধে তাহাকে সেদিন ব্রাহ্মণের গৃহেই রাত্রি-যাপন করিতে হইল। দাক্ষায়ণীর ব্রতের নারায়ণ-প্রেরিত 'বামুন' হইয়া, তাহার আর বাড়ীতে ফিরিয়া আসা ঘটিল না।

দাক্ষায়ণী চিঠির কথা জানিতে পারে নাই। তাহার জননী যে প্রদীপ হস্তে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে সেই প্রদীপ লইয়া বাটীর বহির্ভাগস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে দিতে গিয়াছিল। নহিলে এ চিঠির মর্ম্ম সে বুদ্ধিমতী বালিকার অবিদিত থাকিত না।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কেহই তাহাকে সে কথা শুনান নাই। এবং দাক্ষায়ণীর মায়ের অনুরোধে সে রাত্রির মধ্যে চিঠি সম্বন্ধে আর কোন কথাও উত্থাপিত হয় নাই।

(৩১)

পরদিবসে সার্ব্বভৌমের গৃহে কতকগুলা দৈবঘটনা ঘটিল। তবে সেগুলা খুড়ার চোখের দৈবঘটনা। বিচারের পরিবীক্ষণ দিয়া আমাদের সেগুলাকে দেখিতে হইবে।

অত হাঙ্গাম করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া, আগে হইতেই সে সকলের উত্থাপন হইতে বিরত হইয়াছি। কেবল একটি কথা বলিব। সেইটির সঙ্গে আমার ও এই আখ্যায়িকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রত্যুষে মায়ের সঙ্গে "কাশ্যপ" গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া, দাক্ষায়ণী একটী শিলা কুড়াইয়া পাইয়াছিল। এবং সেই দিবসেই এক জগন্নাথযাত্রী সন্ন্যাসী আসিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে অতিথি হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সেই শিলার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া, নিজেই তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠান্তে সেটি দাক্ষায়ণীকেই দান করিয়াছিল। সেই কমঠ-কঠোর শিলাটাই দাক্ষায়ণীর সহিত আমার মিলনপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে।

ব্রত-উদ্‌যাপনের দিন অপরাহ্ণে ব্রাহ্মণ-গৃহ হইতে গণেশ-খুড়ার বিদায়-গ্রহণের পূর্ব্বে তাহার সহিত দাক্ষায়ণীর মায়ের যে কথা হইয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহার মহত্ত্ব আমরা যথেষ্ট বুঝিতে পারিব। আমি তাহা খুড়ার কথাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ব্রত-উদ্‌যাপনের উল্লাসের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর দারুণ মনোদুঃখ বুঝিয়া, খুড়া নিজেও দুঃখে অধীর হইয়া পড়িয়া-ছিল। বিদায়-গ্রহণের সময় খুড়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিয়াছিল—"মা! আমার অপরাধ লইয়ো না।"

ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন—"তুমি সঙ্কুচিত হইতেছ কেন গণেশ! তোমার আবার অপরাধ কি? বরং তুমি আগে হইতে এ সংবাদ দিয়া আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছ।"

"জেঠাইমার একান্ত অনুরোধে আমি আসিয়াছি।"

"তিনি সাধ্বী। তাঁহার গুণ আমি এক মুখে বলিতে পারি না। তাঁহার দয়া আমি ইহজন্মে ভুলিব না।"

"অঘোর দা'র কেন এমন মতিচ্ছন্ন হইল?"

"কিছু না। তাহারই বা মতিচ্ছন্ন হইবে কেন? সে যেমন শিক্ষা পাইয়াছে, সেইরূপই কাজ করিয়াছে। মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল আমার। আমি আমার দেবতা স্বামীর নিষেধ

না মানিয়া, এক অন্যপূর্ব্বার পুত্রকে কন্যাদানে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।"

আমাদের সমাজে সে সময় অন্য-পূর্ব্বার গর্ভজাত সন্তানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। সুতরাং সত্য কথা বলিতে গেলে, সমাজের চোখে আমি তখন ঘৃণ্য। দেবতার ভোগ-রন্ধনাদি কার্য্যে আমার মাতার অধিকার ছিল না। শুধু পিতামহের লোকপ্রিয়তায় এবং সার্ব্বভৌমের কন্যাদানের সাহসিকতায় সমাজে আমাদের অবস্থা হীন হয় নাই।

প্রথমে ব্রাহ্মণের আমাকে কন্যাদানে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। পত্নীর একান্ত অনুরোধে তিনি আমাকে কন্যার বাগ্‌দান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন—"গণেশ! ক্ষুদ্রবুদ্ধি রমণী আমি। শুদ্ধমাত্র কন্যার প্রতি মমতাবশে আমার নারায়ণতুল্য স্বামীকে লোকবিগর্হিত কাজ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এ ফল ত আমার ন্যায্য প্রাপ্য। আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই একাজ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। মমতাতে অন্ধ হইয়া আমি কাহারও কথায় কাণ দিই নাই।"

"কন্যার জন্য আর কি ভাল পাত্র পাও নাই মা?"

"ঢের। সার্ব্বভৌমের কন্যা, তার কখন কি সুপাত্রের অভাব হইত!"

"সুপাত্র থাকিতে এরূপ ঘরে কন্যা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কাজ ভাল কর নাই।"

"বহুকালের শিবারাধনার ফলে আমার পরিব্রাজক স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। ওঁর যে মনের অবস্থা, তাহাতে উনি কখন্ ঘরে আছেন, কখন্ নাই। আমার ধারণা ছিল, কন্যার বিবাহের পর আর উনি গৃহে থকিবেন না। তাইতে মনে করিয়াছিলাম, কি জান গণেশ, দাক্ষায়ণীকে এমন জায়গায় বিবাহ দিব, যাহাতে আমার বোধ হইবে, সে যেন আমার চোখের উপরেই রহিয়াছে। যখন মনে করিব, তখনি খবর লইতে পারিব। ইচ্ছা করিলে দেখিয়া আসিতে পারিব। তাহার উপর বুঝিয়াছিলাম, শিরোমণি যথেষ্ট পয়সা উপায় করিয়াছে। তাঁহার পুত্রও রত্ন, সেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিবে। পুত্রবধূর খাওয়া-পরার দুঃখ থাকিবে না।"

"তার উপর তোমার ওই সবে একমাত্র কন্যা। আর দুটো একটা থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের বিবাহ লইয়া গোল হইবার সম্ভাবনা থাকিত।"

"শিরোমণির পৌত্রকে দাক্ষায়ণী দানের সেটাও একটা কারণ।"

"তাহ'লে তুমিত কোনও দোষ করনি মা!"

"দোষ করিনি, বলছ কি গণেশ—পাপ করেছি। পাপ—মহাপাপ! সুখদুঃখে সমজ্ঞান মহাপুরুষ আজ আমারই জন্য জীবনে প্রথম বিচলিত হইয়াছেন। যাহা কখন তাঁহাকে দেখি নাই, দেখিবার প্রত্যাশা করি নাই—আজ তাঁহাতে তাই দেখিয়াছি! আজ নিদারুণ মনস্তাপে আমার ঠাকুরের চোখে জল পড়িয়াছে—ক্রোধে শরীর কাঁপিয়াছে!

দুঃখ ও ক্রোধের মধ্য দিয়া নিত্যই আমাদের জীবন চলা-ফেরা করিতেছে। জীবনের এইরূপ মরণে আমরা নিত্য অভ্যস্ত। চপল চিত্তের সুখদুঃখ ঋষিগণের চক্ষে ক্লেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে। সংযমীর চিত্তবিক্ষোভ যে কি বিষম বস্তু, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? গণেশখুড়াও সে ক্রোধের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। খুড়া আমাকে বলিয়াছিল—"হরিহর! ক্রোধটা একটা সামান্য মনের উচ্ছ্বাস বলিয়াই আমার জানা ছিল। আমি দিনের মধ্যে দশবার রাগিতাম, দশবার শান্ত হইতাম। ক্রোধ হইলে মুখ হইতে দু'পাঁচটা অসঙ্গত কথাও যে বাহির না হইত, এমন নয়। ক্রোধের মুখে সময়ে সময়ে দু'একজনকে দুই চারিটা অভিশাপও দিয়াছি। কিন্তু যাহাকে বলিয়াছি—'তোর মৃত্যু সন্নিকট'—সে যেন চারিগুণ সুস্থ ও সবল হইয়া বাঁচিয়া আছে। যাহাকে নির্ব্বংশ হইবার শাপ দিয়াছি, তার বংশ চারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।"

সাভ্যোম-ম'শায়ের ক্রোধ এইরকম একটা কিছু হইবে মনে করিয়া, খুড়া সান্ত্বনার ছলে তাঁহার পত্নীকে কি দুই একটা কথা বলিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"মূর্খ! মনে করিতেছ কি! এ কি তোমার আমার ক্রোধ যে, তাহার যা কিছু শক্তি শুধু আমাদের দেহমনের উপর অনিষ্ট করিয়াই মিলাইয়া যাইবে!"

গণেশ-খুড়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"তবে কি?"

"এ সংযমীর ক্রোধ! এ ক্রোধ অকারণ অথবা তুচ্ছ

কারণে হয় না। কিন্তু যখন হয়, তখন যাহার জন্য এ ক্রোধের উৎপত্তি, তাহার অনিষ্ট না হইয়া যায় না। সে হতভাগ্য যদি পলাইয়া গড়ের ভিতরে আশ্রয় লয়, এ আগুন সেখানে গিয়াও তাহাকে দগ্ধ করিবে! সাগরে ডুবিলে জলভেদ করিয়া তাহাকে ছাই করিয়া দিবে।"

"তবেত অঘোর দা'র সর্ব্বনাশ হইল, দেখিতেছি!"

"হইতে দিই নাই। হইবার মুখে নারায়ণের কৃপায় আমি প্রতিবন্ধক হইয়াছি। গণেশ! তুমি গত রাত্রিতে ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখ নাই। দেখিলে—আমার বিশ্বাস, মূর্চ্ছিত হইতে। নরাধম অসত্যবাদীর শাস্তি হওয়াই উচিত ছিল। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কথা বাহির হইবার সময়ে আমি মুখে হাত দিয়া তাহা রোধ করিয়াছি। তাঁহাকে স্নান করাইয়া আবার শান্ত করিয়াছি।"

এই বলিয়া সার্ব্বভৌম-গৃহিণী গণেশ-খুড়াকে সত্য সম্বন্ধে কতকগুলা উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"কলিতে একমাত্র তপস্যা সত্য। ব্রাহ্মণ শৈশবাবধি সেই তপস্যাই করিয়াছেন। দ্বাদশ বৎসর যে নিরবচ্ছিন্ন সত্য করিয়াছে, সেই বাক্‌সিদ্ধ হয়। যিনি পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর একটি মুহূর্ত্তের জন্যও মিথ্যা কহেন নাই, তাঁহার মুখ হইতে অভিসম্পাতের কয়েকটি অক্ষর বাহির হইতে না হইতে হতভাগ্য অসত্যবাদী সবংশে দগ্ধ হইয়া যাইত।"

আমরা একথা বিশ্বাস করি, আর নাই করি, মূর্খ গণেশ, ব্রাহ্মণকন্যার এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিল। মূর্খ হইলেও কিন্তু খুড়ার বুদ্ধি ছিল। খুড়া বুঝিল, সার্ব্বভৌম-ম'শায়ের মুখ হইতে অভিশাপ বাহির না হউক, তাঁর ভিতরে ক্রোধ ত হইয়াছে! আর ক্রোধ যখন হইয়াছে, তখন আমাদের অনিষ্ট না হইবে কেন? খুড়া সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিল। ক্রোধ যে হয় নাই, একথা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। আর এই ক্রোধ যদি আমাদেরই উপর প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কাহারও যে অনিষ্ট না হইবে, একথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

গণেশ-খুড়া চিন্তিত হইল। বলিল—"তাহলে মা, হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-পরিবারের রক্ষার উপায়?"

তিনি উত্তর করিলেন—"আমি ত স্বামীর মনের অবস্থা জানি না। তিনি চিরদিনই অতি ধীর। একটা কন্যার মোহে তিনি যে এক মুহূর্ত্তের ক্রোধে এতকালের অর্জ্জিত তপস্যার ফল নষ্ট করিবেন, এটা আমার বোধ হয় না। তবে অসত্যের উপর যে ক্রোধের ভাব, তাহাতে সত্যাশ্রয়ীর তপস্যার হানি হয় না। যদি কোনও উপায়ে হতভাগ্যের পুত্রের হাতে দাক্ষায়ণীর হাতটা অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও রক্ষা করা যায়, তাহা হইলেই ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষার উপায় হইতে পারে। শিরোমণির বংশ ব্রহ্ম-কোপানল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।"

গণেশ-খুড়া আমাকে বলিয়াছিল—"হরিহর! সেইদিন সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ও জেঠাইমাকে স্মরণ করিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যেমন করিয়া পারি, আমি তোমাকে চুরি করিয়া আনিব। আনিয়া তোমার হাতে দাক্ষায়ণীর হাত সমর্পণ করিব।"

তাই খুড়া চোরের মত আমাদের হুগলীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু খুড়া নিজে, সঙ্কল্প-সিদ্ধি করিতে পারে নাই। তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, আমাদের ঝি। খুড়া দৈবসুযোগে ঝির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকেই সঙ্গোপনে মনের কথা বলিয়াছিল। এবং ঝিয়ের কৃপাতেই সে যাত্রা আমরা "ব্রহ্মকোপানল" হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। ঝিয়ের কৃপাতেই দাক্ষায়ণীর হাত আমার হাতের উপর সমর্পিত হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম-পত্নীকে আশ্বস্ত করিয়া গণেশখুড়া সেইদিন অপরাহ্নে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

(৩২)

এত করিয়াও গণেশখুড়া কিন্তু পিতামহীর গৃহত্যাগ রক্ষা করিতে পারে নাই। আমাদের গ্রামের মধ্যে এক-জনও ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই, ঠাকুরমা আর আমাদের ঘরের অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। হুগলী হইতে চলিয়া আসিবার পর যে কয়দিন তিনি ঘরে ছিলেন, সেই কয়দিনই তিনি গোবিন্দ-ঠাকুরদার বাড়ীতে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিয়াছেন। সন্দেহ করিবার সমস্ত কারণ থাকিতেও সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ, পিতামহীর এই আচরণ তাঁহার দেবরের প্রতি অহেতুকী প্রীতির একটা নিদর্শন অনুমান করিয়া, পরমানন্দই অনুভব করিতেছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রবধূগণ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া খাওয়াইলেও তিনি তাহাতে সহধর্ম্মিণীর হস্তের মিষ্টতা

অনুভব করিতেন না। সেই মত মিষ্ট হাত ছিল, আমার পিতামহীর। সুতরাং ভ্রাতৃজায়ার তাঁহার গৃহে আহারে গোবিন্দ-ঠাকুরদা'র একটা স্বার্থ ছিল। সেই স্বার্থবশে পিতামহীর অভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার অবকাশই ছিল না।

এই কয়দিন গণেশখুড়ার স্ত্রী আমাদের কুলদেবতার ভোগ রাঁধিত। কেবল পাকস্পর্শ উৎসবের পরদিনে দাক্ষায়ণীর উপর ভোগরন্ধনের ভার পড়িয়াছিল। পিতামহী সেইদিন বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন। পৌত্রবধূর প্রস্তুত অন্ন দেবতাকে নিবেদন করাইয়া, নিজে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। কেন, তখন কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। বাড়ীর একজনও বধূর হাতের অন্ন না খাইলে, অনুষ্ঠানের ক্রটী হয় বলিয়া, তিনি আহার করিয়াছিলেন, অথবা সম্পর্কত্যাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পরগৃহে ভিখারিণীর মত একদিনের জন্য ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজিও পর্য্যন্ত তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

অন্নগ্রহণের রাত্রিতেই তিনি পৌত্রবধূকে লইয়া গৃহত্যাগ করেন। সেদিন গণেশখুড়া, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া, ঠানদিদির কি একটা অসুখ উপলক্ষে বাড়ীতে গিয়াছিল। সুযোগ যেন বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া পিতামহীর গৃহত্যাগের সহায়তা করিয়াছিল।

হুগলীতে বকুল বৃক্ষের তলদেশে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমাদের গ্রামের মধ্যে কাহারও সে কথা শুনিতে বাকী ছিল না। যদিও পিতামহী অথবা গণেশ-খুড়া আমার বিবাহ দেখে নাই, তথাপি ঘটনায় কেহই অবিশ্বাস করে নাই। এক ঝিয়ের সাক্ষ্যতেই আমাকে সার্ব্বভৌম-মহাশয়ের কন্যাসম্প্রদান—গ্রামের ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রীপুরুষ এমন কি, দেশের জমীদার পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা একবাক্যে দাক্ষায়ণীকে আমার বধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিল। তবে ঠাকুরমা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন কেন? হুগলীতে পিতৃ-কর্ত্তৃক পিতামহীর অপমান-কথা, গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহই শুনে নাই। সার্ব্বভৌম ত একথা কাহাকেও বলিবেন না। গণেশ-খুড়াও একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করে নাই। গ্রামের লোকে ঠাকুরমার জন্য দুঃখিত। অনেকেই—বিশেষতঃ গোবিন্দ-ঠাকুরদা মর্ম্মাহত। কিন্তু কেহই তাঁহার চলিয়া যাইবার কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। পিতামহীর মত শান্তপ্রকৃতি স্ত্রীলোক গ্রামের মধ্যে আর ছিল না। কেহ কখন তাঁহাকে রাগিতে দেখে নাই। আমিও দেখি নাই। পিতামহের মৃত্যুর পর মা তাঁকে দিন কয়েক বড়ই উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। পিতামহী তাহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন মাত্র—ক্রুদ্ধ হন নাই। কারণ জানিতাম, পিতা ও আমি। কিন্তু সে কথা কাহাকেও ফুকারিয়া বলিবার উপায় ছিল না। কাজেই সকলের পক্ষে সেটা একটা রহস্যেরই বিষয় হইয়াছিল।

শুনিয়াছি, ঠাকুরমা বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই, পৌত্রবধূর হাত ধরিয়া ও ঝিকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। এবং ব্রাহ্মণদম্পতীর কাছে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া, দাক্ষায়ণীকে তাহাদের কাছে রাখিতে অনুরোধ করেন।

দাক্ষায়ণীর মা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—"মা! অবোধ পুত্রের উপর অভিমান করিয়া গৃহত্যাগ করিয়ো না।"

তারপর যখন তিনি বুঝিলেন, শুদ্ধমাত্র অভিমানে নয়, তাঁহার নিজের ও পুত্রের—উভয়েরই মঙ্গলের জন্যও তিনি গৃহত্যাগ সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং আদর্শচরিত্র ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, তখন আর তিনি পিতামহীকে নিষেধ করেন নাই; কন্যাকেও গ্রহণ করেন নাই। সুখে দুঃখে পিতামহীর সহচরী থাকিতে উপদেশ দিয়া, তিনি দাক্ষায়ণীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পিতামহী কোথায় থাকিবেন, কত দিনের জন্য থাকিবেন, আর কন্যাকে দেখিতে পাইবেন কি না, একথা পর্য্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

কিন্তু দশমবর্ষীয়া বালিকা—মায়ের অঞ্চলের নিধি,—ষড়্‌দর্শনজ্ঞ সার্ব্বভৌমের একমাত্র দর্শনীয় বস্তু, আত্মীয়-স্বজনের একান্ত প্রিয়পাত্রী—দাক্ষায়ণী অম্লানবদনে কেমন করিয়া এই নব আত্মীয়ার অনুসরণ করিল, তাহা মনে করিতে গেলেও সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

যাই হ'ক, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। সে চলার ভাল-মন্দ বিচার করিবার আমাদের সকলের অধিকার থাকিলেও বিচার করিয়া কোনও ফল নাই। দেশের লোকের মধ্যে অনেকেই নির্ম্মম ভাবে আমার পিতামহীচরিত্রের

সমালোচনা করিয়াছেন। অনেকেই বলিয়াছেন, পুত্র-পুত্র-বধূর উপর অভিমান করিয়া, এরূপ অনাথিনীর মত তাঁহার গৃহত্যাগ বিজ্ঞার কার্য্য হয় নাই। ইহাতে বংশের সম্ভ্রম হানি হইয়াছে। বিশেষতঃ একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে তাহার মাতা ও পিতার মমতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞাতবাসে লইয়া যাইতে তাঁহার অধিকার কি? তাঁহার অভিমান তাঁহার সঙ্গে যাক্। একটা শিশুকে সে জন্য সঙ্গে লইয়া অনাচ্ছাদনে অপরিচিত স্থানে অনশনে মারিয়া ফেলা কেন?

কিন্তু সমালোচনায় কোন ফল হয় নাই। তাঁহাদের কথার যিনি উত্তর দিতে সমর্থ, কোথায় আমার সেই, আজি নির্ম্মম, কিন্তু পূর্ব্বের কেবল মমতাময়ী পিতামহী? গ্রামে আসিয়া একমাস আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। শুধু আমি কেন—বাবা, এমন কি মা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন! গ্রামবাসীরাও বসিয়া আছে। কোথায় আমার ঠাকুরমা? গোবিন্দ-ঠাকুরদা প্রভাত হইলেই আমাদের গৃহে আসিয়া ঘুমন্ত পিতাকে ডাক দেন—"অঘোর নাথ!" ডাকিয়া তুলিয়া কত কি কথা চুপি চুপি কহিয়া আবার তিনি চলিয়া যান। গণেশ-খুড়া একবার করিয়া অনুসন্ধানে বাড়ী হইতে চলিয়া যায়, দু'চার দিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া এ গ্রাম সে গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া, আবার ফিরিয়া আসে। আসিয়াই বাটীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠে—"জেঠাই মা! আসিয়াছ?" পিতামহীর গৃহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে সেই যে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা চলিয়া গিয়াছে, তাহারা আর আমাদের গৃহে ফিরিয়া আসে নাই। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের আনিতে খুড়াকে অনুরোধ করিয়াছি। খুড়া অনুরোধ রাখে নাই। এক একবার তাহার মা আসেন। কিন্তু তিনিও পিতামহীর অন্তর্দ্ধানে কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। আগে মূর্খ পুত্রের কল্যাণ-লোভে তিনি মাতার পক্ষাবলম্বিনী হইয়া অন্তরালে পিতামহীর কত নিন্দা করিয়াছেন। এখন পুত্র-পৌত্রাদির অকল্যাণভয়ে কোনও কথা কহেন না।

একজন কেবল—কখন মা, কখন পিতার কাছে—মাঝে মাঝে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া, তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিত। সে সেই বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত। তাহার মূর্খতা শেষে পিতার এমন অসহ্য হইয়া পড়িল যে, তিনি একদিন তাহাকে স্পষ্টতঃই বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি পণ্ডিত আসিত, এবং মতামত প্রকাশ করা সুবিধা নয় বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিত। এবং অনেক সময়ে পিতার ইতস্ততঃ গমনে সহচরের কার্য্য করিত। আমাকে পূর্ব্বে পড়াইত বলিয়া পিতা তাহাকে একটা মাসোহারা-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা অন্য উপকার না হউক, বৈকুণ্ঠ পণ্ডিত না থাকিলে, পিতাকে অনেক সময়ে সঙ্গিহীন থাকিতে হইত। সে বয়সে আমার যতটুকু বুঝিবার শক্তি ছিল, তাহাতেই অনুমান করিয়াছিলাম, অন্তর্যাতনার অতিপীড়নে তাঁহার গৃহ-প্রবাসের দিন তাঁহার জীবনকে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে।

মায়েরও সঙ্গিনীর অভাব হইয়াছে। আমার কাছেও বাল্যসঙ্গীরা বড় আসে না। আসিবার মধ্যে মাঝে মাঝে আসে রামপদ। কিন্তু সেও পূর্ব্বের মত আমার সঙ্গে আর মাখামাখির মত মিশে না। এই একটা বৎসরের বিদেশ-বাস আমাদের ও প্রতিবেশীদিগের পরস্পরের ভাব বিনিময়ের মধ্যে যেন একটা বাঁধের মত প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

আমাদের গ্রাম আর ভাল লাগিতেছে না, ঘরও ভাল লাগিতেছে না। হুগলীতে এক বৎসর বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইয়া অনাড়ম্বরময় গ্রাম্য জীবনও কেমন যেন আমাদের বিসদৃশ বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ পিতামহীর অনাগমনে পিতা ও মাতা উভয়েই সর্ব্বদা অপরাধীর ন্যায় সঙ্কুচিতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়া, বাড়ী যেন ক্রমে তাঁহাদের পক্ষে কারাগারের মত যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে।

এক দুই তিন—দেখিতে দেখিতে মাসের সব কটাদিন শেষ হইতে চলিল—পিতার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। গণেশ-খুড়া ইহার মধ্যে তিন চারিবার গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ঘুরিয়া আসিয়াছে—পিতামহীর কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। অগত্যা আমাদের সঙ্গে লইয়া পিতাকে আবার চাকরীর জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইল।

বিষয় সম্বন্ধে কি করা হইল, আমার জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে পিতামহীর অন্বেষণ সম্বন্ধে পিতা যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিয়াছিলাম। পিতা এই কার্য্যে গণেশ-খুড়াকেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোবিন্দ-ঠাকুরদা ও গ্রামের আরও দুই চারিজন বিজ্ঞের মতে গণেশ-

খুড়াই এ অন্বেষণ-কার্য্যে একমাত্র উপযোগী স্থির হইয়াছিল।

পিতার নিকট হইতে উপযুক্ত পাথেয় লইয়া, আমাদের গ্রামত্যাগের তিনদিন পূর্ব্বে খুড়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইল। খুড়া যতদিন না ফিরিবে, স্থির হইল, ঠানদিদি—বধূ ও পৌত্রপৌত্রী লইয়া আমাদের গৃহেই অবস্থান করিবেন। এবং গোবিন্দ-ঠাকুরদা নিজেই দুই বেলা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। তিনি আমাদিগের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগের যে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পিতার সাগ্রহ অনুরোধে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ সদানন্দ তাহাদের প্রহরিত্বের ভার লইয়া রহিল।

গৃহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে আমার মাতা জীবনে সর্ব্বপ্রথম বৃদ্ধ পিতামহীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, দেশের সম্পত্তি বজায় রাখিতে হইলে ও বাড়ীঘরগুলিকে অকালধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, শাশুড়ীজাতীয়া একটি মিনিমাহিনার দাসী ঘরে রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন। চাকরীর জন্য স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া যাঁহাদের বিদেশে থাকিতে হয়, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা এরূপ পরিচারিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। এখনও বাংলার ঘনবনাকীর্ণ অনেক পল্লীগৃহে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে, এইরূপ এক একটা বুড়ী চাকরীর জন্য বিদেশে অবস্থিত পুত্রপৌত্রাদির মঙ্গল কামনায় সযত্নে বাস্ত-দেবতাকে বুকে লইয়া, যুগযুগান্ত হইতে তপস্যারতার ন্যায় সুস্থদেহ প্রিয়জনের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আজিও পর্য্যন্ত গ্রাম-শ্রীনাশিনী ক্ষুধার্ত্ত মহামারী এরূপ গৃহের গোময়জলনির্ষিক্ত দ্বারের চৌকাট পার হইতে পারে নাই। গ্রাম উজাড় হইয়াছে, কিন্তু তুলসীতলায় নিত্য সন্ধ্যা দিতে বুড়ী এখনও বাঁচিয়া আছে। সেই জন্যই বুঝি, আজ পিতামহীর উদ্দেশে তাঁহার চক্ষু হইতে প্রথমে অশ্রু নিপতিত হইতে দেখিলাম! পিতার মুখেও আজ সর্ব্বপ্রথম আক্ষেপ-বাক্য বহির্গত হইতে শুনিলাম। গঙ্গাতীরে শালতীতে পা দিতে সেই আর এক-দিনের সন্ধ্যার কথা তাঁহার মনে হইল। সে দিন বিদায়দানে অনিচ্ছুক সহৃদয় গ্রাম্য নরনারীতে গঙ্গার ঘাট পূর্ণ ছিল। আজ একান্ত অনুগত দুই একজন ব্যতীত তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। পিতার যাত্রায় বিঘ্ন-উৎসারণ ফুল লইয়া ব্যাকুলতার সহিত আগত সে সার্ব্বভৌমও নাই। মন্থর-গামিনী নদীকূলের সে কল্যাণময়ী নৃত্যশীলা শ্যামার আশীষ-সঙ্গীতের ইঙ্গিত নাই।

সে ভাব যেন মরু-প্রান্তরে উত্তপ্ত বালুকাস্তূপে সমাহিত হইয়াছে। প্রাণ-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া মরণের অধিক বিভীষিকা দেখাইতেছে।

কিন্তু সে সময় নিকটে থাকিয়াও যে সার্ব্বভৌম পিতার দৃষ্টি সম্মুখে অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই, আজ উপস্থিত না থাকিয়াও সে যেন দিব্য কান্তিতে তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইল। শালতীতে উঠিয়াই নদীর ক্ষীণ স্রোতে একবার করস্পর্শ করিয়া পিতা বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, সেবারে যথার্থই অতি অশুভক্ষণে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। তুমি জানিয়া পরমাত্মীয়ের প্রাণ লইয়া, আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলে। তোমার সেই অশুভ-নিরা-করণের নির্ম্মাল্য উজান স্রোতে আর একবার আমার হাতে আনিয়া দাও। মর্ম্ম না বুঝিয়া দম্ভে আমি তাহা জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। ফলে অশুভযাত্রায় পথেই আমি মাতৃরত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।"

ফুল আর উজান আসিল না। তৎপরিবর্ত্তে সার্ব্বভৌমের উদ্যানমধ্যস্থ অশ্বত্থের মাথা হইতে পেচকদম্পতি টিটকারীর অভিনন্দনে গমনপথে আমাদিগকে পুণ্য জন্মভূমি হইতে বিদায় দিল। বুঝি এই অশ্বত্থের তলেই দাক্ষায়ণী পাতি-ব্রত্যব্রত-পালনে একমাস ধরিয়া দীপদান করিয়াছিল!

(৩১)

একটা শালতী একজনে না লইলে শয়নের সুবিধা হয় না বলিয়া, পিতা দুইটা শালতী ভাড়া করিয়াছিলেন। তার একটাতে উঠিয়াছিলেন তিনি, অপরটাতে আমরা—মাতা ও পুত্র—আরোহণ করিয়াছিলাম। মাস জ্যৈষ্ঠ অথবা আষাঢ়ের প্রথম। কেননা আমার বেশ স্মরণ আছে, শালতীতে উঠিবার সময় ভৃত্য সদানন্দ কতকগুলা পাকা আম ঝুড়িতে আনিয়া, বাবার শালতীতে উঠাইয়া দিয়াছিল। সেগুলার সদ্ব্যবহার আমার কাছেই হইবে বুঝিয়া, তিনি আবার সেগুলা আমাদের শালতীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমার বক্ষ্যমাণ জাগরণ কথার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকা বিশেষ সম্ভব বলিয়াই সেগুলার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইতেছি।

বাল্যচাপল্যপ্রযুক্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গ্রাম —ঘরবাড়ী, প্রতিবেশী, সহচর—এমন কি ঠাকুরমা ও আমার 'কনে'কে ভুলিয়া, আমি খালের উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। কনে বলিলাম কেন — পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিচ্ছেদ-অদর্শন সত্বেও দাক্ষায়ণী যে আমার নয়, এটা আমি একবারও মনে করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, এখন এ দূরাবস্থিত বার্দ্ধক্যের কেন্দ্রে বসিয়া, তাহা অনুমান করিবারও আমার শক্তি নাই।

শালতীতে উঠিয়াই মা আমাকে ঘুমাইতে আদেশ দিয়া নিজে শয়ন করিয়াছিলেন। শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, তিনি ঘুমাইয়াছিলেন। নতুবা আমি বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সপক্ক আম্রগুলির সদ্‌ব্যবহার করিতে পারিতাম না।

ঘণ্টাখানেক সময় বোধ হয়, উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আম্র-ভক্ষণে ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে খালের জলে হস্তস্পর্শ করিয়া, আমি স্রোত কাটিয়া মুখে দিতেছিলাম। উদ্দেশ্য মুখ ধুইয়া মায়ের পার্শ্বে শয়ন করিব। এমন সময় দেখিলাম, খালের তীর ধরিয়া চলিষ্ণু ঘনান্ধকারের মত কি যেন শালতীর সমান্তরালে ঘন পাদবিক্ষেপে চলিয়াছে!

দেখিবা মাত্র আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকারের পিণ্ডটা এক একবার নদীতীরস্থ এক একটা বাগানের ছায়ার সঙ্গে মিলাইতে ছিল, আবার দুইটা বাগানের ব্যবধান-মধ্যস্থ অনাবৃত আকাশ-প্রণালীতে মসীকৃষ্ণ শুশুকের মত ভাসিয়া উঠিতেছিল।

ভয়ে জড়সড় হইয়া চক্ষু মুদিয়া, আমি মায়ের পার্শ্বে শয়ন করিলাম। শালতী চালককেও সে সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না।

মা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পিতাও বোধ হয়, তাঁহার শালতীতে নিদ্রা যাইতেছিলেন। মাঝীরা আপনার মনে যে যার শালতী বাহিয়া চলিয়াছে। সহসা তীরভূমি হইতে বংশীরবের মত এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ উত্থিত হইল। শুনিয়া চক্ষুর মুদ্রিত অবস্থাতেও আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভয়ে মাকে জড়াইলাম। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিরক্তির সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অমন ছটফট করিতেছিস্ কেন? শুইবার জন্য ত তোকে যথেষ্ট স্থান দিয়াছি!"

আমি এমন ভীত হইয়াছিলাম যে, সাহস করিয়া তাঁহারও কাছে কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। মাতা আবার নিদ্রিতা হইলেন। অমন শব্দে পিতারও নিদ্রাভঙ্গের কোনও লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয়বার সেইরূপ শব্দ হইল। কিন্তু শব্দটা এবারে সেরূপ জোরে হইল না। বিশেষতঃ এইবারে মাঝীরা কথা আরম্ভ করিল। আমারও ভয় ঘুচিল।

আমাদের এ পথে দস্যুর উপদ্রবের কথা কেহ কখন শুনে নাই। নদীর উভয় পার্শ্বেই গ্রাম। সেই সকল গ্রাম আবার জনবহুল। কেবল একস্থানে উভয় পার্শ্বের এক ক্রোশের মধ্যে লোকালয় ছিল না। যদি ভয় করিবার কিছু থাকিত, তা সেই স্থানেই থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বহুকাল হইতে সেখানেও কেহ কখন দস্যুর উৎপাতের কথা শুনে নাই। নানা গ্রাম হইতে নানা লোক এই খাল দিয়া শালতীতে চড়িয়া কলিকাতা যাতায়াত করিত। দস্যুর উপদ্রবের সুবিধা ছিল না।

ভয়ের কোনও কারণ ছিল না বলিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। এই জন্য মাঝীর সহিত তীরাবস্থিত কাহারও প্রথম আলাপ কথা তিনি শুনিতে পান নাই।

পিতার শালতীর মাঝী প্রথমে কথা কহিল। ইঙ্গিত-ধ্বনিতে তাহার মনে বোধ হয়, কিছু সংশয় জন্মিয়াছিল। সে আমাদের শালতীর মাঝীকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে রেমো! বুঝছিস্ কি?"

রেমোর উত্তরের ভাবে বোধ হইল, সেও সে শব্দটাকে লক্ষ্য করিয়াছে। সে বলিল—"ও কিছু না। দেখ্‌ছিস্ না। সঙ্গে একখানা পাল্কী রয়িয়াছে।"

"তবে কুক্ দিল কেন?"

"কোন একটা হিসেব করিয়া দেয় নাই। আর দিলেই বা ক্ষতি কি। একটা হাঁক দিলেই চারদিকের গাঁ হইতে এখনি হাজার মরদ জড় হবে।"

আমি তখন বুঝিলাম, কাহারা পাল্কী লইয়া তীরভূমি ধরিয়া, শালতীর সঙ্গে একমুখে চলিয়াছে। তাহারা দস্যু নয়। আর দস্যু হইলেও ভয় নাই। এখনি মাঝীর এক ডাকে গ্রাম হইতে হাজার লোক ছুটিয়া আসিবে। বালকের চিত্ত—সহজে এক মুহূর্ত্তে যেমন ভীত হইয়াছিল,

মাঝীর সরল আশ্বাসে তেমনি সহজে এক মুহূর্ত্তে তাহা নির্ভয় হইল। আমি পাল্কী দেখিবার জন্য শালতীর 'ছই' হইতে আর একবার মুখ বাহির করিলাম।

দেখিলাম, বাস্তবিকই চারিজন লোক একটা পাল্কী কাঁধে শালতীর সঙ্গে ছুটিতেছে। তাহার পিছনে একটা লোক, তাহার হাতে একটা লম্বা লাঠী—সেও পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে।

উভয় মাঝীতেই কিছুক্ষণের জন্য শালতী দু'টাকে একটু দ্রুত চালাইল। পাল্কীর বেয়ারাগুলাও সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলিল। মাঝীরা যেই একটু শালতীর বেগ কমাইল, তাহাদেরও বেগ অমনি কমিয়া আসিল। গতিক বুঝিতে না পারিয়া, পিতার শালতীর মাঝী রামাকে বলিল—"একটু দাঁড়া।"

আমরা আগে যাইতেছিলাম—পিতার শালতী পিছনে ছিল।

শালতী থামিল, পালকীও সঙ্গে সঙ্গে থামিল। ইহার মধ্যে আমরা গ্রাম হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এবারে যেখান দিয়া যাইব, যদি ভয় থাকে, ত সেই খানেই একটু থাকিতে পারে। খালে সে দিন অন্য কোন শালতী দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না।

পালকীর পিছনে যষ্টিধারী এইবারে কথা কহিল। আমাদের মাঝীর নিকট হইতে অগ্নি-প্রাপ্তির আশা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদের নিকটে তামাক আছে কিন্তু আগুনের অভাবে তাহারা তার অস্তিত্বে শুধু যাতনার ধূমপান করিতেছে। তজ্জন্য তাহাদের উদর স্ফীত হইবার উপক্রম করিয়াছে।

মাদকসেবনের সৌকর্য্যার্থে শ্রমজীবীদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ অগ্নিআদানপ্রদানের উদারতা চিরকালই আছে। কিন্তু সে দিন আমাদের মাঝী সে রীতির ব্যতিক্রম করিল। বলিল—"থাকিলেও দিবার উপায় নাই। আমরা শালতী ভিড়াইতে পারিব না।"

যষ্টিধারী এরূপ দুর্ব্বোধ্য নিষ্ঠুর আচরণের কৈফিয়ৎ চাহিল। মাঝী কৈফিয়ৎ দিতে শালতীতে হাকিমের অস্তিত্বের কথা শুনাইল। শুনাইয়া আবার যেই শালতী চালাইয়াছে, অমনি সে ব্যক্তি গুরুগম্ভীর স্বরে তাহাকে চালাইতে নিষেধ করিল।

স্বরে মাতা-পিতা উভয়েই জাগিয়া উঠিলেন। সেই একটা গম্ভীরস্বরঝঙ্কার কোলাহলের আকারে সুসুপ্ত পিতার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। পিতা বলিয়া উঠিলেন—"কিরে, গোলমাল কিসের?"

মা আমাকে ছই-এর বাহিরে বসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি হরিহর?" মাঝী পিতার প্রশ্নে যা উত্তর দিল, তাহাতেই মায়েরও ব্যাপার বোঝা হইল। আমাকে আর উত্তর করিতে হইল না।

পিতা বুঝিলেন, মাঝীরা আগুন দিতে স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া, যষ্টিধারী তাহাদের শালতী চালাইতে নিষেধ করিতেছে। তিনি বলিলেন—"তামাক খাবার জন্য আগুন চাচ্চে, তা দেনা কেন।"

ভীত অথবা করুণাপরবশ হইয়া তিনি একথা বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মা কিন্তু ভীতা হইয়াছেন। পিতার আদেশে রাম যেই আমাদের শালতী ভিড়াইতেছিল, অমনি তিনি নিষেধ করিলেন। বলিলেন—"আমাদের শালতী কেন, যে হুকুম করিয়াছে, তাহার মাঝী দিয়া আসুক।"

আমাকে তিনি ভিতরে আসিতে আদেশ করিলেন। আমি ভিতরে না গিয়া, মাকে বলিলাম—"মা! কেমন একটি সুন্দর পাল্‌কী!"

সুন্দর পাল্‌কী দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মাও বাহিরে আসিলেন। পিতাও তাঁহার শালতীর বাহিরে মুখ বহির্গত করিলেন। তাঁহার শালতী যেমন তীরভূমি স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইতেছিল, পালকীও অমনি ধীরে ধীরে তরী হইতে জল-সান্নিধ্যে অবতরণ করিতেছিল।

মা বলিলেন—"তাইত হরিহর, এমন সুন্দর পালকীত কখনও দেখি নাই!"

পিতা যষ্টিধারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এ পালকী কার রে?"

যষ্টিধারী সসম্ভ্রমে উত্তর করিল—"হুজুর! পালকী আমার মনিবের। তাঁহার নাতনীর জন্য বর আনিতে চলিয়াছি।"

পিতা প্রশ্ন করিলেন—"কে তোদের মনিব?"

"মনিবের নাম বলিলে হুজুরত চিনিতে পারিবেন না।"

হুজুর কথা শুনিয়াই মা বুঝিলেন, ভৃত্যটা সভ্য।

সুতরাং তার মনিবও সভ্য। আমাদের দেশের লোকগুলা এখনও সভ্যতা শিখে নাই। তাহারা হাকিম কখন চক্ষে দেখে নাই। সেইজন্য দেশের চাষা-ভূষা, চাকর-বাকরগুলা পিতাকে কেহ ঠাকুর-ম'শায় কেহবা বাবা-ঠাকুর কেহ দাদা-ঠাকুর বলিত—একজনও হুজুর বলিত না।

এরূপ সভ্য মনিবের সভ্য চাকরের সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই বুঝিয়া, মা পিতার হইয়া প্রশ্ন করিলেন —"নাম বল্ না। চিনিবার মত লোক হইলে বাবু তাঁকে অবশ্যই চিনিবেন।"

"তাঁহার বাড়ী এখান হইতে প্রায় একশো ক্রোশ তফাত হইবে।"

"একশো ক্রোশ! তোরা কি গাঁজা খাইয়াছিস্?"

"না হুজুরাইন, এখনও খাই নাই। বর লইয়া তারপর খাইব। এইজন্য হুজুরের শালতী থেকে একটু আগুন যোগাড় করিতেছি।"

হুজুর, হুজুরাইন! মা যেন কথাগুলা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলেন। আমার পিতাকে হুজুর বলা তিনি বহুলোকের মুখে বহুবার শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে হুজুরাইন সম্বোধন তিনি কোনও কালে কাহারও মুখে শুনেন নাই। কি বুঝিয়া মা আর লোকটাকে নিজে প্রশ্ন না করিয়া আমাকে বলিলেন—"জিজ্ঞাসা কর্ত হরিহর, উহারা কি?"

আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। মা আমাকে এমন অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলিলেন যে, সে কথা আপনা আপনিই লোকটার কাণে পৌঁছিল। সে বলিয়া উঠিল—"হুজরাইন! আমরা পাঠান।"

পিতার মুখে এতক্ষণ আর একটি কথা শুনি নাই। এইবারে তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"মনিব?"

"তিনি হিন্দু।"

"জাতি কি?"

"বলিতে নিষেধ আছে, হুজুর। তবে তিনি বামন ন'ন।"

"বর কোথাকার?"

"তার এখনও ঠিক নাই।"

"ঠিক নাই!"

"আজ্ঞে হুজুর, বর খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

শালতী এতক্ষণে তীরসংলগ্ন হইল। পালকী লইয়া বেহারারাও শালতীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

উত্তরগুলা যেন হেঁয়ালীর মত। পালকী লইয়া বেহারাগুলার আগমন যেন সন্দেহজনক। পিতা আর বর সম্বন্ধে কোনও কথা কহিলেন না। মাঝীকে তৎ-পরিবর্ত্তে আগুন দিতে আদেশ করিলেন।

মায়েরও কি জানি, কেন, ভয় হইয়াছে। তিনি আমাকে ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইতে নীরবে আকর্ষণ করিলেন।

আমি দেখিলাম, বেহারারাও যষ্টিধারীর মতই বলিষ্ঠ-কায়। তাহারাও মুসলমান। আমারও কেমন হঠাৎ বুকটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। মায়ের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আগুন করিবার জন্য দ্বিতীয় মাঝী চক্‌মকি ঠুকিতে লাগিল। ইত্যবসরে যষ্টিধারী বলিল—"হুজুর! মনিবের নাতনীর বর খুঁজিয়া আমরা হায়রাণ হইয়াছি। এখন হুজুর যদি গোলামের প্রতি দয়া করেন।"

"আমি কি দয়া করিব?"

এই বলিয়াই পিতা মাঝীকে শালতী চালাইতে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র রাম আমাদের শালতী চালাইল। পিতার শালতী আবদ্ধ হইয়াছে।

দুই তিন হাত শালতী চলিয়াছে কিনা, অমনি যষ্টিধারী গুরুগম্ভীরস্বরে রেমোকে মধুর অন্তরঙ্গ আত্মীয় সম্বোধনে দাঁড়াইতে আদেশ করিল।

পিতা বলিলেন—"আর কেন ভাই, আমাদের যাইতে দাও।"

উভয় মাঝীও পিতার সঙ্গে তাঁহার শালতী মুক্ত করিতে দস্যুকে অনুরোধ করিল। দস্যুটা অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া পিতাকে বলিল—"কি হুজুর, দয়া হইবে না?"

পিতা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—"কিসের দয়া?"

"একটি বর।"

"বর আমি কোথায় পাইব? আমাকে কি ঘটক পেলি?"

"ঘটক হইবেন কেন—আপনি হাকিম। তাই হুকুম চাহিতেছি। বর আপনার সঙ্গে চলিয়াছে।"

"কে? আমার ছেলে?"

"অমন সুন্দর বর এ গোলামের নজরে আর কখন পড়ে নাই। আপনার হুকুম পাইলেই খুসি হইয়া যাই। নহিলে—"

"নহিলে কি জোর করিয়া লইয়া যাইবি ?"

"কি করিব খোদাবন্দ্, উপায় নাই।"

"তোর মনিব শুনিলাম শূদ্র।"

"আপনি কি ?"

"আমরা বামুন।"

"কই, আপনার গাঁয়ের লোকে ত এ কথা বলিল না! তারা বলে, আপনি বামুনের ছেলে বটে! কিন্তু আপনি জাতকে জাহান্নমে দিয়েছেন। আমাদের পয়গম্বরের মতন এক ঠাকুরের সঙ্গে আপনি বেইমানী করেছেন। বামুন হ'লে কখন কি আপনি এমন কাজ করতে পারতেন? আপনার পুত্রই আমাদের মনিবের নাতনীর উপযুক্ত বর।" এই বলিয়াই দস্যু শালতী তীরসংলগ্ন করিতে রামের উপর আদেশ করিল। পিতা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন— "কখন না। যা রাম, তুই শালতী বাহিয়া চলিয়া যা।" দস্যু রামকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"খবরদার!" তারপর পিতাকেও সে রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"খবরদার হুজুর, পিস্তলে হাত দিয়াছ কি জন্মের মত হাতখানি ভাঙ্গিয়া দিব।"

এই সময়ে তীরের উচ্চভূমি হইতে অপর এক ব্যক্তি উচ্চ হাস্যে বলিয়া উঠিল—"একটা পিস্তলে কি হইবে অঘোর বাবু! একবার উপরে চাহিয়া দেখুন। ইহাদের কয়জনকে মারিবেন।" পিতা কাতরভাবে তাহার কাছে আমার ত্যাগ ভিক্ষা করিলেন।

আর ভিক্ষা! ঝপ ঝাপ করিয়া জলে মনুষ্য পতনের শব্দ হইল। রাম বলিয়া উঠিল—"মা! বড় বিপদ। একেবারে একশো ডাকাত তোমার ছেলে লুটিতে আসিতেছে।"

এই বলিয়াই সে শালতী হইতে ঝাঁপ খাইল। মায়ের আর কথা কহিবার শক্তি নাই; আমিই দস্যুতার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু বুঝিয়া বাহুযুগল দ্বারা দৃঢ়রূপে বক্ষমধ্যে আমাকে আবদ্ধ করিলেন। মায়ের হৃদয়ের প্রচণ্ড স্পন্দন প্রহারে আমার যেন শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আমার অঙ্গে কঠোর করস্পর্শ, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ, মায়ের আর্তস্বর, অদূরস্থ গ্রামবাসীদের উদ্দেশে সাহায্য-প্রার্থনার ব্যাকুল চীৎকার।

*　　*　　*　　*

আমি পালকীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছি। বস্ত্রে আমার মুখ আবদ্ধ হইয়াছে। পিতা ও মাতার আর্তনাদ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। রাত্রির ভীম নীরবতায় পথের কোথায় আমি তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি!

লোকালয়

[মোজাম্মেল হক্]

পথিক জিজ্ঞাসে সাধুবরে—
　"বল কোন্ দিকে লোকালয় ?"
সাধু কহে—সমাধি দেখায়ে,—
　"অই—অই—হোথা মহাশয়।"
পথিক রোষের ভরে বলে—
　"পরিহাস কর কি কারণ ?"
সাধু কহে—"নহে পরিহাস,
　যা বলেছি ঠিক সে বচন।
নিত্যই সেথানে লোক নিতেছে আশ্রয়,
তবে কহিব না তারে কেন লোকালয়!"

দেহ ও আত্মা

[শ্রীকালিদাস রায়, B. A.]

দেহের তৃষ্ণায় যথা　জন্মে পাপ, আত্মা নাহি
　যোগ দেয় তায়;
অনুতাপ গঙ্গাস্নানে　দূর করে স্পর্শজাত
　সব কালিমায়।
ও মিলন ক'দিনের!　কোন রূপে সহে আত্মা
　ক্ষমা ঘৃণা করি;
দেহাতীত চিরপ্রিয়　অনন্তের উত্তরীয়
　প্রান্তখানি ধরি।'

স্ত্রীশিক্ষার কথা

[শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, M. A.]

শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির মূল। ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই যে শিক্ষার সমান প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ কথা সকলে স্বীকার করিলেও আমাদের দেশের অবস্থানুসারে স্ত্রীশিক্ষার সমধিক বিস্তারের কোনরূপ সুব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল না। বঙ্গরমণীর শিক্ষা কি প্রকারের হওয়া উচিত এবং কিরূপ পদ্ধতিতেই বা তাহা প্রদত্ত হইবে, তাহা এখনও বিচারের গণ্ডী ছাড়াইয়া বড় বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

এইখানে হয়ত কেহ কেহ বলিয়া উঠিবেন, শিক্ষার আবার প্রকার ভেদ কি? মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি-সমূহের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি-সম্পাদনই যদি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে স্ত্রীপুরুষ ভেদে শিক্ষাপ্রণালীর কোন পার্থক্য হইবে কেন? অতএব "Let us have 'sweet girl graduates', by all means. They will be none the less sweet for a little wisdom; and the golden hair will not curl less gracefully outside the head by reason of there being brains within. *

[অর্থাৎ, যুবতী গ্রাজুয়েট সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। একটু শিক্ষা ও জ্ঞানের ফলে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কিছু হানি হইবে না; এবং মাথার মধ্যে মগজ থাকিলে তাহার বাহিরে কুঞ্চিত কেশের শোভা একটুও কমিবে না]

বিষয়টিকে খুব একটা উচ্চ আদর্শের দিক হইতে দেখিলে কথাটা যে মোটামুটি সত্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু সমাজ বিশেষের অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, শুধু একটা সার্ব্বজনীন উচ্চ আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিলে, আমরা যে বিশেষ কোন ফললাভ করিতে পারিব না, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের সমাজে বালিকাদের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে—সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে—বিবাহ হইয়া যায়; এবং সেই সময় হইতেই তাহাদিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইতে হয়। হিন্দুঘরের বিবাহিতা বালিকার স্কুলকলেজে গিয়া বিদ্যালাভের ব্যবস্থা একেবারে অসম্ভব। এই গোড়ার কথাটি স্মরণ রাখিয়া, আমাদিগকে এই গুরুতর বিষয়টি সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে।

যাঁহাদের মত উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা বলিবেন, এই বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথাই ত স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এই কুপ্রথাগুলিও ত আমরা উচ্ছেদ করিতে চাই। তাহা না হইলে বঙ্গরমণীর শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হইবে কিরূপে? ইঁহারা যে দুইটি প্রথাকে স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায়রূপে খাড়া করিতেছেন, সেগুলি যে বাঙ্গালীর মজ্জাগত, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? যতই কেন Marriage Reform League প্রভৃতি সমিতি-গঠনরূপ উপায় অবলম্বিত হইতে থাকুক না, বাঙ্গালী-বালিকার বিবাহের বয়স সাধারণতঃ চতুর্দ্দশের উপরে উঠিতে এখনও অনেক দেরী। যে দেশে জলবায়ুর গুণে বালিকারা দ্বাদশবর্ষেই নারীত্বে উপনীত হয় এবং যে দেশের সমাজ বহু-সম্বন্ধবিশিষ্ট একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপর আজও প্রতিষ্ঠিত আছে, সে দেশে চতুর্দ্দশের ঊর্দ্ধবয়স পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে অবিবাহিত রাখা যুক্তিসঙ্গত কি না, আমরা এখন সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না। কালস্রোতে হয়ত একান্নবর্ত্তিতা ভাসিয়া যাইবে, যৌবনবিবাহই হয়ত সাধারণপ্রথারূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং আরও কত কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে? কিন্তু সেই সুদূর ভবিষ্যতের অনির্দ্দেশ্য ভবিতব্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ত্তমানের সুনিশ্চিত সত্যকে অবহেলা করিলে চলিবে না। বর্ত্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এবং ইহার অনুযায়ী ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তনেই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। প্রথম হইতেই যদি আমরা বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা স্ত্রীশিক্ষার

* Prof. Huxley in his Science and Education.

অন্তরায় বলিয়া ধরিয়া লই এবং সর্ব্বাগ্রে উহাদের উচ্ছেদ-সাধনে চেষ্টিত হই, তাহা হইলে আসল কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। অতএব আধুনিক হিন্দুসমাজের এই দুইটি প্রথাকে মানিয়া লইয়া, তবে আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

কিন্তু এই বাল্যবিবাহ-প্রথাটি সত্যসত্যই কি খুব আধুনিক? অনেকে মনে করেন যে, মুসলমান-আমল হইতে উত্তর-ভারতে হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। একথা সত্য নহে। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে হয়ত বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না; কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই যে, হিন্দুসমাজে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ন্যায় মনীষিগণেরও মত। তিনি বলেন, "দ্রাবিড়জাতির মধ্যে যৌনসম্পর্ক অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল (promiscuous) ছিল। ইহারা যখন আর্য্য-সভ্যতার মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর্য্যদিগের একটা প্রধান চেষ্টা দাঁড়াইল, যেমন করিয়া হউক, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এই উচ্ছৃঙ্খল ভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আর্য্যজাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইল। ঋগ্বেদের সময় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না; কিন্তু মনুর সময়ে বাল্যবিবাহ সমাজে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। ঋগ্বেদের আর্য্যরা হয়ত শীতপ্রধান দেশে ছিলেন; সেখানে যৌবনোদ্গম কিছু দেরীতে হইয়া থাকে; বিবাহও একটু বয়সে হইত। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থানের ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য দেহযন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। যখন যৌবনোদ্গম অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হইতে আরম্ভ হইল, বিবাহের বয়সও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।" *

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, এবং তাহা সত্ত্বেও স্ত্রী-শিক্ষার কিরূপ ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা এখন আমাদের প্রণিধানযোগ্য। স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে, প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার অর্থ কি এবং কেন ইহা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। বেদবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, "পুরাকালে যখন ছাপাখানা ছিল না, এমন কি লিপির আবিষ্কারও হয় ত হয় নাই, যখন বেদবিদ্যা আচার্য্যদের মুখে মুখে থাকিত এবং মুখে মুখেই তাহা পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হইত, তখন বেদের মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণে যে বিপুলায়তন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাকে অবিকৃত রাখাই প্রাচীন আর্য্যদের একান্ত চেষ্টার বিষয় হইয়াছিল। কারণ, ইহা 'revealed scriptures'—ইহার একবর্ণ নষ্ট বা বিকৃত হইতে দেওয়া চলিবে না। এই জন্য প্রত্যেক দ্বিজ-বালককে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য আচার্য্যের বাড়ীতে গিয়া, শিক্ষালাভ করিতে হইত। গুরুগৃহে অবস্থান ব্যতীত বেদাভ্যাস সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বালিকার পক্ষে পরের বাড়ীতে অধিক বয়স পর্য্যন্ত থাকিয়া বেদ-অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। খুব সম্ভব, এই কারণেই স্ত্রীজাতি কালক্রমে বেদের ভাষা ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়াছে। বেদের ভাষা অবিকৃত না থাকিলে, বেদ-অধ্যয়নে কোন ফল নাই, ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। এই যে সঙ্কোচ এবং সঙ্কীর্ণতা, তাহা কেবল বেদের ভাষার পক্ষেই। এই ভাষাটা অনুপনীত স্ত্রী-জাতি এবং অনুপনীত শূদ্র জাতির নিকট হইতে যথাসম্ভব গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বেদের তাৎপর্য্য কাহারও নিকট গোপন করা হয় নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি ও শূদ্র জাতির নিকট—তাহাদের বোধ্য-ভাষায় বহুলভাবে বেদবিদ্যা প্রচারের জন্যই স্মৃতি শাস্ত্রের এবং বিশেষতঃ পুরাণেতিহাসের রচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-জ্যোতিষাদি সমুদায় বেদাঙ্গ কপিলাদি-প্রণীত সমুদায় দর্শনশাস্ত্র, মন্বাদি প্রণীত সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ-মহাভারতাদি সমুদায় কাব্য ও ইতিহাস এবং যাবতীয় পুরাণ, উপপুরাণ, ঐ স্মৃতিসাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। এ সমুদায়ই বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সমস্তটাই প্রচার করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। সুতরাং স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নাই—ইহার অর্থ এইমাত্র যে, বেদের ভাষায় তাহার অধিকার নাই; বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অধিকার নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।" *

* শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' ৮২—৮৩ পৃষ্ঠা।

* বিচিত্র প্রসঙ্গ—১৭০—৭৫ পৃষ্ঠা।

তবে এ কথাও বোধ হয় মিথ্যা নয় যে, এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার স্ত্রীজাতির সম্মুখে মুক্ত থাকিলেও, তাহারা সাধারণতঃ ইহার মধ্যে প্রবেশলাভ করিবার সুযোগ পাইত না। সংস্কৃত নাটক মাত্রেই দেখিতে পাই যে, স্ত্রী-চরিত্রগণ প্রাকৃতে কথা কহিতেছেন। প্রাকৃত যে অশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষা ছিল, তাহা সকলেই জানেন। হয়ত ইহা একটা নাটকীয় পদ্ধতি মাত্র ছিল। কিন্তু ইহা হইতেই তখনকার স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত অবস্থার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। উত্তর রামচরিতে সীতা প্রাকৃতে কথা কহিতেছেন, কিন্তু বাল্মীকি-শিষ্যা, লবকুশের প্রতিদ্বন্দ্বিনী আত্রেয়ীর ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। সুতরাং ভবভূতির সীতা যে বিদুষী ছিলেন না, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি প্রাচীন বিদুষীগণের উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, প্রাচীন-ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার বিলক্ষণ প্রচার ছিল। ইঁহাদের অসামান্যা মনীষা আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রতিকূল অবস্থা বা অনুকূল ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখে নাই। প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগেও দেখি যে, মনস্বিনী রাণী ভবানী অতি সামান্যমাত্র 'লেখাপড়া' জানিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রদর্শনাতে রাণী ভবানীর যে স্বাক্ষর প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা হইতে উক্ত মতই সমর্থিত হয়। বর্ত্তমানকালেও আমাদের বৃদ্ধা পিতামহী, মাতামহীগণের মধ্যে কয়জন লিখন-পঠন ক্ষমা ?

কিন্তু তাই বলিয়া কি সত্যসত্যই তাঁহারা অশিক্ষিতা ছিলেন ? ইংরাজীতে যাহাকে culture বলে, তাহা কি পূর্ব্বে আমাদের স্ত্রীজাতির মধ্যে ছিল না ? তাহা তখনই বরং খুব বেশী ছিল, আধুনিকযুগে তথাকথিত লেখাপড়ার চাপে তাহা ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রকৃত শিক্ষার গুণে যে, তাঁহারা নিরক্ষরা হইয়াও মহিমান্বিতা ছিলেন, তাহা এখন আমাদের বুঝিতে কষ্ট হইবে। কারণ বর্ত্তমানকালে literacy ও culture—লিখন-পঠন-ক্ষমতা ও প্রকৃত শিক্ষা—অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া আমরা মনে করি। ইহার যে অন্যথা হইতে পারে, তাহা এখন আমাদের কল্পনাতে আসে না। কিন্তু যখন দেখি, যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি তুচ্ছ সাংসারিক কার্য্যেও স্ত্রীকে স্বামীর সহায়তা করিতে হইত, যখন দেখি তিনি স্বামীর সংসারটিকে সুখের নন্দনে পরিণত করিতে হৃদয়ের অনন্ত প্রীতি ও অসীম করুণা ঢালিয়া দিতেন, তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, তাঁহাদের হৃদয়মন সত্যসত্যই প্রকৃত শিক্ষার আলোকে উদ্‌ভাসিত থাকিত। তাঁহারা 'লেখাপড়া' না শিখিয়াও এই জ্ঞানলাভ করিতেন.. কিরূপে, এবং কিরূপেই বা তাঁহাদের হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব উৎকর্ষ-সাধন সম্ভবপর হইত, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

অতি প্রাচীনকালে পুরাণেতিহাস দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য স্ত্রীজাতির মধ্যে কি উপায়ে প্রচারিত হইত, তাহা যদিও এখন ঠিক জানিবার উপায় নাই, কিন্তু 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' এই নির্দেশবাক্যটি যে কেবল একটা শূন্যগর্ভ আদর্শের ভাব খাড়া করিয়াই নিরস্ত থাকিত না, পরন্ত এতদনুযায়ী কার্য্যও হইত, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যেই যদি পুরাণাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, রামায়ণাদি-নিহিত শিক্ষার দ্বারাই ভারত-রমণীর চিরকাল চরিত্র গঠিত ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেটুকু বেদের আদিম তাৎপর্য্য, তাহা হয়ত পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু সীতা-সাবিত্রী, সতী-শৈব্যা, দময়ন্তী-দ্রৌপদী প্রভৃতি আর্য্য-নারীগণের চরিতাবলী ভারতরমণীর সম্মুখে যে মহোচ্চ আদর্শরূপে চির বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না। এই অপূর্ব্ব আদর্শের পূত আলোক যাহাতে সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত হয়, সেদিন পর্য্যন্ত সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি ছিল, এবং তাহারই প্রভাবে বালিকাগণের হৃদয়-কুসুম আপনি বিকসিত হইয়া উঠিত। ইহাই ছিল, তখনকার স্ত্রীশিক্ষা। গৃহে গৃহে রামায়ণ-মহাভারত পঠিত হইত। একজন কেহ পড়িতে জানিলেই হইল—অপর সকলে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। সন্ধ্যা হইলে দেবারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি যখন বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া বালিকাগণের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিত, তখন তাহারা ঠাকুরমাকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলিবার জন্য ধরিয়া পড়িত, আর ঠাকুরমাও তাহাদের এই আব্দার রক্ষা করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিতেন না। গ্রামে যখন কথকঠাকুর আসিয়া,

পৌরাণিক কাহিনী গাহিয়া, শ্রোতৃগণের মন নানারসে সিক্ত করিতেন, তখন বৃদ্ধা পিতামহী তাঁহার ছোট ছোট নাতিনীগণকে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। আবার যখন কোন উৎসব উপলক্ষে যাত্রার দল আসিয়া শান্ত সুপ্ত গ্রামটিকে আনন্দচঞ্চল করিয়া তুলিত, তখনও বালিকারা সীতা-শৈব্যার প্রাণগলানো অভিনয় দর্শন করিয়া, আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। এইরূপে তাহাদের হৃদয়নিহিত দেবভাবটি আপনি জাগিয়া উঠিত। তারপরে কত ব্রত, কত উপবাস, তাহাদের হৃদয়ে এই ভাবকে চিরজাগ্রত রাখিতে, এবং উল্লিখিত নানা উপায়ে লব্ধ শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিতে, সহায়তা করিত। ছোট ছোট মেয়েরা যখন দিনের পর দিন 'সীতার মত সতী হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব' বলিয়া ভগবানের পদে তাহাদের জীবনের কামনা নিবেদন করিত, তখন তাহাদের কল্পনায় যে একটা আদর্শ জীবনের ছবি ফুটিয়া উঠিত, তাহা কি তাহাদের চরিত্রগঠনের পক্ষে কম সাহায্য করিত ?

ইহাই ছিল, পূর্ব্বকালের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইহাতে বালিকাদের চরিত্রগঠন হইত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের মানসিক উন্নতি বড় বেশী হইত না। স্নেহ, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি সাধিত হইত, কিন্তু তাহাদের অজ্ঞতা দূরীভূত হইত না। তাহা হইলেও এই শিক্ষা বর্ত্তমান কালের তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। কারণ, রমণীর পক্ষে জ্ঞানার্জ্জন অপেক্ষা চরিত্রগঠনই যে, অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে বৈদেশিক ভাষা ও তৎসাহায্যে দর্শনেতিহাস, গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা দেশে উচ্চশিক্ষা নামে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু বিকৃত রকমের শিক্ষালাভ হয় বটে, কিন্তু ইহা যে হৃদয় ও চরিত্রোন্নতির বিশেষ সহায়তা করে না, তাহা ত আমরা চক্ষের সম্মুখেই দেখিতেছি। সুতরাং বঙ্গরমণীর এরূপ শিক্ষার পথে কোনরূপ সামাজিক প্রতিবন্ধক না থাকিলেও, আমরা ইহা তাহাদের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করিতাম না। যে শিক্ষার দ্বারা ভারতীয় বালক ও যুবকবৃন্দের মস্তিষ্ক নির্যাতিত হইতেছে, শরীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে এবং মন বিকল হইয়া তাহাদিগকে জড়পদার্থবৎ করিয়া তুলিতেছে, তাহা যে, আমাদের রমণীগণের পক্ষে একেবারে অনুপযোগী তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ? আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি। কিন্তু সে শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই, যাহার ফল এরূপ ভীষণ অনিষ্টকর না হইয়া সত্য সত্যই ভাল হয়।

যদিও আমরা বলি না যে, প্রাচীন ব্যবস্থাই খুব ভাল ছিল, এবং উহাই আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তথাপি ইহার সপক্ষে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর একটি কথা বলিবার আছে। তাহা এই যে, ইহা বঙ্গরমণীকে তাহার কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া তুলিত। সাম্যবাদীরা যাহাই বলুন না কেন, এবং য়ুরোপে যতই কেন সফ্রেজীষ্ট আন্দোলন হইতে থাকুক না, ভারতে স্ত্রী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র চিরকালই স্বতন্ত্র থাকিবে। পুরুষ বাহ্যজগতের সহিত সংগ্রাম করিবে, আর নারী অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাহার প্রেম ও সেবার হেমঝারি আনিয়া পুরুষের ধূলিমলা ধুইয়া মুছাইয়া দিবে, ভগ্নছিন্ন যোড়া দিয়া দিবে এবং সমস্ত পুঞ্জিত আয়োজন সার্থক করিবে—ইহাই হিন্দুর আদর্শ। ঋষিকল্প টলষ্টয় যখন বলিয়াছিলেন—"God made one law for man, the law of labour, and another for woman, the law of maternity." (ভগবানের নিয়ম এই যে পুরুষ পরিশ্রম করিবে আর স্ত্রী মাতৃত্ব-পদ গ্রহণ করিবে) তখন তিনি পরোক্ষভাবে এই হিন্দু আদর্শই সমর্থন করিয়াছিলেন। আগেকার শিক্ষাতে হিন্দুরমণী হৃদয়ের নানা সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়া, অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে বিরাজ করিতেন এবং মাতৃত্বপদের গৌরব-বৃদ্ধি করিতেন।

কিন্তু সে দিন আর নাই। বঙ্গবালিকা এখন আর সে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। অতীতের আদর্শও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। এবং তাহার স্থলে নূতন কিছুও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। ফলে, অক্ষরজ্ঞান-হীনা অথচ অনিন্দ্যচরিতা গৃহলক্ষ্মীর স্থলে এখন নাটক-নভেল-পড়া, সুশিক্ষাবর্জ্জিতা, কর্ম্মকুণ্ঠা—বঙ্গরমণী ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। লাভ হইয়াছে—অক্ষরজ্ঞান মাত্র, কিন্তু যাহা গিয়াছে, তাহার মূল্য নাই!

কালের প্রবাহে যাহা ভাসিয়া যাইতেছে, এবং প্রতিকূল

অবস্থা যে বিলোপ-সাধনের সহায়তা করিতেছে, তাহার জন্য এখন আর বিলাপ করিয়া ফল কি? এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, বর্ত্তমান কালের উপযোগী এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অথচ সহজ স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করা। একটা যে খুব নূতন কিছু করিতে হইবে, তাহা নয়। কিন্তু যাহাই করিনা কেন, অতীতের সহিত যোগের সূত্রটি যাহাতে ছিন্ন না হয়, আমাদের প্রাচীন আদর্শের উপরই যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে স্ত্রীজাতিকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই; আবার ইংরাজী শিক্ষা কথঞ্চিৎ পরিমাণে না পাইলে যে, তাহারা আমাদের প্রকৃত সহ-ধর্ম্মিণী হইতে পারিবে না, এরূপ মনে করাও ভুল। ভারতের শাশ্বত আদর্শের সহিত আধুনিক নূতন ভাবের সমন্বয় বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাব বহুল-পরিমাণে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত পরিচয়ের ফলে বঙ্গরমণী যে, আধুনিক ভাবজগতের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচিত হইবে, তাহা আশা করিতে পারা যায়। অতএব কেবল বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া যাবতীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও, তাহারা 'সেকেলে' হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য যাহাদের সুযোগ ও সুবিধা আছে, তাহারা ইংরাজী শিখিতে পারে এবং ইচ্ছামত নিজেদের জ্ঞানপিপাসা মিটাইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষায় যতটা শিক্ষা সম্ভব, তাহাই আমাদের স্ত্রীজাতিকে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে শিক্ষা ঠিক কিরূপ হইবে, তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে যেরূপ ব্যবস্থাই হউক না কেন, মানসিক উন্নতি নৈতিক শিক্ষার সহগামিনী হওয়া চাই।

এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বাড়ীতে হয় ভালই, নহিলে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে। এখন কেবল সহরগুলিতেই বালিকা-বিদ্যালয় আছে; কিন্তু প্রয়োজনবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ গ্রামে গ্রামে বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে বাঙ্গালীর যে ঔদাসীন্য আজপর্য্যন্ত প্রায় অটুট রহিয়াছে, তাহা দূর না হইলে, এই প্রয়োজনের সৃষ্টি হইবে না।

কিন্তু এই ঔদাসীন্যের একটা কারণও আছে। তাহা আমাদের দারিদ্র্য। যে দেশে অর্থাভাবে দরিদ্র পিতা অনেক সময়ে পুত্রগণেরই সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন না, সে দেশে যে কন্যাগণের শিক্ষাসম্বন্ধে তিনি উদাসীন হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। আর তাঁহার অপরাধই বা কি? একে তাঁহার আয় সাধারণতঃ অতি সামান্য, তাহার উপর দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন অত্যধিক বাড়িয়া যাইতেছে, এবং পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ও বড় কম নহে। সুতরাং তিনি যে স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যাগণকে প্রেরণ না করিয়া, অবৈতনিক মিশনারি স্কুলে 'গুরুমা'দের হস্তে তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন, কিংবা তাহাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন না, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এই ভাগলপুরে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় আছে। কিন্তু যদিও এখানে অন্যূন পাঁচ সহস্র বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীর বাস, তথাপি এই বিদ্যালয়ের ভাগ্যে কখনও পঞ্চাশটি ছাত্রীলাভও ঘটে নাই। অথচ এখানে একাধিক মিশনারি স্কুলে মেয়ে ধরে না।

সুতরাং এই দারিদ্র্যই যে, বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার সঙ্গে আরও একটি গুরুতর কারণ বালিকাদের শিক্ষার পথে বিলক্ষণ বাধা প্রদান করিতেছে। তাহা বিবাহে যৌতুকদানপ্রথা। ইহা যদিও পূর্ব্বোক্ত আসল কারণ দারিদ্র্যেরই অন্তর্ভুক্ত, তাহা হইলেও ইহার জন্যই অনেকে কন্যাদের শিক্ষাদানে অসমর্থ হইতেছেন বলিয়া মনে হয়। কন্যার বিবাহকালে দরিদ্র গৃহস্থকে যদি অন্যূন দ্বিসহস্র মুদ্রা বরের পিতাকে দিতে বাধ্য হইতে না হইত, তাহা হইলে হয়ত তিনি কন্যার শিক্ষার বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন।

দারিদ্র্যের উপর আমাদের কোন হাত নাই। দেশ দিন দিন কেন এত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং এই দারিদ্র্য-নিবারণের কোন উপায় আছে কি না, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার এ স্থল নহে। কিন্তু যে মহানর্থকর কুপ্রথা এই দেশব্যাপী দারিদ্র্যকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে, তাহার উচ্ছেদসাধন আমাদের অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে যুবকগণের চেষ্টা যত কার্য্যকরী হইতে পারে, তত বোধ হয়, আর কিছু হইবে না। তাঁহারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, বিবাহে পণ-গ্রহণ করিবেন না এবং একেবারে

অশিক্ষিতা বালিকাও বিবাহ করিবেন না, তাহা হইলে এক দিকে যেমন এই প্রথার মূলে কুঠার পড়ে, অপর দিকে তেমনই আবার স্ত্রীশিক্ষারও প্রসার দিন দিন বাড়িয়া যায়। স্বদেশের হিতকল্পে তাঁহাদের নানারূপ উদ্যম ত এখন অনেক দিকে পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশের এই কলঙ্ক দূর করিয়া স্ত্রীশিক্ষার পথ সুগম করিতে কি তাঁহারা বদ্ধ-পরিকর হইবেন না ?

কিন্তু যতক্ষণ না সে শুভ মুহূর্ত্ত আগত হয়, ততক্ষণ কি বাঙ্গালী স্বস্ব কন্যাগণের শিক্ষাবিষয়ে এইরূপ উদাসীনই থাকিবেন ? দারিদ্র্যসত্ত্বেও সাধ্যমত বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা নহিলে তাঁহাদের এবং সমাজের মঙ্গল নাই,—এই কর্ত্তব্য বুদ্ধি কবে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিবে ? কবে আমরা অবৈতনিক মিশনরি স্কুলে কন্যা-প্রেরণের কুফল সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজেরাই মেয়েদের জন্য অল্প ব্যয়সাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব ? সেদিন লীডার (Leader) পত্রিকায় শ্রীমতী আনি বেসান্তের 'How to uplift the womanhood of India' নামে একটি পত্র বাহির হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বলিতেছেন, 'ভারতবাসী যদি নিজের মঙ্গল চান, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই মিশনরি স্কুলে মেয়েদের পাঠাইবেন না। তাঁহাদের জাতীয় শিক্ষা যদি তাহাদের না দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের উন্নতির আশা নাই। খৃষ্টান প্রভাব যে কতটা অনিষ্টসাধন করিতে পারে, পণ্ডিতা রমাবাইএর উদাহরণ হইতে তাহা বুঝা যায়। এই মনস্বিনী মহিলা ভারতীয় রমণীগণের নেত্রী হইয়া, দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, শিক্ষার দোষে তিনি দেশের কোন কাজই করিতে পারিলেন না !'

অতএব প্রত্যেক পিতাকে কন্যাগণের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে ; এবং মিশনরীদের হাতে এই শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

কিন্তু কন্যার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ত পিতার দায়িত্ব এক প্রকার শেষ হইয়া যায়। সেই সঙ্গে কি বালিকাদের শিক্ষারও অবসান হইবে ? ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহারা যে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহা আর কতটুকু ? সুতরাং বিবাহের পর শ্বশুরালয়েও তাহাদের শিক্ষা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে, তাহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। গৃহস্থালী শিক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি না ; কারণ হিন্দুর অন্তঃপুরে কন্যা ও বধূগণ সে শিক্ষা অতি সুন্দর রূপেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এখানে আমরা যে শিক্ষার কথা বলিতেছি, তাহা যদিও কোন কোন স্থলে পিতৃগৃহে বালিকাগণ সামান্যমাত্র পাইয়া থাকে, শ্বশুরালয়ে কিন্তু বধূগণের তাহার সহিত বড় একটা সম্পর্ক রাখিবার সুযোগ হয় না। তাঁহাদের লেখাপড়া এখানে সাধারণতঃ চিঠিলেখা ও উপন্যাস-পড়ায় পরিণত হয়। বালিকা বধূগণের অবসরের বড় অভাব হয় না। এই প্রচুর অবসর যদি আলস্যে অপব্যয়িত না হইয়া, বিদ্যাচর্চ্চায় নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে বিপুল ফললাভ হয়।

এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সুখের বিষয় 'ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল' এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন ; এবং শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী প্রমুখ কয়েক-জন উন্নতহৃদয়া মহিলা অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষার এক রকম বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এ জন্য ইঁহাদের সকলেরই নিকট দেশ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও বড় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাকে আরও বিস্তৃত করিতে হইবে। শুধু কলিকাতায় নয়, প্রতি সহরে, এবং ক্রমে বড় বড় অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। আপাততঃ এইরূপ ব্যবস্থা-অনুসারেই কাজ চলিতে পারে। ভবিষ্যতে হয়ত অন্তঃপুরিকাগণের—শিক্ষার আরও ভাল ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন এইরূপেই স্ত্রীশিক্ষার পথ সুপ্রসারিত করিতে হইবে। এই কার্য্যে পুরুষেরাও নানারূপে উদ্যমশীলা মহিলাগণের সহায়তা করিতে পারেন।

এই অন্তঃপুর-শিক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যয়-সাপেক্ষ। ধনী এবং স্বচ্ছল গৃহস্থগণের পরিবারেই এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইতে পারে। যে সকল সংসারে বধূদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় সম্ভবপর নয়, সে সকল স্থলে তাঁহাদের শিক্ষার ভার স্বামীদের গ্রহণ করিতে হইবে। বালিকা-পত্নীর মানসিক ও নৈতিক উন্নতি-বিধান যে পতির একটা প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারা ভুলিলে চলিবে কেন ? এখন, স্বামী যদি

'বলেন যে, স্ত্রীকে পড়াইবার সময় তাঁহার নাই, তাহার উত্তর এই যে, তাঁহাকে স্বয়ং পত্নীর শিক্ষকতা করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পত্নী যাহাতে অবসরকালে নিজের উদ্যমে লেখা-পড়া করেন, তাহার ব্যবস্থা ত তিনি করিয়া দিতে পারেন। তারপর তাঁহার নিজের যখন অবসর হইবে, তখন তিনি পত্নীর শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিবেন। ইহা কি একেবারে অসম্ভব! আর হিন্দুসমাজে পতি-পত্নীর মধ্যে গুরুশিক্ষার সম্বন্ধও অস্বাভাবিক নহে।

কিন্তু অল্পবয়স্কা বধূগণের নিজেদের লজ্জা কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা গুরুতর প্রতিবন্ধক হওয়া সম্ভব। হিন্দুনারী স্বভাবতঃ অত্যন্ত লজ্জাশীলা। কিন্তু এই লজ্জা যদি এরূপ উৎকট আকার ধারণ করে যে, ইহা তাঁহাদের শ্বশুরবাড়ীর শিক্ষালাভের অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তখন আর ইহার প্রশংসা করা যায় না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ তাঁহার 'ধ্রুব-তারা' নামক উপন্যাসে অনিন্দ্যচরিতা বালিকাবধূ বনলতার চরিত্রে লজ্জার এই আধিক্য অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। সে যাহাই হউক, এই লজ্জার মূলে সাধারণতঃ নিন্দাভয়ই প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং পুত্রের ইচ্ছানুসারে মাতা যদি বধূর শিক্ষায় আগ্রহ-প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই নিন্দাভয় তিরোহিত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে লজ্জাও চলিয়া যায়। বর্ত্তমান কালে এরূপ সঙ্কীর্ণ-হৃদয় শাশুড়ী বোধ হয়, খুব কমই আছেন, যাঁহারা বধূগণের এই শিক্ষা-ব্যাপারটা পছন্দ না করিতে পারেন। সুতরাং বিবাহিত যুবকগণ ইচ্ছা করিলে যে, অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, স্ব স্ব পত্নীদিগকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী করিয়া তুলিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

জানি না, কবে বাঙ্গালীর সে শুভদিন আসিবে, যখন সকলের সমবেত চেষ্টার গৃহে গৃহে স্ত্রীশিক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং সুশিক্ষিতা জননীগণের প্রভাবে বাঙ্গালী সন্তান 'একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্' হইয়া বঙ্গে নূতন যুগ আনয়ন করিবে।

পল্লীবাণী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, B. A.]

জড়ানো শ্যাম-শ্যামলতাতে নদীতীরের গুল্মগুলি,
স্বচ্ছতরল মুকুরপানে হর্ষে চেয়ে উঠছে দুলি।
ওই যেথা ওই শশক চরে শঙ্কাবিহীন হৃষ্টমনে,
মিশছে নদীর কলধ্বনি মৌমাছিদের গুঞ্জরণে।
ঝরাপাতার আসন পাতা গাছটিভরা মল্লিকাতে,
আসছে ভেসে ফুলের পরাগ শীতল শীকর সিক্তবাতে,
প্রকৃতির ওই নর্ম্ম গৃহে, শোভার প্রমোদভবন মাঝে,
মোদের বাণীর মৌন মুখর মধুর বীণা নিত্য বাজে।

ওই যে বিশাল হর্ম্ম্য ভাঙা, জঙ্গলেতে পূর্ণবাড়ী,
চঞ্চলা তাঁর পেচক রাখি, অনেক দিবস গেছেন ছাড়ি।
পড়ছে ঝরি চূর্ণবালি সব, জীর্ণ কবাট বন্ধ থাকে;
ভগ্ন পূজার আঙ্গিনাতে দিন দুকুরেই শৃগাল ডাকে।
রুগ্ন বালক-পৌত্র লয়ে হোথায় থাকে একলা বুড়ী,
করবীর ওই ক্ষীণ শাখাতে একটি হের ফুলের কুঁড়ি।
অতীত সুখের পাষাণ-লিপি ধরার মাঝে বড়ই দীনা,
ওই বাড়ীতে মোদের বাণীর বাজে করুণ মধুর বীণা।

শস্পশ্যামল মাঠের মাঝে ওই দেখ ওই অশথ ছায়ে,
পল্লীবাসীর ভক্ত রাখাল কতই গীতি নিত্য গাহে।
কোন্ যুগে কোন্ অতীত দিনে মাঠে গেল ফসল "মারা"
পঙ্গপালে শস্য সকল করেই গেল ছিন্নছাড়া!
কোন্ যুগে কোন্ জমিদারের মারা গেছে তনয় বুঝি
রাখালগণের কণ্ঠগীতি আজো তারে বেড়ায় খুঁজি।
অতীত দিনের ক্ষুদ্র কথা, দুঃখ-সুখ ও কান্নাহাসি,
মোদের বাণীর মৌন মুখর বীণার স্বরে উঠছে ভাসি।

ঠেলে রেখে কাজের বোঝা, বন্ধ করে বইএর পাতা
মায়ের বিজন মন্দিরেতে এসো তোমায় ডাকছি ভ্রাতা!
আজকে শ্যামল মাঠ যে আলো বেগুনী ওই "মসনে ফুলে"
মেঠোঝিঞার সতেজ লতা পড়ছে ঝুলে নদীর কূলে;
বেগুন-খেতের কুটীর হতে মিঠা মেঠো আসছে গীতি,
নূতন আমের মঞ্জরীতে আনছে টেনে সুদূর স্মৃতি।
পল্লীরাণীর শান্ত গৃহে পল্লীরাণীর স্নিগ্ধছবি
দেখ্‌তে সবায় ডাকছি আমি—এসো ভাবুক—ভক্ত—কবি।

কুমুদের বন্ধু

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, B. A., BAR-AT-LAW.]

"গিরৌ ময়ূরা গগনে পয়োদা
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধু-
র্যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্॥"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা ৺রজনীকান্ত সোম মহাশয়ের পুত্র কুমুদনাথ আজ লণ্ডনে মহা বিপন্ন।

পিতার জীবিতকালেই ভেষজ-রসায়ন অধ্যয়ন করিবার জন্য সে বিলাতে আসিয়াছিল। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র কুমুদ যখন যত টাকা চাহিত, পিতা তাহাই পাঠাইয়া দিতেন; মাসিক বরাদ্দও অন্যান্য ছাত্রের অপেক্ষা কুমুদের অনেক অধিক ছিল। সুতরাং তাহার চাল অত্যন্ত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। দুই বৎসর পিতার মৃত্যু হইয়াছে—তাহার পিসে মহাশয় এবং দোকানের ম্যানেজার ব্যবসায় চালাইতেছেন। ম্যানেজারের আমল হইতে কুমুদের টাকার যোগান কিঞ্চিৎ কম পড়িয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু মাসে মাসে নিয়মিত ভাবেই টাকা আসিত। এদিকে দুই আড়াই মাস আর টাকা আসে নাই। কুমুদ প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখিয়া তাগিদ করিয়াছে—ইদানীং দুইখানা টেলিগ্রামও করিয়াছে। কিন্তু এপর্যন্ত কোনও উত্তর পায় নাই।

আজ সোমবার—ভারতবর্ষীয় ডাক আসিবে। চিঠির মধ্যে টাকার ড্রাফ্‌ট আসে, কি না আসে, এই চিন্তায় গত রাত্রি কুমুদের ভাল করিয়া নিদ্রা হয় নাই। সাতটা না বাজিতেই আজ সে শয্যাত্যাগ করিল—অন্যদিন আটটার পূর্ব্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

লণ্ডনের বেজ্‌ওয়াটার নামক অংশে কুমুদ্ লইয়া বাস করে। প্রতি সপ্তাহে ল্যাণ্ডলেডিকে টাকা দিবার কথা—আজ দুইমাস কাল কুমুদ তাহাকে একটি পয়সাও দিতে পারে নাই। উপরন্তু বন্ধুবান্ধবগণের নিকট—কাহারও কাছে দুই পাউণ্ড, কাহারও কাছে চারি পাউণ্ড—এইরূপ করিয়া অনেক টাকা ধার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ ডাকে তিন মাসের টাকাটা যদি আসিয়া পড়ে, তবেই মঙ্গল, নচেৎ কুমুদকে মহাকষ্টে পড়িতে হইবে।

শয়নকক্ষটির আসবাবগুলি সুন্দর ও মহার্ঘ্য। চারিদিকের দেওয়াল ধূসর ও স্বর্ণবর্ণ চিত্রিত কাগজে আবৃত। মেঝের উপর পুরু গালিচা-পাতা। দেওয়ালের একস্থানে একটি মোটা রেশমের ফিতা ঝুলিতেছে—কুমুদ উঠিয়া তাহার হাতলটি টানিয়া ধরিল। একমিনিট পরে গৃহদাসী দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কি মহাশয়?"

"ডাক আসিয়াছে?"

"না—এখনও আসে নাই।"

"গরম জল লইয়া আইস।"

গরম জল আনিলে, মুখ ধুইয়া কুমুদ পোষাক পরিতে

আরম্ভ করিল। পরিধান-শেষে সোণার সিগারেট-কেসটি খুলিয়া দেখিল, একটিও সিগারেট নাই। গতকল্য তাহার সিগারেট ফুরাইয়াছিল, অর্থাভাবে নূতন বাক্স কিনিতে পারে নাই। সে তখন ম্লানমুখে প্যাণ্টালুনের দুই পকেটে দুই হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইল।

মে মাস। বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া দুগ্ধবিক্রেতার গাড়ী, রুটিওয়ালার গাড়ী, বাড়ী বাড়ী যোগান দিয়া ফিরিতেছে।

ক্রমে দূরে ডাকওয়ালার মূর্ত্তি দেখা গেল। ক্রমে সে এই বাড়ীর নিকটবর্ত্তীও হইল। কুমুদ তখন ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া গেল।

চিঠি আসিল—কিন্তু কৈ—সোম-কোম্পানির ছাপা লেফাফা ত নাই! ম্যানেজারের পত্র আসে নাই—টাকা আসে নাই—কুমুদের মাথা ঘুরিতে লাগিল।

অন্যান্য পত্রগুলি লইয়া ধীরে ধীরে সে নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। সেগুলি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে এই পত্রখানি পাইল—

কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল।

ভাই কুমুদ,

তোমার পত্র গত রবিবার দিন পাইয়াছি। তোমার টাকা যাইতে কেন বিলম্ব হইতেছে জানিবার জন্য সোমবার দিন তোমাদের আপিসে গিয়াছিলাম। ম্যানেজার বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দোকানে যিনি ছিলেন, তিনি বলিলেন, ম্যানেজার বাবু আজকাল দোকানে বড় আসেন না।

বাজারে গুজব—"সোম কোম্পানি" ফেল হইবে। তোমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তোমার পিসে মহাশয়ের সহিত যোগসাজসে ম্যানেজার বাবু নাকি দোকানের টাকা ভাঙিতে আরম্ভ করেন। দোকানের দেনার দায়ে তোমাদের বসতবাটীখানি নীলাম হইয়া গিয়াছে, উহা নাকি তোমার পিসে-মহাশয় একজনের বেনামীতে কিনিয়া লইয়াছেন।

আমি বিশস্তসূত্রে অবগত হইলাম, আগামী ১লা জুন তারিখে ম্যানেজার ইন্‌সলভেন্সির দরখাস্ত করিবেন। দোকানের জিনিষপত্র তিনি সরাইতেছেন এবং মিথ্যা হিসাবাদিও প্রস্তুত করিতেছেন।

তুমি যদি ১লা জুনের পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিতে পার এবং ম্যানেজারকে দত্ত ক্ষমতাপত্র প্রত্যাহার করিয়া লও, তবেই তোমার দোকানটি বাঁচে। নহিলে সর্ব্বস্বই গেল। কোনও এটর্ণি বন্ধুর নিকট সকল বিষয় অবগত হইয়া, আমি তোমাকে এ পত্র লিখিলাম।

আমরা সকলে ভাল আছি। তোমার শীঘ্র আসা একান্ত আবশ্যক।

তোমার স্নেহের—হরিপদ।

পত্র পড়িয়া কুমুদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আজ ১৩ই মে, ১৭ই মে শুক্রবার মার্সেলস্‌ হইতে পি, এণ্ড ও.-কোম্পানির জাহাজ ছাড়িবে। সে জাহাজ ধরিতে পারিলে, ৩১শে মে বোম্বাই এবং ২রা জুন কলিকাতায় পৌঁছান যাইবে—নিষ্ফল!

'সময়-মত পৌঁছান যাইতে পারে, এমন কোনও ফরাসী বা ইতালীয় জাহাজ যদি থাকে! আর গাড়ীভাড়ার টাকা? হাতে গোটা পাঁচ ছয় পেনি মাত্র আছে—আর ত কিছুই নাই। কুমুদ জানিত, ফরাসী এবং ইতালীয় জাহাজে থার্ডক্লাসও আছে—অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়া। যদি ধার করিয়া সংগ্রহ হইয়া উঠে।

দাসীকে ডাকিয়া কুমুদ বলিল—"আমাকে শীঘ্র এক পেয়ালা চা এবং কিছু খাবার আনিয়া দাও, আমি এখনই বাহির হইব।"

পনেরো মিনিট পরে দাসী দুইটি সিদ্ধ ডিম, কয়েক টুকরা রুটির টোষ্ট, মাখন ও মার্ম্মালেড এবং চা আনিয়া দিল। তাড়াতাড়ি কোনও মতে তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া, ছড়ি লইয়া কুমুদ বাহির হইয়া পড়িল।

লাড্‌গেট-সার্কাসে টমাস কুক কোম্পানির হেড আফিস। সেখানে গিয়া সংবাদ লইয়া কুমুদ জানিতে পারিল, যদি আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিতে পারে, তবে মার্সেল্‌সে সে একখানি ফরাসী জাহাজ ধরিতে পারিবে। সে জাহাজে সময়মত বোম্বাই পৌঁছিবে।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল—"এত বিলম্বে টিকিট কিনিলে, জাহাজে স্থান পাইব ত?"

কর্ম্মচারী বলিল—"এখন গ্রীষ্মকাল—ভারতগামী জাহাজের পক্ষে slack season—যে সব জাহাজ ভারত

হইতে আসিতেছে, সেইগুলি যাত্রীতে বোঝাই। স্থান যথেষ্ট হইবে।"

"আমি কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে যাইব।"

"তৃতীয় শ্রেণীতেও যথেষ্ট স্থান।"

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াও কুমুদ জানিয়া লইল। হিসাব করিয়া দেখিল, সর্ব্বসুদ্ধ ২৫ পাউণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিলে, কোনও গতিকে সে, কলিকাতায় পৌছিতে পারে।

কুমুদ তখন বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট ঋণপ্রার্থনা করিবার জন্য বহির্গত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা যখন পাঁচটা, তখন হাইগেটের অমনিবস হইতে পিকাডিলির মোড়ে কুমুদ নামিল।

তাহার মুখ শুষ্ক—চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে।

সারাদিন বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও সাত পাউণ্ডের অধিক সংগ্রহ হয় নাই। এখনও ১৮ পাউণ্ডের অস্থিতি!

বন্ধুরা সকলে এখানে থাকিলেও বা হইত—অনেকেই সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মযাপন করিতে গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর কুমুদও গিয়া থাকে, এ বৎসর কেবল অর্থাভাবেই সে যাইতে পারে নাই। যাহাদের অর্থের অনটন—সেই সকল ছাত্রই লণ্ডনে পড়িয়া আছে।

ধার চাহিতে গিয়া দুই একস্থানে কুমুদ একটু অপমানিতও হইয়াছে। সে দারুণ অভিমানী।

প্রাতে সেই দুইটি ডিম খাইয়া বাহির হইয়াছিল—এখনও পর্য্যন্ত সে আর জলস্পর্শও করে নাই। মানসিক উদ্বেগে ক্ষুধার কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছে—কিন্তু তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল।

অমনিবস হইতে নামিয়া মোড়ে দাঁড়াইয়া কুমুদ ভাবিতে লাগিল। যাহাদের যাহাদের কাছে যাইবার—সে সকলই শেষ হইয়াছে। আরও দুই চারিজন পরিচিত ছাত্র আছে বটে—কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠতা নাই। হাত পাতিতে গিয়া আবার যদি অপমানিত হইতে হয়?—তা ছাড়া, তাহাদের মধ্যে হইতে ১৮ পাউণ্ড সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব।

কুমুদ ভাবিতে লাগিল—"এখন কি করি?—বাসায় ফিরিয়া যাইব? ফিরিবা মাত্র ল্যাণ্ডলেডি তাহার সুদীর্ঘ বিলখানি আনিয়া হাজির করিবে।"

কিয়দ্দূরে একটি উচ্চশ্রেণীর পানশালার সাইনবোর্ড দেখা যাইতেছিল। কুমুদ তাহার শ্রান্ত পদদ্বয় ধীরে ধীরে সেইদিকে চালনা করিল। সেলুন বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একগ্লাস হুইস্কি ও সোডা হুকুম করিল।

পরিচারক যথাসময়ে পানীয় আনিয়া দিল। কুমুদ হুহু করিয়া তাহা অর্দ্ধেকের উপর এক নিংশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর টেবিলের উপর দুই কুনুই রাখিয়া, দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নিজ অদৃষ্টচিন্তা করিতে লাগিল।

সময়মত দেশে পৌছান অসম্ভব—সুতরাং সমস্তই গেল। তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইল। দেশ হইতে টাকা আর আসিবে না। পূর্ব্বে হইতে যাহাদের কাছে ঋণ লইয়াছে—তাহাদের টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে না—তাহারা বলিবে কুমুদ জুয়াচোর! ল্যাণ্ডলেডি সম্ভবতঃ উঠিয়া যাইবার জন্য নোটিশ দিবে—বাকী টাকার জন্য জিনিষপত্রগুলি আটক করিবে। পরদিন এক টুকরা রুটির জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া তাহাকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে।

কুমুদ মাথা তুলিল। গেলাসে অল্প যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা পান করিল। পরিচারক প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি তাজা সান্ধ্য-সংবাদ পত্র রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর এক গ্লাস আনিব কি?"

"অর্দ্ধমাত্রা লইয়া এস"—বলিয়া কুমুদ সংবাদপত্র খুলিল। অলসভাবে ইতস্ততঃ চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে, বড় বড় অক্ষরে তিনছত্র হেডলাইন দেওয়া অর্দ্ধ কলম-ব্যাপী একটি সংবাদ দেখিতে পাইল। পড়িয়া জানিল—লিভারপুল-নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত বণিক, ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এবং ঋণশোধের কোনও উপায় না দেখিয়া, গত রাত্রে নিজ আপিসকক্ষে বসিয়া রিভলভারের দ্বারায় আত্মহত্যা করিয়াছেন।

পড়িয়া কুমুদ আপন মনে বলিল—"ঠিক ত!—পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না—এই ত পথ রহিয়াছে।"

পরিচারক অর্দ্ধমাত্রা হুইস্কি এবং বিলখানি আনিয়া দিল। মূল্য দিয়া, হুইস্কিটুকু পান করিতে করিতে

কুমুদ ভাবিতে লাগিল—"কে কাঁদিবে? বাবা নাই, মা নাই, ভাই নাই। বোনেরা আছে, তারা কাঁদিবে। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিবে। আর—না, সে বোধ হয় কাঁদিবে না। শাদা কখনও কালোর জন্য কাঁদে?"

হুইস্কিটুকু নিঃশেষ করিয়া কুমুদ মনে মনে বলিতে লাগিল—"যদি বাঁচিয়া থাকি—তবে প্রথমটা ত জুয়াচোর খেতাবটি মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। তাহার পর জীবিকা-সংগ্রহের জন্য এ দেশে কত লাঞ্ছনাই যে ভোগ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা কি? বাঁচিয়া কি সুখ হইবে? তার চেয়ে—সন্ধ্যার পর হাইডপার্কে বসিয়া, গুড়ুম করিয়া একটি আওয়াজ—এবং সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।"

কুমুদ যেন কল্পনায় দেখিতে লাগিল, পরদিনের সংবাদ পত্রগুলিতে বড় বড় হেডলাইন ছাপা রহিয়াছে—

HYDE PARK TRAGEDY

AN INDIAN STUDENT

SHOOTS HIMSELF

WITH A REVOLVER.

কিয়ংক্ষণ পরে টেবিল ধরিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল-তাহার চক্ষু তখন লাল জবাফুলের মত। পরিচিত কেহ যদি সে অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইত, তবে ভিতরকার কোনও কথা না জানিয়াও শোকাকুল হইয়া উঠিত।

পানশালা হইতে বাহির হইয়া, কুমুদ অমনিবস লইল। হবর্ণে একটি বন্দুকের দোকানে গিয়া একটি ভরা-রিভলভার খরিদ করিল। কোটের ভিতরদিককার বুক পকেটে সেগুলি লুকাইয়া নিজ কলেজের কমনরুমে গিয়া কতকগুলি পত্র লিখিতে বসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুমুদ বসিয়া একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিল। ভারতবর্ষের জন্য দুইখানি মাত্র—বাকীগুলি এখানকার বন্ধু-বান্ধবকে। যাহাদের নিকট টাকা ধার লইয়াছিল—তাহাদিগকে লিখিল—"দেশে আমি পত্র লিখিতেছি, আমার দোকানের যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেখান হইতে তোমাদের টাকাগুলি পরিশোধ হইবে। তাহা যদি না থাকে, তবে ভাই সে টাকা আমায় ঋণ দিয়াছিলে বলিয়া আর মনে করিও না, তোমাদের হতভাগ্য বন্ধুকে অসময়ে দান করিয়াছিলে বলিয়াই ধরিয়া লইও।" ল্যাণ্ডলেডিকে লিখিল—"আমার বহি, জিনিসপত্র বেচিয়া তোমার প্রাপ্য টাকা লইও। যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা ভিখারীদের দান করিও।"—আর একজনকে একখানি পত্র কুমুদ লিখিবে ভাবিল। কলম হাতে করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। শেষে না লেখাই স্থির করিল।

পত্রগুলি পকেটে লইয়া কুমুদ উঠিল; রাত্রি তখন আটটা—কিন্তু গ্রীষ্মকালে এ সময়ে লণ্ডনে সুস্পষ্ট দিবালোক। কলেজ হইতে বাহির হইয়া, একটা পোষ্ট-আপিসে দুইখানি টিকিট খরিদ করিয়া, ভারতবর্ষীয় চিঠি দুখানিতে লাগাইল। সে দুখানি ডাকে ফেলিতে যাইতেছিল—কিন্তু ভাবিল—না, অন্যান্য চিঠিগুলির সহিত এ দুখানিও পকেটেই থাকুক। কল্য পুলিস এগুলি পোষ্ট করিয়া দিবে।

পকেটে হাত দিয়া দেখিল, রিভলভার ও ডাকটিকিট কিনিয়া চারিটি পেনি আর অবশিষ্ট আছে। এইবার হাইড্‌পার্কে যাইতে হইবে। অমনিবসের ভাড়া একপেনি, হাইডপার্কে যে চেয়ারখানিতে বসিয়া অন্ধকার ও নির্জ্জনতার প্রতীক্ষা করিবে—তাহার ভাড়া একপেনি দিতে হইবে। বাকী দুইটি পেনি থাকে—পৃথিবীতে সে-দুটিতে আর তাহার কোনই আবশ্যক নাই। ছেলে কোলে করিয়া একজন ভিখারিণী যাইতেছিল—কুমুদ পেনি দুইটি তাহাকে দিল। "God Bless you Sir"—বলিয়া রমণী সরিয়া গেল।

অমনিবস আসিল। হাইড্‌পার্কের মার্ব্বল্ আর্চ্চ নামক ফটকের সম্মুখে কুমুদ যখন নামিল, তখন সাড়ে আটটা। হাইডপার্কে প্রবেশ করিয়া সে ভাবিল, "আর আধঘণ্টা! আধঘণ্টা পরে অন্ধকার হইবে।"

এখনও বিস্তর নর-নারী পার্কের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে ঘাসের উপর যোড়া যোড়া চেয়ার—প্রায় সকলগুলিতেই এক এক যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। এখানে ওখানে ঘাসের উপর বসিয়া বা শুইয়া লোকে গল্প করিতেছে। জনবহুল অংশ পরিত্যাগ করিয়া কুমুদ নিভৃত স্থানের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল।

দিবালোক হ্রাস হইয়া আসিতেছে। শূন্যমনে কুমুদ একস্থানে দাঁড়াইয়া ছিল—এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে তাহার বাহুস্পর্শ করিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল—দেখিবামাত্র টুপী তুলিয়া বলিল—"এথেল্! How lucky !"

কুমুদ যাহাকে সম্ভাষণ করিল, সে অনুমান বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতী। তাহার বেশে পারিপাট্য ছিল না—তাহার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতা মহিলার মত নহে—ইংরাজিতে যাহাকে "lady" বলে সে তাহা নহে।—সে কোনও হোটেলের ভোজনকক্ষের পরিচারিকা মাত্র—সেই ভোজনশালাতেই বৎসর খানেক পূর্ব্বে ইহার সহিত কুমুদের প্রথম পরিচয়।

যুবতী বলিল—"যাও যাও, তোমার আর ভণ্ডামি করিতে হইবে না। How lucky!—আমাকে দেখিয়া যেন তুমি কতই খুসী হইয়াছ! বোধ হয়, পূরা একমাস পরে আজ তোমায় আমায় সাক্ষাৎ। আচ্ছা কুমি—My goodness!—তোমার চেহারা এমন হইয়া গিয়াছে কেন? তোমার কি অসুখ করিয়াছিল?"

কুমুদ বলিল—"না।"—সে মনে মনে ভাবিতেছিল, জানিয়া শুনিয়া অন্য কাহারও বিশেষ কোনও অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না—কিন্তু ইহার নিকট অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধের জন্য ইহার কাছে আজ ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া যাইব—আমাকে সেই সুযোগটি দিবার জন্যই বোধ হয়, ঈশ্বর দয়া করিয়া, ইহাকে এ সময় আনিয়া দিলেন।

এথেল বলিল—"চল বেড়াই। কুমি—সত্য এ একমাস তুমি ভাল ছিলে? আমার সহিত ছলনা করিতেছ না? যদি ভাল ছিলে, তবে একমাস আমাদের হোটেলে আস নাই কেন?"

"টাকা ছিল না বলিয়া।"

"Rot!, টাকা ছিল না বলিয়া তুমি আমাদের হোটেলে খাইতে আস নাই! কেন তোমার টাকা কি হইল?"

"তিনমাস দেশ হইতে আমার টাকা আসে নাই।"

"কেন?"

"আমাদের ব্যবসায় ফেল হইয়াছে।"

"বল কি?"—বলিয়া এথেল শঙ্কিতভাবে কুমুদের পানে চাহিল।

হাইডপার্কের মধ্যস্থলে সার্পেণ্টাইন নামক একটি দীর্ঘিকা আছে। এ সময় ইহারা কথা কহিতে কহিতে সেই সার্পেণ্টাইনের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছিল। এই দীর্ঘিকায় অনেকগুলি ছোট ছোট বোট আছে—তাহা ভাড়া লইয়া লোকে জলবিহার করিয়া থাকে। এথেল বলিল—"কুমি ডিয়ার—চল বোট লইয়া আমরা একটু বেড়াই। অন্ধকারে জলের উপর ভাসিতে বড় আরাম।"

কুমুদ বলিল—"বড় দুঃখিত হইলাম। আমার কাছে ভাড়া নাই—একটি পেনি মাত্র আছে এবং উহাই পৃথিবীতে আমার শেষ পেনি।"

এথেল বলিল—"What do you mean? পৃথিবীতে শেষ পেনি মানে কি?"

কুমুদ বলিল—"অর্থাৎ এই পেনি ছাড়া আর একটিও আমার নাই।"

এথেল সন্দিগ্ধভাবে কুমুদের পানে চাহিয়া রহিল।

কুমুদ বলিল—"দেখ, সার্পেণ্টাইনের ও পারটি বেশ নির্জ্জন—চল আমরা ঐ খানে গিয়া বসি। তোমার সঙ্গে কোনও কথা আছে।"

এথেল বলিল—"চল।"

সার্পেণ্টাইনের তটপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া উভয়ে যখন পরপারে পৌছিল—তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে—পার্কের নানাস্থানে বিদ্যুৎ-আলোক জলিয়া উঠিয়াছে। আলোক হইতে দূরে একটা চেষ্টনট গাছের নিম্নে, জল হইতে অল্পদূরে ঘাসের উপর দুইজনে উপবেশন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এথেল অন্ততঃ এটুকু বেশ বুঝিয়াছে—আজ কুমুদের মনটা বড়ই খারাপ। তাই সে তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য রমণীজনসুলভ নানাকথা নানাগল্প করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল, কুমুদ শুনিতে পায় না। দুই তিনবার পুনরুক্তি করিলে, সুপ্তোত্থিতের মত জিজ্ঞাসা করে—"কি বলিতেছ?"

অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়াছে। আকাশে শত শত নক্ষত্র জলিয়া উঠিয়াছে। মৃদু বায়ুভরে নৃত্যশীল সার্পেণ্টাইনের বক্ষে সেই নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে।

অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়, হাতের উপর মাথা রাখিয়া কুমুদ সার্পেণ্টাইনের জলের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। এথেল বলিল—"কি ভাবিতেছ, কুমি ?"

কুমুদ বলিল—"তুমি শেলির নাম শুনিয়াছ ?"

"কে ? তোমার কোনও বন্ধু বুঝি ?"

"Goosie !—তিনি বিগত শতাব্দীর একজন মহাকবি ছিলেন।"

"বটে !—তা জানিতাম না।"

"তিনি প্রথমে হেন্‌রিয়েটা নাম্নী এক যুবতীকে বিবাহ করেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ভঙ্গ হয়। তাহার পর, একদিন রাত্রিকালে হেন্‌রিয়েটা আসিয়া এই সার্পেণ্টাইনের জলে ডুবিয়া মরেন।"

কথাটা শুনিয়া এথেলের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বলিল—"উঃ কি ভয়ানক !—তুমি কি করিয়া জানিলে ?"

"আমি শেলির জীবনচরিতে পড়িয়াছি।"

শুনিয়া এথেল প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে, শঙ্কিতচিত্তে কুমুদের দিকে সে চাহিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখভাব কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সে এক কৌশল করিল।

আব্দারের স্বরে এথেল বলিল—"আচ্ছা কুমি, আমি যদি সেই হেন্‌রিয়েটার মত এই সার্পেণ্টাইনের জলে গিয়া ঝাঁপ দিই—তাহা হইলে তুমি কি কর ?"

কুমুদ বলিল—"আমিও জলে ঝাঁপাইয়া পড়ি—তোমায় তুলিয়া আনি।"

"তুমি সাঁতার জান ? "

"Rather !—দেশে থাকিতে বাজি রাখিয়া গঙ্গা কতবার পার হইয়াছি।"

এথেলের বক্ষ কাঁপাইয়া একটি আরামের নিঃশ্বাস পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিল—"Thank God !"

কুমুদ বলিল—"কেন এথেল, Thank God বলিলে কেন ?"

এথেল নীরব।

কুমুদ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি সন্দেহ আজ আমি সার্পেণ্টাইনে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিব ?"

এথেল কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"যাও—আমি বলিব না।"

কুমুদ মনে মনে বলিতে লাগিল—"আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !—পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার সময়, এ কে আসিয়া, ছল ছল নেত্রে আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় ? আমার স্বদেশীয় নহে—স্বজাতীয়া নহে—এমন কি আমার সবর্ণাও নহে—আমার কেহই নহে—ইহার এত ব্যথা কেন ?"—কুমুদের দুইটি চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

আরও দুই চারি কথার পর কুমুদ বলিল—"দেখ এথেল—আমি তোমার কাছে অপরাধী। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করিবে কি ?"

এথেল বলিল—"কি অপরাধ ?"

"মনে বুঝিয়া দেখ—আমি কি তোমার প্রতি কোনও অন্যায় করি নাই ?"

কুমুদের হাতটি ধরিয়া এথেল বলিল—"কেন তুমি আজ একথা বলিতেছ ?"—তাহার স্বর কাঁদ কাঁদ।

কুমুদ বলিল—"কেহ যদি কাহারও নিকট কোনও অপরাধ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে না কি ?—তুমি আমায় ক্ষমা কর এথেল।"

কুমুদের হাতটি ছাড়িয়া দিয়া এথেল বলিল—"যাও, তুমি যদি ও সব বলিবে—তবে আমি কাঁদিব। তুমি আজ এমন হইয়াছ কেন ?"

তাহার ভাব দেখিয়া কুমুদ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

কুমুদ অর্দ্ধশয়ানভাবে পড়িয়াছিল—এথেল নিকটে বসিয়াছিল। আর কিছুক্ষণ একথা সে কথার পর, এথেল খেলাচ্ছলে কুমুদের কোটের বোতাম ধরিয়া টানিতে লাগিল। হঠাৎ একটা স্থলে কোনও পদার্থ আছে অনুভব করিল। ক্ষিপ্রহস্তে কুমুদের পকেট হইতে সে জিনিষটি টানিয়া বাহির করিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"কুমি—এ কি ?"

কুমুদ বলিল—"ওটা রিভল্‌ভার।"

"রিভল্‌ভার কেন ?"

"রাত-বিরাত পথে ঘাটে বেড়াই—সঙ্গে থাকা ভাল। দাও—ঘাঁটিও না।"

কিন্তু ইহারই মধ্যে এথেল বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া-কুমুদের কথা শেষ হইতে না হইতে দ্রুতপদে জলের দিকে ছুটিল।

"কি কর—কি কর"—বলিয়া কুমুদও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। জলের নিকট গিয়া তাহার ব্লাউজের পশ্চাৎ ভাগ চাপিয়া ধরিল।

তন্মুহূর্ত্তেই এথেল, সার্পেন্টাইনের মধ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণ বলে রিভল্‌ভারটি নিক্ষিপ্ত করিল।

জলের কোনও অদৃশ্য অংশ হইতে "কব্" করিয়া একটা শব্দ শুনা গেল। নরশোণিতের পরিবর্ত্তে সেই শিশুরাক্ষস স্বীয় অগ্নিময়ী তৃষা জলেই নিবারণ করিতে বাধ্য হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এথেলের হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া কুমুদ বলিল—"শয়তানী—একি করিলি?"

এথেল বলিল—"শয়তান!—খুব করিয়াছি—বেশ করিয়াছি—আমার খুসী—আমার হাতছাড়—লাগে!"

কুমুদ বলিল—"ভাবিয়াছিস্—রিভল্‌ভার ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই?"

এথেল বলিল—"উঃ উঃ—আমার হাত কাটিয়া গেল—লাগে যে—ছাড় না—Brute."

কুমুদ তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। ধীরে ধীরে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া বসিল—এবার শয়ন করিল না।

এথেল ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"দেখ দেখি কি করিয়াছ! আমার রিষ্টলেট্ ভাঙ্গিয়া কব্জীর মাংসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উহু হু।"—বলিয়া সে হাত ঝাড়িতে লাগিল।

পকেটে দিয়াশলই ছিল—একটা জ্বালিয়া কুমুদ দেখিল, এথেল সত্য বলিয়াছে। এনামেলের চুড়ি ভাঙ্গিয়া খানিকটা এথেলের কব্জীতে প্রবেশ করিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে!

দেখিয়া কুমুদ তাড়াতাড়ি তাহাকে জলের ধারে লইয়া গেল। ভাঙ্গা চুড়িটুকু তুলিয়া, রুমাল ভিজাইয়া স্থানটি ধুইয়া দিল। গোটাকতক ঘাস ছিঁড়িয়া সে গুলা বেশ করিয়া চিবাইয়া ক্ষত স্থানে লেপন করিয়া দিল—তাহার পর রুমাল ছিঁড়িয়া জলপটি বাঁধিয়া দিল। স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এখনও বড় জ্বালা করিতেছে—এথেল?"

এথেল বলিল—"না, একটু কমিয়াছে।"

"বাস্তবিক এথেল—আমি একটা জানোয়ার। এস।"—বলিয়া উভয়ে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

বসিয়া কুমুদ বলিল—"বড় লাগিতেছে কি?—চল, কোনও ডাক্তারখানায় গিয়া ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধাইয়া দিই।"

এথেল উঠিল—"এক পেনিতে কি ব্যাণ্ডেজ হয়?"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কুমুদ বলিল—"ঠিক। ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

এথেল বলিল—"আমরা বাহিরে যাই চল। ডাক্তারখানায় নয়—কোনও একটা রেষ্টোরাঁয় চল। আমার কাছে টাকা আছে। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।"

কুমুদ বলিল—"তুমি কি ডিনার খাইয়া আস নাই?"

"সে ত সাতটার সময় খাইয়াছি। এ তিন চারি ঘণ্টায় আবার ক্ষুধা পায় না বুঝি! তুমি কখন ডিনার খাইয়াছ?"

"খাই নাই।"

"খাও নাই!—চা?"

"চাও খাই নাই।"

"লাঞ্চ?"

"লাঞ্চও খাই নাই। বাড়ী হইতে আটটার সময় দুইটি ডিম, দুই খানি টোষ্ট খাইয়া বাহির হইয়াছিলাম, তাহার পর হইতে আর কিছুই খাই নাই।"

শুনিয়া এথেল বলিল—"Poor dear!—সারাদিন কিছু খাও নাই!—চল চল—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।"

ফটকের বাহির হইয়া একটি ভোজনশালায় প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোনও প্রাইভেট্ সেলুন খালি আছে?"

পরিচারিকা একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"আছে মহাশয়—আসুন।"

প্রাইভেট সেলুনে উভয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি আসিল। এখানে আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না—এমন কি, না ডাকিলে পরিচারিকাও আসিবে না।

কিঞ্চিৎ পানাহারের পর কুমুদের দেহে যেন নবপ্রাণ সঞ্চার হইল। আহারাদি শেষ হইলে, পরিচারিকা আসিয়া টেবিল পরিষ্কার করিয়া লইয়া গেল।

চেয়ার ছাড়িয়া, সোফার উপর আরাম করিয়া, দুইজনে উপবেশন করিলে এথেল বলিল—"আচ্ছা কুমি, তোমার এ পাগলামি কেন উপস্থিত হইল বল ত!"

প্রথমে কুমুদ কিছুই প্রকাশ করে না;—অনেক পীড়াপীড়ির পর নিজের অবস্থা বলিতে আরম্ভ করিল।

আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল—"এ অবস্থায় এথেল, আমি আত্মহত্যা ছাড়া কি করিতে পারি বল? আমার আর কি উপায় আছে? আজ না হয় তুমি বাধা দিলে। কাল হউক—পরশু হউক—ঐ পথ ভিন্ন আমার আর কোন্ পথ আছে? যদি তাহা না করি, অনাহারে মরিতে হইবে, তাহার চেয়ে—"

এথেল বলিল—"কত পাউণ্ড হইলে তোমার দেশে যাওয়া হয় বলিলে?"

"পঁচিশ পাউণ্ড।"

"কাল সন্ধ্যার ট্রেণ—শেষ ট্রেণ?"

"হ্যাঁ।"

"কাল কতক্ষণ অবধি টাকা পাইলে তোমার কায চলিবে?"

"বেলা তিনটে।"

"আচ্ছা—আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।"

কুমুদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তুমি!—তুমি পঁচিশ পাউণ্ড কোথা পাইবে এথেল?"

এথেল বলিল—"দশ পাউণ্ড ত আমার নিজেরই আছে; পোষ্ট আপিসে আছে—যখন খুসি বাহির করিতে পারিব। বাকী ১৫ পাউণ্ড আমি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা দেখিব। যদি আমি সফল হই, তাহা হইলে তুমি ও সকল কুমৎলব পরিত্যাগ করিবে ত?"

"করিব।"

"Honour Bright?"

"Honour Bright."

"আচ্ছা কাল বেলা তিনটার সময় তুমি চান্সেরি লেন ও ফ্লীট ষ্ট্রীটের মোড়ে থাকিও, আমি আসিব। যদি টাকা সংগ্রহ করিতে পারি, সেই সময় তোমায় দিব।"

"বেশ।"

রাত্রি তখন সাড়ে এগারোটা। ভোজনশালা হইতে বাহির হইয়া দুইজনে এথেলের বাসার দিকে অগ্রসর হইল। সে প্রায় দুই মাইল পথ। দ্বারের বাহিরে যখন তাহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তখন ইংরাজি তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে কুমুদ এথেলের সাক্ষাৎ পাইল। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইয়াছে?"

"টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। কুকের আফিসে চল—টিকিট কিনিয়া ফেলা যাউক।"

"তুমি আমার সঙ্গে আসিবে?—তোমার কায—"

এথেল হাসিয়া বলিল—"আমার ত ছুটি! আমার এই পটি-বাঁধা হাতে পরিবেষণ করিলে কেহ ত খাইবে না!—তাই ম্যানেজার হাত ভাল না হওয়া অবধি আমার ছুটি দিয়াছেন। সুবিধাই হইয়াছে—নহিলে টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় পাইতাম না।"

দুইজনে কুকের আফিসে গিয়া টিকিট ক্রয় করিল।

সন্ধ্যা আটটার সময় ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে কুমুদের ট্রেণ ছাড়িবে। দুইজনে একত্র ডিনার খাইয়া যথাসময়ে ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিল।

কুমুদ বলিল—"এথেল—তোমার এ উপকার জীবনে আমি ভুলিব না। যদি আমার ব্যবসায়টিকে বাচাইতে পারি—দুইমাস পরেই তোমার এ টাকা আমি পাঠাইয়া দিব।"

এথেল কোনও উত্তর করিতে পারিল না। অশ্রুবাষ্পে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল।

ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল।

এথেল বলিল—"গুড্ বাই কুমি—এই বোধ হয়, আমাদের শেষ দেখা।"

কুমুদ বলিল—"ও কথা কেন বলিতেছ এথেল?"

এথেল বলিল—"যখন উভয়ের মধ্যে সাত হাজার মাইল ব্যবধান হইয়া পড়িবে—তখন তুমি আর আমায় মনে রাখিবে কি?"

"তোমায় ভুলিব?—বাঁচিয়া থাকিতে ন নয়।"

এথেল বলিল—"ঐ বাতি দেখাইতেছে। গাড়ীতে ওঠ। গুড্-বাই।"

"গুড্-বাই নয় এথেল—ও-রিভোঁয়া যতদিন না আবার দেখা হয়। আবার দেখা হইবে।" বলিয়া কুমুদ, এথেলের হাতখানির উপর নিজ ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আলোচনা

(১)

ভারতে আর্য্য-অভিযান

[শ্রীবিনোদবিহারী রায়]

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম. এ., বি এল-মহাশয়, একজন বিখ্যাত স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি হিন্দু আইন পুস্তকে ঋগ্বেদের দায়ভাগের নিয়ম দেখাইয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে তাঁহার মত বিশ্বাস করাইয়াছেন। ইহাতে ইউরোপে কেবল যে তাঁহার যশোবিস্তার হইয়াছে তাহা নহে, ঋগ্বেদেরও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

কিন্তু এমন ব্যক্তি গত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" "ভারতে আর্য্য-অভিযান"-নামক প্রবন্ধে পুরাণ রামায়ণ-মহাভারতকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তাই নিম্নে তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম ; আশা করি, তিনি উত্তর দিয়া আমাদের ভ্রম দূর করিবেন। আলোচনা দ্বারাই সত্য নির্ণীত হইয়া থাকে।

তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ, অন্য শাখা সকলের ইউরোপ অভিমুখে অভিযানের পরেও একত্র ছিলেন এবং পরে পৃথক্ হন। এক শাখা পারস্যে থাকেন, আর এক শাখা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন।" ইহাতে বুঝিলাম; তিনি বিশ্বাস করেন যে, আর্য্যগণ প্রথমে ইউরোপেই গিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে পরে আসিয়াছেন। তাঁহার মতে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। ৫০০০-১৯০০ = ৩১০০ খৃঃ পূঃ অব্দের সুদাস রাজা ও ভরত বংশীয়গণ, বিশ্বামিত্রবংশীয় ও বশিষ্ঠবংশীয়গণ, যাদব ও কৌরবগণ কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যদিগের সহস্র দুর্ভেদ্য গিরি অধিকার করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে ৩০ সহস্র, ৫০ সহস্র অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রাচীন আর্য্যভূমি জয় করিয়া, ইহার ভারতবর্ষ নাম দিয়া, আর্য্যভূমি করেন, ইহার সত্য ইতিহাস ঋগ্বেদে আছে।"

যোগেন্দ্র বাবুর মতে ঋগ্বেদে সত্য ইতিহাস পাওয়া যায়, পুরাণে সমস্তই কাল্পনিক (Myth)। তাঁহার এই মত পাশ্চাত্য মতানুসারে গঠিত বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি পুরাণকে কাল্পনিক বলিয়াছেন কিন্তু ঋগ্বেদ হইতে সুদাসের সত্য ইতিহাসের উদ্ধার করিতে গিয়া কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন; যাহা ঋগ্বেদে নাই, তাহাও কল্পনাবলে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

সহদেব যে সুদাসের পুত্র তাহা তিনি পাইলেন কোথায় ? ঋগ্বেদে নাই। তাঁহার মতে "রামায়ণ বিষ্ণুপুরাণাদির কাল্পনিক বংশবৃত্তান্ত, বৈদিক সত্য বৃত্তান্ত পাঠে বিশ্বাস করা যায় না। বিষ্ণুপুরাণে সুদাসের পিতা সর্ব্বকাম ও পিতামহ নলোপাখ্যানের ঋতুপর্ণ। এ সমস্ত উপাখ্যান মাত্র। সুদাস প্রাচীন আর্য্যরাজা পিজবনের পুত্র ও দেববানের পৌত্র।"

তিনিই ঋগ্বেদের ৩।৫৩ সূক্তে পাইয়াছেন, সুদাস ভরতবংশীয় (?) অথচ বিষ্ণুপুরাণে সূর্য্যবংশের মধ্যে তিনি সুদাসকে দেখিয়াই লিখিয়াছেন, "এ সব উপাখ্যান মাত্র।" বিষ্ণুপুরাণে চন্দ্রবংশ-মধ্যে দেখিলে তিনি দেখিতেন, সুদাসের কেমন সুন্দর পরিচয় আছে।

যযাতির পুত্র পুরুর অধস্তনবংশীয় ভরতের পিতা দুষ্মন্তের ও বহু পরবর্ত্তী হস্তিনাপুর-স্থাপয়িতা হস্তী রাজার অধস্তন পুরুষ রাজা হর্য্যশ্বের পঞ্চপুত্র পাঞ্চাল-রাজ্য স্থাপন করেন। এই পঞ্চ পুত্র মধ্যে মুদ্গলের বৃদ্ধশ্ব-নামক পুত্র ছিলেন। ঋগ্বেদে তিনি বধ্র্যশ্ব নামে কথিত (৬।৬১।১ ঋক)। ইঁহার পুত্রের নাম দিবোদাস। (৬।৬১।১ ঋক্) বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে, বৃদ্ধশ্বের পুত্র দিবোদাস। ঋগ্বেদ-মতে সুদাস দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনের পুত্র (৭।১৮।২২ ঋক্), আবার ২৫ ঋকে সুদাস রাজাকে দিবোদাস ও পিজবনের পুত্র বলা হইয়াছে। এই দুই উক্তির একটি ঠিক। কারণ, দিবোদাস দেববান রাজার পুত্র পিজবন হইতে পারেন না। (৬।৬১।১ ঋক্)। দুই ঋকেই সুদাসকে পিজবনের পুত্র বলা হইয়াছে। অতএব তিনি পিজবনের পুত্রই বটেন। এই পিজবন দেববানের পুত্র (৭।১৮।২২ঋক্) এবং দিবোদাস বধ্র্যশ্বের পুত্র (৬।৬১।১ ঋক্)। সুতরাং ঋগ্বেদ-মতে বধ্র্যশ্বের পুত্র দিবোদাস, তৎপুত্র দেববান, তৎপুত্র পিজবন, তৎপুত্র সুদাস বলা যাইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণ মতে দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, তৎপুত্র চ্যবন, তৎপুত্র সুদাস। ঋগ্বেদে মিত্রয়ু নাই। চ্যবনের পরিবর্ত্তে পিজবন আছে, অতএব এই পিজবনই চ্যবন। মিত্রয়ুর নাম দেববান ধরা যাইতে পারে। সহদেব যে সুদাসের পুত্র, তাহা ঋগ্বেদে নাই, বিষ্ণুপুরাণে আছে, অতএব বিষ্ণুপুরাণ ফেলিয়া দিবার জিনিষ নহে।

যোগেন্দ্র বাবু এখন বুঝিতে পারিবেন যে, সুদাস ভরতবংশে কত পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সূর্য্যবংশের সুদাসের সহিত মিল করিতে

গিয়া তিনি যে পুরাণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। তাঁহার দেখিবার ভুলে পুরাণ ভুল হইতে পারে না। আর্য্যগণ সুদাসের বহু পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছেন। সুদাস হস্তিনাপুর স্থাপনের পরে জন্মিয়াছেন, সুতরাং ভারতে প্রথম আগমন করিবেন কিরূপে?

সুদাস ইরাণে কখনই ছিলেন না, তিনি ইরাণরাজের পুত্র বা পৌত্র ছিলেন না। চয়মান যে পারসীক তাহাও বেদে নাই। বরং তিনি যে যজ্ঞকারী আর্য্য তাহা বেদে আছে। ৩ম ৩৩ সূক্তে সুদাসের নামই নাই, সুতরাং তিনি শতদ্রু ও বিপাসা পার হন নাই। যদু ও তুর্ব্বসু তাঁহার বহু পূর্ব্বে ভারতে অর্থাৎ সুলেমান পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে আগমন করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের ঊর্দ্ধতন পুরুষ পুরু, তাঁহার ভ্রাতা যদু ও তুর্ব্বসু। তবে যদু ও তুর্ব্বসুর অধস্তন কোন রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়া থাকিবে, সে রাজার নাম নাই। পুরুকুৎস রাজার পুত্র ত্রসদস্যু, সুদাসের সামন্ত-রাজা থাকিবার কথা ঋগ্বেদে নাই, পুরুও তাঁহার সেনাপতি ছিলেন না। সুদাস—শম্বরকে বধ করেন নাই, পঞ্চনদপ্রান্তে দশজন আদিম অনার্য্য রাজার সহিত যুদ্ধও করেন নাই। ঋগ্বেদে এ সব কথা নাই। অথচ ঋগ্বেদের নাম করিয়া যোগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, ইহা সঙ্গত হয় নাই। যে দশজনের সহিত তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা আর্য্য-রাজা।

ঋগ্বেদ হইতে সুদাসের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিলে, পুরাণাদির সহিত তাহার অনৈক্য হইবে না। যদি ঋগ্বেদে কোন কথা বাদ থাকে, তাহা পুরাণের সাহায্যে পূরণ করিতে হইবে এবং পুরাণের ভুল ঋগ্বেদানুসারে সংশোধন করিতে হইবে। যেরূপে পুরাণসংশোধন এবং ঋগ্বেদের ফাঁক পূরণ করিতে হইবে, তাহা উপরে দেখাইয়াছি।

যোগেন্দ্র-বাবুর অনেক কথাই প্রতিবাদযোগ্য। সবগুলির প্রতিবাদ করিলে প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। অদ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। সম্পাদক-মহাশয় আদেশ করিলে সুদাসের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিয়া "ভারতবর্ষের" পাঠক-মহাশয়গণের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আশা করি, যোগেন্দ্র বাবু প্রথম হইতে ইতিহাস আলোচনা করিবেন। মধ্য হইতে ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে ভুল অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, তিনি সোমকের বৃত্তান্ত লিখিবার পূর্ব্বে সুদাসের পূর্ব্বপুরুষ নির্ণয় করিবেন।

---

(২)

জ্যোতিষ-তত্ত্ব

[শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ]

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় "চা'য়ে জ্যোতিষ-তত্ত্ব" বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা আছে, উহা আমি "ভারতবর্ষের" পাঠকদিগকে নিবেদন করিতেছি।

বিগত ১৩১৯ সালে আমি পুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত গ্রীণার পর্ব্বতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। গ্রীণার পর্ব্বতে হনুমান-ধারা নামক একটি পরম রমণীয় স্থান আছে। হনুমান-ধারায় বাস করিবার সময়ে একজন রামানন্দী-সম্প্রদায়ের সাধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়; তিনি কতকগুলি "কুঁচ" লইয়া এই প্রকার জ্যোতিষ তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। হস্তে কতকগুলি "কুঁচ" লইয়া নাড়িতেন, এবং একখানা বিস্তৃত পাথরের থালায় কুঁচগুলি ছাড়িয়া দিতেন। উহা গড়াইতে গড়াইতে থালার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে, এই কুঁচগুলির অবস্থিতি (position) অবলোকন করিয়া, তিনি ভুত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—যে কোন প্রশ্নের আশ্চর্য্য মীমাংসা করিতে পারিতেন। আমি বহু প্রকারে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ভুত ও বর্ত্তমান কোন প্রশ্নের মীমাংসাতেই তাঁহার কোন প্রকার ভুল বাহির করিতে পারি নাই; ভবিষ্যতের কথা এখন পর্য্যন্ত বলিতে পারি না। শ্রীযুত পান্নালাল বাবু যে প্রকার চা'য়ের পাতার অবস্থিতি-অনুযায়ী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ফলাফলের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, এই সাধুটিও সেই প্রকার কুঁচগুলির সংস্থান অনুসারে কতকগুলি ফলাফল আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করার কোন আবশ্যক দেখি না। তবে এই সাধুটি এই প্রকার অদ্ভুত জ্যোতিষ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, উহা প্রকাশ করাই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য।

শাস্ত্র-অনুযায়ী এই প্রকার গণনাকে ঠিক জ্যোতিষ বলা যায় না। জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও অঙ্ক-শাস্ত্র একই জ্ঞান হইতে উদ্ভূত; কিন্তু এই প্রকার গণনা ঠিক গণিত-বিদ্যা হইতে প্রসূত নহে। সাধারণতঃ ইহার নাম অনুভূতি বিদ্যা দেওয়া যাইতে পারে। Mesmerism, Hypnotism প্রভৃতি সম্মোহন-বিদ্যা যে শক্তি (Will Force) হইতে উদ্ভুত, এই গণনাও সেই প্রকার ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ মাত্র। যাঁহারা ইচ্ছা শক্তির (Will Force) সাধনা করেন, তাঁহারা এই প্রকার কোন না কোন একটা বিষয় বা বস্তু অবলম্বন করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কোন প্রকার অবলম্বনশূন্য হইয়া ইচ্ছা-অনুযায়ী এই শক্তির পরিচালনা করা, নির্ম্মল ও বিশুদ্ধচিত্ত মহাশক্তিশালী পুরুষগণের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যগণের পক্ষে উহা সম্ভবপর নহে। এই জন্য যাঁহারা নূতন শিক্ষার্থী, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রকার কোনও একটা বাহিরের অবলম্বন ধরিয়া, এই বিদ্যা অভ্যাস করাই সহজ ও সঙ্গত।

উক্ত সাধুটি আমাকে বলিয়াছিলেন, এবং প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি কুঁচ লইয়া এই প্রকার ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া সুন্দর ফল পাইয়াছেন। কোন্ অবস্থায় (position) কুঁচগুলি কি ভাবে থাকিলে, উহা দ্বারা কি ফল সূচিত হইবে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে তিনি নিজে নিজে স্থির করিয়া লইয়াছেন, এবং ঐ পরিকল্পনার উপরে তাঁহার এতটা দৃঢ় ধারণা আছে যে, উহা যে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত তাহা কোন সময়েই তাঁহার মনে হয় না। এই কল্পনার উপরে দৃঢ় আস্থা থাকায় তিনি মনুষ্যজীবনের যে কোন প্রশ্নের আশ্চর্য্য উত্তর দিয়া থাকেন, এবং উহা সত্য হইয়া থাকে। সাধুটি বলিয়াছিলেন,

কুঁচ ব্যতীত অন্য যে কোন বস্তু লইয়া, যে কেহ এই প্রকার সমস্ত প্রশ্নের সত্য মীমাংসা করিতে পারেন, অবশ্য এ জন্য কল্পনার দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা থাকা আবশ্যক। অদ্য পান্নালাল বাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া আমার সাধু-বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা জন্মিল।

পান্নালাল বাবু যে লিখিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি চায়ের পাতা লইয়া এই প্রকার নানা প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন, উহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। সম্মোহন-বিদ্যা অভ্যাস করিতে যে যে গুণ ও সাধনার আবশ্যক, এই প্রকার ধরণে ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা অভ্যাস করিতেও ঠিক সেই প্রকার যোগ্যতার আবশ্যক। নতুবা যে কেহ চেষ্টা করিলেই উহাতে সফলতা লাভ করা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ—গণনার ফলাফল সম্বন্ধে পান্নালাল বাবু যে তালিকা দিয়াছেন, সকলেরই অবিচারে ঐ তালিকা অনুসারে ফলাফল নির্দ্দেশ করার আবশ্যক হয় না। যে কেহ নিজ ইচ্ছা-অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থানের (position) বিভিন্ন ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার এই কল্পনার একান্ত দৃঢ়তা থাকা আবশ্যক।

(৩)

মেঘবিদ্যা

[শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র]

অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে শ্রীযুত আদীশ্বর ঘটক-মহাশয়ের মেঘবিদ্যা প্রবন্ধে জ্যেষ্ঠা ও অশ্বিনী নক্ষত্রদ্বয়ের অবস্থা ও পাশ্চাত্য নাম সম্বন্ধে ভিন্ন মত দেখিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"অশ্বিনী নক্ষত্র মেষ রাশির প্রথমেই অবস্থিত" ইহা সত্য, কিন্তু "তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি ত্রিকোণ ভ-খণ্ডকেই অশ্বিনী নক্ষত্র (Triangula) বলে"—তাহা নহে। তিনি এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। Triangulum বা উত্তর-ত্রিকোণ রাশি, অশ্বিনী নক্ষত্রের ঠিক উত্তরে ত্রিতারকময় একটি স্বতন্ত্র রাশি, উহাদের অবস্থান $^{*}{}_{*}{}^{*}{}_{*}$ এইরূপ। ইহাদের দুইটি তারা তৃতীয় শ্রেণীর এবং ৩য় তারা ষষ্ঠ শ্রেণীর। অশ্বিনী-নক্ষত্রও অবশ্য ত্রিতারকময় কিন্তু ত্রিকোণাকৃতি নহে, বক্র-রেখাকৃতি ; (crooked line) উহাদিগকে মেষের পুচ্ছ কিংবা অশ্বিনীর ভ্রূমধ্য, নাসারন্ধ্র ও মুখরশ্মি পরিকল্পনা করিলে উত্তম হয়। ঐ তিনটি তারার অবস্থান এইরূপ * B২ | ১ ২
৪ ১ * Y৪ | aওB
দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং Y চতুর্থ শ্রেণীর তারা, a অশ্বিনী নক্ষত্রের যোগ-তারা, উহার নাম অমল (Hamal)। ভরণী নক্ষত্র ত্রিকোণ ভ-খণ্ড বটে কিন্তু Triangulum নহে, উহা মেষের নয়নদ্বয় ও মুখবিবর বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বৃশ্চিক-রাশির শেষ ভাগে অবস্থিত নহে ; আমি যত-গুলি chart দেখিয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই "জ্যেষ্ঠা ১ম বৃশ্চিকস্থ" (a Scorpii or Antares) প্রথম ভাগেই অবস্থিত ; বৃশ্চিকের মস্তক অনুরাধা ও হৃদয় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে গঠিত বলিয়া পরিকল্পিত। জ্যেষ্ঠা ত্রিতারকময় বটে কিন্তু লেখক চিত্রে যেস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথায় নহে। প্রদর্শিত চিত্রের অনুরাধা শব্দের অ বর্ণের নিম্নের ক্ষুদ্রতারা তাহার বামদিকের বড়তারাটি ও তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমের ছোট তারাটিতে মিলিয়া জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র এবং বড় তারাটি জ্যেষ্ঠার যোগ-তারা "পারিজাত"। যেস্থানে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র দেখান হইয়াছে, তথাকার তারা-
৪ ১২ ১৩ ১৬[১] ১৬[২]
গুলি chartএ E. M.[1] M.[2] C.[1] C.[2] বলিয়া চিহ্নিত আছে।

শ্রীযুত আদীশ্বর ঘটক-মহাশয়ের প্রবন্ধের দোষ দেখান আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তিনি যখন সত্বরই একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থে নক্ষত্র সকলের চিত্র প্রকাশ করিবেন, তখন যাহাতে ঐ chartগুলি ভ্রমপ্রমাদশূন্য হয়, সেই জন্য এই কয়েকটি কথা বলিলাম। তিনি chart বাহির করিবার পূর্ব্বে একবার তারাদর্শক পণ্ডিত শ্রীযুত কালীনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত "ভগোল চিত্র" ও অপর দুই এক খানি পাশ্চাত্য chart, মিলাইয়া দেখিলে ভাল হয়।

মেঘবিদ্যার শেষ অংশটা কিন্তু Theoryই হইয়া গেল, যেহেতু 'কন্যা কাণে কাণ' হইলেও ধান্যের গোলা শূন্য পড়িয়া থাকিল। তুলায় বর্ষণ না হওয়ায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশে ধান্যের অবস্থাও অত্যন্ত মন্দ, রবি-শস্যের অবস্থাও ভাল নহে। শ্রাবণের ভারতবর্ষে মেঘবিদ্যা প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে, ৪ঠা কার্ত্তিক প্রাতে বৃষ্টি হইবে, আমরা এইটি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম ; ঐ দিন প্রাতে মেঘডম্বর হইয়াছিল বটে কিন্তু এতদ্দেশে বৃষ্টি হয় নাই—উহা "লমুকিয়া"তেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অন্য কোন স্থানে যে ঐ মেঘে বর্ষণ হইয়াছিল, তাহাও শুনি নাই ; তবে ১৮ই আশ্বিন প্রাতে বৃষ্টি হইয়াছিল।

কথা হইতেছে যে, আকাশে চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির অবস্থান চিরদিন সমান থাকে না। অয়ন-গতিতে শূন্যে পৃথিবীর গতির পরিবর্ত্তন হয়। তারপর জ্যোতিষ্ক-নিচয় সকলেই গতিশীল, আমাদের সূর্য্যও তাহার বৃহৎ পরিবারটি সঙ্গে লইয়া C. Herculisএর দিকে সেকেণ্ডে ৪ মাইল বেগে গমন করিতেছে। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে a Draconis, দ্বাদশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে a Lyrae ধ্রুবতারা ছিল, আজকাল a Ursa minsrii ধ্রুবের আসনে অধিষ্ঠিত আছে, তাহাও Pole হইতে ১° ১৪' অংশ দূরে। এই সকল কারণে বুঝা যায় যে, যে যুগে মেঘবিদ্যা প্রচারিত হইয়াছিল এবং গ্রহনক্ষত্রাদির যে প্রকার অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া উহা গঠিত হইত এক্ষণে আর তাহা নাই। ফলিত জ্যোতিষেরও সেই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত এই সকল গণনা আজকাল সম্যক্ ফলপ্রদ নহে।

(৪)

শেয়াল কাঁটার তৈল

[কবিরাজ শ্রীগিরিজাভূষণ রায়]

ভাদুড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন, শেয়াল কাঁটা আমেরিকা হইতে আনীত—ভারতের সামগ্রী নহে। এ ধারণা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। ভারত হইতে আমেরিকায় গতায়াতের সুবিধা ও সুযোগের বহু পূর্ব্বেই এদেশে শৃগালকণ্টক ব্যবহৃত হইত। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই ক্ষুপ ঔষধরূপে ভারতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং বহু

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। বোধ হয়, শৃগাল-কণ্টকের ল্যাটীন নাম Argemone Mexicana হইতেই ভাদুড়ী-মহাশয় ইহাকে আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো প্রদেশের সামগ্রী ঠিক করিয়াছেন। যেমন ইউরোপ মহাদেশে র‍্যালে সাহেবের আনীত তামাক নূতন কিন্তু ভারতে তাম্রকূট অতি প্রাচীন, তদ্রূপ পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থে শৃগালকণ্টক Argemone Mexicana নূতন হইলেও ভারতে ইহা বহু প্রাচীন; তবে উহা ভারতীয় শৃগালকণ্টকের জাতিভেদ মাত্র। আয়ুর্ব্বেদে শেয়ালকাঁটার ব্যবস্থা বিভিন্ন রোগে উল্লেখ আছে এবং কবিরাজ মহাশয়েরাও নানা রোগে উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এজন্য উহাকে বিদেশীয় দ্রব্য বলিতে আপত্তি আছে। যে সকল দ্রব্য আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহারার্থ লিখিত আছে, তন্মধ্যে যেগুলি বিদেশ হইতে আনীত, তাহার পর্য্যায় মধ্যে "দ্বীপান্তরীয়" বা "বিদেশীয় বণিকদ্রব্য বিশেষঃ" প্রভৃতি বিশেষণ স্পষ্ট দেওয়া আছে কিন্তু শেয়ালকাঁটা সম্বন্ধে সেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"শৃগালকণ্টকোদ্ভূতং তৈলং ভগ্নব্রণাপহং।
আমবাতপ্রশমনং নির্য্যাসোঽস্যাক্ষিরোগজিৎ।"

অর্থাৎ শেয়ালকাঁটার বীজের তৈল ফোঁড়া, খোস, পাঁচড়া, পচা ঘা আরোগ্য হয়; অধিকন্তু ইহা ভগ্ন-অস্থি যোড়া লাগায়, বাতের ফুলো ও বেদনা নাশ করে, ইহার আঠা বা নির্য্যাস চক্ষে লাগাইলে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। এই গেল, শৃগালকাঁটার বাহ্য প্রয়োগের ১ম ব্যবস্থা। ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের কথাও পরে লিখিতেছি। উহা লিখিবার পূর্ব্বে শেয়ালকাঁটার সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বিবৃতি দেওয়া আবশ্যক। ভাদুড়ী-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শেয়ালকাঁটার আটা দুগ্ধের মত সাদা, কিন্তু আমরা দুই জাতীয় শেয়ালকাঁটার কথা জ্ঞাত আছি এবং ব্যবহার করিয়া থাকি। ভাদুড়ী মহাশয় যে জাতির কথা লিখিয়াছেন, উহা শ্বেতক্ষীরী জাতীয় ক্ষুদ্র শৃগালকণ্টক; উহা প্রায় নদীর চরে জলাভূমিতে জন্মায়; উহার ক্ষুপগুলি ক্ষুদ্রজাতীয়, উহার পাতাগুলি অনেকটা কণ্টিকারি পাতার মত কিন্তু ক্ষুদ্র ও অল্প কাঁটাবিশিষ্ট। অপর জাতীয় শৃগালকণ্টক স্বর্ণক্ষীরী (হলদে আঠা-বিশিষ্ট) উচ্চভূমিতে, পোড়ো বাস্তুজমিতে, প্রাচীরে ও বাগান অঞ্চলে জন্মে। ঐ গুলি বৃহৎজাতীয়, পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও লম্বা এবং প্রচুর কণ্টকবিশিষ্ট। পত্রের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ কণ্টকময়। ভাঙ্গিলেই উহার স্বর্ণবর্ণ আঠা নির্গত হয়। এই জাতীয় শৃগালকাঁটাকে স্বর্ণক্ষীরী বলে। ইহার বীজের তৈল ও নির্য্যাস ও পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অধিকন্তু ইহার মূল (যাহা আয়ুর্ব্বেদে চোক নামে লিখিত) বিষভক্ষণ-জড়িত ব্যাধিতে এবং কুষ্ঠাদিতে রক্তদূষিত ব্যাধিতে আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

"কটুপর্ণী হৈমবতী হেমক্ষীরী হিমাবতী।
হেমাহ্বা পীতদুগ্ধাচ তন্মূলঞ্চোকমুচ্যতে॥"

হেমক্ষীরী অর্থাৎ স্বর্ণক্ষীরী ও পীতদুগ্ধা পর্য্যায় হইতে ইহার আঠা যে হলদে, তাহা পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ এই হলদে আঠাবিশিষ্ট বৃহৎ জাতীয় শেয়ালকাঁটার মূলের রসই ভাদুড়ী-মহাশয়ের প্রবন্ধে লিখিত মত কনখল প্রভৃতি উচ্চভূমিতে কুষ্ঠ রোগে ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণক্ষীরী-জাতীয় শেয়ালকাঁটার গুণ পাঠে আমরা আরও দেখিতে পাই—

"হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা ভেদিন্যৎক্লেশকারিণী।
কৃমিকণ্ড বিষানাহকফপিত্তাস্র কুষ্ঠনুৎ॥"

অর্থাৎ পীতবর্ণের আঠাবিশিষ্ট শেয়ালকাঁটা ভক্ষণে তিক্তরস, ইহাতে দাস্ত ও বমি করায় কৃমি, চুলকনা, বিষ, আনাহরোগ, কফ ও পিত্তবৃদ্ধি নাশ করে ও কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য করে।

অতএব আমরা এখন উভয়বিধ শেয়ালকাঁটারই বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ব্যবহারের বিষয় স্পষ্ট জানিতে পারিলাম এবং ইহা যখন আবহমান কাল এ দেশের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যবহৃত, তখন ইহাকে বিদেশীয় দ্রব্য বলিতে পারি না। এলোপাথিমতে ইহার মৌলিক গবেষণা ও নূতন নূতন রোগে ব্যবস্থা হইয়া পরীক্ষা চলিতে পারে; কিন্তু আমাদের নিকট উহা পরিচিত ও বহুদিনের দৃষ্টফল ঔষধ। পীতদুগ্ধা শৃগালকণ্টকই খাওয়ার ব্যবহার হইতে পারে, শ্বেতদুগ্ধা চলিতে পারে না; তাহা হইলে তাহার উল্লেখ চিকিৎসা-শাস্ত্রে থাকিত। উভয়বিধ শেয়ালকাঁটাই বাহ্য প্রয়োগে ব্যবহার্য্য। Argemone Mexicana (শ্বেতদুগ্ধ শেয়ালকাঁটা) আমাদের দেশের ক্ষুদ্র শেয়াল কাঁটারই জাতিভেদ হইতে পারে।

(৫)

বাংলা টাইপরাইটার বা লিখিবার কল

[শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

বিগত ফাল্গুন মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ,-মহাশয় বাংলা অক্ষরে টাইপরাইটার বা লিখিবার কল হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। পদ্মনাথ বাবু নিজে বোধ হয়, কোন দিন কোন টাইপরাইটার ব্যবহার করেন নাই, সুতরাং টাইপরাইটারে লিখিবার সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার অভাব বোঝা যাইতেছে। সেই জন্যই তাঁহার প্রস্তাবিত অক্ষয়-চিহ্নগুলি কার্য্যকারী হইতে যে সমস্ত বাধা আছে, তাহা তিনি অনেকটা অনুমান করিতে পারেন নাই; কিন্তু একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে যে তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

কিছুকাল হইতে আমি টাইপরাইটার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ছিলাম এবং ৭।৮ মাস যাবৎ একটি বাংলা টাইপরাইটার আমি ব্যবহার করিতেছি। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে, 'বিলিক' (Blick) টাইপরাইটার কোং বাঙ্গালা টাইপরাইটার বিক্রয় করিতেছেন। আমার ব্যবহৃত কল ঐ কোম্পানীর তৈয়ারী।

টাইপরাটার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ টাইপ-রাইটারের মূল সূত্রগুলি এবং তাহার সুবিধা-অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। কোন অপরিবর্ত্তনীয়রূপে নিরূপিত স্থলে কাগজে

উপর অক্ষর মুদ্রিত করা এবং কাগজখানা নিয়মিতরূপে একটু একটু সরাইয়া দিবার ব্যবস্থাই টাইপরাইটারের মূলসূত্র। নির্দ্দিষ্ট অক্ষরগুলি কাগজে মুদ্রিত করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট ঘাট (key) টিপিতে হয় এবং তাহাতেই একের পর আর একটি অক্ষর ছাপিয়া যায়। এই অক্ষর-সংখ্যা সাধারণতঃ ৮৪টা। কিন্তু এই সংখ্যা বাড়াইতে বিশেষ কিছু অসুবিধা নাই; যেমন হ্যামণ্ড টাইপরাইটার কোম্পানী ২১৬টি অক্ষর যুক্ত কলও প্রস্তুত করেন। তাহাতে কলটি কিছু বড় ও অধিক

সাধারণতঃ ৮৪ অক্ষরযুক্ত যে সকল ইংরেজী কল আছে, তাহা কোন কলে এক লাইনে, কোন কলে দুই লাইনে এবং কোন কলে তিন লাইনে সাজান থাকে। শেষোক্ত দুই প্রকারের কলে Shift Key বা পরিবর্ত্তনের ঘাটের সাহায্য লইতে হয়। তাড়াতাড়ি লিখিতে হইলে, যত কম ঘাট থাকিবে, ততই সুবিধাজনক। যতবার ঘাট টিপিতে হইবে, ততই সময় যাইবে। সুতরাং এক একটি অক্ষর লিখিতে যত বেশী বার ঘাট টিপিতে হইবে, তত বেশী সময়ের আবশ্যক হইবে।

[illegible], B. L.,
Pleader, Judge's Court.

FARIDPUR.
Dated [illegible]
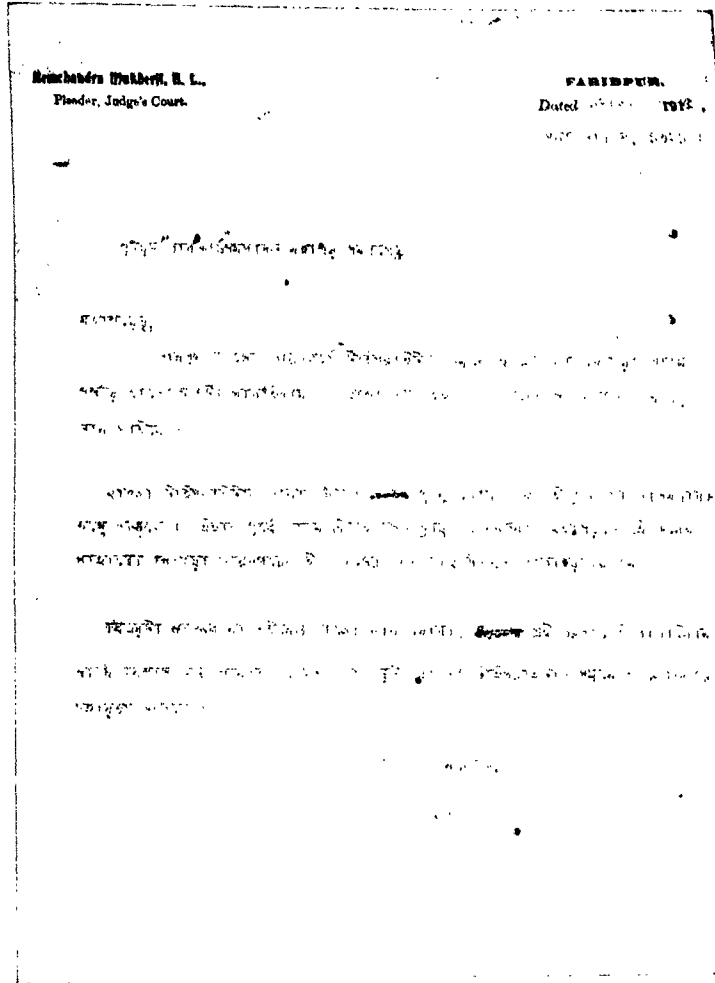
মূল্যের হইয়া থাকে মাত্র। সুতরাং বাংলা ভাষার অক্ষরাধিক্য কার্য্যতঃ তত অসুবিধাজনক হইবে না। ইংরাজী ভাষায় কয়েকটি মাত্র যুক্তাক্ষর (Dipthong) আছে। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল ইংরেজী টাইপরাইটার প্রচলিত আছে, তাহাতে ঐ সকল যুক্তাক্ষর লেখার ব্যবস্থা নাই। তদ্দ্বারা সাধারণতঃ কার্য্য চলার কোন অসুবিধা হয় না। বাংলা ভাষার যুক্তাক্ষরগুলিই অল্পসংখ্যক অক্ষরযুক্ত টাইপরাইটার তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ বাধাজনক।

পদ্মনাথ বাবুর প্রস্তাবিত অক্ষর-চিহ্ন দ্বারা বাংলা টাইপরাইটার করিতে গেলে কোন কথা লিখিতে গেলে এত বেশী সময়ের ও পরিশ্রমের আবশ্যক হইবে যে, ঐ রূপ কল একটি খেলার সামগ্রী হইতে পারে; কিন্তু কোন প্রকার কার্য্যে আসিবে না। তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়ে এক একটি অক্ষর লিখিতেই ৩,৪ বার করিয়া ঘাট টিপিতে হইবে। ঐ গুলির সম্বন্ধ (Combination) মনে রাখাও কঠিন ব্যাপার এবং কালক্ষয়কারী হইবে। অক্ষরচিহ্নগুলি এমন হওয়া চাই, যেন

অধিকাংশ অক্ষরই একবার ঘাট টিপিলেই ছাপিয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে অক্ষর-সংখ্যা বাড়াইয়া কল বড় করাও বরং অনেক ভাল হইবে। নীচে কি মাথায় লেখাও আজকালকার কলে অসুবিধাজনক নহে। কারণ, একটি অক্ষর ছাপাইয়া কাগজ না সরিয়া যাইবার ব্যবস্থাও আছে এবং একটি ঘাট টিপিয়া কাগজখানা পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে সরাইয়া আনিবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা হইতেছে, পরবর্ত্তী যুক্তাক্ষরগুলি সম্বন্ধে—যথা, স্প, ক্ষ, ন্দ, ক্ষ, প্র, ল্ল, ইত্যাদি। কারণ, এই সকল অক্ষর একটির অর্দ্ধেক জুড়িয়া আর একটি অক্ষর আছে। আজকাল যে সকল টাইপরাইটার আছে, তাহাতে একটি ঠিক উপরে, মাথায় কি নীচে আর একটি অক্ষর ফেলার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আধা-আধি ফেলিবার ব্যবস্থা নাই। এই ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেকটা বাধা দূর হইয়া যায়।

এক্ষণে "বিলিক টাইপরাইটার কোম্পানীর" উদ্ভাবিত কলটির পরিচয় দিতেছি। ইহাতে আলোচনার অনেক সুবিধা হইবে।

এই কোম্পানীর কলের বিশেষত্ব এই যে, একই কলে নানা ভাষা লিখা যায়। ইহার অক্ষরগুলি একটি চক্রে অঙ্কিত থাকে। তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যেই পরিবর্ত্তন করা যায়। ইহার অক্ষরগুলি সংখ্যায় ৮৪টি এবং তাহা তিন লাইনে সাজান আছে। বাংলা ভাষার অক্ষরগুলি নিম্নে দেওয়া গেল।

অ ঋ এ ও ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ

ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ক্ষ ং ঃ ँ া ি ী ু ূ ে ৌ ৃ ্ ্ ́ ̀ ঞ

ঽ ৩ ্ ্ম ত্র ত্ত ক্ত জ্ঞ ক ্ ৎ ঙ্ক গু স্ম / ৴ ৶ । ৭ . , ? ১ ২ ৩

৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

দেখা যাইবে যে, সাধারণতঃ ব্যবহৃত নিম্নলিখিত মূল অক্ষরগুলি ইহাতে নাই, যথা ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ, ঞ, ট, ৈ।

ঽ, ঈ, ড, এ, ও, ঢ, ে অক্ষরের সহিত ँ চিহ্নটি উপরে যোগ করিলেই ই, ঈ, উ, ঐ, ঔ, ট, ৈ হয়। দীর্ঘ ঊকারের বিশেষ ব্যবহার নাই, আবশ্যক হইলে ড ্ ্ এই তিনটি অক্ষর যোগ করিলেই ঊ-কার হয়। দীর্ঘ ৠকারও ঋ এর সঙ্গে ৃ ফলাটি যোগ দিলেই হইল।

অকার, ইকার, ঈকার, উকার, ঊকার, ঋকার, একার, ঐকার, ওকার, ঔকার, য ফলা, র ফলা, ব ফলা, ত ফলা, রেফ, হসন্ত, অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দু যোগ করা সহজ। যথা, পা, পি, পী, পু, পূ, পৃ, পে, পৈ, পো, পৌ, প্য, প্র, প্ব, প্ত, র্প, প্, পং, পঃ পঁ।

৩ যোগে গু স্তু, স্তু, প্রভৃতিত হয়ই, ইচ্ছা করিলে উকারের অন্য রূপ যথা—গু, শু, এবং যুক্তাক্ষর ট্র করা যায়। কিন্তু গু, শূ লিখিলেও কোন ক্ষতি নাই। র এর সঙ্গে উকার বা ঊকার যোগে যে চেহারা হয়, তাহা করা যায় না। কিন্তু রু রূ লিখিলে কোন ক্ষতি নাই। সেই প্রকার হু লিখিলেও কিছু আসে যায় না। ঐ প্রকার হ অক্ষরে ঋকার দিতে হৃ লিখিলে কিছু আসে যায় না।

র-ফলা যোগে যে সকল অক্ষরের আকার পরিবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে ক্র, ত্র ভ্র, দেওয়া আছে। কিন্তু ক্র, ত্র, ভ্র, ভ্র, কিছু আসে যায় না। বরং ক্র, ত্র, ভ্র উঠাইয়া দিয়া অন্য বেশী আবশ্যক অক্ষর দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

ঞ যোগে ঞ্চ, ঞ্ছ, জ্ঞ হয়। কলটিতে জ্ঞ অক্ষরটি দেওয়া আছে। কিন্তু উহা উঠাইয়া দিলেও চলে, কারণ ড এবং ও যে জ্ঞ আকার হয়, তাহাতেই কাজ চলে।

ণ যোগে ন্ধ, ন্ধ, ন্ধ, ন্ধ হয়। ২ যোগে স্তু, স্থ, হয়।

হ এবং ব যোগে হ্ব এবং হ্ব বা ব্হ লিখিতে পারা যায়।

যুক্তাক্ষর লিখিতেই বাংলা ভাষার কলে লেখার যত অসুবিধা। কলটিতে কয়েকটি যুক্তাক্ষর যথা—ত্ত, ক্ত, জ্ঞ, ঙ্ক, গু, স্ম, দেওয়াই আছে। অপর কতকগুলি কি উপায়ে করা যায়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ যুক্তাক্ষরই হসন্ত সাহায্যে করিতে হইবে। যেমন শুক্ল, বল্কল, প্লাবন, গ্লাস, প্রফুল্ল, প্রশ্ন, স্নান মগ্ন, ভিন্ন, জন্ম, ভস্ম, পদ্ম, গ্রীষ্ম, নন্দন, ঘণ্টা, কম্প, উচ্চ, স্বচ্ছ, লজ্জা, কুজ্ঝটিকা, খড়্গা, মুদ্গর, উড্ডীয়মান, উৎথান বা উত্থান উদ্দাম, উদ্ঘাটন, সদ্ভাব, চেপ্টা, চন্দ্র, লিপ্সা, কন্জা, শব্দ, পশ্চাৎ, পরিষ্কার, ষষ্ঠ, স্কুল, পদস্খলন, স্ফীত, ফাল্গুন, তীক্ষ্ণ, লক্ষ্মণ, সম্ভ্রম প্রভৃতি। কিন্তু ে যোগ এবং ি যোগ করিলে কি প্রকার আকার দেওয়া উচিত তাহা বিবেচ্য। চন্দ্রে, লুণ্ঠিত, ক্লেশ, চল্লিশ, প্রফুল্লের, প্রশ্নের, অন্নের, পদ্মের, বঙ্কেসর, আনন্দিত, লম্ফে, উদ্দেশ, ইপ্সিত, পশ্চিম, শিরশ্ছেদ, ষষ্ঠের, প্রভৃতি লেখা উচিত কি চন্দ্রে, লুণ্ঠিত, কেল্শ, চল্লিশ, প্রফুল্লের, প্রশ্নের অন্নের, পদ্মের, আনন্দিত, লম্ফে, উদ্দেশ, ইপ্সিত, পশ্চিম, শিরশ্ছেদ, ষষ্ঠের, প্রভৃতি লেখা উচিত, তাহা বিবেচ্য। শেষোক্ত প্রকারে লিখিলে উচ্চারণের সৌকর্য্য হয়।

হ এবং ণ বা ন যোগে যে আকার ছাপার অক্ষরে হয়, তাহা করার উপায় নাই। হ্ণ, হ্ন, ণ্হ, ন্হ দ্বারা কাজ চালাইতে হইবে। ঙ যোগে অঙ্ক, শঙ্খ, সঙ্ঘ লেখা যায়। অনুস্বারের সাহায্যে অংক, শংখ, সংঘ লিখিলেও চলে। ঞ যোগে বাঞ্ছা, ব্যঞ্জন, ঝঞ্ঝাবাত লেখা যায়। অথবা বান্ছা, ব্যন্জন, ঝন্ঝাবাত লিখিলেও বোধ হয় কাজ চলে। হ্ম লেখার উপায় নাই, সুতরাং ব্রাম্হন প্রভৃতি লিখিতে হয়। র এর পুটুলি . যোগে ড়, ঢ়, য় হয়। কিন্তু উহাতে বেশী সময় লাগে বলিয়া সর্ব্বদা বেশী ব্যবহৃত রটি পুটুলিযুক্তই দেওয়া আছে।

কলটিতে এক্ষণে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে দুই তিনটি অক্ষর নীচে সংযোগ করা যায় না। কারণ তাহা করিতে গেলে নিম্নস্থ একটি অক্ষরের উপরেই আর একটি অক্ষর পড়ে। সুতরাং কিন্তু বা কিন্তু, ত্রুটী, বন্ধু, বা বন্ধ, প্রস্তুত বা প্রস্তুত, মন্ত্র, ভ্রু বা ভ্রূ প্রভৃতি লিখিতে হইবে। অবশ্য কাগজ একটু উপরে উঠাইয়া লেখা যাইতে পারে, যথা বন্ধ, ভ্রু, মন্ত্র, প্রস্তুত বা প্রসত। কিন্তু কার্য্যকালে ইহা করা অত্যন্ত বিরক্তি ও অসুবিধাজনক এবং সময়ক্ষয়কারী হইবে, অথচ অনেক সময় সুন্দর হইবে না।

পদ্মনাথ বাবুর প্রস্তাবিত প্রকারে এক একটি অক্ষর অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া কলের অক্ষর করিলে অনেক সময়ক্ষয় ও উহাদের সংযোগ (Combination) মনে রাখা ত দুঃসাধ্য হইবেই, অংশগুলির পরস্পর অবস্থান ঠিক করিয়া দিয়া কল প্রস্তুত করাও কঠিনতর ব্যাপার হইবে।

অক্ষর-সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া আমি নানা কারণে সঙ্গত মনে করি না। কমাইতে গেলে উচ্চারণে অসুবিধা না হইতে পারে, দেখিয়া অর্থবোধ করা কঠিন হইবে, সন্দেহ নাই। শ, ষ, স, র, ড়, ঢ় ব্যবহারে অনেক শব্দের বিভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে। ইংরেজী ছোট হাতের এবং বড় হাতের (Small and Capital) অক্ষরে একই উচ্চারণ, কিন্তু যদিও উহার এক প্রকার অক্ষর দ্বারা কাজ চালাইলে অনেক সুবিধা হয় এবং অক্ষরের সংখ্যা খুব কমিয়া যায়, তথাপি ঐরূপ প্রস্তাব কেহ করে না। প্রথম আমলে যে সকল ইংরেজী টাইপরাইটার বাহির হইয়াছিল, তাহার কোনটাতে কেবল বড় হাতের অক্ষরই ছিল, ছোট হাতের অক্ষর ছিল না। কিন্তু আজকালকার প্রচলিত কলে উহা অবলম্বিত হয় নাই। তবে কতকগুলি যুক্তাক্ষরের আকার অনায়াসেই পরিবর্ত্তন করা যায়। যোগেশ বাবুর কয়েকখানা বহি সাহিত্যপরিষদ হইতে ঐরূপভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ক্র, ভ্র, ত্র, শু রু, হু প্রভৃতি অক্ষরগুলি ক্‌র, ভ্‌র, ত্‌র, শ্‌ু, হ্‌ৃ, হ্‌ু লিখিলে কোন ক্ষতি হয় না।

এক্ষণে বিবেচ্য যে, পূর্ব্ববর্ণিত কলটির অক্ষরগুলির কি কি পরিবর্ত্তন করিলে অধিকতর সুবিধা হয়। একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ত্র, ত্ত, জ্ঞ, ক্র, ৎ ল, ও, ক্ত অক্ষর অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়। একটি মাত্রার চিহ্ন থাকিলে এ, ও, ত্র, ত্ত হইতে পারে। ত্‌ লিখিলেও ক্ষতি নাই। ঐরূপ ক্‌ লেখা যায়। যদিও বেশী শুদ্ধ রূপে লিখিতে ত্র অক্ষরের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকেই পুত্রই লেখেন। টাইপরাইটারের লেখাতে অত শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের আবশ্যকতা নাই ; মাত্রা চিহ্ন থাকিলে ও দ্বারাই ত এর কাজ চলে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রকার ব্যবস্থাদ্বারা কালব্যাজ হইয়া থাকে সুতরাং ত রাখাই বেশী সুবিধাজনক। ৎ এর কাজ ত্‌ দ্বারা, ক্ত এর কাজ ক দ্বারাই চলে। ও এর ব্যবহার খুব কম, আবশ্যকমতে নড দ্বারা চলে। জ্ঞ, ড এবং • দ্বারা হয় তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। মাত্রা, ব্রাকেট, ল ফলা, ম ফলা, ন ফলার সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়। এইগুলি থাকা উচিত। ড্যাস্ চিহ্নেরও আবশ্যক হয়। সুতরাং ত্র, ত্ত, জ্ঞ, ক্র, ৎ, ত্র, ক্ত অক্ষর উঠাইয়া মাত্রা, ব্রাকেট, ল ফলা, ম ফলা, ড্যাস থাকার বন্দোবস্ত করিলে বেশী সুবিধা হয়। ইহা সহজেই হইতে পারে। ৲, ৴, ৷ এইরূপ চিহ্ন তিনটি থাকিলেই হ এর সঙ্গে নকারের চিহ্ন এবং র ফলার সঙ্গে উ ও উকারের যে আকার হয় তাহা এবং ক্ষ অক্ষরটি লেখা যাইতে পারে।

অক্ষর ঠিক হইলে ঐগুলি সুবিধাজনকভাবে সাজাইবার বিষয়ও করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আবশ্যকমতে বারান্তরে আলোচনা করিব।

মন্তব্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অক্ষরসংখ্যা কম করা অপেক্ষা বেশী করিলেই টাইপ-রাইটারদের তাড়াতাড়ি লেখা বেশী সহজ হয়। এই বিষয়ে হ্যামণ্ড টাইপরাইটার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী, কারণ ঐ কল ৯৫, ১৩১, ১৭৬, ২১৩ অক্ষরযুক্ত পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলা লেখার উপযোগী আবশ্যকসংখ্যক অক্ষর করা যাইতে পারে। বিলিক (উপরে বর্ণিত) এবং হ্যামণ্ড টাইপরাইটারের একটী প্রধান বিশেষত্ব ও সুবিধা এই যে, এই দুই কলে একই কল দ্বারা নানা ভাষায় লেখার কাজ চলে, কেবল বিভিন্ন প্রকারের টাইপের চক্র বা চাকতি (Type-wheel or plate) হইলেই হইল। তাহার মূল্যও বেশী নহে। এই দুই কোম্পানী নানা ভাষায়, চীনা ভাষায় পর্য্যন্ত, কল করিয়াছে। হ্যামণ্ড কোম্পানী বাংলা কল এখনও করে নাই। আমি তাহাদিগকে চিঠি লিখিয়াছি। কেহ এক্ষণে তাহাদিগকে কিছু অতিরিক্ত অর্থ ও নমুনা দিলে আবশ্যকমত বাংলা অক্ষরের টাইপের চাকতী তৈয়ার করিয়া দিতে পারে।

রেমিংটন কোম্পানিও বাংলা টাইপরাইটার করার চেষ্টায় আছেন বলিয়া উহাদের এক সাহেব আমাকে বলিয়াছেন। তাহা ২।৬ বৎসর মধ্যে বাজারে উঠিতে পারে। তাহার মূল্য ৩৫০ টাকার কম পড়িবে না। উহাতে কিন্তু ইংরেজী লেখা চলিবে না ; তবে তাহাদের কল ভাল হওয়ারই কথা।

---

(৬)

বাংলা-লেখার কল

[শ্রীইমদাদুল হক্]

ফাল্গুনের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য-মহাশয় "কলের লেখা" সম্বন্ধে যে মৌলিক প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার একটি কথা বলিবার আছে। তাঁহার উদ্ভাসিত প্রণালী অনুসারে, যুক্তাক্ষর লিখিবার সময়, "একটি ঘরে ঘা দিবা মাত্রই অক্ষর চিহ্ন বসিয়া কাগজ কিঞ্চিৎ সরিয়া যাইবে, কিন্তু অনেক স্থলে একটি অক্ষর লিপিতে একাধিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে—তখন বাম হাত দিয়া কাগজ আবশ্যক মত সরাইয়া আনিয়া পূর্ব্বমুদ্রিত চিহ্নের উপরে, নীচে, অথবা গায়ে অপর একটি বা ততোধিক চিহ্ন বসাইতে হইবে।" আমার বক্তব্য এই যে, পুনঃ পুনঃ বামহাত দিয়া কাগজ সরাইতে হইলে বড় বিরক্তিজনক হইয়া উঠিবে। যথা, "কৌ" লিখিতে হইলে ৫ বার ঐরূপ করিতে হইবে। যদি কোন এমন একটি চাবি থাকে, যাহা বাম হাতে টিপিয়া রাখিয়া ডান হাত দিয়া কোন ঘরে ঘা' দিলে আর কাগজ সরিয়া আসিবে না, তাহা হইলে অনেক সহজে যুক্তাক্ষর প্রভৃতি লেখা যাইবে। অথচ ওরূপ একটি চাবি করা কঠিন হইবে না।

(৭)

সীতার বনবাস-তত্ত্ব

[শ্রীশিবরতন মিত্র]

একান্ত শুদ্ধচারিণী জানিয়াও কেবল লোকাপবাদ-ভয়ে সতীশিরোমণি সীতাকে বিসর্জ্জন দেওয়া, লোকোত্তরচরিত সংযতচিত্ত রামচন্দ্রের একটি কলঙ্ক বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। শুদ্ধ প্রজারঞ্জন বা কীর্ত্তি-লোপের বৃথা আশঙ্কায়, যাহা ধ্রুব ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস, যাহা দেবতা ও ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক কঠোর শপথপূর্ব্বক সত্য বলিয়া বিঘোষিত, তৎসমুদয় একবারে অবজ্ঞা করিয়া, সীতাকে অকারণে নির্ব্বাসিত করা, দুর্ব্বল চিত্তের পরিচায়ক বলিয়া অনেকের ধারণা। সীতা নির্ব্বাসন ব্যাপারের জন্য কেহ বা রামচন্দ্রকে, আবার কেহ বা রামায়ণের গ্রন্থকারকে দায়ী বিবেচনা করেন।

প্রথম শ্রেণীর সমালোচকগণ যুক্তি দ্বারা দেখাইতে চান; রামচন্দ্র যখন জানিলেন যে, প্রজাবর্গ তাঁহার সীতা-পরিগ্রহ-ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি সমাজের ভাবী অমঙ্গল বা ব্যভিচার-স্রোত নিবারণ করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছেন। শেষোক্ত সমালোচকগণ বলেন যে, মহর্ষির সীতাকে নির্ব্বাসন করা উপযুক্ত কর্ম্ম হইয়াছে। কেননা, সীতাদেবীর, রামচন্দ্রের পত্নী হইবার গুণ রহিলেও রাজা রামচন্দ্রের মত আদর্শ-সম্রাটের মহিষী হইবার গুণ তাঁহার আদৌ ছিল না। এই নিমিত্ত, রামচন্দ্র যত দিন না রাজা হইয়াছিলেন, ততদিন সীতা তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি রাজা হইলেন, অমনি সীতা রামসঙ্গচ্যুতা হইলেন। সীতা যদি নির্ব্বাসিতা না হইতেন, তাহা হইলে তিনি অন্তঃপুর মধ্যেই আবদ্ধা রহিতেন,—তাঁহার নাম পর্য্যন্ত আর কেহ শুনিতে পাইত না। মহর্ষি, নির্ব্বাসিতা করিয়াও সীতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন—তথাপি অন্তঃপুর মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া, তাঁহার অবশিষ্ট জীবন নিষ্ফল হইতে দেন নাই! 'এককালে রামচন্দ্রের আশ্রয়ে সীতাচরিত্র সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সীতাদেবী কুঞ্চিতপত্র, পুষ্পহীন, শোভাহীন লতার মত শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে কবির দোষ কি ?'—(ভারত, ১৩১৪)। তাঁহাদের মতে, মহর্ষির সীতানির্ব্বাসনের ইহাই গুহ্য তত্ত্ব।

এই উভয় শ্রেণীর সমালোচকগণ, রামচন্দ্র বা বাল্মীকির কৃতকার্য্যের সমর্থন করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের ধারণা অন্যরূপ। মহর্ষি, দেবচরিত্র অঙ্কিত করেন নাই—আদর্শ মনুষ্যচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; সুতরাং, একবারে দোষশূন্য বলিয়া কল্পিত হয় নাই। তিনি, ইহা 'দৈব' ব্যাপার বলিয়া একাধিক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া প্রত্যাগমনের সময় লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলিতেছেন,—'দৈব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না—অতএব আমি বিবেচনা করি, দৈববশতঃ রামের বৈদেহী-বিয়োগ সংঘটিত হইয়াছে। অধিক কি, যে রঘুনন্দন রাম কুপিত হইয়া দেব,' গন্ধর্ব্ব, অসুর, এবং রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছেন, তিনিও সেই দৈবের অনুবর্ত্তন করিতেছেন। * * * প্রাজ্ঞ সুমন্ত্র তদুত্তরে বলিলেন—তুমি মৈথিলীর জন্য সন্তাপ করিও না, পুরাকালে দ্বিজগণ তোমার পিতার সমীপে সীতার এই ভাবী নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন—(উত্তরকাণ্ড ৬০।১)।' ভৃগুমুনি তাঁহার পত্নী-বিনাশের জন্য সুরেশ্বর বিষ্ণুকে অভিসম্পাত দেন যে—'আমার পত্নী অবধ্যা হইলেও তুমি ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছ, অতএব তুমি মনুষ্য লোকে জন্ম-গ্রহণ করিবে, সেখানে তুমি বহুবর্ষ পত্নীর বিয়োগদুঃখ অনুভব করিবে'—(উত্তর কাণ্ড ৬১)। রামচন্দ্র, বনগমন কালে, সীতাকে তাঁহার সমভিব্যাহারে বনগমন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—'পিতৃগৃহে বাসকালে আমি ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, আমাকে অবশ্য বনবাস করিতেই হইবে'—(অযোধ্যা, ২৯)। বলা বাহুল্য, রামের সহিত বনবাস, সীতার বনবাস নহে—রাম কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া একক বনবাসেই সীতার প্রকৃত বনবাস।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে মহর্ষি সীতানির্ব্বাসন-ব্যাপার সমর্থন করেন নাই। এবং তিনি ইহা সম্পূর্ণ রূপ অন্যায় ও ভয়ঙ্কর দোষাবহ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা 'দৈব' বা অদৃষ্ট-বশে ঘটিবেই ঘটিবে, তাহা যতই কেন অন্যায় হউক না, উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবার শক্তি কাহারও নাই। এই জন্যই মহর্ষি, ইহা কাহারও স্বেচ্ছাকৃত নহে, শুদ্ধ 'দৈব' বা 'অদৃষ্ট' কর্ত্তৃক সংঘটিত ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন ও পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের জন্য শাপ-প্রদানাদির কথা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বালীবধ-প্রসঙ্গেও এইরূপ পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে। মহর্ষি বেদব্যাসও দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী প্রসঙ্গে এক পূর্ব্বজন্মঘটিত বৃত্তান্তের অবতারণা করিয়াছেন।

রামচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যে কোন সতীস্ত্রীর একনিষ্ঠ স্বামীর পক্ষে একান্ত মর্ম্মঘাতনাকর। আবার রামচন্দ্রের মত স্বামী, সীতার মত পত্নী, ইহাদের মধ্যে এরূপ বিচ্ছেদ সংঘটন যে, উভয়ের পক্ষে কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক, তাহা অনুমেয়। তবে যাহা অদৃষ্ট, যাহা দৈব, তাহা অবশ্যম্ভাবী; তাহার গতিরোধ করা বা তাহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। *

---

* এই প্রবন্ধটি আমি বহুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। সুতরাং, ইহা শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস-মহাশয়ের, ফাল্গুন সংখ্যা, "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত 'শ্রীরামের সীতাবর্জ্জন' প্রসঙ্গের প্রতিবাদ বা পরিপোষক নহে। সীতাবর্জ্জন বিষয়টি আমি যেরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—প্রবন্ধে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। সীতার বনবাস মহর্ষির অনভিপ্রেত হইলে, অযোধ্যাকাণ্ডে ২৯ অধ্যায়ে সীতার মুখ দিয়া ও রূপ কথা বলাইয়াছেন কেন? তবে, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিলে স্বতন্ত্র কথা।

—(লেখক)

মহানিশা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৫)

সৌদামিনী সে দিন এবং তারপরও দু'চারি দিন তাঁহাদের ঘুঘুডাঙ্গায় রাখিয়া আসিবার জন্য বিহারীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিহারী কোনও বার "কিছু দরকার নাই মা" বলিয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিয়া, কোনও বার বা ঈষৎ ম্লানমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া, তাঁহার অনুরোধগুলাকে খণ্ডন করিয়া যাইতে লাগিল, আজ্ঞা-পালনের কোনই আগ্রহ দেখাইল না। অগত্যা সৌদামিনী মাতামহের বিশেষ অনুজ্ঞা পাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে থাকাই স্থির করিয়া লইলেন। কিন্তু কোন সময় হয়ত চড়াগলায় একটা কড়া-হুকুম জারি হইয়া, দাসী-চাকরাণীদের সাক্ষাতে তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ফেলিবে, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়াই রহিলেন, এবং সেই অপমানটা ঘটিবার একটু পূর্ব্বেই নিজের মানটুকু মাত্র বজায় রাখিয়া, বিদায় হইবার জন্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতেও লাগিল।

"তার পর, বেহারীচন্দ্র! বসে আছেন কি মনে করে?"

সংসারে যাহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া দাঁড়ায়, মনের মধ্যে তাহাদেরই বেশি করিয়া আত্মমর্য্যাদার অভিমান মাথা-খাড়া করিয়া থাকে। যতদিন সে ভাগ্যদেবীর বরপুত্র ছিল, তখন তাহার চারিদিকেও অপর একজন ভাগ্যবানেরই মত উদারতার আবহাওয়ারও অভাব ছিল না। কিন্তু যখন সেই গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবী তাঁহার নিজের গর্ব্ব দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিলেন না,

তখন সে ভারটা কাজেই তাহাকে নিজের হাতে তুলিয়া লইতে হইল। বাহিরে যতক্ষণ সম্মান পাওয়া যায়, মনও ততক্ষণ পূর্ণ থাকে, কিন্তু সেটি ফুরাইলেই সর্ব্বদা ভয় হয়, পাছে তাহার দারিদ্র্য কাহাকেও হঠাৎ মনে করাইয়া দেয় যে, এ ব্যক্তি হয়ত তাহার দ্বারস্থ হইতেও পারে! হয়ত কে এখনি বিরক্তির সহিত ভাবিয়া বসিবে—'ঐ দয়া-ভিখারীটার হয়ত মনে কোন মৎলব আছে!'—

সৌদামিনীর প্রাণটা সংসারচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে এমনি নিষ্পিষ্ট যে, তাহার ভিতরে সহ্য করিবার অসামান্য শক্তি দূরে থাকে, অন্যের সম্বন্ধে এতটুকু বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। আজন্মই তিনি দেবতা ও মানুষের অবিচারের মধ্যেই বর্দ্ধিত ও এই দুয়ের অবিবেচনাজনিত দণ্ড মাথায় বহিয়া এখনও পর্য্যন্ত জীবিত। কাজেই জগতের কাহাকেও অথবা জগদতীত কোন কিছুকেই তাঁহার যথার্থ বিশ্বাস বা ভরসা করিবার কিছুই ছিল না। আর শুধু অবিশ্বাস নয়, এ দুই স্থলেই তাঁহার মনে একটা অত্যন্ত তীব্র অভিমানও সুপ্ত হইয়া আছে এবং অতি সহজেই সেটি উথলিয়া উঠিতে পারে। তাঁহাদের মাতামহের প্রতি অবিচার তাঁহার চক্ষে তাঁহাদের উপর ভাগ্যের অথবা ভাগ্য-বিধাতা ভগবানের অবিচারের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। নিজের কপালকে দোষী করিয়া বরং দৈবকে কখন কখনও মার্জ্জনা করিলেও করিতে পারা যায়। কিন্তু এই অতি বড় কঠিনচিত্ত,—দূর-প্রতীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে সকল প্রকার স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা-ক্ষমা-করুণার আহুতি দানকারী,—মানবের স্বাভাবিক মানবত্ববর্জ্জিত মানুষ—সে কি এতটুকুও ক্ষমার যোগ্য? যে পিতৃহৃদয়ের অতুলনীয় বাৎসল্য জগতের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, মানুষের অন্তরবৃত্তির প্রধান অহঙ্কার, সে সম্বন্ধের চেয়ে আর কোন বড় স্নেহের সম্বন্ধ খুঁজিয়া না পাইয়া, মানুষ তাহার অজ্ঞাত স্রষ্টা, পালন-কর্ত্তা বিধাতাকে 'পিতা' নামে সম্বোধন করিয়া, পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়; সেই পিতৃ-সম্বন্ধ একটা অতিবড় তুচ্ছ মান-অভিমানে একেবারে জন্মের মত ভাঙ্গিয়া গেল! যে মানুষ নিজের সন্তানকে এমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারে, সে পারে না, কি? সৌদামিনী তাই যতদিন না দুঃখের অতি চরমে পৌঁছাইয়াছেন, ততদিন এই অস্বাভাবিক পরমাত্মীয়ের নিকট কোন সাহায্যই প্রার্থনা করিতে চাহেন নাই। দুঃখের বোঝা, রোগের যন্ত্রণা, শোকের ঝড়, সমস্ত বড় বড় বিপ্লবই একে একে এবং এক সঙ্গেও তাঁহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কতবার ঔষধ-পথ্য-বিহীন সন্তানের মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে বসিয়া একখানি পত্র লিখিবার জন্য মন উন্মুখ আকুল হইয়া ছুটিতে চাহিয়াছে—আঙ্গুলগুলা কলমের বাঁটটাকে জোরে চাপিয়া ধরিয়া কাগজের উপর দ্রুত নর্ত্তনবেগে ফিরিয়াছেও; কিন্তু তাহার সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াই তিনি নিজেকে এ হীনতা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। যখন ক্ষুধার জ্বালায় শিশুগুলি কাঁদিয়া আবদার করিয়া লুটাইয়াছে, তখনকার সে প্রলোভন কাটাইতে পারা সে কিছু আর এর কাছে বৈশি নয়! কিন্তু অবশেষে এ প্রাণশোষক হৃদয়পাষাণকারী তীব্র অভিমানকেই পরাজয় মানিতে হইল। সৌদামিনীর অক্ষম অপদার্থ স্বামী মনের মত নেশার জোগান না পাইয়া নিত্য উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। একদিন মত্তাবস্থায় খুব মারধোর করিয়া, সে পুলিষের হাঙ্গামায় পড়িয়া যায় এবং সেই উপলক্ষে ভাঙ্গা-পুরাণো কুঠরিদুটি শুদ্ধ বেচিয়া, সেই সকল অর্থে তাঁহার কারাবাস ক্লেশ ঘুচাইবার পর হইতেই গৃহ-হীনের 'গৃহে' অনশনের ক্লেশ পূর্ণমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। অখাদ্য খাইয়া, আধপেটা খাইয়া, একরকম না খাইয়া, দু তিনটি ছেলেমেয়ে, যাহারা এতদিন কোন রকমে যমের সহিত—রোগের সহিত—যোঝাযুঝি করিতেছিল, একে একে হার মানিয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাঁচিল। মা-বাপ অনেক পূর্ব্বেই মেয়েটিকে 'হাত-পা না বাঁধিয়াই' জলে ফেলিয়া দিয়া, নিজেদের পথ দেখিয়া লইয়াছিলেন। 'হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলার' কথা সর্ব্বদা শোনা যায় বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে সে উপমাটা ঠিক খাটিবে না, কেন না 'হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলে' তো এক রকম ভালই করা হইত—একেবারে ডুবিয়া মরিতেই হইত! না,—জলে ফেলা হয় তা ঠিকই, তবে হাত এবং পা খোলাই থাকে। কেবল জানা থাকে না—সাঁতার। আর সেইটির অভাবেই উঠিবার উপায় তো থাকেই না, এবং সহজেও ডুবিয়া মরা হয় না।

সংসারের মধ্যে রহিল একমাত্র কন্যা; তাও

আবার সবার জ্যেষ্ঠ, যেটির জন্য কেবল দুইটা ভাতের ভাবনা ভাবিলেই যথেষ্ট হইবে না, সেই বয়স্থা আইবড় মেয়েটিই! দুষ্ক্রিয়ার অনুসঙ্গী বিবিধ জটিল রোগ-বিক্ষত শরীর, উত্তপ্তচিত্তস্বামী এবং এই সকল অতীত এবং বর্ত্তমান শোকদুঃখের জ্বালায় একান্ত বিব্রত, ভবিষ্যতের বিভীষিকায় অত্যন্ত আতঙ্কিত—তিনি নিজে।

স্বামীর রোগ—ঔষধ-পথ্য যোগান চাইই; তাঁহার নেশার অভ্যাস, সেও নহিলে নয়; সৌদামিনী পাড়ার এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী পাচিকাবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। এর চেয়ে হিন্দুঘরের অনাথার জন্য অপর কোন সহজ জীবিকার পথ খোলা নাই। তিনি 'সূজনী'র সূক্ষ্ম কার্য্য কিছু কিছু জানিতেন, কিন্তু জর্ম্মন র‍্যাপার ও নকল কম্বলের কৃপাতে এসব জিনিষের আদর ফুরাইয়া গিয়াছে, কাজেই খরিদ্দার নাই, দরও হয় না।—ঈশ্বরের বা ভাগ্যের হয়ত এই খানে একটু দয়া ছিল, নেশার ঝোঁকের সহিত রোগের যন্ত্রণায় মিশ্রিত উপদ্রব-অত্যাচার এর চেয়ে আর বেশিদিন সহ্য করিতে হইল না। দিবারাত্র অপছন্দর খুঁৎ খুঁতানি, গালমন্দ, প্রহার এবং যন্ত্রণাজনক রোগের আর্ত্তনাদ এড়াইয়া একদিন সৌদামিনীর স্বামী তাঁহাকে মুক্তি দিয়া গেলেন। যদি তার এই শেষ চিহ্ন মেয়েটিকেও সে নিশ্চিন্ত করিয়া নিজের সহযাত্রী করিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে সৌদামিনী নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন।

কিন্তু এতগুলি ভাই-বোনের রুগ্ন দেহ ও স্বল্প জীবনের সংস্পর্শে চিরজীবন কাটাইয়াও এ মেয়েটিকে মোটেই তাহাদের ছোঁয়াচ লাগিল না। লোহার মত শক্ত শরীর, এবং বোধ করি, মার্কণ্ডেয়ের মতই আয়ুলাভ করিয়া সে পৃথিবীতে আসিয়াছিল। নহিলে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়া, এমন মৃত্যুর সুযোগসকল তাহার নিকট ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়! তা'ছাড়া অপগণ্ডগুলির ন্যায় 'রোগিয়া' 'ভোগিয়া' থাকিলেও না হয় এক রকম করিয়া চলে, তাহাও না! সেই চির-অনাদৃতা অভাগা মেয়েটা যেন বর্ষার সদ্যঃবর্ষণ-প্রাপ্ত নূতন ভরা নদীর মত দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফুলিয়া ভরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল! হাড়বাহির করা শিরওঠা হাত দুখানি যেন কার মন্ত্রবলে যেমন সুগোল তেম্নি কোমল হইয়া উঠিল। তৈলাভাব অগ্রাহ্য করিয়াও থাট থাট চুলগুলি আগুল্ফ লম্বিত ঘনমেঘ জালবৎ সুচিক্কণ হইয়া উঠিল, এক কথায় তাহার সর্ব্বশরীর পরিপূর্ণ হইয়া, যেন একটি 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'র শোভা ধারণ করিল। ছোট খাট মোটাসোটা সেলাইকরা কাপড়গুলি সে দেহের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে আর কোন ক্রমেই যেন ঢাকা দিয়া রাখিতে পারে না। ছাইচাপা আগুনের মত ভিতর হইতে একটা দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ আপনাকে আবরণমুক্ত করিয়া, সর্ব্বলোচনে প্রকাশ করিয়া ফেলিতে চায়। দিনের আলোকে রাত্রির অন্ধকারে চাপা দিয়া রাখিতে যে, আকাশের সহস্রস্তর মেঘেরও সামর্থ্য থাকে না।

সৌদামিনীর যতদিন বুঝিবার সাধ্য ছিল, তার অনেক পর পর্য্যন্তই তিনি বুঝিয়াছেন। সাম্নের লাইনের সৈন্যদের যেমন সম্মুখে শত্রুর এবং পশ্চাতে সেনাপতির অস্ত্র উদ্যত, কোন দিকেই রক্ষা নাই;—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাদের যুদ্ধ করিতেই হইবে। স্বামী বর্ত্তমানে এই রমণীর অবস্থাও ঠিক ইহারই অনুরূপ ছিল। শুনা যায়, ভরণ-ভার গ্রহণ করেন বলিয়া, তাই স্বামীর একটি নাম ভর্ত্তা। বিবাহ-মন্ত্রে, এবং বৈবাহিক অনুষ্ঠানে এই "ভরণ"-ভার-গ্রহণ প্রতিজ্ঞা একাধিক বারই বরকে করিতে হয়, এবং দু' একজন ছাড়া প্রায় সকলকেই আমরণ এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেও দেখা যায়। আর কিছু না হোক, দুবেলা দুমুঠা—নেহাৎ পক্ষে এক বেলা একমুঠা—'কাঁড়া হোক আ-কাঁড়া হোক' মোটা ভাত, নুন-ভাত বা ফেন-ভাতই না হয় নিজের স্ত্রীকে দেয় না, এমন হতভাগ্য এ দুনিয়ায় খুব বেশি জন্মায় না। কিন্তু কুলীন-কন্যাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা প্রায়ই এই সংসারের বহির্ভূতা। কুলীন পত্নী!—যে পদ সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদ হওয়া উচিত ছিল, তাঁহাদের কপালে সমাজ সেই 'কুলীন'-সম্প্রদায়কে শিব গড়িতে 'যখন' বানর গড়িয়া বসিলেন, তখন তাঁহারা সংসারের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের জীবন বহন করিয়া, এই 'পদের' সার্থকতা করিতেও বাধ্য হইলেন। কুলীন-কন্যাদের স্বামী—ভর্ত্তা প্রায়ই হয় না। স্থলবিশেষে আবার সম্বন্ধ উল্টাইয়াও যায়। সৌদামিনীর ভাগ্যেও এইরূপই ঘটিয়াছিল। স্বামী তাঁহার আধুনিক কুলীন-সন্তানদের ন্যায় একপত্নীক। সৌদামিনী যখন অদ্ধাহারেও স্বামীর নেশার কড়ি উচিতমত যোগান

দিতে অপারগ হইতেন, তখন কত সময় নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিয়াছেন, 'আর দু একজন সতীনও থাকিত!' কিন্তু তাঁহাদেরই বাল্যের সেই সপত্নী-প্রতিষেধক সেঁজুতি-ব্রতের ফলেই বোধ করি, কৌলীন্য-সম্মান-পদক কণ্ঠে ধরিয়াও কোন কুলীন পিতার অতিভারগ্রস্ত কন্যাও সেই জীর্ণবক্ষপঞ্জরোপরি পুষ্পমালাটি দুলাইল না। যত দিন সে বাঁচিয়া রহিল, একা সৌদামিনীই তাহার আবার ভাত, পরণের কাপড়, আফিম, তামাক, আরও কিছু কিছু সদভ্যাসের কড়ি যেমন করিয়া পারিল, যোগাইল। গাঁজার কলিকাটি সাজিয়া হাতে তুলিয়া দিল, এবং মরিয়া গেলে শাঁখা-ডুগাছা খুলিয়া ফেলিয়া, একাই একাদশী করিতে লাগিল।

যতদিন সধবা ছিলেন, স্বামীর খাতিরে সকল দুঃখই অম্লানমুখে সহ্য করিতে স্থিরসঙ্কল্প ছিলেন, করিয়াও-ছেন বড় কম নয়! কিন্তু যখন সে শৃঙ্খল চরণ হইতে খসিয়া গিয়াছে—তখনও তাঁহার মনে হইল—এই মেয়েটাই এ পৃথিবীতে তাঁহাকে যত জনের সঙ্গে সম্বন্ধে আসিতে হইয়াছিল, সে সকলেরই মধ্যে প্রধান শত্রু! কেন সে এত দিন এত কষ্ট সহিয়াও বাঁচিয়া রহিল? রহিলই যদি—তবে সে কিসের জন্য বেটা ছেলে না হইয়া মেয়ে হইয়া জন্মিল? আর তা' ও যদি না হইয়াছিল, তবে এত দুঃখেও তার এই শরীরমনের স্ফূর্ত্তি কোথা হইতে আসিতেছে? এ যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, আর দুদিন পরে বিবাহের জন্য মাথা খুঁড়িয়া বেড়াইতে হইবে। যাহাদের দুবেলায় পেটের অন্ন জুটে না—মেয়ের বিয়ে কেমন করিয়া সে দিতে পারে? অথচ না পারিলেই বা তাঁহার জন্য ক্ষমা কোথায়?

অপর্ণার কিন্তু এ সকল বিষয়ে এতটুকু চিন্তালেশও দেখা যাইত না। সে গাছের উপরকার ফুলেভরা আগাছা গাছের মত দিব্য স্বচ্ছন্দচিত্তে হাসিয়া খেলিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। মেয়ের বাড় কমাইয়া রাখিবার জন্য বিয়ের বয়সের মেয়ের মায়েরা যে সকল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহার সৌভাগ্যক্রমে তাহার পক্ষে সে সকলই অকৃত্রিম বলিয়া নূতন করিয়া তাহার মাকে সে সকলের জন্য চেষ্টিত হইতে হয়ই নাই। কিন্তু তাহার মার মুনিববাড়ীতে মুনিব-গৃহিণী বিস্ময়ে নেত্রবিস্ফারিত করিয়া বলিতেন, "কি খেয়ে তোমার অপির অমন ছিরিখানি হচ্চে বলোদেখি বামুনমেয়ে? এত বাদাম, মাখম, ঘি, দুধ খাইয়াও তো আমার রাজলক্ষ্মীর ভুবনমোহিনীর দেহে মাংসরত্তি আন্‌তে পারলাম না!"

সৌদামিনী এ অনুযোগে অপর কোন ভাগ্যবতী জননীর ন্যায় আনন্দে মন পূর্ণ করিতে না পারিয়া, বিরক্তিপূর্ণ নেত্রে কন্যার অনাবশ্যক স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যভরা শরীরের দিকে চাহিয়া, নীরবেই উত্তর কাটাইয়া দিতেন; কেন না উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, "কিছু না খেয়েই ওর এই ছিরি মা! তোমাদের মেয়েদেরও বেশি বেশি খাওয়ান কমিয়ে দাও, হয়তো অমনি ছিরিই হবে!"

একে মেয়ের প্রতি রাগ করিবার এই সব নানা কারণ তো বর্ত্তমান রহিয়াছেই, তার উপর তাহার জন্য নিজেকে পরের চাকরিতে বদ্ধ রাখিতেই হইল; কাজেই সৌদামিনী কন্যাকে কোন ক্রমেই ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিতে ছিলেন না। সকল সময় সে যেন তাঁহার মনের মধ্যে কাঁটার মতই ফুটিয়া খচ খচ করিতে থাকে। কেমন করিয়া উহাকে পাত্রস্থা করিয়া, জাতজন্ম বজায় রাখিবেন, সেই নিদারুণ চিন্তায় তাঁহার ভগ্নশরীর প্রতিমুহূর্ত্তে অধিকতর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লগিল। কন্যাদায়ের মত এত বড় দায় ঘাড়ে লইয়া, কপর্দ্দকহীনা বিধবা একা এই সংসারসমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া। কোথাও ইহার কুল দেখা যায় না। হঠাৎ একদিন ইহার মাঝখান দিয়া একটু খানি পরিহাসের খেলাও বিধাতা খেলিয়া লইলেন। তা তাঁহাকে এই রকম আমোদ করিতে কত সময়ই দেখা যায়! কি করিবেন, নহিলে যে একঘেয়ে হইয়া পড়ে। মুনিব গৃহিণীর এক ভাইপো তাঁহার সংসারে থাকিয়া পড়া-শোনা করিতে করিতে একটা দুইটা পাশ করিয়া, কলিকাতায় তিনটা পাশের পড়া পড়িতেছিল। ছেলেটির রূপগুণ এবং বিদ্যার বিষয়ে বিচার করিতে বসিলে, সেটি কোন ক্রমেই এই অনাথাদের লুব্ধ দৃষ্টির লক্ষ্য হওয়াই সম্ভব ছিল না; কিন্তু সেই বড়-লোক-বাপেদের লক্ষ্যের বিষয় ছেলেটি নিজেই নাকি এ সম্বন্ধে বিশেষ অপরাধী। সে বামুন-দিদির অনুরোধে একটি 'গরীব সরিব' পাত্রের খোঁজ করা উপলক্ষে অনেকবার ইতস্ততঃ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় গাঢ় রক্তবর্ণগণ্ডে, ভূমিনতনেত্রে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে

সৌদামিনী বলিল,—"তোমার মত গরীব আমার মত লোকের স্বপ্নেরও অতীত"

সৌদামিনী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কোথাও কেহ আছে কি না, কই বোধ হয় না। বলিলেন—"তোমার মত গরীব আমার মত লোকের স্বপ্নেরও অতীত। অত আশা দেখাইও না, ভবিষ্যতে বড় কষ্ট পাইব। কারকুন, মুহুরি, জমিদারের গোমস্তা —এমনি দরের লোক ভিন্ন রাঁধুনি বামনির মেয়েকে কে বিয়ে করিবে? সেইরূপ একটি দেখিয়া দিও।"

ছেলেটি হঠাৎ নিজের জন্য ঘটকালি করিয়া ফেলিয়া, বোধ হয়, একটু বেশী মাত্রাতেই লজ্জা পাইয়া গিয়াছিল। মনে মনে সে একটু বিস্ময়ও বোধ হয়, অনুভব করিতেছিল যে, কেমন করিয়া সে এত দিনকার এই অতিগোপন ইচ্ছাটি আজ অতিসহসা প্রকাশ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইল! কিন্তু যখন প্রথমে লজ্জার আটক মানে নাই, তখন এখন আর 'আসরে নামিয়া ঘোমটার' ব্যবধান রাখিলেও চলিবে না। কাজেই সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে যেন সচেষ্টায় দ্বিধা-লজ্জার আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল, মুখ না তুলিয়া, দৃষ্টি না উঠাইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষাও মৃদুস্বরে কহিল—"যে সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছেন, সেখানে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াও ঢের ভাল। যদি অযোগ্য মনে না করেন, এক বৎসর অপেক্ষা করুন। আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আমি নিজেই।"

ছেলেটি হঠাৎ এইখানেই থামিয়া গেল—না থামিলেও বোধ হয়, তাহাকে বাধ্য হইয়াই থামিতে হইত; কেননা সৌদামিনীও তাহার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া, হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া, এই সময়েই বাধা দিয়া উঠিলেন—"না না, বাছা, হঠাৎ কোন কিছু প্রতিজ্ঞা করা ভাল নয়। তোমার পিসিমা কি বলিবেন ঠিক নাই, হয় ত মনে করিবেন, আমিই তোমায় ভজন দিয়া একাজে মন লওয়াইয়াছি! কাজ নাই, তুমি অন্য পাত্র দেখিয়া দিও। সেই ঢের করা হইবে।"

বলিতে গিয়া, আত্মমর্য্যাদার উচ্চ পাহাড় ধসাইয়া, হুড় বলিয়া ফেলে—"আমিও তো খুব গরীব বামুন মাসি, আমার চেয়ে গরীব আর আপনি কা'কে পাবেন?"

কথাটা এমনই প্রলোভনের—আর এমনই অবিশ্বাস্য যে, সৌদামিনী নিজের শ্রবণশক্তিতে ঘোর সন্দিগ্ধ হইয়া, আর একবার ভাল করিয়া শুনিবার অথবা শোনাজিনিষটাকে বিপর্য্যস্তচিত্তে ধারণা করিয়া লইবার জন্য কিছুক্ষণ স্থির হইয়া, তীক্ষ্ণনেত্রে সেই লজ্জারক্তমুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার সেই সন্ত্রস্ত, বিজড়িত, লজ্জাভীত, অরুণমুখচ্ছবি তাঁহার অবিশ্বাস-কঠিন চিত্তেও সত্য তত্ত্ব প্রচার করিতে একমুহূর্ত্তের অধিক বিলম্ব করিল না। মুখ তাঁহার লজ্জার আভায় যেন লোহিত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তার মধ্যের একটা অতিগোপন হর্ষোচ্ছ্বাসে তাহা উদয়ের তরুণ সূর্য্যের মতই সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে, ইহার ভিতর ঘৃণার্হ পরিহাসের স্থান নিশাচর-পক্ষীর দিবালোকের নিকট অবস্থিতির ন্যায় একান্ত অসম্ভব।

করিয়া অশ্রুর প্রস্রবণ ছুটিয়া আসিতে উদ্যত হইল। কে কি মনে করিবে, বলিবে, ভাবিয়া কোন্ মা নিজের সন্তানের এত বড় সৌভাগ্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে সমর্থ হয়? এ যে জন্মদুঃখিনীর মেয়ের পক্ষে আশার কত অতিরিক্ত, তাহা অন্যে কেমন করিয়া বুঝিবে? কিন্তু তবু এ সুধাপাত্র—এ বুভুক্ষা-ব্যাকুল অধরে তুলিয়া ধরিতে তাঁহার সামর্থ্য নাই! নিজের কোন সুযোগকেই তিনি সুনামের চেয়ে বড় করিতে পারেন না। বিশেষতঃ এ বিবাহ করিতে দিলে, তাঁহার প্রতি প্রবলকরুণাপরতন্ত্র এই বালকের প্রতিও ঠিক সুবিচার করা হইবে না, একথাও সৌদামিনীর ভালরূপেই জানা ছিল। ছেলের পিসি যে তাঁহার রাঁধুনীর মেয়েকে ঘরের বধূ হইতে দিতে কোনমতেই সম্মত হইবেন না, এর চেয়ে সত্য আর সহজে চোখেই পড়িতে পারে না। আর তাঁহার ভ্রাতৃগৃহে! সেখানে প্রবলা বিমাতা সপত্নী-সন্তানকেই এতটুকু স্থান দিতে নারাজ, তাহার বধূর জন্য বরণ-ডালা উঠাইবে কে? কাজে কাজেই এ বেচারা তাঁহার জামাতৃ-পদ গ্রহণ করিতে গেলে, যে পদে আপাততঃ রহিয়াছে, সেখান হইতে পদচ্যুত হইতে বাধ্য হয়। কেন তিনি তাঁহার জন্য তাহার এত বড় অনিষ্ট ঘটিতে দিবেন? কিন্তু সেদিনের সেই অতর্কিত অভিব্যক্তির পর হইতে যখন তখন সেই তরুণ প্রস্তাবকারীর অতি সুকুমার মূর্ত্তিখানি তাঁহার অন্ধকার চিত্তের আশে পাশে নিজেই আলোকাভায় লইয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে, হাজারবার প্রত্যাখ্যান করিয়া, কঠিনমুখে মুখ ফিরাইয়া লইলেও, সে কোনমতেই বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না। কল্পনা কত মত সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়া, ভুলাইয়া দিতে চায়, লোভদমন করা যেন দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কখন মন দৃঢ় অবিচল দাঁড়াইয়া লোভকে ঘৃণার আঘাতে ধিক্কার দিয়া বলে—'এখনও তোর আশা করিতে লজ্জা করে না! দুঃখকে এখনও এত ভয়? যার তুই যোগ্য নহিস্—তাতে তোর লোভ কেন? মুহূর্ত্তটা ভুলিয়া যা' না!" কিন্তু আবার সে কোন সময় উৎসুক আকুল হইয়া ভাবে 'কেন লইব না? চুরি করি নাই, জুয়াচুরি করি নাই, নিজে যা সাধিয়া দিতে আসিতেছে, তাও ফেরৎ দিতে হইবে? কেন? কেন ফিরাইব?'

কিন্তু এ 'কেন'র উত্তর নিজের কাছে নিজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাহিরের কোন একজন অপর লোকেও এ 'কেন'র উত্তর দিতে অসমর্থ। যাহা পাওয়া যায়, সকল সময় কারণ থাক, না থাক, তবু সকল জিনিষ আমরা ভোগ করিতে পারি না, ইহা কত সময় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কেন? কেন পারি না? কে বারণ করে? কেন প্রবৃত্তি হয় না? নিজের অভাব নিজে জানিয়াও কেন সে অভাব-মোচনের চেষ্টা দেখা দেয় না? ইচ্ছা-আগ্রহ সত্ত্বেও মন সাগ্রহ হয় না কেন? বুঝিতে পারা কঠিন!

সৌদামিনী যাহা খুঁজিয়া হাহা করিয়া ফিরিতেছিলেন, হাতের কাছে পাইয়াও সে জিনিষ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন না, সেই হাহা'ই করিতে থাকিলেন! লইতে পারিলেন না কেন? বোধ হয়, যাহা চাহিতেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী পাইতেছিলেন, তাই লওয়া সহজ হইল না,—না?

দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। বিএ-একজামিন যখন সপ্তাহ হিসাবে পড়িয়াছে, এমন সময় একদিন ডাকের চিঠিতে কি খবর পড়িয়া, বাড়ীর গৃহিণীর উচ্চ চীৎকারে বাড়ীর লোক ত্রাস্ত ব্যস্ত হইয়া গিয়া শুনিল, তিনি ভ্রাতৃহীনা হইয়াছেন। ইহার পর প্রায় দিন পনের বাদে একদিন সৌদামিনী একখানি ডাকের চিঠি পাইয়া, বিশেষ বিস্ময়ের সহিত তাহার আবরণ-মোচন করিয়া, পাঠান্তে নিঃস্পন্দ হইয়া অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। সে চিঠিতে যে খবর ছিল, তাহা সু, কিংবা দুঃসংবাদ, তাও তিনি ঠিক ভাল করিয়া যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সে খবর এই—

"প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

"আমাদের দুর্ভাগ্যের সংবাদ বোধ করি, আপনার অবিদিত নাই! কিন্তু সকল সংবাদ জানিতে পারাও আপনার পক্ষে সম্ভব নহে, তাই তাহার মধ্যে যেটুকু আপনাকে জানান প্রয়োজন, শুধু সেইটুকুই জানাইতেছি। আমি পিতৃহীন হইয়াছি, তাহা আপনি জানেন, কিন্তু কে আমাদের এ দুর্ভাগ্য ডাকিয়া আনিল, তাহা কি বলিতে পারিবেন? সকলেই বলিবে—আমাদের ভাগ্য! কিন্তু আমি সে কথা স্বীকার করিব না! আমার বিশ্বাস—মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য তৈয়ারি করে। কর্ম্মফলই ঠিক;

কিন্তু সে কর্ম্ম এ জন্মেরই ; জন্মান্তরে যাইবার কোন আবশ্যক করে না ; দেখিতে চাহিলেই দেখা যায়—আমরা যা কিছু দুঃখ পাই, সে সকলই আমাদের এজন্মের কাজেরই ফল।

"আমি কাহাকেও দোষ দিতেছি না। বিশেষ যাঁহারা এ পৃথিবীর বাহিরে চলিয়া যান, তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে আমরা '৺স্বর্গীয়' এই শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। আমরা মনে করি, তাঁহারা স্বর্গেই গিয়াছেন। এ পৃথিবীর পাপ, তাপ, গ্লানি আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। যাঁহারা এ পৃথিবীতে আমাদের প্রণম্য, তাঁহাদেরও বিপক্ষে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখাই কর্ত্তব্য মনে করি এবং এদেশের চিরন্তন শিক্ষাও এই কথা বলে। কাজেই কাহাকেও আমার কোন কথা বলিবার বা অনুযোগ করিবার নাই। আছে যেটুকু সহিবার এবং বহিবার।

"আমাদের পিতৃঋণ পর্ব্বত প্রমাণ! শোধ দিবার উপায় থাকিলে, আমরা বোধ করি, এত সহসা পিতৃহীন হইতাম না। আমার মা—ছোট মা—ছেলে দুটিকে সঙ্গে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। না গিয়া করিবেই বা কি? বাড়ী বন্ধক রাখা হইয়াছিল, সুদেআসলে ছাপাইয়া গিয়াছে। ডিক্রিজারী করাইতেছে, ক্রোক করিতেও আসিয়াছিল। কাজেই বাধা দিতে সাহস হয় নাই।

"শেষ উপায় তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁর পরম সুহৃদ্ বঙ্গদেশের বাহিরে অনেক দূরে থাকেন, আমার পিতাও অল্প বয়সে সেই খানেই কাজ করিতে গিয়া, অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, মৃত্যুকালেও দৃঢ় বিশ্বাস, বন্ধু তাঁহাকে নিশ্চিত ক্ষমা করিবেন, এবং একমাত্র তিনিই আমাকে এই বিপদ্-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারিবেন, আর কেহ না।

"আমার নিজের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই খানেই চলিলাম। যদি তাঁহার আশা মরীচিকা মাত্র না হয়, যদি এ বিপদে কূল পাই, আবার ফিরিব। নহিলে, না হইলেও ফিরিয়া আসিব। যাঁহাদের ঋণ শোধ করা আমার ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত, তাঁহারা যদি আমায় তাঁহাদের অর্থ-বিনিময়ে দাসরূপে ক্রয়ও করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদের ইচ্ছার বিরোধী হইব না। দণ্ড-গ্রহণ তো সহজ কথা।

"কিন্তু যদি আশাপূর্ণ হয়? যদি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে আপনি কি আমার এ দুরাশা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? দেখুন, আপনি যে দর দিয়াছিলেন, এখন আর তার চেয়ে বড় বেশি দর নাই। গৃহহীন, অর্থহীন, আশাভরসাহীন, নিঃস্ব ভিখারী চাইতে কোন্ মুহুরি, কারকুন, গোমস্তা, ভাতরাঁধা রসুইদার আরও বেশি দারিদ্র্যের দাবী রাখে! যদি এতদিন কাটিয়া গিয়াছে, তবে আরও কিছুদিন। বোধ করি, ছয়মাস সাতমাস এর চেয়ে আর বেশি দেরি না হইতেও পারে; হয় যদি তো এক বৎসরের অধিক হইবে না।"

সৌদামিনী চিঠিখানি দুইবার তিনবার, এবং আরও একবার অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। তাঁহার শীতল কঠিন অন্তরের মধ্যে যেন একটা উত্তপ্ত স্নেহের বাষ্প অতি ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অশ্রুবিস্মৃত নেত্রে হঠাৎ হুস্ করিয়া খুব খানিকটা গরম জল উছলাইয়া উঠিতে গেল। হাত দিয়া তাহা সাবধানে মুছিয়া ফেলিয়া, চিঠিখানি নিজের কাপড়ের বাক্সের মধ্যে সকলের নীচে সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিয়া, কাজ-কর্ম্মে উঠিয়া গেলেন। সে দিন এ সম্বন্ধে আর ভালমন্দ কোন কথাই বিচার করিতে তাঁহার আশাহত চিত্তের প্রবৃত্তি হইল না। ভয়, সন্দেহ, এবং তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আর একটা চিত্তবৃত্তি, সে দিন যুগপৎ তাঁহার আশা-নিরাশার, ঘাত-প্রতিঘাতবিবর্জ্জিত শূন্যচিত্তকে কেমন যেন আলোড়িত, আন্দোলিত করিতে লাগিল। সেটা—সেই নূতন জিনিষটা হয়তো আনন্দ? হয় তো আশা!

পরদিন নিজের সহিত কোনরূপ বিচার-বিতর্ক উপস্থিত না করিয়াই সেই চিঠিতে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল, সেই ঠিকানায় আশীর্ব্বাদ জানাইয়া, একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে জানাইলেন—"এক বৎসর আমি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিব। তুমি আমায় কি ভাবনা হতে রক্ষা করিলে, সে শুধু যিনি সব জানেন, তিনিই জানিতেছেন। নিশ্চয় সে পুণ্য তোমার ব্যর্থ হইবে না।" ইহার পর হইতে,—যে অপত্য-স্নেহ-সমুদ্র অগস্ত্য-গণ্ডূষরূপিণী নিরাশা-রাক্ষসী শুষিয়া শুষ্ক করিয়া দিয়াছিল, এই বালক ভগীরথের সাহায্যে অবতীর্ণা জাহ্নবী সেই বিরাট শূন্যতাকে অতি বেগবান স্রোতোজলে ভরিয়া দিল। অপর্ণা বিস্মিত হইয়া দেখিল—

রাত্রিতে বিছানায় প্রবেশ করিয়া, তাহার মা, তাহাকে দুইহাতে বুকে টানিয়া কতক্ষণ নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিলেন, তাহার ঠিকানা নাই। সে নিজেও শব্দহীন কারণবিহীন অশ্রুজলের, বিনিময় করিয়া, কখন কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়িয়া তাঁহার সেই চিরদিনের অনাবৃষ্টির পরের প্রবলবর্ষণের বিপুল-বেগবর্ষী ধারার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিল। সে প্রাণফাটা বুকভাঙ্গা দিনের সমস্ত সঞ্চয় একসঙ্গে জমা-করা কান্না কি এতটুকু একটি বালিকার পক্ষে সহনীয়! না এর প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতেই সে সমর্থ? সে মাকে কোনদিন কাঁদিতে দেখে নাই, তাই অবাক হইয়া তাঁহার দেখাদেখি, নিজেও একটু কাঁদিয়া লইল। ভিতরের কথা কিছুই জানিতে পারিল না।

যশোহর চিরুণী কারখানা

যখন আমাদের দেশে 'স্বদেশী'র বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন নানা স্থানে নানা দ্রব্যের কারখানা খোলা হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলিই জলবুদ্‌বুদের মত জলে মিশাইয়া গিয়াছে, দুই চারিটা না থাকার অবস্থায় রহিয়াছে; যে কয়েকটির উন্নতি হইয়াছে, যশোহরের চিরুণীর কারখানা (Jessore Comb Factory) তাহার অন্যতম। এই কারখানা অতি সামান্য মূলধন লইয়া যৌথ হিসাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। এক্ষণে ইহার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ এবং সত্বরই এই কারখানার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের যত্ন ও অধ্যবসায়ে এই স্বদেশী কারখানার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর সস্ত্রীক এই কারখানা পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

যশোহরের চিরুণীর কারখানায় বাঙ্গালার গবর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর

কুম্ভ-মেলা

[শ্রীজলধরসেন-সঙ্কলিত]

এবার হরিদ্বারে কুম্ভ-মেলা হইয়া গেল। প্রতি বৎসরই চৈত্র মাসের শেষ দিনে নানাস্থান হইতে সাধু-সন্ন্যাসী, ধনী-নির্ধন, গৃহস্থ এই পবিত্র তীর্থে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া থাকেন। কিন্তু এবার পূর্ণ-কুম্ভ, অনেক দিন পরে এই পূর্ণকুম্ভ যোগ হইয়াছিল; সেই জন্য এবার এত লোকসমাগম। ইহার পূর্ব্বে যে মহাকুম্ভ-যোগ

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট

হইয়াছিল, সে সময় এই হতভাগ্য ব্যক্তি সেই পবিত্রক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল; সে দৃশ্য এখনও আমার মানসপটে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু সে দৃশ্যের বর্ণনা করিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছে; যে সাধনবলে সে কথা বলা যাইতে পারে, তাহা আমার নাই; আমি সে কথা বলিতেও বসি নাই; এতকাল পরে সে চেষ্টা করাও অসম্ভব।

তাহার পর এবার এই মহাকুম্ভের মেলা হইয়া গেল; শান্তিপ্রয়াসী তৃষিত-তাপিত কত নরনারী হরিদ্বার-অভিমুখে ছুটিলেন। কি তাঁহাদের আগ্রহ, কেমন তাঁহাদের উৎসাহ, কত তাঁহাদের একাগ্রতা! কয়েকজন বন্ধু আমাকেও এই কুম্ভে স্নান করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি সে অনুরোধ রক্ষা করি নাই; কারণ সে দৃশ্য-উপভোগ করিবার শক্তি আমার নাই; আমি ফিরিয়া আসিয়া সে পবিত্রকথার বর্ণনা দিতে পারিব না। তাই যাঁহারা সেখানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এবারকার মেলা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা এবার কুম্ভমেলায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই এখনও দেশে ফিরিয়া আসেন নাই; যাঁহারা ফিরিয়াছেন, তাঁহারাও শীঘ্র যে কিছু লিখিয়া উঠিতে পারেন, এমন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আপাততঃ কুম্ভমেলা সম্বন্ধে কোন কথাই পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু আমরা নিরাশ হইলে কি হইবে, যিনি কৃপা করিলে সকলের আশা-পূর্ণ হয়, তিনিই কৃপা করিয়া আমাদিগকে কুম্ভমেলার একটা সুন্দর বিবরণ আনিয়া দিলেন। ইহা বিগত কুম্ভের বর্ণনা নহে, আমি যে কুম্ভমেলায় উপস্থিত ছিলাম, তাহারও বর্ণনা নহে—৬০ বৎসর পূর্ব্বে ১২৬১ সালে যিনি কুম্ভমেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহারই লিখিত বর্ণনা। এই তীর্থ-ভ্রমণকারী আর কেহই নহেন, সর্ব্বজন-পরিচিত মাননীয় আমাদের শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পিতামহ পরলোকগত ধর্ম্মাত্মা যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়। তিনি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল তীর্থস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদিন পরে তাঁহার সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী-মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা সেই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বাধিকারী-মহাশয় কুম্ভমেলার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ন্যায় একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিয়া, আমরা আশ্চর্য্যবোধ করিয়াছি; আমরা লিখিলে এমন সরল সুন্দরভাবে লিখিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। যাঁহারা এবার কুম্ভমেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ৬০ বৎসর পূর্ব্বের এই বিবরণের সহিত তাঁহাদের দৃশ্য মিলাইয়া দেখিবেন। আমি ত বলিতে পারি যে, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আমি যে পূর্ণকুম্ভ দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহার সহিত ৬০ বৎসর পূর্ব্বের এই বর্ণনা ত ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়—এমন কি, সাল-তারিখ বদল করিয়া দিলে, ঠিক হইয়া যায়; তবে দুই একটি ঘটনার কিঞ্চিৎ অমিল হইতে পারে; তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

যাহা হউক, মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী-মহাশয়ের অনুগ্রহেই আমরা ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কুম্ভমেলার বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি; তাঁহারই পিতামহদেব এই সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

"হরিদ্বারে কুম্ভের মেলাতে বহু দেশস্থ নানরূপ মনুষ্যের একত্র মিলন হইয়াছে। প্রায় দেড় ক্রোর মনুষ্য, তদ্ভিন্ন জীব জন্তু আছে। চতুর্দ্দিকে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতি হইয়াছিল। আমরা যে স্থানে প্রথম আসিয়া ঘর বান্ধিয়াছিলাম, তাহার চতুর্দ্দিক্ ময়দান রুড়ির উপরে ছিল। কিন্তু দুই তিন দিন মধ্যে এমত বসতি হইল যে, তিল গুঁজিবার স্থান রহিত হইল। এই সকল মরুভূমি লইয়া পরস্পর বিবাদ হইতে লাগিল। স্থানাভাব এ পর্য্যন্ত হইল, মনুষ্য সকল কেবল বসিয়া এবং ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিল।

গঙ্গার নূতন নগরের পূর্ব্বপার নীলধারার পশ্চিম প্রায় তিন ক্রোশ বাকসের জঙ্গল ছিল। ঐ জঙ্গলের মধ্যস্থলে এই মেলার রক্ষার্থে এক কালা পল্টন ছিল। তৎপরে জঙ্গলে সকল লোক শৌচক্রিয়া করিত। কিন্তু এত মনুষ্যের সমাগম হইল, ঐ অপরিষ্কার ভূমি যত ছিল সকল স্থান পরিষ্কৃত হইয়া নগরের ন্যায় বসতি ও বাজার হইল।

হরিদ্বারের উত্তর দক্ষিণে নয় ক্রোশ—ইস্তক হৃষীকেশ নাগাইদ কঙ্খল; পূর্ব্ব-পশ্চিম চারি ক্রোশ—ইস্তক নীল-পর্ব্বত নাগাইদ জোয়ানপুর, এই চতুঃসীমার মধ্যে সর্ব্বত্র নগর; সহরের ন্যায় মনুষ্যের বসতি এবং বাজার স্থাপিত হইল। সকল পথে এমত লোক গতায়াত করিতে লাগিল যে, পথ চলিতে গেলে মনুষ্যের ঠেলাঠেলিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। তথাচ শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ হইতে এমত বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যে পথে লোক গমন করিবে, সে পথে পুনরাগমনের লোক আসিতে পারিবে না। এই বন্দোবস্ত জন্য স্থানে স্থানে রক্ষকগণ যষ্টিহস্তে ভ্রমণ করিতেছে; গঙ্গাতে দুই স্থানে নৌকায় পুল করিয়াছেন—এক পুল হরপিড়ির ঘাটের নিকট, আর এক পুল নীলপর্ব্বতের সম্মুখে রুড়িতে যথায় পল্টন। ঐ স্থানে দোহারা নৌকার পুল। তাহার দক্ষিণ দিকে যে নৌকার পুল, তাহাতে পশ্চিমপার হইতে পূর্ব্বপার যাওয়া (এবং) উত্তর অংশের পুলে পূর্ব্বপার হইতে পশ্চিম পারে আসা, হরপিড়ির ঘাটের নিকটে ঐরূপ বন্দোবস্ত। এই মত করাতে গমনাগমনের (পথে) লোকের সহিত গোলযোগ হইতে পারে না। মনুষ্য পর্ব্বতের উপর পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিয়াছে।

বাজার সাজাইবার কথা কি পর্য্যন্ত লিখিব, অগণিত দোকান। মনোহারী দোকান নানাবিধ দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, দিল্লীওয়ালাদিগের প্রায় পাঁচশত দোকান। ইহা ভিন্ন দেশী লোকের মনোহারী দ্রব্যাদির দোকান আছে।

ভীমগোদা।

শাল, দোশালা, রুমাল, জামিয়ার, রেজাই, চোগা, মোজা, দস্তানা, আলোয়ান ইত্যাদি, পশমিনার টুপী, নানাবিধ বস্ত্র, কাশ্মীর, অমৃতসহর, নুরপুর, লুধিয়ানা, রামপুর ইত্যাদি প্রদেশের পশমীনার, উত্তম উত্তম বস্ত্র সকলের প্রায় দুই শত দোকান। উলবস্ত্র, লুই, পঙ্খী, একতারি, চশমা, ওদা ইত্যাদি। বৃন্দাবনের এবং কাশ্মীর, অমৃতসহর, শিয়ালকোট, পেশোয়ার, মূলতান, ভোট, রামপুর ইত্যাদি সহরের মহাজন সকল পাহাড় হইতে উল-বস্ত্রাদি আনাইয়া চারিশত দোকান লুই-পটীতে হইয়াছিল। নানা জাতীয় উত্তম উত্তম কম্বল আসিয়াছিল। পট্টবস্ত্রাদির দোকান এবং সূতার বস্ত্রাদি নানাদেশীয় দোকান পাঁচশতের কম নহে। আর পিতল, কাঁসা, তামা, দস্তা, লোহার বাসন এবং অন্যান্য তৈজস নানাপ্রকার আমদানি হইয়া কমবেশ একশত দোকান ছিল। রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিক, পদ্মবীজ, তুলসী, বিল্ব, পলার দোকান অগণিত। শ্বেত পাথরের থালা, বাটী, রেকাব, হুঁকা, ফরশী, মেজ, চৌকী, কৌচ, কেদারা ইত্যাদি উত্তম উত্তম দ্রব্যসকল এবং নানাপ্রকার খেলানা দোকানে উত্তমরূপ সাজাইয়া শোভাযুক্ত করিয়াছে। এই সকল শ্বেত পাথরের দ্রব্যাদি মারোয়ারের মধ্যে যোধ-পুরের সামিল মকরাণা নামে এক স্থান আছে, তথায় শ্বেত পর্ব্বতের উপরে দৃশ্যমান যে পাথর আছে, তাহাতে গঠনাদি হয় না, খানের ভিতর যে সমস্ত প্রস্তর জন্মাইতেছে, তাহাকে বাহির করিয়া গঠন করে। যখন ঐ প্রস্তর খাদ হইতে উঠাইতে হয়, বারুদ দ্বারা ভগ্ন করিয়া, পরে ছেদন করিয়া, যে পাথর যে কর্ম্মোপযুক্ত তাহাতে সেই গঠন করে। উত্তম উত্তম সংতরাস অর্থাৎ ভাস্কর প্রস্তরের কারিগর আছে। নানাবিধ দ্রব্যাদি খোদিত করিতে পারে। মকরাণাতে আসল খান। জয়পুর, আজমীর এবং মকরাণাতে কারিগরদিগের বাস। মকরাণাতে দ্রব্যাদি অধিক তৈয়ার হয়। জয়পুর ও আজমীরে তথা হইতে প্রস্তর আনিয়া তৈয়ার করে। ঐ পাথরের খানেতে রাজার রক্ষকগণ আছে, দ্রব্যানুসারে হাসিল মাসুল আছে।
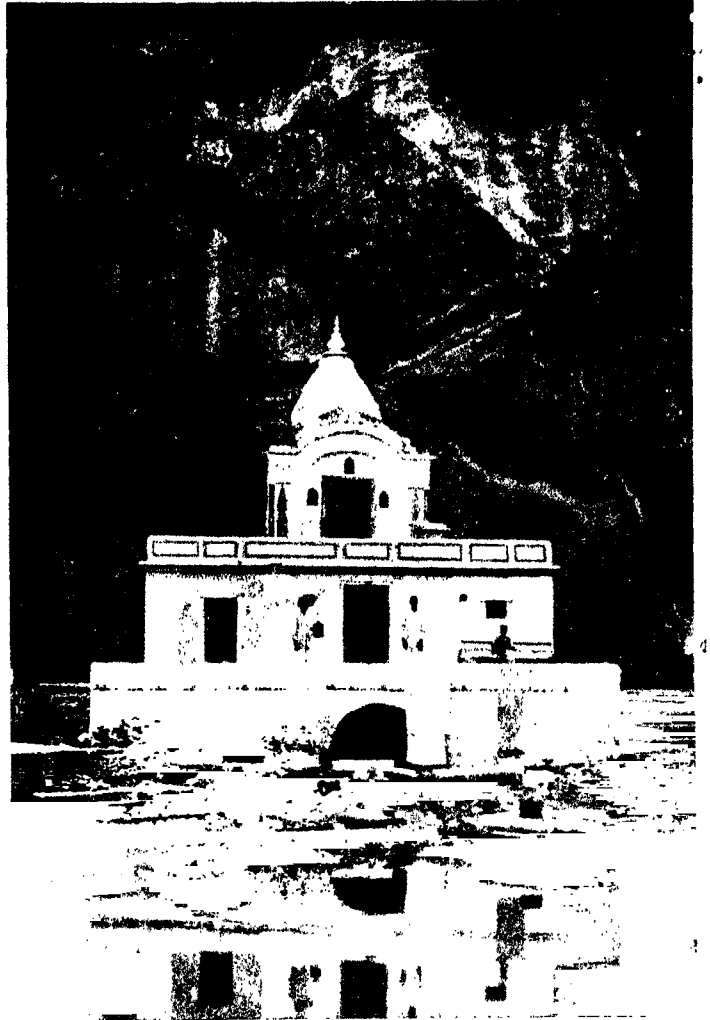
নানা জাতীয় মেওয়া—কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর হইতে মোগল উটের উপর বোঝাই করিয়া আনে। তাহাতে আনার, আঙ্গুর, সেউ, বিহি, সোহারা, কিস্‌মিস্‌, মনক্কা, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি নানাবিধ মেওয়া, আলুবখারা, খাট্টা আনার, আঞ্জীর, জেলেবা ইত্যাদি অম্লরসের দ্রব্য সকলের দোকান পাহাড়ের নিকট স্থাপিত ছিল।

মসলা নানাজাতীয়। গুজরাট, বোম্বাই ইত্যাদি দক্ষিণ পাটনের দ্রব্য সকল লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, কায়ফল, জয়িত্রী, দারুচিনি, কালামরিচ, কালাজিরা, সফেদজিরা, জিরা, তেজপত্র, ছোট এলাইচ ইত্যাদি নানাজাতীয় মসলা এবং নারিকেলের গোলা, চিকিস্থপারি, বোম্বাই স্থপারি, আর দক্ষিণী বাদাম ইত্যাদি জিনিষ সকল উঠে বোঝাই করিয়া সওদাগর সকল আনিয়া দোকান করিয়াছিল। এ সকল দোকানে স্তূপাকার দ্রব্যাদি পাহাড়ের নিকটে পাল তুলিয়া রাখিয়াছিল, এই সকল দ্রব্য অন্য দেশীয় সওদাগরে লইয়া যায়।

পান-তামাকের দোকান স্থানে স্থানে আছে। নানা দেশীয় বণিকা বিক্রয় হইতে আসিয়াছিল। মৃত্তিকার, কাষ্ঠের, পিতলের, কাঁসার, দস্তার, রূপদস্তার এবং নারিকেল ও পাথরের নানা রকম হুকার দোকান ছিল; নল সকল রকম সকল হুকার মত বিক্রয় হইতেছে।

আচারের দোকান শত শত ছিল। কিন্তু পঞ্জাব, লাহোর, অমৃতসহর ও দিল্লীর যে সমস্ত আচারের দোকান-দার ছিল, তাহারা উত্তম উত্তম সকল দ্রব্যের আচার করিয়া-ছিল। আম্র, লেবু, কিস্‌মিস্‌, সোহারা, আদা, করঞ্জা, বার্ত্তাকু, করলা, আলু, পেঁপে (যাহাকে এরণ্ড খরমুজা কহে), সজনাফুল, কাঞ্চনফুল, সজনাডাটা, বকফুল, বক-ফুলের ডালা, বাসকফুল, ঝিঙ্গেফুল, বিলাতী কুমড়ার ফুল এবং কুমড়া, দেশী কুমড়া, লাউ, কচু, বাঁশকোঁড়, থোড়, মোচা, তুঁতপাতা, আকন্দপাতা, লেবুর মধ্যে যত রকম লেবু আছে, সীম, মূলা, পদ্মমূল, পদ্মমৃণাল, কুমুদমূল, মৃণাল ইত্যাদি যত রকম জিনিষ আছে, সকল আচারের নাম লিখিতে বাহুল্য লেখা হয়। সকল আচার উত্তম উত্তম করিয়া দোকান সাজাইয়াছিল।

এইরূপ মোরব্বাওয়ালাদিগের দোকানে নানা দ্রব্যের নানাবিধ মোরব্বা স্থখাদ্য করিয়া, যে যেমত দ্রব্য তাহাকে সেই মত রসে পাক করিয়া, নানা রঙ্গের করিয়াছে। আম্র, আমলকী, কিস্‌মিস্‌, সোহারা, লেবু, নারেঙ্গা, সন্তারা, পাতি, কাগজি, বাতাবি, পেঠাঘিয়া, বার্ত্তাকু ইত্যাদি নানাজাতির দ্রব্যের মোরব্বার দোকান।

মেঠাইওয়ালা হালয়াইদিগের দোকান। নানা দেশের দোকানদার আসিয়া স্থানে স্থানে দোকান করিয়া দ্রব্যাদি নানামত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। দোকান স্থানে স্থানে তিন হাজারের কম নহে। হালয়াইদের দোকান যেখানে লোকের বসতি হইয়াছে, তাহারই নিকটে হালয়াইদের দোকান। তাহা ভিন্ন বাজারে আছে। দোকানদার সকল লাহোর, অমৃতসহর, অম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধর, দিল্লী, সাহরণপুর, মিরাট, কোএল, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি সহর সকল হইতে এবং গ্রাম নগর হইতে আসিয়া দোকান করিয়াছে। ইহাতে পুরি, কচুরি, তরকারি আর আচার ইহাই মবলগ বিক্রয়। এতদ্দেশী লোক রসুই করিতে চাহে না। পুরি কচুরি লইলেক, গঙ্গার তীরে বসিয়া আহার করিলেক, মেলাতে বেড়াইতে লাগিল,—এই মত অনেক মনুষ্যের অবস্থা। এজন্য পুরি কচুরি অধিক বিক্রয়। অমৃতসহরের দোকানদারদিগের পুরি কি উত্তম হয়, তাহা বলিতে পারি না। এমত পাতলা পুরি কোথাও হয় না, তথাচ তাহারা হাতে গঠিয়া ভাজিতেছে—চাকি বেলুন স্পর্শ করে না। সাহরণপুরের দোকানদার এবং দিল্লীর দোকানদার সকলে উত্তম উত্তম নানারকম মিঠাই তৈয়ার করিয়া, মিঠাইতে ঘরবাড়ী, দালান, রথ ইত্যাদি নানামত কারখানা করিয়া, দোকান সাজাইয়াছিল। তাহাতে মুগের উরুদের, মেথির, বেশমের মগধের, (ও) মতিচুরের লাড়ু, অমৃতি, জিলাপি, সকরপানা, রসবড়া, চাঁদসাই, ক্ষুরমা, দইবড়া, পেড়া, বরফি, গোলাবজাম, গুজিয়া, পেঠার মেঠাই, লচ্ছা, মুগদল, চাঁদসাই খাজা, কদমা, ইলাইচদানা, বাতাসা, তিলকুট সন্দেশ, তিলেখাজা, ধুলউড়ি ইত্যাদি মিষ্টান্ন পক্কান্ন আর গোহালার বিক্রয় দ্রব্য দধি দুগ্ধ ক্ষীর রাবড়ি মালাই মাখন ইত্যাদি গোরস সকল স্থানে স্থানে উত্তমরূপে দোকান সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে।

ভারওয়ালা অর্থাৎ ভুনাওয়ালা চনা, মকা, যব, গম, মুগ মটর, তিল, চাউল, জোয়ার, (ও) বজরা ভাজা, বহুরি সিদ্ধির বীজ ভাজা, লেহরা ভাজা, কুসুমবীজ ভাজা, মুড়ি, খৈ, দেধানের খৈ, চৌলাই বীজের খৈ, খশের খৈ, ইত্যাদি চাবেনা সকল লইয়াই দোকান সাজাইয়া গলি গলি দোকান আছে। বিক্রয় অধিক হইতেছে, তাহার কারণ যত দীন-দুঃখী আসিয়াছে, এক এক পয়সার চাবেনা অঞ্চলে লয়, লইয়া গঙ্গার তীরে বসিয়া চর্ব্বণ করিয়া, অঞ্জলি পুরিয়া

গঙ্গার জলপান করিয়া, দিবারাত্র পথে ভ্রমণ করিয়া মেলা দেখিয়া বেড়ায়।

ডোমদিগের বাঁশের লাঠী, ছড় আর গঙ্গাজল বহিবার কাউর, ছোট সাজির আকৃতি টুকরির দোকান কত স্থানে কত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যত মনুষ্য দেশান্তর হইতে আসিয়াছে, ফি জন এক এক গাছি লাঠী লইয়াছে; তদ্ভিন্ন আপন আপন বাটীর জন্য কেহ

সপ্তধারা

পাঁচ, কেহ সাত, কেহ বা দশ গাছা লাঠী লইয়াছে। গঙ্গাজল লইয়া যাইবার জন্য কত শত কাউর বিক্রয় হইতেছে। আর ছোট টুকরি সাজির আকৃতি শত সহস্র স্থানে বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে বসাইয়া গঙ্গাজলের শিশা লইয়া যায়। আর সহস্র সহস্র ব্যক্তি আপন আপন ঘটীতে গঙ্গাজল তাহার মুখে টিনের এক এক চাক্তি বসাইয়া তাহাতে গালার ভরাট করাইয়া আঁটাইয়া প্রায় গৃহস্থের যত মনুষ্য স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা যাহারা পদব্রজে চলিতে পারে, সকলের হস্তে এক একটা করিয়া লইয়া দেশে যাইতেছে।

টিন ও গালা লইয়া বাজারে পথে ঘাটে মাঠে সকল গলি গলিতে দোকান করিয়া আছে। ফুকা শিশি গঙ্গাজল লইবার জন্য কতশত দোকান হইয়া বিক্রয় হইতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। আর ফুকা, বেল লণ্ঠন গোলক লণ্ঠন, আইন বরণ, গেলাস, ভাঁড়, বোতল ইত্যাদি বহু মত দ্রব্যাদির দোকান সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে।

হরপিড়িঘাটের পশ্চিম অংশে পাহাড়ের নিকট পঞ্চাশ জনা ভেটিয়ারি দোকান করিয়া তাহাতে ভাত রুটী খিচুড়ী তৈয়ার করিতেছে। যত মুসলমান লোক খরিদ করিয়া খাইতেছে। তাহাদের লোক ফুরাণ আছে—ইস্তক অৰ্দ্ধ আনা, নাগাইদ চারি আনা পর্য্যন্ত এক এক মনুষ্যের খোরাক; যে যেমত খাইবে তাহার সেই মত দাতব্য, ইস্তক শাক—নাগাইদ মাংসের কালিয়া কোপ্তা কাবাব পর্য্যন্ত পায়। যাহার যেমত কড়ি, তাহার তেমত আহার্য্য দ্রব্য।

মেলাতে নানা দেশের চোর ও উঠায়গির নানারূপ বেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যগণের সমভ্যারে বাজারে পথে ঘাটে মাঠে ভ্রমণ করিতেছে, যখন কাহাকেও গাফেল দেখে, তৎক্ষণাৎ তাহার দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। বৈরাগী নাগা সন্ন্যাসীদিগের ভিতরে, তাহাদের বেশ ধরিয়া, তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদের যাহা পায়, লইয়া যায়। কেহ বা দেখে যে, গঙ্গার লহরের ধারে বাসন মাজিতেছে, যে

পারে বাসন থাকে, তাহার বিপরীত পারে ডুব দিয়া ঐ সকল জিনিস লইয়া পলায়। এই মত কতরূপে চুরি করিবার পথ করে, তাহা বুদ্ধির বাহির। যাহারা হরপিড়ির ঘাটে জলের ভিতর চুরি করে, তাহারা পূর্ব্বে দেখে যে, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ঘরের স্ত্রীগণ জলে নামিয়া স্নানোদ্যোগ করিতেছে, তাহার নিকটে চোর স্নানোদ্যোগে থাকে। যেমন তাহারা ডুব দেয়, চোরও তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তাহার অলঙ্কারের মধ্যে যাহা পারে লয়। স্থানে স্থানে পুলিশের আমলাগণ ভ্রমণ করিতেছে। জলমধ্যে এই মত চুরি করে, ইহাও ধৃত করে। এই সকল চোরের শাসন জন্য গলিতে গলিতে থানা ঘাটী আছে, তাহাতে হাড়-তুড়ঙ্গ আছে। যাহাকে ধরিতেছে, তৎক্ষণাৎ চৌকিতে লইয়া যাইয়া পায়ে হাড় দিয়া ফেলিয়া রাখিতেছে; মেলার শেষ হইলে দশ দশ বেত মারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খোলসা দেন। মেলার সময় শত শত ব্যক্তি বন্দী আছে; দিনান্তে এক এক পয়সার চাবেনা পায়, তাহাতেই প্রাণধারণ।

পাহাড়ের মধ্যস্থলে সাহেবদিগের বস্ত্রাবৃত গৃহ নির্ম্মিত হইয়া তাহারা তাহাতে থাকিত এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদির কাছারি হইত। চারিজন ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর, কমিশনর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ এবং কেনেল ও কাপ্তেন সাহেব আপন আপন দলবল লইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা হস্তীর উপরি আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিত এবং হরপিড়ির ঘাটে জলের উপরি হস্তী দাঁড় করাইয়া, তাহার উপর থাকিয়া সর্ব্বত্র সকল ঘাটে জলের তদারক করা, বিশেষতঃ বেলা চারিদণ্ড থাকিতে নাগাইদ চারিদণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত। হরপিড়ির ঘাটে প্রতিদিবস অতিশয় ভিড় হয়, ঐ সময় পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, জয়পুরী, কাশ্মীরী, পূর্ব্বী দেশ সকলের মনুষ্যগণ স্নান করে এবং আপন আপন মাতৃ পিতৃ ভ্রাতৃ জ্ঞাতি কুটুম্বের মৃত অস্থি যে যাহা লইয়া আইসে, তাহা অর্পণ করে এবং গঙ্গাতে প্রদীপ দেয়—এই সকল কারণ জন্য অতিশয় গোলযোগ হইয়া হুড়াহুড়ি হয়। এজন্য ঐ ঘাটের প্রতি সিঁড়িতে এক এক সিপাই, জলে সাহেব লোক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন। হরপিড়ির ঘাটে জল অধিক থাকিবার হুকুম নাই, সর্ব্বত্র দুই ফুট তিন ফুট জল থাকিতে পারিবে; ইহার অধিক জল থাকিলে মনুষ্য সকল হুড়াহুড়িতে জলে পড়িয়া একের উপর আর এক জন পড়িলে ক্রমে চাপান হইয়া মনুষ্যের ক্লেশ হইয়া বহু মনুষ্যের প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। একে গভীর গভীর জল তাহাতে অতিশয় স্রোত, এজন্য লহরের কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব আপন সরঞ্জাম শুদ্ধ ঐ স্থানে হাজির থাকিয়া জলের ভিতর যে সমস্ত খানা খন্দ ডোবা ছিল, তাহা পাথর দ্বারা ভরাট করিয়া একসা করাইয়া, তাহার উপর তিন ফুটের অধিক না হয় এমত রূপে জল চালান, অধিক জল হইলে অন্য পথ খোলসা করিয়া জল নিকাশ করিয়া দেন। এজন্য স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত আছে।

পূর্ব্বপার পশ্চিমপার দুই মেজেষ্টরের অধিকার। পূর্ব্বপার জেলা বিজনোর। পশ্চিম পার জেলা সাহরণপুর। এই দুই মেজেষ্টরের কাছারি দুই আপন আপন অধিকারের মধ্যে। সাহরণপুর জেলার মধ্যে হরপিড়ির ঘাট। এস্থানে অনেক বসতি, বাজার, কঙ্খল সহর এবং জলাপুর—যথায় পাণ্ডাদিগের বাসস্থান। এই হরপিড়ির ঘাট হইতে কঙ্খল পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ পথ। ইতিমধ্যে অনেক ইমারত আছে। মধ্যে মধ্যে ময়দান এবং রুড়ি সহর। মধ্যে যে সকল বাটী আছে, তাহার এক এক ঘর একশত টাকা ভাড়া; বাহিরের রোয়াক দোকানের জন্য ত্রিশ টাকা চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা। এই মত দশ বার হাত জায়গার ভাড়া মেলার কয়েক দিবস জন্য। এ কারণে সকল ঘর ভাড়া দিয়া দোকান করিতে অক্ষম হইয়া ঝড়ির উপর কেহ ছাপর, কেহ পানি, কেহ টাটী বান্ধিয়া দোকানদার সকল দোকান করিল। তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম প্রকাশ করিলেন, 'রুড়িতে যত দোকানদার যে কিছু জিনিসের দোকান করিয়াছে, তাহার জায়গার ভাড়া ফি গজ দুই টাকা হিসাবে দিতে হইবে।' এই সংবাদে সকল দোকানদার অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিজনোরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে তেঁহ কমিশনর সাহেবের নিকট প্রজার পক্ষে সুরিপোর্ট করিয়া খাজনা মহকুপের জন্য স্বয়ং শ্রম লইয়া রুড়ি ভূমির খাজনা মহকুপ করাইয়া সকল ব্যক্তিকে পরম সুখী করিলেন। রুড়িতে যত মনুষ্য দোকানাদি করিয়াছিল, কাহাকেও কোন রকমে এক পয়সা দিতে হইল না।

কঙ্খল অবধি হরপিড়ির ঘাট পর্য্যন্ত পথে পথে গরু লইয়া ভিক্ষা করিতেছে, কোন গরুর ঝুটার নিকট হইতে এক পদ, কাহারও দুই, কাহারও তিন পদ ঝুটা হইতে

বাহির হইয়াছে; কোন কোন গরুর পাছা হইতে এক দুই তিন পদ হইয়াছে, এ সকল পদ অধিকন্তু। আর এক গাভী অতিআশ্চর্য্যদর্শন। তাহার ঝুটাতে দুই ধারে দুই জটা, পাছা হইতে আর তিন পদ, স্ত্রীচিহ্ন দুই, মলদ্বার এক, দুই স্ত্রীচিহ্ন দিয়া প্রস্রাব নির্গত হয়। এই মত আশ্চর্য্য গরু আর কোথাও দেখা যায় নাই। আর কত লাল নীল শ্বেত পীত কাল শ্যামলা নানাবর্ণের বিপরীত আকৃতি-প্রকৃতির, শৃঙ্গ-লাঙ্গুলের বিপরীত ভাবের এবং অতি খর্ব্ব খর্ব্ব গাভী বহুতর সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতেছে।

পাহাড়ের উপরে বনমধ্যে দক্ষেশ্বরে, বিল্বকেশ্বরে, ত্রিধারাতে, সপ্তধারার নিকটে নলপর্ব্বতে, গুপ্তপর্ব্বতে, আর আর বৃক্ষমূলে সহস্র সহস্র ধুনি জ্বালাইয়া আপন আপন সাধনে আছেন। কেহ এক পদে, কেহ দুই পদে দাঁড়াইয়া, কেহ ঊর্দ্ধবাহু, কেহ বা লৌহকণ্টক উপরে, কেহ পঞ্চাগ্নি জ্বালিত করিয়া, কেহ মৌনব্রতে, কেহ ফলমূলাহারে, কেহ গলিত পত্র ভক্ষণে, কেহ গোগ্রাসে, কেহ অযাচক হইয়া, কেহ বা ভাঙ্গ-ধুস্তুর চরসে মগ্ন হইয়া, বিভূতিতে ভূষিত হইয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ জটাভার শিরোভূষণ করিয়া ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া আছেন।

ডেরাডুন টেনারি

কঙ্খল নগরে দিগম্বরী, পরমার্থী, বলভদ্রী, মালাধারী, নির্ম্মালী, নির্ব্বাণী, বিষ্ণুস্বামী, হনুমানওয়ারা প্রভৃতি আখড়াধারীদিগের আখড়া আছে। তাহাতে ঐ সকল আখড়াতে মোহন্তগণ আপন আপন গদিতে শিষ্য চেলাগণ লইয়া প্রতি দিবস কড়াই করিয়া, বহুলোক একত্র হইয়া, সকলে আহারাদি করিয়া, আনন্দে দুঃখী অভুক্ত ব্যক্তিদিগের আহারাদি করাইয়া, সর্ব্বদা আপন আপন ভজন-সাধনে মগ্ন আছে। মালাধারী আখড়াতে দুইশত পরমহংস একত্র, আর আর স্থানে স্থানে পরমহংসগণ আছেন। সন্ন্যাসিগণ

নীলধারার দুইকূলে কঙ্খল পর্য্যন্ত সপ্তধারাবধি রুড়ির উপরে খাকী, বৈষ্ণব, রামাৎ, নিমাৎ, গিরি, পুরী, ভারতী ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের আসন হইয়াছিল। দশ হাজারের ন্যূন হইবে। ইহারা অযোধ্যা, জনকপুর, মিথিলা, নৈমিষারণ্য, তপোবন, কান্যকুব্জ, বিঠৌর, কদলীবন, পঞ্জাব, কাশ্মীর, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, গুজরাট, বোম্বাই, নাথদ্বার, দ্বারাবতী, কাঞ্চী, অবন্তী, জয়পুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, মাড়োয়ার, বিকানীর, জব্বলপুর, ঝাঁসী প্রদেশের নর্ম্মদা, আবু, গিরণার, লোহাগল, রামপুরা,

কুশেনি, মণ্ডিসেপাটু, কুন্নুসিমূল্যা এবং আর আর কত শত পর্ব্বত ও বন হইতে সকলে আসিয়াছেন। আপন আপন ভজন-সাধনে সর্ব্বদা মগ্ন আছেন ইঁহাদিগের সমভ্যারে আসবাব এক এক কুশরজ্জু কটিবেষ্টিত। কাহার কাষ্ঠের কৌপীন, কাহার কুশের, কাহার কাহার চিমটা, কাহার বা ছোট এক এক কুড়ালি সমভ্যারে আছে। যাঁহাদের সঙ্গে শ্রীমূর্ত্তি শিলা আছে. তাঁহাদের পূজার বসনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আছে। অঙ্গভূষণ ভস্মরাশি, মস্তকে জটা সুশোভিত; ভূমিতে আসন, এক এক ধুনি অবলম্বন করিয়া আপন ভজন-সাধনে সকলে মগ্ন আছেন। ইঁহার মধ্যে অনকে নানা শাস্ত্রেই পণ্ডিত। ইঁহাদিগের নিকটে যে কেহ যে কিছু আহারাদির দ্রব্যাদি উপস্থিত করে, তাহা সকলে বণ্টন করিয়া লয় এবং আপনাদিগের ঝণ্ডু ভিন্ন অন্য অন্য অভ্যাগত কি দুঃখী ব্যক্তি, যে কেহ নিকটে থাকে, তাহাদিগকেও দেওয়া হয়। শ্রী৺ ইচ্ছাতে প্রতি দিবস এত দ্রব্যাদি উপস্থিত হয় যে, সকলে আহারাদি করিয়াও দাতব্য হয়, কেহ সঞ্চয় রাখে না; সঞ্চয়ের মধ্যে ধুনির কাষ্ঠ, যাহা পর্ব্বত হইতে শ্রম দ্বারা আনা হয়। এই মত মনানন্দে থাকিয়া কেবল হরেকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিতেছে।

যে সমস্ত আখড়াধারী মোহান্তগণ আসিয়াছেন, ইঁহাদিগের শিষ্য বড় বড় রাজা আমার লোক সকল আছে। ইঁহাদিগের মানস মতে খরচ খরচা সকল দিয়া থাকে এবং আসবাব সকল রাজাদিগের দেওয়া হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র, আশাশোটা, চামর, মোরছোল, আড়ানি স্বর্ণের (ও) রূপায় মণ্ডিত, কাহার কাহার হস্তীর আমারি রূপার শুণ্ড মণ্ডিত, স্বর্ণখচিত বস্ত্র গলদেশে পুচ্ছে, কাহার স্বর্ণের কাহার রূপার আভরণমণ্ডিত, হস্তিগণ, ঘোটকগণের (ও) এক এক মোহন্তের আট, দশ, বার নিশান সমভ্যারে। এক এক নিশানের মূল্য হাজার টাকা অবধি পোনর শত টাকা পর্য্যন্ত। এই মত আসবাবে এবং এক এক মোহন্তের সমভ্যারে হাজার, বার শত, পোনের শত, দুই হাজার, কাহার বা ইহার অধিক চেলাগণ সমভ্যারে আছে।

যত মনুষ্য কুম্ভের মেলাতে হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান জন্য একত্র হইয়াছে, গোস্বামী, সন্ন্যাসী, অবধূত, বৈষ্ণব, রামাৎ, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংস, পরিব্রাজক, আখড়াধারী, ইহাদিগের পরস্পর প্রথম স্নান জন্য, এবং নিশান—যাহাকে ঝণ্ডু বলে, তাহা অগ্রপশ্চাৎ লইয়া যাইবার বিবাদ করিয়া, নিশান অগ্রে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত সংখ্যা করিয়া উভয় দলে বিবাদ হইয়া বহু প্রাণী নষ্ট হইত। এইরূপ আচার প্রায় সকল কুম্ভের মেলাতে হইয়াছে। এজন্য এই কুম্ভের মেলার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ হইয়াছিল যে, কেহ শস্ত্রধারী হইয়া, কি অগ্নিময় বাণক্ষেপণের যন্ত্র লইয়া, কি যাহাতে মনুষ্য আহত হইতে পারে এমত বস্তু লইয়া, মেলাস্থল বার ক্রোশের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। তৎকারণ চক্রব্যূহের ন্যায় মেলার স্থল করিয়া দুর্গে দুর্গে রক্ষকগণ নিযুক্ত ছিল। এজন্য সকলে নিরস্ত্র হইয়া আসিয়াছে। নাগাগণ অস্ত্রত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে বলিয়া তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে ফুলদোলের মেলা করিয়া, শ্রী৺ জগন্নাথ দেবের নূতন কলেবর দর্শনার্থে গমন করিবার উদ্যোগে ছিল। কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মকারক সকলে বিবেচনা করিয়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোসাঞি, সন্ন্যাসী, দণ্ডী, পরমহংস ও বৈষ্ণব, আর হরিদ্বারের পাণ্ডা এবং নানা দেশের পণ্ডিতগণের সভা করিয়া বিচার করাইয়া স্থির করিলেন যে, এ তীর্থে কাহার অগ্রে স্নান এবং যত রকম উদাসীন আছেন তাহার মধ্যে কাহার মান্য অধিক। ইহাতে সকলের বিচারে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, গোসাঞি মোহন্তদিগের অগ্রে স্নান, এ তীর্থে গোসাঞিদিগের স্থানে স্থানে অনেক কীর্ত্তি আছে, তাহাদের সম্মান অগ্রে, পরে ক্রমে ক্রমে স্নান। তাহার বিশেষ কারণ এই দর্শাইল যে, ইতঃপূর্ব্বে দ্বাদশ বৎসর অন্তর যত বার কুম্ভ হইয়াছে এবং দ্বাদশ কুম্ভের পর যে কুম্ভ হয়, তাহাকে মহাকুম্ভ বলে, কুম্ভ বলিবার কারণ এই যে, বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিস্থ যে বৎসর হন, ঐ কুম্ভরাশিস্থ বৃহস্পতিতে মহাবিষুবসংক্রান্তির সঞ্চার যে সময় হয়, সেই সময় হরিদ্বারে হরপিড়ির ঘাটে স্নান হয়। এই সময়ের স্নান জন্য নানা দেশের মনুষ্যগণ একত্র হইয়া মেলা হয়, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যখন এমত মেলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গোসাঞিগণ আপন আপন নিশান লইয়া স্নান করিয়াছেন; তাহাতে কেহ আপত্তি করিয়া নিবৃত্ত করিতে পারিত না। এই গোসাঞিদিগের সমভ্যারে অস্ত্রধারী নাগাগণ অনেক থাকিত। তাহারা অগ্রে স্নান জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ছিল। তাহারা রাজার সৈন্য মহাবল পরাক্রমশালী, এজন্য কেহ তাহাদিগকে জয় করিতে পারিত

না। এই সকল পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া গোসাঞিদিগের অগ্রে স্নানের বিধি করিয়া আর আর যত উদাসীন আসিয়াছেন, সকল স্থানে কোম্পানি বাহাদুরের তরফ হইতে চৌকিতে লোক নিযুক্ত হইল—কেহ বিনানুমতিতে স্নান করিতে যাইতে পারিবে না। এই হুকুম কেবল উদাসীন প্রতি। আর আর যত যাত্রিগণ স্নানাকাঙ্ক্ষিত, তাহারা যে যখন স্নান করিবে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কি উদাসীনদিগের আপত্তি নাই। কোম্পানি বাহাদুরের সিপাহীগণ গোসাঞি প্রভৃতি উদাসীনদিগের চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া রহিল। এখানে হরপিড়ির ঘাটের এমত বন্দোবস্ত করিল যে, বাজার হইয়া সদর যে পথ তাহার তিন স্থানে বাঁশ বান্ধিয়া তিন ঘাটি করিল, তাহার এক এক ঘাটিতে আট জন করিয়া জঙ্গী সিপাহী পথ রুদ্ধ করিয়া আছে। বাজারের পশ্চিম পাহাড়ের ধার হইয়া যে পথ আছে, ঐ পথ হইয়া আসিয়া ঘাটের উত্তর-পশ্চিম দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়া ঘাটে আসিতে হয়। স্নান করিয়া ঘাটের দক্ষিণ দিকে যেনো কার সেতু আছে, তাহাতে পার হইয়া, কুণ্ডির ধারে ধারে যে পথ আছে, ঐ পথে আসিয়া সর্ব্ব দক্ষিণে যে নৌকার দুই পুল আছে, তাহাতে পার হইয়া আপন আপন স্থানে গমন। মধ্যস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মধ্যে পথ আছে; যেখানে যে পথ আছে, তাহাতে দুই দুই রক্ষক আছে। হরপিড়ি-ঘাটে প্রতি সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুই জন সিপাহী, উপর চাতলে একশত সিপাহী, রাস্তার মুখে এক এক হাওলদার ও পঁচিশ পঁচিশ সিপাহী, জলের ধারে ধারে একশত সিপাহী এবং জলের মধ্যে কাপ্তেন ও বিজনৌরের মাজিষ্টের এক হস্তীতে এবং কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর ও রুড়কির মাজিষ্টের তিন জন তিন হস্তীতে এবং আর আর সাহেব লোক ও নহরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ও আর আর আমলাগণ এক এক হস্তীতে আরোহণ করিয়া জল মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যূহ স্থাপিত করিয়া মনুষ্যের হিতার্থে রাখিলেন।

বিল্বকেশ্বর

জঙ্গী সিপাহীদিগের যুদ্ধের বেশ নহে, এক এক ধুতি পরা, কোর্তা গায়ে, সাদা টুপী মাথায়, বাঁশের লাঠি হাতে এই মত বেশে সকল লোকের রক্ষার্থ ভ্রমণ করিতেছে; কাহারও ক্ষণমাত্র বিশ্রামের সময় ছিল না।

স্নানের সময় আপত্তি হইয়া বিবাদ না হইবার জন্য এমত সুযুক্তি করিল যে, পরস্পর কাহার সহিত কাহার পথমধ্যে, কি ঘাটে সন্দর্শন হইবার সংযোগ রহিল না। প্রথমে গোসাঞিদিগের স্নান। গোসাঞিদিগের মধ্যে প্রধান শ্রবণানন্দের গদি। প্রথমে শ্রবণানন্দকে স্নান করিতে আনিলেন। সাহরণপুরের খোদ মাজিষ্টের ও কাপ্তেন সাহেব অগ্রগামী হস্তি-আরোহণে, একশত সিপাহী লাঠি হাতে, পুলিশের পদাতিকগণ পদব্রজে, অগ্রপশ্চাতে লোক তফাৎ করিতে করিতে লাঠি ফিরাইতে ফিরাইতে

চলিল, তন্মধ্যে গোসাঞিয়ের সমভ্যারে চল্লিশটী উট, এক শত সওয়ার ঘোটকের উপর, বার হস্তী, হস্তীর উপরে অদের নিশান, গোসাঞি যে হস্তীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার রূপার আমারি, স্বর্ণখচিত ঝুল, শুণ্ডে স্বর্ণমণ্ডিত, গলদেশে পুচ্ছে রূপার তবক ইত্যাদি আভরণ, আমারি উপরে শ্রবণানন্দ মোহন্ত, দুই পার্শ্বে দুই শ্বেত চামর, রূপার দাণ্ডি, এক কারচোবের ছত্রি, রূপার দাণ্ড শিরোপরে, আশাশোটা, পঞ্জা, বল্লম, পঞ্চাশ আড়ানি, মোরছোল এই সকল আসবাব। অগ্রে উটের উপর ও ঘোড়ার উপর ডঙ্কা এবং তাসা কাড়া বাদ্য আছে। এই সকল অগ্রে অগ্রে বাদ্যধ্বনি, পরে হাজার এগারশত চেলা সমভ্যারে এবং দুই শত পরমহংস, একশত দণ্ডী ও অপরাপর অভ্যাগত যাত্রীতে কমবেশ এক হাজার সমভ্যারে স্নান জন্য যাত্রা করিয়া, নগরের পশ্চিম দিক্ হইয়া, পল্লতের পূর্বধার দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথ হইয়া বরাবর আসিয়া পূর্ব্বমুখে যে পথ আছে, ঐ পথ দিয়া হরপিড়ির ঘাটে পহুছিয়া নামিয়া প্রথমতঃ নিশানকে ঐ ঘাটের জলমধ্যে বাদ্যধ্বনি করিয়া আরতি করা হইল। পরে ঐ নিশানকে সপ্তবার পরিক্রম করিয়া সকলে স্নানাদি করিল। স্নান করিবা মাত্র উক্ত সাহেবগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে ঐ সকল ব্যক্তিকে নৌকার পুলে পার করিয়া নীলধারার নিকটে রুড়ি হইয়া যে পথ লহরের ধারে ধারে আছে, ঐ পথে আসিয়া দ্বিতীয় পুলে পার করিয়া পুনঃ পশ্চিমপারে আসিয়া, পশ্চিম মুখে যে পথ আছে, তাহাতে আসিয়া চৌরাস্তাতে উঠিয়া যাহার যে স্থানে আখড়া, তাহাকে সেই স্থানে পহুছাইয়া দিল।

এই মত গমনাগমনের প্রথা করিয়া রাজপুরুষেরা সকলে সদলে সমভ্যারে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বার গোসাঞি, মোহন্ত ও আখড়াধারীদিগকে পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া আনিয়া উক্ত রীতিক্রমে সকলের স্নানাদি ক্রিয়া সমাধা করিল। বার আখড়ার মোহন্তের কাহার আসবাব নিশান, হস্তী, ঘোড়া, উট, আশাশোটা, চামর, মোরছোল ইত্যাদি আড়ানি, পঞ্জা কাহার কম নহে, বরং গুজরাটের বলভদ্রী-আখড়ার গোসাঞিয়ের সমভ্যারে এগার হস্তী ও হস্তিনী আছে। ইহাদিগের গমনকালে দেখিতে কি শোভা, তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। গোসাঞিগণ হস্তি-আরোহণে দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর মোরছোলের ব্যজন, শিরোপরে ছত্র এবং অপরাপর আসবাব সকল অগ্রগামী শোভাযুক্ত চেলাগণ ঘোর তপস্বী নানারঙ্গে শোভা করিয়া যাইতেছে। রাজপুরুষেরা অ পশ্চাতে, পদাতিকগণ অগ্রে অগ্রে মনুষ্যগণকে অন্তর করিয়া পথের ভিড় ঘুচাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। এই মত সকলকে ক্রমে ক্রমে স্নান করাইতে প্রায় দিবা দুই প্রহর হইল। এখানে সন্ন্যাসিগণ ও বৈষ্ণবগণ মহা কোপান্বিত হইয়া সকলে আপন আপন চিমটা ও কুড়ালি এবং ধুনির কাষ্ঠের জ্বলিত কুণা লইয়া যুদ্ধের বেশে খাকী বৈষ্ণবগণ উঠিল। তাহাদিগকে কাপ্তেন সাহেব এবং বিজনৌরের মাজিষ্টের অনেক স্তুতি করিয়া কহিলেন যে, "দেখ, তোমরা সকল সুখ এবং গৃহধর্ম্ম ও কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, শিরেতে জটাভার শিরোভূষণ করিয়া, ভস্মরাশি অঙ্গভূষণ করিয়া, মৃত্তিকাতে ভূমিশয্যা, হস্ত বালিশ, অঞ্জলিতে জলপান করিয়া, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হিম শিশির বসন্তে নিরাশ্রমে অযাচক হইয়া, ভগবৎ-পদারবিন্দ পাইবার আশায় কেবল অগ্নি-অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেছ এবং তৎহেতুতে তীর্থভ্রমণ ও তীর্থস্নানাদি; ইহাতে তোমাদিগের এত ক্রোধ করা সম্ভব হয় না। অতএব আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হউন। আমরা উত্তমরূপে তোমাদিগকে স্নান করাইয়া আনিব।" এই স্তবস্তুতিযুক্ত রাজপুরুষদিগের বাক্য শ্রুত হইবা-মাত্র সকলে হস্তের যুদ্ধের দ্রব্য হস্ত হইতে ফেলাইয়া আপন আপন আসনে বসিলেন। বৈষ্ণবগণের রাগ শান্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ রণবাদ্য বিউগলে ফুক দিবামাত্র যুদ্ধের সৈন্যগণ সজ্জীভূত হইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের প্রতি আদেশ হইল, খাকীদিগের চতুষ্পার্শ্বে চক্রব্যূহ স্থাপিত করিয়া মধ্যস্থলে ইহাদিগকে রাখ। ব্যূহের বাহির বিনানুমতিতে না যাইতে পারে। সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া রাখিল।

খাকী বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের এই মত আবদ্ধ করিয়া কাপ্তেন ও মাজিষ্টের আপন দলবল লইয়া যথায় যথায় সন্ন্যাসিগণ আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া সকলকে স্নান জন্য পূর্ব্ব যেমত পথে গোসাঞিদিগকে লইয়া স্নান করাইয়াছে, সেই পথে সন্ন্যাসীদিগকে লইয়া স্নানার্থে গমন করিল। সন্ন্যাসীদিগের শিষ্য অনেক রাজা এবং ধনাঢ্যগণ

আছেন। ইহাদের স্নানে যাইবার আসবাব জন্য হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র, আশাশোটা, পঞ্জা, চামর, মোরছোল, আড়ানি ইত্যাদি যত রাজপরিচ্ছদের দ্রব্যাদি এবং সৈন্যগণ অগ্রপশ্চাৎ শৃঙ্খলামত, গদিয়ান সন্ন্যাসিগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্নানে যাত্রা করিলে পর সমভ্যারে কমবেশ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী, মস্তকে জটাভার, বিভূতিভূষণ, রুদ্রাক্ষ-স্ফটিক-পদ্মবীজের মালা ধারণপূর্ব্বক কাহার কটিতটে কৌপীন লাল যাইল। সকলে হরপিড়ির ঘাটের পূর্ব্বপারে নীলধারার নিকটে ছিল, একারণ ঐ সকল সাধুগণকে রুড়ির রাস্তা হইয়া হরপিড়ির ঘাটের নিকট যে পুল আছে, ঐ পুলে পার করাইয়া, হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার পার করাইয়া, তাহাদের আসনে ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে পঁহুছাইয়া রাজপুরুষগণ আপন আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে কঙ্খল যাইয়া রাজগণের স্নান জন্য তন্ধিরে রহিলেন।
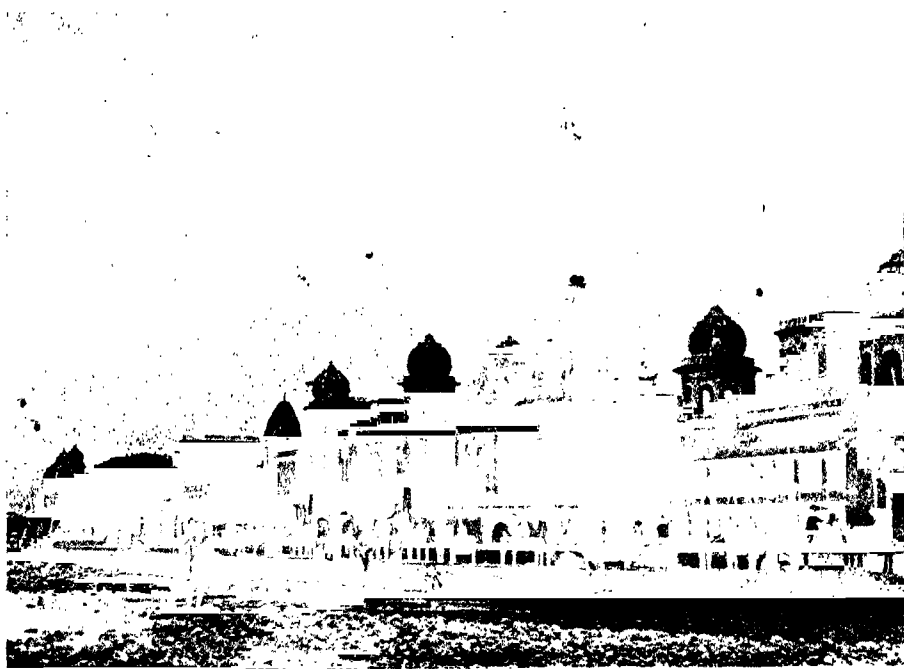
কুশাবর্ত্ত ঘাট

রঙ্গের—উপরে বহির্ব্বাস, কাহার লৌহ কি পিতলের শৃঙ্খল, কটিবেষ্টিত কাষ্ঠের কৌপীন, কেহ কেহ উলঙ্গ—গাঁজা চরস ভাঙ্গ ধুস্তুরাতে চক্ষু ঢুলু ঢুলু—সকলে শিবাকৃতি হইয়া "হর হর গঙ্গাধর, বম্ বম্" গালবাদ্য করিয়া রঙ্গে ভঙ্গে স্নানে গমন করিতেছে,—দেখিতে কিবা শোভা তাহা কহিতে পারি না! কত শত ঊর্দ্ধবাহু অবধূত মৌনব্রতী অনেক সম্প্রদায় যোগিবেশে শিঙ্গা ডম্বুর লইয়া হরগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিত করিতে গমন করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত পথে রাজপুরুষগণের সমভ্যারে হরপিড়ির ঘাটে আসিয়া স্নান করিয়া পুল হইয়া পার করাইয়া পুনঃ পুলে পার করিয়া পশ্চিম পারে আনিয়া, যাহার যে আসন তথায় তাহাকে পঁহুছিয়া দিয়া, পরে খাকী বৈষ্ণবদিগের স্নানার্থে লইয়া

প্রথমতঃ বিকানীরের রাজা স্নানে যাত্রা করিলেন। রাজার সমভ্যারে ত্রিশহাজার লোক। প্রথমে ঘোড়ার উপর ডঙ্কা, তাহার পর উটের উপর ডঙ্কা, তাহার পর বাণ নিশান দুই শত, তাহার পরে খাসগেলাস, ভাল ভাল মুলতানী বনাতে কারচোবের কর্ম্ম, তাহার দুই শত স্বর্ণ রূপার আশাশোটা, পঞ্চাশ রূপার ছড়ের বল্লম, পঁচিশ পঞ্জা, দশ ছত্র, অতি উত্তম রেশমী কাপড়ে স্বর্ণ তারে তারকুশী কারচোব, স্বর্ণের দাণ্ডি, মুক্তার ঝালর, এক ছত্র রাজার মস্তকে আর তদ্রূপ এক আড়ানি শ্বেত চামর, দুই পার্শ্বে দুই স্বর্ণ দাণ্ডি, মোরছোল, তদ্রূপ ত্রিশ হস্তী সুসজ্জিত পঁচিশ ঘোড়সওয়ার অস্ত্রধারী মায় বন্দুক রাজার অগ্রপশ্চাৎ আর দুই পার্শ্বে রক্ষার্থে আছে। কাপ্তেন ও মাজিষ্টের সাহেব

আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে লইয়া অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় ঘুচাইয়া দিতেছে। এইরূপে গমন করিয়া সহরের পশ্চিম দিক্ হইয়া যে পথ দিয়া আর আর সকলে স্নানার্থে আসিয়া ছিল, সেই পথ হইয়া রাজাকে স্নান জন্য আনিয়া হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া, কুশাবর্ত্তের ঘাটে পিণ্ডদান করাইবার জন্য আনয়ন করিল। রাজা ঘাটে পঁহুছিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেন। নয়সের সোণার নয় পিণ্ডদান, এক হস্তী মায় আসবাব, আর ভাল এক ঘোড়া, সুবর্ণের কড়া, মোতির মালা, হীরার অঙ্গুরি, শালের জোড়া মূলতানী জোড়, পাগ দোপাট্টা ও হাজার মোহর দক্ষিণা আপন পাণ্ডাকে তাবৎ দ্রব্য দান করিয়া তক্তারামার উপর উঠিয়া যাত্রা করিলেন। রাণীগণ চতুর্দ্দোলে উঠিলেন। তক্তারামার ষোল দ্বার রূপার নির্ম্মিত, স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদিতে সুশোভিত, আর চতুর্দ্দোলে মুলতানী বনাতের উপর কারচোবের কাজ করা উত্তম ঘেরাটোপে ঘেরা'; বাঁশে সোণার মুখ, উপরে সোণার কলস। এই মত চারি চতুর্দ্দোলে চারি রাণী আর সমভ্যারী সকলে হস্তিপৃষ্ঠে—এই মতে সকলে কুশাবর্ত্তের ঘাট হইতে উত্তরদিকের পুল পার হইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব-পার নীলধারার পশ্চিম দিয়া যে পথ, তাহা দিয়া আসিয়া, দক্ষিণের পুল দিয়া পশ্চিম পার হইয়া, কঙ্খল যাইবার চৌরাহে পঁহুছিয়া তথা হইতে কাঙ্গালীদিগের দান জন্য সিকি আধুলি টাকা ফেলিতে ফেলিতে কঙ্খল পর্য্যন্ত পহুছিল। এই মত ক্রমে ক্রমে রাজাদিগের স্নান দান কর্ম্ম সমাপন করাইতে প্রায় রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মেলা ছিল। ঐ দিবস হরিদ্বারের মধ্য রাস্তার বাজার বন্ধ ছিল। ঐ বাজারে কাহার ক্রয়বিক্রয় ঐ দিবস হয় নাই। রাজপুরুষগণের কি পর্য্যন্ত শ্রম এবং অনাহারে ক্লেশ তাহা বলিতে পারি না। ইহারা এত পরিশ্রম করিয়া ঐ সময় স্নানের এমত বন্দোবস্ত না করিলে কত শত মনুষ্যের প্রাণ দণ্ড হইত, তাহা বলা যায় না। এমত রূপ বন্দোবস্ত করাতেও মনুষ্যের ভিড়ে কত শত মনুষ্যের সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মৃতের ন্যায় হইয়াছে! যে স্থলে যাহার সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথা হইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে লইয়া তাহার সুতদ্দিরের দ্বারায় সুস্থ করা, তজ্জন্য লোক এবং চিকিৎসক নিযুক্ত ছিল। এই মতে সংক্রান্তি দিবসের স্নান-সমাপন হইল।"

তপ

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

স্বার্থ-অসির ঘাত-প্রতিঘাত
　　দুঃখ-সুখে টল্‌ব না,
তোষামোদের নিশান হাতে
　　আপ্‌নারে আর ছল্‌ব না;
স-পৌরুষে দল্‌ব পদে
　　পরাজয়ের কল্পনা—
মঠে মঠে লুটিয়ে মাথা
　　নয়ন-জলে গল্‌ব না।
বিবেক-বারণ শুন্‌ব শুধু
　　গুরুর নিষেধ মান্‌ব না,
জীবন্মৃতের মন্ত্রে ভুলে'
　　কে র'বে আর আন্‌মনা!

সত্য-ন্যায়ের শাস্ত্র ছাড়া
　　অন্য বিধান জান্‌ব না—
আকাশ-কুসুম লক্ষ্য ক'রে
　　বাণের ফলা হান্‌ব না।
অভিমানীর সোণার প্রদীপ
　　পূজার ঘরে জ্বাল্‌ব না,
রজস্তম ধূপ ধূনা ছাই
　　কাজল-কালী ঢাল্‌ব না—
বলের সেরা ধ্যানের বলে
　　অকুতোভয় দৃক্‌পাতে,
ভর্‌ব আমার ধর্ম্মশালা
　　অমৃত-রস-ভিক্ষাতে।

রত্ন-বিয়োগ

কাশ্মীররাজের 'হোম-মিনিষ্টার'
ডাক্তার এ. মিত্র
মৃত্যু - ৭ই কার্ত্তিক, ১৩২১

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষার পরীক্ষক
বিবিধ গ্রন্থ অনুবাদক-প্রাচীন সাহিত্যিক
শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, M.A., B.L.
মৃত্যু—১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২১
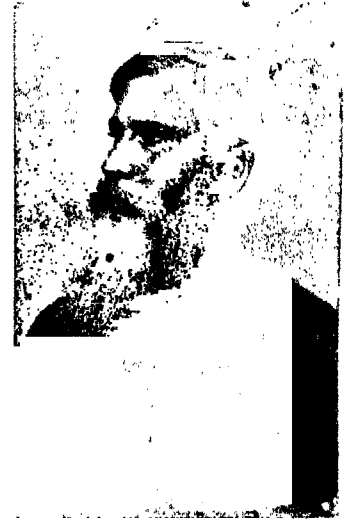
পাকপ্রণালী প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকার
শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
মৃত্যু—১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩২১

ঢাকার নবাব স্যর সলিমুল্লা বাহাদুর
মৃত্যু—২রা মাঘ, ১৩২১

রায় সাহেব চারুচন্দ্র মিত্র
মৃত্যু—৪ঠা পৌষ, ১৩২১

হায়দ্রাবাদের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
মৃত্যু—১৪ই মাঘ, ১৩২১

বৰ্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলন।

বৰ্দ্ধমান অষ্টম সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণ

S. N. Nag Esqr.
Photographer, Burdwan.

বর্দ্ধমান অষ্টম সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতি

S. N. Nag Esqr.
Photographer, Burdwan.
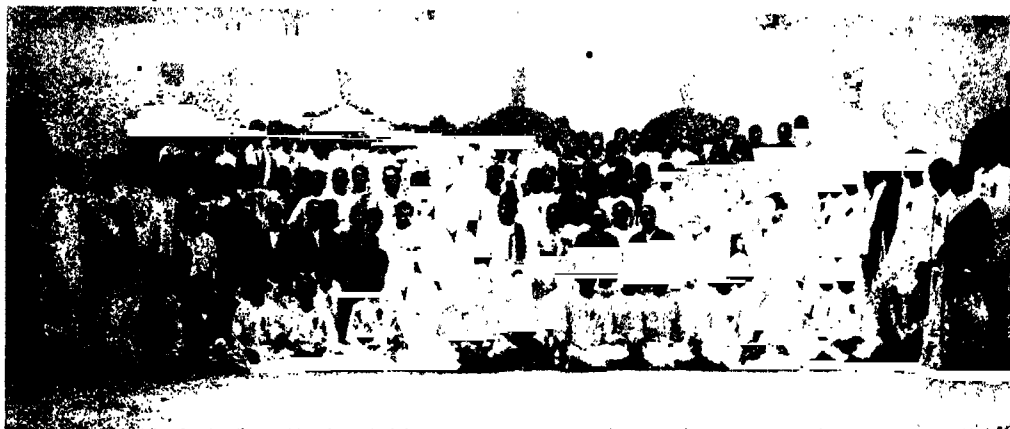
বর্দ্ধমান অষ্টম সাহিত্য-সম্মিলনের স্বেচ্ছা-সেবকগণ

. N. Nag Esqr.
Photographer, Burdwan.

বীণার তান

হিন্দী

১। সরস্বতী, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫।

(ক) শমসুল উল্মা মৌলানা শিবলী নৌমানী।

আলীগড় কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, উর্দ্দু ভাষার খ্যাতনামা লেখক মৌলানা শিবলী এখন পরলোকে। গত ১৮ই নবেম্বর ৫৭ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে নিজনিবাস আজমগড়ে মৌলবী সাহেব দেহত্যাগ করিয়াছেন। শিবলী, আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং ফ্রেঞ্চ, লাটিন ও ইংরাজি ভাষাও অল্পবিস্তর জানিতেন। তিনি ফারসীভাষায় পুস্তক-রচনা করিয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিক বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। একাধারে কবি, লেখক ও ঐতিহাসিক—তাঁহার ন্যায় ভারতীয় মুসলমান সমাজে দ্বিতীয় আর কেহ দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি উর্দ্দু ভাষায় 'মুসলমানজাতির জাতীয় কবি' ছিলেন। শিবলী কিছুদিন সরকারী চাকরী এবং ওকালতীও করিয়াছিলেন। কিন্তু গত ১৩ বৎসর আলীগড় কলেজ স্থাপনাবধি তিনি নিরবধি তাঁহার সকল শক্তি জাতীয় বিদ্যালয়ের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত উর্দ্দু গ্রন্থাবলীর মধ্যে রুম, মিশর ও শ্যামভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং মৌলানা রুমের জীবনী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি খাঁটি মুসলমান হইলেও জীবনে কখনও হিন্দু বা হিন্দী-বিদ্বেষ এবং ভেদ-ভাব প্রকাশ করেন নাই।

(খ) জৈন-পণ্ডিত শ্রীমদ্বিজয়ানন্দ সূরি উর্ফ আত্মারামজী জৈন-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত সাধু ও বিদ্বান ছিলেন। সংবৎ ১৮৯৩, চৈত্র শুক্ল প্রতিপদে পঞ্জাবের অন্তর্গত ফীরোজপুরের অধীন লহরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হইলে জননীর উপর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পতিত হইয়াছিল। যৌবনে ঢুঁঢ়ক মতের (ঢুঁঢ়িয়ে) সাধুবিশেষের সহিত পরিচয় হইলে, তিনি সেই মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন এবং জীবনরাম-নামক সাধুর নিকট ঐ মতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ১৯৩২ সংবৎ ঢুঁঢ়ক মত পরিত্যাগ করিয়া অহমদাবাদে গমন করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি তর্কসংগ্রহ, মুক্তাবলী, দিনকরী, সাংখ্যতত্বকৌমুদী ও যোগচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অহমদাবাদে (গুজরাতি) ইনি বুদ্ধিবিজয়-নামক জৈনসাধুর নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, আনন্দ-বিজয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯৪৩ সংবৎ জৈনসাধুমণ্ডলী তাঁহাকে আচার্য্য-পদবী প্রদান করেন। তদবধি ইঁহার নাম বিজয়ানন্দ সূরী। বিজয়ানন্দ বহুদেশ পর্য্যটন ও বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়প্রাসাদ, জৈনতত্ত্বাদর্শ, অজ্ঞানতিমিরভাস্কর, সম্যকত্বশল্যোদ্ধার, জৈন-প্রশ্নোত্তর এবং শিকাগো-প্রশ্নোত্তর উল্লেখ-যোগ্য। ইদানীম্ আত্মারাম অমৃতসরে অবস্থান করিতেন এবং গত ১৯৪৯ সংবৎ শিকাগো সর্ব্বধর্ম্মপরিষদে (The world's Parliament of Religions)এ আহূত হইয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ বিজয়ানন্দ শিকাগো মহাসভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। গত ১৯৫৩ সং জ্যৈষ্ঠ শুক্লাষ্টমীতে পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাঁবালা নামক স্থানে আত্মারামের আত্মা দেহমুক্ত হইয়াছে।

(গ) বিবিধ বিষয়ের মধ্যে সম্পাদক-মহাশয় মন্তব্য করিতেছেন, (১) যুদ্ধ অপেক্ষা রোগ ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাদিদ্বারা অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথচ সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। ভারতবর্ষের অধিবাসী ৩২ ক্রোর, তন্মধ্যে প্লেগ মহামারীতে প্রতি বৎসর '৭ লাখ আদমী যমলোক কো প্রস্থান কর জাতে হৈঁ।' (২) লৌকিক সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে সরস্বতী-সম্পাদক লিখিয়াছেন—"এদেশে ইংরাজরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্ষত্রিয়দিগের সহিত ব্রাহ্মণেরাও সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা মাল্টা, আদন, বন্দর-আব্বাস, মিশর, ট্রান্সভাল, হংকং, শাংহাই, চীন, সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইতেছে এবং স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে অবাধে সমাজে গৃহীত হইতেছে। ফিজী, ট্রিনিডাড কনাডা, ট্রান্সভাল, কেপ কলোনী, মরিশস প্রভৃতি স্থানে ভারতবাসীরা গমন করিয়া কৃষিবাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতেছে; এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কেহই তাহাদিগের সমাজপ্রবেশে বাধা প্রদান করিতেছে না। এবার হাজার হাজার ব্রাহ্মণ হিন্দুস্থানী পল্টনের সহিত বিলাত গিয়াছে, তাহাতেও কেহ ওজর আপত্তি করে নাই। কিন্তু সমাজের যত প্রতিবন্ধ কেবল যাহারা শিক্ষার্থী হইয়া বিদেশ যাইতেছে, তাহাদের বেলা! আমরা দেখিতে পাই, শিক্ষার্থীদের ন্যায় কুলীরা সমাজ ওলট পালট করিতে শেখে নাই।"

২। ইন্দু, কলা ৬, কিরণ ২ (ফেব্রুয়ারী)।

'হমারী দশা' কবিতায় কবি কৃষ্ণদাস' কহিতেছেন—

* * *

যহ্ ব (ও) হী ব্রজমণ্ডল্ হৈ প্রভো!
বহ্ রহী জমুনা যহ্ হৈ ব (ও) হী,
যহ্ ব (ও) হী অব্ গোয়ালিন্ গোয়াল হৈঁ,
পর্ ন ক্যা তুম্ আজ রহে ব (ও) হী?
ব (ও) হ দয়া ব (ও) হ কোমলতা কহাঁ?
ব (ও) হ সখা-প্রিয়তা ব (ও) হ বন্ধুতা।

বহ্(ও)হ সুখী-সুখ-কারয়তা কহাঁ!
জননি-ভক্তি কহাঁ বহ্(ও)হ? হে হরে!
ন মনুষ্ক সুখ আয়ুভ্যাহ্ ক্যা—
শ্রবণ! নেত্র ন ক্যা বহ্ দেখ্ তে,
অতি দরিদ্র-দশা ইস্ দেস্কী
ফির্ কহেঁ হম্ ক্যা? করুণানিধি!

ইত্যাদি।

(খ) 'হিন্দী-হিতৈষিয়োঁ সে বিনয়' কবিতায় কবি বাবু দ্বারিকা প্রসাদগুপ্ত কহিতেছেন,—

* * *

বংগলাদিক ভাষায়েঁ যদ্যপি বনী ইসীসে মিলকর;
পর দেখো সাহিত্য বঙ্গকা হৈ কিতনা উন্নতিপর।
অন্যকালমেঁ কৈসা ইসনে নাম, মান হৈ, পায়া;
গুরু গুড় হী রহগয়ে কিন্তু চেলা চীনী কহলায়া।

* * * *

তনমনধনসে জিস বংগলা কে সপুতগণ হৈঁত্যপর;
তো ফির সব ভাষাওঁসে বহ বঢ়েনে আগে ক্যোঁকর?
উসী তরহ ইংলিশ ভাষাকা হৈ সাহিত্য সমুজ্জ্বল;
ঔর কহাঁ তক কহেঁ দেখ্ লীজে উর্দূকা হী বল।
বঢ়তে বঢ়তে ইসনে আপনা ঐসা থাপ জমায়া;
জো প্রযত্ন করনে পরভী হৈ হটতা নহীঁ হটায়া।

* * * *

বঙ্কিমবাবুকা করকে অনুকরণ মিত্র! দিখলানা;
মাকা শুষ্ক কমল নবজলকে সিঞ্চনসে হরষানা।

ইত্যাদি।

(গ) ভাষা ঔর সাহিত্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ মিশ্র বলিতেছেন—

পূর্ব্বে হিন্দী প্রান্তিক ভাষা ছিল। অবধী, বুন্দেলখণ্ডী, ভোজপুরী, ব্রজভাষা প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কথিত ভাষা ছিল। তখন কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে বেশী প্রভেদ ছিল না। কিন্তু এখন আর হিন্দী শিশু নহে। সুতরাং তাহাকে 'অব জরা গম্ভীর প্রকৃতি হোনা পড়েগা।' গ্রাম্যভাষা দেশের কথিত ভাষা। গ্রাম্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যের ভাষা অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না। 'ঘরাউ' ভাষায় আমাদের মনের ভাব ও আবেগ প্রকট হয়। অতএব সাহিত্যকে জীবিত রাখিতে হইলে ঘরাউ ভাষায় স্পন্দনধারা ইহাতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে। জনসাধারণের ভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই সূরদাস, কবীরদাস, বিহারী, রহীম ও তুলসীদাসের পুস্তক আজও লোকমুখে জীবিত রহিয়াছে।

দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে এক সার্ব্বজন রাষ্ট্রভাষার আবশ্যক। কোন বিদেশী ভাষার পক্ষে রাষ্ট্রভাষার স্থান গ্রহণ করা সহজ নহে। হিন্দীই এই অভাব পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। এজন্য হিন্দীকে একটু উদার হইতে হইবে। কথিত ভাষার সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া অবসর মত সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে উহা প্রান্তিক সংস্কৃতমূলক ভাষা-ভাষীদের সমুজে বোধগম্য হইতে পারে। শব্দসম্পদে হিন্দীর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ নহে। আজকাল রাষ্ট্রমন্ত্রে ভারতবর্ষ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে কেবল এক হিন্দীই সমর্থ। যেহেতু হিন্দী স্বাভাবিক ভাষা, দেশের অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে এবং ইহা সহজবোধ্য।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার পূর্ব্বে তাহাকে রাষ্ট্রভাষার উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে হিন্দীসেবকদিগের উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

৩। উষা, মাঘ—ফাল্গুন, ১৩৭১।

'আর্য্যভাষাকা অন্য ভারতীয় ভাষা ওঁ সে সম্বন্ধ' আলোচনায় সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন, মরাঠী ছাড়া ভারতীয় অন্য ভাষাভাষীরা সকলেই তাহাদের বর্ণমালা নাগরী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিয়াছেন। বাঙ্গালীরা এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী। তাঁহারা সংস্কৃত পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিকৃত লিপিতে লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগকে খুব দেশভক্ত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু দেশ বলিতে তাঁহারা কেবলই বাঙ্গালা দেশকেই বুঝিয়া থাকেন। স্বীকার করিতেছি বাঙ্গালীরা অত্যন্ত বিদ্বান্ এবং ইহাদের সাহিত্য ও খুব উন্নত, কিন্তু তাহাতে দেশের লাভ কি? ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মন প্রভৃতি ভাষা কি কম উন্নত? তাহাদের উন্নতিতে আমাদের জাতির লাভ কি? দেশভক্ত বাঙ্গালীসজ্জনেরা এদিকে মনোযোগ দিলে এবং বঙ্গভাষাকে অবশ্য দেবনাগরী অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষে একলিপির প্রচার হইতে পারে, এবং শীঘ্র এক ভাষার ও আশা করা যাইতে পারে।

'মাংসভক্ষণ ঔর হিন্দু' আলোচনায় লিখিত হইয়াছে, মাংসাহারী পশুদিগের মধ্যে সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। কিন্তু বৃক্ষপত্রাহারী বন্য মহিষের সম্মুখে সিংহ ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। শূকর, খরগোস প্রভৃতি নিরামিষাশী পশুদিগের বংশবৃদ্ধি অধিক, মাংসাহারী সিংহ বা নেকড়ের নহে। ফলাহারী বানর মাংসাহারী সিংহ অপেক্ষা অধিক দীর্ঘজীবী হয়। য়ুরোপীয়দিগের উৎসাহী ও বলিষ্ঠ হইবার কারণ মাংসভক্ষণ মনে করা এবং তাঁহাদের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার কারণ মদ্যপান ও খ্রীষ্টধর্ম্ম মনে করা এক। * * বৌদ্ধেরা এবং অশোকই মাংসভক্ষণ তুলিয়াদেন নহে, বেদেও ইহার নিষেধ দেখা যায়—

পৃথিবীং মা হিংসীঃ। ১৮
গাং মা হিংসীঃ। ৪৩
অবিং মা হিংসীঃ। ৪৪
ইমং মা হিংসী দ্বিপাদং পশুম্। ৪০
ইমং মা হিংসী এক শফং পশুম্। ৪৮, যজুর্বেদ, অধ্যায় ৩১।

ইত্যাদি।

জগতের কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিরামিষাহারী ব্যক্তির নাম নিম্নে লিখিত হইল,—

পাইথাগোরাস, প্লেটো, অরিষ্টোটল, প্লুটার্ক, হাইপেশিয়া, আইরিনিয়াস, ক্লেমেন্স, ডায়োজিনীজ, প্লুটার্ক, সেনেকা, বুদ্ধ, বেণু, জেমস্ (the Less), পিটার, ওরিগন, মিল্টন, আইজাক নিউটন, বেঞ্জামিন ফ্রেঙ্কলিন, জেসসন, শেলি, সুইডনবর্গ, সোজে, আর্কিডাকন এডিসন, জেনারেলবুথ প্রভৃতি। প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে স্পার্টন, রোমন, আরবী, জাপানী প্রভৃতিরা ও নিরামিষভোজী ছিল।

পুস্তক-পরিচয়

আহুতি

[শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত, মূল্য আট আনা]

ইহা একখানি নাটক; মিনার্ভা-রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের অভিনয় হইতেছে; দর্শকগণ এই নাটকের প্রশংসা করিতেছেন; সুতরাং গ্রন্থকারের নাটক লেখা এক হিসাবে সফল হইয়াছে। কিন্তু যে নাটক রঙ্গমঞ্চে সাফল্য লাভ করে, তাহাই যে সাহিত্যে স্থান পাইবে, এমন কথা নাই। আমরা যে পুস্তকখানির পরিচয় দিতেছি, এই 'আহুতি' যেমন রঙ্গমঞ্চে প্রশংসিত হইতেছে, তেমনই সাহিত্য-ভাণ্ডারেও আসন-লাভের যোগ্য। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী উপন্যাস "Sign of the Cross" পাঠ করিয়া ঐ ধরণে একখানি নাটক লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার হয়। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, 'আহুতি' উক্ত ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। এখানি ঐ পুস্তকের সামান্য ছায়া অবলম্বনে লিখিত। মগধের বৌদ্ধ কাপালিক রাজার বৈষ্ণব-বিদ্বেষ এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টি অবলম্বন করাতেই আহুতি নাটকখানি এমন আদরলাভ করিয়াছে। ইংরাজী পুস্তকের সহিত তুলনা করিবার প্রয়োজন নাই; গ্রন্থকার বৌদ্ধ কাপালিক রাজা রুদ্রচণ্ডকে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; আহুতি ও চন্দ্রপীঠও যথাযোগ্যভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অপরেশবাবু একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা, কতকটা সেই জন্যই তাঁহার এই 'আহুতি' নাটক নাট্যাংশেও মন্দ হয় নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তিনি এই প্রথম চেষ্টাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে যে তিনি একজন প্রধান নাটক-লেখক হইবেন, এ সম্ভাবনাও সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন।

তাই তাই

[শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত B. A প্রণীত]

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত কে. ভি. সেন-মহাশয় 'যেখানে যা সাজে তাই দিয়া' এই সুন্দর মনোমোহন পুস্তক 'তাই তাই' সাজাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকবাবুও 'তাই তাই' বলিয়া মনমাতানো সুরে গান ধরিয়াছেন; সুতরাং এই পুস্তকখানিতে সোণায় সোহাগা হইয়াছে; ছেলে মেয়েদের জন্য যেমন বই চাই, তাহাই হইয়াছে। ছবিগুলি অতি সুন্দর, আর ছবি ছাপিতে বসিয়া সেন-মহাশয় একটুও কৃপণতা করেন নাই। সুতরাং আমাদের বালকবালিকাগণ যে তাই তাই বলিয়া 'তাই তাই'কে অভিনন্দন করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সাবিত্রী

[শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত B. A. প্রণীত; মূল্য ছয় আনা]

সতী-সাবিত্রীর কথা যিনি যেমন করিয়া বলুন না কেন, বিষয়গুণে আমরা বাঙ্গালী, আমাদের তাহাই ভাল লাগে। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক বাবু সুলেখক, তাহার পর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত কে. ভি. সেন তাঁহার সাবিত্রীর চিত্র ও অঙ্গরাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন; এ অবস্থায় বইখানি যে সুপাঠ্য ও সুদৃশ্য হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। অতি সহজ সরল ভাষায় পুস্তকখানি লিখিত।

শান্তিশতকম্

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত]

এই পুস্তকখানি ১২৯৮ সালে শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপুর সাহেব সি, এস, আই. মহোদয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিতরিত হইয়াছিল। তাহার পর পুস্তক ফুরাইয়া যায়। অনেকের আগ্রহে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তকখানি পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়-মহাশয় অতি সরল সুন্দর কবিতায় শান্তিশতকের অমূল্য শ্লোকগুলির অনুবাদ করিয়াছেন; আমরা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই সুন্দর অনুবাদ সকলেরই পাঠ করা উচিত। পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইত, অনুবাদক মহাশয় এবারও বিনামূল্যে বিতরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন; ডাকমাশুল প্রেরণ করিলেই তিনি এই পুস্তক প্রেরণ করিয়া থাকেন। অনুবাদকের ঠিকানা—বর্দ্ধমান-রাজবাটী।

আঙুর

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ; মূল্য ॥০ আনা—বাঁধাই ॥৵০ আনা]

ইহাতে একাদশটি ছোট গল্প আছে। গল্পগুলি যেমন সুলিখিত, তেমনই মনোরম। যদিও দুএকটি গল্পে রবিবাবুর ছোট গল্পগুলির একটু আধটু আভাষ আছে; তথাপি, আমাদের বিশ্বাস, এই নবীন গ্রন্থকার স্বাধীনভাবে লিখিবার অনুশীলন করিলে, কালে একজন সুদক্ষ গল্প-লেখক হইবেন। এই ধরণের গল্পই প্রকৃত ছোট-গল্পের আদর্শ বলিয়া আমাদের মনে হয়। কথাসাহিত্যপ্রিয় পাঠকবর্গকে আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মাসপঞ্জী

(চৈত্র)

১লা—মান্দ্রাজে মেহমেডান এডুকেশনাল এসোসিয়েসনের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। জজ তায়েবজী সভাপতি।

"—কলিকাতা পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্‌টার হ্যামিলটনের মৃত্যু।

২রা—মিঃ ওয়ালটার ক্রেনের মৃত্যু।

৩রা—বোম্বায়ে এক "টাউন-প্ল্যানিং" প্রদর্শনী খোলা হয়।

"—"হামদার্দ্দ" ও "কমরেড" মামলার আপীল না-মঞ্জুর হয়।—লণ্ডনে এক বৃহৎ 'লেবর কন্‌ফারেন্স' হয়।

৪ঠা—'ডিফেন্স্ অফ রেল্‌মস্' বিল ইম্পীরিয়ল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে পেস হইয়া পাশ হইয়া গিয়াছে। হাউস অফ লর্ডস্ স্থির করেন, ইউ, পি, গবর্ণমেন্টকে আপাততঃ এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল দেওয়া হইবে না।

৫ই—সেকন্দরাবাদে (হাইদারাবাদ) এক শিল্পসম্বন্ধীয় কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। মিঃ হাইদারী সভাপতি।

"—মান্দ্রাজে সাদারন ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশন হয়। রাও বাহাদুর পি. টি. চিটী সভাপতি।

৬ই—রামমোহন রায় লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশন হয়। মাননীয় জজ উডরফ সভাপতি।

৭ই—কলিকাতা বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্‌ডার্স এসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশন। রায় ললিতমোহন সিংহ সভাপতি। সম্মিলনী ইউনিয়নের অধিবেশন।

৮ই—রুষের প্রেস্‌মিল অধিকারে তাহাতে রুষিয়ায় আনন্দোৎসব হয়।—পঞ্জাবের কয়েকটি ডিভিজনে "ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এক্ট" জারী।—বড়লাট সভায় বেনারস্ হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেস হয়।—মুসলমানপাড়া বোমা মামলার আসামী নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহামান্য হাইকোর্ট কর্ত্তৃক নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া বেকসুর খালাস পায়।—পারসিয়ান "নিউ ইয়ার্স ডে"র উৎসব হয়।

৯ই—কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।—"জমীদার"-সম্পাদক মৌলভী জাফর আলী খাঁকে সরকার বাহাদুর জামিন দিতে বলেন।—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ এটর্ণী মিঃ ডি. গ্রিগরীর ও মিঃ এফ. জে. ওয়াট্‌কিনসের মৃত্যু। মিঃ জি. মরের সভাপতিত্বে কলিকাতা 'মেরীন ইন্‌সিওরেন্স'-এজেন্টসদের বার্ষিক অধিবেশন।—হাইকোর্টের উকীল প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।—নওগাঁর উকীল শ্রীবনমালী সান্যালের মৃত্যু।

১০ই—মাননীয় নবাব সামসুল হুদার সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশন।

১১ই—মৌলভী মহম্মদ ইউসুফ খাঁ বাহাদুরের মৃত্যু।—পার্লামেণ্টের সভ্য মিঃ জন উইলসন ও মেজর জেনারল আর. রবার্টসের মৃত্যু।—বড়লাট সভায় বজেট পাস হইয়া যায়।—বোম্বায়ে জোরেষ্ট্রিয়ান কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। ডুবাস্‌ টালা সভাপতি।—বিখ্যাত গ্রন্থকার বিহারীলাল রায়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল।

১২ই—রাওলপিণ্ডিতে এক দরবারে পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুর বক্তৃতা করেন।

১৩ই—বাঁকিপুরে 'অল্ ইণ্ডিয়া বৈদিক এণ্ড ইউনানী টিব্বি' প্রদর্শনী খোলা হয়।—তদুপলক্ষে এক কন্‌ফারেন্স্ বসে।—দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর সভাপতি।—বাঙ্গালোরে এক এঞ্জিনীয়ারিং কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়।

১৪ই—কলিকাতা মাড়ওয়ারী এসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশন। "ন্যাশনাল কাউনসিল অফ এডুকেশনে"র পারিতোষিক বিতরণ। —কুমারখালীতে নদীয়া জেলার সাহিত্যিক কন্‌ফারেন্স্। শ্রীচন্দ্রশেখর সেন সভাপতি।

১৫ই—কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ৬৩ বার্ষিক অধিবেশন। মহারাজাধিরাজ বিজয় চন্দ্ মহতাব্ বর্দ্ধমানাধিপতি সভাপতি।—বাঙ্গালোরে এক সিটি মিউনিসিপ্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল কন্‌ফারেন্স্ বসে।

১৬ই—রাণাঘাটের প্রাচীন ডাক্তার দীননাথ বসুর মৃত্যু।

১৭ই—লাহোরের "পঞ্জাবী" পত্রিকা দৈনিকে পরিণত হয়।—লর্ড রথ্‌স্‌চাইল্ডের মৃত্যু।

১৮ই—বিলাতের অনেকানেক বড়লোকের বাটীতে মদের ব্যবহার স্থগিত হয়।—বার্লিনে বিসমার্ক "সেন্‌টেনারী" উৎসব হয়।

১৯এ—গোরখপুরে ইউ. পি.র পলিটিক্যাল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন। এনী বেসাণ্ট সভাপতি।

২০এ—করিমগঞ্জে সুর্মাভেলী মিনিস্‌টেরিয়াল অফিসার্স কন্‌ফারেন্স্ বসে। রায় সাহেব রুক্মিণীকান্ত গুপ্ত সভাপতি।—সাঁইথিয়ায় ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর অধিবেশন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি

সভাপতি।—কৃষ্ণনগরে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্ফারেন্সের অধিবেশন। শ্রীমতিলাল ঘোষ সভাপতি।—বর্দ্ধমান সাহিত্যিক কন্ফারেন্সের অধিবেশন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি।—বহরমপুরে অল-বেঙ্গল মোক্তার্স কন্ফারেন্সের অধিবেশন।—ছাপরায় বেহার প্রভিন্সিয়াল কন্ফারেন্সের অধিবেশন। মিঃ নন্দকিশোরলাল সভাপতি।—বগুড়ায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্ফারেন্স বসে। কাকীনার রাজাবাহাদুর সভাপতি।—গোরখপুরে ইউ. পি. ইন্‌ডষ্ট্রিয়াল কন্ফারেন্সের অধিবেশন। রায় বাহাদুর প্রাগনারায়ণ ভার্গব সভাপতি।

২১এ—মান্দ্রাসে গুটুর প্রভিন্সিয়াল কন্ফারেন্সের অধিবেশন,—মান্দ্রাসে ভিজাগাপত্তম্ প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশন।—চেতলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অন্নদাচন্দ্র দত্তের মৃত্যু।

২২এ—জব্বলপুরে সি, পি. ও বেরার কান্যকুব্জ কন্ফারেন্সের অধিবেশন। শ্রীকুঞ্জবিহারী লাল মিশ্র সভাপতি।—'ইণ্ডিয়ান প্লান্টার্স গেজেটের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ হ্যারী এবটের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল।

২৫এ—প্লীডার সিপ্ ও মোক্তারসিপ্ পরীক্ষার ফল বাহির হয়।—হরিদ্বারে গোবর্দ্ধন মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংস্কৃত সাহিত্যিক কনফারেনস্ বসে।

২৫এ—"ইণ্ডিয়ান্ উইটনেসের" সম্পাদক মিঃ জে ক্রসবীর মৃত্যু।—মেজর জেনারেল সি, গ্রীফিথ্‌সের মৃত্যু। খাঁ বাহাদুর মৌলভী সৈয়দ দিলওয়ার হোসেন আহমেদ সাহেবের মৃত্যু।

২৬এ—হরিদ্বারে অল ইণ্ডিয়া কন্ফারেন্সের অধিবেশন। মাননীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতি।—বিসপ মুরহাউসের মৃত্যু।

২৭এ—হরিদ্বারে অখিল ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্ম মহা-সম্মিলন হয়। মাননীয় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর সভাপতি।

২৮এ—শ্রীজওহাইর সিং চন্দ্রবংশীয় রাওয়ানী জাতীয় সভার সভাপতির মৃত্যু।—পানিহাটী ক্লবের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন।

২৯এ—জেনারেল লোমারের মৃত্যু।—দিনাজপুরের সেসনস্ জজ্ মিঃ বি, ভি, নিকলের মৃত্যু।—হায়দ্রাবাদের "প্রভাত" সম্পাদকের মানহানি করার ২০০৲ টাকা জরিমানা হয়,—হরিনারায়ণপুর-হাটে (নোয়াখালী) এক কৃষি-প্রদর্শনী খোলা হয়।

৩০এ—বোম্বায়ের "আজ দি পক্ষ", "খাঁ বাহাদুর পক্ষ", ও "সন্দেশ"কে জামিন দিতে হয়।—কলিকাতা ডিস্‌ট্রিক্ট্ চ্যারিটেবল সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশন।—মিঃ এফ, মোনাহান সভাপতি।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত মৃত্যুঞ্জয় প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আমার ভ্রমণ—প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ প্রণীত পরিণীতা প্রকাশিত হইল; মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত পরলোক ও হুগলী প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত গোধন প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল; মূল্য ২॥০।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত সর্ব্বজন-প্রশংসিত নাটক 'মিশর মণি ক্লিওপেট্রা' আসামী ভাষায় অনূদিত হইতেছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আমার য়ুরোপ-ভ্রমণ বহুচিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; আর্ট কাগজে ছাপা, বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট; মূল্য ১০৲ পাঁচ সিকা মাত্র।

সুলেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত, বামড়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা সার বাসুদেবের জীবনচরিত যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রত্নদীপ প্রকাশিত হইতেছে; একমাসের মধ্যেই বাহির হইবে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন-মহাশয়ের 'প্রবাস চিত্রের' তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ; এই মাসেই প্রকাশিত হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjee,
of Messrs. Gurudas Chatterjee & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—BEHARY LALL NATH,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.